২৫

প্রকৃতি ও মানুষ

শ্রীমনীন্দ্র দত্ত

ঊষার আকাশ··· স্তব্ধ···স্থির··· সৃষ্টির প্রথম ঊষার মত।···কলা গাছের পাতা হতে শিশির পড়ছে টপ্ টপ্···ঝিঝি ডাকছে অবিরাম···একটা পাখী ডাকছে কু—কু—

কি খেয়াল হলো, বন্ধু ডেকে তুলে বল্লো সেই ভোরেই : চল্, বেড়িয়ে আসি মাঠে।

জানি, আপত্তি তোলা বৃথা, তাই পথে নাম্লাম।...মেঠো পথ···দুদিকের ধান খেত ক্রমে কুয়াসার সাগরে মিলিয়ে গেছে···

একটা গল্প বল্ না নারাণ : বন্ধু বল্লো চল্তে চল্তেই ·········

বাইরের ইন্দ্রিয় এখন এত ব্যস্ত যে সত্যাই স্মৃতির দ্বারপথে কোন গল্পকেই এনে হাজির ত করতে পারবো না।

হেসে বন্ধু দিলো জবাব : সে কিরে নারাণ, তুইত বলিস, সব মানুষেরই জীবন একটা বিরাট গল্প-উৎস, এর জন্য ত আর স্মৃতির বাঁধা পথে ঘুরে মরতে হবে না।

যা বলেছিস্ উদয়, তা সত্য, কিন্তু মানুষের জীবন-ইতিহাসের যত পাতাই তুই উল্টে দেখবি, পাবি শুধু একই কথা : জীবনের সুচির ব্যর্থতার কথা...মানুষের সহস্র ব্যথা ও বেদনার কাহিনী। তাই বল্ছি, এই প্রভাতেই মনে একটা ব্যথার পরশ লাগিয়ে, এমন রাঙা শরতের সারা দিনটাকেই দিবি নষ্ট করে?

বন্ধু বল্লো : ব্যথাই যদি হয় জীবনের অধিকারের পাওনা, তবে তাকে অস্বীকার করে বোঝা ভারী করার চাইতে সে ব্যথাকে সাদরে বরণ করে নেওয়াই উচিত।···তর্ক রাখ্, গল্প তোকে বল্তেই হবে। তুইত জানিস্, তোর মুখে গল্পের রস যেমন ঘনিয়ে ওঠে, এমন আর হয় না—অজানিতেই একটা দীর্ঘশ্বাস এলো : সেও এমনি কথাই কইতো—

কে রে নারাণ?

চম্কে উত্তর দিলাম : মাধবীকে তোর মনে পড়ে উদয়? অবহেলার সুরে উত্তর এলো : খুব, আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি নারান, যে মাধবী বৌদির মনে ছিলো এত বিষ। তবু তাকে আমি কোন দোষ দেই না। রূপ ছিলো তার যথেষ্ট, ছিলো রূপের গর্ব্ব, অথচ ছিলো না গুণের বালাই, তার উপর বাপ মায়ের স্নেহের দুলালী : কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার ওর ছিলো পূর্ণ মাত্রায়, তাই সে অহঙ্কারে যখন লাগলো আঘাত; তখন সে হ'লো একটা শয়তানী : এ ত খুব স্বাভাবিক উদয়!

তবু নারাণ, একই রাতে তিনটি পানপাত্রে বিষ মেশানো, একি কোন মেয়ে মানুষে পারে?

মনে পড়ে সেই রাতের কথা। মনে পড়ে : দুটি বিয়ে করেছিলাম : প্রাণের টানে আর কর্ত্তব্যের টানে। শান্তির প্রাণের পরশ আমায় নিয়ে গেলো তার পাশে, তার ভালোবাসাকে অস্বীকার করতে পারলাম না। আবার বাপ্ মায়ের অনুশাসনে বিয়ে করতে হলো মাধবীকে।···শান্তির ছিলো না রূপ, ছিলো রুচি ও শিক্ষা; আর মাধবীর ছিলো রূপ, ছিলো অহঙ্কার, কিন্তু ছিলো না শিক্ষা ও মনের উচ্চতা।······যা স্বাভাবিক—ফল তাই দাঁড়ালো : শান্তির শ্যাম শোভা আমায় নিলো টেনে মাধবীর রূপালী পরশ হতে অনেক দূরে! চিন্তায় বাঁধা দিলো উদয় : হঠাৎ থাম্লি যে?

হ্যাঁ—তবু আমার একটা সান্ত্বনা এই যে শুধু রক্তের কামনায় এত বড় একটা কাজ সে করেনি।

বলিস কি নারাণ, এ যে ওর অতৃপ্ত দৈহিক লালসারই প্রচণ্ড আত্মপ্রকাশ।

দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলাম : না, আমার চেয়ে বেশী করে তুই তাকে চিনতি না। কিন্তু উদয়, কি যে ও চাইতো, কেন সে এত বড় শয়তানী তোদের চোখে ও হয়ে দাঁড়ালো, আমিই তা ঠিক বুঝতে পারি না, ও সত্যি একটা রহস্য।···তবে আমার মনে হয় উদয়, সব মানুষেরই একটা জন্মগত সংস্কার থাকে যার অতৃপ্তি সে সইতে পারে না কোনমতেই। মাধবীর ছিলো কর্ত্তৃত্বের অন্ধ সংস্কার, কিন্তু সে সংস্কারে যখন লাগলো আঘাত—সংসারের কর্ত্তৃত্ব রইলো মা'র কঠিন হাতে, আর প্রাণের কর্ত্তৃত্ব সহজেই উঠলো যেয়ে শান্তির হাতে—ওর রুদ্ধ অহমিকা মরিয়া হয়ে উঠলো তাই,··· ও সাজলো মণিহারা ফনিণী···একই রাতে মিশালো ওর নিজের, শান্তির ও আমার চায়ে।

একটা দীর্ঘশ্বাস এলো বুকের তল হতে। উদয় এবার বল্লো : ভাবলেও গা শিউরে ওঠে নারাণ। সিনেমা থেকে এলি তিনজন এক সাথেই। ও করলো চা, তাতে মিশালো বিষ—তীব্র বিষ। শান্তি বৌদি পড়লো যেয়ে বিছানায় একটা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে, আর উঠলো না; মাধবী বৌদি নিজের ঘরে বিয়ের চেলী পরেই মরলো—

বাঁধা দিয়ে বল্লাম : আর অভাগা আমি, সে চায়ে চুমুক দেবার মত অবসরই হলো না, একটা গল্পের সমাপ্তি নিয়ে তখন এমনি ব্যস্ত আমি ছিলাম।

উদয় বল্লো : ভাগ্যিস, গল্প লেখার তোমার অভ্যাস ছিলো—

দুই বন্ধুই এর পর নীরব। দুই প্রাণের

সাহিত্য পরিচয়

ইষ্টিশান—সুকোমল বসু।

প্রকাশক—সুভো ঠাকুর (ফিউচারিষ্ট পাবলিশিং হাউস)।

সুকোমল বসু আজ সাহিত্যামোদীদের কাছে সুপরিচিত। বর্ত্তমানে দেহবাদী কবিদের সাহিত্যক্ষেত্রে এই ব্যভিচার হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে পারা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তাঁহার কবিতায় আধুনিকতার নিকষ চিহ্ন না থাকিলেও তিনি প্রাচীনপন্থী এ আখ্যা দেওয়া চলে না।

কবির কাব্য-রচনা প্রণালী নিজের। প্রাচীন পন্থা কাব্যের চিরন্তন পন্থা, তাহারই উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া কবির মৌলিকত্ব এবং বিশেষত্ব জলজলে জড়োয়া গহণা পরিয়া আপন সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া পাঠকগণের চক্ষের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে।

বর্ত্তমান যুগে, বিশেষ কর্ম্মবিহীন শিক্ষা-প্রাপ্ত ও শিক্ষাপ্রাপ্তা কবিত্ববর্জ্জিত বহু কবি সমাকুল-যুগে লেখকের এই পুস্তক সত্যই আদৃত হইবার কথা। কবিতার যে রসবোধ ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আকাঙ্খা ও প্রেরণা আদি-কাল হইতে যুগ পরম্পরায় বিশ্বের কবি অন্তরের উপজীব্য, তাহাই এই স্বভাবসিদ্ধ কবিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

এ যুগের কবি তিনি, দেহবাদী কিংবা দেহতাত্ত্বিক নহেন। তাঁহার কবিতা অজ্ঞাত-লোকের প্রেরিত নিগূঢ় সত্যে মুহ্যমান, বরং অদৃষ্টবাদের পরিপন্থী। তাঁহার কবিতা-পুস্তক পাঠ করিবার সময় প্রথম পৃষ্ঠায় যাহা আমা-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহাই তাঁহার সব কবিতার উত্তর এবং নিছক করুণ সত্য; তাই এমন করিয়া লিখিতে পারিয়াছেন।—

"আমার মাটীর পৃথিবীর পিঠে
জীবনের ভাঙ্গা সাঁকো
নীচে বহে চলে মরণের নির্ঝর
বন্ধুর-পথে দুর্গম বাধা দাঁড়ায়েছে লাখ লাখ
প্রাণ ধারণের মরুভূমি দুস্তর।"

তবে এইটুকু তাঁহার সম্বন্ধে বলে রাখা নিতান্ত আবশ্যক যে নেহাৎ কিশোর বয়সের কবিতাগুলি ছাড়া অন্য সব কবিতাগুলি প্রায় এক পথ দিয়া চলে এবং বাচনের মশলা ও ব্যঞ্জনের সরঞ্জাম একই জিনিষ দিয়া। কবির 'কবর', 'যাযাবর', 'বন্ধ্যাব্যথা', 'ইষ্টিশান' প্রভৃতি কবিতাগুলি সত্যই পড়িবার মত,

---

চির-নীবব আত্মা যেন ওদের চারপাশের বাতাসকে স্তব্ধতায় ভারি করে তুললো।… নারাণ এক সময় বললো দূরে শ্মশান চিতায় চোখ রেখে: ওইখানেই উদয়, একদিন তাদের দেহলতাকে ছাইয়ে ঢেকে দিয়ে গেছি! সেদিনও যখন ওদের চিতায় জল ঢেলে বাড়ী ফিরি তখনও এমনি প্রভাত-সূর্য্য উঠেছিলো ভাটীপুরের শ্মশান-প্রান্তরের বুক ভরে…নদীর জল উঠেছিলো চিকমিক করে;…আজও তেমনি আলোর ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে…নীচের জল তেমনি চিকমিক করছে…কিন্তু আমি শুধু ভাবছি: এ আলোর রেখার মূল্য মানুষের জীবনে কতটুকু…ব্যথা ও ব্যর্থতার ঘন-আঁধার যেখানে পেতেছে স্থায়ী আসন…প্রকৃতির এ আলো-খেলা… হাসি-আনন্দ… সেখানে শুধু বিরাট ব্যর্থতাই গুমরে মরে…জীবন-দেবতার আরতি তাতে হয় না ত কভু…হয় বুঝি শুধু বিসর্জ্জনের ব্যথা-উপচার…জীবন আসনে ব্যর্থতার সুস্থায়ী আবাহন!……

খেয়ালী

মনে রাখিবার মত, জীবনের ইতিহাসের পাতার সহিত মিলাইয়া দেখিবার মত।

'ইষ্টিশান' কবিতায় 'ওমরের' পান্থশালার মত জগৎটাকে ইষ্টিশান ভাবিয়া বলিয়াছেন।

"এ সারা পৃথিবী সেও'ত নিছক ইষ্টিশান
যাত্রী আমরা অপেক্ষামান, পথ যে বাকি
রহস্য-ধূমে ঝাপসা হ'য়েছে দৃষ্টিখান
পড়ে আছে পথ অসীমের বুকে মুখটী ঢাকি।"

তাই তিনি বিদ্রোহী বেপরোয়া হইয়া অন্য একস্থানে বলিয়াছেন।—

"পিছে যাহা পড়ে থাক সামনের যাহা কিছু
তাও সব থাক আজি ভুলিয়া
আজকের যাহা কিছু তাই সখি ভ'রে তোল
কিবা লাভ বাজে কথা তুলিয়া!"

তারপর জীবনের যাহা চিরন্তন সত্য তাই মনে পড়িয়া যাওয়াতে বলিয়াছেন।—

"আজিকার নিঃশ্বাসে কাল কিবা বিশ্বাস
আজিকার এ'বুকের ঝঞ্ঝা
কালি এটা থেমে যাবে হয়ত শুচির তাপে
আজি তাই কেন চাহে মন যা!"

এইখানে কবি চরমে পৌঁছিয়াছেন।—

"উপাধানে কিবা কাজ; তব বুকে রাখি' মাথা
শুনি আজি ও-বুকের ক্রন্দন
শুনি আজ মিলনের ঝঙ্কৃত উচ্ছ্বাস
তারই তলে বিরহের ক্রন্দন!"

সপ্তম রিপু—প্রহসন।

লেখক—শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র নাথ মজুমদার

প্রকাশক—শ্রীপরেশ নাথ বসু। কোহিনুর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্। ১০৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

ভূমিকার মারফৎ জানা যায় যে 'সপ্তম রিপুর' লেখক প্রহসন লেখায় সিদ্ধহস্ত। লেখকের অন্যান্য প্রহসনও বেতারে অভিনীত হয়েছিল এবং আলোচ্য প্রহসনখানা মানব স্মৃতি মন্দির কর্ত্তৃক অভিনীত হয়েছে। সোৎসাহে সপ্তম রিপুখানা পড়তে সুরু করলাম। তিনি কালিতে ছাপা ঝরঝরে বইখানা যেমনই মন আকৃষ্ট করেছিল তেমনি নিরাশ হ'তে হ'ল বইটার কয়েক পাতা শেষ ক'রে। লেখকের ভাষার মতই চরিত্রগুলি বোকা-বোকা। পরিপাট্যহীন অসংলগ্ন কথার টুকরো দিয়ে পাতার পরে সাজানো।

যেখানেই লেখক হাস্যরসের সৃষ্টি করতে গেছেন সেখানে নিজেই অনুকম্পার পাত্র হ'য়ে পড়েছেন।

পিতাপুত্রের সহজ সম্বন্ধ ঠিক ধারণাও লেখকের নাই, একটি চরিত্রের মুদ্রা দোষের পুনরুক্তি হাসির সৃষ্টি করে বটে কিন্তু সে হাসির উদ্রেক-কারী লেখকের ভাঁড়ামির প্রচেষ্টা, এমনি একটা প্রহসন প'ড়ে ক্ষোভ হয়, পক্ষান্তরে এটুকু আনন্দ হয় এই ভেবে যে, এই লেখকেরই লিখিত কয়েকটি প্রহসন কলিকাতার জনসাধারণের তুষ্টির জন্য অভিনীত হ'য়েছিল।

—
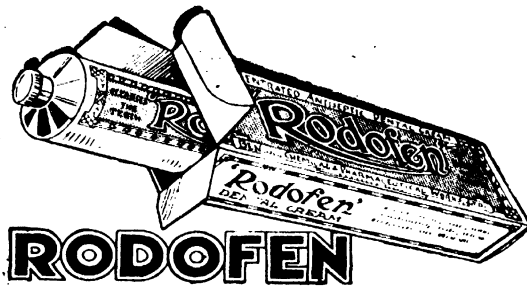
রবীন্দ্রনাথ আর একবার

শ্রীশেফালেন্দু বসু

সত্যদ্রষ্টা বলেন যে প্রাণীজগতে লক্ষ কোটী জীবের স্বাতন্ত্র্য অনন্ত রূপে; আত্মার দিক দিয়া ইহারা এক। সৃষ্টির আদিতে সব একাকার ছিল। তারপর কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্তে ইহারা পৃথক রূপ লইয়া জগতের বুকে জীবলীলা আরম্ভ করিয়াছে তাহা কেহই জ্ঞাত নহে।

রবীন্দ্রনাথ এই একাত্মতার সত্যটি অতি গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন এবং সেই জন্যই তিনি প্রকৃতির প্রাণ প্রবাহের সঙ্গে নিজেকে এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত করিয়া দিতে পারিয়াছেন। অনন্ত আত্মা নিখিল বিশ্বের মধ্যে আপনাকে অনন্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের আত্মার সঙ্গে তাহার সত্যকার বিচ্ছেদ নাই—ছন্দ সুরের ছবিতে ছবিতে তিনি এই তথ্যটিই বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই যে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলাইয়া গান গাওয়া, ইহার মূলে শুষ্কমাত্র কল্পনা নাই; ইহার মূলে রহিয়াছে সত্যকার অনুভূতি, সত্যকার উপলব্ধি। একাত্মতার অনুভূতিটি অতিমাত্র সত্য বলিয়াই কবি একদিকে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে সামাজিকতা রক্ষা অতি নিষ্ঠার সহিত করিয়া থাকেন, তেমনি মানুষের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার গোষ্ঠী, সমাজ, দেশ, তাহার বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—সকলের সঙ্গে তিনি আন্তরিকভাবে যুক্ত থাকিতে পারেন।

অর্থাৎ যিনি সকলের মূলে পৌছিয়াছেন, বিশেষ কোন বস্তুসমষ্টি তাহার দৃষ্টিকে আর বাধা দিয়া রাখিতে পারে না। রজনরশ্মি যেমন সমস্ত বস্তুকে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, কবির সহানুভূতিও তেমনই সমস্ত বস্তুকে ভেদ করিয়া চলে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দ্রষ্টা বলিলে তাহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয় না; তিনি একজন মহৎ শিল্পী। বিশ্ব-শিল্পী যেমন আনন্দ হইতে বিশ্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনই তাহার অনুভূতির আনন্দ হইতে রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ইহাকে বলিয়াছেন 'রস-বেদনা'। অনুভূতির আনন্দ প্রবল হইলে সেই আনন্দ ক্রমে বেদনায় পরিণত হয়; তখন শুধু শুনিবার অথবা দেখিবার নয়, শুনাইবার এবং দেখাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই রস-বেদনার দ্রষ্টা স্রষ্টার আসনে বসেন। দার্শনিক হন তখন শিল্পী। তখন তিনি যে-রস উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা ছন্দ এবং সুরের সুষমায় রূপান্তরিত করিয়া তোলেন। যে-ভাব, যে-আনন্দ আমাদের মনকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করিয়া যায় অথচ যাহাকে ধরা যায় না, তিনি তাহার একটি সুসম্পূর্ণ মূর্ত্তি গড়িয়া আমাদের স্পর্শের যোগ্য করিয়া তোলেন। অর্থাৎ বিশ্ব-স্রষ্টার সৃষ্টির সঙ্গে কবির সৃষ্টি যুক্ত না হইলে জগতের অধিকাংশ সৌন্দর্য্য আমাদের দৃষ্টি গোচরই হইত না।

অসীম নিরন্তর আপনাকে সমর্পণের মধ্যে প্রকাশ করিতেছে এবং সসীম নিরন্তর অসীমের মধ্যে বিলুপ্ত হইতেছে। নর-নারীর মিলন বিরহে কবি এই অসীম এবং সসীমের বিরহ-মিলনের ছবি দেখিতে পাইয়াছেন। সেই জন্যই কবি মানব-হৃদয়ের ক্ষুদ্রতম অনুভূতিও মহৎ করিয়া দেখিয়াছেন; তাহার অঙ্কিত চিত্রগুলিতে আলো ছায়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্যও প্রতিফলিত হইয়াছে। কবির কাব্য পাঠ করিবার সময়

প্রতিপদে কল্পনা ও ভাবের বিস্ময়ে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে হয়। মন যাহার জন্য প্রস্তুত থাকে না, তাহাই মনকে বার বার সচকিত করিয়া তোলে। কিন্তু বিস্ময়ে ইহার শেষ নহে; ইহা মনকে পবিত্র করে, স্নিগ্ধ করে, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাকে এমন এক মহিমাময় কল্পনারাজ্যে লইয়া যায়, যেখানে গ্লানি নাই, পঙ্কিলতা নাই, ধরণীর ধূলি যে-স্থান স্পর্শ করিতে পারে না। সে যেন ভাব-রসের মহাসমুদ্র—মন তাহার গহন গভীরতায় নিমজ্জিত হইয়া অনন্ত অধিকারী হয়।

জগতের লক্ষ প্রকার অজ্ঞাত পথ তাঁহার অনুকম্পার আলোক সম্পাতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কবি সেই পথে আমাদিগকে পৌঁছাইয়া না দিলে আমরা তাহার সন্ধান পাইতাম না। আমাদের কল্পনাকে তিনি অসীমে বিস্তার করিয়া দিয়াছেন; আমরা তাঁহার চোখে সুন্দরকে দেখিতে চিনিয়াছি।

কিন্তু ইহা গেল হৃদয়ের পথে আনাগোনার কথা—সত্য দৃষ্টিতে তথ্য সৃষ্টির কথা। এখানে কবি নিজেকে বিশেষ করিয়া ধরা দেন নাই। শিল্পের আড়ালে শিল্পী লুকাইয়া আছেন; কিন্তু মানব-জাতি এবং পূর্ণ-মনুষ্যত্বের জন্য কবির যে অনুকম্পা সমবেদনা এবং দরদ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি সেখানেই নিজেকে সম্পূর্ণ করিয়া ধরা দিয়াছেন। সমস্ত মানব জাতিকে তিনি অখণ্ডরূপে দেখিয়াছেন। যিনি দ্রষ্টা তিনি সত্যের বিশেষ রূপের মধ্যে সত্যের বিশ্বরূপকে উপলব্ধি করেন। ব্যক্ত এবং অব্যক্তকে তিনি সমানভাবে দর্শন করেন। যে সত্য ভবিষ্যতে বিশেষরূপে প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করিতেছে সে-সত্যকেও তিনি দেখেন। সেইজন্য যে-কাল আমাদের নিকট অনাগত, দ্রষ্টার নিকট তাহা অনাগত নহে। তিনি অনুভূতি এবং অনুকম্পার পথে দেশ এবং কালকে অতিক্রম করিয়া বিচরণ করেন। এবং সেই কারণেই দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের আদর্শের উদার মহিমায় আমরা অভিভূত হই। প্রয়োজনের খাতিরে তিনি আদর্শকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সঙ্কীর্ণ করিতে পারেন না। অখণ্ড জিনিষকে খণ্ড করিলে অসীমের সঙ্গে তাহার মিলন ব্যাহত হয়।

এই বিশ্বছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলাইবার জন্য কবির প্রাণ কাঁদিয়াছে। সেই জন্য মানবজাতি এবং মানবতার জন্য তাহার যে অনুকম্পা ও দরদ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা কোন বিশেষ জাতি বা মানবে আবদ্ধ হইয়া রহে নাই। তাহা কোন বিশেষ কাল বা ক্ষেত্রের মধ্যেও নাই। যিনি সমস্ত মানবজাতিকে অখণ্ডরূপে দেখিয়াছেন তাহার পক্ষে সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখা সম্ভব নহে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে যে প্রাণের ঐশ্বর্য্য আছে, তাহার বিকার যেখানেই দেখিয়াছেন সেখানেই তিনি তীব্রতম বেদনা অনুভব করিয়াছেন। কি স্বদেশে, কি বিদেশে—তিনি সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এবং বাধামুক্ত আনন্দের পথটি আবিষ্কার করিয়া মনুষ্যত্বের পূর্ণ উদ্বোধনের কাজে লাগিবার জন্য দ্বারে দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিয়াছেন। দৈন্যের লজ্জা তাঁহাকে পীড়িত করিয়াছে। ভারতবর্ষ একদিন দারিদ্র্যকে ভূষণ করিতে পারিয়াছিল, কেননা অন্তরের ঐশ্বর্য্যে সে ধনী ছিল। কিন্তু আজ তাহার সে ঐশ্বর্য্য নাই, এই জন্য সে দারিদ্র্যের জন্য লজ্জিত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে যে অমূল্য সম্পদ দান করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিবার যোগ্যতা আমরা যুগে যুগে লাভ করিব। বিশ্বের রহস্যের মত তাঁহার সৃষ্টির রহস্য আমাদিগকে চিরদিন মুগ্ধ করিবে। *

* রেডিয়োতে পঠিত 'কথার' সারাংশ

চালিয়াৎ

একাঙ্ক কথা-চিত্র

মণী ঘোষ

শীতের দিকের একটা অপরাহ্ণ। পরলোকগত ব্যারিষ্টার মিষ্টার সেনের বাড়ীর দোতলার একটা কক্ষ। মাঝখানে সাদা চাদর পাতা একটা লম্বামত টেবিলে গুটি তিন চায়ের কাপ ও একটা প্লেটে কিছু আফ্‌টার-নুন টি' বিস্কুট। কোণের দিকে একটা ছোট মত ড্রেসিং টেবিল,—তাতে রয়েছে একটা ব্রাস ও চিরুণী,—একটা চিনেমাটির সুদৃশ্য ফুলদানে গুটি কয়েক শ্বেতপদ্ম ও রজনীগন্ধার ঝাড়। টেবিলের চারদিকে চেয়ার।

উত্তর দিকে একটা পর্দা অর্দ্ধ তোলা দরজা,—সেখান দিয়ে চোখে পড়ে একটি সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমের খানিকটা। মিষ্টার সেন মারা যাবার পর ওঘরে কেউ একটা বড় বসে না, উপরি উক্ত ড্রাইনিং রুমটাই বসবার জন্যও ব্যবহৃত হয়। পুবের দিকের আর একটা দরজা দিয়ে অন্দরের বারাণ্ডার খানিকটা চোখে পড়ে। বারাণ্ডার গায়ে একটা আয়না সহ হ্যাটষ্ট্যাণ্ড।—

ড্রয়িংরুমের দিকে মুখ করে মিসেস সেন বসে আছেন। বয়েস তার আটাশ থেকে ত্রিশের ভেতরে। মুখখানা বেশ সুন্দর, তবে তাতে এরিষ্টোকেসির একটা কড়া ছাপ সর্ব্বদাই লেগে থাকে। হাসলে ওকে আরো সুন্দর দেখায় বোধ হয় তার সুপরিমিত হাঁ করার কল্যাণে। মাথার চুল সাবান বা শ্যাম্পুর দৌলতে লাল্‌চে ও রুক্ষ। পরণে ছাই ছাই রঙের একখানা সিল্ক শাড়ী আধ ইঞ্চি রূপালী জরীর পাড় বসান; শাড়ীর রঙের ব্লাউস, তার ডান হাতে শাদা সুতোয় তোলা একটি পদ্মের কাজ, ও হাতেই একটী মাত্র সোনার রুলী, বাঁ হাত খালি।

টেবিলের আর এক ধারে মিষ্টার সেনের—অর্থাৎ সেন সাহেবের প্রথমা স্ত্রীর বড় মেয়ে তমালিকা সেন,—সর্ট-এ তমু সেন। থার্ড ইয়ারের কলেজিয়ান গার্ল। বেশ মোটা সোটা গোলগাল চেহারা, একটু মোটার ধাত আছে তবে অসম্ভব মোটা নয়। রংটা একটু কালো, তবে সেটা সমস্তটাই স্বাভাবিক,
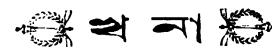
য়ো পাউডারের ছোঁয়াচ আছে বলে মনে হয় না। মাথায় কোন সিঁথী নেই, সবটাই টেনে উল্টে ব্যাক্‌ব্রাস করে একটা লুজ খোঁপা বাঁধা। চুলগুলো মিসেস সেনের মত রুক্ষ নয়, তেল মাঝে মাঝে পড়ে। গলায় সরু একটা চেনহার দোপেচা করে জড়ান প্রায় কোল অবধি ঝুলে পড়েছে। পরণে একটা চওড়া কালো পেড়ে মিলের শাড়ী ও লাল রঙ্গের হাতকাটা খদ্দরের ব্লাউস। বয়েস উনিশ কি কুড়ি। বয়সানুপাতে একটু গম্ভীর হলেও চোখের দিকে তাকালেই ওকে ভালো লেগে যায়—ভারী সুন্দর চাউনিটি তার. তা' ছাড়া সব নিয়ে মোটমাট বেশ একটু লাবণ্য আছে চেহারায়। টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কি একটা বই পড়ছে।

দক্ষিণের দিকের জানালার পরদা ধরে রাস্তার দিকে চেয়ে ছোট মেয়ে রমু—ওরফে রমলা সেন। বয়েস পনের ষোলর ভেতরে, ভালো নাচে বলে কোলকাতায় ওর নাম জানে সবাই। শরীরের গড়নটি ভারী সুন্দর, বোধ হয় নাচে বলে। সাজ পোষাকে রমু মিসেস সেনের দ্বিতীয় সংস্করণ। মুর্শিদাবাদ সিল্কের জংলা শাড়ী ও ব্লাউস। মুখের সঠিক রং বলা কষ্টকর—টয়লেটের ছাপ বেশ সুস্পষ্ট। ঠোঁট দুটি অদ্ভুত রকম লাল, হঠাৎ দেখলে পান খেয়েছে বলে ভ্রম হয়, কিন্তু মুক্তার মত সাদা দাঁতে পানের চিহ্নমাত্র নেই। অনেকে বলে রমু সেন নাকি লিপ্‌ষ্টিক্ মাখে।

কোঁকড়া কোঁকড়া থোকা থোকা চুল খুব বেশী লম্বা নয়, পেছন থেকে দুভাগ করে কাঁধের দুপাশ দিয়ে সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। চুলগুলো দেখলেই মনে পড়ে "আঙ্গুর দোলান অলকে তোমার" ইত্যাদি। চোখে মুখে একটা অপরিমিত চঞ্চলতা সর্ব্বদাই বিরাজ করছে। কাজে অকাজে হেসে লুটিয়ে পড়া ওর একটা অভ্যাস।

রমলা। (জানালা থেকে সরে এসে হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) নাঃ, সাড়ে পাঁচ্‌টা বাজ্‌তে চলল রতনবাবু এখনও এলেন না। কি অন্যায়? ..আজকে 'ফিগ্‌লিফ্' দেখতে যাবার কথা বলে দেওয়া হল একশবার করে। (দরজায় ঘা পড়ল) ঐ বোধ হয় এলেন (নিজের সাজ পোষাকের উপর তাড়াতাড়ি হাত বুলিয়ে নিয়ে ব্যস্তভাবে এদিকে ওদিকে চেয়ে) বারে! আমার ভেনিটি ব্যাগটা কোথায় গেল?

মিসেস সেন। রতনই বোধ হয় এয়েছে। তমু, তুমি কি ঐ কাপড়েই যাবে নাকি? (নিজের কাপড়ের ভাঁজ ঠিক করে নিয়ে) কাম্ ইন্ প্লিজ্।

"রতন নয় আমি"; বলতে বলতে সুজিৎ বোস ঘরে ঢুক্‌ল। সুজিৎ সুশ্রী দর্শন যুবক, বয়েস বছর ত্রিশেক হবে। কোল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এম, এ' 'ল' দুই হয়ে গেছে। এখন আছে বিলেত যাবার চেষ্টায়। বাপ ছিলেন কোল্‌কাতার নামকরা ডাক্তার বেশ কিছু রেখে গেছেন ছেলের জন্যে, তার ভেতরে ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ী আর মাষ্টার বিউক্ গাড়ী অন্যতম। তার ওপরে চেহারাও এরিষ্টোকেট্ সুলভ ও হেল্‌দি। চুল ঈষৎ কোঁকড়ান ব্যাক্‌ব্রাস করা; মুখখানা একটু লাল্‌চে ধরণের, বাঙ্গালী ছেলের বড় একটা দেখা যায় না। এসব ছাড়াও কথা বলার একটা নিজস্ব কায়দা ওকে মেয়ে মহলে খুব পপুলার করে তুলেছিল। একটা অদ্ভুত মিষ্টতা থাকত ওর কথা বলার ধরণে।

সুজিৎ। আপনাদের বিরক্ত করলুম কী?

রমলা। (নাচের ভঙ্গিতে সুজিতের কাছে ছুটে গিয়ে) হাউ সুইট্, সুজিৎদা আপনি? কি মিষ্টি, আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে 'ফিগ্‌লিফ্' দেখ্‌তে? আপনি আসেন না কেন বলুনত? আমরা রোজ মনে করি সুজিৎদা আসবেন—আর একদিনও আসেন না, আর আজকে কিনা একদম—মনে করিনি, আজকেই এসে পড়লেন (সুজিতের গা ঘেঁসে দাঁড়াল)

সুজিৎ। (ছোট্ট মেয়ের মত রমলার চুল নেড়ে দিয়ে) ঐত আমার দোষ রমু, মানুষ যখন আমাকে একদম চায় না, ঠিক সেই সময়েই কিনা আমি এসে হাজির হই।

রমলা। ওমা! আমি বুঝি দোষের কথা বল্লুম। কী ভয়ানক কথা ঘুরোতে পারেন আপনি সুজিৎদা!

সুজিৎ। (রমলার কথায় কান না দিয়া) আপনারা কি আজ সিনেমায় যাচ্ছেন মিসেস সেন—? তাহলে বরঞ্চ আমি সরকারদের ওখানেই একবার।...

তমালিকা। (সুজিৎ এলেই বই বন্ধ করে সুজিৎকে একমনে লক্ষ্য করছিল) কে সরকার? ও মাধবীদের ওখানে বুঝি? (কথার ধরণে অবজ্ঞা প্রকাশ পাইল) কেন বসুন না সুজিৎবাবু—আমি যাচ্ছিনা সিনেমায়;—রতনবাবুর সাথে কোথাও যাওয়া না গঙ্গাস্নান। বায়োস্কোপের তিনটি ঘণ্টা পাশে বসে কবিতা আওড়াবে, বাব্‌বা!

রমলা। তাহলে আমিও যাব না, সুজিৎদার সঙ্গে গল্প করব। সুজিৎদা' গাড়ী এনেছেন, চলুন না বেড়িয়ে আসি, যাবেন? ওকি বসুন না? (সুজিৎ মিসেস সেনের অনুমতির অপেক্ষায় তখনো দাঁড়িয়ে রহিল)

মিসেস সেন। (সুজিতের দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ স্বরে) বোস না সুজিৎ! রতনই এলোনা এখনো, যাওয়া হয় কিনা, ঠিক্ কী? অবিশ্যি এসে পড়লে, ওরা যাক না যাক্, আমাকে যেতেই হবে একবার, যখন কথা দিইচি। তুমিও না হয় চলনা আমাদের সঙ্গে।

তমালিকা। সুজিৎ বাবুর কাছে আমার logic-টা দেখে নেবার ইচ্ছে আছে। রমু তুই যা না মার সঙ্গে।

রমলা। কেন, আমি থাকলে তোমাদের অসুবিধেটা কী শুনি?

মিসেস সেনও এখন চলুক তোমাদের ঐ নিয়ে কগড়া। আমি একটু ওপরে যাচ্ছি। রতন এলে আমায় ডেকো। (সুজিতের দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে) তুমিও ত অনেকদিন পরে এলে সুজিৎ। একবার যাবে? বায়োস্কোপ ভাঙ্গলে? আমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যাবে। (উঠে সুজিতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সুজিতের পিঠে হাত রেখে মৃদু স্বরে) অবিশ্যি তমু রমুকে সঙ্গে নিয়ে নয় (মিসেস সেনের দিকে চেয়ে সুজিৎ অর্থপূর্ণ হাসি হাসল মিসেস সেনও হাসলেন)।

সুজিৎ। আচ্ছা চেষ্টা করা যাবেখন (মিসেস সেন পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সুজিৎ সেদিকে চেয়ে ছিল। হঠাৎ চেয়ারটা তমালিকার দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে) তার পর, মিস্ সেন, খবর কী বলুন? আপনার পড়াশুনা কেমন চলছে?

তমালিকা। আর পড়াশুনা! আপনার লজিকটা পড়িয়ে দেবার কথা ছিল, তা আপনি মোটে আসেনই না এদিকে। কি রকম যেন হয়ে যাচ্ছেন আপনি।

সুজিৎ। হ্যা, আমার মাঝে মাঝে আসাটা দরকার হয়ে পড়েছে। (স্বর নামিয়ে প্রায় কানে কানে বলার মত করে) ভাল কথা, এই রতন বাবু ভদ্রলোকটি কে? প্রতিদ্বন্দ্বী নয় আশা করি?

রমলা (শেষের কথা কটা শুনে হেসে উঠল, দুজনেই তার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে মুখ ফেরাল) কি সুজিৎদা' ভয় হচ্ছে নাকি? কিছু ভয় নেই রতন বাবু দিদির কাছ দিয়েও ঘেঁসে না, ওর সমস্ত কবিতার রাণী হচ্ছে শ্রীমতী রমলা সেন (রমলা poso নিয়ে দাঁড়াল। ভাবটা আমি যে সে নয়)।

সুজিৎ। (কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট) বল কি! একেবারে রাণী! তাহলে ত' দেখছি রীতিমত সাবালক। একটা ডুয়েল লড়লে হয়,···না না, আপনি হাসবেন না, মিস্ সেন, অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাণী, তার জন্য একবার লড়বও না? না হয় হেরেই যাব।

রমলা। (Pose নষ্ট হয়ে গেল, অত্যন্ত দুঃখিতস্বরে) আপনার সঙ্গে কারুর কথা বলা উচিৎ নয়, কথখনো নয়—আমি যদি......

(দরজায় ঘা পড়ল। তমালিকা গম্ভীর কণ্ঠে বলল "কম্ ইন্ প্লিজ্"। রতন উদ্ভাসিত মুখে ঘরে ঢুকল। রতনের বয়েস বাইশ কি তেইশ কলেজে থার্ডইয়ারে পড়ে। ছিপছিপে শ্যামবর্ণ চেহারা—চলার ভেতর একটা দোলার ভাব বর্ত্তমান। চোখে একজোড়া পাঁসনে, চোখের দৃষ্টি উদাস উদাস, সর্ব্বদাই ফিট্‌ফাট্—বেশ আস্তে আস্তে কথা কয় যেন প্রত্যেকটি কথা ওজন করে কইছে;—বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে কথা কইবার সময় একেবারে গলিত হয়ে পড়ে। মোটের ওপর সর্ব্বদাই একটা কবির পোজ্ নিয়ে থাকে)

রতন। আমার একটু দেরী হয়ে গেছে নয়?—এক্স—টা ম-লি সরি।

তমালিকা।—বসুন রতন বাবু। মা ওপরে গেছেন ডেকে দিচ্ছি। আমি আজ আর যাব না সিনেমায়।

রমলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। কোন ইয়ংম্যানের সঙ্গে নিজের থেকে কথা কওয়া তার প্রিন্সিপলের বাইরে; একমাত্র সুজিৎ সম্বন্ধে ওটা খাটে না।

রতন।—(রমলাকে লক্ষ্য ক'রে অস্বাভাবিক মিষ্ট স্বরে) আপনি যাচ্ছেন ত রমা দেবী?

রমলা।—(চমকিত ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে) এই যে, রতন বাবু এসেছেন দেখতে পাচ্ছি। আমি যাব না সিনেমায়, মনটা তেমন ভাল নেই আজকে। (পেছনের দরজার কাছে মিসেস সেন এসে দাঁড়ালেন। একমাত্র সুজিৎ ছাড়া আর কেউ লক্ষ্য করল না)।

রতন।—(রমলার কথায় সমস্ত উৎসাহ এক নিমেষে কমে গেল, আম্‌তা আম্‌তা করে) আজকে বাড়ীতে একটু কাজ ছিল, একটু শীগ্‌গীর করে বাড়ী ফিরতে হবে, সেই কথাই বল্‌তে এসেছিলাম, আপনারা যদি আর একদিন···

মিসেস সেন।—(ঘরে ঢুকে) রতনের কথা শুনতে পেলুম যেন? এই যে রতন, তোমায় কথা দিয়েছিলুম কিন্তু বড় দুঃখিত, আমার মাথাটা হঠাৎ ধরল,—তুমি কিছু মনে করবে না আশা করি?

(ক্রমশঃ)

আমার প্রকৃতি প্রিয়া

শ্রীসচ্চিদানন্দ দাশগুপ্ত

গোপনে তাহারে বেসেছি যে ভালো
গোপনে দিয়েছি মালা
সদা সে গোপন রবে হৃদি মাঝে
আমার গোপন বালা
এ জীবনে হায় বারেকের তরে
পরাণ ভরিয়া দেখেছি তাহারে
সাঁঝের আঁধারে মিশে গেছে সে যে
আমার প্রকৃতি বালা
রেখে গেছে শুধু পরাণ ভরিয়া
তিক্ত বিষেরই জ্বালা।

কায়ার পরশ চাহিনা আমার
চাহিনা মুখেরই হাসি
চাই শুধু তার ছায়ার পরশ
কায়া নাহি ভালোবাসি
অঙ্গ সুষমা বাসি না যে ভালো
পরাণে আমার জ্বালে না সে আলো
হৃদয় মাঝারে গোপন প্রতিমা
তারেই যে ভালোবাসি
কল্পনা চোখে দেখিয়া তাহারে
দুঃখ আমার নাশি।

(তার) পরশ রয়েছে নদীকূলে
(তার) পরশ রয়েছে বনছায়ে
পুষ্প শোভিত কুঞ্জের মাঝে
বিলায়েছে সে যে আপনায়
আমার প্রাণ যে ওদের মাঝারে
তারই তরে সদা ঘোরে বারে বারে
যে-খানে তাহার পরশ রয়েছে
সেখানে আমার মন ধায়
নিশিদিন তাই কাটিছে আমার
কুঞ্জ মাঝারে বনছায় ॥

——

ছিটে ফোঁটা

সন্ধ্যের সময় মহীম এসে হাজির।—হাতের মাসিকখানি দেখে সে জিজ্ঞেস করলে—কি হে, কি পড়ছো?...পৌষের ভারতবর্ষ?—আচ্ছা চেঁচিয়ে পড়, শোনা যাক্।—

খানিকটা পড়া হলে মহীম বাধা দিয়ে বল্লে— থামো— থামো— প্রেমটা হচ্ছে কোথায়?—কুয়ার ধারে?—অংশটুকু ভালো করে শোনালাম—আপনারাও একটু শুনুন :—

"...যদিও প্রেমে পড়ে বিয়ে হবে, তবু বিয়ের প্রস্তাবে লজ্জা, সঙ্কোচ এসে খুব প্রভাব বিস্তার করেছে। খুব ভাল লাগে, পুলক অনুভব করে, শিহরণ আনে, সুখ, তৃপ্তি মধুর হতে মধুরতর হয়, লজ্জায় যখন আড়াল সৃষ্টি করে প্রেমের উৎসে...ফিরে তাকাতে পারলে না, দাঁড়াতে পারলে না (চোখে কুটো পড়ে নি তো—পড়ে যায় নি তো?) দুর্জ্জয় লজ্জা, (দুর্গম বিশেষণ যে বাদ গেল) সঙ্কোচ। হেলে দুলে চলতে লাগলো যেন শুনতে পায় নি কিছু।"...পড়বার সময় মাঝে মাঝে টিপন্নি কাটা মহীমের স্বভাব এ আপনারা জানেন। যাক্!—তারপর শুনুন :—

"...মনুয়া উচ্চস্বরে বল্লে—চেঁচিয়ে ডাকছি, কানে বাতাস ঢুকছে না! কাল চলে যাচ্ছি বলে,' নইলে এক থাপ্পড়ে দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিতাম। এই ছুঁড়ি শোন! আজকাল আর যেন গ্রাহ্যি করিস্ নে?

ফুলকোয়ারা ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লে—ঈস্! চড় মারলেই হলো। কথায় কথায় কেবল মারধর! আমি যেন জলে ভেসে এসেছি!

...জলে ভেসে আসিস্ নি ত কি করে এলি? আকাশ থেকে ছিট্‌কে পড়েছিস্ না কি?—"

মহীম বল্লে—এ যে উৎকট প্রেম হে—রাঁচি পাঠাবার ব্যবস্থা কর।—

মহীমকে ক্ষান্ত করে পড়ে যেতে লাগলুম—"মনের কথাটি বুঝি আমার ওপর দিয়ে চালালি? বহু দূর দেশে চলে যাচ্ছি। সারাদিন খুঁজে খুঁজে হয়রাণ, আর এখন অত করে ডাকছিলাম বেশ ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছিলি। মেয়েরা যে এমন করে জ্বালিয়ে যে কি সুখ পায় বুঝতে পারি নে! (লেখক বোধ হয় ব্যর্থ প্রেমিক—আহা স্ত্রী চরিত্রের কি বিশ্লেষণ!)

ফুলকোয়ারা কোন উত্তর দিলে না, নীরবে পায়ের বুড়ো আঙুলে মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগলো। (পা কেটে রক্ত বেরুই নি তো—কিংবা কাঁটা ফুটে!) একবার ভাবলে মনুয়াকে প্রাণের গুপ্ত রুদ্ধ-দোয়ার খুলে দেখিয়ে দেয় যে সেও তাকে সর্ব্বক্ষণ বাহুপাশে বেঁধে রাখতে চায়, আঁখিতে আঁখি দিয়ে—"

মহীম চীৎকার করে বলে উঠলো—ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু—জিজ্ঞেস করলুম—কি হে, কি হোল? মহীম বল্লে—দেখছো না আঁখির কাছে আঁখি আসছে!—নাঃ মহীমকে নিয়ে আর পারা যায় না!—আর খানিকটা অগ্রসর হওয়া গেল—"ফুলকোয়ারা হাতের ঘটিটা নামিয়ে রেখে বললে 'তাড়াতাড়ি করে টাকার যোগাড় করিস কিন্তু। কাল আবার পুন্নু এসেছিলো। সেত আমার জন্যে পাগল (শুধু পাগল?—). একুনি সমস্ত টাকা দিয়ে দিতে রাজি। আমার বড্ড ভয় করে, পুন্নু টাকা ওয়ালা লোক, জমী জমাও যথেষ্ট আছে। তারপর বাবার ত খুব পছন্দ হয়েছে, শুধু মার জন্যে পাকা কথা দিতে পারছেন না। তুই চলে গেলে ও নিত্য আসবে। যে রকম নাছোড়বান্দা মানুষ, সহজে কি নিস্কৃতি দেবে?

মনুয়া ক্রুদ্ধস্বরে বললে 'ঝাঁটা মারবি কথা বলতে এলে (সাবাস দাদা সাবাস—শুধু ঝাঁটায় সাজাবেনা, আরও চাই কিল, চড়, লাথি) তোর খুব শক্ত হতে হবে। যদি মাও এ বিয়েতে মত দেন, তবে তুই বেঁকে বসিস—জোর ত আর চলতে পারে না (কিছুতেই নয়!)

'ধুৎ! আমার বুঝি লজ্জা সরম নেই।' (আলবৎ, লজ্জাই তো স্ত্রীলোকের অলঙ্কার—মরি, মরি, কি চরিত্র বিশ্লেষণ!)

'বুঝেছি তুই পুরুর বড় বড় ঘর দোর দেখে ভুলে গেছিস্।' (এই রে!) ফুলকোয়ারা উচ্চস্বরে বললে 'যা তা বলিস নে সব সময়, ভাল লাগে না আমার।'

'রাগ করেছিস?' (প্রেমের কি বিচিত্র অনুরাগ রে!) মনুয়া মৃদু হেসে ফুলকোয়ারার হাত ধরে বললে (শুধু হাত ধরা তো হোল? পায়ে ধরা উচিত ছিল) 'যদি তোর মা মত দেন, তবে তুই মাকে এসে বলিস, মা ওঁদের বুঝিয়ে বলবে। পাগল! (শুধু পাগল—বদ্ধ পাগল!) তোর অমতে কি বেশী জোর জবরদস্তি করতে পারেন?—(কিছুতেই নয়—যে যুগে—পোটাসিয়ম সাইনাইড্ আছে)—

আর কিন্তু পড়া গেল না। মহীমকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। জোর করে আমার কাছ থেকে কাগজখানি কেড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তাকে জিজ্ঞেস করলুম—এখুনি চললে যে—আর কাগজখানি কি হবে?—

মহীম বল্লে—এর পর আরও থাকতে বলো?—কাগজখানি নিয়ে যাচ্ছি—এক্ষুনি প্ল্যানচেট নামাতে হবে—আর ভবিষ্যৎ সম্পাদকের কাছে যেতে হবে!—

আমি বললুম—কেন?

মহীম গল্পটির হেডিং দেখিয়ে বল্লে,—দেখছো না—গল্পের নাম—"চলেছিল, চলছে, চলবেও—"

জিজ্ঞেস করলুম—তার মানে?—

মহীম মৃদু হেসে উত্তর দিলে—আরে সোজা কথাটি আর বুঝতে পারলে না। তার মানে—প্ল্যানচেটে সমাজপতি—পাঁচকড়ি বাড়ুজ্যে প্রভৃতিদের নামাতে হবে—আগে কি এ পাগলামি চলেছিল?—আর ভবিষ্যৎ সম্পাদককে জিজ্ঞেস করবো—ভবিষ্যতে কি এ ডেঁপোমি চলবে?—তা না হলে নিরীহ প্রবীণ জলধর দা'র যে এই সব অতি রাবিশ অর্ব্বাচীন 'চলছে'দের জ্বালায় মতিভ্রম হচ্ছে।

মহীমের হেঁয়ালী বোঝা দায়!—তবে এইটুকু আমাদের লেখক মহাশয়ের কাছে অনুরোধ ভবিষ্যতে আর এরকম দয়া করে চালাবেন না।

* *

উক্ত সংখ্যায় শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের স্বরলিপি সমেত শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরীর লেখা একটি গানও প্রকাশিত হয়েছে। ফুটনোটে দিলীপ বাবু টীকা লিখছেন—এ গানটির ভাব ও ছন্দ এত সুন্দর ও সুবিন্যস্ত যে রাগমালায় তাহাদের ফুটাইলে সকলেই মুগ্ধ হইবেন (যেমন মুগ্ধ হন আপনারা—পাঠক পাঠিকাগণ—তাঁর কাব্য পাঠে)। এত সুন্দর লঘু গুরু ছন্দে অদ্বিতীয় কবি দ্বিজেন্দ্র লালের পরে কমই রচিত হইয়াছে। গানের নাম— 'প্রেম অরুণ রাগে—' (নামের চটক্ আছে।) একটু মন দিয়ে শুনুন:—

" প্রিয়তম হে!
আজি জীবন মম সিঞ্চিত কর'
লাবণি—রস—ধারে—
ঝর' নিঝরে—
মম অধরে—(চাঁদ চকোরের কথা স্মরণ করুণ)
আমি চাতক সম ভাসিব তব
(কি উপমা রে—কালিদাসস্য)
তব মধু—চুম্বন—সারে—
(সাধু! সাধু!!)
লাবণি-রস ধারে।"

কবির মাত্রা জ্ঞান আছে—এবং দিলীপ বাবুরও রসজ্ঞান টন্‌টনে! আপনারা কি বলেন?—
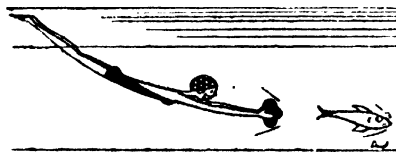
শেষের আরতি
শ্রীঅমিয়া সেন

(১)
শেষ আবাহন রোলে
দিনের দেবতা পশ্চিমাকাশে
সহসা পড়িল ঢলে।
শেষ অরুণিমা ছাইল গগন
বিভোলিত রবি ক্লান্ত চরণ
শেষ চাহনির রক্তিম আভা
ধীরে ধীরে নিভে যায়
শান্ত শীতল বায়—
তন্দ্রা জড়িত আবেশেতে তনু
লুটায়ে পড়িতে চায়।
(২)
লইয়া আরতি থালা
দিক্-বধূরা সযতনে ওই
সাজায় বরণ ডালা।
শেষের শঙ্খ বাজিল বাতাসে
ধূপ-সৌরভ মিশিল আকাশে
চঞ্চল হিয়া কমলিনী বধূ
হেরিয়া চমকি উঠি
সেথায় পড়িল লুটি
অশ্রু জড়িত ব্যথায় কাতর
মুদিল নয়ন দুটী।
(৩)
শেষের বিদায় গানে
কমলিনী বধূ বুক চিরি তার
রক্ত প্রবাহ আনে।
অশ্রুগলিত পিচ্ছিল পথে
চলিয়াছে রবি উঠি নিজ রথে
আবীর ছড়ায়ে পথে ঘাটে মাঠে
অস্ত গিরির দেশে
বিরহী করুণ বেশে
আরতির থালা ভরি,
উঠেছে জলিয়া বিদায়ের ক্ষণে
লক্ষ দীপের সারি॥

খেয়ালী

ব্রীজ খেলা
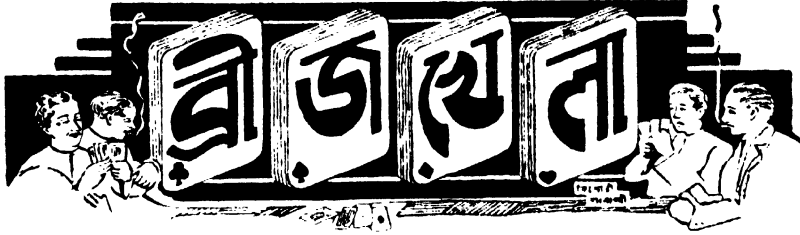
দুর্ব্বাসা

হাতের ও রঙের বিভাগ।

(Hand Distribution and Suit Distribution) :—পূর্ব্বেই বলেছি হাতের ও রঙের বিভাগ এ খেলার পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত কারণ 'গেম' (Game) বা 'স্লাম' (Slam) করবার জন্য হাতের বিভাগ অনারের পিটের অপেক্ষা কম কার্য্যকরী নয়। ফেরাই-এর পিট ও তুরুপের পিট হাতের ও রঙের বিভাগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নিম্নে একটি হাতের দ্বারা আমার বক্তব্য বিশেষভাবে বল্‌বার চেষ্টা করছি।

মনে করুন, ভাল্‌নারেব্‌ল (Vulnerable) অবস্থায় আপনি নিম্নলিখিত হাত পেয়েছেন,

ইস্কাবন (Spade)—nil

হরতন (Heart)—বিবি, গোলাম, দশ, ছক্কা, তিরি, দুরি।

রুহিতন (Diamond)—সাতা।

চিঁড়িতন (Club)—সাহেব, বিবি, গোলাম, দশ, পাঞ্জা, তিরি।

আপনার খেঁড়ী 'খ' বল্‌লেন 'একখানি হরতন', প্রতিদ্বন্দ্বী 'আ' বল্‌লেন 'চারখানি ইস্কাবন'; এখন আপনি কি ডাক দেবেন? অনারের পিট আপনার হাতে আছে মাত্র একখানির কিছু বেশী। কিন্তু হাতের বিভাগ আপনার খুব ভাল এবং রঙের বিভাগও খুব ভাল, কেন না কম পক্ষে আপনারা (অর্থাৎ আপনি ও আপনার খেঁড়ী) দশখানি হরতন পেয়েছেন। সুতরাং যদি হরতন রঙ্গে খেল্‌তে চান, তবে আপনাদের অন্ততঃ বারোখানি পিট অবধারিত। অতএব আপনি নিশ্চিন্ত ভাবে ও নিশ্চিত হয়ে 'ছয়খানি হরতন' পর্য্যন্ত ডাকতে পারেন।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কোন বিশেষজ্ঞ যদি এ প্রবন্ধ পড়েন তবে তিনি নিশ্চয় বল্‌বেন যে আমার এ ডাক্ অর্থাৎ 'পাঁচখানি বা ছয়খানি হরতন' ঠিক ডাক হল না। কারণ এ ডাকে হাতের এই প্রচণ্ড শক্তির এবং সুন্দর বিভাগের পরিচয় খেঁড়ী সবিশেষরূপে পেলেন্ না। তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে এখানে প্রকৃত ডাক হত "পাঁচখানি ইস্কাবন"। তার মানে হত "ওগো বন্ধু, আমি যা' হাত তোমায় দেব তা'তে বারোখানি পিট আমাদের মিলিত হাতে নিশ্চয় আছে এবং ইস্কাবনের প্রথম পিট নিশ্চয় নেব; এখন বল, তোমার হাতে তেরোখানি পিট নেবার মত তাস আছে কি না। যদি তোমার তিনখানি টেক্কা ও যে রঙ তুমি ডেকেছ তা'র সাহেব থাকে, তবে তুমি ডাক দাও "পাঁচখানি No Trump"; আর তা' যদি না থাকে তবে তোমার হাতের বিশেষত্ব কি তা' আমায় জানাও; আর যদি তোমার অন্য কিছু বল্‌বার মত হাত না থাকে তবে 'ছয়খানি হরতন' বলে ডাক্ শেষ করে দাও; আমি বুঝ্‌ব ছয়খানির বেশী খেলা নাই।" ফলতঃ 'পাঁচখানি ইস্কাবন' ডাকার পর খেঁড়ী 'খ' যদি 'পাঁচখানি No Trump' ডাকতে পারেন তবে Grand Slam সুনিশ্চিত। কিন্তু এ ডাক দিবার এবং এ ডাক বিশদভাবে বুঝাবার সময় এখনও আসে নাই। আমার এ প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ হয়েছে অনভিজ্ঞের জন্য, বিশেষজ্ঞের জন্য নয়। যাঁদের জন্য আমি ধারাবাহিকরূপে লিখে যাচ্ছি তাঁদের পক্ষে বর্ত্তমানক্ষেত্রে 'পাঁচখানি হরতন' ডাকাই যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি। পরে যখন Slam ও অন্যান্য উচ্চ

বিষয়ের বর্ণনা করব, তখন যথাস্থানে ও যথাসময়ে এ সব ডাকের উৎকর্ষ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করব।

যা' হোক্ যা' বল্‌ছিলুম্ যে উপরোক্ত হাত হতে সহজেই যে কোন খেলোয়াড় অনুমান করে নিতে পারেন যে 'ছয়খানি হরতনের' খেলা মিলিত হস্তে আছেই। কারণ খেঁড়ী 'খ' যদি চারখানি হরতনও পান্ (অর্থাৎ টেক্কা, সাহেব, সাতা, চৌকা) এবং মাত্র একখানি টেক্কা পান্ (তা' চিঁড়িতন বা রুহিতন যে কোন রঙেরই হোক্ না কেন) তবে বারোখানি পিট সুনিশ্চিত। আর 'খ' যদি দুইটি টেক্কা পান (রঙের টেক্কা সাহেব বাদে) তবে তেরোখানি পিট হবেই।

বারান্তরে আরও দুই একটি হাত দিয়ে এ সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে আলোচনা করব।

একটী সমস্যা:—নিম্নে একটি সমস্যা দিচ্ছি। হরতন রঙ ও 'দ' খেল্‌বে; 'উ' এবং 'দ'-এর সম্মিলিত হস্তে সব কখানি পিট পেতে হবে।

উ:
ইস্কাবন—nil
হরতন—সাহেব, বিবি
রুহিতন—৫
চিঁড়িতন—বিবি, ১০, ৯, ৫

প:
ইস্কাবন—৮, ৭, ৬, ৫
হরতন—গোলাম, ৫
রুহিতন—nil
চিঁড়িতন—গোলাম

পূ:
ইস্কাবন—সাহেব, ১০
হরতন—nil
রুহিতন—১০
চিঁড়িতন—৮, ৭, ৬, ৪

দ:
ইস্কাবন—গোলাম, ৯, ৩
হরতন—nil
রুহিতন—গোলাম
চিঁড়িতন—টেক্কা, সাহেব, ৩

রাজপুরের (সোণারপুর) শ্রীবিজনকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরাসবিহারী চক্রবর্ত্তী পূর্ব্বের সমস্যার সঠিক উত্তর দিয়েছেন। বহু পাঠক আমাদের সমস্যার উত্তর পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের উৎসাহের দরুণই এ সমস্যাটি প্রকাশিত করা হল; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কুসময়ে তাঁদের মীমাংসা হস্তগত হওয়ায় তাঁদের নাম প্রকাশিত করা হল না।

Lunar & Fools-এর পুরস্কার বিতরণ:—গত ২৩শে ডিসেম্বর রবিবার কাষ্টমস্ হাউসের Chief Accountant গাঙ্গুলী মহাশয়ের সভাপতিত্বে Lunar & Fools Club-এর প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ হয়ে গিয়েছে। Auction Singles এ, Auction Duplicateএ, Contract Singlesএ, Contract Duplicateএ যথাক্রমে বিজয়ী হয়েছেন Theta Beta Club, ছত্রভঙ্গ ক্লাব, Lansdowne Club এবং Crockfords Club. যথাক্রমে পরবর্ত্তী দল অর্থাৎ ফাইনালিষ্ট হচ্ছেন খিদিরপুরের Hyde Institute, Lansdowne Club, Dadoo Bridge Club ও Wanderers. আমরা এঁদের সফলতায় আনন্দিত হয়েছি, বিশেষ করে Theta Beta এবং Hyde Institute-এর সাফল্যে,—কারণ এঁদের ক্লাবের বয়স হয়েছে মাত্র এক বৎসর।

এই সুযোগে আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকাদের, ব্রীজ-ক্রীড়কদের এবং প্রত্যেক সমিতিকে আমাদের নববর্ষের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আনিয়াৎ খাঁ'র খোলা

ইন্দুবালা,

তোমাকে 'তুমি' বল্‌ছি, মনে কিছু ক'রোনা। কারণ, বাস্তবিকই বয়েসে আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়ো। তোমার সঙ্গে আমার একদিন দেখা হয়েছিলো, সে কথা তোমার মনে না থাকলেও আমার মনে থাকবে। কারণ, তোমাকে আমি চিনতুম, কিন্তু তুমি আমায় চিনতে না। সেটা স্বাভাবিক—তোমায় কেনা চেনে? বাংলা দেশের বায়োস্কোপ যেদিন থেকে কথা কইতে শিখলে তার কিছুদিন পর থেকেই তোমার আদর। কর্ত্তৃপক্ষরা তোমায় নিলে, তোমার চেহারার জন্যে যে নয় তা তুমি জানো, তোমার গলার জন্যে—তোমার গান গাওয়ার শক্তি দেখে। মনে পড়ে এক ষ্টুডিয়োয় সেই সন্ধ্যে, পাবলিসিটি অফিসারের সঙ্গে বসে' কথা কইছিলুম। নিস্তব্ধ ছিলো সেই ঘর। হঠাৎ—দরজার কাছ থেকে বজ্রের মত এলো তোমার কণ্ঠস্বর—গোলাপ বাবু! সত্যি বলছি—চমকে উঠেছিলুম। মাথা ঘুরিয়ে দেখি তোমার ভীষণতর গলার—চেহারা! তুমি যখন এগুতে আরম্ভ করলে, আমি তখন কাঁপতে লাগলুম। সত্যি, এমনি ভীতিপ্রদ তোমার দেহের আকৃতি। তুমি টেবিলের সাম্‌নে এলে, বললে—আমার ছবি ছাপা হয়নি কেন? আমি চোখ বুজে' রইলুম। আমার কানের মাইক্রোফোন্ তোমার গলা রেকর্ড করতে লাগলো। আরেকটু আস্তে কথা বলা তোমার উচিত ছিলো, কারণ তোমার গলার জোরে আমার মাইক্রোফোন 'ফেইল' করতেও পারতো।

যাক্ গে সে কথা। যা তোমায় জানাবার জন্যে আজ আমি এই চিঠি লিখতে বসেছি, তাই এবার বলি। তোমার সুন্দর চেহারার জন্যে সিনেমা যে তোমায় নেয়নি, একথা

তুমি নিশ্চয়ই জানো। তোমাকে সেই জন্যে নিয়েছে যার জন্য তোমার নাম আজ এতো। তোমার গানের জন্য। তোমাকে সবাই পছন্দ করে রেকর্ডে, রেডিয়োর ভেতর দিয়ে। পর্দ্দার ওপর তোমার চেহারাশুদ্ধ গান, কার যে ভালো লাগে জানিনে।

তোমার যদি ভালোরকম বুদ্ধি থাকতো, সিনেমায় তুমি কখনই নাবতে না। সিনেমায় গান গেয়ে তুমি নিজের নাম অনেক নষ্ট করেছো। তুমি ভেবে দেখো, যে নাম তোমার কিছুদিন আগে রেকর্ডে রেডিয়োতে ছিলো—সে নাম তোমার এখন নেই। তোমার নাম আছে এখন সিনেমায় একটি বীভৎসরূপ বলে। তুমি যখন নানারকম মুখ বানিয়ে পর্দ্দার ওপর গান গাও, তখন সবাই হাসে। তোমার গান কেউ শোনে না। সত্যি বলতে কি—মন যায়না শুনতে, তোমার গলার ও গানের সুন্দর সব কারুকার্য্য ডুবে যায়—ভেসে যায় তোমার চেহারায়। তোমার গান তখন মনে হয় না শুনি। সময় এখনও যায়নি, নিজের নামের পুনরুদ্ধার এখনও তুমি করতে পারো আর সিনেমায় না নেবে।

একান্ত, সিনেমায় নাবতেই যদি হয়, তা হ'লে এক কাজ করো-কমিক ছবিতে নেবো। কারণ, হাসানো সেখানে দরকার। সেখানে তুমি যতখুসি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন করতে পারো। তাতে ফল হবে ভালোই, অত্যন্ত বেরসিক যে তাকেও তুমি হাসাবে। এইজন্য, 'এক্‌স্‌কিউজ মী, স্যার'-এ তোমায় আমার ভালো লেগেছিলো।

এখনই আরেকটা কাজ তোমার করা উচিত, সেটা হচ্ছে ছায়ালোক থেকে কিছুদিনের জন্য তোমার অনুপস্থিতি। এ পর্য্যন্ত হিন্দী আর বাঙলা কত ছবিতে তুমি যে আজ পর্য্যন্ত নেবেছো তার হিসেব নেই। তোমায় প্রায় প্রত্যেক ছবিতে দেখে দেখে আর দেখে, তোমার গান শুনে শুনে আর শুনে এককালে তোমার এমন অবস্থা হবে যে লোকে তোমায় আর দেখতে বা শুনতে আর চাইবেই না। সেটা নিশ্চয়ই তোমার পক্ষে সুন্দর হবেনা। অতএব, এখন কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নেওয়া তোমার পক্ষে দরকার। তাতে, তোমার, আমাদের সবার মঙ্গল।

চিঠি আর বড়ো করবো না। এখানেই শেষ করি। ইতি।

আনিয়াং গাঁ

গত আগত বছরের বাংলা

শ্রীসুবল লাল বসু

বাংলা ফিল্ম-শিল্পের আরেকটি বছর কাটলো। এই একটি বছরে সে যে অনেক কিছু শিখেছে—উন্নত হয়েছে অনেক, তাতে আর সন্দেহমাত্র নেই। আমাদের দেশে একটি ছবি তোলা কত যে কঠিন ব্যাপার তার বিশদ ব্যাখ্যা এখানে না দিলেও চলবে। এই বিপদ আপদের বেপথ পথ দিয়ে আমাদের বাংলা দেশের ছায়াছবি শিল্প যে এতোখানি অগ্রসর হতে পারবে—এ আশা এক বছর আগে সত্যিই হয়তো আমরা করি নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে প্রদেশে আজ ফিল্ম কারখানার ছড়াছড়ি। কিন্তু তাদের কারো সম্বন্ধে কিছু কথা না বলে' শুধু বাংলার কথা এখানে বলছি কেন—তার অনেক কারণ আছে। তাদের ভেতর একটি হচ্ছে—বাংলার সৌন্দর্য্য বোধের জ্ঞান সবার চেয়ে বেশী। খুব তোড়-জোড় দেখিয়ে, জাঁকজমকের বাণ ভাসিয়ে অন্য দেশ যা দেখাবে, বাংলা তা দেখাবে সামান্য জিনিষের সাহায্য নিয়ে। ঠিক যতটুকু দরকার বাংলা তার ততটুকু দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অনাহুত, ঐরাবণ ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে, দর্শকের মনে অস্বাভাবিক চমক লাগাতে বাংলা আমাদের চায় না। সে চেষ্টা করে স্বাভাবিকতার সাহায্য নিয়ে সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতা সাধন করতে।

ভূমিকা বেশী বাড়িয়ে লাভ নেই—বরং ক্ষতির আশঙ্কা আছে। আসল কথার আসরে এবার আসি। পুরোণো বছরের পুরোণো কথা আগে, নতুনের নব-বার্ত্তা তারপর। অল্প সময় একটু হিসেব করলেই অনায়াসে আমরা বলতে পারি—গত বছর বাংলা দেশ মোট ছবি প্রসব করেছে পোনেরো খানা। তার ভেতর 'নিউ থিয়েটার্স' চারখানা, কালী ফিল্মস চারখানা, রাধাফিল্মস্ তিনখানা, ভারতলক্ষ্মীর দু'খানা ও পাইয়োনীয়ার এক খানা। যথাক্রমে এঁদের নাম—"রূপলেখা" "একসকিউজ মি স্যার" "পি ব্রাদার্স" ও "মহুয়া"। "ঋণমুক্তি" "তরুণী" "মণিকাঞ্চন" ও "তুলসীদাস"। এ ছাড়া এরা "গাগরী ভরণে" ও "সোণার বাঙলা" নামে দু'টি শর্ট তোলেন। "শচী-দুলাল" "দক্ষযজ্ঞ" ও "রাজনটী বসন্তসেনা"। "চাঁদ-সদাগর" ও "শুভ ব্রাহ্মস্পর্শ" আর "মা"।

গত বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি

এখন অনায়াসেই আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে গত বছরের শ্রেষ্ঠ ছবি কোনটা? আমার মতে—

প্রথম—"রূপলেখা"
দ্বিতীয়—"তরুণী"
তৃতীয়—"দক্ষ-যজ্ঞ"

পরিচালনার জন্যে শ্রেষ্ঠ সম্মান আমি যথাক্রমে দিই—(১) প্রমথেশ বড়ুয়া (২) "তরুণী"র পরিচালক শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। ক্যামেরার কাজের জন্য ইউসুফ্ মুলজি, ননী সান্যাল ও ডি, জি, গুণে।

অভিনয়

অভিনেতাদের ভেতর মনে রাখবার মত অভিনয় করেছিলেন "রূপলেখা"-য় অহীন্দ্র চৌধুরী। "তরুণা"তে ললিত মিত্র। আর "ঋণমুক্তি"তে শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী শিশুবালা। অভিনেত্রীদের ভেতর "রূপলেখা"-য় ভাবের অভিনয় চমৎকার করেছিলেন শ্রীমতী উমাশশী। "তরুণী"তে শ্রীমতী রাণীবালা। ও "দক্ষযজ্ঞে" শ্রীমতী চন্দ্রাবতী।

নতুন বছরের নব-বার্ত্তা

নতুন বছর এলো। এ বছর আমরা অনেক কিছু আশা করি। ফিল্ম-শিল্প আরো উন্নত তো হবেই, তা ছাড়া আরো উন্নতি কামনা করি দর্শকদের মনের। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশে এখনও এরকম অনেক লোক আছেন, যাঁরা ভুলক্রমেও একবার বাংলা ছবি দেখতে যান না। নিজের দেশের লোক দেশের ছবির পৃষ্ঠপোষকতা যদি না করে, তবে করবে কে? দেশের শিল্প

দেশের লোকের সাহায্য না পেলে সে শিল্প কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। এ বছর প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক ছবি-তেই আরো অনেক দর্শক আমরা দেখতে চাই। দেখতে চাই আরো সহযোগীতা।

সমস্ত দর্শকদের সহযোগীতা পেতে গেলে অবিশ্যি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষদের গভীর নজর থাকা চাই। তাঁরা ইচ্ছে করে' যেন এমন কোনো ছবি তৈরী না করেন যা দর্শকদের মনে কোনো রকম বিরক্তির উৎপাদন না করে। আরো নতুন রকম বাংলা ছবি চাই, সংখ্যায় আরো বেশী, আরো বিভিন্ন রকম। কর্তৃপক্ষদের বিভিন্ন অংশের অভি-নেতা অভিনেত্রী নির্ব্বাচন আরো উন্নত হোক। নতুন ছবিতে নতুন সব মুখ দেখতে তাঁরা চেষ্টা করুন। পর্দ্দার ওপর একই মুখ দেখতে বেশী দিন ভালো লাগে না। নতুন আরো অভিনেতা চাই, চাই আরো নতুন অভিনেত্রী নতুন রকম রূপে গুণে বিভূষিতা।

বাংলার প্রতি ঘরে বাংলার ছবির আদর হোক সবচেয়ে বেশী। দূরে যাক মালিন, সরে যাক্ গার্ব্বো। বাংলা ছবি আরো যেন আমরা বেশী দেখতে পারি।

নতুন বছরের নতুন ছবি

যে ছবিগুলো শীগ্গীরই আমরা দেখতে পাবো তার সংক্ষেপে তালিকা হচ্ছে এই— নিউ থিয়েটার্স্-এর "দেবদাস"। অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর একটি অনিন্দ্যসুন্দর উপন্যাস। শ্রেষ্ঠাংশে দেখতে পাওয়া যাবে—প্রমথেশ বড়ুয়া, অমর মল্লিক, চন্দ্রাবতী ও যমুনাকে। পরিচালনা করবেন প্রমথেশ বড়ুয়া। এর পরিচালনার শক্তির ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। আশা করি তিনি নিশ্চয়ই নতুন কিছু এ ছবির ভেতর দিয়ে আমাদের দেখাবেন। এ ছাড়া "অবশেষে" নামে এরা একখানা হাস্যরসাত্মক ছবি তুলেছেন। এখানা পরিচালনা কোরে-ছেন শ্রীদীনেশ দাশ। শ্রেষ্ঠাংশে নেমেছেন শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া, অমর মল্লিক, শ্রীমতী মলিনা প্রভৃতি।

তারপর কালী ফিল্ম্স-এর "পাতালপুরী"। কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কয়লা কুঠির দেশের একটি সুন্দর উপন্যাস। সম্পূর্ণ নতুন রকম সন্দেহ নেই। শ্রেষ্ঠাংশে জীবন গাঙ্গুলী, শ্রীমতী শিশুবালা ও শ্রীমতী মায়া। পরিচালনা করছেন—প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। ছবিটি নতুন রকম—আশা করি এখানাও যাতে খুব সুন্দর হয়।

কালী ফিল্ম্স-এর আরো তিনখানা ছবি "প্রফুল্ল", "বিদ্যাসুন্দর" ও মণিকাঞ্চন" (দ্বিতীয় পর্ব্ব)। "প্রফুল্ল"র পরিচয় নিষ্প্রয়োজন মনে

করি, ৺গিরীশচন্দ্রের অমর নাটক। শ্রেষ্ঠাংশে অহীন্দ্র চৌধুরী, রাধিকানন্দ, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ও রাণীবালা। ছবিখানার ভূমিকায় বাংলার প্রায় প্রত্যেক প্রখ্যাতনামা অভিনেতা আছেন। তারপর "বিদ্যাসুন্দর"। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে নাচ ও গানের ছবি। এর সম্বন্ধে আমরা আর কিছু জানতে পারিনি—শুধু জানতে পেরেছি পরিচালনা করবেন জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়। ও একটি ভালো অংশে থাকবে রাণীবালা। "মণিকাঞ্চণে" শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় কোরবেন শ্রীমতী উষারাণী দেবী ও শ্রীতুলসী লাহিড়ী।

কেশরী ফিল্মস্ "বাসবদত্তা" তুলছেন। শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত এই ছবির পরিচালনা কোরছেন। মুল ভূমিকায় শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী কাননবালাকে দেখা দেবেন।

পায়োনীয়র "দেবদাসী" নামে একখানা ছবি তুলেছেন। পরিচালনা কোরেছেন শ্রীঅমর চৌধুরী। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় কোরেছেন শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী ডলি দত্ত।

তারপর, রাধা ফিল্মের "মানময়ী গার্ল্স্ স্কুল"। ৺রবীন্দ্র মৈত্রের সেই সুবিখ্যাত হাসির নাটক। পরিচালনা করছেন জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জি। শ্রেষ্ঠাংশে—কাননবালা, জ্যোৎস্না গুপ্তা, জয়নারায়ণ ও কুমার মিত্র। ছবিখানা যে ভালো হবে এ আশা আমরা করছি।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রতি

পর্দা ও মঞ্চে যে কত প্রভেদ—এ কথা স্মরণ রাখতে হবে—রবি রায়, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, আর জীবন গাঙ্গুলীকে। আসছে বছর আরো নাম করতে হ'লে এঁদের মঞ্চ-আবৃত্তি ছাড়তে হবে। প্রত্যেক অংশে প্রাণ আনতে হবে, আনতে হবে দরদ। ছায়াছবির অভিনয় যে কী তা আজ পর্য্যন্ত খুব কম অভিনেতাদের মাথায় বোধ হয় ঢুকেছে। উন্নতির জন্য এদের সকলকেই আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

অভিনেত্রীদের ভেতর রাণীবালাকে "তরুণী"তে যে রকম আশাপ্রদ মনে হয়েছিলো "তুলসীদাস"-এ সে আশা আমরা হারিয়েছি। এর অভিনয়ে আরো যত্নের দরকার। প্রত্যেক অংশে একে অভিনবত্ব আনতে হবে—এক-ঘেঁয়ে অভিনয় ছাড়তে হবে। জ্যোৎস্না গুপ্তার কথাগুলি প্রাণময় করতে হবে।

কুসুমনলিনীকে "মহুয়া"তে আমার খুব ভাল লেগেছিলো। একে আরো একটু বড় অংশে আমরা দেখতে ইচ্ছে করি।

"দেবদাসে"-র যমুনাকে ভালো করে' আমরা দেখবার সুযোগ পাইনি। তার চেহারা সম্পূর্ণ চিত্রোপযোগী, এবং আশা করা যায় আসচে বছর এ স্মরণীয় হবে।

তা ছাড়া উমাশশী, চন্দ্রাবতী, কানন বালার আসচে বছর বোধ হয় ভালোই কাটবে। মলিনারও তাই।

মনে রাখবার মত

গেলো বছর বাংলা ফিল্ম শিল্পে অনেক কিছু নতুনত্ব দেখা গেছে।

প্রথম নম্বর—সর্ব্বপ্রথম কার্টুন ছবি—"পিবাদার্স।"

দ্বিতীয়—জঙ্গলী ছবি "মহুয়া"।

তৃতীয়—শিশু অভিনয়ে সুন্দর শ্রীমতী পূর্ণিমা ও মাষ্টার বুলু "শচী-দুলাল"-এ।

চতুর্থ—সেটিঙ-এ "দক্ষ-যজ্ঞ"।

পঞ্চম—প্রথম Gangster ছবি "তরুণী"।

তা ছাড়া হাসির ছবির ভেতর "মণিকাঞ্চণ"।

আকাঙ্খা

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

ওগো সখা, আজকে কেন
নয়ন কোণে জল,
মৌন বুকের রুদ্ধ বাণী
কও না অবিরল?
যৌবনের ওই তীব্র তাপে
যে দীপ ছিলো ম্লান;
আজ জ্বালো সেই প্রেম-শিখাটী
দীপ্ত করো প্রাণ!
দিনের কাজে যে সুর ছিলো
মনের মাঝে হারা—
সে সুর শোনাও আজ সাঁঝেতে,
আকুল পাগল পারা!
হাসি-অশ্রু দুখের মাঝে
আমারই এই বুকে;—
প্রণয় ভরে রাখিয়াছি
মনের গোপন সুখে!

খেয়ালী চিত্র-পট
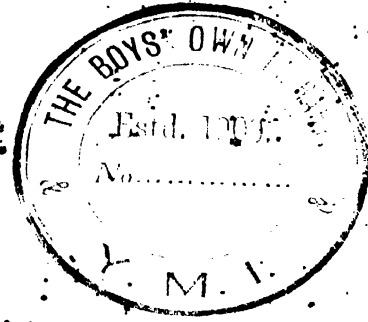
শ্রীমতী উষারাণী দেবী
নির্বাক্-যুগে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় কোরে ইনি খ্যাতি অর্জন করেন। সবাক্-যুগেও এঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কালী ফিল্মস্-এর "মণি কাঞ্চন" দ্বিতীয় পর্বে এঁকে [illegible] নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে।
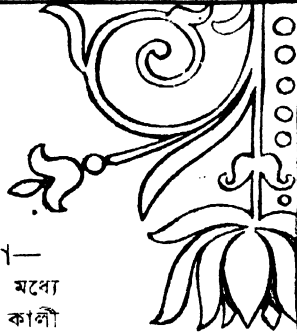
শ্রীমতী শিশুবালা—
নাম-করা অভিনেত্রীদের মধ্যে ইনি একজন। সম্প্রতি কালী ফিল্মস্-এর "পাতাল পুরী"তে ইনি একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় কোরছেন।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ৩রা মাঘ, ১৩৪১. 17th January, 1935. { ৩য় সংখ্যা

সুভাষচন্দ্রের বিদায়-বাণী

বোম্বাইয়ের উপকূলে ভারত পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে বাংলার জননায়ক সুভাষচন্দ্র ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে সুস্পষ্ট বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে বাংলার উপেক্ষিত জনমত প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক রোদেয়াদ যে জাতীয়তার আদর্শের পরিপন্থী তাহা ঘোষণা করিয়া সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসী চক্রান্তের মূলচ্ছেদ করিয়াছেন। বাংলায় কিরণ-বাহিনী বিপর্য্যস্ত হইলে ডাঃ বিধানচন্দ্র পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। তৎপরে অগত্যা সুভাষচন্দ্রকে সভাপতিপদে বরণ করিয়া কিরণ-বাহিনী মান রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সুস্পষ্ট মতবাদে তাঁহাদের আস্থা আছে কি? কিরণ-বাহিনীর মতবাদ যাহাই হউক না কেন বাংলার জাগ্রত জনমত যে সুভাষচন্দ্রের বিবৃতিতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

গণ-পরিষদের মিথ্যা বুলিতে যাঁহারা ভারতের জনমতকে বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন সুভাষচন্দ্র তাঁহাদের স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে যাঁহারা জাতীয় আন্দোলনের ভাব-ধারার সহিত বিচ্ছিন্ন তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা কোনকালেই সম্ভবপর নয়। অতীতে মদনমোহন ও নরমপন্থীরা কংগ্রেসকে অপদস্থ করিয়া পদলেহনে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাঁহাদের এই মনোবৃত্তি মজ্জাগত। সুতরাং পুনরায় অনুরূপ অলীক ঐক্য প্রচেষ্টা বিফলই হইবে।

গান্ধীজির অবসর গ্রহণ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন যে তাঁহার এই অবসর গ্রহণ অর্থহীন। কংগ্রেসকে স্বীয় মতানুযায়ী পুনর্গঠিত করিয়া এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে গান্ধীবাদে আস্থাবান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পুষ্ট করিয়া পরিশেষে অবসর গ্রহণের কথা অলীক ও অশোভনীয় বলিয়াই মনে হয়।

পরিশেষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির নির্ব্বাচনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সুভাষচন্দ্রের সভাপতি নির্ব্বাচন শুধু যে বিজয়ী সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের জয় ঘোষণা করিতেছে তাহা নয়—নিখিল ভারত রাষ্ট্র-সভায় উপেক্ষিতা বাংলার জনমতের বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।

"পুনরাগমনায় চ"—সুস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া সুভাষচন্দ্র বাংলার নেতৃত্ব গ্রহণ করুন দেশবাসীর ইহাই একান্ত কামনা।

চলতি পথে

শ্রীমল্লিনাথ

দেশবাসীর কর্ত্তব্য

যুব-ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু একমাসকাল স্বগৃহে বন্দীজীবন অতিবাহিত করিয়া সরকারী ইচ্ছায় পুনরায় গত সপ্তাহে ইউরোপ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার কলিকাতা পৌঁছান হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে বোম্বাইয়ে জাহাজে তুলিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত সরকারের মুখপাত্র হিসাবে পুলিশ তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে তাহার কোন হেতু আমরা নির্ণয় করিতে না পারিলেও আমাদের মনে হয় সুভাষচন্দ্রকে বহন করিয়া বোম্বাই বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িবার পর হয়তো সরকার ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার বিষয় নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রান্ত সুভাষচন্দ্র ভারতে ইংরাজ আধিপত্য সহসা অচল করিয়া দিতে সক্ষম ছিলেন কিনা অথবা কেবল তাঁহার এদেশে উপস্থিতিই শাসকবর্গের অন্তরে অহৈতুক ত্রাসের সঞ্চার করে কিনা আমরা সবিশেষ জ্ঞাত নই। প্রভুদের আদেশ হইয়াছে, তামিল করিতেই হইবে এই যখন দেশের অবস্থা, তখন ইহার কোন প্রতিবাদ করিয়া লাভ নাই। সংবাদে প্রকাশ যে, সুভাষচন্দ্র রোগমুক্ত হইলে যখন ইচ্ছা ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন, সরকার তাঁহার পথে কোনরূপ বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করিবেন না—ইহা খুবই আনন্দ এবং আশার কথা। এবং সুভাষচন্দ্রের প্রতি এই অসামান্য কৃপা-প্রদর্শনের জন্য সরকারকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ দেই। এখন শুধু ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা সুভাষচন্দ্র সত্বরই রোগমুক্ত হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে আগাইয়া লইয়া জাতির নেতৃত্বভার গ্রহণ করুন।

সুভাষচন্দ্র বোম্বাইয়ে জাহাজ আরোহণ করিবার প্রাক্কালে দেশবাসীর বর্ত্তমান অবস্থায় কর্ত্তব্য কি তাহা এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন। ঐ বিবৃতির ভাষা বা ভাব রাজনৈতিক নেতৃসুলভ অসংযমী গরম গরম কথা নহে বা প্রতিষ্ঠিত সরকারের সম্বন্ধে কতকগুলি উষ্মাপ্রসূত সাবধান বাণী নহে—উহা ধীর মস্তিষ্কের সুচিন্তিত অভিমত। কাজেই তাঁহার বিবৃতি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং আমাদের বিশ্বাস যে সুভাষচন্দ্রের স্বদেশবাসী বিশেষ করিয়া বাংলায় যাহারা তাঁহার অনুচর বা সহকর্ম্মী বলিয়া পরিচিত হইতে লালায়িত তাঁহার নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়া কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিবেন। তিনি প্রথমেই জাতিকে আত্মবিশ্বাসী হইতে বলিয়াছেন। এখন দেশের রাজনৈতিক অঙ্গ যেরূপ অবসাদগ্রস্ত তাঁহাতে তাঁহার ঐ বাণী ভীতিগ্রস্তের হৃদয়েও আশা ও সাহসের সঞ্চার করিবে। আজ ভারতবর্ষের অবস্থা যতই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হউক না কেন, আমরা যদি সাহসসহকারে কাজ চালাইয়া যাইতে পারি, তিনি বলিয়াছেন, পরিশেষে আমরা জয়যুক্ত হইবই। এই বাণী আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট নেতৃবর্গসুলভ চটুল চপলতা নহে, ইহা দৃঢ় আত্মবিশ্বাস প্রসূত কর্ম্মবীরের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে নির্গত রণক্লান্ত অবসাদ[illegible] ভারতের প্রতি অভয় বাণী; ইহার সুফল [illegible]।

বর্ত্তমান কংগ্রেস আইন সভায় প্রবেশ করিতে মনস্থ করিয়াছে। সুভাষচন্দ্রকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন—"কেবল-মাত্র আইন সভার প্রচেষ্টা দ্বারাই আমরা স্বরাজ লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারিব, এইরূপ মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব গোড়া হইতেই আমাদিগকে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের পশ্চাতে জনমতের প্রবল সমর্থন থাকিলেই আইন সভার ভিতরের কাজ দ্বারা কিছুমাত্রায় ফল হইতে পারে। এই অবস্থায় আইনসভার কাজ লইয়া একেবারে মাতিয়া থাকা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।" এই অভিমতের পর কোনও মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সংক্রান্ত বিতর্কের কথা উল্লেখ করিয়া সুভাষচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন—অনুরূপ কথা আমরাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। জাতীয়তাবাদের উপর ভিত্তি করিয়া যে একতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতরে সংস্থাপিত; তাহাই কেবল গ্রহণীয় অন্যথায় নহে, কেননা "বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে গঠিত যে ভারত তাহা অখণ্ড নহে, উহা হইবে খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ভারত।" কংগ্রেস দেশবাসীর বিশেষ প্রতিবাদ সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন রূপ এক অপরূপ ক্লৈব্যনীতির পরিপোষকতা করিতেছেন এবং বর্ত্তমানের কংগ্রেস-কর্ত্তারা এই অভিনব কর্ম্মনীতির যাঁহারা বিরুদ্ধতা করিতেছেন তাঁহাদের সহিত মতান্তর হওয়ায় তাঁহাদিগকে 'বিদ্রোহী' 'কংগ্রেসদ্রোহী' ইত্যাদি আখ্যা দিয়া কোন-ঠাসা করিয়া কংগ্রেসের মধ্যে জাতিচ্যুত করিয়াছেন। এইজন্য সুভাষচন্দ্র বর্ত্তমান কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি যে দেশের সমস্ত মতের প্রতীক এবং সকল দলের প্রতিনিধিত্ব করিবার

যোগ্য, ইহা আমি মনে করিনা। এই কার্য্যকরী সমিতিকে শুধুমাত্র কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।" সত্যই আজ নিখিল ভারতীয় অবাঙ্গালী নেতৃবৃন্দ এইরূপ পরিচয়ই দিতেছেন যে তাঁহাদের উপলক্ষ্য করিয়া উক্ত নিন্দাসূচক বাণী প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সুভাষচন্দ্র বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পর্কে আরও অনেক কথাই বলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কীয় ব্যাপারের সমাধান করিবার নিমিত্ত কংগ্রেস গণ-পরিষৎ আহ্বান করিবার কথা বলিয়াছেন; তিনি বলেন—"বর্ত্তমানে গণ-পরিষৎ আহ্বানের অর্থ গাড়ীর পিছনে ঘোড়া জুড়িয়া দেওয়া। সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর মধ্য দিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করে, তাহা হইলে গণ-পরিষৎ আহ্বান করা হইলেও তাহার সার্থকতা কি? এরূপ ক্ষেত্রে গণ-পরিষৎ আহ্বান করিলেও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে কোনও সু-সিদ্ধান্ত সম্ভব নহে।" আমরাও পূর্ব্বে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য গণ-পরিষৎ আহ্বান করাকে লোক ভুলাইবার মরীচিকা ছল বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। সুতরাং এই সম্বন্ধে আর মন্তব্য বাহুল্যমাত্র—এবং দেখা যাইতেছে ঐ সম্বন্ধে সুভাষবাবু ও আমাদের একমত। পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন—"আমাদের প্রকৃত তথ্যগুলির সম্মুখীন হইতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ দুর্ভাগ্যজনক, তাহাতে আমার মনে হয়, যথাসম্ভব সকল দিক দিয়াই গঠন-মূলক অথচ উন্নত ধরণের একটা কার্য্যক্রম অন্ততঃ কয়েক বৎসরের জন্য গ্রহণ করা আবশ্যক এবং এই সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে উৎসাহের অভাব না ঘটে, তজ্জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করাও একান্ত প্রয়োজন।" কর্ম্মবীর সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠ হইতে দ্বিধাহীন সত্যকথা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার গত দুই বৎসরের বাধ্যকৃত বিশ্রাম তাঁহাকে একান্তে দেশের বিষয়ে নিবিড়ভাবে চিন্তা করিবার অবকাশ দিয়াছে; কাজেই তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ইহাই পরিস্ফুট হয় যে দেশের নানারকম সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার "মানসিক উৎসাহ" কিছুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই, "এই বিবৃতির সংযত ভাষা, নিপুণ বিশ্লেষণ ও অকপট সত্য তাহার প্রমাণ।" আশা করি সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি পাঠ করিয়া দেশের কর্ম্মীবৃন্দের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হইবে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

গোলমাল একটা ঘটিয়াছে কিন্তু তাহা কোনখানে, সেটা ঠিক ধরা যাইতেছে না। ৩নং রেগুলেশনে রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু পরিষদে নির্ব্বাচিত হইয়া স্বয়ং গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরকে গোলমালে ফেলিয়াছেন অথবা তাঁহার অন্যমূর্ত্তি 'সপারিষদ' গভর্ণর-জেনারেলকে গোলমালে ফেলিয়াছেন। বন্দী শরৎ বসুর উপর ইতিপূর্ব্বে স-পারিষদ বড়লাট হুকুম-জারী করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্তরীনাবাস কার্সিয়ং যাইতে হইবে, সে আদেশ লঙ্ঘন করিলে আছে শাসকের শাসন দণ্ড! আবার এদিকে খোদ বড়লাট বাহাদুর অন্য এক পত্রে পরিষদ সদস্য শরৎ বসুকে পত্র দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়াছেন অর্থাৎ আদেশ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে এম-এল-এ হিসাবে পরিষদের অধিবেশনে আগামী ২১শে জানুয়ারী তারিখে যোগ দিতে হইবে। একজন অন্তরীণ বন্দীর উপর একই গভর্ণর-জেনারেলের দ্বিবিধ আদেশে যে অদ্ভুত ও অভিনব পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুও গোলমালে পড়িয়াছেন। যাহা হউক শ্রীযুক্ত বসুকে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছা যদি স-পারিষদ গভর্ণর-জেনারেলের থাকে তবে এই সমস্যার সু-সমাধান হইবে। আর মুক্তি যদি দেওয়া না হয়' তবে তাঁহাকে পত্র দেওয়ায় প্রকারান্তরে তাঁহাকে অপমানিত করাই হইয়াছে। আমরা এই গোলমালের সু-সমাপ্তি দেখিতে আগ্রহান্বিত রহিলাম।

ইউরোপের রাজনৈতিক গগন

ইউরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়া বার বার কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে আবার কখনও বা নূতন এক আবহাওয়ায় তাহা আংশিক নিবৃত্ত হইতেছে। সম্প্রতি ফ্রান্স—ইতালীর এক গোপন চুক্তিতে ইউরোপের কুয়াসাচ্ছন্ন রাজনৈতিক গগন আবার পরিষ্কার হইতে চলিয়াছে বলিয়া রাজনৈতিক মহল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাপারটা আরও একটু খোলাখুলি বলা যাক—বিশ্ব-রাষ্ট্রসভা হইতে জার্ম্মাণী সদম্ভে বাহির হইয়া যাওয়ায় দক্ষিণ ইউরোপের শক্তি সমূহ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তারপর এক একবার এক একটা ঘটনা ঘটে, অমনি তাঁহারা আতঙ্কে চমকিয়া উঠেন, তাঁদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি প্রসারিত হয় জার্ম্মাণীর দিকে। সকলেরই মনে এই প্রশ্ন সাড়া দেয়, গোপাল-গোবিন্দ হিটলার কি এই অপকীর্ত্তির জন্য দায়ী নয়? তারপর অষ্ট্রিয়ার বিদ্রোহের পর যখন প্রকাশ হইয়া পড়িল যে নাৎসীগণ বিদ্রোহের সংঘটনে সাহায্য করিয়াছে, তখন শক্তিবর্গ পরস্পর এক প্রকার মুখ চাওয়া চাওয়ি করিলেন, বুঝিলেন, তাঁহাদের শঙ্কা অমূলক নহে। যাই হোক সকলের শঙ্কা স্থল জার্ম্মাণীকে জব্দ করার কোন আইনসঙ্গত উপায় না থাকায় তাঁহারা বিশ্ব রাষ্ট্র-সঙ্ঘ ও অস্ত্রহ্রাস সম্মেলনের নামে বড় বড় মিষ্ট ও হিতোপদেশ মূলক কথার ফাঁদে জার্ম্মাণীকে আটকাইতে চাহিলেন। ধূর্ত্ত জার্ম্মাণী সে ফাঁদে পা বাড়ায় নাই; এতদূর পর্য্যন্ত ঘটনা খুব খোলাখুলিভাবে ঘটিয়াছে। বিশ্ববাসী—বিশেষ করিয়া অনুসন্ধিৎসু রাজনীতিক ও সাংবাদিক মহল তাহা জানেন। তাহার পর যে ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা গুরুত্বপূর্ণ হইলেও সাধারণের নিকট সহজ বোধ্য নয়।

ফ্রান্সের পররাষ্ট্র সচিব মঁসিয়ে লাভাল

ইতালী অভিমুখে ছুটিয়াছেন। ইতালীর সর্ব্বময় প্রভু সিনর মুসোলিনি তাঁহাকে যথোচিত সাদরভাবে অভ্যর্থিত করিয়াছেন। তাহার পর তাঁহাদের দুইজনের গোপন আলোচনার ফলে ইতালী ও ফরাসী দেশের মধ্যে যে গোপন চুক্তি হইয়াছে তাহা বিশেষ গোপনীয় হইলেও সাংবাদিক মহল তাহা কেমন করিয়া জানিয়া ফেলিয়াছেন। প্রকাশ, এই চুক্তির মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার সংক্রান্ত কয়েকটী সর্ত্ত আছে। বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই চুক্তি সংসাধিত হইয়াছে অর্থাৎ জার্ম্মাণীর লক্ষ্য যে ইতালী ও ফরাসী দেশের উপর আছে কল্পনা করিয়া, সেই লক্ষ্য প্রতিহত করিবার জন্যই এই সন্ধি। ফ্রান্স ও ইতালী যেমন জার্ম্মাণীকে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারে নাই, অপর দিকে আবিসিনিয়াও তেমনি ইতালীর দুর্ব্যবহারে ব্যথিত চিত্তে কাল যাপন করিতেছেন। তাঁহারা রাষ্ট্রসঙ্ঘে আবেদন করিয়াছেন যে, ইতালী আবিসিনিয়ার সীমায় প্রবেশ করিয়া অত্যাচার উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। ইতালীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থিত হওয়ার পরও ফ্রান্স নিজ স্বার্থের খাতিরে আবিসিনিয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ইতালীকে কিছু রাজনৈতিক সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। ফ্রান্স রাষ্ট্রসঙ্ঘের একজন জবরদস্ত সদস্য। অন্যদিকে জাপান তাহার সস্তা পণ্যে আবিসিনিয়া ছাইয়া ফেলিয়াছে—অন্য কোন দেশের বাণিজ্য দ্রব্য সেখানে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং আবিসিনিয়ার জন্য কোন বাণিজ্যক রাষ্ট্রের দরদ নাই, বরং জাপানের সহিত যাহারা প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠে না, তাহারা জাপানকে যে চক্ষে দেখে, আবিসিনিয়া তাহার সমর্থক বলিয়া তাহাকেও সমচক্ষে দেখিয়া থাকে। কাজেই অনুমান হয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ হইতে সে সুবিচার পাইবে না।

জার্ম্মাণীকে জব্দ করিবার জন্যই যদিও ইতালী-ফ্রান্স প্যাক্ট হইয়াছে, তথাপি অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার অজুহাতে আর একটী বড় রকম সভা সত্বরই আহ্বান করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। এই সভায় নাকি জার্ম্মাণী, হাঙ্গেরী, জেকো-শ্লোভাকিয়া, যুগো শ্লাভিয়া, পোলাণ্ড ও রুমানীয়াকে নিমন্ত্রিত করা হইবে।

জার্ম্মাণী এই সংবাদে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে—এই সভা একটী বৃহৎ অশ্বডিম্ব প্রসব করিবে।

লণ্ডনেও নৌ-বল নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন বিফল হইয়া গেলেও সম্মেলনের কর্ত্তাদের এখনও আশা ভঙ্গ হয় নাই। তাঁহারা আশা করেন, কেবল বৃটেনের সদাশয়তায় এই সম্মেলন বিফল হইবে না—নৌ-চুক্তি একেবারে অসম্ভব নহে। ইউরোপের রাজনৈতিক সমস্যা এখন এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে যে, দুইদিন পরে অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহা ভবিষ্যদ্বাণী করা অত্যন্ত কঠিন। তথাপি একথা খুবই সত্য যে আগামী যুদ্ধ যত শীঘ্র আরম্ভ হইবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন, তাহা হইবে না; তাহার কারণ গত মহাযুদ্ধে যে ক্ষতি ইউরোপের সাধিত হইয়াছে আজও তাহার সম্পূর্ণ পূরণ হয় নাই।

"এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে?"

১১।৫ কড়েয়াবাজার রোড হইতে প্রকাশিত "নবশক্তি" ২৬শে পৌষের সংখ্যায় লিখিয়াছেন:—

"সরকারী মহলে মেলামেশার সুযোগ পাইলেই যে সকল কংগ্রেস পেখমধারী নেতা আকুল হইয়া ছুটিয়া যান, সম্বর্দ্ধনা-ভোজের পত্র পাইলেই যাহারা আপ্যায়িত বোধ করেন, তাহাদিগকে চিনিয়া রাখা আবশ্যক। কারণ, এই শ্রেণীর লোক বহুদিন প্রশ্রয় পাইয়াও যখন তাঁহাদের স্বভাব শোধরাইতে পারেন নাই, তখন তাঁহাদিগকে আর সহ্য করা সঙ্গত হইবে না। সরকারী প্রসাদের লোভ তাঁহাদের দুর্জ্জয়, দেশবাসীর নিকট নেতৃত্ব ফলাইবার আকর্ষণও দুর্ণিবার। তাই দুই দিকের তাল সামলাইতে না পারিয়া হাবু ডুবু খাওয়াই তাঁহাদের স্বভাব। কংগ্রেসের নামে এই সকল নায়কের আচরণ জাতীয় জীবনের কলঙ্ক।

যাহারা নামে কংগ্রেসপন্থী, কাজে সহযোগী, মুখে মহাত্মা, মনে সরকারী-আত্মা, তাহারা ভয়ানক। প্রয়োজন হইলে দেশের দাবী অতলে ডুবাইতেও তাহাদের বিলম্ব হয় না, আবার লাঞ্ছিত কংগ্রেস কর্ম্মীদের সহিত সময়মত গলাগলি করিতেও কম উৎসাহ দেখা যায় না। শুধু জনসাধারণের নহে, কর্ত্তৃপক্ষেরও ইহাদের স্বরূপ জানিয়া রাখা আবশ্যক। যাহারা স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে সুযোগমত একবার এদিক আবার ওদিক দুই দিকেই দই মারিবার জন্য লালায়িত, তাহাদের মতেরই বা মূল্য কি, আর ব্যক্তিত্বেরই বা প্রভাব কতটুকু? ময়ূরপুচ্ছধারী এই জীব হইতে সরকার ও জনসাধারণ সকলেরই দূরে থাকা কর্ত্তব্য।"

ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্তের পরিচালিত পত্রিকা "নবশক্তি"র এতদিনে সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে দেখিয়া প্রীত হইলাম। নরেন্দ্রের গুরুদেব বিধান এতদিন কালসর্প নলিনীকে পোষণ করিয়া পরিশেষে অপদস্থ হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া শিলংএর বনবীথিকায় বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন। "নবশক্তি" কর্ত্তৃক আখ্যাত "ময়ূরপুচ্ছধারী জীব" নলিনী যে বাংলা কংগ্রেসের কালসর্প সে জ্ঞান কি এতদিন পরে বিধান—কিরণ—ক্যাপ্টেন দত্তের মনে উদয় হইল? Better Late Than Never!

অবাঞ্ছিত

বহু উপেক্ষিত ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব বলিয়া কথিত অবাঞ্ছিত জে পি সি রিপোর্ট সম্পর্কে যুক্ত-প্রদেশ সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় রিপোর্টের নিন্দা করা হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রনের অধিকার কেবলমাত্র ভারতীয়গণের হাতেই থাকা আবশ্যক—অন্য কাহারও সে অধিকার নাই। করাচী ও নয়া দিল্লীর মহিলা সম্মেলনও মত প্রকাশ করিয়াছেন যে তাঁহারাও ঐ রিপোর্টে সন্তুষ্ট নহেন, তাহার কারণ তাঁহাদের (ভারতীয় মহিলা সমাজের) বিশেষ কোন অধিকার জে-পি-সি রিপোর্টে স্বীকৃত হয় নাই। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্তর হইতে এত প্রতিবাদ হইয়াছে যে উহা জে-পি-সি রিপোর্ট অপেক্ষাও অধিকতর ভারী হইয়া উঠিয়াছে। রিপোর্ট-রচয়িতাগণের তবুও চেষ্টার ক্রুটী নাই, এই অবাঞ্ছিত সামগ্রী ভারতবাসীর স্কন্ধে তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাপাইয়া দিবার। বাজারে জোর গুজব যে, এই অবাঞ্ছিত ভার ভারতের ঘাড়ে চাপাইবার জন্য এবার এক অভিনব পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। জেনারেল স্মাটস্, মিঃ এণ্ডরুজ, রয়ডেন, লর্ড এসবি, মাননীয় আগা খাঁ প্রভৃতি নাকি চেষ্টা করিতেছেন গান্ধিজীকে হাত করিবার জন্য। তাঁহারা মনে করেন গান্ধিজীকে হাতে আনিতে পারিলে তাঁহার হাতে ঐ শাসনতন্ত্র তুলিয়া দেওয়া হইবে। গান্ধিজী অস্পৃশ্যকে স্পৃশ্য করাইতে ওস্তাদ; অতএব তিনি যদি উহা একবার হাত পাতিয়া গ্রহণ করেন তবে উহা সকল শ্রেণীর নিকট গ্রহণীয় হইবে এবং ভারতবাসী আর উহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। আরও এক গুজবে প্রকাশ যে গান্ধিজীকে লইয়া আবার চতুর্থ দফায় এক গোলটেবিল বৈঠক অভিনয় হইবে এবং ঐ সম্পর্কে নাকি সরকারী মহল বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মনে হয়, যাহা কিছুই ঘটুক না কেন, ভারতবাসী গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া যাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে চাহে, তাহাকেই আবার সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতে পারে না। গুজব যদি সত্যও হয় তবে ভারতের স্বার্থের হানিকর কোনরকম শাসনতন্ত্রই গান্ধিজী গ্রহণ করিতে পারেন না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। যাহাদের অনুপ্রেরণায় এবং ইঙ্গিতে গান্ধিজীকে ব্যস্ত করা হইতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলেও প্রকাশ করিতে সাহস করি না। তবে আমরা আবার বলিতেছি গান্ধিজীর নিকট এবং সমগ্র ভারতবাসীর নিকট উহা গ্রহণের অযোগ্য—অবাঞ্ছিত।

সাধু বোম্বাই!

কর্ণাটকের দুর্দ্দশাগ্রস্ত কৃষকদিগের সাহায্যের জন্য বোম্বাই কংগ্রেস কমিটি এক তহবিল খুলিয়াছেন। মিঃ ভুলাভাই দেশাই এই সম্পর্কে দেশবাসীর নিকট এক আবেদন করিয়াছেন যে, কর্ণাটকের কৃষকেরা বিগত জাতীয় আন্দোলনে জড়িত হইয়া এখন সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ অতুলনীয়। অতএব দেশবাসীর পক্ষ হইতে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত এই সকল বীর কৃষকগণকে সাহায্য করা উচিৎ। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ইহার দ্বারা তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার দিকে চাহিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, বাঙ্গলার কি ঐরূপ ব্যাপারে কোন কর্ত্তব্য নাই? বাঙ্গলার এমন কোন জেলা নাই, যেখানে কিছু না কিছু লোক স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়া বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মেদিনীপুর, আরামবাগ প্রভৃতি স্থানের কৃষকদিগের দুর্দ্দশার সীমা নাই। তাহাদের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি কি করিয়াছেন বা করিতেছেন? দলাদলি এবং পরস্পর কোন্দল ব্যতীত আরও করিবার তো অনেক কিছুই আছে—এবিষয়ে আমরা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্ম্মী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কমল কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বীরবলের চিঠি

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

গত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে "খেয়ালী"তে দু'কথা লেখবার আদেশ আমি পেয়েছি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এ সাহিত্য-উৎসবে আমি রীতিমত যোগ দিতে পারিনি। এর কারণ, আমার দেহ এখন আমার ইচ্ছাকে সব সময়ে অনুসরণ করে উঠতে পারেনা। প্রাণ-শক্তির মূল কি জানিনে, কিন্তু সে শক্তি যে দেহের শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুস্যূত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমি যে এই সম্মেলনে নিত্য হাজিরা সই করতে পারিনি, অথবা করিনি, তার জন্য দায়ী আমার মন নয়, আমার দেহ। আজকাল কোনও বিরাট সভাসমিতিতে যোগ দেবার কথা মনে হলেই আমার দেহ আমার কর্ণে এই মন্ত্র দেয় যে—"প্রবৃত্তিরেষা নরাণাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা"।

যাক্ এ সব নাকে-কাঁদুনি কথা। প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনের প্রতি আমার একটু বিশেষ মায়া আছে। এর কারণ, বছর ছয় সাত পূর্ব্বে আমি আমার জীর্ণ দেহ কষ্টেসৃষ্টে হাজার মাইল বয়ে নিয়ে গিয়ে দিল্লীতে উপস্থিত হই—এই প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের মূল-গায়েন হিসেবে। প্রবাসী সাহিত্যিকরা আমাকে যে সভাপতির উচ্চ আসনে বসান, তার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। সে সভায় আমি উপস্থিত ছিলুম বক্তা হিসেবে। কিন্তু কলকাতার এই সম্মেলনে আমি যে শ্রোতা হিসেবেও নিত্য উপস্থিত হতে পারিনি,—তারই কৈফিয়ৎ হিসেবে আমার অপটু শরীর সম্বন্ধে এত কথা বললুম। এ কৈফিয়ৎ দিচ্ছি প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যিকদের কাছে—বঙ্গদেশবাসী বাঙালী সাহিত্যিকদের কাছে নয়। আমি যে একজন খামখেয়ালী সাহিত্যিক, তা আমার স্বদেশবাসী সাহিত্যিকরা সকলেই জানেন। তাঁদের কাছে যদি কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে হয় ত—সাহিত্য-চর্চ্চা-রূপ অনধিকারচর্চ্চা করি কেন?—তার জন্যে।

আমি প্রবাসী-সাহিত্যকদের বক্তৃতা নিজ কানে না শুনি, সংবাদপত্রে প্রায় সকলের বক্তব্যই পড়েছি। এর অনেকগুলি প্রবন্ধই প্রফেসরদের লেখা। আমাদের তথাকথিত বঙ্গসাহিত্য অনেক বিষয়ে অঙ্গহীন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় অনেক সাহিত্যিকদের নিকটই অস্পৃশ্য। এর এক কারণ এই যে, আমরা নানা-রকম বিদ্যা অর্জ্জন করিনি; আর যদিও স্কুল কলেজে তা করে থাকি ত, আমাদের সাহিত্যে তার পরিচয় দিতে আমরা কুণ্ঠিত। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পাশ কাটিয়ে কোন দেশের সাহিত্যই বড় সাহিত্য হয়ে উঠতে পারেনি। সংস্কৃত সাহিত্যও জ্ঞান-বিজ্ঞানবর্জ্জিত নয়। কালিদাস যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সে বিষয়ে সকলেই একমত; অথচ সেকালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে যে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল, কালিদাসের কাব্যই তার প্রমাণ। এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চা করেন—প্রধাণতঃ প্রফেসরের দল। সুতরাং তার প্রচার করবার ভার এখন তাঁদেরই হাতে। তাঁরা যে বাঙলা ভাষায় তা প্রচার করতে ব্রতী হয়েছেন—এ বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে আশার কথা। এঁদের রচিত সাহিত্যকে academic literature বলা যেতে পারে। Academic literature-কে ঠিক literature বলা যায় না। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, সকল দেশেই academic literature বলে একটি বিশেষ শ্রেণীর literature গড়ে উঠেছে। এবং তার প্রভাব pure literature-এর উপর স্পষ্ট। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যিকরা যে অনেকে এ জাতীয় literature গড়ে তুলতে কৃতসংকল্প হয়েছেন, এ আমি অতি সুখের কথা মনে করি। মনে রাখবেন যে, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই মাষ্টারমহাশয়ের দলভুক্ত। বলা বাহুল্য যে, academic literature বলতে text-book বোঝায় না।

প্রবাসী বাঙালীদের প্রবন্ধাদি পড়ে এবং তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে একটি সত্য আমি আবিষ্কার করেছি। প্রবাসী বাঙ্গালীরা যে স্বদেশী বাঙালীদের "দেশকা ভাই" এবং উভয়েই যে একই সমাজভুক্ত, এই জ্ঞানের উপরেই এই সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত। এবং উভয়ের ভাষার ঐক্য যে উভয়ের মধ্যে প্রধান বন্ধন—এই সহজ সত্যটির উপর প্রতি প্রবাসী বাঙালীদের বিশেষ করে দৃষ্টি পড়েছে।

আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বহু লোক নানা কারণে প্রবাসী হতে বাধ্য, অথচ মনে যাতে তাঁরা বিদেশী না হন, এ কারণ তাঁদের পক্ষে নিজেদের জাতীয় মনোভাব জীবন্ত রাখবার জন্য বাঙ্গলা সাহিত্যের চর্চ্চা করা নিতান্ত প্রয়োজন।

এ যুগে আমরা যাকে বাঙলা সাহিত্য বলি, তার অন্তরে বিলেতি মনোভাবের প্রভাব বিশেষ স্পষ্ট—এক কথায় তা যবনদোষে দুষ্ট। কিন্তু সে সাহিত্য বাঙলা ভাষায় লেখা হয় বলে, তাতে বাঙ্গালী মনোভাবেরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশী ভাষাই স্বদেশী

আমি রইবো একা আঁধার কোণে

শ্রীশান্তি প্রকাশ মিত্র
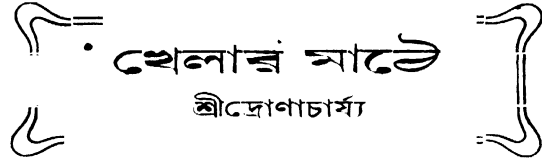
আমি রইবো একা আঁধার কোণে;
তার নুপুরের করুণ ধ্বনি—
শুনবো বসে আকুল মনে।
নিশীথ-নিশা—নীরব ভাষা
জাগায় প্রাণে গোপন আশা;
তার বরণে বরণ-ডালা—
সাজাই, মিছা স্বপ্ন-স্বপনে।
হতাশের পথের সাথী—
সুখের স্মৃতি দুখের গীতি,—
এই নিয়ে তো তারই খোঁজে,
ফিরি একা কাঙাল সাজে;
তার পুলকভরা পরশখানি—
পাই যেন শেষ বিদায়-ক্ষণে।

——

মনোভাবের দেহ। বাঙলা ভাষায় পুরো সাহেবী মনোভাব প্রকাশ করা অসাধ্য। অবশ্য আমরা ইংরেজী শিখে, কি স্বদেশী কি বিদেশী কোন মনোভাবই প্রকাশ করতে পারিনে, শুধু কতকগুলি মুখস্থ বিদেশী বুলি আওড়াতে পারি। স্বদেশী ভাষা আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের মনের যোগ রক্ষা করে। এ কারণেও আমাদের ভাষা, আমরা দেশেই থাকি, কিম্বা বাইরেই যাই, আমাদের জাতীয়তার পৈতৃক বন্ধন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, দল বেঁধে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। একথা ঠিক। কিন্তু দল বেঁধে সাহিত্যের মর্য্যাদা বাড়ান যায়। এ কারণেও এ-জাতীয় সম্মেলন বাঙালীর আত্মাকে প্রস্ফুটিত করে।

প্রমথ চৌধুরী।

খেলার মাঠে

শ্রীদ্রোণাচার্য্য

ক্রীকেট

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সাথে টেষ্ট খেল্‌বার জন্য ইংলণ্ড থেকে একটি ক্রীকেট টিম পাঠানো হয়। ওদের প্রথম টেষ্ট খেলা হয় বার্বাড়সে। এবং এ খেলায় ইংলণ্ড ৪ উইকেটে জয়ী হয়েছে। খেলার পূর্ব্বে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় মাঠের অবস্থা মোটেই ভাল ছিলনা। তাই টসে জয়ী হয়ে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ যদিও প্রথমে ব্যাট্‌ কর্ত্তে থাকে তবুও ওরা মাত্র ১০২ রাণ করেই সকলে আউট হয়ে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসেও ৬ই উইকেটে হয় মাত্র ৫১ রাণ। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে ৮১ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৫ রাণ হয়।

* * *

আস্‌ছে গ্রীষ্মে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে টেষ্ট খেল্‌বার জন্য যে টিম পাঠানো হবে বিলেতে তাতে যারা যারা খেলবে তাদের নাম নীচে দেওয়া গেল।

এইচ, এফ, ওয়াদে (নাতাল) ক্যাপ্টেন। এইচ, বি, ক্যামেরণ (ট্রান্সভাল) আই, জে সিড্‌ল (নাতাল) বি, মিচেল (ট্রান্সভাল) এ, ডি, নরস (নাতাল) ই, এল, ডাল্টন (নাতাল) ই, এ, বি, রোবান (ট্রান্সভাল) আর, জে, উইলিয়ামস (নাতাল) আর, জে, ক্রিস্‌প (ওয়েষ্টার্ণ) এ, জে, বেল (রোডেসিয়া) সি, এল, ভিনসেণ্ট (ট্রান্সভাল) কে, জি, ভিলজোন (অরেঞ্জ ফ্রীষ্টেট) এক্স, বালাসকাস (ওয়েষ্টার্ণ) ডি, টমলিনসন (রোডেসিয়া)।

* * *

অষ্ট্রেলিয়ায় যে দল পাঠানো হয়েছিল এ দল তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী হবে বলে আশা করা যায়। বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়া চিপারফিল্ডকে নিয়ে ইংলণ্ডে এসে যেরূপ চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছিল এরাও সেরূপ ল্যাংটনকে ওদের দলে নিয়েছে।

* * *

জোর গুজব এই বছর নভেম্বর মাসে অষ্ট্রেলিয়া থেকে একটি ক্রীকেট টিম ভারতবর্ষে আনয়ন করা হবে। পাতিয়ালার মহারাজ নাকি তাদের ব্যয়ভার বহন কোরবেন। এ খবর যদি খাঁটি হয় তাহলে ক্রীকেট খেলামোদী মাত্রই যে আনন্দিত হবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া ভারতের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার পর এরূপভাবে পুনরায় অষ্ট্রেলিয়া থেকেই টিম আনানো যুক্তিযুক্ত কিনা তাহাই হচ্ছে বিবেচ্য বিষয়।

ফুটবল

খেলাধূলায় ভারতও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমকক্ষ হতে চলেছে,—তারই একটি নিদর্শন গত শুক্রবার পোর্ট কমিশনার অফিসে মিঃ এল্ডারটনের সভাপতিত্বে আই, এফ,-এর এক সভায় পাওয়া গিয়েছে। বার্লিনে যে অলিম্পিক প্রতিযোগীতা হবে তাতে যোগদান করার জন্য ভারত থেকে একটি ফুটবল টিম পাঠানো হবে বলে ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ হেম্যান আই, এফ,-এর কাছে এক চিঠি দেন এবং উক্ত সভায় এই চিঠি সম্পর্কে আলোচনা হয়। বহু আলোচনার পর সভ্যগণ স্থির করেন যে, বর্ত্তমান সভার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, এমন অবস্থায় এরূপ একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা চল্‌তে পারে না, তাই **এসোসিয়েশনের নব-নিযুক্ত সভ্যগণই পরে এর সমাধান কোরবেন।**

টেনিস

ইণ্টার কলেজ টেনিস খেলায় প্রেসিডেন্সী কলেজ ফাইনালে জয়ী হয়েছে। কলেজের হয়ে খেলেছেন সি. এল. মেটা ও এম, দাস, বিজিত কলেজ সেণ্ট জেভিয়ার কলেজের হয়ে খেলেছেন অদীপ মুখার্জ্জি ও কে, চৌধুরী। খেলার ফল হয়েছিল ৬—৪, ৬—২, ও ৮—৬। নয় বছর পর প্রেসিডেন্সী কলেজ তাদের এই লুপ্ত গৌরবকে ফিরিয়ে এনেছে।

*　　*　　*

নর্থ ক্লাব টেনিস প্রতিযোগীতার ফাইনাল খেলা হয় মিঃ আর, কে দে ও মিঃ আর্ মুখার্জ্জির ভেতর, খেলাটি খুবই চমৎকার হয়েছিল। মিঃ মুখার্জ্জি যথেষ্ট ভাল খেলেও মিঃ দের কাছে হেরে গেছেন।

*　　*　　*

ডাবলসের ফাইনাল খেলায় মিঃ এ, ব্রুক ও ও মিঃ মুখার্জ্জি তাঁদের বিপক্ষ দল মিঃ এস. কে, মিত্র ও মিঃ ম্যাসকে পরাজিত করেন। এই খেলাটি খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। খেলার ফল হয়েছে ৮-৬, ৬-২ ও ৬-৪।

সংগ্রহ

পিঠ সাঁতারে পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেছে এক আমেরিকান বালিকা, বয়স তার মাত্র ১৮ বছর, নাম মিস এলিস। ৪৪০ গজ সাঁতারে তার সময় লেগেছিল মাত্র ৬ মিনিট ১২ সেকেণ্ড। এর পর আপনি কী আশা করেন?

*　　*　　*

বিলেতের সবচেয়ে বড় ফুটবল প্রতিযোগীতা হচ্ছে এফ, এ, কাপ প্রতিযোগীতা। আমাদের আই, এফ, এর খেলার মত উক্ত খেলায়ও ওদেশে খুব হৈ চৈ পড়ে যায়। তার সবচেয়ে মজার খবর হচ্ছে গেল বছরের বিজয়ী মাঞ্চেষ্টার সিটি দ্বিতীয় ডিভিসন টিম টটেনহামের কাছে হেরে গেছে। তা ছাড়া এষ্টন ভিলাও (ওদেশের মোহন বাগান),—দ্বিতীয় ডিভিসনের এক অখ্যাত টিম ব্রাডফোর্ড সিটির কাছে তিন গোলে হেরেছে।

*　　*　　*

প্যারি থেকে টেনিস এসোসিয়েশন রেমিয়োকে ভারতে একজিবিসন ম্যাচ খেলতে নিষেধ করে তার করেছেন।

রূপতরঙ্গ

নিউ থিয়েটার্স

মিঃ পি. ঘোষাল চণ্ডী ঘোষ রোডের ষ্টুডিও-ম্যানেজাররূপে ব্রতী হ'য়েছেন।

নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

এদের তৃতীয় অবদান "ব্লাড্ এণ্ড ক্রয়েড" তোলার জন্য লাহোর ষ্টুডিওতে তোড়জোড় চলছে। ষ্টুডিও ম্যানেজার আমজাদ হোসেন ও পরিচালক শ্রীপ্রফুল্ল রায় আনুসঙ্গিক কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। এই চিত্রে কমলা দেবী, সইদা, আখ্তার, হীরালাল, হীম্মৎ সিং, মাষ্টার লোবে প্রভৃতিকে বিভিন্নাংশে দেখা যাবে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ লিখিত "বিদ্রোহী" নামক গল্পটি শ্রীধীরেন গাঙ্গুলীর পরিচালনায় হিন্দী ও বাঙ্লা সংস্করণে তোলা হ'চ্ছে। বাঙ্লা সংস্করণে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করানোর জন্য এঁরা শ্রীমতী জ্যোৎস্না গুপ্তাকে নিয়োজিত কোরেছেন। এ ছাড়া শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীভূমেন রায়, শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী, শ্রীমতী ডলি দত্ত, শ্রীমতী পূর্ণিমা ও শ্রীমতী ইন্দুবালাকে বিভিন্ন অংশে দেখা যাবে।

বিলাসী

হিন্দী সংস্করণে মজহার খাঁ, গুল হামিদ ও শ্রীস্থলতানা মুখ্যাংশে অভিনয় কোরবেন।

*　　*　　*

"ব্লাড্ এণ্ড বিউটী" নামে আর একখানি উর্দ্দু ছবিও "ডি-জি"-র পরিচালনায় তোলা হ'চ্ছে এতে অভিনয় কোরছেন মজহার খাঁ, গুল হামিদ, শ্রীমতী স্থলতানা, মাধবী ও রাধা বাঈ।

এই ছবিগুলির সঙ্গীত সংযোজনা ও নৃত্য-পরিকল্পনা কোরবেন যথাক্রমে অন্ধ-গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ও শ্রীমতী নীহারবালা।

রাধা ফিল্ম

এরা তামিল ও তেলেগু ভাষায় দু'খানা ছবি তোলার জন্য মদ্রদেশীয় একদল শিল্পী সংগ্রহ কোরেছেন।

"মানময়ী গার্ল-স্কুলে"র শোবার ঘরে নায়ক-নায়িকার কৌতুকপ্রদ দৃশ্যটির শূটিং শেষ হ'য়েছে। এ চিত্রে নীহারিকার ভূমিকায় শ্রীমতী কাননবালা অনেকগুলো গান গাইবেন।

*　　*　　*

এই ছবিখানা শেষ হ'লেই শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীহেমন্ত গুপ্ত লিখিত "সেভেন্থ লাভ" নামে একখানা তিন-রীলের হাস্যরসাত্মক ছবির কাজে হাত দেবেন।

কালী ফিল্মস্

এদের "পাতালপুরীর" শূটিং অর্দ্ধেকের বেশী হ'য়ে গেছে। ছবিখানিকে সব দিক থেকে লোকে না'তে নেয় তার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টার কসুর কোরছেন না।

"শ্রীকৃষ্ণতুলাভরণম" তেলেগু ছবির কাজ শেষ হ'য়েছে।

*   *   *

"সরলা," রঙ্গমঞ্চের বহু-প্রশংসিত নাটকখানি চিত্রে রূপান্তরিত করবার জন্য এঁরা শ্রীনরেশ মিত্রকে নিয়োজিত কোরেছেন। মিত্র মশাই ছবিখানার পরিচালনা ছাড়া তাঁর অভিনব রূপ-সৃষ্টি নীলকমলকে চিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কোরবেন।

ভারতলক্ষ্মী

এদের ষ্টুডিওতে শ্রীনিরঞ্জন পাল লিখিত "সোনিয়া" গল্পটি ছবিতে তোলা হবে বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু ষ্টুডিওর কর্ম্মকর্ত্তাদের ভেতর কোনও উৎসাহ না দেখে আমরা কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় তা' এখনও ঠিক কোরতে পারছি না।

পায়োনিয়র ফিল্ম

শ্রীঅমর চৌধুরী পরিচালিত "সত্যপথে" মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে।

কেশরী ফিল্মস্

এদের "বাসবদত্তা"র কাজ অনেকটা এগিয়েছে।

নিউটন ফিল্ম

এদের প্রথম উর্দ্দু সবাক্-চিত্র "আহ-ঈ-মাজ্লুমান" বা "নির্য্যাতিতের আর্ত্তনাদ" প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। আগামী ফেব্রুয়ারীর প্রথম হপ্তাতেই বোধ হয় ছবিখানি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মুক্তিলাভ কোরবে।

রঙমহল ফিল্ম

রঙমহল থিয়েটার সম্প্রদায় আসচে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে সর্ব্বজন প্রসংশিত নাটক "মন্ত্রশক্তি" তোলা আরম্ভ কোরবেন। সতু সেন ছবিখানির পরিচালনা কোরবেন—এবং চরিত্র নির্ব্বাচন হবে এদের সম্প্রদায় থেকে। তবে বাণীর ভূমিকায় যে শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা আত্মপ্রকাশ কোরবেন তা' ঠিক হ'য়ে গেছে। ইণ্ডিয়া পিক্চার্স লিঃ ছবিখানির সরবরাহকের কার্য্য কোরবেন।

বিংশ শতাব্দীর কেষ্ট কে?…

এখানে অনেক গুলো ভুইফোঁড় প্রতিষ্ঠানের জন্মকথা আমাদের কর্ণগোচর হ'য়েছে। কিন্তু এই সকল পেহ্লাদে প্রতিষ্ঠানগুলোকে আহ্লাদ দিতে আমরা একেবারেই নারাজ। কারণ যাদের স্থারিত্ব দু'দিনের জন্য আর যারা নিৰ্দ্দোষ কাপ্তেন পাকড়িয়ে ফকির জন্য ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দ্দার সেজেছেন তাদের জাহান্নমে পাঠাবার ব্যবস্থা করাই উচিত। পাঠকগণ ধৈর্য্য ধরুন, যথাসময়ে আমরা "নেভার ব্লুপিক্চার্স" যারা "প্রথম চিঠি" লিখ্ছেন তাদের বিংশ-শতাব্দীর কেষ্টর পরিচয় আপনাদের অবগত করাব—কেবল কিছুদিনের জন্য ধৈর্য্য!

অরোরা ফিল্ম

গত ৫ই জানুয়ারী থেকে ১২ই জানুয়ারী অবধি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নিউ থিয়েটার্সের ছবি দেখান হয়। কোথায় কোথায় নিউ থিয়েটার্সের ছবি দেখান হয় তার বিস্তৃত বিবরণ জানবার জন্য যারা উৎসুক তারা নববর্ষ সংখ্যা "খেয়ালী" দেখলেই বুঝতে পারবেন উক্ত সপ্তাহে অরোরা ফিল্মের অদম্য কর্ম্মশক্তির পরিচয়।

জয়ন্ত পিক্চার্স

বোম্বাইয়ের উক্ত প্রতিষ্ঠানের এখানে যে আপিস ছিল, তা' গত ১লা জানুয়ারী থেকে উঠে গেছে। এই আপিসের ম্যানেজার এম্, ভি, জনি বোম্বাই যাত্রাকালে বাঙলার চিত্র-কর্ম্মীদের শুভেচ্ছা নিয়ে গেছেন। তাদের নতুন কর্ম্ম-পন্থা জয়যুক্ত হ'ল।

ছায়া

আগামী শনিবার, ১৯শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতার বাঙালী পরিচালিত শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহে বিগত মহাযুদ্ধের সময়ের একজন নারী গুপ্তচরের কাহিনী লইয়া রচিত একটী শ্রেষ্ঠ চিত্র "আই ওয়াজ এ স্পাই" দেখান হইবে। ইহাতে একত্রে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ "তারকা",
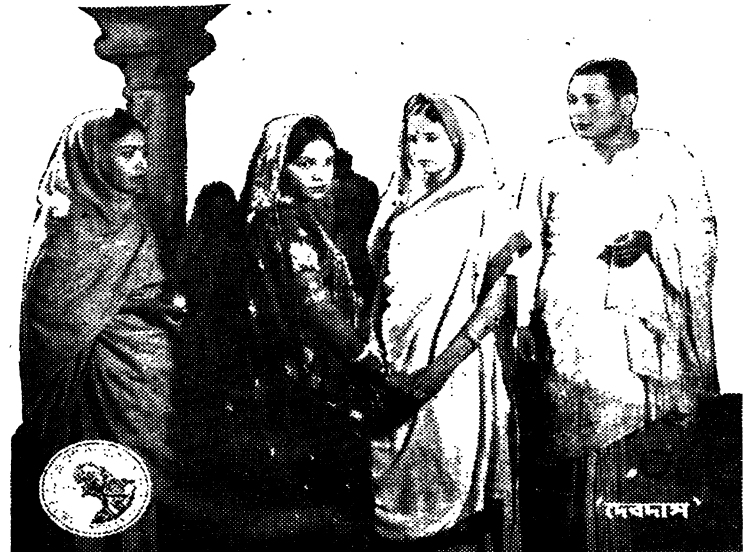
দেবদাস

নিউ থিয়েটার্সের নবতম চিত্র "দেবদাসের" একটি দৃশ্য

অভিনয় করিয়াছেন তন্মধ্যে ম্যাডেলিন ক্যারল, কনরাড ভিড, হার্বার্ট মার্শাল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলিকাতাবাসী সকলেই এই চিত্রটীকে দেখিবেন এবং দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ইহা আমরা বলিতে পারি।

অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে এই বৎসরে "ছায়া" পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কয়েকটী চিত্র দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মাত্র অল্প কয়েকমাস হইল এই চিত্রগৃহটীর জন্ম হইয়াছে কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র ইহার কর্তৃপক্ষ চিত্রামোদীদের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। তাহার উপর ইহারা "প্রাইভেট লাইফ অব ডন জুয়ান" "কাউণ্ট অব মণ্টে ক্রিষ্টো," "ক্যাটস্ প," "কিড মিলিয়ন", "উই লিভ এগেন", "ওয়ার্ল্ড মুভস্ অন", "জজ্‌হোয়াইটস্ স্যাণ্ডালস", "ডাউন টু দি পার্ট ইয়ার্ট", "ক্লাইভ অব ইণ্ডিয়া", "ফার্ষ্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার", ব্ল্যাক ক্যাট", "ভ্যানিসিং স্যাডো" প্রভৃতি চিত্রগুলি দেখাইবেন—ইহা সত্যই আনন্দের কথা। "ছায়ার" কর্তৃপক্ষকে তাঁহাদের এই বিপুল প্রচেষ্টার জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং আশা করিতেছি তাঁহারা উত্তরোত্তর এই প্রকার শ্রেষ্ঠ চিত্রসমূহ দেখাইয়া চিত্রগৃহটীর সুনাম ও চিত্রামোদীবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

নিছক কল্পনা

শ্রীধীরেন সেন

সকাল থেকেই মনটী আজ আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ ক'রে কেমন যেন গুম্ হোয়ে রোয়েছে, একলাটী কি অবস্থাই যে হোয়েছে তা বুঝোতে গেলে বুঝোতে হয় চোখের জলের মধ্য দিয়ে।

এক এক সময়ে ভাবি প্রয়োজন এমন কি হোয়েছিল সৃষ্টি কর্ত্তার আমার মত একটী প্রাণীকে সম্পূর্ণ অচেনা এক যায়গায় ততোধিক অপরিচিতদের মধ্যে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে সোরে দাঁড়ানোর ?

জানি না কেন, ছোট যখন তখন থেকেই সঙ্গীত আমায় ক'রেছে পাগল। কিন্তু সেই সঙ্গীতই যদি শুনেছি প্রভাতে ; তবে সে আমার অন্তরকে দিয়েছে বিষাদে পূর্ণ ক'রে। আজ সকাল থেকেই সামনের একটী বাড়ী থেকে ভেসে আস্‌ছে সঙ্গীতের রেস্। সত্যই ঘরে থাকা হোলো দায় ! ব্যথার যত দুয়ার ছিল বন্ধ, তারা আজ সকলেই হোলো মুক্ত—তারা সব এক জোট হোয়ে লেগে গেছে তাদের সঙ্গে খেলায় আমাকেও মেতে ওঠবার জন্যে খেপিয়ে তুল্‌তে, তাদের উল্লাসের আর সীমা নাই !

আনন্দের সঙ্গে শান্তির সঙ্গে তাদের নেই মিলন—আছে বিরোধ। বলে, "সখা কি কেবল সুখই তোমার একা, আমরা কি নহি কেহ ?" মেনে নিলাম তাদের দাবি। সমস্ত দিন চ'লছে আজ তাদেরই উৎসব আমাকে নিয়ে—বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। অজানা কারণে কান্নার বেগ বুকের ভেতর মাথা গুঁজে গুমরে গুমরে ওঠে।—তারি ফাঁকে ফাঁকে ভেসে ওঠে একটী করুণ মুখ।—দেখেছি তাকে আবাবালির পাহাড়ে পাহাড়ে ইরাণীর বেশে খেলে বেড়াতে। বাহির ছিল তার কঠোরতায় ভরা, অন্তর তার কেউ দেখেনি। তারা সকলেই বোলেছে—"সে যে নিষ্ঠুর, পাষাণী !"

ধরা যার কাছে সে দিলে, সে বল্লে "না গো না, তুমি যে বড় কোমল, বড় মধুর !"

ছুটে সে পালিয়ে গেল, বল্লে না কিছুই—রেখে গেল—চাহনীর ফাঁকে ফাঁকে অর্থভরা ভাষা।

ঘোর কাটছে না। বেশী মাত্রায় ব্রোমাইড্ খাওয়ার মত তারই নেশা চেতনার ভাজে ভাঁজে জমা হ'য়ে রইল—আমার সমস্ত আমিত্বকে হরণ ক'রে।

রূপবাণী

শনিবার ১৯শে জানুয়ারী হইতে প্যারামাউণ্টের বিশ্ব বিখ্যাত কথকচিত্র 'ক্লিওপেট্রা' রূপবাণী চিত্রগৃহে ২য় সপ্তাহে পদার্পন করিবে। ক্লিওপেট্রার মতো ছবির পরিচয় দান করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, ছবিখানি যাঁহারা দেখিয়াছেন জীবনে তাঁহারা এই স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন না। যাহারা একবার দেখিয়াছেন আর একবার দেখিবার জন্য তাঁহারাও উৎসুক হইয়া থাকিবেন।

উপন্যাস

উচ্ছৃঙ্খল

হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেদিন সকাল থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ছে। মেঘ থেকে থেকে অস্ফুট গর্জ্জন করে যাচ্ছে! সারা প্রকৃতি মৌন নিশ্চল। সহরে কর্ম্মের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাট জলে পূর্ণ। ট্রাম গাড়ী চলা বন্ধ হয়েছে। রিক্সা-ওয়ালারা যাত্রী নিয়ে নূতন উদ্যমে ছুটে চলেছে।

ধীরে ধীরে সাঁঝের আঁধার পৃথিবীতে নেমে এলো। বর্ষণমুখর শ্রাবণের সায়াহ্ন তার বিরাট কালীমূর্ত্তি নিয়ে বিশ্বকে গ্রাস করতে এসেছে।

কলিকাতা নগরী। বৈদ্যুতিক আলো জলে উঠেছে। গভীর নীল আকাশে দু'একটী তারা মুমূর্ষুর হাসির মতো ক্ষীণ-ভাবে দীপ্তি পাচ্ছে।

রাস্তাঘাট জনশূন্য, শুধু পার্শ্বস্থিত ঘৃণিত পল্লীর প্রতিগৃহখানি লোকপূর্ণ, তাদের হাসির রোল, গানের সুর, উল্লাসধ্বনি, ক্ষীণ অস্পষ্টভাবে কানে প্রবেশ করছে।

......ঘরখানি বেশ সুসজ্জিত। দেখলেই মনে হয়, বড় লোকের বাড়ী। দ্বিতল ঘরখানি সেই নিভৃত গোপন পল্লীটীকে সুশোভিত করে রেখেছে।

ছাতের উপর বারান্দায় নানারঙের বিলাতী গাছের টব সাজানো। ঘরের আস্‌বাব পত্র সুসজ্জিত—মনোরমভাবে রক্ষিত, দেয়ালের গায়ে কয়েকটী নারীমূর্ত্তি টাঙানো। একটী যেন কুটিল কটাক্ষপাতে অপরটীকে সৌন্দর্য্যে পরাভূত করতে চায়। বস্তুতপক্ষে ঘরখানি বেশ।

বারান্দায় বসে একটী তরুণী হার্ম্মোনিয়ম সহযোগে গান করছে। তার কণ্ঠস্বর খব মিষ্ট না হলেও কর্কশ নয়। কিন্তু তার গানের ছন্দ যেন অমিল থেকে যাচ্ছে, সুরের সামঞ্জস্য নেই! উন্মাদ যেমন আবোল-তাবোল গেয়ে যায়, কোথায় আরম্ভ কোথায় শেষ জানে না, তার গান ও তেমনি।—তার বাজনাতেও

এতদিনে বিধানের সুবুদ্ধি হইল?

'ইউনাইটেড প্রেসের' দিল্লীর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। নলিনীর কুপরামর্শে নিখিল ভারতে বাংলাকে হতমান করিয়া অবশেষে যে বিধান চন্দ্রের আত্মসম্মানবোধ জাগরুক হইয়াছে তাহা মন্দের ভাল

মনে হয়, সে গানে হাতে-খড়ি দিচ্ছে। সে গাইছে—সেই চির পুরাতন গানটী—

"আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে!—"

যেন ঠিক গাইতে পারছে না।

হঠাৎ তার গান বন্ধ হলো। তার পেছনে এক সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে। আগন্তুককে দেখলেই বড় লোকের ছেলে বলে মনে হয়। সুন্দর চেহারা বদনমণ্ডল শ্রীমণ্ডিত। চোখ দুটী ডাগর—সুঠাম দেহ, বিচিত্র চলনভঙ্গী বেশবিন্যাস ভদ্রঘরের সন্তানেরই মতো।

বল্লে—আসুন চঞ্চ আপনারই জন্য আমি বসে আছি। কিছুতেই সময় কাটছে না। গান গাইতে চেষ্টা করলুম, গান হলো না। বাদলের দিনে একা বসে গান গাইতে কি ভাল লাগে?

অরুণ বললে: আমি কী সহজে আসতে পারি? গ্রাম থেকে সহরে আসা। বাড়ীতে বাবাকে ফাঁকি দিয়ে আসতে হবে তো। গাড়ীতে তো আসবার যো নেই, বাবা থাকেন ষ্টেশনে dutyতে। কাজেই কন্দর এগিয়ে থাকি। চলন্ত গাড়ীতে উঠে পড়ি। আজকে প্রথম গাড়ীটা ফেল করেছি কিনা। বুঝতেই তো পারছো। সারাদিনটা কেমন বৃষ্টি বাদল। রাস্তাঘাট জলে ডুবে গেছে। আমি ঠিক সময়েই এসেছিলাম। কিন্তু পথেই বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি বল্লেন, কোথায় যাচ্ছি? আমি বল্লুম, কোথাও যাচ্ছিনে। তিনি আমায় বাড়ী ফিরে যেতে বল্লেন। বললেন বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে। বাড়ী ফিরে গেলুম—বাড়ীতে কি মন টিকে?—তোমারই মধুর হাসি যে আমার হৃদয়কে অধিকার করে আছে! তারপর সাতটার গাড়ী ধরে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

তরুণী বল্লে: বাস্তবিক অরুণবাবু! আপনাকে আমার এত ভাল লাগে! তার কারণ কী?

অরুণ সিগারেট-কেস্ খুলে নিয়ে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বল্লে: কারণ তো তোমারই কাছে।

তরুণী কিছু বল্লে না।

অরুণ বল্লে: অনিমা, এক কাজ করতে পার?

—কী?—

—একগ্লাস্ ওয়াইন্ (wine)

—ছিঃ ছিঃ, আপনি ভদ্রলোকের ছেলে নন? আমার কাছে আসছেন, এতেই আপনার মস্তবড় অন্যায় হচ্ছে। তার ওপর মদ খাবেন? আমি কিছুতেই আপনাকে মদ খেতে দোবনা।

অরুণ বল্লেঃ আমি শুধু তোমার কাছে আসিনা। আসি, মদ খেতে। তোমার কাছে এসে তৃপ্তি পাই, তাই আসি। তুমি যদি আমায় বারণ কর তোমার কাছে আসব না। কল্‌কাতা সহরে আমার কামিনী-কাঞ্চনের অভাব হবে না জেনো।

আমি কি আপনাকে তাই বল্‌ছি? আমি শুধু আপনার ভবিষ্যৎ অবনতির পথ রুদ্ধ করতে চাচ্ছি। আপনি যুবক, আপনার চঞ্চলতা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পরে আপনি যখন পবিত্র সংসার ধর্ম্ম নিয়ে থাক্‌বেন, তখনও তো আপনি মদের নেশা কাটাতে পারবেন না। সেই সময় আপনার অবস্থার কথা ভেবে দেখুন দিকিন।—আমি জানি—অনেককে জানি, যারা এখন তাদের পত্নী নিয়ে সুখে সংসার করছে, কিন্তু আগে তারা আপ্‌নারই মতো উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিল।

—তোমরা রূপের পসরা নিয়ে রূপ বিক্রী করতে বসেছ, আবার বল্‌ছ—তোমার ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য আমি একথা বল্‌ছি। এতই যদি তোমরা বুঝতে তবে আজ বঙ্গদেশে বারবিলাসিনী থাক্‌তো না। শুধু থাকতো—মাতা, ভগ্নী আর সমস্ত শুদ্ধাচারিণী নারী।—অরুণ অনিমার দিকে চাইলে।

অনিমা বল্লেঃ অরুণবাবু। আমরা রূপের পসরা নিয়ে বসে আছি বলে সমাজ এখনো বেঁচে আছে। সতীত্ব বলে একটা জিনিষের গৌরব এখনো ভারতে আছে। আমরা যদি না থাক্‌তাম তবে দেশ অনাচারে ছেয়ে যেতো। কাজেই আমাদের শুধু সর্ব্বনাশের কারণ মনে করবেন না, আমাদেরও চাহিদা সমাজে রয়ে গেছে।

—তা বেশ, আমি আমারই মতো চল্‌বো তুমি কোনো বাধা দিয়োনা।—বেয়ারা—!

বেয়ারা এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

অরুণ বল্লেঃ—এক বোতল বিয়ার।

বেয়ারা সেলাম করে চলে গেল।

অনিমা বল্লেঃ এর পরিণাম কিন্তু খুব খারাপ হবে জান্‌বেন।

অরুণ রেগে উঠ্‌লো। বল্লেঃ যাও, তোমার আর আমাকে হিতোপদেশ শুনাতে হবে না। বারবিলাসিনী আসে ধর্ম্মের বাণী শুনাতে।

অনিমাও ছাড়বেনা। অরুণের প্রতি তার মনে ভালবাসা জন্মেছে। সে তাকে কিছুতেই মদ খেতে দেবে না।—

বল্লেঃ এতো ধর্ম্মের কাহিনী নয়, এ'তো শুধু কঠোর সত্য। সত্য সব সময়েই নিষ্ঠুর। কিন্তু কালে এই নির্দ্দয় সত্যকে মানুষ সাধনা করে।—সত্য আসে না। আপনাকে আমি এখনো বল্‌ছি, অনর্থক শরীর নষ্ট করবেন না,—আমি আপ্‌নাকে আমার যথাসর্ব্বস্ব বিলিয়ে দোব।

অরুণ তার কাঁধ চাপড়াতে চাপড়াতে বল্লেঃ আচ্ছা আজকের দিনে, এক বোতল বিয়ার সেবন করা যাক্। এর পরেই তোমার কথা মেনে চল্‌বো।—আচ্ছা তুমি আমার তো কেউ নও, তবু তুমি আমায় এত ভালবাস কেন?

আপনার কেউ আমি নই। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি আমার পরম আত্মীয়, যার চেয়ে বেশী আত্মীয়তা জগতে কারো সঙ্গে সম্ভব নয়। আমার মনে হয় এর আগের জন্মে আপনি আমারই ছিলেন, আমিই আপনাকে সেবা করেছি।—কিন্তু আমারই পাপের ফলে আমাকে এই পাপপল্লীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে।

অরুণ তার হাত অনিমার হাতের উপর রেখে বল্লেঃ এ জন্মে আবার কেন তুমি আমার হওনা?

—ভগবান যে আমায় সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। অনিমার দু'চোখ বয়ে অশ্রু ঝরতে লাগ্‌ল।

সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌লো।

সময় কিছুতেই যেন কাটতে চায় না। অনিমা হার্ম্মোনিয়ম্ নিয়ে সুর সাধছিল।

অরুণ বল্লেঃ অনিমা আজ তোমায় একটা কথা বল্‌ব

—কী?

—আচ্ছা আগে গান করে নাও।

তারপর—

—আগে বলুন্‌না আপনার কথাটা।

(ক্রমশঃ)

———

1507-7

প্যারামাউন্টের সবাক চিত্র 'ক্রাইম উইদাউট্ প্যাসন্' এর একটি দৃশ্য। এতে ক্লড্ রেইনস্—'ইনভিসিবিল্ ম্যান্'-এর নায়কের অংশ গ্রহণ করেছিলো—সে অতি সুন্দর অভিনয় করে। আর, মার্গো বলে' মেক্সিকান একটি মেয়ে। ছবিটি আমাদের খুব ভালো লেগেছিলো।

চালিয়াৎ

একাঙ্ক কথা-চিত্র

মণী ঘোষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রমলা। না মা, উনি নিজেই আর একদিন যাবার কথা বলছিলেন। আজকে ওঁর বাড়ীতে কাজ রয়েছে।

রতন। (লজ্জিতভাবে) অবিশ্যি আপনারা যদি যেতে চান তাহলে...

মিসেস সেন। না রতন, আর একদিনই যাওয়া যাবে সেই ভাল। (সুজিতের দিকে চেয়ে) ওঃ, তোমাদের বুঝি আলাপ নেই—এর নাম রতন সেন গুপ্ত আমাদের লুলু সেন গুপ্তর ছেলে, আর এ হচ্ছে সুজিৎ বোস Late Dr. Bose-এর ছেলে, আমাদের বন্ধু (দুজন দুজনকে নমস্কার করল হাত তুলে)।

সুজিৎ। এঁদের মুখে আপনার কথা বহুবার শুনেছি, আপনার কবিতার খ্যাতিও বাদ পড়েনি। আপনার সাথে আলাপ হয়ে বিশেষ প্রীত হলাম।

রতন। আপনার কথা এঁরা (সুজিতের কথাই পুনরুক্তি করা হচ্ছে দেখে হঠাৎ থেমে গিয়ে) আচ্ছা, আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন ত? খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে, অথচ ঠিক মনে ক'রতে পাচ্ছিনা...

সুজিৎ। (রতনের কথার সুর টেনে) তাইত কোথায় দেখেছেন বলুন ত? (রতন অপ্রস্তুত হ'ল)।

রমলা। (পরিপূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে) আপনার কিছু মনে থাকেনা রতনবাবু। সেদিন আমাদের সঙ্গে এম্পায়ারে গিয়েছিলেন —মনে আছে একটা চ্যারিটি পারফরমেন্স্ দেখ্তে সেখানে...

(ঠিক মনে করতে পারলনা। তবু রমলার কথায় সায় দেবার জন্যে উৎসাহিত হয়ে) ঠিক বলেছেন, এম্পায়ারেই দেখেছি বটে (নিজের এই হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা, নিজের কাছেই বেমানান ঠেকায় তেমনি হঠাৎ চুপ করে গেল)।

রমলা। (রতন আরো কিছু বল্‌বে আশা করে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে পরিপূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে আবার আরম্ভ করল) ও সেদিন কী চমৎকার প্লে করেছিলেন আপনি সুজিৎদা, স্যুইট আমার এত ভাল লেগেছিল (রতন ভাবিতেছিল যদি সে একবার এম্পায়ারে প্লে করার সুযোগ পায় তবে প্লে কাকে বলে দেখিয়ে দেয়)।

সুজিৎ। (রমলার কথায় বাধা দিয়ে) রমু আমায় এক কাপ চা খাওয়াতে পার!

রমলা। নিশ্চয়ই, এক্ষুনি আনছি।

মিসেস সেন। (ব্যস্ত হয়ে) কেন, কেন, আমি বয়কে বলছি, ও হাত-টাত পুড়িয়ে ফেলবে আবার (বেল টিপ্‌তে উদ্যত হলেন)।

তমালিকা। (উঠে দাঁড়িয়ে) না হয়, আমিই করে আনি না মা?

সুজিৎ। (দুজনকেই থামিয়ে দিয়ে) না, রমুর হাতের চা-ই খাব আমি (রমলা ছুটে অন্দরে ঢুকে পড়ল)।

রতন। (ব্যস্ত হয়ে) আমি এক কাপ পেতে পারি কি, রমা দেবী? (সুজিৎ ইত্যাদি সকলে ফিরে তাকাল রতন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল)।

মিসেস সেন। (সুজিৎকে) হঠাৎ ওর হাতের চা খাওয়ায় তোমার...

সুজিৎ। (হেসে) বুঝছেন না এই মাত্র আরম্ভ হয়েছিল, এখন একটি ঘণ্টা বক্তৃ—আপনার part মার্ভেলাস হয়েছিল ও জায়গাটা how sweet ইত্যাদি তার চেয়ে চা করে আসুক, ভুলে যাবে'খন। (রতন সুজিতের বিনয়ে অবাক হল)।

তমালিকা। (স্নিগ্ধস্বরে) তা যা বলেন, যত বিনয়ই দেখান, আপনার সেদিনকার play ভারী চমৎকার হয়েছিল কিন্তু...

সুজিৎ। (কথা কেড়ে নিয়ে হেসে) নিশ্চয়ই হয়েছিল, আপনি যখন বলছেন তখন আলবাৎ হয়েছিল। (তমালিকা দমে গেল, মিসেস সেন হাস্‌লেন)।

তমালিকা। আমার আবার গা ধুতে হবে (উঠে পড়ল)।

সুজিৎ। দুঃখিত হ'লেন কি মিস সেন? (তমালিকা শুনতে পায়নি ভাবে চলে গেল)।

রমলা। (চায়ের কাপ হাতে ঢুকল; দুজনের সামনে দু কাপ চা রেখে) চা-টা মিষ্টি হয়েছে কিনা দেখুনত সুজিৎদা।

রতন। (তাড়াতাড়ি গরম চায়ে চুমুক দিয়ে) বেশ হ'য়েছে,—ঠিক্ হয়েছে।

সুজিৎ। মিষ্টত দেখছি, কিন্তু হাত পোড়াওনিত আবার? ছেলেমানুষত!

রমলা। (রতনের সামনে ছেলে মানুষ বলায় চটে গিয়ে) দেখুন সুজিৎদা সব সময় আমায় ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ কর্বেন না। আমি এখনো কচি খুকী আছি নয়? (রতন উঠে দাঁড়াল। ভাবটা রমলা আদেশ দিলেই এর একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলে—রমলা হঠাৎ রতনের দিকে ফিরে) চলুন আমরা ওঘরে যাই, আপনার কবিতার খাতাটা এনেছেন?

রতন। (উৎসাহের সহিত) নিশ্চয় এনেছি বৈকি, চলুন।

মিসেস সেন। ওকি রতন চা-টা খেয়ে যাও।

রতন। না চা-টা আজ তেমন (হঠাৎ রমলা চা করেছে মনে পড়ায় ঠোঁটের কাছের কথাটা পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে) ইয়ে, এই বলছিলাম কি ইয়ে—আজ গলার টনসিলটার জন্য একটা পেন্ট দিয়েছি, তাই সব কি রকম বিস্বাদ বিস্বাদ ঠেকছে (বলতে বলতে ড্রয়িংরুমে রমলার অনুসরণ করল। রমলা একটানে পর্দ্দাটা ফেলে দিলে; মিসেস সেন ও সুজিৎ মুখ চাওয়া চাওয়ি করে হেসে উঠল)।

মিসেস সেন! (চেয়ারটা সুজিতের পাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে) তারপর সুজিৎ তুমি আর এদিকে আসা ছেড়ে দিলে, কি হয়েছে বলত? কি ভাবছ?

সুজিৎ। ভাবছিলুম সেন সাহেবের কথা. বেচারা বিয়ে করার একটা বছর না কাটতেই……

মিসেস সেন। ওসব রাখ। আচ্ছা তোমাদের কি আর অন্য কথা নেই, আমাকে বলবার এক সেনের কথা ছাড়া? সত্যি বলছি সুজিৎ অন্য কথা বল।

সুজিৎ। (উদাস ভাবে) আর কি কথা বলব মিসেস সেন?

মিসেস সেন। কেন, কত কথা আছে, আচ্ছা সুজিৎ তুমি আমায় নীলিমা বলে ডাকনা কেন; অন্ততঃ যখন আমরা একলা থাকি।

সুজিৎ। (নিতান্ত সাধারণভাবে) ভাল লাগে না।

মিসেস সেন। (অভিমানের স্বরে) অথচ এক সময় ছিল, যখন ঐ নামটা তোমার সব চেয়ে ভাল লাগত। আচ্ছা সুজিৎ হঠাৎ সেনকে বিয়ে করতে রাজী হওয়ায় তুমি দুঃখিত হয়েছিলে নিশ্চয় খুব। (উদাস স্বরে) জীবনে ঐ একটা ভুলই হয়ত করেছি,……আচ্ছা সুজিৎ (ব্যগ্র হয়ে) আমরা আবার সেই দিনগুলো ফিরে পেতে পারিনা, মাঝের এই ক'টা দিন ভুলে গিয়ে? মনে করতে পারিনা, ও একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়?...ভাব সুজিৎ আমরা সেই পুরোনো সুজিৎ আর নীলিমা, ছাতে বসে স্বপ্নের জাল বুনে চলেছি,—স্বপ্নের ঢেউ-তোলা নীল সাগরে আমাদের ছোট তরী সবুজ পাল তুলে দিয়ে ছুটে চলেছে—দুজনে পাশাপাশি···সেখানে···সেখানে সেই অচিন সায়র পারে মেঘ নেমেছে নীল সায়রের ঢেউয়ের সাথে খেলা কর্ত্তে...তারাগুলো মিট্‌মিট্ করে লুকোচুরি খেলচে . সেখানে...

সুজিৎ। (বাধা দিয়ে) দিন কি আর ফিরে আসে মিসেস সেন? আমি যে সুজিৎ ছিলুম এক বছর আগে এখন আর সে সুজিৎ নেই। ওসব শাঁসশূন্য কথাগুলো এখন আর মাথায় আসেনা, ও যেন নেহাৎ ছেলেমানষি বলে মনে হয়।

মিসেস সেন। (দুঃখিত স্বরে) ছিঃ সুজিৎ, তোমার কাছ থেকে এ আমি আশা করিনি।

সুজিৎ। আমিই কী আশা করেছিলুম, যে তুমি, নীলিমা, হঠাৎ সেনকে বিয়ে করে বসবে।

মিসেস সেন। সেজন্যে আমি দুঃখিত, মানুষ কি ভুল করেনা? কিন্তু তাতে আমাদের বন্ধুত্ব ঘোচেনিত, কি বল?

সুজিৎ। একটু তফাৎ হয়েছে বৈকি। সমাজের চোখে আপনার স্থান আমার চেয়ে উঁচুতে। আপনার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার আমার আর ক্ষমতা নেই। এই দেখুন না কেন, এক বছর আগে আপনার কাছে আমি ছিলাম সুজিৎ বাবু, আর আজ, শুধুই সুজিৎ, আর যেখানে আপনি শুধু নীলিমা, আজকে হয়েছেন মিসেস্ সেন...আর···

মিসেস সেন। ওসব সমাজ কমাজের কথা ছেড়ে দাও, আমিত আর বুড়ো হয়ে যায় নি তোমার চেয়ে, না তুমি বলতে চাও যে আমার (লজ্জায় লাল হয়ে উঠে) মানে বলছিলাম কী এ বাড়ীতে আমার এখন তোমার আর...মানে ইয়ে...কোন চার্ম নেই।

সুজিৎ। (হেসে) বলেন কি, চার্ম নেই, ক্রমে বেশী করে চার্মিং হয়ে উঠ্‌ছে আপনার বাড়ী।

মিসেস সেন। (উৎসাহ কোনক্রমে গোপন করে, লজ্জিত হাসি হেসে) সত্যি?

হঠাৎ কী কারণে বেশী করে চার্মিং হয়ে উঠ্‌ছে শুনতে পাই কি ?

সুজিৎ। এই সেন সাহেবের মেয়ে দুটি ভারী চমৎকার হয়ে উঠ্‌ছে ক্রমেই··· ওদের··:

মিসেস সেন। (ব্যঙ্গ করে) ও তোমার এ বাড়ীর প্রতি টান বুঝি এখন ওদের জন্যেই !

সুজিৎ। (মৃদু হাসি হেসে) হলেই বা ক্ষতি কী ?

মিসেস সেন। (হঠাৎ চটে উঠে) না, হতে পার্ব্বে না, সেনের অবর্ত্তমানে আমিই এ বাড়ীর কর্ত্রী, এবং আমি এ হ'তে দেবনা, আমি ইচ্ছে করিনা যে, এসব লোক আমার বাড়ীতে আসে।

সুজিৎ। (মোটেই চট্‌বার লক্ষণ না দেখিয়ে নেহাৎ শান্ত ভাবে) আপনি চট্‌লে, আপনাকে চমৎকার দেখায় কিন্তু (মিসেস সেনের রাগ পড়ে গেল) আর একটা কথা আমি জানি কিনা, যে আপনার ঐ রাগের কারণ গুলো নিতান্তই ভুয়ো, তাই ভয় হয় না। আশা করি মাপ কর্ব্বেন।

মিসেস সেন। (খুসির হাসিতে) সত্যি সুজিৎ, আমার সম্বন্ধে এই সত্যি কথা গুলো আর কেউ বলতে পার্লে না। (হঠাৎ মিষ্টি স্বরে) মনে পড়ে সুজিৎ প্রথম যেদিন তুমি আমায় kiss করে আমি ভয়ানক চটে ওঠায় তুমি বলেছিলে "নীলু তুমি যে একদম চটনি আর একটা kiss করে তার প্রমাণ করে দিতে পারি"।

সুজিৎ। হুঁ, এখন হলে আর ওরকম বোকার মত বল্‌তুম না।

মিসেস সেন। (আবার চটে গিয়ে) তা জানি, জানি, এখন কেন, কোন কালেই তোমার ভেতর সত্যিকারের প্রাণ ছিলনা, তবে এখন সেটা স্বীকার কর? আগে কর্ত্তেনা; এই যা তফাৎ। তোমার ভালবাসা হল যে উড়ু উড়ু, ওপর ওপর, যাকে ইংরাজিতে বলে passing fancy তাই।

সুজিৎ। (চটে উঠ্‌বার ভান করে) কে বলে আমার ভালবাসায় প্রাণ নেই! আমি ভাল-বেসেছিলাম নীলিমাকে, আপনাকে নয় মিসেস সেন। আমি আজও নীলিমাকে ফিরে পেলে বলি "কথা ছিল এক তরীতে শুধু তুমি আর আমি ভেসে যাব কেবল অকারণে" (কথার সুর বদলে মিষ্টি করে) সত্যি মিসেস সেন, আপনি কি আর নীলিমা হয়ে ফিরে আস্‌তে পারেন না ?...

মিসেস সেন। (হঠাৎ) থাম, থাম। তুমি আবার আমায় তপ্‌লন করে ফেলচ। আর সত্যি করেই ওসব ভড়ং-এ দরকার কি সুজিৎ ? ভালবাসার অভিনয় করে লাভ কি ? প্রকৃত ভালবাসা থাকলে কি আর তুমিই আজ এতগুলো কথা বলতে পারতে, না আমিই সেনকে বিয়ে করতে পারতুম ?

= মা =

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মেই শিশু দেখে মা ; প্রথম আলোর সাথে শিশুর মনের পরদায় সেই মায়ের সৌম্যমূর্ত্তি ফটোগ্রাফের মতো অঙ্কিত হোয়ে পড়ে। শিশুর প্রথম পেয় মায়ের স্তন্য. প্রথম বুলি 'মা'।—মায়ের সঙ্গে শিশুর এই যে প্রথম নিবিড় সম্বন্ধ, এ কি চিরদিনের না ক্ষণিক ? কিন্তু আমরা,—বিংশ শতাব্দীর নবযুবকদল,—মাকে আর আমরা চিনতে পারি না, বুঝিতে পারি না এমন কি লোক-সমাজে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠা বোধ করি। কেন ?. .এ ভাব আমাদের মনের মাঝে উদয় হয় কেন ? মায়েরই কি মাতৃরূপ বদলে গেছে ? না, তা' তো নয়, আমরা নিজেরাই মাকে চিনবার শক্তি পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি ! মা আর আমাদের কাছে মা নয় ! সংসারের সাধারণের মতো একজন কৃপার পাত্রী !... যে দেশে মায়ের প্রতি এত অবজ্ঞা, এত অবহেলা, সে দেশের নৈতিক উন্নতি ও জাতীয় সভ্যতা যে কতো সুদূর পরাহত তা' ধারণা করাও বড়ো কঠিন কথা নয়। আমরা একেবারেই ভুলে গেছি যে কা'র স্নেহে কা'র যত্নে আজ আমরা এত বড়ো হোতে পেরেছি, মানুষ বোলে সকলের কাছে পরিচয় দিতে পারছি !...আমরা এ কথাও একবারও মনে করিনা যে কা'র অক্লান্ত চেষ্টায় এত বড়ো হোয়ে তবে বোলতে পারি মাকে—তুমি তো 'মেয়েমানুষ, এর কি বোঝো ?...'

প্রথম জন্মাবার পর যখন আমাদের কিছুই বোলবার বা কোরবার সামর্থ্য ছিল না. তখন কে তা'র নিবিড় কালো চোখ দু'টির গভীর করুণ দৃষ্টি নিয়ে দিনের পর দিন পাহারা দিয়ে এসেছিলেন ? কে তখন অসহনীয় ক্ষুধা নিবৃত্তি কোরবার জন্যে বুকের দরদ সিঞ্চন কোরেছিলেন ?...সে তো এই 'মা' !...তাঁরই স্নেহে, তাঁরই যত্নে, তাঁরই বক্ষপীযূষধারায় দেহ বর্দ্ধিত কোরে আজ আমরা অকৃতজ্ঞের মতো ভুলে যাই যে নিকটে, দূরে, স্বদেশে, প্রবাসে সকল স্থানেই সেই মায়েরই স্নেহ অনুসরণ কোরছে !...সে হোতে পরিত্রাণ নেই আমাদের ! সেই মায়েরই মঙ্গল আশীষ যে আমাদের আপদে-বিপদে-সম্পদের মৃত্যুঞ্জয় কবচ !......

মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা না এলে, মায়ের প্রতি ভালবাসা না এলে, দেশের প্রতি, স্বজনের প্রতি ভালবাসা আসে না, যেটা আসে সেটা মোহ। সেই মোহের নেশায় অনেকে মায়ের কথা অবহেলা কোরে বড়ো কিছু একটা কোরবার আশায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ! বামন সে, জানে না যে চাঁদ তার চেয়ে কতো উঁচুতে ! জগতের যা' কিছু উন্নতি, কি নৈতিক, কি আর্থিক—কোনো উন্নতিই সম্ভবপর নয় যতোদিন না মায়ের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা আসে !...আমাদের একথা ভুললে চোলবে না যে 'মা'ই আমাদের সবচেয়ে বড়ো গুরু ! সকল দেব-দেবীর সমষ্টির মূর্ত্ত রূপ—'মা'।

* গত ১৯২৮ সালে (লক্ষ্ণৌ) পুর্ণিমা সম্মিলনীতে স্বর্গীয় অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের সভাপতিত্বে ও গত ১৯৩৪ সালে কাশীর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক 'সাধন-পন্থা পত্রিকার' বিজয়া সম্মিলনীতে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

সুজিৎ। (যেন খেই পেয়ে) ঠিক বলেছেন মিসেস সেন যাকে প্রকৃত ভালবাসা যায় তাকে কিছু বলা যায় না— ভাষা সেখানে মুগ্ধ মূক হয়ে শুধু ধ্যান করে। আর সেখানে ভালবাসার গভীরতা নেই সেখানেই যত কথার ঘোর প্যাঁচের দরকার, অভিনয়ের প্রয়োজন ;—সেইখানেই যত 'প্রাণপ্রিয়' আর 'প্রিয়তমে'র ছড়াছড়ি।

ক.

(ক্রমশঃ)

বিপর্য্যয়

—সুনীল মজুমদার—

—বলি, নবাবপুত্তুর ঘুম ভাঙলো ?

সকালবেলা এইরূপ মুখরোচক অভিভাষণে সমরেশকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠিয়া পড়িতে হইল। বিছানার উপর বসিয়াই উত্তর দিল—যাই মা।

কিন্তু যাইতে হইল না, অনুজা দেবী এক হাতে চায়ের পেয়ালা ও অন্য হাতে এক বাটী মুড়ি ধপ্ করিয়া চেয়ারটার উপর রাখিয়া বলিলেন—আর কি, বেলা আটটা বাজলো, নবাবপুত্তুর উঠলেন, চা খেয়ে নাইতে যাবেন কলেজে যাবার বেলা হোল বলে। এ ভাবে নবাবী চাল কোরলে কি আর পরীক্ষায় পাশ করা যায়—বলিয়াই তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সমরেশ মাথা নীচু করিয়া সব কথাই শুনিতেছিল, একটী কথারও উত্তর দেওয়া সে সঙ্গত মনে করে নাই। আস্তে আস্তে চকের গুড়া লইয়া কলতলায় মুখ ধুইতে চলিল। বারান্দা দিয়া যাইবার সময় কতকগুলি কথা আসিয়া তাহার কানে তীরের মত বিঁধিল—তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই কথা চলিতেছিল। জানালার পাশে যেখানটায় দাঁড়াইলে ঘরের ভিতর হইতে দেখা যায় না সেখানে দাঁড়াইয়া আলোচনার ধারা শুনিবার আগ্রহ দমন করিতে সে পারিল না। অনুজা দেবীর গলাই সপ্তমে ছিল। সমরেশ শুনিল—

বলি, নাই দিয়ে দিয়ে তো ছেলেটার মাথা খেলে।

—কেন আমি কি কোরেছি ?

—বা রে কোন রাত্তিরে কলেজের ছেলে বেলা আটটায় ওঠে শুনি ? সারা রাত্তির জেগে জেগে কবিতা লিখবেন, বলি কবিতা লিখলে কি আর টাকা আসবে ?

—রাত্তিরে বোধ হয় পড়ছিলো, তার ঘরে আলো দেখেছিলাম।

—পড়া না ছাই।...

সমরেশের আর দাঁড়াইয়া থাকিবার মত স্নায়ুর ক্ষমতা ছিল না। সে কলতলায় আসিয়া দাঁতে চকের গুড়া ঘষিতে লাগিল। মিনিট পাঁচেক ভালো করিয়া চোখে মুখে জল দিয়া নিজের অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বারান্দা দিয়া যাইবার সময় সমরেশের বাবা অনন্ত বাবু গুরুগম্ভীর সুরে ডাকিলেন—সমর, এদিকে এসো।

অনুজা দেবীর রুদ্রমূর্ত্তি সমরেশের চোখ এড়াইল না। সে মাথা নীচু করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

অনন্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—সমর, এতো বেলা কোরে উঠলে কেন ?

—রাত্তিরে একটু দেরীতে শুয়েছিলুম।

অনুজা দেবী আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—দেরীতে শুয়েছিলে কেন ? কবিতা লেখা হচ্ছিল বোধ হয় !

—না মা, পড়ার বই ই পড়ছিলাম।

মুখ বাঁকাইয়া অনুজা দেবী উত্তর দিলেন—ওঃ কি আমার ভালো ছেলে রে—এবার ফার্ষ্ট হবেন।

সমরেশ তবুও নীরব। ভগবান বোধ হয় তাহাকে অন্য ধাতুতে গড়িয়াছিলেন, তাই তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল কিন্তু মুখ ফুটিতেছিল না—

অনন্ত বাবু অনুজাকে একটু ভৎসনার সুরে বলিলেম—কি আরম্ভ কোরলে তুমি এই ছেলেটার সাথে ?

অনুজা দেবী এবার ফাটিয়া পড়িলেন, হাত পা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—আমি তো আগেই বলেছিলাম যে আমি এসব ঝঞ্ঝাটে থাক্‌তে চাইনে, তোমার ছেলে লাট হোক কি কুমী হোক তা দিয়ে আমার কি? আমায় তো আর খেতে দেবে না? আমি যদি ভালোর জন্যে বলি তবেই হয় মন্দ, কাজ কি বাপু, তোমার ছেলে তুমিই বোঝ ভাল।

তারপর আর নিজেকে যেন সামলাইতে পারিলেন না—নারীর যাহা কিছু ব্রহ্মাস্ত্র তাহাই প্রয়োগ করিলেন, চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। কাঁদ কাঁদ স্বরে অস্পষ্ট ভাষায় বলিলেন—তার চেয়ে আমাকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও, আমাকেও চাকরাণীর মতো খেটে খেটে অস্থিচর্ম্মসার হতে হবে না, তোমরাও বাপ ব্যাটা নিশ্চিন্ত হতে পার। আমি তোমাদের কে? আমি তো শুধু ভাত সেদ্ধ কোরবার জন্যেই তোমাদের সংসারে এসেছি—আর বলিতে পারিলেন না, শাড়ীর আঁচলখানা দিয়া বার বার চোখ মুছিতে লাগিলেন।

সমরেশ এতক্ষণ পাথরের মতো দাঁড়াইয়া ছিল। আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল। চা' ততক্ষণ জুড়াইয়া জল হইয়া গিয়াছে—কিছু না খাইয়াই বিছনার ওপর চিৎ হইয়া শুইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

প্রথমে মনে হইল ছেলেবেলার কথা, তাহার মা যখন মারা যায় তখন সে আট নয় বছরের। সকল কথা ভাল করিয়া মনে পড়ে না, তবু মা'র চেহারা তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়ায়। তাহার চোখের জল বাঁধ মানে না, ভাল করিয়া জ্ঞান হওয়ার পর হইতেই সে এই সৎমাকে দেখিয়া আসিতেছে। তাহার মনে পড়ে তাহার বাবার বিবাহের কথা। তখন সে কি-ই বা বুঝিত—তাহার জ্ঞানই বা কতদুর ছিল! জ্ঞান হওয়ার পর হইতেই সে উঠিতে বসিতে বকুনি খাইয়াই মানুষ হইতেছে। তার সৎমার আচরণের কথা সে ভুলিতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না।...

সে মাতাপিতার প্রতি ভক্তিকে তাহার মনুষ্যত্ব ব্যক্তিত্বর উপরেই চিরদিনই স্থান দিয়া আসিয়াছে তাই সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে না; কোনদিন পারিবে বলিয়া মনে হয় না। তাহার বাবা অনন্ত বাবু সাদাসিধা গোছের লোক—ভালোতেও নাই, মন্দতেও নাই।

এলোমেলো ভাবে ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ দেয়ালের ঘড়িটার দিকে তাহার চোখ পড়িল। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। কলেজের বেলা হইয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া স্নান করিতে চলিল। স্নান করিয়া সার্টটা গায় দিয়া সে রান্নাঘরের দিকে চলিল। রান্নাঘরে

কেহ নাই, রান্না হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মা'র কোঠায় আসিয়া দেখিল মা' তখনও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। সে কি করিবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, অবশেষে ডাকিয়া বলিল—মা, কলেজের বেলা হয়ে গেচে, ভাত দেবে চল।

অনুজা দেবী মাথা না উঠাইয়াই রাগের মাথায় বলিলেন—আমি তো তোমাদের বাড়ীতে ভাত সেদ্ধ কোরতে আসিনি, তোমার বাবাকে ব'লো তিনি বামুন রাখবেন'খন।

সমরেশ কোন উত্তর না দিয়াই আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিল। ঘরে আসিয়া খাতাপত্র লইয়া কলেজে চলিয়া গেল।

কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিতে প্রায় পাঁচটা বাজিল। বাড়ীতে পা দিবার সাথে সাথেই মুড়ির বাটী ও চায়ের পেয়ালা হাতে অনুজা দেবীকে সামনে পাইয়া ভড়কাইয়া গেল। সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু অনুজা দেবীর তীক্ষ্ণ কথাগুলি সহ্য করিবার জন্যেই যেন সে মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

অনুজা দেবী বলিতে লাগিলেন—কি বড়লোকের ছেলে রে, ছেলের আমার মুড়ি সয় না। রোজ রোজ রসগোল্লা এনে দিই বাপের বাড়ী থেকে।

সমরেশ কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইল। তাহার একবার ইচ্ছা করিল যে শুনাইয়া দেয়—বাপের বাড়ী হইতে কে কত আনিয়া খাওয়াইয়াছে তাহা আর না বলিলেও চলে। কিন্তু পারিল না, চক্ষুলজ্জা তাহাকে বাধা দিল।

তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া যেন কিছু বলা হয় নাই এই ভাবে সে তাহার ঘরে আসিয়া বই রাখিয়া সার্ট খুলিয়া শুইয়া পড়িল—সারাদিন না খাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

খানিকক্ষণ এই ভাবে শুইয়া উঠিয়া পড়িল। আবার সার্টটা গায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। মনে মনে ইচ্ছা ছিল সিপ্রাদের বাড়ী যাইবে।

সিপ্রাদের বাড়ী তাহাদের বাড়ী হইতে মিনিট চারেকের পথ। সে সিপ্রার মাকে মাসীমা বলিয়া ডাকে। সিপ্রার বাবা যতীশ বাবু আর তার বাবা ডুজনে ছেলেবেলাকার বন্ধু। সিপ্রার মা আর তার মা দুইজনে ছিল সই। কাজেই দুই বাড়ীতে ঘনিষ্ঠতা ছিল যথেষ্ট। সিপ্রাকে সে ছোট বোনের মত দেখে—ছেলেবেলা হইতেই সে একসাথে খেলাধূলা করিয়া আসিয়াছে। সিপ্রাদের বাড়ী যাইতে সামনে পড়িয়া গেলেন সিপ্রার মা। সমরেশকে দেখিয়াই সিপ্রার মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বাবা, তোর মুখ এতো শুকনো ঠেকচে কেন? মা কিছু বলেচে?

—না মাসীমা।

—খেয়েছিস্ কিছু বিকেলে?

সমরেশ নিরুত্তর, তাহার উত্তর দিবার মত কি আছে? নিরুত্তর দেখিয়া সিপ্রার মা বুঝিতে পারিলেন যে বাড়ীতে আজ কিছু একটা হইয়াছে। বলিলেন—আচ্ছা বাবা, তুই একটু সিপ্রার ঘরে যা, আমি ততক্ষণ কিছু খাবার নিয়ে আসি, বলিয়াই সিপ্রার মা অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। সমরেশ সিপ্রার ঘরে গিয়া ঢুকিল। সিপ্রা তখন সুটকেশ হইতে শাড়ী, ব্লাউজ বাহির করিতেছিল। সমরেশকে দেখিয়া সিপ্রা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কি সমরদা, মুখ ভার কেন? বাড়ীতে বুঝি মার সাথে ঝগড়া কোরে এসেছো?

—না, কে বল্‌লে?

—বল্‌বে আর কে, তোমার চেহারা বলচে।

—চেহারা দেখেই বলে ফেল্‌লে ঝগড়া কোরে এসেছি? তোমার কলেজে পড়া সার্থক, তোমার সাইকোলজি পড়া সার্থক।

এমন সময় ঢুকিলেন সিপ্রার মা, হাতে একটা প্লেটে কতকগুলি কমলা লেবু ও কয়েক টুকরা নাসপাতি। প্লেটটা হাতে দিয়া বলিলেন—বোস্ খা।

সিপ্রা মাকে বলিল—মা, সমরদা আমাদের সাথে সিনেমায় যাক না কেন, ওর মনটা ভাল হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, তা যাবে'খন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। সিপ্রাদের মোটর সমরেশকে তাহাদের বাড়ীর সামনে আসিয়া নামাইয়া দিল। সমরেশ এত রাত্রি হওয়ার কি কৈফিয়ৎ দিবে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ঢুকিতেছিল।

ঘরে আসিয়া দেখিল—ভাত ঢাকা অবস্থায় পড়িয়া আছে। সে হাত পা ধুইয়া খাইতে বসিল।

অনুজা দেবী আসিয়া দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—এত রাত্তির কোরে কোত্থেকে এলে?

—বায়স্কোপে গিয়েছিলাম।

—বায়স্কোপে? খাবার ভাত জোটে না আর তোমার পয়সা খরচ কোরে বায়স্কোপে যাওয়া হয়?

—আমি পয়সা খরচ কোরে যাইনি মা, সিপ্রাদের সাথে গিয়েছিলাম।

অনুজা দেবী ওই বাড়ীর নাম সহ্য করিতে পারিতেন না; গর্জ্জিয়া উঠিলেন—আমি তোমাকে একশো বার নিষেধ কোরেছি যে ওই বাড়ীতে যাবে না।

সমরেশ সকল নিষেধ শুনিতে প্রস্তুত, বাদে ওই একটী। সে কথা বলিল না, অনুজা দেবী রাগে বক্‌বক্ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ইহার প্রায় একমাস পরের কথা। সমরেশ কলেজে গিয়াছে, অনন্তবাবুও আফিসে। দুপুর বেলা ডাকপিয়ন আসিয়া একখানা 'ভারতবর্ষ' দিয়া গেল। অনুজা দেবী খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া সেইখানা হাতে লইয়া গড়াইতে লাগিলেন। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ তাহার একটা গল্পের উপর

চোখ পড়িল। গল্পের নাম—সিপ্রা : লেখক শ্রীসমরেশ রায়। গল্পের ও লেখকের নাম দেখিয়া অনুজা দেবীর কেমন একটু কৌতূহল হইল। পড়িতে আরম্ভ করিলেন। অনুজা দেবী অনুমানে বুঝিলেন যে এই লেখকই যে তাহাদের শ্রীমান্।

একটী নিছক প্রেমের গল্প। সিপ্রার সাথে কি করিয়া প্রথম পরিচয়—পরিচয়ে অনুরাগ অনুরাগের পর প্রেম। নায়ক নায়িকা দু'জনেই কলেজে পড়ে—অনুজা দেবীর মনে হইল সবই তো হুবহু মিলিয়া যাইতেছে। নায়িকাকে লইয়া সিনেমা, গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি জায়গায় বেড়ানর ইতিহাস আছে। ক্রমে তাহাদের প্রেম চরম সীমায় পৌছিল। চৌরঙ্গীর উপর রাত্রি দশটায় ট্যাক্সিতে আলিঙ্গন—চুম্বন...

অনুজা দেবী আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এইখানেই তাঁহাকে থামিতে হইল। ঘৃণায় লজ্জায় তাঁহার সমস্ত শরীরটা ছি ছি করিয়া উঠিল। এই এতটুকু ছেলে যে কি রকম পাকা হইয়া গিয়াছে তাহা আর বুঝিতে দেরী হইল না। বইটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন আর মনে মনে কি ভাবে অনন্ত বাবুর কাছে লাগাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না। অনন্ত বাবু সবেমাত্র আফিস হইতে ফিরিয়াছেন, অনুজা দেবীও পত্রিকাখানা হাতে লইয়া একেবারে স্বামীর চোখের সামনে আনিয়া ধরিলেন।

অনন্ত বাবু পত্রিকা খানা হাতে লইয়া অনুজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনুজা দেবী বলিলেন—আমার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখছো? লেখা আমার মুখে নয়, লেখা তোমার হাতে ওই পত্রিকায়। দেখ তোমার ছেলে কি সুন্দর গল্প লিখেছে—

—তা এতো তাড়াতাড়ি কিসের? গল্প তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না? আফিস থেকে আসচি. জামা কাপড় ছেড়ে নিই, তারপর পড়ে দেখবো।

—না গো না, শীগ্‌গীর পড়ো।

অনন্ত বাবু ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া গল্পটা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। অনুজা দেবী ঠিক যেখানটায় আসিয়া থামিয়াছিলেন, অনন্ত বাবুও ঠিক সে জায়গায় আসিয়া থামিলেন, রাগে অনন্ত বাবুর চোখ মুখ লাল হইয়া গেল।

অনুজা দেবী ঠাট্টার সুরে বলিতে লাগিলেন—এখন আর কি, ছেলেকে একটা মোটর কিনে দাও—ট্যাক্সি কেন?

অনন্ত বাবু রাগিয়া উঠিলেন—অনুজা, এখন ঠাট্টা ইয়ারকির সময় নয়—

কেন বাপু; আমি তো আগেই বলেছিলাম যে ওই বাড়ীর সাথে এত ঘনিষ্ঠতার কাজ নেই আর তোমার ছেলেকে ওই ধাড়ি মেয়ের সাথে মিশতে দিয়ো না—তখন বুঝি কে কার কথা শোনে—এখন মজাটা টের পাবে—

অনন্ত বাবু আর কথা বলিলেন না—বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সমরেশ প্রতিদিনকার মত কলেজ হইতে ফিরিয়া হাতমুখ ধুইতে চলিয়াছে, এমন সময় গুরু-গম্ভীর ডাক আসিল—সমর।

সমরেশকে কোনদিন তাহার বাবা এমন গম্ভীর ভাবে ডাকেন নাই। সে অনুমান করিল যে আজ কিছু একটা হইয়াছে, তাই অতি ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

অনন্ত বাবু বলিতে লাগিলেন—সমর তোমাকে আমি এতোদিন ভালো চোখে'ই দেখেছি, কিন্তু তোমার ভিতরেও যে এতো তা' আমি বুঝতে পারি নি। যাক্ তুমি এই মুহূর্তে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাও। তোমার মতো ছেলেকে জলে ভাসিয়ে দিলেও কিছু হবে না—ভাব্‌বো মরে গেছে।

সমরেশ এর একবিন্দুও বুঝিতে পারিল না। সে একবার অনন্ত বাবুর দিকে আর একবার অনুজা দেবীর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। এতক্ষণ ভাল করিয়া অনন্ত বাবুর দিকে নজর পড়ে নাই, হঠাৎ পড়াতে তাহার স্নায়ুর কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—বাবা, কেন তুমি এ'কথা বোলচ?

অনন্ত বাবু দ্বিগুণ ফাটিয়া উঠিলেন—কেন বলচি? পাজি, এসব কি?—বলিয়া সমরেশের চোখের সামনে পাতাটা মেলিয়া ধরিলেন।

সমরেশের বেশীক্ষণ চাহিবার মত ক্ষমতা ছিল না, সে কি করিয়া বুঝাইবে যে ইহা নিছক কল্পনা মাত্র, বাস্তবের এক কণিকাও ইহার ভিতরে নাই—তাহার কান্না পাইতেছিল, সে যেন কি বলিতে যাইতেছিল—পারিল না কিছু বলিতে—না পারিল হৃদয়ের ব্যথা গোপন করিতে—চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল।

চলিয়া আসিবার সময় তাহার কানে গেল —তুমি আগেই বলেছিলে সত্যি অনুজা, কিন্তু আমি তখন গ্রাহ্য করিনি...

সমরেশ আসিয়া দাঁড়াইল ফুটপাতে। সন্ধ্যা হয় হয়, রাস্তায় অগণিত লোকের চলাচল, বাস, ট্রাম, ট্যাক্সির যাতায়াত—সেই বিশাল জনসমুদ্রের কর্ম্মব্যস্ততার মাঝে সে আপনাকে ডুবাইয়া দিল।

খোলা-চিঠি

শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্যকে

ধীরাজ,

এ সপ্তাহের চিঠি হচ্ছে তোমাকে। বাংলাদেশের ছায়াছবি শিল্পে তুমি হচ্ছ আরেকটি অভিনেতা যে অসংখ্য সুযোগ পেয়েও নিজের বিশেষত্ব দেখাতে পারোনি। আর, মনে হয় পারবেও না। অতএব, কর্তৃপক্ষরা আজও তোমায় কেন নেয় আশ্চর্য্য হয়ে তাই ভাবি। এর জবাবে তুমি বল্‌তে পারো—আমার চেহারা আছে। কিন্তু, বাস্তবিক, উল্টে তোমায় আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি—তোমার চেহারায় কী আছে? তোমার দেহগঠন ভালো—স্বীকার করি—কিন্তু তোমার মুখই তোমায় মাটি করেছে। তোমার মুখকে আবার মাটি করেছে তোমার চোখ। ড্যাবডেবে, প্রকাণ্ড মেয়েলী চোখ। চোখ হচ্ছে মানুষের মনের দরজা, ভাব প্রকাশের সব চেয়ে ভালো অস্ত্র। তুমি পুরুষ, চোখ দিয়ে তোমার পুরুষত্ব ফোটাতে গেলে প্রকাশ পায় মেয়েলিত্ব। তাই জন্যই, প্রথম নম্বর, সিনেমায় তোমায় মানায় না, মানায় কোনো যাত্রা-দলে মেয়ে সাজলে। তোমার মেয়েলী হাবভাব, চলন, সেখানেই হবে সুন্দরতম—সন্দেহ নেই। শাড়ী ব্লাউজ ও গহনা পরে তোমাকে একবার আমাদের ছায়াপটে দেখতে ইচ্ছে করে। বাঙ্‌লার এই অভিনেত্রী সমস্যার দিনে তুমি যদি এইরূপে সাফল্য লাভ কোর্‌তে পার তা' হ'লেও বাঙ্‌লা ফিল্ম শিল্পের কতকটা কাজ হয়। তুমি এ কথা ভেবে দেখ। তারপর যাত্রা হচ্ছে নাম-করার তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জায়গা। শুধু যাত্রা নয়, যাত্রায় মেয়ের পার্ট। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে তোমার অভিনয়। তুমি আজ পর্য্যন্ত কোনোখানে সত্যিকারের অভিনয় করেছো বলে' তো মনে হয় না। লাইনগুলো পরপর মুখস্ত বলা ও মাঝে মাঝে তোমার বিখ্যাত চোখকে ছোটো ও বড়ো করাই হচ্ছে তুমি—শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্যের অভিনয়। প্রাণের ও দরদের অভাব তোমার অভিনয়ে, তোমার অভিনয় পুতুলের কথা বলা। অতএব, সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে আবার প্রমাণিত হচ্ছে—সিনেমায় তোমার মেকী অভিনয় খাটে না, খাটে ঝল্‌মলে যাত্রায়। তুমি বুঝতে পারো না ধীরাজ, তোমার নাম অপেক্ষা করছে কোথায়। যদি বুঝতে তা পারতে, এতদিন তুমি নিশ্চয়ই সেখানে যেতে।

মনে পড়ে একদিন, আমার কাছে বড় দুঃখ তুমি করেছিলে। তোমার মনে পড়ছে না? আচ্ছা, মনে করিয়ে দিচ্ছি। রাধা ফিল্মে তখন 'দক্ষযজ্ঞ' হচ্ছিলো। বিকেল বেলা, শূটিং চল্‌ছিলো—একটি বাগানে সখীদের সঙ্গে সতীর গান। শিবের বেশে সাজঘর থেকে তুমি বেরিয়ে এলে—মুখে পাউডার, মাথায় জটা, কাজল-মাখা তোমার ড্যাবডেবে চোখ। তোমার সঙ্গে অনেক কথা হ'লো। কথায় কথায় তুমি বলেছিলে—'আজ পর্য্যন্ত মনের মত কোনো পার্ট বা কোনো পরিচালক আমি পাইনি।' তার উত্তরে আজ আমায় বল্‌তে হচ্ছে—ধীরাজ, আর তুমি পাবেও না। কারণ, আজ পর্য্যন্ত কত রকম বিভিন্ন পার্টে তুমি অভিনয় না করেছো? সামাজিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক—কিছুই তো বাদ যেতে দেখলুম না। কিন্তু, কোনো অংশতেও তো একদিনও তোমার বিশেষত্ব দেখা গেলো না। এখন মনে হচ্ছে, সত্যি—নিজের বিষয়ে তুমি অত্যন্ত খাঁটি একটি কথা বলেছিলে। নিজেকে তুমি জানো অত্যন্ত সম্পূর্ণভাবে। মনের মত পার্ট তুমি সিনেমায় কোনোদিন পাবেনা, পাবে—যাত্রায়, উদাসিনী রাণীর ভূমিকায়। নিজেকে

সাহিত্য পরিচয়

প্রেমের বিচিত্র ধারা—গল্পের বই, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও মন্মথ ভট্টাচার্য্য রচিত। প্রকাশক—অরিন্দম এণ্ড কোম্পানী, ১০নং গনেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

বইখানায় দশটি গল্প আছে এবং প্রথম গল্পটি দিয়েই বইখানার নাম রাখা হয়েছে। বইখানা উৎসর্গ করা হয়েছে বাংলার তরুণ তরুণীদের হাতে, কিন্তু বাংলার তরুণ তরুণীগণ কিভাবে এ বইখানা গ্রহণ কোরবে তা জানিনা তবে লেখকদ্বয়ের প্রচেষ্টা যে শুভ তা নিঃসন্দেহে বইখানা পড়ে বলা যায়। আজ বিশ্ব-সাহিত্য দরবারে ফরাসী সাহিত্য একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এবং বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী কথাশিল্পী মোপাশাঁর ছায়া নিয়েই এই দশটি গল্পকে এদেশের ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের দেশ ভাবপ্রবণ। কীর্ত্তনের সুরে সে শিখেছে স্নেহ, প্রেম ও দয়া। দ্বেষ ও ব্যভিচারের কথা সে ভাব্‌তেও পারে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ যতই সভ্যতার মুখোস পরে থাকুক না কেন তার ভিতর যে আদিম পশু প্রবৃত্তি লুক্কায়িত আছে সুযোগ হলেই সে তার নগ্ন-স্বরূপ প্রকাশ করবেই। এই নির্ভীক সহজ সত্য কথাটিকেই বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু দু'একটি স্থলে লেখকের লেখনীর গতি তার স্বাভাবিক ছন্দ টেনে যেতে পারেনি। তাই অনুবাদের ও পাশ্চাত্য সমাজের আবহাওয়ার ছাপ মাঝে মাঝে পরিস্ফুট হয়ে পড়েছে। নচেৎ একে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দরই বলা যেত।

অধিকাংশ গল্পগুলিই পূর্ব্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বই-এর ছাপা ও কাগজ ভালই, বাঁধাই তৃতীয় শ্রেণীর।

এতো ভালো করে জেনেও, নিজের ভালো যে না বোঝে তাকে মানুষ কী আর বল্‌তে পারে!

সিনেমায় তোমায় থাক্‌তে হলে প্রথম তোমার মুখ থেকে মেয়েলিত্ব ছাড়তে হবে। উন্নত ধরণে অভিনয় শিখতে হবে, কণ্ঠে—হাবে আর ভাবে আন্‌তে হবে পুরুষত্ব। তা না হ'লে, নেহাৎ বাংলা দেশ বলে যে সমস্ত সুযোগ তুমি পাচ্ছো, সে সুযোগও মনে হয় বন্ধ হবে। কারণ, বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি সবার পাকে, কাঁচা থাকে কম—এটি মনে রেখো। ইতি—

আনিয়াৎ খাঁ

ছিটে ফোঁটা

বাংলা দেশের আবহাওয়ায় করুণরস যেমন জমে উঠে তেমন আর কিছুতেই সম্ভবপর নয়—হাস্যরস কিংবা 'satire' এদেশের সাহিত্যে তুলনামূলক অতি অল্প বললেও অত্যুক্তি হবেনা। 'Our sweetest songs are those that tell of sadest thoughts'—কথাটি খুবই সত্যি—আমরাও একথা মানি। এ যাবৎকাল করুণ রসাত্মক বহু গল্প উপন্যাসই পড়েছি—আপনারাও অনেক পড়েছেন; কিন্তু পৌষের 'ভারতবর্ষে' যে বীভৎস করুণ-রসের সন্ধান পেলুম সাহিত্যের ইতিহাসে তা বিরল। এটা যে গল্প কিংবা চিত্র কিংবা অপর কিছু—পড়ে তা অনুধাবন করা যায় না—অন্ততঃ আমরা পারিনি—তবে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক একে গল্প বলেই চালিয়েছেন, কিন্তু মহীমের মতে এটাকে পাগলের প্রলাপ-উচ্ছ্বাস 'বল্লেই' খানিকটা সামঞ্জস্য এবং স্বার্থকতা থাকে।

লেখক শ্রীক্ষেত্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য পুরাণতীর্থ বি-এ মহাশয় এটির নাম দিয়েছেন 'অন্তিম'। এদিক থেকে কাব্য পুরাণতীর্থ মহাশয়কে আমরা তারিফ না করে থাকতে পারচ্ছিনা; কারণ 'অন্তিম' অবস্থায় না পৌছালে এ রকম ভীমরতি হওয়া সম্ভবপর নয়।

গল্পের (?) বিষয় বস্তু (plot) হচ্ছে এক স্বামীহীনা রোগ শয্যায় শুয়ে প্রলাপ বকছে—স্বামীর স্মৃতিরাশি বুকে ধরে অতীতের মর্ম্মগাথা স্মরণ করে তার অন্তিম পথে স্বামীকে পাবার লালসায় অধীর হয়ে উঠছে। এইরকম একটি মর্ম্মান্তিক উচ্ছ্বাস-কাহিনীকে কাব্যপুরাণতীর্থ মহাশয় তাঁর লেখনীর সাহায্যে রূপ দিয়েছেন অন্তিমে!—

আপনারা একটু নমুনা শুনুন—'ঠাকুরঝি!' 'বউ?'

"নিজে নিজে ইচ্ছে ক'রে এমনধারা আত্মঘাতী হ'তে চলেছ কেন ভাই?" (আত্ম-ঘাতীই বটে; এরকম গল্প পড়তে হলে নিজেদের আয়ুক্ষয় ছাড়া অন্য কোন লাভ নেই।

"কি করি বউ? উপায় ত নেই। সে যে ডাকে—কেবলি ডাকে! বলে, মিনু, এসো; আমি যে একলা থাকতে পারিনে গা!" (ওঃ কী tragedy) পাঠক পাঠিকাগণ, আপনারা অনেক রকম রস আস্বাদন করেছেন—কিন্তু তালের রসের সঙ্গে বাৎসল্য রস কেমন জমে ওঠে ইতিপূর্ব্বে তা বোধহয় উপলব্ধি করেন নি! 'আচ্ছা শুনুন :—

"কি যে বলো, ঠাকুরঝি! ছেলেটার দিকে—" "বাছা আমার, বাছা আমার, বাছা আমার! (আর বেশী নয়, মুখ দিয়ে ফেনা উঠবে) তাকে বউ, তোর কোলে তুলে দিয়ে গেলুম। অভাগাকে দেখিস; আর তাকে তার বাপের মতন কোরে মানুষ ক'রে তুলিস।"......

* * *

'রঙমহলে'রই কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয় 'বাংলার মেয়ে'তে একহাত খুব বাজী মাৎ করেছেন; শুনছি নাকি উক্ত লেখিকারই আর একখানি বই তাঁরা নাট্যে রূপ দেবেন; আমরা বলি তাঁরা এই কাব্য পুরাণতীর্থ মহাশয়কেও যেন বাদ দেবেন না—পরবর্ত্তী বইখানি এঁকে

দিয়ে লেখালে খুব লাভবান হবেন। এঁর লেখায় কি রকম 'Dramatic force' একটু শুনুন ঃ—

"জীবনের পশ্চিম আকাশে আমারও প্রাণের সূর্য্য যে সাঁ সাঁ করে নেমে চলেছে, ভাই! আমার অস্তাচলের শিখরে দাঁড়িয়ে ব্যগ্র দু'বাহু মেলে ঐ সে ডাকে,—বউ, ডাকে! সেই মুখ—হাসিমাখা; সেই উন্নত ললাট; মাথার উপরে সেই মসীকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশের কালো তরঙ্গ! একা কি সে থাকতে পারে—গত সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের একটা দিনও যে সে আমাকে ছেড়ে থাকে নি গা!…"

আরও শুনুন ঃ—

"বড় যাতনা যখন পেয়েছ, তখনি দেখেছি তুমি তাড়াতাড়ি আমার হাতখানাকে মুঠো ক'রে ধ'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে চেয়ে (আরও গোটা চারেক 'চেয়ে' যোগ করলে ভালো হ'ত) একটা অলস হাসি নিয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে থেকেছ! (সে জন্যই কি দম ফেটে মারা গিয়েছেন—তাহলে তো নায়িকার কষ্টের আর নাহিক-ওর!) তার এতটুকু যন্ত্রণার শান্তির জন্যে আমি এক একখানা ক'রে পাঁজরা উপড়ে দিতে চাইলুম যে, (শুধু কি পাঁজরাতে হ'য়—হৃৎপিণ্ডও উপড়ে দেওয়া উচিত ছিল) হে ভগবান্!—ভগবান—ভগবান—নিঠুর ভগবান!—"

আচ্ছা এইবার পরিণতি শুনুন ঃ—

"আলো-নিবে আসছে! চারিদিকে—গোধূলির—সোনারছটা।—স'রে এস!—আরো কাছে।—হাত ধর। (বাড়ী যাও—কি পড়? বড় গাছ—লাল ফুল' বর্ণমালা প্রথম ভাগখানি কি সামনে পড়ে ছিল?)

—"আঃ, কি শান্তি!—খোকা?—ঘুমুচ্চে—"

ওঁ শান্তি! ওঁ স্বস্তি!! ওঁ আপদ্ শান্তি!!! কথাগুলি মহীমই উচ্চারণ করলে। এতক্ষণ সে ঘরের এককোণে বসে গম্ভীর হয়ে পিঁয়াজ ছাড়াচ্ছিল এবং সাশ্রুনেত্রে গল্প পাঠ শুনছিল।

মহীমের বুদ্ধিকে আমরা তারিফ করি। পাঠক পাঠিকাগণ, আপনারাও যখন কাব্য-পুরাণতীর্থ মহাশয়ের এই গল্প (?) পড়বেন তখন মহীমের পন্থা অনুসরণ করবেন—পিঁয়াজের ঝাঁঝ ছাড়া চোখের কোণে জল আসবে না।
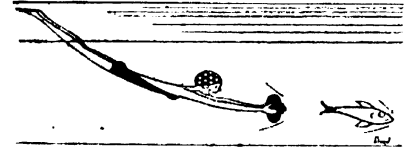
ব্রীজ খেলা
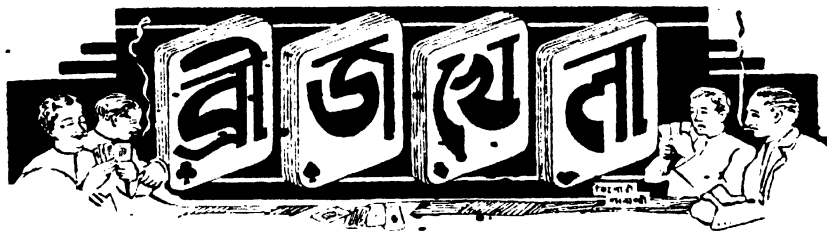
শ্রীদুর্ব্বাসা

প্রথম ডাক (Opening bid) :— এ ডাক তিন প্রকারের (১) একের ডাক,—যথা একখানি হরতন বা একখানি No Trump, (২) দুই-এর ডাক,—যথা দুইখানি ইস্কাবন বা দুইখানি No Trump, (৩) তিন, চার বা পাচের ডাক,—যথা পাচখানি রুহিতন বা তিনখানি হরতন কিংবা তিনখানি No Trump.

(১) রঙের খেলায় একের ডাক :—নন্ ভাল্নারেবল অবস্থায় (Non Vulnerable) প্রথম বা দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি এ ডাক দেন তা'হলে বুঝতে হবে যে তাঁর হাতে আড়াইখানি বা তদূর্দ্ধ অনারের পিট আছে এবং সে অনারের প্রতিরোধ শক্তিও (Defensive value) বর্ত্তমান। নন্ ভাল্নারেব্ল অবস্থায় এ ডাক রঙে দিতে হলে ক্রীড়কের হাতে ন্যূনকল্পে নিম্নলিখিত তাস থাকা প্রয়োজন।

(ক) ন্যূনকল্পে সর্ব্বশুদ্ধ আড়াইখানি অনারের পিঠ।

(খ) ন্যূনকল্পে চারখানি রঙ।

(গ) যদি চারখানি রঙে ডাক দেওয়া হয় তবে অন্ততঃ দেড়খানি অনারের পিট ঐ রঙে থাকা আবশ্যক।

(ঘ) এতদ্ব্যতীত প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির বাহিরের তাসে অন্ততঃ একখানি অনারের পিট থাকা উচিত। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তির দেড়খানি অনারের পিটের আবশ্যক।

যদি কেহ পাচখানি রঙে ডাক দেন তবে উক্ত রঙে আধখানি অনারের পিট নিয়ে (যথা সাহেব বা বিবি, গোলাম) ডাক দেওয়া চলতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এখনও দ্বিতীয় ব্যক্তির বাহিরের দুইখানি অনারের পিট এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তির বাহিরের আড়াইখানি অনারের পিট থাকা আবশ্যক।

যদি ছয়খানি রঙে ডাক দিতে হয় তবে যে কোন ছয়খানি রঙ নিয়ে ডাক দেওয়া চলতে পারে কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির বাহিরের আড়াইখানি এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তির তিনখানি অনারের পিট থাকা অবশ্য প্রয়োজন। ফলতঃ একের ডাক দিতে গেলে অনারের পিট পর্য্যাপ্ত পরিমাণে (ন্যূনকল্পে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির আড়াইখানি কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তির তিনখানি) থাকা একান্ত আবশ্যক। কালবার্টসন্ নিয়মে খেলতে হলে প্রত্যেক ক্রীড়ককেই এ কথা মনে রাখতে হবে। এ' গেল নন্-ভাল্নারেবল অবস্থার ডাক। ভাল্নারেবল অবস্থায় যথাক্রমে তিনখানি বা সাড়ে তিন খানি অনারের পিট থাকা আবশ্যক।

নন্-ভাল্নারেবল অবস্থায় প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তি কিরূপ হাত থাক্লে ডাক আরম্ভ করতে পারেন তার কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দিচ্ছি।

(১) ইস্কাবন—আটা, তিরি; হরতন—টেক্কা, গোলাম, দশ, সাতা; রুহিতন—টেক্কা, দশ, সাতা, তিরি; এবং চিড়িতন—গোলাম, নয়, আটা।

(২) ইস্কাবন—বিবি, নয়, আটা, সাতা, ছক্কা; হরতন—টেক্কা, তিরি; রুহিতন—সাহেব, বিবি, নয়, দুরি; এবং চিড়িতন—সাহেব, সাতা।

(৩) ইস্কাবন—দশ, নয়, আটা, সাতা, পাঞ্জা, তিরি; হরতন—সাহেব, দুরি; রুহিতন—টেক্কা, দশ, নয়; এবং চিড়িতন—টেক্কা, সাতা।

উপরোক্ত যে কোন প্রকারের হাত থাক্লে ডাক আরম্ভ করা যেতে পারে। এই গেল রঙের ডাকের কথা। এবার No Trump ডাকের কথা বলব।

ফেরাই-এর খেলায় (No Trump) একের ডাক :—কালবার্টসন্ নিয়মে No Trump-এর অপেক্ষা রঙের খেলাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ডাকার উপযুক্ত রঙ থাক্লে No Trump-এর বদলে আগে রঙ ডাক্তে হবে এ কথা মনে রাখা প্রত্যেক ক্রীড়কদের প্রয়োজন। যদি ডাকের যোগ্য কোন রঙ হাতে না থাকে তবে একটি No Trump ডাক দেওয়া যেতে পারে কিন্তু সে ক্ষেত্রে ডাক্দারের হাতে নন্ ভাল্নারেব্ল অবস্থায় ন্যূনকল্পে তিনখানি অনারের পিট এবং ভাল্নারেব্ল অবস্থায় চারখানি অনারের পিট থাকা আবশ্যক; এবং এই অনারের পিট অন্ততঃ তিনটী রঙে থাকা একান্ত প্রয়োজন। যদি ডাকদার একখানি No Trump ডাক দেন তা' হলে বুঝতে হবে তাঁর হাতে ডাকের যোগ্য কোন রঙ নাই এবং তাঁর হাতের বিভাগ (Hand distribution) ৪, ৩, ৩, ৩ কিম্বা ৪, ৪, ৩, ২। যদি তাঁর হাতের বিভাগ ৪, ৪, ৪, ১ হয় এবং তিন রঙে তিনখানি অনারের পিট থাকে তবে No Trump-এর বদলে যে কোন রঙ তাঁর ডাকা উচিত,—সে রঙ ডাকের যোগ্য

হোক্ আর নাই হোক্। মনে করুন কৌড়িক নিম্নলিখিত হাত পেয়েছেন,—

ইস্কাবন (Spade)—সাহেব, নয়, তিরি, দুরি।

হরতন (Heart)—টেক্কা, সাত্তা, চৌকা, দুরি।

রুহিতন (Diamond)—টেক্কা, দশ, নয়, সাত্তা।

চিড়িতন (Club)—টেক্কা।

যদিও কোন রঙ্ ডাকের যোগ্য নয় তবুও তার পক্ষে এ হাতে No Trump না ডেকে রঙ্ ডাকাই উচিত। নিম্নে নন-ভাল্নারেবল্ অবস্থায় No Trump ডাকের কয়েকটি উদাহরণ দিলাম।

(১) ইস্কাবন—টেক্কা, সাত্তা, দুরি; হরতন—সাহেব, গোলাম, তিরি; রুহিতন—সাহেব, বিবি, দুরি; চিড়িতন—গোলাম, নয়, আটা, পাঞ্জা।

(২) ইস্কাবন—সাহেব, দশ, নয়; হরতন—টেক্কা, আটা, সাত্তা, তিরি; রুহিতন—টেক্কা, নয়, দুরি; চিড়িতন—সাহেব, নয়, আটা।

(৩) ইস্কাবন—সাহেব, আটা; হরতন—টেক্কা, নয়, তিরি; রুহিতন—সাহেব, দশ, নয়, সাত্তা; চিড়িতন—টেক্কা, নয়, ছক্কা, দুরি।

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়েঃ— আজকাল অমৃতবাজার পত্রিকা বাগবাজারের পুরাতন খ্যাতি বেশ বজায় রেখে চলেছে,—Editorial Department গুলি থেকে বেরিয়ে যে ক্রমশঃ বাগবাজার ষ্ট্রীটের বাবা বুড়া শিবের তলার দিকে এগুচ্ছে—এতে আমাদের হাগুদা'র বুদ্ধির তারিফ করি। লোকে বলে, তুষারদা'র দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়—তা সত্যি কথা। তাঁর অঙ্গুলী হেলনে এই তো সেদিন Fyaz Khan কাগজে ঠুংরী গেয়েছেন—গাইলেও গেয়েছেন, না গাইলেও গেয়েছেন (এতৎ প্রসঙ্গে গোপাল ভাঁড়ের "থাকলেও খাই, না থাকলেও খাই"—দ্রষ্টব্য)। আবার ব্রীজ-সম্পাদক মিঃ Two No Trumps গত ৬ই জানুয়ারী রবিবারের কাগজে তুষারদা'র অনুরূপ বিমান থেকে বিমান মিত্রকে আমদানী করিয়ে Lunar Fools-এর প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল্ খেলায় জিতিয়ে দিয়েছেন; শুধুই কি তাই, আবার কতই না সুখ্যাতি! এঁদের অনন্ত মহিমা বোঝা ভার,—কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম কি না। যা হোক আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে নিশ্চয় বিমান মিত্রই ফাইন্যাল খেলে বিজয়ী হয়েছেন এবং তিনি কখনও মুরারি বসু হোতেই পারেন না। আজকাল—Motor makes a man; তুমি মুরারি বসুই হও আর স্বর্গরাজ ইন্দ্রদেবই হও যখন মোটর নাই তখন প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে উঠ্তেই পারো না; আর যদি উঠেই থাকো,—খেলে জিত্তে চাও না কি?

ইচ্ছা থাক্লেই উপায় হয়ঃ— আমাদের Purdah-down Club শুধু ব্রীজ টেবিলে পরদা আনিয়েই ক্ষান্ত হন্ নি আবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করেছেন বলেই প্রকাশ। যখন এঁরা দেখলেন যে পরদার প্রচলনের দরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীদের তাস নিদ্ধারণ করা অসম্ভব তখন এঁরা জন দুই করে medium-এর আমদানী করলেন—যাদের কাজ হল গিয়ে অন্যের হাত দেখে এঁদের বেতার করা। তাই আমরা বলি যে ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়, মিছামিছি পরদা দিয়ে ব্রীজ টেবিলের ভার বাড়িয়ে লাভ কি? কিন্তু আসব টেবিলে এঁদের এরূপ অত্যাচার যদি ক্রমাগতই চলতে থাকে তবে ভবিষ্যতে আমরা Purdah-down Club-এর পরদা তুলে প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হব না।

কাকস্য পরিবেদনাঃ— Bengal Bridge Association-এর অকসন্ ডুপ্লিকেট্ প্রতিযোগীতার ফাইন্যাল খেলা হয়ে গিয়েছে আজ কতদিন কিন্তু কবে পারিতোষিক বিতরণ করা হবে তার ঠিক নাই।

সব কাজেই দেখি এদের গাফিলতি। সারা ১৯৩৩ ও ৩৪ সালের মধ্যে একটিবারও তো সভার আহ্বান করা হয় নাই—তবে এ এসোসিয়েশন্ রেখে লাভ কি! আমরা ইতিপূর্ব্বে Bengal Bridge Association-কে নিয়ে বহুবার কলমের মুখ ভোঁতা করেছি কিন্তু Bridge Association দিব্য 'পিঠে বেঁধেছেন কুলো আর কানে দিয়েছেন তুলো'! তবে কি Bridge Association বলে কোন সমিতি নাই? কিন্তু সদস্যদের নাম তো বেশ বড় বড় হরফেই দেখা যায়!

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

বভ্রুবাহন বটব্যাল

চার্লি প্রিয়তমা

সব ছবির মতন চার্লি এ ছবিতেও আর একজন লোকের সঙ্গে নতুন করে পৃথিবীর পরিচয় ঘটিয়ে দেবেন। মেয়েটির নাম আপনারা শুনেছেন—বলুন ত কে!—পলেট গডার্ড! পলেট গডার্ড এবারে তাঁর নতুন ছবির নায়িকা হবেন।

ছায়াছবির দর্শকের কাছে পলেট ঠিক নতুন নন। কারণ এর আগেও মিস্ পলেট গডার্ড খান দুয়েক ছ'রীলের কমেডিতে নেমেছেন। তবে এ দুখানা বই গডার্ডকে পরিচয় করিয়ে দেবার মত কিছু নয়। এবারে কুমারী পলেট গডার্ড নামছেন সম্পূর্ণ নতুন ভাবে, নতুন বিশেষত্ব নিয়ে নতুন ছবিতে। কুমারী পলেট গডার্ড বহুকাল হলিউডের শিক্ষকদের কাছে শিক্ষানবিশী করেছেন। তার ওপর চার্লিও যখন তাকে নিজে প্রাণ-মন দিয়ে শিখিয়েছেন তখন তার কাছ থেকে নতুন জিনিষ পাওয়া আশ্চর্য্য নয়।

পলেট চার্লির প্রিয়তমা। কথাটা কিন্তু দুপক্ষ থেকে কেউই স্বীকার করেন না। তাঁদের প্রেম তাঁরাই জানেন; তবে লোকে বলে তাঁরা দুজনে নাকি বিয়ের পবিত্র বন্ধনে দুজনকে বেঁধে ফেলেছেন। আর ছবি তোলা শেষ হবার পর জয় ঢাক বাজিয়ে বিয়ে করে দম্পতী যুগল হনিমুল করতে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে আসবেন। হোলেই ভাল—চার্লির ছন্নছাড়া জীবনের একটা স্থিতি হোক।

পলেটের নাম করতে চার্লি অজ্ঞান। চার্লি জোর গলায় সকলের কাছে বলেন,—এই একখানা বইতেই পলেট হলিউডের নক্ষত্র সভায় স্থান পাবেন। আশ্চর্য্য নয়, চার্লির প্রতিভায় হয়ত তাও সম্ভব।

জ্যাকী কুগানের নতুন বই

জ্যাকী কুগানের নতুন বই হচ্ছে "পেকস্ ব্যাড্ বয়" তার প্রিয় বই হচ্ছে 'দি চ্যাম্প' আর "দি ট্রেজার আইল্যাণ্ড" Actor-দের মধ্যে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে সে ওয়ালেস্ বেরীকে। জ্যাকী তার বদলে 'ডবল' নিয়ে কাজ করা ভালবাসেনা। যখনই কোন stunt ছবি তোলার সময় 'ডবল'-এর কথা উঠে, তাকে সেটা করতে chance দেওয়া হোক বলে জ্যাকী আপত্তি জানায়। জ্যাকীর ধারণা যাদের নরম ঘাড় আলোর আঁচ লেগে নষ্ট হয়ে যাবে ওটা তাদের জন্যে। মেট্রোর সঙ্গে সে আরো একবছরের contract করেছে। সেটের আলো ঠিক করতে, Camera বসাতে আর চারিদিকের তোড়-যোড় করতে প্রত্যেক ছবির যে সময় লাগে সেটা কাটায় সে পড়ার মধ্যে। এই জ্যাকী এমনি করেই সে আরো বড় হবার জন্যে নিজেকে তৈরী করছে।

আর তার বন্ধু, যাকে সে সব চেয়ে বেশী ভালবাসে সে হচ্ছে ওয়ালেস বিয়ারীর মেয়ে ক্যারোল অ্যান্ (Carole Ann)। তখন ট্রেজার আইল্যাণ্ড-এর শুটিং জ্যাকী গেছে shooting করতে ক্যাটালিনাতে Catalina-য়। জ্যাকী চাইলে Ann-কে একটা উপহার দিতে না সে চায়। Ann বলে একটা নীল পাথরের মালা। তারপর সেই রাতের ডিনারে এসেছে জ্যাকী, নেমন্তন্ন, তাতে সেই মালা নিয়ে। Ann নেমেছে একটা নীল পোষাক পরে। জ্যাকী দিলে সেই মালাটি আনের গলায় ঝুলিয়ে।

নয় বছরের মেয়ে আন হেসে বল্লে—দেখ জ্যাকী আমার নীল পোষাকের ওপর এটা মানায় না, তবু তুমি এটা দিলে বলে তাই পরলাম। জ্যাকী ও জানে না—যে পথ দিয়ে জ্যাকী যায় সেটাও সে আনের প্রিয়।

ওয়ারণারের "ম্যাডাম ড্যু ব্যারী"-তে শীঘ্রই দলোরেশ দেল রিওকে দেখা যাবে।

'হেলেন হে'র কথা জানা গেছে—

'হেলেন হে' এখনও ঠিক করেন নি কী করবেন। তবে এক বছরের ভেতর তিনি যে কিছু ক'রবেন না এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। বাড়ীতে ফিরছেন স্বামী তার মেয়েকে নিয়ে, বারোটা মাস তাদের নিয়ে আমোদে আহ্লাদে কাটাবেন। তার ...

চারাগুলি, সখের বাগানখানি আর আর সমস্ত কিছু যা তিনি ভালবাসেন। তিনি মন দিয়ে, অন্তর দিয়ে একটি বছর ধরে দেখবেন, যত্ন করবেন, উপলব্ধি করবেন। এই বছরটি কাটালে—আবার তিনি আসতে পারেন, আবার কাজে নামতে পারেন। এটাই হেলেনের আসল খবর।

যাক এতদিনে—

মায় ওয়েষ্টকে নিয়ে যে রহস্য গড়ে উঠেছিল; যাক এতদিন পরে তা হলে তা উদ্‌ঘাটিত হোল। অবশেষে মায় ওয়েষ্ট সত্যি সত্যিই তা হলে এ বিষয়ে কথা বল্লেন।

'মেট্রো'-র তারকা মরীণ ও' স্যালিভান

লোকেরা নাকি তাঁকে চিঠি দিত, খোঁজ নিত, আবার বলেও বেড়াত যে মায় ওয়েষ্ট নাকি তাঁর ম্যানেজারকে বিয়ে করেছেন। কেউ কেউ চায়ের দোকানে টেবিল চাপড়ে বলে উঠত—'না হে পেছনে রহস্য আছে! কথাগুলো শুনেই নাকি মায় ওয়েষ্ট মুখ খুল্লেন।—ঘোষণা করেছেন—'স্বামীর সঙ্গে' সময় কাটাবার আমার সময় নেই। তাই বলে আমি এমন কথাও জানাচ্ছি না যে আমি বিয়ে করব না।

সত্যিই স্ত্রীলোকের স্বামী থাকা দরকার এবং তা আমি সদা সর্ব্বদা অনুভব করি। আমি ভাল স্ত্রী হতে চাই; যাকে বাস্তবিকই সহধর্ম্মিনী বলে, তাই আমার হতে ইচ্ছে করে। স্বামীই হবে আমার একমাত্র লক্ষ্য। ছবি তোলার দিনগুলোয় স্বামী বলে আমার কিছু থাকবে না; ছবি ছাড়া আমি আর কাকেও টানবো না, মানিবো না।

তাই বলে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে না যে আমার পদস্খলন হতে পারে না। হয়ত এটা ঘটতে পারে, হয়ত পা পিছলোতেও পারে। তবু আমি বলে রাখছি যতদিন ছবির সঙ্গে আছি—ততদিন বিয়ে কোরব না—কোরব না।

মায় আর মার্লিন

মেয়েদের সব নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো—তারা সব কাছাকাছি দাঁড়ালো আর পুরুষগুলো কোথায় গেলো তাদের কেউ দেখতে পায়নি। মার্লিন ডিট্রিশ আর মায় ওয়েষ্ট প্যারামাউণ্টে এসে মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে, এইবার আগুন জ্বলবে বোধ হয়।

সব স্তব্ধ। একটা শব্দও কোথা থেকে গর্জ্জে উঠলনা, আগুনের তাণ্ডব নৃত্যও সুরু হোলনা মার্লিন সিধে 'মায়'-র দিকে আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারপর দুজনে হাসতে সুরু করলেন।

'মায় ওয়েষ্ট'-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হোল যে 'মায় ওয়েষ্টকে'—মার্লিনের একথার উত্তরে তিনি কি বলেন।

মায় উদাস ভাবে হেসে বল্লেন—আমার ওকথা একেবারে কিছু মনে ছিল না। সত্যি বলতে কি আমি ভুলেই গিছলাম যে আমরা দুজনে বন্ধু নহি।

খুচরো খবর

সম্প্রতি সুবিখ্যাত ফিল্ম অভিনেত্রী 'ইভিলিন লের' সঙ্গে নাকি ষ্টেজ অভিনেতা মিঃ ফ্রাঙ্ক লার্টনে'র বিয়ে হয়ে গেছে। মিস্ লে'র বয়স ৩৪ আর মিঃ লার্টনের বয়স ৩০ বছর

* * *

চার্লির হাতে আর একজন মানুষ ভার্জ্জিনিয়া চেরি "সিটি লাইট্‌স্" এ তাঁর সঙ্গে অভিনয় করে বিখ্যাত হয়েছেন।

* * *

এলিজাবেথ অ্যালেন ১৪ই ডিসেম্বর জানিয়েছেন—তাঁর স্বামী মিঃ ডব্লিউ জে ওব্রায়েনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক রইল না।

"কাউণ্ট অফ্ মণ্টে ক্রেষ্ট"-তে এলিসা ল্যাণ্ডি অত্যুজ্জ্বল অভিনয় কোরেছেন।

* * *

হলিউডের মেয়ে জুন লাইট মাত্র পনেরো দিন হয়েছে মিঃ এমিস্-কে বিয়ে করেছেন, এরই মধ্যে তিনি আর এমিসের বাঁধন সহ্য করতে পারলেন না।

খেয়ালী
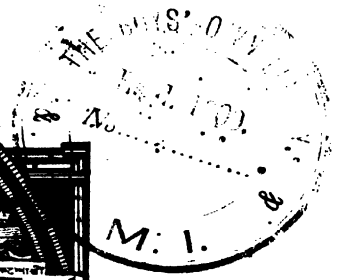
পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১৭ই মাঘ, ১৩৪১, 31st January, 1935. { ৫ম সংখ্যা

মিলনের নির্দ্দেশ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু জেনোয়া হইতে রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে প্রাদেশিক সমিতির ভবিষ্যৎ কর্ম্মধারার যে নির্দেশ সুভাষচন্দ্র করিয়াছেন তাহা বাংলার প্রত্যেক কংগ্রেস-সেবীর প্রণিধানযোগ্য।

একদিকে সরকারী নীতির কঠোরতায়, অপর দিকে অ-বাঙ্গালী নেতৃবৃন্দের ষড়যন্ত্রে বাংলা আজ জর্জ্জরিত। নিষ্পেষিত ও উপেক্ষিত বাংলাকে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে বাংলার কংগ্রেস-কর্ম্মীবৃন্দকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। বাংলার আত্মকলহের রন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পট্টভিসিতারামিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া অ্যানে পর্য্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ শালিসীর অজুহাতে বাংলায় কংগ্রেসী কলহকে বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। নিখিল ভারতের দরবারে বিবদমান আসামীরূপে হাজিরা দিয়া বাংলার কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ভিক্ষুকের পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত হইয়াছেন। সুভাষচন্দ্র ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বাংলার কংগ্রেস কর্ম্মীবৃন্দকে যে আকুল আবেদন করিয়াছেন, আশা করি তাহা বিফল হইবে না।

বি-পি-সি-সি'র বর্ত্তমান কার্য্যকরী সমিতির পুনর্গঠনের প্রস্তাবও আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। নিখিল ভারতের দরবারে উপেক্ষিতা বাংলার পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিতে হইলে ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বাংলার জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে বাংলার কংগ্রেস কর্ম্মীবৃন্দ কি পূর্ব্ব বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া একযোগে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিবেন না? শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত কমল কৃষ্ণ রায় এ বিষয়ে তৎপর হইয়া বাংলার মুখরক্ষা করিবেন কি?

বাংলার দাবী সর্ব্বসাধারণকে সুপরিজ্ঞাত করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রস্তাবও সমীচীন বলিয়া মনে করি। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও যুক্ত সমিতির বিবরণী সম্বন্ধে বাংলার জনমত গঠনে উক্ত সম্মিলন যথেষ্ট সহায়তা করিবে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় সম্মিলন অচিরেই আহুত হওয়া উচিত।

কলিকাতা কর্পোরেশনকে কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেসের নাম ভাঙ্গাইয়া যে দালাল-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার উচ্ছেদ সাধন অচিরেই প্রয়োজন। কংগ্রেস যদি একটা সুনিয়ন্ত্রিত দল গঠন করিতে না পারেন তাহা হইলে ১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্ব্বাচন হইতে কংগ্রেসের অবসর গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। উপদলীয় ব্যভিচারের ফলে আজ কংগ্রেসের নামে কংগ্রেস-দ্রোহী নলিনী রঞ্জন কংগ্রেসী মেয়র-রূপে দেশবন্ধু স্পর্শ-পূত সিংহাসন কলঙ্কিত করিয়াছে।

সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতির ফলে বাংলার কংগ্রেসী কলহের অবসান হইলে বাংলার জনসাধারণের মঙ্গল হইবে।

চলতি পথে

শ্রীমল্লিনাথ

পূর্ণ স্বরাজ দিবসের প্রহসন

নিয়মতান্ত্রিক পথ বাছিয়া লওয়ার পর কংগ্রেসের কর্ম্মশক্তি এতই হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে যে ভাবিলে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসে। নিয়মতন্ত্র মানিয়া চলা ও না চলার মধ্যে কার্য্যশক্তির হ্রাস ও বৃদ্ধি নির্ভর করে, একথা আমরা বিশ্বাস করিনা। ২৬শে জানুয়ারী ভারতের স্বরাজ-সাধকদের কাছে একটা স্মরণীয় দিন। এই তারিখে ভারত তাহার স্বরাজের দাবী জানাইতে সক্ষম হইয়াছিল। তাই প্রতি ভারতবাসীর নিকট এই দিনটী স্মরণীয় করা তাহাদের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি দেখা যায় যে নেতাদের আসন যাঁহারা দখল করিয়াছেন, কর্ত্তব্যহানির অভিযোগ তাঁহাদের উপর পড়িয়াছে, তাহা হইলে আর ক্ষোভের সীমা থাকে না। বাংলার কংগ্রেস পূর্ণস্বরাজ-দিবস উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, কলিকাতার আলবার্ট হলে। বলিতে বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায় যে এই অনুষ্ঠানের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে আসিয়াছিলেন মাত্র ১০০।১৫০ লোক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কেন এমন হয়? যখন কংগ্রেস ছিল সহস্র সরকারী বাধা-নিষেধে আবদ্ধ তখনও তো দেখিয়াছি স্বরাজের মন্ত্রপাঠ করিতে সে কি বিপুল আগ্রহ, সে কি বিরাট জন-সমাবেশ। লক্ষ বাধা উপেক্ষা করিয়া জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য সে কি অপরিসীম উৎসাহ! কিন্তু আজ সে উৎসাহ, সে উদ্দাম তরঙ্গ কোথায় মিলাইল? আমাদের মনে হয়, ভারতে আজও উৎসাহ উদ্দমের অভাব হয় নাই, অভাব হইয়াছে তাঁহাদের যাঁহারা দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করিবেন। যদি নেতাদের মধ্যে কর্ম্মশক্তি বজায় থাকিত, উপযুক্ত মানুষের হাতে নেতৃত্বের ভার অর্পিত হইত, তাহা হইলে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান প্রহসনে পরিণত হইত না। যে কংগ্রেসকে রাজপুরুষরাও ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, আজ তাহার এই শোচনীয় পরিণতি! হায়, হতভাগ্য কংগ্রেস!

ব্যবস্থা পরিষদে

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচন শেষ হইয়া যাওয়ায় ঐ সম্পর্কীয় জল্পনা কল্পনার অবসান হইয়াছে। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের ভূতপূর্ব্ব নেতা স্যার আব্দর রহিম, ৮ ভোটে কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী মিঃ শেরোয়ানীকে পরাজিত করিয়া যথারীতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্যার আব্দর রহিমের যোগ্যতায় কাহারও সন্দেহ নাই। নিয়ম তান্ত্রিকতায় তিনি পূর্ণ বিশ্বাসী। কাজেই পরিষদের কার্য্য পরিচালনায় তিনি যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিবেন, এ-আশা আমরা করিতে পারি।

পরিষদের ভারতীয় সভাপতিদের কথা মনে করিতে সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে পড়ে তেজগর্ব্বী, শক্তিমান পুরুষসিংহ পরলোকগত মিঃ ভি, জে, প্যাটেলের কথা। মিঃ প্যাটেলের পর আর যাঁহারা এতদিন সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সে শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এবার স্যার আব্দর রহিম মিঃ প্যাটেলের গৌরবময় আসনে সমাসীন হইলেন। আমরা আশা করি স্যার রহিম তাঁহার কার্য্যকালে সেই পুরুষ শক্তির পরিচয় দিয়া তাঁহার আসনের গৌরব-রক্ষা করিবেন। নবনির্ব্বাচিত সভাপতির উদ্দেশে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

এই প্রসঙ্গে আমরা মিঃ টি, এ, কে, শেরওয়াণীকেও আমাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী-রূপে দাঁড়াইয়া তিনি কংগ্রেস ও জাতীয় দলের সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। উভয় দলেরই তাঁর উপর আস্থা ছিল তাঁর পশ্চাতে যে দুইটী শক্তিশালী দল আছে ইহাই তাঁহার পক্ষে বড় সান্ত্বনা।

পরিষদের নির্ব্বাচন শেষ হইলে আমরা আশা করিয়াছিলাম যে এবারকার সরকার বিরোধীদল হইবে বিশেষ শক্তিশালী; কারন, কংগ্রেসের একটী মনোনীত শক্তিশালী দল পরিষদে ঢুকিয়াছে, জাতীয়দল সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে পারেনা। এবং মিঃ জিন্নার ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দল কংগ্রেসের সহিত আপোষ-আলোচনা চালাইতেছে, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, যে কার্য্যতঃ আমাদের আশা সম্ভাবনায় সমুজ্জ্বল হইল না। মিঃ জিন্না শক্তিশালী রাজনৈতিক। তা' সত্ত্বেও তিনি যেন বিরোধী দলের সহিত ইচ্ছা করিয়া খাপ খাওয়াইতেছেন না। সেদিন শ্রীযুক্ত শরৎবাবুর পরিষদে যোগদানের বাধা সৃষ্টি হওয়ায় মিঃ বারদোলাই যে মুলতুবী প্রস্তাব আনেন মিঃ জিন্না সেই প্রস্তাবের উপর গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন, কিন্তু ভোট গ্রহণকালে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। তাঁর এই নীতি কি "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের" ইজ্জত রক্ষা করিয়াছে?

কংগ্রেস দলেও যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে

তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। পার্লামেণ্টারী বোর্ড সমর্থিত বাঙ্গলার সদস্য মওলানা আবদুল্লা বাকী, মিঃ সত্যমুর্ত্তির (কংগ্রেস) মুলতুবী প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন নাই। ইহাতে কংগ্রেস দলের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই কি? মওলানা বাকীর ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে কংগ্রেস দল নিশ্চয় এটা প্রত্যাশা করেন নাই। পার্লামেণ্টারী বোর্ডের কর্ণধার ডাঃ বিধান চন্দ্রের এবিষয়ে বক্তব্য কি?

শাসন সংস্কারের হলাহল

শাসন সংস্কারের নামে ভারতের হিতাকাঙ্খীরা যে বিষ-কুম্ভের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আমরা এইবার এই সম্পর্কিত নানা বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছি। সে ধারণা ক্রমে আমাদের মনে বদ্ধমুল হইতেছে। সম্প্রতি লণ্ডনের কমন্স সভায় উত্থাপিত ভারতের শাসন সংস্কার বিলের যে সরকারী ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমরা আবার দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে ইংলণ্ডের পর্ব্বত ভারতের জন্য যে অমুল্য সম্পদ প্রসব করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিল তাহা সত্য সত্যই প্রসব করিল। কিন্তু ভারত দেখিতেছে সেটা মোটেই অমুল্য সম্পদ নহে। ইংলণ্ডের পর্ব্বত ভারতের জন্য মৃত মুষিক প্রসব করিয়াছে, শাসন সংস্কারের নামে ভারতের স্কন্ধে যে দুর্ব্বহ বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে তাহা শুধু যে দীন ভারতের পক্ষে দুর্ব্বহ হইবে তাহা নহে, উহা ভারতের আত্মমর্য্যাদায় বিঘ্ন ঘটাইবে, ইহা কল্পনা নহে বা কোন sentimental outbrust নহে, অতি বিচক্ষণ, মুক্ত বুদ্ধি মানুষের সুচিন্তিত অভিমত। আমরা এই বিলের বিভিন্ন ধারার বিশেষ অংশ সমুহ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ইহা দেখিলে আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি যে যথেষ্ট বিবেচনা সম্ভুত তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

বর্ত্তমান প্রচলিত "গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট"-এ (ভারত গভর্ণমেণ্ট আইনে) ভারতবর্ষের সামরিক ও অ-সামরিক সমস্ত বিভাগের দায়িত্ব স-পারিষদ গভর্ণর জেনারেলের উপর অর্পিত আছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব স-পারিষদ (মন্ত্রীগণ সহ) গভর্ণরের উপর ন্যস্ত আছে।

প্রস্তাবিত শাসন-তন্ত্রে এই বিভাগের অধিকার সম্পর্কে কি রকম ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের জানার আগ্রহ হইবে। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে ভারত গভর্ণমেণ্ট আইনের সমস্ত ক্ষমতা প্রথমে সম্রাটের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে এবং পরে উহা বিভিন্ন কর্ত্তাদের হাতে ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়াও বিলে যে সকল ক্ষমতা বণ্টন সম্পর্কে কোনও নির্দ্দেশ নাই, তাহা সম্রাট যাহাকে ইচ্ছা তাহার হাতে উহা অর্পণ করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য গভর্ণর জেনারেল অথবা গভর্ণর ছাড়া এই দান লাভের সৌভাগ্য আর কাহারও হইবে না। দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে যে, যে সকল করদ রাজা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবেন তাঁহাদের সমগ্র শাসন-সংস্কারের আইন খালি মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু রাজন্যবর্গের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা তাঁহাদের সনদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে; তবে রাজন্যবর্গ যে সকল বিষয় "যুক্ত রাষ্ট্রীয় বিষয়" বলিয়া স্বীকার করিবেন, তাহা তাঁহাদিগের সনদে উল্লিখিত থাকিবে।

রাজন্যবর্গ এ ব্যবস্থা কি ভাবে লইয়াছেন তাহা জানি না, কিন্তু প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র যে তাঁহারা খুব আগ্রহের সহিত সমর্থন করেন নাই, তাহা অনেকগুলি ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা গিয়াছে। কিছুকাল পুর্ব্বে হাউস অফ কমন্সে শ্রমিক দলের জনৈক সদস্য বেফাঁস ভাবে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ভারতের কোন দায়িত্ব সম্পন্ন রাজকর্ম্মচারী কোন কোন দেশীয় রাজার উপর চোখ রাঙ্গাইয়াছেন, কেন না, তাহারা প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে সমুৎসুক ছিলেন না। তাহা ছাড়াও সম্প্রতি পাতিয়ালা ও রামপুরের উক্ত মনোভাব যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার পরিচয় দেয় না।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বিলের পঞ্চম অধ্যায়। এই অধ্যায়ে দেখা যায় যে শাসন বিভাগের সমস্ত ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেল অথবা গভর্ণরের উপর ন্যস্ত হইবে। এখনকার মত মন্ত্রীরা যে থাকিবে না, এমন নহে। তাঁহাদেরও কাজ হইবে গভর্ণর জেনারেল অথবা গভর্ণরকে পরামর্শ দেওয়া। কিন্তু অত্যন্ত হাস্যকর ব্যাপার এই যে, কাষ্ঠ-পুত্তলিকা সম এই সব মন্ত্রীদের কথা তাঁহারা নাও শুনিতে পারেন। আর যদিও বা কোন কথা তাঁহারা দয়া করিয়া শুনেন, তাহা হইলেই যে বিপদ কাটিয়া গেল তাহা নয়। স্বয়ং ভারত সচিব মহাশয় সকল বিষয়ের কল-কাঠি লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ কর্ম্ম সে সময় বাদ যাইবে না। সংস্কারের নামে এমন হাস্যকর অভিনয়ের অনুষ্ঠান ভারতেই সম্ভবপর হয়!

গত সপ্তাহে আমাদের বড়লাট বাহাদুর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিসদে বক্তৃতা করিয়া বৃটিশ রাজত্বের এই অমৃত ফলের ব্যাখ্যা করিয়া পরিষদ সদস্যগণকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রথমে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৃটিশ রাজত্বের পুর্ব্বে ভারত একেবারে ছিল "যা নয় তাই", তাহার পরে খৃষ্টের দোসর খৃষ্টশিষ্য ইংরাজরা আসিলেন সেই "যা নয় তাই" অবস্থা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে—আমরা ডুবিতে ছিলাম, তাঁহারা বাঁচাইয়া ডাঙ্গায় তুলিলেন। আমরা সত্যই ডুবিতেছিলাম কি বাঁচিলাম তাহা মহাকাল বিচার করিবে। যাহা হউক, বড়লাট বাহাদুর অতঃপর ইংরাজ জাতির গুণগান করিয়া বলিলেন, বৃটিশ জাতি ভারতে আসিয়া শান্তি স্থাপন করিয়াছে এবং আইন প্রতিষ্ঠা

শৃঙ্খলার সহিত শাসন করিয়াছে। আমাদের (ইংরাজের) শাসনাধীনে এই দেশের রাজনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতা সম্পর্কে জনগণের নূতন নূতন ধারণা জন্মিয়াছে এবং উহাতে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্র ভারতে বৃটিশের শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া গভর্ণর জেনারেল মনে করেন।

বড়লাট বাহাদুর তাহা স্বচ্ছন্দে মনে করিতে পারেন, কিন্তু ভারতবাসী—সত্যকার স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী—কি মনে করেন, তাহাও বড়লাট বাহাদুর মনে মনে নিশ্চয়ই জানেন, প্রকাশ্যে অবশ্য তাহা বলা যায় না, অন্ততঃ প্রেষ্টিজের খাতিরে। বৃটিশ শাসনের সুফল ভোগ করার ফলেই যে পঙ্গু, অলস ও আত্মবিস্মৃত জাতি এই ভারতবাসী অধিকার লাভের জন্য জাগ্রত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জনগণের অধিকার লাভের জন্য যে উৎসাহ দেওয়া হইতেছে না তাহা এত সত্য যে, উহা অধিকতর বিস্তৃত ভাবে বলিবার কোন আবশ্যকতা উপলব্ধিত হইতেছে না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্য্যালোচনায় তাহা বেশ বুঝিতে পারি।

তথাকথিত সংস্কৃত শাসনতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি করিতে বড়লাট বাহাদুর খুবই উপযুক্ত, কাজেই তাঁহার বক্তৃতা ঠিক লাটোপযোগীই হইয়াছে। কিন্তু আমরা বড়লাট বাহাদুরের বক্তৃতার আড়ালে তথাকথিত শাসন-সংস্কারের যে নগ্নরূপ লুকাইয়া আছে তাহাকে তো উপেক্ষা করিতে পারি না। হলাহলকে "অমৃত" আখ্যা দিলে তাহা অমৃত হইয়া যায় না হলাহলই থাকে। ভারতবর্ষ কি এই হলাহল নীলকণ্ঠের ন্যায় গলাধঃকরণ করিবে? দেখাই যাক।

মহারাজার জয় হউক!

কে বলে ভারত দরিদ্র, কে বলে ভারত অনশন ক্লিষ্ট? এই অপরাধের খণ্ডন করিয়াছেন আমাদের বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর। তিনি ইংলণ্ড হইতে ভারতে পদার্পণ করিয়া তাঁর মাতৃভূমিকে ধন্য করিবার পূর্ব্বে তাঁর বিলাতের পরিচারকবৃন্দকে ধন্য করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দারিদ্র্যের কলঙ্ক অপনোদন করিয়া ভারতকেও ধন্য করিয়াছেন! মহারাজাধিরাজ তাঁর নামের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিলাতী পরিচারকবৃন্দকে অপরিমিত অর্থ দান করিয়া তাহাদের জীবিকার একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। দাতা ও দয়ালু মহারাজের জয় হউক! দানে তিনি আরো মুক্ত হস্ত হউন। কিন্তু একটা কথা সসম্ভ্রমে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করি, এই দান করিবার পূর্ব্বে তিনি কি তাঁর দেশের নিরন্নদের কথা ভাবিয়াছিলেন? অন্নাভাবে আত্মহত্যা ও সন্তান বিক্রয় যে দেশে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া উঠিয়াছে সে দেশের অধিবাসী তিনি, সে দেশের হাজার হাজার প্রজার পালক তিনি, একথা কি তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন? বিলাতের চাকর-বাকরদের জন্য তিনি একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভাল কথা, এজন্য আমাদের কোন হিংসা নাই। কিন্তু এ দেশে তাঁর প্রজারা যাদের অধিকাংশই দীন-দরিদ্র, আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য দুরবস্থায় পতিত তাদের যথেষ্ট দাবী আছে মহারাজার উপর, মহারাজাকে প্রশ্ন করিবার অধিকারও আছে তাহাদের। তাদের বুকের রক্ত ঢালিয়া যে অর্থ উপার্জ্জিত হয়, সেই অর্থে মহারাজার কোষাগার পরিপূর্ণ হয়, রাজার বিলাসিতার আমলে সে অর্থ ইন্ধন যোগায়। প্রজা-পালক রাজার কর্ত্তব্য প্রজা-রক্ষা। কিন্তু তিনি ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া বাইরে বিজলী বাতির চমক লাগাইতে অতিমাত্র ব্যস্ত। যাহা হউক, মহারাজার এ অহেতুক উদারতায় নিশ্চয়ই তাঁর কঙ্কালসার প্রজারা শ্মশান-স্বরূপ বাঙ্গলার বুক হইতে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া বলিবে 'মহারাজার জয় হউক'!

প্রাচ্যের রাষ্ট্রনীতি

সুদূর প্রাচ্যের সকল রহস্যাবৃত। জাপান ও চীনের রাজনৈতিক সম্বন্ধ কখন যে বন্ধুত্বপূর্ণ আবার কখন তা নয়, বুঝা কঠিন। সেদিন জাপানের পররাষ্ট্র সচিব হিরোটা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে জাপান বিশ্বে সকল রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব কামনা করে, বিশ্ব মানবের মিলন স্বপ্নে সেও বিভোর; চীন তার নিকটতম প্রতিবেশী। দূর প্রাচ্যের শান্তি ও কল্যাণের জন্য সর্ব্বাগ্রে তার সহযোগিতা সে প্রার্থনা করে। কিন্তু আজ আবার শুনি চীন-জাপানের যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। প্রকাশ যে, চারহার ও জেহল-প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত একটি রাজ্যখণ্ড লইয়া বর্ত্তমান গোলযোগের সূচনা হইয়াছে। জাপান প্রায় ৩০ বর্গ মাইল স্থান দখল করিয়াছে, এমন কি জাপান যে স্থানকে এতদিন মাঞ্চুকুও রাষ্ট্রের বাহিরে বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছিল সেত কুয়ানও অধিকার করিয়া লইয়াছে? জাপানের এই আকস্মিক আক্রমণের ফলে সারা চীনময় প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে।

জাপান পাশ্চাত্যের যোগ্যতম শিষ্য। আজ পাশ্চাত্যের বড় বড় শক্তিগুলির সম্মুখে যে সব সমস্যা দেখা দিয়াছে জাপানের সম্মুখেও সেগুলি দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্যের অগ্রসর জাতিগুলির মধ্যে একদিকে বর্দ্ধমান জনসংখ্যা ও অপরদিকে বিরাটকায় ক্ষুধার্ত্ত কল কারখানাগুলির খাদ্যের, অর্থাৎ কাঁচা মালের অভাব, মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। জাপানেরও লোক সংখ্যা দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইতেছে—জাপানে তাহাদের স্থানাভাব। অন্যদিকে জাপানের বিশ্বব্যাপী বিরাট শিল্প-ব্যবসায়কে সচল রাখিতে হইলে, তার চাই প্রচুর কাঁচা মাল। তাই জাপানের লোলুপ দৃষ্টি শস্য শ্যামলা, বিস্তৃত চীন সাম্রাজ্যের

উপর পতিত হইয়াছে। কোরিয়াকে জাপান বহু পূর্ব্বেই গ্রাস করিয়াছে। মাঞ্চুকুওকে উপলক্ষ্য করিয়া নূতনভাবে জাপান চীনের উপর প্রভাব বিস্তার করার প্রয়াস পাইতেছেন। চীন আজ বিপন্ন, গৃহযুদ্ধের ফলে চীনে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট গড়িয়া উঠিতেছেনা। জাপানের এই অন্যায় আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য বারবার য়ুরোপীয় শক্তিগুলির সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, লীগ্ অব নেশন্সের দ্বারস্থ হইয়াছে। কিন্তু কোন সুফল তাহাতে ফলে নাই। জাপান সকলেরই উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এমন কি প্রাচ্যের ব্যাপারে সে মনরো নীতি (Monroe Doctrine) অবলম্বন করিবে—তাহাও বলিয়াছে।

সুতরাং সেদিনকার হিরোটার শান্তির বাণীর সঙ্গে জাপানের রাষ্ট্রীয় প্রীতি বা কার্য্যের মধ্যে কোন অর্থ বা সঙ্গতি আবিষ্কারের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। পাশ্চাত্যের বহু রাষ্ট্রবীরের মুখে আমরা অনেক বারই এরূপ শান্তির বাণী শুনিয়াছি। কিন্তু প্রয়োজন মনে করিলে কখনও তাহারা এসব ঘোষণা বাণীকে পদ দলিত করিতে পশ্চাপদ হন নাই। জাপান পররাষ্ট্র সচিব হিরোটা সে সব মহাজন-পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। চীনের ভাগ্য বিধাতা আজ জাপান, চীন নয়। কারণ চীন দুর্ব্বল জাতি। জগতের অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছ হইতেও তার কিছু আশা করা বৃথা।

জাপানের এই অন্যায় নীতি ও কার্য্যের প্রতিকার। একমাত্র ভবিষ্যৎ চীনের উপরই নির্ভর করিতেছে। চীন যদি একদিন সত্যিকারের শক্তি অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে এ অন্যায়ের প্রতিকার খুব স্বাভাবিক ভাবেই আসিবে। বর্ত্তমান চীনের অবস্থা হইতে ভারতবর্ষের অনেক কিছু শিখিবার আছে।
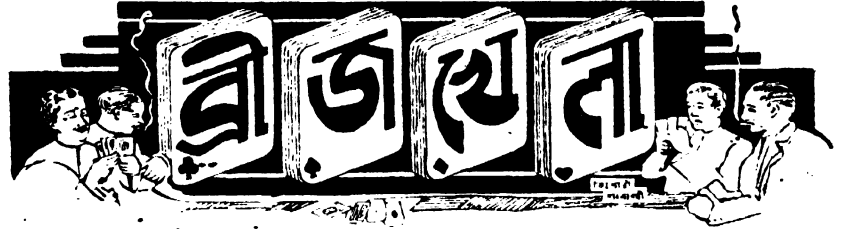
ব্রীজখেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা

সমস্যাঃ—

উ:
ইস্কাবন—সাহেব, ৯
হরতন—সাহেব
রুহিতন—৪
চিঁড়িতন—টেক্কা, বিবি

প:
ইস্কাবন—বিবি, গোলাম ১০
হরতন—nil
রুহিতন—২
চিঁড়িতন—গোলাম, ৬

পূ:
ইস্কাবন— টেক্কা, ৮
হরতন—nil
রুহিতন—nil
চিঁড়িতন—সাহেব, ৫, ৪, ৩

দ:
ইস্কাবন—nil
হরতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম
রুহিতন—৩
চিঁড়িতন—৯, ৭
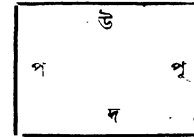
হরতন রঙ, 'দ' খেল্বে; 'উ' এবং 'দ' এর সম্মিলিত হস্তে সব ক'খানি পিট পেতে হবে, 'প' ও 'পূ' যতই বাধা দিক্ না কেন।

অনেকে মনে করেন চার হাত দেখে সমস্যার সমাধান করা এমন কি শক্ত;—মিছামিছি এরূপভাবে সময় নষ্ট করে কোন লাভই নেই। তাই তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে ভালভাবে ব্রীজখেলা শিখতে হলে চার হাত দেখে সমস্যার সিদ্ধান্ত করাই গোড়ায় দরকার। খেল্তে বসে ব্রীজ টেবিলে সময় সময় এই রকম হাতই এসে পড়ে এবং তখন অনেককেই আকাশ পাতাল ভেবে তাস ফেল্তে হয় এবং মাঝে মাঝে ভুল করেও বসেন। কিন্তু এই রকম সমস্যার সিদ্ধান্ত মাঝে মাঝে করলে প্রকৃত খেলার সময় তাঁদের সবিশেষ সুবিধা হবে।

ডাকদারের ডাক বাড়ানঃ—

গতবারে বলেছি যে 'ক'র একখানি হরতনের ডাক পেলে তাঁর খেঁড়ী 'খ' যদি 'চারখানি হরতন' ডাক দেন, তা' হলে বুঝতে হবে যে তাঁদের মিলিত হস্তে 'স্লামের' সম্ভাবনা আছে। সেই কারণে কেবলমাত্র খেলার পিটের উপর নির্ভর করে এ ভাবে ডাক বাড়ান উচিত নয়। হাতে সাতখানি খেলার পিট থাক্লেও যদি পর্য্যাপ্ত অনারের পিট না থাকে (অর্থাৎ অন্ততঃ আড়াইখানি) তবে এ ডাক না দিয়ে 'তিনখানি হরতন' ডাকাই সঙ্গত। মনে করুন 'খ' নিম্নলিখিত হাত পেয়েছেন।

ইস্কাবন—নয়; হরতন—বিবি, গোলাম, দশ, সাতা, চৌকা, দুরি; রুহিতন—সাহেব, বিবি, দশ, নয়, আটা; চিঁড়িতন—সাতা।

এ ক্ষেত্রে তাঁর হাতে যদিও [illegible]

বেশী খেলার পিট আছে কিন্তু অনারের পিট না থাকায় তাঁর পক্ষে 'তিনখানি হরতন' ডাকাই উচিত। কারণ 'চারখানি হরতন' ডাক দিলে 'ক' ভুল বুঝবেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর 'ইস্কাবন ডাকের' ভয়ের কোন কারণ নাই। কারণ এঁদের মিলিত হস্তে 'পাঁচখানি হরতনের' খেলা আছেই। প্রতিপক্ষের পাঁচখানি ইস্কাবনের খেলা হবার কোন আশাই নাই, কেন না 'ক' অন্ততঃ তিনখানি অনারের পিট পেয়েছেন।

পাঠকদের সুবিধার জন্য নিয়ে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম। মনে করুন; ডাকদার 'একখানি হরতন' ডাক দিয়েছেন, প্রতিপক্ষ কোন ডাক দেন নাই; এখন খেঁড়ী 'খ' কোন হাতে কিরূপভাবে ডাক বাড়াবেন?— খেঁড়ীর হাত নিয়ে দিচ্ছি।

(১) ইস্কাবন—টেক্কা, তিরি, দুরি; হরতন—নয়, আটা, সাতা, দুরি; রুহিতন—বিবি, গোলাম, নয়, দুরি; চিড়িতন—আটা।

(২) ইস্কাবন—টেক্কা, সাতা, তিরি, দুরি; হরতন—গোলাম, নয়, সাতা, দুরি; রুহিতন—সাহেব, বিবি, নয়, তিরি; চিড়িতন—আটা।

(৩) ইস্কাবন—সাতা; হরতন—সাহেব, নয়, সাতা, তিরি, দুরি; রুহিতন—টেক্কা, নয়, আটা, দুরি; চিড়িতন—সাহেব, গোলাম, সাতা।

(১) খেঁড়ীর হাতে দেড়খানি অনারের পিট (ইস্কাবনের টেক্কা ও রুহিতনের বিবি গোলাম) এবং তিনখানির কিছু বেশী খেলার পিট আছে—সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাঁর ডাক হবে 'দুইখানি হরতন'।

(২) খেঁড়ীর হাতে দুইখানি অনারের পিট (ইস্কাবনের টেক্কা ও রুহিতনের সাহেব বিবি) এবং প্রায় ছয়খানি খেলার পিট আছে (ইস্কাবন—দেড়, হরতন—এক, রুহিতন—দেড় এবং চিড়িতন—দুই); সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাঁর ডাক হবে 'তিনখানি হরতন'।

(৩) খেঁড়ীর হাতে তিনখানি অনারের পিট (হরতনের—সাহেব, রুহিতনের—টেক্কা এবং চিড়িতনের—সাহেব, গোলাম) এবং প্রায় সাড়ে ছয়খানি খেলার পিট আছে (ইস্কাবন—দুই, হরতন—দুই, রুহিতন—দেড়, চিড়িতন—এক); সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাঁর ডাক হবে 'চারখানি হরতন'।

খেঁড়ীর 'খেলার পিট' কিরূপভাবে গণনা করতে হয়, তার বিস্তৃত আলোচনা বারান্তরে পূর্ব্বেই করেছি। পাঠকদের সুবিধার জন্য উপরে লিখিত (৩) নং উদাহরণ নিয়ে আবার সংক্ষেপে লিখছি। এই হাতের 'খেলার পিট' নিম্নলিখিত ভাবে নির্ণয় করা হয়েছে।

ইস্কাবনের তুরুপের পিট—দুই খানি।

হরতনের সাহেবের পিট—এক খানি এবং পাঁচ খানি তাসের জন্য বাড়তি পিট আর একখানি; একুনে দুই খানি।

রুহিতনের টেক্কার পিট—একখানি এবং চারখানি তাসের জন্য ফেরাই এর পিট আধ খানি; একুনে দেড়খানি।

চিড়িতনের সাহেব গোলামের অনারের পিট—এক খানি। এইভাবে সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে ছয়খানি 'খেলার পিট' গণনা করা হয়েছে।

ডাকদারের একটি রঙের ডাকে খেঁড়ীর অন্য জবাবঃ—

সমর্থনযোগ্য রঙ (Trump Support) থাকলে এবং অন্য ডাকযোগ্য রঙ না থাকলে খেঁড়ী কিরূপভাবে ডাক বাড়াবেন তা' বললুম। এবার খেঁড়ীর হাতে 'ডাকযোগ্য রঙ' বা অন্য ভাল হাত থাকলে তিনি কিরূপভাবে ডাক দিবেন তা' জানাচ্ছি। 'ক' বললেন 'একখানি হরতন', খেঁড়ী 'খ' বললেন 'একখানি ইস্কাবন'। এ ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে 'খ'র হাতে একখানি হতে তিনখানি পর্য্যন্ত অনারের পিট আছে, ডাকের যোগ্য ইস্কাবন রঙ আছে এবং হরতনের সাধারণ সমর্থনের আশাও অসম্ভব নয়। (অবশ্য

এর ব্যতিক্রমও আছে গত সপ্তাহের 'ঘ' ও 'ঙ' উদাহরণ দেখুন। কিন্তু এই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম।) ফলতঃ একটি ডাকের যোগ্য রঙ থাকলে এবং দেড়খানি বা তাঁর কিছু বেশী অনারের পিট হাতে থাকলে সেই রঙটি আগে ডাকা উচিত (ডাকদারের সমর্থন যোগ্য রঙ থাকা সত্ত্বেও)। ডাকদার 'ক' যদি 'খ'র রঙ সমর্থন না করে অন্য কোন রঙ বা No Trump ডাকেন তবে তাঁর প্রথম ডাকের সমর্থন 'খ'র দ্বিতীয় বারে করা বিধেয়। ভালনারেবল অবস্থায় (Vulnerable) 'ক'র 'একখানি হরতনের' ডাকে 'খ' নিম্নলিখিত হাত পেয়ে 'একখানি ইস্কাবন' ডাকবেন।

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, সাতা, চৌকা; হরতন—বিবি, তিরি, ছুরি; রুহিতন—বিবি, দশ, নয়, ছুরি; চিড়িতন—সাতা, ছুরি।

'ক' যদি উত্তরে 'একখানি No Trump' ডাকেন তবে 'খ' 'ছুইখানি' হরতন' ডাক্‌বেন। 'ক' যদি 'ছুইখানি চিড়িতন' ডাকেন তবে 'খ'র ডাক হবে 'ছুইখানি No Trump'। 'ক' যদি 'ছুইখানি রুহিতন' ডাকেন তবে 'খ'র ডাক হবে 'তিনখানি রুহিতন'। 'ক' যদি 'ছুইখানি হরতন' ডাকেন তবে 'খ'র ডাক হবে 'তিনখানি হরতন'। 'ক' যদি 'ছুই ইস্কাবন' ডাকেন তবে 'খ'র ডাক হবে 'তিনখানি হরতন'। এইরূপ ভাবে ডাক চলবে।

প্রতিপক্ষ যদি ডাক না দেয় আর যদি খেঁড়ীর হাতে ডাকের যোগ্য বা ডাকদারের সমর্থন যোগ্য রঙ না থাকে তবে দেড়খানি বা ছুখানি অনারের পিট নিয়ে তিনি 'একটি No Trump' ডাকতে পারেন। কিম্বা আড়াইখানি বা তিনখানি অনারের পিট পেলে 'ছুইটি No Trump' ডাকতে পারেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের ডাকের পর খেঁড়ী যদি 'একটি No Trump' ডাক দেন তবে বুঝতে হবে যে তাঁর হাত ভালই এবং প্রতিপক্ষের রঙের একটি অনারের পিট তাঁর হাতে নিশ্চয় আছে। কালবার্টসন নিয়মে No Trump এর কার্য্যকারিতা ছুই রকম। এ ডাক কোন ক্ষেত্রে হাতের অক্ষমতা এবং কোন ক্ষেত্রে হাতের শক্তির পরিচয় দেয় তা' এখানে বলছি। ডাকদারের ডাকের পর প্রতিপক্ষ ডাক না দিলে খেঁড়ী যদি 'একখানি No Trump' ডাকেন তবে বুঝতে হবে যে ইহা নিষেধ ব্যঞ্জক ডাক' (Negative response)।

এ ডাকে হাতের অক্ষমতা জ্ঞাপন করছে। আবার ডাকদারের ডাকের পর প্রতিপক্ষের ডাকের উপর খেঁড়ী যদি No Trump ডাকেন তবে বুঝতে হবে এ ডাক সামর্থ্য ব্যঞ্জক (Strength-showing response)। যদি ডাকদারের ডাকের পর প্রতিপক্ষ পাস দেন এবং খেঁড়ী 'ছুইখানি No Trump' ডাকেন তা' হলেও সেটি সামর্থ্যব্যঞ্জক ডাক হবে। এ ডাক দিতে হলে অন্ততঃ আড়াই খানি কিম্বা তিনখানি অনারের পিট হাতে থাকা চাই। তার বেশী অনারের পিট হাতে থাকলে (অর্থাৎ অন্ততঃ সাড়ে তিনখানি) এবং ডাকের যোগ্য রঙ না থাকলে তিনি ডাক্‌তে পারেন 'তিনখানি No Trump'। এ ডাক শক্তি-ব্যঞ্জক এবং আংশিকভাবে শ্লাম-সম্ভাবনা-জ্ঞাপক (mild slam try)। আর যদি খেঁড়ী 'চারখানি No Trump' ডাকেন তবে বুঝতে হবে যে তিনি 'শ্লাম' এর সম্ভাবনা রাখেন। কালবার্টসন নিয়মে 'চারখানি No Trump' ডাক প্রচণ্ড শক্তির পরিচায়ক। সে কথা পরে যথাস্থানে বলব।

আমাদের কথা ঃ—আমাদের এই প্রবন্ধের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যাবতীয় ব্রীজ সমিতির ও ব্রীজ ক্রীড়কদের মধ্যে যোগসূত্র রাখা, বিশেষতঃ মফঃস্বলের সমিতিগুলির মধ্যে। কলিকাতার ব্রীজ সমিতিগুলির ও ব্রীজ ক্রীড়কদের যেরূপ ব্যাপকভাবে ভাবের আদান প্রদান হয় কলিকাতার আশে পাশের ও মফঃস্বলের খেলোয়াড়দের সেরূপ সুযোগ হয় না। অতএব সেই সব খেলোয়াড়দের খেলার উৎকর্ষ সাধন করতে হলে এবং কলিকাতার উচ্চাঙ্গের খেলার সহিত সমতা রাখতে গেলে কাগজ কলম ছাড়া তাঁদের উপায় নেই। আমরা জানি বাঙলার

এখন অনেক স্থলেই অক্‌সন্ ও কন্‌ট্রাক্ট খেলা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু তাঁদের উন্নতির প্রধান অন্তরায় হচ্ছে যে তাঁদের কার্য্যাবলী অল্প কয়েকজনের মধ্যেই আবদ্ধ। এ জন্য আমরা পাঠকদের সাগ্রহে জানাচ্ছি যে আমরা তাঁদের সমিতির কার্য্যকলাপ সম্পূর্ণভাবেই জানতে চাই এবং সমস্ত ব্রীজ সমিতির মধ্যে ঐক্য আনতে চাই। এ বিষয়ে আমরা অবশ্য মফঃস্বলের সমিতিগুলিকেই বেশী উদ্বুদ্ধ করছি। আমাদের আশা আছে যে এর পর ব্রীজ খেলায় আমরা Inter-district প্রতিযোগিতা দেখতে পাব।

নৈহাটীর শ্রীপ্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তী, শালিখার শ্রীযতীন্দ্র মোহন সরকার ও শ্রীঅমৃত লাল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের গত সমস্যার নির্ভুল উত্তর পাঠিয়েছেন। সমস্যার উত্তর বা ব্রীজ-সংক্রান্ত যাবতীয় চিঠিপত্র শ্রীচক্রাসা, c/o খেয়ালী, এই ঠিকানায় পাঠাবেন যেন [illegible] নিকট পাঠাবেন না।

নানা মুনির নানা মতঃ—

বোধহয় আমাদের কলমের খোঁচায় Bengal Bridge Associationএর সহ-সভাপতি মশায়ের কানের তুলো খ'সে গিয়েছে। আজ দু' বচ্ছর পরে তিনি হঠাৎ একদিন সভার আহ্বান ক'রে সদস্যদের নিকট চিঠি পাঠালেন। কিন্তু তা' হ'লে কি হয়, গোড়ায় গলদ—Vice-President proposes, Secretary disposes. সেক্রেটারী মশায় সভার সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না সুতরাং গেলেন চটে ;—বল্লেন, 'হুম্, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া ?' তার পরদিনই তিনি সহ-সভাপতির কথা নাকচ করে আবার এক নোটিশ জারি করলেন, আর Bridge Association এর সদস্যরা আবার ঘুমুতে আরম্ভ করলেন—কিন্তু এদিকে শ্রীচক্রাসার কলম চলেইছে। যা' হোক এবার সহ-সভাপতি মশায় যখন জেগেছেন তখন আমাদের একটু আশাও হয় যে, এইবার বুঝি এঁদের ঘুম ভাঙবার পালা পড়ল। কথায় বলে—'পাড়া-পড়শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে।' তাই আমাদের কলমের খোঁচার ওপর আস্থা হ'ল।

খেলার মাঠে

শ্রীদ্রোণাচার্য্য

বেঙ্গল এথলেটীক স্পোর্টস্

শনিবার ক্যালকাটা মাঠে বেঙ্গল এথলেটিক স্পোর্টসের ১৯শ বার্ষিক প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। অনুষ্ঠানটী সর্ব্বপ্রকারেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। শুক্রবার কয়েকটি প্রতিযোগিতার মীমাংসা হয়। শনিবার অবশিষ্ট প্রতিযোগিতাগুলির ফাইনাল হয়, শুক্রবারের হাইজাম্প ছাড়া শনিবার স্কুলের ছাত্রদের ১০০ গজ দৌড় এবং সাধারণ প্রতিযোগিতায় বর্ষা ছোড়া এক মাইল দৌড়ে মঙ্গলবার নূতন রেকর্ড হয়েছে।

একশত গজ দৌড়ে সেণ্টজোসেফ কলেজের এইচ, ষ্টেনর যে নূতন রেকর্ড করেছেন, তাতে এই বালকের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। পনের বৎসরের বালক যে এত অল্প সময়ে এই পথ অতিক্রম করিবে তাহা বিস্ময়েরই বিষয় বটে। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে অন্য কেহ এত অল্প সময়ে এই পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নি, ষ্টেনর অতি সহজেই ১০০ গজ ও ২২০ গজ দৌড়ে জয়লাভ করে।

বর্ষা ছোড়ায় এস, কে বসু এবং এক মাইল দৌড়ে (বি ও এ হ্যাণ্ডিকাপ) এল বেনহাম নূতন রেকর্ড করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন।

কুমারী পূর্ণা ঘোষ ৭৫ গজ (বালিকাদের) এবং ১০০ গজ দৌড়ে (বয়স্ক মেয়েদের) নাম দিয়েছিল। শেষোক্ত প্রতিযোগিতায় বিশেষ কিছু করিতে পারে নি। তবে প্রথম প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে, আমরা পূর্ণা ঘোষের সাফল্যে খুবই আনন্দিত হয়েছি।

'বেষ্টম্যান প্রাইজের' প্রতিযোগিতায় এস. কে বসু ও আর, আর বেলেটি সমান সংখ্যক পয়েণ্ট (২৬) পেয়েছেন।

খেলার শেষে মাননীয় বিচারপতি মিঃ সি, ডি ম্যাকনেয়ারের সভাপতিত্বে মিসেস ইয়ান ক্লার্ক পুরস্কার বিতরণ করেন। সরস্বতী সমিতি ব্যাণ্ড বাজাইয়া সকলকে আনন্দিত করে। প্রতিযোগিতার বিশিষ্ট ফলাফল নিয়ে দেওয়া গেল :—

১০০ গজ (সাধারণের) :—১ম—জেড এইচ খাঁ (মেডিক্যাল কলেজ) ২য়—আর, আর বেলেটি (সেণ্ট জেভিয়ার্স) ৩য়—ডি, সিমসন (আই এ ক্যাম্প) সময়—১০এর ১/৫ সেঃ।

জেড খাঁ ভাল 'ষ্টার্ট' নিয়ে অগ্রসর হন শেষ পর্য্যন্ত তিনি ১ গজে বেলেটিকে পরাজিত করেন।

১০০ গজ (স্কুলের ছাত্রদের) :—১ম—এইচ ষ্টেনর (সেণ্ট জোসেফ) ২য়—জি সার্জ্জেণ্ট (সেণ্ট জোসেফ) ৩য়—আক্রাম হোসেন (ক্যালঃ মাদ্রাসা) সময়—১০ সেঃ (স্কুলের প্রতিযোগিতায় ভারতের রেকর্ড) ষ্টেশনারের সহিত সার্জ্জেণ্টের ব্যবধান ছিল ৫ গজ।

১০০ গজ (কলেজের ছাত্রদের) :—১ম—এস এম হোসেন জাইদি (হোলকার কলেজ) ২য়—জে ষ্টিল (সেণ্ট জেমস্ কলেজ) ৩য়—আর এন গুপ্ত (গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়াল কলেজ) সময়—১০-৪/৫ সেকেণ্ড।

হোসেন ১ ফুটে ষ্টিলকে পরাজিত করেন।

৭৫ গজ [বালিকাদের]

১ম—কুমারী পূর্ণা ঘোষ [জে জে সঙ্ঘ]

২য়— „ বি সরকার [হুগলীর আকনা গার্লস স্কুল]

৩য়— বাণী ঘোষ [ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশন]

সময় ১০ সেঃ

কুমারী পূর্ণা ঘোষ ১ গজে কুমারী বি সরকারকে পরাজিত করে।

১০০ গজ (মেয়েদের প্রতিযোগিতা)

১ম—মিস এম স্মিথ (ওয়াণ্ডারার্স)

২য় " জি লেভি ঐ

৩য়— " সিন্থিয়া ম্যাকলিন (ব্লু ট্রায়াঙ্গেল)

সময়—১২১/৫ সেঃ

মিস জি লেভির সহিত মিস এম স্মিথের ব্যবধান ছিল ২ গজ।

পোল ভল্ট (সাধারণের)

১ম—বি পি রায় চৌধুরী (বালকসঙ্ঘ)

২য়—এন চ্যাটার্জ্জি (ই বি আর)

উচ্চ—১০ ফিট ১ ইঃ

১২০ গজ হার্ডল রেস্ (সাধারণের):—

১ম—ই ডেভিস (ই বি আর)

২য়—এ সি ব্যানার্জ্জি (আই এ ক্যাম্প)

৩য় – এম রো (এটাচড সেক্সন)

সময় ১৬২/৫ সেঃ

ডেভিস্ গোড়া হইতেই ষ্টার্ট নিয়েছিলেন ভাল। ব্যানার্জ্জি শেষ দিনে খুব ভাল দৌড়েছিলেন ; কিন্তু এক ফুটের জন্য দ্বিতীয় হন।

ক্রীকেট

ইডেন গার্ডেনে ইউনিয়ন স্পোর্টিং এর সাথে খেলায় ক্যালকাটা কোনক্রমে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচিয়াছে। ক্যালকাটা প্রথমে খেলিয়া ৭ উইকেটে ১৩২ রাণ করে। ইউনিয়ন পক্ষে ৪ উইকেটে ১০০ রাণ করে।

টালা পার্কে ট্রায়াল্ ম্যাচে জিমখানা দল জয়লাভ করেছে।

পৃথিবীর ক্রীকেট টিম

অষ্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব্ব টেষ্ট খেলোয়াড় কী বলেছেন জানেন?—তিনি বলেন,—এ পর্য্যন্ত যতজন ক্রীকেট টিমের ক্যাপ্টেন হয়েছেন, তার ভেতর জার্ডিনই হচ্ছেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ওঁর মতন ক্রীকেট ক্যাপ্টেন এ পর্য্যন্ত আর মোটেই হয়নি। তা ছাড়া যদি পৃথিবীর সকল জায়গা থেকে ক্রীকেট খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত করতে হয় তা হলে ঠিক নীচের তালিকাটিই হবে সব রকমে ভাল।

ডি, আর, জার্ডিন	(ইংলণ্ড)
ডবলিউ, হ্যামণ্ড	(")
এম, লিনেণ্ড	(")
এইচ, লরউড্	(")
ডি, সি, ব্রাডমান	(অষ্ট্রেলিয়া)
ডবলিউ, এইচ, পন্সফোর্ড	(")
ম্যাককেবে	(")
ও' রেলি	(")
ফ্লিট-উড্ স্মিথ্	(")
ওল্ডফিল্ড	(")
এল, এন, কনষ্টেণ্টাইন	(ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ)

——

বিবিধ

নীলাক্ষি দিদিমণি

ভূতপূর্ব্ব 'ফরওয়ার্ড' ও ভূতপূর্ব্ব 'লিবার্টির' ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার মিঃ বি, এন, দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ রণেন্দ্রনাথ দত্ত একটী ইংরাজ মহিলার পানিগ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ ও মিসেস্ দত্ত বর্ত্তমানে কলিকাতায় গ্রাণ্ড হোটেলে অবস্থান করিতেছেন। মিঃ দত্ত বর্ত্তমানে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার চার্টার্ড এ্যাকাউন্টান্ট এবং শীঘ্রই সস্ত্রীক দ্বারভাঙ্গায় যাইবেন। মিঃ দত্ত পূর্ব্বে প্রায় সাত বৎসর বিলাতে ছিলেন এবং ১৯২৮ সালে চার্টার্ড এ্যাকাউন্টান্ট হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মিঃ দত্ত সম্প্রতি তিন মাসের ছুটী লইয়া বিলাতে গিয়াছিলেন স্ত্রীকে ভারতে আনিবার জন্য। আমাদের নীলাক্ষি "দিদিমণি"-কে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

শ্রীমতী মৃদুলা সারাভাই

খুলনা জিলার অন্তর্গত রেল কোম্পানীর কার্য্য পর্য্যাবেক্ষন করিতে। আমেদাবাদের প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী মিঃ আম্বালাল সারাভাই সকন্যা গত সপ্তাহে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন কলিতাকায় তাঁহারা ৩৪ নং থিয়েটার রোডে মিঃ কে, এন্, মজুমদারের বাড়ীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

মিঃ আম্বালালের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মৃদুলা সারাভাই আমেদাবাদের বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী এবং জাতীয় আন্দোলনে তিনবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে শ্রীমতী মৃদুলা খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্তের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছেন এবং কলিকাতার বিভিন্ন জনহিতকর নারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়াছেন। গত রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকার ও 'ফরওয়ার্ডের' শ্রীযুক্ত অনিল রায়ের সহিত শ্রীমতী মৃদুলা চিত্তরঞ্জন সেবাসদন পরিদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীমতী লতিকা বসু শ্রীমতী মৃদুলাকে সেবাসদনের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী বুঝাইয়া দেন।

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় সোমবার মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত আম্বালালের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সারাভাই পরিবার সোমবার অপরাহ্নে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বাংলার হিটলার ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান-দিবস উপলক্ষ্যে হিটালারী ভঙ্গিমায় ভ্যাইস-চ্যান্সলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদের অভিবাদন এক হাস্যোদ্রেক প্রহসনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। পুরুষ সিংহ আশুতোষের মন্ত্রবাণী "freedom first, freedom second, freedom last"কে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিলুপ্ত করিয়া পুত্র শ্যামাপ্রসাদ গড়ের মাঠে যে কৌতুকপ্রদ প্রহসন দেখাইয়াছেন তাহাতে শ্রদ্ধেয় আশুতোষের স্মৃতিকে অপমানিত করা হইয়াছে। স্যার আশুতোষের তেজোদীপ্ত বাণীতে পরাধীন জাতির মর্ম্মবাণী মুখর হইয়া উঠিয়াছিল আর পুত্র শ্যামাপ্রসাদের প্রহসনে যুবক-বাংলার স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইয়াছে। সম্রাটের রজত উৎসবে শ্যামা-প্রসাদ ময়ুর-পুচ্ছে ভূষিত হইলে আমরা সুখী হইব।

এ্যাডভ্যান্স-ফরওয়ার্ড

বাংলার দুইটী জাতীয় দৈনিক 'এ্যাডভ্যান্স' ও 'ফরওয়ার্ড'কে সম্মিলিত করিয়া একটী সুপরিচালিত দৈনিকে পরিণত করার প্রচেষ্টা চলিতেছে। প্রকাশ যে নবপরিকল্পিত দৈনিকের পরিচালকবোর্ড ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত ও কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁকে লইয়া গঠিত হইবে। এই 'মহামিলনের পুণ্যতীর্থে' বাংলার জাতীয়তার আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠুক ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

শুভ বিবাহ

গত শুক্রবার, ১১ই মাঘ সন্ধ্যায় ১১।১ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীটে একটি উল্লেখযোগ্য বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

বর—ময়মনসিংহের সরকারী উকিল রায় বাহাদুর সারদা চরণ ঘোষের পুত্র এবং কন্যা—কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের ডাঃ এম, রায়ের মেয়ে। কন্যার মাতুল—রূপবাণীর অন্যতম কর্ম্মসচীব শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ এম, এ, বি, এল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের আদর আপ্যায়নে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—

মিঃ ঘনশ্যাম গোয়েঙ্কা, সার বদ্রিদাস গোয়েঙ্কা, সার কেদার নাথ দাশ, সার যদুনাথ সরকার, মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকার, মিঃ এস, সি, মিটার ডেপুটি ডাইরেক্টর অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিজ—বেঙ্গল, রায় বাহাদুর মন্টুলাল টেপুরিয়া, বাবু জওলাপ্রসাদ ভারটিয়া, বাবু রাজেন্দ্র সিং সিংহী, বাবু লক্ষ্মীপৎ কুঠারী, মিঃ অমৃত লাল ওঝা, মিঃ জি, এল, মেটা, বাবু ভানিরাম ভাল্‌টিয়া, মিঃ সুধীর মিত্র, মিঃ শৈলেন মিত্র, মিঃ সুবোধ মিত্র, মিঃ সুরপৎ সিং, মিঃ মহিতোষ রায় চৌধুরী, মিঃ খগেন সেন, মিঃ যতীন ভট্টাচার্য্য, ডাঃ জে, সি, নিয়োগী, মিঃ সুশীল মুখার্জ্জি, ডাঃ ইন্দু বসু, ডাঃ এম, এন, বসু, ডাঃ হরিহর গাঙ্গুলী, ডাঃ সুবোধ দত্ত, ডাঃ এস, এন, সেন, ডাঃ এইচ, সেন, ডাঃ জে, সি, সিংহ, ডাঃ এইচ, সিংহ, রায় বাহাদুর অশ্বিনী কুমার বসু, রায় সাহেব সতীশ চন্দ্র ঘোষ, লেপ্টেনাণ্ট সুশীল ঘোষ, মিঃ জে, এম, দত্ত, মিঃ এস, সি, নান, মিঃ আর, এন, দত্ত, মিঃ পি, সি, নান, ডাঃ বি, সি, ঘোষ, ডাঃ সুধীর রায় বার-এট-ল, ডাঃ এস, সি, ঘোষ, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল এবং মিঃ মনোমোহন ভট্টাচার্য্য।

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

নিউ থিয়েটার্স

১৯৩৫ এর আগতপ্রায় চিত্রাবলী

১৯৩৫ খৃঃ অব্দে নিউ থিয়েটার্স বহু বিখ্যাত বাংলা ছবি তুলবেন বলে' আমরা শুনতে পাচ্চি। বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চারখানা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের স্বত্ব এঁরা ইতিমধ্যেই ক্রয় করেছেন। তাদের ভেতর 'বিজয়া' ও 'চন্দ্রনাথে'র নাম অবিশ্যি আমরা এখুনি বলতে পারি। আর দু'খানার নাম আমরা জানতে পারিনি, তবে আশা করছি অবিলম্বেই আপনাদের জানাতে পারবো। প্রথমেই এঁরা 'বিজয়া'র কাজে হাত দেবেন মনস্থ করেছেন।

শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের চিত্র-রূপগুলো যাতে উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত হয় সে জন্য কর্তৃপক্ষের যে বিশেষ দৃষ্টি আছে এ কথা বলা বাহুল্য মনে করচি।

গত বছরের ছবি তোলা এঁরা বন্ধ করেছেন শরৎচন্দ্রেরই উপন্যাস 'দেবদাস' দিয়ে। সেই 'দেবদাস' আজ প্রায় শেষ হ'য়ে এলো। ছবিখানির যতদূর পর্য্যন্ত আমরা দেখেছি তাতে অনায়াসেই মনে হচ্ছে—শরৎচন্দ্রের যে সমস্ত উপন্যাসের চিত্র সংস্করণ আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে হয়েচে—সেগুলোর থেকে যে এখানা সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ হবে—সন্দেহ নেই, হবে আসচে বছরের চিরস্মরণীয় এক সবাক চিত্র।

বাংলা ছবির এ সুন্দর নির্ব্বাচনের জন্যে নিউ থিয়েটার্সকে আমরা অভিনন্দন না জানিয়ে পারচিনে।

ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিঃ

বিশ্ব বিখ্যাত নর্ত্তক উদয়শঙ্কর আসচে ১২ই ও ১৩ই মার্চ্চ ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স পরিচালিত বাঁকীপুরের এল্‌ফিন্‌ষ্টোন পিক্‌চার প্যালেশে দু'দিন নাচবেন।

* * *

বেগম হুস্‌না জেহন উক্ত চিত্রগৃহে দু'দিন নাচ দেখিয়ে বাঁকীপুরবাসীদের বিশেষ আনন্দ দেন। তাই কর্তৃপক্ষ আসচে ১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী আর দু'দিন নাচের ব্যবস্থা কোরেছেন।

* * *

বাঁকীপুরে এল্‌ফিনষ্টোন পিক্‌চার প্যালেশে রঞ্জিতের "তুফান মেল" কোল্‌কাতার মত তুফান মেলের গতিতে দ্বিতীয় হপ্তায় পড়্‌ল।

রাধা ফিল্ম

"মানময়ী গার্ল-স্কুলে"-র শয়ন-কক্ষের দৃশ্য শেষ কোরে জ্যোতিষ বাড়ুয্যে রাস্তার দৃশ্য তুলছেন। এদিকে ষ্টুডিওতে জমিদারের বসবার ঘরের সেট্‌ তৈরি হ'চ্ছে—আসচে হপ্তার গোড়া থেকে এখানে পুরো দমে কাজ চল্‌বে।

* * *

তড়িৎ বসুর পরিচালনায় "ওয়ামক্‌ এজ্‌রা"-র কাজ পূর্ণ গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

* * *

"দক্ষ-যজ্ঞ" সতেরো হপ্তায় পড়্‌ল। আগামী অৰ্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষ্যে ছবিখানা মেয়েদের দেখাবার জন্য 'ক্রাউন' কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা কোরছেন। যাঁরা ছবিখানা এখনও দেখেন নি—তাঁরা অৰ্দ্ধোদয় যোগে দশ মহাবিদ্যার রূপ দেখে নিশ্চয়ই তৃপ্তি পাবেন।

প্যায়োনিয়র ফিল্ম

এদের "সত্য-পথে" নামে নতুন ছবিখানা আসচে মাসে কর্ণওয়ালিসে মুক্তিলাভ কোরবে। প্যায়োনিয়র ছবি তুলে এ অবধি কেবল দুর্নামই কিনেছেন—আশা করি, এ ছবিতে তাঁদের দুর্নাম কতকটা অপসারিত হবে।

কেশরী ফিল্ম

এদের "বাসবদত্তা"-র কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। শোনা যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ ছবিখানি লোকের দা'তে মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়, তার চেষ্টা কোরছেন। কিন্তু কয়েকটি বিভাগের কাজ 'নভিস্‌-কে দিয়ে করানোর জন্য ছবিখানি যে কর্তৃপক্ষের আশা পুরণে সমর্থ হবে—আশা করা যায় না। দেখা যাক্‌, কোথার জল কোথায় দাঁড়ায়।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম

"ডি-জি"-র পরিচালনায় উভয় সংস্করণ "বিদ্রোহীর"-র শুটিং মন্থর-গতিতে চলেছে। "ব্রাড্ এণ্ড বিউটী"-র শুটিংও চল্‌ছে।

* * *

মধু বোস পরিচালিত "সেলিমার"-র সম্পাদনা চল্‌ছে।

* * *

যতীন দাস পরিচালিত "মিঃ ডব্লিউ" মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে।

নিউ টনফিল্ম

এদের উর্দ্দু সবাক্-চিত্র "আই-ঈ-মাজলুমান" বা "নির্য্যাতিতের আর্ত্তনাদ" বড়ুয়া ষ্টুডিওতে তোলা প্রায় শেষ হ'য়েছে। শীঘ্রই ছবিখানি মুক্তি পাবে।

এরপরে এরা "মহারাণী" নামে একখানা হিন্দী ও "রক্তের নেশা" নামে বাঙলা ছবি তুলবেন।

ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ লিঃ

এই নামে কোল্‌কাতায় শীঘ্র একটি যৌথ-প্রতিষ্ঠান দেখা দেবে। শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠবে এবং অনারেবল্ বিজয় বসু, কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ প্রভৃতি ডিরেক্টর শ্রেণীভুক্ত হ'য়েছেন।

ছায়া

"কাউণ্ট অব মণ্টে ক্রিষ্টো" ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে "ছায়ায়" দ্বিতীয় সপ্তাহে পড়িল। এখানি যেরূপ উচ্চাঙ্গের ছবি হইয়াছে—তাহাতে দ্বিতীয় সপ্তাহ চলা মোটেই বিস্ময়কর নহে। এখনও যাহারা এ ছবিখানি দেখেন নাই—তাঁহারা অবিলম্বেই আসন সংগ্রহ করিবেন।

ছায়ায় আগামী আকর্ষণ হ্যারল্ড লয়েডের "ক্যাট্‌স্ প"। হ্যারল্ডের এ ছবিখানি হাসিতে—অশ্রুতে — ভীতি-বিভীষিকায় — মনোরম হইয়াছে।

রূপবাণী

শনিবার ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে রূপবাণী চিত্রগৃহে মেট্রোর বিরাট কীর্ত্তি "ভিভা ভিলা" প্রদর্শিত হইবে।

মেক্সিকোর স্বাধীনতার জন্যে একজন দস্যু কী ভাবে জীবন-পাত করিয়াছিল তাহারই প্রেম ও প্রতিহিংসা মাখানো এই অপূর্ব্ব চিত্রখানি সর্ব্বদিক দিয়া উপভোগ্য হইয়াছে।

সেই বিখ্যাত "পাঞ্চো ভিলা"-র ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন—ওয়ালেস বেরী। এতদ্ব্যতীত এই চিত্রে দশ হাজার লোক বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করিয়াছে। মেক্সিকোর যে স্থানে চিত্র গ্রহণ হইয়াছিল—এক উড়ো জাহাজ ব্যতীত সেখানে যাতায়াতের আর কোনো উপায় ছিল না।

সমালোচকগণ বলিয়াছেন—"ভিভা ভিলা" ওয়ালেস বেরির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

"মানময়ী গার্লস স্কুল" চিত্রে বিপিন সরকারের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত জানকী ভট্টাচার্য্য

স্বাধীনতা সংগ্রামে পাঞ্চো ভিলার সেই অপরিসীম দানের কথা এখনো মেক্সিকোর পর্ব্বত প্রদেশে সগর্ব্বে ধ্বনিত হয়।

জ্যাকী ড্যালি—

এঁর নাম হয় ত' আপনারা অনেকে শোনেন নি; কিন্তু বাস্তবিকই এঁর অঙ্গ-সৌন্দর্য্যের ভেতর এমন একটা যৌন-আবেদন আছে, যা দেখেই মনে হয় এঁর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

ডয়েচে অ্যাকাডেমী ও ভারতীয় ছাত্রদের জন্য জার্ম্মাণ ছাত্রবৃত্তি

অধ্যাপক—**শ্রীবিনয় কুমার সরকারের সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণ**

জার্ম্মাণীর ফ্যাক্টরী, হাঁসপাতাল, ল্যাবরেটরী ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সমস্ত ভারতবাসী শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছেন, ভারতীয় কৃষ্টি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তাঁহাদের প্রভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীবিনয় কুমার সরকারের সহিত নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর কৌতুহলপ্রদ।

প্রশ্ন—জার্ম্মাণীতে যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে ডয়েচে অ্যাকাডেমি তাহাদের মধ্যে কোন স্থান অধিকার করে?

উত্তর—ডয়েচে অ্যাকাডেমি জার্ম্মাণীর শ্রেষ্ঠ বিদ্বৎ-সমাজের প্রতিষ্ঠান। ১৯২৫ সালে মিউনিক্ সহরে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। গণিতবিদ, পদার্থ বিজ্ঞানবিদ্, রসায়নশাস্ত্রবিদ্, পূর্ত্তবিজ্ঞানবিদ্, চিকিৎসক, ইতিহাসকার, ভূগোলকার, অর্থশাস্ত্রবিদ, জীবতত্ত্ববিদ্, নৃতত্ত্ববিদ্, মনস্তত্ত্ববিদ, শব্দতত্ত্ববিদ্ ও অন্যান্য শিল্পবিজ্ঞানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত। ইহা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ নয় বা কোন সরকারী বিভাগের শাখাও নয়। ইহার আয় বেসরকারী ভাবে চাঁদা ও এককালীন অর্থদান হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে।

প্রঃ—ডয়েচে অ্যাকাডেমির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি?

উঃ—ইহার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুই প্রকারের—(১) জার্ম্মাণ ভাষা, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি ও জার্ম্মাণ সংস্কৃতির অন্যান্য শাখায় গবেষণার উন্নতি সাধন ও (২) ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে প্রবাসী জার্ম্মাণদের সাহায্যের প্রয়োজন হইলে ও তাঁহারা সাহায্য প্রার্থনা করিলে উপযুক্ত জার্ম্মাণ-সাহিত্য-শিক্ষক দ্বারা ও কখন কখন জার্ম্মাণ-শিক্ষা-সভ্যতা সম্বন্ধে পুস্তক দ্বারা সাহায্য দান।

প্রঃ—তাহা হইলে জার্ম্মাণীতে ভারতীয় শিক্ষার্থী ও গবেষণাশীল ছাত্রেরা ডয়েচে অ্যাকাডেমির নিকট হইতে বৃত্তিলাভ করিয়া আসিতেছেন কেন?

উঃ—জার্ম্মাণী-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্ক, বীমা অফিস, হাঁসপাতাল ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গুলিতে তাঁহাদের স্বদেশবাসীদের সুযোগ সুবিধা করিয়া দিবার জন্য ডয়েচে অ্যাকাডেমির নিকট এক বিশেষ আবেদন করেন। তাহার ফলে ডয়েচে অ্যাকাডেমি

তাঁহাদের প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করিতে প্রণোদিত হন ও ১৯২৯ সালে "ভারত-সমিতি" নামে এক বিশেষ বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় স্বার্থের জন্য এবং ভারতবাসীর বিশেষ উদ্যমের ফলেই ডয়েচে অ্যাকাডেমি কর্ত্তৃক এই বিশেষ বৃত্তিগুলি প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রঃ—ডয়েচে অ্যাকাডেমির মত জার্ম্মাণীর অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কি ভারতবাসীর সাহায্যকল্পে কোন চেষ্টা করেন?

উঃ—ডয়েচে অ্যাকাডেমি স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বেও জার্ম্মাণী প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ উচ্চ শিক্ষা, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে জ্ঞানাভিলাষী ভারতীয় ছাত্রদের সুযোগ দানের জন্য এইভাবে জার্ম্মাণ ব্যবসায় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ করিতেন। ১৯২১ সাল হইতে ১৯২৯ সালের মধ্যে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয় গুলির কর্ত্তৃপক্ষ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গ বহুবার সাগ্রহে তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতের উচ্চাভিলাষের সহিত জার্ম্মাণীর চিরাচরিত যে সহানুভূতি মূলগত তাহা যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই, ১৯২৯ সাল হইতে ভারতীয় ছাত্রবৃন্দকে ডয়েচে অ্যাকাডেমি কর্ত্তৃক সাহায্য দান হইতেই তাহা প্রতিপন্ন হয়। আজ যাঁহারা বিদ্বান্, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, অধ্যাপক ও তত্ত্বানুশীল হিসাবে ভারতীয় সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের ধীশক্তি ও ব্যবসায়ীর নৈপুণ্যের জন্য জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়র, ব্যবসায়ী এবং ল্যাবরেটরী ও হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বহু পরিমাণে ঋণী।

ভারতীয় ছাত্রবর্গ ও শিক্ষানবিশদিগের শিক্ষার সুবিধা দিবার জন্য বা তাহাদের স্থান সংরক্ষণের জন্য ডয়চে অ্যাকাডেমিকে টেক্‌নলজিকাল, পশু চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প বাণিজ্য-শিক্ষা সম্পর্কিত বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে এবং মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, কেমিক্যাল, রেলওয়ে ও ব্যাঙ্ক, বীমা অফিস, ক্লিনিক্স্ ও মিউনিসিপ্যাল আফিস গুলির নিকট আবেদন করিতে হয়। অনেক সময় সেরূপ সুবিধা বা স্থান সঙ্কুলান হইয়া উঠে না। কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি সহৃদয় সাহায্যের জন্য ডয়েচে অ্যাকাডেমিকে এই সকল জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়।

প্রঃ—ভারতীয় প্রার্থীকে বৃত্তিদান প্রসঙ্গে ডয়েচে অ্যাকাডেমি কোন কোন গুণের বিচার করিয়া থাকেন?

উঃ—প্রথমতঃ সাহায্য প্রার্থীর ভারতবর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা কার্য্যের উৎকর্ষ। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক, ব্যবসায়ী, গবেষণাশীল ছাত্র হিসাবে বা অন্যান্য যে বিষয়ের বৃত্তির জন্য প্রার্থী আবেদন করে তাহাতে তাহার ব্যবহারিক বা ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার পরিমাণ। গুরুত্ব হিসাবে দ্বিতীয়টী, প্রথমটী অপেক্ষা অল্প নয়।

সাধারণতঃ বারটীর অনধিক বৃত্তির জন্য তিনশতেরও অধিক প্রার্থী আবেদন করে। ভারতীয়, জার্ম্মাণ কাহারও এমন কি জার্ম্মাণ বন্ধুগণেরও এই নির্ব্বাচনের উপর কোন হাত নাই। সাহায্য প্রার্থী, আবেদনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার অধীত বিষয়ে যে গবেষণা কার্য্য করিয়াছে তাহার তালিকা প্রদান করে এবং ডয়েচে অ্যাকাডেমি বৃত্তিদান প্রসঙ্গে তাহাই বিশেষভাবে বিবেচনা করেন।

এক্ষেত্রে ইহাই স্বতঃসিদ্ধ যে ডয়েচে অ্যাকাডেমির সভ্যদের সহিত কোন আবেদন-কারীর সাক্ষাৎভাবে পরিচয় থাকিতে পারে না এবং তাহার স্বীয় বিদ্যাবত্তা ভিন্ন অন্য কোন বিবেচনাই কার্য্যকরী হইতে পারে না। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে জার্ম্মাণীতে অবস্থিত কোন ভারতীয় ছাত্র হয়ত অকস্মাৎ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে ও তাহার অভীষ্ট কার্য্যসম্পন্ন করিবার মত অর্থসঙ্গতি নাই। এক্ষেত্রে এইরূপ জার্ম্মাণী প্রবাসীর পক্ষে বৃত্তিলাভ করা সম্ভবপর হইতে পারে।

প্রঃ—ডয়েচে অ্যাকাডেমি কত বৎসর ধরিয়া এই বৃত্তি দান করিবেন মনে করেন?

উঃ—যদি ডয়েচে অ্যাকাডেমি মনে করেন যে ভারতীয়েরা জার্ম্মাণী প্রদত্ত বৃত্তির জন্য আর বিশেষ যত্নবান নন বা গত পনের বৎসর ধরিয়া যে সকল পদার্থ বিজ্ঞানবিদ, রসায়নবিদ, ইঞ্জিনীয়র, চিকিৎসক, জীবাণু

বিজ্ঞানবিদ্ ও অন্যান্য যে সকল ভারতবাসী জার্ম্মাণী হইতে কোন প্রকার সাহায্য পাইয়াছেন তাঁহারা সে দেশের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন তখন ডয়েচে অ্যাকাডেমির পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক যে তাঁহারা ভারতীয় শিক্ষার্থীর জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে যে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন তাহার গুরুভার হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহিবেন। ভবিষ্যতে হয়ত এই সকল বৃত্তি একেবারেই দেওয়া হইবে না। আমি এই কথারই পুনরুক্তি করিতে চাই যে, ভারতীয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াই এবং ভারতের স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই, ডয়েচে অ্যাকাডেমি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের সাহায্য দান করিয়া আসিতেছেন।

প্রঃ—হামবোল্ট ছাত্রবৃত্তি কি ?

উঃ—হামবোল্ট ছাত্রবৃত্তির কথা ভারত-বর্ষে বহুবিদিত নয়। ইহা বার্লিন হইতে প্রদত্ত বহুকাল হইতে প্রবর্ত্তিত একটী ছাত্রবৃত্তি। সম্প্রতি একজন বাঙ্গালী ছাত্র শ্রীমান প্রফুল্ল চন্দ্র বিশ্বাস উচ্চ নৃতত্ত্ব বিদ্যায় (Higher Anthropology) পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য এই বৃত্তি লইয়া বার্লিনে গিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশের সীমান্তস্থিত জেলা গুলিতে কোন কোন জাতি সম্বন্ধে তিনি বিশদভাবে গবেষণা করিয়া বহু অধ্যাপকের নিকট হইতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

প্রঃ—ফ্যাক্টরী, কারখানা, মহাজনী প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে এইরূপ ভারতবাসীদের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ কি মাত্র জার্ম্মাণী দেশেই আন্দোলন করিয়া আসিয়াছেন ?

উঃ—প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা আমেরিকা, অষ্ট্রিয়া, জেকোশ্লাভাকিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জাপান, সুইটজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও তাঁহাদের দেশবাসীদের জন্য সাহায্য ব্যবস্থার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। জার্ম্মানী দেশের মত অন্যান্য দেশেও তাঁহারা আবেদন জানাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষাভিলাষীদের জন্য জার্ম্মাণী যে সুযোগ সুবিধা দান করিয়া আসিতেছে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র ও বিশদ।
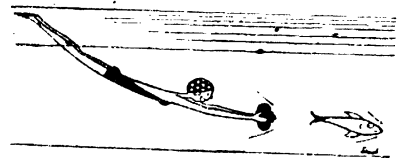
চালিয়াৎ

একাঙ্ক কথা-চিত্র

মনী ঘোষ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তমালিকা। (রীতিমত চটে) দেখুন মাধবীকে যদি আপনার অত ভাল লাগে...

সুজিৎ। দেখবেন মিস সেন, আবার প্রেম-সংক্রান্ত কিছু আনবেন না ও প্রসঙ্গটাও আপনার অপছন্দ মনে থাকে যেন।

তমালিকা। (সুজিতের কথায় কান না দিয়ে) খালি মাধবী আর মাধবী—যেন মাধবী ছাড়া আর কথা নেই···আপনি ভাবছেন আমি জেলাস্ তা' নয়...কিন্তু, তাই ব'লে কি দিন রাত এক কথা ভাল লাগে ?

সুজিৎ। ঐখানেই আপনার সঙ্গে তফাৎ মাধবীর··ওর সম্বন্ধে আপনার এত উদার মত অথচ ও আপনার কথাটিও শুনতে পারে না। ও বলে sincerity থাকলে jealousy আসতেই হবে।

তমালিকা। কে বলে আমার jealousy নেই। আপনি রাত দিন আমার সামনে আর একটা মেয়ের কথা বলে, আমায় অপমান কচ্ছেন সুজিৎ বাবু।

সুজিৎ। আমায় মাপ করবেন, আপনাকে ঈর্ষান্বিত বা অপমানিত করার জন্যে আমি ওগুলো বলিনি। মাধবীর সম্বন্ধে একটা ভারী মজার কথা ছিল, তা' থাক আপনার সামনে মাধবীর প্রসঙ্গ আর তুলব না।

তমালিকা। (ভয়ানক উৎসুক হয়ে লজ্জার ভান করে) দেখুন আমি ঠিক ওভাবে কথাটা বলিনি ; মাধবীর কথা উঠলেই আমি কানে আঙ্গুল দেব, এমন কথাত' বলি নি।

সুজিৎ। তবু আপনি যখন পছন্দ করেন না আমারও ত সেটা দেখা উচিৎ।

তমালিকা। (গম্ভীর ভাবে) আপনি ইচ্ছে কল্লে বলতে পারেন, আমার আপত্তি নেই কিছু।

সুজিৎ। (উদাসভাবে) না থাক্ গে।

তমালিকা। না, আপনাকে বলতেই হবে।

সুজিৎ। তেমন কিছু নয়, মাধবী সেদিন হঠাৎ স্বীকার করে ফেললে যে ও আমাকে···

তমালিকা। দেখুন আমরা এখানে Love Story শুনতে আসিনি।

সুজিৎ। আপনি পীড়াপীড়ি করলেন তাই···নইলে (কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলে পর)।

তমালিকা। (স্নিগ্ধ স্বরে) দেখুন সুজিৎ বাবু (অনেকক্ষণ চুপ) অনেক দিন থেকে আপনাকে একটা কথা বলব বলব করি··· (আবার চুপ) আজকে সাহস করে ..

সুজিৎ। (হঠাৎ) কি আশ্চর্য্য ! আমিও ঠিক এই ধরণের একটা কথা বলব বলব কচ্ছিলাম, কিন্তু ঠিক কি করে বলতে পারা যায়, বুঝতে পারছিলুম না···

তমালিকা। (সুজিতের কথায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে থেমে থেমে বলতে লাগল) অনেক দিন থেকেই ভাবি, যে বলেই ফেলি... তারপর···তারপর আর বলা হয় না... কিন্তু···

সুজিৎ। কী আশ্চর্য্য !

তমালিকা। (সুজিতের বাধায় অবিচলিত) কিন্তু ভেবে দেখলুম কথাগুলো মনে চেপে রেখে লাভ নেই···বলে ফেলাই হচ্ছে...মানে লজ্জা কাটাতেই হবে···তা'ছাড়া···

সুজিৎ। ঠিক মিলে যাচ্ছে।

তমালিকা। (বিরক্ত স্বরে) বলুন এ' গুলোও আপনি বলবেন ভেবে রেখেছিলেন।

সুজিৎ। ঠিক তা নয় মিস সেন, মাধবী সেদিন ঠিক এভাবেই বলতে সুরু করেছিল··· যে—

তমালিকা। (হাল ছেড়ে দিয়ে) হোপ্‌লেস্, আপনি অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য সিরিয়াস হতে পারেন সুজিৎ বাবু ?

সুজিৎ। আমার এই লাইট্ মুড্‌টাই সবাই ভালবাসে জানতাম, আপনার ভাল লাগে না মিস সেন ?

তমালিকা। লাগে, তাই বলে সব সময় ?

সুজিৎ। আচ্ছা, বলুন ; আমি আর বিরক্ত করব না।

তমালিকা। আমার কিচ্ছু বলার নেই।

সুজিৎ। কিচ্ছু নেই ?

তমালিকা। (জোর দিয়ে) না।

সুজিৎ। তবে শুনুন মাধবী সেদিন কি বলছিল—

তমালিকা। না আমি শুনতে বাধ্য নই, (উঠে দাঁড়াল)।

"রমু কোথায় গেল" বলতে বলতে মিসেস সেন ঘরে ঢুকলেন)

তমালিকা। (হঠাৎ আবার বসে পড়ে চাপা মিষ্টি স্বরে) আমার কতগুলো কথা, সত্যি বলবার আছে সুজিৎ বাবু, না শুনে যাবেন না।

মিসেস সেন। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে ইচ্ছে করি···সুজিৎ···চল না; তোমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্ ; যাবে ?

তমালিকা। আমি আসতে পারি কি,

তোমাদের সঙ্গে ? সুজিৎ বাবু, কিছু আপত্তি আছে ?

মিসেস সেন। (একটু বিরক্ত স্বরে) তা' হলে তোমরাই যাও সুজিৎ, আমার আবার একটু কাজ আছে, ভুলেই যাচ্ছিলুম।

(তমালিকা যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল; রমলা ও রতন ড্রয়িংরুমের পর্দ্দা ঠেলে ভেতরে এল)।

রমলা। আপনার সঙ্গে বড় rude ব্যবহার করেছি সুজিৎদা'—আমি ক্ষমা চাইচি (হঠাৎ তমালিকার ভাবগতিক নজরে পড়ায় উৎসাহের সঙ্গে) ওমা! বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি সুজিৎদা' আমিও যাব।

তমালিকা। (হঠাৎ বসে পড়ে টেবিলের ওপরকার বইখানা টেনে নিয়ে) আপনারা যান সুজিৎ বাবু, আমায় আবার বইখানা শেষ কর্ত্তেই হবে, কালকেই ফেরৎ দেবার দিন।

(রমলা সুজিৎকে ওঠবার জন্যে ইঙ্গিত করিল)।

রতন। (নেহাৎ ছেলে মানুষের মত বলে উঠল) আমি আসতে পারি কি আপনাদের সঙ্গে ?

(রমলা মুখ বিকৃত করল, সবাই রতনের দিকে ফিরে তাকাল)

রতন। (অপ্রস্তুত হয়ে নিজেকে সংশোধন করার সুরে) না থাক্, আমায় আবার শীগ্‌গীর বাড়ী ফিরতে হবে, মনেই ছিল না (ভাব দেখে মনে হল বেচারা একেবারে দমে গিয়েছে)।

সুজিৎ। (এতক্ষণ কথা কয়নি, ঈষৎ হাসি হাসি মুখে সবাইকে দেখছিল) আমায় মাপ কর্ত্তে হবে রমু, আমি একজনকে কথা দিয়ে এসেছি সে হয়'ত বসে থাকবে আমার জন্যে (হাতের ঘড়ি দেখে) আমায় এক্ষুনি যেতে হবে।

তমালিকা। (শ্লেষের স্বরে) কে বসে থাকবে সুজিৎ বাবু—মাধবী বুঝি ?

সুজিৎ। (শান্ত ভাবে) ঠিক অনুমান করেছেন মিসেস্ সেন, (হঠাৎ পকেটে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে) দেখ, যার জন্যে এয়েছি তাই ভুলে যাচ্ছিলাম (পকেট থেকে একগোছা হলদে খাম বার করে বাছ্‌তে বাছ্‌তে) আস্‌ছে রোববার, আপনাদের সবাইকে যেতে হবে একবার দয়া করে। হঠাৎ ঠিক হ'য়ে গেল কিনা, (সবাই অবাক্ হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল)।

রমলা। (নিজেকে সংবরণ কর্ত্তে না পেরে) সেকি সুজিৎদা' আপনার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল না কি ?

সুজিৎ। (প্রসন্ন মুখে) হ্যাঁ ভাই! (তমালিকার দিকে চেয়ে) আশা করি, এ ক্ষেত্রে মিস্ সেন আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণ মাধবীকে শুধু আজকের জন্যই নয়, আমরণ পর্য্যন্ত কথা দিয়ে ফেলেছি। (মিসেস সেনের দিকে একখানা চিঠি এগিয়ে দিয়ে) তাহ'লে চলি, যাবেন কিন্তু, কথা রইল। (রতনের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে) কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা লেখা নেই। আপনাকে সেদিন কিন্তু দেখতে চাই, (রতন সহাস্য মুখে চিঠি নিল) আচ্ছা cherio all, (বলতে বলতে সুজিৎ বোঁ করে বাইরের দরজার পর্দ্দা ঠেলে বেরিয়ে গেল, কারুর মুখে কথা জোগাল না সবাই অবাক হয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইল। এক মিনিট কাল একেবারে নিস্তব্ধ ভাবে কাটলে, রতনের কথায় সকলের চমক ভাঙ্গল)।

রতন। (দরজার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে) অদ্ভুত লোক !

মিসেস সেন। (কিঞ্চিৎ বিমর্ষভাবে) ওর মত অমন first class flirt যে শেষে মাধবীকে...

তমালিকা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে) ট্রেচারাস !

রমলা। উঃ, কি ভয়ানক চালিয়াৎ লোকটা।

ফ্রেডরিক মার্চ

শ্রীসরোজ ঘোষ

যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমার প্রিয় অভিনেতা কে?—আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দেব, ফ্রেডরিক মার্চ। একঘেঁয়ে প্রেমের অভিনয় করে যারা বড় অভিনেতা বলে নাম পেয়েছে তাদের আমি কিছুতেই বড় বলে স্বীকার করি না। অভিনেতা নামের যোগ্য তারা, যারা বিভিন্ন রকম চরিত্র সৃষ্টি করে দর্শকের মনে নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এই কারণেই ফ্রেডরিক মার্চ আমার প্রিয় অভিনেতা—শুধু এই কারণেই আমি তাকে বড় বলি।

“সাইন অফ দি ক্রশ,” “গুড্ ডেম,” “ডেথ্ টেক্স এ হলিডে” প্রভৃতি ছবির প্রেমিক, “ডাক্তার জিকিল এণ্ড হাইড”-এর সেই অতিমানব বা দানব এবং “দি ঈগল এণ্ড দি হক”-এর উন্মাদকে চিত্রপ্রিয়েরা চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

১৮৯৮ সালের ৩১শে আগষ্ট। সেই দিনই ফ্রেডরিক মার্চের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয়। বাবা, মা কেউ কোনদিন অভিনয় করেন নি। কিন্তু শৈশবেই ফ্রেডরিকের মনের গোপন কোণে অভিনেতা হবার ছোট্ট আশা মাঝে মাঝে উঁকি দিত।

মিচিগান হ্রদের ধারে ‘র‍্যাঞ্চে’ সে তার বাপের সঙ্গে বাস কোরত। দশ বৎসর বয়সে হ্রদের জলে সাঁতার দিয়ে আর কাঠের ‘ভেলা’ তৈরী করে সে তার খেলার সঙ্গীদের কাছে জলদস্যুরাজ নাম পেয়েছিল। দুষ্ট বুদ্ধিতেও সে ছিল তার দলের সেরা। একবার তরমুজ চুরি কোরতে গিয়ে ধরা পড়ে—ম্যাজিষ্ট্রেট তার বাপের বন্ধু সেইজন্য তার কোন সাজাই হবে না—এই রকম বাজে কথায় ক্ষেতের মালিককে বোকা বুঝিয়ে ছাড়া পায়।

বার বৎসর বয়সে সে এক থিয়েটারের দল খুলে বসল—অবশ্য তারই মত ছোট ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে। তাদেরই বাড়ীতে খানিকটা জায়গা ঘিরে নিয়ে রঙ্গমঞ্চ তৈরী হ'ল;—প্রবেশ মূল্য নির্দ্ধারিত হ'ল প্রায় সাড়ে তিন পেন্স। কিন্তু দর্শকের অভাব হ'লে তিনটী কাঁচের মার্ব্বেল বা এক থলি বাদামের পরিবর্ত্তে প্রবেশাধিকার দেওয়া হ'ত।

ছোটবেলার সেই ‘তরমুজ চোর’ আজ পনের বৎসরের যুবক। অর্থ উপায়ের আকাঙ্খা তার মনকে ছেয়ে ফেলেছে। ছুটীর দিন সংবাদপত্র বিক্রয় করা, প্রতিবেশীর জমি চ'ষে দেওয়া, সংবাদ বহন করা প্রভৃতি কাজে সে যা উপায় কোরত সমস্তই জমা করে রাখত। ভবিষ্যতে সে যে একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ হ'বে একথা অনেকেই ধারণা কোরেছিল।

ষোল বৎসর বয়সে স্থানীয় ব্যাঙ্কের এক কেরাণীর পদ নিয়ে তার চাকুরী জীবন আরম্ভ হয়। ফ্রেডরিকের মতে এই দিনগুলোই ছিল তার জীবনে সবচেয়ে সুখের। ভাল পোষাকের অভাব অনুভব কোরতে হ'ত না। নাচের মজলিশে যোগদান করবার সময় মেয়ে বন্ধুও অনেক মিলত। আর শিকাগো সহরে গিয়ে থিয়েটার দেখবারও কোন বাধা ছিল না।

অদূর ভবিষ্যতে সে যে একটা ব্যাঙ্কের

(আবার আধ মিনিটকাল বিরাট নিস্তব্ধতা)

রতন। তাহলে উঠি...আমি...

রমলা। (চমকিত ভাবে) এত শীগ্‌গীর? কাল আসছেন ত রতন বাবু? (স্নিগ্ধ স্বরে) আসবেন কিন্তু, নিশ্চয়ই।

মিসেস সেন। (যেন নিজেকে হঠাৎ ফিরে পেয়ে) হ্যাঁ, তাহ'লে Fig Leaf দেখতে কবে যাওয়া যায় বলত' রতন?

রতন। (উৎসাহের সঙ্গে) যে দিন আপনাদের সুবিধে হয় বলুন আমায়—

[তমালিকা হেসে রতনের দিকে মুখ ফিরিয়ে কি যেন বলবে মনে হল, যবনিকা এসে সবাইকে ঢেকে ফেলল, তমালিকার কথা শোনা গেল না।]

যবনিকা

মালিক হবে সে বিষয়ে তার নিজের মনে কোন সন্দেহই ছিল না। অর্থনীতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করবার জন্য সে 'উইসকনসিন' বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'বৎসরের জন্য যোগদান করে।

ফ্রেডরিকের বয়স তখন কুড়ি বৎসর। আমেরিকা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কোরেছে। সে সৈন্য দলে ভর্ত্তি হ'ল বটে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা লাভ করবার পূর্ব্বেই যুদ্ধ বিরতির সংবাদ প্রচারিত হয়।

এইবার ব্যাঙ্কিং কারবার ভাল ভাবে শিক্ষা করবার জন্য সে নিউইয়র্কে এসে উপস্থিত হয়।

.........তারপরের কাহিনী তার নিজের মুখেই শুনুন ;—"প্রতি সন্ধ্যায় কর্ম্ম-ক্লান্ত দেহমনকে একটু আরামপ্রদ করবার চেষ্টায় ব্রডওয়ের বিখ্যাত থিয়েটারগুলির অল্প মূল্যের আসনে বসে অভিনয় দেখতাম। ব্যাঙ্কের মালিক হ'য়ে অনেক টাকা রোজগারের স্বপ্ন ধীরে ধীরে মন থেকে মুছে গিয়ে আমার নিজেরই এক অন্য মূর্ত্তি আমার কল্পনায় ভেসে উঠল—সে মূর্ত্তি একটা ব্যাঙ্কের বা অনেক টাকার মালিক নয়—অগণিত দাসদাসী তার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে না—সে মূর্ত্তি অভিনেতার—অনেক অর্থের মালিক নয় বটে—তার চেয়ে বড়—অনেক বড়—যশ, মান, খ্যাতি,—দেশজোড়া নাম।

"ব্যাঙ্কের উঁচু টুলে বসে কাজ কোরছি, হঠাৎ একদিন বৈকালে appendixes রোগের ভীষণ যন্ত্রণায় কাতর হ'য়ে পড়লাম। অস্ত্রোপচারের জন্য তৎক্ষণাৎ আমাকে হাসপাতালে পাঠান হ'ল।"

"যতই আরোগ্যের পথে অগ্রসর হই—অভিনয়ের নেশা আমাকে মাতাল কো'রে তোলে। নিজে একজন বড় অভিনেতা এবং অভিনয় কালে যে যথেষ্ট কলাকুশলতা দেখাতে পারব সে বিষয় একেবারে নিঃসন্দেহ হ'য়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ব্যাঙ্কের পথে আর কোনদিন যাইনি।"

"পূর্ব্বেই জানা ছিল অভিনয়ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ পেতে হ'লে এজেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়। নিজের কতকগুলো ফটো এজেণ্টকে দিয়ে বাসায় ফিরলাম। বরাত ভাল। লংআইল্যাণ্ডের 'ওল্ড প্যারামাউণ্ট ষ্টুডিও'তে তখনকার তারকা অভিনেত্রী 'ডরথী ডিকসনে'র "পেইং দি পীপার" ছবিতে একটা বাড়তি ভূমিকা পেতে বিশেষ দেরী হ'ল না। তারপর জর্জ্জ আলিশ-এর ছবি "দি ডেভিল"-এ এক জনতা দৃশ্যে স্থান পেলাম। লায়নেল ব্যারিমোরের একখানা ছবিতে এক মিনিটের জন্য আমাকে প্রয়োজন হ'ল। শেষে অবস্থা দেখে মনে হ'ল অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠবার ধৈর্য্য আমার নেই।"

"উৎসাহ নেই—আশা নেই—এমনি এক

মনের অবস্থা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক থিয়েটারে বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক ডি, ডব্লিউ গ্রিফিথের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। বিলম্ব না করে তাঁর কাছে আমার আর্জি পেশ করলাম—চিত্রাভিনয়ের জন্য একবার আমাকে পরীক্ষা করা হোক, তিনি যে উত্তর দিলেন সেটা আমার পক্ষে মোটেই সুবিধাজনক হ'ল না। তিনি বললেন—তাঁর সেক্রেটারীকে ফোন করে আমি যেন সব ব্যবস্থা করি। কিন্তু ঐখানেই তার যবনিকা পড়ল।

"এইবার রঙ্গমঞ্চের দিকে গতি ফিরালাম। কাজও শীঘ্র মিলে গেল। ১৯২০ সালের নভেম্বর মাস। নিউইয়র্কের বেলেস্কো থিয়েটার ষ্টক কোম্পানীতে চাকুরী পেলাম। কিন্তু আর্থিক অবস্থার একটুও উন্নতি হ'ল না। সপ্তাহে ৩টা পরিষ্কার সার্ট ব্যবহার করাও তখন আমার অবস্থার বাহিরে। "পাপেট্‌স" নাটকে তখন আমি অভিনয় করি—মিরিয়াম হপকিন্স আমার সহঅভিনেত্রী। তখন আমরা কেউ ধারণাও করতে পারিনি যে পরবর্ত্তী যুগে কখনও আবার একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে 'ডাক্তার জিকিল এণ্ড মিষ্টার হাইডে"-র দানবরূপে তাকে শ্বাসরোধ করে মারবার জন্য ছুটে যাব বা "ডিজাইন ফর লিভিং"-এ তার কাছে প্রেম নিবেদন কোরব।"

"১৯২৭ সাল। অভিনেত্রী ফ্লোরেন্স এলড্রিজ-এর সঙ্গে পরিচয় হ'ল 'ডেনভার' রঙ্গমঞ্চে। প্রথমে প্রেম, তারপর পরিণয়—সুদূর মেক্সিকো সিটীতে—সেই বছরই বসন্তকালে।

"১৯২৮ সাল। লস এঞ্জেলস্-এ উপস্থিত হ'লাম—জন্ ব্যারিমোর-এর পরিবর্ত্তে রঙ্গমঞ্চে "দি রয়েল ফ্যামিলী" নাটকে অভিনয় করবার জন্য। এইখানেই অভিনয় করবার সময় প্যারামাউণ্ট আমাকে চুক্তিবদ্ধ করে এবং সর্ব্বপ্রথম আমি "দি ডামী" নাটকে অভিনয় করি। তারপর আসে ক্লারা বো'র সঙ্গে "দি ওয়াইল্ড পার্টি"।

"এখন অভিনয় করা ছাড়া জীবনে কোন বৈশিষ্ট্য নেই। পাঁচ বৎসর প্যারামাউণ্টে থাকবার পর আমি উক্ত কোম্পানীর সংস্রব ত্যাগ কোরেছি। আপনারা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন—কেন? তার উত্তরে বলব—আমি চাই অধিক অর্থ—প্যারামাউণ্ট যা আমাকে দিতে ইচ্ছুক নয়। এখন টোয়েনটেথ সেঞ্চুরী পিক্‌চার্সে যোগ দিয়েছি এবং উক্ত কোম্পানীর কর্ত্তা ড্যারিল জ্যানুক আমার প্রার্থিত অর্থ দিতে স্বীকৃত হ'য়েছেন।"

আমেরিকান হ'লেও স্পষ্ট উচ্চারণের জন্য ফ্রেড্‌রিক মার্চের অভিনয়—আরও হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে ওঠে। "ডাক্তার জিকিল এণ্ড মিষ্টার হাইডে"-র অভিনয় করে ফ্রেডরিক ১৯৩২ সালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে স্বীকৃত হয়।

অবসর সময়ে ঘোড়ায় চড়া, টেনিশ খেলা এবং সাঁতার দিতেই সে ভালবাসে। বাদামী চুল, কটা চক্ষু আর পুরা ছ'ফিট লম্বা—এই-ই ফ্রেড্‌রিক মার্চের দৈহিক পরিচয়।

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে ?

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে, এ বিশ্ব নিখিল তোমারি প্রতিমা ;
মন্দির তোমার কি গড়িব মাগো ! মন্দির যাহার দিগন্ত নীলিমা !
তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,
সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী,
নিকুঞ্জভবন, বসন্তপবন, তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা ;
সতীর পবিত্র প্রণয় মধু,—মা !
শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,
সাধুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,
—তোমারি মাধুরি, তোমারি মহিমা ;
সেই দিকে চাই এ নিখিলভূমি—
শতরূপে মা গো বিরাজিত তুমি,
বসন্তে কি শীতে, দিবসে, নিশীথে,
বিকশিত তব বিভব গরিমা ! *

মিলাবো তায় জীবনগানে

যে ধ্রুবপদ দিয়েছো বাঁধি বিশ্বতানে,
মিলাবো তায় জীবন গানে।
গগনে তব বিমল নীল—
হৃদয়ে লবো তাহারি মিল,
শান্তিময়ী গভীর বাণী
নীরব প্রাণে॥
বাজায় উষা নিশীথ কুলে যে গীত ভাষা,
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর নবীন আশা।
ফুলের মতো সহজ সুরে,
প্রভাত মম উঠিবে পুরে,
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন
মরিতে জানে॥ *

---

* [জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে পঞ্চাধিক শততম সাংবাৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষ্যে গীত]

উপন্যাস

উচ্ছৃঙ্খল

শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এতবড় মানসিক দুশ্চিন্তা নিয়ে তিনি যখন কলম হাতে করে ষ্টেশনের ছোট একটী কক্ষে বসে ছিলেন, তখন আবার আর একখানি গাড়ী আসবার সঙ্কেত পাওয়া গেল। তিনি ভাবছিলেন, এবার বোধ হয় তাঁর পুত্র ফিরে আসবে।

দুর্য্যোগের অবসানে সদ্যসিক্ত পৃথিবীর বুকের ওপর দিবসের কিরণ নেমে এসেছে। ঘাসের সবুজ শীর্ষের ওপর থেকে বারিবিন্দু মুছে গেছে। নিচে জমাট হয়ে আছে,—সূর্য্যের সোনালি আভা জলকে সোনালি করে তুলেছে। কাছে গিয়ে দেখলে—ওপরে আকাশের সূর্য্যকে জলসিক্ত দেখা যাচ্ছে—এ' জমানো জলের ভিতর।

যার মন শুধু অবসাদগ্রস্ত—জীবনে যে শুধু দুঃখই পেয়েছে, যার জীবন ব্যর্থতায় ভরা—সে একবার জগতকে সুন্দরভাবে দেখতে পারলে তার দুঃখ দূরে যায়; এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে।

নিখিলবাবু অনেক আগে কাজে ঢুকেছেন, জগতের আনন্দের সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন নি। জগতকে যখন ভালভাবে দেখবার সময় হয়েছে তখন তাঁকে অনিবার্য্য কারণে কাজে ঢুকতে হয়েছে। তারপর তার বিবাহ—বছর তিনেক পরেই পত্নী বিয়োগ, তারপর ঐ অরুণকে নিয়ে তাঁর দুঃখ ভারাতিক্রান্ত জীবন চালাচ্ছেন।

মানুষ বুঝি দুঃখের সময়েও তাই সুন্দর জগতকে চায়।—তিনি পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মনের জ্বালা কিছু জুড়িয়ে গেল। তার মনে হলো—তিনি জগতের নন্।

ঘড়ীতে ঢং ঢং করে নয়টা বেজে গেল। তাঁর জাগ্রত স্বপন ভেঙ্গে গেল।

গাড়ী আসবার সময় হয়েছে। সিগ্‌নেল পড়লো। গাড়ী এসে ষ্টেশনে থামলো। তিনি আগের বারের মতো দেখছিলেন—অরুণ এলো কিনা। হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

ছেলে বেলা তাঁরা একসঙ্গে পড়েছেন। অরুণকে তিনি বেশ ভাল করেই চিনেন। তিনি কল্‌কাতা থেকে আসছেন। আসবার তাঁর ব্যক্তিগত কোন কারণ ছিল না। তিনি আসছিলেন—নিখিলবাবুকে খবর দিতে। তিনি অরুণকে কলকাতায় এক নগণ্য পল্লীতে সুখশয়ান দেখে এসেছেন। বলা বাহুল্য, নিখিলের বন্ধু কমলের চরিত্র সম্বন্ধে বিশ্রী অপবাদ জন সমাজে প্রচলিত ছিল। তিনি মদের নেশায় বিভোর হয়ে পড়ে থাকতেন, সব সময় বাড়ী ফিরতেন না।—তিনি সেদিন হঠাৎ অরুণকে সেই পথে দেখে তার অনুসরণ করে তাকে এক গৃহে ঢুকতে দেখেছেন। সে কথা তার বাবাকে বল্‌তে এসেছেন।

কমলকে দেখতে পেয়ে নিখিল বললেন: আমার অরুণকে দেখতে পেয়েছ ভাই? সে তো কাল কোথায় চলে গেছে, আজ পর্য্যন্ত ফিরে নি।

—সে অনেক কথা; বসোনা বলছি—কমল ষ্টেশনে ঢুকলেন। তিন মিনিট গাড়ী থেমে আবার হাওয়ার বেগে ছুটলো।

নিখিল বললেন: কী ভাই আমার অরুণ কোথায়?—পাশে পয়েন্টস্‌মেন্ দাঁড়িয়েছিল। সে অনেকদিন পর্য্যন্ত ঐ ষ্টেশনে কাজ করছে। নিখিলের ছেলেকে সে "দাদাবাবু" বলে ডাকে, তার সঙ্গে বেশ ভাব। তার অনুপস্থিতিতে সেও চঞ্চল হয়ে উঠেছে

তিনি একবার পয়েন্টস্‌মেনের দিকে চাইলেন। আর একবার নিখিল বাবুর দিকে চেয়ে বললেন, তোমায় বল্‌তে নিখিল লজ্জা করে, আর হয়তো তুমি বিশ্বাসও করবে না—তোমার ছেলেকে আমি কাল—পাড়ায় দেখেছি।

—হ্যাঁ, বল কি? আমার ছেলে?—সত্যি? নিখিলবাবু অধীর হয়ে উঠলেন।

কমল বললেন: কী হলো তুমি এত অধীর হচ্ছ যে!

—অধীর হবোনা? আমার এত যত্নে পালিত, আদরের খোকাকে আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে ভগবান্।—তিনি কাঁদতে লাগলেন। ক্ষুব্ধ পিতৃবক্ষের সান্ত্বনা কোথায়?

কমল তাঁর হাত ধরে বললেন: তুমি নিজে সেখানে যাও। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। সে আসবে।

যাঁর জীবন শুধু সাধু মহাত্মাগণের আদর্শে চালিত হয়ে এসেছে, জীবনে পাপ যাঁকে স্পর্শ করেনি, তিনি আজ তারই সন্তানের জন্য নগণ্য ঘৃণিত পল্লীতে বিচরণ করবেন? এ ও তাকে সইতে হবে?

একদিকে পুত্রস্নেহ—আর একদিকে নরক,

পুত্র স্নেহ তাকে নরক দেখাবে। সে নরক দর্শন তো তিনি করবেন না।

তাঁর শত মধুর স্বপ্ন কালের অতল তলে ডুবে গেল, সন্তানকে তিনি ভুলবেন।

তিনি চুপ করে রইলেন, তাঁর বুকের ভেতর জ্বালা করছিল, তবু মুখে কিছুই বললেন না।

কমল বললেন :—কী! যাবে তো চলো, এখনই দু'জনে যাবো।

—নিখিল বললেন : আমার জীবন বিরাট ব্যর্থতার।—যেখানেই যাই না কেন আমার শান্তি নেই, বল হারিয়েছি, শক্তি হারিয়েছি, এখন আবার সন্তান হারাতে বসেছি। এখনো যদি আমি তাকে ফিরিয়ে আনি সে কি থাকবে? সে তো আর দুগ্ধপোষ্য শিশু নয়। হায়, আমি কি জানতুম—আমার সন্তান এমনি করে আমায় ছেড়ে যাবে? জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি। বিরাট শূন্যতায় জীবন হাহাকার করছে।—ব্যর্থতার জীবনে বুঝি কোনদিন শান্তি ফিরে আসে না! তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

কমল বললেন : আগে তাকে ফিরিয়ে আন, তারপর দুই বন্ধুতে মিলে যা হয় একটা উপায় করবো।

—উপায়, উপায় তো আর কিছুই নেই। আমি আমার চোখের সামনে একটা বীভৎস শোচনীয় দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। আমি দেখছি—বৃদ্ধ বয়সে আমি রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছটফট করছি, আর আমারই সন্তান তা' দেখেও বিলাস সম্ভোগে লিপ্ত রয়েছে।

নিখিলের দু'চোখ বয়ে শ্রাবণের ধারার মতো অশ্রুজল নির্গত হতে লাগলো।

......পরের গাড়ীতেই নিখিল আর কমল কলকাতা যাবেন। তাকে ফিরিয়ে আনবেন।

সন্তান-স্নেহ আজ নিখিলকে তাঁর ধর্মভাব থেকে বিচ্যুত করলো। তিনি আজ তাই ঘৃণিত পল্লীতে যেতে স্বীকৃত হলেন।

কমল নিখিলের সঙ্গে তাঁর বাসায় ফিরে গেলেন। খাওয়ার পরই গাড়ীতে যাত্রা করলেন।

সে তার সকল অবলম্বন হারিয়ে পথে পথে ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তার প্রতি পদক্ষেপে যেমন তার অবসাদের ভাব দৃষ্ট হয়, নিখিলের চলন ভঙ্গীতে তেমনি। তবু, বাসায় ফিরে যেতে অল্প সময় লাগলো।

—নিখিল স্বহস্তে রন্ধন ক'রে বন্ধুকে খাওয়ালেন। নিজে খেতে বসে কিছুই খেতে পারলেন না। বাসনপত্র ধুয়ে একটু বিশ্রাম করে'—বন্ধুর সঙ্গে যাত্রা করলেন। তাঁর অ্যাসিষ্টান্টকে সেদিনের কাজ চালাতে বলে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে কমল আর নিখিল শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

অরুণের কোন খবর পাওয়া গেল না। সেদিন রাতেই সে সে স্থান ত্যাগ করেছে।

কমল অনিমার কাছে জানলো, সে বাড়ী ফিরে গেছে।

নিখিল ভাবলেন, তার কথাই বুঝি ঠিক। আবার গাড়ীতে তাঁরা বাড়ী ফিরবেন। এক অজানিত আশঙ্কায় তাঁর প্রাণ ভরে গেছে। যে পুত্রের কয়েক ঘণ্টা মাত্র অদর্শন জ্বালা তাঁর সহ্য হতো না সেই সন্তানের আজ দু' দিন কোন খবর নেই।

নিখিল বললেন : ভাই কমল, অনেকদিন হলো বালিগঞ্জ "লেক" দেখেছি। চল, একবার বেড়িয়ে আসি। তাঁর অন্তর দেবতা যে তাঁকে সেখানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন!

কমল খুসি হয়ে বললেন : বেশ তো চল না।

তাঁরা বাসে চড়ে বালিগঞ্জের দিকে যাত্রা করলেন।

তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা নূতন আয়োজনে ধরার বুকে নেমে আসছে। আকাশে সন্ধ্যা-তারা দেখা দিয়েছে। বলাকার দল অনির্দ্দিষ্ট পথে পাখায় ভর ক'রে নিঃশব্দে উড়ে চলেছে। অনন্ত-প্রসারিত আকাশ স্বচ্ছ পবিত্র উদার!

বাস থেকে নেমে তাঁরা হেঁটেই চললেন। চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। নিখিল বাবু দু' দিকে নিস্তব্ধ উপকণ্ঠে কুলবধূর কার্য্য তৎপরতা দেখছিলেন। আর তার মনের মাঝে তাঁর নিজের বহু পুরাণো গার্হস্থ্য-জীবনের কথা জেগে ওঠে তাঁকে চঞ্চল করে তুলছিল। হায়, আজ যদি তাঁর পত্নী বেঁচে থাকতেন!

মানুষের এক দুঃখের সঙ্গে আরেক দুঃখ বুঝি এমনি করেই মানুষের প্রাণে আরো গভীর দুঃখ দিয়ে যায়।

তিনি বেদনা ক্লিষ্ট-অন্তরে ধীরপদক্ষেপে চলছিলেন।

তাঁরা যখন লেকে-এ পৌঁছলেন তখন কত লোক স্বচ্ছ নীল জলের সামনে বসে জলের খেলা দেখছিল। বৈদ্যুতিক-আলো জায়গাখানিকে আরো রমনীয় মধুর করে তুলেছে। তাঁর তৃষিত ক্ষুদিত প্রাণ জুড়িয়ে গেল। দুঃখের মাঝে যদি মানুষ সুখের এতটুকু আভাসও না পায়, তবে সে বাঁচে কি করে?

নিখিল দেখতে পেলেন, একটা ছেলে ঠিক অরুণেরই মতো,—তাঁর দিকে আসছে।—তাঁর দৃষ্টি শক্তির তেমন প্রখরতা নেই। তবু তাঁর সন্তানকে চিনতে তাঁর দেরী হলো না। কাছে এসে অতর্কিত-ভাবে তার বাবার সামনে পড়ে অরুণ আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তার বাবা কি তবে সব কথা জানতে পেরেছেন? ক্ষোভে দুঃখে গ্লানিতে তার সারা অন্তর পূর্ণ হয়ে গেলো। লজ্জায় গণ্ডদ্বয় আরক্ত হয়ে গেল।

পুত্রের মধুর স্পর্শে পিতার সমস্ত অবসাদ গ্লানি দূরে গেল। গভীর আনন্দ অন্তরে সাড়া দিল। তিনি তাকে গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। তার মুখচুম্বন করে বললেন :—বাবা, আমি তোমায় খুঁজতে এখানে এসেছি।

আমি সারাদিন তোমার জন্য কত চিন্তা করেছি, তা তুমি জাননা। একদিন তুমিও সন্তানের পিতা হবে। তখন বুঝতে পারবে, সন্তানের জন্য পিতামাতার প্রাণ কতই উদগ্রীব, আকুল হয়ে থাকে। সন্তানের মধুর স্পর্শ পিতার কাছে কত তৃপ্তিপ্রদ!

কমল দাঁড়িয়ে নিখিলের এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছিলেন। অরুণ মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

নিখিল বললেন: চল, এ গাড়ীতেই বাড়ী যাই।

সে বললে: বেশ তো।

কমল বললেন: তুমি কাল কোথায় ছিলে হে?

অরুণের উপস্থিত বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল। তার সঙ্গীদের মধ্যে এর জন্য তার বেশ সুনামও ছিল। সে বললে: কেন? কাল তো আমি আমার এক বন্ধুর বাসায় ছিলাম।

—বন্ধুর বাসায় ছিলাম—তোমার কোন বন্ধু ছিল—ঐ—পাড়ায়? সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার পিতা সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি তাকে কোন কথা বললেন না, অথচ কমল তাকে এমন কথা বলছেন! সে বিরক্ত হয়ে বললে: তা' আপনাকে বলে কী হবে? আমার বাবাকে আমি সে কৈফিয়ৎ দিতে পারি। আপনি কে? আপনাকে আমি চিনি না। তার দৃষ্টি অবজ্ঞাপূর্ণ।

কমল বল্লে: শুনলে ভায়া তোমার ছেলের কথা! কেন মিছিমিছি আমায় আনিয়ে অপমানটা করালে?—তোমার ছেলে সেই ছুড়ি অণিমার কাছে কাল রাতে ছিল। সে কথা কে না বলবে? আর তুমিত নিজেই দেখে এলে। সেই ছুঁড়ি না হয়; তার নাম কী করে জানলো? ছুঁড়ীকে দেখেছ তো। তাকে দেখলে ওর মতো ছোকড়ার মন মজবে তাতে আর বিচিত্র কী?

(ক্রমশঃ)

প্রাতরশ্মি

কুমারী কল্যাণী রায়

প্রাণের মাঝের কালোকে'—
শুভ্র করিলে হে মহানবীন,
তোমার উষার আলোকে।
দিক বলয়ের স্পর্শ আনিয়া,
হৃদয় আমার আগালে রাঙিয়া,
মরণের মাঝে জীবন রচিয়া,
পূর্ণ করিলে মোরে;
হে মহামরণের জীবন-যাত্রী
শতেক প্রণাম তোরে॥

অবশেষে যবে নমিয়া,—
দিবসের আলো বিদায় সে নেয়
গোধুলির ডাক শুনিয়া!
শ্রান্ত অবশ ভগ্ন-হৃদয়,
বৃন্তের কলি গোপনে লুকায়,
ভয়-বিহ্বল চকাচকি রয়'
আপন কুলায় লুকায়ে;
তুমি তাই প্রাতে অভয় বাণীতে
বিশ্বেরে তোল জাগায়ে॥

যেমন অভয় মন্ত্রে,—
জাগিয়া গো উঠে সুর-কোলাহল
ভগ্ন-বীণার তন্ত্রে।—
তেমনি তোমার সোণার পরশে,
সোণা হ'য়ে উঠে সকলি হরষে,
তাইত' প্রেয়সী প্রিয়তম আশে
মিলনের গান গাহে;
পাখী গায় গান, ফুল উঠে ফুটে
পরাণ কী যেন চাহে!!

ধরার আদিম প্রাতে,—
হৃদয়ে যেদিন স্পন্দন দিলে
মরণের রথ হ'তে,
বিশ্ব জাগিল হর্ষে ও ভয়ে
গগন মানিল তার পরাজয়,
সেই দিন হ'তে জীবন যে রয়
জীবনের মাঝে লুকায়ে;
ক্ষণিক তোমার কোমল পরশে
গোপনকে তোল ফুটায়ে॥

প্রাণের মাঝের কালোকে,—
শুভ্র করিলে হে মহানবীন,
তোমার উষার আলোকে।
যুগ যুগ ধরি' এ আলো তোমার
অন্ধ-কারাকে করি চুরমার,—
নবীন প্রভাত আনিল আবার
বিশ্বের সভা দ্বারে;
হে মহামরণের জীবন-যাত্রী
শতেক প্রণাম তোরে॥

———

সোণার পিঞ্জরে মুক্ত বিহঙ্গম

শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র দাসগুপ্ত

পাহাড়ের কিনারায় বেদের ঘর। বাস করে সে ছোট্ট কুঁড়েতে—তার চারিদিকে ফুটো ফাটা, কোন রকমে জোড়া তালি দিয়ে সে থাকে। কুঁড়েটি তার নিজের হাতে গড়া নয়। সেটা বোধ হয় গড়েছিল তার বাপ কী ঠাকুর্দ্দা—তা সে ঠিক্ জানত না; তবে সে জানত যে, সেই কুঁড়েতেই তার জন্ম থেকেই আঠার বছর কেটেছে—।

পাহাড় কিনারায়, সাথী ছিল তার—পাহাড়ের ঝোঁপ ঝাঁপ; পাহাড়েরি মেয়ে—ঝরণা; আর ছিল সাথী তার আপন হাতে গড়া তীর ধনুক্—তার প্রাণ। সকাল ও সাঁঝে, তার কাজ ছিল—পাহাড়ের এপারে ওপারে তীর ধনুক হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। এইত ছিল তার কাজ; কিন্তু এই কাজের ভেতরেই সে উপভোগ কোরত অফুরন্ত আমোদ। দুনিয়াকে তার পায়ের সামনে ঢেলে দিলেও সে তত আমোদ পেতনা—যত পেত, সে তার নিজের অভিরুচিতে চলতে।

গাঁ-এর কত লোক যে তাকে অনুরোধ করেছে; শাসিয়েছে, বলেছে,—"হ্যারে, যা না সহরে, না হয় রাজবাড়ীতে, অনেক কাজ পাবি—এ ভাবে ঘুরে ঘুরে কেন কাটাস্, আর কেনইবা জীব জন্তুদের ভেতরে তুমুল ব্যস্ততার ভাব তুলিস।" আড়ালে বলে—তুই কাজ পেলে, বনের জানোয়ারগুলো সুস্থির হোয়ে ঘুমোতে পারে,—গাছের পাখীগুলো নির্ভাবনায়, পাকা ফলগুলি খেতে পারে।

বেদে হেসে উড়িয়ে দেয়,—হাতে হাতে তাল ঠোকে, ধনুকে গুণ চড়ায়। বলে—"বেশ আছি ভাইরা, জীবনে সেইত সুখী, যে আমার মত জীবনকে চালিয়ে নিতে পারে। তুমিও এসনা আমার দলে দেখ্‌বে কত মজা।" দুরন্ত বেদে শাসনের বাইরে—কে তারে ফেরাবে!

দিনগুলো কেটে যায়, দুরন্ত রথের চাকার মত। বেদের যে কাজ, সেই আছে; একটুকুও তার নড়চড় হয়নি। সাঁঝ, সকালে, বর্ষা, বাদলে, বেদের ধনুক্ হাতে করে বেরিয়ে পড়া চাই—সেই গভীর জঙ্গলে।

একদিন হোল কী, সে দেখ্‌তে পেলে, মহুয়া গাছের ওপর দুটি পাখী; একটি পাকা রসে ভরা মহুয়া ফলে তাদের ঠোঁট্ দুটো অনবরত পেরে—মহুয়া ফলটিকে ব্যস্ত করে তুলেছে। বর্ণের অপরূপ সম্ভার—সে পাখী দুটির রূপ। দেবতার রংদানিতে যত রকমের রং আছে, সব রং দিয়ে তাদের দেহ গড়া। একবার ভাবে তাদের দিকে দিনরাত তাকিয়ে থাকি—আবার ভাবে ঐ বুঝি উড়ে পালাল—ধনুকে গুণ চড়ায়। চঞ্চল পাখী দুটি কতক্ষণ আর স্থির থাকতে পারে; যেই তাদের পাখা মেলেছে, শূন্যে গা ঢেলে দেবে বলে—অমনি বেদের দুরন্ত তীর গিয়ে লাগল তার পাখায়—আর যাওয়া হোলনা, করুণস্বর তুলে পড়ে গেল মাটিতে। আর অপরটি, প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে মিলিয়ে গেল, কোথায়, আর দেখা গেল না—।

পড়ে-যাওয়া পাখীটিরে বেদে তুলে নিলে। দেখ্‌লে বাঁচ্‌তে পারে যত্ন নিয়ে সেবা করলে—কেননা তীরটা দেহে না লেগে, লেগেছিল তার ডানায়।

বেদে বাড়ী এনে, কাঠের খাঁচায় রেখে, তারে প্রাণ দিয়ে সেবা করলে। ভাল যখন হোল, গায়ের যত সব মুরুব্বি লোক, তাকে বল্লে—"বেদে, সহরে গিয়ে বেচে আয় অনেক টাকা পাবি।"

* * *

রাজার মেয়ে সদ্য ধরে আনা পাখীটিকে, রূপোর দাঁড়ে, সোনার ছিকলিতে পা বেঁধে রেখেছে—আর অন্দর মহলের ফুল বাগানের একটি ধারে করে দিয়েচে তার থাকবার যায়গা। দাঁড়ের দু'পাশে দুই সোনার বাটী—তাতে হরেক রকমের কাজকরা। একটিতে থাকৃত—খাবার, আর অন্যটিতে জল।

রাজার মেয়ে সকালে নিজে হাতে তার খাবার নিয়ে আসে, নিজে হাতে তার বাটীতে খাবার দিয়ে নিজমুখের বুলি শেখায়—ব'লত—"বল্‌রে পাখী বল,—দুঃখ গেচে ছেড়ে, এসে সোনার দাঁড়ে।"

বলে দেহ ধরে রাখা যায় কিন্তু মন ত' পাওয়া যায় না; রাজকুমারী পাখীর দেহ পেয়েছিল—কিন্তু মন ত' পায়নি; তাই বনের পাখীর এসব মোটেই ভাল লাগে না। রাজকুমারীর মুখের বুলি শুনে—তারে যতটুকু অধিকার দেওয়া হোয়েচে; সেইটুকু যায়গার ভেতরেই সে ছট্‌পট্ করে। মন তার ছুটে যায়—সেই নীল আকাশের গায়ে—সেই কাল পাহাড়ের পাশে—সেই নদীর বাঁকে বাঁকে—ধান ক্ষেতের আলোর ওপর দিয়ে; কিন্তু তার দেহটি পড়ে থাকে সেই রূপোরি দাঁড়ে।

পাখীর সে ভুবন আলোকরা অপরূপ রূপ, যেন দিনে, দিনে, ক্ষীণ হোয়ে যেতে লাগল। খাবার বাটীতে পড়ে থাকে, জল বাটীতেই শুকিয়ে যায়।

যাকে ভালবাসা যায় সে যদি তার প্রতিদান না দেয়; তবে হৃদয় দুঃখের খনি হোয়ে ওঠে। রাজকুমারীর হোয়েছিল তাই—ভাবে, ভালবেসে একি জ্বালা। পাখীর শরীর দিনে দিনে যত খারাপ হয়, রাজকুমারীর ভাবনা দিন দিন তত বেড়ে ওঠে। পাখীর ভাবনায় মন তার ব্যাকুল হোয়ে ওঠে; কিছু তার

ভাল লাগে না। সইরা আসে তাদের অছিলা কোরে ফিরিয়ে দেয়—বলে—"তোরা ফিরে যা ভাই, আজ আমার যেন কেমন কেমন ঠেকছে।

সইদের বিদেয় করে, পাখীর কাছে দৌড়ে আসে—তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে ব'লে—পাখী ধরা দেয় না, করুণস্বরে ডাকে আর দাঁড়ের ওপর পাখা চালায়—বলে, "ছেড়ে দে, ওরে নিঠুর ছেড়ে দে। এ সোনার দাঁড়ে তুই সোনার পাখী সাজিয়ে রাখিস্। আমায় ছেড়ে দে, আমি যাব সেই আমার সাথীর কাছে।"

রাজকুমারীর মন যখন আর কিছুতেই মানে না—রাজবাড়ীর লোকেরা বল্লে—"হয়ত' পাখীর ব্যামো ভাল করতে পারে সেই বেদে।"

অমনি ছুটলো পেয়াদা তাকে ডাকতে; রাজবাড়ীতে বেদের ডাক পড়ল।

রাজকুমারী দাঁড় শুদ্ধ পাখীকে বেঁদের হাতে তুলে দিয়ে বল্লে—"একে ভাল করে দেওয়াই চাই, যে করে হোক্; সময় দিলাম সাত দিন।"

* * *

একদিন, দু'দিন করে পাঁচদিন কেটে গেল। পাখীর যে ব্যামো সেই ব্যামোই রইল—ভাল আর হোল না; উপরন্তু যে অবস্থায় বেঁদে তাকে এনেছিল, তার চাইতে ক্ষীণতর হোয়ে উঠল। বেঁদে ওষুধ করে, ওঝা ডেকে ঝাড়ায়। বনের পাকা ফল এনে দেয়—পাখী তা স্পর্শ করে না; শুধু সজল নয়নে চেয়ে থাকে—আকাশের শেষ সীমানায়—তার মন চায় কত বেদনার ভাষা বলতে, কিন্তু পেরে ওঠে না। বেঁদে তার নীরব ভাষা কিছুটা আঁচ করে, সবটা করে উঠতে পারে না।

ছ' দিনের দিন রাতে বেঁদে স্বপন দেখলে—সেই পাখীর সাথী যেন তারে বলছে—"ওরে নিঠুর ছেড়ে দেরে, ছেড়ে দে, ও সোনার দাঁড়ে তুই সোনার পাখী সাজিয়ে রাখিস, ওরে ছেড়ে দে, ও আসুক আমার কাছে।"

বেঁদের মনে পড়ল, গেল বছর ঠিক এমনি দিনে সে তার আপন সাথীকে হারিয়ে কী ব্যথা অনুভব করেছিল।

ভোরের বেলা, বেঁদে পাখীর পায়ের বাঁধন খুলে তারে মুক্ত করে দিলে—পাখী করুণস্বর তুলে, তীরবেগে মিলিয়ে গেল—পাহাড় কোলে, আর তাকে দেখা গেল না—বেঁদে তাকিয়ে রইল সেই দৃষ্টি হীন পথে।

পেয়াদা এসে বলে—"কই রাজকুমারীর পাখীর ব্যামো ভাল হোল।" শূন্য দাঁড়টি পেয়াদার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে—"রাজকুমারীকে গিয়ে বল—পাখীর বেমারি ভাল হোয়ে গেছে।"

শোনা যায় তারপর থেকে বেঁদে নাকি আর কোন দিন শীকারে বের' হয় নি—গাঁয়ের লোকে বলে—"দেবতা পাখীর রূপে এসে বেদেকে শিক্ষা দিয়ে গেছে।"

খোলা-চিঠি

শ্রীরবি রায়কে

রবি রায়,

তুমি হ'চ্ছ আর একটি অভিনেতা, যার অভিনয় ছায়াপটে কেউ-ই সাদরে গ্রহণ কোরতে পারে না। যেদিন শিশিরকুমারের পাশে তোমাকে তরুণ যুবক বেশে প্রথম দেখি, সেদিন তোমাকে দেখে অনেক উচ্চ আশা আমাদের মনের কোণে উঁকি মেরেছিল; এবং হয়ত' আমাদের সে আশা নিরাশা হ'ত না—কিন্তু শিশিরকুমারের অধীনে থেকে সামান্য নাম কিনেই তুমি 'ধরাকে সরা মনে কোরলে'—ভাবলে তুমি মস্ত বড় এ্যক্টর হ'য়েছ, নিজেকে বড় ভাবা কখনও দোষের নয়, কিন্তু তুমি যা' নও, তাই ভেবে আকাশের চাঁদ ধরবার আশা করা দুরাশা।

রবি রায়, রঙ্গমঞ্চের কথা ছেড়ে দিই—ছায়াপটে কী কোরে অভিনয় কোরতে হয়, তা' তোমার এখনও ধাতস্থ হয় নি—এমন কী, পর্দার অভিনয়ে কী কোরে দাঁড়াতে হয়, তারও কলা-কৌশল তোমার এখনও আয়ত্ত হয় নি। ছায়াপটের অভিনয় যে উচ্চ চীৎকার নয়, একথা তোমায় আমরা বহুবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছি—কিন্তু ও জিনিষটা যেন তোমার মজ্জাগত হ'য়ে গেছে। রঙ্গমঞ্চে তুমি যত ইচ্ছা পার চীৎকার কোরে লোক ভোলাবার চেষ্টা কোর, তা'তে কারুর আপত্তি নেই—কিন্তু ছায়াপটে সব ভূমিকাতেই যদি তুমি হাত, পা ছুড়ে চীৎকার কোরতে সুরু কর, তা' হ'লে শুধু দর্শকদের কানের ভেতরকার পাত্‌লা পরদা ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা নয়, হয়ত' যার ওপর তুমি অভিনয় কোরছ সে পর্দাটিও ছিঁড়ে যেতে পারে।

তুমি এ অবধি অনেক বিভিন্ন ভূমিকাতেই অভিনয় কোরেছ, কিন্তু তার সব অভিনয়ই হ'য়েছে যাত্রাদলের রাজার মত। "শচীদুলাল", "দক্ষযজ্ঞে" তুমি যা অভিনয় কোরেছ—তা' দেখে আমাদের মনে হ'চ্ছিল, পরিচালক মশাই তোমার পার্টের নাম বদলিয়ে যদি একটা যাত্রাদলের রাজা=রাজড়ার নাম বসিয়ে দিতেন, তা' হ'লে তবুও তোমার অভিনয় কতকটা বরদাস্ত করা যেত। তাই বোধ হয় তোমার স্বরূপ বুঝতে পেরে তারপরে

অর্থাৎ "রাজনটী বসন্তসেনা"-তে তোমাকে অনুরূপ ভূমিকায় নামানো হয়, কিন্তু হঠাৎ ছোট ভূমিকা থেকে একেবারে 'হিরো'র ভূমিকায় নামানোয় তাল সামলাতে না পেরে তোমার দুর্দ্দশা হ'য়েছে চরম!

রবি রায়, সেইজন্য আমরা তোমাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিচ্ছি—পর্দ্দায় অভিনয় করার যদি তোমার নিতান্ত-ই বাসনা থাকে তা' হ'লে তুমি কিছুদিন সিনেমায় অভিনয় না কোরে সিনেমা দেখ, তারপর তুমি যদি ভাল বোঝ তা' হ'লে নয় অভিনয় কোর। রবি রায়, তুমি হয়ত' বলবে আমি যদি পর্দ্দায় অভিনয় কোরতে না পারি, তবে চিত্র-নির্ম্মাতারা আমায় ডাকে কেন?—সে কথা স্বতন্ত্র। এ দেশের চিত্র-নির্ম্মাতারা যাকে পায় তাকেই নেয়—কারণ যারা ছবির পরিচালক তাদের মধ্যে অনেকেরই জ্ঞান তোমার চেয়ে বেশী নয়। কিন্তু তা' বলে বুঝে সুঝে তুমি তোমার পায়ে কুড়ুল মের না। তাই বলছি কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে পর্দ্দার অভিনয় জিনিষটা সম্যক্ উপলব্ধি কোরে আবার যদি ছায়াপটে তুমি দেখা দেও—সেটা তোমার পক্ষেও মঙ্গল, ছায়াচিত্র-শিল্পের পক্ষেও মঙ্গল।

শ্রীরুদ্রেশ্বর রুদ্র

সাহিত্য পরিচয়
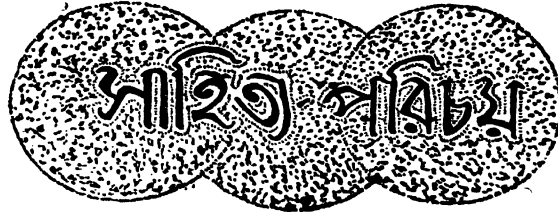
চার অধ্যায়—শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর; দাম ১৷৹ ও ১৸৹ টাকা।

বিবর্ত্তন—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী; দাম ২৲ টাকা।

সজ্জিত পুস্তাকাগার থেকে হাতে অনায়াসে উঠে এল রবীন্দ্রনাথের নতুন কথা-সাহিত্য "চার অধ্যায়" ও অনুরূপা দেবীর অন্যতম নতুন উপন্যাস "বিবর্ত্তন"। চার-অধ্যায়ের নামকরণ নতুন ধরণের, সমগ্র পুস্তকের অধ্যায়-বিভাগ নিয়ে। বইয়ের ঘটনার পরিণতি হ'য়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় পরিণতি ইঙ্গিত দিয়েছে, স্পষ্ট হ'তে, স্পষ্টতর ক'রে। আভাষ ও ভূমিকা লেখার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়-রূপে ধরা দিয়েছে। ব্যক্তি বিশেষের সত্যের উপলব্ধি নিয়ে সাহিত্য গ'ড়ে তোলা সব সময়ে সম্ভব হয় না—যদিও সেটা তার প্রথম এ্যক্‌সাম (axiom)। উপলব্ধির ভিত্তি যত গভীর হয় লেখায় তত বল জোগায়। রবীন্দ্রনাথ খুব অল্প জায়গায় এত জোরের সহিত নিজের মতবাদ প্রচার করেছেন যদিও তিনি এমন করে কোন লেখায় প্রচারকের সহজ-লভ্য হাততালি চাননি। প্রচারকের স্বরূপ ঢাকা আছে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার মুখোসের তলায়—সামান্য ঝড়ো-হাওয়ায় সেটা সরে যায়। আজকের বিশ্বসাহিত্যে প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য কথা-সাহিত্যের মিঠে সুরে—তার কঠোরতা হারিয়েছে, শ্রোতার মন সরস করার জন্য। রবীন্দ্রনাথের চির-তরুণ প্রতিভা তার সন্ধান আগেই দিয়েছে। এবারের সত্য কঠোর সত্য—শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বিশেষের তথা-কথিত আপ্রাণ চেষ্টার শেষে উদ্গত আত্মানুশোচনা ও মনীষি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উপলব্ধির পরে প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে ধরা পড়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটী বিশেষ দিক। কিন্তু তা ব'লে প্রচার-সাহিত্যের স্বরূপ কথা-সাহিত্যের নয়। তাই দুইয়ের স্বরূপ বিকৃত হয়েছে সংমিশ্রণে। সত্যের উপলব্ধি ও তার কাল্পনিক রূপ রঙ্ ও তুলিতে শোভা বাড়ায় কথা-সাহিত্যের, মতের বিশ্বাস ও তার বাস্তব অন্ধতা ঢঙ্ ও বুলিতে বড় করে প্রচার-সাহিত্যকে। কিন্তু দু'য়ের সংমিশ্রণ অবিমিশ্র না হ'লেও এই বইয়ে রবীন্দ্র-কথা-সাহিত্যের স্বরূপ ঢের বেশী প্রকাশ পেয়েছে আর সেটাই তাঁর বিশিষ্ট দান। রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক লেখা রিয়্যাল মানুষের সন্ধান দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে মানুষের কল্পনার জালে আরও ঢের বেশী ঠাস বুনন দিয়েছে। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি এলার "নারী" ও অতীন্দ্রের "নর" বাস্তবে ঢের বেশী সহজ ব'লে অনিয়মেও নিয়ম হয়ে শ্রদ্ধা পেয়েছে।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর নতুন বইখানি নিবেদন-যুক্ত। কর্ম্মীসঙ্ঘের সহানুভূতি চান তাঁর বর্ণিত কর্ম্মীর পল্লী-সংস্কার স্কীমে (scheme)। মৌলিকতার দাবী তিনি করেন নিশ্চয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজ সংস্কারে গোঁড়ামি ছাড়া অপর কোন সন্ধান দিয়েছেন কিনা সন্দেহ। তবে সুবৃহৎ পাতার গ্রন্থিতে উপন্যাস থেকে সুরু করে পল্লী-সংস্কারের সুচিন্তিত খসড়া যায় ডিটেকটিভ গল্প পর্য্যন্ত কেমন করে সন্নিবেশ করতে পারা

যায় তার হদিস্ দিয়েছেন সত্য। অথচ এতে তার খোয়া কিছু যায়নি, পৈতা, ব্রাহ্মণত্ব, জাতি বিচার, জল অচল, সিঁদুর ও নোয়া, সবশেষে মৃত্যুশয্যায় অনুশোচনা, সাধ্বীর স্ত্রী স্বামীকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে স্বামীর পিতৃপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সবই বজায় আছে। দুর্ব্বল লেখনী, দুর্ব্বলতর ধারণাশক্তি যে দুর্ব্বলতম লেখার সৃষ্টি করেছে তাকে অনায়াসে লক্ষ্য না করা যায় কিন্তু যখন লেখায় ফুটে উঠে ভবিষ্যত ছবি, অন্তরে থাকে ঋষিকল্প আত্মপ্রসাদ তখন তাকে সচেতন করা প্রয়োজন। গল্প ও ঘটনা-বিন্যাস কিছুই চোখে ঠেকে না। চোখে পড়ে শুধু লেখিকার এক অদম্য ইচ্ছা, কেমন করে নায়কের মুখ দিয়ে সময়ে অসময়ে তাঁর নিজের ছকা পল্লী সংস্কারের বিশদ বিবরণটী তাঁর পাঠকেরা শুনতে পান। আজ যদি কোন পল্লীমঙ্গল সমিতি তাদের প্রচার-পুস্তিকা-রূপে লেখিকার বইটীকে ছাপাত, তাহ'লে আমরা খুব খুসী হ'তাম, কারণ সাহিত্যের মধ্যে যে প্রচার-সাহিত্য আছে তা সত্যিকার সাহিত্যিকের।

শ্রীসুধীর বসু।

কলিকাতা পরিচয়—প্রকাশক—অভ্যর্থনা সমিতি, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান অজন্তা প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৬নং মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতি প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের অবগতির জন্য "কলিকাতা পরিচয়" পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকে কলিকাতার ইতিহাস, বিশিষ্ট বাঙ্গালীদিগের জীবনী ও কীর্ত্তিকলাপ, কলিকাতার বিবিধ দর্শনীয় বস্তু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বহু সংখ্যক গ্রন্থাবলী সচিত্র আলোচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় এরূপ পুস্তক এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাতায় বাস করিয়া অনেকে কলিকাতার অনেক খবরই রাখেন না, এই পুস্তক পাঠে বহু তথ্য জানিতে পারা যাইবে।

নাট্য-তরঙ্গ

(ক্ষেমীশ্বর)
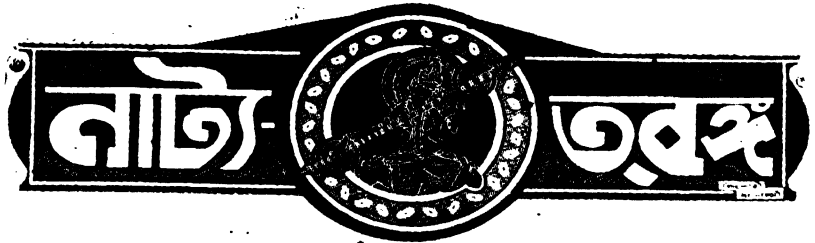
বাঙলায় তিনটি রঙ্গালয়কে কোনো রকমে মেনে নেওয়া যেতে পারে,—নব-নাট্যমন্দির, নাট্যনিকেতন ও রঙ্মহল। এই তিনটিকেই প্রধান ব'লে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু একটি রঙ্গালয়েও বর্ত্তমানে প্রথম শ্রেণীর নাটকের দেখা পাওয়া যায় নি। শুধু মুমূর্ষু অবস্থা কোনো উপায়ে ইন্জেক্সনের জোরে বাঁচিয়ে রাখা ছাড়া অন্য কোনো চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। যেমন—নব-নাট্যমন্দির। "সরমা", "দশের দাবী" প্রভৃতি তথাবাচ্য নাটকের অভিনয় ক'রতে গিয়ে ঐ রঙ্গালয় ঘা' সামলাবার জন্যে শক্তিশালী লেখক শরৎচন্দ্রের দ্বারস্থ হয়েছে। "বিজয়া" আজ নব-নাট্যমন্দিরের থলি ভর্ত্তি ক'রে ম্লান মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলেছে। শরৎচন্দ্রের "দত্তা" উপন্যাসের নাট্য-রূপ "বিজয়া" সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রেছে। প্রথমতঃ তা'র কারণ—"দত্তা"র নামডাক, তারপর অভিনয়ের গুণ। যে শিশির কুমার একদিন অখ্যাত লেখকের দুর্ব্বল রচনা নিয়ে অসম সাহসের পরিচয় দিয়ে গেছেন—সেই শিশির কুমার আজকে সব কয়খানি নাটকে অকৃতকার্য্য হ'য়ে—শুধুমাত্র শরৎচন্দ্রের "বিরাজ বৌ" নাটকে কিঞ্চিৎ সফল হ'য়েছেন—"বিজয়া"তে তো কথাই নাই। তা' হ'লে যুক্তির খাতিরে অবশ্য বল্তে হ'বে শরৎচন্দ্রের নামের জোরে নাটক দু'টি দাঁড়িয়েছে। প্রথমোক্ত নাটকটী "বিরাজ বৌ" এ'টিকে নাটক শ্রেণীভুক্ত করা যায় না, যদিও করা যায়—সে নাটক শুধু [illegible] বিভিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত ও সংলাপে গ্রথিত উপন্যাস মাত্র। নাট্য-রচয়িতার কোনোরূপ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় নি। তবে শিশির কুমারের "নীলাম্বর" ভূমিকার অভিনয় একটি প্রধান দ্রষ্টব্য ব্যাপার ছিল।

তারপর "বিজয়া"। "দত্তা" উপন্যাসে নাটকীয় উপকরণ যথেষ্ট আছে। নাট্যরূপ দেখে আমরা চমৎকৃত হ'তে পারি নি। মামুলি ধাঁচের নাট্য-রচন-রীতি অনুসৃত হ'য়েছে। কেবল মাত্র উপন্যাসের ঘটনাগুলি পরম্পরা রক্ষা ক'রে সোজাসুজি ভাবে গেঁথে দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই হয় নি। "বিজয়া" নাটক "দত্তা" উপন্যাসের নূতন সৃষ্টি বলা যায় না।

আমরা চাই—শিশির কুমারের কাছে—ভালো, নাটক, যা' সত্যই অভূতপূর্ব্ব। কিন্তু তাঁর দানের কৃপণতা লক্ষ্য ক'রে আমরা আজকাল হতাশ হ'য়ে পড়্ছি। অমিত শক্তিধর শিশির কুমার আজ কেন এতোদূর হীনবল হ'য়ে প'ড়লেন—সেই টুকুই আমাদের বিস্ময়ের কারণ।

* * *

রঙ্মহল "বাঙলার মেয়ে"-তে "মহানিশা"র মত সাফল্য অর্জ্জন ক'রতে পারে নি, কারণ একখানি অতি দুর্ব্বল লেখিকার রচনা অবলম্বনে যে নাটক রচিত হয়—তা'র মর্য্যাদা কখনই সাধারণের কাছে মেলে না। তারপর "কাজরী"-র মত একখানি ব্যর্থ গীতি-নাট্য [illegible] -আবাপন্ন লেখক কী [illegible]

নিজেই জানেন না। কেবল শিশুর লোষ্ট্র নিক্ষেপের মত তাঁর বিফল প্রয়াস দৃষ্ট হ'য়েছে; তাই এই পঙ্গু গীতি-নাটিকাকে দাঁড় করাবার জন্যে সৌরীন্দ্র মোহনের ব্যঙ্গ-কৌতুকের টনিক মিক্শ্চার আমদানি করেছেন রঙমহলের কর্ত্তৃপক্ষ। শেষে "নিজস্ব নাট্যকারের" "রাবণ" দশমুণ্ড নেড়ে নিজের অক্ষমতা জানিয়ে দিয়ে গেলো। যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর এই "রাবণ" নাটকটি রচনা-হিসাবে তাঁর কলঙ্ক। শূন্য দম্ভ প্রকাশ ক'রতে গিয়ে এতোখানি বিফলতা আমরা বহুদিন লক্ষ্য করিনি।

রঙমহল শুনচি সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নাট্যসূত্রে গ্রথিত ইন্দিরা দেবীর "স্পর্শমণি" অভিনয়ের ব্যবস্থা ক'রতে মনস্থ হ'য়েছে। বেশ আশাপ্রদ সংবাদ। আশা করা যায়, এ' নাটকটি সাফল্য মণ্ডিত হ'বে। আর একটী "মায়াপুরী"। তবে "মায়াপুরী" মায়ার রাজ্যেই থেকে যাবেন কি না, কে জানে? তবুও একটী কথা এখানে বলা দরকার—সতু সেনের প্রয়োগ-কৌশল হয়তো "মায়াপুরী"-র মায়া সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রতে পারে।

* * *

নাট্য নিকেতন এখন নামজাদা নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের "চক্রব্যূহ" নাটক নিয়েই আসর জমাতে চেষ্টা ক'রেও বিফল হ'য়েছে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য যেদিন "চক্রব্যূহ" নামে একখানি নাটক রচনা ক'রেছেন শুনলুম—আমরা একেবারেই বিস্মিত হই নি। শ্যাম, হরি, যদু যদি নাটক ক'রতে পারে এবং সেই নাটক রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হয়, তা' হ'লে মনোরঞ্জনের মত একজন শিক্ষিত অভিনেতা নাটক লিখতে পারবেন না একথা আমাদের মনে ওঠে নি। ভেবেছিলুম হয়ত' তিনি এতোদিনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলে এই নাট্য-দুর্ভিক্ষের দিনে একখানি সু-নাটক প্রসব ক'রবেন। কিন্তু তিনি "চক্রব্যূহ" রচনা ক'রতে গিয়ে নিজেই ব্যূহের মধ্যে প'ড়ে গেছেন। যে পর্য্যন্ত তিনি মহাকবি ভাস-রচিত "পঞ্চরাত্র" নাটক ("সমবকার" জাতীয়) অনুসরণ ক'রেছেন, ততদূর তিনি এক প্রকার চালিয়ে দিয়েছেন—তারপর ভাসের হাত ছেড়ে দিতে না দিতেই তিনি ঠিক্রে গিয়ে প'ড়েছেন—চরিত্র ও ভাষায় ব্যূহের ভিতর। নাট্যকার আর তাল সাম্লাতে পারেন নি। ভাষার দুর্ব্বলতা ও মুহুর্মুহু ছন্দ-পতন নাটকটিকে অপাংক্তেয় ক'রে তুলেছে। নাটকটি সম্বন্ধে বিস্তারিত সমালোচনা বারান্তরে করা যাবে।

এখন অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই ব'লেই মনে হয়। একটি কথা না ব'লে থাকতে পারলুম না। আমরা জানতুম—অভিমন্যু ছিল বীর পুরুষ। কিন্তু নাট্যনিকেতনের "চক্রব্যূহ" নাটকের শূর-পুঙ্গব ক্লীবত্ব-প্রাপ্ত বৃহন্নলার পুত্র অভিমন্যু ক্লীব-বেশে দেখা দেবে—এ যে আমাদের ধারণার অতীত। অভিমন্যু তো মহাভারত সংহিতায় বা অন্য কোনো সংস্কৃত নাট্যকারের নাটকে অথবা কাশীরাম দাসের মহাভারতে ক্লীব-রূপে চিত্রিত হন নি। "চক্রব্যূহে" কি এটি একটি নূতনত্ব? কিংবা প্রয়োগ-শিল্পীর খেয়ালের অভিব্যক্তি? যাই হোক—"অভিমন্যু"-কে খর্ব্ব করা হ'য়েছে একটী অভিনেত্রীকে ঐ ভূমিকায় নামিয়ে। অভিনেতার কি এতোই অভাব? ক্লীব বৃহন্নলার পুত্র বীর অভিমন্যু ক্লীব-বেশে দেখা দিয়ে আমাদের চোখে পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠেছিল।

* * *

আমরা নিরপেক্ষ সমালোচকের ন্যায়—যে কয়টি মন্তব্য প্রকাশ ক'রলুম হয়তো—যাঁদের উদ্দেশ্য ক'রে বলা হ'য়েছে তাঁরা নিশ্চয় ভালো ভাবেই নিতে পারবেন। আমরা কোনোরূপ বিদ্বেষ না রেখে এই আলোচনা ক'রেছি। কারণ যাঁরা সাধারণের তৃপ্তি বিধানের ভার নিয়েছেন—যাঁরা রঙ্গালয়ের পরিচালক, যাঁরা নাট্যকার তাঁদের 'পরে অনেকখানি দায়িত্ব নির্ভর করে। একথা যেন না তাঁরা বিস্মৃত হন। সব সময়েই মুখরোচক আলোচনা হওয়া সম্ভব নয়।

—

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ১০ই মাঘ, ১৩৪১, 24th January, 1935. { ৪র্থ সংখ্যা

রজত জয়ন্তী ও কলিকাতা কর্পোরেশন

"ব্যক্তিগতভাবে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সুখী হউন, দীর্ঘজীবী হউন, ইহাই কংগ্রেসের আন্তরিক ইচ্ছা; তথাপি কংগ্রেস এই সত্য উপেক্ষা করিতে পারেন না যে, যে শাসন পদ্ধতি ভারতবাসীর নৈতিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সম্রাটকে একান্ত স্বাভাবিকরূপেই সেই শাসন পদ্ধতির প্রতীক বলিয়া মনে করা হয়। এই শাসনের শেষ পরিণতিস্বরূপ এখন এমন একটি শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা হইয়াছে, যাহা পরিবর্ত্তিত হইলে ভারতের এখনও যে কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাও শোষিত হইবে এবং ভারতের রাজনৈতিক অধীনতা পাশ কঠোরতর হইবে। অতএব প্রস্তাবিত উৎসবের অনুষ্ঠানে সকলকে যোগদানের পরামর্শ দেওয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে অসম্ভব।"

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির বিগত অধিবেশনে এই যে সুসংযত প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে তাহাতে দেশবাসীর মনোভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান নির্দ্দেশ গৃহীত হইবার পূর্ব্বেই বাংলায় বৈধানিক কংগ্রেসের মনোনীত মেয়র মিঃ নলিনী রঞ্জন সরকারের নেতৃত্বে কংগ্রেস কাউন্সিলার-অধ্যুসিত কলিকাতা কর্পোরেশন রজত উৎসবে যোগদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন কিন্তু করাচী মিউনিসিপ্যালিটীতে রজত উৎসবে যোগদান প্রস্তাব উপস্থাপিত হইতে পারে নাই কারণ উক্ত সভায় ন্যূনতম নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য উপস্থিত হন নাই। এই বিষয়েই কলিকাতা কর্পোরেশন ও করাচী মিউনিসিপ্যালিটীর কার্য্যক্রমের তারতম্য পরিলক্ষিত হইয়াছে।

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির নির্দ্দেশের পর শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তের ন্যায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কোন পন্থা অবলম্বন করেন তাহা দ্রষ্টব্য। আর বৈধানিক কংগ্রেসের মনোনীত মেয়র মিঃ নলিনী রঞ্জনের কথা উত্থাপন না করাই শ্রেয়ঃ। তিনি অতীতে কোনদিনই কংগ্রেসের কোন নির্দ্দেশ পালন করেন নাই বরং বিদ্রোহিতাই করিয়া আসিয়াছেন। আর এবারে যখন কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন যে "কাহাকেও উৎসবে যোগদান করিতে নিষেধ করিবেন না" তখন ত' নলিনীর আর কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই।

আমরা সম্রাটের শান্তিময় দীর্ঘজীবন কামনা করি। তবে যখন বাংলায় দুই সহস্রাধিক যুবক-যুবতী বিনা বিচারে আবদ্ধ তখন বাংলা কখনই হৃষ্টচিত্তে এই রজত উৎসবে যোগদান করিতে পারে না। সম্রাটের রজত-জয়ন্তীর উৎসবাদির সুযোগ লইয়া যদি কর্ত্তৃপক্ষ বিনাবিচারে আবদ্ধ কর্ম্মীবৃন্দের মুক্তি ঘোষণা করেন তাহা হইলে বাংলায় যে শান্তির আবহাওয়া প্রবাহিত হইবে তাহা রজত উৎসবের সাফল্যের অনুকূল হইবে। আমরা এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চলতি পথে

শ্রীমল্লিনাথ

২৬শে জানুয়ারী

আগামী ২৬শে জানুয়ারী কংগ্রেসের আদেশানুসারে সারা ভারতব্যাপী "পূর্ণ-স্বরাজ" দিবস প্রতিপালিত হইবে। আমাদের কর্ত্তব্য ঐ দিনকে স্মরণীয় করিয়া রাখা যে, সেইদিনে আমরা প্রথম আমাদের জাতীয় দাবী কি তাহা পৃথিবীর বক্ষে দাঁড়াইয়া সগর্ব্বে ঘোষণা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ভারতীয় জনসাধারণ গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, তাহার হিসাব নিকাশের সময় আজও আসে নাই কেননা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে সংগ্রামের সূত্রপাত হইয়াছিল আজও তাহার বিরাম হয় নাই। অন্যান্য প্রদেশের কথা আমরা বিশেষভাবে জানিনা। কিন্তু বাংলা সম্বন্ধে একথা সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। যদি আমাদের প্রশ্ন করা হয় কেন আমরা বাংলাকে বিশেষিত করিলাম, তবে তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিব হিজলী, বক্সা ও দেওলী বন্দী নিবাসের দিকে চক্ষু ফিরাইতে। সেই যে বাংলার কয়েক সহস্র নরনারীকে প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বিনা বিচারে কেবল সন্দেহের বশে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল তাহাদিগের তো আজিও মুক্তি হয় নাই, বরং তাহাদের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। বাংলা কি ইহাদের কোন ক্রমেই ভুলিতে পারে? ভুলিতে পারে না এবং সেইজন্যই বলিতেছি আজও আমাদের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হয় নাই। বাংলা ও বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য শুধু ২৬শে জানুয়ারী যথারীতি সমারোহ সহকারে সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া গত পাঁচ বৎসরের স্বার্থত্যাগ ও শৌর্য্যবীর্য্যের অনাবশ্যক মিথ্যা স্তুতি করিয়া আত্ম প্রশংসা তথা আত্ম-প্রবঞ্চনারূপ মহা পাপে লিপ্ত না হওয়া। সে দিনের কর্ত্তব্য ধীর ও স্থির চিত্তে পুনঃ দীক্ষা গ্রহণ। সেদিন বাঙ্গালীর করণীয় তাহার কর্ম্ম পদ্ধতি বা কর্ম্মনীতিকে কোথায় গলদ তাহার নির্ম্মম আত্মদর্শনের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতীকার করা এবং কর্ম্মক্ষেত্রে পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ। বাঙ্গলার সাধনা ও স্বপ্ন সফল হউক এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

রজত-জয়ন্তী

বর্ত্তমান বর্ষে সম্রাটের ২৫ বৎসর রাজত্ব-কাল পূর্ণ হওয়ায় সাম্রাজ্যব্যাপী এক বিরাট উৎসবের আয়োজন হইতেছে। সংবাদ পত্রে, রাজকীয় ফরমাণে সাড়ম্বরে ঘোষিত হইতেছে, আনন্দ কর, উৎসব কর, সব দুঃখ বেদনা ভুলিয়া যাও সাম্রাজ্যের সকলস্তরে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হউক। দেশে দেশে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনি উঠিতেছে—আনন্দ কর, উৎসব কর। আনন্দের নাম শুনিলে মানুষের মন স্বভাবতঃই হর্ষে নাচিয়া উঠে; ব্যথাতুর বাঙ্গলার মনও চাহে সেই আনন্দের স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিতে। কিন্তু বিবেক-সম্পন্ন বাঙ্গলা ভাবে উৎসব কোথায়, আনন্দ কোথায়। আজ বাঙ্গলার ঘরে ঘরে ক্রন্দন রোল। বাঙ্গলার বহু অন্তঃপুরে অন্নহীনা পুত্র-স্বামী-পিতৃবিচ্ছেদ-কাতরা নারীর বিচ্ছেদ কাতর অন্তরের হতাশার দীর্ঘশ্বাস। তাহাদের মধ্যে আনন্দ কোথায়? তাহাদের মনে উৎসবের প্রেরণা আসিবে কোথা হইতে?

আজ বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসাস্থল বহু যুবক শুধু রাজনৈতিক কারণে সন্দেহভাজন বলিয়া বিনা বিচারে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দী। বহু যুবক ক্ষণিকের উত্তেজনার বশে একটা রাজনৈতিক অপরাধের জন্য কারান্তরালে তাহাদের ভাগ্যের ফল ভোগ করিতেছে। তাহাদের মনে, তাহাদের বিচ্ছেদ-কাতর আত্মীয় স্বজনের মনে আনন্দ যদি না আসে, তাহারা যদি আনন্দ করিতে না পারে, তবে এই "জয়ন্তীর" উৎসব থাকিয়া যাইবে অসম্পূর্ণ। এমন অনেক সংসার আছে যেখানে হয়তো বৃদ্ধ পিতার একমাত্র পুত্র আজ রাজরোষে পতিত হইয়া কিম্বা একটা ভুল করিয়া দণ্ডভোগ করিতেছে। বাঙ্গলার এমন অনেক সংসার আছে—দুঃখীর সংসার সন্দেহ নাই যেখানে একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ আজ বিনা বিচারে বন্দী, অথবা আদালতের বিচারে দণ্ডিত; তাহাদের সংসার আর সংসার নাই—হইয়া পড়িয়াছে শ্মশান। এ শ্মশানে কি আনন্দের স্রোত বহিতে পারে?

নিজেকে প্রশ্ন করি, সম্রাটের "রজত জয়ন্তী"—ইহাতে বাঙ্গলা কি আনন্দ করিবেনা? শাসন কর্ত্তাদের নিকট আবার প্রশ্ন করি, ইহাদের সংসারে আনন্দ দান করিতে কি তাঁহাদের কোন কর্ত্তব্য নাই?

কর্ত্তব্য যথেষ্ট আছে। কিন্তু সে কর্ত্তব্য পালন করিতে যতটা উদারতার পরিচয় দেওয়ার আবশ্যক তাহার আশা আমরা শাসিত-জাতি শাসক-শক্তির নিকট হইতে পাইতে পারি কি? আজ "জয়ন্তীর" উৎসব সম্পূর্ণ করিতে হইলে আবশ্যক শাসক-শক্তির হৃদয়ের পরিবর্ত্তন। ভারতীয় রাজনীতি আজ নিয়ম-তান্ত্রিকতার পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে। ভারতের সকল প্রকার চরমপন্থী আন্দোলন আজ একেবারে

নৈরাশ্যজনকভাবে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। এ সময় এবং সম্রাটের সাম্রাজ্য শাসনের "রজত জয়ন্তী" উৎসবের বিশেষ ক্ষণে শাসক-শক্তির হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং হৃদয়ের এই পরিবর্ত্তনের পরিচয় প্রদান করা হইবে যদি General Amnesty ঘোষিত হয়।

আমরা আশা করি ভারত সরকার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী এবং বিনা বিচারে আটক বন্দীদিগকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিবেন, এবং বৃটিশ-সাম্রাজ্যের কলঙ্ক স্বরূপ চরম অস্বাস্থ্যকর আন্দামানের সেলুলর বন্দী-নিবাস চিরতরে উঠাইয়া দিবেন। বাঙ্গলার বন্দী যুবকগণ মুক্ত হইলে তাহারা আবার তাহাদের শ্মশান সমতুল সংসারে শান্তি ফিরাইয়া আনিলে বাঙ্গলা আনন্দিত হইবে, বাঙ্গলার উৎসব সার্থক হইবে—"রজত জয়ন্তী"ও সার্থকতার গৌরবে সমুজ্জ্বল হইবে।

আমাদের স্বপ্ন সফল হউক, এই মাহেন্দ্র-ক্ষণে শাসক-শক্তির হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হউক এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

সার সমস্যার সমাধান

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর দীর্ঘ ১৫ বৎসর ধরিয়া সার প্রদেশের উপর যে অবিচার চলিয়াছে, তাহার অবসান হইয়াছে। এই প্রদেশকে এতকাল তাহার মাতৃভূমি জার্ম্মাণী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল। সন্তানহারা জননী যেন এতদিন পরে তাহার হারানিধি বুকে ফিরিয়া পাইল—অন্ততঃ সার প্রদেশের সার্ব্বজনীন ভোট গ্রহণ অন্তে জার্ম্মাণীতে যেরূপ উল্লাস স্রোত বহিয়া গিয়াছে তাহাতেই এই উপমা মনে আসে।

সে আজ ১৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা—ইউরোপের কুরুক্ষেত্রে তখনও অস্ত্র-ঝনৎকার থামে নাই। শক্তি-মদমত্ত রাষ্ট্র সকল তখনও দুর্ব্বল শক্তির গলা চাপিয়া ধরিয়া আছে, পরস্পর হানাহানিতে সকলেই মত্ত। এই যখন অবস্থা, তখনকার ইউরোপীয় শান্তিকামী মনীষিবৃন্দের চেষ্টায় কোন রকমে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হইল এবং অবশেষে ভার্সাই সন্ধির পরে সেই ভয়ানক কুরুক্ষেত্রের অবসান করিয়া রণোন্মত্ত ইউরোপ অস্ত্র সম্বরণ করিলেন। বহু বৎসর পরে ইউরোপে আবার শান্তির আবহাওয়া ছুটিল। কিন্তু উহা সত্ত্বেও সেই শান্তি হইল কাল, সার প্রদেশ সেই সন্ধি অনুসারে মাতৃ-অঙ্ক জার্ম্মাণী হইতে হইল বিচ্ছিন্ন। পরাজিত হীনবল জার্ম্মাণী খণ্ডিত অঙ্গ হইয়া শিরে পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা বহন করিয়া ঘরে ফিরিল।

বিশ্ব-রাষ্ট্র সঙ্ঘের ইচ্ছামত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। সন্ধির সর্ত্ত এই হইল যে জার্ম্মাণী তাহার রাজ্যের তিনটী প্রদেশ হারাইবে। জার্ম্মাণ রাজ্যের অন্তর্গত লোরেন ও আলসাস প্রদেশ ফরাসীর হাতে তাহাদিগকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং সার প্রদেশ যাইবে বিশ্ব-রাষ্ট্র সঙ্ঘের কর্ত্তৃত্বাধীনে। রাষ্ট্র-সঙ্ঘের ইচ্ছামত কাজ হইল। সঙ্ঘের মনোনীত ৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত এক কমিটীর হস্তে সার প্রদেশের শাসনভার অর্পিত হইল। সে গত ১৯২০ সনের কথা।

সার প্রদেশে জার্ম্মাণ অধিবাসীর সংখ্যা মোট জনসমষ্টির শতকরা ৯৫ জন। ইহারা রোমান ক্যাথলিক। ৭৩৭ বর্গমাইল ভূভাগের মায়া জার্ম্মাণী যে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে তাহা নয়। কিন্তু তখন জার্ম্মাণীর সে শক্তি কোথায় যে, ভার্সাই সন্ধি উপেক্ষা করিবে?

যাহা হউক, এই সময় ফরাসী আবদার ধরিল, জার্ম্মাণ যুদ্ধে সে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং সার-এর অধিবাসীর কিছু অংশ ফরাসী, কাজেই সার ন্যায়তঃ তাহারই প্রাপ্য। ফরাসীর এই আবদার রাষ্ট্র-সঙ্ঘের তদানীন্তন সভাপতি মিঃ উইলসন তখন মোটেই কানে তোলেন নাই, কারণ, ঐ প্রদেশটীর উপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেরও ছিল লোলুপ দৃষ্টি। কিন্তু ফরাসীর ঐ আবেদন অগ্রাহ্য হইলেও সারের খনি অঞ্চলের বন্দোবস্ত পাইল ফ্রান্স। সেই হইতে খনি অঞ্চলের অধিকার সে নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতেছে।

রাষ্ট্র-সঙ্ঘ যখন সার সম্পর্কে বিলি বন্দোবস্ত করিয়াছিল সেই সময় ঠিক হয় যে ১৫ বৎসর পরে সার প্রদেশে সার্ব্বজনীন ভোট গ্রহণ করা হইবে এবং সেই সময়ে ঐ প্রদেশের অধিক সংখ্যক অধিবাসী যদি ফ্রান্স অথবা জার্ম্মাণীর অঙ্গীভূত হইতে চাহে তাহা করা হইবে। সেই চুক্তি অনুসারে ১৯৩৫ সালে ঠিক ১৫ বৎসর পরে সারে সার্ব্বজনীন ভোট গৃহীত হইয়াছে। ভোট গ্রহণের কিছুকাল পূর্ব্বে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট হিটলারী শাসনের নিন্দা করিয়া সার প্রদেশে জোর প্রচার কার্য্য চালাইয়াছিল এবং জার্ম্মাণীও অবশ্য তাহার পালটা জবাব দিতে ছাড়ে নাই। ইহাতে অবস্থা ক্রমশঃই জটিল হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া রাষ্ট্র-সঙ্ঘ ব্যবস্থা করেন, ভোট গ্রহণ সম্পর্কে কোন রাষ্ট্র কোনরূপ প্রচার কার্য্য চালাইতে পারিবে না। এমন কি, ভোট গ্রহণ স্থল হইতে ভোট দিয়া ফিরিবার সময়ও কোন দিকে ভোট দিল সে কথাও কেহ কাহাকেও বলিতে পারিবে না। গত ১৩ই জানুয়ারী ভোট গ্রহণ শেষ হইয়াছে। সারের শতকরা নব্বই জনেরও অধিক জার্ম্মাণীতে ফিরিবার পক্ষে ভোট দিয়াছে, ফরাসীর পক্ষে ভোট হইয়াছে শতকরা অর্দ্ধজনেরও কম। কাজেই রাষ্ট্র-সঙ্ঘ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন যে, অতঃপর সার জার্ম্মাণীর অঙ্গে স্থান পাইবে। জার্ম্মাণী খণ্ডিত দেহাংশ ফিরিয়া পাইয়া তাহার বিগত সোয়া এক যুগের অপমান ভুলিতে পারিবে কি না জানি না, তবে আমাদের মনে হয়, জার্ম্মাণী তথা সারের উপর রাষ্ট্র-সঙ্ঘ এতকাল যে অবিচারের বোঝা চাপাইয়া রাখিয়াছিল, এবার তাহার অবসান হইল। অবশ্য সারের খনি অঞ্চলে যেখানে ফরাসীরা সুখের ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপিয়া বসিয়াছিল, সেই অংশ ভোগ

করিতে ফরাসীকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ছাড়িয়া দিতে জার্ম্মাণী বাধ্য থাকিবে এবং আগামী মার্চ্চ মাসে সার জার্ম্মাণী সম্ভবতঃ ফিরিয়া পাইবে। এতৎসত্ত্বেও জার্ম্মাণী সার ফিরিয়া পাওয়ায়, সারের জনমতের দাবী রক্ষিত হওয়ায় ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিতে একটা আদর্শ স্থাপিত হইল এবং বিশেষ করিয়া ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক মণ্ডলের একটা গুরুতর সমস্যার সমাধান হইল। ইউরোপের পক্ষে এটা খুবই আনন্দের বিষয়। আর সব্বাপেক্ষা বেশী বোধ হয় আনন্দিত হইল সার—মাতৃহারা যেন মাতৃক্রোড় ফিরিয়া পাইল।

ইনি আবার কে?

লণ্ডনের এক স্বয়ংসিদ্ধ পুরুষ ডেলী মেলে এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই পত্রে বৃটিশ সরকারকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের কথা না ভোলেন, যাঁহারা ভারতীয় মহাজন ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শোষিত হইতেছে। তিনি বৃটিশ সরকারকে নবদেবেন মন্ত্র শিখাইয়াছেন যে দৃঢ় হস্তে ও স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া ভারতবর্ষকে শাসন করিতে হইবে এবং ভারতের শাসন ক্ষমতা বাক্য-বাগীশ ভারতীয় নেতাদের হস্তে যেন অর্পণ না করা হয়। তিনি চাহেন যে, বৃটিশ সরকার দৃঢ়হস্তে ভারত শাসন করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা করিবেন; কারণ তিনি আশঙ্কা করেন, এইরূপ শাসন না করিলে বৃটীশ সাম্রাজ্য ভারতবর্ষকে হারাইবে এবং তাহার পরিণতি বৃটেনের পৃথিবীতে একটী তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হওয়া। স্যার অসওয়াল্ড যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের প্রভুদেরও মনের কথা কি না জানি না, এবং দৃঢ় হস্তে ভারত শাসন করিতে হইলে ভারতবর্ষকে আরও কতটা দুর্দ্দশার অধম সীমায় পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, তাহা স্যার অসওয়াল্ড মোস্‌লে বলেন নাই। যাই হোক, ভারতের এই পরম হিতাকাঙ্ক্ষীটা কে? ইনি কি মুসোলিনির নবতম মন্ত্রশিষ্য ইংরেজ ফ্যাসিষ্ট মোসলে?

স্বেচ্ছাচারিতা নয় কি?

বোম্বাই সরকার আবার হঠাৎ অকারণে উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন? তাঁহারা বহু গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতটী ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত নহে এবং ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায় ঐ সঙ্গীতটীকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করে নাই। কাজেই উহা হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছুই নয়। জাতীয় পতাকা সম্পর্কেও উপরোক্তরূপ ইস্তাহার জারী করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট সরকারী কর্ম্মচারীগণের উপর আদেশ দিয়াছেন যে তাঁহারা যেন "বন্দে মাতরম" সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার উপর কোন রকম সম্মান প্রদর্শন না করেন। জাতীয়-সঙ্গীত যখন গীত হইবে, তখন যেন তাঁহারা উঠিয়া না দাঁড়ান এবং সম্ভব হইলে সভাস্থল ত্যাগ করেন। জাতীয় পতাকা ভারতের জাতীয়তার প্রতীক নহে এবং জাতীয় সঙ্গীত ভারতের সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই, এই অভিনব তথ্য বোম্বাই সরকার কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন? আর সরকারী কর্ম্মচারীদিগের উপর এই প্রকার যুক্তিহীন আদেশ দিয়া শুধু ইহাই কি দেখানো হইল না যে গভর্ণমেণ্ট যেহেতু সর্ব্বশক্তিমান সেই হেতু তাঁহার স্বেচ্ছাচারের ক্ষমতা আছে? ভারতের জনসাধারণের মনে অনর্থক শাসন কর্ত্তাদের প্রতি বিরুদ্ধভাব জাগাইয়া দিয়া বিশেষ কিছু লাভ হয় কি?

গোপন সার্কুলার

গান্ধিজীর পল্লী-সংগঠন সঙ্ঘের প্রস্তাব যে গভর্ণমেণ্ট সুদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই এবং এখন হইতেই সংগঠনের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জল্পনা কল্পনাও যে চলিতেছে তাহা কোন "বিশ্বাসঘাতক রাজকর্ম্মচারী" প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ইউনাইটেড প্রেস প্রমুখ কয়েকটী সংবাদ সংগ্রাহক সঙ্ঘ এই বিশ্বাসঘাতক রাজকর্ম্মচারীর মারফৎ জানিতে পারিয়াছেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্টের হোম সেক্রেটারী মিঃ হালেট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট গুলির উপর এই মর্ম্মে এক অতি গোপনীয় সার্কুলার জারী করিয়াছেন যে, গান্ধিজীর পল্লীসংগঠন প্রস্তাবের মধ্যে এমন মনোবৃত্তি লুকাইয়া আছে যাহার ফলে তিনি যে কোন মুহূর্ত্তে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন অধিকতর ব্যাপকভাবে আরম্ভ করিতে পারেন এবং এইবার আইন অমান্য আরম্ভ হইলে ঐ তথাকথিত পল্লীসংগঠন কার্য্যের ফলে ভারতের পল্লীবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়া পূর্ব্বের অপেক্ষা সহজ হইবে। কাজেই এখন হইতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহের কর্ত্তব্য গান্ধিজীর পরিকল্পিত কার্য্যপদ্ধতির উপর প্রখর দৃষ্টি রাখা। এই কার্য্য যাহাতে দ্রুত অগ্রসর হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবার ইঙ্গিতও এই সার্কুলারে আছে।

মিঃ হালেটের এই গোপন সার্কুলার অবশ্য আর গোপন রহিল না। গোপন ইস্তাহারের কথা যদি সত্য হয়—এবং সত্য হইবার কথা, কারণ, গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে আজিও ইহার প্রতিবাদ হয় নাই—তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের এই মানসিকতা যে কোন মনোবৃত্তির ফলে উদ্ভূত তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। গান্ধীর পল্লীসংগঠনের সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টও পল্লীর দুঃখের দরদী সাজিয়াছিলেন। তাঁহারা ঠিক করেন গান্ধীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, এইরূপভাবে পল্লীসংগঠনের স্কীম তৈয়ারী করিতে হইবে। গান্ধিজী আপোষপন্থী; তিনি গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, আমাদের উভয় দলের উদ্দেশ্য যখন একই, তখন গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিতে পারেন এবং গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলে সব কাজই অতি সহজসাধ্য হইয়া পড়িবে। গভর্ণমেণ্ট গান্ধিজীর এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলেন। উপরন্তু এই

আদেশ হইল যে, গান্ধিজীর পল্লীসংগঠন সমিতি কোন সরকারী গৃহে স্থাপিত হইতে পারিবে না এবং সরকারী এলাকার মধ্যে কোন সভা-সমিতি করিতে দেওয়া হইবে না। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট এই সার্কুলার অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু ইস্তাহার প্রকাশের মূলীভূত কারণ সম্পর্কে উহার কর্ত্তারা কি একবারও সুবিবেচনার সহিত ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন? গান্ধিজী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত করিয়াছিলেন ইহার সার্থকতার সম্ভাবনা নাই বলিয়া। তিনি একথাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার পল্লীসংগঠন স্কীমের সহিত কোন রাজনৈতিক সংশ্রব নাই, ইহা নিছক পল্লীর মঙ্গল সাধনের ভিত্তিতে গঠিত। তবুও গভর্ণমেণ্ট কোথা হইতে যে ইহার মধ্যে ভীষণ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা আবিষ্কার করিলেন এবং ইহার আবিষ্কর্ত্তা সেই উর্ব্বর মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মহাপুরুষটী কে, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে অক্ষম। কিন্তু, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে গভর্ণমেণ্ট অহেতুক আতঙ্কগ্রস্ত। ভারতের রাজনৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘ অ-রাজনৈতিক যে কোন কাজই করুন, গভর্ণমেণ্ট তাহাতে আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, ভারত গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে এমন কোন লোক নাই কি, যিনি সরকারের এই অকারণ আতঙ্ক বিদূরিত করিতে পারেন?
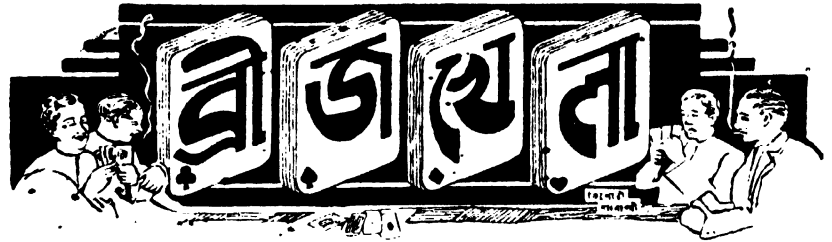
ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা

সমস্যার উত্তরঃ—

উ:
ইস্কাবন—nil
হরতন—সাহেব, বিবি
রুহিতন—৫
চিঁড়িতন—বিবি, ১০, ৯, ৫

প:
ইস্কাবন—৮, ৭, ৬, ৫
হরতন—গোলাম, ৫
রুহিতন—nil
চিঁড়িতন—গোলাম

পূ:
ইস্কাবন—সাহেব, ১০
হরতন—nil
রুহিতন—১০
চিঁড়িতন—৮, ৭, ৬, ৪

দ:
ইস্কাবন—গোলাম, ৯, ৩
হরতন—nil
রুহিতন—গোলাম
চিঁড়িতন—টেক্কা, সাহেব, ৩

হরতন রঙ, 'দ' খেল্‌বে; 'উ' এবং 'দ' সম্মিলিত হস্তে সব ক'খানি পিট পেতে হবে।

'দ' ছোট চিঁড়িতন খেল্‌বে; 'উ' বিবি দিয়ে পিট নিয়ে, হরতনের সাহেব, বিবি খেলে 'প'র রঙ দু'খানা বার্ করে নেবে; 'পূ' রুহিতনের দশ ও ইস্কাবনের দশ পাস দিয়ে যাবে এবং 'দ' প্রথমে চিঁড়িতনের সাহেব এবং পরে রুহিতনের গোলাম পাস্ দিয়ে যাবে।

'উ' এখন রুহিতনের পাঞ্জা খেললেন; যদি 'পূ' চিঁড়িতন দিয়ে যায়, 'দ' চিঁড়িতনের টেক্কা দেবে। যদি 'পূ' ইস্কাবনের সাহেব দেয়, 'দ' ইস্কাবন দেবে এবং চিঁড়িতনের পিট ও ইস্কাবনের পিট দু'খানি নেবে।

হাবড়ার শ্রীবারীন্দ্র নাথ পাণ্ডে আমাদের সমস্যার নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন।

একের ডাকে খেঁড়ীর জবাব (রঙের ডাকে)ঃ—ডাকদার (call opener) মুখ খুললে প্রতিপক্ষ কিছু বলুন আর নাই বলুন খেঁড়ীর পক্ষে নিম্নলিখিত তিনটী পথ খোলা।

(১) পাস দেওয়া (২) ডাকদারের ডাক বাড়িয়ে দেওয়া (৩) অন্য কিছু ডাকা। আর প্রতিপক্ষ যদি ডাক দেন তবে খেঁড়ী

হয় 'ডবল' বা 'রিডবল' করতে পারেন। কিরূপ হাতে কি ডাক দেওয়া উচিত তা' নিয়ে বল্‌ছি।

(১) পাস দেওয়া ঃ—খেঁড়ী এ ডাক দিলে ডাক্‌দার বুঝবেন যে 'গেমের' আশা নাই। এ ক্ষেত্রে ডাকের যোগ্য হাত থাকা সত্ত্বেও পাস দিলে ক্ষতির সম্ভাবনা। আবার পাসের হাত থাকা সত্ত্বেও ডাক দিলে খেসারৎ (Penalty) অবশ্যম্ভাবী। তাই খেঁড়ীর পক্ষে খুব সাবধানতা সহকারে হস্তমূল্য নির্ণয় করা উচিত। নিম্নলিখিত 'হাত' থাকলে খেঁড়ী এ ক্ষেত্রে পাস দিতে পারেন।

(অ) যদি তাঁর হাতে একখানির কিছু বেশী অনারের পিট থাকে এবং ডাকদারের ডাক্ বাড়াবার উপযোগী রঙ না থাকে কিম্বা অন্য কোন ডাকের যোগ্য রঙ না থাকে।

(আ) যদি তাঁর হাতে একটি খুব সাধারণ ডাকের যোগ্য রঙ থাকে এবং একখানির কম অনারের পিট থাকে।

এই হল সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যদি খেঁড়ীর হাতে আধখানি অনারের পিট এবং হরতন বা ইস্কাবন যে কোন রঙের ছয়খানি তাস থাকে তবে তিনি উক্ত রঙ ডাকতে পারেন। কিম্বা তাঁর হাতের বিভাগ যদি খুব ভাল থাকে আর হাতে মাত্র আধখানি অনারের পিট থাকে তবেও তিনি ডাক দিতে পারেন। মনে করুন, আপনার খেঁড়ী বলেছেন একখানি হরতন, আপনার প্রতিপক্ষ পাস দিয়েছেন আর আপনি নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার হাত পেয়েছেন।

(ক) ইস্কাবন—আটা, সাতা, চৌকা; হরতন—দশা, সাতা, তিরি; রুহিতন—নয়, তিরি, দুরি; চিঁড়িতন—টেক্কা, গোলাম, তিরি, দুরি।

(খ) ইস্কাবন—নয়, আটা; হরতন—সাতা, চৌকা, তিরি; রুহিতন—সাহেব, দশ, সাতা, চৌকা, দুরি; চিঁড়িতন—আটা, সাতা, পাঞ্জা।

(গ) ইস্কাবন—আটা, দুরি; হরতন—বিবি, নয়, সাতা, দুরি; রুহিতন—নয়, আটা, সাতা; চিঁড়িতন—সাহেব, দশ, সাতা, তিরি।

(ঘ) ইস্কাবন—বিবি, দশ, নয়, আটা, তিরি, দুরি; হরতন—সাতা, দুরি; রুহিতন—সাহেব, সাতা, দুরি; চিঁড়িতন—তিরি, দুরি।

(ঙ) ইস্কাবন—গোলাম, সাতা, পাঞ্জা, চৌকা, দুরি; হরতন—সাতা, চৌকা; রুহিতন—সাহেব, নয়, আটা, ছক্কা, পাঞ্জা, চৌকা; চিঁড়িতন—nil.

(ক) ও (খ) হাতে আপনার পাস দেওয়া উচিত। (গ) এ হাতে আপনার ডাক হচ্ছে 'দুইখানি হরতন' (ঘ) এ হাতে আপনার ডাক দেওয়া উচিত 'একখানি ইস্কাবন' এবং (ঙ) এ হাতে আপনার ডাক হবে 'দুইখানি রুহিতন'। (গ), (ঘ), (ঙ) সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে বল্‌ছি। (ক) ও (খ) সম্বন্ধে আগেই বলেছি যে এ হাত দুটি উপরে লিখিত (অ), (আ) পর্য্যায়ভুক্ত।

(২) ডাকদারের ডাক বাড়ান ঃ—'ক' 'একখানি হরতন' ডাক্‌লে তাঁর খেঁড়ী 'খ' যদি 'দুইখানি হরতন' ডাকেন তবে বুঝ্‌তে হবে যে তাঁদের মিলিত হস্তের খেলায় হরতনই সব চেয়ে ভাল রঙ এবং অন্য রঙ অন্বেষণ করবার দরকার নাই। 'খ' এর ডাক বাড়ানোর উপর তাঁর হাতের পরিচয় নির্ভর করছে। তিনি যদি মাত্র 'দুইখানি হরতন' ডাকেন তা' হ'লে বুঝতে হবে তাঁর হাত অতি সাধারণ (উপরে লিখিত (গ) উদাহরণ দেখুন) কিন্তু তিনি হরতন রঙে খেলতে চান্। হাতে একখানি অনারের পিট এবং সমর্থন-যোগ্য রঙ (Normal Trump Support) থাক্‌লেই এ ডাক দেওয়া যেতে পারে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে সমর্থন-যোগ্য রঙ কা'কে বলে? কোন রঙের একটি ডাক হলে তাঁর খেঁড়ীর হাতের বিবি, তিরি, দুরিকে 'নিম্নতম সমর্থন-যোগ্য রঙ' (Minimum Trump Support) বলা হয়। এর বেশী যত থাকে তত ভাল। খেঁড়ীর হাতের সাহেব, দুরিকে সমর্থন যোগ্য রঙ ধরা হয় না, কারণ ডাক্‌দার চারখানি রঙেও ডাক দিতে পারেন। সেজন্য কোন রঙের সাহেব, দুরি থাক্‌লে খেঁড়ীর পক্ষে সে রঙ প্রথমবার সমর্থন করা উচিত নয়। তবে যদি ডাকদার দ্বিতীয়বার সেই রঙ ডাক দেন তা' হ'লে খেঁড়ী সাহেব দুরি নিয়ে সে ডাক বাড়াতে পারেন (অবশ্য যদি পর্য্যাপ্ত অনারের পিট হাতে থাকে)।

'ক' 'একখানি হরতন' ডাকলে 'খ' যদি 'তিনখানি হরতন' ডাকেন তা' হ'লে বুঝতে হবে যে তাঁর হাতে দুইখানি বা তার বেশী অনারের পিট আছে এবং তাঁর হাতের বিভাগ খুব ভাল। এ ক্ষেত্রে 'ক' যদি মাত্র সাধারণ আড়াইখানি অনারের পিট এবং মাত্র চারখানি রঙ নিয়ে ডাক দিয়ে থাকেন এবং তাঁর হাতের বিভাগ যদি খুব খারাপ হয় (অর্থাৎ ৪, ৪, ৩, ২, বা ৪, ৩, ৩, ৩) তবেই তিনি পাস দিতে পারেন, না হ'লে 'গেম' ডাক দেওয়া তাঁর অবশ্য কর্ত্তব্য। খেঁড়ী যদি দুইখানি ডাক বাড়িয়ে দেন তা' হ'লে বুঝতে হবে যে তাঁর হাতে অন্ততঃ পাঁচখানি খেলার পিট আছে।

আবার খেঁড়ী যদি তিনখানি ডাক বাড়ান (অর্থাৎ 'ক'র একের ডাকে 'খ' যদি চারখানি হরতন ডাক দেন) তবে বুঝতে হবে যে তাঁর হাতে অন্ততঃ ৬ খানি খেলার পিট বর্ত্তমান এবং তাঁর অনারের পিটও আড়াইখানি বা তার বেশী। এক্ষেত্রে 'স্লাম' (Slam) এর আশা আছে।

আবার খেঁড়ী যদি চারখানি ডাক বাড়ান অর্থাৎ একের ডাকে পাঁচখানি ডাক দেন তবে 'স্লামের' সম্ভাবনা হয়তো হতে পারে কিন্তু কালবার্টসন্ নিয়মে এভাবে সাধারণতঃ ডাক বাড়ান হয় না। তার জন্য অন্য রকম ডাক আছে। সে কথা 'স্লাম' সম্বন্ধে

চলন্তিকা

(সুইন্‌বার্ণ) শ্রীবসন্ত কুমার ঘোষাল

জীবন-পথে চলার তালে এমন সময় আসে,
সকল অভাব, গ্লানি যখন এক নিমেষে নাশে ;
মানব-মনের অপূর্ণতা,
কতই আশা মিট্‌ল না তা,—
পায় যেন সব সার্থকতা—সুখের আলো হাসে ;
সকল চাওয়া-পাওয়ার হিসাব পলায় কোথায় ত্রাসে।

শিল্পী যদি পটের উপর আঁক্‌তো নাকো ছবি,
কাব্যে যদি রূপের প্রকাশ করতো নাকো কবি,—
তবু ধরার রূপের বিভা
জ্বল্‌তো এমন রাত্রি দিবা ;
রূপ-মাধুরী ছড়িয়ে দিতো কুঞ্জ, কানন সব-ই,
তেমনি আলো বিলিয়ে দিতো চন্দ্র, তারা, রবি।

এই যে সকল নিমেষ আসে মধুরতায় ভরে,—
বিশ্ব যখন রূপের ডালি উজাড় করে ধরে,
শক্তি যদি মনের কোণে,
রইতো না এ'র রসগ্রহণে,
এ মাধুরীর মূল্য ধরা পড়তো কেমন করে ?
ব্যর্থ হোত সব আয়োজন রসজ্ঞদের তরে।

কালের সাথে মিলায় কত মূর্ত্তি ছায়ার মত,—
মানুষ তাদের সজীব করে তুল্‌তে নিতুই রত ;
আসন পাতে গোপন প্রাণে,
অর্থ জোটায় ছন্দে, গানে ;
স্থায়ী তাদের প্রভাবগুলি হয় যে হৃদয় গত,—
চপল ক্ষণের উপেক্ষাতে নইলে হোত হত।

দিন চলে যায়, রয় না বসে কান্নাহাসি ভরা—
অসীম-মাঝে তলিয়ে পড়ে, দেয়না সেগো ধরা !
যায় মিলিয়ে স্বপ্ন শেষে,
স্রোতের তালে যায় যে ভেসে,
একটুখানি চপল হেসে, হিয়া পাগল-করা,—
আত্মা থাকে সাক্ষী তাহার এড়িয়ে মরণ জরা।

স্থায়ী আসন হয় যা' পাতা চিন্তারাশির মাঝে,
কাব্যে এবং কথায় যখন প্রকট হয়ে রাজে,—
সর্ব্বগ্রাসী সময় তারে
ধ্বংস তখন করতে নারে ;
আঘাত দিলে স্মৃতির দ্বারে, মধুর-ধ্বনি বাজে !
আকাশ ভুবন ভুলায় নয়ন মধুর মোহন সাজে।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যের সঙ্গে যথাস্থানে জানাব।

"To err is human" :—গত ১৩ই জানুয়ারী রবিবারের অমৃত বাজার পত্রিকায় মিঃ Two No Trumps লিখেছেন যে ভ্রমবশতঃ তিনি নাকি মুরারি বসুর পরিবর্ত্তে বিমান মিত্রের সুখ্যাতি করেছেন। তিনি আরো বলেন যে বিমান মিত্র একজন ভালো খেলোয়াড় এবং তাঁর বিষয়ে যা' বলা হয়েছে তা' সর্ব্বতোভাবে প্রযুজ্য, তবে কিনা এক্ষেত্রে মুরারি বসুর বদলে বিমান মিত্রের নাম দেওয়া ভুল হয়েছে। 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ'—তা' ঠিক, কিন্তু ইনি তো কখনও ভুল করে আমাদের ক্যাব্‌লা কলুর নাম তাঁর কাগজে ছাপান্ না ; তবে বিনা কারণে লোকবিশেষের সুখ্যাতি করেন কেন ? আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু ক্যাব্‌লা বলেন যে ইনি নাকি মটর দেখ্‌লেই একটু বিহ্বল হয়ে পড়েন,—আশৈশব মটরের নম্বর, মার্কা, তাঁর স্বত্ত্বাধিকারীর নাম মায় চালকের নাম পর্য্যন্ত মুখস্থ রাখা অভ্যাস ছিল এবং সে অভ্যাস নাকি এখনও যায়নি এবং সেজন্যই তাঁর লেখার মধ্যে মটরের স্বত্ত্বাধিকারীর নাম প্রায়ই এসে পড়ে। যা' হোক্ পূর্ব্বে যদি জানতাম যে তাঁর মটর দুর্ব্বলতা আছে, তা' হলে আর তাঁকে মিছামিছি আঘাত করতাম না।

বিবিধ

বিধানের নবকলেবর

বিধানচন্দ্র পতিগিরি পরিত্যাগ করার পরই আমাদের কমলদা লরেটোর সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। চাণক্য কিরণ শঙ্কর ঢাকুরিয়ার লেকের আশে পাশে দ্বিপ্রহরে মোটরে পরিভ্রমণে রত হইয়াছেন। ব্যারিষ্টার সুধীর রায়ের ব্রজমাধুরী সঙ্ঘে যোগদান করিয়া বিধানচন্দ্র বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রকাশ এবং বি, পি, সি, সিকে ব্রজমাধুরী সঙ্ঘে পরিণত করিবার জন্য এক প্রস্তাব শীঘ্রই নাকি উপস্থাপিত করা হইবে। বিধানচন্দ্রের এই নবরূপ পরিগ্রহণের পর উচ্ছ্বাসভরে আমরা গাইব ঃ—

"দেখ দেখ আসি যত নদেবাসী
মোদের গৌরাঙ্গ চাঁদে"

গোঁসাইজীর গোঁসা

দোস্ত নিশীথচন্দ্রের অপেক্ষায় বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ গোঁসাইজী নিরালায় বসিয়া আক্ষেপ করিতেছেন ঃ—

"আর কতকাল রইব বসে·········

এমন সময় কলসন্ সাহেবের পরোয়ানা আসিয়া হাজির এবং গোসাইজীর ধ্যান ভঙ্গ হইল।......পরদিন সন্ধ্যায়—নাকে খত দিয়া ফিরিয়া আসিয়া গোসাইজী সোমরসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন।

"আসিবে সেদিন আসিবে!"

"এত আশা দিয়ে নিরাশ করিলে মোরে"—স্যার জর্জ্জ সুষ্টার কত আশা দিয়াছিলেন যে নলিনীকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার মনোনীত করিবেন। নলিনী সেই আশায় বি, পি, সি, সিতে সরকারী দূতরূপে বিরাজ করিতেছিল আর কোথা হইতে গ্রীগ্ সাহেব তাহার আশা নির্ম্মূল করিয়া বদ্রীদাসের বদনে হাসি ফুটাইলেন। তবে নলিনী সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। গোসাইজীকে মার খাওয়াইলেও গ্রীগ্ সাহেবকে নলিনী ভূরিভোজে পরিতুষ্ট করিয়াছে। নলিনী এখনও আশা করে ঃ "আসিবে সেদিন আসিবে যেদিন প্রভাতে নবীন তপন শ্রীহীন নলিনীকে স্যাররূপে অভিবাদন করিবে।

তুষারদা না হাণ্ডদা ?

আমাদের তুষারদার ডাক নাম হাণ্ডদা বলিয়া ঘোষণা করার জন্য আমাদের শ্রীদুর্ব্বাসার উপর অশ্লীলতার দোষ আরোপ করিয়া বাগবাজারী বৈষ্ণবী নাক সিঁটকাইয়াছেন। তুষারদাদার "বিভায়" "পত্রিকা" উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া বৈষ্ণবীদিদি উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন! দিদির ভগ্নি-প্রীতি প্রশংসনীয়। "বিভার" বিভা উজ্জ্বলতর হউক ইহাই আমাদের কামনা।

মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোং

রূপচর্চ্চা করাই সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রধান অঙ্গ। প্রকৃতির এই উপাদানগুলিকে মনোমত রূপ দিতে পারাই বোধহয় শিল্প নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষতা। আভরণ দিয়া আমরা অঙ্গসৌন্দর্য্যের শোভাবর্দ্ধন করিতে প্রয়াস পাই। কিন্তু আমারা শিল্পির নৈপুণ্য কোনখানে বেশ অনুধাবন করিতে পারগ হই যখন দেখি আভরণ আবরণ স্বরূপ হ'য়ে উঠে নাই। আমরা দক্ষিণ কলিকাতার বিখ্যাত মণিকার মেসার্স মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোম্পানীর বর্ত্তমান প্রদর্শনী গৃহ পরিদর্শন করিয়া সম্পূর্ণরূপে আশান্বিত হইয়াছি যে, এই অলঙ্কার শিল্প চাতুর্য্য কত উন্নত আকার প্রাপ্ত হইতেছে। প্রত্যেক অলঙ্কার আধুনিকতার পূর্ণ নিদর্শন! প্রাচুর্য্যেরও ইয়ত্তা নাই! তুলনায় মজুরী আশাতিরিক্ত সুলভ—এবং এই অর্থ সঙ্কটকালের অবস্থানুযায়ী। দীর্ঘ ৫১ বৎসরকাল ইঁহাদের নির্ম্মিত অলঙ্কার খাঁটী জিনিষ বলিয়া পরিচিত। যে যুবকের প্রচেষ্টায় এই কোম্পানী আজ গৌরবান্বিত আমরা সেই তরুণ শিল্পী রূপদক্ষ—শ্রীমান্ পার্ব্বতী শঙ্কর মিত্রকে অভিনন্দিত করিতেছি ও এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বিমান চালনায় বাঙ্গালী যুবকের সাফল্য

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ

শ্রীমান অজিত রঞ্জন ঘোষ ন্যাশন্যাল ডাই এণ্ড ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কসের কর্ম্ম-সচীব ও ও রূপবাণীর যুগ্ম কর্ম্ম-সচীব শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ এম-এ, বি-এল, মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

ইনি দীর্ঘ চারি বৎসর কাল ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়া বিমান সম্পর্কিত সমস্ত কলা-কৌশল (Ground Engineering) আয়ত্ব করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে ইনি নিম্নলিখিত বারোটি বিমান চালনা সম্পর্কিত এবং তেরটি ইঞ্জিন সম্পর্কিত "এ" ও "সি" লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রিয়া

শ্রীশচীন্দ্র নাথ সান্যাল

যদি অকালে এভাবে শুকালে—
কেন তবে বল ফুটিলে?
ক্ষণেকের তরে সৌরভ দিয়ে
কেন বা বাতাস মাতালে?
দু'দিনের তরে প্রেমডোরে বেঁধে,
গিয়াছ কোথায় চলিয়া!
স্মৃতিটুকু শুধু রেখে গেছ হেথা,
বিরাট শূন্য ভরিয়া!
মম মর্ম্ম মুকুরে তব ছবি, প্রিয়া,
চির তরে রবে ফুটিয়া,
সেথা প্রেম-পুষ্পে অশ্রু-অর্ঘে
রাখিব আমি তা পুরিয়া!

"এ" লাইসেন্স
(বিমান চালনা সম্পর্কিত)

ডি. এইচ্ মথ্ সর্ব্ব প্রণালীর
ডি, এইচ্ পুস মথ্
ডি, এইচ্ ফক্স মথ্
"এরো" এভিয়েসন সর্ব্ব প্রণালী
এরো "ক্যাডেট" " "

"সি" লাইসেন্স ইঞ্জিনস্

ডি, এইচ্ গিপসী	এক
ডি, এইচ্ গিপসী	দুই
" " "	তিন
" " "	মেজর
" " "	ছয়

সাইরাস এক দুই তিন
" এম কে চার
জেনেট সর্ব্ব প্রণালীর (তিন)

মাত্র একুশ বৎসর বয়সে শ্রীমান অজিত রঞ্জন এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, শুধু তাহাই নহে—ইতি পূর্ব্বে আর কোন বাঙালী এই সম্মানের অধিকারী হইতে পারেন নাই।

"এস এস নারকুণ্ডা"য় তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

আশা করা যায়, ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যেই তিনি স্বদেশে অবতরণ করিতে সমর্থ হইবেন। এই নবীন যুবকের ভবিষ্যৎ আরো উন্নতিতে সমৃদ্ধ হোক আমরা তাহাই কামনা করি।

খেলার মাঠে

শ্রীদ্রোণাচার্য্য

ক্রিকেট

নয়াদিল্লী থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, ওখানে মেডেন হোটেলে ভারতীয় ক্রীকেট কনট্রোল বোর্ডের এক সভা হয়ে গেছে। সভাপতি হয়েছিলেন সেকেন্দার হায়াৎ খান। সভায় স্থির হয়েছে যে, আসছে গরমের ছুটিতে যখন পাতিয়ালার মহারাজা ও মিঃ আর. আই. গ্রাণ্ট হাওয়া খেতে বিলেত যাবেন তখন তাঁরাই ইম্পিরিয়েল ক্রীকেট বৈঠকে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব কোরবেন। খবরটি যে খুবই উপভোগ্য এতে কোনই সন্দেহ নেই। এক ঢিলে দুই পাখীই মারা যাবে।

* * *

১৯৩৬ সালে ভারত থেকে যে টিম বিলেত পাঠানো হবে তাদের ভ্রমণ তালিকাও ঐ বৈঠকে স্থির হয়েছে। তা ছাড়া আরও স্থির হয়েছে যে, আসছে ২২শে থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে ভারতীয় ক্রীকেট চ্যাম্পিয়ন সিপের ফাইনাল খেলা হবে। ৯ই থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে উত্তর ও পূর্ব্ব বিভাগের ভেতর প্রথম সেমি ফাইনাল,—মাদ্রাজে দক্ষিণ ও পশ্চিম বিভাগের ভেতর দ্বিতীয় সেমি ফাইনাল খেলা হবে। তা ছাড়া ৯ই থেকে ১১ই মার্চ্চ দিল্লীতে চ্যাম্পিয়ন বনাম ভারতীয় ক্রীকেট ক্লাবের একটি বিশেষ খেলা হবারও খুবই সম্ভাবনা রয়েছে এবং ঐ সময় নাকি বোর্ডের বাৎসরিক সভা হবে।

* * *

গেল শনিবার বালীগঞ্জ মাঠে ক্রীকেট প্রতিযোগীতায় নূতন যুগের আভাষ এনেছে। প্রতিযোগীতাটি হয়েছিল মেয়েদের সাথে পুরুষদের। আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন না—এ খেলায় মেয়েরাই ৮১ রাণে জয়ী হয়েছে। ওদের জয়ত সব সময়েই। পুরুষদের খেলতে হয়েছিল বাঁ হাতে সরু ব্যাট দিয়ে। তার উপর "ক্যাচ" ধরতেও হয়েছিল এক হাতে।

মোহনবাগান স্পোর্টস

২৯শে জানুয়ারী মোহনবাগান মাঠে ক্লাবের ৪৫শ বার্ষিক স্পোর্টস প্রতিযোগিতা হয়েছে। প্রতিযোগীতার ভেতর হাই জাম্পই হয়েছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়ান এথলেটস ক্যাম্পের আবু ইউসুফ ৫ ফুট ১০॥ ইঞ্চি লাফিয়ে মোহনবাগান স্পোর্টসে নূতন রেকর্ড করেন। স্পোর্ট সকল বিষয়েই বেশ সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিল; স্পোর্টসের শেষে সার মন্মথ নাথ রায় চৌধুরী স্পোর্টস্ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার পর প্রতিযোগীদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

মেয়েদের হকি

মেয়েদের হকি খেলায় খড়্গপুর দল ব্লু-ব্রাউসকে এক গোলে পরাজিত করেছে। ব্লু-বাউস দলের খেলা হয়েছিল চমৎকার—বিশেষতঃ ওদের দলের মিস্ হাউটা খেলার সাথে সাথেই আহত হওয়ায় ওদের দশ জনেরই সারাক্ষণ খেলতে হয়েছিল।

* * *

সোমবার দিন চৌরঙ্গী ওয়াই, এম সি হলে হকি এসোসিয়েসনের এক বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে বহু সদস্যই উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বিষয় আলোচনার পর নিউজিল্যাণ্ডে হকি টিম পাঠানো হবে কিনা তার আলোচনা হয়। অবশেষে স্থির হয় যে, কয়েকটি সর্ত্তে নিউজিল্যাণ্ডে একটি অল ইণ্ডিয়া হকি টিম পাঠানো হবে।

কুস্তি প্রতিযোগীতা

২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে জানুয়ারী ৫॥ টায় ইউনিভার্সিটি ইনসষ্টিটিউট হলে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রাদেশিক কুস্তি প্রতিযোগীতা হবে এবং ৩০শে জানুয়ারী রাত্রি ৯টায় ফাইনাল প্রতিযোগীতা হবে। এ প্রতিযোগীতায় বহু নাম করা কুস্তীগীর যোগদান করেছেন।

রূপতরঙ্গ

নিউ থিয়েটার্স

আনওয়ার শা রোডের ষ্টুডিয়োতে 'চন্দ্রমুখী'-র বাড়ীর দৃশ্য তোলা হচ্ছিলো। দেখতে গিছলুম। দৃশ্যটির সবিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন মনে করছি নে, কারণ, এর ঘটনাবলী শরৎবাবুর এই উপন্যাসের প্রত্যেক পাঠকেরই জানা। বইটি পড়ে কল্পনায় যে কল্পিত রূপ ছিলো, তারই হুবহু অবিকল রূপ পরিণত দেখলুম বাস্তবে। বাস্তবিক, খুঁৎ কোন চোখে পড়লো না।...ফরাস, কাঁপানো হারমোনিয়মের রিড্, নুপুরের ঝুমুর, তবলার বোল।

প্রমথেশ বড়ুয়া শেষবারের মত পরিচালনা সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। 'রেডি'। জ্বললো আলো, 'মাইক্' ঠিক, ঘুরলো ক্যামেরার হাতল। নির্ব্বাক, চোখে বিস্ময়, দর্শকদের মুখে কথা নেই।

সত্যি, অতি সুন্দর হচ্ছে এই "দেবদাস"। সবার অভিনয়ে প্রাণ ও দরদের সাড়া পাওয়া গেলো প্রচুর। অমর মল্লিক—বেশ মানানসই 'মেক-আপ্', বেশী বলা বাহুল্য, বিশিষ্ট এক একটি চরিত্র বা 'টাইপ্' সৃষ্টি করতে তাঁর জুড়িদার ক'টা আছে বাংলায়! তারপর সামনে ঐ দেখি বাঙালী সাইগল্। মিঃ সাইগলকে মানিয়েচে চমৎকার। কে বলবে—বাঙালী নয়। নিখুঁৎ বাংলা ভাষা, গানে ও কথার নিখুৎ উচ্চারণ। চঞ্চল চোখ ঐ চন্দ্রার, চকচকে অভিনয়, ঝক্‌ঝক করছে। ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে হুয়া-ভায়া ঢুকলো। আগের থেকে অনেক 'স্মার্ট' হুয়া ভায়া, দেখে বেশ ভালো লাগলো, অংশের অনুরূপ হাব আর ভাব তার চোখে মুখে, চেহারায়।

ভূমিকা বণ্টনে একটি সুন্দর বিশিষ্টতা লক্ষ্য করলুম। চন্দ্রমুখী—চঞ্চল, চক্‌চকে চন্দ্রাবতী। ক্ষেত্রমণি—নৃত্য চটুল পা—ক্ষেত্রবালার। এরকম অভিনব 'কাস্‌টিং' আর কোথাও তো চোখে পড়েনি। আপনাদেরই জিজ্ঞেস করি—বেশ অভিনব নয়?

চন্দ্রমুখী-চন্দ্রাবতীর কথা বলেছি। এবার

সংগ্রহ

পোর্ট অব স্পেনে এম, সি, সি বনাম ত্রিনিদাদের খেলা তিন দিবস ব্যাপী হবে। প্রথম ইনিংসে এম, সি, সি সকলে আউট হয়ে করেছে ২২৬ রাণ। ত্রিনিদাদ ব্যাট কচ্ছে এবং দিনকার খেলা শেষে করেছে ৬ রাণ।

* * *

জামসেদপুর ইয়ং ম্যানস এসোসিয়েশনের সাথে ক্রিকেট খেলবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে ভবানীপুর ওখানে রওনা হয়ে গেছেন। ক্যাপ্টেন হয়ে গিয়েছেন মিঃ এ, দাস। পরে জানা যায় যে জামসেদপুর খেলায় হেরে গেছে।

* * *

সেনট্রাল সুইমিং ক্লাবের "ইণ্টার ক্লাব" ৮ মাইল ভ্রমণ প্রতিযোগীতায় প্রথম হয়েছে প্রবোধ দাস, দ্বিতীয় রাজারাম সাহু এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে হরেন দাস। শ্রীযুত সত্যব্রত সেনের সভাপতিত্বে এই তিনজনকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বিলাসী

ক্ষেত্রমণি-ক্ষেত্রবালার কথা একটু শুনুন। নাচে নিউ থিয়েটার্স-এর এ আরেকটি নাম-করা মেয়ে। সুরের তালে আর তানে নাচে তার পা, নাচে চোখ, নাচে মুখ, নাচে তার দেহের ভঙ্গী।

নিউ থিয়েটার্স-এর হিন্দী ছবি 'ডাকু-মনসুর'-এর নাচ দেখে আমরা চমৎকৃত না হয়ে পারিনি।

* * *

২৬শে বোম্বাইয়ে নিউ থিয়েটার্স—নিউ ইণ্ডিয়ার "কারওয়ান্-ঈ-হায়াৎ" মুক্তিলাভ কোর্‌বে।

কালী ফিল্ম

"পাতালপুরী"-র শুটিং প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। এই চিত্রখানিকে অভিনব রূপে রূপায়িত করবার জন্য গাঙ্গুলী মশাই চেষ্টার কসুর কোরছেন না। কয়লাখনি আর সেখানকার লোকজনদের আবহাওয়া—তারই ভেতর প্রেম ও প্রতিহিংসাই হ'চ্ছে ছবিখানির মূল প্রতিপাদ্য। গল্পটি চলচ্চিত্রের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সেই জন্যই মনে হয়—লোকে এটিকে সাদরে গ্রহণ কোর্‌বে।

* * *

"বিদ্যাসুন্দরে"-র আনুসঙ্গিক কাজ শেষ হ'য়েছে। "প্রফুল্ল" আস্তে আস্তে চল্‌ছে।

ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিঃ

উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও রাধা ফিল্ম কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার মিঃ এ, এন্, সিংহানিয়া পাটনা, লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর পরিভ্রমণ কোরে সম্প্রতি কোল্‌কাতায় প্রত্যাবর্ত্তন কোরেছেন। এদের বাঁকীপুরের এল্‌ফিনষ্টোন পিক্‌চার প্যালেশে দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান-গুলির শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলী প্রদর্শন করায় সেখানে অত্যল্পকালের মধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। জয়পুরে এদের একটি চিত্রগৃহের কাজ দ্রুত এগুচ্ছে। এপ্রিলে চিত্রগৃহটির উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

রাধা ফিল্ম

"ওয়ামাক্ এজ্‌রা"র "হারেম" দৃশ্য এখনও তোলা হ'চ্ছে।

* * *

তামিল ছবি তোলার তোড়জোড় চলেছে।

ষোড়শ সপ্তাহে পড়্‌বে। ভীড় দেখে মনে হয় ছবিখানি এখনও কিছুদিন চল্‌বে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

এদের "সুলতানা", "মমতাজ বেগম", "সীতা বনবাস" (তামিল), "লব-কুশ" (তেলেগু) ও হাসির ছবি "লাভ ফ্যাক্টরী"

রাজবন্দী শরৎচন্দ্রের অবরোধ

"প্রতিকারের জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ"

-আইন-সচীব নৃপেন্দ্রের অভিমত

গত মঙ্গলবার নবগঠিত ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে আসামের কংগ্রেস সভ্য শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র বরদোলাই কলিকাতা কেন্দ্র হইতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি বর্ত্তমানে অন্তরীণে আবদ্ধ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সভায় যোগদানে বাধা দিবার জন্য ভারত সরকারের প্রতি নিন্দাজ্ঞাপক এক স্থগিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্বতন্ত্রদলের সদস্যগণ নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিলেও শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্রের স্থগিত প্রস্তাব ৫৮-৫৪ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। স্বরাজ্যদলের পরিষদ হইতে অবসর গ্রহণের পর সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে পরিষদে সরকারের এই প্রথম পরাজয়।

আলোচনা প্রসঙ্গে আইন সচীব স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার বলিয়াছেন যে পরিষদে এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না। তবে ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করিলে শ্রীযুক্ত বসু এ' বিষয়ের মীমাংসার জন্য আদালতের স্মরণাপন্ন হইতে পারেন।

কলিকাতার এর্টর্নী পাড়ায় প্রবল জনরব যে শীঘ্রই কলিকাতা হাইকোর্টে শ্রীযুক্ত বসুর পক্ষ হইতে অনুরূপ আবেদন করা হইবে। আইন-সচীব স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকারের উপরে-উল্লিখিত মতবাদ প্রকাশের পর কলিকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত জনসাধারণ ও আইনজীবিগণ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিবে।

"মানময়ী গার্ল-স্কুলে"-র প্রকোষ্ঠ দৃশ্য তোলা হ'য়েছে। ছবিখানি আগামী মাসের মাঝামাঝি মুক্তি প্রতীক্ষায় থাক্‌বে।

* *

পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় এর পর "সেভেন্থ লাভ" নামে একখানা দু'রীলের হাসির ছবির কাজে হাত দেবেন।

* * *

আসচে শনিবার থেকে এদের "বক্ষ-যজ্ঞ"

গত বছরের শেষ ভাগে মুক্তিলাভ কোরেছে। ছবিগুলি সর্ব্বত্রই যথেষ্ট আদৃত হ'য়েছে। এ' বছরের গোড়া থেকে এরা যেরূপ কাজ কোরছেন—তা'তে ১৯৩৫ সাল এদের কাটবেই ভাল বলে মনে হয়।

* * *

উত্তর কেন্দ্রে প্রদর্শনের জন্য এরা "নাইট বার্ড" চিত্রখানির স্বত্ব দিল্লীর জগৎ টকীজের

লালা জগৎ নারায়ণের কাছে বিক্রী কোরেছেন।

* * *

"ষ্টেপ্ মাদার" প্রায় শেষ হ'য়েছে। যতীন দাসের পরিচালনায় মিঃ "ডব্লিউ"ও শেষ হ'তে আর দেরী নেই।

বঙ্গলক্ষ্মী টকীজ লিঃ

কলিকাতা কর্পোরেশনের এ্যাসেসার মিঃ পি, ত্রিবেদী তাঁর নব প্রচেষ্টা ও নূতন উদ্যমের ফল নবজাত ফিল্ম কোম্পানী 'বঙ্গলক্ষ্মী টকীজ লিঃ' অন্যান্য সংগঠনকারী, পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকদিগকে তাঁর গড়িয়াস্থিত উদ্যান বাটীতে এক প্রীতি সম্মিলনে আপ্যায়িত করেন।

এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সীর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীবঙ্গভূষণ দীর্ঘকাল ধরিয়া চিত্র প্রদর্শন ও অন্যান্য বহু ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থেকে ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রচুর জ্ঞানলাভ কোরেছেন।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে নেপালের রাণা হম্বীর জঙ্গ বাহাদুর, সেরাইকালের মহারাজকুমার, লক্ষ্মীকুলের কুমার, অনারেবল সত্যেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মৌলিক, অনারেবল রায় রাধাকিষণ জালান বাহাদুর, সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমী, লালমিঞা, এ, এফ, এম আব্দুল আলি, এস, এন, গুহ, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের বি, এল, খেমকা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এস, এন, গুহ বৈদেশিক ও ভারতীয় ফিল্ম ব্যবসায়ের তুলনা মূলক সমালোচনা করিয়া সুন্দর একটি বক্তৃতা দেন। এই উৎসবের সাফল্যের জন্য যতীন বাবু, বঙ্গ বাবু ও ত্রিবেদী মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে উৎসব সমাপন হয়।

ছায়া

আগামী শনিবার, ২৬শে জানুয়ারী হইতে "ছায়া"য় এ' যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়াকর্ষক চিত্র "কাউণ্ট অব মণ্টেক্রিষ্টো" প্রদর্শিত হইবে। অভিনয়ে, দৃশ্যপটে, সর্ব্ব সু-সঙ্গতিতে, পরিচালনা গুণে এবং প্রথম শ্রেণীর আলোক-চিত্রের গুণে ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যশস্বী ঔপন্যাসিক আলেকজাণ্ডার ডুমার যাদুকরী লেখনী-সঞ্জাত এই উপন্যাস এত জীবন্ত অভিনীত হইয়াছে যাহাতে ইহাকে নিঃসন্দেহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র বলা যাইতে পারে।

"কাউণ্ট অব মণ্টেক্রিষ্টো"কে এ সপ্তাহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বলিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। আমরা আশা করি এ' চিত্রখানি সকলেই অন্ততঃ একবার দেখিবেন নতুবা সত্য সত্যই জীবনের আনন্দ অসম্পূর্ণ থাকিবে।

"ছায়া"র আগামী আকর্ষণ হইতেছে হ্যারল্ড লয়েডের শ্রেষ্ঠ চিত্র "ক্যাট্স প"। "ছায়া"য় ক্রমান্বয়ে যেরূপ প্রথম শ্রেণীর চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে তাহাতে ইহা বাঙালী পরিচালিত চিত্রগৃহের মধ্যে অচিরেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠিবে তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

রূপবাণী

ক্লিওপেট্রার মতো ছবি তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করিতেছে ইহা কোন বিস্ময়কর সংবাদ নহে।

আমরা আশা করি 'রূপবাণী' এই ধরণের প্রথম শ্রেণীর চিত্র-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিয়া রসিক জনকে তুষ্ট ও নিজের আভিজাত্য বজায় রাখিবেন।

শনিবার ২৬শে জানুয়ারী হইতে তৃতীয় সপ্তাহ সুরু হইবে।

ইহার পরের চিত্র ওয়ালেস বেরীর "ভিভা ভিলা"।

এ্যান্ নোলান

ইনি খুব নাম-করা অভিনেত্রী নয় সত্য; কিন্তু দেহের এঁর হাব-ভাব দেখে সকলে যেমন এঁর দিকে দৃষ্টি ফিরাচ্ছেন তেমনি হয়ত ভবিষ্যতে এঁর অভিনয় দেখবার জন্যও সকলে পাগল হবেন।

উপন্যাস

উচ্ছৃঙ্খল

শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—শোন তবে। যেদিন আমি উচ্ছৃঙ্খলতার পথে ছুটে চলে এসেছি সেদিন তোমার কাছেই এসেছি। তারপর বারবার তোমারই সঙ্গে রাত্রি যাপন করেছি মাঝে মাঝে মন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌তো, আমার ইচ্ছা হতো তোমায় আমার করে নিই কিন্তু হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় পারিনি। আমার মন বিদ্রোহী হয়ে আমায় বার বার কানে কানে বলে দিয়ে গেছে—বারবণিতাকে তোমার পত্নী করবে?—তাই পারিনি।—আজ আমার ইচ্ছা হয় তোমার জীবনের ইতিহাসটুকু জেনে নিই।—অনিমার জীবনেতিহাস জান্‌বার কথা শুনে তার দুটী চোখ কান্নায় ভরে গেল। তার সেই চির পুরাণো সুখের দিনগুলির কথা মনে পড়ে প্রাণ ব্যথিত হয়ে উঠলো। সে তার কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে লাগলো। তবু জল যেন নীরোধ মান্‌লে না। তার হৃদয়ের সমস্ত সুখস্মৃতি মুছে ধুয়ে বা'র হয়ে না গেলে বুঝি তার অশ্রুজল থাম্‌বেনা। সে চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদতে লাগল। পাছে অরুণ দেখে ফেলে, তাই সে পেছন ফিরে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে বিয়ার দিয়ে গেল। অনিমা তা' লক্ষ্য করলনা। তার নিজের দুঃখকে এড়িয়ে না নিয়ে সে কী অপরকে প্রবোধবাক্য দিতে পারে?—অরুণ মহানন্দে ও তৃপ্তিতে সুরা পান কর্‌লো।

পান শেষে অনিমার দিকে দৃষ্টিপাত করে বল্‌লে: কী তোমার জীবনের ঘটনা বল্‌লে না?

অনিমা চোখ মুছে ফিরে দাঁড়াল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে: সে অনেক কথা। অভাগিনীর এই কাহিনী যে শুনেছে সে সহানুভূতি না জানিয়ে পারেনি। কত সদাশয় ব্যক্তি আমায় আবার সমাজে তুলে নিতেও চেয়েছেন। কিন্তু আমি যাইনি—যেতে পারিনি। যার ভিতর একবার পাপ প্রবেশ করেছে, শত প্রায়শ্চিত্তেও সে পাপ কি স্খলন্ হয়? একটী সামান্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত, আমি আজ এখানে বসে করছি।

—কী এমন ঘটনা তোমার জীবনের যে, তুমি বল্‌বার আগে এত ভূমিকা করছ?

—আপনি যদি একান্তই জান্‌তে চান্ আপনাকে বল্‌ছি।—আমি জন্মেছিলাম্ আমার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে, এক ধনীরই ঘরে,—মা বাবা সবাই ছিলেন। বড়ঘরে বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু রূপই ছিল আমার কাল। রূপমুগ্ধ ভ্রমর ছুটে এলো—অনেকেই এলো। বিবাহিতা পত্নী দেখে অনেকেই সরে পড়্‌ল কিন্তু একজনের আমাকে চাই-ই, আমিও তখন রূপই খুঁজ্‌ছিলাম। গুণের উপাসনা ছেড়ে দিয়ে রূপের উপাসনাই ছিলো আমার কাম্য। তাই একদিন, তারই সাথে গভীর নিশীথে আঁধারে ডুবলাম্।—সেই আঁধার এখনো অবসান হয়নি।—আরো শুনতে চান্?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—তারপর তার বাসনা যখন তৃপ্ত হলো, বছরখানেক যখন কেটে গেল তখন এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে আমার জীবনের দুঃখ আরো বাড়িয়ে দিলো। সে চলে গেল। কন্যাটী আমায় দিয়ে গেল।—ভিক্ষাবৃত্তি করে খেতে চাইলুম। কিন্তু পারিনি।—তাই রূপ-পসারিণী হয়ে বসে আছি। সব ঘটনা একটা বিরাট ইতিহাস! তা' বলে আপনাকে দুঃখ দিতে চাইনা।

অরুণ শুনে যাচ্ছিল, কোন বাদ প্রতিবাদ করছিল না। অনেক রাত হয়েছে। আকাশ ফর্সা হয়েছে। ম্লান আকাশের ক্ষীণ তারকা ডুবেছে। সারাদিক্ নিঝুম। থেকে থেকে সমুদ্র গর্জ্জনের মতো দু'একটী মেঘ-গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে।

অরুণের ঘুম আস্‌ছিল।

অনিমা বল্‌লে: বিছানা করে দিচ্ছি। শোবেন আসুন।

অরুণ বল্‌লে: তোমার খাওয়া দাওয়া তো হয়নি। তুমি খেয়ে এসো। তারপর দুজনে—,

বাধা দিয়া অনিমা বল্‌লে: আমি আজ খাবো না। আমার বিছানা নীচে মেঝেয় করবো। আপনার বিছানা তক্তপোষেই করে দিই।

অরুণ ক্ষুব্ধ হয়ে গেল। সে এসেছিল—মনের দুর্দ্দমনীয় পিপাসা নিয়ে এক বারবিলাসিনীর কাছে।—সে আজ তাকে প্রত্যাখ্যান করছে। জগতে কি তবে এম্‌নি করে লোক অপমানিত হয়? সে ভাবলে: এর কারণ কী? অনিমা তার কাছ থেকে দূরে থাক্‌তে চায় কেন? সে কি তবে তাকে পছন্দ করে না? তা'র আগমন-পথ কি তবে চেয়ে থাকে না। আবার ভাবলে: সে কে? তার ত কেউ নয়। শুধু মিথ্যা ছলনার প্রলেপ দিয়ে মিথ্যা ভালবাসায় মানুষকে প্রতারিত করে।

সে চুপ করে রইল। তার অন্তরে এক

তাঁর দাহন। শরীর সুরাপানে সতেজ হয়ে উঠেছে। বর্ষার নিঝুম রাত।—সে তবে কী জন্য ছুটে এসেছে?

অনিমা তার সেই ভাব বুঝতে পারলো। বললে: অরুণবাবু, আজ আমার শরীর সুস্থ নেই। অনেক রাত হয়ে গেছে। বিছানায় এসে শোন্।.........

অনিমার উপর বিতৃষ্ণায় তার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এত রাতে আর কোথাও যাওয়া অসম্ভব। কাজেই মনে বিদ্বেষভাব নিয়ে অনিমার বিছানায় শুয়ে অরুণ নানান্ রকম চিন্তা করতে লাগ্‌লো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোট একখানি ষ্টেশন। কাজ তবু কম নয়। রোজ দশখানা গাড়ী pass করাতে হয়। একজন ষ্টেশন মাষ্টার, একজন য়্যাসিণ্টাণ্ট আর দুটী পয়েণ্টস্‌মেন্ ছাড়া আর কেউ নেই। ষ্টেশনবাবু নিখিল নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর একমাত্র পুত্র অরুণ সেখানে থাকেন। অরুণ কল্‌কাতা কলেজে আই, এ পড়ে। রোজ আসে যায়। একমাত্র পুত্রকে কল্‌কাতা রেখে তিনি একা থাক্‌তে পারেন না। তাই, সে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে।

পুত্রটীর জন্মের পরই তাঁর স্ত্রী লোকান্তর প্রাপ্ত হন। তিনি তাকে বুকে পিঠে করে মানুষ করেছেন। সে এত বড়টী হয়েছে তবু, কোনদিন তার মায়ের অভাব বোধ করেনি। তার বাবাই তার সমস্ত অভাব পুর্ণ করেছেন। সেও তার পিতাকে কম ভালবাসে না। সব সময় পিতাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। কিন্তু তার দুর্দ্দমনীয় পিপাসা।—মাঝে মাঝে সে তার পিতার কথা ভুলে যায়। তার নিজের অস্তিত্বের কথা স্মরণে বাজে না। এক অনির্ব্বচনীয় মধুর সুখের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে থাকে। তখন সে সব ভুলে যায়। তার বাবার কাছে থাকলে তার মন পিতার প্রতি শ্রদ্ধায় পূর্ণ থাকে। তাঁর অভাব-অনাটন পুর্ণ করতে চায়।

.........কলেজ ছুটী। অরুণ সেদিন কলেজে যায়নি। বাড়ীতেই ছিল। ষ্টেশনে তার বাবার কাজের সাহায্যও করছিল। রাত নিঝুম নিরালা। সব গাড়ী চলে গেছে। ষ্টেশনের কাজ সেদিনের মতো ফুরিয়েছে।

নিশীথ রাতের নীরব সুর যেন অলক্ষিতে নিখিলের কানের ভেতর প্রবেশ করছিল। কত কথাই না মনে জেগে উঠছিল। তাঁর সেই সুখে কাটানো দিনগুলি! সারাদিন পরিশ্রম করে যখন তিনি বাড়ী ফিরতেন, তাঁর পত্নী কতই না যত্ন করে তাঁকে খাওয়াতেন। আজ তাঁর সমস্ত সুখ কোথায়—কোন অতীন্দ্রিয় লোকে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। আছে—শুধু সেই সুখের স্মৃতিটুকু। আর তাঁদেরই ভালবাসার নিদর্শন ঐ একমাত্র পুত্র অরুণ। দুঃখের একমাত্র সান্ত্বনা, আশ্রয়হীনের আশ্রয়।

তিনি ভাবছিলেন, অরুণ হয়তো খাওয়ার পরে শুয়ে আছে—মাতৃহারা সন্তান বুঝি মাতৃচিন্তায় বিভোর হয়ে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হয়েছে। বাসায় পৌছে তাঁর সমস্ত সুখ-স্মৃতি শত কল্পনা মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাঁর চোখের সামনে এক ভয়াবহ দৃশ্য ভেসে উঠলো। অন্যদিন তিনি বাসায় ফিরতে দেরী হলে অরুণ বাতি জ্বালিয়ে রেখে শুয়ে থাক্‌তো,—আজ বাতি নেই আলো নেই। গৃহের দ্বার উন্মুক্ত—অন্ধকার! সেই বিরাট বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারে ছোট খোলার ঘরখানি আরো আঁধার বোধ হচ্ছিল।

তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠ্‌লো। কত চিন্তা মনে জেগে তাঁকে জ্বালা দিতে লাগলো। তাঁর বহু আদরের অরুণের বিপদ চিন্তা করে তাঁর সারা চিত্ত আকুল হয়ে ওঠলো। তিনি অবসর সময়ে দু'একটা বিড়ি সেবন করতেন। তাই তার পকেটে দেয়াশালাই ছিল। বাতি জ্বালিয়ে দেখলেন—ঘরশূন্য—বিছানাশূন্য—অরুণ নেই।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পরও যখন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন কল্‌কাতা নগরীর লোভনীয় পল্লীর ছায়া তাঁর মনে জেগে উঠলো। তিনি পিতা। তাঁর পুত্র তাঁকে ভক্তি করে, সম্মান করে। সে হয়তো অবিশ্বাসী চরিত্রহীন না হতেও পারে, হয়তো সে কোন বিপদে পড়েছে। সন্তানের বিপদ আশঙ্কা করে যে সমস্ত মাতাপিতা আকুল হয়ে ঘরের কোণে নীরবে অশ্রুপাত করেন, নিখিলবাবু ঠিক সেই প্রকৃতির। তাঁর মনে কত শত চিন্তা জড় হতে লাগলো।

সে হয়তো সারাদিন অভুক্তভাবে আছে। তার বিষাদক্লিষ্ট ক্ষুধিত মুখখানি তিনি মানসচক্ষে দেখতে পেলেন। তার বিপদ আশঙ্কা করে বিছানার ওপর বসে চিন্তা করতে লাগলেন। কখন রাত প্রভাত হয়ে গেছে তিনি জানতেও পারেন নি। বেলা সাতটায় তাঁর duty।

সারারাত অভুক্ত বিনিদ্র থেকে তার শরীর ক্লান্ত হয়ে গেছে। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর যে এত দুঃখ সইতে হবে, তিনি তা স্বপ্নেও ভাবেন নি। তিনি দারুণ মানসিক চিন্তায় কাতর হয়ে পড়েছেন।

ষ্টেশনে গাড়ী আস্‌বার ঘণ্টা বাজ্‌লো। তিনি চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ষ্টেশনে ছুটে গেলেন, কাপড়-চোপড় আর বদলাতে হলোনা। ছুটে চল্‌লেন। গাড়ী এসে ষ্টেশনে থাম্‌লো।

অনেক যাত্রী উঠলো নাম্‌লো। তাঁর উৎসুক দৃষ্টি সেই অগণিত লোকের মাঝে তাঁর সন্তানকেই খুঁজ্‌ছিল। অরুণকে দেখতে পাওয়া গেল না।—পুঞ্জীভূত বেদনায় তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আস্‌ল।

তিনি বুঝি তাঁর সম্বল,-একমাত্র সান্ত্বনা আজ হারালেন। ইচ্ছা হলো—ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন! কে বলে ঈশ্বর দয়াময়? কত সন্তানহারা জনক-জননী দিনরাত কেবল অশ্রুমোচন করছেন। কত চরিত্রহীন সন্তানের পিতামাতা শুধু তাদের সন্তানকে দেখবার আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।—ভগবানের কি কান নেই? কে বলে তিনি ভগবান? প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন চিন্তা তাঁর মন অধিকার করে বসছিল। প্রতি পলে পলে নব নব পীড়া তাকে দাহন করছিল। কিছুতেই মনে শান্তি ফিরে আসছিল না।

পীড়িত চিন্তিত জীবন বুঝি এমনি ভাবেই চলে।—এক মুহূর্ত্ত একটি যুগের মতো দুর্ব্বিসহ হয়ে ওঠে। তিনি যে আহার করেননি এ চিন্তা তাঁর মনে জাগেনি। আহার নিদ্রা ভুলে তিনি শুধু ভাবছেন—অরুণের কি হলো? ইতঃপূর্ব্বে তিনি লোকমুখে তাঁর পুত্রের কুৎসা শুনেছেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেননি। যাকে তাঁর দেবপ্রতিম আদর্শে গঠিত করেছেন, সে—চরিত্রহীন—তাঁর কল্পনায়ও তিনি তা আনতে পারেননি।—আজ শুধু তাঁর মনে হচ্ছিল—তাদেরই কথা সত্য, তাঁর পুত্র চরিত্রহীন।—তার মনে নিদারুণ-ভাবে এ কথাই শুধু বাজছিল—তাঁর পুত্র উচ্ছৃঙ্খল। উচ্ছৃঙ্খলের পিতা হয়ে কী লাভ? পৃথিবীর নিভৃত-কন্দরে যদি কোথাও যায়গা থাকে তিনি সেখানে লুকিয়ে থাকবেন। জগতের কাছে কী করে মুখ দেখাবেন?

(ক্রমশঃ)

চার্লির কথা

শ্রীপশুপতি নাথ মুখোপাধ্যায়

এসিয়ার চার্লি—ইউরোপের চার্লি—আমেরিকার চার্লি—বিশ্বের প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব—হাস্যাবতার সেই চার্লি চ্যাপলিন যার প্রতিভার কাছে গার্ব্বোর গর্ব্ব হয়ে যায় খর্ব্ব, মার্লিনকে পাঠাতে হয় বার্লিন, আর হলিউডের তারাদের ভাবতে হয় পাইনের চারা। তাঁর গত দশ বছরের চতুর্থ ছবি, কল্পনার বেদী হতে ষ্টুডিওর সেট্-এ এসে দাঁড়িয়েছে। আবার চার্লি তাঁর ছেঁড়া ব্যাগি প্যাণ্ট, তোবড়ান তালিমারা ঢলঢলে ডার্বি জুতো, সেই সরু ছড়ি যা দেখলেই মনে হয় চাপ দিলেই ভেঙ্গে যাবে আর ছোট্ট গোঁপটুকু, বাক্স থেকে টেনে বার করেছেন।

চার্লির ষ্টুডিও, যেখানে সবাই চার বছর ধরে কুঁড়ের মত বসে ছিল সেখানে আবার কাজের তাড়ায় সব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আজ সেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে ছুতোর প্রচণ্ড জোরে হাতুড়ি চালাচ্ছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আলোগুলোকে নিয়ে ইলেকট্রিসিয়ানরা কুস্তি করতে লেগেছে আর ক্যামেরাগুলো বিশ্বে হাসির খোরাকের রসদ জোগাতে চার্লির নবতম অভিযানকে ছায়ায় রূপান্তরিত করে চলেছে।

গত দশ বছরের হিসাবে দেখা যায় চার্লি নেমেছেন তিনখানা বইতে। তাঁর মধ্যে সার্কাস থেকে "সিটি লাইট্‌স"-এর মাঝের দিনগুলো কেটেছে তিন বছরের ভেতরে। আর তারপর চার বছর কাটল এই বইখানা গড়তে। অথচ তাঁর নাম এতটুকুও কারোর চেয়ে কমেনি এমনিই তাঁর প্রতিভা। যতদিন পর্য্যন্ত না চার্লির নতুন ছবি বেরোয় ততদিন পর্য্যন্ত কেউ বলতে পারে না সত্যিই তাঁর প্রতিভা কারোর চেয়ে কম কিনা। আর পয়সার দিক দিয়েও কারোর চেয়ে কম টাকার তাঁর বই আনে না। কারোর মত-আর্টিষ্টকে দূরে রাখলেই তাঁর দর কমে যায়। কথাটা কিন্তু চার্লি সম্বন্ধে খাপ খায় না "আর্টিষ্টকে বেশী চোখের সামনে রাখলে তাঁর আদর কমে যায়" কথাটা আমাদের দেশের প্রডিউসারদেরও ভাববার মত। চার্লির এ বইখানা টাকা এনেছে প্রায় ১০০০,০০০ পাউণ্ড, তাঁর অন্যান্য বইয়ের তুলনায় সব চেয়ে বেশী।

চার্লি এই বইখানার কোন নাম দেন নি হয়ত খাতার পাতাতেও লেখা হয় নি, তবু এটা সাধারণ থেকে আলাদা করে রেখে দেয়। শুধু চার্লির প্রোডাকশন্—শুধু চার্লি নামছেন এইটেই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। এর চেয়ে বড় পরিচয় আর নেই। এতেই লোকে আর ভুলতে পারবে না।

চার্লি ঘোষণা করেছেন—তাঁর সব ছবির তুলনায় এই ছবিই হবে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। তাই বলে একথা ধরে নেওয়া যায় না যে এই ছবিই সবচেয়ে লোকেক বেশী হাসাবে বা হাস্যরসের উপাদান এতে বেশী থাকবে। কারণ যতদিন না ছবিখানা কোনো সিনেমায় দেখান হচ্ছে ততদিন তা কেউ বলতে পারে না। আজ পর্য্যন্ত যতগুলো ছবি তাঁকে নিয়ে করা হয়েছে, সবচেয়ে বেশী উৎসাহ এবং আগ্রহ

নিয়েছেন তিনি এই বইতে। ষ্টুডিওর মধ্যে তিনটে বড় বড় সেট করা হয়েছে আর 'লস এঞ্জেলস'এ সাত একার জমী নেওয়া হয়েছে বাহিরের দৃশ্যগুলো তোলবার জন্যে।

আশা করা যায় ছবি তোলা শেষ হবে জানুয়ারীর শেষে। মাঝখানের দিনগুলোর হিসেবে দেখা যায় সাড়ে তিন মাস আর খরচ হবে চার লক্ষ পাউণ্ড।

ছবি তোলার সময় চার্লি কোনো দিকেই দৃকপাত করেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ভাল জিনিষ পাওয়া, ভাল ছবি তৈরী করা। পয়সা তাঁর নিজের এবং খরচও দুহাতে করেন। এমন না করলে হয়ত সত্যিই ভাল ছবি পাওয়া যায় না, অবশ্য অপব্যয় যদি না হয়।

হলিউডের আর সমস্ত লোক এমন কি চার্লির অন্যান্য কর্ম্মচারীরাও আশা করেন ছবি জানুয়ারীর মধ্যে শেষ হবে। তবু তাঁর অন্যান্য ছবির সঙ্গে হিসাব করলে দেখা যায়, এপ্রিল বা মে-র আগে বোধ হয় শেষ হবে না। যদি তাই হয়, তা হলে সেই আগামী শরতের আগে সাধারণের দেখা কিছুতেই সম্ভব হবে না। কারণ ব্যবসাদার হিসাবেও চার্লি কোনো লোকের চেয়ে ছোট নয়, কাজেই গরমের মন্দা বাজারে কিছুতেই তিনি ছবি ছাড়বেন না।

আজ পর্য্যন্ত চার্লি যতগুলো ছবি তুলেছেন তার মধ্যে এইখানারই আগে থেকে নথি পত্র ঠিক করে রেখেছেন আর তা করতে লেগেছে প্রায় এক বছরের ওপর।

গল্প গেঁথেছেন—বর্ত্তমান ব্যবসা বানিজ্যের মাঝখানে চার্লি; কারখানা গুলোর এ দোর ও দোর ঘুরে বেড়াচ্ছেন চাকরী জন্যে, আর তারই মাঝে গৃহহীন, আশ্রয়হীন পথচারী একটি মেয়ে—তাকেই সাহায্য করা, তাকে নিয়ে সকরুণ প্রেম করা—এই। বর্ত্তমান বাণিজ্যের মাঝে থাকলেও তাঁদের অর্থনীতিতে তিনি হাত দেন নি। গল্প তাঁর আগাগোড়া একখানা নিছক কমেডি।

সবাক ছবি তুলবেন কিনা এই নিয়ে গত বছর থেকে কথা উঠেছে, চার্লি এইবার জানিয়ে দিয়েছেন, একেবারে 'না'। লোকে তাঁকে নাকি নির্ব্বাক অবস্থায় ভাল ভাবে নেবে। তাঁর ছবিতে তিনি ছাড়া অন্য লোক কথা কইবে এও হয় না, কারণ তাতে ছবির balance-এর অভাব ঘটবে। তাই বলে ছবি

Charlie Chaplin

চার্লির মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অভিনেতা পৃথিবীতে বিরল। তাঁর টুপি, তাঁর গোঁপ, তাঁর ছড়ি, তাঁর বুট ও তাঁর সই সবারই ভেতর একটা অভিনবত্ব আছে।

তিনি একেবারে শব্দহীন করবেন না; এবং কখন কখনও একটা আধটা কথা শোনাও যেতে পারে। এই সব শব্দ তোলার জন্যে একটি ছোট্ট 'পোর্টেব্ল সাউণ্ড ট্রাক' ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ব্যবস্থা তিনি ষ্টুডিওতে করেন নি।

সত্যিই সেদিন পর্য্যন্ত চার্লির ষ্টুডিও দেখে কেউ ভাবতে পারেনি যে এই নিস্তব্ধ কুড়েমির ভেতর থেকেও এমন কাজের তৎপরতা, তীব্রতা, প্রেরণা জেগে উঠতে পারে। সেখানে আজ তিন দল লোক লেগেছে দিন রাত কাজ করে চলেছে সেট তৈরী করবার জন্যে। আর চার্লি—যাঁকে সবাই ভাবে কুঁড়ে চার্লি—যে মাসের পর মাস কুঁড়ের মত বসেছিল সে—সে এখন অন্তহীন, বিরাম বিহীন কাজের সঙ্গে। বাস্তবিকই যারা চার্লিকে চেনে তারা জানে তিনি একবার কাজে নামলে আর থামেন না; সিধে চলে যান যতোদিন না একেবারে সব শেষ হয়। এতেই বোঝা যায় তাঁর ছবি আরম্ভ করতে কেন এত দেরী হয়। তাঁর দেরী হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়।

প্রথম নম্বর—চার্লি চান যাতে লোকে তাঁকে দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। কারণ এই সবাক যুগে তিনি মনে করেন যে এক বছরে একখানা নির্ব্বাক ছবিও লোকের কাছে খুব বেশী হবে, খুব উগ্র হবে। লোকে সহ্য করতে পারবে না। তা ছাড়া তিনি এমন একটা নতুন জিনিষ দিতে চান যা লোকে গ্রহণ করবে। এবং লোকে সেই কোনো একটা নতুন জিনিষ-এর জন্যে তাঁর অপেক্ষা করে থাকবে।

দ্বিতীয় নম্বর—একখানা ছবি শেষ করার পর তিনি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে এক বছরের ভেতর আর কিছুতেই তিনি ছবির দিকে মন দিতে পারেন না। একা চার্লি নিজের স্কন্ধে যে ভার নেন কোনো ষ্টারই তা নিতে সক্ষম নন। তিনি সত্যই এ ছুটী পাবার যোগ্য। চার্লি নিজে সব কাজ করেন, কারোর কাছ থেকে সাহায্য নেন না। তাঁর গল্পের প্রত্যেক লাইনই তাঁর নিজের সৃষ্টি। পরিচালনা তাঁর সব নিজের। আর তাঁর ছবি পাঁচ ভাগের চার ভাগ তিনি নিজে part করেন। এই চার্লি—এই তাঁর পরিচয়—এ ছাড়া আর তার সম্বন্ধে বলবার, পরিচয় দেবার কিছু নেই—কিছু নেই—একেবারে কিছু নেই। আর তাঁর অবদান—অজেয়, অমর, অতুল।

চালিয়াৎ

একাঙ্ক কথা-চিত্র

মণী ঘোষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মিসেস সেন। (দুঃখিত স্বরে) তার মানে তুমি এই বলতে চাও যে আমাদের ভালবাসার গভীরতা নেই এবং কোনকালে ছিলও না।

সুজিৎ। আমার আগে আপনিই সেই কথা বল্লেন না কি?

মিসেস সেন। (শেষ চেষ্টায়) জান এ' সব ভয়ানক খারাপ, মেয়েরা অনেক সময় মরিয়া হয়ে ওঠে।

সুজিৎ। (ক্ষীণ হেসে) কবিরা কহেন 'দলিতা ফণিনী সম'।

মিসেস সেন। ঠাট্টা নয় সুজিৎ, জান তুমি আমার বাড়ীতে বসে আছ, ইচ্ছে কল্লে আমি সবাইকে ডেকে বলে দিতে পারি যে তুমি আমায় প্রেম জানাচ্ছিলে, তখন তোমার অবস্থাটা কি রকম হবে বুঝতে পাচ্ছ?

সুজিৎ। খুব বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু আপনি কষ্ট করবেন কেন? সবাইকে ডাকুন না, আমিই বলছি যে এঁকে আমি বিয়ের আগেও ভালবাসতুম এখনও বাসি। সে সাহস আমার আছে। শুধু এখানে কেন, আমি পৃথিবীশুদ্ধ সবাইকে বলতে পারি এ'কথা।

মিসেস সেন। (খুসি হয়ে ব্যগ্র স্বরে) সত্যি, সত্যি পার সুজিৎ? কেনই বা পারবে না? কেনই বা ভয় পাব আমরা, কিসের ভয় করি! কিসের সমাজ, মানি না—আমরা জোর করে বলব আমরা ভালবাসি…

সুজিৎ। (কথা লুফে নিয়ে) নিশ্চয়ই কেন বলব না…বুক ফুলিয়ে বলব…(বাইরে পদশব্দ হল)

মিসেস সেন। (সুজিতের মুখে হাত চাপা দিয়ে) চুপ্ চুপ্ কে আসছে এঘরে।

সুজিৎ। কেন চুপ করব? এই আপনার সাহস—আসুন আজ আমাদের বলবার দিন এসেছে—জগৎ চায় আমাদের বল্‌তে হবে—

রমলা দোদুল গতিতে ওপাশের পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল)

এই যে রমু...মিসেস সেনকে বলছিলুম যে, আমাদের মত শিক্ষিত লোকদের 'পাছে লোকে কিছু বলে'র ভয় ছাড়তে হবে। যেটা আমরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করি,—অনুভব করি—সেটা লোকলজ্জার ভয়ে বলব না; না না, আমায় বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না মিসেস সেন, আজকে আমার বলবার দিন এয়েছে আমাকে বলতে দিন...আমি আজ বলবই যে...(মিসেস সেন ত্রাস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুজিৎ চেয়ে ছিল, মিসেস সেন অদৃশ্য হলে ঈষৎ হেসে মুখ ফেরাল)।

রমলা। কি বলবেন সুজিৎ দা?

সুজিৎ। হ্যাঁ বলব···তাইত কী বলব সব ভুলে গেলাম; কিন্তু রতন বাবু কি চলে গেলেন না কি?

রমলা। (হেসে মৃদু স্বরে) হ্যাঁ আপন মনে কবিতা পড়ে চলেছেন আমি পালিয়ে এয়েছি টের পাননি (হেসে উঠল) (সুজিৎ রমলার হাসিতে যোগ না দিয়ে একদৃষ্টিতে রমলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল)

রমলা। কী দেখছেন সুজিৎদা'?

সুজিৎ। দেখছি যে তুমি দেখবার মত; সত্যি তুমি বড় সুন্দর হচ্ছ রমু।

রমলা। (খুসি চেপে) কেন আমায় ঠাট্টা করছেন সুজিৎদা' আমি ওর এক বর্ণও বিশ্বাস করি না।

সুজিৎ। সেটা আমার দুর্ভাগ্য; আমার ভাল লাগে আমি বললুম, সত্যি তোমার দিকে আজকাল তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

রমলা। (কপট দীর্ঘনিশ্বাস টেনে) তবু ত' আপনার ধারণায় আমি এখনো ছেলে-মানুষ···আমি।

সুজিৎ। (হেসে ফেলে) আমি ত' বলছি না যে তুমি বুড়োমানুষ হয়েছ।

রমলা। না না বুড়োমানুষ হবার কথা বলছি না, মানে আমায় নিতান্ত ছেলেমানুষ মনে করে আপনিও এদ্দিন আমায় একদম আমল দিতে চান নি···আমিও যে আপনার···

সুজিৎ। সেটা আবার কি? তোমার চেহারা আমার মিষ্টি লাগে—ভাল লাগে; তাতে আমল দেবার কথা আসে কোত্থেকে।

রমলা। ছিঃ সুজিৎদা' আপনার এইটুকু সাহস নেই, যে কথাটা আপনার মনের কোণে উঁকিঝুকি মারছে সেটা মুখে বলতেই এত ভয়। আপনি যে মনের কথা গোপন করে যাচ্ছেন বেশ স্পষ্ট ধরা যাচ্ছে।

সুজিৎ। (মজা পেয়ে) বারে রমু—তুমি দেখছি মনস্তত্ত্ববিদ হয়ে পড়েছ। তা বেশ, তোমার কাছ থেকেই শোনা যাক্ আমার মনের গোপন কথাটা কী।

রমলা। (মরিয়া হয়ে) যতই চাপা দিতে চেষ্টা করুন না কেন সুজিৎদা' ওটা ধরা পড়ে গেছে; আপনার চাউনিই বলছে। আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে আপনি মনে মনে আমায় ভালবাসেন?

সুজিৎ। (হেসে ফেলে) ওঃ এই কথা, তা শুধু মনে মনে কেন; আমি ত' মুখেও বলতে পারি যে তোমায় আমি···

রমলা। (কৃতকার্য্যতার আনন্দে কথা শেষ করতে না দিয়ে) সত্যি? সত্যি সুজিৎদা' তবে কেন আপনি আমায় সকলের সামনে ছেলে মানুষ ছেলে মানুষ করেন? Oh! How Sweet! এ আমি জানতাম সুজিৎদা—আমি যে কতদিন থেকে···উঃ আমার কী রকম আনন্দ যে হচ্ছে আপনি জানেন না···(গোপন কথা বলার সুরে স্বর নীচু করে) জানেন সুজিৎদা' রতনও আমায় ...মানে ইয়ে···ভালবাসে—বহুবার বলেছেও —কিন্তু সত্যি কথা বলব সুজিৎদা, আমার মনে হয় too young—আজকে আমার কী ভাল যে লাগছে—আমার মনে হচ্ছে যেন তুমি আর আমি ছাড়া—(হঠাৎ বাস্তবতায় ফিরে এসে) কিন্তু এ আমি কী কচ্ছি?

সত্যি, সত্যি, সুজিৎদা' প্লীই—রি-য়্যাল্লি বল, তুমি আমায়...(হঠাৎ থেমে গেল)।

সুজিৎ। (যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, মৃদু হেসে) থেমেছ? বাব্বা! শোন রমু তোমার চেহারা, তোমার care free নেচে চলা, তোমার অকারণে হেসে লুটিয়ে পড়া, এসব আমার ভাল লাগে—খুবই ভাল লাগে, তাই বলে আমায় ভুল বুঝনা রমু! তোমায় আমি আমার ছোট বোনটির মত ভালবাসি।

রমলা। (চেঁচিয়ে উঠে) উঃ! কী ভয়ানক লোক আপনি? না, না, এ আপনার ভারী অন্যায় সুজিৎদা'—আপনি মিথ্যে কথা বলছেন...আমি না, না, কী হবে, আপনি কেন আমায় আগে বললেন না—আমি কত কীই না বল্লাম ছিঃ ছিঃ—আপনি কেন আমায় বল্লেন না আগে (প্রায় কেঁদে ফেলবার উপক্রম করল)।

সুজিৎ। (ঈষৎ হেসে) আমায় আগে বলবার সময় দিলে কোথা? তুমিই ত' অনুমানে সব বলে ফেল্লে। অবিশ্যি ও কথা ঠিক যে...

রমলা। না, না, অপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। আমি যা বলেছি তার একটি কথাও সত্য নয়—এক বর্ণও নয়—কখ্খনো নয়।

সুজিৎ। তা আমি জানি রমু।

"কিরে রমু অত চেঁচাচ্ছিস কেন" (বলিতে বলিতে তমালিকা ঘরে ঢুকল, রমলা ছুটে ড্রয়িং-রুমে ঢুকে পড়ল)।

তমালিকা। (চেয়ারে বসে গম্ভীর ভাবে) দেখুন সুজিৎ বাবু আপনি রমুর সঙ্গে ও রকম ঠাট্টা করবেন না—ও সত্যি করে মনে কর্ত্তে পারে যে আপনি হয়ত...

সুজিৎ। (দুষ্টু হাসি হেসে) আপনার তাহলে এ গুণও আছে দেখ্‌ছি।

তমালিকা। না থাকবে কেন? ছোট বোন সে শত হলেও...

সুজিৎ। না, না, আমি সে গুণের কথা বলছি না।

তমালিকা। তবে?

সুজিৎ। এই আড়িপাতার কথা বলছিলুম।

তমালিকা। (বিশেষ লজ্জিত হয়ে) আড়ি পাতা, কই নাত? না, সত্যি দেখুন আমি কিছুই জানি না, এই ঘরে ঢুকতে ঢুকতে যা শুনলুম তাই থেকে বলছি।

সুজিৎ। ও! তা আমি যদি বলি যে আমি ঠাট্টা করিনি, সত্যি সত্যি আমি রমুকে...

তমালিকা। (বাধা দিয়ে) কখ্খনো নয়, "তবে যে আপনি বলছিলেন আমার ভুল
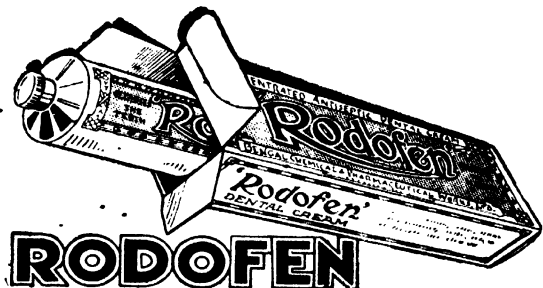
বুঝোনা রমু তোমার আমি...ওকি হাসছেন যে? ও আমি মিথ্যে কথা বলেছি ধরে ফেলেছেন (চটে) হ্যাঁ, তা ঠিক আপনাদের সব কথাই আমি শুনেছি—চুরি করেই শুনেছি। কি কর্ত্তে চান বলুন?

সুজিৎ। (জিভ কেটে) না, না, করব আর কি? ঐ যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে প্রেম আর যুদ্ধের ব্যাপারে কোন কাজই নীচ নয়—তা এখানে ত' আমার দুটোই একেবারে প্রেমের যুদ্ধ।

তমালিকা। ঈস্, প্রেমের যুদ্ধ তা'ও আবার ছোট বোনের সঙ্গে—দেখুন সুজিৎ বাবু আপনি ভাবেন যে দুনিয়া শুদ্ধ মেয়ে আপনার সঙ্গে প্রেম করার জন্যে হাঁ করে বসে আছে নয়।

সুজিৎ। এর আগে ভাবিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে ভাবলেও ভাবতে পারি। অন্ততঃ একজন মেয়ের মনেও যখন সন্দেহ হয়েছে যে আমার ভাববার ক্ষমতা হয় ত' আছে।

তমালিকা। (কথা ঘুরিয়ে নেবার মতলবে) খালি প্রেম আর প্রেম। আপনার আছে দুই এক প্রেম আর মাধবী—কেন এ' ছাড়া কি আর বলবার কথা কিছু নেই?

সুজিৎ। এ দুটো কথাই আপনি শুনতে চান বলে জানতাম, অবিশ্যি দুটো সম্পূর্ণ উল্টো কারণে।

তমালিকা। না প্রেম ভালবাসার গল্প ছাড়াও আমাদের ভেতর অনেক কিছু কথা হতে পারে।

সুজিৎ। কি আশ্চর্য্য, মিস সরকারও ঐ কথা বলেন যে শিক্ষিত যুবক যুবতীর ভেতর অন্য ধরণের কথা হওয়া উচিৎ।

তমালিকা। (মাধবী সরকারের প্রসঙ্গ পছন্দ করে না) তা' যাই বলুন, মাধবীর আবার সবতাতে বাড়াবাড়ি! ওঃ, সেদিন কী তর্ক, যে মেয়েদের স্মোক্ করা ভয়ানক অন্যায়, যদিও আমি নিজেও ও জিনিষটার পক্ষপাতী নই, তবু কেউ ওটা খেলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে এমনতর Prejudiced মতামত থাকবে কেন!

সুজিৎ। মিস সরকার ভাবতেই পারেন না যে মেয়েরা কি করে সিগেরেট খাবে। ও কি রকম ধরণের মেয়ে জানেন ত? ও ছেলেদের সিগেরেট খাওয়া পর্য্যন্ত দেখতে পারে না।

তমালিকা। তা একে বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কি বলব? তারপর শুনুন, আপনাদের কথা উঠতে....

সুজিৎ। (হঠাৎ কী সর্ব্বনাশ, আপনারা বলেছেন নাকি, আমি স্মোক করি?

তমালিকা। তা' যদি বলেই থাকি, আপনি ও রকম চমকে উঠলেন যে?

সুজিৎ। না, না, আপনি জানেন না, ও কী ভয়ানক এককাট্টা মেয়ে। স্মোক করি জানতে পারলে হয়ত' "Smokers not allowed" বলে দরজায় নোটিশ ঝুলিয়ে দেবে।

তমালিকা। তা' যদি দেয়-ই, তা' বলে যা করেন, তা বলতে ভয় পাবেন?

সুজিৎ। আমি ত' স্মোকিং ছেড়েই দিয়েছি, আর তা'ছাড়া আপনি জানেন না মাধবীদের ওখানে ভাল ছেলে বলে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আমার কী রকম বেগ পেতে হয়েছে, তবে না সহজ ভাবে মিশবার সুযোগ পেলাম।

তমালিকা। (ভ্রু কুঁচকে) আর আমাদের এখানে সহজ ভাবে মিশ্‌ছেন কবে থেকে?

সুজিৎ। (তমালিকার দিকে কটাক্ষ হেনে) এখানে জুলিয়াস্ সিজারের ভাষায় বলতে হয় ভিনি, ভিডি, ভিসি,—এলাম, দেখ্‌লাম্ জয় করলাম্—কী বলেন আপনি?

তমালিকা। (খুসী হয়ে হেসে) অতটা অহঙ্কার থাকা ভাল নয়, অহঙ্কারই...

সুজিৎ। (ব্যস্ত হইয়া) রক্ষা করুন, আপনি আবার মাধবীর মত বাল্যশিক্ষার উপদেশ আওড়াতে সুরু করবেন না—ঐ একটি জিনিস আমার ধাতে সয় না, নেহাৎ মাধবী মেয়ে, তায় সুশ্রী-দর্শন, তাই পুষিয়ে যায়, তা না'হলে একেবারে অসহ্য হয়ে উঠত।

(ক্রমশঃ)

খোলা-চিঠি

শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে

দুর্গাদাস,

তুমি হ'চ্ছ বাঙলার সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় চিত্র-নট। তোমার বয়েস হ'য়েছে ঢের; কিন্তু এখনও এখানকার প্রযোজকেরা তোমাকে নায়ক সাজাবার জন্য টানাটানি করে। অর্থাৎ বাঙলা ফিল্মের তুমি হচ্ছ 'আলালের ঘরের দুলাল।' তোমার চেহারা ভাল, তোমার কথা মিঠে এবং তোমার অভিনয়ের ভেতর একটা স্বাতন্ত্র্য আছে—তাই বোধহয় তোমাকে সকলে চায়। কিন্তু তুমি রাগ কোর না, নায়ক সাজবার বয়েস আর তোমার নেই। তুমি অসংখ্য ছবিতে অভিনয় কোরে নাম কিনেচ—তোমায় দেখবার জন্যই সকলে ছবি-ঘরে গিয়ে মারামারি করে। কেন করে?—তুমি যদি নারী হ'তে তা হ'লে নয় বুঝতাম তোমার নারী অঙ্গের সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য মধু-মক্ষিকার ভীড় হ'য়েচে। কিন্তু তুমি পুরুষ; সুতরাং একথা বুঝতে হবে যে তোমার নামই ভীড় জমায়েৎ করবার একমাত্র অস্ত্র।

দুর্গাদাস, কিন্তু, আমি বলি তুমি এ প্রৌঢ় বয়সে আর নায়ক সেজোনা তা'তে তোমার এতদিনকার কষ্টার্জ্জিত সুনাম নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। তোমাকে এখন আমরা বয়স্ক লোকের ভূমিকায় বা 'ভিলেন' রূপে দেখতে চাই। ফিল্ম শিল্পের তুমি অনেক সেবা কোরেছে—এই শিল্পের সঙ্গে তুমি যদি আরও জড়িত থাকতে ইচ্ছে কর, তা' হ'লে আমার কথাগুলো তুমি বিবেচনা কোরে দেখ্‌লে সুখী হব।

আর একটা কথা, তুমি যখন এবার থেকে অভিনয় কোরবে তখন চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ কোরে অভিনয় করবার চেষ্টা কোরবে। তোমার প্রত্যেক চরিত্রেই আমরা দেখতে পাই স্থানে স্থানে তোমার অভিনয় হয় খুব ভাল, আবার জায়গায় জায়গায় তুমি যেন তাল রেখে চল্‌তে পার না। যদি তুমি এবার বয়েসী লোকের অংশে নামো তা' হ'লে তোমাকে একটু সংযমী হ'য়ে অভিনয় কোরতে হবে। লোকে তোমায় দোষ দেয়, তুমি নাকি অত্যধিক হাত পা নাড়াও—এ অভ্যাসটা যে তোমার নেই, এ কথা আমরা অস্বীকার কোরতে পারি না।

আর একটা বিষয়ে তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে সেটা হ'চ্ছে, আমাদের দেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীর মত তুমি এ ষ্টুডিও ও ষ্টুডিও ঘুরে বেড়াও না। এতে যে শিল্পীর আভিজাত্যের কতটা হানি হয় তা' আমাদের দেশের শিল্পীরা বোঝে না।

দুর্গাদাস, তোমাকে আমি যে কথাগুলো বল্‌লাম তা' ভালর জন্য বলেছি—তুমি যদি সেই মত কাজ কর তা' হ'লে তোমার আরও উন্নতি হবে আশা করি। তোমাকে আমরা আরও অনেকদিন ছায়াপটে দেখ্‌তে চাই—সেইজন্যই তোমাকে এ খোলা-চিঠি লেখার আমার উদ্দেশ্য। ইতি—

শ্রীঅকিঞ্চিৎকর কর

আগামী সংখ্যার খোলা-চিঠি পাঠানো হবে রবি রায়কে।

আকাশ ও নীড়

শ্রীতারাপদ রাহা

ভালবাসিলে সকলে যা মনে করে ছেলেটীও তাই করিত। প্রতিদিন মেয়েটীর পাশে বসিয়া তা'র চোখের দিকে চাহিয়া সে ভাবিত—ঐখানে চাহিতে পারিলে সে জগতের আর কিছুই চায় না, একটুও না: ও কি আমায় চায়—আমার মত করে, অপার অসীম কামনা নিয়ে?—কখনও নয়!

মাঝে মাঝে ছেলেটী অনেক কথা শুনাইত মেয়েটীকে তীক্ষ্ণ, ক্ষুরধার, তীব্র জ্বালাময়ী কথা। শুনিয়া মেয়েটি হাসিত—ছেলেটীর হাতখানি হাত নিজের হাতের মাঝে লইয়া, তার মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিত। ছেলেটীর জ্বালা আরও বাড়িত।

তারপর হঠাৎ একদিন ছেলেটী বিদেশে গেল,—কি জানি কেন? মানুষের নিজের মনের খবরই কি মানুষ সকল পায়?

মেয়েটী তাদের নিত্যকার জায়গায় বসিয়া সকাল সন্ধ্যা করিয়া তার আসিবার দিন গণিত, আর স্মৃতির পুঁটুলী খুলিয়া দেখিত; মনের কোণে ছেলেটীর জ্বালার কথা ফুল হইয়া ফুটিত।

তারপর একদিন তাদের বিরহের অবসান হইল, ছেলেটী ফিরিয়া আসিল, তা'র মুখে আরও তীব্র করিয়া জ্বালার কথা শুনিতে মেয়েটীর অন্তরাত্মা তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠিল। ছেলেটী তা'র দুটী হাত ধরিয়া উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া বলিল, ওগো, কত সুন্দর কি অপরূপ এই পৃথিবী, ইচ্ছে করে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সব দেখাই। কত মরুপ্রান্তরের মাঝ দিয়ে যে গাড়ী ছোটে! জোছ্‌না রাতে দূরের পাহাড়গুলি যেন এক মায়ারাজ্যের সৃষ্টি করে। আর সাগর? সে বুঝবে না তুমি, কি বিরাট অনুপম সৌন্দর্য্য সে! সর্ব্বনেশে! মানুষের সকল ভুলে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাধ যায়।

মেয়েটী ছেলেটীর দিকে অপলক চোখে চাহিয়া থাকে; তা' হ'লে মিছে, আমার চোখে সাত সাগরের গভীরতা—মিছে! কথায় অমৃত ঝরে মিছে! আমার পায়ের নখে জগতের যত শোভা হার মেনে যায় এ সব মুখের কথা!

ছেলেটী তখনও অবিরাম বলিয়া চলে: ওঃ কি শান্তি, কত বর্ণ, কত আলো! একদিন যদি তুমি—

মেয়েটী তার মুখ আটকাইয়া ধরিয়া বলে, থামো,—তারপর তার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদে।

ছেলেটী যেন কিছু বুঝিতে পারে না, অপ্রতিভ হইয়া বলে, কেন? কি হ'ল এই! বলো না!

মেয়েটী চোখের জলের ভিতর দিয়াই বলে, ওগো তোমার দুটী পায়ে পড়ি, থামো,...আমার সারা প্রাণটা যে তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে আছে!...আমার জন্যে তোমার সকল জ্বালা কি শেষ হয়ে গেছে? আজ অনেক পেয়ে এসেছ তুমি—অনেক, কিন্তু আমার না পাওয়ার একটুখানি জ্বালাও কি তোমার বুকে নেই—একটু খানি ব্যথা!

নব বর্ষের দেয়াল পঞ্জী

কন্টিনেণ্টাল ট্রেড্ এজেন্সীর মারফৎ আমরা জার্ম্মেনীর কালী প্রস্তুতকারক মেসার্স ই, টি, গ্লিটসম্যানের একখানা সুদৃশ্য ত্রিবর্ণ রঞ্জিত দেয়াল পঞ্জী পাইয়াছি।

আমরা সুপ্রসিদ্ধ চা ব্যবসায়ী মেসার্স এ, টস, এণ্ড সন্সের একখানা সুদৃশ্য দেয়াল পঞ্জী পাইয়াছি।

যা হয়ে থাকে

শ্রীইন্দুভূষণ চৌধুরী

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই হরিশ বাবু হাঁক্‌লেন,—"কাগজ কোথায়, কাগজ, আনন্দ-বাজার আবার নিয়ে গেল কে? নাঃ, আর পারা গেল না; দরকারের সময় যদি কোন জিনিস পাওয়া যায়! কী সুখেই যে সংসার করি, তা—"

কথাটার শেষ আর হলনা, শুধু রেশটাই রয়ে গেল। কারণ সুমুখেই গিন্নী এসে হাজির, বললেন,—"কীগো, ঘুম থেকে ত উঠেছ বেলা ৯টায় তা অত চেচাচ্ছ কেন? বলি বাজার টাজার কি আজ আর হবে না। ওদিকে ঠাকুরপো'র অফিসের বেলা যে হয়ে এল। এক্ষুনি ত চান্ করে এসে হাজির হবে।

হুঁ, চেচাই কি আর সাধে। ঘুম থেকে উঠে কাগজ না দেখ্‌লে আমার আর সেদিন কোন কাজই কর্ত্তে ইচ্ছে করে না।

কেন, কেন—কাগজ দেখত মোটে তমিনিট, তাও "পাত্র চাই" "পাত্রী চাই",—ঐত খবর, তা আর না দেখ্‌লেও হবে। এখন সকাল সকাল বাজারটা সেরে এস।

তুমি ত' বলেই খালাস গিন্নী। তোমার ত' কোন চিন্তা ভাবনা নেই। থাকৃত তোমার ঘাড়ে আইবুড়ো বোনের বিয়ের ভার, ভাবতে হত কি করে আইবুড়ো বোনের বিয়ে হয়,—

দেখ,—তাহলে তোমার মত ঘরে বসে রোজ খবরের কাগজে বিয়ের খোঁজ নিতুম না। কই, একবছর ধরেত' খবরের কাগজে কত বিজ্ঞাপন দিলে, বিজ্ঞাপন দেখেও ত কত জায়গায় হাটাহাটি করলে, কই হল কি কিছু তাতে?

সাধে কি আর হয় না গিন্নী,—সবই অদৃষ্ট, কপাল কপাল,—আজ থাক্‌ত আমার হাতে অজস্র টাকা, দেখতে সবই হয়। এইত সেদিনও আনন্দবাজারেই বিজ্ঞাপন দেখলুম—"পাত্র চাই তিন হাজার টাকা পুণ দেওয়া হবে"—দেখত এখন, এরূপ যদি বিজ্ঞাপন দেবার ক্ষমতা থাকত।

নাও, এখন আর বাজে বকতে পারি না। বাজার থেকে সকাল সকাল এস।

* * *

বিকেলে অফিস ফেরতা হরিশবাবু গিন্নীকে ডেকে বল্‌লেন,—ওগো শুনছ, প্রতিভা কোথায় গেল, আবার।

কেন, কেন—কী হয়েছে?

না, তা নয়, আজকে সন্ধ্যার সময় চার পাঁচজন ভদ্রলোক আসবেন কিনা, ওরা খুকীকে দেখ্‌বেন, দেখ তুমি, এবারকার সম্বন্ধটা ঠিক হয়েই যাবে, হাসছ কী অত?

না, না, হাসবার কথাত' এ নয়, কিন্তু "প্রজাপতি-দপ্তর" অফিসের লোক এই নিয়ে কবার এল বলত।

হরিশবাবু এবার ভয়ঙ্কর চটে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন, দেখ, সব বিষয়েরই একটা গুরুত্ব আছে। তুমিত হাসছ, কিন্তু জানো লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না, ও একটা বৃহৎ ব্যাপার।

কিন্তু আমার মনে হয় আজকাল লাখ টাকা না হলে মেয়ের বে হয় না।

এমন সময়ে বাইরে কড়া নেড়ে উঠ্‌ল ও ডাক এল "হরিশ বাবু বাড়ী আছেন কী?"

হরিশ বাবু ব্যস্তভাবে বাইরে এলেন, এবং দরজায় উপস্থিত চারিজন ভদ্রলোককে অত্যন্ত বিনয় সহকারে বৈঠকখানা ঘরে নিয়ে বসালেন। এবং পরক্ষণেই ভিতরে এসে খুকীকে একখানা ফর্সা কাপড় পরিয়ে বাইরের ঘরে পাঠাবার ও সমাগত ভদ্র-লোকদের জন্য কিছু মিষ্টির কথা ব'লেই চট্ করে ফিরে যেয়ে বল্‌লেন,—এই, আপনারা আসায় খুবই খুসী হয়েছি, আমারই বোন বিবাহযোগ্য। এখনি এই, আপনাদের সাথে আলাপ হয়ে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি, এই,

আশা আছে এ মাঘ মাসের ভেতরই যাতে এখন শুভ কার্য্যটি হয়ে যায়।

তাহার কথায় বাধা দিয়ে সমাগত এক ভদ্রলোক বললেন,—আপনি অত ব্যস্ত হবেন না হরিশ বাবু, আমরা "প্রজাপতি-দপ্তর" অফিস থেকে আসছি। ওখানে আমরা টাকা জমা দিয়ে নাম ভর্ত্তি করিয়েছি কিনা তাই ওরাই আমাদের হয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।

হরিশবাবু বললেন, "আমি বিজ্ঞাপন দেখেই ও অফিসে গিয়েছিলাম, ওখানকার সকলেই আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, আপনারা অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি, এখন এ গরীবের,—এই যে, এটিই আমার বোন, বোস্ খুকী ভাল হয়ে বোস।

আগত প্রবীণ ব্যক্তি বললেন, "তোমার নামটি কি মা?

শ্রীমতী প্রতিভা চাটার্জ্জি।

লেখাপড়া কতদূর করেছ মা,

ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছি, অসুখ হয়েছিল বলে পরীক্ষা দিতে পারিনি।

বেশ, বেশ, আচ্ছা মা, রান্না-বান্না জানোত।

জানি,

বেশ, বেশ, বেশ; এখন তুমি ভেতরে যাও,—বুঝলেন হরিশ বাবু, মাকে আমাদের চমৎকার লেগেছে। বুঝেছেন, বড় লক্ষ্মী মেয়ে। এ যার ঘরে যাবে তারই ভাল হবে।

আনন্দের আতিশয্যে প্রথমতঃ হরিশবাবু কোন কথাই বলতে পারলেন না। পরে বললেন, এখন আপনাদের দয়া।

না, না, সেকি বলছেন? দয়া আবার কি—যা খাটি কথা তাই বলছি। হ্যাঁ, তবে এখন আপনি আপনার বোনের বিয়েতে কি দেবেন সে সব কথা বলুনত! তাহলেই সব ঠিক হয়ে যায়।

আকাশ থেকে পড়ে হরিশ বাবু বললেন, সে কি? বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল যে, পাত্রী পছন্দ হলে দাবী কিছুই থাকবে না।

হাঁ, হাঁ, হাঁ, আরে আমরা কি কিছু দাবীই করছি। তবে আমরা ত' আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারব না। ওই খরচ বাবদ ধরুন হাজার খানেক টাকা—আর আপনার বোনকে যাতে কোন পার্টি নিমন্ত্রণ ইত্যাদিতে শুধু হাতে ত' আর নেওয়া চলবে না। তাই চলনসই হাজার দু এক-টাকার গহনা, কী বলেন, শুধু এই দিলেই হবে।

কিন্তু দেখুন আমি খুবই গরীব, ওই আপনাদের বিজ্ঞাপনে দাবী থাকবে না দেখেই শুধু আপনাদের কাছে গিয়েছিলাম, আমি কিছুই খরচ কর্ত্তে পারব না। এমন সাধ্যই আমার নাই।

কি আর করি বলুন তাহলে। খুবই দুঃখিত হরিশ বাবু। আচ্ছা, আসি তাহলে, নমস্কার।

পৃথিবীর আলো ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। অন্ধকার এখনি পৃথিবীকে গ্রাস করবে। হরিশ বাবুর সম্মুখেও আজ বিশ্বের অন্ধকার বিরাট মুখ ব্যাদন করে আসছে। এ সংসারে হরিশ বাবুর মাত্র ৫০৲ টাকার চাকুরীই সম্বল। বাড়ীঘর বলতে তার কিছুই নেই, আত্মীয় স্বজন তার এক ছোট ভাই বোন আর স্ত্রী। বোনের বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আরও দুবছর আগে বিয়ে দিলে ভাল হত।

বাবু চিঠ্ ঠি হ্যায়।

হাত বাড়াইয়া হরিশ বাবু চিঠিখানি গ্রহণ কোরলেন। চিঠি আসছে "প্রজাপতি-দপ্তর অফিস" থেকে। তারা জানিয়েছে—মহাশয়, পাত্রীর সম্বন্ধ জন্য অদ্য পুনরায় এক ভদ্রলোক আপনার সাথে দেখা কোরবেন। কিন্তু আপনার কথিত মত এখন পর্য্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। আপনার সদস্য জন্য বর্ত্তমান মাসের দু'টাকা শীঘ্রই পাঠাবেন।

নাঃ, আর ভাবা যায় না, কোন চেষ্টাই সে আর করবে না। বোনকে লেখাপড়া শেখান হয়েছে, দেখেও কেহ অপছন্দ করে না, তবুও কেন ওর বিয়ে হয় না। টাকা নেই বলে? দরিদ্রের বোন তাই কি? দাবী নাইর পরিমাণই যদি তিন হাজার টাকা তাহলে দাবীর পরিমাণ কি? এ সংসারে তাহলে গুণের মূল্য রইল কি। কে এই সমস্যার সমাধান কোরবে। এ সংসারে

সাহিত্য পরিচয়

চক্রব্যূহ—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

মহাভারতের একটি পর্ব নিয়ে এই নাটকখানি রচিত হ'য়েছে। পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের শেষ সময়ে কৌরবরা যখন গোধন হরণ কোরতে যান সেখান থেকে আরম্ভ কোরে সুভদ্রা-নন্দন অভিমন্যুর চক্রব্যূহে নিধন ব্যাপারেই এই নাটকের পরিসমাপ্তি। নাট্যকার এই রচনার জন্য মহাকবি ভাসকৃত রূপকাবলি থেকে ভাব সংগ্রহ কোরেছেন, এমন কি স্থানে স্থানে ভাসের ভাষাও পর্য্যন্ত গ্রহণ কোরেছেন। অবশ্য সেজন্য তিনি যথেষ্ট ঋণ স্বীকার কোরতেও কুণ্ঠিত হন নি।

এই নাটকের প্রথম অঙ্কটি ভাসের অনুকরণে লিখিত। অবশিষ্টাংশ মহাভারত থেকে গৃহীত হ'য়েছে। যাই হ'ক, একথা বলতে আমরা কুণ্ঠিত হব না যে নাট্যকারের ভাষা ও বলবার শক্তি চমৎকার। অধুনা এই সুনাটক বর্জ্জিত বাঙলায় মনোরঞ্জনবাবুর "চক্রব্যূহ" সত্যই আশার সঞ্চার কোরেছে। নাট্যকার হিসাবে এই তাঁর হাতে-খড়ি; সেজন্য ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলে মনে হয়।

বইখানির ছাপা প্রশংসনীয়।

স্রক-চন্দন—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—বুক এজেন্সী। ৩৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। দাম—পাঁচ সিকা।

ছোট গল্পের বই বলতে বাজারে চলতি যে সব প্যাচোয়া ঘটনার তথাকথিত মনস্তত্ত্ব মুলক গল্পগুলোর কথা মনে পড়ে, বইটি সে শ্রেণীর নয়। স্রক চন্দনের বিশেষত্ব হচ্ছে এর সারল্য গ্রাম্য বালিকার সহজ ও স্বাভাবিক প্রসাধন নিয়ে—এ কস্‌মেটিক এর রাজ্যে প্রবেশ করেছে—কিন্তু সৌন্দর্য্যে নাগরিকার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়।

এই ভদ্রলোকের লেখা মাঝে মাঝে মাসিক পত্রে লক্ষ্য করেছি বটে কিন্তু পড়িনি। আজ পড়ে ভালই লাগলো—আর অনেকের চেয়েই ভাল লাগলো। সমস্ত রচনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে একটি পবিত্র পরিচ্ছন্নতা। অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায়—গল্পগুলির প্রতিষ্ঠা।

ছাপা ও বাঁধাই ভাল। বইয়ের তুলনায় দাম অপেক্ষাকৃত সুলভই হ'য়েছে। আমরা এই লেখকের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

ডুমডুমা থিয়েট্রিকেল ইনস্‌ষ্টিটিউসন্

(নিজস্ব সংবাদ দাতার প্রেরিত)

গত ২২শে ডিসেম্বর ডুমডুমা এলাকাভুক্ত মেডিকেল ষ্টাফ্ মিলিয়া ডুমডুমা দাতব্য চিকিৎসালয়ের সাহায্যার্থে 'প্রাণের দাবী' ও 'রেশমী রুমাল' অভিনয় করিয়াছেন। নাম ভূমিকায় কেশব (প্রাণের দাবী) ও মিঃ স্যাটো (রেশমী রুমাল) ডাঃ মুনীন্দ্রচন্দ্র দত্ত বেশ সুঅভিনয় করিয়াছেন। শশাঙ্কের ভূমিকায় ডাঃ জানকী চক্রবর্ত্তীর অভিনয় বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রামরূপ, ভোলাপাগলা ও ঝণ্টু—যথেষ্ট পরিশ্রম করা স্বত্বেও আমাদিগকে সেরূপ আনন্দ দিতে পারেন নাই। সর্ব্বাণী—সুঅভিনয় করিয়াছেন। অচলার গান বেশ ভালই হইয়াছে, কিন্তু অভিনয় তত হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। ডাঃ ভৌমিকের শান্তির অংশ মন্দ হয় নাই। চুনিয়া (প্রাণের দাবী) এবং আন্নাকালী (রেশমী রুমাল), যিনি এই দুইটি ভূমিকার অভিনয় করিয়াছেন ও রেশমী রুমালের ভিখারীর অভিনয় যিনি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতেছি। প্রাণের দাবীর মদন, আমাদের একেবারেই নিরাশ করিয়াছেন। রেশমী রুমালের যামিনী, পেশাদারীকেও হার মানাইয়াছে। অন্যান্য ভূমিকা সাধারণ।

মফঃস্বলের অভিনয় মোটের উপর ভালই হইয়াছে। ডিব্রুগড় এমেচার থিয়েট্রিকেল ইনস্‌ষ্টিটিউসন্-এর কনসার্ট পার্টি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং ডুমডুমা চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারীর ডাক্তার কামাখ্যালাল চক্রবর্ত্তীর আদর অভ্যর্থনায় সকলেই বিশেষ প্রীত হইয়াছেন।

তাহলে দরিদের ঘরে কি আর বিয়েই হবে না—

কী অত ভাব্‌ছ?

সম্মুখে গিন্নীকে দেখে হরিশ বাবু বললেন, ভাব্‌ছি সংসার কি ভাবে চলে, এই দেখনা কতইত চেষ্টা করছি বোনের বিয়ে দেবার জন্য—কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত' কিছুই সুবিধা হোল না, অথচ অনেকের ত' হয়ে যায়। আমার টাকা নাই বলেই কী এই অবস্থা।

এ আর নূতন কথা কী। সংসারে যার টাকা আছে তার সবই আছে, তার সবই হয়ে যায়। টাকার উপরেই জগৎটা ঘুরছে। এত হয়েই থাকে, এখন চল ভিতরে চল।

এ কথার উত্তরে শুধু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস হরিশ বাবুর বক্ষ থেকে বেরিয়ে এল।

করিবেন কি?

"ফিরিবনা সাকী আর"

শ্রীশিশির কুমার সরকার

ফিরিবনা সাকী আর
আমি চলিলাম বিপথী পথিক শেষহীন সাহারার।
মেঘ-ডুম্বুর শাড়িতে টানিয়া মেঘলা আঁচলখানি,
দূর পথবাসী হুতাশীর মুখে দিওনা আশার বাণী।
আমার তরেতে আর
ভুল করে সাকী দিওনাকো কভু অশ্রুর উপচার।
শীতের নিশিথে আকাশের ভালে কুহেলী-উঠিলে ফুলে,
পর-দেশবাসী উদাসীর মত থেকো নাকো দ্বার খুলে।
হুতাশার বেদনা,
তব সুরভিত সুরার সুধায়, পায় যেন সান্ত্বনা।
সাকী গো বান্ধবী,
আমার আঁখির জোয়ারের জলে বড় হলো জাহ্নবী।
বুকে জ্বালা আর পেটে ভুক্ নিয়ে অশিতের পথবাহি,
আমি এসেছিনু মুসাফির এক বেদনা বেহাগ গাহি।

আমার আকাশে তাই
চেরাপুঞ্জির আকাশের জল এতটুকু নামে নাই।
হৃদয়েতে মোর সাহারা ফুকিছে চোখে জলে মরুগবী,
তৃষ্ণার জল যাচিতে পেয়েছি—মরিচীকা ছায়া ছবি।
আমি তো চাবনা আর,
যে চাওয়ার মাঝে বিফলতা কাঁদে অপমান আপনার।
লোভাতুর শিব অমৃতের লাগি মথিয়া অসীম জল,
আসিল উঠিয়া কাল-কূট-বিষ আর বিষ-কল্লোল।
ক্ষণিক কামনা মাখি,
নর ও নারীর কামনার প্রেম ভুলিয়া গিয়াছি সাকী
সেই পুরাতন অশ্রুর দান বাহুতে বাহুর বাঁধ,
বন-উচ্ছের পাতার মতন তেঁতো যেন বিস্বাদ।
সবই যে ভুলিতে চাই,
জোয়ারেতে আসা চঞ্চল পানা ভাটাতে ভাসিয়া যাই।

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

বজ্রবাহন বটব্যাল

জন বোলস্

হলিউডে ন বছর কেটে গেলো। জন বোলস আজও এতটুকু বদলে যান নি, গানের জোয়ারে ঠিক তেমনি ভেসে চলেছেন। তাঁর দেহ যেমনটি ছবিতে দেখাত', তাঁর চোখ, ঠিক ন' বছর আগে যেমন করে' ভাবের ভাষা প্রকাশ করত, আর তাঁর স্ত্রী,—যা হলিউড রংমহলে আঁকড়ে ধরে রাখা শক্ত, তা তাঁর অন্তরের অতল তলে ঠিক তেমনি সুন্দরী তরুণী হয়ে ফুটে রয়েছে। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর, তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব, তাঁর পৌরুষত্ব প্রকাশিত সুন্দর চেহারা একটুও বদলে যায়নি শুধু এসেছে নতুন জিনিস—তার দুটি ছেলে।

অনেকদিন আগে—সেই ন বছর আগে—জন বোলস তখন ষ্টেজে গান গেয়ে আসর মাৎ করতেন, তাঁদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কুড়োতেন। তখন টকির যুগ নতুন এসেছে সবাই বলত, জন ছবিতে নামলে এমনি করেই জগতের লোককে মুগ্ধ করবে। একদিন এলেন গ্লোরিয়া সোয়ানসন। গ্লোরিয়া বল্লেন—চল হলিউডে যেতে হবে। জন গ্লোরিয়াকে যেমন ভালবাসেন তেমনি শ্রদ্ধাও করেন; আজও তিনি গ্লোরিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। জন এড়াতে পাল্লেন না। গ্লোরিয়ার সঙ্গেই হোল তাঁর প্রথম ছায়াছবি 'দি লাভস্ অব সুনিয়া।' সেইদিন থেকেই জনের ভাগ্য হলিউডের সঙ্গে এক সুতোয় গ্রথিত হোল। 'দি ডেসার্ট সং' তাঁর ছায়াচিত্র জীবনের পথ আরো প্রশস্ত করে দিলে। তারপর খ্যাতির সুমেরু শিখরে উঠলেন, 'ওনলি ইয়েস্টারডে' অভিনয় করে মার্গারেট সুলেভানের সঙ্গে। ছায়াছবির সঙ্গে জীবনটাকে বেঁধে ফেলবার পর গ্লোরিয়র সোয়ানসনের সঙ্গে আবার একখানা নতুন ছবি এইবার শেষ করলেন। বইখানা হচ্ছে 'মিউসিক ইন দি এয়ার'।

এর পর অন্য ছবি তোলা আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত কলেজ জীবনের প্রেমে পাওয়া,—নীল চোখ, সোনালী চুল, হাসিমাখা মুখ—সেই তাঁর স্ত্রী,—তাকে নিয়ে চুমু খেয়ে, ঘুরে বেড়িয়ে, বাজার করে দিন কাটবে।

'মেট্রো'-র "মেরী উইডো" গত বছরের একখানি নাম-করা ছবি। এতে মরিশ শিভালিয়ে 'ড্যানিলো'-র ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন।

'ক্লদেৎ কলবার্ট'এর নতুন বই

ক্লদেৎ নামছেন নতুন বইতে সুপুরুষ যুবা 'রেমণ্ড মিলাণ্ড'কে নিয়ে। বইখানা হচ্ছে 'দি গিলডেড্ লেডি'। 'নাইট ক্লাবের দৃশ্য তোলবার সময় ক্লদেৎ পড়েছেন সারা গায়ে গহনা। গলায় ঝুলিয়েছেন হীরের মালা মাঝখানে বড় একখানা চুনী রেখে। তারপর কানে, হাতে মাথায় হীরে জহরতের ছড়াছড়ি। এই গহনা গুলির দাম নাকি এক লক্ষ পাউণ্ড। এই সব গহনা গুলি ইংরাজ রাজপরিবার থেকে হলিউডে এসে আস্তানা গেড়েছে। আশ্চর্য্য নয় ছায়াছবির রাজা রাণী সত্যিকার রাজা রাণীর চেয়ে কি কিছু কম। তাদের অর্থ, তাদের যশ, তাঁদের ব্যক্তিত্ব কার চেয়ে ছোট।

কনি বেনেট আর ক্লার্ক গেবল্

ক্লার্ক গেবলের বক্স অফিসের আদর ভয়ানক বেড়ে গেছে। লাওনেল ব্যারিমুর প্রথম তাঁকে পর্দ্দায় নামাবার জন্যে টেনে আনে। আর আজ লাওনেল চেয়ে তাঁর দর

"মেরী উইডো" কোলকাতায় দেখানো হ'চ্ছে। এতে জ্যানেটা ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে আপনারা সম্পূর্ণ একটি নতুন অংশে 'সোনিয়া'-র দেখতে পাবেন।

অনেক বেশী। ক্লার্ক প্রেমের অভিনয় করতে ভয়ানক ওস্তাদ। সবাই বলে জোয়ান ক্রফোর্ডের সঙ্গে তাঁর প্রেমের অভিনয় হয় ভাল। 'চেইনড্' বইখানায় এরা দুজনে একসঙ্গে নেমেছেন। এবার নামছেন কর্নি বেনেটের সঙ্গে নতুন বই 'টাউন টকে'। ক্লার্ক গেবলের এখন বাজারে দর অনেক। এ বছরে তাঁকে অনেকগুলো বইতে অভিনয় করতে হবে। কখন কার সঙ্গে পর্দার বুকে প্রেমের অভিনয় সুরু হবে কে জানে।

'ম্যাক্রীর' আর বনল না

সেদিন জোয়েল ম্যাক্রীর সঙ্গে জোসেফ ভন ষ্টার্ণবার্গের সঙ্গে রীতিমত বচসা হয়ে গেছে। জোয়েল স্বাধীনচিত্ত পুরুষ; তিনি কারোর কথার ধার ধারেন না। যা তাঁর বোঝেন তাই করতে চান। ডাইরেক্টারের বলার সীমার মধ্যে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারেন না। কাজেই 'Carnival in Spain' এ আর তাঁর নামা হোল না। মার্লিন নিজেই তাঁর এ ছায়াছবির নায়ককে বেছে নিয়েছেন। ভাগ্যবানটির নাম হচ্ছে সিসের রোমারো। ইনি হচ্ছেন একজন পুরোদস্তুর ইতালিয়ান। ছায়াছবিতে এটা তাঁর প্রথম অভিনয়। ছবিখানিতে ডাইরেকসন ছাড়া ভন নাকি ক্যামেরার কাজও নিজেই করবেন।

লন চ্যানির ছেলের নাম।

লন চ্যানি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। আজ লোকে ভুলে না গেলেও তাঁকে নিয়ে কাগজে লেখালিখি করেনা বড় তাও দেয় না। তবু যাঁরা তাঁকে ভাবে, যাঁদের মনে লন চ্যানির কথা জেগে আছে, বৈঠকে বসে যাঁরা তার কথা আলোচনা করেন, তাঁরা হয়ত তাঁর ছেলের নাম শুনলে খুশী হবেন। তাঁদের স্মৃতির ইতিহাসের পাতায় একটা কথা আরো বেশী যুক্ত হবে সেটা হচ্ছে 'ক্রটন চ্যানি'।

মিরনা লয়

মিরনা লয় নামছে নতুন বইতে। সেই ছায়াচিত্রের প্রেমিক নায়ক হয়ে দেখা দেবেন উইলিয়াম পাওয়েল। বইখানার নাম জানতে ইচ্ছে হচ্ছে—না,—'ক্যাসিনো মারডার' সেই বইখানা।

কোন্ ছবিতে?

সেই বইখানা যা আমাদের সবায়ের মুখে মুখে ফেরে। গানের দরজাও যাঁরা মাড়ায় না তাদের মুখেও সেই ছায়াছবির গান শোনা যায়। যাতে প্রথম অভিনয় করেছেন 'হুইলার' ও 'উইলসি'। এ আপনাদের কারোর মনে এলোনা। আপনারা গান জানেন না, তবে লোককে খুন করতে পারেন। আমি বলছি বইখানি হচ্ছে—'রিও রিটা'।

জ্যাকি কুপারের নতুন বই

জ্যাকি কুপার নামছে নতুন বইতে। বইখানির নাম হচ্ছে, 'লোন কাউবয়'।

আইরেন ডুনের দেমাক ভারী

ছুটীতে 'আইরিন ডুনেকে' যদি ষ্টুডিওর কর্তারা ডেকে পাঠান তা হলে তাঁর আসবার খরচা ছাড়াও নাকি এক হাজার ডলার দিতে হবে। এমনিই নাকি ষ্টুডিওর কর্তাদের সঙ্গে তাঁর চুক্তি আছে। ধন্য এদের বরাত।

পেগি কঙ্কলিনের চুক্তি

এদেশের চুক্তির মেয়েদের নিয়ম আছে নাকি চুক্তিতে আবদ্ধকালে এই সব মেয়েরা বিয়ে করতে পারবেন না বা তাদের ছেলেও হবেনা। সেদিন পেগি কিন্তু এতে আপত্তি তুলেছিল এবং যা চায় তা পেয়েও ছিল। পেগি চায় 'সে বিয়ে করবে তার ছেলেও হবে'। বাড়িতে ছেলে বা মেয়েকে আদর করে, চুমু খেয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, আয়ার হাতে দিয়ে এসে ষ্টুডিও'র সেটের ওপর আলোর তাপে নাচবে—তাই না!

ডগলাস কোথায়?

ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্ নাকি এখন রয়েছেন সুইজারল্যাণ্ডে। মনের দুঃখে নয়, ছবি তুলতে। সেদিন পিকফোর্ড আর তাঁর মামলা সব শেষ হয়ে গেলো। মেরী আপত্তি জানিয়েছেন কোর্টে এ না'কি যে ডগলাস্ কেন এত বাইরে বাইরে এত ঘুরে বেড়ায়, তাই মনোকষ্টে আইন দিয়ে ছাড়াছাড়ি আনছেন। ছায়ার মানুষের সবটাই যেন ছায়ার মতন, মনটাও।

খুচরো খবর

সুবই অদ্ভুৎ। জিনজার রোজাস তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে প্রতি মাসে পান প্রায় ৬[illegible]০ চিঠি।

* * *

মার্লিন ডিট্রিচ যখন মোটে বারো বছরের মেয়ে তখন থেকেই জার্ম্মাণ, ইংরাজি ও ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন।

* * *

রিচার্ড ট্যালমেজের আসল নাম হচ্ছে 'মেট জেন্টি'।

* * *

রবার্ট মন্টোগোমারীর স্ত্রী হচ্ছেন এলিজাবেথ ব্রায়ান এ্যালেন।

* * *

ভারজিনিয়া ভালি হচ্ছেন চার্লস ফ্যারেলের স্ত্রী।

* * *

মরিয়ম ও সুলিভ্যানের সঙ্গে জন ফ্যারোর বিয়ে হয়ে গেছে।

* * *

বক্স অফিসের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, দেখা যায় লাওনেল ব্যারিমুরের জনপ্রিয়তা অনেক কমে এসেছে, সেই পরিমানে বেড়েছে ক্লার্ক গেবলের।

* * *

জ্যাক বুকানন, ন্যানসি ও নেল নেমেছেন 'ক্রস্টার মিলিয়নস্' ছবিতে নায়ক নায়িকার অংশ নিয়ে।

* * *

রোনাল্ড কোলম্যানকে নাকি কোনকালে জামা বাঁধা দিয়ে এক পক্ষকালের খাওয়ার সংস্থান করতে হয়েছিল।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ২৪শে মাঘ, ১৩৪১, 7th February, 1935. { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

উপনির্ব্বাচনের শিক্ষা

কলিকাতা কর্পোরেশনের ২৭নং ওয়ার্ডের উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ জে, এম্, দাশগুপ্ত অতি অল্পসংখ্যক ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আশুতোষ কলেজের একজন অপরিচিত অধ্যাপকের পক্ষে এত অধিক সংখ্যক ভোট পাওয়ার একমাত্র কারণ হইতেছে যে দেশবাসী বিবদমান কংগ্রেসী উপদলদ্বয়ের কর্ম্ম-পন্থায় আস্থা হারাইয়াছেন। তরুণ মুসলমান কংগ্রেস কর্ম্মী মিঃ লাল মিঞার প্রচেষ্টায় শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীকে অগ্নিসাক্ষী করিয়া ডাঃ জে, এম্, দাশগুপ্ত কংগ্রেসের মনোনয়নের ছাপ লইয়াছিলেন। দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী মিঃ এন্, সি, সেন দ্বন্দ্ব হইতে অবসর গ্রহণ না করিলে অধ্যাপক সোমেশ্বর নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইতেন। মিঃ সেনের অবসর গ্রহণে কংগ্রেস-প্রার্থী সাময়িকভাবে জয়লাভ করিলেও উক্ত নির্ব্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে কি ? অধ্যাপক সোমেশ্বর পরাজয়ের পঙ্কতিলক শিরে বহন করেন নাই—তিনি কংগ্রেসী উপনেতাদের কার্য্যাবলীতে দেশবাসীর অনাস্থার যে স্বরূপ দেখাইয়াছেন; তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস যদি জয়লাভের বাসনা পোষণ করেন, তবে বর্ত্তমানে বিবদমান দল দুইটীকে পূর্ব্ব বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র জেনোয়া হইতে সম্পাদককে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতেও তিনি অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ২৭নং ওয়ার্ডের উপনির্ব্বাচনের ফলাফল সুভাষচন্দ্রের অভিমতকেই সমর্থন করিয়াছে। শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর, শ্রীযুক্ত যোগেশ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সুরেশ মজুমদার মহাশয়ত্রয় এখন হইতেই তৎপর হউন নচেৎ ১৯৩৬ সালের মার্চ্চ মাসের পর কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাঁহাদের দ্বিধাবিভক্ত বাহিনী বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং কলিকাতার স্বরাজ কর্পোরেশনে আবার বিশ্বাস-জ্যোতিষ-রুণী-রাজের প্রতিষ্ঠা হইবে। দেশবন্ধুর অক্ষয় কীর্ত্তির এই বিলোপ সাধনে কি শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর প্রভৃতি কংগ্রেস-সেবীবৃন্দ সহায়তা করিবেন ? তাহা করিলে দেশবাসী কোন দিনই তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিবে না।

২৭নং ওয়ার্ডের বিগত উপনির্ব্বাচনের প্রসঙ্গে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ আমরা করিতে চাই। দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি দুইটী অধিবেশনে মিঃ এন্, সি, সেনকে কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে মনোনীত করেন। পরিতাপের ও লজ্জার বিষয় যে ডাঃ জে, এম্, দাশগুপ্ত এই নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ন্যায় হউক, অন্যায় হউক দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটী যখন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তখন যিনি ত্যাগী কংগ্রেসকর্ম্মী বলিয়া জাহির করেন তাঁহার পক্ষে এই বিদ্রোহ শোভন হয় নাই। আমরা মিঃ নিশীথ চন্দ্র সেনকে আদর্শ কংগ্রেসকর্ম্মী বলিয়া মনে না করিলেও নিয়মানুগত্যের ও শৃঙ্খলার দিক দিয়া বিচার করিয়া তাঁহাকেই সমর্থন করিতাম। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অপেক্ষা গোষ্ঠীগত শৃঙ্খলা যে বড়—এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাংলার কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ মৃতপ্রায় কংগ্রেসকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন কি ?

চলতি পথে

শ্রীমল্লিনাথ

অর্দ্ধোদয় যোগে দুর্য্যোগ

এবার অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে কলিকাতা সহর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলার মফঃস্বল হইতে লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গাস্নান করিয়া পুণ্যলাভের আশায় কলিকাতায় সমবেত হইয়াছিল। কর্পোরেশন ও বে-সরকারী সেবা-প্রতিষ্ঠান সমূহ যাত্রীদের সেবা ও সুবিধার জন্য যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এতদ সত্ত্বেও গঙ্গার ঘাটে ও অন্যান্য স্থানে কয়েকটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। দৈনিক পত্রিকাসমূহ প্রকাশ করিতেছেন যে, গঙ্গার ঘাটে একটী নারীর গর্ভস্রাব হইয়াছে, একটী বৃদ্ধা কালীঘাটে পৌঁছিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ঘাটে ও রাস্তায় বহু তরুণী, শিশু ও বৃদ্ধা হারাইয়া গিয়াছে। আমরা এ সকল সংবাদে বিস্মিত হই নাই। লক্ষ লক্ষ জনসমুদ্রের মধ্যে ২।৪ জন পাড়াগাঁর তরুণী, বৃদ্ধা বা শিশু হারাইয়া যাওয়া খুব অস্বাভাবিক নয়। অস্বাভাবিক ইহাই যে, পুণ্যসঞ্চয়ের লোভ দেখাইয়া ইহাদের এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনা।

যারা গর্ভবতী, যারা শিশু, যারা যুবতী তরুণী,—পদে পদে যাদের বিপদের সম্ভাবনা, যাদের বিপদের জালে ফেলিবার জন্য অসংখ্য নর-পশু নানারূপ ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে—তাদের জন্যও কি গঙ্গাস্নানের পুণ্যলাভ করা অবশ্য কর্ত্তব্য? গর্ভবতী নারী যে ভবিষ্যৎ সন্তান হারাইল তাতে কি সে পুণ্যলাভ করিল? এত নারী যে হারাইল, তারা যদি বিপদগ্রস্ত হয় তবে কি তাহা এই পুণ্য সঞ্চয় অপেক্ষা দুঃখজনক হইবে না? মোটের উপর যা-কিছু করা হউক না কেন, একটু বিবেচনা করিয়া করা উচিত। এই বিবেচনা-শক্তি হারাইয়া সমাজ আজ বিপদগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে। কলেরা রোগগ্রস্ত হইয়া অনেকে হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তারা নিরাময় হউক এই আমাদের কামনা। কিন্তু, এই 'যোগ' উপলক্ষে হিন্দুর অনেক পরিবারে যে দুর্য্যোগ ঘটিল, আমরা আশা করি, ইহাতে সমাজের চক্ষু খুলিবে, চৈতন্য হইবে।

সমাজ-ব্যাধি

হিন্দু সমাজ-দেহে যে কয়টী ব্যাধি সংক্রামকভাবে দেখা দিয়াছে তন্মধ্যে পণপ্রথা অন্যতম। এ-সম্পর্কে সমাজে বহু আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে, কিন্তু ফল যে বিশেষ কিছু হইতেছে, তাহা মনে হয় না। এই সমাজ-ঘাতী পণপ্রথার কবলে পড়িয়া—কত হতভাগা পিতা যে কন্যার বিবাহ দিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক পিতা অর্থের অভাবে তার বালিকা কন্যাকে 'বাহাত্তুরে' বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিয়া কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। পরিণামে ইহাদের যে কি দশা ঘটিয়া থাকে তা' তারা পূর্ব্বাহ্নে ভাবিবার অবকাশ পায় না। সম্প্রতি বহরমপুরে এইরূপ একটী দুর্ঘটনা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু স্থানীয় ভদ্রলোকদের চেষ্টায় উহা ঘটিতে পারে নাই। প্রকাশ, ৭৫ বৎসর বয়স্ক এক আবগারী দারোগা স্থানীয় ১৩ বৎসর বয়স্কা এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করার জন্য শোভাযাত্রা করিয়া আসে। কন্যা-সম্প্রদান আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে আশে-পাশের লোকেরা মেয়েটীকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসে, এবং তাহারা স্থানীয় একটী যুবক-ছাত্রের সহিত কন্যাটীর বিবাহ দেয়। বৃদ্ধটী নাকি কন্যার পিতাকে দুই হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিল। যাহা হউক, দুর্ঘটনা যে ঘটিতে দেওয়া হয় নাই সেজন্য স্থানীয় ভদ্র-মহোদয়গণকে আমাদের অভিনন্দন। যুবকটী, যে কন্যাটীকে বিনা পণে বিবাহ করিলেন, তাঁকে বেশী প্রশংসা করিব না, কারণ তিনি তাঁর কর্ত্তব্য করিয়াছেন। এখন হইতে বাঙ্গলার প্রত্যেক শিক্ষিত যুবকের এই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, পণপ্রথা দূর করিয়া সমাজের একটা দুরন্ত ক্ষত তাঁরা আরোগ্য করিবেন।

বরিশালেও এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতে ঘটিতে অবশেষে ফাঁসিয়া গেল। প্রকাশ, এক বৃদ্ধ সাধু এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটী মেয়েকে বিবাহ করিবে, স্থির হইয়াছিল। সাধুর সহিত বিবাহ দিলে ধর্ম্মের দিক দিয়া ভাল হইবে, বহু পুণ্যলাভ ঘটিবে ইত্যাদি ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই কন্যার অভিভাবক এই বিবাহে স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু, পরে যখন জানাজানি হইয়া গেল, তখন সাধুপ্রবর গা-ঢাকা দিলেন। শেষকালে জানা গিয়াছে যে, এই সাধুটীর পূর্ব্বে ছয়টী বিবাহ হইয়াছিল। ধর্ম্মের মধ্যস্থতায় সমাজে এই যে একটী সর্ব্বনাশ ঘটিতে বসিয়াছিল, তার জন্য দায়ী সমাজ নিজে—সাধুবেশী ভণ্ডটী নয়। সমাজ ধর্ম্ম অর্জ্জনের আশায় যে-কোন সাধু-বেশধারী ভণ্ডকে গুরুদেবের আসন দেয়। পরে সুযোগ বুঝিয়া গুরুজী আশ্রয়দাতা শিষ্যকুলের সর্ব্বনাশ সাধন করে। সমাজ ধর্ম্ম কর্ম্ম করে, খুব করুক, তাতে কেহ বাধা দিতে চায় না। কিন্তু সেই ধর্ম্মবুদ্ধি যেন ভুলপথে পরিচালিত না হয় এদিকে সমাজপতিগণকে খর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সমাজপতির আসন যাঁরা অলঙ্কৃত করিয়া আছেন, তাঁদের কর্ত্তব্য তাঁরা

ভুলিয়াছেন, তাঁরা তাঁদের আসনকে কলঙ্কিত করিয়াছেন, একথা বড় দুঃখের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে। এখন সমাজকে নূতন পথ দেখাইবার সময় আসিয়াছে, এবং এ-পথ দেখাইতে হইবে একমাত্র বাঙ্গলার যুব-শক্তিকে। বাঙ্গলার ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে রক্ষা করিবে বাংলার দুরন্ত-যৌবন। আমাদের এ-আশা সার্থক হউক।

কামধেনুর দোহন ব্যবস্থা

ভারতের কামধেনুকে আর আর একবার ভাল করিয়া দোহনের আয়োজন চলিতেছে। আইন ও শৃঙ্খলার দ্বারা ভারতে স্থাপিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন যন্ত্র চেষ্টা করিতেছে, তার দেহের শেষ রক্তটুকুও নিংড়াইয়া লইবার। আয়োজনটা হইয়াছে অভিনব রকমের। ২৮শে জানুয়ারী তারিখে 'কলিকাতা গেজেটের' এক বিশেষ সংখ্যায় ঘোষিত হইয়াছে যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি নূতন কর স্থাপনের জন্য আইনের প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। প্রস্তাবগুলি এই :—

(১) বঙ্গীয় বৈদ্যুতিক শুল্ক আইন। আলো ও পাখার জন্য যে বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয়, তাহার উপর এই শুল্ক বসিবে।

(২) বঙ্গীয় তামাক বিক্রয় লাইসেন্স আইন। এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে বাঙ্গলা দেশে তামাক বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স লাগিবে।

(৩) কোর্ট ফী সংশোধন আইন।

(৪) বঙ্গীয় আমোদ প্রমোদ শুল্ক সংশোধন আইন।

(৫) ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন সংশোধন।

উক্ত তারিখের গেজেটে এই সকল প্রস্তাবিত আইনের খসড়াও বাহির হইয়াছে।

কেন আবার এই কর ভার বৃদ্ধি করা হইতেছে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহারে বলিয়াছেন যে, ১৯৩০-৩১ সাল হইতে বাঙ্গলার রাজস্বে অসম্ভব রকম ঘাটতি পড়িতেছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলাকে পাট শুল্কের এক অংশ দিবেন, এবং তাহা হয়ত বরাবরের জন্য নয়। যাহা হউক, পাট শুল্কের টাকা পাইয়াও বাঙ্গলা সরকারের তহবিলের আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষিত হইবেনা। তাই নূতন আইন করিয়া আয় বৃদ্ধির এই প্রস্তাব। গবর্ণমেণ্ট বলেন, বঙ্গীয় বিদ্যুৎ শুল্ক বিলে আয় বাড়িবে ১০ লক্ষ টাকা, তামাক-বিক্রয় লাইসেন্সে ৫ লক্ষ টাকা, কোর্ট ফি বিলে ৩॥০ লক্ষ টাকা, আমোদ প্রমোদ শুল্ক সংশোধন বিলে ৪ লক্ষ টাকা ও ভারতীয় ষ্ট্যাম্প আইন সংশোধন বিলে ২ লক্ষ টাকা। এই পরিমাণ আয় বাড়িলে বাঙ্গলা সরকারের তহবিলে আর ঘাটতি পড়িবে না।

সরকারী তহবিলের ঘাটতি পূরাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট দৈন্য-পীড়িত বাঙ্গলার মাথা মুড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চলিয়াছেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে দেশবাসী কি জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, সরকার শাসনব্যয় সঙ্কুলানের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চলিয়াছেন ন্যায় সঙ্গত ও সুবিবেচনা সম্ভূত কিনা? প্রস্তাবিত উপায় সমূহ ছাড়াও অন্য কোন উপায়ে ব্যয় সঙ্কুলানের চূড়ান্ত চেষ্টা করা হইয়াছে কিনা? আমাদের মনে হয় সরকার এমন কোন চেষ্টা করেন নাই যাহাতে বাঙ্গলার দরিদ্র কৃষক, প্রজা ও ক্ষুদ্র কুটীর-শিল্পী বাঁচিতে পারে, অথচ সরকারী আয় ব্যয়ও সমান রহিয়া যায়। সেরূপ কোন চেষ্টা যদি করা হইত তাহা হইলে চব্বিশ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণ করিতে দরিদ্র বাঙ্গালী প্রজার মাথায় এরূপ নিদারুণভাবে হাত বুলাইবার দরকার হইত না।

বাঙ্গলায় তহবিলের সমতা রক্ষার জন্য ১৯৩২ সাল হইতে গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলার ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটী গঠিত হয়। এই কমিটীর সভাপতি হন গবর্ণমেণ্টেরই অতি বিশ্বস্ত উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী মিঃ সোয়ান। ঐ বৎসর তিনি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে ব্যয় সঙ্কোচের একটী ফিরিস্তি দেন। এই ফিরিস্তি অনুযায়ী কাজ করিলে বাঙ্গলায় কয়েকটী সরকারী বিভাগের ব্যয় কমাইতে হইত। তাতে পৌনে দুই কোটী টাকা বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দোহাই দিয়া সরকারী বিভাগ সমূহের ব্যয় কমাইতে রাজী হন নাই। অর্থাৎ তাঁরা আগে হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন যে নিরীহ, অর্দ্ধভুক্ত দেশবাসীর মাথা এখনও কাঁঠাল ভাঙিবার উপযুক্ত আছে, কাজেই অন্য পন্থা পরিহার্য্য! গবর্ণমেণ্টের এই নীতির যে ভাষায় নিন্দা করা উচিত, তাহা প্রেস-আইন-কণ্টকিত, এদেশে সম্ভবপর নয়।

নূতন কর বসানোর নীতির আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া পৃথক পৃথক করিয়া ৫টী আইনের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে উহা দেশের পক্ষে কত সর্ব্বনাশকর হইবে।

প্রথমতঃ, বৈদ্যুতিক শক্তি আইনের আলোচনায় দেখা যায় যে বিদ্যুত শক্তির সহায়তায় যে সকল শিল্প গড়িয়া উঠিতেছিল তাহা বাধা প্রাপ্ত হইবে। ফলে এই শিল্পের মধ্যস্থতায় যে হাজার হাজার লোক প্রতিপালিত হইতেছিল তাহাদেরও জীবিকার পথ রুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত।

তামাক বিক্রয় শুল্ক আইনে দেশের যে ক্ষতি হইবে তাহা অতুলনীয়। ইহার দ্বারা দেশের লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। গবর্ণমেণ্টের বিলে তামাক অর্থে, গুড়া তামাকের গাছ, তামাক পাতা, সিগারেট, বিড়ি, মাখা তামাক, সিগার (চুরুট), পাইপের তামাক, সিগারেটের জন্য ব্যবহৃত তামাক, জরদা, দোক্তা, সুর্ত্তি, গুল তামাক, গুণ্ডি, নস্য ইত্যাদি তামাক জাতীয় যতপ্রকার জিনিষ আছে তৎসমুদয়কে বুঝায়। নূতন আইন পাস হইলে গাঁজা ও আফিম বিক্রেতার

ন্যায় প্রত্যেক তামাক বিক্রেতাকে লাইসেন্স লইতে হইবে। এই লাইসেন্সের জন্য পাইকারী বিক্রেতাগণকে বৎসরে ছয় টাকা, খুচরা বিক্রেতাগণকে বৎসরে তিন টাকা ও ফেরীওয়ালাগণকে বৎসরে একটাকা সেলামী দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া এইটুকু করিয়াছেন যে, যারা নিজের ক্ষেতের উৎপন্ন তামাকের ব্যবসা করিবে তারা এই আইনের আমলে আসিবে না। কিন্তু, বাঙ্গলায় শতকরা কয়জন লোক তামাকের চাষ করে? কয়জন লোক নিজের ক্ষেতের তামাক লইয়াই ব্যবসা করে? এদের সংখ্যা তামাক ব্যবসায়ীদের শতকরা ৬ জন হইবে কিনা সন্দেহ। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য এ তথ্য অবগত নন, তাহা হইলে তাঁরা উদারতার বহর দেখাইয়া ধন্য হইবার লোভ নিশ্চয়ই সম্বরণ করিতেন। এখন দেখা যাইতেছে যে প্রস্তাবিত আইনের কৃপায়, সহর ও মফঃস্বলের যে শত দোকানে বিড়ি, সিগারেট ও নস্য বিক্রয় হয়, তাদের মালিকগণকে লাইসেন্স লইতে হইবে, বেচারা পান ওয়ালাগণকে লাইসেন্স লইতে হইবে, কারণ তাদের দোকানে দোক্তা ও জরদা এবং বিড়ি সিগারেট রাখিতে হয়। এমন কি পাড়াগাঁর সামান্য মুদি, যার দোকানে তামাক-জাতীয় জিনিষ থাকে, ও মাথায় মোট করিয়া যে সব লোক মাথা তামাক ও গাছ তামাক বিক্রয় করিয়া কোন রকমে কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তারাও লাইসেন্স ব্যতিরেকে এই ব্যবসা দ্বারা তাদের পরিবার প্রতিপালনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। আইনে এ বিধানও আছে যে, কেহ যদি লাইসেন্স না লইয়া ব্যবসা করে তবে তার এক শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবে—অধিকন্তু, তাহার নিকট তামাক বা তামাকজাত যে সব জিনিষ পাওয়া যাইবে তাহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে। ইচ্ছামত, সন্দেহ হইলে, যে কোন তামাক ব্যবসায়ীর দোকান ও বাড়ী থানা তল্লাস করিতে পারার অধিকারও গবর্ণমেণ্টের থাকিবে।

বাঙ্গালীর হৃদয় হইতে আমোদ প্রমোদ চির-বিদায় গ্রহণ করিতে বসিয়াছে। নানা অভাব-দৈন্যের নিষ্পেষণে তারা জর্জ্জরিত। এদের মধ্যে যাদের মধ্যে প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্য্য ছিল তারা সস্তায় সিনেমা প্রভৃতি দেখিয়া আনন্দের খোরাক যোগায়। আনন্দের জন্য বাঙ্গালী অধিক ব্যয় করিতে সক্ষম নয় বলিয়াই আজ বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ নাট্যশালা গুলি ভীষণ দুর্দ্দশায় পতিত। অল্প খরচে সিনেমা দেখিয়া তারা যে একটু আনন্দ পাইবে, গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত এই আইনে সে পথও রুদ্ধ হইতে চলিল। আগে আট আনার অধিক মূল্যের টিকিটের উপর ট্যাক্স দিতে হইত, এখন হইতে তিন আনার অধিক মূল্যের টিকিটের উপর ট্যাক্স দিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া দুই আনার টিকিটকে রেহাই দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের এই অনুগ্রহে সত্যই আমাদের হাস্যোদ্রেক হয়। দুই আনার টিকিট বাঙ্গলার কয়টী সিনেমা গৃহে বিক্রয় হয়? সিনেমা সম্বন্ধে আর একটী কথা বিশেষ বিবেচনা করা দরকার। বাঙ্গলায় সিনেমার শিশু অবস্থা। অনেক সিনেমা শিশু অবস্থায়ই মরিয়াছে। কলিকাতা ও মফঃস্বলের যে কয়টী সিনেমা-গৃহ এখনও কোন গতিকে টিকিয়া থাকিয়া তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। এ অবস্থায়, নূতন ট্যাক্স তাদের পক্ষে মৃত্যুশেলের মত হইবে। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের এ দিকে বিবেচনা করার সময় এখনও আছে। নূতন ট্যাক্স বসানোর ফলে বাঙ্গলার সিনেমা জগতের কোন ক্ষতি যদি হয় তাহা হইলে তার সমস্ত দায়িত্ব পড়িবে গভর্ণমেণ্টের উপর।

অন্যান্য ট্যাক্স গুলি সম্বন্ধেও আমাদের একই মত। এবং একই লোক অনেক গুলি আইনের কবলে আসিতে পারেন। কাজেই গভর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের অনুরোধ, তাঁরা বিল কয়টী বিধিবদ্ধ করার পূর্ব্বে, আর্ত্ত বাঙ্গলার কথা আর একবার চিন্তা করিবেন। ব্যবস্থাপক সভার নিকট আমাদের কোন বক্তব্য নাই। কারণ ঐ বিল কার্য্যকরী করার ইচ্ছা যদি গভর্ণমেণ্টের থাকে তবে উহা ব্যবস্থাপক সভায় পাশ না হইলেও গভর্ণমেণ্ট তাহার জন্য 'কেয়ার' করিবেন না। আইন সভা ত' প্রহসন মাত্র!

জাঞ্জিবারে ভারতবাসী

দক্ষিণ আফ্রিকার জাঞ্জিবারে প্রবাসী ভারতীয়গণের উপর অত্যাচার ও অবিচারের কথা বহুদিন হইতে শুনা যাইতেছিল। এই সকল অসুবিধার বিষয় তদন্ত করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট মিঃ মেনন, আই-সি-এসকে জাঞ্জিবারে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, উপরোক্ত অত্যাচার অবিচারের কথা অলীক নয়। জাঞ্জিবার গবর্ণমেণ্ট এমন কতকগুলি আইন করিয়াছেন, যাহার ফলে ভারতীয়গণকে জাঞ্জিবার হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে। মিঃ মেনন বলিয়াছেন, সেখানে যে সকল ভারতীয় বাস করেন তাহাদের মধ্যে শতকরা আশী জনের উপর সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাহারা কয়েক পুরুষ ধরিয়া সেখানে বাস করিতেছে। কিন্তু এমন আইন করা হইয়াছে যে, তারা বৃটিশ রেসিডেণ্টের অনুমতি ব্যতীত সেখানে কোন জমি ক্রয় করিতে পারিবেন না। ভারতীয়গণ সেখানকার নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। কিন্তু কেন এরূপ আইন করা হইল তাহা একটু বিবেচনার সহিত ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, ইউরোপীয়দিগের সুবিধা প্রদান এই বিলের অন্যতম উদ্দেশ্য। আগে ভারতীয়গণ লবঙ্গের ব্যবসায় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিত, তাহা ইউরোপীয়দের সহ্য হয় নাই, তাই আইন করিয়া প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়গণের লবঙ্গ ব্যবসায়ের সুযোগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল এবং সেখানে একচেটিয়া ইউরোপীয়

প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাতে ক্ষান্ত না হইয়া তারা জাঞ্জিবার হইতে ভারতীয়গণকে বিতাড়নের ব্যবস্থা করিলেন। এই বিতাড়নেরও একটা কারণ আছে। ভারতীয়গণ জাঞ্জিবারের অধিবাসীদের চেয়ে একটু রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন। তারা যদি হঠাৎ সেখানে নাগরিক অধিকারের বলে একদিন জাঞ্জিবারকে নিজ বাসভূমি বলিয়া স্বীকার করে এবং সেই বাসভূমির সুবিধার দিকে নজর দেয় তাহা হইলে ত' জাঞ্জিবারের প্রভুদের পক্ষে সেটা ভয়ানক ব্যাপার হইয়া পড়িবে! কাজেই সে পথ রুদ্ধ করার জন্য তাঁরা যথা ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

যাহা হউক, আসল ব্যাপার হইতেছে এই যে, যে জাতি আপন দেশে পরদেশী, সে বিদেশে অধিকারের দাবী করিতে পারে না। ভারত পরাধীন। তার পা' হইতে মাথা পর্য্যন্ত পরাধীনতার কলঙ্কে মসীলিপ্ত। নিজের দেশে সে কতটুকু অধিকার ভোগ করে? আজ যদি বিদেশে অসম্মান পাইয়া থাকে তবে বলিতে হইবে সে ত'ার ন্যায্য প্রাপ্যই পাইয়াছে। স্বাধীন জাতি অধিকারের, সম্মানের দাবী করিতে পারে। ভারত যতদিন স্বাধীন না হইবে ততদিন সে লাঞ্ছিত হইবে। তার লাঞ্ছনা! ভারতের শাসকগণ মিষ্ট হাসি দিয়া উপভোগ করিবে। ভারত স্বাধীনতা না পাইলে তার ভাগ্যে আরও বহু বিড়ম্বনা জমা হইয়া আছে।

পরিষদ প্রসঙ্গে

পার্লিয়ামেণ্টারী দলের মিঃ সত্যমূর্ত্তি পরিষদে দমন-মূলক আইন সমূহের রদ-বদল করার প্রস্তাব উত্থাপন করার অনুমতি পাইয়াছেন। তিনি প্রধানতঃ ১২৪ ও ১৪৪ ধারার রদবদলের উপর জোর দিবেন। মিঃ সত্যমূর্ত্তির এই প্রচেষ্টা শুভ এবং পরিষদের সকল ভারতীয় সদস্য মিঃ সত্যমূর্ত্তির সমর্থন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

আমাদের বাঙ্গলাদেশের প্রতিনিধিদের বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে সরকারী দমন-নীতি বাঙ্গলায় যেরূপ ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে এমন আর কোথাও নয়। বহু প্রকার আইনের নিষ্পেষণে বাঙ্গলা আজ রুদ্ধ-কণ্ঠ। বাঙ্গলার কয়েকটী জেলা সরকারী পিটুনী ট্যাক্স ও পাইকারী ট্যাক্স দিতে দিতে প্রাণান্তকর অবস্থায় উপনীত। বিনা-বিচারে বন্দীশালায় বেশী করিয়া বাঙ্গলার ছেলেই পচিয়া মরিতেছে। কাজেই বাঙ্গলার প্রতিনিধিদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হইবে সর্ব্ব প্রকার দলাদলি ভুলিয়া গিয়া মিঃ সত্যমূর্ত্তির সহিত একযোগে দমন-নীতির নিন্দা করা। গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, এই আইন মনুষ্যত্বহীন করে মানুষকে, এই আইন সভ্য জগতের কলঙ্ক।

মিঃ সত্যমূর্ত্তির প্রস্তাব গৃহীত হইলেই যে দমন-নীতিগুলি প্রত্যাহার করা হইবে, এমন মনে করার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে জনমতের কোন মূল্য নাই। পরিষদে যে আইন বাতিল করা হয়, খোদ বড়লাট সার্টিফিকেটের বলে আবার সেই আইনকে সজীব করেন। পরিষদের মতের কোন তোয়াক্কা যদি গবর্ণমেণ্ট করিতেন তাহা হইলে আজ মিঃ শরৎচন্দ্র বসু বন্দী থাকিতেন না। জনমতকে যদি গবর্ণমেণ্ট মানিতেন তবে পরিষদ ও জনসাধারণকে উপেক্ষা করিয়া তাঁকে বন্দী রাখিতে তাঁরা সাহসী হইতেন না।

এই সেদিন ভারতের ব্যবসায়ী সমাজকে না জানাইয়া, তাদের কোন মতামত না লইয়া দিল্লীতে ভারত-বৃটিশ বাণিজ্য-সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। অবশ্য এর অর্থও ছিল। ভারতের অধিকার সঙ্কুচিত করা যতদূর সম্ভব ততদূর করিয়া এই সন্ধি-কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। কিন্তু পরিষদে যখন এই সন্ধি আলোচনার জন্য আসিল তখন ভারতীয় সদস্যগণ উহাকে ভারতের পক্ষে অসম্মানজনক ও ক্ষতিকর বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। অবশেষে ভোটের জোরে উহা waste-paper basket-এ ফেলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সরকারী মহলে কাণাঘুসা হইতে শুনা গিয়াছে যে, পরিষদের মূল্য কতটুকু? পরিষদ যাহা মৃত বলিয়া ফেলিয়া দিবেন, তাহার জীবন-কাঠি আছে বড়লাট বাহাদুরের উপর। তিনি তাঁর জীবন কাঠির জোরে সব 'না'কে 'হ্যাঁ' করিয়া দিবেন। কাজে কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বাণিজ্য-সন্ধি যদিও পরিষদে বাতিল হইয়া গিয়াছে, তবুও কার্য্যতঃ উহা বাতিল হইবে না।

এই সব দেখিয়া আমাদের মনে হয়, মিঃ সত্যমূর্ত্তির প্রস্তাব পরিষদে গৃহীত হইলেও উহা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে না। গবর্ণমেণ্ট দমন-নীতি উঠাইয়া দিবেন, ইহা চিন্তা করাও বৃথা। তবুও আমাদের উচিত, এই মনুষ্যত্ব-হানিকর আইন সমূহের নিন্দা করা, সমস্বরে জানানো যে, ইহা আমাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। তাহা হইলে, গবর্ণমেণ্ট আর প্রচার করিয়া বেড়াইতে পারিবেন না যে, আমাদের আইনে ভারত সন্তুষ্ট, ভারত আমাদিগকে চায়।
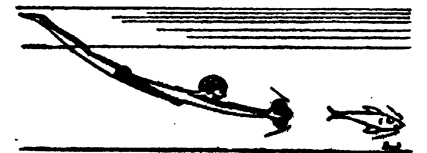
বিবিধ

"চার অধ্যায়"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ অধ্যায়ে পদার্পণ করিয়া "চার অধ্যায়" রচনা করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের স্মৃতির অবমাননা করিয়া ও এক পুণ্যাত্মা দেশনেতার জীবনের আদর্শকে বিকৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ "চার অধ্যায়ের" মশলা সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের অন্যতম বিশিষ্ট লেখক শ্রীসুধীর বসু স্থানান্তরে রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়ের" যে সুসংযত বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার ফাঁকে ফাঁকে রবীন্দ্রনাথের কলঙ্কিত লেখনীর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। "চার অধ্যায়" পড়িয়া আমাদের মনে হইল যেন আমরা সরকারী দপ্তরখানার publicity pamphlet বা Royalist Partyর নিবেদন পাঠ করিতেছি। পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতিবাদে একদিন যে "স্যার" উপাধি রবীন্দ্রনাথ পরিত্যাগ করিয়াছেন "চার অধ্যায়ের" রচনার পুরস্কার স্বরূপ সেই "স্যার" উপাধি পুনরায় তাঁহার মস্তকে ভূষিত হইবে কিনা তাহাও গবেষণার বিষয়। "চার অধ্যায়" রবীন্দ্রনাথের বার্দ্ধক্যের বিকৃত মনোভাবের গ্রন্থ অবদান।

সাতাশ বছর পরে

অর্দ্ধোদয়-যোগের দিন সহযোগী "বন্দে মাতরম্" আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"২৭ বৎসর আগে সেই ১৩১৪ সালের মাঘ মাসে এমনই অর্দ্ধোদয়-যোগ-স্নানের দিন শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন সরকার স্বেচ্ছাসেবকরূপে এই কলিকাতা-সহরে কিভাবে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল তাহার স্মৃতি যাঁহাদের মনে ছিল তাঁহাদের অনেকেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুত রাজেন্দ্র দেব প্রভৃতি এখনও বোধ হয় সে স্মৃতি ভুলেন নাই। ২৭ বৎসর আগেকার সেই স্বেচ্ছাসেবক—আজ ১৩৪১ সালে কলিকাতার মেয়রের আসনে অধিষ্ঠিত। স্বেচ্ছাসেবকের ব্রজলীলার কথা যে এখনও তাহার মনে আছে তাহার প্রমাণ মথুরায় আসিয়াও তারকা-মণ্ডিত আকাশ-তলে সে বিচরণ করিয়া থাকে।"

"From Pavement To Mayoral Chair"—এই গর্ব্বোদ্দীপ্ত অহমিকার বিকাশ সাতাশ বৎসরের পরের রজতমূল্যে-বিক্রীত বাংলায় সম্ভবপর হইয়াছে। বর্ত্তমান বাংলায় বিবেকানন্দ সোসাইটির সভায় এক কামরাঙা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ও নলিনীর কর্ম্মোৎসাহের তুলনা করিয়াছে—সাতাশ বৎসর পরে এও সম্ভব হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারের বরিশালে বিজলী-বাতির আলো জ্বালিতে নলিনীর আহ্বান হয়, তাহা কি সহযোগী জ্ঞাত নহেন? কলিকাতার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিজলী-বাতির ঝলমলের প্রভায় "নবতারার" প্রভা নিষ্প্রভ হইয়া উঠিলেও লেক-সান্নিধ্যে সর্দ্দার শঙ্কর রোডে "বীণা"র বীণা আজও বাজিতেছে। অধ্যাপক স্বামী "ফেনী"তে ফোঁস ফোঁস করিলেও নিরুপায়। কৌতূহলী পাঠক তিন মাস পূর্ব্বের "Statesman"র বিজ্ঞাপন-স্তম্ভ একটু অনুসন্ধান করুন নচেৎ বর্ত্তমানে ধৈর্য্য ধারণ করুন। অধ্যাপক স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া "বীণা" অর্দ্ধোদয়-যোগের দিন কাহার মোটরে করিয়া গঙ্গাস্নানে পাপক্ষয় করিতে গিয়াছিল তাহা "এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের" অন্যতম সাব-এডিটর আমাদের জানাইবেন কি? তিনি ত' "বীণার" প্রতিবেশী!

"নবশক্তি" ও সুভাষচন্দ্রের চিঠি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদকের নিকট মিলনের নির্দ্দেশ জ্ঞাপন করিয়া সভাপতি সুভাষচন্দ্র যে চিঠি লিখিয়াছেন কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্রই তাহা সমর্থন করিয়াছেন—নীরব শুধু একমাত্র ভাঙ্গা-ভেঁপু "ফরওয়ার্ড"। তবে আনন্দের বিষয় যে নবজাতা ভগ্নি "নবশক্তি" সুভাষচন্দ্রের আবেদন সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন : "......সত্য সত্যই বাংলার দলাদলি অবসান করিবার সময় আসিয়াছে। আশা করি সুভাষচন্দ্রের আবেদন ব্যর্থ হইবে না।" কাপ্তান দত্তের সযত্ন-পরিচালিত পত্রিকা যে উপদলগত সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে উঠিয়াছেন তাহাতে আমরা অতীব প্রীত হইয়াছি। সুব্যবসায়ী

কাপ্তান দত্ত কি চিরকাল নলিনীর ব্যক্তিগত স্বার্থের ইন্ধন জোগাইতে বিধানী-দলের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিবেন? "নবশক্তিকে" উপদলগত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া কাপ্তান যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন রাজনীতি ক্ষেত্রে অনুরূপ স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিলে কাপ্তান দত্ত বাংলার অশেষ উপকার সাধন করিতে পারিবেন।

নলিনী কি করিবে?

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির সিদ্ধান্তের পর সম্রাটের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কংগ্রেস সেবীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে "নবশক্তি" লিখিয়াছেন:—"কংগ্রেসের যে সকল লোক ইহার পূর্ব্বেই এই অনুষ্ঠানে অল্প বিস্তর জড়িত হইয়াছেন, আশা করি ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্ধারণের পরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন।" সাধু ও সৎ আশা সন্দেহ নাই। বৈধানিক কংগ্রেসের মেয়র নলিনী কি করিবেন তাহা "নবশক্তি" জানাইবেন কি? বাজারে গুজব নলিনী বৈধানিক দলকে কদলী প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বিধানচন্দ্র সেই দুঃখেই বনবাসী হইয়াছেন। কাপ্তান দত্তের ত' বাৎসরিক আয় ১ লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকায় উঠিয়াছে বলিয়া প্রকাশ—নলিনীর ত' মোটে এক লাখ। এই CLASH OF LAKHS-এর দ্বন্দ্ব কি অনিবার্য্য নয়? বিধানের নাকি মহা মুস্কিল—শ্যাম রাখেন না কুল রাখেন? কাপ্তান ত' নেহাৎ মন্দ লোক নন, টাকাও আছে, ambitionও আছে, গুরুভক্তিও অটল। বিধানচন্দ্র তাঁকেই শান্ত করুন না—কাল সাপকে দুধ কলা দিলে কোনদিন দংশন লাভও ঘটিতে পারে ত?

মিলন-শঙ্খ

আমরা শুনিয়া প্রীত হইলাম যে "ফরওয়ার্ড" ও "এ্যাডভ্যান্সের" মিলন-পরিকল্পনা সমাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান "ফরওয়ার্ড হাউসে" দুইটী কাগজের প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হইবে এবং নামকরণ হইবে "ADVANCE with which is incorporated FORWARD"। শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত কলিকাতায় ফিরিলেই এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে। কলিকাতায় কংগ্রেসের আদর্শে শ্রদ্ধাবান এই পত্রিকা দুইটী একত্রিত হইয়া জনসেবার বিমল আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করুন ইহাই আমাদের শুভেচ্ছা। কংগ্রেসী সংবাদপত্র মহলে যে "মিলন-শঙ্খ" বাজিয়া উঠিয়াছে তাহার মঙ্গল ধ্বনি কংগ্রেসী উপদলদ্বয়কে কি অনুপ্রাণিত করিবে না?

পুণ্যাত্মা অশোকনাথের গবেষণা

আমাদের সহপাঠী ও গুরুদেব পণ্ডিত-প্রবর অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য "অমৃতবাজার পত্রিকার" স্তম্ভে অর্দ্ধোদয়-যোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। অশোকনাথের মতে অর্দ্ধোদয় যোগে গঙ্গা স্নান করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। সহযোগী "পত্রিকা" ও "ষ্টেটস্‌ম্যান" যথাক্রমে বলিতেছেন যে প্রায় ১২ লক্ষ ও ৫ লক্ষ লোকের সমাগম কলিকাতায় হইয়াছিল। সুতরাং অশোকনাথের মতে এক কলিকাতায় গঙ্গা স্নান করিয়া ন্যূনপক্ষে সাড়ে আট লক্ষ লোকের মোক্ষলাভ হইয়াছে—অর্থাৎ তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে গমনের passport পাইয়াছেন। স্বর্গে স্থান সঙ্কুলান হইবে ত? আর অশোকনাথ প্রভৃতি এই সাড়ে আট লক্ষ পুণ্যাত্মার সহিত আমাদের মতন পাপীর কোন পার্থক্য ত' আমাদের পাপচক্ষে পরিলক্ষিত হইতেছে না। তবে আমরা দেখিলাম ও দেখিয়া ধন্য হইলাম যে সদ্যস্নাত পুণ্যার্থীর ভিঁড়ে ধর্ম্মতলার ওয়াছেল মোল্লার দোকান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল আর "দক্ষযজ্ঞে"র "সতী" চন্দ্রাবতী পুণ্যবতী হিন্দু রমণীদের ধর্ম্মগত প্রাণ বিগলিত করিয়া তুলিয়াছিল। সদ্যস্নাত পণ্ডিতপ্রবর অশোকনাথ মোক্ষ লাভের সময় আমাদের escort হিসাবে সঙ্গে লইবেন কি—কারণ অর্দ্ধোদয়যোগ-স্নানের পর তিনি ত' এখন "ব্রহ্মণ"। আমাদের "পাপতাপ-হিয়া" গুমরাইয়া উঠিয়া বলিতেছে:—"যত রাবিস জোটে ঐ বাগবাজারে।"

জামসেদপুরে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রদর্শনী

গত শনিবার ২রা ফেব্রুয়ারী জামসেদপুরে টাটা কোম্পানীর পরিচালনায় চতুর্থ বার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন হইয়াছে। টাকো ইনষ্টিটিউটে মিঃ কীনার, টাটা কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। প্রথমে কয়েকটী বালিকা দ্বারা একটী সুন্দর সঙ্গীত গীত হয়। দ্বারোদ্ঘাটন করিতে অনুরোধ করিয়া ওয়েল ফেয়ার অফিসার মিঃ এস্, কে বসু কি ভাবে গত তিন বৎসর এই প্রদর্শনী হইয়াছে তাহার বিবরণী প্রদান করেন। প্রদর্শনীটী দিন দিন জনসাধারণের সমাদর লাভ করিতেছে।

প্রদর্শনী ক্ষেত্রের নক্সা সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্মত হইয়াছিল বৈদ্যুতিক বাতির দ্বারা সমস্ত জায়গাটী অতি সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে মোট ১০০টী দোকান আছে। স্বাস্থ্য বিভাগে ৪০টী বিভাগ করা হইয়াছে এবং চিত্র মডেল প্রভৃতি দ্বারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্য অতি সুন্দর ভাবে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

টাটা কোম্পানীর মত বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম কর্ত্তারা সত্যই কর্ম্মচারীদের উন্নতির জন্য নানা চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ চেষ্টা সামান্য প্রতিষ্ঠানেরও করা উচিত।

প্রথম দুই দিনেই প্রায় ২৫,০০০ হাজার লোক প্রদর্শনী দেখিয়া গিয়াছে। প্রদর্শনীর কর্ম্ম কর্ত্তারা বিশেষ ভাবে ওয়েল ফেয়ার অফিসার মিঃ বসু এইজন্য বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

সাহিত্য পরিচয়

"চার-অধ্যায়"

"খেয়ালীর" গত সংখ্যায় পুস্তক পরিচয়ে 'চার অধ্যায়' সম্বন্ধে কিছু বলার সুযোগ ঘটেছিল তবে আমার মনে হয় সেটা যথেষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথের 'চার-অধ্যায়' তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ দান—তাই এর সম্বন্ধে আমাদের মনে যথেষ্ট কৌতূহল, শঙ্কা ও শ্রদ্ধা আছে। রবীন্দ্রনাথের অপর লেখা হ'তে 'চার-অধ্যায়' যথেষ্ট বিভিন্ন, তাই একে নতুন গোত্রভুক্ত ক'রতে অসুবিধা হয় না। কবি-সাহিত্যিক তাঁর অপর সাহিত্যে প্রত্যক্ষভাবে impersonal কিন্তু এখানে সোজাসুজিভাবে পাঠকের চোখের সামনে ধরা দিয়েছেন, যেমনভাবে ধরা দেয় প্রচারকেরা তাঁদের দর্শকদের সামনে। সাহিত্যের মূল প্রতিপাদ্য সত্য হ'লেও, সে সত্য বাস্তবের জটিল সত্য নয়—যাকে অনায়াসে relativity-র শাসনে টানা যায়। সাহিত্যের সত্য অনেকটা সত্যের abstraction, যেটা ছায়াতে বিরাজ করে আর তাতেই তার শোভা, কায়ায় যেরূপ ধরা পড়ে সেটা তার কদর্য্যতা। কথাটা হয়ত আদর্শবাদীর কিন্তু তবু তার আওতায় যে-সাহিত্য গড়ে উঠে তাতেই শুধু বিষয়বস্তুর উপর কড়া নজর থাকে। আর বাস্তব-সাহিত্যের সবচেয়ে আদরের হয়েছে প্রকাশ-ভঙ্গিমা ও ষ্টাইল। সাহিত্যের রূপ বিচার না করে অনায়াসে বলা যেতে পারে সাহিত্যের সত্য বিচারের অনুশাসনে প্রতিভাত নয়। তাই যে-সব লেখায় সত্য নিয়ে বিতর্কের সম্ভাবনা থাকে তাতে রসহানির যোগও থাকে। তা বলে স্বীকার করি সাহিত্যিক নবতম সত্যের সন্ধান দিতে পারেন। কিন্তু সে সত্য সহজ, সরল ও সাধারণের। 'চার-অধ্যায়ে'র সত্য বিভিন্ন রকমের, তাই মনে হয় তা' নিয়ে সাহিত্য গড়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের নবতম লেখায় রস-সৃষ্টির প্রচেষ্টা অনেকটা বেশী ব্যাহত হয়েছে তাঁরই সত্যপ্রচারের অন্ধতায়। রবীন্দ্রনাথের নিজের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সত্যের উপর অত্যধিক দরদ ও আকরণ অভিমান তাঁর এই সাহিত্যে সুস্পষ্ট। তাই এই ধরণের সাহিত্যকে কথা-সাহিত্য থেকে বিভিন্ন ক'রে প্রচার-সাহিত্য গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়। তা ব'লে প্রচার-সাহিত্যে রস সৃষ্টির চেষ্টা সবচেয়ে বড় কথা নয়—অনেকটা অতিরিক্তের মত। রসসৃষ্টি যে নিঃসন্দেহে সব সাহিত্যের সৌন্দর্য্যের কারণ তা অস্বীকার করা যায় না তবে সেটা যেখানে অপরিহার্য্য নয়, সেই বিশেষ সাহিত্যের তা রূপ বলে স্বীকার করা যায় না। এরপর শুধু থেকে যায় সাহিত্য-বিশেষের ধর্ম্ম।

প্রচার-সাহিত্যের বড় কথা কোন বিশেষ মতবাদের প্রতিষ্ঠা—কিন্তু তার নিছক প্রচার

বাণী বন্দনা

শ্রীশান্তি প্রকাশ মিত্র

এস মা তুষার-কুন্দ-ভূষণা—
ভুবন-মোহিনী হে বীণাপানি!
প্রসীদ, বরদে, তব প্রসাদ-কণা
লভুক বিশ্ব—দাও অভয় বাণী।
তব বিনোদ বীণার দিব্য তানে,
ধ্বনিত ভারত পূত-সাম-গানে;
দূর কর দেবি তমঃ মর্ত্ত্য-প্রাণে—
ওমা কমলবাসিনী শ্বেতাঙ্গিনী।
এস মা অজ্ঞান-দম্ভ-হারিণী,
বিজ্ঞান-রূপিনী, বিদ্যাদায়িনী;
তব পূত-পদ-পঙ্কজ-পরশে,
হউক ধন্যা অধীরা ধরণী।

—

নয়। সাহিত্যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে যে অখণ্ডনীয় যুক্তি, যে সত্যানুসন্ধিৎসা, যে প্রেরণার প্রয়োজন তা propagandist-র নয়। সাহিত্য Bulletin থেকে আরও বড়, কারণ তাতে প্রযোজনা আছে, সৃষ্টি আছে।

রবীন্দ্রনাথের নতুন লেখায় কথা-সাহিত্য বা প্রচার-সাহিত্যের পুরো রূপের যথেষ্ট অভাব মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ সুরু করেছেন কর্ম্মজালে আবদ্ধ হওয়ার tragedy নিয়ে। জীবনের সব প্রকার tragedy-র মধ্যে মোহগ্রস্ত মানুষের tragedy সবচেয়ে নিষ্ঠুর। কিন্তু মোহ ততক্ষণই থাকে যখন সেটা আত্ম-বিলোপ, আত্ম চেতনার সঙ্গে সঙ্গে যে চেতনা জাগে সে মুক্তির, তাই আমরা মনে প্রাণে কর্ম্মজালে বিশ্বাস করলেও আত্ম-চেতনার পরে বন্ধনে বিশ্বাস করতে পারি না। সাহিত্যে শ্রেষ্ঠরস মানব-উপাদানে। প্রকৃতির দুর্জ্জয় জড়শক্তি, নির্দ্দয় পারিপার্শ্বিক, নিষ্ঠুর নিয়তি, অবিশ্বাসী আত্মানুশোচনা। রুদ্র আত্মা ও নীতি সবার সঙ্গে যে দুর্ব্বার যুদ্ধে মানুষ প্রতিনিয়ত ক্ষুব্ধ ও বিধ্বস্ত হয় তাই tragic সাহিত্যের মূল রসাল কথা। কিন্তু তা বলে সংগ্রামে জয়-লাভ ক্ষণিকের হ'লেও অন্ততঃ পক্ষে যুদ্ধ-অবসানে শান্তির কারণ। যুজতে যে-শক্তির প্রয়োজন তা নিজের ভিতরকার বিরোধী শক্তি। এই বিরোধী শক্তির অভাব ঘটলে tragedy সম্ভব নয়। এ দিক থেকে মনে হয় "চার-অধ্যায়" ব্যর্থ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সত্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে যে প্রচার-সুর কানে বাজে তা সাহিত্যের নয়। সত্য-প্রতিষ্ঠার মধ্যে সত্যান্বেষীর যে অনুভূতি তা প্রচার সাহিত্যের অন্ধতা নয়।

তাই আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কথা-সাহিত্যে মত প্রচারের চেষ্টা না করলেই ভাল করতেন। তবে যদি বলা হয়, যে আজকের দিনে সর্ব্বজন-নিন্দিত 'সন্ত্রাস-বাদের' উচ্ছেদের জন্য রবীন্দ্রনাথের ন্যায় জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখনীর প্রয়োজন, তাহ'লে আমরা তাঁর নবতম লেখাকে অভি-নন্দিত করি। কিন্তু সাহিত্যিক-গুরুর বয়োবৃদ্ধ দানকে আমরা সাহিত্য হিসাবে খুব শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম না।

—শ্রীসুধীর বসু

বাপুজীর বায়না

হোসনে আরা বেগম

অভিমান করেছি তাই রবে কি দূরে ঠেলে?
অপমান সয়েছি ভাই, সবি কি ভুলে গেলে?
আমারি বাসনা যত
সবই ত অবিরত
জানায়েছি তোমার কাছে—মনে কি নাহি মোটে?
জাননা ত কতই ব্যথা সদা এ-হৃদে ফোটে!

তোমাদের তরেই ত গো সেজেছি 'ভুয়া'-নেতা
যদি মোর তোমায় চাহে এ কথা জানে কে তা?
জুটানু ভক্ত কত
নেতা 'সাব'-নেতা অত
নন-কোর কাটায়ে মায়া আসিছে তব দ্বারে
তোলো মুখ, ফিরিয়া চাও লহ গো বুকে তারে।

অহিংসার মন্ত্র দিয়া মাতানু সারা দেশে
তাইতে কি শত্রু মোরে ভাবিলে অবশেষে?
তাহাতে হয়েছে কিবা?
এখনত নিশি দিবা
তোমারই স্মরণ চাহি ভরসা তুমি মম
তুমি বিনা নাইক গতি ক্ষম গো, দাসে ক্ষম।

ভুলে গেছি যতই ব্যথা দিয়েছ তুমি মোরে
বাঁধ নাই শিকল দিয়া—বেঁধেছ প্রেম ডোরে
পাঠানু তোমার জেলে
কত না সোণার ছেলে;
তাহাদের ব্যথায় কভু ভেজে কি মম আঁখি?
তোমাকেই তুষিতে গিয়ে তাদেরে দিছি ফাঁকি।

আজি ফের আসিনু দ্বারে চাহ গো করি ত্বরা
বুজরুকি যতেক মম এবারে গেছে ধরা।
মোহ সব গেছে কাটি
মেকী নয় চাহে খাঁটি
খাঁটির এ বাজারে তাই টেঁকা যে নহে সোজা
কি যে করি কোথায় যাই যায়না কিছু বোঝা।

ও চরণে স্মরণ লহ ছেড়েছি দেশ-সেবা
বাপুজীরে অভয় দিলে, স্বরাজ চায় কেবা?
তোমারি দয়ার জোরে
এসেছি বিলাত ঘুরে
এখনও তোমার গান গাহি যে জোরে সোরে।
কতজনে কতই ডাকো—বারেক ডাকো মোরে॥

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

নিউ থিয়েটার্স

শেষ হয়ে এলো "দেবদাস"। শরৎচন্দ্রের সেই সুন্দর উপন্যাস, বাংলা সবাকচিত্রে যার রূপ সেই উপন্যাসের মতনই সুন্দর। পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিশ্রমের অন্ত নেই, বিভিন্ন অভিনেতা ও অভিনেত্রীরও অন্ত নেই পরিশ্রমের। প্রমথেশ বাবু দেবদাসের ভূমিকাটিকে সম্পূর্ণ জীবন্ত করে' তোলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। অমর মল্লিক মশাইও তাঁর অংশটিকে উপন্যাসের অনুরূপ রূপ দিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করছেন না। এবং আমরা জানি তিনি সফল হবেন, কারণ বাংলার type character-এর অভিনয়ে শ্রীযুক্ত মল্লিকের স্থান আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ধর্ম্মদাসের ভূমিকায় সবার মনোরঞ্জন করবেন সন্দেহ নেই। ভুবনের ভূমিকায়—শ্রীদীনেশ রঞ্জন দাস, ছায়াছবি সম্বন্ধে অনেকদিনের অভিজ্ঞ, শ্রীযুক্ত দাশ, এদেশে ফিল্মশিল্পের জন্ম থেকেই সংযুক্ত। ইনি আর 'ডি-জি' সেই ব্রিটিশ এণ্ড ডোমিনিয়ান্‌স্ ফিল্মে একসঙ্গে কাজ করতেন—খবরটি হয়তো আপনাদের কাছে অজানা নয়। সেই শ্রীযুক্ত দাশ "দেবদাসে" নিয়েছেন ভুবনের ভূমিকা। দীনেশবাবুর বয়েস যেমন পাকা, তেমনি অভিনয়ের দিক থেকেও আমরা তাঁর কাছ থেকে পাকা অভিনয় আশা করি।

"দেবদাসে"র অভিনেত্রীদের কথা ভাবলেই চোখের সামনে ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে তিনখানা ঝলমলে ছবি। প্রথমখানা—চন্দ্রমুখী—চঞ্চল চোখ চন্দ্রার। অংশটি যে শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর স্মরণীয় হবে তাতে আমাদের সন্দেহ হচ্ছেনা বিন্দুমাত্র।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে—পার্ব্বতীর প্রাণ দিচ্ছেন যিনি শ্রীমতী যমুনা। এঁকে আমরা বেশী দেখিনি, তাই বেশী বলা সম্ভব নয়। চিত্রের উপযোগী চেহারা এঁর আছে, এবং আমাদের মনে হয় চিত্রে এর ভবিষ্যতও বেশ উজ্জ্বল।—অন্ততঃ এটুকু আমরা বল্‌তে পারি, 'মহব্বত-কি-কাসুতি'র একটি ছোটো অংশে যমুনাকে দেখে অন্ততঃ এটুকু ধারণা আমাদের হয়েছিলো।

তারপর ক্ষেত্রমণি, সেই ক্ষেত্রবালা। নাচে চমক লাগায় যার পা। নিজের রূপ ও গুণে যেরকম উন্নতি এই অভিনেত্রী ক্রমশঃ করছেন, তাতে মনে হয় একে শিগগীরই সুনামের উচ্চ শিখরে দেখা যাবে। এর চিত্র জীবনের ইতিহাস অনেকটা নিউ থিয়েটার্স-এর আরেকজন নাম-করা অভিনেত্রী শ্রীমতী মলিনার মত। ছোটো অত্যন্ত ছোটো এক নাচবার অংশে এসে মলিনার নাম আজ কতোখানি তা আর না বল্‌লেও চল্‌বে। সুন্দরী শ্রীমতী ক্ষেত্রবালারও তাই। শুধু নেচে ইনি নিজের পারদর্শিতা দেখিয়েছেন—উর্দ্দু ছবি "ডাকু মনসুর," তামিল ছবি "কোভালন্" ও আরেকটি উর্দ্দু ছবি "কারওয়ান-ই-হায়াত"-এ। "দেবদাস"-এ শ্রীমতী ক্ষেত্রবালা সবার প্রশংসার অপেক্ষা করছেন। বাংলায় সুন্দর মুখের অভাব—

ভারতী বন্দনা

শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী

এসেছে ভারতী বরষের পর বিশ্বে
বরণ করিছে প্রকৃতি রাণী অদৃশ্যে
ঝরা ফুল রাশি প্রণতি জানায় লাস্যে।

দেয়ান মগ্ন তরুণ প্রভাত শান্ত
বন্দনা গাহে পিককুল অবিশ্রান্ত
কানন রাণীর রঙ্গীন আঁচল প্রান্ত।

কচি পল্লবে নব তৃণ পরে লুণ্ঠিত
শাখায় শাখায় আম মুকুল মুঞ্জিত
আকাশ বাতাস ভুবন নবশ্রী মণ্ডিত।

এসেছে ভারতী পুণ্য এ মাঘ সুন্দর
উল্লাসে নাচে শ্বেত শতদল অন্তর
আগমনী গানে মুখরিত হল প্রান্তর।

মত্ত মধুপ বিকশিত ফুল গন্ধে
পুঞ্জে পুঞ্জে ধায় বনে মহানন্দে
জননীর স্তব গাহে সুললিত ছন্দে।

ঘন নীল বাস পরিয়াছে নভ মণ্ডল
সমীরণ আজি হয়েছে পুলকে চঞ্চল
কুসুমের মুখে ঝরে হাসি মৃদু নির্ম্মল।

এসেছে ভারতী সাধকের পূজা মন্দিরে
নটীনির মৃদু মধুর চরণ মঞ্জীরে
পুলকিত হল বেদীতল। শুভ অন্তরে

তটিনী গাহিছে কলকল হ'ল সঙ্গীতে
জননীর স্তুতি নৃত্য চপল ভঙ্গীতে
শ্যামল বনানী নাচে তার বুকে ইঙ্গিতে।

শিশিরের বুকে তারি পদ রেখা অঙ্কিত
আকাশ বীণায় তারি সুর আজি ঝঙ্কৃত
এস বীণাপাণি নিখিল বিশ্ব বন্দিত॥

———

এ সর্ব্বজনবিদিত—শ্রীমতী ক্ষেত্রর সুন্দর মুখ সে অভাব অনেকটা দূর করবে—এ আশাও আমরা করি।

সাংবাদিক প্যাঁচ—না আর কিছু!

নিউ থিয়েটার্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি, এন, সরকারকে নিয়ে গত সোমবারে সহযোগী 'ফরওয়ার্ড' বেশ একটু রসিকতা কোরেছেন—আর সহযোগী 'অমৃত বাজার' তারই চব্বিশ ঘণ্টা পরে সেই রসিকতায় রসান দিয়েছেন। 'ফরওয়ার্ড' কোথা থেকে জানিনা কেমন কোরে খবর পেলেন নাকি, মিঃ বি, এন সরকার মটর দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হ'য়েছেন। আর সাধারণকে এ আশ্বাসবাণী দিতেও ভোলেন নি যে, অলৌকিকভাবে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। 'অমৃত বাজারও' ঘটনাটি বেশ সরস ভেবে হয়ত', তার পরের দিনের কাগজে উক্ত ব্যাপারটির পুনরুল্লেখ করেন। ঘটনা পড়ে কোলকাতার সহস্র সহস্র লোক বিশেষ উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়ে ফোনের পর ফোন কোরে মিঃ সরকারের সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত কোরে তোলে। সহযোগীদ্বয় এ সংবাদ যে কোথা থেকে সংগ্রহ কোরলেন এবং কোন্ সাংবাদিক প্যাঁচে এটি প্রকাশ কোরলেন, তা' সুস্থ ব্যক্তির ধারণার অতীত। যাই হ'ক, মিঃ সরকারের এরূপ কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নি—এবং সম্প্রতি তিনি সুস্থ শরীরে বাহাল তবিয়তে আছেন—একথা সহযোগীদ্বয়ের জেনে রাখা ভাল।

কালী ফিল্মস্

"পাতালপুরী"র শূটিং প্রায় শেষ হ'য়েছে।

* * *

"বিদ্যাসুন্দরে"র কাজ পূর্ণোদ্যমে চলেছে।

কেশরী ফিল্মস্

শোনা যাচ্ছে, কোনও কারণে নাকি "বাসবদত্তা"-র কাজ এখন বন্ধ রয়েছে। কারণটি নিষ্পত্তি না হ'লে "বাসবদত্তা"-র কাজে কর্ত্তৃপক্ষ এগুতে পারছেন না। ব্যাপারটি যেরূপ জটিল হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে—তা'তে নিষ্পত্তি কবে হয়, তা' বলা শক্ত! ব্যাপারটি কী তা' এখন আমরা প্রকাশ কোরতে পারলুম না, তবে শীঘ্রই প্রকাশ কোরতে হয়ত' আমাদের বাধা থাকবে না।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

"বিদ্রোহী"-র কাজ "ডি-জি"-র পরিচালনায় দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। ছবিখানির আখ্যানভাগ চিত্ত-উত্তেজক—পরিচালক মশাই ও শিল্পীবৃন্দ যদি উৎরে যান, তা' হ'লে ছবিখানির ভবিষ্যৎ ভাল বলেই মনে হয়।

রাধা ফিল্ম

এদের হিন্দী "দক্ষযজ্ঞে"র সত্ত্ব ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিঃ বাঙ্গালোরের কন্টিনেণ্টল পিক্‌চার্স কর্পোরেশনের মিঃ নন্দলাল বাটাভিয়াকে দক্ষিণ ভারতে প্রদর্শনের জন্য বিক্রী কোরেছেন।

* * *

"মানময়ী গার্লস্কুলের" বৃহৎ শেষ দৃশ্য তোলা হ'চ্ছে।

অর্দ্ধোদয় যোগের যাত্রীদের সুবিধার জন্য এ হপ্তায় ক্রাউনে রোজ তিনবার প্রদর্শনী হবে।

* * *

এরা শ্রীতড়িৎ বসুর নেতৃত্বে অর্দ্ধোদয় যোগের দৃশ্যাবলী তুলে ক্রাউনে "দক্ষযজ্ঞে"র সঙ্গে দেখাচ্ছেন। অর্দ্ধোদয় যোগের খুঁটি-নাটি সব ব্যাপারই অতি মনোজ্ঞভাবে চিত্রে রূপ পেয়েছে।

রূপবাণী

মেট্রোর অপূর্ব্ব চিত্র "ভিভা ভিলা" শনিবার ৯ই ফেব্রুয়ারী থেকে দ্বিতীয় হপ্তায় পড়ল। একটী দস্যু কি ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে মেক্সিকোকে চিরদিনের জন্য বিদেশীর অধীনতা পাশ থেকে মুক্ত করে তাহারই কৌতুহলদ্দীপক কাহিনী।

অর্দ্ধোদয় যোগের দিনই ৩ ঘটিকার প্রদর্শনীতে কালী ফিল্মস কর্ত্তৃক গৃহীত অর্দ্ধোদয় যোগের শব্দমুখর দৃশ্যাবলী রূপবাণীতে প্রদর্শিত হ'য়েছিল।

আয়ার্লাণ্ডের রাজ-অতিথি সুভাষচন্দ্র বসু—ডি ভ্যালেরা সাক্ষাৎকার

বাংলার জননায়ক সুভাষচন্দ্র ভিয়েনায় অস্ত্রোপচারের পর আইরিশ ফ্রি ষ্টেটের রাজ-অতিথিরূপে ডাবলিনে কয়েকমাস অবস্থান করিবেন। সুস্থ হইলে সুভাষচন্দ্র আয়ার্লাণ্ডে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন এবং আইরিশ নেতা ডি ভ্যালেরার সহিত আয়ার্লাণ্ড ও ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্র স্থাপনের জন্যে আলাপ আলোচনা করিবেন। আইরিশ নেতা ডি ভ্যালেরা সুভাষচন্দ্রকে আয়ার্লাণ্ডে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং ডি ভ্যালেরার মুখপত্র "আইরিশ প্রেস" সাড়ম্বরে তাহা ঘোষণা করিয়াছে।

ডি ভ্যালেরা

সুভাষচন্দ্র বসু

লিলিয়ান্ হার্ভে

লিলিয়ান্ হার্ভে—হচ্ছে একটি মেয়ে যার কাছে হলিউড চিরকালই হার্বে। কি কারণ জানিনে, একদিন হঠাৎ সে বল্লে—তোমায় নমস্কার হলিউড্। ব্যস্, তারপর আমেরিকা আর তাকে দেখ্তে পায় নি। সে চল্লো—কোথায়? কোথায় আর—বিলেতে। সেখানে তার ছবি—খুব সম্ভব—"ডু ব্যারী"। বিলেতে থাক্লেও লিলিয়ান কিন্তু ফ্রান্সের মেয়ে।

মিষ্ট্রেস রহস্য

শ্রীঅমর বসু

ওদের প্রথম পরিচয়ের পর আজ ঠিক এই আটমাস চলেছে। একটি একটি করে আজ এই আটমাস, প্রথম আলাপ জমেছিল এক-জনের মধ্যস্থতায়—আটমাস পূর্ব্বে একদিন মিউজিয়মে। মিষ্ট্রেস সুষমা ঘোষ—আর ইঞ্জিনিয়ার ধীরেন দত্ত! মধ্যস্থ যিনি ছিলেন—তিনি আজ সাত মাস এখানে অনুপস্থিত—ওদের পরিচয়ের এক মাস পরেই চলে গেছলেন নোয়াখালী হয়ত কার্য্য-গতিকেই—চুনীলাল চৌধুরী। চুনীলালের সাথে সুষমা এসেছিল মিউজিয়মে—দেখছিল এটা সেটা ঘুরে ঘুরে—সে সময় কোন কারণই ছিল না—দু'পক্ষের এক পক্ষও যা ভাবে নি—অতর্কিতে তাই হোল। হঠাৎ ধীরেন সেখানে উপস্থিত। চোখোচোখি হওয়া মাত্রই প্রথম সম্ভাষণের পালা মুহূর্ত্তেই সাঙ্গ হোল। এবং চুনীলালের বন্ধু ধীরেন, বান্ধবী তার সুষমা—যেহেতু দু'জনেই একান্ত আপনার—সুতরাং সেই করে দিলে পরিচয়। প্রথম নমস্কার আদান প্রদানের ক্ষণে খানিকটা সলজ্জভাব যে উভয়পক্ষ থেকেই বিচ্ছুরিত না হোল—তা নয়—কিন্তু পরক্ষণেই গেল তা নিঃশেষে মিলিয়ে। মুচকি হেসে উভয়েই উভয়কে সম্ভাষণ জানালে—এবং তারপরই আলাপ জমে উঠতে আর সময় নিলে না বেশীক্ষণ। মিষ্ট্রেস সুষমা ঘোষ—আর ইঞ্জিনিয়ার ধীরেন দত্ত—মধ্যস্থ চুনীলাল চৌধুরী, সেদিন ফেরবার পথে সুষমা ধীরেনকে পরদিন চায়ের নিমন্ত্রণ করে দিয়েছিল।

সে নিমন্ত্রণ কিন্তু ধীরেন প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি, বরঞ্চ সাদরে গ্রহণ করে ছুটে এসেছিল পরদিন বিকেলে। সেদিন মজলিশটা জমেছিলও মন্দ নয়। চুনীলাল মাঝখানে থাকাতে হাসি ঠাট্টায় হয়ে উঠেছিল গরগরম।

সে হতেই ওদের আলাপের সুরু—এবং ক্রমে ক্রমে আজ এই আট মাস পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে—নিবিড় হয়েছে উভয়ের সম্বন্ধ! মধ্যস্থ চুনীলালের কথা এখন আর ওদের মনে নেই। ভুলে গেছে নিঃশেষে তার কথা—যার জন্যে আজ তাদের এই নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। এই দীর্ঘ সাত মাসের বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে চুনীলাল চৌধুরী।

তবে একটা কথা ধীরেনের মনে পড়ে—স্পষ্ট মনে আছে তার—চুনীলাল বলেছিল,—সুষমা তার লাভার—তাকেই সে বিয়ে করবে। একদিন নয়—কয়েকদিনই! তাই সুষমাকে মনে প্রাণে যথেষ্ট ভালবাসা সত্ত্বেও সে আশা ছাড়তে সেদিন সে বাধ্য হয়েছিল। কারণ বন্ধুর লাভারের ওপর কোন রকমেই লোভ রাখা উচিত নয়। কিন্তু সে চলে যাবার পর একদিন সুষমাকে জিজ্ঞেস করাতে সে বললে, চুনীলালদার ও ফাজলামো কথা—আপনাকে একটা ব্লাফ দিয়েছে। ও আমার দূর সম্পর্কে পিসতুতো ভাই হয়। সেদিন খুব খানিকটা হেসেছিল উভয়ে একথা নিয়ে। চুনীলালটা কিন্তু আচ্ছা ফাজিল যা হোক! বানিয়ে প্লট একটা জমিয়ে তুলেছিল মন্দ নয়।

সেই হতেই ঘনিষ্ঠতা আরো ওদের বেড়েছে এবং আজ এই আট মাসে তা' উঠেছে চরমে। চুনীলালকে ভুলে আজ ওরা সুখ সাগরে নিমগ্ন! এবং সেই মাত্রারই জের টেনে আজ শনিবার ওরা এই লেকের ধারে।

মোটর রেখে কিছুটা এগিয়ে এসে ধীরেন বললে,—চল ঐ বেঞ্চটাতে বসিগে।

সুষমা আপত্তি করলে না—বসলে এসে দু'জনেই, সামনে জল—অতল না হলেও কিছুটা গম্ভীর বটে। দেখতে কালো—কিন্তু উঠিয়ে ধরলে দেখা যাবে স্বচ্ছ—পরিস্কার। তারই তীরে উভয়ে রয়েছে ওরা পাশাপাশি। হাওয়ার আতিশয্যে আঁচল উড়ছে ফুরফুর করে। সুষমার শাড়ীর আঁচল—আর সিল্কের চাদরের আঁচলটা উড়ছে ধীরেনের, দু'টো একত্র হয়ে জড়াজড়ি করে মরছে যেন। বাতাসটা মাতাল—অশান্ত—সমস্ত বাধা ওর গণ্ডীর বাইরে, কিন্তু ধীরেন আজ যেন বাতাসটার সাথে আড়ি করেই গম্ভীর অতি-মাত্রায়। পার্শ্বে সুষমা—একান্ত আদরিণী তার—যার সাথে দেখা হলেই সহস্র কথায় সে ভেঙ্গে পড়ে—তারই আজ এমনি অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য! মোটরে আসতেও আজ সে বেশী কথা বলে নি—শুধু সুষমা যা বলেছে—ড্রাইভ করতে করতে দু' একটার উত্তর দিয়েছে মাত্র।

পা দু'টাকে একটু ঝাকৃতে ঝাকৃতে সুষমা বললে, কি, অমন গম্ভীর হয়ে রইলে যে? কি ভাবছ অত?

—না, কিছু না—এমনি! আধা গলায় ধীরেন বললে।

—এমনি কি? কপালটা কুঁচকিয়ে মুখে খানিকটা পেটেণ্ট মুচকি হাসি ফুটিয়ে দিয়ে সুষমা বললে,—এমনি এতটা গাম্ভীর্য্যের কোন কারণই থাকতে পারে না, কি হয়েছে বল? নিশ্চয়ই কিছু আজ হয়েছে তোমার। মোটরে আসতে আসতে কত কথা বললাম—কিন্তু একটিরও ত' তুমি উত্তর দাও নি।

ধীরেন তেমনি পূর্ব্ববৎ গম্ভীর—শুধু মাথাটা একটু নুইয়ে দিলে।

সুষমা বললে,—কি হয়েছে বলনা লক্ষ্মীটি! কোন দিনত তোমার [illegible] দেখি নি! কথায় কথায় এত [illegible] হঠাৎ [illegible]!

ধীরেনের শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল—উত্তর দিলে না।

একটু থেমে সুষমা বললে, তাহলে কি আমি তোমার কাছে কিছু দোষ করেছি ?

—না, না, সেকি ! ধীরেন এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। তুমি আবার কি দোষ করতে যাবে ? তোমার কোন দোষের কথা আমি ভাবতেও পারি না।

—কি জানি হতেও ত' পারে ! অভিমানের ভঙ্গিতে সুষমা বললে,—কাল পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছিলাম—তাই যদি তুমি দোষ ধরে থাক ! কোথা দিয়ে কোন ত্রুটি হয়ে যায়—বলা ত যায় না কিছু ! কিন্তু তুমি জান না—কতখানি ঠেকে এটাকা চাইতে আমি বাধ্য হয়েছি। নইলে নিজের ইচ্ছায় যখন যা দিয়েছ তার উপরে কি কোনদিন কিছু চেয়েছি আমি ?

—না, না, ছিঃ—নিজের মনে তুমি অতটা কুণ্ঠিত হও কেন ? আমাকে কি তুমি তাই ভাব ? তুমি স্বেচ্ছায় কিছু চাও না বলেইত আমার আরো বেশী দুঃখ ! কাল যে আমার কি আনন্দ হয়েছিল তোমার কথা শুনে—তা' জানেন একমাত্র ভগবান। তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব দিতে যে আমার কত আগ্রহ—সেকি তুমি নিজেই জান না ? তুমি কাল চাওয়া মাত্রই বাসায় যেয়ে একশ টাকা আমি পকেটে পুরে রেখেছি, পকেট থেকে বের করে বললে,—নাও—রেখে দাও !

—না, না, একশ টাকাত আমার লাগবে না !

—লাগুক—না লাগুক সে ভিন্ন কথা—লাগতে পারে ত !

—না, তুমি রেখে দাও পঞ্চাশটা—পঞ্চাশ টাকাতেই আমার যথেষ্ট হবে।

—না, তুমি নাও—তোমার লাগবে আমি জানি। আজ না লাগুক—অন্যদিন লাগবে।

—না, না, ছিঃ সেকি—সঙ্কুচিত ভাবে সুষমা মুখ তুলে তাকাল।

—তাহলে নেবে না ? আমাকে তুমি পর ভাব ?

—আচ্ছা তাহ'লে দাও ! সুষমা হেসে ফেললে।

কিন্তু ধীরেন হাসলে না। তোমার যখন যা কিছু দরকার হবে আমার কাছে চাইতে কুণ্ঠিত হয়ো না। সামর্থ্য আমার খুব বেশী নয় বটে—কিন্তু তোমার যা কিছু দরকার হতে পারে—তার সব দিয়েই তোমায় আমি ঢেকে রাখতে পারব। সে সামর্থ্যটুকু অন্ততঃ আমার আছে।

সুষমা লজ্জিতভাবে মুখ নামাল।

ধীরেন বললে,—কি বল—চাইবে ত ?

আচ্ছা চাইব। সুষমা নতমুখেই দ্বিরুক্তি না করে বললে।

খানিকটা নিস্তব্ধতা। সম্মুখে নীথর জল সে মৌনতার সাথে যেন বন্ধুতা পাতিয়েছে। বাতাসটা কিন্তু তেমনি উচ্ছৃঙ্খল—তেমনি বাধন-হারা।

সুষমা বললে,—কিন্তু তুমি আজ এতটা গম্ভীর কেন বললে না ?

ধীরেন আবার তেমনি মৌনতাকে আশ্রয় করলে।

সুষমা বললে,—আমি তোমার কাছে সমস্ত কথা খুলে বলি—কিন্তু তুমি মনের কথা আমার কাছে কিছু বলতে চাও না ! আমি কি সত্য সত্যই তোমার পর ? শেষের কথাটাতে সুষমার ছেলেমানুষের মত খানিকটা অভিমানের সুর বেজে উঠল।

এবার ধীরেন কথা বললে,—পর নও বলেই ত'...হঠাৎ থেমে গিয়ে কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দিলে—একটা কথা আজ ক'দিন ধরেই বলব বলব মনে করে আসছি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একদিনও বলতে পারি নি।

—কি কথা ? সুষমা চোখ তুলে তাকাল। বল না ?

—যদিও জানি—শুনলে এতে আপত্তি করতে পারবে না তুমি, সে সামর্থ্যই তোমার নেই, তবু বলতে কেমনই যেন আমার একটু দ্বিধা বোধ হচ্ছে ! শত সহস্র রকম কথা বলতে যেখানে আমার এতটুকু আটকায় নি—আজ কেন যে এ' জড়তা বুঝতে পারি না ! তোমার সাথে মিশতেও ত' আমি একদিনেই পেরেছিলাম—আমাদের মধুর বন্ধন জমে উঠতেও লজ্জার বাঁধ ছিল না। কিন্তু আজ...

চালাক মেয়ে সুষমা কথাটা যে বুঝতে না পারলে তা' নয়—কিন্তু বুঝতে যেন পারেনি এ'ভাবে বললে,—কিন্তু, কি এমন কথা যা' বলতে আজ আমার কাছেও তোমার লজ্জা ?

—না, লজ্জা ঠিক নয়···তোমার কাছে লজ্জা আমার আসবেই বা কেন ? তবে কি কি...আমতা আমতা করে ধীরেন বললে,—ভেবেছিলাম কথাটা একদিন তুমিই উত্থাপন করবে। তোমার মুখ থেকে শুনতে পেলে সে হোত আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ! কিন্তু আজ আট মাস চলল—প্রতিদিন উভয়ে একসঙ্গে হওয়া সত্ত্বেও···

—কিন্তু কি কথা খুলে বল না ?

একটু চুপ থেকে ধীরেন বললে,—বলছিলাম আমাদের বিয়ের কথা। তোমার মুখ থেকে যখন কিছুতেই বেরুল না—তখন বাধ্য হয়ে আমাকেই বলতে হোল। আচ্ছা সুষমা, এভাবে আর আমরা কতদিন থাকব বলত' ? আমাদের মনে কি একটা ইচ্ছা থাকতে নেই ? আজ এতদিন আমরা একসঙ্গে ...আট মাস চলল···আর বয়সও ত' আমাদের কমছে না !

—ওঃ, এই কথা ? এটুকু বলতে তোমার এতগুলো ভূমিকা করতে হোল ?

—ভূমিকা নয় ; ধীরেন বললে,—একটু দ্বিধা এসেছিল মাত্র। আমি জানতাম আগে হ'তেই তুমি কিছুতেই আপত্তি করতে পারবে না।

—তুমি জানতে ? চোখ দু'টো বিস্ফারিত করে সুষমা বললে।

—জানতাম না? তোমার মনের কোন কথাই যে আমার অজ্ঞাত নেই। আজ আট মাস তোমাকে একান্ত কাছে পেয়ে তোমার মনের সাথে মন আমার নিঃশেষে মিশে গেছে। তোমার প্রত্যেকটি কথা জিহ্বা থেকে বেরুবার পূর্ব্বেই আমার কাছে ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

এবার সুষমা মুখ নামাল। মুখের উপর গাম্ভীর্য্যও যেন ফুটে উঠল খানিকটা।

ধীরেন বললে,—প্রথম সেদিন তোমাকে আমি মিউজিয়ামে দেখেছিলাম—সেদিনই মুগ্ধ হয়েছিলাম প্রথম—এবং মনে মনে একটা বাসনাও সেদিনই আমার অঙ্কুরিত হয়েছিল। কিন্তু মাঝখানে চুনীলালের ইয়ারকির জন্যেই দমে গেছলাম খানিকটা। কিন্তু, সে কথা প্রকাশ হয়ে যাবার পর থেকে সে বাসনা আবার মাথা খাড়া করে উঠল। এবং সে জন্যেই উভয়ে আজ আমরা এত নিকটে। তোমাকে পেয়েছি নিবিড়ভাবে।

সুষমা তেমনি গম্ভীর। একটু থেমে ধীরেন আবার বললে,—যে বাসনা আমার ছিল আজ তার সমস্তই প্রায় সার্থক হয়েছে। যে ভাবে, যে রূপে, তোমায় আশা করেছিলাম সমস্ত সাধই তুমি পূর্ণ করেছ, তবু কি জান? মন আমার ভরে ওঠে না, তোমাকে সব দিক দিয়ে—সমস্ত রকমে পেয়েও সর্ব্বদা বুকে একটা খোঁচা জেগে থাকে—তুমি পরিপূর্ণ ভাবে আমার নও।

হঠাৎ সুষমা মুখ উঠাল। আমি যে একান্ত করে নিঃশেষে তোমারই—একি তুমি বিশ্বাস কর না?

—সে কি, বিশ্বাস করব না কেন? মৃদু হেসে ধীরেন বললে, আমি তোমার—তুমিও যে একান্ত করে আমারই সে বিষয়ে আজ আর আমার কোন সংশয় নেই, তোমার কথায়, ভাবে অভিব্যক্তিতে তুমি আজ আমায় অভিভূত করে ফেলেছ, এবং সেই জন্যেই চাই এ'কে আরো পাকা করে নিতে। বল তুমি কবে পর্য্যন্ত রাজী আছ, তুমি বললেই আমি ওদিকে সমস্ত ঠিক করে ফেলব।

—একটা কথা তোমায় বলব, রাগ করবে না বল? অত্যধিক গম্ভীরভাবে সুষমা চেপে চেপে কথাটা বললে?

—না, কি বল?

—হয় ত' শুনলে তুমি রাগ করে বসবে। কিন্তু সত্যি সত্যি রাগের কথা এটা নয়। এ আমার অন্তরের খাঁটি সত্য—এবং এ' মতকেই চিরদিন আমি প্রাধান্য দিয়ে এসেছি!

—কথাটা কি তাই খুলে বল না?

—কিন্তু সত্যি সত্যি রাগ করবে না বল?

—বাবা, এত ভারিক্কিও তুমি করতে পার! কথাটা আগে খুলেই বল না বাপু? আচ্ছা যাও—কথা দিলুম, করব না রাগ—প্রতিজ্ঞা।

একটু সময় গম্ভীরভাবে চুপ থেকে ধীরে ধীরে সুষমা বললে, তুমি যার জন্যে ব্যস্ত হয়েছ ওতেই আমার সম্পূর্ণ অমত। সত্যি সত্যি বিয়ে আমার ভাল লাগে না।

—সে কি, কেন? আশ্চর্য্য হ'য়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টি ধীরেন তুলে ধরলে।

—বিয়েটা একটা চিরাচরিত প্রথা! ও একঘেঁয়েমী আমি পছন্দ করি না, নিত্য নূতন আনন্দ সেই ত সুন্দর! এই কি আমরা মন্দ আছি? বিয়ে করি নি অথচ সমস্ত আনন্দই তার উপভোগ করছি।

ধীরেন এবার হেসে ফেললে। সে ত ঠিকই, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু বিয়েটা চিরাচরিত প্রথা হলেও একঘেঁয়ে নয়। প্রত্যেক দম্পতির জীবনেই তা' নূতন ভাবে আলো-পাত করে। তাই বিয়ে আমাদের করতেই হবে। তুমি অমত ক'র না লক্ষ্মীটি! এতে আনন্দ যথেষ্ট হ'লেও আমি ঠিক পরিপূর্ণতা অনুভব করতে পারি না।

কিন্তু,—কটাকে কুঁচকিয়ে দিয়ে সুষমা বললে, অপরিপূর্ণতারই বা এতে কি আছে? বিয়ের দু'টো মন্ত্রই কি আমাদের এর চেয়ে আরো বেশী নিবিড় করতে পারবে? ও আমি বিশ্বাস করি না। তার চেয়ে এই বেশ আছি। তুমি আমার—আমি তোমার—এই আমাদের আনন্দ, চরম আনন্দ! অপার সুখ-সমুদ্রে আমরা ভেসে চলেছি। কোন রকম অভাব কি আছে আমাদের? বিয়ে করি নি বটে—কিন্তু কিছুই তার বাদ থাকছে না। একসঙ্গে মেলামেশা, হাসি আহ্লাদ, খেলাধূলা—সবই চলেছে সমানে। আর এ' একটা বেশ নূতনত্বও! খোলা হাওয়ায় বেশ আছি আমরা। আসল কথা ওসব মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই নয়—ও যার যার মনের মিল!

—তা হ'লেও মনের মিল যতখানিই থাক কিন্তু বিয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একটা সঙ্কোচ ভাব উভয় পক্ষ থেকে আত্মপ্রকাশ করবেই। কিন্তু বিয়ে হলে আর সেটুকু থাকে না। ও বাঁধনটা যে একটা সত্যিকারের বন্ধন এ'কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এই যে, দেখ আজ একশ টাকা দিতে চাইলাম. কিন্তু কতখানি সঙ্কোচ তুমি [illegible] করলে। বিয়ে হ'লে কি আর সেটুকু [illegible]কবে?

—ও এমনিও থাকবে না! সুষমা তাচ্ছিল্যের স্বরে [illegible]লে, আপনার থেকে সেরে যাবে। প্রথম দু'দিনই যা একটু লজ্জা—তারপর কি আর তা থাকে! ভালবাসার বন্ধনটাই আসল-বিয়ের টুটো ফুটো দু'টো মন্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই!

—না, না লক্ষ্মীত, তুমি আপত্তি কর না! বেচারার মত ধীরেন বললে,—বিয়ে না করলে আমাদের কিছুতেই চলবে না। তুমি যতই বল কিন্তু মনের সম্পূর্ণতা আমি কিছুতেই পাই না। তুমিও যে পাওনা—একথা মুখে অস্বীকার করলেও—মনে মনে স্বীকার করতে তুমি বাধ্য! বিয়েটা সত্যি অনেক উচ্চ জিনিষ! বিয়ের ভেতর দিয়ে এর চেয়ে

অনেক বেশী আনন্দ উভয়ের ভেতর জমে উঠবে। নইলে, এই দেখ না তুমি এতটা আমার আপনার—তবু বুকে তোমাকে জড়িয়ে ধরে কেবলই মনে হয়—কোন কারণে হয়ত তুমি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পার।

—তা'হলে তুমি বলতে চাও, সুষমা সহসা হেসে ফেললো: যে বিয়ে হলে আটকা পড়ে যাব—বিচ্ছিন্ন হবার আর কোন আশঙ্কা থাকবে না। কিন্তু মেণ্টালিটি যদি সে রকমই হয় তাহলে উভয়ের ভেতর আগুনও ত জ্বলে উঠতে পারে। যাতে করে চিরজীবন উভয়ের মাটি হয়ে যাবে। ও রকম কি অনেক সংসারে সত্যি সত্যি হয় না?

—হয়! ধীরেন বললে,—কিন্তু আমাদের ভেতর সে রকম পরিস্থিতির আশঙ্কাও হাস্যকর। ···কিন্তু না—ওসব বাজে কথা বলে আমাকে ভুলাতে চেও না। বল কবে পর্য্যন্ত আমি দিন ঠিক করব!

—কিন্তু কি যে পাগল তুমি' নিতান্ত অনিচ্ছার স্বরে সুষমা বললে,—বিয়ের জন্যে হঠাৎ এত উন্মাদ হলে কেন?

—উন্মাদ হওয়াটা স্বাভাবিক বলেই উন্মাদ হয়েছি।

—কিন্তু, না সত্যি—আমার বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই!

—তাহলে আমার কথা তুমি রাখবে না?

—কিন্তু একজনের অনিচ্ছায় কি তা সম্পূর্ণতা লাভ করবে তুমি মনে কর?

—সে আমি নিজের মনে বুঝি বলেই শুধু তোমার মতটুকু চাচ্ছি। বিয়ের পর দেখব মুখে হাসি ফোটে কি না ফোটে? তখন যদি আমার প্রশংসা না কর ত—নাম ফিরিয়ে দেব।

—হুঃ, প্রশংসা করব না ত—ছাই করব! গম্ভীরভাবে সুষমা বললে।

—আচ্ছা কোরনা—এখন শুধু মতটুকু দাও। দিন আমি স্থির করে ফেলি!

সুষমা গম্ভীর। একটা মহা চিন্তা তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। অতীত ভবিষ্যতের মহা এক সংশয়। ধীরেন বললে,—কি চুপ করে রইলে যে?

—কিন্তু বিয়ে না করলে কি তোমার চলে না?

—তুমিই বা কেন যে এত আপত্তি করছ তাও ত আমি বুঝতে পারছি না। বিয়ে না করার উপর কি এত তোমার অনুরাগ? এবার ধীরেনও নিজেকে গম্ভীর করে এনেছে। আর এটাও সাধারণ কথা তুমি বুঝতে পার বিয়ে না করে এমনি থাকাটা সমাজের চক্ষে কত বড় অপরাধ।

—ওসব সমাজ ফমাজ আমি মানি না।

—না মানো—তবু বিয়ে করতে হবে। আমার ইচ্ছার সাথে তোমার ইচ্ছার বিভিন্নতা আমি আশা করি না!

—কিন্তু জানো, যদি এ বিয়ে হয়'—চোখ দু'টো সুষমার জ্বলজ্বল করছে। তাহলে তা আমার সম্পূর্ণ মতের বিরুদ্ধে হবে।

খানিকটা আশার রশ্মি পেয়ে ধীরেন পুলকিত হয়ে উঠল। গাম্ভীর্য্য গেল মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে। জানি! এখন মতের বিরুদ্ধে হলেও—বিয়ের পরক্ষণেই যখন সিঁদুরের রেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে সিঁথিতে—তখন আর এ বিরুদ্ধতা থাকবে না। এখন মনের ইচ্ছা মনে রেখে শুধু মতটুকু দাও!

এবার সুষমা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। মাঝখানে কপালের শিরাগুলো হঠাৎ একবার উঠল টানা দিয়ে। দু' আঙ্গুলে কপালটা চেপে ধরে রইল নতমুখে। তারপর সহসা মুখ উঠিয়ে বললে,—আচ্ছা যেও কাল চারটার সময়—তখনই আমি মত দেব।

পরদিন দুপুর বেলা কাটায় কাটায় দু'টো। অফিস নেই—তাই ধীরেন এর মধ্যেই অস্থির হয়ে উঠল। সুষমা আজ মত দেবে—মুখের কথা আজ সে পাবে তার। একান্ত আদরের সুষমা—তবু আজ পর্য্যন্ত যাকে সম্পূর্ণ আপনার করে নিতে পারে নি—তাকেই পাবে সে পরিপূর্ণভাবে! শুধু তার মুখের একটি কথা বলবে; হয়ত এমনি করেই বলবে—তোমার মতের উপর আবার আমার মত কি! জিজ্ঞেস করতে আসাই তোমার অন্যায়।

হয়ত এমনি করে সে বলবেই। কারণ তাকে সে চেনেত! আজ আট মাস একসঙ্গে থেকে তার মনের সম্পূর্ণ পরিচয় আর তার অজ্ঞাত নেই! তবে কালকের সে অনিচ্ছা জ্ঞাপন যে একটা তার খেয়াল! চির খেয়ালী এই সুষমা! তার মতের উপর সত্যি সত্যি কি তার কোন মত থাকতে পারে! এতদিনে শুধু বিয়েটা ছাড়া আর তারা কিসে পৃথক! সুষমা কথাটা বলেছে একেবারে মিথ্যে নয়। তবু মনত মানতে চায় না—বিয়ে হলে সুষমাকে পাবে সে আরো একান্ত করে।

মনে মনে ধীরেন উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠল। কিন্তু আরো যে পুরোপুরি দু'টো ঘণ্টা বাকি! সত্যি ধৈর্য্যের বাঁধ আর তার টিকছে না। তা হলেও উপায় নেই—চারটার আগে সে কেমন করে···। একটু আগে গেলেই সুষমা খোঁটা দিয়ে বসবে—বাঙ্গালীর সময় লোকে এ জন্যেই বলে। প্রথম প্রথম সময় ঠিক রাখতে পারে নি বলে, খোঁটা কি তার কাছ থেকে সে কম খেয়েছে! সত্যি—আচ্ছা ফাজিল সুষমাটা! বাঙ্গালী হয়েও খাঁটি সাহেবের মত চাই তার আদব কায়দা!

যাই হোক, তারপর থেকে সেও আর ভাঙ্গেনি সময়। ঘড়ির কাটা ধরে একেবারে ঠিক সময়ে যেয়ে হাজিরা দিয়েছে। একটি দিন এতটুকু নড়চড় হয় নি। আর সুষমা যে জিনিষ পছন্দ করে না—তা' সে করবেই বা কেন? সময় ঠিক রাখতে না পারাটা কিছু গৌরবের কথা নয়।

কিন্তু আজ...ঘড়ির কাঁটা দু'টো যেন আর কিছুতেই এগুচ্ছে না। এবং সে জন্যে ধৈর্য্যের বাঁধ তার আরো বেশী শিথিল হয়ে আসছে। সুষমা আজ কথা দেবে—পূর্ণ মিলনের প্রথম

অঙ্কের হ'বে আজ সূত্রপাত! তারপর যেদিন তারই কল্যাণে শিঁথির 'পরে সিঁদুর ওর জ্বল জ্বল করে উঠবে···উঃ, সে আনন্দের কথা সে ভাবতে পারে না। অথচ সেই আনন্দই লাভ করতে হয়ত' বেশী দিন লাগবে না। মাস খানেক কিম্বা হয়ত' খুব বেশী হ'লে দেড় মাস।

স্তব্ধের মত সে বসে রইল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মিনিটের পর মিনিট অপেক্ষা করছে এবং ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে উঠছে ততোধিক হাঁপিয়ে। উঃ, ঘড়ির কাঁটা দু'টো কি বেহায়া রে! চলবার শক্তি কি আজ ওরা সত্যি সত্যি হারিয়ে ফেলেছে।···তবু সে বসে রইল অপরিসীম ধৈর্য্যে। মাথা তার গরম হয়ে গেছে —পা' দু'টো করছে সুর সুর? ধৈর্য্যকে আকড়ে রেখেছে প্রাণপণ শক্তিতে।

এক মিনিট—দু' মিনিট—তিন মিনিট—পাঁচ—দশ—পনের···

পোনে তিনটা...কিন্তু...

না, না, আর সে পারে না এবং তারপরই সহসা···

একদিন একটু কথা ভাঙ্গলে এমন কিছু এসে যাবে না। মনকে সে আর কিছুতেই বেঁধে রাখতে পারলে না। ধৈর্য্যের বাঁধ তার কুটি কুটি হয়ে নিঃশেষে ছিঁড়ে গেছে। চাদরটা টেনে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়লে। সে পাগল হয়ে গেছে—উন্মাদ—পাগল! ঘড়িটা আজ ষড়যন্ত্র করেছে।

এক রকম ছুটতে ছুটতেই এসে দাঁড়াল গেটের কাছে। কিন্তু এসেই থামলে। মাথা তার এতক্ষণে অনেক খানি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পরিবর্ত্তে জেগে উঠেছে কৌতূহল। সুষমা যেন কি করছে এখন, কি যেন ভাবছে! প্রতিদিনের মতই আজও তাকে সে চমকিয়ে দেবে।

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। একটা অজানা পুলকে বুকের ভেতরটা ঢিব ঢিব করছে। কি ভাবে যেয়ে যেন দেখবে সুষমাকে! হয়ত' বসে বসে পড়ছে—অথবা করছে শেলাই—অথবা হয়ত' ভাবাচ্ছন্ন শুধু।

জুতার শব্দ যেন একটুও না হয় এ'ভাবে দাঁড়াল সামনে। কিন্তু দরজা আটা ভেতর থেকে। তা' এমন প্রায় প্রতিদিনই সে দরজা বন্ধ করে কাজ করে। নইলে কাজের না'কি ভয়ানক অসুবিধা হয়।

কিন্তু,—ধীরেন মনে মনে হাসলে খানিকটা। তার একটি গুপ্ত জায়গা আছে যা' দিয়ে ঢুকবার পূর্ব্বে তার সোহাগিনীকে প্রতিদিন একবার সে দেখে নেয়। একটি ছোট্ট ফাঁক। সেখানে উঁকি দিলেই নজরে পড়ে হয় সুষমা পড়ছে—না' হয় লিখছে—কিম্বা এমনি কিছু।

আজও সে সেখান দিয়েই উঁকি দিলে। কিন্তু সুষমাকে দেখা গেল না। চেয়ার টেবিল তার খালি পড়ে আছে। সামনে কোন বইও আজ খোলা নেই। কিন্তু তারই বিপরীত দিকে আর নজর যায় না—যেদিকে তার পালঙ্ক। শরীর কি তা'হলে তার খারাপ! শুয়ে কি আছে তা'হলে? কে বলবে! বুকটা তার দুর দুর করে কেঁপে উঠল একবার।

আরো ভাল করে সে লক্ষ্য করলে। ঘড়িতে পুরোপুরি সাড়ে তিনটা। এবার সুষমাকে ডাকতে যাবে—ঠিক সেই সময় নজর পড়ল তার টেবিলের ওধারে বড় আরশী-খানার উপর। পালঙ্কের সবখানি দেহই তার ভেতর প্রতিফলিত হয়েছে।

···উঃ ভগবান!···একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ মুখ দিয়ে তার ছুটে বেরিয়ে গেল। পতনের হাত থেকে কোন রকমে রক্ষা করলে নিজেকে। তার পর···তার পর...প্রাণপণ শক্তিতে দু'বার সে আঘাত করলে বন্ধ দর-জাতে। মাথা···মাথা দিয়ে তার আগুণ ছুটেছে।

দেহে যতখানি শক্তি তার ছিল সবটুকু

=ত্রিশূল=

রামের দুর্ম্মতি

শরৎচন্দ্রের "বিজয়া" জমিবার সঙ্গে সঙ্গেই করপোরেশনে "রামের-দুর্ম্মতি" জমিবার উপক্রম হইয়াছে

কুক্ষণে কলিকাতা করপোরেশনে আয়ুর্ব্বেদ-হাঁসপাতালে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বৎসর বৎসর grant বৃদ্ধির জন্য তদ্বিরকারকেরা Health Committee-র সকাশে যে নিবেদন দাখিল করেন তাহা অভ্রান্ত বলিয়াই এতদিন বিবেচিত হইতেছিল। সহৃদয় কাউন্সিলারবৃন্দ গৌরী সেনের টাকা খয়রাতে দানশীলতায় কোনদিনই কার্পণ্য করেন নাই। এবার ফ্রি গোবিন্দ-সুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও হাঁসপাতালের grant-এ যে বিভ্রাট ঘটিয়াছে তাহা যেমন মনোরম তেমনি কৌতুকপ্রদ।

"মহা-মহাধ্যাপক" বলিয়া বিজ্ঞাপিত কবিরাজ রামচন্দ্র মল্লিক গোবিন্দ-সুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় যথারীতি শ্রীরামচন্দ্র এবারও হাঁসপাতালের grant লাভের জন্য করপোরেশন সকাশে এক নিবেদন পেশ করেন। Health Committee-র তিনজন সভ্য কাউন্সিলার মিঃ এ, রাজ্জাক্‌, মিঃ আর্, জে, কোহেন ও শ্রীমতী কুমুদিনী বসু এই নিবেদন প্রাপ্তির পর গত ১৪ই নভেম্বর প্রাতে ৯.৩০ টার সময় গোবিন্দ-সুন্দরী হাঁসপাতালে এক "Surprise visit" দেন। এই visit-এর পর তাঁহারা করপোরেশনে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন সে সম্বন্ধে শ্রীরামচন্দ্র কি বলেন, তাহা আমরা জানিতে চাই। উক্ত তিনজন কাউন্সিলার বলিতেছেন "Only 19 beds out of 50 were occupied" অথচ শ্রীরামচন্দ্র Health Committee সকাশে যে দরখাস্ত করিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন—"That the principal himself has clearly written in the application that the average beds occupied in the Out-door are 48." মিঃ রাজ্জাক্‌, মিঃ কোহেন ও শ্রীমতী কুমুদিনী বসু পরিদর্শনান্তে বলিতেছেন "That the average attendance in the Medical Out-door is 22 and surgical 12 only" অর্থাৎ Out-door-এর সর্ব্বসমেত attendance 34. মহা-মহাধ্যাপক রাম কিন্তু application-এ বলিয়াছেন "average attendance in the Out-door is 150." কমিটী যেখানে ৩৪ জন স্বচক্ষে দর্শন করিতেছেন রামচন্দ্র তথায় দেড়শতের দর্শন পান। মহা-মহাধ্যাপক কবিরাজ রামচন্দ্র করপোরেশন grant লাভের আশায় রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির যে কসরৎ করিয়াছেন তাহাতে মিঃ রাজ্জাক্‌, মিঃ কোহেন ও শ্রীমতী কুমুদিনী বসু বিরক্ত হইয়া লিখিয়াছেন "We want to point out to the members of the Health-Committee that the principal himself has clearly written in the application etc etc."

এইবার হাঁসপাতালের খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহের যে কাহিনী ত্রয়ী কাউন্সিলার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এই:—"We are informed that both diet and medicine are supplied by the contractors."

সঞ্চয় করে ছুটে এসে দাঁড়াল রাস্তার উপর। ক্লার্ট! ক্লার্ট! সমস্ত পৃথিবী তার কাছে আজ অন্ধকার হয়ে গেছে। তার সমস্ত আশা গেছে চূর্ণ হয়ে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে সমস্ত ভরসা। ভগবান···ভগবান···কী বীভৎস দৃশ্য আজ দেখালে প্রভু! সুষমা... সুষমা...উঃ···সুষমা তার বিশ্বাসঘাতিনী।

শেষ।

মন্দ ব্যবস্থা নহে—তবে কে সে Contractor ধুরন্ধর—যিনি ঔষধ ও পথ্য সরবরাহ করিয়া থাকেন ? কাউন্সিলাররা বলিয়াছেন "We are told that all the medicines are supplied by Kaviraj Ram chandra Mallick who has been paid Rs.2161-11 annas for the same." বাহবা, রামচন্দ্র স্বয়ং ঔষধের ঠিকাদার রূপে ঔষধ সরবরাহ করিয়া যথারীতি মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। এমন গুণনিধি নইলে আর Free College-এর principal হয় ?

ঠিকাদাররূপী রামচন্দ্রের voucher তত্ত্ব আবার অপূর্ব্ব। কাউন্সিলাররা বলিতেছেন "We found that the vouchers are in loose sheets and the receipts have been granted by the principal about payment of Rs 2000/- under the head of medicines supplied by him to the Institution. ঔষধের মূল্যে ঠিকাদার রামচন্দ্র ৷৷৵০ এগার আনা কোন item-এ ধরিয়াছেন তাহা কিন্তু কাউন্সিলাররা বলেন নাই। ঔষধের মূল্য সম্বন্ধে কাউন্সিলাররা বলিতেছেন "rates charged we consider to be too high" যথা we find "চিন্তামণি-চতুর্ম্মুখ" has been charged Rs 2/8/- per week, etc etc. কিন্তু অত্যধিক মূল্যের ঔষধে তথা পথ্যেও রোগীরা কিরূপ অবস্থায় আছেন কাউন্সিলাররাই বলিতেছেন "The patients showed great dissatisfaction regarding the diet and treatment rendered to them. মহা-মহাধ্যাপক রামচন্দ্র Free Govinda-Sundari Ayurved College এবং হাঁসপাতালের principal-রূপে বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া থাকেন, ঔষধের ঠিকাদাররূপে উক্ত হাঁসপাতালে ঔষধ সরবরাহ করিয়া সালিয়ানা বৎসর বেশ two pice আমদানী করিয়া থাকেন, রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে অঙ্ক শাস্ত্রের কসরতের নিপুণতা প্রদর্শনও করেন আর বেচারী রোগীরা পথ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থায় হা-হুতাশ করিয়া মরে। করদাতাদের অর্থের অপব্যবহার যদি এই প্রকারে ঠিকাদার কবিরাজদের দ্বারা হইয়া থাকে—কাউন্সিলার-দের কি কর্ত্তব্য নয় তাহা প্রতিরোধ করা ?

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মেয়র মিঃ রাজ্জাক্ করপোরেশনের পুরাতন কাউন্সিলার মিঃ কোহেন ও মহিলা সদস্যা শ্রীমতী কুমুদিনী বসু গোবিন্দ-সুন্দরী পরিদর্শনান্তে একমত হইয়া অনুরোধ করিতেছেন "We are in view that the members would not be justified in recommending last years grant to the Institution. ঔষধের মূল্য বাবদ যে রামচন্দ্র too high price লইয়া থাকে। রোগীর গড়পড়তা উপস্থিতির সংখ্যা যে ৩৪কে ১৫০-এ পরিণত করে, যাহার পরিচালনা নৈপুণ্যে রোগীরা পথ্য ও চিকিৎসায় great dissatisfaction
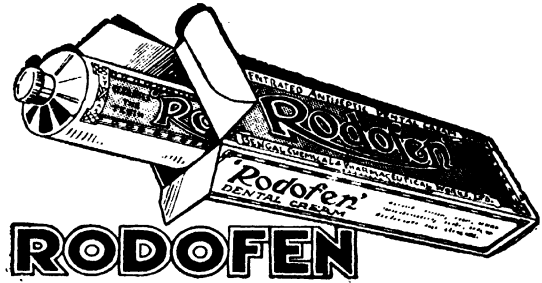
দেখাইয়া থাকে—কিসের জন্য তাহাকে হাঁসপাতাল grant-এর অর্থ প্রদত্ত হইবে? আমরা বাংলার গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাম-কাহিনীতে আকৃষ্ট করিতেছি। কাউন্সিলার অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ, কবিরাজ সত্যব্রত সেন, শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র বিশ্বাস, অল্ডারম্যান যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত, ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসুর নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁহারা অচিরে কমিটী গঠন করিয়া প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদীয় হাঁসপাতালের তত্ত্ব অবগত হউন। এক রামের কাহিনী অবলম্বন করিয়া রাজ্জাক্, কোহেন, বসু প্রমুখ কাউন্সিলাররা যে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন, তাহাই কি তদন্তের পর্য্যাপ্ত বিষয় নহে? ডাঃ যতীন্দ্র নাথ মৈত্রই বলুন তিনি অতীতে একদিন এই গোবিন্দ-সুন্দরী হাঁসপাতাল সম্বন্ধে কি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন? অপব্যয় নিবারণের জন্যই তো Sir Charles-এর ব্যবস্থা হইয়াছে।

সত্য বটে যামিনী ভূষণ অষ্টাঙ্গ বিদ্যালয়ের হাঁসপাতাল শ্রদ্ধেয় স্যর মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ও পরহিতব্রত শ্রীযুক্ত মনমোহন পাঁড়ের কর্ম্ম-কুশলতায় আজ বাংলার শ্লাঘার-কেন্দ্র। Grant বৃদ্ধি করিতে হয় অষ্টাঙ্গের দাবী যে শ্রেষ্ঠ তাহা বলাই বাহুল্য. যে হাঁসপাতাল স্বর্গীয় যামিনী ভূষণের দানে প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার পরিচালনা সমিতি যামিনী ভূষণের তিরোধানের পর আজ পর্য্যন্ত হাঁসপাতালকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিবার জন্য নিত্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, যামিনী ভূষণের প্রদত্ত উদ্যানে যাহারা নব-নির্ম্মিত যক্ষা-হাঁসপাতাল দরিদ্র মুমূর্ষ রোগীদের আশ্রয় দানে রক্ষা করিতেছে,—grant পাইবার তাহার যোগ্যতাই যে শ্রেষ্ঠ তাহা বলাই বাহুল্য। তবে তাই বলিয়া ঠিকাদার কবিরাজেরা করপোরেশনকে ঠকাইবে এ কেমন কথা? হে রাম, সংযত হও—রাম নামে আর কলঙ্ক দিওনা। সাবধান, শ্রীযুক্ত গণদেব গঙ্গোপাধ্যায় আর নীরব থাকিবেন না

——

কিশোরী

শ্রীঅরুণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্নিগ্ধ শ্যাম পল্লীপথে আলো-কালোর সঙ্গমে,
সহসা কার হাল্কা হাসির হিল্লোলে;
চমকে উঠি ত্রাস্ত-ব্যাকুল চির চেনা সঙ্গীত-এ,
শুনেছিনু ভাগীরথীর কল্লোলে।
কিশোরী সে অঙ্গ ব্যাপি বিরাজিছে সৌরভ,
রাঙ্গান তার ওষ্ঠ রাঙ্গা রঙ্গনে।
দিব্য লোকের অপ্সরি কী? ছন্দি ওঠে মূর্চ্ছনা
স্পর্শিতে তার চরণ ধরার অঙ্গনে।
পথ বেয়ে যায় শ্যামা মেয়ে লীলায়িত ভঙ্গিমায়.
দেখলে তারে হয় যে ভালবাসিতে।
কপোল তাহার সরম-রাঙ্গা—কম বয়সের রঙ্গীমায়
যৌবনের স্বপন ভাসে হাসিতে।
নিতম্বের দোলে কাঁপে স্নিগ্ধ তনু-লতাটী,
অপরূপ বিলসিত ভঙ্গিতে।
কোমল-বাহু কম্পনে তার কাঁকন চুড়ি চঞ্চলি'
বেজে ওঠে মন্দ মধুর সঙ্গীতে।
যৌবনের জোয়ার বহে হিয়াতলে উল্লাসে,
দীপ্ত আঁখির চপল দু'টী তারাতে,—
নীরব বাণী কানাকানি করে,—সারা অন্তর
তাহার মাঝে হয় রে যেন হারাতে।
নীলাম্বরী ধন্য আজি তনু দেহের পরশে,
পল্লব কী উঠিয়াছে মুঞ্জরি'?
যুবন প্রাণে দাগ দিয়ে যায় শত বীণার ঝঙ্কারে
এঁকে চলা চরণ দু'টী গুঞ্জরি'।
ললাটে তার সরলতা—পবিত্রতার গরিমা,
আপ্না হতে নুইয়ে পড়ে মাথাটী।
শোণিত বহে স্পর্শে তাহার বিভোল করে অন্তর,
হৃদয় তারে গুঞ্জরে তার কথাটী।
সত্য কবি, মুগ্ধ আজি কিশোরী তার দরশে
দেখলে পরে হয় যে ভালবাসিতে।
বিশ্ব কবির কল্পিত ও অঙ্গ ঝরা লাবণি,
যৌবনের আবেশ বহে হাসিতে।

——

=উপন্যাস=

উচ্ছৃঙ্খল

শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—তাতে আপনার মন মজ্‌তে পারে, তাই বলে আমাকে কেন ঐ অপবাদে জড়িত করছেন। আমাকে লোকে তার কাছে দেখতে পারে, আমিও সেকথা স্বীকার করি। কিন্তু তাই বলে, যে আমি উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন হবো একথা আমি মান্‌বো কেন? বারবণিতার ঘরে রাত্রিবাস করলে যে চরিত্র হারাতে হয় আমি তা' স্বীকার করিনা।—আপনার যদি তার মতো অন্তঃকরণ হতো তবে আপনি আমাকে একথা বল্‌তেন না।—বলতে পারতেন না। সে আমায় বিপদে আশ্রয় দিয়েছিল।

অরুণ রোষভরে কমলের দিকে চাইলে।

নিখিল বললেন: অরুণ, তুমি আমার সামনে এত কথা বল্‌তে কখন থেকে শিখেছ?—তুমি জাননা, আমি তোমার পিতা।

—জানি—কিন্তু—

—কিন্তু কী? সে আমার বন্ধু, তোমার পিতার মতোই, তাকে অপমান করা কি তোমার উচিত? যাক্, বাজে কথায় অনেক রাত করে ফেল্‌ছি। গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে গেছে।

নিখিল, কমল ও অরুণ একসঙ্গে হেঁটে চললো। শিয়ালদা'র বাসে চ'ড়ে তারা ষ্টেশনে পৌছলো।

টিকেট কিন্‌তে হলোনা। গাড়ীতে চড়ে বস্‌লো।

গাড়ীতে বসে নিখিল অরুণকে জিজ্ঞাসা করলেন: এসব কথা কি সত্য?

—কি বাবা ?

—যে তুমি চরিত্রহীন।

—তা তো আপনিই বুঝতে পারছেন!

—আমার ছেলে চরিত্রহীন, আমি তো সেকথা ভাবতেও পারিনা। ক্ষণিক দুর্ব্বলতার বশীভূত হয়ে তোমার চিত্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল,—কিন্তু, তুমিতো চরিত্রহীন নও। তুমি যে আমার পুত্র—

—সে নিরুত্তর। সে কী বলবে? সে যে চরিত্র হারিয়েছে। তার দেবোপম পিতার আদর্শ বংশ কলঙ্কিত করেছে।—এখন শুধু অনুতাপ ছাড়া তার আর কী সম্বল আছে?

নিখিল বল্লেন: আজ তোমায় একটী কথা বল্‌বো। তুমি আজ আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর, ভবিষ্যতে আর কোনদিন পাপ সংসর্গে মিশবে না।

অরুণ প্রতিজ্ঞা করলে সে আর পাপ সংস্পর্শে আস্‌বে না। তাদের বাড়ীর ষ্টেশনে গাড়ী থামলো। কমল আগের ষ্টেশনে নেমে পড়েছে। নিখিল ও অরুণ নেমে এলো।

তারা যখন বাড়ী ফিরলে, তখন মধ্যরাত্রি।—রাত্রির নীরবতা ভেদ করে, পেচকের রব উঠছিল। তা' ছাড়া দু'একটী ঝিল্লীর শব্দও কানে বাজছিল।

বাড়ী ফিরে এসে তাদের আর খাওয়া হলোনা। নিখিল তাঁর ছেলের সঙ্গে কিছু মুড়ি-চিড়া খেয়ে জল খেয়ে হুকো টান্‌ছিলেন।

অরুণ পাশের ঘরে বিশ্রাম করছিল।

নিখিল বল্লেন: এবার পরীক্ষার বছর। কল্‌কাতা আসা যাওয়া করে ভাল পাশ করতে পারবেনা। সেখানে কোন আত্মীয়ের বাসায় থেকে পড়লে ভাল হয় না?

অরুণ বল্লে: বেশতো। তাতে একটু সুবিধা হয় বৈকি! কিন্তু তেমন যায়গাতো দেখছিনে।

তিনি বল্লেন: অখিলের বাসায় থাক্‌তে পার। সে আমার নিকট-আত্মীয়। তোমার মার দিক্ থেকে সে তোমার দাদা। তার কাছে, তুমি বোধ হয় ভালই থাক্‌বে·········

অরুণ সম্মত হলো।

পরদিন অরুণ কল্‌কাতা যাত্রা করবে। আনন্দ ও বেদনায় তা'র সারা অন্তঃকরণ ভরে গেছে। আনন্দ—সে কল্‌কাতায় থাকবে। নিত্য নতুন জিনিষ দেখবে। বেদনা—তার পিতাকে ফেলে যেতে হবে!

নিখিলকে পুত্রের আসন্ন বিরহ-বিচ্ছেদ-ব্যথা পাগল করে তুলছিল। তবু কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাকে কল্‌কাতা পাঠাবেন।

নিখিল কাগজ পেন্সিল নিয়ে একখানা পত্র লিখতে আরম্ভ করলেন। কী লিখবেন ভেবে পেলেন না।—পুত্রকে ছেড়ে কী করে থাকবেন? শত চিন্তা জড়ীভূত হয়ে এলো। তিনি লিখ্‌লেন—

প্রিয় অখিল,

আজ আমি তোমার কাছে একখানা পত্র নিয়ে উপস্থিত হলুম্। আশা করি, তুমি আমায় ভুলে যাওনি। আজ আমি আমার অরুণকে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। তাকে তুমি তোমার বাসায় রাখবে। আমি তোমার কৃতজ্ঞতার মূল্য স্বরূপ তোমায় কিছু দোব। তাকে তোমার নিজের পুত্র মনে করে, তোমার তত্ত্বাবধানে রেখে আমার চিন্তা দূর করো। আমার একমাত্র পুত্রের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা আমায় যে অহর্নিশ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে, সে কথা আর তোমায় বলি কেন? আশা করি, তুমি আমার এই প্রথম ও শেষ অনুরোধটুকু রক্ষা করে কৃতার্থ করবে।—

অনুরোধ পত্র। জীবনে তিনি আর কোন অনুরোধ পত্র লিখেননি। লিখবার কারণও নেই। তার কাছে কারো পাওনা নেই। তিনিও কারো কাছে পান্ না। নিজে যা রোজগার করেন তাই দিয়ে তাঁর ছেলেকে খাইয়ে আরো কয়েকটী টাকা উদ্বৃত্ত থেকে যায়। সেগুলি তিনি Saving Bank এ জমা রাখেন। এইতো তাঁর জীবন! এই জীবনে অনুরোধ পত্রের প্রয়োজন নেই।

—পত্রখানি লিখে তিনি বারবার পাঠ করতে লাগলেন। পড়া শেষ হয়ে গেলে একটী লেফাপায় পুরে চিঠিখানি অরুণের হাতে দিয়ে বল্‌লেন এই পত্র নিয়ে তুমি অখিলের কাছে দিলেই সে তোমায় রাখ্‌বে। তোমায় একটা কথা বলে রাখি। ইতঃপূর্ব্বে আমি আর কোনদিন কারো কাছে কোন অনুরোধ করিনি। আজই আমার প্রথম ও শেষ অনুরোধ। আমার মনে হয়, সে অনুরোধ রাখলে তুমি তার অমর্য্যাদা করবেনা।

—তাঁর গণ্ড বেয়ে দুঃখের প্রবাহ অশ্রুজল হয়ে ছুটে এলো। তিনি কিছুতেই তার নিরোধ করতে পারলেন না।

পিতার এই অবস্থা দেখে অরুণও অশ্রু সংবরণ করতে পারলে না।

পিতাপুত্র উভয়ে অনেকক্ষণ নীরবে অশ্রু-মোচন করলো। মাতৃহারা সন্তান কাঁদলো—তার মায়েরই স্মৃতি উদ্দেশ্যে, আর পত্নীহারা স্বামী, আসন্ন পুত্রবিরহ বিচ্ছেদ কাতর পিতা কাঁদলেন—স্বর্গগতা-পত্নীর জন্য—আর সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ ভেবে।

রাত্রি নিবিড় হয়ে এসেছে। গভীর নিশা বিরাট রাক্ষসীরই মতো ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করেছে।

নিখিল বল্লেন: অরুণ ঘুমোও। অনেক রাত হয়ে গেছে।

(ক্রমশঃ)

ওপারের ছায়া

বভ্রুবাহন বটব্যাল

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভবিষ্যদ্বাণী

ডেরিয়স ওদেশের একজন নাম করা ভবিষ্যৎ বক্তা। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের হলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রী সম্বন্ধে তিনি এক স্মরণীয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। গত বছরে ডেরিয়স এমনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আর তা হুবহু মিলেও গিয়েছে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ওদেশের তারাদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যও দেখা দিয়েছে। গত বৎসরে তিনি জানিয়েছিলেন তিন জন তারকা হলিউড আকাশ থেকে খসে পড়বেন, তাদের অস্তিত্বও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সত্যিই তা পাওয়া যায় না, কারণ মেরী ড্রেসলার, লিলিয়ান ট্যাসমান ও লিউ কোডি-র অস্তিত্ব চিরদিনের জন্যে ধরা থেকে মুছে গেছে! 'মীরণা লয়-এর ওপর তাঁর আশা খুব বড়। হলিউড আকাশ থেকে মীরণা-র জ্যোতিঃ অতি সুদুর ব্যাপী প্রবল বেগে বিচ্ছুরিত হবে। মীরণা সম্বন্ধে এ'রকম আশা বোধ হয় অন্যায় নয়। যে স্রষ্টারা ওই তারাদের আকাশে ফুটিয়ে তোলেন তাঁরা এবারে মীরণা-র দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। সুনাম করানর' আসল পন্থা হচ্ছে publicity (নামের প্রচার); গত বছরের তুলনায় মীরণার নামের প্রচার এ' বছরে বেশী দেখা যায় আর তাঁর অভিনয়ের উৎকর্ষতা অনেক বেড়ে গেছে, কাজেই কথাটা একেবারে মিথ্যে না'ও হতে পারে। আরো'ও জানিয়েছেন, এই বছরেই জোয়ান ক্র্যাফোর্ড, জেনেট গেনর, ক্যারল লম্বার্ড ও উইলিয়াম পাওয়েল এঁরা নাকি হাতে হাতে বাঁধা পড়ে সুখের ক্রোড়ে নীড় বাঁধতে যুগলের আশ্রয় নেবেন। আশ্চর্য্য নয়, জেনেটের জর জর হিয়া যেভাবে জড়িয়ে রয়েছে,—তিন তিনটে সোণার কাঠির পরশ যার পাওয়া হয়ে গিয়েছে, সে যে এমন করে ঘুমিয়ে থাকবে তা' মনে হয় না। ক্র্যাফোর্ডের কামুক দেহের কচি

কথাটা একেবারে বাজে। এটা ভবিষ্যদ্বাণী ও আমাদের কথাও। ক্যারল লম্বার্ড-এর রসাল দেহ, যার ছবি দেখলেই লোকে প্রেমে পড়ে যায়। চোখ!—সে ত' ওই ভাষাই আনে। সুতীক্ষ্ণ সায়কে অন্য কারোর চোখ না বিদ্ধ ক'রে কি আর এবারে ছাড়বে। আর উইলিয়াম পাওয়েল তার কথা নয় নাই বল্লাম। পর্দ্দার বুকে ছায়াছবিতে ম্যায় আর নাম করতে পারবেন না। কথাটা হয়ত' সত্যি, কারণ ম্যায়-এর আসল রসদ ছায়াছবিতে হচ্ছে sex-show, তাই যখন আর সুবিধে করতে পাচ্ছেন না তখন ডুবতে হবে বলেই মনে হয়। কারণ ম্যায়-ও যত অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখাচ্ছেন ওদেশের

"উই আর রিচ্ এগেইন"-এ গ্লোরিয়া সিয়া ও বাষ্টার ক্র্যাবী।

প্রাণ ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ (জুনিয়ারে)-পর থেকে যে ভাবে শুকোচ্ছে আর তিনি যে রকম কাঁদুনি গাইছেন, তাতে যে তিনি বুকে বালিস দিয়ে, কড়িকাঠে চেয়ে ভোরের আলো দেখবেন তা' আমাদেরও মনে হয় না, তবে ফ্রাঙ্কাট টোনের সঙ্গে একসঙ্গে তাকে যে মন্ত্র পড়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'তে হ'বে সে

সেন্সারও তত' কাঁচি চালাচ্ছেন। এভাবে কাঁচি চললে ভবিষ্যতে হয়ত' দেখতে পাব আসল ম্যায়'ই কাটা পড়েছেন; কে জানে! ম্যায় নাকি সুলেখিকা ও প্রযোজক হিসেবে নাম করবেন, হলেই ভাল। নির্ব্বাক যুগের অভিনেত্রী পোলা নেগ্রী আর গ্লোরিয়া সোয়ানসনের আসন নাকি আবার সসম্ভ্রমে

প্রতিষ্ঠিত হবে। জিন হারলোর এ বছরের পড়তা খুব ভাল; আমাদেরও তাই মনে হয়। হারলোর নামটা একটু বেশী শোনা যাচ্ছে। ক্লোদেৎ কলবার্ট, ক্লার্ক গেবল আর রুবি কিলারের সুনাম কিছু কম। ক্লোদেৎ-এর অভিনয়ে আসছে একঘেঁয়েমি। ক্লার্ক গেবলকে এ বছরে নামতে হবে অনেক গুলো ছবিতে। একই বছরে এত ছায়াছবিতে নামলে তাঁর ব্যক্তিত্বের হানি ঘটতে পারে এটা আমাদেরও বিশ্বাস। রুবি কিলারের কথা আপনারা বিচার করুন। জর্জ্জ র‍্যাফটেরও এখন থেকে ভাঁটা পড়তে সুরু হোল। তিনি যা' নাম পেয়েছেন তাই যথেষ্ট। চার্লস ফ্যারেল নাকি এবারে প্রযোজকের স্থান পাবেন। চার্লস ফ্যারেলের ওপর এ আশা আমরাও করতে পারি। নর্ম্মা শিয়ারার পারিবারিক জীবন অন্ধকারময়। ক্যাথারিন হেপ্‌বার্ণ আবার প্রজাপতির আশ্রয় নেবেন আর চার্লি চ্যাপলিন তাঁর নতুন ছায়াছবির কাজ শেষ করবেন এ' কথা আমরা জানি কিন্তু।

মে রবসনের ছায়াছবির শতবার্ষিকী

মে রবসন কী আর আজকের লোক। সেই কবে, কতদিন আগে মে এসেছিলেন হলিউডে। ছবির পর ছবিতে নেমেছেন। লোকে তাকে যত দেখেছেন. এমন বোধ হয় আর কারুকেই দেখেন নি। তাঁর মত ছায়াছবিতে আর কে এত নেমেছে। সেই অনেকদিন আগে লোকে তাঁকে প্রথম দেখে 'রিজুভিনেশন অব আণ্ট মেরী'-তে। সে কী আর আজকের কথা। সেইটেই মে রবসনের প্রথম ছায়াছবি। তারপর এই এতদিন কেটে গেলো। মে রবসন নামলেন কত কত ছায়াছবিতে। এইবার তাঁর অভিনয় করা শত ছায়াছবিতে পূর্ণ হোল। তাঁকে শতবার নতুন করে পর্দ্দার বুকে দেখা গেলো। যেখানায় শত নম্বরের দাগ পড়ল সেখানার নাম 'ভ্যানিসা'। তাঁর সঙ্গে আছেন হেগেন হজ, অটোক্রুগার, রবার্ট মণ্টোগোমারী আর আর সব।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ ছবি।

আমেরিকান ন্যাশনাল বোর্ড অব ফিল্ম রিভিউ ও ইতালির ছায়াছবি বিশেষজ্ঞেরা ঘোষণা করেছেন, 'ম্যান অব আরন্‌' ছবিখানি নাকি ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ ছবি।

ভারতে 'সোলজার্স থ্রি'

ভারতীয় ঘটনা, ভারতীয় মাল মশলা দিয়ে একখানি ছায়াছবি ভারতে তোলবার জন্যে একদল লোক ইংলণ্ড থেকে এসেছেন। ইংলণ্ড থেকে জাহাজে করে মোটমাট মাল এসেছে আশী টন। ভারতবর্ষ থেকেই সমস্ত বহির্দৃশ্য তোলবার জন্যেই নাকি তাঁদের এদেশে আসা। বোম্বাই ছাড়া ভারতের অন্যান্য সব প্রধান প্রধান সহরের ছবিও এরা নেবেন। শুনছি, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত থেকেও নাকি একটা যুদ্ধের দৃশ্য তোলা হবে। "মাউণ্ট এভারেষ্ট" অভিযানের ক্যামেরা ম্যান জিওফ্রে বার্কস এবং বেনেটও এই দলে আছেন। সমস্ত ছবিখানি তুলতে খরচ হবে সত্তর হাজার পাউণ্ড। তার দশ হাজার পাউণ্ডই নাকি খরচ হবে এই ভারতেই।

মার্লিনের নতুন শিক্ষা

মার্লিন, মার্লিন আর মার্লিন। মার্লিন আর গার্বো এই নিয়ে যেন কাগজ চলে। মার্লিন কি খায়,—কি পরে—কি ভালবাসে, শোয় কী পোষাক পরে,—বিছানার চাদর কি রকম কুঁচকে থাকে এবং Bath tub-এর ভেতর কতক্ষণ পড়ে থাকে, মায় স্বামী রাতে ক'টা চুমু খেয়েছে তার খবরও দিতে হবে। তা না দিতে পারলে কাগজের যেন কোন দাম নেই। তাই ওরা খবর পাঠিয়েছে—মার্লিন নিজে হাতে পাকিয়েই নিজের সিগারেট খাচ্ছে। নাও, এইবার ইতিহাস দাও; তবে শুনুন—মার্লিন নামছেন 'কার্ণিভাল ইন স্পেনে' সিজার রোমারো-কে নিয়ে। পরিচালক জোসেফ ভন ষ্টার্ণবার্গ বল্লেন—'মার্লিন তোমাকে সিগারেট পাকান শিখতে হবে।' মার্লিনও উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। এই ছবিতে সিগারেট কারখানায় তিনি কাজ কর্চ্ছেন কাজেই সিগারেট পাকান শেখা দরকার। চার সপ্তাহ ধরে রোজ একঘণ্টা করে সিগারেট পাকাতে সুরু করলেন। তাই থেকে অমনি মার্লিনের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলো। এখন তিনি ঘণ্টায় ১৫০টা সিগারেট পাকাচ্ছেন। আর নিজের, সেত' পাকিয়ে খানই।

খুচরো খবর

জেনেট গেনর আর চার্লস ফ্যারেলকে আবার আমরা একসঙ্গে দেখতে পাব বলে মনে হয়।

* * *

নোভা পিলবিমকে হলিউডের অনেকে ছোট ক্যাথরিন হেপবার্ণ মনে করেন।

* * *

জোয়ান বেনেট আর বিন্ ক্রসবিকে 'মিসিসিপি' ছবিতে আমরা একসঙ্গে দেখতে পাব।

* * *

মায় ওয়েষ্ট তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে নাকি পনেরো থেকে কুড়িটি পর্য্যন্ত উপহার পান।

* * *

জোয়ান ক্রাফোর্ড বছরে তিনখানা বই শেষ করেন। প্রত্যেকখানা তুলতে সময় লাগে ছ'মাস করে।

* * *

'ক্লাইব অব ইণ্ডিয়া' নাকি ১৯৩৫-এর একখানা ভাল ছবি হবে তবে দেখা না গেলে কিছু বলা যাচ্ছে না। এতে নেমেছেন প্রধান অংশ নিয়ে লরেটা ইয়ং ও রোনাল্ড কোলম্যান।

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা
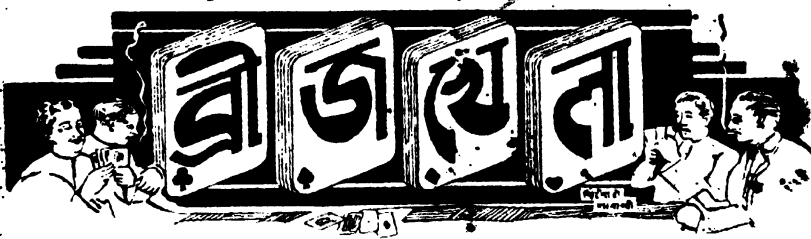
নন্‌-ভালনারেবল অবস্থায় একের ডাকে খেঁড়ীর জবাব (No Trump-এর ডাকে) :—(I) যদি প্রতিপক্ষ ডাক না দেন, একখানির কম অনারের পিট হাতে থাক্‌লে খেঁড়ী পাস দিবেন। তবে যদি কোন রঙের ৬খানি তাস এবং আধখানি বা একখানি অনারের পিট তাঁর হাতে থাকে কিম্বা তিনি যদি কোন রঙের সাতখানি তাস পেয়ে থাকেন তবে সেই রঙ ডাকতে পারেন। কিন্তু এরূপ হাত নিয়ে ডাক্‌তে হলে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। ডাকদার (Call openers) যদি দ্বিতীয়বার No Trump কিম্বা অন্য কোন রঙ ডাক দেন আর প্রতিপক্ষ যদি পাস দেন তা' হলে সেই ছয়খানি বা সাতখানি তাস নিয়ে খেঁড়ীকে আবার সেই রঙ ডাক্‌তেই হবে। ইহাকে নিষেধ ব্যঞ্জক ডাক (Sign off bid) বলে। এর অর্থ হচ্ছে: "ওগো বন্ধু, আর এগিও না, আমার হাত ভাল নয়; অনারের পিট খুব কম কেবলমাত্র হাতের বিভাগের উপর নির্ভর করে ডেকেছি।" এই নিষেধজ্ঞাপক ডাক মিঃ কাল্‌বার্টসনের চমৎকার উদ্ভাবনা। ডাকদারের উত্তেজনাকে নিরুৎসাহ করবার এমন সুন্দর পন্থা আর নেই। এতে দুইটি কার্য্য সাধিত হবে। যদি ওই ছয়খানি বা সাতখানি রঙের অনারের পিট ডাকদার পেয়ে থাকেন তা' হলে সেই রঙে খেলা খুব ভালই হবে এবং ডাকদারের হাতে অনারের প্রাচুর্য্য থাক্‌লে 'গেম্'ও (Game) হতে পারে। পক্ষান্তরে সে রঙের অনারের পিট যদি ডাকদারের হাতে বিশেষ কিছু না থাকে তা' হলে নিষেধজ্ঞাপক ডাক পেয়ে (Sign off bids) তিনি আর বেশীদূর অগ্রসর হবেন না। তিনের ডাকেই তাঁরা খেলা পাবেন এবং ডাকদারের হাতে অন্য রঙের অনারের পিট থাকায় (তিনি No Trump ডেকেছেন সুতরাং তিনখানি অনারের পিট তাঁর হাতে আছেই) তিনের খেলা করতে

কোন অসুবিধা হবে না। নিম্নে একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

'ক' ডেকেছেন একটি No Trump; 'আ' পাস দিয়েছেন, 'খ' নিম্নলিখিত হাত পেয়ে 'দুটি রুহিতন' ডেকেছেন। ইস্কাবন—সাতা; হরতন—দশ, নয়, তিরি; রুহিতন—বিবি, গোলাম, নয়, আটা, ছক্কা, চৌকা, দুরি; চিড়িতন—তিরি, দুরি। 'অ' পাস দিলেন; 'ক' ডাকলেন 'দুইখানি No Trump', 'আ' পাস দিলেন। এবার 'খ' কি বল্‌বেন? তিনি বল্‌বেন 'তিনখানি রুহিতন'। একেই বলে নিষেধজ্ঞাপক ডাক (Sign off bid)। এ ডাক শোনার পর 'ক' যদি আরও অগ্রসর হতে চান সে তাঁর নিজের দায়িত্বে। তাঁর খেড়ী 'খ' তাঁকে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে তিনখানির বেশী খেলা হবার আশা তাঁর হাত থেকে তিনি কোন মতেই অনুমান করতে পাচ্ছেন না। সুতরাং 'ক' কিরূপ হাত পেতে পারেন তা' দেখা যাক। তাঁর হাত যদি নিম্নলিখিত, কয়েক রকম হাতের মধ্যে যে কোন এক রকম হয় তবে তাঁর কিরূপ ডাক দেওয়া উচিত এবং তার ফল কিরূপ হবে তা' আলোচনা করা যাক্।

(১) ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, নয়; হরতন—সাহেব, গোলাম, আটা; রুহিতন—দশ, সাতা, তিরি; চিড়িতন—টেক্কা, দশ, নয় আটা।

(২) ইস্কাবন—সাহেব, নয়, তিরি, দুরি; হরতন—সাহেব, বিবি, দশ; রুহিতন—টেক্কা, সাতা; চিড়িতন—টেক্কা দশ, নয়, চৌকা।

(৩) ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, দুরি; হরতন—টেক্কা, বিবি, সাতা; রুহিতন—সাহেব, সাতা, পাঞ্জা; চিড়িতন—সাহেব, ছক্কা, পাঞ্জা, চৌকা।

(৪) ইস্কাবন—বিবি, দশ, তিরি; হরতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম; রুহিতন—টেক্কা, দশ, তিরি; চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, ছক্কা, পাঞ্জা।

(৫) ইস্কাবন—টেক্কা, দশ, নয়; হরতন—টেক্কা, সাহেব; রুহিতন—টেক্কা, দশ, সাতা, তিরি, চিড়িতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, চৌকা।

(১) এ ক্ষেত্রে 'ক'র উচিত হচ্ছে তিনখানি No Trump ডাকা; কারণ 'খ'র ডাক দেখে তিনি বুঝতে পাচ্ছেন যে তিনি সাতখানি রুহিতন পেয়েছেন। সুতরাং বাকী তিনখানি রুহিতন যদি প্রতিপক্ষের কারও একহাতে না পড়ে থাকে (তা' না পড়াই সম্ভব) তবে রুহিতনের পাঁচখানি পিট পাবার আশা তাঁর আছে; এবং তাঁর নিজের হাতে ন্যূনকল্পে চারখানি পিট হবেই কারণ হরতন, ইস্কাবন বা চিড়িতন যে রঙই আগে খেলা হোক না কেন তাঁর হাতে শেস খেলা যাওয়ায় একটি পিট বাড়্‌বেই।

(২) এক্ষেত্রে 'ক'র উচিত আর না ডাকা। কারণ No Trump-এর খেলায় রুহিতনের দুইখানির বেশী পিট পাবার আশা কম। সাহেব ও অন্য দুটি ছোট তাস এক হাতে পড়তে পারে, তা' হলে খেড়ীর হাতে প্রবেশ করবার পথ বন্ধ। পক্ষান্তরে রুহিতন রঙেও তিনখানির বেশী খেলা হবার আশা নেই। বড় জোর চারখানির খেলা হতে পারে কিন্তু Game-এর কোন আশা নেই।

(৩) এ ক্ষেত্রে 'ক' 'তিনখানি No Trump' বা 'চারখানি রুহিতন' যা' ইচ্ছা ডাকতে পারেন। আমার মতে তিনখানি No Trump ডাকাই ভাল।

(৪) এ ক্ষেত্রে 'ক'র ডাক হবে পাঁচখানি রুহিতন। 'খ'র হাতে যদি বাড়্‌তি কোন সাহেব বা বিবি থাকে তবে তিনি 'ছয়খানি রুহিতন' বল্‌তে পারেন। উল্লিখিত 'খ'র হাতে বাড়্‌তি পিট না থাকায় তাঁকে পাস দিতে হবে।

(৫) এ হাতে Slam অবশ্যম্ভাবী। No Trump-এ হওয়াও সম্ভব রুহিতনেও হতে পারে। রুহিতনে খেলাই আমার মতে সুবিধাজনক।

(II) দেড়খানি হতে দুইখানি অনারের পিট হাতে থাক্‌লে এবং ডাকের যোগ্য রঙ হাতে না থাক্‌লে খেড়ী পাস দিবেন। তবে যদি হাতে ডাকের যোগ্য রঙ থাকে এবং দেড়খানি বা দুইখানি অনারের পিট হাতে থাকে তা' হলে সেই রঙ ডাকতেই হবে।

(III) দুইখানি হতে আড়াইখানি

অনারের পিট হাতে থাক্‌লে কিম্বা তিনখানি বা সাড়ে তিনখানি অনারের পিট পেলে খেঁড়ী যথাক্রমে দুইটী বা তিনটী No Trump ডাক্‌তে পারেন। কিন্তু একপ অবস্থায় ডাকের যোগ্য রঙ হাতে থাক্‌লে তা' ডাকাই শ্রেয়স্কর। এর বেশী অনারের পিট হাতে থাক্‌লে স্লামের সম্ভাবনা আছে।

ভাল্‌নারেবল (Vulnerable) অবস্থায় একটী No Trump-এর ডাকে খেঁড়ীর জবাব ঃ—

(I) দেড়খানি হতে দুইখানি অনারের পিট হাতে থাক্‌লে খেঁড়ী দুটী No Trump ডাক্‌তে পারেন।

(II) দুইখানি হতে তিনখানি অনারের পিট পেলে তিনি তিনটী No Trump ডাক্‌বেন।

(III) তিনখানির বেশী কিম্বা চারখানি অনারের পিট থাক্‌লে (এবং এই অনারের পিটের মধ্যে তিনটী টেক্কা থাক্‌লে) তিনি চারটী No Trump ডাক্‌বেন।

এখানে ধরে নিতে হবে যে উপরোক্ত তিন ক্ষেত্রেই খেঁড়ীর হাতে ডাকের যোগ্য রঙ নেই। তা' থাক্‌লে তাঁকে আগে সেই রঙ ডাক্‌তে হবে।

কালবার্টসন্ নিয়মে কন্‌ট্রাক্টে ভাল্‌নারেবল অবস্থায় (Vulnerable) প্রারম্ভিক (opening) No Trump ডাক শক্তিব্যঞ্জক ডাক (Strength showing bid) নয়। সুতরাং খেঁড়ীকে সে ক্ষেত্রে খুব সাবধানে ডাক্‌তে হবে। হাতে ডাকের যোগ্য কোন রঙের পাঁচখানি তাস থাক্‌লে ন্যূনকল্পে দেড়খানি অনারের পিট হাতে নিয়ে তিনি সেই রঙ ডাক্‌তে পারেন। দুইখানি অনারের পিট নিয়ে চারখানি রঙেও ডাকা যেতে পারে যদি হাতের বিভাগ হয় ৪, ৪, ৪, ১। তিনখানি বা তার বেশী অনারের পিট হাতে থাক্‌লে এবং হাতের বিভাগ খুব ভাল হলে তিনি শক্তিজ্ঞাপক ডাক (forcing bid) দিতে পারেন। সে ডাকের কথা পরে বল্‌ব।

কিন্তু ভাল্‌নারেবল অবস্থায় প্রারম্ভিক (opening) ডাক হলে খেঁড়ী একখানি অনারের পিট এবং ডাকের যোগ্য একটি রঙ নিয়ে সেই রঙ ডাক দিতে পারেন। আড়াইখানি অনারের পিট এবং একটি ভাল ডাক যোগ্য রঙ নিয়ে শক্তিজ্ঞাপক ডাক (forcing bid) দিতে পারেন। এই শক্তিজ্ঞাপক ডাকের কথা আগামী বারে বল্‌ব।

চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং ক্লাব ঃ— সম্প্রতি এই সমিতি Bengal Bridge Association-এর সদস্যভুক্ত হয়েছে। এঁরা সদস্যভুক্ত হয়েই Auction (singles) প্রতিযোগিতা বের করেছেন। এঁদের সমিতিটী এত সত্বর উন্নতি লাভ করেছে এবং প্রতিযোগিতার খেলাগুলি এত সুবন্দোবস্তের সহিত চালিত হচ্ছে যে এঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অবশ্যম্ভাবী; বলা বাহুল্য যে এর জন্য সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দত্তের অক্লান্ত পরিশ্রমই সর্ব্বতোভাবে দায়ী! এমন কি আদর আপ্যায়ন বিভাগেও সুন্দর সুমিষ্ট ব্যবহারে এঁরা অনেক পুরাতন সমিতিকে ছাপিয়ে উঠেছেন। তাই আমাদের কামনা এই, যে মহাপুরুষের নামটিকে পাথেয় করে এঁদের সমিতির যাত্রা সুরু হয়েছে সেই মহাপুরুষের মতই এঁদের সমিতি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকুক।

কন্‌ট্রাক্ট খেলার নিয়ম পরিবর্ত্তন ঃ— ইংলণ্ডের Portland Club, নিউ ইয়র্কের Whist Club ও ফ্রান্সের Commission Francaise du Bridge-এর সমবেত চেষ্টায় আগামী জুন মাসে আন্তর্জ্জাতিক কন্‌ট্রাক্ট খেলার নিয়ম-কানুনের কিছু পরিবর্ত্তন হবে। তাস প্রদর্শনমূলক ডাক (Card showing bid), স্লামের প্রিমিয়ম্, No Trump পিটের মূল্য ও ডাক অনুযায়ী খেলায় বেশী পিটের পুরস্কার ও কম পিটের খেঁসারৎ সম্বন্ধেই পরিবর্ত্তন হবে ঠিক হয়েছে। কতকগুলি নিয়ম নিয়ে গত এপ্রিলে Portland Club-এর সহিত Whist Club-এর মতদ্বৈধ হওয়াতেই এই পরিবর্ত্তনের সূচনা।
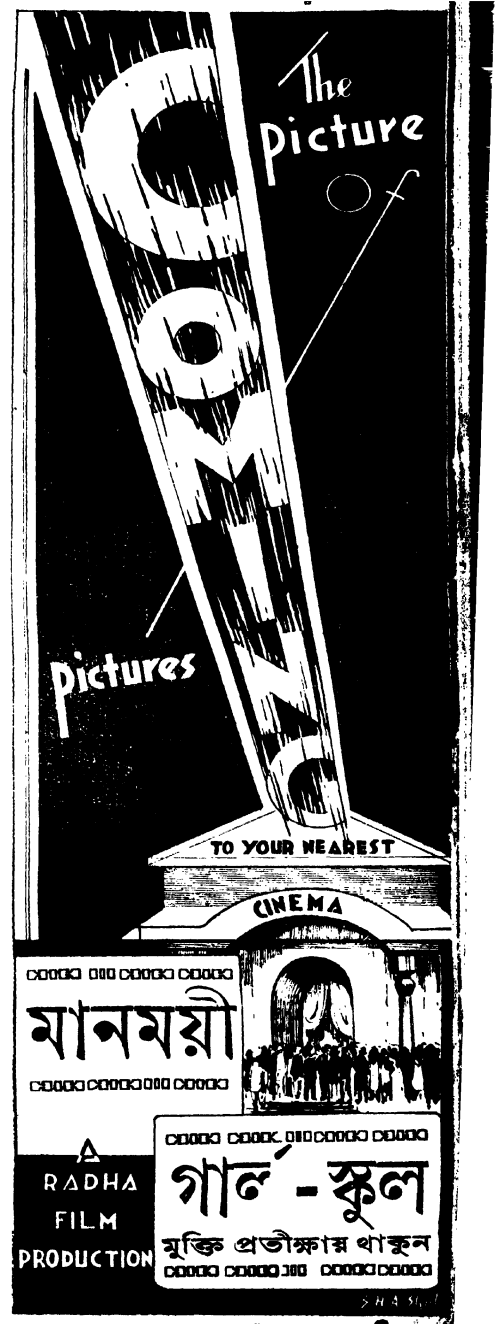
খোলা-চিঠি

শ্রীমতী বীণা দেবীকে

বীণা,

সব চেয়ে আগে তোমায় জিজ্ঞেস কোরব, যে অভিনয় জানেনা, অভিনেত্রী হিসাবে সাধারণের সাম্‌নে তার নাবা উচিৎ কিনা ?

তোমাকে এ চিঠি লেখার মূল উদ্দেশ্য হবে তাই। বাঙ্‌লাদেশের ফিল্মশিল্পে এমনিই সাধারণ অভিনয় ধারা অত্যন্ত বাজে, তার ওপর তুমি অভিনেত্রী হিসাবে নেবে, সে ধারাকে নাবিয়েছো অনেক নীচে। তুমি হয়ত' ভেবেছিলে দেহের তরঙ্গ-তোলা-গড়ন দেখিয়ে দর্শকদের এমন তাক্ লাগিয়ে দেবো, যে, তারা তোমার অভিনয় কী রকম তা' ভেবেও দেখ্‌বে না। চোখের নীচে সুরমা কাঠির টান মেরে তোমার মনে হয়তো হ'য়েছিল যে, বোকা বাঙ্‌লাদেশের প্রাণ তুমি নিয়েই বুঝি নিলে! ভুরুর ওপর কালো তুলি যখন শিল্পত্ব ফোটালে, তুমি আয়নার ওপর তখন হয়তো হেসেছিলে—বাঙলাদেশের বায়োস্কোপে এখন থেকে 'চিরস্বাগত তুমি।' স্বপ্নের অন্তরালে তুমি হয়তো দেখতে—বীণার গানে বাঙলার বাতাস হাঁপিয়ে উঠেছে, বীণার ঝঙ্কারে ঝড় উঠেছে আকাশে! সত্যকথা বল্‌তে কী বীণা! কেউ হাঁপিয়ে না উঠ্‌লেও—হাঁপিয়ে উঠেছিলুম আমরা। আর, কোথাও ঝড় না উঠ্‌লেও—ঝড় উঠেছিল তোমার সেই কোম্পানীর পাবলিশিটীর পান্‌সীতে। প্রত্যেকে কাগজের পাতায় পাতায় তোমার ছবি, তোমার নাম, তোমার কথা। তুমি হাস্‌ছো, তুমি কাঁদ্‌ছো, তুমি শুয়ে আছ আবেশে, তুমি বসে আছ নিরালায়। এমন্ কী ছ' পাতার প্রোগ্রামেও তোমার নামটা একেবারে ধর্ম্মতলার ইলেক্‌ট্রিক বিজ্ঞাপনের মত জ্বল্ জ্বল্ কোরছিল। তখন অত আমরা বুঝতে পারি নি 'যে, তারা এমন তার-ছেঁড়া-বীণা বাজাচ্ছে। এখন মনে হ'চ্ছে, হয়তো তারাও তখন বুঝতে পারেনি।

তোমার ছবি দেখে এলুম—"রাজনটী বসন্তসেনা"। ভাব্‌তে পারিনি "স্বামী"-র বীণা আমাদের এত হতাশ কোরবে। দেখে এলুম বাঙ্‌লার এক উৎকৃষ্ট শিল্পী তোমাকে মডেল কোরে অনেকদিন ধরে এঁকেছেন এক নিকৃষ্ট ছবি। তা'তে তোমার অভিনয়—অভিনয় হয়নি—হ'য়েছে অভিনয়ে অনধিকার প্রবেশ। তোমার কথা বলার ভঙ্গী অতি জঙ্গলীকেও হাসিয়েছে। তুমি সেখানে পুতুল নাচের প্রধান পুতুল—নেচেছ আর ঘুরে বেড়িয়েছ, আঁকা-ঠোঁট নেড়েছ, আর মাঝে মাঝে টেনেছ—তোমার তুলিতে-টানা সরু ভুরু। এ জন্য অবিশ্যি, সম্পূর্ণ তুমি দোষী নও—দোষ তোমার পরিচালকেরও কিছু আছে। এ ছবিতে তোমার পরিচালক প্রমাণিত কোরেছেন—তিনি হ'চ্ছেন, সেই ধরণের শিল্পী, যিনি নর-নারীর মূর্ত্তি আঁকতে পারেন অনেক, কিন্তু সে মূর্ত্তিতে প্রাণের ভাব আনতে পারেন কম! সে মূর্ত্তিগুলোর প্রাণ নেই, ভাব নেই,—মূর্ত্তিগুলো অতি নিকৃষ্ট শিল্পীর আঁকা। সে চিত্রগুলোয় দেহের ভঙ্গীই শুধু আছে, ভাব কিংবা ভাষার ভঙ্গী তিনি ফোটাতে অক্ষম!

বীণা, "রাজনটী বসন্তসেনা" দেখে তোমার সম্বন্ধে বিলাসী যে কথা বলেছিলেন সে কথার পুনরুল্লেখ না কোরে পারলুম না।

"......রাজনটী বসন্তসেনা"কে যদি "রাজনটী বীণা" বলি, তা হ'লে বোধ হয় বিশেষ ভুল করবো না। কারণ, ছবির আগাগোড়া আবহাওয়া শুধু বীণার। বীণা, বীণা আর বীণা। বীণার চোখ, বীণার নাক, বীণার ঠোঁট, বীণার বুক আর বীণার দেহ। বীণার কী না এঁকে চারু রায় দেখান নি! বীণাকে দেখে দেখে আর দেখে এইটুকু ধারণা আমাদের হয়েছে—যে—তার অঙ্গগঠন ভালো, চিত্রকারের তুলির সাহায্যে তার ঠোঁট আঁকা ভালো, তার আঁকা ভালো তার টানা ভুরু। তা ছাড়া তার গলা থেকে খস্‌খসে আওয়াজ বার হয় ভালো, তার কথা বলার ভঙ্গী বেশ আদরে আধো আধো, আর আধো আধো তার ভাব আর ভাষা......"।

শিল্পী চারু রায়ের রাজনটী বসন্তবীণা এক তার অঙ্গগঠন ছাড়া এক কথায় আমাদের হতাশ করেছে।

সেই জন্যই বল্‌ছি। তোমার চিত্রোপযোগী চেহারা আছে, স্বীকার করি। কিন্তু সে চেহারায় এতটুকুও গুণ নেই, যা এই বাঙ্‌লা দেশকেও একটু আনন্দ দিতে পারে। এ শিল্পে রূপ থাকা যতটা দরকার—গুণের দরকারও প্রায় ততখানি। অনেক সময়ই দেখ্‌তে পাচ্ছি, এ শিল্পে মনোহারী রূপের চেয়ে, মনোহারী গুণের দাম বেশী। তোমার তা' নেই। বীণা, তোমায় দেখে তাই মনে হ'চ্ছিল, তুমি সেই রকম বীণা, যার তন্ত্রীগুলো সব মরচে পড়ে গিয়ে ঝঙ্কার তুল্‌তে পারে না—কেবল ওপরের আবরণটাই মখমলের বলে জ্বল্‌জ্বল কোরছে। তাই বলি, বীণার তারই যদি ঝঙ্কার না তোলে, তবে ভাঙ্গা-বীণা নিয়ে লোকে ক'দিন টানাটানি কোরবে।

কিন্তু, সময় এখনও আছে। তোমার বয়েস মোটে বাইশ—অভিনয় শেখ্‌বার, ভাষায় উন্নতি করবার সময় এখনও আছে তোমার যথেষ্ট। ভাল শিক্ষকের হাতে পড়্‌লে মনে হয়, তুমি অভিনয় শিখ্‌তে পারবে। তবে অভিনয় শেখ্‌বার সময় তোমার দু'টো জিনিষ ছাড়তে হবে—যে দু'টো তুমি ইচ্ছে কোরলেই ছাড়তে পারো—সে দু'টো হ'চ্ছে, ন্যাকামী ও ভাষায় আধো আধো ভাব। তা' হ'লেই তোমার উন্নতি হবে। সেই দিনই শুন্‌বে তুমি সকলের প্রশংসার বাণী।

মোট কথা, অভিনয় জিনিষটা কী—তা' না জেনে, না শিখে, না চিনে আমাদের ইচ্ছে—বীণা তুমি ভবিষ্যতে আর বেজো না। ইতি—

শ্রীতানসেন সেন

এলিসা ল্যাণ্ডি ও ক্যারী গ্রাণ্টকে চিত্রপ্রিয়েরা শীঘ্রই এখানে দেখ্তে পাবেন। প্যারামাউণ্টের "এণ্টার ম্যাদামে" চিত্রে এই দু'টি তরুণ তরুণী একত্র অভিনয় কোরেছেন।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ২রা ফাল্গুন, ১৩৪১, 14th February, 1935. { ৭ম সংখ্যা

জে, পি, সির নির্দ্ধারণ

যুক্ত পার্লামেণ্টারী সমিতির নির্দ্ধারণকে অগ্রাহ্য করিয়া ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইয়ের যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের ভুল চালে তাহা বানচাল হইয়া গিয়াছে। সুচতুর মিঃ জিন্নার সযত্নপ্রসারী জালে আটক পড়িয়া কংগ্রেসী দল বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভূপালের অঞ্চল-নিধি ডাঃ আন্সারীর চক্রান্তে গান্ধীজি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ অন্ধ হইয়া যে মায়ামৃগের অনুধাবন করিতেছিলেন সেই মায়ামৃগ ক্ষিপ্র পদে শত্রুপক্ষের অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বীয় মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। আর কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ পরিষদের মধ্যে ও বাহিরে অনাথ বালকবৃন্দের ন্যায় হা হুতাশ করিতেছেন। মহাত্মার মহামানবীয় ভেল্কী বা Magic যে মরজগতের পাপতাপ-জর্জ্জরিত মানবকুলের কৌশল বা strategyকে দমন করিতে পারেনা পরিষদে মহাত্মাজীর আশীষপূত ও সরোজিনীদিদির স্নেহাভিষিক্ত ভুলাভাই সাহেবের পরাজয়ে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার সংশোধক প্রস্তাবে কংগ্রেসী সভ্যবৃন্দ "না গ্রহণ না বর্জ্জন" নীতির উপাসকরূপে হস্তপদহীন কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। মিঃ জিন্না যখন তাঁহাদিগকে কদলী প্রদর্শন করিয়া স্বীয় সম্প্রদায়গত স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লইলেন তখন কংগ্রেসী সভ্যবৃন্দ নপুংসকের ন্যায় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রস্তাব সম্বন্ধে ভারত সরকারের আইন-সচীব স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার যে স্বাধীন চিত্তের পরিচয় দিয়াছেন তাহা সরকারী মহলে অভূতপূর্ব্ব। সরকারী "নেতা" হইয়া সরকারী প্রস্তাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া স্যার নৃপেন্দ্রনাথ দেখাইয়া দিয়াছেন যে সরকারী চাকরী গ্রহণ করিলেই স্বীয় ব্যক্তিগত মতামত বিসর্জ্জন দিতে হয় না। শক্তিধর পুরুষের পক্ষে সব সময়েই স্বীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা সম্ভবপর।

যাহা হউক নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে বাংলায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা লইয়া কংগ্রেসী মহলে যে মতানৈক্য পরিস্ফুট হইয়াছিল নির্ব্বাচনের শিক্ষার ফলে তাহা বিদূরিত হইবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ গোস্বামীর সভাপতিত্বে যুক্ত পার্লামেণ্টারী সমিতির নির্দ্ধারণের প্রতিবাদ কল্পে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এলবার্ট হলে যে বিরাট জনসভা হইয়াছিল তাহাতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বাংলার মনোভাব-দ্যোতক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

অন্যান্য প্রদেশের নেতৃবৃন্দের কার্য্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই—তবে বাংলায় সঙ্ঘবদ্ধ জনমত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-সম্বলিত জে, পি, সির নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিলে তাহা যে ফলপ্রদ হইবে তাহা আমরা মনে করি। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বসু, এম্, এল্, সি মহাশয়ের নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মিলনও জে, পি, সির নির্দ্ধারণের উচ্ছেদ সাধনের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলনের কল্পনা করিয়াছেন। বাংলায় কংগ্রেস, হিন্দুসভা ও স্বাধীনচেতা ও সতন্ত্রদলগত ব্যক্তিবর্গ একযোগে প্রতিবাদ কল্পে সংযুক্ত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। বাঁটোয়ারা-বিরোধী এক সর্ব্বদল-সম্মিলন বাংলায় আহুত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন; তাহাতে বাঁটোয়ারা-বিরোধী কর্ম্মীবৃন্দের সংহতি শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

চলতি-পথে

শ্রীমল্লিনাথ

প্রজা আন্দোলন

এদেশের রাজনীতি হইতে এতদিন প্রকৃত পক্ষে এদেশকেই বাদ দেওয়া হইত। কারণ এদেশের যারা মেরুদণ্ড সেই কৃষক জনসাধারণের কথা রাজনীতিতে স্থান পাইত না। ভারতের স্বাধীনতার বড় বড় কথা সবাই বলিতেন, কিন্তু কি জন্য, এবং কাদের জন্য ভারত স্বাধীন করা হইবে, কাদের সহায়তায় ভারত সমৃদ্ধ হইবে তা' এতদিন কারও চিন্তার বিষয় ছিল না। সুখের বিষয় সম্প্রতি এদিকে নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। তারা কৃষক সমাজকে আর উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। কংগ্রেসও ভাল বুঝিয়াছে যে কৃষকদের দ্বারা অসম্ভব সম্ভাবিত হইতে পারে, বারদৌলীতে তা' প্রত্যক্ষও করিয়াছে। তাই কৃষক-সমাজের হিতের জন্য নেতৃবর্গ আন্দোলন সুরু করিয়াছেন।

গত ৮ই ও ৯ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহে নিখিল-বঙ্গ প্রজা সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহা নানাদিক দিয়া প্রণিধানযোগ্য। তিনি বাঙ্গলার আর্থিক-সমস্যা ও চাষীদের অবস্থার সঙ্গে এর সম্পর্ক আলোচনা করিয়া দেখান যে, "এদেশের অন্নদাতা কৃষক-সমাজ। গবর্ণমেণ্ট নূতন শাসনতন্ত্রে অবাঞ্ছিত রূপে ও অহেতুক ভাবে মুসলমান, বর্ণ-হিন্দু, অনুন্নত ও অস্পৃশ্য হিন্দু, খৃষ্টান, স্ত্রীলোক, ইংরেজ, ফিরিঙ্গী প্রভৃতি নির্ব্বাচক মণ্ডলী সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু চাষীদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষক-সমাজ যতই জোট বাঁধুক না কেন, মিশ্র নির্ব্বাচনের ফলে তারা যত বেশী প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিত, ইহা দ্বারা ততটা সম্ভবপর হইবে না। তিনি তাই গবর্ণমেণ্টের নীতির নিন্দা সুতীব্র ভাষায় করেন এবং বলেন, "তাদেরই (কৃষকদের) অন্ন দিয়ে যারা দেশকে খাওয়াচ্ছে, সম্পদ সৃষ্টি ক'রে তাদের বড়লোক করছে, রাজস্বের জোগান দিয়ে শাসন-যন্ত্র চালান সম্ভব করছে, আর রাজকর্ম্মচারীদের মোটা মোটা মাইনে সরবরাহ করছে—সে এই দরিদ্র, নিরন্ন, চির উৎপীড়িত, নিত্য-শোষিত চাষী সম্প্রদায়। যারা এই সংস্কার প্রস্তাবরূপ বিকট পরিহাস রচনা ক'রেছেন, তাঁদের বিবেচনায় এই চাষী সম্প্রদায়ের স্বার্থটা দেখবার বোধ হয় কোনও প্রয়োজন নেই।"

কারও কোনও স্বার্থ দেখিবার প্রয়োজন আমাদের কর্ত্তাদের নাই, কারণ গণ-স্বার্থ ও বিশেষ কোন এক সম্প্রদায়ের স্বার্থ একই সঙ্গে সংরক্ষণ অসম্ভব। আর সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের—অবশ্য শাসক-সম্প্রদায়ের—স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া গণ-স্বার্থ পদদলিত করিতে এঁরা চির-অভ্যস্ত। ডাঃ সেনগুপ্ত এতদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকিয়া সে অভিজ্ঞতাটুকু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

দেশের বর্ত্তমান অর্থ সঙ্কট সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়া ডাঃ সেনগুপ্ত বলেন এর জন্য দায়ী আমাদের গবর্ণমেণ্ট। এদেশের পাট চাষ যদি নিয়ন্ত্রণ করা হয় তবে চাষীর এ দুর্দ্দশা হয় না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যথাসময়ে এদিকে কান দেন নাই। তিনি গবর্ণমেণ্টকে আরও বিষম অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, "এর আগে যখন পাটের দর বড্ড বেড়ে গিয়েছিল, তখন ডাণ্ডীর চটকলওয়ালারা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। ফলে গবর্ণমেণ্ট তাঁদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আরম্ভ করেছিলেন এক বিরাট প্রোপ্যাগাণ্ডা বা দালালী। কৃষি বিভাগের মোটা মাইনের কর্ম্মচারীরা পাটের চাষ বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তার ফলে দেখতে দেখতে পাটের চাষ অসম্ভব বেড়ে গেল, পাটের দাম গেল এত অসম্ভব কমে যে তাতে মজুরী পোষায় না।

আজ এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে এখন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৯০ লক্ষ গাইট অর্থাৎ সাড়ে চারি কোটি মণ পাট মজুত আছে পৃথিবীতে। এখন অতিরিক্ত পাট না জন্মাইলেও জমান পাটের দরুণ খরিদ্দারের আগ্রহ নেই, কাজেই পাটের দর কমে যাচ্ছে।

"আজ যদি গবর্ণমেণ্ট মুখ ভার ক'রে বোঝাতে আসেন যে, পাটের দর কমেছে

শুধু তুনিয়ার অর্থ-সঙ্কটের জন্যে কিংবা চাষীর অবিবেচনার জন্যে, তবে তাঁদের সে উক্তি না হ'বে সত্য, না হ'বে ইমানদারের কথা।"

তিনি আরও বলেন, পাটের অবস্থা সবে যখন খারাপ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখন তার প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেণ্টকে বলা হয়, কিন্তু তখন গবর্ণমেণ্ট সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এখন, যখন অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, শাসন-যন্ত্র অচল অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন তাঁরা আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিলেন।

গ্রাম সমৃদ্ধির আয়োজন ও অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কৃষকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে উপদেশ দিয়া, উপসংহারে গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি গবর্ণমেণ্টকে বলেন যে, "দেশকে শাসন কর্ত্তে হ'লে তাকে একটা পরিবার হিসাবে দেখতে হবে। বর্ত্তমান তুরবস্থায় প্রতিকার করবার শক্তি চাষীর সামান্যই আছে—শক্তি আছে গবর্ণমেণ্টের। কিন্তু সেই গবর্ণমেণ্টের চাকা এক পা' চালাবার শক্তি নেই চাষীর। এখনও নেই—নূতন আইনেও থাকবে না।"

ডাঃ সেনগুপ্ত কৃষককুলকে জিজ্ঞাসা করেন, "চিরদিন কি এমনি যাবে? বাঙ্গলার চাষীর শ্রমের ফলে ধনী হবে বহুলোক, বাঙ্গলার সম্পদে সম্পন্ন হবে অন্য দেশ, আর বাঙ্গলার চাষী থাকবে নিরন্ন, ক্ষুধিত, আর্ত্ত?"

আমাদের বিশ্বাস, ডাঃ সেনগুপ্তের এ' প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় বাঙ্গলার কৃষককুলের আসিয়াছে। কোনো নেতা বা উপনেতা যদি কৃষকদের স্বার্থ-রক্ষার জন্য আগুয়ান না হন, সেজন্য ভাবনা করিলে চলিবে না; তার নিজের স্বার্থ নিজেই বুঝিয়া লইতে হইবে—আদায় করিয়া লইতে হইবে। কৃষক-সমাজের উন্নতির উপর সমগ্র দেশের উন্নতি নির্ভর করে। ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা কৃষক-সমাজের যাত্রাপথের নির্দ্দেশ মাত্র।

সম্মেলনের সভাপতি মিঃ এ, কে, ফজলুল হক্ যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহাও খুব যুক্তিপূর্ণ। তিনি প্রজার প্রতি গবর্ণমেণ্টের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, "দেড়শত বৎসরের বিদেশী শাসনের পরে বাঙ্গলার কৃষক-সমাজের মধ্যে আজ শতকরা ৫ জনেরও বর্ণপরিচয় হয় নাই।" কৃষক-সমাজ অজ্ঞ বলিয়া জমিদার মহাজন তাহাকে ইচ্ছামত শোষণ করিতে পারে। কৃষককুল কোনো প্রতিবাদ করিবার ভাষা খুঁজিয়া পায় না। "জমিদার উৎপীড়ক হইতে পারে, এবং মহাজন ও বণিক লোভপরবশ হইয়া প্রজাকে শোষণ করিতে পারে। কিন্তু এই শোষণ হইতে দেশের মেরুদণ্ড কৃষক-সমাজকে রক্ষা করা কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য ছিল না? গবর্ণমেণ্ট প্রজাকে ভূমির উপর কি অধিকার দিয়াছেন?..."

মৌলবী সাহেব প্রজার স্বার্থের হানিকর সরকারী নীতির যেরূপ কঠোর সত্য কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁর তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমাদের আশা, ভবিষ্যতে দেশের নেতৃবর্গ সত্যকার স্বার্থরক্ষার জন্য পণবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইবেন। দেশের মুক্তি দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে।

ময়মনসিংহের সম্মেলনের আয়োজন দেখিয়া আমাদের যথেষ্ট আশা হওয়া সত্ত্বেও একটু সন্দেহ যে জাগে নাই তা' নয়। নওয়াব ফারুকী সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়াছেন। কৃষকের ব্যথায় তিনি ব্যথিত, একথাও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কৃষক-হিতৈষী হইতে পারেন, হইতে পারেন তিনি মহৎ ব্যক্তি। কিন্তু যে গবর্ণমেণ্ট গণ-স্বার্থ বিরোধী, সে গবর্ণমেণ্টেরই একজন অমাত্য তিনি, তাঁর দ্বারা কৃষকের মঙ্গল-আশা করা দুরাশা নয় কি? আবার কলিকাতার সেই শ্রী-হীন নলিনীকেও সেখানে উঁকি মারিতে দেখা গিয়াছিল!

পরিষদ-প্রসঙ্গ

পরিষদের কংগ্রেসী-দলের অসহায় অবস্থা দেখিয়া করুণার উদ্রেক হয়। তাঁরা শ্যাম ও কুল, উভয় রাখিতে গিয়া দু'কুলই হারাইয়া বসিলেন। জয়েন্ট-পার্লামেন্টারী কমিটীর রিপোর্টের আলোচনা কালে কংগ্রেস-সদস্যদের অসহায় অবস্থা আরও বেশী করিয়া ধরা পড়িয়াছে। তাঁরা মিঃ জিন্নার রাজনৈতিক জালে ভুলিয়া বাঁটোয়ারা সম্পর্কে সেই 'না গ্রহণ, না বর্জ্জন' নীতির দোহাই দিয়া তাঁর সাথে হাত মিলাইলেন। ফলে সুবিধা বুঝিয়া মিঃ জিন্না কংগ্রেস দলকে হাত করিয়া তাঁর তিনটী প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইলেন, এবং মিঃ দেশাইয়ের দুইটী প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন। এই বিরোধিতা করিয়া মিঃ জিন্না তাঁর কর্ত্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু মিঃ দেশাই করিলেন কি! তাঁর জানা উচিত ছিল, মিঃ জিন্না সুচতুর, তিনি গভর্ণমেন্টের ঘোর বিরোধিতা করা হয় এমন কিছু করিবেন না। তার উপর আরও ব্যাপার আছে। হিজ হাইনেস্ আগা খাঁ পরিষদ মহলে ঘোরাঘুরি করিতেছেন। মুসলমান সদস্যগণকে মাঝে মাঝে মন্ত্র দিতেছেন যে, তারা যেন ভুলিয়া না যায় যে, শাসন সংস্কার তাদের গ্রহণ করিতেই হইবে। কাজেই মিঃ জিন্না যে-কোন উপায়ে হোক, আগামী শাসনতন্ত্র মানিয়া লইতে বাধ্য।

বড় দুঃখে মিঃ সত্যমূর্ত্তি বলিয়াছেন, শাসন সংস্কার প্রত্যাখ্যানের জন্য কংগ্রেস হইতে যে প্রস্তাব আনীত হইয়াছিল, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দল পক্ষে ভোট দিলে তাহা গৃহীত হইত। কিন্তু মিঃ জিন্নার দল যখন মুখ তুলিয়া চায় নাই, তখন আর কি করিবেন! ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হউন!

কংগ্রেস জাতীয় দলের সদস্যগণকে পরিষদে অত্যন্ত কম সময়ের জন্য বক্তৃতা করিতে দেওয়া হয়। তাঁদের অভিযোগ, বক্তব্য প্রভৃতি বলার সুযোগ খুব কমই দেওয়া হয় বলিয়া কেহ কেহ অভিযোগ করিতেছেন। ঘটনা সত্য হইলে ক্ষোভের কথা সন্দেহ নাই। আমাদের স্যার আবদুর রহীমের নিরপেক্ষতার উপর কিন্তু আস্থা ছিল খুবই। আশা করি সে আস্থা বরাবরই বজায় থাকিবে।

পরিষদ কর্ত্তৃক ইন্দো-বৃটিশ বাণিজ্য চুক্তি পরিত্যক্ত হইলেও গভর্ণমেন্ট যে উহা পরিত্যাগ করিতেছেন না, তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, পার্লামেন্টের কমন্স সভায় জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর জানান যে, ভারত সরকার পরিষদের প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না। বাণিজ্য-চুক্তি অক্ষুণ্ণ আছে এবং নীতি পরিবর্ত্তনের কোন কথাই নাই।

ব্যবস্থা পরিষদের মূল্য যে গভর্ণমেন্টের কাছে কতটুকু তাহা এই সব ব্যাপারে বোঝা যায়। গভর্ণমেন্ট ভারতের স্বার্থকে নিশ্চয়ই ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থের চেয়ে বড় করিয়া দেখিতে পারেন না। কাজেই, ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ রক্ষা করিতে পরিষদের মত, তথা ভারতীয় স্বার্থ যদি পদ দলিত হয় তার জন্য দায়ী আমাদের গভর্ণমেন্ট নন, দায়ী আমাদের ভাগ্য!

এই বাণিজ্য-সন্ধি সম্পর্কে পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব গভর্ণমেন্ট গ্রহণ করিতেছেন না জানিতে পারিয়া মিঃ কে, এল গোবা আবার এক নূতন প্রহসনের অভিনয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। গভর্ণমেন্টের কার্য্যের নিন্দা করিবার জন্য তিনি এক মুলতুবী প্রস্তাবের নোটিস্ দিয়াছেন। মিঃ গোবার প্রস্তাব যদি গৃহীতই হয় এবং গভর্ণমেন্ট যদি আবার বলেন যে, তোমার নিন্দাবাদ আমি কানেই তুলিলাম না, তাহা হইলে মিঃ গোবা কি করিবেন? গভর্ণমেন্ট কানে যে বহু পূর্ব্ব হইতে তুলা দিয়াছেন তাও ত তিনি জানেন।

মিঃ ফজলুল হক কি করিলেন? তাঁর কি কোন অভিসন্ধি আছে? সেদিন পরিষদে খোদাই খেদমৎগারদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন নাই। মিঃ জিন্নার মত তাই যে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন, তাতে নিরপেক্ষ থাকায় মনে একটু সন্দেহ জাগে।

ভিয়েনায় নাজী-ভীতি

অষ্ট্রিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়। গত ৮ই তারিখের মধ্যে ভিয়েনায় নাজীদের কতকগুলি চিঠি পাওয়া যায়। সেই চিঠিতে লেখা আছে যে, গ্যাসের সাহায্যে চ্যান্সলারের অট্টালিকা ধ্বংস করা হইবে। চিঠি পাইয়া সশস্ত্র প্রহরী চ্যান্সলারের অট্টালিকা পাহারা দিতেছে। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী অট্টালিকার সিঁড়ির নীচে একটা গ্যাসপূর্ণ বোমা পাওয়া গিয়াছে। একটা বিকৃত মস্তিষ্ক নাজীকেও পিস্তলসহ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৮ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে একটী বিমানপোত শ্রমিক অঞ্চলে বিপ্লবী ইস্তাহার ছড়াইয়াছিল। পুলিস বিমান উহাকে তাড়া করিয়াছিল। কিন্তু ধরিতে পারে নাই। সতর্কতা ব্যবস্থার জন্য ৫০০ সোস্যাল ডিমোক্রাটকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গত বৎসর হইতে অষ্ট্রিয়ার রাজনীতি জটিল হইয়াছিল। এবার সে জটিলতা আরও জটিলতর হইল। তবে নূতন কিছু না ঘটিলে কোন আশঙ্কা নাই নাই। আর ঘটার সম্ভাবনাও কম, কারণ ওরা অতি সাবধানী।

সুভাষচন্দ্র ও তাঁর পুস্তক

লণ্ডনের কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য কর্ণেল জোসিয়া ওয়েজউডের এক প্রশ্নের উত্তরে স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন, "ভারত গভর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর পুস্তক "ভারতীয় সংগ্রাম—১৯২০—৩৪" বৃটিশ ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কারণ এই পুস্তকে সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। ভারতে এই পুস্তক প্রবেশ করিলে বিপদের সম্ভাবনা।" স্যার

স্যামুয়েল হোর একথাও স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছেন। স্যার স্যামুয়েল সত্য-সত্যই উহা পাঠ করিয়াছেন কিনা জানি না, তবে খুব সম্ভব ভারত-গভর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত মতই তিনি উক্ত পুস্তকের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন।

সন্ত্রাসবাদের সমর্থন সূচক কোন কথা যদি উক্ত পুস্তকে থাকিত তবে স্যার স্যামুয়েলের দেশেরই পাকা-রাজনীতিকগণ সেই পুস্তকের প্রাণ খোলা প্রশংসা করিতে পারিতেন না। মিঃ ল্যান্সবেরী মিঃ বসুকে পুস্তক সম্পর্কে অভিনন্দন জানাইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ঐ পুস্তক পাঠ করিয়া যথেষ্ট জ্ঞান-লাভ করিতেছেন। আয়র্লণ্ডের রাষ্ট্রনেতা ডি, ভ্যালেরাও মিঃ বসুর পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছেন। এদের প্রশংসার মূল্য আছে। এরা ভারতের দরদী হইতে পারেন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদ নীতির সমর্থন এরা করেন না। স্যার স্যামুয়েল-হোর যদি এদের মতামত পাঠ করিয়া পুস্তকখানি একবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন তাহা হইলে বোধ হয় তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস পরিষদে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, (১) "ভারতীয় সংগ্রামের" কোন অংশ আপত্তিকর বলিয়া গভর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছেন এবং সেজন্য ঐ পুস্তকের ভারত প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে? (২) খোলাখুলি ভাবে বর্ণনা করা সম্ভবপর না হইলে কোন ধরণের আপত্তিকর তাহা নির্দ্দিষ্ট ভাবে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা গভর্ণমেণ্ট দিবেন কি?

ইহা ছাড়া পণ্ডিত দাস আরো কয়েকটী প্রশ্ন ঐ পুস্তক সম্বন্ধে করিয়াছেন। দেখা যাউক, গবর্ণমেণ্ট কি উত্তর দেন।

সন্তোষজনক কোন উত্তর যে গবর্ণমেণ্ট দিতে পারিবেন না তা আমরা জানি। গবর্ণমেণ্টও জানেন! গবর্ণমেণ্টের এই ধারণা সুভাষচন্দ্র সাঙ্ঘাতিক লোক। কাজেই তাঁর লেখা পুস্তক নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক পুস্তক হইবে। সুতরাং ভারতে তার প্রবেশাধিকার কোন মতেই দেওয়া যায় না। এই হইবে গবর্ণমেণ্টের কৈফিয়ত। এই কৈফিয়তের জন্যই তারা "ভারতীয় সংগ্রামের" উপর এত বিরূপ।

বিলাতে গবর্ণমেণ্টের এই নীতির প্রতিবাদ করিবার জন্য জনমত গঠিত হইতেছে। শীঘ্র সভা সমিতি করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করা হইবে। কিন্তু ফল যে কিছু হইবে না তা নিশ্চিত। ভারত শাসন ব্যাপারে জনমতের কোন মূল্য নাই। মূল্য নাই বলিয়া অনেক অঘটন সংঘটিত হয়। সুভাষ বসুর পুস্তক ত ছোট কথা!

কলিকাতা কর্পোরেশন

গত বুধবারে কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় স্থির হইয়াছে যে, হাঁসপাতাল সমূহের

সাহায্যের হার আর বর্দ্ধিত করা হইবেনা। কিন্তু রাস্তা মেরামত বাবদ খরচ মঞ্জুর করার জন্য তাঁদের উদারতার অন্ত নাই। রাস্তাঘাট আগে না নাগরিকদের স্বাস্থ্য আগে, সেটা বিবেচনা করিয়া দেখার সময় বোধ হয় কর্পোরেশনের কর্ত্তাদের হয় নাই। কলিকাতা সহর যদি সংক্রামক রোগের তীর্থভূমি হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে সুদৃশ্য রাস্তাঘাট ব্যবহার করিবে কে? এদিকে কর্পোরেশনের ঔদাসীন্য সমর্থন যোগ্য নয়।

কর্পোরেশনের সম্মুখে আর একটী কর্ত্তব্য রহিয়াছে। ডাঃ আর আহমদ কলিকাতার ভিক্ষুকদের জন্য এক আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছেন। ডাঃ আহমদের প্রস্তাব মানবতার দিক দিয়া বিশেষভাবে সমর্থনযোগ্য। কলিকাতা কর্পোরেশন হয়ত অর্থ সঙ্কটের কথা তুলিবেন, কিংবা অন্য যে কোন একটা অজুহাত দেখাইয়া তাঁদের অ-সামর্থ্য জ্ঞাপন করিবেন। কিন্তু কর্পোরেশন ইচ্ছা করিলে তাঁদের কতকগুলি বাহুল্য ব্যয় কমাইয়া এই সৎ উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। আমরা জানি, কর্পোরেশনের কতকগুলি টাকা—যাহার পরিমাণ কম নয়—অনর্থক ব্যয়িত হয়। সে ব্যয় অনায়াসে কমানো যায়। যাহা হউক, আমরা ডাঃ আহমদের প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিতে চাই।

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা
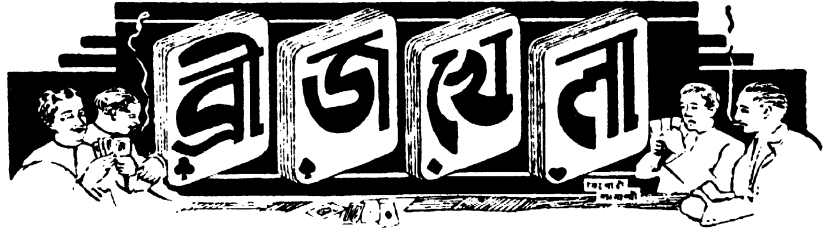
প্রারম্ভিক দুই-এর ডাক (Opening Two Bid) :—পূর্ব্বেই বলেছি এ ডাক একের দুই-এর বা তিন ও তদূর্দ্ধের হতে পারে। একের ডাক কিরূপ হাত থাকলে দেওয়া চলে এবং খেঁড়ী তার কি জবাব দিতে পারেন সে সম্বন্ধে আলোচনা বিগত কয়েক সপ্তাহে করেছি। এবার প্রারম্ভিক দুই-এর ডাক (Opening two bid) সম্বন্ধে আলোচনা করব।

রঙের খেলায় দুই-এর প্রারম্ভিক ডাক :—কালবার্টসন পদ্ধতিতে এর মতন শক্তি ব্যঞ্জক ডাক (strength showing bid) আর নেই। এ ডাক ডাকদারের হাতের প্রচণ্ড শক্তি নির্দ্দেশক। শুধু তাই নয় ইহা 'গেমের' (Game) সূচনা ব্যঞ্জক এবং স্লাম-সম্ভাবনা-জ্ঞাপক। এ ডাক আরম্ভ হলে এবং প্রতিপক্ষ ডাক না দিলে হাত যা'ই থাক্ না কেন তিনি ডাকতে বাধ্য (মিঃ কালবার্টসন্ বলেন, "He must bid or die")। সেইজন্য এর অপর নাম হচ্ছে forcing bids অর্থাৎ বাধ্যকারী ডাক। আমরা একে শক্তিজ্ঞাপক ডাক আখ্যায় অভিহিত করব।

কিরূপ হাতে দুই-এর ডাক আরম্ভ করা উচিত? (Minimum requirements :—এই ডাক দিতে হলে ন্যূনকল্পে নিম্নলিখিতভাবে 'হাত' পাওয়া প্রয়োজন। অন্ততঃ পাঁচখানি অনারের পিট তিন রঙে বিভক্ত হওয়া চাই এবং রঙের প্রায় সব বড় তাস হাতে থাকা চাই। এই হল সাধারণ নিয়ম। এখন হাতের বিভাগের ভাল মন্দের উপর এই অনারের পিটের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে। সাধারণতঃ হাতের বিভাগ ৫, ৩, ৩, ২ কিম্বা ৪, ৪, ৩, ২ হলে অন্ততঃ সাড়ে পাঁচখানি অনারের পিট হাতে থাকা চাই। আবার হাতের বিভাগ ৪, ৩, ৩, ৩ হলে এর বেশী অনারের পিটের প্রয়োজন। আবার এমন হাতও আসতে পারে যেখানে সাড়ে পাঁচখানি অনারের পিট নিয়েও এ ডাক দেওয়া চলবে না কিন্তু সাড়ে তিনখানি পিটে দেওয়া চলতে পারে। ফলতঃ এ ডাকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে খেঁড়ীকে 'গেমের' সম্ভাবনা জানান। সুতরাং ডাকদারের হাতের খেলার পিটের প্রাচুর্য্যের উপর এ ডাকের সার্থকতা নির্ভর করে।

মনে করুন 'ক' নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার হাত পেয়েছেন। এখন তাঁর ডাক কি হবে?

(১) ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, সাতা; হরতন—টেক্কা, বিবি, নয় সাতা; রুহিতন—সাহেব, তিরি, দুরি; চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, ছক্কা। এখানে ডাক হবে 'একখানি হরতন', 'দুইখানি হরতন' নয়। হাতে যদিও সাড়ে পাঁচখানি অনারের পিট আছে কিন্তু 'গেম' নাও হতে পারে। মনে করুন খেঁড়ী নিম্নলিখিত হাত পেয়েছেন। ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম, দশ, হরতন—পাঞ্জা, তিরি, দুরি; রুহিতন—দশ, সাতা, চৌকা;

চিড়িতন—সাতা, পাঞ্জা, তিরি, দুরি। মিলিত হস্তে হরতন রঙে আটখানির বেশী পিট পাবার আশা দুরাশা মাত্র।

(২) ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, নয়, সাতা, তিরি, দুরি; হরতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, দশ, তিরি, দুরি; রুহিতন—nil; চিড়িতন—nil এখানে সাড়ে তিনখানি অনারের পিট থাকা সত্ত্বেও ডাক হবে দুইখানি ইস্কাবন'। খেঁড়ীর হাতে যাই থাক্ না কেন 'গেম' আছেই। ইস্কাবনের সাহেব কিম্বা হরতনের বিবি থাকলে শ্লাম অবশ্যম্ভাবী। তাই আগেই বলেছি এ ডাক নির্ভর করে 'খেলার পিটের' প্রাচুর্য্যের উপর—অনারের পিটের উপর নয়। অনারের পিটের স্বল্পতার পূরণ করে হাতের বিভাগ শক্তি।

(৩) ইস্কাবন—টেক্কা, দুরি; হরতন—টেক্কা, সাহেব, সাতা, তিরি, দুরি; রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, তিরি; চিড়িতন—সাহেব, তিরি, দুরি। সাড়ে পাঁচখানি অনারের পিট থাকলেও এ ক্ষেত্রে ডাক হবে 'একখানি হরতন'। খেঁড়ীর হাতে অন্ততঃ দেড়খানি অনারের পিট না থাকলে 'গেম' হবার আশা নেই।

(৪) ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, দশ, নয়; হরতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, আটা; রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, তিরি; চিড়িতন—দুরি। এখানে ডাক হবে 'দুইখানি ইস্কাবন'। খেঁড়ী ইস্কাবন, হরতন বা রুহিতন যে রঙেই সমর্থন করুন না কেন 'গেম' অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে তিনি চিড়িতন ডাকলে No Trump-এ গেম অবশ্যম্ভাবী।

(৫) ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, দশ; হরতন—টেক্কা, বিবি, দশ, নয়; রুহিতন—সাহেব, বিবি, গোলাম, সাতা; চিড়িতন—টেক্কা। এ ক্ষেত্রে ডাক হবে দুইখানি ইস্কাবন। খেঁড়ী প্রথমোক্ত তিন রঙের একখানি ছবি তাস পেলেই 'গেম'

আংশিক গেমে দুই-এর ডাক :—নিজেদের গেম না থাকলে ডাকদার যদি দুই-এর ডাক দিতে চান্ তবে তাঁকে উল্লিখিত নিয়ম মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে গেমের ডাকে না পৌছান পর্য্যন্ত (তবে যদি প্রচুর খেঁসারৎ পাবার সম্ভাবনা থাকে সে কথা স্বতন্ত্র) উভয়পক্ষ ডাক ছাড়তে পারবেন না। কিন্তু যদি তাঁদের আংশিক গেম থাকে তা' হলে ডাকদার এ ডাক দিলে তাঁর খেঁড়ী খুব খারাপ হাত পেলেও অন্ততঃ একবার ডাক দিতে বাধ্য (অবশ্য প্রতিপক্ষ পাস দিলে)। এরপর ডাকদার যদি দুইটী ডাক বাড়িয়ে দেন (jump rebid) তা' হলেও খেঁড়ীকে আবার যা' হোক কিছু বলতেই হবে। তবে যদি

ডাকদার একবার মাত্র ডাক বাড়ান তা' হলে খেঁড়ী সে ক্ষেত্রে পাস দিতে পারেন। মনে করুন 'ক' ও 'খ' এর আংশিক গেম আছে ৪০ পয়েন্ট।

'ক' ডাকলেন 'দুইটী ইস্কাবন'; প্রতিপক্ষ পাস দিলেন। 'খ' কিছুই পাননি (এমন কি তাঁর হাতে একখানিও অনারের পিট নেই) কিন্তু, তবুও তাঁকে ডাকতে হবে 'দুইখানি No Trump'। 'ক' আবার ডাকলেন 'চারখানি রুহিতন'; প্রতিপক্ষ কিছুই বললেন না। সুতরাং 'খ'-কে আবার ডাকতেই হবে। কিন্তু যদি 'ক' 'চারখানি রুহিতন' না ডেকে 'তিনখানি রুহিতন' ডাক দেন, তা' হলে 'খ' পাস দিতে পারেন; কেন না শ্লামের কোন আশাই নেই অথচ তিনখানির খেলায় ৬০ পয়েন্ট পেলে 'গেম' হবে

দুই-এর ডাকের আবশ্যকতা :—পূর্ব্বেই বলেছি কণ্ট্রাক্ট খেলার প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে শ্লামের প্রিমিয়ম (Premium)। এতে এত বেশী লাভ হয় যে শ্লামের উপযোগী হাত পেয়ে শ্লামের ডাক না দিতে পারলে জয়ের আশা নাই বললেও চলে। তাই এই প্রচণ্ড শক্তিব্যঞ্জক ডাকের উদ্ভাবনা। এ ডাক শুনলে খেঁড়ী নিজের হাতের তাস মিলিয়ে বুঝতে পারেন যে শ্লাম হবার সম্ভাবনা কতখানি; এবং সেইভাবে ধীরতা ও বিবেচনার সহিত ডাক দিয়ে ডাকদারকে নিজের হাত বলেন। এইরূপে উভয়ে পরস্পরকে পরস্পরের হাত জ্ঞাপন করে সতর্ক অথচ দৃঢ়পদে শ্লামের সোপানে আরোহণ করতে পারেন, যার ফলে বিজয়মাল্য লাভ তাঁদের অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ ক্রীড়ককেই বিন্দুমাত্র বিবেচনা না করে এ ডাক আরম্ভ করতে দেখি। শিশু যেমন আগুন নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে, এঁরাও তেমনি এই চমকপ্রদ ডাক দিয়ে খেঁড়ীকে বিভ্রান্ত করে এবং দর্শককে চমৎকৃত করে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করতে ভালবাসেন কিন্তু, একবারও ভাবেন না যে বাস্তবিকই তাঁরা আগুন নিয়ে খেলা করছেন। মিঃ কালবার্টসন নিজেই বলেছেন, "A two bid is packed with dynamite. I believe that a majority of players still mishandle this beautiful instrument of precision." ফলতঃ সবিশেষ বিবেচনা না করে এ ডাক দেওয়া কারও উচিত নয়। নিজের হাতের অনারের পিট গণনা করে, হাতের বিভাগ ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করে, রঙের বিভাগ যতখানি সম্ভব মানসিক গণনায় নির্ণয় করে, খেঁড়ী কি জবাব দিলে তারপর নিজে কি ডাক দেব তা'ও পূর্ব্বেই যথাসম্ভব স্থির করে তবে এ ডাক দেওয়া উচিত। তা' না হ'লে প্রচুর খেঁসারৎ এবং পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ডাকদার যখন বুঝবেন যে

তার খেঁড়ী একটি পিট না দিলেও তিনি নিজের হাতের দ্বারাই 'গেম' করতে পারেন তখনই তাঁর পক্ষে এ ডাক দেওয়া উচিত। এই ডাক দেবার পর খেঁড়ীর নিকট হতে তিনি মাত্র একখানি পিট আশা করতে পারেন, তার বেশী নয়।

No Trump-এর খেলায় দুই-এর প্রারম্ভিক ডাক :—এ ডাক বাধ্যকারী নহে (Not forcing) এবং খেলায় সাধারণতঃ এ ডাক ব্যবহৃত হয় না। কারণ এতে আগেই খেঁড়ীর মুখবন্ধ করে দেওয়া হয়; সুতরাং সাধারণ হাত নিয়ে সে বেশী কিছু জানাবার অবকাশ পায় না, কেননা ডাক বড় বেশী বেড়ে যায়। ভাল্‌নারেব্‌ল অবস্থায় এ ডাক হলে বুঝতে হবে যে ডাকদারের হস্তে চারটী রঙে অন্ততঃ পাঁচখানি অনারের পিট আছে; সুতরাং খেঁড়ীর হাতে একখানি বা তার বেশী অনারের পিট থাকলে তিনি তিনটী No Trump বলতে পারেন কিম্বা ডাকের যোগ্য কোন রঙ থাকলে (পাঁচখানি থাকা চাই) অথবা যে কোন একটি রঙের ছয়খানি তাস পেলে সেই রঙ ডাকবেন। এর চেয়ে কম হাত পেলে তিনি পাস দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে তাঁর কোন বাধ্য বাধকতা নেই। নন-ভাল্‌নারেব্‌ল অবস্থায় এর চেয়ে কিছু কম অনারের পিট নিয়ে এ ডাক দেওয়া চলে। তবে আমরা এ ডাকের পক্ষপাতী নই এবং সাধারণকেও সাধারণতঃ এ ডাক দিতে নিষেধ করি।

তোমাদের প্রতি—

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

তোমরা এসেছ কাছে আশা-ভরা সুখ-স্মৃতি লয়ে,
আপন করেছি নাকি সুমধুর মোর পরিচয়ে!
মোর কাছে এসে নাকি ভুলে যাও
যত কিছু কালো,
বহুদূর হোতে আস,—এতো মোরে
বাসিয়াছ ভালো!
কেন মিছে ভুলে যাও, রিক্ততার মাঝে
কিবা আছে?
শত সুখে, শত দুখে তবু ছুটে আস মোর কাছে!
আমি একা নিঃস্ব এই ঘরে;—
তোমাদের হাসি দেখি সুখে মোর
হাসি নাহি ধরে।

মধুর স্বপন বুঝি নাহি জাগে মানুষের মনে?
তাই তোমাদের খুঁজি একা মোর এই নিরজনে!
...ভুলিব না কোন দিন,—চিরদিন
দ্বার রবে খোলা,
তোমরাও ভুলিবে না?...ও মিলন যাবে
নাকো ভোলা।
তোমাদেরি পেয়ে মোর সুখ,
তোমাদের হাসি গানে ভুলিয়াছি
জীবনের দুখ!...
দুদিনের তরে আসা,—বিষাদের কি
থাকিতে পারে?—
হেসে খেলে পাবো সুখ, কিবা ফল
নয়নের ধারে?
বিদায়ের আসে যদি দিন—
ওই মুখ ছবি হৃদে হবে নাকো কভু মোর লীন।

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

নিউ থিয়েটার্স

দিন দশেকের মধ্যেই শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত "দেবদাসে"-র কাজ শেষ হবে। এই চিত্রে হাওড়া টকী হাউসের ম্যানেজার শ্রীনির্ম্মল দাশগুপ্ত দেবদাসের ভাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন।

* * *

'বি' ইউনিটে মিঃ রাওয়ের পরিচালনায় একখানা তামিল ছবি উঠ্‌ছে। শ্রীবিমল রায় ও শ্রীমুকুল বসু যথাক্রমে এর আলোক-চিত্র ও শব্দ-নিয়ন্ত্রণের কাজ কোরছেন। আমাদের মান্না চক্রবর্ত্তী এর তত্ত্বাবধান কোরছেন।

‡ * ‡

নিউ থিয়েটার্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকার ও শ্রীঅমর মল্লিক গত শনিবারে বোম্বে রওনা হ'য়েছেন। ফেরবার পথে নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মসের কার্য্যাবলী পরিদর্শনের জন্য মিঃ সরকার একদিন লাহোরে থাক্‌বেন।

* * *

শ্রীমতী মলিনা 'নিউ ইণ্ডিয়া'র পরবর্ত্তী চিত্রের জন্য লাহোরে গেছেন।

শ্রীপাহাড়ী সান্যাল লাহোরেই আছেন—তবে শীঘ্রই কোল্‌কাতায় প্রত্যাবর্ত্তন কোরবেন।

অত্যধিক কার্য্য-প্রসারতাহেতু 'নিউ থিয়েটার্সে'-র পরিস্ফুটনাগারের বৃদ্ধি বিশেষ প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়েছে—তাই কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক কোরেছেন প্রয়োজনানুসারে পরিস্ফুটন বিভাগটি চণ্ডী ঘোষ্‌ রোড ষ্টুডিওতে একটি প্রশস্ত জায়গায় তৈরি হবে।

* * *

প্রকাশ যে, নিউ থিয়েটার্স—নিউ ইণ্ডিয়ার "কারওয়ান-ঈ-হায়াৎ" বোম্বেতে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ কোরেছে।

রাধা ফিল্ম

রাধা ফিল্ম ও ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্সের সহযোগে এদের টালিগঞ্জ ষ্টুডিওতে সরস্বতী দেবীর পুজার্চ্চনা হয়। বিদ্যাদায়িনীর পাদপদ্মে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রায় তিন শত কর্ম্মী পুষ্পাঞ্জলি দেন।

* * *

শ্রীমতী কাননবালার অসুস্থতার জন্য "মানময়ীর গার্লস্‌ স্কুলে"র জমিদার বাড়ীর বৃহৎ শেষ দৃশ্যের কাজ স্থগিত রয়েছে। এই হপ্তায় এই দৃশ্যটি শেষ হবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়া এ হপ্তায় আর একটি বহির্দৃশ্যও তোলা হবে।

* * *

"দক্ষযজ্ঞ" আস্‌চে শনিবার থেকে উনবিংশ হপ্তায় পড়্‌বে। অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষ্যে 'ক্রাউনে' "দক্ষযজ্ঞ" দেখ্‌বার জন্য যে জন-সমাগম হয়, তাকে সিনেমার অর্দ্ধোদয় যোগ বলা যায়।

"রাজনটী বসন্তসেনা"র কাল চিত্রায় শেষ অভিনয়। এই শুক্রবার থেকে ছবিখানা কুমিল্লায় দেখানো হবে। তারপর ১৬ই মার্চ্চ পূর্ণ থিয়েটারে আস্‌বে।

কালী ফিল্মস্‌

এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীসতু সেন প্রোডাক্‌শন ম্যানেজার রূপে এক বছরের জন্য নিয়োজিত হ'য়েছেন।

* * *

নায়ক শ্রীজীবন গাঙ্গুলীর অসুস্থতার জন্য "পাতালপুরী"র শূটিং কয়েকদিন বন্ধ ছিল। এই হপ্তা থেকে আবার পুর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ হ'য়েছে।

* * *

"প্রফুল্লে"-র শূটিং মাঝে মাঝে হ'চ্ছে।

* * *

"বিদ্যাসুন্দরে"র কয়েকটি দৃশ্য তোলা হ'য়েছে। আপাততঃ ছবিখানা শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে তোলা হচ্ছে. তিনি যদি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইতিমধ্যে সম্বন্ধ ছিন্ন করেন, তবে কে যে এর পরিচালনা কোরবেন, তা' সঠিক বলা যায় না। আমরা নিম্নে "বিদ্যাসুন্দরে"-র সম্পূর্ণ চরিত্র-লিপি লিপিবদ্ধ কোরলাম।

বিদ্যা—শ্রীমতী রাণীবালা
সুন্দর—শ্রীটুলু সেন
রাজা—শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়
মালিনী—শ্রীমতী নীহারবালা
কোটাল—শ্রীললিত মিত্র
রাণী—শ্রীমতী সুরবালা
সুলোচনা—শ্রীমতী সুনীতি সরকার
গঙ্গাভাট—শ্রীজ্ঞান দত্ত

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

সুপ্রসিদ্ধ "ডি-জি"-র পরিচালনায় "বিদ্রোহী"র শুটিং প্রায় অর্দ্ধেক এগিয়েছে। ছবিখানির আখ্যানভাগ আমরা যতটা শুনেছি—তা'তে বেশ চিত্ত-উত্তেজক বলেই মনে হয়। পরিচালনার দিক থেকে "ডি-জি" একটা কিছু নূতনত্ব দেখাবেন বলে আশা করা যায়।

বাণী বন্দনা

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে দেবীর পূজার্চ্চনায় ও আমোদ প্রমোদে যোগ দেবার জন্য আমরা আহূত হই। কিন্তু সব জায়গায় যোগদানের সময় বা সুযোগ আমাদের ঘটে ওঠে নি।

"কালীঘাট ক্লাব" ও "ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে"-র উৎসবে যোগদান কোরে আমরা বিশেষ আপ্যায়িত হই।

বিদ্যুৎ চুরির মামলা

চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট্ অনারেবল এস্, কে, সিংহ কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের বিদ্যুৎ অপহরণের অপরাধে চল্লিশ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ কোরে বারো জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন কোরেছেন। ঘনশ্যাম আয়েঙ্গার, সমরথ চৌবে ও সৃষ্টিধর ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে কোনও প্রমান না থাকায় তাদের খালাস দেওয়া হয়। ফরিয়াদী পক্ষ কৃষ্ণনাথ সোম, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও হরদ্বার সিংহের বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বেই অভিযোগ প্রত্যাহার করায়, তাদের মুক্তি দিয়া ফরিয়াদী পক্ষ হ'তে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। অশ্বিনী কুমার পাঁজা, ননীলাল ঘোষ (ননী মিস্ত্রী) পুট্, জুপিটার সিনেমার মালিক মহম্মদ আবদুল আজিম ও ভূদেব চন্দ্র শেট পলাতক। প্রকাশ যে, পরে জুপিটার সিনেমার মালিক পুলিশে আত্মসমর্পণ করে।

যে বারোজন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হ'য়েছে তাদের নাম নীচে দেওয়া হ'ল। শৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুশীল কুমার ঘোষ, রাসবিহারী সাহা, মনীন্দ্র নাথ দে, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদ নাথ নন্দী, শৈলেন্দ্র নাথ সান্যাল, হরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, পটল চন্দ্র সাঁতরা, জগদীশ সিংহ, ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিও ও ভারতলক্ষ্মী পিকচার হাউসের মালিক বাবুলাল চোখানি ও গণেশ বাহাদুর।

আসামীদিগকে ষড়যন্ত্র কোরে ভারতলক্ষ্মী পিকচার হাউস, ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিও, জুপিটার সিনেমা ও অন্যত্র বিদ্যুৎ চুরি করায় অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০খ ও তৎসহ ভারতীয় বিদ্যুৎ আইনের ৩৯ ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করা হ'য়েছে। এ ছাড়া বাবুলাল চোখানির বিরুদ্ধে গত ১৯৩৪ সালের এপ্রিল ও ১৯৩৫ সালের ১৬ই জানুয়ারীর মধ্যে ভারলক্ষ্মী পিকচার হাউসে বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগে ভারতীয় বিদ্যুৎ আইনের ৩৯ ধারা ও তৎসহ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ গঠিত হ'য়েছে।

শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কুমুদনাথ নন্দী ও গণেশ বাহাদুর বাবুলাল চোখানিকে বিদ্যুৎ অপহরণে অবৈধভাবে সাহায্য করায় বিদ্যুৎ আইনের ৩৯ ধারা ও তৎসহ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করা হ'য়েছে।

শৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী সাহা (হাঁড়া), সুশীলকুমার ঘোষ ও জগদীশ সিংহ জুপিটার সিনেমার মালিককে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ চুরির সহায়তা করায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ ধারা ও তৎসহ বিদ্যুৎ-আইনের ৩৯ ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হয়।

আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী মামলার শুনানীর তারিখ ধার্য্য হ'য়েছে। ঐ দিন অন্যান্য আসামীর সঙ্গে জুপিটার সিনেমার মালিকেরও বিচার হবে।

এই চুরির ফলে ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হ'য়েছে বলে প্রকাশ।

স্কারলেট এক্সপ্রেস

জোসেফ ভন ষ্টার্নবার্গের পরিচালনায় এবং চিত্র-জগতের রাণী মার্লিনের অভিনয় সাফল্যে চিত্রখানি এক অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে ফুটে উঠেছে। শিশু বয়সে সাম্রাজ্ঞীর ভূমিকায় অভিনয় কোরেছে মার্লিনের একমাত্র মেয়ে মেরিয়া।

শনিবার ১৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে "রূপবাণী"তে ছবিখানি প্রদর্শিত হবে। এবং পরবর্ত্তী আকর্ষণ "ডেথ টেকস্ এ-হলিডে।"

রূপবাণীতে বাণী বন্দনা

রূপবাণীতে মহাসমারোহে বাণীবন্দনা হয়ে গেছে, প্রদর্শনীর পূর্ব্বে সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত ধীরেন দাস, শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী রচিত "বাণী-বন্দনা" উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছিলেন। সর্ব্বশেষ উপস্থিত অভ্যাগতদিগকে জলযোগ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

সত্য-পথে

বহুকাল পরে 'ম্যাডানে'-র একখানা বাঙ্লা সবাক-চিত্র দেখবার সৌভাগ্য সাধারণের হ'ল। একটি সামাজিক গল্পের ভেতর দিয়ে যা'তে ধর্ম্মপ্রাণ বাঙলাদেশের দর্শকদের মনে ধর্ম্মভাব জেগে উঠতে পারে, সেইভাবেই গল্পটি বর্ণিত হ'য়েছে। একটি অসৎ-পথগামী যুবক কি ভাবে তার বোনের আত্মোৎসর্গ ও সাধুর উপদেশে ধর্ম্মভাবে পণোদিত হয়। এই হ'চ্ছে গল্পের মূল-কথা। গল্পটির ভেতর কোনও নূতনত্ব নেই—একেবারে একঘেঁয়ে।

ছবিখানার গল্প-লেখক, পরিচালক ও অভিনেতা হ'চ্ছেন, শ্রীঅমর চৌধুরী। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে শেষোক্ত বিভাগেই তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। পরিচালনা কার্য্যে ত্রুটি বিচ্যুতি অনেক আছে; তা' ছাড়া পরিচালনার ভেতর প্রশংসা করবার মত কিছু আমরা খুঁজে পেলাম না।

উনি যে অংশটিতে অভিনয় কোরেছেন তা' দেখে আমরা খুব হেসেছি এবং তাঁর অভিনয় সত্যই হৃদয়গ্রাহী। শ্রীমতী ডলি দত্তের অভিনয় মোটের ওপর মন্দ বলা যায় না। শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্যের অভিনয় গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ কোরেছে। এর সম্বন্ধে বেশী কিছু বলে আমরা একে মনোকষ্ট দিতে চাই না। বারবণিতারূপে শ্রীমতী কিরণ রায় একেবারে অচল। যেমনি চেহারা তেমনি তাঁর অভিনয়। কূট-চক্রী শ্রীকার্ত্তিক রায়ের অভিনয় একেবারে বাজে না হ'লেও প্রশংসার যোগ্য নয়। সন্ন্যাসীরূপে শ্রীতারা ভট্টাচার্য্য গান গেয়ে সবাইকে মাৎ কোরেছেন।

আলোক-চিত্র স্থানে স্থানে ভাল, কিন্তু বেশীর ভাগই বাজে।

শব্দ-স্থিরীকরণ জঘন্য।

যাই হ'ক, 'ম্যাডানে'-র অন্যান্য বাঙ্লা ছবির চেয়ে যে এ ছবিখানা সাধারণে নেবে, এ ধারণা করা যেতে পারে।

বেতার-মঙ্গল

—সত্যদূত—

বহুকাল পরে বেতারে প্রাণের সাড়া পাওয়া গেল—সরস্বতী পূজার দিন। বেতার অনুষ্ঠান-কর্ত্তা সেই শুভ দিনে যে অপরূপ রস পরিবেশণ ক'রবার আয়োজন ক'রেছিলেন—তা' সত্যই অভূতপূর্ব্ব, এতাবৎ অনাস্বাদিত। এই দিনটী এই অভিনবত্বের জন্য স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

* * *

প্রাচীন সংস্কৃত কবি রাজশেখরের কাব্য মীমাংসা থেকে সংগ্রহ ক'রে কবি বাণীকুমার "সারস্বত-মঞ্জরী" রূপকটিকে সুন্দর সজ্জায় রচনা ক'রেছেন, এবং শুনলাম তাঁর রচনা কার্য্যে সহায়ক ও ভাবের উৎস ছিলেন অধ্যাপক শ্রীঅশোক নাথ ভট্টাচার্য্য ম'শায়। এইরূপ মণি-কাঞ্চনযোগে অপূর্ব্ব এ রস-বস্তুর নূতন সৃষ্টি সম্ভব হ'য়েছে।

* * *

এমন অভিনব অনুষ্ঠান ইতঃপূর্ব্বে আমরা কখনো শুনিনি! সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত বাণীকুমারের প্রতিভা যেন এই "সারস্বত মঞ্জরী"-তে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

* * *

এই অনুষ্ঠানটির পরিচালনা ক'রেছেন ভারত বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী শ্রীরাইচাঁদ বড়াল, এবং তাঁর সহযোগী হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন প্রথিতযশা সুরশিল্পী শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক। অনুষ্ঠানের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত যে সুমোহন সঙ্গীতের বিচিত্র তরঙ্গ উঠেছিল—তা' সকলের মন-প্রান কানায় কানায় ভ'রে তুলেছিল।—সেদিনকার অনুষ্ঠানে আমরা যে অখণ্ড রস উপভোগ ক'রেছিলাম—তা'র জন্য আমাদের আন্তরিক সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রছি—অনুষ্ঠাতৃবর্গকে। এই অনবদ্য সুন্দর অচিন্তনীয় সঙ্গীত-অনুষ্ঠান আয়োজন ক'রে প্রোগ্রাম পরিচালক ম'শায় বেতারকে অনেকখানি উন্নীত ক'রেছেন। এই প্রকারেই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ রুচির পরিচয় দিতে সমর্থ হ'বেন।

* * *

কলাবৎ শ্রীযুক্ত রাইচাঁদ বড়ালের পুনরাগমন আমাদের বিশেষ ভাবে আশান্বিত ক'রেছে; আশা করা যায় হয়তো এইরূপ মনোহর অনুষ্ঠানের সাক্ষাৎ মধ্যে মধ্যে মিলবে।

* * *

কোন আবৃত্তিতে, শ্লোক-পাঠে, সঙ্গীত-বাদ্যে ও গীত-গানে "সারস্বতমঞ্জরী" নাট্যাসরটি এক অনির্ব্বচনীয় শ্রী ধারণ ক'রেছিল। প্রত্যেক শিল্পীই আমাদের অকৃত্রিম অন্তরের প্রশংসা পাবার যোগ্য।

* * *

এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর অনুষ্ঠান মাঝে মাঝে শোনবার আগ্রহ আকাঙ্খা আমাদের প্রবল হ'য়ে উঠেছে। এরূপ অনুষ্ঠান কাব্য ও সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে আমাদের আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছিল। তাই শতসহস্র সাধুবাদ দিচ্ছি—উদ্যোক্তৃগণকে।

নকুসর্দ্দারের গুরুমারাবিদ্যা

(বাবা বিশ্বনাথ বিরচিত)

ভোমবোল্—শর্ম্মা মশায়—দণ্ডবৎ—

শর্ম্মা—কে হে, ভোমবোল্ বাবাজীবন না কি! তা' বাপু, এতো ভক্তির ঘটা কেন? শেষে তো গুরুকে দক্ষিণে দেবার ছলে টিক্টিকীর খোঁচা দেবে!

ভোমবোল—কেন গুরুদেব, এ আবার কি কথা!

শর্ম্মা—বাপু—তুমি রামময় রোডের নকুসর্দ্দারের "খেয়ালী"-আখড়ার একজন পাণ্ডা। সেখানে তো বাপধন—গুরু-মারা-বিদ্যেরই চর্চ্চাটা বেশী হয়। এই দেখনা—সেদিন নকুসর্দ্দার তা'র গুরুদেব চারু ভট্টাচার্য্য ম'শায়কে খোঁচা দিয়েছে, আবার সেদিন গুরুদেব অশোকনাথ শাস্ত্রী ম'শায়কে বিশেষ-রকম বাণ ঝেড়েছে। তুমি তো তা'রই চেলা—তোমার কোন্ না সে-বিদ্যেটা আয়ত্বের ভেতর নেই। সব শিয়ালেরই এক রা'—বাবা!

ভোমবোল—আপনি গুরুদেব, আমায় ভুল বুঝ্ছেন কেন? আমি সে দলেরই নই। সর্দ্দার সর্দ্দারী করুক—B. P. C. C-তে আর Tollywood-এ; ও-সব জায়গায় তা'র মগজে নানা ফন্দি-ফিকির-ভরা বুকনি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠে, অন্যস্থলে—"পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার"—গোছের অবস্থা হয়। তা' গুরু-মারা-বিদ্যেটা এখনো আমি হজম ক'রতে পারিনি।

শর্ম্মা—তা' হ'লে দীক্ষিত হ'য়েছে—এ-বিদ্যে হজম না হ'লেও তোমার গলাধঃকরণ কার্য্যটি হ'য়ে গেছে!

ভোমবোল—আজ্ঞে তা' নয়—ও সব আমাদের ধাতে সইবে না। কথাটাই না হয় শুনুন একবার। সেদিন আমি নকুসর্দ্দার-কে এ-সম্পর্কে খুব শুনিয়ে দিয়েছি। বল্লুম—হ্যাঁ হে নকু—তোমার কি একটুও অঙ্কে বা Geography-তে জ্ঞান নেই! লিখেছ যা'রা অর্দ্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নান ক'রে স্বর্গে যা'বার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে, তা'দের স্বর্গে সঙ্কুলান হ'বে কি ক'রে! তোমার আধা-টেকো মাথা ঘেমে উঠ্লো—এই ছোট্ট জিনিষ নিয়ে। তা' হ'লে B. P. C. C., Tollywood-এর problem solve করো কি উপায়ে! এক আউন্স ব্রেন্ যদি থাক্তো! আরে গঙ্গার ঘাটে যদি এতো লোকের ঠাঁই হ'তে পারে, তা' হ'লে স্বর্গে হ'বে নাই বা কেন? স্বর্গ-তো আর তোমার "খেয়ালী-অফিস্" নয়—যেখানে সাড়ে তিন জনের বেশী—চারজন লোক ধরে না!

তা' বেশ ব'লেছো, কিন্তু আর একটা ঠাট্টার কথা,—অশোক শাস্ত্রী নাকি স্বর্গের passport দেবেন—এই রকম ব্যঙ্গ করা কি ভালো!

ভোমবোল্—সে কথারও কি জবাব দিই নি—মনে ক'রেছেন?—তা'কে ভালো-ভাবেই চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি যে—স্বর্গের passport টা বায়োস্কোপের pass-এর মত সস্তার নয়। স্বর্গে যিনি যাবেন তিনি একলাই যাবেন,—বায়োস্কোপের একটা পাসের দৌলতে সবান্ধবে যাওয়ার অভ্যেস আছে ব'লেই—এই বিকট ধারণা মাথায় জেগেছে।

শর্ম্মা—বাহবা ভোমবোল্—খোঁচার উল্টো খোঁচাটি বেশ দিয়েছো—তবে গুরুদেবের ওপর নকুসর্দ্দারের এতো গাত্রদাহ কেন? আমার বোধ হয় গুরুর বাড়ী প্রসাদ-পাবার নেমন্তন্ন পায়নি ব'লেই রাগ। তা' বাবা—যা' দক্ষিণের ঘটা—সেখানে তাই মেলে অষ্টরম্ভা।

ভোমবোল্—তা' মিলুক না—শর্ম্মা ম'শায়। গুরুর বাড়ীতে রম্ভার চাট তো নেই—সেখানে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-রূপ অষ্টরম্ভাই জোটে, কিন্তু Tollywood-এ বাটালি-খোদা রম্ভার বেজায় ভিড়, সেই রম্ভাতেই প্রাণে মিষ্টি রসের সঞ্চার হয়। আবার কি!—অভাবটাই বা কিসের!

শর্ম্মা—তা' বাপু, যাই বলো তোমার নকুসর্দ্দারের গুরুদক্ষিণা দেবার রীতিটি নতুন ধরণের, খুঁচিয়ে পেন্নাম-করা আর কি! যেমন অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে তীর ঝেড়ে পেন্নাম ক'রেছিল। তা'—নকুসর্দ্দার কি অর্দ্ধোদয়ে গঙ্গাস্নান পর্য্যন্ত করে নি!

ভোমবোল্—রাম কহো—নকু ব'ল্লে—"গঙ্গা-স্নানেতে মুক্তি সে আমার নয়—B. P. C. C., Tollywood-এ লভিব মুক্তির স্বাদ।"

শর্ম্মা—বটে—তাই স্বাদ ভক্ষণ ক'রতে থাকুক্ তোমাদের নকু। তবে বাগবাজারটাকে রাবিসের আড্ডা ব'লেছে কেন হ্যাঁ!—একদিন দেখা হ'লে ব'ল্বো—ওহে বৎস, ভুলে গেছ—তোমার রামময় রোডের খানা যে ঐ বাগবাজারের রাবিশ দিয়েই বোঝানো হ'য়েছে। আর নতুন বছরের প্রথমেই তোমার "খেয়ালী"-পাততাড়ির পয়লা পৃষ্ঠায় দেগে দিয়েছে ঐ বাগবাজারের একটি রাবিশ্। তা' যাই হোক—নকু-কে অতো ঘন ঘন Tollywood আর B. P. C. C.-তে যেতে বারণ ক'রে দাও, পরামর্শ দাও সন্ধ্যেবেলায় কালীঘাটে যেতে—রোজ এক কোশা ক'রে খাঁড়া-ধোয়ানো জল খেলে, আর সিঁদুরের ফোঁটা কপালে প'রে এলে—একটু সদ্বুদ্ধি আস্তে পারে।

[পাপাত্মার লেখনীর তাড়নায় বাবা বিশ্বনাথের টনক নড়িয়াছে। তাঁর কোপানলে দগ্ধ হইবার ভয়ে আমরা সন্ত্রস্ত হইয়া তাঁর প্রলাপ পত্রস্থ করিলাম। বিল্বপত্রের অর্ঘ্য দিয়া বাবা বিশ্বনাথকে তুষ্ট করিবার সঙ্কল্প আমরা করিয়াছি।

সঃ খেঃ]

কেটি গ্যালান

প্যারিশ থেকে এসেছেন হলিউডে ছায়াছবিতে অভিনয় করবার জন্য। 'ফক্সে'র অভিনেত্রী ইনি—সেখানে "ম্যারী গ্যালান্টি" ছবিতে অভিনয় কোরে ইনি স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শন কোরেছেন।

লিলি ড্যামিটা

একে কে না চেনে! নির্ব্বাক যুগের আদর্শ অভিনেত্রী আবার সবাক্ ছায়াপটে অভিনয় করছেন। ইউনাইটেড্ আর্টিষ্টের "ব্রিউষ্টার মিলিয়নস্"-এ ইনি জ্যাক্ বুকাননের বিপরীতে অভিনয় কোরেছেন।

অলকার এ্যাডভেঞ্চার

ইরা ঘোষ

অলকা ঘোষ ও পূর্ণিমা বোনার্জ্জি—দুজন বন্ধু। শুধু বন্ধু নয়—একেবারে যাকে বলে 'হরিহর আত্মা', কিছুদিন হ'লো ম্যাট্রিক দিয়ে কলেজে ঢুকেছে—উভয়েই এখন কলেজের ফাষ্ট ইয়ারের ছাত্রী। অলকা পূর্ণিমার চেয়ে মেধাবী—তার ওপর কৃতিত্বের সঙ্গে ফাষ্ট ডিভিসনে গোটা চারেক অক্ষর নিয়ে পাশ ক'রেছে ব'লে কলেজে খুব হাঁক-ডাক। কিন্তু অলকা ভুলেও একদিন ছেলেদের দিকে ফিরে তাকায় না, শুধু গর্ব্বিত ব'লে নয়—সে প্রেম জিনিষটা আদৌ পছন্দ করে না। অলকার চেয়ে পড়ার দিকে একটু নীরেশ থাকলেও পূর্ণিমা ছিল, যাকে বলে সবদিকে 'স্কোয়্যার'। সুতরাং কিছুদিনের ভেতর প্রেম জিনিষটার ধাক্কা সামলাতে না পারলেও অলকার সঙ্গে বন্ধুত্ব তার অটুট থাকল। অধ্যাপক অসিত বোনার্জ্জি এসে পড়লেন তাদের ভেতর। বোনার্জ্জি সাহেব ছিলেন গম্ভীর এবং নীরস প্রকৃতির লোক—স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন এবং তাঁর মত লোকের সঙ্গে কিরূপে পূর্ণিমা প্রেমে প'ড়লো তার কৈফিয়ৎ অলকাকে দিতে পূর্ণিমাকে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠতে হ'য়েছিল। যা' হোক তাদের বন্ধুত্বের স্রোত অবাধ গতিতে অগ্রসর হ'তে লাগল। শেষে এমন গিয়ে দাঁড়াল যে কেউ কা'কেও একদিন না দেখে থাকতে পারে না—এমন কি একে অপরের বিরহে মূর্চ্ছা যায়।

দু'জনেই বালীগঞ্জে দুটো সম্ভ্রান্ত পাড়ায় বাস করে। খুব সৌখীন তারা—লরেটো স্কুলের ছাত্রী ছিল, হ'তেই হবে—কাথবার্টসন এণ্ড হার্পারের উঁচু হীল জুতো ছাড়া পরে না—'কটি'-র প্রসাধন-দ্রব্য ছাড়া ব্যবহার করে না—"ডোরা স্মিথে"-র বাড়ী থেকে ওদের অর্ডারি জামা আসে—ইত্যাদি। এক কথায় দু'জনেই হ'চ্ছে যাকে বলে একেবারে অতি আধুনিকা।

এখন অজয়ের পরিচয় দেওয়া যাক। অজয় বোস হচ্ছে রাসবিহারী এভিনিউস্থ এক খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারের ছেলে—অলকার বাবা ওর বাবার বন্ধু, এই সূত্রেই অলকার সঙ্গে ওর পরিচয়। পূর্ণিমার সঙ্গে ওর এখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যদিও এই সম্বন্ধ অল্প কিছুদিন হ'য়েছে—কারণ অধ্যাপক বোনার্জ্জি শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবীর স্বামী অজয়ের এক নিকটতম বন্ধু। সম্প্রতি অধ্যাপক বোনার্জ্জি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে গেছেন হাজারিবাগে—দিন সাতেকের জন্য আমোদ ক'রতে, আর পূর্ণিমাকে দেখা শুনা করবার ভার দিয়ে গেছেন অজয়ের ওপর, তাই অজয় প্রায়ই পূর্ণিমাদের বাড়ী আসে—খোঁজ খবর নিতে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ ডিগ্রি অজয় আজ বছরখানেক হ'ল পেয়েছে—পেয়ে aviation-এর লাইসেন্সের চেষ্টা করছে। ইচ্ছে আছে বিলেতটা একবার ঘুরে আসে, কিন্তু বাপ মা'র নয়নের মণি সে—তাঁদের একটি মাত্র পুত্রকে কিছুতেই তাঁরা চোখের অন্তরালে যেতে দেবেন না। বাধ্য হ'য়ে অজয়কে এখান থেকেই শিখতে হচ্ছে কিছু কিছু। বন্ধুমহলে অজয়ের খুব প্রতিপত্তি—শুধু তার চেহারার জন্য নয়, সকলেরই ধারণা অজয়ের সর্ব্ববিষয়ে পছন্দ খুব ভাল।

অজয়ের একমাত্র বন্ধু—যার কাছে সে প্রাণ খুলে কথা বলে তার নাম হচ্ছে, কল্যাণ রয়। কল্যাণ হচ্ছে অজয়ের কলেজের সহপাঠী—এখন পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র। কল্যাণ অজয়ের কাছে অশেষ ঋণী, কারণ অজয়ের সাহায্যেই যে তাহার জীবন সঙ্গিনী 'এমা'কে লাভ ক'রতে পেরেছে। তারই অনুগ্রহে কল্যাণ ও এমা আজ জগতের মধ্যে 'one of the happiest couples' আজ অজয়কে দেখলেই কল্যাণের চোখের সামনে তার জীবনের একটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, কৃতজ্ঞতায় তার মন তখনই ভরপুর হ'য়ে যায়। কল্যাণের মন তখন যৌবনের উন্মত্ত নেশায় ভরপুর—এমনই একটা দিনে অজয়ের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সে লেকের ধারে গিয়ে পড়ল। হঠাৎ অজয় তার ডবল-ব্রেষ্ট কোটের ভেতরের পকেট থেকে একখানা 'ফোটো' বে'র ক'রলে, সম্পূর্ণ এক অপরিচিতার মুখ বল্লে—"How sweet কল্যাণ—Do you like it ?"

সে উত্তর দিতে পারলে না, স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল—কিন্তু তার চোখই সব প্রকাশ ক'রে দিলে—একপ্রকার কম্পন তাহার অজ্ঞাতসারেই শরীরটাকে রোমাঞ্চিত ক'রে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, সে দাড়টা তখনই কাৎ করলে অজয় আর থাকতে পারল না হেসে ফেললে—বললে "আমি কি আর বুঝতে পারি'নি ভাই।"

* * *

বছর দুই কেটে গেছে, কল্যাণ এখন পুরো দস্তর গৃহী—এমাকে ছেড়ে এক মিনিটও থাকতে পারে না। সেই থেকে অজয়েরও তার বাড়ীতে আসা কমে গেছে, কারণ তার আসাতে পাছে তাদের নব-আরব্ধ প্রেমেতে বাধা পড়ে। কোন দরকার না পড়লে সে বড় একটা যায় না। অলকাকে ওর ভারি পছন্দ, কিন্তু অলকা বলে, জীবন-পথে কোন সঙ্গী-সাথী সে চায় না—একলা চলার মত সামর্থ্য আছে ওর, যাকে কবির ভাষায় বলে 'একলা চলার পথিক', অজয় মাঝে মাঝে

বলে—"অলকা, তুমি বুঝছ না—মুখে বলা সহজ, কিন্তু কাজের সময় তোমরা দুর্ব্বল—তোমরা frail"। অলকা বিদ্রূপের হাসি হাসে এবং সে হাসি তীক্ষ্ণ শরের মতনই অজয়ের বুকে এসে বেঁধে। এষা অলকাকে অনেক দিন থেকেই জানে—স্কুলে এষা ছিল তার এক ক্লাশ জুনিয়ার। সে অজয়কে উৎসাহ দেয় যে, অলকাকে যেন সে আপনার ক'রে নিতে চেষ্টা করে, অলকার অনুকূলে অনেক কথা অজয়কে বলে, আর আশ্বাস দেয় যে তারা দু'জন তা'কে এই কাজে প্রাণপণ সাহায্য ক'রবে। এই রকম ভাবে অজয়ের দিনের পর দিন কেটে যায়।

সে দিন সোমবার। অজয় আর আজ বাড়ীর বাইরে যায় নি। কি একটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে, হঠাৎ দেখতে পেলে একখানা মটর তার বাড়ীর সামনে এসে থামল—গাড়ী ঘুরিয়ে রাখতে বলে কল্যাণ ও এষা এসে ঘরে ঢুকল। অজয় উঠে এসে কল্যাণের হাত ধরে বল্‌ল—"প্রেম-সাগরে হাবু-ডুবু খেয়ে বুঝি অস্থির হ'য়ে পড়েছিলে—হঠাৎ এই হতভাগ্যের কথা মনে পড়ে গেল, তাই নিজে একলা না আস্‌তে পেরে এষাকেও কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে এসেছো বুঝি? দেখি, সূর্য্য আজ কোন দিকে উঠেছে?" বলে ব্যঙ্গপূর্ণ দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকাল। এষার দিকে চেয়ে দেখল তার গাল সিঁদুরের মত লাল হ'য়ে উঠেছে। তারপর অজয় দু'জনকেই নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। কল্যাণ ঠাট্টাচ্ছলে বল্‌ল, "দিনরাত অলকা অলকা ক'রে পাগল হ'লে চলবে না, আমাদের কথাও একটু মনে করতে হয়" ব'লে একটু হাসল, তারপর দম নিয়ে আবার বল্‌ল, —"যাক্ আসল কথাটি বলি। অনেক দিন থেকেই—তুমি বোধ হয় জান,—আমার ইচ্ছে ছিল একটু দেশ বিদেশে ঘুরে আসি। কিন্তু আজ কাল ক'রে আর যাওয়া হ'য়ে উঠে নি। সম্প্রতি অফিস থেকে একটা মোটা ছুটি পেয়েছি—মাস ছ'য়েকের জন্য, ইংলণ্ডে যাওয়া ঠিক করলাম—এষাকেও সঙ্গে নিচ্ছি।" "কি গো? বক্তৃতাটা শেষ কর না" এই বলে এষার দিকে কল্যাণ তাকাল। এষা বিনম্রভাবে বল্‌ল—"অজয় বাবু, কাল উনি আমাদের যাওয়ার ঠিক্‌ঠাক করেছেন—'পাশপোর্ট' আনান হ'য়ে গেছে—দয়া ক'রে কাল সকালে একবার যাবেন,—সকালে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ও বিকেলে গাড়ীতে উঠিয়ে দেবার নিমন্ত্রণ আপনার রইলো, বুঝলেন?"

অজয় চিন্তা ক'রতে ক'রতে উত্তর দিল, "আচ্ছা; তাহ'লে তোমরা কালই বোম্বে মেলে রওণা দিচ্ছ?" "আচ্ছা যাব" ব'লে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ল। অজয়ের মনের ভাব বুঝতে পেরে কল্যাণ বল্‌ল, "অলকার জন্যে আর ভাবতে হ'বে না, এষা সব ঠিক ক'রে এসেছে—অলকাকে বুঝিয়ে বলে। শুভ-বিবাহের পত্র দিতে ভুলোনা যেন।" "আচ্ছা, যেও" বলে দু'জনে গিয়ে গাড়ীতে বসল। গাড়ী দরজা অতিক্রম ক'রে চলে গেল। অজয় আর সেদিন কোথাও বেরোলো না। বিমর্ষ মনে ভাবতে লাগল অলকার কথা।

* * *

মাস খানেক পরের কথা। অধ্যাপক বোনার্জ্জি এতদিনেও ফেরেন্ নি। হাজারিবাগ থেকে কোন জরুরি কাজে তিনি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে এলাহাবাদ অঞ্চলে গেছেন—এই মর্ম্মে এক চিঠি পূর্ণিমার কাছে এসেছে। অজয় এখনও পূর্ণিমার কাছে দেখাশুনা করতে যায়—অলকার ওখানে আর বেশী বড় একটা যায় না—মন খারাপ। সেদিন কল্যাণের চিঠি এসেছে নিরাপদেই গিয়ে তারা পৌঁছেছে।

শনিবার। প্যাজায় জেনেট্ গেনারের নতুন বই দিয়েছে। পূর্ণিমা অলকাকে টেলিফোন ক'রে জানালে—"thrilling drama—দেখতেই হবে—ready হ'য়ে থেকো—"ছ"টার "শো"এ যাব—টিকিট বুক করতে পাঠিয়েছি—প্যাজায়।" সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে—সিনেমায় যাবার জন্যে গাড়ীতে ওরা দুজনে উঠেছে—হঠাৎ অজয় এসে হাজির—সে জিজ্ঞাসা ক'রলে—"কোথায় যাচ্ছ বৌদি"? "জেনেট্ গেনারের নতুন বই এসেছে "প্যাজায়" তাই দেখ্‌তে যাচ্ছি।" "যাবে? চলনা—অজয়? একলা দুজনে যাচ্ছি—তুমি গেলে বেশ enjoy করা যাবে।" পূর্ণিমা বল্লে।—অজয় মুখ তুলে অলকার পানে চেয়ে তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বল্লে—"না"। পূর্ণিমা আর বেশী পীড়াপীড়ি ক'রলে না,—তারা চ'লে গেল।

সিনেমা ভেঙ্গেছে। গাড়ীতে ছবির আলোচনায়ই তারা মশগুল। অলকা বলে উঠ্‌ল, "আমার একটি দৃশ্য এত ভাল লেগেছে সে আমি মুখে তা প্রকাশ করতে পারছি না—সে আর emotion না চাপ্‌তে পেরে ব'লে উঠ্‌লো "আচ্ছা ভাই, সে সিনটা, যেখানে চার্লস্ ফ্যারেল এসে জেনেট্ গেনারকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে দুটো জীবন্ত চুম্বন দিলে আর গেনার কি রকম অবিচলিতভাবে সেই চুম্বন দুটোকে অনুভব ক'রলে, কিরকম লাগ্‌ল বলত?" আনন্দের আতিশয্যে পূর্ণিমা চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—Super Excellent! Awfully Nice! My beloved! এই রকম ভাবে কত কথাই যে চলতে লাগ্‌ল, তার ইয়ত্তা নেই। হঠাৎ অলকার চমক ভাঙ্গল বাইরের দিকে তাকিয়ে। কি সর্ব্বনাশ—এ'ত চৌরঙ্গী দিয়ে গাড়ী যাচ্ছে না—এত যাচ্ছে একটা অন্ধকার রাস্তার ভেতর দিয়ে। চেঁচিয়ে উঠে সে বল্লে—"এই অর্জ্জুন সিং—কোথা দিয়ে গাড়ী নিয়ে যাচ্ছ"? কোন উত্তর নেই, গাড়ী তীরবেগে ছুটে চলেছে, ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে দেখতেই পূর্ণিমা ও অলকার মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল—কিন্তু দুজনেই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"কী সর্ব্বনাশ! এত অর্জ্জুন সিং নয়—অত অন্য একটা লোক গাড়ী ড্রাইভ

ক'রছে। অলকা আর নিজেকে সামলাতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠে বল্লে—"লাফিয়ে পড় পূর্ণিমা, হাঁ ক'রে দেখ্‌ছ কি? লাফিয়ে পড়—যা থাকে কপালে।" পূর্ণিমা স্থির-ধীর প্রকৃতির মানুষ—সে হতভম্ব হ'য়ে বল্‌লে—"পাগলের মত কথা ব'লো না অলকা, এখন লাফিয়ে পড়া মানেই মরা—সে শক্তি আমাদের নেই যা দিয়ে লাফিয়ে প'ড়ে বাঁচতে পারি, দেখা যাক না, কি করে—বেগতিক দেখ্‌লে যা কর্ত্তব্য করা যাবে'খন।" অলকা আর কোন কথা না ব'লে গুম্ হ'য়ে ব'সে রইল। খানিকক্ষণ এভাবে চলার পর, গাড়ীটা এসে দাঁড়াল একটা বড় বাড়ীর সামনে। তার আশে পাশে কোন বাড়ীর চিহ্ন নেই, সমস্ত রাস্তাটা নীরব, নিস্তব্ধ। হঠাৎ গাড়ীর দরজা খুলে গেল। একজন লোক বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে তাদের নামতে বল্লে—সে তাদের এই কথা ব'লে নির্ভর দিলে যে তাদের কোনরকম অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই, অগত্যা তারা দুজনে ভয়ে ভয়ে নেমে তাকে অনুসরণ ক'রলে একটা ঘরের ভেতর। ঘরটা আলোয় আলোকিত; একটা বুড়ী সেখানে ব'সেছিল—বুড়ীটা এসে একটা ঘর খুলে দিলে—লোকটা তাদের ঘরটার মধ্যে পুরে দিল—বাইরের দিক থেকে চাবি লাগিয়ে দিলে—তারপর চলে গেল। সে চলে গেলে বুড়ীটা অলকাকে তার ব্লাউজ্ খুলতে বললে। অলকা তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রতিবাদ ক'রলে—কিন্তু অচেনা জায়গায়, ও অসহায় অবস্থায় এরূপ সমীচীন নয় ব'লে পূর্ণিমা তাকে বারণ করাতে সে আর কোন অনুযোগ করলে না। বুড়ীটা ব্লাউজ নিয়ে দরজায় আঘাত করতেই তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল—আবার চাবি লাগান'র শব্দ শোনা গেল—সে চলে গেল। অলকা আর থাকতে পারলে না—কেঁদে ফেলে, বল্লে—"পূর্ণিমা, unbearable insult, এ রকম অপমান যদি আগে জানতাম [illegible] তখনই আত্মহত্যা ক'রতাম।" পূর্ণিমা নিরুত্তর—তার বুদ্ধি-শুদ্ধি বোধ হয় লোপ পেয়েছিল—সে জড়ের মত ব'সে রইল। এই অবস্থায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। হঠাৎ দরজায় শব্দ হ'ল খট্! খট্! খট্! চাবি ঘোরাবার শব্দ—দরজা খুলে ঢুকলো অজয়—তার হাতে অলকার ব্লাউজটা। দুজনে তার দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইল—যেন তাদের দেহটা রয়েছে দাঁড়িয়ে কিন্তু তার ভেতর প্রাণ নেই—অসাড়, নিস্পন্দ ভাব, অপলক দৃষ্টি। পূর্ণিমা চেঁচিয়ে উঠল—"অজয়! তুমি—তুমি এখানে—Riddle! না [illegible]—অজয় শুধু অলকার দিকে চেয়ে বল্‌লে—"অলকা, ব্লাউজটা পরে নাও, পরে হাত দিয়ে পূর্ণিমাকে আসতে ইঙ্গিত করলে। অলকা টলতে টলতে এগিয়ে এল—অজয়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো

তার চলন্‌শক্তি রহিত হ'য়ে গিছ্‌ল। অজয় অলকাকে বুকে ক'রে নিল, পুর্ণিমাও মন্ত্র-চালিতের মতন তাকে অনুসরণ করল। নিজের গাড়ীতে উঠে অলকাকে বসিয়ে দিতে যাবে এমন সময় দেখল তার দেহ কাঠ হয়ে গেছে—ঠাণ্ডা হিম—বরফের মত। অজয় বিচলিত হ'ল না—মুখে শুধু বল্‌ল 'অজ্ঞান' পূর্ণিমা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। "গাড়ীতে আরও স্পীড্‌ দাও অজয় বল্লে, সোজা 'Avenue Ridge'।" মিনিট্‌ সাতেকের মধ্যে গাড়ী এসে দাঁড়াল অজয়ের বাড়ীর সামনে। অজয় গাড়ী থেকে নাম্‌ল—অলকা আট্‌ ক'রে নিজেকে রেখেছে জড়িয়ে অজয়ের বুকের মধ্যে, অজয় তার নিজের বুকের শব্দ শুনতে লাগল—টিপ্‌! টিপ্‌! টিপ্‌! পুর্ণিমাকে বল্লে—"চল বৌদি? ভেতরে চল।" পুর্ণিমা নেমে চল্‌ল—অজয়ের মুখের দিকে তাকাল—কি সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি তার, প্রশান্ত মুখের চারিদিকে একটা মাধুর্য্য তার ফুটে উঠেছে—তার মুখই যেন বল্‌ছে আমি আজ 'বিজয়ী'—'বিজয়ী'। পূর্ণিমার মনে সর্ব্বদা একটা কথা তোলপাড় ক'রে উঠতে লাগল—"ভালবাসার জন্য মানুষ কি না ক'রতে পারে।" অলকাকে নিয়ে গিয়ে অজয় তার বিছানায় শুইয়ে দিল—বয়কে জোর গলায় অর্ডার দিল 'হট্‌ ব্যাগ'। কিছুক্ষণ পরে অলকা কতকটা সুস্থ হ'ল। তখন কেবলমাত্র একটি কথা তার মুখ দিয়ে বের হ'ল "অ—জ—য়!" অজয় বিছানার সামনে হাঁটুগেড়ে বস্‌ল—তার হাতখানি নিজের হাতের ভিতর নিল, বল্‌ল "অলকা,—অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন অলকা? এই যে আমি, তোমার কাছেই ব'সে আছি—একটু সুস্থ বোধ ক'রছ বোধ হয়"। আবার অস্ফুটস্বরে একটা কথা অলকার মুখ থেকে বেরিয়ে এল "অজয়"। পরক্ষণে অলকা চোখ মেলে চাইল—দেখল জলজলে দুটি চোখ তারই দিকে তাকিয়ে র'য়েছে। অলকা আস্তে আস্তে নিজের হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে অজয়ের হাতখানি নিজের বুকের উপর রাখল। হঠাৎ কি যেন একটা আতঙ্কে অজয়ের হাতটা দুরে সরিয়ে দিয়ে অলকা ব'লে উঠল—"ছি! ছি! অজয়, কি করছ—বাবা মা কি ভাব্‌বেন—ছি! ছি! তুমি চ'লে যাও—আমার চোখের সামনে থেকো না—চলে যাও এতে আমার অসুখ বাড়বে।" অজয় ঝুঁকে পড়ে বল্‌লে "একটু গরম দুধ খাবে অলকা? দুধ?—এই বয়।

"গেলে না! গেলে না! এখনও দাঁড়িয়ে আছ—তবে থাক—দেখ আমি কি রকম্‌ ভাবে মরি, আমি মরব—মরব" বলে অলকা পাশ ফিরে শুল। অজয় আর থাকতে পারল না এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেল্লে—"যাচ্ছি? কিন্তু কিন্তু? তুমি ত তুমি ত জাননা,—

বোঝনা—আমি তোমায় কত,—কত—ভালবাসি—" চোখ দিয়ে দর্ দর্ ধারে জল নেমে এল—ধীরে ধীরে অজয় সেখান থেকে চ'লে গেল।

দিন সাতেক পরের কথা। অজয়, অলকা, পুর্ণিমা তিন জনেই পুর্ণিমাদের বাড়ী চায়ের টেবিলে ব'সে—সেদিনকার ঘটনার কথা বল্‌তে বলাতে অজয় যা বল্লে তার সার মর্ম্ম এই :—পুর্ণিমা ও অলকা সিনেমার চ'লে যাবার পর অজয় যায় এক বন্ধুর বাড়ী। সেখান থেকে ফেরার পথে পুর্ণিমার গাড়ী হঠাৎ তার চোখে পড়ে এবং সে আরও লক্ষ্য করে সে গাড়ীর ড্রাইভার অর্জ্জুন সিং নয়—অন্য একজন। এতে তার মনে কেমন একটা সন্দেহ আসে। সে তারপর তার নিজের গাড়ী নিয়ে পুর্ণিমাদের গাড়ীকে follow ক'রে পুর্ব্বোল্লিখিত বাড়ীর কাছে এসে ব্যাপার কী জানবার জন্যে মোড়ে গাড়ীটা ঘুরিয়ে রেখে সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে। বন্ধ-করা একটা জানলার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পায় একটা লোক অলকার জামা দেখে কী যেন আঁকছে। তারপর তার দেখা হয় বুড়ীটার সঙ্গে। তাকে পুলিশের ভয় দেখাতে সে, যে ঘরে লোকটা অলকার জামা দেখে কী আঁকছিল—সেই ঘরের দরজা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। তারপর অজয় ঘরে ঢুকে লোকটাকে আক্রমণ করে—লোকটা প্রার্থনা করে যে আগে তার যা বলবার আছে তা শুনে নিয়ে সে তাকে যা খুসী ক'রতে পারে। লোকটা বলে, তার নাকি লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে মস্ত এক দরজীর দোকান আছে। দিন কতক আগে একজন মহিলা অলকার সুন্দর ব্লাউজটা দেখে ও রকম একটী করাতে ইচ্ছা করে,—সে যত টাকাই লাগুক না কেন। কিন্তু অলকার জামা না হ'লে কী করে সে মহিলাটির জামা তৈরি কর্ব্বে। তাই বাধ্য হ'য়ে তাকে এই উপায় অবলম্বন ক'রতে হ'য়েছে—অর্জ্জুন সিংএর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে। একজন ভদ্রমহিলার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করার জন্য যারকে মারতে গিছল—সে তার পায়ে পড়ে মাপ চেয়েছে এবং বলেছে যে সেই অপরাধজনিত কাজ নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে ক'রেছে। তারপর অজয়, অলকা ও পুর্ণিমার মধ্যে যে ব্যাপার ঘটেছিল—কি করে ওদের অজয় উদ্ধার ক'রেছিল—তা আগেই বলেছি।

গল্প শেষ ক'রে অজয় দেখে অলকার মুখ জবা ফুলের মত লাল হ'য়ে উঠেছে—এবার আসল অজয়ের বিদ্রূপ করার পালা। সে বল্লে—"খুব সাহসিকতা তো দেখালে ঐ দর্জ্জির পাল্লায় পড়ে, আমি যদি না দেখতে পেতুম তোমাদের কী হোতো বল দেখি?" একটু মুচকি হেসে অলকাকে বললে—"তোমার না জীবন পথে চলবার—যাক্‌গে—আমি উঠি এখন, বৌদি। আর অলকা, আসছে সপ্তাহে তোমাদের ওখানে একবার যাব—দরকার আছে—আচ্ছা—good-bye।" অজয় চলে গেল।

আবার এক সপ্তাহ কেটে গেল। অজয়ের গাড়ীখানা অলকাদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে নেমে অজয় অলকার ঘরের কাছে এসে বল্লে "অলকা—আস্‌তে পারি কি?" "স্বচ্ছন্দে" অলকা উত্তর ক'রলে। এমন সুন্দর মিষ্ট গলা অজয় অনেকদিন শোনেনি। একটা অজানা পুলকে তার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। তার কেবলি মনে হতে লাগল, "যে জিনিষের আশা সে করেছে—সে কী সে পাবে?" সংশয় ও আনন্দে তার সারা শরীর কেঁপে উঠল। সোজা ঘরের ভেতর ঢুকে—কোনও রকম ভূমিকা না করে আবেগের উচ্ছ্বাসে সে বলে ফেল্‌ল—"অলকা আমি তোমাকে ভালবাসি—তোমাকে আমি চাই—তুমি ত জাননা, তোমার জন্যে আমি কি না ক'রেছি—প্রতিদানে পেয়েছি কি জান—বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনা—ওগো, কথা কও—বলো—নিষ্ঠুরের মত আমার জীবনটাকে ভাসিয়ে দিও না।"—অজয় আর পার্চ্ছে না—তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে, দেরী আর সইছে না। এবার আর অলকা স্থির থাক্‌তে পারল না—সে কেঁদে ফেল্ল—বলে—"অজয়, আমার আগেকার অপরাধ ক্ষমা কর ; তোমার কথা এখন পদে পদে উপলব্ধি করছি—তুমি ঠিকই বলেছিলে—

"নারীরা বড় দুর্ব্বল" তার প্রমাণ আমি সেদিন পেয়েছি—আর তুমি না থাকলে………"

তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাকে বুকের কাছে টেনে আনলে অজয়—অলকা বাধা দিল না! অজয় বল্লে—"ক্ষমার কথা বলছ অলকা! ক্ষমা তো তোমাকে আমি অনেক দিনই করেছি অলকা—না হ'লে মিঃ ঘোষের কাছে তোমাকে চাইতে Propose করি?" অলকা লজ্জায় নিরুত্তর রইল।

"তা হলে অলকা, সত্যিই জীবন-যাত্রার একজন সঙ্গীর প্রয়োজন তোমার হল" বলে অজয় হাস্‌তে হাস্‌তে অলকার গালে প্রথম প্রেম-চুম্বন করলে তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিছুদিন পরে……………রাসবিহারী এভিনিউস্থিত বিরাট অট্টালিকার দোতালার ঘরে—দুইটি মাত্র প্রাণী—একটি অজয় অপরটি অলকা। অজয় অলকার কোলে মাথা দিয়ে নিবিষ্টচিত্তে অলকার গান শুনছে—অপূর্ব্ব প্রণয়লীলা—গানের কয়েকটি লাইন গানের সুরে ভেসে ভেসে আস্‌ছে—"আমার সকল কাঁটা ধন্য কোরে ফুটবে গো ফুল ফুটবে"—দূরে—বহুদূরে এই সুরের ঝঙ্কার উন্মত্তের মত ছুটে চলেছে………… *

---

* ফরাসী সাহিত্যিক পিয়েরী হনিজের ছায়া-অবলম্বনে লিখিত।

ভারতের ১৯৩৩ সালের বীমার অবস্থা।

বর্ত্তমান অবস্থা:—

১৯১২ সালের ভারতীয় জীবন বীমা কোম্পানীর আইন এবং ১৯২৮ সালের ভারতীয় বীমার আইন অনুযায়ীতে যে সব কোম্পানী রেজেষ্ট্রীকৃত করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ৩১৯, এই সংখ্যার মধ্যে ১৬৯ ভারতীয় কোম্পানী। তন্মধ্যে বোম্বেতে—৬৮, বাংলাতে—৩১, মাদ্রাসে—২৬, পাঞ্জাবে—১৯, দিল্লীতে—৯, বিহার উড়িষ্যাতে—৫, আজমীর মারওয়ারে, মধ্য প্রদেশে ও যুক্ত প্রদেশে ৩টী করিয়া, আসাম ও ব্রহ্মদেশে ১টী করিয়া কোম্পানী আছে। ১৫০টী অভারতীয় কোম্পানী সমূহের মধ্যে ইউনাইটেড্ সাম্রাজ্যে—৭১টী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অধিকৃত স্থানে ও কলোনিতে—৩১টী, ইউরোপে—১৮, আমেরিকাতে—১৬, জাপানে—৯টী জাভাতে ৫ গঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় কোম্পানী গুলি বেশীর ভাগই জীবন বীমা কার্য্যে লিপ্ত আছে। ইহাদের সংখ্যা ১২৪টী, ২৯টী কোম্পানী জীবন বীমার সাথে অন্যান্য বীমাও করিয়া থাকে, বাকী ১৬টী জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য বীমা করিয়া থাকে, এই সব কোম্পানী গুলি গভর্ণমেণ্টের চাকুরীর সাথে জড়িত আছে। যথা ভারতীয় ডাক বিভাগের জীবন বীমার ব্যবস্থা। এই সকল কোম্পানীর বিষয় এ্যাকচুয়ারীর তালিকা বহির্ভূত।

অভারতীয় কোম্পানী সমূহের মধ্যে বেশীর ভাগই জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য প্রকারের বীমাতে নিযুক্ত আছে। এই প্রকারের ১৫০টী কোম্পানীর মধ্যে ১২৬টী কোম্পানীই জীবন ছাড়া অন্যান্য বীমা করিয়া থাকে, ১১টী জীবন বীমার সাথেই অন্যান্য বীমা করিয়া থাকে। এই প্রকারের ২৪টী কোম্পানীর মধ্যে ১৬টী যুক্ত সাম্রাজ্যে গঠিত, ৬টী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকৃত স্থানে গঠিত ও ১টী জার্ম্মাণীতে, ও ৪টী সুইজারলেণ্ডে গঠিত।

নূতন কোম্পানী:—

আলোচ্য বর্ষে বীমার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য ৩০টী কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই ৩০টীর মধ্যে ৮টী বোম্বেতে, ৫টী বাংলাদেশে, ৪টী করিয়া মাদ্রাজে ও পাঞ্জাবে, ৩টী বিহার ও উড়িষ্যাতে, ২টী করিয়া দিল্লী ও যুক্ত প্রদেশে ও ১টী করিয়া মধ্য প্রদেশে ও আজমীর মারওয়ারে অবস্থিত। হিসাব পরিক্ষকের হিসাব হইতে বুঝা যায় যে ২৫ বৎসরের উর্দ্ধস্থিত যে সব কোম্পানী বীমার কার্য্য করিতেছে ঐ সব কয়েকটী পুরাতন কোম্পানী ছাড়া ১০ বৎসরের স্থায়ী কোম্পানী অংশীদারদের কোন প্রকার লাভাংশের ভাগ দিতে পারে নাই।

ভারতবর্ষে ১৯৩২ সালে নূতন জীবন বীমার পলিশির সংখ্যা ১৩৯ হাজার। এবং ১৩৯ হাজার পলিশি ২৭-২।৩ কোটী টাকা, ইহাদের প্রিমিয়ামের আয় দেড় কোটী টাকা। এই মোট পলিশির সংখ্যার মধ্যে ১১৩ হাজার পলিশি ভারতবর্ষীয় কোম্পানীর। এই সমস্ত পলিশি ১৯ কোটী টাকার এবং ইহাদের প্রিমিয়ামের আদায় টাকার আয় এক কোটী টাকা। নূতন বীমার আয়ের অংশের মধ্যে ব্রিটিশের ৩-২।৫ কোটী টাকা; কলোনী সমূহের ৫ কোটী টাকা এবং একমাত্র জার্ম্মাণী কোম্পানীর ২।৫ কোটী টাকা। ভারতবর্ষীয় কোম্পানী সমূহের নূতন পলিশির গড়পরতা টাকার পরিমাণ ১,৬৭৪ টাকা এবং অভারতীয় কোম্পানী সমূহের পরিমাণ ৩,৩৭৬। ইহা

হইতে বুঝা যাইতেছে যে অভারতীয় কোম্পানী সমূহের আয় আমাদের দেশীয় কোম্পানী হইতে অনেক অংশে বেশী। ইহা সত্য যে বিদেশী কোম্পানী বহু পূর্ব্ব হইতেই আমাদের দেশে বীমার কার্য্য চালনা করিতেছিল। ভারতে বীমার গোড়াপত্তন খুব বেশী দিনের কথা নয়। সুলক্ষণ এই যে, ক্রমেই ভারতীয় কোম্পানীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে ও লোকেও সহজেই দেশী কোম্পানীতে জীবন বীমা করিতেছে।

ভারতীয় জীবন বীমার অফিস সমূহ :—

ভারতীয় জীবন বীমা এ্যাক্ট্ অনুযায়ী যে সমস্ত কোম্পানী গঠিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা মোট ১৫৩। ইহাদের মধ্যে ১১৬টী মালিকত্ব সত্বের ও ৩৭টী মিউচুয়েল সত্বের। এই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ৩৭টী কোম্পানীর মধ্যে ১৭টী ১৯১২ সালের এ্যাক্টের পূর্ব্বেই গঠিত হইয়াছিল এবং বাকী ২০টী ১৯১২ সালের পরে গঠিত। প্রথম শ্রেণীভুক্ত ১১৬টী কোম্পানীর মধ্যে ১৭টী ১৯১৩ সালের পূর্ব্বেই গঠিত হইয়াছিল এবং বাকী ৯৯টী সেই সময় হইতে গঠিত।

বিদেশে ভারতীয় কোম্পানী :—

কতক কতক দেশী কোম্পানী বিদেশে উহাদের কাজ আরম্ভ করিয়াছে। ইহা একটা সুলক্ষণ। ইহাদের কার্য্যাবলী বেশীর ভাগ ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকাতে ও পূর্ব্ব দেশীয় স্থানে নিবদ্ধ।

১৯২৩ সাল হইতে নূতন কার্য্য :—

১৯৩২ সালে দেশীয় কোম্পানী সমূহের ১৯-২১৩ কোটী টাকার নূতন জীবন বীমার কার্য্য করা হইয়াছে। গত কয়েক বৎসরের নূতনজীবন বীমার টাকার পরিমান হইতে ২ কোটী টাকার বেশী কাজ হইয়াছে।

দেশীয় কোম্পানী সমূহের আয় :—

প্রতি বারই দেশী কোম্পানীর মোট আয় পূর্ব্ব বৎসরের আয় হইতে এক কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে যে তালিকা দেওয়া গেল তাহা হইতে পাঠকেরা দেশী কোম্পানীর বৎসরের আয়ের তুলনা করিতে পারিবেন।

লক্ষ টাকা			সাল
২,৪৯	...	...	১৯২৩
২,৯০	...	...	১৯২৪
২,৯৮	...	...	১৯২৫
৩,৩১	...	...	১৯২৬
৪,২২	...	...	১৯২৭
৪,২৩	...	...	১৯২৮
৪,৯১	...	...	১৯২৯
৫,৪০	...	...	১৯৩০
৫,৮৭	...	...	১৯৩১
৬,৪৪	...	...	১৯৩২

প্রভিডেণ্ট ইনসিওরেন্স সোসাইটিজ্ :—

উপরে আলোচিত বীমা কোম্পানী ব্যতীত প্রভিডেণ্ট কোম্পানীও আমাদের দেশে এক প্রকার বীমার কার্য্য চালাইতেছে। ৩৬৯ প্রভিডেণ্ট কোম্পানীর মধ্যে ; ২২১টীই বাংলা দেশে, ৫০টী বোম্বেতে ও ৬১টী মাদ্রাজে ও বাকী কয়েকটী ব্রহ্মদেশ শুদ্ধ অন্যান্য প্রদেশে আছে। ১৯৩২ সালে তাহাদের মোট ফলের পরিমাণ ১৮ লক্ষ টাকা এবং তাহাদের মোট আয়ের টাকা ১২ লক্ষ টাকা। ১৯১২ সালের প্রভিডেণ্ট সোসাইটি এ্যাক্ট অনুযায়ী এই সব কোম্পানী গঠিত। প্রায় ২৫ বৎসরের পূর্ব্বে এই সব কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১২০০ কিন্তু যখন ১৯১২ সালের এ্যাক্ট পাশ হইল তখন ঐ সংখ্যার মধ্যে অল্প কয়েকটী মাত্র বাকী রহিল।

* * *

গত ৬ই জানুয়ারীতে মিঃ বিমল ঘোষ বি, এস্ সি (লণ্ডন); বি, কম (লণ্ডন) ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইনষ্টিটিউট এ "Problem of Bengal's Smaller Industries" নামক একটী সারগর্ভ বক্তৃতা পাঠ করেন। তিনি বাংলার নানাপ্রকার কুটীর শিল্পের বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করা হইলে পর মিঃ ঘোষ নানাপ্রকার প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দেন। ইনষ্টিটিউটের অনেক সভ্য ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

* * *

লক্ষ্মী ইনসিওরেন্সের বাংলাদেশের শাখা বিভাগের কার্য্যভার শ্রীযুক্ত শচীন বাগচীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাগচীর কর্ম্মকুশলতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। তিনি যুবক এবং আমরা আশা করি তিনি তাঁহার নূতন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কর্ম্মকুশলতার পরিচয় দিবেন। আমরা তাঁহাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

* * *

লক্ষ্মী কোম্পানীর বাংলা-শাখার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত কে, বি, মুখোপাধ্যায় ইণ্ডিয়া ইকুইটেবলে [illegible]ন করিয়াছেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ [illegible]মা কর্ম্মী এবং লক্ষ্মী ইনসিওরেন্সের উন্নতি[illegible] তিনি সদাই ব্যাপৃত থাকিতেন। তি[illegible] নূতন স্থানে যাইয়া তাঁহার অভিজ্ঞতার [illegible]রিচয় দিবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

বভ্রুবাহন বটব্যাল

দুঃখ এনেছে রহস্য

দিন আসে, রাত আসে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। তারা আসে, তারা যায়। কে খবর রাখে কখন রাতের পর দিন আসে, দিনের পর রাত আসে। আকাশের ওই ভেসে বেড়ানো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে দিনের আলো কখন লুকিয়ে গিয়ে অন্ধকারের নিবিড় বাষ্প পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেয় কে জানে। এমনিই রাত্রি নামে হলিউডের বুকে। আঁধারে হারিয়ে যাওয়া কোনো গোধূলির সন্ধান হদিশে ও আভাষে মেলে না। এরই মত পরিচয় অপরিচয়ের রহস্যে ঢাকা গার্বো অতীন্দ্রিয় লোকের দেবী।

সেই অনেকদিন আগে, সে এক অতি অপরিচিত দিনে, অতি সামান্য, অতি সাধারণ গার্বোকে মুরিজ ষ্টিলার সুইডেন থেকে নিয়ে আসেন হলিউডে। সে দিনের সেই কচি, সরল গার্বোর সঙ্গে আজকের মোহ মাখা কল্প লোকের গার্বোর কোনো পরিচয় নেই। সেদিনে গার্বোর সঙ্গে 'গর্ব্ব'র এমন মিলও কেউ খুঁজতে চাইতও না। তেমনি দিনে,—ঠিক তেমনি দিনেই গার্বো ভালবেসেছিল 'মুরিজ ষ্টিলার'কে। সেই তার ছবির প্রথম নায়ক। সেই তার প্রথম প্রিয়তম বাস্তবে এবং পর্দ্দার বুকেও। গার্বো আজও তা ভুলতে পারেনি। নিস্তব্ধ নির্জ্জন ঘরে বসে কোনো কাজের মধ্যে, কোনো অতর্ক মুহূর্ত্তে তাঁর জন্যে গার্বোর চোখে জল আসে কিনা তা আমরা জানি না, মুরিজ ষ্টিলারও জানেন'। মুরিজ আজ পরপারে। সুদূর অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে অসংখ্য কবরের মাঝখানে সেখানকার বিস্মৃতির মানুষগুলোর মতই পাথরের বিছানায় শুয়ে আছে। একথা আমরা জানিনা, খোঁজও রাখিনা আমরা রহস্যময়ী গার্বোকে চিনতে যাই, তার খবর রাখতে যাই।

গ্রেটা গার্বো

গার্বো জন গিলবার্টকে ভালবেসেছিল সত্যি। মুরিজ ষ্টিলারের পর ওই একজন লোকই যাকে সত্য সত্যই গার্বো ভাল বেসেছিল। কিন্তু সে শুধু রহস্যময়ীর রহস্য লোকের খাস মহলে প্রবেশ করবার পূর্ব্বাবস্থায়।

তবু সে মুরিজকেই ভালবাসত, ভালবাসে।

আজ মুরিজ বেঁচে নেই নতুন গার্ব্বোকে দেখবার জন্যে। আজকের গার্ব্বো, সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনময়ী প্রকৃতি—কুয়াসাচ্ছন্ন সীমাহীন তুষার প্রান্তর—জলাশয়ের অনন্ত প্রাণের ভাষাহীন কাকলী। বর্ত্তমান জগতের বিস্ময়কর কল্পনার প্রতিমুর্ত্তিকে আজ মুরিজও হয়ত দেখতে পেত না। কে জানে মুরিজের প্রেমই গার্ব্বোকে রহস্য লোকের সন্ধান দিয়েছে কিনা।

কারণ তাঁর মৃত্যুতেই গার্ব্বোর জীবনে এই নিস্তব্ধতা এনে দিয়েছে। গার্ব্বো নিজের দুঃখকে অন্তরের অতি নিভৃত মণিকোঠায় অর্গলবদ্ধ করে রেখেছেন। মানুষ শুধু ধারণা করে' নিতে পারে যে তাঁর দুঃখের মধ্যে কতখানি অনুশোচনা মিশিয়ে রয়েছে। গার্ব্বো তাদের সঙ্গে মিশতে পারেন না—যারা হাসে, কথা বলে ;—যারা ভুলে যায়,—তাঁর কাছে পৃথিবী অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে আছে, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রের আলো তাঁর কাছ থেকে চিরকালের জন্য চলে গেছে।

বর্ষার মুখর সন্ধ্যায় স্তিমিত অন্ধকারে বারিধারার সঙ্গে তাঁর চোখে জল আসে—ধরার আকাশ বাতাস কেঁদে ওঠে। বাতায়ন তলে গার্ব্বোর মন ক্যালিফোর্ণিয়ার 'পপিসের' চারার ওপর দিয়ে, সুদুর বিস্তৃত মহাসাগর্ পার হয়ে, সুইডেনের সবুজ ক্ষেত ডিঙ্গিয়ে সেখানে কাটিয়ে আসা গত দিনের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে। এইই গার্ব্বো—রহস্যময়ীর আসল পরিচয় এইই।

ভনষ্টার্ণবার্গের নূতন আবিষ্কার

ভনষ্টার্ণবার্গ নতুন ছবি পরিচালনা ক'রেছেন 'কার্ণিভাল ইন স্পেন'। স্পেনের কার্ণিভালে যে দুজনকে বেশী দেখাবেন তাদের একজনের নাম সকলের জানা, জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মার্লিন ডিয়েট্রিচ অপর জন পর্দ্দার বুকে নবাগত সিসিল রোমারো। এদের পরিচালনা করে তিনি ক্ষান্ত হননি, ক্যামেরার হাতলও ঘোরাচ্ছেন। সেই সঙ্গে আলোকছায়ার পরীক্ষাও চলেছে। ভন ঠিক করেছেন সেটে রঙ হবে কালো, সাদা আর ধূসর বর্ণের তৈরী, এতে নাকি আলো ছায়ার রেখা বিভাগ খুব পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট হবে। এটা হলে, ভন একটা নতুন জিনিষ আবিষ্কার করলেন তা স্বীকার করতেই হবে। বিষয়টা এদেশের ক্যামেরাম্যানদের জেনে রাখা ভাল।

কনি বেনেটের নতুন চুক্তি

বছরখানেক আগে পৃথিবীর লোক জানত কনির আয় হচ্ছে সপ্তাহে ছ হাজার পাউণ্ড। কিন্তু আজকের দিনে ক'জন চিত্রামোদীর জানা আছে এখন তিনি পান কত। সে কথা আমরাও বলতে পারলাম না। তখনকার দিনে আয়ের জয় ঢাক বাজিয়ে নামের প্রচার করা হত কিন্তু, আজকে এই অর্থ সমস্যার দিনে সেকথা তাঁরাও বলা বন্ধ করেছেন কাজেই আমরাও বলতে পারলাম না। তবে এইটুকু খবর পেয়েছি যে কনি নাকি মেট্রো গোল্ডউইনের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। প্রথম বছরে তাঁর চল্লিশ সপ্তা কাজ করতে হবে আর দু'বছরের এক বছর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ হবে। কিন্তু এই অমূল্য সময় আর তাঁর চিত্ত চমকহারী রূপের জন্যে তিনি যে কত পাবেন না পাবেন তার খবর পাওয়া যায়নি

হাঁসের অত্যাচারে সুটিং বন্ধ

বেচারী—অতি বেচারী মার্লিন—সব সময়েই একটা না একটা বিপদের জন্য তাকে তৈরী থাকতে হয়। সেদিন "Carnival in Spain"এ ছবি তোলা প্রথম আরম্ভ হয়েছে। প্রথমেই মার্লিনকে অভিনয় করতে হবে একটা হাঁসের সঙ্গে। মার্লিন মন প্রাণ দিয়ে অভিনয়ের কাজে হাত দিলেন। হাঁসও মন প্রাণ দিয়ে জামার বোতাম থেকে আরম্ভ করে তাঁর সিল্কের সুন্দর পোষাকটার সব জায়গায় ঠোঁট লাগাতে সুরু করলে। ফলে, আধ ঘণ্টার মধ্যে মার্লিনের পোষাকের কোন স্থানটা আর ছিঁড়তে বাকী রইল না। হৈ হৈ রব পড়ে গেল। হাঁসও এইবার তাঁকে ছেড়ে অতর্কিতে এ্যাট উইলকে ঠোকর মারতে সুরু করলে। সব যখন থামল, তখন দেখা গেলো চল্লিশ ফুট ফিল্ম আর পঞ্চাশ পাউণ্ডের একটা আলো নষ্ট হয়েছে। কাজেই কর্ত্তারা সেদিনকার মত ছবি তোলা বন্ধ করে হাঁসকে ঠিকমত পরিচালনা করার মত লোক খুঁজতে লেগে গেলেন। সেদিন ছবি তোলা বন্ধ করে তাঁরা ভালই করেছিলেন, শুনেছি, হাঁসটা এত নিষ্ঠুর যে নাগালের কাছে কারোর হাত পা থাকলে তাতেও ঠুকরে মাংস তুলে নেয়। যদি এমনিই হোত বিশ্বের কত মৌন আত্মা মার্লিনের জন্য কেঁদে ককিয়ে উঠত কে জানে।

খুচরো খবর

১। পল লুকাস মেট্রো গোল্ডউইন মায়ারের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন।

২। বেটি ডেভিস 'দি গ্রীণ ক্যাট'-এ নামছেন।

৩। মেরি পিকফোর্ড এক বছরের জন্য নাকি প্লেজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

৪। জ্যাকি কুপারের বড় ইচ্ছে সে নাকি মোটর সাইকেল পুলিস হয়।

৫। মায় ওয়েষ্ট সমুদ্র-যাত্রা ভালবাসেন না।

৬। ফে রে এক বছরে ষোল খানা ছবিতে কাজ করেছেন।

৭। লিলিয়ান হার্ভের নতুন ছবিতে ষোলটা দেশের লোক দেখা যাবে।

৮। রোনাল্ড কলম্যান আর জেন বাক্সটার-এর আসপাশে প্রজাপতি ঘুরছে। লোকে যা সন্দেহ করে, জেন, তা অস্বীকার করে। তবে কি রোনাল্ডের এক তরফা।

= উপন্যাস =

উচ্ছৃঙ্খল

শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন প্রত্যূষে নিখিলনাথ নয়ন জলে পুত্রকে বিদায় দিলেন। সে কল্‌কাতা যাত্রা করলো। তার পিতার দেওয়া অনুরোধ-পত্রখানি সে খুব যত্ন করে ট্রাঙ্কের ভিতর রেখেছিল। নবীন আশা ও আনন্দ নিয়ে পুত্র কল্‌কাতায় চল্‌লো।

সে যখন কল্‌কাতায় পৌঁছলো তখন সবেমাত্র কর্ম্ম ব্যস্ততা আরম্ভ হয়েছে। সে একখানা রিক্‌সা ভাড়া করে ভবানীপুরের দিকে যাত্রা করলো।

রোদের সোণালি আভা ধীরে ধীরে নাম্‌ছে। প্রাচীর দেউলে কনককিরণের লুকোচুরি খেলা। আকাশে লাল নীল শুভ্র রেখা। স্বচ্ছ চিত্র-পট, পরিষ্কার। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। রিক্সাওয়ালা আনন্দের সঙ্গে চল্‌ছে। রসা রোডে রিক্সা পৌঁছলো। সে রিক্সাওয়ালাকে গাড়ী বামদিকের গলিতে ঢুকে যেতে বল্‌লো।

অখিল বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। অরুণ তাঁকে চিন্‌তো না। সেখানে পৌঁছে বল্‌লে: এটা কি অখিল বাবুর বাড়ী? অখিলবাবু আগন্তুকের আপাদ মস্তক লক্ষ্য করে বল্‌লেন, হ্যাঁ, কেন?

অরুণ বল্‌লে—বলছি।

রিক্সাওয়ালাকে জিনিষ নামিয়ে দিতে আদেশ দিয়ে অরুণ বল্‌লে: আমাকে আমার বাবা নিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

—নিখিলের সঙ্গে অখিলের বহুদিনের পরিচয়। একসঙ্গে পড়েছেন। দু'জনের খুব ভাব। তিনি পরিচয় পেয়ে অরুণকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

রিক্সাওয়ালা অরুণের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

অখিল তার চাকরকে ডেকে তার বিছানাপত্র বাড়ীর ভিতর পাঠিয়ে দিলেন।

অখিলের স্ত্রী কনকপ্রভা বাইরে এসে অরুণকে দেখতে পেয়ে অন্দরে প্রবেশ করছিলেন। অখিল তাঁকে ডেকে বল্‌লেন: তুমি চলে যাচ্ছ কেন? এ তোমার নাতি।

তিনি কাছে এলেন। অরুণ তার পদধূলি গ্রহণ করলো। অখিল পত্নীকে বল্‌লেন: এ হচ্ছে; নিখিলের ছেলে।

ওঃ—গৃহিণী একবার তার দিকে চাইলেন্। বল্‌লেন: বসোনা দাদা এখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

অখিলের স্ত্রী অন্দরে ঢুকে পড়লেন। অখিল হাত মুখ ধু'তে চলে গেলেন। অরুণকে বল্‌লেন: তুমি এখানে তোমার কাপড়চোপড় ছাড়।

অরুণ তাঁদের এ ব্যবহারে খুসী হলোনা। একজন আগন্তুক বসে আছে আর গৃহের কর্ত্তা-কর্ত্রী নিজের কাজে চলে গেলেন। সে ট্রাঙ্ক খুলে তার বাবার চিঠিখানি বা'র করে নিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই অখিল ফিরে এলেন। সে তাঁর হাতে চিঠিখানি দিয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অখিল চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করে বল্‌লেন: বেশ তো, আমার এখানে থাক্‌বে। আমার মেয়েটারও পড়ার একটু সাহায্য হবে।

কনকবালা এসে তার জিনিষ পত্তর একখানি সুসজ্জিত কক্ষে রাখতে লাগলেন। তাঁর আদেশে সে তাঁর সঙ্গে সে ঘরে প্রবেশ করে নিজেই তার জিনিষগুলি গুছিয়ে রাখতে গেলো।

কনকবালা বল্‌লেন: তুমি অনর্থক কষ্ট করছ কেন? আমিই সব ঠিক করে রাখছি। তুমি ততক্ষণ হাত মুখ ধুয়ে এসো। রাতেই তো এসেছো। তারপর খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমোও।

সে হাত মুখ ধুয়ে এলো। তাঁর কন্যা অনুপমা তাকে চা এনে দিল। যাবার সময় একটা ছোট নমস্কার করে যেতেও ভুল্‌লোনা। এই অনিন্দ্য-সুন্দরী ষোড়শী বিদ্যুৎঝলকের মতো তার চোখের সামনে এসে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

.........সে সেখানে স্থান পেলো। কনকবালা তাকে তার নিজের সন্তানের মতো আদর করতে লাগ্‌লেন।

বন্দীর পাশে যেমন মুক্ত বাতাস বিষাদময়, আজ এই অষ্টাদশ বর্ষ পরে এই স্বাধীন জীবন-যাত্রাও অরুণের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠল। এতদিন সে পিতার তত্ত্বাবধানে ছিল। এখন সে মুক্ত,—স্বাধীন। সময় যেন আর কিছুতেই কাটে না। মাঝে মাঝে অনুপমাকে পড়া বুঝিয়ে দেয়। তবুও যেন সময়ের শেষ হয় না।

কিন্তু, এই সময় কাটাতে পারা যায় না এমন নয়। সে কল্‌কাতা এসেছে অনেকদিন আগে। কিন্তু কল্‌কাতা সহর ভাল করে দেখবার সুযোগ তার হয়নি। সে রাস্তায় ঘুরে সব যায়গা দেখ্‌তে লাগল। সারাদিন এমনিভাবে কাটে। রাত্রে থিয়েটার দেখে।

কনকবালা কিছু বলেন না। অখিলকেও তার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না।

তার বাসায় আসতে দেরী হলে কনকবালা বল্‌তেন: ছেলে মানুষ, নতুন কল্‌কাতা এসেছে। এদিক্‌ ওদিক্‌ ঘোরাফিরা করবেই তো। দেশ থেকে এসে কল্‌কাতার সহর একটু আশ্চর্য্য লাগবেই তো। তা' দু'এক দিন ঘুরে ফিরে নিক্‌। তারপর ঠিক হয়ে যাবে।

অখিল কিছুই বলেন্‌ না।

অনুপমার গৃহ শিক্ষক নেই। তাকে পড়ানোর ভার পড়লো অরুণের ওপর।

অরুণও সহজে রাজী হলো। তবু যে সময় কাটেনা। জোয়ারের জল কী বাঁধ দিয়ে ঠেকানো যায়। পূর্ণিমায় যেমন নদীর জল উচ্ছ্বসিত পূর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি অরুণের মন একদিন দুর্ণিবার চঞ্চল হয়ে ওঠলো।

তার মনে হলো অনিমার কাছে ছুটে যাবে। মন বিদ্রোহী হয়ে গেল। আবার তার মনে পড়ে গেল তার পিতার কথা— বিদায়ের দিনের সেই ব্যথাতুর মুখখানি।— তারপর আবার পরক্ষণেই অনুপমার হাস্য মধুর মুর্ত্তি তার চোখের সামনে ভেসে ওঠল।

উচ্ছ্বসিত নদী যেমন নিপুণতার গুণে কিছুক্ষণ আঁট বেঁধে রাখতে পারলে, অল্পক্ষণ পরেই ভাটার টানে সব জল নিমেষে শুকিয়ে যায়—তেমনি উদ্বেলিত চঞ্চল হৃদয় নিয়ে অরুণ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে, যদি তার প্রবৃত্তি দমন হয়!

সে তার মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। মন তাকে ছুটে নিয়ে যেতে চায়। সে রাজী হয় না।

অরুণ কাপড়চোপড় নিয়ে বা'র হয়ে যাচ্ছিল, পথের সামনে অনুপমা।

রাত বেশী হয়নি। জনস্রোত তখনো কমেনি। কার্য্যব্যস্ততা সারা হয়নি। জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী। অনুপমা বল্‌লে: অরুণবাবু আপনি কোথায় যাচ্ছেন?—সে নিরুত্তর। অনুই তো আজ তার গমনে বাধা দিল। তার ওপর খুব বেশী রাগ হলো— আবার যখন তার মনে হলো—সে আজ কত বড় বিপদ থেকে পরিত্রাণ করেছে, তখন কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে গেল।

অরুণ বললে: কৈ—না। একটু বেড়াতে যাচ্ছিলাম।—এই এখনই তো বেড়িয়ে এসেছেন। আবার বেড়াতে যাবেন কেন? অসুখও করতে পারে। অনু তার দিকে সলজ্জ দৃষ্টিক্ষেপ করে আছে।

ইতঃপূর্ব্বে অনুপমা আর কোনদিন অরুণের কাছে সহানুভূতির কথা বলেনি। অবশ্য অরুণ চায়ওনি। কারণ, যে দুর্দ্দমনীয় পিপাসা নিয়ে তার জন্ম—তার সঙ্গে সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটলে হয়তো একটা অপ্রীতিকর ব্যাপারও ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু মানব মন তো চঞ্চল। পদ্ম পত্রের নীরেরই মতো। সামান্য-কারণেই বিচলিত হয়ে পড়ে।

অরুণ ভাবলে—অনুপমা নিশ্চয় তার প্রতি অনুরক্তা। নতুবা সে কেন এমন কথা বলবে? তাকে সহানুভূতি জানাবে কেন?—

এইতো আমাদের সমাজ! নারী পুরুষের বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করতে চাইছে, আর সে ভাবছে—সে তার প্রতি আসক্তা। তারি সামনে অত্যাচার অনাচারের স্রোত বয়ে যাক্‌। আর সে চুপ করে দেখুক— তবেই তার চরিত্র মহৎ।

অরুণ তো ছাড়বার পাত্র নয়। সে বল্‌লে: যৌবন তো; বুঝতেই তো পারো। যৌবনের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে এম্‌নি করে তোমারই মতো রূপসীর সামনে অবিচলিত অবস্থায় কি থাকা যায়? কাজেই সেই উদ্দাম বাসনা তৃপ্তির জন্যই—

অনুপমা এই উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে আগে থেকে অরুণের কথা শুনেছে। সে যে চরিত্র হারিয়ে উচ্ছন্ন যাচ্ছে একথাও বহুবার তার কানে এসেছে। তাই সে নিঃসঙ্কোচে তার সাথে আলাপ করতে পারতো না।

এ'কয়দিন থেকে সে তাকে কেমন অন্যমনা দেখছিল। তাই গোপনে তার আসা-যাওয়া লক্ষ্য করছিল। বাইরে থেকে এসে সে কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে ছিল। তারপর আবার ছুটেছে দেখে অনু তার পথে এসে দাঁড়িয়েছে।

অনু বললে: অরুণবাবু শ্লীলতার বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। আপনি কী ভুলে গেছেন, আপনি আমার গৃহশিক্ষক আমার নমস্য আর আমি আপনার স্নেহের পাত্রী!

অরুণ উত্তর দিলে হ্যাঁ খুব জানি। কিন্তু—তুমিও বোধ হয় জানো আমি শ্লীলতা মানিনা। শ্লীলতা কি বুঝিনা।

হ্যাঁ, আপনি নিজে না মানতে পারেন। অপরের সঙ্গে বিশেষ স্ত্রীলোকের সঙ্গে যখন আলাপ করবেন তখন আপনি অশ্লীল হবেন না আশা করি।

অরুণ তার কথা শুনে ক্ষুব্ধ হলো। ভাবলে—তাকে সে তার মুঠোর ভেতর নিয়ে আসবে, যেমন করেই হোক্‌।

প্রতারক যেমন করে লোককে ঠকিয়ে তাকে তার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে, সেও অনুকে তেমনিভাবে ঠকাতে চেষ্টা করতে লাগলো।

সে বললে: আচ্ছা অনু, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?

—না

—তবে তোমায় একটা কথা—

—আমায় কোন কথা বল্‌তে হবেনা। আমি আপনার মনের গোপন কথা বুঝতে পেরেছি।

—তুমি কি তাহলে আমার হবে?

—এত দুরাশা মনে আন্‌বেন না। আপনি শুধু এই জান্‌বেন আমি আপনার উচ্ছন্ন যাওয়ার পথে বাধা হয়ে রইলুম।

অরুণের সেদিন আর কোথাও যাওয়া

হলোনা: সে নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে আপন কক্ষে প্রবেশ করলে।—

বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলো—অনুপমাকে যদি আমার করে নিতে পারতুম, তবে আমার কোন অভাব থাকত না। তার মনে কত কল্পনাতীত সৌন্দর্য্যপূর্ণ মধুর ছবি ভেসে উঠতে লাগলো। তার ধমনীর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সে বিছানা ছেড়ে উঠে বস্‌লে। স্থির আকাশে চাঁদের আলো ম্লান, কুয়াসা ঢাকা—শান্ত নদীবক্ষেরই মতো।—তার তক্তাপোষে চাঁদের আলো এসে পড়েছে।—সে একবার সেদিকে চায় আবার চোখ বুজে স্বপ্ন দেখে। সে দেখতে পেলো—ঠিক তারই মতো শয়ন-বিষণ্ণ হয়ে অনুপমা নিশি যাপন করছে।

তাকে তার চাই-ই চাই। ছ'মাস তার অনিন্দ্য সুন্দর মূর্ত্তি তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। সেদিন তার সঙ্গে নিভৃত আলাপের সুযোগ হয়ে তাকে আরো বেশী পাগল করে দিয়েছে।

নিঃশব্দ রজনী, জনশূন্য। তেমনি নিঃসঙ্গ। সে চুপি চুপি অনুপমার ঘরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। মনে আসা, ভয়, আনন্দ, উদ্বেগ। হিয়ার ভেতর দুরু দুরু করছে। সে চোর। চোরেরই মতো তার ঘরে ঢুক্‌লো।

অনু তখন তার যত্ন বিন্যস্ত চুলগুলি উন্মুক্ত করে তক্তপোষকে আত্মসমর্পণ করে আছে। চাঁদের কনক কিরণ নেমে এসে পড়েছে তার ফুল্ল কমলিনীর মতো সহাস্য সলজ্জ বদনে।—অরুণ থমকে দাঁড়ালো। সে আজ তাকে চুরি করে নিয়ে যাবে। কোথায় নেবে—কী সম্বল তার কিছুই ঠিক নেই, তবু তাকে নেওয়া চাই।

কঠোর হৃদয় একবার স্নেহপূর্ণ হলো। আবার শুকিয়ে গেল।—সে আস্তে আস্তে তার পালঙ্কের ওপর বস্‌লো। অনু চমকে উঠলো। চোখ মুছে চেয়ে দেখলে—অরুণ, মুখে কুটিল হাসি। বিলোল কটাক্ষপাতে সে তারই দিকে চেয়ে।

সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলে না। ভাবলে—সে স্বপ্ন দেখছে।

অরুণ তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলো। সে তাকে দূরে সরিয়ে দিল। সে ইচ্ছা করলে চীৎকার করে সবাইকে জাগিয়ে অরুণকে ব্যতিব্যস্ত করতে পারতো। কিন্তু সে তা করলোনা দেখে অরুণ ভাবলে—তাকে অনায়াসেই তার সঙ্গে নে'য়া যাবে।—

অরুণ বল্‌লে: অনু তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি তোমায় রাণী করে রাখবো। তোমার প্রীতির জন্য আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমায় দোব। তবু আমার তোমায় চাই। সে আবার অনুপমার কাছে ঘেঁস্‌তে চেষ্টা করতেই সে একখানি শাণিত ছুরিকা বা'র করে বল্‌লে: আর এক পা এগু'বেন তো এখানেই আপনার পাপ জীবনের শেষ।

অরুণের গায়ে সিংহের শক্তি। সে যুযুৎসু শিক্ষা করেছে। খপ্‌ করে তার হাত থেকে ছুরি ছিনিয়ে নিয়ে তার গালে একটী নিবিড় চুম্বন এঁকে দিল।

অনুপমার আর সহ্য হলোনা। সে চীৎকার করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তার সংজ্ঞাহীন দেহ ধূলায় লুটিয়ে পড়লো।—অরুণ তেমনিভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

তার চীৎকারে সকলেই ছুটে এলো। অরুণকে তেম্‌নি অসারভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অখিলবাবু বল্‌লেন: আমার অনুর এই অবস্থা করলে কে?

সে কিছুই বল্‌তে পারলনা।

অনেক সেবা শুশ্রূষার পর যখন তার চেতনা ফিরে এলো, তখন ধীরে ধীরে অরুণ সে স্থান ত্যাগ করছিল দেখে সে বল্‌লে: দাঁড়ান, কোথায় যাচ্ছেন?

নিশীথ রাত্রে, ঘুমন্ত অসহায়া নারীর সম্মানের হানি করতে আসা খুব সহজ। কিন্তু যখন—সকলের সাম্‌নে যখন তার কৈফিয়ৎ দিতে হয় তখন ভীরু কাপুরুষের মতো পালিয়ে যাওয়া তেমনি কঠিন, নয় কি?

অখিল ও কনকবালা কিছুই বুঝতে পারলেন না। শুধু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কন্যার আচরণ লক্ষ্য করছিলেন।

অনুপমা বল্‌লে: এই নরপিশাচকে আমাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার আগে তার বাবাকে তার করে এখানে আনান। তাঁকে তাঁর যোগ্য পুত্রের কীর্ত্তির কথা বলবো।

অরুণ ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করলো। তারপর তার বাক্স খুলে ২০০ টাকা বার করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

ছিটে ফোঁটা

ভাবি মুস্কিলেই পড়েছি ছেলেটাকে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বোঝাতে। 'রামের গরু', 'শ্যামের ছাতা', 'সম্পাদকের খেয়াল' প্রভৃতি বহু উদাহরণ দিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু তবুও ঠিক হচ্ছেনা। এমন সময় মহীম এসে হাজির! বিপদের কথা উল্লেখ করতেই বন্ধু প্রবর একটু মুচকি হেসে একখানা মাঘ সংখ্যার উদয়ন হাতে দিলেন। জিজ্ঞেস করলুম—এতে কি হবে হে? মহীম বল্লে—খুলেই দেখ না—তোমার মুস্কিলের আসান হবে।

মহীমের কথা মতো পাতা ওল্টাতে লাগলুম—বাঃ, চমৎকার! এ যে একেবারে লোহারামের ব্যাকরণ—'মসির দেহে প্রাণ সঞ্চার', 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস', 'কাজল-লতার-কুঁড়ে,' 'প্রতিভার খেয়াল', 'নাচের ছন্দ,' 'নারীর মন,' 'রম্যকলা-পরিষদের নূতন প্রদর্শনী'!

মহীমকে ধন্যবাদ এবং ততোধিক ধন্যবাদ উদয়ন সম্পাদককে—সন্ধ্যার গুরুতর খাটুনিকে লাঘব করবার মহানুভবতার জন্যে।

পাঠক পাঠিকাগণ! সম্বন্ধে ষষ্ঠী বোঝাতে যদি আমার মতো আপনাদেরও বেগ পেতে হয় তা হলে আমার পন্থা অনুসরণ করবেন—একখানা মাঘ সংখ্যার উদয়ন কিনে দেবেন!

*　　　+　　　*

উক্ত সংখ্যায় একটি গল্প (?) প্রকাশিত হয়েছে—'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'। উদয়নে গল্প প্রতিযোগীতায় তা সপ্তম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা। তা নিয়ে অবিশ্যি আমাদের বল্‌বার কিছু নেই, তবে মহীম বলছিল—এরও একটা রূপ আছে—যেমন বাঁদরের গলায় মুক্তার হার!

যাক! এইবার গল্পটার একটু নমুনা! শুনুন:—

"সেদিন বিকেল বেলায় মাকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। মা বললেন—'ওরে একটা ভাল দেখে কাপড় পর, আজ আবার ওখানে একজন আসছেন।' এই হল গল্পের আরম্ভ। পাঠক পাঠিকাগণ, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এ একজন কে? নায়কের মায়ের বুদ্ধির তারিফ করি—কি দরদী মা! কি মনোস্তত্ত্ববিদ্—একজনের সঙ্গে দেখা করতে হলে নিশ্চয়ই ভালো কাপড়ের দরকার।

সেই ভালো কাপড় পরিধান করে নায়ক তাঁর মায়ের সঙ্গে মোটর করে চললেন একজনের সঙ্গে দেখা করতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। পথে অনেক কথাই মায়ের সঙ্গে হল। বুদ্ধিমতী মা অনেক প্রলোভনীয় কথাই ছেলেকে বললেন যাতে একজনকে দেখা মাত্রই তাঁর ছেলের মন বিনিময় হয়ে যায়। নর দেখলেই নারীর এবং নারী দেখলেই নরের মন উচাটন হয়ে ওঠে এ সত্য চিরন্তন, কিন্তু আমাদের লেখক মহাশয়ের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল প্রথম দৃষ্টির পূর্ব্বেই। তা আর হবে না—মধ্যে যে ঘটকী! লেখকের তখনকার মনের অবস্থা কি রকম জানেন?

"সত্যি এরকম ভাবে মেয়ে দেখতে যাওয়া ত মন্দ নয়। আজ গোধূলি-লগনে সিন্ধুপার আগত কোন্ কুমারীর সঙ্গে দেখা হবে কে জানে! অস্ত যাবার মুখে রবি কার কপালে সিঁদুর ছড়িয়ে দেবে! (ঘাবড়াও মাৎ! রবি নির্দ্দয় ন'ন।) কোন সে দেশের বালা তার শান্ত, স্নিগ্ধ, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, গভীর চোখ দুটী আমার চোখের উপর তুলে ধরবে (ওঃ মধু! তারপর?) তার কালো চোখের অতল জলের তলে তার কোমল ছোট্ট হৃদয়খানির কি কোন পরিচয় পাওয়া যাবে না! (নিশ্চয়ই যাবে! ছাদনা তলায়—এত আশা, সাধনা, একি ব্যর্থ হবার!) ছোট হাতখানির চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলি সে আমার সামনে কেমন করে ধরবে! (যেমন করে ধরলে শীঘ্রই বাঁচি

পাঠাবার ব্যবস্থা করা যায়) আঙ্গুলে তার কিসের আংটি থাক্‌বে। নীলা……! না, নীলা-পড়া মেয়ে যাদুকরী, (কেন লেখক কি ঘা খেয়েছেন্ নাকি?) সে আমায় ভুলিয়ে তার মাঝে আমায় ডুবিয়ে রেখে দেবে। (বহুত আচ্ছা—তা হলেই তো পরম চরিতার্থ লাভ) বাইরের আলো-বাতাস আর আমার ভাল লাগবে না, (তা না লাগুক, বাহিক অপেক্ষা আন্তরিক বড়) তার চোখের আলোয়, নিঃশ্বাসের হাওয়ায় আমায় মাতিয়ে রেখে দেবে।…আঙ্গুলে তার থাকবে একটা ছোট্ট লাল পাথর, সদ্য-পড়া এক ফোঁটা রক্তের মত…! না, হয়ত তার আঙ্গুলে থাক্‌বে উজ্জ্বল একটি ছোট্ট হীরে। তার পরণে থাকবে কি ধরণের সাড়ী, কি তার রঙ, কি তার পাড়ের ডিজাইন! (কি পোয়েটিক্ ইন্‌স্পিরেশন্!) মাথার চুল তার কি ভাবে বাঁধা থাক্‌বে! এই গেল একজনকে দেখার পূর্ব্বের অবস্থা। দেখবার পরের অবস্থা যে কতটা শঙ্কটাপন্ন তা নিশ্চয়ই আপনারা অনুমান করতে পেরেছেন। একজনের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ পরিচয়, সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে তিমি মাছ নিয়ে পর্য্যন্ত কথোপকথন এবং আরও কত কি! গল্পের পরিণতি:—

'হ্যাঁ, কিন্তু মা, ওখানে বিয়ে হ'লে মনে হবে না—কি যে সাত-সমুদ্র তের-নদীর পার থেকে কোন্ রাজকন্যাকে ঘরে আন্‌লাম। আজ কালকার দিনে রূপকথার মতো রোমান্টিক ভাবে বিয়ে কি কারোর হ'য়ে থাকে?'

"ভালই ত' কপালে তোর যদি এতই রোমান্স থাকে ত' তুই কি আট্‌কাতে পারবি! (কিছুতেই নয়) আমি তা হলে রাজকন্যা আনবার জন্যে বরণ ডালা সাজাতে বস্‌তে পারি!" (নিশ্চয়ই!)

এ গল্প সম্বন্ধে আমাদের বলবার কিছুই নেই; গল্পটি শুনে মহীম কেবল বল্‌ছিল—বাংলা দেশে যে রকম পাগলামী বেড়ে চলেছে বিশেষতঃ আধুনিক ভুঁইফোঁড় সাহিত্যিকদের মধ্যে তাতে অচিরাৎ Mental observation House-এর সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার।

খোলা-চিঠি

শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ীকে

শিশির কুমার,

যখন বাঙ্গলা রঙ্গালয় এক ঘনীভূত যবনিকার অন্তরালে লুকোবার চেষ্টা কোরছিল, তখন তুমি তোমার সম্মানিত আসন থেকে—বাঙ্গলাদেশ যাকে চিরদিনই ঘৃণার চক্ষে দেখে সেই নাট্যমন্দিরের আঙ্গিনায় এসে পূজাব্রত গ্রহণ কোরলে। শুধু তাই নয়, তোমার অলৌকিক শক্তি প্রভাবে তুমি অল্পদিনের মধ্যেই রঙ্গমঞ্চের প্রতি সাধারণের প্রবল উত্তেজনা বাড়িয়ে দিলে—মরণোন্মুখ রঙ্গালয়ের প্রাণে মৃতসঞ্জীবনীর প্রলেপ দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুল্‌লে। সেজন্য দেশবাসী চিরদিনই তোমাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাবে।

কিন্তু, শিশিরকুমার, যে শক্তি নিয়ে দেশবাসীর মনোনয়নে তুমি প্রথম আবির্ভূত হ'য়েছিলে—সে শক্তির ঔজ্জ্বল্য দেখে সকলেরই মনে আশা হ'য়েছিল যে, তোমার দ্বারাই হয় ত' অদূর-ভবিষ্যতে বাঙলার রঙ্গ-জগৎ সারা বিশ্বময় এক জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত কোরে তুলবে। তোমার শক্তি সম্বন্ধে কারও সন্দেহ ছিল না বা এখনও নেই, কিন্তু তুমি তোমার সেই শক্তির অপব্যবহার কোরে সকলের আশা ভরসার মূলে কুঠারাঘাত কোরেছ। যাক্, রঙ্গমঞ্চের কথা নিয়ে আলোচনা করা আমার এ খোলা চিঠি লেখার উদ্দেশ্য নয়। তোমার চিত্র-জীবনের দু'একটি কথাই আমি এখানে বল্‌তে চাই।

ছায়াছবিতে তুমি বেশী নামোনি—আর না নেমে খুব ভালই কোরেছ। নির্ব্বাক্-যুগের কথা ছেড়ে দিয়ে সবাক্-যুগে একমাত্র "সীতা"-য় তোমার রামের ভূমিকা দেখে আমরা বিশেষ মর্ম্মাহত হই। বয়েস তোমার হ'য়েছে—বার্দ্ধক্যের চাপে তোমার দেহের বাঁধুনি গেছে ভেঙ্গে—রামের মত চরিত্রে অভিনয় করবার মত বয়েস তোমার আর নেই। তোমার গলার আওয়াজ চমৎকার! —কথা বলার ভঙ্গী অপূর্ব্ব! তাই বল্‌ছি রামের ভূমিকায় তখন তুমি না নেমে যদি বশিষ্ঠ কিংবা বাল্মিকীর ভূমিকায় অভিনয় কোরতে তা' হ'লে বোধ হয় তোমার এতটা দুর্ণাম হ'ত না—আর তার চেয়েও ভাল হ'ত, অভিনয় করার লোভ সাম্‌লিয়ে যদি তুমি ছবির প্রযোজনা কোরতে তা' হ'লে হয়ত' তোমার সুনাম হ'ত। ভবিষ্যতে এই কথা ভেবে কাজ কোর, তা' হ'লে তোমার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। ইতি—

আনিয়াৎ খাঁ
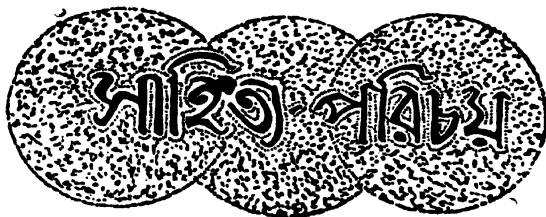
সাহিত্য পরিচয়

'ভবিষ্যৎ'র পরিচয়
'পরিচয়ের' ভবিষ্যৎ

সাহিত্য-পরিচয় করা ক্রমশঃ একটা নেশা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে—যাই হোক পেশার চেয়ে মর্য্যাদা-সূচক। সাহিত্যের পরিসর বিশ্রী অন্তহীন, অনন্ত ব্রহ্মের কল্পনার চেয়েও vulgar, তবু সুবিধা এই যে ব্রহ্মের "নিরাকারে" বিশেষিত নয়। তাই—টানা যায় যেমন করে assorted বিস্কুটের টীন থেকে গোলাপীচিনির টিপি এরারুটের বাদামী-বিস্কুটকে সময়ে অসময়ে বিশেষ করে অবেলায় ঘুমের পরে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল গলাধঃকরণ করার জন্য। বাঙলা সাহিত্যে 'হরিজন' আন্দোলন অনেকদিনের যদিও 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে' তাই 'ব্রাহ্মণ্য' চাড়া দিয়েছে। তবু আজও মন্দির প্রবেশের অধিকার আইনতঃ বন্ধ নয়। দেবতার-রূপ কল্পনা কারুর এজমালি নয়, সাধারণের না হ'লেও হয়ত ক্রিশ্চ্যান মোসলেমের বা বৌদ্ধের ধর্ম্ম হয় না ঠিক, কিন্তু বৈষ্ণব, শাক্ত, বা ব্রাহ্মের হ'তে আপত্তি কি ?

এবারে হাতে পেলাম ছ'খানি বাঙলা পত্রিকার হাল সংখ্যা যারা অভিনবত্বের দাবী করেন দারুণ। একখানি অল্পবয়সী (অপরাধ বা অবজ্ঞার নয়) আর অপরটী তার চেয়ে বয়োধিক (ইজ্জৎ বা শ্রদ্ধার নয়)। 'ভবিষ্যৎ'র পরিচয় দেওয়া সামাজিক আর 'পরিচয়ে'র ভবিষ্যত ভাবা নৈতিক।

"ভবিষ্যৎ" চায় পন্থী, "পরিচয়" চায় গোষ্ঠী। তাই মূলতঃ এরা আদর্শে, চিন্তার কর্ম্মধারায় বিভিন্ন। গোষ্ঠীভুক্ত করতে অনিচ্ছায় ঔদার্য্য আসে, পন্থী-দীক্ষা দিতে মতবাদ দৃঢ় হয়। "ভবিষ্যৎ"র creed অনেকগুলি। সবচেয়ে দাম-দেওয়াটা হ'চ্ছে নোতুন সৃষ্টি, অতীতের আওয়তায় নয়, অতীতের ভিত্তিতেও নয়, অতীতের পুনরাবর্ত্তনেও নয়। এ যেন অনেকটা স্বয়ম্ভূ। তাই তাদের শিল্প থেকে সুরু করে লেখা, প্রকাশ ও ভঙ্গি সবই অগতানুগতিক। 'ভবিষ্যৎ'র মাঘ সংখ্যার প্রচ্ছদপট, রঙ্গিন ও একরঙ্গা ছবি, লেখার লিষ্ট সবই কৌতূহলে দেখলাম। নোতুন না হ'লেও, সবই নোতুন ব'লে জাহির হ'তে চায়, শোনা যায় নিজেকে

জাহির করার' মানসিক প্রক্রিয়া উঁচুদরের complex। কে না জানে এই গৌরব-যান ব্যোমযানের চেয়ে দ্রুত হ'য়ে তীক্ষ্ণভাবে পাঠক-মনে প্রবেশ করে ব্যাপক হ'য়ে। শুধু "ভবিষ্যৎ" সম্বন্ধে এ'কথা বল্লে এক-চোখামি করা হ'বে, "পরিচয়"ও অনেক বিষয়ে shaw-পন্থী। অহমিকা পণ্ডিতের আর বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে তবে নাকি অদ্ধং ত্যজতি নীতির অবলম্বনে আমরা পরিচয়-গোষ্ঠীর কাছ থেকে জাহির Economic plan আশা করতে পারি। 'ভবিষ্যৎ'র ভিড় এখানে-ওখানে চোখে পড়ে। তা ব'লে ভিড় প্রকৃত নয়, ভিড় শুধু জড় করা। ভিড় সরিয়ে নয় তার মধ্য থেকে নির্জ্জনতার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। এটা ঠিক গত-যুগের বাস্তব-সাহিত্যের কথা নয়। জনতার শৃঙ্খলা জনতাই রক্ষা করে এটা democracy-র আদর্শ। বাস্তব-সাহিত্য ছিল এরই অনুকূল। রাজনীতির আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে যুগের জন-সংখ্যাকে উপেক্ষা করা যায় না, তাই ভিড়ের ভিতর থেকে শাসকের উদ্ভব। 'ভবিষ্যৎ'র আদর্শ-সাহিত্য জনতা-সাহিত্যের খোলসে চাপা পড়ে না। তার আসল মণি শুধু ফণী-রাজের মণি, প্রজা থেকে যায় রাজার কর যোগাতে। 'ভবিষ্যৎ'এ তাই দেখি কিছুরই অস্বীকার নেই শুধু স্বীকৃত বস্তর রূপ-পরিকল্পনায় নোতুনত্বের আকাঙ্খা আছে। কিন্তু আমার বলতে বাধা নেই 'ভবিষ্যৎ'-র সে দাবী পূরণ হ'তে দেখিনি। প্রচ্ছদপটে "সিঁড়ির" পরিকল্পনা কি মোটেই নোতুন, "ভবিষ্যৎ" নাম-করণে কি ভবিষ্যত সাহিত্যে বর্ত্তমান "ভবিষ্যৎ"-র পুনারাগমনায় চ দোষ-দুষ্ট হয় না? আজকের দিনে সাহিত্যের "ভবিষ্যৎ" হওয়ার স্পর্দ্ধা প্রাচীন সাহিত্যের আদর্শ ও ব্যবসাদারী নোতুনত্ব প্রেম···আর অতীতের নকল-করা গতানুগতিক গুরুগিরি নয়। তবে নতুনত্বের দাবী কি শুধু 'ক্যামেরার মুখে' প্রতিফলিত হ'বে। দেহের পরিচয়, sex-appeal ত নোতুন কথা নয়। মানুষকে আনতে হ'লে তারা আসেই অপরিহার্য্যের ন্যায়। সেটা অতি বাস্তব, অতি পুরু, অতি পুরাতন—তাই নতুন-হাল্কা-কল্পনার ছোঁয়া-অভাবে সাহিত্য নয়। 'ভবিষ্যৎ' পন্থীদের এই কথা সাদরে বলতে চাই যে জগতে নোতুনের আদরের অভাব নেই—তবে সেটা অতীত থেকে, ভবিষ্যৎ থেকে যেমি-বিচ্ছিন্ন, বস্তুতে তেমি ধার বা ভারবান।

'পরিচয়' আজ প্রায় চার বছর ধরে তার নিজের পরিচয় দিয়েছে তবে সুবিধা এই যে তাদের বছর কাটে একটু বেশী শীগগির। দেশে intellectualismর আদর যত বাড়ে তত সম্পদ—এটা ছিল লোকসাহিত্যের তাৎপর্য্য আবিস্কার হওয়ার পূর্ব্ব কথা। সাহিত্যের সম্পদ তার অর্গল মুক্তিতে মনে হয়। "পরিচয়ে" প্রকাশিত 'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথ আধুনিক ইংরাজী কাব্যে সার্ব্বভৌমিকতার অভাব অনুভব করেছেন। কথাটা কতটা সত্য বিচার্য্য তবে এটা ঠিক সাহিত্যে intellectual আভিজাত্য আজকের রাষ্ট্রের গর্ব্ব নয়। সাহিত্যের রস দু প্রকারের যেমন অপর সব সৃষ্টির স্রষ্টার ও উপভোগীর। স্রষ্টার রসে technique আছে। মানুষের সহজবুদ্ধি থেকে চিত্তবৃত্তিতে পৌছবার সেতু এই technique। জ্ঞান, কল্পনা, সংযম সবই techniqueর গঠনে। উপভোগী সৃষ্টিকে বুঝে তার নিজের বোধে, আর তাতেই তার রস। আজকের দিনে যখন বাঙ্লা-সাহিত্যে এই আভিজাত্যের অনুশীলন করার কথা মনে হয় তখন কোনমতেই ভোলা উচিত নয় যে সাহিত্যের সার্থকতা উপভোগীর সহজ রস-বোধে। ভারাক্রান্ত ছন্দ কবিতার পতন ঘটায় কবির ছন্দবোধের অভাবের জন্য নয়, শ্রোতার শ্রবণে কটুতার জন্য। শ্রীবিষ্ণু দে তার শিখণ্ডী কবিতায় কি সেই tragedy আশঙ্কা করেন না? আজকের দিনে Abstract স্থূল যে শক্তিশালী তা আমরা ভুলিনি কিন্তু তবু কি তাঁরা নিছক প্রসারতার লোভে পদে পদে compromise করেন নি? ব্যঞ্জনা ক্ষীণ বলে যে গ্রহণ করে না সে অন্ধ, কিন্তু যেখানে ব্যঞ্জনা অস্পষ্ট সেখানে সৃষ্টি দুর্ব্বল। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে আভিজাত্য তাকে পদে পদে phillistine বলে উড়িয়ে দিয়েছে। আমরা সব সময়ে বিশেষ করে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঐক্যে বিশ্বাস করতে পারি না। আমি স্রষ্টা, আমার কল্পনাশক্তি অপরিমেয়, তাই আমার কাছে সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা অপর কাছে অতি অস্পষ্ট ব্যঞ্জনা হ'য়ে দাঁড়াল। এই যে জ্ঞানের অভাব সৃষ্টির সবচেয়ে tragedy। তাই চায় নিক্তির জ্ঞান আমার সৃষ্টির উপভোগীর বোধ-শক্তির। কথা উঠবে না বলে বলতে চাই আমাদের সৃষ্টি, সাহিত্য-সৃষ্টি—বিরাট জনসমাজের মাঝে যার দাম ধার্য্য হ'বে অগণিত কাল ধরে, অসংখ্য পারিপার্শ্বিকের মধ্যে। 'পরিচয়ে' যে আভিজাত্য মাঝে মাঝে দেখা যায় আর সবচেয়ে যার বেশী দাবী তাঁরা করেন সেটা বাঙ্লা-সাহিত্যের গৌরবের নয়। এদের বিশেষত্ব পুস্তক-পরিচয়ে এই মনোভাব আরও বেশী দেখা যায়। তাই সময়ে অসময়ে পুস্তক পরিচয় করতে এঁরা এমন পুস্তকের আমদানী করেন, যার সঙ্গে পরিচিত হ'বার লোভ সাধারণের মোটেই নেই, অথচ যার সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার দুর্ব্বার লোভ তার সম্বন্ধে এঁরা সম্পূর্ণ নীরব। আর তাছাড়া পরিচয় দিতে গিয়ে এঁরা সাধারণ সামজিকতা না মেনে এঁদের আভিজাত্য ঢের বেশী সুস্পষ্ট করেন। তবে আশা এই "পরিচয়ের" হাল-সংখ্যায় তার মধ্যযুগের cloak ভেতর থেকে নগ্ন গা হাত পা যেন দেখা যাচ্ছে।

সুধীর বসু

খেয়ালী

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৩৪১, 21st February, 1935. { ৮ম সংখ্যা
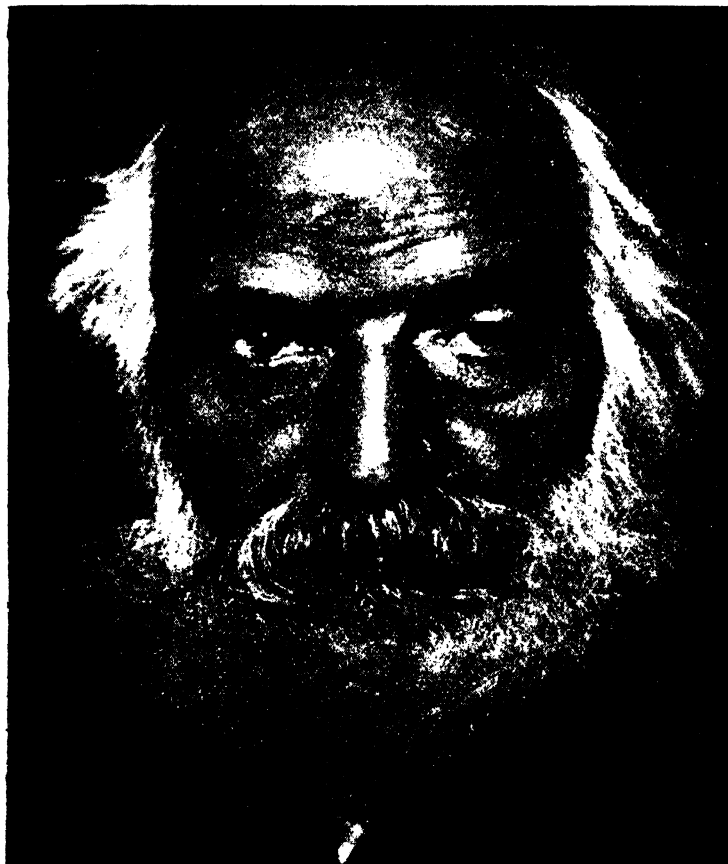
৺ বিঠলভাই প্যাটেলের উইল

৺ বিঠলভাই প্যাটেল

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে জেনেভায় কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সুকুমার সেন, আই, সি, এসের ভ্রাতা মিঃ অজিত সেন কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র হইতে। ['খেয়ালী'র নিজস্ব]

গুজরাটের গৌরব ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্বনামধন্য ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বিঠলভাই প্যাটেল জেনেভায় দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যে উইল রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দেশপ্রেমের জ্বলন্ত আদর্শ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শীঘ্রই বোম্বাই হাইকোর্টে এই উইলের 'প্রোবেট' গ্রহণ করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

১৯৩৩ সালের ২রা অক্টোবর জেনেভায় যে উইল তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন তদনুযায়ী নগদ দশ সহস্র টাকা, মিলের শেয়ার, পুস্তক, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশিভাই প্যাটেল, ভ্রাতুষ্পুত্র মনিভাই সখাভাই প্যাটেল, আর্য্য মিশনের ব্যাচু বেন প্রভৃতিকে দান করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত অর্থ বাংলার জননায়ক সুভাষচন্দ্র বসুকে অর্পণ করিয়াছেন। ভারতের উন্নতিকল্পে ভারতের বাহিরে প্রচার কার্য্যে উক্ত অর্থ ব্যয় করিবার ভার সুভাষচন্দ্রের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম উক্ত অর্থের পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ টাকা। উক্ত উইলের সাক্ষী হইয়াছেন তিন জন বাঙ্গালী:—মিঃ এ, সি, চ্যাটার্জি (জেনেভার লীগ অফ্ নেশানের কর্ম্মচারী ; ইনি সম্প্রতি কলিকাতায় মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন) ; ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসুর পুত্র শ্রীঅনাথনাথ বসু ও ঢাকার বজ্রযোগিনী গ্রামের শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র গুহ। এই উইলের 'এক্সিকিউটার' (Executors) হইতেছেন মিঃ গোধনভাই জে প্যাটেল ও বোম্বাইয়ের মালাবার হিল নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পুরুষোত্তম দাশ প্যাটেল এম্, ডি (লণ্ডন)।

উইলে ইহাও লিপিবদ্ধ ছিল যে ইউরোপে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার মৃতদেহ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে অর্পিত হইবে এবং তিনি (সুভাষচন্দ্র) মৃতদেহকে ভারতে প্রেরণ করার যথাযথ ব্যবস্থা করিবেন এবং যাহাতে তাঁহার মৃতদেহ চৌপাট্টি তীরভূমে লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের পার্শ্বেই ভস্মীভূত করা হয় তাহারও ব্যবস্থা করিবেন।

চলতি পথে

শ্রীমল্লিনাথ

আর কত সহিব ?

ভারতবাসী বৈদেশিক শক্তি কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে তার ভাগ্য-দোষে। আবার ভাগ্য-দোষেই সে মিথ্যাবাদী, কপটচারী, ভণ্ড প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত হইতেছে, সেই শাসিক শক্তির দুই একটী অতি ধূর্ত্ত আমলার কাছে। ভারতের এমনি ভাগ্য যে তার লবণ খাইয়াছে, সেই-ই তার বদনাম করিয়াছে—প্রাণখোলা বদনাম করিয়াছে। এই জাতীয় নেমক-খোর বদনামকারীদের (এক কথায় এদের 'নেমক-হারাম বলে, কিন্তু কথাটা হয়ত আইন প্রয়োগকারীদের কাছে শক্ত ঠেকিতে পারে) নাম করিতে গেলে অনেক ইংরেজের নামই একসঙ্গে মনে পড়ে, কিন্তু আজ আমরা কেবলমাত্র দুইজনের কথাই আলোচনা করিব। এঁরা যুক্ত-প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর স্যার ম্যালকম হেলী ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে—অধুনা লর্ড জেটল্যাণ্ড।

যুক্তপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব লাট স্যার ম্যালকম হেলী একজন পাকা সিভিলিয়ান বলিয়া খ্যাত। অনেকে তাঁকে ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারে ঝুনা সিভিলিয়ান বলিয়া মনে করেন। তাই ভারত শাসন আইনের খসড়া প্রণয়ন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁর উপর গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট আস্থা ছিল। আর আস্থা থাকাই স্বাভাবিক। যাহা হউক, ভারতবাসীর ভাগ্যের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া তিনি মনে করিলেন একটা কাজের মত কাজ করিয়াছি। ভারতবাসীর নিকট হইতে প্রশংসালাভের একটা সুনিশ্চিত পন্থা আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছি। ভারত-শাসন বিলের আর্থিক-বিভাগটাই নাকি তিনি প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহা হোক, তিনি বিলের গুণগান করিতে করিতে যখন শুনিলেন যে, ভারতবাসী এই শাসন-সংস্কার ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিতে চায়, তখন তাঁর গানের সুর ছিঁড়িয়া গেল। রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তিনি বিলাতী-মেছোহাটার ভাষায় 'অর্ব্বাচীন' ভারতবাসীকে গালাগালি করিতে লাগিলেন।

লণ্ডনে রয়েল এম্পায়ার সোসাইটীতে ভারতীয় শাসন সংস্কার প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া স্যার ম্যালকম হেলী বলিয়াছেন:—

"এই শাসন সংস্কারের প্রস্তাবকে ভারত-বাসীরা যে সাগ্রহে সমর্থন করে নাই, ইহা স্বাভাবিক। শাসন সংস্কারে যে সব সুবিধা দেওয়া হইতেছে, সেগুলি বাদ দিয়া কেবল-মাত্র রক্ষাকবচগুলির উপরেই ভারতবাসীরা জোর দিতেছে, ইহাও ঠিক। কিন্তু আমাদিগকে 'প্রাচ্য মনোভাব' বিদায় করিতে হইবে। সকলেই জানেন যে, ভারতবাসীদের প্রকাশিত মনোভাবকে সম্পূর্ণ মূল্য দেওয়া যায় না। (ভারতবাসীদের মনে এক, মুখে আর) এই কথা বুঝিলে, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে কেন যে ভারত শাসন বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ ধরা যাইতে পারে।"

তিনি এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, ভারত শাসন আইন যখন কার্য্যে পরিণত হইবে তখন ভারত-বাসীদের মনোভাব কি তাহা বুঝা যাইবে। তিনি বলেন, ভারতে আমি যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহাতে আমার বিশ্বাস, কেহই প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার বর্জ্জন করিবে না, বরং উহা পরম আগ্রহের সহিত কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে যত্নবান হইবে। আমি দীর্ঘকাল ভারতবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া ইহা বুঝিয়াছি যে, ভারতবাসীরা মুখে যাহা বলে, কাজে তাহা করেনা। তাদের প্রকাশিত মতামতের উপর নির্ভর করিতে নাই। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের প্রতিবাদ ভারতবাসী খুবই করিতেছে বটে, কিন্তু মনে মনে তাহারা বেশ খুসী হইয়াছে। অর্থাৎ স্যার ম্যালকম হেলী সোজা কথায় অত্যন্ত নির্ভীকভাবে ভারতবাসীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ফেলিয়াছেন।

স্যার ম্যালকম হেলীর দোসর অন্যতম ঝুনা সিভিলিয়ান লর্ড রোণাল্ডশে যাহা বলিয়াছেন তাহাও এখানে উদ্ধৃত করা দরকার। আমাদের মনে হয়, এইরূপ গালাগালি ভারতবাসী যত বেশী শুনিবে, তাদের আত্মচেতনাবোধ ততই বৃদ্ধি পাইবে, অধীনতার বেদনা তত বেশী তাদের কাছে বৃশ্চিক দংশনবৎ বোধ হইবে। লর্ড রোণাল্ডশের পরিচয় ভারতবাসী বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী ভাল করিয়াই জানে। বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তারূপে তিনি বাঙ্গালীর নিকট ভালরূপে পরিচিত হইয়া গিয়াছেন। তিনিও 'প্রাচ্য মনোভাবের' অদ্ভুত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনিও রয়েল এম্পায়ার সোসাইটীর সভায় বলিয়াছেন, কোন ভারতীয় রাজনীতিবিদ যখন বলেন যে, সিলেক্ট কমিটীর প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র গ্রহণ করা অপেক্ষা তিনি বরং বর্ত্তমান ব্যবস্থার অধীনে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন, আমি তাঁহার কথা বিশ্বাস

করিনা। তিনি আরও বলেন, কোনো ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইলে তিনি যতদূর বিস্মিত হইবেন অপর কেহই তত বিস্মিত হইবেন না। বর্ত্তমানে যাহারা এই শাসন সংস্কারের কোনও মূল্য নাই বলিয়া প্রকাশ করিতেছে যথাসময়ে তাহাদের অধিকাংশই তাহা সানন্দে গ্রহণ করিবে এবং তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, অন্তরে অন্তরে অনেকে এখনই তাহা করিয়াছে।

আমাদের ভারত গভর্ণমেণ্টও কমবেশী পরিচালিত হন এই সব ঝুনো সিভিলিয়ানদের ইঙ্গিতে। এই ধরণের সিভিলিয়ান যে মনোবৃত্তি লইয়া 'প্রাচ্য মনোভাব' বিশ্লেষণ করেন, বুঝেন, সেই মনোবৃত্তি লইয়াই আমাদের ভারতগভর্ণমেণ্ট ও বিলাতে ভারত-সচিবকে জানাইয়াছেন যে, ভারতবাসীরা মুখে যাহাই বলুক, প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারে তাহারা বিষম খুসী হইয়াছে এবং উহা নিশ্চয়ই কার্য্যকরী হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের এই ইঙ্গিত পাইয়াই ভারতসচিব পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন, কোন চিন্তা নাই, ভারতবাসীরা শাসন সংস্কার গ্রহণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত।

ভারত সচিব বা ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁদের প্রোপ্যাগাণ্ডার জন্য যাহা ইচ্ছা হয় বলুন তাহাতে আমাদের যা ক্ষতি হয় হইবে। সে ক্ষতি ঠেকাইয়া রাখিবার মত শক্তি আমাদের নাই। কিন্তু আমাদের ইহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে স্যার ম্যালকম হেলী ও লর্ড জেটল্যাণ্ড কোন যুক্তিবলে ভারতবাসীর চরিত্রে দুরপণেয় কলঙ্ক আরোপ করিলেন, ভারতবাসীকে মিথ্যাবাদী, কপটচারী বলিয়া অভিহিত করিলেন! আমরা ইহার একটীমাত্র উত্তর জানি, তাহা এই যে আমরা পরাধীন। আর পরাধীন বলিয়াই এরূপ কলঙ্ক আরোপ করিবার দুঃসাহস তাঁহাদের হয়।

যাহা হউক, স্যার ম্যালকম হেলী ও লর্ড জেটল্যাণ্ড যদি 'প্রাচ্য মনোবৃত্তি' বিশ্লেষণের আগে ইংরেজ জাতির চরিত্র বিশ্লেষণ করিতেন তাহা হইলে তিনি অনায়াসে নিজেদের দুর্ব্বলতা ধরিতে পারিতেন, এবং ভারত-বাসীদের চরিত্র এরূপ মিথ্যা ভাবে চিত্রিত করিতে সাহসী হইতেন না। এই দুই পুরুষ-পুঙ্গব কি জানেন না যে, স্বার্থের খাতিরে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য বৃটিশজাতি জগত বিখ্যাত। সুচতুর পাকা 'ডিপ্লোম্যাট' আখ্যা একমাত্র বৃটিশ জাতিই পাইতে পারে।

প্রস্তাবিত ভারত শাসন বিলে কোনো স্থানে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের উল্লেখ মাত্র নাই অথচ স্যার স্যামুয়েল হোর উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস প্রদানই এই বিলের চরম লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে স্যার ম্যালকম হেলী ও লর্ড জেটল্যাণ্ড কি বলেন? এখানে কি মিথ্যা ভাষণের লেশ মাত্রও নাই? ভারতকে বহু বিষয়ে অধিকার দেওয়া হইতেছে বলিয়া শাসনকর্ত্তারা ঘোষণা করিতেছেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তার যেটুকু অধিকার ছিল তাহাও হরণ করা হইতেছে। এখানে কি নির্জ্জলা সত্যের অবতারণা করা হইতেছে? স্যার স্যামুয়েল হোর বলিয়াছেন, ভারতবাসীকে 'ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস' দেওয়া হইতেছে, আর স্যার ম্যালকম হেলী তাঁর বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস পাইবার উপযুক্ত হইতে ভারতবর্ষের এখনও বহু বৎসর লাগিবে। এখানেও কি মিথ্যার হোলি-খেলা চলিতেছে না? আর ভারতবাসী শাসন-সংস্কারের প্রহসনকে বরাবরই একস্বরে নিন্দা করিয়াছে; ইংরেজের হাতে গড়া-মডারেট হইতে আরম্ভ করিয়া সকল মতাবলম্বী ভারতবাসীই ইহাকে অবাঞ্ছিত, অপমানকর ইত্যাদি ভাষায় সম্বোধন করিয়াছে। কেহই নূতন শাসন-তন্ত্রের উপর আস্থাবান নহে। অথচ ভারত-বাসী হইল মিথ্যাবাদী! ইহা ভারতবাসীর ভাগ্য বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি বলা যায়!

রাজবন্দী ও সরকারী নীতি

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্যবস্থা-পরিষদে রাজবন্দীদের সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর কালে স্যার হেনরী ক্রেক এমন কতকগুলি উত্তর দিয়াছেন যাহা বহুবার তিনি বলিয়া-ছেন। স্যার হেনরী ক্রেক কি জানেন না যে বারবার একই কথা বলিলে, যাহাদের কাছে বলা হয় তাহাদের কাছে তার কোন মূল্য থাকে না? তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, "মাঝে মাঝে আটকবন্দী ও রাজবন্দীদের বিষয় বিবেচনা করা হয় এবং সেই সময় স্থির হয়, জনসাধারণের স্বার্থহানি না করিয়াও ইহাদিগকে মুক্তি দেওয়া যায় কিনা।" কিন্তু বিবেচনাটা কোন ধরণের করা হয় স্যার হেনরী ক্রেক তাহা বলেন নাই। তাঁর নিজের কথায়ই প্রকাশ যে, রাজবন্দীদের মুক্তির বিষয় যাঁরা বিবেচনা করেন তাঁদের মধ্যে কোন জজ নাই। রাজবন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে কতদিনে যে বিবেচনা করা হইবে তাহা বন্দীগণকে জানিতে দেওয়া হয় না। এবং সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার এই যে, যারা রাজবন্দীদের বিষয় বিবেচনা করেন তাঁদের নিকট রাজবন্দীদের নিজেদের অবস্থা জানাইবার জন্য কোন প্রতিনিধি পাঠাইতে দেওয়া হয় না। আমরা শুনিয়াছি, মাঝে মাঝে পুলিস কর্ম্মচারীরা বন্দীশালায় রাজবন্দী-দের সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু তাহাদিগকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় না, কিংবা তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহাও বিবৃত করিতে বলা হয় না। কাজেই রাজবন্দীরা তাদের নির্দ্দোষিতা সম্পর্কে কোন বিবৃতি দিবার সুযোগ পায়না এবং তাহার ফলে তাদের বিষয় বিবেচনা করার সময় আর সব বিষয় হয়ত বিবেচনা করা হয় কিন্তু তাদের মুক্তির বিষয় বিবেচিত হয় না।

আমরা এবং অন্য সকল জাতীয়তাবাদী পত্রিকা বহুবার বলিতেছি যে, গবর্ণমেণ্ট

রাজবন্দীদের কথা বিবেচনা করুন, তাদের একটা নূতন তালিকা প্রস্তুত করিয়া ক্রমশঃ মুক্তি দানের ব্যবস্থা করুন! কিন্তু মিঃ সত্যমূর্ত্তির প্রশ্নের উত্তরে স্যার হেনরী ক্রেক যাহা বলিয়াছেন তাহাতে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের আপাততঃ সে ইচ্ছা নাই। বাঙ্গলায় আটকবন্দীর সংখ্যা ১৬৫৩। ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশনের বন্দী সংখ্যা ৭২ জন। আমাদের মনে হয়, স্যার হেনরী ক্রেকের প্রদত্ত এই সংখ্যা সঠিক নয়। দুই হাজারেরও অধিক আটকবন্দী ও রাজবন্দী বন্দীশালায় বা স্বগৃহে আটক আছে। এত বিপুল সংখ্যক যুবক বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কারান্তরালে আবদ্ধ থাকিবে, ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার নয় কি? প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তিই জানিতে চাহিবেন, আর কতকাল তারা এইরূপ কারা যন্ত্রণা ভোগ করিবে? আমাদের গবর্ণমেণ্ট কিন্তু এরূপ প্রশ্নে কোনদিন বিব্রত হন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁরা নির্ব্বিকার চিত্তে, অব্যাহত গতিতে তাঁদের শাসনের রথচক্র চালাইয়া যান। এই রথের চলার পথে চাকার তলায় যারা নিষ্পেষিত হয় তাদের কথা ভাবিতে গেলে শাসন যন্ত্র অচল হইয়া যায়। কাজেই জনমতের দাবী হয় তাঁদের কাছে উপেক্ষিত।

রাজবন্দীদের পোষণ করিতে ভারত সরকারের যে ব্যয় হয় তাহার পরিমাণ এত অধিক যে তদ্দ্বারা আর একটী গবর্ণমেণ্ট চালানো যায়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তার জন্য পরওয়া করেন না। তাঁরা দরিদ্র প্রজাবর্গের কুব্জ পৃষ্ঠে ট্যাক্সের নূতন নূতন বোঝা চাপাইয়া দেন। প্রজার পিঠ ভাঙিয়া যাক ক্ষতি নাই, তাঁদের শাসন-যন্ত্রের চাকা ঘুরিলেই হইল। গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, আটক রাখার নীতি পরিবর্ত্তন করিতে তাঁরা আদৌ ইচ্ছুক নন, কারণ সন্ত্রাসবাদ দমন করিবার জন্য ইহা সহজতম পন্থা, কাজেই ইহা সর্ব্বাপেক্ষা আশাপ্রদ ও সুফলপ্রসূ।

আটক রাখার নীতি গবর্ণমেণ্টের নিকট সহজতম পন্থা হইতে পারে কিন্তু ইহা কি সুফলপ্রসূ? সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে অসংখ্য যুবককে বহুকাল হইতে বিনা-বিচারে আটক রাখা হইতেছে, কিন্তু ইহাতে কি বিপ্লববাদ দেশ হইতে একেবারে নির্ম্মূল হইয়াছে? তা যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের উচিত তাঁদের নীতির পরিবর্ত্তন করা। যে নীতি জনসাধারণ কর্ত্তৃক অসংখ্য বার নিন্দিত হইয়াছে, যাহা কেবল জরুরী অবস্থার উদ্ভবে প্রয়োগ করার জন্য সৃষ্টি, তাহাকে স্থায়ী নীতি হিসাবে গ্রহণ করা সভ্যজাতি সম্মত নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। শুধু তাহাই নহে, যে নীতির ফলে দুই হাজারের অধিক যুবককে আটক রাখা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে প্রকাশ্য বিচারের জন্য জেলের বাহিরে আনিবার সৎসাহস গবর্ণমেণ্টের নাই, সে নীতি সর্ব্বথা নিন্দনীয়। সে নীতির দ্বারা গবর্ণমেণ্ট চলিতে পারে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের পশ্চাতে যে বিপুল জনমত থাকা বাঞ্ছনীয় তাহা চালিত হইতে পারে না। জনমতের সদিচ্ছা ও সমর্থন সে নীতি পাইতে পারেনা। তাই বলিতেছিলাম, গবর্ণমেণ্টের নীতি পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে।

সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গলার লাট বাহাদুরও বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাজবন্দীদের সম্পর্কে আইন যে অত্যন্ত কঠোর হইয়াছে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনিও কঠোরতার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক স্থানে এই কঠোর নীতির অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা আছে বলিয়া তিনি স্বীকারও করিয়াছেন। যে নীতির ব্যাপকতা এত অধিক যে একটু ভুলের জন্য বহু অঘটন ঘটিতে পারে সে নীতির পরিবর্ত্তন কি বাঞ্ছনীয় নয়? গবর্ণমেণ্টের উচিত, বর্ত্তমান সময়ে চণ্ডনীতির পরিবর্ত্তন করিয়া দেশবাসীর সদিচ্ছা অর্জ্জন করা। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি সে কথা শুনিবেন?

বে-আইনী প্রতিষ্ঠান

কয়েকদিন পূর্ব্বে স্যার হেনরী ক্রেক ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছেন যে, গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় হইতে যতগুলি প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছিল তাহাদের ২০৫টী প্রতিষ্ঠানের উপর হইতে এখনও নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া লওয়া হয় নাই। স্যার হেনরী ক্রেক জগতকে ও আমাদিগকে বুঝাইতে চান যে, ঐ সকল প্রতিষ্ঠান বিপ্লব-বাদ অথবা সন্ত্রাসবাদ প্রচার করিতেছিল, কাজেই উহাদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা উঠিতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট যদি সত্য সত্য জানিতে পারেন যে, কোন প্রতিষ্ঠান বিপ্লববাদী সঙ্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে তাঁরা উহার দমন কল্পে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে জনসাধারণের জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে যে, দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ আছে কিনা। পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্ট দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্ব্বে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানকে এমন অবসর দেওয়া হয় না, যাহাতে তারা নিজেদের বিরুদ্ধের অভি-অমূলক প্রতিপন্ন করিতে পারে। আমরা জানি, বাঙ্গলার বহু পাঠাগার ও ব্যায়ামশালা গবর্ণমেণ্টের রোষ দৃষ্টিতে পড়িয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অভয় আশ্রমের ন্যায় গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র-সঙ্ঘ, নিখিলবঙ্গ ছাত্র-সঙ্ঘ প্রভৃতি ছাত্র-সঙ্ঘ আজ গবর্ণমেণ্টের কোপে পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে! অভয় আশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিপ্লববাদ প্রচার করিবে, ইহা কেহ সহজে বিশ্বাস করিবেনা। এখন পল্লী-সংগঠনের সময়। সমস্ত বে-আইনী ঘোষিত প্রতিষ্ঠানকে দেশের সংগঠনের জন্য কার্য্যে অগ্রসর হইবার সুযোগ

দেওয়া এখন গবর্ণমেণ্টের অন্যতম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।

এরা কি!

বাঙ্গলা কাউন্সিলের বিরোধী দলের অসহায়তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। পাঁচটী ক্ষতিকর বিল তাঁহাদের সম্মুখ হইতে একে একে সিলেক্ট কমিটীতে গেল, কিন্তু তাঁহারা কিছুই করিতে পারিলেন না। কিছুই না করিতে পারার কারণ, তাঁরা সংখ্যা লঘু, বাঙ্গলার অধিকাংশ মালসী বাঙ্গলার জনসাধারণের হইয়া কাউন্সিলে যান না, তাঁরা যান 'হুজুর কা ওয়াস্তে'। তাই হুজুর যাতে সন্তুষ্ট হয়, তাই করিয়াই তাঁরা তৃপ্ত হন। জনসাধারণের তাতে ক্ষতি হইল কি লাভ হইল তাহা তাঁরা দেখিবার সময় পান কোথায়! অথচ যেদিন বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় জে, পি, সি, রিপোর্ট আলোচনায় প্রস্তাব আনিয়া গবর্ণমেণ্ট 'বেকুব' বনিয়া গেলেন। তাদের প্রস্তাব বিরোধী পক্ষের ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হইয়া গেল। বোম্বাইয়ে গবর্ণমেণ্টের এই শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদের পর আমাদের বাঙ্গলার পানে চোখ তুলিয়া দেখি এখানকার কাউন্সিলে সাক্ষীগোপালগণ কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ বসিয়া সরকার-নাম জপ করিতেছেন। আর সরকারী সদস্যগণ যে দিকে হাত তুলিতেছেন, তাঁরাও আল্লা ও হরি-নাম জপ করিতে করিতে সেই দিকে হাত তুলিতেছেন। দুই একজনের কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় সত্য, কিন্তু তা অতি ক্ষীণ! ইহাদিগকেও দেখিয়া নিজকে নিজেই জিজ্ঞাসা করি, এরা কি!

ওরা ও আমরা

পার্লামেণ্ট সভায় গবর্ণমেণ্ট বিরোধী দলের শ্রমিক সদস্য মিঃ জর্জ্জ ল্যান্সবেরী গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিবার জন্য এক মুলতুবী প্রস্তাব আনয়ন করেন। বর্ত্তমান মন্ত্রী সভার বিরুদ্ধে তিনি এই অভিযোগ করেন যে, গবর্ণমেণ্ট বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে ধাপ্পা দিয়াছে। এই সমস্ত কারণে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট দেশবাসীর আস্থা হারাইয়াছে।

মিঃ ল্যান্সবেরী বলেন, আমরা তাই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই চার্জ্জ করিতেছি যে, তাঁহারা অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত্রী সভার গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়াছেন।

উদার নৈতিক দলের স্যার হারবার্ট স্যামুয়েল ও ম্যাকডোনাল্ড গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করেন।

ওরা সন্তুষ্ট না হইলে নিন্দা করিতে পারে, গবর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, দাবী আদায় করিতে পারে। আর আমরা? আমরা অনুরোধ উপরোধ করিতে পারি, কাঁদিতে পারি, নীরবে দুঃখ সহিতে পারি; বড় জোর আইন অমান্য করিয়া জেলে যাইতে পারি, কিংবা সহযোগ করিয়া মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে পারি!

বাঙ্গলার উন্নতিবিধায়ক বিল

উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের নদীগুলি মজিয়া যাওয়ার ফলে যে ২৫ হাজার বর্গমাইল পরিমিত আবাদী জমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী আইনের খসড়া তৈয়ার করিয়াছেন। গত বৃহস্পতিবারের কলিকাতা গেজেটে এই খসড়াটী প্রকাশিত হইয়াছে। যে সকল জমিতে উপযুক্ত জলের অভাবে অথবা যে সকল জমিতে অতিরিক্ত জল জমিয়া চাষের ক্ষতি হয়, গবর্ণমেণ্ট সেই সকল স্থানে বাঁধ দিয়া অথবা খাল খনন ও জল সেচের ব্যবস্থা করিবেন। জমি ইহার ফলে উর্ব্বর হইবে। এজন্য কৃষককে সেস দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টের এ' ব্যবস্থা যদি কার্য্যকরী হয় তাহা হইলে ম্যালেরিয়া ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত কৃষককুল খুবই উপকৃত হইবে। এর জন্য সেস ধরা হইলে, কৃষকরা অথবা জমির মালিক সে সেস হৃষ্টচিত্তে প্রদান করিবে। পতিত জমি যদি আবাদী হয় তাহা হইলে লাভের কিছু অংশ সেস স্বরূপ দিতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু খসড়াটায় এমন কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ নাই, যাহার উল্লেখ থাকার খুবই প্রয়োজন ছিল। সেস ধার্য্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে কিন্তু সে সেস ধার্য্যের মেয়াদ কতদিন থাকিবে? প্রতি বৎসর সেস ধরা হইবে, না একবারে ৫ বৎসরের জন্য সেস ধার্য্য হইবে। কাহার উপর সেস ধার্য্য হইবে? যে জমির মালিক তার উপর, না মালিকের জমি যে ভাগে আবাদ করে তার উপর? সেস ধার্য্য করার জন্য যে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হইবে তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। নিরীহ মূক কৃষকদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইবে। তাঁহাদের বুঝিতে হইবে, কৃষকদের অবিচার করা হইলেও তারা তার কোনো প্রতিবাদ করিতে পারিবে না, নীরবে সব অত্যাচার সহিয়া যাইবে। কাজে কাজেই যাহা কিছু করা হউক না কেন, একটু বিবেচনা করিয়া করিতে হইবে।

সর্ব্বশেষে আমাদের জিজ্ঞাস্য, এত আড়ম্বর বহ্বাড়ম্বরে পরিণত হইবে না ত'?

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা

সমস্যার উত্তর ঃ—

উ (উত্তর):
ইস্কাবন—সাহেব, ৯
হরতন—সাহেব
রুহিতন—৪
চিঁড়িতন—টেক্কা, বিবি

প (পশ্চিম):
ইস্কাবন—বিবি, গোলাম, ১০
হরতন—nil
রুহিতন—২
চিঁড়িতন—গোলাম, ৬

পূ (পূর্ব):
ইস্কাবন— টেক্কা, ৮
হরতন—nil
রুহিতন—nil
চিঁড়িতন—সাহেব, ৫, ৪, ৩

দ (দক্ষিণ):
ইস্কাবন—nil
হরতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম
রুহিতন—৩
চিঁড়িতন—৯, ৭

হরতন রঙ, 'দ' খেলবে ; 'উ' এবং 'দ' এর সম্মিলিত হস্তে সব কয়খানি পিট নিতে হবে, 'প' ও 'পূ' যতই বাধা দিক্ না কেন।

'দ' রঙের টেক্কা ও বিবি খেলবে, 'উ' যথাক্রমে রঙের সাহেব ও চিড়িতনের বিবি দিয়ে যাবে। 'প' রুহিতনের দুরি, চিড়িতনের ছক্কা এবং 'পূ' দুইখানি চিড়িতন দিয়ে যাবে। এখন 'দ' রুহিতন খেলবে, 'উ' পিট নেবে আর 'পূ' একখানা ইস্কাবন পাস দিয়ে যাবে।

'উ' ইস্কাবনের নওলা খেলবে, 'পূ' ইস্কাবনের টেক্কা দিলে 'দ' রঙের গোলাম মারবেন। এখন 'দ' চিড়িতন খেলে 'উ'-কে পিট ধরাবেন এবং 'উ' ইস্কাবনের সাহেব দিয়ে শেষ পিটটা নিয়ে নেবেন।

খিদিরপুরের শ্রীসুধীর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সমস্যার উত্তর পাঠিয়েছেন।

দুই-এর ডাকে খেড়ীর জবাব
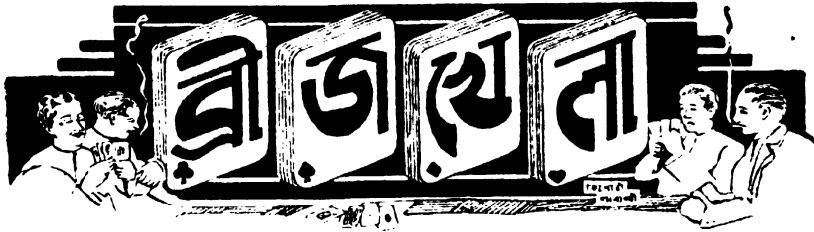
(Responses to opening two bids) ঃ— খেঁড়ীর নির্ভুল জবাবের উপর এ ডাকের যা' কিছু সফলতা নির্ভর করছে, সুতরাং খুব সাবধান হয়ে জবাব দেওয়া প্রয়োজন। এ কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে যে এ ডাকের পর 'গেম' ডাক অবধি না পৌঁছান পর্য্যন্ত খেঁড়ীর পক্ষে ডাক ছেড়ে দেওয়া নিষেধ। তবে যদি উপযুক্তরূপ খেঁসারৎ (Penalty) পাবার আশা থাকে তা' হলে সে কথা স্বতন্ত্র। মনে করুন 'ক' ডাকলেন 'দুইটি হরতন', প্রতিপক্ষ 'আ' পাস দিলেন। 'খ'-কে এবার ডাকতেই হবে— তাঁর হাতে যা'ই থাক্ না কেন তিনি ডাকতে বাধ্য। আবার দেখুন 'ক' ডাক দিলেন 'দুইটি হরতন', প্রতিপক্ষ 'আ' ডাকলেন 'দুইটী ইস্কাবন'। এ ক্ষেত্রে খেঁড়ী 'খ' খারাপ হাত নিয়ে এবারের মত পাস দিতে পারেন (কেননা ডাক শেষ হয়নি, 'ক' আবার ডাকবার অবকাশ পাচ্ছেন)। এখন 'অ' পাস দিলেন, 'ক' আবার ডাকলেন 'তিনটী চিড়িতন', 'আ' পাস দিলেন। 'খ'-কে এবার ডাকতেই হবে, কেন না তাঁদের ডাক এখনও 'গেম' অবধি পৌঁছায়নি। দেখা গেল যে এ ডাকের পর খেঁড়ীর পক্ষে পাস দেওয়া প্রায় নিষিদ্ধ। সুতরাং প্রতিপক্ষ ডাক না দিলে তাঁর পক্ষে তিনটী পথ খোলা আছে,—(১) দুইটী বা ততোধিক No Trump ডাকা, (২) ডাকদারের ডাক বাড়ান, (৩) নতুন কোন রঙ ডাকা। অবশ্য 'ডবল' বা 'রিডবল' করবার ক্ষমতা খেঁড়ীর সব সময়েই আছে।

(১) দুইটী বা ততোধিক No Trump ডাকা ঃ—খেঁড়ীর হাত যদি খুব খারাপ হয় অর্থাৎ তাঁর হাতে যদি একখানি বা তার কম অনারের পিট থাকে তবে তিনি দুইটী No Trump ডাক দিবেন। একের ডাকের জবাবের সহিত দুই-এর ডাকের জবাবের এ বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। একের ডাকে একটি অনারের পিট না থাকলেও হাতের বিভাগ ভাল হলে বা ডাকদারের রঙ হাতে যথেষ্ট থাকলে ডাক দেওয়া চলে। কিন্তু দুই-এর ডাকের জবাবে সে নিয়ম খাটবে না। এখানে কেবলমাত্র অনারের পিটের উপর নজর রেখে জবাব দিতে হবে। কেন না এ ডাকের বিশিষ্টতা হচ্ছে স্লাম-জ্ঞাপনা। খেঁড়ীর হাতে কয়খানি অনারের পিট আছে তা' নির্ণয় করতে পারলে ডাকদার বুঝতে পারবেন যে স্লাম হতে পারে কিনা। তাই এ ডাকের পর খেঁড়ীকে দেখাতে যে তাঁর হাতে কয়খানি অনারের পিট আছে। হাতের বিভাগ বা রঙের বিভাগ দেখাবার অবকাশ তিনি পরের ডাকে পেতে পারবেন, কেননা 'গেম' অবধি

না পৌছান পর্য্যন্ত ডাক চল্‌বেই। মনে করুন 'ক' ডেকেছেন 'দুইখানি হরতন', খেঁড়ী 'খ' নিম্নলিখিত হাত পেয়েছেন।

(১) ইস্কাবন—সাহেব, দশ, নয়, আটা, তিরি, দুরি, হরতন—সাতা, ছক্কা; রুহিতন—নয়, আটা, সাতা, চৌকা; চিড়িতন—বিবি।

(২) ইস্কাবন—আটা, সাতা; হরতন—দশ, নয়, আটা, চৌকা, দুরি; রুহিতন—দুরি; চিড়িতন—সাহেব, নয়, আটা, পাঞ্জা, দুরি।

উপরোক্ত দুই প্রকার হাতেই খেঁড়ীর জবাব হবে 'দুইখানি No Trump, যদিও তিনি প্রথমোক্ত হাতে ছয়টী ইস্কাবন এবং দ্বিতীয়োক্ত হাতে সমর্থন-যোগ্য রঙ পেয়েছেন। ডাক ফিরে এলে তিনি এই দুইপ্রকার হাতের বিশেষত্ব দেখাতে পারেন কিন্তু তাঁর প্রথম জবাব হবে 'দুইখানি No Trump' কেননা তাঁর হাতে একখানিরও কম অনারের পিট বর্ত্তমান। খেঁড়ীর হাতে যদি দেড়খানি হতে দুইখানি অনারের পিট থাকে এবং ডাকের যোগ্য বা ডাকদারের সমর্থন-যোগ্য রঙ হাতে না থাকে তবে তাঁর ডাক হবে তিনখানি No Trump। চারখানি বা পাঁচখানি No Trump-এর কথা পরে বলব।

(২) ডাকদারের ডাক বাড়ান

(Raises):—'ক' 'দুইখানি হরতন' ডাক্‌লে 'খ' যদি 'তিনখানি হরতন' ডাক দেন তা' হলে বুঝতে হবে যে তাঁর হাতে একখানির বেশী অনারের পিট এবং সমর্থনযোগ্য রঙ আছে। আবার 'খ' যদি দুইটী ডাক বাড়ান তা' হলে তাঁর হাতে অন্ততঃ গোলাম সমেত চারখানি রঙ (কিম্বা টেক্কা বা সাহেব সমেত তিনখানি) এবং আরও দুইখানি অনারের পিট থাকা প্রয়োজন। এর চেয়ে ভাল সমর্থনযোগ্য রঙ থাক্‌লে এবং আড়াইখানির বেশী অনারের পিট থাক্‌লে স্লামের সম্ভাবনা আছে।

এইখানে একের ডাকের এবং দুই-এর ডাকের পর খেঁড়ীর ডাক বাড়ানোর পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। ডাকদারের 'একটি হরতন' ডাক দেওয়ার পর খেঁড়ী তাঁর নিজের হাতের পূর্ণ মূল্য নির্দ্ধারণ করে একেবারে দুইটী বা তিনটী ডাক বাড়িয়ে দিতে পারেন (যথা তিনখানি বা চারখানি হরতন)। কিন্তু দুই-এর ডাকের পর এ ভাবে ডাক বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। শুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন কেন ক্ষতিজনক, কেননা ডাক অযথা বেড়ে গেলে পরস্পরের হাতের বিশেষত্ব পরস্পরকে জানান্ চলবে না। তাতে 'স্লাম' ডাকার অসুবিধা ঘট্‌তে পারে। এই দুইপ্রকার ডাকের জবাবের আর একটি পার্থক্য হচ্ছে এই যে প্রথমোক্ত হাতে যে প্রকার তাস থাকা প্রয়োজন দ্বিতীয়োক্ত হাতে তার চেয়ে সামান্য পরিমাণে কম হলেও ডাক বাড়ান চলে।

(৩) অন্য কোন রঙ ডাকা

(Suit take outs):—'ক' ডেকেছেন 'দুইখানি হরতন', 'আ' পাস দিয়েছেন, 'খ' ডাকলেন 'দুইখানি ইস্কাবন'। এতে বুঝ্‌তে হবে যে 'খ'র হাতে একখানির বেশী অনারের পিট আছে এবং ন্যূনকল্পে বিবি গোলাম নিয়ে বা সাহেব নিয়ে পাঁচখানি ইস্কাবন আছে। অবশ্য অনার বিহীন ছয়খানি ইস্কাবন নিয়ে তিনি ডাক্‌তে পারেন কিন্তু সে ক্ষেত্রে হাতে দেড়খানির বেশী অনারের পিট চাই। এখানে আর একটি কথা বলে রাখ্‌তে চাই। 'খ' নিজেও যদি খুব ভাল হাত পেয়ে থাকেন তা' হলেও তাঁর পক্ষে অযথা ডাকবৃদ্ধি না করেও 'দুইখানি ইস্কাবন' ডাক দেওয়া উচিত। ডাক ফিরে এলে তিনি নিজের হাতের প্রচণ্ড শক্তি প্রদর্শন কর্‌বার অবকাশ পাবেন।

দুই-এর ডাকে খেঁড়ীর জবাবের কথা সবিস্তারে জানালাম। এবার কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ কর্‌ব। মনে করুন 'ক' ডাক দিলেন 'দুইখানি হরতন,' প্রতিপক্ষ 'আ' পাস দিয়েছেন এবং 'খ' নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার হাত পেয়েছেন।

(১) ইস্কাবন—সাহেব, নয়, তিরি, দুরি; হরতন—সাতা, তিরি, দুরি; রুহিতন—সাহেব, বিবি, দুরি; চিড়িতন—বিবি, গোলাম, সাতা।

(২) ইস্কাবন—আটা, ছক্কা; হরতন—ছক্কা, পাঞ্জা, দুরি; রুহিতন—নয়, সাতা, তিরি, দুরি; চিড়িতন—বিবি, দশ, নয়।

(৩) ইস্কাবন—দশ, নয়; হরতন—গোলাম, নয়, আটা, সাতা; দুরি; রুহিতন—সাহেব, সাতা, দুরি; চিড়িতন—নয়, সাতা, তিরি।

(৪) ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, সাতা, তিরি, দুরি; হরতন—সাতা, তিরি, দুরি; রুহিতন—বিবি, গোলাম, তিরি, দুরি; চিড়িতন—নাই।

(৫) ইস্কাবন—টেক্কা, তিরি; হরতন—গোলাম, নয়, সাতা, দুরি; রুহিতন—সাহেব, বিবি, দুরি; চিড়িতন—নয়, সাতা, চৌকা, তিরি।

(১) এখানে 'খ'র ডাক হবে 'তিনখানি No Trump' কারণ তিনি প্রায় দুইখানি অনারের পিট পেয়েছেন এবং ডাকের যোগ্য বা সমর্থন যোগ্য রঙ তাঁর হাতে নেই।

(২) এখানে ডাক হবে 'দুইখানি No Trump'; কারণ হাতে একখানিও অনারের পিট নেই।

(৩) হাতে একখানির কম অনারের পিট থাকায় প্রথমে ডাক হবে 'দুইখানি No Trump'। তবে হাত ঘুরে এলে হরতন রঙ জানাতে হবে।

(৪) ডাক হবে 'দুইখানি ইস্কাবন'। 'ক' আবার ডাক দিলে এই ইস্কাবন পুনরায় ডাক দিতে হবে। তা'তে 'ক' যদি 'তিনখানি No Trump' ডাক দিয়ে সতর্ক সঙ্কেত করেন তা' হলে পাঁচখানি বা ছয়খানি ইস্কাবন ডাক দিয়ে (আমার মতে ছয়খানি ইস্কাবনই ঠিক ডাক) হাতের প্রচণ্ড শক্তি 'ক'কে বুঝিয়ে দিতে হবে। এর পর 'গ্রাণ্ড স্লাম' ডাক দেওয়া 'ক'র ইচ্ছাধীন।

(৫) ডাক হবে 'তিনখানি হরতন'। 'ক' অন্য কিছু ডাক দিলে হরতনের ডাক আর একবার বাড়ান যেতে পারে, কেন না হাতে গোলাম সমেত চারখানি রঙ এবং আরও দুইখানি অনারের পিট আছে।

ঘুঘুডাঙ্গা ক্লাবঃ—বিগত ২৫শে মাঘ শুক্রবার শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার দিন এই ক্লাবের Auction (singles) প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা হয়। স্থানীয় দল (মিঃ গাঙ্গুলী এবং পার্টনার) জয়লাভ করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের শৈলপতি বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। সভায় বিবিধ সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রভৃতি হয়েছিল। তন্মধ্যে কল্যাণীয়া ভারতী মজুমদারের গানে সকলেই পরম পরিতোষ লাভ করেন। পরে জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সম্পাদক ধীরেন বাবুর যত্নে এবং সুগায়ক কৃষ্ণবাবুর প্রচেষ্টায় সমস্ত অনুষ্ঠানটা বেশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

সান্ধ্যসঙ্ঘের ডিম টোষ্টঃ—

সান্ধ্যসঙ্ঘের তাসের আড্ডা আজকাল বেশ জমে উঠেছে। এঁদের ক্লাবে এখন ওয়াছেল্ মোল্লার Winter Sale-এর চেয়েও খুব ভিড়। এঁদের সভ্যদের মধ্যে Contract Singles খেলার এত আগ্রহ, এত তৎপরতা, দেখলে সত্যিই আনন্দ হয়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল এঁদের আদর-আপ্যায়ন বিভাগের খরচা বেশ চক্রবৃদ্ধিহারেই বেড়ে চলেছে। বলি, বাপু হে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ',—Lunar & Fools, North Club প্রভৃতি তথাকথিত বড় বড় ক্লাবের পন্থা অনুসরণ করলেই হয়। তাঁরা তো ফাইন্যাল খেলার দিনেও মাত্র প্রতিযোগী কয়টিকে জলযোগ করিয়েই ছেড়ে দেন; তা' তোমরা তো ছোট ক্লাব—বলি জলযোগে গোলযোগ করে লাভ কি?

Mutual Admiration Society:—সম্প্রতি কয়েকটি ক্লাব ও ব্রীজ খেলোয়াড়দের নিয়ে কোল্‌কাতায় Mutual Admiration Society স্থাপিত হয়েছে। এদের সমিতির যে কি উদ্দেশ্য তা' আপনারা সমিতির নাম দেখেই বুঝতে পারছেন বোধ হয়? যে কেউ এঁদের সমিতির সভ্য হতে পারেন তবে পরস্পর পরস্পরের ঢাক বাজাতে হবে এই যা'। এই অভিনব সমিতির জন্মদাতা কা'রা এবং এঁদের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করব।

আনন্দ পরিষদঃ—শুনেছি এঁরা নাকি কোল্‌কাতায় কন্‌ট্রাক্ট খেলা আরম্ভ হবার বহুদিন আগে থেকেই কন্‌ট্রাক্ট খেলছেন এবং এ নিয়ে এঁদের আভিজাত্যও আছে বেশ। এঁদের সমিতির সকলেই নিজেদের বড় বড় খেলোয়াড় মনে করেন, কিন্তু কার্য্যকালে কর্পূরের মতন যে কোথায় উপে যান তা' সঠিক জানা যায় না। খেলায় আজ পর্য্যন্ত এঁদের সাফল্যমণ্ডিত হতে দেখিনি, সেজন্যে এদের কোথায় গলদ্ সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু বল্‌বার ইচ্ছে রইল।

ব্রীজের নিয়ম—

বালি থেকে এজেনবাবু জান্‌তে চেয়েছেন যে insufficient bid হ'লে কি ভাবে penalise করা যায়। তার উত্তর স্বরূপ আমরা International Bridge Laws থেকে উদ্ধৃত করছি :—

The player on the left may either :—

(a) allow the bid to stand : in this case, the insufficient bid ranks as a sufficient bid, and the auction proceeds : or

(b) require the offender to increase the number of tricks specified in the bid to a number of the same denomination sufficient to overbid the preceeding bid, or to seven, whichever is lower ; in this case the auction proceeds, but the offender's

বিবিধ

শ্রীযুক্ত সন্তোষ বসু

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু আলিপুরের পাব্‌লিক প্রসিকিউটার পদপ্রার্থী হইয়াছেন বলিয়া সহরে এক গুজব রটিয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, এ গুজবের কোন ভিত্তি নাই। কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে উপদলগত সঙ্কীর্ণতা-প্রসূত এইরূপ মিথ্যা রটনায় আমরা বিস্মিত হই নাই। আলীপুরের বটবৃক্ষ-ছায়াশ্রিত কাউন্সিলার বিশেষ এই গুজব রটনায় বিশেষ উৎসাহী বলিয়া মনে হয়।

শ্রীঅজিত সোম

শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সোম, এম্, এল্, এর ভ্রাতস্পুত্র শ্রীযুক্ত অজিত কুমার সোমকে গত শনিবার পুলিশ বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের নিয়মানুযায়ী ঢাকার অন্তর্গত বজরগঞ্জ গ্রামে অন্তরীণ বাসের আদেশ জারী করিয়াছেন। তদনুযায়ী অজিতবাবু গত সোমবার কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অজিতবাবু ভূতপূর্ব্ব 'অনওয়ার্ডের' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ছিলেন।

---

partner must pass when next it is his turn to call if the opponent on his right has passed the offender's bid ; or

(c) declare the auction closed. In this case the contract shall be the last bid preceding the insufficient bid ; and if such last bid was doubled or redoubled before the insufficient bid was made, such double or redouble remains effective.

রাম-কাহিনী

গতপূর্ব্ব সংখ্যার "ত্রিশূল" "খেয়ালী"র পাঠকবর্গকে যে রাম-কাহিনী শুনাইয়াছেন তাহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া 'মহামহাধ্যাপক' শ্রীরামচন্দ্র বয়োবৃদ্ধ অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্রের 'সার্টিফিকেট' 'পত্রিকার' অঙ্কে প্রকাশ করিয়াছেন। গিরীশচন্দ্রের কোন নিকট আত্মীয়ের নিকট হইতে আমরা অবগত হইলাম যে গোবিন্দ সুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে এই অভিমত গিরীশচন্দ্র প্রায় ছয়মাস পূর্ব্বে দিয়াছিলেন। এতদিন পরে "খেয়ালী"র প্রবন্ধ প্রকাশের পর শ্রীরামচন্দ্র তাহা সাধারণের গোচর করিলেন ঠিক কর্পোরেশনের অর্থ সাহায্যের প্রাক্কালে। 'পত্রিকায়' SCRAPও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। বারান্তরে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

অর্দ্ধোদয়যোগের জের

'বাবা বিশ্বনাথে'-র বন্ধু-প্রীতি প্রশংসনীয়। পুরোহিতকুলতিলক অশোকনাথের অর্দ্ধোদয় যোগ সংক্রান্ত গবেষণা সমর্থন করিতে গিয়া Tollywood-এর মায়াবিনী রম্ভার দিকে বাবা বিশ্বনাথের নজর পড়িয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। তবে Tollywood-এর রম্ভার দিকে বেশী নজর দিলে বাবা বিশ্বনাথের ও পুণ্যাত্মা অশোকনাথের সুখ-নীড়ে দাম্পত্য কলহের সূত্রপাত হইতে পারে। 'Bachelors Can Sow Wild Oats' এই কথা বাবা বিশ্বনাথ স্বীকার করেন ত ?

তবে সমগ্র 'বৈদিক ব্রাহ্মণ' যে একই মনোভাব সম্পন্ন নন, তাহার প্রমাণও আমরা পাইয়াছি। অধ্যাপক শ্রীচারু চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় অর্দ্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নান কেন করেন নাই তাহা কি অশোকনাথ জানেন! সাত বৎসর বয়সে গঙ্গাস্নান করিয়া অধ্যাপক চারুচন্দ্র চতুর্দ্দশ পুরুষের জন্য যে মোক্ষলাভের পুণ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, সে সঞ্চয়

এখনও অক্ষয় হইয়া আছে। আচ্ছা পণ্ডিতপ্রবর অশোকনাথ! কর্ম্মফল বলিয়া এক মাকাল ফলের নজীর হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া যায় কি? অর্দ্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নান দ্বারা মোক্ষলাভ ও কর্ম্মফলের ফললাভ—এই দুটী নীতিকথার সামঞ্জস্য কোথায়! তবে আমাদের হয়ত ভুল হইয়াছে যে Priestcraft হইতেছে একটী Profession. 'Demand and Supply'—এই অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে বিচার করিয়াই Priestcraft-এর নীতিবাণী প্রচারিত হয় এবং আমরা শ্রীশ্রীশ্রীঅশোক নাথের শ্রীশ্রীশ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শুনিয়া মুগ্ধ হই। রাশিয়ায় Priestcraft-এর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হইয়াছে তাহারও মূলে বাগবাজারের ন্যায় পুঞ্জীভূত "রাবিস"।

সুভাষচন্দ্রের নবতম পুস্তক

আমাদের রোমের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, সুভাষচন্দ্রের পুস্তক "Indian Struggle" ভারতের বাহিরে সর্ব্বত্র বিশেষভাবে প্রশংসালাভ করিয়াছে এবং পুস্তকখানির খুব কাটতি হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন ভারতীয় নেতার রচিত পুস্তক ইউরোপে এইরূপ সম্মানলাভ করে নাই।

অস্ত্রোপচারের পর সুভাষচন্দ্র আয়ার্ল্যাণ্ডে অবস্থানের সময় ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে আর একটী পুস্তক রচনা করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহার নব-পরিকল্পিত পুস্তকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হইতে বর্ত্তমান পরিস্থিতি পর্য্যন্ত বিশেষ করিয়া বাংলার দানের কথা আলোচিত হইবে।

"চণ্ডীদাস" কীর্ত্তনাভিনয়

বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারী (৫ই ফাল্গুন) রবিবার শ্যামবাজার বৃন্দাবন পাল বাই লেনে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে ভবানীপুর সমাজ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত "চণ্ডীদাস" কীর্ত্তনাভিনয় হ'য়ে গিয়েছে। হাওড়ার "নদের নিমাই" কীর্ত্তনাভিনয়ের দেখাদেখি আজকাল পাড়ায় পাড়ায় এই ধরণের কীর্ত্তনাভিনয়ের খুবই ধূম প'ড়ে গিয়েছে। কিন্তু অভিনয়ের বহর দেখে আমাদের হতাশ হ'তে হ'ল। যেমন চণ্ডীদাস, তেমনি রামী—এ ব'লে আমায় দেখ, ও ব'লে আমায় দেখ। দু'জনের গান শুনে আমাদের কোন সুরসিক বন্ধু বলছিলেন—"ধোপার বাড়ীর গাধার দুধে পাতা দই খেয়ে খেয়ে বোধ হয় চণ্ডীঠাকুর ও রাসমণির গলা ব'সে গিয়েছে"!

প্রায় সব ভূমিকাই এক রকম অচল। কেবল নিত্যা আর ভোলা পাগ্‌লা যা' একটু আসর রাখবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু একে কাঁচা হাতের লেখা, তা'তে গানের এইরূপ দুর্দ্দশা—আর তা'র ওপর বাগবাজার হেন জায়গা! পালার রস এমনই জমে উঠেছিল, যে শেষ বরাবর গৃহস্বামীকে বাশুলী দেবীর খাঁড়া দিয়ে কেটে কেটে তা' শ্রোতৃবৃন্দকে পরিবেশন করতে হ'য়েছিল। তবে এক ভরসা—এ সবে "একবিংশ বাসর"। একটু "বহু ধৈর্য্যম্" করতে পারলে শ্রোতারা অনায়াসেই এর শতাভিনয় রজনীর নিমন্ত্রণ পেতে পারবেন ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদন

গত শনিবার অপরাহ্ণে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর প্রতিষ্ঠিত ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদনের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কলিকাতা শ্রমজীবি বিদ্যালয়

গত রবিবার অপরাহ্ণে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর প্রতিষ্ঠিত উক্ত প্রতিষ্ঠানের পারিতোষিক বিতরণ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। হাজি আবদুর রাজাক সভাপতি হইয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠানটীর বিস্তৃত বিবরণ বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

এ্যামুজ্‌মেণ্ট ট্যাক্স

চার আনা ও আট আনা টিকিটের ওপর যথাক্রমে দু' পয়সা ও এক আনা এ্যামুজ্‌মেণ্ট ট্যাক্স ধার্য্য করার প্রস্তাব উঠেছে। আমাদের চিত্র-গৃহগুলি চার ও আট আনার দর্শকদের কৃপায়ই বেঁচে আছে। সারাদিন নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থেকে সন্ধ্যার সময় একটু আমোদ উপভোগ করবার জন্য বায়োস্কোপে যারা চার ও আট আনার আসনগুলির শোভাবর্দ্ধন করেন, তাঁরা সাধারণতঃ চাকুরীজীবী, না হয় স্কুল কলেজের ছাত্র; সুতরাং তাদের আমোদ আহ্লাদের ওপরও যদি ট্যাক্স ধার্য্য হয়, তা' হ'লে তারা হয় ত' এ-আমোদ-আহ্লাদে আর যোগ দিতে পারবে না। যা'তে এই ট্যাক্স রদ্ হয়, সেজন্য আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত সকল প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে 'রূপবাণী'-র অন্যতম কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ বাঙ্গলার লাট বাহাদুরের সমীপে একখানি আবেদন-পত্র প্রেরণ কোরেছেন এবং সহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর কোরেছেন।

সাহিত্য-সম্মেলন

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে চুঁচড়াস্থ "ডাচ্ ভিলায়" বাণী চক্রের একটি সাহিত্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শচী শাল বি-এ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য একটি গল্প পাঠ করিয়াছিলেন। সমালোচনা প্রসঙ্গে সকলেই গল্পটির বিশেষ প্রশংসা করেন। সভায় স্থানীয় বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিক যোগদান করিয়াছিলেন। গৃহস্বামী জলযোগদ্বারা সমাগত সাহিত্যিকদের আপ্যায়িত করেন।

নিউ থিয়েটাস

'নিউ থিয়েটার্সে'-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকার কোলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন কোরেছেন।

* * *

পত্রান্তরে প্রকাশ যে, 'নিউ থিয়েটার্সে'-র আগামী বাঙলা সবাক্-চিত্র "দেবদাস" 'চিত্রা' ও ভবানীপুরের নব-নির্ম্মিত চিত্র-গৃহ 'বিজলী'তে একসঙ্গে মুক্তিলাভ কোরবে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হ'লাম যে, এ সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। "দেবদাস" মার্চের প্রারম্ভেই 'চিত্রা'-য় মুক্তির জন্য অপেক্ষা কোরছে।

ইণ্ডিয়া পিকচার্স লিঃ

"কেশরী ফিল্মসে"র হিন্দী সবাক্-চিত্র "পবিত্র পেয়ার"-এর স্বত্ব এঁরা ক্রয় কোরেছেন।

রাধা ফিল্ম

"মানময়ী গার্ল-স্কুলে"র একটি বহির্দৃশ্য গত হপ্তায় আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট অঞ্চলে তোলা হ'য়েছে। এ ছাড়া বালীগঞ্জে গেল হপ্তায় নাটকে বর্ণিত সাহায্য রজনীর গীত-বাদ্যের একটি মিছিল দৃশ্য তোলা হ'য়েছে। এ হপ্তায় শয্যা-গৃহ দৃশ্য তোলার চেষ্টা চলেছে।

* * *

"দক্ষযজ্ঞ" বিশ হপ্তায় শনিবার থেকে পড়বে। কিন্তু এর আকর্ষণ এখনও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। পঁচিশ হপ্তায় এই ছবিখানির জুবিলী উৎসব হবে এবং এই উপলক্ষ্যে "দক্ষযজ্ঞে"র আর একখানি কপি 'পূর্ণ থিয়েটারে' প্রদর্শিত হবে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

"ডি-জি"-র পরিচালনায় "বিদ্রোহী"-র হিন্দী ও বাঙলা উভয় সংস্করণই জোরভাবে তোলা হ'চ্ছে। গতদিনের ভারতের এক ঐশ্বর্য্যময় রাজপুত কাহিনী অবলম্বনে গল্পের মূল প্রতিপাদ্য গঠিত হ'য়েছে। ছবিখানির ভূমিকা নির্ব্বাচন হ'য়েছে চমৎকার। তদুপরি "ডি-জি" ছবিখানি যা'তে সাধারণের মনোনয়নে সমর্থ হয়, তার জন্য খুঁটি-নাটি সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে কাজ কোরছেন। আমরা আশা করি, ছবিখানি 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া'-র পূর্ব্ববর্ত্তী ছবিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হবে।

* * *

এ ছাড়া "ডি-জি" আর একখানা ছবির কাজে হাত দিয়েছেন। সেখানি হ'চ্ছে উর্দ্দু—"ব্লাড্ এণ্ড বিউটী"। এতে 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া'-র সব শিল্পীর ত' সাক্ষাৎ মিলবেই—এ ছাড়া সুন্দরী আড়াই হাজারী শ্রীমতী সুলতানাকেও দেখা যাবে।

নিউ টনফিল্ম

এদের উর্দ্দু সবাক্-চিত্র "আহ-ঈ-মাজলুমান" (বা "নির্য্যাতিতের আর্ত্তনাদ") আগামী

ঈদের দিনে ভারতের বিভিন্নাংশে দেখানো হবে। গল্পের নূতনত্বে, নৃত্য-গীত-বাদ্যে-অভিনয়ে ছবিখানা যে সাধারণের চিত্তে রেখাপাত কোরবে—এ আভাষ আমরা কিছু কিছু পেয়েছি।

* * *

এরপরে এঁরা কবিবর গুলাবের "মহারাণী" (হিন্দী) ও "রক্তের নেশা" (বাঙ্গলা) নামে দু'খানি ছবি একসঙ্গে তোল্‌বার ব্যবস্থা কোরছেন।

কেশরী ফিল্মস্

এদের বাঙ্গলা সবাক্-চিত্র "বাসব-দত্তা"-র কাজ ধীরে ধীরে এগুচ্ছে।

কালী ফিল্মস্

শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় সত্য সত্যই গাঙ্গুলী মশাইকে ছেড়ে 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া'-য় গেলেন। অনেকে বলছেন—"কাজটা ভাল হয় নি।" ভাল খারাপের বিচারকর্ত্তা আমরা নই। গাঙ্গুলী মশাই ও মুখুয্যে মশাই সে বিষয় ভাল বল্‌তে পারেন।

* * *

"পাতালপুরী"-র সম্পাদনা চল্‌ছে দিন-রাত। গাঙ্গুলী মশাই "পাতালপুরী"র পর্ব্বত পরিমাণ সেলুলয়েডের ভেতর দিনরাত নিমগ্ন হ'য়ে আছেন। দিনরাত 'এডিটিং' আর 'প্রজেক্‌শন'—যেখানে খুঁৎ লাগছে সেখানেই আবার 'রি-টেক' এমনি ভাবে "পাতালপুরী"-র কাজ চল্‌ছে। এত চেষ্টা, এত যত্ন যখন, তখন ছবিখানা যে 'কালী ফিল্মসে'-র অন্যান্য ছবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হবে—এ কথা ভাবা বোধ হয় দুরাশা নয়!

* * *

"বিদ্যাসুন্দর" তোলা হ'চ্ছে। শোনা গেল, কোনও এক সাহিত্যিক নাকি ছবিখানার পরিচালনা কোরছেন। ছবিখানার জন্য ষ্টুডিওর ভেতর কয়েকটি সুন্দর সেট্ তৈরী হ'য়েছে দেখ্‌লুম। সেট্‌গুলির রূপশিল্পী হ'চ্ছেন শ্রীপরেশ বসু (পটল বাবু)।

রূপবাণী

শনিবার ২৩শে ফেব্রুয়ারী থেকে রূপবাণীতে একখানি নতুন ধরণের চিত্র প্রদর্শিত হ'বে। ছবিখানির বিষয় বস্তু হ'চ্ছে স্বয়ং মৃত্যু যদি অবসর গ্রহণ করে তবে পৃথিবীর অবস্থা কি হয়। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় কোরেছেন ফ্রেড্‌রিক মার্চ্চ, আশা করি, চিত্র রসিকগণ ইতিমধ্যেই "ডক্টর জিকেল এণ্ড মিষ্টার হাইড্" চিত্রখানির কথা ভুলে যান নি, তার অভিনয়ের অন্য একটা দিক দেখে সবাই সুখী হবেন। রূপবাণীতে পরবর্ত্তী চিত্র "দি ইন্‌ভিজিবল ম্যান"।

ছায়া

আগামী শনিবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারী হইতে "ছায়ায়" বর্ত্তমান বৎসরের একখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র "ওয়ার্ল্ড মুভস্ অন" দেখান হইবে; বহুদিন হইতে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ দুইটী পরিবারের একটী ছেলে ও একটী মেয়ের কিশোর হৃদয়ের ভীরু প্রেমকে হত্যা করিবার জন্য ব্যবসায়ের উন্নতির ব্যস্ততা, সাংসারিক গণ্ডগোল, পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ একযোগে দীর্ঘ বিংশ বর্ষ ধরিয়া চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইল। তাহাদের অবশেষে অভিপ্সিত মিলন হইল বটে—কিন্তু হৃদয়ের ক্ষুধা তাহাতে মিটিল না। ব্যবসায়ের নেশায়, অর্থোপার্জ্জনের আনন্দে তরুণ মাতিয়া রহিল বাহিরে আর হৃদয়ের ভরা প্রেমের নৈবেদ্য সাজাইয়া তরুণী বৃথাই প্রেমাস্পদের আশায় অর্থহীন দিন কাটাইতে লাগিল। তারপর ভগবানের দয়ায় (?) ব্যবসায়ের অবনতির পর হইল তাহাদের প্রকৃত মিলন। এই চিত্রের শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করিয়াছেন ম্যাডেলিন ক্যারল ও ফ্রাঙ্কোট টোন। এই দুইজনের অভিনয় হইয়াছে সত্যই অপূর্ব্ব সুন্দর।

"ছায়ায়" পরবর্ত্তী আকর্ষণ—ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের নবতম অবদান "দি প্রাইভেট লাইফ অব ডন জুয়ান।"

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার
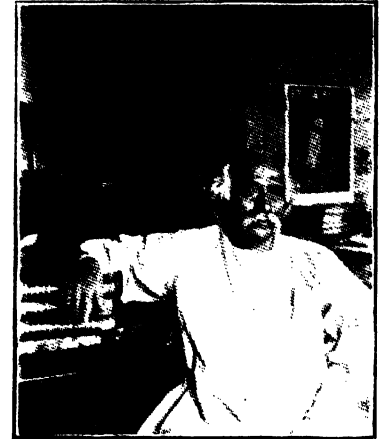
আগামী শনিবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের একত্রিংশৎ মৃত্যু বার্ষিক দিবস অনুষ্ঠিত হবে। স্থান—ইণ্ডিয়ান সায়েন্স এসোসিয়েশন। সভাপতি—ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার, ঐদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায়—১৫, মহেন্দ্র সরকার লেনে প্রার্থনা ও কীর্ত্তন হবে।

—

গ্রেস্ মুর =

অভিনয়ে এর দক্ষতা আছে—এ
সবাই জানে ভালো। কলো
"ওয়ান্ নাইট্ অফ্ লাভ"-এ ইনি
গেয়েছেনও কিন্তু চমৎকার

পেট্রিসিয়া হিলিয়ার্ড =

"দি প্রাইভেট লাইফ্ অফ্ ডন জুয়া
একটি সুন্দরী মেয়ে। ঐ ছবিতে
অভিনয়ও কোরেছেন সুন্দর

মেঘ

[রূপক]

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নীল আকাশের অসীমতার ধারে সীমার রেখা টেনে দিয়ে, কে তুমি এসে দাঁড়ালে? অসীম নীল সাগরের বুকে কোন্ বণিকের ডিঙ্গায় তোমারই তোলা পালে লেগেছে হাওয়া!...

সাঁঝের আঁধারে ধীরে ধীরে এসে প্রকৃতি দেবীর নীলাঞ্চলখানি ঢেকে ফেল্‌লে। দিনের আলোয় লুকানো ছোট্ট তারা-মেয়েরা তখন তাদের মিটিমিটি শিখা নিয়ে এল তোমারই নীরাজনা সম্পন্ন করতে। তখন কি তুমি, ওগো মেঘ, তোমার স্তুতি সম্পাদিত হয়নি' বলে' ঈর্ষায় সুদূর নীহারিকার ওপর তোমার ক্ষীণ আবরণখানি তুলে ধরে' পূজ্য ও পূজারীর মাঝে এনে দিতে চাও শুভ্র তোমার ধূমাভ ব্যবধান। বিস্তীর্ণ নিরধির বুকে অবিশ্রান্ত যে লহরীর লীলা চলেছে, উর্দ্ধে মেদুর নীলার মুকুরে,—তুমি কি তারই প্রতিবিম্ব!...

না—তা'তো নয়! তপন দেবের প্রখর প্রভাবে ঐ নীলাম্বুর গর্ভেই তোমার জন্ম! তাই কি তুমি জন্মলাভেই ছুটে যাও এক নীলার কাছ থেকে আর এক নীলিমার বুকে!!...

ঐ নীলিমার বুকেই কি তোমার ক্রীড়ার সবচেয়ে সুখকর স্থান?...

কৈশোর থেকে এলে ক্রীড়মান যৌবনে। কত রূপের অভিনয়ই খেললে! শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে তোমারই অন্তরালে লুকিয়ে নিকটে এসে পড়া তারাটি চাঁদের তাড়া থেকে রেহাই পেলে! চাঁদ ও তারার লুকোচুরি খেলার তুমিই ছিলে প্রধান সহায়ক! গোধূলি বেলার নদীর ওপারে সূর্য্যদেব যখন ছোট্ট মেঘখানির আড়ালে চুপ করে ডুবে গিয়ে মেঘখানির চারিধার সোণালী রঙে রাঙিয়ে তোলে, তখন তুমি মাঝ-আকাশে, অনেক উঁচুতে উঠে বল—

"না, আমার কাছে তো এখনও সূর্য্যাস্ত হয়নি', এই দেখ তাঁর চম্পকরাজি এখনও আমার সারা অঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে।"

তারপর এলে গাম্ভীর্য্যময় প্রৌঢ়ত্বে।

ঘনঘটায় সারা আকাশকে ঘিরে ফেলে গম্ভীর হুঙ্কারে বিশ্ববাসীর হৃদয়ে প্রলয়ের ভীতি জাগিয়ে তুল্‌লে। শেষে এসে দাঁড়ালে —স্থির, শান্ত, বার্দ্ধক্যে।...যখন ঝরঝরানির

মৃদু গান গেয়ে বিশ্ববাসীকে ঘুম পাড়ালে,—যেমন করে' দাদামশাই রূপকথার 'রাজপুত্তুর ঘোড়ায় চড়ে' সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে, তেপান্তরের মাঠ ডিঙ্গিয়ে ঘুমন্ত রাজকন্যার সন্ধানে যাওয়ার' গল্প বলে' নাতিদের ঘুম পাড়াত'। ঘোড়ায় চড়ে' যাওয়ার কথা শুনে খোকা বুঝি একবার উৎসাহে ভর করে' উঠতে চেষ্টা করেছিল', কিন্তু কম্পমান দীপশিখায় নড়া দেওয়ালের গায়ে কালো কালো ছায়াগুলো দেখে আর উঠতে সাহস হয় নি'। চোখ বুজে শুয়ে পড়ে' পায়ের বালিশটাকে আরও নিবিড় করে' জড়িয়ে ধরে' ছিল'। তারপর কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে তা' গল্প-বল্‌তে-রত তার বৃদ্ধ দাদামশাইও জানে না। এ কি সেই বৃদ্ধ দাদামশাইয়ের রূপকথার গল্পে, না বন্ধ জানালার বাইরের গাছের পাতার 'পরে তোমারই ঝরঝরানির গানে ?...

যেখান হতে' তুমি এসেছিলে, আজ আবার সেইখানে ফিরে গেলে! মাঝখানে রেখে গেলে তোমার অবর্ণনীয় কীর্ত্তি!...

নদী কলকল-তানে নূতন উৎসাহে ছুটে চলল দূরের বিরহী সাগরের কাছে—পৌছে দিতে তাদের নব-মিলনের বার্ত্তা। গাছে গাছে সবুজ পাতা গজালো। লতায় লতায় রঙিন ফুল ফুটে উঠল। মাঠে মাঠে সবুজ ধানের শীর্ষ; কাশের শীর্ষ চামর দুলিয়ে মার আগমনীর পথ পরিষ্কার করে' দিল!—নদী পেল প্রাণ, তরুলতা পেল প্রাণ, নর পেল প্রাণ। দেশে একটা সরস সজীবতা বিরাজ করতে লাগল'। তাই বলি ঃ

তুমি দিলে আশা, তুমি দিলে উদ্যম,
তুমি দিলে প্রাণ,
ঘরে ব'সে গাইছে চাষা,
তোমার মধুর গান!

কোন বিস্মৃত অতীত দিনে না-জানি কোন তরুণ প্রণয়ীর মন তোমায় দেখেই প্রথম কেঁদে উঠেছিল'।...তোমার ভিতর কি সে তার দূরের বিরহিণী প্রেমিকার মুখখানি অস্পষ্ট আকারে দেখতে পেয়েছিল'? তাই কি সে সেদিন জগতের সব কিছু ভুলে তোমারই কাছে তার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করেছিল'? না, তা'তো নয়। তবে কি জগতের যত প্রেমিক তোমারই মধ্যে তার প্রিয়ার সঙ্গীদের পরিচয় পেয়ে তোমাকেই তার প্রেমের দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করে! জানি না, কেন তোমায় দেখে তরুণ-প্রেমিকের হৃদয়-তন্ত্রীতে উদাস-করুণ-সুরের মূর্চ্ছনা বেজে ওঠে! সে কি ভাবে যে, তুমি যে আকর্ষণে আজ তাকে বাইরের জগৎ থেকে ছিন্ন করে' একের চিন্তায় বিহ্বল করেছ, সেই আকর্ষণেই তার বিরহিণী প্রিয়াকেও সংসারের সকল কাজ থেকে সরিয়ে শুধু সেই ক্ষণটুকুর জন্যে জানালার কাছে এসে দাঁড়াবে!......যে আকর্ষণে তার প্রেম-নদী উপ্‌চে ওঠে অশ্রুলোরে চোখের কোন বেয়ে ঝরে' পড়ছে—সেই টানেই তার প্রেমিকার চোখ হতে' ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে-পড়া-অশ্রু মুক্তোর আকারে তার মুখের বিদ্যুৎ ঝলকে চিকমিকিয়ে উঠবে। যে সুরের রেশ আজ তোমার প্রাণের তারে বেজে উঠেছে, সে সুরের ঝঙ্কার কি তারও হৃদয়-তন্ত্রীতে এমনিই কাঁপন তুল্‌বে?...সমাধান হ'ল না। অশ্রু-ভেজা আধফোটা যে প্রেম-প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল' না! কিন্তু আজও তেমনি মেঘ ওঠে। আজও তেমনি তোমায় দেখে প্রেমিকের মন প্রিয়ার জন্য কেঁদে ওঠে।...আজও তেমনি শিখী তার প্রিয়তমার পেখম তোমারই মধ্যে মেলা দেখে উল্লাসে নাচন সুরু করে দেয়।

"সহসা মনে পড়ে যায় এমনি আর একটী মেঘলা দিন। তখন অপরাহ্ণ।—সারা দুপুর মেঘ করে' থেকে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নামলো। বৃষ্টির ছাট রোখবার জন্যে তুমি এসে পূবের জানালা বন্ধ করে' দিয়েছিলে! তারপর বীণাখানি পেড়ে নিয়ে একের পর এক ধীরে ধীরে কত সুরই না বাজিয়ে চলেছিলে! আজ মনে পড়ে অত সুরের মধ্যে তোমার সেই মেঘমল্লারটিই আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল'।"

তরুণ লিখছে আর ভাবছে সেদিনকার সেই মেঘমল্লার আজও কি তার প্রাণে ঝঙ্কার তুল্‌ছে!...এমনি কত কী!...

ওগো মেঘরাজ! তোমার সঙ্গে কি তরুণ প্রণয়ীর এই সম্বন্ধ—যে তোমায় দেখলেই তার চোখের জল ঝরে' পড়ে! তুমি কি তার শত্রু?—না, তা' তো নয়! চোখের জলের সঙ্গেই যার প্রথম পরিচয় সে তো তার সব চেয়ে বেশী আপনার। 'মা'র অঙ্কে জন্ম নিয়েই শিশু কেঁদেছিল তাই তো সে আজ 'মা'র সঙ্গে এত নিবিড় বাঁধনে বদ্ধ।...তুমি কি তার সমব্যথী? তবে বল, কোথায় তোমার প্রিয়া? কে সে অভিমানিনী বালা? যার জন্যে সারা আকাশখানিকে মন্থন করে' বেড়ালে?...কিন্তু তবুও পেলে না। অভিমানে সারা মুখখানি তোমার কালো হয়ে' উঠল'! বক্ষ তোমার ফুলে ফুলে উঠতে লাগল'!...ব্যর্থতার হুঙ্কার ছেড়ে, আকাশের একস্থানে স্থির হয়ে' দাঁড়ালে। মুখে তোমার বিজ্ঞতা-পূর্ণ বিদ্রুপের হাসি খেলে গেল'। তুমি কাঁদছ'!...নীচের দিকে তাকিয়ে কি দেখতে পেয়েছ' যে মানুষ কাঁদে তার না-পাওয়া প্রিয়ার জন্যে। অন্তরের চরম-চাওয়াকে না পাওয়াই যে প্রকৃত মিলন, পেলেই যে তা' ফুরিয়ে যায়, তা' কি তুমিও বুঝেছ'? তুমিও কি বুঝেছ যে প্রিয়জনের জন্যে কান্নার মধ্যে কত বড় আনন্দ নিহিত আছে, যা' তাকে কাছে পেলেও পাওয়া যায় না।...তাই কি তোমার এই অঝোর-ধারা!

কাঁদ, তুমি কাঁদ! বক্ষ তোমার শূন্য করে' প্রতি নদী নির্ঝরিণীতে তোমার চোখের জলে ভরিয়ে দাও!...জগতে তোমার প্রেমই হ'ক আদর্শ। তুমি প্রেমিক।...তাই কি কবি তোমায় অত ভালবাসে?...তাই কি শিল্পীর সাথে তোমার অত ঘনিষ্ঠতা?...

তাই হ'ক।...
যুগে যুগে কবি গাক তোমার গান,—
—শিল্পী আঁকুক তোমার মুখের ছবি!!

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

বজ্রবাহন বটব্যাল

আরো গুজব

কাল প্রেসে লেখা পাঠাতে হবে কাজেই আজ রাতে যেমন তেমন ক'রে একটা লেখা শেষ করতে হবে। কী খবর দি,—বলুন ত' কার খবর আপনারা চান। আমি চুপ্‌চাপ বসে আছি হাতে সিগারেট ধরিয়ে ওই চাঁদের দিকে চেয়ে। সত্যিই আমার কিন্তু, কোনো খবরই মনে আসছে না। হ্যাঁ, একটা মনে পড়েছে শুনুন! শুনুন;—ওই চাঁদ—'The Moon Goddess' কে বলুন ত?—গার্বো। একজন চীনে বলেছেন; গার্বোকে ওমনিই দেখতে। আশ্চর্য্য নয়, রহস্যময়ীর রহস্যের খাস মহলে প্রবেশ করতে কে কী ভাবে ঢুঁ দেয় বলা শক্ত। সে যাক্! সে কথা আমাদের দরকার নেই। নকল না ভেবে আসলই যদি ভাবেন তাতেই আমাদের কী। আমাদের কাছে কিন্তু তাঁর রহস্য লোক থেকে আর একটি বার্ত্তা এসে পৌঁছেচে। শুনুন! শুনুন, গ্রেটা নাকি নামছে ষ্টেজে। সপ্তাহে ন হাজার পাউণ্ডের জমান ভাগটুক এতদিন একটা মস্ত বড় অঙ্কের স্থান নিয়েছে, তাই গার্বো নাকি ঠিক করেছে ষ্টকহলমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঞ্চটা কিনবে, আর ছায়ার মায়া কাটিয়ে সহস্র সহস্র লোক-চক্ষুর সম্মুখে নিজের রহস্যময় মন নিয়ে রাতের পর রাত সেই মঞ্চের ওপর অভিনয় ক'রবে। সত্যি মিথ্যে গুজব-সম্রাটই জানেন।

আরো খবর; গার্বো একখানা গাড়ী কিনেছে। গাড়ীখানার দাম নাকি আটশ' ডলার। গাড়ীখানাকে গ্রেটা ঠিক করেছে মনের মত করে সাজাবে। আর মনের মত করে সাজাতে যত টাকাই খরচ হোক, গ্রেটা তা করবে।

গাড়ীখানার সব জায়গায় কলা সম্মত

রুচি অনুযায়ী রং করা হবে এবং আঁকাও হবে। একদিকের দরজায় লেখা থাকবে স্প্যানিশ ভাষায় "Verad-y-silence" (সততা ও মৌনতা)। গার্বোর জীবনে এই কথাই ব্রত এবং উদ্দেশ্য।

বন্ধু বলতে, গ্রেটার কেউ নেই বল্লেই হয়। যারা আছে তাদের হাত দিয়ে গুণে বের করা যায়। এদের মধ্যে মিস্ অ্যাকষ্টার সঙ্গেই তার সব চেয়ে ভাব বেশী; সবচেয়ে বেশী ভালবাসে তাকে। এই গাড়ীখানি নাকি তার জন্যেই তৈরী হচ্ছে। তাই বোধহয় দরজায় স্প্যানিশ ভাষায় লেখা হচ্ছে, কারণ মিস অ্যাকষ্টা হচ্ছেন একজন স্প্যানিশ মেয়ে। বাস্তবিকই গার্বোর বন্ধু হয়েও লাভ আছে। আমরা কেবল রহস্যের আগল ভাঙ্গতেই দিন কাটালুম—কী বলেন!

ক্যারোল লম্বার্ড আর উইলিয়াম পাওয়েল

খুব চমৎকার একটা খবর পাওয়া গিয়েছে। সেই যে সেই লম্বা মেয়েটি;—ক্যারোল লম্বার্ড। কেমন চমৎকার দেখতে বলুন ত। অমন শরীর, অমন গঠন কার না ভাল লাগে। সেই ক্যারোলের কিন্তু ভাল লাগে 'উইলিয়াম পাওয়েলকে'। ক্যারোলের বড় সাধ সে মা হয়, আর উইলির সাধ সে বাপ হয়। আপনি যদি উইলির ঘরে যান দেখতে পাবেন ছেলেদের খেলনা আর নানা রকম খেলবার সামগ্রীতে ঘর সাজান; আর যদি আপনি কোনদিন ক্যারোলের বাড়ীতে যান দেখতে পাবেন মা সাজার যা কিছু দরকার সব ক্যারোলের ঘরে সাজান। তাইতেই সবাই আশা করে, ক্যারোল উইলির গায়ে ঢলে পড়ে, কানে কানে কোন কথা শোনাবার জন্যে উইলির সঙ্গে হনিমুন ক'রবেন।

ডেভিড কপারফিল্ড-এর বরাত

অভিনেতা অভিনেত্রীর বরাত কখন যে ফেরে তার কোন স্থিরতা নেই। কাল যে লোকটা পথে খবরের কাগজ বিক্রি করে

ক্যারোল লম্বার্ড

বেড়াত, কি যে মেয়েটা হোটেলের খাবার পরিবেশন করত, কিম্বা যে ছেলেটা এ, বি, সি, ডি, চিনত আজ পর্দ্দায় ছবি দিয়ে হয়ত সে লক্ষপতি হয়ে গেলো। এমনিই ছায়া জগতের মাহাত্ম্য। এমনিই ভাগ্য ডেভিড কপার ফিল্ডের। ঠিক দু বছর আগে, যে অভিনেতার নাম বড় কেউ জানত না, আর যে সামান্য টাকার একটা কাজ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করত, সেই ডেভিড কপারফিল্ড আজ দু বছর পরে ছবিতে ১০ দিন কাজ করে পঞ্চাশ হাজার ডলার পেয়েছেন। ডেভিড আগে রেডিও ষ্টুডিওতে কাজ করতেন। সেখানে মনের মত সুযোগ না পেয়ে ডেভিড ও কাজে ইস্তফা

চার্লস্ লাটন

দেন। এই সময় ম্যাক সেনেট তাকে সুযোগ দেন। সেই সুযোগের জোরেই আজ ডেভিড এত বড় লোক।

গত দিনের চার্লস লাটন

আজ চার্লস লাটনের নাম কে না জানে। অত বড় শক্তিশালী অভিনেতা পর্দ্দায় ক'জন আছেন। যে তাঁর অভিনয় একবার দেখেছে কোনো দিনই সে তাঁকে ভুলতে পারবে না। তাঁর অভিনয় অমুক বইতে চমৎকার একথা বলে দিতে হয় না। এই ত সেদিন "হেনরি দি এইটথ্" তিনি অভিনয় করেছেন। বইখানা আমরা দেখতে পাই নি, ভারতে দেখাতে দেয়নি বলে; তবু কাগজে ত পড়েছি তার অভিনয় অতুলনীয় হয়েছে। ওদেশের বিশেষজ্ঞেরা বলেছেন ছবিখানি নাকি ১৯৩৪ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি। সেই চার্লস লাটন ছিলেন হোটেলের কর্ম্মচারী। বাপের ছিল হোটেলের ব্যবসা, তাঁর কাছ থেকেই হোটেলের কাজ শেখেন। চার্লস বলেছেন—হোটেলের কাজে থাকতেই তাঁর সময় এবং অর্থ দুইই থিয়েটারের গ্যালারির জন্যে খরচ করতেন। কাজেই তিনি খারাপ কর্ম্মচারী ছাড়া ভাল কর্ম্মচারী কোনো দিন হতে পারেন নি। প্রথমে তিনি লণ্ডনে সোয়াঙ্ক ক্যালরিজ হোটেলে কাজ করেন। তারপর তা ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্সে এসে দিন কতক এক হোটেলে কাজ করবার পর চার্লস ঠিক করেন ইংলণ্ডে এসে ষ্টেজে অভিনয় করবেন। ইংলণ্ডে ফিরে এসে চার্লসের তা সুবিধে হোল না কারণ এই সময়ে তাঁর বাপের হোটেলের দিকে নজর দিতে হোল। সাড়ে চার মাস সেখানে চার্লস-মন দিয়ে কাজ করলেন বটে কিন্তু দিন দিন মন দমে এলো। এ কাজ আর ভাল লাগল না।

এই সময় চার্লসের ভাই ফিরলেন যুদ্ধ থেকে। চার্লসও অভিনয় করতে মন দিয়ে লেগে গেলেন। ১৯২৭ সালে 'অ্যাকাডেমী অব লণ্ডন আর্ট' এ যোগদান করলেন।

এক বছর থাকবার পর সেইখানে একটি অংশ অভিনয় করতে পান। তারপরই চার্লসের বরাত খোলে।

তার এক বছর পরে চার্লস যশের সুমেরু শিখরে উঠলেন। তার নাম পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। লোকে তাঁর নামের পেছনে অগণন বিশেষণ যোগ করে দিলেন। আজকের দিনে চার্লস যে অভিনয়ে নতুন টেকনিক এনেছেন এ কথা কিন্তু সত্যিই অস্বীকার করবার যো নেই।

খুচরো খবর

উইলিয়াম পাওয়েলের প্রথম ছবিতে নামা হচ্ছে, আর একজন আঘাত প্রাপ্ত লোকের বদলে নামা।

* • *

গ্রেটা গার্ব্বোর 'পেন্টেড ভেল'-এ, হার্ব্বাট মার্শেলকে চীনে ভাষা শিখতে হয়েছে।

• • *

জিন হারসল্ট তার গত দিনের ইতিহাস লিখছেন। এই ছবি নিয়ে তার নামা হবে ৪২৬ বার।

* * *

সিরলে টেম্পলের প্রাথমিক বই পড়া শেষ হোল।

• • *

চার্লস লাটন আর ফ্রেডারিক মার্চ্চ নামছেন একসঙ্গে 'লা মিজারেবল্‌স্‌'-এ।

———

গ্রামের লাইব্রেরী।

শ্রীবিভূতি ভূষণ মালাকার

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই সনাতন নিয়ম পরিলক্ষিত হয় যে, শিক্ষা প্রসারের সাথেই দেশে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা তথা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে শিক্ষা প্রসারের আন্দোলন বাড়িয়া থাকে। লাইব্রেরীর মধ্য দিয়াই মানব অনেক কিছু শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ ও সুবিধা পায়। স্কুল, পাঠশালা, টোল, মাদ্রাসা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে আমাদের যে শিক্ষালাভ ঘটিয়া থাকে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে লাইব্রেরীর সাহায্য নিতান্ত কম নহে। তাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি পল্লীর লাইব্রেরীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সামান্য দুই চারিটি কথা লিখিবার প্রয়াস পাইব।

পল্লীগ্রামের জনসাধারণ পাঠশালা পর্য্যন্ত পড়িয়া সাধারণতঃ তাহাদের পাঠ শেষ করে এবং ইহাতেই তাহাদের মোটামুটি হিসাবে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তাহারা দিবসের সামান্য ভাগে নিজ নিজ কাজ করিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় তাস পাশা খেলা পরনিন্দা পরচর্চ্চা প্রভৃতি করিয়াই সময় অতিবাহিত করে। পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবের অভাবে তাহাদের দ্বারা একতাবদ্ধভাবে কোন জনহিতকর কাজই সম্পাদিত হয় না। কিন্তু আমার মনে হয়, গ্রামে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইলে এই সব দোষগুলি সংক্রামিত হওয়ার সুযোগ পায় না। কারণ, এই সব সংকীর্ণ মনোবৃত্তি সম্পন্ন গ্রাম্য লোকেদের মনের ধারা একবার যদি পরিবর্ত্তিত করা যায় তাহা হইলে তাহারা সেই ভাবধারার সাথেই নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া চলিবে। তাহারা চায় একটা আড্ডা এবং আড্ডা স্বরূপ লাইব্রেরীর নেশা বড় একটা কম নহে। এবং এই লাইব্রেরীতে নানা রকমের চিত্তাকর্ষক শিক্ষাপ্রদ বই, মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা, দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র থাকার দরকার। জনসাধারণ যাহাতে অনায়াসে ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পায় তাহারও সুবন্দোবস্ত চাই। কথা প্রসঙ্গে তাহাদের মনে পাঠের অনুরাগ উদ্রেক করা আবশ্যক। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বই তাহারা পূর্ব্বে আগ্রহ সহকারেই পড়িত। কিন্তু ক্রমশঃ পূর্ব্ব সরলতার অভাবে তাহাদের সেই পূর্ব্ব অনুরাগ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তাহাদের প্রচ্ছন্ন অনুরাগ সঞ্জীবিত করিতে হইলে গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনই সমধিক।

গ্রামের উন্নতি করিতে হইলে লাইব্রেরী স্থাপন ও তাহার প্রসার একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। সামান্যভাবে কাজ আরম্ভ করিয়া ঐকান্তিকতার সহিত উদার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিলে ফল সুন্দর হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। অকৃতকার্য্যতার মধ্য দিয়াই মানব সুষ্ঠু উন্নতি লাভ করে।

বর্ত্তমানে গ্রামে গ্রামে যে দলাদলি রেশারেশি প্রভৃতি গ্রাম্য-সংস্কার সমস্যা জাগাইয়া তুলিয়াছে এইরূপ আদর্শ গ্রাম্য লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার অনেকটা সমাধান হইতে পারে।

———

— উপন্যাস —

উচ্ছৃঙ্খল

শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিখিল পুত্রকে তাঁর বাল্যবন্ধুর কাছে রেখে বেশ নিশ্চিতে কাল কাটাচ্ছেন। সে নিয়মিত পত্রাদি দেয়। অখিলও তার সম্বন্ধে ভাল খবর দিতেন। পুত্র সুখে আছে। তাঁর বিরহ-চিন্তা আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে গেছে। তার পুত্রের সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার মনে অননুভূতপূর্ব্ব সুখ জেগে ওঠে।

অজানিত বেদনায় মানুষের মন বুঝি এমনি করে ওঠে যখন দুঃখ নিশ্চিতভাবেই আস্‌তে থাকে। তার আগমন সূচনা— মানুষকে জানাতে পারলেই বুঝি দুঃখ আসার—স্বার্থকতা। আগের দিন থেকে নিখিলের মন ভাল ছিলনা। মনে কত রকমের দুঃস্বপ্ন জাগ্‌ছিল। তিনি একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

টেলিগ্রাম পিয়ন এসে তাকে খুঁজতে লাগলো। তাঁর বুকের ভিতর কেঁপে ওঠলো। অশুভ আশঙ্কা করে তিনি ভীত হয়ে পড়লেন।

তিনি তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম খুলে পাঠ করতে লাগলেন।

পাঠ করে তিনি মর্ম্মাহত হয়ে বসে পড়লেন। তাঁর পুত্র আবার কু-পথে চলেছে। তাঁর বাসা ত্যাগ করে গেছে। আবার কী কাণ্ড করেছে, করছে। তিনি গেলেই সব জানবেন। তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো।

দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কল্‌কাতার দিকে

অখিলের বাসায় যেতে তাঁর লজ্জা করছিল। তিনি কী করে তাঁর কাছে যাবেন? তিনি তো তাঁর কথায় বিশ্বাস করে তার পুত্রকে স্থান দিয়েছিলেন। এখন কোন্ সাহসে তিনি তাঁর বাসায় যাবেন? তবু তাঁকে যেতে হবে! কর্ত্তব্যের অনুরোধে মানুষকে এর চেয়েও যে কঠোর দুঃখ বিপদ অতিক্রম করতে হয়!

অখিল মধ্যাহ্ন-ভোজনের-শেষে বিশ্রাম করছিলেন। তার পত্নী পাশে বসে ব্যজন করছিলেন, আর অরুণেরই কথা চিন্তা করছিলেন। অনুপমা তার ঘরে বসে কী যেন ভাবছে। কড়া নাড়ার শব্দ শুনে চাকর এসে জানালে, বাবু ঘুমুচ্ছেন।

নিখিল বল্‌লেন: তাঁকে বলগে আমি এসেছি।

—বাবু, আপনাকে তো চিন্‌তে পারছিনে— চাকর মাথা নীচু করে দাঁড়ালে।

—আমার নাম নিখিল নাথ বন্দোপাধ্যায়।

—ওঃ চিনেছি। আপনি আমাদের অরুণ বাবুরই বাবা। আজ্ঞে পেন্নাম হই।

বার্ত্তা নিয়ে চাকর চলে গেল।

ফিরে এসে তাঁকে নিয়ে অখিলের কক্ষে ঢুক্‌লো। অখিলের পত্নী তাকে প্রণাম করলেন। অখিলও তার পদধূলি তুলে নিল। নিখিল কাতর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন: অরুণ কোথায়?

—অরুণ? সে তো সকালে কোথায় গেছে আর আসেনি।

নিখিলের দু'চোখ বয়ে বেদনার অশ্রু ঝরতে লাগলো। ক্ষুব্ধ পিতৃবক্ষ পুত্র-বিরহে আবার কাতর হয়ে উঠ্‌লো।

অখিল বল্‌লেন: আপনি খাওয়া দাওয়া করুন আগে। তারপর যা' হয় বন্দোবস্ত করা যাবে।

যার মন দারুণ দুশ্চিন্তাপূর্ণ তার কি

আহারে রুচি লাগে? এক বিরাট শূন্যতা তাকে গ্রাস করতে আসে। পুঞ্জীভূত বেদনায় নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। জগতে শুধু বেদনা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না।

তবু অখিল ও তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে তিনি সেখানে আহার করলেন। আহারে তৃপ্তি নেই। একটা ঔৎসুক্য একটা অজানিত সংশয়, বেদনা তার মনে সদা জাগ্রত হয়ে আছে!

চাকর এসে হুঁকো দিয়ে গেল। তিনি হুঁকো টানতে লাগলেন।

অখিল বল্‌লেন: আপনার ছেলে অরুণ কাল রাতে কী কাণ্ডটাই না করে বসেছে! রাতে কোথায় বা'র হয়ে যাচ্ছিল, অনুপমা আমার মেয়ে, তাকে যেতে বারণ করেছিল। রাত্রি প্রভাত হওয়ার আগে সে তার ঘরে ঢুকে তার ওপর জোর-প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিল। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তার চীৎকারে আমরা সবাই দৌড়ে গেলুম। মেয়ে লজ্জায় কিছু বল্‌লে না। তারপর আপনাকে তার করেছি।—সে কোথায় চলে গেছে, এখনো আসেনি।

নিখিল কি করবেন ভেবে পেলেন না। তাঁর শরীরের প্রতি অঙ্গ চঞ্চল হয়ে উঠলো। তার বুকের ভেতর থেকে যেন বাড়বাগ্নির মতো অনল উদ্‌গীর্ণ হয়ে আস্‌তে লাগল।

মানুষের ভেতর পশুতো এরাই। তাকে তিনি যার আশ্রয়ে রেখেছেন, তারই কন্যাকে সে অপবিত্র করতে চেষ্টা করেছে! ছিঃ, ছিঃ, এর চেয়ে লজ্জা আর কী আছে?

যার মনে শুধু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির বাসনাই প্রবল হয়ে জেগে আছে—তার পক্ষে জগতে সবই সম্ভব। তাকে পথে আন্‌তে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যতদিন সে আপনা থেকে বুঝতে না পারবে এর পরিণাম কোথায়, ততদিন সে তার কাজই করে যাবে।

নিখিল বল্‌লেন: আমি আজ থেকে তাকে ত্যাজ্যপুত্র করলাম।

অখিল এই মর্ম্মপীড়িত পিতার দিকে চেয়ে রইলেন।.........

......নিখিল সেদিন তাদেরই বাসায় রইলেন। আগামী দিন দৈনিক-পত্রে একখানা বিজ্ঞাপন দেবেন। তিনি জীবনে আর তার মুখ দেখবেন না। যে পুত্র পিতার চোখে অপবিত্র—যাকে এক মুহূর্ত্তও বিশ্বাস করা চলে না তাকে পুত্র বলে স্বীকার করাও যে পাপ! বিদ্রোহী পিতৃবক্ষ আগামী দিনের প্রতীক্ষায় রইলেন।

......পরদিন পত্রিকায় ছাপানো হলো—"অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আজ থেকে আমার ত্যাজ্য পুত্র করলাম; আমার সঙ্গে তার আর কোন সম্বন্ধ নেই। আমি তাকে আমার পুত্র বলে স্বীকার করিনা—" স্বাঃ—নিখিল নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অরুণ কল্‌কাতায়ই ছিল। সাহেবদের হোটেলের ছাতের বারান্দায় বসে চা পান করতে করতে "হকারের" ডাক কাণে পৌঁছলো—পিতা কর্ত্তৃক পুত্র ত্যাজ্য—!

তার মনে হলো তার পিতাই তাকে ত্যাজ্য পুত্র করেছেন বুঝি! বেয়ারাকে একখানা কাগজ আনতে বল্‌লো। বেয়ারা কাগজ নিয়ে এলে সে এক নিঃশ্বাসে তার বাবার দেওয়া বিজ্ঞাপন খানি খুঁজে বার করে পাঠ করে ফেল্‌লে।

—বাবা তাকে ত্যাগ করেছেন। বাড়ীর সঙ্গে তার সমস্ত সম্বন্ধ চুকে গেছে। এখন তার তো কোন অবলম্বন নেই। একমাত্র অবলম্বন আছে—ঐ অনিমা। সে হয়তো তাকে কয়েকদিন খাওয়াতে পারে। তার কাছে সে যাবে। সেদিন সেই হোটেলেই রইলো।

সন্ধ্যাতারা আকাশে ফুটে উঠেছে। গড়েরমাঠ থেকে বাতাস হু হু করে ছুটে এসে তার তাপিত প্রাণ শীতল করে দিচ্ছে।—কাছেই whiskey-র গ্লাস পূর্ণ ছিল। এক গ্লাস পান করে কিছুই নেশা হলোনা। ক্রমান্বয়ে আরো দু'গ্লাস পান করে ফেল্‌লো। তখন সে আর ইহজগতের লোক নেই। তার চোখের সামনে শুধু স্বপ্ন—মায়া মরীচিকার মতো সুখের ছবি ভাস্‌ছে—সে যেন এক সুখের রাজ্যের অধীশ্বর। সেখানে শুধু ভোগবিলাস, তৃপ্তি—সান্ত্বনা! আর কিছু নেই

পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করে নিয়ে একখানা টেক্সি ভাড়া করে সে অনিমার বাড়ীতে পৌঁছলো। দেখলে, সে নেই। বাড়ী তালা বন্ধ। গাড়ী থাম্‌তেই অনেক স্ত্রীলোক এসে তার গাড়ীখানি ঘিরে ধরলো। সে নেমে ড্রাইভারের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে একখানি সুসজ্জিত গৃহে প্রবেশ করলো।

বাড়ীখানি বিখ্যাত কীর্ত্তনওয়ালী শেফালিরই বাড়ী। সে ইতঃপূর্ব্বে অনিমার বাড়ী এসেছে। শেফালি বহু চেষ্টা করেও তাকে তার কাছে আন্‌তে পারেনি তাই তাকে তার বাড়ীতে এনে বড়ই তৃপ্তি বোধ করতে লাগলো, এবং কিসে তাকে আকৃষ্ট করবে ভাবতে লাগলো।

শেফালি বল্‌লে: একটা গান শোনাব?—

—বেশ তো গাও। গাওতো তোমার সেই গান্‌টী—

—কোন গানটী?—

—কি বলে—"গোকুলচন্দ্র ব্রজে না এলো"—। তোমার মুখে সে গানটী বেশ মিষ্টি লাগে।

সে খুশী হয়ে গান আরম্ভ করলো।

ডাকাত একটা শিশুকে যেমন বাপ-মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে তুষ্ট করতে নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করে, তেমনি আজ অরুণকে পেয়ে শেফালি নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে তার গানটী গাইলে—যদি তার মন পায়।

অরুণ তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ

করলে। শেফালী কোনরূপ আপত্তি করলো না। অনিমা হয়তো কিছুতেই এত সহজে ধরা দিতনা যত সহজে শেফালি তাকে ধরা দিলে।

তার মন গভীর তৃপ্তিতে ভরে গেল। এই গণিকার স্পর্শই যেন তাকে স্বর্গসুখ দিয়েছে, সে তার মুখে একটী উত্তপ্ত চুম্বন এঁকে দিলে। সেও বিনিময়ে তাকে চুম্বন করলো।

এমনি করে কখন রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল, তা সে টেরও পায়নি। তখন তার তন্দ্রা ভাঙ্ছে। সে বুঝলে যে গণিকালয়ে। অনিমার পরিবর্ত্তে সে যে শেফালির গৃহে এসেছে তাও তার মনে নেই।

শেফালি বিছানা ছেড়ে উঠলো। তার উন্মুক্ত কেশ বাঁধতে বাঁধতে সে বল্লে: ভোর হয়েছে উঠুন।

কণ্ঠস্বরে অরুণ বুঝলে—এতো অনিমা নয়। তবে এ কে, তাকে এত তৃপ্তি দিয়েছে, তাকে মোহমন্ত্রে ভুলিয়ে রেখেছে?

সে বল্লে: শোন।

শেফালি কাছে এলো। বল্লে—কী, আমায় ডাক্‌ছেন কেন?

—তোমার নামটী আমায় বল্‌লেনা?

—আমার নামতো আপনি জানেন। আমার নাম শেফালি।

—ও, শেফালি, বেশ। আমি তোমারই কাছে রইলুম।

—সে তো আপনার অনুগ্রহ। আপনার মতো লোকের পদধূলি পেলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

অরুণ শেফালির বাড়ীতেই আছে।—কিন্তু গণিকারা কি প্রেম চায়? তারা চায় অর্থ। অর্থের বিনিময়ে তারা তাদের কপট প্রেম বিলায়। অন্তরে কি তাদের নিঃস্বার্থ ভালবাসা আছে? যার যত অর্থ আছে, সেই তাদের তত বেশী মন পেতে পারে। অরুণের অর্থ ফুরিয়ে এসেছে। তার আদরও আগের চেয়ে অনেক কমে যাচ্ছে। আগে সারারাত সারাদিনই সে তারই কাছে বসে থাক্‌তো। এখন আর তা' নেই। আস্তে আস্তে সে তাকে সরিয়ে দিতে চাইছে। ভদ্রতার খাতিরে এত সহজে মুখে কিছু বল্‌ছেনা। তা হলে কেমন বিসদৃশ দেখায়।

অরুণ তা বুঝেও বুঝছেনা। সারাদিন মদের নেশায় বিভোর হয়ে থাকে। খাওয়া পরার ঠিক-ঠিকানা নেই। চেহারা রুক্ষ হয়ে গেছে, চক্ষু কোঠরাগত হয়েছে। চোখের নীচে কাল' দাগ পড়েছে। তবু—তার চেহারায় তার আগেকার সৌন্দর্য্যের কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে। যা' চিরসুন্দর শত মলিনতা তাকে মলিন করতে পারে না।

তার মনে কোন চিন্তা জাগেনা,—জাগবার অবসর সে দেয় না। সুরাপান করে'—সে নিজের দুঃখ ভুলে থাকে।

মাঝে মাঝে মনে হয়—বাবার কাছে ছুটে যাবো। তিনি আমায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু পারে না—যেতে পারে না। একদিকে বাসনা পরিতৃপ্তি—অপরদিকে পিতৃভক্তি। কোনটা ছোট? পরে বাসনা পরিতৃপ্তিকেই সে বড় মনে করে।—তাই তার বাবার কাছে ছুটে যাওয়ার অবসর পায় না।

বর্ষণ-মুখর সায়াহ্ন। বৃষ্টি পতনের বিরাম নেই। সারাদিন বারিপাত হচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। শেফালি এসে অরুণকে বল্লে: আপনি এবার অন্য চেষ্টা করুন। একশত টাকা আমায় দিয়েছেন। আপনাকে একমাস খাইয়েছি। আমি তো আর পার্‌ছিনা।

অরুণ বল্লে: বেশ আমি চলে যাবো। কিন্তু আজকের রাতটা তোমায় আমার চাই। আজ হচ্ছে বাদলের রাত। তোমার বিরহে আমি মরে যাব যে! আমার সঙ্গে তোমার এই মধু-যামিনীর অবসান হতে দাও। এখানেই তো শেষ। আমার এই অনুরোধ রক্ষা কর। এখানেই সব শেষ। আমার এ অনুরোধ রক্ষা কর।—শেফালি তেমনি ভাবেই বল্লে: শুধু আপনাকে নিয়ে থাক্‌লে তো চল্‌বে না। আমার নিজের পেটের রোজগার তো আমায় করতে হবে। আজ আমায় আপনি পাবেন না। সে অধীর হয়ে উঠলো। আজ তার টাকা নেই বলে একজন সামান্য গণিকা তাকে মুখের ওপর এত বড় কথা বলে যেতে পারলো। জগতে তবে অর্থই সব? যেদিন তার অর্থ ছিল সেদিন তার পায়ের কাছে গণিকারা এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের প্রেমের পসরা নিয়ে, আর আজ তারাও তাকে উপেক্ষা করছে। জীবনের ওপর তার ধিক্কার এলো। চোখ বেদনায়, ক্ষোভে, দুঃখে অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠলো!

সে বল্লে: আজ আমার অর্থ নেই। তাই তুমি, সামান্য গণিকা—আমায় অপমান করলে। আচ্ছা যাও—যদি কোনদিন পারি—আমার এই অপমানের শোধ নেব।

মাতালের কথার মূল্য কী?—সে তার কাজে চলে গেল; অরুণের কথায় কান দিলে না।

দারুণ উদ্বেগের সঙ্গে তার রাত কাট্‌লো। উষার সঙ্গে সঙ্গে সে রাস্তায় বার হয়ে গেল। তখন ধীরে ধীরে নগরী সুষুপ্তির কোল থেকে সন্তর্পণে জেগে উঠ্‌ছে। (ক্রমশঃ)

ব্যবসা, বানিজ্য ও বীমা

শ্রীগৌরীসেন

"লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন ঃ—

বাংলা সরকারের অর্থসচিব সার জন উডহেড্ বাংলা কাউন্সিলে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা হইতে আমরা বাংলা সরকারের শোচনীয় আর্থিক অবস্থা অবগত হইতে পারি। ১৯৩৫-৩৬ সালের আয় হইতে ব্যয় ২২৮ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। এই অস্বাভাবিক ঘাটতি পুরণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে দুই প্রকারে—প্রথমতঃ, পাট রপ্তানী শুল্কের অর্দ্ধেক আয় বাংলা পাইবে। আয়ের পরিমাণ অনুমিত হইয়াছে ১৫৮ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয়তঃ, বাকী ৭০ লক্ষ টাকার ঘাটতি পূরণ করা হইবে মরা বাংলার উপর ৫ দফা নূতন ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করিয়া। নূতন ট্যাক্সের (সংশোধন) বিল ঃ—

১। বিদ্যুৎ শুল্ক বিল।
২। তামাক (বিক্রয়ের লাইসেন্স) বিল।
৩। কোর্ট ফিস্ বিল।
৪। ষ্ট্যাম্প বিল।
৫। প্রমোদকর বিল।

নানা দেশের দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় যে বাজেটের ঘাটতি হইলে পূরণ করা হয় দুই প্রকারে, যথা—ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া বা দেশে নূতন ট্যাক্স বসাইয়া। দেশে নূতন ট্যাক্স বসাইতে হইলে দেশের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, দেশবাসী কর-ভার বহন করিতে সমর্থ কিনা ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে সরকার বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেন। দেশ যখন কর-ভার বহন করিতে অসমর্থ তখন ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া সরকারী বাজেটের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উপায় ভাল বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা বাংলা সরকারের বিশেষরূপে জানা আছে। সাইমন কমিশন ও পার্সি কমিটিও নূতন ট্যাক্সের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই সব সত্বেও বাংলা সরকার ব্যয় সঙ্কোচের প্রস্তাব না করিয়া দেশে নূতন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব করিতে যাইয়া যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত লঘু ও হাস্যাস্পদ।

তিনি বলিয়াছেন যে বাংলা সরকার ও ব্যবস্থাপক সভা যদি বাংলার আর্থিক উন্নতির জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা না করেন তবে ভারত সরকার পাট রপ্তানী শুল্কের অর্দ্ধেক আয়

প্রদান করিবেন না। কাজেই এই ঘাটতি পুরণ যদি না করা হয় তবে বাংলার ন্যায্য দাবী অস্বীকারও করা হইতে পারে! সাবাস্—বাজেট সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে সে যে নূতন ট্যাক্স আদায় করিয়াই করিতে হইবে, এ দুর্ব্বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে বাংলা সরকার গড়ে প্রায় ৯৫ লক্ষ টাকা করিয়া বৎসরে ব্যয় সঙ্কোচ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু সরকার মনোনীত সোয়ান কমিটি যে বছরে প্রায় দুই কোটী টাকা করিয়া ব্যয় কমাইবার পরামর্শ দেন, সেই বিষয়ে বাংলা সরকার কেন কর্ণপাত করিলেন না। আমরা বুঝিতে পারিলেও কিছু না বলাই ভাল বিবেচনা করি। ব্যয় সঙ্কোচের দিকে না যাইয়া সরকার ভারত সরকারের সাথে ঠাঁট বজায় রাখিতে যাইয়া তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের বেতনের কর্ত্তিত অংশ পুনরায় বহাল করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ঠাঁট বজায় রাখিতে যাইয়া নানাভাবে প্রপীড়িত দেশবাসীর ওপর কর ধার্য্য করার পক্ষে যে যৌক্তিকতা থাকিতে পারে তাহা আমরা জানিতাম না। একবারও তিনি ভাবিলেন না যে ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বচ্ছল অবস্থার সহিত বাংলার ঘাটতি বাজেটের তুলনা হয়না। যদি অনশনক্লিষ্ট দেশবাসী এই মনে করিয়া থাকেন যে সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি বাবদ বছরে যে কয়েক লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে তাহা সংগ্রহ করিবার জন্যই এই পাঁচ দফা ট্যাক্সের নির্দ্ধারণ, তাহা হইলে সরকারের কি বলিবার আছে? আথিক অবস্থার উন্নতি কল্পে ও বাজেট সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে ব্যয় সঙ্কোচ না করিয়া বৎসরে বহু লক্ষ টাকার আয় বাড়াইয়া সরকার নিজের কর্ত্তব্য করা হইয়াছে বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন, কিন্তু দেশবাসী কখনই তাহা মনে করে না। "লাগে টাকা দিবে গৌরীসেন"—কাজেই ট্যাক্স বসাইলেই আর ভাবনা কি?

চাউলের সমস্যা ও প্রস্তাবিত ইন্দো-বার্ম্মা চুক্তি :—

বাংলার সমস্যার শেষ নাই। দিন দিন সমস্যা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। তার উপর ভারত গবর্ণমেণ্টের "প্যাক্ট", "এগ্রিমেণ্ট" ইত্যাদির ফলে অবস্থা গুরু হইতে গুরুতর হইয়া পড়িতেছে। ইতিমধ্যে পাঠকগণ সকলেই প্রস্তাবিত "ইন্দো-বার্ম্মা" চুক্তির কথা অবগত হইতে পারিয়াছেন। এই প্রকারের চুক্তি যে বংলার আথিক সমস্যা কিরূপ ভাবে প্রভাবান্বিত করে তাহার একটী নমুনা—বংলার চাউলের সমস্যার উল্লেখ করিলেই বুঝা যাইবে।

যদিও পাটকে বাংলার অর্থাগমের প্রধান ফসল বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু ধানের চাষকে উহা হইতে ন্যূন বলা যায় না। বাংলার চাউলের বাজার বার্ম্মার চাউলের বাজারের উপর নির্ভর করে। বার্ম্মার বাড়তি চাউলের বাজার, বাংলা ও মাদ্রাজ এবং বাংলার চাউলের দরের নিয়ন্তা বার্ম্মা দেশের চাউলের ব্যবসায়ীগণ। কারণ, দেখা যায় যে যখনই বাংলার চাউলের দাম বাড়িয়া চলিতেছে তখনই বার্ম্মার চাউলের আমদানীর জন্য আমাদের এদেশের চাউলের দাম কমিয়া যাইতে থাকে। গত কয়েক বছরের চাউলের যাহারা অবস্থা বারবার লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারাই দেখিয়া থাকিবেন যে যখনই আমাদের দেশের চাউলের দরের বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইয়াছে তখনই বার্ম্মার চাউলের আমদানীর জন্য তাহা ঘাটিয়া ওঠে নাই।

একদিন ভারত ও বার্ম্মাদেশ একই দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু প্রস্তাবিত শাসন সংস্কারে বার্ম্মাকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে—তাহা পাঠকগণ অবশ্যই জানেন। এবং ইহাও জয়েণ্ট পার্লামেণ্টের কমিটিতে স্থির হইয়াছে যে, অবাধ বাণিজ্য সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া এই দুই দেশের একটী বাণিজ্য চুক্তি হইবে। যদি অবাধ বাণিজ্য করিবার প্রসার

বার্ম্মাকে দেওয়া হয় তাহা হইলে আমাদের চাউলের সমস্যা সমাধান করা একটী দুরূহ কার্য্য হইয়া পড়িবে। কারণ এই চুক্তির ফলে বিণা সারচার্জ্জে চাউলের অবাধ আমদানী বাড়িয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতে বাংলার চাউলের দর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা একেবারেই লোপ পাইয়া যাইবে। বাংলার ধনসম্পত্তি চাষ আবাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, এবং এই কথা বারংবার ভারত গবর্ণমেণ্টকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎসত্বেও যদি ভারত গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কোনরূপ ব্যবস্থা না করেন তাহা হইলে বাংলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত হইতে হয়।

অবাধ চুক্তির সমর্থক একমাত্র ইউরোপীয়ানগণ। কারণ তাহারা খনিজ তৈল ও সেগুন কাঠ বার্ম্মা হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করে, এবং দ্বিতীয়তঃ, বার্ম্মার চাউলের ব্যবসাতে তাহাদের স্বার্থ দৃঢ়ভাবে জড়িত আছে। ইউরোপীয়ানগণের স্বার্থ বজায় রাখিতে চিরকালই আমাদের গবর্ণমেণ্ট সতর্ক। যদি এই চুক্তিতে বিদেশী দ্রব্য আমদানী নিয়ন্ত্রণের কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকে তবে বাংলার আর্থিক অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেইদিন সার জোশেফ ভোর এসেম্ব্লিতে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমরা এই চুক্তির পরিণামে কি হইবে সেই বিষয়ে আশান্বিত হইতে পারিতেছি না।

পোষ্টেল ইন্‌সিওরেন্স

যখন আমাদের দেশে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী সমূহের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না এবং যখন এই ব্যবসা মাত্র শৈশব অবস্থায় ছিল তখন অনেকের মনে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানী সমূহের কার্য্যতৎপরতা ও কর্ম্মকুশলতার প্রতি নানা প্রকার সন্দেহ থাকিত। তখন এই কোম্পানী সমূহের কার্য্যের প্রতি আমরা উদাসীনতা দেখাইয়া আসিতাম। কিন্তু, আজকাল আমাদের দেশীয় কোম্পানী সমূহের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেশের লোক বুঝিতে পারিয়াছেন যে দেশীয় কোম্পানী সমূহ ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতেছে এবং যে সন্দেহের চোখে তাহারা দেশীয় কোম্পানী সমূহকে দেখিত, এখন আর তাহারা সেই চোখে দেখে না। কারণ দেশীয় কোম্পানী সমূহের উন্নতি দেখিয়া সকলের মনেই এখন এই ধারণা হইয়াছে যে দেশীয় কোম্পানীতে জীবন বীমা করিলে কাহারও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে না। বস্তুতঃ আমরা চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারি যে দেশীয় বীমা কোম্পানীতে বীমা করিবার আগ্রহ আমাদের দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। পূর্ব্বে দেশীয় কোম্পানীতে জীবন বীমা করাইতে নানা প্রকার যুক্তির অবতারণা করিতে হইত। দেশের লোক তখন সহজে দেশীয় কোম্পানীতে বীমা করিতে নানা প্রকার ইতস্ততঃ করিত।

যখন দেশীয় কোম্পানীর ঠিক এইরূপ অবস্থা ছিল তখন পোষ্টেল ইন্‌সিওরেন্সের প্রয়োজনীয়তা ছিল, কারণ আমাদের দেশীয় কোম্পানীর ভবিষ্যৎ কিরূপ দাঁড়াইবে সেই বিষয়ে আমাদের কোনরূপ ধারণাই ছিল না। তখন লোকে যেখানে বীমা করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবেনা বলিয়া বুঝিত তখন সেইখানেই জীবন বীমা করিত। কাজেই তখন সরকারী কর্ম্মচারীরা পোষ্টেল ইন্‌সিওরেন্সেই বীমা করিত। কিন্তু এখন, যখন দেশীয় কোম্পানী সমূহের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও ইহাদের কার্য্যের প্রতি সকলেরই আস্থা হইয়াছে তখন পোষ্টেল ইন্‌সিওরেন্স ফাণ্ডের কি প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে বুঝিনা। দেশীয় কোম্পানী সমূহের স্বার্থের জন্য এখন পোষ্টেল ইন্‌সিওরেন্স ফণ্ড যাহাতে উঠাইয়া দেওয়া হয় সেই বিষয়ের মত দৃঢ় হইতেছে। এই বিষয়ে বহু বীমা কোম্পানীর মত আমাদের জানা। বীমা পারদর্শী অনেক সুযোগ্য ভদ্রমহোদয়গণের মতের সহিত আমাদের ঐক্য আছে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে মাদ্রাজে বীমা কর্ম্মীদের সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে যে পোষ্টেল ইন্‌সিওরেন্সের এখন আর প্রয়োজনীয়তা নাই এবং দেশীয় কোম্পানী সমূহের উন্নতির জন্য পোষ্টেল ইন্‌সিওরেন্স ফণ্ড উঠাইয়া দেওয়া হউক। এই অনুরূপ একটী প্রস্তাব কলিকাতার বীমা কোম্পানী সমূহের পক্ষ হইতেও পাশ করা হইয়াছে। আমরা আশা করি যে, দুই প্রদেশের বীমা কোম্পানী সমূহের প্রস্তাব একেবারে ব্যর্থ হইবে না।

সংবাদিকা:—

আর্য্যস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক রায় বাহাদুর নগেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জি গত ৯ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় ভবানীপুরে নীজ বাসস্থানে পরলোক গমন করেন। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকসন্তপ্তঃ পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছি।

* * *

কয়েকদিন পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর একটী শাখা ঢাকাতে স্থাপিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে এই কোম্পানীর সুযোগ্য সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঢাকায় গিয়াছিলেন। ঢাকার শাখার সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন মিঃ ডি, সি, চৌধুরী, এম্, এস্ সি।

* * *

আর্য্যস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর কর্ম্মীগণ উক্ত কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর স্বর্গীয় রায় বাহাদুর নগেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জীর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য এক সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ এস্, সি, রায় সভাপতির কাজ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার বসু রায় বাহাদুরের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ সূচক একটী প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং শ্রীযুত নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সমর্থনে প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

নগেন্দ্র নাথের স্মৃতির সম্মানার্থে সোমবার আর্য্যস্থান অফিস বন্ধ থাকে।

* * *

নিউ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুত গোবিন্দ মালবীয় বাংলাতে চীফ্ এজেন্ট স্থির করিতে কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকদিন এখানে থাকিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কয়েকদিন পরে তিনি পুনরায় এখানে আসিবেন, কারণ এখানে তাঁহার কাজ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে।

* * *

মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জি এম, এ, বি, কম, জি, ডি, এ, আর সি, বাংলাদেশের জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী সমূহের অস্থায়ী এ্যাসিষ্টেণ্ট্ রেজিষ্টারের পদ লাভ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে তাঁহার নূতন পদ লাভের জন্য আন্তরিক অভিবাদন জানাইতেছি।

* * *

হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার বসু, এম্, এ, আর্য্যস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স ও রিয়েল প্রোপার্টী কোম্পানীরও এ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার ছিলেন।

* * *

রায় বাহাদুর গিরিশ চন্দ্র দাস "ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ ইঞ্জিনিয়ার্সে"র সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা তাহাকে অভিবাদন জানাইতেছি।

* * *

ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ কে, ডি, ব্যানার্জ্জি কয়েকদিন পূর্ব্বে ঢাকা গিয়াছিলেন। ঐ স্থানের কার্য্য শেষ করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

‡ * ‡

কয়েকদিন পূর্ব্বে ৪।১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে বাংলার ঔষধ ব্যবসা সমিতির এক সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সমিতির সহ সভাপতি মিঃ প্রেমানন্দ দাস সভার সভাপতির কার্য্য করেন। মিঃ দাস এই ব্যবসা সম্পর্কে বহু তথ্যের কথা বলেন।

* * *

ভারতের বাহিরে যাহাতে ভারতের দ্রব্য বিক্রয় হয় সেই সম্পর্কে একটী ভ্রাম্যমান বৈদেশিক মিউজিয়াম স্থাপন করিবার জন্য "ইণ্ডিয়ান কলোনিয়েল রিভিউ," (মাদ্রাজ) পত্রিকার সম্পাদক মিঃ টি, কে, স্বামীনাথন্ বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। মিঃ স্বামীনাথনের উদ্যম প্রশংসনীয়।

বসন্তের গান

—কবিতা—

হোসনে আরা বেগম

দখিন হাওয়া হিল্লোলিয়া
বসন্তেরি বার্ত্তা আনে
দিগ্‌বধুদের ঘোমটা খুলি
কয় কি কথা কানে কানে।
কয় বুঝি আর ভয় কি প্রিয়া
এনোনা জল নয়ন পাতে
নূতন গানে ভরবে হিয়া
নবীন সুরের মূর্চ্ছনাতে।
তন্দ্রা চোখে আসবে ছেয়ে
কোয়েল শ্যামার ছন্দ-তানে॥
ফাগুন দিনের আগুন জ্বালা
উতল করে ব্যথিত মনে
পাগল সাজে সন্ধ্যা-বালা
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে
ফুলবালা সব ঘোমটা খোলে
ভোমরা বঁধুর মঞ্জু তানে॥
লায়লা সে-কোন মজনু বঁধু
চায় যে ফিরে আপন বুকে
ঢালবে সুখে অধর মধু
নাম না-জানা হর্ষ সুখে।
বঁধুরে তার পায়না ফিরে
বক্ষ ভাসে অশ্রু-বাণে॥

———

ছিটে ফোঁটা

এবারের বার্ষিক 'রূপ রেখা'য় শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী শ্যালিকার কথা কিছু শুনিয়েছেন :—

"(বুঝি) দিদির বকুনী খেয়ে অ্যাতো
আজ কাবু ?
(আহা) তুলুনই না মুখখানি
অ-জামাই বাবু !"

সুরসিকা শ্যালিকা বোধহয় ভুলে গেছেন জামাই বাবুর মুখ তোলাতে হলে কয়েকটি ঔষধের প্রয়োজন—আস্‌ছে বারের কবিতায় তিনি যেন ঔষধকটার একটা ফিরিস্তি দেন।

তারপর—

"(একি !) জম্‌কালো গোঁফ্‌জোড়া
প্রসাধন বিনে—
(হায়) হ'য়ে গেছে ঝরঝরে ঝাঁটা
একই দিনে !"

কিন্তু হায় অধুনা তাও আবার নেই—এখন আবার জামাই বাবু একেবারে গুম্ফহীন ! দিদির রোষানলেই বোধহয় তা দগ্ধ হয়ে গেছে।

"(গায়ে) গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী
কই ?
(মোটে) মানায় না আপনাকে পাম্পসুটি
বই !"

যা দুর্দ্দিন—Hard despression ! সুরসিকার এটা বোঝা উচিত ছিল !

"(টাক্) টেরীতে পড়েনি ঢাকা,
দেখা যায় ফাঁক !
(হাঁ হাঁ) হাত দেবো নাকো ওতে,
ভয় নেই থাক্ !"

রসিক প্রবরার ভদ্রতা জ্ঞান আছে—সৌন্দর্য্য বোধও টন্‌টনে ! পাঠক পাঠিকাগণ—টাক নিবারণের ঔষধ যদি আপনাদের জানা থাকে, তা হলে জামাই বাবুকে জানাবেন।

* * *

উক্ত সংখ্যাতেই শ্রীপ্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতা লিখেছেন—

"রাজার বেটা ঘামে ভিজি গেল,—
ঘোড়া দিদি ধরোলো—"

বেচারী রবীন্দ্রনাথ !—

"ও গো মা,
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সুমুখ পথে,—"

এতদিন পরে এইবার বুঝি রবীন্দ্রনাথের গৌরব আসন আর অক্ষুণ্ণ থাকে না !

প্রভাত বাবুর কাব্য প্রতিভা দেখুন :—

"রাজার দুলাল দাঁড়ায়ে পথের মাঝে,
পাড়ার পুরুষ গিয়েছে যে যার কাজে।
নিশুতি দুপুরে কুকুরের কোলাহলে,
নিষাদযুবতী বাহিরিল দলে দলে।
ছবির মতন ভেসে ওঠে নাকি চোখে,
নিকষকান্তি নারীরা ঘিরেছে ওকে !
সবাই অবাক্ হেরি তা'র রাজবেশ—
কেহ নাহি বুঝে তাহার আতপ ক্লেশ।"

শুধু—

"দরদী তরুণী সে এক শ্যামলী মেয়ে,
সরমে সরিয়া দূর হ'তে ছিল চেয়ে ;
করুণায় গলি দাঁড়ায়ে সবার পিছে,
বাহিনীর কাণে মিনতি গুঞ্জরিছে—
"রাজার কুমার ভিজিয়া গেল যে ঘামে !
ঘোড়া ধর তোরা নহিলে কেমনে নামে ?"

সত্যিই তো সম্মানী লোক তো ! এরই নাম সাঁওতালী গাথা !

এই সংখ্যায় শ্রীমতী ধরা সুন্দরী 'দেবী কবিতা লিখেছেন—'আমার দেশ' কবিতাটির মধ্যে লেখিকা অনেক প্রকার কসরৎ দেখিয়ে—স্বদেশ প্রেম ; সত্যকার স্বদেশ কাকে বলে—প্রচেষ্টা ভালো ! কিন্তু সবচেয়ে প্যাঁচ দেখিয়েছেন তাঁর মনের দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে।—

"আমি আমি করি বুঝিতে না পারি,
কে আমি কোথা নিবাস !
কে আমার মাতা কেবা মোর পিতা—
কা'র তরে করি আশ।"

যা পদ্য মিলে যা !—

তারপর—

"দুদিনের তরে আমি সংসারে পেতেছি
মায়ার ফাঁদ।
দিন শেষ হলে যেতে হ'বে চলে,
ফেলে রেখে সব সাধ।"

এমন কবিতা না লিখলেই নয় !

* * *

সকলের ওপর কিন্তু টেক্কা দিয়েছেন শ্রীদিলীপ কুমার রায়।

......"কেন হেন বাদ সাধে
সিন্ধু মোর সুখশান্তি সনে ? কেন হায়,
মোর আলিঙ্গন ছাড়ি' বল্লভ মিলায়
যাচি চক্রবাল হারা কম্প্র মরীচিকা—
ফিরায়ে আমার প্রেম-নিষ্কম্প দীপিকা,
কলিত কাকলি, উষ্ণ রঞ্জিত অধর,
চিক্কণ চুম্বন"—

চুম্বনের বাহার আছে—উষ্ণ রঞ্জিত অধরে (লিপ্‌ষ্টিক্ লাগান হয়েছিল) চিক্কণ চুম্বন—দিলীপ বাবুর মতো রসিক ব্যতীত কে পারে এ রস বিতরিতে ?—হাজার হোক্ ওস্তাদের কসরৎ ! কিন্তু হায় তবুও :—

"এত ডাকি—ফিরিয়াও চাহে না বধির !"

শুধু বধির—অন্ধও ! যাক্—আর বেশী ডেকে কাজ নেই—গলা ভেঙে যাবে ! তা হলে আরও বিপদ !

নাট্য-তরঙ্গ

(ক্ষেমীশ্বর)

"বিজয়া"

নব নাট্যমন্দিরে "বিজয়া" নাটকের অভিনয় বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হ'য়েছে। এই অভাবনীয় সাফল্যের জন্য জন-সাধারণের কাছে এই নাটকটি অতিরিক্ত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। ইতিপূর্ব্বে এই নাট্য-প্রয়োগ ও অভিনয়ের অবিমিশ্র প্রশংসা নানারূপে প্রকাশিত হ'য়েছে। কিন্তু সরস্বতী পূজার বিজয়ার দিন শরচ্চন্দ্রের "বিজয়া" অমলিন পদ্মের মত রূপে-রসে-গন্ধে পূর্ণ বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল; এবং সেইদিন সন্ধ্যায় শরচ্চন্দ্রের কিরণ রূপদক্ষ শিশিরকুমারের প্রতিভা-দ্যুতির সংস্পর্শে আরও শুভ্রোজ্জল হ'য়ে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহকে উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছিল। বহুদিন যাবৎ প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হ'য়ে আস্‌চে, কিন্তু এই স্মৃতিপূর্ণ দিবসে পূর্ব্বাহ্নে রঙ্গপীঠে বন্দিতা ও সত্যনিরাজিতা বাগ্‌দেবীর আবির্ভাব যেন আমরা উপলব্ধি ক'রতে পারছিলাম। কোনো দিনই এরূপ অনবদ্য অভিনয় হয় নি—এ কথা আমরা বিনা দ্বিধায় ব'ল্‌চি।

* * •

সেদিন শিশিরকুমার স্বার্থান্বেষী, নীচ-চেতা, চতুর ও মিষ্টভাষী "রাসবিহারী-"র প্রকৃত রূপটি যেরূপ নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা' সত্যই তাঁর মত একজন শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষের যোগ্য হ'য়েছে। বর্ত্তমান-যুগে এরূপ ভাব-ব্যঞ্জনা ও সরল সুন্দর অভিনয় দেখা যায় নি। কিন্তু "রাম-" বেশী শিশিরকুমার, "আলমগীর"বেশী "শিশিরকুমার, তপতীর "বিক্রমদেব"বেশী শিশিরকুমার, ষোড়শীর "জীবানন্দ"বেশী শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্ব "রাসবিহারী"-র ভূমিকায় খর্ব্ব হ'য়েছে, এইটুকু আমরা বিশেষ-রূপে লক্ষ্য ক'রেছি। তাঁর ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা দিতে কখনই পারে না—"রাসবিহারী"র মত একটি ক্ষুদ্র চরিত্র;—এই চরিত্র অভিনয়ে তিনি রূপ ফুটিয়ে তোল্‌বার যতই চেষ্টা করুন,—তবু ক্ষুদ্রাশয়, সামান্য মনোবৃত্তির "রাসবিহারী" মনের 'পরে বিশেষ কোনো সহানুভূতি জাগিয়ে তুল্‌তে পারে না। Villain হিসাবেও না, কিম্বা বড় চরিত্র হিসাবেও না। "রাসবিহারী"-কে নাটকের একটি পার্শ্ব-চরিত্র-রূপে ধরা যেতে পারে। শিশিরকুমার ঐ ভূমিকায় অবতরণ ক'রে শুধুমাত্র "রাসবিহারী"-চরিত্রের সম্মান ও গুরুত্ব এনে দিয়েছেন, যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে এ-চরিত্রটি অতোখানি মনোযোগ পাবার উপযুক্ত নয়। এখানে রূপদক্ষ শিশিরকুমার এই চরিত্রটিকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলেছেন। যে-কোনো দৃশ্যে "রাসবিহারী"র আবির্ভাব হ'য়েছে, এই চরিত্রটি দর্শকদের মনে তখনই কৌতুক ও প্রমোদ-রসের সঞ্চার ক'রেছে।

* * •

"বিজয়া"-র অভিনয়ে নায়ক "নরেন"-এর ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ী সকলের মন সবচেয়ে বেশী অধিকার ক'রে ব'সেছিলেন। বিশ্বনাথের এরূপ অভিনয়-কৌশল তাঁর অভিনীত দু-একটি চরিত্র ভিন্ন কোনো চরিত্রেই পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠেনি। বিশ্বনাথের হাব-ভাব-ভঙ্গী, ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, এমন কি হাসিটি পর্য্যন্ত প্রাণস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে। "নরেন"-চরিত্রের সারল্য-ভাব, সুস্পষ্টভাষিতা ও সংপ্রকৃতি বিশ্বনাথের অভিনয়ে সুন্দর প্রকাশ পেয়েছিল। পরোপকারী ডাক্তার নরেনের মনোবৃত্তি ভালরূপেই ফুটে উঠেছিল। ভূয়সী প্রশংসা পাবার অধিকারী "নরেন"-বেশী বিশ্বনাথ ভাদুড়ী।

"বিজয়া"র "বিজয়া" কঙ্কাবতী গৃহীত ভূমিকার পরিপূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা ক'রতে পেরেছেন। সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে—তাঁর উৎকৃষ্ট বাচন-ভঙ্গী, এবং তাঁর সংলাপকথনের নিপুণতায় এই চরিত্রটি ক্রমবিকশিত হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু বাচন-ভঙ্গীর তুলনায় তাঁর অঙ্গহারের কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হয়। কঙ্কাবতীর অভিনয় যেরূপ প্রশংসনীয় হ'য়েছে, তদনুরূপ নিন্দার হ'য়েছে তাঁর গীত গান দু'টি। এই গান দু'খানি নাটকে কেন স্থান পেলো, সেইটেই প্রশ্ন,—এবং আমাদের মনে হয়—গান দু'টির সন্নিবেশ অবান্তর হ'য়েছে, রচনাও অত্যন্ত সাধারণ। গায়িকা অপেক্ষা এখানে দোষ গীত-প্রবর্ত্তকেরই বেশী।

*　　*　　*

আর একটি অভিনেতা বিশেষ প্রশংসা পাবার যোগ্য। "পরেশে"র ভূমিকায় যে নট অবতরণ ক'রেছিলেন—তিনি নিখুঁত ও উজ্জ্বল অভিনয় ক'রে সকলের অন্তর অধিকার ক'রতে পেরেছিলেন। তাঁর আঙ্গিক, বাচিক ও আহার্য্য-অভিনয় অতি চমৎকার।

*　　*　　*

সরলপ্রাণ বৃদ্ধ "দয়াল"-ভূমিকার অভিনয় দ্রষ্টব্য হ'য়েছিল। বৃদ্ধ "ব্রাহ্মের" ভূমিকা দু'টি নিন্দার হয়নি। তাঁদের দেখ্‌লেই বিশেষ কৌতুক-রসের উদ্রেক্ হ'তে বাধ্য।

শেষ বিবাহ-দৃশ্যে যে পরিবেষ্টাটি "জ্বালা ফেঁসে গেছে"—ব'লে ছুটে এলো—তাঁর এই একটি মাত্র কথায় সুন্দর effect জেগে উঠেছিল, এবং এই কথাটি "রাসবিহারী"র সমস্ত চক্রান্ত ফেঁসে গেছে—এইরূপ ইঙ্গিত ক'রেছিল। নাটকে এই কথার সার্থকতা প্রতিপাদিত হ'য়েছিল উক্ত অভিনেতার ভাবাভিব্যক্তিতে।

*　　*　　*

"বিলাস-বিহারী"-র ভূমিকায় শৈলেন্দ্র চৌধুরী চরিত্র বর্ণিত জাতিগত ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর অভিনয় দেখে-শুনে এইটুকু মনে হোলো যে—"শ্রীবিলেস" যতই ব্রাহ্ম-বাবু সাজুন—তাঁর কেবট-ভাবটি ঢাক্‌বার উপায় নাই।

শান্তশীল গোস্বামীর ছ্যাব্‌লামি দু'একটি নাটকে ক্ষান্ত দিলে প্রয়োগকর্ত্তার সুরুচির পরিচয়ই পাওয়া যায়।

*　　*　　*

জ্যাঠা মেয়ে "নলিনীর" জ্যাঠামিটি যবনিকা-পাতের ঠিক পূর্ব্বে উপভোগ্য হ'য়েছিল।

"বিজয়া"—নাটক সম্বন্ধে দু'একটি বক্তব্য :—

"বিজয়া"র বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ যে—"বিজয়া"কে "নাটক" নামে অভিহিত করা যায় না। নাটক ব'ল্‌তে যা' বোঝায়—"বিজয়া"-তে সেই রচনা-রীতি অনুসৃত হয় নি। "বিজয়া"—শুধুমাত্র একখানি "Satire"—বা "ব্যঙ্গনাট্য", এ-র অধিক কিছু বলা যায় না। কোনো সমস্যা এ-র মধ্যে নেই, কেবল সুন্দরভাবে গল্পটি বিবৃত করা হ'য়েছে, এবং মনোহর সংলাপ আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত এই নাটকটিকে জীবন্ত ক'রে রেখেছে। শেষ বক্তব্য এই যে—যে যে স্থলে নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল—সেখানেই ব্যঙ্গ ও প্রহসনের সৃষ্টি ক'রে নাটকের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হ'য়েছে। আমরা নিঃসন্দেহে ব'ল্‌তে পারি যে—"বিজয়া" নাটক-শ্রেণীভুক্ত করা যায় না, এখানি একটি ব্যঙ্গ-চিত্র মাত্র।

সাহিত্য-পরিচয়

উন্মোচন—নবতম মাসিক পত্র। শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য ও শ্রীভূপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক যুগ্ম সম্পাদিত।

মূল্য প্রতি সংখ্যা তিন আনা।

বাঙ্‌লা পত্রিকার জন্ম-খাতায় "উন্মোচনের" নাম নতুন উঠল। ফাগুনে হাওয়ায় শুধু প্রজননের সুবিধা ঘটায় না, ভূমিষ্ঠ হ'তে সহায়ক হয়। আমরা নবজাত শিশু ষেটেরা বাসরে দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল কামনা করি। গোড়ার সংখ্যার লেখক-লেখিকা অল্পবিস্তর সকলেই সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্র নাথের আশীর্ব্বাণী, বীরবলের আশীর্ব্বাদ প্রেস-গর্ভে এর উপর বর্ষিত হ'য়েছে। তা ছাড়া ধূর্জ্জটীপ্রসাদ, বিভূতি বন্দ্যো, সজনী দাস, সুধীন দত্ত চিঠিতে, ডায়েরীর ছেড়া পাতায়, কবিতা-আলাপে কাগজটীকে সুসজ্জিত করেছেন। প্রবন্ধ, গানও স্থান পেয়েছে। গল্প তিনটী—তার মধ্যে দুটী সুবিখ্যাত বিদেশী গল্পের তর্জ্জমা। এ প্রচেষ্টা সাধু সন্দেহ নেই। "ঘোড়াচোর" গল্পের অনুবাদক শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য সরস অনুবাদ করেছেন, কোথাও কোন খোঁচ নেই। আমরা হুবহু মূল রসের সন্ধান পাই। এবারের "উন্মোচনে" খুব বিশেষত্ব না দেখা গেলেও, আমাদের স্বীকার করতে বাধা নেই যে এটী বেশ রুচিপূর্ণ সাহিত্য সংখ্যা হ'য়েছে। সম্পাদকীয় বক্তব্যে এদের আদর্শের কথা বলা হ'য়েছে। তার মধ্যে আমাদের দু'টী কথা ভাল লেগেছে।

"......আমরা বর্ত্তমান—এই সংজ্ঞা। অতীতের স্পর্শ পরম্পরা আর ভবিষ্যতের আয়োজন দুই-ই আমাদের মধ্যে, আমরা দুয়ের মধ্যবর্ত্তী।"

"........জন্মাবধি যা দেখে আসছি লেখবার বেলা তা যদি না লিখি তবে সে লেখা ত হবে মিথ্যা"। "উন্মোচন" যেন এই উক্তির মধ্যে তার নিজের বৈশিষ্ট্য পায়। প্রচ্ছদ-পটের কল্পনা বিখ্যাত পটুয়া যামিনী রায়ের, বহিআবরণের সৌষ্ঠবে পরিপূর্ণ।

সুধীর বসু।

ফে রে

শ্রীসরোজ ঘোষ

কানাডা রাজ্যে আলবাটার অন্তর্গত 'ওয়ারীল্যাণ্ড' সহরে ফে রে জন্মগ্রহণ করেন—১৯০৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর।

তের বৎসর বয়সে ফে রে তাঁর বাড়ীর সকলের সঙ্গে 'সল্টলেক্ সিটী'তে চলে আসেন এবং পরে সেথান থেকে হলিউডে এসে উপস্থিত হন এবং হলিউড হাই স্কুলে লেখাপড়া আরম্ভ করেন।

চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তখন তাঁর ছিল না। কিন্তু স্কুলে সকলের মুখে ষ্টুডিও এবং অভিনেতা অভিনেত্রী ছাড়া আর কোন কথাই নেই। এমন অবস্থার মধ্যে ফেও যে ঠিক তাদেরই মত অভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহিত হ'য়ে উঠবেন তার আর আশ্চর্য্য কি! অল্প দিনের মধ্যেই নিজের পড়াশুনার চেয়ে তিনি স্কুলের অভিনয়ের প্রতিই বেশী উৎসাহ দেখাতে লাগলেন। শুধু তাই নয় অল্পদিনে ফে একেবারে দলের সর্দ্দার হ'য়ে দাঁড়ালেন।

তারপর এক গরমের ছুটীতে ফে ষ্টুডিওতে বাড়তি কাজ করবার জন্য মার সম্মতি চেয়ে বসলেন। মা শুধু সম্মতি দিলেন না, তিনি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এক ষ্টুডিওতে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন।

কিন্তু ষ্টুডিও'তে গেলেই কাজ মেলে না। চরিত্র-নির্ব্বাচন কর্ত্তার দরজাতেই একটা একঘেঁয়ে কথা শুনতে পাওয়া যায়—"Nothing today, Miss." ফে রেও এই অবশ্যম্ভাবী বিপদের হাত হ'তে উদ্ধার পেলেন না। বাধ্য হ'য়েই তিনি বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু ফিরতে হ'ল না। তিনি যে চিত্রে 'বাড়তি' কাজ কোরতে গিয়েছিলেন, সেই চিত্রেরই প্রযোজক মহাশয় সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হ'লেন। ফে-কে দেখে তাঁর মনে কি ভাবের উদয় হ'ল বলা যায় না—তবে তিনি তাঁকে 'বাড়তি' কাজ দিলেন। ফে একদিন মাত্র 'বাড়তি' কাজ কোরলেন এবং তার পরই তাঁকে একটু ভাল অংশ দেওয়া হ'ল। অনেক দিন ধরে বিভিন্ন ষ্টুডিওতে ছোট ছোট কমিক ছবিতে অভিনয় করার পর ইউনিভার্স্যাল তাঁকে 'ওয়েষ্টার্ণ' ছবিতে অভিনয় করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ করেন।

মানুষের মন প্রতিদিন বৈচিত্র চায়—নূতনত্ব চায়। একটা কিছু নিয়ে কেউই সন্তুষ্ট থাকতে চায় না—এই-ই পৃথিবীর নিয়ম। সুতরাং ফে রে যে চিরদিন ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় কোরে সন্তুষ্ট থাকবেন—সেটাও কথনও সম্ভব নয়। তাঁর ইচ্ছা কোন বিশিষ্ট চিত্রনাট্যে অভিনয় কোরে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু সুযোগ আসে না—তিনি প্রতীক্ষায় থাকেন।

শেষে একদিন সুযোগ আসে। এরিক ভন্‌ষ্ট্রোহিম তাঁর "দি ওয়েডিং মার্চ" ছবির জন্য একজন নায়িকা খুঁজছিলেন। ফে রে সেই ভূমিকার জন্য ষ্ট্রোহিম'-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কথাবার্ত্তার পর ষ্ট্রোহিম তাঁকে অংশটী দিলেন।

এই ছবিতে তাঁর কাজ দেখে প্যারামাউন্ট খুসী হয়ে তাঁকে বহুদিনের চুক্তিতে আবদ্ধ করেন, এবং পর পর এমিল জেনিংস্-এর বিপরীতে "দি ষ্ট্রীট্ অফ্ সিন" এবং গ্যারী-কুপারের সঙ্গে "দি লিজিয়ন অফ দি কম্যাণ্ড" চিত্রে অভিনয় করেন। এরপরই তাঁর নাম সাধারণের গোচরীভূত হয়। এবং পর পর বহু চিত্রে অভিনয় কোরে যশের অধিকারিণী হন। তাঁর অভিনীত বিশিষ্ট চিত্রগুলির নাম নীচে দেওয়া হ'ল—"দি ফিনগার পয়েণ্টস্", "ডিরিজিবল্", "দি আনহোলী গার্ডেন", "ডক্টর এক্স", "কিং কং", "দি মিষ্ট্রী অফ দি ওয়াক্স মিউজিয়ম", "দি ভামপায়ার ব্যাট", "সাংহাই ম্যাডনেস", "বিলো দি সী", "ওয়ান সানডে আফটারনুন", "দি বাওরী" প্রভৃতি।

ফে রে বিবাহিত। ১৯২৮ সালে চিত্র-নাট্য-লেখক জন মঙ্ক সণ্ডার্স-কে তিনি বিয়ে করেছেন। খেলার প্রতি তাঁর অত্যন্ত ঝোঁক। প্রায়ই তাঁকে তাঁর টেনিশ কোর্টে টেনিশ খেলতে কিংবা 'স্যাণ্টা মনিকা'র হ্রদে সাঁতার দিতে দেখা যায়। কাজ থেকে একদিন ছুটী পেলেই তিনি 'গলফ্' খেলে কাটিয়ে দেন। 'পিং পং' খেল্‌তে সিদ্ধহস্ত তাঁর মত খুব কমই আছেন। এই খেলায় তিনি 'রোনাল্ড কোলম্যান', রিচার্ড বার্থেলমেস 'জেশী লাস্কী' প্রভৃতি অনেক হারিয়ে দিয়েছেন।

খাওয়া সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সাবধানী। তাঁর ওজন আট ষ্টোনের কিছু কম। কিন্তু চিত্রাভিনয় কালে আবশ্যক অনুযায়ী তিনি তাঁর ওজন সাড়ে আট ষ্টোন কিংবা সাত ষ্টোন কোরতে পারেন।

বাদামী চুল, নীল চক্ষু, এবং পাঁচ ফিট তিন ইঞ্চি লম্বা—এই হ'ল ফে রে-র দৈহিক পরিচয়।

——

মিস্ সুলতানা

এই আড়াই হাজারী সুন্দরীকে আমরা 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া'র উর্দ্দু সবাক চিত্র "ব্লাড এণ্ড বিউটী"তে দেখতে পাব। সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হয়ে অভিনয়ও ইনি সুন্দর করেন।

খেয়ালী

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৪১, 7th March, 1935. { ১০ম সংখ্যা

তুমি আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী-কাশী

কাল গুণিতে গুণিতে ফাল্গুন আসিয়া পড়িল। স্বর্গ হইতে সদ্য আমদানী গাছের মাথায় মাথায় সবুজ শিঙ্কের ঘোম্‌টা দেখিয়া মনে পড়িয়া গেল—আহা, বসন্ত আসিয়াছে বাংলায়! পাকা চুলে কলপ মাখিয়া তাই যুবক সাজিলাম, কারণ, প্রেম করিতে হইবে। প্রেমের কাল তো এই আরম্ভ হইল ফাল্গুনে! কলিকাতার গরমে কোকিলের কুহুতান অসহ্য হইলেও, জোর করিয়া মনে আবেশ সঞ্চার করিতে প্রয়াস পাইলাম। ভাবিতে লাগিলাম—আমি যেন নির্ব্বাসিত এক যক্ষ। করতালি দিয়া আমার প্রিয়া হয়তো পুষ্করিণীর ধারে সেই পুষ্পকুঞ্জে আনমনে কোনো ময়ূরকে নাচাইতেছে। কোকিলের কুহুতানে উত্তপ্ত তাহার নিশ্বাস—সেই নিশ্বাসে বাতাসের অদৃশ্য অঙ্গ পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে! সেই নিশ্বাস যেন আমারি বুকে আসিয়া লাগিতেছে, কিন্তু, হায়, প্রিয়ার কপোলে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিবার সাধ্য আমার নাই। আমি নির্ব্বাসিত!

কলিকাতার বসন্ত কাল! আহা, কী আধুনিক আকুলিত কাল! দুপুরের গরমে পাখা চালাইয়া টেলিফোনে-টেলিফোনে প্রেম! সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে মোটরের গাড়িতে আর গাড়িতে প্রেম! প্রেম সিনেমা-থিয়েটারের প্রতি সারিতে। চাংওয়ার বন্ধ ঘরে গুঞ্জরিত প্রেম! ইস্কুল-কলেজ-আপিস ছুটির পর, প্রতি অপরাহ্নে প্রতি গৃহে গৃহে, সাজ-আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া কত গীটা কত রিটা কত সীটা প্রসাধনের প্রবল চাপে নিঃশ্বাস ফেলিতে পায় না। কত অনুপম, কত মনোরম, কত সহদেব-এর সঙ্গে সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখা করিতে হইবে। কত নিশ্বাস, কত প্রশ্বাস, কত আবেশ। কত আইসক্রীম, কত শ্যাম্পেন, কত কক্‌টেল্! সিগারেট্ এর লাল-মাথা কত কবিতা-কথার তালে তালে নাচে! আধুনিক তানে নাচেরে!

ভাবি আর ভাবি! মন ক্রমশঃ সাতমনি হইয়া আসে। ভগবান আমার শরীরের যৌবন কাড়িয়া লইলেও, মনের যৌবন ছিনাইতে পারেন নাই। তাই, দুই গিন্নী মারা গেলেও তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছি। কলিকাতার প্রখর রৌদ্রে কোকিল ডাকিলেও প্রাণটা যেন কেমন কেমন করিয়া ওঠে। কত সময় লইয়া তাই কলপ মাখি, দাঁড়াইয়া নিজে দাড়ি কামাই, হাড়-শূণ্য গালকে সাহারা করিয়া তুলি। কাজে মন বসে না, কলম তুলিয়া রাখিয়া প্রিয়ার কথা ভাবি। কী এখন করিতেছে সে?—মনের শুক-পাখিকে জিজ্ঞাসা করি। শুক-পাখি কতই না আজে বাজে জবাব দেয়। আমার প্রিয়া নাকি এখন ধোপার হিসাব চুকাইতেছে! নরুণ দিয়া নখ কাটিতেছে পায়ের! কী?—শুইয়া আছে? বন্ধ ঘরে! আমাকে ছাড়িয়া আর কাহারো কথা ভাবিতেছে না তো! শুক-পাখি বেহায়া, কহিল—হইতে পারে! আর থাকিতে পারি না। ছুটিয়া যাই। লজ্জার মাথা খাইয়া বড়বাবুর প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর সাম্‌নেই টেলিফোন তুলিয়া প্রিয়াকে মনের আবেগ জানাই। "তুমি আমায় ভালোবাসো তো? দয়া করিয়া বাসিও। তুমি না বাসিলে আমি যে মরিয়া যাইবো। ওগো, বিকালের বকুল-ফুল—ওগো, ওগো"—পোড়া মনে আর কিছু আসে না। ভাবিয়া আকুল হই। হঠাৎ মনে পড়ে সহপাঠী পদ্মরঞ্জনের কথা। উড়িষ্যায় গিয়া সে এখন প্রকাণ্ড বড়লোক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সহকারী-সেক্রেটারীরা শুধু বক্তৃতার খসড়া করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, প্রিয়ার কাছে প্রেম-পত্রও লিখিয়া দিত! সেই পদ্মরঞ্জনই একদা তাহার প্রিয়াকে যাহা লিখিয়াছিল—তাহাই কহিয়া ফেলিলাম—"ওগো, ভুলিও না তুমি আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী কাশী"!—

চলতি পথে

শ্রীমল্লিনাথ

মুক্তির দাবী

আগামী মে মাসে সম্রাটের পঞ্চবিংশতি বর্ষ রাজত্বকাল পূর্ণ হইলে তদুপলক্ষে বিরাট আড়ম্বরের সহিত এক রজতোৎসব সম্পন্ন হইবে। সম্রাটের ব্যক্তিগত জীবন রাজনীতির উর্দ্ধে, স্থতরাং সম্রাটের নামে যাঁহারা রাজ্য শাসন করেন, তাঁহাদের উপর নানা কারণে আমরা যতই বীতশ্রদ্ধ হই না কেন, সম্রাটের ব্যক্তিগত জীবনে আমরা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। ইতোপূর্ব্বে রজতোৎসব সম্বন্ধে লিখিবার সময়ে পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি যে ঐ সময়ে যাহাতে সাম্রাজ্যের সকল স্তরে আনন্দ উচ্ছ্বাসের বন্যা বহিয়া যায়, রাজকর্ত্তৃপক্ষ তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। যাঁহারা সেই ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত তাঁহাদের সকল বিষয় বিবেচনা করা উচিত যে কি উপায়ে আগামী উৎসব সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে সম্পাদিত হইতে পারে। রাজপুরুষেরা ঘোষণা করিতেছেন—আনন্দ কর। কিন্তু যখন জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ যুবক-শক্তি কারা-প্রাচীরের অন্তরালে নিক্ষিপ্ত, তখন কি উপায়ে জাতি সেই ব্যথা বহন করিয়া উৎসবে যোগদান করিতে পারে? এই কথা কর্ত্তৃপক্ষের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে যুক্তপ্রদেশে প্রবল গুজব, আগামী রজতোৎসবের সময়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মুক্তি সম্ভাবনা আছে। পণ্ডিত নেহেরু যদি ঐ সময়ে মুক্তি পান তো খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু যদি এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় যে শুধু পণ্ডিত নেহেরু মুক্তিলাভ করিবেন এবং বিভিন্ন প্রদেশের অন্যান্য রাজনৈতিক কয়েদী ও বিনা বিচারে আবদ্ধ রাজবন্দীরা মুক্তি পাইবে না, তাহা হইলে আমাদের মনে হয়, যাঁহারা পণ্ডিতজীকে মুক্তিদান করিয়া শান্তির আবহাওয়া ফিরাইয়া আনিতে আগ্রহশীল, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। এই কথায় কেহ যদি স্থির করেন যে অন্যান্য বন্দীদের মুক্তিদান না করা হইলে আমরা পণ্ডিতজীর মুক্তির বিরোধী, তবে তিনি মারাত্মক ভুল করিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পণ্ডিতজী মুক্তি পাইবেন ইহা খুবই আনন্দের কথা। আমরা চাই অন্যান্য বন্দীদেরও মুক্তি দেওয়া হউক। সম্রাটের রজতোৎসবকে সার্থকতা মণ্ডিত করিতে হইলে সকল রকম রাজনৈতিক কয়েদীর মুক্তি হওয়া আশু প্রয়োজন। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের অন্যতম বাংলার নায়ক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তিন আইনে বন্দী। তাঁহার অপরাধ কি তিনি জানেন না; তবে সরকার বাহাদুর যেহেতু মনে করেন তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট, সেই হেতু তিনি বন্দী। কিন্তু তাঁহার (শ্রীযুক্ত বসুর) দেশবাসীর সেই কথায় যে আস্থা নাই তাহা প্রমাণিত হইয়াছে গত পরিষদ নির্ব্বাচনে তাঁহার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কলিকাতা সহরের ন্যায় কেন্দ্র হইতে বিনা বাধায় নির্ব্বাচন। এই নির্ব্বাচনের পরেও সরকার তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া বিধেয় মনে করেন নাই। ইহাতে আমরা মনে করি, অযথা শাসিতের মনে শাসকের প্রতি বিরোধী ভাব জাগাইয়া তোলা হয়। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এইরূপ বিরোধী ভাবসম্পন্ন জনসাধারণ কেমন করিয়া রজতোৎসব উপলক্ষ্যে আনন্দ সমারোহে সাগ্রহে যোগদান করিবে? যদি জনসাধারণের এই উৎসবে আন্তরিক যোগদান করা সরকারের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে সরকারের কর্ত্তব্য, সকল প্রকার রাজনৈতিক কয়েদীদের মুক্তি প্রদান। আশা করি ভারতবাসী জনসাধারণের এই দাবী পূরণ করিতে সরকার বাহাদুর পশ্চাৎপদ হইবেন না।

কংগ্রেসের নীতি (Creed) পরিবর্ত্তন

কর্ত্তার যখন ইচ্ছা হইয়াছে কর্ম্ম তখন হইবেই। মূলে যুক্তি থাকুক অথবা নাই থাকুক তাহাতে কিছু যায় আসে না। কংগ্রেসী শাসন তন্ত্র অধুনা কোনরূপ নীতির বালাই না লইয়াই চলিতেছে; আর কোন রকম সুনিয়ন্ত্রিত নীতিই যখন নাই, তখন যুক্তি তর্কের কথা উঠিতে পারে না। কর্ত্তাদের খুসী হইল কংগ্রেসের বর্ত্তমানে প্রধান মন্ত্রী প্রদত্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে নপুংশক-চরিত্র-সুলভ না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন নীতি অনুসরণ করা উচিৎ, অমনি সেইরূপ কর্ম্ম হইল। তাঁহারা বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পাইলেন না যে তাঁহাদের কার্য্যের ফলে দেশের ক্ষতিবৃদ্ধি না উন্নতিসাধন হইল। এমনই বর্ত্তমান কংগ্রেসী কর্ত্তাদের কার্য্যধারা।

কর্ত্তাদের পুনরায় খেয়াল হইয়াছে যে আজকাল কংগ্রেসের যে নীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে কাজ হইতেছে না—সত্বরই তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কংগ্রেসের প্রচলিত নীতি হইতেছে যে "শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে" (by peaceful and legitimate means) স্বরাজ লাভ। কংগ্রেসের কর্ত্তারা নাকি সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন যে এই নীতির মধ্যে যথেষ্ট গলদ রহিয়াছে; অতএব উহাকে পরিবর্ত্তন করিয়া "সত্যপূর্ণ ও অহিংস উপায়ে

by truthful and non-violent means) স্বরাজ লাভ" করা হউক। এই পরিবর্ত্তনে দলের কতখানি ঢাকা পড়িবে তাহা বিবেচনা করিবার ক্ষমতা মোহান্ধ কংগ্রেসী কর্ত্তাদের থাকিলে তাঁহারা ঐ পরিবর্ত্তনের জন্য সচেষ্ট হইতেন না। অধিকন্তু, তাঁহাদের তারতম্য বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিলেও কি হইবে, কর্ত্তার ইচ্ছায় যে কর্ম্ম,—কর্ত্তার যখন খুসী হইয়াছে, তখন তাহা যতই আপত্তিকর হউক না কেন তাহা হইবেই। ইহার মধ্যে এইটুকু আনন্দের বিষয় যে উক্ত নীতি পরিবর্ত্তন সরাসরি তাঁহারা করিয়াই ফেলেন নাই—মতামতের জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী গুলির নিকট ঐ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব বিবেচনা করিতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির গত অধিবেশনে এই বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। অনেক চিন্তার পর ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, ঐ বিষয়ের আলোচনা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আগামী অধিবেশন পর্য্যন্ত মুলতুবী থাকিবে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে যখন ঐ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল তখন ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছিল যে বাংলার কংগ্রেস কর্ত্তাদের এইরূপ খামখেয়ালী কার্য্যে কোনমতে সায় দিবে না। ইহা খুবই আশার কথা সন্দেহ নাই, এবং আমাদের বিশ্বাস যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আগামী অধিবেশনে যখন এই বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার জন্য উপস্থাপিত হইবে তখন বাংলা একবাক্যে এই অহৈতুক পরিবর্ত্তনের বিরোধিতা করিবে। যদি পরিবর্ত্তনের দ্বারা সত্যই কোন উপকার মিলিত তাহা হইলে আমরা উহাকে সাদরে সমর্থন করিতাম; কিন্তু উক্ত পরিবর্ত্তন তো কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর কর্ম্মক্ষম করিবার উদ্দেশ্যে হইতেছে না, উহা করা হইতেছে যেহেতু, কংগ্রেসের কোন কোন ভাগ্যবিধাতার মনে এই পরিবর্ত্তন করার আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছে, সেহেতু, ইহা করা হইবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু জেনোয়া হইতে যে পত্রখানি প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের নিকট লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে এই অহৈতুক পরিবর্ত্তনের ঘোরতর বিরোধী তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সুভাষবাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে এই পরিবর্ত্তন কংগ্রেসের সভ্যগণকে সত্যাশ্রয়ী ও অহিংস করিবার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর অসৎপন্থাশ্রয়ী করিয়া তুলিবে। অধিকন্তু এইরূপ নীতি অনুসরন আশ্রমবাসীদিগের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অবান্তর (…the proposed change in the creed of the Congress …instead of making people more truthful and non-violent will open the way to greater dishonesty than exists at present. Moreover such

creeds though they are suitable for Ashramas, are quite out of place in a political organisation...) সুভাষচন্দ্র বাংলার মনোভাবের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—তাঁহার কথার প্রত্যেকটী অক্ষর বাঙ্গালী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। গত কয়েকবৎসর যাবৎ কংগ্রেসকে একটী আশ্রমে পরিণত করার অবিরত চেষ্টা চলিতেছে; এই চেষ্টা প্রতিহত করিবার জন্য দেশবাসীর অবিলম্বে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিৎ। ইতিমধ্যেই অন্যান্য কয়েকটী প্রদেশে এই নীতি পরিবর্ত্তনের বিরোধিতা করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; বাংলার কংগ্রেসও ইহার বিরোধিতা করিবেন, আশা করা যায়।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—জিন্না বৈঠক

সাম্প্রদায়িক একটী চুক্তি করিবার জন্য কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মুসলিম লিগের সভাপতি মিঃ মহম্মদ আলী জিন্নার দিল্লীতে এক গোপন বৈঠক হইয়াছিল। বৈঠক তাঁহারা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হইতে পারেন নাই। এই বিফলতার জন্য দায়ী কে তাহা আমরা বলিতে অসমর্থ, কেন না, এই মহামাননীয় ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত নই। তাঁহারা গোপনে যাহা বলা-কওয়া করিতেন, তাহার চুম্বক বিশেষ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। এই চুম্বক সংবাদের মধ্যে আশা-নিরাশার দুই প্রকারের বাণী থাকিত; কোন দিন সংবাদ আসিল তাঁহারা একটী সু-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছেন, আবার তাহার পরমুহূর্ত্তেই ঘোষিত হইল যে তাঁহাদের গোপন-বৈঠক ভাঙ্গিবার উপক্রম। কিছুদিন এই আশা-নিরাশার দ্বন্দে দোল খাইয়া আমরা অবশেষে জানিতে পারিলাম যে তাঁহাদের আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বাংলা ও পাঞ্জাব ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের বিশেষ হানি করে নাই; সেইজন্য অন্যান্য প্রদেশগুলি স্বভাবতঃই হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দেশের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টকর। কংগ্রেস যখন ঐ বাঁটোয়ারা সম্পর্কে না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন নীতি গ্রহণ করিলেন তখন অন্যান্য প্রদেশগুলি তাহা স্বীকার করিলেন, কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাবের পক্ষে তাহা জীবন মরণের সমস্যার ন্যায়; সুতরাং বাংলা ও পাঞ্জাব তাহা মানিয়া লইলেন না। কংগ্রেস সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন নীতিতে আবদ্ধ—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলি যাহারা ঐ নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন তাহাদের পক্ষে কথা বলিবার অধিকার রাজেন্দ্রবাবুর থাকিতে পারে, কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাবের পক্ষে কথা কওয়ার অধিকার তাঁহার নাই, এই চেতনা তাঁহার মনে সর্ব্বদাই জাগরুক ছিল। তিনি চাহিলেন, প্রকারান্তরে বাংলা ও পাঞ্জাবের এম-এল্-এদের দ্বারা তাঁহাদের ক্লৈব্য নীতি সমর্থন করাইয়া লইতে; রাজেন্দ্রপ্রসাদ বুঝাইতে চাহিলেন যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কিত প্রস্তাব যখন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে পাস হইয়া গিয়াছে, তখন উহা মানিয়া লওয়াই বিধেয়। তদুপরি মিঃ জিন্না একজন পাকা স্বদেশ-প্রেমিক, তিনি সম্প্রদায়ের স্বার্থ অপেক্ষা দেশের ও দশের স্বার্থ বেশী করিয়া দেখেন, ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তথা বর্ত্তমান কংগ্রেসের মূঢ়তা ধরিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই তাঁহাদের আর বোকা বানান রাজেন্দ্রপ্রসাদের দ্বারা আর সম্ভব হইল না। মিঃ জিন্না একজন গোঁড়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী। অতীতে তিনি কি ছিলেন তাহা লইয়া বর্ত্তমানের বিচার চলিতে পারে না। বর্ত্তমানে তিনি যখন একজন উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদী তখন তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব আশা করা

ব্যভিচারের মামলায় মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকার

ফেণী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকারের স্ত্রী শ্রীমতী বীণা সরকারের সহিত ব্যভিচারের অভিযোগে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস কে সিংহের আদালতে শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু হইয়াছে, ৪ঠা মার্চ্চ সোমবার তাহার শুনানী উঠিলে ফরিয়াদী পক্ষের কৌশুলী মিঃ এইচ এম বসু এই মর্ম্মে এক আবেদন পেশ করেন যে, মামলাটি রুজু হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক চিঠি-পত্র হস্তগত হইয়াছে; ঐ সকল চিঠি-পত্র পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ঐ সকল চিঠি-পত্র পরীক্ষার্থ সময় চাহিয়া তিনি আদালতকে আগামী ১৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মামলার শুনানী স্থগিত রাখিবার জন্য প্রার্থনা করেন।

শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের পক্ষের কৌশুলী মিঃ এ কে বসু বলেন যে, ইতিপূর্ব্বেই মামলাটির শুনানী ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। ফরিয়াদী পক্ষ উক্ত ধার্য্য তারিখে শুনানীর পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া লইতে পারেন। মিঃ বসু বলেন যে, তাঁহার মক্কেল যত সত্বর সম্ভব এমন কি সম্ভব হইলে আগামী মেয়র নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই আদালতের সমক্ষে স্বীয় চরিত্রের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আমি ইতিপূর্ব্বে এই মামলার শুনানী ১১ই মার্চ্চ তারিখে হইবে বলিয়া ধার্য্য করিয়াছি। উক্ত ধার্য্য তারিখই ঠিক থাকিবে।

অতএব ১১ই মার্চ্চ ঐ মামলার শুনানী আরম্ভ হইবে।

মিঃ এইচ এম বসু, মেসার্স ডি জি লুইস, জি এন বিশ্বাস, মেসার্স ক্লার্ক রলিন্সন এণ্ড কোং ফরিয়াদী পক্ষে এবং মিঃ এ কে বসু, মেসার্স কে ডি মিত্র, জে এন মিত্র, পি এন মুখার্জ্জী, এস পি কর এবং মেসার্স এইচ এন দত্ত এণ্ড কোং আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

প্রকাশ, খানাতল্লাসীর সময় শ্রীমতী বীণার বাড়ী হইতে কতকগুলি ফটো-চিত্র, পত্রাদি, ছবি, কার্ড এবং পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

বৃথা; এবং হইয়াছিলও তাহাই। মিঃ জিন্না যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার পুনরুক্তির এখানে প্রয়োজন নাই, তাহা সকলেরই জানা আছে। মিঃ জিন্নার প্রস্তাব যদি গৃহীত হইত, তাহা হইলে বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দুদের চিরদিনের জন্য পঙ্গু হইয়া থাকিতে হইত। এমত অবস্থায় যে বাংলা ও পাঞ্জাবের হিন্দুরা জিন্না সাহেবের প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইতে অস্বীকার করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা এই জিন্না-রাজেন্দ্র বৈঠক বিফল হওয়ায় মোটেই দুঃখিত নহি, বরং আমরা জানিতাম এই বৈঠকের স্বাভাবিক পরিণতিই এই।

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা
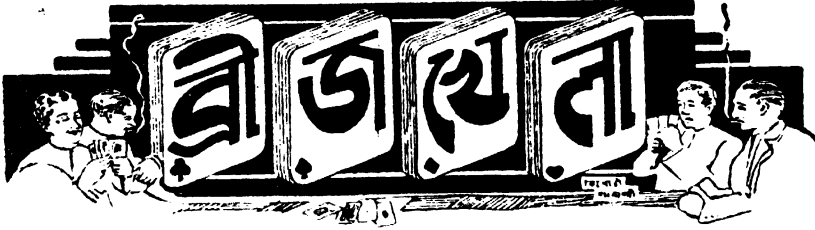
সমস্যা ঃ—

	ইস্কাবন—নাই হরতন—ছক্কা, তিরি রুহিতন—টেক্কা, নওলা চিঁড়িতন—আটা, দুরি	
ইস্কাবন—সাতা, তিরি হরতন—নাই রুহিতন—সাহেব, ১০ চিঁড়িতন—নওলা, পাঞ্জা	উ প পূ দ	ইস্কাবন—ছক্কা, দুরি হরতন—নাই রুহিতন—আটা চিঁড়িতন—সাতা, চৌকা, তিরি
	ইস্কাবন—পাঞ্জা, চৌকা হরতন—নাই রুহিতন—বিবি চিঁড়িতন—গোলাম, দশ, ছক্কা	
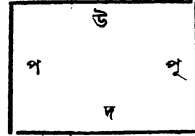
হরতন রঙ, 'দ' খেল্‌বেন 'উ' এবং 'দ'-এর সম্মিলিত হাতে সব ক'খানি পিট নিতে হবে।

প্রারম্ভিক তিন চার বা পাঁচের ডাক ঃ—এরূপ ডাককে ইংরাজীতে Pre-emptive bid বলে। আমরা একে শুদ্ধকারী ডাক বল্‌ব। রঙের খেলায় প্রারম্ভিক একের বা দুই-এর ডাক ডাকদারের অনারের পিটের প্রাচুর্য্য নির্দ্দেশ করে বটে কিন্তু রঙের পিটের জন্য খেঁড়ী সমর্থনের প্রত্যাশা রাখে। বিশেষতঃ এই দুই প্রকার ডাকে রঙ নির্ব্বাচনের ভার প্রধানতঃ খেঁড়ীর হস্তেই ন্যস্ত থাকে। ডাকদার এক বা দুই ডেকে যে রঙটী প্রথমে প্রদর্শন করেন, ডাক ফিরে আস্‌লে তিনি অধিকাংশ সময়েই সেটী পুনরায় না বলে অন্য রঙ ডেকে খেঁড়ীকে জানান যে তাঁর হাতে দুইটী ডাকের যোগ্য রঙ আছে। এই দুইটীর মধ্যে তিনি নিজে মনে করেন যে প্রথমটিতে খেলাই ভাল। সে ক্ষেত্রে খেঁড়ীর মতের উপরই রঙ নির্ব্বাচনের ফলাফল নির্ভর করে। এ বিষয়ে 'শুদ্ধকারী ডাকের' সঙ্গে উক্ত দুই প্রকার ডাকের সুপ্রচুর পার্থক্য বিরাজমান। এ ডাক দিয়ে ডাকদার তাঁর খেঁড়ীকে জানাতে চান যে তাঁর হাতে অনারের পিট যাই থাক্ না কেন রঙের পিট আছে প্রচুর এবং এই রঙের পিট পাবার জন্য তিনি খেঁড়ীর নিকট হতে কোনরূপ সমর্থনের আশা রাখেন না। তিনি আরও জানাতে চান যে তাঁর হাতে যা' খেলার পিট (রঙের পিট সমেত) আছে তার উপর তিনি খেঁড়ীর কাছে vulnerable অবস্থায় মাত্র একখানি এবং non-vulnerable অবস্থায় মাত্র দুইখানি পিটের প্রত্যাশা রাখেন। নিম্নে কিরূপ অবস্থায় এ ডাক কেমনভাবে দেওয়া চল্‌তে পারে তার বিশ্লেষণমূলক বিবরণ দিচ্ছি।

শুদ্ধকারী ডাকের অর্থ নামেই স্বপ্রকাশ। এই ডাকের দ্বারা ডাকদার প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করেন এবং তাঁদের পরস্পরকে পরস্পরের হাত জ্ঞাপন করে রঙ মেলাবার সুযোগ হতে বঞ্চিত করেন। শুদ্ধ তাই নয় এই একটি ডাকের দ্বারা তিনি খেঁড়ীকে নিজের হাতের প্রচণ্ড শক্তির পরিমাণ বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেন এবং তাঁকে অন্য রঙ নির্ব্বাচন করতে প্রকারান্তরে নিষেধ করেন। এই ডাকের দ্বারা তিনি জানিয়ে দেন যে প্রতিরোধ শক্তি (Defensive value) না থাক্‌লেও তাঁর হাতের আক্রমণ শক্তি (offensive value) প্রচণ্ড। সুতরাং এ ডাকের উপর নির্ভর করে খেঁড়ীর 'ডবল' দেওয়া নিষেধ। এক্ষেত্রে তাঁকে 'ডবল' দিতে হলে কেবলমাত্র তাঁর নিজের হাতের উপর নির্ভর করতে হবে। ডাকদারের কাছ থেকে তিনি একটি পিটও প্রত্যাশা করতে পারবেন না। যদি কোন পিট পান সেটা হবে তাঁর উপরি লাভ।

শুদ্ধকারী ডাকের প্রকার ভেদ ঃ—সাধারণতঃ প্রারম্ভিক 'গেমের' ডাককেই (যথা চারখানি ইস্কাবন বা পাঁচখানি রুহিতন) শুদ্ধকারী ডাক বলা হয়। ইহাই খাঁটি Pre-emptive বা শুদ্ধকারী ডাক। ইস্কাবন বা হরতনের তিনের প্রারম্ভিক ডাক কিম্বা রুহিতন ও চিড়িতনের চারের বা তিনের প্রারম্ভিক ডাককেও শুদ্ধকারী ডাক বলা যেতে পারে কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে এ ডাক হচ্ছে Part pre-emptive অর্থাৎ আংশিক শুদ্ধকারী। ব্রীজ খেলোয়াড় মাত্রেই জানেন যে ইস্কাবন বা হরতন রঙকে "মেজর" (Major) এবং অন্য দুই রঙকে "মাইনর" (Minor) আখ্যায় অভিহিত করা হয়ে থাকে। সুতরাং এ

হিসাবে শুদ্ধকারী ডাককে নিম্নলিখিত কয় ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

(১) মাইনরে তিনের ডাক অর্থাৎ চিড়িতন বা রুহিতন রঙের প্রারম্ভিক তিনের ডাক।

(২) মাইনরে চারের বা মেজরে তিনের ডাক অর্থাৎ চিড়িতন বা রুহিতনের প্রারম্ভিক চারের কিম্বা ইস্কাবন বা হরতনের প্রারম্ভিক তিনের ডাক।

(৩) মাইনরে পাঁচের বা মেজরে চারের ডাক অর্থাৎ চিড়িতন বা রুহিতনের প্রারম্ভিক পাঁচের কিম্বা ইস্কাবন বা হরতনের প্রারম্ভিক চারের ডাক।

উল্লিখিত প্রত্যেকটী ডাক ডাকদারের হাতের বিভাগ এবং অনারের পিটের অস্তিত্ব বিভিন্নভাবে নির্দ্দেশ করে।

(১) মাইনরে তিনের প্রারম্ভিক ডাক (Opening minor suit three bids):—এ ডাক দিতে হলে রুহিতন বা চিড়িতনের টেক্কা সাহেব বিবি গোলাম সমেত ছয়খানি কিম্বা টেক্কা সাহেব বিবি সমেত সাতখানি তাস হাতে থাকা চাই এবং অন্য রঙ কয়টির বিবি গোলাম প্রভৃতি তাস হাতে থাকা চাই।

খেঁড়ীর জবাব:—ডাকদারের এই ডাক সাধারণতঃ No Trump-এ খেলার বাসনা জ্ঞাপন করে। সুতরাং খেঁড়ী সাধারণ হাত পেলে সেই ডাক দিতে চেষ্টা করবেন। খেঁড়ীর হাতে একখানি অনারের পিট এবং দুই-একটি বিবি গোলাম থাকলেই এ ক্ষেত্রে তিনটী No Trump-এ খেলা হবার সম্ভাবনা। কেননা ডাকদারের হাতে সাতখানি খেলার পিট আছেই।

(২) মাইনরে চারের বা মেজরে তিনের প্রারম্ভিক ডাক (Opening minor suit four or major three bids:—ভাল্‌নারেব্‌ল অবস্থায় প্রথম ও দ্বিতীয় ডাক দিতে হলে হাতে খেলার পিট চাই যথাক্রমে নয়খানি ও আটখানি। নন্‌-ভাল্‌নারেব্‌ল অবস্থায় যথাক্রমে আটখানি ও সাতখানি খেলার পিটে এ ডাক দেওয়া চলে। ভাল্‌নারেব্‌ল অবস্থায় অনারের পিট চাই দুইখানি হতে সাড়ে তিনখানি, তন্মধ্যে অন্ততঃ একখানি বা দেড়খানি অন্য রঙে থাকা চাইই। পক্ষান্তরে নন্‌-ভাল্‌নারেব্‌ল অবস্থায় দুইখানি হতে তিনখানি অনারের পিট হলেই এ ডাক চল্‌বে কিন্তু সে ক্ষেত্রেও অন্য যে কোন রঙে অন্ততঃ একখানির কিছু বেশী অনারের পিট প্রয়োজন। সে জন্য এ ডাকের আক্রমণ শক্তি ও প্রতিরোধ শক্তি দুইই বর্ত্তমান। আংশিক শুদ্ধকারী ডাকের ইহাই বিশেষত্ব এবং পূর্ণ শুদ্ধকারী ডাকের সঙ্গে ইহার পার্থক্য এইখানে। এ ডাকের উপর নির্ভর করে খেঁড়ী প্রতিপক্ষের ডাককে 'ডবল' দিতে পারেন; কেননা তিনি জানেন ডাকদারের হাতে রঙ ব্যতীত একখানির বেশী অনারের পিট আছেই।

খেঁড়ীর জবাব:—নন্ ভাল্‌নারেবল অবস্থায় হাতে একখানির কিছু বেশী অনারের পিট থাক্‌লে কিম্বা অন্ততঃ হাতের বিভাগ ভাল হলে (যথা তিনখানি ছোট রঙ এবং কোন রঙের মাত্র একখানি তাস) তিনি একটি ডাক বাড়াতে পারেন। ভাল্‌নারেবল অবস্থায় একখানি অনারের পিট পেলেই খেঁড়ী একটি ডাক বাড়াতে পারবেন।

মেজরে চারের বা মাইনরে পাঁচের প্রারম্ভিক ডাক (Pure Pre-emptive bids):—এ ডাক দিতে হলে হাতে প্রচুর পরিমাণে রঙ থাকা চাই। যদি প্রচুর পরিমাণে রঙ থাকে তা' হ'লে বাহিরের অনারের পিটে হাতে না থাক্‌লেও এ ডাক দেওয়া চলে। ফলতঃ এ ডাক দিতে হলে বাহিরের অনারের পিট একখানির বেশী যেন না থাকে। কেন না এ ডাকের মুখ্য উদ্দেশ্য খেঁড়ীকে জানান যে ডাকদারের হাতের আক্রমণ-শক্তি প্রচণ্ড, প্রতিরোধ-শক্তি অল্প। কাজে কাজেই এ ডাকের উপর নির্ভর করে প্রতিপক্ষের ডাককে 'ডবল' করা খেঁড়ীর পক্ষে নিষেধ। বাহিরের অনারের পিট একখানির বেশী থাক্‌লে আংশিক শুদ্ধকারী ডাক দেওয়াই বিধেয় (মাইনরে চারের বা মেজরে তিনের ডাক)। এ ডাক দিতে হলে হাতে নিম্নলিখিত খেলার পিট থাকা প্রয়োজন।

ভাল্‌নারেবল অবস্থায়—মেজরের ডাক—অন্ততঃ আটখানি খেলার পিট (যথা,—ইস্কাবন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম, আটা, সাতা, ছক্কা, দুরি; হরতন—দুরি; রুহিতন—দশ, নয়, সাতা, দুরি)।

ভাল্‌নারেবল অবস্থায়—মাইনরের ডাক—অন্ততঃ নয়খানি খেলার পিট (যথা,—ইস্কাবন—সাতা; হরতন—আটা, ছক্কা, তিরি; রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম, দশ, আটা, পাঞ্জা, তিরি, দুরি)।

নন্‌-ভাল্‌নারেবল অবস্থায়—মেজরের ডাক—অন্ততঃ সাতখানি খেলার পিট।

নন্‌-ভাল্‌নারেবল অবস্থায়—মাইনরের ডাক—অন্ততঃ আটখানি খেলার পিট।

খেঁড়ীর জবাবঃ—এ ডাকের পর প্রতিপক্ষ যদি কোন ডাক দেন তা' হলে ভাল্‌নারেবল অবস্থায় দুইখানি খেলার পিট নিয়ে এবং নন্‌-ভাল্‌নারেবল অবস্থায় একখানি খেলার পিট নিয়ে খেঁড়ী একটি ডাক বাড়াতে পারেন। তবে এ ভাবে ডাক বাড়াতে হলে দুটী বিষয় বিশেষ সাবধানতা সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। যদি খেঁড়ী নিশ্চিত বোঝেন যে প্রতিপক্ষের ডাকে খেলা হবার সম্ভাবনা তবে তিনি তার প্রতিরোধকল্পে এ ডাক বাড়াতে পারেন নচেৎ নয়। আর একটি বিষয় খেঁড়ীকে অনুধাবন করে দেখ্‌তে হবে, সেটী হ'চ্ছে তাঁর ডাকের ফলে প্রতিপক্ষেরা যেন 'স্লামের' ডাকে না চলে যান। যদি তিনি মনে করেন যে তাঁদের 'স্লামের' সম্ভাবনা আছে তবে তাঁদের উত্তেজিত করে ডাক বাড়ানো অনুচিত। মনে করুন 'ক' ডেকেছেন 'চারটী ইস্কাবন' 'আ' বল্‌লেন 'পাঁচটী হরতন'। 'খ' যদি মনে করেন যে তিনি প্রতিরোধকল্পে 'পাঁচটি ইস্কাবন' ডাক্‌লে 'অ' 'ছয়টি হরতন' ডাক দিতে পারেন এবং সে ডাকে তাঁদের খেলা হবার সম্ভাবনা আছে সে ক্ষেত্রে 'খ'র পক্ষে ডাক দেওয়া অনুচিত। কেন না 'স্লাম' ডেকে খেলা করবার 'প্রিমিয়ম' (Premium) অনেক বেশী। ডাক বাড়াবার আগে খেঁড়ীর পক্ষে এ সব বিষয় বিশেষ ধীরতা সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

শুদ্ধকারী ডাকের পর প্রতিপক্ষ কোন ডাক না দিলে খেঁড়ী যদি স্বেচ্ছায় ডাক বাড়ান তবে বুঝতে হবে যে তিনি 'স্লামের' সম্ভাবনা রাখেন এবং তাঁর হাতে অন্ততঃ তিনখানি অনারের পিট বর্ত্তমান আর তিনি নিজের হাতেই তিনখানি বা চারখানি (ডাক অনুযায়ী) পিট পাবার আশা রাখেন।

Theta Beta Club:—অনেকেরই ধারণা Theta Beta Club মাত্র এক বৎসর স্থাপিত হয়েছে কিন্তু তা' ভুল। উত্তর কলিকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্রীজ খেলার আড্ডা হিসাবে Theta Beta Club স্থাপিত হয় সাত বৎসর পূর্ব্বে। Hony. Secretary শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র ভূষণ রায়ের অক্লান্ত চেষ্টায় সমিতিটির ধীরে ধীরে উন্নতি হতে থাকে। অনেকেরই জানা নেই যে কলিকাতার ভিতর Theta Beta Clubই বোধ হয় একমাত্র সমিতি, যা' সর্ব্বতোভাবে Portland Club ও New York Whist Club এর আদর্শে অনুপ্রাণিত। সদস্যদের সকল রকম সুবিধার দিকে এঁদের প্রখর দৃষ্টি। মাস তিনেক পূর্ব্বে এঁরা ব্রীজ প্রতিযোগিতায় অভ্যস্ত ছিলেন না কিন্তু এখন এঁদের এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে এবং এর মধ্যেই এরা প্রতিযোগিতার খেলায় বেশ নাম করেছেন। এখানে এদের অক্‌লন্‌ ও কন্‌ট্রাক্ট দুইই নিয়মিত ভাবে প্রায় প্রতিদিনই খেলা হয়ে থাকে এবং এমন কতকগুলি খেলোয়াড় আছেন, খেলা দেখে যাঁদের প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় বলা যেতে পারে।

কাশীপতি মেমোরিয়াল ক্লাবঃ—এরা খেলার উৎকর্ষ সাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন এবং বহু প্রতিযোগিতায় খেলে চলেছেন। যদিও এরা কন্‌ট্রাক্ট আরম্ভ করেছেন অল্পদিন তবুও এঁদের মধ্যে অনেকেই এখন বেশ ভালই খেল্‌তে পারেন। অন্যান্য গুণের মধ্যে সময়ানুবর্ত্তিতা ও ভদ্রতাই এদের সমিতির শ্রেষ্ঠ গুণ। এরা যে সব প্রতিযোগিতায় নাম দেন সেখানে তো খেলেন্‌ই, উপরন্তু দু-এক মিনিট সময়ের একটু তফাৎ করেন না। এ সমিতির গোড়ায় কমলেশ বাবু ও ভট্‌চায্যি ম'শায়ের সমবেত প্রচেষ্টা বর্ত্তমান বলেই এদের উন্নতির সম্বন্ধে আমাদের কোন ভাব্‌না নেই।

কাশীপুর ইন্‌ষ্টিট্যুটঃ—প্রতিযোগিতার টেবিলে আজকাল এদের বড় একটা দেখা যাচ্ছে না—এর কারণ কি? সতুবাবু ও প্রফুল্লবাবুর মত উপযুক্ত ব্যক্তি যখন এঁদের সমিতির হালে তখন এঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে সন্দেহ করাই অনুচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাইরে এঁদের প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে না কেন,—এদের ক্লাব কি নীরব প্রতিযোগীতে ভরা? তবে হয়তো হঠাৎ কোনদিন এঁরা চমকপ্রদ খেলা দেখিয়ে আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত করবেন বলেই চুপ্‌চাপ্‌ আছেন! আমরা অবশ্য এই সুখকর বিস্ময়ের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়েই রইলুম্‌।

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

কাণপুর "চিত্রা"

মিঃ বি, এন, সরকার এইবার বোম্বে, লাহোর, দিল্লী পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন পথে চিত্রার কাণপুর ব্রাঞ্চ পরিদর্শনের জন্য তথায় অবতরণ করেন। কাণপুরে চিত্রগৃহ প্রতিষ্ঠার পর তিনি এই প্রথমবার ঐ ব্রাঞ্চ পরিদর্শন করেন। স্থানীয় ম্যানেজার মিঃ টি, রায় সঙ্গে থাকিয়া চিত্রগৃহ পরিদর্শন করান এবং ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর তাঁহার আগমন স্মরণীয় করিবার জন্য তথাকার কর্ম্মীগণ সহ একখানা প্রতিকৃতি গ্রহণ করা হয়।

১লা মার্চ্চ হইতে নিউ থিয়েটার্সের নবতম উর্দ্দু চিত্র "কারওয়ান-ই-হায়াৎ" উক্ত গৃহে মুক্তিলাভ করিয়াছে। ঐ ছবির অভিনব প্রচার-কার্য্যের ফলে সহরে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আশা করা যায় যে কাণপুরে উক্ত ছবি অন্যান্য সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করিবে।

উদয়শঙ্কর

শনিবার ১৬ই মার্চ্চ থেকে বিশ্ববিখ্যাত এই নর্ত্তক এম্পায়ারে এক সপ্তাহের জন্য সাধারণকে তাঁর নাচ দেখাবেন। এবার তাঁর নাচের প্রোগ্রামে অনেক নতুন নৃত্যের সমাবেশ থাকবে। উদয়শঙ্করের প্রত্যেকটি নাচই, হাজার পুরোণোই হোক না কেন, আজ পর্য্যন্ত কারো সমাদর লাভে বঞ্চিত হয় নি। তার ওপর নতুন কয়েকটি নৃত্যের সমাবেশে এবারে তাঁর প্রোগ্রাম সাধারণের অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই লোভনীয় হয়ে

এবার একটি সুন্দর ঘটনা ব'লে উদয় শঙ্করের নাচ যে সবার কাছে কতখানি প্রিয় তার প্রমাণ দিচ্ছি। আপনারা জানেন বোধ হয় শঙ্কর সম্প্রতি দিল্লীর "রিগাল" রঙ্গমঞ্চে নেচে এসেছেন। তখন গ্রিগ্ বাজেট্ নিয়ে লেজিস্‌লেটিভ্ অ্যাসেম্‌ব্লির সভ্যরা অত্যন্ত ব্যস্ত। তর্কাতর্কি, ঝামেলা আর ঝগড়া। কিন্তু, সেই সন্ধ্যেবেলা আবার তাঁদের জন্যেই 'রিগাল' হল্-এ তিল ধারণের জায়গা থাকতো না। উড়িষ্যার প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বি, দাসকে সারাটা দিন দেখা যেতো বাজেট নিয়ে অসম্ভব তর্ক করতে। আবার সন্ধ্যেবেলাই দেখা যেতো সেই মিঃ দাসই শ্রীমতী কনকলতার নাচ দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠে অসম্ভব আনন্দ জ্ঞাপন করছেন। সেই দিন সকালেই আবার তিনি ভারতীয় শিল্পে পাশ্চাত্যের প্রভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট নিন্দে করছিলেন। তিনি প্রার্থনা করছিলেন ভারতের সেই অতি পুরাতন একমাত্র নিজস্ব শিল্প যেন ভারতেই আবার ফিরে আসে। শঙ্করের নৃত্য-শিল্প শুধু যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের মিলন ঘটিয়েছে—তা' না, এ মিলন ঘটিয়েছে বুরোক্রেসি ও কংগ্রেস-এরও।

সদলবলে লেডি উইলিংডন, অনেকবার স্বদেশী জেল-ফেরৎ শ্রীযুক্তা নাইডু ও শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইর সঙ্গে সমস্বরে শঙ্করের নৃত্যের সুপ্রশংসা করতে ব্যস্ত ছিলেন। খদ্দরের টুপি ও ইভ্‌নিঙ্ ড্রেস্-এর অপূর্ব্ব মিলন! ডাক্তার আন্‌সারী, শ্রীযুক্ত দীপ-নারায়ণ সিং, শ্রীযুক্ত লাহিড়ী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বাজপাই—সকলেই শঙ্করের 'তাণ্ডব নৃত্যে' রাজনীতিকে সাময়িক ভাবে জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। মিঃ জিন্নারও যেন মনে হ'লো, তিনি সাম্প্রদায়িক দাবী সম্বন্ধীয় তাঁর 'চতুর্দ্দশ দফা' একেবারেই ভুলে গেছেন। মিঃ ফকীর চাঁদের কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে তাঁকেও শঙ্করের নাচে প্রবল ভাবে হাত্-তালি দিতে দেখা গিছ্‌লো। দু'জনকার মত্-এ দু'জনকার তখন অভেদ্য মিলন।

এমনিই অপূর্ব্ব যাদু জানে শঙ্করের অতুলনীয় নৃত্য-শিল্প। নাগরাজ্যে তাঁর শিল্প যেন সাপুরিয়ার বাঁশী। বাইরের আবহাওয়া সে তোমাকে ভোলাবেই ভোলাবে। তুমি যাই ভুলতে না চাও না কেন!

ঈষ্ট ইণ্ডিয়ার "বিদ্রোহী"

গত সপ্তাহে পরিচালক ধীরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী "বিদ্রোহী"-র প্রকাণ্ড এক দল নিয়ে জয়পুর রওয়ানা হয়ে গেছেন। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ভেতর যাঁরা গেছেন—তাঁদের ভেতর অহীন্দ্র চৌধুরী, ভূমেন রায়, জ্যোৎস্না গুপ্তা ও ডলি দত্তের নাম উল্লেখ-যোগ্য। রাজপুতদের সুন্দর একটি আখ্যান নিয়ে হচ্ছে এর গল্প. তাই রাজপুতানার আসল আবহাওয়া যে চিত্রখানির অত্যন্ত প্রয়োজন—তাতে আর সন্দেহ নেই। প্রকাশ, যে পরিচালক 'ডি জি' জয়পুরে প্রায় একমাস থেকে "বিদ্রোহী"-র ছবি তোলার কাজ শেষ করবেন।

"বিদ্রোহী"-র হিন্দী দলও গেছেন জয়পুরে। এ চিত্রখানির নায়িকা মিস্ সুলতানা। তিনি দলের সঙ্গে না গিয়ে পরে রওয়ানা হয়েছেন গত মঙ্গলবারে।

* * *

অবিশ্যি, 'ডি জি'-র আরেকখানি ছবিও সেখানে তোলা আরম্ভ হবে—সেটি হচ্ছে হিন্দী "ব্লাড্ এণ্ড বিউটি"।

কালী ফিল্মস্

এঁদের "পাতালপুরী"-র মুক্তিলাভের বেশী আর দেরী নেই। শৈলজানন্দের এই সুন্দর গল্পটির পরিচয় আর নিষ্প্রয়োজন, তা'র ওপর কর্ত্তৃপক্ষ নাকি এর সুন্দরতর রূপ প্রদানে কসুর করেন নি। চিত্রখানির সাফল্য সকলেই অচিরে অপেক্ষা করছেন।

অন্যান্য ছবির কাজও বেশ এগুচ্ছে।

ইণ্ডিয়া পিকচার্স লিমিটেড

আগামী ১২ই এবং ১৩ই মার্চ্চ বিখ্যাত উদয়শঙ্কর ও তাঁর বিখ্যাত দল বাঁকীপুরে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন পিক্‌চার প্যালেসে নাচবেন।

* * *

এঁদের হিন্দী "দক্ষযজ্ঞ" ছবিখানির সত্ব বোম্বাই, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশ-এর জন্য বোম্বাই-এর সেন্ট্রাল টকি সারকুট ক্রয় করেছেন।

নাটোরে নুতন-গৃহ

সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায় মহাশয়ের একটি নতুন চিত্রগৃহ সম্প্রতি রাধা ফিল্মের "দক্ষযজ্ঞ" নিয়ে উদ্বোধন হয়েছে। এ চিত্রগৃহটির যন্ত্রপাতিও ঐ কোম্পানীই সরবরাহ করেছেন।

রাধা ফিল্ম

৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের মানময়ী গার্লস স্কুল প্রহসনখানি প্রায় শেষ হয়ে এলো। ইস্কুলের আর কয়েকটি দৃশ্য আসচে সপ্তাহে তোলা হবে।

* * *

এঁদের "দক্ষযজ্ঞ" আগামী শনিবার ২২শ সপ্তাহে পড়বে।

বার্জ্জ-হল্-এর বার্ষিকী

গত ৬ই মার্চ্চ বুধবার খড়্গপুরে অরোরা সিনেমা কোম্পানীর বার্জ্জ-হল্-এর বার্ষিকী রেডিয়োর "সন অফ্ কড়" চিত্রখানি দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীযুক্ত জে সি রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন।

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

এঁদের সামাজিক উর্দ্দু ছবি "ডাকু-কা-লাড়কা"-র কাজ শ্রীযুক্ত চারু রায়ের পরিচালনায় তাড়াতাড়ি শেষ হচ্ছে। এতে নেমেছেন শ্রীমতী মিরা দত্ত, শ্রীমতী দেববালা, রাজি উদ্দিন, বিজয় সুকলা, আবদুল রহিম ফিদা হোসেন, দীপনারায়ণ সিং এবং মাষ্টার গামা। আশা করা যায় অনতিবিলম্বেই এই ছবিখানি মুক্তি পাবে।

এঁদের আরেকখানি উর্দ্দু ছবি হচ্ছে "জানি ওয়াকর" বা মাস্তানা। এই ছবিতে অভিনয় কর্চ্ছেন মাষ্টার গামা, শ্রীমতী পার্ব্বতী, দেববালা, দীপনারায়ণ সিং এবং মিস্ লীলা। পরিচালনা কর্চ্ছেন মিঃ আজাদ। ছবিখানির কাজ দ্রুতভাবেই এগুচ্ছে।

* * *

এঁদের তেলেগু ছবি "সাক্কবাই," প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এতে নমেছেন যুঙ্গালা চলপতি রাও, স্বারাভারপু ভেঙ্কটেশ্বরেলু, কুম্পাতলা সুব্বা রাও, চোপাল্লী, সূর্য্যনারায়ণ ভাগবাথার এবং শ্রীমতী দাশারী কটিরত্নম ও শ্রীমতী চিতাজল্লু কণ্ঠমণী।

রূপবাণী

শনিবার ৯ই মার্চ্চ হইতে চিত্র জগতের অপরূপ চিত্র "দি ইনভিজিবল ম্যান" ২য় সপ্তাহে পদার্পন করিল। শনিবার ১৬ই মার্চ্চ হইতে লরেল হার্ডির অপরূপ চিত্র "হলিউড্ পার্টি"—রূপবাণীর প্রেক্ষাগৃহখানি মুখরিত করিয়া তুলিবে, তারপর আসিবে বহু বিজ্ঞাপিত বহু আলোচিত কালী ফিল্মসের "পাতালপুরী"।

বিবিধ

বাঙ্গালী যুবক শ্রীযুক্ত সুধীশ ঘটকের সাফল্য

ইংলণ্ডের জলপথ তথা খালগুলি শুধু ইলংণ্ডেরই নহে, সমগ্র পাশ্চাত্যের গ্রাম্য জীবনে এক অতি সুন্দর বিষয়। কিন্তু বর্ত্তমানের অপেক্ষাকৃত দ্রুতগামী যানবাহনাদির বহুল প্রচলনে এইগুলি ক্রমশঃ ইহাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট হারাইয়া ফেলিতেছে।

সম্প্রতি তথাকার স্বনামখ্যাত ষ্টুডিও ডিরেক্টর মিঃ জে, কার এবং মিঃ জি, এল, ব্যাণ্ডের সহায়তায় শ্রীযুক্ত সুধীশ ঘটক একটী মনোহারী ব্রিটিশ ছবি তুলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঘটক বর্ত্তমানে লণ্ডনের পলিটেকনিক কলেজে ব্রিটিশ ছায়াছবি নির্ম্মাণ বিষয়ে অধ্যয়ণ করিতেছেন। এই ছবিখানির ডিষ্ট্রিবিউসনের ভার অর্পিত হইয়াছে Warwick Street, W. I. এর Regency House এর উপর।

ছায়াছবির বিষয়ে বিশেষ শিক্ষালাভার্থে ১৯৩৩ সালে এপ্রিল মাসে বিলাতে আগমন করিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সুধীশ ঘটক ভারতবর্ষে ছায়াছবি নির্ম্মাতা মহলে সুপরিচিত ছিলেন এবং বিলাতে আসিবার পর হইতেই তিনি লণ্ডন কলেজ এবং এলষ্ট্রীতে ছবি তোলার বিষয়ে (Camera work) নিয়মিত শিক্ষা লাভ করিতেছেন। তিনি পরলোকগত কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি, ঘটকের পুত্র।

জলপথ সম্বন্ধীয় ছায়াছবির সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ঘটক ইংলণ্ডের বার্ম্মিংহাম, কভেণ্ট্রী, ন্যুনেটন প্রভৃতি স্থানের গ্রাম্য সৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং ইলংণ্ডের বজরাগুলি এবং উহার মধ্যে জীবনযাপনকারী ইংরাজী পরিবারের বর্ণনাও ঐ প্রসঙ্গে তিনি করিয়াছেন। এই বজরাগুলি ভারতীয় মন্থর-গতি নৌকার ন্যায়। তিনি আরও বলেন যে ঐ বজরাগুলি এবং উহাদের আরোহীদের দেখিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার স্বদেশ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা তাঁহার স্মরণ হয়।

শ্রীসুধীশ ঘটক

এই ছবিগুলি গত ডিসেম্বর মাসে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের একাডেমী সিনেমাতে লণ্ডনের ব্যবসায়ী মহলে প্রদর্শিত হইয়াছে। ছবিগুলি ছোট সাংবাদিকা ছবির মধ্যে উত্তম বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। লণ্ডনের ব্যবসায়ী মহলে ছবিগুলি প্রচুর খ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং ইহা কিছু কম গৌরবের কথা নহে যে এই সম্পর্কে তরুণ ঘটক মহাশয় স্বনামখ্যাত মিঃ কারের সহিত সাধারণভাবে ক্যামেরা-মন্ত্রী হিসাবে অভাষিত হইয়াছেন।

শরৎ-সম্বর্দ্ধনা

বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে খিদিরপুরবাসীর পক্ষ হইতে অদ্য বৃহস্পতিবার ছয় ঘটিকার সময় এক মানপত্র প্রদান করা হইবে। শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মানহানির মামলা

সাউথ সুবার্ব্বান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বীরেন রায় "খেয়ালী"র সম্পাদক, প্রকাশক ও পরিচালকের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে ৫০,০০০৲ টাকার দাবী করিয়া এক মানহানির মামলা রুজু করিয়াছেন। মামলার বিবরণ যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বীরেন রায়ের পক্ষে এটর্ণী হইতেছেন মেসার্স এ, পি, রায় এণ্ড কোং। "খেয়ালী"-র সম্পাদক, প্রকাশক ও পরিচালকের পক্ষে যথাক্রমে মেসার্স মিত্র এণ্ড মিত্র, মিঃ বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায় ও অজিত কুমার দে এটর্ণীর কার্য্য করিবেন।

শুভ পরিণয়

আমাদের সুহৃদবর উত্তর কলিকাতার সুপরিচিত কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র কুমার-ব্রতের উদযাপনান্তে আগামী কল্য শুক্রবার উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবেন। তদুপলক্ষে আগামী ২৬শে ফাল্গুন রবিবার মিত্রভাতৃবর্গের ৫।২ কাঁটাপুকুর লেনের গৃহে এক "সামান্য" সান্ধ্য উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। বন্ধুবর শৈলেন্দ্রের "সকল কাঁটা ধন্য হয়ে যে গোলাপ হয়ে ফুটেচে" তাহার জন্য আমরা আন্তরিক প্রীত হইয়াছি। "দেখা পেলাম ফাল্গুনে"—বলিয়া কবে আমরা বন্ধুবর শচীন্দ্রকে উল্লসিত দেখিতে পাইব তাহার জন্য আমরা বসিয়া রহিলাম:—"পথ চেয়ে আর কাল গুণে"। আমরা নবদম্পতীর মধুময় দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

— —

"হেসে নাও দুদিন বইত নয়"

জিপ্‌সী নৃত্যের একটি দৃশ্য। নিউ টনফিল্মের "আহ-ঈ-মাজলুমান" উর্দ্দু ছবিতে এ রকম অনেক নাচের দৃশ্যই দেখ্‌তে পাওয়া যাবে বলে আমরা আভাষ পেয়েছি।

=উপন্যাস=

উচ্ছৃঙ্খল

শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মানুষের দুর্দ্দমনীয় আশা এম্‌নি করেই বুঝি অলক্ষিতে পূর্ণ হয়! সব সময় সম্পূর্ণভাবে আশা সফল না হলেও আংশিকভাবে মানুষের আকাঙ্খা পূর্ণ হয়।

অরুণ আশা করেছিল, সে পত্রিকার সম্পাদক হবে। কিন্তু সম্পাদক হতে পারেনি। তাই, সে জনৈক সম্পাদকের অধীনে কাজ নিলে। তাকে সম্পাদকের অধীনে নিযুক্ত করলে তার কাগজের উন্নতি হবে আশায় তিনি তাকে গ্রহণ করলেন। সে নৈপুণ্যের সঙ্গে কাজ চালাতে লাগলো।

সম্পাদকের অনুপস্থিতে সেই সম্পাদক! তার কর্ত্তব্য অসীম। সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে আরম্ভ করে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধাদি মনোনীত করার ভারও তার উপর। চিঠিপত্র হিসাব পত্রাদি সেই দেখে! বল্‌তে গেলে সেই সর্ব্বেসর্ব্বা—শুধু কাগজটী তার নিজের নয়।

সম্পাদক! সম্পাদকের কাছে রোজ কত লোক আসে যায়। সেই তাদের সঙ্গে আলাপ করে। তার সঙ্গে কথা বলে সকলেই সন্তুষ্ট হয়।

'মিলন' পত্রিকা বা'র হয়েছে। সে নিজেই সব কাজ করেছে। সাহিত্য সমাজে পত্রিকাটী খুব সমাদর প্রাপ্ত হলো। তার আদর ও প্রতিপত্তি খুব বাড়্‌লো।

সে অনিমার বাড়ীতেই থাকে। সকাল, সন্ধ্যা আফিসেই কাটায়। পারিশ্রমিক পঞ্চাশ টাকা পায়। সে সব টাকা নিয়ে অনিমার কাছে গচ্ছিত রাখে। দরকার হলে তার কাছ থেকে চেয়ে নেয়।

...দ্বিতল ঘরে খোলা জানালার ধারে বসে সে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের দিকে চেয়ে আছে! আকাশের সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবে গেল। অসীম আকাশের এক পাশে লাল, নীল, হরিৎ, সাদা, সবুজ, কালো, পিঙ্গল সাত রঙে রঞ্জিত হয়েছে। তারই পাশে যেন একটী গভীর নীল সমুদ্র! সে চেয়ে আছে! পাশে বাড়ীগুলির ছাতের ওপর থেকে ধূম উঠে সেই নীল সাদা মেঘের সাথে মিশে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আকাশের সুদূর প্রসারিত সমুদ্রে তরঙ্গ উঠেছে। রামধনুর এক অংশ দিগঞ্চল আবৃত করে উঠেছিল। পূর্ণিমার চাঁদ দেখা দিয়েছিল, চাঁদ অস্পষ্ট ক্ষীণ, তবু যেন মাধুর্য্যে ভরা—সৌন্দর্য্যে পূর্ণ।

সে পদ শব্দে চমকিত হলো। পেছন ফিরে দেখলে—"মিলনে"-র নিয়মিত লেখিকা লীলারাণী! লীলার সঙ্গে তার আলাপন নেই। তবু সে ইতঃপূর্ব্বে অনেকবার তাকে দেখেছে। তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে বল্‌লে: আপনি এমন অসময়ে যে! আসুন, বসুন।

সে লজ্জিতা হয়ে বল্‌লে: আমি এসে আপনার অনিষ্ট করেছি।—

—না কিছুই অনিষ্ট করেন্‌নি। তার স্বর লজ্জায় ভরা।

—আপনি তো তন্ময় হয়ে জগতের সৌন্দর্য্য দেখছিলেন। এই সৌন্দর্য্যটুকু বর্ণনা করতে যেয়ে আপনি হয়তো একটা সুন্দর গল্প রচনা করতে পারতেন।

—তা আজ আর নাই বা হলো। গল্প লিখতে লিখতে হাত ভোঁতা হয়ে গেছে কিনা!

লীলা বল্‌লে: আপনার কাছে এসেছি, আমার এক উদ্দেশ্য আছে।

—বেশ নির্ভয়ে বলুন!

—আমি একটী কবিতার বই ছাপাবো। কবিতাগুলি আপনাকে দেখাতে এনেছি।—আপনি একটা সমালোচনা করে দেবেন?

—আচ্ছা রেখে যান। আমি সময় মতো পড়ে আপনাকে জানাব।

—আপনি কষ্ট করবেন কেন? আমি নিজে এসে জেনে যাবো।

—আচ্ছা

—নমস্কার—

—নমস্কার,—তাহলে দশদিন পর আবার আসবেন।

লীলা মাথা নেড়ে জানালে—হাঁ।

লীলা চলে গেল, কিন্তু সে লীলাকে ভুলতে পারল না। সে কবিতা লেখে। জগতকে সে জানে। জগতের প্রতি অণুরেণুর সঙ্গে সে পরিচিতা। তাকে বিবাহ করতে পারলেই হয়তো তার তৃপ্তি হবে!—

সন্ধ্যা হয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ—উজ্জ্বল সুন্দর। জগতে সৌন্দর্য্যের খেলা। পথে পথে কলরব, আনন্দের জয়োল্লাস!—

সে লীলার কবিতার খাতাটী নিয়ে বাসায় ফিরলো।

অনিমা বল্‌লে: আপনি আজ এত দেরীতে এলেন কেন?

—আজ একজন একটা কবিতা দেখাতে

এসেছিল কিনা! মেয়ে মানুষ। কতক্ষণ আলাপ না কর্‌লে ও অভদ্র বল্‌বে।

সে আর কিছুই বল্‌লে না।

অরুণ তার পড়ার ঘরে ঢুক্‌লো।

কবিতার খাতা। স্ত্রীলোকের লেখা। সমালোচনা কর্‌তে হবে। সে খাতা খুলে আদ্যোপান্ত পাঠ করে ফেল্‌লে। সব কবিতাই প্রেমের কবিতা; প্রিয়তমকে উদ্দেশ্য করেই রচিত। কবিতার প্রাণ আছে।—কিন্তু জগতকে শেখাবার দিক থেকে কবিতার মূল্য কিছুই নেই।

কবিতাগুলি পাঠ করে সে বড়ই তৃপ্তি পেলো। তৃপ্তিতো পাবেই। তার তখন যৌবন। যৌবনে প্রেমের কবিতা, প্রিয়র কাছে প্রিয়ার আহ্বান লিপি—হৃদয়ের বেদনা-গান ভালই লাগে। ভাল না লেগে পারে না, তাই ভাল লাগে।

অরুণ কাগজ কলম নিয়ে সমালোচনা লিখতে আরম্ভ কর্‌লো। সে লিখলে: "লীলারাণী দেবীর কবিতার খাতা"—কবিতাগুলি নিছক প্রেমের কবিতা। প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে কাব্যে এর চেয়ে সুন্দরভাবে পত্র ব্যবহার করা চলে না। জান্‌বার বিষয় বেশী না থাক্‌লেও লেখিকার লেখন ভঙ্গী লক্ষ্য কর্‌বার জিনিষ।—আমরা লেখিকার এই কবিতাগুলি পাঠকদের পড়্‌তে অনুরোধ করি।"

.........পরদিন।

সে অতি প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করেছে। প্রাতঃস্নান করে চা-বিস্কুট খেয়ে সে কবিতার খাতাটী নিয়ে বার হয়ে গেল।

আফিসে গিয়ে সে কাজ কর্‌তে পারছিল না। বার বার লীলার কথাই তার মনে জাগছিল।—সে টেলিফোনে লীলাকে ডাক্‌লো। লীলা বল্‌লে: সে দশটার পর আস্‌বে। কলেজে যাবার পথে তার সঙ্গে দেখা করে যাবে।

দশটা বাজে না। সময় কাটে না। মুহূর্ত্ত, দিনের মতো বোধ হতে লাগ্‌ল। কখন সেই শুভ মুহূর্ত্ত আস্‌বে সে তার প্রতীক্ষায় রইলো।

ঘড়িতে দশটা বেজে গেল।

লীলা হাসিমুখে ঘরে ঢুক্‌লো। সে তার হাতে সমালোচনাখানি দিয়ে বল্‌লে: আমার যা মনে হয়েছে তাই লিখে দিয়েছি। আপনার যা ইচ্ছা হয় আপনিই করুন।

লীলা সেটী পড়ে খুশী হয়ে বল্‌লে: তা' হ'লে আমি ওটা ছাপাতে দোব।

—তা' নিশ্চয়, তাড়াতাড়িই ছাপিয়ে ফেলুন। এমন কবিতাই তো আজকালকার দিনে চাই।

—আমি আপ্‌নার কাছে ঋণী, আপ্‌নি আমার ধন্যবাদ নিন্। এখন আমার কলেজের সময় হয়েছে। আমি আপনার বাড়ীতে আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

সে চলে গেল। অরুণের মন শূন্য হয়ে গেল।

সে বাসায় ফিরে এলো। সেদিন আর কোন কাজ হলোনা। বিকাল বেলা আফিসে যাওয়ার সময় হলো না।

লীলা এসে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। কি ক'রে কবিতা লিখ্‌লে কবিতা হৃদয়গ্রাহী হয়, কোন্ ছন্দ মধুর, অরুণের সঙ্গে সে তা-ই আলাপ কর্‌তে লাগ্‌ল।

সন্ধ্যা হয়েছে, বিশ্ব জগত মৌন নিশ্চল।

লীলা বল্‌লে: আজ আমার সময় যেন খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে। চলুন না Lake-এ যাই। সেখানে বসেই আলোচনা করা যাবে।

কাছেই Lake; তারা দু'জনে সেখানে গিয়ে বস্‌লো। অরুণ বল্‌লে: লীলা তোমায় একটা কথা বল্‌বো।

—কী?

—তুমি আমার কাছে আস কেন? তুমি কী জাননা আমি অসচ্চরিত্র?

—জানি বৈকি।

—তবু তুমি আমার সঙ্গে রাতে বেড়াতে আস্‌তে সাহস করলে কী করে?

—জানি না।

—তুমি আমায় বিবাহ কর্‌বে!

—সে তো আপনার ইচ্ছা।

—আমার আবার ইচ্ছা কি? আমি তোমায় বিবাহ কর্‌তে চাইতে পারি কিন্তু তুমি তো প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পার। হয়তো আমি তোমার উপযুক্ত না হতেও পারি। তোমার মতো বিদুষী নারীর পক্ষে—আমার মতো অনুপযুক্ত স্বামীকে বরণ করা কত বড় অন্যায় তা' তুমি বুঝতে পারছ না।

—বেশ পারছি। যে আপনাকে দুশ্চরিত্র বলে, আমি নিজে তাকে চরিত্রহীন বলি।

তা হলে তুমি আমায় ভালবাস! আমায় স্বামীরূপে পেলে তুমি খুসী হও?

সে নীরব।

অরুণ তাকে বুকের কাছে টেনে একটী সাদর চুম্বন করলো।

অরুণ বল্‌লে: তবে লীলা, আর দেরী করা কেন? আজতো আমরা বাক্‌দত্ত হয়ে গেলাম। চলো, আমরা আমাদের শুভ মিলন দিনের প্রতীক্ষায় থাকিগে।

তারা দু'জনে যখন বাড়ী ফিরল তখন রাত নিঝুম হয়ে উঠেছে। ট্রাম চলা বন্ধ হয়েছে। বাসওয়ালারা শুধু খালি গাড়ী নিয়ে ডাকছে—শ্যামবাজার কলেজ ষ্ট্রীট !

বাসায় ফিরে অনিমাকে অরুণ বল্‌লেঃ অনিমা, আমি বিবাহ করবো।

অনিমা খুসী হয়ে বল্‌লেঃ কাকে! সে কোন ভাগ্যবতী ?

—লীলাকে ?

—সেই কবি লীলাকে !

—বাঃ, বেশ তো। তারা রাজী হয়েছে ?

—তারা আর কে রাজী হবে? সে নিজেই তো রাজী হয়েছে।

—তবে শীঘ্রই কাজ সেরে ফেলা যাক, কারণ,—"ক্ষিপ্রমক্রিয়মানস্য কালঃ পিবতি-তদ্রসম্"—হিতোপদেশের নীতিটা তো মেনে চলা দরকার—

অরুণ নীরব। অজানিত সুখের আশায় তার মন ভরপুর। উচ্ছৃঙ্খল অরুণ কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি, সুন্দরী তরুণী কবিকে সে পত্নীরূপে পাবে। সে সাহিত্য সেবা করেছে। বাণীর সাধনা তাকে এক অমূল্য বর দিয়েছে. সে বিদুষী পত্নী পেয়েছে !

বিবাহ।

অগ্রহায়ণ মাস। সবুজ ধানের শীর্ষে শীর্ষে ঢেউ উঠেছে। প্রকৃতি সুশ্যামল। গাছে গাছে পাখীর গান। ফুলে ফুলে ভ্রমরের গুঞ্জন। নবীন দম্পতির প্রাণে নূতন আনন্দ, উদ্যম ও আশা !

অনিমার প্রাণে আনন্দের শেষ নেই! সে সংসারী হতে চল্‌লো। তার ছন্নছাড়া জীবনের অবসান হবে।

......বিবাহ হয়ে গেল।

অরুণ আর লীলার মিলন হলো এক শুভ রাত্রির শুভ-মুহূর্ত্তে।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য পরিচয়
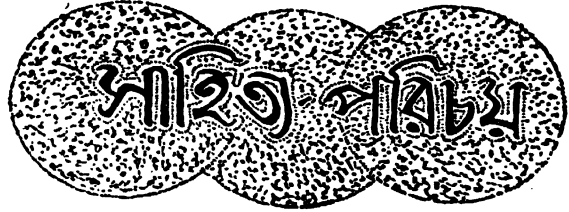
বিপ্রদাস—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কবে কোথায় পড়েছিলাম scribo quia absurdum তর্কের বিষয় সন্দেহ নেই। বিজ্ঞান আর সাহিত্যের সীমা নির্দ্দেশ করার যত প্রচেষ্টা হয়েছে তার মধ্যে এই absurd কথাটা ব্যবধানের হ'য়ে উঠেছে। Classic যুগের শাসন সাহিত্যকে অনেক পতন থেকে বাঁচাতো আর সেই খাদ্যের সেরা খাদ্য absurdity। এরপর দেখি যথেচ্ছাচারের যুগ—আংশিক ও সম্পূর্ণ। তারপর আবার Neo-classicism। যাক্ সাহিত্যের chronology না আউড়ে, স্বচ্ছন্দে বলতে পারা যায় mystery-র প্রতি সাহিত্যের দুর্দ্দমনীয় লোভ অথচ সেটা সাহিত্যের পুরাপুরি স্বরূপ নয়। mystery খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করলাম যাতে absurdityর কানাচে ঠেকে। Mysteryর ইঙ্গিত আজ পর্য্যন্ত কত না জ্ঞানের সন্ধান দিলে আবার mysteryর অস্তিত্ব কত না সত্যকে ঘোলাটে করলে। দার্শনিকের Mystery বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন আর বিজ্ঞানের mystery মানব সভ্যতার চোরা-বালি। সাহিত্য গ্রহণ করে দুইই আবার বর্জ্জন করে দুইই—এ যেন না-গ্রহণ না-বর্জ্জন নীতির উপরও এককাঠি। তাই সাহিত্যের সবচেয়ে লক্ষ্য যুগধর্ম্মের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য করা। যুগধর্ম্ম বাস্তব আর তা ছাড়া সব কিছু অবাস্তব। এই যুগধর্ম্মের মধ্য থেকে যায় মানব ঐতিহ্য, মানবধর্ম্ম ও মানব সম্ভাব্য। Classic সাহিত্য যে উপায়ে mysticism এড়িয়ে যায়, সেই elimination এ আর সর্ব্বসমন্বয়ে আজকের সাহিত্য আস্থা হারিয়েছে। তাই সে একক ঘটনার সম্বলে তাৎপর্য্য-ভরা উপস্থিত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে জগতের শেষ সত্য আবিস্কার করতে চায়। শরৎচন্দ্রের "বিপ্রদাস" পড়তে আমার এই কথাটা সবচেয়ে বেশী মনে হয়েছে। বিপ্রদাস কথা সাহিত্য নয়, উপন্যাস। মানব জীবনের বিভিন্ন জটিলতায় এক একটী চরিত্রকে সুমণ্ডিত করবার চেষ্টা আছে অথচ তারা মূলতঃ বিচ্ছিন্ন নয়। বলরামপুরের মুখুয্যে পরিবার যেন মহীরুহের রসবাহী মূল। প্রতি কাণ্ডে তার যেমনি দরদ, ঠিক তেমনি অবজ্ঞা, এই নৈব্যক্তিক সম্বন্ধের মাঝে যে রসের উৎস আছে তারই সন্ধান শরৎচন্দ্র দিতে চেষ্টা করেছেন। শরৎচন্দ্রের বহুমুখী অভিজ্ঞতা তাঁর লেখনীকে অনেক সাহায্য করেছে। বিপ্রদাসের গৃহত্যাগের পর মুখুয্যে পরিবার যে ভেঙ্গে পড়েনি সেটাই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। জীবনে ভাবপ্রবণতার স্থান আছে মানি কিন্তু, তার চরমতায় যে সাহিত্য দুষ্ট হয় তা vulgar সন্দেহ নেই। দয়াময়ী চরিত্র শরৎচন্দ্রের নবতন শ্রেষ্ঠ অবদান। দয়াময়ীর চরিত্রে যে সত্যের সন্ধান তা প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের পরস্পরের উপর আলোকপাতের ফলে। দয়াময়ীর মুখুয্যে পরিবারের মাতৃ-মর্য্যাদা তাঁর নিজের গর্ভজাত সন্তানের মাতৃ-স্বার্থের চেয়ে উজ্জ্বলতর সন্দেহ নেই। কিন্তু তা বলে কোনটীর অস্তিত্বে মিথ্যা নেই। শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে কৃতিত্ব দয়াময়ী চরিত্রে ভাবের

অন্তর্বিরোধ বা বহির্বিরোধ নেই। সুপ্রযোজনার ফলে দয়াময়ীর জীবনধারা বা তার পরিবর্ত্তন আকস্মিক হ'লেও অস্বাভাবিক নয়, তবুও প্রথমে কোথায় সেটা বালির ঘর নয়। এই লেখার গুণগান করতে একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক বলেছেন "...... His ambition is to render, in literary terms, the quality of immediate experience—in other words, to express the finally inexpressible..." শরৎচন্দ্রের দয়াময়ীর রূপ অনবদ্য, সবচেয়ে সাবলীল গতিতে বইয়েতে ফুটে আছে। এরই পরে চোখে পড়ে দ্বিজদাস ও বন্দনা। দুজনে পরস্পরের complementery নয় অথচ বিরোধী নয়। দুজনের সমান আকর্ষণের স্থল বিপ্রদাস। মাঝে সতী ও বাসু সংযোগ স্থল। এরূপ যুগ্ম চরিত্রের অবতারণা সম্ভব হয়েছে কারণ শরৎচন্দ্র সাহিত্যের convention-এ বিশ্বাস করেন। যুগে যুগে সাহিত্যের convention বদলায়। বাঙলায় আজও অল্ডুস হাক্সলের ভাষায় economic heroismর যুগ। জীবনের মুল্য ধার্য্য হয়েছে সবচেয়ে বেশী, তাই মনে হয় গৌতম বুদ্ধ আবার বুঝি দেখা দেবে। জীবনের মুল্য শ্রেষ্ঠ আর্টের পরিকল্পনা, মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। তাই শরৎ চন্দ্রের মিলন গীতির সার্থকতা। বন্দনার চরিত্রে যে ভাবপ্রবণতার সমাবেশ তার আতিশয্য ক্ষণিক জলতরঙ্গের মত। তার অন্তরে যে প্রবাহ সে শান্ত ও সমাহিত। জীবনের মুল্য দিতে জীবনকে অস্বীকার যে করতে চায় সে romantic সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাসে আমরা ভাবের বিভিন্ন স্তর পাই। বিপ্রদাস-চরিত্র শরৎ-চন্দ্রের mystic দান। বিপ্রদাসের মধ্যে আমরা শরৎচন্দ্রের উপীনদাকে, আশুবাবুকে আর অনেক পূর্ব্ব পরিচিত চরিত্রকে খুঁজে পাই। যে শরৎচন্দ্র romatic গীত-কবির চারণ গীতি গাইতে পেরেছেন, তিনিই আবার জীবনের চেয়ে বড় নতুন বস্তুর সন্ধান বিপ্রদাস চরিত্রে দিয়েছেন। কর্ত্তব্যের কঠোর শাসন বিপ্রদাসের ব্যবহারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু সেটা তার শেষ কথা নয়। তার নির্জ্জন জীবনের যে idealism প্রতি পদে পদে তার চলার পথ আলোকিত করে সেই mystery জীবনের শ্রেষ্ঠ মুল্য দেয় না। শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাসে exhibitionism যথেষ্ট পরিমাণে আছে সন্দেহ নেই কিন্তু, তবু আমরা বুঝতে পারি বিপ্রদাস কোন বিশেষ শ্রেণীভুক্ত নয়। তাই বিপ্রদাসের জীবনের প্রতি অবজ্ঞা নেই, সে নাস্তিক নয়। জীবনকে সে বড় মনে করে না সত্য, কিন্তু তবু জীবনের কঠোরতা তাকে বিচলিত করে। তাই শরৎচন্দ্রকে আমরা বলতে চাই যে আমরা জনপ্রবাদে বিশ্বাস করি না। বিপ্রদাস আবার ফিরবে যেদিন তার কর্ত্তব্য পরায়ণ ভাই, তার পুত্রের পালক-পিতা দ্বিজদাস তাকে ডাকবে। বন্দনার স্পর্দ্ধা মিথ্যা হবে না। শরৎচন্দ্র কেন যে বিপ্রদাসকে তার মাতৃদেবীর ব্রত-আসরে অত অসহিষ্ণু করলেন তা আজও বোঝা গেল না। ঘটনা যা তা আকস্মিক নয়, তার উপর বিপ্রদাসের সামাজিকতা তাকে কোন মতেই আনুষ্ঠানিক কর্ত্তব্য ভোলাতে পারে না। তবে কি বিপ্রদাস-চরিত্রের absurdity শরৎচন্দ্রের চোখে পড়েছিল? বিপ্রদাস super-human। তাই তার চরিত্র মানব-উপাদান বর্জ্জিত। মানব-জীবনের অতি-মানবের সম্ভাব্য ক্ষণিকের। আগাগোড়া যে চরিত্রকে মানবধর্ম্ম ভুলতে হয়, সে হয় নাস্তিক, না হয় তার জীবনে আছে অজানার সন্ধান। শরৎচন্দ্র নিজে এই অসম্ভবের হাত থেকে এড়াতে চান বলেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অবতারণা করেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র কি স্বীকার করেন না কর্ত্তব্যাচরণ শুধু প্রস্ফুট মানবধর্ম্ম নয়? আর তাই যদি হয় তবে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে মাঝে মাঝে তাঁর কেন এত বৈরাগ্য? শরৎচন্দ্রের লেখায় যে আতিশয্যের ও অসম্ভাব্যের সমাবেশ রয়েছে তাকে সাহিত্যের মর্য্যাদা দিতে গিয়ে vulgar শ্রেণীভুক্ত করলে অপরাধ হয় না। জীবনের মুল্যধার্য্য ও জীবনকে অস্বীকার যুগে যুগে হয়ে এসেছে। কর্ম্মযুগ ও ধ্যানযুগ দুইই একটানা গতিতে চক্রবৎ ফিরেছে। কিন্তু কথা তা নিয়ে নয়। জীবনের কত না রহস্য আজও আমাদের অগোচরে। সেটা অজ্ঞাত বলে মিথ্যা নয়, কিন্তু অসম্ভব বলে অপাংক্তেয়। সাহিত্যে তাকে যা ফোটাতে হ'বে সে মানব জীবনের সম্ভাব্য। আর কোন আতিশয্যে সে অপবিত্র নয়।

উপন্যাস ঘটনা—স্বল্প নয়, তাই কথা-সাহিত্যের অকৃত্রিম রূপ তার বিশেষণ নয়। অথচ আমরা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এর ব্যতিক্রম দেখি। আজকের দিনে সবচেয়ে প্রয়োজন উপন্যাস ও কথা-সাহিত্যের সীমা নির্দ্দেশ।

সুধীর বসু

অর্চ্চনা—বত্রিশ বর্ষ—১ম সংখ্যা। সম্পাদক—শ্রীসুধীর কুমার চন্দ্র। মুক্তারামবাবু ফোর্থ লেন থেকে—অর্চ্চনা প্রকাশিত। বার্ষিক মুল্য দেড় টাকা।

বঙ্গ-সাহিত্য জগতে অর্চ্চনা সুপরিচিত। আজ সুদীর্ঘ একত্রিশ বর্ষ ধরে অর্চ্চনা বাণী পাদপীঠে নানা অর্ঘ্য সাজিয়ে আসছে—সেবা তার নিষ্ফল হয়নি। ক্ষণস্থায়ী পত্রিকা বহুল বঙ্গ-সাহিত্যে এত সুদীর্ঘ দিন ধরে বেঁচে থাকা এ বড় কম গৌরবের নয়। প্রবন্ধ সম্ভারে সমৃদ্ধ, সুনির্ব্বাচিত কবিতা গল্পে সুসজ্জিত হয়ে অর্চ্চনা বঙ্গভাষা পাঠক পাঠিকাগণের চিত্ত বিনোদন করে আসছে—আমরা আজ বত্রিশ বর্ষের নবসংখ্যা অর্চ্চনা পেয়ে বিশেষ প্রীত হলুম।

এ সংখ্যায় বহু বিশিষ্ট জনপ্রিয় সাহিত্যিকের রচনা প্রকাশিত হয়েছে—তার মধ্যে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, শ্রীযুত নলিনী রঞ্জন পণ্ডিত, কেশব চন্দ্র গুপ্ত, কৃষ্ণধন দে,

দেহ-যমুনা

[নাটক]

শ্রীবিশ্বায়ক ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রায়। তোর বৌকে একথা বলিস্ নি কেন?

প্রদ্যোত। অনেক দিন বলি বলি করেও বলে উঠতে পারি নি। তার কারণ কি জানিস? আমি মাঝে মাঝে একটু drink করি বলে আমার উপর ওর একটা সন্দেহ বরাবরই আছে, একথা শুনলে পাছে সেটা আরও বাড়ে সেই ভয়ে বলি নি। আর যা হোক ভাই, গীতার সম্বন্ধে কোন কথা আমি সত্যই সহ্য কোরতে পারব না। আমি ওকে স্নেহ করি।

গীতার বয়স কত?

প্রদ্যোত। এই বছর সতেরো হ'বে বোধ হয়। Most innocent girl.

(অণিমার প্রবেশ)

অণিমা। মিঃ রায়! কাল রাত্তিরে আপনি যে সময় এসেছিলেন, আজ একবার আসতে পারবেন সে সময়? গোটা কয়েক দরকারী কথা আছে। আসবেন?

রায়। আসবো।

অণিমা। হ্যাঁ, ভালকথা, আজকে কিন্তু আপনাকে না খাইয়ে ছেড়ে দেবো না, সেদিন বড্ড পালিয়েছিলেন।

(চলিয়া গেল)

প্রদ্যোত। (অন্যদিকে চাহিয়া) কাল রাত্তিরে তাহ'লে এখানে ছিলে—ব্যাণ্ডেল যাওয়া মিথ্যে।

রায়। না কেবল যাবার আগে একবার দেখা কোরতে—

প্রদ্যোত। যাবার আগে! যাবার আগে একবার দেখা কোরতে এসে আর বুঝি যেতে পারোনি? আর এই কথাটাই আমার কছে গোপন কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছিলে? বন্ধু আমার, প্রদ্যোত বোস তোমার অপরিচিত নয় বলেই আমি জানতাম। সে যাই হোক্—আমি তোমার সাফল্য কামনা করি—good luck.

(হঠাৎ প্রস্থান করিল)

(ডাক্তার রায়ের প্রস্থান)

নেপথ্যে অণিমা। একি মিঃ রায় চলে যাচ্ছেন যে—ভারী অন্যায় কিন্তু! রাত্তিরে আসছেন তো—আচ্ছা—'

(বিজয় ও প্রদ্যোতের বিপরীত দিক দিয়া প্রবেশ)

বিজয়। দাদা! দিদির গীতবিজ্ঞানটা আমি একবার নিতে চাই।

প্রদ্যোত। বেশতো নিয়ে যাও।—ওহে বিজয়—শোন শোন। একখানা গান গাইবে? খুব প্রিয়া-টি্রয়া আছে যাতে।

বিজয়। জানি—গাইবো?

প্রদ্যোত? হ্যাঁ।

বিজয়ের গান

বল প্রিয়া একি লীলা।
আমার মনের গভীর গহনে গোপনে সঞ্চারিলা।
নিবেছে প্রদীপ শয়ন শিয়রে—
বুকেরি বিতানে বেদন শিহরে—
উজাড় করিয়া লহ গো আমারে মিলন
সরম লীলা॥

প্রদ্যোত। দেখ বিজয়, আজকে একবার আমার সঙ্গে ভবানীপুর যেতে পারবে বিকেলে?

বিজয়। হ্যাঁ, পারবো। কিন্তু একি দাদা! আপনার মুখ থেকে—আপনি কি মদ খেয়েছেন?

হেমেন্দ্র কুমার রায়, রাস বিহারী মণ্ডল, অনিল কুমার ভট্টাচার্য্য, সারদা রঞ্জন পণ্ডিতের নাম উল্লেখযোগ্য।

অর্চ্চনার নবজীবন যাত্রা জয়যুক্ত হোক্—সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করে অর্চ্চনা সাহিত্য রসপিপাসুদের পরিতৃপ্ত করুক এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

প্রদ্যোত। হ্যাঁ, তোমার তা'তে লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। মদ খাওয়ায় যদি কিছু লজ্জা থাকে তবে সে লজ্জা আমারি। তুমি খাবে একটু?—

বিজয়। না—ও আমি খাইনে।

প্রদ্যোত। Hopeless! তোমরা গীত-শিল্পী, তোমাদের জন্যেই তো মদের সৃষ্টি।

বিজয়। আমি দিদির কাছে চল্লাম।

প্রদ্যোত। তুমি তো দিদির কাছে চল্লে কিন্তু, তোমার দিদিটী কার কাছে চল্লেন—সে খবরটা আমায় একবার এনে দিতে পার?

বিজয়। ছি, ছি, দিদি শুনতে পেলে কী মনে কোরবেন বলুন তো?

প্রদ্যোত। দিদি শুনতে পাবেন! তোমার দিদি শুনতে পাবেন বলে আমি আমার আনন্দ উপভোগকে boycott কোরব—ততখানি কাপুরুষ আমি নই। দিদি শুনতে পাবেন, পেলেনই বা। তোমার দিদির কথা আর দয়া ক'রে শুনিও না আমাকে, (একটু পরে) কী যেন গানটা—"বল প্রিয়া একি লীলা", লীলাই বটে।

বিজয়। এ' সব আপনি কী বলছেন দাদা?

প্রদ্যোত। ভুল বক্‌ছি নাকি?

(উচ্চহাস্য)

(বিজয়ের প্রস্থান)

(প্রদ্যোত ভিতরে গিয়া জামা গায় দিয়া আসিয়া বাহির হইয়া গেল)

(দ্রুতপদে অণিমার প্রবেশ)

অণিমা। আচ্ছা কী তুমি ভেবেছো বলতো—একি! এখানে তো নেই! (বিজয়ের প্রবেশ) কই বিজয়—ইনি তো ঘরে নেই।

বিজয়। তবে বোধ হয় বেরিয়ে গেছেন। রাস্তায় একবার দেখবো দিদি?

অণিমা। না। দেখ দিকি কি অন্যায়। এই দুপুর বেলা, এখন কি মানুষের মদ খাবার সময় না বাইরে বেরুবার সময়? দোষ করবেন নিজে আর তার শাস্তি ভোগ করতে হবে আমাকে। বিজয়—তোমার আর এত বেলায় বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। এখানেই খেও।— (প্রস্থান)

(স্বপনের প্রবেশ)

স্বপন। আমার Genealogy of morals খানা ফেলে গেছলাম—একি! বিজয় যে? তুমি হঠাৎ!

বিজয়। যান, যান, এখন বিরক্ত কোরবেন না। আমার মন ভাল নেই।

স্বপন। বটে! ভয়ানক আশ্চর্য্য তো। কিন্তু মন ভাল না থাকার হঠাৎ কি কারণ ঘটলো?

বিজয়। আঃ! আপনি মশাই বড় বিরক্ত কোরতে পারেন তো, দেখছেন যে দাদা মদ খেয়ে রাগ ক'রে কোথায় চলে গেছেন—

স্বপন। চলে গেছেন! তাহ'লে তিনি এখন বাড়ী নেই? অণিমা দেবী কোথায়?

বিজয়। জানিনে।

স্বপন। আচ্ছা বিজয়,—তোমার দাদার মদ খাওয়াটা অবশ্য বুঝতে পারছি কারণ, ওটা নতুন নয়—ও আমি জানি। কিন্তু রাগ? রাগ আবার কার ওপর হ'ল হে?—

বিজয়। কার ওপর হ'ল তা' আমি কী করে বলবো? আমি কি হাত গুণতে জানি নাকি?

(প্রস্থান)

(অণিমার প্রবেশ)

অণিমা। বিজয়! একি! মিঃ রায় এমন অসময়?

স্বপন। পথে নেমে আপনার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার জন্য মনে মনে বড় ব্যথা পেলাম তাই চলে এলাম।

অণিমা। আমার ভাগ্য। আচ্ছা আপনি একটুখানি বসুন—আমি সব ব্যবস্থা ক'রে ফেলছি।

স্বপন। তা'তো ফেলবেন,—কিন্তু এসব কি শুনছি অণিমা দেবী?

অণিমা। কী শুনছেন?

স্বপন। প্রদ্যোত নাকি রাগ ক'রে মদ খেয়ে কোথায় চলে গেছে?

অণিমা। হ্যাঁ—

রায়। এই সমস্ত ব্যাপার আপনাদের দাম্পত্য-জীবনে খুব শুভ বলে মনে হচ্ছে না। যদিও আমি জানি না সত্যিকার ঘটনা কি! কিন্তু—অবিশ্যি গীতার ওপর যে ওর একটা মোহ জন্মেছে—তা' আমি জানি। তবুও—

অণিমা। গীতা! গীতা কে?

রায়। আপনি জানেন না নাকি! গীতা হচ্ছে ভবানীপুরের এক প্রফেসরের মেয়ে—বাপ গেছে মারা, মরবার সময় বুঝি প্রদ্যোৎকে দেখাশুনা করতে বলে গেছ্‌লো—তার থেকেই আর কি। তা সে, আমি তাকে দেখেছি মানে accidentally. Simply a charmless creature. আমার মত যদি বলি হাসবেন না আপনি—আমি whole continent tour করেছি—কিন্তু আপনার মত দীপ্তি আমি কম মেয়ের মধ্যে দেখেছি—মানে দেখিইনি। সেইজন্যেই তো বলছি।

অণিমা। গীতা! হবে!

রায়। না না—অণিমা দেবী আপনি এ সময়ে নরম হ'লে চলবে না। You must strict, must be—কি বোলব! মেয়েদের সনাতন দুর্ব্বলতা যেন আপনাকে পেয়ে না বসে। নইলে ভেবে দেখুন দিকি—এই বেলা বারোটার সময় শোধ নেবে বলে—কোন স্বামী কি কখন মদ খেয়ে বেরিয়ে যেতে পারে! খামখেয়ালীর তো একটা সীমা থাকা উচিত।

অণিমা। আপনি তো জানেন মিঃ রায়, পুরুষদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করবার নেই।

রায়। করবার নেই? আপনি কি—বলেন কি অণিমা দেবী? এই আমি আপনাকে বলছি—আপনি আমার বন্ধু—
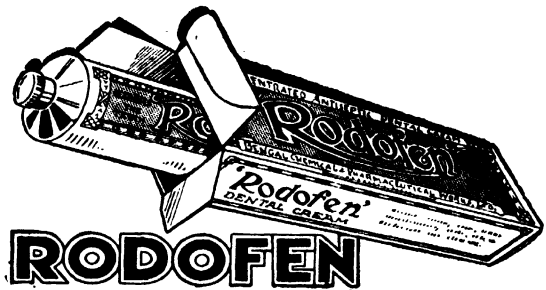
আমার শুধু এই দাবী আপনি তার প্রতি নির্ম্মম হ'য়ে উঠুন—আপনি তাকে বুঝতে দিন—যে তার ভিক্ষা দেওয়া প্রেম ছাড়াও আপনার দিন চলবে। আপনার জীবন সহজ এবং স্বচ্ছল ক'রে তুলতে তার ওই দ্বিধা বিভক্ত প্রেম অপরিহার্য্য নয়—এই কথাটা তাকে বোঝবার অবকাশ দিন।

অণিমা। সে আমি জানি মিঃ রায়।

স্বপন। শুধু জানলে তো চলবে না অণিমা দেবী। আপনার এই জানাকে প্রয়োগ ক'রে সার্থক ক'রে তুলতে হবে—আপনাদের জীবনে। প্রদ্যোত বুঝুক যে দরকার হ'লে আপনিও তার মতো নিষ্ঠুর হ'তে পারেন। স্বামী যদি স্ত্রীর মূল্য বুঝতে না পারে—তবে স্ত্রী যেন সুলভ না হন। আপনাকে কী বোলব, এসে শুনে অবধি রাগে আমার সব শরীর জ্বলে যাচ্ছে। প্রদ্যোত যে এতবড় অপদার্থ হয়ে উঠবে—এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। বিশেষ ক'রে যার পাশে আপনার মত স্ত্রী—

বিজয়। (নেপথ্যে) দিদি!

অণিমা। যাই। আমি আসছি মিঃ রায়।

(প্রস্থান)

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। খেতে আসুন।

স্বপন। আজকে তোমারও এখানে নেমন্তন্ন নাকি হে?

বিজয়। আমার নেমন্তন্ন হয় না, আমি এমনই খাই। নেমন্তন্ন আপনাদের—

স্বপন। হিংসে হচ্ছে নাকি?

বিজয়। হিংসে হবার কি আছে এতে? উঠুন দেরী কোরবেন না।

স্বপন। বাস্তবিক তোমার মত একটা ভাইকে সব সময় কাছে পাওয়া মেয়েদের অনেক তপস্যার ফল বিজয়।

(উভয়ের প্রস্থান)

(প্রদ্যোতের প্রবেশ)

প্রদ্যোত। যতীন। (যতীনের প্রবেশ) দ্যাখ যতীন বিজয়কে আমার একবার দরকার, তাকে একবার বাড়ী থেকে ডেকে আনতে পারবি?

যতীন। তিনি তো এইখানেই আছেন বাবু।

প্রদ্যোত। বেশ ভালই—ভালো। আজকে তার এখানে নেমন্তন্ন ছিল বুঝি?

যতীন। তাতো জানি না বাবু। তবে দেখলাম তিনি আর ডাক্তার বাবু বৌদিমণির ঘরে খেতে বসেছেন।

প্রদ্যোত। আর কে খাচ্ছেন বল্লি?

যতীন। ডাক্তার বাবু।

প্রদ্যোত। সে তো চলে গেছলো, আবার এলো কখন?

যতীন। আপনি বেরিয়ে যাবার একটু পরেই।—

প্রদ্যোত। হুঁ। দেখ্ যতীন আমার ঘর থেকে চাবুকটা একবার শীগ্‌গীর নিয়ে আয়তো।

যতীন। চা-বু-ক!

প্রদ্যোত। হ্যাঁ-হ্যাঁ, চাবুক শীগ্‌গীর!

(যতীন চাবুক টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া গেল।)

(ক্রমশঃ)

শ্রেষ্ঠ পূজা

শ্রীঅরুণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ছিন্ন মালায় ভরিয়া ডালা ভগ্ন দেবতাটিরে,
ডাকিনু মৃদু স্বরে।
সে বাণী দু'টি শূন্যে উঠি প্রতিধ্বনি করে,
আসিল পুন ঘুরে।
ভাবিনু আমি কাহারে পুজি,
লইয়া মোর এ ছেঁড়া পুঁজি,
করুণ হাসি হাসিয়া যেন
উঠিলো পাষাণ নড়ে।
কহিলো মোরে ভগ্ন দেবতা মধুর স্বরে ধীরে,
পূজারী আমার ওরে—
হেরিয়া ভাঙ্গা আমার দেহ,
জ্বালেনা দীপ, পূজে না কেহ,
কহিনু আমি লহ গো লহ,
ছিন্ন মালিকাটিরে।
ভরিয়া ফুলে, দু' হাত তুলে ঢালিনু
বেদীমুলে,
নমিনু শিলাটিরে।

রূপলেখা

[রূপক]

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিয়তির আদেশে সে বন্দী হয়ে এলো এই লোকালয়ের বুকে—

শান্ত নীরব গতিতে কোন অজানা অচেনা পথে তাকে আসতে হবে বলে বহু দীর্ঘ দিনের পথ অতিক্রম করে যে এসেছে, সে তা এখানে এসে নিমিষের মধ্যে সব ভুলে গিয়ে কেবল কাঁদতে থাকে। এ কান্না তার অফুরন্ত, চিরন্তন! পৃথিবীর বুকের ওপর এসে সে তার প্রথম অর্ঘ্য দেয় কেবল এই—কান্না! জানে না সে, এ কান্না কোন মহামায়ার পদতল ধৌত করে দিয়ে চলে যায়!……

কারাগৃহে প্রবেশ করেই সে দেখে—কত প্রহরী তার অনিন্দনীয় কোমল তনুটি দেখবার জন্যে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে আছে। এরা তাকে শাস্তি দিতে এসেছে, না পৃথিবীর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে তার অত্যাচারের মাত্রা বাড়াবার জন্যে মায়ারজ্জু হাতে করে নিয়ে এসেছে,—সে তা তখনও বুঝতে পারে না, আর পাবে বলেও আশা করতে পারে না, তাই সে কাঁদে! এ গভীর কান্না তার প্রতি শিরায় শিরায় জাগরণ তুলে জানিয়ে দেয় যে তার পূর্ব্বজন্মের বিজড়িত স্মৃতিগুলি তাকে ভুলে যেতে হবে!… আদেশের বসে সে এইখানে এসে সকলের দিকে উদাসদৃষ্টি মেলে দেখবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না!—হায়! সে তখনও বুঝতে পারে না যে এ কোন লোকালয়ের বুকে এসে সে দাঁড়ালো!…

কারাগারে প্রবেশ করেই সে কোন এক অপরিচিতা নারীর বুকের মাঝে আশ্রয় পায়—আর সেই আশ্রয়ের মাঝে পড়ে মোহাবিষ্টের মতন কী এক মায়ামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাকে অস্ফুটস্বরে 'মা' 'মা' বলে ডেকে ওঠে—আর এই এমন মধুর ডাকার মাঝেই সে কী এক মায়ার শৃঙ্খলে ধরা পড়ে—তা সে নিজেই কল্পনা করে উঠতে পারে না!…

এমনি করেই সে মায়ার শৃঙ্খলে ধরা দেয়!…

ছোট্ট সংসারের ভেতর দিয়ে সে বড় হয়ে চলে—

চারিদিক দিয়ে তাকে সকলের মাঝে ধরা দিতে হয়!…

আধ-আধ-অস্ফুটন্ত ভাষা, তার লীলাময় ভঙ্গী, বাহ্যিক সৌন্দর্য্য সব ব্রীড়াময় করে তোলে তার ঐ অনিন্দনীয় রূপের মাঝে !...

কোমলা, শ্যামলা ধরণীর ওপর দাঁড়িয়ে সে একটু একটু করে কারাগৃহের অন্তরতলে প্রবেশ করে !...

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী ভুলে যায় আপনার কথা—

—কেবল আঁকড়ে ধরতে চায় পরের ধার-করা ভাষা !...

সংসারের নিয়মে সে বাঁধা পড়ে ! পিতার আদেশে, মায়ের অনুরোধে, ভাই-বোনের কর্ত্তব্য দেখে, সেও এগিয়ে চলে সেই এক বাঁধা পথে !...

এমনি করেই সে কারাব্রতে ব্রতী হয় !...

তারপর—

—যৌবনের হিল্লোল যখন তার ঐ কিশোর তনুটির ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে,—তখন তার তরুণ চিত্তের মাঝে নূতন বীণার ঝঙ্কার তুলে দিয়ে এক নূতন পথে এগিয়ে নিয়ে যায় !...

জোয়ারের আসার আশায় সে ভেসে চলে—

সংসারের সব জিনিষকেই সে নূতন করে গড়ে তুলতে চায় ! বাধা দিতে গেলেই উচ্চহাস্যে জগৎকে মুখরিত করে দিয়ে বলে সে—

সে মানে না কাহারও কথা, সে শোনে না কাহারও বাধা, সে চলেছে আপন মনে আপনার রূপকে নিয়ে আপন প্রিয়ার কাছে !...

প্রকৃতি তখন তার উজ্জ্বল অথচ শান্ত দীপ্ত প্রভা—এই ধরণীর সুকোমল বুকের 'পরে উদ্ভাসিত করে দিয়ে অনন্তের পানে তাকিয়ে বলে ওঠে সে—

ওর দেহ আমার দেহে নেই !...ওর রূপের জ্যোতি আমার স্নিগ্ধ দীপ্তির সাথে মেলে না !...আমি নিয়ে চলি অন্তরের সৌন্দর্য্যকে—ফেলে যাই মিথ্যা বাহ্যিক আড়ম্বরটাকে।

মনের সঙ্গে প্রাণের তারটি একত্র করে দিয়ে সে এবার ঠিক পথে চলতে চেষ্টা করে !...

ভুলের পথকে ছেড়ে দিয়ে চলে এবার সে নূতন চলার পথে।—

উচ্ছৃঙ্খল গতিটাকে বাধা দিয়ে এবার সে শান্ত ধীর ভাবে কর্ত্তব্যকে লক্ষ্য করে চলবার চেষ্টা করে !...

মায়ায় বাঁধন থেকে সে এবার ছুটে বেড়িয়ে যেতে চায় !...জগতের দিকে করুণ-দৃষ্টি মেলে সে কেবলই বলতে থাকে—

ভুলের বোঝা নিয়ে আমি এই দীর্ঘ পথের যাত্রা সুরু করেছিলাম, আজ এই শেষ প্রান্তে এসে বুঝতে পারছি ; আমি আমার সাধনার পথের সন্ধান পাইনি।—

পথভ্রান্ত পথিক তার বহু আরাধনার জীবন বীজকে নষ্ট করে ফেলে এসেছে !...এবার সে চায় মুক্তি ! সকলের দিকে ব্যাকুল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হতাশ নয়নে বলে ওঠে সে—

আমার কি মুক্তি হবে না ?—আমার—

গাছ-পাথর-কীট-পতঙ্গ যাকে দেখে, তাকেই বৃথা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা ক'রে পাগলের মতন বলে ওঠে—

ওগো, বলো, বলো—আমার মুক্তি কিসে হবে ?

মায়ার বাঁধকে ভেঙ্গে দিয়ে এবার সে ছুটে বেড়িয়ে যেতে চায় !...লীলাময়ের উদ্দেশ্যে সে আর্ত্তস্বরে বলে ওঠে—

হে দয়াময় !...হে সৃজনকর্ত্তা !!......হে ভগবান !!!...আমায় মুক্তি দাও !...যে পথে আসবার জন্যে বহু আরাধনা করেছিলাম তোমার কাছে, আমি সেই পথ থেকেই আবার ফিরে যেতে চাই !...আমায় পথ দেখাও !—আমায় মুক্তি দাও !—মুক্তি—

মৃত্যুর বিষাণ কবে বেজে উঠে পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে ছেড়ে দেবে, তারই আশায় সে বসে থাকে !...

সে এখন কেবল চায় মুক্তি !—

—মুক্তি !!— *

---

* আবৃত্তি সাহিত্য সম্মিলনীর (কাশী) কোনও এক সভায় পঠিত।

কমরেড্ মদন

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক

বাঙালীর যৌবন-সমুদ্রে এক সময়ে হঠাৎ দুই চারিটা রুশ-দেশীয় আইস্‌বার্গ আসিয়া ভাসিয়া ওঠে। এইটি তাহার কম্যুনিজম্-এর প্রবাহ। কলেজের তরুণ ছাত্র সহসা একদিন কার্ল মার্ক্সের ক্যাপিট্যাল্ হইতে সুরু করিয়া দু বল্‌শেভিক্ রাস্তা, অবশেষে লেনিনিজম্-এ আসিয়া পৌঁছায়। অনেক ইজম্ তখন সে আয়ত্ত করিয়াছে, রুশ-সাহিত্যের পিণ্ডি চটকাইয়া সে তখন বাংলার পুরাতন সাহিত্যের গয়ায় দিবার ব্যবস্থাও করিয়াছে সবেমাত্র।

ঠিক এম্নি বয়সে মদনমোহন একটি প্রাক্‌টিক্যাল কম্যুনিজম্-এর ক্লাশ খুলিল। অর্থাৎ—বউবাজারে বানার্জি লেনে একটি মেস খুলিল। সাম্যবাদের মেস। মেম্বার—১। মদনমোহন, কেরাণীর ছেলে, এম্-এ পড়ে; ২। বিপিনচন্দ্র, নারিকেল-ব্যবসায়ীর পুত্র, আই-এ পড়ে; ৩। হরিশ, উকীলের ছেলে, বি-এ পড়ে; ৪। গৌরাঙ্গ, ডেপুটি-পুত্র, ল পড়ে; ৫। বরেন্দ্র, তালুকদারের ছেলে; আই-এস্-সি পড়ে; ৬। ঘনশ্যাম, ধানকলের মালিক পুত্র, আই-এ পড়ে; ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট দশ জন। এবং একাধারে রাঁধুনী-ভৃত্য মহেশ।

দূরস্থিত পিতামাতার বাৎসল্যরসের ঘন-রূপ যত টাকাই যাহার নামে আসুক না কেন, সমস্তই একত্র পুল্ অর্থাৎ জড়ো করা হয়,—যেমন পল্লীর সকল নর্দ্দমার জল-ই একটি ডোবায় গিয়া জমা হয়,—তারপর সেই ডোবায় পুণ্য-স্নানের সকলের সমান অধিকার। নিজের বলিয়া কাহারো কিছু নাই, সমস্তই কম্যুনের (সাম্য-গৃহের)। মদনমোহন ক্যাশিয়ার মাত্র। মহেশের ওপর হুকুম দেওয়া আছে দশ টাকায় তিনদিন চালাইতে হবে,—মায় ড্রাইং ক্লিনিং পর্য্যন্ত। মেসে সর্ব্বদাই তিনখানি ধোয়া ধুতি ও তিনটি পাঞ্জাবী মজুত থাকে; যে কেহ বাহিরে গেলে উহারই এক প্রস্থ ব্যবহার্য্য। মেসের ভিতর লুঙি। তিন-ঘরের তিন কোণে তিনখানি সিঙ্গাপুরী মাদুর ও তিনটি ছোট্ট আলমারিতে অত্যাধুনিক চিন্তাজগতের গ্রন্থাবলীর ফাঁকে ফাঁকে কলেজের পাঠ্যপুস্তক। খাওয়া-টা তেমন বড় কাজ নয়, কারণ বাঁচিবার জন্যই খাওয়া,—অধ্যয়ন-টাই শ্রেষ্ঠ কাজ। তাই হেঁসেলে মহেশ, আর উপরের ঘরে কমরেড মদন। সকলেই কমরেড্। কিন্তু পুলিশের চোখে ধূলা দিবার জন্য 'দাদা' শব্দ ব্যবহার করা হয়।

গৌরাঙ্গের উদর কিছু অবুঝ, মাঝে মাঝে চপ্-কাটলেট খায়, আর বিপিন বড় চকোলেট্ ভালবাসে। তা বাসুক, মদনের সে খবরে প্রয়োজন কি? ব্যক্তির একান্ত (প্রাইভেট্) জীবনটুকু সমাজ-শাসনের আয়ত্তে আনিতে রুশের ষ্টালিন্-ও যখন পারেন নাই, তখন মদনমোহন ত কোন ছার। মানুষের নিগূঢ় চেতন মনোরাজ্যকে সোস্যালাইজড্ করিবার মতো ইজম্ এখনো আবিষ্কৃত হয় নাই যে! হইলে মদন একবার দেখিয়া লইত,—কমরেড্‌দের রসনা ও রসানুভূতিকে কেমন করিয়া সাম্যবাদের ছাঁচে ঢালিয়া একটি অপূর্ব্ব ব্যক্তি-আদর্শ খাড়া করিত। কিন্তু এখনো তার যুগ আসে নাই।...

রুশদেশের নদীতে জারের অধীনেও যেমন বরফ জমিত, আজিও তেম্নি জমে, সোভিয়েটের শাসন সে মানে না। বানার্জি লেনের মেসেও শীত পড়িল। হরিশ তাহার ফর্সা গালের হিমানী বেশ করিয়া ঘষিয়া মুছিয়া বরাবর মদনের ঘরে আসিয়া বলিল,—মদন দা'—রাত্তিরে গায়ে দেবো কী? আর ত র‍্যাপারে শীত ভাঙে না।

গৌরাঙ্গ কানে আঙুল দিয়া সুরসুরি লাগাইতে লাগাইতে বলিল,—আপনিই লেপগুলো বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়ালেন; বল্লেন ঘরে বেশি আসবাব থাকবে না,—জীবন হবে অত্যন্ত সহজ, লঘুভার, নিরাভরণ।

মদনমোহন বলিল,—না হয় লেপ দু'চার খান জোগাড় করো এখানকার পিসী-মাসীদের বাসা থেকে।

বিপিন পকেট হইতে একটি টফি টপ্ করিয়া মুখে ফেলিয়া বলিল,—কেন, সেই যে আমাদের কাজের জন্যে প্রায় দু'শো টাকা জমা আছে, তার থেকে এখন খান কয়েক র‍্যাগ কিনুন না, পরে টাকা-টা মেক্-আপ্ করলেই হবে।

ঐ টাকাটি প্রপাগাণ্ডা ফাণ্ড। ভবিষ্যতে শ্রমিক আন্দোলন চালাইবার জন্য মদনমোহন সকলের কাছ হইতে মাঝে মাঝে চাঁদা সংগ্রহ করিত। সেই সংগ্রহ এখন ব্যাঙ্কের খাতায় বেশ মোটা হইয়া উঠিতেছে। অগত্যা তাহারি উপর নির্ভর করিয়া তিনখানি ইতালিয়ান্ কম্বল কেনা হইল। দাম ছত্রিশ টাকা, ছ কিস্তিতে দেয়। কিন্তু এ কম্বল গায়ে দেওয়ার সৌভাগ্য সকলের থাকে না। গৌরাঙ্গ যেদিন নিজে যাচিয়া তাহার ঘরের কম্বলখানি ইলাদেবীর গায়ে জড়াইয়া দিয়া আত্মত্যাগ করিল, সেদিন সে ভাবিয়া পাইল না, এ তাহার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য।

(২)

ইলা কে তাহা মদনমোহন জানে। আর কাহারো জানিবার অধিকার নাই। অযথা কৌতূহল ভালো নয়, কমরেড্‌দের পক্ষে তাহা অতীব দূষনীয়, ইন্‌ডিসিপ্লিন। এই ব্যক্তি

তোমারি মতো একজন কর্ম্মী এই সরল সত্য-টুকু স্বীকার করিয়া নিতে হইবে, যেমন করিয়া তুমি স্বীকার করিয়া নাও ঐ আকাশের ইন্দ্রধনুকে, বসন্তের হাওয়াকে, কালবোশেখীর ঝড়কে।

ইলা আসিয়া বানার্জি-লেনের মেসে আসন গ্রহণ করিল,—তিন-তলার সেই ছোট্ট কুঠুরীতে, যেখানটিতে সাদা-সিধা গম্ভীর ঘনশ্যাম নিরালায় থাকিয়া একমনে পড়াশুনা করিত। তিনতলার ছাদটুকুতে আর কেহ রাত্রিতে ভ্রমণ করিতে পাইবে না, দো-তলার পায়খানা-বাথরুম্ আর কেহ ব্যবহার করিতে পাইবে না। ভৃত্য মহেশ ছাদের উপর জল তুলিয়া দিয়া যায় ইলার স্নানের জন্য, আর পাচক মহেশ একটি ছোট টিপয়ে তাহার অন্ন পরিবেশন করিয়া যায় সর্ব্বাগ্রে,—পরিপাটি দু-তিন রকম ভাজা ও তরকারি পরিশোভিত থালা সাজানো অন্ন। সকালে বিকালে টোষ্ট ডিম্ আর চা।

ইলা ছাত্রী। প্রাইভেট্ ম্যাট্রিক্ পরীক্ষা দিবে। ঘনশ্যাম যেদিন কক্ষ-চ্যুত হইয়া নীচে নামিয়া গেল, সেদিন একবার শুধু মাথা চুলকাইয়া বলিয়াছিল,—পুরুষের মেসে মেয়ে মানুষ থাকা কি ভালো দেখায় মদন দা' ?

মদন দা'র উত্তর আসিল এই ঃ—এটা তোমাদের একটা মস্ত প্রেজুডিস্। কম্যুনিষ্টের জীবন সম্পূর্ণভাবে আন্‌সোফিষ্টিকেটেড (সংস্কারাতীত), আন্‌সেক্সড (লিঙ্গাতীত), আন্‌ফীলিং (অনুভাবাতীত), আন-এস্থেটিক্ (রসাতীত), ক'রে গড়ে তুলতে হবে। জীবনে যা' কিছু অনর্থ ঘটে মানুষের রস-লিপ্সায়। রসজ্ঞানের দ্বারাই মানুষ নারী-দেহে বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য্য দেখে ; নারী নর নয়, এই কথা স্বীকার করে নিতে শেখে, আর জীবনটাকে খামোখা দ্বিধা বিভক্ত ক'রে এক পাশে রাখে ব্যবসায়-বাণিজ্য, কল-কারখানা, কুলি মজুর ; এবং অন্য পাশে রাখে সাহিত্য-সঙ্গীত, থিয়েটার-বায়স্কোপ, বধূ আর নর্ত্তকী। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তা নয়। আমরা জীবনকে সমগ্রভাবে দেখবো, একটা অখণ্ড গোটা জিনিষরূপে দেখবো ; মানুষের দেহমন, আশা-আকাঙ্খা, স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব, সমস্ত পরিব্যাপ্ত ক'রে এক পরিপূর্ণ বিশ্বরূপ প্রতিভাত করে তুলবো দেশে দেশে। আর সেই আদর্শের ভিত্তির ওপর গ'ড়ে উঠবে সাম্যবাদের এক অপরূপ সমাজ-মূর্ত্তি,—যার মধ্যে ব্যক্তির বিভিন্নতা নেই, ধনী-দরিদ্র নেই, স্ত্রী-পুরুষ নেই,—আছে শুধু এক অক্ষয় অব্যয় মহান্ মানবাত্মা, এক বিরাট্ দেহ,—এক হাতে যার ধনতন্ত্র ভাঙবার হাতুড়ি, অপর হাতে যৌনবোধের রসলিপ্সা ছিন্ন করবার কাস্তে। অর্থাকাঙ্খা আর যৌনবোধ, এ দুই সমস্যাই সমাজের মূল সমস্যা। আমাদের লক্ষ্য হবে এই দুইকে অতিক্রম ক'রে বড় হওয়া···

বলিতে বলিতে মদনমোহনের কণ্ঠস্বর ক্রমেই শক্তির আবেগে মন্দ্রিত হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সকল কমরেড-ই তখন তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। মদন দা'র এইরূপ চমৎকার বক্তৃতা তাহারা আর কখনো শোনে নাই। সাম্যবাদের ভাব-রূপ-টিকে এরূপ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা —হয়ত লেনিনেরও ছিল না।

ইহার পর ইলা দেবীর অস্তিত্ব মেসের ভিতর তাহারা স্বীকার করিয়া নিয়াছে তেম্নি সহজ চিত্তে যেমন করিয়া আর সকলে নেয় আজকাল ট্রামে, বাসে, ট্যাক্সিতে। ইলা পরীক্ষা দিবে, পাশ করিয়া সাম্যবাদিনী হইবে। অতএব এই অঙ্কুর কমরেড্-কে গড়িয়া তুলিবার জন্য নিযুক্ত হইল তিন জন। গৌরাঙ্গ তাহাকে অঙ্ক কষায়, হরিশ পড়ায় সংস্কৃত, আর মদনমোহন নিজে পড়ায় সাহিত্য অর্থাৎ বাংলা, ইংরাজী ও ইতিহাস। মদন যে-ভাবে বাংলা পদ্য পড়ায় তাহা ইলার খুবই ভালো লাগে। ঠিক অমনটি ভালো আর কাহারো কাছে লাগিবে কিনা দেখিবার জন্য ইলা গৌরাঙ্গের সামনে মাঝে মাঝে বাংলা বইখানা আগাইয়া দেয়। সেদিন আর অঙ্ক কষা হয় না।

ইলার লেপ ছিল না, তাড়াতাড়িতে আনিতে ভুলিয়াছে। গৌরাঙ্গ নিজের ঘরের র‍্যাগখানা তাহার গায়ে জড়াইয়া দিয়া বলিল, রংটা বেশ ম্যাচ্ করেছে আপনার গায়ের রঙের সঙ্গে। ইলা ইস্ বলিয়া মৃদু হাসিল, তাহার কাণের দুলও হাসিল, তাহার প্রগ্‌লভ চুড়ি ক'গাছি কি যেন কাণাকাণি করিয়া উঠিল।

গৌরাঙ্গ বলিল, আজ বায়স্কোপে যাবেন, রীগ্যালে মাতাহরি দেখতে ?

ইলা আধবোজা চোখ দুটি মিনিট খানেক

গৌরাঙ্গের চোখের উপর ন্যস্ত করিল। তারপর সহসা ঠোঁট ফাঁক করিয়া হাসির অবস্থায় মিনিট খানেক থমকিয়া রহিল। তারপর চায়ের বাটিতে ফের চুমুক দিয়া বলিল,—মদনদা'র পারমিশন্ চাই ত, টাকাও ত স্যাংক্শন্ করিয়ে নিতে হবে?

গৌরাঙ্গ বাঁ চোখ বন্ধ করিয়া ভ্রূকুটিভঙ্গে ধীরে ধীরে কহিল' সে টাকা আমার আছে।

ইলা আশ্চর্য্যভরে শুধাইল,—সে কি, আপনাদের প্রাইভেট্ পার্স থাকে? গৌরাঙ্গ মাথা নাড়িয়া কহিল,—না, তা থাকে না, কিন্তু আমার দুটো মণি-অর্ডার আসে, একটা এই মেসের নামে, আর একটা এখানকার মামার বাড়ীর ঠিকনায়······

ইলা খিল্ খিল্ করিয়া হাসি বলে,—হাউ নাইস্! গৌরাঙ্গ একপ্রস্থ ফর্সা ধুতির জোগাড়ে নীচে নামিয়া গেলে ইলা প্রসাধনে প্রবৃত্ত হইল। তাহার একটি নতুন স্যুটকেশে অনেক কিছু শিশি বোতল, কতক হরিশের উপহার, কতক বিপিনের, কতক গৌরাঙ্গের। কেহ জানেন না, আর কে কবে কী দিল। শুধু এই কয়টি তরুণ কমরেড্-দের স্নেহাতিশয্যে ক্রমে ইলার তোরঙ্গটি উপহার সামগ্রীতে একটি কেমিক্যাল কারখানায় পরিণত হইয়া উঠে।

নীচেয় শোনা গেল গৌরাঙ্গ একটা ইংরাজি লাইন বাংলা গানের সুরে গুন্‌গুন্ করিতেছে—where the bee sucks, there suck I. ইলা সঙ্কেত বুঝিয়া নামিয়া যায়।

(৩)

বায়স্কোপ দেখিয়া ইলারা চাং-ওয়া-তে চিংড়ির কাট্‌লেট্ খাইতে গিয়াছিল কিনা জানা যায় না। তাহারা যখন মেসে ফিরিল তখন রাত্রি দশটা। মদনদা গম্ভীরভাবে বলিলেন,—ইলা, আজ যেমন তিন ঘণ্টা নষ্ট করেছো, তেমি রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত পড়তে হবে, তারপর তোমার খাবার দেবে মহেশ। কম্যুনে-র এ শাস্তি মানিয়া নিতে ইলা বাধ্য। সে নিরুত্তরে তেতলায় উঠিয়া গেল।

রাত্রি এগারোটায় গৌরাঙ্গের ডাক পড়িল। গৌরাঙ্গ তখনো পর্য্যন্ত ভাবিয়া পায় নাই, ইলাকে বায়স্কোপে নিয়া গিয়া সে যে ডিসিপ্লিন্ ভঙ্গ করিয়াছে, তাহার শাস্তি কী।

সভা বসিয়াছে মদনমোহনের ঘরে। হরিশ, বিপিন প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত। সকলের মুখেই যেন এক আসন্ন ঝটিকার কালো ছায়া, মদনদার চোখে যেন—বাতায় কপিলা বিদ্যুৎ। গৌরাঙ্গ আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিল। নিঃস্তব্ধতার তুষার ছেদ করিল মদনমোহন। বলিল,—রাশ্যাম্ কম্যুনিষ্ট লীনড্রফ্ আমেরিকান টুরিষ্টের ছদ্মবেশে কলকাতায় এসেছেন। আমার সঙ্গে তাঁর অনেকদিন থেকেই গুপ্ত পরিচয় আছে। একটা বিশেষ মিশন্ নিয়ে আজ তাঁর আগমন······

তবে ত বায়স্কোপ দেখার শাস্তি নয়,—এ যে কাজের কথা। গৌরাঙ্গ কপালের ঘাম মুছিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে গ্রেটা গার্ব্বোর চোখ,—আর সেই তার প্রেমাস্পদের দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ।

মদনমোহন বলে,—কতকগুলো গুপ্ত রেকর্ড আজ তাঁর কাছে পৌছে দিতে হবে,—আমাদেরি একজনকে পৌছে দিয়ে আসতে হবে।

মদনদা'র প্রতি সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় সকলের বুক ভরিয়া ওঠে। রুশদেশীয় নভেল তাহারা এ রকম কাজের কথা পড়িয়াছে, আজ তাহাদেরি সম্মুখে সেই কর্ম্মপন্থা,—ক্ষুরস্থ ধারা নিশ্চিত দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ।

মদন মোহন বলে,—আমি ঠিক করেছি, আজ লটারিতে যার নাম উঠবে সে-ই যাবে কমরেড্ লীনড্রফের কাছে।

সকলের মুখেই তখন এক বিস্মিত আনন্দের অস্ফুট ব্যঞ্জনা।

লটারিতে নাম উঠিল ঘনশ্যামের। সকলে অম্লান হর্ষে তাহাকে অভিনন্দিত করিল। একখানা প্রকাণ্ড শীল্ করা খাম বগলে করিয়া ঘনশ্যাম রওনা হইয়া পড়িল গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের উদ্দেশ্যে,—কারণ তাহারি নীচে লীনড্রফ প্রতীক্ষমান রহিবেন।

* * *

পরদিন প্রভাতে বানাজ্জি লেনের মেসে পুলিশের হানা। ধৃত হইল গৌরাঙ্গ, হরিশ আর বিপিন, ঘনশ্যাম পথেই ধরা পড়িয়াছে। মদন মোহন ও ইলা দেবী অদৃশ্য। মদনদা'র ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে তখনো ঐ শৃঙ্খলিত তরুণদের মন প্রশংসায় উচ্ছ্বলিত। যাক্ তবু ত ইলা রক্ষা পাইয়াছে! ধন্য মদনদা'!

সেইদিন অপরাহ্ণে চাং-ওয়া রেস্তোরায় বসিয়া ইলা ও মদন। ইলা হাসিয়া বলে,—সত্যি মদন দা,—আমার যা ভয় হয়েছিলো,—ঐ অত রাত্তিরে উঠে মামার বাসায় যাওয়া!

—কী ইডিয়ট্ তোমাদের ঐ বিপিন। আমি শুধু একদিন তার হাতের আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করেছিলুম। তাতেই সে সোহাগে গ'লে গিয়ে আমাকে দুটো হীরের দুল্ কিনে দিলে।—আচ্ছা, তাদের যে ধরিয়ে দিলেন, জেল হবে ত।

মদন ইলার নাকের ওপর টুক্ করিয়া টোকা মারিয়া বলে,—না, জেল হবে না। কেবল বন্দী থাকবে বছর কয়েক। থাকাই উচিত। ওই গৌরটা ইদানিং বড় সর্দ্দারি করতে সুরু করেছিলো। পাস্ বই থেকে তিনশো টাকা তুল্লাম কেন, আমাকে প্রশ্ন করছিলো,—হাউ ইম্পার্টিনেন্ট্।

ইলা মুর্গীর ঠ্যাং চিবাইতে চিবাইতে বলে,—আচ্ছা, সত্যিই কি ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে মামাবাবু আপনাকে একটা চাকরী দিবেন? আমাকে কি শুধু ঐ জন্যে মেসে রাখা হয়েছিলো।

মদন টেবিলের তলায় ইলার পায়ের আঙুল টিপিয়া ধরিয়া বলে,—চাক্‌রী না পেলেও

আমার ক্ষতি নেই আপাততঃ; পরীক্ষাটা হ'য়ে গেলে যা হয় করা যাবে।

ইলার কণ্ঠস্বরে যেন কিসের মৃদুতা আসে, শুধায়,—আপনার বিবেকে একটুও বাধ্‌লো না?

মদন বিকট হাসি চাপিতে চাপিতে উত্তর দেয়—কনসেন্স্‌ ইজ্‌ এ স্ক্র্যাপ্‌ অব্‌ পেপার, ছিঁড়ে ফেলতে দেরী লাগে না। ত্যাখো, আমি ছেলেগুলোকে রাশিয়ান্‌ আদর্শ দিয়েছি, আর নিজেকে গড়ে তুলেছি জার্ম্মাণ আদর্শে। আমি সুপার-ম্যান্‌, সবাইকে দ'লে চমড়ে আমি হবো বড়, ছনিয়া হবে আমার করায়ত্ত, এই আমার আদর্শ, আমি চাই নীটসে-কে লেনিনকে নয়। আর সবাই হোক প্রোলিটারিয়েট্‌, আমি হবো সুপার-ম্যান্‌।...

ইলা বলে,—ও বাবা! তবে কি আমা-কেও দ'লে চমড়ে ফেল্‌বেন নাকি?

মদন অসহিষ্ণু চিত্তে বলে,—নাও, ইয়ার্কি করতে হবে না,—রঙমহালে বক্স রিজার্ভ করে রেখেছি, চলো।

ইলা বলে,—আপনার সঙ্গে যেতে যে ভয় করছে—আপনি সুপার ম্যান।...

মদন বলে,—ইস্‌। ন্যাকামি হচ্ছে, না ইলু? বলিয়া ইলার গাল ছুইটা সজোরে টিপিয়া দেয়।

খোলা-চিঠি
শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীকে

অহীন্দ্রভূষণ,

বাঙ্‌লার রসিক-সম্প্রদায়ের কাছে আজ আর তুমি অপরিচিত নও। বঙ্গরঙ্গমঞ্চে তোমার স্থান নাকি শিশিরকুমারের পরেই, এ কথা সত্য। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের তুমি যে একজন একনিষ্ঠ সেবক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মঞ্চোপযোগী কণ্ঠস্বর তোমার নেই। এ বিষয়ে তুমি শিশিরকুমারের অনেক নীচে। কিন্তু রূপসজ্জা ও ভাব ব্যঞ্জনার সাহায্যে তুমি তোমার অভিনীত চরিত্রকে মর্ম্মস্পর্শী করে তুলতে পার। তাই আজ তোমার এত নাম—এত কদর।

এবার ছায়াচিত্র সম্বন্ধে গোটাকয়েক কথা বল্‌ব—আশা করি তুমি রাগ করবে না। বাংলা ছবিতে তুমি অভিনয় করছ আজ বড় কম দিন নয়। বেশ মনে আছে, তোমাকে প্রথম আমরা দেখি 'Soul of a Slave' চিত্রে নায়কের ভূমিকায়। এ ছবিতে তোমার অভিনয় দেখে ভেবেছিলাম যে চিত্রজগতে তোমার স্থান হবে বোধহয় অনেক উচ্চে। কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, তুমি আমাদের আশাহত করেছ। নির্ব্বাক যুগে ম্যাডানের শাস্তি-কি-শাস্তি, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি ছবিতে তুমি অভিনয়ের চেয়ে তোমার চেহারা দেখিয়ে লোক ভোলাবার চেষ্টা করতে বেশী—কারণ তখন তোমার চেহারা ছিল সত্যই সুন্দর। কিন্তু সবাক যুগের গোড়াপত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হোল তোমার অধঃপতন। তোমার মঞ্চঘেঁষা অভিনয় ও অতিরিক্ত অঙ্গসঞ্চালনই সবাক চিত্রে তোমার প্রসিদ্ধিলাভের অন্তরায়। মঞ্চ ও ছায়াচিত্রে যে কত তফাৎ তা তুমি আজও বোঝনি। অনেকে নাকি তোমাকে বাঙ্‌লার Lon Chaney বলে অভিহিত করে থাকে। আশ্চর্য্য হই তাদের এই দুঃসাহসে। এ সব চাটুকারদের কথা তুমি কখনও কানে তুলো না। এখনও সময় আছে। আগে film technique ভাল করে শিখে নাও। তারপর ভবিষ্যতে ছবিতে অভিনয় করবে।

ইতি—

শ্রীউগ্ররুদ্র রাহা

টিট্কারি

শ্রীবজ্রবাহু

ফাগুনের হাওয়া বইতে সুরু হয়েছে এবং তার সঙ্গে কবিকুলের মনের প্রেম-আগুনও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে ; সেইজন্যেই সকলে আশ্রয় নিয়েছেন "ছায়াবীথি" তলে।

ফাল্গুনের "ছায়াবীথি"তে প্রকাশিত একটি গল্পের নমুনা গত সংখ্যায় আপনাদের শুনিয়েছি—এবার কয়েকটি কবিতা শুনুন।—ইমাউল হক আফ্‌শোষ করে বল্‌ছেন—

"ভাল যে বাসনা তাই বলনা খুলিয়া,
মিছামিছি কেন তুমি কর তা'র ভাণ ;—
প্রেমের আলোকে সখি, রঙো যার হিয়া
তার কি থাকিতে পারে ভাল-মন্দ জ্ঞান ?"

কিছুতেই নয়। তাহলে কি আর এ প্রলাপ বকা যায় ?—অতঃপর কবি তাঁর মানসীকে ভালবাসা জানাচ্ছেন—

"তীব্র ভালবাসা চাই তোমা-কাছে আমি'
(সর্ব্বনাশ-ঝোঁক সাম্‌লে)
তুমি চাও অন্তরাল করিতে সৃজন,—"
(হায় ! এইতো স্ত্রী চরিত্র)
"বুকে ভালবাসা কারো আছে কিবা নাই,
সে-ও কি বুঝিতে ভারি দেরী লাগে ছাই ! !"

তবে আর কী !—হে অন্তর্য্যামী—মানে মানে বিদায় নিলেই তো হয় ! তবে কেন বৃথা আশা ?

* * *

বন্দেআলী মিয়া "সোণালি ফাগুন দিনে" তাঁর মানসীকে আবেদন জানাচ্ছেন :—

"তুমি এলে যদি রহিলে না কেন
ঘরেতে মোর ;
না হ'তে ভোর।

ভোর না হতেই কবিপ্রিয়া পালিয়েছেন—'য পলায়তি স জীবতি'—তাছাড়া আর অন্য উপায় তো নেই—যে দিন কাল !

"মনেতে ভাবিনি কভু তুমি এসে এমন বেলায়
শিথানে বসিয়া মোর পরশিয়া জাগাবে আমায়,
যদি হেথা নাহি রবে কেন তবে
ভাঙলে ঘোর,
হে মন—চোর !"

বাস্তবিকই দুঃখের কথা !

কবি কিন্তু সে ক্ষোভ মিটিয়ে নিয়েছেন—ক্ষণেকের তরে প্রিয়াকে পাওয়া মাত্রই :—

"কত কাল পথ চেয়ে সেইক্ষণে পেলাম হেথায়
হাতদিয়া বুকে ধরি সাপ্‌টাইয়া
নিলাম তোমায়—"

তবে আর দুঃখ কী ?—

ক্ষণিকের পাওয়াতে কবির লালসা মেটেনি—তিনি চান আরও নিবিড়ভাবে—

"বেগুনী বসন পরি এসো আজ
ঘরেতে মম—
হে মনোরম।
ফাগুনের ফুল বায়ে শিহরিছে বেপথু মন
নিশিদিন আছো তুমি জেগে মোর বিরহী স্মরণ
বাহুতে জড়ায়ে মোর বুকেতে এসো
ফাগুনী সম,
হে প্রিয়া মম।"

কবি 'ময়নামতীর চর' থেকে ফিরে এসেছেন বেগুনী বসনাতে—আর কিছুদিন বুক পেতে অপেক্ষা করুন—আশা ফলবতী হতে পারে—ধৈর্য্যং রহু !—

* * *

আহমেদ মণির "একটি সন্ধ্যার গল্প" শুনিয়েছেন।—ইনি আবার মিলের ভাঁড়ারের চাবি হারিয়ে ফেলে অনশেষে গদ্য কাব্য (?) prosaic-এর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন :—

"আমরা দুজনে চঞ্চল হয়ে উঠি
আসন্ন বিদায় মুহূর্ত্তে
প্রতিটি মুহূর্ত্তের নিঃশব্দ পদ সঞ্চার
আমরা অনুভব করি,
আমরা অনুভব করি আমাদের
সকল অঙ্গের নিষ্ক্রিয়তা।
চঞ্চল হয়ে ওঠে তোমার মন,
চঞ্চল হয়ে ওঠে আমার প্রতিটি অঙ্গ
আমার হাত তোমার হাতে
নিবিড়তায় আবদ্ধ হয়—"

এরই নাম গদ্য কাব্য ! সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ রামা শ্যামা যত মধু সবাইকে দেখি বেসাতি করতে—তাকেও উপেক্ষা করা যায় ; কিন্তু এই সব অর্ব্বাচীন ছাগ সাহিত্যিকদের বিদায় করবার এদের ঔদ্ধত্যের সমুচিত শাস্তি দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

* * *

এই সংখ্যাতেই 'মণি-মঞ্জুষা'র (অর্থাৎ পুস্তক পরিচয়ে) শ্রীযুত দিলীপ কুমার রায় অনেক প্রলাপই বকেছেন। তাঁর দুঃখে আমরা সহানুভূতিই জানাচ্ছি। সমালোচকদের তিনি এক হাত আক্রমণ করেছেন—"ছোট ছোট ত্রুটি জড়ো ক'রে দেখানো আমি কর্ত্তব্য বলে মনে করি না। ও-কাজ আমার নয়ও। কেননা আমি ইতিপূর্ব্বে বার বার বলেছি ; আমি চাই না ক্রিটিক হ'তে, চাই দরদী হ'তে গুণগ্রাহী হ'তে। (সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন—'একে রাম সুগ্রীব তায় দোসর'—তাঁর কাব্যের ঠেলায় অন্ধকার, এরপর যদি আবার সমালোচক হতেন !) যাঁরা আজকের দিনে নিজেরা একটি লাইনও রচনা করতে না

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

বভ্রুবাহন বটব্যাল

আজ কোন খবর দেবার আগে একটা গল্প আরম্ভ করা যাক্। এটা আমাদের কাছে গল্প বলে মনে হবে, কিন্তু ওদেশে ষ্টারদের কাছে সত্যি কথা। আমাদের ষ্টারদের, আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন। আমাদের দেশে মানে এই বাংলা দেশে আর্টিষ্ট মানে হচ্ছে 'মোমের পুতুলের জামাই বাবু'। আঁচ লাগলেই তাঁরা গলে যান। আর্টিষ্ট মানে হচ্ছে বড় বড় চুল, গোলহাতা পাঞ্জাবী আর হাতে ধরা কোঁচা। ব্যস্ এই যাঁর দেখবেন তিনিই আর্টিষ্ট। তাঁরা না জানেন ঘোড়ার ওপর বসতে, না জানেন জলে হাত পা ছুঁড়তে, না জানেন মাটির ওপর ডিগ্‌বাজী খেয়ে পড়তে। এ দেশের যদি কোন আর্টিষ্টের ঘোড়ায় চড়া দৃশ্য থাকে, যা' প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, দেখবেন পরিচালক মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। আর একজনকে সাজিয়ে দূরের ছবিতে খুব প্রাণপণে ছুটিয়ে নেন, অবশ্য যদি তার দৃশ্যে থাকে তারপর 'নদের চাঁদকে' দেখান দাঁতে দাঁত দিয়ে, ঘোড়ার ঘাড় আঁকড়ে টাল খেতে খেতে আসছেন, তা' তার যে ভাব প্রকাশের দৃশ্যই থাকুক না কেন। তাই বলছিলাম একটা গল্প শুনুন। ক্লার্ক গেব্‌ল যখন নামছেন 'কপি ক্যাট'-এ কনষ্ট্যান্স বেনেটের সঙ্গে তখন একটা দৃশ্য তোলবার সময় বেশ একটা ব্যাপার ঘটে। আপনারা জানেন, ক্লার্ক গেবল্ লাফান ঝাঁপান ভালবাসেন। গেবল্ সকলের কাছে বলেন ছায়াচিত্রের ষ্টারদের জীবন 'ফুলের বিছানা' নয়। সে সব কথা এখন থাক, সেবার হয়েছে কি গেবলের ওই বইখানায় একটা দৃশ্যে একখানা বোটের ওপর লাফিয়ে পড়ার দরকার হয়েছে। পরিচালক মশাই এই রকমই বল্লেন কাজেই গেবল্ সঙ্গে সঙ্গে তাই করলেন ফলে—হোল কি, তিনি এত জোরে লাফিয়ে পড়লেন যে বোটের তলাটা গেলো ভেঙ্গে। গেবল্ এমন ভাবে আটকে পড়লেন যে অপরকে এসে তাঁকে উদ্ধার করতে হোল। সেখানে অনেক লোকজন ছিল তাই, তা নয়ত' গেবলকে ফিরে পাওয়া শক্ত হোত। হায়! আর আমাদের দেশের আর্টিষ্ট!

ক্লার্ক গেব্‌ল

পেরে ভাবেন যে, অপর সবার রচনাকে চড়াও হ'য়ে কটূক্তি ক'রে মস্ত কাজ করছেন তাঁদের সঙ্গে আমার বিবাদ নেই—ভিন্ন রুচির্হি-লোক:—কেবল আমি চাই যেন সাহিত্য-নন্দনে শুধু গলদ আঁধার ও কাঁটা আবিষ্কার করারই ভার আমার ভাগ্যে না পড়ে। সাধ্যমত যা পারি সৃষ্টি করি যেন—তার মূল্য যাই হোক। কেননা আমি বিশ্বাস করি যে, Announce of Creation is worth a ton of Criticism."

এর প্রতিবাদে আমরা কিছুই তর্ক করতে চাইনে—তবে মহীমকে এ কথা বলায় সে উত্তর দিলে—খুব সত্যি কথা। কিন্তু সেটা যদি সত্যিকারের সৃষ্টি হয়। সত্যিকারের সৃষ্টির প্রতি আমাদের কটাক্ষ নেই। কিন্তু তা যদি মাকড়সার সৃষ্টি হয় তবেই আমাদের আপত্তি। মাকড়সার মত সৃষ্টি করা অপেক্ষা বন্ধ্যা হওয়া কি ভালো নয়?

নামে না ভারে?

'দি প্রাইভেট লাইফ অব হেন্‌রি দি এইটথ'-এর সফলতা দেখে হলিউডের প্রডিউ-সাররা আর স্থির থাকতে পারলেন না। এঁদের দলের সব ক'জনকে হলিউডে টেনে আনবার চেষ্টায় আছেন। চার্লস লাউটনের নাম আগেই হলিউডে প্রসার লাভ করেছে। এইবার চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন রবার্ট ডোনাট, এলসা ল্যাঙ্কেষ্টার, মেরি ওবেরন আর বিলি বার্ণেস্। শোনা যাচ্ছে, ওয়েণ্ডিবেরি ও নাকি এই দলে জুটলেন। হলিউডের আর্কল্যাম্পের আলো আর্টিষ্টের গায়েও যে জ্যোতি এনে দেয় এটা আমরাও মানি।

চলতি খবর

১। মিকি রুণী আর ওয়ালেস বিয়ারী একসঙ্গে নামছেন 'হিরোস্ সন' ছবিতে।

২। ভার্জিনিয়া ব্রুশ নামছেন 'অ্যাম্-বুলেন্স কলে'এ সঙ্গে আছেন চেষ্টার মরিস্।

৩। ১৯২৮ সালে লণ্ডনের পিকাডেলী থিয়েটারে প্রথম যে সবাক ছবি দেখান হয় তার নাম হচ্ছে 'দি জাজ্ সিঙ্গার'।

লণ্ডনের অন্ধকার জগতে যারা প্রিয়, তাদের নিয়েই প্যারামাউন্টের "লাইম হাউস্ ব্লুস"। তাদেরই রূপ দিয়েছে জর্জ্জ র‍্যাফ্‌ট্, অ্যানা মে ওয়াঙ্ ও জিন পার্‌কার। ওপরে—প্রেমিকের বাহুপাশে জিন ভারী সুন্দর ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে।

শ্রেয়সী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ৭ই চৈত্র, ১৩৪১, 21st March, 1935. { ১২শ সংখ্যা

পথ-নির্দ্দেশ

আজিকার দিনে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ কোন পন্থা অনুসরণ করিয়া স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছিবে বলিয়া নানারূপ এবং বহু আলোচনা ও গবেষণায় নিযুক্ত, তখন ভারতবর্ষও যে নিজ প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ও অনমুসন্ধিৎসু হইয়া বসিয়া থাকিবে, তাহা অতীব ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। ভারতের, বিশেষতঃ বাঙ্গলার যুবশক্তি, চিরদিনই এই পরপদানত দেশের মত এবং কর্ম্মের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে; আজও যে তাহারা কোন পথ দর্শাইতে অক্ষম, অথবা দেশের তরুণ সমাজের চিন্তা-শক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে, এই প্রকার অপবাদ মানিয়া লইতে অন্ততঃ বাংলার সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মগতপ্রাণ যুবশক্তি অস্বীকার করিবে। কোনরূপ পথ-নির্দ্দেশ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা; এবং পরে ঐ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মিলাইয়া দেশের নানাবিধ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি আধিব্যাধির ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিষয় অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাই, দেশের অভ্যন্তরে সমষ্টিগত রাজনৈতিক মত নাই বলিলেও চলে, কংগ্রেস এতদিন যে সু-উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছিল তাহা হইতে আজ সে ভ্রষ্ট; আদর্শবাদী ও একছত্র নেতা বলিতে কেহ নাই। দেশ আজ যেন সন্তরণ-অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় মহাসমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, ছোট বড় সকলেই নেতৃত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত, সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্য ও নেতৃত্ব বজায় রাখিতেই ব্যস্ত। গত কয়েক বৎসর ভারতের উপর দিয়া যে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, আজিকার রাজনৈতিক কর্ম্মক্ষমতায় দৈন্য এবং অবসাদ অবশ্য উহারই ফল। এই শোচনীয়ভাবে নিজ্জীব অবস্থা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় একটী ক্ষমতাশালী ও উগ্রপন্থী কর্ম্মনীতি সমন্বিত দল গঠন করিয়া অবিলম্বে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ। এই দলের কর্ম্মনীতি ও কর্ম্মধারা এমনিই হইবে যে ইহাদের ভাবীকালের ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর খসড়া প্রণয়ন করিবার জন্মগত অধিকার জন্মিবে। ইহাতে যে উহাদের পথে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না, তাহা নহে; এই দলের কর্ত্তব্য হইবে নির্ম্মমভাবে উক্ত বাধা সমূহ পদদলিত করিয়া স্বীয় লক্ষ্যের প্রতি ধীর পদক্ষেপে চলা। এই কথায় গণতন্ত্রবাদীরা হয়তো ক্ষুব্ধ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা যদি তাঁহাদের চক্ষু উন্মীলন করিয়া বিশ্বের পানে তাকাইয়া দেখেন, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন, পরপদানত ক্লৈব্যপ্রাপ্ত জাতিকে বাঁচাইতে হইলে গণতন্ত্রের হট্টগোল চলিবে না। আজিকার বিশ্বের দিকে চক্ষু ফিরাইলে দেখিতে পাই নব-জাগ্রত সোভিয়েট রাশিয়া, হিটলারের জার্ম্মানী এবং মুসোলিনির ইতালী। উপরোক্ত তিনটী দেশেই শাসন কার্য্য পরিচালিত হইতেছে ঐরূপ উগ্রপ্রকৃতি-সম্পন্ন দল বিশেষের দ্বারা এবং ঐ রূপ দলগত শাসন পরিচালনায় যে সেই দেশের উন্নতি হইতেছে না, তাহা উহাদের নেহাত নিন্দুক ছাড়া আর কেহই বলিবে না!

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যে পত্রখানি সম্প্রতি ভারতীয় কংগ্রেস কর্ম্মীগণকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে এই রূপই পথের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কথা আমরা সবিশেষ পরিজ্ঞাত নই, কিন্তু উপদলীয় বিষে জর্জ্জরিত ও খণ্ডবিখণ্ডিত বাংলার পক্ষে অন্য পথ নাই।

চলতি পথে

শ্রীমল্লিনাথ

রাজবন্দীর মুক্তি

আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইবার পর দেশের রাজনৈতিক অবস্থা শান্ত-ভাব গ্রহণ করিবার পর সাধারণের মনে হইয়াছিল যে সরকার হয়তো তাঁহাদের দেশের শাসন নীতিতে কঠোরতার হ্রাস করিবে। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নীতি পরিবর্তনের কোনই যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিলেন না, তাঁহারা তাঁহাদের অনুসৃত কঠোর হস্তেই শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। গত কয়েক বৎসরের সংঘর্ষ-মূলক কর্ম্মনীতির ফলে বিপুল শক্তিশালী সরকারের সহিত দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া দেশের অগ্রগতি সম্পন্ন রাজনৈতিক কর্ম্মীদল আজ অবচেতন অবস্থায় পৌছিয়াছে; সুতরাং সরকারী নীতি যাহাই হউক না কেন, তাহাকে বাধা দেবার কেহ নাই। তাহা সত্ত্বেও, জনসাধারণ ভাবিল হয়তো ক্রমশঃ সরকারী নীতির পরিবর্ত্তণ সাধিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই এবং সেই জন্য আজ পর্য্যন্তও সরকারী দমন-লীলা সমভাবেই চলিয়াছে। সরকারী দমন-নীতির অবশ্যম্ভাবী ফলে বহুদিন হইতে আজ পর্য্যন্তও অনেক কর্ম্মী কারাগারে পচিতেছে—তাহাদের মধ্যে এক অংশ একটী সাময়িক উত্তেজনার বশে কিছু অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছে, এবং আরও কিছু আছে, যাহারা আজ পর্য্যন্ত তাহাদের অপরাধ কি তাহা জানে না; ইহা ব্যতীত আইন অমান্য আন্দোলনে অভিযুক্ত কয়েকজন বন্দীও আছে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক কয়েদীরা যে অভিযোগে দণ্ডিত, তাহা খুবই গর্হিত সন্দেহ নাই, এবং দেশের ও দশের যাহারা হিতাকাঙ্ক্ষী তাহারা সকলেই এক-বাক্যে উহার তীব্র নিন্দাবাদ করিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া ইহা ভুলিলে চলিবে না যে সাময়িক উত্তেজনার বশে যদি কেউ কোন অপকর্ম্ম করিয়াই থাকে, তবে তাহার মার্জ্জনা নাই। কঠোর দণ্ডাদেশ পাপীর কোমল হৃদয়কে কঠিন করিয়াই তোলে, বরং ক্ষমা গুণ নিজ মাহাত্ম্যে পাপের প্রতি পাপীর মনে ঘৃণার উদ্রেক করে, এই সহজ সত্য বুঝাইয়া দিবার মত কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কি সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে নাই?

সম্রাটের রাজত্বকাল পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে আগামী রজত-জয়ন্তীর সময়ে হয়তো রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে, এইরূপ আশা অনেকেই মনে মনে পোষণ করিতেন। রজত-জয়ন্তীর সময়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মুক্তির জোর গুজব সংযুক্ত প্রদেশে রটিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে (Council of State) ঐ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর হইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য রায় বাহাদুর মথুরা-প্রসাদ প্রশ্ন করেন যে আগামী রজত-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সরকার পণ্ডিত জওহরলাল এবং অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তিদান সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন কি না। তাহার উত্তরে হোম সেক্রেটারী বলেন যে—"সম্রাটের রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বা আইন অমান্য আন্দোলনের অপরাপর বন্দী-দিগের মুক্তিদান সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কোনরূপ আলোচনা করেন নাই।" হোম সেক্রেটারী আরও বলেন যে—"বন্দীদিগের মুক্তির দাবী মঞ্জুর বা তাহাদের দণ্ডাদেশ হ্রাস সম্রাটের আগামী রজত-জয়ন্তী উৎসবের অঙ্গীভূত হওয়া উচিৎ নহে, ইহাই গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত।" সত্য কথা বলিতে কি, আমরা এই প্রকারের জবাবের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। সরকারী কর্তৃপক্ষ চাহিতেছেন রজত-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাম্রাজ্যের সকল স্তরে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আনন্দের বন্যা বহিয়া যাক, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে তাঁহারা আনন্দ করিবার ব্যাপারে সম্রাটের প্রজাসাধারণকে মোটেই সাহায্য করিতেছেন না। বাংলাদেশে এখনও

বিনা বিচারে আটক কার্য্য চলিতেছে; সারা দেশব্যাপী নিরানন্দ বিরাজমান; ইহা লইয়া কি আনন্দ করা চলিতে পারে? আমাদের ভাগ্যবিধাতাগণকে এই সম্বন্ধে আরও কিছু চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন

প্রায় চারি বৎসর পরে আগামী ইষ্টারের ছুটীতে উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর সহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। আজপর্য্যন্ত কখনও দিনাজপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাই—এই বারই সর্ব্বপ্রথম। এইজন্য দিনাজপুরে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং অধিবেশন যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে সেই চেষ্টার কোন ত্রুটী নাই। উত্তরবঙ্গের সর্ব্বজনপূজিত দেশ-কর্ম্মী ও নেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে বৃত হইয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কর্ম্মশক্তিতে আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে, এবং বিশ্বাস করি, তাঁহার নায়কত্বে এইবারকার প্রাদেশিক সম্মেলন সর্ব্ব বিষয়েই সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

মিলনের আহ্বান

গত কয়েক বৎসরের বাংলার রাজনৈতিক দলাদলি বাঙ্গালীকে নিখিল ভারত রাজনীতির আসরে যে কতখানি নিম্নে আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহার পুনবর্ণনায় আমাদের লেখনীকে মসীলিপ্ত করিতে চাহি না। এবং এই অবস্থা সম্বন্ধে চেতনা যে বাংলার রাজনীতিক মহলে ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতেছে তাহা খুবই আশার কথা সন্দেহ নাই। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর জেনোয়া হইতে প্রাদেশিক সমিতির সম্পাদকের নিকট লিখিত পত্রে এই দুরাবস্থা হইতে বাংলাকে পরিত্রাণ করিবার জন্য মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বাংলার বিবদমান দুই পক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন এবং আমরা শুনিয়া আশান্বিত হইলাম যে কংগ্রেসের দুই পক্ষের কলহ মিটাইবার নিমিত্ত বাংলার অন্যতম নিরলস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয় অগ্রণী হইয়াছেন। সত্যেন্দ্র-চন্দ্রের এই প্রচেষ্টা সার্থক হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই মিলন প্রচেষ্টার প্রথম ফলস্বরূপ আগামী এপ্রিল মাসে যাহাতে করপোরেশনের উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে একজন নিষ্ঠাবান কংগ্রেসসেবী মেয়র নির্ব্বাচিত হ'ন, তাহার চেষ্টা হইতেছে। দ্বিধা-বিভক্ত ও বিবদমান দুই পক্ষের মতানু-ক্রমে যিনিই মেয়র নির্ব্বাচিত হউক না কেন, তিনিই দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জনে সমর্থ হইবেন ইহা আমরা মনে করি। এবং আমাদের আরও মনে হয় যে এইবার যেন একজন মুসলমানকে মেয়র করা হয়।

গত অর্দ্ধোদয় যোগের সময়ে যখন আমাদের তথাকথিত কংগ্রেসী মেয়র কলিকাতায় আগত হিন্দু তীর্থযাত্রীগণের নিমিত্ত সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করিবার বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া দিল্লী সিমলায় খানা পিনায় রত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে হেলথ কমিটীর সভাপতিরূপে কাউন্সিলার হাজী আবদুর রেজাক সাহেব মুসলমান হইয়াও যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা আশা করি, এইবার রেজাক সাহেবকেই মেয়রের আসনে বরণ করা উচিত। হয় রেজাক সাহেব নয়ত ডাঃ আর, আমেদ সাহেব মেয়র নির্ব্বাচিত হইলে হিন্দুকরদাতারাও যে অসন্তুষ্ট হইবেন না তাহা আমরা বিশ্বাস করি।

গ্রীষ্মাবকাশ ও ছাত্র সমাজ

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গুলির মধ্যে ইণ্টারমিডিয়েট ও প্রবেশিকা পরীক্ষা সমাপ্ত-প্রায় এবং এপ্রিল মাসের মাঝামাঝির মধ্যেই বি, এ, পরীক্ষাও শেষ হইবে। তাহার পর পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ এবং কলেজের অন্যান্য ছাত্রেরাও এক দীর্ঘ অবকাশ গ্রীষ্ম উপলক্ষ্যে লাভ করিবেন। সাধারণতঃ ছাত্রগণ এই সময়টী অতি আরামেই অতিবাহিত করেন। সারা বৎসরের পরিশ্রমের পর যে সামান্য কয়েকদিন অবকাশ পাওয়া যায় তাহা যদি ছাত্র সমাজ আমোদ আহ্লাদে নির্ব্বাহ করেন অবশ্যই ছাত্রগণকে ঐ কারণে দোষী করিলে চলিবে না। এই দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য প্রায়ই খারাপ, দীর্ঘ অবকাশও প্রায় স্বল্প, কাজেই সামান্য দু'এক মাসের যে ছুটী

পাওয়া যায়, তাহা হর্ষ উল্লাসেই অতিবাহিত করিতে স্বাভাবিক ইচ্ছা জাগে। কিন্তু পর-পদানত দেশের ছাত্র সমাজের কর্ত্তব্য ও কোন স্বাধীন দেশের ছাত্র সমাজের কর্ত্তব্য-ধারা বিভিন্ন। স্বাধীন দেশে ছাত্র সমাজ যে সময়টা ব্যসন উল্লাসে অতিবাহিত করেন, সেই সময়টা পরাধীন দেশের ছাত্র সমাজ ঠিক একই ভাবে অপব্যয় করিতে পারে না। পর-পদানত দেশের ছাত্র সমাজের অপব্যয় করিবার মত অবকাশ নাই; তাহার সর্ব্বক্ষণই জাতি গঠন বিষয়ক কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকা উচিত।

ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ, সুতরাং উহার ছাত্র সমাজকে অবকাশ সময়ে বিলাস ব্যসনে নিযুক্ত থাকিলে চলিবে না। তাহার সম্মুখে জাতি গঠনের মহান কর্ত্তব্য পড়িয়া আছে। ভারতবর্ষকে সকল রকমে উন্নত করিবার ভার এই যুবশক্তির উপর ন্যস্ত। জাতি গঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগে হয়তো একটু বিপদ আপদের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া উহার ভয়ে পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। সকল বিপদ উপেক্ষা করিয়া তাহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। বাংলা দেশ আজিকার দিনে চারিদিক হইতেই উৎপীড়িত, একদিকে সরকারী কর্ম্মনীতি বহু বাঙ্গালী পরিবারকে আশ্রয়হীন করিয়া তুলিয়াছে, অপর দিকে কংগ্রেসী চক্রের কর্ত্তাদের অবহেলা বাংলা ও বাঙ্গালীকে চরম দুর্দ্দশার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে। সরকারী কর্ম্মনীতির ফলে বাংলার প্রায় আড়াই সহস্রাধিক পুত্রকন্যা বিনা বিচারে শুধু গুপ্তচরদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত; নিজেদের অপরাধ কি, কি জন্যই বা তাহারা এতদিন দুঃখ নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে, আজও তাহারা জানে না। এমন কি, তাহারা আজ পর্য্যন্তও জানিতে পারিল না, তাহাদের মুক্তি সম্ভাবনা কবে। এই তো গেল সরকারী কর্ম্মনীতির ফলে উদ্ভূত অবস্থার বর্ণনা। অপর পক্ষে, দেশবাসী আশা করিত যে এই সরকারী অনাচারের প্রতিবাদ করিতে কংগ্রেস অগ্রসর হইবে। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা, যে কংগ্রেসের জন্য বাংলার দ্বারা হইয়াছিল, আজ বাঙ্গালীর স্থান সেই কংগ্রেসেই অতি নিম্নে। শুধু সরকারী অনাচারের প্রতিবাদ করিতে কংগ্রেস যে অমনোযোগী হইল, তাহাই নহে, কংগ্রেস বাংলার স্কন্ধে পুনা প্যাক্ট ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন নীতি গ্রহণ করিয়া বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন একান্ত ভাবে শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। বাংলার হিন্দুদিগের মধ্যে সাধারণতঃ কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না, পুনা প্যাক্ট তাহার সৃষ্টি করিয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কংগ্রেসের না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন নীতি বাংলার হিন্দুর অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় করিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। ইহার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করা বাঙ্গালীর

অবশ্য কর্ত্তব্য এবং এই সময়োপযোগী কার্য্যের গুরুভার বাংলার ছাত্র সমাজকেই গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলার ছাত্র সমাজকে আগামী সুদীর্ঘ অবকাশ সময়ে সকল শক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে উপরোক্ত দ্বিবিধ অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে। অতীতের কর্ম্মপরিচয়ে বাঙ্গালী ছাত্র আজও গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে সুতরাং বর্ত্তমানের অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতেও তাহারা সক্ষম হইবে, ইহা কি নিতান্ত দুরাশা ?

বিশ্ব-ছাত্র কংগ্রেস

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্র সমাজের মধ্যে সংহতি ও সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি বেলজিয়াম অন্তর্গত ব্রুসেলস নগরে এক বিশ্বছাত্র সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশের ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি এই প্রাথমিক অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিল এবং তাহার মধ্যে ভারতীয় ছাত্রও ছিল। এই বিশ্বছাত্র সম্মেলনের প্রারম্ভে বিশ্বের ছাত্র সমাজকে উদ্দেশ্য করিয়া যে প্রচার পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পাঠ করিলেই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি তাহা সম্যক উপলব্ধি করা যায়। উহাতে বলা—হইয়াছে "পৃথিবীতে যে সকল কোটী কোটী লোকের ভাগ্য আমাদের ভার্গ্যের সহিত জড়িত, তাহাদিগকে একটী নূতন যুগ সৃষ্টিরজন্য সম্মিলিত সংগ্রামে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছি।......বর্ত্তমান সমাজ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত। সেই সমাজে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই।...... আমরা যুদ্ধ চাহি না। পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমিকদের সহিত মিলিত হইয়া আমরা তাহার বিরোধীতা করিব। আমাদের অভিমত এই যে, ফ্যাসিজম ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম হইতে তাহাকে পৃথক করা যায় না ; সুতরাং জাতীয় সংস্কৃতি ও জনশিক্ষার অবাধ বিস্তারের জন্য আমরা পরাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতা দাবী করিতেছি।" এই প্রচার পত্রে যে মহান উদ্দেশ্য সাধন করিবার বিষয়ে দিক নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহা ফলবতী করিবার জন্য এক বিশ্ব সমিতিও গঠিত হইয়াছে। সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয়ে নানাভাবের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং ঐ প্রস্তাবের ভিতর দিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের রূপ তাহাদের ছাত্র সমাজের চক্ষু দিয়া আমরা দেখিতে পাই। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ স্ব স্ব দেশের অবস্থা বর্ণনা করিয়া যে রিপোর্ট পাঠ করেন, তাহাতে এক "আশ্চর্য্য রকমের সাদৃশ্য" দেখা যায়। এবং এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে চিত্র ঐ সম্মেলনে অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা প্রায় এই দেশের প্রকৃত অবস্থাই ব্যক্ত করিয়াছে। তাহাতে ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি এবং ছাত্র সমাজ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৭·৬ জন লেখাপড়া জানে, অথচ সেখানে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার সমস্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভারতে যে ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে ২০৲ ২৫৲ টাকার চাকুরী পাওয়া শক্ত—এমন কি, ইউরোপে যে সমস্ত যুবক শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে পর্য্যন্ত চাকুরী পাওয়া কঠিন।"

এই বর্ণনাতে যে সত্য কথাই ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। এবং এইটুকু শুধু চিন্তা করিবার বিষয় যে এই বর্ণনা পাঠ করিয়া পাশ্চাত্যের যুব শ্রেণীর মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন সত্য চেতনা জাগরিত হইবে কি না ; যদি তাহাই হয়, তবে এই বর্ণনা পাঠ ও প্রচার সার্থক হইবে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল হইয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ডে গমন করিবার পর ভারতীয় ছাত্রদিগের যে নানাবিধ দুরাবস্থার মধ্যে পড়িতে হয়, তাহার উল্লেখ আছে। অবশ্য এই দুরাবস্থার কারণ আর কিছুই নহে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের বিরাট অজ্ঞতা। আশার কথা এই যে ক্রমশঃ পাশ্চাত্যের মন হইতে এই অজ্ঞতা দুরীভূত হইতেছে এবং "নব যুগের ছাত্র" সমাজ বুঝিতে পারিতেছে যে,—"যে জাতি অপর একটী জাতিকে পরাধীন করিয়া রাখে, তাহারা নিজেও কখনও স্বাধীন হইতে পারে না।" অন্যান্য প্রস্তাবগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় বিশ্বছাত্র সমাজ স্থির করিয়াছেন যে এই পৃথিবীর বহু দুঃখ কষ্টের কারণ—সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ, ফ্যাসিজম ও যুদ্ধ। পৃথিবীতে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা স্থাপন করিতে হইলে, ঐ কারণ গুলির নিরাকরণ করিতে হইবে এবং ঐ উদ্দেশ্যেই বিশ্বছাত্র কংগ্রেস স্থাপিত হইয়াছে। বিশ্বছাত্র সমাজের এ প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হইবে না, এই আশা আমরা পোষণ করি।

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

নিউ থিয়েটার্স

"দেবদাসে"র ছবি তোলা শেষ হয়ে গেছে। সম্পাদনার ঘর থেকে এর মুক্তি পেতে আর বেশি দেরী নেই। এর 'ট্রেলার'-ও শেষ হয়েছে, এবং "চিত্রা"য় ও "রঙমহলে" দেখানো হচ্চে। ছবিখানির ফটোগ্রাফী নাকি এতো সুন্দর হয়েচে—যা নাকি সচরাচর ভারতবর্ষে দেখা যায় না। বিশেষ করে' সেই দৃশ্যখানা যেখানে ক্যামেরাম্যান দুটো লাইনের মাঝখান থেকে দুটো চলন্ত ট্রেণের দৃশ্য তুলেছেন। কাজটা বিপজ্জনক সন্দেহ নেই।

ছবিখানির চরিত্রলিপি আপনাদের সবারই জানা ও সবারই প্রিয়।

চিত্রখানি শীগ্‌গীরই চিত্রায় মুক্তিলাভ করবে।

* * *

শ্রীযুক্ত নিতীন বসুর পরিচালনায় একখানা ছবি তোলা হ'বে। এর দুটো সংস্করণ থাকবে—বাংলা ও হিন্দী। চরিত্র নির্ব্বাচন ও চিত্রলিপি সম্পূর্ণ হয়েছে। রিহার্সালও চলছে দ্রুতগতিতে। ছবিটির আখ্যানবস্তু আবাল-বৃদ্ধ বণিতার সন্তোষসাধনে সমর্থ হবে শুনতে পাচ্ছি।

* * *

নিউ থিয়েটার্স-এর এক নম্বর ষ্টুডিয়োয় যে নূতন বৃহৎ ল্যাবোরেটরী স্থাপনা করা হয়েছে—তার জুড়িদার ভারতবর্ষে নাকি খুব কম। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এ ল্যাবোরেটরী নিউ থিয়েটার্স-এর অত্যন্ত উপযুক্তই হয়েছে বলতে হবে।

* * *

বি ইউনিট্‌-এ একটি প্রকাণ্ড আধুনিক সাউণ্ড ষ্টুডিয়ো তৈরী হয়ে এই ইউনিট্‌-এর যে বিশেষ সুবিধে হয়েছে সন্দেহ নেই।

উদয়শঙ্করের নাচ এ সপ্তাহের একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। ওপরে শঙ্কর ও কনকলতা নিজেরাই বাজনার বাক্স ঠিক করছেন—মফঃস্বল থেকে কল্‌কাতায় নাচ্‌তে আস্‌বার জন্যে।

কালী ফিল্মস্‌

এঁদের "পাতালপুরী" ২৩শে মার্চ্চ শনিবার থেকে "রূপবাণী"-তে প্রদর্শিত হবে। শৈলজানন্দের গল্পের বৈচিত্রে, তিনকড়িবাবু, জীবনবাবু, ও শ্রীমতী মায়া ও শ্রীমতী শিশুবালার অভিনয়ে "পাতালপুরী" যে কলকাতাবাসীদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে এ আশা আমরা অনায়াসেই করতে পারি। প্রযোজনা ও পরিচালনার দিক থেকে কর্ত্তৃপক্ষ চিত্রখানিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে কোন চেষ্টার কসুর করেন নি। এবং, তাঁদের সেই চেষ্টা যেন সফল হয়—এই কামনাই আমরা করি।

* * *

"বিদ্যাসুন্দর" প্রায় অর্দ্ধেক তোলা শেষ হয়েছে। সুলেখক হেমেন্দ্র কুমার এ ছবিখানা খুব দেখা শুনো করছেন দেখ্‌তে পেলুম। নাচ আর গানে ভরা হচ্ছে এই "বিদ্যাসুন্দর", তাই এই ষ্টুডিয়োয় আজকাল বেশীরভাগ সময়ে নুপুরের রিণিরিণি ও গানের সুর শোনা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

রাধা ফিল্মস্‌

গত সপ্তাহে এঁদের "রাজনটী বসন্তসেনা" ভবানীপুরের পূর্ণ থিয়েটারে মুক্তিলাভ করেনি। তার কারণ, ওখানে "দক্ষযজ্ঞ" শীগ্‌গীরই মুক্তিলাভ করবে বলে'। আগামী ৩০শে মার্চ্চ শনিবার থেকে "দক্ষযজ্ঞ" একসঙ্গে শ্যামবাজারের ক্রাউন ও ভবানীপুরের পূর্ণ থিয়েটারে চল্‌বে। ঐ তারিখেই "দক্ষযজ্ঞে"র রজত-জুবিলী উৎসব সম্পন্ন হবে। ছবিটি বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে বলে' আমরা অত্যন্ত খুসি হয়েছি।

* * *

পরিচালক জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জীর "মানময়ী গার্লস্‌ স্কুল"-এর শুটিং শেষ হয়েছে। চিত্রখানি এখন সম্পাদকের আস্তানায়। আর সপ্তাহ দু'এক-এর ভেতর ৺রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের এই প্রখ্যাত প্রহসন সবাকরূপে মুক্তিলাভের অপেক্ষা করবে। পরিচালক ব্যানার্জ্জীর ভাবী ছবি হচ্ছে হিন্দীতে "দুলারী বেটি"। নির্ব্বাক যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রী ইন্দিরা দেবী এতে নাম ভূমিকায় নাব্‌বেন।

* * *

এই কোম্পানী এঁদের প্রথম তেলেগু ছবি

তোলায় এখন ব্যস্ত। নাম—"ভক্ত কুচেলা"। মান্দ্রাজ প্রদেশের পণ্ডিত কে সুবরমনরম্-এর গল্প ও কথা। পরিচালনা শ্রীতড়িৎ বসুর। রেডিয়ো ও গ্রামোফোনের নাম-করা গায়ক-গায়িকারা এতে নাববেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি তামিল ছবি তোলারও কথা চল্ছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

পরিচালক জ্যোতিষ মুখার্জ্জীর এ প্রতিষ্ঠানের হয়ে প্রথম বাংলা ছবি হবে—হেমেন্দ্র কুমার রায়ের "পায়ের ধুলো"। গল্পটি চিত্রোপযোগী সন্দেহ নেই, আশাকরি জ্যোতিষবাবু এতে সাফল্যলাভ করবেন। নিম্নলিখিত নামগুলো থেকে ভূমিকা বণ্টন করা হবে। "রাজনটী বসন্তসেনা"র শ্রীমতী বীণা, শ্রীমতী শেফালিকা, শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা ও শ্রীজীবন গাঙ্গুলী। আরেকটি নতুন মুখের প্রকাশ এ চিত্রখানিতে নাকি হবে।

* * *

হেমেন্দ্র কুমারের "পায়ের ধুলো" নিয়ে জ্যোতিষবাবু ভবিষ্যতে যেন সাফল্যলাভ করেন—এই আমাদের কামনা।

* * *

এঁদের হিন্দী ছবি 'সেলিমা' শেষ হয়েছে সেদিন। পরিচালক মধু বোস চিত্রখানাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আমরা আশা করি তাঁর চেষ্টা সার্থক হবে। 'সেলিমা'কে সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করতে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ আয়োজন করছেন।

* * *

কোম্পানীর জেনারাল ম্যানেজার মিঃ মোলিয়ান জয়পুর থেকে প্রত্যাগমন করেছেন। এবং সেই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন বাংলা ও হিন্দী 'বিদ্রোহী'র খবর। 'বিদ্রোহী' জয়পুরে কোনো বিদ্রোহ ঘোষণা না করে বেশ সুচারুভাবে কার্য্য সম্পন্ন করছে। সম্পাদকের ঘরে যেতে 'বিদ্রোহী'র বেশী আর দেরী নেই।

'ব্লাড এণ্ড বিউটি' বা 'রূপ ও রক্ত' চলেছে দ্রুতগতিতে। অতি শীঘ্রই এ চিত্রখানি শেষ হবে শোনা যাচ্ছে।

"বিজলী"

ভবানীপুরে এই নতুন চিত্র গৃহটি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। বসবার ব্যবস্থা, গৃহটিকে সাজাবার জন্যে সুরুচিপূর্ণ শিল্প ও শক্তিসম্পন্ন সবাক যন্ত্রে শ্রীযুক্ত হরিপ্রিয় পাল মহাশয়ের "বিজলী" কলকাতার উৎকৃষ্ট চিত্রগৃহগুলির ভেতর বেশ সম্মানজনক স্থান লাভ করেছে—এ বিষয়ে কারো সন্দেহই নেই। গত ৮ই মার্চ্চ শুক্রবার এর শুভ-উদ্বোধন হয়েছে। কলকাতা করপোরেশনের শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা জে, সি, মুখোপাধ্যায় এতে পৌরহিত্য করেছিলেন।

* *

উদ্বোধন-উৎসবে বিশেষ জন সমাগম হয়। ঝল্মলে নানান রঙের শাড়ী, কুচোনো ধুতি ও পোষাকে "বিজলী"র উজ্জ্বল অথচ উগ্র-নয় আলোকে চারদিক ঝক্মক্ করছিলো। পর্দ্দার ওপর চিত্র প্রক্ষেপের পর নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভারী জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। সবচেয়ে অভিনব ও দেখবার মত জিনিষ সেদিন হয়েছিল "বিজলী"র বাজি পোড়ানো। আকাশে এর নানান রকম খেলা দেখতে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সকলেই বিশেষ ভীড় করে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জনসমুদ্রকে ট্রাম-রাস্তা থেকে সরানোর জন্য পুলিশকে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিলো।

* * *

প্যারামাউন্টের বিখ্যাত ছবি 'লাইভ্স্ অফ এ বেঙ্গল ল্যান্সার' প্রথম এখানে প্রদর্শিত হয়। এবং সবারই চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ হয়েছিলো।

* * *

আমরা শ্রীযুক্ত পালের এ প্রচেষ্টায় আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

চিত্রছায়া

প্রতিষ্ঠানটি আবার পূর্ব্বতন পরিচালক মিঃ ডবলিউ, সি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় এসেছে। পূর্ব্বের জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে খুব বেশী দেরী হবেনা কারণ মিঃ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীপ্রভাত সিংহের কর্ম্মদক্ষতার উপর আমাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে। এঁদের

“বাসবদত্তা”—“ছায়া”র আগত-প্রায়। প্রধান ভূমিকায় শ্রীমতী কাননবালাকে ঐ দেখুন ওপরে।

পরবর্ত্তী আকর্ষণ হচ্ছে “লষ্ট জঙ্গল,” “ফ্লাইং ডাউন টু রিও” প্রভৃতি।

ম্যাডান

শুনতে পেলুম, দুর্ব্বল মদন একখানা বাংলা ছবি তুলতে মনস্থ করেছেন। নাম—অদ্ভুত, ‘ফ্যান্টম অফ ক্যাল্‌কাটা’ বা ‘কল্‌কাতার ভূত’। খুব সম্ভব একটি ডিটেকটিভ গল্প। কী যেন নাম—আওামুক না অ্যাণ্ডিমুর রায় এর পরিচালনা করছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় সন্তোষ সিংহ, মীরা ঘোষ ও সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষকে দেখা যাবে। সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষের ছায়াছবিতে নাবা এখন ঠিক হয়েছে কিনা বল্‌তে চাইনে, তবে ফিল্মে নাম করার চেয়ে, মনে হয়, সাঁতারে আরো নাম করা তাঁর উচিত ছিলো।

এর উত্তরে আপনারা যদি জনি ওয়াইস-মুলারের নাম উল্লেখ করেন, আমার একমাত্র জবাব হচ্ছে—হলিউড ও টলিউডে প্রভেদ অনেক।

রঙমহল ফিল্মস্

এঁরা কোন্ ষ্টুডিয়োয় ছবি তুল্‌বেন এতোদিন তা নিয়ে গোলমাল চল্‌ছিলো। প্রথমে রাধা, এখন ঠিক হয়েছে কালী। রঙ্গমঞ্চের অনুরূপা দেবীর ‘মন্ত্রশক্তি’-কে এঁরা ছায়াছবিতে রূপ দেবেন—এখবর আপনারা হয়তো জানেন। শুনতে পাওয়া গেল—ভূমিকা নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করা হবে—অম্বর—রথিন বন্দোপাধ্যায়, বাণী—শান্তি গুপ্তা, মৃগাঙ্ক—জহর গাঙ্গুলী!

* * *

ষ্টেজ-টেক্‌নিক্ আর ফিল্ম টেক্‌নিক্ এক কিনা—এ বিষয়টি ছায়াছবি—‘মন্ত্রশক্তি’র প্রযোজক মহাশয়কে আমাদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে যাচ্ছে!

—

উদয় শঙ্কর

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

নৃত্যের ললিত কলা উৎসারিল উৎস সম
শঙ্করের পাদপদ্ম হ'তে,
যুগ যুগ চলে যেত উচ্ছ্বসিয়া ভাসাইয়া
জনমনে আনন্দের স্রোতে।
কত যুগ এইমত ভারতের পুণ্য বক্ষে
নৃত্যছন্দ বিচিত্র বিকাশ,
আনিয়াছে আঁখি আগে অপরূপ সুন্দরের
লীলায়িত অপূর্ব্ব আভাস।
সুন্দরের সেই লীলা অকস্মাৎ অবলুপ্ত
জানিনাকো কার কোন শাপে
অসুন্দর প্রেতনৃত্য বিভীষিকা সঞ্চারিত
দিকে দিকে প্রবল প্রতাপে।
যেখানে আলোক ছিল সেথা এলো ঘনঘোরা
কালরাত্রি,—প্রলয় আঁধার,
বাণীর বীণার তন্ত্রী যেন ছিন্না সুরহীনা
নাহি উঠে সুস্বর ঝঙ্কার।
সুরসভা মাঝে যেন নাহি আর গীতগান
ম্লান মুখ গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
অপ্সরীর লাস্য স্থির চিরশুদ্ধ মূক মৌন
উচ্চশীর মঞ্জীর গুঞ্জর।
মানবের চিত্তব্যথা দেবতার দুঃখরাশি
পুঞ্জীকৃত ঘনীভূত হয়ে
নিবেদিল আপনায় ধ্যানমগ্ন মহেশেরে
সকরুণ ক্লান্ত কান্তি লয়ে।
ধূর্জ্জটীর ধ্যানভঙ্গ আঁখি যুগ উন্মীলিত
দেবনর কিন্নরের দুখে,
চাহিলেন নটরাজ আর্ত্ত দেবনর পানে
করুণায় শান্তি সৌম্যমুখে।
ধূর্জ্জটীর সেই দৃষ্টি সৃষ্টি করি সেইক্ষণে
নৃত্যশিল্পী সুরূপ সুন্দর,
পাঠাইল ধরণীতে নৃত্যকলা রূপ দিতে
দিয়ে নাম “উদয়-শঙ্কর”!

—

খেলার মাঠে

শ্রীদ্রোণাচার্য্য

ক্রিকেট

এ বছর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের হেরে যাবারই পুরোপুরি সম্ভাবনা। এ পর্য্যন্ত তিনটি টেষ্ট খেলা হয়ে গেছে। তাতে একটিতে ইংলণ্ড ও অপরটিতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ জয়ী হয়। তৃতীয়টির ফল হয় সমান সমান। সুতরাং চতুর্থ খেলার ফলাফলের উপরই সব নির্ভর করছে।

গত শুক্রবার কিংষ্টনে (জ্যামেইকা) অসংখ্য দর্শকের সম্মুখে খেলা আরম্ভ হয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ "টসে" জয়ী হয়ে প্রথমেই ব্যাট্ কর্ত্তে থাকে এবং সাত জন আউট হয়ে ৫৩৫ রাণ করার পর ইনিংস শেষ বলে ঘোষণা করে। এই ইনিংসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য খেলাই হচ্ছে হেডলির। হেডলি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের একজন নামকরা খেলোয়াড়। পূর্ব্বেও হেডলি ক্রিকেট খেলায় যথেষ্ট রেকর্ড করেছে কিন্তু এ টেষ্ট খেলায় আউট না হয়ে ২৭০ রাণ করায় ওর আগেকার রেকর্ডকেও এ রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল। কারণ এ পর্য্যন্ত টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের বিপক্ষে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কোন খেলোয়াড়ই এত অধিক রাণ তোলেনি।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ইনিংস শেষ বলে ঘোষণা করার পর ইংলণ্ড দলকে ব্যাট কর্ত্তে দেওয়া হয়। কিন্তু ওরা তখন শ্রান্ত ও ক্লান্ত। সারাদিনব্যাপী বলের পিছনে ছুটোছুটি করার পর ওদের একাগ্রতা তত ছিল না, তাই মাত্র ২৭ রাণ করার পরই পরপর ৪ জন আউট হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দিন খেলা যখন আরম্ভ হয় তখন সকলেই ভেবেছিল হয়ত ইংলণ্ড দল বিশ্রাম নেওয়ার পর আজকে খুবই ভাল খেলবে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস—মাত্র ২৭১ রাণ করার পরই ওদের সকলে আউট হয়ে যায়। আরও দুর্ভাগ্য ওয়াট্ খেলতে নেবেই ভীষণ ভাবে আহত হয়।

এত অল্প রাণ করায় পুনরায় ইংলণ্ডকে "ফলো অন" করিয়ে ব্যাট কর্ত্তে দেওয়া হয়। নিচে প্রথম ইনিংস দেওয়া গেল।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ (১ম)

বেরো	...	...	...	৩
ক্রিশ্চিয়ানি	...	...	...	২৭
হেড্‌লি	...	...	...	২৭০
সিলি	...	...	...	৯১
কনষ্টেণ্টাইন	...	...	...	৩৪
মুডি	...	...	...	৫

ফুলার	... ...	১
গ্রাণ্ট	... ...	৭৭
হিণ্টন	... ...	৫
	অতিরিক্ত ...	২২
		৫৩৫ (৭)

ইংলণ্ড (১ম)

ওয়াট	...	১ (আহত)
টাউনসেণ্ড	...	৮
হ্যামণ্ড	...	১১
পেইন	...	০
হোমস্	...	০
এমস্	...	১২৬
হেন্‌ড্রেন	...	৪০
স্মিথ	...	১০
ইডন	...	৫৪
ফার্ণস্	...	৫
হোলিস	...	১
	অতিরিক্ত	১৫
		২৭১

ইংলণ্ড (২য়)

টাউনসেণ্ড	...	১১
ইডন	...	০
	অতিরিক্ত	৪
		১৫

হকি

হকি খেলার মরশুম বেশ ভালই চল্‌ছে। এ বছর এখন পর্য্যন্ত মোহন বাগান যে ভাবে এগিয়ে চল্‌ছে শেষ পর্য্যন্ত যদি তা অব্যাহত থাকে তবে ওদের লীগ নেবার এবার খুবই সম্ভাবনা। গতবারের চ্যাম্পিয়ন রেঞ্জার্স খুবই ভাল খেল্‌ছে। মোহন বাগানের সঙ্গে ওদের শুধু এক পয়েণ্ট ব্যবধান। কাষ্টমস্ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বল্‌বার নেই। ওরা যদি নূতন খেলোয়াড় আমদানী কর্ত্তে না পারে তাহলে ওদের খেলার ধারার কোনই পরিবর্ত্তন আশা করা যায় না। পুরানো খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞতা থাকে বটে কিন্তু speed কোথায়? রবিবার পর্য্যন্ত কার কি অবস্থা তা নীচে দেওয়া গেল :—

	খেলা	পয়েণ্ট
রেঞ্জার্স	১০	১৯
মোহন বাগান	৯	১৬
কাষ্টমস	১০	১৩
জেভেরিয়ান্স	৯	১২
মিলিঃ মেডিকেল	১০	১১
পুলিশ	৮	৯
ভবানীপুর	৮	৯
ই, বি, আর	৯	৯
সেণ্ট জোসেফ	৮	৯
লিলুয়া	৯	৮
ড্যালহৌসী	১০	৮
ক্যালকাটা	৯	৪
গ্রীয়ার	৮	৩
মহমেডান	৮	২
রাজপুত	৭	০

দ্বিতীয় ডিভিসনে পোর্ট কমিশনার ও আর্ম্মেনিয়ান এগিয়ে চল্‌ছে। পোর্ট কমিশনারের ১১টি খেলে ১৭ ও আর্ম্মেনিয়ানের ৯টি খেলে ১৬ পয়েণ্ট হয়েছে।

ফুটবল

হকির মরশুম যাবার পরই ফুটবল মরশুম আরম্ভ হইবে। লীগ খেলা নিয়ে এখন থেকেই বেশ তোড়জোড় আরম্ভ হচ্ছে। প্রত্যেক ক্লাবই যাতে নিজ নিজ দলের শক্তি বাড়ে তার জন্য ভাল ভাল খেলোয়ার সংগ্রহে

ব্যস্ত। আমরাও আশা করি এ বছর খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড যেন গত বারের চেয়েও ভাল হয়।

ইতিমধ্যে আই, এফ, এর সভাও হয়ে গেছে। খেলামোদীগণ শুনে নিশ্চয়ই খুসী হবেন এ বছর এরিয়ান্স লীগ কোঠার সর্ব্ব নীচে থাক্‌লেও প্রথম ডিভিসনেই খেল্‌বে।

খুচ্‌রো খবর

গত ১৬ই মার্চ্চ শনিবার ইউনাইটেড বরেন্দ্র এথ্‌লেটিক ক্লাবের উদ্যোগে অষ্টম বাৎসরিক ৫ মাইল দৌড় প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। ৩০ জন প্রতিযোগী দৌড়ে যোগদান করেছিলেন। প্রথম হয়েছেন মেদিনীপুর স্পোর্টিং-এর ফণিভূষণ চন্দ্র। কিন্তু আসল খবর হচ্ছে—এ প্রতিযোগিতায় দশ বছরের বালক শিব ভট্টাচার্য্য ৯ম স্থান অধিকার করেছে।

* * *

শনিবার ইষ্ট বেঙ্গল লনে উক্ত ক্লাবের টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হয়।

মোটরে ভারত থেকে ইংলণ্ড যাবার রেকর্ড সময় বর্ত্তমানে ৩৫ দিন ২ ঘণ্টা, আমরা খবর পেয়েছি পুণার চিত্রশিল্পী মিঃ এ, এইচ খাসনি আলী এ রেকর্ড ভঙ্গ করবার সঙ্কল্প করেছেন।

বামার দালাল

কলিকাতার এক ইনিসিওরেন্স কোম্পানীর কর্ম্মচারী বীমার দালালী পরিহার করিয়া বামার দালালী আরম্ভ করিয়াছেন। এক কবি-যশঃপ্রার্থী সাহিত্যিকও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরী গ্রহণ করিয়া আদর্শচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহারা স্থান বিশেষে দালালী ব্যবসায় আরম্ভ করিলে অশেষ লাভবান হইবেন।

শীলা দেবী

শ্রীমতী শীলা দেবী শ্রীরঞ্জিত মুভিটোন্ এ আজকাল অভিনয় কোরছে। এ চিত্রখানিতে এ হচ্ছে একজন বিলেত ফেরত মেয়ে। নাম 'কলেজ গার্ল'। শীলা আমাদের পত্রিকাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে, সেজন্য ধন্যবাদ তোমার শীলা। তোমায়ও আমরা শুভকামনা জানাচ্ছি, ছায়াছবিতে তোমার নাম অক্ষয় হোক।

নিরালা

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাণের কোলেৎ,

সত্যি, মানুষের জীবনটা একটা বিচিত্র রকমের।...যখন ভাবি এ কথা, তখন আরও বেশী আশ্চর্য্য হ'য়ে পড়ি। মানুষ কেমন ক'রে বাস্তব জগতের ওপর ঠোক্কর খেতে খেতে চলে।...

আজ তোমাকে আমি নিজে সংসারের খুঁটি-নাটির ভেতর কেমন ক'রে চলেছি, তাই বলবো।...

এই এত বড়ো বাড়ী কিন্তু বাস ক'রবার মধ্যে আমি একা!...এখানেই আমি জগতের প্রথম আলো দেখেছিলাম আর এখানেই আস্তে আস্তে চিরশান্তির তলে ডুবে যেতে চাই!...বাড়ীটি, আমার আশ পাশের জিনিষ-গুলি খুব সুন্দর না হ'লেও এখানা আমার কাছে যে কতো প্রিয়, কতো সুন্দর, কতো মনোরম তা' নিজে আমি ভাষায় ব্যক্ত ক'রতে পারি না,—কেবলই মনে হয় এর ভেতর কতো কোমল স্মৃতি জড়ানো আছে যা' প্রত্যেকটি আমায় মুগ্ধ ক'রে দেয় আর তা'রই মোহের আবেশে আমি নিজেকে যেন খেই হারিয়ে ফেলি।...

ছেলে হেনরি থাকে রটার্‌ডামে, মস্ত বড়ো উকীল, নাম-ডাক খুব, সে বেশ কাজের মধ্যে ডুবে আছে!...মাঝে মাঝে আসে বটে তবে কোনবারে সাত দিনের বেশী থাকে না, কাজের ক্ষতি হবে কি না, তাই! জেনী থাকে তা'র স্বামীর কাছে, ফ্রান্সের সেই অপর সীমায়, এখান থেকে সেখানে রেলে ক'রে যেতে প্রায় চার দিনেরও বেশী লাগে।...শীতকালটা তার কাছে যাই তবে মাস দু'য়ের বেশী থাকতে পারি না, আবার চলে আসি। এমনিই আমার এখানকার ওপর টান!...তাই তোমায় ব'লচি, বছরের বেশীর ভাগই আমায় এই নির্জ্জন, নিরালা বাড়ীটাতেই একলা থাকতে হয়—ছোটখাটো স্মৃতিগুলোই আমার এখন নিরালার সাথী, দুঃখের ব্যথী, আনন্দের বন্ধু হ'য়ে উঠেচে, এদের নিয়েই আমার এখন জীবন কাটে।...

বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে সে রকম আর শক্তিও নেই আমার, কোন কিছু খাটুনির কাজ ক'রতেই যেন আমার হাঁফ ওঠে, বেশী পড়াশুনাও আর তেমন ক'রতে পারি না, এমন কি একটু বেশী চিন্তা ক'রলেই মাথা যেন গরম হ'য়ে ওঠে. ভাববার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে যায়।...

এখন কেবল আমার এক প্রধান সাথী হ'য়ে উঠেচে—স্মৃতি; যাকে আগলেই আমার জীবন কাটচে সুখ-দুঃখের ভেতর দিয়ে।... স্বপনপুরীর ভেতর দিয়েই আমার এখন দিনগুলো কাটচে।...সে স্বপন যে সে স্বপন নয়!...বাল্যের সেই আবেগভরা আর আজগুবি স্বপন সে নয়!...এখন বেশ বুঝতে পারচি, জীবনটা কি রকমের।...এখন বুঝি, ছেলেবেলাকার সেই সব টুকরো স্বপনগুলি আমাদের জীবনে সত্যিকার আকার নিয়ে আসতো না—তখনকার জীবনে এমনিধারা একটা জিনিষ আসতো, যা আমরা বুক পেতে নিতে পারতাম, যা আমরা বিজ্ঞের চশমা দিয়ে বুঝে নিতাম।...

আচ্ছা, তুমি ব'লতে পারো কি আমরা—এই স্ত্রীজাতি কেন এত অসুখী?...আমরা জীবনের মুকুল থেকেই ছুটে চলি সুখের পেছনে তা'কে ধরে রাখবার জন্যে...তাই নয় কি? আমাদের জীবনের ওপর জোয়ার আসে এমনিধারা অনাবিলভাবে, আর এমনি বাধা বাঁধন-হারা সোজা পথ দিয়ে যে আমরা এই বাস্তবজগতে থেকেও জীবন সংগ্রামে লড়াই ক'রতে শিখিনা, একটুও ক্লেশ কঠোরতা সইতে পারি না।...আমরা সব সময়ই আগ্রহ নিয়ে আমাদের বাহু দুটো উঁচু ক'রে রাখি সুখকে বরণ ক'রে নেবার জন্যে।.. সব সময়ই যেন উৎকণ্ঠিত হ'য়ে থাকি কখন কেমন ভাবে সুখের গলায় প্রীতিডোর পরিয়ে দেবো!... আর একটু ঘা খেলেই মুষড়ে পড়ি ঠিক 'ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছার মতো', নয় কি?...

আর দেখ কোলেৎ, সুখের পথ চেয়ে থাকাটা প্রকৃত সুখের চেয়ে বেশী তৃপ্তি, বেশী আনন্দ এনে দেয়। সত্যিকার সুখ হ'চ্ছে পুলকের একটা ঝিলিক্ একটা তড়িৎ যা' আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব ক'রতে পারি।...

আকাশের ঐ সীমাহীন বুকখানা যেখানে এই সবুজ মাঠের সাথে, গাছের সারির সঙ্গে আর নীল নীলিমার অতল জলের ভেতর মিলেচে সেই অসীমতার সুখ,—তা'র খোঁজে আমরা শুধু ঘুরে বেড়াই মরীচিকার মতো দিশেহারা হ'য়ে...আপনহারা হ'য়ে...

আজ আমি বুড়ো হ'য়ে প'ড়েচি তবুও সেই মরীচিকা, সেই ভ্রান্তি, সেই ভুলের কাছ থেকে মুক্তি নেই...নিস্তার নেই।...তুমি বুঝতে পারচো আমার কথা।...আমার মনের ইসারা...? আশ্চর্য্য বোধ হ'চ্ছে, না? মনে বুঝি কৌতূহল জাগবে তোমার?...আচ্ছা শোনো আমার স্বপন-পুরীর কথা,...একদিন যা' তোমার কাছে বাস্তবের প্রচণ্ডাঘাতে সত্যি সুন্দর হ'য়ে তোমার কাজে আসতে পারে।...

প্রথম হ'চ্ছে, আমি একটা নীচু চেয়ার-খানায় আগুনের পাশে চুপ ক'রে ব'সে থাকি।...আমার এই বুড়ো হাড়-কখানা নিয়ে সেখানে ব'সে আমি অতীতের পাতা এক-এক ক'রে উল্টে যাই, কবে কি হ'য়েছিলো, এই সব।...জীবনটা কতো ছোটো!...

সেই সুদূর অতীত, এ যেন সব টাটকা, সব নতুন, মনে হয় এখনও আমার তরুণ

যৌবন, এখনও আমার বয়েস বুঝি ষোল কি সতেরো।...চুপ ক'রে ব'সে ভাবি অতীতের কোলঘেঁসা কতো কী সব ছোটোখাটো ঘটনা চোখের সামনে বেশ ফুটে ওঠে...কবে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলাম তখন মনে হ'য়েছিলো কি—। মনে পড়ে বেশ, যখন আমি প্রথমে থিয়েটার দেখেছিলাম, তখন জীবনের সবটাই কেমন একটা প্রহেলিকার আড়ালে লুকিয়ে প'ড়েছিলাম—কবে সুখের ছবি গ'ড়তাম ভাঙতাম আবার গ'ড়তাম।...

তারপর শোনো কোলেৎ, আমি আবার এ বাড়ীর একটি কুটোও নষ্ট করিনি। ঐ সেলফের ওপর আমার ভাঁড়ার সেখানে শুধু আছে বাজে আর খুঁটিনাটি, যা'র মূল্য তোমার কাছে কেবল পাগলামী আর ভীমরতির চিহ্ন। কিন্তু ব'লতে পারি না, কতোবার আমার সেইগুলো দেখবার জন্যে অস্থির হ'য়ে ওপরে যাওয়া আসা করি, তা'দের চোখ ভ'রে দেখি,—সে দেখার শেষ খুঁজে পাই না যেন!...

আবার প্রায়ই মনে হয়, বুঝি কিছু দেখার বাকী রইলো, আবার দেখতে ছুটি।...

আমি জানি, তুমিও ব'লবে, এমনিধারা জঞ্জালের রাশের ভেতর শুধু সময় নষ্ট করা।...

কিন্তু ছোট্ট একটি পুতুল দেখলেই সামনে এসে দাঁড়াবে তোমার পবিত্র একখানি মায়ের ছবি; আর তোমারও মনে প'ড়বে, তুমিও একদিন এমনিধারা একটি ছোট্ট মা ছিলে, আর তোমার প্রাণও সময় সময় এমনিধারা একটি ছোট্ট ছেলে পাবার জন্যে ব্যাকুল মাতৃস্নেহে ভ'রে উঠতো,—এই জন্যে তা'দের একটিকেও আমি নষ্ট করি নি, যত্নের সঙ্গে তুলে রেখে দিয়েছি—তা'রা অমর, যুগের পর যুগ ধ'রে তা'রা অমর। সংসারে পুরাতন চ'লে যায়, নতুন আসে কিন্তু চির নতুন অথচ চির পুরাতন!...তা'দের ভেতর এমনিধারা একটি সজীবতা আছে, এমনিধারা একটা প্রগাঢ় প্রভুভক্তি তা'দের জড়তার ভেতর জড়িয়ে আছে,—যা'তে মনে হয় এরাই আমার চির আচরিত, চির সাথী।...

তোমার কাছে এসব পাগলামী ব'লে মনে হ'চ্ছে নিশ্চয়—তোমার ভেতর অন্তর নেই,—তলিয়ে দেখবার একটা শক্তি নেই—

আমি এখন একা। কাজেই তোমায় ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই যাকে এ কথা ব'লতে পারি।...

আচ্ছা কোলেৎ, তোমার জীবনের ছবি আমার সামনে তুলে ধ'রবে!...

কিন্তু একটা কথা তুমি বোধহয় কখনও বুঝবে না, সারাজীবন একলা থাকার মানে কি।...

তোমার

আদিলেদি

* গি দি মোঁপাসাঁর ফরাসী থেকে—

খোলা-চিঠি

শ্রীমতী রাণীবালাকে

রাণীবালা,

এই সময়ে তোমাকে একটি চিঠি লেখা প্রয়োজন মনে করলুম। কারণ, আমাদের যেন কেন মনে হচ্ছে, যে কিছুদিন অভিনয় ক'রে তোমার মনে অনাহূত একটা আত্মাভিমান আশ্রয় পেয়েছে। আজ পর্য্যন্ত মোট চারখানা ছবিতে তুমি নেবেছো, প্রথম নম্বর হচ্ছে শিশিরবাবুর "সীতা"র উর্ম্মিলা। ঐ ভূমিকায় নেবে তুমি প্রশংসা ছাড়া আর কী যে পেয়েছো তা তুমিই জানো। তারপর কালী ফিল্মস্-এর "বিল্বমঙ্গল"। এতে, অস্বীকার করবো না, তুমি রত্নাবলীর অংশ গ্রহণ করে' বাংলার প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করো। এ ভূমিকাটি তোমার মনে রাখবার মত, তোমার ছায়াজীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে তখন, একমাত্র তখন। "তরুণী" এলো তারপর। এতে তোমার প্রতিমা—অভিনয়ে খুব বেশী অবনতির ছোঁয়া আমাদের চোখে পড়েনি। উৎসাহ দেবার জন্যে আমাদের 'বিলাসী' যা তোমাকে প্রশংসা করলেন, সে প্রশংসায় তোমার ফল হ'লো কিন্তু খারাপ। নিরালায় তুমি তাতে একদিন হয়তো ভাবলে—আর কী, ছায়াছবির দুরূহ অভিনয় আমি তো আয়ত্তই করে' ফেলেছি। রাণী আমার নাম, অভিনয়েও আমি হ'তে চলেছি রাণী। চোখের সামনে সোনালী-রঙীন-কত স্বপ্ন তুমি দেখলে।

এই অহমিকায় তোমার হ'লো অবনতি।

তোমার "তুলসীদাস" এলো। এতেই সারা বাংলা তোমায় লক্ষ্য করলে—সেই রাণী আর নেই। অভিনয় তোমার যে খুব খারাপ—একেবারে যা তা হয়েছিলো—তা বল্‌তে চাইনে, তবে যে রাণীবালা 'রত্নাবলী' যে রাণীবালা "তরুণী"র প্রতিমা—সেই রাণীবালার কাছ থেকে আমরা আরো উন্নত অভিনয় আশা করেছিলুম। পরিস্কার দেখতে পেলুম—তুমি নীচের দিকে ফের নাবছো। যে নামের সিঁড়ি বেয়ে তুমি উঠছিলে, সে ওঠা তুমি ছেড়ে দিয়েছো। হঠাৎ, শাড়ীর সঙ্গে তুমি মুখ ঘুরিয়েছো নীচে।

গর্ব্ব মানুষের নামকে করে খর্ব্ব। তোমার মনে যদি এতটুকুও গর্ব্বের ছোঁয়া এসে থাকে, মনে হয় এসেছে, সে গর্ব্ব থেকে তুমি মুক্তি পাও—এই আমরা চাই। ছায়াছবির প্রত্যেকটি অংশ, প্রত্যেকটি দিন—তুমি তোমার চোখ দিয়ে চির নতুন করে' দেখো। ছায়াছবিতে তোমার আশা আছে অনেক, অহমিকার আশ্রয় নিয়ে, রাণী, দেখো সে আশার যেন ছাই না পড়ে।

অভিনয়ের প্রতিটি অংশে তুমি আরেকটু যদি বেশী করে' খাটো, আরেকটু প্রাণ যদি তুমি দিতে পারো, তা হ'লে আমরা জানি, রাণী, তুমি নাম করবে। ইতি—

আনিয়াৎ খাঁ

=উপন্যাস=

উচ্ছৃঙ্খল

শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নবম পরিচ্ছেদ।

অরুণ তার নববিবাহিতা পত্নীকে নিয়ে লজ্জা ও সঙ্কোচ মিশ্রিত ভাবে বাড়ী ঢুকলো। অনেকদিন পরে তা'র বাবাকে দেখতে এসেছে।

সকাল বেলা। তেমনি সুন্দর, রমণীয়! সারা দেশে কর্ম্মের কোলাহল। আনন্দের সাড়া!—দুঃখের স্রোত—আরো কত কী!

নিখিল তার ছোট একখানি ঘরে বিছানায় পড়ে রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছেন। তাঁর কেউ নেই যে তাঁকে তার মৃত্যুসময়ে দু'টো সান্ত্বনাবাণী শোনাবে।

লীলা আর অরুণ যখন বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করলো তখন বৃদ্ধের করুণ শেষ-মুহূর্ত্ত। শুধু একটিবার তাঁর পুত্রকে দেখবার আশায় তাঁর প্রাণ বার হ'তে পারছিল না। জগতে যার একটী মাত্র পুত্র ছাড়া আর কেউ নেই, সে তার পুত্রকে ভাল না বেসে পারে না। হোক সে চরিত্রহীন—হোক্‌ সে মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল—তবু পুত্রকে পিতা ভালবাস্‌বেই।

অরুণের পিতা নিখিল শুধু তারই কথা ভাবছিলেন। পিতার এই অবস্থা দেখে অরুণের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু বা'র হ'য়ে আস্‌ছিল। হায়, সে কি অন্যায়ই না করেছে!

তার এমন পিতাকে ভুলে গিয়ে শুধু উচ্ছৃঙ্খলতার পথে অগ্রসর হয়েছে। ক্ষণিক উত্তেজনায় বশীভূত হ'য়ে পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

তার মা নেই। মাতৃস্নেহ জানে না। মায়ের কথা স্মরণে বাজে না। জন্ম থেকে শুধু তারই স্নেহময় পিতাকে দেখে আস্‌ছে। তার অপরিমিত স্নেহ পেয়ে এসেছে। মায়ের অভাব অনুভব করেনি।

তার মাতার উদ্দেশ্যে তার একফোঁটা তপ্ত জল ঝরে পড়লো। সে তার নিজের সত্তা ভুলে গেল। কোমলতা তার মন অধিকার করলো। সে যে কোনদিন কঠোর প্রকৃতির হতে পারে—তা' তার মনেও আসলো না।

সে ঘরে প্রবেশ করল লীলাকে নিয়ে।

লীলা ধীরে ধীরে তাঁর পায়ের কাছে বসে তাঁর পদধূলি তুলে নিল। তিনি চোখ খুলে চাইলেন।

মানুষের আপনার জনকে চিনতে খুব বেশী দেরী হয় না। একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখলেই চিনতে পারা যায়। তিনি লীলাকে দেখেই চিনতে পারলেন। বললেন: এসো মা, বসো। যদি এলে তো' এত দেরীতে এলে কেন? আমার তো দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমি চোখ ভরে তোমাদের দেখতে পারলুম না।

সে বল্‌লে: আমাদের ছেড়ে আপনার কী যেতে আছে? নিখিল কিছু বল্‌লেন না। শুধু একটী দীর্ঘশ্বাস তাঁর হৃদয়ের গভীর দুঃখ জানিয়ে দিয়ে গেল।

উভয়ে নীরব।

অরুণ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। পিতার কাছে যেতে তার ভয় হচ্ছিল। যদি অত্যধিক আনন্দে তার পিতার মৃত্যু ঘটে!

নিখিল কাতর কণ্ঠে বল্‌লেন: অরুণ, অরুণ আমার আসে নি?

—হ্যাঁ বাবা, এসেছেন। তিনি ভয়ে আপনার কাছে আসছেন না।. লীলা অরুণের দিকে ফিরে চাইল।

—ভয়? ভয় কিছুই নেই। আমি তো তাকে দেখবার আশায় বেঁচে আছি। কৈ বাবা আমার?

অরুণ তার বাবাকে নমস্কার করলো। তিনি তার হাত দু'খানি তাঁর বুকের ওপর রেখে বললেন, দেখ্‌তো বাবা,—তোর অদর্শনে আমার বুকে কী দারুণ অগ্নি জ্বলছে। তোরই হাতের কোমল স্পর্শে আমার বুক জুড়িয়ে গেল।

আমি যখন জান্‌তে পারলুম আমার ছেলে পত্রিকা সম্পাদন ক'রে সুনাম অর্জ্জন করেছে—আর তারই সাথে কবি লীলার বিবাহ হয়েছে। তখন গর্ব্বে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠেছিল। আমার ইচ্ছা হয়েছিল আমি তোমার কাছে ছুটে যাই।...কিন্তু পারিনি,—কেন?—আমি তোমার ওপর কত বড় অন্যায় করেছি। তুমি আমার পুত্র, আমি তোমায় ত্যাগ করেছি। সে ত্যাগ শুধু মুখের কথা নয়; কাগজে-কলমে আমি তোমায় অপমান করেছি।

অরুণ লজ্জিত হয়ে বল্‌লে: আপনি কেন অনর্থক কষ্ট পেলেন বাবা? আমি অন্যায় করেছিলাম। আপনি পিতা, তারই শাস্তি দিয়েছেন। তার জন্য আপনার সঙ্কোচের কী কারণ আছে? পিতা পুত্রকে শাসন করবে না তো কি?

—না, না, তুমি ছেলে মানুষ, ওসব তুমি বুঝবে না। যার ঘা তারই জ্বালা। তুমি আবার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে মারছো কেন? সন্তানকে শাস্তি দেবার অধিকার পিতার আছে। একথা তুমি কেন সকল সন্তানই স্বীকার করবে। কিন্তু তারও তো

একটা সীমা আছে। আমি তোমায় সীমাহীন দুঃখ দিয়েছি। তাই আমার নিজের জীবনে তার শতগুণ দুঃখ পেয়েছি। তোমায় নিঃসহায় করে আমি তোমায় ত্যাগ করেছিলুম। কিন্তু আজ তুমি নিজে উপার্জ্জন ক'রে আমার কাছে ফিরে এসেছ।

অরুণ ভাবলো—মানুষের জীবনের সায়াহ্নে বুঝি সুখ দুঃখের সমস্ত ঘটনা মানুষের অন্তরকে ব্যথিত করে তোলে! তাই আজ নিখিলনাথ এত কথা বলছেন। যাঁর কথা বলার স্বভাব মোটেই নেই, তিনি আজ অনর্থক কথা বলে সময় নষ্ট করছেন, ক্ষোভে দুঃখে যাতনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। সে একমনে পিতার মুখখানির দিকে চেয়ে রইল। তিনি কোনদিন যেন সুখ পান নি। দুঃখের ছবি, বিষাদের কালিমা তাঁর মুখে স্পষ্ট প্রতীয়মান।

নিখিল লীলাকে ডেকে বল্লেন: মা, তোমার এই অযোগ্য পুত্র তোমাকে কিছু দিতে পারবে না। তুমি আমার মা। আমি আমার মা'র জন্য একখানি সিঁথী তৈরী করিয়েছি। আমার অন্তরাত্মা আমায় যেন ডেকে বল্ছেন—তোমার মা আসবেন। তুমি নিজে তাকে ওটা পরিয়ে দিয়ো,—আমি দেখছি আমার মা আর কেউ নয়, তুমি। তোমায় আমি সিঁথিখানি পরিয়ে দোব। কাছে এসো মা। তিনি তাঁর বিছানার নীচে থেকে সিঁথি বা'র করে নিলেন। তিনি জীবনে যা' রোজগার করেছেন, সব অর্থ দিয়ে ঐ সিঁথিখানি তৈরী করিয়েছেন। মণি-মাণিক্য হীরকখচিত সিঁথি তার ঔজ্জ্বল্যে জ্বল্ জ্বল্ করছিলো।

লীলার বাবার কলকাতায় বেশ প্রতিপত্তি আছে। নগদ লক্ষাধিক টাকার মালিক। সে কোনদিন এত সুন্দর সিঁথি দেখেনি। সে আশ্চর্য্য হয়ে সেটার দিকে চেয়ে রইলো। নিখিল সিঁথিখানি তার কপালে পরিয়ে দিলেন। এক অভিনব দীপ্তিতে তার দু'চোখ ভরে গেল।

দুঃখই যার জীবনের সঙ্গী সে সুখ পায় জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে। কারণ দুঃখী সুখ সহ্য করতে পারে না। আনন্দের আতিশয্য রাত-দিন তাকে পীড়ন করে বেশী। ব্যর্থতাই যার অবলম্বন, শূন্যতাই যার জীবনের সাথী—আনন্দ যেন তাকে ছেড়ে যেতে চায়।

অরুণ ও লীলার সেবায় ও শুশ্রূষায় নিখিল একটু সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি যে অসুস্থ ছিলেন,—এ' কয়দিনে তাঁর সেই ভাব চলে গেছে।

দুপুর বেলা। নবীন বসন্তের মধ্যাহ্ন। রমণীয় মধুর উপভোগ্য নয়,—বেশ গরম পড়েছে। প্রকৃতি উত্তপ্ত, সাম্নে পুষ্করিণীতে শ্রান্ত কাকগুলি অবগাহন করছে। কুকুর পুকুরে সাঁতরাচ্ছে। বকুল গাছের ছায়া-শীতল শাখায় বসে দু'একটী পাখী ডাক্‌ছে। বসন্তের কোকিল মধ্যাহ্নের নীরবতা ভঙ্গ করে বল্‌ছে কু—উ—

মাঝে মাঝে তপ্ত বাতাস বইছে, আকাশ মেঘমুক্ত। আকাশে যেন আগুণের শিখা!

নিখিল খাওয়া দাওয়ার পর, বিশ্রাম করছে।

লীলা ও অরুণ একখানি ছোট কক্ষে বসে আলাপ করছে।

নিখিলের কিছুই ভাল লাগছে না। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে বুঝি মানুষ এমনি করে' সংসার থেকে বিদায় নেয়। প্রাণ যেন তাই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ভগবানের সহিত মিলনের আশায় বুঝি—তাই মানুষ সেই শেষ দিনটীর অপেক্ষা করে।

নিখিল অরুণকে ডাকলেন। অরুণ এলো।

নিখিল বল্লেন: অরুণ, আজ চতুর্দ্দশী, এই চতুর্দ্দশীতে আমার বাবার কালপ্রাপ্ত হয়েছিল। তোমার মাও এই দিনেই তোমাকে আমার কাছে ফেলে চলে গিয়েছিলেন। আজকের দিনটী স্মরণীয়। আমি শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে এই দিনটি স্মরণ করছি।—আমিও বুঝি আজ আর থাকতে পারবো না।

অরুণ বললে: বাবা আপনি বুড়ো হয়েছেন, তাই বুঝি আপনার মন দুর্ব্বল হয়ে গেছে। সংসারে তো আপনার কোন দুঃখ নেই—তবু কেন আপনি মৃত্যু কল্পনা করছেন। লীলাকে এনে দিয়েছি, সে আপনার সেবা করবে। আমি ফিরে এসেছি, আপনার চিন্তা কি?

নিখিল হেসে বল্লেন: তা তো ঠিকই। কিন্তু আমার কাল ফুরিয়ে এসেছে, আমি কী করে থাকবো? অরুণ, আজ তুমি আমার কাছে একটী প্রতিজ্ঞা করবে?

—কী বাবা? তার কণ্ঠস্বর নম্র, বিনীত, ব্যথায় ব্যাকুল।

—তুমি আজ আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে পার যে তুমি লীলাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না। তা'কে নিয়ে দাম্পত্যধর্ম্ম নির্ব্বাহ করবে?

প্রশ্ন শুনে অরুণ স্তম্ভিত হয়ে গেল। তবে কি তার বাবা জেনেছেন, বিবাহের পরও তার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নি!

সে বল্লে: বাবা, আপনি আমার পূজনীয়। একবার আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—সৎপথে জীবন যাপন করবো। কিন্তু কর্ত্তব্যচ্যুত হয়েছি। সেই ক্ষোভে দুঃখে আপনি আমাকে ত্যাগ করেছিলেন। আমি আপনার কাছে আস্‌তে পারিনি—জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছিলাম। ভাগ্যিস্ একটা প্রতিভা ছিল। সেই প্রতিভা আর আপনার পুণ্যবলে আমি একটু সুনামও অর্জ্জন করেছি। আজ আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি—জীবনে আর কোনদিন অন্যায় কাজ করবো না।

নিখিল তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

গভীর অমানিশীথিনী। চারদিকে আঁধার পৃথিবীকে ঘিরে আছে। দিগন্তব্যাপী আঁধার ধরণীর শোভা আবৃত করে রেখেছে। সকলেই নিদ্রার কোলে মগ্ন, জগৎ সুপ্ত, গাছগুলি বিরাট রাক্ষসের মতো মাথা উঁচু ক'রে

ব্রীজখেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা
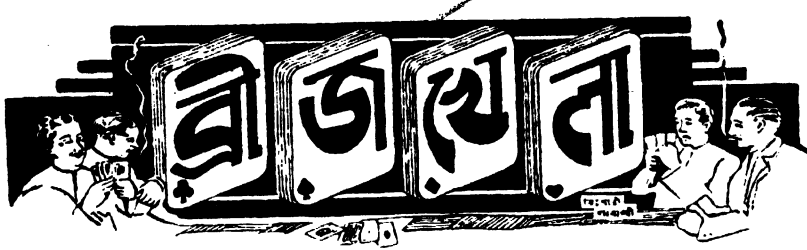
প্রতিরোধকারী ডাক (Defensive overcalls) :—প্রতিপক্ষ প্রারম্ভিক ডাক দিলে অন্য পক্ষ যদি কোন ডাক দেন তাহাকে প্রতিরোধকারী ডাক বলা হয়। প্রারম্ভিক ডাকে (opening bid) প্রতিপক্ষের শক্তির পরিচয় আগেই ব্যক্ত হয়েছে, সুতরাং মাইনর সুটে (চিড়িতন বা রুহিতন রঙে) বা No Trump-এ অন্য পক্ষের গেমের সম্ভাবনা নাই বল্‌লেও চলে অথচ খেঁসারৎ দেওয়ার আশঙ্কাও সুপ্রচুর ; অপর পক্ষে আবার প্রতিরোধকারী যদি মোটেই ডাক না দেন তবে অন্য পক্ষ খুব সাধারণ হাত নিয়ে আংশিক গেম্ করতে পারেন, সেটাও বাঞ্ছনীয় নয়। তাই এ ডাক দিতে হলে বিশেষ ধীরতা ও নিপুণতার সঙ্গে কর্ত্তব্য অবধারণ করতে হবে।

প্রতিরোধকারীর হাত সাধারণতঃ এই কয়প্রকারের হতে পারে। (১) খারাপ হাত (২) সাধারণ হাত (৩) ভাল বিভাগ সমেত সাধারণ হাত (৪) শক্তিব্যঞ্জক হাত (৫) খুব ভাল বিভাগ সমেত শক্তিব্যঞ্জক হাত।

(১) খারাপ হাত ঃ—দেড়খানির কম অনারের পিট হাতে থাক্‌লে এবং হাতের বিভাগ খুব সাধারণ হলে (অর্থাৎ ৪, ৪, ৩, ২ অথবা ৪, ৩, ৩, ৩ কিম্বা ৫, ৩, ৩, ২) পাস দেওয়াই বিধেয়।

(২) সাধারণ হাত :—দেড়খানি বা তার বেশী অনারের পিট হাতে থাক্‌লে এবং একটি ডাকের যোগ্য রঙ থাক্‌লে এ ক্ষেত্রে ডাক দেওয়া চলে। এ ডাক প্রধানতঃ দুই প্রকারের একের ডাক ও দুইয়ের ডাক। মনে করুন প্রতিপক্ষ 'ক' ডেকেছেন 'একখানি হরতন'। 'আ' প্রতিরোধকল্পে ইস্কাবন ডাকতে চান সে ক্ষেত্রে তাঁর ডাক হবে একের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে 'ক' যদি ইস্কাবন ডেকে থাকেন আর প্রতিপক্ষ 'আ' যদি 'হরতন' ডাকতে চান তবে তাঁকে 'দুইখানি হরতন' ডাক দিতে হবে, এবং সে ক্ষেত্রে তাঁর হাতের শক্তি আরও বেশী হওয়ার প্রয়োজন।

একের ডাক :—প্রতিরোধক একের ডাক দিতে হলে নিম্নলিখিত হাত থাকা প্রয়োজন।

(ক) নন্-ভাল্‌নারেবল অবস্থায় নিজের হাতে চারখানি খেলার পিট এবং ন্যূনকল্পে দেড়খানি অনারের পিট আর একটি ডাকের যোগ্য রঙ থাকা চাই। চারখানি রঙ থাক্‌লে এক্ষেত্রে ডাক দেওয়া যেতে পারে।

(খ) ভাল্‌নারেবল অবস্থায় ন্যূনকল্পে দেড়খানি অনারের পিট, পাঁচখানি খেলার পিট এবং পাঁচখানি তাস সমেত একটি ডাকের যোগ্য রঙ থাকা চাই।

দুই-এর ডাক :—প্রতিরোধক দুই-এর ডাক দিতে হলে নিম্নলিখিত হাত থাকা প্রয়োজন।

(ক) নন্-ভাল্‌নারেবল অবস্থায় দেড়খানি অনারের পিট, পাঁচখানি খেলার পিট এবং পাঁচখানি তাস সমেত একটি ডাকের যোগ্য রঙ থাকা চাই।

(খ) ভাল্‌নারেবল অবস্থায় প্রায় দুইখানি অনারের পিট, ছয়খানি খেলার পিট এবং পাঁচখানি বা তার বেশী তাস সমেত ডাকের যোগ্য রঙ থাকা চাই। এক্ষেত্রে ডাক দিতে হলে রঙের চারখানি সুনিশ্চিত পিট হাতে থাকা চাই।

(৩) ভাল বিভাগ সমেত সাধারণ হাত ঃ—আগেই বলেছি প্রারম্ভিক তিন, চার বা পাঁচের শুদ্ধকারী ডাক বলা হয়। শুদ্ধকারী ডাকে ডাকদারের হাত থাকে সাধারণ, কিন্তু হাতের বিভাগ হয় অসাধারণ। প্রারম্ভিক ডাকদারের মতন প্রতিরোধকারীও ভাল বিভাগ সমেত সাধারণ হাত পেলে এ ডাক দিতে পারেন। মনে করুন 'ক' ডেকেছেন 'একখানি হরতন'। এখন প্রতিদ্বন্দী 'আ' উক্ত প্রকার হাত নিয়ে ইস্কাবন ডাক্‌তে চান্।

(ক) যদি তাঁর হাতে ছয়খানি সুনিশ্চিত খেলার পিট থাকে তা' হলে নন্-ভাল্‌নারেবল অবস্থায় তিনি তিনখানি ইস্কাবন ডাক দিতে পারেন। এক্ষেত্রে অনারের পিট দেড়খানি হতে তিনখানি থাকা প্রয়োজন।

(খ) যদি তাঁর হাতে সাতখানি সুনিশ্চিত খেলার পিট থাকে তা' হলে

দাঁড়িয়ে আছে। দু'একটা গৃহপালিত কুকুরের ডাক রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিলো।

নিখিল ডাক্‌লেন : অরুণ! মা, লীলা তোমরা এসো। আজকে বুঝি আর আমায় রাখতে পারবে না।

তারা ঘুম থেকে জেগে উঠে গেল।

নিখিলের বাক্‌শক্তি রহিত হয়েছে। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌ছেন—জল! একটু জল।

লীলা তাড়াতাড়ি জল দিতে গেল। তিনি জল পান করতে পার্‌লেন না। জল পান করবার আগেই তাঁর জীবন-বায়ু বা'র হয়ে গেছে।

অরুণ ও লীলার সমুত্থিত ক্রন্দনে পাড়ার লোক একত্র হ'লো।

(ক্রমশঃ)

ভাল্‌নারেবল অবস্থায় তিনি তিনখানি ইস্কাবন ডাক দিতে পারেন। এক্ষেত্রেও অনারের পিট দেড়খানি হতে তিনখানি থাকা প্রয়োজন।

চারের ডাক দিতে হলে উভয়বিধ অবস্থায় যথাক্রমে সাতখানি ও আটখানি সুনিশ্চিত পিট থাকা প্রয়োজন।

প্রতিরোধকারীর তিন প্রকার হাতের বৈশিষ্ট্য এবং সে ক্ষেত্রে ডাকের কথা সংক্ষেপে জানালাম। আগামীবারে শক্তিব্যঞ্জক ডাকের কথা বল্‌ব। এবার কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে উল্লিখিত তিনপ্রকার হাতের পরিচয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ ডাক হওয়া উচিত তা' নিয়ে লিপিবদ্ধ কর্‌ছি।

মনে করুন প্রতিপক্ষ 'ক' ডেকেছেন 'একখানি হরতন' এবং 'আ' নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার হাত পেয়েছেন। তিনি এরূপ ক্ষেত্রে কি ডাক দিবেন?

(১) ইস্কাবন—বিবি, নয়, আটা, তিরি, দুরি; হরতন—নাই; রুহিতন—বিবি, দশ, সাতা, চৌকা, তিরি, দুরি; চিড়িতন—দশ, তিরি।

(২) ইস্কাবন—দশ, আটা; হরতন—সাতা, চৌকা, তিরি; রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, সাতা, তিরি; চিড়িতন—সাহেব, নয়, সাতা, ছক্কা।

(৩) ইস্কাবন—বিবি, গোলাম, দশ, আটা, তিরি; হরতন—দুরি; রুহিতন—টেক্কা, দশ, নয়, তিরি; চিড়িতন—সাতা, ছক্কা, পাঞ্জা।

(৪) ইস্কাবন—সাহেব, দশ, সাতা, দুরি; হরতন—নাই; রুহিতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, সাতা, দুরি; চিড়িতন—দশ, নয়, সাতা, দুরি।

(৫) ইস্কাবন—টেক্কা, চৌকা, তিরি, দুরি; হরতন—সাতা; রুহিতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, নয়, সাতা, ছক্কা; চিড়িতন—তিরি, দুরি।

(৬) ইস্কাবন—দশ, তিরি; হরতন—নাই; রুহিতন—বিবি, গোলাম, দশ, আটা, ছক্কা, পাঞ্জা, চৌকা, তিরি, দুরি; চিড়িতন—টেক্কা, আটা।

(৭) ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, দশ, নয়, আটা, সাতা, চৌকা, দুরি; হরতন—নাই; রুহিতন—সাহেব, বিবি, নয়, আটা; চিড়িতন—ছক্কা।

(১) হাতে দেড়খানি অনারের পিট না থাকায় ভাল্‌নারেবল বা নন্-ভাল্‌নারেবল কোন অবস্থাতেই ডাক দেওয়া চল্‌বে না। তবে যদি খেঁড়ী ডাক দেন তা' হলে ডাকের অবস্থা বিবেচনা করে এবং হাতের মূল্য নিরূপণ করে পরে ডাক দেওয়া যেতে পারে।

(২) অনারের পিট আড়াইখানি আছে বটে কিন্তু যেহেতু ডাক দুই-এর পর্য্যায়ে উঠে গেছে, (কেননা একটি হরতনের পর দুইটি রুহিতন ডাক্‌তে হবে) সে ক্ষেত্রে হাতে পাঁচখানি তাস সমেত রঙ না থাকায় ডাক দেওয়া চল্‌বে না।

(৩) হাতে চারখানির বেশী খেলার পিট আছে, দেড়টি অনারের পিট আছে এবং ডাকের যোগ্য রঙ আছে; সুতরাং নন্-ভাল্‌নারেবল অবস্থায় 'একটি ইস্কাবন' ডাক্‌তে হবে, তবে ভাল্‌নারেবল অবস্থায় ডাকা চল্‌বে না।

(৪) হাতে পাঁচখানি খেলার পিট, দুইটী অনারের পিট এবং পাঁচখানি তাস সমেত ডাকের যোগ্য রঙ আছে, সুতরাং নন্-ভাল্‌নারেবল অবস্থায় 'দুইটী রুহিতন' ডাকা চল্‌বে তবে ভাল্‌নারেবল অবস্থায় ডাক দেওয়া চল্‌বে না।

(৫) হাতে ছয়খানি খেলার পিট, আড়াইখানি অনারের পিট এবং ডাকের যোগ্য রঙ আছে এবং সেই রঙে পাঁচখানি পিট পাবার সম্ভাবনা সুতরাং ভাল্‌নারেবল

[অ]বস্থায় 'দুইটী রুহিতন' নিঃসঙ্কোচে ডাকা [যে]তে পারে।

(৬) এ ক্ষেত্রে শুদ্ধকারী ডাক দেওয়াই [বি]ধাজনক। হাতে খেলার পিট আছে [কি]ন্তু কিন্তু অনারের পিটের অভাব। নন্-[ভা]ল্‌নারেবল অবস্থায় 'পাঁচখানি রুহিতন' [এ]ং ভাল্‌নারেবল অবস্থায় 'চারখানি রুহিতন' [ডা]ক দেওয়া উচিত।

(৭) ভাল্‌নারেবল অবস্থায় 'চারখানি [ই]স্কাবন' ডাক দেওয়া উচিত। প্রতিরোধকল্পে [এ]ইটাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ডাক।

খেঁড়ীর জবাব ঃ—প্রতিরোধকারীর [ড]াকের প্রসঙ্গে আমরা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করেছি [যে] নন্-ভাল্‌নারেবল অবস্থায় তিনি খেঁড়ীর [নি]কট হতে তিনখানি পিট এবং ভাল্‌নারেবল অবস্থায় তাঁর নিকট হতে দুইখানি পিট পাবার আশা রেখে ডাক দেবেন। (অর্থাৎ ভালনারেবল অবস্থায় তাঁর নিজের হাতে পাঁচটি খেলার পিট থাক্‌লে এবং নন্-ভাল্‌না-রেবল অবস্থায় চারটি খেলার পিট থাক্‌লে তিনি একের ডাক দিতে পারেন।) সুতরাং জবাব দিবার সময়ে খেঁড়ীকে এই তথ্যটি সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যে এই উভয়বিধ অবস্থায় তাঁর হাতে যথাক্রমে দুইটী বা তিনটীর বেশী যে কয়টি খেলার পিট থাক্‌বে তিনি ততগুলি ডাক বাড়াতে সমর্থ। অর্থাৎ খেঁড়ীর হাতে তিনটী খেলার পিট থাক্‌লে তিনি ভাল্‌নারেবল অবস্থায় একটি ডাক বাড়াতে পারেন কিন্তু নন্-ভাল্‌নারেবল অবস্থায় পাস দিতে বাধ্য; কেননা তাঁর খেঁড়ী আগেই অনুমানের উপর নির্ভর করে সে ডাক বাড়িয়ে রেখেছেন।

এড্‌মিরেশন্ সোসাইটীর ঢাক্ ঃ—প্রথম যখন Mutual Admiration Society স্থাপিত হোল, আমরা ভাবলাম্ কতই না একটা বিরাট ব্যাপার হবে। কোল্‌কাতার প্রত্যেক অলি-গলি থেকে দলে দলে লোক এর সভ্য হতে লাগ্‌ল, চারিদিকে এঁদের ঢাকের আওয়াজে কান পাতা দায়; আমাদের শ্রীদুর্ব্বাসার কাছে এ সম্বন্ধে কতই না চিঠি-পত্র আস্‌তে লাগ্‌ল,—কেউ সোসাইটীর ঠিকানা চেয়ে পাঠাল, কেউ নিয়ম-কানুন চেয়ে পাঠাল, আবার কেউ বা সভ্যদের নাম চেয়ে পাঠাল। কিন্তু হরি, হরি,—'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া,' কতদিনই বা পরস্পর পরস্পরের দামামা বাজাতে ভাল লাগে! তাই ক্রমে মেম্বারসিপ্ এ ভাঁটা পড়্‌ল, আবার Admiration Society-র ঘর ফাঁকা হতে লাগ্‌ল। এখন অবশ্য এদের বাইরের সভ্য একজনও নেই, কিন্তু যাঁরা গোড়ায় আরম্ভ করেছেন তাঁরা এখনও মায়া কাটাতে পারেন নি এমন কি তাঁদের একটু অরুচিও ধরে নি; তাই সভ্য বল্‌তে আছেন, যাঁরা এর প্রতিষ্ঠাতা। এই সোসাইটীকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্যে এখনও তাঁদের কতই না প্রয়াস, কতই না প্রচেষ্টা এবং এখনও দেখছি রাস্তায় রাস্তায় ঢাক বাজাতে এঁরা লজ্জাবোধ করেন না।

সাহিত্য পরিচয়
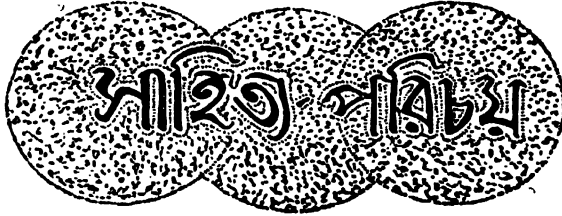
জয়ন্তী—শ্রীঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর।—মূল্য এক টাকা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথের জয়ন্তীর পর হইতে দেশশুদ্ধ সকলের জয়ন্তী উৎসব হওয়ায় লোকের চিত্তবিক্ষোভ এবং তাহা হইতেই এই পুস্তকের উৎপত্তি। বিভিন্ন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা লেখক বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে রণজয়ী, দুর্দ্ধর্ষ, দুরূহকর্ম্মা ও সর্ব্বজয়ী ব্যক্তিগণমাত্রেই জয়ন্তী লাভের উপযোগী, অন্যে নহে। প্রমাণ ও যুক্তিতর্ক তিনি বেদপুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ধনুর জ্যা হইতে বারুদ তৈরীর কাঠ পর্য্যন্ত সকলেই সমালোচিত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় শ্লোকগুলির সমাবেশ অতি সুন্দর হইয়াছে। বিভিন্ন সুললিত স্তোত্রদ্বারা রচনাটী বিশেষ সমৃদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিই সাধারণে জয়ন্তী তিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ যদিও অন্য পাঁচটী জয়ন্তীতিথির কথা লেখক আমাদের জানাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা গভীর জ্ঞান ও অনুশীলনের পরিচয় প্রদান করে। এবং তাঁহার রচনা হইতে আমরা ইহাই পাই যে মাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবই জয়ন্তী আখ্যার উপযুক্ত অপরের নহে। কিন্তু আমরা মানুষ এবং মানুষ মাত্রেরই সাধারণ অভ্যাস "দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।" পিতার দেবোচিত গুণ না থাকিলেও যেমন তিনি সন্তানের কাছে দেবতা তেমনি জয়ন্তী লাভের যোগ্যতা না থাকিলেও প্রিয়জনের নিকট যে কেহ জয়ন্তী পাইতে পারেন এবং তাহাতে জয়ন্তীর মর্য্যাদাহানি হয় না। সূর্য্যরশ্মি শুধু দেবমন্দিরে ভক্তের প্রাঙ্গণে পড়িবে অন্যত্র পড়িবে না একথা অসঙ্গত। লেখক তাঁহার রচনায় আপনার অজ্ঞাতসারেই আপন মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহারই লেখায় আমরা পাই শুধু শ্রীকৃষ্ণ নহেন অনেকানেক ইতরেতর প্রাণীও আপনাদের সম্বন্ধে জয়ন্তী বা ঐ রূপাত্মক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং ঘোড়ার জিন ও বন্দুকের বারুদও বাদ যায় নাই।

উপসংহারে এইটুকু বলিতে চাই যে লেখক যদি বেদপুরাণের সাহায্যেই তাঁহার বক্তব্য বলিয়া শেষ করিতেন তাহা হইলে বিশেষ ভাল হইত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র, কামানের বারুদ এবং ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার সহিত তুলনা না করিলেই সঙ্গত হইত মনে হয়। এ যেন শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে মাংসের পোলাও ও মুখশুদ্ধির সহিত হজমিগুলি প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। এবং অবান্তর ব্যাপারের সমাবেশে লেখকের "জয়ন্তী" শব্দের গুরুত্ব ও প্রাচীনত্ব প্রকাশের প্রচেষ্টা অপেক্ষা জয়ন্তী দাতা ও জয়ন্তী গৃহীতাগণের উপর অন্যায় কটাক্ষ নিক্ষেপই সমধিক প্রস্ফুট হইয়াছে। এটী না হইলেই বেশ সঙ্গত ও শোভন হইত।

শ্রীবিজলীমোহন মুখোপাধ্যায়

পর্দ্দা ডাউনের আস্ফালন ঃ—R. S. Union-এর ব্রীজ প্রতিযোগিতার টেবিলে আমরা Lansdowne Club-এর সভ্যদের চেঁচামেচি করতে শুনেছি। চীৎকারের কারণটা এই, যে এদের কোন একটি দল সান্ধ্য সঙ্ঘের প্রতিযোগিতার খেলায় না হাজির হওয়ার দরুণ প্রতিযোগিতার কর্ত্তারা সেই দলটিকে scratch করে দিয়েছেন। এর প্রতিবাদ স্বরূপ এঁরা সান্ধ্য সঙ্ঘের প্রতিযোগিতা থেকে এদের সব কয়টি দলের নাম তুলে নিয়েছেন এবং সুবিধে পেলেই আড়ালে আড়ালে এঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন। ভালই করেছেন,—যতদিন না মগজে নতুন ফন্দী গজায় ততদিন নাম তুলে নেওয়াই ভাল। বলি খেলার সময় না আসার দরুণ বিপক্ষ দল যদি walk over চায়, তা'তে কা'র দোষ?—Lansdowne Club-এর না সান্ধ্য সঙ্ঘের?

⁂ উদাসী ⁂

শ্রীসচ্চিদানন্দ দাশ গুপ্ত

যেখানে আকাশ মিশেছে মাটীর সনে
স্নেহ-চুম্বন এঁকেছে ধরার বুকে ;
সেখানে মনের ম্লানিমা ঘুচায়ে দিয়ে
একলা বিজনে থাকিব আমি যে সুখে।
ঝড়ের বাতাসে যেথা কালো মেঘ উড়ে
আলুথালু বেশে ধরারে দিয়েছে বাণী,
আমি সেথা বসে একলা আপন মনে
রচিব আমার ক্ষুদ্র গীতিকাখানি।
চঞ্চল বায়ু সদা সে যে দিশেহারা
লুটায়ে পড়িবে আমারই আপন বুকে,
সদা ঘন ঘন প্রেম-চুম্বন রেখা
আঁকি দেবে সে যে মোর আনমিত মুখে
সে যেন আমার প্রবাসী দূরের বঁধু
তাই তার আজ এত করে মোরে চাওয়া
জানেনা আমি যে শেষ করে গীতিখানি
চলি যাব দূরে হবেনাতো তার পাওয়া।
যবে থেমে যাবে ঝড়ের মাতাল খেলা
ধরা যবে ফের "নীলের" পাবেগো দেখা,
আমিও আমার লেখনী কাগজ লয়ে
ধীরে গৃহ-মুখে ফিরিব তখনও একা ?

ছিটে ফোঁটা

শ্রীবজ্রবাহু

গত মাঘ সংখ্যার বসুমতীতে শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় গল্প লিখেছেন 'জন্মমৃত্যু এবং……।' এবংটা যে কি তা বোধ হয় আপনারা অনুমান করতে পেরেছেন। কিন্তু এর ভেতর একটু অসাধারণ বৈচিত্র আছে। লেখকই বল্‌ছেন—

কথাটি চল্‌তি।

বাঁধা ধরা নিয়মে ঘটক আঁসিয়া পাত্র-পাত্রীর খবর দেয়; তারপর দেখাশুনা, কোষ্ঠী বিচার ও হিসাব নিকাশের ফয়শালা চুকিলে পাঁজি দেখিয়া শুভদিনের নির্ঘণ্ট হাতড়াইয়া এক সুতহিবুকযোগে বরযাত্রী লইয়া বর যাত্রা করে; বিবাহে সেই কবিতা, সামিয়ানার নীচে সেই কুশাসন, কলাপাতা, মাটির খুরি, গেলাস ও প্রচণ্ড কোলাহল; মেয়ে-মহলে ছান্‌লাতলায় শঙ্খ রোলের মধ্যে স্ত্রী-আচার ও শুভ দৃষ্টির সমারোহ—বাঙালীর ঘরে শতকরা নব্বইটা শুভবিবাহ এভাবে নিষ্পন্ন হয় বলিয়া। চলিত কথাটা আমরা ভুলিতে বসিয়াছি! কিন্তু বাকী দশটা বিবাহের মূলে যে বিচিত্র ঘটনা, যে সুমধুর রোমান্সের আমেজ দেখি, তাহাতে ঐ চলিত কথা না মাজিলে চলে কৈ!

এমনি একটা কথা আজ বলিতে বসিয়াছি। এবিবাহে ঘটনাচক্র ছিল একটু (?) অসাধারণ রকমের।"

এই অসাধারণ রকমটি কেমন উৎকটরূপে পরিণত হয়েছে তার কিছু নমুনা আপনাদের শোনাই :—

রায় বাহাদুর বিনোদ শঙ্কর জজীয়তীর পর পেন্‌সন গ্রহণ ক'রে কিছুদিন কল্‌কাতায় থাকার পর তাঁর স্বগ্রাম শেয়াখালায় ফিরে

এলেন। পৈত্রিক ভিটের সুসংস্কার করে সেইখানেই বসবাস করবার মনস্থ করলেন। বাড়ীতে গৃহ প্রবেশ উপলক্ষে স্ত্রী এবং কন্যা প্রীতিলতার অনুরোধে একটা ভোজের আয়োজন হল। সেই ভোজে বহু অতিথিই উপস্থিত হল—তার মধ্যে হিমাংশু অন্যতম। হিমাংশুর বাবা সুধাংশুবাবু হাইকোর্টের মস্ত এ্যাডভোকেট, রায় বাহাদুরের বাল্যবন্ধু। "হিমাংশু এম্-এ পাশ করিয়া আইনের দুটা পরীক্ষার ধাপ্ টপ্‌কাইয়া তৃতীয় পরীক্ষার ধাপে দাঁড়াইয়াছে।" পাত্রটি ভালো!

যাক্!—হিমাংশুকে রাত্রিবাস করতে হলো। রায় বাহাদুর নিজে তদ্বির করে একতলায় সিঁড়ির কোণে একটা ঘরে হিমাংশুর শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন সঙ্গে দিলেন কুকুর জিমিকে।—

"হিমাংশু খাটে বসিল। জিমি কুকুর তার দীর্ঘ দেহ প্রসারিত করিয়া মেঝের শুইয়া পড়িয়াছে!..আতঙ্ক হয়! এই বাঘটাকে ঘরে লইয়া শোওয়া!

উপায় কি? তপস্যায় এর চেয়ে কত বড় বড় বিঘ্ন...বাঘ, সিংহ, ভূত, প্রেত—রাক্ষস অবধি আসিত যে! পুরাণের পাতাগুলো মনের উপর জ্বল-জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিল।..." কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুগুরেরও ব্যবস্থা হ'ল। মুগুর অর্থাৎ প্রীতিলতা শুয়েছে দোতলায় সিঁড়ির পাশের ঘরে। অতএব অবস্থাটা যে কি রকম দাঁড়াবে আপনারা তা কিছু কিছু অনুমান করতে অবশ্যই পারছেন।

নীচে হিমাংশু প্রীতিলতার স্বপ্ন দেখছে। ওপরের প্রীতিলতা নেমে এল। প্রেম চল্‌লো একটা চাম্‌চিকেকে কেন্দ্র করে।

একথা শুনে আমাদের মহীম বল্লে—কুকুর, বিড়াল, ছাগল—থাক্‌তে চাম্‌চিকে?

বন্ধুবরের আক্ষেপ করতে আর হল না—জিমি (কুকুর) বড় ওস্তাদ্।—সে (জিমি কুকুর) প্রীতির গা ঘেঁসিয়া মাথা নাড়িতেছিল। তার অঙ্গের সুরভি গ্রহণে মশ্‌গুল!

হিমাংশুর সারা অন্তর চূর্ণ করিয়া ব্যথার নিঃশ্বাস...হায়রে! হিমাংশু না হইয়া সে যদি জিমি হইত!" সঙ্গে সঙ্গে মহীম বলে উঠল—"হায়রে—ছাগ সাহিত্যিক হয়ে বিকৃতভাবের পরিচয় না দিয়ে যদি ছাগল হ'ত"—

একটা চাম্‌চিকে এসে প্রীতিলতার ঘরে উৎপাত করছিল। তারই সাহায্যার্থে প্রীতিলতা হিমাংশুকে তার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে গিয়ে কিন্তু চাম্‌চিকের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তারপর ঘটনাচক্রে (?) হিমাংশুকে প্রীতিলতার ঘরে রাত্রিবাস করতে হ'ল। রাত্রে আবার হিমাংশুর ঘর দিয়ে চোর ঢুকে সব বাসন জিনিষপত্র, এমন কি হিমাংশুর দামী চেষ্টার ফীল্ড কোট...সোণার বোতাম-লাগানো ভায়েলা সার্ট...চুরি করে নিয়ে গেছে। সর্ব্বনাশ! "হিমাংশুর দেহে রোমাঞ্চ! সে চিন্তিত হইল। সে এখন কি করিবে? এই দোর দিয়াই চোর আসিয়াছিল! অথচ রায় বাহাদুর জানেন—বাড়ীর সকলে জানে—এ ঘরে সে শয়ন করিয়াছিল রাত্রে... কিন্তু রাত্রে সে এ-ঘরে ছিল না; ছিল প্রীতির ঘরে...এ-কথা প্রকাশ করিয়া বলা চলে না। প্রীতি তরুণী...প্রীতির বিবাহ হয় নাই। তার ঘরে কি কারণে এবং কি করিয়া তার রাত্রি কাটিয়াছে ......"

এর বেশী তুল্‌লে আপত্তিকর হবে বলে আমরা আর অধিকদূর অগ্রসর হলুম না। বসুমতী পত্রিকা এঁরাই আবার পুতিগন্ধময় নক্কারজনক ছাগ সাহিত্য বলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন—সৎসাহিত্য প্রচার করেন নাকি এঁরাই!—

সৌরেনবাবু অতি আধুনিকতা ছেড়ে আবার তাঁর নিজের জায়গায় ফিরে যান! বৃদ্ধ বয়সে আর এ ভীমরতিতে কাজ কি?—

দোলের দিনে

শ্রীআদিত্য নারায়ন সিংহ

এল ছুটে সুন্দরী রঙে ভরি পিচ্‌কিরি দোলাইয়া দেহ মহানন্দে
শ্লথ হল অঞ্চল মন তার চঞ্চল ঘূর্ণীতে নাচে নব ছন্দে।
কবরীর বন্ধন শিহরায় কম্পনে শঙ্কিত প্রলয়ের নর্ত্তে,
সুন্দরী স্বরগের পথ ভুলে এলে তুমি ফাগুয়ায় ফাগ মেখে মর্ত্তে।
উন্মাদ পরশনে পুলকিত অন্তর যৌবন হল আজি ধন্য
প্রেম-দরিয়ার মাঝে জাগিয়াছে মৈনাক তোলপাড় করে চৈতন্য।
আনমনে বসেছিনু কবিতার খাতা লয়ে গরমিল হয়ে গেল ছন্দ
পিচ্‌কারী লয়ে হাতে এলে তুমি প্রিয়তমা—অঙ্গ-কুসুম ভরা গন্ধ।
হাসি ভরা মুখখানি আনে প্রাণে হিল্লোল চোখে নাহি খরতাপ দৃষ্টি
ক্ষণেকে ঝরায়ে দিলে বাদলের ধারা প্রায় বিনামেঘে রক্তের বৃষ্টি।
সঙ্কিত অঞ্চলে ফাগুয়ায় ফাগ মেখে রঞ্জিত হল মোর অঙ্গ
নেচে ওঠে প্রাণ-মন দুরন্ত যৌবন অপাঙ্গে করিছে ভ্রুভঙ্গ।
প্রভাতের-প্রান্তর-কান্তার প্রাঙ্গণে বঙ্গের রং হল গৈরি
বন্দনা করি আজ হৃদি-প্রাণ-বল্লভে প্রেম দিয়ে দেহ যার তৈরি।

অতীতের হুগলী

শ্রীসুবোধ রায়

হুগলী জেলা একটী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। হিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ পর্য্যন্ত বহু জাতির ইতিহাসের ধারা এই জেলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া তাহার কোন না কোন নিদর্শন এখানে রাখিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি মহানাদ খননের ফলে বিরাট গুহের রাজত্বের বহু নিদর্শন বাহির হইতেছে। অবশ্য সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা নয়। সম্প্রতি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার সেন, অক্ষয়কুমার সরকার ও সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত হুগলীতে গিয়া যে দুইটী প্রতিষ্ঠান দেখিয়া আসিয়াছি সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটী হুগলীর ইমাম্‌বাড়া, অপরটী সেণ্টমেরিজ চার্চ্চ অথবা ব্যাণ্ডেল

সেণ্ট মেরিজ্ চার্চ্চ

চার্চ্চ। ইহাদের মধ্যে হুগলীর ইমাম্‌বাড়া জনসমাজে সমধিক পরিচিত। কিন্তু ব্যাণ্ডেল চার্চ্চ সম্বন্ধে অনেকেই অবগত নহেন যে, কতদিনের পুরাতন স্মৃতি, চিত্রশিল্পের কি সুন্দর ও হৃদয়-গ্রাহী নিদর্শন, শান্তি ভক্তির কি নীরব মাধুর্য্য বহন করিয়া এই গির্জ্জাটী দণ্ডায়মান আছে।

প্রথমেই ইমাম্‌বাড়া সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে চাই। ইমাম্‌বাড়া দেখিলেই ইহার প্রতিষ্ঠাতা পুণ্যস্মৃতি হাজী মহম্মদ মহসীনের

সেণ্ট মেরিজ্ চার্চ্চের মাতৃমূর্ত্তি

কথা মনে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে কবির বাণী স্মরণ হয়—"তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"। বাস্তবিক এই ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী ছিলেন এক বিরাট পুরুষ। মানুষের আধিব্যাধি নিবারণের জন্য, তাঁহার মানসিক ও ধর্ম্মজীবনের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি কিরূপ মুক্তহস্তে দান করিয়া গিয়াছেন হুগলী কলেজ, ইমাম্‌বাড়া হাসপাতাল ও হুগলীর ইমাম্‌বাড়া তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। এতদ্ভিন্ন হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে দরিদ্রদের মধ্যে তাঁহার নীরব ও অযাচিত দান তো জনপ্রবাদে পরিণত হইয়া আছে। আজিকার ঈর্ষা-কলুষিত, ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বিদ্বেষদুষ্ট আবহাওয়ার মধ্যে এইরূপ শান্ত সমদর্শী প্রকৃত ধার্ম্মিক মুসলমানের কথা স্মরণ করিয়া সত্য সত্যই দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে।

বর্ত্তমান সুবৃহৎ ইমাম্‌বাড়া যেখানে অবস্থিত তাহার ঠিক বিপরীত দিকে রাস্তার অপর পার্শ্বে পুরাতন ইমাম্‌বাড়া ছিল। সে বাড়ীটী ছোট এবং একতলা। এই ইমাম্‌বাড়াটী নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর আমলে নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পরে ১২১৩ সালে যখন হাজী মহম্মদ মহসীন গঙ্গার কূলে বর্ত্তমান ইমাম্‌বাড়া নির্ম্মাণ করেন তখন পুরাতন ইমাম্‌বাড়ার জিনিষপত্র এখানেই স্থানান্তরিত হয়। বর্ত্তমান ইমাম্‌বাড়ার দ্রষ্টব্য দুইটী জিনিষ—ইহার ঘড়িঘর ও প্রার্থনাগৃহ। প্রার্থনা গৃহের দেওয়ালে আরবী অক্ষরে কোর-আন্-শরিফ লিখিত আছে। এই প্রার্থনা গৃহের পিছনদিকের সুউচ্চ দেওয়ালে এই ইমাম্‌বাড়া, তৎসম্পর্কিত সম্পত্তি ও তাহার পরিচালন-ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়া মহম্মদ মহসীন যে উইল করেন তাহা আরবী ও ইংরাজী—এই দুই ভাষায় খোদিত
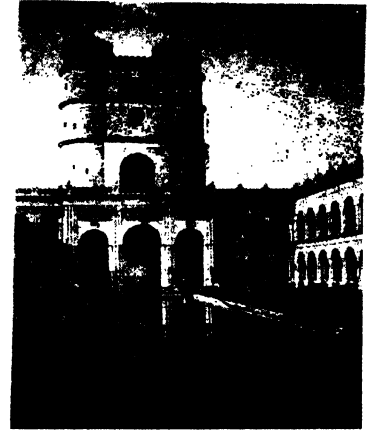
ইমামবাড়া

আছে। তাহাও একটী দর্শনীয় বস্তু। এই ইমামবাড়ার ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য তিনি প্রভূত সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার আয় হইতে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা,

নিত্যনৈমিত্তিক দানধ্যান, এবং মহরম প্রভৃতি পালপার্ব্বন মহাসমারোহে সুনিষ্পন্ন হইত। কিন্তু ক্রমেই সমারোহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও নিত্যনৈমিত্তিক দানধ্যান তো একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। মহরম প্রভৃতি উৎসবেও পূর্ব্বে যে অর্থ ব্যয়িত হইত এখন তাহার অনেক কম হয়। ইহার কারণ নাকি সম্পত্তির আয় কমিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে দেবোত্তর সম্পত্তির আয় কোন্ ফুটা দিয়া বাহির হইয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে একদিন সম্পত্তির জীর্ণ তরী কেমন করিয়া ভরাডুবি হয়, সে রহস্য একমাত্র ভগবানই জানেন।

সেন্ট মেরিজ চার্চ্চ অথবা ব্যাণ্ডেল চার্চ্চ একটী সবিশেষ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৃহ। বাঙ্গলার মধ্যে তো নিশ্চয়ই বোধহয় ভারতের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন গির্জ্জা। এই গির্জ্জাটী রোম্যান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক ১৫৯৯ সালে স্থাপিত হয়। হুগলীর শেষ প্রান্তে জনবিরল স্থানে এই গির্জ্জাটী অবস্থিত। একসময়ে ইহার ঠিক দক্ষিণেই ছিল সরস্বতী নদীর একটী প্রবাহিনী এবং পূর্ব্বেই ছিল গঙ্গা। এখন সরস্বতীর প্রবাহিনী শুকাইয়া মজিয়া গিয়াছে এবং এক সময় যেখান দিয়া ছোটখাটো বাণিজ্য-তরী যাতায়াত করিত সেখানে তৃণগুল্ম ও বৃক্ষাদির আশ্রয় হইয়াছে। গঙ্গা ও গির্জ্জার তলদেশ হইতে শতাধিক গজ দূরে সরিয়া গিয়াছে। পুরাতনের স্মৃতিজনিত হউক অথবা রোম্যান ক্যাথলিকদের শক্তিভক্তির নানা নিদর্শনের দ্বারা চিহ্নিত বলিয়াই হউক, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই একটী ভক্তিনম্র শান্তমাধুর্য্য হৃদয়কে আবিষ্ট করে। ইহার গম্বুজে শিশুপুত্র যীশুকে ক্রোড়ে করিয়া মেরীর যে মাতৃমূর্ত্তি আছে তাহা অতি সুন্দর। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ইহার প্রার্থনাগৃহের মধ্যস্থিত খ্রীষ্টের অবরোধ হইতে আরম্ভ করিয়া সমাধি পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া নানা অবস্থার চতুর্দ্দশখানি ছবি। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, বর্ণের সুষমায়, ভাবের গভীর অভিব্যক্তিতে এই চিত্রগুলি শিল্পজগতের এক অপূর্ব্ব বিস্ময়। যে জাহাজে করিয়া পর্ত্তুগীজ ধর্ম্মযাজকগণ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে আসেন তাহার মাস্তুলটী এই গির্জ্জার সংলগ্ন উদ্যানে প্রোথিত আছে। প্রত্যেক শিক্ষিত ও চিত্রশিল্পে উৎসাহী ব্যক্তির এই গির্জ্জাটী দেখিয়া আসা উচিত।
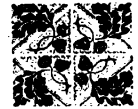
'শুভ্রার কথা'

শ্রীকেশব চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দিদির বিয়ে হ'য়ে গেছে আজ প্রায় ছ'বছর। আমার বিয়ে—সে কথা উঠলেই বাবা মাকে বলেন "থাক তোমাদের সমাজ, শুভ্রাকে আমি বি, এ, পাশ না করিয়ে বিয়ে দিচ্ছিনা। কচি কচি মেয়েগুলোর বিয়ে দিয়ে মাথা খাওয়ার পক্ষপাতি আমি নই।" আমার বুক থেকে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে আস্তো। সুদূরাগত বন্ধুর জন্য কতকাল ব্রতচারিণী হয়ে থাক্‌তে হবে তা কে জানে?

যতীনবাবু (দিদির স্বামী) বলে বসেন—"শুভ্রা—হোপ্‌লেস"। আচ্ছা, কি এই লোকটা একটু সভ্যতা জ্ঞানও নেই একেবারে বাবার সাম্‌নেই এসব কথা বলে বসেন। দাদাতো ফেউ পেছনে লেগেই আছে—বলে "শুভ্রার বিয়ের জোগাড় শীগ্‌গিরই দেখ্‌ছি। উপার্জ্জনশীল সুশ্রী ছেলে পেলেই তাঁর হাতে শুভ্রাকে তুলে দেব,—ব্যস্।" দাদা চোখ মুখের এমনি এক বিকৃত ভঙ্গী ক'রে আমার দিকে চায় যে আমার দম ফেটে হাসি আসে। তবুও হাসি চেপে সেখান থেকে উঠে যাই।

এবাড়ীর সবাই আমার শত্রু—মিত্র কেবল দিদির তিন বছরের ছেলে 'সমীর'। এসব কথা উঠলেই বাড়ীতে আমার স্থান ভার হয়ে উঠে, একা পড়ার ঘরেও ভাল লাগে না—নিঃসঙ্গ মন সঙ্গীর জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে। তাই সমীরকে কোলে করে একেবারে ছাদে চলে যাই। ওর সঙ্গে কথা ক'য়েই তখন সময় কাটে।

একদিন খেয়াল হলো, সমীরকে জিজ্ঞাসা করলাম "হ্যারে সমীর, তোর বাবু তোর মাকে ভালবাসে?" সমীর ঠোঁট দুটো উঁচু ক'রে একপ্রকার অদ্ভুত ভঙ্গী করে বল্লে—"খুউব"। ওর হাত মুখ নাড়া দেখে আমার হাসি এল। ফের প্রশ্ন কর্‌লাম "মেসোমশায় কবে আস্‌বে বল্‌তে পারিস?" বলেই সিঁড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম কেউ আছে কিনা। সমীর এবার খুব গম্ভীরভাবে বল্‌লে—"কাল"। আমি ওকে বুকে আদর ক'রে জড়িয়ে ধর্‌লাম। কতক্ষণ এভাবে কাট্‌লো বল্‌তে পারি না, সমীরের উর্ব্বর মস্তিষ্কে কি ভাবনা জোগান দিচ্ছিল তা সেই জানে। আমার চিন্তা তখন আকাশের কোণে কোণে মেঘদূতের মতই ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

সমীরের সঘন মেসোমশাই! ও মেসোমশাই! চিৎকারে আমার দৃষ্টি পড়লো পাশের ছাদে। চেয়ে দেখি রাকেশবাবু সমীরের কথা শুনে আমার দিকে চেয়েই হাস্‌ছেন। তার এ ভাবের হাসি আমার মুখে তপ্ত লোহার মতই একটা দাগ কেটে দিল। আমি সমীরকে একটা বকুনি দিয়ে নীচে ছুটে এলাম। যেন এইমাত্র উপরে এক প্রলয় অগ্নিকাণ্ড থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে আন্‌লাম। আমার নিঃশ্বাস বেজায় ঘন হলো। বুকটা টিপ টিপ করতে লাগলো। চলে আসার সময় রাকেশবাবুর সেই কথাটাই কানের ভেতর ঢাক পিট্‌তে লাগলো। "ভয় পাবেন না, আমি তো সত্যি সত্যি আর সমীরের মেসোমশাই হচ্ছিনা।" উঃ, ভারি ভয়, শুভ্রা পুরুষগুলোকে দেখে ভয় খায়না মোটেই। কিন্তু কি বেহায়া পুরুষ, কবে তার কাছে একদিন জ্যামিতি বুঝতে গিয়েছিলাম সেই সূত্র ধরে আজ আমায় এই অপমান। রাগ হ'ল বেজায়, সব চেয়ে রাগ হলো দিদির উপর। সমীরকে দিদির কোলে ছুড়ে ফেলে কেঁদে বল্লাম—"এই নাও বাপু তোমার ছেলে, আমায় যার তার সাম্‌নে অপমান করে বসবে, আর ওকে কোলে নেবোনা!

দিদি কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি দম্ দম্ ক'রে পা ফেলে সোজা পড়ার ঘরে চলে এলাম।

রাকেশবাবু লোকটাকে শান্ত এবং ভদ্র বলেই জানতাম তার উপর এত অল্প বয়সে প্রফেসর—শ্রদ্ধা করতাম বেশ মনে মনে।

কিন্তু আজকের ব্যাপারে ইচ্ছা হচ্ছে—পেলে দু'কথা যা'তা বলে আসি। এমন আর দেখিনি—সোজা দাদার কাছে এসে সমীরের কাণ্ড সব বলে দিয়েছে। আর যায় কোথা, দাদার কান—সংবাদ আধ মিনিটের ভিতর বিলি হ'য়ে গেল। বৌদি সমীরকে কোলে করে এসে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে—"ও এই অপমান করেছে সমীর। আচ্ছা এর মীমাংসা আমি শীগ্‌গিরই করছি; রাকেশবাবুকে বলে ক'য়ে রাজী……।" ধোৎ! বৌদিটা যেন আর এক ডিগ্রি উপরে। ঐ ভদ্রলোক কি আর অত সব ভেবে বলেছেন। ওরই বা দোষ কি যত নষ্টের গোড়া আমাদের বাড়ীর লোকগুলো।

আজ ক'দিন ধরে ওদের সঙ্গে (নীতিশ, সতীশ, ব্রজেন, পেলব) বসে গল্প করতে যাইনি। ইচ্ছেও করে না। ওরা হতাশ হয়েই ফিরে যায়। সব চেয়ে কষ্ট হয় আমার ঐ পেলবের জন্য। ছেলেটা কবি, তার উপর ওর ধারণা আমি ওকে ভালবাসি। ওর যত সব কবিতা আমায় লক্ষ্য করে লেখা। বেচারা যদি শুনতে পায় যে শুভ্রা ওকে ভালবাসে না তবে হয়ত আত্মহত্যা ক'রে বস্‌বে। আশ্চর্য্য কি—তরুণ কবি যে ভাবপ্রবণ।

মাসখানেক পরে…………

একদিন বসে নীলার কাছে চিঠি লিখছি এমন সময় বৌদি হাস্‌তে হাস্‌তে এসে বল্লে "শুভ্রা—সামাল্ সামাল্ বাণ এলো। রাকেশবাবু রাজি—।" বৌদিটা যেন কি; আর কিছু না বলে হাসতে হাসতে আমার খাটের উপর গড়িয়ে পড়লেন। আমার মনে উপর্য্যুপরি কয়েকটী প্রশ্ন এল—তবে কি রাকেশবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উত্থাপন করা হয়েছে নাকি? রাকেশবাবু কি এতে মত দিয়েছেন? তিনি কি রোজই আমাদের বাড়ীতে আসেন? বৌদির কথায় কিছু ঠিক বুঝতে না পেরে আমার রাগ হলো। বৌদিকে এক প্রকার জোর ক'রেই ঘর থেকে বের করে দো'র দিলাম।

বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে আমার আর ভাল লাগছিলো না; তার উপর আজকের বৌদির এই কথা কয়টী—আমার মন পুনঃ পুনঃ আঘাত ক'রে অবশ করে ফেল্লে। দো'র ভেজিয়ে দিয়ে খাটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। দেখি রাকেশ বাবুর একখানা ফটো রয়েছে আমার খাটের ওপর আর তার নীচে লেখা রয়েছে—"To Shuvra, New years greetings and love"

Rakesh.

কাঠে কেরোসিন তেল মেখে আগুন লাগালে ধপ করে জ্বলে উঠে, তেমনি বৌদিকে রাকেশ বাবুর সঙ্গে যোগ দিয়ে এ ফটো সরবরাহ করতে দেখে আমার দেহের প্রত্যেকটী শিরা উপশিরা রি রি ক'রে জ্বলতে লাগলো। বাড়ীর এ গুপ্ত চক্রান্ত আমার চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।

কদিন থেকে রাকেশ বাবুর ঘরের দিক্‌কার জানালাটা বন্ধ করে রেখেছি। আজ রাগের ঝোঁকে সেই জানালা দিয়ে ফটোটা ছিঁড়ে ফেলতে গেলাম। কিন্তু খুলতেই দেখি রাকেশ বাবু আমার ঘরের দিকে চেয়ে আছেন। ফটো ছেঁড়া আর হ'লো না। জানালাটা বন্ধ করে ফটোটা ছুঁড়ে ফেললাম মেঝের উপর; সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও কান্নার ভারে ধরে রাখতে পারলাম না। বেজায় কান্না এল। নাগালের বাইরে যেন কি ধরতে চাই মনোমতো তা পাই না—সেইজন্য ছোট ছেলের মত এই অভিমান। হঠাৎ মনে হলো এ আমি কচ্ছি কি—কেন, কিসের জন্য কাঁদছি? মন যেন অন্য মানুষটী হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এবার যে শুভ্রা ছিলাম সে শুভ্রার মতই চলবো, ভেবে চোখ মুছে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা প্রতিমাদের বাড়ী চলে গেলাম। জোর করে মনকে ফেরাতে চাই—কিন্তু মন যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। প্রতিমার সঙ্গে ভাল করে কথা জম্‌লো না। রুদ্ধ মনের দ্বার ঠেলে নিরন্তর যেন কান্নাই আসতে চায়।

সন্ধ্যার পর প্রতিমাদের বাড়ী থেকে এসে পড়ার ঘরে চলে গেলাম। আল্‌গা একটা কাগজ নিয়ে তার পিঠে যা মনে এলো তাই লিখে যেতে লাগলাম। কাগজের একপিঠ মসীমাখা ক'রে অন্য পিঠ উল্‌টিয়ে দেখি পেলবের দুই স্তবকের একটী অসম্পূর্ণ কবিতা। অনেকদিন আগে সে আমাকে লক্ষ্য করেই লিখেছিল কিন্তু তা তাঁর আর শেষ করা হয়নি।

কাগজটাকে কুটিকুটি ক'রে ছিঁড়ে পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলাম।

দিন কয়েক পরের কথা—ইজি চেয়ারটায় বসে 'ওস্কার ওয়াইল্ডের' The Picture of Dorian Grey পড়ছি এমন সময় আচম্বিতে রাকেশ বাবু এসে ঘরে ঢুকলেন, হাতে তার একখানা কাগজ। তিনি এসে সোজা আমার পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন এবং রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে লাগলেন।

এরকম ভাবে সোজা তাকে আমার ঘরে আসতে আর দেখিনি। আমি চেয়ার থেকে

উঠে দাঁড়াতেই রাকেশ বাবু আমার হাত ধরে বল্লেন—"বা রে! আমি এলাম তোমার কাছে আর তুমিই চল্লে—? বোস কয়েকটা কথা আছে"। আমি জোর করে হাত ছাড়াতে যাচ্ছি দেখে রাকেশ বাবু আমাকে একেবারে বুকের ওপর টেনে নিলেন, তারপর এক প্রকার আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমার ঠোঁটের উপর তার উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ করলেন। আমার বুকে একটা হৃদ্‌কম্পন হয়ে গেল। তাঁহার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে উঠে দাঁড়ালাম। রাগে আমার মুখ লাল হয়ে গেল কিন্তু কোনো কথা বেরুলো না। উনি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে হাতের সে কাগজখানা আমার সামনে খুলে ধরলেন, বল্লেন "এরি জোরে আজ আমি তোমার উপর এ অত্যাচার করতে সাহস পেয়েছি। কিন্তু তুমি কি তা' হলে এ বিয়েতে রাজি নও?"

আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। কাগজটার সবগুলো কথা গিলে ফেলতে লাগলাম। সেটা বিয়ের পাটীপত্রের কাগজ। তার ভেতর রাকেশ বাবুর সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব ও বিয়ের তারিখ লেখা রয়েছে। আমার মাথাটা ঘুরে গেল। নিজেকে বেশ দুর্বল বোধ করতে লাগলাম। এবার স্ব ইচ্ছায় আমি ওর বুকের উপর নিজের মাথাটা রেখে বল্লাম—"মত কি ক'রে দেব। তোমরা তো কেউ আমার মত জিজ্ঞাসা করো নি? জাননা আমার রাগ কেবল তোমাদের ঐ চক্রান্তের উপর।"

এমন সময় বৌদি নীচ থেকে ডেকে বল্লেন "শুভ্রা দো'র খুলে রাখ, (দো'র কিন্তু খোলাই ছিল) তোমাদের দু'জনার খাবার নিয়ে আসছি।" ছিঃ ছিঃ ছিঃ কি এই বৌদিটা। বাবা শুনতে পেলে হয়ত কি ভাববেন।

—

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

মনোরম সাধুখাঁ

বিফল স্বপ্ন

গ্রেটা গার্বো ফ্রেড্‌রিক মার্চ্চ-এর সঙ্গে একসঙ্গে প্রথম নাববে "অ্যানা কার্‌লিনা"য়—এ কথা শুনে আমরা সবাই লাফিয়ে উঠেছিলুম। উঃ—কী ভীষণ হবে ছবিটা—এ

জিনজার রোজার্স তার ভক্তদের ভারী সুন্দর সব উপহার দিচ্ছে। মনোরম সাধুখাঁর কাছ থেকে বিশদ বিবরণ শুনুন।

কথা শুধু ভেবেও আমাদের ভালো লাগতো। খবর যখন প্রথম পেলুম, তখন বিশ্বাসই করি নি। বিশ্বাস শেষকালটা করেও কিন্তু বিস্ময়ের অবধি মাত্র ছিলো না। দিন কয়েক খুব চ্যাঁচালুম, হৈ হৈ করলুম, তর্ক করলুম আর স্বপ্ন দেখলুম।

কিন্তু, হায়, স্বপ্ন হ'লো বিফল।

গার্বো এ ছবিতে নাববেই না।

একদিন তার কানে খবর গেলো, বিলেতেও এ ছবিটা তৈরি হবে ঠিক হয়েছে। নায়িকার ভূমিকায় থাক্‌বে এলিজাবেথ বার্গনার। গ্রেটা বল্‌লে—বন্ধ করো, ও ছবিতে আমি নাববো না। যে ছবির দুটো সংস্করণ—সে ছবিতে আর সবাই নাবতে পারে, গ্রেটা পারে না। গার্বোর গার্বোত্ব তা হ'লে থাকে না।

কপাল খারাপ কার

দু'জনে দু'জনের সঙ্গে নাবতে না পেরে, কার ভাগ্যকে যে দোষ দেবো ভাবতে পারছিনে। মার্চ্চ-এর কপাল খারাপ, যে, সে ছায়াছবির রহস্যকে চুমো খেতে পার্‌লো না; না,—গার্বো প্রেম করতে পারলো না মার্চ্চ এর সঙ্গে!

কপাল খারাপ কারো নয়, খারাপ আমাদের।

আমরা দু'জনকে একসঙ্গে দেখতে পেলুম না।

গ্রেটা গার্বোর আগামী ছবির নাম তা হ'লে কী? 'দি ফ্লেম্ উইদিন'। এখানে তার প্রেমিক কে জানিনে, তবে এটুকু জানি—যে—এটির পরিচালক হচ্ছেন এডমাণ্ড গোল্ডিং।

প্রেমাভিনয়ের পরিণতি

কেউ কারো সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে করতে তাদের মনে যে সত্যি প্রেম জেগে ওঠে না—এ কথাটার কোনো মানে নেই। ক্যামেরার সাম্‌নে প্রেমের আসল রূপ না দিতে পার্‌লে আমরা সন্তুষ্ট হই না, বলি দূর

ও চুমোটা কি চুমো হ'লো! আমি যাকে ভালোবাসি তাকে অতো আল্‌গোছে কি জড়িয়ে ধরি!

কথ্‌খনো না।

সেই জন্যে প্রেমের আসল রূপ যাঁরা দিতে পারেন, তাঁদের আদর আমাদের কাছে এতো বেশী।

সম্প্রতি, রোণাল্ড কলম্যান্ লরেটা ইয়ং-এর সঙ্গে ক্যামেরার সামনে খুব প্রেম চালাচ্ছিলো। দু'টো ছবি—'দি বুল্‌ডগ ড্রামণ্ড ষ্ট্রাইক্‌স্ ব্যাক্' ও 'ক্লাইভ্ অফ্ ইণ্ডিয়া'। তাদের নকল প্রেম নাকি পরিণত হয়েছে বাস্তবে।

একদিন রোণাল্ডও বাড়ি নেই, লরেটাও কোথায় যেন বেরিয়েছে। খোঁজ করে' দেখা গেলো, এক নির্জ্জন স্থানে তারা বসে, দুজন দুজনকে আর ছাড়ে না। দু'জনের চোখে রঙ্‌। একজন বল্‌লে—'রোণাল্ড ডারলিঙ্', আরেকজন বল্‌লে 'লরেটা, মাই লাভ্।'

বিয়ে যদি হয়, আপনারা খুসি হন্ না?

উপহার

জিন্‌জার রোজার্স-এর ভক্ত হয়ে লাভ আছে। যে সব ভক্তেরা তার কাছে চিঠি লিখেছে, উত্তর দেবার সময় জিন্‌জার প্রত্যেককে তার বিয়ের গাউনের একটুক্‌রো করে' লেস্ কেটে পাঠিয়ে দিচ্ছে। ভক্তদের ভেতর মহা হুলুস্থুল পড়ে' গেলো। চিঠি আর চিঠি আর চিঠি। জিন্‌জার রোজার্স তার গাউনের টুক্‌রো কেটে সবাইকে পাঠাচ্ছে এ কি কম কথা! আহা, সেই গাউন—যেটা পরে' সে সেদিন লু আয়ার্স-এর সঙ্গে আংটি বদল করেছে! সেই গাউন—যেটি তার অমন সুন্দর দেহকে কতক্ষণ জড়িয়ে ধরে' ছিলো! লেস্ এর ভেতর জিন্‌জারের গায়ের খানিক গন্ধ থাকাও তো বিচিত্র নয়!

আসল ব্যাপার হচ্ছে এই! বিয়ের সময় অনেকখানি লেস্ জিন্‌জার বেশী কিনেছিলো। সেই বেশী লেস্‌টুকু কেটে সে সবাইকে পাঠাচ্ছিলো।

খবরটা শুনে আপনারা হৈ হৈ করে' জিন্‌জারের কাছে চিঠি লিখতে না বসেন যেন! কারণ, ভক্তের সংখ্যা তার অফুরন্ত হলেও লেসের গজ অফুরন্ত নয়।

লেস্ ফুরিয়েছে, আর তাই থেমেছেও জিন্‌জারের উপহার।
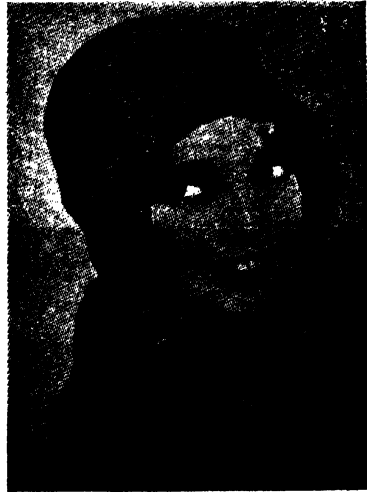
লরেটা ইয়ং রণি কল্‌ম্যানের সঙ্গে প্রেমাভিনয় করে' করে' সত্যি নাকি প্রেমেই পড়েছে।

এডি ক্যাণ্টর

এর নতুন ছবি এখন দেখানো হচ্ছে কল্‌কাতায়। ম্যায় ওয়েষ্ট-এর মত ক্যাণ্টরও কেন জানি এক ঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে। এডির ছবি—একমাত্র এডিরই ছবি—সেই একরকম। অবশ্যি, 'কিড্ মিলিয়ানস্'-এ কিছু যে দেখবার নেই, এ কথা আমি বল্‌তে চাইনে। দেখবার যথেষ্ট আছে। বিশেষ করে' শেষের দৃশ্যখানা। যেখানে সুন্দরী মেয়েদের সহযোগে আইসক্রীম তৈরি হচ্ছে। এত সুন্দর রঙ্‌, আর এতো সুন্দর ধারণা।

এডির ভাবী ছবির চারভাগের তিনভাগে থাকবে নাকি প্যান্টোমাইম।

হলিউডে সেদিন সে ফিরেছে বিলেত থেকে, তার ভাবী ছবির কাজ আরম্ভ হ'লো ব'লে।

কল্‌কাতায় বিলেতী-ইউনিট

রুড্ইয়ার্ড কিপ্‌লিঙ্ এর 'সোল্‌জার্স থ্রি' বলে' বইখানা তুল্‌তে বিলেতের লণ্ডন ফিল্মস্-এর একদল ভারতে ছবি তুল্‌তে এসে সেদিন কল্‌কাতায় এসেছিলো। খুব হৈ চৈ। ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে অনেকক্ষণ ধরে শুটিঙ্। আলীপুরের চিড়িয়াখানা থেকে দুটো হাতী ভাড়া করে' এনে কামান টানানো, ইত্যাদি।

ভারতবর্ষে লণ্ডন ফিল্মের একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় ছবি তৈরি হচ্ছে তার নাম হচ্ছে 'এলিফ্যাণ্ট বয়'। সম্পূর্ণ ভারতীয় মানে, এতে ভারতবর্ষের লোক ছাড়া আর কেউ অভিনয় করবে না, দৃশ্য সব ভারতের, ঘটনা ভারতের।

ভারতবর্ষকে নিয়ে ছবি তোলো আমাদের কোনো আপত্তি নেই, তবে গালাগাল যেন দিয়ো না।

খুচরো খবর

মারগারেট্ সালিভ্যান্ এর নতুন বই হচ্ছে 'নেক্সট্ টাইম উই লিভ্'। প্রেমিক হচ্ছে রোজার প্রায়ার।

* * *

জেনেট্ গেনর স্পেন্সার ট্রেসির সঙ্গে নাবছে 'দি ফারমার টেক্‌স্ এ ওয়াইফ্'-এ।

* * *

ক্যাথ্‌রিন হেপ্‌বার্ণ জে, এম, ব্যারীর আরেকখানা বইয়ের সবাক চিত্রে রূপ দেবে। 'কোয়ালিটি ষ্ট্রীট্'। বইখানার নির্ব্বাক রূপ দিয়েছিলো মেরিয়ান্ ডেভিস্।

* * *

ওয়ালেশ বিয়ারী আর জ্যাকী কুপার আবার একসঙ্গে নাবছে 'ও সাগ্‌নেসিস্ বয়'-এ।

* * *

ক্যারল লমবার্ড মা হবার জন্যে নাকি ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ব্যভিচারের দায়ে মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকার

মেয়রের বেশে | আসামীর বেশে

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের দশম বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত বোর্ণ এণ্ড শেফার্ড কর্তৃক গৃহীত মেয়র নলিনী-রঞ্জনের আলোকচিত্রের প্রতিলিপি।

২৩-এ মার্চের শুনানীর দিন গভর্ণমেণ্ট এ্যাডভোকেট মিঃ এ, কে বসুর সহিত আসামী মেয়র নলিনীরঞ্জনের পুলিশ কোর্টে অবতরণ কালীন দৃশ্য।

"সাধু সাবধান!"

দূর সে নিকট হ'ল নিকট সে দূর
দু'য়ে মিলে কলিকাতা হ'ল মধুপুর।
মধু—সে শুকা'য়ে গেল, র'য়ে গেল হুল,
বধূ শেষে ক'রে দিল "এপ্রিল-ফুল"!
শিবের কণ্ঠের বিষ পদ্মে এসে বসে
গরল উগারি' তুলে গাঁজা-প্রেম-রসে!
মহা-নাগরিক তাহে করে আনচান্!
জনতা দেখিয়া হাসে—"সাধু সাবধান"!

"মাছ ধরো ক্ষতি নাই ছুঁয়োনাকো জল"

অতি ভাল ভাল নয়, সাধুজনে কয়।
অতি কাছাকাছি এলে বড় গোল হয়।
অতি মাখামাখি হ'লে ল্যাজে ও গোবরে
জড়া'য়ে চালাক-অতি শেষকালে মরে।
চিনে দেখি বুঝি' লও, যে জান সন্ধান;
অসাধু তফাৎ থাক, সাধু সাবধান।
মাছ ধরো ক্ষতি নাই, ছুঁয়োনাকো জল,
একথা যাবে ঘোর রসাতল।

নলিনীর বোবা লিফ্‌ট্‌ম্যান

হিন্দুস্থান বিল্ডিংসের এই বোবা লিফ্‌ট্‌মান সকলের নিকট সুপরিচিত। সে নাকি নলিনীর বিশ্বস্ত ভৃত্য। গত ২৩শে মার্চ্চ মামলার দিন প্রভু নলিনী যখন পুলিশ কোর্টে আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান তখন বিশ্বস্ত ভৃত্য হিন্দুস্থান বিল্ডিংসের সম্মুখে বিশ্রামরত। কে জানে তাহার মনে তখন হয়তো "সাধু সাবধান" বা "মাছ ধরো ক্ষতি নাই, ছুঁয়োনাকো জল"

পুলিশ কোর্টে

পুলিশ প্রহরী

গত শনিবার মেয়রের মামলায় শ্রীমতী বীণা বিশ্বাসের আদালতের সাক্ষী হিসাবে হাজির হওয়ার কথা থাকায় আদালতে লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। এইজন্য আদালতে পুলিশের কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পুলিশ ইন্সপেক্টর, সার্জ্জেণ্ট ও কনেষ্টবলগণ জনতা নিয়ন্ত্রণে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রকাশ, সার্জ্জেণ্ট ও কনেষ্টবলগণ কয়েকবার জনতা সরাইয়া দেয়। একবার কোন ফটোগ্রাফার বীণার ফটো তুলিতে চেষ্টা করায় জনৈক সার্জ্জেণ্ট তাহাকে বাধা দেয় বলিয়া প্রকাশ। শ্রীমতী বীণা একখানি ট্যাক্সিতে আদালত ত্যাগ করে। ট্যাক্সি

১৮৭৪১ সংখ্যক মোটরে নলিনী ২৩এ তারিখে পুলিশ কোর্টে আসিয়াছিলেন।

বড়কাকার সন্ধানে

ও জনতা

যখন আদালত হইতে বাহির হয়, তখন এক জনতা হল্লা করিতে করিতে ঐ ট্যাক্সির পশ্চাদ্ধাবন করে। সেই সময় একখানি ছাই রংয়ের মোটর ও একখানি চকোলেট রংয়ের মোটর ট্যাক্সির অনুসরণ করিতে দেখা গেল। আসামী নলিনীরঞ্জন সরকার ইহার পূর্ব্বে একখানি ট্যাক্সিতে আদালত গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছিল।

আদালতের পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষ গুলির শাখায়ও বহু লোক উঠিয়া আসামী ও বীণাকে দেখিবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল।

ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ইতিপূর্ব্বে কখনও এইরূপ জনতা পরিলক্ষিত হয় নাই।

অদ্য (২৮এ মার্চ্চ) বৃহস্পতিবার পুলিশ কোর্টে পুনরায় মেয়রের মামলার শুনানী হইবে।

মধ্যাহ্ন রৌদ্রে প্রতীক্ষায়,—

"আর কতকাল রইব ব'সে................."

গত ২৩শে মার্চ্চের মেয়রের মামলার শুনানীর দিন পুলিশ কোর্টে যে জনতা হইয়াছিল তাহার দুইটী দৃশ্য।
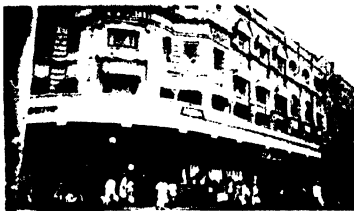
কলিকাতার দুইটী বহুবিনিন্দিত বাড়ী

নলিনীর কর্ম্মস্থল —— বীণার বাসস্থান

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্

২৭ বি সর্দ্দার শঙ্কর রোড

কন্যাদ্বয়সহ স্বর্গীয় অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ। উপবিষ্টা—শ্রীমতী লতিকা বসু (ঘোষ) Presidency College Magazine-এ (Vol XI No III March 1924) প্রকাশিত আলোক-চিত্র হইতে।

খেয়ালীর নিজস্ব প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সুধীর সিংহের সৌজন্যে এই সংখ্যায় প্রকাশিত চিত্রগুলি প্রাপ্ত।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ১৪ই চৈত্র, ১৩৪১, 28th March, 1935. { ১৩শ সংখ্যা

"আমিই চেম্বার"

সাধারণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কতকগুলি সাধারণ প্রচলিত বিধি আছে এবং সেই বিধিগুলি যথাযথভাবে পালিত হয় কিনা সে বিষয়ে সাধারণের নিকট জবাবদিহি করিবার দায়িত্ব ও প্রত্যেক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অত্যন্ত প্রাথমিক নীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে! মিউনিসিপ্যালিটি, প্রাইভেট্ স্কুল হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় নানা সাধারণ প্রতিষ্ঠান কিছুদিন পরেই ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল খুসীর আখড়া হইয়া দাঁড়ায়। সম্প্রতি "বেঙ্গল ন্যাশান্যাল চেম্বার অফ্ কমার্সে" এইরূপ একটী পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এই সংখ্যায় অন্যত্র প্রকাশিত শ্রীযুক্ত এস, সি ঘোষ ও চেম্বারের সম্পাদকের মধ্যে যে পত্রাদি বিনিময় হইয়াছে, তাহা হইতেই পাঠকগণ ব্যাপারটী বুঝিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত এস, সি, ঘোষ বঙ্গীয় বণিক সমাজে একজন সুপরিচিত, পদস্থ ব্যক্তি। ইতিপূর্ব্বে চেম্বারের অবৈতনিক যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে তিনি দুই বৎসর কাজ করিয়াছিলেন। সেইজন্য বহু দ্বিধা ও চিন্তার পর তিনি জনসাধারণের কল্যাণার্থ চেম্বারের পরিচালনা সম্বন্ধে খেয়ালখুসীর যে অসঙ্গত নমুনা সাধারণের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছেন, সে সম্বন্ধে চেম্বারের স্বাধীনচেতা সদস্যগণ, জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করি।

চেম্বারের আয় ব্যয় হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে চেম্বারের সদস্য হিসাবে শ্রীযুক্ত ঘোষ সম্পাদককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তদুত্তরে সম্পাদক মহাশয় লিখেন যে, সেই সংবাদ দিতে তিনি অপারগ ইহা শ্রীযুক্ত ঘোষকে জানাইতে তিনি "আদিষ্ট" হইয়াছেন? এই আদেশ কাহার?

ইহার পর শ্রীযুক্ত ঘোষের নিষেধ ও সাবধানবাণী সত্ত্বেও বিধি-বহির্ভূতভাবে চেম্বারের সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া নলিনী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই এক সময়ে বলিয়াছিলেন—"আমিই রাষ্ট্র!" তাহার পরিণতি কি শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জানেন। অতএব শক্তিমদমত্ততায় নলিনী যদি আজ মনে করিয়া থাকে "আমিই চেম্বার" তাহা হইলে দেশ তাহা নির্ব্বিবাদের সহ্য করিবে না। বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভার মত একটী জনহিতকর সাধারণ প্রতিষ্ঠানকে অনাচারমুক্ত করিবার জন্য আমরা সকলকে আহ্বান করিতেছি।

আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় নলিনী ও রমণী

রাজা সাহেবের মোটর-চালকের মুখে দিল্লী-কাহিনী

২৩শে মার্চ্চ শনিবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে নলিনী সরকারের মামলার শুনানী উঠিলে ফরিয়াদী পক্ষের তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। অতঃপর ২৮শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবী রাখা হয়।

শ্রীমতী বীণা সরকার আদালতে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে জেরা করা হয় নাই। শুনানীর সময় বীণা সরকার মাত্র একবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিয়াছিলেন এবং ঐ সময় দুইখানি পত্র তাঁহার হাতে দেওয়া হয়। পত্র দুইখানি নাকি বীণা সরকার অধ্যাপক প্রমথ সরকারের নামে লিখিয়াছিলেন। পত্র দুইখানি তাঁহার (বীণার) হাতে দিয়া ঐ পত্র দুইখানি এই মামলায় সাক্ষ্য স্বরূপ ব্যবহৃত হইলে তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি আছে কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করা হয়। পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া তিনি (বীণা) বলেন যে, তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

আদালতের মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে কড়া পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা বীণা সরকারকে একজন পুলিশ সার্জ্জেণ্ট ও একজন কনেষ্টবলের হেফাজতে মোটরে করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আদালত হইতে ব্যবহারজীবি ও দর্শকবৃন্দকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়; সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এবং যে সকল উকীল এই মামলায় নিযুক্ত কেবলমাত্র তাঁহাদিগকেই আদালতে থাকিতে দেওয়া হয়। মামলার শুনানীর সময় ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে এক বিরাট জনতাকে ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসুর প্রশ্নের উত্তরে বিনোদবিহারী বিশ্বাস বলেন যে, তিনি নদীয়া জেলায় মেহেরপুরে শ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী মন্দির নামক এক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৩৫৲ টাকা। তিনি বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। বাদী অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের এক ভগ্নীকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন।

বিশ্লথবসনা বীণা

"তাহারা এক শয্যায় নলিনী বাবু ও বীণাকে দেখিতে পায়। আসামী তাড়াতাড়ি প্রকোষ্ঠান্তরে চলিয়া যায়। বীণা ইত্যবসরে কাপড়চোপড় সামলাইতে সামলাইতে প্রমথ বাবুর সহিত ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দেয়, প্রমথ বাবু তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখান। সাক্ষী তখন প্রমথ বাবুকে লইয়া বাহিরে আসেন এবং তখনই হিন্দুস্থান বিল্ডিংস ত্যাগ করেন।"

—বিনোদের সাক্ষ্য

প্রঃ। গত ১৭ই জুনের কথা আপনার স্মরণ আছে?

উঃ। হাঁ। প্রমথবাবু কলিকাতায় আছেন শুনিয়া গত ১৭ই জুন বেলা ১০টার সময় আমি কলিকাতা আসি। হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর এজেন্সী সম্পর্কে তাঁহার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

অতঃপর সাক্ষী বলেন, কলিকাতায় তিনি বাবু বিভূতিভূষণ সরকারের বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। তথায় প্রমথবাবুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি সাক্ষীকে বলেন যে, আহারাদির পর তিনি সাক্ষীকে হিন্দুস্থান বিল্ডিংসএ লইয়া যাইবেন। বেলা প্রায় দুইটার সময় তাঁহারা ট্রামে চড়িয়া হিন্দুস্থান বিল্ডিংসএ যাত্রা করেন। তথায় পৌছিয়া প্রমথবাবু সাক্ষীকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলেন এবং বলেন যে, তিনি উপরে গিয়া দেখিবেন, নলিনী বাবু আছেন কি না।

কোর্ট—আপনি পূর্ব্বে নলিনীবাবুকে দেখিয়াছিলেন কি?

উঃ। না

অতঃপর সাক্ষী বলেন, প্রমথবাবু ফিরিয়া আসিয়া সাক্ষীকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলেন। কিন্তু কেন অপেক্ষা করিতে হইবে তাহার কারণ তিনি বলেন নাই। উভয়ে বাহিরে অপেক্ষা করেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর প্রমথবাবু আবার ভিতরে যান এবং ফিরিয়া আসিয়া সাক্ষীকে তাঁহার সঙ্গে ভিতরে যাইতে বলেন। সিঁড়ি দিয়া তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ তলায় যান। সাক্ষী সমস্ত দরজা ও জানালা বন্ধ দেখিতে পান। তাঁহারা সামনের দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলিয়া যায়, নলিনীবাবু ও বীণাকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখা যায় এবং নলিনীবাবু আর এক ঘরে চলিয়া যান। বীণা প্রমথবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করিতে আরম্ভ করে এবং প্রমথবাবু বলেন, তাঁহাকে খুন করিয়া ফেলিবেন। সাক্ষী প্রমথবাবুকে লইয়া বাহিরে আসেন ও উভয়ে ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন।

এই সময় শ্রীযুত নৃপেন্দ্র বসু বলেন, ক্যাপ্টেন কার যে পত্র দাখিল করিয়াছেন,

তাহা পড়িয়া দেখা যায় যে, আসামী দিল্লীতে যে বাড়ীতে ছিলেন, সেই বাড়ীর নিকটেই আজিমগঞ্জের রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়া, কুমার গোপিকারমণ রায় এবং বিলাসপুরের রাজা থাকিতেন। তিনি তাঁহার মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উহাদের মধ্য হইতে কাহাকেও তিনি সাক্ষী মানিতে পারেন কি না? মিঃ সামসুদ্দিন আমেদ নামক যে ভদ্রলোককে সাক্ষী মানা হইয়াছে তিনি ঐ সময় দিল্লীতে আসামীর বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। তাহা ছাড়া, অন্যান্য লোকও আছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুও আছেন।

কোর্ট—মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ কি প্রমাণ করিবেন?

মিঃ বসু—দিল্লীতে ফরিয়াদীর স্ত্রী ও আসামীর মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি প্রমাণ করিবেন।

আসামীর পক্ষ হইতে এডভোকেট জেনারেল বলেন, "মিঃ সামসুদ্দিন আমেদ সাক্ষীর কাঠগড়ায় আসিতে চাহিলে আমি তাঁহাকে সেই আনন্দ উপভোগে বাধা দিব না। কিন্তু কোর্ট স্মরণ রাখিবেন, ফরিয়াদীর দরখাস্ত বা জবানবন্দীতে এই সকল সাক্ষীর নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

কোর্ট—কিন্তু ইঁহাদিগকে সাক্ষী মানিতে বাধা দেওয়া অসম্ভব।

এডভোকেট জেনারেল—সাক্ষ্য উত্থাপনে আমি বাধা দিতে চাই না, কিন্তু আমি বলিতে চাই যে, ইঁহাদিগকে সাক্ষী মানিবার জন্য যেন শুনানী স্থগিত না রাখা হয়।

শ্রীযুক্ত বসু—কোর্টেই আমার আরও সাক্ষী উপস্থিত আছেন।

অতঃপর সাক্ষী বদরুজ্জমান খাঁর জবানবন্দী হয়। কৌশুলী মিঃ ডি এস ব্যানার্জ্জীর প্রশ্নের উত্তরে সে বলে যে, সে রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়ার এষ্টেটের মোটর ড্রাইভার। ১৯৩০-৩১ ও ৩২ সালে সাক্ষী রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়ার সঙ্গে দিল্লী গিয়াছিল। আসামী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে সাক্ষী চিনে। ১৯৩১ সালে সাক্ষী তাঁহাকে দিল্লীতে দেখিয়াছে। সাক্ষী যেখানে রাজা সাহেবের সহিত থাকিত, আসামীও সেই উঠান সংলগ্ন একটি ছোট গেষ্ট হাউস

ভাড়া লইয়াছিলেন। আসামী তথায় প্রায় আড়াই মাস কাল ছিলেন। তিনি তথায় একটি মহিলা ও কয়েকজন চাকরবাকরের সহিত থাকিতেন। মহিলাটি আসামীর সঙ্গেই গিয়াছিলেন এবং আসামীর সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

প্রঃ—ঐ আড়াই মাস তুমি কি দেখলে?

উঃ—কখনও কখনও নিচের তলায় নলিনী বাবু ও ঐ রমণী পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে দেখিতে পাইতাম। একদিন দিনের বেলায় আমি তাহাদিগকে একত্র শয়ন করিতে দেখিয়াছি।

প্রঃ—ইহা ভিন্ন আর কিছু দেখিয়াছ?

উঃ—কখনও কখনও ঐ রমণী নলিনী বাবুকে মাখন ও বিস্কুট খাওয়াইতেছে দেখিতে পাইতাম।

প্রঃ—তুমি কি শয়ন-ঘর দেখিয়াছ?

—হাঁ, আমি ঘরের ভিতর গিয়াছিলাম।

প্রঃ—ঘরে কয়খানা খাট ছিল?—

পাশাপাশি দুইখানা খাট ছিল।

এই সময় সাক্ষীকে তিনটী স্ত্রীলোকের গ্রুপ ফটো দেখান হয়। ঐ গ্রুপের মধ্যভাগে যে বালিকা ছিল, সাক্ষী তাহাকে আসামীর সহিত দিল্লীতে দেখিয়াছে বলিয়া বলে।

প্রঃ—তুমি অন্যত্র কোথাও তাহাদিগকে শয়ন করিতে দেখিয়াছ কি?

উঃ—হাঁ, সময় সময় তাহারা বারেন্দায় খাটিয়া আনিয়া শয়ন করিত।

প্রঃ—ঐ বাড়ীতে অন্য কোনও স্ত্রীলোক ছিল কি?—না।

মিঃ বসুর প্রশ্নের উত্তরে বিমলেন্দু সরকার (২৯) বলে, ফরিয়াদী তাহার মাতুল। বীণার সহিত তাহার মাতুলের যখন বিবাহ হয় তখন সে উপস্থিত ছিল। সাক্ষীর সহিত বীণার সদ্ভাব ছিল।

মিঃ বসুঃ—প্রমথবাবু তোমাকে যে কয়েকখানি চিঠি দিয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া ঐসব চিঠি আদালতে দাখিল করিবে কি?

কোর্ট—কি প্রকারের চিঠি ঐসব?

মিঃ বসু—বীণা প্রমথবাবুর নিকট যে সব চিঠি লিখিয়াছিল, এই সব চিঠি তাহাই।

সাক্ষী—আমার মাতুল আমাকে এই সব চিঠি দিয়াছিলেন এবং তাহার নকল করিতে বলিয়াছিলেন।

কোর্ট—(মিঃ বসুর প্রতি) আপনি

এখন কি চাহেন? আপনি জানেন যে ফরিয়াদী এখন এই সব চিঠি দাখিল করিতে পারেন এবং আপনি সাক্ষীর মারফৎ এই সব চিঠি দাখিল করিতে চান। কিন্তু ফরিয়াদীর স্ত্রী যদি এইসব চিঠি দাখিল করিতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে আমি ইহা প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করিতে দিব না।

মিঃ বসু—আমি কি ২২ মাদ্রাজের নজির দেখাইতে পারি? ঐ মামলায় দায়রা জজ স্বামীর নিকট লিখিত স্ত্রীর চিঠিপত্র আদালতে দাখিল করিতে দেন না। কিন্তু হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করেন যে, তাহা দাখিল করা যাইতে পারে।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আমার মনে হয় না যে, স্ত্রীর অসম্মতিতে উহা দাখিল করা যাইতে পারে।

মিঃ ডি, এন, ব্যানার্জ্জি—মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট যদি ফৌঃ কাঃ বিঃ ৯৪ধারার প্রতি লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, ঐ ধারাতে ব্যক্তি সম্পর্কেই ঐরূপ নিষেধের কথা বলা হইয়াছে। চিঠিপত্র সম্পর্কে বলা হয় নাই। আমার নিবেদন এই যে, যদি চিঠিপত্র ইত্যাদি দাখিল করা সম্পর্কে নিষেধ করা হইত তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আইনে তাহার উল্লেখ থাকিত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে চিঠিপত্রই আদালতে দাখিল করা হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট—তাহার কারণ সলিসিটরগণ ঐ সব আটক করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্যানার্জ্জি—আমার নিবেদন এই যে, চিঠিপত্র দাখিল করা সম্পর্কে যদি কোনও আপত্তির কারণ থাকিত, ঐ ধারায় তাহার উল্লেখ থাকিত। যদি স্ত্রী তাহাতে সম্মতি নাও দেন, তবুও তাহা প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আমার মনে হয় না উহা প্রমাণে ব্যবহৃত হইতে পারে।

এ্যাডভোকেট জেনারেল—যে ব্যক্তি চিঠি লিখিয়াছে তাহাকে না পাইয়া অপর-পক্ষের কৌঁসুলীগণ ঐ চিঠি প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। ঐ ধারার সাহায্যে ধাপ্পা দিয়া ইহারা প্রমাণ দাখিল করিতে চেষ্টা করিতেছেন কি না ম্যাজিষ্ট্রেটকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ঐ ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোনও বিবাহিত ব্যক্তিকে বিবাহঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে কোনও চিঠিপত্র কিংবা কথাবার্ত্তা প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইবে না। সুতরাং বীণা তাহার স্বামীর নিকট যে সব চিঠিপত্র লিখিয়াছে কিংবা কথাবার্ত্তা বলিয়াছে তাহা তাহার স্বামীকে প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট—যদি স্ত্রী সম্মতি না দেন।

এ্যাডভোকেট জেনারেল—ঠিক তাহাই। যদি স্বামী কিংবা স্ত্রীকে ঐসব চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রকাশ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে ঐ ধারা প্রযোজ্য হয় না।

ম্যাজিষ্ট্রেট—কিন্তু অপর কাহাকেও তাহা প্রকাশ করিতে হইবে।

এ্যাডভোকেট জেনারেল—হাঁ। এমনও কোন কোনও নজীর আছে যেখানে বলা হইয়াছে যে, যদি অন্যভাবে দলিলাদি হস্তগত হইয়া থাকে এবং ঐসব দলিল যদি দাখিল না করা যায়, তাহা হইলে ঐ ধারা অনুসারে ব্যক্তিবিশেষকে সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চিঠিপত্রাদি সম্পর্কে নহে। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটকে ইহাও দেখিতে হইবে যে, ঐ সব চিঠিপত্র আদালতে দাখিল করিবার জন্য গোপনে তাহার ভাগিনেয়ের নিকট দেওয়া হইয়াছে কি না। কারণ ভাগিনেয় নকল করিবার জন্য তাহার এজেন্ট হিসাবে কাজ করিত। ক্যাপ্টেন কার ফরিয়াদীর সলিসিটার হিসাবে ঐসব চিঠিপত্র রাখিয়া-ছিলেন। ক্যাপ্টেন কার ফরিয়াদীর এজেন্ট মাত্র।

ম্যাজিষ্ট্রেট—যথার্থ বটে।

মিঃ ব্যানার্জ্জি—কিন্তু যখন ক্যাপ্টেন কার আদালতে ঐসব চিঠিপত্র দাখিল করেন, তখন তিনি আমার এটর্নি ছিলেন না; সুতরাং তিনি আমার এজেণ্টও ছিলেন না।

ম্যাজিষ্ট্রেট—আদালতে চিঠি দাখিল হইলেই তাহা প্রমাণে ব্যবহার হইতে পারে না।

এডভোকেট জেনারেল—আমার মনে হয় বীণা যখন আদালতে উপস্থিত আছেন, তখন এই প্রশ্ন উত্থাপনই হইতে পারে না।

তাহাকে ঐ সব চিঠিপত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

ম্যাজিষ্ট্রেট—যে ভাবেই হউক, ঐ সব চিঠিপত্র সম্পর্কে বীণার কোনও আপত্তি আছে কি না আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব।

এই সময় বীণা সরকারকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় আনা হয় এবং তাহাকে ঐ সব চিঠিপত্র দেওয়া হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট—ঐ সব চিঠিপত্র পাঠ করিয়া আপনি বলিবেন কি যে, উহা এই মামলায় দাখিল করা সম্পর্কে আপনার কোনও আপত্তি আছে কিনা?

শ্রীযুক্তা বীণা সরকার—না, ইহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট—ধন্যবাদ।

অতঃপর চিঠিগুলি একজিবিট স্বরূপ চিহ্নিত করা হয়।

মিঃ বসু—অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ চিঠিগুলির দিকে একবার তাকান।

ম্যাজিষ্ট্রেট—ঐ সব চিঠি কি তিনি লিখিয়াছেন?

মিঃ বসু—হাঁ। ঐ সব চিঠি ও একখানা ডায়রী ক্যাপ্টেন কার আদালতে দাখিল করেন। এই মামলায় তাহা প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা সম্পর্কে তাহার (বীণার) কোনও আপত্তি আছে কিনা তাহা আমি জানিতে চাই।

শ্রীযুক্তা বীণা সরকার—(আদালতের প্রতি) আমাকে অনুমতি প্রদান করিলে আমি বাংলাতে সাক্ষ্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।

ম্যাজিষ্ট্রেট বাঙ্গলায় শ্রীযুক্তা বীণা সরকারকে সমস্ত বুঝাইয়া বলেন এবং তাঁহাকে চিঠি ও ডায়রী পড়িতে অনুরোধ করেন। মিঃ বসুর প্রস্তাব অনুযায়ী তাঁহাকে আদালত গৃহ হইতে বাহির হইয়া সংলগ্ন বারান্দায় পুলিশ সার্জ্জেণ্টের সম্মুখে ঐ চিঠি ও ডায়রী পড়িতে দেওয়া হয়।

সাক্ষী বিমলেন্দু সরকার মিঃ বসুর প্রশ্নের উত্তরে পুনরায় বলে, ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে সে শ্রীযুক্তা বীণা সরকারকে ফেণী লইয়া যায়। বীণা ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা ফিরিয়া আসেন এবং আগষ্ট মাসে একটি সন্তান প্রসব করেন। ইহার পর পূজার ছুটীর সময় ফরিয়াদী কলিকাতা আসিয়া তাঁহাকে ফেণী লইয়া যাইতে চাহে। কিন্তু বীণা তাহাতে স্বীকৃত হয় না! বিরক্ত হইয়া ফরিয়াদী তাহাকে

নলিনী ও রমণী

মাখন-বিস্কুট ভক্ষণের দৃশ্য

প্রঃ—ঐ আড়াই মাস তুমি কি দেখলে?
উঃ—কখনও কখনও নীচের তলায় নলিনীবাবু ও ঐ রমণী পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে দেখিতে পাইতাম। একদিন দিনের বেলায় আমি তাহাদিগকে একত্র শয়ন করিতে দেখিয়াছি।

প্রঃ—ইহা ভিন্ন আর কিছু দেখিয়াছ?
উঃ—কখনও কখনও ঐ রমণী নলিনী বাবুকে মাখন ও বিস্কুট খাওয়াইতেছে দেখিতে পাইতাম।

বীণার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলেন। এইজন্য সাক্ষী সাধারণতঃ শনিবার ও রবিবার বীণার বাসায় যাইত। কোন সময় সে আসামীকে ঐ বাড়ীতে দেখিতে পাইত। কোনও সময় বীণাকে বাসায় পাওয়া যাইত না।

প্রঃ—তিনি কোথায় যান, তুমি ইহা তাঁহাকে কোনও সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?—হাঁ, তিনি হয় "বড় কাকার" বাড়ীতে কিংবা লাইব্রেরীতে গিয়াছিলেন বলিয়া বলিতেন।

এডভোকেট জেনারেল—আমি এই প্রশ্নে আপত্তি করিতেছি। বীণা এখানেই আছেন।

সুতরাং তাঁহাকেই এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

মিঃ বসু—তুমি ঐ বাড়ীতে কখনও কোনও মোটর গাড়ী দেখিয়াছ কি?—হাঁ। নলিনী বাবু যখন ঐ বাড়ীতে আসিতেন তখন তিনি মোটরে করিয়াই আসিতেন।

প্রঃ। তুমি কি বীণাকে কাহারো সঙ্গে যাইতে দেখিয়াছ?

—হাঁ, আমি কখনও কখনও বীণাকে নলিনী বাবুর সহিত তাঁহার গাড়ীতে করিয়া যাইতে দেখিয়াছি।

এডভোকেট জেনারেল—আমি কি ফরিয়াদী পক্ষ হইতে এমন প্রতিশ্রুতি পাইতে পারি যে, তাঁহারা ২৮শে মার্চ্চ তাঁহাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষ করিবেন?

কোর্ট—কোনরূপ প্রতিশ্রুতির আবশ্যক নাই; তাঁহাদের মামলা শেষ করিবার জন্য আমি তাঁহাদিগকে আর একবার সুযোগ প্রদান করিয়াছি।

সিঙ্গাপুরের কৌঁসুলী মিঃ ডি, এন, ব্যানার্জ্জি, মিঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু ও মেসার্স সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ, কপিল দত্ত, হরিপদ বিশ্বাস, এস, পি, কর এবং বিপুল সাহা ফরিয়াদীর পক্ষ সমর্থন করেন।

এডভোকেট জেনারেল মিঃ এ, কে, রায় ও মিঃ এ, কে, বসু (সরকারী কৌঁসুলী,) মেসার্স কে, ডি, মিত্র, জে, এন, মিত্র, পি, এন, মুখার্জ্জি এবং নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন। কৌঁসুলী মিঃ জে, কে, মুখার্জ্জি শ্রীযুক্তা বীণা সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

চলতি পথে
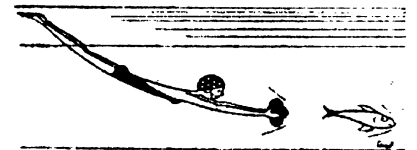
শ্রীমল্লিনাথ

দিনাজপুর সম্মেলন

আগামী ইষ্টারের ছুটীতে যে দিনাজপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে তাহা আর কাহারও অজ্ঞাত নাই। প্রাদেশিক সম্মেলনের ইতিহাসে এই প্রথমবার দিনাজপুরে উহার অধিবেশন হইবে; উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব নাই, দিনাজপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই এই অধিবেশন সাফল্য-মণ্ডিত করিতে আগ্রহান্বিত। প্রাদেশিক সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে একটী প্রদর্শনী করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে দিনাজপুরের প্রবীণ জননায়ক ও সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলিকাতায় আগমন করিয়া কলিকাতার প্রদর্শনী-অভিজ্ঞ কর্ম্মীগণের সহিত সলা-পরামর্শ করিতেছেন।

দিনাজপুরের সম্মেলন নানা দিক দিয়াই গুরুত্বপূর্ণ। চারি বৎসরের পর অধিবেশন হইতেছে,—কাজেই গত চারি বৎসর দেশের ভিতরে যে সকল জটিল রাজনৈতিক প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাই নিষ্পত্তির জন্য আগামী সম্মেলনের সম্মুখে উপস্থাপিত হইবে। গত চারি বৎসরের বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিতে বসিলে দেখিতে পাই চারিদিক হইতে বাংলা ও বাঙ্গালীর অবহেলা, অবমাননা ও লাঞ্ছনা। যে বাংলা ও বাঙ্গালী জাতি, খুব বেশী দিন গত হয় নাই, বরাবরই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইয়া আসিয়াছে, তাহার আজ কেন এ শোচনীয় দুরাবস্থা উপস্থিত হইল তাহা চিন্তা করিয়া কিরূপে তাহা হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে, তাহা স্থির ও শান্তভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। বাংলার সম্মুখে আজ প্রধান সমস্যাগুলির অন্যতম, রাজবন্দী সমস্যা, আইন অমান্য আন্দোলন বহুদিন প্রত্যাহৃত এবং বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ প্রশমিত হওয়ার পরও সরকারের বিনা-বিচারে আটক কার্য্য হইতে অনিবৃত্তি, পুণাপ্যাক্ট ও কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন সিদ্ধান্ত। এই চতুর্ব্বিধ সমস্যা বাংলাদেশকে আজ চতুর্দ্দিক হইতে উৎপীড়িত করিতেছে। দিনাজপুর সম্মেলনে বাঙ্গালী স্বদেশ-সেবীগণের কর্ত্তব্যই হইতেছে কোন একটী উপায় স্থির করিয়া এই চারি অন্যায়ের প্রতিবিধান করা। উপরোক্ত উৎপীড়ন চতুষ্টয়ের প্রথম দুইটীর কারণ সরকারী মনোভাব ও শেষ দুইটীর কারণ নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেসী নেতৃবর্গের বাংলার মতামতের ও শুভাশুভের প্রতি উপেক্ষা।

বাংলাদেশের অন্যান্য জিলাগুলির কোন একটীতে প্রাদেশিক সম্মেলন না হইয়া কেন দিনাজপুরেই অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা লইয়া একটী জোর গুজব আমরা শুনিতে পাইতেছি, এবং গুজবের যদি কণামাত্রও সত্য হয় তবে অতীব দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে বাংলা কংগ্রেস যাহাদের করতলগত তাহারা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন নীতিতে আবদ্ধ। গুজব এইরূপ যে যখন স্থিরীকৃত হইল আগামী ইষ্টারের ছুটীতে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে, তখন তাহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন এমন কোন জেলায় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যে স্থানে অতি অনায়াসেই তাহারা উঁহাদের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে তাঁহাদের নীতি বাংলাদেশের ঘাড়ে চাপাইতে পারেন এবং অন্ন-শত্রু বিভীষণদিগের এই ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় বাংলার অন্যান্য জিলাগুলি সহানুভূতি জানাইতে অক্ষম হওয়ায়, শেষ পর্য্যন্ত দিনাজ-

হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মাসোহারার মামলা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ঊর্দ্ধ সপ্ততি বর্ষ বয়স্কা ভগিনী রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের উইল অনুযায়ী মাসোহারা বাবদ ১০০৲ টাকার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে এক মামলা রুজু করিয়াছেন। মামলাটীর শুনানি আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া সহযোগী 'ষ্টেটসম্যান' সংবাদ দিয়াছেন।

যে দিন প্রাতে 'ষ্টেটসম্যানে' এই সংবাদ পড়িলাম সেই দিনই রবীন্দ্রনাথের কবিতা পুস্তকগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে নজরে পড়িয়া গেল :—

"হের ঐ ধনীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া
কাঙালিনী মেয়ে।"

পুরেই সম্মেলন করার ব্যবস্থা হয়। ইহার কারণ যে দিনাজপুর জিলায় না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন নীতির সমর্থক নাকি খুবই বেশী এবং উহাদের সাহায্যে কলিকাতার কংগ্রেসী মোহান্তেরা না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন নীতি বাংলার স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে অক্লেশেই সক্ষম হইবে। এই সম্পর্কে আরও শুনা যাইতেছে যে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক নীতি সম্পর্কীয় উভয় মতামতের একটী সামঞ্জস্যমূলক প্রস্তাবের খসড়া ডাঃ জে, এম, দাসগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের চেষ্টায় রচিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কোনরূপ আপোষ মীমাংসায় রাজী হইতে পারে না এবং যে আপোষ প্রস্তাবের চেষ্টা হইতেছে, তাহা আমাদের মনে হয় জনসাধারণকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যেই প্রণীত হইয়াছে এবং বাংলার জনসাধাণ যে ঐ মতের সম্পূর্ণ বিরোধী তাহা গত পরিষদ নির্ব্বাচনে প্রকটিত হইয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পক্ষের প্রার্থীরা যোগ্যতর হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহারা যে নীতি সমর্থন করিয়া নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার জন্য অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় দলের প্রার্থীদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই প্রমাণের পরেও যাহারা বাংলার স্কন্ধে না-গ্রহণ না-বর্জ্জন নীতি চাপাইতে উদ্যত, বা কোনরূপ আপোষ রক্ষা করিতেও রাজী তাহাদিগকে শুধু মুর্খ বলিলেও তাহাদের যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করা হয়—তাহারা দেশের শত্রু ও হস্তীমুর্খ। যাহাতে এইরূপ ভাবে আত্ম-প্রবঞ্চিত ও রাজনৈতিক আত্মঘাতী বাংলাকে না হইতে হয়, তাহার জন্য বাংলার জনমতকে এখন হইতেই অবহিত হইতে হইবে।

করাচীর গুলিবর্ষণ

গত সপ্তাহের করাচীর গুলিবর্ষণ এক শোকাবহ ঘটনা। ঐ অমানুষিক ব্যাপারে যেমন একদিকে সরকারী কার্য্য নিন্দনীয়, তেমনিই অপরদিকে খুবই চিন্তা করিবার বিষয় সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্মান্ধতা। নাথুরাম নামক জনৈক হিন্দু ব্যক্তিকে হত্যা করিবার অপরাধে আবদুল কুয়ায়াম নামে এক মুসলমান বিচারক কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয় এবং ঐ আসামীর ফাঁসি হইয়া যাইবার পর তাহার মৃতদেহ ইসলামী প্রথানুসারে যথাবিহিত ভাবে কবর দেওয়া হয়। কিন্তু অতি ক্ষোভের বিষয় করাচীর মুসলমান সমাজ হত্যাকারীকে "গাজী" আখ্যা দিয়া তাহার প্রতি অজ্ঞ অশিক্ষিত মুসলমান সমাজের সহানুভূতির উদ্রেক করে এবং সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান উহাদের প্রচারে এবং প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত হইয়া মৃতদেহ কবর খনন করিয়া বাহির করে এবং এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে করাচী নগর প্রদক্ষিণ করে। পুলিশ প্রথমে শোভা-যাত্রীদিগকে ঐরূপ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে

চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু অশিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় তাহাতে কর্ণপাত না করায় পুলিশ গুলি চালাইতে বাধ্য হয়। এই গুলিচালনার ফলে অনেক নিরীহ প্রাণীর প্রাণহানি ঘটিয়াছে এবং তদপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে আহত।

এখন আমাদের বিচার্য্য যে কেন মুসলমান সমাজ এই শ্রেণীর হত্যাকারীদিগের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়। কৈ উহাদিগকে তো কখন অন্য কোন শ্রেণীর হত্যাকারীদিগের জন্য উন্মত্ত হইতে দেখা যায় না? ইহা আর কিছুই নহে, ইহা এক শ্রেণীর মূর্খ "মোল্লা" জাতীয় জীবশ্রেণীর মিথ্যা প্রচার কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী কুফল। পূর্ব্বেও আমরা রাজপাল এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হত্যাকারীর ব্যাপারে এইরূপ উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়াছি। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় যে কেন্দ্রীয় আইন সভার মুসলমান সদস্যগণের পক্ষে এইরূপ হীন হত্যাকারীদিগের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া বড়লাটের নিকট ডেপুটেশনে আবদুল কুয়ায়ামের প্রাণভিক্ষার আবেদন। তাঁহাদের বরং জ্ঞানী ও গুণী হিসাবে অন্ধধর্ম বিশ্বাসে উন্মত্ত মুসলমান সম্প্রদায়কে ঐরূপ হত্যাকাণ্ড ধর্ম্মসঙ্গত নহে এবং ঐরূপ বিকৃত ধর্ম্মানুরাগ জাতীয়, এমন কি সাম্প্রদায়িক স্বার্থেরও যে পরিপন্থী তাহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা মুসলমানদিগের সম্প্রদায় হিসাবে "রাজভক্তি"র (Loyalism) কথা স্মরণ করাইয়া ঐরূপ ঘৃণ্য ঘাতকদিগের জন্য সরকার সকাশে আবেদন নিবেদন করেন। কিন্তু তাহার ফলে কি হয়? ফল যাহা হয় তাহা যে অতীব ভয়াবহ, করাচীর দুর্ঘটনা তাহা যথেষ্টই প্রমাণ করিতেছে। করাচীর হত্যাকাণ্ডের জন্য শুধু যাহারা সাময়িক উত্তেজনার বশে পুলিশ আদেশ অমান্য করিয়াছিল তাহারাই দায়ী নহে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী দায়ী অশিক্ষিত মোল্লা সম্প্রদায়। ইহারা যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে সংযত করিতে যত্নহীন তাহা নহে, বরং উহারা সাম্প্রদায়িক কলহের গন্ধ পাইলেই তাহাতে ইন্ধন সংযোগ করে।

পৃথিবীর ইতিহাসের পাতা উল্টাইলে অবশ্য ধর্ম্মের নামে হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কিন্তু কোন ধর্ম্মই তাহার নামে হত্যাকার্য্যে সায় দেয় না। অপর পক্ষে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে যদি কেহ কোন ধর্ম্মের নিন্দা বা কুৎসা রটনা করে, তবে তাহার প্রতি কোনরূপ জীঘাংসা প্রদর্শন না করিয়া বরং তাহাকে ক্ষমা করা এবং সহ্য করিবার উপদেশই বিভিন্ন ধর্ম্মের অনুশাসনের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা সত্ত্বেও যে সব হত্যাকার্য্য ধর্ম্মের নামে সংঘটিত হয়, তাহার কারণ অন্ধ ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং মূঢ়তা। প্রত্যেক সমাজের ধর্ম্মনায়ক দিগের এই বিষয় সাধারণকে শিক্ষা দিবার বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিৎ এবং করাচীর দুর্ঘটনার পর আশা করি যে মুসলমান ধর্ম্মনায়কগণ তাঁহাদের সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরের জনগণের ভ্রান্ত ধারণাগুলির নিরাকরণ করিতে সচেষ্ট হইবেন।

করাচীর গুলিবর্ষণ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মধারাও সমর্থনযোগ্য নহে। আবদুল কুয়ায়ামের প্রাণদণ্ডাদেশ হইবার পর হইতেই সিন্ধু প্রদেশে জোরভাবে মুসলমান মোল্লাগণ কর্ত্তৃক যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করা হইতেছিল, তাহার ফলে আবদুল কুয়ায়ামের ফাঁসির পরে অবস্থা কিরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিতে পারে তাহা গভর্ণমেণ্ট উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এবং "পারেন নাই বলিয়াই বেলা দুইটা পর্য্যন্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কেবলমাত্র পুলিশের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। মৃতদেহটা পুনঃপুনঃ কবর দেওয়া এবং কবর হইতে উত্তোলন করিয়া" মিছিলের সহিত "উত্তেজিত জনতার নগর মধ্যে প্রবেশ করিবার জিদকে" কেহই সংযত করিতে পারেন নাই। "মৃতদেহ যথারীতি কবর দিবার পর যদি সশস্ত্র পাহারা বসাইয়া জনতাকে সম্মিলিত হইতে বাধা দেওয়া হইত" তাহা হইলে কোনরূপ ভীড় জমিতে পারিত না এবং ভীড় না জমিতে পারিলে এইরূপ মর্ম্মান্তিক ও শোচনীয় দুর্ঘটনা করাচীতে সংঘটিত হইত না। এই বিষয় লইয়া ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটী মুলতুবী প্রস্তাবের আলোচনা হইয়াছিল; ঐ প্রস্তাবে করাচী দুর্ঘটনার তদন্ত করিবার জন্য দাবী করা হইয়াছে। আমরাও ঐ দাবীর সহিত একমত এবং কর্ত্তৃপক্ষের অবিলম্বে তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা উচিৎ।

সরকারের সুমতি

বাংলা গভর্ণমেণ্ট যে এতদিনে বাংলার উন্নতি কিসে হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে সুরু করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিয়া বাঙ্গালী জন সাধারণ নিশ্চয়ই খুবই ভরসা পাইবে। সম্প্রতি কর্ত্তৃপক্ষ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় "জমি উন্নতি বিধায়ক" বিল নামে এক আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছেন। উহার মূল উদ্দেশ্য যতটুকু আমরা জানিতে পারি তাহা এই—"বাঙ্গলার উত্তর, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চল গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, উৎপাদিকা শক্তিহীন ও ক্ষয়িষ্ণু হইয়া পড়িয়াছে। যদি এই সমস্ত অঞ্চলের ক্ষয়রোধ না করা যায়, তবে বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির উন্নতির কোন আশা নাই। প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য,—ব্যাপকভাবে জল সেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা তথা নদী নালা প্রভৃতির সংস্কার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট এক দিকে ম্যালেরিয়া দূর, অন্যদিকে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবেন। ঐই জন্য অবশ্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইবে এবং নিম্নলিখিত প্রণালীতে গবর্ণমেণ্ট ঐ অর্থ সংগ্রহ করিবেন। প্রথমতঃ

তাঁহারা ঋণ করিয়া বা অন্য উপায়ে জলসেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি করিবেন। তাহার পর উহার ফলে জমির উন্নতি হইলে যে লাভ হইবে তাহার অর্দ্ধাংশ তাঁহারা আদায় করিয়া লইবেন। এই উদ্দেশ্যে বিলে গবর্ণমেণ্টের হাতে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে।"

উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় সরকার যে স্কীম করিয়াছেন তাহাতে বাংলা যে কি রোগে ভুগিতেছে, তাহা তাহারা মোটামুটি ধরিতে পারিয়াছেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী সুধী ব্যক্তিবর্গ বাংলার দুরাবস্থা সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যের বিষয় এতাবৎকাল তাঁহারা ঐ কথায় কর্ণপাত করিতে অবকাশ পান নাই। কর্ত্তৃপক্ষ আজ যাহা করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তাহা যদি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে করিতেন তবে সোণার বাংলাকে আজ শ্মশানে পরিণত দেখা যাইতনা। বাংলার সমস্যা বিরাট; সুতরাং বিরাট সমস্যার সমাধান করিতে নিশ্চয়ই বিরাট প্রচেষ্টার প্রয়োজন হইবে এবং সরকারী স্কীমও অনেকটা সেইরূপ ব্যাপকভাবব্যঞ্জক। সত্য সত্যই যদি সরকার এই স্কীম কার্য্যে পরিণত করেন, তবে অদূর ভবিষ্যতে বাংলার অবস্থা অনেকটা ভাল হইতে পারে। কিন্তু এ দেশের দুর্ভাগ্য নিশ্চয়ই যে আজ পর্য্যন্ত অনেক মহান স্কীম তো করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে কতকগুলি শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে আমাদের আশা দুরাশায় পরিণত হয়। এই সম্পর্কে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা আইন, বঙ্গীয় জল নিকাশ আইন, জলপথ আইন, শিল্প সাহায্য আইন প্রভৃতি বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারি। স্কীম কার্য্যে রূপান্তরিত হউক বা না হউক, কর্ত্তৃপক্ষ যে ক্রমশঃ জন সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন সেইটুকুই আমাদের যথেষ্ট সান্ত্বনা।

স্ত্রীলোকের যক্ষ্মা রোগ

ডাঃ কে সি মুখার্জ্জি বি-এস সি, এম বি

অন্যান্য নিবার্য্য ব্যাধির তুলনায় যক্ষ্মা রোগের সাংঘাতিকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ইহা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়। এই সাংঘাতিক ব্যাধি বাঙ্গালা দেশের জীবনী শক্তিকে বিশেষভাবে হ্রাস করিয়া দিতেছে, এজন্য এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন এবং প্রতীকার ব্যবস্থায় অবহিত হওয়া দেশবাসীর পক্ষে অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য। শুধু জনাকীর্ণ সহরে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নহে, সুদূর পল্লীগ্রাম গুলিও এই সকল ব্যাধির আক্রমণে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার কোনও দেশে এত অধিক সংখ্যক নরনারী এমন মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, সে দেশের সরকার ও জনসাধারণ তাহার প্রতিকার উপায়ে নিশ্চয়ই বদ্ধপরিকর হইতেন।

লণ্ডনে যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত নরনারীর মধ্যে পুরুষের মৃত্যুর হারই সমধিক। কিন্তু দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে ঠিক তাহার বিপরীত। এদেশে যক্ষ্মা রোগ পীড়িত নরনারীর মধ্যে নারীর মৃত্যু সংখ্যা পুরুষের চারিগুণ। বাঙ্গলা দেশে কেন এত অধিক সংখ্যক নারী যক্ষ্মা রোগে মারা যায়, বিশেষজ্ঞগণ তাহার আলোচনা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে, আমাদের দেশের নারীরা সাধারণতঃ শরীরের প্রতি তেমন যত্ন লন না। পোষাক, পরিচ্ছদ আহার্য্য কোন বিষয়েই বাঙ্গালা দেশের মাতৃজাতির লোভ নাই। তাঁহারা স্বামী, পুত্রকন্যা, আত্মীয় স্বজন, সকলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের দিকে অবহিত হইয়া থাকেন। এমন কি পীড়িতা হইয়াও নিজের শরীরের প্রতি উদাসীন থাকেন।

প্রতীচ্য দেশের নারীরা অন্যান্য অসুখ, সর্দ্দি, কাসি কিছুই উপেক্ষা করেন না। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হেতু তাঁহারা জানেন যে, তুচ্ছ ব্যাধি হইতেও কঠিন ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। এজন্য প্রতীচ্য দেশের সাধারণ নারীরা সর্ব্বজন শ্রুত, ফলপ্রদ ঔষধ প্রথমাবস্থা হইতেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধিকাংশ স্থানে দেখা যায়, তাঁহারা সুইজারল্যাণ্ডের সুফলপ্রদ ঔষধ "সিরোলিন রচি" ব্যবহার করেন। আমি অনেক রোগীকে যক্ষ্মা রোগের প্রথমাবস্থায় "সিরোলিন রচি" ব্যবস্থা করিয়া অমোঘ ফল পাইয়াছি। যক্ষ্মা রোগের সূত্রপাত হইতে এই ঔষধ সেবনে অনেক যক্ষ্মা রোগী রোগমুক্ত হইয়াছেন, ইহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে অবগত আছি।

প্রতীচ্য দেশের চিকিৎসা সংক্রান্ত ও অন্যান্য সাময়িক পত্রাদিতে দেখা যায় যে, বহু য়ুরোপীয় গৃহিনী "সিরোলিন রচি" ব্যবহার করিয়া শ্বাসরোগাক্রান্ত সন্তানদিগকে রোগমুক্ত করিয়াছেন। রুগ্ন অবস্থায় দুর্ব্বল শিশুরা কটু বা বিস্বাদ ঔষধ সেবন করিতে চায় না, অনেক সময় ঔষধ সেবন করিবামাত্র বমি করিয়া ফেলে, কিন্তু "সিরোলিন রচি" খাইতে সুস্বাদু বলিয়া বিনা কৈফিয়তে সেবন করিয়া থাকে। আমাদের দেশের মাতৃজাতির স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের বিকাশ সাধন অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে অবহিত হইতে হইবে। দেশের মাতৃজাতির স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে না পারিলে, জাতির কল্যাণ নাই। যক্ষ্মা রোগ যাহাতে প্রতিহত হইতে পারে সে জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে।

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

"পাতালপুরী" (কালী ফিল্মস্)

প্রযোজক—শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

গল্প ও চিত্রনাট্যকার—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আলোক-চিত্রশিল্পী—শ্রীননী সান্যাল

মুলযন্ত্রী—শ্রীমধুসূদন শীল

শব্দযন্ত্রী—শ্রীজগদীশ বসু

শিল্পী—শ্রীপরেশ বসু

ভূমিকা।—মাতলা সর্দ্দার—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী ; মুংরা—শ্রীজীবন গাঙ্গুলী ; ঠিকাদার—শ্রীপরেশ বসু ; টুম্‌নি—শ্রীমতী মায়া মুখার্জ্জী ; বিলাসী—শ্রীমতী শিশুবালা ; টুম্‌নির প্রতিবেশিনী — শ্রীমতী কমলা (ঝরিয়া) ; ও একটি ছোটো অংশে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

প্রথম মুক্তি—"রূপবাণীতে"। গত ২৩শে মার্চ্চ, শনিবার, ১৯৩৩।

শৈলজানন্দের উপন্যাস হিসেবে "পাতালপুরী" প্রথম যখন পড়ি, তখনই ভূমিকায় জান্‌তে পাই—যে, ঘটনাটি বিশেষ করে' ছায়াছবির জন্যেই লেখা। অনেকদিন অকৃতকার্য্য হয়ে, অবশেষে বইটি সেলুলয়েড-এ রূপান্তরিত করবার সুযোগ যখন মিল্‌লো, তখন স্বভাবতঃই শৈলজানন্দ বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। "ছায়া" মিল্‌লো ছায়ায়, তিনি ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে টালীগঞ্জ ও রাণীগঞ্জ ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

তাঁদের তোড়জোড় দেখে ও গল্পের অভিনবত্ব উপলব্ধি করে' অতীতকালে এই "পাতালপুরী"কে আমরা এ বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্র বল্‌তে অনেকবারই কুণ্ঠা বোধ করিনি, এবং চল্‌তিকালেও করতুম না। সত্যিকথা বল্‌তে কি, অনেকেরই মতন, আমরাও আশা করেছিলুম—"পাতালপুরী"কে আমরা প্রশংসা করতে পারবো, একশো বার বল্‌তে পারবো—হ্যাঁ, ছবিখানি অবিশ্যিই দেখবার মত। কিন্তু, সে আশা যে এরকম মরুভূমির মরীচিকায় পরিণত হবে—এ কথা আমাদের মনে উঁকি দিতে একবারও চায়নি, চেষ্টা করা তো থাকুক দূরে !

তবে, এটা অবিশ্যি খুবই সত্যি, যে, "পাতালপুরী"র শুধু প্রথমার্দ্ধ যদি দেখে আস্‌তুম, তা হ'লে নিশ্চয়ই এরকম ভাবে কলম আমাদের ধরতে হ'তো না। সত্যি, সুন্দর হয়েছিলো ছবিখানির বিশ্রামের আগ-পর্য্যন্ত অংশটুকু। এ অংশে একেবারে যে ত্রুটি ছিলো না বল্‌তে চাইনে, তবে যা ছিলো তা ছেড়ে দিয়ে প্রথমার্দ্ধ আমরা বেশ উপভোগ করেছিলুম।

প্রযোজকের প্রথম নম্বর ত্রুটি হচ্ছে অতো ছোটো গল্পটিকে অতোখানি বাড়ানো। অহেতুক দৃশ্য-বৃদ্ধির জন্য দর্শকের মন দ্বিতীয়ার্দ্ধে অত্যন্ত হাঁপিয়ে ওঠে, মন যায়না ভালো করে' ছবিখানি দেখতে। সামান্য একটি ঘটনা যা পাঁচ সেকেণ্ডে দেখালে চলে, কর্ত্তৃপক্ষ সেখানে সবশুদ্ধু সাহায্য নিয়েছেন পাঁচ মিনিটের। দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে খুব খানিকটা কাঁচি চালালে—ছবিটি এ দোষগুলো থেকে একটু মুক্তি পাবে এই আমাদের বিশ্বাস।

"পাতালপুরী"র আরম্ভ যেরকম ভালো, শেষ তার তুলনায় সেইরকমই খারাপ। যবনিকার প্রয়োজন কতখানি আগে হওয়া উচিত ছিলো, তা দর্শকরা অনুভব করলেও কর্ত্তৃপক্ষ অনুভব করতে পারেন নি। যদিও বা শেষ হ'লো—শেষ দৃশ্যে একটি উলঙ্গ মূর্ত্তির কী যে প্রয়োজন তা এখন পর্য্যন্ত ভেবেই উঠতে পেলুম না।

গল্পটির বিষয়বস্তু অত্যন্ত ছোটো, সিনেমা উপযোগী ঘটনা একদিকে যেমন ভারী—অন্যদিকে তেমনই হাল্কা। এতো ছোটো গল্প যে এক নিঃশ্বাসে বলা অসম্ভব নয়। টুম্‌নি, সাঁওতালী এক সুন্দরী, ভালোবাস্‌তো মুংরাকে। কিন্তু, বিয়ের মত দিলো না টুম্‌নির বাবা মাতলা সর্দ্দার। দুঃখিত হয়ে মুংরা ও টুম্‌নি গেলো কয়লা-খনির কাজে। সেখানে বিলাসী বলে' আরেকটি মেয়ে তাকে মুগ্ধ করলে বিলেতী মদ ও তার দেশী রূপ দেখিয়ে। মুংরা তাই টুম্‌নিকে অবহেলা কর্‌লে, এমন কি তাকে একদিন খুন করতেও কুণ্ঠিত হলো না। তাই, টুম্‌নি—পেটে তার মুংরার ছেলে—ফিরে গেলো দেশে। বিলাসী কিন্তু ছিলো ভাড়াটে বিলাসিনী। মুংরার এ সহ্য হ'লো না, তাকে খুন করতে গিয়ে জেলে গেলো ও ভুল বুঝতে পার্‌লে। তাই সে দাড়িশুদ্ধুই দেশে গিয়ে টুম্‌নীকে জড়িয়ে ধরলে।

"পাতালপুরী"র প্রথমাঙ্কে দেখানো হয়েছে—মুংরা রাগ করে' গেলো খনিতে কাজ করতে, টুম্নিও গেলো সেই সঙ্গে। সেখানে মুংরার সঙ্গে হ'লো বিলাসীর ভাব। এই প্রথমার্দ্ধ যে উপভোগ করবার মত আগেই বলেছি। অতি সুন্দর "পাতালপুরী"তে কয়লা খনির introduction, অতি সুন্দর ট্রেণে চড়ে' আকাশের চাঁদ।

তারপর, দ্বিতীয় অংশ। বেশির ভাগ সময় কাটে বিলাসীর বাড়িতে, মদের গেলাসে ও টুম্নির সঙ্গে ঝগড়ায়। বোধহয়, সের পাঁচেক জল মুংরাবেশী জীবন গাঙ্গুলীকে গিল্তে হয়েছিলো বিলাসীবেশিনী শিশুবালার সামনে। এ অংশটির ভালো করবার উপায় আগেই বলেছি।

* * *

"পাতালপুরী" পরিচালনা যিনিই করে' থাকুন না কেন—তাঁর কাজ যে প্রশংসার যোগ্য নয় এ কথা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। সামঞ্জস্য-জ্ঞান থাকলে চিত্রখানিকে দ্বিতীয় অংশে ওরকম দুর্ব্বল করে' তোলার জন্যে আমরা তাকে নিন্দে না করে' পারিনে। আমরা ভাব্তে বাধ্য হচ্ছি প্রথম অংশের পরিচালনা যিনি করেছিলেন, দ্বিতীয় অংশে হয়-তো তিনি সবটা করেন নি। ক্যামেরার সাম্নে একটা জিনিষ তুল্লেই যে পর্দ্দার ওপর তাকে ফেল্তে হবে—তার কোনো মানে নেই। নেহাৎ কয়েকটা দৃশ্য তোলা হয়েছিলো বলে', জোর করে' সেগুলোকে যে জুড়ে' দেওয়া হয়েছে—এ আমরা পরিষ্কার অনুভব করতে পার্ছিলুম। সেগুলো বাদ দিলে নিজের ছবির মঙ্গল তিনি কতখানি যে করতেন—তা বলা অবান্তর মনে করছি। অবিরত একঘেয়েমি, দৃশ্যে থ্রিল থাক্লেও দর্শকের মনে থ্রিলের অভাব-এর জন্যে একমাত্র তিনিই তো দোষী।

সম্পাদনাও তথৈবচ। সম্পাদকের বুদ্ধি আরেকটু বেশী যদি থাকতো তা হ'লে "পাতালপুরী" আরো উন্নত ধরণের ছবি হ'তো সন্দেহ নেই। একঘেয়েমি, অহেতুক দৃশ্য বৃদ্ধি ও একদম অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য প্রভৃতি অন্যতম দোষগুলো তাঁর কাঁচির সাহায্যেই অনেক নষ্ট করা যেত। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, সম্পাদকের এক ফোঁটা কৃতিত্বও আমাদের সাম্নে প্রকাশ পায়নি।

আলোকচিত্রের কাজ "পাতালপুরী"র বেশ ভালো বল্তে পার্ছি বলে' আনন্দিত হচ্ছি। ননী সান্যাল যে একাজে ক্রমশঃ উন্নত হচ্ছেন—এ অত্যন্ত সুখের বিষয়। বাস্তবিক, এ বিভাগের কাজ বেশ উল্লেখযোগ্য হয়েছে। গভীর অন্ধকারে, কয়লাখনির নীচে ননীবাবুর কাজকে আমরা বিশেষ প্রশংসা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নই।

\+ * +

শব্দযন্ত্রের কাজও বেশ পরিস্কার। প্রত্যেকের কণ্ঠই বেশ স্বাভাবিকরূপে পর্দ্দার ওপর প্রকাশ পেয়েছে। যদিও এক আধবার কণ্ঠের দূরত্বের ব্যবধান ঠিক ছিলোনা, ও মোটরের আওয়াজ একবার শোনা গিছলো—তবুও, মোটের ওপর মুলযন্ত্রী মধু শীল ও শব্দযন্ত্রী জগদীশ বসুর কাজও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

* * *

চিত্রখানির নেপথ্য-সঙ্গীতও বেশ ভালো। বিশেষ করে' শুধু বাঁশের বাঁশির সুরগুলি। সবশুদ্ধ চোদ্দখানা গান এতে আছে, তার ভেতর কমলা (ঝরিয়া), শিশুবালা ও কাম্নিদের গান উল্লেখযোগ্য। গানগুলোর বেশ commercial সুর, অতএব প্রায় প্রত্যেকেরই প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ।

* * *

এবার আসল কথা অভিনয়।

মাত্‌লা-সর্দ্দার বেশে তিনকড়ি বাবুর কথা আর কী বল্বো—বাংলার তিনি একজন প্রখ্যাতনামা অভিনেতা। তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে এখন কিছু বলা অবান্তর মাত্র। তবে কর্তৃপক্ষ তাঁর এই বুড়ো বয়েসে তাঁকে দিয়ে আর গানখানা না গাওয়ালেও পারতেন।

মুংরা—জীবন গাঙ্গুলী। সাঁওতালের স্বাস্থ্য অনুযায়ী তাঁকে যতখানি মানিয়েছিলো, অভিনয়ে তিনি কিন্তু ততটা সাফল্যলাভ করতে পারেননি। এঁর অভিনয়ে প্রাণের অভাব পরিলক্ষিত হ'লো। জীবনবাবু, মনে হয়, অভিনেতা হয়েও অভিনয় জিনিষটা এখনও সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি।

ঠিকাদার বেশে পরেশ বসুকে একেবারে ঠিক মানিয়েছিলো। এতো ভালো মানিয়েছিলো—তিনি যে অভিনয় করছেন আমরা বুঝতেই পারিনি। সত্যি, এতো স্বাভাবিক 'পাতালপুরী'র পরেশবাবু।

কয়েকটি ছোটো ভূমিকায় বাংলার একজন নামকরা সাহিত্যিক, "পাতালপুরী"র গল্প ও চিত্রনাট্য লেখক, ভূতপূর্ব্ব "ছায়া"র সম্পাদক ও সম্প্রতি "দুন্দুভি" সম্পাদক—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে মানিয়েছিলো বেশ ভালো। ও রকম অংশে তাঁর নাবা উচিত হয়েছিলো কিনা এ নিয়ে তর্ক করতে আমি চাইনে, তবে এটুকু বল্তে পারি—যে, বাংলার এক নাম-করা

সাহিত্যিককে হাফ্-প্যাণ্ট পরে' ছায়াছবিতে নাবতে দেখা সত্যিই ভারী এক লোভনীয় ব্যাপার!

টুমনির ভূমিকায় শ্রীমতী মায়া মুখার্জ্জির অভিনয় খুব ভালো না হলেও খুব মন্দ নয়। 'বিল্বমঙ্গলে'র একটি অংশে তাঁর অভিনয়ের তুলনায় তিনি যে অনেক—অনেক উন্নত হয়েছেন এ আমরা অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। শ্রীমতী মায়ার ভবিষ্যত উজ্জ্বল হবে যদি তিনি ভাবপ্রকাশে আরেকটু দক্ষতা অর্জ্জন করতে পারেন। সঙ্গীত-বিদ্যেটাও তাঁর আরেকটু আয়ত্ত করা উচিত।

বিলাসীর ভূমিকায় শ্রীমতী শিশুবালাকে যেমন মানিয়েছিলো সুন্দর, অভিনয়ও হয়েছিলো তাঁর চমৎকার। এঁর হাব-ভাব প্রতিটি ভঙ্গীতে, ও চোখে মুখে ইসারায় বিলাসীর রূপ অপরূপভাবে ফুটে উঠেছিলো। এর কণ্ঠ সম্পূর্ণ সবাকচিত্রপযোগী তাই, এর গানগুলোও হয়েছিলো শোনবার মত। অভিনেত্রীদের ভেতর "পাতালপুরীর" সম্মান একমাত্র শ্রীমতী শিশুবালাই দাবী করতে পারেন।

"পাতালপুরী"তে পাতাল যদি না থাক্‌তো, ও যদি তার জন্যে না থাক্‌তো এর কয়লাখনির অভিনবত্ব ও নতুনত্ব, তা হ'লে বলবার আমাদের অনেক কিছুই ছিলো। কিন্তু, তা যখন আছে, এতে আছে যখন এমন জিনিষ যা বাংলা দেশের ছায়াছবিতে আর কোনোদিন তোলা হয়নি—তখন কালী ফিল্মস্-এর "পাতালপুরী"তে যে বিশেষ জনসমাগম হবে—এ আমরা অনায়াসেই বলতে পারি।

নিউ থিয়েটার্স

"দেবদাস"

নিউ থিয়েটার্স-এর নবতম চিত্র, শরৎচন্দ্রের সেই শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের চিত্র সংস্করণ, আগামী ৩০শে মার্চ্চ শনিবার "চিত্রা"য় প্রথম মুক্তিলাভ করবে। পরিচালনা করেছেন প্রমথেশ বড়ুয়া, গত বছর যাঁর "রূপলেখা" বছরের শ্রেষ্ঠ সম্মান—প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। তাঁর অভিনব পরিচালনা শক্তিতে আমাদের বিশ্বাস আছে যথেষ্ট, এবং সেই জন্যই আমরা যথেষ্ট আশা করছি—এ বছরেও তাঁর "দেবদাস" আরেকখানা শ্রেষ্ঠ ছবি হতে চলেছে।

"দেবদাসে"র বিভিন্ন ভূমিকায় বহু নাম-করা সব অভিনেতা-অভিনেত্রী অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের ভেতর নাম-ভূমিকায় প্রমথেশ বড়ুয়া, অমর মল্লিক, দীনেশ দাস, চন্দ্রাবতী, যমুনা ও ক্ষেত্রবালার নাম উল্লেখ যোগ্য।

"দেবদাসে"র কয়েকটি দৃশ্য তোলা আমরা দেখেছিলুম। এবং সে দৃশ্যগুলো দেখে ছবিখানির অপূর্ব্ব সাফল্য সম্বন্ধে আমাদের আর সন্দেহ নেই। দেখেছিলুম—চন্দ্রমুখীর একটি ঘরের দৃশ্য। পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া নাম ভূমিকায় অভিনয় করলেন অপূর্ব্ব। চন্দ্রমুখী—চক্‌চকে চোখ চন্দ্রাবতী—তাঁর অভিনয়ও হ'লো ঝক্‌ঝকে। এলো ক্ষেত্রবালা—ছায়াছবি খানিতে ক্ষেত্রমণি নাম যার। তার সম্বন্ধে আপনাদের আগেই বলেছি। নাচ-শিল্পে আপনাদের কাছে নাম যিনি এ ছবিখানিতে অপেক্ষা করছেন। আর—অমর মল্লিক। বিশিষ্ট এক রকম ভূমিকায় তাঁর স্থান আজ সর্ব্বজনবিদিত—তাঁর অভিনয়ও আপনাদের যে ভাল লাগবে—এ আভাসও আমরা দিতে পারি।

এ হেন অভিনেতা-অভিনেত্রী ও পরিচালকের হাতে পড়ে' নিউ থিয়েটার্স-এর নবতম চিত্র "দেবদাস" আপনাদের আনন্দ দানে যথেষ্ট যে সমর্থ হবে—এ আমরা অনায়াসেই বল্‌তে পারি।

রাধা ফিল্ম

এদের সাফল্য-মণ্ডিত চিত্র "দক্ষযজ্ঞে"-র আসছে হপ্তায় 'জুবিলী' হবে। আশা করা যায়, জুবিলী হপ্তায় ক্রাউনে পূর্ব্ববৎই জনসমাগম হবে। এই হপ্তা থেকে ছবিখানা 'পূর্ণ থিয়েটারে'ও প্রদর্শিত হবে।

কালী ফিল্মস

"বিদ্যাসুন্দরে"র কাজ দ্রুতগতিতে চল্‌ছে। নাচ গানের ছবি বাঙ্‌লায় এ অবধি বেশী তোলা হয় নি। "বিদ্যাসুন্দর" হবে সম্পূর্ণ musical extravaganza.

খুচরো খবর

কেশরী ফিল্মসের "বাসবদত্তা" ছায়ায় মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে।

* * *

এভারগ্রীনের "শেষপ্রশ্ন"ও তাই। এঁদের নাকি শীঘ্রই একটি ষ্টুডিও খোলবার বাসনা আছে—দেখা যাক্।

শ্রীযুক্ত বীরেন রায়

বনাম

"খেয়ালী"

কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম বিভাগে সাউথ সুবার্ব্বন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বীরেন রায় 'খেয়ালী'র পরিচালক, সম্পাদক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে ৫০,০০০ টাকার দাবী করিয়া যে মানহানির মামলা আনয়ন করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে ব্যারিষ্টারত্রয় মিঃ এস্, আর, দাশ; মিঃ ডি, এন, ব্যানার্জ্জি ও মিঃ পি, সি, বসু যথাক্রমে "খেয়ালী"র পরিচালক, সম্পাদক ও প্রকাশকের পক্ষ সমর্থন করিবেন। শ্রীযুক্ত অজিত কুমার দে; মেসার্স মিত্র এণ্ড মিত্র ও শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায় এটর্নীত্রয় মামলাটী পরিচালনা করিতেছেন।

শোক-সংবাদ

হাওড়ার বিখ্যাত সরকার পরিবারের শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সরকারের পুত্র, আমাদের পরম প্রীতিভাজন ভাই শ্রীসুধীর কুমার সরকার গত মঙ্গলবার অপরাহ্নে বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়ে' পরলোক গমন করেছেন। সদা হাসি মুখ সুধীরবাবুর মৃত্যু সংবাদ প্রথমে আমরা বিশ্বাসই করিনি। এইতো সেদিন, একসঙ্গে বসে' গার্ব্বোর সম্বন্ধে কতক্ষণ তর্ক করলুম। 'হাণ্ড্-শেক্' করে বলে এলুম—'বেশ তো, দেখা হবে ফের মেট্রোতে।'

মেট্রোতে সেদিন গিছলুম। কিন্তু সেখানে সবচেয়ে যে বেশী হাস্‌তো, যার সঙ্গে আলাপ ছিলো সবচেয়ে বেশী—তাকেই দেখতে পেলুম না।

কিছুদিন হলো' সুধীরবাবু কল্‌কাতার মেট্রো-গোল্ডইন মায়ারে শিক্ষানবিশী করছিলেন। ছায়াছবি সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য ও মতামত আমাদের কাছে পরমপ্রীতিকর ছিলো। লণ্ডন ফিল্মস্-এর বিখ্যাত অভিনেত্রী মারলে ওবারণ যখন কল্‌কাতায় ছিলেন তখন তিনি মিঃ সরকারের ছিলেন বিশেষ একজন বন্ধু।

সরকার পরিবারের এই নিদারুণ শোকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমাদের আছে কিনা জানিনে; তবে এখন খুঁজে পাচ্ছিনে।

নাট্য-তরঙ্গ

শ্রীনটশেখর

গত ২৮শে ফাল্গুন গিরিশচন্দ্রের দ্বি-নবতিতম জন্মোৎসব প্রাতে গিরিশ-পার্কে এবং সন্ধ্যায় নাট্যনিকেতনে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। উদ্যোক্তা—গিরিশ সঙ্ঘ। কিন্তু আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত উল্লেখ ক'র্‌ছি—যে এই অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে ওঠেনি। যে গিরিশচন্দ্র-কে "নাট্যসম্রাট"—"মহাকবি" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হ'চ্চে—সেই গিরিশচন্দ্রের এরূপ হতশ্রী "এক্কুড়ি সাতের খেলার" মত যেন বাৎসরিক শ্রাদ্ধের আয়োজন করা হ'য়েছিল। গিরিশচন্দ্রের স্মরণ-দিন কি জাতির গৌরবের দিন নয়? তিনি কি বাঙলা জাতির নাট্যকার নন? তাই যদি হয়—তবে "গিরিশ সঙ্ঘ" নাট্যনিকেতনে এই সামান্য আয়োজন ক'রে কী এমন মহাকার্য্য ক'রেছেন?—হয়তো কথা উঠ্‌বে—বিরাট্ আয়োজন ক'র্‌তে গেলে বহু বাধা ও অর্থব্যয় আছে, সে দায় সাম্‌লাবে কে?—যদি সামলাবার কোন লোক না থাকে তা' হ'লে—এরূপ "নাম-রক্ষে"-করার অনুষ্ঠান না করাই ভালো। এই রকম "অমৃতচক্র" বছরে বছরে অমৃতলালের স্মৃতিরক্ষা ক'রে স্বর্গত মহাজনের প্রতি বিপুল শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকেন।—এ-সমস্ত বাজে অনুষ্ঠান-আয়োজন—যা' সমগ্র-জাতির সঙ্গে যোগ নাই—তা'র কোনো সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পেয়েছি—তাঁদের স্মৃতি-পূজার দিনে। কতকগুলো চিরকেলে বক্তার মামুলি অসার বক্তৃতা, কতকগুলো সুযোগ-অন্বেষী আবৃত্তি-পাগ্‌লার কান-ঝালা-পালা কচ্‌-কচানি, আর হঠাৎ গান-লিখিয়েদের গান উদ্ধার ক'র্‌বার মত কতকগুলো ধ'রে-আনা গাইয়েদের কিম্ভূতকিমাকার চীৎকার—ভিন্ন স্মৃতি-পূজায় আর কী হ'য়ে থাকে? জাতির যদি জাতীয় কবি-নাট্যকারের জন্যে টনক না নড়ে—তা' হ'লে বুঝ্‌তে হবে—সেই সেই কবি-নাট্যকারকে জাতি অন্তরে অন্তরে মেনে নেয় নি। আমাদের মনে হয়—বড়লোকদের স্মৃতি-পূজার সুযোগ নিয়ে কয়েকজন মন্দ কবি যশপ্রার্থী সকল-আসর-বিতাড়িত গায়ক, বারোয়ারি তথাবাচ্য বক্তা, ও কতিপয় আ'ড্ডা বৎসরকার একদিন নিজেদের বিজ্ঞাপন বা ঢাক্ (তা' ঢ্যাপ্ ঢ্যাপে হ'লেও) পিটিয়ে নিতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু মহাকালের এমনি বিচার—এঁরা "যে তিমিরে সেই তিমিরে"-ই থেকে যান, হায়রে! গিরিশ পার্কের অনুষ্ঠানে গিরিশ-চন্দ্রের গুণমুগ্ধ শিষ্য ভূতনাথের রচিত একটি গানে প্রকাশিত যে—গিরিশচন্দ্র "ষড়রস দান ক'রে অভিনয়ে প্রাণ" দিয়ে গেছেন। ষড়রস ব'ল্‌তে আমরা বুঝি—অম্ল, কটু, তিক্ত, কষায়, ক্ষার, মধু। অবশ্য ভূতনাথ বাবুর অদ্ভুত আবিষ্কারে আমরা চমৎকৃত। গিরিশ-চন্দ্র যদি এই গুণমুগ্ধ শিষ্যের স্তুতিবাদটি শুন্‌তেন তা' হ'লে নিশ্চয় তিনি ব'ল্‌তেন—"ভগবান, এই গুণমুগ্ধদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করো।" অভিনয়ে ষড়রসের আবির্ভাব কোনোদিনই রীতি নয়—আমরা জানি "নবরস"; তবে ঐ গানটিতে ষঁড়রস টল্‌টল্ ক'রছে।

যাই হোক্, আসল কথাটা এই যে—সে দিন ফাল্গুন-সন্ধ্যায় গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-উৎসবটি আমাদের কাছে কতক পরিমাণে হাস্যকর ব'লেই মনে হোলো। তা'র কারণ আমরা দাখিল ক'রছি।—

প্রথমেই স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ অতি ক্ষীণ কণ্ঠে সন্ধ্যায় মালকোষরাগের আদ্যশ্রাদ্ধ ক'রে হঠাৎ-লিখিয়ে ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি ছন্দ-হীন বড় অর্থ-দুষ্ট গান গেয়েছিলেন। উদ্বোধন-গান রচনা ক'রবার মত কোনো কবি কি বাঙলাদেশে ছিল না, এবং গান গাইবার মত কোনো গায়ক কি নাই? বক্তৃতার কথা পরে আলোচনা করা যাবে—এখন গানের পালাটা শেষ ক'রে নিই।—আশ্চর্য্যময়ীর গীত গান নিন্দনীয় না হ'লেও—ভগ্নকণ্ঠ-সুবাসিনী এবং নীহার বালার গীত গান দু'টি অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। একমাত্র বিভূতি মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গীত গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে একখানি সুরচিত গান দর্শকবৃন্দকে আশ্বস্ত ক'রেছিল। আবৃত্তি যিনি ক'রতে উঠ্‌লেন—তাঁকে নিন্দা ক'রলেও আদর করা হয়।

এবার বক্তৃতার পালা আরম্ভ হোক। বক্তৃতা-ক্ষেত্রে শচীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণি (কেবা দিল এ হেন উপাধি!) হাস্যরসের উদ্রেক্ ক'রেছিলেন,—অথচ তাঁদের কিছু বলা চাইই চাই,—কী ভীষণ জিদ!—শচীনবাবু তো ভুঁড়ি দুলিয়েই সারাক্ষণ সারা হ'লেন। তারপর চিন্তামণি ম'শায় যেই ব'ল্‌লেন—পরমহংসদেবের ভক্তদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র "বয়োজ্যেষ্ঠ" (?)—অমনি দর্শকমণ্ডলী তাঁকে হাততালি দিয়ে বড়ই দমিয়ে দিয়েছিল, আর তিনি অগ্রসর হ'তে পারেন নি। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধা নটী তারাসুন্দরী বক্তৃতা ক'র্‌তে উঠে সকলের কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন; এ-কে সে-যুগের মস্ত বড়

অভিনেত্রী—তার ওপর বক্তৃতা ক'রতে উঠেছেন—এ-তো একটা বিষম বিস্ময় ও আশার ব্যাপার। তিনি বক্তৃতা ক'রতে উঠে সুর টেনে টেনে মামুলি ধরণের থিয়েটারী ঢঙে অভিনয় ক'রতে সুরু ক'রে দিলেন। দর্শকরা পুলকিত হ'য়ে উঠলো—ভাব্লে—ফাঁকি-দিয়ে গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকের বিশেষ বিশেষ অংশ তারাসুন্দরীর মুখে শোনা যাচ্ছে—এর চেয়ে মজা কী আছে। মজার বেশী আর কিছু নয়। স্বামী অভেদানন্দের বক্তৃতায় আমরা self-advertisement-এর বিশেষ আভাস পেলুম। তিনি ২৫ বছর আমেরিকায় ছিলেন কি-না, তা' বোধহয় সেদিনকার আলোচ্য বিষয় নয়,—বরঞ্চ অবান্তর। আর সেই এক কথা,—ধ্যান ক'র্‌ছি এমন সময় গিরিশ শুধু থু থু ক'র্‌লেন—অর্থাৎ এই দেহটাকে থুৎকারের মত পরিত্যাগ ক'রেছেন ইত্যাদি। বহুদিন থেকে গিরিশচন্দ্র-সম্পর্কিত সভায় স্বামীজী বক্তৃতা দিয়েছেন—এই তাঁর অমূল্য লাইনটি শুনে আস্‌ছি। আমরা তাঁকে খুব বড় বক্তা ব'লেই জেনে এসেছি—(অবশ্য লোকমুখে) কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শুনে আমরা চিরদিনই হতাশ হ'য়েছি।

সদ্যনাট্যকার নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য একটি প্রবন্ধ প'ড়েছিলেন। তিনি অনেক অতিশয়োক্তি ক'রেছেন—তথাপি এ-সব ক্ষেত্রে ও-রীতি প্রচলিত। কিন্তু তিনি একটি মস্তবড় ভুলকথা ব'লেছেন ;—তিনি গিরিশ চন্দ্রের তুলনা খুঁজে পেয়েছেন পাশ্চাত্যে এবং শেক্স্পীয়ারই তাঁহার একমাত্র সমতুল্য। কোন্ যুক্তিতে মনোরঞ্জনবাবু এই অতিরঞ্জিত মন্তব্যটি প্রকাশ ক'র্‌লেন ?—তাঁর মনের কথা মনেই গোপন রাখ্‌লেই তিনি সুবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। তিনি কি শেকস্পীয়ারের নাটকগুলি উল্টে পাল্টে দেখে এই শিশু-সুলভ মন্তব্যটি প্রকাশ ক'র্‌তে দ্বিধাবোধ ক'রেন নি ? তিনি যখন এ'কথা বলতে পারেন তখন নিশ্চিত (অন্ততঃ আশা করা যায়) তিনি গিরিশচন্দ্র ও শেক্স্পীয়ারের একটা সৌসাদৃশ্য (সর্ব্ব দিক দিয়ে) দেখিয়ে দিতে পশ্চাদ্‌পদ হ'বেন না। আমরা তাঁকে সাদরে আহ্বান ক'র্‌ছি। সমালোচনা ক্ষেত্রে এ বিষয়টি একটি নূতন গবেষণা হিসাবে গৃহীত হ'বে। নাট্যজগতে শিশির কুমার প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর বক্তব্যের একটি কথা কৌতুকজনক ব'লে মনে হোলো। কথাটি এই—সব নাটক পৌরাণিক ও "যাত্রা"-র পালার মত হওয়া উচিত। এই "যাত্রা"-ই তাঁর কাছে নিজস্ব বস্তু ব'লে মনে হ'য়েছে। এটি তাঁর ধার করা কথা ছাড়া কিছুই নয়, কারণ তাঁর "সীতা", "দিগ্বিজয়ী", "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া", "পূর্ণিমা-মিলন"—ও অপ্রকাশিত "রাবণ"—এলিজাবেথীয় অপকৃষ্ট নাট্য-রচন-রীতি অনুকরণে রচিত। যোগেশচন্দ্র কোন্ যুগে কথা কইছেন—তা' বোধ হয় বিস্মৃত হ'য়েছিলেন, সেই জন্যে তাঁর মুখে এ রকম অযৌক্তিক কথা বাহির হ'য়েছে। তিনি কালের গতি ও দেশবাসীর চিত্তকে বোধহয় অগ্রাহ্য ক'রতে চান, যদিচ তিনি তা' একেবারেই পারেন নি। তাঁর নাট্য রচনা থেকেই আমাদের ধারণা হ'য়েছে—যে তিনি গিরিশচন্দ্রের একজন পুচ্ছগ্রাহী লেখক, সংস্কারের দাস,—তাই যদি না হ'বে—তিনি তো অনায়াসেই সৎসাহসের পরিচয় প্রদান ক'রে যাত্রার ঢোলে "পালা" রচনা ক'রে—বাঙ্‌লার রঙ্গালয়ে একটা নূতন ধারা প্রবর্ত্তন ক'র্‌তে পার্‌তেন। এদিকে বিলেতী নাটকের মোহ ছাড়্‌তে পার্‌বোনা কার্য্য কালে,—অথচ মুখে—"যাত্রা", "যাত্রা" ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'র্‌বার লোভটাও সাম্‌লাতে পারিনা। একেই বলে—"Blowing hot and cold in the same breath।" অধ্যাপক অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রীর বক্তৃতাটাই সারগর্ভ হ'য়েছিল। তিনি গুটীকয়েক বেশ মূল্যবান কথা ব'লেছেন। তিনি ব'লেছেন—

"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্ জ্ঞাতো লোকে স্বর্গে চ কামধুগ ভবতি" সুকবি শব্দ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। সুকবি আবার দুই প্রকার শ্রব্যকাব্যের কবি ও নাট্যকবি। নাট্যরচনাই কবিত্বের চরম উৎকর্ষ ব'লে পরিগণিত হয়—"কবিত্বং নাটকাবধি।" এই নাট্যকবি-রূপে গিরিশচন্দ্র যে সিদ্ধিলাভ ক'রেছিলেন, তা' বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাই ব'লে—পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মনোরঞ্জন বাবু গিরিশচন্দ্রকে শেক্স্পীয়ারের সঙ্গে তুলনা ক'রেছেন—তা'ও সমীচিন নয়। গিরিশচন্দ্র—গিরিশচন্দ্র, শেক্স্পীয়ার—শেক্স্পীয়ার। গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার বৈশিষ্ট্য কোনখানে তা' আলোচনা ক'র্‌লে দেখা

বাগবাজারে বিষম গোল

(তোরা) নব গৌউর বোল।
(এবার) মিয়ার পুরী ন'দে হ'ল
ঘুচলো সকল গোল ॥
হিজ হোলিনেস্ বন্ মহারাজ,
লেক্‌চারে তাক্ লাগালে আজ,
গলায় কণ্ঠির হার, হার হিট্‌লার
বাজায় ক'সে খোল ॥
ইতালীতে মুসোলিনী মত্ত প্রেমরসে,
পোপসাহেবের এবার বুঝি
চাকুরী গেল খ'সে।
ক'সে মাল্‌পো লুসে টমাস্ সাহেব
দিচ্ছে হরি বোল।
নব গৌউর অবতারের নিত্য নব রঙ্গ,
নবীনা শ্রীমতী বামে দাঁড়ান ত্রিভঙ্গ,
মিয়াপুরে বান ডেকেছে
বাগবাজারে বিষম গোল ॥ *

* শ্রীদুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক রসরাজের অনুসরণে রচিত। মিরাপুরের গৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক মহোৎসবে লণ্ডনে গীত।

যা'বে যে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নাটকীয় আদর্শের সমন্বয়ের পথপ্রদর্শক ছিলেন। প্রাচীন ভারতের মূল রস-স্ফূর্ত্তিতে, আর পাশ্চাত্য নাটকের মূল ঘটনা ও বস্তুর (plot) সন্নিবেশে। মহর্ষি ভরত ব'লেছেন—

"ন চাতিরসতো বস্তু দূরং
বিচ্ছিন্নতাং নয়েৎ।
রসং বা ন তিরো'দধ্যাদ্বস্তলঙ্কারলক্ষণৈঃ॥

কেবল রসের প্রাচুর্য্য বা কেবল বস্তু ও টেক্‌নিকের উপর জোর না দিয়ে তিনি তাঁর নাটকে এই উভয়ের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ক'রে গেছেন—এই তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য,—আর এই জন্যই আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান ক'রছি।

অশোকনাথ শাস্ত্রীর একটি মন্তব্য আমরা মেনে নিতে পারি। "গিরিশচন্দ্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নাটকীয় আদর্শের সমন্বয়ের পথ-প্রদর্শক ছিলেন।" সত্যই গিরিশচন্দ্র পথ-প্রদর্শক ছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ ক'রতে পেরেছিলেন কি-না, সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের প্রশ্ন জাগ্‌তে পারে। আর একটি কথা আমাদের মনে হয় যে—গিরিশচন্দ্র—শেক্‌স্পীয়ারকে আদর্শ রেখে নাটক রচনা ক'রতে ব'সেছিলেন। তাই তাঁর নাট্যরচনায় এলিজাবেথীয় নাট্য-রচন-রীতির বহুল প্রভাব দৃষ্ট হয়। তিনি নূতন কিছু সৃষ্টি ক'রে যেতে পারেন নি, তবে বাঙ্‌লা রঙ্গালয়কে অনেক খোরাক যুগিয়ে গেছেন। তাঁর কোনো নাটকই—বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না—এই আমাদের ধারণা। বঙ্গ নাট্য-সাহিত্যের সম্যক্ উৎকর্ষ এখনো সাধিত হয়নি, ক'বে হ'বে তা'ও বলা কঠিন। নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী পৌরাণিক তথ্য "যাত্রা"র পালার ছাঁচে ঢেলেও—মুমূর্ষু রঙ্গালয়ের কোনো উন্নতি এনে দিতে পারবেন না। অপঘাত-মৃত্যু "রাবণের" রচনাতেই তা'র প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

তথাপি গিরিশচন্দ্র মহাকবি না হ'লেও,—এবং নাট্যসাম্রাজ্য শূন্য দেশে নাট্যসম্রাট ব'লে খ্যাতিলাভ ক'রলেও—তাঁকে বাঙ্‌লার একজন বড় নাট্যকার ব'লেই মানা কর্ত্তব্য। কারণ নাট্যজগতে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন—তাঁরা অল্প শক্তির লেখক, তাঁদের সকলের চেয়ে তাঁর বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চের ধরণ-ধারণ অনেক বেশী জানা ছিল। এবং আমাদের রঙ্গমঞ্চ বিলেতী তৃতীয়শ্রেণী প্রাদেশিক রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে সৃষ্ট হ'য়েছে। এইটেই যদি গৌরবের বস্তু হয়—তা' হ'লে এই কঠিন সত্যটাকে চাপা দিয়ে—মিথ্যা আত্মপ্রসাদের দম্ভকে পূজা করাই এখানে উচিত। উৎসব-সভাপতি জলধর সেনের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলি—গিরিশচন্দ্র মানুষ হিসাবে খুব বড় ছিলেন। সত্য কথা—গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, তাই তিনি সেই যুগকে শাসন ক'রে গিয়েছেন—অনাগত যুগ "সকলে ভালো বলে তাই ভালো" এই সংস্কারের মায়া ছাড়্‌তে না পেরে তাঁর নাটক না প'ড়েই তাঁকে অল্প পরিমাণে মেনে নিয়েছে।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি-পূজা-উৎসব যেন আগামী বৎসরে বৃহৎ ব্যাপারে পরিণত হয়, নটনাথের কাছে এই আমাদের প্রার্থনা।

শরচ্চন্দ্রের "বিজয়া" ও তা'র "চরিত্র"

শরচ্চন্দ্রের "বিজয়া"-কে একখানি ভালো নাটক বলা যায় না। সংলাপ (dialogue) চরিত্র বিকাশ ক'রতে সাহায্য করে বটে, কিন্তু শুধুমাত্র উত্তম সংলাপ উচ্চশ্রেণীর নাটক সৃষ্টি ক'রতে পারে না। "বিজয়া"র বৈশিষ্ট্য চমৎকার সংলাপ। এই নাটকের মধ্যে ঘটনার অসামঞ্জস্য দেখা যায়, অনেকস্থলে অনিবার্য্য গতি প্রহত হ'য়েছে—আংশিকভাবে একটি ঘটনার পরে অন্য একটি ঘটনা হুড়্ হুড়্ ক'রে এসে প'ড়ে (over lapping of incidents)। একটি দৃশ্যে অনেকগুলি পরের-পর ঘটনা পুরতে গিয়ে তিনি নাট্য-রচন-নীতি অন্যথা ক'রেছেন! নাটকের দুর্ব্বলতা এইখানে ধরা পড়ে। উপন্যাসে যা' শোভন—নাটকে তা' অনেক সময় বর্জ্জনীয়, এইটুকু উপন্যাসকে নাট্যরূপান্তরিত ক'রতে হ'লে ধারণা রাখা বিধি। এই অন্ধ মায়া অনেক সময়ে ছাড়তে পারা যায় না ব'লেই উপন্যাস থেকে নাটক নাটকের পর্য্যায়ে গিয়ে উঠতে পারে না।

"বিজয়া"রও তাই দোষ।

"বিজয়া"র "নরেন" চরিত্রটি মেরুদণ্ডহীন, "বিজয়া"র হাতে খেলনা বিশেষ। বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরবার আগে খেলিয়ে বেড়ায় (bat'and mouse play) ঠিক সেই রকম

বাগবাজারে বান ডেকেছে

ওরে গৌউর গৌউর বোল।
মহাপ্রভু মাই লর্ড এবার
ঘুচে গেল গোল॥
কাছা খুলে সেণ্ট নিতাই,
হাত তুলে ভাই দিচ্ছে রে তাই,
রাদার জগাই মাধাই—
তাক্ তাক্ সাঁই বাজায় খোল॥
রেভারেণ্ড অদ্বৈত মত্ত প্রেমরসে,
রীচ সার্মন্ করছে প্রীচ,
তুলসীতলায় ব'সে,
ক'সে মাল্‌পো লুসে ন'দেবাসী
দিচ্ছে হরিবোল॥
নদীয়ার গৌউরাঙ্গের কিবা নব রঙ্গ,
সেভিয়র ব'লে এবার ডাক্‌ছে তারে বঙ্গ,
বাগবাজারে বান ডেকেছে,
বদ্বিনাথে বিষম গোল॥ *

* 'গ্রাম্য বিভ্রাটে' স্বর্গত রসরাজ অমৃত লাল বসু কর্ত্তৃক মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের "লর্ড গৌরাঙ্গ"কে কটাক্ষ করিয়া রচিত।

বিজয়া নরেনকে নিয়ে খেলা ক'রেছে। যখনই ডাক পড়ে তৎক্ষণাৎ নরেন ছুটে আসে, এবং যতক্ষণ ব'স্‌তে বলা হয়—প্রায় ততক্ষণ ব'সে থাকে। এই তো হোলো নরেন,—অপমানিত হ'য়েও বার বার যে ঘুরে আসে। ঠিক refined ও cultured আধ-পাগলা শিশুচিত্ত "পরেশ"। নরেনের proportion বা সমতা-জ্ঞান একটু কম। শুধু ডাক্তারীটাই পাশ করে এসেছে, ভালো ডাক্তার কি না তা'র কোনো প্রমাণ প্রয়োগ নেই। মেনে নিলুম—নরেন আপন বিদ্যা-চর্চ্চায় মনীষার পরিচয় দিতে পারে, চিকিৎসা শাস্ত্রে তা'র অত্যন্ত জ্ঞান, কিন্তু সংসারে একেবারে গণ্ডমূর্খ—dull, নির্ব্বোধ। বিজয়ার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার তুলনায় নরেন ছেলে-মানুষ। বিজয়া নরেনের প্রতি প্রথম থেকেই সহানুভূতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠে,—তা'র অন্তরে যা' জেগে ওঠে তা' কৃপা—প্রেম নয়। এবং যে কোনো intellectual মহিলা নির্ব্বোধ পুরুষদের নিয়ে খেলা ক'রতে ভালোবাসে—এ'টি মনস্তত্ত্বের একটি সিদ্ধান্ত।

নরেনের ছেলেমানুষী বিজয়ার উপভোগের উপাদান। এটা তা'র বদ্ধ জীবনের একটা relief বা আরাম। বিজয়ার আচরণ থেকে বিচার করা যায় যে—এই মহিলাটির নরেনের প্রতি বিশেষ প্রীতি ছিল, এবং এই প্রীতি-ই পরে অনুরাগে পরিণত হয়েছিল। বিজয়া যে নরেনকে প্রথম দর্শনেই ভালোবাস্‌তে সুরু করে দিয়েছিল—এ কথা কোনো দিক থেকেই মানা যেতে পারে না। যদি মান্‌তে হয় তাহ'লে বল্‌তে হ'বে—বিজয়ার চরিত্রের কোনো দৃঢ়তা নেই; নরেন কেন—যে কোনো শিক্ষিত সুশ্রী যুবক বিজয়ার মনোযোগ আকর্ষণ ক'রতে পারতো। এ যুক্তির তর্ক নয়, প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এক্ষেত্রে তা' নয়। নরেন বিজয়ার আতিথ্য আদর-আপ্যায়নে গ'লে গিয়েছিল, কারণ নরেনের সত্যকারের ব্যক্তিত্ব ছিল না; হ'তে পারে নরেন আপনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, নিজের সুখ দুঃখে নিজেই সম্পূর্ণ ছিল, তা'র অন্তর কোমল ছিল, তার স্বভাবজাত নিষ্ঠা ছিল, সমাজের হট্টগোল থেকে নিজেকে একান্তবাসী রাখবার চেষ্টা তা'র ছিল,—কিন্তু তাই ব'লে নরেন চরিত্রটি অসাধারণ—এ মন্তব্য প্রকাশ করা নির্ব্বুদ্ধিতার নামান্তর। নরেন একটি অতি সাদা-সিধা চরিত্র, তার বাস্তব-জীবন কতকগুলি Crudity বা immaturity নিয়ে গঠিত। নরেন অত্যন্ত তরলমতি, সরল প্রাণ। নরেন বিজয়ার অনুরোধে হয়তো গরল ভক্ষণ ক'রতেও দ্বিধা ক'রতো না। এ হেন নরেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে-ছিলেন বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। তিনি অল্পবিস্তর পরিমাণে নরেনের চরিত্র-গত সমস্ত ভাব-রস ও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুল্‌তে পেরেছিলেন। তাঁর হাসি উচ্চ হোক্ বা নীরব হোক্ (chuckled laughter) তা'তে কিছু ক্ষতি হয় না। তবে একটা কথা এই যে, নরেনের অভিনয় "আরও ভাল হ'লে খুব ভালোই হোতো।" ঠিক কথাই,—কিন্তু অহীন্দ্র চৌধুরী নরেনের ভূমিকায় কিরূপ অভিনয় ক'রবেন—সে বিষয়ে sanguine হওয়া যায় না। তিনি "চন্দ্র" বাবুর ভূমিকায় একটা উদ্ভ্রান্ত অভিনয় ক'রে অধিকাংশ দর্শককে দিশাহারা ক'রে দিয়ে-ছিলেন ব'লেই যে নরেনের ভূমিকায় তিনি অপূর্ব্ব অভিনয় ক'রতে সমর্থ হবেন, তা' জোরগলায় ব'ল্‌তে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কী হ'তে পারে? নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী তো প্রশ্নের বাইরে।

† * †

আমাদের এক সুরসিক বন্ধু "ড্যাশ দাদা" ব'লছিলেন—এবার হয়তো কোন্ দিন শুনবো যে, রাসবিহারীর ভূমিকায় হরেন ঘোষ, নরেনের ভূমিকায় উদয় শঙ্কর, বিজয়ার ভূমিকায় সিম্‌কি, আর "জ্যাঠা মেয়ে" নলিনীর ভূমিকায় কনকলতা নাম্‌লে নাটকটির পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা হতে পারে।

= উপন্যাস =

উচ্ছৃঙ্খল

শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দশম পরিচ্ছেদ

পিতার মৃত্যুর পর অরুণ ও লীলা কল্‌কাতায় ফিরে এসেছে। পিতার শোক তার মনে গভীর ভাবে বেজেছে। ছেলেবেলায় মাকে হারিয়েছে, তার বাবা বেঁচে থাকলে, তার কাছে না গেলেও তার স্নেহময় পাশ থেকে দূরে সরে থাক্‌লেও তার মন পিতার জন্য কেঁদে উঠতো। সে তার বাবার চরণ চিন্তা করতে পারতো। এখন তার সে সুযোগ ও সুবিধাটুকুও সে হারিয়েছে।

পাপীর জীবনে শান্তি নেই। শান্তির আশায়, সুখের কল্পনায় মানুষ পাপ করে। ভাবে—পরে শান্তি পাবে—তৃপ্তি পাবে। কিন্তু তার জীবনে সুখ হয় না; পাপকার্য্য ছেড়ে দিয়ে সৎকার্য্যে রত হলেও তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়—অনুতাপে দুঃখে।

অরুণ অনেক পাপ করেছে. লীলাকে বিবাহ করে সে অনেকটা শান্তি পেয়েছে। কিন্তু সে শান্তি বেশী দিন স্থায়ী হবে না, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো এখনো হয় নি; সে শুধু পাপই করে গেছে। অনুশোচনা হয় নি, অনুতাপ আসেনি।

লীলার গর্ভে সন্তান, তারই ঔরসজাত। এক অজানিত আনন্দে তার মন পূর্ণ হয়েছে। সে পিতা হবে, সে ঔৎসুক্যের সহিত সেই দিনের অপেক্ষা করছে।

লীলার চোখে মুখে তৃপ্তির ভাব!—সেই অনাগত অতিথির আগমন দিন তারা গুণছে।

তারা কি জানতো সেই অনাগত অতিথির সংসারে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে লীলার জীবন-লীলা শেষ হবে?

…শরতের মধুর অপরাহ্ণ। বিশ্বে অপরূপ মাধুরী, ধীর বাতাস বইছে।

তারা তাদের ঘরের দাওয়ায় বসেছে। ধীরে ধীরে সূর্য্য অজানিত লোকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারি সঙ্গে সঙ্গে খেচর, স্থলচর

জন্য বাসায় ফিরছে। জলচর জলের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করছে। আধখানা চাঁদ আকাশে দেখা দিয়েছে। পাশেই ধানের ক্ষেত, বাতাসে কাঁপছে ধানের শীষ; ধান তখনো পাকেনি। সবুজ গাছ সমুদ্রের মতো নীল,—যেন সমুদ্রের বুকে তরঙ্গ উঠছে।

লীলা বললে: অনেক দিন কবিতা লিখিনি। সময় পাই না, তার ওপর শরীরও ভাল নেই; তুমিও কাছে থাক না, কবিতা কী হয়?

অরুণ বল্‌লে: তোমার কবিতা আর হবেও না, তুমি বড্ড বেশী সংসারী হয়ে গেছ।

—সংসারী হবো না তো উড়ো হয়ে যাবো? তা' হলে তো এতদিনে কিছুই থাক্‌তো না। তুমি কিছুই দেখ না, সবই আমার দেখতে হয়, পুরুষরা ভাবে টাকা রোজগার করছি, এই তো আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল। কিন্তু টাকা খরচ করতে দায়িত্ব যে কতটুকু ভেবে দেখ কি? টাকা আনা সহজ, কিন্তু হিসাবের সঙ্গে খরচ করা কঠিন।

—বেশ তুমি সংসারী হয়েই থাকো না। আমিও তো তাই চাই। কিন্তু কবিতার কথা বলছ? এ সময়ে হাজার হাজার কবিতা রচিত হচ্ছে। কিন্তু তুমি আর আমি শুধু বসে আছি—কিছুই হচ্ছে না। আজকের দিনের মতো কাল্‌কের দিন হবে? আজকে আকাশে যা' দেখছি, কাল হয়তো তা' দেখা যাবে না। আজ যে পাখী এ সময়ে উড়ে যাচ্ছে—কাল হয়তো তারা দেরীতে কিংবা আগে চলে যাবে। আমরা হয়তো দেখতে পাবো না। তাই কবির পক্ষে সব সময়টা নিগূঢ় সূক্ষ্মভাবে প্রত্যক্ষ করা উচিত।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হলো, আকাশের রঙিন রবি অদৃশ্য হয়ে গেল। সাঁঝের বাতি জ্বলে উঠল। আকাশে অসংখ্য তারকা ফুট্‌লো।

লীলা বললে: যাই বাতির সময় হয়েছে।

…লীলা চলে গেল। অরুণ সেখানে বসে ভাবতে লাগলো, কত চিন্তা তার মনে আসতে লাগলো, সে ভাবলে—কত মধুর কল্পনাতীত কাহিনী! আঁধার ঘনীভূত হয়ে এল; সে অন্দরে প্রবেশ করলো।

কয়েক মাস কেটে গেছে, লীলার দশমাস পূর্ণ হয়েছে। অচিরে তার সন্তান মুক্তিলাভ করবে।

হেমন্তের প্রভাত। শাখে শাখে পাখীর গান, ফুলে ফুলে ভ্রমরের গুঞ্জরণ। পাতায় পাতায় সৌন্দর্য্য। গাছে গাছে মর্ম্মর ধ্বনি। সূর্য্য কিরণ নেমে এসেছে, ফুল-কলি ফুটেছে; গন্ধে দশদিক মেতে উঠছে। ফুর ফুর হাওয়া শীতল তৃপ্তিপ্রদ!

লীলা সূতিকাগারে।—

কুলবালাদের হুলুধ্বনি। অরুণ বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো, নব-প্রসূত শিশুর ক্রন্দন তার কানে প্রবেশ করল। অজানিত আনন্দে তার প্রাণ ভরে উঠলো! একটা অমঙ্গল সূচক চিহ্ন তার অমঙ্গল জানিয়ে গেল, সে শিউরে উঠলো।

নিয়তির খেলা, সে কী করে তা' এড়াবে! শিশু-সন্তান প্রসব করে লীলা কাতর হ'য়ে পড়েছে। ধাত্রী শুশ্রূষা করছে।

তার অবস্থা খুব খারাপ। খবর পেয়ে অরুণ ডাক্তার ডেকে আন্‌লো; ডাক্তার রোগিণীকে ফেলে চলে এলো, বল্‌লে ফুস্‌ফুসে আঘাত লেগেছে; তাঁর বাঁচবার আশা নেই!

কী নিদারুণ খবর! সে কাতর আকুল হ'য়ে উঠলো। যার আয়ু যতদিন তার বেশী সে কী বাঁচতে পারে? লীলা পঞ্চবিংশ বয়সেই কালপ্রাপ্ত হলো। তারই সন্তান যে অহর্নিশ স্মৃতি জাগিয়ে দেয়! তার ভালবাসা—তার আকুলতা—স্বামী ভক্তি যে এখনো তার মনে জেগে আছে! সে কী করে তাকে ভুলবে?

তার শ্বশ্রূঠাকুরাণী তাঁর একমাত্র কন্যার মৃত্যু সংবাদ শুনে পাগলিনীর মতো ছুটে এসেছিলেন। তিনি অরুণের গৃহে আছেন।

অরুণ তাঁকে বল্‌লে: মা, আপনি আপনার নাতিকে নিয়ে যান! আমি তাকে বাঁচাতে পারব না! আমার বাবা আমায় মানুষ করেছিলেন—আমি কিন্তু তা পারবো না। তাকে আপনিই রাখুন। সে বেঁচে থাক্‌লে আমি অনেকটা শোক সহ্য করে নিতে পারবো।

তিনি কোন আপত্তি কর্‌লেন না। তাঁর কন্যাকে হারিয়ে তার সন্তানকে পেয়ে তিনি

বুক বেঁধে রইলেন। অরুণের পুত্র, দীপ্তি তারই মাতুলগৃহে মাতামহীর সঙ্গে রইলো।

......মদ নাকি মানুষের দুঃখ ভুলাতে পারে। লীলার শোক তাকে বড়ই ব্যাকুল করে তুলেছে! সে সেই শোক সামলাতে মদ খাবে। ঘরে বসে মদ খেয়ে লোকের তৃপ্তি হয় না। বাঙ্গালীরা মদকে ঘৃণা করে। ঘরে বসে ঘৃণিতবস্তু নিষিদ্ধ জিনিষ পান করবে না। লোকে সেই নিষিদ্ধবস্তু ঘৃণিত-গৃহেই সেবন করে থাকে!

সে আবার সেখানে যাবে। গোপনে বসে তার বাসনা তৃপ্ত করবে।

অণিমার কথা তার মনে পড়ে গেল। সে তার কাছেই যাবে। তার কাছে থাকলে হয়তো পবিত্র জীবনযাপন করতে পারবে।

দুঃখ আসে, একা আসে না, পুঞ্জীভূত হয়েই আসে! গৃহের আশ্রয় ছিন্ন হয়ে গেছে। সে অণিমার কাছে গিয়েছিল সেখানে কয়েকদিন সুখে কাটাতে। তার ভাগ্যে তা'ও নেই। তা'র পাপের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি আরম্ভ হয়েছে! আস্তে আস্তে সে সকল আশ্রয় হারাচ্ছে।

অণিমা তখন রোগ শয্যায়। তার পাণ্ডুর, রোগ-বিমর্ষ মুখখানি তার গমনে আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তার ক্ষীণ দৃষ্টি তাকে দেখে যেন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল। সে বল্‌লেঃ অরুণবাবু, আমি তো যেতে বসেছি। আপনি এসে আমায় শেষ দেখা দিয়ে চরিতার্থ করলেন।

অরুণের হৃদয়ে দুঃখের উচ্ছ্বাস। হতাশার দৃষ্টি! কাতরতায় মন পূর্ণ। বেদনায় হৃদয়-সিন্ধু উদ্বেলিত। তার সতী সাধ্বী পত্নী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। পিতৃদেবকে সে হারিয়েছে জগতের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আস্তে আস্তে বুঝি ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে!

সে ডাকলেঃ অণিমা!

অণিমা চোখ দুটী ঈষৎ বিস্ফারিত করে তার দিকে চাইল।

সে বল্‌লেঃ তুমি শুনেছ অণিমা, আমি লীলাকে হারিয়েছি?

—অণিমার কানে সে কথা বাজ্‌লো। বুকে লাগ্‌লো। সে-ই তো লীলার সাথে তার বিবাহ দিয়েছিল। তাদের ঘরেই তো তাদের শুভরাত্রি। সে লীলাকে কত ভালই না বাসতো। সে—লীলা—আর নেই! তার দু' চোখ বয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিস্মিত হয়ে ক্ষীণ মৃদুকণ্ঠে বল্‌লেঃ কৈ, না,—কী অসুখ তা'র হয়েছিল?

—অসুখ তো তেমন কিছু হয়নি। সে এক শিশু সন্তান প্রসব করেই আমায় ছেড়ে চলে গেছে। সে আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার অবসরটুকু পায় নি। তার মৃত্যুর পর তার বিছানার নীচে শুধু একটী কবিতার খাতা পাওয়া গেছে। সেদিন তার কবিতার খাতা পেয়ে আমি তাকে পাবার জন্য চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম। আজ আরো বেশী

ব্যাকুল হয়েছি। কিন্তু—তাকে পাবার আশা একেবারেই নেই। যদি মরতে পারি তবে তার সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে। সে শুধু জগতে ব্যথার গান শুনিয়ে গেছে নিজের ব্যথা জগতকে জানিয়ে গেছে—আমাদের ভবিষ্যত বংশ-ধরগণ যেন নিজেরা সাবধান হয়ে চলতে পারে। অনিমা কিছু বলতে পারলো না। তার বলবার শক্তি যে নেই। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে মানুষ শুধু তার শেষ কথাটী বলে যেতে চায়। কেউ পারে, কেউ পারে না। অনিমা ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বললে: অরুণবাবু আমার একটী অনুরোধ।

—কী?

আপনি আমার সম্পত্তি গ্রহণ করুন। আপনাকে আমি ভক্তি করি, পূজা করি। আপনার ব্যক্তিগত জীবন কলুষিত হতে পারে, কিন্তু তবু আপনি আমার ভক্তির পাত্র। আপনি আমার এই অকিঞ্চিৎকর দান গ্রহণ করুন। আপনার দেখা পা'বার আশায় আমি এতদিন বেঁচেছিলাম। নতুবা কখন আমার জীবন শেষ হতো, আমি জানি না।

অরুণ বললে: বেশ তো, আমাকে তোমার সর্ব্বস্ব দিয়ে যদি তোমার তৃপ্তি হয় দাও। তার চেয়ে দীন-দুঃখীদের বিলিয়ে দিলে হয়তো তোমার ভাল হতো।

—দেবতাকে দিলেই যে দীন দরিদ্র পায়।

সে না হেসে পারলো না। বিদ্রূপের হাসি! আমি দেবতা! চরিত্রহীন মাতালই তবে পৃথিবীতে দেবতা বলে পূজিত হবে।

সে শুধু তার দিকে তার ক্ষীণদৃষ্টিপাত করে বললে: হ্যাঁ, সে আর কিছু বলতে পারল না। অরুণ তা'র দিকে চেয়ে রইলো। তার মাথাটী নিজের কোলের উপর রেখে অরুণ ডাকলে: অনিমা! তখন সকৌতুকে অপরপারের মধুর ছবি দেখছে।

অনিমার মৃত্যুর পর তার দাহকার্য্য সম্পাদন করা হলো। বাসায় ফিরে অরুণ ভাবলে—অনিমা কি তবে আমার ভালবাসতো? নতুবা সে তার সর্ব্বস্ব আমায় দিয়ে গেল কেন?

(ক্রমশঃ)

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

মনোরম সাধুখাঁ

ফে রে

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সাধারণ মানুষদের সংস্পর্শে এলে কত রকম অভিজ্ঞতা যে অর্জ্জন করতে হয় তার সংখ্যা হিসেব করে' ওঠা কঠিন। এই ফে রে—সে অনেকবার অনেক অদ্ভুত জিনিসের ওপর তার হাতের সই দিয়েছে। একবার সে এক হোটেলে গেলো খেতে, বাট্‌লার বুঝতে পারলে এই সেই বিখ্যাত অভিনেত্রী—ফে রে। সে অভিবাদন করে' ফে'র একটি সই প্রার্থনা করলে। পকেট থেকে পেন্‌সিল বার হ'ল বটে, কিন্তু কাগজ আর বেরোয় না। অনেক খোঁজাখুঁজি, সে ঘেমে উঠলো, তবু এক টুকরো কাগজ তার কাছে নেই। শেষে আর কি করা ফে তার সার্টের শক্ত বুকের ওপর এক সই করে দিলে, বাট্‌লার খুসি হয়ে চলে গেলো।

সম্প্রতি, এরকম অদ্ভুত একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত ঘটেছে। ফে সেদিন বেড়াতে গেছে এক জায়গায়। মোটরের ধারে অসংখ্য ভক্তরা তাকে ঘিরে দাঁড়ালো।

একটি যুবক ছেলে ও মেয়ে, লজ্জার লাল রঙ তাদের গালে, এসে সই চাইলে। এবারের ঘটনাও আগের মত, পেন্‌সিল আছে, কিন্তু, নেই কাগজ। অবশেষে অনুপায় হয়ে তারা যে কাগজখানা বার করলে সেটা তাদের বিয়ের লাইসেন্স।

তারা বিয়ে করতে যাচ্ছিলো গির্জ্জায়, পথে এই ব্যাপার। ফে কিন্তু অভিভূত হয়ে পড়লো। আপনারা বোধ হয় জানেন, ফে কী রকম নাম-করা অনুগত স্ত্রী। সে সেই বিয়ের লাইসেন্স-এর ওপর শুধু সই করলে না, একটি লাইন লিখে, নিজের আন্তরিক শুভেচ্ছাও জানালে।

নতুন যুগ

পুরাণো যুগের যবনিকা হলিউডে সেদিন পড়েছে। এই যুগে সবাই সিনেমা দেখতে যেতো, নাম-করা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর ছবির ওপর নাম দেখে। ধরুন, দেখতে পেলে অমুক সিনেমায়—র‍্যামন নোভারো ও লুপে ভ্যালে নাবছে একসঙ্গে, কিম্বা ঐখানে কে ফ্র্যান্‌সিস্ ও এডওয়ার্ড জি রবিনসন, কিম্বা দোলোরেস্ দেল রিয়ো ও জিন রেমণ্ড—

অমনি সবাই ছুটলো। তারা তখন গ্রাহ্য করতো না, এটা কার ছবি, কে পরিচালনা করেছে, কিম্বা কার গল্প বা কার কী। তারা ছুটলো শুধু কাগজের ওপর নাম-করা সব নাম দেখে। তারা ছুটলো শুধু বিখ্যাত নামের মোহে।

কিন্তু, সে যুগ আমেরিকা থেকে ক্রমশঃ সরে' যাচ্ছে দূরে। মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তে। এখন দর্শকরা আগের থেকে অনেক জ্ঞানী হয়ে উঠছে। তারা এখন শুধু নাম-করা অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম দেখেই ভোলে না, তারা মনোযোগ সহকারে দেখে পরিচালক বা প্রযোজকের নাম। ফ্র্যাঙ্ক কাপ্‌রা, আর্ণশ লুবিশ, ভনষ্টান্‌বার্গ, প্যাবস্ট ইত্যাদি সব নাম তাদের কাছে অধিকতর প্রিয় হয়ে উঠছে।

ভবিষ্যতে হয়তো এমনও বা হবে, যখন পরিচালকের শুধু নাম দেখেই দর্শকরা প্রতিদিন যাবে সিনেমায়।

হলিউডের প্রেম-জীবন

অপরূপ রূপসী ক্যাথলিন বার্ক গ্রেন বার্ডিন্ এর সঙ্গে এক শয্যায় শোয়া বন্ধ করেছে···জন্ গিল্‌বার্ট নাকি তার পূর্ব্ব স্ত্রী ভারজিনিয়া ব্রুস্ এর প্রেমে পড়েছে আবার... তাদের আবার বিয়ে হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।...ক্লদেত কলবার্ট নাকি তার বিখ্যাত বিয়ের সাঙ্গ শিগগীরই করবে।··· কিটি কার্‌লাইল্ এক অজানা যুবকের সঙ্গে খুব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অসম্ভব কাণ্ড

ট্রোক্যাডেরো হচ্ছে হলিউডের একটি নাম-করা নাচবার ও খাবার জায়গা। ছায়াছবি রাজ্যের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বেশীর ভাগ সময়েই সন্ধ্যেবেলা এখানে এসে খেয়ে নেচে গেয়ে আনন্দ করে যান। সন্ধ্যায়ও তাই। এলিসা ল্যাণ্ডি, জিন মুইর, জোন বেনেট্, লিলি ড্যামিটা, আর্ণশ লুবিশ ইত্যাদি ট্রোক্যাডেরোয় বসে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি করছিলেন। হঠাৎ, গার্কোর কালো রঙ-এর গাড়িখানা সেই রেষ্টুরেন্ট এর দরজায় এসে দাঁড়ালো।

কী ব্যাপার? না, গার্কোই এসেছে।

গোড়ায় অবিশ্যি কেউ বিশ্বাসই করতে চাইলে না। কারণ, হলিউডে সেই কবে তো সেদিন গার্কো এসেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ট্রোক্যাডেরোয় পা দিতে তাকে কেউ দেখেনি। কিন্তু, গার্কো সত্যিই যখন এলো, তখন প্রথমটা কেউ নিজেদের চোখকেই তারা বিশ্বাস করলে না। গার্কো! ফ্যাসানেবল্ এক রেস্তোরায়! এও কি সম্ভব!

হ্যাঁ, সম্ভব। ঐ তো গ্রেটা, আগাগোড়া কালো পোষাকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে

গ্লোরিয়া রেনল্ডস্ একজনের নাম, আরেকজনের নাম ডায়না হোয়াইট। সুন্দরীদের অঙ্গ ভালো, ভালো তাদের ভঙ্গী; কী ভালো নয় জিজ্ঞেস করি আপনাদের। বেশী প্রশংসা করতে ইচ্ছে যাচ্ছে না, কারণ, হায়—এরা নিছকই ছবি!

সোজা সে চল্‌লো জনি ওয়াইস্‌মুলার ও লুপে ভ্যালের টেবিলে। সেখান থেকে তার অন্যান্য বন্ধুদের কাছে।

ওয়াল্টার ওয়ান্‌গার, 'কুইন খৃশ্চিনা'র প্রযোজক, এসে জিজ্ঞেস করলে—সে নাচবে কিনা।

গ্রেটা গার্বো

'না, ধন্যবাদ, ওয়াল্টার। নূতন জায়গায় এসেছি, আচার ব্যবহার গুলো একটু শিখে নি।' গার্বো হাস্‌লে।

সবাই অবাক! কী হ'লো, কী ব্যাপার বলোতো গার্বোর?

রাত এগারোটা থেকে আড়াইটে পর্য্যন্ত গার্বো ট্রোক্যাডেরোয় সেদিন ছিলো। না নাচ, না খাবার, না কিছু। শুধু শ্যাম্পেন্‌-এর গেলাসে মাঝে মাঝে চুমুক।

আড়াইটের সময় গার্বো তার বিখ্যাত 'আই ট্যাঙ্ক আই গো হোম নাউ' আর বল্‌লে না, বল্‌লে 'শুভ-রাত্রি বন্ধুরা, আমি এখন যাচ্ছি।'

তার গাড়ি এবার পেছনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ, সদরে অসংখ্য ক্যামেরা-ম্যান এখন দাঁড়িয়ে, ফ্ল্যাশ আর সাটার হাতে একেবারে প্রস্তুত। কিন্তু গার্বো চালাক মেয়ে, নিঃশব্দে, হলিউডের ইতিহাসে নতুন একটা পাতা জুড়ে', সে পেছনের দরজা দিয়ে পালালো তার বাড়িতে।

খুচরো খবর

হ্যারল্ড লয়েড এ বছরে তিনখানা ছবি তৈরী করবে। প্রথমখানা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে।

* * *

জনি ওয়াইস্‌মুলার ও মউরিন ও'সুলাভান আরেকখানা জঙ্গল ছবিতে নাববে।

* * *

টালা বিরেন লু আয়ার্স-এর সঙ্গে নাবছে 'ম্যান ইটিং টাইগার'-এ।

* * *

অ্যানা মে ওয়াও ইটালী সেদিন রওয়ানা হয়েছে, একটি নাটকে অভিনয় করবার জন্যে।

* * *

অল্ জলসন—রুবি কিলারের "ক্যাসিনো ডি প্যারী"তেও তাই। খরচ হয় ১০,০০০,০০ ডলার।

——০——

যৌবনের ভগবান

বসন্তকুমার ঘোষাল

বাজাও ডমরু তব, ওগো রুদ্ররাজ!
সে নিনাদে তন্দ্রা মোর টুটে যাক আজ।
আলোড়ন আনো তুমি, স্পন্দন জাগাও,
অন্তরের বদ্ধ দ্বার দাও খুলে দাও।
ভালে তব, ত্রিলোচন, প্রলয়ের আলো,
সে আলোয় দূর কর হৃদয়ের কালো।
সব পাপ, সব গ্লানি পুড়ে হোক ছাই,
অনলের তীব্র শিখা তাই আমি চাই।
রুদ্রতায় ভরে দাও আমার হৃদয়,
কোমলতা এক কণা নাহি যেন রয়।
যৌবনের বুকে দাও প্রলয়ের সুর,
ভালবাসা, প্রেম, মোহ—সব হোক দূর।
রুদ্রের পূজারী আমি, প্রেমহীন প্রাণ—
হে মদন! শুষ্ক হৃদে হেনো না ও-বান।
মহাকাল! বক্ষে মোর হানো তুমি বাজ,
সারা অঙ্গ ভরি মোর দাও রণ-সাজ।
নিখিলের কলুষতা, হীনতা, আঁধার—
আজিকে সবার সাথে সমর আমার।

——

বেঙ্গল ন্যাশ্‌ন্যাল চেম্বারের কার্য্যাবলীর আলোচনা

মিঃ সুশীল ঘোষের পত্র

"খেয়ালী" সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু—

কলিকাতা

মহাশয়,

আপনার বহুজন সমাদৃত পত্রিকায় আমার এই পত্র প্রকাশ করিলে বিশেষ বাধিত হইব।

প্রারম্ভেই স্বীকার করিতেছি যে, অনেক চিন্তা ও ইতঃস্তত করার পর আমি এই চিঠি লিখিতেছি। কিন্তু জনসাধারণের তরফ হইতে এই ব্যাপারটী বিশেষ গুরুতর মনে করি বলিয়াই আপনার কাগজের মারফতে এই সমস্ত তথ্য বঙ্গীয় জাতীয় বণিক-সভা (Bengal National Chamber of Commerce) ও জনসাধারণের অবগতি ও বিচারের জন্য তাহাদের সমক্ষে স্থাপন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ইতিপূর্ব্বে দুই বৎসর ধরিয়া আমি এই বণিক সভার অবৈতনিক যুগ্ম সম্পাদকরূপে কাজ করিয়াছি এবং কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমক্ষে ইহার প্রতিনিধিরূপেও উপস্থিত হইয়াছি। অতএব এই চিঠির দ্বারা উক্ত বণিক-সভার কোন স্বার্থহানি হইবে কি না সে কথাও আমি ভাবিয়াছি। কিন্তু যেহেতু বঙ্গীয় জাতীয় বণিক-সভা এই প্রদেশের একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় সাধারণ প্রতিষ্ঠান এবং যেহেতু এই দেশের বাণিজ্য বিষয়ক উন্নতির পথে এই প্রতিষ্ঠান বিশেষ সহায়ক বলিয়াই সকলে মনে করে, সেই জন্য জনসাধারণের কল্যাণার্থে সমস্ত তথ্যই অকপটে তাঁহাদের নিকট নিবেদন করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। অতএব আমি আশা ও বিশ্বাস করি যে, আমাকে বাধ্য হইয়া যে কাজ করিতে হইল তাহার জন্য বণিক-সভার কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

সম্প্রতি কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্টে বণিক সভার দুইজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন লইয়া যে তর্কবিতর্ক চলিয়াছে, আমার এই পত্রে আমি সে বিষয়ে কিছু বলিতে চাহি না, কারণ আমার মনে হয় ব্যাপারটী এখনও বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে। ১৯৩৫ সালের ১৯শে মার্চ্চ বণিক-সভার যে সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে, সেই সম্পর্কিত কয়েকটী বিষয় লইয়াই আজ আলোচনা করিতে চাই।

১৯৩৪ সালের কমিটীর যে রিপোর্ট বণিক-সভার সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে পাইলাম

যে, উক্ত রিপোর্টে কমিটীর কোন সদস্যেরই সহি নাই। ১৯৩৪ সালের আয় ব্যয়ের তালিকা ও অডিটর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হিসাবেও সভাপতি বা সম্পাদকের সহি নাই। সেই জন্য ১৪ই মার্চ্চ তারিখে আমি বণিক-সভার সম্পাদক মহাশয়কে একটী চিঠি লিখি। উক্ত পত্রে আমি তাঁহাকে অনতিবিলম্বে আমাকে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি দিতে অনুরোধ করি।

(১) কমিটীর কোনো সদস্য উক্ত রিপোর্ট অনুমোদন ও তাহাতে সহি করিয়াছেন কি না ?

(২) আয়-ব্যয়ের তালিকা ও অডিটর কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হিসাব যাহা প্রচারিত হইয়াছে, কমিটী কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল কি না ? যদি হইয়া থাকে, কোন তারিখে ?

(৩) অডিটর একটী মন্তব্য করিয়াছেন যে, বণিক-সভার আয়-ব্যয় সম্বন্ধে তিনি একটী স্বতন্ত্র রিপোর্ট দিয়াছেন। অতএব সেই স্বতন্ত্র রিপোর্টটী আমাকে প্রেরণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

(৪) হিসাবে যে কয়েকজন ঋণ-কর্ত্তার উল্লেখ আছে (ঋণের পরিমাণ ১১০০৲ শত টাকা) তাহাদের নাম কি ?

(৫) খরচের জন্য ঋণ খাতে যে ৫৫৪৫।০ আনা দেখানো হইয়াছে তাহা আয়-ব্যয়ের তালিকান্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কি না ? যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে জমাখরচের হিসাবে ব্যয় অপেক্ষা আয়ের যে আধিক্য দেখানো হইয়াছে তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইল ?

পরে, আমি সম্পাদক মহাশয়কে আর একখানি পত্র লিখিয়া অবিলম্বে আমার পূর্ব্ব পত্রের উত্তর দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করি। ১৮ই তারিখে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে যে উত্তর পাই, তাহাতে আমি বিস্মিত হই। কারণ, তিনি তাঁহার উত্তরে জানান যে আমি যে সকল বিষয় জানিতে চাহিয়াছি, তিনি সেই সকল বিষয় আমাকে জানাইতে তাঁহার অক্ষমতা "জ্ঞাপন করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন।" সম্পাদক মহাশয়ের উত্তর এবং তাহার পর আমি তাঁহাকে যে পত্রাদি লিখিয়াছি তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। জনসাধারণই ইহার সম্যক বিচার করিবেন। ইতি—

৩৩নং ক্যানিং ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২২শে মার্চ্চ ১৯৩৫

ভবদীয়
এস, সি, ঘোষ

১৮ই মার্চ্চ ১৯৩৫, বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভার সম্পাদকের নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্রের প্রতিলিপি :—

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১৫ই মার্চ্চ ১৯৩৫, তারিখের চিঠি সভার অফিসে অদ্য হস্তগত হইয়াছে। সেই সম্পর্কে আমি আপনাকে ইহা জ্ঞাপন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, আপনি খুঁটীনাটি যে সকল সংবাদ জানিতে চাহিয়াছেন তাহা আপনাকে জানানো সম্ভব নয়। আগামী কল্য (মঙ্গলবার) ৩-১৫ মিনিটের সময় কমিটীর একটী সভা বসিবে। সেই সভায় যোগদান করিবার জন্য আপনাকে আহ্বান করা যাইতেছে। সেই সভায় উল্লিখিত বিষয়গুলি বা অন্যান্য যে কোনো বিষয় আপনি জানিতে চাহেন তাহার আলোচনা করিতে পারেন।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাঃ জে, এন, সেনগুপ্ত
সম্পাদক।

১৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৫, বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভার সম্পাদককে লিখিত পত্রের প্রতিলিপি :—

আপনার অদ্য তারিখের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। বলা বাহুল্য যে, মধ্যে কয়েকদিন ছুটী থাকাতে আমার ১৫ই তারিখের পত্র ইতিপূর্ব্বে আপনার হস্তগত হয় নাই। আমার পূর্ব্বেকার পত্রাদিতে যে সকল বিষয় আমি জানিতে চাহিয়াছিলাম তাহা আমাকে জানাইতে আপনি রাজী নহেন, জানিলাম। আপনার নিকট হইতে আমার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে লিখিত উত্তর চাহিয়াছিলাম, সেই বিষয়ে আপনার কমিটীর সহিত আলোচনা করিবার কোনো অনুরোধ আমি জানাই নাই। এমতাবস্থায় আপনার আমন্ত্রণ অনুসারে আগামী কল্যকার কমিটীতে যোগদান করিয়া কোনো ফলোদয় হইবে না। তদ্ভিন্ন আমি ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না যে, আপনার পক্ষে যে সকল তথ্য আমাকে জানানো সম্ভবপর হয় নাই, আপনার কমিটী আমাকে তাহা কিরূপে জানাইবেন।

আপনার পত্রে আপনি লিখিয়াছেন যে আমার খুঁটীনাটী প্রশ্নের উত্তরদান সম্বন্ধে আপনার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন। আমি জানিতে পারি

কি যে আপনি কাহার দ্বারা "আদিষ্ট" হইয়াছেন, আপনার কমিটী, না সভাপতি কর্ত্তৃক ?

সাধারণ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও আপনি আপনার সদস্যদের প্রয়োজনীয় তথ্য জানাইতে কেন অস্বীকার করিতেছেন, তাহার হেতুও আমি বুঝিতে পারিতেছি না। সদস্যদের নিকট হইতে কোনো কিছুই গোপন রাখা উচিত নহে।

আপনি ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় আগামী কল্যকার আহূত সভার অধিবেশন বিধিবহির্ভূত হইবে। আর সেই সভায় গৃহীত কার্য্যতালিকা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাঃ এস, সি, ঘোষ

২১এ মার্চ্চ ১৯৩৫, বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভার সম্পাদককে লিখিত পত্রের প্রতিলিপি :—

প্রিয় মহাশয়,

আমি সংবাদ পাইলাম যে, বণিকসভার সমস্ত নির্ব্বাচন সম্পর্কে কতকগুলি বিধি ও উপবিধি ১৯এ তারিখের কমিটী সভায় গৃহীত হইয়া উক্ত দিবসেই অনুমোদনের জন্য সাধারণ-সভার সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছিল। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে পূর্ব্ব হইতেই সাধারণ সভার কার্য্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া সাধারণ সদস্যদের নিকট ইহা প্রচার না করিলে সাধারণ বিধি ও উপবিধি গৃহীত ও অনুমোদিত হইতে পারে না। (গঠন বিধির ৪৩াক, ৬ নিয়ম অনুসারে) আমার বিশ্বাস যদি এরূপ হইয়া থাকে তাহা হইলে বণিক সভার কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের পূর্ব্বতন অনিয়মিত ব্যবস্থাকে নিয়মানুগ করিবার ঔৎসুক্যে এইরূপ বে-আইনী উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। অতএব ইহা উল্লেখ করাই বাহুল্য যে, এইরূপ বিধি ও উপবিধি সাধারণ সদস্যদের উপর কার্য্যকরী হইতে পারে না। আমি ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না যে, এই ভাবে বণিকসভার সাধারণ ও বিশেষ অধিবেশন পরিচালনায় অতীতে যে-সকল অনিয়ম হইয়াছে তাহাও কিরূপে নিয়মানুগ হইতে পারে।

এই পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত

স্বাঃ এস, সি, ঘোষ

———

বিবিধ

হোলি সংবাদ

"বড়কাকার" ছাপ হোলি উৎসবের প্রমত্ততার প্রমাণ স্বরূপ অনেকের অঙ্গে ভূষিত হইয়াছিল।

* * *

মৃতকল্প কংগ্রেসের কবন্ধকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কমলদা' মৌলালির সন্নিকটে হোলি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

* * *

কলিকাতার দূষিত হাওয়া পরিত্যাগ করিয়া ভূতপূর্ব্ব মেয়র সন্তোষ কুমার কর্ম্ম-ব্যপদেশে দিল্লী যাত্রা করিয়াছিলেন।

* * *

'নবশক্তি'-বলে বলীয়ান কাপ্তান দত্ত কড়েয়া বাজারে পীরের দরগায় সিন্নী মানত করিয়াছেন। আগামী দোল-পূর্ণিমার দিন কাপ্তানের ব্রত ভঙ্গ হইবে।

* * *

'আনন্দবাজারের' মাখমদা' কথা দিয়াছেন যে, ব্যক্তিবিশেষকে তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া যে অর্থের পরিমাণ হইবে তদ্দারা তিনি আমাদের সকলকে ভূরিভোজে পরিতুষ্ট করিবেন।

* * *

'অমৃতবাজারের' তুষারদা' হোলির দিন এক Circular প্রচার করিয়াছেন যে তাঁহার বিজ্ঞাপন-বিভাগে ভবিষ্যতে কোন অবিবাহিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না এবং যাঁহারা বর্ত্তমানে অবিবাহিত আছেন তাঁহাদিগকে তিন মাসের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। পরমানন্দে অতুলদা' উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

* * *

ম্যালেরিয়া মশকাদির অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াও বন্ধুবর ব্রজেন্দ্র ভদ্র তাঁহার মর্ম্মবেদনা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে নিবেদন করিয়াছেন। বৃন্দাবনে ভেক গ্রহণ না করিয়াই ব্রজেন বাবু কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তণ করিয়াছেন।

* * *

বন্ধুবর নির্ম্মল বসুর সাহচর্য্যে বঞ্চিত হইয়া 'ছোটাইদা'র এবারের হোলির প্রোগ্রাম সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। আমাদিগকে ঠকাইয়া অতি প্রত্যূষেই 'ছোটাইদা' দাদুকে escort হিসাবে সঙ্গী করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। গত বৎসরের মধুর স্মৃতি আমাদের মর্ম্মপীড়া দিলেও আমরা অসহায়। বন্ধু বিশেষের গর্দ্দভারোহণ ব্যর্থ হইল দেখিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। Better luck next year!

* * *

'ব্যচিলর' এটর্ণী বিশ্বপতি তাঁহার বিবাহিত বন্ধু-পত্নীদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হোলির দিন শ্রীরামপুরের রথতলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* * *

সুদর্শন এটর্ণী সুবোধ বসু আমাদের জানাইয়াছেন যে আগামী পহেলা এপ্রিল ব্যচিলর এটর্ণীদের এক অধিবেশন হইবে। স্থান ও সময় বর্ত্তমানে অজ্ঞাত। এই মন্ত্রণা সভায় এটর্ণী-বান্ধব কবিরাজ মশাই "দোললীলা ও আয়ুর্ব্বেদ" সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। "ব্যচিলর এটর্ণী"দের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

* * *

দুর্ম্মুখ সুকুমার হোলির দিন কোথায় মিষ্টিমুখ করিয়াছিলেন নির্ম্মলবাবু ও মেজদা' সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ দেন নাই। ফেরারী দিপুবাবু এবারে ঠকাইলেও তাঁকে স্মরণ করাইয়া দিই—বাছাধন এঁবারে ধান্য ভক্ষণের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হাওড়ায় পলায়ন করিলেও বারান্তরে ইহার হিসাব নিকাশ হইবে।

* * *

হোলির দিন সন্ধ্যায় এস্প্লানেডের মোড়ে 'মমতাজ বেগমের' কার্ড আমাদের গাড়ীতে পড়িলে পকেটে মনিব্যাগের সন্ধান করিয়া দেখিলাম সেটী ফেলিয়া আসিয়াছি। সুতরাং ব্যর্থ মনোরথে বুকের ব্যথা বুকে ভরিয়া কবিরাজ আথড়ায় সাংবাদিক, রাজনৈতিক ও আয়ুর্ব্বেদিক শিক্ষানবিশী করিতে রত হইলাম।

মেগাফোন রেকর্ড

এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানটী স্বল্প দিনের হইলেও, মাসের পর মাস যে রেকর্ডগুলি এখান হইতে প্রকাশিত হয়, সুরের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্যে তাহা অনবদ্য। এই প্রতিষ্ঠানের "খনা" অভিনয়-রেকর্ড জগতে যুগান্তর আনিয়াছে।

কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলন

আগামী গুড্‌ফ্রাইডের অবকাশে (১৮ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা হইতে) তালতলা পাব্‌লিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। সকল সাহিত্যিককেই এই সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা যাইতেছে।

বীণাপাণি সাহিত্য সম্মেলন

গত ৩রা মার্চ্চ রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ পি, এইচ, ডি মহাশয়ের বালীগঞ্জস্থিত 'সুখের নীড়' গৃহে বীণাপাণি সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক সাহিত্য অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কাশীর আরতি সাহিত্য সম্মিলনীর প্রবর্ত্তক ও 'আরতি'র সম্পাদক সুলেখক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভার পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্ন্যাল এম্-এ বি-এল, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কাব্যতীর্থ, শ্রীভাববিলাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহরিপদ গুহ,

শ্রীমনোরমা দেবী সরস্বতী, শ্রীনিস্তারিণী দেবী, শ্রীবিমলা দেবী, শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া, কুমারী লতিকা মুখোপাধ্যায়, কুমারী দীপ্তি দেবী, শ্রীদুর্গা দেবী প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লেখক লেখিকা ও বিশিষ্টব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি পাঠ হয় এবং গান, বাদ্য, নৃত্য ও আবৃত্তিতে সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করা হইয়াছিল। সু-সাহিত্যিক শ্রীহরিপদ গুহর রবীন্দ্রনাথের 'চার-অধ্যায়ের' সমালোচনা, কুমারী প্রভাবতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যের স্বপ্ন' শীর্ষক প্রবন্ধ ও শ্রীবেলা দেবী বি, এ (সম্পাদিকা) মহাশয়ার 'বাণীর পূজা' শীর্ষক প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমারী অশ্রুরাণী চট্টোপাধ্যায়ের সুমধুর গান, কুমারী আভাময়ী গুহর 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তি, ও কুমারী রেণুকা গুপ্তর সু-নৃত্য সত্যই বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। সভার কার্য্যসূচী শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুমধুর ভাষায় একটি সুন্দর ছোট বক্তৃতা প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহার রচিত একটি সুন্দর ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ 'বঙ্গসাহিত্যের-ক্রমবিকাশ' পাঠ করেন। তৎপর তিনি পুনরায় মৌখিকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল কামনা করিয়া সভার কার্য্য শেষ করেন। সভা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে সম্মেলনের কর্ম্মীগণ সভাস্থ সকলকে জলযোগদ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

হাবুদা'র বিয়ে

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র বিজ্ঞাপন বিভাগের অন্যতম কর্ম্মী আমাদের সুপরিচিত প্রভাতদা' ওরফে হাবুদা প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বলক্ষণে 'যোগমায়ার' মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া আমাদিগকে প্রীতি-ভোজে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। 'পত্রিকা'-আপিসের যুবক-কর্ম্মীদের প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে হাবুদা'র যখন ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে তখন হয়ত নববর্ষের আবাহন-গীতির সঙ্গে সঙ্গে অতুলদা "সোনার টোপর মাথায় দিয়ে" অনুরাগ সলিলে অবগাহন করিতে যাইবেন। Best Man's Prize আমাদের ভাগ্যে পড়িবে নিশ্চয়—আর Bride's Maid হইবেন কে তাহার মীমাংসার ভার শচীদার উপর অর্পন করা হইবে। মনুভায়ার একটা বউ যোগাড় না করিয়া দিলে জ্ঞানবাবু আমাদিগকে কলিকাতা ছাড়া করিবেন বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন—আর আমাদের 'সাহেব' নিহাত নাবালক (মনুভায়ার মতে) সুতরাং বেচারাকে এখন হয় সিনেমা দেখিয়া নয় ত বেহালার বেহাগ (?) শুনিয়া সময় কাটাইতে হইবে।

—

ছিটে ফোঁটা
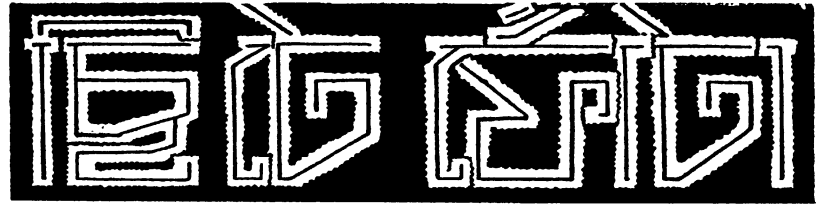
শ্রীবিরূপাক্ষ শর্ম্মা

সাহিত্যের শ্বেতপত্র

ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া বন্ধু টেবিলের উপর একখানি বই সজোরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"এই নাও তোমাদের সাহিত্যের শ্বেতপত্র!" তুলিয়া লইয়া দেখিলাম, বইখানি রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়।"

হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"সাহিত্যের শ্বেতপত্র মানে?"

বন্ধু বলিলেন,—"হাসি নয়। পৌষের "উত্তরা" দেখিয়াছ? না দেখিয়া থাক তো এই দেখ বলিয়া "পুস্তক পরিচয়" পৃষ্ঠা আমার সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন। পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম, পরিচয় দিতেছেন শ্রীঅনাথ নাথ বসু। বন্ধুর নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেখিলাম—"যেদিন কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, সেইদিন হইতে অপেক্ষা করিয়াছিলাম কবে ইহা প্রকাশিত হইবে। বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে ইহা প্রকাশিত হইল।"

অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হইল। তবে কি রবীন্দ্রনাথেরও আজকাল বই ছাপাইবার পয়সার অভাব হইয়াছে? হ'বেও বা, না হইলে কি এই সেদিন রবীন্দ্রনাথের তরফের এটর্ণী মহাশয়দেবের উইলে উল্লিখিত মহর্ষিকন্যা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর মাসহারা কেন দেওয়া হইবে না সমন্ধে তাহার কারণ দেখাইতেন? যাক্, অনুমান করিয়া লাভ নাই। বন্ধুবরকে প্রশ্ন করিলাম—বই প্রকাশ করিতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বাধা বিপত্তি—সে কি হে?"

বন্ধু গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"হয়, "রাজনীতি" পার না। এর জন্য হয়তো কত পরামর্শ, কত কমিশন, কত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা ক'রতে হয়েছে! তাইতো বলছিলাম যে, ইহা সাহিত্যের শ্বেতপত্র বা White Paper। যাক শেষ পর্য্যন্ত সাহিত্যের কমলবন মথিত ক'রে যে এই শ্বেতহস্তী বাহির হ'য়েছে এইটাই বঙ্গ-ভারতীর সৌভাগ্য। না, না,—রেখো না, পরিচয়টা প'ড়ে যাও। নবরস না হোক, অনেক নব-তথ্যের সন্ধান তুমি পাবে।"

কিছু দূর পড়িয়া বলিলাম, "গোরা" ও "ঘরে বাইরে"র এই বইখানি স্বাভাবিক পরিণতি। এই তিনখানি বই একসঙ্গে প'ড়লে তবে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতামত ঠিক সম্পূর্ণ বোঝা যাবে, পরিচায়ক অনাথ নাথ বসু সেই কথাই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু পরক্ষণেই পাঠককে এই পুস্তকের মধ্যে লেখকের মতামত খুঁজতে নিষেধ ক'রে অনাথ বাবুর কি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ দেখেছ! যাক্—এইটুকু বোঝা গেল যে, "চার অধ্যায়" হ'চ্ছে

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক উপন্যাসের তেহাই।" "এখন এই "শমে" পৌছে, রবীন্দ্রনাথ যদি একটু থামেন তাহ'লে তিনিও বাঁচেন, আমরাও বাঁচি।"

কোন উত্তর না দিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলাম। পুস্তকের আভাস সম্বন্ধে অনাথ বাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া সবিস্ময়ে বলিলাম,—"এর মানে।"

বন্ধু সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের মানে?"

বলিলাম, দাঁড়াও পড়িয়া শোনাই:—"হয়ত' রবীন্দ্র নাথ গ্রন্থের আভাসে বিভীষিকা পন্থা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত সুস্পষ্ট করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, সেটা দেওয়া নানা কারণে সমীচিন হইতে পারে কিন্তু রসিক পাঠকের পক্ষে সেটা একান্ত প্রয়োজন নহে. সমগ্র গ্রন্থের গল্পের প্রবাহের অন্তরালে এই আভাস অনতি-লক্ষ্য অথচ সুস্পষ্ট রহিয়াছে।"

বন্ধু বলিলেন,—"কেন, এ'র মানে তো অত্যন্ত প্রাঞ্জল। অভিধানে দেখবার মত একটা কঠিন কথাও তো এতে নেই।"

বলিলাম: "ভাষা যে প্রাঞ্জল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা' বলে বক্তব্যটি প'ড়ে প্রাণ যে জল হ'য়ে গেল সেকথা শপথ ক'রে বল্‌তে পারব না। আচ্ছা, এ সব অদ্ভুত কথার মানে কি? রবীন্দ্রনাথের মত লেখক প্রয়োজন মনে করে উপন্যাসে যে "আভাস"টা জুড়ে দিলেন, পাঠক পাঠ করবার সময় সেটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে নেবেন, কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক লোক যে এ'রকম কথা বল্‌তে পারে. এ ধারণা আমার ছিল না!"

বন্ধুবর বল্‌লেন,—"স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের একটা গানের দুই লাইন তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তাহ'লেই তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে। সেই লাইন দুইটী এই"—

"আমি যদি পিঠে তোর ওই,
'লাথি একটা মারি-ই রাগে
তোর তো আস্পর্দ্ধা বড়,
পিঠে যে তোর ব্যথা লাগে!"

বলিলাম,—"ঠিকই বলেছ। গুরুদেবের প্রতি অন্ধ-ভক্তি বশতঃ ভক্তবর অনাথ বাবু এতই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে প'ড়েছেন যে. সত্য হ'লেও স্বর্গত বন্ধু একদিন বাথিত ও বিশ্বস্ত চিত্তে রবীন্দ্রনাথের কাছে যে একটি গোপন কথা ব'লেছিলেন ত্রিশ বৎসর পরে তার নূতন মানে ক'রে জনসাধারণের সমক্ষে তাকে প্রকাশ করার মধ্যে ভব্যতা ও রুচির যে ত্রুটী তা' তাঁর চোখে পড়ল না! বাঙ্গলা দেশের স্বয়ংসিদ্ধ প্রতিনিধি হ'য়ে তিনি আবার রবীন্দ্রনাথের কাছে এ'র জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।"

বন্ধু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন,—"আহা তুমি উত্তেজিত হ'য়ে পড়ছ কেন? ক্রোধ রিপু, তাকে দমন করাই ভাল। দুষ্কৃত-কারীর উপরও ক্রোধ প্রকাশ ক'রতে নেই, ক'রলে পতন হয়। তোমার বৈষ্ণব সাহিত্যে জ্ঞান নেই। যদি থাকৃত, তো জান্‌তে—

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ির বাড়ী যায়
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।"

ওলট পালট

লাগিয়াছে বড় ডামাডোল।
কার বউ কোথা যায়, বর ক'নে বদ্‌লায়
প্রেম-রাজ্যে বাধিয়াছে গোল!
নারী যে পুরুষ হয় তবু তাহা প্রাণে সয়,
প্রকৃতির 'পরে কার হাত?
নারী হ'লে বারনারী দুঃসহ যে হয় ভারি
স্বামিত্ব কোথায় কুপোকাৎ!
বহুদিন ঘর করি সহসা বিধান স্মরি'
বধূ আজি ধরে নব বেশ,
স্বামী সে যে স্বামী নয়, সাথে শুলে কিবা হয়?
বিবাহের নূতন সন্দেশ
করে পড়ে কার পাতে! ভেবে হাত দেয় মাথে
স্বামিগণ রজনী জাগিয়া!
খাইয়া কামের গুঁতো প্রেম হ'ল রাজ্যচ্যুত,
দ্বারে দ্বারে ফিরিছে কাঁদিয়া।

"বাসবদত্তা"র নাম ভূমিকায় নেবেছেন শ্রীমতী কাননবালা। ওপরে সেই বেশেই সুন্দর একখানা ছবি। দেহের ওপর অনেকখানি আলোয় কাননকে আরো যে ভালো দেখিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কারো। "বাসবদত্তা" "ছায়া"র পর্দায় ছায়া ফেল্‌বে শিগ্‌গীরই।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ২১শে চৈত্র, ১৩৪১, 4th April, 1935. { ১৪শ সংখ্যা

স্বখাত সলিল

বাঙ্গলার কংগ্রেসী কলহের অবসানের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ইউরোপ হইতে প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন, গত শনিবার ৩০শে মার্চ্চ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সাধারণ সভায় উহা উপস্থিত করা হয়। শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন। শ্রীযুক্ত চপলা বাবুর প্রস্তাব ছিল এই—

"প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এই সভা ইউরোপ হইতে প্রেরিত তাঁহাদের সভাপতি শ্রীযুত সুভাষ বাবুর পত্রের নির্দ্দেশসমূহ গ্রহণ করিতেছে এবং তদনুসারে সিদ্ধান্ত করিতেছে যে—

(১) বাঙ্গলার পক্ষ হইতে ওয়ার্কিং কমিটী এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিকে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বর্জ্জনের জন্য অনুরোধ করা হউক।

(২) কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্রে ডেলিগেট ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্য সংখ্যা হ্রাস করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হউক এবং খদ্দর ও কায়িক শ্রম বিষয়ে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করা হউক।

(৩) বাঙ্গলার পক্ষ হইতে সুভাষ বাবুর নাম কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে গ্রহণ করিবার জন্য কংগ্রেস সভাপতিকে অনুরোধ করা হউক।

(৪) প্রাদেশিক সমিতির বর্ত্তমান কার্য্যকরী সমিতি ভাঙ্গিয়া দিয়া উভয় দল হইতে সমান সংখ্যক সভ্য লইয়া নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠন করা হউক। শ্রীযুত সুভাষ বাবু এই নূতন কার্য্যকরী সমিতিরও সভাপতি থাকিবেন।

বলা বাহুল্য, কিরণশঙ্করী দল প্রস্তাবক ও তাঁহার সমর্থকগণকে ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া সুভাষচন্দ্রের নিরপেক্ষ ও সময়োচিত নির্দ্দেশ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ইহাতে দেশের প্রকৃত কর্ম্মী ও কল্যাণকামী সকলেই ব্যথিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা এই কথাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে কিরণশঙ্কর ও তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গগণের নিকট হইতে ইহার চেয়ে ভাল কিছু আশা করা অন্যায়। ভেদ ও বিভেদের উপর যাহাদের প্রতিষ্ঠা, কলহের কর্দ্দমে লুণ্ঠন করিয়া ও অপরের গায়ে সেই কাদা ছিটাইয়া যাহাদের আনন্দ, কলহের অবসান হইলেই তো তাহাদের প্রাধান্য, প্রতিষ্ঠা সবই অন্তর্হিত হইবে!

আজ বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হইতে সিংহ অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, তাই সেই স্থান ফেরুপালের চীৎকারে মুখরিত। কিন্তু চিরদিন এমন যাইবে না! যেদিন মায়ের সুসন্তানেরা মায়ের বুকে আবার ফিরিয়া আসিবে, সেদিন এই কুচক্রীর দল থাকিবে কোথায়? আজিকার সাময়িক বিজয়গর্ব্বে যতই তাঁহারা উল্লসিত হউন না কেন, দেশ তাঁহাদের চিনিয়া রাখিয়াছে এবং কখনও ভুলিবে না! আজিকার কুচক্রীর চক্র সেই দিন ফিরিয়া আসিয়া এই মিথ্যার চক্রব্যুহকে ছিন্নভিন্ন করিবে। যদি তাঁহাদের সত্যদৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতেন যে এ তাঁহাদের জয় নহে, পরাজয়! তাঁহারা স্বখাত সলিলে ডুবিতেছেন!

বিবিধ

নটরাজ নটবর

১১নং ওয়ার্ডে বিপিনদার স্থলাভিষিক্ত নটবরের নট-লীলা কীর্ত্তনের সময় আসন্ন। তাঁহার ভাগলপুর-যাত্রার কাহিনী এগারর পল্লীর বাসিন্দাদের মুখে মুখে ফিরিতেছে। নটবর-পিতা বা ভাগলপুরের সহরতলীর বঙ্কুক ইহার সঠিক সংবাদ প্রচার করিলে করদাতাদের বিশেষ সুবিধা হয়। মদন দত্তের গলির সন্নিকটে পার্ক-গঠনের ইতিহাসের অন্তরালে অন্য কোন গূঢ় রহস্য লুক্কায়িত নাই ত? বারান্তরে আমরা এগারর পল্লীর কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি-কথার বিশদ বিশ্লেষণ করিব।

গোরস্থানের Caretaker

আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে আমাদের পরমপ্রীতিভাজন সুহৃদবর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র কিরণশঙ্করী উপদলের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বাংলার ভাঙ্গা ভেঁপু 'ফরওয়ার্ডে'র de facto ম্যানেজাররূপে শিয়ালদহের গোরস্থানের caretaker হইয়াছেন। বিগত এ্যাসেম্ব্লি নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে সত্যেনবাবুর যে অভিজ্ঞতা হইয়াছিল তাহা তিনি এত শীঘ্র বিস্মৃত হইয়াছেন? তাঁহার assets জানিবার জন্য নলিনীর চরের ব্যগ্রতা তিনি এত শীঘ্র ভুলিয়া গেলেন? সত্যেনবাবুর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। শরৎচন্দ্র ও বিধানচন্দ্রের অজস্র অর্থব্যয় যে "ফরওয়ার্ড"কে পুষ্ট করিতে পারে নাই নলিনীর মুখপত্ররূপে সেই "ফরওয়ার্ডে"র শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা কতটা কষ্টসাধ্য—তাহা বোধ হয় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। কিরণশঙ্করী মায়া কাটাইয়া 'ফরওয়ার্ড" পরিত্যাগ করিলে আমরা যে বিশেষ সুখী হইব তাহা আমরা সত্যেনবাবুকে জানাইয়া রাখিতেছি।

"ছিঁড়িল বীণার তার, শুকাল কমল-হার"

(জনৈক পাঠক লিখিত)

হায়, হায়! কি করিলে খেয়ালী!
একি কাণ্ড অভিনব! একটী ফুৎকারে তব
নিভাইলে মদনের দেয়ালী!
অতি কাছাকাছি যারা ছিল মত্ত আত্মহারা
তফাৎ করিলে সেই দু'জনে,
অধর সুধায় ভরি' ঠোঁটে ঠোঁট এক করি
থামাইলে দু'জনের কূজনে!
ছিঁড়িল বীণার তার, শুকাল কমল-হার
পুন কেলি-কদম্বের তলে
কে আর বাজাবে বাঁশী! আয়ান দাঁড়াল আসি,
সব বুঝি যায় রসাতলে!

নারী কর্ম্ম মন্দির

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে কাপ্তেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত তাঁহার সযত্ন পরিচালিত প্রতিষ্ঠান "নারী কর্ম্ম মন্দির"কে উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—কাপ্তানের ন্যায় উদ্যোগী পুরুষের পক্ষে এইরূপ বৈরাগ্য নেহাত অশোভন বোধ হইতেছে।

বিমলের "কস্তুরী-ভৈরব"

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেনঃ—কলিকাতায় কয়জন বিমলানন্দ তর্কতীর্থ আছেন। শ্রদ্ধেয় শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের এক পুত্র গ্রে ষ্ট্রীটে কবিরাজি করিয়া থাকেন—সুসময়ে পলিটিক্সও করিয়া থাকেন—অর্থাৎ তাঁহাকে "পলিটিকাল কবিরাজও" বলা যায়। তাঁহারই আবাসে উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির এক সভা হইবার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। কংগ্রেসের সভ্য বলিয়া নিত্য বিজ্ঞাপিত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ যশোহর হইতে স্বরাজী এম্, এল্, সি, হইবার জন্য ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস তহবিলে প্রণামী ও সেলামী স্বরূপ কত রজতখণ্ড দিয়াছিলেন তাহা কটবুদ্ধি কিরণই জানে। সম্প্রতি সম্রাটের রজত জয়ন্তীর উদ্যোগ-সভায় কে আর এক বিমলানন্দ তর্কতীর্থ সহস্র মুদ্রা দিয়া কমিটির সভ্য হইয়াছে। এ বিমলানন্দের বসতি কোথায়? দুই এক এবং অভিন্ন, না, দুই পৃথক এবং বিভিন্ন—রামচন্দ্রই বা স্বরূপ ব্যক্ত করিতে এত ব্যগ্র কেন?

ভ্রান্তি নিরসন

গত সংখ্যার "খেয়ালী"তে প্রকাশিত সুধীর সরকারের পরলোক গমনের সংবাদে আমাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধব মহলে একটা ভুলের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে ইঁহাকে "খেয়ালী"র ভূতপূর্ব্ব মুদ্রাকর ও প্রকাশক মনে করিয়া চিঠিপত্রে ও ফোনযোগে সহানুভূতি জানাইতেছেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে শেষোক্ত ব্যক্তি সুস্থ দেহমনে এখনও এজগতে বর্ত্তমান আছেন এবং আশা করি দীর্ঘকাল থাকিবেন।

শ্রেষ্ঠ নাগরিক কে ?

কলিকাতা করপোরেশনের প্রচার-বিভাগের অন্যতম প্রচার-পত্রে প্রকাশ :

শ্রেষ্ঠ নাগরিক
কে
?

যার—

অপচয়ের দিকে লক্ষ্য
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি
সংক্রামক ব্যাধি নিরাকরণে সঙ্কল্প
ভেজাল খাদ্য বিক্রয় বন্ধের চেষ্টা

=আছে=

সে ।

বন্দী জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী যখন প্রচার পত্রের অনুরূপ পরিকল্পনা করেন তাহা হইতে বর্তমানে স্বতন্ত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। তদনুযায়ী প্রচার-পত্রটিকে নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করা সমীচিন বলিয়া মনে করি :—

শ্রেষ্ঠ নাগরিক
কে
?
কলিকাতার সেরা লম্পট
যে ।

কে প্রভু কে ভৃত্য

গত রবিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রচার বিভাগে হেলথ অফিসার ডাঃ মজুমদারের সম্বর্দ্ধনা-সভায় এক বিসদৃশ দৃশ্য আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল। সভায় চিফ্ জে, সি, মুখোপাধ্যায়ের আগমনে অল্ডারম্যান জে, সি, গুপ্তের আসন পরিত্যাগ নিতান্তই অশোভন ঠেকিয়াছিল। আমাদের স্বতঃই মনে উদয় হইয়াছিল—কে প্রভু আর কে ভৃত্য—জে, সি, মুখো না জে, সি, গুপ্ত।

"চুমু খাও—ধীরে খাও কর কেন শব্দ ?"

শ্রীঅ···

আঃ ! যাও, ছাড়ো ছাড়ো,
খুলে গেল ঘোমটা,
নাই কি গো এতটুকু
লজ্জা সরমটা ?

এই ভর দুপুরেতে ঘর করি বন্ধ,
মোর সাথে খুনসুটি আর শুধু দ্বন্দ,
ওকি ! ওকি ! পায়ে পড়ি' ক'রোনাক জব্দ
চুমু খাও—ধীরে খাও কর কেন শব্দ ?

ও ঘরেতে বড় বউ কার্পেট্ বুনছে
জানালায় কাণ পেতে ছোট বউ শুনছে,
তোমার কি ! তুমি বেশ মার মজা ফুর্ত্তি
মা এখুনি চাইবেন জর্দ্দা ও সুর্ত্তী ॥

কলেজেতে গেলে না যে বল্‌লে যে পষ্ট
"মাথা করে কটকট হ'চ্ছে কি কষ্ট"

এই বুঝি মাথাধরা ! এই বুঝি কষ্ট !
মিছামিছি কর কেন পড়াশুনা নষ্ট ?

ওমা, ওকি ! আমি কবে করলুম মানা গো !
মিথ্যাক তুমি বড় মিছে বল নানা গো—
থাক', তবে চল্লুম চীৎকার কোরো না,
যেতে দাও আর কভু বুকে চেপে ধোরোনা ॥

ওকি ! ওকি ! কোথা যাও জামা কেন পরলে ?
সত্যিই রাগ ক'রে কলেজেতে চল্লে ?
নাও বাপু যত পার চুমু খাও দুগালে,
বল্‌বো না কিচ্ছুই বইগুলো পোড়ালে !

খুলে ফেল জুতো জোড়া দাও মোরে কোটটা
পারি নাক' আর বাপু এই নাও ঠোঁটটা ॥
পায়ে পড়ি মিছিমিছি করোনাক' জব্দ
চুমু খাও—ধীরে খাও কর কেন শব্দ ? *

বিদায়ী হেলথ অফিসার

বিদায়ী হেলথ অফিসার ডাঃ মজুমদারকে সম্বৰ্দ্ধনা করিবার জন্য গত রবিবার কর্পোরেশনের প্রচার বিভাগ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের লোহাপটির ওপর এক প্রীতি-সম্মিলনের আয়োজন করেন। চীফ্ জে, সি, মুখোপাধ্যায়, অল্ডারম্যান জে, সি, গুপ্ত, কাউন্সিলার সুবোধ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন বসু, চীফ্ একাউন্টান্ট, নব নিযুক্ত হেলথ অফিসার ডাঃ এল্, এম্, বিশ্বাস, ডি, এল্ ও শ্রীশৈলেন ঘোষাল এবং কলেক্টার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম

১৯২৪ সালের ৫ই মার্চ্চে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর প্রচেষ্টায় দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলার ও এ্যাসেসার মিঃ অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়ের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সেবাশ্রমটী বর্ত্তমানে ৯৭নং ল্যান্সডাউন রোডে স্থায়ী আবাসগৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। গত রবিবার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসুর সভাপতিত্বে সেবাশ্রমের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। কাউন্সিলার প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা, কাউন্সিলার ইন্দ্র ভূষণ বিদ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

* 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-আপিসের Waste paper Basket হইতে সংগৃহীত।

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

মনোরম সাধুখাঁ

ক্লার্ক এর সখ

ক্লার্ক গেবল্ শিকার করতে ভালোবাসে—এ খবর আপনারা সকলেই হয়তো জানেন। সিনেমার ক্যামেরার সামনে তার যতটুকু সময় কাটে, তার বাকীটা সে কাটাতে ভালোবাসে তিনটে জিনিষে।—স্ত্রী, বন্দুক ও ক্যামেরার সাহচর্য্যে। স্ত্রীকে সে ভীষণ ভালোবাসে। তার প্রথম নম্বর প্রমাণ হচ্ছে—সে বলে—পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী যে দশজন মেয়ে আছে, তার একজন হচ্ছে তার স্ত্রী। দ্বিতীয়—পৃথিবীর যে ক'জন শ্রেষ্ঠ মেয়ে—তার স্ত্রীও সেই দশজনের ভেতর একজন। এ হেন সম্মান যে তার স্ত্রীকে দিতে পারে, সে তার স্ত্রীকে কতোখানি যে ভালোবাসে তা সবার বোঝা খুব কঠিন নয়। তার সেই বিরাট ভালোবাসার আর দু'জন ভাগী হচ্ছে—তার ক্যামেরা ও বন্দুক। এ দুটিকে সে সমান ভালোবাসে। কোনো জন্তু বা পাখী মারতে যাবার সময় তার মন আকুল হ'য়ে ওঠে একটা ছবি তুলতে। আবার, তাদেরই ছবি আগে তুলতে হ'লে তার প্রাণ আবার ব্যাকুল হয়ে ওঠে বন্দুকের জন্যে। গেবল্ পড়েছিল সম্প্রতি মহামুস্কিলে। সমস্যার মাঝখানে পড়ে' তার ছবিগুলো হ'তো খারাপ, শিকারও হ'তো না ভালো। অতএব, অনেক ভেবে চিন্তে সে এক অভিনব উপায় বার করেছে। তার বন্দুকে সে লাগিয়ে নিয়েছে এক ক্যামেরা। গুলি ছোঁড়ার জন্যে যেমনি না ঘোড়া টেপা, অমনি ক্যামেরার 'সাটার'ও ওঠে টিপে। এতে ভারী সুবিধে, শিকারও হয়—ছবি তোলাও বাদ যায় না।

ক্ল্যারা বো'র সম্বন্ধে যিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন—তার জবাব মনোরম সাধুখাঁ এ সপ্তাহে দিয়েছেন।

কে প্রেমিক বেশি?

ক্লার্ক গেবল্ এর কথা বলায় তার সম্বন্ধে আরেকটি কথা মনে পড়লো। একে নিয়ে হলিউডে আজকাল এক মহা গোলমাল পড়ে' গেছে—কে প্রেমিক বেশি? রুডলফ ভ্যালেন্টিনো না ক্লার্ক গেবল্? ক্লার্কই বড়ো, কারণ ভ্যালেনটিনোকে পছন্দ করতো বেশি একমাত্র মেয়েরা। মেয়েদের সে ছিলো সোনালী স্বপ্ন, গোলাপী রঙ ও বকুলের হাওয়া। মেয়েদের বুকের লকেটে, হাতের আংটিতে বা চুলের পিনে ভ্যালেনটিনোর প্রতিকৃতি থাকা হয়তো সম্ভব ছিলো, কিন্তু ছেলেদের পকেটে তার ছবি পাওয়া ছিলো দুষ্কর। এর থেকে প্রমাণিত হয়—ভ্যালেনটিনো ছিলো মেয়েদের, ছেলেদের নয়। কিন্তু, এই ক্লার্ক ঠিক তার উল্টো। তার ছবি ছেলেদের বুক-পকেটে যেমনি আরামে বাস করে—মেয়েদের বুকেও তাই। ছেলেরা চায় তার মত প্রেম করতে, মেয়েরা চায় তার মত প্রেম পেতে।

ক্ল্যারা বো'র কথা

ক্ল্যারা বো'র সম্বন্ধে সম্প্রতি এক পাঠক কিছু জানবার জন্যে অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন। আশা করি নীচের খবরে তিনি সন্তুষ্ট হবেন।

ছেলে হবে বলে' ক্ল্যারা বো 'হুপলা'র পর আর কোন ছবিতে নাম লেখায় নি। গত ফেব্রুয়ারী মাসে তার ছেলে হয়েছে। নাম—রেক্স লারলো বেল্। তার স্বামীর নাম আপনার হয়তো অজানা নয়—রেক্স বেল্। সন্তানের মা হবার জন্য ক্ল্যারা ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। রেক্স লারবো পৃথিবীতে সেদিন এসে দেখে—তার জন্যে অনেক খেল্না-জামা-কাপড় অনেকদিন আগেই কেনা হয়েছে। এমন কি একটি বাচ্চা ঘোড়াও তাকে পিঠে নিয়ে বেড়াবার জন্যে অপেক্ষা করছে। আনন্দের আতিশয্যে তার বাপ মা কিন্তু এটুকু ভাবে নি, যে, লারবো যখন ঘোড়ায় চড়তে পারবে, তখন বাচ্চাটা হয়ে যাবে অনেক বড়ো। যাকৃগে, সন্তান-কোলে ক্ল্যারা ফিল্ম থেকে সম্প্রতি ছুটি নিয়েছে। সে বলেছে—লারবো বেশ বড়ো না হলে আমি ক্যামেরার সামনে আর নাবছি নে। তবে ভবিষ্যতে ছবি তৈরি করলে সে যে ফক্স এর হ'য়েই করবে এ আমরা জানি।

তাকে এই ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন—C/o Fox Studios, 1401 N. Western Avenue, Hollywood, California.

খুচরো খবর

বেটি ডেভিস বিঙ্ ক্রস্‌বির সঙ্গে আজকাল নাব্‌ছে 'মিসিসিপি'-তে।

‡ * ‡

জোয়েল ম্যাক্‌ক্রিয়া ও ক্লদেৎ কলবার্ট 'প্রাইভেট্ ওয়ার্লড্‌স্'-এ প্রেম করছে।

* • *

জিন পার্কার-এর পরের ছবি হচ্ছে 'প্রিন্সেস্' ও 'হায়া'।

চলতি পথে

শ্রীমল্লিনাথ

দুরপনেয় কলঙ্ক

"বাংলার রাজনৈতিক দলাদলি কি কোন কালেই মিটিবে না ?"—এই প্রশ্ন গত ৩০শে মার্চ্চ তারিখের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভা হইয়া যাইবার পর পুনরায় জনসাধারণের মনে জাগিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বাংলার কংগ্রেসী কলহের পরিসমাপ্তি ঘটাইতে অনুরোধ জানাইয়া প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদককে একটী পত্রে যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, তাহা গত ৩০শে মার্চ্চ তারিখের সভায় আলোচিত হইয়াছিল এবং অতি দুঃখের বিষয় যে সুভাষ বাবুর প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের চক্রান্তে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিতে কর্ত্তৃত্ব করেন, তাঁহারা অধুনা-বিলুপ্ত "সুভাষী দলের" অন্তর্গত বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন এবং শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্রকে নেতা হিসাবে স্বীকার করেন বলিয়া আমরা জানিতাম। আমাদের আশা ছিল এই কারণে হয়তো সুভাষচন্দ্রের চিঠির নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হইবে এবং তাহা হইলে বাংলার কংগ্রেসী কোন্দলের অবসান হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু আমরা অযথা আশান্বিত হইয়াছিলাম। এবং সেই মরীচিকা-সম অযথা আশার মোহে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে যাহারা বাংলার বর্ত্তমান কংগ্রেসী কর্ত্তাদের নেতা এবং পথ প্রদর্শক হিসাবে কাজ করেন এবং খ্যাত, তাঁহাদের অন্যতম হইতেছেন শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়। কিরণ শঙ্করের ব্যক্তিগত চরিত্র নিষ্কলুষ, তিনি perfect gentleman হিসাবেও খ্যাত, কিন্তু এতগুলি সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও বাংলার কংগ্রেসী ঝগড়ার একজন প্রধান পাণ্ডা যে তিনি তাহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য কথায় বলে একহাতে তালি বাজে না ; কিরণ বাবুই বাংলার ঘরোয়া বিবাদের একমাত্র শনি। কিরণবাবু চিরদিন সুভাষ-অনুরক্ত হিসাবে পরিচিত থাকিয়া আজ যে কোন কারণেই হোক না কেন হয়তো বা নিষ্ঠুর অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁহাকে সুভাষচন্দ্রের বিপক্ষতা করিতে হইতেছে

ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত

জাতীয়তাবাদী কর্ম্মী ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তকে আসন্ন প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া বাংলার কংগ্রেস কমিটিগুলি বাংলার দাবী সমর্থন করুন।

বাংলার কংগ্রেসে তাঁহার ন্যায় শনিমার্কা জীব আরও অনেক আছে। বাংলার দুরপনেয় কলঙ্ক কংগ্রেসী কোন্দল যদি সত্যসত্যই মিটাইতে বাংলার নিঃস্বার্থ কর্ম্মী সম্প্রদায় বদ্ধপরিকর হ'ন, তবে তাঁহাদিগকে সব পূর্ব্বেই এই শ্রেণীর কংগ্রেসী অপনেতাগুলিকে বাংলার কংগ্রেস প্রাঙ্গন হইতে বহিস্কার করিতে হইবে ; ইঁহাদের যতদিন কংগ্রের অভ্যন্তরে গতিবিধি থাকিতে দেওয়া যাইবে ততদিন কংগ্রেসে বিবদমান দুই পক্ষের নিঃস্বার্থ কর্ম্মীসম্প্রদায়ের মিলন কিছুতেই সাধিত হইবে না।

সভাপতি হইবেন কে ?

দিনাজপুরের আগামী প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি কে হইবেন তাহা লইয়া জোর গবেষণা চলিতেছে। এক পক্ষ, যাঁহারা জাতীয় দল বলিয়া খ্যাত, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত মহাশয়কে সভাপতি করিতে সচেষ্ট এবং অপর পক্ষ, যাঁহারা বর্ত্তমানে কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কীয় না-গ্রহণ না-বর্জ্জন সিদ্ধান্তে আবদ্ধ, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়কে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিতে তদ্বির করিতেছেন। এই ব্যক্তিদ্বয়ের সভাপতি হইবার যোগ্যতার পর্য্যালোচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ডাক্তার বিধানচন্দ্র ব্যক্তিগত হিসাবে যোগ্যতর ব্যক্তি। সাধারণতঃ যাহারা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সেই সেই প্রদেশের নেতা হিসাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, কেন না তাঁহারা প্রদেশের বিভিন্ন জেলার মনোনয়নে অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হয়েন। তবে সব ক্ষেত্রেই যে নির্ব্বাচন আইনানুযায়ী এবং নির্ব্বাচক মণ্ডলীর বিবেক সম্মতভাবে সাধিত হয় তাহা নহে, বরং অনেক সময়ে দলগত রাজনৈতিক মতামতের চক্রান্তে উপযুক্ত ব্যক্তিও নির্ব্বাচনে পরাজিত হয়েন এবং এইরূপ উপদল-ঘটিত ও চক্রান্ত-সাধিত নির্ব্বাচনের ফলে প্রদেশের অবস্থার যথাযথ পরিচয় প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রতিফলিত হয় না। সেই হিসাবে আমরা আশঙ্কা করি যে, ডাক্তার বিধানচন্দ্র নেতা হইবার বেশী উপযুক্ত হইলেও তিনি যদি দিনাজপুরের প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন, বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বাংলার প্রকৃত মনোভাব তিনি ব্যক্ত করিতে পারিবেন না। ডাক্তার বিধানচন্দ্র না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন নীতির পরিপোষক, কিন্তু বাংলা দেশ যে তাঁহার মতের সমর্থন করে না তাহা গত ব্যবস্থা

পরিষদ নির্ব্বাচনে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও তাঁহাকে সভাপতি করিতে দলবিশেষ কেন সচেষ্ট হইয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। তাঁহার মতের সমর্থন যদি বাংলা দেশ করিত তবে গত ব্যবস্থা পরিষদ নির্ব্বাচনে বিধানচন্দ্রের পক্ষীয় প্রার্থীগণের অধিকাংশ ক্ষেত্রে যোগ্যতর ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও শোচনীয় ভাবে পরাজিত হইতে হইত না। গত ব্যবস্থা পরিষদ নির্ব্বাচনে অতি সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে যে বাংলা দেশ তাঁহার নেতৃত্বে আস্থাহীন। এবং আমরা যতদুর জ্ঞাত আছি তাহাতে মনে হয় যে, ডাক্তার রায়ের গত নির্ব্বাচনের অভিজ্ঞতায় যথেষ্ট শিক্ষালাভ হয় নাই এবং এখনও পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেসের বর্ত্তমান ক্লৈব্য-নীতির পরিপোষকতা করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় বাংলার বিভিন্ন জেলা-রাষ্ট্রীয় সমিতিগুলি যদি উপদলীয় চক্রান্তে পড়িয়া ডাক্তার রায়কেই মনোনীত করেন তবে তাহা রাজনৈতিক আত্মঘাতী হওয়ার সমতুল্য হইবে। বাংলার বর্ত্তমান মনোভাব অনুসারে যিনি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধী তাঁহাকেই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা উচিত এবং সেই হিসাবে ডাক্তার বিধান চন্দ্র এবং ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তিরই দিনাজপুরের সভাপতিত্ব করিবার অধিকতর দাবী আছে বলিয়া মনে হয়।

* * *

এই প্রসঙ্গে অতি দুঃখের সহিত আমরা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি যে উত্তর বঙ্গের প্রবীন ও জ্ঞানবৃদ্ধ জননায়ক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আধুনিক কার্য্যধারা জনসাধারণের মনে এক ধোঁকার সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি কলিকাতায় জাতীয় দল সম্মেলনে যোগদান করিলেন এবং কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতির নিন্দাবাদ করিয়া বক্তৃতা করিতেও কসুর করিলেন না, কিন্তু এখন শোনা যাইতেছে যে, তিনি তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং অনেকেই সন্দেহ করেন যে তিনি তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের ভারে দিনাজপুর সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কীয় বাংলার পক্ষে মারাত্মক-জনক ক্লৈব্য-নীতি সমর্থন করাইয়া বাংলাদেশের বহুদিনের সাধনালব্ধ জাতীয়তার ভিত্তি চূর্ণ করিয়া দিবেন। আমরা স্বীকার করি যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতের পরিবর্ত্তন কিছুতেই পাপকার্য্য নহে, কিন্তু অযথা চক্রান্তে জড়াইয়া আত্মবিবেকের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক মতের পরিবর্ত্তন কিরূপে সমর্থনযোগ্য? যোগীন্দ্র বাবু বাংলাদেশে একজন স্বাধীনচেতা নেতা হিসাবে পরিচিত, এবং তাঁহার সেই সুনাম তাঁহার জাতীয় দল সম্মেলনে যোগদান এবং বাংলার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বক্তৃতা দেওয়ায় যথেষ্টই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি আংশিক ভাবেও সত্য হয়, তবে অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত বলিতে হইবে তাঁহার আদর্শবিচ্যুতি ঘটিয়াছে। আশা করি বাংলার এই বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ নেতা বাংলার জনগণকে স্বীয় ব্যক্তিত্বের বশে ভুল পথের সন্ধান দেবেন না।

"পরকে করিলে নিকট বন্ধু—"

জার্ম্মাণী ভার্সাই-সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করার ফলে বিশ্ব-শক্তি সমুহের মধ্যে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা খুব সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিবার বিষয়। জার্ম্মাণী যুদ্ধের পূর্ব্ব যুগে ছিল বিশ্ব-ত্রাস। যুদ্ধের পর সে হইয়া পড়ে হীন-বীর্য্য দুর্ব্বল, পঙ্গু। কিন্তু তলে তলে সে যে এত শক্তি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ভীরুতার অপমান মুছিয়া ফেলিবার জন্য পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে, এ যেন বিশ্বের কাছে একটা অন্যতম বিস্ময়! তাই শক্তি গর্ব্বিত জার্ম্মাণীকে সায়েস্তা করিবার জন্য ইতিমধ্যে ফরাসী, বৃটেন ও ইতালী এই ত্রিশক্তির মিলিত বৈঠক

হইয়া গিয়াছে। এই তিন শক্তির পরস্পরের মধ্যে মনের মিল হয়ত' নাই। ইতালীর ফ্যাসিষ্টদের সহিত ফরাসী ও বৃটেনের মনের মিল থাকিতেই পারে না। তথাপি তাঁরা উদ্ধত জার্ম্মাণীর অতি-বাড়ন্ত মনোভাব সহ্য করিতে পারেন নাই বলিয়া সব মত বিভিন্নতা ভুলিয়া একই মিলন-তীর্থে অবগাহন করিয়াছেন। উদ্দেশ্য, এখনকার গোলমালটা ত' চুকিয়া যাক, পরের কথা পরে আছে।

এই তিনশক্তির মতের ঐক্য সম্ভব হওয়া বিচিত্র নয়। কাজেই এদের মিলন লক্ষ্যের বিষয় নয়। লক্ষ্যের বিষয় যেটা, সেটা যেমনি অভিনব, তেমনি অশোভন। সোভিয়েট রুশিয়া আদর্শবাদিতার দিক দিয়া অন্যতম রাষ্ট্র। বিশ্বের চিন্তাধারার মধ্যে এক বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল সে। তাদের মতবাদের কোন স্থানে Compromise-এর ইঙ্গিত ছিল না, বিশ্ব-বিপ্লব ছিল তাদের Slogan. সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহ ছিল তাদের নিন্দা-সমালোচনার একমাত্র কেন্দ্রস্থল। এই আদর্শবাদী রাষ্ট্রের সহিত যদি সাম্রাজ্যবাদীদের মিলন সম্ভবপর হয় তবে অহী-নকুলের মিলনও অসম্ভব নয়, ইহাই ছিলো আমাদের ধারণা। কিন্তু আমাদের সে ধারণা বদলাইয়াছে। আমরা বুঝিয়াছি, স্বার্থ জগতে অসম্ভবও সম্ভব করিতে পারে। জার্ম্মানীর চোখ রাঙানীতে সন্ত্রস্ত হইয়া সোভিয়েটকে হাত করিবার জন্য বৃটিশ প্রতিনিধি মিঃ এন্টনি ইডেন মস্কোয় গিয়াছিলেন। কমরেড ষ্ট্যালিন ও এম, লিটভিণফের (রুশিয়ার পররাষ্ট্র সচিব) সহিত তাঁর মোলাকাত হইয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে এম, লিটভিনফ বৃটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনা করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমার মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল। অর্থাৎ তোমরা ও আমরা এক। এই সব মিলনের জন্য আমরা জার্ম্মানীকে ধন্যবাদ দিই। ধন্য জার্ম্মানী তোমার এক ধমকি দ্বারা "পরকে করিলে নিকট বন্ধু"......। সাধু! পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি, তোমায় ধন্যবাদ।

বিশ্ব-শক্তির মনস্তত্ত্ব

পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রীক ধুরন্ধররা বিশ্ব শান্তি চান। বিশ্বশান্তির জন্য তাঁরা মরেন, বাঁচেন। বিশ্ব শান্তির জন্যই বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ, অস্ত্র হ্রাস সম্মেলন ইত্যাদি আরো কত কী। কিন্তু অস্ত্র যারা হ্রাস করিলে বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে তারা অস্ত্র ও সমরসম্ভার বাড়াইয়াই চলিয়াছে। ফ্রান্স, আমেরিকা ও ইতালী তাদের অস্ত্র, বিমান ও সেনাবাহিনী বিপুল ভাবে গঠন করিতেছে। জার্ম্মানী ইহাদের এই উদ্যম প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু লীগ সে কথা কানে তোলে নাই, তাই সে লীগের ভণ্ডামী বুঝিতে পারিয়া রাষ্ট্র সঙ্ঘ ত্যাগ করে। যখন অন্য রাষ্ট্র অস্ত্র বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত তখনও সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত মনে করে নাই। এই জন্যই সে ভার্সাই সন্ধি উপেক্ষা করিয়া বিমান বাহিনীগঠন করিয়াছে ও বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়াছে। তথাপি বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব স্যার জন সাইমনকে হিটলার বলিয়াছেন যে, বিশ্বশান্তি জার্ম্মানীর কাম্য। অন্য রাষ্ট্র অস্ত্র হ্রাস করিলে সেও সেই অনুপাতে অস্ত্র হ্রাস করিবে। সাইমন সাহেব এদিকে কিন্তু উচ্চবাচ্য করেন নাই। ওদিকে আবার সাইমন সাহেবদের বন্ধু অর্থাৎ মিত্রশক্তি ইতালী তাল ঠুকিয়া বেড়াইতেছে। আবিসিনিয়াকে জব্দ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে, এককথায় ইতালীর সীমান্তে এক সামরিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছে। তাকে সায়েস্তা করার চেষ্টা না করিয়া এঁরা কোল দিলেনই বা কেন? কোন মনস্তত্ত্ব তাঁদের এইরূপ ব্যবহারের জন্য প্রেরণা দিল বুঝি না। ইউরোপীয় রাজনীতি সত্যই অত্যন্ত জটিল। সাধু মন লইয়া উহা বুঝা যায় না।

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

"দেবদাস"

প্রযোজক—নিউ থিয়েটার্স লিঃ

পরিচালক—প্রমথেশ বড়ুয়া

গল্প—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আলোক-চিত্র—নীতীন বসুর তত্ত্বাবধানে, ইয়ুসুফ মুলজী, দিলীপ গুপ্ত ও সুধীন মজুমদার

শব্দযন্ত্রী—লোকেন বসু, শ্যামসুন্দর বিশ্বাস, ননী মিত্র

সঙ্গীত-পরিচালক—রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক

গান—বানীকুমার

সম্পাদক—সুবোধ মিত্র

ভূমিকা:—দেবদাস—প্রমথেশ বড়ুয়া, পার্ব্বতী—যমুনা, চন্দ্রমুখী—চন্দ্রাবতী, ক্ষেত্রমণি—ক্ষেত্রবালা, চুনীলাল—অমর মল্লিক, ভুবন চৌধুরী—দীনেশ দাশ, ধর্ম্মদাস—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অন্ধভিখারী—কৃষ্ণচন্দ্র দে, দ্বিজদাস—নির্ম্মল দাশগুপ্ত, জনৈক ভদ্রলোক—সায়গল, মহেন—শৈলেন পাল, গাড়োয়ান—অহি সান্যাল, যশোদা—লীলা, জলদবালা—কিশোরী, বড়-বৌ—প্রভাবতী।

প্রথম মুক্তি—"চিত্রা"য়, ৩০শে মার্চ্চ, ১৯৩৫।

নিউ থিয়েটার্স-এর "দেবদাস" দেখে এলুম, সেই সঙ্গে দেখে এলুম বাংলাদেশের ছায়া-চিত্র-শিল্পে নতুন এক ধারা ও প্রথার এক প্রবর্ত্তন। পুরোণো যুগ বাংলাদেশের মিলিয়েছে অতীতে, এসেছে উন্নত, সোনালী নতুন যুগ। এতদিন পর—এতকাল অপেক্ষার পর, আমাদের সোণার বাংলায় এই নতুন শিল্প তা হ'লে সোণারই হ'তে চলেছে। এ দেশে, এই শিল্পের ধারা এতো শিগ্‌গীর এতোখানি যে উন্নত হবে—এ কথা আমরা সত্যিই ধারণা করতে পারি নি। "দেবদাস" সেদিন শত্রুমিত্র সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে—যত ছবি আজ পর্য্যন্ত তৈরী হয়েছে—বাংলায় তাদের সঙ্গে তুলনা এর নেই। তাদের থেকে এ বহু দূরে, সে দূরত্ব মাপ-কাঠি দিয়ে মাপা আজ থেকেও অনেকের অনেকদিন পর্য্যন্ত আকাশ-কুসুম হ'য়ে থাকবে। বাংলার এই শিল্পে, উত্তরোত্তর এই উন্নত প্রথা ও ধারা প্রবর্ত্তন যে একমাত্র নিউ থিয়েটার্স-এরই সম্ভব—এ ধারণাও আমাদের মনে "দেবদাস" দেখার পর অমর ও অটল হয়ে রইলো।

সত্যিই, এতো অবিশ্বাস্য ও অদ্ভুত্ রকমের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে এই "দেবদাস"।

শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাস, সমালোচকরা বলেন, লেখার আর্টের দিক থেকে এর খুব দাম নেই। কারণ, এ উপন্যাসের যখন জন্ম তখন শরৎচন্দ্রের কলম একেবারে নতুন। অবিশ্যি—এ সমস্ত কথাই শরৎচন্দ্রের অন্যান্য সব বিখ্যাত উপন্যাসের তুলনায়। তবুও, আমরা জানি, আর্ট হিসেবে এই বইখানা সমালোচকদের কাছে খুব বিখ্যাত না হ'লেও, আমাদের কাছে এটি অতি আদরের। কেন জানিনে, ঠিক করে' বুঝে উঠতে পারিনে এর আসল কারণটা কী। এই বিখ্যাত

উপন্যাসের এতো সুবিখ্যাত চিত্র-সংস্করণে পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া যে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা দেওয়া সত্যিই সহজসাধ্য নয়।

এই উপন্যাসের সবাকরূপ দেবার খবর আমাদের কাণে প্রথম যখন এলো, তখন এর এতোটা সাফল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আমাদের ছিলো। তার প্রথম নম্বর কারণ—শরৎচন্দ্রের উপন্যাস আজ পর্য্যন্ত চিত্রে খুব কমই প্রশংসনীয় হয়েছে। আর, দ্বিতীয়তঃ—বিশেষ করে' এই "দেবদাস"-এর গল্প পর্দ্দার ওপর রূপ দেওয়া দুরূহ রকমের কঠিন ব্যাপার। কিন্তু, পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমাণ করেছেন—ওসব আমার কাছে নয়, আর যে কারো কাছে হয়তো হতে পারে।

সর্ব্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয় হয়েছে উপন্যাসখানিকে একখানি ছায়াচিত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী করে' তোলা। একটি উপন্যাস যেমন ভাবে পড়ে' আমরা আনন্দ পাই, সেই উপন্যাসখানাকেই যদি দু'টুক্‌রো কাঁচ, কিছু সেলুলয়েড-এর ফিতে ও একটা আর্কল্যাম্প-এর সাহায্যে হুবহু পর্দ্দার ওপর ফেলি তা হ'লে উপন্যাসখানার উপন্যাসত্ব যে কোথায় গিয়ে পড়ে—সহজেই অনুমেয়। প্রমথেশবাবুর "দেবদাস" তাই প্রকাশ পেয়েছে সেই শাখায় যে শাখায় শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" প্রকাশ পায় নি, অথচ আসল মূল তাদের এক। উপন্যাসখানি থেকে ঘটনা সংগ্রহ করে' যতটুকু দেখাবার দরকার ঠিক ততটুকুই প্রমথেশ বাবু দেখিয়েছেন, দরকার যখন হয়েছে নতুন কোনো জিনিষের সংযোজনা করতে তিনি কুণ্ঠিত হন্ নি।

যে আব্‌হাওয়ায় শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" জন্মগ্রহণ করেছিলো, সে আব্‌হাওয়া চল্‌তি-কালের সাধারণের রুচিতে পোষাবে না—প্রমথেশ বাবু তা বুঝেছিলেন। চিৎপুর রোডের চন্দ্রমুখীর ঘরে তাই তামাকের সরঞ্জাম দেখিনা। শরৎচন্দ্রের চন্দ্রমুখী দিব্যি গড়গড়া টান্‌তো, কিন্তু প্রমথেশবাবুর চন্দর যেমন মদ খায় না, তেমন তামাকও টানে না।

চন্দ্রমুখীকে প্রথমে দেবদাস ঘৃণা করতো। সে মদ খেতো তার দুঃখ ভোলবার জন্য আর 'এখানে থাকবো বলে শুধু মদ খাই।' সে যে চন্দ্রমুখীকে প্রথমে ঘৃণা করতো তার স্পষ্ট প্রতীয়মান প্রমথেশবাবুর দেবদাস করেছে—মদের বোতল দিয়ে চন্দরের ছবি ভেঙ্গে। এর সংযোজনায় মদে দেবদাস যে কতদূর মাতাল হ'তো—শুধু তাই প্রকাশ পায়নি, প্রমাণ করেছে এ হেন মেয়েদের প্রতি তার আন্তরিক ঘৃণা। অতি সুন্দর এই সংযোজনা!

* * *

দেবদাসের গল্প আবার বলা বাহুল্য মাত্র। পরিচালনায় প্রমথেশবাবু যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তার যে তুলনা নেই আগেই বলেছি। প্রমথেশবাবু সারা বাংলা সারা ভারতবর্ষের গৌরব। অত্যন্ত উঁচুদরের—যে উচ্চতা

আমাদের কল্পনারও ছিলো অতীত—তাই হয়েছে 'দেবদাস'-এর পরিচালনা। সারা ছবিতে এমন একটি দৃশ্য নেই যেটা বাজে, যেটা দেখতে একটুও কষ্ট হয়। দ্রুত হচ্ছে প্রমথেশবাবুর টেম্পো—যা দর্শককে ক্রমশঃ আরো উৎসুক ক'রে তোলে। অতুলনীয় তাঁর হচ্ছে পরপর দৃশ্যগুলোকে সাজানো, অপরূপ তাঁর পরপর ঘটনা পরিবেশন। সারা ছবিতে প্রমথেশবাবু এক ফুট ফিল্মও বাজে জিনিষ দেখিয়ে নষ্ট করেন নি, তাই প্রত্যেক দৃশ্যটিই দর্শকের কাছে পরমপ্রীতিকর, পরম আগ্রহের বস্তু।

দেবদাসের প্রতি নীলকণ্ঠ চক্রবর্ত্তীর মেয়ে পার্ব্বতীর প্রেম যে কতখানি গভীর ছিলো তা শরৎচন্দ্রের থেকে প্রমথেশবাবু ফুটিয়ে তুলেছেন অনেক বেশী। তাদের ভেতর দূরত্বের পরিমাণ অনেক বেশী থাক্‌লেও, মন যে তাদের এক—এইটি প্রমাণ করবার জন্যে যে সমস্ত দৃশ্য তিনি দেখিয়েছেন সে গুলো অতি চমৎকার। অতি চমৎকার সে দৃশ্যের ফল। তাদের মনের এই ঘাত-প্রতিঘাত গুলো দর্শকের মনে অনেকদিনই থাক্‌বে।···বহুদূরে দেবদাস চলেছে—ট্রেণে, অসুখের প্রবল চাপে হঠাৎ সে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ঠিক সেই সময়েই শ্বশুর বাড়ীতে পুজোর ফুল নিয়ে চলেছিলো পার্ব্বতী. হঠাৎ সে ফুলের ডালাও তার হাত থেকে পড়লো নীচে।···দেবদাস বুঝি আর বাঁচেনা ; নিদারুণ অসুস্থ শরীরের জ্বালা সে আর সইতে পারেনা, পার্ব্বতীর কথা মনে পড়লো—সে শপথ করে এসেছিলো অন্ততঃ মরবার সময় সে একবার যাবে। অতি কষ্টে ট্রেণের জানালার কাছে সে মুখ নিয়ে গভীর কণ্ঠে একবার ডাক্‌লে—পারু। হাতিপোতা গ্রামের জমিদার চৌধুরী ম'শায়ের ঘরের জানালা তখুনি দম্‌কা এক বাতাসে খুলে' গেলো। পারু চিৎকার করে উঠলো কে? কে?...

সবচেয়ে স্মরণীয় দৃশ্য হচ্ছে দেবদাস মুখুজ্যের মৃত্যু-সংবাদ পার্ব্বতীর কাণে যখন এলো। মহেন নিয়ে এলো সংবাদ, হুবহু বর্ণনা দিলে। পার্ব্বতী ছুটলো—'আমি যাই'। 'ওমা, কোথা যাও?' 'দেবদাদার কাছে।'...চশমার ভিতর দিয়ে চৌধুরী মশায় বল্‌লেন—যায় কে? 'ছোটো মা'। 'সে কি? কোথায় যায়?' 'দেবদাসকে দেখতে।' 'তোরা কি সব ক্ষেপে গেলি! ধর—ধর—ধরে আন ওকে!...ও মহেন, ও কনে বৌ!' আর কনে বৌ! পারু ছুটেছে দেবদাসের, জ্ঞান নেই, দিশেহারা। পারু ছুটেছে—সে যে আস্‌বে বলেছিলো। সামনের দিকে লোহার ফটক বন্ধ হচ্ছে। বন্ধ হ'লো—ঢং! পারু অজ্ঞান!—চারদিকে চেয়ে দেখি—দর্শকদের চোখে জল, মুখে কথা নেই, নিস্তব্ধ। কী অপূর্ব্ব, কী অপরূপ climax! 'ব্রেইন্ আছে বটে বড়ুয়ার' বল্‌লে এক সাহিত্যিক।

* * *

চিত্রখানির ফটোগ্রাফীও প্রমথেশ বাবুর পরিচালনার মত অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। এতো ভালো ফটোগ্রাফী আগে অন্য কোনো ছবির হয়নি—এ আমরা অনায়াসেই বল্‌তে পারি, বিশেষ করে' ট্রেণ-শট্‌গুলো এতো চমৎকার যে—বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে যায় না ওরকম ফটোগ্রাফী ভারতে সম্ভব কিনা। অতুলনীয়, একেবারে হলিউডের জৌলস চিত্রটির প্রতি রীল্-এর ফটোগ্রাফীতে। চিত্রখানির এই অপূর্ব্ব সাফল্যে নীতিন বসু মহাশয় যে অনেকখানি দায়ী—সে বিষয়েও আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

* * *

শব্দযন্ত্রেরকার্য্যাবলীও চমৎকার, পরিস্কার, জীবন্ত 'দেবদাস'-এর শব্দ।

* * *

সঙ্গীতগুলোও 'দেবদাস'-এর সৌন্দর্য্যের বিশিষ্ট একটি অঙ্গ। কৃষ্ণচন্দ্র দে ও মিঃ সাইগল দু'জনেই তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখে গান গেয়েছেন। নেপথ্য-সঙ্গীত ও সুরের বৈচিত্রে দর্শকদের মনোহরণ করেছিলো। একটা জিনিষ খুবই ভালো লাগলো—যে—উপসংহারে ঔপন্যাসিক যা বলেছেন ঠিক তাই বলেছে কেষ্টবাবুর মুখ দিয়ে বাণীকুমারের গান।

* * *

সম্পাদনাও অনিন্দনীয়।

* * *

অভিনয়। আমরা বল্‌তে অত্যন্ত আনন্দিত হচ্ছি যে চিত্রখানির এ অংশটিও বিশেষরকম উচ্চাঙ্গের। সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য অবিশ্যি প্রমথেশ বড়ুয়া, কারণ চিত্রটির পরিচালক যেমন তিনি, নাম-ভূমিকার অভিনেতাও আবার তিনি। এঁর অভিনয় পূর্ব্বের অন্যান্য অংশের তুলনায় অত্যন্ত সুন্দর ও চিত্তগ্রাহী হয়েছে। পরিচালনা ও নামভূমিকায় অভিনয়—দু'টি একসঙ্গে করা ভারী কঠিন ব্যাপার। কিন্তু, আবার প্রমথেশবাবু প্রমাণ করেছেন—ওসব আমার কাছে নয়, আর যে কারো কাছে হয়তো হ'তে পারে।

যমুনা পার্ব্বতীর ভূমিকায় অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছেন। পার্ব্বতীর অংশটি কতদূর করুণ আপনাদের অবিদিত নেই। শ্রীমতী যমুনা এই করুণ অংশের অনুরূপ ভাবপ্রকাশে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। একজন অবাঙ্গালী অভিনেত্রীর বাংলায় এহেন অভিনয় বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তিনি যদি আরেকটু স্বাস্থ্যসম্পন্না হতেন তা হ'লে আমাদের দেশে সুঅভিনেত্রীর অভাব একটুখানি যে কমতো এ কথা আমরা অনায়াসেই বল্‌তে পারি।

চন্দ্রমুখী—চঞ্চল, চক্‌চকে চোখ চন্দ্রা এ অংশটিতে তাঁকে মানিয়েছিলো অপরূপ ভাবে। মিষ্টি কথায়, মধুর হাবভাবে ও চমৎকার ভাবপ্রকাশে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী তাঁর যশোমুকুটে আরেকটি সোনালী পালক পরিয়েছেন। ছায়াছবিতে যতো তাঁর দিন বাড়্‌ছে—রূপ তাঁর ততই বাড়্‌ছে—না, আমরা

তাঁকে ক্রমশঃই সেরকম দেখ্‌ছি বুঝতে পারছিনে।

অমর মল্লিকের চুনীলাল তাঁর পূর্ব্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর ভাবভাষা ও কথা বল্‌বার ভঙ্গী চিরকালের মতই দর্শকদের যে অত্যন্ত প্রীতি উৎপাদন করেছিলো—একথা বলা বাহুল্য মনে করছি। দীনেশ দাশের চৌধুরী মশাই প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে খুবই যে আশাপ্রদ হয়েছে সন্দেহ নেই। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের ধর্ম্মদাসও বেশ ভালো।

মহেনের অংশে শৈলেন পালকে মানিয়েছিলো সুন্দর, অভিনয়ও হয়েছিলো তাই।

ক্ষেত্রমণির অংশে ক্ষেত্রবালার কাজ করতে হয়েছে অত্যন্ত কম। তা হ'লেও ঐ ধরণের নাচে যে তাঁর পা ভালো ভাবেই নাচে সন্দেহ নেই। অন্যান্য ভূমিকাগুলো অনুল্লেখযোগ্য বিবেচনা করি।

+ * +

উপসংহারে এক কথায় আমরা বল্‌তে বাধ্য যে "দেবদাস"-এর তুলনায় এতো ভালো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছবি আজ পর্য্যন্ত সারা বাংলায় তৈরী হয়নি। সেইজন্য চিত্রখানির প্রযোজক নিউ থিয়েটার্স ও তার বিভিন্ন শাখার প্রত্যেকটি কর্ম্মীবৃন্দকে আমরা জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। প্রত্যেকটি কর্ম্মীর আন্তরিক প্রচেষ্টা না হ'লে কোন ছবি এতোটা সাফল্যলাভ যে করতে পারেনা সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র। এবং, আমরা অনেকদিন থেকেই এটা লক্ষ্য করে আস্‌ছি—যে সবরকম শাখায় সমস্ত কর্ম্মীর এই যে আন্তরিক সহযোগীতা—সে শুধু ভারতের প্রখ্যাতনামা ষ্টুডিয়ো একমাত্র নিউ থিয়েটার্সের এলাকায়ই সবচেয়ে বেশী। প্রতিটি-চিত্রের এতোটা সাফল্যলাভ তার জন্যেই মূল দায়ী—কারণ সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি পৃথিবীতে করতে পারেনা এমন কাজ নেই।

নিউ থিয়েটার্স

এঁদের ভাবী বাংলা ছবি—শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া'র পাণ্ডুলিপি প্রায় শেষ হয়ে এলো। পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ।

* * *

"পূরণ ভকত"-এর একটি তামিল সংস্করণ এরা তুলবেন ঠিক করেছেন। এরও পরিচালক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ।

* * *

মাদ্রাজের আন্‌জেল ফিল্মস্ করপোরেশন এঁদের বি ইউনিটে একটি 'নটথ্যান্‌গল' বলে ছবি তুলে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। চিত্রখানা সেখানে এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে যে তার সম্মানের জন্য আন্‌জেল ফিল্মস্ করপোরেশন এক বিশেষ উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মিত্র। অ্যানজেল ফিল্ম করপোরেশন বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিউ থিয়েটার্স-এর কর্ম্মীবৃন্দের কার্য্যকুশলতার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। শ্রীযুক্ত মিত্র তার উপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন। বিরাট ভূরিভোজ ও সুন্দর প্রজ্ঞাপনী বিতরণে উক্ত সভা শেষ হয়।

* * *

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া ঠিক করেছেন একটা হিন্দী কমিক ছবি তুলবেন।

* * *

অমর মল্লিক কার্য্যোপলক্ষে লাহোর গমন করেছেন।

* * *

আরেকখানা তামিল ছবি তোল্‌বার তোড়জোড় চলছে নাম—"ধ্রুব"।

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

আগামী সংখ্যায় স্বদেশী বীমা কোম্পানীর কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলি যাহাতে দেশের লোকের সমর্থনের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতে পারে তাহাই এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

"দক্ষযজ্ঞে"র রজত-জয়ন্তী

গত রবিবার সকালে 'ক্রাউনে' রাধা ফিল্মের সাফল্য-মণ্ডিত সবাক-চিত্র "দক্ষযজ্ঞে"-র রজত-জুবিলী উৎসব সম্পন্ন হ'য়েছে। এই উপলক্ষ্যে 'রাধা'-র কর্ত্তৃপক্ষ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সাংবাদিকমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ কোরে তাদের জলযোগে আপ্যায়িত করেন এবং জুবিলী উৎসবের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ "দক্ষযজ্ঞে-"র শিল্পীগণের স্বাক্ষরিত একখানি কোরে সিল্কের রুমাল উপহার দেন। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের এই আয়োজনের ব্যবস্থার জন্য তাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি আর আমরা কামনা করি, "দক্ষযজ্ঞে"র জুবিলী যেন রজত থেকে স্বর্ণে পরিণত হয় আর আমরা আবার সকলে একত্রে মিলে সেই উৎসব আয়োজনে যোগদান কোরতে পারি।

"দক্ষযজ্ঞ"

আমরা শুনে সুখী হ'লুম রাধা ফিল্মের এই চিত্রখানি ভবানীপুরের পূর্ণ থিয়েটারে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আশা করি "দক্ষযজ্ঞ" আরো কয়েক সপ্তাহ ধরে' ভবানীপুরে চল্‌বে।

"মানময়ী গার্লস স্কুল"

চিত্রখানা এখন সম্পাদকের ঘরে। কবে কিম্বা কোথায় মুক্তিলাভ করবে এখনও ঠিক হয়নি। তবে, খুবই সম্ভব, আমরা শিগগীরই এ খবরটা আপনাদের জানাতে পারবো।

পাতালপুরী

শনিবার ৬ই এপ্রিল হইতে রূপবাণীতে কালী ফিল্মসের "পাতালপুরী" তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ কোরল। চিত্রখানির পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সত্যই চিত্তাকর্ষক।

ছবিখানি বেশ কিছুদিন ধরে রূপবাণীতে চলবে বলে মনে হয়।

সেলিমা

শ্রীমধু বোস পরিচালিত 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া'-র উর্দ্দু সবাক্‌-ছবির বিশেষ প্রদর্শনী গত বৃহস্পতিবার 'নিউ এম্পায়ারে' হ'য়ে গেছে। ছবিখানা [illegible]

হ'য়েছি। অভিনেতৃদের ভেতর কেউ কম যান না---তার মধ্যে আবার নবাগতা শ্রীমতী মাধবী সেলিমার ভূমিকায় তাঁর রূপ ও অভিনয়ে সকলকে মুগ্ধ কোরেছেন। ছবিখানি সাধারণে যে বিশেষভাবে গ্রহণ কোরবে একথা বলাই বাহুল্য।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

জয়পুরে "ডি-জি"-র পরিচালনায় "বিদ্রোহী"-র কাজ শেষ হ'য়েছে। শিল্পীরা সব কোল্‌কাতায় ফিরেছেন, কিন্তু "ডি-জি" "ব্লাড এণ্ড বিউটী"-র কয়েকটি দৃশ্য তোলবার জন্য এখনও সেখানে অবস্থান কোরছেন। আমরা শুনলাম, জয়পুরের পাথর আর বালি দিনের বেলা অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে এদের কাজের কিছু কিছু ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এমন কী অগ্নিদেবের এ তেজ সহ্য কোরতে না পেরে "ডি-জি" নাকি একদিন অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিলেন। কাজকর্ম্ম সেরে ঘরের ছেলে শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর ঘরে ফিরলেই আমরা নিশ্চিন্ত হব।

*　　*　　*

শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় হেমেন্দ্রকুমারের "পায়ের ধূলো"-র আনুসঙ্গিক শূটিং আরম্ভ হ'য়েছে।

'সুস্বাগতম্‌'!

খেলার মাঠে

মোহনবাগান　　　　**শ্রীদ্রোণাচার্য্য**

খেলার মাঠে "মোহনবাগানের" নাম চির প্রসিদ্ধ। এ বছর হকি লীগ খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে সে খ্যাতি তার আরও বেড়েছে। এ পর্য্যন্ত ফুটবল খেলাতেই শুধু "মোহনবাগান" প্রত্যেক বাঙ্গালী এমন কি প্রত্যেক ভারতীয়দের কাছেও গৌরবের ছিল—কিন্তু আজ আর তা নয়। যাবতীয় স্পোর্টসের ভিতর তার প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে। আমরা মোহনবাগানের এ সাফল্যে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। মোহনবাগানের ভবিষ্যৎ পথও যেন এরকমই জয়যুক্ত হয়।

এর পূর্ব্বে ভারতীয় গ্রীয়ার দুইবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল—১৯১৯ ও ১৯২৩ সালে। কিন্তু ওরা বাইরে থেকে অনেক খেলোয়াড় আনিয়েছিল। শুধু নিজ টিম নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল মোহনবাগান। অবশ্য এজন্য আজ আর একজনের কথাও মনে পড়ে। তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত হকি খেলোয়াড় মিঃ জয়পাল সিং। মোহনবাগানের ভূতপূর্ব্ব খেলোয়াড় ও ট্রেনিং শিক্ষক ছিলেন ইনি। চাকুরীতে আজ তিনি বিদেশে। এ খবর যখন ওঁর কাছে পৌঁছবে, গর্ব্বে নিশ্চয়ই ওঁর বুক ভরে উঠবে। তাছাড়া মোহনবাগানের পি, দাস; পি, সেন; এন, মুখার্জ্জি; এ, দেব ও খাঁনের নামও আমরা করতে পারি। এদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

শেষ পর্য্যন্ত লীগ কে পাবে তা নিয়ে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ রেঞ্জার্সের সঙ্গে মোহনবাগানের পয়েণ্ট ব্যবধান ছিল মাত্র এক। কাষ্টমস যখন রেঞ্জার্সকে হারিয়ে দেয় তখন মোহনবাগানের বাকী থাকে শুধু লিলুয়ার সাথে খেলা এবং তারই ফলাফলের উপর সব নির্ভর করে। লিলুয়ার খেলার দিন মাঠে যথেষ্ট লোক জমায়েত হয় এবং তাদের সন্তুষ্ট করে ২ গোলে মোহনবাগান জয়ী হয়।

১৪টি খেলার মধ্যে মোহনবাগান একটিতেও পরাজিত হয় নাই। ৯টি খেলায় জয়ী ও ৫টিতে "ড্র" করেছে। তাই ওদের হয়েছে ২৩ পয়েণ্ট। ২২ পয়েণ্ট পেয়ে রেঞ্জার্স রানার্স আপ হয়েছে। আসছে বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান এরূপ নৈপুণ্য দেখালে আমরা যে খুসী হব তা বলাই বাহুল্য।

*　　*　　*

প্রথম ডিভিসন থেকে মহমেডানস দ্বিতীয় ডিভিসনে নাম্‌বে। তাছাড়া গ্রীয়ার ও ক্যালকাটার মধ্যে একটিও নামবে। কারণ, দুটি করে টিমের বদল হয়। গ্রীয়ারের এই পরিণতি বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়।

*　　*　　*

বাইটন খেলা আরম্ভ হল বলে। ফিক্সচার ঠিক হয়ে গেছে। এবার প্রতিযোগিতা খুব ভালই হবে। বাইরের অনেক ভাল ভাল টিম এ বছর এ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে।

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা

প্রতিরোধে শক্তিজ্ঞাপক ডাকঃ—প্রতিরোধকারীর সাধারণ হাত থাক্‌লে তিনি কিরূপভাবে ডাক দিবেন তা' আগেই বলেছি। কিন্তু তাঁর যদি প্রচণ্ড শক্তিব্যঞ্জক হাত থাকে তবে তিনি নিম্নলিখিত-ভাবে ডাক দিবেন। শক্তিব্যঞ্জক হাত সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়—এক অনারের পিটের সুপ্রাচুর্য্য, দুই ভাল বিভাগ সমেত অনারের পিটের প্রাচুর্য্য। এই দুই প্রকার হাতের ডাকও হবে দুই প্রকার। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে প্রতিরোধকারী আক্রমণকারীর প্রারম্ভিক ডাককে 'ডবল' (Double) দিবেন এবং দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে আক্রমণকারীর কথিত রঙকে নিজেই দ্বিতীয়বার ডাক দিবেন। মনে করুন 'ক' বলেছেন 'একখানি হরতন' আর প্রতিপক্ষ 'আ' নিম্নলিখিত দুই প্রকার হাত পেয়েছেন।

(১) ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম, দশ, দুরি; হরতন—তিরি; রুহিতন—টেক্কা, গোলাম, নয়, সাতা; চিড়িতন—সাহেব, বিবি, তিরি, দুরি।

(২) ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম, নয়, আটা; হরতন—নাই; রুহিতন—সাহেব, বিবি, গোলাম, আটা, চৌকা; চিড়িতন—টেক্কা, সাহেব, দশ, আটা।

(১) এক্ষেত্রে 'আ'র ডাক হবে 'ডবল'। এ 'ডবল' হচ্ছে আবাহনমূলক। এই 'ডবলের' দ্বারা ডাকদার ঘোষণা করেন যে তাঁর হাতে নূনকল্পে তিন বিভিন্ন রঙে তিনখানি অনারের পিট আছে অথবা দুইটি বিভিন্ন রঙে তিনটি অনারের পিট আছে এবং ডাকের যোগ্য একটি ভাল রঙও আছে। সুতরাং তিনি তাঁর খেঁড়ীর হাতে বিশেষ কি তাস এবং কোন রঙে খেঁড়ী খেল্‌তে চান তা' জান্‌তে ইচ্ছুক। খেঁড়ীর হাত জানতে পারলে তিনি যথাকর্ত্তব্য অবধারণ করবেন। তাই এ 'ডবলের' নাম আবাহনমূলক 'ডবল' (take out double)। প্রতিরোধকারী এই ডবল দিলে এবং অন্য প্রতিপক্ষ পাস দিলে খেঁড়ীকে ডাক্‌তেই হবে,—কারণ এ হচ্ছে কালবার্টসন্ নিয়মে বাধ্যতামূলক ডাক। তবে কিরূপ অবস্থায় খেঁড়ী পাস দিতে পারেন সে কথা পরে জানাচ্ছি।

(২) এক্ষেত্রে 'আ'র ডাক হবে 'দুইখানি হরতন'। এ ডাকও বাধ্যতা-মূলক। সুতরাং খেঁড়ীকে জবাব দিতেই হবে এবং 'গেম' ডাক অবধি না পৌঁছান পর্য্যন্ত তাঁকে ডাক বজায় রাখতে হবে। এ ডাকের দ্বারা ডাকদার ঘোষণা করেন যে তাঁর হাতের অনারের শক্তি প্রচণ্ড (নূনকল্পে পাঁচখানি অনারের পিট আছে) এবং একটি ডাকের যোগ্য রঙ আছে যে রঙে তিনি অন্ততঃ চারখানি পিট পাবার আশা রাখেন।

আবাহনমূলক ডবল (take out double)**:—প্রতিপক্ষের প্রারম্ভিক ডাক দিবার অব্যবহিত পরেই যদি প্রতিরোধকারী 'ডবল' দেন তা হলে সেই 'ডবলকে' আবাহন-মূলক 'ডবল' বলা হয়ে থাকে। প্রতিরোধ-**

কারীর হাতের শক্তি-জ্ঞাপনার্থে ইহা এক চমৎকার উদ্ভাবনা। মনে করুন 'ক' ডেকেছেন 'একটি ইস্কাবন', 'আ' দিলেন 'ডবল'। এই 'ডবল' হচ্ছে—আবাহনমূলক। আবার দেখুন 'ক'র ইস্কাবন ডাকের পর 'আ' ও 'খ' পাস দিয়েছেন এবং 'অ' বল্‌লেন 'ডবল'। এই 'ডবল'ও আবাহনমূলক। আবাহনমূলক 'ডবল' কতরকম অবস্থায় দেওয়া যেতে পারে এবং বিরতিমূলক 'ডবলের' (penalty double or leave-in double) সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায় তা' পরে বল্‌ব। এখন কিরূপ হাত থাক্‌লে এ 'ডবল' দেওয়া যেতে পারে আগে তাই বল্‌তে চাই।

প্রতিপক্ষের রঙের ডাক হলে তিনটী বিভিন্ন রঙে তিনখানি অনারের পিট নিয়ে কিম্বা একটি ভাল ডাকের যোগ্য রঙ এবং দুই রঙে বিভক্ত তিনখানি অনারের পিট নিয়ে এ 'ডবল' দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রতিপক্ষের No Trump ডাক হলে নন্‌-ভাল্‌নারেবল অবস্থায় 'ডবল' দিতে হলে চারখানি অনারের পিট হাতে থাকা প্রয়োজন। আর ভাল্‌নারেবল অবস্থায় চারখানি অনারের পিট তো চাইই উপরন্তু মধ্যবর্ত্তী তাস (intermediate cards) প্রচুর পরিমাণে থাকা উচিত। অবশ্য ভাল হাতের বিভাগ হলে এর চেয়ে কম অনারের পিট নিয়ে 'ডবল' দিতে পারা যায়। প্রতিপক্ষের একটি No Trump ডাককে ভাল্‌নারেবল অবস্থায় নিম্নলিখিত হাত নিয়ে 'ডবল' করা অনুচিত।

ইস্কাবন—টেক্কা, তিরি, দুরি, ; হরতন—সাহেব, সাতা, দুরি ; রুহিতন—টেক্কা, বিবি, দুরি ; চিড়িতন—সাহেব, বিবি, তিরি, দুরি !

পক্ষান্তরে নিম্নলিখিত হাত নিয়ে স্বচ্ছন্দে 'ডবল' দেওয়া যেতে পারে। ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, নয়, দুরি ; হরতন—টেক্কা, বিবি, নয়, তিরি ; রুহিতন—নাই ; [illegible] তিরি দুরি। [illegible]

'ডবল' না দিয়ে যদি 'দুইটী ইস্কাবন' ডাক দেওয়া হয় তবে খেঁড়ীর পক্ষে 'গেম' কল্পনা করা দুরূহ। সুতরাং 'ডবল' ব্যতীত অন্য ডাক এক্ষেত্রে অচল।

আবাহনমূলক ডবলে খেঁড়ীর জবাব (Responses to a take out double) ঃ—এক্ষেত্রে খেঁড়ীর জবাব হয় দুইপ্রকার, বাধ্যতামূলক ডাক (forced response) অথবা স্বেচ্ছামূলক ডাক (free response)। 'ডবলের' পর খেঁড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী যদি পাস দেন তবে খেঁড়ীর ডাক হবে বাধ্যতামূলক আর যদি উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী কোন ডাক দেন তবে খেঁড়ীর ডাক হবে স্বেচ্ছামূলক। এই স্বেচ্ছামূলক ডাক হচ্ছে শক্তিব্যঞ্জক। কেননা খেঁড়ীর কোন বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বইচ্ছায় ডাক দিতে এসেছেন।

খেঁড়ীর বাধ্যতামূলক জবাব ঃ—(১) যদি তাঁর হাতে আধখানি বা তার কম অনারের পিট থাকে এবং কোন রঙের পাঁচখানি তাস না থাকে তবে তিনি যে রঙের চারখানি তাস পেয়েছেন সেই রঙ ডাক্‌বেন। যদি প্রতিপক্ষ আগেই সে রঙ ডেকে থাকেন তবে তিনি দুইখানি চিড়িতন ডাক দেবেন। এর থেকেই তাঁর খেঁড়ীকে (যিনি ডবল দিয়েছেন) বুঝতে হবে যে তাঁর হাত খুবই খারাপ। খেঁড়ীর হাত যতই খারাপ হোক্ না কেন ডাক তাঁকে দিতেই হবে। এ বিষয়ে মিঃ কালবার্টসন্ বলেন, "The weaker the hand the more imperative it is to bid."

(২) যদি তাঁর হাতে আধখানি হতে একখানি অনারের পিট থাকে তবে তিনি গোলাম বড় চারখানি তাস নিয়ে একটি মেজর ডাক (পাঁচখানি তাস সমেত মাইনর থাকা সত্ত্বেও) দিবেন। কিন্তু যদি তাঁর হাতে ছয়খানি তাস সমেত কোন মাইনর থাকে তবে চারখানি তাসের মেজর থাকলেও তিনি সেই মাইনরের ডাক আগে দিবেন (অবশ্য আধখানি হতে একখানি অনারের পিট হাতে থাকা চাইই)।

(৩) যদি তাঁর হাতে একখানি বা তার বেশী অনারের পিট থাকে এবং ডাকের যোগ্য কোন রঙ না থাকে তা' হলে হাতে মধ্যবর্ত্তী তাস (intermediates) বেশী থাকলে এবং প্রতিপক্ষ যে রঙ ডাক দিয়েছেন সে রঙে পিট পাবার মতন বড় তাস থাক্‌লে

'তনি No Trump ডাক দিতে পারেন 'কন্তু এ ক্ষেত্রে খুব সাবধানতা সহকারে ডাক দেওয়া বিধেয়। ডাক দেবার মত জোর থাকলে No Trump-এ যাওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়।

খেঁড়ীর স্বেচ্ছামূলক জবাব:—এ ক্ষেত্রে হাতে দুইখানি অনারের পিট থাকলেই সে হাতকে শক্তিব্যঞ্জক বলা যেতে পারে। সুতরাং খেঁড়ীর জবাবও সেই ভাবে দেওয়া প্রয়োজন। মনে করুন 'ক' ডেকেছেন 'একখানি চিড়িতন', 'আ' 'ডবল' দিয়েছেন আর 'খ' বলেছেন 'একটি রুহিতন'। 'অ' নিম্নলিখিত হাত পেয়ে কি ডাক দিবেন?

ইস্কাবন—বিবি, গোলাম, নয়, সাতা; হরতন—টেক্কা, দশ, সাতা, দুরি; রুহিতন—সাহেব, সাতা, তিরি; চিড়িতন—সাতা, দুরি।

এ ক্ষেত্রে তিনি 'একখানি ইস্কাবন' ডাক দিলেই 'আ' বুঝতে পারবেন যে তাঁর হাত মোটের উপর ভাল,—দেড়খানি বা তার বেশী অনারের পিট আছে কেন না তিনি স্বেচ্ছায় ডাক দিতে এসেছেন। আবার দেখুন 'ক' ডেকেছেন 'একখানি চিড়িতন', 'আ' 'ডবল' দিয়েছেন আর 'খ' বলেছেন পাস। 'অ' উল্লিখিত হাত নিয়ে কি ডাক দিবেন? এ ক্ষেত্রে তাঁর ডাক হবে 'দুইখানি ইস্কাবন'। তা' না হলে 'আ' বুঝতে পারবেন না যে তিনি দুইখানি অনারের পিট পেয়েছেন এবং তাঁর হাত শক্তিব্যঞ্জক। সে ক্ষেত্রে 'একটি ইস্কাবন' ডাক তাঁর হাতের দুর্বলতার পরিচায়ক হবে। এরূপ ক্ষেত্রে দুইটী ইস্কাবন ডাক ডাকদারের হাতে উক্ত রঙের প্রাচুর্য্য নির্দ্দেশ করে না। ইহা তাঁর হাতের অনারের পিটের শক্তির পরিচয় প্রদান করে। 'অ' যদি 'দুইটী ইস্কাবন' না বলে 'তিনটী ইস্কাবন' ডাকতেন তা' হলে অবশ্য তাঁর হাতের ইস্কাবনের শক্তির পরিচয় অনুমাণিত হোত এবং সে ক্ষেত্রে তাঁর হাত হোত ইস্কাবন—বিবি, গোলাম, দশ, নয়, আটা, তিরি; হরতন—টেক্কা, দশ, সাতা, দুরি; রুহিতন—সাহেব, সাতা, দুরি; চিড়িতন—নাই। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে বলব।

কন্ট্রাক্ট খেলায় খেঁসারত নিরূপণের ফরমুলা:—ভাল্‌নারেবল অবস্থায় Re-double-এর খেলায় কম পিটের দরুণ খেঁসারতের পরিমাণ সঠিক নিরূপণ করতে গেলে আমাদের মাথা ঘামাতে হয় অনেক। খেঁসারতের মূল্য খুব সত্বর ও সহজে নির্দ্ধারণ করবার একটি নূতন পন্থা আমরা পাঠকদের দিচ্ছি; আমাদের মনে হয় নিম্নের ফরমুলাটি (formula) পাঠকদের শ্রম ও সময় অনেকাংশে লাঘব করবে।

ক (ক+৩) × ১০০, যেখানে ক = কম পিটের সংখ্যা।

মনে করুন পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় আপনাদের চারখানি পিট কম হয়েছে; সুতরাং 'ক'-র

পরিবর্ত্তে '৪' রেখে মোট কত সংখ্যা হয় দেখা যাক্।

৪ (৪+৩) × ১০০ = ৪×৭×১০০ = ২,৮০০।

এখন ২,৮০০ হল আপনাদের উক্ত অবস্থায় মোট খেঁসারত।

এর থেকে আমরা ভাল্‌নারেব্‌ল অবস্থায় 'ডবলের' খেলায় ৪ খানি কম পিটের খেঁসারতের পরিমাণ বের করতে পারি, যদি ২,৮০০ এর অদ্ধেক করে নিই (অর্থাৎ ১,৪০০) এবং ভাল্‌নারেব্‌ল অবস্থায় সাধারণ খেলায় ৪ খানি কম পিটের দরুণ মোট খেঁসারতের মূল্য হবে 'রি-ডবলের' ১/৪ অংশ (অর্থাৎ ৭০০) বা ডবলের অদ্ধেক (অর্থাৎ ১/২ × ১৪০০ = ৭০০)।

কণ্ট্রাক্ট খেলার নিয়ম-কানুনের পরিবর্ত্তন :—লণ্ডনের পোর্টল্যাণ্ড ক্লাবের পক্ষ থেকে ১৯৩২ সালের কণ্ট্রাক্ট খেলার আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম-কানুনের কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। এই নূতন নিয়মে অনারের দরুণ পয়েণ্ট পাওয়া বন্ধ করা হয়নি বলে অনেকের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও এই নূতন আইন এক রকম সর্ব্ববাদীসম্মত।

কণ্ট্রাক্ট খেলার আইনের প্রধান পরিবর্ত্তন গুলি আমাদের পাঠকদের সুবিধার্থে নিম্নে দেওয়া হল।

নন-ভাল্‌নারেব্‌ল অবস্থায় Grand Slam-এর bonus ১,৫০০ থেকে ১,০০০ পয়েণ্টে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ভাল্‌নারেব্‌ল অবস্থায় ২,২৫০ হতে ১,৫০০ পয়েণ্টে ধার্য্য করা হয়েছে।

প্রথম পিটের জন্য No-Trump-এ ৪০ পয়েণ্ট ধরা হয়েছে এবং তারপর প্রত্যেক পিটের জন্য ৩০ পয়েণ্ট করে ধরা হয়েছে।

প্রচলিত হারের পরিবর্ত্তে ভাল্‌নারেব্‌ল অবস্থায় প্রত্যেক কম পিটের খেঁসারতের মূল্য ১০০ পয়েণ্ট করে ধরা হয়েছে। Double-এর খেলায় কম পিটের দরুণ খেঁসারতের প্রচলিত হারের পরিবর্ত্তে নন-ভাল্‌নারেবল অবস্থায় প্রথম কম পিটের দরুণ ১০০ পয়েণ্ট ও তার পর প্রত্যেক কম পিটের দরুণ ২০০ পয়েণ্ট এবং ভাল্‌নারেবল অবস্থায় প্রথম কম পিটের দরুণ ২০০ পয়েণ্ট ও তার পর প্রত্যেক কম পিটের দরুণ ৩০০ পয়েণ্ট করে দেওয়া হবে ধার্য্য হয়েছে।

নূতন নিয়মে খেঁড়ীর সুবিধা :—এই নূতন নিয়মে খেঁড়ীকে অনেক শক্তি দেওয়া হয়েছে এবং খেঁড়ীর সুবিধাও হয়েছে অনেক। খেঁড়ী সম্বন্ধে এবং নিম্নলিখিত অন্যান্য নিয়মগুলি কণ্ট্রাক্ট এবং অক্‌সন্ দুয়েতেই খাটবে।

নূতন নিয়মে খেঁড়ী ("Declared Partner") প্রতিপক্ষের অনিয়ম এবং revoke-এর জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন।

তাস বণ্টনকালে যদি কোন খেলোয়াড় নিজের তাসের দিকে দেখেন তবে পুনরায় তাস বণ্টন করা হবে। এটি একেবারে বাধ্যতামূলক নিয়ম।

অন্যায়ভাবে পুরাণো পিট দেখলে খেলোয়াড়কে ৫০ পয়েণ্ট খেঁসারত দিতে হবে।

আগামী ৩১শে মার্চ্চ থেকে সকল খেলা এই নূতন নিয়ম অনুযায়ী চলবে এবং এই নিয়ম ১লা জানুয়ারী ১৯৪০ সাল অবধি অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকবে। বলা বাহুল্য যে নিয়ম-কানুনগুলি ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের নামজাদা ক্লাবের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা বৈঠক করে স্থিরীকৃত হয়েছে।

সান্ধ্য সঙ্ঘের পুরস্কার বিতরণ :—বিগত ১৩শে মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় মাননীয় বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সভাপতিত্বে সান্ধ্য সঙ্ঘের ব্রীজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। উক্ত সমিতি হতে তিনটা প্রতিযোগিতার উদ্যোগ করা হয়েছিল, তন্মধ্যে Auction (singles)-এ সান্ধ্য সঙ্ঘ, Auction (Duplicate)-এ চুঁচুড়ার দল এবং Contract (singles)-এ Calcutta Doctors Assotion যথাক্রমে বিজয়ী হয়েছেন। শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের মর্ম্মস্পর্শী কণ্ঠসঙ্গীত ও শ্রীগোপাল লাহিড়ীর সুমধুর বংশীবাদন উক্ত অনুষ্ঠানটিকে মধুরতর করেছিল। পরে জলযোগান্তে এই শুভানুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটী যে সান্ধ্য সঙ্ঘের দক্ষতার পরিচয় দেয় তা'তে সন্দেহ নেই।

কে তুমি

পূর্ণেন্দু নারায়ণ সেন

কে তুমি গো উদয় হলে আমার হৃদয় গগনে
কৃষ্ণাকাশে শুকতারাটীর মত,
শুষ্ক শাখে প্রথম ফুলের মত;
ভরিয়ে দিলে কুঞ্জ ভরা মঞ্জরীকে
বসন্তেরি পবনে!
জাগালে গো কে আমারে নীরব তারের হরষে!
হৃদয় বীণা উঠল বেজে,
স্বর্ণ হয়ে উঠল সে যে,
জাগল' হঠাৎ নবীন আশায়
সোনার কাঠির পরশে।
নিত্য আমার হৃদয় মাঝে বিরহ যে বাজে গো!
একটু শুধু বাণীর তরে
পরাণ আমার হয় যে আকুল;
একটু শুধু হাসির তরে
হৃদয় আমার হয় যে ব্যাকুল
আমার সকল কাজে গো!
আম্র মুকুল মুঞ্জরিল, গাহিল পিক শিয়রে
গন্ধে আকুল গন্ধবহ
বইছে কি যে সুরের মোহ
হৃদয় আমার চাইছে তোমায়
ওগো আমার প্রিয়রে!
কবে তোমার পাব দেখা সুদূর কালের তরীতে?
কবে তোমার পরশ ভরে
জীবন আমার উঠবে ভ'রে?
ওগো আমার নিঠুর রমা!
পূর্ণ কর ব্যথিতে।

উচ্ছৃঙ্খল

= উপন্যাস =

শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একাদশ পরিচ্ছেদ

অরুণের জীবন চলেছে ! নিঃসঙ্গ জীবন।

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ! পঙ্ক-পাপে ডুবে আছে ! জগতে তার কোন কর্ত্তব্য নেই। শুধু হেসে খেলে চলে যাওয়া।—গেয়ে যাচ্ছে আনন্দের গান !

অনেকদিন পরের কথা। জগতে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। যুবা বৃদ্ধ হয়েছে, ছেলে যুবা হয়েছে। প্রকৃতির বুকে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দৃশ্যমান। কত গাছপালা মরেছে, প্রাণ হারিয়েছে—আবার কত গাছ মাথা তুলে উঠেছে। এই এক যুগে কত পরিবর্ত্তন হয়েছে—শুধু অরুণের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। সে তেমনি ভাবেই আছে। চরিত্র তেমনই।

তা'র পুত্র দীপ্তি বেশ বড় হয়েছে। তার শ্বশ্রুঠাকুরাণী পরলোক গমন করেছেন। তার শ্বশুর বাড়ীতে কেউ নেই যে তার ছেলের তত্ত্বাবধান করে। সে বাধ্য হয়ে তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

ষোল বছরের ছেলে। সংসারকে ভাল করে চিনে না, বাবার বাড়ীতে আছে। দু'বেলা ভাল রকমে খাচ্ছে। পড়াশুনা করছে, যা চায় সবই মিলছে। পিতার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নেই।

অরুণ তার বন্ধুদের নিয়ে মেতে আছে।—ইয়ার বন্ধু অনেক জোটে। সম্পদের সহায় অনেকেই হয়। বিপদে কেউ আসে না। বন্ধুর বিপদে বন্ধু সাহায্য করে না। একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে চায়। মনে মনে হাসে, কাছে আসে না।

অরুণের এক বন্ধু জুটেছিল—সন্তোষ। তার সঙ্গে অরুণের খুব বেশি ভাব। তাকে তার প্রাণের কথা খুলে বলে দু'জনে বসে মদ খায়, স্ফূর্ত্তি করে।—

অরুণ সন্তোষকে বললেঃ ভাই আমার ছেলেটাকে আমার বাড়ী এনে রেখেছি। কেউ তাকে দেখবার লোক নেই। তুমি তাকে তোমার বাড়ী নিয়ে রাখ। আমার খুব উপকার হবে।

সে বললেঃ আমার স্ত্রী একা মানুষ, তাকে দেখতে শুনতে তো পারবে না। আর—আমি সহসাই তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিতে চাই।

অরুণ কিছু বললে না।—শুধু এই কথাই ভাবলে—জগতে কারো বন্ধু কেউ নয়।

দিন চলেছে। অরুণ তেমনিই আছে। কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। স্বভাব আগেরই মতো। ছেলে বড় হয়েছে। সকলই বুঝতে পারে। সে জানে, তার বাবা—অসচ্চরিত্র।

উপযুক্ত পুত্রের কাছে পিতা—চরিত্রহীন পিতা যেমন সঙ্কোচ করে চলে অরুণও ঠিক তেমনি ভাবে চলে। অরুণের ব্যবহারে কোনদিন তার চরিত্রের দোষ তার পুত্রের কাছে ধরা পড়ে না।

দীপ্তি জানে, তার পিতা উচ্ছৃঙ্খল। মদ্য পান করে। তার বেশি সে কিছুই জানে না।

জলন্ত আগুন ছাই চাপা থাকে না; বাতাসের স্পর্শে আগুন আত্মপ্রকাশ করে।

রজনী দুর্য্যোগময়ী। সেদিন অরুণ অণিমার কাছে তার চঞ্চল প্রাণ নিয়ে ছুটে গিয়েছিল। তার প্রাণ হাহাকার করে উঠলো। সে কাপড়চোপড় নিয়ে বা'র হয়ে গেল। যা'বার আগে দীপ্তিকে বলে গেল —আমার আসতে একটু দেরী হবে। তুমি খেয়ে দেয়ে ঘুমুবে।

দীপ্তি বল্‌লে : আচ্ছা।

অরুণ ধীরে ধীরে আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাঁচদিন পরের কথা। অরুণ তখনো ফিরেনি। একটা দারুণ দুঃশ্চিন্তা ভরে গেছে। তার পিতা এখনো ফিরেনি। হয়তো সে কোন বিপদে পড়েছে। সে তো বালক মাত্র। সে তার পিতার উদ্ধার কল্লে কী করবে।

পাঁচদিন পরে, প্রভাত হয়েছে। দীপ্তির কিছুই ভাল লাগছে না। পিতার অমঙ্গল আশঙ্কায় তার প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করছে। সে কি জানতো তার বাবা—সুখে পঙ্কিল আবর্ত্তে ডুবে আছে!

সে তার পিতাকে খুঁজবে। কোথায় সে জানে না। জগতকে সে জানে। তার পিতাকে কোথায় গেলে পাবে—কোথায় তাঁর বাস—সে, সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পৃথিবীকে সে চেনে, কিন্তু ভাল করে নয়। সংসারের শত আবর্ত্ত সম্বন্ধে তার কোন ধারণা নেই। তবু সে বা'র হবে।—আজীবন তাকে খুঁজবে। না পায়, তো নিজের জীবন ত্যাগ করবে।

সে নিঃসম্বল অবস্থায় রাস্তায় বা'র হয়ে পড়লো। ঘরবাড়ী শূন্য পড়ে রইল।

কল্‌কাতার রাস্তা। কোথায় গেলে কোন্‌ যায়গায় যেতে পারবে জানে না। সে হেটেই চল্‌লো।

শীতের দুপুর। সূর্য্য কিরণের ধারা ঢাল্‌ছে—উত্তপ্ত—উষ্ণ। সে চলেছে। কোথাও বিশ্রাম করছে না। কোথায় যাবে—কোথায়—কোথায় তার লক্ষ্য সে নিজেই জানে না।

রাস্তায় বিশাল জনস্রোত। সবাই আপনাপন কাজে চলেছে। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করছে না তার দুঃখ কী, কোথায় সে যাবে কেন যাবে?

সে ক্রমাগত হাটছে।

পেছন ফিরে দেখতে পেলো—জনৈক ভদ্রলোক তার পেছনে পেছনে আসছে। তাকে দেখে তার মনে ভক্তির সঞ্চার হলো।

সে দাঁড়ালো একটী গাছের ছায়ায়।—

লোকটী তার কাছে এলো। সে তাকে জিজ্ঞাসা করলে; তুমি কোথায় যাবে? অনেকদূর হেটে আস্‌ছো দেখছি।

সে বল্‌লে: আমি আমার বাবাকে খুঁজছি।

—তোমার বাবার নাম কি?

—অরুণকুমার বন্দোপাধ্যায়—

—ওঃ অরুণ বাবু? তিনি বাড়ী ফেরেন নি। কাল্‌কেই তো আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। এসো তো আমি তোমায় পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন,—একখানি ছোট গলিতে। আশে পাশে নানা রঙের সাড়ী কাপড় ঝুলছে—বাতাসে। মাঝে মাঝে দু' একটী উৎসুক দৃষ্টিও চোখে পড়ছে।

তারা একখানি বড় দ্বিতল বাড়ীর সামনে উপস্থিত হলো। লোকটী বললেন: তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কড়া নেড়ে দেখ কেউ আসে কিনা। তারপর কেউ এলে তুমি তোমার বাবার কাছে যাবে। আমি একটু তফাতে দাঁড়াচ্ছি।—

কড়া নাড়ার শব্দে ঝি নেমে এলো। সে তাকে তার বাপ অরুণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলো। সে বল্‌লে: আসুন আমার সঙ্গে, তিনি এখানেই আছেন।

সে মনে সঙ্কোচ ও ভয় নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ। আশে পাশে নানা রঙয়ের ছবি টাঙানো রয়েছে।—

ঝি তাকে একখানি ঘরে নিয়ে প্রবেশ করল। ঝি ঘরখানি দেখিয়ে দিয়েই সরে পড়ল। সে আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখল; তার বাবা একটী রমণীর পাশে বসে রয়েছে। তার চোখ ব'য়ে বেদনার অশ্রু বা'র হয়ে আস্‌তে লাগল। কী বীভৎস সে দৃশ্য। পিতা পুত্রের সামনে এমনি অবস্থায়। তার ইচ্ছা হলো এ নরক দর্শনের আগে তার মৃত্যু হোক্‌।—তবু—সে তার পিতাকে পেয়েছে। তাই তার মনে একটু আশা আছে। সে ডাক্‌ল: বাবা!

অরুণ চমকে উঠলো। লজ্জায় তার সর্ব্বাঙ্গ লাল হয়ে ওঠলো। সে বিছানা ছেড়ে হতাশ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইল। দাঁড়িয়ে আছে—চোখে শ্রাবণের ধারা বইছে।

কী অপমান! পুত্রের সাম্‌নে তার এ অপমান সহ্য হলো না। বল্‌লো: পৃথিবী দ্বিধা হও আমি আমার কলুষ ঢেকে ফেলি।

অরুণ বল্‌লে: দীপ্তি—আয় বাবা, একটু বসি। তুই সারাদিন পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছিস্‌। আমার অসুখ করেছিল কিনা তাই এখানে ছিলাম।

দীপ্তি শুধু এইটুকু বল্‌লে—আমি চল্‌লুম। জীবনে বুঝি এই শেষ দেখা। তারপর দীপ্তিকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। অরুণ কাতর কণ্ঠে বল্‌লে: আয় বাবা আমি ফিরে যাচ্ছি। এমনি করে আমায় ছেড়ে যাস্‌নি। সে সংজ্ঞা হারিয়ে নীচে মেঝেয় পড়ে রইল।

(ক্রমশঃ)

মেয়রের মামলা

ব্যভিচারের চার্জ্জ গঠিত

বীণার বিবাহিত জীবনের বর্ণনা

কাউন্সিলার স্যামসুদ্দিন আমেদের জবানবন্দী

শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে আনীত ব্যভিচারের মামলায় বৃহস্পতিবার শ্রীমতী বীণা সরকারের বিস্তৃত জবানবন্দী গ্রহণের পর চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন যে, তিনি ১৯৩৪ সালের ১৭ই জুন বেলা সাড়ে তিনটার সময় হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এ শ্রীমতী বীণা সরকারের সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন।

আসামী অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন। ৯ই এপ্রিল পর্য্যন্ত শুনানী স্থগিত আছে। ঐ দিন বোধ হয় ফরিয়াদী অধ্যাপক প্রমথ নাথ সরকারকে বিস্তৃতভাবে জেরা করা হইবে।

শ্রীমতী বীণা সরকার ব্যভিচারের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার চিঠিপত্র এবং ডায়েরী মামলায় দাখিল করিতে দিতে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। তিনি তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর চিঠিপত্র পাঠ করিতে ম্যাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করেন।

আসামীর পক্ষ হইতে এডভোকেট জেনারেল মিঃ এ, কে, রায় বলেন, অধ্যাপক সরকার শ্রীমতী বীণার নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা অধ্যাপক সরকারের জেরার সময় তিনি আদালতে দাখিল করিবেন।

কৌঁশুলী মিঃ ডি, এন, ব্যানার্জ্জী; শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ বসু; শ্রীযুত সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ; শ্রীযুত কপিল দত্ত; শ্রীযুত হরিপদ বিশ্বাস এবং শ্রীযুত বিপুল সাহা ফরিয়াদী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

এডভোকেট জেনারেল মিঃ এ, কে, রায়, সরকারী কৌঁশুলী মিঃ এ, কে, বসু এবং মিঃ কে, ডি, মিত্র, মিঃ জে, এন, মিত্র, মিঃ পি, এন, মুখার্জ্জী, মিঃ পি, কে, সান্ন্যাল, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও শ্রীযুত সুনীতি প্রকাশ কর আসামী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

কৌঁশুলী মিঃ জে, কে, মুখার্জ্জী এবং মিঃ ডি এন দত্ত শ্রীমতী বীণা সরকারের পক্ষে আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমতী বীণা সরকারের সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্ব্বে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী শ্রীযুত বিভূতি-ভূষণ সরকার এবং হাইকোর্টের এডভোকেট মিঃ সামসুদ্দীন আমেদের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। শ্রীযুত বিভূতিভূষণ সরকারের জবানবন্দী পূর্ব্বে লওয়া হইয়াছিল, বৃহস্পতিবার পুনরায় তাঁহাকে আহ্বান করা হয়।

বিভূতিভূষণ সরকারকে জেরা করায় তিনি বলেন যে, তিনি ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে একখানি 'খেয়ালী' পত্রিকা ক্রয় করেন এবং পরদিন ঐখানি প্রমথবাবুকে দেন। সাক্ষী প্রমথবাবুকে "খেয়ালী"তে প্রকাশিত ঘটনা সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলেন। কারণ "খেয়ালী"তে কেলেঙ্কারী প্রকাশিত হইয়াছিল। বিহিত ব্যবস্থা বলিতে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদই বুঝাইয়াছিলেন। প্রমথবাবু এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই। তিনি

তাঁহার শ্বশুরালয়ে ৩।৪ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

তারপর প্রমথবাবু ফিরিয়া আসিয়া সাক্ষীকে বলেন যে, তাঁহার (প্রমথবাবুর) স্ত্রী তাঁহার (প্রমথবাবুর) প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল। প্রমথবাবু সাক্ষীর সহিত কয়েকদিন অবস্থান করেন। সাক্ষী বিনোদবিহারী বিশ্বাসকে চিনিতেন।

বিনোদবাবু সাক্ষীর বাড়ীতে আসেন এবং ১৭ই জুন তারিখে প্রমথবাবুর সহিত বাহিরে যান। বিনোদবাবু ফিরিয়া আসেন এবং সাক্ষীকে বলেন যে, নলিনী বাবু বীণা সরকারের সহিত হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ে ব্যভিচার করিয়াছেন। বিনোদবাবু কয়েকদিন এখানে অবস্থান করেন, কিন্তু প্রমথবাবুর ছুটী ফুরাইয়া আসিয়াছিল বলিয়া তিনি এই ব্যাপারের বিহিত ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

অতঃপর সাক্ষী বলেন, ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে পূজার ছুটিতে প্রমথবাবু পুনরায় কলিকাতা আসেন। পরামর্শ গ্রহণের জন্য সাক্ষী তাঁহাকে এডভোকেট শ্রীযুত গোপীনাথ বিশ্বাসের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। তাহার ফলে প্রমথবাবু "ষ্টেটসম্যানে" একটি বিজ্ঞাপন দেন। (ষ্টেটসম্যানের বিজ্ঞাপন ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেখান হইল)।

এডভোকেট জেনারেল এই বিজ্ঞাপন প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করিতে দিতে আপত্তি করিয়া বলেন, ফরিয়াদী তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন নাই যে, তিনি এই সাক্ষীর নিকট ১৭ই জুনের ঘটনা বলিয়াছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট—তাহা তর্কের বিষয়।

পরবর্ত্তী সাক্ষী কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ। তিনি ১৯৩১ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে করাচী গমন করেন। করাচী হইতে সাক্ষী দিল্লীতে যান এবং সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত আসামীর আবাসে অবস্থান করেন। সাক্ষী আসামীর গৃহে অতিথি হিসাবেই অবস্থান করিয়াছিলেন। নলিনী বাবু এবং একজন মহিলা ঐ বাড়ীতে ছিলেন। সাক্ষী ঐ মহিলার নাম জানিতেন না। মহিলাটির বয়স ছিল ১৮ অথবা ১৯ বৎসর। এই সময় সাক্ষী একটী গ্রুপ ফটো হইতে উক্ত মহিলাকে সনাক্ত করেন। সাক্ষী আরও বলেন যে, সুভাষ বাবু এবং সাক্ষী স্বয়ং দুই তিন দিন ঐ বাড়ীতে অবস্থান করেন। তাঁহারা দুইজনে বাহির ঘরে নিদ্রা যাইতেন। ঐ ঘরে কতকগুলি খাট ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঘরের মেঝেতেও নিদ্রা যাইতেন। আসামী এবং উক্ত মহিলা একই ঘরে নিদ্রা যাইতেন কিনা তাহা সাক্ষী বলিতে পারেন না।

এই সময় শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য শেষ করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি বলেন যে, এই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করা হইবে?"

শ্রীযুত বসু। হাঁ। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি আপনাকে কাগজপত্রগুলি দাখিল করিতে অনুরোধ করি, কারণ উহা হইতে আমি আপনাকে অনেক বিষয় জানাইতে পারিব।

ম্যাজিষ্ট্রেট—শ্রীমতী বীণা সরকার কর্ত্তৃক লিখিত পত্রের কথা আপনি বলিতেছেন?

শ্রীযুত বসু। হঁ।

ম্যাজিষ্ট্রেট—অপেক্ষা করেন। আমি শ্রীমতী বীণা সরকারকে জিজ্ঞাসা করিব।

বীণা সরকারের সাক্ষ্য

অতঃপর শ্রীমতী বীণা সরকার সাক্ষ্য দেন। তিনি বলেন, ১৯২৯ সালে তাঁহার বিবাহ হয়। আসামী তাহার পিতার মাসতুত ভাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট—এইরূপ মামলায় আমাকে বাধ্য হইয়াই কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক উত্তর দিন। আপনি কি আসামীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন?

—না।

সাক্ষী বলেন, ব্যভিচারের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। চিঠিগুলি কোর্টে দাখিল করিতে দিতে আমার তো কোন আপত্তি নাই-ই, বরং আমি আপনাকে অনুরোধ করি। আমি স্বামীর নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছি এবং স্বামী আমার নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া আপনি সত্য নির্দ্ধারণ করুন।

অতঃপর সাক্ষী বলেন, আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। আমার বর্ত্তমান বয়স ২৪ বৎসর। শশিব্রত ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে স্বামীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সেটা মার্চ্চ মাস। যে মাসে শ্রীযুত বিমলাংশু প্রকাশ রায়ের পত্নী বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। সম্বন্ধ স্থির হইবার পর আমার এই বিবাহে কিছু আপত্তি ছিল। জুলাই কি আগষ্ট মাসে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলাম। কি কারণে আমার আপত্তি হইয়াছিল, তাহা ঠিক মনে নাই। তবে সম্বন্ধ স্থির হইলে পর আমার স্বামী এমন ব্যবহার করিয়াছিলেন, যাহাতে আমার মনে

খটকা বাঁধিয়াছিল এবং আমার মনে হইয়াছিল, এই বিবাহ না হওয়াই উচিত। কিন্তু পরে আমি সম্মতি দেই। পীড়াপীড়ির ফলে যে আমি সম্মতি দেই তাহা নয়। স্বামী আমাকে বুঝাইয়া বলেন যে, আমার আপত্তি অসঙ্গত, তাই আমি সম্মতি দেই। বিবাহের পর আমি প্রায় সপ্তাহকাল স্বামীর সঙ্গে কৃষ্ণনগরে ছিলাম। তখন আমরা একশয্যায় শয়ন করিয়াছি এবং সহবাস করিয়াছি। কলিকাতা ফিরিবার পর স্বামী ও আমার মধ্যে স্বামী স্ত্রীর ন্যায় সম্পর্ক ছিল না—এই কথা সত্য নহে। আসামী আমাদের বাড়ীতে আসিয়া আমাকে মোটরে করিয়া লইয়া যাইতেন—এই কথা সত্য নহে। আসামী তখন কলিকাতায় ছিলেন না। সেইবার স্বামী ৫।৬ দিন আমার সঙ্গে বাস করেন। আসামী আমাদের আত্মীয়, সুতরাং তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন, কিন্তু আমি কেবল তাঁহাকেই অভ্যর্থনা করিতাম—এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ঐ সময় 'রমেশ দা'র আত্মকথা নামক একখানা পুস্তক পাইয়া স্বামী আমাকে আসামীর সহিত মিশিতে নিষেধ করেন, এই কথা সত্য নহে। তাহার পরের বার কৃষ্ণনগর গিয়া যখন দুই মাস ছিলাম, তখন আমিও আসামীর নিকট পত্র লিখি নাই, এবং তিনিও আমার নিকট পত্র লিখেন নাই। গত ছয় বৎসরের মধ্যে সম্ভবতঃ আসামীর নিকট কোনও পত্র লিখি নাই। আই-এ পাশ করিবার পর আমি বি-এ পড়িতে যাই এবং স্বামীও আমাকে অনুমতি দেন, তখন তিনি আমাকে ফেণী লইয়া যাইতে চাহেন নাই। আসামী শ্রীযুত সরকার আমার খরচপত্র দিতেন না। আমি আসামীর সঙ্গে দিল্লী গিয়াছিলাম। সেপ্টেম্বর মাস হইতে আমি ভয়ানক পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম, এবং চিকিৎসকগণ বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছিলেন।

আমি এবং আমার পিতামাতা আমার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়াছিলাম। পারিবারিক কোন অসুবিধার জন্য আমি কিশোরগঞ্জে আমার জ্যেঠা মহাশয়ের বাড়ীতে যাইতে সম্মত হই নাই। আমার জ্যেঠা ও জ্যেঠী উভয়েই অসুস্থ ছিলেন; আমি শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহারা কলিকাতায় আসিতেছেন। আমি তথায় যাইতে অনিচ্ছুক ছিলাম। আমার স্বামী বলিয়াছেন যে, আমি ২৬শে জুন দিল্লীতে গমন করিয়াছিলাম। আমি একা তথায় গিয়াছিলাম। আমি আমার পিতা-মাতার সম্মতিক্রমে দিল্লী গমন করি। আমার অল্প অল্প জ্বর হইত। আমি গুরুতর অসুস্থ ছিলাম বলিয়া আমাকে আমার কাকার সহিত দিল্লী যাইবার অনুমতি প্রদানের জন্য আমার পিতা আমার স্বামীর নিকট চিঠি লিখিয়াছিলেন। আমার ভগ্নীপতি ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র প্রথমে আমার দিল্লী যাওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আমার দিল্লী যাওয়ায়, আমার স্বামীর সম্মতি থাকিলে তাঁহাকে তারে উহা জানাইতে বলা হইয়াছিল। তদনুসারে তিনি তারে জানান, "বীণা কাকার সঙ্গে যাইতে পারে।" দিল্লীতে আমি ১৩, হেলি রোডে আড়াই মাস ছিলাম। ঐ বাড়ীতে আমি, কাকা, একজন চাকর, একজন ড্রাইভার ও কাকার দুইজন সেক্রেটারী ছিলাম। সেক্রেটারীদ্বয় পুরুষ ছিলেন। আমি দিল্লী হইতে আমার স্বামীর নিকট চিঠি লিখিতাম। ঐ সমস্ত চিঠি আমার নিকট নাই; সম্ভবতঃ আসামী পক্ষের ব্যবহারজীবীদের নিকট রহিয়াছে। আমার স্বামী আসামীর সহিত আমার দিল্লীতে অবস্থানে আপত্তি করেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি আমাকে তথায় থাকিয়া স্বাস্থ্যলাভ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

আদালতের সম্মুখে জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য মোতায়েন অশ্বসহ মাউণ্টেড পুলিশ।

ঐ সময়ে এডভোকেট জেনারেল মিঃ এ, কে, রায় বলেন, ঐ সমস্ত চিঠি আমার নিকট আছে। ফরিয়াদীর জবানবন্দীর সময়ে আমি প্রত্যেক চিঠি উপস্থিত করিব।

অতঃপর বীণা বলেন যে, ২রা জুন তারিখে আমাকে হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ে লইয়া যাইবার জন্য আসামী তাঁহার মোটর গাড়ী পাঠান নাই; উহার পরদিন পাঠাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে কাকা পীড়িত ছিলেন। তিনি কেবল আমাকে লইয়া যাইবার জন্য মোটর পাঠান নাই; আমাদের পরিবারের সকলকে লইয়া যাইবার জন্য মোটর পাঠাইয়াছিলেন। আমি কখনও একা তাঁহার সহিত তাঁহার মোটরে ভ্রমণ করি নাই। আমি যখনই হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ে গিয়াছি তখনই আমার পিতা-মাতা, ভ্রাতৃগণ কিংবা ভগ্নীগণ আমার সঙ্গে ছিলেন।

২৩শে জুলাই তারিখে আমি স্বামীর সহিত যাইতে অসম্মত হইয়াছিলাম। উহার পূর্ব্বে আমার স্বামী আমার নিকট অত্যন্ত অপমানজনক চিঠি লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের পরিবারের সকলে বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমি যখন দেখিলাম যে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে মনের মিল নাই, তখন

আমি আরও পড়াশুনা করা শ্রেয় মনে করিলাম। আমার পিতা আমার পড়ার ব্যয় বহন করিতেন। আমার দিল্লী যাইবার গাড়ীভাড়া ও অন্যান্য খরচ এবং দিল্লীতে অবস্থানের খরচ কাকা দিয়াছিলেন।

আমার স্বামী ফেণীতে আমার গর্ভ হওয়ার লক্ষণ দেখিয়াছেন বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, উহা সত্য নহে। ঐ সময়ে আমরা এক শয্যায় শয়ন করিতাম। আমি গর্ভ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট স্বীকারোক্তি করিয়া বলিয়াছি যে, তিনি গর্ভস্থ সন্তানের জনক নহে। তাঁহার এই উক্তি সত্য নহে। তিনিই সন্তানের জনক।

ফেণীতে ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েকদিন ও মার্চ্চ মাসে কয়েকদিন মোট এক মাস আমরা ব্যক্তিগত কারণে পৃথক শয্যায় শয়ন করিয়াছি। আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। আমার স্বামী চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে প্রসবের ব্যয় বহন করিয়াছেন; আসামী বহন করেন নাই। পূজাবকাশের সময়ে আমার ফেণী যাইবার কোন কথা হয় নাই; বড় দিনের কয়েক দিন পূর্ব্বে আমার স্বামী ঐরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, একদিন তিনি যখন আমার ডায়েরী পড়িতেছিলেন তখন আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম, ইহা সত্য নহে। তিনি তৎ-কর্ত্তৃক আমার নিকট লিখিত কয়েকটি চিঠি আমার সুটকেশ হইতে বাহির করিয়া তাঁহার সুটকেসে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমি তাঁহার সুটকেসে ঐ সমস্ত চিঠি দেখি। তিনি ফিরিয়া আসিলে আমি আমার চাবি-দ্বারা সুটকেস খুলিয়া ঐ সমস্ত চিঠি বাহির করি। তিনি ইহাতে ক্রুদ্ধ হওয়ায়, আমাদের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং আমি তাঁহাকে আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে বলি।

১৯৩৪ সালে ১৭ই জুন বেলা ২টার সময়ে আমার স্বামী ও বিনোদ বিহারী বিশ্বাস আমাকে হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ে মিঃ সরকারের সহিত এক শয্যায় দেখিয়াছেন বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত।

আদালতের সম্মুখে পুলিশ ব্যবস্থার অপর একটী দৃশ্য।

আদালত—আপনার স্বামী কি কখনও আপনাকে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসিনী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিলেন?—না, কখনও তাহা করেন নাই। তবে তিনি বিশেষ করিয়া আমার সম্বন্ধে না বলিলেও সাধারণ ভাবে শিক্ষিত বালিকাগণের সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি করিতেন। সময় সময় সেই ধরণের উক্তি আমার সম্বন্ধেও তিনি করিতেন।

আদালত—আসামী কি আপনাদের বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাইতেন?—তিনি কখনও কখনও যাইতেন। তিনি সর্ব্বদা কাজেই ব্যস্ত থাকেন, কাজেই ঘন ঘন আমাদের বাড়ী তাঁহার যাওয়া সম্ভব হইতে পারে না।

কোর্ট—আসামীর সহিত আপনার মেলামিশা সম্পর্কে আপনার স্বামী কোনও সময় আপত্তি করিয়াছিলেন কি?—না।

কোর্ট—আপনার সহিত আপনার স্বামীর কখন্ মনোমালিন্য ঘটে?

উঃ—প্রথমাবধি। শিশুকাল হইতে আমি পড়াশুনা করিতে খুব ব্যগ্র ছিলাম। আমি সর্ব্বদা বই লইয়াই থাকিতাম। বিবাহের সময় আমাকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, যতদুর পর্য্যন্ত আমি পড়িতে চাই ততদুর আমাকে পড়িতে দেওয়া হইবে।

কোর্ট—পড়াশুনার ব্যাপার লইয়াই কি আপনাদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে?

উঃ—না। অন্যান্য কারণ ছিল, তবে পড়াশুনা তাহার মধ্যে অন্যতম কারণ। শ্বশুরালয়ে আগমন অবধি আমি শাশুড়ী ননদ এমন কি স্বামীর নিকট হইতেও অত্যন্ত দুর্ব্যবহার পাইতে লাগিলাম।

কোর্ট—২৩শে জুন কোনও ঝগড়া হইয়াছিল কি?—ঐ সময় আমার স্বামী আমাদের বাড়ীতে ছিলেন এবং ২৩শে জুন পর্য্যন্ত তথায় থাকেন। ঐ সময় তিনি ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসেন। আমার সুটকেস হইতে চিঠি লইয়া যাওয়ায় ঐ ঝগড়া হয়।

কোর্ট। ইহার পর তিনি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন?—হাঁ।

মিঃ বসু। আসামী পক্ষের উকীলদের নিকট যে সব দলিলপত্র আছে চার্জ্জ গঠিত হইবার পূর্ব্বে, এক্ষণে তাহা দাখিল করিতে অনুরোধ করিতে পারি কি?

মিঃ রায় (এডভোকেট জেনারেল) ইহাতে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। মাননীয় আদালত কোর্টসাক্ষীরূপে এই মহিলাকে আনিয়াছেন। ফরিয়াদীর নিকট এই মহিলার এমন সব চিঠি আছে যাহা এই পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পারি নাই।

কোর্ট। আপনি তাহা দেখেন নাই?

মিঃ রায়। না, মহাশয়।

কোর্ট। একজিবিট হিসাবে আমি ঐসব গ্রহণ করিয়াছি।

মিঃ রায়। হাঁ, আমরা এখন ঐসব চিঠি

দেখিতে পারি। কিন্তু মহিলার নিকট লিখিত ফরিয়াদীর যে সব চিঠি আমাদের নিকট আছে, আমি ফরিয়াদীকে সেই সব চিঠি দেখিতে দিয়া, তাহাকে তদনুসারে মামলা তৈরী করিতে দিব না।

কোর্ট। আমি এক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতেছি।

মিঃ রায়—কারণ, ফরিয়াদী যে সব উক্তি করিয়াছে, আমি তাহার প্রত্যেক উক্তি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিতে চাই। মাননীয় আদালত ফরিয়াদী পক্ষের উকীলের অনুরোধক্রমে এই মহিলাকে আদালতে হাজির করিয়াছেন। এক্ষণে তাহাকে জেরা করিয়া তাহার সাক্ষ্য শেষ করিয়া দেওয়া ফরিয়াদীর উকীলের কর্ত্তব্য।

মিঃ ডি এন ব্যানার্জ্জি—ডাইরি প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা যাইতে পারে।

মিঃ রায়—ডাইরিতে কি লেখা আছে তৎসম্পর্কে কাহাকেও কোনও প্রশ্ন করা হয় নাই। ইহা অপ্রাসঙ্গিক ও গ্রহণের অযোগ্য। মাননীয় আদালত যদি ঐ ডাইরি দেখিয়া সাক্ষীকে কোনও প্রশ্ন করিতে চান তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

কোর্ট—স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চিঠিপত্রের আদান প্রদান হিসাবে ডাইরী ঐ ধারার বহির্ভূত নহে।

মিঃ রায়—আমি তাহা বলি না।

কোর্ট—ডাইরীতে এমন কোন অংশ আছে কি, যাহা আপনি প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করিতে চান?

মিঃ বসু—হাঁ, এরূপ অনেক অংশ আছে।

কিয়ৎক্ষণ আলোচনার পর এইরূপ স্থির হয় যে, আদালতের পড়িবার জন্য ফরিয়াদী পক্ষ ডাইরীর অংশ বিশেষ চিহ্নিত করিয়া দিবেন এবং ঐ সব অংশ প্রাসঙ্গিক কি না তাহা আদালত দেখিবেন।

এই সময় আদালত জলযোগের জন্য উঠিয়া যান।

জলযোগের পর

জলযোগের পর মিঃ বসু সাক্ষীকে জেরা করেন। সাক্ষী দুইখানি ডাইরী সনাক্ত করেন।

মিঃ বসু—পুলিশ যখন আপনার বাড়ী খানাতল্লাসী করে তখন আপনি উপস্থিত ছিলেন কি?—হাঁ।

আদালতের সম্মুখে "বড়কাকার" সন্ধানে কৌতূহলী জমাদারগণ।

মিঃ বসু—এই ডাইরী, দুইখানি 'খেয়ালী' এবং 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা আপনার ঘরে পাওয়া যায়।

—হাঁ, আমার ঘরে, কিন্তু আমার মা'র আলমারীতে।

মিঃ বসু—গত শুনানীর দিন আপনি কোর্টের বারান্দায় বসিয়া আদালতের দাখিলা চিঠি পাঠ করিয়াছেন?

হাঁ, আমি কয়েকখানি চিঠি পড়িয়াছিলাম। সব চিঠি পড়িতে পারি নাই।

কোর্ট—আপনার বক্তব্য কি? আমার অনুমতিক্রমে তিনি চিঠিপত্রগুলি পড়িয়াছেন।

মিঃ বসু—তিনি কি প্রায়ই আপনার বাড়ীতে আসিতেন? তাহার কোন ঠিক ছিল না। তিনি পরিবারের আত্মীয় হিসাবে সকালে বিকালে সন্ধ্যায় যে সময়ে ইচ্ছা আসিতেন।

মিঃ বসু—তিনি কি আপনাকে লইবার জন্য মোটর পাঠাইতেন?—নির্দ্দিষ্ট করিয়া কেবলমাত্র আমার জন্য কখনই পাঠাইতেন না। যখনি মোটর পাঠাইতেন পরিবারের সকলের জন্যই পাঠাইতেন।

এই সময়ে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের একখানি চিঠি সাক্ষীকে দেখান হয়, উহাতে লিখিত ছিল,—আমি তোমাকে অবহেলা করিয়াছি; আমার মধ্যে যখন নারীত্বের অভাব রহিয়াছে, তখন কি করিতে পারি?

মিঃ বসু—আপনি কি ইহা লিখিয়াছিলেন?—আমি লিখি নাই। ইহা আমার স্বামী কর্ত্তৃক লিখিত চিঠির উদ্ধৃত অংশ মাত্র।

কোনও স্বামী কি স্ত্রীকে এরূপভাবে চিঠি লিখিতে পারেন?—এরূপ স্বামীকে কি চরিত্রের লোক বলা যায় আমি জানি না।

মিঃ বসু—ঐ জন্যই কি আপনি বলিয়াছিলেন আপনাকে বিবাহ না করিলে তিনি সুখী হইতে পারিতেন?—বিবাহে আমার আপত্তির জবাবে স্বামী যখন জানাইয়াছিলেন আমি বিবাহে স্বীকৃত না হইলে তিনি জীবনে বিবাহ করিবেন না, সেই সময়ে উহা লিখিত হয়। এই চিঠিতে আমি লিখিয়াছিলাম, যদি আমার সহিত তাহার বিবাহ না হইবার সংকল্পে দৃঢ় থাকি তাহা হইলে তিনি হয়ত অধিকতর সুখী হইতেন এবং আমার জীবনও সুখের হইত।

মিঃ বসু—১৯৩০ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখের ডায়েরীতে আপনি কি আপনার বিবাহ সম্পর্কিত মনোভাব লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন?—হাঁ।

মিঃ বসু—বিবাহের পর আপনার ও আপনার স্বামীর মধ্যে কি ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল?

—ভালবাসা ছিল কিন্তু স্বামী বিবাহের

২।৩ মাসের মধ্যে দুইখানি অপমানকর পত্র লিখিয়া তাহা ধ্বংস হইতে সাহায্য করেন। স্ত্রী বিশেষতঃ নব পরিণীতা স্ত্রীর নিকট কোনও স্বামী যে ঐরূপ চিঠি লিখিতে পারেন আমি তাহা কখনও জানিতাম না।

মিঃ বসু—তাহার পর কি হইল?

—স্বামী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া গ্রীষ্মের ছুটীতে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া চিঠি দুইখানি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন।

মিঃ বসু—আপনাকে ফরিয়াদী যে সকল পত্র লিখিয়াছিল আপনি কি তাহা আসামী পক্ষের উকীলের নিকট দিয়াছেন?

—না, আমি তাহা করি নাই। গত অক্টোবর মাসে আমার স্বামী যখন ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় একটী নোটীশ বাহির করেন তখন পরামর্শ করিয়া আমার পিতামাতা ঐ পত্রগুলি আমার নিকট হইতে লইয়া যান এবং পিতার জনৈক আইন ব্যবসায়ী বন্ধুর নিকট উহা প্রদান করেন। অতঃপর আমার পত্রগুলি সম্পর্কে কি করা হইয়াছে তাহা আমি জানি না।

আদালত—আপনি উক্ত আইন ব্যবসায়ীর নাম বলিতে পারেন?—বীরেন্দ্রকুমার দে নামক কলিকাতা হাইকোর্টের জনৈক এ্যাডভোকেট।

মিঃ বসু—আপনার পিতা কি আপনাকে বলিয়াছেন যে, উক্ত পত্রগুলি আসামী পক্ষের উকীলের নিকট দেওয়া হইয়াছে? আপনার যখন বিবাহ হয় তখন কি উহা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইয়াছিল?

উঃ—যদিও আমার উহাতে আপত্তি ছিল কিন্তু আমার স্বামী ও প্রত্যেকেই আমাকে উহা বুঝাইয়া দিলে আমি উহাতে রাজী হই।

মিঃ বসু—আপনি পড়াশুনা করিতে চাহেন—এই কারণ ব্যতীত আপনার আপত্তির কি অন্য কোন কারণ ছিল?

—না।

মিঃ বসু—বিবাহের পূর্ব্বে ইহা কি স্থির হইয়াছিল যে, আপনি আপনার পিত্রালয় হইতে আই এ পাস করিবার পর আপনার স্বামীর সহিত থাকিবেন?

—না।

আদালত-প্রাঙ্গনে পুলিশ প্রহরী ও জনসাধারণ।

মিঃ বসু—কাশী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর আপনাকে কিশোরগঞ্জ যাইতে হইয়াছিল?

—হাঁ কাশী হইতে ফিরিয়া আসিবার অনেক দিন পর।

মিঃ বসু—আপনি কি আসামীকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি দিল্লী যাইতে চান?

—হাঁ।

আপনি কি ঐ বিষয়ে আসামীকে প্রমথ বাবুর নিকট পত্র লিখিতে বলিয়াছিলেন?

—হাঁ, তিনি একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন।

—আপনি কি আসামীকে 'বড়কাকা' বলিয়া ডাকেন?—হাঁ, আমার ভাই-বোনেরাও তাহাই বলিয়া ডাকে।

উদ্ধৃত চিহ্নের মধ্যে 'বড়কাকা' বলিয়া লেখাসহ আসামীর এই ফটোখানা আপনাদের বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছিল?—হাঁ।

কোর্ট—(মিঃ বসুর প্রতি) এই উদ্ধৃত চিহ্নকে কি আপনি কোন বিশেষ গুরুত্বদান করেন?

মিঃ বসু—হাঁ, ইহাতে অসঙ্গত ঘনিষ্ঠতা বুঝায়।

মিঃ বসু (সাক্ষীর প্রতি) আপনার সঙ্গে আপনার মাতা ও ভগ্নীদেরও কি দিল্লী যাইবার কথা হইয়াছিল?—হাঁ।

—আপনার সঙ্গে অন্ততঃ একজন ঝিকে দিল্লী লইবার কথা হইয়াছিল কি?

—না, বড়কাকা বলিয়াছিলেন যে দরকার হইলে ঐ স্থানেই একজন ঝি রাখা যাইবে।

কোর্ট—ইহা কি সত্য যে, আপনার স্বামী আপনাকে দিল্লীতে একজন ঝি রাখিতে লিখিয়াছিলেন?

—না, তিনি বরং একপত্রে আমাকে দিল্লীর ঝি চাকরদের বিশ্বাস না করিতেই লিখিয়াছিলেন। তাহাদের কাহারও সহিত আমাকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বড়কাকা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি আমার জন্য একজন ঝি রাখিবেন কিনা। কিন্তু ঐ সময় দিল্লীর কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদিগকে দিল্লীর ঝি'দের বিশ্বাস না করিবার জন্য সাবধান করিয়া দেওয়ায় ঝি রাখার সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়।

মিঃ বসু—দিল্লীতে আপনাদের কয়খানা ঘর ছিল?—সর্ব্বসমেত ৫খানা। বড় কাকার শুইবার ঘর, আমার শুইবার ঘর, একখানা বাহিরের ঘর, গ্যারেজ ও রান্নাঘর।

ঘরগুলি সংলগ্ন কি একটা বারান্দা ছিল?—হাঁ।

—গরমের সময় আপনি রাত্রে বারান্দায়ও শুইয়াছেন?

—হাঁ, একরাত্রি কি দুই রাত্রি বারান্দায়ও ঘুমাইয়াছি।

—আসামীও কি ঐ স্থানে ঘুমাইয়াছে?

—হাঁ, তাহা না হইলে আমি কি করিয়া বারান্দায় ঘুমাইব ?

—আপনার বড় কাকার শয়ন কক্ষে কয়খানা খাট ছিল ?—একখানা।

—রাজা বিজয় সিংহ দুধোরিয়াও কি ঐ বাড়ীতেই ছিলেন ?—হাঁ।

—তাহার গ্যারেজ ঠিক আপনাদের বাড়ীর ঠিক বিপরীত দিকে ছিল ?—হাঁ।

—তাঁহার ড্রাইভার কি গ্যারেজেই থাকিত ?—হাঁ।

—আপনারা দিল্লী থাকিবার সময় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কি আপনাদের বাড়ী গিয়াছিলেন ?—হাঁ।

মি সামসুদ্দিন আমেদও কি আপনাদের বাড়ীতে আসিতেন ?—আমি জানি না, আমি তাঁহাকে দেখি নাই।

ঐ বাড়ীতে কি আর কোন স্ত্রীলোক ছিলেন ?

—না।

কোর্ট (মিঃ বসুর প্রতি) আপনি কি বলিতে চান ? আপনি কি বলিতে চান যে, সাক্ষী আসামীর সহিত প্রণয় করিবার জন্য দিল্লীতে গিয়াছিলেন ?

—মিঃ বসু—হাঁ, মহাশয়।

কোর্ট (সাক্ষীর প্রতি) আপনার মাতা এবং ভগ্নী আপনার সঙ্গে দিল্লী গেলেন না কেন ?

—অনিবার্য্য কারণ বশতঃ তাঁহারা যাইতে পারেন নাই, ঐ সময় আমি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ৬।৭ মাস যাবৎ আমি মৃত্যুজ্বরে ভুগিতেছিলাম। কলিকাতার তিনজন ডাক্তার আমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। সকলেই আমাকে কোন শুষ্ক স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন—সেই জন্যই আমি আমার স্বামীর অনুমতি লইয়াই দিল্লী গিয়াছিলাম—আমার স্বামী ঐ সময় ফেণী ছিলেন।

মিঃ বসু—১৯৩১ সালে এপ্রিল মাসে দিল্লী হইতে আপনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন—আপনার স্বামী আপনার সহিত দেখা করিয়া আপনাকে কৃষ্ণনগর লইয়া গিয়াছিলেন ?—হাঁ।

অনুমান দুইমাস পর আপনি কলিকাতা চলিয়া আসেন ?—হাঁ।

১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে আপনি প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে বি-এ, পড়িতে থাকেন ?—হাঁ।

—আপনার প্রাইভেট টিউটরকে বেতন দিতেন কে?—আমার পিতা।

ইহা কি সত্য যে, আসামী আপনার প্রাইভেট টিউটরকে বেতন দিতেন?—না, কখনই না।

অতঃপর সাক্ষী বলেন যে, ১৯৩২ সালের ৭ই জুন তারিখ আমার স্বামী যখন আমাদের বাড়ী হইতে ফেণী রওণা হইতেছিলেন ঐ সময় আসামীর গাড়ীও আমাদের বাড়ী আসে। আমি ঐ গাড়ী চড়িয়া বড় কাকাকে দেখিতে যাই, বড় কাকা ঐ সময় অসুস্থ ছিলেন, যাইবার পূর্ব্বে আমি আমার স্বামীর অনুমতি লইয়া গিয়াছিলাম।

মিঃ বসু—আপনি কি আপনার স্বামীকে "হে আমার প্রিয়তম" বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাঁহাকে বাড়ী রাখিয়া আসামীর বাড়ীতে চলিয়া আসার জন্য আপনাকে ক্ষমা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন?—হাঁ।

আর কোন পত্রেই আপনি তাঁহাকে অতটা প্রিয়ভাবে সম্বোধন করেন নাই?

কেন করিব না, আপনাদের হাতে মাত্র ১০।১২ খানা চিঠি আছে, কিন্তু এই ৫।৬ বৎসরের মধ্যে আমি অন্ততঃ ২০০।৩০০ পত্র লিখিয়াছি।

—আপনার স্বামীর বারম্বার প্রতিবাদ সত্ত্বেও আপনি পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে যোগদান করিয়াছিলেন?

—আমি যখন পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে যোগদান করি, ঐ সময় আমার স্বামী কলিকাতায় ছিলেন না! পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে ভর্ত্তি হওয়ার প্রতিবাদ করিয়াও তিনি আমার নিকট কোন পত্র দেন নাই।

—১৯৩২ সালের ৯ই অক্টোবর রাত্রে হঠাৎ আপনি ফেণী রওণা হইয়া গেলেন কেন?

—আমার স্বামী আমাকে সমস্ত ভুলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি আর আমাকে অপমান করিবেন না—আমার মাতার নিকট মার্জ্জনা চাহিয়াও তিনি এক পত্র লিখিয়াছিলেন, এই পত্রগুলি পাইয়া ৯ই অক্টোবর রাত্রে আমি ফেণী রওণা হইয়া যাই।

—ইহা কি সত্য নহে যে আপনার মাসিক স্রাব বন্ধ হয় এবং আপনি হঠাৎ ফেণী রওণা হইয়া যান?

—না, ইহা সত্য নহে।

—ফেণী অবস্থান কালে আপনার সহিত আপনার স্বামীর সহবাস হয় নাই?

—হইবে না কেন, অনেকবার হইয়াছে; মাত্র একটী মাস কোন বিশেষ কারণে আমরা পৃথক শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম।

—এইটী কি আপনার সন্তানের ফটো? ১৯৩৩ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখ ইহার জন্ম হইয়াছিল?—হাঁ।

সাক্ষীর স্বামী সাক্ষীর সুটকেস হইতে চিঠি লইয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া সাক্ষী তাহার স্বামীকে অপমান করিয়াছিলেন, সাক্ষী ইহা অস্বীকার করেন—কিন্তু তিনি যে তাহার স্বামীকে বাহির হইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করেন। সাক্ষী প্রথমে সংবাদ-পত্রে পাঠ করেন যে, তাহার স্বামী আসামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগে মামলা আনিয়াছেন।

সাক্ষী বলেন যে, গত ৬ বৎসরের মধ্যে তিনি ৯।১০ বার হিন্দুস্থান বিল্ডিংসে গমন করিয়াছেন। সাক্ষী বলেন যে, আসামী একজন মৃতদার—আসামীর সহিত তাহার পরিবারের আর কেহ থাকে না,—কয়েকজন মাত্র চাকর তাহার সঙ্গে থাকে।

—আপনি কখন হিন্দুস্থান বিল্ডিংসে যাইতেন?

—আমার বড়কাকা অসুস্থ হইলেই গাড়ী পাঠাইয়া দিতেন এবং আমি আমার ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ সহ তথায় যাইতাম।

আপনি কখনও আসামীর গাড়ীতে 'লেকে' গিয়াছেন?—না, কখনই না।

আপনি কখনও 'লেকে' গিয়াছেন?

প্রায় প্রত্যই আমি তথায় যাই, লেক আমাদের বাড়ীর কাছেই।

ইহা কি সত্য যে, আপনি আসামীর সহিত তথায় গিয়াছেন?—না।

আপনি কি আসামীর বালীগঞ্জের বাড়ী হইতে লেকে গিয়াছেন?

—হাঁ, কিন্তু আসামীর সঙ্গে নয়—তাহার ভ্রাতা ও ভগ্নীদের সঙ্গে গিয়াছি।

অতঃপর সাক্ষী বলেন "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার নোটিশটি পাঠ করিবার পর আমি আমার স্বামীর নিকট হইতে রেজেষ্ট্রী করা একখানা পত্র পাই। ঐ পত্র আমি গ্রহণ করি না। ঐ নোটিশ প্রকাশিত হইবার পর আমার স্বামীর নিকট পত্র লিখিয়া আমি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে যত্নবান হই নাই—আমি তখন হইতে আমার স্বামীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করি, আমার স্বামীও তাহাই করেন। আমি যখন হিন্দুস্থান বিল্ডিংসে গমন করিয়াছি, তখনই আসামীর পাঠাগারে বই পড়িবার জন্যই গমন করিয়াছি।

এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বসুকে চার্জ্জ-গঠন সম্পর্কে তাহার বক্তব্য বলিতে অনুরোধ করেন।

মিঃ বসু বলেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে ১৯৩৪ সনের ১৭ই জুন তারিখ হিন্দুস্থান

বিল্ডিংসে, ১৯৩১ সনের ২৬শে জানুয়ারী হইতে ১৯৩১ সনের এপ্রিল মাসের ১৪ই তারিখ পর্য্যন্ত ব্যভিচার করিবার অভিযোগে চার্জ্জ গঠন করা যাইতে পারে।

এডভোকেট জেনারেল—১৭ই জুন এবং জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত সময় মধ্যের দুইটী কারণের জন্য একটি চার্জ্জ গঠিত হইতে পারে না। তারপর ব্যভিচারের অভিযোগ সম্পর্কে বলা যায়, ঐ ঘটনা দিল্লীতে ঘটিয়াছিল বলা হইয়াছে, ঐস্থানের উপর এই আদালতের কোন প্রতিপত্তি নাই। তারপর ব্যভিচার যখন যখনই করা হয় উহা তখন তখনই অপর একটী করিয়া অভিযোগের সামিল হয় ১৯৩৪ সালের ব্যভিচার ও ১৯৩১ সালের ব্যভিচার এক করা যায় না। সাক্ষী আপনার আদালতের এলাকার বাহিরে বাস করিতেছিলেন, ফরিয়াদীও ফেণীতে বাস করিতেছিলেন। আপনাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, আপনি দিল্লীর ঘটনা সম্পর্কে চার্জ্জ গঠন করিবেন, না হিন্দুস্থান বিল্ডিংসের ঘটনা সম্পর্কে চার্জ্জ গঠন করিবেন।

মিঃ বসু—হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ের ঘটনা সম্পর্কে চার্জ্জ গঠিত হওয়া দরকার।

এডভোকেট জেনারেল—স্থান এবং সময়ের কথা চার্জ্জে উল্লেখ করিতে হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট অতঃপর ১৯৩৪ সালের ১৭ই জুন তারিখের হিন্দুস্থান বিল্ডিংসের ঘটনা সম্পর্কে আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ (ব্যভিচার) ধারানুসারে চার্জ্জ গঠন করেন—কোর্টের প্রশ্নের উত্তরে আসামী নিজেকে নির্দ্দোষ বলে। ৯ই এপ্রিল তারিখে পুনরায় শুনানী উঠিবে।

নাট্য-তরঙ্গ
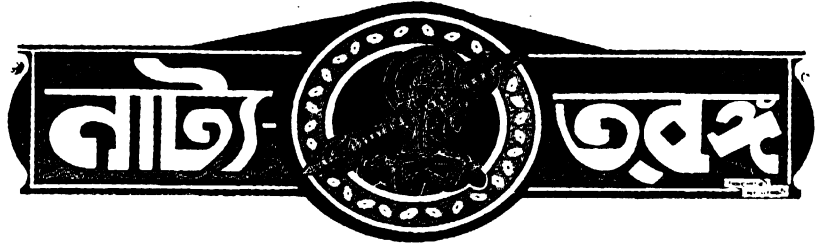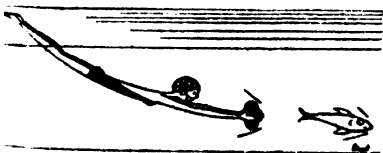
শ্রীক্ষেমীশ্বর

নাট্যনিকেতনে "জন্মতিথি"

গত শনিবার ৩০শে মার্চ্চ নাট্যনিকেতন-রঙ্গমঞ্চে নবীন লেখক শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার রচিত "জন্মতিথি-"র উদ্বোধন হ'য়েছে। "জন্মতিথি"কে প্রকৃত প্রস্তাবে খাঁটি "নাটক" বলা যায় না, ইহা আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত upstart-সমাজের একটি খণ্ডচিত্র। এই গ্রন্থে যতটুকু কৌতুক বা ব্যঙ্গ রস ফুটে উঠেছে—সেই সেই অংশ উপভোগ্য ব'লে মনে হয়। কিন্তু আসল "বস্তু" অত্যন্ত মামুলিধরণের, বৈচিত্র্যহীন ও ফাঁকিতে ভ'রপূর। "কার্য্য"গতি অতি মন্থর, তৃতীয় অঙ্কে আখ্যানটির সত্য আভাষ পাওয়া যায়। সংলাপ-রচনা অত্যন্ত দুর্ব্বল, এবং "জন্ম-তিথি-"তে টেকনিকের কোনো বালাই নাই। সংলাপের দুর্ব্বলতার জন্য চরিত্র ক্রমবিকশিত হ'য়ে উঠতে পারেনি। মোটের উপর "জন্মতিথি"-র মধ্যে কোনো নাটকীয় পদার্থ নাই। মনে হোলো যেন "চিরকুমারসভা"র একটি ব্যর্থ অনুকরণ।

* * *

অভিনয় নাট্য-রচনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হ'য়েছিল, তুলনা হিসাবে আমাদের এই কথাই মনে হ'য়েছে। মোটমাট ব্যাপারটি এই যে, ব্যবসায়ী ক্ষিতীশ দরিদ্র যুবক পরিমলের সহিত কন্যা ঊর্ম্মিলার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু তা'র স্ত্রী মনোরমার অভিপ্রায় কন্যার বিবাহ মুখচোরা শিশিরের সঙ্গে সংঘটিত হোক্। এদিকে ঊর্ম্মিলা পরিমলের প্রতি অনুরক্তা। ঊর্ম্মিলার জন্মতিথি-সন্ধ্যায় বাগানে পরিমল ঊর্ম্মিলা ভ্রমে দীপ্তির হাত চেপে ধরে, কারণ পরিধানে ঊর্ম্মিলা ও দীপ্তির একরকমের শাড়ী ছিল। দীপ্তির মন পরিমলের দিকে ঝুঁকে পড়ে, পরিমলের কাছে এই অনুরাগ বৃত্তান্ত অজ্ঞাত থেকে যায়। উৎপলের উপহাসের মধ্য দিয়ে দীপ্তি ও পরিমলের একতরফা হ'লেও প্রণয়ের সংবাদটুকু ঊর্ম্মিলার কাছে ধরা পড়ে। ঊর্ম্মিলা ঈর্ষায় আত্মহারা হ'য়ে প্রত্যাখ্যাত শিশিরকে বিবাহ ক'রবে ব'লে সম্মতিদান করে। কিন্তু শিশির সত্য ব্যাপার জানতে পেরে ঊর্ম্মিলার কাছে পরিমলের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ ক'রে নিজের উচ্চমনের পরিচয় দেয়। শেষে ঊর্ম্মিলা ও পরিমলের মিলন ঘ'টে গেল।

* * *

দাদাম'শায় ভূদেব চৌধুরীর ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অভিনয় প্রশংসাযোগ্য বলা যেতে পারে, কিন্তু স্থানে স্থানে অপরেশচন্দ্রের "রসিক" অভিনয়ের প্রভাব পরিদৃষ্ট হ'য়েছিল। "পরিমল" চরিত্রটি চিরকুমারসভার "পূর্ণ" চরিত্রের মত, তবে "পূর্ণ" যেমন লাজুক ছিল, পরিমল প্রগল্ভ। "পরিমল" ও "শিশিরে"র ভূমিকা গ্রহণ ক'রে যে দু'টি নট অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন, তাঁদের অভিনয় বিশেষ সুন্দর হ'য়ে ওঠেনি। বাচ্ছা "রঘুয়া"-চাকরটি বেশ একটি type সৃষ্টি ক'রেছে, তা'র অভ্যাস ভাঙা ভাঙা চিনেবাজারী ইংরেজী বুলি (Pigeon

English) আর শুদ্ধ বাঙ্‌লা কথা আওড়ানো। এই চরিত্রটি আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় "থাসদথলে"র "ঝি"-এর চরিত্র। এই চরিত্রে যিনি অভিনয় ক'রেছেন তিনি বেশ কৌতুক-রসের সৃষ্টি ক'রতে পেরেছিলেন।

* • •

"মনোরমা" বেশিনী চারুশীলা বিশেষ কোনো কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থ হন নি। নীহারবালার "উর্ম্মিলা" ভূমিকাভিনয় নিন্দনীয়। সেই studied চলন-বলন, সুর টেনে টেনে ও মুচ্‌কে হেসে কথা-বলা—বড়ই চোখে ও কানে পীড়া দেয়; তিনি অভিনয়ের এই ঢঙ-টি বদলে ফেলুন; এই বিশেষত্ববর্জ্জিত অভিনয় দেখে তাঁকে উচ্চ-শ্রেণীর নটী ব'লে আখ্যা দেওয়া যায় না।

সরযূবালা "উৎপলা"-র ভূমিকায় কোনো পদার্থ না থাক্‌লেও সহজ-স্বচ্ছন্দ অভিনয় ক'রে সকলের মনোরঞ্জন ক'রতে পেরেছেন, এইখানেই এই তরুণী নটীর কৃতিত্ব।

"উজ্জ্বলা"-র নাচটি বিসদৃশ হ'য়েছে। পরিকল্পনার যে রূপ মাথা-মুণ্ড নাই—নাচের পরিবেশটিও সেইরূপ কদর্য্য হ'য়ে উঠেছিল। এরূপ নাচ বাদ দিলে রুচির পরিচয় পাও যেতে পারে।

"দীপ্তি"-র ভূমিকায় যে নটী নেমেছিলেন—তাঁর অতিরিক্ত জঘন্য অভিনয় অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল। একজন শিক্ষিতা আধুনিক মহিলার কিরূপ সাজসজ্জা হওয়া উচিত—সে বিষয়ে সজ্জাকরের (Dresser and Painter) জ্ঞান অর্জ্জন করা দরকার।

প্রয়োগ-কর্ত্তা-ও কি নিদ্রা যাচ্ছিলেন, না—তাঁর-ও এটুকু ধারণা নেই?

"মিসেস্ হালদারের" ভূমিকায় কুসুম-কুমারীর অভিনয় সেদিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'য়েছিল। কুসুমকুমারীর এরূপ সুন্দর অভিনয় আমরা বহুদিন দেখিনি। বৃদ্ধবয়সে তিনি যে এই রকম আশাতীত অভিনয় ক'রে দর্শকগণকে চমৎকৃত ক'রে দেবেন—তা' আমরা ভাবিনি। তাঁকে আমরা অশেষ প্রশংসা করি; "জন্ম-তিথি"-তে তাঁর অভিনয় দ্রষ্টব্য,—ঠিক পূর্ব্বযুগে তাঁর "মর্জ্জিনা"—যেরূপ ছিল।

• * *

"জন্মতিথির" গানগুলি রচনা থেকে আরম্ভ ক'রে সুর ও গাওয়া পর্য্যন্ত যৎ-পরোনাস্তি বিরক্তি এনে দিয়েছিল। গীত-রচনার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু যাঁরা গান গেয়েছিলেন—তাঁদের গলায় সুরের বদলে বেসুর ও false roto উঁকি-ঝুঁকি মারছিল, তাল ও লয়ের সঙ্গে সঙ্গে আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থাটাও বেশ করা হ'য়েছিল।

সুগায়িকা যদি রঙ্গমঞ্চে না জোটে—গান বাদ দিয়ে নাটক চালাতে দোষ কি?—তবে—"এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী"র diminutive সংস্করণের মত—"নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।"—আমরা বলি—"ভালো তো ভালোই। কিন্তু জেনে রেখো দাদা, এ-রকমটি বেশীদিন চালালে, পুতুল-নাচের ব্যবস্থা দেখ্‌তে হ'বে। এবং পুতুল নাচাবেন ঐ ওঁরাই—অর্থাৎ ???।"

সুধীর-স্মৃতি

শ্রীনিশিকান্ত সরকার

সত্য তুমি গেলে চলি,
এত অভিমান?
আমার ঔরসজাত
করেছ প্রমাণ।
ক'রেছ প্রমাণ আর
কতখানি ব্যথা
মর্ম্মের গোপন কোণে,
শব্দহীন কথা
রেখেছিলে রুদ্ধ করি
মরমের তলে,
ডুবে নাই বিশ্ব সেই
রহস্য অতলে।
আজ প'ড়ে গেল ধরা
শেষ ডাকে তব

বাবা—বাবা—বাবা—বাবা
মর্ম্মভেদী রব।
চির অপরাধী করি
সত্যি চ'লে গেলি?
দিলি না'ক অবকাশ
দুটো কথা বলি?
অন্তর্য্যামী যাহা জানে
আজ জান তুমি
যে কথা বলিতে গিয়ে
বলিতে পারনি,
জানি তাহা, আর তুমি
জান, মর্ম্মে গাঁথা
বাক্য-হীন মহা-কথা
গেলে রেখে হেথা।
অক্ষয় অমর ক'রে
রেখে গেলে যাহা
তোমায় আমায় রবে
চিরদিন তাহা!
মর্ম্মের গোপন ধন
নিতান্ত আমার,
বিপুল সম্পদরাশি
মূল্য নাই তার॥

মিস্ ভায়োলেট্ অনেক ভালো দেখতে এই ছবিখানার চেয়ে। ছবি যে তুলেচে, তারও দোষ নেই কিন্তু। ভায়োলেট্ তখন সবে মাত্র কল্‌কাতা থেকে নেবেছে বোম্বাইয়ে। কেন সেখানে? কুমা'র মুভিটোন্-এ সে অভিনয় করছে জানেন বোধহয়। 'গ্রীণ হোটেল'; হীরেণ বোসের পরিচালনা।

* * * * *

খেয়ালী

পরিচালক - ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ২৮শে চৈত্র, ১৩৪১, 11th April, 1935. { ১৫শ সংখ্যা

হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী

স্বদেশী শিল্প, স্বদেশী ব্যবসায়, স্বদেশী প্রতিষ্ঠান—ইহাদের "সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি" কামনা করেনা, এমন স্বদেশদ্রোহী বাঙ্গালী আজিকার দিনে কেহ আছে কিনা জানি না। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করার অর্থ দোষ ত্রুটী না ধরিয়া সকল অবস্থাতেই অন্ধ স্তবগান করা নহে। পুত্রকে সুসন্তানে পরিণত করিতে হইলে তাহার সকল আব্দার সহ্য করিয়া তাহাকে "নাই" দিলে চলে না। ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে একথা যখন সত্য তখন সাধারণ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে একথা যে শতগুণ সত্য তাহা বলাই বাহুল্য।

হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর জয়ধ্বনি গাহিয়া এবং উক্ত কোম্পানীর প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস অটুট রাখিবার জন্য আবেদন জানাইয়া দশদিক্পালের সহিযুক্ত যে একটা নিবেদন সহসা সংবাদ-পত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়াই আমাদের মনে এই সকল চিন্তার উদয় হইয়াছে। শুধু আমাদের কেন, এই অপ্রত্যাশিত আবেদনের ফলে অনেকের মনে চমক্ লাগিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছে যে, তবে কি হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর ভিতর এমন কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যাহার জন্য দশদিক হইতে এই দশদিক্পালের ঠেক্নোর প্রয়োজন হইয়াছে? এজেন্ট আসিয়া ধরিলেই তাহার কথায় ভুলিয়া চক্ষু বুজিয়া যেখানে সেখানে বীমা করিবে, শিক্ষিতগণের মধ্যে আজকাল এইরূপ লোক বিরল। যাঁহারা বীমা করেন বা করিবেন, তাঁহারা আজকাল কিছু খোঁজখবর রাখেন। এবং যাঁহারা খোঁজখবর রাখেন তাঁহারাই জানেন যে স্বদেশী বীমা কোম্পানীর মধ্যে হিন্দুস্থান অন্যতম প্রধান, এবং বাঙ্গলা বীমা কোম্পানীর মধ্যে বোধহয় সর্ব্বপ্রধান। এই সর্ব্বজনবিদিত সত্যের সম্মুখে তবু উপরচড়াও হইয়া এই দালালী কেন? আবেদনের মধ্যে যে কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা যেমন অপর্য্যাপ্ত, তেমনি হাস্যকর। কোথায় কে দুই একখানি "অশ্লীল" পুস্তিকা লিখিল, আর [illegible]মনি হিন্দু[illegible]নের মত সুপ্রতিষ্ঠ কোম্পানী কাঁপিয়া উঠিল? এ কি তাসের ঘর? আমরা কিন্তু এতদিন জানিতাম যে এই কোম্পানী তাসের ঘর নহে, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ইহার প্রতিষ্ঠা।

এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারিতেছি না। তবে আমাদের মনেও সন্দেহ হইতেছে যে, হয় তো এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যা[illegible] এইরূপ আবেদন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু সেই অবস্থা যে কি, বাহির হইতে তাহা নির্ণীত হ[illegible] কঠিন। সেইজন্য আমাদের অনুরোধ নিরপেক্ষ তদন্তের দ্বারা কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরীক্ষা ক[illegible] সকল কথা জনসাধারণের নিকট জ্ঞাপন করা হউক। কেবলমাত্র

ফতোয়া দ্বারা কোনো কোম্পানী সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে বিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন লোকে চায় Facts and Figures. যাঁহারা এই ফতোয়া জারি করিয়াছেন তাঁহারা কি হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর খাতাপত্রাদি পরীক্ষা করিয়াছেন, না বাহির হইতে আন্দাজী ঢিল ছুঁড়িতেছেন ! শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস ও মিঃ এস, সি, গুপ্ত একাধিক পুস্তিকায় উক্ত কোম্পানী সম্বন্ধে নানা তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। আবেদনকারিগণ সেই পুস্তিকাগুলি দেখিয়াছেন কি ? আমরা যতদূর জানি উক্ত কোম্পানীর অংশীদারগণকে বহুকাল পর্য্যন্ত ডিভিডেণ্ড বাবদ কোনও লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই, অথচ প্রকাশ যে, ইহার জেনারেল ম্যানেজার মাহিনা ও কমিশন বাবদ একটা অত্যন্ত মোটা টাকা লইতে পারেন। অংশীদারগণকে যখন কিছু দেওয়া যায় না, তখন এইভাবে ব্যক্তিবিশেষের পুষ্টিসাধন করা কি বীমা-কোম্পানী পরিচালনার সুষ্ঠু রীতি ?

প্রসঙ্গক্রমে, এই বহু প্রচারিত আবেদনে স্বাক্ষরকারিগণের যোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা, বোধ করি নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকমাস পূর্ব্বে বাসন্তী কটন মিলের উদ্বোধনকালে বলিয়াছিলেন যে, যৌবনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এপর্য্যন্ত তিনি বহু ব্যবসায়েই হাত লাগাইয়াছেন, কিন্তু কোনটাই এপর্য্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। অতএব সেই কল্পনালোকবিহারী কাব্য-জগতের অধিবাসীর পক্ষে কোনও ব্যবসায় সম্বন্ধে কথা বলিতে যাওয়া কি অনধিকার চর্চ্চা নহে ? মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর নিজের সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের হস্তে ন্যস্ত ! তদুপরি শোনা যায় যে তিনি হিন্দুস্থান কোম্পানীর নিকট ঋণী। একথা সত্য হইলে তাঁহার পক্ষে এই আবেদনে স্বাক্ষর না করিলেই বোধহয় শোভন হইত। ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকারের ব্যবসায়ে কৃতিত্বের কথা উল্লেখ না করাই ভাল। স্যার হরিশঙ্কর পাল পৈতৃক অর্থে ধনী হইয়া বিলাতী মদ্যের Vendor রূপে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। বীমা সম্বন্ধে কথা বলিবার যোগ্যতা তিনি কবে অর্জ্জন করিলেন জানি না ! শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যে-বীমা কোম্পানীর কর্ণধার তাহার যথোচিত উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সবিশেষ সংবাদ আমরা আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। অন্য কোম্পানী সম্বন্ধে মাথা না ঘামাইয়া নিজের চরকায় তেল দেওয়াই বোধহয় তাঁহার পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের ফাঁকে কবে হইতে ও কেমন করিয়া বীমা-বিশারদ হইয়া পড়িলেন তাহা জানিতে পারিলে অনেকের ঔৎসুক্য নিবারণ হইবে। ইহাদের মধ্যে আবার দুইজন মাড়োয়ারীও আছেন। মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ দেখিয়া হাসি পায় ! স্বাক্ষরকারিগণের মধ্যে একমাত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। তিনি একাধিক ব্যবসায়ের সফলকাম পরিচালক, তদুপরি তিনি হিন্দুস্থানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। হিন্দুস্থানের কল্যাণার্থে ঔৎসুক্য প্রকাশ তাঁহার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তাঁহার নিকট এবং অন্যান্য যাঁহারা সত্য সত্যই হিন্দুস্থানের কল্যাণকামী তাঁহাদের সকলের নিকট তাই আমাদের আবেদন যে, এইরূপ একটা ফাঁকা ফতোয়া জারি করার পরিবর্ত্তে তাঁহারা অবিলম্বে কয়েকজন নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞকে লইয়া একটা তদন্ত কমিটী নিযুক্ত করুন। এই কমিটী হিসাবপত্রের খাতা হইতে আরম্ভ করিয়া কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাপার, পরিচালনারীতি প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া যে রায় দিবেন দেশের জনসাধারণ নিশ্চিন্তমনে তাহা গ্রহণ করিবে। জনসাধারণের সন্দেহ উদ্ভবের কারণ থাকিলে তাহা নিরসনের ইহাই একমাত্র ও প্রকৃষ্টপন্থা। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

শ্রীসব্যসাচী

গত ৩১শে মার্চ্চ দিল্লীতে ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের অধিবেশনে পণ্ডিত সন্তানম বলিয়াছিলেন—বিদেশী বীমা কোম্পানীর প্রতিযোগিতায় এদেশের বীমা কোম্পানীগুলি বিপন্ন হইতেছে, সুতরাং তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য আইন করা সরকারের কর্ত্তব্য।

আমরা এই প্রস্তাব সমর্থন করি। কারণ, বীমা কোম্পানীর সঞ্চিত অর্থ যদি সুপ্রযুক্ত হয়, তবে তাহাতে দেশের অনেক উপকার হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিতে হয়, এদেশের বীমা কোম্পানীগুলি যাহাতে সুব্যবস্থায় পরিচালিত হয়, সে জন্যও আইন করা প্রয়োজন। মাত্র কয়মাস পূর্ব্বে কলিকাতার একাধিক বীমা কোম্পানীর পরিচালকরা মামলা সোপর্দ্দ হইয়াছিল। পাইওনিয়ার এস্যুরেন্স কোম্পানীর পরিচালকদিগকে দণ্ড দিবার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছিলেন—"The offence was one of criminal speculation"। তাঁহারা কোম্পানীর টাকা ব্যবহার করিয়াছেন "without due care and caution". পাবলিক ওয়েল্‌থ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর মামলা আরও গুরুতর।

এদেশের কয়টি সুপরিচিত বীমা কোম্পানী—**ভারত ইন্‌স্যুরেন্স ও হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলী**—প্রভৃতি সম্বন্ধে মাদ্রাজ সরকার ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে প্রচার করেন: তাহাদিগের নাম—

"were deleted from the list of Life Assurance Companies accepted as sound for the purpose of rule 2 (b) (i) of the rules relating to the Provident Fund for teachers in non-pensionable service."

কোম্পানীগুলি দরখাস্ত করায় ঐ আদেশানুসারে কাজ বন্ধ থাকে ও পরে চার মাস পরে আদেশ বাতিল করা হয়। কেন যে মাদ্রাজ সরকার ঐ সব কোম্পানীর নাম "নির্ভরযোগ্য" (Sound) কোম্পানীর তালিকা হইতে কাটিয়া দিয়াছিলেন এবং শেষে কি জন্য আর সে আদেশ বহাল রাখেন নাই তাহা দেশের লোকের নিকট রহস্যই রহিয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ সরকার কোন বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে কোনরূপ মত প্রকাশ বন্ধ করাতেই ঐ আদেশ বাতিল করিয়াছেন কি না, তাহাও আমরা জানি না।

তবে হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর তরফ হইতে এ বিষয়ে যে পত্র প্রচারিত হয়, তাহাতে মাদ্রাজ সরকারের আদেশ "really unfortunate" মাত্র বলা হয়।

এই পত্রে বলা হয়—এই কোম্পানী নানারূপে টাকা খাটান—তাহার ক্ষেত্র "covering Municipal and Port Trust Debentures, Govt. Securities, First Mortgages on landed and building properties, its own house properties, mainly in Presidency towns". কিসে কত টাকা খাটান হইয়াছে, তাহার হিসাব দিলে কি ভাল হইত না? কোম্পানীর Balance Sheet এও আমরা—Investments, Mortgages, Loans একত্রিতভাবে পাই নাই। সে যাহাই হউক—এই পত্রের তারিখ ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪। আর ১৯৩৩ সালের Indian Finance Year-Book লিখেন—

"A scrutiny of the investments of the Hindusthan Co-operative shows that giltedge and bonds and cash are about 12 per cent. of the life fund; loans on policies absorb another 12 per cent: the balance is invested either in house and landed properties or loans on mortgages of properties."

ভূমি সম্পত্তিতে টাকা খাটানর সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া ঐ পুস্তকে লিখিত হয়—

"While we have no doubt that great vigilance is being excercised in this regard, we cannot but think that the Company has too small a portfolio of liquid securities."

'ষ্টেটসম্যান' এইরূপে টাকা খাটান সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—

"As regards the investment policy of the Hindusthan, the balance sheet shows that of total assets of Rs 173 and half lakhs, about Rs 106 lakhs are represented by loans on mortgages of real property, house property and landed property and less than Rs 17 and half lakhs in gilt-edge and other investments. The Hindusthan is the only important Indian Assurance office that has made a feature of placing the bulk of its funds in mortgages".

কেন এরূপ করা হইয়াছে তাহা হিন্দুস্থানের পরিচালকরা লোককে জানান নাই।

হিন্দুস্থানের টাকার আয় সম্বন্ধে 'ষ্টেটসম্যান' বলিয়াছেন :—

"The balance sheet shows nearly Rs 6 lakhs in respect of outstanding interest, dividends and rents, which seems a very large item when compared with the total interest on the life fund of Rs 8.26 lakhs, the latter item being 6 per cent. on the the fund guaranteed by the share-holders and transferred from their revenue account.......The Society's policy-holders would probably be glad of some enlightenment as to the details of the outstandings referred to."

আমরা মনে করি, হিন্দুস্থানের পরিচালক-দিগের এ বিষয় জানাইয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

আবার দেখিতেছি, বণিক সভাসঙ্ঘে মিষ্টার শীতলবাদ বলিয়াছেন, অনেক বিদেশী কোম্পানী ভারতে ব্যবসা বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত। তাহাদিগের টাকা আছে—আর হিন্দুস্থানের মত বিরাট প্রতিষ্ঠান দশ বৎসরেরও অধিক কাল অংশীদারদিগকে এক পয়সা দেয় না—ইহারই বা কারণ কি?

আমরা দেশীয় বীমা কোম্পানীর মঙ্গল ও উন্নতি ইচ্ছা করি। আমরা আশা করি, কোম্পানীগুলি দেশের লোকের সমর্থনের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিবেন এবং লোকমতের সমর্থন লাভ করিতে পারিবেন।

["সব্যসাচী" লিখিত এই প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের দিকে আমরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এখন হইতে বিশেষজ্ঞগণ লিখিত এইরূপ প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে "খেয়ালী"তে প্রকাশিত হইবে। আমরা স্বদেশী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা কামনা করি। কিন্তু তাহা করিতে হইলে কোন্ পথে উন্নতি সাধিত হইবে এবং সেই উন্নতির পথে বাধাই বা কি সে বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা হওয়া দরকার। যে দুইটী বীমা কোম্পানীর কার্য্যাবলী এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে তাঁহাদের তরফ হইতে কিছু বলিবার থাকিলে আমরা তাহা সাদরে পত্রস্থ করিব।

—সঃ খেঃ]

চলতি পথে

শ্রীমল্লিনাথ

মেয়র নির্ব্বাচন সমস্যা

আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আগামী বর্ষের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচন হইবে। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনানুসারে কর্পোরেশনের বৎসর শেষ হয় মার্চ্চ মাসের সঙ্গে এবং যিনি পূর্ব্বের বৎসর মেয়র থাকেন, তিনি কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে নির্দ্দেশ দিলে, প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তাহার পরের বৎসরের মেয়র নির্ব্বাচনী সভা আহ্বান করেন। আইন এইরূপ থাকায় কর্পোরেশনের কাজে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং বর্ত্তমান বর্ষে এইরূপ একটী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। যখন নিয়ম আছে যে পরবর্ত্তী বর্ষের মেয়র নির্ব্বাচন সভা আহূত হ'বে পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের মেয়রের নির্দ্দেশ-ক্রমে, এবং যদি পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের মেয়র কোন দল বিশেষের সভ্য হ'ন, তবে দলগত চক্রান্তের ফলে মেয়র নির্ব্বাচন সভা আহূত হইতে অযথা বিলম্ব হয়। বিলম্বের হেতু আর কিছুই নহে, কাল হরণ করিয়া দল বিশেষের সুবিধা করিয়া দেওয়া। কর্পোরেশনে একাধিক দল আছে এবং প্রত্যেক দলই মেয়র পদের জন্য নিজ নিজ প্রার্থী দাঁড় করান এবং পুরাতন বর্ষ শেষ হওয়ার পর হইতে নূতন নির্ব্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক দলই অশেষ তদ্বির করেন কি করিয়া তাঁহাদের নিজ প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। যিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের মেয়র তিনি যতদিন না তাঁহার দল হইতে ইঙ্গিত পান যে এতদিনে ব্যবস্থা সমস্তই পাকা হইয়াছে, তাঁহাদের দলের প্রার্থীর জয়ের আশা সুনিশ্চিত, ততদিন তিনি পরের বৎসরের জন্য মেয়র নির্ব্বাচনী সভার জন্য কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাকে নির্দ্দেশ দেন না। এইরূপ অবস্থায় যে কর্পোরেশনের কাজে অসুবিধা হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কর্পোরেশনের কাজের সমস্ত ব্যবস্থা হয় কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক সভায়; কিন্তু যদি মেয়র না থাকেন তাহা হইলে তো কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক সভার অধিবেশন হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত কর্পোরেশনে সমস্ত বিভাগগুলি সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালনার নিমিত্ত প্রতি বৎসরেই মেয়র নির্ব্বাচনের পর বিভিন্ন কমিটী গঠিত হয়; কিন্তু কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনানুসারে এই সমস্ত কমিটি গঠিত হইতে পারে মেয়র নির্ব্বাচনের পরে—পূর্ব্বে নহে। এই কমিটিগুলির কর্পোরেশনের কার্য্য পরিচালনায় কতখানি গুরুত্ব আছে, তাহা যাহারা কর্পোরেশনের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন তাহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দলগত চক্রান্তের ফলে যদি মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপার অহেতুক বিলম্বিত হয়, তবে কর্পোরেশনের কাজে যে কত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, তাহা উপরোক্ত কয়েকটী কথায় যথেষ্টই প্রতীয়মান হয়।

বর্ত্তমান বর্ষে যে মেয়র নির্ব্বাচনী সভার তারিখ এখন নিরূপিত হয় নাই, তাহার কারণ দলগত চক্রান্ত। সহরের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের যে অসুবিধা হইতেছে, সে অতি সত্য কথা, কিন্তু তাহাতে কি? কিন্তু জনসাধারণ তথা কলিকাতার করদাতাগণের পক্ষ হইতে এইরূপ অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য যাহারা দায়ী তাহাদের নিন্দা করা উচিৎ এবং সঙ্গে সঙ্গে, যাহাতে পুনরায় এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিৎ এবং আমাদের মনে হয় এই সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে এই বিষয় এমন একটী আইন প্রণয়ন করা দরকার যাহাতে পুনরায় এইরূপ অপ্রীতিকর অবস্থার সূচনা না হইতে পারে। বর্ত্তমানে নিয়ম আছে যে পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ষের মেয়রের নির্দ্দেশক্রমে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নূতন মেয়র নির্ব্বাচন করিবার সভা আহ্বান করিবেন। এই নিয়ম সংশোধন করিয়া যদি করা হয় যে মেয়র বা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা দুইজনেরই মেয়র নির্ব্বাচনী সভা আহ্বান করিবার অধিকার থাকিবে এবং সংশোধিত আইনে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত থাকিবে যে মেয়রের কার্য্যকাল শেষ হইবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে নূতন মেয়র নির্ব্বাচনী সভার অধিবেশন করিতে হইবে তাহা হইলে আমাদের মনে হয় বর্ত্তমান আইনের গলদ-জনিত দুরবস্থার যথাযথ প্রতীকার হইতে পারে।

* * *

অবশেষে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে মেয়র নির্ব্বাচনের তারিখ এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে স্থির হইয়াছে। এ বৎসর মেয়র পদের জন্য সম্ভবতঃ ডাঃ যতীন্দ্র মৈত্র এবং খাঁ বাহাদুর মোমিন প্রতিযোগী হইবেন। ডাঃ মৈত্র এবং মোমিন সাহেব যথাক্রমে সেনগুপ্ত মহাশয়ের এবং মুসলমান, ইউরোপীয়,

চুঁমু খাবো ঠোঁট ভ'রে হয় হোক্ শব্দ !

শ্রীশ, পা....

ছেড়ে দোব, কেন, কেন ? খুলে' গেছে ঘোম্‌টা !
গেলই বা, তা'তে বল এত কি সরমটা ?
তুমি আছো, আমি আছি, দ্বার আছে বন্ধ,
আর নাহি কেউ, তবে মিছে কেন দ্বন্দ্ব ?
চুমু খা'বো তাও ধীরে ! করিব না শব্দ !
কেন ? কেন ? তা' না হ'লে তুমি হবে জব্দ
ছোটবউ জানলায় কান পেতে শুনছে ?
শুনুক্ গে ! সেও বসে' মনে মনে গুনছে
প্রতিপল, কতখনে সিল্কের কুর্ত্তি
গায়ে দিয়া আসিবেন ছোট সিরিমূর্ত্তি।

কলেজেতে গেলাম না কেন, তাহা পষ্ট
শুনিবে কি ? উঃ বুকে কি দারুণ কষ্ট !
মদন কি ঠাঁই নিল হ'য়ে শাপভ্রষ্ট !
পড়াশুনা সব দেখি করে' দেবে নষ্ট।

মোরে তুমি কখনো কি করোনিক' মানা গো,
বেশ পারো বলে' যেতে মিছে কথা নানা গো।
ওমা, ওকি কথ মুখে ঃ যেতে দাও ধোরো না,
আর কভু বুকে চেপে খুনসুটি কোরো না !

মিছে কেন জিজ্ঞাসা ঃ জামা কেন পর্‌লে ?
কি বলিছ ? এখনি যে কথাগুলো বল্‌লে,
ভুলে' যদি যাই, মনে নাহি রাখি, তাহ'লে,
যত পারি চুমু খেতে দেবে তব দু'গালে !
বেশ, তবে কাছে এস, খুলে' দাও কোট্‌টা,
এইবার পেয়েছি যে, দেখি, দেখি ঠোঁট্‌টা !
বহুক্ষণ ধরে' আছি যে বিপ্রলব্ধ,
চুমু খা'বো ঠোঁট ভ'রে হয় হো'ক্ শব্দ ! *

---

* শ্রীঅ......লিখিত "চুমু খাও—ধীরে খাও, কর কেন শব্দ" পড়িয়া।

(**চল্‌তি পথে**)

ও মনোনীত দলের পক্ষ হইতে প্রার্থী হইয়াছেন। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের দল বলিয়া যে উপদল কর্পোরেশনে আছে, শুনা যাইতেছে, তাহারা এ বৎসর তাহাদের দল হইতে কোন প্রার্থী খাড়া করিবেন না, এবং উহারা নাকি বলিয়াছে যে এ বৎসর যাহাতে কংগ্রেসের দ্বিধা-বিভক্ত দল এক হইয়া একজন নৈষ্ঠিক কংগ্রেসী ব্যক্তিকে মেয়রের গদীতে বসাইতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন। উদ্দেশ্য যে খুবই সাধু সন্দেহ নাই, কিন্তু সহসাই তাহাদের সাধু উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে আমাদের মন নারাজ। যাহারা চিরদিন দল পাকাইয়া চক্রান্ত করিয়া বাংলার রাজনৈতিক ললাট মসীলিপ্ত করিয়াছে, তাহারা অকস্মাৎ তাহাদের নিজ চরিত্র বৈশিষ্ট্য হারাইয়া এত সাধু হইয়া উঠিল কি প্রকারে তাহা ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হই, এবং মনে মনে স্বতঃই [illegible] কোন মজার [illegible] করিবার ফন্দী অতীতের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট আছে এবং যখনই আমরা এই অকারণ উদারতার হেতু খুঁজিয়া পাইতে চেষ্টা করি, তখনই মনে পড়ে ডাক্তার বিধানচন্দ্রের কীর্ত্তি। কর্পোরেশনের গত সাধারণ নির্ব্বাচনের সময়ে ১১নং পল্লীতে যথাবিধি দল হইতে ডাঃ হরেন্দ্র সর্ব্বাধিকারীকে সমর্থন করিয়া তলে তলে নটরাজ নটবরের জন্য তদ্বির, মনে পড়ে মেডিকেল কাউন্সিল নির্ব্বাচনে ডাঃ শান্তিরাম চট্টোপাধ্যায়কে বাহিরে সমর্থন করিয়া ভিতরে ভিতরে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের অন্যতম প্রধান চিকিৎসকের জন্য চেষ্টা করা, এবং মনে পড়ে আরও কত দৃষ্টান্ত ! ডাঃ বিধান চন্দ্র অসীম কীর্ত্তিমান পুরুষ, তাঁহার এবম্প্রকার কীর্ত্তির শেষ নাই !

ডাঃ বিধান চন্দ্রের দল মিলনের প্রস্তাবের সহিত যে সকল বিধিসর্ত্ত জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহা নানা কারণে কার্য্যক্ষেত্রে অসাধ্য। সেনগুপ্ত মহাশয়ের দলের সকলেই ডাঃ মৈত্রকে সমর্থন করিবে না বলিয়া প্রকাশ। সেনগুপ্ত মহাশয়ের দলের একাধিক সভ্য মনস্থ করিয়াছেন যে তাঁহারা গত বৎসরের পরাজিত প্রার্থী ফজলুল হককে অথবা যে কোন মুসলমান প্রার্থীকে সমর্থন করিবেন। বর্ত্তমান কর্পোরেশনে কংগ্রেসী দলের যে অবস্থা, তাহাতে যদি কংগ্রেস পক্ষীয় উভয় দলই কোন একজন প্রার্থীকে একযোগে সমর্থন করেন, তবেই জয়ের আশা আছে ; নতুবা যদি কোনমতে দু একটী ভোট এধার ওধার চলিয়া যায়, তবে কংগ্রেস পক্ষীয় প্রার্থীর পরাজয় সুনিশ্চিত। কর্পোরেশনের কংগ্রেস পক্ষীয় উভয় দলের মতিগতি একটু বিচক্ষণতার সহিত পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, এই দুইটী দল এমন ভাবে কাজ করিতেছেন, যাহাতে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে উহারা মোমিন সাহেবকে মেয়রের গদিতে বসাইয়া দিতে

কংগ্রেসী দলের সভ্যগণের এতদূর অধঃপতন হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিতে সহসা প্রবৃত্তি হয় না।

প্রাদেশিক সম্মেলন

আগামী ইষ্টারের ছুটী আসন্নপ্রায় ও তাহার সহিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের দিনও নিকটবর্ত্তী। সম্মেলনের আয়োজন, যতদূর জানা যায়, প্রায় সম্পূর্ণ এবং যাহা কিছু আয়োজনের অবশিষ্ট আছে, তাহা দুই একদিনের মধ্যেই শেষ হইবে। বাঙ্গলা দেশের চারিদিক হইতে যেরূপ সাড়া পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে সারা বাংলাদেশ জাতীয় ভাবাপন্ন এবং সেইজন্য আগামী সম্মেলনের সভাপতি পদে জাতীয় দলের কর্ম্মী ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত মহাশয়কে দেখাও কিছু আশ্চর্য্য নহে। বাংলার অনেকগুলি জেলাই ইতিমধ্যে ডাঃ সেনগুপ্তের নাম সভাপতি পদের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং আশা করা যায় যে অবশিষ্ট কয়েকটি জিলার অধিকাংশই ডাঃ সেনগুপ্তের নাম চূড়ান্তভাবে মনোনীত করিবেন। বাঙ্গলা দেশকে আজ চতুর্দ্দিক হইতেই যে উৎপীড়ন সহিতে হইতেছে, তাহার প্রতিবিধান কি তাহা আগামী সম্মেলনে স্থির করিতে হইবে। বাঙ্গলার তরুণ সমাজের নেতৃস্থানীয় যুবকগণ বিনা বিচারে আজ পাঁচ বৎসর প্রায় কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে; ইহাদের কি উপায়ে মুক্তি সাধিত হইতে পারে, তাহা বাঙ্গালীকেই স্থির করিতে হইবে। বাঙ্গালী জাতি আজ ত্রিধা-বিভক্ত—প্রথম দুইভাগ—হিন্দু ও মুসলমান, এবং তাহার পর হিন্দুদিগের মধ্যে উপবিভাগ যথা, উন্নত সম্প্রদায় ও অনুন্নত সম্প্রদায়। ত্রিধা-বিভক্ত বাঙ্গালীকে পুনরায় কি উপায়ে এক ও অখণ্ড জাতিতে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহার উপায়ও নির্ণয় করিতে হইবে। নিখিল ভারতীয় নেতৃবর্গ বা কংগ্রেসের নিকট এই সকল বিপদের বিষয় জানাইয়া কোন লাভ নাই, কেন উপরোক্ত উৎপীড়নের কারণ সমূহের অনেকগুলি উহাদেরই সৃষ্টি। হিন্দু মুসলমানের বিভেদ ও হিন্দুদিগের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উপ-বিভাগ বাঙ্গালার জাতীয়তা বোধ নষ্ট করিতে পারে, তবে আশার কথা যে বাঙ্গালার জাতীয় দল দেশকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার পথ দেখাইয়াছে। বাঙ্গলাকে চতুর্দ্দিকের বিবিধ উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, আগামী প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে জাতীয় দলের কার্য্যাবলী গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

ভাটিয়ালী

কথা ও সুর:

শ্রীশিশির কুমার ঘোষ

সওদাগরের নউকা ভাসে মেঘনা নদীর জলে
নউকায় থাকে আমার বধু হীরার মালা গলে।
রেশ্মী সুতায় বান্ছে কইন্যা
চিকণ কালা চুল
কানের মাইজে ঝিল্মিল্ করে
নক্সী কাড়া ফুল
মুখ ফিরায়ে চায় গো কন্যা চায়না মনের ভুলে
নদীর বুকের কালাপানি
করছে কারে কানাকানি
মালা গেঁইথে কেঁদে মরি বুকে চিতা জ্বলে। *

* ১৬-২-৩৫ তারিখে গানখানি লেখক কর্তৃক রেডিয়োতে গীত হইয়াছে, 'এপ্রিলে' গানখানি রেকর্ডিং হইবে।

কারাবাসে তুষারকান্তি

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিগণের আচরণ সম্পর্কে অপমানসূচক মন্তব্য প্রকাশ করার অপরাধে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদক শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ ও মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত তড়িৎকান্তি বিশ্বাস যথাক্রমে তিন মাস ও একমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। গত সোমবার উক্ত মামলার রায় বাহির হয় বিচারপতি স্যার মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় অন্যান্য বিচারপতিদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। প্রীতিভাজন তুষার বাবুর কারাদণ্ডে আমরা ব্যথিত চিত্তে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি

সম্পাদক—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ তিন মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত

'অমৃতবাজার পত্রিকার' ন্যায় সতর্ক পত্রিকার ইতিহাসে কারাবরণ এই প্রথম। এই মামলার রন্ধ্রপথে 'পত্রিকার' পরিচালনা-পদ্ধতির যে বিরাট ব্যর্থতা প্রকাশ পাইয়াছে আশা করি তুষার বাবু কারামুক্তি লাভ করিয়া সে বিষয়ে যত্নবান হইবেন। আমরা বন্ধু হিসাবে তুষার বাবুকে তাঁহার কয়েকটা তথা-কথিত বন্ধুদের মায়াজাল ছিন্ন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি কারণ আমাদের মনে হয় তাঁহার দুই একটা ছদ্ম-বেশী বন্ধুদের ষড়যন্ত্রের ফলে ভাগ্য চক্রের আবর্ত্তনে মলবোণ-যাত্রী তুষার বাবুকে প্রেসিডেন্সী জেলে আবদ্ধ হইতে হইল। আদালতে তুষার বাবু স্বীকার করিয়াছেন যে প্রবন্ধটা তিনি লেখেন নাই। আমরা অবগত হইলাম প্রবন্ধটা 'পত্রিকা' আপিসের কোন কর্ম্মচারীও লেখেন নাই—লিখিয়াছিলেন মদরত-দলীয় ব্যক্তি বিশেষ। সংবাদ যদি সত্য হয় ত' আমরা বলিতে বাধ্য মদরত-মনোগত কাপুরুষতার বেসাতী করিয়া কলিকাতার শ্রেষ্ঠ সংবাদ পত্রকে বিপদগ্রস্ত করা মদরত-পুঙ্গবের পক্ষে অশোভন হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তুষার বাবুর এটর্নী ও উকিলেরা যে affidavit রচনা করিয়াছিলেন তাহাও যে জি, সি, চন্দ্রর এবং কোম্পানীর ন্যায় বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ীদের দপ্তরে কিরূপে রচিত হইল তাহাও আমাদের অবোধ্য :—

EDITOR'S AFFIDAVIT

1. I admit that on the 23rd March 1935, there appeared an article as stated in paragraph 2 of the affidavit of the said Arthur Lowe Collet. The said article was not written by me and in fact I had not seen it before publication but I take full responsibility therefore as Editor of the said newspaper. Since the said article was published I have ascertained that the article was written on the night of the 21st March, 1935 on the basis of the report of that day's proceedings of the Bengal Legislative Council as published on the 22nd March, 1935 in the "Amrita Bazar Patrika," and that the said article was intended to appear on the 22nd March, 1935 but was not printed on that day owing to want of space.

এই affidavit এ কি তুষার বাবুর দোষ আরও গুরুতর তাহা পরোক্ষে স্বীকার করা হয় নাই? অতি দ্রুত সিদ্ধান্তে ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জ্জনীয় কিন্তু অশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া চব্বিশ ঘণ্টারও অধিক সময়ের পরেও প্রকাশিত

মুদ্রাকর—শ্রী তড়িৎকান্তি বিশ্বাস এক মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত

প্রবন্ধ সম্বন্ধে "দ্রুত সিদ্ধান্ত" যে বলা চলে না তাহা কি গণেশ চন্দ্রের আপিসের affidavit—রচয়িতাদের মনে উদয় হইল না। যাহা হউক তুষার বাবু ভবিষ্যতে যদি তাঁহার বন্ধুদের স্বরূপ চিনিতে পারেন তাহা হইলে আমরা সুখী হইব। তিনি সুস্থদেহে স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসুন ইহাই আমরা কামনা করি।

মেয়রের বিরুদ্ধে আর এক দফা ব্যভিচারের অভিযোগ

ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক আরও একটী চার্জ্জ গঠন

৯ই এপ্রিল তারিখে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে কলিকাতার মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে মামলার শুনানী উঠিলে ফরিয়াদী মিঃ প্রমথনাথ সরকারের পক্ষের এডভোকেট মিঃ পরেশনাথ ব্যানার্জ্জী এই মর্ম্মে আবেদন করেন যে, ১৯৩৩ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৩৪ সালের ১৬ই জুনের মধ্যে কলিকাতায় ব্যভিচারের অভিযোগে আসামীর বিরুদ্ধে এক অতিরিক্ত চার্জ্জ গঠন করা হউক।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—১৭ই জুন তারিখে বর্ণিত ঘটনার অভিযোগানুসারে একটী চার্জ্জ ইতি-পূর্ব্বেই গঠন করিয়াছি।

এইরূপ অতিরিক্ত চার্জ্জ যে গঠিত হইতে পারে তাহার সমর্থনে মিঃ ব্যানার্জ্জী একটি নজীর দেখান।

এডভোকেট জেনারেল মিঃ এ, কে, রায় আসামী পক্ষ হইতে বলেন যে, এই মামলায় যে সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ খাড়া করা হইয়াছে, তাহা হইতে অতিরিক্ত চার্জ্জ গঠনের যৌক্তিকতা দেখা যায় না। ফরিয়াদী ১৭ই জুন তারিখের ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়াই স্পষ্টরূপে ব্যভিচারের মামলা খাড়া করিয়াছেন, ইহা ছাড়া অপর কিছুই নহে।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—ইহা ছাড়া অপর কিছুই নহে—এ বিষয়ে আমি একমত নহি।

মিঃ রায়—মাননীয় বিচারপতি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক ফরিয়াদীর অভিযোগপত্র পাঠ করেন এবং তাহাতে যে সাক্ষ্যসাবুদ দেওয়া হইয়াছে তাহা মনে রাখেন, তাহা হইলে তাহা হইতেই বেশ বুঝা যাইবে যে, দিল্লীতে বর্ণিত ঘটনানুসারে যে ব্যভিচারের চার্জ্জ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাহা নহে, কেবল ১৭ই জুন কলিকাতায় ঘটিত এই ব্যাপার সম্পর্কেই বলা হইয়াছে—দিল্লীতে ঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে বলা হয় নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—১৭ই জুন তারিখের ব্যভিচারের অভিযোগ সম্পর্কে যে চার্জ্জ আনা হইয়াছে, শুধু তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া যে মামলাটি গঠিত হইয়াছে, আমি এরূপ মনে করি না।

১০ই এপ্রিল

কলিকাতা আদালত সমূহের স্মরণীয় দিন

গত ১০ই এপ্রিল কলিকাতায় নিম্নে উল্লিখিত তিনটি মামলার শুনানী হয়।

১। ব্যভিচারে অভিযুক্ত মেয়র ও হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার নলিনী সরকারের মামলার মাননীয় সুশীল সিংহের কোর্টে আর এক দফা শুনানী

২। আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল্, কে, সেনের এজলাসে কবিরাজ অনাথ নাথ রায় বনাম হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর অন্যতম কর্ম্মচারী ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের মার পিটের মামলার শুনানী। আসামী হাজির হইয়া ২০০৲ ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তিলাভ করেন। আগামী ১৪ই মে শুনানী হইবে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু ও শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন পাইন যথাক্রমে ফরিয়াদী ও আসামীর পক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

৩। ব্যাঙ্কশাল কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সিংহ রায়ের এজলাসে "খেয়ালী"-র চিত্রকর শ্রীযুক্ত সুধীর সিংহ ও হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার নলিনী সরকারের ড্রাইভারের মামলার শুনানীর প্রথম দফা আরম্ভ হয়।

মিঃ এ, কে, রায় :—আপনি কি দয়া করিয়া মামলার দরখাস্তখানির প্রতি লক্ষ্য করিবেন? আপনি দেখিতে পাইবেন, ২৭নং প্যারাগ্রাফে দিল্লীর ঘটনা সম্পর্কে একটা অভিযোগ দাঁড় করান হইয়াছে। ইহার পর ৩২ এবং ৩৩নং প্যারাগ্রাফে না আসা পর্য্যন্ত আর কোন অভিযোগের কথাই নাই। তারপর আবার দিল্লীর কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। আপনি দেখিতে পাইবেন যে, ৫২নং প্যারাগ্রাফে ১৭ই জুনের ঘটনার কথাই বলা হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন আর কোন অভি-যোগের কথাই নাই। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি বলিতে চাই যে, ফরিয়াদীর দরখাস্ত এবং আপনার নিকট উত্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণের মধ্যে এমন কিছু নাই যাহাতে আর একটি চার্জ্জ গঠনের কথা উঠিতে পারে। এই অবস্থায় আর একটি চার্জ্জ গঠনের পূর্ব্বে আপনার নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন যে, ১৭ই জুন তারিখের পূর্ব্বেকার ব্যভিচার সম্পর্কে (অবশ্য দিল্লী ব্যতীত) সাক্ষ্য উপস্থিত করা হইয়াছে। আপনার নিকট যে নজীর উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা আমার মতে এস্থলে খাটে না।

বিগত শুনানীর দিন আমি বলিয়াছিলাম যে, দিল্লীর ঘটনাকে এই মামলায় টানিয়া আনা যায় না এবং কেবল ১৭ই জুন তারিখের ঘটনা সম্পর্কেই সাক্ষ্য উপস্থিত করা হইয়াছে। আপনি তখন আমার কথাই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং ইহার পর একটি মাত্র চার্জ্জই গঠন করিয়াছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—কিন্তু আর একটি অতিরিক্ত চার্জ্জ গঠন নিষিদ্ধ নহে।

মিঃ রায় :—আমি আপনাকে বুঝাইতে চাই যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ না হইতেছেন যে, আপনার সম্মুখে যথেষ্ট উপাদান আছে, ততক্ষণ আপনি আর একটি চার্জ্জ গঠন করিতে পারেন না।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আর একটি চার্জ্জ গঠন করা যায়।

মিঃ রায় :—আসামী কোথায় ব্যভিচার করিয়াছিলেন, আমি নিশ্চয়ই একথা জানিবার

অধিকার দাবী করিতে পারি। তাহা না হইলে আমি কি প্রকারে অভিযোগ খণ্ডন করিব?

ম্যাজিষ্ট্রেট:—অভিযোগ করা হইতেছে যে, ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাস ও ১৯৩৪ সালের ১৬ই জুন তারিখের মধ্যে ব্যভিচার করা হইয়াছে।

মিঃ রায়:—আমি বলিতে চাই যে, এরূপ চার্জ্জ সমর্থনযোগ্য নহে; অতএব ইহা গঠন না করাই কর্ত্তব্য। তবে যদি আপনি আমার এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া দেন, তাহা হইলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। আমি এই প্রতিবাদ জানাইয়া রাখিতেছি যে, আর কোন চার্জ্জ গঠন করা উচিত নয়। যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জেরা করিবার জন্যই আজ আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট:—এই অভিযোগ সমর্থনযোগ্য কিনা, তাহা পরে সাক্ষ্য প্রমাণাদি হইতে দেখা যাইবে।

মিঃ রায়:—দুইটি নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ব্যভিচার করা হইয়াছে এই মর্ম্মে অভিযোগ করা হইয়াছে। অতএব কলিকাতায় ব্যভিচার হইয়াছে, একথা বলা চলে না। আপনাকে দেখিতে হইবে, আপনার এলাকার মধ্যে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না। আপনি জানেন যে, এই বালিকা আপনার এলাকার বাহিরে বাস করে। আসামী অবশ্য আপনার এলাকাধীন স্থানেরই বাসিন্দা। ১৭ই জুন তারিখে কলিকাতায় ব্যভিচার করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর কোন ঘটনার প্রমাণ আপনার নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে কি?

ম্যাজিষ্ট্রেট:—ফরিয়াদী কয়েক বারই ব্যভিচারের কথা বলিয়াছেন।

মিঃ রায়:—ফরিয়াদী সেই সম্পর্কে বলেন নাই।

মিঃ পি, এন, বাঁড়ুয্যে:—তিনি বলিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট:—তিনি এইরূপ কথা বলিয়াছেন। সেই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিলে ইহা একটি অতিরিক্ত চার্জ্জ হইয়া দাঁড়ায়।

মিঃ রায়:—অপেক্ষাকৃত বিলম্বে এই চার্জ্জ গঠন করার ফলে আসামীর অসুবিধা করা হইতেছে। সাক্ষ্যের যে অংশের উপর নির্ভর করিয়া অভিযোগ গঠন করা হইতেছে, তাহার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করি।

বাঙ্গলায় ক্লৈব্য-নীতির উপাসক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে পরাজিত করিয়া ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত আগামী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙ্গলার স্বাধীন ও নির্ভীক জনমত যে, ক্লৈব্য-নীতি পরিহার করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইয়াছে, ইহাতে দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রই আনন্দিত হইবেন।

(এ স্থলে মিঃ রায় ও মিঃ বাঁড়ুয্যে সাক্ষ্য হইতে কয়েকটি অংশ পাঠ করেন)।

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলেন, ১৭ই জুন যাহা ঘটিয়াছে তাহা একটা স্বতন্ত্র ঘটনা নহে। পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আরও অনেক ঘটনা হইয়া থাকিবে এবং তৎসম্পর্কে পারিপার্শ্বিক প্রমাণও রহিয়াছে।

মিঃ রায়—অপর ব্যভিচার সম্পর্কে চার্জ্জ গঠন করিবার কথা যাহা বলা হইতেছে, ঐ ব্যভিচার মাননীয় আদালতের এলাকার মধ্যে হইয়াছে কি না তৎসম্পর্কেও মাননীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়কে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আসামীকে আমি বীণার বাড়ীতে অনেকবার যাইতে দেখিতাম এই কথা বলিলেই চলিবে না।

যে সব ঘটনা আপনার নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহাতে আপনার এলাকার মধ্যে ব্যভিচার হইয়াছে এইরূপ অভিযোগ গঠন করিবার মত প্রমাণ আছে কি না তৎসম্পর্কেও মাননীয় আদালতকে ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমার দৃঢ় ধারণা যে, প্রস্তাবিত অতিরিক্ত অভিযোগ সম্পর্কে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি তাহা তাহাকে জানিবার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট:—যে সব প্রমাণ রহিয়াছে তাহাতে আমি অতিরিক্ত চার্জ্জ গঠন করিতে পারি। নিম্নোক্তরূপে চার্জ্জ গঠন করা হইল:—

"আপনি ১৯৩৩ সালের অক্টোবর ও ১৯৩৪ সালের জুন মাসের কোন সময়ের মধ্যে কলিকাতায় শ্রীমতী বীণা সরকারের সহিত ব্যভিচার করিয়াছেন।"

আসামী:—ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

মিঃ রায়:—আপনি অতিরিক্ত চার্জ্জ গঠন করিতে পারেন কিন্তু তৎসম্পর্কে আমি আমার আপত্তি জানাইয়া রাখিতেছি।

অতিরিক্ত চার্জ্জ গঠন হইবার পর আসামীকে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতিক্রমে মিঃ রায়ের পার্শ্বে বসিতে দেওয়া হয়।

তৎপরে এ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ এ, কে, রায় অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারকে জেরা করেন।

"খেয়ালী"র ফটোগ্রাফার ও নলিনীর ড্রাইভার অভিযুক্ত

মেয়রের মামলার জের

গত মঙ্গলবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে যখন নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মামলার বিচার হইতেছিল তখন "খেয়ালীর" ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত সুধীর সিংহ আদালতের জনতার ফটো লইতে চেষ্টা করেন। এই সময় নলিনী সরকারের ড্রাইভার রাম মিশ্র ও তাহার পক্ষের অন্যান্য লোক আসিয়া তাহাকে বাধা দেয় এবং ক্যামেরা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করে। শ্রীযুক্ত সিংহ বাধা দিতে গেলে তখন ঘটনাস্থলে হাঙ্গামা বাধে। আদালতে দাঙ্গা হাঙ্গামা করিবার অপরাধে তখন 'খেয়ালীর' ফটোগ্রাফার ও নলিনীর ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করিয়া হেয়ার ষ্ট্রীট থানায় লইয়া যাওয়া হয়। উভয়কেই জামীনে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকার শ্রীযুক্ত সুধীর সিংহের এবং নলিনী সরকারের ভ্রাতা শ্রীসরোজ রঞ্জন সরকার নলিনীর ড্রাইভারের জামীন হইয়াছেন।

গত বুধবার প্রাতে শ্রীসুধীর সিংহ ও নলিনীর ড্রাইভার ডেপুটী কমিশনার মিঃ বি. এন্. ব্যানার্জ্জির এজলাসে উপস্থিত হইলে ডেপুটী কমিশনার উভয়কে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে চালান দেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয় সরকার ও নলিনীর ভ্রাতা শ্রীসরোজরঞ্জন সরকার যথাক্রমে 'খেয়ালী'র ফটোগ্রাফার ও নলিনীর ড্রাইভারের সহিত লালবাজারে উপস্থিত ছিলেন।

তৎপরে মধ্যাহ্নে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সিংহ রায়ের এজলাসে উভয়কে উপস্থিত করা হয়। কনেষ্টবলের সাক্ষ্য গ্রহণের পর মামলা আগামী ১৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। ঐ দিন অন্যান্য সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

আলিপুরের উকিল শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বসু ও পুলিশ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত সুনীতি কর যথাক্রমে শ্রীযুক্ত সুধীর সিংহ ও নলিনীর ড্রাইভারের পক্ষ সমর্থন করেন।

উভয়েই ২০০৲ টাকার জামিনে মুক্তিলাভ করেন।

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

রাধা ফিল্ম

এঁদের "মানময়ী গার্লস্ স্কুল"-কে চিত্রামোদীদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি উপহার দেবার জন্যে তোড়জোড় চল্‌ছে। সম্পাদনা শেষ হয়েছে—পরিচালক মহাশয় এখনও যথাসম্ভব চিত্রখানিকে উন্নত করবার চেষ্টা করছেন। আমরা খুবই আশা করছি তাঁর পরিশ্রম সার্থক হবে।

"দক্ষ-যজ্ঞ" যথানিয়মিত শ্যামবাজারের "ক্রাউন" ও ভবানীপুরের "পূর্ণ থিয়েটারে" সাতাশ ও তৃতীয় সপ্তাহ ধরে' চল্‌ছে। শনিবার ও রবিবারের দর্শকদের এঁরা সই করা সিল্কের রুমাল উপহার দেবেন ঠিক করেছেন। অবিশ্যি, এ উপহারটা শুধু শ্যামবাজারের "ক্রাউন"-এ।

"বাসবদত্তা"-য় শ্রীমতী কাননবালা। ছায়ায় আস্‌ছে শনিবার থেকে

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

গত রবিবার জয়পুর থেকে "বিদ্রোহী" ও ব্লাড্ এণ্ড বিউটী"-র কাজ শেষ কোরে এরা সদলবলে কোল্‌কাতায় ফিরেছেন। "বিদ্রোহী"-র কোল্‌কাতায় আর দু' একদিন স্যুটিং হ'লেই ছবিখানা মুক্তি প্রতীক্ষায় থাক্‌বে।

"বাণ্ডে" ও "তায়ের বাণ্ডে"

গত ৬ই এপ্রিল শনিবার মাদ্রাজের মুরুগান টকী ফিল্ম কোং-এর এক পার্টিতে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিলো। উৎসবটি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বি, এল্, খেম্‌কা মহাশয়কে সম্মানিত করবার জন্যে। ই, আই, এফ ষ্টুডিয়োতে সম্প্রতি ঐ কোম্পানী "নবীনা সরঙ্গধারা" বলে এক তামিল সবাক ছবি তুলে কোম্পানীর কাজে বিশেষ প্রীত হয়েছেন।

সেদিন কয়েকটি নতুন জিনিষ চা'য়ের সঙ্গে আমরা খেয়েছি—কয়েকটি সুস্বাদু মাদ্রাজী খাবার। যথা—'বাণ্ডে' ও 'তায়ের বাণ্ডে' 'পুংগল' 'চিন্তাপাণ্ডু' ও 'পায়সম' ইত্যাদি।

চা'য়ের পর মুরুগান-এর বক্তৃতা। তারপর স্বত্বাধিকারী ও প্রত্যেকটি কর্ম্মীকে উপহার বিতরণ।

সুমিষ্ট মদ্র-সঙ্গীতে উৎসব সাঙ্গ হয়।

বাসবদত্তা

কেশরী ফিল্মের এই বহু প্রতীক্ষিত কথা-চিত্রখানি আসছে শনিবার, ১৩ই এপ্রিল থেকে ছায়ায় প্রদর্শিত হবে। বাংলা ছায়া-চিত্রের জনপ্রিয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী কানন-বালা ও শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য এই চিত্রে নায়ক নায়িকারূপে দেখা দেবেন।

এই ছবির পরিচালক ও চিত্র-শিল্পী যথা-ক্রমে শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত ও শ্রীদীরেন দে। চিত্রজগতে এরা প্রতিষ্ঠালাভ না কোর্‌লেও—এদের কাছে আমরা ভাল কাজের প্রত্যাশা করি। মিঃ ইরাণী ও শ্রীনিতাই মতিলালের শব্দ-স্থিরীকরণ ও সঙ্গীত পরিচালনা ভাল হবে বলেই মনে করি। আমরা 'কেশরী'-র প্রথম উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হ'তে দেখলে সুখী হবে।

পাতালপুরী

কালী ফিল্মসের "পাতালপুরী" আসছে শনিবার থেকে চতুর্থ হপ্তায় পড়বে। কাহিনীর নতুনত্ব হিসাবে "পাতালপুরী" যে 'রূপবাণী'-তে আরও কিছুদিন দর্শক টান্‌বে—একথা বলাই বাহুল্য।

খেলার মাঠে

শ্রীদ্রোণাচার্য্য

ফুটবল

ফুটবলের মরশুম এসে পড়ল। বাইটন কাপ খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গেই ফুটবল লীগ খেলা সুরু হবে। তাই এখন থেকে প্রত্যেক ক্লাব ভাল ভাল খেলোয়াড় সংগ্রহ কোরে নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত। ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষের এতটুকু সময় পর্য্যন্ত নষ্ট হবার যো নেই, দেখা হলেই,—"ভাই আজ্‌কে বড্ড ব্যস্ত, আর একদিন এস, তখন সব খবর দেব" ব্যস,—কিন্তু আমরা যা জানি কৌতূহলী পাঠকদের তাই জানাচ্ছি, এবং এর পর এ বিষয়ে আরও খবর যথাসময়ে দেব।

আই, এফ, এ, থেকে একটি সাব কমিটী করা হয়েছে। এদের কাজ হবে ক্লাব কিম্বা খেলোয়াড়ের আইন সঙ্গত আচরণ, বাইরের আগত খেলোয়াড়দের প্রথম ডিভিসনে খেলার অনুমতি প্রদান, ইত্যাদি সম্বন্ধে তদন্ত করা। কমিটীতে আছেন মিঃ নিকলস; এস, এন, ব্যানার্জ্জী; বি, সি, ঘোষ; বি, ম্যাগননি; ও জে, এন. মুখার্জ্জি। খবরটী যে সুখবর সন্দেহ নেই।

হকি

ভারত থেকে যে হকি টিম নিউজিল্যাণ্ড যাবে তার ভেতর বাংলার চারজন খেলোয়াড় রয়েছেন, তাঁরা মাদ্রাজ রওনা হয়ে গেছেন। নীচে তাঁদের নাম দেওয়া গেল:—পি, দাস (মোহনবাগান) নেষ্টর (রেঞ্জার্স) ডেবিডসন (রেঞ্জার্স) এন, মুখার্জ্জি (মোহনবাগান)। নির্ব্বাচিতদল মাদ্রাজে একটি ম্যাচ খেলে রওনা হবেন।

* * *

বাইটন কাপ সুরু হয়েছে।

সাঁতার

আপনারা শুনে খুসী হবেন প্রসিদ্ধ সাঁতারু পি, ঘোষ হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় ৬০ ঘণ্টার অধিককাল সাঁতার কেটে পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন।

হকি লীগ বিজয়ী মোহনবাগান
আলোক চিত্রকর—শ্রীযুক্ত এস, বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায়—প্রফুল্ল ঘোষ
শ্রীযুক্ত সুধীর সিংহের সৌজন্যে

1519·17

চীনে চোখ জর্জ র‍্যাফট্-এর। সেটা স্বাভাবিক। চীন-মেয়ে অ্যানার সঙ্গে প্রেম করতে হবে তো? বাস্তবিক, ভারী সুন্দর কলিউডের মেক-আপ্ এর নমুনা। র‍্যাফট্-এর ওরকম চোখ নয়—সবাই জানে। ছবিটি প্যারামাউণ্টের 'লাইম হাউস্ ব্লুস্' থেকে।

আলো-ছায়া

—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

সামান্য একখানা খোলার বাড়ীর পাশেই দেখতে পাওয়া যায় প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা। সুদৃশ্য অট্টালিকার প্রতি গবাক্ষে ও দ্বারে সুদৃশ্য পর্দ্দা ঝুলান, বাইরে থেকে দেখা যায় সারাক্ষণই দশ বারোজন চাপরাশী ভৃত্য তক্‌মা এঁটে ব্যস্তভাবে উপর নীচ ছুটোছুটি ক'চ্ছে। সামান্য পথচারীও এ বাড়ীর কাছ দিয়ে যাবার সময় ক্ষণেকের তরে দাঁড়িয়ে বাড়ীর মালিকের অভিরুচির প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারে না। সাঁঝের আঁধার যখন ঘনিয়ে আসে বাড়ীর শ্রী তখন বদ্‌লে হয়ে ওঠে আরেক রকম। দিনের আলোকে যার রূপ ছিল ম্লান, রাত্রিতে বিজলী-বাতির আভায় হয়ে উঠে সে দীপ্ত। প্রতিকক্ষ থেকে আলোকের রেখা বেরিয়ে ওর চতুর্দ্দিকে এক মায়াপুরীর সৃষ্টি করে। হঠাৎ কাছে এসে পড়লে চোখে ধাঁধাঁ লাগে।

সামান্য খোলার ঘর। সামান্যই তার বাইরে থেকে দেখা যায়। সব সময় থাকেও না, হয় ত' মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাওয়া যায় ধোঁয়ায় ম্লান একখণ্ড পর্দ্দা জানালায় ঝুল্‌ছে।

পর পর মেয়ে হ'লে কোলের মেয়েটার দিকে মার যেমন নজর থাকে না, নিতান্ত অবহেলা ও অনাদরের মাঝেই ও বাড়তে থাকে, তেমনি জানালার এক কোণেই জড়সড় ভাবে পর্দ্দাখানা পাকিয়ে থাকে। অবজ্ঞার মাঝেও পায় একটু আদর, বাতাসের শীতল একটু স্পর্শ। দিনের আলো যখন ক'মে যায়, আঁধারের কোলে আত্মসমর্পণ করে, পাশের দীপ্ত শ্রীর সান্নিধ্যের লজ্জার হাত থেকে ও তখন রেহাই পায়।

অট্টালিকার মালিক ধনপতি বাবু প্রকাণ্ড বড়লোক—অর্থাৎ ব্যাঙ্কে তাঁর প্রচুর টাকা, কলকাতায় তিন চারখানা বাড়ী ও গাড়ী আছে। তা' ছাড়া চা' বাগানের শেয়ার, ব্যাঙ্কের শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ এসব ত' রয়েছেই। এক কথায় বলতে ধনপতি বাবু কোটীপতি। ধনপতি বাবুর টাকা সম্বন্ধে বাজারে নানা প্রকার গুজবও নাকি আছে। ধনপতি বাবু টাকা অর্জ্জন করে ব্যাঙ্কে জমা রাখেন, ইচ্ছা করলে শুধু সিকি দুয়ানি দিয়েই

গঙ্গার উপর একটি পুল তৈয়ার করিয়ে দিতে পারেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ওসব কথা যাক, আমরা জানি ধনপতি বাবু প্রকাণ্ড বড়লোক, কলকাতায় তাঁর তিন চারখানা বাড়ী ও গাড়ী আছে। বড় বড় লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ, বড় বড় অনুষ্ঠানে তাঁর যাতায়াত—সুতরাং...

খোলার ঘরে বাস করে মার্চেন্ট অফিসের সরু বেতনের সামান্য কেরাণী শশধর। সংসারের একমাত্র অবলম্বন পত্নী সুরমা ও পাঁচ বছরের ছেলে গোপাল। মাসান্তে পচিশ টাকা এনে শশধর পত্নীর হাতে দেয়, পত্নী সুরমা তাতেই কোন প্রকারে সংসারের যাবতীয় খরচের বন্দোবস্ত করে। কোন কোন মাসে তাতে' সঙ্কুলান হয় না, হয় ত' দু'এক টাকা বাকীও পড়ে। কিন্তু দারিদ্র্য তাদের পারিবারিক জীবনের শান্তিকে ম্লান কর্তে পারেনি। স্বল্প আয়ে স্বল্পেতেই এই দম্পতী সুখী।

কিন্তু শশধর আজ বড়ই বিমর্ষ। ছেলে গোপালের সাত দিন ধ'রে জ্বর। কিছুতেই জ্বরের বিরাম নেই। দরিদ্রের সংসার, সামান্য জ্বরে উপোস দিলেই জ্বর ভাল হ'য়ে যাবে। কিন্তু সাত দিন ধরে উপোস দেওয়া সত্ত্বেও জ্বর ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। মাস কাবার না হলে টাকা পাওয়া যাবে না। অথচ হাতে একটি পয়সাও নেই যা'তে ডাক্তার ডেকে ঔষধের কোনপ্রকার বন্দোবস্ত করা চলে। বন্ধুদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও ধার পাওয়া যায় নি, এমন কিছু জিনিষ পত্তরও নেই যা' বন্ধক দিয়ে টাকা পাওয়া যায়, তাই শশধর চিন্তিত মুখে দাওয়ায় বসে' ভাবছিল, কী করা যায়।

পত্নী সুরমা এসে বললে, দেখ একবার যাওনা ধনপতি বাবুর কাছে। পাড়া প্রতিবেশী ত' সব কথা বুঝিয়ে বললে হয়ত' কিছু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। বসে থাক্‌লে ত' কিছু হবে না। দেখ্‌ছ না গোপাল যেন ক্রমেই নেতিয়ে পড়ছে, ওঠ একবার।

শশধর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, কিন্তু সুরমা, ধনপতি বাবু বড়লোক, আমাদের মত গরীবদের হয়ত' চিনতেই চাইবেন না। আচ্ছা তুমি যখন বলছ তখন একবার যেয়েই দেখি।

ধনপতি বাবুর বৈঠকখানা লোকে ভর্ত্তি, বড় জুড়িগাড়ীতে সামনের ফুটপাত ছেয়ে গেছে, লোকের চলাফেরায় বাড়ীতে একটা উৎসবের সাড়া পাওয়া যায়। চতুর্দ্দিকে হাঁক ডাকের অন্ত নেই। আজ ধনপতি বাবুর একমাত্র পৌত্রের জন্মদিন উৎসব, তাই এ বিরাট আয়োজন। সহরের এমন কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি নেই যিনি আজ ধনপতি বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রিত হন নি। ধনপতি বাবু স্মিত হাস্যে আগত ভদ্রলোকদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত।

ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত ভাবে শশধর ধনপতি বাবুর সামনে এসে দাঁড়ালো ?

কে ? কি চাই আপনার ?

আজ্ঞে আমি, আপনার পাশের বাড়ীতেই থাকি, আমার নাম শশধর রায়, বড় বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি।

ধনপতি বাবুর মুখে বিরক্তির ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি পার্শ্বোপবিষ্ট অপর একজনের দিকে মুখ ফেরাতেই শশধর পুনরায় মরিয়া হয়ে বললে, দেখুন আমার ছেলের বড্ড অসুখ, আজ সাতদিন ধরে জ্বর, একফোঁটা ওষুধও তার পেটে এ পর্য্যন্ত দিতে পারিনি, যদি দয়া করে একটা টাকাও অন্ততঃ সাহায্য করেন।

ধনপতি বাবু বললেন, দেখুন, এ সময় বিরক্ত করবেন না। আচ্ছা, এখন আসুন। ধনপতি বাবু একথা বলতেই পার্শ্বোপবিষ্ট রায় সাহেব বললেন, ভিক্ষার জন্য এসেছিল বুঝি, এই করেই ত' আমাদের সর্ব্বনাশ হ'ল, কবে যে এ পাপ দূর হবে, আর পারা যায় না এ'সব, এ বলে আমায় সাহায্য কর; ও বলে আমায় সাহায্য কর, যত সব... ভিতর থেকে খবর হল জায়গা করা হয়েছে। আপনারা আসুন, ধনপতি বাবু মিষ্ট হাসি হেসে সকলকে ভিতরে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

পাশের বাড়ীতে তখন আঁধার নেমে আসছে, দরিদ্র পিতা একমাত্র পুত্রের তিল তিল মৃত্যু নীরবে দেখছে। মৃত্যুর নিকট দরিদ্রেরও ক্ষমা নেই। সুরমা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে উঠল, মাণিক রে—গোপাল আমার কোথা চললি বাপ"

ধনপতি বাবু বলছেন, "ওকি রায় সাহেব, হাত তুলেছেন যে, না না, ওরে হরি—আরও কয়খানা লুচি রায় সাহেবের পাতে দিয়ে যা।"

— উপন্যাস —

উচ্ছৃঙ্খল

শ্রীহরিরঞ্জন দাশগুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অরুণের সংজ্ঞা ফিরে এল বটে, কিন্তু তার ফুস্‌ফুস্‌ পচে গেছে। অতিরিক্ত মদ সেবনে lungs কেটে গেছে। ডাক্তাররা বলেছে—সে আর বাঁচবে না। তারপর তার মনে আঘাত লেগেছে, সে আঘাত সে সামলাতে পারবে না।

অরুণের পীড়া বাড়ছে। রোগশয্যায় পড়ে সে শুধু ভাবছে,—পিতৃস্নেহ কেমন! তার পিতা কী যন্ত্রণায় মরে' ছিলেন। তার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে।

নরক বলে স্বতন্ত্র কিছুরই অস্তিত্ব নেই। এ' সংসারেই স্বর্গ নরক; যে নরকে সে বাস করে এসেছে, সে নরকেই তার অবসান হবে। সে নরক-যন্ত্রণা সহ্য করেছে, কী নিদারুণ সে জ্বালা! পুত্র তাকে ছেড়ে গেছে, অতুল ঐশ্বর্য্য হারিয়েছে। উচ্ছৃঙ্খলতার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁচেছে।

জীবন-প্রদোষে দাঁড়িয়ে সে শুধু দেবতাকে এই কথাই জানিয়েছে—দেবতা! আমার সন্তানকে ফিরে দাও! কিন্তু দেবতা তার এ' আকুল আহ্বান শুনবেন কেন? এতদিন সে নিজেই তো তার পিতৃরূপী দেবতার আহ্বান, আদেশ, মিনতি শোনে নি। সে নিজে তার চেয়ে শতগুণ যন্ত্রণা ভোগ না করার আগে তার যন্ত্রণার অবসান হবে কেন?

তার বয়স পঞ্চাশেরও বেশী হয়েছে, তবু সে তার স্বভাব শুধ্‌রাতে পারে নি। অবশেষে পুত্রের সামনে লজ্জিত হয়েছে। সে ভাবলে: পিতার এ শোচনীয় দশা দেখে মাতৃস্নেহ বঞ্চিত সন্তানের মনে কী নিদারুণ ভাবেই না আঘাত লেগেছে।

তার প্রত্যেকটী দিনের প্রত্যেকটী ঘটনা তার চোখের সামনে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। তার অন্তর ব্যথায় ভরে গেল। দারুণ অনুশোচনায় তার মন পূর্ণ হয়ে গেল।

শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন রজনী, আকাশে চাঁদ উঠেছে; দু' একটী তারাও ফুটেছে। নীল মেঘের আড়ালে চাঁদটা বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল, মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল,—তার প্রাণ শীতল হ'য়ে গেল। তৃষিত প্রাণে শীতের মধুর পবন তৃপ্তির আনন্দ দিল।

দীপ্তির কোন খবর পাওয়া যায় নি। সেই যে সেদিন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে সে ফেরে নি। বোধ হয় জীবনে তার সঙ্গে আর দেখা হবেও না; গোপনে তার হৃদয়-সিন্ধু উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌ল। কান্নায় তার বুক ফেটে যেতে চাইছিল।

—কিন্তু কান্নায় কী হবে? সে তো তাকে ছেড়ে গেছে। পিতা উচ্ছৃঙ্খল; পুত্র তা' কী করে সহ্য করবে? মনে বিদ্বেষ ভাব নিয়ে সে ফিরে গেছে।—কেন সে আস্‌বে! চরিত্রহীন পিতার পুত্র ব'লে পরিচয় সে কেন দেবে?

তার মনে হ'লো—সে তো ছিল দেবোপম পিতার সন্তান। সে তার পিতাকে জ্বালিয়ে মেরেছে, জীবনে এতটুকু তৃপ্তি তাঁর হয় নি। সে তো চরিত্রহীন—সে তো ছার; জগতের লোক শুধু তার প্রতিভার আদর করে। ব্যক্তিগত চরিত্রে ঔদাসীন্য প্রকাশ করে।

ইচ্ছা হ'লো বাঁচবে। তার অন্তরাত্মা যেন তাকে ডেকে বল্‌তে লাগল—না তুমি বাঁচবে না। তোমার পাপ শেষ হবে তোমার মৃত্যুতে, দুঃখের ভিতর দিয়ে। জগতকে চিন্‌তে পারোনি—তাই শুধু অবাধে স্বচ্ছন্দে চলে গেছ' আনন্দে কাল কাটিয়ে—অপত্য-স্নেহ বুঝতে পার নাই।

—সে তার সন্তানকে খুঁজবে। তাই-ই তো তার কর্ত্তব্য! তার পুত্র তাকে খুঁজতে গিয়েছিল কোথায়? যা'র কথা লোকে মুখেও আনতে পারে না,—আর সে—যাবে না কেন? তার হৃদয়ে যে সেদিন পিতৃস্নেহের স্রোত গোপনে প্রবাহিত হয়েছিল তা' সে লক্ষ্য করে নি। সে বুঝতে পারল' পিতৃস্নেহ কেমন পবিত্র, মধুর।

তার মনে শক্তি ফিরে এল। হৃদয়ে আশার সঞ্চার হ'লো, সে তাকে খুঁজতে যা'বে।

সে ধীরে ধীরে রাস্তায় নেমে পড়ল। শক্তি নেই, কোথায় যাবে? দীপ্তি যে অদম্য আশায় যা'র গেছিল তার কি সে শক্তি আছে! সে যুবক, যৌবন বলদৃপ্ত দেহে, আর প্রৌঢ়ের দেহে কি শক্তি এক?

রাস্তাঘাট নির্জ্জন। জনমানবের সাড়া শব্দ নেই, সে পথ চলতে চলতে আর চলতে পারে না; রাস্তায় বসে পড়লো।...

ভোর হয়েছে, ভোরের বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে তার চেতনা ফিরে এল, সে চোখ মেলে দেখলে সে হাসপাতালে। কিছুই বুঝতে পারল' না।

নার্সকে দেখে সে বলল: আমায় এখানে কে এনেছে?

—সে বলল: পরে বল্‌ছি, আপনি বড়ই অসুস্থ।

—না আগে বল, তার পর।—

আপনাকে রাস্তার ধারে পাওয়া গেছে।

সে মন সুস্থ করে চিন্তা করতে লাগল। তার মনে পড়ল, সে দীপ্তিকে খুঁজতে বা'র হয়েছিল, পথে পড়ে গেছে; ambulance তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।

...আবার তার অন্তর ব্যথায় ভরে উঠ্‌ল।

নিঝুম রাত।...

হাসপাতালে লোকের শব্দের বিরাম নেই, অরুণের অবস্থা খারাপ হয়েছে। সে বাঁচবে না; কলেজের ছাত্রেরা তাকে বেষ্টন করে বসেছে। শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী তার নাড়ী পরীক্ষা করছে, সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছে; হঠাৎ উন্মাদের মতো বলে উঠল: "বাবা আমার! আমার কাছে ফিরে আয়, আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। তুই আয় আমার মরণকালে আমার এ' তপ্ত প্রাণে শান্তি দিয়ে যা'। আমায় একবার শেষ দেখা দে।" তার সে কথার পর আর তার প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গেল না।

...দীপ্তি তার বাবার খোঁজ করছিল, শুনতে পারলে তাঁর অবস্থা খারাপ।

পিতা পিড়ীত। বাঁচবার আশা নেই, পুত্র ছুটে গেল হাসপাতালে। দুপুর রাতে তার সাথে তার বাবার দেখা হ'লো না। সে ভোর হবার অপেক্ষা করছিল।

ভোরের বাতাস বইছে, দীপ্তির মনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার হ'লো। তার বাবাকে দেখতে পাবে। কিন্তু বিস্মিত নয়নে চেয়ে দেখল,—দু'জন কুলি একটা মৃতদেহ বয়ে আন্‌ছে। মনে আতঙ্কের সঞ্চার হ'লো, বুক ধড়াস্‌ করে উঠলো। তবে—তার পিতা নেই!

মৃতের অনাবৃত বদনের ওপর তার চোখ পড়তেই সে চিনতে পারলে, তার বাবার শব! গভীর অনুতাপে অন্তর দগ্ধ হয়ে যেতে লাগল। সে তাড়াতাড়ি উন্মাদের মতো সেদিকে অগ্রসর হয়ে কাতর কণ্ঠে ডাক্‌ল' বাবা!

শেষ

সাহিত্য পরিচয়
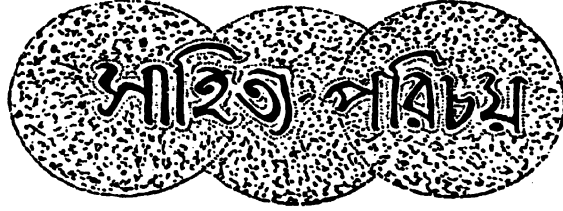
ননদিনী—শ্রীউপেন্দ্র কৃষ্ণ পালিত প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীবনবিহারী নাথ। ৯।১ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১।৹

বইখানা গার্হস্থ্য উপন্যাস এবং পারিবারিক জীবনের ঘটনা সমূহ কেন্দ্র করেই লিখিত। লোকচক্ষুর অন্তরালে কত পরিবারে কত সামান্য ঘটনা উপলক্ষ্য করে কত যে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে,—কত পরিবার যে সে অশান্তির আগুনে পুড়ে ধ্বংস হচ্ছে তার কতটুকু খবরই আমরা র'খি। সুখের আশা সকলেই করে এবং এ' যদি না থাকত তাহ'লে ভগবানের রাজ্য আজ অচল হয়ে যেত। কিন্তু সুখের সন্ধান পাবার আগে দুঃখের ঝড়ও যে সইতে হয়, তাই হচ্ছে চির সনাতন। হয়ত' অনেকে দুঃখকে বরণ ক'রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, অনেকে আবার ব্যর্থকাম ও হয়। পারিবারিক জীবনের এই সব তুচ্ছ খুটিনাটি ঘটনা নিয়ে বইখানা লিখিত হয়েছে বলে গ্রন্থকারকে আমরা সাধুবাদ করতে পারি। নচেৎ এ' ধরণের লিখিত বই আজকাল বাজারে একেবারে অচল। সামঞ্জস্যহীন বাগাড়ম্বরে, ঘটনার অসম্ভাব্যে, ও লেখনীর ব্যর্থ-প্রয়াস বইখানার আগাগোড়ায় বর্ত্তমান। চরিত্র সৃষ্টিও মাঝে মাঝে এরূপ হয়েছে যে লেখক মোটেই তার ছন্দ রাখতে পারেন নি। অধিকন্তু লেখক চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে যেয়ে যে সকল কথার অবতারণা করেছেন তা'তে রুচি জ্ঞানাভাবেরও যথেষ্ট পরিচয় দেয়।

ছাপা ও বাঁধাই বইখানির ভালই, কিন্তু আগাগোড়া যথেষ্ট ভ্রমপ্রমাদ বিদ্যমান।

ছেলেধরা—(সচিত্র ছোটদের এড্‌ভেঞ্চারের বই) শ্রীনীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান:—গুরুদাস লাইব্রেরী। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

"ছেলেধরা" আদ্যোপান্ত পড়লাম। বই খানির সবচেয়ে বড় গুণ এই যে—পড়তে বসলে শেষ না করে ওঠা যায় না। শিশু-সাহিত্যের পক্ষে এর চেয়ে বড় গুণ আর নেই। বইখানি যেন চির-চঞ্চল শিশুচিত্তের দিগ্বিজয় যাত্রা। এই বই পড়ে ছেলেরা যে আশাতীত আনন্দ লাভ করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। বিঃ চৌঃ

বর্ষ-ফল—শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ লিখিত ও শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি সম্পাদিত। বিধিলিপি গ্রন্থ-বিহারের পক্ষে ৫০ নং হালদার পাড়া রোড, কালীঘাট, কলিকাতা হইতে শ্রীনীরেন্দ্র ভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম পাঁচ সিকা।

ফলিত জ্যোতিষের আলোচনা স্মরণাতীত কাল হইতেই আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। যাহা অজ্ঞাত সেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ মানব মাত্রেরই হইয়া থাকে, এবং বাংলা ভাষায় এতাবৎকাল তাজিকোক্ত বর্ষ প্রবেশ গণনার কোন বই আমাদের চোখে পড়ে নাই। কিন্তু লেখক এই গ্রন্থে সরল ভাবে বর্ষ-প্রবেশ বিচারের সমস্ত বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বহু দুরূহ বিষয়ের সরল মীমাংসা ইহাতে করা হইয়াছে গ্রহের স্বরূপ, বর্ষ-প্রবেশের সময় নির্ণয়, মুন্থা, পঞ্চাধিকার, বর্ষ-রিষ্ট, ভাব-বিচার,

বনের বাঘ ও ছবির বাঘ

শ্রীঅতুলানন্দ দত্ত

(অমৃতবাজার পত্রিকা)

তোমরা অনেকে হয়ত নানারকম শীকারের গল্প পড়েছ। শীকারি শিকার কর্ত্তে বেরিয়ে কত রকম বিপদের মধ্যে দিয়ে যায়, কতদিন তা'দের হয়ত না খেয়ে উপোষ করে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হয়, দুর্গম ও বিজন বনের মধ্যে প্রাণ হাতে করে তা'রা কি করে চলে এই সমস্ত অদ্ভুত ঘটনা বোধহয় বিখ্যাত শিকারিদের কাছেও শুনেছ বা তা'দের লেখাও পড়েছ। হয়ত পড়ে থাকবে কি রকম ভাবে শীকারির অসাবধানতার জন্যে বাঘ এসে তাকে ক্ষত বিক্ষত করেছে বা একেবারে মুখে করে তুলে নিয়ে উধাও হয়েছে, আবার হয়ত এও শুনে থাকবে যে চালাক শীকারি বুদ্ধিভ্রংশ না হয়ে ভাল্লুকের মুখের ভিতরেও বন্দুকের নল চালিয়ে দিয়েছেন এবং গুড়ুম করে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছেন। আরও বিপদের ঘটনাও শোনা গেছে—হাতীর উপর হাউদা তার উপর দলবল নিয়ে শীকারি বসে আছেন। তাঁর শেষ গুলিটি পর্য্যন্ত খতম হয়ে গেছে এমন সময় এক প্রকাণ্ড বাঘ এসে হাতীর পা বেয়ে উঠতে লাগলো। শীকার কর্ত্তে গেলে এই সমস্ত হাঙ্গামা হয়েই থাকে এবং বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ শীকারি আগে থেকেই এই সমস্ত ঝঞ্ঝাটের ব্যবস্থা করে থাকেন।

এখন আমি তোমাদের একটা ঘটনা বলছি যে রকম ঘটনা, আমার ধারণা, তোমরা পূর্ব্বে কখনও শোন নি। ভদ্রতার খাতিরে, যে সমস্ত লোকের এই ঘটনার সঙ্গে সংযোগ আছে তাঁ'দের নাম আমি বলবো না তবে যা বলবো তা'র প্রত্যেকটি কথা সত্য—একটুও কল্পনা বা আষাঢ়ে গল্প বা বানান কথা নয়।

আমার এক বন্ধু—তাঁর নাম বলার প্রয়োজন নেই—অনেক চেষ্টা করেও বন্দুকের পাশ পেলেন না ; অথচ তার শীকার কর্ব্বার ভয়ানক ইচ্ছা। শেষে তিনি বুদ্ধি করে অনেক মাথা ঘামিয়ে এক উদ্‌ঘুটে মতলব ঠিক কল্লেন। তিনি একটা আষাঢ়ে গল্প বানিয়ে লিখে খবরের কাগজে ছাপতে দিলেন। গল্পটা সংক্ষেপে এই :—তাঁ'র এক বন্ধুর বন্দুক ছিল। দুই বন্ধু একদিন বন্দুক নিয়ে সুন্দরবনে শীকার কর্ত্তে গেছেন। বনের ভিতর ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ বাঘের গর্জ্জন শোনা গেল। এখন কথা হচ্ছে এই, বন্দুকের পাশ থাকলেই যে ভাল শীকারি হবে তা'র কোনও মানে নেই ; কাজে কাজেই যাঁর বন্দুক তিনি ভয়ে নবমীর পাঁঠার মত কাঁপতে লাগলেন আর তাঁর হাঁটু দুটো ঠকাঠক করে ঠুকতে লাগলো। কিন্তু আমার বন্ধু, যিনি এই গল্পটা লিখেছেন তিনি ত' আর ভীরু নন তিনি জান্‌তেন যে বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ কর্ত্তে হয়। সেই জন্যে তিনি সাহসে ভর করে তাঁর বন্ধুকে একটা গাছে উঠিয়ে দিলেন এবং পাছে তিনি পড়ে যান সেই জন্যে তাঁকে বেশ ভাল করে বেঁধে দিলেন। বন্ধুকে বেশ নিরাপদ জায়গায় বেঁধে রেখে দিয়ে তিনি নিজে নীচে নেমে এলেন এবং বন্দুক ঘাড়ে করে বাঘের সন্ধানে চল্লেন। বেশীক্ষণ দেরী হ'ল না। অতি অল্প সময়েই দেখা গেল যে একটা ৬ ফুট বড় বাঘ সামনে রয়েছে। বুঝতেই পাচ্ছ মানুষ-খেকো বাঘ তার সামনে পড়েছে মানুষ। বাঘ একেবারে যেন আনন্দে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। বাঘের জিভ্ দিয়ে লালা বেরুতে লাগলো আর বাঘ নিজের ঠোঁট চাটতে লাগলো। বন্ধু মুহূর্ত্তমাত্র দেরী না করে গুলি ছুঁড়লেন। তিনি তাক্ করেছিলেন বাঘের গলায় সুতরাং গুলি খেয়ে বাঘের ঘাড় ভাঙ্গলো।

উপরের ঐ গল্পটি লিখে বন্ধুপ্রবর সেটিকে ছাপবার জন্যে খবরের কাগজে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর নিজে ছুটলেন হগ্ সাহেবের বাজারের দিকে। সেখান থেকে বেছে বেছে একটা বড় বাঘের চামড়া কিনে আনলেন। কেউ যদি দেখতে চাইত কত বড় বাঘ তিনি সেই খরিদ করা চামড়াটা দেখাতেন।

কলিকাতায় কোনও একটা খবরের কাগজে এই শীকারের গল্প বেরুবার পর, দিন-কয়েক বাদে আমার বন্ধু কোনও একজন বড় কর্ম্মচারীর কাছ থেকে এক নিমন্ত্রণ পত্র পেলেন। পত্রে লেখা ছিল যে আমার বন্ধু যেন পত্র পাঠ গিয়ে বাঘ স্বীকার সম্বন্ধে সেই কর্ম্মচারীর সঙ্গে দেখা করেন। বন্ধু গিয়ে তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে তিনি সাদরে বন্ধুর তুই হাত ধরে আচ্ছা করে ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লেন, "কি করে বাঘটাকে মার্লেন?" বন্ধু বল্লেন, "শুনুন মশাই—বাঘটা হেঁতো দিয়ে বসে রয়েছে। আমি শুনেছিলুম যে বাঘের চোখের উপর চোখ রাখলে বাঘ আর নড়তে পারে না। আমি বাঘের চোখের উপর নজর রেখে আমার বন্দুক ঠিক কর্ত্তে লাগলুম। তুটো নলের মধ্যে তুটো বুলেট পুরে নিলুম। ঠিক সেই সময় বাঘ ব্যাটা হাঁ কর্লে, হাই তোলার জন্য, আর আমিও তাক কল্লুম ওর মুখের ফুটোর মধ্যে। আমিও গুলি ছুঁড়েছি বাঘও মুখ বন্ধ করেছে। কাজে কাজেই গুলি গিয়ে লাগলো গলায়।" কর্ম্মচারী হাঁ করে গল্প শুনছিলেন। এখন তিনি বল্লেন, "তোমার সাহসের যথার্থ প্রশংসা করি। বন্দুকের পাশ যদি কাকেও দিতে হয় তবে সে তোমাকে!" এই বলে তিনি তখনই একটা পাশ লিখে আমার বন্ধুকে দিলেন ও তার কথাটা সত্য কি কল্পনা তা' ভেবে দেখাও প্রয়োজন কি না মনে কল্লে না।

তিন বছর পরে একদল শীকারি, প্রায় জন কুড়ি লোক, শীকার কর্ত্তে যাচ্ছেন। এঁদের পাণ্ডা আমার ঐ বন্ধুটি। এঁরা সুন্দরবনে যাচ্ছেন। বনের মধ্যে ঢুকে কিছুদূর গিয়ে একটা সাইন বোর্ড দেখতে পেলেন। ফরেষ্ট অফিসার সেই সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে দিয়েছেন আর তাতে লেখা আছে যে সেইখানে একটা মানুষ-খেকো বাঘ আছে যে অনেক মানুষ গরু মোষ আরও কত কি মেরেছে। যদি কেউ সেই বাঘটাকে মারতে পারে তবে সে ২,০০০৲ টাকা পুরস্কার পাবে। এই শীকারির দল এইখানে এসে থামলেন; স্থির কল্লেন বাঘটাকে মেরে পুরস্কার নিতে হবে।

বাঘ মার্ব্বার নানারকম প্রথা আছে। সাধারণতঃ তুরকম ভাবে বাঘ মারা হয়ে থাকে—এক মাচা বেঁধে, আর না হয় মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে। একটা গাছের উপর খাটিয়ার মত একটা মাচা বেধে শীকারিরা তার উপর বসে। বাঘ সেখানে উঠতে পারে না সুতরাং সেখান থেকে নীচে বাঘকে গুলি করা সোজা। কেউ কেউ মাটিতে একটা বড় গর্ত্ত খুঁড়ে সেই গর্ত্তর ধারে বা পাড়ে গাছের ডাল পাতা দিয়ে বেড়া দিয়ে দেয়। বাঘ মানুষের গন্ধ পেয়ে সেই দিকে আসে অথচ মানুষ খুঁজে পায় না; শীকারিরা সেই সময় বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকে গুলি করে।

আমাদের শীকারিরা এই দ্বিতীয় রকম ভাবে শীকার কর্ব্বেন স্থির কল্লেন এবং গর্ত্তের ভেতর নিজেরা ঢুকে পাড়ে বেশ ভাল করে বেড়া দিয়ে দিলেন।

মানুষ যেমন বাঘ দেখলে ভয় পায় তেমনি বাঘও মানুষ দেখলে ভয় পায়। এখানে যে বাঘটার কথা বলা হচ্ছে সে পুরোদস্তুর মানুষ-খেকো অনেক মানুষ সে মেরেছে, আর সে জানে যে সুবিধা পেলে শীকারি তাকে ছেড়ে কথা কইবে না। সেই জন্যে সেও খুব সাবধানে চলাফেরা করে, কি জানি কোন-দিক থেকে শেষে গুলি এসে লাগবে!

"অবশেষে সত্য সত্যই বাঘ আসিয়া পড়িল।" বাঘত এসেই দেখলে যে মানুষের সুগন্ধে তার রাজ্য ভরপুর হয়ে রয়েছে। কোথা থেকে এই সুগন্ধ আসছে খোঁজ কর্ত্তে কর্ত্তে সে যখন গর্ত্তের কাছ বরাবর এসে পৌঁছাল তখন গর্ত্তের ভেতর হ'ল ভীষণ গোলমাল এবং গণ্ডোগোল। "বাঘ এই আসে এই আসে" করে শীকারিবর্গ অনেকক্ষণ থেকে অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন। আর থাকা যায় না। এমন সময় বন্ধুপ্রবর মাথা উঁচু করে দেখতে গেলেন বাঘের কতদূর। কারণ যদি বাঘ মার্ত্তেই হয় তবে তিনিই মার্ব্বেন অপর কেউ মার্ব্বে এ তাঁর সহ্য হবে না। অর্থাৎ যাকে সরল বাঙ্গলায় বলে "হয় ভারত আমা কর্ত্তৃক স্বাধীন হোক, না হয় ভারত উচ্ছন্নে যাক্।" সুতরাং তিনি মুণ্ড বার করে দেখতে গেলেন আর দেখলেন যম সামনে

দাঁড়িয়ে। তার পরেই তিনি বন্দুক গর্ত্তের ভিতর ফেলে একলাফে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন এবং "ওগো আমাকে বাঁচাও কে কোথায় আছ রক্ষে কর সামনে বাঘ" বলে চেঁচাতে লাগলেন। তাঁর দলবল যারা ভিতরে ছিল সকলেই চীৎকার কর্ত্তে লাগলো। "ওরে ও হতভাগা ভেতরে ঢোক তোকে বাঘে খাবে। বাঘে তোকে নিলো বলে" ইত্যাদি। কিন্তু কে কাকে বলে আর কেই বা শোনে। বন্ধুর তখন বুঝবার বা শোনবার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। তিনি পাগলের মত শ্রেফ্ চেঁচাচ্ছেন "বাঘ বাঘ"। কিন্তু বাঘ এতক্ষণ কি কচ্ছিল। বাঘ তখন দেখেছে সামনে অপূর্ব্ব জিনিষ জগতের শ্রেষ্ঠ খাদ্য। সে বেশ চেপে বসে আনন্দের গর্জ্জন কচ্ছে আর ল্যাজ নাড়ছে। বাঘের চোখে মুখে আনন্দ মাখান, সে যেন বলছে, "ভগবান তোমার জয় হোক আজ তোমার জন্যেই এমন চমৎকার নবীন ময়রার স্পঞ্জ রসগোল্লা পাওয়া গেল।" বাঘ লাফ মারে মারে অবস্থা; একেবারে সাজাহানের "দারা লাফ দেবো!" এমন বন্ধুর বিপদে সাহায্য কর্ব্বার জন্যে আর একজন বাইরে এসে পড়লেন—তার পিছনে। পিছনে আর একজন এবং এইভাবে দলকে দল বাইরে এসে পড়লেন। সে বাঘটা আগে অনেক শিকারীর হাতে পড়েছে। যদিও গুলি কখনও খায়নি বটে তবে অনেক গুলি তার কাণের পাশ দিয়ে বেরিয়ে (আমি বন্দুকের গুলির কথা বলছি বাগবাজারের গুলি নয়)। সে সেখানে অপেক্ষা করা বিবেচনা সঙ্গত মনে কল্লে না—আস্তে আস্তে সরে গেল।

শিকারটা বিলকুল মাটি হয়ে গেল। খবরের কাগজে একটা বাজে গল্প ছেপে গোঁয়ার্ত্তুমি ও বোকামি করে সমস্ত আনন্দ মাটি করার জন্য তার সঙ্গে আর সকলের ঝগড়া বেধে গেল। যদি কেউ আজও তাকে জিজ্ঞাসা করে "কি হে তুমি কি রকম করে বাঘ মেরেছিলে ত?" তবে তার উত্তর হয় "বোঝ না হে খবরের কাগজে যা বের হয় তার অনেক বেশী আসলে ঘটে থাকে।"

উপরে যে ঘটনাটা বলেছি সেটা সত্য। আমার কল্পনা নয়। যে কোনও লোক বাঘের সামনে পড়েছে সে বুঝতে পার্ব্বে যে আমি একটুও বানিয়ে বলি নি। যাই হোক বুনো বাঘের সামনে পড়লে কি হয় সেটা আমার পক্ষেও বলা বোধহয় যুক্তি সঙ্গত নয় যেহেতু আমিও কখনও বাঘের রাজ্যে বাঘকে দেখিনি; তবে মানুষের বুদ্ধি প্রভাবে খাঁচায় বন্ধ বাঘ দেখেছি—সে ঠিক আলেকজান্দরের শিকল দিয়ে বাঁধা ডাকাতের মত।

সেদিন চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়ে বাঘের ঘরের সামনে ভিড় দেখে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। বাঘের ঘরে দেওয়ালের গায়ে যে বড় তাক ছিল সেই তাকের উপর প্রকাণ্ড এক বাঘ চার পা তুলে চিৎ হয়ে ঘুমচ্ছে। তাকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে নীচে নামাবার

জন্যে নানারকম তদ্বির হচ্ছে, তবে সে কিছুতেই নামছে না। সেই জন্যেই এত ভিড়। এমন সময় তিনজন গোরা হাত ধরাধরি সেখানে এসে দাঁড়াল এবং তাদের নিজস্ব ভাষায় কি বলাবলি কর্ত্তে লাগলো। এইখানে একটা কথা বলে রাখি—গোরাদের কথা আমি বুঝতে পারি না, যারা টকি ছবি দেখেন তাঁরা বুঝতে পারেন। তবে পরে যা ঘটলো তা' থেকে বুঝতে পাল্লুম যে তারাও সেই বাঘটার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবার কথাই বলছেন। গোরারা বাঘের উদ্দেশ্যে নানারকম চীৎকার ছুটহাট কর্ত্তে লাগলো কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপও কল্লে না। পাশে একজন ভট্টাচায্যি ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়েছিলেন। তিনজন গোরার মধ্যে যিনি সবচেয়ে সাহসী তিনি "আহা হা কর কি" বলতে না বলতে সেই ভট্টাচায্যি বামুনের পা থেকে চটি জুতোর একপাটি খুলে নিলেন আর এক লাফে সামনের লোহার ডাণ্ডার বেড়া ডিঙ্গিয়ে বাঘের খাঁচা আর বেড়ার মধ্যে যে নর্দ্দমা আছে তাইতে নামলেন। তারপর সেই চটি জুতোর এক দিক হাতে করে অপর দিক দিয়ে খাঁচার গরাদের গায়ে রটরটটং রটরটটং করে রগড়াতে লাগলেন। এতেও বাঘ গ্রাহ্য কল্লে না যেমন ছিল তেমনি রইল। এখন ঘটনা হয়েছে এই যে বাঘ অনেকক্ষণ আগেই উঠেছে তবে মটকা মেরে পড়ে আছে সাড়া শব্দ দিচ্ছে না। আমরাও জানি না আর গোরারাও জানে না কাজেই গোরাদের সেই সাহসী বীরটি সেই রকম কর্ত্তে লাগলেন আর বাঘকে নানারকম গালাগালি দিতে লাগলেন। বাঘ নিজের সুবিধে খুঁজছে। সে দেখাচ্ছে আছে ঘুমিয়ে কিন্তু আসলে আছে বিলকুল জেগে। এই রকম অবস্থায় থেকে থেকে হঠাৎ আচমকা মাল্লে এক লাফ। হাঁক্ করে একটা শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে লাফ আর এসে পড়লো কুড়ি ফিট দূরে একেবারে গরাদের উপর। আর গোরা কি কল্লে? "বাপরে!" বলে চেঁচিয়েই উঠলো সেই লোহার বেড়ার উপর—লোহার বেড়ার উপর এক পা আর বাঘের ঘরের মেঝেয় যেটুকু রক মত বেরিয়ে থাকে তারির উপর এক পা—সেখান থেকে একটি লাফে সমস্ত বারান্দা এবং লাল কাঁকর দেওয়া রাস্তা ডিঙ্গিয়ে পড়লো গিয়ে একেবারে ঘাসের উপর। গোরা বোধহয় এক লাফে ১৫ ফুট গিয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনা ঘটতে বড় জোর দু' সেকেণ্ড তিন সেকেণ্ড সময় লেগেছিল। বাঘের হাঁকুনিতে চিঁড়িয়াখানার পশুবর্গের ভিতর একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। যত বাঘ সিংহ সব একসঙ্গে চেঁচাতে লাগলো। পাশে চৌবাচ্চার জলহস্তী দুবার চেঁচিয়ে জানিয়ে দিলে যে সেও জেগে আছে। শেয়ালেরা "ফেউ ফেউ" কর্ত্তে লাগলো বুনো কুকুর "খেউ খেউ" কর্ত্তে লাগলো আর যত রাজ্যের পাখীরা একসঙ্গে কনসার্ট জুড়ে দিল।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এ হচ্ছে চিঁড়িয়াখানার বাঘ খাঁচার মধ্যে বন্ধ, রুগ্ন দুর্ব্বল সব দিন খেতে পায় না। এই অভুক্ত চিঁড়িয়াখানার বাঘ—যার খাঁচার বাইরে আসবার শক্তি নেই। এর কোনও শক্তি না থেকেও গোরার কি দুর্দ্দশা তা' আমি বুঝিয়ে বলেছি।

এইবারে বলবো সবচেয়ে হিংস্র বাঘের কথা আর একেবারে খোদ আফ্রিকার সিংহের কথা। এ হচ্ছে ছবির বাঘ অর্থাৎ সিনেমার বাঘ। এ আমার বন্ধুর কাল্পনিক গল্প নয়, মানুষের বুদ্ধির আঁচ পাওয়ার চালাক বাঘ নয়। এ একেবারে আসল বাঘ যা স্বেচ্ছায় বনের মধ্যে লাট সাহেবের মত ঘুরে বেড়ায় (কারণ সিংহ পশুরাজ সেটা ত আর অস্বীকার করা যায় না) কারো তোয়াক্কা রাখে না, শিকারী চেনে না, গুলি বোঝে না। এরা নিজের মনে ঘুরে বেড়ায়। আপনার শীকার আপনি জোগাড় করে নেয়। চিঁড়িয়াখানার বাঘের মত এক চাপড়া বাসি গরুর মাংসের জন্য ধাঙ্গড়ের উপর নির্ভর করে না।

শুনলুম "ট্রেডার হর্ণ" নামে একটা কথা বলা ছবি দেখান হচ্ছে। যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা বল্লেন "এ রকম ছবি কখনও দেখিনি কি সুন্দর।" আমি চিড়িয়াখানায় যে রকম বাঘ সিংহ দেখেছি ও শীকারিদের কাছে যে রকম বাঘ বা সিংহের গল্প শুনেছি তার সঙ্গে এর কিছুই মেলে না। ট্রেডার হর্ণ বই দেখবার পর আমাকে স্বীকার কর্ত্তে হচ্ছে যে আজ পর্য্যন্ত আমি বাঘ সিংহ সম্বন্ধে যা জ্ঞান পেয়েছি তা' সব ভুল; কারণ মানুষের দেখবার, শোনবার বা বোঝবার ভুল হ'তে পারে কিন্তু

ক্যামেরাতে যা ছবি ওঠে তার ভুল হয় না।

এখন অদ্ভুত ঘটনা যা দেখলুম তার কয়েকটা বলি। বেশ পরিষ্কার দেখলুম একটা সিংহ গিয়ে একটা জেব্রার কোমরের উপরে লাফিয়ে পড়লো। লাফিয়ে পড়লো পিছনের দিক থেকে এবং জেব্রা নিরুপায় হ'য়ে পশুরাজকে এক লাথি মাল্লে। পশুরাজ জেব্রার পদাঘাতে ৮।১০ ফিট দূরে ছট্‌কে পড়ে মরমে মরে আক্ষেপ কর্ত্তে কর্ত্তে চলে গেলেন। যে সিংহটির কথা বলছি তিনি সত্যি সত্যি সিংহ বা "কথামালার" "সিংহ-চর্ম্মাবৃত" "গর্দ্দভ" তা' জানি না। জেব্রার কাছে লাথি খেয়ে সিংহ চার চিৎপাত হয়ে পড়ে, এ কখনও শুনি নি। আমার জ্ঞানে আমি জানি সিংহ যদি আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয় তাহলেও জেব্রা নড়তে পারে না।

"হায়না" বলে এক রকম জানোয়ার আছে তারা শেয়ালের জাতীয়। পশুরাজ একবার এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এসে হায়নার সামনে পড়লেন। হায়নারা রাজাকে ঘেরাও করে এইসা দন্তপ্রহার ও নখপ্রহার দিলে যে রাজা "বাপ্‌রে মারে" (?) করে দৌড়। প্রজাদের তাড়নে রাজা কোন দিক দিয়ে পালাবেন ঠিক কর্ত্তে পারেন না। ভয়াবহ ভাবে ল্যাজ গুটিয়ে রাজা দৌড়াচ্ছেন, কয়েক-জন প্রজা এসে পাছাতে কামড় দিলে, যেই রাজা ফিরে দেখতে গেছেন একজন ঘাড়ে কামড় দিলে, ঘাড় সামলাতে গিয়ে কানে কামড়; এই রকম। যারা কুকুরের ঝগড়া দেখেছেন তাঁরা এ জিনিষটা বেশ ভাল করে বুঝতে পার্ব্বেন। একটা বাইরের কুকুর যদি স্থানীয় কুকুরের দলের ভিতর পড়ে তা' হলে তার যে রকম দশা হয় এরও ঠিক সেই রকম দশা হ'ল।

এতক্ষণ তবু যেমন করে হো'ক দেখ-ছিলুম কিন্তু এবারে একেবারে অসহ্য হয়ে দাঁড়ালো। তিনজন শীকারি দেখলেন যে একটা সিংহ একটা সম্বর হরিণ মেরে খাচ্ছে—আমার বিশ্বাস যে সিংহটা জেব্রার লাথি আর হায়নার কামড় খেয়েছিল এ সেই সিংহটাই—তা' যাই হোক তাঁরা দেখলেন যে সিংহ তার শীকারের উপর বসে বেশ মজা করে চিবোচ্ছে। একটা কথা মনে রাখা দরকার—সে সেখানকার একচ্ছত্র রাজা; তার চেয়ে বড় সেখানে আর কেউ নেই। কিন্তু তা' বল্লে সব সময় চলে কি করে! দরকারের সময় কি আইন কানুন রাজা রাজ্য এ সব মেনে চলে? তখন বেলা হয়ে গেছে, ক্ষিদের চোটে পেটের মধ্যে নেংটী ইঁদুর লাফাচ্ছে অথচ বন্দুক রাইফেলের গুলি খতম হয়ে গেছে। তখন তাঁরা সাব্যস্ত কল্লেন যে সিংহটাকে তাড়িয়ে দিয়ে আধ খাওয়া হরিণটাতে নিজেদের পেটপূজা কর্ব্বেন। এই স্থির করে তাঁরা আরও কাছে এলেন, আর একজন একটা আধগজ ডাণ্ডা নিয়ে সিংহের দিকে হুট্ হাট কর্ত্তে লাগলেন।

সিংহ চেয়ে দেখলে কারা এসেছে। সে

কাফ্রি দেখেছে, স্থানীয় বেঁটে মর্কট লোকদেরও দেখেছে কিন্তু ক্ষমতাবান শ্বেতাঙ্গদের বড় দেখেনি! তাই সে দেখেই ঘাবড়ে গেল। সে বুঝলে এরা সাদা চামড়ার জাত এদের কাছ থেকে "শতহস্তেন" সমীচিন। সুতরাং এক্ষেত্রে লম্বা দেওয়াই সবথেকে বুদ্ধি ও বিবেচনা সঙ্গত। এই স্থির করে পশুরাজ একেবারে দে দৌড়—দৌড় ত' দৌড় তাঁর ফিরে একবার দেখবার পর্য্যন্ত অবসর হোল না। তিনি এত মেহনত করে একটা সম্বর মারলেন—মনে রেখো তিনি একেবারে আফ্রিকার তিনি—আমাদের এখানকার চিড়িয়াখানার আধপেটা খাওয়া লাঙ্গুলহীন তিনি নন। সকলেই জানেন যে চিড়িয়াখানার সিংহের "লাঙ্গুলহীন" শৃগালের মত প্যাজ নাই। আর সেই হরিণটা তিনজন সাদা চামড়ার জোরে কোনও বন্দুক রাইফেল বা গুলি ব্যবহার না করে খালি হাতে কেড়ে নিলেন।

আমার কিছু বলা চলে না কারণ আমার চোখে দেখা চিড়িয়াখানার ঘটনা বলেছি আর একেবারে Cinema-র ঘটনা। একটা কথা আছে—Camera cannot lie. সুতরাং প্রমাণ হয়ে গেল (১) সিংহকে জেব্রায় লাথি মেরে ফেলে দিতে পারে (২) হায়নার অত্যাচারে সিংহ কুপোকাত (৩) হরিণের মাংস সিংহের মুখ থেকে কেড়ে নেওয়া সোজা (৪) চিড়িয়াখানার বাঘ সিংহ বুনো বাঘ সিংহের থেকে হিংস্র বেশী।

বিশ্বপ্রাণের আবাহন

শ্রীঅমিয়া সেন

১

মুছাতে অশ্রু মরণ বরিয়া
উতলা সতত হিয়া,
কে মহামানব দাঁড়াইয়া ওই
শান্তির দীপ নিয়া!
কণ্ঠে তাহার শুধু সেই ধ্বনি
মাভৈঃ মন্ত্রে উঠে জাগরণী
নিখিলের ব্যথা তার হিয়া মাঝে
করুণ মূরতি ধরি,
বেদন-ব্যথিতে মুক্তি দানিতে
হৃদয় দিয়াছে ভরি।

২

উদাত্ত স্বরে মিলনের বাণী
আঁধারের বুক চিরে,
হিংসা নীতির চরম দেখিয়া
ব্যথায় কাঁদিয়া ফিরে।
এত নহে শোন, মানব আচার
আপনার 'পরে করি অবিচার
এক শোণিতের বহিছে প্রবাহ
সে কথা গিয়াছ ভুলি;
সকল দর্প করিয়া চূর্ণ
ডাকে তাই গলা ধরি।

৩

বিশ্বের ছেলে এই শুধু দাও
আপনার পরিচয়
স্নেহের বাঁধনে বাঁধো সবাকারে
অন্য বাঁধনে নয়।
যে মাটীর বুকে জনম লভিয়া
ভরিলে আদরে সুকোমল হিয়া
শেষের শয্যা বিছাইতে হবে
সেই ক্রোড়ে একদিন
দু'দিনের লাগি শুধু অকারণ
ভাই ভাই কেন ভিন!

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

মনোরম সাধুখাঁ

আয়না ভাঙ্গা দোষ

ব্যাপারটা ঘটেছিলো ওয়ার্নার ব্রাদার্স-এর ষ্টুডিয়োয়। "গোল্ড ডিগারস্ অফ ১৯৩৫"-এর একটি দৃশ্যে আছে, কাউকে বড়ো একটা আয়না ভাঙ্গতে হবে। দৃশ্যটিতে অভিনয় করছিলো অ্যালিস্ ব্র্যাডি, গ্লোরিয়া ষ্টুয়ার্ট, ডিক পাওয়েল আর অ্যাডলফ মেনজু। কিন্তু, আয়না ভাঙ্গা ও দেশে একটি মস্ত বড় দোষ। অ্যালিস্ বল্লে—"আমি ওসব মানিটানি না। কাজটা তাই করবো আমিই। কারণ, রোজ সকালে একটি করে' ও জিনিষ আমি ভাঙ্গি, ভারী মজা লাগে আমার। দাও—কি দিয়ে গুঁড়ো করতে হবে আয়না"—

বাজ্ বারকলি চিত্রটির পরিচালক, দেখিয়ে দিলে প্রকাণ্ড একটা পাথরের টব। এতো ভারী—যে অ্যালিস্ দু'হাত দিয়ে সেটা তুলতেই পারলে না। অতএব, মিস্ ব্র্যাডির আয়না ভাঙ্গা আশা ছাড়তে হ'লো।

বারকলি আরেকজন লোককে ধরলে—যে দৃশ্য সাজায়। লোকটি চ'টেই আগুন—আমি ওসব করতে পারবো না বাবা! একটা লোককে জানি, একদিন একখানা আয়না ভেঙ্গেছিলো—সে পৃথিবী থেকে পটলই তুল্লে সেদিন। আর, আমাকেই কিনা ও কাজটা করতে বল্ছেন। জানেন ঘরে আমার স্ত্রী রয়েছে, সে সেদিন সবেমাত্র দুটো যমজ ছেলে'—

কাজটি আপনিই করুন

জর্জ্জ বার্ণস্, চিত্রখানির আলোকশিল্পী ও জোন ব্লনডেন-এর স্বামী, তখন পরিচালককে বললে "আচ্ছা, মিঃ বারকলি, একটা কথা বলি, কাজটা আপনিই করুন না কেন?

পলেট্ গডার্ড—চার্লির প্রিয়া না স্ত্রী তা কেউ বল্তে পারে না—তবে তার ছবিতে যে সে নাবছে—এ সবাই জানে। ছবিটির নাম খুব সম্ভব 'দি ওয়েইফ্'।

আপনিও তো ওসব মানেন না, না?" সবাই খুব হেসে উঠে জর্জ্জ-এর সমর্থন করলে।

বাজ্ চটে' একেবারে বারুদের মত বিপদজনক হয়ে উঠলো। 'এ ছবিখানার প্রযোজক কে সবাইকে তা মনে রাখতে আমি অনুরোধ করি।—আয়না ভাঙ্বার জন্যে আমাকে এখানে আনা হয়নি!'

সবাই চুপ। আয়না ভাঙ্গা আর হচ্ছে না। অথচ, না ভাঙ্গলেও নয়। বারকলি ডিক্ পাওয়েল-এর দিকে তাকালে। 'তুমি, তুমি এসব মানো?'

'না—ঠিক তা-নয়' ডিক একটু ঘাবড়ে গেলো 'তবে কি জানেন?—আয়না যে ভাঙ্গতে হবে এমন কোনো কথা আমার কনট্র্যাক্টে লেখা নেই'—

কনট্র্যাক্টকে সে বড়ো ভয় করে। ও জিনিষটাই তাকে বিয়ে করতে বারণ করেছে!

হতাশ হয়ে বারকলি মেনজুকে জিজ্ঞেস করলে—'তুমি—?'

স্ত্রীর মস্ত আপত্তি

মেনজু কী জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছিলো না। বাঁচালে তার স্ত্রী ভেরি টিস্ডেল। সে তার স্বামীর বাহুর ভেতর চট্ করে' একখানা হাত ঢুকিয়ে বল্লে—'না, অ্যাডল্ফ, ও কাজ তুমি করতে পাবে না।' ভেরির কণ্ঠস্বর সবার কাছে ভারী দৃঢ় ঠেকলো।

আবার সবাই চুপ। হতভম্ব সবাই—কী করা যায়! এমন সময় অ্যালিস এলো ফিরে। 'কী করছো গো তোমরা? আয়না—আশ্চর্য—এখনও যে আস্তো রয়েছে!'

ব্যাপার শুনে সে তো হেসেই আকুল। 'দাও—দাও আমিই ভাঙ্গি। তবে, কেউ আমার হাতের ওপর টবটা তুলে দাও। খুব কাছ থেকে এটা আমায় ছুঁড়তে হবে—না হ'লে আয়না হয়তো গুঁড়ো হবেনা। মিঃ

বারণস, ক্লোস্ আপ্—আমার হাতে টব।
ক্লোজ আপ—আয়না।'

অতি কষ্টে অ্যালিস্ তো টবটা হাতে নিলে। ঘুরলো ক্যামেরা। তারপর, চুরমার একটা শব্দ। গুড়োগুড়ো আয়না।

মিস্ ব্যাডিই এ কাজটা শেষ পর্য্যন্ত তা হ'লে করলে। বেচারীর গত সাতটা বছর খারাপ কেটেছে, তবুও এসব সে মানেনা। খুব সাহসী মেয়ে এই অ্যালিস্ ব্যাডি।

বেশী স্বদেশ-প্রেমিক

ভদ্রলোকটির পরিচয় আগে দি। নাম—গাইল্স ইসাম। স্যর ভিয়ার ইসাম বলে' এক প্রকাণ্ড বড়লোকের ছেলে। নর্দাম্পটন-সায়ারে তাঁর মস্ত জমিদারী। বয়েস সত্তর, সম্প্রতি এক মোটর দুর্ঘটনায় অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন। গাইল্স সুন্দর স্বাস্থ্য সম্পন্ন এক যুবক, সখের জন্য অভিনয় করে। ভালো ক্রিকেট ও টেনিস প্লেয়ার বলে নাম আছে। ভালো সাঁতারু, ভালো ঘোড়ায় চড়ে। রাগ্বি ও অক্সফোর্ড-এর ম্যাগডালেন কলেজ-এ তার পড়াশুনা। আগে সেক্সপীয়ারের নাটকে অভিনয় করতো। ছায়াছবিতে আজকাল নাবে। তার কয়েকটি ছবির নাম হচ্ছে—বেটি ষ্টকফিল্ড-এর সঙ্গে 'অ্যান্ ওয়ান্ হানড্রেড', ডরথি বুশিয়ারের সঙ্গে 'পাসিষ্টং', 'আয়রণ ডিউক', 'মিঃ হোয়াট্স্ হিস্ নেম' ও সম্প্রতি বিটিশ ইন্টারন্যাশনালের হয়ে রাজার জুবিলী ফিল্ম।

অভিনয় সে বেশ ভালোই করে। কিন্তু বিখ্যাত গার্বোর তাই নজর ছিলো তার ওপর।

গ্রেস মুর সম্প্রতি যে ছবিতে নাবছে তার নাম—'উইংস্ অফ্ সঙ্স্'।

গার্বো তাকে চাইলে

কিছুদিন আগে আমি খবর দিছলুম—'অ্যানা কারনিনা'য় গ্রেটাগার্বো ফ্রেডরিক মার্চ্চ-এর সঙ্গে নাববেনা। সে খবর ভুল। সে নাববে। স্বপ্ন তাই আমাদের হবে সফল। এই 'অ্যানা কারনিনা'য় স্বামী সাজতে গার্বো ডেকেছিলো গাইল্স্ ইসামকে। কিন্তু, আশ্চর্য্য, মিঃ ইসাম বল্লে—'আমি যাবোনা।' কী সাহস! অবাক হই তার সাহস দেখে। গার্বো—যার ছবিতে সারা পৃথিবীর লোক একটু অভিনয় করতে পারলে নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করে—তারই ডাকে উল্টো জবাব! গাইল্স্ বল্লে—'বিলেতে আমি থাক্বো। বিলেত ছাড়া কোথায়ও আমি অভিনয় করবোনা—গার্বোর স্বামী সাজতেও না।' লোকটার মাথা খারাপ মনে হচ্ছে।

যাক্গে গাইল্স্ না হ'লে যে ছবি হবে না তার কোনো মানে নেই। সে অংশটি দেয়া হয়েছে ব্যাসিল্ রাথবোন্কে। 'অ্যানা কারনিনা'য় আর যারা নাবছে তাদের নাম—ফ্রেডরিক মার্চ্চ, মউরিন ও সুলাভ্যান, রেজিনাল্ড ডেনি ও ফ্রেডি বার্থোলমো—'ডেভিড কপারফিল্ড'-এর নায়ক।

যে ছবিটায় গার্বো নাববে, তার নাম

= গান =

কথা—শ্রীশান্তি প্রকাশ মিত্র
সুর—শ্রীসুনীল কুমার দাশগুপ্ত

কেন এলে প্রিয় আজি সাঁঝের ছায়ায়,
হের ক্লান্ত ছায়া পড়ে পাখীর পাখায়।
কেন গাহিলে ব্যাকুল গান,
দিবা যবে হ'ল অবসান।
ঝরা ফুল লয়ে কেন মালা গাঁথা,
মরমে বৃথাই বাড়ায় যে ব্যথা;
স্মরণে আনিয়া স্বপনের কথা,—
(আর) বাঁধিও না মোরে মোহের মায়ায়।
মন যত করে মানা আঁখি যে তবু কাঁদে,
ওগো নিঠুর, এ কি ফেলিলে কুহক-ফাঁদে!
শিথিল চরণ চলিতে না চায়,
স্মৃতির মালিকা হৃদয়ে জড়ায়;
ক্ষমা কর প্রিয় মোর দীনতায়,—
(বৃথা) আশায় কাঁদায় বিদায়-বেলায়।

বলেছিলুম—'দি ফ্লেম উইদিন'। সেটাতে দেখা যাবে—মারলে ওবারণ, অ্যান্ হার্ডিং ও ফ্র্যান্‌সট্ টোন্‌কে।

খুচরো খবর

ফ্র্যান্‌সিস্ লিডারকে কারা সেদিন ডাকাতি করতে এসেছিলো, কিন্তু পারেনি।

• • •

চার্লি চ্যাপ্‌লিন ও ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্-এ ভারী ভাব। কিন্তু, তাদের প্রথম আলাপ করে' দিয়েছিলো কন্‌স্ট্যান্স কলিয়ার—থেট্রোর অভিনেত্রী।

* * *

জিন পার্কার সুযোগ পেলেই নাচের মেয়েদের সঙ্গে নাচে। এটা তার ভালো লাগে।

• • •

লিওনেল ব্যারিমুর পিয়ানো বাজিয়ে অভিনয় করবার আগে মনটাকে ঠিক করে নেয়।

ব্রীজ খেলা
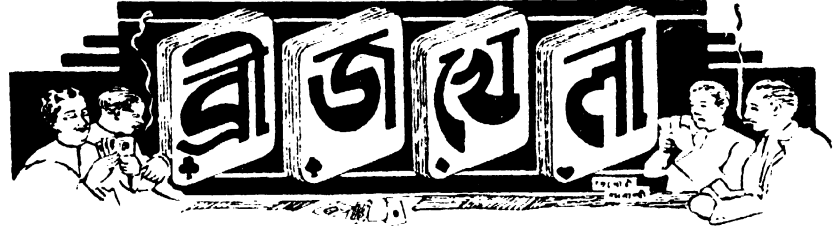
শ্রীদুর্ব্বাসা

'ডবলের' প্রকার ভেদঃ— আগেই বলেছি 'ডবল' দুই প্রকার, আবাহনমূলক ডবল (Take me out double) অথবা বিরতিমূলক ডবল (Leave me in double)। মনে করুন আপনি নিম্নলিখিত দুই রকম হাত পেয়েছেন:—

(১) ইস্কাবন—সাহেব, বিবি, নয়, আটা; হরতন—নাই; রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, দশ, নয়, সাতা; চিড়িতন—নয়, সাতা, তিরি।

(২) ইস্কাবন—নয়, আটা; হরতন—বিবি, গোলাম, দশ, নয়, তিরি, দুরি; রুহিতন—টেক্কা, সাতা; চিড়িতন—নয়, সাতা তিরি।

১নং হাতঃ—খেঁড়ীর ইস্কাবন রঙের সমর্থনে কিম্বা আপনার নিজের রুহিতন রঙের খেলায় আপনার হাতের মূল্য খুব বেশী কিন্তু প্রতিপক্ষের হরতন রঙের খেলায় আপনার হাতের মূল্য বেশী নয়। সুতরাং এ প্রকার আক্রমনে শক্তিব্যঞ্জক।

২নং হাতঃ—খেঁড়ীর ইস্কাবন রঙের সমর্থনে এ হাতের মূল্য বড় বেশী নয়, মাত্র একখানি পিট; পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষের হরতনের খেলায় এ হাতে অনেক বেশী পিট পাবার সম্ভাবনা। সুতরাং এ প্রকার হাত প্রতিরোধে শক্তিব্যঞ্জক।

১নং হাতে আবাহনমূলক এবং ২নং হাতে বিরতিমূলক 'ডবল' দেওয়াই বিধেয়। অবশ্য এমন অনেক প্রকার হাত আছে যা' দেখে অনুমান করা শক্ত যে সে হাত কোন প্যাটার্ণের। তাতে আবাহনমূলক ডবলে প্রিমিয়ম লাভ হবে বেশী না বিরতিমূলক ডবলে খেঁসারৎ পাবার সম্ভাবনা বেশী তা' অনুমান করা অনেকস্থলেই প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তৎসত্বেও অনেক প্রকার হাতে এই দুই প্রকার ডবলের বিভিন্ন প্রকার কার্য্যকারিতা খুব সহজেই নির্দ্দেশ করা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কোন্ 'ডবল' আবাহনমূলক আর কোনটিই বা বিরতিমূলক তা' খেঁড়ী কেমন করে অনুমান করবেন। সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ নিয়ে দিচ্ছি।

বিরতিমূলক ডবলের বিশেষত্ব (Penalty double—its characteristics):—(১) খেঁড়ীর ডাকের পর যদি তাঁর খেঁড়ী প্রতিপক্ষকে 'ডবল' দেন, মনে করুন 'ক' ডেকেছেন 'একটি হরতন', 'আ' বললেন 'একটি ইস্কাবন', 'খ' বল্‌লেন 'ডবল', —এখন এই 'ডবল' হল বিরতিমূলক। ডাক একের হউক বা দুয়েরই হউক তাতে কিছু যায় আসে না, খেঁড়ী মুখ খোল্‌বার পর প্রতিপক্ষের যে কোন ডাককে তাঁর খেঁড়ী 'ডবল' করবেন সেই 'ডবলই' বিরতিমূলক।

(২) খেঁড়ী মুখ না খুললেও তার সঙ্গী যদি প্রথমবার পাশ দিয়ে পরে বিপক্ষকে ডবল দেন তা' হ'লেও সে 'ডবল' বিরতিমূলক। মনে করুন 'ক' ডেকেছেন 'একটি ইস্কাবন', 'আ' বলেছেন 'পাশ', 'খ' বলেছেন 'একটি No Trump', 'অ' বলেছেন 'পাশ', 'ক'-ও বলেছেন 'পাশ' এবার 'আ' বল্‌লেন 'ডবল'। এ ডবল বিরতিমূলক। 'অ' মুখ না খুললেও

'আ' প্রথমবার 'পাশ' দিয়ে পরে 'ডবল' দিয়েছেন সুতরাং এ 'ডবল' বিরতিমূলক (Penalty double)। ফলতঃ প্রতিপক্ষের ডাকের পর প্রথম সুযোগ পাবামাত্র 'ডবল' না দিয়ে ডাক ফিরে এলে 'ডবল' দিলেই সে ডাক হবে বিরতিমূলক।

(৩) প্রতিপক্ষের প্রারম্ভিক ডাক যদি দুইটি No Trump কিম্বা কোন রঙের চারখানি ডাক হয় এবং তার পর যদি 'ডবল' দেওয়া হয় তা' হ'লে সে 'ডবল' হবে বিরতিমূলক। মনে করুন 'ক' ডেকেছেন 'দুইটী No Trump' কিম্বা 'চারটি ইস্কাবন', আর 'আ' বল্লেন 'ডবল'। এ ডবল হবে বিরতিমূলক।

(৪) ডাকদার যদি প্রারম্ভিক No Trump ডাক দিয়ে পরে প্রতিপক্ষের কোন ডাককে 'ডবল' করেন, সে 'ডবল' হবে বিরতিমূলক। মনে করুন 'ক' ডেকেছেন 'একটি No Trump', 'আ' ও 'খ' পাশ দিয়েছেন, 'অ' বলেছেন 'দুইটী হরতন' এবার 'ক' বল্লেন 'ডবল'। এ ডবল বিরতিমূলক। তবে এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে। ডাকদারের প্রারম্ভিক No Trump ডাকের পর প্রতিপক্ষের কোন রঙকে তিনি যদি 'ডবল' দেন তবেই সেটি হবে বিরতিমূলক, নতুবা নয়। তিনি যদি প্রারম্ভিক কোন রঙ ডেকে পরে প্রতিপক্ষের কোন রঙকে 'ডবল' দেন সে 'ডবল' বিরতিমূলক হবে না। মনে করুন 'ক' ডেকেছেন 'একটি ইস্কাবন' 'আ' ও 'খ' পাশ দিয়েছেন, 'অ' বলেছেন 'দুইটি হরতন' এবার 'ক' বল্লেন, 'ডবল'। এ 'ডবল' বিরতিমূলক নয়, ইহা আবাহনমূলক informatory)।

(৫) ডাকদার যদি প্রারম্ভিক দুই-এর ডাক দিয়ে নিজেই প্রতিপক্ষের কোন ডাককে 'ডবল' দেন, সে ডবল হবে বিরতিমূলক। মনে করুন 'ক' ডেকেছেন 'দুইটি ইস্কাবন', 'আ' বলেছেন 'তিনটা হরতন', 'খ' ও 'অ' পাশ দিয়েছেন। এবার 'ক' বল্লেন 'ডবল'। এ 'ডবল' বিরতিমূলক (Penalty double)।

আবাহনমূলক ডবলের বিশেষত্ব (Take out doubles—its charateristics) :—(১) প্রতিপক্ষের একটি No Trump বা রঙের এক, দুই (শক্তি-জ্ঞাপক ডাক নয়) বা তিনের ডাকের 'ডবল' হচ্ছে আবাহনমূলক। (তবে মনে রাখতে হবে যে কোন স্থলেই 'ডবল' কর্ত্তার খেঁড়ী ডাক দেন্ নি এবং প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্রই 'ডবল' দেওয়া হচ্ছে।) নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

ক) 'ক' (ডাকদার) — 'আ'
একটি No Trump — 'ডবল'
বা একটি ইস্কাবন — (আবাহনমূলক)

খ) 'ক' (ডাকদার) 'আ' 'খ'
একটি ইস্কাবন — পাস — দুইটী ইস্কাবন
'অ'
'ডবল'
(আবাহনমূলক)

গ) 'ক' (ডাকদার) 'আ'
'ডবল'
তিনটি ইস্কাবন (আবাহনমূলক)

ঘ) 'ক' (ডাকদার) 'আ'
একটি ইস্কাবন দুইটী হরতন
'খ' 'অ'
দুইটী ইস্কাবন 'ডবল'
(বিরতিমূলক)

এ ডবল বিরতিমূলক কেন না খেঁড়ী মুখ খুলেছেন, তিনি 'দুইটী হরতন' ডেকেছেন।

(২) ডাকদার যদি একটি রঙ ডাকেন No Trump নয়), তাঁর খেঁড়ী যদি পাস দেন এবং কোন প্রতিপক্ষ বা উভয় প্রতিপক্ষই যদি রঙের ডাক দেন তারপর ডাকদার যদি 'ডবল' দেন সে ডবলও আবাহনমূলক। নিম্নে উদাহরণ দিলাম।

'ক' (ডাকদার) 'আ' 'খ' 'অ'
১ হরতন ১ ইস্কাবন পাস ২ রুহিতন
'ডবল' (আবাহনমূলক)

এই ক্ষেত্রে 'আ' পাস দিলে খেঁড়ী 'খ' ডাক দিতে বাধ্য।

(৩) 'ডবল' কর্ত্তা যদি একবার আবাহনমূলক 'ডবল' দিয়ে পরে যে কোন রঙের তিনটী ডাককে 'ডবল' দেন (অবশ্য খেঁড়ী ইতিমধ্যে মুখ না খুললে) সে ডবল হবে আবাহনমূলক। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এ ক্ষেত্রে চারের ডাকের 'ডবল' আবাহন-মূলক হবে না, সে 'ডবল' হবে বিরতিমূলক (Penalty double)। নিম্নে উদাহরণ দেখুন

'ক' (ডাকদার) 'আ' 'খ' 'অ'
১টি হরতন 'ডবল' ৩টী হরতন 'পাস'
আবাহনমূলক
পাস ডবল
আবাহনমূলক

এই দ্বিতীয় 'ডবল'ও আবাহনমূলক এর পর 'খ' পাস দিলে 'অ' ডাক দিতে বাধ্য। কিন্তু,

'ক' (ডাকদার) 'আ' 'খ' 'অ'
১টি হরতন 'ডবল' ৪টি হরতন পাস
(আবাহনমূলক)
'পাস' 'ডবল'
বিরতিমূলক)

এই দ্বিতীয় 'ডবল' হবে বিরতিমূলক; কেন না ডাক চারের পর্য্যায়ে উঠে গেছে। বিরতিমূলক 'ডবলের' ৩নং উদাহরণ দেখুন।

দুই প্রকার ডবলের বিশেষত্বের কথা বিশদভাবে জানালাম। এ কথা মনে রাখতে হবে যে এই দুই প্রকার 'ডবলের' সার্থকতাই নির্ভর করছে খেঁড়ীর বুদ্ধি বিবেচনা এবং তাস নিরূপণের শক্তির উপর। দুই প্রকার 'ডবলই' 'ডবলকর্ত্তার' হাতের পরিচয় জ্ঞাপক মাত্র। এখন খেঁড়ীর উপর 'ডবল' রাখা না রাখা উভয়ই নির্ভর করে। খেঁড়ী নিজের হাত প্রতিপক্ষের ডাক এবং 'ডবলের' দ্বারা বিজ্ঞাপিত তাঁর সঙ্গীর হাত অনুমান করে তবেই সিদ্ধান্ত করবেন যে কোন্ হাত নিজেদের খেলায় প্রিমিয়ম (Premium)

পাবে বেশী আবার কোন হাতই বা প্রতিপক্ষের খেলায় খেসারৎ পাবে বেশী। হয় তো 'ডবলকর্ত্তা' দিয়েছেন 'আবাহনমুলক ডবল' কিন্তু খেঁড়ী নিজের হাত দেখে অনুমান করলেন যে খেসারৎ পাবার সম্ভাবনাই বেশী সুতরাং তিনি পাস দিয়ে আবাহনমূলক 'ডবল'কে বিরতিমূলক 'ডবলে' পরিণত করলেন। আবার হয় তো 'ডবলকর্ত্তা' দিয়েছেন বিরতিমুলক 'ডবল' কিন্তু খেঁড়ী নিজের হাত দেখে অনুমান করলেন যে প্রতিপক্ষের খেসারৎ বেশী হবে না কিন্তু তাঁদের নিজেদের রঙে 'গেমের' সম্ভাবনা তো আছেই হয়তো শ্লাম (Slam) সম্ভাবনাও আছে। তাই তিনি উক্ত বিরতিমুলক 'ডবলে' তাঁর সঙ্গীর ইঙ্গিত পাওয়া সত্ত্বেও বিরত না হয়ে আবার ডাক দিলেন। ফলতঃ এর সার্থকতা পুর্ণমাত্রায় নির্ভর করছে খেঁড়ীর উপর।

এসপ্ল্যানেড ইন্‌ষ্টিট্যুট ঃ—

এর আগে প্রায় প্রত্যেক প্রতিযোগিতাতেই এসপ্ল্যানেড ইন্‌ষ্টিট্যুট-এর নাম দেখা যেত কিন্তু আজকাল ব্রীজ টেবিলে এদের আর কোন পাত্তাই নেই। প্রকাশ যে, এই সমিতির সেক্রেটারী ম'শায় না কি দিনকতক আগে ব্রীজ সংক্রান্ত বড় বড় প্রবন্ধ লিখে সভ্যদের মধ্যে প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন, এমন কি খেলা শেখাবার জন্যে প্রত্যেককে কালবার্টসন্ সিষ্টেম্ গুলে খাওয়াবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কাজে ঢিলে পড়ায় সাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সুরু হয়েছে; কেউ কেউ বলেন, এর কারণ কালবার্টসন্ সিষ্টেমে আর কো-অপারেটীভ সোসাইটীতে দ্বন্দ্ব, আর কেউ বলেন সম্রাটের রজতোৎসবের জন্য নাট্যাভিনয়ই নাকি এর জন্য সম্পুর্ণ দায়ী। আমাদের মনে হয় গর্জ্জন সম্রাট নেপেনবাবুর চীৎকারেই এদের বিষয়ে আমরা কিছু শুনতে পাচ্ছি না। সেক্রেটারী ম'শায় ও শীতাংশুবাবু এ বিষয়ে কি বলেন?

আপনাদের সমস্যা ঃ—আপনাদের মধ্যে কারুর ব্রীজ সংক্রান্ত কোন কিছু জানবার থাকলে আমাদের শ্রীদুর্ব্বাসাকে লিখতে পারেন। তিনি তাঁর তপোবলে আপনাদের সকল সমস্যার সমাধান করে দেবেন।

—

যক্ষ্মারোগে প্রতিকারের উপায়

ডাঃ মুরারীমোহন ঘোষ

ভারতবর্ষে যে সমস্ত সংক্রামক ব্যাধি অবাধে বিস্তার লাভ করিয়া দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে যক্ষ্মারোগ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। কর্ম্মকেন্দ্র সহরের সঙ্গে গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হওয়ায় বর্ত্তমানে সুদূর প্রান্তস্থিত গ্রামগুলিতেও যক্ষ্মারোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এবং ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যতলোক মৃত্যু মুখে পতিত হয় তাহার শতকরা দশ ভাগ লোকের মৃত্যুর কারণ যক্ষ্মা।

ভারতবর্ষের আবহাওয়া, দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থা ও জনসাধারণের বিষয় বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে যক্ষ্মা নিবাসে বা স্যানাটোরিয়ামে রাখিয়া যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা করা একপ্রকার অসম্ভব। উহা এত অধিক ব্যয়সাধ্য বলিয়া যাহাতে যক্ষ্মারোগী স্বীয় বাটীতে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া অল্প ব্যয়ে সর্ব্বজন ব্যবহৃত ও ফলপ্রদ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সুইজারল্যাণ্ড দেশে যক্ষ্মারোগের আধুনিক চিকিৎসার জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। দেশ দেশান্তর হইতে বহু ধনী ব্যক্তি যক্ষ্মা চিকিৎসার জন্য ঐ দেশে গমন করে। রচি কোম্পানী সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থিত এবং "সিরোলিন" ঔষধ আবিষ্কার করিয়া বহুতর যক্ষ্মারোগীর উপকার সাধন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যেক আধুনিক যক্ষ্মা নিবাসেও বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী রচির "সিরোলিন" যক্ষ্মারোগীকে সেবন করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন—এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ক্ষুধা ও শরীরের ওজন বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। "সিরোলিন" যে পৃথিবীর ব্যবহৃত ঔষধের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেবল ফুস্‌ফুসের ক্ষয় রোগের নহে অন্ত্রের ক্ষয় রোগও "সিরোলিন" রোগ মুক্তির জন্য যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে ইহা দেশীয় ও পাশ্চাত্য বিখ্যাত চিকিৎসকগণ স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে যেরূপ দ্রুতগতিতে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হইয়াছে, এতদবস্থায় রচির "সিরোলিন" যক্ষ্মা রোগে নিয়মিত ব্যবহারে রোগের গুরুত্ব কমাইয়া যে ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে লইয়া যাইয়া দরিদ্র দেশ ও অজ্ঞ দেশবাসীকে রক্ষা করিবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বহু বৎসরাধিক কাল ব্যবহারের পর ইহা বলা যাইতে পারে যে ক্ষয় রোগগ্রস্থ স্ত্রী, পুরুষ কিংবা শিশুদের পুর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করাইতে "সিরোলিন রচিই" একমাত্র সক্ষম।

—

ফটো : রাধা ফিল্ম্

রাধা ফিল্মের "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" এখন মুক্তি প্রতীক্ষায়। ডায়োসিসান কলেজের গ্রাজুয়েট নীহারিকাকে ওপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি জমিদার বাড়ীর নিমন্ত্রণে, পাশে স্বয়ং জমিদারণী-মানময়ী। মানসকুমারের অবিবাহিতা স্ত্রীর রূপ দিয়েছেন কমলাক্ষী মিস্ কাননবালা। আর, ইস্কুল যাঁর নামে—
তিনি হচ্ছেন মিস্ রাধারাণী।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ৫ই বৈশাখ, ১৩৪১ 18th, April, 1935. { ১৬শ সংখ্যা

"যাব কি যাবনা, কেন এ ভাবনা?"

যাহারা অন্ধকারের জীব, অন্ধকারের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া যাহারা স্বার্থ-সিদ্ধির আনন্দে আত্মহারা হয়, তাহারা ভুলিয়া যায় যে অন্ধতম ও দীর্ঘতম রাত্রিরও অবসান হয়। তাই যখন প্রথম ঊষার দীপ্তি আসিয়া ধরণীকে স্পর্শ করে তখন তাহাদের চোখে ধাঁধা লাগে এবং চমকিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করে।

বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আজ নানা কারণে দুর্য্যোগ নামিয়াছে। সে সকল কারণের আলোচনা না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে, যেখানে একদিন ছিল প্রাণের দীপ্তি, আজ যেন সেখানে শ্মশানের অন্ধকার। এই অন্ধকারের আশ্রয় ও প্রশ্রয় লইয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ক্লৈব্যনীতির ইমারত গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার হয়তো কল্পনা ছিল যে, অনতিবিলম্বে ইহা সম্পূর্ণ করিয়া তিনি তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গগণ সহ হীনতার এই দৃঢ় দুর্গে কায়েমী বসবাস করিবেন। সুখের বিষয় বাঙ্গলা মৃতপ্রায় হইলেও এখনও মরে নাই। তাই জনমতের এক ফুৎকারে তাঁহার বড় সাধের স্বার্থদুর্গ আজ ধূলিসাৎ।

তাঁহার প্রথম পরাজয়ের আভাষ অবশ্য দেখা গিয়াছিল গত ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের গোঁড়া ঘোড়া লইয়া বাজীমাৎ করিবেন। কিন্তু বহু আস্ফালন ও উত্তেজনা সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টার পর তিনি বোধহয় বুঝিলেন যে বাঙ্গালীরা ঠিক গুজরাটী নয়! টিকি ও মালার দোহাই সেখানে চলিবে না! অবশ্য সেবার তিনি নিজে "জকী" হন নাই, শিখণ্ডীর মত অন্তরালে থাকিয়া শব্দভেদী বাণ মারিয়া কতকগুলি দুর্ভাগ্য "জকী"কে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এবারের পরাজয় তাঁহার নিজস্ব অবিসংবাদিত পরাজয়। বাঙ্গলার জনমত এই অন্ধকারের জীবকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে অন্ধতম রাত্রিরও অবসান আছে।

ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচন ব্যাপারে পরাজয়ের পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের শ্মশান-বৈরাগ্যের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। তিনি তখন এক ফতোয়া দ্বারা শাসাইয়াছিলেন যে, তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে অবসর লইতেছেন। তাঁহার এই রাগ কি বিরহিনীর রাগের রূপান্তর অনুরাগের লক্ষণ। মুখ যখন বলিতেছিল "বিদায়, বিদায়"—তাঁহার মন বোধহয় তখন বলিতেছিল—"একবার ডাকিলেই ফিরিব।" কিন্তু তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিবার দরকারও হইল না। যথাসময়ে দেখা গেল এই রাষ্ট্র-বৈরাগী ভিক্ষার ঝুলি হাতে নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছেন। ইঁহাকে প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তকে নির্ব্বাচিত করিয়া বাঙ্গলা যে মনুষ্যত্বের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, ইহাই আনন্দ ও গৌরবের কথা। কিন্তু এখন ইনি কি করিবেন? আবার কি "বিদায়, বিদায়" বলিয়া অবসর গ্রহণের প্রহসনের অভিনয় করিবেন। তাঁহার হয়তো লজ্জা নাই, কিন্তু যাহারা দেখে তাহাদের লজ্জা করে। তাই তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে নেতা ও অভিনেতা এক নহে এবং তাঁহাকে অনুরোধ করি যে যদি এখনও সখ না মিটিয়া থাকে তো নেতৃত্ব করিবার আর একবার চেষ্টা তিনি করুন, কিন্তু রাষ্ট্রমঞ্চে "ক্লাউনের" মত এই যাতায়াত তিনি যেন পরিত্যাগ করেন!

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

শ্রীসব্যসাচী

গতবার আমরা স্বদেশী বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। এই সময় ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ১০।১১ জন বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর স্বাক্ষরিত এক আবেদন হিন্দুস্থান সমবায় বীমা কোম্পানীর ব্যয়ে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা বিস্মিত, ব্যথিত ও শঙ্কিত হইয়াছি। সহসা এই কাজ কেন করা হইল? কৈফিয়তে এই সব "প্রজায় মানে না, তবু আপনি মণ্ডল" বলিয়াছেন :—

"Our attention has been drawn to certain sinister and baseless propaganda indulged in by some irresponsible persons through a series of scurrilous pamphlets calculated to damage the reputation of the Hindusthan Co-operative Insurance Society Ltd. and we feel it our duty to warn the public against them."

কে বা কাহারা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিদিগের মনোযোগ অশ্লীল পুস্তিকার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে? আমরা আশা করি, হিন্দুস্থানের ডিরেক্টাররাই তাহা করিয়া এই নিবেদনে স্বাক্ষরের জন্য তাঁহাদিগের দ্বারস্থ হন নাই।

এই আবেদন বা আবেদনে স্বাক্ষরকারীদিগের সমালোচনা করা আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল বলিব, হিন্দুস্থানের কল্যাণকামী রূপেই আমরা মনে করি—হিন্দুস্থানের পরিচালন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সব আলোচনা স্থির, ধীর সমালোচকরা করিয়াছেন, সে সকলের সদুত্তর দিয়া লোককে নিশ্চিন্ত করাই হিন্দুস্থানের পরিচালকদিগের কর্ত্তব্য।

গত নভেম্বর মাসে য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' লিখিয়াছেন :—

"The Hindusthan Life fund now stands at the substantial figure of Rs 1,50,37,000.

Here we get into really big figures and it is for that reason that the Directors of the Hindusthan might heed the pointed criticisms of their investment policy—criticisms, be it said, which do not always come from rivals and competitors but sometimes from friends. As things stand, out of total assets of Rs 173½ laks no less than Rs. 106 lakhs is represented by loans against real property, house property and landed property and a sum just in excess of Rs. 17½ laks in giltedged and other investments.......

The average Indian Company usually has about two-thirds of its assets invested in giltedged securities.......

It may be noted, however, that the balance-sheet shows nearly Rs 6 laks in respect of outstanding interest, dividends and rents and this must be regarded as a large item compared with the total interest on the Life fund of Rs 8·26 laks.

......A not inconsiderable number of its critics will remain unconvinced that a higher ratio of giltedged to real property investments would place the company in a more satisfactory position."

এই উক্তি scurrilous ও irresponsible সমালোচকের নহে। আবেদনে স্বাক্ষরকারীরা ইহার উত্তর দিয়া লোককে সন্তুষ্ট করিবেন, এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

হিন্দুস্থানের তহবিলের টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে যেমন এই কথা উত্থাপন করা

হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী

হিন্দুস্থান সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট আবেদন প্রচারিত হইবার পর হইতে, চারিদিকে এই লইয়া নানারূপ আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত গত সংখ্যায় বিবৃত করা হইয়াছে। আমরা এখনও বলি যে, অবিলম্বে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটী নিরপেক্ষ তদন্তকমিটী গঠিত হউক :—

১। ডাক্তার—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য
২। অধ্যাপক—জে, পি, নিয়োগী
৩। মিঃ জি, বসু—ইনকরপোরেটেড একাউন্টান্ট
৪। মিঃ এস্, এন্, মুখার্জ্জী—ইনকরপোরেটেড একাউন্টান্ট

কোম্পানীর খাতাপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া আভ্যন্তরীণ সকল অবস্থা পরীক্ষা ও পর্য্যালোচনা করিয়া ইঁহারা লিখিত মতামত দান করুন। জনসাধারণের মনে যদি সন্দেহের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা নিরসনের ইহাই একমাত্র উপায়।

গেল, তেমনই ইহার অংশীদারদিগের দুর্গতি সম্বন্ধে একটী কথা বলিবার আছে। হিন্দুস্থানের ডিরেক্টাররা কেহই বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেন না—কর্ম্মচারীদিগের ত' কথাই নাই কেবল অংশীদাররা খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার হইতেছেন। **১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহারা কিছুই পান নাই!** মিষ্টার এস, সি, দাশ দেখাইয়াছেন :—

(১) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে (তখন সভাপতি ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য) বলা হইয়াছিল, অংশীদারদিগের অবস্থা ভাল হইতেছে—সুদের ও ভাড়া প্রভৃতির অঙ্ক বাড়িতেছে, আবার কম্বাইণ্ড বাবদে অগ্রিম প্রদত্ত টাকার পরিমাণ কমিতেছে। যে টাকা জমিতে আবদ্ধ ছিল, তাহাও পাওয়া যাইতেছে। এই সকল কারণে বলা যায়, শীঘ্রই অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ হিসাবে টাকা দেওয়া যাইবে।

(২) তিন বৎসর পরে কুমার কার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিক যখন সভাপতি তখন বার্ষিক বিবরণে প্রকাশ—নিয়মানুসারে দেয় প্রদান করিয়া অংশীদারদিগের আয় এখনও কম্বাইণ্ড বীমার টাকা দিতেই ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। **আগামী চারি বৎসরে** এই দেয় টাকা পরিশোধ হইবে এবং **আশা করা যায়, তাহার পর অল্পকালের মধ্যেই** সাধারণ অংশীদারদিগকে ডিভিডেণ্ড দেওয়া যাইবে।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রাণকৃষ্ণ অংশীদারদিগের প্রাণে যে আশার সঞ্চার করাইয়াছিলেন, তিন বৎসর পরে কার্ত্তিক চন্দ্র তাহা হতাশায় পরিণত করাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"হনোজ দিল্লী দূরস্ত"—আরও চার বৎসরে কম্বাইণ্ডের ভার দূর হইবে এবং তাহারও পরে "অল্পকাল মধ্যে" অংশীদাররা লভ্যাংশ হিসাবে কিছু পাইবার আশা করিতে পারেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে—"শীঘ্রই" বলার সার্থকতা থাকে নাই, তাহার পর সম্মুখে চারি বৎসর পার হইলে "অল্পকাল"—অর্থাৎ আরও দশ বৎসরের মেয়াদ!

১৯১৪ হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ—তখন কি হইবে তাহা কার্ত্তিক কল্পনা-ময়ূরে আরোহণ করিয়া বলেন নাই বটে, কিন্তু—তখন আবার কোন্ গণেশ শুঁড় নাড়িয়া কি বলিবেন, তাহা কে বলিতে পারে?

যে কোম্পানী প্রায় ৩০ বৎসর অংশীদারদিগকে এক পয়সা লভ্যাংশ হিসাবে দিতে পারে না—সে কোম্পানীর অংশের মূল্য কি? কার্ত্তিক কোম্পানীর "prospective ability to declare a reasonable dividend" সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্য ডিরেক্টারদিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে—তাঁহারা নগদ পারিশ্রমিক লইয়া কাজ করেন—তাঁহারা ওমর খৈয়ামের মতাবলম্বী—

"Take the cash and let the credit go." আর অংশীদাররা—তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতেই হইবে। কারণ, অন্য উপায় নাই।

কম্বাইণ্ড দাবীর জন্য যে টাকা "outstanding advance from capital" হিসাবে গিয়াছে, তাহা কিরূপ মন্থর গতিতে হ্রাস পাইতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, সন্দেহ নাই।

আমরা হিন্দুস্থানের পরিচালকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা বাহিরের লোককে আনিয়া আবেদন প্রকাশ না করিয়া এই সব সমালোচনার সদুত্তর প্রদান করুন—লোক সন্তুষ্ট হইবে।

যদি প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহারা এক অনুসন্ধান কমিটী গঠিত করুন—রাজনৈতিক নহেন, এমন কয়জন লোকের নাম আমরা করিতে পারি—তাঁহাদিগকে লইয়া অনুসন্ধান কমিটী গঠন করিতে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আন্দোলনকারীরা সম্মত আছেন কি?

[বীমা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলিতে ধারাবাহিক ভাবে যে সকল আলোচনা হইতেছে, সেই সম্পর্কে হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণের যদি কিছু বলিবার থাকে, আমরা তাহা সাদরে পত্রস্থ করিব। খেঃ সঃ]

—

বিবিধ

চিত্তরঞ্জন পরিষদ

অতিশয় ক্ষোভের বিষয় যে দেশবন্ধুর স্মৃতিপূত বহুবাজারের বিখ্যাত পাঠাগার চিত্তরঞ্জন পরিষদ সম্বন্ধে আমরা বহু গুরুতর অভিযোগ শুনিতে পাইতেছি। ১০নং ওয়ার্ডে শুনা যায় যে চিত্তরঞ্জন পরিষদ পাঠাগার বর্ত্তমানে ব্যক্তিবিশেষের পারিষদাগারে পরিণত হইয়াছে এবং যে সব অভিযোগ পরিষদের বর্ত্তমান পরিচালকবর্গের বিরুদ্ধে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল। এই সম্বন্ধে পরিষদের পরিচালকবর্গের যদি কিছু বলিবার থাকে তাহা আমাদের জানাইলে আমরা তাহা সাদরে পত্রস্থ করিব।

১। গত দুই বৎসরের (১৯৩২-৩৩, ১৯৩৩-৩৪) মধ্যে চিত্তরঞ্জন পরিষদের সাধারণ সভার (general meeting) অনুষ্ঠান হয় নাই কেন?

২। গত বৎসরে (১৯৩৩-৩৪) পরিষদের পরিচালক সমিতির (executive committee) কতগুলি অধিবেশন হইয়াছে?

৩। গত বৎসরের (১৯৩৩-৩৪) হিসাব নিকাশ এখনও হয় নাই কেন?

৪। এ বৎসর (১৯৩৪-৩৫) চারি মাসের মধ্যে পরিচালক সমিতির কোন সভা হয় নাই কেন?

৫। বাংলা প্রায় দুই তিন হাজার পুস্তকের কোন "সম্পূর্ণ" তালিকা বা হিসাব আছে কি?

৬। ইংরাজী পুস্তকের কোন ছাপান তালিকা নাই কেন, এবং বৎসরে কয়খানি ইংরাজী পুস্তক কেনা হয়?

৭। কোন মাসের শেষাশেষি পরের

মাসের হিসাবে চাঁদা দিয়া চাঁদা দিবার তারিখ হইতে গ্রন্থাগার হইতে বই লওয়া যায় কিনা। ইহা কি আইন সঙ্গত?

৮। লাইব্রেরীর বই কেনার সময় বই পছন্দ করার জন্য একটী Book Selection Committee আছে, কিন্তু বই কেনার সময় সত্যই কি ঐ committeeকে consult করা হয়?

রাইমার এণ্ড কোং

রাইমার এণ্ড কোংর ভবানীপুরের হোমিও-প্যাথিক বিভাগের উদ্বোধন গত ১লা বৈশাখ বেলা ৯॥০টার সময় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। সুপরিচিত রাইমার এণ্ড কোংর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক ইহাই আমাদের কামনা।

A. B. S. A-এর পাণ্ডার কীর্ত্তি

অধুনালুপ্ত A. B. S. A.-এর পাণ্ডা খঞ্জ-পদবিশিষ্ট জীবের কীর্ত্তিকাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। রিপণ কলেজের অধ্যাপক অশ্বিনী গুপ্তকে সিণ্ডিকেটের নির্দ্দেশানুযায়ী পুলিসে চালান দেওয়া হইয়াছে। মামলাটী বিচারাধীন, সুতরাং এ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে বিরত রহিলাম। কেহ কি বাচাধনের খঞ্জ-পদের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন? বারান্তরে গুপ্তের গুপ্ত-লীলা ব্যক্ত হইবে।

আশ্রমবাসীর অনুতাপ

'সংহতির' জয়গান ব্যর্থ না হইলে আমরা সুখী হইব। সাত্ত্বিক সুরেন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের মৈমনসিংহ-প্রীতি প্রশংসনীয়, তবে আশ্রম-ফেরত সুরেন বাবুর মানসিক ছাঁচে ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত আসামীর প্রতি অহেতুক প্রেম কিরূপে খাপ খাইল তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। প্রীতিভাজন সুরেন্দ্র বাবু একটা আশ্রম গড়িতেই চেষ্টা করুন না কেন—প্রেসের কালিধূলা মাখিয়া বিশেষ লাভ কি? প্রেসের কালিধূলার ছাপ আশ্রমবাসীর হৃদয়ে লাগিতে পারেও ত'।

বিদায়, বিদায়...

'ক্লাইভ ষ্ট্রীটের' বিদায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধাংশু বিকাশ রায় চৌধুরী পুণ্যতীর্থ হিন্দুস্থানে আশ্রয় পাইয়া ডাঃ এস্, সি, রায়ের ১৮ নম্বরের আখড়া হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদায় বিদায় আজি নিরূপায়
দেখা হ'বে পরপারে'—

বন্ধুবর ব্রজেন সেনের এই আক্ষেপধ্বনি আমাদিগকে আজও ব্যথিত করিতেছে।

নববর্ষে

নববর্ষ উপলক্ষে কোল্‌কাতার বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পাই। এদের মধ্যে ফটোগ্রাফিক ষ্টোর্স, ফ্যান্সী টেলারিং, চণ্ডীচরণ নায়েক, রাইমার এণ্ড কোং, দেশবন্ধু ডেকরেটিং, নিউ আর্ট ষ্টুডিও প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা কামনা করি, বছরের প্রথম দিনে এরা যে সহযোগিতার পরিচয় দিয়েছেন—বছরের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই সহযোগিতা এদের মধ্যে যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

চলতি পথে

শ্রীমল্লিনাথ

সেবাসদন দিবস

দেশবন্ধু স্মৃতিপূত চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের সাহায্যের জন্য এক আবেদন পত্র বাহির হইয়াছে। সেবাসদন বাংলার মাতৃজাতির কল্যাণার্থে কি করিয়াছেন এবং কি করিয়া থাকেন তাহাও মোটামুটী ঐ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন যখন প্রথম সংস্থাপিত হয় তখন হইতে আজকার অবস্থা যে অনেক উন্নত হইয়াছে সেই সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ নাই। তবে সেবাসদনের আভ্যন্তরিক কার্য্যপরিচালনা রীতি সম্পর্কে আমরা প্রায়ই নানরূপ কানর্ঘুষা শুনিতে পাই। ইহা দুঃখের কথা সন্দেহ নাই যে এমন একটী প্রভূত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের বিষয় জনসাধারণের অন্তরে সন্দেহ, অবিশ্বাসের অবকাশ থাকিতে পারে। প্রতিবৎসরই যথাবিধি সেবাসদন দিবস পালিত হয়, এবং কলিকাতার জনসাধারণও তাহাদের সাধ্যমত মাতৃজাতির দুঃখব্যধি মোচনকল্পে সাহায্য করিয়া থাকেন। জনসাধারণের সেই দান করিবার প্রেরণা আসে তাহাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে, তাহাতে না থাকে অবিশ্বাসের চিহ্ন, না থাকে সন্দেহের ইঙ্গিত। কিন্তু এ বৎসর যেন সেবাসদন দিবস ততটা উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত পালিত হয় নাই; উহার কারণের আভাষ পুর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সেবাসদন দিবসে ঐ প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিতে দেশবাসীকে অনুরোধ জানাইয়া সুদূর বিদেশ প্রবাসী বাংলার জননায়ক শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এক বেতার বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন। গত তিন বৎসর সুভাষচন্দ্র কারাবাস অথবা প্রবাস হেতু সেবাসদনের বিষয় কিছু করিতে পারেন নাই কিন্তু তাহা সত্বেও সেবাসদন দিবস যথারীতি পালিত হইয়াছে। এ বৎসর অকস্মাৎ সুভাষচন্দ্রের আবেদন দেখিয়া সাধারণের মনে সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইয়াছে যে সত্যই হয়তো কোন দোষ ত্রুটী সেবাসদন পরিচালনার ব্যাপারে রহিয়া যাইতেছে; এবং সুভাষচন্দ্র আজ প্রায় সাড়ে তিন বৎসরকাল সাধারণের সহিত সংযোগ-বিচ্ছিন্ন, সুতরাং তিনি জানিতে পারেন না কোন গলদ যদি তাঁহার অনুপস্থিতির সময়ে ঘটিয়া থাকে। তিনি জানেন না প্রকৃত ব্যাপার কি, কাজেই কলিকাতা হইতে যখন তাঁহার নিকট সেবাসদন দিবসে জনসাধারণকে সাহায্য করিবার অনুরোধ করিতে তার প্রেরিত হইয়াছিল, তখন তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। কিন্তু অনেকে মনে করেন, এ বৎসরে সুভাষচন্দ্রের বেতার মারফৎ "আবেদন পত্র" আনানো আর কিছুই নহে, সেবাসদনের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ জনসাধারণের মনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে, তাহারই উপর চূণকাম করিবার প্রচেষ্টা। এই প্রসঙ্গে আমরা একটী কথা না বলিয়া পারিলাম না: সুভাষচন্দ্র কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার রাজনৈতিক দুরবস্থার প্রতীকার কল্পে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের নিকট কয়েকটী পন্থার প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের চক্রান্তে তাঁহার প্রস্তাবগুলি পরিত্যক্ত হয়। কংগ্রেসের এই সংখ্যা গরিষ্ঠ দলই চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের পরিচালনা করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি—সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেসের মিলন বিষয়ক প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া এই দল যেমন দেখাইলেন যে সুভাষচন্দ্রের নির্দ্দেশ না মানিয়া তাঁহারা যেমন কংগ্রেস চালাইতে পারেন, তেমনি কি তাঁহারা সুভাষচন্দ্রের নিকট হইতে সেবাসদনের সার্টিফিকেট না আনাইয়া সেবাসদন চালাইতে পারেন? যাহা হউক আমরা কামনা করি উপরোক্ত কানর্ঘুষা যেন গুজবমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, এবং ইতিমধ্যে যদি সত্যই কোন দোষ ত্রুটী সেবাসদন পরিচালনা ব্যাপারে থাকে, তবে জনসাধারণ কর্ত্তৃপক্ষকে তাহা নিরাকরণ করিবার সুযোগ দিয়া সেবাসদনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

কিরণশঙ্করের সাফাই

প্রায় মাস তিনেক পূর্ব্বে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হিসাবে প্রবাস হইতে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের বরাবরে ঐ সমিতির কার্য্যকরী সভার নিকট দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্যক আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রস্তাব সম্বলিত এক পত্র লেখেন ঐ পত্রখানিকে প্রথমে যথাসাধ্য ধামা চাপা দিবার প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরুদ্ধবাদীদের চেষ্টায় সেই উদ্যম সাফল্য মণ্ডিত হয় নাই। সেইজন্য কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভায় ঐ পত্র যথাবিহিতভাবে আলোচিত হইবার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ইচ্ছায় সুভাষবাবুর প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের এই কাজে জনসাধারণ ঐ দলের উপর বড়ই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এমনিই তো ঐ দলের দলপতিগণের অপকীর্ত্তির কলঙ্কে বাংলার

আকাশ আজ কলুষিত, তাহার উপরও, সুভাষচন্দ্রকে নেতা হিসাবে স্বীকার করায় উঁহাদের উপর জনসাধারণের যেটুকুও বা আস্থা ছিল, সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায়, সেটুকুও তাহারা হারাইতে বসিয়াছে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সভার ঐ অধিবেশনের পরে সংবাদপত্রে ও সাধারণের মধ্যে ঐ সম্পর্কে যথেষ্ট বিরুদ্ধ আলোচনা হইয়াছে কিন্তু এতাবৎ কাল প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বিধাতারা বেশ মৌনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে কঠোর বিরুদ্ধ আলোচনার ফলে তাহাদের কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, এবং শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে মুখপাত্র করিয়া প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বর্ত্তমান কর্ণধারগণ এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত আমরা বহু আবেদনপত্রে ও বিবৃতিতে কিরণশঙ্করের নাম দেখিয়াছি। কিন্তু কখনও তাঁহার নাম সর্ব্বপ্রথম দেখি নাই। তিনি বরাবরই গোপনে থাকিয়া শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ভালবাসেন বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু এতদিনে দেখিতেছি তাঁহার সাহস ও বীর্য্য বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং তিনি সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তবে কিরণবাবুর নাম কেন সর্ব্বপ্রথম ঐ বিবৃতিতে রহিয়াছে তাহার আরও একটা ব্যাখ্যা হইতে পারে। কিরণবাবুর নামের পরে আরও যতজন ভদ্রব্যক্তি ঐ বিবৃতিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আর কেহই হাইকোর্ট মার্কা নহেন। যেহেতু কিরণবাবু একমাত্র হাইকোর্ট মার্কা সেইজন্যই হয়তো তাঁহাকে ঐ বিবৃতিপত্রে মুখপাত্রপদে বরণ করা হইয়াছে।

কিরণবাবুকে মুখপাত্র করিয়া যে বিবৃতি প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কোনমতেই জনমতের সমর্থনলাভ করিতে পারে না। কিরণবাবুর দল বলিতেছেন যে তাঁহাদের বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা সুভাষবাবুর কথামত শুধু কার্য্যকরী সমিতি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িবার প্রস্তাবেই জোর দিয়াছিলেন। ধরিয়া লইলাম কিরণবাবুর কথাই সত্য, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব মত বিপক্ষদল যে অন্যান্য প্রস্তাবগুলি করিয়াছিল, কিরণবাবুর দল কেন সেগুলি গ্রহণ করিলেন না তাহা তিনি জানাইবেন কি? অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই, এই একটী হইতেই বুঝা যাইবে কেন বাংলার রাজনৈতিক দলাদলি মিটিতেছেনা। পূর্ব্বেও আমরা বলিয়াছি এবং আর একবার বলি যে যতদিন কিরণবাবুর ন্যায় চক্রান্তকারী ব্যক্তিগণের কংগ্রেসের ভিতরে গতিবিধি সংযত না করা যাইবে, ততদিন মিলনের কোন আশা নাই।

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ

বারাণসী, ১৬ই এপ্রিল।

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের নিকট আজ সংবাদ আসিয়াছে যে কলিকাতা কেন্দ্র হইতে ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচিত রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যের পদে ইস্তফা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদে ইস্তফার কারণ যাহা পণ্ডিত মালব্যকে জানাইয়াছেন, সেই সম্বন্ধে প্রকাশ, তিনি পণ্ডিতজীকে জানাইয়াছেন যে যেহেতু ব্যবস্থা পরিষদের দিল্লী অধিবেশনের সময়ে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই, তাহাতে তাঁহার নির্ব্বাচন কেন্দ্র অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং যেহেতু ব্যবস্থা পরিষদের আগামী সিমলা অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইবে সেহেতু তিনি চান না যে তাঁহার নির্ব্বাচন কেন্দ্র প্রতিনিধিবিহীন থাকে অথবা সিমলা অধিবেশনের সময়ে পরিষদের সরকার বিরোধী দল তাঁহার একটী ভোট হইতে বঞ্চিত হ'ন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সদস্যপদে ইস্তফা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত স্থির করিয়াছেন।

ভরা ডুবির আশঙ্কা

বার্লিন হইতে সর্ব্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গেল, তাহাতে জানা গেল, ত্রি-শক্তির যে মিলিত বৈঠক হইতেছে এবং যাহার বেড়াজালে ফেলিয়া জাগ্রত জার্ম্মানীকে আবার ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা হইতেছে তাহা ফাঁসিয়া যাইতে আর বিলম্ব নাই। ছোট আঁতাত সম্পর্কে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে হাঙ্গেরীকে নিরস্ত্র করার সঙ্কল্প করা হইয়াছিল। দুর্ব্বুদ্ধি হাঙ্গেরী ছোট আঁতাতের সে প্রস্তাব সাদরে উপেক্ষা করিয়াছে। ঘাড় নাড়িয়া সে বলিয়াছে "না না, তা হবে না, নখদন্ত-বহুল এই হিংস্র রাষ্ট্র সমূহের আবর্ত্তে পড়িয়া আমাকেও বাঁচিতে হইবে। আমি কেমন করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করি?" এখানে ত' হাঙ্গেরীর সম্পর্কে সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হইল! আমাদের আশাবাদী ভারতবন্ধু "ষ্টেটস্‌ম্যান" উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, ট্রেসার ছোট আঁতাত সফলতা মণ্ডিত হইতে চলিল। আমরাও একটা শান্তির আশায়

ভারতবন্ধুর সহিত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু অদ্যকার সংবাদ বুঝি সে আশায় বাদ সাধিল, জাগ্রত জার্ম্মানী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে "আমরা আর ঘুমাইব না, এমন কি চক্ষু বন্ধও করিব না। ইটালি প্যাক্টের নামে রাষ্ট্র বিশেষকে যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি উহা একদেশদর্শীতায় পূর্ণ। বিশ্বশান্তির সদিচ্ছা উহার মধ্যে নাই।" স্বয়ং রাষ্ট্রনেতা হার হিটলার এই ঘোষণা করিয়াছেন। ছোট আতাতের উদ্যোক্তাদের কোন কোন রাষ্ট্র ধুরন্ধরকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন, ওরা aggressive—উগ্রপ্রকৃতির। ওদের উগ্র-মতকে দমন করার কোন ব্যবস্থা হইলে অর্থাৎ বিশ্বশক্তির অনুকুল কোন সন্ধিসর্ত্ত তৈয়ারী হইলে জার্ম্মানী সাগ্রহে সে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিবে। কিন্তু সে রকম সন্ধির খসড়া তৈয়ারী হইবে না। কারণ জার্ম্মানীকে ত' কেউ আর মিত্রতার দৃষ্টিতে দেখেন না! সে এখন সমস্ত শক্তির মনে এক দুশ্চিন্তার ছায়াপাত করিয়াছে। সন্ধি হয়ত একটা হইবে, কিন্তু তাহা জার্ম্মানীকে বাদ দিয়াই হইবে। যাহা হউক, ত্রি-শক্তি এখনও হাল ছাড়েন নাই। বাতাসও অনুকুল নহে। আমরা শুধু ভয় করিতেছি—বুঝিবা মাঝ দরিয়ায় ভরা ডুবি হয়। দেখাই যাক্।

খেলার মাঠে

শ্রীদ্রোণাচার্য্য

বাইটন

রেঞ্জার্স

সোমবার রেঞ্জার্স মাঠে বাইটন কাপের দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা হয়। ঐ রাউণ্ডে প্রতিযোগী টিম ছিল রেঞ্জার্স ও ভবানীপুর ক্লাব। খেলায় প্রথম উল্লিখিত দলটি এক গোলে জয়ী হইয়াছে। খেলায় পূর্ণ সময় পর্য্যন্ত কোন পক্ষে গোল হয় নাই। সেইজন্য উভয় দলকে অতিরিক্ত সময় খেলিতে হয়। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্দ্ধেও কোন গোল হয় নাই। বিশ্রামের পর বিজয়ী দলের লেফট আউট গোল করেন। এই গোলটি হইয়াছিল ভবানীপুর লেফট ব্যাক ও গোলরক্ষকের ভুলের জন্য। গোলরক্ষক বিপক্ষ দলের একজনের সট্ থামান। যখন গোলরক্ষক বল থামাইয়াছিলেন তখন বিপক্ষদলের কোন খেলোয়াড়ই তাঁহার সন্নিকটে ছিলেন না। ব্যাক সোহানি গোলরক্ষকের নিকট হইতে বল লইয়া বল 'ক্লিয়ার' করিতে অসমর্থ হন। ওয়েষ্ট এই সুযোগে গোল করেন। রেঞ্জার্স দল তৃতীয় রাউণ্ডে লক্ষ্ণৌ ইয়ং মেনসের সহিত খেলিবে।

> **নববর্ষ**
>
> **শুভ নববর্ষে আমরা "খেয়ালী"র গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও বন্ধুগণকে আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।**

মোহনবাগান

মোহনবাগান নিজমাঠে খেলিয়া ইউনিয়ন স্পোর্টিংকে ২—০ গোলে পরাজিত করিয়াছে। বিজয়ীদলকে মঙ্গলবার ডালহৌসীর সহিত খেলিতে হইবে।

গত শুক্রবার মোহনবাগান বনাম ইউ-নিয়ন স্পোর্টিং-এর প্রথম মিলনে উভয়পক্ষে একটী করিয়া গোল হওয়ায় খেলার শেষ নিষ্পত্তি হয় নাই। এই হেতু সোমবার পুনরায় খেলা হয়।

তুলনায় যদিও মোহনবাগানের টীম ভাল ছিল তথাপি খেলা মোটেই উচ্চাঙ্গের হয় নাই। কোন খেলোয়াড়ের সহিত অপর খেলোয়াড়ের কোনরূপ সংহতির ভাব ছিল বলিয়া বুঝা যায় নাই. গতানুগতিক রূপেই খেলা চলিয়াছিল। ইহার মধ্যে কোনরূপ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর আভাস পাওয়া যায় নাই।

কাষ্টমস্

কাষ্টমস দল অতি সহজেই তাহাদের প্রতিপক্ষ রাজপুত রেজিমেণ্ট দলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করিয়াছে। খেলাটী হইয়াছিল ক্যালকাটা মাঠে। রাজপুত দল এবার লীগে শেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং, তাহারা যে পরাজিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু ছিল না।

লিলুয়া বনাম পুলিশ

মহমেডান স্পোর্টিং বিজেতা পুলিশ দল সোমবার ভবানীপুর মাঠে খেলিয়া লিলুয়া-দলের সহিত 'ড্র' করিয়াছে। পূর্ণ সময় খেলায় কোন গোল না হওয়ায় উভয় দলকে অতিরিক্ত সময় খেলিতে হয়। অতিরিক্ত সময় খেলা সত্বেও কোন পক্ষে গোল হয় নাই।

খুব প্রতিযোগিতার উপরই এই দুইদলের খেলা হয়। শেষ সময়ে দুই দলের খেলা হয়। শেষ সময়ে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে খেলোয়াড় মনোভাবের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা দেয়। খেলোয়াড়েরা মারামারি করিয়া খেলিতে থাকেন। আম্পায়ারদ্বয় খেলোয়াড়-দের একটু সতর্ক করিয়া দিলে এইরূপ ঘটিত কি না সন্দেহ।

বাইরের দল

রবিবার দিল্লী ইয়ং মেনসের নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন :—

গোল—কেকি ; ব্যাক—এস সত্তর ও জাফর আমেদ ; হাফব্যাক—সুলতান, তাহির ও এম জাফর ; ফরওয়ার্ড—রঞ্জিৎ সিং, গিয়ান সিং, মাকুর, সুলতানী ও হরি ; রিজার্ভ—নাই৬ ; মঙ্গলবার মাদ্রাজ মেলে আসার কথা আছে।

সোমবার প্রাতে কাণপুর দল আসিয়াছে বলিয়া জানা গেল।

ফুটবল-প্রীতি সম্মেলন

রবিবার মোহনবাগান ও ক্যালকাটার খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইয়াছে। উভয়পক্ষে একটি করিয়া গোল হইয়াছিল প্রথমার্দ্ধের পনের মিনিট খেলার পর এস চৌধুরী পি বসুকে "পাস" দিলে, শেষোক্ত খেলোয়াড় গোল করেন। বিশ্রামের পর বি, সরকার হ্যাণ্ডবল করায় রেফারি পেনালটি দেন। গোল্ড পেনালটি কিকে গোল করেন।

* * *

সোমবার এরিয়ান্স মাঠে খেলিয়া আলীপুর ৪—২ গোলে এরিয়ানকে হারাইয়া দিয়াছে। আলীপুর পক্ষে এস এন্দ, এন রায়, এস দত্ত, এন সরকার গোল দিয়াছিলেন। এরিয়ান্স পক্ষে ডি রায় চৌধুরী ও রামচন্দ্র প্রত্যেকে একটি করিয়া গোল দিয়াছিলেন।

* * *

রবিবার ই বি রেলওয়ে মাঠে খেলিয়া টাউন ৪—১ গোলে ই, বি, রেলওয়ে ম্যানসনকে হারাইয়া দিয়াছে। টাউন ক্লাব পক্ষে পি ঘোষ ৩ ও এন রায় একটি গোল দিয়াছিলেন, রেলওয়ে পক্ষে পি চট্টোপাধ্যায় একটি গোল পরিশোধ করিয়াছিলেন।

* * *

সোমবার ক্যালকাটা জোড়াবাগান পার্কে অরোরার সহিত প্রীতি-সম্মেলনের খেলায় যোগ দিয়াছিল। কোন পক্ষের গোল না হওয়ায় খেলার কোন মীমাংসা হয় নাই।

* * *

রবিবার ব্যারাকপুরে খেলিয়া ডালহৌসী দল ব্ল্যাকওয়াচ রেজিমেণ্টের নিকট তিন গোলে পরাজিত হইয়াছে। রিচি (২) ও মার্টিন বিজয়ী দলের হইয়া গোল করিয়াছিলেন।

দাবা প্রতিযোগিতা

দক্ষিণ আফ্রিকার কেনিয়া সহরে একটি দাবা প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। এই প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে তরুণ পাঞ্জাবী

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"

——:০:——

"বসুমতী" ও নলিনী

"ইষ্টারের মরসুমে দিনাজপুরে কেবল যে প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইবে এরূপ নহে, যেমন সর্ব্বত্র হইয়া থাকে ঐ সঙ্গে কৃষি শিল্প প্রদর্শনীরও অনুষ্ঠান হইবে। আমরা যে কেবল বক্তৃতাই করি না, কাজও করি, কৃষিবিদ্যার চর্চ্চা এবং শিল্প কার্য্যের উন্নতিরও চেষ্টা করি, তাহাতে উৎসাহ দান করি—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই প্রকার প্রদর্শনীর উপযোগিতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দিনাজপুরেও আগামী ১৮ই এপ্রিল কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী আরম্ভ হইয়া তাহা সপ্তাহকাল স্থায়ী হইবে। প্রদর্শনীর দ্বার-উদ্ঘাটন একটা সম্মানের ব্যাপার। দেশের যাঁহারা সুসন্তান, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে অগ্রগণ্য, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া এই ভার অর্পণ করা হয়। কলিকাতার মেয়র ভাগ্যবান ব্যক্তি, কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠাও অসাধারণ; এই হেতু প্রস্তাব হইয়াছিল, কলিকাতার মেয়রকে এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটনের জন্য নিমন্ত্রণ করা হইবে। কিন্তু কি কারণে প্রকাশ নাই, দিনাজপুরের অধিকাংশ ভদ্রলোক এই প্রস্তাবের ভীষণ প্রতিবাদ করায় প্রস্তাবটি বাতিল হইয়া গিয়াছে এবং স্থির হইয়াছে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত করিবেন। কলিকাতার মেয়র নিমন্ত্রিত হইলেও দিনাজপুরে পদার্পণ করিয়া এই উৎসবে যোগদান করিতে ও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দানে দিনাজপুরবাসীদের মুগ্ধ করিতে সম্মত হইতেন কিনা, এ বিষয়ে এখন অনেকেরই সন্দেহ হইয়াছে। ময়মনসিংহের সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনেও তাঁহার পৌরহিত্য করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। সেই প্রস্তাবও প্রতিকূল বায়ু প্রবাহে মাঠে মারা গেল কিনা, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই। শুনিতেছি, আগামী বৎসরের জন্য মেয়রের গদীতে পুনর্ব্বার অভিষিক্ত হইবার চেষ্টাতেও তাঁহার অরুচি হইয়াছে! তাঁহার এই বৈরাগ্যে ভক্তবৃন্দের মর্ম্মাহত হইবারই কথা।"

—বসুমতী ৪ঠা বৈশাখ

কলিকাতার বিদায়ী মেয়র ব্যভিচারের মামলায় অভিযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার যে ভাগ্যবান ব্যক্তি সে বিষয়ে আমরা "সহযোগী" 'বসুমতী'র সহিত একমত। তবে নলিনীর যে বৈরাগ্য উদয় হইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। শাস্ত্রে হয়ত পঞ্চাশ ঊর্দ্ধে বনবাসী হইবার নির্দ্দেশ আছে, তবে পঞ্চান্ন বৎসরের প্রৌঢ় নলিনীর এখনও গৌরীশঙ্কর লেনের অভিসারে বিতৃষ্ণা আসে নাই। বাঙ্গালী যুবকবৃন্দের পুরুষত্বের প্রতি মিস্ মেয়োর কটাক্ষ খণ্ডনের নিমিত্ত বিদায়ী মেয়র সঙ্কল্প করিয়াছে যে—

সে—————

"রচিবে যে মধুচক্র
গৌড়জন যাহে আনন্দে
করিবে পান সুধা নিরবধি!"

তবে এই "মধুচক্র" কলিকাতার কোন্ অঞ্চলে স্থাপিত হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। গৌরীশঙ্কর লেনের সন্নিকটে হইলেই রথ দর্শন ও কদলী বিক্রয় উভয়ই সহজে সমাধা হইবে।

——

এতদিনে চৈতন্য হইল?
নলিনীর প্রতি হিন্দুস্থানের ডিরেক্টারবর্গের নির্দ্দেশ

"সম্প্রতি করপোরেশন ষ্ট্রীটস্থিত হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটির ডিরেক্টরদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, সভায় হিন্দুস্থানের ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারের আলোচনা হয় এবং ডিরেক্টরগণ নাকি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, হিন্দুস্থানকে রক্ষা এবং তাহার উন্নতি সাধন করিতে হইলে হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার, কলিকাতার গত বৎসরের মেয়র শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারকে সকল প্রকার জনসেবার (?) ক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে এবং তাহাকে অনন্যমনা হইয়া হিন্দুস্থানের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

—বন্দেমাতরম ৪ঠা বৈশাখ

খেলোয়াড় বরকৎ আলী ইউরোপের বিখ্যাত খেলোয়াড় মিড্‌লডিচকে পরাজিত করিয়াছেন। এই তরুণ ভারতীয়ের সাফল্যে স্থানীয় ভারতীয়গণ খুবই আনন্দিত হয়েছেন। বরকৎ আলীর বাড়ী পাঞ্জাবের গুজরাণওয়ালা সহরে। তিনি ১৯২৭ সালে সর্ব্বপ্রথম এই খেলা শিক্ষা করেন। কার্য্যোপলক্ষে কেনিয়াতে আসিয়া তিনি বিদেশীয় নিয়মাদি শিক্ষা করেন।

——

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

নিউ থিয়েটার্স

চিত্রায় এঁদের "দেবদাস" দেখার জন্যে অসম্ভব ভিড় হচ্ছে। যে রকম দেখছি তাতে মনে হয়, "দেবদাস" ছবিতে একটানা চলার বিষয়ে নিউ থিয়েটার্স আরও একটা রেকর্ড করবে।

* * *

বি-ইউনিট ষ্টুডিয়োয় শরৎচন্দ্রের "বিজয়া" তোলার বেশ তোড়জোড় হচ্ছে এবং এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও "বিজয়ার" পরিচালক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ "বিজয়ার" চিত্রনাট্যরূপ দিতে খুব ব্যস্ত। আর শ্রীযুক্ত মিত্র ও শ্রীযুক্ত দাশকে বিশেষ সাহায্য করছেন "নাচঘর"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। "বিজয়ার" চিত্ররূপ যাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তার জন্যে এঁদের চেষ্টার অন্ত নেই।

* * *

ডিরেক্টার বড়ুয়ার হিন্দী হাস্যরসাত্মক ছবি ও শ্রীযুক্ত নীতিন বসুর উর্দু ছবির কাজ শীগ্‌গীরই আরম্ভ হবে বলে খবর পাওয়া গেছে।

কারওয়ান-ঈ-হায়াৎ

নিউ থিয়েটার্স'-নিউ ইণ্ডিয়ার প্রথম উদ্যম "কারওয়ান-ঈ-হায়াৎ" গত শনিবার থেকে নিউ সিনেমায় দেখানো হ'চ্ছে। ছবিখানা কোল্‌কাতার বাইরে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ কোরেছিল—সেজন্য ছবিখানা দেখবার আগ্রহ ছিল আমাদের বিশেষ। এবং "কারওয়ান্-ঈ-হায়াৎ" দেখে আমাদের সে আগ্রহ যে পরিতৃপ্ত হ'য়েছে—একথা বলাই বাহুল্য।

ছবিখানার গল্পের ভেতর বেশ একটা মৌলিকত্বের ছাপ পরিস্ফুট হ'য়েছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ছবির গল্পের Treatment আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল। পরিচালকদ্বয় শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শ্রীহেমচন্দ্র পরিচালনার দিক থেকে ছবিখানাকে যথাসম্ভব সাবলীল কোরে তুলেছেন। শ্রীকৃষ্ণগোপালের আলোকচিত্রও হ'য়েছে স্বচ্ছ ও সুন্দর। শ্রীঅতুল চ্যাটার্জ্জীর শব্দস্থিরীকরণের প্রশংসা না কোরে থাকা যায় না।

অভিনেতৃদের মধ্যে সাইগাল, নবাব, পাহাড়ীর অভিনয় খুব ভাল হ'য়েছে। রাজ-কুমারীর ভূমিকায় রাজকুমারী ও রাজমাতার ভূমিকায় শ্যামা জুৎসীর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। রূপসী বালিকাদ্বয় রতনবাঈ ও মলিনার মধ্যে শেষোক্ত মেয়েটির অভিনয় ও নৃত্যগীত সকলের মনস্তুষ্টি কোরেছে। অন্যান্য ভূমিকা-গুলি সু-অভিনীত হ'য়েছে।

ছবিখানির দৃশ্যসজ্জা প্রশংসনীয়।

মোটের ওপর ছবিখানা দেখে সকল সম্প্রদায়ের লোকই যে খুসী হবে—একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

রাধা ফিল্ম

আস্‌চে মে মাসের প্রারম্ভেই এদের "মানময়ী গার্ল স্কুল" উত্তর কলিকাতার কোনও বিশিষ্ট চিত্র-গৃহে মুক্তিলাভ কোর্‌বে।

* * *

"দক্ষযজ্ঞে"-র জনপ্রিয়তা এখনও কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি। ছবিখানি আস্‌চে শনিবার থেকে ক্রাউনে আটাশ হপ্তা ও পূর্ণতে চতুর্থ হপ্তায় পড়বে।

* * *

এদের উর্দ্দু ছবি "ওয়ামাক্‌-এজ্‌রা"-র কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এল। দু'টি বহির্দৃশ্য মাত্র তুল্‌তে বাকী।

* * *

"ভক্ত কুচেলা" (তামিল) ও "সিরুতোণ্ডা" (তেলেগু) ছবি দু'খানা মিঃ সদাশিব রাওয়ের পরিচালনায় দ্রুতগতিতে এগুচ্ছে।

* * *

দিল্লীতে পরিচালক শেঠীর পরিচালনায় উর্দ্দু ছবি "থাণ্ডারবোল্টে"র বহির্দৃশ্য তোলা হ'চ্ছে।

কালী ফিল্মস্‌

"বিদ্যাসুন্দরে"-র কাজ আধাআধি শেষ হ'য়েছে।

* * *

শোনা যাচ্ছে, শ্রীশিশির কুমার ভাদুড়ী নাকি এঁদের হ'য়ে শরৎচন্দ্রের "বিন্দুর ছেলে" পরিচালনা কোর্‌বেন।

‡ * ‡

"গুলবাকাওলি" নামে এঁদের তামিল ছবির শুটিং শেষ হ'য়ে গেছে।

ম্যাডান থিয়েটার্স

"ফ্যান্টম্‌ অফ ক্যালকাটা" নামে এঁদের বাঙ্‌লা সবাক্‌ ছবির কাজ অনেকটা এগিয়েছে। ছবিখানার পরিচালনা কোরছেন কে এক এণ্ডিমুর রায়। আমরা ত' "গৌরীশঙ্কর" ঘোড়ার ওপর চেপেছিলেন এক এণ্ডামুর না কি এণ্ডিমুরের নাম শুনেছিলাম—ইনি কী তিনি?

পায়োনিয়র

শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের পরিচালনায় "দেবদাসী" নামে একখানা বাঙ্‌লা ছবি তোলা হচ্ছে।

* * *

এরপরে এই ষ্টুডিওতে বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" তোলা হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

কেশরী ফিল্মস্‌

শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য নাকি এই প্রতিষ্ঠানের হ'য়ে একখানা ছোট হাস্যরসাত্মক ছবি তুলবেন। তা' হ'লে পরিচালক হ'তে বাকী রইল কে? হরে, যদু ও মেধো—তোমরাও বসে রয়েছ কেন—লেগে পড় এবার।

রঙমহল ফিল্মস্‌

কালী ফিল্মস্‌ ষ্টুডিওতে "মন্ত্রশক্তি" ও "মহানিশা" তোলার আনুষঙ্গিক কাজ এরা প্রায় শেষ কোরে ফেলেছেন।

"খেয়ালী"র ফটোগ্রাফার ও নলিনীর ড্রাইভারের মামলা

২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত পুনরায় স্থগিত

গতকল্য বুধবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নিত্যানন্দ সিংহ রায়ের এজলাসে "খেয়ালী"র ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত সুধীর সিংহ ও নলিনীরঞ্জন সরকারের ড্রাইভারের মামলার আর এক দফা শুনানী হয়।

কলিকাতা পুলিশ এ্যাক্টের ৬৮ ধারা অনুযায়ী সরকার কর্ত্তৃক উভয়ের বিরুদ্ধে এই মামলা রুজু করা হইয়াছে।

হেড কনেষ্টবলের সাক্ষ্য গ্রহণের পর ড্রাইভারের পক্ষের উকিল মিঃ ডি, এন্‌, দত্ত মেয়রের মোকদ্দমার চিত্র সম্বলিত দুইখানি "খেয়ালী" দাখিল করিবার আবেদন করেন।

তৎপরে নলিনীর ড্রাইভারের পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আগামী [illegible]শে পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী থাকে।

শ্রীযুক্ত সুধীর সিংহের পক্ষে আলীপুরের উকিল শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বসু ও নলিনীর

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

শ্রীজ্যোতিষ ব্যানার্জ্জীর পরিচালনায় হেমেন্দ্র কুমার রায়ের "পায়ের ধূলো" তোলা সুরু হ'য়েছে।

* * *

"ডি-জি"-র পরিচালনায় "বিদ্রোহী"-র কাজ প্রায় শেষ হ'য়েছে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার ও কুমার সুরেন লাহা

সভাপতি নলিনীর বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের সহকারী সভাপতি কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ নিম্নলিখিত বিবৃতিটি দিয়াছেন :—

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য চার মাসের অধিক কাল কলিকাতার বাহিরে ছিলাম। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, সংবাদপত্রে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স সম্পর্কে অনেক কথা প্রকাশিত হইতেছে। যাঁহারা চেম্বারের শুভাকাঙ্খী তাঁহারা ইহার প্রতিবাদ না করিয়া পারেন না।

সম্প্রতি 'এ্যাডভ্যান্স' পত্রিকায় এই ব্যাপার সম্পর্কীয় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লাহা পরিবারের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে, চেম্বারের সহকারী সভাপতি হিসাবে নহে, এই সম্বন্ধে আমার কিছু বলা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ ইহা পরিষ্কার করিয়াই বলিতে চাই যে, সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যদিগকে কোন সংবাদ জানিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইলে তাহা ক্ষমার্হ নহে। কারণ তাহাতে সদস্যদের মনে এই সন্দেহ জাগে যে, ইহা দ্বারা শুধু অবৈধ আচরণ করা হইতেছে না, পরন্তু প্রতিষ্ঠানের আসল অবস্থা গোপন রাখা হইতেছে। কয়েকজন সদস্য চেম্বারের কোন কোন ব্যাপার জানিতে চাহিলে (যাহা তাঁহারা জরুরী বলিয়া মনে করেন) তাঁহাদিগকে তাহা জানানো হয় নাই বলিয়া সংবাদপত্রের মারফৎ বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে—ইহা দেখিয়া আমি দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের চেম্বারের মত একটি সম্মানিত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে তাহা খুবই পরিতাপের বিষয়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এই মত পোষণ করি যে, চেম্বারের কোন বিশেষ পদ বা অন্য প্রতিষ্ঠানে চেম্বারের প্রতিনিধিত্ব একচেটিয়া করিয়া লওয়ার চেষ্টায় অন্যান্য সদস্যদিগকে চেম্বারের কাজ করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হয়। এই জন্য যদি কোন অভিযোগ করা হয়, তবে তাহা বৈধ বলিয়াই জানিতে হইবে এবং যাহাতে উহা বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। ব্যক্তিগতভাবে এই ব্যাপারে আমি একটু মুস্কিলে পড়িয়াছি; কারণ আমার পুজনীয় পিতৃদেবকে দীর্ঘকাল চেম্বারের সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তখন অবস্থা অন্যরূপ ছিল। অবশ্য এই সম্পর্কে আমি উল্লেখ করিতে পারি যে, যখন তিনি পদত্যাগ করেন এবং চেম্বারের একদল সদস্য নিয়মকানুন 'গণতন্ত্রমূলক' করিতে সিদ্ধান্ত করেন, তখন বর্ত্তমান সভাপতি দুই বৎসরের অধিক কাল সভাপতি পদে থাকিবেন না বলিয়া আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু আরও দুই বৎসর কাটিয়াছে, তবু সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ হয় নাই।

রায় পরিবার চেম্বারের সম্পর্ক-চ্ছেদ করিয়াছেন, সংবাদপত্রে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐজন্য আমি দুঃখিত। আমি আশা করি, রায় পরিবার পুনরায় চেম্বারে যোগ দিবেন এবং পূর্ব্বের মত চেম্বারের উন্নতির জন্য সাহায্য করিবেন।

বর্ত্তমান নিয়ম-তন্ত্রে যে দোষ-ত্রুটি আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যথাশীঘ্র তাহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। সুতরাং আমার সহকর্ম্মীদের আমি এই আবেদন জানাইতেছি, নিয়ম-তন্ত্রের ঐ দোষ-ত্রুটি দুর করিবার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

পরিশেষে আর একটী কথা বলিতে চাই। কয়েকজন সদস্য চেম্বারে তাঁহাদের পদ 'মৌরসী পাট্টা' করিয়া লইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই যে, যে কোন সময় চেম্বারের সহকারী সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে আমি প্রস্তুত।

——:o:——

ড্রাইভারের পক্ষে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের শ্রীযুক্ত ভি. এন্. দত্ত, শ্রীযুক্ত সুনীতি কর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

মেয়রের মামলা

কলিকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় মিঃ সুশীল সিংহের এজলাসে গতকল্য বুধবার মেয়রের মামলার আর এক দফা শুনানী হয়। শ্রীযুক্ত বিনোদ বিশ্বাস প্রভৃতির জেরা হয়।

উক্ত দিনের শুনানী প্রসঙ্গে প্রকাশ পায় যে ফরিয়াদী অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার কয়েকদিন অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় কোথায় গিয়াছেন—তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। অবশ্য তিনি মামলা পরিচালনার ভার তাঁহার উকিলের উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

——

সুন্দরী সিল্‌ভিয়া সিড্‌নীর প্রত্যেকটি অংশই একটু অভিনব ধরণের।—এটি সিড্‌নী-প্রিয় দর্শকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে আস্‌চেন। প্যারামাউন্ট্‌ পিক্‌চারস্‌ এর "বিহোল্ড মাই ওয়াইফ্‌" চিত্রখানি দেখে বেশ সুখ আছে। প্রেমিক জিন্‌ রেমণ্ড্‌—সাদা চুল—খুব ভালো অভিনেতা, এখানেও অভিনয় করেছেন অপূর্ব্ব। জিন্‌ আর সিল্‌ভিয়া—আদর্শ প্রেমিক আর প্রিয়া—সে বিষয়ে আমাদের আর সন্দেহ নেই।

নাট্য-তরঙ্গ

শ্রীনটশেখর

গত ৫ই এপ্রিল, শুক্রবার সন্ধ্যায় 'এস্প্ল্যানেড্ ইন্‌ষ্টিটিউট্'-এর সভ্যবৃন্দ মহামান্য ভারত সম্রাট বাহাদুরের 'রজত-জয়ন্তী' উৎসব উপলক্ষে 'নাট্যনিকেতন' রঙ্গমঞ্চে এক বিশেষ অভিনয়ের আয়োজন ক'রেছিলেন। প্রথম যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গেই উৎসব উপলক্ষে বিশেষভাবে রচিত একখানি ইংরাজী সঙ্গীত ও একখানি বৈঠকী উর্দ্দু গান গীত হয়। তা'র পর আরম্ভ হয় অভিনয়। অভিনয় হ'বার কথা দু'খানি নাটকের—স্বর্গত ডি, এল, রায়ের সুপ্রসিদ্ধ নাটক "সাজাহান" ও তৎসহ একখানি রঙ্গচিত্র "রূপকথা"।

ডি, এল্, রায়ের "সাজাহান" বহু অভিনীত নাটক। কতবার কত প্রসিদ্ধ নট এই নাটকখানির বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে সুনাম ও দুর্ণাম দুই-ই অর্জ্জন ক'রেছেন। এই কিছুদিন আগেও খ্যাতনামা নট শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই নাট্যনিকেতন রঙ্গপীঠেই এই নাটকটির কয়েকটি ভূমিকা একেবারে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন। এ অবস্থায় এস্প্ল্যানেড্ ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ "সাজাহানের" মত একখানি নাটকের অভিনয়ের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবেন শুনে প্রথমটা বড় আশ্বস্ত হ'তে পারি নি। এঁদের এ প্রচেষ্টা দুঃসাহস ব'লেই মনে হ'য়েছিল। কিন্তু প্রথম দৃশ্যে সাজাহানের দর্শন মিল্‌বার পর থেকেই মনে হ'ল আমাদের এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। সাজাহানের রূপসজ্জা হ'য়েছিল অপূর্ব্ব। অভিনয়ের প্রথম অংশে সাজাহানের কণ্ঠস্বর অল্প একটু মৃদু শোনাচ্ছিল ব'লে কেউ কেউ অনুযোগ করছিলেন; কিন্তু দুই একটি দৃশ্যের পর হ'তেই তাঁর অভিনয় অনবদ্য রূপ ধারণ ক'রেছিল। জীর্ণ, শীর্ণ, স্থবির, পঙ্গু সাজাহান, লোকান্তরিতা প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর ধ্যান-বিভোর আদর্শ-প্রেমিক সাজাহান, পুত্রবাৎসল্যে বিগলিত-প্রাণ সাজাহান, হৃত-শক্তি চ্যুতসর্ব্বস্ব পূর্ব্ব গৌরবের ছায়ামাত্র-সার সম্রাট্ (!) সাজাহান, পুত্রগণের অত্যাচারে-নির্য্যাতনে ভগ্নহৃদয় সাজাহান, দারুণ বিধি-বিড়ম্বনায়, শোকে, ক্ষোভে ও নিস্ফল রোষে ক্ষিপ্তপ্রায় সাজাহান—সাজাহান চরিত্রের এই বিচিত্র বিকাশ আশুবাবুর অভিনয়ে নিখুঁৎ ভাবেই ফুটে উঠেছিল। অথচ তাঁ'র অভিনয়ের ধারা ছিল সম্পূর্ণ মৌলিক। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের কোন নামজাদা অভিনেতারই তিনি অনুকরণ করতে যান নি,—এইটেই তাঁ'র সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের নিদর্শন। আর এইজন্যে আমরা তাঁকে আমাদের আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আশুবাবুর সাজাহানের পরই নাম করতে হয় বিরাজবাবুর 'দিলদার' ও গোপীনাথ বাবুর 'জাহানারা' ভূমিকার অভিনয়। বিরাজবাবু বেশ স্বচ্ছ, সরল, সাবলীল অভিনয় ক'রে দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ ক'রেছিলেন। দিল্‌দারের ভূমিকার উপযোগী কণ্ঠস্বর তাঁ'র আছে। তাই এই ভূমিকায় অভিনয়ে কোথাও

কৃত্রিমতার ছাপ পড়ে নি। জাহানারার ভূমিকার গাম্ভীর্য্য ও দীপ্তি বরাবর বেশ সমান ভাবেই বজায় ছিল দেখে আমরা বেশ আনন্দিত হ'য়েছি। এ ছাড়া 'যশোবন্ত সিংহে'র ভূমিকায় নুটুবাবু অতি উজ্জ্বল অভিনয় ক'রেছেন। এই সামান্য বৈচিত্র্য-হীন ভূমিকাটির অভিনয়ে তিনি যেরূপ সাফল্য দেখিয়েছেন, তা'তে আমাদের মনে হয় ভবিষ্যতে একে দিয়ে বীর নায়কের ভূমিকা বেশ প্রশংসার সহিত অভিনয় করান যেতে পারবে। ভবিষ্যতে ইনি আমাদের আরও প্রচুর রস পরিবেশন করবেন এ আশায় আমরা উদগ্রীব হ'য়ে রইলুম।

এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারা যায় না। সেটি "পিয়ারা"র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের অভিনয়। গায়ক হিসাবে কৃষ্ণবাবুর নাম পাঠকমহলে খুবই সুপরিচিত। এদিন তিনিই সমস্ত গানের সুর দিয়েছিলেন। আর পিয়ারার গান ক'খানি নিজেই গেয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর সুরগুলি খুবই সুন্দর হ'য়েছিল—গাইবার দিক থেকেও কোন রকম খুঁৎ ছিল না। কিন্তু তবু একটিও গান নাটকের মূলগত ভাবের সঙ্গে খাপ খায় নি—এইটেই হ'য়েছিল তাঁর সবচেয়ে বড় দোষ। মৌলিকতার মোহে প'ড়ে তিনি থিয়েটারের গানে বৈঠকী সুর দিয়েছিলেন, যার ফলে সেদিনকার অভিনয়ে কয়েকটি দৃশ্যে অনেকটা যাত্রা ও জলসার মিলিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'য়েছিল। সাজাহানের গানের সুর বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধ-বণিতার পরিচিত। সেই সব চির পুরাতন সুর বদলে বৈঠকী সুর দিতে যাওয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়—আমাদের একথা কয়টি কৃষ্ণবাবু যেন ভবিষ্যতে মনে রাখেন। অবশ্য গানের টেক্‌নিকের দিক্ থেকে তাঁর যে কোন ত্রুটিই হয় নি—এ কথা আমরা পূর্ব্বেই স্বীকার ক'রেছি। কিন্তু থিয়েটারী গান ও বৈঠকী গান যে দু'টা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ—এই কথাটী স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই এত কথা বল্‌তে হ'ল। যখন তিনি মুখে গাইছিলেন—"পরাব বলিয়া গলাতে তোমার মালাটি আমার গেঁথেছি,"—তখন ভাবভঙ্গীতে সে ব্যাপারটা না দেখিয়ে তিনি উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে তাল লয়ের কসরৎ করছিলেন। রঙ্গমঞ্চে এ জিনিষ চলে না। কোন আসরে তিনি তাঁ'র এ সুরের মৌলিকতা দেখালে আমরা শতমুখে তাঁ'র প্রশংসা করতুম। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে এ ওস্তাদী কায়দা আমাদের ব্যথিত ক'রেছে। কৃষ্ণ বাবুর শক্তির উপর আমাদের বিশেষ আস্থা আছে। ভবিষ্যতে মঞ্চাভিনয়ে তিনি যেন তাঁ'র ঢং বদলে ফেলেন—এই আমাদের অনুরোধ। তাঁ'র অভিনয়ও বেশ আশানুরূপ সুন্দর হয় নি। কারণ, তাঁর স্বভাবসুলভ অতি-অভিনয়ের চেষ্টা। তাঁ'র অভিনয়ের ভঙ্গীতে মেয়েলি ঢঙের চেয়ে পুরুষালি ভাবের আধিক্যই আমাদের চক্ষুকে বিশেষ পীড়া দিচ্ছিল।

* * *

আওরঙ্গজীবের ভূমিকা আশানুরূপ সুষ্ঠুভাবে অভিনীত না হ'লেও চরিত্রের গাম্ভীর্য্য কোথাও নষ্ট হয় নি। অবশিষ্ট ভূমিকার অভিনয় চলনসই। মোটের উপর অভিনয় বেশ সাফল্যমণ্ডিতই হ'য়ে উঠেছিল।

* * *

যখন সাজাহানের অভিনয় শেষ হ'ল, তখন রাত্রি একটারও বেশী। কিন্তু সাজাহানের চেয়েও সেদিনের বেশী আকর্ষণ ছিল—রঙ্গচিত্র "রূপকথা"। এখানির অভিনয় দেখবার জন্যে অধীর আগ্রহে আমরা যবনিকা অপসরণের প্রতীক্ষা করছিলাম। যবনিকা উঠ্‌ল বটে; কিন্তু হায়! "রূপকথার" অভিনয় আর হ'ল না। ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র বসু মহাশয় সজ্জিত অভিনেতৃবৃন্দের মুখপাত্র হিসাবে রঙ্গপীঠের সামনে এগিয়ে এসে যা' বল্‌লেন তা'র ভাবার্থ হ'চ্ছে এই—

মাননীয়া মহিলাবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

আমরা আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্যে "সাজাহান" ও "রূপকথা" অভিনয়ের আয়োজন করেছিলুম। কিন্তু সন্ধ্যা থেকে নাট্যনিকেতনের কর্ত্তৃপক্ষবৃন্দ এরূপ ভাবে নানাবিধ বাধা প্রদানে আমাদিগকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলেছেন যে, অতঃপর এই রঙ্গমঞ্চে
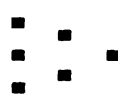
অ'র অভিনয় করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। "রূপকথা" অভিনয়ের জন্যে আমরা সাজসজ্জা শেষ করেছি, কিন্তু বর্ত্তমানে stage থেকে shifter, manager ও অন্য অন্য সকল কর্ম্মচারীই চ'লে গেছেন। অনেক অনুরোধ উপরোধ ও বকশিষের লোভ দেখান সত্ত্বেও তাঁ'রা কেহই আর কাজ কর্ত্তে স্বীকৃত ন'ন। কাজে কাজেই বাধ্য হ'য়ে আমাদের 'রূপকথা'র অভিনয় বন্ধ কর্ত্তে হ'চ্ছে। ত্রুটী আমাদের হ'ল বটে, কিন্তু এ ত্রুটী আমাদের অনিচ্ছাকৃত। আশা করি, তা'র জন্যে আপনারা নিজগুণে আমাদের মার্জ্জনা করবেন।"

* * *

রূপসজ্জা শেষ ক'রে "রূপকথার" অভিনেতৃবৃন্দ সকলেই যতীশবাবুর পিছনে রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁ'দের রূপসজ্জা দেখে মনে হ'য়েছিল যে, রঙ্গচিত্রখানি খুবই মনোরম হ'বে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে নাট্যনিকেতনের কর্ত্তৃপক্ষগণের দুর্ব্যবহারে আমরা সে রাত্রির জন্য এ রসাস্বাদ থেকে বঞ্চিত হ'লুম (কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবহারের নমুনা অবশ্য পূর্ব্ব হতেই দৃশ্যপটাদির জঘন্যতা দেখেই অনেকটা আঁচ করা গিয়েছিল।) বাঙলার অধিকাংশ রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের ব্যবহার সম্বন্ধে এ দুর্নাম চিরদিনই আছে। অনেক এমেচার পার্টিই এ বিষয়ে ভুক্তভোগী; তবে 'কিল খেয়ে কিল চুরী করেন' মাত্র। কিন্তু এস্প্লানেড ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ মিলিটারী একাউণ্ট বিভাগে কাজ করেন। কাজেই বীরত্বের ছোঁয়াচ লেগে তাঁ'রাও একটু মিলিটারী মেজাজের হ'য়ে উঠেছেন। তাঁ'রা যে প্রকাশ্য সভাস্থলে "ঢাক ঢাক গুড় গুড়" না ক'রে 'রঙ্গালয়ের গুপ্তকথা' প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন—এতে আমরা খুব খুসীই হ'য়েছি। সেদিন গিরিশস্মৃতিবাসরে এই নাট্যনিকেতন রঙ্গমঞ্চ হ'তেই মুক্তকণ্ঠে বিঘোষিত হ'য়েছিল যে, রঙ্গালয় লোকশিক্ষার একটা প্রধান স্থান। অন্য শিক্ষার কথা দূরে থাকুক, ভদ্রলোকের সহিত ব্যবহারের যে আদর্শ এই রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সেদিন শিক্ষা দিলেন, বাঙ্‌লাদেশের লোকদের তা' অনেকদিন হাড়ে হাড়ে মনে থাকবে।

হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গার কৃতিত্বের জন্য আমরা ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুরোধ কচ্ছি, যেন তাঁ'রা অচিরে অন্য কোন স্থানে কেবল 'রূপকথা' খানির অভিনয়ের আয়োজন ক'রে সে রাত্রির নিরাশ দর্শকচিত্তকে পুনরায় সরস ক'রে তোলেন।

বিপত্তি

—নক্সা—

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

পেশোয়ারে—

ট্রেণ তখন ছাড়ে ছাড়ে—

একজন আধবয়েসী বাঙালী ব্যস্ত স্মস্ত হয়ে আমাদের কামরায় এসে ঢুকলেন। চোখে মুখে একটা অনাগত লাঞ্ছনার আশঙ্কা ফুটে উঠচে। গাড়ীতে উঠে এমন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন যেন মনে হল, এইমাত্র সাক্ষাৎ যমরাজার সঙ্গে হাতাহাতি করে তার এলাকার বাইয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন!

অমল তাকে জিজ্ঞাসা করলে—

কি হয়েছে মশাই?

ভদ্রলোকটি চমকে উঠলেন। এতদূর প্রবাসে যা' তিনি আশা করেন নি, বোধহয় তাই দেখে।...'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব'এর কাচ্চা-বাচ্চারাও যে এতদূর পায়তাড়া কসতে পারে, এ হয়তো এর আগে তাঁর কল্পনায়ও ছিলো না। প্রভুত্বব্যঞ্জক জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি শুধু বললেন—

কিচ্ছুই না ভাই, আর একটু হলেই ট্রেণ ফেল করতাম! উঃ! কি বাঁচাই না বাঁচলাম!...তারপর, তোমরা কোথায় যাবে?

সনৎ গম্ভীর হয়ে বললে—

কাম্‌স্‌কাটকা।

কামস্‌কাটকা?...দিল্লীতে নাবতে হয় না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, দিল্লী থেকে 'বম্বে-করাচী এক্সপ্রেসে' চড়ে' দ্বারভাঙ্গা জংসনে নেবে কাম্‌স্‌কাটকায় যেতে হয়!

ভদ্রলোকটা যেন কেমন হয়ে গেলেন। বুঝলাম, দোটানায় পড়ে' কথাটা বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিছুই করতে পারলেন না। তাঁকে সামলাবার জন্যে আমি বললাম—

আপনার নিবাস?

সের খাঁ, সের খাঁ, আরে ইধার আওনা ভাই, এই গাড়ীতে এক সাথমে চলো।... আচ্ছা, শুনতে পেলো না, যাই আমিই ওর কাছে, বড্ডো ভালোমানুষ ও, বুঝলে ভাই...

বলে তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেবে আরো পেছনের একটা কামরার দিকে দৌড়লেন।

সনৎ বললে—

কোনো বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীর চাকর-বাকর বা গোমস্তা-টোমস্তা হবে; হয়তো বাছাধন কিছু নিয়ে সটকাচ্ছেন, জ্যাঠার কাছে এসেছেন জ্যাঠামো করতে?... এদিকে পেটে তো ক' অক্ষর গো-মাংস!.. বেটাকে ঘোল খাওয়াতে হয়!...

অমল গম্ভীর হয়ে বললে—

স্থাখ সনৎ, তোর সব তাতেই পাকামো; হয়তো ভদ্রলোকটা নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছেন! কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, সব যায়গায় যাস্ ইয়ারকি করতে!...তুই জানিস কোন কথা? তবে যা' তা' একটা মতামত বার করিস কেন?

—তুই বা কি জানিস? ও যে চোর নয় তার প্রমাণ? ভদ্রলোক!...তাড়াতাড়ি সরে' পড়লো 'সের খাঁ'র দোহাই দিয়ে!... 'বম্বে-করাচী এক্সপ্রেস' দ্বারভাঙ্গায় যায়, না কোনো কালে যাবে? আজকালকার দিনে পাঁচ ছ' বছরের মেয়েরা যা' জানে, তোমার ঐ ভদ্রলোকটি তা-ও জানে না।...বুঝলে হে ভদ্রলোক!...

বলে সনৎ নিজের বুড়ো আঙ্গুলটা ঘোরাতে লাগল।

অমল চটে গেল। বললে—

তোর সাথে কথা বলতেও আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। নিজের অন্তরঙ্গ পরিচিত লোককে দেখে কে বাপু অপবিচিতদের মধ্যে থাকে? বেচারী বাঙ্গালী কি না, তাই এত আস্কারা, না?...

—ছত্তোরি তোর সের খাঁ।...সের খাঁ শুধু পেশোয়ার পর্য্যন্ত রাস্তা তৈরী করে গেছেন, কোনোদিন আসেন নি।...বলেই সনৎ গাড়ীর কবাট খুলে নেবে পড়তে পড়তে আবার বললে—

যাচ্ছি তোমার সের খাঁর অন্তরঙ্গের সাথে মুলাকাৎ করে আসি।...

গাড়ী তখন সবে ছেড়েচে। গাড়ী থেকে নেবে সনৎ দাঁড়িয়ে রইল। কিছু পরেই সে চলন্ত ট্রেণের শেষের কামরায় উঠে পড়ল। জানালা থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে অমলকে বললাম—

কেন ঐ পাগলাকে ক্ষেপালি ?

ছাখ, এই জন্যেই বাঙ্গালীদের উন্নতি হয় না। এই কাবুলিওয়ালাদের দেশে একজন বাঙ্গালী স্বজাতি পেলাম। হোক সে চোর বা অন্য কিছু (ভগবান যেন না করেন) কিন্তু আমাদের উচিত কি ওর সাথে অমন ভাবে কথাবার্ত্তা বলা ?···

আমি আর কিছু বললাম না। কেন না অমলের বক্তৃতা একবার সুরু হ'লে আর থামতে চায় না।...তারপর থেকে অমল আর কোন কথা বললে না।···জিজ্ঞাসা করাতে 'হ্যাঁ,' 'না,' উত্তর পাওয়ায় আমিও চুপ করলাম।...

পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই কামরা ছেড়ে চললাম সনতের কাছে।

শেষের কামরা—

থার্ডক্লাস—

একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক প্রবল বেগে থু-থু ফেলতে ফেলতে চীৎকার করে গালাগালি দিচ্ছেন, একজন কাবুলিওয়ালা তার লাঠি গাছটা হেলিয়ে সামনে ধরে বলছে—

রুপি, রুপি লাও—

আর সনৎ তার পাশে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিল বাঙ্গালী ভদ্রলোকের তর্জ্জন-গর্জ্জন !...

এই উল্লুক ! টাকা নিয়ে পালান হচ্ছে ? সে গুড়ে বালি দিচ্ছি, দাঁড়াও। পরের ষ্টেশনেই তোকে পুলিশে ধরিয়ে দেবো। এই ক'দিন কোথায় পালিয়েছিলি বল তো ? পাঁচ-পাঁচশো টাকা নিয়ে চল্‌তা দিচ্ছ অথচ জেলের ভয় কর না ?···বাঙ্গালীর মুখে কালি মাখাচ্ছ !··· এই—আমির খাঁ, তোমরা রুপি সব এই উল্লুককা কান পাকড় করকে লে লেও...

বলেই মাড়োয়ারীটা বাঙ্গালীর কান ধ'রে নিজের পায়ের থেকে জুতো বার করে দিলেন কয়েক ঘা বসিয়ে।

জুতো খেয়ে লোকটা পড়ে গিয়েছিলো। উঠবার চেষ্টা করতে গেল, কিন্তু নিষ্ফল হয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে বললে—

ভগবান !...

ভগবান !···ভগবান কি তোর শালা'রে বেটা,—যে বোনাইর—আঃ মোলো যা—ঢং দেখো না আবার !...বমি করা হচ্ছে !... দিচ্ছি তোর সব ঢং বার করে—

এই বলে আবার লোকটার ঘাড় ধরে' যেমনি এক ঘা মারতে যাবে অমনি পেছন থেকে 'খবরদার' বলে' বিরাশী শিক্কা ওজনের এক চড় ! পেছন ফিরে দেখি—অমল ! কখন যে আমার পেছনে পেছনে এসেছে তা' জানতেই পারি নি'। তার সে রুদ্র মূর্ত্তির দিকে চেয়ে থমকে রইলাম !···অমল একবার তাচ্ছিল্য ভরে সনতের দিকে চাইলো, তার পর বাঘের মতো চেয়ে সেই ভদ্রলোকটাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে—

চুপ করে দাঁড়ান।

তারপর মেঝের উপর নেতিয়ে-পড়া লোকটার মাথাটা কোলের ওপর রেখে আমায় বললে—

অজিত, ও গাড়ী থেকে আমার দুধটুকু নিয়ে এসো তো !···

তাড়াতাড়ি নামতে যেয়ে দেখি, ট্রেণ চলতে আরম্ভ করছে। তখন একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক নিজের কুঁজো থেকে জল দিলেন; সে তাই একটু একটু করে খাইয়ে লোকটার চেতনা ফিরিয়ে আনলে।···অমল বললে—

তোমার নাম কি?

সে একবার চোখ বুঁজে বললে—

শিবচন্দ্র মাইতি।

একে চেনো?

জিজ্ঞাসা করায় ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল—একটু ইতস্ততঃ করে—

চিনি।

তারপর অনেক কষ্টে তার ভয় ভাঙ্গিয়ে যা জানতে পারা গেল, তার সারাংশ—

ভদ্রলোকের নাম লছমন্ সিং; স্থানীয় ব্যবসায়ী। পনের বছর আগে কবে তিনি বাংলা মুলুকে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে কত লাভ দেখিয়ে তিনি শিবু মাইতিকে নিয়ে আসেন নিজের ফলের দোকানে বসাবার জন্যে।···

বেচারী এখানে আসবার পর থেকে কোনদিন তার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পায় নি। ছোট ভাই মরণাপন্ন, তা খবর পেয়ে লছমন্ সিং এর পায়ে পড়ে' কিছু দেবার জন্যে অনেক কাঁদাকাটি করে, কিন্তু লছমন্ সিং কিছুই দেন নি; তখন বেচারী আমির খাঁ কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়ে বাড়ীতে পাঠায়। সেই থেকে শিবু আরও খারাপ ব্যবহার পেতে লাগলো। কবে একদিন সের খাঁ কর্ম্মক্লান্ত হয়ে তার দোকানে দাঁড়ায়। শিবুর কাছে সে কয়েকটা ফল চায়, অবশ্য দাম পরে দেবার কড়ারে!··· এমনি দুইটি ভিন্ন জাতীয় পুরুষের মন পরস্পর পরস্পরের নিকটস্থ হয়েছিল। কয়েকদিন আগে সের খাঁর কি কাজে যেন কয়েকটা টাকা দরকার হয়েছিল, সে শিবুকে জানাতে শিবু তাকে টাকা কটা ধার দেয়। কিন্তু এমনই দুভাগ্য, লছমন্ সিং সেটা হাতে-নাতে ধরে ফেললেন। তারপর অকথনীয় অত্যাচার করে' বেচারীকে তাড়িয়ে দেন। শিবু এ ক'দিন কলের জল খেয়ে আর গাছের তলায় রাত কাটিয়ে আজ সের খাঁর ছোট ভাই ফরিদ খাঁর কাছ থেকে সবিস্তারে নিজের অবস্থা জানিয়ে নিজের বাড়ী যাবার মত টাকা ধার চায়। ফরিদ খাঁ কিন্তু টাকা ক'টা ধার না দিয়ে সাহায্যই করেছিল।...শিবু সেই টাকা ক'টা নিয়ে বাড়ীর উদ্দেশে গাড়ীতে চড়ে। তারপর সের খাঁ ভ্রমে একজনকে দেখে সে সেই গাড়ীতে যেয়ে এই বিপদে পড়ে। লছমন্ সিং আমির খাঁকে বলেন যে শিবু তার তহবিল থেকে পাঁচশ' টাকা চুরি করে' বাঙ্গলা দেশে মহাপ্রস্থান করছেন।···

সব শুনে অমল বললে—

লছমন্ সিং, আপনি কোর্টে যান; টাকা যদি পান, কোর্টের মারফৎই পাবেন, না পেলে এক পাইও পাবেন না।

তারপর কাবুলিওয়ালাকে সে নিজের জামার সোনার বোতাম ছড়া খুলে, আর রোল্ড গোল্ডের রিষ্ট ব্যাণ্ডটি আর তার হাতের আংটিটি দিয়ে বললে—

আমির খাঁ, এর বেশী তো আর আমার কাছে কিছুই নেই যে তোমায় দেবো। আজ এই পেয়ে সন্তুষ্ট থাকো। এতেও যদি সুদ আসলে তোমার টাকা শোধ না হয়, তা হলে ঠিকানা আমায় দাও, পরে বাকীটা তোমায় পাঠিয়ে দেবো।

লছমন্ সিং রেগে বললেন—

আমি একে পুলিশে হাণ্ড-ওভার কোরবো। এর নামে কেস্ চালাবো। তোমাদেরও আসামীর দলে ঢুকিয়ে দেবো। লোক ফুস্‌লিয়ে তহবিল ভাঙ্গিয়ে চম্পটদানের মামলা করবো।

অমল বললে—

আপনার যা' খুসি পারেন, করুন। শুধু স্মরণ রাখবেন, আমি শিবু মাইতি নয়। আমি পেশোয়ার পুলিশ কোর্টের জজ—মিঃ সুখেন্দু বোসের ছেলে অমল বসু। লাহোর ল' কলেজের একজন স্কলার। আমি শিবু মাইতির হয়ে আপনার নামে অভিযোগ আনবো—মানহানির।

গাড়ী তখন আর একটা ষ্টেশনে এসে থামলো। শিবু মাইতির হাত ধরে', আমার দিকে তাকিয়ে অমল বললে—

নামতে হলো অজিত। আমি পর গাড়ীতেই পেশোয়ার চললুম। বলেই শিবুর হাত ধরে নেমে পড়লো।

———

ছিটে ফোঁটা

শ্রীবজ্রবাহু

দূর ছাই! ভালোও লাগেনা। কাল সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটুও ঘুম হয় নি। আমার এই সাহিত্য-সাধনার নির্জ্জন কক্ষে এমন কেউ নেই যার কোলে আমার এই পরিশ্রান্ত মাথাটা এলিয়ে দিয়েও একটু শান্তি পাই! আপাততঃ নীরবে নিষ্কর্ম্মা ভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘরের এককোনে বসে সময় কাটাবার চেষ্টা করি।

ওই-ওই রাস্তা দিয়ে মহীম যাচ্ছে নয়? ডাকা যাক্। সকাল বেলাটা তা হলে বেশ ওর সঙ্গে গল্পগুজবে কাটে।

ডাক্‌লাম—মহীম-অ-মহীম—

ও আমার আহ্বান শুনতে পেয়ে রাস্তা থেকেই চীৎকার করে উঠলো হ্যালো ভট্‌চায্ আজ যে বড় সকাল সকাল ঘুম ভেঙেছে দেখ্‌ছি? তারপর আমার কাছে এসে বলে উঠলো সামান্য দু'দণ্ডের ভোগের লোভে, আয়ুকে খাটো করা, শরীরকে ব্যাধিগ্রস্ত করা, মনের ও দেহের পুষ্টিকে নষ্ট করা বোকামীর পরাকাষ্ঠা নয় কি?

আমি অবাক্ হলুম, মহীম বলে কি! বল্লুম—এ তুমি কি বলছ মহীম?

মহীম বল্লে—বন্ধু, আমি কি তোমার কথা বলছি? বল্‌ছি রাধিকা বাবুকে, শ্রীরাধিকা রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়; নামটি বেশ। কিন্তু এর গল্প সম্বন্ধে আলোচনা করলে আমার আজ আর "উদয়ন" অফিসে যাওয়া হবে না। লেখক তাঁর গল্পের নায়িকা যামিনীকে যে কোথায় কোন্ রাজ্যে ঠেলে দিলেন তা বুঝতে পারি নি। সে হারালো-না ডুবলো, কি গাড়ী চাপা পড়লো কিছুই বুঝতে পারা গেল না। এধারে নায়ক ঝোটনের জন্যে আমার মায়া হচ্ছে। এ অবস্থায় কি করা যায় তুমিই বলো।

মহীমকে বসতে বল্লুম। চাকরটাকে হুকুম করলুম দু'কাপ চা নিয়ে আসতে। এক টিপ নস্যি নিয়ে হাসতে হাসতে মহীমকে জিজ্ঞাসা করলুম- -গল্পটির নাম কি হে?—

মহীম উত্তর দিলে—"বেদিয়া-ছন্দ।"

আমি বল্লুম—ঠিক হয়েছে। লেখক নায়িকাকে যে পথ দিয়ে নিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন তা আর হয়ে উঠ্‌লোনা; হঠাৎ তার মন গেল বিগড়ে। বেদিয়া মেয়ে

আই লেখকের কল্পিত পথ দিয়ে চল্‌লোনা। বেদিয়া ছন্দে তাই পালাতে বাধ্য হল, বোধ হয় ফাঁকি দিয়েই পালিয়েছে নয়?

মহীম বেশ একটু হেসে নিয়ে বল্লে—সকাল বেলা বেশ একটা মুখরোচক আলোচনা দাদা। তবে বলা যাক্। এই নাও চৈত্রের "উদয়ন।" গল্পটি বার করে পড়ে ফেল।

চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে আরম্ভ করলুম। প্রথমেই লেখা—"জীবনের আচমকা আরম্ভ।" সন্দেহ মিটে গেল তাই মহীমকে বল্লুম—জীবনের তাই আচমকা শেষ হয়েছে এবং লেখকেরও আচমকা গল্প লেখবার সখ হয়েছে। লেখক ঠিক তার পরেই লিখেছেন :—

"পদ্মার তীরে তীরে, খালের মুখে মুখে, ভাসমান নৌকার বুকে। পদ্মার বুকের উপর দিয়া উড়িয়া চলা পাখীর ঝাঁকের মধ্যেই সে যেন একটি বিরাট শূন্যে সৃষ্টি-ছাড়ার দলে ছন্দহারা সঙ্গিনী। জীবন তখন তরল, জলের মতোই স্বচ্ছ সরল, কিশোরী-কিশোরের চপল খেলায় উদাসিনী, শিঞ্জিনী বাজার কৌতূহলেই শুধু বাজিয়া চলে।"

মহীমকে বল্লাম—ভাই আমার ধৈর্য্য থাকছেনা; বরং চলো একটু বেড়িয়ে আসা যাক্। মহীম বল্লে—একটু মন দিয়ে পড়ই না ছাই।…তবে মাঝখান থেকে পড়।

পাতা ওল্টাতেই নজর পড়লো—"এক ঝাঁক পানকৌড়ি। টুপ্‌টাপ্ ডুব দেয়, ওঠে, হাসে, আবার ডুব। জলে সে কি আলোড়ন! ……যামিনী তাড়া করে। ঝোটন টুপ্ করিয়া ডুব দেয়, কিন্তু নড়েনা। যামিনী হাতের কাছে পাইয়াও তাহাকে ছোঁয়না। পরকা, কুর্ণা দূরে দূরে থাকে (বেচারি পরকা, কুর্ণা—নিতান্তই দুর্ভাগ্য তাদের)… খেলায় তাল কাটা যায়, আর সেখানেই সে দিনের মতো শেষ হয়।"—(লেখকের তাল কাটা যায়নি তো?)

তারপর শুনুন :—

"যামিনী কিছুতেই যখন ওঠে না তখন বলে—না উঠলে চোখে ফের আঙ্গুল দিয়ে দেব! (সর্ব্বনাশ—কাণা হয়ে যাবে যে—কি উৎকট প্রেম!)

যামিনী ভাবে, জলতলে আর বনতলে অনেক তফাৎ। বলে—কই, দিয়ে দ্যাখ দেখি?

ঝোটন মাটিতে একটা জানু রাখিয়া নত হইয়া দু'হাত দিয়া যামিনীর মুখটা তুলিয়া ধরিয়া ত্রস্তে (বেশ ভাই) তাহার ঠোঁটের উপর নিজের কম্পিত (?) ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়।

—কেমন, হলো তো?—

যামিনী বলে—না—(ওরে বাস্)

ঝোটন এবার তাহার দুই ঠোঁটের পাতা দিয়া যামিনীর নিচেকার ঠোঁটের পুরু পাতাটা চাপিয়া ধরিয়া নিবিড়ভাবে নিপীড়ন করিতে থাকে। যামিনী পুলক-ব্যথায় কাঁপিতে কাঁপিতে ঝোটনের মাথাটা দু'বাহুর বেষ্টনে বৃথাই চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে প্রয়াস পায় (গুড়িয়ে ফেল্‌বে নাকি!) খেলাচ্ছলে আজ যে কথার সে প্রথম আভাস পাইয়াছে, তাহার সমগ্ররূপ সে যেন চায় ঝোটনের ওষ্ঠের স্পর্শে চিনিয়া লইতে।

…বনের পাখীটা উচ্চকিত হইয়া ডাকিয়া ওঠে। (তারও মনে বিরহের বান্ ডেকেছে—যে দৃশ্য দেখছে!) সাঁঝের আঁধার ঘনাইয়া আসে। বনপথ ছাড়াইয়া আসিয়া ঝোটন বলে—দেখি তোর মুখ যামিনী। (আশা তবুও মেটেনি) যামিনী বলে—বাঃ। (অনুরাগ!)

—বাঃ না, কেশর যদি বুঝতে পারে, তবেই—মুখ টিপিয়া হাসে (কর্ত্তা কোথায়?)

—ব'য়েই গেল! যামিনী কিন্তু মহা ভাবনায় পড়ে। ঝোটনের অলক্ষ্যে জিব দিয়া চাটিয়া চাটিয়া ঠোঁটের দাগটা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। মুখ তাহার আরও লাল হইয়া ওঠে। (তাতো হবেই—ঠোঁটের কোণে রক্ত যেন ঝল্‌কিয়ে উঠছে)।

"যামিনীর যৌবন সহসা জীবন পায়।"

মহীমকে তাই জিজ্ঞাসা করলুম—এহেন সময়ে যদি মিলনের সমাপ্তি হয় তবে? মহীম বল্লে—লেখকের ভাষায় বল্‌তে হলে, অতৃপ্তির প্রাণ-পোড়ানী—হা-হুতাশ। তবে তাই হয়েছে। লেখক সর্ব্বশেষে লিখ্‌ছেন :—

"সে (ঝোটন) যদি চীৎকার করিয়া বলিতে পারিত—যামিনী ফিরে আয়, ফিরে আয়, আর কখনও তোকে ফেরাবোনা। তবে সে যেন বাঁচিয়া যাইত।"

যামিনীর জীবনাকাশে ধূমকেতুরূপে উদিত হয়ে তার সুখ, শান্তি, আশা, আকাঙ্খা সব এক নিমেষে ভস্মীভূত করে দিলে কে? কোন হতভাগ্য তার শান্ত মনোরম জীবন-পথে তীক্ষ্ণ কণ্টকস্বরূপ হয়ে দাঁড়ালো এক পলকের মধ্যে? ঝোটন, কুর্ণা, পরকা, কেশর না খুরশান?

মহীম বল্লে—ওদের আর দোষ কি বল? লেখক যে গল্পের নাম দিয়েছেন "বেদিয়া ছন্দ।" এর জন্যে দামী গঞ্জিকার ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত লেখকের উৎকট কল্পনা—এবং সাহিত্য রসিক "উদয়ন" সম্পাদকের উদার মহানুভবতা—এইজন্যেই তো "উদয়ন" অফিসে যাচ্ছিলাম হে!—জীবনের আচ্‌মকা আরম্ভ—আর আচ্‌মকা শেষ।

এই অদ্ভুত (?) গল্পটি আবার "আনন্দ-বাজার পত্রিকায়" দোল সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়েছে। একই গল্প একই মাসে দু'টি পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক কিন্তু স্থানে স্থানে এই নক্কারজনক কল্পনার বেগকে সুসংযত করে প্রকাশ করেছেন—উদয়ন সম্পাদক আর সেদিকে অগ্রসর হননি—কাজ কি আর অত ঝঞ্ঝাটে?—ছাপ সাহিত্য প্রচারে কাগজের কাট্‌তি হবে বেশ!—

সাহিত্য-পরিচয়

স্রোত—শ্রীভুবনমোহন মিত্র প্রণীত। প্রকাশক,—নারায়ণ সাহিত্য মন্দির। ৮নং, রাধামাধব গোস্বামী লেন, বাগবাজার। দাম—দেড় টাকা।

যে সকল ঘটনা অবলম্বন কোরে বইখানি লেখা হয়েছে, তার চুলচেরা বিচার করলে বইখানার "স্রোত" নাম দেওয়ার সার্থকতাই আমাদের প্রথম চোখে পড়ল। বইখানার গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী পরস্পরকে আঁকড়ে না ধরে একটানা স্রোতের মতই বয়ে গিয়েছে। সমগ্র বইখানার এমন একটা সাবলীল সতেজ অথচ কোমল অনুভূতি রয়েছে যার জন্য লেখনীকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না।

ধনীর দুলাল কমল আর নিঃস্ব দরিদ্র নীলাদ্রি। উভয়ের মধ্যে যে ভালবাসা গড়ে উঠেছিল তাতে কোন ফাঁক না থাকায় কমল তার বিপুল জমিদারীর ভার নীলাদ্রির হাতেই তুলে দেয়। ঝর্ণা কমলের দূরসম্পর্কীয়া বিধবা বোন। কমলের বাড়ীতে নীলাদ্রি জীবনে নূতন করে ঝর্ণাকে দেখ্‌ল। ইহার পূর্ব্বে কোন নারীকে সে এমন করে কোন-দিনই দেখেনি। ঝর্ণারও তাই। কিন্তু মাঝখানে আসে শ্যামলী। নীলাদ্রি থতমত খেয়ে ফিরে যায়। কিন্তু ঝর্ণা হেসে বলে—"ও যে শ্যমলী।" তারপর ঘটনার স্রোতে আমাদের টেনে নিয়ে যায় কমলের উর্ম্মিলার সাথে ও নীলাদ্রির শ্যামলীর সাথে বিয়ের মাঝখানে। কমল ও উর্ম্মিলা সুখী কিন্তু শ্যামলী কিছুতেই ভুলতে পারে না তার স্বামী একদিন ঝর্ণাকেও ভালবেসেছিল। তাই যাবার সময় ঝর্ণা বলে "শ্যামলা, ভুলে যাস্‌নি রক্ত মাংসে গড়া মানুষের দোষগুণ দুটোর কোনটাকেই কোনকালে অস্বীকার করা যাবে না—" ঝর্ণা যেন পাষাণে গড়া প্রতিমা, যেন নিষ্ঠুর বিধাতার সৃষ্ট একটা পরিহাস।

কিন্তু নীলাদ্রির মনের শান্তি ঘুচে গেছে। তার অত সাধের চিত্রাঙ্কনেও তার উৎসাহ নেই। তারপর একদিন শ্যামলীর কাছে নিষ্ঠুর আঘাত পেয়ে ও বেরিয়ে গেল কোন এক অজানা দেশে। কেউ তার কোন সন্ধান পেল না, কমলও নয়।

নীলাদ্রির ঝর্ণা গেছে, শ্যামলী ছেড়েছে কিন্তু ওর জীবনে আবির্ভাব হল রাত্রির। তারপর স্রোতের মতই ঘটনা বয়ে চলেছে। রাত্রি চলে যায়। শ্যামলীর শয্যা প্রান্তে বসে নীলাদ্রি বলে, "শ্যামলী" আমাদের ভালবাসার এমন একটা সুখের নীড় রচনা

ব্যথার দান

শ্রীরাধেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভালবেসে সখি ! যে বেদনা পাই,
তাহাতে নাহিক' দুঃখ ;
যত ব্যথা পাই তত গান গাই,
আবেগে ভরে যে বুক !

তোমার হাতের জ্বালানো আগুনে,
পথ চলি আমি বর্ষা, ফাগুনে ;—
শিশির শরতে, বসন্তে শীতে,
তোমারি রাগিনী শুনি চারিভিতে,
স্বপনেতে হয়ে মুক !
বেদনা যা পাই, বেদনার সাথে,
পাই যে দরদী বুক !

দুঃখ্ নহে সখি ! তোমার সে দান
সুখের অতীত মোর ;
সারাটি জীবন, ব্যথার এ গান
স্বপনে ক'রেছে ভোর !

পথ চেয়ে থাকি মরণের তরে,
বিশ্ব-জীবন আমারে যে বরে।
শুধু ভালবেসে, আমি যাহা পাই,
এতটুক তা'র কভু দিই নাই,
ঝড়ে তাই আঁখি লোড় !
না পেয়ে তোমারে, পেয়েছি যেটুক,
সে পাওয়া অসীম মোর।

——:o:——

করবো..." রাত্রিও শ্যামলার দিকে আগাইয়া আসে, ক্ষীণ হাসি হাসিয়া শ্যামলা বলে,—কি করে পরিচয় দেবে এই ভাবছো? তুমি আমার বোন, এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কি থাকতে পারে ভাই, ওরে র্না—...কিন্তু তখন সব শেষ।

বইখানার ছাপা ও প্রচ্ছদপট ভালই কিন্তু দাম অনুপাতে বাঁধাই নিকৃষ্ট হয়েছে।

——

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

মনোরম সাধুখাঁ

মার্লিন ডিট্রিশ

'দি ডেভিল ইস্ এ ওম্যান্'

প্রথমে ছিলো 'ক্যাপ্রিস্ এস্প্যাগ্নল,' তারপর হ'লো 'কার্ণিভাল ইন্ স্পেন্,' শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হ'লো 'দি ডেভিল ইস্ এ ওম্যান'। মার্লিন ডিট্রিশ্-এর নতুন ছবির নাম। এ ছবিতে মার্লিনের অনেক ইতিহাস আছে। প্রথমতঃ তার বিখ্যাত পরিচালক জোসেফ্ ভন্ ষ্টার্ণবার্গ্-এর এটা শেষ ছবি। অবিশ্যি, মার্লিনকে নিয়ে। তার পরের ছবি পরিচালনা করবে—আর্ণষ্ট লুবিশ। যাঁরা এসব বিষয়ে খোঁজ রাখেন—তাঁরা হয়তো জানেন এ' ছবিতে মার্লিনের সঙ্গে প্রেম করবার কথা ছিলো—জোয়েল্ ম্যাক্রিয়ার। কিন্তু জোসেফ্ ভন্-এর সঙ্গে তার কি গোলমাল হয়—সে বিখ্যাত অভিনেত্রীটির সঙ্গে অর্দ্ধেক-প্রেম করে চলে' যায়। নতুন করে' আবার আরম্ভ হয়—নতুন এক প্রেমিক নিয়ে, যার নাম আমাদের কাছে নতুন—সিজার রোমিরো। মিঃ রোমিরোর সঙ্গে আপনাদের আজ আলাপ করিয়ে দেবার আগে মার্লিন-এর সম্বন্ধে আমি কিছু বল্তে ইচ্ছা করি।

এ পর্য্যন্ত এক রুবেন্ ম্যামুলিয়েন্ ছাড়া সব ছবিই তার পরিচালনা করে' এসেছে ভন্ ষ্টার্ণবার্গ্। ছায়াছবির রাজ্যে মার্লিনের আজ যে এতো সুনাম তার একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ ভন্। ভন্ তাকে খুঁজে বার করে, তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে করে' তোলে এতোখানি বড়ো। সে জন্য, মার্লিন্ নিজেই স্বীকার করে, ভন্-এর কাছে সে আজীবন কৃতজ্ঞ।

মেজাজ গরম ভারী

ভন্-এর মেজাজ ভীষণ রকম গরম। মার্লিনকে এতোখানি বিখ্যাত করে' সে ভাবলে তার ওপর যা ইচ্ছে করবার অধিকার একমাত্র তারই আছে। সেট্-এর ওপর রাগা-

রাগি হৈ চৈ গোলমাল করতে ভন্-এর জুড়িদার আর নেই। সে ভুলে যায় মার্লিনের আজ পৃথিবী-জোড়া এক সম্মান আছে, নাম আছে। সবার সামনে যা তা' বলে সে

মে ওয়েষ্ট

তাকে গালাগাল্ দিতো, অপমান করতো। মার্লিন থাকতো ভয়ে ভয়ে, সব সময়ে চুপচাপ করে'। 'ভয়ের চোটে খুব ভালো করে' অভিনয় আমি করতে পারিনে'—এ কথা ডিট্রিশ সেদিন নিজেই বলেছে। প্যারামাউন্ট কোম্পানী মার্লিনের এ কষ্ট বুঝলে—তারা ঠিক করলে ভনকে মার্লিনের ছবি আর পরিচালনা করতে হবে না।

ভন্ বল্‌লে 'বেশ, তবে এ ছবিটার ক্যামেরার কাজ কিন্তু আমি করবো।'

অ্যাডল্‌ফ্ জুকর, প্যারামাউন্টের প্রেসিডেন্ট্, বল্‌লে—'তথাস্তু'।

সিজার রোমিরো

ভদ্রলোকের নাম আপনারা বেশি শোনেন নি বলে' মনে করবেন না যেন ছায়ারাজ্যে জন লজ্-এর মত সে একেবারে নতুন। প্রায় বছর দেড়েকের বেশি হয়েছে আজ পর্য্যন্ত তার হলিউড্ জীবন। জাতে স্প্যানিশ্, লম্বায় ৬ ফিট ত' ইঞ্চি। ওজন চোদ্দ ষ্টোন্ ত' পাউণ্ড বা প্রায় ত' মণ বারো সের। বড়ো বড়ো বাদামী চোখ আছে, লম্বা মুখ, পাতলা গোঁফ। ফে রে'র সঙ্গে সে প্রথম প্রেম করে 'চিটিং টিচারস্'-এ। ফে'র সম্বন্ধে তাই বোধ হয় তার এতবড়ো ধারণা, বলে—'এতো ভালো মেয়ে আজ পর্য্যন্ত আমি দেখি নি। কী সুন্দর, কী গম্ভীর, কী বুদ্ধি! ফে হচ্ছে সে রকম মেয়ে সে কারো স্ত্রী হ'লে হয় অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী, স্বামীকে যে করতে পারে অত্যন্ত সুখী।'

মার্লিন তারপর

ফে'র সঙ্গে অভিনয় করবার পরই জোসেফ ভন্ তাকে ডাকে মার্লিনের প্রেমিক হ'তে। একথা শুনে আমার কী রকম ভয় যে হ'লো

মউরিন্ ও' সুলিভ্যান্

আপনারা বুঝতে পারবেন না। পৃথিবীতে এতো লোক থাকতে এখনি এতো বিখ্যাত মার্লিনের সঙ্গে প্রেম! আশ্চর্য্য—অবাক কাণ্ড। ভয়ে বুক আমার কাঁপতে লাগলো!'—

'কিন্তু, কী অদ্ভুত মেয়ে এই মালিন। জানিনে কী যাদু সে জানে, মনেও নেই সে আমাকে কী করলে বা বললে, তবে ঘণ্টা দু'য়েক পর আমার মনে হ'তে লাগলো—মালিন যেন আমার অনেক দিনের বন্ধু, তার সঙ্গে অনেক দিনের আমার গভীর আলাপ। অপূর্ব্ব, অপরূপ মেয়ে হচ্ছে এই মালিন—দামী শ্যাম্পেন্-এর মত, মাথাকে করে ঠাণ্ডা, কিন্তু বুককে গরম।'

আর কাকে লাগে ভালো

"আমি প্যাট্রিসিয়া এলিসের সঙ্গেও অভিনয় করেছি। তার সঙ্গে বেশি ভাব সবার সঙ্গে ঘরের বাইরে। টেনিস্ লন্ বা সমুদ্রের ধারে যে ফুর্ত্তিবাজ প্যাট্রিসিয়া—আবদ্ধ ঘরে সে প্যাট্রিসিয়া নয়।"

সিজার রোমিরো এখন মউরিন্ ও' সুলিভ্যান্-এর সঙ্গে আছে 'কার্ডিনাল্ রিভেলিউ'-তে। মউরিন সম্বন্ধে সে বেশি কিছু বল্‌তে পারে না, কারণ, আলাপ এখনও তত গভীর হয় নি।

যদি রোমিরোকে আপনি জিজ্ঞেস করেন 'কোন মেয়েকে সবচেয়ে আপনার বেশী ভালো লাগে?'

সে জবাব দেবে স্যালি ব্লেন'।

এ জবাব শুনে অনেকেই সন্দেহ করে লরেটা ইয়ং-এর বোনের সঙ্গে তার বিয়ের কথা ঠিক কি না! কে জানে!

ঘুম পাড়ানো

আপনারা জানেন মেট্রোতে উইলিয়াম পাওয়েল আর জিন হারলো নাবছে 'রেকলেস্'-এ। এতে জনি বলে' একটি খুব ছোট্ট খোকা সেজেছে জিন হারলোর ছেলে। পরিচালক এড্মাণ্ড্ গোল্ড্‌ইন এক জায়গায় চাইলেন—জনি হাত জোড় করে আছে। কিন্তু জনি তা কিছুতেই করবে না। কিন্তু, তার হাত-জোড় করাটা চাই-ই চাই।

ঠিক হ'লো জনিকে ঘুম পাড়াতে না পারলে এ কিছুতেই সম্ভব নয়।

পরিচালক মশাই সাউণ্ড ষ্টেজের ওপর সব আলো নিবিয়ে দিতে হুকুম করলেন। কাউকে একটু টু শব্দ করতে পর্য্যন্ত বারণ। সেট্-এর সামনে পুলিশ এসে দাঁড়ালো—কাউকে ঢুকতে দেবে না।

'রেকলেস্'-এর সমস্ত সেট্টা নিঝুম, অন্ধকার।

এরকম করে' এক মিনিট গেলো, দু' মিনিট গেলো—কুড়ি মিনিট গেলো।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। পরিচালক মশাই নিজে, উইলিয়াম পাওয়েল আর জিন হারলো।

জনিও নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছে।

জ্বালানো হ'লো আলো।

অবাক্—সবাই দেখে যার ঘুমের দরকার সে জনিই রয়েছে জেগে। সে নির্ব্বিকার, দিব্যি আরামে নিজের পা কামড়াচ্ছে।

খুচরো খবর

জর্জ্জ র‍্যাফট্-এর অসুখ করেছে। তাই সে এখন দিন রাত বিছানায়।

ক্যাথ্‌রিন হেপ্‌বার্ণ

মালিনের মেয়েকে কারা ভয় দেখিয়েছে চুরি করবে বলে। মালিনের বাড়ীতে তাই সর্ব্বদা পুলিশ-প্রহরী।

* * *

ফ্র্যান্সিস্ লিডারার সেদিন হঠাৎ রাগ করে' ক্যাথ্‌রিন হেপ্‌বার্ণকে আধ-খানা চুমো খেয়ে পালিয়েছে। আপনারা জানেন বোধ হয় তারা একসঙ্গে 'ব্রেক অফ্ হার্টস্'-এ অভিনয় করছিলো।

* * *

ইংরেজ হ'লেও স্যার গাই ষ্ট্যাণ্ডিং আমেরিকার হালচাল্ ও অভিনয় পছন্দ করেন বেশী।

* * *

মে ওয়েষ্ট তার নতুন ছবি—'হাউ অ্যাম্ আই ডুইং'-এ আর 'কাম্ আপ্' আর 'সি মি সাম টাইম্' বল্‌বে না।

* * *

কাল্ ব্রিসন্ 'অল্ দি কিংস্ হর্সেস্'-এ চব্বিশ রকম জামা পরেছে।

——

আমার কবিতা

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ রায়

তোমার তুলির মোহন পরশে
আমার কবিতাখানি,
ফুটিয়া উঠেছে ভাবে ও ভাষায়
নূতন রঙ্গেতে রাঙ্গি।
আমার বুকের গানখানি আজ
তুমিই গাহিলে সখা
তাই তব সাথে নিশীথ স্বপনে
প্রাণে প্রাণে হ'ল দেখা।
মলিন আমার বাগিচা বালাটি
তোমারই কোমল করে,
দুলে দুলে তাই নেচে ওঠে আজ
রঙ্গিন হাসিতে ভরে।
আমার বীণাতে ছিল নাকো সুর
ছিল নাকো তাহে গান,
তুমিই তাহাতে বাঁধিলে যে তার
তুমিই তুলিলে তান।
বদ্ধ প্রাণের অন্ধ ব্যাথাটি
খুঁজিয়া পায়নি পথ
গুমরি গুমরি ঘুরেছিল তাই
এতদিন অবিরত।
বদ্ধ প্রাণের দুয়ার খুলিয়া
বক্ষে তাহারে তুলি—
সারা বিশ্বের ব্যথাটীর সাথে
করিলে যে কোলাকুলি।
আকুল পরাণে দরশ লাগায়ে
যে ব্যথা ফুটিল গানে
তোমার মধুর কণ্ঠে তাহাই
নাচিয়া উঠিল তানে।
সারা নিশি মোর মন্দির তলে
যে দেবের পূজা হয়
(সে যে) তোমারো পরাণে ছন্দে গন্ধে
ধূপ দীপ জেলে রয়।

—:—

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা
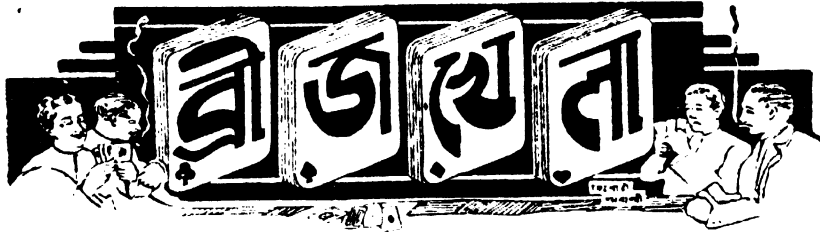
আবাহনমূলক ডবলে খেঁড়ীর জবাব (Partner's response to a take-out double) :—খেঁড়ীর বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছামূলক জবাবের কথা গত সপ্তাহে বলেছি। এতদ্ব্যতীত খেঁড়ীর আর এক রকমের জবাব আছে। সেটি হচ্ছে 'পাস'। আবাহনমূলক ডবলের পর খেঁড়ী যদি মনে করেন যে তিনি প্রচুর পরিমাণে খেঁসারৎ পাইতে পারেন তবে তাঁর পাস দেওয়া উচিত। মনে করুন ভাল্‌নারেবল অবস্থায় 'ক' ডেকেছেন 'একটি No Trump, 'আ' 'ডবল' দিয়েছেন, 'খ' 'পাস' দিয়েছেন আর 'অ' নিম্নলিখিত হাত পেয়েছেন।

ইস্কাবন—টেক্কা, তিরি, দুরি ; হরতন—নয়, সাতা, ছক্কা ; রুহিতন—বিবি, দশ, সাতা, দুরি ; চিড়িতন—দশ, চৌকা, তিরি।

এ ক্ষেত্রে 'অ'র কি করা উচিত। 'অ' জানেন যে 'ক' ভাল্‌নারেবল অবস্থায় No Trump ডেকেছেন সুতরাং তাঁর হাতে তিনখানি বা তার কিছু বেশী অনারের পিট আছেই, আবার 'আ' আবাহনমূলক ডবল দিয়েছেন তাঁর কাছেও তিনখানি অনারের পিট আছে এবং তাঁর নিজের হাতে একখানি অনারের পিট—একুনে সাতখানি অনারের পিটের হিসেব তিনি পাচ্ছেন। তা' হ'লে 'খ'র হাতে দেড়খানি অনারের পিট আছেই। কাজে কাজেই সাড়ে চারখানি অনারের পিট নিয়ে প্রতিপক্ষ একটি No Trump এর খেলা করতে পারেন সুতরাং তাঁকে ডাক দিতেই হবে, পাস দিলে চল্‌বে না। কিন্তু 'অ' যদি এই অবস্থায় নিম্নলিখিতরূপ হাত পেয়ে থাকেন, তবে তাঁর কি ডাক হবে ?

ইস্কাবন—টেক্কা, তিরি, দুরি ; হরতন—গোলাম, সাতা, ছক্কা ; রুহিতন—বিবি, দশ, নয়, সাতা ; চিড়িতন—সাহেব, বিবি, দশ।

এ ক্ষেত্রে 'অ'র হাতে প্রায় আড়াইখানি অনারের পিট আছে। তাঁদের মিলিত হস্তে সাড়ে পাঁচখানি অনারের পিট থাকায় এবং 'খ'র হাত সম্পূর্ণ রিক্ত হওয়ায় 'অ' এবং 'আ' ন্যূনকল্পে ৯০০ পয়েণ্ট খেঁসারৎ পেতে পারেন।

এই হোল No Trump এর আবাহনমূলক 'ডবলের' খেলায় পাস। এ ক্ষেত্রে কেবল অনারের পিটের উপর লক্ষ্য রেখে পাস দিতে বা ডাক্‌তে হবে। কিন্তু রঙের খেলায় আবাহনমূলক 'ডবলে' খেঁড়ীর বিচার্য্য বিষয় হবে প্রতিপক্ষের কথিত রঙ। উক্ত রঙ হাতে প্রচুর পরিমাণে না থাক্‌লে পাস দেওয়া অবিধেয়। মিঃ কালবার্টসন্ বলেন যে অন্ততঃ চারখানি রঙের পিট পাবার সম্ভাবনা না থাক্‌লে এ ক্ষেত্রে পাস দেওয়া অনুচিত। তিনি বলেন, "A penalty pass after partner has doubled an opening suit bid of one should be emphatically avoided. Only hands with such extraordinary trump length in opponent's suit that practically four sure trump tricks are guaranteed justify a pass."

মনে করুন ভাল্‌নারেবল অবস্থায় 'ক' ডেকেছেন 'একটি ইস্কাবন', 'আ' 'ডবল' দিয়েছেন, 'খ' পাস দিলেন এবং 'অ' নিম্নলিখিত হাত পেয়েছেন।

ইস্কাবন—বিবি, গোলাম, সাতা, ছক্কা, তিরি ; হরতন—আটা, দুরি ; রুহিতন—দশ, নয়, তিরি, দুরি ; চিড়িতন—টেক্কা, তিরি।

এ ক্ষেত্রে 'অ'র ডাক হবে 'একটি No Trump'. কিন্তু 'অ' যদি নিম্নলিখিত হাত পেয়ে থাকেন তবে তিনি পাস দিতে পারেন।

ইস্কাবন—বিবি, গোলাম, দশ, নয়, ছক্কা, তিরি; হরতন—দুরি; রুহিতন—দশ, নয়, তিরি, দুরি; চিড়িতন—টেক্কা, তিরি।

এ হাতে 'অ' ন্যূনকল্পে ৫০০ পয়েণ্ট খেঁসারৎ পেতে পারেন।

ভুয়ো ডাক বনাম আবাহন-মূলক ডবল (Psychics vs. Take-out double) :—অধিকাংশ কাঁচা খেলোয়াড়ের ধারণা এই যে ভুয়ো ডাক দিতে পারাই ব্রীজ খেলার সার্থকতা। অনেক সময়েই দেখি তাঁরা একখানি হরতন বা একখানি ইস্কাবন পেয়ে একটি হরতন বা একটি ইস্কাবন ডাকেন এবং ভীতু প্রতিপক্ষ উক্ত দুই রঙের ডাকযোগ্য তাস পাওয়া সত্বেও ভয়ে ডাক দিতে বিরত হওয়ায় চিড়িতন বা রুহিতন যে কোন রঙে শেষ ডাক ওঠে। সে স্থলে উক্ত ভুয়ো ডাকওয়ালা মনে করেন যে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে খেলার গতি ফিরিয়েছেন। ভাল প্রতিপক্ষের বিপক্ষে বসে উক্ত ভুয়ো ডাকওয়ালা আবার অনেক সময়ে বিষম ক্ষতিগ্রস্তও হন কিন্তু ঐ ভুয়ো ডাকের মোহ তাঁর আর ঘোচে না। তিনি বন্ধুবান্ধব মহলেও এই ডাকের কৃতিত্ব ঘোষণা করে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করেন এবং কোনও প্রতিষ্ঠাপন্ন ক্রীড়কের সম্মুখীন হলেই আগেই তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, "ধরুন আমি যদি 'সাইকিক' (Psychic) দিই তবে আপনি কি করতে পারেন?" এই ক্রীড়কেরা ব্রীজ ক্লাবের সর্ব্বনাশকারী মাত্র। ইঁহারা 'সাইকিক' কাহাকে বলে তা' জানেন না, কিরূপ হাত হলে 'সাইকিক' ডাক দিতে হয় তাও জানেন না। তাঁদেরও সাধারণের অবগতির জন্য জানাচ্ছি কালবার্টসন নিয়মে এই 'সাইকিক' ডাক প্রতিপক্ষের নিকট অতি সহজেই ধরা পড়ে। মনে করুন 'ক' ডেকেছেন একটি No Trump, 'আ' 'ডবল' দিয়েছেন, 'খ' বলেছেন 'রিডবল'। এখন আড়াইখানি অনারের পিট হাতে নিয়ে 'অ' কি বল্‌বেন? 'অ' জানেন তাঁর খেঁড়ী পেয়েছেন তিনখানি অনারের পিট এবং তিনি নিজে পেয়েছেন আড়াই। সুতরাং সাড়ে পাঁচখানি অনারের পিট তাঁদের। প্রতিদ্বন্দ্বী 'ক' ও 'খ' No Trump-ই বলুন আর 'রিডবল' বলে আস্ফালনই করুন তাঁরা দুজনে পেয়েছেন মাত্র তিনখানি অনারের পিট সুতরাং প্রচুর খেঁসারৎ তাঁরা দিতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে উক্ত 'ক' বা 'খ'-এর একজন যে ভুয়ো ডাক (Psychic) দিয়েছেন তা' বুঝতে 'অ'-র বিন্দুমাত্রও দেরী হবে না। সুতরাং 'সাইকিক' এখানে নিষ্ফল।

আবার দেখুন। 'ক' ডেকেছেন একটি ইস্কাবন, 'আ' দিয়েছেন 'ডবল'। 'খ' বল্‌লেন 'পাস', 'অ' বল্‌লেন 'দুইখানি রুহিতন', 'ক' বল্‌লেন 'পাস'। এবার 'আ'

বল্‌লেন 'তিনখানি ইস্কাবন'। প্রতিপক্ষের একটি রঙের ডাকের পর 'ডবল' দিয়ে যদি পুনরায় সেই রঙ ডাকা হয় তা' হলে বুঝতে হবে ডাকদার সেই রঙে খেল্‌তে চান্ এবং সম্ভবতঃ প্রতিপক্ষের ডাকটি ভুয়ো ডাক অর্থাৎ 'সাইকিক'। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে 'আ' 'ডবল' দিয়ে তারপর 'তিনটা ইস্কাবন' ডাকায় 'ক'-র ইস্কাবন ডাক যে 'সাইকিক' তা' সহজেই প্রতীয়মান হচ্ছে। তাই বল্‌ছিলুম যে কাঁচা খেলোয়াড় তাঁর সাইকিক ডাকের যতই গৌরব করুন না কেন নিয়মানুবদ্ধ ডাক-দারের (Systematic bidders) কাছে তাঁর কৌশল চল্‌বে না—সহজেই ধরা পড়্‌বে। 'সাইকিক' ডাক দেবার হাত ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সে কথা পরে যথাস্থানে বল্‌ব। তবে এই মাত্র বলে রাখি যে সার্কাসের ক্লাউনের যেমন সব খেলায় দক্ষতা থাকা আবশ্যক, থিয়েটারের প্রম্পটারের যেমন সব পার্টে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক তেমনি 'সাইকিক' ডাকদারের তাসের সর্ব্বরকম হাতের বিভাগ এবং সর্ব্বপ্রকার ডাকের সহিত সুপরিচিত হওয়াও প্রয়োজন। নইলে 'সাইকিক' ডাক চলে না। কালবার্টসন্ নিয়মের কষ্টিপাথরে সেই ডাক সহজেই ভুয়ো বলে ধরা পড়ে যায়। তার গিল্টির আবরণ অতি সহজেই খসে পড়ে। তাই এ প্রবন্ধের পাঠকপাঠিকাগণের প্রতি আমাদের অনুরোধ ভাল করে তাসের বিভাগের সঙ্গে পরিচিত না হয়ে কেউ যেন 'সাইকিক' ডাক দেবার চেষ্টা না করেন। তা' নিজের সর্ব্বনাশকর এবং খেঁড়ীর পক্ষে মারাত্মক। আবার যাঁরা বাজী রেখে (stake) খেলেন তাঁদের তো কথাই নেই।

প্রতিযোগিতায় নূতন গোল-মাল :—কোল্‌কাতার ব্রীজ মহলে আবার নূতন এক গোলমালের সুরু হয়েছে। আইনতঃ প্রবেশ মূল্য (Entry fee) দিলে তবে প্রতিযোগিতায় নাম নেওয়া উচিত কিন্তু এখানকার প্রতিযোগিতার কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রবেশ মূল্য পরে দিলেও যে কোন সমিতিকে প্রতিযোগিতার খেলায় খেল্‌তে দেন। এই ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে আজকাল কয়েকটি ক্লাব টুর্ণামেন্টে খেলার পর প্রবেশ মূল্য দেবার আর নাম করেন না। এই সম্বন্ধে প্রায়ই আমাদের শ্রীতুর্ব্বাসার কাছে নানারূপ অভিযোগ আস্‌তে আরম্ভ হয়েছে এবং এই পন্থা যে সকল সমিতি গ্রহণ করেছেন তাঁদের নামও আমরা পেয়েছি। আমরা এ বিষয়ে তাঁদের সাবধান করি এবং এর পরেও যদি এঁদের অত্যাচার না থামে আমাদের শ্রীতুর্ব্বাসা তাঁদের নাম ব্রীজমহলে জাহির করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

"অটল বসিয়া আছে কিরণশঙ্কর"

(মোহমুদ্গর লেখক বিরচিত)

কত যায় কত আসে—
বৃহৎ নোঙ্গর
অটল বসিয়া আছে
কিরণশঙ্কর।
কোথা দিয়ে কি যে হয়
বোঝে নাকো কেউ,
আলোড়নে তার আসে
ছোট বড় ঢেউ।
পাকা পাকা মাঝি করে
তরী বান্‌-চাল্,
আপনি তারিফ করে
আপনার চাল্
কত রাজা যায়—রাজ্য
ভেঙ্গে গড়াগড়ি
চিরন্তন মন্ত্রী আছে
আসন আঁকড়ি!
কত যায় কত আসে—
বৃহৎ নোঙ্গর
অটল বসিয়া আছে
কিরণশঙ্কর।

শ্রীমতী জোহ
এখানে সুন্দর দে
—সত্য সত্যই
সুন্দর দেখ্‌তে।
কিনেটোনের
মঞ্জরী" চিত্রে
হরের সঙ্গে

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—চ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ১৯শে বৈশাখ, ১৩৪২—2nd. May, 1935. { ১৮শ সংখ্যা

"চার অধ্যায়" ও কবির কৈফিয়ৎ

"চার অধ্যায়ের" সহিত একটা অনাবশ্যক "আভাষ" জুড়িয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস-সাহিত্যের যে আদর্শচ্যুতি ও রস-বিকৃতি ঘটাইয়াছেন তাহার ফলে প্রবুদ্ধ পাঠক ও সমালোচকবর্গের মনে একটা ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু হয়তো একাধিক কারণে তাঁহারা মনের ক্ষোভ মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। একমাত্র "খেয়ালী"ই প্রথমে একাধিক সংখ্যায় অকুণ্ঠকণ্ঠে এই ক্ষোভের অভিব্যক্তি দান করে। অতঃপর অন্যান্য পত্রিকাতেও ইহার আলোচনা হয় এবং যাহা লোকের মনে অস্ফুট কলগুঞ্জন ছিল দেখিতে দেখিতে সেই প্রতিবাদের মিলিত সুর রীতিমত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে! দেখা যাইতেছে,—এই প্রতিবাদের অশান্তধ্বনি শান্তি-নিকেতনের শান্তি-কুঞ্জেও প্রবেশ করিয়া কবি-সম্রাটের সিংহাসন টলাইয়াছে। তিনি বৈশাখের "প্রবাসী" মারফৎ সাহিত্যিক ও সমালোচকদের দরবারে তাঁহার "কৈফিয়ৎ" পেশ করিয়াছেন।

প্রথমেই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে,—"আমার 'চার অধ্যায়' গল্পটী সম্বন্ধে যত তর্ক ও আলোচনা উঠেছে, তার অধিকাংশই সাহিত্য-বিচারের বাইরে প'ড়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ, এই গল্পের যে ভূমিকা সেটা রাষ্ট্রচেষ্টা-আলোড়িত বর্ত্তমান বাংলা দেশের আবেগের বর্ণে উজ্জ্বল ক'রে রঞ্জিত।" আলোচনার মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন কিন্তু ভুল করিয়াছেন তাহার কারণ উল্লেখ করিবার সময়। আলোচনা ও তর্কের প্রকৃতি সাহিত্যের এলাকাবহির্ভূত হওয়ার প্রধান কারণ উপন্যাসের সহিত একটা উদ্দেশ্যমূলক "আভাষ" জুড়িয়া দেওয়ার অসাহিত্যিক রীতি।

কিন্তু যতই ঘুরাইয়া লিখুন, এই "আভাষ" যে নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন—আমাদের এই প্রধান প্রতিবাদটী তিনি স্বীকার করিয়াছেন। সরস্বতীর বরপুত্র তিনি, কথার আতসবাজীতে লোকের চোখে ধাঁধা লাগাইবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কথার অন্তরালে তাঁহার অনুতপ্ত মনের যে ভ্রান্তি-স্বীকার লুক্কায়িত আছে তাহা সকলের চোখ এড়ায় নাই।

এই কৈফিয়ৎ পাঠ করার পর আমাদের মনে আর একটী প্রশ্ন জাগিতেছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি রাজনৈতিক পটভূমিকার উপর যে দুইটী বিখ্যাত উপন্যাস—"গোরা" ও "ঘরে বাইরে" লিখিয়াছিলেন তাহাদের চরিত্রের মনস্তত্ত্বঘটিত বাস্তবতা সপ্রমাণ করিবার জন্য তো কোনো সাক্ষ্য ডাকিবার প্রয়োজন হয় নাই। কেবল এই "চার অধ্যায়" সম্বন্ধেই কেন তিনি এরূপ অসহায় বোধ করিয়া সাক্ষ্যের জন্য মৃত বন্ধুর স্মরণাপন্ন হইলেন। বার্দ্ধক্যের শক্তিহীনতায় বাহিরের যষ্টি অবলম্বন প্রয়োজন হয়। তবে কি রবীন্দ্রনাথের মনোরাজ্যেও জরার আধিপত্য সুরু হইল?

অবশেষে বলিতে চাই যে, তাঁহার "কৈফিয়ৎ"টী একাধিকবার মনোযোগের সহিত পাঠ করিবার পর আমাদের পূর্ব্ব ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে যে এই "আভাষটী" যেমনি নিষ্প্রয়োজন তেমনি সাহিত্য-রীতি-রুচি-বিগর্হিত। পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহা তুলিয়া দিলে রবীন্দ্রনাথের গৌরব বাড়িবে বই কমিবে না।

চলতি পথে

শ্রীমল্লিনাথ

ন্যাশনাল চেম্বার

সাধারণ প্রতিষ্ঠান চালাইতে জাতি হিসাবে বাঙ্গালী চিরদিন অপারক, এ অপবাদ আমরা বাহিরে স্বীকার না করিলেও, অন্তরে অন্তরে অস্বীকার করিতে পারি না; অবশ্য ইহার যে ব্যতিক্রম নাই এ কথা আমরা বলি না, কিন্তু বাঙ্গালী পরিচালিত যে কয়টী বিশিষ্ট সাধারণ প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার মধ্যে অন্যতম বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভার (Bengal National Chamber of Commerce) আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার ইতিকথা আজ যাহা সংবাদপত্র মারফৎ সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে বাঙ্গালীর অবস্থা যে কত অসহায় তাহা চিন্তা করিলে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড়ই নিরাশ হইতে হয়। সাধারণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে কতগুলি মূলগত আদর্শ আছে; তাহার মধ্যে প্রধানতম হইতেছে যে সাধারণকে প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সব সময়েই সব ব্যাপার জানানো। সাধারণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কোনরকম লুকোচুরী না থাকাই উচিৎ এবং সাময়িক কর্ণধারগণের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের স্বকীয় আইনকানুনের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া উহার অন্যান্য সভ্যগণকে কোনরূপ সংবাদ হইতে বঞ্চিত করিতে চেষ্টা না করাই কর্তব্য এবং ঠিক এমনিই অন্যায় হয় যদি কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষ কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানকে তাঁহাদের অর্থের জোরে করায়ত্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সংসদ সম্পর্কে এই রকম এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। সম্প্রতি "খেয়ালী"তে ন্যাশনাল চেম্বার সম্বন্ধে দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে—একটী লিখিয়াছেন ভূতপূর্ব্ব অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীল ঘোষ এবং অপরটীর লেখক ন্যাশনাল চেম্বারের বর্ত্তমান সহ-সভাপতি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ লাহা পরিবারের কুমার সুরেন লাহা। শ্রীযুক্ত ঘোষ অভিযোগ করিয়াছেন যে তিনি চেম্বারের আয় ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে কিছু সংবাদ চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। তাঁহাকে কেন তাঁহার প্রাপ্য সংবাদ হইতে বঞ্চিত করা হইল চেম্বারের কর্ত্তৃপক্ষ তাহা তাঁহাকে জানানো প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই। কুমার সুরেন্দ্র নাথ লাহা উপরোক্ত পত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—"ইহা পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই যে, সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যদিগকে কোন সংবাদ জানিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইলে, তাহা ক্ষমার্হ নহে। কারণ তাহাতে সদস্যদের মনে এই সন্দেহ জাগে যে, ইহার দ্বারা শুধু অবৈধ আচরণ করা হইতেছে না, পরন্তু প্রতিষ্ঠানের আসল অবস্থা গোপন রাখা হইতেছে।" অন্যতম সহ-সভাপতির এইরূপ ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করার পর চেম্বারের বর্ত্তমান কর্ণধারগণ শ্রীযুক্ত সুশীল ঘোষের প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে কি করেন, তাহা দেখিতে উৎসুক রহিলাম। তাহার পরের কথা, কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি বা দল বিশেষের অর্থের জোরে অথবা কোন অন্যায় উপায়ে 'মৌরসী পাট্টা' গাড়িবার প্রচেষ্টা। সাধারণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইরূপ অপচেষ্টা যে কিরূপ ক্ষতিকর তাহা বলাই বাহুল্য। সাধারণ প্রতিষ্ঠান যখন চলে সাধারণের সহানুভূতির উপর, তখন কাহারও পক্ষে বেশীদিন যাবৎ কোন পদ অধিকার করিয়া রাখা অন্যায়। ইহার ফলে এই হয় যে, প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যাহারা উৎসাহী কর্ম্মী আছেন, ক্রমশঃ তাঁহারা কাজ করিবার সকল প্রকার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রতিষ্ঠানের সহিত সকলপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এইস্থানে উল্লেখযোগ্য যে কুমার সুরেন্দ্র নাথ লাহা বর্ত্তমান সভাপতি নলিনী সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ আনিয়াছেন। কুমার বাহাদুর বলেন যে নলিনীবাবু যখন প্রথমবার সভাপতিপদে বৃত হ'ন, তখন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তিনি দুই বৎসরের অধিককাল সভাপতির পদ আঁকড়াইয়া রাখিবেন না, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি তাহা করেন নাই। নলিনী বাবুর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে এবং অন্যান্য চক্রান্তে বিরক্ত ও বীতশ্রদ্ধ হইয়া বাংলার পুরাতন বণিক সমাজের শীর্ষস্থানীয় ভাগ্যকুলের রায় পরিবার বঙ্গীয় জাতীয় বাণিজ্য সংসদের সহিত সকলপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি তাঁহারা এইরূপ হতাশ হইয়া চেম্বারের সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক রহিত না করিলেই ভাল করিতেন। বাংলাদেশে বণিক সমাজে পরিচয় দিবার মত হইতেছেন ভাগ্যকুলের রায় পরিবার এবং কলিকাতার সুবিখ্যাত লাহা পরিবার। সাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা আত্মস্থ হইয়া উঠুন, জাতীয় বণিক সংসদ কলঙ্ক ও অপবাদ মুক্ত হইয়া পুনরায় স্বগৌরব লাভ করিবে। তাঁহারা আজ কেহ হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছেন অথবা কেহ

...পার সম্বন্ধে ততটা মনযোগী নহেন বলিয়াই ...মনসিংহের ভাগ্যভিখারী বিশেষ আজ জাতীয় ...ণিজ্য সংসদ নিজের একচেটিয়া সম্পত্তিতে ...রিণত করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাঁহারা ...কটুখানি আত্মচেতনা লাভ করিলে বর্ত্তমানের ...পযুক্ত ভাগ্যান্বেষীর দল পলাইবার পথ ...ইবে না।

দিনাজপুর সম্মেলন

বিপুল আড়ম্বর এবং জাঁকজমকের সহিত ... ইষ্টারের ছুটীতে দিনাজপুরে ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হইয়া গেল। উত্তর বঙ্গের প্রবীন জননেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নেতৃত্বে দিনাজপুরের কর্ম্মী-সম্প্রদায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে দিনাজপুর সম্মেলন যে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে একটী প্রদর্শনী ও হিন্দী ভাষা সম্মেলন হওয়ায় দিনাজপুর সহরে ইষ্টারের ছুটীতে একটী জাতীয় মহোৎসব হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে। সম্মেলনের কিছুদিন পূর্ব্বে যে গুজব রটিয়াছিল যে চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের চাপে বাংলার স্কন্ধে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন নীতি চাপাইয়া দিবার প্রচেষ্টা করিবেন, তাহা সত্য হয় নাই দেখিয়া আমরা আন্তরিক আনন্দিত। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র বাবু বাংলার বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা এই প্রদেশের খাঁটি অবস্থার পরিচয় দেয়। দিনাজপুর তথা উত্তরবঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসাবে, তাঁহার অভিভাষণ মোটের উপর জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মূল সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত মহাশয়ের অভিভাষণও নৈরাশ্যপীড়িত জাতিকে অন্ধকারের দুর্য্যোগে পথ দেখাইবে। দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যখন কোন ভাবের তরঙ্গ আসে তখন তাহাতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া ত্যাগের পথ, কৃচ্ছসাধনের পথ গ্রহণ অতি সহজ, কিন্তু যখন চারিদিক কেবল ঘোর তমসাচ্ছন্ন, কোথাও কোন আলো দেখিতে পাওয়া যায় না, জড়তা অবসাদে দেশের রাজনৈতিক দেহ অবসন্ন, তখন মস্তক সু-উচ্চ রাখিয়া নিজের কার্য্য করিয়া যাওয়া বড়ই কষ্টের। সত্যই যখন দেশের অবস্থা আজ এই রকম, তখন ডাঃ সেনগুপ্তের অভিভাষণ অতিশয় সময়োচিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার অভিভাষণে দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিপুণ সমালোচনা করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কোথায় কি গলদ আমাদের রাজনৈতিক জীবনে রহিয়া গিয়াছে, তাহা অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়াছেন। বাংলার বিভিন্ন সমস্যা-গুলির অন্যতম রাজবন্দী সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বাংলার কর্ত্তব্য সকল বিষয়ই তিনি যথাসাধ্য সু-সমালোচনার দ্বারা ঐ সমস্যাগুলির প্রতীকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাংলা বৃহত্তর ভারতের একটা অংশ, সুতরাং তাহার সমস্যার সমাধানকল্পে এমন কোন দাওয়াই তিনি প্রয়োগ করিতে পারেন না, যাহাতে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কোন ক্ষতি হইতে পারে এবং আনন্দের কথা ডাঃ সেনগুপ্ত মহাশয় সকল দিক বিবেচনা করিয়াই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দিনাজপুর সম্মেলন উপলক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে বাংলাদেশে যাহারা কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্বন্ধে না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন নীতিতে আবদ্ধ, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই মতান্তর ঘটিয়াছে। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি রাজসাহীর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন মৈত্র এইরূপ একজন। খুবই আনন্দের কথা যে তিনিই দিনাজপুর সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত বর্জ্জন সম্বন্ধে প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন। চক্রান্তে পড়িয়া সুরেন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের যে সাময়িক বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছিল, তাহা হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিজেকে ছাড়াইয়া লইতে পারিয়াছেন দেখিয়া আমরা খুশী হইয়াছি এবং তাঁহাকে সেইজন্য আমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। দিনাজপুর সম্মেলনে অন্যান্য প্রস্তাবগুলির মধ্যে জন-শিক্ষা এবং জাতি গঠন বিষয়ক কর্ম্মনীতি সম্বন্ধে প্রস্তাবদ্বয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রস্তাব দুটী যদি সত্যই কার্য্যে পরিণত হয় তো দেশের অনেক উপকার হইবে।

সর্ব্বদিক হইতে বিবেচনা করিয়া চারি

'চার-অধ্যায়ে'-র আভাষ ও "খেয়ালী"

পরিশেষে অকপটে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এই "চার অধ্যায়ে"-র অংশ বিশেষ আমাদের মনে শুধু যে দুঃখ ও ব্যথার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নহে, জুগুপ্সারও উদ্রেক করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে আমরা রুচির রাজা বলিয়া জানিতাম। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি স্বধর্ম্ম বিদ্রোহী হইয়া সেই রুচির রীতিকেও লঙ্ঘন করিবেন, ইহা ছিল আমাদের কল্পনাতীত। "চার-অধ্যায়ে"-র সহিত আড়াই পৃষ্ঠাব্যাপী স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্বন্ধে যে আভাষটী তিনি জুড়িয়া দিয়াছেন, আমরা তাহার কথাই বলিতেছি। সাহিত্যে বিনা প্রয়োজনে এতবড় Literary and Artistic Vulgarity-র পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে আর পাই নাই।

"খেয়ালী"—৩০শে ফাল্গুন ১৩৪১

বৎসর পরে দিনাজপুরের প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন যে সর্ব্বাঙ্গভাবে সুন্দর ও সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। দিনাজপুরে বাঙ্গালী নিখিল ভারতীয় ভেস্কী-বাজীর মায়া কাটাইয়া আত্মপ্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছে,—সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের কথা হইতেছে এই।

রজত-জয়ন্তী প্রসঙ্গে

আর কয়েকদিনের মধ্যেই সম্রাট দম্পতীর পঞ্চবিংশতি বর্ষ রাজত্বকাল পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে সারা ইংরাজ সাম্রাজ্য ব্যাপিয়া এক বিরাট উৎসব হইবে। সম্রাটের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিতে ভারতবর্ষে রাজকর্ত্তৃপক্ষ সম্রাটের ভারতীয় প্রজাবৃন্দকে নানাভাবে অনুরোধ উপরোধ জানাইতেছে। এই প্রসঙ্গে ভারতবাসী জনসাধারণের কর্ত্তব্য কি তাহা নির্দ্দেশ করিয়া কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির বিগত অধিবেশন যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—"ব্যক্তিগত-ভাবে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সুখী হউন, দীর্ঘজীবি হউন, ইহাই কংগ্রেসের আন্তরিক ইচ্ছা; তথাপি কংগ্রেস এই সত্য উপেক্ষা করিতে পারেনা যে, যে শাসন পদ্ধতি ভারতবাসীর নৈতিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির প্রত্যক্ষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সম্রাটকে একান্ত স্বাভাবিকরূপেই সেই শাসন পদ্ধতির প্রতীক বলিয়া মনে করা হয়। এই শাসনের শেষ পরিণতিস্বরূপ এখন এমন একটী শাসন-তন্ত্রের পরিকল্পনা হইয়াছে, যাহা পরিবর্ত্তিত হইলে, ভারতের এখনও যে কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও শোষিত হইবে এবং ভারতের রাজনৈতিক অধীনতা পাশ কঠোরতর হইবে। অতএব প্রস্তাবিত উৎসবের অনুষ্ঠানে সকলকে যোগদানের পরামর্শ দেওয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে অসম্ভব।" কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি সকলদিক বিবেচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন আমরাও উহার সহিত সম্পূর্ণ একমত। সম্রাটের ব্যক্তিগত জীবন রাজনীতির উর্দ্ধে, সুতরাং তাঁহার প্রতিনিধিগণের উপর নানাকারণে যতই বীতশ্রদ্ধ হইনা কেন, তাঁহার মঙ্গলকামনা আমরা করি। কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি সকলকে এই রজতজয়ন্তী উৎসবে যোগদান করিতে অনুরোধ জানাইতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া তাহার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বাংলাদেশ উহা অপেক্ষা আরও বহু গুরুতর হেতু প্রদর্শন করিতে পারে। বাংলার প্রায় আড়াই হাজার তরুণ তরুণী আজ বিনা বিচারে শুধু পুলিশ গুপ্তচরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কারারুদ্ধ। পল্লী বাংলার প্রায় প্রতি গ্রাম হইতে একাধিক যুবক এক মাতৃক্রোড় হইতে অপসারিত হইয়াছে—বাংলার প্রতিগৃহ এই কারণে শান্তিহীন, নিরানন্দময়, তাহারা কিরূপে এই রজতজয়ন্তীর আনন্দোৎসবে আন্তরিকভাবে যোগদান করিবে? তবে এখনও বিশেষ বিলম্ব হয় নাই; যদি রজতজয়ন্তী উৎসবকে সর্ব্বাঙ্গভাবে সার্থকতা মণ্ডিত করিতে রাজকর্ত্তৃপক্ষের একান্তই অভিপ্রেত হয়, তবে অবিলম্বে তাঁহারা এদেশের বিশেষ করিয়া বাংলার, সকল দুঃখ নিরানন্দের কারণ অপসারণ করুন, ভারতবাসী আন্তরিক হর্ষে উল্লসিত হইয়া রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া উৎসবকে সর্ব্বপ্রকারে সুষমামণ্ডিত করিয়া তুলিবে।

ত্রুটী স্বীকার

বৈশাখের "প্রবাসী"-তে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "চার-অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:—

"গল্পের উপক্রমণিকায় উপাধ্যায়ের কথাটা কেন এল এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস্য। অতীনের চরিত্রে দুটী ট্র্যাজেডি ঘটেছে—এক সে এলাকে পেলেনা, আর সে নিজের স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হ'য়েছে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি স্বভাব-বিশেষে মনস্তত্ত্ব হিসাবে বাস্তব হ'তে পারে তারই **সাক্ষ্য উপস্থিত করার লোভ সম্বরণ ক'রতে পারিনি।** ভয় ছিল পাছে কেউ ভাবে যে, এই সম্ভাবনাটী কবি-জাতীয় বিশেষ মত বা মেজাজ দিয়ে গড়া। এর বাস্তবতা সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ হ'লে এর বেদনার তীব্রতা পাঠকের মনে প্রবল হ'তে পারে এই আশা ক'রেছিলুম। **তা হোক্, তবু গল্পের দিক থেকে এর কোনো মূল্য নেই সে কথা মানি। গল্পের সাক্ষ্য গল্পের মধ্যে থাকাই ভাল।"**

কুমার রাধারাণী সুলাল কানন মৃণাল জ্যোৎস্না

—"রূপবাণীতে" মানময়ী গার্লস্ স্কুল—

আগামী সপ্তাহে, চিত্র-জগতের উল্লেখযোগ্য খবর হ'চ্ছে—"মানময়ী গার্লস্ স্কুলের" মুক্তি।

রাধা ফিল্মের এই হাস্যরস মধুর ব্যঙ্গ-নাটিকাখানি উত্তর কলিকাতার, অন্যতম জনপ্রিয় চিত্র-সৌধ "রূপবাণীতে" আগামী শনিবার ১১ই মে থেকে দেখানো হবে। রস-রচনায় সিদ্ধ-হস্ত, নব্য বাঙলার শক্তিমান লেখক, স্বর্গীয় রবীন্দ্র মৈত্রের এখানি শেষ এবং উল্লেখযোগ্য দান। রঙ্গ-মঞ্চে বহুকাল সুনামের সঙ্গে এই নাটিকাখানি অভিনীত হ'য়েচে।

বর্ত্তমানে রাধা ফিল্ম কোম্পানী এখানি চলচ্ছবির উপযোগী কোরে গঠন কোরেছেন এবং বাঙলার শক্তিমান শিল্পীদের যোগাযোগে চিত্রাকারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ কোরেচে।

সবাক্-চিত্রে, "মানময়ী গার্ল স্কুলের" ভূমিকা-লিপি হ'য়েছে এইরূপ :—

নীহারিকা···	শ্রীমতী কাননবালা
মানসমোহন...	জহর গঙ্গোপাধ্যায় (সুলাল)
দামোদর চৌধুরী··· ...	তুলসী চক্রবর্ত্তী
চপলা···	কুমারী জ্যোৎস্না গুপ্তা
রাজেন্দ্র বাড়োড়ী··· ...	মৃণাল ঘোষ
হারানিধি···	কুমার মিত্র
ফার্ণান্দেজ...	জানকী ভট্টাচার্য্য
মানময়ী···	শ্রীমতী রাধারাণী

এই ছবির চিত্র-নাট্য রচনা এবং পরিচালনা কোরেছেন বাঙলার স্বনামধন্য প্রয়োগশিল্পী···শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোক-চিত্র গ্রহণ কোরেছেন শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় গোপাল গু[illegible] এবং শব্দানুলেখন কোরেছেন, ডাঃ হৃষীকেশ রক্ষিত ডি-এস-সি।

সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের দুটি অভাবগ্রস্থ বেকার নর-নারী পরস্পর পরস্পরের সম্পূর্ণ অচেনা হোয়েও, দারিদ্র্যের হা[illegible] থেকে মুক্তি লাভের আশায়, কিভাবে মিলিত হয়···সামা[illegible] পরিচয় থেকে ক্রমশঃ অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পায়···এবং তারা আকর্ষণে ক্রমশঃ কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, সুকৌশলী লেখক কল্পনায় রং ফলিয়ে তারই মনোরম চি[illegible] "মানময়ী গার্ল স্কুলে" উপহার দিয়েছেন।

অন্তরে কেউ কারু নয়, অথচ সারা দুনিয়ার চোখে স্বামী-স্ত্রী সেজে অটল বৈরাগ্যে ক'দিন সংসার করা চলে ?······

এমন অবস্থা আপনারা কল্পনা কোরতে পারেন কী ?

"মানময়ী গার্ল স্কুলে" আপনারা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এ[illegible] অনস্বাদিত রোমান্সের আস্বাদন কোরতে পারবেন···

অন্ন-সমস্যার সঙ্গে প্রেম-সমস্যার একাধারে মীমাংসা······

বাঙলার প্রত্যেক শিক্ষিত নর-নারী মাত্রকেই এই না[illegible] রস-পুষ্ট বিচিত্র কাহিনীটি ছবির পর্দায় প্রত্যক্ষ কোরতে বলি।

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

সব্যসাচী

গত ২৩শে এপ্রিল তারিখের 'ষ্টেটসম্যান' পত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর পক্ষে তাহার জেনারেল ম্যানেজারের স্বাক্ষরে এক বিজ্ঞাপন (প্রায় অর্দ্ধ কলম ব্যাপী) প্রকাশিত হইয়াছে। "জাতীয় প্রতিষ্ঠান" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান বিলাসী কোম্পানীর বিজ্ঞাপন "অজাতীয়" পত্রেই কেন প্রকাশিত হইল, তাহা আজ আমরা জিজ্ঞাসা করিব না। বিজ্ঞাপন—ইমারতের নক্সা-প্রতিযোগিতার।

হিন্দুস্থান বীমা মণ্ডলীর এক গৃহ নির্ম্মিত হইবে—ইহার জন্য নক্সা দাখিল করিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। যাহার নক্সা গৃহীত হইবে, তিনি চারি হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন।

বিজ্ঞাপনে প্রকাশ—**গৃহটির নির্ম্মাণ ব্যয় ৯ লক্ষ টাকার অধিক হইবে না।**

গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় যে স্থানে ৯ লক্ষ টাকা সে স্থানে জমীর দামও অবশ্য কয়েক লক্ষ টাকা হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং হিন্দুস্থান আবার জমীতে ও বাড়ীতে ১০ বা ১১ লক্ষ টাকা বদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

মানুষ যেমন জীর্ণ বাস ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলী কি তেমনই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রোডে পুরাতন বাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও (চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে?) নূতন গৃহে আফিস স্থানান্তরিত করিবে?

যদি তাহাই মত, তবে পুরাতন গৃহটি হইতে কি আশানুরূপ আয়ের কোন সম্ভাবনা আছে? সে সম্ভাবনা কিরূপ সুদূর পরাহত তাহা হিন্দুস্থানের গৃহসংলগ্ন সমবায় গৃহের অভিজ্ঞতায় বুঝা যায়। এই সমবায় গৃহের মালিক—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। উভয়েই হিন্দুস্থানের পক্ষ হইতে প্রচারিত "নিবেদনে" স্বাক্ষর দিয়াছেন। একজন হিন্দুস্থানের অনেক অংশের মালিক, একজন খাতক। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই সমবায় গৃহের শোচনীয় অভিজ্ঞতা জানা যাইত। এই অবস্থায়—**২০ বৎসর কাল** অংশীদারদিগকে লাভের অংশ হিসাবে এক পয়সাও দিতে না পারিয়াও ১০ বা ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পুরাতন গৃহ ত্যাগ কিরূপ ব্যবসাবুদ্ধির ও অংশীদারদিগের প্রতি কিরূপ সুবিচারের পরিচায়ক, তাহা সহজেই অনুমেয়।

জমীতে ও বাড়ীতে টাকা খাটাইবার বিষয় আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। জমী ক্রয় বিক্রয়ে ও গৃহ নির্ম্মাণে ও বন্ধকে যে দালালী প্রভৃতিতে লোক পালন সম্ভব হয়, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু সে বিষয় উপেক্ষা করিলেও বলা যায়—এইরূপে জমী খাটান যুক্তিযুক্ত কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহের অবসর আছে। সেই সন্দেহ যে 'ষ্টেটস্‌ম্যান', 'ক্যাপিট্যাল' প্রভৃতি পত্রও প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

হিন্দুস্থানের যে জেনারেল ম্যানেজারকে 'ক্যাপিটাল' Mr. Facing-Both-Ways আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তিনিও এ বিষয়ে দুই স্থানে (দুই রূপে) দুই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। যদি এই উভয় মতই তাঁহার হয়, তবে বলিতে হয়—"কাশী মক্কা পাশাপাশি, কোন দিকে তাকাই।" আর দুই মত যদি দুই জনের হয় এবং গ্রামোফোনের কথার মত বাজা না হইয়া থাকে, তবে তাজা উপভোগযোগ্য সন্দেহ নাই।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখে হিন্দুস্থানের রজত রঞ্জনোৎসবে, ইহার জেনারেল ম্যানেজার জমী ও বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা খাটাইবার সুবিধা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন:—

"We made a striking departure from the orthodox policy of investment in gilt-edged securities only such as was followed by most of the earlier-established companies. In doing so, we did not outlook the "safety" of the funds invested, but we were convinced that without sacrificing 'safety' in the least, investment in the mortgage of good real properties offered a larger return and better scope in this country, provided, of course, from the point of view of 'safety', there is an ample margine in the intrinsic value of such property and provided there is a regular repayment of interest...... Mortgages, for example, have proved in the past one of the most suitable channels of investment of British, French and American Life Offices."

ইহার পর তিন মাস যাইতে না যাইতে (২২শে মে তারিখে) যে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সে জমী বাড়ী বন্ধক রাখিয়া টাকা খাটাইবার সমর্থক যুক্তি প্রয়োগের

প্রয়োজন নাই (পরন্তু যথায় সভ্যদিগের চাঁদা নাকি ৮ হাজার টাকা ও দেয় টাকার পরিমাণ প্রায় ৪ হাজার টাকা) সেই বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সে এই ব্যক্তিই বলিয়াছিলেন; জমীজমায় টাকা খাটাইলে যে বিপদ ঘটে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে :—

"As a matter of fact, a considerable number of those who may be regarded as wealthy now find their capital frozen—thanks to investment directly in land or against the security of land."

এই পরস্পর বিরোধী মতদ্বয়ের কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য ? আর জিজ্ঞাস্য—

হিন্দুস্থান যে ভূমিসম্পত্তিতে অনেক টাকা খাটাইতেছেন, তাহারও মূলধন আটকাইয়া (frozen) যায় নাই ত ?

কলিকাতার বাড়ীর কথা ধরা যাউক। হরি ঘোষ ষ্ট্রীটে ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গলিতে উপেন্দ্রনাথ করের দরুন বাড়ী দুইখানি ও ১১।১ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীটে যে একখানি বাড়ী হিন্দুস্থানের "ঘাড়ে পড়িয়াছে" বলিয়া প্রকাশ সেগুলিতেও কি a larger return হইয়াছে ? একখানি বাড়ী সময় সময় বিবাহের জন্য ভাড়া হয় এবং একখানিতে অধুনা বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের কমিটী মেম্বর ডাক্তার মনোমোহন রায়ের কন্যার বিবাহ ভাড়া দিয়া কিনা, জানি না হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কি এইবার সুদ ভালরূপ পোষাইতেছে এবং টাকাও ওয়াশীল হইবার সুবিধা আছে ? আশা করি, এই সকলে ও মার্চেণ্টিয়ট চা বাগানে, করিমগঞ্জ চা-বাগানে capital frozen হয় নাই।

আর ঐ যে provided there is a regular payment of interest, ইহার সম্বন্ধে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' বলিয়াছিলেন :—

"The balance sheet shows nearly Rs. 6 lakhs in respect of outstanding interest, dividents and rents, which seem a very large item when compared with the total interest on the life fund of Rs. 8·26 lakhs, the latter item being 6 per cent. on the fund guaranteed by the share-holders and transferred from their revenue account."

হিন্দুস্থানের অংশীদারেরা ১০ বা ১১ লক্ষ টাকা গৃহ-নির্ম্মাণের শক্তিস্বপকর সংবাদে কি ভাবিবেন জানি না। কিন্তু যে কোম্পানী দীর্ঘ ২০ বৎসর কাল অংশীদারদিগকে এক কাণা' কড়ি লাভের অংশ দিতে পারে না, সে কোম্পানীর পক্ষে ১০ বা ১১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাড়ী নির্ম্মাণের চেষ্টা কিরূপ, তাহা হিন্দুস্থানের হতভাগ্য অংশীদাররা এবং তথা হিন্দুস্থানে বীমাকারীরা ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

——

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

নিউ থিয়েটার্স

শ্রীনীতীন বসুর হিন্দী-বাংলা চিত্র "সুরদাসে"-র মহলা বিশেষভাবে চল্‌ছে। সুপ্রতিষ্ঠিত অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে সুস্থ হ'য়েই "সুরদাসে"-র মহলায় যোগদান কোরেছেন।

সঙ্গীত-পরিচালক শ্রীরাইচাঁদ বড়াল সঙ্গীত মহলার জন্য আনুষঙ্গিক কার্য্যে ব্যস্ত আছেন।

* * *

'এ ইউনিটে' শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দী সবাক-চিত্র "পূরণ ভকতে"-র তামিল সংস্করণ তুলছেন। আলোক-চিত্র-শিল্পী ও শব্দ-যন্ত্রীর কাজ কোরছেন যথাক্রমে মিঃ ইউসুফ মুলজী ও লোকেন বসু।

* * *

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্রের একান্ত সহযোগিতায় শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়ার হিন্দী "দেবদাসে"-র মহলা 'বি ইউনিটে' জোরভাবে চল্‌ছে। শ্রীমতী ক্ষেত্রবালার নাচের মহলা নিয়ে এঁরা ব্যস্ত আছেন—এবং তাঁর নাচ দেখে এবার যা'তে সকলে খুসী হন তার ব্যবস্থা হ'চ্ছে।

* * *

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ "বিজয়া"-র চিত্রনাট্য লেখা শেষ কোরেছেন। ভূমিকা এখনও পাকাপাকি ঠিক না হ'লেও শ্রীঅমর মল্লিক যে রাসবিহারীর অংশে নামবেন—তা' ঠিক হ'য়েছে।

* * *

ব্রিটিশ একাউষ্টিক রেকর্ডিং সেট্ পৌচেছে—এই সেটের কাজ "সুরদাস" থেকেই বোধ হয় আরম্ভ হবে।

'বি ইউনিটে'-র আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ বৃহৎ সাউণ্ড প্রুফ ষ্টুডিওর কাজ দ্রুতগতিতে এগুচ্ছে।

* * *

"কারওয়ান-ঈ-হায়াতে"র অন্যতম পরিচালক শ্রীহেম চন্দ্র প্রেম-মুখর একখানি হিন্দি ছবি শীঘ্রই তোলা সুরু কোরবেন। এতে নামবেন সাইগাল, নবাব, মলিনা, রাজকুমারী প্রভৃতি।

নিউ ইণ্ডিয়া

শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় লাহোর ষ্টুডিওতে নিউ ইণ্ডিয়ার তৃতীয় অবদান "ব্লাড ফিউড্" চিত্রে মলিনার নাচের কয়েকটি সঙ্গতি ছাড়া অন্যান্য কাজ শেষ হ'য়েছে।

ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স

এদের জয়পুরে নতুন সবাক-চিত্রগৃহ 'মানপ্রকাশ টকীজে'-র ২রা মে জয়পুরের মহারাজ কর্ত্তৃক উদ্বোধিত হ'বে। এই উপলক্ষ্যে শেঠ রাধাকিষেণ জয়পুর যাত্রা কোরেছেন।

রঙমহল ফিল্মস্

কালী ফিল্ম ষ্টুডিওতে এদের "মহানিশা-"র একদিন শুটিং হ'য়েছে।

দেবদাসের গান

"আঁকা বাঁকা এ-পথ ধরে চল্‌ছে দিবারাতি
নিভ নিভ হয়ে এল এ জীবনের বাতি।"

—এই গানের মধ্য দিয়ে দেবদাসের ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দেবদাসের জীবনের চরম পরিণতি পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।—এ কথা আমরা পত্র প্রেরক শ্রীসুশীল সেনের সঙ্গে একমত। গান রচয়িতা বাণীকুমার

কাহারে সে জড়াতে চায় কোমল দু'টি বাহুলতা
যেতে হবে যেতে হবে যেতেই হবে রে!
মরণ আমার...............

প্রভৃতি গানগুলির মধ্যে দিয়ে যে মধুর ও করুণ রসের সৃষ্টি কোরেছেন তার জন্য পত্র প্রেরকের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা বাণীকুমারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সংবাদিকা

প্রমথনাথের মৃত্যু

দাঁতনে যে বাঙ্গালী যুবকের শবদেহ পাওয়া গিয়াছিল তাহা মেয়রের মামলার ফরিয়াদী অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের মৃতদেহ বলিয়া তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীবিমলেন্দু সরকার গতকল্য লালবাজারে তাঁহার ফটো সনাক্ত করিয়াছেন।

মেয়রের মামলার রায়

গত মঙ্গলবার চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মেয়রের মামলার রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

কলিকাতার নূতন মেয়র

মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক্ ও শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার রায় চৌধুরী যথাক্রমে মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

চন্দ্রগুপ্ত

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর হিন্দী সবাক-চিত্র "চন্দ্রগুপ্ত" গত ২০শে এপ্রিল থেকে গণেশ টকী হাউসে চল্‌ছে। ছবিখানা দেখে আমরা বিশেষ প্রীত হ'য়েছি। একমাত্র শ্রীধীরাজ কুমার ভট্টাচার্য্যের চন্দ্রকেতু ছাড়া পুরুষ ভূমিকাগুলি সুঅভিনীত হ'য়েছে। ছায়ার ভূমিকায় শ্রীমতী সবিতা দেবীকে মানিয়েছিল চমৎকার—সেই পরিমাণে ভাবব্যঞ্জনা যদি তাঁর আর একটু পরিস্ফুট হ'ত তা' হ'লে শ্রীমতীর অভিনয় উচ্চ প্রশংসা পাবার যোগ্য হ'ত। করদারের

পরিচালনা, কৃষ্ণগোপালের আলোক-চিত্র, নিগমের শব্দ-নিয়ন্ত্রণ, কৃষ্ণচন্দ্র দের সঙ্গীত পরিচালনা প্রশংসনীয়।

মিঃ ডব্লিউ

"চন্দ্রগুপ্তে"-র সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের মিঃ ডব্লিউ নামে একখানা উর্দ্দু ছোট হাসির ছবি দেখানো হয়। এই ছবিখানির পরিচালক শ্রীযতীন দাস ও অভিনেতা হাসান দিনকে আমরা প্রশংসা করি।

এভারগ্রীন পিক্‌চার্স

উক্ত প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় অবদান "পঞ্চবানে"র মহলা শেষ হয়েছে। এই ছবিতে শ্রীসন্তোষ দাস, ললিত মিত্র, সন্তোষ সিংহ, মিস্ হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী), মিস্ নমিতা প্রভৃতি অনেক নামজাদা অভিনেতৃবর্গের সমাবেশ করা হয়েচে। ক্যামেরার হাতল ঘুরোবেন পি, স্যাণ্ডেল ও শব্দ নিয়ন্ত্রণের ভার পড়েছে হিতেন মজুমদারের ওপর।

রীভেন এণ্ড কোং

অত্যল্পকালের মধ্যেই এই চিত্র-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানটি যে কয়খানি ছবি প্রদর্শনের জন্য সংগ্রহ কোরেছেন—তা'তে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরা কালী ফিল্মস্ চিত্রের একমাত্র সরবরাহকারক। এতদ্ভিন্ন পায়োনিয়রের "মা" ও আগতপ্রায় চিত্র "দেবদাসী" এবং "ফাইটিং পাইলট," "লষ্ট সিটী," "জাঙ্গল গডেস্" প্রভৃতি কয়েকখানি চিত্ত-উত্তেজক সবাক্-চিত্র শীঘ্রই কোল্‌কাতায় ও মফঃস্বলে প্রদর্শনের ব্যবস্থা কোরেছেন। এঁদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন হ'ক—এই আমাদের কামনা।

রূপবাণী

আগামী ৪ঠা মে শনিবার থেকে লরেল হার্ডির কৌতুককর "বেবস্ ইন্ টয়ল্যাণ্ড" সুরু হবে। খেলনার দেশ বলে এক কাল্পনিক রাজ্যের মজাদার কাহিনী নিয়ে এই ছবি তৈরী হয়েছে। এই ছবিখানি একাধারে ছেলেরা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক সবাই একসঙ্গে বসে দেখতে পারবেন এবং সবাই হাসিতে যোগ দিতে পারবেন।

কালী ফিল্মস্

ডি, এল্, রায়ের প্রহসন "বিরহ" তুল্‌তে এখন এঁরা বিশেষ ব্যস্ত। শোনা যাচ্ছে, 'রূপবাণী'-তে আস্‌চে ১১ই মে "মানময়ী গার্লস্ স্কুলে"র সঙ্গে এই হাস্যরসাত্মক ছবিখানি দেখানো হবে। এতে অভিনয় কোরেছেন—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শ্রীজীবন গাঙ্গুলী, শ্রীমতী শিশুবালা, শ্রীমতী মায়া মুখার্জ্জি, শ্রীমতী রাণীবালা প্রভৃতি।

অভিশপ্ত ও ব্যথিত জীবনের অবসান

অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের বিড়ম্বিত জীবনের শোচনীয় পরিণতিতে দেশবাসী তাঁহার একমাত্র পুত্রহারা শোকাতুরা বিধবা জননীকে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে। এ শোকের সান্ত্বনা নাই—বৃদ্ধার একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র সম্বল যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্য দিয়া মৃত্যু-কবলিত হইয়াছে তাহাতে দেশবাসী মর্ম্মাহত অপেক্ষা ততোধিক স্তম্ভিত হইয়াছে। সহায়-সম্পত্তিহীন এই দরিদ্র শিক্ষিত যুবক তাহার বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভ হইতে যে অশান্তি ও দুর্ভোগের যাতনা নিত্য অনুভব করিয়াছিল; পত্নী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া তাহার সান্নিধ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল, আজ ভাগ্যচক্রের ক্রূর পরিহাসে সে নিন্দা-স্তুতির বহুদূরে।

যে মর্ম্মন্তুদ বেদনায় নিপীড়িত হইয়া সে রাজদ্বারে বিচারের প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার ফল প্রকাশের পূর্ব্বেই সে তাঁহারই সম্মুখে আজ বিচারপ্রার্থী যিনি ন্যায়, ধর্ম্ম ও সত্যের প্রতীক।

জুবিলি উপলক্ষে

আতসবাজীর

—বিরাট আয়োজন—

(কলিকাতার জুবিলি উৎসব কমিটী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত)

মঙ্গলবার ৭ই মে ১৯৩৫ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়

স্থান—টার্ফ্ গ্রাউণ্ড, ফোর্ট উইলিয়ামের দক্ষিণ পশ্চিম দিকস্থ ক্রমনিম্ন ভূমি।

প্রিন্সেপ মেমোরিয়েলের পশ্চাদ্দিক হইতে প্রবেশ পথ।

মোটর রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র স্থানের ব্যবস্থা

কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মোটর রাখিবার স্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সম্মুখের শ্রেণীতে প্রত্যেক মোটর পিছু ১০৲ টাকা।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রতি মোটর পিছু ৫৲ টাকা।

কার এণ্ড মহলানবীশে—৩ নং চৌরঙ্গী রোডে পূর্ব্বাহ্নে টিকিট পাওয়া যাইবে।

কেবলমাত্র ট্যাক্সি ও প্রাইভেট মোটরের জন্য টিকিট পাওয়া যাইবে—বাস অথবা লরীর জন্য নহে।

দাঁড়াইবার স্থান—প্রত্যেক দর্শকের জন্য রিজার্ভ করা পরিবেষ্টনী (দাঁড়াইবার স্থান)।

প্রতি টিকিটের মূল্য ২৲ টাকা—গেটগুলিতে টিকিট বিক্রয় হইবে।

প্রিন্সেপ ঘাট মেমোরিয়েলের পশ্চাদ্দিকে সেণ্ট জর্জ্জেস গেট রোড দিয়া প্রবেশ পথ।

আপনার সমগ্র পরিবার সহ আসিয়া

এই বিরাট প্রদর্শন উপভোগ করুন।

প্রসূতি ও শিশু

ডাঃ বিপিন চন্দ্র পাল, এম, বি,

শিশু সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান হয়—সকল পিতা মাতাই ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, টাকা পয়সা, ধনদৌলত অপেক্ষা সুন্দর সবল শিশুই পিতা-মাতার অধিক গৌরবের জিনিষ। এবং দেশের ভবিষ্যৎ অনেক কিছু ও তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। যে দেশের যুবকবৃন্দ যত সবল, কষ্ট সহিষ্ণু এবং উদ্যমশীল, সেই দেশ তত উন্নত। পিতামাতা হইতে অর্জ্জিত সিফিলিস যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে মৃত মুষ্টিমেয় শিশুর সংখ্যা বাদ দিলে দেখা যায় যে অধিকাংশই উপযুক্ত জীবনী শক্তির অভাব বশতঃই অথবা গর হজম জনিত কোন প্রকার রোগ বশতঃ অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া থাকে। নানা কারণ বশতঃই শিশুদের এই সমস্ত রোগ হইতে পারে। তবে প্রধান কারণটি বোধ হয় মাতার অসুস্থতা এবং দুর্ব্বলতা। গর্ভাবস্থায় সাধারণতঃ সকল স্ত্রীলোকের শরীরই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শরীরের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার সঙ্গে এই গর্ভাবস্থার দুর্ব্বলতা মিশিয়া এক ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে এই সমস্ত গর্ভজাত সন্তানের অনেকেই দুর্ব্বল এবং অল্পায়ু হইয়া অচিরকাল মধ্যেই ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিশু রোগের আসল কারণটি হইতেছে প্রসূতির অসুস্থতা। সুতরাং দেশের শোচনীয় অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রসূতিগণের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করা কর্ত্তব্য। এবং গর্ভাবস্থা হইতেই গর্ভিনীর পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করা উচিত। ইহাতে প্রসূতির যেমন উপকার হয়, গর্ভস্থ সন্তানেরও তেমনই উপকার হইয়া থাকে। ইহা ঠিক যে স্তন দুগ্ধই শিশুর প্রকৃত খাদ্য। সুস্থমাতার দুধই শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার প্রকৃত উপাদান এবং ইহাই শিশুকে নানা প্রকার রোগ হইতে রক্ষা করিতে পারে।

প্রসূতির শুষ্ক স্তনে দুগ্ধ পুনরানয়ন করিবার নিমিত্ত এবং তাহার রক্তহীনতা রোগ দূর করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে "রচিটোন্" নামক সুপ্রসিদ্ধ টনিক ব্যবহার করায় বিশেষ সুফল লাভ হইয়াছে। ইহা বিখ্যাত রচি কোম্পানীর তৈয়ারী একটি যুগান্তকারী মহৌষধ। ইহা সেবনে প্রসূতির হজম শক্তি উৎকর্ষ লাভ করে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনীত হয় এবং জরাজীর্ণ দেহ পুনর্গঠিত হইয়া রক্তহীনতা চিরতরে লুপ্ত হয়। রচিটোন্ গর্ভাবস্থার মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসবের পর বেশ কিছুকাল পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে সেবন করিলে প্রসূতির ত কোন রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকেই না, শিশুরও চিররুগ্ন হইবার অথবা অকাল মৃত্যু হইবার ভয় থাকে না। শিশুকে বাজারের কৃত্রিম খাদ্য খাওয়াইয়া তাহার স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যৎ নষ্ট না করিয়া তাহার মাতাকে নিয়মিত ভাবে রচিটোন্ সেবন করাইলে শিশু প্রকৃতদত্ত খাদ্য (স্তন্য দুগ্ধ) খাইয়া স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য উভয়ই লাভ করিতে পারে।

উপরে যে প্রেমিক-প্রেমিকাকে দেখ্‌ছেন—এরা হ'চ্ছেন ক্লডেট্ কলবার্ট ও ফ্রেড্ ম্যাক্‌মারে। প্যারামাউন্টের "গিল্‌ডেড্ লিলি" চিত্রে এদের অভিনব অভিনয় দেখে সকলে বিস্মিত হয়েছেন!

ব্রীজ খেলা
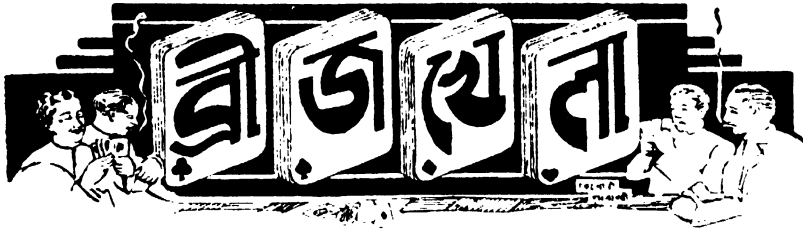
দুর্ব্বাসা

আবাহনমূলক ডবলে প্রতিপক্ষের উত্তর (Procedure after an opponent's take out double) :— প্রতিরোধ কারীর এই প্রকার 'ডবলের' পরে খেঁড়ীর কি করা উচিত তা' গত সপ্তাহে বলেছি এবার প্রতিপক্ষের কি করা উচিত তা' বল্‌ব। মনে করুন ভাল্‌নারেব্‌ল অবস্থায় 'ক' ডেকেছেন 'একটি ইস্কাবন' 'আ' বলেছেন 'ডবল'। এবার 'খ' কি বল্‌তে পারেন ? 'খ'র হাত সাধারণতঃ তিন রকম হতে পারে।

(১) হাতে আড়াইখানি বা তার চেয়ে বেশী অনারের পিট থাক্‌তে পারে। এ হাত প্রচণ্ড শক্তিমূলক।

(২) হাতে একখানির বেশী ও আড়াইখানির কম অনারের পিট থাক্‌তে পারে।

(৩) হাতে একখানির কম অনারের পিট থাক্‌তে পারে কিম্বা হাত অনারবিহীনও হতে পারে।

(১) হাতে আড়াইখানি বা তার বেশী অনারের পিট থাক্‌লে কিম্বা ভাল হাতের বিভাগ সমেত দুইখানি অনারের পিট থাক্‌লে 'খ' তৎক্ষণাৎ 'রি-ডবল' করবেন। এই 'রি-ডবল' 'খ'র হাতের অনারের শক্তির জ্ঞাপক। এ ডাক অবশ্য তাঁর হাতের ইস্কাবনের প্রাচুর্য্য নির্দ্দেশ করে না। ফলতঃ ইস্কাবন ডাকের উপর 'রি-ডবল' হলেও 'খ'র হাতে ইস্কাবন নাও থাক্‌তে পারে। 'খ'র 'রি-ডবল' 'ক'র কাছে নিম্নলিখিত বার্ত্তা ঘোষিত করছে। এই 'রি-ডবলের দ্বারা 'খ' জানাচ্ছেন, "ওগো বন্ধু, তুমি একটি ইস্কাবন ডেকে জানিয়েছ যে তোমার কাছে ন্যূনকল্পে তিনখানি অনারের পিট আছে, প্রতিপক্ষ 'আ' ডবল দিয়ে জানিয়েছেন যে তাঁর কাছে তিনখানি অনারের পিট আছে ; এবার আমি 'রি-ডবল' দিয়ে জানাচ্ছি যে বাকী যা' কিছু অনারের পিট (অর্থাৎ আড়াইখানি) তা' আছে আমার কাছে। সুতরাং আর খেঁড়ীর কাছে অর্থাৎ 'অ'র কাছে অনারের পিট নেই ! এ অবস্থায় তিনি যদি 'আ'কে বাঁচাবার জন্য কোন ডাক দিতে চান তবে তুমি সানন্দে 'ডবল' দিও (অবশ্য যদি 'অ'র কথিত রঙের কোন এক

খানি নিশ্চিত পিট পাবার সম্ভাবনা তোমার থাকে) আর যদি ডবল দিতে অসমর্থ হও তবে পাস দাও, আমার কাছে ডাক আসুক আমি যথাকর্ত্তব্য করব।" 'খ'র 'রি-ডবল' 'ক'র কাছে এই বাণী প্রচার করবে।

ফলতঃ এরূপ স্থলে 'রি-ডবল' করার অর্থই হচ্ছে এই যে 'রি-ডবল-কর্ত্তা' এবার নিজের হাতে চাবুক নিতে চান এবং প্রতিপক্ষের ডাক তাঁর কাছে ফিরে এলে তিনি যথাকর্ত্তব্য করতে চান্। সুতরাং প্রারম্ভিক ডাকদারের হাত কোনওরূপ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক না হলে তাঁর পক্ষে প্রতিপক্ষের ডাকের উপর পাস দেওয়াই বিধেয়। তাঁর খেঁড়ী অর্থাৎ 'রি-ডবল-কর্ত্তা' যদি পুনরায় 'ডবল' দেন তবে তাঁদের খেঁসারৎ পাবার সম্ভাবনা খুবই বেশী এবং 'গেমের' পয়েন্ট অপেক্ষা সে খেঁসারৎ অনেক বেশী লাভজনক হবে।

(২) হাতে একখানির বেশী কিম্বা আড়াইখানির কম অনারের পিট থাকলে:—

(ক) (যদি হাতে একটি ডাকযোগ্য পাঁচ খানি বা তার বেশী তাস থাকে) এ ক্ষেত্রে 'খ'র পক্ষে সেই রঙ তৎক্ষণাৎ ডাকা উচিত। মনে করুন 'খ' পেয়েছেন ইস্কাবন—সাতা, দুরি; হরতন—বিবি, দশ, নয়, তিরি; রুহিতন—টেক্কা, বিবি, দশ, সাতা, দুরি; চিড়িতন—দশ, আটা। তা' হলে ডাক হবে

'ক'	'আ'	'খ'
একখানি ইস্কাবন,	'ডবল'	দুইখানি রুহিতন

(খ) (যদি হাতে খেঁড়ীর সমর্থনযোগ্য রঙ থাকে) এরূপ অবস্থায় পূর্ণমূল্য নির্দ্ধারণ করে হাতে যতখানি বাড়তি ডাক আছে এক সঙ্গে ততখানি ডাকা উচিত। মনে করুন 'খ'র হাত আছে

ইস্কাবন—বিবি, আটা, ছক্কা, পাঞ্জা, চৌকা; হরতন—দশ, সাতা, তিরি; রুহিতন—দুরি; চিড়িতন—টেক্কা, নয়, সাতা, চৌকা।

এ ক্ষেত্রে 'আ'র 'ডবলের' পরে 'খ'র ডাক হবে 'তিনখানি ইস্কাবন'।

(গ) (যদি হাতে কোন রঙের ছয় খানি বা তার বেশী বড় তাস থাকে) এরূপ অবস্থায় উক্ত রঙে শুদ্ধকারী ডাক দেওয়াই বিধেয়। মনে করুন 'খ'র হাত আছে

ইস্কাবন—সাতা; হরতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, নয়, সাতা, তিরি, দুরি; রুহিতন—দশ, নয়, সাতা, দুরি; চিড়িতন—দশ।

এ ক্ষেত্রে 'আ'র 'ডবলের' পরে 'খ'র ডাক হবে 'চারখানি হরতন' ('ক'র কাছে সাধারণ সমর্থনযোগ্য খেলার পিট আশা করে তিনি এই ডাক দিবেন)।

উল্লিখিত (খ) ও (গ) পর্য্যায়ভুক্ত ডাক হাতের শক্তির পরিচয়জ্ঞাপক নহে। 'খ' এই প্রকার ডাক দিলে 'ক' বুঝবেন যে তাঁর খেঁড়ীর হাতে অনারের পিটের প্রাচুর্য্য নেই বটে কিন্তু রঙের বিভাগ ভাল। 'খ'র 'রি-ডবল' এ ক্ষেত্রে একমাত্র শক্তিব্যঞ্জক। কেবলমাত্র এই ডাকের দ্বারাই তিনি তাঁর অনারের শক্তির ঘোষণা করতে পারেন। অন্য ডাক ভাল বা সাধারণ বিভাগের পরিচায়ক মাত্র।

(৩) হাতে একখানির কম অনারের পিট থাক্‌লে কিম্বা হাত অনারবিহীন হলে এ ক্ষেত্রে পাস দেওয়াই একমাত্র ডাক। অনেক কাঁচা খেলোয়াড় আবাহনমুলক 'ডবলের' পর হাতে কিছু না থাক্‌লেও ডাক দিয়ে খেঁড়ীকে বাঁচাতে যান্। সেটা ভয়ানক ভুল কেন না খেঁড়ী মোটেই বুঝতে পারেন না যে তাঁর হাতে কি আছে। তিনি ভাবেন যে নিশ্চয়ই দেড়খানি অনারের পিট বা তার বেশী কিছু তাঁর খেঁড়ী নিশ্চয়ই পেয়েছেন; নতুবা আবাহনমুলক 'ডবলের' পর পাস না দিয়ে ডাক দিতে এসেছেন কেন? ফলে ডাকবৃদ্ধি এবং অবশ্যম্ভাবী ফল প্রচণ্ড খেঁসারৎ প্রদান। নিম্নলিখিত বা তত্তুল্য হাত পেলে

আর 'ডবলের' পরে 'খ'র পক্ষে পাস দেওয়াই প্রশস্ত।

ইস্কাবন—সাতা, দুরি; হরতন—গোলাম, নয়, সাতা, তিরি, দুরি; রুহিতন—দশ, আটা, তিরি; চিড়িতন—বিবি, নয়, সাতা।

প্রতিপক্ষের 'রি-ডবলের' প্রত্যুত্তর (Procedure after a redouble of a partner's take out double) :—

'ক'	'আ'	'খ'	'অ'
একটি ইস্কাবন	'ডবল'	'রি-ডবল'	?

'অ' এবার কি বলবেন? কালবার্টসন নিয়মে 'অ' যদি মনে করেন একটি ইস্কাবনের খেলা হবেই তবে তিনি পাস দিতে পারেন নতুবা তাঁকে ডাকতেই হবে। অর্থাৎ ভাল হাত পেলেই তিনি পাস দিতে পারেন নতুবা নয়। ফলতঃ 'অ'র হাত যত খারাপ হবে ডাক দেবার দরকার তাঁর ততখানি বেশী (the weaker the hand is, the more urgent it is for him to bid)। মনে করুন 'ক'র একটি no trump ডাকে 'ডবল' ও 'রি-ডবল' হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'অ' যদি আড়াইখানি বা তার বেশী অনারের পিট পান তবে তিনি পাশ দিতে পারেন। তিনি যদি দুইখানি অনারের পিট পান এবং প্রচুর মাঝারী তাস (intermediate cards) পান তা হলেও তিনি পাস দিতে পারেন। (উদাহরণ, যথা—ইস্কাবন—গোলাম, দশ, সাতা; হরতন—সাহেব, দশ, নয়, সাতা রুহিতন—সাহেব, গোলাম, দশ; চিড়িতন—বিবি, গোলাম, নয়।) কিন্তু রঙের খেলায় 'ডবল' বা 'রি-ডবল' হলে প্রতিপক্ষের রঙে চারখানি সুনিশ্চিত পিট পাবার সম্ভাবনা থাকলে তবেই তিনি এ ক্ষেত্রে পাস দিতে পারেন নতুবা নয়। আর, যদি তাঁর কাছে প্রতিপক্ষের কথিত রঙের একটি বড় তাস এবং একটি অনারের পিট থাকে তবে তিনি একটি No Trump দিতে পারেন। তাঁর হাতে যদি অনারের পিট মোটেই না থাকে আর তাঁর হাতে যদি ডাকযোগ্য 'মেজর' না থাকে তবে তিনি একটি চার তাস সমেত 'মাইনর-সুট' (minor suit) ডাকতে পারেন। আর যদি উক্ত 'মাইনর সুট' প্রতিপক্ষ আগেই ডেকে থাকেন তবে তিনি তিন তাস নিয়েও অন্য 'মাইনর সুটটী' ডাকবেন।

আবাহনমূলক রি-ডবল S.
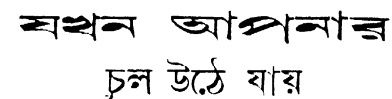
O. S. Redouble) :—মনে করুন ডাক হয়েছে নিম্নলিখিতরূপ :—

'ক'	'আ'	'খ'	'অ'
একটি No Trump	'ডবল'	'পাস'	'পাস'

'ক' মনে করেন একটি No Trump-এর খেলায় খেঁসারৎ দিতে হবে প্রচুর সুতরাং তিনি 'খ'-র কাছ থেকে একটি ডাক চান্। সে ক্ষেত্রে তাঁর ডাক হবে 'রি-ডবল'। এই ডাক হচ্ছে আবাহনমূলক। অর্থাৎ 'খ'কে এবার ডাক দিতেই হবে। 'খ'র হাত যা'ই থাক না কেন তাঁর হাতে যে রঙের সবচেয়ে বেশী তাস আছে সেই রঙটা ডাক দিতেই হবে। মিঃ কালবার্টসন্ বলেন, "To leave the S. O. S. redoubler in the lurch is almost worse than to ignore the pitiful little cries of a baby lost in a snowstorm."

বড়াল ফ্রেণ্ডস্ :—এই সমিতির 'ডুপ্লিকেট টুর্ণামেণ্ট' বেশ ভালভাবেই চলেছে। আমাদের প্রবীণ বন্ধু কেদারবাবু যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন এই টুর্ণামেণ্টের সাফল্যের জন্যে তা, দেখে আমাদের young friends-দের লজ্জা পাওয়াই উচিত। প্রকৃতপক্ষে কাজের সময় 'বড়াল ফ্রেণ্ডস্'-এর অন্যান্য হর্ত্তাকর্ত্তারা কোথায় থাকেন তা' আমরা জানি না কিন্তু এদের পাকা মাঝি কেদারবাবু ঝড় জল রৌদ্র সবই উপেক্ষা করে, থাকেন এদের হালে। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের বাড়ী যাওয়া, যথাসময়ে তাঁদের খবর দেওয়া প্রভৃতি সমস্ত ছোট বড় কাজ তাঁকে একাই সম্পন্ন করতে হয়, অথচ তাঁর কাজের মধ্যে এতটুকুও গলদ পাবার উপায় নেই। সুতরাং মোটের উপর এঁদের টুর্ণামেণ্ট যে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হবে তাতে সন্দেহ নেই।

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

বভ্রুবাহন বটব্যাল

চুম্বনে তারকা

চুমু খেতে কে না চায়, আর পেলে কে না খায়। যে ভাল না বাসে তার স্থান ঘরেও না বাহিরেও না—আর কোথায় তা আমি জানিনা। কিন্তু তবু এই চুমু খাওয়াতেই

জন ক্রফোর্ড

অসংখ্য সঙ্কোচ। ধরুন আপনার প্রিয়তমা আপনার কাছে এসেছে, আপনাকে জড়িয়ে ধরেছে—তার দেহের ওপরকার শাড়ী খানা, তার গরম হাত দুখানা—তার চুলের গন্ধ, নিঃশ্বাস আর চুলের আলগা স্পর্শ আর চোখের ওপর অতৃপ্ত অথচ সকাতর ফ্যাল-ফ্যালে চাহনি—এমন সময়ে দূরে আপনি দেখতে পেলেন কে একজন আপনাদের দেখছে—পারেন—পারেন তখন আপনি চুমু খেতে, ঠিক ওমনিই হয় ওদেশের ষ্টারদের। তবুও ওরা ঘাটে মাঠে হাটে বাটে চুমুর সৃষ্টি ছড়িয়ে বেড়ায়। চুমুর রেকর্ড তৈরী করে—একদিন, দুদিন, আর সাড়ে-তিন দিন। ওরা নেচেই মেরে দেয় সাত দিন—আর জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকে পাঁচ দিন আর শুনেছি, পনেরো বিশ বারের রেকর্ড অসংখ্য রকমের অসংখ্য ভাবের। সে যাক্ শুনুন গল্প!—ফ্র্যাঞ্চট টোন বিছানার ওপর শুয়ে···জোয়ান ক্র্যাফোর্ডের সঙ্গে প্রেমের দৃশ্যে অভিনয় করছেন। সেই হচ্ছে তার জীবনে প্রথম প্রেমের দৃশ্যে নামা। ব্যাপারটা এই ফ্র্যাঞ্চট টোন চুমু খাবে ত ক্র্যাফোর্ডকে—আলো আর এত লোক দেখে ঘাবড়ে গেছে। ফ্র্যাঞ্চট কী করবে ভাবছে, এমন সময়ে পরিচালকের নির্দ্দেশানুযায়ী ফ্র্যাঞ্চট কোন রকমে মুখ নীচু করে সে যাত্রা থেকে উদ্ধার পেলেন।

আর একবার লজ্জায় পড়ে ছিলেন ম্যাক্স বিয়ার 'এভ্রি ও ম্যান্স ম্যানে'। তাঁকে মিরণাকে জড়িয়ে ধরতে হবে—চুমু খেতে হবে। ম্যাক্সি মিরণাকে হাতে করে জড়িয়ে ধরলে, বুকের কাছে প্রাণপণে টিপে ধরলে—কিন্তু চুমু খাওয়া আর হচ্ছেনা, পরিচালক বারবার ইসারা করছেন, ম্যাক্সির আর সাড় হয় না তারপর হঠাৎ মুখ খানা মুখের ওপর গুজে দিলেন। পরিচালক জিজ্ঞেস করলেন : ম্যাক্সি বল্লেন মিরণাকে আমার মনে হচ্ছিল যেন একটা কাপড়ের বস্তা তাই পারছিলাম না।

এইবার জন বোলসের গল্প বলে শেষং

করব। এরপর আর একদিন এ গল্প আরম্ভ করা যাবে। এখন গল্প শুনুন—জন বোলস আর গ্লোরিয়া সোয়ানসন দুজনে নামছেন 'মিউজিক ইন দি এয়ার'এ। জন বোলসের সেই প্রথম নামা। সেবার দরকার

ওয়ালি বিয়ারি

পড়েছে একটা প্রেমের দৃশ্যে,। জন সেই দৃশ্যের এক বন্ধুর কাছে গল্প করেছেন—আমি গ্লোরিয়াকে হাতের মধ্যে নিলাম, গ্লোরিয়া মুখ খানা আমার মুখের কাছে তুলে ধরলেন। আমার শরীর শক্ত হয়ে গিয়েছে, আমার কেবলি মনে হচ্ছে এ আমি কী কর্চ্ছি। গ্লোরিয়া বার বার বলেছেন "কী কচ্ছেন—অত জোরে চেপে ধরবেন না একটু আলগা করে ধরুন।' তার মহলা কিছুতেই ঠিক হয় না। গ্লোরিয়া তাঁকে হাত ধরে সেট থেকে বাহিরে নিয়ে গিয়ে কয়েক বার চুমু খেয়ে বল্লেন আপনি আমার যটা ইচ্ছে চুমু খান ভয় নেই আমি আপনাকে চড় দেবোনা। ভুলে যাচ্ছেন কেন আমি এখন 'ক্যাসা লোভা।' কিন্তু, সত্যিই ছবি তোলা আরম্ভ হোল জেনে তখনও কিছুতেই ভুলতে পারছেন না যে তাঁর হাতের মধ্যে শ্রদ্ধেয়া গ্লোরিয়া সোয়ানসন। হঠাৎ কাট, কাট শব্দ তা'র কাণে এলো, জন গ্লোরিয়ার মুখ থেকে মুখ তুলে দাঁড়ালেন। সবাই চেয়ে দেখলে তাঁর ঠোঁটে, গালে, কপালে গ্লোরিয়ার মুখের রং লেগে চারিদিক ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া হয়ে গিয়েছে। গ্লোরিয়া বল্লেন—আমার গা থেকে যেন কে জাহাজের কাছির বাঁধন খুলে নিলেন।

ওয়ালি বিয়ারির মেয়ে

—ক্যারোল এ্যান হচ্ছে বিয়ারির সব ছোট মেয়ে। ভারী ভাব তার জ্যাকী কুপারের সঙ্গে। দু'জনে দুজনকে ভারী ভাল বাসে। সেই ক্যারোলে নামছে ছায়া চিত্রে 'ওয়েষ্ট পয়েণ্ট অব দি এয়ারে'। মোটে তার বয়স চার বছর এরই মধ্যে যা অভিনয় করছে তা অতুলনীয়। ওয়ালির অন্তরের গোপন তলে এতদিন যে কামনা আস্তে আস্তে বেড়ে চলে ছিল আজ তা বাস্তবে রূপ পেতে চলল। আমরাও চাই ওয়ালির মত তার মেয়ের নাম জগতে ছড়িয়ে পড়ুক। ক্যারোল প্রথম নামে 'ভিভা ভিলা'তে। বিয়ারী ক্যারোলকে দত্তক নেন প্রায় তিন বছর আগে। কথা কওয়ার প্রথম দিন থেকেই ক্যারোল এসেছে ছায়া চিত্রে। এইবার নামছে সৈন্যাধ্যক্ষের মেয়ে হয়ে। মরিন ও সুলিভ্যানের ছোট বয়সের অভিনয় নিয়ে।

খুচরো খবর

লি ট্রেসি যখন কাজ করেন তখন দিনে ৬০ টা সিগারেট আর যখন কাজ থেকে দূরে তখন দশটা পান করেন।

যাঁদের চিত্র জগতের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই তারাই আমাদের পক্ষ—ক্লাক গেবল্ বলেছেন।

১৯৩৪ সালের শ্রেষ্ঠ কার্টুন চিত্র 'হলি ল্যাণ্ড' (কলম্বিয়া), জলি লিটল ওয়াইভস

মিরণা লয়

(ইউনিভারসলে), কচ্ছপ ও খরগোস (ওয়াল্ট ডিসনে)।

খবর পাওয়া গেলো ভার্জিনিয়া ব্রুশ আর জন গিলবার্ট আবার মিলবে।

ডগলাস্ আর চার্লিতে এখন ভয়ানক ভাব, তাঁদের প্রথম আলাপ ১৯১৬ সালে।

মায়াবাদ

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশ ভেদ ক'রে লৌহবর্ত্মের উপর দিয়ে ট্রেণ ছুটে চলেছে।

বললাম: বুঝলে রমা, তোমার কথামত সদানন্দ গিরির বাৎসরিক উৎসব দেখতে চলেছি। সত্যি বলছি, আমার কিন্তু মোটেই ইচ্ছে ছিল না।

একটু বিস্ময়ে রমা উত্তর দিলে: কেন? ওর মধ্যে তুমি এমন কী জিনিষের সন্ধান পেলে যাতে তোমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।

মোহন্তজীর ওপর অগাধ শ্রদ্ধা অনন্ত বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু যত গোলযোগ এই তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের নিয়ে।

তাঁরা আবার তোমার কী করলেন?

থাক, সে কথা শুনে তোমার কাজ নেই। তাঁদের উপর তোমার যে-রকম অখণ্ড বিশ্বাস সেটুকু আমি নষ্ট করতে চাইনা।

যা বলবার স্পষ্ট করেই বলে ফেল। ও রকম ধোঁকার মধ্যে রাখতে চাইচো কেন?

সাধুসঙ্গ আমিও কামনা করি। কিন্তু ওঁদের উপর আমার এতটুকুও বিশ্বাস নেই।

এ-আশ্রমের কোন সাধুর সঙ্গে তোমার আলাপ-পরিচয় আছে?

না।

অথচ না জেনেশুনে এতবড় একটা অপবাদ কী করে এদের উপর আরোপ করচো?

এদের জানতে হলে পরিচয় থাকার কোন দরকার নেই, রমা। আসল লেনদেন হলো মানুষের মনটাকে নিয়ে। এর আগে বহু তীর্থস্থান পর্য্যটন করেচি, অনেক সাধু সন্দর্শনও ঘটেচে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করে বুঝেচি এঁরা অন্তঃসারশূন্য। বাইরেকার আবরণের চমৎকারিত্ব তোমায় মোহিত করে দেবে; কিন্তু ঘেটে কিছু পাবে না— আবর্জ্জনা ছাড়া। যে-সব সাধুদের আজ দেখতে চলেচি,—রাগ করোনা রমা—এঁরা আসলে হচ্ছেন উল্লিখিত বহু আশ্রমের সাধুদেরই সমগোষ্ঠী। এঁদের কথাবার্ত্তায়, প্রকাশ-ভঙ্গিমায় হয়তো কিছু নতুন সুর খুঁজে পাবে। আসলে এঁরা একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন।

চোরের মন বোঁচকার দিকে। যত কিছু খারাপ জিনিষ তোমার নজরেই আগে পড়ে। ভাল জিনিষের কারবার তাঁরা কি মোটেই করেন না?

ঠিক বলেছো, রমা। ওঁদের বুঝতে হলে মনটাকে যতখানি উন্নত করা দরকার ঠিক সেই ধাপে এসে এখনো পৌছতে পারি না। তাই পদে পদে অসামঞ্জস্য চোখে ঠেকে। তবুও বলি অক্ষমতাই হচ্ছে ওঁদের আসল পরিচয়।

তার মানে?

জীবন-সংগ্রামে যারা উঠতে বসতে ব্যর্থতার তীব্র কশাঘাত বহন করে তারাই সন্ন্যাসী হয়। বুঝলে রমা?

এঁদের উপর তুমি এত বীতশ্রদ্ধ কেন?—এই সাধু সন্ন্যাসীর দেশে।

এর উত্তর তোমায় এক কথায় বোঝাতে পারবো না।

থাক, দরকার নেই। বুঝতে পেরেচি।

কী আবিষ্কার করলে বলতো?

ছেলেবেলায় একদিন খেয়ালের বশে সন্ন্যাসী হতে গিয়ে নিশ্চয় কোন অসৎ সঙ্গের পাল্লায় পড়ে প্রতারিত হয়েছিলে। তারই প্রতিক্রিয়া তোমার কথাবার্ত্তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।

সন্ন্যাসী হতে গিয়েছিলুম ঠিক। কিন্তু প্রতারিত হয়েছিলুম কী না তা জোর গলায় বলতে পারি না।

তবে আবার ফিরলে কেন? বেশ পথ তো বেছে নিয়েছিলে।

বুঝলুম ওঁদের মত অকর্ম্মণ্য, অক্ষম আমি নই। আমার জীবনীশক্তিকে ওভাবে অপচয় করতে দিতে আমি পারবো না। আমি

সমাজের মধ্যে নিজের সামর্থ্যের জোরে দশের মাঝে একজন হয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

এঁরা তো সকলের পুজো পেয়ে আসচেন চিরকাল।

ভুল করচো, এঁরা নয়। যাঁরা চিরকাল মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়ে আসছেন তাঁদের কোলাহলমুখর জনসমুদ্রের পঙ্কিলতায় সচরাচর সাক্ষাৎ মেলে না। তাঁদের দেখা পেতে হলে চাই পূর্ব্ব জন্মের তপস্যা—সুকৃতি। সমাজের মধ্যে থেকে যোগীরাও ভোগী হয়ে ওঠে। তাই বলছিলুম রমা, দু নৌকায় পা দিলে ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা যায় না। এদের কোন বৈশিষ্ট্য নেই, নেই কোন পরিচিতি। যখন যে ভাবে হাওয়া বয় এরা নিজেদের সেই ভাবে চালিত করেন। তুমি হঠাৎ এত ধার্ম্মিক হয়ে উঠলে কী করে বলতো রমা।

নিজেকেই ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কী জবাব দেবো ?

পল্লীগ্রামের মেঠো বন্ধুর পথ ধরে চলেছি। সকাল হয়ে গেছে। কুয়াসার দুর্ভেদ্য যবনিকাকে কে যেন তুলে ধরেছে। সূর্য্যের লোহিত আভায় পূর্ব্বাকাশ প্রদীপ্ত। গাছের পাতায় পাতায় সূর্য্য-রশ্মির অপূর্ব্ব সমাবেশ।

অতি প্রত্যুষে অনেকগুলি নরনারীকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখে অনুমান করে নিলুম এরা আমাদেরই সহযাত্রী। আশ্রমের উৎসব-বাসরে যোগদান করতে চলেছেন।

অধিকতর নির্জ্জন পথে এসে পড়লুম।

পথের দু ধারে অসংখ্য বাঁশঝাড় পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন-পাশে বন্দী করার আশায় নুইয়ে প'ড়ে—একটি বিরাম কুঞ্জের সৃষ্টি করেছে। এবং ইহারই ফাঁকে ফাঁকে তেঁতুল এবং অর্জ্জুন গাছের সারি। ছায়া-সুনিবিড় নির্জ্জন পথ দিয়ে যেতে যেতে গহন অরণ্যের ভয়াবহ নিস্তব্ধতার কথা আগে মনে পড়ে। সূর্য্য-রশ্মির সহজ প্রবেশাধিকার এখানে দুঃসাধ্য।

চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলুম : তোমার পাড়াগাঁ কেমন লাগে, রমা ?

খুব ভাল। সহরের কোন কোলাহল এখানে পৌঁছায় না। এ রকম নিরিবিলি জায়গা আমি পছন্দ করি। একটা কথা তোমায় বলে রাখি। ওদের সম্বন্ধে তোমার মনে যত খারাপ ধারণাই থাকনা কেন সামনা সামনি কোন অপ্রীতিকর আলোচনা করোনা।

কেন বল তো ?

দু দণ্ডের জন্যে এসে একটা অশান্তি সৃষ্টি করতে চাই না।

বেশ, তোমার কথাই শিরোধার্য্য।

সামনে কাদের প্রকাণ্ড বাগান দেখেচো ?

এরই মধ্যে গৃহস্বামীরা মাতৃদেবীর স্মৃতিকল্পে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেচেন।

লোকজনের অবিরাম যাতায়াত এবং কলগুঞ্জনে নিৰ্জ্জীব বাগানটি মুখর এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেচে।

বাগানের মধ্যে ঢুকে একটু হেসে বললাম : চেয়ে দেখো, রমা—গাছতলায় কী কাণ্ড চলেচে ?

কী বল তো ?

দেখতে পাচ্ছো না ?

কী দেখবো? কতগুলো লোক গাছ তলায় বসে জটলা করচে।

ওর চেয়ে বড় কাণ্ড চলেচে। শীতের সকালটা তাসের আড্ডা কী রকম সরগরম করে তুলেছে, দেখেচো?

ওমা, সত্যিই তো তাই। আজকের দিনে এখানে এগুলো না খেললেই ভাল হতো।

ওদের উপর খামাকা রাগ কোরো না, রমা। বুঝে দেখলে সমস্ত জিনিষটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যে আগ্রহ নিয়ে এরা সাধুসঙ্গলাভ করতে এসেছিলেন সেটা গেছে নিভে। এখানকার আয়োজন-অনুষ্ঠান এদের কোন তৃপ্তিই দিতে পারেনি। অথচ সময় কাটানো এদের কাছে মস্ত একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েচে। এদের তুমি দোষ দিয়োনা, রমা।

একটু এগিয়ে আসতেই প্রমথর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বল্লে: যা হোক্ তুমি যে মনে করে এসেচো রমেন, এই আমার ভাগ্যি। বৌ কোথায়? আসেনি বুঝি? আমি মনে করেছিলুম এবারও আমাদের উৎসবে এলে না।

গিন্নি ছাড়া আজকাল এক পাও কোথাও হাঁটি না। অথচ সেইদিন পর্য্যন্ত কোন পরিচিত ভদ্রমহিলাকে কোথাও নিয়ে যাবার কথা উঠলে মাথায় যেন বাজ পড়তো!

ও! গিন্নি তোমার পেছনেই রয়েচে। যাও দাঁড়িয়ে থেকোনা, রমেন ওকে উপরে নিয়ে যাও। এদিকে আবার একটু দেখাশোনা করি।

আমাদের জন্যে তোমার মোটেই ব্যস্ত হতে হবেনা, প্রমথ। তুমি স্বচ্ছন্দে অতিথি-আপ্যায়ন কর। আমরা মন্দিরটা একবার ঘুরে আসি।

বাগানের এক প্রান্তে মোহন্তজীর মন্দির। মন্দিরের আশপাশের জায়গাটুকু ছিটে-বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরে যাবার ফটক পেরিয়ে যেতেই প্রমথর বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। একটা প্রণাম করলুম। তিনি ছোট্ট একটি প্রশ্ন করলেন: কতক্ষণ এসেচ?

বললুম: এই আসচি।

মন্দিরের সামনে কের্ত্তন হচ্ছে একটু শোন গে। বৌমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেচো বুঝি। বেশ, বেশ। বলে, আর একজন অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে এগিয়ে চল্লেন।

প্রমথর বাবা সমরবাবুকে সত্য সত্যই ভক্তি করতে ইচ্ছে করে। বয়েস অনেক হয়েছে। মাথার সমস্ত চুল শোন দড়ির মত সাদা। অত্যন্ত অমায়িক প্রকৃতির লোক। সারাজীবন ধরে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেছেন। সমাজে পসার-প্রতিপত্তি অনেক। অথচ বাইরেকার কোন আবরণেই ঐশ্বর্য্যের বিপুল বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায় না। অত-বড় একটা লোক অহঙ্কারের বালাই নেই।

সকলের উপর সমান দৃষ্টি। ইনিই হচ্ছেন উৎসবের উদ্যোক্তা, প্রাণ। এরই আগ্রহে এত বড় একটা উৎসবের বিরাট আয়োজন-অনুষ্ঠান।

মন্দিরের সামনে সামিয়ানা ঢাকা প্রাঙ্গনটি পেশাদার কের্ত্তন-গাইয়েদের বিকট চীৎকারে মুখর হয়ে উঠেচে। সামনে একটি বেদীর উপর মোহন্তজীর বড় অয়েল পেন্টিং। এবং এরই আশে পাশে 'গেরুয়াপরা' মোহন্তজীর চেলারা বসে আছেন। কের্ত্তনের দল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়ে গান করছেন কী শোকচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন তা ওদের হাবভাব দেখে বোঝা যায় না।

এখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, রমা? একটু ঘুরে ঘুরে সব দেখিগে চল।

মন্দিরটা একবার দেখে নিই।

মন্দিরের সামনে দাঁড়ালেই আগে চোখে পড়ে কাল পাথরের শিব-মুর্ত্তির উপর। ট্যাবলেটের উপর লেখা আছে প্রতিষ্ঠার নাম ও তারিখ।

মন্দির প্রাঙ্গন থেকে ফিরে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাবো এমন সময় বাড়ীর উঠানে একজন গেরুয়াপরা সাধুর কথা শুনে দাঁড়াতে হলো।

ওকি সিড়ির মাঝখানে আবার দাঁড়ালে কেন?

একটু চুপ কর রমা, এদের কথাটা আগে শুনি।

পাগলামী করোনা, উপরে চলো, কী হবে ওদের কথা শুনে?

লাভ-লোকসানের কথা পরে শুনবো'খন। এখন একটু স্থির হয়ে থাকো।

সাধুটি বলছেন: প্রমথ, একটু চা দিতে পারো।

সে কি, গুরুজির, এখনও যে পূজা শেষ হয়নি।

আমার একটা ভারী বদ অভ্যাস আছে। চা মুখে না দিলে কোন কাজই করতে পারি না।

চল রমা এইটুকু শোনবার জন্যে তোমাকে এখানে দাঁড় করিয়েছিলুম। শুনলে তো— এর পরের জিনিষগুলো আর না শোনাই মঙ্গল। এই হচ্ছে এদের শুচিতা। এরাই মানুষের শ্রদ্ধা কুড়িয়ে বেড়াচ্চেন।

রমা কোন কথা না বলে উপরে উঠতে লাগলো।

খাওয়া-দাওয়া যখন শেষ হলো বেলা বোধ করি তখন তিনটে। পুকুর-পাড়ে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছি। সকালের দিকে যে-রকম লোকের ভিড় দেখেছিলুম এখন অনেক পাতলা হয়ে গেছে। যাঁরা আছেন তাঁদের অনেকেই গাছের তলায় এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্চেন।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ধরণীর উদ্ভাসিত মুখরতা থেমে গেছে। গোধুলির ধূমায়িত ধূসরতার সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছে একটা বিরাট শান্তি, রূপকথার স্বপ্নপুরীর মত। দূরে গৃহস্থের কুটীর থেকে শঙ্খনিনাদ শোনা যাচ্ছে।

খবর এলো গুরুজী বিশ্রামাগার থেকে বেরিয়ে এসে দোতলার একটি বৃহৎ কক্ষে ভক্তদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

খবরটা শুনে আমি কিন্তু একটুও বিচলিত হলুমনা। গুরুদর্শনলাভ মালিকের অশেষ অনুকম্পা না থাকলে ঘটে না। কাজেই অনেকেই এ-সুবর্ণ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে।

বললুম: চল রমা, সাতটা ক'মিনিটের গাড়ীতে বাড়ী ফেরা যাক। অনেকখানি পথ যেতে হবে গল্প করতে করতে যাই চলো।

একটু পরে যেয়ো।

কেন?

সকালের দিকে গুরুজীর ভালো দর্শন মেলেনি। সুযোগ যখন ঘটলো, তাঁকে একবার ভালো করে দেখে যাই। রাত একটু হবে তা হোক। আমার জন্যে আজ একটু না হয় কষ্টই করলে।

রমাকে নিরাশ করতে কেমন যেন বাধবাধ ঠেকলো। নিজের অনিচ্ছাকে দমন করে বললুম: বেশ তো চল না। তোমার জন্যে আমার যদি সাধুসঙ্গ লাভ হয় সে তো আমার পরম সৌভাগ্য।

দোতলার ঘরে প্রবেশ করে দেখলুম এরই মধ্যে ঘরটি লোকে বেশ ভর্ত্তি হয়ে গেছে।

মাঝখানে ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর গুরুজী বসে আছেন। সামনে ঈষৎ উচ্চ চৌকিতে আসন পাতা। একধারে খানকতক বই এবং অপর পার্শ্বে ছোট দুটি রেকাবে তালের মিছরি এবং এলাচ-লবঙ্গ। লক্ষ্য করলুম দুজন অপরিচিত লোক গুরুজীকে সষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেই তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে রেকাব থেকে আগন্তুকদের হাতে দু'টুকরো তালের মিছরি এবং এলাচ-লবঙ্গ তুলে দিলেন। চৌকির ঠিক ধারে একটি রূপোর থালায় অনেকগুলি টাকা রয়েছে। বুঝলুম প্রণামী না দিলে গুরুদর্শনের কোন ফলই হবেনা। পকেট থেকে দুটো টাকা রমার হাতে গুঁজে দিলুম।

প্রণাম-পর্ব্ব শেষ হতেই ঘরের একটি কোণে জায়গা করে নিলুম। রমা আমার পাশে এসে বসলো।

গুরুজীর কাছে সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে আপনার সুখ-দুঃখের কথা বিবৃত করে চলেছেন। তিনি ধ্যানস্থ হয়ে সকলের কথা শুনচেন এবং দু'একটি কথা বলে সকলের দুঃখ-কষ্ট নিরাময় করচেন।

আমার এ-সব দৃশ্য ভাল লাগছিল না। কাজেই চোখ বুজে বসেছিলুম। হঠাৎ কান্নার শব্দ কাণে আসতেই চোখ চেয়ে দেখলুম একটি বৃদ্ধা পায়ের কাছে পড়ে অঝোর নয়নে কাঁদছেন।

গুরুজী প্রশ্ন করলেন: কান্না থামা বেটি। কী হয়েছে তাই আগে বল।

বাবা, আমার বাপ-মা মরা নাতনিটি সম্প্রতি মারা গেচে। এ-কষ্ট আর সহ্য হয়না। এ-কষ্টটা যাতে ভুলে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করে দাও বাবা।

আমি কী করতে পারি।

তুমি না করলে কে করবে বাবা? ব্যবস্থা না করলে তোমার পা ছাড়বো না।

ছাড় ছাড় বেটি পা ছেড়ে দে।

না বললে কিছুতেই ছাড়বোনা।

যে গেছে কাঁদলে কি তুই তাকে আর ফিরে পাবি!

কিন্তু মন যে কিছুতেই প্রবোধ মানচে না, বাবা।

সংসারের মায়াটা তোকে ত্যাগ করতে হবে, বুঝলি? এ-ছাড়া অন্য উপায় নেই। আমার আমার করে সমস্ত জীব মরচে। যা বেটি যা।

বৃদ্ধা উঠে গেলেন। ইহার পরে যিনি এলেন তাঁহার বাহ্যিক আবরণে ঐশ্বর্য্যের বিজ্ঞাপন ঝলমল করছে। গুরুজী সসম্ভ্রমে তাঁকে কাছে বসতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন: কী হয়েচে বলুন তো, লোকেন বাবু? আপনাকে অত মনমরা দেখচি কেন?

মাসখানেক হলো আমার বড় ছেলেটি মারা গেচে।

এ্যা, বলেন কি? কী হয়েছিলো?

নিউমোনিয়া।

ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন নাকি?

আজ্ঞে হাঁ।

ছেলেপিলে কিছু আছে?

একটি মেয়ে। যা হোক কিছু একটা উপায় বলে দিন। কিছুতেই শোক ভুলতে পারছি না।

কী যে বলেন তার ঠিক নেই। চোখের সামনে ছেলের মত ছেলের মৃত্যু দেখে আপনি কী করে এখনো বেঁচে আছেন তাই বুঝতে পারচি না। ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। শান্তি-স্বস্ত্যেন করে আপনার মনের ভাব-বৈলক্ষণ্যকে নষ্ট করে দেব।

রমাকে সঙ্গে করে কখন যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলুম তা স্মরণ হয় না। বাড়ীর দরজায় মোটর দাঁড়াতেই পাশের বাড়ীর ঘড়িতে টং টং করে এগারটা বাজলো।

নাট্য-তরঙ্গ

নাট্যনিকেতনে "ব্রতচারিণী"

নাট্যনিকেতন কর্তৃপক্ষের নিমন্ত্রণে সেদিন (১৯শে এপ্রিল শুক্রবার) তাঁদের নবতম নাটক "ব্রতচারিণী"-র অভিনয় দেখে এসেছি। কর্তৃপক্ষের আদর আপ্যায়নের ত্রুটী ছিল না একথা আমরা খুব আনন্দের সঙ্গেই স্বীকার করবো। সেদিন "ব্রতচারিণী"-র প্রথম রাতের অভিনয়, কাজেই অভিনয় এবং অভিনয় সম্পর্কীয় ব্যবস্থার যে একটু আধটু দোষ থাকবে, তাতে নিন্দে করার বিশেষ কারণ নেই। তবে একটা কথা: দোষ ত্রুটী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার পরও যদি সেগুলো শোধরান না হয়, পরবর্ত্তী অভিনয় রাত্রেও যদি সেগুলো থেকে যায়, তা'হলে অবিশ্যি দুঃখের কথা। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে ঐ রকম দুঃখ করার অবকাশ আমাদের আসবে না।

শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীর "ব্রতচারিণী" নামক উপন্যাস অবলম্বনে নাট্যনিকেতনের অন্যতম নট শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য নাটকটী রচনা করেছেন। "ব্রতচারিণী" উপন্যাস হিসেবে মোটেই দামী নয়, সুতরাং এহেন উপন্যাসকে নাটকাকারে রূপান্তরিত করতে গিয়ে নাটকটীও যে খুব উঁচুদরের হবে না, এবং তা অবশ্যম্ভাবী, সে কথা বলা বাহুল্য। সেই একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন প্রেমের উপাদান নিয়ে হচ্ছে "ব্রতচারিণী"-র আখ্যানবস্তু আর গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত কেবল চোখের জল আর আশা ভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস; না আছে কোনরকম বৈচিত্র্য, না আছে বিভিন্ন রসের সমাবেশ। তারপর গল্পটা এত বড় যে একঘেঁয়ে প্যানপ্যানানী শুনতে শুনতে শেষের দিকে বিরক্তি এনে দেয় দর্শকদের মনে। মনোরঞ্জনবাবু অনেকদিন বাংলা রঙ্গমঞ্চে আছেন। তিনি নিশ্চয়ই বোঝেন কি করে নাটকের প্রতি দর্শকের সহানুভূতি জাগান যায়; কিন্তু তাঁর সাধের মানসপুত্র "অভিমন্যু" ঐ নাট্যনিকেতন পীঠেই অকালমৃত্যু লাভ করায় আমাদের প্রথম যে সন্দেহ হয়েছিল যে তিনি বড় অভিনেতা হতে পারেন, অতি জটীল চরিত্রও তিনি বেশ স্বচ্ছন্দভাবে অভিনয় করতে পারেন, কিন্তু তিনি নাম করার মত নাটককার ন'ন, তা আজ অনেকটা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। আমাদের মনে হয় তাঁর উচিৎ ছিল গল্পটাকে লম্বায় বেশ কিছু কমিয়ে দেওয়া। অভিনয় সেদিন আরম্ভ হয়েছিল পৌনে আটটায় আর যখন রঙ্গমঞ্চের উপর শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের শেষে পর্দ্দা পড়ল তখন ঠিক দুটো। এই ছ' ঘণ্টার অভিনয়কে আমাদের মতে অনায়াসেই চার ঘণ্টা সাড়ে চার ঘণ্টায় আনা যায়। নাটকের গল্প আসল সুরু হয়েছে যেখানে জ্যোতি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হোল। এই যে এর আগে আরও দুটো অঙ্ক শেষ হয়েছে তার অনেকখানি বাদ দেওয়া যেতে পারতো। কিন্তু নাটককার তা' করেন নি। তিনি ইচ্ছে করলে একঘেঁয়ে প্যান-প্যানানীর অনেকখানি ছাঁটাই করে ভিন্ন রসের অবতারণা করতে পারতেন। তারপর নাট্যকার "ব্রতচারিণী"-র নায়ক জ্যোতিকে যে ভাবে এঁকেছেন তাতে মনে হয়, ঐ চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করার সুযোগ দেওয়া হ'য়েছে বড়ই কম। জ্যোতিকে যেন সব সময়েই ছায়ায় আড়াল করে রাখা হয়েছে। নাটকের dialogue ও (সংলাপ) আমাদের অন্তরে বিশেষ কোন রেখাপাত করতে পারেনি।

এরপরে হচ্ছে অভিনয়ের কথা। অভি-নয়ের কথা বলতে গেলে সবার আগে

আমাদের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে মনোরঞ্জনের 'রজনী'। আমাদের বলতে কুণ্ঠা নেই যে 'রজনীর' ভূমিকায় মনোরঞ্জন একটা নতুন টাইপের সৃষ্টি করেছেন। এরকম ধরনের তাঁর অভিনয় আমরা আগে কোথাও দেখিনি। 'রজনী' একটা পার্শ্ব-চরিত্র, খুব গুরুত্বপূর্ণও নয়, কিন্তু তাঁর অভিনয় হয়েছে অনবদ্য, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ। 'বিহারী মুখুজ্জের' ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবু আমাদের নতুন কিছু দিতে না পারলেও, তাঁর অভিনয় হয়েছে যা এককথায় বলা যেতে পারে সুন্দর। জ্যোতি হচ্ছে নাটকের নায়ক। ঐ অংশে আমাদের দেখা দিয়েছিলেন প্রখ্যাতনামা নট নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী। নাটকের আখ্যান-বস্তুর কথা বলতে গিয়ে আগেই 'জ্যোতি' সম্বন্ধে কিছু বলেছি; নির্ম্মলেন্দুবাবুর অভিনয় সম্বন্ধে এইটুকু বললেই হবে যে তাঁকে যতটুকু সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তার এককণাও তিনি অসদ্ব্যবহার করেন নি, বরং ওরই মধ্যে তিনি তাঁর দর্শকদের মনে একটা ছাপ দিতে পেরেছেন। বিশেষ করে মনে পড়ে সেই দৃশ্যটা, যেখানে 'মিঃ ডাটা' 'বিহারী মুখুজ্জে'কে পাগল বলে অভিহিত করলেন, তখন 'জ্যোতির' ভাবান্তর লক্ষ্য করে 'মিঃ ডাটা' বল্লেন "মিঃ মুখার্জ্জি আপনিও কি পাগল হলেন", তখন জ্যোতি বল্লে, "না এখনও আমি পাগল হই নি, কেননা আমি যে শিক্ষিত, আমি যে সভ্য, আমায় যে সব দমন করতে হয়"—এই কথা বলে ষ্টেজ থেকে তাঁর নিষ্ক্রামন; সত্যিই এই দৃশ্যটা যেন এখনও আমাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। ছোটখাটো ভূমিকাগুলির মধ্যে সুবোধ মজুমদারের 'প্রশান্ত' আমাদের সন্তুষ্ট করেছে। সুবোধ-বাবু সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী আর তার ওপরে আছে মঞ্চোপযোগী দেহ সৌষ্ঠব, তিনি যদি কায়মনোবাক্যে কলালক্ষ্মীর মন্দিরে সাধক হ'ন, তা হ'লে নিশ্চয়ই তাঁর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। 'মিঃ ডাটা' (সুবল ঘোষ) ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজভুক্ত জীববিশেষের চরিত্র হিসেবে চলনসই। ব্রজেনবাবুর 'সুশীল' যতখানি সুযোগ পেয়েছেন, ততটার সদ্ব্যবহার তিনি করতে পারেন নি; ব্রজেন বাবুর অভিনয় আরও মাজ্জিত হওয়া উচিৎ। মণি ঘোষ দুটী অংশে নেমেছিলেন—দুটীর মধ্যে অধ্যাপকের চরিত্রে তিনি একদম অচল, তাঁর এ অংশটী অন্য কাউকে ছেড়ে দিলে ভাল হয়। তবে মণি বাবুর 'নিতাই গাঙ্গুলী' চরিত্রোপযোগী হয়েছে এ অবশ্যই আমরা স্বীকার করবো। ননীবাবুর 'রাখালে' আমাদের হতাশ করেনি। স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে ব্রতচারিণী 'সীতার' ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালা নিজের সুনামের হানি করেন নি, তবে ক্রমশঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বরের বৈকল্য ঘটেছে; তিনি যে কয়খানি গান গেয়েছিলেন, তার মধ্যে সব শেষেরটীতে সুগায়িকা নীহারবালাকে চেষ্টা করে চেনা যায়। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আমাদের রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে না বলে পারিনে; তা হচ্ছে এই যে, তাঁরা নায়ক নায়িকা নির্ব্বাচন করার সময় কি নটনটীর ভূমিকা উপযোগী দেহ-সৌষ্ঠবের কথা একটুও চিন্তা করেন না? জ্যোতির অংশে নির্ম্মলেন্দুবাবুর নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এই এক কথাই প্রযোজ্য। এঁরা দুজনে অভিনয় করেছেন নিখুঁত, কিন্তু হায়! দুর্ব্বার কাল অনেকদিন আগেই তাঁদের নায়ক-নায়িকা সাজার বয়েস চুরি করে নিয়েছে! বিহারী মুখুজ্জের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূর ভূমিকায় বড় সুশীলা আমাদের অসন্তুষ্ট করেন নি; ছোট বউ জয়ন্তীর ভূমিকায় চারুশীলা জায়গায় জায়গায় যেমন খুব উঁচুদরের অভিনয় করেছেন, তেমনি জায়গায় জায়গায় তাঁর অভিনয় বড় নীচে নেমে গিয়েছিল। জয়ন্তীর কন্যা: ইভার ভূমিকায় শ্রীমতী সরযূবালাই সেদিন রাত্রে আমাদের খুশী করেছিলেন সবচেয়ে বেশী। শ্রীমতী সরযূর চরিত্রোপযোগী অঙ্গ-গঠন, সুন্দর মাজ্জিত চালচলন, সহজ সরল অভিনয়, কর্ণতৃপ্তিদায়ক বাচনভঙ্গী, সবদিক থেকেই অনন্য সুন্দর অভিনয় করেছেন ইনি, যার জন্যে আমাদের মন থেকে বেরিয়ে আসছে আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্তরিক সাধুবাদ—চমৎকার! শ্রীমতী নিরুপমা ব্রাহ্মিকা দেবযানীর যা রূপ দিয়েছেন, তা দেখে বলতে আমরা বাধ্য যে সত্যিই কোন ব্রাহ্ম পরিবারে ঐ রকম চালচলনের মেয়ে আছে কিনা আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তিনি সেদিন যা অভিনয় করেছিলেন তা বড়ই দৃষ্টিকটু। তিনি অযথা যা বাড়াবাড়ি করেছিলেন তাতে আমাদের মনে হয় অতি নিম্ন শ্রেণীর বাইজী স্ত্রীলোকেরাও ঐ রকম অসভ্যভাবে অঙ্গভঙ্গী করে না। আজকালকার ব্রাহ্ম-পরিবারের কলেজে পড়া মেয়ের যে একটু আধটু coquetry-র ভাব থাকবে তা আমরা অস্বীকার করিনে, কিন্তু তা হ'বে সেই মেয়ের শিক্ষা দীক্ষার ফলে বেশ মাজ্জিত, বেশ সূক্ষ্ম, যা তার স্তাবক সম্প্রদায়ের মনে বিলোল বিভ্রমের সৃষ্টি ক'রবে, যা তার মনের মানুষকে তার দিকে টেনে আনবে,—এই কথাগুলি "ব্রতচারিণী"-র প্রযোজকের একটু ভেবে দেখা দরকার বলে মনে করি। 'জয়ন্তীর দিদি'-র ভূমিকায় কোহিনুরবালা তাঁর চরিত্রকে বেশ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন; 'খ্যান্ত ঝি'-এর অংশে সুবাসিনীর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী কুসুমকুমারী 'মাধবী'-র অংশে একেবারে অচল আর ইভার 'সঙ্গীত শিক্ষয়ত্রী'-র ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি এখনো আরো কিছুদিন মহলা দিন।

এবার অভিনয় সম্পর্কীত অন্যান্য ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমরা বলতে আনন্দিত হচ্ছি যে অন্যান্য ব্যবস্থা সবই অনিন্দনীয়, শুধু একটু খুঁত ছিল যা

আমরা আশা করি এতদিনে শোধিত হয়েছে। প্রথম রাতের অভিনয়ে প্রতি দৃশ্যের শেষে dialogue শেষ হবার বা pose নেবার আগেই আলো নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। "ব্রতচারিণী"-র দৃশ্যপট, সাজসজ্জা নাট্যনিকেতনের গৌরব বৃদ্ধির সহায়তা করবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। সামান্য দুটিনাটি ত্রুটীবিচ্যুতি যা আমরা দেখিয়েছি সেগুলো সত্ত্বেও "ব্রতচারিণী"-র অভিনয় বেশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলতে হবে এবং তার জন্যে নাট্যনিকেতনের কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

—শ্রীনটনাথ

অমৃত-জন্মোৎসব

গত ৬ই বৈশাখ শুক্রবার সন্ধ্যায় নাট্যাচার্য্য রসরাজ অমৃতলালের ত্র্যশীতিতম জন্মোৎসব এ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। উদ্যোক্তা—অমৃতচক্রের সদস্যবৃন্দ। সভানায়ক ছিলেন কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথমেই আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হ'চ্ছি যে, সেদিনকার এই অনুষ্ঠানটি ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই হয় নি। রসরাজের জন্মোৎসব। অথচ কৈ বাঙ্লার রঙ্গালয় থেকে একটিও অভিনেতা বা অভিনেত্রী তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাতে সভাস্থলে সমবেত হ'ন নি! রসরাজের জন্মদিবস কি বাঙ্লার রঙ্গালয়ের গৌরবের দিন নয়? অমৃতলাল কি বাঙ্লার—বাঙালী জাতির নাট্যকার ন'ন? তিনি কি বাঙ্লার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অন্যতম প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ন'ন? তাই যদি হয়, তবে সেদিন স্বর্গত অমৃতলালের স্মৃতির এ অবমাননা করার জন্য তাঁ'দের কি কৈফিয়ৎ দেবার আছে? আর অমৃতচক্রের চক্রীদেরও জিজ্ঞাসা করি, তাঁ'রা যদি সকল দল মিলন ক'রে (representative gathering) স্মৃতিসভা করতে না পারেন, ত' এরকম "পিত্তিরক্ষে" গোছের অনুষ্ঠান করার সার্থকতা কি? যা'র সঙ্গে সমগ্র জাতির হৃদয়ের যোগ নেই—এমন প্রাণহীন, ভুঁয়ো, বাজে অনুষ্ঠান-আয়োজন না করাই ভাল। এ সব অনুষ্ঠানে দেখা যায়—শুধু কতকগুলো ভিবেকেলে পেশাদার বক্তার একঘেয়ে নীরস নিরর্থক মামুলী বক্তৃতা, কতকগুলো আবৃত্তি পাগ্লার কর্কশ গলাবাজি ও বিকট অঙ্গভঙ্গী, কতকগুলো প্রবন্ধ-লিখিয়ের আবোল-তাবোল কান-ঝালা-পালা কচ্‌কচানি, কতকগুলো হঠাৎ গান-লিখিয়ের অর্থহীন ছন্দোহীন, মিলহীন, যতিহীন গান ছাপানোর হুড়োহুড়ি, আর এই সব গানের আগুশ্রাদ্ধ করবার জন্যে কতকগুলো ধ'রে-পাক্‌ড়ে আনা, শিশু-বালিকা-অন্ধ গাইয়ের বেতা'লা বেসুরো কিম্ভূৎকিমাকার চীৎকার।

* * *

প্রথমেই শচীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে ও অশোক শাস্ত্রীর সমর্থনে শরৎবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। দুটি বালিকা দু'খানি গান গাইলেন। প্রথম গানখানির কিছু কিছু তবু শুনতে পাওয়া গেল—এই মাত্র। দ্বিতীয় বালিকাটি অত লোকের সামনে বেজায় থতমত খেয়ে যাওয়ায় কণ্ঠ থেকে বাণী আর বেরুল না। আচ্ছা! এসব বাহাদুরির দরকার কি? "চোদ্দ গুণতে হাঁফিয়ে ওঠে, পদ্য লিখ্‌তে সাধ!" পুরুষ-গাইয়ের মধ্যে এক অন্ধ গায়ক সত্যেন্দ্র চক্রবর্ত্তী উৎসব উপলক্ষে শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়-রচিত একখানি গানের দফা-রফা করলেন। এর ভাবভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছিল, ইনি বুঝি বা অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'-র ওপরেও টেক্কা মারবার প্রয়াসী। কিন্তু 'তা হয় না হুসেন!'

* * *

তা'র পর বক্তৃতার পালা আরম্ভ হোল। শচীন বাবুর ভুঁড়ি দোলান বক্তৃতা চিরদিনই হাস্যরসের উদ্রেক ক'রে—সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে এক্ষেত্রে রসরাজের জন্মোৎসবে এ হাস্যরস বেশ মানিয়েছিল। দুঃখের বিষয়, কতকগুলো বেরসিক অপোগণ্ড শ্রোতা হাততালি দিয়ে মুখুজ্যে মশায়কে থামিয়ে দেবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু দাদা আমাদের বীরপুরুষ। তিনি দর্পভরে হুঙ্কার দিয়ে দিয়ে জনকরতালির শব্দ ছাপিয়ে নিজের কণ্ঠধ্বনি করতেই লাগলেন। অবশেষে তাঁ'র মস্তিষ্কোষের সঞ্চিত মধু নিঃশেষ হওয়ায় আসন পরিগ্রহ করতে হোল। তা'র পর উঠলেন রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ। রসলেশহীন শিলালিপির কর্কশ কারবার ছেড়ে রায় বাহাদুর হঠাৎ রসিক হ'য়ে উঠলেন কবে থেকে—তা'র একটি গোপন ইতিহাস আমাদের শ্রীতন্দাসা কানে কানে জানিয়েছেন। আমরা অবশ্য তা' গোপনই রাখ্‌ল। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু পাঠক ধারাপাতের শটকের মধ্যে "একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ" নিয়ে একটু গবেষণা করলেই তত্ত্ব বেরিয়ে পড়বে।

পরে উঠলেন শ্রীযুক্তা উমা দেবী। ইনি রসরাজের হাস্যরসের নমুনা-স্বরূপে ৺ মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষকে কটাক্ষ ক'রে রচিত—"ওরে গোউর গোউর বোল। মহাপ্রভু মাই লর্ড এবার ঘুচে গেল গোল।"—গানটির উল্লেখ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সব ক'টি বক্তৃতার সার মর্ম্মই এক—বাঙালী জাতটা হাস্‌তে ভুলে গিয়েছিল। অমৃতলাল শিখিয়েছিলেন তাদের হাস্‌তে...ইত্যাদি।

এর পর বক্তৃতা দেন অধ্যাপক অশোকনাথ শাস্ত্রী। শাস্ত্রী ম'শায়ের বক্তৃতা দেবার বেশ একটা নিজস্ব ভঙ্গী আছে। আর মামুলী দিক্‌টা ছেড়ে ইনি দু'একটা নূতন কথাও ব'লেছিলেন—

রসস্ফূর্ত্তি সকল কবির আদর্শ। কিন্তু রসের স্বরূপ নিয়েই তাঁদের মধ্যে যত মতভেদ। জনৈক সংস্কৃত কবি করুণ রসকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নাট্যকার হিসাবে সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। পক্ষান্তরে হাস্যরসকে আশ্রয় ক'রে রসরাজ নাট্যজগতে অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন ক'রেছিলেন। এর কারণ, স্বভাবতঃ

দুঃখময় জীবন বহন ক'রে মানুষ প্রায়ই শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। তাই রঙ্গালয়ে আনন্দ করতে এসে তা'র কাঁদতে বড় বেশী ভাল লাগে না। সে হাসতেই চায়। মানব মনের এই গোপন তত্ত্বটি ধরতে পেরে রসরাজ এই হাস্যরসকে তাঁ'র অবলম্বন ক'রে নিয়ে সমাজকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁ'র অম্লমধুর কশাঘাতে বাঙালী মরণের পরিবর্তে অমৃতের সন্ধান পেয়েছে।

শাস্ত্রী ম'শায়ের বক্তৃতাটি বেশ সারগর্ভ হ'য়েছিল সত্য, কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁ'কে আমরা একটা কথা বলতে চাই। এই সব বাজে সভার অনুষ্ঠানে তাঁর ভাবগম্ভীর বক্তৃতা তারিফ করবার উপায় থাকে না। তিনি পণ্ডিত লোক। এই সব পেশাদার বক্তাদের গড্ডলিকা প্রবাহে তিনি যেন ভবিষ্যতে আর গা' ঢেলে না দেন। আমাদের বিশ্বাস, এসব মামুলী অনুষ্ঠান থেকে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেই তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে। নইলে ভবিষ্যতে এরূপ পেশাদারী বক্তা হ'য়ে উঠলে—তাঁকে একদিন পিছন হাততালির পুরস্কার প্রাপ্য হ'লেও হ'তে পারে। অতএব শাস্ত্রী ম'শায়কে বলি—"আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।"

অতঃপর শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র বিশ্বাস রসরাজের রচিত "জেলে পাড়ার সঙের" দুইটি ছড়া আবৃত্তি করেন। আবৃত্তি দু'টিই খুব রসাল হ'য়েছিল।

হঠাৎ এই সময় অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু ম'শায় প্রস্তাব ক'রে বললেন—"ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ নিয়ম ক'রেছেন যে, কোন ভারতীয় ভাষায় রচিত কথাসাহিত্য অতঃপর আর ঐ লাইব্রেরী থেকে পাঠকদের পড়তে দেওয়া হবে না—বর্তমান সভা ঐ নিয়মের প্রতিবাদ করছেন।" অবশ্য নিয়মটির সমর্থন আমরাও করি না। কিন্তু তাই ব'লে অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত অমৃতলালের জন্মোৎসবে তাঁর স্মৃতি রক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব উত্থাপন না ক'রে এ রকম একটা অবান্তর প্রস্তাব আনয়ন আমাদের বড়ই খাপছাড়া ঠেকল।

সভাপতি শরৎবাবু বক্তৃতাতে মামুলী বক্তাদের একটু প্রতিবাদ ক'রে ব'লেন—বাঙালী হাসতে ভুলে গেছে—একথাটা ঠিক নয়। বরং বলা চলে যে, রসরাজের মত হাসাবার লোকেরই অভাব হ'য়েছে। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি রসরাজের সহিত তাঁ'র নিজের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্দ্য ও আদান প্রদানের কথা আলোচনা ক'রেছিলেন। এর পর রাত ন'টায় সভাভঙ্গ হয়।

* * *

এই প্রসঙ্গে বাধ্য হ'য়ে আর একটা কথাও ব'লতে হ'চ্ছে। অমৃতচক্রের চক্রধর 'গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল'—সচিবপুঙ্গবটি তার কার্য্যবিবরণীর মধ্যে শ্যামবাজার এ, ভি, স্কুলের কতিপয় কর্তৃপক্ষকে অসভ্য গালাগালি দিয়েছেন।

বন্ধুবান্ধব সমিতি

গত ২রা বৈশাখ সোমবার রাত্রি ন'টায় ৬নং রায় নন্দলাল বসু মহাশয়ের ভবনে "বন্ধুবান্ধব সমিতির" কিশোর সভ্যবৃন্দ "পোষ্যপুত্র" নাটকের অভিনয় ক'রেছিলেন। "শ্যামাকান্তে"র ভূমিকায় "অন্নবাবু"র অভিনয় মন্দ হয় নাই। তবে চরিত্রের অনুপাতে বয়সটা তাঁ'র বড় কম দেখাচ্ছিল। রূপসজ্জার প্রতি তাঁ'র আরও একটু মন দেওয়া উচিত ছিল। "শিবানী"র ভূমিকায় যিনি নেমেছিলেন, তাঁকে মানিয়েছিল বড় সুন্দর। কিন্তু ভূমিকার উপযোগী কণ্ঠস্বর ও অভিনয় নৈপুণ্যের অভাবে রসসৃষ্টি হ'তে পারে নি। "গাঁট কাটাদ্বয়" চমৎকার হ'য়েছিল। "কটিকচাঁদ" যেন কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার চেষ্টা করছিলেন। অবশিষ্ট ভূমিকার মধ্যে "বিনোদ"-বেশী "শৈলেনবাবু", "রজনী-নাথ"-বেশী "সিধুবাবু", "বিপিন"-বেশী "গোপীনবাবু" ও "সিদ্ধেশ্বরী"র ভূমিকায় শরৎবাবুর নাম উল্লেখযোগ্য। "অতুলবাবু" অনেকগুলি (চারিটি) ভূমিকা একসঙ্গে নিয়েছিলেন ব'লে কোনটাতেই বেশ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। "বৈকুণ্ঠ"-বেশী "ননী বাবু"র গীত উপভোগ্য হ'য়েছিল। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির স্থায়িত্ব কামনা করি।

শ্রীনটশেখর

আনন্দ পরিষদ

এঁদের "মেঘনাথ রায়" নামে একখানা নাটকের অভিনয় হ'বে বলে অনেক দিন আগেই প্ল্যাকার্ড বেরিয়েছিল, কিন্তু তার কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না কেন? মহলা দেওয়া কি এখনো শেষ হয়ে ওঠেনি? আমরা তো "মেঘনাথ রায়"-এর দেখা পেতে খুবই উৎসুক।

বিবিধ

নলিনী-বিজয়

আমরা বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রী, চকদিঘীর রায় ললিতমোহন সিংহ রায়ের দৌহিত্র স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়ের সহিত নলিনী সরকারের ঘনিষ্ঠতার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছি। সে সম্পর্কে আমরা কয়টি বিষয়ের আলোচনা করিতে পারি না—

(১) মন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে স্যার বিজয় প্রসাদ উকীলরূপে বার্ষিক কত টাকা আয়ের উপর ইনকামট্যাক্স দিতেন।

(২) কি জন্য তিনি "দাঁতে তৃণ লয়ে" বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের রেজিষ্ট্রারের পদে ইস্তফা দিয়া অব্যাহতিলাভ করিয়াছিলেন। (সে কথা বলিবার অধিকারী—মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, শ্রীপ্রফুল্ল নাথ ঠাকুর ও কুমার সুরেন্দ্র নাথ লাহা)।

(৩) কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিলে কিরূপে বিজয় প্রসাদের পদলাভ ঘটে।

আমরা নলিনীর সহিত বিজয় প্রসাদের ঘনিষ্ঠতার—হয়ত বা বাধ্যবাধকতার কথাই বলিব।

বিজয় প্রসাদ যখন কীর্ত্তিনাশারূপে সুরেন্দ্রনাথের অতুল কীর্ত্তি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন "সংশোধনের" নামে বিকৃত করিতে উদ্যত, তখন নলিনীই তাঁহার সহায় হইয়াছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টের বার্ত্তাবহ হইয়া যে হিন্দুস্থান গৃহে সুভাষচন্দ্র প্রভৃতিকে "জাতীয় দিবসানুষ্ঠান" বর্জ্জন করিতে বলিতে গিয়াছিলেন, সেই হিন্দুস্থান গৃহেই নলিনী আইন "সংশোধনের" প্রতিবাদকারী সাংবাদিকদিগকে নিমন্ত্রণ

করিয়া লইয়া গিয়াছিল। রঙ্গালয়ে মঞ্চের "উইং" হইতে যেমন সহসা নটের আবির্ভাব হয়, সেই সম্মিলনে তেমনই ভাবে স্যার বিজয় প্রসাদের আবির্ভাব হয়। বিজয় প্রসাদ ও তস্য বন্ধু নলিনী চা পানরত সাংবাদিকদিগকে অনুরোধ করেন—তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া থাকেন এবং আইনের পাণ্ডুলিপি সিলেক্ট কমিটীর করাল কবল হইতে বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার কোনরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা না করেন। এত বড় উপকার যে করে—তাহার নিকট বাধ্য থাকা কি বিস্ময়কর?

আমরা ইহাও শুনিয়াছি যে, বিজয় প্রসাদ বলিয়াছিলেন, সরকার কলিকাতা কর্পোরেশনকে স্বায়ত্ত-শাসনে বঞ্চিত করিয়া আপনার অধীন করিতেই চাহিয়াছিলেন, কেবল তিনিই ত্রাণকর্ত্তারূপে "সংশোধক" আইন করিয়া সে দুর্ঘটনা রদ করিয়াছেন। এ যেন সেই উকীলের গল্প। আসামীর যখন ফাঁসীর আদেশ হইয়া গেল এবং আসামী কাঁদিয়া উকিলকে বলিল, "বাবু, কোঁচড় ভরা টাকা নিয়েছিলেন—বলেছিলেন, খালাস করে দেবেন; আর এখন আমি ধনেপ্রাণে গেলাম।"—তখন উকীল বলিলেন :—

"জান না ত, বাপু, কি ব্যাপার! এই এত মোটা জাহাজের কাছি দিয়ে ফাঁসী দেবার হুকুম হচ্ছিল, আমি কত বলে তবে সরু দড়ীর ব্যবস্থা করেছি।"

বিজয় প্রসাদ—জীব বিশেষ যেমন সাজান বাগান নষ্ট করে—তেমনি ভাবে সুরেন্দ্রনাথের কীর্ত্তি নষ্ট করিয়াছেন। তাহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। কারণ, যাঁহার আয়োজনে তিনি আজ মন্ত্রী তাঁহার সেই পিতৃব্য রাজা বাহাদুর মণিলাল সিংহ রায় ব্যবস্থাপক সভায় কোন পক্ষে কিরূপে ভোট দিতেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সে কথা আমরা প্রয়োজন হইলে পরে বিবৃত করিব।

কিন্তু বিজয় প্রসাদেরও প্রত্যুপকার করিবার ইচ্ছা থাকিতে পারে। সেইজন্যই তিনি গতবার নলিনীকেই মেয়র নির্বাচিত করিবার জন্য চারু-বিজয়-সুধাংশু সহ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আর কমলার মধু দিয়া যদি প্রত্যুপকার-বৃত্তির মকরধ্বজ সড়যন্ত্রের ফলে মাড়া হইয়া থাকে, তবে তাহাতেই বা বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে?

এখন জিজ্ঞাস্য—নলিনাক্ষ সান্যাল যদি সত্য সত্যই হীরা মালিনীর মত বিজয় প্রসাদের বাড়ীতে "যাওয়া আসা" করে, তবে তাহা নলিনীর সম্পর্কে—না আর কোন অপ্রকাশ্য কারণে? নলিনাক্ষ যদি নলিনীর তরফে বিজয় প্রসাদের কাছে যাইয়া থাকে, আমরা বিজয় প্রসাদকে বলিব—"ছিঃ।" কারণ—

নলিনী স্বয়ং মহারাজা বাহাদুর ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায়ের কাছে যাইত; আর

তাহার কর্ম্মচারী নলিনাক্ষ মধ্য স্যার বিজয় প্রসাদের বাড়ীতে যায়।

অর্থাৎ বিজয় প্রসাদ is not considered aristocratic enough for Nalini to go to him নহিলে ল্যান্সডাউন রোড হইয়াও সর্দ্দার শঙ্কর রোডে যাওয়া যায়।

আর নলিনাক্ষ যদি অন্য কারণে—নিজ অধিকারে—নিজ প্রয়োজনে বা স্যার বিজয় প্রসাদের প্রয়োজনে ললিত বাবুর গৃহে বিজয় প্রসাদের কাছে যাইয়া থাকে, তবে—তাহার কারণ কি? সে বিষয়ে লোক যাহাই কেন অনুমান করুক না, সত্য হয়ত সত্য সত্যই প্রকাশ পাইবে।

স্যার বিজয়ের বিভাব বিষয় কেহ কেহ অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহার বাসগৃহ যে, যে-আইন অমান্য আন্দোলনের আসামীকে তাঁহারা শৃঙ্গী অপেক্ষা অধিক ভয় করেন সেই আসামীর সংশোধনাগার অর্থাৎ Reformatory হইতে পারে, ইহা কাহারও জানা নাই। আবার সংশোধিত হইবার বয়সও ত চাই। "কাটা" অর্থাৎ গলায় দাগ উঠিবার পর টিয়াপাখীকে আর পড়ান যায় না। তাহা স্যার বিজয় প্রসাদ অবশ্যই জানেন।

বাগবাজারের মুস্কিল

নলিনীকে লইয়া সত্য সত্যই 'অমৃতবাজার পত্রিকার' মুস্কিলের শেষ নাই। গত ১৯শে তারিখের সংখ্যায় পত্রপ্রেরকদিগের একজনের উদ্দেশে বলা হইয়াছে—বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স সম্বন্ধে পত্র ছাপাইবার স্থান নাই। অবশ্য। কারণ—

(১) নলিনী সরকার যদি সন্ধ্যায় ফোন করিত—তাহার এক বক্তৃতা বা বিবৃতি রাত্রিতে প্রকাশ জন্য প্রেরিত হইবে—সে জন্য এতটা জায়গা চাই, তবে তখনই সে হুকুম তামিল হইত, আর সেই সব বক্তৃতা স্থান দিয়া 'অমৃতবাজার' আপনাকে অস্থানে পরিণত করিতেও দ্বিধাবোধ করিত না।

(২) রাত্রি ১টার সময়ও নলিনীর লোক তাহার প্রেরিত বক্তৃতায় বা বিবৃতিতে ভুল সংশোধন করিতে বলিবার জন্য আসিলে 'পত্রিকার' রাত্রির রবিরা বলিয়াছে—"স্বাগত।"

আর স্থানাভাব হয়, যখন নলিনী-শাসিত চেম্বারের ত্রুটি দেখান হয়। তখনই শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষের পত্র ছাটিয়া প্রকাশ করা হয়—আর কোন কোন পত্র প্রকাশ করাই হয় না। অনেক পত্র বহুদিন চাপিয়া রাখিয়া শেষে প্রকাশ করা হয়।—ইত্যাদি।

এই যে পক্ষপাতিত্ব ইহার মূল কোথায়?

নলিনীর জন্য 'অমৃতবাজার' কি অবিচারিতচিত্তে বিষপানও করে নাই? একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

যে পত্রে নলিনী সরকার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে অর্দ্ধ-সত্যবাদী বলিয়া তাহার স্বভাবের ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিল, 'অমৃতবাজারে' সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পার্শ্বেই সে পত্র প্রকাশ করিবার সময় স্থানাভাব হয় নাই।

অন্য কোন দেশ বা প্রদেশ হইলে এই কার্য্যের জন্য 'অমৃতবাজার'কে নাকে খৎ দিতে হইত। এই কাজ কত বড় পাপ তাহা বুঝিয়াও কেন যে 'অমৃতবাজার' ইহা করিয়াছিল, তাহাও কি আবার কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে ?

এই কাজের পরও যখন কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের যে বার্ষিক হিসাব বিজ্ঞাপন রূপে পূর্ব্বে 'অমৃতবাজারে' প্রকাশিত হইত, তাহা নলিনীর 'ফরওয়ার্ডে' প্রকাশিত হইল এবং 'অমৃতবাজার' তাহাতে বঞ্চিত হইল, তখন কি 'অমৃতবাজারের' বৃদ্ধ পাদরীর সেই কথাই মনে পড়ে নাই —যে ভাবে আমি তোমার সেবা করিয়াছি, যদি সেই ভাবে ভগবানের সেবা করিতাম, তবে তিনি কখনই আমার বৃদ্ধ বয়সে আমার সহিত এমন ব্যবহার করিতেন না ?

টাকার বিনিময়-মূল্য নির্দ্ধারণ কালে কি নলিনীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াই 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বোম্বাইয়ের স্বার্থরক্ষার জন্য টাকার মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্স করিতে বলে নাই ?

'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদক, উপপাদক বা আর কেহ কখন নলিনীর বীণা-বিরাজিত দিল্লীর আবাসে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না বটে, কিন্তু এ কথা দৃঢ়তা সহকারেই বলিতে পারি যে, সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল শ্রাদ্ধ বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বাধা দিবার জন্য হিন্দুস্থান বিল্ডিংএ যে পার্টি হইয়াছিল, তাহাতে 'অমৃতবাজার' পত্রিকার প্রতিনিধি হাজির ছিলেন।

গভর্ণরের সেন্ট এণ্ড্রুজ ভোজের পূর্ব্বে বক্তৃতাটি আনিবার জন্য 'অমৃতবাজারের' প্রতিনিধি যেমন লাট প্রাসাদে হাজিরা দিয়াছিলেন ; বিধান চন্দ্রে বিবৃতি প্রকাশের পূর্ব্বেই তিনি যেমন বিধান-বিতানে উপস্থিত হইয়াছিলেন—তেমনই তিনি কতবার সন্ধিক্ষণে নলিনী-নিবাসে গিয়াছেন, তাহার হিসাব কে নিকাশ করিতে পারে ?

কুমার শ্রীস্বরেন্দ্র নাথ লিখিয়াছেন—

দুই বৎসরের অধিক কাল কখন সভাপতি থাকিবে না, এই প্রতিশ্রুতি বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারে দিয়া নলিনী সে প্রতিশ্রুতি-বিরুদ্ধ কাজই করিয়াছে।

তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া তাঁহার নিন্দা করিয়া একজন যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছে, তাহা মুদ্রিত করিবার সময় 'অমৃতবাজার পত্রিকার' স্থানাভাব হয় নাই।

আরও দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারি। কিন্তু সত্য সত্যই আমাদের স্থানাভাব। সেই জন্য কেবল একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই আমরা নিরস্ত হইব :—

নলিনীর বিরুদ্ধে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত ব্যাভিচারের মামলা পুলিশ কোর্টে রুজু হইলে সে সংবাদ 'অমৃতবাজার' গোপন করিয়াছিল।

গেটে যেমন বলিয়াছিলেন, যে ঋতুর যে ফল ফুল সর্ব্বোৎকৃষ্ট যদি তাহাই চাও তবে এক 'শকুন্তলা' নাটকেই তাহা পাইবে, তেমনিই আমরা বলিতে পারি—'অমৃতবাজারের' নলিনী-প্রীতিবশে সংবাদিক-কর্ত্তব্যচ্যুতির প্রমাণ চাহিলে—ইহাতেই তাহা পাওয়া যাইবে।

কয় বৎসর ধরিয়া 'অমৃতবাজার' নলিনীর বিজ্ঞাপনের ঢাক হইয়া রহিয়াছে। সেজন্য 'অমৃতবাজার' যাহা করিয়াছে, তাহার কতকটা পরিচয় আমরা আজ দিয়া আর কতক ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিলাম।

তবে আমরা আশা করি, বাগবাজার আপনার মুস্কিলে আসানের উপায় আপনি করিবেন—সংবাদপত্রের কর্ত্তব্যপালনে দ্বিধা বোধ করিবেন না। যদি তাহা হয়, তবে আমাদিগের পক্ষে আর এই অপ্রিয় বিষয়ের আলোচনা নাও করিতে হইতে পারে।

জেনুইন ইন্‌সিওরেন্স কোং

জেনুইন ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩৪ সালের (তৃতীয় বর্ষের) কার্য্য বিবরণী হইতে দেখা যায়, এই কোম্পানীর জীবন বীমার কাজ সুন্দরভাবে চলিতেছে। ১৯৩৪ সালের জুলাই ও ডিসেম্বর মধ্যে ৩৮৭৫৫০ টাকার ৪৩৯টী জীবন বীমার প্রস্তাব কোম্পানীর নিকট উপস্থাপিত হয় ও তন্মধ্যে ২,৫৩,২৫০ টাকার ৩১৩টি পলিসি দেওয়া হয়। পরে দেখা যায় ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ২,৩৫,৩৫০ টাকার ২৮৪টী পলিসি কার্য্যকরী রহিয়াছে। ইহা কম গৌরবের কথা নহে। পূর্ব্বে ইহা প্রভিডেণ্ট কোম্পানী ছিল। যদিও বর্ত্তমানে প্রভিডেণ্ট বিভাগের কার্য্যই সমধিক। তবুও যে ভাবে ইঁহারা জীবন বীমার কাজ করিতেছেন তাহা বিশেষ আশাজনক। ছয় মাসে ৫২১৭ টাকার একটি লাইফ ফণ্ডেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কোম্পানীর কার্য্যাবলী ও পরিচালনার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলে এই প্রতিষ্ঠানটী ক্ষুদ্র হইলেও বাংলার অন্যতম সুপ্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

উপরে যে মেয়েটিকে দেখ্‌ছেন, ইনি হ'চ্ছেন এভিলীন লেয়ী। সুন্দর এঁর চেহারা আর ব্যবহার এঁর অমায়িক। কিন্তু এই পরিচয়ই এঁর যথেষ্ট নয়—ইনি স্বর্গের উর্ব্বশী, মেনকার মত নাচতে পারেন। তাই মেট্রো এঁকে র‍্যামন নোভারোর বিপরীতে "দি নাইট ইজ্‌ ইয়ং" চিত্রে অভিনয় করানোর জন্য চুক্তিবদ্ধ করিয়েছেন।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৯

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ১২ই বৈশাখ, ১৩৪২ 25th, April, 1935. { ১৭শ সংখ্যা

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স

যে-যুগে এবং যেখানে সত্য অপেক্ষা স্বার্থ বড়, নিষ্কলুষ চিত্ত অপেক্ষা কলুষিত বিত্তই যখন মানুষের সমধিক কাম্য হইয়া উঠে, তখন সত্য—বিশেষ করিয়া অপ্রিয় সত্য বলিবার দায় ও সাহস কম নহে। এই বিরোধী আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া যাঁহারা ব্যক্তি অপেক্ষা জাতির কল্যাণের দিকে চাহিয়া নির্ভয়ে, অকুণ্ঠকণ্ঠে অপ্রিয় সত্য বলিবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাঁহারা বাস্তবিকই জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন।

সম্প্রতি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অব্ কমার্সের অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য মিঃ এস, সি, ঘোষ চেম্বারের পরিচালনা রীতি, নির্ব্বাচন-নীতি প্রভৃতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সংবাদ পত্রাদিতে আন্দোলন সুরু করিয়া জনসাধারণের একান্ত কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঘোষের অভিযোগগুলি যে গুরুতর এবং অবিলম্বে তাহাদের প্রতীকার বাঞ্ছনীয়—আর একজন নিরপেক্ষ সত্যভাষী ব্যক্তির উক্তি দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি আর কেহই নহেন—চেম্বারের সহ-সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ লাহা। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তিনি চারমাসের অধিককাল কলিকাতার বাহিরে ছিলেন। আমাদের মনে হয় তিনি কলিকাতায় থাকিলে চেম্বারের মধ্যে এইরূপ একটা শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইত কি না সন্দেহ! তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াই যেরূপ তৎপরতা ও নিরপেক্ষতার সহিত চেম্বার সম্বন্ধে সংবাদপত্রে প্রকাশিত অভিযোগ ও আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার মত লোকেরই উপযুক্ত হইয়াছে।

রায়-পরিবার চেম্বারের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছেন এজন্য কুমার তাঁহার বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এ দুঃখ শুধু তাঁহার একার নহে, ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রেই ইহার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। রায়-পরিবার ও লাহা-পরিবার—বাঙ্গলার ব্যবসায়-জগতে এই দুইটী বনিয়াদী ও উল্লেখযোগ্য পরিবার। বংশানুক্রমে এই দুইটী পরিবার অর্থে ও সামর্থ্যে বাঙ্গলার ব্যবসায়ের উন্নতি ও প্রসার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ইঁহাদের মধ্যে একজন চেম্বারের পরিচালনা রীতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া চেম্বারের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছেন এবং অপরজন বিরক্ত ও সম্পর্ক ত্যাগ করিতে উদ্যত। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে চেম্বারের আভ্যন্তরীণ রীতি নীতি ও ব্যবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ হইতেছে না। এক অজ্ঞাতকুলশীল ভাগ্যান্বেষীর খেয়ালখুসীর উপদ্রবে চেম্বারের সহিত এই দুইটী পরিবারের সম্পর্কচ্ছেদের শোচনীয় ক্ষতি দেশ কি নীরবে সহ্য করিবে?

কুমার সুরেন্দ্র নাথ লাহা তাঁহার বিবৃতিতে মিঃ এস, সি, ঘোষ কর্ত্তৃক উত্থাপিত দুইটী প্রধান অভিযোগের সমর্থন করিয়াছেন ঃ

(১) "প্রথমতঃ ইহা পরিষ্কার করিয়াই বলিতে চাই যে, সাধারণ প্রতিষ্ঠান সমূহের সদস্যদিগকে কোন সংবাদ জানিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইলে তাহা ক্ষমার্হ নহে।"

(২) বর্ত্তমান নিয়মতন্ত্রে যে দোষ-ত্রুটী আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যথাশীঘ্র তাহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।"

কিন্তু এতদ্ভিন্ন কুমার তাঁহার বিবৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র ও নিন্দনীয় অভিযোগ করিয়াছেন বর্ত্তমান সভাপতি নলিনীর বিরুদ্ধে। কুমার বলেন ঃ—"অবশ্য যখন তিনি (রাজা হৃষীকেশ লাহা) পদত্যাগ করেন এবং চেম্বারের একদল সদস্য নিয়মকানুন 'গণতন্ত্রমূলক' করিতে সিদ্ধান্ত করেন, তখন বর্ত্তমান সভাপতি দুইবৎসরের অধিককাল সভাপতি থাকিবেন না বলিয়া আমাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু আরও দুই বৎসর কাটিয়াছে, তবু সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ হয় নাই।"

নলিনীরঞ্জন সরকারের আর যত দুর্ব্বলতাই থাকুক, প্রতিশ্রুতি দিলেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে হইবে—এইরূপ দুর্ব্বল ধর্ম্মভীরু মনোবৃত্তি তাহার আছে—এ কথা তাহার অতি বড় শত্রুও বলিতে পারে না। অতএব নামাইয়া না দিলে স্বেচ্ছায় সে কোনদিনই চেম্বারের সভাপতির গদী হইতে নামিয়া বসিবে না। বাঙ্গলায় আজ প্রয়োজন হইয়াছে সেই সাহসিক সঙ্ঘশক্তির যে দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য এই অবাঞ্ছিতকে জোর করিয়া চেম্বারের "মৌরসী পাট্টা" হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে পারে।

প্রমথ, নলিনী ও বীণা

ব্যভিচারের মামলার পূর্ণ বিবৃতি

দাম্পত্য জীবন, দিল্লী কাহিনী, পুত্রের জন্ম ও ১৭ই জুনের ঘটনার বিশ্লেষণ

ফরিয়াদী পক্ষে এডভোকেট মিঃ পি, এন, ব্যানার্জ্জি, সওয়াল প্রসঙ্গে অভিযোগোক্ত ১৭ই জুন তারিখের ঘটনার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ঐ ঘটনা সম্পর্কে যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে সর্ব্বাংশেই প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ বলা চলে। তদ্ব্যতীত পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণও বিস্তর রহিয়াছে।

মিঃ ব্যানার্জ্জি বলেন,—ফরিয়াদীপক্ষের কথা এই যে, বীণা ফরিয়াদী প্রমথনাথ সরকারের আইনসঙ্গতভাবে বিবাহিতা পত্নী কিন্তু বিবাহের পর হইতেই বীণা অবিরত তাহার স্বামীকে স্বামীর অধিকার দানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছিল এবং অসুস্থতার অজুহাতে ১৯৩১ সালের জানুয়ারীর শেষের দিকে বীণা ও আসামী সুদূর দিল্লী নগরীতে চলিয়া যায়। তথায় তাহারা ২৫শে জানুয়ারী হইতে ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে—তারপর তাহার গর্ভ সঞ্চার হয়। ফরিয়াদী পক্ষ বলেন যে, ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের কাছাকাছি সময়ে কলিকাতায় অবস্থানকালে বীণার গর্ভ সঞ্চার হয়। বীণা তখন তাড়াতাড়ি তাহার স্বামীর সঙ্গে বাস করিবার জন্য ফেণী চলিয়া যায়। পাছে ব্যভিচারের ফলে গর্ভসঞ্চার হইয়াছে লোকে এইরূপ মনে করে এই জন্যই সে ফেণীতে তাহার স্বামীর নিকট গিয়াছিল—পরে বীণার একটি ছেলে হয় ঐ ছেলে ফরিয়াদীর ঔরসজাত নহে। ১৯৩৪ সনের ১৭ই জুন তারিখ ফরিয়াদী ও তাহার ভগ্নীপতি বিনোদ হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ের সকলের উপরের তলায় আসামীর বাসস্থানের একটা কক্ষমধ্যে আসামী ও বীণাকে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা কালে হাতে নাতে ধরিয়া ফেলেন। ঐ সময়ই ফরিয়াদী তাহার স্ত্রী ও আসামীকে সমুচিত শিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ভগ্নীপতি বিনোদ তাহার হাত ধরিয়া ফরিয়াদীকে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করেন। ফরিয়াদী তাহার স্ত্রীর সহিত আর কোনই সংস্রব রাখেন না, তবে তিনি প্রকাশ্য আদালতে এই সকল কেলেঙ্কারীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ১৯৩৪ সনের অক্টোবর মাসে আইনজ্ঞদের পরামর্শ মত ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় ফরিয়াদী এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। উহাতে জানান হয় যে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার হেফাজত ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। ফরিয়াদীর আত্মীয়গণ ফরিয়াদীকে তাড়াহুড়া করিয়া একটা কিছু করিয়া বসিতে নিষেধ করায় তিনি কিছু করেন নাই। ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ফরিয়াদী কলিকাতা আসিলে "খেয়ালী"তে কিছু পাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন যে, ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই সাধারণ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কাজেই আর অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। এই জন্যই তিনি বিবাহ-চ্ছেদের মামলা আনিবার জন্য আইন ব্যবসায়ীদের নিকট গমন করেন। আইন ব্যবসায়ীদের পরামর্শ মতই তিনি আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারার অভিযোগ আনয়ন করেন।

সুটকেসের চিঠি

অপর পক্ষের কথা এই যে, বীণা তাহার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুরক্তা, সে কখনও তাহার স্বামীকে স্বামীর অধিকার ছাড়িয়া

দিতে গররাজী হয় নাই এবং বীণার যখন মাঝে মাঝে জর হইতেছিল সে তখন বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যই তাহার কাকার সঙ্গে দিল্লী গিয়াছিল এবং দিল্লীতে কখনও সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই। বীণার যে ছেলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে উহা ফরিয়াদীরই ঔরস-জাত পুত্র। বীণা যখন ফেনীতে তাহার স্বামীর নিকট ছিল তখনই সে গর্ভবতী হয়। আসামী পক্ষ হইতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, ১৭ই জুন তারিখে যেরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে ঐ ধরণের কিছুই হয় নাই এবং ১৯৩৪ সালের ১৬ই জুন তারিখ বা উহার কাছাকাছি সময়ে ফরিয়াদী কলিকাতায় আসিয়া বীণার পিত্রালয়ে বাস করিতে থাকে। পরে ২৩শে জুন তারিখ কোন অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য ফরিয়াদীকে শ্বশুর গৃহ ত্যাগ করিতে হয়। এই অপ্রীতিকর ঘটনা এইরূপে ঘটে:—বীণার নিকট ফরিয়াদী কর্ত্তৃক লিখিত কতিপয় চিঠি ফরিয়াদী হস্তগত করিয়া একটি সুটকেসে রাখে, ফরিয়াদীর অনুপস্থিতিতে বীণা আবার তাহার স্বামীর সুটকেশ হইতে ঐগুলি বাহির করিয়া লইয়া নিজের বাক্সে রাখে। ফরিয়াদী ইহা জানিতে পারিয়া নিজকে অপমানিত বোধ করে, বীণাও এই ব্যাপার লইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে ও তাহাকে অবিলম্বে ঐ বাড়ী ত্যাগ করিতে বলে। এই মামলা সম্পর্কে এরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে যে, মিথ্যা কুৎসা প্রচারের ভয় দেখাইয়া টাকা আদায়ের মতলবে এই মামলা দায়ের করা হইয়াছে। আসামী পক্ষের কথা এই যে, ফরিয়াদী একজন সন্দেহপ্রবণ লোক এবং তাহাই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গোলযোগের মূল। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য এই যে, স্বামীকে স্বামীর অধিকার ছাড়িয়া দিতে বীণার আপত্তি কিসে? প্রকৃত ব্যাপার হইল এই যে, ফরিয়াদী তাহার স্ত্রীর সততা সম্পর্কে সন্দিহান ছিল। এই সন্দেহ সংশয় থাকা কালেই সুটকেশ হইতে চিঠি অপসারণের ঘটনা ঘটে। মিঃ ব্যানার্জ্জি বলেন, আসামী পক্ষের এই সকল যুক্তি কখনই টিকিতে পারে না। প্রমথ সরকারের মত প্রতিষ্ঠার একজন লোক কি তাহার কয়েকখানা চিঠি তাহার পত্নী যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়াছে বলিয়া নিজ বিদুষী পত্নীকে গালিগালাজ করিতে পারে? তারপর বীণার ন্যায় একজন শিক্ষিতা মহিলা কি করিয়া এতটা আত্ম-বিস্মৃত হইতে পারে যে, সে তাহার স্বামীকে গালিগালাজ করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিতে পারে? এরূপ উত্তেজিত হইবার কারণ বীণার পক্ষে কি হইতে পারে? বলা হইয়াছে যে, শ্বশুর গৃহ হইতে বিতাড়িত হওয়ায় প্রমথ সরকারের মনে এতই আঘাত লাগে যে, সে শুধু ঐ বাড়ী হইতেই বাহির হইয়া যায় না—সে ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপনও দিয়া বসে। ঐ বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছে যে, পত্নীর সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই।

সন্দেহের সূত্র কোথায় ?

মিঃ ব্যানার্জ্জি অতঃপর কতিপয় চিঠিপত্রের কথা উল্লেখ করেন। ঐ সকল পত্রে জানা যায় ফরিয়াদী তাহার স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। ঐসকল সাক্ষ্য হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ফরিয়াদীর মনে একটী সন্দেহ ছিল। প্রমথ সরকার কখনও ভাবে নাই যে, এইভাবে তাহাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হইবে। প্রমথ সরকারের মনে প্রথম হইতেই যে সন্দেহ জাগরুক ছিল, ঐ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া ফরিয়াদী নিশ্চয়ই ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে নাই। এতৎ সম্পর্কে ২৩শে অক্টোবর তারিখের ঘটনার কথা বিবেচনা করা যাউক। একটী সাধ্বী স্ত্রী ও একজন শিক্ষিত স্বামীর মধ্যে সামান্য একটু মতানৈক্য হইয়াছিল, ঐ মনোমালিন্যটুকুর জন্যই কি ফরিয়াদী ঐরূপ আচরণ করিতে পারে? ৪ মাসকাল বিবেচনার পর ফরিয়াদী 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় উক্ত নোটীশ প্রকাশ করেন। প্রমথ বাবু ছেলেটী নিজের ঔরস-জাত বলিয়া জানিয়াও তাহাকে জারজ পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন একজন প্রকৃতিস্থ মানুষ কি তাহা পারে?

সামান্য একটু মনোমালিন্যের জন্য বীণা যদি তাহার স্বামীকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে তাড়াইয়া দিত তাহা হইলে বাড়ীর অপর লোকদের এমন কি বীণারও পরবর্ত্তী আচরণ কিরূপ হইত? একটা তুচ্ছ ঘটনাকে এতবড় করিয়া ফেলার জন্য বীণাও কি পরে অনুতপ্ত হইত না? স্ত্রী সর্ব্বদাই স্বামীর নিকট পূজনীয়, কাজেই আসামীপক্ষের এই সকল ঘটনা সম্পর্কীয় যুক্তিকে একান্ত আজগুবী ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া বাতিল করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

দিল্লী প্রবাসে নলিনী ও বীণা

মিঃ ব্যানার্জ্জী অতঃপর বদরুজ্জমানের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য কিনা তৎসম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, এই সাক্ষ্য পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহের একটা নির্দ্দিষ্ট রূপ দান করিবে।

দিল্লীর ঘটনা সম্বন্ধে মিঃ ব্যানার্জ্জী স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে সকল পত্রের আদান প্রদান হইয়াছিল তাহা হইতে কয়েকটি অংশ উল্লেখ করিয়া বলেন যে এ ক্ষেত্রে এমন এক পত্নী দেখা যাইতেছে, স্বামীর প্রতি যাহার অনুরাগ ত' নাই-ই, পক্ষান্তরে তাহার প্রতি একটী বিরাগই আছে। চিঠিপত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহবাস হয় নাই। বদরুজ্জমানের সাক্ষ্য ও পারিপার্শ্বিক ঘটনা হইতে ব্যভিচার যে হইয়াছিল এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। ১৭ই জুনের পরবর্ত্তী ঘটনা সম্পর্কে মিঃ ব্যানার্জ্জী বলেন যে, ইহার পূর্ব্বেও ব্যভিচার হইয়াছিল। ১৭ই জুনের ঘটনা সম্পর্কীয় সাক্ষ্য হইতে উহা একরূপ নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হয়।

অতঃপর মিঃ ব্যানার্জ্জী বীণা কর্ত্তৃক

তাহার স্বামীকে লিখিত পত্রসমূহ ও ডাইরী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিবাহের পর হইতে স্বামীর প্রতি তাহার মনোভাব বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, তিনি বলিতে চাহেন যে, বীণা স্বেচ্ছায় আসামীর সহিত দিল্লী গিয়াছিলেন। বীণা নিজে আসামীর সহিত পরামর্শ করিয়া দিল্লী যাত্রার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, বীণাকে তাহার পিতামাতা প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং আসামী তাঁহাকে দিল্লী লইয়া গিয়াছিলেন।

বীণা রোগিণী ছিলেন, মাঝে মাঝে জ্বর হইত বলা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার জন্য কোন পরিচারিকা নিযুক্ত করা কেহ আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। বস্তুতঃ ইহা বড়ই বিস্ময়কর। ডাঃ এস, কে, মিত্র বলিয়াছেন যে, ১৯৩০ সালের শেষভাগে বীণা গুরুতররূপে পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। মিঃ ব্যানার্জ্জী সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে দেখান যে, ১৯৩০ সালের শেষভাগে বীণার কোন পীড়া ছিল না এবং দিল্লীতে অবস্থানের প্রথম হইতেই বীণা সুস্থবোধ করিতে লাগিলেন। বীণা তাঁহার পত্রসমূহে দিল্লী যাত্রা ও তাহার খাদ্যদ্রব্যের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা দেখিবেন, উহা সত্য কিনা। ডাইরী বহিতে লেখা হইতে দেখা যায় যে, তাঁহাদের দিল্লী অবস্থান যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তখন আসামী ফরিয়াদীকে দিল্লী যাইতে পত্র লিখিয়াছিলেন।

অতঃপর মিঃ ব্যানার্জ্জি বলেন যে, বীণার পত্র হইতে দেখা যায় যে, বীণা হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ে যাওয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু বলিয়াছেন যে, তিনি কখনও একাকী যান নাই এবং তাহার ও আসামীর মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। মিঃ ব্যানার্জ্জি অতঃপর বলেন, তাহার বক্তব্য এই যে, কলিকাতায় থাকা কালে বীণার গর্ভ হইয়াছিল। বীণা তাঁহার ডাইরীতে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিবাহিত জীবনের কোন সুযোগ লাভ হয় নাই। বীণা আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, ফেণীতে অবস্থানকালে তিনি একত্রে শয়ন করেন নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাই দাঁড়ায় যে, স্বামীর সহিত সম্পর্কে তিনি ঘৃণা করিতেন।

বীণার পুত্র—বৈধ না অবৈধ ?

অতঃপর মিঃ ব্যানার্জ্জী পুত্রটি বৈধ, কি অবৈধ তৎসম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স হইতে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া ও নজীর দেখাইয়া বলেন যে, শিশুর জনক কে, তাহা নির্দ্ধারণে কোন গোলযোগই হইতে পারে না। ফরিয়াদী তাঁহার পত্নীকে অপমানকর পত্রসমূহ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর তিনি হঠাৎ মনোভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। কেন এরূপ হইয়াছে ? কারণ, শিশু নিজ ঔরসজাত না হইলেও কেহ তাহা অস্বীকার করিবার মত নির্ম্মম হইতে পারে না।

১৭ই জুনের ঘটনা

অতঃপর মিঃ ব্যানার্জ্জী বলেন যে, বিমলেন্দু বলিয়াছে যে, জুন মাসে সে যখন বীণার বাড়ীতে গিয়াছিল তখন তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখিয়াছিল। সে আরও বলিয়াছে যে, অনেক সময় সে আসামীর মোটর আসিতে ও বীণাকে লইয়া যাইতে দেখিয়াছে। বীণার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে, বীণা তাহার 'বড়কাকার' সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। মিঃ ব্যানার্জ্জী বলেন, এই সকল বিষয়ের সহিত বদরুজ্জমান খাঁয়ের সাক্ষ্য বিবেচনা করিলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ব্যভিচারের অভিযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৭ই জুনের ঘটনা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। ফরিয়াদী ও তাঁহার ভগ্নীপতি বিনোদ এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন। বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ের দ্বারবান ইঁহাদিগকে উপরতলায় যাইতে দিয়াছিল কেন? সেদিন রবিবার বলিয়া ইহা সম্ভবপর; তাহা ছাড়া, পাছে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয়, এইজন্য নলিনীবাবু সম্ভবতঃ তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতে পারেন নাই।

দরজায় খিল দেওয়া না থাকার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রমথবাবু যে আসিবেন, নলিনীবাবুর সে ধারণা ছিল না।

প্রমথবাবু যে, থানায় রিপোর্ট করেন নাই, তৎসম্পর্কে মিঃ ব্যানার্জ্জী বলেন যে, পুলিশের নিকট পত্নীর ব্যভিচারের বর্ণনা করা স্বামীর পক্ষে প্রীতিকর কার্য্য নহে। সেইজন্য তিনি সম্ভবতঃই ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন।

উপসংহারে মিঃ ব্যানার্জ্জী বলেন যে, দিল্লীর ঘটনা ও তাহার সমর্থনে বদরুজ্জমানের সাক্ষ্য, ফেণীতে স্বামীর সহিত অবস্থানের জন্য জুলাই মাসে বীণার কলিকাতা ত্যাগ, ১৭ই জুন তারিখে বীণার আচরণ সম্পর্কে সাক্ষ্য এবং তাহার পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রমথবাবুর পক্ষে অভিযোগের প্রকৃত কারণ বিদ্যমান।

ফরিয়াদীর যোগাযোগে ব্যভিচার হইয়াছিল কি না, তৎসম্পর্কে মিঃ ব্যানার্জ্জী বলেন যে, বিবাহের এক মাস পরে ফরিয়াদীর কিছু সন্দেহ হইয়াছিল। আসামীর মোটরে বীণার যাওয়ায় তিনি উষ্মা প্রকাশ করিতেন। তিনি যখন বীণাকে ফেণীতে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন বীণা অসম্মত হইয়াছিলেন। ফরিয়াদী তাঁহার ভাগিনেয়কে বীণার উপর লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা হইতে ফরিয়াদীর যোগাযোগ ছিল না ইহাই প্রমাণিত হয়।

মিথ্যা কুৎসা প্রচারের ভয় দেখাইয়া টাকা আদায়ের বিষয় সম্পর্কে মিঃ ব্যানার্জ্জী বলেন যে, আসামী পক্ষ বলিতে চাহিয়াছেন যে, মামলাটি সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত—কাল্পনিক মিথ্যা কুৎসা প্রচারের দ্বারা টাকা আদায়ের উদ্দেশ্য ইহার অন্তরালে আছে। ফরিয়াদী বলিয়াছেন যে, তিনি আসামীকে শাস্তি দিতে চাহেন—আসামীর নিকট হইতে একটি কড়িও চাহেন না। টাকা আদায়ের ফন্দীতে যে এই মামলা রুজু করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।

মিঃ ব্যানার্জ্জী বলেন যে, ব্যভিচারের দুইদিকা অভিযোগই প্রমাণিত হইয়াছে। এই মামলায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা হইয়াছে, এরূপ ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষা ভাল সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা সম্ভবপর নহে। এ ক্ষেত্রে আসামীর সাজা হওয়া উচিত।

জীম্ ও অভী

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক

(১)

'জীম্'। কলেজের খাতায় নাম ছিল হয়ত জীমূতবাহন। কিন্তু প্রফেসারের কাছে সে বিনামা রোল্ নাম্বার মাত্র। বন্ধুরা ডাকিল 'জীম', কোন মাস্‌তুত ভাইয়ের কাছে ঐ সংক্ষিপ্ত সংস্করণের আবিষ্কার করিয়া। জীম সাড়া দিল,—নিক্ নেম্-টাও জেনেছো বাবা!

আর 'অভী'। পুরানাম আভাও হইতে পারে, আইভি-লতাও হইতে পারে, আবার অভিলাষিণীও হইতে পারে। জীমের সেই মাস্‌তুত ভাইয়ের পিস্‌তুত বোন অভী। এখন আর কলেজে পড়ে না,—যারা সদ্য কলেজ ছাড়িয়াছে তাদের সঙ্গে বায়স্কোপ দেখিতে যায়,—যথা জীমের সঙ্গে। অভী এখন জীমের কাছে ঠিক সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, যখন আর নাম ধরিয়াও ডাকা চলে না, আপনি বলিতেও বাধে; শুধু সাম্‌না সাম্‌নি বলিতে হয়,—কখন্ আসা হোলো? আবার দীর্ঘ আলাপের মধ্যে নিজের ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্‌স্ (নিজেকে ছোট দেখা রোগ) এর জন্যই হয়ত 'আপনি' আসে।

অভী বলিল,—আজ চিত্রায়? না প্লাজার ম্যাটিনীতে? জীম্ বলিল,—না, ম্যাটিনীতে নয়, সেই সাড়ে ন'টায়,—ম্যাটিনীতে যায় কেবল টেলিফোন্ গার্লস্। অনেক রাত হবে ব'লে ভাবছো? সেদিন ত গেছলে, মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি তাতে আশা করি।

কিন্তু সে আশার বাড়াবাড়িও ভালো নয়। বলিয়া অভী ভ্রূভঙ্গী করিল। পাতলা ছিপ্‌ছিপে মাজা-ঘষা অভী—চক্‌চকে রুটি কাটা ছুরির ফলার মতো অভী—যার বয়স বাইশ হইতে বত্রিশের যে কোনটা মনে করা যায়,—সেই অবিবাহিতা তরুণী অভী—যার কানে বিলম্বিত দীর্ঘ ঝুমকা, আর বুকের ডানদিকে নামানো সাড়ীর লাল পাড়—যেন বইয়ের পাতায় লাল পেন্সিলের দাগ,—সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল,—তবে চা খেয়ে গল্প টল্প ক'রে বেরোলেই চলবে। না হয় ব্রীজ খেলা যাক্ খানিকক্ষণ।

জীম আরও বেশী রকম গম্ভীর হইয়া বলিল,—না। চা না হয় বাইরেই খাবে আজ। আর জানোই ত গল্প আমার তেমন জমে না, মুখের চেয়ে হাত-পা-ই বেশী চলে। শীগ্‌গি প্রস্তুত হ'য়ে নাও, একটু বেড়িয়ে শেষে প্লাজায় যাবো।

অভী হাসিয়া ফেলিয়া ভিতরে গেলো কাপড় ছাড়িতে। জীম্ বসিয়া সিগারেট্ খাইতে লাগিল। বাহিরে আসিল সুসী।

অভীর বোন সুসী। সুসীর এখন সে-ই বয়স যে-বয়সে মেয়েটি অকারণ স্নানের ঘরে বড্ড দেরী করে, আর বেশ-ভূষা পরিতেও প্রায় ঘণ্টা খানেক লাগে,—অথচ যে-বয়সে পুরুষের সান্নিধ্যে মেয়ে থাকে সর্ব্বদাই এলার্ট্ (হুঁসিয়ার), পাছে কেহ আচম্‌কা গায়ে হাত দিয়া ফেলে। আর এই বয়সেই মেয়ের মুখের দিকে চাহিলে স্বভাবতই চোখ নামিয়া আসে আরও নীচে।

সুসী কোন প্রকার ভণিতা না করিয়াই বলিল,—আমিও যাবো বায়স্কোপে, রোজ রোজ দিদির সঙ্গে ফ্লার্ট করা চলবে না। বলে দিচ্ছি—হুঁ।

জীম চমকাইল না। ধীরে বলিল,—আজ নয়, মাত্র দুটো সীট্ কিনেছি—আর একদিন যেয়ো তুমি।

নাগিনীর মতো ফোঁস্ করিয়া সুসী বলিল,—চালাকি হচ্ছে, না? তা হ'লে ব'লে দেবো দিদিকে যে আপনি সেদিন আমার চুমু খেয়েছিলেন। হুঁ—

জীম ঘাবড়াইল না। বলিল—ছি! তুমি ছেলেমানুষ। আচ্ছা কাল যাবে তুমি।

—ঠিক?

—ঠিক।

থ্যাঙ্কিউ। বলিয়া সুসী বিদ্যুতের মতোই আবার মিলাইয়া গেলো।

* * *

ট্যাক্সি ছুটিয়াছে কলিকাতার রাজপথে। অপরাহ্নের কলিকাতা—একদিকে চলিয়াছে ঘর-মুখো ক্লান্ত গরীব কেরাণীর দল—বাসে

ট্রামে অসম্ভব ভীড়, যেন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে গাড়ী গাড়ী আহত সৈনিক চালান্ যাইতেছে হাঁসপাতালে। আর একদিকে ভ্রমণ-বিলাসী ধনীদের মোটর গাড়ী—মিনিটে মিনিটে বাজে হর্ণ, আর চকিতে চলিয়া যায় রূপ আর রাশি রাশি সোনা-রূপা।

অভীর মুখে তরল খুসি। জীম্ তখনো গম্ভীর। হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—এই সহরটার ওপর যদি বোমা পড়ে হাজার দশেক—তাহলে কাণ্ডটা হয় কেমন ধারা একবার ভাবো দেখি?

—হঠাৎ এ আজগুবি ভাবনা কেন? 'অল্ কোয়াইট্—' ছবি দেখেছেন বুঝি?

—না—না, 'অল্ কোয়াইট্'—নয়। যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ!!! আমি যুদ্ধে যাবো অভী। বলিতে বলিতে জীমের দুই চোখ গোলাকার হইয়া উঠে। নিজের জানুর উপরেই বাঁ হাতে একটা ঘুষি মারিয়া একবার নড়িয়া চড়িয়া বসে।

—তার মানে? যুদ্ধ আবার কোথায় বাধ্লো?

অভীর হাসি শুকাইয়া গেছে। চোখে বিস্ময়। ডান হাতে জীমের বাঁ হাত ধরিয়া ফেলিল, পাছে এরপর ঘুষিটা তার হাঁটুতেই পড়ে।

—যুদ্ধের আর দেরী কি অভী! বাধ্লো ব'লে। চীনের সীমান্তে জাপান ক্রমেই এগোচ্ছে। সমস্ত এসিয়া একদিন গ্রাস করবে ঐ জাপান। তখন কি আর ভারতবর্ষকে ছেড়ে দেবে? আর জানই ত কামানের গোলা ছুটে যায় বড় দ্রুত, এরোপ্লেন চলে দ্রুততর। যুদ্ধ, অভী, যুদ্ধ! আমি যুদ্ধে যাবো। মনে পড়ে রবিঠাকুরের সেই লাইনটা—"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন"? বাংলার প্রাণের ভেতর মস্ত একজন বেদুইন আছে লুকিয়ে,—বেদুইন দস্যু, বেদুইন যোদ্ধা। তুমি কি ভেবেছো জীবন একটা সখের গোলাপ-বাগান? ভুল, ভুল অভী!

এইবার অভীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। ঠোঁটে দাঁত চাপিয়া প্রথমে জীমের উরুতে একটা চিমটি কাটিল। তারপর চাপা খিল্ খিল্ হাসি হাসিয়া বলিল,—তবে ভুল এই বায়স্কোপ দেখা। তবে ভুল ঐ কবি-কবি চেহারা! যুদ্ধ করবেন আপনি? একবার সিঁড়ি উঠতে যে হাঁপিয়ে ওঠে। একদিন বেশী কিছু খেলেই যার শরীর অসুস্থ হয়, পরদিন আর পাত্তা পাওয়া যায় না ......

যুদ্ধের ধোঁয়ার কালী যেন জীমের মুখে ছাপ মারিয়া গেল। সে নিজেকে সামলাইয়া লইবার পূর্ব্বেই ট্যাক্সি থামিল মির্জ্জাপুর স্কোয়ারের ধারে এক বৃহৎ হোটেলের সামনে।

—এখানে গাড়ী থাম্লো কেন?

—এইখানেই কিছু খাওয়া যাক্,—এদের পুডিং একটা বিশেষত্ব। রুমগুলিও বেশ।

অভী আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই জীম দোতলায় উঠিয়া গেছে। ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—এসো।

অভী বলিল,—দোতলায় কেন? রেস্তোরাঁ ত এই নীচেয় দেখছি।

—ওখানে তোমার স্থান নয়। বলিয়া অভীর হাত ধরিয়া জীম তাহাকে তুলিয়া নিয়া গেল।

সুন্দর তক্তকে ঘর, দক্ষিণের জানালা দিয়া হু হু করিয়া বাতাস আসে। পালঙ্কে পরিপাটি বিছানা।

অভী কি ভাবিল। ভ্রূকুটী করিল। জীমের মুখের পানে একটা কঠিন দৃষ্টি ন্যস্ত করিল। আবার একবার বিছানার পানে তাকাইল। তারপর চেয়ারে বসিয়া পড়িল। টেবিলে খাবার সাজানো।

মুখের ভিতর খাদ্য পুরিয়া গাল ভারী করিয়া অভী বলিল,—এ ঘরের ভাড়া দিতে হবে?

—রাত্রি সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত পাঁচটাকা। আচ্ছা তুমি ওরকম রাক্ষসের মতো খাচ্ছো কেন অভী?

—আপনার মতো আর্টিষ্ট আমি নই। খাওয়াটা একটা পাশবিক ক্রিয়া, যদিও রান্নাটা আর্ট।...গেলাসে ও কি?

—মদ।

—মদ আমি কখনো খাইনি, খাবো না। মদ খাওয়া আর্ট! পশুরা মদ খায় না।

দেখো, অভী,—আমি ভেবে দেখলাম, যুদ্ধ বাধবে য়ুরোপে, এসিয়ায় নয়। ওঃ কি সাংঘাতিক রকম যুদ্ধের আয়োজন করছে ওরা—জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইটালি, রাশ্যা, আমেরিকা। আমি যুদ্ধে যাবো। এই বোধ হয় আমার শেষ জীবন উপভোগ। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমি কেবল ধোঁয়া আগুন, জাহাজ আর এরোপ্লেন। আর আহত সৈনিকদের সেই হাঁসপাতাল, সেই মৃত্যুর পরম রূপ। ওঃ ভাবতে শিউরে উঠি যে পৃথিবীর সমস্ত শিল্প-কলা ধ্বংস করে জেগে ওঠে এক প্রচণ্ড প্রলয়লীলা। মানুষ রূপে রসে পৃথিবীটা সাজাতে যেমন আনন্দ পায়, তাকে ছারখার করতেও কি তেম্নি আনন্দ পায়, অভী ?

—আবার প্রলাপ বকছেন ?

বলিতে বলিতে গলায় হাত চাপিয়া অভী কাসিতে লাগিল। বলিল,—বড় গলা জ্বলে এতে! না-খাওয়াটা কুসংস্কার বলেই খেলুম, নইলে... ওকি! এই বুঝি খাজায় বায়স্কোপ দেখা ?...

* * *

রাত্রি প্রায় দশটার সময় জীম দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া একখানা ডেক্-চেয়ারে বসিল। বাহিরে মিঠা হাওয়া, আর সম্মুখে নগরীর দৃশ্য! অভী তখনো খাটে শুইয়া আছে। বাহিরে আসিতে লজ্জা করিতেছিল, তাই খোলা জানালার ধারে হাওয়ায় মুখ পাতিয়া পড়িয়া রহিল।

ও পাশের একখানা চেয়ারে নজর পড়িতেই জীম দেখে তার মাস্তুত ভাই। জীমের কৌতূহল। কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই ভাই বলে,—রাস্কেল জীম, তুই এখানে কেন ?

—তুই কেন ?

হো-হো শব্দে মাস্তুত ভাই হাসিল। তারপর গলার স্বর নামাইয়া বলে,—দুদিন কলেজ বন্ধ,—তাই বারাসাত যাবার নাম ক'রে বিভাকে হষ্টেল থেকে নিয়ে এসেছি। কাল রেখে আসবো। বলিয়া দুই চোখ আধা বুজিয়া, ঠোঁটে-দাঁতে-হাসিতে রহস্য বুনিয়া মাস্তুত ভাই শিস্ দিতে লাগিল।... বিভাকে চেনো না শূয়ার,—বীণার বোন বিভা, বারাসতে আমাদের বাড়ীর পাশেই যাদের বাসা। দেখা হলে লজ্জা পাবে, তুই স'রে পড়।

বলিয়া মাস্তুত ভাই ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

একঘণ্টা পরে যখন হোটেলের ম্যানেজার বসিয়া ভাবিতেছিল,—না, এসব আর চলবে না,—কোন্‌দিন পুলিশ কেসে পড়বো—ঠিক সেই সময় নীচে আবার জীমের ট্যাক্সি শিঙ্গা বাজাইয়া যাত্রা করিল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকিয়া জীম বলিল,—দেখো অভী, যুদ্ধটা এসিয়া-মাইনরেও বাধা অসম্ভব নয়। কাজী নজরুল ঐখানে গিয়েই কবি হয়েছিলো।

অভী সখ করিয়া একটান সিগারেট

খাইয়া বলিল,—আপনার যুদ্ধেই যাওয়া উচিত। সমাজ আপনার স্থান নয়।

জীমের মুখে আবার কালিমা নামিতে-ছিল। অভী তাহা লক্ষ্য করিয়াই হয়ত চোখে স্বপ্ন জড়াইয়া জীমের বাঁ হাঁটুতে ডান হাত রাখিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে কহিল,—সত্যি, আজকের দিনটা আমি ভুলতে পারবো না—কিন্তু কি বিশ্রী! এতে নেশা লাগে কিন্তু আনন্দ নেই!

জীম্ শুধু অন্যমনস্কভাবে বলিয়া ফেলিল,—তাই নাকি!—কিন্তু এই কলকাতা একদিন ধ্বংস পাবে···

(২)

জীমকে নিয়া তার মা-বাপ কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পোর্ট-কমিশনারের অফিসে একটা চাকরী জুটিয়াছিল পঁয়তাল্লিশ টাকার, কিন্তু জীম করে নাই। বলে বছর দুই পরে তার আরও বড় কাজ মিলিবে মিলিটারী একাউণ্টস্-এ। কেমন করিয়া? কেন, যুদ্ধ ত বাধিল বলিয়া। সে যাবে বাঙ্গালী পল্টনে হাবিলদার হইয়া। ফিরিয়া আসিবে হয়ত এক ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া। তারপর চাকরী।

জীমের বাবা বলিলেন,—ছেলেটার মাথা বিগ্‌ড়াইছে। অতএব মা কহিলেন,—বিয়ে দাও।

মাস্তুত ভাই আসিয়া বলিল,—হ্যাঁ, বিয়ে দেওয়ার দরকার হয়েছে। নইলে দুদিন পরে আর পাত্তা পাওয়া যাবে না,—বড্ড বায়স্কোপ দেখার বাড়াবাড়ি, মেয়েদের সঙ্গে মিশছে একটু বেশি রকম।

জীমের ঘরে ঢুকিয়া সে বলিল,—আরে, সুসীকে বিয়ে করবি? আপত্তি নেই বোধহয়?

জীম ঠোঁট পাকাইয়া বলিল,—সুসীকে কেন? অভীর বিয়ের আগে সুসীর বিয়ে! আমি যুদ্ধে যাবো।

—তোর মুণ্ডু করবি স্টুপিড্। যুদ্ধে যায় কারা? যারা দুর্বল। যারা বিয়ে করতে ভয় পায় অথবা মেয়েমানুষকে সামলাতে পারে না, যারা দাম্পত্য-জীবনের জন্যে আন্‌ফিট্ (অযোগ্য)!

জীমের মুখ যেন ভূত দেখিয়া ফ্যাকাশে হইয়া গেল। ভাঙ্গা গলা দিয়া ছোট্ট শব্দ বাহির হইল—যাঃ!

মাস্তুত ভাই বলিয়া চলিল,—যাঃ নয়, ঠিক তাই। পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধে তখুনি যখন মেয়ে জাতটা পুরুষের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে—যখন বেড়ে ওঠে তাদের বিলাস-বাসনা, উচ্ছৃঙ্খলতা; পুরুষকে অতিক্রম ক'রে ওঠে তাদের দেহ-মন; আর পুরুষ নানা-প্রকার অসংযমের ফলে হয়ে যায় তাদের চেয়ে দুর্বল, ক্ষীণজীবী, হার মানতে আরম্ভ করে তাদের কাছে ঘরে বাইরে পদে পদে। তখুনি পুরুষ বাধায় যুদ্ধ, একটা অসামাজিক বীভৎস ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে মেয়েমানুষের হাত থেকে রক্ষা পায়। যাদের পৌরুষ আছে, তারা যুদ্ধ চায় না, তারা চায় বিবাহ, নারী, জীবন-সম্ভোগ। এই আমার ওয়ার থিওরি (যুদ্ধতত্ত্ব)!

জীমের মুখ তখন সম্পূর্ণ রক্তহীন। সে যেন ধরা পড়িয়া গেছে। তবু কোন মতে সামলাইয়া নিয়া বলিল—ননসেন্স্! (প্রলাপ!)

মাস্তুত ভাই চলিয়া গেল। কিন্তু জীমের আত্মসম্মানে ঘা মারিয়া গেছে। বিবাহ করিতে হবে। হ্যাঁ সুসী! অভীর চেয়েও চঞ্চল সুসী, তবু অতটা তীক্ষ্ণ নয়,—আরও রোগা ছোট্ট—তাহাকে হাতের তালুতে তুলিয়া বোধহয় নাচানো যায়। কিন্তু অভী কী বলিবে? বিশ্বাস-ঘাতকতা......

অভী কিছুই বলিল না। সে কেবল তার প্রিয় সখী বিভার কাছে নিভৃতে বলিল—আই পিটি সুসী (সুসীর জন্যে আমার দুঃখ হয়)! জীম তাকে সুখী করতে পার্বে না মোটেই—লুকিয়ে চুমু খাওয়া এক, আর সারাজীবন সুখী করা অন্য জিনিষ। জীমের না আছে অর্থ না আছে সামর্থ্য!

বিভা কটাক্ষে চাহিয়া বলিল—তাই নাকি! তবু তোমার বিয়েটা আগেই করা উচিত ছিল।

—তোমরা বিয়েটাকে অত বড় ক'রে দেখো

কেন ? বিয়ের ফুলশয্যার গোলাপই দেখো তোমরা, তার কাঁটা দেখো না। আমি সিনেমায় নামছি। বলিয়া বিভার হাতখানা টিপিয়া দিয়া অভী বলিল,—নীরেনবাবু—অফার দিয়েছেন একটা।

বিভা কিন্তু খুসী হয় নাই, কারণ জীম দেখিতে সুন্দর, তার ম্লান মুখেও একটা মাদকতা আছে। তা ছাড়া তাহাকে বিয়ে করিলে অভী নিশ্চয়ই নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিত।

খুসী হইল সুসী। সে আড়ালে একদিন জীমকে বলিল,—শেষে আমাকেই জালে ফেল্লেন, বড় দুষ্ট আপনি, হুঁ। আর তার প্রিয় সখী লীনাকে একদা ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল,—যাক্ জীম দা' শেষ রক্ষা করেছেন। নইলে বড্ড ভয় হয়েছিল আমার। সেদিন বায়স্কোপ থেকে......। কি সাংঘাতিক লোক, হুঁ।...হ্যাঁ, দিদি যে সিনেমায় নামছে—কুন্তল ফিল্মস্-এর নীরেন রায় ওকে নামাচ্ছেন 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-য়।

লীনা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল।

সুসীর সহিত জীমের বিবাহ হইল। সকল বিবাহের মতো ইহাতেও কত শত উৎসব। আলোকে উদ্ভাসিত গৃহ প্রাঙ্গণ, কলকণ্ঠে মুখরিত, রূপসী নারী সমাগমে গমগম কক্ষ। হাতে হাতে ফুলের তোড়া, প্রীতি-উপহার। ভোজনের বিপুল সম্ভার। কত রস, কত আনন্দ ! আকাশে হাসিতেছে সুন্দর চাঁদ। নীচে বর-বধূর গাত্রে মনোরম আভরণ, কণ্ঠে মোহন পুষ্প-মালিকা। বাসরে গীতালাপ, হাস্য-কৌতুক, ঢলাঢলি গলাগলি ভাব ! এ বর যেন সকল নারীর বঁধু, আজিকার রজনীতে যেন আবার প্রত্যেক যুবতী তার মানস-প্রিয়ের নিগূঢ় রূপটির সাক্ষাৎ পাইয়াছে ! তাই আর লজ্জা নাই, দ্বিধা নাই। তাহাকে ঘেরিয়া সারারাত চলিল আনন্দের নৃত্য, গানের মজলিস।

ফুলশয্যার রাত্রিতে জাগিয়া জীম ডাকিল,—সুসী। সুসী সাড়া দিল,—হুঁ।

পরদিন জীম তাহার ঘরে বসিয়া আছে মুখ গম্ভীর করিয়া, চাহনিতে উদাস ভাব। মাসতুত ভাই শুধাইল,—কি রে, কেমন লাগলো ?

জীম বলিল,—সুসী সতী নয়।

—তার মানে ?

—তার মানে—সুসীকে শুধোলাম, তুমি আর কাউকে ভালবেসেছিলে ? সে উত্তর দিলে, তুমি যেমন দিদির সঙ্গে প্রেম ক'রে আমাকে বিয়ে করেছো, আমিও যদি তেমিধারা কিছু ক'রে থাকি ত ক্ষতি কি ? বলে, কোন্ পুরুষটা বিয়ের আগে ব্রহ্মচারী থাকে শুনি ? আর মেয়েদের দেহ ত দূরের কথা, মনের শুদ্ধি নিয়েও তোমরা মাথা ঘামাও ?—মাইরি বলছি, যুদ্ধ বাধলেই আমি মেসোপোটেমিয়া চলে যাবো।

—তা হ'লে তুই সুখী হস্‌নি ? বলিয়া মাসতুত ভাই নাক চুলকাইতে লাগিল।—বড় বোকার মতো প্রশ্ন করিছিলি গাধা ! ওসব চেপে যা এখন। তা ছাড়া কোর্টসিপের বিয়েতে আবার কেউ সুখ পায় ?—যা সুখ ঐ বিয়ের আগে। বরং একটা অজানা অদেখা মেয়েকে বিয়ে করলে ঢের আনন্দ পেতিস্।

কি রকম ?—জীমের সপ্রশ্ন মুখ ক্রমেই পাংশুবর্ণ ধারণ করিতেছিল।—তবু যেন নিজের একটা মৌলিক কথা বলিয়া ফেলিল,—অজানা মেয়েকে বিয়ে করা মানে ত অন্ধকারে একটা মাংসপিণ্ডকে দুহাতে চট্‌কানো।

—হ্যাঁ—ঐ মাংসের গন্ধ যখন কমে আসে দুচারটে ছেলে-পিলে হওয়ার পর, তখন তার হাড়ের সামর্থ্যেই খাড়া হয়ে থাকে জীবনের চাল-খুটি। আর কোর্টসিপের বউ ত বাগানের প্রজাপতি, যার রং আছে প্রচুর, অথচ মাংসও নেই হাড়ও নেই। বলিয়া মাসতুত ভাই নিজের মুখখানাকে চাপটা করিয়া জীমের মুখের উপর একটা ক্রূর দৃষ্টি ছুঁড়িয়া দিল।

জীম রাগিয়া বলে,—তবে আগে কেন বলিস্‌নি এ'কথা ? তুই ত গছালি সুসীকে।

—নইলে আর উপায় ছিল কি ! অভী ত হাসপাতালে যাচ্ছে কাল—এপেণ্ডিসাইটিস্ অপারেশন্ করিয়ে সিনেমায় নাম্‌বে।—যাক্ উঠি।

মাস্তুত ভাই চলিয়া গেল। জীম ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া বইয়ের সেল্‌ফের পানে তাকাইয়া রহিল। চোখে পড়িল ছোট্ট একখানা বই—নাম 'ভাইল্ বডিস্' (ঘৃণ্য দেহ) !

জীমের মনে হইল, সত্যি যেন একটা ভীষণ যুদ্ধ কোথায় বাধিয়া গেছে। চোখের সম্মুখে সমস্ত কলিকাতা নগরী টলমল করিয়া উঠিল। সমাজের সকল শ্লীলতার মুখোস খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল যেন এক বিশাল বর্ব্বর, ক্ষুধিত হিংস্র পশু ! আর কত আবরণ দিয়া তাহাকে ঢাকা যায় ?...

রাত্রে জীম সুসীকে বলিল,—আচ্ছা, য়ুরোপে যদি যুদ্ধ বাধে, আর আমি যদি যুদ্ধে চলে যাই, তোমার আপত্তি আছে ?

সুসী বলিল,—না। তারপর সুসী ঘুমাইল। অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিয়া জীম দেখিল সুসী পাশ ফিরিল না ; তখন সেও ঘুমাইল।

(৩)

অভী এখন সিনেমার অভিনেত্রী। তাহার জন দশেক প্রণয়ী। কিন্তু তাহাকে বেশ্যা বলা সামাজিক কুসংস্কার, বাঁকা চোখের দৃষ্টি-

বিভ্রম মাত্র! সে রাত্রিতে বাড়ী আসে, কোন কোন দিন আসে না, সখী বিভার গৃহে নিমন্ত্রণ থাকে। মদ খাইতে আর তার গলা জ্বলে না।
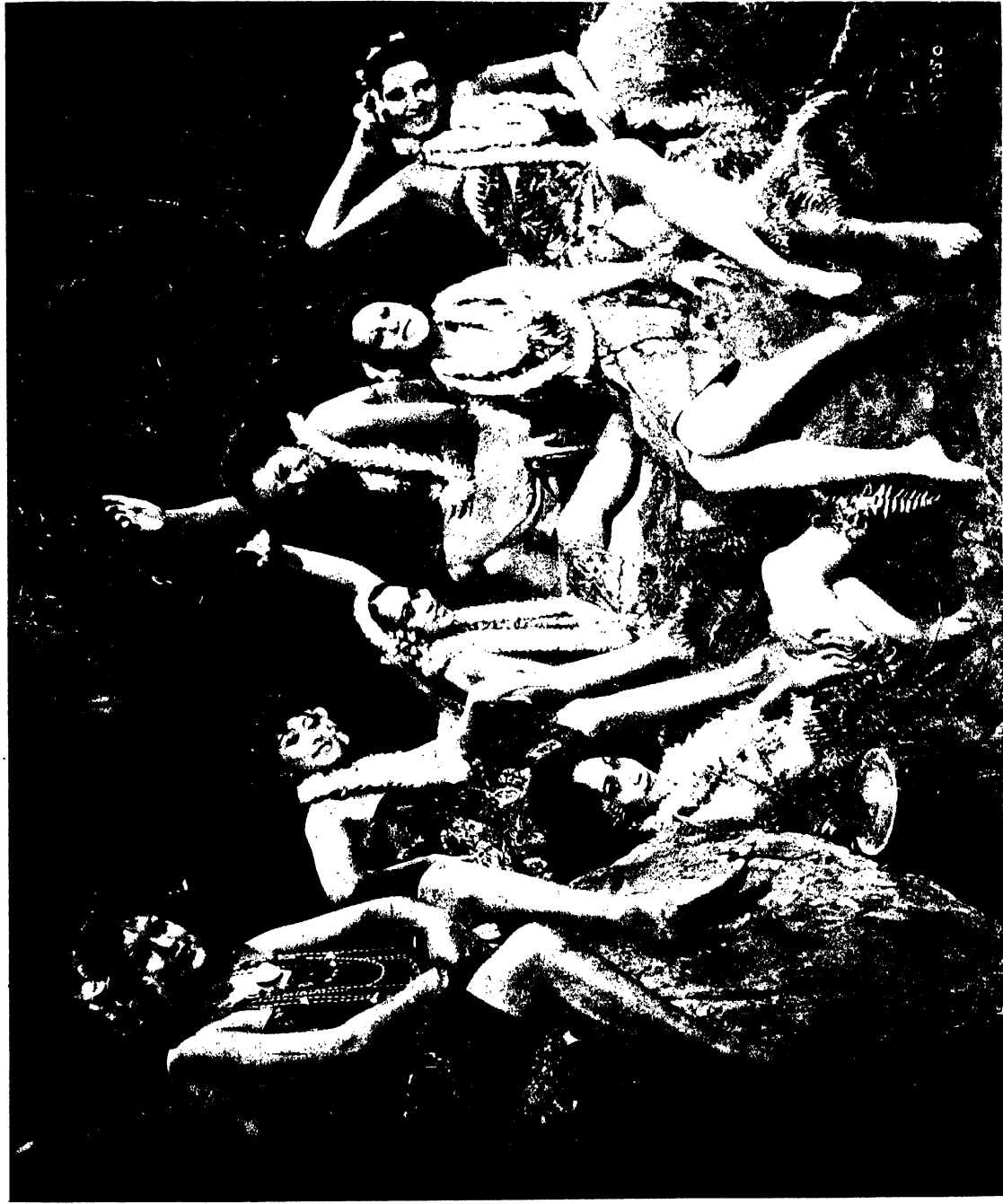
জীম এখন বায়স্কোপ দেখে কম। যেদিন দেখে, ফার্ষ্ট ক্লাশে সুসীকে সঙ্গে নিয়া আসে। একশো টাকার একটা চাকরী পাইয়াছে।

অভী দেখিল জীমের চেহারা আরও খুলিয়াছে—চোখ যেন আগের চেয়ে বড় বড়, গালে কিছু মাংস বেশি, যেন হারানো যৌবন ফিরিয়া আসিতেছে।

এই জীমকে সে চেনে,—সেই তিন মাস পূর্ব্বে ইহার সঙ্গে হোটেলে গিয়াছিল। জীম দুর্ব্বল, জীম দরিদ্র, জীম কি যেন কম্‌প্লেক্সে ভোগে···আই পিটি সুসী!

কিন্তু সুসী দুঃখিত বলিয়া মনে হয় না। হাসিয়া দুলিয়া জীমের হাত ধরিয়া বাস্‌ হইতে নামে। আর একটু মাংসল হইয়াছে, আরও আঁটো-সাঁটো চেহারা, আগের চেয়ে সম্বৃত।···কি করিয়া সম্ভব?

জীমকে দেখিয়া অভী হাসিল, জীমও হাসিল। অভী ভ্রূভঙ্গি করিল, জীম গম্ভীর হইল। অভী ভাবিল, জীম হোপ্‌লেস্ (আর উদ্ধার নেই)। বিবাহ করিয়া মানুষ এমন ধারা সুস্থ থাকে কেন? অভী শুধাইল,—ভগ্নীপতি, কাল আমাদের বাড়ী তোমার চায়ের নেমন্তন্ন। জীম বলিল,—ধন্যবাদ, কিন্তু সুসীর দু'দিন শরীর খারাপ, আস্‌তে পার্ব্বো না।

—বটে!···

মাস্তুত ভাইয়ের সঙ্গে দেখা, জীম বলিল,—অভী জাহান্নামে গেছে।

—তার জন্যে দায়ী তুমি আর আমি।

—কিন্তু পুরুষের জন্যে সমাজের ওপর এমন ধারা প্রতিশোধ নেওয়া ঠিক নয়। মেয়েরা উলটো পথে চলেছে।

—মানে?

—মানে, পুরুষ এতদিন বলে এসেছে, আমার চরিত্র যা-ই হোক না কেন, নারী তুমি সতী হও। আজ নারী বল্লে 'আমিও তোমারি মতো চরিত্রের আদর্শ দেবো ধূলায় লুটিয়ে, কিন্তু আমাকে স্বীকার ক'রে নিতে হবে।' সে বল্লে না,—'পুরুষ তোমার অশুদ্ধ দেহ আমি ছোঁব না'। বল্লে, 'এসো—তুমি আমি গলাগলি করি; দুজনায় সমাজ-নদীর দুই তীর ভেঙ্গে ফেলে বন্যা আনি।'

মাস্তুত ভাই বলিল,—ব্রেভো! জীম তোর এ তত্ত্ব এদ্দিন কোথায় ছিল? তারপর যুদ্ধটা এখন কোথায় বাধছে?
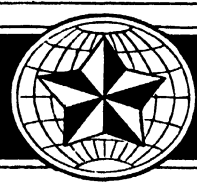
—যুদ্ধ বাধবে য়ুরোপেই। প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের সঙ্গে এমেরিকারও বাধা অসম্ভব নয়। জার্ম্মাণির সঙ্গে···

—যুদ্ধ বাধবে বোনে বোনে, ষ্টুপিড্‌! বলিয়া মাস্তুত ভাই চলিয়া গেল। জীম বোকার মতো হাসিল। তারপর সুসীর জন্য ওষুধ কিনিতে বাহির হইল।

ওষুধ কিনিয়া সুসীর কক্ষে গিয়া দেখে সুসী নাই। শুনিল, অভী আসিয়া সুসীকে নিয়া গেছে, বায়স্কোপ দেখাইবে। জীমের জন্য অপেক্ষা করিবে নীরেন রায়ের বাড়ীতে, সে ইচ্ছা করিলে যাইতে পারে।

জীমের আপাদমস্তক দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া

উঠিল। যুদ্ধটা তবে বাধিল বুঝি। অভী পতিতা, তাহার সংসর্গে সুসী! শিক্ষা, সংস্কার, রুচি, শিল্প, আর্ট—ফিড্‌লষ্টিকস্! সব দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে!

নীরেন রায়ের ঘরে তখন সুসী পড়িয়াছে বিপদে। নীরেন রায় তাহাকে জোর করিয়া মদ খাওয়াইবে, অভী তাহার চোয়াল টিপিয়া হাঁ করাইবার চেষ্টা করিল।

সুসী তড়িৎ-স্পৃষ্টের ন্যায় তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল। জীম বলিল,—য়্যা! সুসী তুমি! ওঃ!

অভী বলিল,—হ্যাঁ, সুসী আমারি বোন। তুমি তাকে য়্যাবডাক্ট্ করেছো। গেট্ আউট্!

জীম টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল। সুসী তখন বিছানায় পড়িয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। নীরেন রায় হতভম্বের মতো দাঁড়াইয়া আছে।

মাতাল অভী বলিল,—ঐ জীম দুর্ব্বল, সুসীর অযোগ্য। কিন্তু ও আমার মনে একদিন একটা ইমোশান জাগিয়ে তুলেছিলো,—ও নিজে সে-কথা ভুলে গেছে। বড় ভুলে যায় ও। বেশ হয়েছে!

সুসী একাই ফিরিয়া আসিল। অভী তাহার দিদি—সেই সেদিনের কলেজে-পড়া অভী! সর্ব্বশরীর ভয়ে ঘৃণায় কণ্টকিত হইল।

অভীর হিংসা,—পিশাচের মতো হীন জঘন্য হিংসা! সুসী কেন সুখে থাকিবে? জীম কেন সুখী হইবে?—সেই জীম যে অভীকে পথে নামাইয়াছে, কিন্তু সুখ দিতে পারে নাই! সুসীকে জীমকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও দুই তীরে, মাঝখানে প্রবাহিনী অভী! কাটি-কাটা ছুরির ফলার মতো অভী!

সুসী কোনমতে চোখের জল মুছিয়া গৃহে উঠিল। কিন্তু চোখের জল মুছিতে পারিল না......

জীম আত্মহত্যা করিয়াছে। কারণ জীম সুসীকে ভালবাসিত। সেদিন তাহাকে ভুল বুঝিয়াছিল।···· য়্যা, সুসী তুমি! ও! সুসী অভীর-ই বোন!

মাস্তুত ভাই বলিল,—য়ুরোপে যুদ্ধ একটা বাধিলে হয়ত জীম মরিত না।

সুসী কিছুই বলিল না। বাঙ্গালী-ঘরের আর সকল বধূর মতোই সে বিধবা হইল। ঠিক তেমিধারা ক্রন্দনরোল, চিতাবহ্নি, গঙ্গায় অস্থি-বিসর্জ্জন। তারপর সব শেষ। সুসী জীমকে হয়ত' ভালবাসিত। হয়ত সে জীমকে বুঝিবার আর চেষ্টাই করে নাই, অতি সহজে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। যেমন অনেক মেয়েই লইয়া থাকে।

সুসী বিধবাই আছে, শুনিয়াছি।

অভী সব শুনিয়া সখী বিভার কাছে বলিল,—স্মাট্ আনফিট্ জীম! (অক্ষম জীম!) তাহার মরাই উচিত। ঐ সুসীটার জন্যে আমার দুঃখ হয়—আবার বিয়ে করে না কেন?

ছিটে ফোঁটা

বিরূপাক্ষ শর্ম্মা

"বড় যদি হ'তে চাও ছোট হও তবে"

বহুদিন পরে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এবং এক অদ্ভুত অবস্থায় সতীশের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ঘটনাটা বলিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাভাস দিলে পাঠকগণের সুবিধা হইবে।

সতীশ ছিল আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। স্কুলে ও কলেজে সে ছিল আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। আই, এ, পাশ করিয়া আমাকে চাকরীতে যোগ দিতে হইল। সেই হইতে সতীশের সহিত ছাড়াছাড়ি। তবে শুনিয়াছিলাম সে এম, এ, পাশ করিয়া বাঙ্গলার বাহিরে কোথায় মাষ্টারী করিতে গিয়াছে। শিক্ষাদ্বারা ছেলেদের মানুষ করিয়া দেশ গঠন করিব— এইরূপ কতকগুলি ধূমমার্গী ধারণায় তাহার মস্তিষ্ক ভরাট ছিল। আমাদের ফাজিল বন্ধু কেদার তাই বলিত—"সতীশ আমাদের নবযুগের 'হেড়ো' '(Hero)'।

এহেন সতীশের সঙ্গে ময়দানে দেখা। খেলা দেখিতে যাইতেছিলাম। এমন সময় দেখি একজন লোক গম্ভীরভাবে ও চিন্তাকুল-নেত্রে আকাশের দিকে কি নিরীক্ষণ করিতেছে! লোকটাকে দেখিয়াই অত্যন্ত চেনা বলিয়া মনে হইল, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি কিছুতেই স্মরণ হইল না। কাছে গিয়া ভাল করিয়া দেখিতেই মনে পড়িয়া গেল—"আরে, এ যে সতীশ!" তবে চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুখের সে লাবণ্য, চোখের সে দীপ্তি নাই। মলিনবর্ণ, কোটরগত চক্ষু ও কৃশ শরীর দেখিয়া মনে হইল নিশ্চয়ই সে কোনো অসুখে ভুগিতেছে। একটু আশ্চর্য্য ও ব্যথিত হইলাম, কারণ সতীশ চিরদিনই ছিল স্বাস্থ্যবান। কিন্তু পরমাশ্চর্য্য এই যে, সতীশের কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। সে যে আকাশের দিকে চাহিয়া গভীর তন্ময়তার সহিত কি নিরীক্ষণ করিতেছে, তাহা সেই জানে। একটা লোক যে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তিন চার মিনিট ধরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে, সে দিকে তাহার লক্ষ্যই নাই। হঠাৎ মনে সন্দেহ হইল তবে কি সতীশ নয়। দূর ছাই! অত ভাবিতে পারি না। সহসা ডাক দিলাম "কি হে, সতীশ না?"

সতীশ চমকিয়া আমার দিকে ফিরিল এবং ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বলিলাম—"কি হে, আমাকে চিনতে পারলে না নাকি?"

আকাশ হইতে তাহার মনকে মাটীতে নামাইয়া আনিতে বোধহয় এই সময়টুকু গেল। কারণ এতক্ষণে সে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া ম্লান হাস্যের সহিত বলিল—"কে, অরুণ না?"

তাহার মুখের ম্লান হাসি এতই করুণ যে, সে কান্নারই নামান্তর। অত্যন্ত দুঃখ হইল। বলিলাম—"তোমার শরীর তো বড় খারাপ দেখ্ছি, কোন ভারি অসুখ বিসুখ ক'রেছিল বুঝি?"

"অসুখ ক'রেছিল মানে? অসুখ যে সঙ্গের সাথী!" শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম "অসুখ সঙ্গের সাথী! সে কি অসুখ হে?"

আবার সেই ম্লান হাসি হাসিয়া সতীশ উত্তর দিল "ভয় নেই, যক্ষ্মা নয়!"

একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম—"না তা' বল্‌ছিনা, তবে অসুখটা কি তাই জিজ্ঞাসা ক'রছিলাম।"

"অসুখটা শিবেরও অসাধ্য। এ অসুখের নাম দারিদ্র্য!" একটু থামিয়া সতীশ আবার বলিল "জানতো এম, এ, পাশ করার পর অন্য চাকরীর offer পেয়েছিলাম। কেরাণীগিরি ব'লে তা' ছেড়ে দিয়ে মাষ্টারী নিয়েছিলাম ছেলে গ'ড়ব, দেশ গ'ড়ব ব'লে। এখন নিজেই ভেঙ্গে যাচ্ছি। কেদারের কথাই এতদিনে ঠিক মনে হ'চ্ছে।"

ব্যাপারটা বড়ই করুণ ও মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আলাপের মোড় ফিরাইবার জন্য বলিলাম—"তা তুমি উপর দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছিলে?

হঠাৎ সতীশের দৃষ্টি আবার সেই উদাস-ভাব ধারণ করিল। সে উত্তর দিল—"আমার এক ধনী আত্মীয় ব'লেছিলেন যে ক'ল্‌কাতার আকাশে বাতাসে টাকা ঝুল্‌ছে, পেড়ে নিতে পারলেই হ'ল। তাই দেখ্‌ছিলাম।"

উত্তর শুনিয়া মনে হইল সতীশের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে।

আমার মনের কথা বুঝিয়া সতীশ বলিল—"মনে ক'রছ বোধহয় আমি পাগল হ'য়েছি। মোটেই নয়। আগে বরং পাগল ছিলাম—এখন মাথাটা প্রায় ঠিক হ'য়ে এসেছে। আগে বড় বড় কথায়, বড় বড় আদর্শে বিশ্বাস করতাম। এখন বুঝ্‌ছি সব বাজে কথা। ছোট বেলায় পড়ি

"বড় যদি হ'তে চাও ছোট হ

খুব সত্যি কথা। যে

হীন, যত নীচ, এ যুগে ধ

বড়। তাই কল্‌কেতায় এসেছি। ছোট হ'বার, হীনতা ও নীচতা করবার—অর্থাৎ বড় লোক হ'বার পথ খুঁজতে। বাৎলে দিতে পার সেই পথ।"

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া সতীশ হন্ হন্ করিয়া রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। ব্যথিত বিস্ময়ে আমি সেই দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম আর মর্ম্মান্তিক ব্যথার সঙ্গে সতীশের কথাচিত্র—এ যুগের বিভীষিকাময়ী ছবি চোখের সাম্‌নে ফুটিয়া উঠিল :—

"বড় যদি হ'তে চাও, ছোট হও তবে।"

——:০:——

সাহিত্য পরিচয়
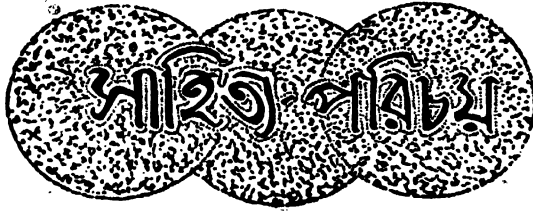
ওগো কল্পময়ী—(কবিতার বই) শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত প্রণীত। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

কবি শ্রীযুক্ত দিলীপ দাশগুপ্ত বাঙ্গলার পাঠকপাঠিকা সমাজে অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বে "মুশাফির" নামে তাঁর আর একটী কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। "মুসাফির"-এ দিলীপ বাবুর কবিত্বশক্তির যে আভাষ পাওয়া গিয়াছিল, আলোচ্য পুস্তকে তাহা সুপরিণত হইয়াছে। ছন্দের সাবলীল বৈচিত্র্যে, ভাষার মাধুর্য্যে, কল্পনার সুষমায় এই পুস্তকের কয়েকটী কবিতা উল্লেখযোগ্য। যখন পড়ি—

"ব্রীড়ানতা উচ্ছ্বসিতা বধূ
কিশলয়া অরণ্যেতে উন্মথিয়া রচিল যে মধু
সম্পূরক একান্ত সে সুধা
জাগাইলো দেহ মনে প্রাণমনে অপমৃত্যু
রূপতৃষা ক্ষুধা।
ওষ্ঠভরা যে মিনতি ডাকে বারে বারে
পেনু না তাহারে।
অসাড় অনড় বধূ প্রতিক্ষণ ধরে নবরূপ
রচে অন্ধকূপ ;
রমণীয় কমনীয় নৃত্যরতা প্রথমা সে তাই
তুলিয়া শেষের দাবী তাহারেই প্রণাম জানাই।"

অথবা

তোমার আকাশ নীলিমা জড়ায়ে
গান গেয়ে একা একা
মোর আঙ্গিনার ফুলকলি ঠোঁটে
ফুটায়েছে হাসি রেখা।
ঝ'রে যদি পড়ে সে মুকুলদল,
নয়নকোণের দুটী ফোঁটা জল
সে ব্যথা তোমার সানন্দ অগ্নি
অয়নের চারিধারে
সাবধানী হ'য়ো যদি বা কখনো
ফিরে আসে বারে বারে।"

—তখন কবির মনের আঙ্গিনায় কল্পনার আল্‌পনায় আঁকা কল্পময়ীর ছবি আমাদের চোখের সামনেও ফুটিয়া ওঠে। এই পুস্তকে দুই তিনটী যে হাল্কা কবিতা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে যেন সমস্ত পুস্তকের সুর কাটিয়া গিয়াছে মনে হয়। শেষে গদ্য ছন্দের কবিতাটী না লিখিলেই কবি ভাল করিতেন। জোর করা তারুণ্য বা ধারকরা ভঙ্গী সত্যকারের কবির শোভা পায় না। "গ্যাছে", "কাউরে" ইত্যাদি কবির ভাষার Mannerism গুলি কাণে লাগে।

ছাপার ত্রুটী বড় বেশী নজরে পড়ে, এমন কি সেই ত্রুটী এই পুস্তকের উৎকর্ষের হানি করিয়াছে বলিলেও বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। এই প্রসঙ্গে প্রকাশক যে মামুলি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন তাহা অচল। তিনি বলেন—"বইখানি ছাপ্‌বার জন্য অনিবার্য্য কারণে হাতে ছিল মাত্র তেরটি দিন।" এ' যুগে কবিতার বই খারাপ ছাপিয়া অনিবার্য্য কারণের দোহাই দিলে সকলে সে দোহাই যথেষ্ট না'ও মনে করিতে পারে। আশা করি ভবিষ্যতে দিলীপ বাবু এমন কোন প্রকাশকের হাতে তাঁহার কবিতা পুস্তক ছাপিতে দিবেন যাহার হাতে বই ছাপিবার জন্য অন্ততঃ তেরোর পরিবর্ত্তে তেত্রিশ দিন সময় থাকিবে।

——

সুদর্শন—(পাক্ষিক পত্রিকা) প্রথম বর্ষ, প্রথম খণ্ড। সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্ল চ্যাটার্জ্জী। কার্য্যালয় ১৫৬।১ হরিশ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য—বার্ষিক তিন টাকা ; প্রতি সংখ্যা ছ' পয়সা।

এই নূতন সহযোগীকে আমরা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাই। প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্তের "আধুনিক সাহিত্য" প্রবন্ধ ও নজরুল ইসলামের গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন গল্প, কবিতা, স্বরলিপি, ছায়াচিত্র-সমালোচনা যথারীতি আছে। ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

——

বিবিধ

নলিনী-বিজয়

কবিরাজ শ্রীঅনাথনাথ রায় নালিশ করিয়াছেন, বাঙ্গলায় অন্যতম মন্ত্রী সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় যে গৃহে বাস করেন (গৃহটি তাঁহার নহে—তাঁহার মাতামহ ৺ রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুরের এবং তাঁহার ঘর-জামাই—বিজয়প্রসাদের পিতা তথায় আশ্রয়লাভ করায় ললিতবাবুর তরফ হইতে এক দৌহিত্রপুত্রকে পোষ্যপুত্রে পরিণত করা হইলেও বিজয়প্রসাদ সপরিবারে তথায় বাস করিতেছেন) তথায় যাইবার জন্য তাঁহাকে টেলিফোনে ডাকা হইয়াছিল এবং তথায় তিনি মন্ত্রীর সহিত কোন বিষয়ের আলোচনা শেষ করিয়া ফিরিবার সময় সেই গৃহের কোন কক্ষ হইতে নলিনীর হিন্দুস্থানের কর্ম্মচারী—আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য জেলখাটা নলিনাক্ষ সান্ন্যাল বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাকে বলে—কয়খানি কাগজে তাহার সম্বন্ধে যে সব কথা বাহির হইয়াছে সে সব যে মিথ্যা, কবিরাজ মহাশয়কে তাহা লিখিয়া দিতে হইবে। কথাকাটাকাটি হইতে হইতে শেষে নলিনাক্ষ কবিরাজ মহাশয়কে প্রহার করে বলিয়া প্রকাশ।

আমরা মামলা সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। কিন্তু এমন মামলা সচরাচর দেখা যায় না। ইহাতে কে নাই? সরকারী কর্ম্মচারী বিজয়প্রসাদ আছেন—আইন অমান্য আন্দোলনে আসামী নলিনাক্ষ আছে। ইহাতে সাক্ষী আছেন—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। হিন্দু যেমন তেমনই মুসলমানও সাক্ষী আছেন। প্রত্যক্ষ সাক্ষী—বীরভূম জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীজিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও কর্পোরেশনে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-রূপে মনোনীত শ্রীদেবেন্দ্র দাস। আবার শুনিতেছি—কবিরাজ মহাশয়ের পক্ষ হইতে সার হরিশঙ্কর পালকেও সাক্ষী মানা হইবে।

মামলাটির বিবরণ যদি সত্য হয়, তবে লোকের পক্ষে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মন্ত্রীর বাড়ীতে যাওয়া আর সম্ভব হইবে না।

ঘটনার পর ও মামলা দায়ের হওয়ার পূর্ব্বে যে কয়দিন গিয়াছিল, তাহার মধ্যে মন্ত্রী—তাঁহার মাতামহের গৃহে সংঘটিত বলিয়া প্রচারিত ঘটনা সম্বন্ধে কোন বিবৃতি প্রকাশ করেন নাই; ঘটনা সত্য হইলে সে জন্য কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করেন নাই। এই শিষ্টাচার কি তাঁহার কৌলিক অর্থাৎ ঘর-জামাইয়ের ছেলের উপযুক্ত বলিতে হইবে?

নলিনীর আফিসের কর্ম্মচারী নলিনাক্ষ সান্ন্যাল কোন্ সূত্রে বিজয়প্রসাদের গুপ্ত-কক্ষে (অন্দরে নহে) থাকে?

আমরা আশা করি, বিজয়প্রসাদ ইহার মধ্যেই মুর্শিদাবাদের রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র সিংহ নেহালিয়াকে ভুলিতে পারেন নাই—যদিও "need-made honour doth forget men's names." বোধহয় তাঁহার স্মরণ আছে—রায় বাহাদুর যখন তাঁহার নিকট মনোনয়নপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন তিনি যে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাহার কারণ—রায় বাহাদুরের অপরাধ—

তাঁহার বহুদিনের পরিচিত নলিনাক্ষ সান্যালের অনুরোধে তিনি প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির শোভা-যাত্রায় নিজ মোটরকার দিয়াছিলেন।

সে ত অধিক দিনের কথা নহে। আর তাহার পর কোন্ সূত্রে (সূত্রটা লাকলাইন বটে) সেই নলিনাক্ষই তাঁহার কক্ষে আশ্রয় পাইল?

যে রাজনৈতিক সূত্রে নলিনী সরকার স্বরাজ্য দলের "হুইপ" হইয়াও কৃষ্ণনগরের মহারাজা—সরকারের কর্ম্মচারী ক্ষৌনীশচন্দ্রের গৃহে যাইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘণ্টার উপর গরুড়ের মত বসিয়া থাকিত, এ কি সেই রাজনৈতিক সূত্র? না—ভিতরে আরও কিছু আছে?

নলিনীর সহিত বিজয়প্রসাদের যে প্রেম কমলাকুঞ্জে ঘনীভূত হইয়াছে এবং বাগবাজার যাহার লীলাক্ষেত্র সেই প্রেম হেতু নলিনাক্ষ কি দৌত্য করিতেছে?

আমরা পরে বিজয়প্রসাদের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

বাগবাজারের বিপদ

দশ বা এগার জনের স্বাক্ষরে হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর সাফাই যে আবেদন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা লইয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। "আনন্দবাজার" ও "এ্যাডভ্যান্স" দামে ঐ বিজ্ঞাপন ছাপাইয়াছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সম্পাদকীয় মন্তব্যে হিন্দুস্থানের গুণ গাহিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন—"অমৃতবাজার" তাহাও করিয়াছিলেন।

গত ১৯শে এপ্রিলের "অমৃতবাজার" "পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি" স্তম্ভে ৪ জন পত্রপ্রেরককে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"Why not address your letters to the signatories to the manifesto issued by the (!!) asking there (!) to expre s their views publicly on the issues raised by you in your letters".

আর ঢাকার প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণ কাপড়ের কলের ম্যানেজিং এজেণ্ট শ্রীযুক্ত অতুল সেনকে লিখিয়াছেন—

"As we are not publishing any letters questioning the statements in the fanifesto (?) we should not we think in fairness to (?) publish your letter also".

ইংরাজীর বাহার দেখিয়া মনে হয়, লিখিবার সময় সম্পাদকের কম্প উপস্থিত হইয়াছিল।

সে কি নলিনী-প্রেম বশে?

বাগবাজারের নলিনীপ্রেমের কথা কে না জানে? হয়ত ইহার কারণও অনেক, যথা—

(১) হয়ত 'অমৃতবাজারের' কোন কোন অধিকারীর কোন দোকান হইতে হিন্দুস্থানের কাগজ কেনা হইতে পারে।

(২) হয়ত কর্ত্তাদের কাহারও কাহারও দুঃস্থ আত্মীয় হিন্দুস্থান কার্য্যালয়ে চাকরী পাইতে পারে।

(৩) হয়ত 'অমৃতবাজারের' বাজার দর সরবরাহকার পাটোৎপাদকরূপে নলিনী-শাসিত চেম্বারে স্থান পাইতে পারে এবং 'অমৃত-

বাজারের' বিবরণে চেম্বারের প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় পাইতে পারে।

কারণ যাহাই হউক কার্য্যকালে দেখি, নলিনীর স্তুতি গাহিতে 'অমৃতবাজার' মিথ্যা কথা বলিতেও পিছ্ পা' হয় না। দৃষ্টান্ত দিব কি?

গত ২১শে অক্টোবর তারিখে 'অমৃত-বাজারে' Rural Indebtedness শিরো-নামায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত ছিল:—পল্লীগ্রামে ঋণ সম্বন্ধে আইনের পাণ্ডুলিপি রচিত হইয়াছে এবং:—

"In contemplating the scheme underlying the Bill and the procedure envisaged in it we are reminded of the fact that the measures embodied in the Bill were, in all its essentials, anticipated some two years ago, by Mr. N. R. Sarkar in an address on the problem of Agricultural Indebtedness in Bengal. ...Mr. Sarkar's scheme embodied almost all the essential features contained in the Government Bill···We feel that no small meed of praise is due to Mr. Sarkar for the constructive suggestions put forward by him which formed the seed now sprouting into the Bill."

অর্থাৎ সরকার যে আইনের পাণ্ডুলিপি দাখিল করিবেন, তাহার মূল মালিক নলিনী। কিন্তু এই যে নির্লজ্জ স্তুতিবাদ ইহা নির্জ্জলা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

কারণ ৩০শে নভেম্বর তারিখে—'অমৃত বাজারের' স্তুতিবাদের মাসাধিক কাল পরে গভর্ণর সার জন উডহেড সেণ্ট এনড্রুজ ভোজে বলেন—

"A year ago tonight Sir John Anderson announced the decision to set up a Board of Economic Enquiry in order to facilitate co-operation between Government and outside opinion in the solving of economic problems. Government have just received a report from the Board together with a draft Bill for debt conciliation which will be examined by Government as quickly as possible."

তবেই দেখা গেল:—

(১) 'অমৃতবাজার' যে Government Bill বলিয়াছেন, তাহা সত্য নহে।

(২) বিল তখনও সরকারের কাছে পেশ হয় নাই।

তখন কে এই বিলের ভিতরের কথা বাগ-বাজারের গোচর করিয়া ছিলেন? যাহার স্তুতি গান করা হইয়াছিল, তিনিই নহেন ত? আর প্রবন্ধটি কাহার রচনা? নলিনী সর-কারের বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের মামলায় যে দিন সাক্ষী বদিডিজমানের জেরা হইবে সেই দিন সকালে যে ব্যক্তিটী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারই নহে ত?

গতবার মেয়র নির্ব্বাচন কালে নলিনীকে মেয়রের চেয়ারে বসাইবার জন্য 'অমৃত বাজারের' যে আগ্রহ দেখা গিয়াছিল, তাহাও আমরা জানি। নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে প্রথম যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহা কাহার লিখিত তাহা চারুচন্দ্র বিশ্বাস ও কোথায় লিখিত তাহা সার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় বলিবেন কি?

'অমৃতবাজার পত্রিকা' জাতীয়তাবাদী দলের পত্র বলিয়া সরকার কর্ত্তৃক "নিষিদ্ধ" হইলেও কি জন্য তাহাতে সরকারের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, সে রহস্য ভেদও দুঃসাধ্য নহে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স সম্পর্কে 'অমৃতবাজার' কিরূপ নলিনী-প্রীতি বা পিরীতি দেখাইয়াছেন, তাহার আলোচনা আমরা আর এক বার করিব। তাহা হইলেই বাগবাজারের সহযোগীর স্বরূপ প্রকাশ পাইবে।

চিত্তরঞ্জন পরিষদ

চিত্তরঞ্জন পরিষদ সম্বন্ধে কয়েকটী অভিযোগ পাইয়া আমরা গত সংখ্যা 'খেয়ালী'তে তাহা আলোচনা করিয়াছিলাম। ইহার পর আমরা চিত্তরঞ্জন পরিষদের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তাহার

আভ্যন্তরীণ সমস্ত পরিচালনা রীতি ও পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছি। আমরা এখন বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি যে, কর্তৃপক্ষগণ পরিষদটীকে যথাসম্ভব সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না।

এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যে কয়েকটী প্রধান অভিযোগ আনীত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বক্তব্য :—

(১) গত দুই বৎসরের মধ্যে সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয় নাই ইহা ঠিক নহে। এই সময়ের মধ্যে একটী সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কেবল গত বৎসরের সাধারণ সভা এখনও হয় নাই। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা তেমন উল্লেখযোগ্য ত্রুটী নহে।

(২) গত বৎসরে পরিষদের পরিচালক সমিতির ১৬টী অধিবেশন হইয়াছে।

(৩) গত বৎসরের হিসাব নিকাশ আমরা দেখিয়াছি। কর্পোরেশনের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্তির নিয়মানুসারে ৩১এ মার্চ্চের মধ্যে সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অডিট্‌ করা হিসাবপত্র দাখিল করিতে হয়।

(৪) এ বৎসর ৫-১-৩৫ তারিখে পরিচালক সমিতির একটা সভা হইয়াছে।

(৫) বাঙ্গলা পুস্তকের সম্পূর্ণ মুদ্রিত তালিকা আছে।

(৬) বৎসরে ৫০খানি করিয়া ইংরাজী পুস্তক কেনা হয়। মুদ্রিত না হইলেও, ইংরাজী পুস্তকের একটী সম্পূর্ণ হস্তলিখিত তালিকা আছে।

(৭) নিয়মিত পাঠকদের suggestions পুস্তক কিনিবার সময় গৃহীত হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন যে সকল অভিযোগ গত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। এই পরিষদের অন্যতম সহঃ সভাপতি কাউন্সিলর শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ বীদ্‌ প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতির জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। কাহারও কোন অভিযোগ বা জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিলে তাঁহার নিকট জানাইলে তিনি তাহার যথোচিত উত্তর দিবার এবং অভিযোগ সত্য হইলে সেই ত্রুটী অপসারণের ব্যবস্থা করিবেন।

অসীমের আহ্বান

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের ভগ্নী শ্রীযুক্তা মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিচেরী যাত্রা করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি এখন হইতে পণ্ডিচেরী আশ্রমেই স্থায়ীভাবে থাকিবেন। বাস্তবজীবনের কবি ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, যিনি একদিন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অসীমের ধূমমার্গী অস্পষ্টতা লইয়া কলহ করিয়াছিলেন, তাঁহারই পুত্রকন্যা অসীমের আহ্বানে আজ সংসারত্যাগী! ইহাই তো জীবনের বৈচিত্র্য! ভবশঙ্করবাবুর নিঃশঙ্ক জীবন শান্তিময় হউক—ইহাই কামনা করি।

—ঃ—

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

সব্যসাচী

স্বদেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যা যেমন বাড়িতেছে—সেগুলির কাজও তেমনই বিস্তার লাভ করিতেছে। আর তাহাদের দাবীও বাড়িতেছে। পরলোকগত লালা লাজপত রায় দেখাইয়াছিলেন, বিদেশী বীমা কোম্পানী গুলিতে বীমা করিলে টাকাটা বিদেশে যায়; সেই টাকায় বিদেশের শিল্প বাণিজ্য সমৃদ্ধ হয়। সংপ্রতি দেখা গিয়াছে, অন্য দেশের সরকার তথায় ভারতীয় বীমা কোম্পানীকে শাখা সংস্থাপন করিতে দেন নাই। এই সব কারণ দেখাইয়া এ দেশের লোককে বিদেশী কোম্পানী বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী কোম্পানীতে বীমা করিতে অনুরোধ করা হয়। এই কাজের জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় এক সমিতি প্রতিষ্ঠাও হইয়াছিল।

আমরা এই ব্যবস্থার পক্ষপাতী। দেশের টাকা দেশে থাকিবে—তাহাতে দেশের অনেকে উপকৃত হইবে—ইহা সঙ্গত, শোভন ও স্বাভাবিক।

কিন্তু দেশীয় কোম্পানীগুলির পক্ষে দেশের লোকের এই অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। চিরকালই লোক "even at a sacrifice" স্বদেশীর সমর্থন করিতে পারিবে না। আবার সময় সময় ইহা "even at a risk" হইয়া দাঁড়াইতেও পারে।

আমরা হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

দেখা যাইতেছে, হিন্দুস্থানের অংশীদাররা **২০ বৎসরের অধিক কাল লভ্যাংশ হিসাবে এক পয়সাও পান নাই।** সুতরাং উঁহারা যে যথেষ্ট sacrifice করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা হয়, কম্বাইণ্ড বীমার ভুলে এমন হইতেছে। কিন্তু এই ভুল কতদিনে সংশোধিত হইবে? ২০ বৎসরে তাহা সংশোধিত হয় নাই। হিন্দুস্থানের সভাপতি প্রাণকৃষ্ণ যে আশা দিয়াছিলেন, তাহাতে অংশীদাররা আশায় প্রাণধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে আশা যে সফল হইবার নহে কার্ত্তিক তাহা বলিয়াছেন।

মিষ্টার দাশ হিন্দুস্থানের হিসাব ধরিয়া বলিয়াছেন, যে ভাবে দেয় টাকা পরিশোধ করা হইতেছে, তাহাতে (অর্থাৎ ৫ বৎসরে ১৭ হাজার হইতে ২০ হাজার টাকা শোধ হইলে) **কোম্পানীর এই টাকা শোধ করিতে ৬৫ বৎসর লাগিবে।** ২০ বৎসরের উপর আর ৬৫ বৎসর—একুনে ৮৫ হয়। গল্প আছে, বিলাতে কোন যুদ্ধের সময় একজন সৈনিক এক বৃদ্ধার দোকান হইতে একটা জিনিষ তুলিয়া লয়। বৃদ্ধা দাম চাহিলে সে বলে, পরে দিবে। সে কবে দাম দিবে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দেয়—প্রলয়ের দিন। বৃদ্ধা তাহাতে বলিয়াছিল—"A long credit!" এক্ষেত্রেও কি অংশীদাররা সেই কথা বলিবেন না?

কিসে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাহা নির্দ্ধারণ জন্য কোন ব্যবস্থা কি হইতে পারে না?

বলা বাহুল্য, ব্যয় যদি অধিক হয়, তবে তহবিলে কম টাকা পড়ে। বীমা কোম্পানীর খরচের একটা সম্ভব অঙ্ক এতদিনের অভিজ্ঞতায় ধরা যায়। এ বিষয়ে সরকারও বীমাকারীদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। সরকার বলেন বীমাকারীরা ৩টি বিষয় বিবেচনা করিবেন, তাহার একটি এই—

"Whether the revenue account shows that the expenses of management, including commission, did not absorb more than a third of the premium income in the last financial year."

অর্থাৎ পরিচালনের ব্যয় (কমিশন ধরিয়া হিসাব করিলে) প্রিমিয়ামের আয়ের এক-তৃতীয়াংশের অধিক হইয়াছে কি না।

সুতরাং ধরা যাইতে পারে, ব্যয় আয়ের শতকরা ৩৩ ১/৩ ভাগের অধিক হওয়া সঙ্গত নহে।

এই হিসাব ধরিলে আমরা দেখিতে পাই—যে সময়ে হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে এই কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত আর একটি বীমা কোম্পানীর (ন্যাশনালের) হিসাবে দেখা যায়—ব্যয় **শতকরা ২৭ টাকা।** কিন্তু হিন্দুস্থানের ব্যয়—**শতকরা ৩৭৲ টাকার কম নহে।** ইহার কারণ কি?

অথচ আমরা দেখিতে পাই—

হিন্দুস্থানের ব্যয় যদি শতকরা ৩৩ ১/৩ দাঁড় করান হয়, তবে তাহাতে **প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা খরচ কমিবে।** আর

ব্যয় যদি শতকরা ৩০ টাকা করা যায়, তবে—**প্রায় ২ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা খরচ কমিবে।**

এই প্রসঙ্গে আমরা হিন্দুস্থানের অন্যতম ডাইরেক্টার কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—

প্রাণকৃষ্ণ লাহা কোম্পানীর কাজ যখন পূর্ণোদ্যমে চলিত, তখন তাঁহারা সেই কোম্পানীর ম্যানেজারকে মাসিক কত টাকা বেতন দিতেন, আর **হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার মাসিক**

কত টাকা বেতন ও পারিশ্রমিক হিসাবে পাইতেছেন ?

তাহার পর জিজ্ঞাস্য—

ওরিয়েন্টাল ও এম্পায়ারের মত কোম্পানী ম্যানেজারকে বেতন হিসাবে মাসিক কত টাকা দিয়া থাকেন ? সেই দুই কোম্পানীর ম্যানেজারের বেতন তুলনায় হিন্দুস্থানের ম্যানেজারের বেতনের হার কিরূপ দাঁড়ায় ?

কিন্তু হিন্দুস্থানের ডাইরেক্টাররা মনে করেন,—তাঁহারা তাঁহাদিগের ম্যানেজারকে যে বেতন দেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনায় ও ম্যানেজারের কর্ম্মদক্ষতার তুলনায় অধিক নহে ! ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজারেরই বা বেতন কত ?

হিন্দুস্থানের কল্যাণ কামনা করেন না, এমন কোন বাঙ্গালী নাই—অন্ততঃ থাকা উচিত নহে। আর সেই জন্যই আমরা মনে করি—যখন ২০ বৎসর কাল হিন্দুস্থান অংশীদারদিগকে লাভের অঙ্কে কিছুই দিতে পারিতেছেন না, তখন—**হিন্দুস্থানের ব্যয় সঙ্কোচে আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে।**

যাহারা সমালোচনা করেন, তাঁহাদিগকে নিন্দুক ও অশ্লীল অপ্রিয় বলিয়া গালি দিলে কোন ফল হয় না—তাহা হইতে পারে না।

হিন্দুস্থানকে উপলক্ষ করিয়া আমরা যাহা বলিলাম, তাহা যে বাঙ্গলার আরও কোন কোন বীমা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বলা যায় না, তাহা নহে।

গত ১২ই এপ্রিল হাইকোর্টে পুলিনকৃষ্ণ রায় বনাম রায় বাহাদুর রাধিকাভূষণ রায় দিগর যে মামলায় প্রতিবাদীদিগের বিরুদ্ধে ৩৪ হাজার ১ শত ৯৯ টাকা সাড়ে ১২ আনার ডিক্রী হইয়াছে, সে কি আর একটি বীমা কোম্পানীর জন্যই নহে ? রায় বাহাদুর প্রভৃতি কি ডাইরেক্টার হিসাবে কোম্পানীর জন্য শতকরা বার্ষিক ১১ টাকা সুদে আসল টাকা শোধ করিয়াছিলেন এবং পর বৎসরে তাহার মধ্যে ২ হাজার ৫ শত টাকার অধিক পরিশোধ করিতে পারেন নাই ? আমাদিগের এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে কি ইহাও সত্য নহে যে,

যাঁহারা এই বীমা কোম্পানীর ডাইরেক্টার তাঁহাদিগের মধ্যেই দুইজন সেদিন হিন্দুস্থানের পক্ষ হইয়া—সমালোচকদিগকে গালি দিয়া আবেদন প্রচার করেন নাই ? যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে কি বলিতে হইবে না—

Physician heal thyself ?

[স্বদেশী বীমা কোম্পানীর স্তম্ভে আলোচিত বিষয় গুলি সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিলে আমাদের জানাইলে সুখী হইব। সঃ খেঃ]

চলতি পথে

শ্রীমল্লিনাথ

সেবাসদনের ধর্ম্মঘট

সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে যে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে নার্সদিগের ধর্ম্মঘট হইয়াছে। এই ধর্ম্মঘটের কারণ কি, তাহা সেবাসদনের কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণকে জানাইতে রাজী হ'ন নাই। হেতু তাঁহারা সাধারণকে জানান বা নাই জানান একথা নিশ্চয়ই সত্য যে সেবাসদনের ভিতরে এমন কোন বিশেষ গোলমাল ঘটিয়াছে, যাহার ফলে নার্সরা ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হইয়াছে।

সেবাসদন একটী হাসপাতাল, এবং হাসপাতালের প্রাণ হইতেছে নার্সরা ; এখন নার্সরা যদি ধর্ম্মঘট করে, তবে হাসপাতালের রোগীদিগের অবস্থা যে কি শোচনীয় হয়, তাহা না বলাই ভাল। তাহার পর কি কারণে ধর্ম্মঘট হইয়াছে, তাহা যদি সাধারণকে না জানানো হয়, তবে সাধারণের পক্ষে বড়ই চিন্তার কারণ। বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দ সাধারণতঃ কি এমনিই অনুপযুক্ত হ'ন যে তাঁহাদের কর্ম্ম-নীতির ফলে হাসপাতালের ন্যায় স্থানেও ধর্ম্মঘট হয়। একথা বিশ্বাস করিতে সহসা আমরা প্রস্তুত নহি। তবে ইহা হয়তো হইতে পারে যে পরিচালকবৃন্দ কোন কোন ক্ষেত্রে মূঢ়নীতি অনুসরণ করিলে ধর্ম্মঘটের কারণ ঘটিতে পারে। কিছুদিন হইতে সেবাসদনের কর্ম্মকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে জনরব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। সেবাসদনের নার্স ধর্ম্মঘট কি তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল ? সেবাসদন বা অন্য কোন জনহিতকারী প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে যাহাতে কোন রকম গোলযোগ উপস্থিত না হইতে পারে, তাহার উপায় নির্ণয় করা বাঙ্গলার মনীষি সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। সেবাসদনের কর্ত্তৃপক্ষের আশু কর্ত্তব্য কেন নার্সরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে, এখনও ধর্ম্মঘট চলিতেছে কি না, ধর্ম্মঘট যদি বর্ত্তমানে চলিতে থাকে, তবে রোগিনী-গণের পরিচর্য্যার কি বন্দোবস্ত হইয়াছে, ইত্যাদি সকল বিষয়ে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ সাধারণ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে অতি শীঘ্রই দেওয়া উচিৎ। যদি শীঘ্রই কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের মৌনতা ভঙ্গ না করেন তবে সাধারণের পক্ষে খুবই দুশ্চিন্তার কারণ হইবে, এবং সেবাসদনের কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে। তবে আমাদের মনে হয় তাঁহারা এইরূপ নির্ব্বোধের ন্যায় কাজ করিবেন না, এবং অতি সত্বরই কৈফিয়ৎ দিয়া জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করিবেন।

(অবশিষ্টাংশ ৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

বাসবদত্তা

প্রযোজক—জে, জে, ম্যাডান
পরিচালক—সতীশ দাশ গুপ্ত
আলোক-শিল্পী—ধীরেন দে
শব্দযন্ত্রী—জে, ডি, ইরাণী প্রভৃতি
সঙ্গীত-পরিচালক—নিতাই মতিলাল
শিল্প-নির্দ্দেশক—রমেশ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদনা—চোহান ও নায়েক
ভূমিকায়—কাননবালা, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, রবি রায় প্রভৃতি।
প্রথম মুক্তি—ছায়া, শনিবার ১৩ই এপ্রিল।

কেশরী ফিল্মসের প্রথম অবদান "বাসবদত্তা" দেখে, সে সম্বন্ধে সাধারণের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেব তা' আমরা ভেবে উঠতে পারি নি বলে,—গত হপ্তায় এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা থেকে আমরা বিরত ছিলাম। ছবিখানি সম্বন্ধে কিছু লিখ্‌তে গেলে আমরা ছবির মালিকদের কাছে অপ্রিয়ভাজন হব—একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সমালোচকের কাজে যখন হাত দিয়েছি—তখন সাধারণে আমাদের মতামত দাবী করেন নিশ্চয়ই—সেইজন্য লোকের নিন্দাস্তুতি সমান জ্ঞান কোরে আমাদের সব সময়ই অতি অপ্রিয় সত্য বল্‌তে হয়।

"বাসবদত্তা" সম্বন্ধে প্রথম কথা আমাদের হ'চ্ছে, ছবিখানি পনের বছর আগে যদি আমরা দেখ্‌তাম, তা' হ'লে বোধ হয়, কর্ত্তৃপক্ষকে আমরা প্রশংসা কোরতে পারতাম; কিন্তু যে সময় "দেবদাসে"-র মত ছবি আমরা দেখ্‌ছি সে সময় "বাসবদত্তা"-র মত ছবি দেখে আমরা শুধু ক্ষুব্ধ হয়নি—আমরা ভাবছি আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা! কয়েকদিন আগে যে দেশের শিল্পের উন্নতিতে আমরা পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছিলাম—কয়েকদিন পরে আবার সেই শিল্পের অবনতির চরম বিকাশ দেখে আমাদের কল্পনার রঙীন স্বপ্ন ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। হ্যাঁ, এবার আসল কথায় এগোনো যাক্।

"বাসবদত্তা"-র কাহিনী অতি প্রাচীন। গল্পটির ভেতর চিত্রোপযোগী যথেষ্ট মালমশ্‌লা ছিল—কিন্তু চিত্রনাট্যকার সামঞ্জস্য না রেখে চিত্রনাট্য গঠনের জন্য গল্পটির বিষয়বস্তুটিকে একেবারে জবাই কোরেছেন। যাদের চিত্রনাট্য লেখার সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান নেই—তারা কোন সাহসে একটি সুন্দর আখ্যানকে নিয়ে ছেলেখেলা করেন, তা' আমরা বুঝে উঠ্‌তে পারি না। ছবির গল্পটি সংক্ষেপে এখানে বিবৃত হ'ল।

মথুরার রাজমন্দিরের দেবদাসী ছিল বাসবদত্তা। সে ভালবাসিল তরুণ ভাস্কর উপগুপ্তকে।

বাসবদত্তার যৌবন-সুষমামণ্ডিত দেহ-বল্লরীর প্রতি সহসা একদিন রাজার দৃষ্টি পড়ল। চরিত্রহীন, লম্পট নৃপতি বসন্ত উৎসবের ছলে বাসবদত্তাকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ কোরল। উপগুপ্ত নিষেধ কোরল বটে, কিন্তু রাজাদেশ অমান্য করবার শক্তি ক্ষুদ্র বাসবদত্তার হ'ল না।

উৎসবের অন্তরালে, কৌশলে বাসবদত্তা নীত হ'ল রাজার বিলাসকক্ষে। সহস্র প্রলোভনেও ক্ষুদ্র বালিকার মন ট'লল না; তার সমস্ত অন্তর প্রিয়তম উপগুপ্তের কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। রাজা নিজের ভ্রম বুঝতে পারলেন; অবশেষে তিনি বাসবদত্তাকে দিলেন মুক্তি। এদিকে উপগুপ্ত জান্‌তে পারলে বাসবদত্তা নীত হ'য়েছে রাজপ্রসাদে; সে তাকে উদ্ধার কোরতে এসে গবাক্ষ-পথে দেখ্‌ল রাজার ব্যাঘ্র বাহুর আলিঙ্গনে বাসবদত্তা রয়েছে বন্দী। উপগুপ্ত ভুল বুঝ্‌ল—ব্যথা-কাতর অন্তরে সে ফিরে গেল তার পাতার কুটীরে।

অপমানাহতা, ব্যথিতা বাসবদত্তা সান্ত্বনার জন্য ছুটে এল তার প্রিয়তমের কাছে; কিন্তু ঈর্ষা-কাতর উপগুপ্ত তাকে ব্যভিচারিণী বলে ফিরিয়ে দিল। সমস্ত অন্তর বাসবদত্তার আজ গর্জ্জে উঠ্‌ল মানুষের উপরে এবং তাদেরই গড়া পাথরের দেবতার বিরুদ্ধে।

বাসবদত্তা রাজপ্রাসাদে ফিরে গেল। আজ সে নিজের দেহের বিনিময়ে, পবিত্রতার মূল্য দিয়ে এ অবিচারের প্রতিশোধ নেবে।

ব্যর্থ প্রেমে উপগুপ্ত সন্ন্যাসী হ'য়েছে। রাজাদেশে উপগুপ্তকে যখন ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করা হবে তখন বাসবদত্তা ছুটে এল আপনার নিষ্ঠুর লীলার পৈশাচিক দৃশ্য উপভোগ করবার জন্য; কিন্তু পারল না—হৃদয়ের গোপন তারে ব্যথার ঝঙ্কার বেজে উঠ্‌ল। প্রিয়তমার এ পরিবর্ত্তনে উপগুপ্ত মরতে চাইল; কিন্তু প্রিয়তমের ব্যথায় ব্যথিতা বাসবদত্তা তাকে দিল মুক্তি।

সকল রকমে অভিলষিত কার্য্য কোরেও বাসবদত্তার মনের সন্ধান না পেয়ে নিষ্ঠুর রাজা বলপ্রয়োগে তাহার দেহে একপ্রকার বিষ প্রবেশ করিয়ে দিল এবং তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাসবদত্তার সকল অঙ্গে বসন্ত রোগ আত্মপ্রকাশ কোর্‌ল।

মৃতপ্রায়, সেই দেহবল্লরী রাজাদেশে নগরীর বাহিরে গভীর বিজন বনমধ্যে নিক্ষিপ্ত হ'ল। মরণ পথ-যাত্রিণী সেই নারীর কাতর কণ্ঠের করুণ আহ্বানে এক তরুণ সন্ন্যাসী সেখানে এসে দাঁড়াল ;—গভীর স্নেহে সেই দেহ নিজের বুকে তুলে নিল। সংসারের সকলে বাসবদত্তাকে পরিত্যাগ কোরেছে বলেই আজ উপগুপ্তের সহিত তার মিলনের কোন বাধা হল না।

পরিচালনা হ'য়েছে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। পরিচালকের দায়িত্ব কী এবং পরিচালনা কাকে বলে, তা' শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত কিছুই জানেন না। "বসন্তসেনা" ছবিতে চারু রায় বীণার দেহকে দেখিয়েছিলেন—আর এ ছবিতে সতীশবাবু কাননবালার অর্দ্ধখোলা মূর্ত্তি আর কতকগুলি চুনোগলির ফিরিঙ্গি মেয়ের বিকৃতরূপের 'সেক্স এপীল' দেখিয়ে লোকদের তাক্ লাগিয়ে দেবার চেষ্টা কোরেছেন। কিন্তু 'সেক্সে'-র যারা ধার ধারে না—সে সকল মেয়ের 'সেক্স-এপীল' প্রকাশ করা কুৎসিৎ রুচি জ্ঞানেরই পরিচায়ক মাত্র। এ ছাড়া পরিচালনার ভেতর একটা নয়, দু'টো নয় অসংখ্য অসঙ্গতি চোখের ওপর প্রতি দৃশ্যেই ভেসে ওঠে। খুঁটিনাটি-ভাবে সে সকলের আলোচনা অসম্ভব। এবং সে কাজে যদি আমরা এগুই তা' হ'লে আমাদের স্বর্ণমুখী-লেখনীর টেম্পার নষ্ট হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

ছবিখানার আলোকচিত্রও হ'য়েছে একেবারে বাজে। এত বাজে আলোকচিত্র আমরা নির্ব্বাক্‌যুগের গোড়ার দিক্‌কার দু' একখানা ছবি ছাড়া আর দেখিনি। "বাসবদত্তা"র আলোক-চিত্র যা' হ'য়েছে—তা' আমাদের মনে হয়, যারা দু' একদিন নিশ্চল ক্যামেরা নিয়ে নাড়াচাড়া কোরেছেন, তারাও এমন ছবি তুলতে পারে। ছবিখানার ভেতর ফটোগ্রাফীর কলাকৌশলের কথা ত' ছেড়েই দিলাম—এমন কী 'ডিজল্‌ভ,' 'ফেড্‌-ইন্‌,' 'ফেড্‌-আউট্‌' ও 'ক্লোজ-আপে'র কোনও বালাই নেই বল্লেই হয়। আমাদের শ্রীধীরেন দে'কে অনুরোধ ভবিষ্যতে তিনি কোনও ভাল লোকের কাছে অন্ততঃ কয়েক বছর শিক্ষানবিশী কোরে তারপর যেন স্বাধীনভাবে ছবি তোলার চেষ্টা করেন।

দৃশ্য সজ্জা ও সাজ-পোষাকের ভেতর যথেষ্ট গলদ আছে।

ছবিখানির সম্পাদনা হয় নি বল্লেই চলে। এখনও ফিল্মের মায়া ত্যাগ কোরে ছবিখানার সম্পাদনার প্রয়োজন।

এবার অভিনয়ের কথা।

উপগুপ্তের ভূমিকায় নায়ক শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য একেবারে অচল। আমরা বহুবার এঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি, এবং আজও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, যদি ধীরাজ বাবু ভবিষ্যতে নায়ক সাজবার স্পর্দ্ধা রাখেন, তা হ'লে তিনি কিছুদিনের জন্য অবসর গ্রহণ কোরে এ সম্বন্ধে কিছুদিন ভেবে দেখবার চেষ্টা করুন। তিনি

ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত

বিদায়ী মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকার

মঙ্গলবার রায় প্রকাশ

ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত বিদায়ী মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকারের তরফ হইতে এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল মিঃ এ, কে, রায়ের সওয়াল জবাব শেষ হইয়াছে। কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় মিঃ এস, কে, সিংহ আগামী ৩০শে এপ্রিল মঙ্গলবার এই চাঞ্চল্যকর মামলার রায় দিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

"বাসবদত্তা"-র শব্দযন্ত্রী তিনজন—ইরাণী, পাণ্ডে ও শর্ম্মা। এদের সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকু বল্‌তে পারি, কর্ত্তৃপক্ষ যেন অবিলম্বে এদের কাজ দেখে এপ্রেন্টিস্ হ'য়ে কাজ করবার—এদের ব্যবস্থা করেন। এমন বিশ্রী হ'য়েছে এদের শব্দ গ্রহণ।

শ্রীরমেন চট্টোপাধ্যায়ের শিল্প-নির্দ্দেশনার ভেতর আকৃষ্ট হবার মত কিছুই খুঁজে পেলাম না।

সঙ্গীত-পরিচালনা বিশেষত্ব বর্জ্জিত। গানের সুর হ'য়েছে তৃতীয় শ্রেণীর আর নেপথ্য-সঙ্গীত কাকে বলে তা বোধ হয় নিতাই বাবু এখনও জানবার সুযোগ পান নি।

তাঁর মেয়েলি ঢ্যাবঢ্যাবে চোখ ঘুরিয়ে মনে করেন না যেন, আমি মস্ত বড় এ্যাক্টর হ'য়েছি। তিনিই ভেবে দেখুন না—একমাত্র নির্ব্বাক যুগের "কাল পরিণয়" ছাড়া তিনি কোন ছবিতে দর্শকদের খুশী কোরেছেন! উপগুপ্তের ভূমিকায় বাসবদত্তার কাছে যখন তিনি প্রেম-নিবেদন কোর্‌ছেন তখন তিনি হাস্‌ছেন না কাঁদ্‌ছেন তা' আমরা শত চেষ্টা কোরেও ধর্‌তে পার্‌লাম না। তাঁর অভিনীত চরিত্রের মধ্যে এই জায়গা গুলোই হ'য়েছে climax, তাই এখানে উল্লেখ কোর্‌লাম। এই চরিত্রটি অন্য যে কোনও লোককে দিয়ে

অভিনয় করালে কর্ত্তৃপক্ষ বুদ্ধিমানের কাজ কোরতেন।

নায়িকা কাননবালার অভিনয়ও বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয় নি। তাঁর অভিনয়ের ভেতর দরদের অভাব বড় বেশী। গানগুলি চলনসই। নাচের পা একেবারেই নেই। নাচখানি নেচে লোক হাসাবার প্রয়োজন ছিল না।

শ্রীরবি রায়ের সেই মঞ্চ-ঘেঁষা অভিনয় ও উচ্চ চীৎকার দর্শকদের চক্ষু ও কর্ণ পীড়াদায়ক হ'য়েছে।

পুরোহিতের ভূমিকায় শ্রীসত্যেন ভদ্র নামে যে লোকটি নেমেছিলেন তার চেহারা, কথাবার্ত্তা সবয়েরই ভেতর "বীণাপাণি নাট্য সমাজ" বা "ভাণ্ডারী অপেরার" ছাপ দেখা গেল।

অন্ধ ভিক্ষুকরূপে অন্ধগায়ক শ্রীসত্যেন চক্রবর্ত্তীর একখানা গান মন্দ লাগ্‌ল না। অন্যান্য ভূমিকাগুলি উল্লেখযোগ্য নয়।

পরিশেষে কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আমাদের অনুরোধ ভবিষ্যতে তাঁরা পয়সা খরচ কোরে এই সমস্ত লোক দিয়ে কাজ করিয়ে দেশের এই উঠ্‌তি শিল্পের উন্নতির যেন অন্তরায় না হন।

নিউ থিয়েটার্স

শ্রীনীতীন বসু হিন্দী ও বাঙ্‌লা সংস্করণে একখানা ছবি তোলা শীঘ্রই সুরু কোরবেন। ছবিখানার আপাততঃ নাম দেওয়া হ'য়েছে "সুরদাস" এ নাম হয়ত' পরে বদল হ'লেও হ'তে পারে। এই ছবিতে উভয় সংস্করণে নামবেন, শ্রীমতী উমা দেবী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীপাহাড়ী সান্যাল ও শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী।

কলিকাতার সহরবাসীদের প্রতি নিবেদন

মহামান্য সম্রাটের

রজত-জয়ন্তী

—উপলক্ষে—

আনন্দ উৎসব করিবার যে সুযোগ উপস্থিত আশা করি কলিকাতা সহরবাসী মাত্রেই এই মহানগরীর প্রচলিত সুনাম ও সম্মান রক্ষার জন্য সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না।

কলিকাতার "রজত-জয়ন্তী উৎসব কমিটির"

পক্ষ হইতে আমাদের নিবেদন,—

যেন আগামী ৬ই মে তারিখে প্রত্যেকেই জাতি-ধর্ম্মনির্বিশেষে সাধ্যমত নিজ নিজ বাসগৃহ এবং কর্ম্মস্থলাদি আলোকমালায় (Illumination) সজ্জিত করিয়া, সম্রাট দম্পতীর মঙ্গলকামনায়, এই শুভ দিনের স্মরণার্থে আমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সম্ভব হইলে ৭ই এবং ৮ই মে তারিখেও এই ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

আশা করি আমাদের আবেদন উপেক্ষিত হইবে না।

নিবেদক

এ, এইচ, গাজনাভী

কলিকাতার শেরিফ্ এবং উৎসব কমিটির সম্পাদক

ও

শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

(আতসবাজী এবং আলোক-সজ্জা সাব-কমিটির পক্ষ হইতে)

কলিকাতা
২৬শে এপ্রিল
১৯৩৫

"খেয়ালী"র ফটোগ্রাফার ও নলিনীর ড্রাইভারের মুক্তিলাভ
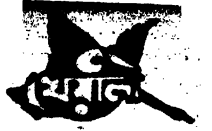
"খেয়ালী"র ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সিংহ ও বিদায়ী মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকারের ড্রাইভার কলিকাতা পুলিশ এ্যাক্টের ৬৮ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দুইদিন শুনানীর পর গতকল্য ব্যাঙ্কশাল কোর্টের অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নিত্যানন্দ সিংহ রায় উপযুক্ত প্রমাণাভাবে উভয়কে মুক্তি দিয়াছেন।

আলীপুর কোর্টের শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ বসু 'খেয়ালীর' ফটোগ্রাফারের পক্ষ ও মিঃ ডি, এন, দত্ত, শ্রীযুক্ত সুধীর বসু ও শ্রীযুক্ত সুনীতি প্রকাশ কর নলিনীর ড্রাইভারের পক্ষ সমর্থন করেন।

গতকল্য বেলা দুইটার সময় মামলার শুনানী আরম্ভ হয় ও বেলা প্রায় চারটার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট রায় দেন।

নলিনী সরকারের ভ্রাতা এটর্ণি মিঃ এন, কে, রায় চৌধুরীর আর্টিকেল ক্লার্ক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন সরকার আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

শুধু বাঙলাতে নামবেন শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমর মল্লিক, সাইগাল, শ্রীমতী নিভাননী, শ্রীমতী ক্ষেত্রবালা প্রভৃতি। আর হিন্দিতে নামবেন, নবাব, কাপুর, বাবুলাল, বৈদ, ওহায়েব প্রভৃতি। শ্রীনীতীন বসুর পরিচালনা তার ওপর এরূপ শক্তিশালী অভিনেতৃ সমন্বয়ে ছবিখানি যে নিউ থিয়েটার্সে'র জয়গৌরবের আর একটি নিদর্শণ হবে—এ আশা করা যায়।

* * *

বাঙলা "দেবদাসে"-র সাফল্যে উৎফুল্লিত হ'য়ে এই প্রতিষ্ঠান হিন্দিতে এই ছবির রূপ দেবার মনস্থ কোরেছেন। সাইগাল, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীমতী রাজকুমারী, শ্রীমতী যমুনা, শ্রীমতী লীলা, পণ্ডিতজী, বেগ ও শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া বিভিন্নাংশে অভিনয় কোরবেন।

বলা বাহুল্য শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া এই চিত্রখানি পরিচালনা কোরবেন।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৪২—9th. May, 1935 { ১৯শ সংখ্যা

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাঙ্গলা আজ কোথায়?

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী আসিয়া পড়িল। এই বৎসরটিকে নানাদিক দিয়া স্মরণীয় ও বরণীয় করিবার জন্য দেশ-বিদেশের মনস্বীদের লইয়া একটা রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী কমিটী গঠিত হইয়াছে। এই কমিটীর সম্পূর্ণ কার্য্য-তালিকা এখনও জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই, তবে বিজ্ঞাপনের ঘটা দেখিয়া মনে হয়, একটা অসাধারণ কিছু ঘটিবেই। ইহাই তো স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। বাসনাক্লিষ্ট মৃত্যুদিগ্ধ ইহলোকের ক্ষয়ক্ষীণ জীবনকে যে লোকোত্তর মহাপুরুষ লোকাতীত অক্ষয় জীবনের অমৃত রসে অভিসিঞ্চিত করিয়া গেলেন, তাঁহার শতবার্ষিকী যদি অনন্যসাধারণভাবে অনুষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ আয়োজন হইয়া থাকে, সে তো আনন্দেরই কথা। কিন্তু, তাহা না হইয়া অন্যান্য বহু অনুষ্ঠানের ন্যায় এই অনুষ্ঠানটিকেও কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনের জয়ঢাক হিসাবে ব্যবহার করিয়া ব্যক্তি বা সঙ্ঘবিশেষ যদি আত্মতৃপ্ত স্বকপোল-কল্পিত কৃতকার্য্যতার হাসি হাসেন, তাহা হইলে তদপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে?

সহযোগী "সোনার বাংলা" এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-যুগের বাঙ্গলার সহিত বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গলার তুলনা করিয়া দুঃখ করিয়াছেন। জীবনের একটা ভয়াবহ পরিণতির দিকে 'সহযোগী' সাবধানতার তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে কলিকাতার নাগরিক জীবন যখন পাশ্চাত্যের মোহ-প্রবাহে আবিল, ইহজগতের স্থূল ভোগসর্ব্বস্বতা যখন শিক্ষিত সমাজকে গ্রাস করিতে উদ্যত, তখনই বাঙ্গলার বুকের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এই সহজ, সরল, নিরক্ষর, বাঙ্গলার প্রাণের ঠাকুর। এই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ভাবোন্মাদ ঠাকুরের প্রেরণা ও আহ্বানে জাগিল বিবেকানন্দ ও তাহার বহু সহকর্ম্মীর দল। বাঙ্গলা চমকিত হইয়া শুনিল জীবনের এক নূতন গান, শক্তির এক নূতন সুর। জ্ঞানে ও কর্ম্মে, ত্যাগে ও সাধনায় বাঙ্গলা সেদিন জাগিয়া উঠিয়া এক নবজন্ম লাভ করিয়াছিল। কিন্তু হায়, সে কি ক্ষণিকের জাগরণ?

ইন্দ্রিয়ের লীলাভূমি কলিকাতার এক প্রান্তে দক্ষিণেশ্বরে এই অতীন্দ্রিয় লীলা হইয়া গেল—সে তো খুব বেশী দিনের কথা নহে। এই লীলা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এমন বহু লোক এখনও বাঙ্গলায় জীবিত আছেন। কিন্তু কলিকাতার নাগরিক জীবনের বুকে সেই লীলার পদচিহ্ন আজ কোথায়? অসংযত উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবাহে সে কি একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল?

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী ছিল জীবনকে সব দিক দিয়া সংযমে ও নিষ্ঠায় শক্তিমান করিয়া তোলা। কিন্তু আমাদের জীবনে কোথায় সেই শক্তি, কোথায় সেই সংযম ও নিষ্ঠা? রাজনৈতিক জীবনের দিকে চাহিয়া মনে হয় বাঙ্গলায় কংগ্রেসের বোধ হয় অপমৃত্যু ঘটিয়াছে; এবং সেই ভূত কয়েকজনের ঘাড়ে চাপিয়া তাঁহাদিগকে পৌরসভার দালালী কার্য্যে ঘুরাইতেছে। সামাজিক ও নৈতিক জীবনের কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহা পথে, ঘাটে এবং সংবাদপত্র খুলিলেই চোখে পড়ে। সম্প্রতি প্রমথ সরকার বনাম নলিনী সরকার ব্যভিচার মামলার রায়ে মাননীয় শ্রীযুক্ত এস, কে, সিংহ সামাজিক এই গভীর ক্ষত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। যাহার সহিত রেজেষ্ট্রী বিবাহে বাধা নাই, সম্ভবতঃ অনতিক্রান্তযৌবন সেই নলিনীরঞ্জনের সঙ্গে বীণার তিনমাস একত্র দিল্লীতে নির্জ্জনবাস ম্যাজিষ্ট্রেট সমর্থন করেন নাই। এবং অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র তাহা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে তিরস্কারচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, তাঁহার স্ত্রী লিলি মিত্র (যিনি নলিনীরঞ্জনের সহিত সম্পর্কে বীণার সমস্থানীয়া) যদি উক্তরূপ আচরণ করিতে চাহিতেন, তখন তিনি কি করিতেন? দেশের আব্‌হাওয়া এতদূর দূষিত ও কলুষিত হইয়াছে যে, একজন প্রবীণ অধ্যাপকও স্বাধীনতার নামে স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাচারকে সমর্থন করিতেছেন!

এই তো গেল সামাজিক জীবনের কথা! তাঁহার নামে যে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা প্রাত্যহিক জীবনকে উন্নত করিবার জন্য কি করিতেছেন, তাহা কাহারও জানা নাই। কবে দেশে মড়ক ও মন্বন্তর হইবে, সেই প্রতীক্ষায় সেবার উপকরণ লইয়া তাঁহারা বসিয়া আছেন! এই প্রতীক্ষা কি বাস্তবিকই মর্ম্মান্তিক নহে!

তাই বলিতেছিলাম যে, রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীকে সেই মহাপুরুষের যোগ্য অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে হইলে চাই ঘরের দিকে মুখ ফিরানো, চাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে এই কলুষ ও আবর্জ্জনার উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা। এই চেষ্টা যাহাতে ফলবতী হয় সে দিকে শতবার্ষিকী কমিটী একান্ত মনোযোগ দান করুন, ইহাই তাঁহাদের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

প্যাটেলের উইল ও বাঙ্গালী বিদ্বেষ

স্বর্গীয় ভি-জে পেটেলের উইলের মর্ম্ম ইতিপূর্ব্বে 'খেয়ালী'তে বিশদ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত উইলের মর্ম্মানুযায়ী ভারতের বাহিরে প্রচার-কার্য্য চালাইবার জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে প্রায় এক লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব আছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, বর্ত্তমানে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর পক্ষে এটর্নী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও স্বর্গীয় প্যাটেলের ট্রাষ্টীদের পক্ষে বোম্বাই নিবাসী কোন এক এটর্নী ফার্মের সহিত উক্ত টাকা সুভাষচন্দ্রকে প্রদানের জন্য পত্র বিনিময় চলিতেছে।

আমরা আরও অবগত হইলাম যে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই আইন জীবিরূপে কার্য্য করিতেছেন এবং ইহাও নাকি প্রকাশ যে, ট্রাষ্টীগণ স্বর্গীয় প্যাটেলের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইয়ের নিকট হইতে অনুরূপ পত্র কলিকাতায় শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের নিকট আসিয়াছে। বোম্বাইয়ে এরূপ জনরব যে, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল ব্যক্তি বিশেষের নিকট এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্যাটেল পরিবারের প্রদত্ত অর্থ কোনও বাঙ্গালীর মধ্যস্থতায় দেশ সেবায় ব্যয়িত হয়, তাহা তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিবেন না।

আমরা আরও অবগত হইলাম যে, কলিকাতার কোনও আইনজীবী সুভাষচন্দ্রের পক্ষ হইতে ভুলাভাইয়ের পত্রের জবাব দিয়াছেন। স্বর্গীয় প্যাটেলের শেষ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করার পক্ষে যে বাধা উপস্থিত হইয়াছে তাহার শেষ মীমাংসা বা নিষ্পত্তির জন্য যদি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহার চেয়ে, শোচনীয় আর কী হইতে পারে! এই ব্যাপারে বাঙ্গালীর প্রতি সর্দ্দার প্যাটেল প্রভৃতি অবাঙ্গালী নেতৃবৃন্দের যে মনোভাব প্রকটিত হইয়াছে তাহা যেমন ঘৃণ্য ও তেমনি অপমান সূচক।

বিবিধ

অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার

পরিণীতা পত্নী বীণার সহিত নলিনীরঞ্জন সরকারের ব্যভিচারের মামলায় ফরিয়াদী অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের জীবননাটকে যেভাবে যবনিকাপাত হইয়াছে তাহাতে ব্যথিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রমথনাথ মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াই আত্মরক্ষার জন্য পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহার পর মোকর্দ্দমা চলিতে থাকে এবং তাঁহার জবানবন্দী শেষ হয়। তাঁহার এটর্নীর পরামর্শে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসক মত প্রকাশ করেন, তিনি সুস্থ ছিলেন। তাঁহার জবানবন্দী শেষ হইবার পর তিনি কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং তাঁহার ভাগিনেয় বিমলেন্দু তাঁহার এক পত্র প্রাপ্ত হন। তাহাতে লিখিত ছিল, তিনি ভীষণ ষড়যন্ত্রে পড়িয়াছেন। এখন জানা যাইতেছে ১১ই এপ্রিল তারিখে রাত্রিকালে তাঁহাকে পুরী এক্সপ্রেস ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তাঁহাকে ট্রেন হইতে নামাইয়া বালেশ্বরে ডাক্তারখানায় লইলে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

১১ই এপ্রিলের পরদিন অর্থাৎ ১২ই এপ্রিল যদি এই ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তবে ৩০শে এপ্রিলের পূর্ব্বে মৃতব্যক্তিকে সনাক্ত করিবার কোন চেষ্টা কেন হয় নাই? যখন মৃতব্যক্তির নিকট হাওড়া হইতে গৃহীত টিকিট পাওয়া গিয়াছিল, তখন পুলিসের পক্ষে কি লাশ সেইদিনই হাওড়ায় পাঠাইয়া তাহা সনাক্ত করিবার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য ছিলনা? আমরা বাঙ্গলার গভর্ণরকে এবিষয়ে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

অধ্যাপক সরকারের মৃত্যু যে রহস্যজনক, তাহা মনে করিয়াই 'ষ্টেটস্‌ম্যান' সংবাদের শিরোনামায় লিখিয়াছেন:—

"Railway Carriage Suicide?"

যাহারা পুরী এক্সপ্রেসে গতায়াত করেন, তাঁহারাই জানেন, তাহাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা প্রায়ই খালি পাওয়া যায় না। তবে কিরূপে অধ্যাপককে সঙ্গিহীন কামরায় অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেল?

অধ্যাপক সরকারকে যখন ডাক্তারখানায় নেওয়া হয়, তখন তাঁহার পাকস্থলী পরীক্ষা করা হইয়াছিল কিনা এবং হইয়া থাকিলে তাহা পরীক্ষার্থ কোথায় পাঠান হইয়াছে?

একবার প্রচারিত হইল, অহিফেন সেবনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; আবার শুনা গেল, তিনি পোটাসিয়াম সায়েনাইড সেবন করিয়াছিলেন! যে লোক অহিফেন সেবনে আত্মহত্যা করে বা মরে, যন্ত্রণায় তাহার মুখ বিকৃত হয় না কি? সায়েনাইড অব পটাশিয়াম সেবন করিলে সে রোগীর মৃত্যুতে বিলম্ব ঘটে না—সুতরাং তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া সম্ভব নহে।

প্রকাশ, শবের জামার পকেটে একখানি কার্ডও পাওয়া গিয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তবে তাহার পরও পুলিশের লাশ সনাক্ত করিতে বিলম্বের কারণ কি হইতে পারে?

আমরা সকল কথা বিবেচনা করিয়া বলিতে বাধ্য—যথাকালে শব সনাক্ত করিবার জন্য পুলিশ যথাসম্ভব চেষ্টা করে নাই।

কেন পুলিশ সে চেষ্টা করে নাই, তাহাই জিজ্ঞাস্য।

অধ্যাপকের মৃত্যুর পর তিন সপ্তাহ কাল অতীত হইয়া গেল, এখনও পুলিশের পক্ষ হইতে কোন বিবৃতি প্রকাশিত না হইবারই বা কারণ কি?

১২ই হইতে ৩০শে এতদিন পুলিশ কি করিতেছিল—এখনই বা কি করিতেছে?

সেদিন পুরী এক্সপ্রেসে দ্বিতীয় শ্রেণীতে কতজন যাত্রী ছিল, তাহা সহজেই জানিতে পারা যায়—যাত্রীরা কে কোথায় নামিয়াছিল, তাহাও জানা অসম্ভব নহে। সর্ব্বোপরি কথা:—

(১) অধ্যাপক সরকার হাওড়া হইতে টিকিট কিনিয়াছিলেন, জানিতে পারিয়াও কেন পুলিশ লাশ হাওড়ায় পাঠাইয়া সনাক্তের ব্যবস্থা করে নাই?

(২) অধ্যাপক সরকারের পাকস্থলী কোথায় এবং তাহার পরীক্ষাফলই বা কি?

(৩) ১২ই এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিল—এতদিনের মধ্যে পুলিশ কি জন্য সংবাদপত্রে লাশ সনাক্ত করিবার অভিপ্রায়ে সংবাদ প্রকাশ করে নাই?

কলিকাতার সাধারণ ব্যাপারেও লাশ সনাক্ত করিবার যে চেষ্টা হয়, এক্ষেত্রে যে তাহাও হয় নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১২ই এপ্রিল রেলের নির্জ্জন কামরায় এইরূপ ব্যাপার ঘটা ও ৩০শে পর্য্যন্ত তাহা গোপন থাকা এমন অসাধারণ ব্যাপার যে, ইহার রহস্য ভেদ করা সরকারের কর্ত্তব্য বলিয়াই আমরা বিবেচনা করি।

'অমৃতবাজার পত্রিকার' যে সংবাদদাতা প্রথমে এই দুর্ঘটনার সংবাদ প্রেরণ করেন, তাঁহার নাম ও ঠিকানা এবং তাঁহার লিখিত পত্র 'পত্রিকা'-সম্পাদক—অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য—ফটোগ্রাফ রাখিয়া পুলিশকে দিয়াছেন কি

প্রথমনাথের এই অকাল ও আকস্মিক মৃত্যু যেমন রহস্যাচ্ছন্ন, তেমনই দুঃখের বিষয়। তিনি অধ্যাপকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জ্ঞানালোচনায় অবহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দাম্পত্য-জীবন কিরূপ হইয়াছিল, তাহা মোকর্দ্দমায় প্রকাশ পাইয়াছে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন—তাহা "ghastly failure"—তাঁহার পত্নীর ব্যবহার সম্বন্ধেও ম্যাজিষ্ট্রেট তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর তাঁহার এই রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু। তাঁহার বিবাহিতা পত্নীকে অবশ্য সান্ত্বনা দিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তাঁহার বিধবা জননীর কথা মনে করিলে অশ্রু সম্বরণ করা দুষ্কর হয়।

অধ্যাপকের কথা

ডাক্তার শিশিরকুমার মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি সংপ্রতি ভারতীয় বিজ্ঞান সভায় মনোনীতও হইয়াছেন। তিনি প্রমথনাথ সরকার বনাম নলিনীরঞ্জন সরকার—ব্যভিচারের অভি-যোগের মামলায় সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি বীণার ভগিনীকে (জ্যেষ্ঠ-তাতের কন্যাকে) বিবাহ করিয়াছেন। তিনিই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বীণা যখন অত্যন্ত অসুস্থ তখন সে যেন তাহার "বড়কাকা" নলিনীর সহিত "হাওয়া খাইতে" দিল্লীতে গমন করে। মামলার সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন—শিশিরকুমার সত্য কথা বলেন নাই। বীণা তাহার ডায়েরীতে

লিখিয়াছিল—তাহার কাকা তাহাকে যাইতে বলে। তিনি বীণার আহারের তালিকা দেখিয়া বলিয়াছেন—খাবারের বহর দেখিলে বলিতে হয়, তাহা বিশেষ পীড়িত রোগীর খাদ্য নহে—

"The diet prescribed above, even if we leave the numerous etcetra to the imagination is hardly that of a moribund invalid whose life was despaired of."

তিনি বলিয়াছেন, আসামীই বীণার যাইবার কথা বলে এবং বীণা আগ্রহ সহকারে সেই প্রস্তাবানুসারে কাজ করে।

বীণার ডায়েরীতে লিখিত বিবরণের উল্লেখ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন :—

"Which shows that neither Bina nor her brother-in-law (অর্থাৎ ডাক্তার শিশিরকুমার) nor her Barakaka has told the truth."

অর্থাৎ—

ইহাতে দেখা যায়, বীণা, তাহার ভগিনীপতি ও তাহার বড়কাকা কেহই সত্য কথা বলে নাই।

অধ্যাপক শিশিরকুমারকে ম্যাজিষ্ট্রেট যে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন, রায়ের এই অংশ তিনি যদি আদালতের সাহায্যে বাদ দেওয়াইতে না পারেন, তবে এ বিষয় বিবেচনা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য হইবে। কারণ, অধ্যাপকরা ছাত্রদিগের শিক্ষাদানের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। তাঁহারা যদি আদালতের বিবেচনায় মিথ্যাবাদী বিবেচিত হন তবে তাহা লজ্জার কথা এবং তাহাতে বিদ্যালয়ের সম্ভ্রমহানি হয়।

অল্পদিন পূর্ব্বে একজন অধ্যাপক তাঁহার এক ছাত্রের পরিবর্ত্তে পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল বলিয়া আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। এ সব কি ব্যাপার? আমরা জানি, সেকালে সার রোপার লেথব্রিজ যখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক, তখন তাঁহাকে চুরুট টানিতে টানিতে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে দেখিয়া অধ্যক্ষ শট্‌ক্লিফ বলিয়াছিলেন—

"লেথব্রিজ, এ দেশের আচার ব্যবহার বিবেচনা করিয়া আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি গোলদিঘীর ওপাশে চুরুট ফেলিয়া আসিও।"

তাহার পর ২০।২১ বৎসরের যুবতী বীণা যে একা ৫১।৫২ বৎসরের পুরুষের সঙ্গে গেল এবং নলিনী সরকার তাহার "বড়কাকা" হইলেও উভয়ের যে সম্বন্ধ তাহাতে উভয়ের রেজেষ্ট্রারী বিবাহে বাধা হয় না তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন!—

"One cannot help wondering what Doctor Sisir Mitter, whose wife, as he says, stands in the same degree of relationship to the accused as does Bina and gives the accused a very good character as an affectionate

uncle, would have done in similar circumstances, if his wife Mrs. Lily Mitter had thought to go off alone with the accused to Delhi and spend three months there with him."

অর্থাৎ—

"ডাক্তার শিশির মিত্র বলিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রীর সহিত আসামীর যে সম্বন্ধ বীণারও সেই সম্বন্ধ। তিনি আসামীকে স্নেহশীল কাকা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, যদি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী লিলী মিত্র এই ভাবে আসামীর সহিত দিল্লীতে যাইতেন ও তথায় তিনমাস থাকিতে চাহিতেন, তবে তিনি কি করিতেন?"

শিশিরকুমারকে আমরা স্বাবলম্বনের ও স্বৈরাচারের প্রভেদ বুঝিতে বলি। স্বাবলম্বন দোষের নহে—স্বৈরাচার বর্জ্জনীয়। শিশির-কুমারের মাতা ভাগলপুরে লেডী ডাক্তার। তিনি প্রাইভেট প্রাকটিশের উপার্জ্জনে যদি পরিবার পালন করিয়া থাকেন—পুত্রের বিদেশে বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহও করিয়া থাকেন, তবে সে জন্য কেহ তাঁহাকে প্রশংসা ব্যতীত নিন্দা করিবে না। কিন্তু কাকার সহিত বীণার ব্যবহার যে স্বৈরাচারের পরিচায়ক তাহা সমাজ নিন্দনীয় বিবেচনা করে।

স্বাবলম্বন ও স্বৈরাচার এক নহে।

ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনেকেরই কৌতূহল হয়। আর ম্যাজিষ্ট্রেট যে তাঁহার সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে তিনি কি বলিবেন?

বাগবাজার

পাঠকগণ অবগত আছেন, যেদিন অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার তাঁহার বিবাহিতা পত্নীর সহিত নলিনীরঞ্জন সরকারের ব্যভিচারের অভিযোগ আদালতে দায়ের করেন তাহার পরদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'এডভান্স' ও 'বন্দেমাতরম' সে সংবাদ প্রকাশ করিলেও **'অমৃতবাজার পত্রিকা' সে সংবাদ প্রকাশ করেন নাই।**

অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের মৃত্যু-রহস্য সম্বন্ধে সহযোগী লিখিয়াছেন!—

অধ্যাপক—"Vanished mysteriously after his own cross-examination, leaving a note which undoubtedly indicates that his mind was unhinged and that he was up to taking any foolish action to end his own life, as he was in the midst of a huge "conspiracy."

মৃত্যু বা অপমৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত হইবার পূর্ব্বে এইরূপ মত প্রকাশে কি অনিষ্টই হয় না?

'অমৃতবাজারের' পাটোৎপাদকরা চেম্বারের চেয়ারে, মাড়বারীর গদীতে, 'পত্রিকা' অফিসে রিপোর্টারের টেবিলে, লাট দপ্তরের গোলঘরে পাটোৎপাদন করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা কিরূপে স্থির করিতে পারেন—

প্রমথনাথের পত্রে বুঝা যায়, তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছিল এবং তিনি আত্ম-জীবনান্তের জন্য যোগ্যরূপ নির্ব্বোধজনোচিত কাজ করিতে পারিতেন—আরও, তিনি মনে করিয়াছিলেন, তিনি ভীষণ ষড়যন্ত্রে পড়িয়াছেন?

প্রমথনাথের পত্রখানি আদালতে পঠিত ও সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হইয়াছিল। তাহাতে মস্তিষ্ক বিকৃতির কোন লক্ষণ নাই। হাইকোর্ট সম্বন্ধে 'পত্রিকার' যে প্রবন্ধ মামলার বিষয় হইয়াছিল এবং 'পত্রিকার' পক্ষে সার তেজ বাহাদুর সাপরু যাহাকে পিতামহীর উপদেশ বলিয়া ব্যাঙ্গোক্তিও করিয়াছিলেন, তাহাতে কি মস্তিষ্ক বিকৃতির কোন লক্ষণ ছিল?

প্রমথনাথ যে লিখিয়াছিলেন, তিনি ভীষণ ষড়যন্ত্রে পড়িয়াছেন, তাহা যে কল্পিত অর্থাৎ বিকৃত মস্তিষ্কের ভাবনামাত্র তাহা মনে করিবার কোন্ কারণ, 'পত্রিকার' হস্তগত হইয়াছে?

প্রমথনাথের পত্র পাঠ করিয়া 'পত্রিকা' কিরূপে বুঝিয়াছেন, তিনি আপনার জীবন-নাশের জন্য যে কোন নির্ব্বোধজনোচিত কাজ করিতে পারিতেন?

প্রমথনাথের মৃত্যু যে আত্মহত্যা ইহা স্থির করিবার কোন কারণ এখনও জনসাধারণের হস্তগত হয় নাই। এখনও সকলে এই রহস্যাচ্ছন্ন মৃত্যুর রহস্যভেদ করিতে বলিতেছেন। কোন সহযোগী বলিয়াছেন—বাঙ্গলার গভর্ণর যেরূপ তৎপর হইয়া কলিকাতা কর্পোরেশন গৃহে হত্যার তদন্ত করাইয়া-ছিলেন, তিনি তেমনই তৎপর হইয়া এই মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত ব্যবস্থা করুন। সহযোগী 'এডভান্স' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'—এই মৃত্যু সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই সময় যদি মত প্রকাশ করা হয়—

(১) অধ্যাপকের মস্তিষ্ক বিকার হইয়াছিল।

শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার

ভূতপূর্ব্ব মেয়রের জয়ন্তী-পদক প্রাপ্তি

সোমবারে 'ফরওয়ার্ডে' প্রকাশ যে সম্রাটের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে যাঁহারা স্মারক পদক পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকার অন্যতম।

(২) তিনি জীবনাস্ত করিবার জন্য যে কোন নির্ব্বোধোচিত কাজ করিতে পারিতেন।

তবে তাহা কি সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে ?

আমরা সহযোগীর এই ব্যবহারে ব্যথিত হইয়াছি। মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ প্রকাশের পুর্ব্বে—লাশ সনাক্ত করিতে পুলিশের কোনরূপ আগ্রহের অভাব দেখিয়াও এইরূপ উক্তি কি সঙ্গত ?

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স সম্বন্ধে সহযোগীর ব্যবহারেও কি এই সন্দেহের উদ্ভব হয় না ?

কয় বৎসর পুর্ব্বেও যাঁহার অনুগ্রহাশায় 'পত্রিকার' পক্ষে মিষ্টার এ. কে. ঘোষকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে দেখা যাইত, তাঁহার পুত্র—প্রকৃত ব্যবসায়ী কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা চেম্বার সম্পর্কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন—তাহার প্রতিবাদে কোন ঔষধ ব্যবসায়ীর কর্ম্মচারীর পত্র পত্রস্থ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের কথার পোষণ পত্র প্রকাশিত হয় নাই। আমরা শুনিয়াছি, কোন পত্রলেখক স্থান-মূল্য দিতে চাহিলেও তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই !

সুরেন্দ্রনাথের পত্রে লিখিত হইয়াছিল—নলিনীরঞ্জন সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তিনি দুইবারের অধিক চেম্বারের সভাপতি হইবেন না—কিন্তু তাঁহার পর বার বার চারবার তিনি সভাপতি হইয়াছেন অর্থাৎ—তিনি প্রতিশ্রুতি পালন কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন নাই।

রাজনৈতিক নৃত্যশালা

দিনাজপুর সম্মেলনের অসাফল্যের উপর কটাক্ষ করিয়া সহযোগী "সংহতি" নৃত্য করিতে করিতে বলিয়াছেন :—"সহরের বিশিষ্ট কয়েকটী প্রকোষ্ঠে এবং কয়েকটি সংবাদপত্রের দপ্তরখানায় আজ বাংলার রাষ্ট্র আন্দোলন সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রচার দেবীর ঢক্কা নিনাদে জনচিত্ত বশীভূত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস হইতেছে। কিন্তু এই শিথিল ভিত্তির উপর রাষ্ট্র আন্দোলন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তাই আজ সংবাদ পত্রের স্তম্ভে যত বড় করিয়াই সম্মেলন প্রভৃতির জয়যাত্রার ঘোষণা হউক না কেন, তাহাতে জনসাধারণের চিত্ত চঞ্চল হয় না। ব্যক্তি-স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া জন-স্বার্থে নিজেকে প্রবুদ্ধ করিবার মহান আদর্শ হইতে বাংলার নেতৃমণ্ডলী যে দিন বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন সেই দিন হইতে জনচিত্ত হইতে তাঁহাদের আসনও খসিয়া পড়িয়াছে। বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের উপর গালিবর্ষণ করিয়া নিজেদের দেশহিতৈষী প্রতিপন্ন করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। দেশের মধ্যে শিক্ষা, শিল্প, ও সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্য শক্তিশালী সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারিলে এই সব সম্মেলনের সার্থকতা কোথায় ? দলের জয়

ঘোষণায় জাতির জন্ম ঘোষিত হইবে না—এই সত্য আজ যদি আমরা স্বীকার না করি তাহা হইলে এই সব সম্মেলন বড় ও মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক নৃত্যশালায় পরিণত হইবে।"

যে রাজনৈতিক নৃত্যশালায় একদিন দাদা জ্ঞানাঞ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া অবিনাশ ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত নৃত্য করিয়াছিলেন, আজ চেলা সুরেন্দ্র-সুকুমারের যুগ্ম আক্রোশ সেই নৃত্যশালার উপর হইল কেন? Globe-এর Non-stop Revue-এ নৃত্যরতা অর্দ্ধনগ্না সুন্দরীদের আকর্ষণে নয়ত? "শিক্ষা, শিল্প ও সামাজিক উন্নতি বিধানের জন্য যে শক্তিশালী সঙ্ঘ স্থাপনের" আভাষ 'সংহতি' দিয়াছেন তদনুরূপ সঙ্ঘ কি পূর্ব্বে স্থাপিত হয় নাই! আজ "দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতির" অস্তিত্ব কোথায়? দেশবন্ধু পল্লী সংস্কার সমিতির ন্যায় শক্তিশালী সঙ্ঘও যে দেশের জনসাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছিল তৎসম্বন্ধেও মতভেদ আছে। ইহাও কি সত্য নহে যে দেশবন্ধু পল্লী সংস্কারের অর্থও রাজনৈতিক নৃত্যশালায় প্রলয় নাচনের অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইয়াছে? রাজনৈতিক স্বরাজ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন স্থায়ী সংস্কারক প্রতিষ্ঠান গড়া সম্ভবপর নয় এবং ততদিন পর্য্যন্ত রাজনৈতিক নৃত্যশালায় নৃত্য করিতেই হইবে! এই নৃত্যে যাঁহাদের অরুচি, বৈরাগ্য বা বিতৃষ্ণা আসিয়াছে তাঁহারা পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করুন অথবা সংসারে সুখ-নীড় রচনা করুন। সুরেন্দ্রবাবু ও সুকুমারের বিরুদ্ধে "সংহতি"র নামে ভাবের ঘরে চুরি করার চৌর্য্যবৃত্তির অপবাদ দিতে আমাদের ন্যায় কঠিন প্রাণেও ব্যথা লাগে।

লেবুর আচার

দাদা যখন বন্দীশালায় দেশপ্রেমের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন ভ্রাতা তখন "সংহতি"-র বাজারে "লেবুর আচারের" ফেরীওয়ালা হইয়া বেড়াইতেছেন। লেবুর রস চারিয়ে সুরেন নিয়োগী মহাশয় রাতারাতি বিক্রীওয়ালা হইয়া উঠিয়াছেন। তবে গভীর রাত্রে স্থানবিশেষে "বেলিফুলের" বেসাতী করিলে বিশেষ লাভবান হইতে পারেন। আশ্রম-ফেরতের চরম পরিণতি কোথায় তাহা কে বলিবে?

যে সরকারী আইনের ব্যবস্থায় দাদা জ্ঞানাঞ্জন আজ বন্দী সেই সরকারী আইনে কবে হইতে সুরেন্দ্রের ও সুকুমারের বিশ্বাস ও ভক্তি উছলিয়া উঠিল? দুর্নীতির মূলধন 'সংহতির' বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় "সিল্ক হোমের" পার্শ্বে দ্রষ্টব্য। নলিনীর মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড' সুরেন্দ্র নিয়োগীকে সার্টিফিকেট দিয়াছেন যে তিনি "the editor........ ...is...a fearless person of a vigorous and independent inviduality." 'ফরওয়ার্ডের' এই সার্টিফিকেট সুরেন্দ্রবাবুর পঙ্ক-তিলক হয় নাই ত?

আন্তঃসাম্প্রদায়িক যুবসঙ্ঘ

ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে এক মিলিত মহাজাতি গঠনের কল্পনায় সামাজিক ক্ষেত্রে ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের লোকদিগের ঘনিষ্ঠ মেলা মেশা ও সর্ব্বপ্রকার মৈত্রী সম্বন্ধ সম্ভব করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ইয়ং মেনস্ ইন্টার কমিউন্যাল ক্লাব নামক একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত সভ্যবৃন্দ ও কর্ম্মকর্ত্তাগণ লইয়া সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সভাপতি শ্রীযুত সত্যানন্দ বসু, সহঃ-সভাপতিগণ—ডাঃ আর আহমেদ, কাজী নজরুল ইসলাম, মিঃ এইচ কে মুখার্জ্জি।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্র মোহন চৌধুরী, মিঃ জসিমুদ্দীন। সভ্যবৃন্দ: মিসেস কুমুদিনী বসু, মিঃ বেনারসী দাস চতুর্ব্বেদী (সম্পাদক বিশাল ভারত), প্রিন্সিপাল ক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত, মিস চারু সেন, মিসেস এইচ, এ, হাকাম, শ্রীযুত অক্ষয়কুমার সরকার, মিঃ এন মজুমদার, মিসেস হেমলতা বসু প্রভৃতি।

নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আচার্য্য সার পি, সি, রায়, কলিকাতার মেয়র মিঃ এ কে ফজলুল হক, এম-এল-এ, শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র, মৌলবী আবদুল করিম এম, এল, সি, মিঃ জে, এন, বসু, এম-এল-সি, মিঃ জে, সি, গুপ্ত, খান বাহাদুর আবদুল মমিন, প্রিন্সিপ্যাল জে আর ব্যানার্জ্জি ও মিঃ এন, কে, সিং চৌধুরিয়া।

ত্রিপুরায় গ্রন্থাগার-সংগঠন

গত ১৪ই এপ্রিল, ১লা বৈশাখ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে ত্রিপুরা জেলা গ্রন্থাগার-সঙ্ঘের একটী সভা হয়।

উক্ত সভায় যে প্রতিভাষণ পাঠ করা হয় তাহার মূল কথা:—ত্রিপুরা জেলায় আরো নূতন গ্রন্থাগার-স্থাপন এবং যে সব গ্রন্থাগার বর্ত্তমানে রয়েছে—সেগুলির আরো উন্নতি দরকার। গ্রন্থাগারগুলির মাঝে পরস্পর যোগাযোগ থাকলে পুস্তক আদান প্রদান দ্বারা নূতন পুস্তকের অভাব অনেকটা দূর করা যায়। এই সব উদ্দেশ্য নিয়েই এই গ্রন্থাগার-সঙ্ঘের উদ্ভব। গ্রন্থাগার-আন্দোলনে আস্থাবান যে কোনো নর-নারী এই সঙ্ঘের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ'তে পারেন। সভ্যগণের অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা বারো আনা। সভ্যগণ স্থানীয় গ্রন্থাগার থেকে একখানি হিসাবে বই বাড়ীতে নিয়ে প'ড়তে পারেন।

পুস্তকাদি সংগ্রহ করে ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে কুমিল্লা গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠভবন সুরু করা হ'য়েছে। বর্ত্তমানে পুস্তক সংখ্যা সাতশত। প্রত্যহ সাড়ে তেরো ঘণ্টা পাঠভবন খোলা থাকে। সর্ব্বসাধারণ পাঠভবনে ব'সে পত্রিকাদি পাঠ করেন। কুমিল্লা গ্রন্থাগারের সভ্যসংখ্যা ২০৯ জন।

——

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

সব্যসাচী

আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকে বলেন, রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই বাঙ্গালীর ব্যবসাবিমুখতার কারণ। অর্থাৎ রাজস্ব-বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বলিয়া বাঙ্গলার উকীল, মোক্তার, ব্যারিষ্টার, দোকানদার—কিছু টাকা জমিলেই জমীতে বা জমীগত সম্পত্তিতে তাহা প্রযুক্ত করেন—ফলে ব্যবসার ক্ষতি হয়।

এই যে ভূমিসম্পত্তির মোহ, ইহা হইতে বাঙ্গালীকে মুক্ত হইতে হইবে—এই উপদেশ আমরা শুনিতে পাই। কিন্তু যখন নাকি, এ দেশে জীবনবীমা কোম্পানীগুলিও এই মোহমুক্ত হইতে পারিতেছেন না, তখন মনে হয়, এযে সেই—

"নাচে ভাল
পাক দেয় খারাপ!"

হিন্দুস্থান সমবায় বীমামণ্ডলীর এইরূপ সম্পত্তিতে টাকা প্রয়োগের বিষয় আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। দেখিতে পাইতেছি, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দেও কোম্পানীর বার্ষিক সভায় সভাপতি কুমার কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক এইরূপে অর্থ প্রয়োগের সমর্থন করিয়াছেন এবং সমর্থনে বিদেশের কতকগুলি প্রসিদ্ধ লোকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন :—

"Our experience about the relative superiority of investment in mortgages has also the support of many eminent actuarial experts. Such renonwed actuaries as Mr. T. E. Young, Sir Gerald Ryon, Sir George May, Mr. A. W. Taru and Mr. W. Penman—all of whom are great figures in the world of insurance—have definitely expressed themselves in favour of investment in mortgages on real property in big cities as the most stable and suitable investment for life offices."

এই সব প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কোথায় কি মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অবশ্য কুমার কার্ত্তিকচন্দ্র অবগত আছেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই—

(১) মিষ্টার ইয়ং যে Commercial Union-এর সহিত সংযুক্ত ছিলেন, তাহার এইরূপে প্রযুক্ত টাকার পরিমাণ......শতকরা ২৯·৯ টাকা।

(২) সার জেরাল্ড রায়ান যে Phoenix-এর সহিত সংযুক্ত, তাহার এইরূপে প্রযুক্ত টাকার পরিমাণ.........শতকরা ২৫·২ টাকা।

(৩) সার জর্জ্জ মে যে Prudential-এর স্তম্ভ তাহার এইরূপে প্রযুক্ত টাকার পরিমাণ......শতকরা ১৬·৮ টাকা।

(৪) মিষ্টার পেনম্যানের সহিত যে Atlas-এর সম্বন্ধ তাহার এইরূপে প্রযুক্ত টাকার পরিমাণ......শতকরা ১৯·৯ টাকা।

All the above figures include loan to policy-holders within their surrender-value, যে কোম্পানীর এইরূপে প্রযুক্ত টাকার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহার পরিমাণ **শতকরা ৩০**; অথচ কুমার কার্ত্তিকচন্দ্র যে কোম্পানীর কর্ত্তা তাহার এইরূপে প্রযুক্ত টাকার পরিমাণ (including 10 per cent as Loans) **শতকরা প্রায় ৭০ টাকা।**

সুতরাং বিদেশী কোম্পানীগুলির সহিত এই স্বদেশী বীমা কোম্পানীর তুলনা করা সঙ্গত হইবে না।

কুমার সাহেবের উক্তি যে 'ষ্টেটসম্যানের' Notes লেখকের উত্তরে কল্পিত তাহা মনে করা যাইতে পারে। কারণ 'ষ্টেটসম্যান' লিখিয়াছিলেন :—

"The Hindusthan is the only important Indian Assurance office that has made a feature of placing the bulk of its funds in mortgages etc."

আর—

"The carping critic may find a weak point in the Society's accounts in the fact that no details are given of the very large amount of these mortgages and holdings, nor of the proportion—if any—that has involved in foreclosure."

কুমার কার্ত্তিকচন্দ্র বলিয়াছেন :—

"We are not for putting all our edges into mortgages, we have considerable investments in gilt-edged securities."

কিন্তু Indian Finance Year Book (1932) লিখিয়াছিলেন, এই কোম্পানীর—

"Guilt-edge and bonds and cash

are about 12 per cent of the life fund."

কেবল gilt-edge হয়ত শতকরা ৭.৮ টাকা হইবে। কুমার কার্ত্তিকচন্দ্রের মতে ইহাই কি considerable?

আবার তিনি যে স্থানে বিদেশী বিশেষজ্ঞদিগের মতের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই স্থানে বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে **বড় সহরে** সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা খাটান সঙ্গত ও অবিরল। কয়দিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে দেখিয়াছি, কার্শিয়াংএ চা বাগান ও অন্য সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া হিন্দুস্থান কয় লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিলেন। কার্শিয়াং বড় সহর কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু করিমগঞ্জ বা মোতিহার যে বড় সহর নহে—তাহা আমরা বলিতে বাধ্য।

ভূমিসম্পত্তিতে অধিক বা অধিকাংশ টাকা প্রযুক্ত করিলে কিরূপ বিপদ ঘটিতে পারে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—বাঙ্গালার নানা স্থানে লোন কোম্পানীগুলির বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা।

সেই অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয়, জীবন বীমা কোম্পানীর পক্ষে ভূমিসম্পত্তিতে অধিকাংশ টাকা প্রযুক্ত করার অনেক বিপদ হইতে পারে। যে পথে বিপদের সম্ভাবনা থাকে, সে পথ বর্জ্জন করাই কি মঙ্গল নহে? যে সময় ভূমিসম্পত্তির মূল্য হ্রাস হয় বা ব্যবসা মন্দা ঘটে, তখন সুদ আদায়ে কিরূপ বাধা পড়ে তাহাও হিন্দুস্থানের হিসাবের আলোচনা করিলে দেখা যায়। আমরা তিনটি কোম্পানীর হিসাবের আলোচনা করিতেছি:—

(১) এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়ার (১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী) মোট টাকা—৪ কোটি ১০ লক্ষ ২২ হাজার। ইহার প্রাপ্য সুদ—১৯ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা; অনাদায়ী—৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বা শতকরা ১৭ টাকা।

ন্যাশনালের (১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর) মোট টাকা—১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩০ হাজার। ইহার প্রাপ্য সুদ ৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা; অনাদায়ী—১ লক্ষ ৪৫ হাজার বা শতকরা ১৬ টাকা।

(৩) হিন্দুস্থানের (১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল) মোট টাকা ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার। ইহার প্রাপ্য সুদ ৭ লক্ষ টাকা; অনাদায়ী ৮ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা—অর্থাৎ শতকরা ১২৫ টাকা!

আমরা দেখিতে পাই ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থানের পরামর্শদাতা একচুয়ারী বলিয়াছিলেন—আমি "have satisfied myself that the Society is fully able to meet its commitments to its policy-holders."

তিনি হতভাগ্য অংশীদারদিগের দিকে মুখ তুলিয়া চান নাই।

যখন দেখা যাইতেছে, অনাদায়ী সুদের পরিমাণ অসাধারণ, তখনও হিন্দুস্থান কি টাকা খাটাইবার নীতির পরিবর্ত্তন প্রয়োজন মনে করেন না?

ভূসম্পত্তিতে টাকা খাটাইবার বিরুদ্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে।

"খেয়ালী"র মামলার জের

গতকল্য বুধবার আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল্, কে, সেনের এজলাসে "খেয়ালী" ও ন্যাশনাল নিউস্‌পেপার্স লিমিটেডের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিশ্ববন্ধু রায় চৌধুরীর পক্ষে উকীল শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ বসু এই মর্ম্মে এক আবেদন পেশ করেন যে "খেয়ালী"র বিরুদ্ধে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যালের মানহানির মামলার জন্য "খেয়ালী" কার্য্যালয় খানাতল্লাসীর ফলে "খেয়ালী"র যে ক্যাশ বই পুলিশে লইয়া গিয়াছে তাহা ফেরত দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হউক। আবেদনে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ক্যাশ বইটী নাকি লইয়া যাইবার কোন কারণ নাই কারণ ডাঃ সান্ন্যালের আবেদনের সহিত ক্যাশ বহিটির কোন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। "খেয়ালী" ও ন্যাশনাল নিউস্‌পেপার্স্ লিমিটেডের দেনা পাওনার আদান প্রদানে ও কার্য্যাবলী পরিচালনায় অসুবিধা হইতেছে বলিয়া উক্ত আবেদনে উল্লেখ আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট তল্লাসীর সময় প্রাপ্ত ক্যাশ বই প্রভৃতি সমস্ত কাগজপত্র অবিলম্বে আদালতে দাখিল করিতে আদেশ দিয়াছেন এবং তৎপরে তিনি উক্ত বিষয়ে যথারীতি আদেশ দিবেন।

স্বাস্থ্যের পুনর্গঠন

ডাঃ এম, জি, বসাক

বাঙ্গালা দেশে ম্যালেরিয়ার আধিপত্য ও মৃত্যুর হার ভারতের অন্যান্য এবং বিভিন্ন রোগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। একথা অস্বীকার করিবার নহে। প্রতি বৎসর প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ এই ম্যালেরিয়া জ্বর। তাই শীঘ্র এ ধ্বংশের পথ রোধ না করিলে বাঙ্গালী জাতির আর উন্নতি নাই। ম্যালেরিয়া আজ যে কেবল এই প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাহা নহে, বরং ইহা বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছে। অতএব ইহার প্রতীকার আশু বাঞ্ছনীয়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর ক্ষীণ দেহ রক্তের অভাব হেতু কর্ম্মশক্তি হীন হইয়া পড়ে। বহু বৎসর গবেষণার পর ইহা বিশেষজ্ঞগণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, সুইজারল্যাণ্ডের—আবিষ্কৃত "রচিটোন" ম্যালেরিয়া রোগীর কর্ম্মশক্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ। ইহার নিয়মিত ব্যবহার ম্যালেরিয়ার পুনরাক্রমণ হইতে রোগীকে রক্ষা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিকিৎসক মণ্ডলী ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ম্যালেরিয়া রোগ ভোগের পর "রচিটোন" ব্যবস্থা দিতেছেন। ইহা রক্তস্থিত ম্যালেরিয়া বীজাণুদের ধ্বংস সাধন করিয়া, শরীরে নূতন রক্ত কনিকা সৃষ্টি করিয়া রক্তকে সতেজ করে। ইহা সেবনে দুর্ব্বলতা দ্রুত দূর হইয়া দেহে যথেষ্ট নব বল ও জীবনী শক্তির সঞ্চার হয়, উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

নিউ থিয়েটার্স

পরিচালক বড়ুয়ার হিন্দী "দেবদাস" বি-ইউনিটের ষ্টুডিওতে তোলা আরম্ভ হয়েচে।

রাধা ফিল্ম

আসচে শনিবার থেকে এদের বহু প্রতীক্ষিত হাস্য-মধুর বাণী-চিত্র "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" রূপবাণীর রূপোলি পর্দ্দায় প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠবে।

* * *

এদের উর্দ্দু সবাক্ চিত্র "ওয়ামক এজরা"র শেষ বৃহৎ দৃশ্য তোলা শেষ হ'য়েছে। ছবিখানি নানা কল্পনায় রঙীন হ'য়ে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ কোরবে।

* * *

এঁরা হিন্দী "দক্ষযজ্ঞ", "রাজনটী" ও উর্দ্দু "ওয়ামক এজ্‌রা"র কেন্দ্র-স্বত্ব হায়দারাবাদের 'ইণ্ডাস্ টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্সে'র কাছে বিক্রী কোরেছেন।

কালী ফিল্মস্

"বিদ্যাসুন্দরে"-র কাজ আপাততঃ স্থগিত রেখে গাঙ্গুলী মশাই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন "বিরহ" তুলতে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। আসছে ১৮ই মে ক্রাউনের পর্দ্দায় ছবিখানি উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। আমরা যতদূর জানি, শিল্পী সম্মিলনে ও গল্পের প্রয়োগ নৈপুণ্যে ছবিখানি বিশেষ চিত্তগ্রাহী হ'য়েছে।

এভারগ্রীন পিক্‌চার্স

এঁদের নিজেদের ষ্টুডিওতে "পঞ্চবানে"-র একটি বিশেষ দৃশ্য এই হপ্তায় তোলার কথা আছে। এই দৃশ্যে শ্রীললিত মিত্র, শ্রীসন্তোষ সিংহ, শ্রীসন্তোষ দাস, শ্রীমতী ব্লাকী ও শ্রীমতী নমিতা দেবী প্রভৃতি নামবেন।

নিউ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্

পরিচালক শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের "ব্লাড্ ফিউড্" চিত্রের কাজ প্রায় শেষ হ'য়েছে আলোকচিত্র-শিল্পী কৃষ্ণগোপাল, শব্দযন্ত্রী শ্রীঅতুল চ্যাটার্জ্জী, সঙ্গীত-পরিচালক দাস প্রভৃতি সকলেই ছবিখানির সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কোরছেন।

শ্রীকেষ্ট হালদার এই চিত্রের তত্ত্বাবধায়ক-রূপে কাজ কোরছেন। অভিনেতৃদের মধ্যে সকলেই সাধারণের কাছে বিশেষ পরিচিত। এদের মধ্যে জগদীশ, হীরালাল, কমলা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী মলিনা ও মাদাম গ্যাব্রিলা ফ্রাঞ্জের নাচ এই চিত্রের একটি আকর্ষণীয় বিষয়-বস্তু হবে।

ভারতলক্ষ্মী

এই প্রতিষ্ঠানের হ'য়ে শ্রীতুলসী লাহিড়ী চা বাগানের বিষয়-বস্তু নিয়ে একখানি ছবি শীঘ্রই তোলা আরম্ভ কোরবেন। শ্রীমতী মীরা দত্ত নায়িকার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ কোরবেন।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

"বিদ্রোহী" এখন পরিস্ফুটনাগারের লোকদের হাতে। 'ডি-জি' বিশেষ অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় ছবিখানির সম্পাদনার কাজে হাত দিতে পারছেন না। আমরা ভগবানের কাছে তাঁর দ্রুত মঙ্গল কামনা করি।

* * *

মিঃ এ, পি, সিংহের উর্দ্দু সবাক্-চিত্র "ভিক্টিমে"-র আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হ'য়েছে।

: খেয়ালী :

= চিত্রপট =

এই যে ওপরে ছবিখানি দেখ্ছেন, ইনি মেয়ে না পুরুষ—ভাল কোরে দেখ্লেই বুঝ্তে পারবেন ইনি সুঅভিনেত্রী মলিনা। নিউ ইণ্ডিয়ার "ব্লাড্ ফিউড্" চিত্রে একটি অভিনব ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ কোর্বেন।

ডায়েরীর ছিন্ন-পত্র

[স্মৃতির কথা]

রঞ্জন

মানুষের জীবন সব-পাওয়াটুকুর ওপরেই চলে কিন্তু তা পায় না। আজ এই মুহূর্ত্তে আমার চাওয়াটুকু পূরণ হয় কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার আর এক বাসনা মনের মাঝে উঁকি মারে।···বাসনার টুঁটি চেপে ধ'রে হত্যা করাও আবার মহাপাপ। মানুষ বাসনার আশ্রয়ই থেকে অভাবের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সংসারের দুঃখকে বরণ ক'রে নেয় হাসিমুখে।···দুঃখের ভেতর দিয়ে সুখের সন্ধান পায় বুঝি মানুষ—তাই সে জগতের কাছে পরিচয় দেয় নিজেকে পার্থিব বলে।···

আজ ভোর বেলা ঘুম ভেঙ্গে উঠতেই দেখি বৌদি ঘরের ভেতর ব'সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।···নিদ্রার সঙ্গে জাগরণের পরিচয় হয় নাই কান্নাকে সাথী ক'রে।···তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, বৌদি, তুমি কাঁদছো কেন ?

চোখের জল আঁচল দিয়ে আস্তে মুছে বলে, কিছু না।

কিন্তু এই 'কিছুনা'র ভেতরে আছে এমন এক নিগূঢ় অর্থ যা মানুষ অন্তরের সঙ্গে উপলব্ধি করে কিন্তু ইঙ্গিতে বা ভাষায় প্রকাশ ক'রতে পারে না।···অসহায়ের আর্ত্তবেদনা বুঝি অন্যের কাছে জানাবার জন্যেই এই অশ্রুর সৃষ্টি।···

মৃদু হেসে তাকে বলি, যদি 'কিছু না'ই হয় তবে কেঁদে কাপড়খানা ভেজাচ্ছ কেন ?···

অনেক বলাবলির পর তার কাছে এই-টুকু জানতে পারি যে, তার এক আদরের ভাই, সংসার আলো-করা একমাত্র বৃদ্ধ পিতা-মাতার কাণ্ডারী, কাল রাতে এই পৃথিবীর কোল থেকে চিরকালের জন্ম বিদায় নিয়েছে।···

কাশীতে থাকে, বেরিবেরির তীব্র তাড়ণ তাকে রেহাই দেয় নি।···সংসারের দুঃখ-জ্বালা থেকে মুক্তি দেবার জন্য ভগবান বুঝি তাকে দয়াপরবশ হ'য়ে কোলে টেনে নিয়েছেন।···

এই মৃত্যুর সঙ্গে আমারও কিছু যোগ আছে কিনা জানি না, তবে মুহূর্ত্তেই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি জগৎ আলো-করা-চার-বছর-ছেলের হাসিমাখা মুখ।···অন্তর কেঁপে ওঠে, বুকের তীব্র দাহন আরও জ্বলে ওঠে।···

বৌদিকে সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা আমার নেই ; আমার নিজেরই অন্তর জুড়ে তখন যে এক প্রলয় বৃষ্টি বইতে থাকে।···

বইয়ের পাতায় পাতায় প্রতি কথাতেই পড়ি : মানুষ মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাই সে সামান্যতেই শোকে মুহ্যমান হ'য়ে পড়ে ; কিন্তু যে ব্যক্তি এই মায়ার শৃঙ্খল খণ্ডন ক'রতে সমর্থ হ'য়েছেন, তিনিই প্রকৃত সাধু।···

হাসি।···নিরর্থক সে হাসি।···ভাবি, এই পৃথিবীর বালুতটের ওপর এমন কোনও জিনিষ নেই, যে এই অভাব, এই শোকের অন্তরালে গিয়ে বাস ক'রতে পারে।···সংসারী সংসারের অভাবের কথা ভাবে, সাধু ভগবানকে পাবার কথা ভাবে।···

চিন্তা কল্পনার সাথী। মানুষ যখন কোনও জিনিষকে লক্ষ্য ক'রে চিন্তা করে তখন তার মনের মধ্যে দৃশ্যের পর দৃশ্য আসে রঙীন ফলকে ফলিয়ে। এ চিন্তার সাথী কল্পনা।

ভজু।...

আমার আদরের ছোট ভাই।...

ঠিক এই সময় গতবছরে সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে।···

নিয়তি।...

আবার শিউরে উঠি—'নিয়তি'।...মুখে মলিন হাসি ফুটে ওঠে, কিন্তু প্রাণ কাঁদে হা-হা ক'রে।···

সেই হাসি-মাথা মুখ, সেই চপলতা, সেই ব্রীড়াময় ভঙ্গী—সব—সব আমাদের চোখের কোল থেকে ধীরে ধীরে মুছে যাবে।

কিন্তু সে করুণ দৃশ্য মুছবে না আমার চোখ হ'তে...যতদিন না মৃত্যু আমার কণ্ঠ চেপে ধ'রবে—ততদিন।...

কোলে ক'রে যাকে মানুষ করেছি, যার আধ-আধ অস্ফুটস্বর ভাষা শুনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে দিনগুলো কাটাতাম, যাকে দেখবার জন্যে বারবার ছুটে আসতাম ঘরের ভিতরে সেই প্রাণ-প্রতিম ছোট ভাই ভজুর মৃতদেহ এই নিজ অঙ্কে তুলে নিয়ে আবার ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি গঙ্গা সলিলের তলহীন বুকে, তার বুকের ওপর একটা আধমণের পাথর চাপা দিয়ে।...

উঃ। সারা আকাশ, সারা বাতাস, সারা পৃথিবীর জিনিষই যেন তখন আমার চোখে একটা প্রহেলিকা, একটা কুয়াশা—একটা আঁধার, ঘন আঁধার!

নৌকা থেকে নামিয়ে যখন মাঝ গঙ্গার বুকের ওপর ফেলে দিতে যাই, তখন মুহূর্ত্তে আমার চোখ তার দিকে পড়ে—আবার সেই হাসি, সেই মৃদু হাসি, সেই সুদূরে হারিয়ে যাওয়া স্বপন-মাখান আঁখিদুটি!

অজানতে প্রাণ শিউরে ওঠে।...চোখ বুজি।...

ঝুপ্—ঝপাস্...!!

নিজের প্রাণকেও যেন ঐ গঙ্গাবারিধির তলায় আমার আদরের নিধি, আমার এক-মাত্র পুতুল প্রতিমার সঙ্গে ভাসিয়ে দিলাম।...

চোখ ফেরাই—

দেখি, বাবা, কাকা, দাদা সব কাঁদে!

বাড়ী ফিরি—

দেখি মা, বৌদি, দিদি, সব কাঁদে।...

কাঁদে.. সকলে কাঁদে।...

ঘরের ভেতর যাই—

বড়দির ছোট ছেলে অসীম ছুটে আসে আমার কাছে, আমার আঙ্গুল ধ'রে বলে,

মামা! ভজু কবে ডাক্তার বাড়ী থেকে ফিরবে!...

তার দিকে চোখ পড়ে।

আবার সেই আকুল প্রশ্ন।

কাঁপা-হাতে তুলে নি তাকে বুকের মাঝে, বলি, কাল ফিরবে বাবা আমার!

এবার অন্তর খালি কাঁদে না, বাইরেও কাঁদি!

* * *

স্মৃতি।

দুনিয়ার মালিকের কাছে জানতে চাই এ স্মৃতির মূল্য কি?

'ডায়েরীর ছিন্নপত্র' লেখকের ডায়েরী থেকেই নেওয়া। লেখক রোজ রাত্রি বেলা শোবার আগে একপাতা ক'রে সেদিনকার কোনও একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে লেখেন। এ অনেকটা চিত্র গোচের কিন্তু ঘটনাটা আবার Philosophic ভাবে লেখেন, তাই সময় সময় হ'য়ে দাঁড়ায় আবার প্রবন্ধ। এ রকম ধরণের লেখার প্রবর্ত্তক ইনিই নিজে। সুতরাং পাঠকদের কাছে

দেহ-যমুনা

[নাটক]

শ্রীবিশ্বায়ক ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নেপথ্যে অনিমা—ও ঘরে টেবিলের ওপর আছে বইখানা ?—

স্বপন—হ্যাঁ—

অ—আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ ।—

স্বপন—আমি তাহলে এখন যাই ?—না না—আপনি বসুন গে আমার ঘরে—আমি বইখানা নিয়েই আসছি ।—

অনিমার প্রবেশ ।

প্র ।—কি চাচ্ছো ?—

অ ।—ওই বইখানা ।—

প্র ।—কিছু বলবে ?—

অ ।—ও চাবুক আনলে কে ?—

প্র ।—আমি ।—

অ ।—কেন ?—

প্র ।—মনে পড়ছে না—বোধহয় নিজেকে—চাবকাবো বলে ।—

অ ।—তুমি মনে মনে কী ভেবেছো আমাকে বলতো ?—

প্র ।—মনে মনে যা ভাবা যায়—তা তৃতীয় ব্যক্তিকে বলতে বারণ ।—

অ ।—তোমার সাহস দেখছি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে ।

প্র ।—আমার সাহস ! আমি তো বলি তোমার—সাহস । কিন্তু আর নয় যাও। ডাক্তার রায় এবার অপেক্ষা ক'রে ক'রে সত্যিই ক্লান্ত হয়ে—পড়ছেন—সেটা ভুলো না ।—

অ ।—সেটা তোমার দেখবার বিষয় নয় ।

প্র ।—বল কি এতো আমারই একমাত্র দেখবার বিষয় । আমার ধর্ম্মপত্নীর অতিথি পরিচর্য্যায় যদি কোন খুঁত থাকে—তবে সে পাপ তো আমারই ।—

অ ।—ধর্ম্মপত্নী ! জানি তুমি পত্নীগত প্রাণ । কিন্তু নিজে যখন বেলা আটটা ক'রে বাড়ী ফেরো—তখন তো এ কর্ত্তব্যবুদ্ধি দেখা যায় না । যখন স্ত্রী বারম্বার বারণ করা সত্ত্বেও বেলা বারোটার সময় মদ খেয়ে মাতলামি করবার জন্য রাস্তায় বেরোবার দরকার হয়—তখন এ কর্ত্তব্যবুদ্ধি থাকে কোথায় ?—পৌরুষ বুঝি দেখা দেয় স্ত্রীকে উপদেশ দেবার বেলায় । অতিথি পরিচর্য্যা নিয়ে আমাকে উপদেশ দিতে এসেছো । কথার বাদশা ।—

প্র ।—দ্যাখো এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা—কাটাকাটি করবার আমার রুচি নেই । তোমাকে আধুনিক হবার যথেষ্ট অবকাশ দিয়েছি । কিন্তু আজ থেকে সব বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল । আমার কোন বন্ধুর সঙ্গে তোমার অবারিত মেলামেশা আর চলবে না এই আমি আদেশ ক'রে যাচ্ছি । তা সত্ত্বেও যদি তুমি মেশো—তবে আমার বাড়ীর দরজা তোমার জন্য খুলবে না ।

অ ।—আমি জানি এই কথাই তুমি বলবে ।—আমার অত্যন্ত কপাল মন্দ যে একজন মাতালের কাছ থেকে আমায় সংযমের উপদেশ শুনতে হচ্ছে ! আদেশ ! তোমার আদেশ আমি মানবো না । আমি এখানেই থাকবো এবং এইখানেই তোমার বন্ধুদের সঙ্গে মিশবো । তোমার যা করবার তুমি কোরো । গীতা রায়ের বাড়ী যাবার সময়—

প্র ।—গীতা রায় ! ও ! সে কথাও কাণে গেছে দেখছি ।—

অ ।—হ্যাঁ, কেন যাবে না ? তুমি কি চাও যে তোমার সমস্ত পাপ কাজ আমার অগোচরে ঘটুক । তোমার সব কথা আমি জানি । গীতা রায়ের গান—

প্র ।—থামো গীতা রায়ের নাম তুমি উচ্চারণ কোরো না । সে অধিকার তুমি হারিয়েছো ।—

অ ।—অধিকার আমি—হারিয়েছি ? মিঃ রায় ঠিকই বলেন—

প্র ।—চুপ্ । মিঃ রায় কি বলে না বলে শোনবার আমার ঔৎসুক্য নেই । আমি চল্লাম । শুনে হয়ত আনন্দিত হবে—আমি সেই গীতা রায়ের ওখানেই চল্লাম । তোমার সংশোধনের আশা একেবারে ছেড়ে দিয়ে । তোমার আর স্বপন রায়ের নব পল্লবিত প্রেমকে আমি আশীর্ব্বাদ করে যাই—তোমাদের প্রেম নির্ভয় হোক ।—

অ ।—কী—কী বল্লে ?—

প্র ।—অনিমা বোস—আমি তোমার স্বামী, খেলার পুতুল নই—(প্রস্থান)—

(স্বপনের প্রবেশ)

রায় ।—অমন ক'রে কাঁদবেন না অনিমা দেবী । হঠাৎ—একটা কিছু অসুখ হ'তে পারে ।—

অ ।—আপনি যান মিঃ রায় । আমায় একটু একা থাকতে দিন ।—

রায় ।—আমি বলছিলাম কি !

অ ।—না—না আপনি যান ।--

রা ।—আপনি উতলা হবেন না—আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি—

অ ।—দাঁড়ান—আপনার বইখানা নিয়ে যান—আমার প্রয়োজন হবেনা ।—(প্রস্থান । স্বপন রায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ।)

ক্রমশঃ

এটা জানিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি, এ উপন্যাস নয়, গল্প নয়, প্রবন্ধ নয়—এ চিত্র প্রবন্ধ । কিন্তু টুকরো টুকরো ভাবে লেখা এক সুতোয় বাঁধা থাকলেও প্রত্যেকটির পর পর গ্রন্থি দেওয়া আছে । লেঃ সঃ]

ছিটে ফোঁটা

শ্রীবজ্রবাহু

বর্ষনমুখর সন্ধ্যায় আমার নিরালা অবসর মুহূর্ত্তকে কাটাবার জন্যে সদ্য-ক্রীত বাঁশীটি নিয়ে বসে তাতে সুর সংযোগ করতে যাচ্ছি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ব্যস্তভাবে মহীম আমার ঘরে প্রবেশ করলে। আমাকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই বাঁশীটি আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলে উঠ্‌লো—উ'হু, কর কী? নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে এনো না!—

বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলুম, তার মানে?—

—তার মানে বাঁশী বাজিয়েছ কি ঘরের মায়া ত্যাগ করতে হবে এবং তারপর গুডুম গুডুম—বলে গম্ভীর দৃষ্টিতে মহীম আমার বাঁশীর দিকে তাকিয়ে রইল—বেচারি বাঁশের বাঁশী!

আমি বললুম—এ পাগলের মতো কী বাজে বক্‌ছো?—

মহীম বল্‌লে—পাগল্?—বটে!—একি আমার কথা?

মহীমকে মিনতি করে বললুম—তোমার হেঁয়ালী রাখ—বলতো আমার বাঁশীর অপরাধ কী?

মহীম হস্তস্থিত বৈশাখের 'অর্চ্চনা'খানি থেকে একটি গল্প বার করে আমাকে পড়তে দিলে—প্রমাণ চাও—এই দেখ—পড় :এই গল্পটা!

গল্পের নাম—'অন্তরে ফিরে এসো'—লেখিকা—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী।

গল্পটি পড়ে সত্যিই বাঁশের বাঁশীটিকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিলুম। পাঠক পাঠিকাগণ, আপনাদেরও এরকম বাঁশী থাকলে অচিরাৎ বিসর্জ্জন দেবেন, তা না হলে দেবী সরস্বতী বর্ণিত নায়ক নায়িকার অবস্থায় যদি পড়তে হয়!—গল্পটার বিষয়-বস্তু শুনুন :—

নায়ক নিতাই বাঁশী বাজায়—নায়িকা সুরমা তার বাঁশীর টানে প্রেমে পড়ে—তার হৃদ্-মুনা বাঁশীর তানে উজান বইয়ে দেয়—(কলিযুগের রাধা-শ্যাম) এই বাঁশীর জন্যেই নিতাইকে স্কুল ছাড়তে হল, বাড়ী ছাড়তে হল, কারণ সুরমার বাপ নিতাইয়ের পিসিমাকে শাসিয়ে দিলেন—নিতাইকে যদি সে সংযত না করে, যদি তার বাঁশী বাজানো বন্ধ না করে, তা' হলে তিনি তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবেন।

নিতাইয়ের পিসী ভয় পেয়ে গেল। রাগ করে সে নিতাইকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বললে। হাসিমুখে নিতাই চলে গেল—"

তারপর নায়িকা সুরমার হল বিয়ে। যশোহর জেলার এক জমিদারের একমাত্র ছেলে প্রভাতের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। সেদিনও বাঁশী বেজেছিল—সুরমাও সে বাঁশীর ডাকে সাড়া দিতে বাসর ঘর থেকে উঠে পড়েছিল। কিন্তু স্বামীর কঠিন প্রশ্নে তার আর ঘর ছাড়া হল না। "উপায় নেই—উপায় নেই বন্ধু" বলে সুরমাকে কেঁদে বসে পড়তে হল।

সুরমা গেল স্বামীর আলয়ে। সেখানেও গেল নিতাই এবং তার বাঁশী! রোজই রাতে বাঁশী বাজে—বাঁশীর তানে পাগলিনী সুরমা ঘর সংসার ভুলে ছুটে যায়!—(যেমন বাজ্‌তো শ্যামের বাঁশী এবং সব ভুলে যেত রাধা।)

ক্রমে সুরমার এই কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল—তার স্বামী জান্‌লে এই ব্যাপার। কিন্তু সকলেই তো আয়ান ঘোষ নয়—সাংসারিক প্রভাত প্রশ্রয় দিলে না এ প্রেম-লীলা!—একদিন সে দৃঢ়কণ্ঠে বল্‌লে—

"আমি সব বুঝেছি সুরমা, বুঝেছি যে কেন তুমি স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করতে পারছ না। ওই বাঁশীই তোমার সর্ব্বনাশ করেছে, তুমি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য হারিয়ে ফেলেছ।"......"আসছে পূর্ণিমায় আমি তাকে একবার দেখে নেব সুরমা, দেখব কে

চুমু খেয়ে ভেঙে দেবো অভিমান-দ্বন্দ্ব

শ্রী ক...... ব......

দূর ছাই, ফিরে চাও! করো কেন দ্বন্দ্ব?
চুপচাপ বসে কেন থাকো নিঃশব্দ?
দেখ্‌বে কি মজা খান্, যাবো উঠে! শুন্‌ছো!
ওকি ও, আচল্ দিয়ে অভিমান বুনছো?
রাগ হলো? লক্ষীটি বলো নাকো পষ্ট,
মুখ বুজে থেকে করো সব দিক নষ্ট!
আড়চোখে দেখছ কি? জানো ভারী ছলনা!
এ দুপুরে জ্বালাতন কেন করো বলো না!

* * *

এইবার, ওকি কথা, করো মুখ গোমটা;
ও দিকে ফিরাও চোখ টেনে দাও ঘোমটা।
লাগ্‌ছে—কি মিথ্যুক! কেটে গেল গাল যে!
চুমু খেলে লাগে নাকি? দাও বাজে চাল্ যে!
মান ক'রে এতক্ষণ মিছামিছি ভুগালে,
দিনু তার শোধ তুলে রাঙা রাঙা দু'গালে!
এইবার ক'রে থাকো রাগে মুখ বন্ধ;—
চুমু খেয়ে ভেঙে দেবো অভিমান দ্বন্দ্ব।*

* খেয়ালীতে প্রকাশিত কবিতার উত্তর।

সে কেন এরকম করে আমার সকল সুখ শান্তি হরণ করলে? আমি তার কি করেছিলুম—যাতে সে আমার এমন সর্ব্বনাশ করলে? কিন্তু তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি সুরমা, তুমি যদি আগে হতেই জানো তুমি আর কাউকে ভালোবেসে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করবে না, কেন তবে বিয়ে করেছিলে? তখন জোর করে কেন বললে না তুমি বিয়ে করবে না, কেন তুমি সেকালের নভেলের নায়িকাদের মত ঘর ছেড়ে চলে গেলে না, অথবা একালের মেয়েদের মত বিষ খাওয়ার ভয়টাও দেখালে না?"—(লেখায় কী Dramatic force!)

তারপরই লেখিকার উৎকট পাগল কল্পনা একেবারে climax-এ উঠেছে।

পূর্ণিমায় বাঁশী বেজে উঠ্‌লো—সুরমা চল্‌লো আত্মহারা হয়ে। তারপরই—

"গুড়ুম—

শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ স্বপ্নজাল ছিঁড়ে গেল, পাপিয়া ভয় পেয়ে নীরব হয়ে গেল, বাঁশী থেমে গেল। "মাগো" বলে বুকখানা চেপে ধরে নিতাই লুটিয়ে পড়ল বালুচরে—

নিতাই দা—নিতাই দা—

সুরমা ছুটে এসে নিতাইয়ের বুকের পর আছাড় খেয়ে প'ড়ল—

গুড়ুম—

আর একটা শব্দ—অতি নিকটে, নিতাইয়ের ঠিক পাশে। প্রভাত নিজের বুকে নিজেই গুলি মেরেছে।

টেনে টেনে সে বললে, "তোমায় হত্যা করলুম না সুরমা, চিরকাল তুষানলে পুড়বার জন্যে তোমায় রেখে গেলুম। চিরদিন আজকের স্মৃতি তোমার মনে জেগে থাক—এই তোমার শাস্তি।"

মা গো মা—"

গল্পটার সম্বন্ধে মহীম বললে—লেখিকা বোধহয় সম্প্রতি "যমুনা পুলিনে"র সখি সখি শুনে এসেই গল্প লিখতে বসেছেন। আমরা বলি—এমন গল্প না লিখলেই নয়!

• • •

উক্ত সংখ্যাতেই শ্রীকল্পনা দেবী "লিপি" পাঠিয়েছেন—

"বলি কি ব্যাপার? আজকাল দেখি
উড়ু উড়ু সদা মন,
বাঁশি কল বুঝি ভালো নাহি লাগে?
হয়েছে সে বাদাবন?"

• • •

"ভাবো বোকা মেয়ে! কিছু বুঝি নাকো?
তোফা নাই নিরালায়
পাশের বাড়ীর মন্দারে পেয়ে
কাটে দিন জানালায়!"

অপরাজিতা দেবীর আর এক সংস্করণ দেখে আমরা খুসিই হলাম। সুরসিকা 'অর্চনা' মারফৎ অথ স্বামীর উত্তরটি জানালে আর এক দফা উপভোগ করা যাবে।

ঐতিহাসিক চিত্র

(এম, রায়, এম, এ,)

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতই ঐতিহাসিক চিত্র লোকের প্রিয়। মানুষ অতীতকে পুজো না ক'রে পারে না। এক সম্প্রদায়ের লোক কল্পনা নিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ চায় স্বচক্ষে সব দেখতে। অতীতে কী ঘটেছিল তা কল্পনা ক'রে নিয়ে মানুষ চুপ ক'রে থাকে না—মানুষ বার করছে মোহেন জো দাড়ো—পাঁচহাজার বছরের সভ্যতাকে চাক্ষুষ দেখবার জন্যে, গ্রীস-রোমের ধ্বংসাবশেষ তারা চোখের সামনে দেখতে চায়, পম্পিয়াই তারা খুঁড়ে বার ক'রে দেখবে, কী ছিল তখন, যখন ভিসুভিয়সের উদ্গারে তা লোপ পায়। মানুষ জানতে চায়, অতীতে লোকের রীতি-নীতি পোষাক ইত্যাদি কেমন ছিল। রূপকথার নিদ্রিতা রাজকন্যাকে জাগিয়ে দেখতে চায় তার রূপ, তার কার্য্যকলাপ। ইতিহাসের নীরস পৃষ্ঠার বাইরে তাই মানবের অভিযান! এই দেখার সাহায্য যে করে, মানুষ তার দ্বারে ছুটে আসে। কল্পনাপ্রবণ যাঁরা তাঁরা হয়ত ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত বলবেন, কল্পনাই ভা'লো—বাস্তবের আঘাতে তা চূর্ণ হয়ে যাবে এ তাঁরা চান না—কিন্তু সকলেই "ইয়ারো আনভিজিটেড্‌" এর কবি নন। তাঁরা চান স্থূল কিছু। ইতিহাসের পৃষ্ঠা হ'তে ঘটনা তুলে এনে তাতে প্রাণসঞ্চার করতে লোকে ভালোবাসে। এ কাজ "ফিল্ম কোম্পানী" যতখানি পারে, ঔপন্যাসিক ততখানি পারে না! হলিউড থেকে যে সমস্ত ঐতিহাসিক চিত্র বেরিয়েছে, তার কদর দেখলেই আমরা বুঝতে পারি এরূপ চিত্রের চাহিদা কত এবং এ লোকের কত প্রিয়। "কুইন ক্রিশ্চিনা", "ক্যাথেরিণ দি গ্রেট", "স্কারলেট এম্প্রেস", "ডিসরেলী", "ভলটেয়ার", "আইরণ ডিউক", "ক্লিওপেট্রা", "ব্যারেটস্‌ অফ দি উইমপোল ষ্ট্রীট", "ভিভা ভিলা" প্রভৃতি কয়েকটী ফিল্মের কথা মনে করলেই বুঝতে পারি এদের দাম কত।

আমরা এখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শিল্প-নৈপুণ্যের বিষয় আলোচনা করবো না। গ্রেটা গার্বো কী অপূর্ব্ব অভিনয় করেছে "কুইন ক্রিশ্চিনা"-য়, তা দেখবে চিত্রামোদীরা। তাঁরা তুলনা ক'রে দেখবেন মার্লিন ডিয়েট্রিক এবং এলিজাবেথ বার্গনারের মধ্যে কে দ্বিতীয় ক্যাথেরিণের চরিত্র সুন্দরভাবে ফোটাতে পেরেছে, * কিংবা ক্লডেট্‌ কোলবার্ট "ক্লিওপেট্রা"র কী রূপ দিয়েছে, বা জর্জ আর্লিস কেমন ডিসরেলী, ভলটেয়ার, ডিউক অফ ওয়েলিংটনের চরিত্র ফুটিয়েছে, নর্ম্মা শিয়ারার কতখানি এলিজাবেথ ব্যারেট হ'তে পেরেছে, অথবা "পাঞ্চভিয়া"র চরিত্রে ওয়ালেশ বীরিকে "ভিভা ভিলা"তে কতখানি মানিয়েছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করবো না। আমরা ভাববো ফিল্ম প্রডিউসারগণ কেন এসব ফিল্ম তুলছেন এবং এত অর্থ ব্যয় করছেন কী জন্যে—দর্শকগণ কী চান এবং কতখানি তৃপ্তি পান।

শুধু সাধারণে নয়, শুনেছি বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকগণও "কুইন ক্রিষ্টিনার প্রথম দৃশ্যে রাজার মৃত্যু দৃশ্যে কোন ভুল বার করতে পারেন না। রাজা কোন্‌ সময়ে মারা গিয়েছিলেন, আকাশের অবস্থা তখন কেমন ছিল, তাঁর কী পোষাক পরা ছিল ইত্যাদি বিষয়ে দৃশ্যটি নাকী নিখুঁত হয়েছে এবং এজন্যে অনেক অর্থব্যয় করতে হয়েছে;—গুজব যে এজন্যে একাধিক ঐতিহাসিককে ডিরেক্টর নিযুক্ত করেছিলেন। এতখানি সাফল্য আর অর্থব্যয় আমরা সমস্ত ঐতিহাসিক চিত্রে আশা করতে পারি না বটে, কিন্তু যা আমাদের কল্পনার বস্তু তার রূপ দেয় যা তাকে প্রশংসা না ক'রে পারি কী করে? আট আনা এক টাকা খরচ করলে আমরা অন্য অক পৃথিবীতে উপস্থিত হ'তে পারি এবং সেখানে

* ১৩৪১ পূজা সংখ্যা "খেয়ালী"তে লেখকের এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ বের হয়েছিল।

কিছুকালের জন্যে হ'লেও আনন্দ পাই। "ক্লিওপেট্রা" চিত্র তুলতে কী বিপুল অর্থব্যয় হয়েছে—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ক্লিওপেট্রার "বার্জ" তৈরী করতে কী নৈপুণ্য দেখা যায়—তা তাঁরাই জানেন যারা "ছবি"খানি দেখেছেন। ইতিহাসে কী লেখে সকলে জানেন না। যারা সেক্সপীয়রের 'এন্টনী ও ক্লিওপেট্রা' পড়েছেন তাঁরা হয়ত যতখানি আশা করেন ঠিক ততখানি চিত্রে পাননি, কিন্তু সাধারণে কী ছবিখানি দেখে হতাশ হন? রোম ও ইজিপ্টের জীবন, রোমের সেনেট, রোম-সম্রাটদের বিজয় বাহিনীর পুরপ্রবেশ, ইজিপ্টের বিলাসিতা কী যথাসাধ্য ফোটানো হয়নি? বিংশ শতাব্দীতে ব'সে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে আমরা ফিরে যাচ্ছি—আমাদের মানস চক্ষে ফুটে উঠেছে অতীত। এর রূপকার যারা তাঁদের প্রশংসা করা কী অন্যায়?

আরলিসের মত বিজ্ঞ ও সুনিপুণ অভিনেতার কাছ হ'তে আমরা ইতিহাসের যে সব চরিত্র পাই—তা কী আমাদের আনন্দ না দিয়ে পারে? ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জীবন-চরিত প'ড়ে আমরা ভুলে যাই যে এঁরাও ছিলেন সুখে দুঃখে গড়া—স্নেহ-প্রেম-প্রীতিতে এঁদের হৃদয়ও টলতো। এঁরা অমানুষী শক্তি ধরলেও মানুষ ছিলেন। এই সব চরিত্রকে যখন পর্দ্দার ওপর আমরা দেখি তখন আমরা আনন্দই পাই—কেউ হয়ত প্রেরণাও পেতে পারেন।

জীবনী-ফিল্ম "ব্যারেট্স অফ দি উইমপোল ষ্ট্রীট"এ ফ্রেডেরিক মার্চের ব্রাউনিং। ব্রাউনিংএর দাড়িওয়ালা ফটো দেখে দেখে আমরা ভুলে যাই "ফ্রা লিপ্পো লিপ্পির' কবিকে—সেই এক্সেণ্ট্রিক খামখেয়ালী কবিকে। মার্চের চরিত্র অঙ্কন আমাদের চোখে একটু লাগলেও মনকে দেয় নাড়া। তার ওপর নর্ম্মা শিয়ারারের এলিজাবেথ ব্যারেট। শয্যাশায়িনী নারী প্রেমের পরশে ভুললো রোগ—কবি-অন্তঃকরণে অন্য কবির পরশ। ব্যারেট কী সত্যিই এত সুন্দরী ছিলেন!—যাই থাকুন নর্ম্মা আমাদের দেয় অতুল আনন্দ। চার্লসের নিখুঁত অভিনয় আমাদের চোখে কঠোর পিতার চরিত্র কী পরিস্ফুটভাবে ফুটিয়ে ধরে! ঐতিহাসিকও ক্ষুন্ন হবে না আশা করা যায়। সাহিত্যের ছাত্রেরা আনন্দ পাবেনই।

"ম্যাটাহারী," "রাসপুটীন" বা "ভিভা ভিলার" মধ্যে যতই উপন্যাস থাকুক না কেন—উপযুক্ত ডিরেক্টরের হাতে উপযুক্ত অভিনেতা অভিনেত্রীর সম্মিলনে ইতিহাস রূপ পেয়েছে অপূর্ব্ব। মানব-মন খুসী না হ'য়ে পারে না। আমাদের দেশে ফিল্ম প্রস্তুতকারীদের অনেক বাধা আছে জানি, তবু কী আমরা আশা করতে পারি না যে এমনই ভাবে ছবি তুলে দেশের ইতিহাস-পিপাসু চিত্তকে তাঁরা পরিতৃপ্ত করুন। আমরা সকলেই যখন নাক বুজে চোখ বন্ধ ক'রে পরকালের চিন্তায় কাটাচ্ছিনা—ছবিও যখন উঠছে, তখন এরকম খান কয়েক "ছবি" ভারত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে নিয়ে তৈরী করলে কী লোকসান হবে। ইতিহাসকে জীবন্ত করতে ফিল্ম কোম্পানী যত খানি পারে—এমন আর কেউ পারে না।

মধু উৎসব

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিষ্টার ভাস্বর বাড়ীতে আজ বিবাহ উৎসব।

বালীগঞ্জের একটি বিশিষ্ট কোয়ার্টাস তাই আজ সকাল থেকেই পরিপূর্ণ সুখ উৎসবে মেতে উঠেছে। লোকজন, আত্মীয় আত্মীয়ায়, বন্ধুবান্ধবে এরই মধ্যে বাড়ীখানিকে চাঞ্চল্য কোলাহলে ভরিয়ে তুলেছে। চারিদিকেই একটা বিরাট ব্যস্ততা—ভোরের শানাই ভৈরবীর তানে বিভোর। মিষ্টার ভাস্বর একটি মাত্র কন্যা সন্তান চিত্রার আজ বিবাহ; সুতরাং অনুষ্ঠান বড় সহজ নয়।

বিনীতা উঠি উঠি করেও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছিলো না। কাল সমস্ত দিনের গুরুতর খাটুনির পর অধিক রাত্রে শুয়ে এখন যেন ক্লান্তিটা অধিকতর ভাবে অনুভূত হচ্ছিল—শরীরটাও ভারী বোধ হয়।

নব বসন্ত প্রভাতের ঝিরঝিরে মিষ্টি দখিণা বাতাস—পরিশ্রম-ক্লান্ত দেহটির 'পর একটা তন্দ্রা আমেজের ভাব এনে দেয়। মিষ্টি করুণ শানাইয়ের মূর্চ্ছনা বিনীতার অন্তর দেশে ঘা দেয়—অবসাদ-ক্লিষ্ট চিত্তে তন্দ্রা-বিজড়িত চক্ষে তাই সে চুপ করে শুয়ে থাকে। ওদিক্‌কার হাঁক ডাকে যোগদান করবার মতো ক্ষমতা তখন তার নেই।

বামনদির চীৎকারে কিন্তু উঠতেই হোল!—

বলি ও রাজরাণী—ও নবাব নন্দিনী, আজ কি আর উঠতে হবে না—গতরে কি শুঁয়া পোকা লেগেছে? ওদিকে বেলা যে আটটা বাজতে চললো—সুয্যি যে মাঝ আকাশে এলো—আজ কি পাটরাণীর মতো গতর এলিয়ে শোবার দিন? বলি গায় হলুদের তত্ত্বতাবাস যে এসে পড়লো—উঠোন ভর্ত্তি মাছ—কে কমনে সরাবে সে দিকে কি হুঁস আছে?—না, যার যাবে তার যাবে? যার অন্ন গিলে মানুষ হচ্ছিস্ তার দিকে তো তাকাতে হয়!

বিনীতার তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়।

বামন দির তীক্ষ্ণ বাক্যবান্ তখনও বিনীতার অন্তরকে বিদ্ধ করে চলেছে।

বিনীতা অসহ্য ভাবে উত্তর দেয়—কেন বামন দি, মিছিমিছি বকছো? কত আর বেলা হয়েছে? তুমি তোমার কাজে যাও—আমার কাজ আমি ঠিক করবোখন! কই চিত্রা কি এখনও উঠেছে?

বিনীতার কথায় বামনদির কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠলো। বাম তর্জ্জনী আশ্চর্য্যভাবে চিবুককে স্পর্শ করলো—ওমা—কি হবে গো? বলি ও শতেক্‌খোয়ারী, আমার চিত্রার কাছে তুই! মুখে আগুণ! সে কপাল করলে কি আর রাক্ষুসী হয়ে জলজ্যান্ত বাপমাকে খেয়ে এখানে আসতিস?

সকাল বেলা বামনদির চীৎকারে সবাই এসে রঙ্গস্থলে হাজির হয়।

মিসেস্ ভাস্বু—সৌদামিনী এসে বিরক্ত ভাবে বল্লেন—সকাল বেলা বাড়ীটাকে তোমরা কি করে তুলেছো। পাঁচটা ভদ্রলোক আস্‌বেন—তোমাদের কাণ্ড কারখানা কি?

বামনদি সজল কণ্ঠে অভিযোগ জানালেন—না মা. আমি আর থাক্‌তে চাই না। আমি তোমাদের আপনার লোক নই—তা না হলে বিনী কি আর এমনি করে অপমানটা করতে পারে?

বামনদির কণ্ঠস্বর অভিমানে রুদ্ধ হয়ে আসে।

সৌদামিনী বল্লেন—সে কি কাকী—তুমি আমাদের লোক নও কে বল্লে—বিনী করেছে তোমাকে অপমান?—বিনীতা—

বিনীতাকে কোন কথাই বল্‌তে হয় না। বামনদি সবিস্তারে ঘটনাটি সৌদামিনীকে বুঝিয়ে দেন।—

তোমরা আমাকে চিরদিনই আপনার ভাবো—কাকী বলো, তাই তোমাদের ইষ্টি করতে যাই—তোমাদের কোন মন্দটা চোখের সামনে দেখতে পারিনে। মাছগুলো উঠোনে পড়ে আছে—কাঠফাটা রদ্দুরে এক্ষুনি শুকিয়ে যাবে—কে কমনে সরাবে তাই বল্‌তে

আসা। আর কাজের বাড়ী, আজ কি আর শুয়ে থাকলে চলে? অপরাধের মধ্যে মা বিনীকে এই কথাই বলেছি। আর কোথায় যাবি—খই ফোটার মত মুখে রা ফুটে উঠলো। যা না তাই বলে আমাকে অপমান করলে। বলে কিনা চিত্রা তো রয়েছে—তাকে বলো গে, সে কি এখন উঠেছে? আমার চিত্রার সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলা।

সৌদামিনী গম্ভীর হয়ে বিনীতাকে বল্লেন—বিনীতা, ভদ্রলোকের বাড়ী থাকতে হলে ভদ্রভাবেই থাকতে হয়—ভদ্রভাবেই কথাবার্ত্তা কইতে হয়। ছোটলোকের মতো কথাবার্ত্তা হলে ছোটলোকের ঘরেই যাওয়া উচিত—আমার বাড়ীতে ওসব চলবে না। তোমার সম্বন্ধে যেন ফের আমাকে ওরকম অভিযোগ আর কখনও শুনতে না হয়। বামন কাকী আমাদেরও গুরুজন স্মরণ থাকে যেন!

সৌদামিনী গম্ভীর পদক্ষেপে চলে গেলেন।

সৌদামিনীর কথাগুলি অতি সংক্ষেপ—বামনদির মতো জোরালো নয়; কিন্তু তবুও ওই সামান্য কয়েকটি কথাই বিনীতার অন্তরে অতি কঠিন ভাবে আঘাত করে।

চোখের কোণের উদ্গত অশ্রুরাশিকে কোন রকমে বামনদিদির সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে বিনীতা আস্তে আস্তে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো।

রুদ্ধ চোখের জল আর কোন বাধা না মেনে অবিশ্রান্ত ধারায় গড়িয়ে পড়ে।

সত্যিই তো চিত্রা আর সে?—বামনদির অপরাধ কি?—অপরাধ সমস্তই তার পোড়া অদৃষ্টের! দুনিয়ায় যার কেউ নেই, কাকা কাকীর অনুগ্রহ-অন্নে যে প্রতিপালিত তার আবার মান অপমান কিসের—তার আবার অভিমান অভিযোগ কার ওপর?

বিনীতা নিজেকে দৃঢ় করবার প্রতিজ্ঞা করে নিলে—শত দুঃখ কষ্টেও আজ সে বিচলিত হবে না; কিন্তু আজিকার উৎসবের কথা মনে করেই আবার সে বিচলিত হয়ে উঠলো।

আজ চিত্রার পরিণয় উৎসব—ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় বিনীতার কাছে আর কিছুই নেই।—চিত্রাকে সে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসে—চিত্রার মঙ্গল কামনা সে অন্তর দিয়েই প্রার্থনা করে; কিন্তু মনোজকে ভোলাও যে অসম্ভব।

দিনের পর দিন—কত বিচিত্র মধুর স্মৃতি, কত রঙিন সুখ স্বপ্ন, কল্পনার কত মোহন মোহ জাল—তার হৃদয়ের প্রতি মর্ম্মে আঁকা—তাকে বিস্মৃতির কোঠায় চির তরে বন্ধ করে রাখা যে বিনীতার পক্ষে অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব।

মনোজ রায়—কত সুদীর্ঘ দিনের বন্ধু মনোজ রায়—বিনীতার প্রাণপ্রিয় মনোজ রায় আজ চিত্রার স্বামী!—একেই বলে হয়ত অদৃষ্টলিপি—কিংবা ঘটনাচক্র!—

চিত্রার মতো বিনীতারও যখন ঐশ্বর্য্য, প্রতিপত্তি খ্যাতি ছিল—যখন বিনীতার

মাতাপিতা বর্ত্তমান ছিলেন তখন মনোজ রায় ছিল বিনীতার প্রেম-ভিক্ষু।

আজও সে কথাগুলি বিনীতার কাণে বাজে—মনোজের চাঁপা ফুলের কলির মতো আঙ্গুলগুলির পর হাত বোলাতে বোলাতে কতদিন বিনীতা বলেছে—মনোজ দা, তোমার এমন রূপ, তোমার পাশে আমায় কিন্তু মোটেই মানাবে না—ভারী "বিশ্রী" দেখাবে।

এ কথায় মনোজ তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলো—মনোজদা বললে কিন্তু সত্যিই ভারী বিশ্রী ঠেকবে—

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বিনীতা লজ্জিত হয়ে ওঠে, বলে—ধ্যেৎ, তুমি ভারী ইয়ে—একটুও যেন বুদ্ধি নেই।

বিনীতার চক্ষু দুটি আবার অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে—বিনীতা আর নিজেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাখতে পারে না।

আজ মনোজ সে সব স্মৃতি—অতীত দিনের সে সব কথা নির্ম্মমভাবে ভুলেছে। বিনীতার ছবি তার মনের পাতা থেকে একেবারে মুছে গেছে।

বিনীতার আজ মান প্রতিপত্তি কিছু নেই—বিশিষ্ট সমাজে চলাফেরা করবার মতো—কোন সম্বলই তার হাতে নেই—মাতাপিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সবই সে হারিয়েছে। সোসাইটি, পোজিশন এবং এটিকেট বজায় রাখতে পিতা কিছুই সঞ্চয় করে যেতে পারেন নি—যার জন্যে সোসাইটি তাকে আদর যত্ন করবে—এখন সে কাকা কাকীর গলগ্রহ—অনুগ্রহের পাত্রী।

চিত্রা ধনী পিতার একমাত্র আদুরে কন্যা।—বিশেষ সুন্দরী না হলেও অগাধ ধনসম্পত্তির অধিকারিণী—ড্রায়োশেসনে ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে; সুতরাং যে কোন ছেলের পক্ষে লোভনীয়। কিন্তু মনোজও কি সেই দলের ?—

মনোজেরও কিছুই অভাব নেই—নাম-করা বড় লোক না হলেও—সংসারে অস্বচ্ছলতা নেই। কোলকাতায় বাড়ী, মোটর সবই আছে। মনোজের পিতা মিষ্টার রায় সেক্রেটারিয়েটে উঁচু পোষ্টেই চাকরী করেন। মনোজও বেশ উচ্চ শিক্ষিত—ইউনিভারসিটির নাম করা ছাত্র। সুতরাং চিত্রার পিতার টাকা কড়ির'পর লোভ না করলেও আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না।

বিনীতার সম্পর্কেই চিত্রার সঙ্গে তার আলাপ। তারপরই এই বিবাহ। আধুনিক প্রেমরীতিই হয়ত এই! আন্তরিকতা কিছুই নেই—মনবিনিময় প্রয়োজন হলে শতাধিক বারও হতে পারে।

বিনীতার চোখের জল তখন ও শুকিয়ে যায় নি—বাথ্রুমের দরজায় নকিং হতেই সে তাড়াতাড়ি চোক মুছে দিলে। মুখ হাত পা ধুয়ে নিয়ে বাইরে আসতেই দেখে চিত্রা!

চিত্রা বিনীতাকে লক্ষ্য করে বললে—ভদ্রতা ভাই রাখতে পারলাম না। প্রায় আধঘণ্টাটাক্ ওয়েট্ করে শেষে দরজায় নক

করতেই হোল—দেখি, দেখি—ইস্ মুখখানা যে একেবারে লাল করে তুলেছিস্—ভারী সুন্দর কিন্তু দেখাচ্ছে—মাইরি যে কোন পুরুষ দেখ্‌লেই এক্ষুনি তোর লভে পড়ে যেতো। এখন থেকেই নিজেকে অত advertise করিস্ নে।

চিত্রার কথাগুলি নিছক ঠাট্টা হিসাবে হলেও অন্তরে তা তীক্ষ্ণ ভাবেই গিয়ে আঘাত করে।

বিনীতা পাল্টা জবাব দেয়—ভয় নেই চিত্রা, তোর মনোজ রায় তোরই থাকবে, তোর মুখের পাশে আমার মুখ, তার মনে কোন দাগই টানবে না।—

কথাটি বেশ সহজ ভাবে বলবার চেষ্টা করলেও বিনীতার কণ্ঠস্বর ভারী-হয়ে এলো।

বিনীতা ত্রস্তে মুখখানি ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে চলে গেল—যাই ভাই, উঠোনে মাছগুলি রয়েছে দেখি গে—

বাড়ীর মধ্যে এই একটি লোক চিত্রাই যা তাকে একটু প্রীতির চক্ষে দেখে। বিনীতাও চিত্রাকে আন্তরিক ভালোবাসে।

বিনীতা আর চিত্রা উভয়েই প্রায় সমবয়সী—দুজনে সখী ভাব। দিনরাত বামনদির অবিশ্রান্ত বাক্য যন্ত্রণা, কাকা কাকীর উপেক্ষিত ব্যবহারের মাঝেও চিত্রার সংস্পর্শে বিনীতা তবু খানিকটা সান্ত্বনা পায়।

বিনীতা এবং মনোজের সম্পর্ক চিত্রা কিছু কিছু জানে, কিন্তু ইদানিং তার আবির্ভাবে দুজনের মধ্যে একটা সুদৃঢ় ব্যবধানে তেমন কিছু উপলব্ধি করতে চিত্রা পারে নি এবং শত চেষ্টাতেও বিনীতার মনের কথা সে জানতে পারে নি।

মনোজকেও কথা প্রসঙ্গে চিত্রা জিজ্ঞেস করেছিলো—কিন্তু উপেক্ষিত হাসি এবং প্রতিবাদের পর চিত্রার মনে তেমন কোন সংশয় আর নেই। আর মনোজের চেহারার ভেতরও এমন একটা মাদকতা আছে যে তার প্রতি যে কোন মেয়েরই আকৃষ্ট হওয়া অতি স্বাভাবিক; সুতরাং চিত্রাও যখন তার সঙ্গে নিবিড় সংস্পর্শে এলো তখন সেও মনোজকে ভালোবেসে ফেল্‌লে অতি সহজেই। দিনের পর দিন মনোজের ছবি তার মনের পাতায় অতি দৃঢ়ভাবেই অঙ্কিত হয়ে গেলো।

চিত্রা এ বিবাহে খুবই খুশী। বিনীতার কথা ভাব্‌বার মতো অবসর তার নেই। কবে অতীত দিনে বিনীতা মনোজকে ভালোবেসেছিলো; কিংবা মনোজ-বিনীতার মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন গড়ে উঠেছিলো তা ভাববার মতো চিত্তবৃত্তি চিত্রার এখন নেই। সে হয়ত একটা মোহ—তরুণ বয়সের স্বাভাবিক কথা বিশেষ—তা' বলে মনোজকে চিত্রা ত্যাগ করতে পারে না। চিত্রা কেন, কোন মেয়ের পক্ষেই তা স্বাভাবিক নয়। আজিকার মিলন আনন্দের আধিক্যে বিনীতার এই এড়িয়ে চলা ভাব এবং মন ক্ষুণ্ণ চিত্রার মনে কোন সংশয়ের ছায়া আনলে না। তাই সে প্রসন্ন চিত্তেই বাথরুমে প্রবেশ করলে।

বিবাহ বাড়ীর কোলাহল বেড়েই চলেছে। চারিদিকে বিরাট ব্যস্ততা, লোকজনের যাতায়াত, ছুটাছুটি, হাক-ডাক-এর আর বিরাম নেই। প্রহরে প্রহরে শানাইয়ের বিচিত্র রাগিনী, অভ্যাগত নরনারীর বিচিত্র কলকণ্ঠ, মোটর, ট্যাক্সি, ফিটিং-এর অবিরাম গমনাগমন বিবাহ বাড়ীর উৎসবকে মুখরিত করে তুল্‌ছে।

হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিষ্টার ভাদুর—একমাত্র কন্যা চিত্রার আজ শুভ পরিণয়-উৎসব!

সহরের নামজাদা সমস্ত লোক আজ তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রিত—আয়োজন বড় সহজ এবং সামান্য নয়।

ক্যাটারের দল সকাল থেকে এসেই হাজির—এত বড় একটা অনুষ্ঠান—সামান্য লোকের কাজ নয়। বড় বড় ডেকরেটার সকাল থেকেই বাড়ীখানিকে সুদৃশ্য করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগে গেছে—মিষ্টার ভাদুর সুবৃহৎ লজ্‌টি চেয়ারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে—মস্ত প্যাণ্ডেল খাটানো—নানা জাতীয় পুষ্প সম্ভারে সুশোভিত। ওদিকে এ্যামপ্লিফায়ার ফিট করা—ইলেকট্রিকের নানা বিভিন্ন রং-এর বালব প্রতি বৃক্ষের শাখে শাখে, লতায়, পাতায় গৃহের প্রতি অঙ্গে ঘন বেষ্টিত। ব্যস্ততার আর সীমা নেই—সেই ব্যস্ততার মাঝে বিনীতাও নিজেকে ডুবিয়ে দিলে। কোন দুঃখ—কোন বেদনাই তার নেই। নবদম্পতির সে মঙ্গল কামনা করে—মনোজ চিত্রা সুখী হোক!

সন্ধ্যার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই পুরবীর সুর বেজে উঠ্‌লো। মিষ্টার ভাদুর উজ্জ্বলালোকিত গৃহখানি আনন্দের পসরা নিয়ে যেন হাসতে থাকে। ব্যস্ততার আর সীমা নেই। গোধূলি লগ্নে বিবাহ!

বসন্তের দক্ষিণ সমীরণে, শানাইয়ের মধুর তানে, ব্যস্ততার আধিক্যে, অভ্যাগত নরনারীর মার্জ্জিত বিশিষ্ট কলগুঞ্জরণে, মোটরের সংখ্যায় বালীগঞ্জের একটি বিশিষ্ট

কোয়ার্টার মেতে উঠেছে। পুষ্প সম্ভারে সুসজ্জিত সুবৃহৎ মিনার্ভার শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই কলকোলাহল বেড়ে গেল। শঙ্খের এবং হুলুধ্বনিতে, সুবেশা আভিজাত্য গৌরবে গৌরবান্বিতা তরুণী মণ্ডলীর হিল তোলা জুতার মাপ করা খটাখট্ শব্দে, বরযাত্রীর হাস্যধ্বনিতে, কনে কর্ত্তাদের হাঁক ডাকে বরের শুভাগমন বার্ত্তা রটে গেল।

বিনীতার কাজের আর সীমা নেই! ভাঁড়ারের কর্ত্রী সে। কার কি প্রয়োজন—কোন জিনিষটা কোথায় এলো—কে কোথায় খাবে—সমস্ত তার তালিকাভুক্ত। বামনদি মাঝে মাঝে এসে উপদেশ দিয়ে যান—দুচারটে ভৎর্সনা শুনিয়ে দেন—বিনীতার কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আর অবকাশ নেই।

মনোজ—তারই প্রাণপ্রিয় মনোজ রায়ের সঙ্গে আজ চিত্রার বিবাহ—বিবাহ-উৎসব সুসম্পন্ন করবার দায়িত্ব আজ সব চেয়ে তারই বেশী। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ছোটখাটো কাজের ভেতর সে আজ নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। অন্য কোন দিকে তার দৃষ্টি নেই—শুধু কাজ!

বর এসেছে—বাড়ীময় হুলুস্থুলু রব—দর্শনাভিলাষীদের দলে দলে গমনাগমন—বিনীতা জান্‌লে—বর এসেছে!—

বিনীতা আস্তে আস্তে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখ্‌লে—চন্দন-চর্চ্চিত ললাটে—গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, পরণে গরদের জোড়—চোখে রিমলেশ চশমা—প্রশান্ত হাস্য রেখায় সমুজ্জ্বল মুখশ্রী—কোঁকড়ান হ্যাকব্রাশ্‌ চুলগুলি—সুন্দর সুপুরুষ বর—চমৎকার মানিয়েছে আজ মনোজকে—মিষ্টার ভাস্কর একমাত্র কন্যা সন্তান—ধনীর আদরিণী দুহিতা চিত্রার উপযুক্ত স্বামীই হয়েছে।

অলক্ষ্যে বিনীতার চোখের কোণে অশ্রুরেখা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

ওপরে বামনদির ডাকে সজাগ হয়ে বিনীতা ত্রস্তে চোখের জল মুছে চলে যায়।—

বামনদির বাক্যবান্‌গুলি নীরবে হজম করে সে সন্দেশের রেকাবী সাজাতে থাকে।

খাওয়া দাওয়ার পালা শশব্যস্তে চলতে থাকে। পরিবেশনকারী ছেলের দলের কর্ম্মতৎপরতার আর বিরাম নেই—উৎসাহের প্রাবল্যে ছুটাছুটির আধিক্যে চীৎকারের ব্যস্ততায় তরুণ সম্প্রদায় মেতে উঠেছে। মেয়েদের দিকে পরিবেশন করার প্রলোভনই তাদের বেশী। বিনীতাকে স্তুতিগান ইতি-মধ্যে অনেকেই শুনিয়ে গেছে—তার মতন কাজের লোক নাকি নেই—এমনি একজন কর্ম্মী পেলেই পৃথিবীতে এমন কোন অসাধ্য কাজ নেই যা সম্পাদন করা যায়। সকলেই নিজেদের গুণমুগ্ধ অন্তরের প্রেমগান শোনায়। বিনীতা কিন্তু নির্ব্বিকার। বিনীতা উপলব্ধি করে—সকলেই মনোজ শ্রেণীর!

বিবাহ উৎসব শেষ হয়ে গেছে।—

খাওয়া দাওয়ার পালা সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। আত্মীয় আত্মীয়ার সংখ্যাই এখন অবশিষ্ট।

বাসর ঘর থেকে মাঝে মাঝে হাসির তরঙ্গ ভেসে আস্‌ছে। বিনীতার বান্ধবী দলের ঠাট্টা—সুমিষ্ট কণ্ঠের সঙ্গীতালাপ তখনকার উৎসবকে সজীব করে রেখেছে।—

বিনীতার কাজ শেষ হয়ে গেছে।—বাসর ঘরে সে যায় নি। এতক্ষণ সে নিজেকে কর্ম্মস্রোতে ডুবিয়ে রেখেছিলো—এবার তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল।—

চিত্রার পাশে মনোজ—তার বিস্মৃত দিনের বন্ধু মনোজ—তার প্রেমিক মনোজ!—

বিনীতা ছাদের ওপর উঠে এলো। ছাদের একপাশে খানিকটা খোলা জায়গা—সেখানে এসে সে চুপ করে বসে পড়লো।—

মাথার ওপরে সীমাহীন বাসন্তী আকাশ—অসংখ্য নক্ষত্রমালায় বিভূষিত। স্নিগ্ধ চাঁদের খানিকটা নির্ম্মল আলো তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছে।—

বিনীতার মন চলে যায় দূরে—অতীত দিনের সুখস্মৃতি মাঝে।—

এমনি কত চন্দ্রালোকিত রজনীতে সে আর মনোজ প্রেমবিভোর চিত্তে কত সুখ কল্পনা সৃষ্টি করেছিলো—এই নক্ষত্র খচিত

'খেয়ালী'র বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির এজেন্সি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্ন্যাল "খেয়ালীর" বিরুদ্ধে আলিপুর পুলিশ কোর্টের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল-কে-সেনের আদালতে যে মামলা রুজু করিয়াছেন নিম্নে তৎসম্পর্কে অভিযোগের বিবরণ প্রদত্ত হইল—

নলিনাক্ষ সন্ন্যাল— ফরিয়াদী

বনাম

১। এস আর মুখার্জ্জী
২। এস-কে সরকার } আসামী
৩। যোগজীবন ব্যানার্জ্জি

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৫০০ ও ৫০১ (মানহানি) ধারা।

হুজুরে আবেদনকারীর নিবেদন এই,

১। আবেদনকারী লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পি এইচ ডি ও হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিমিটেডের এজেন্সি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট।

২। বাঙ্গলা সাপ্তাহিক "খেয়ালী" কিছুকাল যাবৎ স্যার বি-পি-সিংহ রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও আবেদনকারীর নামে মানহানিকর কথা প্রকাশ করিতেছে। কথাগুলি নিম্নলিখিত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে—

(ক) ৩০শে ফাল্গুন সংখ্যা, ৬ পৃষ্ঠায় "মাণিক জোড়কে চিনিয়া রাখুন" শীর্ষক প্রবন্ধ।

(খ) ৭ই চৈত্র সংখ্যা, ১৬ পৃষ্ঠা "বামার দালাল" শীর্ষক প্রবন্ধ।

(গ) ১২ই বৈশাখ সংখ্যা, ২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠা "বিবিধ" প্রবন্ধ।

(ঘ) ১৯শে বৈশাখ সংখ্যা, ৩৩ ও ৩৪ পৃষ্ঠা "বিবিধ" প্রবন্ধ।

৩। ৩০শে ফাল্গুন সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে প্রমথনাথ সরকার নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে আবেদনকারী ও উক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় গভীর রাত্রিতে বাহির হইয়া শ্রীযুক্ত জে-সি গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নিকট গমন করে এবং সংবাদ যাহাতে প্রকাশিত না হয় তজ্জন্য অবৈধ উপায় অবলম্বন করে।

৪। ৭ই চৈত্রের সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে, আবেদনকারী ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বীমার দালালী না করিয়া বামার দালালী করিতেছে।

৫। ১২ই বৈশাখের সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে, নলিনী সরকার ও স্যর বিজয়প্রসাদের বন্ধুত্ব বাগবাজারে কমলার (জনৈক বারবিলাসিনী) উদ্যানে জন্মিয়াছে এবং আবেদনকারী তাহাদের মধ্যস্থ।

৬। ১৯শে বৈশাখের সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে আবেদনকারী স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহরায়ের নিকট দালালরূপে গমন করে। এই প্রবন্ধে আবেদনকারীকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বিষবৃক্ষের হীরামালিনীরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে।

৭। আসামী এস-আর-মুখার্জ্জি ৩০শে ফাল্গুন সংখ্যার সম্পাদক, আসামী এস-কে সরকার ৩১শে ফাল্গুন ও ৭ই চৈত্র সংখ্যার মুদ্রাকর ও প্রকাশক এবং আসামী যোগজীবন ব্যানার্জ্জি ১২ই বৈশাখ ও ১৯শে বৈশাখ সংখ্যার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক।

৮। আবেদনকারী বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছে যে, অক্ষয় কুমার সরকার কার্য্যতঃ উক্ত পত্রিকার ম্যানেজার এবং উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত।

৯। অভিযোগগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা এবং আবেদনকারীকে লোক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

১০। উক্ত আসামীগণ দণ্ডবিধি আইনের ৫০১ ধারায় (প্রকাশের অপরাধ) দণ্ডনীয় এবং অক্ষয়কুমার সরকার ও হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ দণ্ডবিধির ৫০০ ধারা (মানহানি) অনুযায়ী দোষী বলিয়া সন্দেহ হয়।

১১। উক্ত লেখাগুলির পাণ্ডুলিপি ৮১৮ বি হাজরা রোড ভ্যারাইটিজ প্রেসে এবং ৯নং রামময় রোডে পাওয়া যাইতে পারে।

১২। মূল পাণ্ডুলিপি মামলার সর্ব্বাপেক্ষা ভাল প্রমাণ হইবে এবং উক্ত মানহানিকর প্রবন্ধগুলি কে লিখিয়াছে তাহা প্রমাণের জন্য এসম্বন্ধে তদন্ত আবশ্যক।

'খেয়ালীর' মামলা

হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর কর্ম্মচারী ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল 'খেয়ালী'র সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে যে মানহানির মামলা আনিয়াছেন, 'খেয়ালী'র পক্ষে তাহার পরিচালনার ভার কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নি শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়ের উপর অর্পিত হইয়াছে।

আকাশকে সাক্ষী করেই তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল পরস্পর পরস্পরকে ছাড়া অপর কাউকে আর জীবন সঙ্গী করবেনা—সেদিনকার প্রকৃতিও ঠিক আজকের মতোই ছিল—কিন্তু তবে আজ কেন মনোজের মনের এ পরিবর্ত্তন!—প্রকৃতির তো কোন পরিবর্ত্তনই হয় নি!—

বিনীতার চোখের কোণ বেয়ে অবিরাম ধারায় অশ্রুজল বেরিয়ে আসে—এই কি প্রেমিক চিত্ত!—

——:o:——

১৩। আসামীদের হাতে এই আবেদন পড়িলে পাণ্ডুলিপি তাহারা নষ্ট করিতে অথবা লুকাইয়া রাখিতে পারে অতএব খানাতল্লাসী পরোয়ানা জারী করিয়া সেগুলি ধরা হউক।

দ্বিতীয় আবেদন

ফরিয়াদী উল্লিখিত আসামীদের বিরুদ্ধে আর একখানি আবেদনে বলিয়াছেন—

উপরোক্ত সংখ্যায় আসামীগণ আমার মানহানি করিয়াছে। যে যে সংখ্যার খেয়ালীতে উক্ত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমি সঙ্গে আনিয়াছি। ৩০শে ফাল্গুনের সংখ্যায় "মাণিক জোড়কে চিনিয়া রাখুন" প্রবন্ধে আমার মানহানি করা হইয়াছে। মাণিক জোড় বলিয়া আমাকে ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে (কবি ও ব্যবসায়ী) বুঝাইয়াছে। আমরা উভয়েই হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কর্ম্মচারী। আমি এজেন্সি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও সাবিত্রী বাবু পাবলিসিটি অফিসার।

১২ই বৈশাখের সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে আমাকে ও সাবিত্রী বাবুকে বামার দালাল করিয়া অপমান করা হইয়াছে।

উক্ত সংখ্যারই 'বিবিধ প্রসঙ্গে' নলিনী-বিজয়' শীর্ষক নিবন্ধে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, আমি নলিনী বিজয়ের জন্য কমলা নাম্নী রমণীকে সংগ্রহ করি। সেখানে আমাকে "হীরা-মালিনী" বলা হইয়াছে।

উক্ত প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও হিংসা-প্রসূত এবং মানহানিকর। ইহা সমাজে আমাকে হেয় করিয়াছে।

আমি কালিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের আমি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী।

বহু বৎসর আমি ভারতীয় বণিক-সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির সদস্য ছিলাম।

বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের আমি একজন অভিজ্ঞ সদস্য।

আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন লেকচারার ও পরীক্ষক।

হল্যাণ্ডে বিশ্ব যুব কংগ্রেসে আমি ভারতের প্রতিনিধি ছিলাম। কলিকাতার নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত আমি সংশ্লিষ্ট।

আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকার কার্য্যতঃ খেয়ালীর ম্যানেজার। আমি আরও জানিতে পারিয়াছি যে, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ উক্ত মানহানিকর প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন?

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদের বিরুদ্ধে সমন জারী করিয়াছেন এবং খেয়ালী অফিসে খানাতল্লাসের জন্য যে আবেদন করা হইয়াছিল তাহা মঞ্জুর করিয়া তথায় খানাতল্লাসের হুকুম দিয়াছেন।

কাল-বৈশাখী আসে

কথা—শ্রীশান্তিপ্রকাশ মিত্র

সুর—শ্রীসুনীল কুমার দাশগুপ্ত

আসে ঘোর উল্লাসে—কাল-বৈশাখী আসে;
স্বনিল পিনাক, বাজিল বিষাণ উদ্দাম উচ্ছ্বাসে।
এ-যে প্রলয়-লীলার ছন্দে,
নাচে ভীম ভৈরব আনন্দে;
মাতিল রুদ্র, বাজিছে বজ্র, দামিনী দাপটে হাসে।
ভাঙ্গিছে শৃঙ্গ, ভাঙ্গে অরণ্য,
তাণ্ডবে নাশিত জল-স্থল-শূন্য।
গর্জ্জে সিন্ধু প্রমত্ত হরষে,
ধরণী ভীতা কম্পিতা ত্রাসে;
সম্বর প্রকোপ, ধরহ আলোক, সম্বর লীলা সর্ব্বনেশে।

———

খেয়ালী অফিসে খানাতল্লাস

শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্যাল খেয়ালীর বিরুদ্ধে যে মানহানির মামলা উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে খেয়ালীর অফিসে খানাতল্লাসী পরোয়ানা জারী করিবার আবেদন অনুসারে গত শুক্রবার দুপুর বেলা পুলিশ পি-১৮ বি হাজরা রোডস্থ ভ্যারাইটিজ প্রেসে ও ৯ নং রামময় রোডে খেয়ালী অফিসে খানাতল্লাস করে। ভ্যারাইটিজ প্রেস হইতে পুলিশ কয়েক কপি খেয়ালী ও এক বাণ্ডেল প্রুফ লইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ভ্যারাইটিজ প্রেসে খানাতল্লাসীর সময় সনাক্ত করিয়াছিলেন।

খেয়ালী অফিসে খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কয়েক কপি খেয়ালী এবং সেই সঙ্গে কোম্পানীর ক্যাস বহি লইয়া গিয়াছে।

———

ওপারের ছায়া

বজ্রবাহন বটব্যাল

ওয়াথেল ফিরেছে

সেই অনেক দিন আগে। সে কি আর আজকের কথা। তখন আমরা ওয়াথেলকে প্রথম দেখি। তখন ওয়াথেল নেমেছিল 'দি বার্থ অব নেশান'এ ছোট কর্ণেল হয়ে। সেই ওয়াথেল ফিরেছে—আবার পর্দ্দার বুকে দেখা দেবে। লোকে তাকে দেখতে এখন ভীষণভাবে চাইছে। তাই ওয়াথেল আবার দেখা দেবে উইল রোজার্সকে নিয়ে। বই খানার নাম হচ্ছে 'জাজ্ প্রিষ্ট'।

ডাইট্রিক সঙ্গে ভনের ছাড়াছড়ি

ছবির নাম অনবরত বদল করা পরিচালকদের একটা চাল কিনা কে জানে। এতে প্রচার কার্য্যের সহায়তা করে কিনা ছবির কর্ত্তারাই জানেন। তাই কি 'কার্ণিভ্যাল ইন স্পেন' ছবির নাম বদল করে 'দি ডেভিল ওম্যান' রাখা হোল—তা তারাই জানেন। বদল হয় হোক। আমাদের কথা হোল ডাইট্রিকে আর ষ্টার্ণবার্গ-এ ত ছাড়াছড়ি হতে চ'লল। কেউ কেউ বলছে মার্লিন নাকি এইবার রং আর তুলির সরঞ্জাম নিয়ে মেট্রোর ঘরে আস্তানা গাড়বেন। তা হলে কী মজাই হবে। কী চমৎকার তারপরেই না ঘটবে? মার্লিন আর গার্ব্বোর দুজনের ভাগ্য এক কর্ত্তার হাতে গিয়ে পড়বে। কে হারে আর কে জেতে বলা কঠিন। জগতের দুটী প্রদীপ্ত তারকা একেবারে পাশাপাশি। কে জানে কার জ্যোতিঃ ম্লান হবে।

মার্লিন নাকি ভাবছেন এমনই অনেকের বিশ্বাস, যে নতুন জায়গায় আস্তানা গাড়ার চেয়ে জানা জায়গায় থেকে ভাগ্যটা তাঁদের হাতে ছেড়ে দেওয়া ভাল। তবে শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা বলা শক্ত।

বোধ হয় কেন; খুব সম্ভব মার্লিনকে প্যারামাউন্টই টেনে নেবেন। এবং দুনিয়ার লোকের মনে রঙমহল আলো করতে এক-লক্ষ পাউণ্ডের ওপর দেবেন। এতে চমকাবার কিছু নেই কিন্তু।

রহস্যময়ী গার্ব্বো

লোক মুখে শোনা যাচ্ছে গার্ব্বো নাকি ছায়া ছবি থেকে বিদায় নেবে। কথাটা নতুন নয়। এই কথাটা, এই ন্যাকামিটা আমরা এতবার শুনেছি যে তা আর শোনা যায় না। আকাশের তারার মত, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত, মরাইয়ের ধানের মত। সেই অনেকবারের মত এবারেও ছায়া সম্রাজ্ঞী এই 'আনা কারনিনা' শেষ করেই সুইডেনে তাঁর দুর্গের মধ্যে গুপ্ত এবং সেখানেই গুপ্ত হবেন। এও আর এক রকম প্রচারকার্য্য কিনা তাও আমরা জানি না।

যাক্ ও কথা। গার্ব্বো নাচবে। আবার নাচবে সে। লোককে নাচাবে, হাসাবে; মুখে মুখে তাদের সেই আনন্দের উৎস খুলে দেবে। পরিচালক ক্লারেন্স ব্রাউন মারগু-রাইট ওয়ালম্যানকে ঠিক করেছেন এই নাচ নাচাবার জন্যে---পরিচালনা করবার জন্যে। এই নাচ নাকি অদ্ভুত হবে। অদ্ভুত---অদ্ভুত, গার্ব্বোর সবই অদ্ভুত। চলা, বলা, হাঁটা, হাসা, কাঁদা, দেখা আর নাচ তাও অদ্ভুত হবে না। গার্ব্বো যে। তাকে নাচ শেখাচ্ছে যে, তিনি যা তা লোক নয়। তাঁর মাথা থেকে অনেক বড় নাচের আইডিয়া বেরিয়েছে। ইউরোপ জুড়ে তাঁর নাম। সম্প্রতি এই নাচের দৃশ্য গুলি মেট্রোর ষ্টুডিওয়োয় তোলা হচ্ছে। এই মেয়েটির মাথা থেকে তাল, তান, লয়, সংরক্ষণে এবং সংমিশ্রণে যে ছবি বেরিয়েছে তা ষ্টুডিওর

লোকদের চমকে দিয়েছে। গার্ন্সোর সবই অদ্ভুত। যারা জোটে তারাও।

জেনেট কি ছাড়বে নাকি!

যেমন সর্বাক্ষের বেলা গুজব রটে তেমনি জেনেটকে নিয়েও গুজব রটেছে যে সে নাকি পর্দা থেকে বিদায় নেবে। সত্য মিথ্যা গুজব সবাইই জানেন। ওটা বলা ওদের ও একটা ফ্যাশান। যাই হোক জেনেট বলেছেন পাকা ছটা বছর পরে তিনি ছায়াছবি থেকে একেবারে বিদায় নেবেনই—সত্যি। সত্যি একেবারে সত্যি। চন্দ্র সূর্য্যের মত, সুখ দুঃখের মত।

কে ফ্রান্সিসের পছন্দ

মরিস সিভালিয়ে আর কে ফ্রান্সিসকে নিয়ে কাগজ ওয়ালার হৈ চৈ লাগিয়েছিল। কে ফ্রান্সিস্ জানিয়েছেন এই প্রেমের ব্যাপারটা একেবারে মিথ্যে। তার পছন্দ মত আটজন লোকের নাম দিলাম। পর পর শুনুন :

১। গ্রেটা গার্বো
২। জন ব্লনডেল
৩। জেমস কগনে
৪। ফ্রেড অ্যাষ্টার
৫। ডব্লিউ, এস, ভ্যানডাইক
৬। ফ্রান্সেস্ গোল্ড্উইন
৭। পার্ক ওয়েষ্ট মোর
৮। অ্যানা মে ওয়াঙ্।

খুচরো খবর

মে অলিভারের সঙ্গে মেট্রোর খুব বড় রকমের চুক্তি হয়েছে।

* * *

জিন হারলোর পরের ছবি "গর্জ্জাস হসি"।

* * *

মে ওয়েষ্টের ষ্টাণ্ড ইন হচ্ছেন লিলিয়ান কিল্লি গাল্লান।

সনেট

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সহসা নিশীথ রাতে দেখিলাম ঘুম ভেঙে উঠি,
আকাশ-শিথান বেপে রাশি রাশি তারা-ফুল শোভে,
রজনী ঘুমায়ে আছে কুণ্ঠাহীন শ্লথ আরামেতে,
লঘু মেঘ নীলাঞ্চল অতর্কিতে কোথা গেছে টুটি!
নিটোল বুকের 'পরে ওঠে-পড়ে শুভ্র স্তন দুটি,
দুটি দীপ্ত নীল তারা—আলু থালু ন্যস্ত অলকেতে,
মূর্চ্ছিত চাঁদের ছায়া, অধরের মদিরায় মেতে,
লম্পট রাতের বায় ঘোরে-ফেরে চুমা নিতে লুটি!
ফিরে এনু গৃহকোণে—রুদ্ধদ্বার, রুদ্ধ বাতায়ন,
চোখে ঘুম নাহি আসে, জাগে দাহ শিরায় শিরায়;
মনে হ'ল একদিন ওরে যেন দেখেছি কোথায়;
কোন দীপ-আলোকিত উৎসবের ক্ষণিক দর্শন
চমকে বুকের তলে—অবচ্ছা স্মৃতির বেদনায়
চোখ ছেপে জল আসে: শুয়ে শুয়ে কাঁদি অকারণ!
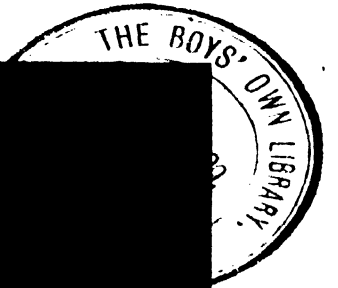
রাজপুতানার রাজকুমারী

এবার জ্যোৎস্না আর 'উমা' কিম্বা 'চপলা' নয়, একেবারে মুকুট মাথায় রাজকুমারী। আবার রাজকুমারী সেই দেশের যে দেশের মেয়েরা কুসুম-কোমল, অথচ কঠোর বজ্রের মত। রাজপুতানার এই তরুণী রাণীকে আমরা অদূর ভবিষ্যতেই দেখতে পাবো ইষ্ট ইণ্ডিয়ার "বিদ্রোহী"তে।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২—16th May, 1935. { ১০শ সংখ্যা

নিখিল ভারত রাজবন্দী দিবস

যে কোনো স্বাধীন জাতির তুলনায় পরাধীন জাতির জীবন সব দিক দিয়াই সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশের স্যার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনস্বিগণের কথা উল্লেখ করিয়া অনেক বিখ্যাত বিদেশীরাও বলিয়াছেন যে, যে-কোনো স্বাধীন দেশে জন্মাইলে ইঁহারা সেই দেশের ভাগ্য-বিধাতা হইতে পারিতেন। এই সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ জীবনে চলিবার পথে পদে পদে বাধা। তদুপরি যাহাদের জীবন হইতে এই সীমাবদ্ধ নামমাত্র স্বাধীনতাও লোপ পাইয়াছে, যাহারা বিনা বিচারে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে বন্দী অবস্থায় দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত করিতেছে, তাহাদের অবস্থা সত্যই মর্ম্মন্তুদ। বিনা বিচারে ইঁহাদের আটক রাখার যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা লইয়া সরকার ও বে-সরকারী পক্ষ হইতে এতবার এত আলোচনা ও উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়া গিয়াছে যে, আজ আর তাহার পুনরুক্তি করিয়া লাভ নাই। তবে আজ যদি অনিশ্চিত ও অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া যে-সকল অসহায় যুবক বন্দীশালায় দিন গুণিতেছে, তাহাদের ব্যর্থ ও ভগ্ন জীবনের কথা ভাবিয়া কাহারও বুক ব্যথায় গুমরিয়া ও চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহা কি বিশেষ অপরাধ হইবে?

আজ আরও বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে যে-সকল গৃহ অন্ধকার করিয়া ইহারা চলিয়া গিয়াছে, সেই সকল গৃহ ও গৃহবাসীর কথা। ইহাদের অভাবে আজ কত গৃহ শূন্য, কত পরিবার অসহায়, কত জননী নয়নমণি হারাইয়া পথের কাঙ্গাল। সমস্ত রাজনীতির ঊর্দ্ধে যে মানবনীতি আছে সেই মনুষ্যত্বের দিক হইতে এই সকল অসহায় পরিবারকে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য আমরা ১৯এ মে তারিখের নিখিল ভারত রাজবন্দী দিবসের সাহায্যের আবেদনকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং আশা করি প্রত্যেক দেশবাসী যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

বিবিধ

বাগবাজারের "মৌনী বাবা"

শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি—বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স সম্বন্ধে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আমাদের বাগবাজারের বৈষ্ণব সহযোগী "বোবার শত্রু নাই"—জানিয়া একেবারে speak not হইয়াছেন। চেম্বার নলিনী-শাসিত এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকার' নলিনী-প্রীতিশতদল যে শতদলে শতবার ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কে না জানে? বাঙ্গলার ছোটলাট যখন 'পত্রিকার' প্রাণ শিশিরকুমারকে পুরাতন বন্ধু হিসাবে একবার সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন, তখন শিশিরকুমার উত্তর দিয়াছিলেন—আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় বা প্রবৃত্তি আমার নাই। সেই একদিন। আর এখন 'পত্রিকার' সম্পাদক কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের বার্ত্তা বহন করিয়া নলিনীর গৃহে ৺স্বরাজ্যদলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিতে গিয়াছিলেন। বাঙ্গলা সরকারের মন্ত্রী যে মৌলবী ফজলুল হকের মেয়র নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া নলিনীকেই বিজয়ের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে 'পত্রিকাতেই' প্রকাশিত হইয়াছিল। নলিনীর মেয়র নির্ব্বাচনে যেমন, ব্যভিচারের মামলায় নলিনী অব্যাহতিলাভ করিলে অর্থাৎ যে প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহাতে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যায় না—ম্যাজিষ্ট্রেট এই মত প্রকাশ করিলেও — তেমনই 'ষ্টেটসম্যানের' মত 'পত্রিকা' নলিনীকে অভিনন্দিত করিয়াছে। কেন যে 'পত্রিকা' মামলার পুরা রায় প্রকাশ করিয়াছে, তাহাও আমরা জানি।

এ হেন নলিনী চেম্বারের সভাপতি হইয়া দুইবারের অধিক সভাপতি হইবে না প্রতিশ্রুতি দিয়া সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া—যে সব কাজ করিতেছে, তাহা কি 'পত্রিকা' নিন্দা করিতে পারে? অসম্ভব।

'পত্রিকা' হিন্দুস্থান সমবায় বীমামণ্ডলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথঠাকুর প্রভৃতির আবেদন বিজ্ঞাপন মূল্যে ছাপাইয়াই নিরত হইতে পারেন নাই—সে সম্বন্ধে আবেগোচ্ছ্বসিত প্যারাও লিখিয়াছিলেন। নলিনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে—একথা কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ লাহা লিখিলেও 'পত্রিকা' এক ঔষধবিক্রেতার দোকানের কর্ম্মচারীর কৈফিয়ৎ ছাপিতে স্থানাভাব অনুভব করেন নাই। কৈফিয়ৎও চমৎকার—নলিনী স্বয়ং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নাই, পত্র লেখকের মত তাহার স্তাবকরা বন্দোবস্ত করিয়া বিশেষ কারণে তাহাকেই বারবার চেম্বারের সভাপতি করিয়াছে। অথচ তাহার উত্তর একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী দিলেও তাহা প্রকাশের স্থান হয় নাই! কেবল কি তাহাই? তিনি স্থানের জন্য মূল্য দিতে চাহিলেও স্থান পাওয়া যায় নাই! এই অবস্থায় 'পত্রিকা' যদি মনে করে—

"বকো আর ঝকো, কাণে দিয়েছি তুলো।
মার আর ধর, পীঠে বেঁধেছি কুলো॥"

তাহাতে কি বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে? শিশিরকুমার ছোটলাটের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিয়া আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন; আর এখন 'পত্রিকা'-সম্পাদক বিজয় "দাদা" মিনিষ্টার বলিয়া তাঁহার দরবারে হাজিরা দেন—return visit এর কথা মনেও করেন না। সুতরাং—সে দিন আর নাই। এখন যে স্থানেই গোল—সেই স্থানেই দুর্নীতি ভাল।

কুল? রাধা ত বলিয়াছিলেন:—

এ কুলে ও কুলে গোকুলে দুকুলে
আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া স্মরণ লইনু
ও দুটি কমল-পায়।"

'পত্রিকা' নলিনীকে কি তাহাই বলে নাই? নহিলে দেশপূজ্য আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে যে পত্রে নলিনী অর্দ্ধসত্যবাদী বলিয়াছিল, 'পত্রিকা কি তাহা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় ছাপাইয়া কলঙ্কের পশরা মাথায় তুলিয়া লইত? রায় মহাশয় হিন্দুস্থান সম্বন্ধে নিবেদনে স্বাক্ষর দিয়া noble revenge লইয়াছেন; কিন্তু 'পত্রিকা'? নলিনী বলিয়াছিল—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র অর্দ্ধসত্য বলিয়াছিলেন। আর কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট নলিনীর সম্বন্ধে রায়ে বলিয়াছেন—বীণার দিল্লীযাত্রা সম্বন্ধে বীণার ও ডাক্তার শিশির মিত্রের মত নলিনীও সত্য কথা বলে নাই। ইহাকে কি প্রকৃতির প্রতিশোধ বলা যায় না?

চেম্বার সম্বন্ধে 'পত্রিকা' যে ব্যবহার করিতেছেন, তাহাকে কি journalistic fairness বলা যাইতে পারে?

রাধার ছিল দুই কূল—'পত্রিকার' কিন্তু লালদীঘীর মত চারি কূল। তাহার এককূলের কাণ্ডারী বিজয়-চারু-সহায় নলিনী। আর এককূলে যদি লাট দপ্তরের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তবে তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু আর দুই কূল?

লোকমতের বিরুদ্ধে যাহারা কাজ করে, তাহাদিগকে বলিতে হয়—

"তোমারে বধিবে যেই
গোকুলে বাড়িছে সেই।"

একবার লোকমত তুষ্ট করিবার জন্য 'পত্রিকা' বিপিনচন্দ্র পালকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন—'পত্রিকার' commercial concern-ত্ব সুরক্ষিত ও সার্থক হইয়াছিল। তবুও চিত্তরঞ্জনের মুখপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। আজ 'পত্রিকাকে' সেই কথা স্মরণ করিয়া মনে রাখিতে বলি :—

"কালেতে না জানি কি হবে আবার?
এই কথা সদা করিও ধ্যান।"

কোন্ পথে?

অল্পদিনের মধ্যে সংঘটিত কয়টি ঘটনায় স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—আমরা আদর করিয়া নারীদিগকেও যে শিক্ষা দিতেছি, তাহা সমাজকে কোন্ পথে লইয়া যাইতেছে? আজ আমরা হতভাগ্য প্রমথনাথ সরকারের মামলা লইয়া এই বিষয়ের কিছু আলোচনা করিব। এই মামলার নায়িকা বীণা "আলোক-প্রাপ্ত" পরিবারের দুহিতা—স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়া উপাধি লাভ করিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে তাহার স্বামী (যাহার সহিত প্রাপ্ত বয়স্কা বীণার বিবাহ হইয়াছিল) এই অভিযোগ আদালতে উপস্থিত করেন যে সে ব্যভিচারিণী। অভিযোগ—সে নলিনী সরকারের সহিত ব্যাভিচারে রত ছিল। নলিনী সরকার তাহার পিতার ভ্রাতা (সহোদর নহে) এবং নলিনী বলিয়াছিল, বীণা তাহার কন্যাস্থানীয়া। কিন্তু বীণার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ তাহাতে উভয়ের বিবাহে কোন বাধা হয় না। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার রায়ের প্রথমেই তাহা বলিয়াছেন—"There would have been no bar to their marriage under the Civil Marriage Act, 1873."

বীণা হিন্দু বিবাহ করে নাই—বালিকা বিবাহ ত নহেই। সে প্রাপ্ত বয়স্কা হইয়া বিবাহ করিয়াছিল। বিবাহের পর হইতেই সে স্বামীর প্রতি বিমুখ ছিল। সে স্বামীর সঙ্গে যাইতে বরাবরই অসম্মত ছিল এবং তাহার বিবাহিত জীবন "ghastly failure" হইলেও সে স্বামীর পত্রগুলি যে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল, তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন—তাহা ভালবাসার জন্য নহে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যদি কখন প্রয়োজন হয়, তবে সে সেগুলি মামলায় ব্যবহার করিতে পারিবে বলিয়া।

সে যে মিথ্যা কথা বলিতে পটু তাহাও ম্যাজিষ্ট্রেট দেখাইয়াছেন। প্রথমে—সে যে একবার পিতারও মত না লইয়া (স্বামীর ত নহেই) গিয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটের উক্তি :—

"It was clear that it was a clandestine visit unknown to her father or her husband. She has stated in evidence that she went to Benares with her mother. Her own diary proves it to be false."

অর্থাৎ—তাহার বারাণসী গমন যে তাহার পিতার ও স্বামীর অজ্ঞাতে গোপনে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে আদালতে বলিয়াছে, সে মা'র সঙ্গে গিয়াছিল। কিন্তু তাহার ডায়েরীতে দেখা যায়, সে কথা মিথ্যা।

তাহার পর—তাহার দিল্লী যাত্রা। নলিনী বিপত্নীক। সে সেই বিপত্নীকের সঙ্গে একা দিল্লীতে যাইয়া কয়মাস কাটাইয়া আসে। সে-ও স্বামীর অমতে—সঙ্গে যে আর কোন স্ত্রীলোক যাইবে না, তাহা প্রমথনাথ জানিত না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় বীণার পিতামাতার ও তাহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্রীর স্বামী—ভাগলপুরের লেডী ডাক্তারের পুত্র ডাক্তার শিশির মিত্রের তাহাতে সম্মতি—এমন কি আগ্রহ ছিল। শিশির মিত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং নলিনী যে হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর ম্যানেজার সে তাহার একজন ডিরেক্টারও হইয়াছে। তাহার দিল্লী যাত্রা সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট স্পষ্ট বলিয়াছেন :—

"Neither Bina, nor her brother-in-law, nor her Barakaka had told the truth"—

অর্থাৎ বীণা, শিশির ও নলিনী কেহই সত্য কথা বলে নাই।

বীণা যে অসুস্থ হইয়া নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার লাভের আশায় দিল্লীতে গিয়াছিল, তাহাও ম্যাজিষ্ট্রেট বিশ্বাস করেন নাই।

বীণার একক দিল্লীতে নলিনীর সঙ্গে থাকার কথায় ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন :—

"Under the circumstances it must not be regarded as unduly uncharitable if people are so low-minded as to regard the conduct of the accused and Bina as not wholly above suspicion."

এই যে বীণা—"আলোকপ্রাপ্ত" পরিবারের কন্যা—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিতা বীণা—এ যে ভাবে সমাজ ও সংস্কারকে পদদলিত করিতে পারিয়াছে, তাহাতে স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে হয়—

এই যে শিক্ষা—ইহা কি সমাজের ও নীতির পক্ষ হইতে সমর্থন করা যায়?

বীণার পিতামাতা ও শিশির মিত্র; ইঁহাদিগের ব্যবহারও যে বিস্ময়কর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে শিক্ষায় শিক্ষিতা হইয়া বীণা কিছুদিন হিন্দু বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাজও করিয়াছিল, সে শিক্ষা গ্রহণযোগ্য—না ত্যাজ্য? ইংরাজ কবি টেনিসন লিখিয়াছেন :—

"Let knowledge grow from more to more;
But more of reverence in us dwell."

এক্ষেত্রে তাহার বিপরীতই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; মানুষের প্রতি ও সমাজ-

নীতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাবই এই শিক্ষার দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে। এই বিপদে যে সন্ত্রাসবাদের বিপদ অপেক্ষা অল্প ভয়ানক—এমন কখনই বলা যায় না। যাহারা হিন্দু সমাজের গণ্ডী ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহাদের কথা বলি না; কিন্তু যাহারা হিন্দু বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেন, তাঁহারা এই শিক্ষার ফল দেখিয়া কি স্থির করিবেন?

মৃত্যু?

কবি রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখিয়াছেন—

"শুধু ক্ষুধা—হীন ক্ষুধা—দরিদ্রের ক্ষুধা।"—তেমনই অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের মৃত্যু সম্বন্ধে বলা যায়—যাহা গিয়াছে, তাহা—"শুধু প্রাণ—হীন প্রাণ—দরিদ্রের প্রাণ।" নহিলে কলিকাতার নিকটে তাঁহার মৃত্যুরহস্য একমাসেও ভেদ হইল না কেন? আর কেনই বা সে সংবাদ ১৮ দিন পরে জনসাধারণের গোচর হইয়াছিল? যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সম্পাদকীয় প্যারায় এই মৃত্যুরহস্য ভেদ করিবার প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিতে করিতে অনায়াসে বলিয়াছিলেন—প্রমথনাথের পক্ষে আত্মহত্যা করা অসম্ভব ছিল না, সেই 'অমৃতবাজার' জলেশ্বরের এক ভদ্রলোকের এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করিয়া তাহার শিরোনামায় লিখিয়াছেন—"More light on the mystery"—কিন্তু পত্রখানি পাঠ করিয়া মনে হয়—ইহা আলো নহে—কবি মিল্টনের ভাষায় "darkness visible".

দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় যদি মরণাহত যাত্রীকে পাওয়া গিয়াছিল, তবে তাহাকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া তাহার জীবন রক্ষার চেষ্টা দীর্ঘ ২ ঘণ্টা পরে করা হয় কেন? কর্ত্তব্য কি—তাহা বিবেচনা করিতে করিতে ট্রেণ ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া গেল—ট্রেণে উঠিয়া বিপদজ্ঞাপক শিকল টানিয়া বা ষ্টেশন মাষ্টারকে বলিয়া ডিসট্যান্ট সিগন্যালের আলো বদলাইয়া ট্রেণ থামান হইল না—এ কিরূপ ব্যবস্থা?

যাত্রীর নিকট যদি হাওড়া হইতে গৃহীত টিকিট পাওয়া গিয়া থাকে, তবে হাওড়ায় লাশ সনাক্ত করাইবার চেষ্টা হইল না কেন? বাঙ্গালা সরকার পয়সা খরচ করিয়া সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই মূল্যবান বিজ্ঞাপন পাইবার জন্য 'ষ্টেটস্‌ম্যান' হইতে 'অমৃতবাজার' পর্য্যন্ত সংবাদপত্রগুলি কিরূপ তদ্বির করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই ব্যাপারে সরকারী কর্ম্মচারীরা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে নারাজ হইলেন কেন?

মৃত্যু সন্দেহজনক মনে না করিলে বালেশ্বরের রাজকর্ম্মচারীরা তখনই লাশ না পুড়াইয়া প্রোথিত করিতে আদেশ দিতেন না। কিন্তু বহু বিলম্বে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় কি তাহার উদ্দেশ্য—অর্থাৎ লাশ তুলিয়া পরীক্ষার উপায়—ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে?

দেখা গিয়াছে, সংবাদপত্রে একটু সংবাদ পাইয়াই প্রমথনাথের আত্মীয়রা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সহজেই লাশ সনাক্ত করিতেও পারিয়াছিলেন। এ অবস্থায় অবশ্যই মনে করা যাইতে পারে, ১৪ই বা ১৫ই তারিখে সংবাদ প্রকাশিত হইলে লাশ বহুপূর্ব্বে সনাক্ত হইতে ও তদন্তের অনেক সুবিধা ঘটিতে পারিত। তাহা যে হয় নাই, এজন্য কে দায়ী?

তাহার পর বালেশ্বরে শবব্যবচ্ছেদের ফল ও শেষে রাসায়নিক পরীক্ষকের পরীক্ষা ফল আজও প্রকাশিত হইল না—ইহার কারণ কি?

আমরা জানি, বাঙ্গালার গভর্ণরের আগ্রহেই কলিকাতা কর্পোরেশন গৃহে সংঘটিত হত্যার রহস্যভেদ হইয়াছিল। তিনি এই হতভাগ্য অধ্যাপকের মৃত্যু রহস্য ভেদ করিবার জন্য পুলিশকে আদেশ দিবেন, এরূপ আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

প্রমথনাথের সম্বন্ধে আজ আমরা আর কি বলিব? তাঁহার জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার কারণ, আত্মহত্যা—

কি হত্যা—কি আর কিছু—তাহা প্রকাশ পাইতেছে না।

তাঁহার সহিত যাহার বিবাহ হইয়াছিল—সে যে মনে করিয়াছিল তাহার বিবাহিত জীবন "ghastly failure" হইয়াছিল, তাহা ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলিয়াছেন। প্রমথনাথের জীবননাটকে শেষ দৃশ্যে যবনিকা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু বীণার জীবন নাটকে হয়ত ঘটিবে—

"খুলিল দ্বিতীয় অঙ্কে দৃশ্য অভিনব।"

রহিল কেবল প্রমথনাথের জননীর বক্ষে পুত্রশোক-শেল। সে শোকের সান্ত্বনা নাই। তাহা রাবণের চিতার মত মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত অভাগিনীর বুকে জ্বলিতে থাকিবে।

আমাদের প্রাদেশিক গভর্ণররা পুলিশের সুনাম রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যগ্র। লর্ড লিটন সেই ব্যগ্রতার আগ্রহে এ দেশের লোকের অযথা নিন্দা করিয়া চাকরী হারাইবার সম্ভাবনা ঘটাইয়াছিলেন। বাঙ্গালার ও বিহারের গভর্ণরদ্বয়কে আমরা বলি—তাঁহারা কি পুলিশের সুনাম ও কার্য্যদক্ষতা পরিচয় জন্য এই দরিদ্র—হতভাগ্য অধ্যাপকের মৃত্যুর রহস্য ভেদের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে আদেশ প্রদান করিবেন না?

প্রমথনাথের মৃত্যু-রহস্য

ভূতপূর্ব্ব মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের মামলার ফরিয়াদী অধ্যাপক প্রমথনাথের অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, এ সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে! আরও সংবাদ ধীরে ধীরে প্রকাশিত হওয়াতে সেই রহস্য আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

'আনন্দবাজার পত্রিকার' প্রেরিত সংবাদ-দাতা জলেশ্বর ও বালেশ্বর হইতে যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, অজ্ঞান প্রমথনাথের পাকস্থলী ধুইবার ব্যবস্থা করাইবার জন্য টিউব প্রবেশ করাইতে গিয়া সিভিল সার্জ্জন ডাঃ সেনগুপ্ত গলার ডানদিকে টিউব প্রবেশ করাইতে অসমর্থ হন ও অনেক চেষ্টার পর কোনরূপে গলার বামদিকে টিউব লাগাইতে পারেন। কণ্ঠনালীর এইপ্রকার জড়তা (Paralysis) দৃষ্টে মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সিভিল সার্জ্জেনের সন্দেহ জন্মে ও শব-ব্যবচ্ছেদের সময় তিনি কণ্ঠনালী কাটিয়া উহা পরীক্ষা করেন। কণ্ঠনালীর এই জড়তা হইল কি কারণে? অহিফেন সেবনের ফলে এইরূপ ঘটিতে পারে কি? এরূপ মনে হইতেও পারে যে, কোনও উগ্র ঔষধের সাহায্যে প্রমথনাথকে অজ্ঞান করিয়া বল-পূর্ব্বক অহিফেন মিশ্রিত মদ্য তাঁহার কণ্ঠনালীতে যন্ত্র সাহায্যে ঢালিয়া দেওয়ার ফলেই কণ্ঠনালীর এইরূপ জড়তা সম্ভব হইয়াছে। এইরূপ হওয়া সম্ভব কি-না, সে সম্বন্ধে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য আমরা একথা বলি না, যে প্রমথনাথের পক্ষে আত্মহত্যা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু তাঁহার আত্মহত্যা করিবার কি সঙ্গত হেতু তাঁহার ছিল? তিনি অনেক চিন্তা ও বহু দ্বিধা অতিক্রম করিয়াই নলিনী সরকারের নামে তাঁহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারের মামলা রুজু করিয়াছিলেন; মামলার ফলাফল সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কারণও তাঁহার পক্ষে কিছু ঘটে নাই। বীণার ডায়েরী ও চিঠিপত্র ও বীণার পূর্ব্বাপর ব্যবহারে প্রমথনাথ সন্দেহান্বিত হইলে তাহা অসঙ্গত হইত না, এরূপ ভাবিবার যথেষ্ট কারণ প্রমথনাথের ছিল এবং মামলার রায়েও ম্যাজিষ্ট্রেট সেকথা স্বীকার করিয়াছেন। তবে নিজের জেরার পর সহসা এমন কি ঘটিল যে প্রমথনাথ মামলার ফলাফল না দেখিয়াই আত্মহত্যা করিলেন। তাহার পর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিলেও আত্মহত্যা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। চিকিৎসকগণ বলেন যে, পাকস্থলী ধৌত করিয়া তাঁহারা বহুল পরিমাণে মদ্য-মিশ্রিত অহিফেন পাইয়াছেন। প্রমথনাথ যখন বাড়ী হইতে বাহির হন, তখন, তাঁহার ভাগিনেয় বিমলেন্দুর এজেহার অনুসারে, রাত্রি নয়টা বাজিয়া গিয়াছিল। প্রমথনাথ অত রাত্রিতে মদ্য সংগ্রহ করিলেন কোথা হইতে? যে আধারে মদ্যের সহিত অহিফেন মিশাইলেন সেই আধার ও মদ্যের বোতল প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে—এমন জানা যায় নাই। সেগুলি কোথায় গেল? অত বেশী অহিফেন পান করিতে যে পরিমাণ মদ্যের প্রয়োজন, একজন পাকা মাতাল না হইলে কাহারও পক্ষে বিস্বাদ অহিফেনযুক্ত অত মদ্য স্বেচ্ছায় পান করা কি সম্ভব? প্রমথনাথ ফেণীতে অধ্যাপকের কাজ করিতেন। সেখানে তাঁহার স্বভাব সম্বন্ধে উক্তরূপ জনরব নাই! সেজন্যও পানীয় বিষ স্বেচ্ছায় পান করা সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যাইতেছে।

তাহার পর, অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহার দেহ বেঞ্চের নীচে পাওয়া—বিশেষতঃ নীচে হইতে পা বাহির হইয়া দরজা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া দরজা রোধ করার অবস্থায় দেহ লম্বমান থাকাও সহজ নহে। দেহের এই ভাবে অবস্থানও সন্দেহের উদ্রেক করে। এই সব কারণে এ সম্বন্ধে খুব যত্নের সহিত তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তাহার পর রেলকর্ত্তৃপক্ষের একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। দাঁতন ষ্টেশনে জনৈক রেলকর্ম্মচারী মিষ্টার রাইট অজ্ঞান অবস্থায় একজন ভদ্রলোককে দেখিতে পাইলেন। সম্মুখের একটি মাল গাড়ীর গার্ড মিষ্টার পাইবাস ও উক্ত কর্ম্মচারী এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন, তাহার পর গার্ড মিষ্টার রোজারীকে সংবাদ দিবার অভিলাষ করিলেন। কিন্তু সময় হইয়া যাওয়াতে গার্ড গাড়ি ছাড়িয়া দেওয়াতে তাঁহারা গাড়ীতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ফলে প্রায় দুই ঘণ্টার পর জলেশ্বরে অচৈতন্য লোকটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। টিকেট চেকার কি গাড়ীর চেন টানিয়া

দাঁতনে গাড়ী বন্ধ করিতে পারিতেন না? এইরূপ বিপন্নাবস্থায় যদি গাড়ী বন্ধ না হয়, তবে গাড়ীতে চেন থাকিবার সার্থকতা কি? ট্রেন দাঁতনে বন্ধ করিলে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইতে পারিত এবং প্রমথনাথের জীবন ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু রেলকর্ম্মচারীর এই সাংঘাতিক ত্রুটিতে তাহা সম্ভব হইল না।

রেলকর্তৃপক্ষ অথবা চিকিৎসকগণ এই মৃত্যু যে নিশ্চিত আত্মহত্যা, তাহা বলেন নাই—হয়ত বলা সম্ভবও নহে। অথচ জলেশ্বর, বালেশ্বর ও সুদূর কটক হইতে কয়েকজন ভদ্রলোক উহা যে নিশ্চিত আত্মহত্যা তাহা প্রচারের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। কটকের সংবাদদাতা আবার কতকগুলি আজগুবি খবরের প্রচার করিতেও দ্বিধাবোধ করিলেন না। এই রহস্যজনক মৃত্যু হত্যা কিম্বা আত্মহত্যা যাহাই হৌক, ইহার সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে বাঙ্গলা ও বিহার সরকারের অবহিত হওয়া উচিত। জনসাধারণের পক্ষ হইতে আমরা সেই দাবী জানাইতেছি।

শুভ-বিবাহ

কলিকাতা কর্পোরেশনের পাবলিসিটী বিভাগের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ ভদ্রের সহিত কটকের উকিল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়ের ভ্রাতষ্পুত্রী শ্রীমতী উমা দেবীর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় শ্রীযুক্ত ভদ্র যখন রাজদ্রোহ বক্তৃতা দিবার অপরাধে বালেশ্বরে এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তখন তিনি কয়েক মাস কটক জেলেই অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন কে জানিত যে সবার অলক্ষ্যে প্রজাপতি তাঁহার কুসুম-লঘু স্পর্শ ব্রজেন্দ্রবাবুর ললাটে দিয়া গিয়াছিলেন। আইন-অমান্যের অভিজ্ঞতা ব্রজেন্দ্রবাবুর আছে, আশা করি ভবিষ্যতে আইন-মান্য করার সুমধুর অভিজ্ঞতা নব-দম্পতীর জীবনকে চির-নবীন করিয়া রাখিবে।

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

সব্যসাচী

আজকাল আমাদের সমাজে যেমন কবিতা ছাপা না হইলে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে বলিয়া ভয় হয়, তেমনই বিজ্ঞাপনের বাহার ও বাহুল্য ব্যতীত ব্যবসা জমে না, ইহা অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু কোন বীমা কোম্পানী যদি সাবান, কেশতৈল বা ঔষধের মত বিজ্ঞাপনে বাহুল্য করেন, তবে তাহা সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে পারে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, স্বদেশী বীমা কোম্পানীর মধ্যে কতকগুলি বিজ্ঞাপনে অনেক টাকা খরচ করিয়া থাকেন। ২৫।৩০ বৎসরের বীমা কোম্পানীকেও যদি বিজ্ঞাপনের বাহুল্য করিতে হয়, তবে তাহা কোম্পানীর সম্ভ্রম বৃদ্ধি করেনা।

বাঙ্গলায় হিন্দুস্থান সমবায় বীমামণ্ডলীর দৃষ্টান্ত লইলে, কথাটা বুঝা যায়। এই কোম্পানীর বিজ্ঞাপন কি ভাবে বিলি হয়, তাহা আমরা জানিনা—ডিরেক্টাররা অবশ্যই জানেন। কিন্তু—আমরা দেখি, 'ফরওয়ার্ড', 'লিবার্টি', 'ফরওয়ার্ড' (নব কলেবর) এসব কাগজ নূতন হইতেই হিন্দুস্থানের বড় বড় বিজ্ঞাপনে সমৃদ্ধ হয়। এইসব পত্রের পরিচালকদিগের সহিত হিন্দুস্থানের পরিচালকদিগের সম্বন্ধ কি?

হিন্দুস্থান তাহার বয়স ২৫ বৎসর পূর্ণ হইলে যে বিরাট উৎসব করিয়াছিলেন, তাহাতে মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে? একদিকে গভর্ণরের সার্টিফিকেট আর একদিকে যে দিন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর মামলার রায় বাহির হইবার কথা, সে দিন উদ্যান-সম্মিলন স্থগিদ রাখা—ইহাও অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

হিন্দুস্থানের ম্যানেজারের নামে যখন ব্যভিচারের মামলা হয়, তখন, সেই ব্যক্তিগত ব্যাপারের সময়, কি জন্য যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ১০।১১ জন লোকের স্বাক্ষরে এক নিবেদন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন-মূল্যে প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাতে কি আশানুরূপ ফল হয় নাই? নহিলে মেঘের আড়াল হইতে বাণবর্ষণ প্রথা ত্যাগ করিয়া—ঘোমটা ফেলিয়া হিন্দুস্থানের ডিরেক্টাররা—"প্রতিবাদ" পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন কেন? আজ এই পুস্তিকা আমাদিগের আলোচ্য নহে।

তবে আমরা শুনিয়াছি, হিন্দুস্থানের প্রচার বিভাগে মোটা মাহিয়ানার কর্ম্মচারীরা বিরাজিত! যথা—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

এই সাবিত্রী প্রসন্নই কি তাঁহার 'উপাসনায়' হিন্দুস্থান সম্বন্ধে অপ্রিয় আলোচনা করায় মহারাজা শ্রীশ চন্দ্র নন্দীর (ইঁহার সহিত হিন্দুস্থানের সম্বন্ধ আমরা জানি) ময়মনসিংহের আমদানী সেক্রেটারী অনাথ গোপাল কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন?

কিন্তু এই সব কর্ম্মচারী থাকিতে হিন্দুস্থান সম্বন্ধীয় অনেক অসঙ্গতি দেখা যায় কেন?—

হিন্দুস্থানের কার্য্য সমালোচনার সময় মিষ্টার কুক বলিয়াছিলেন—১৯৩২ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ এই দুই বৎসরে ইহার কাজ যেমন শতকরা ৫৭ ভাগ বাড়িয়াছে (১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ৫ কোটি ৬৩ লক্ষ হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৮ কোটি ৮৬ লক্ষ হইয়াছে)—তেমনই ইহার

প্রিমিয়াম আদায়ের পরিমাণও শতকরা ৫৩ ভাগ বাড়িয়াছে। অবস্থা ইহাতে খুবই ভাল মনে হইতে পারে। কিন্তু কাজের পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা কয়টি বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি :—

(১) ডিরেক্টাররা ৩০।৪।১৯৩৫ রিপোর্টে বলিয়াছেন :—

The total number of policies in force at the end of the year was 37,136 assuring a total sum of Rs 6,39,70,096 of which Rs 2,35,000 was reassured.

(২) ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের সরকারী রিপোর্টে অর্থাৎ যাহাকে ব্লুবুক বলে তাহাতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মোট কাজের পরিমাণ—(বোনাস সহ)—৬,৫৫,৫৪,০০০ টাকা দেখান হইয়াছে। অর্থাৎ রিপোর্টেও সরকারী বিবরণের অঙ্কে মোটামুটি সামঞ্জস্য আছে।

(৩) হিন্দুস্থান সমবায় বীমামণ্ডলীর ভেলুয়েশন রিপোর্টে কাজের পরিমাণ (বোনাস সহ) দেখান হইয়াছে—৫,৭৪,৩৯,০০০ টাকা।

অর্থাৎ যত টাকার কাজের ভেলুয়েশন করা হইয়াছে তাহা সরকারী বিবরণের অঙ্ক হইতে প্রায় ৮১ লক্ষ টাকা কম বলিয়া মনে হয়।

(৪) আবার ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে ডিরেক্টারগণ মোট কাজের পরিমাণ (রি-এস্যুরেন্স বাদে) বলিয়াছেন—৫,৪৪,০০,০০০ টাকা কিন্তু

(৫) Stone and Cox Tables-এ দেখা যায়—উহা ৬,৪৪,০০,০০০ টাকা—

একেবারে একলক্ষ টাকার প্রভেদ!

এ সব বৈষম্য কিরূপে উদ্ভূত হয়?

মিষ্টার কুক কোথা হইতে ৫,৬৩,০০,০০০ টাকার অঙ্ক পাইয়াছেন, তাহার সন্ধান করিলে মনে হয়—জেনারল ম্যানেজার নলিনী সরকারের স্বাক্ষরে প্রকাশিত এক পুস্তিকা তাঁহার অবলম্বন হইতে পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য—হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর প্রচার বিভাগ ও তাহাতে মোটা মাহিয়ানার কর্ম্মচারীরা থাকিতেও—

ডিরেক্টারদিগের রিপোর্ট

একচুয়ারীর ভেলুয়েশন রিপোর্ট

সরকারের ব্লু বুক

ষ্টোন এণ্ড কক্স টেবল

জেনারল ম্যানেজারের পুস্তিকা

—এইগুলিতে অঙ্কে প্রভেদ হয় কেন? কোন অঙ্কই বা নির্ভরযোগ্য?

কারণ,—

অঙ্ক ধরিলে তবে বুঝা যাইবে—কাজ সত্য সত্যই শতকরা ৫৭ ভাগ করিয়াছে কি না। **উহা ৫৭ ভাগও হইতে পারে, আবার ৩৮ ভাগও** হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, ৫৭ আর ৩৮ এক নহে।

যদি বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৩৮ ভাগ হইয়া থাকে, তবে তাহার সহিত প্রিমিয়মের শতকরা ৫০ ভাগ আয় বৃদ্ধির সামঞ্জস্য থাকে না।

কোম্পানীর পরামর্শদাতা একচুয়ারী

ডিরেক্টারগণ

জেনারল ম্যানেজার

সরকারী একচুয়ারী

আমরা এই চারিজনকে এই দুই প্রকার অঙ্কের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া দিতে বলিতেছি। এই সামঞ্জস্য সাধন ব্যতীত সাধারণ লোকের পক্ষে সন্দেহ নিঃশেষ করা দুঃসাধ্য হইবে।

আমরা বিজ্ঞাপনের কথা লইয়া এই প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়াছি। প্রসঙ্গ শেষে, হিন্দুস্থানের ডিরেক্টারদিগকে দুইটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব :—

চুমোর দাওয়াই

শ্রীসুধীর কুমার সরকার

চুমকুড়ী-খুনসুড়ী ছাড়া মন ওঠেনা?
কি বলিব? দড়ি আর কলসী কি জোটেনা?
লজ্জা ও ভদ্রতা সব গেছে গোল্লায়?
একেবারে বিকিয়েছ চুনো-চুমি পাল্লায়?
কেউ চায় আস্তে বা কেউ চায় শব্দ,
ভাবে কেবা কারে করে চুমো-কলে জব্দ!
বাঙ্গালীর ছেলে মেয়ে সব কাজ ভুলিয়া
ফিরিছে কি আজকাল চুমো ফেরী করিয়া?
কেউ বলে- "ছাড়ো, ছাড়ো, অত জোরে কামড়ায়?"
এখনও সে লোভ যদি এত কাঁচা চামড়ায়
ঘর দোর ছেড়ে কেন বনে চ'লে যাওনা,
যত খুসী সেখানেতে কাঁচা গোস্ খাওনা?
এ বড় বিসম ব্যাধি, কলমে কি সারবে?
বেতের দাওয়াই চাই—পারে সেই পারবে। *

——:o:——

(১) হিন্দুস্থানের **প্রচার বিভাগে ও বিজ্ঞাপনে, পুস্তিকা প্রচার** প্রভৃতিতে বৎসরে মোট কত টাকা ব্যয় হয় এবং যে কোম্পানী ২০ বৎসর অংশীদার-দিগকে লাভ হিসাবে এক কড়া কড়ি দিতে পারে না, তাহার লাভের তুলনায় সে ব্যয় কিরূপ?

(২) গত ২ বৎসরে নিম্নলিখিত সংবাদপত্রের কোনখানিকে কত টাকা বিজ্ঞাপন বাবদে দেওয়া হইয়াছে?

(ক) ষ্টেটস্‌ম্যান

(খ) ফরওয়ার্ড

(গ) অমৃতবাজার পত্রিকা

* [ভবিষ্যতে এসম্বন্ধে আর কোন কবিতা খেয়ালীতে প্রকাশিত হইবেনা। খেঃ সঃ]

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

"মানময়ী গার্ল্‌স্‌ স্কুল"

প্রযোজক—রাধা ফিল্ম্‌ কোম্পানী।

পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার } জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কথা-শিল্পী—স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র।

আলোক-শিল্পী- ডি জি গুণে।

শব্দ-যন্ত্রী—ডাঃ হৃষীকেশ রক্ষিত।

গীত-রচয়িতা—গ্রন্থকার ও সুধীরেন্দ্র সান্যাল।

সুর-শিল্পী—অনাথ বসু, মৃণাল ঘোষ ও কুমার মিত্র।

সম্পাদক—ভোলানাথ আঢ্য ও রাজেন দাস।

চিত্র-পরিবেশক—ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স্‌ লিঃ।

ভূমিকা।—দামোদর—তুলসী চক্রবর্ত্তী, মানময়ী-রাধারাণী, মানস-জহর গঙ্গোপাধ্যায়, নীহারিকা কাননবালা, চপলা—জ্যোৎস্না গুপ্তা, রাজেন্দ্র বাড়োড়ী—মৃণাল ঘোষ, হারানিধি—কুমার মিত্র, ফার্ণাণ্ডেজ—জানকী ভট্টাচার্য্য।

প্রথম মুক্তি—"রূপবাণী"তে।

শনিবার, ১১ই মে ১৯৩৫।

স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের এই বিখ্যাত প্রহসন খানি বাঙালী মাত্রেরই আজ অতি আদরের বস্তু! রঙ্গমঞ্চে এর জনপ্রিয়তা সর্ব্বজনবিদিত। রাধা ফিল্ম্‌ কোম্পানী এই প্রহসন খানিকে চিত্ররূপ দিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট করেছেন—তার প্রথম নম্বর কারণ, এ হেন গল্পের, বাঙ্‌লার চিত্র রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ এই প্রথম। রাধা ফিল্ম্‌ কোম্পানীরও সামাজিক রঙ্গনাট্যের চিত্রে সবাক রূপ এই প্রথম। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে এই কোম্পানী যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে এ বিষয়ে এদের অদূরভবিষ্যত যে বেশ উজ্জ্বল এ আমরা অনায়াসেই কল্পনা করতে পারি।

চিত্রটির সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটী ধারণা হচ্ছে এই- সু-অভিনীত, সুগীত ও প্রহসনের প্রচুর হাস্যরসে ভরা। নাট্যকার দর্শকদের যেখানে যেরকম ভাব হাসাতে চেয়েছেন—চিত্রটিতে তাদের প্রকাশ বেশ অক্ষুন্নই রয়েছে। পর্দ্দার ওপর অভিনেতা-অভিনেত্রীর ভাব-ভঙ্গী ও ইসারা অনেক বড়ো ও স্পষ্টতরো হয়ে উঠে জায়গায় জায়গায় এ চিত্রখানি মঞ্চের চেয়ে দর্শকদের হাসিয়েছে অনেক বেশী। মোটকথা, প্রচুর হেসে ঢ'ঘণ্টা নির্ম্মল আনন্দ লাভের জন্য রাধা ফিল্ম্‌ কোম্পানীর এই "মানময়ী গার্ল্‌স্‌ স্কুল" একটি আপাততঃ শ্রেষ্ঠ অবদান।

গার্ল্‌স্‌ স্কুলের গল্পটি বাঙালী সমাজে এতদূর প্রিয় যে এখানে এর পুনরুল্লেখ একান্ত নিষ্প্রয়োজন। কে না জানে চার্চ্চ লেনের সুন্দরী বেকার এক গ্রাজুয়েট্‌ শিক্ষয়িত্রী পেটের দায়ে এক মানস মুখার্জ্জীর নকল স্ত্রী সেজেছিলো। সেই নকল স্ত্রী আসল স্ত্রীর পবিত্র পথে চল্‌তে গিয়ে তার যে সমস্ত হাস্যরসাত্মক বাধা বিঘ্ন—তার ঘটনা, তার বিবরণ কে পড়ে' নির্জ্জন একলা এক ঘরে বসে' বসে' না হেসেছে! 'হে 'হে হাসি, নাৎ-বৌ-প্রাণ, জমিদার দামোদরকে কার না ভালো লেগেছে শুনি! কাকে না মুগ্ধ করেছে ইডিয়ট্‌ মোক্তার রাজেন্দ্র বাড়োরীর উৎকট প্রেম। চপলার রূপ-স্রোতে তার 'যথার্থ' খাবি-খাওয়া কার কাছে হাসির দাবী না করেছে শুনি! কে না অন্ততঃ একবার গুণগুণ করে' গান না গেয়েছে—'ভজ মন মেরি ঘোষের নন্দনে'! কিম্বা, 'জগতজন্মে যত তরকারী তার মাঝে সেরা 'ওল'—

পরিচালনায় শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে নিখুঁৎ 'জ্যোতিষ-ব্যানার্জ্জী-পরিচালনা' করেছেন। সাধারণ নাটককে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করতে গেলে কিছু পরিমাণে যে অদল-বদল করতে হয়—তা তিনি করেছেন। এবং, তা প্রশংসনীয়। তবে, আরো একটু বেশি করলে চিত্রখানির ধারা যে আরো বেশী উন্নত হ'তো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কারো। 'টেম্পো'কে আরো একটু দ্রুত করা তাঁর উচিত্‌ ছিলো, উচিত্‌ ছিলো সংযোজনা করা এই চিত্রে আরো কিছু চিত্র-নাটকীয় উপাদান। জ্যোৎস্নার স্নানে-ভেজা দেহ দেখবার যদিইবা কোন সার্থকতা থাকৃতে পারে—কিন্তু, তা একেবারেই নেই কাননের ব্লাউজ্‌ খুলে বডিস্‌ দেখাবার। কারণ, সত্যিই, দেখবার তো কিছু দেখ্‌লুম না। আরেকটি জিনিষ করলে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কাছে আরো ধন্যবাদ পেতেন—সেটি হচ্ছে, অন্ততঃ কাননের একটি গান কমানো।

ফটোগ্রাফি মোটের ওপর ভালো। কিন্তু শ্রীযুক্ত ডি জি গুণে, কেন জানিনে, এতে খুব বেশী উন্নতধারা প্রবর্ত্তন করতে পারেন নি। ঐ ধরণের কাজ অবিশ্যি বাজারে খুবই সচল, কিন্তু শ্রীযুক্ত গুণের শিল্প এতোদিনে আমরা উন্নত আশা করেছিলুম।

শব্দের কাজ হৃষিকেশবাবুর পক্ষে খুবই ভালো, কিন্তু ডাঃ রক্ষিত্‌এর উপযুক্ত নয়।

সম্পাদনা অত্যন্ত সরল।

পরিস্ফুটনাগারের কাজে যত্নের অভাব দেখা গেল। আর একটু সতর্ক হয়ে কাজ কোর্‌লেই ভাল হত।

চিত্রখানির সাফল্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারণ হচ্ছে এর সঙ্গীত। প্রত্যেকটি গানই সুরচিত ও সুগীত। আসল নাট্যকারের কথা

ছেড়ে দিয়ে এর জন্য প্রশংসার্হ শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যাল ও সুরের জন্য যথাক্রমে অনাথ বসু, মৃণাল ঘোষ ও কুমার মিত্র।

খুব উঁচু হচ্ছে "মানময়ী গার্ল্স্ স্কুলে"র অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়-ধারা। যদিও দু'একজন একটু মঞ্চ-ঘেষা। এতে অভিনয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান আমরা দিচ্ছি শ্রীযুক্ত মৃণাল ঘোষকে। ইডিয়ট্ মোক্তার রাজেন্দ্র বাড়োড়ী সেজেছিলেন যিনি। হাবে ভাবে ও কথা-বার্ত্তায় রবী মৈত্রের রাজু এর ভেতর এতখানি জীবন্ত হয়ে উঠেছিলো যে সত্যিই অত্যন্ত প্রশংসনীয়। মৃণাল বাবুকে এতোদিন আমরা জানতুম একজন সুন্দর সঙ্গীতজ্ঞ বলে, জানতুম না তিনি যে এতো চমৎকার একজন রঙ্গাভিনেতা। তাঁর গানটি—যদিও এটির সংযোজনা সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি আছে, তবুও বলি—একেবারে অনবদ্য সুন্দর। সুর, তান, লয়ের এত চমৎকার সম্মিলন অনেকদিন অনেক গানে শুনিনি।

তারপর জহর গাঙ্গুলীর মানস ও তুলসী চক্রবর্ত্তীর দামোদর। অভিনয়ে দু'জনই প্রচুর হাসিয়েছেন, কোনো প্রকারে আড়ষ্টতার প্রকাশ পায়নি, তা ছাড়া মানিয়েছিলোও চমৎকার। রঙ্গমঞ্চে জহর গাঙ্গুলীর মানসের সুনাম চিত্রপটেও অক্ষুণ্ণ রইলো।

কুমার মিত্রের হারানিধি মন্দ নয়, তবে আরেকটু ছ্যাবলামি কম হ'লে হ'তো ভালো।

জানকী ভট্টাচার্য্যের 'ফার্ণাণ্ডেজ' একটু বেশি দাঁত বার করে' ফেলেছেন।

অভিনেত্রীদের ভেতর কাননবালা নীহারিকার অতি-আধুনিক ভূমিকাটিতে বেশ প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। এঁর মুখ দু'এক জায়গায় ডি জি গুণে সুন্দরভাবে তুলেছেন। হায়, সব সময়েই কাননের আনন ওরকম ভাবে তোলা হোল না কেন ভাবি।

মানময়ীর অংশটি চিত্ররাজ্যে নবাগতা রাধারাণীর প্রথম প্রচেষ্টার দিক দিয়ে খুবই আশাজনক হয়েছে বল্তে হবে।

চপলার ভূমিকায় জ্যোৎস্না বেশ 'চঞ্চলা'। আগের চেয়ে অনেক উন্নত, কুমারী জ্যোৎস্না গুপ্তার ভবিষ্যৎ ভাল—সন্দেহ নেই।

রূপোলী পর্দায় অনেক সাফল্যমণ্ডিত সপ্তাহ ধ'রে যদি না চলে—তা হ'লে অবাক হবার আমাদের অনেক কিছুই থাকবে।

* * *

আসল চিত্রখানি আরম্ভ হবার আগে দর্শকদের শোনানো হয় রাধা ফিল্মের তোলা

রাজবন্দী শরৎচন্দ্র বসু

কলিকাতায় স্বগৃহে অন্তরীণের জনরব

হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভের সম্ভাবনা

কলিকাতার বিশ্বস্ত মহলে প্রকাশ যে রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে শীঘ্রই তাঁহার কলিকাতার বাটী ১নং উডবার্ণ পার্কে স্থানান্তরিত ও অন্তরীণাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হইবে। প্রকাশ যে তাঁহার উপর এই আদেশ দেওয়া হইবে যে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবীর ব্যবসা আরম্ভ করিতে পারিবেন কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্ট ও ১নং উডবার্ণ পার্কের সীমানা ছাড়া অন্যত্র কোথাও পুলিশের অনুমতি ব্যতীত যাইতে পারিবেন না। ইহাও প্রকাশ যে তাঁহার উপর কর্ত্তৃপক্ষের আরও নির্দ্দেশ রহিবে যে তিনি রাজনীতি সম্বন্ধীয় আলোচনা কাহারও সহিত করিতে পারিবেন না—অর্থাৎ আইন ব্যবসায় ছাড়া অন্য কোন কার্য্যে তিনি যোগদান করিতে পারিবেন না।

প্রকাশ যে বর্ত্তমানে সিমলা সরকার ও দার্জ্জিলিং সরকারের মধ্যে উক্ত বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে এবং শীঘ্রই এ' বিষয়ের শেষ সিদ্ধান্ত সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইবে।

বিভিন্ন অংশের চরিত্র-নির্ব্বাচনের প্রশংসা করতে আমরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নই। এবং, এখানেই তা হ'লে বলা যেতে পারে—এতো নানাগুণে বিভূষিতা যে রাধা ফিল্ম কোম্পানীর "মানময়ী গার্ল্স্ স্কুল", সেটি "রূপবাণী"র

দু'খানি গান। একটির গায়ক—মৃণাল ঘোষ, আরেকটি গেয়েছেন শ্রীমতী রাধারাণী। দু'টি গানই রচনা ও সুরের বৈচিত্রে আমাদের মুগ্ধ না করে' পারে নি।

* * *

"মানময়ী গার্ল্স্ স্কুলে"র যে সমস্ত

প্রস্তাপনী সেদিন বিতরণ করা হ'য়েছিলো সেগুলো অভিনব মলাট, কারুকার্য্য ও সুন্দর ছবিতে ও ছাপায় সবাইকে অভাবনীয়রূপে অবাক না করে' পারেনি। ইণ্ডিয়া পিক্‌চারস্-এর প্রচার বিভাগের প্রত্যেকটি কর্ম্মীরই এ যে অত্যন্ত সুরুচির পরিচায়ক—সন্দেহ নেই।

নিউ থিয়েটার্স্

শ্রীযুক্ত নিতীন বসুর 'সুরদাস' আজ—বৃহস্পতিবার আরম্ভ হবে।

* * *

শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ তামিল 'পুরণ ভকতের' কাজ চারভাগের তিন ভাগ শেষ করেছেন।

* * *

ষ্টুডিয়োয় কাজের চাপ, কাজেই' এখন ঝঞ্ঝাট খুব বেশী। ঝঞ্ঝাট কিছু কমলে পর 'বিজয়া'র চরিত্র নির্ব্বাচন ঠিক হবে। 'বিজয়া'র চরিত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে যে সমস্ত খবর ইতিমধ্যে বেরিয়েছে-সেগুলো সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করতে সাধারণকে আমরা বারণ করি। কারণ, ঠিক সত্য খবর প্রকাশ পায়নি।

রাধা ফিল্ম

প্রকাশ যে, "মানময়ী গার্লস স্কুলে"র প্রথম হপ্তার বিক্রী রূপবাণীর পূর্ব্বেকার রেকর্ড ভেঙ্গেছে। আমাদের বিশ্বাস যে, ছবিখানি বহুদিন ধরে রূপবাণীর আসর জমিয়ে রাখবে।

‡ * ‡

এদের তেলেগু ও তামিল "ভক্ত কুচেলা" ও "সিকুটোণ্ডা" দ্রুতগতিতে তোলা হচ্ছে।

* * *

"ওয়ামক্ এজরা"-র মাত্র একটি দৃশ্য তোলা বাকী আছে।

কালী ফিল্মস্

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের অমর প্রহসন "বিরহ" আসছে ১৮ই মে থেকে ক্রাউন টকী হাউসে দেখানো হবে। "বিরহ" রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালীন প্রেক্ষাগৃহ হাস্যরসস্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। ছায়াপটেও ছবিখানি যে বিশেষ আদৃত হবে একথা বলাই বাহুল্য।

❊ "মানময়ী"-র গান ❊

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

(এক)

আমার পরাণ যা'রে চায়, তারে নাহি পায়,
নিমিষে আসিলে কাছে, ছুটিয়া পলায়।
তার মুকুতা ঝরা হাসি, পাগলপারা
কাজল-কালো চোখে বিজলী-ধারা;
সে নহে ধরার ফুল সে যে আলেয়া,
দেখেছি তাহারি লীলা নব-বরষায়।
চঞ্চল বনানীর বন হরিণী
বাহুতে দিল না ধরা, নয়নমণি;
দেখি, মিলন-বিরহ মাঝে সে মুখ ছবি
চির-বন্দিনী সে আমার চিত্ত-কারায়॥ •

—:o:—

কারণ শিল্পী সমন্বয়ে ছবিখানি হয়েছে অতুলনীয়। তার ওপর গাঙ্গুলী মশাই প্রয়োজনার দিক থেকে খুঁটিনাটি বিষয় পর্য্যন্ত দেখছেন। সঙ্গীত-পরিচালনা কোরছেন লব্ধ প্রতিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে। এ মিলনে "বিরহ" হ'য়ে উঠবে সত্যই প্রাণস্পর্শী। শোনা গেল, কর্তৃপক্ষ নাকি এগারো দিনের মধ্যে ছবিখানির প্রাথমিক কাজ থেকে আরম্ভ কোরে উপসংহার পর্য্যন্ত শেষ কোরেছেন। এত তাড়াতাড়ি একখানি দশ রীলের ছবি সমাপ্ত করার ভেতর কর্তৃপক্ষের বাহাদুরীর পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মঙ্গল কামনা করি।

পায়োনিয়ার ফিল্ম

শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের পরিচালনায় "দেবদাসী"-র কাজ প্রায় শেষ হ'য়েছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

শ্রীজ্যোতিষ মুখার্জ্জীর "পায়ের ধুলো"-র কাজ ধীরে ধীরে এগুচ্ছে।

খেলার মাঠে

শ্রীদ্রোণাচার্য্য

লীগ খেলার উৎসাহ ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। এ বছর প্রত্যেকটি টিমই যেরূপ খেল্‌ছে তাতে জোর করে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলা খুবই শক্ত। খেলার ষ্টাণ্ডার্ডও এবছর খুবই উন্নত, তাই মাঠে অন্যান্য বারের চেয়ে এ বছর জনসমাগমও হচ্ছে অনেক বেশী।

গত সপ্তাহে যে সব খেলা হয়েছে নিচে সংক্ষিপ্ত ভাবে তার বিবরণ দেওয়া গেল।

ইষ্টবেঙ্গল ও ডিভন্‌স

ইষ্টবেঙ্গল ৩ গোলে ডিভন্‌স টিমকে পরাজিত করে। ইষ্টবেঙ্গল ভালই খেলেছিল কিন্তু এ দলটির প্রধান দোষ হচ্ছে সমগ্র মাঠ অতিক্রম করে গোল পোষ্টের কাছে এরা সব থেই হারিয়ে ফেলে। তা ছাড়া team work-এর অভাব বড় বেশী, সেণ্টার হাফে নুর মহম্মদের খেলা ভালই হচ্ছে।

হাওড়া ও ক্যালকাটা

ক্যালকাটা ৩ গোলে হাওড়া ইউনিয়নকে পরাজিত করে। হাওড়ার এখন থেকেই সাবধান হওয়া উচিত।

মহমেডান ও এরিয়ান্স

এরিয়ান্স ৩ গোলে লীগ বিজয়ী দলকে পরাজিত করে। সকলেই ভেবেছিল মহমেডানই জয়ী হবে। কিন্তু ফল হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথম ডিভিসনে ভারতীয় টিমের নিকট মহমেডান দলের এই প্রথম পরাজয়।

কাষ্টমস্‌ ও ব্ল্যাকওয়াচ

কাষ্টমস ৩ গোলে মিলিটারী দলকে পরাজিত করে। কাষ্টমস shocking team নামে পরিচিত। কাজেই কাষ্টমস কখন যে কী করে তা কেউ ভাবতেও পারে না।

ই, বি, আর ও ড্যালহৌসী

রেলওয়ে দল খুবই শক্তিশালী। কিন্তু এদের গোড়ার খেলা এরূপ নৈরাশ্যজনক ছিল যে ২ গোলে ড্যালহৌসীকে হারিয়ে দেওয়ায় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছে। সামাদ, মনা দত্ত, টি সোম, আনোয়ার—প্রত্যেকেই এ বছর এদলে খেলছে।

কালীঘাট ও ডিভনস

৫ গোলে কালীঘাট মিলিটারী দলকে পরাজিত করে। কালীঘাটের খেলা খুবই চমৎকার হয়েছিল। কিন্তু খেলায় রেফারিং এত খারাপ হয়েছিল যে তাতে খেলার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। রেফারিং সমস্যার সমাধান আজ পর্য্যন্তও সমস্যা হয়ে রয়েছে। আমরা এদিকে এসোসিয়েশনের দৃষ্টি আকর্ষণ কচ্ছি।

এরিয়ান্স ও ব্ল্যাকওয়াচ

মিলিটারীদল ১ গোলে জয়লাভ করে। এরিয়ান্স টিম মহমেডানকে পরাজিত করায় ওদের এ খেলাতেও জয়লাভ সকলেই ভেবেছিল। মিলিটারীদল মিলিটারী কায়দায় যথেষ্ট ফাউলিং গেম খেলেছে। এরিয়ান্স যথেষ্ট বাধা দেওয়া সত্ত্বেও শেষ মুহূর্ত্তে সৈনিক-দল ১ গোল দেয়।

ই, বি, আর ও হাওড়া

এ খেলার ফল হয় "ড্র"। উভয় দলই একটি করে গোল করে। রেলওয়েদল খুবই ভাল খেলেছিল। বিশেষ করে আনোয়ারের খেলা।

ক্যালকাটা ও মোহন বাগান

খেলার নামে এটি হয়েছে এক প্রহসন। মোহন বাগান টিমের খেলোয়ারগণ পায় দাড়িয়েই ছিল। এর কারণ সেই পুরাতন রেফারিং সমস্যা। কবে যে এর সমাধান হবে তা একমাত্র ভগবানই জানেন। এসোসিয়েসনের এদিকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তারা যথাপূর্ব্বম উদাসীন রয়েছেন।

কালীঘাট ও ইষ্টবেঙ্গল

১ গোলে ইষ্ট বেঙ্গল জয়ী হয় কিন্তু ইষ্টবেঙ্গলের খেলা মোটেই ভাল হয়নি।

মহমেডান ও ড্যালহৌসী

মহমেডান পেনালটিতেও গোল দিতে না পারায় খেলার ফল হয়েছে—ড্র। (১-১)

* * * *

জোর গুজব বাইরের তিনজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় কল্‌কাতায় খেল্‌তে আস্‌ছেন। তাদের ভেতর একজন আসবেন কালীকট থেকে এবং ল্যাফ্‌ লাইনের খেলায় তার জুড়ী কেউ থাকবে না। অন্য দুজন আসবেন বাঙ্গালোর থেকে। এঁরা কোন টিমে খেলবেন যথা সময়ে আপনারা তা জানতে পাবেন।

ইষ্টবেঙ্গল খেলোয়াড় লক্ষ্মীনারায়ণ নিজের কাজের জন্য বাঙ্গালোর রওনা হয়ে গেছেন।

* * * *

লীগ তালিকা

শনিবার পর্য্যন্ত খেলার ফলাফল অনুযায়ী :—

	খেলা	পয়েণ্ট
ব্ল্যাকওয়াচ	৫	৮
ক্যালকাটা	৪	৬
মহমেডান	৫	৬
মোহনবাগান	৪	৬
কালীঘাট	৪	৫
ইষ্টবেঙ্গল	৪	৪
হাওড়া	৫	৪
ই, বি, আর	৪	৩
এরিয়ান্স	৪	২
ড্যালহৌসী	৪	২
ডিভনস	৪	২
কাষ্টমস	৩	১

ছিটে ফোঁটা

বজ্রবাহু

সম্প্রতি কবি শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাদের একটি নতুন কথা শুনিয়েছেন—স্বর্গের দেবতাদেরও কামনা আছে এবং তাই নিয়ে ধরালোকেও কাব্যের সৃষ্টি হয়। (অবিশ্যি তাঁর মতো কবিরাই এই ধরণের কাব্য সৃষ্টি করেন)

বৈশাখের ছায়াবীথিতে সুরেশ বাবু লিখেছেন—

"আমাদের বুকের কামনা—দেবতার
বুকের কামনা—
দিকে দিকে দীপ্ত হ'য়ে জ'লে ওঠে
অনিত্য ভুবনে,
মায়া জাগে ছায়া রূপে,
ছায়া ধরে কঠিন শরীর স্থূল বাস্তবতা রূপী;
আমাদের বুকের কামনা—দেবতার
বুকের কামনা—
দান করে ধরণীর প্রতি ধূলি—রেণুকায়
সত্যের সাহস
প্রতি মুহূর্ত্তের বুকে সৃষ্টির সঙ্গীত,
আমাদের বুকের কামনা—দেবতার
বুকের কামনা—

বলবার কিছুই নেই—এরই নাম গদ্যকাব্য (Prosaic) গবিতা।

* * *

ধানখেত, বালুচর, সোজন বদিয়ার ঘাট, নক্সী কাঁথার মাঠ থেকে সম্প্রতি জসীম কবি ভবানীপুরে ফিরে এসেছেন—

"কি ভাই সুরেশ! কোথা যাইতেছ,
তাড়াতাড়ি কেন, ব'সনা একটু ভাই,
কোর্টে যাইবে, বারোটা ত বাজে, ভেবে লও
নাক, আজকে কাছারি নাই,
না হয় দাঁড়াও, দু মিনিট কিম্বা পাঁচ মিনিট,
এর বেশী নেব নাক
মাসিক কাগজে তুমি নাকি ভায়া অতি ঘন
ঘন কবিতা লিখিয়া থাক,
আমিও ওসব খবর রাখিনে, ভবানীপুরের
মিস্ উষাবতী সেন,
ভারি খাসা মেয়ে রবী ঠাকুরের কবিতাই যেন
পাতা ছিঁড়ে এসেছেন।
"টয়লেট করা রাঙ্গা মুখখানি, তোমার
কবিতা আওড়িয়ে যবে চায়,
ড্রইংরুমের মাদুর হইয়া মনে হবে তব
লুটাই সে পদ-ছায়।"

গেঁয়ো কবির ভবানীপুরের উষাবতী সেনের টয়লেট-করা রাঙ্গা মুখখানি দেখেই ড্রইংরুমের মাদুর হবার ইচ্ছে হয়েছে—আর একটু এগিয়ে বালীগঞ্জে এলে কবির কী দুরবস্থা হবে আমরা তো তাই ভাবছি। জসীম-উদ্দীন বালুচরে বাঁশরী হারিয়ে কি এইবার দক্ষিণ কলিতাকায় ধাওয়া করেছেন? রাঁচির দিকে অগ্রসর হতে আর কত দেরী—এইবার একবার সেইদিকে ঘুরে আসুন!—

* * *

আশাহত ইমাউল হক 'মিনতি' জানিয়েছেন—

"ভালবাসা দিও তোমার যোগ্য আর
কোন বন্ধুরে
আমার পরাণ ব্যথিত হবে না তবু।"

এ উদারতার বিরুদ্ধে আমাদের বলবার কিছুই নেই। সাধু! সাধু!

তিনি শুধু চাইছেন—

"দেহের বিলাস চাহিনা মোটেই,
তাই ত' তোমারে বলি,—
হাসিখানি দাও এতটুকু ভালবেসে;
তারি স্মৃতি খানি বুকে ধরি, আমি
জীবনের পথে চলি,
মরণের কোলে ঘুমায়ে পড়িব শেষে।"

এ কারুণ্যে কিন্তু আমরা ব্যথিত—তাঁর প্রেমের মর্য্যাদা নিশ্চয়ই উপেক্ষিত হবে না—ঘাবড়াও মাৎ!—

ক্রীকেট

বেঙ্গল জিমখানার এক বৈঠকে স্থির হয়েছে যে, আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রীকেট প্রতিযোগিতায় বাংলাও যোগদান করবে। এ সিদ্ধান্তটি যে খুবই ভাল তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

* * *

ভারতীয় ক্রীকেট খেলোয়াড় দলীপ সিং বিলাত রওনা হয়েছেন। তিনি সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট জানিয়েছেন যে, তিনি বিলাতে কোন খেলাতেই যোগদান কর্ব্বেন না। কারণ খেলা থেকে তিনি সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেছেন। ভারতের ক্রীকেট খেলা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন আসছে বার যখন ভারত থেকে ক্রীকেট টিম বিলাতে যাবে তখন ভারত যে খুব ভাল "ফাইট্" দেবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

বরবেশে রাজকুমার বসু

এটর্নীপাড়ায় প্রকাশ যে কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্নী শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পন করিবার প্রাক্কালে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। পুত্র-কন্যা ও দৌহিত্র সুখে সুখী হইয়াও প্রবীন বসু মহাশয় নবীনার আকর্ষণে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। মা ষষ্ঠীর কৃপা তাঁহার উপর শীঘ্রই পুনরায় বর্ষিত হউক এবং অনতিক্রান্ত যৌবন রাজকুমার বাবুর নব পরিণীতা পত্নীর সিঁথির সিন্দুর অক্ষয় হউক ইহাই আমরা কামনা করি।

ব্রীজ খেলা

দুর্ব্বাসা
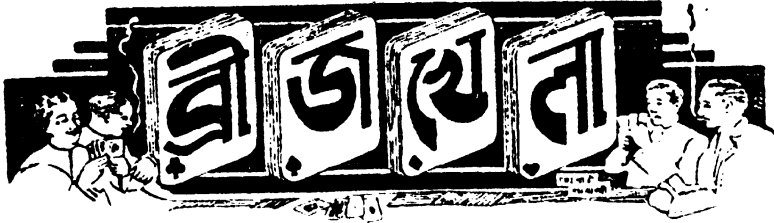
শ্লাম-তথ্য :—কণ্ট্রাক্ট খেলার বিশেষত্ব হচ্ছে শ্লাম ডাক। পরস্পরকে পরস্পরের হাতের জ্ঞাতব্য তথ্য জানিয়ে ছয়-খানি বা সাতখানি ডাক দিয়ে খেলা করতে পারা কণ্ট্রাক্টের চরমোৎকর্ষ। এতে প্রিমিয়ামও সুপ্রচুর। এখন কি উপায়ে পরস্পরের হাত জানিয়ে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাস কয়টির খবর দেওয়া বা নেওয়া চলতে পারে তা' এখানে জানাচ্ছি—।

দুই রকম ভাবে শ্লাম সম্ভাবনা জানান যেতে পারে—প্রত্যক্ষ ভাবে ও পরোক্ষ ভাবে (direct and indirect slam inferences)।

প্রত্যক্ষ ভাবে শ্লাম জ্ঞাপনা :—(১) গেমের চেয়েও বেশী ডাক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ডাক দিলে। (যেমন খেঁড়ী 'খ' তিনখানি ইস্কাবন পর্য্যন্ত ডাক দিয়েছেন 'ক' জবাবে চারখানি ইস্কাবন না বলে পাঁচখানি ইস্কাবন ডাক দিলেন।) (২) ডাক খুব উঁচুতে উঠলে যদি ডাকদার বা তাঁর খেঁড়ী সে অবস্থায় বিপক্ষের উল্লিখিত কোন ডাক দেন। মনে করুন 'ক' ডেকেছেন একখানি ইস্কাবন, 'আ' বলেছেন দুইটী হরতন, আর 'খ' বলেছেন তিনটি রুহিতন। তারপরে 'আ' বা তাঁর খেঁড়ী 'অ' কিছু ডাক দেননি। 'ক' ও 'খ' দুজনে মিলে ডাক বাড়িয়ে চারখানি ইস্কাবন ডাক তুলেছেন, এমন সময় তাঁদের যে কেউ ডাক দিলেন পাঁচখানি হরতন (বিপক্ষের রঙ)। এ ডাকের অর্থ হচ্ছে এই, "বন্ধু, এই হরতনের প্রথম পিঠ আমি নোবই—হয় আমার হাতে টেক্কা আছে নয় হরতন একেবারে নেই। আমি মনে করি শ্লাম আছে তবে হরতনের জন্যে তুমি ভেবনা, তোমার হাতে আর বেশী কি আছে জানাও।" (৩) কালবার্টসন্ প্রবর্ত্তিত চারখানি ও পাঁচখানি No Trump নিয়ম। এ ডাক শ্লাম-সম্ভাবনা জ্ঞাপনের অতিচমৎকার পন্থা। পরে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলছি।

পরোক্ষ ভাবে শ্লাম-জ্ঞাপনা :—(১) খেঁড়ীর শক্তি-জ্ঞাপক ডাক। (ডাকদারের নির্দ্দিষ্ট রঙ ব্যতীত অন্য যে কোন রঙের একটি বাড়্তি ডাক। ১৩৪১ সালের ১৬ই ফাল্গুনের 'খেয়ালী' দেখুন।) (২) প্রারম্ভিক দুই-এর ডাক (২রা ফাল্গুনের 'খেয়ালী' দেখুন)। (৩) ডাকদারের একটি রঙের ডাকের জবাবে খেঁড়ীর তিনখানি No Trump ডাক (অন্ততঃ সাড়ে তিনখানি অনারের পিট হাতে থাক্লে তবে এ জবাব দেওয়া যেতে পারে;—১৭ই মাঘের 'খেয়ালী' দেখুন।) (৪) ডাকদারের একটি রঙের ডাকের জবাবে খেঁড়ীর উক্ত রঙের 'গেম' ডাক (১০ই মাঘ ও ১৭ই মাঘের 'খেয়ালী' দেখুন)।

শ্লাম-সম্ভাবনা নিরূপণ :—মিলিত হস্তে শ্লাম-সম্ভাবনা আছে কি না তা' জান্তে হলে প্রধানতঃ দুইটী বিষয় বিশেষ অনুধাবন করে দেখা প্রয়োজন।

(১) মিলিত-হস্তের হাতের বিভাগ বেশ ভাল হওয়া চাই (অর্থাৎ রঙের প্রাচুর্য্য, অন্য কোন রঙের দৈর্ঘ্য এবং বাকী একটী বা দুইটী রঙের মাত্র একখানি তাস হাতে থাকা চাই)। মনে করুন 'ক' ডাক দিয়েছেন একখানি ইস্কাবন আর 'খ' নিম্নলিখিতরূপ হাত পেয়েছেন :—

ইস্কাবন—সাহেব, দশ, নয়, আটা, দুরি;
হরতন—সাহেব, বিবি, গোলাম, দশ, আটা, চৌকা, তিরি; রুহিতন—আটা; চিড়িতন নাই।

এ হাত নিয়ে 'খ' সহজেই বুঝতে পারবেন যে তাঁদের শ্লাম-সম্ভাবনা বর্ত্তমান। কেবল তাঁর জানা প্রয়োজন যে 'ক' হরতন এবং রুহিতনের টেক্কা পেয়েছেন কি না? যদি তিনি উক্ত দুইটি টেক্কা পেয়ে থাকেন তবে Grand slam এবং উক্ত দুই রঙের যে কোন একটি টেক্কা পেলে Small slam অবধারিত। শ্লাম-নিরূপণ করতে হলে হাতের বিভাগ খুব ভাল হওয়া চাই।

(২) মিলিত হস্তে ন্যূনকল্পে সাড়ে ছয়খানি অনারের পিট থাকা চাই। অবশ্য এ হল সাধারণ নিয়ম। হাতের বিভাগের শক্তির উপর অনারের পিটের পরিমাণ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে। সাধারণ হাতের বিভাগ হলে অর্থাৎ ৪—৩—৩—৩ কিম্বা ৫—৩—৩—২ হলে হয়ত সাড়ে সাত-খানি এমন কি আটখানি অনারের পিটেও শ্লাম না হতে পারে আবার হাতের বিভাগ ভাল হলে পাঁচখানি বা সাড়ে চারখানি অনারের পিটেও শ্লাম হতে পারে! উপরে উল্লিখিত উদাহরণ দেখ্লেই এ কথার যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারবেন। উক্ত হাতে 'খ'র আছে মাত্র দেড়খানি অনারের পিট। আর 'ক' যদি মাত্র সাড়ে চারখানি অনারের পিট পেয়ে থাকেন তা' হলেই grand slam অবধারিত। কিম্বা তিনি যদি মাত্র চারখানি অনারের পিট পান তা' হলে small slamও সুনিশ্চিত। মনে করুন 'ক' নিম্নলিখিত

হাত পেয়ে একটি ইস্কাবন ডাক দিয়েছেন।

ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম, সাতা, ছক্কা, পাঞ্জা, তিরি; হরতন—টেক্কা, দুরি; রুহিতন—টেক্কা, নয়, সাতা, তিরি, দুরি; চিড়িতন—নাই।

এ ক্ষেত্রে 'ক'-র হাতে আছে মাত্র তিনখানি অনারের পিট, আর তাঁর খেঁড়ীর হাতে আছে দেড়খানি অনারের পিট (একুনে সাড়ে চারখানি) অথচ মিলিত হস্তে grand slam আছেই। আবার মনে করুন 'ক' মাত্র আড়াইখানি অনারের পিট পেয়ে একখানি ইস্কাবন ডাক দিয়েছেন (উল্লিখিত উদাহরণে রুহিতনের টেক্কার পরিবর্তে রুহিতনের সাহেব বসিয়ে দিন) তা'হলেও তাঁদের সম্মিলিত হস্তে মাত্র চারখানি অনারের পিট থাকা সত্ত্বেও small slam অবশ্যম্ভাবী। তাই বল্‌ছিলাম, হাতের বিভাগের উপর নির্ভর করছে সবই। কিন্তু এরূপ প্রচণ্ড শক্তিব্যঞ্জক হাতের বিভাগ প্রায়ই দেখা যায় না। তাই অনারের পিটের উপর নির্ভর করে স্লাম নিরূপণ করাই যুক্তি-সঙ্গত। তাই সাধারণতঃ মনে রাখতে হবে যে ন্যূনকল্পে সাড়ে ছয়খানি অনারের পিট মিলিত হস্তে না থাকলে স্লাম সম্ভাবনা নিরূপণ করা নিরর্থক। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে বল্‌ব।

বোস্‌পাড়া এপোলো ক্লাব:—ড্রিল, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা প্রভৃতি যাঁরা দেখে থাকেন তাঁরা সকলেই বোস্‌পাড়া এপোলো ক্লাবের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। এরা যে শুধু ছোরা লাঠি খেলেই থাকেন তা' নয়, তাসের খেলায়ও এদের নাম হচ্ছে বেশ। এদের সমিতির প্রধান গুণ এই যে নিয়মিতভাবে ব্রীজের চর্চ্চা হয় এবং অধিকাংশ প্রতিযোগিতার খেলায়ই এদের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে এমন কতকগুলি খেলোয়াড় আছেন যাঁদের খেলা দেখে খুবই আনন্দ হয় এবং মনে হয় যে ভবিষ্যতে এই সমিতি থেকে আন্তর্জ্জাতিক খেলোয়াড় পাওয়াও যেতে পারে। খেলাধূলার মহলে সুপরিচিত সুপ্রসিদ্ধ ক্রীকেট খেলোয়াড় শ্রীযুক্ত কালাধন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে এই সমিতির উন্নতি হচ্ছে বেশ। যে শক্তিবলে তিনি বাঙ্গলার ক্রীকেট মহলে তাঁর নাম অক্ষয় করেছেন, আমরা আশা করি সেই শক্তিবলেই তিনি তাঁর সমিতিকে নামজাদা সমিতি করে তুলবেন।

রবীন্দ্রনাথের অভ্যাস দোষ?

২৬শে বৈশাখ তারিখের "ভারত" পত্রিকায় বোম্বাই ফেরত লিখিতেছেন :—

"১৩২৩ সালের ফাল্গুন মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে 'রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে' প্রকাশ যে—একদা চন্দ্রশেখর বাবুর "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের কথা উঠিলে রবিবাবু বলিয়াছিলেন, "চন্দ্রশেখর বাবু ইদানীং আমায় বলিতেন যে, তাঁহার ও-লেখাটা ভাল হয় নাই, ওটার ভিতর বিশেষ কিছুই নাই।"

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি বাহির হইবার পর "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের" লেখক চন্দ্রশেখর বাবুকে তাহা দেখান হইয়াছিল, তাহাতে চন্দ্রশেখর বাবু বলিয়াছিলেন, "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম সম্বন্ধে রবিবাবুর সঙ্গে আমার কখনও কোনও কথা হয় নাই! রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গের এতদ্‌বিষয়ের কথাগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা"

('সাহিত্য', ২৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)।

ইহার পর সমালোচক মহাশয় বলিয়াছেন, "দেখা যাইতেছে, রবিবাবুর এই উক্তি ১৩১৮ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র গত মাঘ-সংখ্যার বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, রবিবাবু ইহা পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে চন্দ্রশেখর বাবুর পরলোক প্রাপ্তি হইলে কোন গোলই থাকিত না—।"

দুই-ই হইতে পারে। হয়—রবিবাবু ঐরূপ কোন কথা মোটেই বলেন নাই, 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা, নয় তো রবিবাবু সত্যই ঐরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া থাকিবেন; অর্থাৎ চন্দ্রশেখর বাবু তাঁহার কাছে ঐরূপ কোন কথা না-বলিলেও তিনি বলিয়াছিলেন, "চন্দ্রশেখর বাবু ইদানীং আমায় বলিতেন যে, তাঁহার ও-লেখাটা ভাল হয় নাই। ওটার ভিতর বিশেষ কিছুই নাই।" এই উক্তি যে মিথ্যা তাহা চন্দ্রশেখর বাবু নিজে সকলকে জানাইয়া দিয়া গিয়াছেন এবং রবিবাবুও তাহার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ও-সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া, তাহা মানিয়াই লইয়াছেন।

এই পুরাতন প্রসঙ্গ এতদিন পরে তুলিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না, যদি না রবীন্দ্রনাথ লিখিতেন,—একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছেন, "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।" তখন চন্দ্রশেখর বাবু জীবিত ছিলেন, তাই—তৎপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় জীবিত নাই তাই তিনি—রবীন্দ্রনাথের তৎসম্পর্কে উক্তি যে মিথ্যা—তাহা স্বয়ং প্রতিবাদ করিবার সুযোগ পাইলেন না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—লোকে যাহা বলে না, তাঁহার নাম করিয়া তাহা বলা রবিবাবুর অভ্যাস-দোষে পরিণত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের অবিচল।"

গোবর্দ্ধনবাবু

(নক্সা)

শ্রীনীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

সে ছিলো বেজায় মোটা। সে রকম মোটা বড় একটা দেখা যায় না। নেহাৎ এক পাড়াগাঁয়ের জমিদার ছিলো তারা। দু'ভাই—সেই-ই ছোট। বাপ মারা যাবার পর, জমিদারী তাদের মধ্যে সমান বখরা হয়ে গেলো। ছোট ভাই বল্লে—'আমার ষ্টেটের ভার দাদা তুমি-ই নাও, আমি ওসব পারবো না,—কিছু কিছু খরচ দিও, ব্যস্—তা'হলেই চলে যাবে।" বড় ভাই তাতেই রাজী, কোন আপত্তি তুল্লে না,—কেন না এতে তার লাভ ছাড়া তো আর লোকসান নেই।

ছোট ভাই অর্থাৎ আমাদের গল্পের 'হিরো' যিনি, তাঁর নাম ছিলো শ্রীমৎ গোবর্দ্ধন বাবু। এখন থেকে তাঁকে আমরা গোবর্দ্ধন বাবু বলেই ডাকবো।

গোবর্দ্ধন বাবু মোটা হয়ে স্বস্তি পেতেন না। ইচ্ছে তাঁর ছিলো কি করে রোগা হবেন। রোগা লোক দেখলেই তিনি তাকে কাছে ডেকে গায়ে গা-টা বুলিয়ে নিতেন, কেন না কে যেন তাঁকে বলেছিলো—'রোগার হাওয়া লাগলে রোগা হওয়া যায়।' তাঁর ইচ্ছে ছিলো একটা রোগা দেখে বউ ঘরে আনা, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি, সকলেই বলেছিলো—'তার বউ হবে রোগা', কিন্তু কনেকে বিয়ের আসরে উপস্থিত করতেই তিনি যখন দেখলেন—এ'ও তাঁরই মত একটী, তখন তিনি বলে উঠেছিলেন—Div-o-r-c-e.

কিন্তু হায়, 'ডাইভোর্স' করা কি যেন, কেন তার হয় নি! আঁচলে গাঁট-ছড়া বেঁধে তাকেই ঘরে তুলে নিতে হয়েছিলো।

রোগা হবার আশায় তিনি এক সময় এক সাধুর আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই সাধু তাকে বলেছিলো—আপনি যদি প্রত্যহ এক ঘণ্টা করে পায়ে দড়ি বেঁধে মাথা নীচু করে গাছে ঝুলতে পারেন, তা'হলে মাসখানেকের মধ্যে আপনি হয়ে যাবেন এক তালপাতার সেপাই।

এই সুযোগ তিনি কিন্তু ছাড়তে পারেন নি, তবে পায়ে না বেঁধে তিনি হাতে দড়ি বেঁধে একদিন অতি কষ্টে পাঁচ মিনিট চোদ্দ সেকেণ্ড ঝুলেছিলেন। এইতেই তিনি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে—রোগা না হ'তে যাওয়াই ভালো।

হঠাৎ একদিন তাঁর খেয়াল চাপলো—কোল্‌কাতায় যাওয়ার। সে দেশে তিনি নাকি কথখোনো যান্ নি। সেখানে নাকি এমন অনেক ডাক্তার কোবরেজ পাওয়া যায়,

যাত্রা মোটা লোককে অনায়াসেই রোগা করতে পারে। দু'দিনের মধ্যেই সব যোগাড় হ'য়ে গেলো, তিনি তো আর একলা যেতে পারেন না, তাই সঙ্গে নিলেন একটা উড়ে চাকরকে। সে কিম্বা তার বাবা অথবা তার বংশের কে নাকি একবার কোলকাতায় গেছলো,—সেই জন্যেই তাকে সঙ্গে নেওয়া। যাবার আগে উড়ে মালিটা কোমর বেঁধে বলেছিলো—"মু সব চিন্নুছি বাবু"। এর বেশী আর কথা ছিলো না,—সেই দিন-ই সব ঠিক ঠাক হয়ে গেলো। সন্ধ্যের ট্রেণে সেই দিন 'হরি হরি' করতে করতে উড়ে মালিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কোল্‌কাতায় রওনা হ'লেন।

তিনি গিয়ে উঠলেন 'সেকেণ্ড ক্লাসে' আর উড়ে মালি গেলো 'থার্ড ক্লাসে'। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে এমন সময় গোবর্দ্ধন বাবু ছুটে এসে গাড়ীতে উঠলেন। গাড়ী ছেড়ে দিলে—কোল্‌কাতার উদ্দেশে।

ট্রেণ-এ চড়তেই ট্রেণ ছাড়ার একটা ঝাঁকুনি এসে তাঁর গায়ে লাগলো। তিনি যাহোক করে পিছন দিকে না চেয়েই চেয়ার খানায় বসে পড়লেন।

এদিকে সেই চেয়ারে এক ক্ষীণাঙ্গী মেম ঘুমুচ্ছিলো। যেমনি বসা সেই চেয়ারে, মেমের তো দম্ আট্‌কে যাবার যোগাড় হয়ে উঠলো। বিশাল চাপে মেমের ঘুম তো ভাঙ্গলোই, তার ওপোর নিঃশ্বাস আট্‌কে প্রাণ যায় আর কি! উপায়ান্তর না দেখে মেম করলে কি—জোরে দিলে এক কামড়!

উঃ—বলেই চেয়ার থেকে লাফিয়ে গোবর্দ্ধন বাবু সাম্‌নে ছিট্‌কে পড়লেন। পিছন ফিরে দেখলেন—একটা সাদা-মূর্ত্তি হাত-পা নাড়ছে আর মুখ দিয়ে যেন খই ফোটাচ্ছে।

গোবর্দ্ধন বাবু কাচু মাচু হয়ে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। দু' চার বার ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেও বাকি রাখ্‌লেন না।

খানিক পরে মেম শান্ত হয়ে গেলো, একটা চেয়ারে বসে গোবর্দ্ধন বাবুকে একটা চেয়ারে বস্‌তে বল্‌লে ঐ কোণের দিকে। গোবর্দ্ধন বাবুর বুক কাঁপছিল,—কি বিপদ, ওরে বাবা,—একেবারে মেমের পাল্লায়।—

চেয়ারে বসেই গোবর্দ্ধন বাবু ঘুমিয়ে পড়লেন, আর নাসিকা গর্জ্জন সুরু হলো—ভোঁস—ভোঁস—

মেম তখন সবে মাত্র ঘুমবার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু নতুন বিপদে তার গা মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো,—কোথাকার একটা 'নিগার,' ট্রেণও থামে না,—অন্য কামরায় যাওয়া যায় তা'হলে।

মেম গেলো ভীষণ রেগে, গোবর্দ্ধন বাবুকে বেশ করে ঠেলতে লাগ্‌লো। কিন্তু ঘুম তার ভাঙ্গলো না—সে যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম।

ঘুম ভাঙ্গে না দেখে মেম গোবর্দ্ধনেরই পকেট থেকে নস্যির ডিবেটা খুলে গোবর্দ্ধনের নাকের সামনে ধরলে,—এক নিঃশ্বাসে সেই সবটা নস্যি তার নাকের ভেতর চলে গেলো। এবং পর মুহূর্ত্তেই ভীষণ একটা হাঁচির সঙ্গে সেই গুলো একরাশ কফের সঙ্গে মেমের গায়ে এসে লাগলো। তারপর হাঁচি, সে হাঁচি আর থামে না! পায়ের নোখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত মেমের জলে উঠ্‌লো। কি আর করে বেচারি, চড় দিয়েও তার কাজ হাসিল হলো না! গোবর্দ্ধন বাবুর দ্বিগুণ নাসিকা গর্জ্জন সুরু হলো। মেম গা-হাত ধুয়ে পোষাক বদল করে ফেল্‌লে, গোবর্দ্ধন বাবুর দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে রইলো, ইচ্ছে হচ্ছিলো তার গিলে ফেল্‌তে।

হঠাৎ মেম লাফিয়ে উঠলো, একটা ব্র্যাণ্ডির বোতল খুলেই গোবর্দ্ধন বাবুর হাঁ-করা মুখে দিলে ঢেলে।

গোবর্দ্ধন বাবুর পেট ছিলো ভরপুর, তার ওপোর ব্র্যাণ্ডি যেমন পেটে যাওয়া—অম্‌নি কামানের ফায়ারের মত পেটের যত মাল-মশলা বমির আকারে মেমের গায়ে এসে লাগলো—মেমের সমস্ত শরীর একেবারে ভেসে গেলো।

সাম্‌লাতে না পেরে মেম চালিয়ে দিলে —কিল, চড়, ঘুসি—ব্র্যাণ্ডির বোতল, চায়ের কাপ, আরশী, চিরুণী, যা সামনে পেলে তাই গোবর্দ্ধন বাবুর গায়ে বর্ষণ করতে লাগলো।

এই বার গোবর্দ্ধন বাবুর ঘুম ভাঙ্গলো। তিনি মেমের অগ্নি-মূর্ত্তি দেখে এমন ভয় পেয়ে গেলেন যে—মেমের কিল-চড়-ঘুসি উপেক্ষা ক'রে সেই বিশাল বাহু নিয়ে মেমের পা দুটো জড়িয়ে ধরতে ছুটে গেলেন। মেম ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো,—সে কিল-চড় থামিয়ে ভয়ে 'সিগ্‌নাল্‌-চেন' ধরে ঝুলে পড়লো। গোবর্দ্ধন বাবুও সেই শুভ-মূহূর্ত্তে মেমের পা-দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

কড়-কড় করে ট্রেণ থেমে গেলো। গার্ড, ক্রু সব ছুটে এলো; সারা ট্রেণখানায় হৈ হৈ পড়ে গেলো। সকলে এসে দেখলে—একটা মেম 'সিগ্‌নাল্‌' ধরে ঝুলছে, আর গোবর্দ্ধন বাবু তার পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে রয়েছেন। কোন কথা না বলে গার্ড এসে গোবর্দ্ধন বাবুকে ধরে ফেল্‌লে। মেম বুঝিয়ে দিলে—এই লোকটা ট্রেণে উঠে তার উপর অত্যাচার করবার চেষ্টা করছিলো।

গোবর্দ্ধন বাবু কেঁদে ফেললেন। নিকটের ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌লো, পুলিশ এসে গোবর্দ্ধন বাবুকে গ্রেপ্তার করলে। বাবুর অবস্থা দেখে উড়ে মালি কেঁদে উঠলো। কি আর হবে? সে পরের ট্রেণেই বাড়ী ফিরে এলো। বিচারে গোবর্দ্ধন বাবুর দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হ'লো।

যাই হোক এই জেল হওয়ায় তার একটা বড় উপকার হয়েছিলো। রোগা হবার সাধ তার পূর্ণ হলো, কেন না—তিনি যখন জেল থেকে বেরুলেন, তখন তিনি প্রায় সিকিখানা হয়ে গেছলেন।

রোগা হবার সাধ ভগবান তার এম্‌নি করেই পূর্ণ করলেন!

সাহিত্য পরিচয়
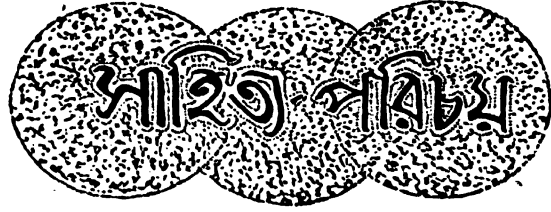
সেতু—(কবিতার বই) শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত। রয়েস্ পাবলিসিং, কালিঘাট। মূল্য এক টাকা।

সমসাময়িক পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট এই তরুণ কবি অপরিচিত নন্। কিছুকাল হইতে প্রবাসী, পরিচয়, বিচিত্রা, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি কাগজে নন্দগোপাল বাবুর কবিতা দেখা যাইতেছে, এবং যাহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারাই দেখিয়াছেন যে, কবিতাগুলিতে একটা সহজ স্বচ্ছন্দতা, একটা মধুর আন্তরিকতা বর্ত্তমান, কোথাও তারুণ্যের আতিশয্যের আত্মম্ভরী উগ্রতা নাই। যে সকল কবিতার বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীতে আধুনিক পাশ্চাত্য কবিদের ছায়া বর্ত্তমান (নবীন কবির পক্ষে যুগপ্রভাব এড়াইয়া যাওয়া কঠিন), তাহার মধ্যেও তাঁহার এই মাধুর্য্য ও আন্তরিকতার স্বকীয়তা বর্ত্তমান। কবিতাগুলি পড়িলে মনে সত্যই আনন্দ জাগে, মনে হয় একজন সহৃদয় ভক্তিমান্ পূজারী কাব্যভারতীর মন্দিরের পথ খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। তিনি এখনও হয়তো ঠিক পথ খুঁজিয়া পান নাই, কিন্তু তাঁহার সাফল্য সম্বন্ধে মনে কোনো সন্দেহ থাকে না।

বর্ত্তমান যুগের যন্ত্রের চাপ, জীবনের কামনা ও ক্লেদ, পাপ ও বীভৎসতাকে তিনি অস্বীকার করেন নাই বা কল্পনার ফুৎকারে উড়াইয়া দেন নাই। তিনি তাহা স্বীকার করিয়াছেন, ব্যথার সঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি আমাদের শুনাইয়াছেন কামনা ও বাসনা নিপীড়িত মানুষের অতৃপ্তির গান, কুৎসিত বীভৎসতার মধ্যেও সুন্দরের জন্য মানুষের চিরন্তন দীর্ঘশ্বাস। ডি, এচ্, লরেন্সের ব্যর্থ অনুকরণকারী উগ্রপন্থী অতি-আধুনিকদের সহিত এইখানেই তাঁর প্রভেদ।

'হাসপাতাল' কবিতায় কবি বলিতেছেন:—

"মস্ত বিছানা বিছানো রয়েছে আকাশতলে,
উপরে আশার আস্‌মানী-দীপ ঝিমায়ে জ্বলে;
উৎসুক চিতে দেখি আর শুনি সুমুখে পাছে,
ভরা বেদনায় জ্বলে রোশ্‌নাই সানাই বাজে!
আজিকার ব্যাধি সেরে যেতে পারে হাসপাতালে.
জীবনের ব্যাধি সারিবার নয় জীবন-কালে;"

"শৃঙ্গার" কবিতায় কবি মানুষের প্রেমের দেহজ মিলনের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন "আত্মঘাতী সরীসৃপসম" এই প্রেম মানুষকে কিরূপ "পুরীষ-পিচ্ছিল-পথে" টানিয়া লইয়া যায় এবং ক্রমে তাহার জাগে "ছিন্নমস্তাবৃত্তি

"একি ছিন্নমস্তাবৃত্তি? নিজরক্ত নিজে পান করি'
মেটে না পিপাসা তবু!
আরো চাই, আরো রক্ত চাই!
এই প্রেম!

এরই লাগি' যুগে যুগে মানুষের এত
অশ্রুপাত ?

গুণীর সঙ্গীতালাপ ? কবির কবিতা ?
শিল্পীর আলেখ্যপট ?

হায় প্রবঞ্চনা—
হায় ভণ্ড বিজ্ঞাপন দেহ-বিপণির !
'ঘৃণা করি তবু চাই, চাই তবু ঘোর
ঘৃণা করি।"

আমরা এই নবীন কবিকে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাই।

স্পর্শের প্রভাব—কুমার শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম, এ,। ৫নং কার্ত্তিক বসুর লেন, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস লাইব্রেরী, কমলা বুক ডিপো ও শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বাহিরের আড়ম্বর ও চাকচিক্য যখন মনকে মুগ্ধ করে তখন মানুষের আপনার ঘরের সরল আড়ম্বরহীন জীবন আর মনে ধরে না। সে তখন বাহিরের ওই ধার করা ঐশ্বর্য্য লইয়া মাতামাতি ধাপাধাপি করে। সুপ্রতিষ্ঠ আত্ম প্রবুদ্ধ মানুষের চক্ষে এই অস্বাভাবিক মত্ততা অত্যন্ত বিসদৃশ্যই বোধ হয়। আজকাল পাশ্চাত্য সাহিত্যের ব্যর্থ অনুকরণে আমাদের উপন্যাসে এইরূপ ধার করা "প্লটে"-র ঐশ্বর্য্য লইয়া একটা মাতামাতি সুরু হইয়াছে। এইরূপ অস্বাভাবিক আবহাওয়ার মধ্যে কুমার ধীরেন্দ্র নারায়ণ যে বাঙ্গলার একান্ত ঘরোয়া জীবনের সহজ আড়ম্বরহীন "প্লট" লইয়া ভারতীর অর্ঘ্য সাজাইয়াছেন, এজন্য তিনি রসিক সুজন মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। রণেন্দ্র, রাজেশ্বরবাবু, জ্যোৎস্না, তারকনাথ, সোণামাসী এমন কি তরলা ও গুপে গুণ্ডা পর্য্যন্ত কেহই আমাদের অপরিচিত নয়।

আখ্যানটী পড়িতে স্বতঃই পাঠকের মন ইহাদের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া উঠে, লেখকের সহিত পাঠকের চিত্তের যোগাযোগ ঘটিয়া আখ্যানভাগের চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া উঠে। ইহা একজন নবীন উপন্যাসকারের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। অপরাজেয় কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার পরিচায়িকাতে সত্যই বলিয়াছেন "ধীরেন্দ্র নারায়ণ আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করিয়াও অতি আধুনিকতার স্পর্শদোষ বাঁচাইতে কায়মনে চেষ্টা করিয়াছেন, তাই গল্পের ভাষা, ভাব ও আখ্যানবস্তু হয়ত অনেকের চোখে গত যুগের বলিয়া ঠেকিবে; কিন্তু বিগত মাত্রকেই যাহারা অশ্রদ্ধেয় জ্ঞান করেন না, বরঞ্চ অতীত ও বর্ত্তমানের নিগূঢ় যোগসূত্রটুকু প্রীতি ও অনুরাগের সহিত আজও মনের মধ্যে লালন করিয়া চলেন, তাঁদের এই বইখানি ভালই লাগিবে।"

দেহ-যমুনা

(নাটক)

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

প্রথম দৃশ্যের সারাংশ

[প্রদ্যোত ধনীর ছেলে। কয়েকদিন থেকে সে রাত্রে বেরিয়ে ভোরে বাড়ী ফেরে বলে তার শিক্ষিতা স্ত্রী অণিমার সঙ্গে তার মনোমালিন্য। তাদের এই মনোমালিন্যের সুযোগ নিয়ে প্রদ্যোতের বাল্য বন্ধু স্বপন রায় (ডাক্তার) অণিমাকে বোঝাতে লাগলো প্রদ্যোত অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করে। অণিমা তাই বুঝতে লাগলো। কিন্তু প্রদ্যোত কোন খারাপ জায়গায় রাত্রি যাপন করে না। সে তার প্রফেসরের মেয়ে গীতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার—তার বাপ মারা যাওয়ার পর থেকে নিয়েছে বলে সময় করে উঠতে পারেনা বাড়ী ফেরবার।]

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ভবানীপুরে গীতার ড্রয়িং রুম। দেখা গেল গীতা ও বিজয় দুখানি চেয়ারে বসিয়া আছে। গীতা কি লিখিতেছে। তাহার বয়স ১৮-১৯এর বেশী হইবে না। দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী]

বিজয়—দেখি কি লিখলে? নাঃ তোমাকে নিয়ে আর চল্‌লোনা। সব উল্টে পাল্টে বসে আছ?

গীতা—যে বিশ্রী জিনিষ। ওকি কোন ভদ্রলোকে ঠিক রাখতে পারে?

বিজয়—না না ফের লেখো। পা মাপা নিনিধা নিনিধা পামাপা।

গীতা—পা মাপা নিধা নিধাপা—

বিজয়—ধ্যেৎ! নিনিধা নিনিধা পামাপা।

গীতা—নিনিধা নিনিধা পামাপা।

বিজয়—ধাধাপা ধাধাপা গামা।

গীতা—ধাধাপা ধাপা গামা।

বিজয়—আঃ! শুধু ধাপা নয়। ধাধাপা ধাধাপা—

গীতা—দূর ছাই! ও আমি পারবোনা। ভাল লাগছে না আজ আর এসব স্বরলিপির কচ্‌কচি। তার চেয়ে বরং সেই গানটা গান সেদিন যেটা শেখাবেন বলছিলেন।

বিজয়—নাঃ, তোমার কিছু হবেনা দেখছি। (উঠিয়া গিয়া হারমোনিয়ামে বসিয়া গাহিল)

গান

আজি তন্দ্রা বিলিন মম নয়নে,
হেরি নিমগন তুমি সুখ শয়নে।
কার অন্ধ যামিনী ভরি—
ক্রন্দন পড়ে ঝরি—
বন্ধনহীন মোহ বয়নে॥
মোর দুখের দিনে মোরে নিলেনা,
এই বাঞ্ছিত বুকে ধরা দিলেনা,
বন্ধুরে রাখি দূরে—
তুমি ফেরো সুরে সুরে—
দূরতম বনে ফুল চয়নে॥

গীতা—আচ্ছা, আপনি এত ভাল গান কী ক'রে?

বিজয়—ওসব হচ্ছে সাধনার বিষয়।

গীতা—সাধনা জিনিষটাতো আমরাও করতে পারি। আপনার কতদিন লেগেছিল?

বিজয়—আমার? ওস্তাদের কাছে যখন যাই—সে আজ প্রায় দশ বছর আগের কথা; ওস্তাদজি স্রেফ হারমোনিয়ামের 'সা' পর্দ্দাটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন—এইখানে তিন মাস ধরে গলা ভেড়াও।

গীতা—আপনি ভেড়ালেন?—

বিজয়—হ্যাঁ-আ। যে সে গলা আবার সব সময় ভেড়েনা, সেও আবার ঈশ্বর দত্ত হওয়া চাই।—

গীতা—(কৌতুকচ্ছলে) বা-ব্বাঃ! গান শেখা তা'হলেতো দেখছি বেশ শক্ত ব্যাপার?—

' বিজয়—শক্ত ব্যাপার নয়? এই ধরনা কেন এই তানটা, (একটা তান তুলিয়া) এ বার করা কি যে সে লোকের কাজ—না যার তার দ্বারা হয়?

গীতা—আচ্ছা—তাহ'লে আমারও তো হবেনা?—

বিজয়—তোমারও অবিশ্যি chance কম। তবে ভরসা এই যে তোমার Vocal cordটা বলে ভালো। এখন যেমন সাদা সাপ্টা শিখছো তাই শেখো,—এর পরে দেবো দু'একখানা দামী জিনিষ।

গীতা—আচ্ছা।

বিজয়—আরে, এই কথা নিয়েই তো সেদিন স্বপন রায়ের সঙ্গে আমার ঝগড়া। বলে কি না মাঠের জিনিষ drawing room-এ কেন? আ-গেল যা! তুই তার বুঝবি কি? তুই হ'লি ডাক্তার!

গীতা—স্বপন রায় কে? নামটি তো বেশ!

বিজয়—সে একটা অতি বোগাস্ হামবাগ ডাক্তার। বেটার fine arts-এ মোটে নেই taste, এদিকে নাম রেখেছে স্বপন—কু-স্বপন কোথাকার। (গীতা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।)

বিজয়—দেখ তুমি এই বদ্ স্বভাবটা ছাড়ো। যখন কেউ seriously talk করছে, তখন খিল্ খিল্ ক'রে হেসে ওঠার কোন মানে হয় না—চুপ কর।

গীতা—আচ্ছা। (মুখে কাপড় চাপা দিল।)

বিজয়—তুমি বড় careless, তোমার কখনও কিছু হবে না। আচ্ছা এই ব্যাড্-মিণ্টনের ব্যাট্‌টা এখানে ফেলে রেখেছ কেন—কী কাজে লাগে ওটা?

গীতা—ওটা ব্যাট নয় স্যার। ওকে বলে র‍্যাকেট—টেনিস র‍্যাকেট। র‍্যাকেটকে ব্যাট বলতে নেই।

বিজয়—(উঠিয়া) ত্যাখো যা জাননা তা' নিয়ে তর্ক ক'রতে এসো না। ওটা ব্যাট নয় টেনিস র‍্যাকেট? হাইকোর্ট দেখাচ্ছ, নয়? আচ্ছা দু'টোতে তফাৎ কী বোঝাও আমাকে। (হাসিতে হাসিতে গীতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতেই বিজয় তৎক্ষণাৎ পাগলের মত তাহার হাত ধরিয়া টানিল।)

বিজয়—না না আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাও। অপমান করার মজা দেখাচ্ছি তোমাকে।

গীতা—বা রে! আমি আপনাকে অপমান করলাম? আপনি নিজে জানেন না কাকে কী বলে—আর দোষ হ'ল আমার? বা রে?

বিজয়—আমি কিছু জানি নে! তোমার সাহস তো কম নয়! আমি কিছু জানিনে? কী বলবো তুমি স্ত্রীলোক—

(প্রদ্যোতের প্রবেশ—তাহার মুখে একটা মোটা বর্ম্মা)

প্রদ্যোত—এই যে! দিব্যি গণ্ডগোল বাধিয়েছ? কি হচ্ছে বিজয়?

বিজয়—এই যে দাদা। দেখুন আমি আর এখানে আসবো না।

প্রদ্যোত—কেন? কী হ'ল আবার তোমাদের?

বিজয়—না, হয় নি কিছু; তবে—এই মেয়েটির temper ভাল নয়। (গীতা আবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া উঠিল)—ওই দেখুন, দেখছেন?—এই সব সহ্য ক'রে আজও যে আমি আসি দাদা, সে শুধু ভালবাসি ব'লে।

(দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল)

প্রদ্যোত—ব্যাপার কী?—

গীতা—সে আর বোলোনা। এই পদার্থটিকে উনি বলতে চান—ব্যাড্‌মিণ্টন ব্যাট, আমি বললাম—না, ওটা টেনিস র‍্যাকেট ব্যস্ আর যায় কোথায়?—

প্রদ্যোত—এরপর থেকে ওকে আর তুই সংশোধন কর্‌বার চেষ্টা করিসনে ভাই তাহলে ঠিক ও পালাবে। কথাবার্ত্তায় ওর একটু সামঞ্জস্যের অভাব আছে। তা যাক্—গান শেখাচ্ছে তো?—

গীতা—হ্যাঁ।

প্রদ্যোত—ক'খানা শিখ্‌লি?—

গীতা—খান পাঁচেক।

প্রদ্যোত—একখানা গেয়ে শোনাবি নে?—

গীতা—শোনাচ্ছি। (গীতা ভিতরে গিয়া একটু পরে এক কাপ চা লইয়া ফিরিয়া আসিল। তারপরে হারমোনিয়ামে গিয়া বসিল)—

—গান—

আজি ঝর ঝর উতরোল বাদল নামে
একি গুরু গুরু গরজন গগণ-গাঙে॥
সারা ভুবন ভরিয়া এযে
কী গান উঠেছে বেজে
সুরখানি এসে মোর দুয়ারে থামে।
সজল-জলদ-জাল দিনের দুখে
নীরবে চাহিয়া আছে ব্যথিত মুখে
যেন কোন বিরহিনী দয়িত লাগি
ভাসিছে চোখের জলে রজনী জাগি
তার বিজলীমালিকা দোলে অলকদামে॥

[গানের মাঝখানে 'পঞ্চম' 'পঞ্চম' করিয়া চীৎকার করিতে করিতে বিজয়ের প্রবেশ]

বিজয়—হচ্ছেনা, হচ্ছেনা, পঞ্চমের কাজটা কিছু হচ্ছেনা। ওটা না ওঠাতে পারলে গান আর তুমি গেয়োনা।—

গীতা—না উঠলে আমি কি করবো?

বিজয়—(ভ্যাংচাইয়া) না উঠলে আমি কি করবো? এদিকে ব্যাট আর টেনিস-র‍্যাকেট নিয়ে গলাতো খুব ওঠে, তখন তো আটকায়না!

প্রদ্যোৎ—বিজয়! দোহাই তোমার, গানটা আমায় শুনতে দাও ভাই। তুমি এ সময় আর পঞ্চমের বাগড়া দিওনা।

বিজয়—যা খুসী হোকগে। ঐ ধাড়ী মেয়ের কখন গান শেখা হয়—মরুকগে যাক্।

(বিজয় চলিয়া গেলে গীতা গান শেষ করিল)

প্রদ্যোৎ—বেশ হয়েছে।—

(নীচে কড়া নাড়ার শব্দ হইতে, গীতা উঠিয়া ছাদে গেল)—

গীতা—কে?…হ্যাঁ এই বাড়ী।…কাকে চাচ্ছেন? ও! আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি।—

প্রদ্যো—আমায় ডাকছে কেউ?

গীতা—হ্যাঁ। একবার নীচে যাও।—

[প্রদ্যোৎ চলিয়া গেল। গীতা গুণ গুণ করিয়া একটা গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে ঘর গুছাইতে লাগিল]

বিজয়ের প্রবেশ—

বিজয়—আমি বাড়ী চল্লাম।—(গীতা কোন উত্তর দিল না)—

বিজয়—এক ডাকে কি কথা কানে যায়না? আমি যে একটা কথা বল্লাম—সেটা শুনতে পেয়েছ?—(গীতা নিরুত্তর)

বিজয়—(ধমকাইয়া) এই?

গীতা—কী?—

বিজয়—আমি বাড়ী যাচ্ছি!—

গীতা—আমি তার কী জানি? (আবার কাজ করিতে লাগিল)—

বিজয়—(বিস্ময়ে)—তুমি তার কি জানো! মানে? (একটুপরে ও! আবার বাগও আছে দেখছি।—(গীতা কথা কহিল না)—

বিজয়—(একটুপরে) এই?—

গীতা—কী বারে বারে এই এই কোরছেন? আমার কি নাম নেই নাকি?

বিজয়—ওঃ! নামের যা ছিরি, ও নাম ধরে আর ডাকেনা।—

গীতা—আপনার করবার মত নয় মশায়!

বিজয়—আমার নাম? ..নে কি জানো? যা পরাজয় নয়। আমার কাজ হচ্ছে কেবল জয় করা।

গীতা—(হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া) কী জয় করা?—

বিজয়—কেন—ইয়ে,—ইয়ে জয় করা।—

(প্রদ্যোত ও প্রভবের প্রবেশ)

প্রদ্যোৎ—গীতা! বিজয়! এসো তোমাদের সঙ্গে আমার একটি বাল্য-বন্ধুর আলাপ করিয়ে দি'। ইনি হচ্ছেন প্রভব গুপ্ত, দিল্লীতে থাকেন। আর এঁরা হচ্ছে বিজয়,—আমার একটি দুর্দ্দান্ত sentimental ভাই (গীতা বিজয়ের দিকে চাহিয়া মুখে কাপড় চাপা দিল—বিজয় কট্‌মট্ করিয়া তাহার দিকে চাহিল) আর এ গীতা—আমার বোন।—

বিজয়—আমাকে কি এখন এখানে থাকতে হবে?—

গীতা—না থাকলেও চলে।—

বিজয়—আমার একটু কাজ আছে। (বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।)—

(ক্রমশঃ)

ডায়েরীর ছিন্ন-পত্র

[সাহিত্যের প্রভাব]

রঞ্জন

মাটির বুকের ওপর এসে মানুষ যখন আশ্রয় নেয় তখন থেকেই তার ভেতর একটা আকাঙ্খা, একটা বাসনা, একটা স্পৃহা জেগে ওঠে, সীমার বাইরে ছেড়ে যেতে চায়!...

বাইরে থেকে তার পরিচয়, সে একজন পৃথিবীর জীব, কিন্তু তার আসল পরিচয় তার ভেতরকার দিয়ে, মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়ে!...

এই সীমাহীন বিচিত্র নীলিমার বুকের ওপর বিন্দু বিন্দু ভাবে অগণিত তারা জ্বলে মিট্‌মিট্ ক'রে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র তকারারাশির ভেতর যে কী এক বিচিত্র কাহিনী বাস করে, তা মানুষ যখন ভাবে, তখন সে দিশেহারা হ'য়ে পড়ে!...ভাবে, সে আরও ভাবে, কিন্তু দিশা পায় না তার!...

তেমনি মানুষের বাসনাও। ছোট্ট সীমারেখা টেনে দিয়ে যখন সে মার কোলে আসে, তখনই সে কেঁদে ওঠে, তার প্রাণের ভেতরকার একটা সুপ্ত বাসনা জেগে ওঠে—মার দুধ পান করে!...শিশু কাঁদে মায়ের দুধের জন্য, এ চিরন্তন! এ কাউকে ব'লে দিতে হয় না!...শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এটার সন্ধান পায়!...এ প্রকৃতিগত!...

তারপর পৃথিবীর বুকের ওপর এক পা, দু'পা ক'রে যখন সে এগিয়ে চলে, তখন থেকে একের পর এক ক'রে বাসনাও জেগে ওঠে তার মনের মধ্যে। এটা চাই, ওটা চাই, সেটা না হ'লে চ'লবেই না, ওটা তো পাবার কথা, ইত্যাদি।...বাসনার সীমা যেন নেই তার কাছে!...

আজ বাঙ্গালা সাহিত্যকে ফলে-ফুলে সাজিয়ে দেবার জন্যে পূজারীদল দাঁড়িয়ে আছে মায়ের দ্বারে সাজি হাতে ক'রে!...

শীর্ণ মায়ের জীর্ণ বস্ত্র আর সেই তাঁর অঙ্গে, তাঁর অঙ্গে এখন নানাসাজে সজ্জিত, সু-আননখানি যেন হেসে নেচে দুলে ওঠে!...

বাণীর চরণ-কমলে আজ প্রণতা দু'জন, যাঁদের কথা সহজেই মনে পড়ে আমাদের—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র!

রবীন্দ্রনাথ লেখার ভেতর দিয়ে যে জিনিসটি ফোটাতে চেয়েছেন, শরৎচন্দ্রও তাই চেয়েছেন।...

দু'জনকার লেখার তুলনা ক'রতে গেলে এক কথায় বেশ ক'রে বুঝিয়ে বলা যায়—রবীন্দ্রনাথ যেন এলেন স্বর্গ-থেকে পারিজাত কুসুম চয়ন ক'রে মায়ের মাথায় মুকুট ক'রে পরিয়ে দিতে, আর শরৎচন্দ্র, দূরের ঐ পাঁক-জলাশয় থেকে একটি ফুটন্ত কোকনদ নিজ-হাতে তুলে নিয়ে এলেন মায়ের রাতুল চরণে অর্ঘ্য দিতে ভক্তি ভরে।...

বঙ্কিম যেদিন বাঙ্গালা সাহিত্যে অমৃত বিতরণ ক'রতে এলেন সেদিন এল' বাঙ্গালায় এক নতুন যুগ, এক নতুন আলো, এক নতুন চিন্তাধারা!...লোকে চ'মকে উঠে, এ-ওকে ব'লে—বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন!...অমনি অপরজন দশ-হাত বুক উঁচু ক'রে আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে বলে—হুঁ, এমনি!...

আজ সারা বাঙ্গালা, সারা বাঙ্গালা কেন, সারা পৃথিবীর চোখ পড়ে এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির ওপর—লোকেদের চলা-ফেরা, কথাবার্ত্তা, কাজ করবার কৌশলাদি সবই বিদেশকে চমক লাগিয়ে দেয়, বলে, হাঁ!...তারা বলে, বাঙ্গালা সাহিত্য চলে ঠিক নদীর জোয়ারের মতন উদ্দাম গতিতে, তাই বুঝি বাঙ্গালা সাহিত্য ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, পৃথিবী-সাহিত্যের একটি বিশেষ স্থান লাভ করে!...

তাঁরা যেমন একদিকে আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠেন আবার তেমনি হতাশার সুরও কাণে ভেসে আসে—আজকাল বাঙ্গালায় কি লেখা বেরোয়?...লেখকের শক্তির হ্রাস হ'ল নাকি?...

ঘরের কোণে, ছাদের তলায়, সিঁড়ির ধাপে ব'সে কিশোর ভাই-বোনেরা বই পড়ে আড়ালে, বাবা ওঠেন চ'টে বলেন, হ্যাঁ রে, আমার আলমারীতে যে রামায়ণ, মহাভারত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত,

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইগুলো ছিল, সে সব কোথায়? আর সে গুলোর বদলে এ সব কিসের বই? আগুন নিয়ে খেলা, বিবাহের চেয়ে বড়, ক্রৌঞ্চ-মিথুন, মনের মতন, যত সব রাবিশ্!...আর ছাই, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, কেদার বাঁড়ুয্যে—এদের বইগুলোও যত্ন ক'রে রাখতে হয়, নীচে ধুলোয় প'ড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে?...কে করেছে এ সব?

রাগে কটমট্ ক'রে পেছন ফিরতেই সাত-বছরের ভাই মলয় শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে যায়। বাবা রাগের মাথায় তাকেই এক ধমক দিয়ে বলেন, বল্ কে রেখেছে?

সে কাঁদ-কাঁদ ভাবে বলে, বাঃ, আমি কি জানি? ছোট মাসীমা আর ফুলদিই ত' তোমার আলমারীতে হাত দিয়েছিল কাল!...

আর যায় কোথায়!

অমনি হাঁক ছাড়েন, প্রবাসী!

ফলে মেজ বোন প্রবাসী আর ছোট মাসী [প্রবাসীর সমবয়েসী] সুষমা বকুনি খায় অনেক। বাবা রাগ ক'রে শেষে যবনিকা টানেন, আজকাল লেখকদের জ্বালায় বাড়ীর ছেলে মেয়েদেরও ভাল ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারা যায় না!...

আমি আমার ছাদের ঘরে [চিল কোঠাতে] ব'সে কী যেন লিখছি। কানে আসে বাবার কথাগুলো। হাসি, অর্থহীন সে হাসি!...

কী একটা কাজে সিঁড়িতে নামতেই দেখি সুষমা সিঁড়ির-ধাপ থেকে কী একটা বই আঁচলের ভেতর লুকায়। আমাকে দেখে একটু মুচকে হাসে মাত্র। আমি জিজ্ঞাসা করি, কি বই ও?

সে আমায় ইসারায় চুপ ক'রতে ব'লে আস্তে বলে, না, তুমি রাগ ক'রবে তা হ'লে?

আমি আরও একটু হেসে বলি, আমায় রাগ ক'রতে দেখেছো কখনো?

আস্তে আঁচল থেকে বার ক'রে সুষমা দেখায় চুপিচুপি—প্রাচীর ও প্রান্তর!...

কিছু বলি না, নেমে পড়ি।

ভাবি, সাহিত্যই জাতীয় জীবনের উন্নতির প্রধান সোপান!...
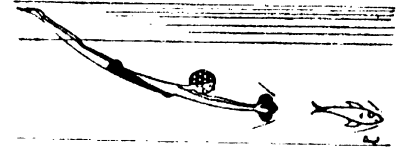
নাট্য-তরঙ্গ

"দীনবন্ধু সম্মিলনী"

নাটুকেদলের নায়ক আমাদের প্রিয় সুহৃৎ, বাগবাজারের প্রসিদ্ধ, সর্ব্বজনপ্রিয় কালী বাবু অভিনয় রজনীতে (শনিবার ৪ঠা মে) নিমন্ত্রিতদের অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আপ্যায়িত ক'রেছিলেন। একালে এ রকম আদর আপ্যায়ন প্রায় দেখাই যায় না,—কিন্তু নায়ক ম'শায় বিনয়ের মাশুল দিয়ে এই অসহ্য গরমে হলঘরে পাখা-না-দেওয়ার ত্রুটীটা বোধ হয় শুধ্রে নিচ্ছিলেন। আমাদের তখন মনে হ'য়েছিল—কালীবাবুর সমাদরের অতিমাত্রাটা একটু কমিয়ে যদি আমাদের সকলকে বিজলী পাখা-তাড়িত হাওয়ার ঘূর্ণির মধ্যে ছেড়ে দিতেন—আমরা কিছুমাত্র মনঃক্ষুণ্ণ হ'তুম না। আপ্যায়নের আতিশয্য মন ঠাণ্ডা করে বটে—কিন্তু ঘর্ম্মাপ্লুত দেহটাকে শীতল করে না তো। উপরন্তু হলে বিছানো ফরাসের ওপর বিনা-তাকিয়ায় গায়ে গায়ে ঠেস্ দিয়ে ব'সে অনেকেই বস্‌বার কষ্টটা কমিয়ে নিচ্ছিলেন। একাক্রমে ৯৷৷০ থেকে ১৷৷০টা পর্য্যন্ত স্থূলকায় দর্শকদের কষ্ট দেখে (অধিকাংশ দর্শকই স্থূলবপু ছিলেন) আমরা কালীবাবুকে তাকিয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিলুম—কিন্তু তিনি এতোদূর ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁকে এই উপদেশটী দেবার সময় ক'রে উঠতে পারি নি।

আমরা আজকাল জলসা ব'ল্‌তে বুঝি, কতকগুলি অন্ধগায়ক ও দুগ্ধপোষ্য বালিকার জনতা। কিন্তু সেদিন পর্দ্দা ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুমান একটি ছয় বছরের বালিকাকে (শ্রীমতী গীতা রায়) হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইতে শোনা গেল। তিন তিনখানা গান গেয়েও ঐ বালিকাটির চড়াসুর বেসুর হয় নি। মেয়েটির স্বর, তান, লয় ও দম সবই খুব প্রশংসনীয়। আমাদের বিশ্বনিন্দুক দুর্ব্বাসা দাদা পর্য্যন্ত বালিকার গান শুনে ব'ল্লেন যে তিনিও নাকি এরকম গাইতে ব'সে দমে কুলিয়ে উঠতে পারতেন না। মাণ্যবর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্রের শ্রদ্ধেয়া জননী এই বালিকার গানে মুগ্ধ হ'য়ে একটি পদক পুরস্কার দিয়েছেন।

*   *   *

"অলীক বাবু" প্রহসনটির অভিনয় সকলকেই হাসিয়েছিল। এক আধ স্থানে অতি-অভিনয় সত্বেও অলীকপ্রকাশের অভিনয়ই সকলের চেয়ে ভালো বলা যায়। ওস্তাদের ভূমিকায় যে ভদ্রলোক অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন—তাঁর ভূমিকানুযায়ী কমিক্ চেহারার সঙ্গে ভাও বাত্‌লানোর অপূর্ব্ব ঢঙ্ মিলে চমৎকার হাস্য-রসের আবহাওয়া তৈরী ক'রেছিল। প্রসন্ন "ঝি"-এর ঠাট ঠমক্ দেখে শুধু "গদাধর" কেন আমাদের ক্রনিক্ ব্যাচিলার দুর্ব্বাসা দাদার পর্য্যন্ত চিরকৌমার্য্য-ব্রত খণ্ডে যাবার উপক্রম হ'য়েছিল। অন্যান্য ভূমিকা চলনসই।

*   *   *

"শ্রীচরণেষু" নামে বিট্রকেল-বিরচিত বাজে ছ্যাব্‌লামি-টি-কে একখানি ঊনপঞ্চাশ-শ্রেণীর প্রহসন বলা যেতে পারে।—দু' এক কথায় আখ্যানটি এই—ছেলের সাহিত্যের দিকে বড় ঝোক্। বাপ তাইতে চট্‌লো। ছেলেকে শিক্ষা দেবার জন্যে একদা বিদেশ থেকে বাপ টেলিগ্রাম পাঠালে ছেলেকে—সে ম'রেচে। ছেলে নব্যমতে চা-বিস্কুট খেয়ে বাপের শ্রাদ্ধ করলে। বাপ সেই শ্রাদ্ধের দিনে এসে হাজির, কিন্তু ভূত ব'লে তা'কে তাড়িয়ে দেওয়া হোলো। বাপ মনের দুঃখে সাধু হ'য়ে গেল। এদিকে ছেলেটিকে আজকালকার তথাকথিত হামবড়া সাহিত্যিকরা ঠকিয়ে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে দিলে। সাধু বাপ ছেলেকে উদ্ধার ক'রলে। বাপ ও ছেলের মিল্ হোলো। ছেলে নাকে কানে খৎ দিয়ে ব'ল্‌লে—"বাবা এবার থেকে আপনার "শ্রীচরণেষু"।—

বইটির ভিতর হাস্য- রস তো দূরের কথা কাতুকুতু দিয়ে হাসাবার প্রচেষ্টাও বিফল হ'য়েছে। বইটির ভিতর মৌলিকতাও কিছু নেই; কারণ বাগবাজারের স্বনামধন্য "৮—বোস্" ঠিক এই রকম ব্যাপারই ক'রেছিলেন, অধিকন্তু তাঁর চিতায়-চড়া চিতেবাঘ-মার্কা শ্রীবপুখানির ফটো পর্য্যন্ত পাঠিয়েছিলেন। আমরা মনে ক'রচি—এইরূপ eccentric মনের একটি নক্সা আঁকবার জন্যে অতি-আধুনিক "পুরাণ-প্রবেশ"-এর জন্মদাতা গিরীন্দ্রশেখর বসুকে অনুরোধ ক'রে পাঠাবো। দুর্ব্বাসাদাদার অভিমতটা কিন্তু নেওয়া হয়নি।

*   *   *

ইন্দ্রগোপ-সম্পাদক দুর্ল্লভ বাবুর রূপসজ্জা, বাচনভঙ্গী, ও সঙ্গীত আমাদিগকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ ক'রেছিল। কিন্তু এ প্রশংসা গ্রন্থকারের প্রাপ্য নয়। প্রাপ্য তাঁরই ষোলো আনা, যিনি এই ভূমিকাটিতে নেমেছিলেন। বল্‌তে কি চরিত্রটিকে তিনি নতুন কোরে ঢেলে সেজেছিলেন। "চণ্ডী বাবু"র রাম-প্রসাদী গানখানা নিন্দার হয় নি। তবে

তাঁর রূপসজ্জাটার দিকে আর একটু নজর দেওয়া কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল। "সমরে"র কবি ভাবের চাউনীটুকু বেশ ভালোই লাগ্‌ছিল। কিন্তু কতকগুলি দৃশ্য (—যথা নেতা ও ঘুঘনীওয়ালা) সম্পূর্ণ অবান্তর—রসসৃষ্টির বদলে রসভঙ্গই ক'রেছে। অবশিষ্ট ভূমিকা একরূপ চলনসই। আমাদের মনে হয় দীনবন্ধু সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ সত্যিকারের একখানি প্রহসন বেছে নিলে বোধহয় বেশ নাম করতে পার্ত্তেন। কারণ হাস্যরসের অভিনয় করতে তাঁরা যে সকলেই দক্ষ তার নমুনা আমরা একাধিকবার পেয়েছি।

* * *

মধ্যে মধ্যে বিরামের সময় একটি ট্যাব্‌-ঢেবে গ্রামোফোন শ্রোতৃবর্গের বিরক্তি উৎপাদন করছিল। যন্ত্রটির এ দুর্দ্দশা কেন জিজ্ঞাসা করায় ক্ষীণকায় "দুর্ল্লভ বাবুর মোটা দাদা"টি বল্লেন, সকাল থেকে খালি বরফ-জল খেয়ে খেয়ে সাউণ্ডবক্সের (ইমাম বক্সের ইনি কেহ নহেন) গলা ব'সে গিয়েছে।

দীনবন্ধু সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষ মধ্যে মধ্যে আমাদের যেন এরূপ আনন্দ দান থেকে বঞ্চিত না করেন—ইহাই তাঁহাদের কাছে অনুরোধ। আমরা সম্মিলনীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীক্ষেমীশ্বর

রঙমহলে "পথের সাথী"

গেলো বেস্পতিবার দিন রঙমহলে তাঁদের নতুন নাটক "পথের সাথী"র অভিনয় দেখে এলুম। অভিনয় দেখে এসে এত খুসী হয়েছি যে কাকে রেখে কার স্তুতি গাইবো ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছিনে; সত্যিই এত সুন্দর হয়েছে "পথের সাথী"র অভিনয়। রঙমহলে একটা জিনিষ যা আমাদের মন সহজেই আকৃষ্ট করে, সেটা হ'চ্ছে এই সম্প্রদায়ের team work. "পথের সাথী" অভিনয়ে নটনটীরা কেউ চোক ধাঁধান বা তাক লাগানো অভিনয় করেন নি, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে নটনটীদের অভিনয়—যার ইংরিজী পরিভাষা হিসেবে অভিনয়ের general standard বলা যেতে পারে—এত উঁচু স্তরের হয়েছিল যে ৫॥০ ঘণ্টার অভিনয় দেখতে আমাদের মনে একটুও বিরক্তি ঠেকেনি।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর উপন্যাসখানিকে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী "পথের সাথী" নাটকে রূপান্তরিত করেছেন। একে অনুরূপা দেবীর বই, তার উপর যোগেশ চন্দ্রের মত নাট্যকার, দুইয়ের যোগাযোগে যে একখানি চমৎকার নাটকের সৃষ্টি হবে, তা বলার কি প্রয়োজন আছে? নাট্যকার যোগেশচন্দ্র তাঁর প্রবীন বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে এই উপন্যাসখানিকে নাটকাকারে গ্রথিত করেছেন; তিনি গতানুগতিক পন্থা অর্থাৎ সোজা একখানি উপন্যাসের কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি সব শুদ্ধই নাটকের মধ্যে বজায় রাখেন নি; তিনি মূল গল্পটী অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন জিনিষের অবতারণা করে একখানি উপভোগ্য নাটকের সৃষ্টি করেছেন। তাই "পথের সাথী" নাটক অভিনয়ের সাফল্য

সম্বন্ধে তাঁর কৃতিত্ব আছে অনেকখানি। এই প্রসঙ্গে আরো দু'জন আছেন যাঁদের দাবী যোগেশ বাবুর চেয়ে বেশী না হলেও, কিছু কম নয়; এঁরা হচ্ছেন "পথের সাথী"র যুগ্ম-প্রযোজক শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র ও সতু সেন। "পথের সাথী"র দৃশ্যপট অতি সুন্দর হয়েছে। খুব উচুদরের অভিনয়, তার উপর এমন চমৎকার দৃশ্যপট সত্যিই আমাদের ভুলিয়ে দেয় যে আমরা অভিনয় দেখছি। "পথের সাথী"র অভিনয়ের অসামান্য সাফল্যের জন্য এই প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী-ত্রয়ীকে—(শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী, নরেশ মিত্র ও সতু সেন)—জানাই আমাদের হর্ষ-উল্লসিত অন্তরের স্তুতিবাদ!

অভিনয়ের প্রশংসা ব্যাপকভাবে আগেই জানিয়েছি, নতুন করে বলবার কিছু নেই। তবুও ওরই মধ্যে যদি তারতম্য করতে হয় তবে আমরা সর্ব্বাগ্রেই নরেশ বাবুর কথা বলবো। নরেশ বাবু রূপ দিয়াছিলেন এক আত্ম-ভোলা, সরল-প্রাণ স্কুল মাষ্টারের। তাঁকে "অমর মাষ্টারের" রূপে আমাদের ভুলতে অনেক দেরী হবে। শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরীর "বসন্ত সেন" হয়েছিল সুন্দর। "শশাঙ্কে"র ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী এমন তৃপ্তিদায়ক অভিনয় করেছেন, যা অনেকদিন তাঁর কাছ থেকে পাইনি। রবি রায়ের "শরদিন্দু" ভালোই লাগলো। "অর্দ্ধেন্দু ডাক্তারের" অংশে ইন্দুবাবু আমাদের অসন্তুষ্ট করেন নি। কৃষ্ণধন বাবুর "জ্ঞান চন্দর" আমাদের খুসী করেছে। ভূমেন রায়ের "নরেন্দ্র নারায়ণ" বেশ কৌতুকের সঞ্চার করেছিলো। হীরালাল চট্টোর "দাদু" নাতি-নাতনীদের মন কাড়তে সক্ষম হোয়েছে। রতীন বন্দ্যোর "হিরন্ময়" শান্ত, সংযত ও চরিত্রোপযোগী অভিনয় করেছেন। ছোটো খাটো ভূমিকাগুলি বেশ সু-অভিনীত।

স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে আমাদের সেদিন অভিনয়ে মুগ্ধ করেছিলেন "শোভা"র অংশে শ্রীমতী চারুবালা। তিনি যেমন অভিনয় করেছিলেন সুন্দর, গানও গেয়েছিলেন তেমনি চমৎকার, বিশেষ করে "ওমা গৌরী, তুই পরের ঘরে" গানটী আমাদের খুবই ভাল লেগেছিলো। শ্রীমতী শান্তি গুপ্তাও "পথের সাথী"র নায়িকা "রুবির" অংশে আমাদের কম খুসী করেন নি, তবে গোড়ার দিকের তাঁর গান দু'খানিতে দরদের একটু অভাব মনে হোয়েছিলো। তা প্রথম অভিনয়ে সেটা এমন কিছু মারাত্মক নয়। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী "বিন্দুবাসিনী"র ভূমিকায় তেজোদৃপ্ত অথচ, ধীর স্থির অভিনয়ে আমাদের মনে দাগ দিতে পেরেছেন। শ্রীমতী আশমানতারার "সরযূ" বেশ ভালোই। শ্রীমতী রেণুবালাকে পরচর্চ্চা অর্থাৎ পরনিন্দা বিলাসিনী প্রতিবেশী "আন্নাকালী" রূপে আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে। পদ্মাবতীর "প্রতিমা" আমাদের বেশ মিষ্টি লেগেছে। "নর্ম্মদা", "সুমতি" ও অন্যান্য স্ত্রী ভূমিকাগুলি রঙমহলের সুনামের হানি করে নি।

"পথের সাথী"র অভিনয়ে একটু খুঁত যা আমাদের চোখে পড়েছে, তা হ'চ্ছে রুকুম পুরের রাজসভার দৃশ্যের অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য। এই অনাবশ্যক দৈর্ঘ্যের জন্যে ভূমেন রায়কে একঘেয়ে মনে হচ্ছিল। আর একটা কথা: সম্প্রতি আমাদের রঙ্গালয়ের বৈতালিকের বেতালা কর্কশ সুরের গানের কসরৎ, কিম্বা চড়কের সন্ন্যাসীর গাজনের নাচ ইত্যাদির উপর বড়ই সুনজর পড়েছে—এগুলোর অভিনয়ের সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই, তবে এগুলো কোন নাটকে অনাবশ্যক জুড়ে দেওয়ার সার্থকতা কেউ আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন কি?। রুকুমপুরের রাজসভার দৃশ্যটি ছাঁটকাট করে একটু সংস্কার করা প্রয়োজন।

পরিশেষে আবার আমরা বলি যে "পথের সাথী"র অভিনয় দেখে আমরা যথার্থ তৃপ্তি লাভ করেছি এবং আমাদের স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে সেদিন ৫॥০ ঘণ্টা সময়ের এক মিনিটও আমাদের অস্বস্তি লাগেনি। "পথের সাথী"র অভিনয় জমে উঠেছে প্রথম অঙ্কের গোড়া থেকেই, এবং আমরা ৫॥০ ঘণ্টার সারাক্ষণই অসীম কৌতূহলের সঙ্গে দৃশ্যের পর দৃশ্য অনুধাবন করে গিয়েছি। রঙমহলের কর্তৃপক্ষকে তাঁদের "পথের সাথী" অভিনয়ে অসামান্য সাফল্যের জন্যে অভিনন্দিত করি।

—শ্রীনটনাথ

ওপারের ছায়া

বভ্রুবাহন বটব্যাল

কার কী রকম খাওয়া

"নুণ বেশী নয়"—গেবল্।

"চিনিটা বাদ"—ব্যারীমুর।

"মাষ্টার্ড বেশী"—বিয়ারী।

ছোট ছোট কাগজে লেখা এ রকম সব কথা হলিউডে মেট্রোর রেষ্টুরেণ্ট-এ ঝুলছে। তাই দেখে বেয়ারারা যাকে যে রকমভাবে খাবার দেবার দেয়। নিয়মগুলো যথাসময়ে এবং যথাযোগ্য স্থানে খাটে কিনা—তা দেখবার জন্যে আবার ওয়েট্রেস্ মেয়েরা আছে। তারা ঘুরে' ঘুরে' দেখে গেবল্-এর ডিস্-এ নুণ কম পড়লো কিনা, ব্যারীমুরের চায়ে চিনি না মেশানো হ'লো কিনা, আর বিয়ারীর চপ্-এ মাষ্টার্ড পড়লো কিনা বেশী।

"গার্বো নিজেই সব করেন।"—বলে আরেকটি কাগজ-টুক্রো। রেষ্টুরেণ্ট থেকে গার্বোর সাজ-ঘরে যখন মধ্যাহ্ন ভোজ পাঠানো হয় তখন তার খাবারে চিনি কিম্বা নুন কিম্বা অন্য কোন জিনিষ—কিছুই মেশানো বারণ। সব থাকে আলদা আলাদা পাত্রে—রহস্যময়ী নিজেই নিজের রুচি অনুসারে সব মিশিয়ে নেয়।

"আলু পাঠাবে বেশি"—লেখা আছে জেনেট্ ম্যাক্ডোনাল্ডের নামের তলায়। সুকণ্ঠী জেনেট্ তরকারীটাই পছন্দ করে বেশী—তার ভেতর আবার আলু।

"হেলেন হেজ্ ঝাল্ খান বেশী।" "স্যালাডে লেবুর রসের পরিমাণ কম—মিস্ ক্রাওফোর্ড অপছন্দ করেন।" "নর্মা শিয়ার—যবের রুটী।" "কম-সেদ্ধ গরুর রোষ্ট খেতে চান এভেলিন্ লে।" "জ্যাকী কুপারের জন্য মাংসের স্যাণ্ডউইচ" ইত্যাদি হরেক রকমের সব উপদেশ মেট্রো-রেষ্টুরেণ্ট-এর কালো বোর্ডে দিন-রাত ঝুলছে—বেয়ারারা ভুলে' গেলেও যাতে অনায়াসে মনে করতে পারে।

দুই এভলিনের বিয়ে

হলিউডে নাম-করা এভলিন আছে দু'জন।—এভলিন ভেন্এবল্ আর এভলিন লে। এ দু'জনকে নিয়ে কিছুদিন আগে ভারী এক মজার ব্যাপার হয়ে গেছে।

নামের মিল থাক্লেই যে জীবনের মস্ত বড় এক শুভ দিনেরও মিল্ তাদের থাক্তে হবে এর কোনো মানে নেই। কিন্তু, সেদিন এই দু' এভলিন প্রমাণ করেছে—না, আছে মানে। ব্যাপারটি অতো ঘোরালো না করে' একটু সরল যদি করি—তা হলে হয় এই—এদের দু'জনের এক মাসের একই দিনে, একই রকম উপায়ে একই জায়গায় বিয়ে হয়েছিলো।

সে দিন ছিলো সাত তারিখ। সকাল বেলা হঠাৎ এভলিন ভেন্এবল্ আর ক্যামেরা ম্যান হল্ মহর হলিউড থেকে এরোপ্লেন করে' পালালো অ্যারিজোনায়। সেখানে জজ ফ্রিম্যানের আফিসে তারা পরস্পরের আংটি বদল করে। ঠিক আধঘণ্টা বাদেই আরেকখানা এরোপ্লেনকে দেখা গেলো হলিউড থেকে আস্তে। ভেতরে আলিঙ্গনাবদ্ধ ভাবী বর-কনে' এক জোড়া। মেয়েটি হচ্ছে এভলিন লে, পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, আর ফ্র্যাঙ্ক লটন্ 'ডেভিড কপারফিল্ডে'র নায়ক। নেবে তারাও জজ ফ্রিম্যানের আপিসে বললে 'আই ডু'।

কিন্তু, অমিল্ এক জায়গায়

সেটা হচ্ছে, যার যার বাপ-মায়ের মতামত। মিস্ লে'র বাড়িতে অমত নেই নিশ্চয়ই, কারণ—তারা ভাবে মেয়ে যা করছে তাই ভালো। কিন্তু, বেচারী ভেন্এবল্ এর অবস্থা তা নয়। আপনাদের বলেচি কিনা মনে পড়চে না—এভলিন ভেন্এবল্ কড়া এক প্রফেসরের মেয়ে। সে যখন ছায়াছবিতে ঢোক্‌বার ইচ্ছে প্রকাশ করলে—তখন তিনি তো চটে'ই আগুন। মহা হৈ চৈ। অবশেষে একমাত্র মেয়ে যখন একেবারেই নাছোড়বান্দা, তিনি মত দিলেন—একটি সর্ত্তে—যে, তাঁর মেয়েকে কেউ চুমো খেতে পারবে না।

তখনকার মত এভলিন্ অবিশ্যি 'আচ্ছা' বল্‌লে। কিন্তু, ক্যামেরার সামনে এসে তা আর সম্ভব হ'লো না। ফ্রেডরিক্ মার্চ্চই তো দু'তিনবার চুমো খেয়ে ফেল্‌লে 'ডেথ টেক্‌স্ এ হলিডে'তে। প্রফেসর-বাবা বল্‌লে—তুমি গোল্লায় গেছো।

কিন্তু, তাঁরই মেয়ে যখন লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে ক্যামেরা ম্যান্‌কে বিয়ে করলে তখন তিনি বল্‌লেন—ওর মুখ আমি আর দেখবো না।

দেখেনও নি আজ পর্য্যন্ত। তাই জন্য ভারী দুঃখিত প্যারামাউণ্টের এই সুন্দরী অভিনেত্রী এভলিন ভেন্এবল্। কে জানে আর কতদিন তার এই রকম থাক্‌বে!

শিরলীর অভিলাষ

বাচ্চা শিরলী বড়ো হ'লে কী হবে তাই ভেবেই এখন থেকে অস্থির! ছোট্ট মাথাটাকে সে দিনরাত ঘামাচ্ছে—আমি বড়ো হ'লে কী হবে, কী হবো, কী হবো! সে দিন একজন জিজ্ঞেস্ করলে—আচ্ছা, মিস্ শিরলী, আপাততঃ তুমি কী ভেবেছো। সে বল্‌লে—আমি মেয়েদের চুল সাজাবো, জানো? অতএব ফক্স-এর ষ্টুডিয়োয় এখন তাকে সবচেয়ে বেশী দেখা যায় মেয়েদের চুল সাজাবার স্যালুনে। মন দিয়ে দেখে এসে সে বিদ্যেটা অভ্যেস করে' তার মোমের পুতুলের ওপর।

ওপরের মত্ হবার এক সপ্তাহ আগে শিরলীর দুর্দ্দান্ত ইচ্ছে ছিলো ফল্‌ওয়ালী হবার। তার কারণ, খুব ফল খেতে পারবে বলে'।

হার্‌লোর প্রেম

জিন্ হারলোর যে ছবিটা সেদিন শেষ হয়েছে, তার নাম আপনারা হয়তো জানেন—'রেকলস্'। এতে তার প্রেমিক ছিলো উইলিয়ম পাওয়েল। ক্যামেরার সামনে নকল প্রেমের অভিনয় করতে গিয়ে নাকি তাদের হৃদয় নাকি আসল প্রেমে সাড়া দিয়েছে। তার প্রমাণ ওদেশ থেকে পাচ্ছি—দু'জন নাকি বেশীর ভাগই থাকে একসঙ্গে, গল্‌ফ খেলে, সিনেমায় যায়, আর একসঙ্গে যায় খেতে।

জিন্ হারলোকে জিজ্ঞেস্ করা হয়েছিলো—পাওয়েলকে স্বামীতে বরণ করতে তার মনে কোন ইচ্ছে কিম্বা কামনা উঁকি মেরেছে কি-না? জিন্ একদম অস্বীকার করে, বলে—না। তবে এটুকু সে স্বীকার করে—যে—উইলিয়মের মত এত রসিক লোক পৃথিবীতে সে খুব কমই দেখেছে। এতো হাসাতেও পারে সে! একমাস ধরে' সাধারণ লোক মজার মজার কথা বলে' জিন্‌কে যা হাসায়, পাওয়েল হাসায় তা এক সপ্তাহে। পাওয়েল বলে—ভারী ভালো মেয়ে এই জিন্।

ওরা দু'জনেই অস্বীকার করলেও আমি খুবই আশা করছি যে অবিলম্বেই আপনারা আমার কাছ থেকে শুনতে পাবেন—হারলো আর পাওয়েল অমুক দিনে এরোপ্লেন-এ অ্যারিজোনায় পালিয়ে গিয়ে সাতদিন আর হলিউডে ফেরেনি।

সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মুখ

সম্পূর্ণ রকমের সুন্দর মুখ হলিউডে নেই—বলেছে ঐ দেশেরই বিখ্যাত এক ক্যামেরা-ম্যান্। সুবিখ্যাত সুন্দরী অভিনেত্রীদের মুখের কোন কোন অংশ নিয়ে একটি সম্পূর্ণ রকমের সুন্দর মুখ তৈরি করা যায়—তার তালিকাও ইনি দিয়েছেন। সুন্দরী দু'রকম—ব্লণ্ড আর ব্রুনেট। ব্লণ্ড শ্রেষ্ঠ মুখ হবে তাঁর—যাঁর মার্লিনের মতো থাক্‌বে চোখ, ক্যারল লম্বার্ড-এর চুল, জোন বেনেটের ঠোঁট, লরেটা ইয়ং এর নাক, অ্যান্ হার্ডিং এর কপাল, জিন্ হারলোর দাঁত, গারট্রুড মাইকেল্ এর ভুরু, এলিসা ল্যাণ্ডির থুতনী, মে ওয়েষ্ট এর চামড়া ও আইডা লুপিনোর গালের টোপ।

ব্রুনেট্—ফ্রান্‌সেস্ ড্রেক্ এর চোখ, নর্ম্মা শিয়ারারের চুল, ক্লদেৎ কলবার্ট এর ঠোঁট, জিন্ পার্কারের নাক, কিটি কার্লাইলের ভুরু, হেলেন ম্যাক্ এর থুতনী, কে ফ্রান্‌সিস্ এর দাঁত আর গালের টোপ কোরা মু কলিন্‌স্‌এর।

আমি তো সম্পূর্ণ কল্পনাই করতে পার্‌ছিনে সুন্দরীর চেহারা কী রকম। আপনাদের ভেতর কেউ যদি পারেন একে পাঠালে যথাযোগ্য পুরস্কার দিতে যথেষ্ট চেষ্টা করবো।

খুচরো খবর

হাতীর বর্ণম মউরিশ শেভালিয়র কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। কোন জায়গায় হাতী-দর্শনের একটু মাত্র সম্ভাবনা থাক্‌লেই শেভালিয়র যত্ন সহকারে সে জায়গায় যাওয়া বন্ধ করে।

* * *

মে ওয়েষ্ট এর বাড়িতে তার পোষা বাঁদর হচ্ছে সবচেয়ে দামী জিনিষ। কারণ এমন দিন নেই, যেদিন না সে তার আনন্দের জন্য মূল্যবান সব মাথার টুপি, আলোর ঢাক্‌না, মেয়েদের ছাতা প্রভৃতি না ছিঁড়েচে।

* * *

ওয়ার্ণার ওল্যাণ্ড বিলেত অত্যন্ত পছন্দ করলেও যায় না কেন জানেন? তার কারণ তারা ওল্যাণ্ডের কুকুরকে কিছুতেই ঢুকতে দেয় না ঐ দেশে।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—চ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২—23rd May, 1935. { ২১শ সংখ্যা

যুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যপদ পরিত্যাগ করায় কলিকাতা কেন্দ্র হইতে যে উপনির্ব্বাচন হইবে তাহাতে কংগ্রেস জাতীয়দল শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্রকে মনোনীত করিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে বাংলার সুধী সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে যাঁহারা জাতীয় যজ্ঞে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র মহাশয় অন্যতম। স্বরাজ্যদলের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা-হিসাবে শ্রীযুক্ত চন্দ্র ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য হইয়াছিলেন এবং সভ্যরূপে নিজের কৃতিত্বের পরিচয়ও দিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর যাবৎ বাংলার বিবদমান কংগ্রেস উপদলদ্বয়ের সঙ্কীর্ণতার আবেষ্টন হইতে দূরে অবস্থান করিলেও, শ্রীযুক্ত চন্দ্র মহাশয় বাংলার রাজনৈতিক ভাবধারা হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করেন নাই।

ইতিপূর্ব্বে তিনি বাংলা কংগ্রেসের "রত্নপঞ্চকের" (Big Five) অন্যতম সদস্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু অন্তরীণে আবদ্ধ এবং তিনি উপদলগত সঙ্কীর্ণতার বহু উর্দ্ধে। কলিকাতার করদাতাদিগের নিকট নিবেদনে শ্রীযুক্ত চন্দ্র মহাশয় স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরিত্যক্ত আসনে তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত শ্রীযুক্ত বসুরই ন্যায় সুস্পষ্ট। তিনি ইহাও স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত বসু মুক্তিলাভ করিলে তিনি সানন্দে পদত্যাগ করিবেন।

নলিনী-পোষিত ও কিরণ-শাসিত পার্লামেণ্টারী দল কাহাকেও উক্ত নির্ব্বাচনে মনোনীত করিতে সাহস করেন নাই। তাঁহাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চন্দ্র জাতীয় দলে যোগদান করিয়া যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি হিন্দুস্থানের কুচক্রী দলের নিকট অপাংক্তেয় হইবেন না ত? এই নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসুও জাতীয় দলের সমর্থক হিসাবে উক্ত নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতে পারিতেন। তবে যে-হেতু নির্ম্মল বাবু দণ্ডায়মান হইতে সম্মত হইলেন, সন্তোষ বাবুকে আর দাঁড়াইতে হইল না। বিধান-নলিনী-কিরণ এই ত্রিমূর্ত্তির ছায়া অপদেবতার মত হিন্দুস্থান বিল্ডিংসের গুপ্ত কক্ষে বিরাজ করিতে পারে, কিন্তু বিলাসব্যসনোদ্ভাসিত কলিকাতা মহানগরীতেও তাঁহাদের ন্যায় অপদেবতার পূজা করিতে কেহই অগ্রসর হইল না, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়!

নলিনীর মুখপত্র 'ফরওয়ার্ডের' defacto Manager শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র সিং সিংজী ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রার্থীই মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র যে সহজেই নির্ব্বাচিত হইবেন, তাহা সুনিশ্চিত।

বিবিধ

"শেষ কর্ত্তব্য"

খোস খবরের ঝুঠাও যে ভাল তাহা কে না জানে? গত ২রা জ্যৈষ্ঠের 'দৈনিক বসুমতী'তে সম্পাদকীয় প্যারায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে:—

"ফেণী কলেজের অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের আকস্মিক আত্মহত্যার সংবাদে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বীণা সরকার বি, এ, ক্ষোভে দুঃখে, এবং দুঃসহ মর্ম্মবেদনায় ব্যাকুল হইয়া পরলোকে তাঁহার পতি দেবতার অনুসরণ করিবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া ইতঃপূর্ব্বে যে জনরব প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। শ্রীমতী বীণা সরকার তাঁহার পরলোকগত স্বামীর প্রতি তাঁহার শেষ কর্ত্তব্য পালনের ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার স্বামীর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনায় যথারীতি শ্রাদ্ধ, উপাসনা করিয়াছেন। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারও এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি গুরুতর কর্ত্তব্যানুরোধে কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকায় শ্রাদ্ধবাসরে যোগদানে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহার ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন।"

এই সংবাদ প্রকাশের জন্য আমরা সহযোগীকে অভিনন্দিত করিতেছি। কারণ, যে দিন ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ঠিক পূর্ব্বদিন নলিনী সরকারের যে মোটর গাড়ী বীণা সরকারের পিতৃগৃহে দেখা যাইত, তাহা 'বসুমতী' সাহিত্যমন্দিরের—সম্পাদক শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার বসুর গৃহদ্বারে নহে এবং প্রাতে—নিশীথে নহে—দেখা গিয়াছিল। সুতরাং সংবাদটী হয় ত সহযোগীর first-hand information. বীণা যে আত্মহত্যা করিয়াছে, এ সংবাদ আমরা শুনি নাই—তবে প্রমথনাথের অভিযোগ, সে নৈতিকজীবন হত্যা করিয়াছে। সে অভিযোগ সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট মামলার রায়ে বলিয়াছেন—উপস্থাপিত সাক্ষ্যে অপরাধ প্রমাণ হয় না। তবে লোক যদি নলিনীর ও বীণার চরিত্র সন্দেহাতীত মনে না করে, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ থাকিতে পারে না। বীণা প্রমথনাথের অতর্কিত, অপ্রত্যাশিত অপমৃত্যুর স্মৃতিতাড়নায় আত্মহত্যা করিয়াছে—এ কথা বলিলে যেমন অসম্ভব কথা বলা হইবে; হয় ত ১২ই এপ্রিল কোথাও ভোজ হইয়াছিল বলিলেও তেমনই অসম্ভব কথা বলা হইবে।

বীণা প্রমথনাথের সম্বন্ধে যে স্ত্রীর কর্ত্তব্য—প্রাথমিক কাজ—করে নাই, তাহা সে মামলায় স্বীকার করিয়াছে। "শেষ কর্ত্তব্য" সে পালন করিয়াছে, কি না—তাহা জানিবার জন্য লোকের ঔৎসুক্যের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

শ্রাদ্ধ উপাসনা কিরূপ হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না, জানিতে ইচ্ছাও করি না। কেবল জানিতে কৌতূহল হয়, কে তাহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছে? বীণা, না বীণার পিতা, না যে "বড়কাকা" তাহাকে "অসুস্থ" জানিয়া তাহার ভগিনীপতি ডাক্তার শিশির মিত্রের "উপদেশে" তাহাকে দিল্লীতে অন্য কোন স্ত্রীলোক-হীন গৃহে পরম স্নেহে রক্ষা করিয়াছিল—সেই "বড়কাকা?" ম্যাজিষ্ট্রেট ত বলিয়াছেন, স্নেহশীল পিতৃব্য বলিয়া—ডাক্তার শিশির মিত্র—হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর ডিরেক্টার ডাক্তার মিত্র—নলিনীকে সার্টিফিকেট দিয়াছেন! ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন বীণা যে অবস্থায় নলিনীর সঙ্গে যাইয়া দিল্লীতে কয় মাস কাটাইয়া আসিয়াছিল—ডাক্তার মিত্রের পরিণীতা পত্নী শ্রীমতী লিলি মিত্র যদি সেই ভাবে নলিনীর সঙ্গে যাইত ও থাকিত, তবে তিনি কি করিতেন? আমাদের মনে হয়, নলিনী বা শিশিরের কাহারও পক্ষে এই challenge গ্রহণ করিয়া সৎসাহস দেখাইতে ভয় পাওয়া সঙ্গত নহে।

বাগবাজার

বাগবাজার নলিনী-প্রীতিবশে কিরূপ হাস্যাস্পদ হইতেছেন, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি—

গত শুক্রবারের 'অমৃতবাজারে' পূর্ব্বদিন রাজা হৃষীকেশ লাহার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। যে পৃষ্ঠায় এই শোকসংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহাতেই নলিনী-শাসিত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের (হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলী ও বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স) সংবাদে প্রকাশ—রাজা সাহেবের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র এই প্রতিষ্ঠান দুইটি বন্ধ করা হয়।

অবশ্য আর কোন প্রতিষ্ঠান এমন অসাধ্য-সাধন করিতে পারেন নাই। কিন্তু 'অমৃতবাজারে'ই প্রকাশ রাজা সাহেবের মৃত্যু ঘটিয়াছিল অপরাহ্ন ৪টা ১৫ মিনিটে। সংবাদটি প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে পৌছিতে যদি ১৫ মিনিট সময়ও লাগিয়া থাকে, তবে সাড়ে ৪টায় উহা তথায় পৌছিয়াছিল। যদি এই প্রতিষ্ঠানদ্বয় নৈশ প্রতিষ্ঠান না হয়—অর্থাৎ ইহাদের কাজ সম্বন্ধে যদি বলিতে না হয়—"অপ্রদীপ প্রদীপ থাকিলে"—তবে ত ততক্ষণ আফিস বন্ধ হইবারই কথা। সুতরাং এই সংবাদ যে ব্যঙ্গ—এমনও মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু হইলে কি হয়, নলিনী-শাসিত প্রতিষ্ঠানের সংবাদ—সম্ভবই হউক, আর অসম্ভবই হউক—'পত্রিকাতে' পত্রস্থ করিতে হইবে।

এই নলিনী স্তাবকতাহেতুই 'অমৃতবাজার' চেম্বার সম্বন্ধে নির্ব্বাক—এমন কি প্রেরিত পত্রে যদি নলিনীর আমলের ব্যবস্থার নিন্দা থাকে, তবে তাহাও ছাপিতে অসম্মত। 'এডভান্স' চেম্বারের ত্রুটি দেখাইয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, 'আনন্দবাজার' ৭টি প্রবন্ধে অনাচারের আলোচনা করিয়াছেন, 'দৈনিক বসুমতী'ও বলিয়াছেন, নলিনীর পক্ষে এখন

চেম্বার ত্যাগ করাই প্রয়োজন—কিন্তু 'অমৃতবাজার'—মৌনী।

নলিনী যদি চেম্বার ত্যাগ করে, তবে 'অমৃতবাজারের' বাজার রিপোর্টার পাটোৎপাদকরূপে তাহাতে স্থান লাভ করিয়া 'পত্রিকায়' সভার বিবরণে আপনাকে চেম্বারের প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে না—'অমৃতবাজারের' নিশীথ রবি অকাল জলদোদয়ে ম্লান হইয়া যাইবে—ইত্যাদি—

বাঙ্গালার ছোটলাট সার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জী একবার বলিয়াছিলেন, তিনি অভিনন্দন ভাল বাসেন না—তবে তাঁহার এক পুত্র আছে, তাহাকে অভিনন্দন পত্রগুলি ও সেগুলির আধার দিয়া যাইবেন—সেই জন্যই সেগুলি গ্রহণ করেন। তখন 'অমৃতবাজার' বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন, এক ব্রাহ্মণ মাগুর মাছ লোভী ছিলেন—কিন্তু শিষ্যগৃহে যাইয়া সে কথা না বলিয়া বলিতেন—তাঁহার তৃতীয় পক্ষের ব্রাহ্মণী প্রসবান্তে দৌর্ব্বল্যে কষ্ট পান—তাই কবিরাজ মাগুর মাছের ঝোল ব্যবস্থা করিয়াছেন। এবার যে নলিনী চেম্বারের সভাপতিত্ব সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া তাহার এক তল্পীদার 'অমৃতবাজারে' লিখিয়াছে—নলিনী সভাপতি হইতে চাহে নাই বটে, কিন্তু তাঁহারাই "বিশেষ কারণে" তাহাকে বার বার চারবার সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এই কৈফিয়ৎ 'অমৃতবাজার' এমনই সন্তোষজনক বিবেচনা করিয়াছেন যে, তাহার সম্বন্ধে আপনি কোন কথা বলাত পরের কথা—সে বিষয়ে প্রেরিত কোন পত্রও প্রকাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। যাহার প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নাই—অর্থাৎ যে সত্যের মর্য্যাদা জানে না—সে কি চেম্বারের সভাপতি হইবার যোগ্য? না—চেম্বারের সভ্যদিগের কর্ত্তব্য—তাহাকে কুলার বাতাস দিয়া দূর করা?

নলিনীকে লইয়া কি 'অমৃতবাজারের' এতই বিভ্রম ঘটিয়াছে যে, গত রবিবারে সম্পাদকীয় প্যারায় লিখিত হইয়াছে—"The imbroglio over the Mohun Bagan—Calcutta football match is still in the melting pot"? Imbroglio যে আবার melting pot এ থাকে, ইহা মৌলিক সংবাদ সন্দেহ নাই।

[ব্যক্তিগত ভাবে শ্রীযুক্ত তুষার কান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দত্ত ও শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ দত্ত আমাদের পরম প্রীতিভাজন হইলেও কর্ত্তব্যবোধে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সাংবাদিক কর্ত্তব্যের ত্রুটি বিচ্যুতি দেখাইতে হইতেছে বলিয়া মানিকজোড় আঁধার-বিমল ক্ষিপ্ত হইয়া যে অভদ্রোচিত আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সভ্যসমাজ-বহির্ভূত। 'অমৃতবাজার' কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে—ইহা একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া আমরা মনে করি। যে অর্দ্ধ-নগ্ন বর্ব্বর—'পত্রিকা' আপিসে প্রলাপোক্তি করিয়াছে, সেই আঁধার-মানিককে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে তাঁহার

বর্ব্বরতার দাওয়াই কলিকাতার সহরের পথে ঘাটে মিলিতেও পারে। 'পত্রিকার' সহিত আমাদের ব্যক্তিগত কলহ নাই। তাঁহারা যে নিরপেক্ষতার বড়াই করেন তাঁহারা যদি সেই নিরপেক্ষতা কার্য্যে অবলম্বন করেন ও নলিনী-প্রীতি পরিহার করেন তাহা হইলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। বর্ত্তমান অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দত্তের দৃষ্টি আমরা এই বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। ——সঃ খেঃ]

মিস্ লতিকা ঘোষ !

শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতষ্পুত্রী ও স্বনামধন্য অধ্যাপক স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের কন্যা কলিকাতা কংগ্রেসের Lady G. O. C. শ্রীমতী লতিকা বসু তাঁহার স্বামী চক্ষু-চিকিৎসক ডাঃ সুবোধ বসুর বিরুদ্ধে বিবাহ অসিদ্ধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য আলিপুরে যে মামলা আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা ডাঃ বসু বিরোধিতা করিবেন না। শ্রীমতী লতিকা বসু বর্ত্তমানে পুনরায় কুমারী লতিকা ঘোষরূপে পরিচিতা হইতেছেন। একাদশ বৎসর পরে শ্রীমতী লতিকা পুনরায় কুমারী হইলেন !

প্রীতি-সম্মিলন

কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ অফিসার ডাঃ এল্, এম্, বিশ্বাসের পুত্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষ্যে গত রবিবার রিপণ কলেজ হলে এক প্রীতি-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ডাঃ বিশ্বাস ও কাউন্সিলার শ্রীযতীন্দ্র নাথ বিশ্বাস অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র

নলিনীর মুখপত্র 'ফরওয়ার্ডের' defacto manager শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র আমাদের বিশেষ প্রীতিভাজন বন্ধুবর। তবে তিনি যতদিন নলিনী-কিরণের মায়াজাল ছিন্ন করিতে না পারিবেন, ততদিন রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমরা তাঁহাকে সমর্থন করিতে পারিব না। আর বাংলাদেশে যদি পুনরায় তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে নলিনীর দুতিয়ালী পরিত্যাগ করিতে হইবে। সত্যেনবাবুর স্মৃতিশক্তি কি এতই ক্ষীণ—তিনি কি ইতিমধ্যেই গত সাধারণ নির্ব্বাচনের শিক্ষা বিস্মৃত হইলেন? আর একটা কথা—শ্রীযুক্ত অনিল রায়ের 'ফরওয়ার্ড' ত্যাগ বিষয়ে তাঁহার কোন যোগাযোগ আছে কি? শ্রীযুক্ত শরৎ বসু ও শ্রীযুক্ত সুভাষ বসুর প্রতি মৌখিক আনুগত্যের যে কোন মূল্য নাই তাহা কি সত্যেনবাবুকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে?

সসীমের আহ্বান ?

কিছুদিন পূর্ব্বে "অসীমের আহ্বান" শীর্ষক মন্তব্যে শ্রীযুক্তা মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিচেরী গিয়াছেন এবং তিনি সম্প্রতি ফিরিবেন না—এইরূপ সংবাদ "খেয়ালী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। চন্দননগর হইতে শ্রীযুক্তা প্রমীলা মুখোপাধ্যায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে, সম্প্রতি তিনি তাঁর ভগ্নী (?) মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক পত্র পণ্ডিচেরী হইতে পাইয়াছেন, তাহাতে মায়া দেবী লিখিয়াছেন যে, তিনি শীঘ্রই ফিরিবেন।

দেখা যাইতেছে, আসল সংবাদে ভুল হয় নাই। তফাৎ হইয়াছে মায়া দেবীর পণ্ডিচেরীতে স্থিতির দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ এবং মন পরিবর্ত্তনশীল। অতএব আমাদের সসীম জ্ঞান অথবা শ্রীযুক্তা মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোভাবের পরিবর্ত্তন—যে কোনো কারণেই হউক Details-এ সামান্য এই প্রভেদের জন্য কোনো পক্ষকেই বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি?

শ্রীযুক্তা প্রমীলা দেবী সর্ব্বাপেক্ষা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন আমরা ভবশঙ্করবাবুর নিঃসঙ্গ জীবন শান্তিময় হউক—এই কামনা করিয়াছি বলিয়া। তাঁহার ক্রোধোপশমের জন্য আমরা আমাদের মন্তব্যের শীর্ষনাম "অসীমের

আহ্বান'' বদলাইয়া "অসীমের আহ্বান" করিতেছি এবং অচিরে ভবশঙ্করবাবুর মিলিত জীবন পুনরায় আনন্দময় হউক—এই প্রার্থনা] জানাইতেছি।

রাজা হৃষীকেশ লাহা

কলিকাতার—তথা বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী লাহা পরিবারের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—গত সপ্তাহে রাজা হৃষীকেশ লাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৮৪ বৎসর হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যু অকালমৃত্যু বলা যায় না। তিনি কর্ম্মবহুল জীবনের সায়াহ্নে লোকান্তরিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলার যে ক্ষতি হইল—যে স্থান শূন্য হইল, তাহা পূর্ণ হইবে কি না সন্দেহ বলিয়াই বাঙ্গালী তাঁহার মৃত্যুতে শোকার্ত্ত। তিনি যৌবনে পিতা মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার নিকট ব্যবসা শিক্ষা করিয়া ব্যবসায় রত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী ব্যবসায়ী-সমাজে তিনি অন্যতম নেতা বলিয়া প্রায় ৩০ বৎসর সম্মানিত ছিলেন। কিন্তু আপনার বিরাট ব্যবসা ও বিশাল জমিদারী পরিদর্শন করিয়াও তাঁহার উদ্যম নিঃশেষ হইত না। দেশের প্রতি ও জাতির প্রতি যে তাঁহার মত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, তাহা তিনি কখন ভুলিতে পারিতেন না। সেই জন্যই তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, জমীদার সভার সম্পাদক ও সভাপতি, বঙ্গীয় বণিক সভার সভাপতি, ২৪ পরগণা জিলা বোর্ডের সভাপতি, একাধিক রেলের পরামর্শ সভার সদস্য, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সদস্য মিউজিয়মের ট্রাষ্টী—প্রভৃতি ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টার ছিলেন। তিনি এত কাজ করিতেন—কিন্তু কোনটিতেই তাঁহার মনোযোগের অভাব ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহাও তিনি পরিতৃপ্ত করিতেন। ইহা যে বাঙ্গালীর—যে কোন জাতীয় লোকের—পক্ষে অনন্যসাধারণ ব্যাপার তাহা বলা বাহুল্য।

তিনি সর্ব্বোপরি যে কারণে বরেণ্য ছিলেন, সে তাঁহার অসাধারণ সাধুতা।

রাজা হৃষীকেশ লাহা

তিনি কোন কথা দিলে অজস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহা রক্ষা করিতেন। যথাকালে সব কাজ করা তাঁহার নিকট কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

তিনি দীর্ঘকাল বণিক সভার সভাপতি ছিলেন এবং সেই সময়ের মধ্যে স্বীয় বন্ধু রায় বাহাদুর সীতানাথ রায়ের সহযোগিতায়

পিতৃবিয়োগব্যথাতুর পুত্রদ্বয়
সুরেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ

চেম্বারকে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া বাঙ্গালীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। তিনি চক্রীদিগকে ঘৃণা করিতেন এবং ষড়যন্ত্র ঘৃণা করিতেন। প্রতিষ্ঠানের ও দেশের স্বার্থ তিনি ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা অনেক বড় মনে করিতেন। যাঁহারা প্রকৃত ত্যাগী তাঁহারা কখন তাঁহার স্নেহ ও সাহায্য লাভে বঞ্চিত হন নাই।

তিনি কখন দেশের ও দশের অমঙ্গলজনক কোন কাজ সমর্থন করেন নাই। পরন্তু দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণ-চিন্তা করিতেন।

এইরূপ লোকের মৃত্যুতে দেশের ও সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

যখন তিনি নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের পর ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন, তখন বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের মুখপত্র লিখিয়াছিলেন—যদি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের মধ্য হইতে অর্থ-সচিব নিযুক্ত করা হইত, তবে আমরা রাজা সাহেবের নিয়োগ সমর্থন করিতাম। বাস্তবিক তিনি কখন ধার করা বিদ্যা জাহির করেন নাই—আর্থিক ব্যাপারে ও অর্থনীতিক বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বাঙ্গলায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বিরাজিত ছিলেন।

আমরা রাজা সাহেবের পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা ও ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহাকে তাঁহাদিগের এই দারুণ শোকে আমাদিগের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

এ প্রহসন কেন?

কলিকাতা সহর অমুসলমান কেন্দ্র হইতে ব্যবস্থা পরিষদে নির্ব্বাচিত জাতীয় দলভুক্ত সদস্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু আসন পরিত্যাগ করায়, তাঁহার শূন্য স্থান পূরণ করিতে যে উপ-নির্ব্বাচন হইবে, তাহাতে যে কয়জন ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের বর্ত্তমান ক্লৈব্যনীতি না-গ্রহণ না-বর্জ্জন নীতির উপাসক হিসাবে পার্লামেণ্টারী দল কাহাকেও দাঁড় করাইতে পারেন নাই, অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশে

পার্লামেন্টারী দলের কর্ম্মকর্ত্তারা সাধারণ নির্ব্বাচনে যে বেশ শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহা অতি স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। মনে পড়ে গত সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে গগনস্পর্শী অহমিকাস্ফীত বাঙ্গলার পার্লামেন্টারী চক্রপতি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সদম্ভে বলিয়াছিলেন যে ব্যবস্থা পরিষদ নির্ব্বাচনে বাঙ্গলার প্রায় সব কয়টী আসন পার্লামেন্টারী দল করায়ত্ত করিবে। কিন্তু তাঁহার সেই সদম্ভ উক্তি কতদূর সফল হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া ডাক্তার বিধানচন্দ্রকে লজ্জা দিয়া কোন লাভ নাই, কেন না, তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বর্ত্তমানে পার্লামেন্টারী দলের মায়া কাটাইয়া রাজনীতিক্ষেত্র হইতে শিলংয়ের বনবীথিকায় বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্রের রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর পার্লামেন্টারী রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা হিসাবে আবির্ভূত হইলেন বাঙ্গলার রাজনীতির শনিস্বরূপ কিরণশঙ্কর ও রাজসাহীর সুরেন্দ্র মৈত্র। বাঙ্গলার পার্লামেন্টারী দলের বাতি দিতে এখন এই দুই মহারথীই নিযুক্ত। আমরা ভাবিয়াছিলাম এই মহারথীদ্বয় কলিকাতার বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্য হইতে অন্ততঃ একজনকেও উপ-নির্ব্বাচনে প্রার্থী হইতে মত করাইয়া নির্ব্বাচন যুদ্ধে অগ্রসর হইবেন, কিন্তু বিধি বাম, তাঁহারা সারা কলিকাতা খুঁজিয়া এমন একজনকেও পাইলেন না যিনি ক্লৈব্যের তকমা আঁটিয়া নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত, অর্থাৎ কিরণশঙ্কর ও সুরেন্দ্র মৈত্রের মুখ রক্ষা করিতে ইচ্ছুক। পার্লামেন্টারী দলের পক্ষে অবস্থা যখন এতদূর শোচনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে যে, কলিকাতার ন্যায় বিশাল সহরে পার্লামেন্টারী দলের স্বপক্ষে একজনকেও পাওয়া গেল না, তখন আমরা জিজ্ঞাসা করি—আর কেন, কিরণশঙ্কর ও সুরেন্দ্র মৈত্রকে লইয়া পার্লামেন্টারী দলের মিথ্যা ঢক্কা-নিনাদের সার্থকতা কি! এবং এ প্রহসনের আর প্রয়োজন নাই। কিরণশঙ্কর ও মৈত্র মহাশয় এখন হয় নিজেদের স্বেচ্ছাকৃত আত্ম-প্রবঞ্চনার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বাংলার জনমতের অনুগামী হউন, অথবা অকারণ আত্মাভিমানের বশে যদি তাহা না সম্ভব হয় তাহা হইলে, ডাঃ বিধানচন্দ্রের ন্যায় মহাজনসুলভ "যঃ পলায়তি স জীবতি" নীতি অনুসরণ করিয়া রাজনীতি হইতে সসম্মানে অবসর গ্রহণ করুন।

জেনুইন ইনসিওরেন্স

জেনুইন ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেডের মিঃ ইউ, আর, ঘোষ গত ২১শে মে সোমবার উক্ত কোম্পানীর কার্য্যবিস্তার করিবার জন্য খুলনা, মাদারীপুর, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে রওনা হইয়া গিয়াছেন। তিনি আগামী মাসের মধ্যভাগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

—ই—

স্বর্গীয় প্যাটেলের উইল ও সুভাষচন্দ্র

... গণের মতি বৈচিত্র্য

স্বর্গীয় ভি, জে, প্যাটেলের শেষ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার অর্থাৎ ইউরোপে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য সুভাষ বাবুর হস্তে একলক্ষ কয়েক টাকা দান করিবার পথে প্যাটেলের উইলের অছিগণ যে মনগড়া বাধা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সে সংবাদ গতপূর্ব্ব সংখ্যা 'খেয়ালী'তেই প্রথম প্রকাশিত তাহার খসড়া পাইলেই টাকাটা দিয়া দিবেন। তৎপরে জানা গেল যে সাব-কমিটীর প্রয়োজন নাই, শুধু অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থার একটা খসড়া পাইলেই হইবে। তৃতীয় সংবাদ রাজনৈতিক কারণে যদি সুভাষচন্দ্র আটক হন, তাহা হইলে টাকাটাও না আটকাইয়া যায়, এরূপ একটা ব্যবস্থার নির্দ্দেশ সুভাষচন্দ্রের নিকট

সুভাষচন্দ্র ও ভি, জে, প্যাটেল

আঁধার মরণ কোলে ডুবে যেই প্রাণ
নবীন জীবনমাঝে তারই অভিযান
যাত্রাকালে পতাকাটী নবীনের করে
প্রাচীন সঁপিয়া যায় সে-বিশ্বাস-ভরে।

হয়। তৎপরে ইহা "আনন্দবাজার" ও "বম্বে ক্রনিক্‌ল"-এ প্রকাশিত হইয়া ইউনাইটেড প্রেস মারফত ভারতের নানা সংবাদপত্রে বাহির হয়। ইহার অব্যবহিত পরে উক্ত অছিগণের তরফ হইতে একের পর এক ইউনাইটেড প্রেস ও এসোসিয়েটেড প্রেস মারফত যে সংবাদগুলি প্রকাশিত হয় তাহার ক্রম-বৈচিত্র্য বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমে জানিতে পারা যায়, যে উক্ত অছিগণ সুভাষচন্দ্রের নিকট হইতে একটা কার্য্যপরিচালনার জন্য গঠিত কমিটী ও যে ভাবে অর্থ ব্যয় করা হইবে হইতে পাইলেই তাঁহাদের চলিবে। শেষ সংবাদ—সুভাষচন্দ্রের নিকট হইতে উক্তরূপ ব্যবস্থা হইবে, এইরূপ একটা আশ্বাস পাইলেই তাঁহারা টাকাটা দিয়া দিবেন!

স্বর্গীয় প্যাটেলের উইলের অছিগণ (যাঁহারা স্বর্গীয় বিশ্ববিখ্যাত প্যাটেলের উইল ও সুভাষচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া প্রখ্যাত বা কুখ্যাত হইবার চেষ্টা করিতেছেন) যে ভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধাপে ধাপে নামিয়া আসিতেছেন তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা নিজেদের দাবী ও অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান। ভি, জে, প্যাটেলের মত তীক্ষ্ণধী শক্তিমান রাজনীতিজ্ঞ ভারতে খুব অল্পই জন্মিয়াছে। তিনি সব জানিয়া বুঝিয়া স্বোপার্জ্জিত যে অর্থ বিনা সর্ত্তে সুভাষচন্দ্রকে দিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে সর্ত্তের কথা অছিগণ কোন্ হিসাবে উত্থাপন করেন তাহার কারণ ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। একি বোম্বাইয়ের ব্যবসা-বুদ্ধি, না বাঙ্গালী-বিদ্বেষ, না আর কিছু?

আমরা শুনিয়াছিলাম যে, যদি ইতিমধ্যে ব্যাপারটীর সুমীমাংসা না হয়, তো বোম্বাই হাইকোর্ট খুলিলে এ বিষয়ে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করা হইবে। ব্যাপারটী আদালত পর্য্যন্ত যায় এবং দেশের কাজে ব্যয়িত না হইয়া স্বর্গীয় প্যাটেলের টাকা উকীল ও এটর্নীর পকেটে যায়—ইহা দেশবাসী চাহেন না—আমরাও চাহি না। আশা করি ইতিমধ্যে অছিগণের সুমতি হইবে এবং স্বর্গীয় মহাপুরুষের শেষ ইচ্ছা যাহাতে বিনা বাধায় কার্য্যে পরিণত হয়, সে বিষয়ে তাঁহারা অকারণ অসুবিধার সৃষ্টি করিবেন না।

—গান—

ফাল্গুনী রায়

দেহের বোঁটা হ'তে যখন ঝরবে জীবন-ফুল,
তখন তুমি ভুলবে কি মোর জীবন-ভরা ভুল?
অমানিশার নিকষ কালোর
যবনিকা সরবে কি মোর
পুবের গায়ে রঙের লহর
ফুটবে কি রাতুল?
(যখন) হাল-ভাঙ্গা মোর জীবন-তরী
চলবে আপন পথ টি ধরি।
তখন তুমি পরশ করি।
ভিড়িয়ে দেবে কূল?

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

"বিরহ" (কালী ফিল্মস্)

প্রযোজক—শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

পরিচালক ও চিত্রনাট্য } শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

গল্প—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আলোক-চিত্র—শ্রীনন্দগোপাল সান্যাল

প্রধান শব্দযন্ত্রী—শ্রীমধু শীল, এম্.-এস-সি

সম্পাদক—শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরশিল্পী—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

শিল্প-নির্দ্দেশক—শ্রীপরেশচন্দ্র দত্ত

ভূমিকা—গোবিন্দ—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, ইন্দুভূষণ—শ্রীশৈলেন চৌধুরী, রামকান্ত—শ্রীতুলসী লাহিড়ী, নির্ম্মলা—শ্রীমতী শিশুবালা, চপলা—শ্রীমতী ডলি দত্ত, গোলাপী—শ্রীমতী রাণীবালা।

প্রথম মুক্তি—"ক্রাউন সিনেমায়," শনিবার ১৮ই মে, ১৯৩৫।

কোনদিন শুনেচেন?—এর আগে কোনো বাঙ্গলাদেশের কোম্পানী, তেরোদিনে একটি সম্পূর্ণ ছবি তোলা শেষ করেছেন। আপনারা নাও বা পারেন শুনতে, কিন্তু, আমরাও যে শুনিনি! যখন খবর এলো গাঙ্গুলীমশাই এই সপ্তাহ দুয়েকের ভেতর ডি, এল্, রায়ের "বিরহ" ক্রাউনের পর্দ্দায় ফুটিয়ে তুলবেন, তখন—সত্যি বল্‌ছি—ভেবেছিলুম অনেক কথা। তেরো সপ্তাহ সময় নিয়ে অনেক কোম্পানীকে দেখা গেছে তাঁরা যে ছবি তুলেছেন—যা দেখা মানে—দামী সময়ের অনেকখানি নষ্ট করা। "বিরহে"র সাফল্য সম্বন্ধে সেইরকমই অনেকটা সন্দেহ আমাদের ছিলো।

কিন্তু, গত শনিবার আঠারোই মে, প্রমাণ করেছে—যে আমাদের সে সন্দেহের কোনো ভিত্তি নেই।

"বিরহ" দেখতে গিয়ে এতো আমাদের হাস্‌তে হয়েছে—যে কী আর বল্‌বো। কেবল হাসি, হাসি আর হাসি। বাংলা ছবি দেখতে গিয়ে এতো যে হাস্‌বো—স্বপ্নেও ভাবিনি। "পেন্নাম হই কর্ত্তা" বলে' "বিরহ" তো বিদেয় নিলে—কিন্তু, তখনও দেখি সারা সিনেমা হাস্‌ছে। "হাস্‌তে হাস্‌তে আসছে দাদা, আস্‌ছি আমি, আসছে ভাই, হাস্‌ছি কেন সবাই জানে, পাচ্ছে হাসি হাস্‌ছি তাই। ভাবছি মনে হাস্‌বোনা আর, এখন থাকি চুপ করে'; ভাবতে গিয়ে ফিক্‌ফিকিয়ে ফেল্‌ছি হেসে ফ্যাক্ করে।" "বাইরে এসেছি বেরিয়ে,—তখনও 'পাচ্ছে হাসি চাইতে গিয়ে, পাচ্ছে হাসি চোখ বুজে; পাচ্ছে হাসি চিম্‌টি কেটে নাকের ভেতর নোখ গুজে।"

এতো হাসাতে পারা পরিচালক শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিশ্রামের পর থেকে গল্প ক্রমশঃ আরম্ভ করে জমতে, হাসির সংখ্যাও থাকে বাড়তে। "বিরহ"কে পর্দ্দার ওপর এতো নিখুৎভাবে ধরে' রাখতে দেখে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। গল্পের আরম্ভ সুন্দর।

ডি, এল্, রায়ের "বিরহ" বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকে নিশ্চয়ই উপভোগ করেছেন। তবুও যাঁদের মনে নেই তাদের জন্য বলি—গোবিন্দবাবু বৃদ্ধ বয়েসে তৃতীয়বার বিয়ে করলেন নির্ম্মলাকে। সে কালো, সে মোটা—গোবিন্দবাবুর রসিকতা একদা তার সহ্য হ'লোনা, সে নিলে বাপের বাড়ীর আশ্রয়। প্রশ্রয় দেবেন না বলে' গোবিন্দবাবুও ঠিক করলেন—নিজে যেচে আনতে যাবেন না, যতদিন না সে নিজে আসে। কিন্তু, সংসার চলেনা। ধোপা, মুদী, তাঁর জীবন অসহ্য করে' তুল্‌লো। অতএব, তিনি এক কৌশল করলেন। প্রিয়-ভৃত্য রামকান্তকে বল্‌লেন—'তুই বল্‌গে যা বাবু আবার বিয়ে করছেন।' রামকান্তের আবার এক ইতিহাস আছে। সে বিয়ে করেছিলো, কিন্তু, কী একটা কারণে ছেড়ে আসায় বউকে সে ভুলে' গেছে। একটি মেয়ের প্রেমে সে পড়েছিলো, তার নাম গোলাপী। গোলাপী কিন্তু তার স্ত্রী। রামকান্ত চিনতে পারেনি, বউ তাকে চিনেছিলো।

খোকা রামকান্ত গিন্নীমার কাছে গিয়ে ধরা

পড়লো। নির্ম্মলার বোন চপলাও এক চালাকী খাটালে। সে গোলাপীকে পুরুষ সাজিয়ে নির্ম্মলার সঙ্গে এক ফটো তুলিয়ে পাঠিয়ে দিলে গোবিন্দবাবুকে। গোবিন্দবাবুতো ভেবেই অস্থির! হায়, তাঁর স্ত্রীর আজ একী অবস্থা হ'লো!

অবশেষে, রামকান্ত বাবুর কাছে এসে মিছিমিছি এক কান্নাকাটি—যে গিন্নীমা আফিং, গিন্নীমা দড়ি···। গোবিন্দবাবুও কেঁদে আকুল। কিন্তু, সবই মজা দেখবার জন্যে। নির্ম্মলা হাসছিলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এইখানেই "বিরহে"র অবসান হ'লো গোবিন্দবাবুর ও প্রিয় ভৃত্য রামকান্তের।

ছবিটির ফটোগ্রাফী বেশ ভালো। জায়গায় জায়গায় খুবই ভালো।

শব্দযন্ত্রের কাজ ভালো। এবং এই বিভাগের কাজ যে ভালো হবে এটা ছবি দেখার আগেই ধারণা ক'রে নেওয়া যেতে পারে। কারণ, মধুবাবুর কাজের সঙ্গে সকলেই বিশেষ পরিচিত।

সম্পাদনা সাধারণ, চলনসই।

গানগুলো শ্রুতিমধুর, কয়েকটি চমৎকার। নেপথ্য-সঙ্গীতও সেইরকম যা একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র দে'র কাছ থেকেই আশা করা যেতে পারে।

অভিনয়ে গোবিন্দবাবুর ভূমিকায় তিনকড়িবাবু তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এবং, হাসিয়েছেনও প্রচুর। আর, চমৎকার হচ্ছে তুলসী লাহিড়ীর রামকান্ত। দারুন বোকা, অথচ চোখে গোলাপী। এমন একটি বিশিষ্ট চরিত্রাঙ্কনে যে দক্ষতা তুলসীবাবু দেখিয়েছেন তা সহজে ভোলবার নয়। তাঁর দাঁতবার-করা হাসি-হাসি চোখ, বোকা-বোকা চাউনি ও 'বিয়ে যখন হবেই, তখন যাবার সময় একবার চুক্‌-চুক্‌' আমাদের অনেকদিন মনে থাক্‌বে। শৈলেন চৌধুরীর ইন্দুভূষণ মন্দ নয়।

শ্রীমতী শিশুবালা 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা' নির্ম্মলার ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করেছেন। একটু-বুদ্ধি-কম অথচ অভিমানিনী নির্ম্মলার নিখুঁৎরূপ শিশুবালা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। সরল গোলাপীর অংশে শ্রীমতী রাণীবালা আবার নিজের গুণের পরিচয় দিয়েছেন। এর 'হেসে নাও দু'দিন বইতো নয়' গানটি দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছিলো। কেবলমাত্র অত্যন্ত হতাশ আমাদের করেছেন শ্রীমতী ডলি দত্ত—নির্ম্মলার বোন চপলার অংশ গ্রহণ করেছিলেন যিনি। চপলার মত পার্টকে এর হাতে এমন করে' হত্যা করতে দেয়া কর্ত্তৃপক্ষের উচিত হয়নি। কণ্ঠস্বর 'মাইকে'র উপযোগী হ'লেও, অভিনয় ক্ষমতা ও মুখ-সৌন্দর্য্যের শ্রীবৃদ্ধি ইনি যদি কর্‌তে না পারেন, তা হ'লে ডলির মাথার ওপর ভবিষ্যতের কালো মেঘ আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ হাসির ছবি কালী ফিল্মস-এর এই 'বিরহ' অগণিত দর্শকদের ঠিক আমাদেরই মত যে হাসাবে এ আমরা অনায়াসেই বল্‌তে পারছি। প্রতি শ্রেণীর দর্শককে এমন প্রাণ-খোলা হাসির পরিবেশন আগে খুব কমই দেখেছি বলে' কালী ফিল্মস্-এর স্বত্বাধিকারী থেকে আরম্ভ করে' প্রত্যেকটি কর্ম্মীকে আমরা জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

* * *

"সাঁঝের প্রদীপ"-এ কুমার শচীন্দ্র দেব বর্ম্মণের গান দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দান করেছিলো। গানটির চিত্র-রূপের ধারণা বেশ সুন্দর।

নিউ থিয়েটার্স

হিন্দী "দেবদাসে"-র শুটিং অনেক দূর এগিয়েছে। বাঙ্‌লা "দেবদাসে"-র অভাবিত সাফল্যে অনুপ্রেরিত হ'য়েই কর্ত্তৃপক্ষ অত্যল্প-কালের মধ্যেই এই ছবিখানি তোলবার চেষ্টা কোরছেন। হিন্দী "দেবদাসে"-র চরিত্র সংগঠন হ'য়েছে অপূর্ব্ব! বাঙ্‌লা সংস্করণে যে অ-বাঙালী অভিনেত্রীটি পার্ব্বতীর ভূমিকায় অভিনয় কোরে বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ কোরেছেন, তিনিই উক্ত ভূমিকায় আবার আত্মপ্রকাশ কোরবেন। সাইগাল নাম্‌ছেন "দেবদাসে"-র ভূমিকায়। অন্যান্য চরিত্রে বড়ুয়া, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীমতী রাজকুমারী, শ্রীমতী লীলা প্রভৃতি বিভিন্নাংশে নেমে ছবিখানির গৌরব বৃদ্ধি কোরবেন।

* * *

শ্রীদীনেশ দাশের পরিচালনায় তাদিল "পূরণ ভকতে"-র কাজ শেষ হ'তে আর বেশী দেরী নেই। সহকর্ম্মীরূপে শ্রীছবি ঘোষাল ও বোকেন চট্টোপাধ্যায় দীনেশবাবুকে যথেষ্ট সাহায্য কোরেছেন।

* * *

"সুরদাস" প্রায় তিন হাজার ফিট্‌ সেলুলয়েডে ধরা হ'য়েছে।

নিউ ইণ্ডিয়া

মিঃ কাজী ও মিঃ মামুজী "ব্লাড ফিউড" সম্পর্কে গত হপ্তায় কোলকাতায় এসেছেন।

"ব্লাড ফিউডে"-র শেষ দৃশ্যগুলি নিউ থিয়েটার্সের বড় ষ্টুডিওতে তোলা শেষ হ'য়েছে।

কালী ফিল্মস্‌

"বিদ্যাসুন্দরে"র শুটিং আবার সুরু হ'য়েছে।

* * *

"বিদ্যাসুন্দরে"র কাজ শেষ হ'লেই "প্রফুল্ল" জোরভাবে আরম্ভ হবে।

রাধা ফিল্ম কোম্পানী

ছোটখাটো দোষ ত্রুটি বাদ দিলে রাধা ফিল্মের "মানময়ী গার্লস্‌ স্কুল" হ'য়েচে একখানি সত্যকারের উপভোগ্য চলচ্চিত্র। এই শ্রেণীর, সর্ব্বরসপুষ্ট একখানি রঙ্গ-নাট্য সবাক চিত্রাকারে উপহার দিয়ে রাধা ফিল্ম কোম্পানী বাঙলার চিত্র-রসিক জনসাধারণ মাত্রেরই বিশেষ ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ছবিতে ছোট বড় প্রায় সকল

চরিত্রেই শ্রীমতী কাননবালা, মৃণাল ঘোষ, জ্যোৎস্না গুপ্তা, তুলসী চক্রবর্ত্তী, জহর গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সকল শিল্পীই বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই শনিবার থেকে "রূপবাণীর" রূপোলী পর্দ্দায় "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" তৃতীয় সপ্তাহে পড়লো।

* * *

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উর্দ্দু ছবির পরিবর্ত্তে শীঘ্রই একখানি বাঙ্লা ছবি আরম্ভ কোরবেন। এই বাংলা ছবিখানির বিষয় নির্ব্বাচন নিয়ে সম্প্রতি শুনছি কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে আলোচনা চলচে। আমরা বারান্তরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর দিতে পারবো বোলে আশা করছি।

* * * *

এঁদের হিন্দী "দক্ষ-যজ্ঞ" ছবিখানি অদুর-ভবিষ্যতে "নিউ সিনেমায়" মুক্তিলাভ কোরবে বোলে শোনা যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রদেশের জন্যে এই ছবিখানির প্রাদেশিক সত্ব বিক্রীত হোয়ে গেছে—এ খবর আমরা বহু পুর্ব্বেই জানিয়েছি।

* * * *

এদের বাংলা "রাজনটী বসন্তসেনা" ১লা জুন ভবানীপুর পূর্ণ থিয়েটারে মুক্তিলাভ কোরবে বোলে শোনা যাচ্ছে, বাংলা "দক্ষ-যজ্ঞ" ছবিখানি গত চার সপ্তাহ ধ'রে ইটালী টকীতে মহাসমারোহে চলচে।

রঙমহল ফিল্মস্

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে "মহাশক্তি" মন্দ মন্দ গতিতে এগুচ্ছে।

পায়োনিয়র

শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের পরিচালনায় "দেবদাসী"-র কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এল।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

"পায়ের ধুলো"-র ধুলো গুমোতে ছড়াবার জন্য শ্রীজ্যোতিষ মুখার্জ্জি সদলবলে সেখানে রওনা হ'য়েছেন।

* * *

"ডি জি" ভগবানের কৃপায় সুস্থ হ'য়েছেন। গায়ে একটু জোর পেলেই তিনি "বিদ্রোহী"-র সঙ্গে আবার যুঝবেন।

নাট্য-তরঙ্গ
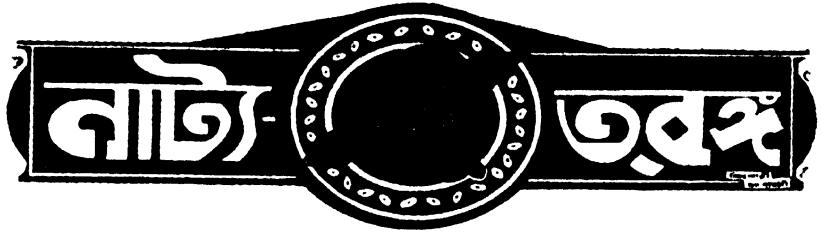
"রূপ-মহল"

নাট্য-নিকেতনের কর্ত্তৃপক্ষের আচরণে ব্যথিত হ'য়ে নবীন ও প্রবীণদলের অভিনেতৃ-বৃন্দ উক্ত রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন কোরে নিজেরাই স্বাধীনভাবে একটি রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা কোরেছেন। নট-পরিচালিত রঙ্গমঞ্চের প্রবর্ত্তণ বাঙ্লাদেশে এই প্রথম। এই সম্প্রদায়ের পরিচালনা কোরবেন "অভিনেতৃ-সঙ্ঘ" নাম দিয়ে অভিনেতৃরা স্বয়ং। এবং এই রঙ্গমঞ্চটির নামকরণ হ'য়েছে "রূপ-মহল"।

গত শনিবারে এদের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হ'য়েছে। 'চিপ থিয়েটারে' নিয়মিত-ভাবে অভিনয় করবার জন্য উক্ত গৃহটি এরা ভাড়া নিয়েছেন। উদ্বোধন উৎসবে পৌর-হিত্যের ভার গ্রহণ করেন বিখ্যাত উকীল শ্রীচন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উৎসবান্তে উক্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "কণ্ঠহার" নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় বেশ চিত্তাকর্ষক হ'য়েছিল। শ্রীসন্তোষ সিংহের নরেন, শ্রীসন্তোষ দাসের রণলাল, শ্রীললিত মিত্রের হরেকৃষ্ণ, শ্রীআশু বোসের নরহরি, শ্রীনরেনচক্রবর্ত্তীর গৌরীকান্ত, শ্রীকুঞ্জ সেনের মধু ও শ্রীমতী অম্বালিকার সরোজ বিশেষ প্রশংসনীয়। আমরা এই নব-গঠিত প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কেশরী ফিল্মস্

"বাসবদত্তা"-র অভাবিত অসাফল্যের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্লা ছবি জোরভাবে তোলার সাহস হারিয়েছেন। কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আমাদের নিবেদন, তাঁরা যদি মান ও ধন চান তা' হ'লে তাদের প্রতিষ্ঠানের নভিস্ কর্ম্মীদের বাতিল কোরে ভাল শিল্পী সংগ্রহে মনোনিবেশ করুন।
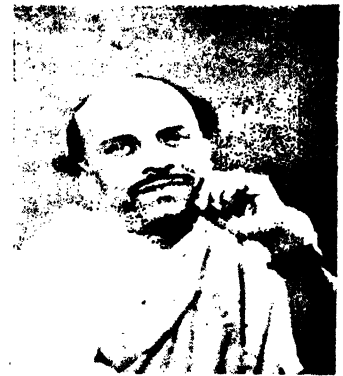
শ্রীআশুতোষ বসু

টাইপ চরিত্রে সু-অভিনয়ের জন্য শ্রীআশুতোষ বসু সাধারণের কাছে পরিচিত। হাস্যরসের নানা ভূমিকায় অভিনয় কোরে ইনি রঙ্গামোদীদের বিপুল আনন্দবর্দ্ধন কোরেছেন। সম্প্রতি 'নাট্যনিকেতনে'র সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন কোরে ইনি 'রূপ-মহল' সম্প্রদায়ে যোগদান কোরেছেন।

খেলার মাঠে

দ্রোণাচার্য্য

লীগ খেলার প্রথমার্দ্ধের খেলা এখনও শেষ হয়নি,—কিন্তু এর ভেতরই কে চাম্পিয়ন হবে তাই নিয়ে বেশ জল্পনা কল্পনা চল্‌ছে। অবশ্য খেলার ধারা যেভাবে চল্‌ছে তাতে জোর করে কিছু বলা না গেলেও এসম্বন্ধে অনেকটা যে বলা চলে তাতে কোনই সন্দেহ নাই। গোড়ার দিকে খেলা যেরকম জোর সুরু হয়েছিল মাঝখানে হঠাৎ তাতে ভাটা পড়েছে। হয়ত বা যে অসহ্য গরম পড়ছে এ তারও ফল হতে পারে। কিন্তু তাতে যে ফল এরকম দাঁড়াবে তা কেউ কল্পনাও কর্ত্তে পারেনি। নচেৎ ক্যালকাটার কাছে মোহনবাগানের অত গোলে হেরে যাওয়া—কাষ্টমসের কাছে কালীঘাটের অত গোল খাওয়া,—কিছুই বিশ্বাসযোগ্য নয়। অনেকে বলছেন upset, দেখা যাক ফল কি দাঁড়ায়।

* * *

গেল হপ্তায় যে সকল খেলা হয়েছে তার ভেতর মোহনবাগান ও ব্লাকওয়াচের খেলাই ছিল সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। ব্লাকওয়াচ এক গোলে মোহনবাগানের কাছে হেরে যায় এবং এ গৌরব মোহনবাগান সকল রকমেই দাবী কর্ত্তে পারে। সে দিন মোহনবাগান খেলেছিল চমৎকার। সেদিনের খেলা দেখে প্রাণে এদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যতটা আশার সঞ্চার হয়েছিল ই, বি, আর ড্যালহৌসীর সাথে খেলা দেখে ততটা নিরাশ হতে হয়েছে। মোহনবাগানের এ পরিবর্ত্তনের হচ্ছে হাফ্‌লাইন নিয়ে। যেদিন ওদের হাফলাইন ভাল খেলবে সেদিন ওদের খেলা হবে চমৎকার। হাফলাইন আরও ভাল করা মোহনবাগানের প্রধান কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ গোলকীপারকে আরও শক্ত হতে হবে।

* * *

ইষ্টবেঙ্গল সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই। যেখানে যত ভাল ভাল খেলোয়াড় ছিল তাদের সবাইকেই আনা হয়েছে। এক এক নাম করলে প্রত্যেকেই ভাল খেলোয়াড়। কিন্তু তবুও ওদের অবস্থার পরিবর্ত্তন নেই। অনেকেই বলছেন luck ভাল নয়—কিন্তু খেলায় যেটি প্রধান আবশ্যক সেই team workএরই ওদের অভাব। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখাতে গেলে খেলা কখনও ভাল হয় না।

দ্বিতীয়তঃ speed বলতে যা বোঝায় ফরওয়ার্ড লাইনের তা মোটেই নেই। মজিদকে যে এখনও কেন chance দেওয়া হয় সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্য্য। অনেক সময়ই ভাল ভাল "বল" শুধু নিজের নৈপুণ্য দেখাতে যেয়ে নষ্ট করতে মজিদের দ্বিতীয় কেউ নেই। খেলোয়াড় নির্ব্বাচন, ক্লাবের শৃঙ্খলা, মেম্বারের মনযোগ, যাবতীয় ব্যাপারেই উদাসীনতার পরিচয় এখনও ইষ্টবেঙ্গলের রয়েছে—এটাই সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা।

* * *

ইণ্ডিয়ান দলের ভেতর কালীঘাট অন্যতম শক্তিশালী দল। সৈনিকদলকে অত গোলে পরাজিত করে সে শক্তির পরিচয়ও ওরা দের, কিন্তু কাষ্টমসের কাছে ৫ গোলে পরাজিত হওয়ার কোন যুক্তিযুক্ত কারণই ওদের থাকতে পারে না। এরূপ দলের এরকম upset কখনও ভাল নয়। ভবিষ্যতে সাবধান না হ'লে position আরও খারাপ হবে, এখন থেকেই সেদিকে দৃষ্টি রাখা ক্লাবের সঙ্গত।

* * *

গেল হপ্তায় যে সকল খেলা হয়েছে :—

মোহনবাগান	০	কালীঘাট	০
ডিভনস	৩	হাওড়া	১
ড্যালহৌসী	১	কাষ্টমস	১
এরিয়ান্স	১	ক্যালকাটা	০
ই, বি, আর	২	ইষ্টবেঙ্গল	১
কালীঘাট	০	ড্যালহৌসী	০
ডিভনস	৩	মহমেডান	২
মোহনবাগান	১	ব্লাকওয়াচ	০
ইষ্টবেঙ্গল	৩	কাষ্টমস	০
ডিভনস	৩	ই, বি, আর	৩
মহমেডান	৩	হাওড়া	০
ড্যালহৌসী	২	মোহনবাগান	১
ইষ্টবেঙ্গল	২	এরিয়ান্স	২
ব্লাকওয়াচ	১	ক্যালকাটা	০
কাষ্টমস	৫	কালীঘাট	০

* * *

গত শনিবার পর্য্যন্ত খেলা অনুযায়ী লীগ কোঠার তালিকা :—

	খেলা	পয়েণ্ট
ব্লাকওয়াচ	৭	১০
মোহনবাগান	৭	৯
মহমেডান	৭	৮
কালীঘাট	৭	৭
ইষ্টবেঙ্গল	৭	৭
ডিভনস	৭	৭
ই, বি, আর	৬	৬
ক্যালকাটা	৬	৬
ড্যালহৌসী	৭	৬
এরিয়ান্স	৬	৫
কাষ্টমস	৬	৫
হাওড়া	৭	৪

গত সপ্তাহে প্যারামাউন্টের "হিয়ার ইস্ মাই হার্ট্"—বিভিন্ন চিত্রের ভেতর একটি ছিলো শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। অনবদ্য গান গেয়ে অপরূপ প্রেম নায়ক-নায়িকা—বিঙ্ ক্রস্‌বি আর কিটি কার্লাইল্।

যাদুঘর

শ্রীরজত সেন

চারিদিক থেকে রাস্তা এসে হুড়মুড় করে পড়েছে, ওদের মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে নিশ্চয়। গাড়ীগুলোও ক্যাপার মত ছুটে আস্‌ছে চুরমার হ'য়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত যেন ওদের স্বস্তি নেই। এই মাত্র কি যেন ঘটে গেল অত্যন্ত অদ্ভুত, ভয়ানক আশ্চর্য্যজনক এবং লোমহর্ষণ।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান।' শব্দময় জনতার প্রান্ত থেকে সতর্ক সঙ্কেত শোনা গেল, হাতে মোড়ক নিয়ে একটি মেয়ে কবিতার ছন্দের মত বাজ্‌তে বাজ্‌তে রাস্তা অতিক্রম ক'রছিল। 'দাড়ান' শব্দে ও থমকে দাঁড়িয়ে দেখে চারপাশ থেকে মোটর, লরী, রিক্সা সাইকেল সব তার অভিযান লক্ষ্য করেছে, যন্ত্রযানগুলো শাসিয়ে বল্‌ছে—এটা নৃত্যগৃহ নয় নরজগতের রাস্তা; তোমার সুর নিয়ে তোমার ছন্দ নিয়ে—গান নিয়ে সরে যাও সরে যাও।

ব্যস্ত হ'য়ে মেয়েটা কয়েক পা হঠে এলো পেছনে।

'আপনাকে বাঁচিয়ে দিলাম—এখুনি চাপা পড়ছিলেন।' যুবা পুরুষ। মুখে বুদ্ধির দীপ্তি, আপাদমস্তকে সভ্যতার ছাপ—সংযত মনের আভাষ। মিষ্টি হেসে মেয়েটি বল্‌লে—'অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।' একেবারে বেপরোয়া মেয়ে। কোনদিকে দৃক্‌পাত নেই।

'আপনার এ রকম অন্যমনস্কভাবে রাস্তা চলা উচিত নয়।'

ওর কপালে কয়েকটি রেখা ধনুকের মত বাঁকা হ'য়ে উঠ্‌লো। প্রশ্ন করলে—'কেন?'

'কেন কি? গাড়ীচাপা পড়তেন তাই; আসুন পার হওয়া যাক, কোথায় থাকেন আপনি?'

'ভবানীপুরে' আর সাহায্যের দরকার হ'বেনা আপনি যেতে পারেন।'

হেসে উঠ্‌লো সে। রাস্তার লোকে চমকে উঠ্‌বার কথা, এমনি তার ধ্বনি! বল্‌লে—'বা-রে! যেতে ত পারিই, গেলে আপনি ধরে রাখ্‌তে পারেন নাকি? কিন্তু কথা হচ্ছে আপাততঃ ভিন্ন পথে কোথাও আমার যাবার নেই, আমিও ভবানীপুরে যাব যে! আসুন ওঠা যাক—বাস্‌ এসে পড়লো।'

'বাঃ আপনার সঙ্গে যাব কেন?'

'সঙ্গে মানে পাশে বসে ত? আমার সঙ্গে না হয় আর কারুর পাশে বসে যাবেন ত? আমিত তবু পরিচিত—জীবনদাতাও বল্‌তে পারেন।'

আর একটা বাস্‌ এলো। মেয়েটা বল্‌লে—'আসুন তা হলে ওঠা যাক্‌ দাঁড়িয়ে লাভ কি? আপনার 'টেনাসিটি' আছে—'সাক্‌সেস্‌ সিওর।' কৌতুক-কণ্ঠে ছেলেটি বল্‌লে—'ছেলেবেলায় গুরুমশাই কি বল্‌তেন জানো—Sorry জানেন? বল্‌তেন কাজ করে যাও—ফলাফল ভগবানের হাতে।'

'তিনি কি কাজ নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন?'

'না'

'তবে? এ পথটা নিজেই বেছে নিলেন বুঝি?—মানে স্বেচ্ছাকৃত?'

'কোন পথ?'

'এই ধরুন—flirting?'

আবার সেই উচ্চ তীব্র হাসি। ওর যৌবনমণ্ডিত মুখশ্রী হাসিতে দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

'হাসলেন যে—মিথ্যে বল্‌ছি?'

বাসটা ছুটে চলেছে যাত্রীদের নিয়ে। অপরাহ্ণের ছায়া নেমে এসেছে মাঠের
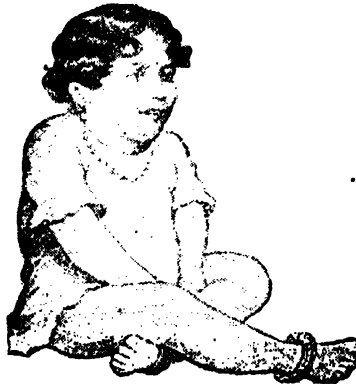
কিনারায়। মেমোরিয়েলের চূড়াটা এখুনি গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। মেয়েটি সেদিকে চেয়ে ছিল, ওর বড় চোখ দুটি ভরে গিয়েছে সোনালী আলোয়। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে মেয়েটি বল্‌লে—'বা রে! লুকিয়ে দেখ্‌ছেন কি?' ছেলেটি হেসে বল্‌লে—'forgive me'

'Forgive করে আর লাভ কি? পরের মুহূর্ত্তেই ত আবার তাকাবেন—তার চাইতে fill your eyes'। ছেলেটি বল্‌লে 'don't be flattered আপনাকে ক্রমশঃই ভালো লেগে যাচ্ছে।'

'তাই নাকি? পরের কথাটা কতক্ষণ পরে শুনবো? Funny!' মেয়েটির মুখে বিদ্রুপের আভাষ। ওর কমনীয় চিবুকে দৃঢ়তা আরও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হ'ল।

বাস্‌টা হাঁকাতে হাঁকাতে ভবানীপুরে এসে পড়লো। মেয়েটি প্রশ্ন করলে—'আপনি কোথায় নামবেন?'

'আপনার সঙ্গে' মৃদু হাসি-মিশ্রিত উত্তর এলো।

'আপনার টেনাসিটি আছে' হেসে মেয়েটি বল্‌লে—'almost dog-like'

ওরা দুজনে নেমে পড়লো বাস থেকে।

সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে। দৈনিক জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত পথিকের সারা মুখে পরাজয়ের গ্লানি—আহত অহঙ্কারের ছাপ।

'আপনার নাম কি? if I am not inquisitive.'

'পোষাকী না আটপোরে?' মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে।

'দুটোই'

'মণ্টু আর মনিকা; বলবেন না—বাঃ বেশ নাম তো?'

'বল্‌তে আর দিলেন কৈ?'

'আপনি কি নাম ধারণ করেন?' মণিকা প্রশ্ন ক'রলে।

আপনার সঙ্গে, ভালকথা আপনি কোথায় অধ্যয়ন করেন? মানে কোন কলেজে পড়েন?'

'কেন ধাওয়া ক'রবেন নাকি?'

'না, পড়াশুনোর যদি ক্ষতি না হয়—তা হ'লে কাল আপনার সঙ্গে একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্ করি।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ—Let this not be our last meeting?'

এবার প্রকৃতই মণিকা বিস্মিত হ'ল কিনা কে জানে—বল্‌লে—'এটা বিলেত নয়।' কিন্তু আপনিও ত' কুলবধূ নন।' শ্রীশের দৃঢ়তা অন্যক্ষেত্রে সুশোভন হ'ত না।

খল্ খল্ করে হেসে উঠ্‌লো মণিকা বল্‌লে—'কুলবধূ না হ'তে পারি, কিন্তু কুলবালা ত বটে।'

'তাতে কি? আমিও ত' কুলবালক।'

আবার হেসে উঠ্‌লো মণিকা, ক্ষিপ্র স্রোতের মত ব'য়ে যেতে লাগলো সে হাসি, শ্রীশের সর্ব্বাঙ্গে আছাড় খেয়ে পড়ছে যেন।

মণিকা বল্‌লে—'ঐ আমার বাড়ী এসে গেলাম, দুঃখিত আপনাকে আস্‌তে বল্‌তে পারছি না—আপনি'——

'দুঃখে সহানুভূতি জানাচ্ছি কিন্তু কাল আপনার দেখা পাবোত'?'

দুটো চোখের দৃষ্টির মধ্যে এত মিনতি এবং ব্যগ্রতা ফুটে উঠ্‌তে পারে মণিকার জানা ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে—'কোথায়?'

'যেখানে আপনার খুসী, মিউজিয়াম, গঙ্গার ঘাট, রেড্ রোড্, জু—যেখানে বল্‌বেন?' 'মিউজিয়াম দেড়টার সময়।' বল্‌তে বল্‌তে মণিকা উপরোক্ত গৃহটার দ্বারদেশে এসে দাঁড়ালো।

* * * *

সে রাত্রে অর্দ্ধসমাপ্ত উপন্যাসখানা শ্রীশ ছোয়নি; নিদ্রা ওকে মোহাসক্ত করে ফেল্‌লে। আর মণিকা গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বইখানা দীপালোকে চোখের সামনে মেলে ধরেছিল—তার একবর্ণও তার মাথায় ঢোকেনি।

পরদিন শ্রীশ যখন মিউজিয়ামের দরজায় পৌছালো তখন দুটো বেজে গেছে। শ্রীশ চিন্তিত হ'ল। মিউজিয়ামের প্রায় সব ঘর-গুলো সে একবার পাক খেয়ে এলো, কোথায় মণিকা?

অগত্যা শ্রীশ গান্ধার-শিল্পে মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করলে। সে চলে গেল সেই

পুরাতন যুগে যখন স্বাস্থ্যবান শিল্পীরা রৌদ্রজ্জ্বল প্রাঙ্গনে উন্মুক্ত দেহে পাথর খুঁদে খুঁদে প্রাণের সৃষ্টি করছে। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে ও একেবারে ফিরে এলো হাজার বছর পরে—

'আচ্ছা লোক ত' আপনি! দেখ্‌তে পান না?' আরে মণিকা যে! 'আপনাকে যে রকম খুঁজেছি—দান্তেও বোধহয় বিয়াত্রিচকে এত খোঁজেনি।'

'কিন্তু আপনার অন্বেষণ এ মিউজিয়ামের বাড়ীটার মধ্যেই নিবদ্ধ রইল—যাক্ তবু 'ইনটেনসিটি' আছে এই যা ভরসা।'

'আপনাকে খুঁজেছি কেমন করে জান্‌লেন?'

'জ্যোতিষ জানি; আসুন এ ঘরে ঢোকা যাক—দ্রষ্টব্য অনেক আছে'।

ঘরটায় বৌদ্ধ এবং সমসাময়িক যুগের নানাপ্রকার প্রস্তরমূর্ত্তি। অধিক সংখ্যক বুদ্ধমূর্ত্তি।

'আমি ভেবেছিলাম—আপনি আসবেন না'—শ্রীশ বল্‌লে।

'আপনারা সব সময়েই তাই ভাবেন—অবিশ্বাসী মন কিনা!'

'অবিশ্বাসের জন্যে নয়—আপনারা চিরকালই রইলেন দূরে—ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আমরা চিরকালই রয়েছি হাত বাড়িয়ে আকাশ-প্রদীপের পানে। তাই কেমন করেই বা ভরসা করি?'

'কেন জানেন?' মণিকা বল্‌লে—'সহ-শক্তি আমাদের অত বৃদ্ধি পায়নি এখনও। বহুকর্ম্মে নিযুক্ত বিভিন্নমুখী ধাবমান পুরুষের প্রেম একনিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব জেনেও যেদিন নিঃসঙ্কোচে আপনাদের নিকট এগিয়ে যেতে পারবো—সেদিন আর আমাদের আকাশ-প্রদীপ মনে হবে না।' মণিকা গম্ভীর হ'ল।

আলোচনা ভারি এবং বিষয় যেখানে গভীর হ'য়ে ওঠে শ্রীশ তখনই অস্বস্তি বোধ করে; ও কৌতুক-কণ্ঠে বল্‌লে—আপনি অত বড় Sentence-এ কথা বলেন কেন?'

মণিকা হেসে উঠ্‌লো; লঘু-সাবলীল সে হাসির গতি। বল্‌লে—'দেখুন উপাসনারত বুদ্ধদেবকে মেয়েরা কেমন করে অর্চ্চনা করছে—চমৎকার না? বাঁ পাশের প্রথম মেয়েটার দাঁড়াবার কেমন সুন্দর ভঙ্গী দেখেছেন? আচ্ছা এমন নির্ব্বিকার পুরুষকে দেখে কি মনে হয়?'

'আমাদের আর কি মনে হ'বে—মেয়েদের বোধহয় হিংসা হয়।'

'কেন? বাঃ!'

শ্রীশ উত্তর দিল না—ডাক্‌লে 'মণিকা!'

'কি!'

'আসুন উচ্চাসন থেকে নেমে আসা যাক—এখানে কেউ কাউকে নাগাল পাচ্ছিনা।'

হেসে মণিকা বল্‌লে—'বেশ ত' আপনি নামুন না আগে—তারপর—'

'আচ্ছা মণিকা! তুমি আমাকে সতেরো শতাব্দীর পাশ্চাত্য যুবক ভাব্‌ছো নাত?'

'ভাব্‌লেই বা! আপনাকে দেখে ত' মনে হয়না যে সেজন্যে আপনি খুব বেশী 'কেয়ার' করেন, কিন্তু ব্যাপার কি জানেন—তারা ছিল খাঁটি, যখন তারা বলেছিল আকাশের তারা এনে তোমার পায়ের কাছে রাখ্‌বো—তখন সত্যিসত্যিই তারা অন্ততঃ পাহাড় থেকে তরঙ্গসঙ্কুল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতো; কিন্তু আপনারা যখন বলেন তোমার জন্যে মরতে পারি—তখন আপনারা এক কোমর জলেও ডুব দিতে রাজী নন্!'

'না—না' প্রতিবাদের সুরে শ্রীশ বল্‌লে—'একেবারে ওরকম আমাদের ভাব্‌বেন না—'

'আচ্ছা আর একটু না হয় ভালো করে ভাববো, আসুন আপাততঃ এ ঘরটা দেখে শেষ করা যাক; আপনার এ সব দেখতে ইচ্ছে করে না? আমার কিন্তু বেশ লাগে।

মণিকা বল্‌লে—'আচ্ছা বৌদ্ধধর্ম্ম আপনার কেমন মনে হয়? That the universe is an illusion, that life is but one momentary halt upon an infinite journey; that all attachment to persons or to things must be fraught with sorrows—এ সব বিশ্বাস করেন আপনি?'

অনেক বেশী অস্পষ্টতার অবতারণা হ'য়েছে। সুযোগ লোভনীয়। নিজকে রহস্য-জালে অদৃশ্য ক'রে শ্রীশ বল্‌লে—'ওসব

বিশ্বাস অবিশ্বাসে আমার কিছু এসে যায়না মণিকা, আমি বিশ্বাস করি প্রেম—মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম—'

হঠাৎ যেন শ্রীশের মাথাটা ঘুরে গেল; চট্ করে সে মনে ক'রতে পারলে না উত্তেজক ভোজ্য কিছু আহার ক'রেছে কি না; সমস্ত শরীর ওর দুলে উঠ্‌লো হঠাৎ। যুগপৎ বিস্ময় এবং ভয়ে সে চারিদিক চাইল। অপর কয়েকজন দর্শক ত্রস্তে ঘর থেকে বাইরে চলে এলো। শ্রীশের মনে হ'ল সমস্ত বাড়ীটা দুলছে—ভীষণ সে দোলা। দুটো বড় বুদ্ধ-মূর্ত্তি ওদের পায়ের কাছে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেল। মাথার উপরে ঘন ঘন গুরু-পতনের শব্দ। একটা কাঁচের বড় কেস্ কাৎ হ'ল, চুরমার হ'য়ে গেল একেবারে। ওরা সভয়ে পেছিয়ে এলো।

ভূমিকম্প! তাইত! সামনের খিলানটা চড় চড় করে দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে গেল।

আঃ সামনে আবার কে—মণিকা! শ্রীশ মণিকার পাশ কাটিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এলো দরজার দিকে। সে ধাক্কায় মণিকা পড়লো ছিট্‌কে। আত্মপ্রকৃতিস্থ হয়ে মণিকা উঠে দাঁড়ালো এক নিমেষে—ছুটে গেল দরজার দিকে; পাশে বিশাল এক বুদ্ধমূর্ত্তি গতি প্রতিরোধ ক'রে ভেঙ্গে পড়লো। পেছিয়ে এলো মণিকা—সর্ব্বদেহ তার থর থর করে কাঁপছে। যে জীবিত বুদ্ধ একদিন মানুষের বুভুক্ষাকে হিংসা ক'রেছিল সে বুদ্ধই আজ মৃতাবস্থায় হিংসা করলে মানুষের প্রাণকে। সুনিশ্চিত মৃত্যু! মণিকা কোনদিন সুন্দরী ছিল না—ওর মুখাবয়বে যেন কোনদিন ললিত ছিল না। তার মুখে ফুটে উঠ্‌লো সুস্পষ্ট মৃত্যু-রেখা—চোখে মরণের বিভীষিকা। বিশাল প্রস্তর-স্তূপ অতিক্রম করে সে ওপাশে যেতে পারবে না, কিছুতেই না। এক মুহূর্ত্তের জন্যে সে দেখ্‌তে পেয়েছিল—উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের প্রান্ত—জীবনের লীলা। সে দেখেছিল ছুটে যাচ্ছে—বিপর্য্যস্ত বিধ্বস্ত আহত নরনারী। ওরা বাঁচবে—ওরা বেঁচে যাবে এ যাত্রা, মরবে না। মণিকার দেহ শীতল হয়ে এলো। যাক্! ভূমিকম্পের শব্দটা মৃদু হয়ে এলো না? মণিকা শব্দানুসরণ করে উর্দ্ধে তাকিয়ে দেখে—ছাদে ফাটল ধরেছে—এখুনি ভেঙ্গে পড়বে মাথার উপরে সশব্দে। শ্রীশ যদি ওকে ধাক্কা না দিয়ে পালাত একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারতো, তা' হ'লে ও মরত না; প্রাণে বেঁচে যেতো বোধ হয়। 'ইস্!' মণিকার ভয়ার্ত্ত কণ্ঠস্বরের অস্ফুট আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হ'ল। ছাদটার একাংশ ভেঙ্গে পড়লো সশব্দে।

ভূমিকম্প থেমে গেল। অর্দ্ধমৃত বা আহত মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। চারিদিকে রাশীকৃত ভগ্নস্তূপ। গান্ধার-শিল্প এবং বুদ্ধ-শিল্প নিয়ে এখন আর সমালোচনা চলবে না—সব মিশে একাকার হ'য়ে গেছে।

স্তূপের এক পাশে মনিকা পড়ে আছে; লুণ্ঠিতা—সুন্দরী মনিকা। মুখে সৌন্দর্য্যের দীপ্তি, দেহে যৌবনের প্রাচুর্য্য।
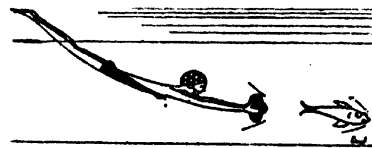
মণিকা মরেনি—বেঁচে গেছে।......

দেহ-যমুনা

[নাটক

শ্রীবিনায়ক ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রভব—হঠাৎ এই বৈরাগ্যের হেতু ?—

প্রদ্যোত—বৈরাগ্য কি আর পাঁজি দেখে আসেরে ভাই ?—এমনি।—

প্রভব—ভাল।

প্রদ্যোত—তুই বোধহয় জানিস নে, এই গীতা হচ্ছে প্রফেসর জগদীশ রায়ের মেয়ে।

প্রভব—আমাদের সেই জগদীশ বাবু? যিনি বটানি পড়াতেন ?—

প্রদ্যোত—হ্যাঁ, মাসখানেক হ'ল তিনি মারা গেছেন। গীতা এখন সম্পূর্ণ একলা, কাজেই আমাকে তার দেখাশোনা করতে হয়—

প্রভব—তা' এইটেই কি তোর বাড়ীতে না যাওয়ার কারণ ?

প্রদ্যোত—কতকটা। তারপর হঠাৎ কোলকাতায় এলি কী মনে করে ?—

প্রভব—একটি লোকের খোঁজে। তাকে পাবই এ ভরসা আমি করিনি, তবে পেলে ভাল হয়।

প্রদ্যোত—লোকটা কে ?—

প্রভব—তার পরিচয় তো এক কথায় হবে না ভাই, সে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস। আজ আর সে সময় নেই—আমাকে এক্ষুনি উঠতে হবে।

(গীতার চা ও জলখাবার লইয়া প্রবেশ)

প্রভব—এত সব কী হবে ?—

গীতা—কি আবার হবে—খাবেন।

প্রভব—খাবো ? বেশ।

প্রদ্যোত—গীতা! বিজয় কোথায় গেলরে ?—

গীতা—কোথায় আবার যাবেন। ও ঘরে দেখলাম Exercise করছেন।

প্রদ্যোত—Exercise করছে! কই ডাকতো তাকে। (গীতা চলিয়া গেল)—

প্রভব—ছেলেটি খুব সরল তো !—

প্রদ্যোত—হ্যাঁ। এবং ইঞ্চি খানেক পাগল—

[গীতা বিজয়কে সঙ্গে লইয়া আসিল। বিজয়ের গায়ে একটা গেঞ্জি। সে হাঁপাইতেছে। তাহার দুই হাতে দুটি ডাম্বেল]

প্রদ্যোত—তুমি নাকি Exercise কচ্ছিলে ?—

বিজয়—(হাঁপাইতে হাঁপাইতে) হ্যাঁ।

প্রদ্যোত—হঠাৎ এটা আরম্ভ করলে কেন ?

বিজয়—সেদিন এ্যালবার্ট হলে একটা Lecture শুনছিলুম যে, Exercise না করলে মানুষ বেশী দিন বাঁচে না।

গীতা—আপনাকে বেশীদিন বাঁচতেই হবে এমন অনুরোধ কে করেছে ?

বিজয়—(দাঁত মুখ খিচাইয়া) বাঁচবার জন্যে কাউকে বুঝি অনুরোধ করতে হয় ? ফাজিল মেয়ে কোথাকার। তোমাকে কে কথা কইতে বলেছে ?—

গীতা—আপনিই তো বলেছেন। যত রাজ্যের আজগুবী খবর সব আপনার কাছে।

বিজয়—আজগুবী খবর! Exercise না করলে মানুষ বেশী দিন বাঁচে না—এটা আজগুবী খবর ?—এতো একটা কচি শিশুও বুঝতে পারে।

গীতা—কচি শিশু বুঝতে পারে বলেই বড় মানুষে পারে না। Exercise করলে যদি মানুষ বাঁচতো, তাহ'লে ভীম ভবানী মারা যেতো না।—

বিজয়—ভীম ভবানী ? তারতো অসুখ করেছিল—তবেই না—

প্রদ্যোত—ওহে, তোমরা ঝগড়া করো না। দাঁড়াও বিজয়, গীতাকে আমি এক্ষুণি ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছি। আচ্ছা গীতা, তুই এমন একটা লোকের নাম করতে পারিস যে সারা-জীবন Exercise না করেও দীর্ঘ জীবন পেয়েছে ?

গীতা—নিশ্চয়ই পারি। কেন আমাদের রবীন্দ্রনাথ।—

বিজয়—রবীন্দ্রনাথ! রবীন্দ্রনাথ Exercise করেন না, একথা কে বলে ?

গীতা—আমি বলি।—

বিজয়—তুমি বল! (একটু থামিয়া) ও রকম কবিতা লিখতে পারলে আমরাও হ্যাঁ—! (সবেগে প্রস্থান করিল)

(চা খাওয়া হইয়া গেলে)—

প্রভব—আমি উঠি।

প্রদ্যোত—চল্ আমি তোকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি। গীতা, যদি কেউ আমায় খুঁজতে আসে, বসতে বলবি, শীগ্‌গির আসছি আমি।

(দু'জনের প্রস্থান)—

[ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতে-ছিল। গীতা সুইচ টানিয়া দিয়া ঘর মগ্ন এদিক ওদিক বেড়াইতে বেড়াইতে সেল্‌ফের উপর হইতে সে মাসের Modern Review খানা টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। দাঁড়াইয়া পড়িতে পড়িতে বোধহয় কোন এক জায়গায় ভাল লাগিল বলিয়াই একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। একটু পরে বাহির হইতে কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল

—ভেতরে আসতে পারি ?—

গীতা—(চমকিয়া বই হইতে মুখ তুলিয়া) আসুন।

[স্বপন রায় প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া গীতা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

গীতা—কাকে চাচ্ছেন ?—

স্বপন—প্রদ্যোত বোসকে। আছে ?

গীতা—তিনি এই মাত্র বেড়াতে বেরুলেন।

স্বপন—ও! তাহ'লে একটু বসি।

গীতা—বসুন।

স্বপন—(বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইল) তোমার নামই বুঝি গীতা ?

গীতা—হ্যাঁ—কেন বলুন তো ?

স্বপন—না-এমনিই বলছিলাম। তোমার নামটা আমি জানি কিনা অনেক দিন থেকেই, (যেন অন্য মনস্ক হইয়া গেল)

গীতা—দাদা বুঝি আপনার বন্ধু ?

স্বপন—দাদা কে ? অ-ও! প্রদ্যোতকে তুমি দাদা বল বুঝি ?

গীতা—শুধু বলিনে—তিনি সত্যিই আমার দাদা।

স্বপন—বেশ বেশ এইত দরকার, সত্যিকার ভ্রাতৃত্ব সংসারে বড় দুর্লভ। তোমাদের এই সম্বন্ধ দীর্ঘজীবি হউক।

(গীতা সস্মিত মুখে চুপ করিয়া রহিল)

স্বপন—তা বিজয়কে যে দেখছিনে আজ ? সে কি আর আসে না না কি ?

গীতা—হ্যাঁ, আসেন বই কি! রোজই আসেন। এই তো একটু আগে চলে গেলেন। তিনি আমাকে গান শেখান কিনা!

স্বপন—অ-ও! আচ্ছা, অনেক দিন দেখা হয়নি, প্রদ্যোতের সেই পুরানো স্বভাবটা গেছে কিনা বলতে পারো ?

গীতা—কোন্ পুরানো স্বভাবের কথা বলছেন আপনি ?

স্বপন—এই মদ খাওয়া টাওয়া—তারপর—

গীতা—(সবিস্ময়ে) ম—দ ? দাদা কি মদ খান নাকি

খেতেন। আর ঐ বিজয়—ওর সঙ্গ ছাড়বার জন্যে প্রদ্যোতকে আমি কম অনুরোধ করেছি। নাঃ, কিছুতেই না। কি চোখেই যে ওকে দেখেছে, যেখানে যাবে সেখানে বিজয়কে না নিয়ে গেলে ওর চলবেই না।

গীতা—এসব আপনি কী বলছেন ?

স্বপন—যা বলছি তা বুঝতে নিশ্চয়ই তোমার কষ্ট হচ্ছে না। তুমি এখন কুমারী দেখছি, বাড়ীতে একলাই থাকো এ অবস্থায় (গীতা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া স্বপনের মুখের দিকে চাহিল) অথচ আমি তো জানি ওর আগের সমস্ত ইতিহাস।

গীতা—ইতিহাস ?

স্বপন—হ্যাঁ, তাকে এক রকম ইতিহাসই বলতে হবে বৈকি।

গীতা—আমাকে বলতে আপনার কোন বাধা আছে কি ?—

স্বপন—বাধা আর কি। তবে কি জান—মানে—তোমার একটা ধারণার ওপর—

গীতা—না—আপনি বলুন।—

স্বপন—আজও সুব্রতার কাছে—

গীতা—সুব্রতা কে ?

স্বপন—চরিত্রহীনা—মেয়ে।

—অবিশ্যি এখন। কিন্তু আগে কোন এক Respectable familyর মেয়ে ছিল ও। বিজয় তাকে শেখাতে যেতো গান।···এর পরের ঘটনা টুকু তুমি শুনতে চেয়ো না······তারপর থেকে······।

গীতা—আপনার কথা মিথ্যে—আমি এ কিছুতেই—মরে গেলেও বিশ্বাস করবো না।

স্বপন—(হাসিয়া) অপ্রিয় সত্য চিরকালই অপ্রিয় সত্য। কিন্তু দেখছি কথাটাতে তুমি আঘাত পেয়েছো। (থামিয়া) সে থাক আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি—গেলবার All India Exibitionএর beauty prize কি তুমিই পেয়েছিলে ?—(গীতা মাথা নাড়িল)

স্বপন—পাওনি না ? তোমাকে প্রথম সেই। বাস্তবিক, আশ্চর্য্য তোমার রূপ, (গীতা কি একটা বলিতে গেল) তুমি আমার ছোট বোনের মত—কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্য মানে—কি বোলব—splendid তুমি যার ঘরে যাবে সে ঘর হবে পৃথিবীর তীর্থস্থান।

(প্রদ্যোতের চাকর যতীন হঠাৎ প্রবেশ করিল।)

যতীন—বাবু! ডাক্তার বাবু—বাবু কোথায় ?

স্বপন—একি! যতীন, তুই এখানে কেন ?

যতীন—বৌদিমণি হঠাৎ ফিট্ হয়ে পড়েছিলেন—

স্বপন—তারপর ?

যতীন—তারপর মাথায় জল টল দিয়ে জ্ঞান হবার পর বলছেন বুক ধড় ফড় করছে—আর—

স্বপন—(ব্যস্ত হইয়া) বটে! তা প্রদ্যোত তো এখন বাড়ীতে নেই। চল্ আমিই যাচ্ছি। আমার কথা কিছু বলেছেন।

যতীন—হ্যাঁ, যদি বাবু এখানে না থাকেন তবে আপনাকে বাড়ীতে খবর দিতে বলেছেন।

স্বপন—আচ্ছা তুই তবে চল, কি বিপদ হঠাৎ এ রকমটা হবার মানে? চল্—তুই এগো—আমি যাচ্ছি।

(যতীন চলিয়া গেল)—

স্বপন—আচ্ছা তবে চল্লাম গীতা। প্রদ্যোতের সঙ্গে দেখা হোল না—কী কোরবো কপাল খারাপ।

গীতা—শুনুন—আপনি বিজয় বাবুর সম্বন্ধে যা বল্লেন একি সব সত্যি ?

স্বপন—আমার কথা মিথ্যে হ'লে সুখী হ'তাম। কিন্তু সাবধান—তুমি যেন জগতে সুব্রতার সংখ্যা আর বাড়িওনা।

গীতা—(প্রায় কাঁদিয়া) আপনার নাম ?

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

মনোরম সাধু খাঁ

ম্যাক্‌ডোনাল্ডের বিপদ

মহা মুস্কিলে সেদিন পড়েছিলো জেনেট্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড। বিকেল হয় হয়, বেড়িয়ে এসে জেনেট দেখলে তার বাগানে বসে রয়েছে এক বাঁদর। বাঁদরটি জেনেট-প্রিয় সন্দেহ নেই, কারণ বাগানে যেখানেই না সে যাচ্ছিলো, তার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলো, সেই বাঁদর। কী করা যায়, বাড়ীর ভেতর গিয়ে সে পুলিশকে করলে টেলীফোন। তখুনি তারা এলো। বিপদ—এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর ঘরে—এতো ফেল্‌বার জিনিষ নয়। কিন্তু, পুলিশরা তাকে ধরতে পারলে না। দুষ্টু শাখামৃগ গাছের এ শাখা থেকে ও শাখা, ও শাখা থেকে এ শাখা করে' বেড়াতে লাগলো। উঁচু, নীচু জায়গায় এ হেন ক্ষিপ্র গতি মানুষের ভেতর একমাত্র আছে—দমকলের লোকদের। পুলিশরা বল্‌লে—ডাকো তাদের। তারা এসে চটাপট্ গাছে গাছে ঝোলানো মই লাগিয়ে বেচারা বাঁদরকে তাড়া করলে—কিন্তু শাখায় শাখায় যাদের রাজত্ব তাদের সঙ্গে মানুষ পারবে কেন! কথা হলো—এখান থেকে ওকে যখন তাড়াতে পারা যাচ্ছে না, তখন গুলি করে' ওকে একেবারে পৃথিবী থেকেই তাড়ানো হবে কি-না। জেনেটের নারী মন, বল্‌লে—না, না, বরঞ্চ ও থাকুক।

বাঁদরটা বোধহয় ওদের কথাবার্ত্তা বুঝলে। ভাবলে—ব্যাপার তো সুবিধের নয়, অতএব নিজেই শেষকাল্‌টা পালালে।

অনেকে বলে—জেনেট্ নাকি ভারী এক ভুল করেছিলো। অতো গোলমাল না করে' জনি ওয়াইসমুলারকে ডাকলেই তো হ'তো।

প্রিয় হাঁসপাতাল

আমেরিকার অভিনেতা অভিনেত্রীদের যেটা সবচেয়ে প্রিয় হাঁসপাতাল তার নাম হচ্ছে—গুড সামারিটান্। সম্প্রতি ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের দু'জন প্রখ্যাত অভিনেত্রী এ হাঁসপাতালে আবদ্ধ আছেন। এক নম্বর হচ্ছে—কে ফ্রান্সিস্। ইনি কিছুদিন হ'লো হলিউডের সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীকে এমন এক ভোজে আমন্ত্রণ করেছিলেন—যে—সবাই স্বীকার করেছে—এ হেন সম্মিলন হলিউডে এই প্রথম বল্‌লেই চলে। কিন্তু, তারপরই হয়, মিস্ ফ্রান্সিসের ইনফ্লুয়েঞ্জা। ইনফ্লুয়েঞ্জা মানুষকে কী রকম কাহিল করে—ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা আছে। কে'রও হ'লো তাই। ভারী দুর্ব্বল হয়ে পড়লো তার কমনীয়, রমনীয়, সুন্দর শরীর। তাই, দশদিন সে একান্ত নির্জ্জনে কাটাবে সাময়ি

এড্‌গার ওয়ালেশ-এর 'স্যাণ্ডারস্ অফ দি রিভার'-এর চিত্র সংস্করণ করছেন লণ্ডন ফিল্মস্। ছবি তোলা হচ্ছে—এমন সময় এই ছবি।

স্বপন—আমার নাম?—আমার নাম তাপহরণ রায়।… (চলিয়া গেল)

গীতা—শুনুন—আর একটা কথা শুনুন (স্বপন তখন চলিয়া গেছে 'গীতা' সেই খানে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার দুই চোখ স্থির নিষ্পলক, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একটি পাথরের প্রতিমূর্ত্তি দাঁড় করাণ রহিয়াছে।—)

যবনিকা

ক্রমশঃ

অত্যন্ত প্রাণের যে সমস্ত বন্ধু—তারাও তাকে দেখতে আস্‌তে পারবে না।

রুবি কিলার তারপর

হাঁসপাতালে দ্বিতীয় নম্বর যাত্রী হচ্ছে—রুবি কিলার। রোগ এর বিশেষ কিছু নয়, পায়ে একটা অপারেশন। রুবির পায়ের দাম কতখানি আপনাদের কাছে অজানা নয়। তার মিষ্টি স্বভাব ও মিষ্টি অভিনয়ের মতই বিখ্যাত হচ্ছে তার অনিন্দ্যসুন্দর নাচ। রুবি যখন নাচে—নাচে প্রতি দর্শকের চোখ তালে তালে। সেই রুবির পায়ে হবে ছোট্ট, সামান্য একটি অপারেশন। সঙ্গে আছে তার বোন, তারও টন্‌সিলটা কেটে করতে হবে ছোটো।

রুবি কিলার এইমাত্র যে ছবি শেষ করেছে—সেটি হচ্ছে তার স্বামী অল্ জল্‌সনের সঙ্গে—'গো ইনটু ইয়র ডান্স'।

আর, কে ফ্রান্‌সিস্—ওয়ারেন উইলিয়ম আর জর্জ্জ ব্রেনট্-এর সঙ্গে 'লিভিং অন ভেলভেট্'।

অ্যান সাদার্ন-কলম্বিয়ায়-অনেকদিন পর ঘরের ষ্টুডিয়োয় ফিরে এসেছে।

আবার এক সঙ্গে

জিন্‌জার রোজার্স আর ফ্রেড অ্যাসটেয়ার একসঙ্গে তিনটে ছবিতে নেবে ও নেচে আজকাল আমাদের কাছে এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে—যে—রোজার্স বল্‌লেই অ্যাস্‌টেয়ার বল্‌তে ইচ্ছে করে। একসঙ্গে তারা যে ছবিগুলোতে নেবেছে তার নাম হচ্ছে—'ফ্লাইং ডাউন টু রিয়ো', 'গে ডিভোর্সি' ও 'রবারটা'।

কিন্তু, তাতেও হ'লো না। আর-কে-ও-রেডিয়ো আবার তাদের একসঙ্গে প্রেম করতে দিয়েছে 'টপ্ হ্যাট্' বলে এক ছবিতে।

সঙ্গে থাক্‌বে অতুলনীয় হাস্যাভিনেতা এডওয়ার্ড এভারেট হরটন।

হলিউডে গরম কাল

গরম শুধু আমাদের ভারতবর্ষেই পড়েনি, পড়েছে পৃথিবীর প্রায় সকল জায়গায়। অবিশ্যি আমাদের গরমে ও ওদের গরমে তফাৎ অনেক। তবুও গরম তো পড়েছে!

গরম পড়েছে এখন হলিউডে—চিত্র রাজ্যের রাজধানী। গরমের সময় হলিউডের লোকেরা সপ্তাহ শেষে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সহর ছেড়ে বাইরে যেতে। সপ্তাহের দুটো দিন

তারা তাদের ইয়ট্ বা মোটর বোটে চলে যায় অনেক দূরে, সহরকে তারা ভোলে, সমুদ্রের ধারে-সবুজ গাছের ছায়ায় ছায়ায়।

লুইস্ ষ্টোন্, লিয়ো কারিলো, ফ্র্যাঙ্ক মরগান আর উইলিয়ম হেন্‌রী তাদের সমুদ্র-ভ্রমণের জন্য হলিউডে বিখ্যাত। ইতিমধ্যেই তারা তাদের ইয়ট্‌গুলোকে ভ্রমণের উপযোগী ঠিকঠাক করতে আরম্ভ করেছে। সাণ্টা বারবারা দ্বীপ হচ্ছে ক্যারিলোর প্রিয়, সে সেখানে মাছ ধরে ও শীকার করে কাটায়।

লুইস্ ষ্টোন্-এর ইয়ট্-এর নাম হচ্ছে 'সিরিনা'। অ্যাভালন হ্রদের এক চরে সে তার জাহাজ থামায়, জলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে দিনরাত বই পড়ে, ছবি আঁকে, ঘুমোয়।

জন ভিলারস্ ফারো সম্প্রতি চমৎকার এক ইয়ট্ কিনেছে, তার নাম হচ্ছে 'ম্যাভাউরিন্'। মউরিন ও' সালিভান্-এর সম্মানের জন্য এ নাম, কারণ ফারো সালিভান্‌কে বিয়ে করতে যাচ্ছে শিগ্‌গীরই। ফারো সপ্তাহ শেষে অনেক বন্ধুবান্ধব নিয়ে অনেকদূর যায় জল-পথ-ভ্রমণে।

জল যাদের প্রিয় নয়

জল-ভ্রমণ সবাই যে পছন্দ করে তা কিন্তু নয়। পাম্ স্প্রিং বা লাকুইন্টা ব'লে দুটো জায়গায় সপ্তাহ শেষে দেখা যায়—জেনেট্ ম্যাকডোনাল্ড, রবার্ট টেলর, লোয়িস ক্যাজেণ্ডা, গ্লোরিয়া সোয়ানসন, মে রব্‌সন ইত্যাদিকে।

ওয়ালেশ বিয়ারীর সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে বন্দুক, তাই সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে তার ছুটির দিনে জঙ্গল। হাই সিরাস জঙ্গলে, বগলে বন্দুক বিয়ারী শীকার করে' বেড়ায়।

পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটি উপভোগ করে জ্যাকী কুপার ঘোড়ায় চড়ে, সাঁতার কেটে, মাছ ধরে' ও মিছিমিছি অনেকখানি ঘুরে' বেড়িয়ে।

জিন পার্কার—খেলে আর সাঁতার কেটে। রোদে পুড়ে' খানিকটা কালো হওয়া জিনের হচ্ছে আন্তরিক ইচ্ছে।

আর-কে-ও রেডিয়োর "ব্যাচেলারস্ বেট' এ এই মেয়ে, নাম—পার্ট্ কেল্‌টন।

ফ্রেড্‌রিক মার্চ ও পরিচালক ই, এচ, গ্রিফিথ্‌কে সপ্তাহ শেষে দেখা যায় লাগুনা বিচ্-এ।

ছুটির দিনে জনি ওয়াইস্‌মুলার তার 'টারজান খেলা' দেখায় তার প্রায় তিন-শ' দর্শকদের। দর্শকদের বয়েস ছ' থেকে আরম্ভ করে' বারো পর্য্যন্ত। তারপর—সাণ্টা মণিকা হ্রদে খুব জোরে সে একটা মোটর বোট চালায়।

নিবেদন

গত সপ্তাহের "ওপারের ছায়া" মনোরম সাধু খাঁ লিখেছিলেন, বভ্রুবাহন বটব্যাল নয়।

'দি থারটিনথ্ গেষ্ট'

কল্‌কাতায় খুব শিগ্‌গীরই একটি সুন্দর রোমাঞ্চকর ছবি আসছে যে এরকম ছবি খুব কমই আসে এখানে। নাম হচ্ছে 'দি থারটিন্‌থ্ গেষ্ট'। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন জিন্‌জার রোজার্স ও লাইল্ টাল্‌বট্। রোমাঞ্চকর ছবি অনেকই আপনারা দেখেছেন, রোমাঞ্চকর ছবি আমাদের কল্‌কাতায় আর আসেনি। চিত্রের একটি গল্প যে কতখানি মানুষকে অভিভূত করতে পারে 'দি থারটিন্‌থ্ গেষ্ট' নাকি একটি তার শ্রেষ্ঠ ও অনিন্দ্যনীয় নিদর্শন।

অতএব, রসিকমাত্রই এ চিত্রখানি দেখবার সুযোগ যে হেলায় হারাবেন না তাতে সন্দেহ নেই।

খুচরো খবর

জেমস্ ক্যাগ্‌নি যে ছবিতে এখন নাব্‌ছে তার নাম 'দি ফ্যারেল কেস্'।

* * *

চার্লস্ লফ্‌টন বিলেত থেকে হলিউডে সেদিন ফিরেছে। মেট্রোর হয়ে কাজ আরম্ভ করেছে—'মিউটিনি অন দি বাউন্‌টি'-তে। সঙ্গে আছে ক্লার্ক গেব্‌ল আর রবার্ট মনট্‌গোমারী।

* * *

দশ বছর আগে গার্বো যখন প্রথম এসেছিলো হলিউডে—তখন চিত্ররাজ্যে বিখ্যাত ছিলো লিলিয়ান গিস্, মে মুরে, র‍্যামন নোভারো ও লন্ চানী।

* * *

গ্লোরিয়া ষ্টুয়ার্টের সেদিন একটি ছেলে হয়েছে।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স

"ঈশান কোণে মেঘ উঠেছে—
করতেছে গোঁ—গোঁ ;
তোরা ডিঙ্গি বাঁধি থো।"

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারে মেঘ উঠিয়াছে। চেম্বার সম্বন্ধে কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ লাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন—

দুইবারের অধিক সভাপতি থাকিবে না—এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া নলিনী সভা-পতির পদলাভ করিয়া সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে।

এখন তাহার vice-like grip হইতে চেম্বারকে অব্যাহতি দান করাই দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

সহযোগী 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কয়টি ধারাবাহিক প্রবন্ধে চেম্বার সম্বন্ধে অনেক ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন। সহযোগী 'দৈনিক বসুমতী' সব বিবেচনা করিয়া নলিনীকে সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

'আনন্দবাজার' জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

নলিনীকে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটীর সভ্য মনোনীত করিবার জন্য রাজা হৃষীকেশ লাহার নামে ভারত সরকারের কাছে যে তার গিয়াছিল, তাহা কে পাঠাইয়া-ছিলেন এবং তাহার খসড়ায় কাহার হস্তাক্ষর আছে?

আমরা আর একখানি পত্রের উল্লেখ করিব।—

(১) ঢাকায় যখন হাঙ্গামা হয়, তখন নলিনী সভাপতি না হইয়াও—কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির—এমন কি সভাপতিরও বিনানু-মোদনে ও অজ্ঞাতে গভর্ণরের নিকট কোন পত্র লিখিয়াছিল কি না?

(২) পত্র লিখিয়া থাকিলে তাহাতে যে সব অভিযোগ ছিল, সে সব প্রমাণের জন্য আহূত হইলে সে প্রহৃত সারমেয় যেরূপে লাঙ্গুল নত করিয়া পলায় সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, কি না?

(৩) এই পত্রের উত্তরে গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারী লিখিয়াছিলেন কি না—

(ক) এই পত্র চেম্বারের মত—না সহকারী সভাপতি নলিনী সরকারের মত?

(খ) চেম্বারের মত প্রতিষ্ঠান
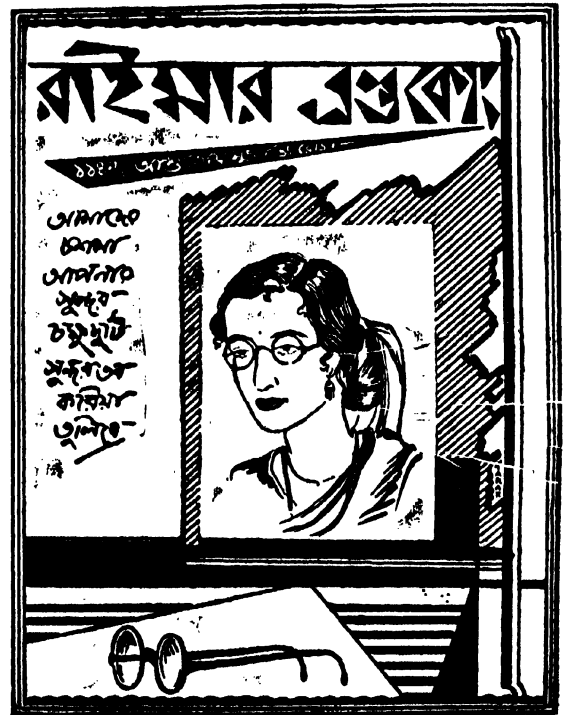
যে প্রমাণ করিতে পারেন না, এমন সব অভিযোগ উপস্থিত করেন, ইহা দুঃখের বিষয়।

বলা বাহুল্য, এই উক্তিতে চেম্বারের সম্ভ্রমহানিই হইয়াছিল।

চেম্বারের কার্য্যবিবরণের সঙ্গে যে সব পত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে নলিনীর পত্রের ও গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে কি? **যদি না হইয়া থাকে, তবে তাহার কারন কি?**

সহযোগী 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, নলিনীর ব্যবহারে কোন কোন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী চেম্বারের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা একটি কথা বলিব—

যে লাহা-গৃহে আজকাল নলিনীর গতায়াত বড় বাড়িয়াছে এবং যে—তাহার অকূলের কাণ্ডারী কার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিক ও যতীন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া যথায় নানা অভিনয় করিয়া আসে, সেই লাহাদিগের সহিত সে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে? লাহা পরিবার ও ভাগ্যকুলের রায় পরিবার চেম্বারে একযোগে কাজ করিয়া চেম্বারের মানপ্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিয়া আসিয়াছিলেন। ভেদনীতিবিশারদ নলিনী এই দুই পরিবারের যোগ ভাঙ্গিবার মতলবে প্রথমে ভাগ্যকুলের রায় পরিবারকে আক্রমণ করে। শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় তখন চেম্বারের অবৈতনিক সেক্রেটারী। তাঁহাকে সরাইয়া—গোল টেবিল বৈঠকে বিলাত-প্রবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ লাহাকে সেক্রেটারী করিবার আয়োজন হইল। সভাপতি রাজা হৃষীকেশ লাহা সে সংবাদ পাইয়া তাহা তারে পুত্র নরেন্দ্রনাথকে জ্ঞাপন করিলে নরেন্দ্রনাথ চেম্বারে তার করেন—তিনি অবৈতনিক সেক্রেটারী থাকিতে ইচ্ছুক নহেন এবং তাঁহার অনুরোধ ও অভিপ্রায়, যদুনাথ বাবুকেই সম্পাদক করা হউক।

সেই তার পাইয়া নলিনী প্রথম বলে—**তারের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করা সঙ্গত নহে** সুতরাং নরেন্দ্রনাথের তার ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলা হউক।

যতীন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিব্রত হইয়া পড়েন। তিনি এক দিকে যেমন লাহা পরিবারের অপ্রীতি অর্জ্জন করিতে পারেন না, তেমনই আবার মোতিধার ও বিজলীমণি চা বাগানের জন্য নলিনীকে চটাইতে পারেন না। তিনি বলিলেন, তার যে নরেন্দ্রনাথের নহে, ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে না।

তখন নলিনী বলে—

নরেন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্পাদকের পদ গ্রহনে অসম্মতি জানাইতে পারেন; কিন্তু কাহাকে সম্পাদক করা হইবে, সে সম্বন্ধে মত প্রকাশের কোন অধিকার তাঁহার নাই।

এইরূপে নরেন্দ্রনাথের ও রাজা সাহেবের মতের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। সে বিষয়ে যতীন্দ্র চন্দ্র যে নলিনীর সহযোগী ছিলেন, তাহাও আমরা জানি।

রাজা হৃষীকেশ লাহা মহাশয় যতদিন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ডিরেকটার ছিলেন, ততদিন কুমার কার্ত্তিক চন্দ্র যেরূপ ঘন ঘন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে যাইতেন, এখন আর তত ঘন ঘন যান না। কিন্তু সম্প্রতি নলিনীর ব্যাপারে তাঁহার গতায়াত আবার ঘন ঘন হইতেছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

নলিনী অনেককে বলিয়া থাকে, তাহার আমলে চেম্বার সরকারের কাছে অধিক সম্ভ্রম লাভ করিয়াছে, কথাটা যে ভিত্তিহীন তাহার প্রমাণ—

[illegible]

ট্রাষ্টে ৩ জন প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকারী ছিলেন—এখন সে অধিকার সঙ্কোচ করিয়া ২ জন প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা—

(১) যাহারা চেম্বারে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করেন, তাঁহাদিগের নাম প্রকাশের পদ্ধতি পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং

(২) এই সব অতিরিক্ত সাহায্য লইয়াও চেম্বারের ঋণের পরিমাণ—প্রায় সাড়ে ৫ হাজার টাকা।

নলিনীর শাসনাধীন হইবার পূর্ব্বে চেম্বারের কখন এমন আর্থিক দুরবস্থা হয় নাই।

এক দিকে এই অবস্থা আর এক দিকে—

সভাপতি নলিনী বহু কষ্টে (with faltering footsteps) মেয়র হইলে, তাহার সম্বর্দ্ধনা বাবদে অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া ব্যয় করা হইয়াছিল। এমন লজ্জাহীনতা সকলে দেখাইতে পারে না।

এ হেন ব্যক্তিকে সভাপতি রাখায় চেম্বার কিরূপ সম্ভ্রম লাভ করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

ব্যভিচারের মামলার রায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন—**নলিনী সত্য কথা বলে নাই,** চেম্বারে তাহার কর্তৃত্বফলও প্রকাশ পাইয়াছে।

এখন নলিনী যদি মানে মানে পদ ত্যাগ না করে, তবে কি চেম্বারের সভ্যরা তাহার সম্বন্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে ইতস্ততঃ করিবেন?

['অমৃতবাজার পত্রিকা ব্যতীত কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্রে বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বারে নলিনীর কীর্ত্তি-কাহিনী আলোচিত হইতেছে। সহযোগী-'আনন্দবাজার পত্রিকার' বাণিজ্য-

[illegible]

মেয়রের মামলার জের ?

"খেয়ালী"র বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর কর্ম্মচারীর অভিযোগ

১৮ই জুন শুনানীর দিন ধার্য্য

হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর কর্ম্মচারী ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল "খেয়ালী"র বিরুদ্ধে এক মানহানির মামলা রুজু করিয়াছেন। এই মামলায় উক্ত পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীযুত এস, আর, মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত এস, কে, সরকার ও শ্রীযুত যোগজীবন বন্দোপাধ্যায়কে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ গত বৃহস্পতিবার আলিপুরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এল, কে সেনের এজলাসে হাজির হয়েন। তাহাদের প্রত্যেককে ৭৫৲ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

ক্যাশবহি ফেরৎ পাইবার প্রার্থনা

ব্যারিষ্টার শ্রীযুত ডি, এন, বন্দোপাধ্যায় "খেয়ালী" পত্রের ম্যানেজার শ্রীযুত বিশ্বাবসু রায় চৌধুরীকে ক্যাশ বুক ফেরত দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান মামলা মেয়রের মামলার জের এবং যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া কেহ সমুদয় ব্যাপার পরিচালনা করিতেছে। এই আদালতের তল্লাসী পরোয়ানা বলে উক্ত ক্যাশ বুক ধৃত করা হইয়াছে। পরোয়ানাতে কিন্তু ক্যাশ বুক ধৃত করা বিষয়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল না। ন্যাশন্যাল নিউজপেপার্স লিমিটেডের কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্যই ক্যাশ বুক ধৃত করা হইয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষের প্রতিবাদ

ডাঃ সান্ন্যালের পক্ষ হইতে উকিল শ্রীযুত এ, কে, ভাদুড়ী অভিযুক্ত পক্ষের ব্যবহারাজীবের মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, এই মামলাকে মেয়রের মামলার জের বলিয়া অভিহিত করা সমীচীন নহে। আরও বলেন যে, একথা অভিযুক্ত পক্ষের ব্যবহারাজীবকে যাঁহারা বলিয়াছেন তিনি তাঁহাদিগের নাম জানিতে ইচ্ছা করেন। তিনি ক্যাশ বুক ফেরত দেওয়া বিষয়ে আপত্তি করেন। তাঁহার মতে উক্ত পত্রের সহিত আসামীদের সম্পর্ক প্রমাণ করার পক্ষে উহা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, যদি আবশ্যকীয় অংশের অনুমোদিত অনুলিপি লওয়া হয় তাহা হইলে ক্যাশ বুক ফেরত দেওয়াতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।

ব্যবহারাজীব শ্রীযুত ভাদুড়ী ইহাতে সম্মত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে অনুলিপির জন্য আবেদন করিতে বলেন।

অতঃপর অনুলিপি প্রদানের পর ৫০৲ টাকার জামিনে উক্ত পত্রের ম্যানেজারকে ক্যাশ বুক ফেরৎ দিবার আদেশ প্রদত্ত হয়।

মামলার শুনানী ১৮ই জুন পর্য্যন্ত স্থগিত আছে।

"খেয়ালী"র পক্ষে ব্যারিষ্টার মিঃ ডি, এন, ব্যানার্জ্জি, ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত মনোমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বসু উপস্থিত ছিলেন।

অনুরোধ করিয়াছেন। নলিনীর মর্কট-সুলভ প্রবৃত্তির কথা বিস্মৃত হইয়া সহযোগী বোধ হয় এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। মর্কটকেও যেরূপ উচ্চশিখর হইতে বল প্রয়োগ না করিলে বিদূরিত করা সম্ভবপর নয় সেইরূপ সভ্যগণ একত্রিত হইয়া বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া আনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন না করিলে নলিনী যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া গৌরীশঙ্কর লেনের আশ্রমে প্রস্থান করিবে এ আশা করা দুরাশা। সুতরাং লাহা-রায় স্যার হরিশঙ্করের সম্মিলিত শক্তি যাহাতে নলিনীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় তদ্বিষয়ে অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র ঘোষের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করিতেছি। —সঃ খেঃ]

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

সব্যসাচী

চানাচুর ভাজাওয়ালারা বলে—

মালে বোলে বিক্রী

ইহা চানাচুরওয়ালার পক্ষে যেমনই কেন হউক না, কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আমরা গৌরজনক বলিয়া বিবেচনা করি না। তাই হিন্দুস্থান সমবায় বীমামণ্ডলীর বহু ব্যয়সাধ্য নূতন বৃহৎ বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। ইহাতে বলা হইয়াছে :—

দেশের নেতারা বলিয়াছেন—হিন্দুস্থান "Citadel of Bengal's creative genius of Swadeshi".

এই নেতারা কাহারা ?—

(১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—যিনি পাটের ব্যবসা হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ব্যবসায়ই লোকসান দিয়াছেন।

(২) প্রফুল্লচন্দ্র রায়—যাঁহাকে 'অমৃত-বাজার পত্রিকার' মারফতে নলিনী সরকার "অর্দ্ধসত্যবাদী" বলিতে দ্বিধা বোধ করে নাই।

(৩) মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী—যিনি নেতৃত্ব অর্জ্জন করেন নাই—উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়া থাকিতে পারেন এবং যিনি হিন্দুস্থানের নিকট ঋণী।

(৪) রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—যিনি নেতা—এই মৌলিক সংবাদ এই বারই প্রথম হিন্দুস্থানের বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হইল।

ইত্যাদি।

স্বদেশীতে বাঙ্গলার সৃজনী প্রতিভার এই দুর্গ কি এমন যে, ইহাতে ১০।১১জন "নেতার" সার্টিফিকেটের ঠেকো দিতে হয় ?

দেশের লোককে বলা হইতেছে—

হিন্দুস্থানকে সমর্থন করিলে স্বদেশী সমর্থন করা হয়।

ভাল কথা। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তবে বিদেশীর সংবাদপত্র 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা দিয়া "নেতা"দের নিবেদন প্রকাশিত হইল কেন ? ইহা কি বিশ্ব-প্রেমের পরিচায়ক—না হিন্দুস্থানের টাকা খাটাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে 'ষ্টেটস্‌ম্যানের' মন্তব্যের ফল ?

ম্যানেজার নলিনী সরকারের মামলার সময়—**নিবেদন, তাহার পর** Refutation **পুস্তিকা ও তাহার পর এই সব বড় বড় বিজ্ঞাপন—**

ইহাতে মোট কত টাকা ব্যয় হইল ? গান্ধীজী যেমন অনেক টাকা লইয়া সাহিত্য-সম্মেলনে পদধূলি দিয়াছেন, আশা করি তেমনই আবেদনে স্বাক্ষরের জন্য রবীন্দ্রনাথকে প্রণামী দিতে হয় নাই। যদি দিতে হইয়া থাকে, তবে অবশ্য খরচের অঙ্ক আরও বাড়িবে। উপরে আমরা যে তিন দফার উল্লেখ করিলাম তাহাতে মোট কত টাকা ব্যয় হইল, তাহা হিন্দুস্থানের মাধব-গোবিন্দ রায় প্রমুখ ডিরেক্টাররা জানাইয়া দিবেন কি ?

এই যে টাকা ব্যয় হইল—ইহা কোন্ তহবিল হইতে দেওয়া হইবে ? বীমাকারী-দিগের তহবিল হইতে, না—অভাগা অংশী-দারদিগের ? অংশীদারদিগের অংশ হইতে ইহা ব্যয় হইলে তাহাতে কেহ কিছু বলিতে পারিবেন না। তাহার কারণ যাঁহারা ২০ বৎসর লাভের কড়ি দেখিতে পান নাই, তাঁহাদের এই ব্যয়ে কি আপত্তি হইতে পারে ? রবীন্দ্রনাথই ত লিখিয়াছেন—

> "চির-দিন অর্দ্ধাশনে কেটে গেছে যার,
> আজও তার অনশন হল না অভ্যাস ?"

যে স্বদেশীর অবলম্বন—'ষ্টেটস্‌ম্যান' কার্য্যালয়, তাহা অবশ্যই গোয়েন্দার দেশ-প্রেমের সহিত তুলনীয়। তবে হিন্দুস্থানের ডিরেক্টার শিশির মিত্র নিশ্চয়ই ইহার দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করিতে পারেন।

হিন্দুস্থান বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন ;—

"সত্য প্রকাশের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও তাহার তুলনার নামই ন্যায় বিচার। ধীর

এবং নির্ভুল যুক্তির উপরই তাহা নির্ভর করে। কিন্তু, বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যুক্তি-প্রয়োগেই ন্যায়বিচার করিয়া থাকেন।"

"Reason without passion" বলিলে কখন "ধীর যুক্তি" বুঝায় না—যুক্তি ধীর বা অধীরও হয় না।

সে যাহাই হউক ন্যায় বিচারে লোককে সাহায্য করিবার জন্য হিন্দুস্থানের ডিরেক্টাররা যদি লোককে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রদান করেন, তবে দেশের লোক নিশ্চয়ই প্রীত হইবেন ;—

(১) এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন বাবদে বিদেশীয় সংবাদপত্রে বার্ষিক কত টাকা দেওয়া হয়?

(২) হিন্দুস্থান বিজ্ঞাপন বাবদে বৎসরে কত টাকা ব্যয় করেন এবং ওরিয়েণ্টাল, এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া ও ন্যাশনালের তুলনায় তাহা কিরূপ দাঁড়ায়?

(৩) হিন্দুস্থানের ব্যয়ের হার ঐ তিনটি ভারতীয় বীমা কোম্পানীর ব্যয়ের তুলনায় কিরূপ দাঁড়ায়? হিন্দুস্থানের ব্যয়ের হার যদি অধিক হয়, তবে তাহার কারণ কি এবং তাহা কি "বাঙ্গালী জাতির গঠন-প্রতিভার প্রকৃষ্টতম উন্মেষক্ষেত্র" বলিয়া?

এই কয়টি তথ্য পাইলে লোকের পক্ষে ন্যায় বিচার করা সহজ হইবে—সন্দেহ নাই।

এই সঙ্গে আমরা আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি ;—

হিন্দুস্থানের বিজ্ঞাপনে ও প্রচার পুস্তিকায় যাহাদিগের সার্টিফিকেট জয়পত্ররূপে প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহারা কি হিসাব প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া ফতোয়া দিয়াছেন—না, পরের মুখে ঝাল খাইয়াছেন?

হিন্দুস্থানের বিজ্ঞাপনে সাহিত্যিক কৃতিত্বের পরিচয়ও অসাধারণ—"মোট সংস্থানের" মত "মড়া দাহ" ভাষা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু ভাষার আলোচনায় আমরা কালক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনে দেশের "নেতাদিগের" পদাঙ্কানুসরণ করিতে বলা হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

এই দুইজনের মধ্যে কেহ কি হিন্দুস্থানে জীবন বীমা করিয়াছেন যে, লোককে তাহাদের অনুসরণ করিতে বলা হইতেছে?

মিষ্টার বিড়লা

মিষ্টার খৈতান

এই দুইজন অবাঙ্গালী হিন্দুস্থানে কে কত টাকার জীবন বীমা করিয়াছেন? না—তাঁহারা বলিবেন, আমরা যাহা করি, তাহা করিও না—যাহা বলি, তাহাই কর?

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এই দুইজন কি গ্রেট ইণ্ডিয়ার দড়ী ছিঁড়িয়া একেবারে হিন্দুস্থানের অঙ্কে আসিয়াছেন?

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা
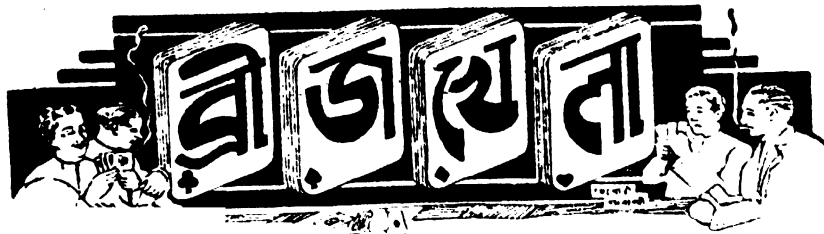
শ্লাম-সম্ভাবনা নিরূপণঃ— সম্মিলিত হস্তের পূর্ণমূল্য নির্দ্ধারণই (Plastic valuation) শ্লাম-সৌধের একমাত্র ভিত্তি। এই ভিত্তি যতই সুদৃঢ় হবে শ্লাম-সৌধও ততই সুরক্ষিতভাবে সুনির্ম্মিত হবে। ফলতঃ সম্মিলিত হস্তের পূর্ণমূল্য নির্দ্ধারণ-জ্ঞান না প্রাপ্ত হলে শ্লাম-সৌধ নির্ম্মাণের কল্পনা বাতুলতা মাত্র। সে ক্ষেত্রে শ্লাম-কল্পনা স্বপ্ন-বিলাসীর অলস স্বপ্ন-কল্পনায় পরিণত হয় এবং তা' পাঠক সাধারণের সুপরিচিত অ্যাল্‌নাস্কারের নিস্ফল স্বপ্ন-কল্পনায় রূপান্তর পরিগ্রহণ করে। বিগত সপ্তাহে বলেছি যে শ্লাম-নির্দ্ধারণ করতে হলে মিলিত হস্তে ন্যূনকল্পে সাড়ে ছয়খানি অনারের পিট থাকা প্রয়োজন এবং হাতের বিভাগও ভাল হওয়া প্রয়োজন। এখন কোন্ কোন্ অনারের পিট হাতে থাক্‌লে তবেই শ্লাম-সম্ভব ইহাই সর্ব্বাগ্রে অনুধাবন করতে হবে। তারপর সেই নির্দ্দিষ্ট অনারের পিট খেঁড়ীর হাতে আছে কি না তাই জান্‌তে হবে। এর জন্যই সম্মিলিত হস্তের পূর্ণমূল্য-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা শ্লাম-কল্পনাকারীর একান্ত আবশ্যক। মিঃ কালবার্টসনের উদ্ভাবিত চারখানি ও পাঁচখানি No Trump ডাক শ্লাম-কল্পনাকারীর এ বিষয়ে এক প্রধান সহায়। এই ডাক ও তাঁর জবাব ঠিক নির্ভুলভাবে দিতে পারলে শ্লাম অবশ্যম্ভাবী, আর শ্লাম যদি নাও হয় তবে খেসারৎ দিবার ভয় নাই। কারণ এই ডাক ও তার নির্দ্দিষ্ট জবাব উভয় হস্তের অনারের শক্তির এবং খেলার পিট পাবার শক্তির নির্ভুল ভাবে ঘোষণা করে। খেঁড়ীর বা ডাকদারের পক্ষে যে যে নির্দ্দিষ্ট তাস জানার প্রয়োজন এই ডাকে ও তার নির্ভুল জবাবে উক্ত তাস কয়টির অস্তিত্ব বা অনুপস্থিতির নির্দ্দেশ করে। নিম্নে এই দুইটী ডাকের বিশিষ্টতার পরিচয় দিচ্ছি।

চারখানি ও পাঁচখানি No Trump ডাকঃ—এ ডাক আরম্ভ করতে হলে সর্ব্বপ্রথমে মনে রাখতে হবে যে উভয় খেঁড়ীর মধ্যে যে কেউ প্রথমে যে কোন একটি ডাক দিয়েছেন। ডাকদারের ডাকের পর খেঁড়ী তাঁদের মিলিত হাতের পূর্ণ মূল্য নির্দ্ধারণ করে যদি মনে করেন যে তাঁদের শ্লাম-সম্ভাবনা বর্ত্তমান তবে তিনি ডাক দিবেন চারখানি No Trump। এ ডাকের অর্থ হচ্ছে নিম্নলিখিত রূপ।

(১) তিনি মনে করেন যে শ্লাম-সম্ভাবনা আছে এবং পূর্ব্ব কথিত যে কোন রঙের ডাকে খেলা হলে তাঁরা ১১খানি পিট পাবার সুনিশ্চিত আশা রাখেন।

(২) তাঁর হাতে হয় তিনখানি টেক্কা আছে না হয় দুইটী টেক্কা এবং যে কয়টী রঙ তিনি বা তাঁর খেঁড়ী ডেকেছেন তার মধ্যে যে কোন একটির সাহেব আছে। এই ডাক দিতে হলে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। ডাক 'গেম' অবধি না পৌছান পর্য্যন্ত এই ডাক বাড়তিভাবে দেওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ মনে করুন খেঁড়ী ডাক দিয়েছেন তিনখানি হরতন সে অবস্থায় চারখানি No Trump ডাকা উচিত নয়। ডাক 'গেম' অবধি উঠলে তবেই এ ডাক দেওয়া ভাল। কেন না ডাক উঁচুতে উঠলে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানাবার অবসর পাওয়া যায় না।

চারখানি No Trump ডাকে খেঁড়ীর জবাবঃ—(ক) খেঁড়ী যদি মনে করেন যে তিনি পূর্ব্বের ডাকে যা' জানিয়েছেন তার বেশী তাঁর আর কিছু নাই তবে তিনি যে কয়টা রঙ তাঁরা দু'জনে মিলে ডেকেছেন তার মধ্যে সব চেয়ে ছোট রঙটীর পাঁচখানি ডাক দিবেন। হয়ত এমন হতে পারে যে উক্ত রঙের তিনি বিশেষ কিছুই পাননি ত' হলেও এই ডাক তিনি দিবেন। এতে তাঁর খেঁড়ী বুঝবেন যে ইহা নিষেধ-জ্ঞাপক ডাক (Sign off bid)। তিনি শ্লামপথে আর অগ্রসর হবেন না। মনে করুন ডাক হয়েছে নিম্নলিখিত ভাবে।

(ক)

একটি ইস্কাবন
তিনখানি হরতন (২)
চারখানি ইস্কাবন (৩)
পাঁচখানি চিড়িতন (৫)
ছয়খানি চিড়িতন (৭)

(খ)

তিনখানি চিড়িতন (১)
তিনখানি ইস্কাবন
চারখানি No Trump (৪)

পাঁচখানি No Trnmp (৬)
ছয়খানি ইস্কাবন।

(১) খেঁড়ীর শক্তি-জ্ঞাপক ডাক। অনারের পিটের প্রাচুর্য্য (তিনখানির বেশী) নির্দ্দেশ করছে।

(২) ডাকদারের দ্বিতীয় রঙ্ প্রদর্শন। সাধারণ হাতের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল হাত জানাচ্ছে।

(৩) প্রকারান্তরে নিষেধ-জ্ঞাপক ডাক। আর বড় বেশী কিছু নেই।

(৪) হয় তিনখানি টেক্কা, নয় দুইখানি টেক্কা এবং হরতন, ইস্কাবন বা চিড়িতন যে কোন রঙের সাহেব নির্দ্দেশ করছে।

(৫) সম্পূর্ণ নিষেধ-জ্ঞাপক ডাক। কারণ খেঁড়ীর চারখানি No Trump ডাকের পর ডাকদার জবাব দিতে বাধ্য। হয়ত এমন হতে পারে যে তাঁর হাতে চিড়িতন মোটেই নেই।

(৬) তাঁর নিজের হাতে চারখানি টেক্কার অস্তিত্ব জানাচ্ছে। কেউ যদি চারখানি No Trump ডেকে তার পরে নিজেই পাঁচখানি No Trump ডাক দেন তা' হলে তাঁর হাতে চারখানি টেক্কারই অস্তিত্ব বিজ্ঞাপিত হয়।

(৭) আর অগ্রসর হবার মোটেই ইচ্ছা নেই। এই ডাকের সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে 'ওগো বন্ধু, ডাক শেষ কর'।

(খ) খেঁড়ীর চারখানি No Trump ডাকের পর ডাকদারের হাতে যদি কিছু বাড়তি শক্তি (added value) থাকে এবং একটি মাত্র টেক্কা থাকে তা হলে তিনি রঙের ছয়খানি ডাক দিবেন।

(গ) আর যদি তাঁর হাতে দুইটী টেক্কা থাকে তবে তাঁর জবাব হবে পাঁচখানি No Trump। তাঁর হাতে অন্য কিছু যদি নাও থাকে এবং পূর্ব্বের বিজ্ঞাপিত শক্তি ব্যতীত বাড়তি শক্তি (added value) যদি কিছু নাও থাকে তবুও দুইটী টেক্কা হাতে থাকলে তাঁকে পাঁচখানি No Trump ডাক দিতেই হবে।

প্রিয়ার অশ্রুধারা

ফাল্গুনী রায়

কাজ্‌লা চোখে বান ডেকেছে আজ্‌কে বাদল-রাতে
অশ্রুধারা ঝরছে প্রিয়ার, বৃষ্টিধারার সাথে।
কোন স্বপনের কোন মায়াতে ভুল্‌লে ওগো তুমি,
কোন মেঘের ছোঁয়ায় ঝরে অশ্রু কপোল চুমি?
শুভ্র কপোল উঠ্‌ল রাঙ্গি বুক-ভাঙ্গা অই জলে।
ব্যথার পাহাড় স্মরণ নিল যেন প্রাণ-কোলে।
সুন্দরী লো সুন্দরী, থামাও ওগো করুণ কাঁদন
অশ্রুধারা তোমার গো নাচাল ব্যথার নাচন।
মোর চক্ষুতটে বন্যা এলো করুণ কাঁদন দেখি,
তুমি যদি কাঁদ প্রিয়া—কি নিয়ে তবে আমি থাকি?
বৃষ্টিঝরা এই রাতিটিরে মহাশূন্য করি দিয়া
তোমার কাঁদন থামাও গো আমার প্রাণ-প্রিয়া।
(মোর) অশ্রুধারা চল্‌কে পড়ে তোমার ও কাঁদন দেখি।
কাঁদছে দেখ নৈশ আকাশ তোমার তরে-, একি!

সান্ধ্য সঙ্ঘের At Home :—

সান্ধ্য সঙ্ঘ আজকাল এই গ্রীষ্মের সন্ধ্যা জমিয়ে তুল্‌ছে খুব। এঁদের সমিতিতে নানারূপ অনুষ্ঠান প্রায় লেগেই আছে এবং তাই থেকেই এদের প্রতিষ্ঠানের সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। গত সপ্তাহে এই সেদিন এদের সভ্যগণ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নারায়ণ দে ম'শাইকে At Home দিয়েছেন। শ্রুতিমধুর গানবাজনার আয়োজন হয়েছিল আর জনসমাগমও হয়েছিল বেশ,—আমাদের দুর্ব্বাসাও অবশ্য বাদ পড়েন নি। নানারূপ মিষ্ট ও শিষ্টালাপের সহিত ভুরি ভোজনান্তে এদের অনুষ্ঠানটীর সমাধা হয়। তাই মনে হয় সমিতিটী যে খুব সজীব তা'তে সন্দেহ নেই।

ইউনিক্ ক্লাবের ট্র্যাজেডি :—

পাঠকবর্গকে আমরা দুঃখের সহিত জানাচ্ছি যে Unique club-এর সভ্য গুপীনাথ হালদার আর ইহলোকে নাই। তিনি Unique club-এর একজন প্রধান সভ্য ছিলেন এবং এই ক্লাবের উন্নতিকল্পে তাঁর জীবনের অনেকাংশ সময় অক্লান্তভাবে ব্যয় করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে শুধু Unique club-এর নয়, সমগ্র ব্রীজমহলের যা' ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা' পূরণ করা দুঃসাধ্য। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে আমরা সকলেই স্তম্ভিত, সুতরাং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-বর্গকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নাই। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র ২৭।২৮ বৎসর হয়েছিল।

খেয়ালী
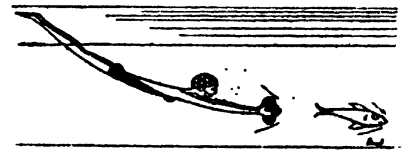
পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২—30th May, 1935. { ২২শ সংখ্যা

'খেয়ালী' ও নলিনীরঞ্জন সরকার

সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব সৃষ্টির আদি হইতেই আছে এবং হয়তো অন্ত পর্য্যন্ত থাকিবে। কেহ বা সত্যের দলে, কেহ বা মিথ্যার দলে ভিড়িয়া স্ব স্ব স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ যদি কোনো শিক্ষিত ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা যায়—"আপনি কি চান, সত্য না মিথ্যা?" তখন হয়তো তিনি বিনা দ্বিধায় উত্তর দিবেন—"আমি সত্যকেই চাই।" অথচ, এই সত্যকে চিনে কয়জন?

মানুষ চায় আড়ম্বর। তাই সহজ সরল অনাড়ম্বর সত্যকে সে চিনিতে পারে না। বটের সামান্য বীজ যখন মাতা ধরিত্রীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করে তখন কে তাহার সংবাদ রাখে? কিন্তু সেই বীজ যখন বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়া বহু জন-প্রাণীকে ছায়া ও আশ্রয় দান করে, তখনই হয় সে লোকলোচনের বিষয়ীভূত।

দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতার একপ্রান্ত হইতে "খেয়ালী" নলিনীরঞ্জন সরকারের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক অনাচার লইয়া আন্দোলন ও তীব্র প্রতিবাদ করে, তখন তাহা অনেকের নিকট অরণ্যে রোদন বলিয়াই অনুমিত হইয়াছিল এবং অনেকে হয়তো ইহাকে একটা সিনেমা পত্রিকার পক্ষে একান্ত স্পর্দ্ধা মনে করিয়া অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন সমস্ত অবজ্ঞা ও অবহেলা তুচ্ছ করিয়া "খেয়ালী" নিঃসঙ্গ একাকীত্বের গৌরবে যে সত্যের বীজ বপন করিয়াছিল,—আজ তাহা দুই বৎসর পরে বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, আমাদের ইহাই আনন্দ ও গৌরবের বিষয়।

গত ১৪ই চৈত্র তারিখের ত্রয়োদশ সংখ্যা "খেয়ালী"তে ন্যাশনাল চেম্বার অফ্ কমার্সে নলিনীর অনাচার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া "আমিই চেম্বার" লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর "আনন্দবাজার", "এড্ভান্স", "বসুমতী" ও "বন্দেমাতরমে" সে সম্বন্ধে নিয়মিত ও প্রবল আলোচনা হইয়াছে। হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী নলিনীর জন্য নিজের কি ক্ষতি করিতেছে, সে বিষয়েও আলোচনার প্রারম্ভের দাবি "খেয়ালী" করিতে পারে, কারণ সর্ব্বপ্রথমে গত ২৮এ চৈত্র তারিখের 'খেয়ালী'তে (পঞ্চদশ সংখ্যা) এই বিষয়ে আলোচনা হয়। আজ সর্ব্বজনসমাদৃত বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৈনিক পত্র "আনন্দবাজারে"ও সেই বিষয়ে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। অর্থাৎ যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা নলিনীর ন্যায় ভণ্ডের মুখোস খুলিতে

উদ্যত হইয়াছিলাম, আজ দুই বৎসর পরে "আনন্দবাজার", "এড্ভান্স" ও "বসুমতী" অর্থাৎ কলিকাতার সমগ্র সংবাদপত্র-মহল হইতে সেই আদর্শের সমর্থন পাইতেছি। এমন কি বাগবাজারের নলিনীভক্ত "অমৃতবাজার", যে এতদিন পর্য্যন্ত নলিনীর ওকালতী করিয়া আসিয়াছে, বিরুদ্ধ জনমতের প্রাবল্য দেখিয়া তাহাকেও নলিনী সম্বন্ধে "না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন" নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়া "খেয়ালী" আপন অস্তিত্বের সার্থকতা সপ্রমাণ করিয়াছে,—এ কথা আজ কে অস্বীকার করিবে?

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে চাই যে, নলিনী সম্বন্ধে আমাদের একটী অভিযোগও যে ভিত্তিহীন ব্যক্তিগত-আক্রোশ-প্রণোদিত নহে, কাল কি তাহা প্রমাণ করে নাই? সুভাষচন্দ্র নলিনীকে Government-Man বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, "খেয়ালী" সে কথা প্রকাশ করিয়া নলিনীকে তাহার উত্তর দিবার জন্য আহ্বান করে। আজও নলিনী সেই অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইয়া নিরুত্তর আছে। এক বৎসর পূর্ব্বে মেয়রের গদীতে আরোহণকালে নলিনী সদম্ভ উক্তি করিয়াছিল—"From pavement to the Mayoral chair." সেই গদী হইতে নামিবার পূর্ব্বেই তাহাকে পুলিশ কোর্টে ব্যভিচারের অভিযোগে আসামী হইয়া যাইতে হইয়াছিল। "খেয়ালী"ই প্রথমে লিখিয়াছিল "ফেনীতে অধ্যাপক স্বামী ফোঁস্ ফোঁস্ করিলেও নিরুপায়, সর্দ্দার শঙ্কর রোডে বীণার বীণা আজও বাজিতেছে।" ব্যভিচার মামলার রায়ে মাননীয় সুশীল সিংহ বলিয়াছেন যে, দিল্লীতে অবস্থান কালে নলিনীও বীণার ব্যবহার লোক সন্দেহের অতীত নহে মনে করিলে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ থাকিতে পারে না। একদিন মদগর্ব্বে স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া রেশিও সমস্যায় বোম্বাই বণিকদের সমর্থন করিতে গিয়া নলিনী আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত লোককে অর্দ্ধসত্যবাদী বলিতে দ্বিধা করে নাই। সত্যের অমোঘ বিধানে সেই নলিনীকেই মাননীয় সুশীল সিংহ মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই নলিনীকেই ইংরাজ বণিক সমাজের মুখপত্র "Capital"এ Ditcher "Mr. Facing-Both-Ways" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, সে কথা তো দেশের লোক ভুলে নাই। অতএব এইরূপ একজন ভণ্ডের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সাহায্য করিয়া "খেয়ালী" কি লোক-হিতৈষণার পরিচয় দেয় নাই?

এক সময়ে কলিকাতার সমগ্র সংবাদপত্র মহল তাহার করায়ত্ব বলিয়া নলিনী গর্ব্ব করিত। অধিকাংশ কাগজেই তাহার উৎকোচপুষ্ট লোক হয়ত ছিল। যে "অন্ওয়ার্ড" বলিয়াছিল—"To call him (Nalini) a Congressman is to unlearn the ideals of the Indian National Congress" সেই কাগজের সম্পাদককে টাকা দিয়া কিনিয়া আজ সে হিন্দুস্থানের দাস করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু একমাত্র "খেয়ালী"র চেষ্টায় চাকা ঘুরিয়াছে। আজ "খেয়ালী" তাহাকে হাড়ে হাড়ে বুঝাইয়াছে যে, অর্থের দাসখতে মনুষ্যত্ব বিক্রয় করে না,—এমন মানুষও এদেশে আছে। দেশের মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠা, মানুষের আত্মসম্মানকে জাগ্রত করা, মিথ্যাকে ভূমিসাৎ করা—সংবাদপত্রের ইহাই অন্যতম ব্রত। বহু অসুবিধা ভোগ করিয়া, বহু বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে গিয়া "খেয়ালী" আজ হয়তো বহু শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার আপন জন আজ পর হইয়াছে। তবু আজ আমাদের সান্ত্বনা এই যে, বাঙ্গলার শিক্ষিত জনমত আজ আমাদের পশ্চাতে এবং আমাদের বিশ্বাস আছে, এখনও যাঁহারা নলিনী-মোহে অন্ধ হইয়া আমাদের প্রতি বিরক্ত তাঁহারা একদিন তাঁহাদের ভুল বুঝিবেন এবং এই নির্ভীক ও কঠোর দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য আমাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিবেন।

——:O:——

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

সব্যসাচী

বৃদ্ধা সহযোগিনী 'সঞ্জীবনী' সাধুত্বের ছদ্মবেশে স্বদেশী প্রীতির রঙ্গমঞ্চ হইতে অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা—ব্যক্তিগত কারণ বশতঃ কতিপয় ব্যক্তি কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স সোসাইটির অনিষ্ট করিবার চেষ্টায় আছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বিদেশী বীমা কোম্পানীর স্থলে বাঙ্গালার নেতাগণের বাঙ্গালায় ব্যবসায় স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টার মধ্যে ইহা অন্যতম। বাঙ্গালীর প্রথম প্রচেষ্টা নষ্ট করা উচিত হইবে না। হয়ত এই বীমা কোম্পানীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য কোনও প্রতিযোগী কোম্পানী ইহার বিরুদ্ধাচারণ জন্য এই সকল আন্দোলনে উক্ত লোক সকলের পশ্চাতে আছে। ব্যক্তিগত কারণে ইহার পরিচালকগণের বিরোধিতা করিতে যাইয়া বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের এই প্রথম নিদর্শনকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালী চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করা হইবে। এই প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিয়া তবে ব্যক্তিগত কারণ লইয়া ব্যক্তি বিশেষের সহিত সংগ্রাম করা যায়। উক্ত কোম্পানীর দোষ ত্রুটি থাকিলে হিতাকাঙ্ক্ষীর প্রথম কর্ত্তব্য তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা, তাহা বলিয়া উহাকে ধ্বংশ করা উচিত নহে। গড়িয়া তোলাই শক্ত কিন্তু ধ্বংশ, যে কেহ করিতে সক্ষম। যাহারা প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিগত ক্রোধ মিটাইতে সক্ষম নহে তাহারা সমস্ত ঝাল হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর উপর ঝাড়িবার এখন সুযোগ পাইয়াছে। বাঙ্গালীর এই প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায় হিন্দুস্থানের অনিষ্ট করার অর্থ হইবে দেশের শত্রুতা করা।"

সহযোগিনী ধরিয়া লইয়াছেন, একদল লোক স্বদেশী প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং "ব্যক্তিগত ক্রোধ" মিটানই তাঁহাদের কাজের কারণ।

সহযোগিনীর এই সব কথার উত্তর আমরা বারান্তরে দিব। আজ জিজ্ঞাসা করি যে বৃদ্ধ কৃষ্ণকুমার মিত্র মাদ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনে মিষ্টার নর্টনের উপস্থিতিতে উষ্মা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি নলিনী সরকারের সম্বন্ধে নির্ব্বাক কেন?

আমরা তাঁহার দৃষ্টি কয়টি বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি :—

(১) নলিনী সরকারের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ উপস্থাপিত হইলে সে তাহার বিবৃতিতে বলিয়াছিল—

"Bina is my neice and I have always looked upon her and her other sisters (ডাক্তার শিশির মিত্রের পত্নী লিলি মিত্র অথবা মাধুরী—বীণার sister নহেন) as my own daughters."

অর্থাৎ বীণা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং আমি বরাবরই বীণাকে ও তাহার অন্য (?) ভগিনীগণকে আমার কন্যার মত দেখিয়া আসিয়াছি।

রায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট কিন্তু বলিয়াছেন—বীণা যে ভাবে একা অর্থাৎ অন্য কোন স্ত্রীলোক সঙ্গে না থাকিলেও বিপত্নীক নলিনীর সহিত দিল্লীতে কালযাপন করিয়াছিল প্রভৃতি—তাহাতে—

"It must not be regarded unduly uncharitable if people are so low-minded as to regard the conduct of the accused and Bina as not wholly above suspicion."

অর্থাৎ লোক যদি মনে করে আসামী নলিনী সরকারের ও বীণার চরিত্র সর্ব্বতোভাবে সন্দেহাতীত নহে—তবে তাহাদিগকে অকারণ অনুদার বলা যায় না।

তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে, ডাক্তার শিশির মিত্রের (ইনি হিন্দুস্থানের ডিরেক্টার হইয়াছেন) পত্নী লিলি যদি একা নলিনীর সঙ্গে দিল্লীতে যাইতেন ও ৩ মাস সেইভাবে বাস করিয়া আসিতেন, তবে ডাক্তার কি করিতেন?

(২) রায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন :—

"Neither Bina, nor her brother-in-law nor her Barakaka has told the truth."

অর্থাৎ বীণা, ডক্তার শিশির মিত্র, নলিনী কেহই সত্য কথা বলে নাই।

সহযোগিনী ত স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের জন্য দরদের আধিক্যে বলিয়াছেন, লোক "ব্যক্তিগত কারণে" হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছেন; আমরা যদি বৃদ্ধ সম্পাদক কৃষ্ণকুমার বাবুকে জিজ্ঞাসা করি :—

(১) সে ব্যক্তির চরিত্র ম্যাজিষ্ট্রেট সন্দেহাতীত নহে বলিয়াছেন এবং

(২) ম্যাজিষ্ট্রেট যাহার উক্তি অসত্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন—

সে ব্যক্তিকে কি তিনি বিরাট স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা রাখিতে বিশেষ আনন্দানুভব করেন? আমরা আশা করি, ইহার কোন "ব্যক্তিগত কারণ" নাই—তাঁহার কন্যা বা জামাতা বা পুত্রবধূ কাহারও সহিত হিন্দুস্থানের কোন স্বার্থ সম্বন্ধ নাই।

'লিবার্টি' পত্রের পরিচালক নলিনী প্রেস অফিসার মিষ্টার বি, আর, সেনের ভ্রাতাকে হিন্দুস্থান কার্য্যালয়ে চাকরী দিয়াছে; আর

একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদকের ভ্রাতা ও ভগিনীপতি তথায় চাকরী করিয়া দিন গুজরান করেন; বাগবাজারের সহিত হিন্দুস্থানের ঘনিষ্ঠতার বিষয় 'খেয়ালীতে' আলোচিত হইয়াছে;—আশা করি 'সঞ্জীবনীর' সহিত হিন্দুস্থানের সেরূপ কোন সম্বন্ধ নাই এবং কৃষ্ণকুমার বাবুর সাংবাদিক চরিত্র সন্দেহের অতীত। কেবল তিনি "ব্যক্তিগত কারণ" লইয়া বড় বিব্রত হইয়াছেন বলিয়াই আমরা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলাম।

কিন্তু কৃষ্ণকুমার বাবু নলিনীকে তাঁহার প্রচার-বেদীতে আসন দিতে সম্মত আছেন কি?

তিনি সম্মত থাকিলেও দেশের লোক যদি মনে করেন—হিন্দুস্থানের গদীতে আর তাঁহার স্থান থাকায় আপত্তি করা সঙ্গত—তবে তিনি কি বলিতে পারেন?

দেশের হিতসাধন—ব্রহ্ম দর্শনেরই মত—তাঁহারই একচেটিয়া অধিকার নহে। হিন্দুস্থানের সতীত্ব সম্বন্ধে যাঁহাদিগের সার্টিফিকেট সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনরূপে প্রকাশিত হইয়াছে—তাহাতে যে কৃষ্ণকুমার বাবুর নাম নাই—ইহাই বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।

আমরা আশা করি অতঃপর ডাক্তার শিশির মিত্রের সার্টিফিকেটের সমর্থনে কৃষ্ণকুমার বাবুর একখানি সার্টিফিকেটও প্রকাশিত হইবে। তাহাতে মহাত্মা গান্ধীর counter signature যোগাড় করা সম্ভব হইবে কি?

হায় কৃষ্ণকুমার বাবু—আপনার জন্য সত্য সত্যই দুঃখ হয়। আপনি কি মনে করেন—যে কোম্পানী ২০ বৎসর কাল অংশীদারদিগকে এক পয়সা লাভ দিতে পারিতেছে না এবং প্রায় ৩০ বৎসর বয়সেও যাহাকে বড় বড় সার্টিফিকেট ছাপিয়া সাফাই গাহিতে হয়, তাহার আভ্যন্তরিক ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত কমিটীর নিয়োগপ্রস্তাব দেশের শত্রুতা সাধন? আজ তাহাতে আমরা বলিব—যাহারা সত্যকে ভয় করে তাহারা আপনার শত্রু, দেশের শত্রু—সমগ্র মানবজাতির শত্রু।

—

চলতি পথে

মল্লিনাথ

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

নির্ব্বিবাদে ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেয়র নির্ব্বাচন পালা সাঙ্গ হইয়া যাইলে কলিকাতার করদাতারা আশা করিয়াছিল যে কর্পোরেশনের দলগত কোন্দলের অবসান ঘটিল, কিন্তু তাহা যে সত্য সত্যই ঘটে নাই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে কর্পোরেশনের মধুচক্র কমিটি গঠন লইয়া অর্থাৎ কর্পোরেশনের দলাদলি পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শুনা যায় যে কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচনের ন্যায় কমিটি গঠন কার্য্যও যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় শৈলশিখরে আরোহন করেন, কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া Government Man নলিনী রঞ্জন সরকার আত্মপ্রাধান্য বজায় রাখিতে ডাঃ বিধান চন্দ্রের মিলন প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়াছেন। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় শিলং যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কর্পোরেশনের দুই কংগ্রেসী উপদলকে মিলিত করিয়া যাহাতে কর্পোরেশনের কমিটি গঠন কার্য্য নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার উদ্দেশ্যে দুই দলের মধ্যে এক চুক্তি করিয়া দেন। কিন্তু নলিনী রঞ্জনের চক্রান্তে বিধানী দল সেই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া কর্পোরেশনের গৌরাঙ্গ সম্প্রদারের সাহায্যে নিজেদের অভিলাষ অনুসারে কমিটি গঠন করিয়াছেন। ইহাতে কংগ্রেসের সম্মান নলিনী রঞ্জন সরকারের কুমতলবে আরো একবার ধূলিসাৎ হইল। কংগ্রেসের সম্মান বজায় থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে নলিনীর কিছু যায় আসে না, কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে ডাঃ বিধান চন্দ্র নলিনীর এবম্বিধ কু-কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখিয়াও নলিনীকে এখনও তাঁহার দলে স্থান দিয়া উহাকে প্রশ্রয় দিতেছেন।

*   *   *

কর্পোরেশনের কমিটি গঠনের প্রস্তাবে, দেখা যায় যে ডাঃ রায়ের দল তিন হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছে। এই সংখ্যাধিক্যের কারণ যে কর্পোরেশনের ইংরাজ কাউন্সিলার সকলেই (একমাত্র মিঃ গার্ণার ব্যতীত) এবং মুসলমান কাউন্সিলারদিগের অংশ বিশেষ ও মনোনীত দলের মিঃ বি, এন, রায় চৌধুরী ডাঃ রায়ের দলের পক্ষে ভোট দেন। ঐ দিনকার কর্পোরেশন সভার ভোটাভুটী বিষয়ে আরও শুনিতে পাওয়া যায় যে তিন নম্বর পল্লীর প্রতিনিধি ডাঃ যতীন্দ্র মৈত্র বরাবরই নলিনীর পক্ষে হাত তুলিয়াছিলেন এবং তালতলার ডাঃ শ্রীশ চক্রবর্ত্তী সেদিনকার সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু মহাশয় কংগ্রেসের বর্ত্তমান দলাদলি সম্পর্কে কোন দল বিশেষের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট নহেন এবং সেই হিসাবে সেদিন কর্পোরেশনের ভোটাভুটীর ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিয়া সমুচিত কার্য্য করিয়াছেন।

*   *   *

এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য যে সেনগুপ্ত মহাশয়ের ভাঙ্গাদলের নেতা বলিয়া প্রখ্যাত ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় কিরূপে নলিনীর সহিত হাত মিলাইলেন? একটী গূঢ় কারণ

অবশ্যই বর্ত্তমান, কিন্তু সেই হেতুই যদি ডাঃ মৈত্রকে তাহার দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে বাধ্য করিয়া থাকে, তবে আমরা ডাঃ মৈত্রকে রাজনীতি হইতে সরিয়া পড়িতে উপদেশ দিব। নিজের দলের বিরুদ্ধাচরণ করায় ডাঃ মৈত্রের যে হেতু থাকিতে পারে, তাহা আমাদের মনে হয় আর কিছু নহে, উহা হইতেছে যে গত মেয়র নির্ব্বাচনে যে হেতু তাঁহাকে তাঁহার দল মনোনীত করে নাই, সেই জন্য তিনি তাঁহার দলের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছেন। সকলেই একথা জানেন যে দলগত শৃঙ্খলা বজায় রাখাই হইতেছে দল রক্ষা করিবার প্রকৃষ্ট উপায় এবং ইহাও কাহারও অজ্ঞাত নাই যে দলগত শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য অনেক সময়ে দলগত স্বার্থের চরণে আত্মস্বার্থ বলি দিতে হয়। ডাঃ মৈত্র কি সামান্য এই কথাগুলি ভুলিয়া গিয়াছেন? তিন নম্বর পল্লীর করদাতাগণ তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহার উপর যে অবিমিশ্র আস্থার পরিচয় দিয়াছেন, তিনি তাহা নিজের দোষে হারাইয়াছেন এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আগামী বৎসর সাধারণ নির্ব্বাচনে ঐ পল্লীর করদাতাগণ তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

ডাঃ মৈত্রের পর আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি হইতেছেন তালতলার ডাক্তার শ্রীশ চক্রবর্ত্তী। সেদিনকার কর্পোরেশন সভায় তাহার অনুপস্থিতির হেতু অনুসন্ধান করিলে তাঁহার সমধর্ম্মী ডাঃ যতীন মৈত্রের ন্যায় অনুরূপ কারণই পাওয়া যায়। শুনা যায় তিনি সেদিন কর্পোরেশনের সভায় অভিমান ভারে আসিতে পারেন নাই। অগ্নিযুগের দাদা অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথায় ভুলিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর পরিত্যক্ত আসন পুরণার্থে ব্যবস্থা পরিষদের যে উপ-নির্ব্বাচন হইবে, ডাঃ শ্রীশ চক্রবর্ত্তী উহাতে একজন প্রার্থী ছিলেন এবং অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নাকি শ্রীশবাবুকে জাতীয় দলের ছাপ জোগাড় করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র মহাশয় নির্ব্বাচনে জাতীয় দলভুক্ত প্রার্থী হইতে রাজী হইলে, দাদা অমরেন্দ্রের পক্ষে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আর সম্ভব হয় নাই। শুনা যায় এই কারণে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া শ্রীশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিজ দলের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কর্পোরেশনের সভায় আসেন নাই। যদি আমাদের অনুমান সত্য হয় তবে ডাঃ চক্রবর্ত্তীকে শুধু বলিব "অতি বাড় বেড না।" অবস্থা এবং পদমর্য্যাদানুসারে প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষার একটী সীমা থাকা উচিৎ। ডাঃ চক্রবর্ত্তীকে দুই বৎসর পূর্ব্বে যে অখ্যাত ও অজ্ঞাত পল্লীতে তিনি বাস করেন, তাহারই সকল বাসিন্দা চিনিত না; কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হইবার পর হইতেই তিনি কলিকাতার জনসাধারণের নিকট পরিচিতহীন; এমতবস্থায় তিনি কি নিজেকে ব্যবস্থা পরিষদ উপ-নির্ব্বাচনে নির্ম্মল চন্দ্র অপেক্ষা অধিকতর উপযুক্ত প্রার্থী মনে করেন? অবশ্য, যদি যোগ্য ব্যক্তির অভাব ঘটিত এবং উহা সত্বেও তাঁহাকে না মনোনীত করা হইত, তাহা হইলে অন্য কথা। সেইজন্য তাঁহাকে বলি, তিনি পার্থিব সম্মানের প্রতি তাঁহার অত্যধিক লালসাকে বেশ সংযত করুন। অন্যথায় তাঁহার অকালপতন অবশ্যম্ভাবী।

* * *

কর্পোরেশনের সরকারী মনোনীত যে দশ জন সদস্য আছেন, তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র সন্তোষের রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর পুত্র মিঃ বিনয়েন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী ডাঃ বিধান রায়ের দলের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। সন্তোষ-তনয় বিনয়েন্দ্র তাঁহার দলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নলিনীর প্রতি হঠাৎ এত সোহাগ দেখাইলেন কেন, আমরা তাহার হেতু সবিশেষ নির্ণয় করিতে না পারিলেও, কেহ কেহ বলেন যে নলিনী সন্তোষ রাজের বিশেষ বন্ধু, হয়তো সেইজন্য পিতৃভক্ত বিনয়েন্দ্র পিতৃবন্ধুকে সমর্থন করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বলেন—মৈমনসিংহ প্রীতি হয়তো নলিনী-বিনয়েন্দ্র মিলন সাধন করিয়াছে। যাহা হউক এই বিষয়ে বেশী চিন্তা করিবার কোন কারণ আমরা দেখি না; বিনয়েন্দ্র যাহাদের প্রতিনিধিত্ব করেন, তাহারাই বিনয়েন্দ্রের উপর দৃষ্টি রাখিবে।

* * *

পরিশেষে আর একজনের কথা আলোচনা করিয়া আমরা এ প্রসঙ্গের শেষ করিব। 'স্বদেশ' পত্রিকায় যেরূপ আন্তরিকতার সহিত জাতীয়তার আদর্শ প্রচারিত হয়, আমরা তাহা হইতে ধারণা করিয়াছিলাম যে কাশিপুরের প্রতিনিধি কুমার বিশ্বনাথ রায় প্রয়োজন হইলে উপদলগত সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া বৃহত্তর আদর্শ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইতে পারেন এবং সেই হিসাবে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে তরুণ আদর্শবাদী কুমার বিশ্বনাথ নলিনীর কলঙ্কিত কুক্ষি হইতে নিজেকে আত্মরক্ষা করিতে পারেন। আমরা আশা করি কুমার সাহেব ভবিষ্যতে দৃঢ়তার পরিচয় দিবেন।

—১—

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার ও নলিনী

শ্রীসত্যবাদী

ভ্রাতুষ্পুত্রী বীণা সরকারের সহিত ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া নলিনী সরকার আদালতে যে বিবৃতি প্রদান করে, তাহাতে তাহার কাজের এক ফিরিস্তি ছিল।

সে বলিয়াছিল—"আমি কাজের লোক এবং আফিসের কাজে ও অন্যান্য কাজে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকি। হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর কর্ত্তা ছাড়া আমি গত কয় বৎসর—

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি,

কলিকাতা বন্দরের ট্রাষ্টি,

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার,

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের মেম্বার,

বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রিজের মেম্বার

এবং

আরও নানা প্রতিষ্ঠানের সভ্য আছি।"

নলিনী যে সব কাজের ফিরিস্তি দিয়াছিল, তাহার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিলে আর সবই—

চেম্বারের দৌলতে।

চেম্বার হইতেই সে পোর্ট ট্রাষ্টে গিয়াছে এবং পোর্ট ট্রাষ্ট হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনে কাউন্সিলার হইয়াছে। চেম্বার হইতেই সে বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রিজের মেম্বার হইয়াছে।

চেম্বারে তাহার কার্য্যকালে যত অনাচার প্রবেশ করিয়াছে সহযোগী 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

পোর্ট ট্রাষ্টে যাইয়া সে কিরূপে ভারতবাসীর স্বার্থ-বিরোধী কাজ করিয়াছে, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে।

সে যে বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রিজে সভ্য হইয়া কিরূপ কাজ করিয়াছে, তাহার পরিচয় সম্প্রতি প্রকট হইয়াছে। **বোর্ডের ১৯টি অধিবেশনের মধ্যে চেম্বারের "স্থায়ী" সভাপতি ও প্রতিনিধি ৪টির অধিকে উপস্থিত থাকে নাই।**

ফলে সরকার নাকি চেম্বারে পত্র লিখিয়াছেন—"কৃত্তা বোলায় লেও"—আর একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত কর।

ইহা যে নলিনীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচায়ক তাহা বলাই বাহুল্য।

যে ব্যক্তি এইরূপে চেম্বারের মর্য্যাদাহানি করে, তাহাকে চেম্বারের সভাপতি পদ হইতে বিতাড়িত করাই কি সভ্যদিগের কর্ত্তব্য নহে?

শুনা যাইতেছে, বোর্ডের সদস্যগিরিতে পূর্ব্বে—যখন নলিনী অনুপস্থিত থাকিত তখন—বৃত্তি ছিল না। হয়ত বা সে বোর্ডে য়ুরোপীয়দিগের সহিত মত বিরোধও হইবার সম্ভাবনা থাকিত।

গুজব, একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদককে এখন এই পদ দিবার লোভ দেখান হইতেছে। কিন্তু এই ব্যক্তিটিকে কমিটীর সভ্য করিবার প্রস্তাব যখন ইঁহার কোন বন্ধু করিয়াছিলেন, তখন নলিনীর দল তাহাতে বাধা দিয়াছিল। আজ ইনি কি বন্ধুকে ত্যাগ করিলেন? ঈশপের উপকথায় দুই বন্ধুর গল্প আছে—ভালুক দেখিয়া এক বন্ধু অপরকে ত্যাগ করিয়া গাছের ডালে চড়িয়া বসে। অপর ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া মৃতবৎ মাটীতে পড়িয়া থাকে এবং ভালুক তাহাকে শব মনে করিয়া শুঁকিয়া চলিয়া যায়। ভালুক চলিয়া গেলে শাখারোহী বন্ধু নামিয়া আসিয়া অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে—"ভাই, তোমার কাণের কাছে মুখ লইয়া ভালুক কি বলিতেছিল?" সে উত্তর দেয়—"ভালুক বলিয়া গেল, যে-লোক বিপদের সময় বন্ধুকে ত্যাগ করে, তাহাকে কখন বিশ্বাস করিও না।"

ডাক্তার বন্ধুর বন্ধুটি এখন তাহা বুঝিলেন ত? বন্ধুত্যাগী বন্ধুর কথা আমরা পরে আলোচনা করিব।

চেম্বারের অবস্থা এখন যে one man show দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিবিধ

বাগবাজার

এত দিনে বাগবাজারের বুলি ছুটিয়াছে—কিন্তু সে যেন পাগলের প্রলাপ। সবই beating about the bush. সহসা 'অমৃতবাজার' বাঙ্গালার ব্যবসায়ীদিগকে সদুপদেশ দিয়াছেন—ছেলেরা চাকরী বা অন্নার্জ্জনের অন্য উপায় পাইতেছে না—

"If it were possible for some of the leading Bengalee industrialists, bankers and businessmen to form an association to offer facilities for training of educated Bengalee youngmen, the problem would be nearer solution."

বোধ হয়, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার পর আর কেহ এমন আবিষ্কার করেন নাই। তবে দেখিতেছি—'অমৃতবাজার' যাহাতে বাঙ্গালার একমাত্র অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী বলিয়া স্তব করিয়া আসিয়াছেন—ইহাতে সেই নলিনী সরকারের নাম নাই! যখনই এইরূপ কোন প্রবন্ধ 'পত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়াছে, তখনই তাহাতে নলিনীর স্তুতিগীতি দেখা গিয়াছে। সে জন্য সহযোগী মিথ্যার আশ্রয় লইতেও দ্বিধা বোধ করে নাই। তবে আজ যে বাঙ্গালার ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বীণার "বড়কাকার" নামোল্লেখ নাই—ইহা কি বিস্ময়কর নহে? 'অমৃতবাজারের' কর্ত্তারাই কি businessmen নহেন? নহিলে—জাতীয়দলের সংবাদপত্র সাজিয়া স্থান বিশেষ হইতে প্রেরিত প্রবন্ধ ছাপাইয়া কখনই কোন বিশেষ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অর্থার্জ্জন করিতে পারিতেন না। গত ৮ মাসে সেইরূপ কতগুলি প্রবন্ধ 'পত্রিকা'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার ফর্দ্দ প্রকাশ করিব কি? 'অমৃতবাজার' বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার ও হিন্দুস্থান সম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করেন দেখিয়া আমরা সে ফর্দ্দ প্রকাশ করিব—সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মামলার নথিপত্রের নকলও প্রদান করিব।

এখন এই দুরবস্থা হইতে ইহার উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। সে কাজ চেম্বারের সভ্য-দিগকেই করিতে হইবে। না তাড়াইলে নলিনী যে তাহার স্বার্থ সিদ্ধির উপায় চেম্বার ত্যাগ করিবে, ইহা কল্পনাতীত। কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ লাহা অনায়াসে পদত্যাগ করিতে পারেন—সার হরিশঙ্কর পালও তাহা করিতে পারেন। কিন্তু নলিনী—চেম্বার কি সে সহজে ত্যাগ করিতে পারে? যে চেম্বারে স্থান পাইবার জন্য সে কিরূপ কাজ করিয়াছে, তাহা সকলেই জানেন—

যে চেম্বার হইতে সে বহু অর্থ উপার্জ্জন করে—

যে চেম্বার ছাড়িলে তাহার অনেক কুল যায়—

সে চেম্বার সে সহজে ত্যাগ করিবে না—স্বেচ্ছায় ত নহেই।

কি উপায়ে তাহাকে তাড়াইতে হইবে, তাহার আভাস সহযোগী 'দৈনিক বসুমতী' দিয়াছেন।

কি হইল?

দেড় মাস কাল অতীত হইয়া গেল—অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের মৃত্যু হইয়াছে। এই মৃত্যু—আত্মহত্যা, কি হত্যা, কি স্বাভাবিক মৃত্যু, কি আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা-জনিত—তাহা আজও জানা গেল না! ব্যাপারটি যে সন্দেহজনক তাহা সরকারী কর্ম্মচারীরাও মনে করিয়াছেন। এ বিষয় লইয়া সংবাদপত্রে অনেক আলোচনাও হইয়াছে। অথচ সরকারের পক্ষ হইতে আজও এ বিষয়ে কোন বিবৃতি প্রকাশিত হয় নাই। আমরা আবার এ বিষয়ে বাঙ্গালার গভর্ণরের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

(১) রেলে যে কামরায় প্রমথনাথের দেহ পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ, তাহাতে আর কেহ ছিল না। ট্রেণ যখন হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়াছিল, তখন তাহাতে কোন যাত্রী ছিল কি না, তাহার অনুসন্ধান হইয়াছে কি?

(২) যে ডাক্তার তাহাকে প্রথম দেখেন, তাঁহার রিপোর্ট কোথায়?

(৩) পাকস্থলীর রাসায়নিক পরীক্ষার কি রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে?

(৪) যে দিন প্রমথনাথের মৃত্যু হয়, সেইদিন হইতে ১৮ দিন পর্য্যন্ত সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই কেন?

প্রমথনাথের অন্তর্ধানের সংবাদ যে কলিকাতায় আলোচনার বিষয় হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ—নলিনী সরকারের পক্ষে এডভোকেট জেনারল মামলার পরবর্ত্তী শুনানীর দিন তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। অথচ ট্রেণে একজন লোককে অজ্ঞান অবস্থায় প্রাপ্তির পরে তাহার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াও সে সম্বন্ধে পুলিশের কোনরূপ সন্দেহোদ্রেকের কারণ ঘটে নাই—ইহা কিরূপ ব্যাপার?

প্রমথনাথ দরিদ্র অধ্যাপক; তাঁহার ভ্রাতা নাই যে তিনি এ বিষয় সচেষ্ট হইবেন; তাঁহার পত্নীর কথা আদালতেই প্রকাশ পাইয়াছে; অধ্যাপক শিশির মিত্রের মত স্নেহশীল বন্ধুভাগ্যও তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং তাঁহার মৃত্যু-রহস্য ভেদ করিবার জন্য অর্থ ও সময় ব্যয় করিবার মত লোক দেখা যাইতেছে না। কিন্তু এই কথা সত্য যে—

প্রমথনাথের মৃত্যু হইয়াছে এবং সে মৃত্যু সন্দেহজনক।

এ অবস্থায় লোকের সন্দেহ উপেক্ষা করা আমরা সরকারের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি না।

আমরা শুনিতেছি, প্রমথনাথের সমব্যবসায়ী অধ্যাপকদিগের পক্ষ হইতে তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ যে সভা হইবে, তাহাতে এ বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

পাবলিসিটী! পাবলিসিটী!!

সেক্সপীয়রের 'কিং রিচার্ড দি থার্ড' নাটকের নায়ক অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে যেমনভাবে বলিয়াছিলেন—

"A horse! A horse! my kingdom for a horse!" আজ বাঙ্গালায় কোন তথা-কথিত "পাবলিকম্যান" তেমনই তার-স্বরে চীৎকার করিতেছেন—"পাবলিসিটী! পাবলিসিটী!"—তবে তিনি সেজন্য কোনরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি প্রথম চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন প্রসিদ্ধ প্রসাধনদ্রব্য প্রস্তুতকারককে দিয়া বাঙ্গালা দৈনিক পত্র প্রকাশ করাইতে। কিন্তু যাঁহার নিকট সে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তিনিও ব্যবসায়ী! তিনি যে হিসাব দিয়াছিলেন, তাহাতে—জীব বিশেষ যেমন সিণি দেখিয়া অগ্রসর হইলেও কোঁৎকা দেখিয়া পিছায়—পাবলিসিটী-পিয়াসী তেমনই পিছাইয়া গিয়াছিলেন। পরস্মৈপদে পাবলিসিটীর আশা শেষ হইয়াছিল। এখন আবার সেই প্রস্তাব নূতন করিয়া করায় ব্যবসায়ী বন্ধু বলিয়াছেন—প্রার্থীর প্রকৃতি-পরিচয় তিনি পাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে আর ও কথা বলা নিষ্ফল হইবেই। তাহার পর কোন দৈনিক পত্রের অধিকারীকে ভোগা দিবার চেষ্টা হইয়াছে—পাবলিসিটী-প্রয়াসীর হাতে যে প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার—রাবণের যেমন ছিল "এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি"—তেমনই ৪০ হাজার ক্যানভাসার আছে—তাহারা ঐ দৈনিক পত্রের গ্রাহক সংগ্রহ করিবে—তাহা হইলেই "কেল্লা ফতে" হইবে—'আনন্দবাজার' মরুভূমিতে পরিণত হইবে। শুনিয়া অধিকারী নাকি বলিয়াছেন!—

(১) বাঙ্গালায় কয়টি জিলা যে, ঐ প্রতিষ্ঠানের ৪০ হাজার ক্যানভাসারের কথায় বিশ্বাস করিতে হইবে?

(২) আর যদি ঐ প্রতিষ্ঠানের ৪০ হাজার ক্যানভাসারই থাকে, তবে ত ঐ জাতীয় আর সব প্রতিষ্ঠানের ৪ লক্ষ ক্যানভাসার আছে। ৪০ হাজারের আশায় ৪ লক্ষকে বিরূপ করা কি সুবুদ্ধির কাজ হইবে?

এই প্রসঙ্গে আমরাও একটি কথা বলিব। যদি অন্য প্রতিষ্ঠানের লোক দিয়া সংবাদপত্র প্রচার করা সম্ভব হইত, তবে নলিনী সরকারের হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর বহু কর্ম্মচারী ও ক্যানভাসার বিদ্যমানে—তাহারই জয়গানকারী 'লিবার্টির' পটল তুলিতে হইত না। নলিনী স্বয়ং ত হিন্দুস্থান হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে। তবে 'লিবার্টির' বহু কর্ম্মচারীর বেতন বাকি ফেলিয়া সহসা নিম্নলিখিত নোটিশ প্রকাশ করা হইয়াছিল কেন?

Liberty Newspapers Limited

Tele: 1485 B. B. "Liberty House"
32, Upper Circular Road

Notice is hereby given that the undersigned having taken possession of the undertaking and property of the above company, the services of all members of the staff or in the Press or otherwise in the employment of the above company are no longer required by him and he will not entertain any claim to salary except as are payable by law out of the assets that may come to his hands.

(Sd) D. N. Mitra
Receiver on behalf of
the Debenture holders

24th. September 1933
38, Upper Circular Road
Calcutta.

এই ডিবেঞ্চার হোল্ডাররা কাহারা? যাঁহারা কোম্পানীর ডিরেক্টার ছিলেন, যাঁহাদিগের জয়গান করিবার জন্যই 'লিবার্টি' পরিচালিত হইত, তাঁহারাই কি ডিবেঞ্চার-হোল্ডার ছিলেন?

সে যাহাই হউক—'লিবার্টি'তে-শতাধিক লোককে আইনের ফাঁসিতে প্রাপ্যে বঞ্চিত করা হইয়াছিল—তাঁহাদিগের দিকে কি কেহ তাকাইয়াছিলেন? বীণাকে দিল্লীতে লইয়া যাইতে ও রাখিতে নলিনী যে টাকা ব্যয় করিয়াছিল, তাহার সমান টাকাও কি ইঁহাদিগকে আংশিক প্রাপ্য হিসাবে দিয়াছিল?

হাজার ক্যানভাসারকে অতিরঞ্জিত করিয়া ৪০ হাজার করিলেও তাহার দ্বারা সংবাদপত্র পরিচালিত করা যায় না। সংবাদপত্র সফল করিতে হইলে দরদ প্রয়োজন—বুকের রক্ত দিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিতে হয়। ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে পত্র পরিচালিত হয়, তাহা ধোপার কুকুরের মত "না ঘাটকা, না ঘরকা" হইয়া থাকে। এই 'লিবার্টির' জন্য যে সব ভদ্রলোকের নিকট হইতে দান হিসাবে টাকা আনা হইয়াছিল, তাঁহাদের অনেকের নাম ও প্রদত্ত টাকার পরিমাণ আমরা জানি। আজ সে সব প্রকাশ করিলাম না। তাঁহাদিগকে "দেশপ্রেমের" কথা বলিয়াই টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছিল। কিন্তু কাজের সময় কি হইয়াছিল? You can bluff some people for all time and all people for some time, but not all people for all time. রঙ্গালয়ের পরিচালক বন্ধুর সহিত ঘুরিয়া নানারূপ অভিনয় করা যত সহজ, লোককে সেই অভিনয় আন্তরিকতার পরিচায়ক বলিয়া বিশ্বাস করান তত সহজ নহে। সেইজন্য এ যাত্রায় পাবলিসিটী-পিয়াসীর পাবলিসিটীর আশা নিরাশায় নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে? প্রবোধের স্তোকবাক্যে বা নলিনীর

অভিনয়ে উনপঞ্চাশী-দাদা তাঁহার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইবেন না, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

৺ রমেশ ভট্টাচার্য্য

সার্কুলার রোডের দেশবন্ধু সঙ্গীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় মাত্র তিরিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শীতল ভট্টাচার্য্য, এনায়েৎ খাঁ, আমির খাঁ, মাজিদ খাঁ, ও আলাউদ্দিন সাহেবের প্রতিথযশা শিষ্য হিসাবে তিনি এই তরুণ বয়সে কলিকাতার অন্যতম বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি একজন বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ছিলেন। তিনি দেশবন্ধু পার্কের কলিকাতা কর্পোরেশনের ব্যায়াম-শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার বিধবা মাতা ও অন্যান্য ভ্রাতা ভগিনীগণকে আমাদের গভীর সহানুভূতি জানাইতেছি।

শিশির কুমার ইনষ্টিট্যুট

গত রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুট হলে উত্তর কলিকাতার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান শিশিরকুমার ইনষ্টিট্যুটের সাম্বৎসরিক সভার অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা উপস্থিত ছিলাম। অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপিত সভাপতি মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জি কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই এবং ঐ দিনকার সভায় পৌরহিত্য করিয়াছিলেন ঝামাপুকুর রাজবাটীর কুমার হিরণ্য কুমার মিত্র। অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীর বসু শিশিরকুমার ইনষ্টিট্যুটের যে কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন, তাহাতে গত বৎসরের ইনষ্টিট্যুটের কার্য্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ "সাংবাদিক" শিশির-কুমার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় শিশিরকুমারের অশেষ গুণ-কীর্ত্তন করেন এবং শিশিরকুমার ইনষ্টিট্যুটে যে নানাভাবে নানারূপ জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া জনসাধারণের বহু উপকার সাধন করেন, তাহারও ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীমতী পদ্মা বসু ইনষ্টিট্যুটের বিবিধ খেলা-ধূলার পুরস্কার বিতরণ করেন। তাহার পর অভ্যাগতগণের আমোদ প্রমোদের জন্য ইনষ্টিট্যুট কর্তৃপক্ষ মিঃ ফানিম্যানের কমিক, মহারাজ বসুর প্রাচ্য নৃত্য ও ইনষ্টিট্যুটের সভ্যগণ কর্তৃক পুনর্মূষিকো ভব নামক একটী ক্ষুদ্র হাস্যরসাত্মক নাটিকা অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নাটিকার অভিনয় বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কলিকাতার মেয়র মিঃ ফজলুল হক, ডেপুটী মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী, বিচারপতি মাননীয় ডি, এন, মিত্র, কর্পোরেশনের শিক্ষা-সচিব শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ জে, সি, গুপ্ত, কবিরাজ শ্রীযুক্ত অনাথনাথ রায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, ও অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ।

বাগবাজারের দৈন্য

প্রবীন সাংবাদিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষকে শিশিরকুমার ইনষ্টিট্যুটের গত সাম্বৎসরিক সভায় পরিচয় করাইয়া দিতে যাইয়া ইনষ্টিট্যুটের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীর বসু বলিয়াছিলেন—"বর্ত্তমান যুগে শিশিরকুমার সম্বন্ধে বলিবার বা লিখিবার

বৃদ্ধা তপস্বিনীর নিষ্ঠা-বৈচিত্র্য

সেকাল ও একাল

বৃদ্ধা তপস্বিনী "সঞ্জীবনী" কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র নলিনী রঞ্জন সরকারের উপর বাংলার জনসাধারণের বিরুদ্ধ মনোভাব দেখিয়া মনে বড়ই ব্যথা পাইয়াছেন। "সঞ্জীবনীর" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের একটী পুরাণো কাহিনী মনে পড়িল। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান জার্নালিষ্টস্ এসোসিয়েসনের এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী জার্নালিসম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য বক্তৃতাটী অতি মনোরম হইয়াছিল। উক্ত সভায় "সঞ্জীবনী" সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতান্তে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণকুমার বাবু পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"এই প্রিয়দর্শন যুবকটী কে? বাঃ, বেশ বললে তো!" ভূতপূর্ব্ব লিবার্টির জনৈক কর্ম্মচারী বক্তাটীর পরিচয় দিয়া যখন বলিলেন যে ইনি শ্রীযুক্ত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী তখন কৃষ্ণকুমার বাবু সর্পদষ্টের ন্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন "আগে কেন বলোনি, তা'হলে এ সভায় আসতুম না।" এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে কলিকাতার কোন কলেজের অধ্যক্ষকে Star Theatre কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে—"জানি কিন্তু বলিব না"—এই অপূর্ব্ব সত্যভাষণে গোষ্ঠী বিশেষের যে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, কৃষ্ণকুমার বাবু সেই গোষ্ঠীরই সভ্য। তবে ব্রহ্মরসিক্ত নিষ্ঠার মাপকাঠি কি, তাহা কেহ জানেন কি?

খেলার মাঠে

দ্রোণাচার্য্য

আই, এফ, এর খামখেয়ালী

রাজনীতির সূক্ষ্মপ্যাঁচ অবশেষে খেলার মাঠেও প্রবেশ করিল,—বিগত ১১ইমে কলিকাতা বনাম মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল খেলার সময়ে যে বিসদৃশ ও অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে আই, এফ, এ, কাউন্সিল গত ২২শে মে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে আই, এফ, এ, কাউন্সিলের সভ্যগণ সেই সনাতন কালাধলার বিভেদ সৃষ্টি করিয়া এ উক্তিই সমর্থন করিবে।

আই, এফ, এর সিদ্ধান্ত বাস্তবিকই আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছে। ক্রীড়ামোদী মাত্রেই মোহনবাগান ও কলিকাতা ক্লাবের খেলাকে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতার পর্য্যায়ে ফেলিয়া থাকেন। এবং এই খেলা দর্শন করিবার জন্য মাঠে হাজার হাজার দর্শক সমবেত হয়। তাহাদের আশা ও আগ্রহকে ক্ষুণ্ণ করিয়া উক্ত দিবস খেলার নামে মাঠে যে নাটকীয় প্রহসনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে যথাযোগ্য প্রতীকার ও সঙ্গত মীমাংসাই আই, এফ, এর নিকট হইতে সকলে আশা করিয়াছিলেন,—কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই।

বুধবার সন্ধ্যায় চৌরঙ্গী 'ওয়াই, এম, সি এ' হলে সন্তোষের রাজা সার মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে কাউন্সিলের সভা হয়। সভার প্রারম্ভেই মোহনবাগানের পক্ষ হইতে মিঃ এস, এন, ব্যানার্জ্জি এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করিয়া বলেন, উক্ত দিবস খেলার ফলে মোহন বাগান ক্লাবের অনেক খেলোয়াড়ই অল্প বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হ'ন এবং তাহার একমাত্র কারণই হইতেছে কলিকাতা ক্লাবের খেলোয়াড়দের জবরদস্ত নীতিতে খেলা। রেফারী ম্যাজি এ সম্পর্কে কোনই প্রতীকার না। লওয়ায় কলিকাতা ক্লাবের খেলোয়াড়গণ জবরদস্ত নীতিতেই খেলিতে থাকে। ফলে মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়গণ শুধু আত্মরক্ষা করিতেই ব্যস্ত থাকে। এর উপর মোহনবাগান ক্লাবের কেহ কেহ "রেফারিং" সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিলে কলিকাতা ক্লাবের কোন কোন খেলোয়াড় তাহাদের প্রতি অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করে। এবং বহু দর্শকও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

কলিকাতা ক্লাবের পক্ষ হইতে মিঃ ল্যাম্ব বলেন, যদিও তিনি উক্ত দিবস খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন না, তবুও তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন কলিকাতা ক্লাব কখনও এরূপ জবরদস্ত নীতিতে খেলা কিম্বা অভদ্র ভাষা প্রয়োগ করিতে পারে না। কারণ এ যে একেবারেই অসম্ভব।

গোরা রেফারি ম্যাজি বলেন, মোহনবাগান কিংবা কলিকাতা ক্লাব কেহই জবরদস্ত নীতিতে খেলে নাই এবং খেলার নিয়ম অনুযায়ী মোহনবাগানের গোল-রক্ষক ব্যতীত অপর সকলেই খেলার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া খেলিয়াছেন। যদিও ১৩নং আইন

চক্ষুহীন চক্ষুচিকিৎসককে চিনিয়া রাখুন!

কর্পোরেশনের-কমিটি নিয়োগ সভায় তিন নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিনিধি ডাঃ যতীন্দ্র নাথ মৈত্র দলগত নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া নলিনীর সম্মিলিত উপদলে ভোট দিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর—কোন্ সূত্রে জানিনা—ডাঃ মৈত্র উক্ত দলের নেতা বলিয়া নিজেকে জাহির করিয়া আসিতেছেন। গত মেয়র নির্ব্বাচনের তিক্ত ব্যর্থতা তাঁহাকে স্বীয় দল পরিত্যাগ করাইয়া নলিনী অঙ্কে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। গোয়াবাগান ষ্ট্রীটে কোন প্রবীন সাংবাদিকের গৃহে "Advance"-এর সত্বাধিকারী মিঃ জে, সি, গুপ্ত মহাশয় সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা কি তাঁহার এখন স্মরণ আছে? বারান্তরে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আমরা করিব। জামাতা-বাবাজী শ্রীমান সরোজেন্দ্র সান্ন্যালের চাকুরী তো কর্পোরেশনে বহাল হইয়া গিয়াছে, তবে গুপ্তভ্রাতার উপর তাঁহার এত আক্রোশ কেন?

কর্পোরেশনের আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে তিন নম্বর ওয়ার্ডের করদাতাগণ এই বহুরূপী নপুংসককে চিনিয়া রাখুন।

যোগ্যতা প্রবীন সাংবাদিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ব্যতীত আর কাহারও নাই।" সুধীর বন্ধুর এই উক্তির সমর্থন করিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করি "অমৃতবাজারের" ঘোষ পরিবারের কি মস্তিষ্কের দৈন্য (bank ruptcy of brain) ঘটিয়াছে? সুধীর বাবুর এই উক্তিতে অমৃতবাজার পত্রিকা অফিসের তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার উপর ক্ষুণ্ণ হইবেন না ত?

—

অনুযায়ী খেলার মাঠে কোন খেলোয়াড় খেলার নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে মাঠ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারা যায় কিন্তু চতুর্দ্দিকের এরূপ অসম্ভব "জনতা" দেখিয়া তাহা করিতে তাহার সাহস হয় নাই।

ব্যস, অতঃপর দীর্ঘ তিন ঘণ্টা আলোচনার পর সভায় মোহনবাগান ক্লাবকেই ঐ ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় এবং বিখ্যাত খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল ও অশোক চট্টোপাধ্যায়ের আচরণের প্রতি তীব্র নিন্দা করা হয়। কলিকাতা ক্লাব কিম্বা তাহার খেলোয়াড়দের আচরণ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না—কারণ মাঠে অনুপস্থিত থাকিয়াও মিঃ ল্যাম্ব যে বলিয়াছেন "এ একেবারেই অসম্ভব"। কিন্তু যে কলিকাতা দলের হইয়া মিঃ ল্যাম্ব এই সাফাই সাক্ষ্য গাহিলেন—অতীতের ইতিহাস কিন্তু তাহার বিরুদ্ধাচরণই করিবে। খেলার মাঠে কলিকাতা দলের খেলার দিবস মিঃ ক্রেটনের "রেফারিং"এর কথা কাহার না স্মরণ নাই? বিগত ১৯২৩ সালে কলিকাতা ও মোহনবাগানের মধ্যে শীল্ড ফাইনাল খেলায় ঝড়জলে মাঠ যখন খেলার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল তখন খেলায় বাধ্য করাইতে উদারতার পরিচয় কোন ক্লাব দিয়াছিল? সৈনিকদলের সহিত ফাইনাল খেলায় কোন দল "রেফারিং"-এর সুযোগ লইয়াছিল? মিঃ ল্যাম্ব এ বিষয়ে কী বলেন?

মিঃ এস, এন ব্যানার্জ্জি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারাজীবী। সুধী সমাজেও তাঁহার প্রতিপ্রত্তি যথেষ্টই আছে। কিন্তু এই সভায় তাঁহার কথার কোন মূল্যই রহিল না। মিঃ ওয়েবের প্রস্তাবকেই বলবৎ রাখিয়া মোহনবাগানকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এমন কি মিঃ এস, সি, তালুকদার এ সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটী গঠিত হউক বলিয়া যে প্রস্তাব আনয়ন করেন তাহাও অগ্রাহ্য করা হয়।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

ডাকু মনসুর

নিউ থিয়েটার্সের বহু প্রত্যাশিত উর্দ্দু সবাক "ডাকু মনসুর" গত শনিবার থেকে নিউ সিনেমায় দেখান হচ্ছে। গল্পের দিক থেকে তেমন ভাল না হ'লেও সুপরিচালনা ও সুষ্ঠু অভিনয়ের জন্য আলোচ্য ছবিটিকে একখানা বেশ ভাল ছবি বলা যেতে পারে। কেমন করে এক সুন্দরী রমণীর প্রেম লাভ করে দুর্দ্দান্ত দস্যু মনসুর তার দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিলে, তরই একটি সুন্দর আলেখ্য পরিচালক মহাশয় এই ছবিটির ভিতর ফোটাবার চেষ্টা করেছেন। পরিচালনার ভিতর শ্রীযুক্ত নীতীন বসু তাঁর কৃতিত্ব বেশ ভাল ভাবেই দেখিয়েছেন এবং সেদিক থেকে আমাদের অভিযোগ করবার কিছু নেই। তবে সম্পাদনার কাজ আর একটু ভাল হ'লে ছবিটা আরও উপভোগ্য হত।

অভিনয়ের দিক থেকে ছবিটি হয়েছে একেবারে নিখুঁত। পৃথ্বিরাজের মনসুর ও শ্রীমতী উমার মেহের অভিনয়ে ও ভাব ব্যঞ্জনায় হয়েছে অপূর্ব্ব। সাইগলের আবিদ, পাহাড়ী সন্যালের নাজিম ও হাসন বানুর পরীবানুও বেশ চরিত্রোপযোগী হয়েছে। ক্ষুদ্র ভূমিকাগুলিও হয়েছে সুঅভিনীত।

"ডাকু মনসুরে"র ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জিনিষ হচ্ছে এর আলোক-চিত্র। আলো এবং অন্ধকারের ভিতর যে Shot গুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলি এত চমৎকার যে তা মুখে বলা যায় না। এরকম আলোকচিত্র যে কোনও ছবির একটি বিশেষ গর্ব্ব করবার জিনিষ। "ডাকু মনসুরে"র শব্দ নিয়ন্ত্রণও অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছে। তবে পরিস্ফুটনাগারের কাজ আরও উন্নত হওয়া উচিত ছিল।

"ডাকু মনসুরের" আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করবার জিনিষ এর সঙ্গীত। সঙ্গীত পরিচালক রাই চাঁদ বড়ালের আবার কৃতিত্বের পরিচয় পেয়ে আমরা খুব প্রীত হয়েছি। এ ছবিটির প্রত্যেকটি গান সুর, তান ও লয়ের সংমিশ্রনে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছে। একটি ছবির সবগুলি গানই যে এত সুগীত হতে পারে তার পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বে আর কোনও ছবিতে পাইনি। নেপথ্য সঙ্গীতও হয়েছে চমৎকার—এত চমৎকার যে মনে হয় একমাত্র রাইবাবু ছাড়া আর কারু পক্ষে তা' সম্ভব নয়। দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা ঠিক সময়োপযোগী হয়েছে।

"ডাকু মনসুর" যে এখন বেশ কিছু দিন ধরে নিউ সিনেমায় চলবে তা' অনায়াসেই বলা যায়।

কালী ফিল্মস

'ব্রিটিশ একাউষ্টিক সেট্' আনবার জন্য গাঙ্গুলীমশাই ও মধু শীল বোম্বে গিছলেন।

* * *

ক্রাউনে "বিরহে" দর্শক সমাগম হ'চ্ছে অসম্ভব। যারা হাসতে ভালবাসেন—তাঁরা এ ছবিখানি দেখে হাসবেন ত' খুবই, উপরন্তু আনন্দ পাবেনও যথেষ্ট। ছবিখানির ভবিষ্যৎ খুব ভাল বলেই মনে হচ্ছে।

রাধা ফিল্মস্

এদের "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" এর মধ্যেই প্রায় চল্লিশ হাজার লোক দেখে ফেলেছে। ছবিখানা সকলের মনোরঞ্জনে সমর্থ হ'য়েছে দেখে আমরা খুসী হ'য়েছি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

উর্দ্দু ও বাঙলা "বিদ্রোহী"র শুটিং শেষ হতে মাত্র হপ্তা খানেক বিলম্ব হবে। এর পরই "বিদ্রোহী" মুক্তিলাভের জন্য বিদ্রোহ সুরু কোরবে। আমরা যতদূর জানি, ছবিখানা সাধারণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে।

* * *

"পায়ের ধূলোর" ধূলো শ্রীজ্যোতিষ মুখার্জ্জি পথে, ঘাটে, দরদালানে সর্ব্বত্র ছড়াচ্ছেন—এত ধূলোর ছড়াছড়ির মধ্যে মুখুয্যে মশাইকে শেষ অবধি খুঁজে পেলেই বাঁচি।

পায়োনিয়ার

"দেবদাসী"র কাজ শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের পরিচালনায় প্রায় শেষ হ'তে চললো। আসছে জুলাইয়ের প্রথমে 'ছায়া'য় ছবিখানার মুক্তি সম্ভাবনা আছে।

রঙমহল ফিল্মস্

"মন্ত্রশক্তি" তোলা হচ্ছে। কালী ফিল্মস ষ্টুডিওর শিল্পীরা সেজন্য বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ার পার্টি

গত শনিবার ২৫শে মে মিঃ বি, এল, খেমকাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে 'ই-আই এফ' এর কর্ম্মীরা এক বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সাজানো বাগানে সুবেশী অতিথি ও সুলতানা প্রমুখ সুন্দরীদের ঝকমকে আনাগোনা, আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছিলো। সবুজ শাড়িতে (আড়াই হাজারী) সুলতানা, লাল শাড়ি রাধাবাঈ, মালা গলায় মিঃ বি, এল্, গান্ধী-টুপি গাঙ্গুলী নেয়াপাতি জলোভূঁড়ী (নব ডি সোটো) জ্যোতিষ, সুট পরা গম্ভীর গোসাই ও মিঠে হাসি দাশকে সেদিনের অনুষ্ঠানে যে ভুলবে তাকে আমরা নিন্দে করবো সন্দেহ নাই। চারটের থেকে অনুষ্ঠান যখন ছুটে' গেলো ছ'টায় তখন সর্ব্বপ্রথম তোলা হ'লো ছবি কর্ম্মীদের নিয়ে কর্ত্তার। তারপর, অতিথিরা, কর্ম্মী ও কর্ত্তা। তারপর, ডিসে ডিসে প্রচুর খাবার, আইসক্রীম্, আরো কতো না কী! ষ্টেজের ওপর মিঃ সিংহের ম্যাজিক। তারপর—তারপর আর কী? সন্ধ্যা নেবে এসেছে রিজেন্ট্ পার্কে, ঝিরঝিরে হাওয়া হু হু ছুটে আসে—মাথায় হেড্ লাইট আমাদের মিকি মাউস।

এভারগ্রীণ পিক্‌চার্স

এদের নবতম বাংলা সবাক ছবি পঞ্চবানের মহলা শেষ হ'য়ে গেছে। আগামী হপ্তায় চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হবে। এই ছবির আলোক-চিত্র গ্রহণ কোর্‌ছেন পি, স্যাণ্ডেল ও শব্দ শিল্পী হ'চ্ছেন শ্রী হতেন মজুমদার।

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কিন্তু ঘটনার দিবস যাহারা মাঠে উপস্থিত ছিলেন তাহারা সকলেই এক বাক্যে বলিবেন যে কলিকাতা ক্লাবের খেলোয়াড়গণই এই বিসদৃশ ঘটনার জন্য দায়ী এবং ততোধিক দায়ী গোরা রেফারী মিঃ ম্যাগ্নী। মাঠে নিয়মভঙ্গ অনুযায়ী খেলা চলিলে খেলোয়াড়কে মাঠ হইতে বহিষ্কৃত করার ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও যখন তাহা করা হয় নাই তখন বলিতে হইবে মাঠে নিয়মভঙ্গ অনুযায়ী কেহই খেলে নাই। "জনতা" দেখিয়া খেলোয়াড়কে সতর্ক করে নাই ইহা কি মিলিটারী রেফারির উক্তি!

সর্ব্বশেষ পরিতাপের বিষয় আই, এফ, এর সভায় সভাপতি সন্তোষের রাজা বাহাদুরের "কাষ্টিং ভোট" প্রদান। রেফারীর সমর্থন ও মিঃ ল্যাম্বের উক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া কাউন্সিল যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন তাহাতে "কাষ্টিং ভোট" প্রদান করিয়া মোহনবাগানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া মন্মথনাথ রায় চৌধুরী নিন্দনীয় কার্য্যই করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি। এক্ষেত্রে জনসাধারণ যদি আই, এফ, এর উপর পক্ষ পাতিত্বের দোষারোপ করে এবং রাজ-নীতিক্ষেত্রে নরমপন্থী (Moderate) রাজা বাহাদুর খেলার মাঠে ও শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের মনস্তুষ্টির জন্য ধামা ধরিয়াছে বলে তাহা হইলে তাহাকে অসঙ্গত বলা চলে না।

আঁধার-মাণিক

ওরে আমার খাস্তা খবর,
  আঁধার ঘরের মাণিক!
নগ্নগাত্রে দাঁড়াও যাদু
  দেখি তোমায় খানিক।

কেউবা হাসে, কেউবা কাসে
  কারও লাগে চমক্,
দেখে তোমার ওই অপরূপ
  রূপ-প্রবাহের ধমক।

ভাগ্যে আছে বাপপিতাম'র
  প্রাচীন ভাঁড়ে ঘি!
নইলে, শুধু ভাব্‌ছি ব'সে
  ক'রতে তুমি কি?

যেমন আছ খোপের মধ্যে
  তেমনি ধারাই থাকো,
দোহাই তোমার, ক'পচে বিদ্যা
  জাহির কোরো নাকো! *

---

* ['অমৃতবাজার পত্রিকার' অফিস পরিদর্শন করিয়া জনৈক পাঠক আঁধারের বিমল কান্তির অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করিয়া কবিতাটি লিখিয়াছেন।—সঃ খেঃ]

রাজকুমারী প্রিয়া

আপাততঃ জ্যোৎস্নার ভাগ্যে রাজকুমারী হওয়া চললো না। সে "বিদ্রোহী"তে নাকি এক ব্রাহ্মণ কুমারী। তবে রাজকুমারের প্রিয়া বটে। তরোয়াল হাতে, বিপদের আশঙ্কা চোখে, ওই রাজকুমার—শ্রীমান ভূমেন রায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়ার চিত্রখানি মুক্তি অপেক্ষায়।

প্রথম পরশ

শ্রীজয়া দেবী

সৌম্য ঝর্ণাকে ভালবেসেছিল অত্যন্ত গভীরভাবে, ভেবেছিল পৃথিবীতে বোধ হয় কেউ আর কাউকে এমন ভাবে ভালবাসেনি। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে ঝর্ণার সাথে হয়েছিল সৌম্যের দেখা…। শিলঙের এক নিভৃত পল্লীর মাঝে, ছিল তাদের বাড়ী… সৌম্য গিয়েছিল সেখানে তার মামার বাড়ী বেড়াতে। তাদের উভয়ের বাড়ী ছিল পাশাপাশি। সৌম্যের মামাত বোন বেবীর মধ্যস্থতায় তাদের পরিচয় ক্রমে ক্রমে হয়ে আসে নিবিড়, সহজ ও সরল। তাদের অজ্ঞাতে যেন কোথা হ'তে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের অচ্ছেদ্য বাঁধন এসে দুজনকে বেঁধে ফেলে… সেখানে তারা খুব হৈ চৈ করে কাটায় বেশ স্ফূর্ত্তিতেই।

সৌম্য তার চিন্তাধারাকে একসূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করে এবং সবই একে একে তার স্মৃতিপথে প্রতিফলিত হয়ে উঠে… সৌম্যের বেশ মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যার সময় পাহাড়ের এক নির্জ্জনতম স্থান বেছে নিয়ে দুজনে পাশাপাশি ব'সে সৌম্য ঝর্ণাকে বলে—"ঝর্ণা, তোমার ভালবাসা, তোমার সঙ্গ আমায় পার্থিব আনন্দের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়…তোমার মধ্যে দিয়ে আমি সব কিছুরই মধ্যে একটা অফুরন্ত আনন্দের আস্বাদন পাই…। আমি সবেরই ভিতর প্রাণের সাড়া অনুভব করি…সবই আমার কাছে এখন সরস ও সজীব হয়ে উঠে।"

"আচ্ছা, ঝর্ণা আমাদের এই নিবিড় ভালবাসার মর্য্যাদা কি আমরা শেষ পর্য্যন্ত রাখতে পারি না? তোমার মনের কোণে অতি অল্প সময়ের জন্য কি আমার একটু স্থান হ'তে পারে না?"

ঝর্ণা তার উত্তরে বলে,—"পৃথিবীতে সব থেকে অতিপ্রিয়জনের পদ সৌম্যই দখল করে ফেলেছে…"

আর একদিনের কথাও সৌম্যের মনে প'ড়ে যেদিন কোল্‌কাতা থেকে তার মা'র চিঠি পায় ফিরবার জন্য। সেদিন সে ছল্ ছল্ চোখে বলে,—"ঝর্ণা, আমার ফিরে যাবার ডাক এসেছে, কিন্তু আমার চলবার শক্তি যে আমি খুঁজে পাই নে…মনপ্রাণ আমার সবই যেন কেমন অবশ হয়ে আস্‌ছে…তুমি যে আমার সব কিছুই নিজের করে নিয়েছ…আমার নিজের পুঁজি বল্‌তে যে কিছুই নেই…আমার যে পথ চলবার শক্তিটুকু, সেটাও যেন মরচে ধরা ইঞ্জিনের কলকব্জার মত অচল হয়ে আস্‌ছে…।"

বছর কয়েক পরের ঘটনা। সৌম্য কলেজ থেকে বেরিয়ে বাড়ী ফিরবার জন্য একটা কালীঘাট-শ্যামবাজারগামী 'বাসে' উঠে বস্‌ল। সে অনেকটা অন্যমনস্ক ভাবেই যাচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ ঠিক্ সামনের সীটটায় দৃষ্টি পড়ায় সে বেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই অকস্মাৎ চাঞ্চল্যের হেতুটা হচ্ছে তার সম্মুখে উপবিষ্টা তরুণীটি যাঁকে তার অতি পরিচিত বলে মনে হচ্ছে…।

কৌতুহলের আতিশয্য বশতঃ সৌম্য তরুণীটিকে উত্তমরূপে দেখবার উদ্দেশ্যে উল্টো দিকের সীটে গিয়ে বসে…। তরুণীটিকে দেখে তার বুকের ভিতরে যেন তুফান বইতে সুরু করে।

তরুণীটিও বার কয়েক তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চায়…

পূর্ব্বে বর্ণিত ঘটনা সমূহ সৌম্যের একে একে মনে পড়ে। কিন্তু তথাপিও সে সাহস করে ঝর্ণার সাথে আলাপ করতে পারে না। আজ কালের গতিতে পরস্পর পরস্পরকে চিন্‌তে পেরেও শুধু বয়সের তারতম্য ও দেহের বাহ্যিক পরিবর্ত্তনের জন্য কথা কইতে পারে না।

সারাটা পথ এই ভাবে মনের মধ্যে কথা কাটাকাটি করে সৌম্য অনেকটা সময় কাটিয়ে দেয়। 'বাস' ইত্যবসরে সৌম্যের গন্তব্য স্থান ভবানীপুরে বেলতলার মোড়ে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সৌম্য শেষ পর্য্যন্ত নাব্‌তে পারে না। 'বাস' শেষে কালীঘাট পার্কের শেষ সীমায় এসে পৌঁছে…মেয়েটি ধীরে ধীরে তার সীট্ ছেড়ে উঠে…তারপর একটা বিষাদমাখা দৃষ্টিতে বারেক তাকিয়ে নেবে যায়…সৌম্য ভারাক্রান্ত মনে একদৃষ্টিতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মেয়েটিকে দেখা যায় তাকিয়ে থাকে…তারপর সেও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে 'বাস' থেকে নেবে পড়ে এবং অন্য 'বাস' ধরে বাড়ী ফিরে আসে।

সৌম্যের এখন আর কিছুই ভাল লাগে না। জগতের সব কিছুতেই সে বিষাদের মলিন ছায়া দেখে। তার কাছে কোকিলের গানও যেন বিরক্তিকর হয়ে উঠে। তার মনে অসহিষ্ণুতার ভাব প্রবল হয়ে জাগে।

সৌম্যের এই মানসিক পরিবর্ত্তন সকলেরই চোখে পড়ে। তার বৌদি—তিনি সুগায়িকা সুতরাং তিনি ভাবপ্রবণ—দেবরের এ সকল অস্বাভাবিক লক্ষণের কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

সৌম্য উত্তরে বলে,—"সে চায় একটু নীরবতা…তার এই সব নীরস ও অসারতাপূর্ণ কোলাহল আর লাগে না ভাল…এসব হয়ে উঠে তার কাছে অসহ্য।"

বাড়ীতে সৌম্য সকলকে কোন প্রকার

যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে রাখলেও—পারে না সে তার বন্ধু-বান্ধবদের এসব অবান্তর কথায় ঠেকাতে···তারা সৌম্যের অবস্থা কিছু কিছু বুঝে ফেলে। সৌম্য তাদের নিয়ে রোজই 'লেকের' ধারে বেড়াতে যায়। এক কোণে, যেখানে লোকজনের ভীড় কম, শব্দ বা গোলমালের আধিক্য তেমন নেই, সেই জায়গা তারা বেছে নেয়। এই জায়গাটাই তাদের সবচেয়ে বেশী পছন্দ হয়···কারণ তারা নির্জ্জনতার বেশী পক্ষপাতী এবং নির্জ্জনতাই তাদের ভাবপ্রবণ শক্তিটাকে বাড়িয়ে তোলে।

কোন এক পূর্ণিমা রাত্রিতে সৌম্য তার চার বন্ধু মিহির, অজয়, সরল ও সলিলের সাথে লেকে বেড়াতে আসে। তারা সেই তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় চুপ করে বসে।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ...তার জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় পৃথিবীকে যেন স্নান করিয়ে দেয়...চাঁদের কিরণ 'লেকের' জলে পড়ায় সমস্ত 'লেকটা' রূপালী রংয়ের আভায় ভরে উঠে···চারিদিকের নীরবতাকে তারা আরো নীরবতর করে তোলে কেউ কথা না ব'লে, কিন্তু শেষে নীরবতাকে ভেঙ্গে দিয়ে প্রিয় বন্ধু মিহির কথা ব'লে উঠে···সৌম্যকে জিজ্ঞাসা করে,—"হ্যারে সৌম্য, তোর ব্যাপার কি বল্‌ত? ভেবেছিস্ আমরা বুঝি আর কিছু বুঝি না।"

মিহির ছিল সৌম্যদের দলের মধ্যে একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক, যদিও সে প্রাণ খুলে সকলের সঙ্গে কথা বল্‌ত। তবুও তার চরিত্রে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যার জন্য সবাই তাকে সমীহ করে থাকে।

সৌম্য মিহিরের কথায় প্রথম চুপ ক'রে থাকে—তারপর উত্তর দেয়, বলে—"ভাই মিহির, তোমরা যদি আমার কথা জানবার জন্য এতই ব্যাকুল হয়ে থাক—তবে শোন। তোমরা বেশ জান পৃথিবীতে কোন জিনিষ তোমাদের কাছে কখনও লুকোই না এবং সকলের থেকে তোমাদেরই আমি বেশী বিশ্বাস করি। সুতরাং তোমাদের সব কথা বল্‌তে আমার কিছুই বাধা নেই।"

এই বলে সে তার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাসে আগেকার অধ্যায়ের পাতা একের পর এক উল্টে যেতে থাকে। সে আন্ত-রিকতার সঙ্গে সব স্বীকার করে, বলে,—

—"ঝর্ণাকে আমি আমার সবচেয়ে আপন ক'রে নিতে চেয়েছিলাম এবং সেটা পেয়েওছিলাম আমি কতক পরিমাণে আমাদের দুজনের ভালবাসার বিনিময়ে······আমাদের সে ভালবাসা ছিল অতি গভীর এবং অতি উচ্চস্তরের......প্রেম ত' মিহিরদা জীবনে একবারের বেশী দু'বার আসে না—যারা সে কথাটা স্বীকার করে না তারা 'প্রেম' কথাটারই অমর্য্যাদা করে, কারণ জান বোধহয়'—'Once, for once and for one only'। প্রথম যৌবনের উন্মেষে যাকে ভালবাসা যায়—সে যে তার কাছে কতখানি প্রিয় তা তোমাদের কি ক'রে বোঝাব মিহির ভাই। আর সে ভালবাসা কতখানি পবিত্র ও গভীর—যেটাকে কন্টিনেণ্টের কবিরা 'Earthly Paradise' ব'লে পরিকল্পনা করেছেন,—সেটা যে কতখানি গভীরভাবে প্রাণে লাগে তা তোমাদের জীবনে না এলে তোমরা তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে পারবে না। বছর কয়েক আগে ঝর্ণার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল আসামের কোন এক বড় সহরে। সেই পরিচয় ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। শেষে সেটা গভীর প্রেমে চরম পরিণতি লাভ করে। তখন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা একজন আর একজনকে না দেখে থাকতে পারতাম্ না। কিন্তু ভাই প্রেম কি সত্যই ক্ষণস্থায়ী—যে সে আমায় দেখে চিন্‌তে পেরেও মুখ দিয়ে কোন কথা উচ্চারণ করল না। আমার কাছে সত্যিই ভাই এ যে কতখানি পীড়াদায়ক তা তোমাদের বোঝাতে পারব না। মনে একটুও শান্তি নেই। কোথায় গেলে শান্তি পাব, এই দুরাশা নিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াই, কিন্তু কোথায়ও যে ভাই শান্তি খুঁজে পাচ্ছি না। জীবনটা আমার দুঃসহ হয়ে উঠেছে... মন আমার অস্থির, চঞ্চল···সব সময় যেন আমার ভিতরে ঝড় বইছে···আর বোধহয় নিজেকে লাগামের বাঁধনে টেনে রাখতে পারব না।" এই বলে সৌম্য তার উচ্ছ্বাস শেষ করে দেয়।

মিহির বলে উঠে,—"বুঝতে তোমায় পারলাম না, হে মোর বন্ধু! আচ্ছা সৌম্য, প্রেমটাকে তোমরা এত Shallow ভাবে দেখ কেন? প্রেম জিনিষটা কি এরকম সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে কখনও? প্রেম হবে বিরাট, বিশ্বজগত জোড়া······। একের পর এক আস্‌বে, তার থাকবে না অন্ত। আমার যেটা ভাল সেটা আমি দেব তাকে—আর তার ভালটা নেব আমি। এই দেওয়া নেওয়ার মধ্যে হবে প্রেমের পূর্ণ-বিকাশ। প্রথমে যা সুন্দর তার আস্বাদন সবাই আগে পেতে চায়; তারপর সুন্দরতর জিনিষের প্রতি সকলের মন আকৃষ্ট হয় এবং শেষে সুন্দরতমতে গিয়ে এই সৌন্দর্য্য প্রীতি চরম পূর্ণতা লাভ করে। সুতরাং যা সুন্দর তাকে সবাই ভালবাসে, তা বলে যে জিনিষ অধিকতর সুন্দর তাকে আমরা কি আসন দেব না, তার পূজা করব না? যেই ভালটুকু দেওয়া বা নেওয়া শেষ হয়ে যাবে অমনি উভয়পক্ষ থেকে চলে যাবে আরও ভাল আরও উন্নততর অবস্থার জিনিষের অন্বেষণে।"

সৌম্য মনে ব্যথা পায়, তারপর উত্তেজিত হয়ে বলে উঠে,—"মিহির, তোমার কথায় যতই 'ফ্যালাসি' থাকুক না কেন আমি ও সব 'থিওরির' গূঢ়তত্ত্বের মধ্যে ঢুক্‌তে চাই নে। যা 'প্র্যাকটীকালি' ঘটছে তা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছি। আমি চাই সর্ব্বক্ষণ তাকে দেখতে—আমার মনপ্রাণ দিয়ে সর্ব্বক্ষণ তাকে গভীর অনুভূতির সাথে অনুভব করতে। যখনই নির্জ্জনে চুপচাপ

বসে থাকি তখন কেবলই মনের সঙ্গে নানান্ সুরে খেলা করে কবির গীতি—

"In memory, a silent thought,

In sorrow, a silent tear."

সময় সময় ব্রাউনিঙের "A woman's last word-এর" কথাও মনে পড়ে যায়—

"I will speak thy speech, love

Think thy thought."

মিহির সেদিন আর সৌম্যের কথার কোন জবাব দেয় না—শেষে তারা সকলেই যে যার বাড়ী ফিরে যায়। সৌম্যও তার বাড়ী ফিরে আসে। এসে ড্রইংরুমের আলো নিবিয়ে দিয়ে ধপ্ ক'রে 'সোফার' কোলে আশ্রয় নেয়···এইভাবে সে কতখানি সময় কাটিয়ে দেয় তা সে বুঝে উঠ্‌তে পারে না। হঠাৎ সে তার বৌদির সাড়া পায়···সে ধ্যানভঙ্গ ক'রে উঠে বসে। বৌদিদি এসে দেবরকে শুধায়—"সৌম্যবাবুকে যে আজ অত্যন্ত বিমনা দেখাচ্ছে, কি ব্যাপার?"

সৌম্য নির্লিপ্তভাবে উত্তর দেয়,—"ব্যাপার আর আমাদের কি থাকবে বৌদি। ব্যাপার ত সব তোমাদেরই। আমাদের জীবনটাই বা কি, আর এর সার্থকতাই বা কোথায়?"

—"বড় যে কবির মত উত্তর দিচ্ছ সৌম্য। বলই না ভাই কি হয়েছে? আমরাও আর কেড়ে খেয়ে ফেল্‌ছি না। বল্‌লেই বা আমাদের কাছে, দোষই বা কি? দেখি না একটু চেষ্টা করে তোমার ব্যথার উপশম করতে পারি কিনা।"

ইতিমধ্যে সৌম্যের বৌদির বোনেরা ভক্তি, বিজয়া, অনু ও মালতী এসে উপস্থিত হয়। এরা সকলেই আশুতোষ কলেজের আই, এ, ক্লাশের ছাত্রী। এদের আগমনে বৌদি আরও জোর পায়—সকলেই সৌম্যকে চেপে ধরে—সৌম্য অবশেষে বল্‌তে বাধ্য হয়।—

—"ব্যাপারটা বৌদি বিশেষ আর কিছু নয়—শিলঙে একটী মেয়ের সাথে আমার ভাব হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে তা গভীর ভালবাসায় দাঁড়ায়। নামটী তার ঝর্ণা। সেদিন হঠাৎ তার সাথে 'বাসে' হ'ল দেখা। এখানে এসেছে বোধ হয় Scottish-এ আই, এ, পড়তে। সেদিন তাকে দেখে আমার আবার পুরাণো ব্যথা সতেজ হয়ে উঠল। কিন্তু আজ এই কয় বছরের ছাড়াছাড়িতে পরস্পরের মধ্যে এমন একটা ব্যবধান এসে গেছে যে কেউ কা'রো সঙ্গে কথা কইতে পারলাম না। আমার মনটা বড়ই উদাস হয়ে পড়ে......কিছুই আর লাগে না ভাল।"

একটা চাপা হাসির শব্দ শোনা যায়। ভক্তি ও বিজয়া সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠে,—"আরে আমাদের বলনি কেন আগে? ঝর্ণাকে খুব চিনি, আমাদের স্কুল থেকেই 'ম্যাট্রিক' পাশ করে সে—থাকে ত আজকাল—নং লেক রোডে।"

সৌম্য তাদের কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠে···একলাফে চলে যায় গ্যারেজে······তারপর মোটর বাইকে চড়ে বেরিয়ে যায় সেই বাড়ীর উদ্দেশ্যে......বাড়ীর কাছে এসে পড়ে, বুকের মধ্যে তার আলোড়ন হতে থাকে......তারপর হাওয়ায় ভেসে আসে গানের সুরের রেশ......ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠে গানের কথাগুলি—

"আজি আমারি কথা, ওগো বিমনা সাঁঝে,
তব-স্মরণ বীণে যেন বারেক বাজে।
তব আঙ্গিনা তলে,
যে দীপালি জ্বলে,
জ্বেলো একটী বাতি, মোরে স্মরিয়া লাজে॥"

সৌম্য মোহিত হয়ে পড়ে···গান আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায়···গানের সুরের রেশ সৌম্যের কাণে যেন আস্তানা গাড়ে। সৌম্য পকেট থেকে তার 'মাউথ অরগ্যান' বাঁশী বের করে নেয়, তারপর তার প্রিয় গানটী—'আজ আলোকেরই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও' বাজাতে সুরু করে.........

ঝর্ণাদের ঘরের আলো নিভে যায়......? কে একজন বাইরের বারান্দায় চুপ করে এসে দাঁড়ায়...সৌম্য বাজাতে বাজাতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে—এই নির্ম্মল আনন্দ তার ভেঙ্গে যায় একটা মোটরের 'হর্ণে'···মোটর এসে ঝর্ণাদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়ায়. .কারা সব নাবে আবার ঘরে জ্বলে উঠে আলো... বারান্দা হয়ে পড়ে নির্জ্জন......। বাড়ী কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠে.....। সৌম্য তার হৃদয়ে একটু আনন্দের সাড়া পায়...... হৃদয়ের স্পন্দন থেমে আসে আস্তে আস্তে... তারপর একটা সুখের স্মৃতি নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে।

* * *

তারপর কিছুদিন বাদে সৌম্যের নামে একটা চিঠি আসে, সম্পূর্ণ অপরিচিত হস্তের মেয়েলি ছাঁদে লেখা—সৌম্য সেটা খুলে ফেলে অনেকটা উৎসাহের সঙ্গে। চিঠি খুলে দেখে ঝর্ণা লিখেছে সৌম্যকে—

"সৌম্য, জীবনে কোনদিন তোমার উপরে আমার সবচেয়ে বেশী ছিল দাবী। তোমায় নিয়েছিলুম আমি অত্যন্ত আপনার করে, বোধ হয় তুমি তা এখনো ভোলনি। তোমায় একদিন ভালবেসেছিলুম—ভেবেছিলুম তোমায় আমি পাব আমার জীবনসঙ্গীরূপে। কিন্তু বিধির নিয়ম ব্যতিক্রম করা প্রায় সময়ই ঘটে উঠে না। ঘটনাচক্রে দুটী কুঁড়ি ক্ষণিকের তরে প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু কালের গতিতে অসময়েই তা আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সৌম্য, তুমিই আমার জীবনে প্রথম আলোর সন্ধান দিয়েছিলে।

আমরা মেয়ের জাত, আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া তোমাদের পক্ষে একটু কঠিন হয়ে পড়ে। তোমায় সেদিন কলেজ থেকে ফেরবার পথে 'বাসে' দেখেছি। আবার তোমায় দেখেছি সন্ধ্যার কিছু পরে আমাদের

বাড়ীর ঠিক্ সাম্‌নেই রাস্তার ওপারে তাল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে তোমার মনের আবেগ বাঁশীর সুরের ঢেউয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছিলে……

আচ্ছা সৌম্য, এভাবে আর আমার পিছনে পিছনে ঘুরে কি হবে? বন্ধু, অগ্রসর হও, আবার নূতন আলোর সন্ধানে। তোমার যা ভাল তা নিয়ে আমি হয়েছি ধন্য—জীবন পথে চল্‌তে আর আমার থাক্‌বে না বাধা…বন্ধু, এটা আমাদের প্রথম-পরশ ব'লে বোধ হয় একটু দাগা দিয়েছে গভীরভাবে। আমাদের জীবনের সার্থকতা আস্‌বে তখন, যখন আমরা একের পর একে সুন্দর হতে সুন্দরতর জীবনের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ লাভ করব।

* * *

আসছে ১০ই বৈশাখ আমার বিয়ে—এখানকার এক উদীয়মান নবীন ব্যারিষ্টারের সঙ্গে। আমার জীবন পথের বন্ধু তুমি—প্রীতির প্রদীপ জেলে দিতে আস্‌বে কি? বিয়ের পর ভাব্‌ছি যাব Continent Tour-এ।

"মোর লাগি' করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম্ম, আমার র'য়েছে বিশ্বলোক।
হে বন্ধু, বিদায়।"

"কণা"—

—১—

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা

পাঁচখানি No Trump ডাক ঃ—

ডাকদার বা তাঁর খেঁড়ী যদি চারখানি No Trump না ডেকে একেবারে পাঁচখানি No Trump ডাকেন, তবে বুঝতে হবে যে উক্ত ডাকদারের হাতে তিনখানি টেক্কা ও উভয়ের ডাকের যে কোন রঙের একটি সাহেব আছে এবং উক্ত ডাকদার এই ডাকের দ্বারা তাঁর খেঁড়ীকে জানাতে চান যে তাঁদের মিলিত হস্তে Small Slam আছেই এমন কি Grand Slam হওয়াও সম্ভবপর।

উক্ত ডাকে খেঁড়ীর জবাব ঃ—

(১) খেঁড়ী যদি একটি টেক্কা পান এবং তিনি ইতিপূর্ব্বে ডাক দিয়ে তাঁর হাতের শক্তি যা' নির্দ্দেশ করেছেন তদপেক্ষা কিঞ্চিদধিক শক্তি তাঁর হাতে থাকে তবে তিনি তৎক্ষণাৎ যে রঙে ভাল খেলা হবে বলে অনুমাণ করেন সেই রঙের সাতখানি ডাক দিবেন।

(২) খেঁড়ী তাঁর হাতের যে শক্তি পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করেছেন তার চেয়ে বেশী কিছু যদি তাঁর না থাকে তবে তিনি পূর্ব্ব-কথিত যে কোন একটি নিম্নতম রঙে ছয়খানি ডাক দিবেন। ইহা নিষেধজ্ঞাপক ডাক। এই নিষেধজ্ঞাপক ডাকের পর পাঁচখানি No Trump-এর ডাকদার যদি আবার ডাক বাড়াতে চান্ তবে তাঁর নিজের দায়িত্বে সে ডাক বাড়াবেন।

(৩) খেঁড়ী যদি একটি টেক্কা পান কিন্তু তাঁর হাতে পূর্ব্ব-বিজ্ঞাপিত শক্তির অতিরিক্ত কিছু না থাকে তা' হলেও তিনি নিষেধজ্ঞাপক ডাক দিতে বাধ্য।

চার বা পাঁচখানি No Trump-এর সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য পাঠক-পাঠিকাকে জানালাম। এবার কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করব।

১নং উদাহরণ—মনে করুন 'ক' নিম্ন-লিখিত হাত পেয়েছেন।

ইস্কাবন—টেক্কা; হরতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম, সাতা, তিরি; রুহিতন—সাহেব, গোলাম, দশ, ছরি; চিড়িতন—সাতা, তিরি।

'ক' ডাক দিলেন একখানি হরতন, প্রতি-পক্ষ পাস দিলেন, 'খ' বল্‌লেন তিনখানি রুহিতন। এবার 'ক' কি ডাক দিবেন? 'খ'র শক্তিজ্ঞাপক ডাকে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে তাঁর হাতে অন্ততঃ সাড়ে তিন-খানি অনারের পিট বর্ত্তমান আর তাঁর নিজের হাতেও চারখানি। সুতরাং তাঁদের মিলিত হাতে ন্যূনকল্পে সাড়ে সাতখানি অনারের পিট থাকায় স্লাম-সম্ভাবনা সুপ্রচুর। এখন 'ক'-কে নির্দ্ধারণ করে দেখতে হবে যে তাঁর খেঁড়ীর হাতে কোন্ কোন্ অনারের পিট থাক্‌লে স্লাম হবেই। যদি 'খ'-র হাতে রুহিতনের টেক্কা, বিবি এবং চিড়িতনের টেক্কা এবং ইস্কাবনের বা চিড়িতনের সাহেব বিবি এই সাড়ে তিনখানি অনারের পিট থাকে তবে Grand Slam অবশ্যম্ভাবী। 'খ'র হাতে উক্ত তাস আছে কি না তা' 'ক' নিম্নলিখিত উপায়ে জান্‌তে পারবেন। 'ক'র হাতে দুইটী টেক্কা এবং যে দুইটী রঙ ডাকা হয়েছে তার দুইটী সাহেব আছে। সুতরাং
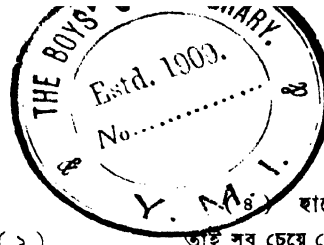
তিনি তিনখানি হরতন ডাক দিয়ে 'খ'র জবাব পেলে চারখানি No Trump ডাক দিয়ে তাঁর হাতের টেক্কা সাহেবের পরিচয় 'খ'কে দিতে পারেন এবং 'খ' জবাবে পাঁচখানি No Trump জানালে তিনি বুঝতে পারবেন যে তাঁর হাতে রুহিতনের ও চিড়িতনের টেক্কা বর্ত্তমান। এই দুইটী অনারের পিটের বিষয় সুনিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হয়ে 'ক' নিশ্চিন্তচিত্তে Grand Slam ডাক দিতে পারেন। কেন না 'খ'র হাতে যদি ইস্কাবন বা চিড়িতনের যে কোন রঙের একটি সাহেব থাকে তা' হলেই সেই সাহেবের পিটে নিজের চিড়িতনের ছোট তাসখানি পাস দিবার সুযোগ পাবেন। তবেই Grand Slam অবশ্যম্ভাবী। তা' হলে ডাক হবে নিম্নরূপ

'ক'

একখানি হরতন
তিনখানি হরতন
চারখানি No Trump
সাতখানি হরতন, রুহিতন বা No Trump

'খ'

তিনখানি রুহিতন
তিনখানি No Trump (যদি অন্য কোন বিশেষত্ব না থাকে) বা
চারখানি রুহিতন
পাঁচখানি No Trump

২নং উদাহরণ—ডাক হয়েছে নিম্নরূপ এবং 'খ' পেয়েছেন—ইস্কাবন—সাহেব; হরতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম তিরি; রুহিতন—টেক্কা, গোলাম, দশ, নয়, আটা; চিড়িতন—সাতা, তিরি।

'ক'

একখানি ইস্কাবন
চারখানি ইস্কাবন (২)

'খ'

তিনখানি হরতন (১)
চারখানি No Trump (৩)
পাঁচখানি হরতন (৪)

অথবা

পাঁচখানি ইস্কাবন (৬)

কিম্বা

পাঁচখানি No Trump (৮)
পাঁচখানি ইস্কাবন (৫)
ছ'খানি ইস্কাবন (৭)
সাতখানি ইস্কাবন (৯)

(১) শক্তিজ্ঞাপক ডাক। হাতে তিনখানির বেশী অনারের পিট আছে এবং হাতের বিভাগও ভাল।

(২) ইহাকে বলে jump trump rebid। রঙের ডাক দ্বিতীয়বার দেওয়া হচ্ছে এবং একটি বাড়্‌তি ডাক দেওয়া হচ্ছে (কেন না তিনটী ইস্কাবন ডাক দিলেই চল্‌ত)। এ ডাক রঙের প্রাচুর্য্য নির্দ্দেশ করে এবং জানায় যে একটি বাদে বাকী সব কয়টি রঙের পিট ডাকদার নিতে সক্ষম।

(৩) দুটী টেক্কা ও রঙের সাহেব নির্দ্দেশ করছে।

(৪) হাতে আর কোন শক্তি নাই তাই সব চেয়ে ছোট রঙ ডেকে (ডাক হয়েছে ইস্কাবন ও হরতন—সুতরাং হরতনই সব চেয়ে ছোট) নিষেধ জ্ঞাপনা করছেন।

(৫) চিড়িতনের টেক্কা সাহেবের পরিচয় না পেয়ে 'খ' আর অগ্রসর হতে পারেন না, কেন না 'ক'র হাতে ইস্কাবনের টেক্কা বিবি ও রুহিতনের সাহেব বিবি থাকতে পারে সে ক্ষেত্রে স্লাম সম্ভাবনা নাই।

(৬) হাতের শক্তি নির্দ্দেশ করছে। দুইটী টেক্কা নাই বটে কিন্তু 'ক' মনে করেন যে স্লাম আছে।

(৭) 'ক'র উক্তরূপ অনুমানে 'খ' আশা রাখেন যে চিড়িতনের একখানি পিট 'ক' পেতে পারেন তাই তিনি বারটী পিটের আশা রাখেন।

(৮) হাতে দুইটী টেক্কা আছে এবং 'ক' স্লাম সম্ভাবনা রাখেন।

(৯) 'খ' জানেন যে 'ক'র হাতে দুইটী টেক্কা আছে এবং একখানি ব্যতীত রঙের সব কয়টি পিট তিনি পাবেন সুতরাং তাঁর নিজের হাতে রঙের সাহেব থাকায় তিনি নিশ্চিন্তভাবে সাতটি ইস্কাবন ডাক দিতে পারেন।

অমরেশ ও মীনা

নাটক

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

পাত্র ও পাত্রী

অমরেশ : প্রকাশ : দীপক্ :

মীনা : সুরমা :

সংযোগস্থল : কলিকাতা, কাল—বর্ত্তমান

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য : ঘর

সুরমা ও অমরেশ

সুরমা—বৌ যে প্রকাশকে ভালোবাস্‌তে সুরু কর্লে এ কি তুমি দেখেও দেখবে না ?

অমরেশ—দেখছি সবই, কিন্তু কর্ব্বার তো কিছু নেই।

সুরমা—বলো কি দাদা! তোমার বৌ তোমার চোখের উপর আর একজনকে ভালোবাসবে--তোমার কিছু কর্ব্বার নেই!

অমরেশ—অসভ্য লোকদের মতো হাঙ্গামা কর্ত্তে পারা যায়, এমন কি পুলিশ কোর্টেও যাওয়া যায়, কিন্তু তাই কি তুমি আমায় কর্ত্তে বলো ?

সুরমা—তা বলি না, কিন্তু ওদের দুজনের আলাপ বন্ধ কর্ত্তে পারো ত'?—প্রকাশকে শাসিয়েও তো দিতে পারো ?

অমরেশ—না—তা পারি না। কারণ তা ক'রে ভালোবাসার গতি কখনও ফেরানো যায় না।............মীনা যদি প্রকাশকে ভালবাসতে পারে আমি অন্তরায়ের সৃষ্টি কর্ব্ব কি তার স্বামী হ'য়ে পড়েছি বলে ?

সুরমা—'স্বামী হয়ে পড়েছো' মানে কি ? স্বামী হওয়া কি একটা দৈবাতের ব্যপার যে সেটা যেন না হ'লেও হ'তে পার্ত্তে ?

অমরেশ—ঠিক তাই। অবাক হয়ে গেলে ?

সুরমা—অবাক হবার কথা বটে!'—তা হ'লে পূর্ব্বজন্ম জন্মান্তরের বাঁধাবাঁধি এসব কিছুই নয় বল ?

অমরেশ—আমার কাছে কিছু নয়। তোমার কাছে 'কিছু' হ'তে পারে! চৌধুরী সাহেব যে তোমার স্বামী, সে হয়তো তোমার মতে পূর্ব্বজন্মে তোমার স্বামী ছিল এবং পরজন্মেও থাকবে, কিন্তু মীনা আমার শুধু এ জন্মের। শুধু তাই নয়—এ জন্মের ততটুকুই সে আমার, যতটুকু আমাকে তার দরকার বা আমার তাকে দরকার!

আজ যদি সে প্রকাশকে চায়, প্রকাশকে সে নিক্। পূর্ব্বজন্মের দোহাই দিয়ে আমি দখল্ আটকে রাখতে চাই না!

সুরমা—আচ্ছা, তা না হয় না-ই রাখলে, কিন্তু অভিভাবক হিসেবে তাকে সুপথে নিয়ে যেতে তো কোন বাধা নেই ? সে যদি ভুলবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে তুমি কি বাধা দেবে না ?

অমরেশ—তা দোব বই কি বোন্। কিন্তু মন্দ কাজ এক বস্তু আর ভালবাসা আর এক বস্তু! ভালবাসা যে মন্দ কাজ এ কথা কেউ বলে না, সে আমার স্ত্রী ব'লে সে যে আমাকেই ভালবাসতে বাধ্য এ কথা আমি কি ক'রে বলবো ? এবং তা না পেরে আর একজন সুপাত্রকে সে যদি ভালবাসে, তার সে কাজকে কি আমি মন্দ কাজ বলবো ?

সুরমা—স্ত্রীলোক স্বামী ছাড়া আর কাউকে ভালবাসলে মন্দ কাজ করা হবে না ? সে দ্বিচারিণী হবে না ?

অমরেশ—দ্বিচারিণী বলতে পারো, কারণ কথাটার মানে দাঁড়ায় ঐ। কিন্তু আমি তাকে মন্দ বলে বিচার কর্ত্তে বসবো না। কারণ ভালবাসা কারুর ইচ্ছাধীন নয়। কোন অনুষ্ঠানেরই অন্তর্ভূত বস্তু নয় তা। কোন শৃঙ্খলই তুমি তার পায়ে জড়িয়ে রাখতে পার না। চিরমুক্ত সে। (স্তব্ধ)

অমরেশ—তাই স্বাধীন স্বত্ত্বার পরিচায়ক ব'লে আমি তাকে বরং শ্রদ্ধা কর্ব্ব!

সুরমা—তা হ'লে পুরুত কিংবা আচার্য্য দেব কাউকে ডাক্‌তে পাঠাও। আজ তিথি

ভাল আছে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে—স্ত্রীর বিবাহের উদ্যোগ ক'রো। (প্রস্থান)

(মীনার প্রবেশ)

মীনা—সুরো কি বলছিল?

অমরেশ—নাই বা শুনলে!

মীনা—শুনলুমই বা?

অমরেশ—ও বলছিল……

মীনা—স্পষ্ট ব'লে যাও। সঙ্কোচের কিছু নেই।

অমরেশ—ও ব'লছিল প্রকাশকে তুমি ভালোবাসো।

মীনা—ঠিকই ব'লেছে। বাসিই তো। তুমি কি কর্ত্তে চাও?

অমরেশ—আমি কিছু কর্ত্তে চাই না। ও জিদ্ করছিল step নিতে হবে।

মীনা—তা হ'লে ওর জিদ্ বজায় রাখো, step নাও। Bag and baggage নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবো?

অমরেশ—তুমি ঠাট্টা করছো মীনা।

মীনা—ঠাট্টা করছি! কিসে বুঝলে ঠাট্টা করছি? আমি কি তোমায় ভালোবাসি যে আর কাউকে ভালোবাসতে পারি না?

অমরেশ—তাইতো আমার মনে হয়।

মীনা—এ ধারণা ভুল হলে কি হবে?

অমরেশ—অর্থাৎ তুমি আমায় ভালোবাসো এ কথা যদি মিথ্যা হয়?

মীনা—হ্যাঁ—

(অমরেশ মীনার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সহসা হো হো করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন)

মীনা—হাসলে ভুলবো না। বলতে হবে। (এই বলিয়া মীনা অমরেশের হাত ধরিল)

অমরেশ—না—না মীনা, সে থাক্। হাস্যকর যে বস্তু, নিতান্তই প্রহসন তা, তাতে আর ট্র্যাজিডীর ছোঁয়া লাগিয়ে কাজ নেই! (প্রস্থান)

(কয়েক মুহূর্ত্ত মীনা স্তব্ধ হ'য়ে রইলো—প্রকাশ সহসা প্রবেশ কর্লে।)

প্রকাশ—একি! এমন আবছায়া ভাবে দাঁড়িয়ে যে?

মীনা—আবছায়া মানে?

প্রকাশ—মানে—খানিকটা বোঝা যাচ্ছে খানিকটা যাচ্ছে না!

মীনা—সবটাই বুঝতে পার্ব্বে এবার! অমরেশ আমায় ভালোবাসে, সুতরাং তোমার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক থাকবে না!

প্রকাশ—এ তোমার মনের কথা নয়।

মীনা—তার মানে?

প্রকাশ—তার মানে—আমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না—এ কথাটা শুধু মুখের কথা। তোমার অন্তর এতে সাড়া দেয় না।

মীনা—আমার অন্তর কিসে সাড়া দেয়, কিসে দেয় না—সব তোমার মুখস্থ দেখছি!

প্রকাশ—মুখস্থ কথাটা ঠিক নয়—তবে সমস্ত অন্তঃকরণটি আমার কাছে কাঁচের মতো স্বচ্ছ। ওর প্রতি ভঙ্গিটি আমি দেখতে পাই। ওখানে লুকোচুরি তুমি খেলতে পার্ব্বে না মীনা!

মীনা—তোমার এ একটা দম্ভ যে তুমি আমার অন্তঃকরণ বুঝতে পারো।—আর কিছু নয়।……

মেয়েছেলের অন্তর আজ পর্য্যন্ত কোন পুরুষ অমনি কোরে বুঝতে পেরেছে যে তুমি পার্ব্বে ?—সুতরাং বাড়াবাড়ি করোনা।

প্রকাশ—আমায় যদি অমন ধমকে থামিয়ে দাও আমি থেমে যাবো। কিন্তু বলবার স্বাধীনতা আমায় দিলে এর উত্তর পেতে।

মীনা—উত্তরটা শুনি কি ?

প্রকাশ—মেয়ের অন্তর সব পুরুষে হয়তো বুঝতে পারে না। সবাই যেমন সব জিনিষ বুঝতে পারে না, এও তেমনি।

কিন্তু ক্ষমতা থাক্‌লে—ও জিনিষ বোঝার মত সহজ জিনিষ আর কিছুই নেই। কোন রকম যন্ত্র যদি থাকতো যাতে মনের ভাবের প্রতি তরঙ্গটী ছাপার অক্ষরের মত আপনা আপনি ছেপে উঠতো তা হ'লে আমি তোমায় Challenge কর্ত্তুম !

মীনা—যন্ত্রের অভাবে বুঝি Challenge করা যায় না ?

প্রকাশ—না।—কারণ আমি যখন বলবো তুমি আমার কাছে একটুখানি মহার্ঘ্য হবার চেষ্টা কর্চ্ছ, তুমি তৎক্ষণাৎ বলবে 'মোটেই না'। যন্ত্রটি থাকলে—এক মুহূর্ত্তে সেটি খুলে দেখিয়ে দিতুম ভাবের তরঙ্গটি ঠিক সেই জিনিষই ঘোষণা কর্চ্ছে কি না !

মীনা—তুমি তা হ'লে বলচো—আমরা মিথ্যা কথা ব'লে মনের ভাব গোপন ক'রে রাখি ?

প্রকাশ—কিন্তু ওটাকে তো মিথ্যা কথা বলা হয় না।

মীনা—কি বলা হয় ?

প্রকাশ—ওকেই বলে ছলনা !

মীনা—তুমি তা হ'লে জানো আমি ছলনা করি ?

প্রকাশ—শুধু তুমি ব'লে নয়, স্ত্রীলোকের ওটা একটা ধর্ম্ম !

মীনা—পুরুষ বুঝি ছল কাকে বলে জানে না ?

প্রকাশ—জানে, কিন্তু প্রেমের বেসাতি কর্ত্তে গিয়ে সে ছলের ধার ধারে না। তার বাক্য, তার ভঙ্গী, তার উচ্ছ্বাস্—সোজা, সুস্পষ্ট,—অবোধ্য বলে সেখানে কিছু নেই !

(মীনা প্রশান্ত ভাবে প্রকাশের দিকে চাহিয়া রহিল ক্ষণিক)

মীনা—তা হ'লে এতোদিন ধ'রে তুমি যা ব'লে এসেছ সব সুস্পষ্ট ও সোজা এবং আমি যা ব'লেছি তা ছলনা ?

প্রকাশ—তাই কি প্রমাণ হচ্ছে না ?

মীনা—তাই প্রমাণ হচ্ছে। কিন্তু তুমি বোধ হয় আগেই জান্‌তে পেরেছিলে আমি ছলনা কর্চ্ছি ? না এখন জান্‌লে ?

প্রকাশ—এ প্রশ্নের উত্তর নিস্প্রয়োজন।

মীনা—ঠিক্ তাই ! কারণ এর উত্তর দিতে গেলে তুমি নিজে ফাঁদে পড়বে !

প্রকাশ—কি রকম ক'রে ?

মীনা—কারণ যদি বল—আগেই জান্‌তে পেরেছিলে ছলনা কর্চ্ছি, তাহলে তোমার এ ছলনাময়ীর সংস্রব আগেই ত্যাগ করা উচিত ছিল; এবং যদি বলো এখন জান্‌তে পার্লে ছলনা ব'লে, তা হ'লে আর তর্ক করা উচিত নয়। এখনি এ বাড়ী ছেড়ে দিতে হয় !

প্রকাশ—এ কথা হয়তো ঠিক্

(উঠিয়া বলিলেন)

তা হ'লে আমি এ বাড়ী ছেড়েই চল্‌লুম।

মীনা—খুব হয়তো কষ্ট হবে, না ?

প্রকাশ—'না' ব'লতে পারলে মানাতো ভালো। কিন্তু সত্য কথা হোত না !

মীনা—যেমন বন্ধুর মত একদিন এসেছিলে তেমনি কি আর আস্‌তে পারবে না ?

প্রকাশ—না।

মীনা—কেন ?

প্রকাশ—কেন ?…(সহসা প্রদীপ্ত হইয়া) জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ 'কেন ?'…কিন্তু সে থাক্—

(প্রস্থানোদ্যত)

মীনা—একটা কথা শোন'।

(প্রকাশ ফিরিয়া দাঁড়াইল)

মাথা গরম করোনা। আমি খুব কড়া কথা ব'লেছি বটে, কিন্তু সেগুলো অমন নিক্তির ওজনে বিচার করোনা। ছল্ আমি ক'রেছিলাম বটে আবার হয়তো কিছু সত্যও ছিল। বলা তো যায় না! তবু এ হয়তো আমার উচিত নয়। তাই একবার ঘুরে দাঁড়ানো দরকার। একবার দেখা যাক্ ও-দিকটায় কি আছে !

(প্রকাশ কিছু না বলিয়া পুনরায় গমনোদ্যত)

মীনা—শোন'……

(প্রকাশ ফিরিল)

কাল আস্‌বে ?

প্রকাশ—না।

মীনা—পরশু ?

প্রকাশ—না।

মীনা—কখনও আর আসবে না ?

প্রকাশ—না।

(মীনা এক মিনিট্ স্তব্ধ)

মীনা—আমার যদি খুব অসুখ হয় ?

(প্রকাশ মীনার মুখের উপর চোখ বুলাইয়া লইল মুহূর্ত্তের জন্য)

প্রকাশ—আমার হয়তো তাতে কিছু এসে যাবে না। (প্রস্থান)

(প্রকাশের শেষের কথায় মীনা একেবারে অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিল : সে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো সেই দিকে যে দিক্ দিয়ে প্রকাশ বেরিয়ে গেল)

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য পরিচয়
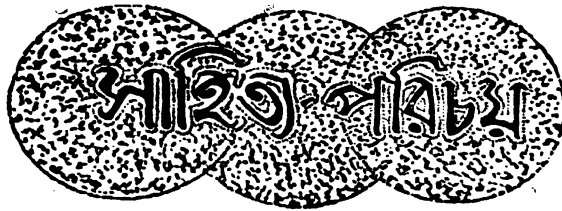
প্রেতাত্মার বার্ত্তা—সুকোমল বসু। ৩৫ই, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট হইতে সুভো ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা

এই পুস্তকখানিতে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টি গল্প আছে। গল্পগুলি এত চিত্ত-উত্তেজক যে আগাগোড়া শেষ না করিয়া পারা যায় না। ভূতের গল্প ছোটদের জন্য বেশী লেখা হইয়াছে। বড়রা ভূত বিশ্বাস করেন কিনা জানিনা—কিন্তু মৃত্যুর পর আত্মার পরিণতি কোন পথে তাহা ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে হয় তো যাঁহারা ভূতের গল্পকে গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে নূতন কিছু তথ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাঙ্‌লা ভাষায় পরিণত পাঠকদের জন্য ভূতের গল্পের বেশী বই নাই বলিলেই চলে, কিন্তু বিদেশী সাহিত্যে এ সম্বন্ধে অদ্যাবধি বহু পুস্তক বাহির হইয়াছে এবং সেগুলির চাহিদাও খুব বেশী। সুকোমল বাবু এ সম্বন্ধে পুস্তকখানি লিখিয়া সত্যই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এতদিন তাঁহাকে কবি বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু গল্প রচনায়ও যে তাঁহার সমধিক দখল আছে তার পরিচয় প্রেতাত্মার বার্ত্তাতে পরিস্ফুট হইয়াছে? লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, বর্ণনা কৌশল প্রশংসনীয়। আমাদের মনে হয়, সাময়িক চিত্ত-বিনোদনের জন্য এই ধরণের পুস্তকের প্রচার আরও বেশী হওয়া উচিৎ।

প্যান্‌সি ও পিকো—সুভো ঠাকুর রচিত ও ৩৫ই, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট-এর ফিউচারিষ্ট পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত। দাম এক টাকা।

"প্যানসি ও পিকো" কবিতার বই কিংবা গ্রন্থকারের মত অনুযায়ী একখানা ছড়ার বইও বলা চলে। কিন্তু যে ছন্দে তিনি এই ছড়া কেটেছেন তার প্রত্যেকটির সাবলীল ভঙ্গী যেন একটির পর একটি নেচে গিয়েছে। তারই সাথে সমান তালে পা রাখতে হলে পাঠকদের বইয়ের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্য্যন্ত এক নিঃশ্বাসে পড়তেই হবে। নইলে তিনি এর রসাস্বাদন করতে পারবেন না। ফুল তুলতে যেয়ে অকারণ কাঁটার খোঁচা খেয়েই তাকে ফিরতে হবে

বিদেশী ভাবা ও ভাব এদেশীয়দের সাথে মিশ খাইয়ে আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের কোনও এক অবিবাহিত তরুণ মনের উচ্ছ্বাস নানাপ্রকার ছন্দে ও বিচিত্র ঢঙ্গে কবি এই বইতে প্রকাশ করেছেন। তারই প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার সঙ্গে মিশ খাইয়ে এ মরজগতের যে কঠিন সত্য কবি বলেছেন তাইতেই বইখানা আমাদের এতো ভালো লেগেছে।

উদাসীন চির চঞ্চল আমি খেয়ালী-মরুর মত
হেলা ভরে কত খেলার ছলেতে করেছি
হৃদয় হত

তুলনা আমার নাই—
কান্না দেখিয়া হাসি পায় মোর
অবাক হইয়া যাই!

জগতে দুঃখ করবার কিছু নেই। সময় থাকতে ভোগ করে নাও—মরণ ত' আসবেই। যেন,
পৃথিবীর সাথে চলেছে আমারো
অন্ত বিহীন ঘোর।

অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকাও বোকামী। ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবে শুধু বর্ত্তমানকে নিয়ে চলাই আমাদের কাজ—পঙ্গু মন চিরকাল শুধু অতীতের দোহাই বরাবরই দিবে—কিন্তু সুস্থ মন বর্ত্তমানকেই চাইবে। বইয়ের উপসংহারে কবি তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অতীত ডুবিল বর্ত্তমানের বিবর্ত্তনের ঘোরে!
.........পিছনে ফেলিয়াই যাই—

অতি সুন্দর কাগজে ছাপা, বাঁধাইও চমৎকার। সবচেয়ে ভালো এর প্রচ্ছদপট।

বইখানি হাতে নিলেই বোঝায় কবি এতে কী বলতে চেয়েছেন। ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বইখানিতে যে ছবি রয়েছে তাও হয়েছে এক অভিনব অবদান।

জামাই-ই-চোর—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ৭৮নং কাশীপুর রোড, বরাহনগর। প্রাপ্তিস্থান—এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। দাম ছয় আনা।

বইখানি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত। কোমলমতি বালকগণই দেশের ভবিষ্যৎ এবং তরুণ মনে একবার যে ছাপ পড়ে ভবিষ্যৎ তারই জের টেনে চিরকাল চল্‌তে থাকে। তাই নানাপ্রকার সুখপাঠ্য বইয়ের ভেতর দিয়ে শিশু মনকে গড়ে তোলা জাতির সেবা করারই নামান্তর। নীরেন বাবু তাঁর প্রচেষ্টাকে এদিকে নিযুক্ত করায় আমরা খুশীই হয়েছি। শিশু সাহিত্যে প্রতিভার পরিচয় নীরেনবাবু এর পূর্ব্বেও দিয়েছেন এবং এইখানিও আমাদের ভালই লেগেছে। ছবিগুলোও ভাল, নানারঙের কালিতে ছাপা। এক কথায় ছেলেদের জন্য বইখানি বেশ।
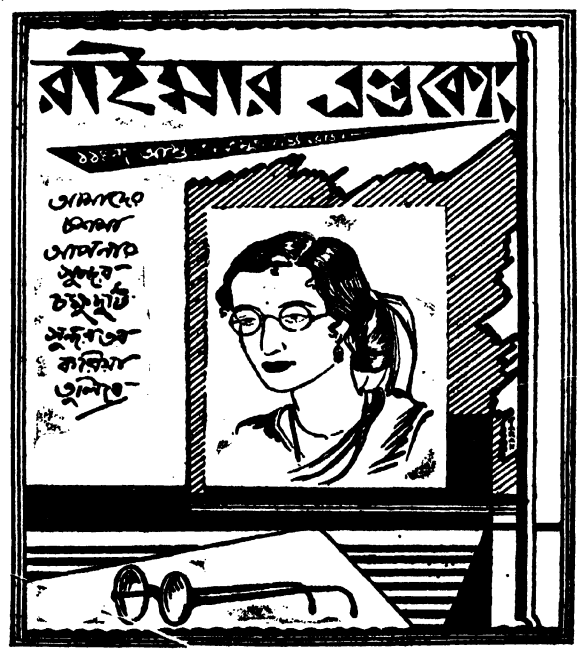
সঙ্গীত-বাদ্য-চর্চ্চায় আমেরিকার উৎকর্ষতা	# আমেরিকার চিঠি	**ডাঃ শরৎচন্দ্র মুখার্জ্জি** নিউ ইয়র্ক

ওয়াল্‌টার ড্যাম্‌রস্ (Walter Damrosch) এ বৎসর তার পঞ্চাশৎ বাৎসরিক বাদ্যনেতৃত্বের উৎসব করিলেন। ঠিক পঞ্চাশ বৎসর আগে এর বাবা তখন নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত বাদ্যনেতা বা কণ্ডাক্টর (Conductor) ছিলেন। হঠাৎ বাবার মৃত্যু হওয়াতে, যুবক ছেলেকে এ দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হয়। তবে সুখের বিষয় যে ছেলেটী এ দায়িত্ব, বাবার চেয়ে কোনও অংশে খারাপ ভাবে পুরণ করেন নাই, বরং অনেকের মতে বাবার চেয়েও ভাল করিয়াছেন।

তখনকার দিনে অপেরার (opera) গান বাজনা সাধারণ লোকে তেমন পছন্দ করিত না। করিলেও আর্থিক সামর্থ্য না থাকাতে তাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হইত না। অপেরা ছিল বড় লোকের জন্য। মিঃ ড্যামরস্ বুঝিতেন যে সঙ্গীতপ্রীতি বড় লোকের চেয়ে সাধারণ অবস্থাপন্ন গরীবদের মধ্যেই অনেক বেশী, অথচ তিনি এ বিষয়ে কিছু করিতে পারিতেন না বলিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইতেন। এবং এর জন্য চিরকাল তিনি লড়াই করিয়া আসিয়াছেন।

ড্যাম্‌রস্ আরও একটা জিনিষ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। গান বাজনা যাহারা করিতে ভালবাসে অনেক সময় তাহারা শিখিবার সুযোগ পাইত না। আসল কথা, যাহারা শিখিতে চায়, তাহারা অর্থাভাবে শিখিতে পায় না—যাহারা শুনিয়া আনন্দ পায়, তাহারাও অর্থাভাবে ভাল গান বাজনা শুনিতে পায় না। এমন সময়ে হইল "ফনোগ্রাফের" সৃষ্টি। ড্যাম্‌রস্ খানিকটা শান্তি পাইলেন যে, ভাল ভাল ওস্তাদের রেকর্ড কিনিয়া অনেক সঙ্গীত-প্রিয় লোক খানিকটা উপভোগ করিতে পারিবেন। এর পর একটীর পর আর একটী করিয়া এদেশের নানা রকম উন্নতি ও ওলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে। ফনোগ্রাফের পর বিশিষ্ট উল্লেখযোগ্য জিনিষ হইল "রেডিও"। ড্যাম্‌রসের প্রাণে আরও আনন্দ হইল। এখন যে কোনও লোক ঘরে বসিয়া ভাল গান বাজনা উপভোগ করিতে পারিবে। এ বিষয়ে ইনি যত চেষ্টা করিয়াছেন, এমন বোধহয় খুব কম লোকে করিয়াছে। এজন্য ইহাকে অনেক কষ্টও ভোগ করিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ অনেকে এ সব পছন্দ করিত না। তাদের ওজর এই যে গান বাজনা যদি সকলে অনায়াসে শুনিতে পারে, তবে পয়সা খরচ করিয়া কেহ শুনিতে যাইবে না। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন "ফনোগ্রাফের" সময়ে তেমন বেশী না হইলেও, "রেডিও"র সময়ে বড় বেশী হয়। সে আন্দোলন আজ পর্য্যন্তও কমে নাই। ড্যামরস এখন নিয়মিত ভাবে মেট্রোপলিটান অপেরাতে (Metropolitan Opera House) বা কার্ণেগী হলে (Carnegie Hall) তার দল বল লইয়া যখন বড় বড় অপেরা ও কন্‌সার্ট বাজান তখন তাহা রেডিওতে ব্রড্‌কাষ্ট্ করা হয়। বহু লক্ষ লোক ঘরে বসিয়া তার অপূর্ব্ব সঙ্গীত ও সঙ্গত বিনামূল্যে শুনিতে পায়।

মিঃ ড্যাম্‌রস্ কথায় কথায় সেদিন বলিলেন, "আমার বিশেষ চিন্তা ছিল ছেলে মেয়েদের জন্য। এই সব কোমল প্রাণে সঙ্গীত ও সঙ্গতের মাধুরী না দিলে তারা কি কখনও জীবনে খাঁটী মনুষ্যত্ব পাবে? বিশেষতঃ আমাদের বর্ত্তমান স্বার্থপর ও কলকারখানা-পূর্ণ জীবনে যদি একটু খানি সঙ্গীত ও সঙ্গত না দেওয়া যায়, তবে আমার মনে হয় যে আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের জীবনকে প্রায় মরুভূমির মত করিয়া তুলিবে। ইতিমধ্যেই আমরা তার প্রমাণ বহু জায়গায় পাইতেছি।"

কথা গুলি বড় সত্য। আমাদের বর্ত্তমান জীবন পুরাকালের মত আদৌ নয়। আমরা এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে বাস করিতে বাধ্য হইতেছি! কাজেই আমাদের জীবনের ধারা গুলিও সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লান বিশেষ দরকার। রেডিও আজ আমেরিকায় যে কি অদ্ভুত কাজ করিতেছে তাহা বলা অসম্ভব। রাশিয়াতেও আজ রেডিও অসম্ভব সম্ভব করিতেছে। আজ ঘরে বসিয়া যে কোনও রকম শিক্ষা, আমোদ, বক্তৃতা, সঙ্গীত ও সংবাদ সবই পাওয়া সম্ভব। ভারতবর্ষের রেডিওর বিষয় গুলি দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া অনেক সময় ভাবি যে কেন আমরাও এদের মত সদ্ব্যবহার করি না। আমাদের দেশে রেডিওর যত দরকার এত বোধহয় আর কোনও দেশে নয়। অথচ আমরা সকালে কয়েকটী রেকর্ড বাজাইয়া ও বিকালে কয়েকটী গান গাহিয়া রেডিও রাখার নাম রাখিতেছি।

মিঃ ড্যাম্‌রসের মতে রেডিও (ও ভবিষ্যতে টেলিভিসন্) জগতে সভ্যতা বিস্তার করিতে অনেক সাহায্য করিবে। কিন্তু বিভিন্ন দেশে তার সদ্ব্যবহার করা দরকার। বিশেষতঃ যে সব দেশে শিক্ষার অভাব, পয়সার অভাব, ও যেখানে লোক জনের বসবাস অনেক দূরে ছড়ান, সে সব দেশে রেডিও দ্বারা সমাজের বহু অভাব পূরণ করা সম্ভব। রাশিয়া যেমন রেডিও দ্বারা সাধারণ শিক্ষা দিতেছে, স্বাস্থ্য শিক্ষা দিতেছে ও রাজনীতি শিক্ষা দিতেছে, ভারতবর্ষের মত দেশেও ঐ সব গুলি শেখান খুবই সম্ভব। এ দেশের রেডিও ষ্টেশন বহু। দিন বা রাত্রের যে কোনও সময়ে, কোনও না কোন শিক্ষাপ্রদ জিনিষ রেডিওতে পাওয়া সম্ভব। মিঃ ড্যাম্‌রস্ সঙ্গীত ও সঙ্গতেই বেশী উৎসাহী। তিনি বলেন যে সব দেশেই এটা দরকার, শুধু বিজ্ঞান, বা দর্শন বা জ্ঞান লাভ করিলেই যথেষ্ট হইল না। সঙ্গে যদি সঙ্গীত ও সঙ্গতের মাধুর্য্য একটু না থাকে তবে পূর্ণাঙ্গ হইল না। সঙ্গীত, তাঁর মতে

ক্ষয় রোগ

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ মিত্র

ক্ষয় রোগ বা যক্ষ্মা অতি সাংঘাতিক ব্যাধি। যক্ষ্মা রোগের বীজাণু অনুক্ষণ মানবের জীবনী শক্তিকে ধ্বংশ করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। বর্ত্তমান বস্তু তান্ত্রিক যুগে এই মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপ অতি-মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই বাঙ্গালা দেশে কয় বৎসরের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ দ্রুত গতিতে তাহার জয় পতাকা উড়াইয়া চলিয়াছে। এই ব্যাধি বয়সের তারতম্য মানে না, স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ ইহার কাছে নাই, জাতি ভেদ করে না। ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়ার পরই এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক। যে কোন প্রকারে জীবনী শক্তির হ্রাস হইলে যক্ষ্মা রোগ দুর্ব্বার গতিতে মানব দেহ অধিকার করিয়া থাকে। অত্যধিক সুরাপান, পুনঃ পুনঃ সন্তান ধারণ ও প্রসব ফুস্ ফুস্ যন্ত্র কোন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ক্ষয়-রোগ অতর্কিত ভাবে এইরূপে নর-নারীকে আক্রমণ করে। বাস গৃহে বায়ু প্রবাহের অভাব ও বহু লোকের একত্র বাস। শয়ন গৃহে আলোক ও বাতাসের অপ্রাচুর্য্য, ভেজাল খাদ্য গ্রহণ, পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাব যক্ষ্মা রোগ বৃদ্ধির অনুকূল। ধুলার প্রভাবে ফুস্-ফুসের উত্তেজকশীল ক্ষত স্থান যক্ষ্মা বীজাণু দ্বারা শীঘ্রই আক্রান্ত হইয়া থাকে।

এই কাল-ব্যাধির কতক গুলি প্রাথমিক লক্ষণ আছে প্রথম আক্রমণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাসি দেখা যায়। প্রথম হইতে শেষ কাল পর্য্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে।

। সঙ্গীতে সাপ মুগ্ধ হয়; পাষণ্ড দয়ালু হয়; এমন কি প্রাণ-হীনও মানুষ হইতে পারে।

প্রথমাবস্থায় কাসির পরিমাণ অল্প থাকে। এই কাসি বিশেষ ভাবে লক্ষ করিবার—যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত নর-নারীর কাসি শুষ্ক এবং অল্প কষ্টদায়ক অনুমিত হয়। কিন্তু রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহা অত্যন্ত ক্লেশ-দায়ক হইয়া উঠে। প্রায়ই দেখা যায় যে রাত্রিকালে এবং প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগের সময়ে কাসির অবস্থা মন্দ আকার ধারণ করিয়া থাকে। যে কোনও মুহূর্ত্তে রক্ত মিশ্রিত থুতু উঠিয়া রোগ ভয়ঙ্কর অবস্থায় পরিণত হইতে পারে। যক্ষ্মা রোগের বিশিষ্ট লক্ষণ—সন্ধ্যাকালে তাপ বৃদ্ধি ও প্রভাতে হ্রাস। রাত্রিকালে স্বেদ নির্গত হইয়া শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শরীরের ওজন ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। কাসির সঙ্গে সঙ্গে বক্ষের কোন কোন স্থানে কখন কখন বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

সমগ্র সভ্য দেশের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক-গণ যক্ষ্মা রোগের প্রতিবিধানের জন্য নানা প্রকার গবেষণা করিতেছেন। দেশ বিদেশের বহু চিকিৎসক এই ক্ষয় রোগ দূরীভূত করিবার জন্য চিকিৎসক মণ্ডলী যে সকল ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন তন্মধ্যে নেবাল্‌সের যক্ষ্মারোগের আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক রেঁজি সুইজারল্যাণ্ডের আবিস্কৃত একটি ঔষধকে শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে যক্ষ্মা রোগের প্রকোপ যে ভাবে বৰ্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে জনসাধারণের পক্ষে এই ঔষধের নাম জানিয়া রাখা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিবার শক্তি শতকরা নিরানব্বুই জনের নাই, এইরূপ অবস্থায় অমোঘ ফলপ্রদ "সিরোলিনের" নাম জানা থাকিলে স্বল্পা-য়াসেই এই ঔষধ সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে।

চিকিৎসা সংক্রান্ত দেশবিদেশের সাময়িক পত্রে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উল্লিখিত ঔষধের অব্যর্থ ফললাভের সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

মনোরম সাধুখাঁ

চার্লির বিয়ে

চার্লি চ্যাপ্‌লিন অতি গোপনে, সেদিন বিশেষ এক বন্ধুর দলের কাছে স্বীকার করেছে—যে—পলেট্‌ গডার্ড্‌ তার স্ত্রী আজ এক বছর। পলেট যে তার স্ত্রী হয়ে গেছে, বা অবিলম্বেই হবে—এ আমরা জানতুম। তবে এতোদিন এ জিনিষটা গোপনে রাখা সেটা চার্লির চ্যাপ্‌লিনত্ব। বিয়ে যে হয়ে গেছে—এ সে স্বীকার করেছে বটে, কিন্তু কোথায় জান্‌তে পারা যায়নি। যাক্‌, পলেট এবার থেকে সাধারণের কাছে তার গডার্ড্‌ নামটি হারালো।

চ্যাপ্‌লিনের ছবি সম্বন্ধে খবর হচ্ছে সেটি অবিলম্বেই শেষ হবে। এবং তাতে চ্যাপলিন কথাও বল্‌বে। তারপরেই সে আরেকটি ছবি তুলবে—পলেট্‌ অবিশ্যি নায়িকা, তবে নায়ক চার্লি নয়।

মার্লিনের কথা

মার্লিন ডিট্রিশের 'দি ডেভিল্‌ ইস্‌ এ ওম্যান্‌' কল্‌কাতায় শিগ্‌গীরই আস্‌ছে। এতে তার প্রেমিক সিজার রোমিরো। রোমিরোর সম্বন্ধে মার্লিনের মতামত শুনুন।

'আজ পর্য্যন্ত অনেক অভিনেতাই ক্যামেরার সামনে আমার সঙ্গে প্রেম করেছে। অনেকে বিখ্যাত, অনেকে অখ্যাত। কিন্তু রোমিরোর মত প্রেমিক পাওয়া আমার জীবনে এই প্রথম। রোমিয়োর চুম্বন ও আলিঙ্গন ক্যামেরার সামনেও আমার প্রাণে এনেছিলো শিহরণ। তার সঙ্গ জীবনে আমি ভুলবো না।'

কৃতজ্ঞ সিজার রোমিরো—সন্দেহ নেই।

তবে দুষ্টুলোক আস্তে আস্তে দুষ্টু কাশিও কাশ্‌ছে।

জো-ই ব্রাউনের ভাবী ছবি 'সিক্স ডে বাইক রাইডার'।

পিক্‌ফোর্ডের প্রেম

হলিউডের বাজারে জোর গুজব—মেরি পিক্‌ফোর্ড্‌ নাকি ডগ্‌লাসের কথা ক্রমশঃ ভুলছে। গঙ্গোপনে চার্লস (বাডি)

রোজার্স্-এর সঙ্গে তার ঘন ঘন আনা গোনা, মিছে অছিলায় টেলিফোনে কথা বলা অনেকের মনেই সন্দেহ জাগায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন মেরির নাকি মিসেস্ রোজার্স্ হওয়ার বেশি আর দেরী নেই।

সেদিন লজ্জায় লাল মুখ ডোলোরেস ডেল রিয়োর—কেন?—এ সপ্তাহে মনোরম সাধুখাঁ বলেছেন।

সব নিজের

যদি জিজ্ঞেস করি—কেটি গ্যালিয়ানকে চেনেন? জবাবে আপনারা যদি বলেন 'না' আমি কিছুমাত্র অবাক হব না। ফ্রেঞ্চ্ মেয়ে হচ্ছে এই কেটি গ্যালিয়ান, ফক্স্ মুভিটোন তার ওপর অনেক খানি আশা রাখে। সেদিন তার একটি ছবি তোলা হ'লো—শোবার ঘরের। কেটি বল্লে, দেখুন, আমি অন্যের জিনিষে শুতে পারবো না। আমি আমার সব নিজের জিনিষ আনাচ্ছি।

আনানো হ'লো। কালো ক্রেপ্ ডি সাইনের সব আসবাব, কেটির নাম তাতে মনোগ্রাম করা।

পল মুনির গত তিনটে ছবিতে হয়েছিলো তিন রকমের চুল।

ডিরেক্টর বল্লে—কালো ভালো হবে না, ছবি তোলা হবে খারাপ।

'বেশ.' বল্লে কেটি, 'আমি সাদা আনাচ্ছি।'

সাদা জিনিষ এলো, পাতা হ'লো, তবে তোলা হ'লো কেটির ছবি।

পল্ মুনির চুল

গত ৮'মাসের ভেতর মুনি অন্ততঃ তিন-বার তার চুলের রং বদলেছে। 'বর্ডার টাউন্' এ নাব্বার সময় তার চুল ছিলো খুব ঘন কালো। যখন সে 'ব্ল্যাক ফিউরি'তে নাব্লে তখন তার চুলের রং হ'লো প্রায় সাদা। কয়লা খনির এক গল্প হচ্ছে 'ব্ল্যাক্ফিউরি'।

তারপর তার নতুন ছবিতে—নাম এখনও হয়নি—মুনি নাব্ছে তার স্বাভাবিক চুলে। ঘন বাদামী হচ্ছে পলের স্বাভাবিক চুল।

ডেল্রিয়োর বিপদ

ভারী লজ্জায় সেদিন পড়েছিলো ডোলোরেস্ ডেল রিয়ো। ব্যাপারটা ভাবতেও হাসি পাচ্ছে।

ফক্সের কেটি গ্যালিয়ান ছবি তোলার সময়েও নিজের জিনিষ ব্যবহার করে।

সকাল বেলা ডোলোরেস্-এর ছবির সেদিন ছিলো শুটিং। দৃশ্য হচ্ছে সাঁতার কাট্বার। রক্তের মত লাল এক জামা পরে' ডেল্রিয়ো জলে নাব্লো—যেন নীল জলে লালপরী। কতরকম কায়দায়, কতরকম ভাবে—ক্যামেরা

তার সাঁতার কাটা সুন্দর দেহ তুলে নিলে। আর কাজ নেই, অতএব ডল্ ঠিক করলে জলেই কাটাবে সারাটা সকাল।

প্রায় দুপুর। খিদেটাও পাচ্ছে। জল ছেড়ে লাল পরী ওঠবা মাত্রই সবাই আরম্ভ করলে হৈ হৈ হাসি। ব্যাপারটা ডোলোরেস প্রথমে বুঝে উঠ্‌তেই পারলে না। তারপর দেখলে তার সাঁতার পোষাক—আন্‌কোরা নতুন—জলে থেকে থেকে কুঁচকে হয়েছে এতো ছোটো—যা শির্‌লী টেম্পল্‌ও লজ্জায় গায় দিতে সাহস করে না। ডেল্ রিয়োর সুন্দর শরীরের প্রতিটি রেখা সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল-তরো হয়ে উঠেছে!

লজ্জায় লাল মুখ, সুন্দরী ডোলোরেস্ কত জোরে সেদিন ছুটেছিলো?

সুন্দরী কে—জানে সুন্দরী

জেসি ল্যাস্কি, বিখ্যাত প্রযোজক, তার ভাবী ছবি 'রেড্ হেড্‌স্ অন্ প্যারেড্'-এর জন্য খুঁজ্‌ছেন এমন পাঁচশ' মেয়ে যাদের চুলের রং লাল। এদের বেছে নেবার জন্য জেসি হলিউডের কয়েকজন বিখ্যাত লাল মাথা-সুন্দরীদের নিমন্ত্রণ করে' এনেছিলেন। তারা হচ্ছে—জেনেট্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড্, জেনেট গেনর, মির্ণা লয়, জিন্‌জার রোজারস্, ক্ল্যারা বো, ন্যান্‌সি ক্যারল আর গ্রেস ব্র্যাড্‌লি।

ভিল্‌মা ব্যাঙ্কীর স্বামী

রড্ লা রক্ নির্ব্বাক যুগে ছিলো হলিউডের অত্যন্ত নামজাদা এক অভিনেতা। অনেকদিন পর স্ত্রীর সঙ্গে অনেক দেশ ঘুরে' সে সেদিন হলিউডে ফিরে এসেছে। ফক্স্ মুভিটোন্ অমনি তাকে সবাক ছবিতে নাব্‌তে অনুরোধ করলে। প্রথমে কিছুতেই স্বীকার হয় না, অবশেষে অনেক সাধাসাধি করবার পর রড্ রাজী হয়েছে। তাই, শিগ্‌গীরই আমরা তাকে দেখ্‌তে পাবো "মিষ্ট্রি ওম্যান্"-এ।

খুচরো খবর

জিন্ হার্‌লো তার স্বামীর সঙ্গ ছাড়্‌বার জন্য নালিশ করেছে কোর্টে।

* * *

লাইজ রবার্ট অ্যাপেনডিক্স্ অপারেশনের পর সেরে উঠ্‌ছে।

* * *

হেলেন ম্যাক্-এর সেদিন বিয়ে হলো ফক্সের চার্ল্‌স্ আরউনের সঙ্গে।

* * * *

অ্যানিটা পেজ তার কবি স্বামী হাব ব্রাউনকে আর ভালোবাস্‌ছে না।

* * * *

মার্লিন ডিট্রিশ্ ছুটিতে এলো নিউ ইয়র্ক্-এ।

এ সপ্তাহে সুন্দরী ছ'টি ইংরেজ অভিনেত্রীর ছবি আপনাদের উপহার দিচ্ছি। বাঁ দিকে হচ্ছে অ্যানা লী— 'ক্যামেল্‌স্ আর কামিং' এ অত্যন্ত নাম করে। এর ভাবী ছবি হচ্ছে 'হিট্ ওয়েভ্'। আর, ডানদিকে লোভনীয় দেহ দেখাচ্ছে কনসট্যান্স্ গডরীজ্। জেমসবরো এই কনির ওপর অনেকখানি আশা রাখে।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—স্ত্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২—6th June, 1935. { ২৩শ সংখ্যা

চক্ষুহীনের চক্ষুদান

সত্যকারের কংগ্রেসী সদস্য কাহারা ? কংগ্রেসী তক্‌মা আঁটিয়া স্বাদেশিকতার মুখোসে স্বার্থের ছদ্মবেশ ঢাকিয়া যাহারা বাজারে মনুষ্যত্বের ফেরী করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে কংগ্রেসী সদস্য বলিয়া স্বীকার করা কি সত্যের অপলাপ নহে ?

রাজনীতির ক্ষেত্রে মতভেদ ও মতবৈচিত্র্য অবশ্যম্ভাবী। যে কোনো স্বাধীন দেশের দিকে চাহিলেই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। বৃটিশ পার্লামেণ্ট তো Party System এর উপর প্রতিষ্ঠিত। ইউরোপের অধিকাংশ শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে অল্পাধিক পরিমাণে এই কথা খাটে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই সকল দলের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ ও বিরোধিতা অনিবার্য্য। কিন্তু মতভেদ যতই তীব্র হউক, বিরোধিতা যতই সুস্পষ্ট হউক, আদর্শ কিন্তু সেখানে এক—অর্থাৎ দেশের ও রাষ্ট্রের কল্যাণ-সাধন। যে যাঁর নিজের বুদ্ধি ও বিবেকানুযায়ী এই আদর্শ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট থাকেন। অতএব আমাদের দেশেও যখন কংগ্রেসের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া স্বাধীন চিন্তা ও রাজনৈতিক মতামতের পার্থক্যহেতু এক দলের সহিত আর এক দলের বিরোধ হয়, তখন তাহাতে লজ্জা পাইবার মত কিছু দেখি না। কিন্তু যখন দেখি, সাময়িক আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া, দেশের স্বার্থকে বলি দিয়া কেহ নিজের স্বার্থকে বড় করিতেছেন, তখন বাস্তবিকই লজ্জা ও দুঃখ হয় এবং মনে হয় এই সকল অপদার্থ ব্যক্তিকে দেশের কল্যাণের জন্যই অসঙ্কোচে রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত।

সম্প্রতি কর্পোরেশনে ডাঃ জে, এন, মৈত্রের ডিগ্‌বাজী দেখিয়া এই সকল কথা মনে পড়িল। অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সময়, দুঃখের কষ্টি-পাথরে স্বদেশ-প্রেমের পরীক্ষার দিনে ডাঃ মৈত্র বোধ হয় রোগীদিগের চক্ষু-পরীক্ষায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে, দেশসেবার কথা চিন্তা করিবার সময় পান নাই, কিংবা সময় পাইলেও তখন দূরে থাকা সুবিধাজনক বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সুখভোগের দিনে দেখা গেল তিনি একজন কংগ্রেসওয়ালা এবং কোন্ সূত্রে বা কি অধিকারে জানি না, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে উক্ত দলের নেতা বলিয়া জাহির করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এই নেতৃপুঙ্গবের মেরুদণ্ড এমনই কঠিন ও শক্তিমান্ যে, মেয়র নির্ব্বাচনের ব্যর্থতার এক ধাক্কাতেই তাহা বাঁকিয়া গেল এবং তিনি বিনা দ্বিধায় নিজ দলের মুখে চুণকালি লাগাইয়া অপর পক্ষে আত্মবিক্রয় করিলেন।

অতএব, সময় থাকিতে এই সকল হীনবীর্য্য দেশদ্রোহী নপুংসকদের চিনিয়া রাখা উচিত। আগামী কর্পোরেশান নির্ব্বাচনের সময়ে ইহারা যাহাতে কংগ্রেসের নাম করিয়া দেশের মাথায় নিজের স্বার্থের কাঁঠাল ভাঙ্গিতে না পারে, সে বিষয়ে এখন হইতেই সকলের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল স্বার্থান্বেষীদের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, কলিকাতার করদাতাগণের পাষণ্ডদলনের উপযোগী বুদ্ধি ও শক্তি আছে।

ব্যবস্থা পরিষদের উপ-নির্ব্বাচনে

'খেয়ালী'র মারফৎ কলিকাতাবাসিগণের নিকট

শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্রের নিবেদন

'খেয়ালী'র প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ্র রায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের উপ-নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে নির্ম্মল বাবু "খেয়ালী"র মারফৎ কলিকাতাবাসিগণের নিকট নিম্নলিখিত নিবেদন জানাইয়াছেন :—

মাননীয় মহাশয়,

আপনি বোধ হয় জ্ঞাত আছেন যে, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু পদত্যাগ করায় কলিকাতা সহর কেন্দ্র হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্যপদ শূন্য হওয়াতে একটী উপ-নির্ব্বাচন আসন্ন। এই আসন্ন উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস জাতীয় দল কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া আমি সেই শূন্য পদের জন্য প্রার্থী হইয়াছি। আমি দুইটী উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া এই নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে যোগদান করিয়াছি :—

(১) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর প্রতিনিধি হিসাবে পরিষদে তাঁহার জন্য আসনটী রক্ষা করা।

(২) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্পর্কে বাঙ্গলার সুদৃঢ় প্রতিবাদমূলক মতবাদের সমর্থন করা।

শ্রীযুক্ত বসুর জনপ্রিয়তা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির সবিশেষ প্রমাণ এই যে, গত নির্ব্বাচনে তিনি কংগ্রেস জাতীয়দলের পক্ষ হইতে বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং সরকারী বাধায় নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে না পাওয়ায় তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলেন। অতএব, আজ আমার নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে অকুণ্ঠকণ্ঠে ইহাই ঘোষণা করিতে চাই, যে, শ্রীযুক্ত বসু মুক্তিলাভ করিয়া যেদিন পরিষদে স্বীয় আসনে ফিরিয়া আসিতে চাহিবেন, সেইদিনই আমি সানন্দে সরিয়া দাঁড়াইব।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে বাঙ্গালার সুদৃঢ় ও সুতীব্র জনমত আজ সর্ব্বজনবিদিত। প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীর ন্যায় আমিও এই বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে। এই সম্পর্কে "না-বর্জ্জন-না-গ্রহণ" রূপ কংগ্রেসের ক্লৈব্যনীতি আমি কোনোমতেই সমর্থন করিনা এবং আমি মনে করি অলস নিরপেক্ষতার দ্বারা নহে, সক্রিয় প্রতিবাদের দ্বারাই এইরূপ অনিষ্টকর ব্যবস্থার প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে গত দিনাজপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশের যে সুস্পষ্ট ও সুবিবেচিত মত ব্যক্ত হইয়াছে, যতদূর সাধ্য পরিষদে আপনাদের প্রতিনিধি হিসাবে আমি সেই মতের সমর্থন ও প্রচার করিব।

অতএব, আশা করি যাঁহারা বাঙ্গালার জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান, তাঁহারাই আমার নির্ব্বাচন সমর্থন করিবেন। কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক ও জনসেবক আমার পিতামহ স্বর্গত গণেশ চন্দ্র চন্দ্র ও আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় রাজচন্দ্র চন্দ্রের বংশধর হিসাবে কলিকাতাবাসীর নিকট এই সমর্থন দাবী করিবার মত আমার সামান্য অধিকার আছে। স্বর্গীয় দেশবন্ধুর পরিচালনায় আমার সাধ্যমত দেশসেবাও আপনাদের সুবিদিত। অতএব, আপনাদিগের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, দেশগত ও ব্যক্তিগত, উভয়দিক হইতেই আপনারা এই আসন্ন নির্ব্বাচনে আমাকে ভোট দিয়া আমার নির্ব্বাচন-প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত করুন। ইতি

বিনীত

শ্রী নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র

২৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
২৯শে মে, ১৯৩৫।

—:০:—

"আমি এক ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াছি"

—প্রমথনাথের শেষ উক্তি

আত্মহত্যা, না হত্যা, মৃত্যু না অপমৃত্যু ?

মেয়রের মামলার ফরিয়াদী অধ্যাপক প্রমথনাথের আকস্মিক মৃত্যু লইয়া দেশের জনসাধারণের মধ্যে যে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে তাহা নিরসনকল্পে দুইজন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। প্রমথনাথের মৃত্যু সম্বন্ধে যথাযথ তদন্ত করিবার জন্য আমরা বাংলার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রমথনাথের মৃত্যু-রহস্য

(অভয়ঙ্কর)

বিবাহিত জীবনের নিত্য লাঞ্ছনাকে বঞ্চিত করিয়া প্রমথনাথ যখন ইহধাম পরিত্যাগ করে, তখন সে কোনও বাণী উচ্চারণ করিয়াছিল কিনা, কে বলিবে ? যদি কিছু সে বলিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে সেই না শুনা বাণী লোকের অগোচরেই থাকিয়া যাইবে—তাহা জানিবার উপায় নাই ! সেই হতভাগ্যের শেষ কথা বলিয়া আজ যাহা পরিচিত সেই কথাটি আজিও আমাদের কাণে বাজিতেছে—"আমি একটি ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াছি।" এই শেষ কথার গভীর রহস্যজাল ভেদ করিবে কে ? যে ব্যক্তি প্রতিবাদীকে প্রবল পরাক্রান্ত মনে করিয়া আপনার জীবনকে বিপন্ন মনে করিত, যে ব্যক্তি আপনাকে বিপন্মুক্ত রাখিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের শরণাপন্ন হইয়া কাতর কণ্ঠে পুলিশ প্রহরী ভিক্ষা করিয়াছিল, প্রাণরক্ষা করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব ভয়ার্ত্ত সেই ব্যাকুল প্রাণীটি অকারণে আত্মহত্যা করিল ইহাতো সহজে বিশ্বাস হয় না। "খেয়ালী"র পূর্ব্বে এক সংখ্যায় তাহার মৃত্যু যে রহস্যাবৃত, তাহা যে আত্মহত্যা না হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে, তাহা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। এইবার তাহার মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে লিখিত পত্রের ইঙ্গিতটি বুঝিবার প্রয়াস করিব।

একদল লোক পরম উৎসাহে প্রচার করিতেছেন যে প্রমথনাথের মামলাটি মিথ্যা এবং এই মিথ্যা মামলায় প্রমথনাথকে প্ররোচিত যাঁহারা করিয়াছিল, তাহাদের লক্ষ্য করিয়াই প্রমথনাথ ওই উক্তিটি করিয়াছেন। এই মতবাদ সর্ব্বাগ্রে প্রচার করিয়াছে নলিনী প্রভাবান্বিত "ফরওয়ার্ড।" কিন্তু এই মতবাদ কোনও ক্রমেই বিচার-সহ যে হইতে পারেনা, তাহা ভাবিয়া দেখিবারও অবসরটুকু এই পরম উৎসাহীদলের নাই।

যদি চক্রান্তকারীদের চেষ্টার ফলে এই মিথ্যা মামলা দায়ের হইত, তাহা হইলে সেই চক্রান্তের কথা বিমলেন্দু, বিভূতিবাবু ও বিনোদবাবুর নিশ্চয়ই জানা ছিল। কেননা তাহারা সে ক্ষেত্রে মিথ্যা সাক্ষ্যই দিয়াছিল। সেক্ষেত্রে প্রমথনাথ বিমলেন্দুকে কেন একটা "ষড়যন্ত্রে পড়িয়াছি" বলিয়া হেঁয়ালীর সৃজন করিবেন ? যে ষড়যন্ত্রের কথা ইহাদের সকলের বিদিত, তাহা কখনও ওইরূপ ভাষায় বলা সম্ভব নহে। একটি ষড়যন্ত্রের আভাষ হয়ত প্রমথ পাইয়াছিল, যাহার পূর্ণ স্বরূপ পত্র লেখার সময় পর্য্যন্ত প্রমথনাথ স্পষ্ট বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই—প্রমথনাথের ভীতি সমূলক কি অমূলক তাহাও সঠিক বুঝিয়া উঠা সম্ভব না হওয়াতেই "একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াছি" এইরূপ অস্ফুট আভাষ মাত্রই

শেষ অংশ পর পৃষ্ঠায় দেখুন

নীরব কেন ?

(সত্যবাদী)

অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের মৃত্যু আত্মহত্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য 'অমৃতবাজার পত্রিকার' পরোক্ষ চেষ্টার কারণ কি ? এই চেষ্টা কি প্রমথনাথ বনাম নলিনীরঞ্জন সরকার ব্যভিচারের অভিযোগে মামলার প্রথম সংবাদ প্রকাশে বিরতির মতই বিস্ময়কর নহে ? প্রমথনাথের মৃত্যু-সংবাদ মৃত্যুর ১৮ দিন পরে প্রকাশ পাওয়ায় 'এডভান্স', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি দৈনিকপত্র যখন এ বিষয়ে বিশেষ তদন্ত করিতে বলেন, তখন (অবশ্য এই সব পত্রের পর) 'অমৃতবাজার' দুইটি প্যারায় সেই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেই সহযোগীর মনের কথা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সহযোগী লিখিয়াছিলেন—প্রমথনাথের মনের অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে তাহার পক্ষে আত্মহত্যা করা অসম্ভব ছিল না। এই কথা সহযোগী কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহা কি মনস্তত্ত্বে সহযোগীর পারদর্শিতার পরিচয়, না পরলোকের সহিত "পরিচয়ের" ফল ? কাহারও মৃত্যু সন্দেহজনক বলিয়া অনুসন্ধান করিতে বলা ও সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ মত প্রকাশ করা

শেষ অংশ পর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রমথনাথের মৃত্যু-রহস্য

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষ অংশ

সে দিতে পারিয়াছিল বলিয়া অনুমান করাই সঙ্গত। কিন্তু প্রমথনাথের মৃত্যুরহস্য উড়াইয়া দিতে যাহারা অতি মাত্রায় ব্যগ্র, তাহাদের নিকট ষড়যন্ত্রটি অতিশয় সহজ ও সরলভাবে দেখা দিল—তাঁহারা ধরিয়া ফেলিলেন যে ষড়যন্ত্রকারী অর্থে মিথ্যা মামলার প্ররোচনাদাতাগণ। মামলাটি যে নিছক মিথ্যা এরূপ কথা প্রমাণিত না হইলেও, ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর রায়ে মামলা মিথ্যা না বলিয়া বরং মামলার সত্যতায় বিশ্বাস করা প্রমথনাথ ও জনসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করা স্বত্বেও, প্রমথনাথের পক্ষে ফৌজদারী মামলা না করিয়া বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করাই সঙ্গত হইত বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্ধারণ করা সত্বেও ইঁহাদের নিকট মামলাটি নিছক মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রীদের প্ররোচনার ফল বলিয়া স্বতঃসিদ্ধান্ত হইয়া গেল! ইহাকেই বলে প্রয়োজনের বালাই নাই! কিন্তু মামলার বিবরণে দেখা যায় কি? দেখা যায়—দিল্লী গমনের হেতু সম্বন্ধে আসামী ও বীণা মিথ্যা বলিয়াছে, দিল্লীযাত্রা আসামীর প্ররোচনায় স্বাস্থ্যলাভের মিথ্যা অজুহাতে ঘটিয়াছে এবং এই ব্যাপার হইতে প্রমথনাথের পক্ষে সন্দিগ্ধ থাকিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ হইত বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার পর প্রমথনাথ তাহার শ্বাশুড়ী ঠাকরুণকে এক পত্রে নলিনীবাবুর ন্যায় বিত্তশালীদের অতিরিক্ত আপ্যায়ণের তীব্র নিন্দা করিয়া পত্র দিয়াছে, তাহার পর পত্নীর পত্র পাঠের তথাকথিত কারণে বীণা প্রমথনাথকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, প্রমথনাথ প্রকাশ্যে দৈনিক পত্রে বীণার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছে, তথাপি বীণার পিতামাতা, বীণার ভগ্নিপতি ও সুহৃৎ শিশির মিত্র ও তথাকথিত "ইন লোকো পেরেনটিস" নলিনীরঞ্জন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলন সংঘটনের কোনও চেষ্টাই করিলেন না—তাহার পর প্রমথনাথকে মামলা করিবার জন্য কি কাহারও প্ররোচনা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল? অনুসন্ধানে প্রকাশ যে দৈনিক পত্রিকায় নোটিশ দিয়া চলিয়া যাইবার পর হইতেই প্রমথনাথের উকীলের সহিত মামলা সম্পর্কে পত্রাদির আদান প্রদান চলিতেছিল। কাজেকাজেই মামলার অন্তরালে ষড়যন্ত্রকারীর কোনই প্রয়োজন ছিল না।

নলিনীবাবু অবশ্য নিজেই রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিপক্ষের প্ররোচনার নিছক মিথ্যা মামলা যে তাঁহার বিরুদ্ধে উথাপিত হইয়াছে, এইরূপ গল্পের উদ্ভাবক। তাঁহার প্রথম বিবৃতিতে তিনি এই মামলা তাঁহার রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিপক্ষদলের কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ দেওয়া দূরে থাকুক জেরায়, কিম্বা তাঁহার দ্বিতীয় বিবৃতিতে বা তাঁহার ব্যবহারাজীবের বক্তৃতায় সে সম্বন্ধে আর কোনও উচ্চবাচ্য করা হয় নাই। তথাপি মামলা পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্ব বিবৃতির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া "ফরওয়ার্ড" সেই কথারই পুনরুক্তি করিতেছেন। যদি "ফরওয়ার্ড" কোনও চক্রান্তের প্রমাণ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের চক্রান্তকারীদের নামধামসহ পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেছি। একজনের প্রাণ লইয়া যাহারা খেলা করে, সেই সব নরপিশাচদের কীর্ত্তি প্রকাশিত হওয়াই উচিত। প্রমথনাথের শেষ উক্তি এই "ষড়যন্ত্র" কি, সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে তদন্ত হওয়া উচিত—বিশেষতঃ তাহার মৃত্যু যেরূপ রহস্যজনকভাবে সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে এবিষয়ে বিশেষভাবে তদন্ত না হইলে জনমত কিছুতেই শান্ত হইবে না।

নীরব কেন?

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষ অংশ

কেবল যে "নাচে ভাল পাক দেয় খারাপ", তাহাই নহে—পরন্তু তদন্তের পথে বিঘ্ন-স্থাপনও বটে।

তাহার পর প্রমথনাথের মৃত্যু-সংবাদ ১৮ দিন পরে প্রকাশিত হয় এবং দেড়মাস মধ্যেও তদন্তফল রেলের পক্ষ হইতে বা সরকারের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইল না! এই সম্পর্কে আমরা কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি!—

(১) খালি কামরায় প্রমথনাথকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল।

(২) যে ষ্টেশনে রেলের কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পায়, সে ষ্টেশনে তাঁহাকে নামাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় নাই। কর্ম্মচারীরা জল্পনা কল্পনা করিতে করিতে ট্রেণ ছাড়িয়া দেয় এবং তাঁহাদিগের হস্ত এমনই পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল যে তাঁহারা চেন টানিয়া ট্রেণ থামান নাই।

(৩) যে অবস্থায় তাঁহাকে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও সন্দেহজনক।

(৪) তাঁহার নিকট কলিকাতা (হাওড়া) হইতে ক্রীত টিকিট পাওয়া যাইলেও তাঁহার শব সনাক্ত করিবার জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হয় নাই—সে বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করাও হয় নাই।

(৫) ১৮ দিন পরে সংবাদ প্রকাশিত হয়!

এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, মামলা রুজু করিয়া প্রমথনাথ পুলিশকে তাঁহার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছিলেন। ইহা বেদান্তের বা বৈষ্ণবী মায়া নহে। তিনি অনিষ্টের আশঙ্কাই করিয়াছিলেন। তাঁহার যে শেষপত্র তাঁহার আত্মীয়দিগের নিকট (বোধহয় বীণার নিকট ঐরূপ কোন পত্র যায় নাই) পৌছিয়াছিল, তাহা যে অবস্থায়

যে স্থান হইতেই কেন লিখিত হইয়া থাকুক না—তাহাতে লিখিত ছিল, তিনি বিষম ষড়যন্ত্রে পড়িয়াছেন। তিনি কি সত্য সত্যই উলুবেড়িয়ায় গিয়াছিলেন? যদি যাইয়া থাকেন, তবে কি তিনি হাবড়ায় ফিরিয়া পুরী প্যাসেঞ্জারে উঠিয়াছিলেন?

এ সকল বিষয় বিবেচনা করিলে জিজ্ঞাসা করিতে উৎসুক জন্মে!—

রাত্রিতে উচ্চ শ্রেণীর কামরায় বেঙ্গল নাগপুর রেলে ভ্রমণ কি নিরাপদ নহে?

এতদিন পরে ১লা জুন তারিখে সহযোগী 'অমৃতবাজার' বালেশ্বরের সিভিল সার্জ্জেনের এক অতি সংক্ষিপ্ত পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত হইয়াছে:—

"Death was most probably due to suicidal opium poisoning."

অর্থাৎ সম্ভবতঃ আত্মহত্যাকল্পে গৃহীত অহিফেনের বিষে মৃত্যু হইয়াছিল।

বলিতে কি, আমরা এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। ডাক্তার কিরূপে "সম্ভবতঃ"—বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন? মৃতব্যক্তির পাকস্থলী ত রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার পরীক্ষা ফল অবশ্য এখনও লোক জানিতে পারে নাই। কিন্তু পরীক্ষার ফল কি আজও বালেশ্বরের সিভিল সার্জ্জেনের হস্তগত হয় নাই?

তিনি যে "most probably" বলিয়াছেন—তাহাতেই কি প্রমাণ হয় না—

মৃত্যু অন্য কারণেও হইয়া থাকিতে পারে?

যদি সেরূপ হয়, তবে অন্য কি বা কি কি কারণে মৃত্যু ঘটিতে পারে, তাহা তিনি বলিবেন কি? তাহাতে হয় ত মৃত্যু-রহস্যভেদে সাহায্য হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, সে সকল সম্বন্ধে জনসাধারণের সন্দেহ নিরসন করা কি সরকার ও রেল কোম্পানী কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন না? যদি এই মৃত্যু আত্মহত্যা হয়, তাহা হইলেও ইহা বিস্ময়কর এবং বিস্ময়কর অবস্থায় সংঘটিত, বলিতে হইবে। আর যদি ইহা আত্মহত্যা না হয়, তবে যে এই মৃত্যু-রহস্য ভেদ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া জনসাধারণের সন্দেহ ও শঙ্কা দূর করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রাসায়নিক পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্বের কি কারণ থাকিতে পারে?

আমরা এ বিষয়ে পুনরায় বাঙ্গালার গভর্ণর সার জন এণ্ডার্শনের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

বিবিধ

উপাধি

যখন সরকার সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে উপাধি দিয়াছিলেন, তখন 'সাহিত্য' এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—"উপাধি উৎপাত"। এবার একে সম্রাটের সিলভার জুবিলী, তাহাতে বার্ষিক জন্মদিনের উৎসব—কাজেই উপাধির তালিকার দৈর্ঘ্য কিছু অধিক হইয়াছে। উপাধি আবার নানারূপ—বড়, মেজো, ছোট। বড় উপাধির মধ্যে এবার বাঙ্গালায় "নাইট" হইয়াছেন—আবদুল হালিম গজনভী সাহেব। ইহাতে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। আর "নাইট" হইবার আশা ছিল, কিন্তু আশা পূর্ণ হয় নাই—এমন ? গল্পে আছে, ছেলে ছুটীতে বাড়ীতে আসিয়া ঘণ্টা খানেকের মধ্যে একবারও স্ত্রীকে দেখিতে না পাইয়া মা'কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মা, সকলকে দেখতে পাচ্ছি, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ?" তেমনই কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক, মাধবগোবিন্দ রায় ও ডাক্তার শিশিরকুমার মিত্র, বোধহয়, উপাধি তালিকা দেখিয়া বলিয়াছেন—সব নাম দেখ্‌ছি, 'বসের' নাম দেখছি না কেন ?"

কয় বৎসর পরে বাঙ্গলায় একজন "রাজা" হইয়াছেন। ইনি প্রফুল্লনাথ ঠাকুর। উপাধি লাভ করিয়া কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছিলেন, "What dire offence have we committed that we have been honoured with a title ?" প্রফুল্লনাথ কি বলেন ? দর্পনারায়ণ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র মোহিনীমোহনের বহু দানের মধ্যে মন্দির নির্ম্মাণ জন্য ৬৪ হাজার টাকা দান অন্যতম। তিনি কিন্তু "বাবু"ই ছিলেন। তাঁহার পুত্র গোপাললাল—মেও হাসপাতালে, ফিভার হাসপাতালে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বহু অর্থ দিয়া মন্দির নির্ম্মাণের জন্য জমি ও ১ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। তিনিও ছিলেন "বাবু"। তাঁহার পুত্র বাণীকৃষ্ণ নানা হাসপাতালে, বিদ্যালয়ে, মহেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সভায় বহু অর্থ দিয়াছিলেন। তিনিও "বাবু" ছিলেন। প্রফুল্লনাথ তাঁহার পৌত্র। এত দিনে এই পরিবারে উপাধি সংক্রমিত হইল। প্রদেশভেদে "রাজার"ও হয়ত বাজেট আছে। রাজা হৃষীকেশ লাহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই একজন রাজার "পদ" শূন্য হইয়াছিল—রাজা বিজয় সিং দুধোরিয়ার মৃত্যু হইয়াছিল। তাই কি এবার একজনকে "রাজা" করা হইল ? প্রফুল্লনাথ যদি এই উপাধিপ্রাপ্তিতে প্রীত হন, তবে তাঁহার প্রীত হইবার ডবল কারণ আছে ; যেহেতু সমস্ত রাজারা বলেন—রাজা, মহারাজা তাঁহারাই থাকিবেন—আর কাহাকেও যেন রাজা মহারাজা করা না হয় ; বিলাতের লোক মনে করে বিকানীরের মহারাজাও যেমন বৰ্দ্ধমানের মহারাজাও তেমনই—যেন মুড়ি মিছরির এক দর ! তবুও তিনি রাজা হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের এক বহুব্যাখ্যাত "রাজার" কথা মনে পড়িতেছে। তিনি বলিতেন—আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দেখিতে পাই সেই সকলের মত রাজাও তিন প্রকার—

চেতন
অচেতন
উদ্ভিদ্

চেতন রাজা—ইংরাজ ; অচেতন—সামন্ত রাজারা ; আর অবশিষ্ট—উদ্ভিদ অর্থাৎ ভুঁইফোড়।

তাহার পর কুচো উপাধি। তাহার তালিকা এত দীর্ঘ যে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' তাহা ছোট অক্ষরে ছাপিতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে "রায় বাহাদুরের" তালিকায় প্রথম নাম—বাবু ভূপতিনাথ দেব। "ক্রোরপতি রামদুলাল সরকারের" বংশধর—"সাতুবাবুর" বংশে ভূপতি বাবুর কি "রায় বাহাদুর" হইয়া মর্য্যাদা বাড়িল ? বলিতে পারি না। ইনিই ত সে দিন মেডিক্যাল কলেজের শতবার্ষিক উৎসবে লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন ? যদি তাহাই হয়, তবে বলিতে হয়—মিণ্টো ফিটে লক্ষ টাকা দিয়া বিজয় সিং দুধোরিয়া 'রাজা' হইয়াছিলেন ; আর মেডিক্যাল কলেজের উন্নতিকল্পে লক্ষ টাকা দিয়া ভূপতিবাবু হইলেন—"রায় বাহাদুর"। এই উপাধিভেদের কারণ কি ? অবশ্য ভিতরে কিছু আছে। নহিলে যে ইলিশ মাছ ২০ হাত জলের নিম্নে থাকে সে হয় গরম, আর যে ডাব জমীর ২০ হাত উপরে রৌদ্রদগ্ধ হয় সে হয়—ঠাণ্ডা !

"রায় বাহাদুর" তালিকায় দ্বিতীয় নাম—গিরিজানাথ পাল চৌধুরী (রাণাঘাট)। পড়িয়া মনে পড়িল, এই বংশের বংশপতি "রাজা" উপাধি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

আমরা অভিনন্দিত করিতেছি—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুকে। পিতৃব্য ভূপেন্দ্রনাথ ভারত-সচিবের পরামর্শ সভা হইতে বিদায় লইবার সময় লিখিয়া আসিয়াছিলেন—তাঁহাকে যেন উপাধি প্রদান করা না হয়। যতীন্দ্রবাবুও কি তেমনই কথা বলিয়াছেন ?

উপাধি-তালিকায় বিশেষ বিস্ময়কর ব্যাপার—যেমন তালিকায় নলিনীর নাম নাই, তেমনই মন্ত্রী সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের পিতা রজনীবাবুরও নাম নাই। দাদা মণিলাল "রাজা বাহাদুর"—পুত্র বিজয়প্রসাদ "নাইট"—কেবল রজনীবাবু "বাবু" ?—

"কুম্ভকর্ণে ভকারোঽস্তি ভকারোঽস্তি বিভীষণে।
কথং জ্যেষ্ঠে কুলশ্রেষ্ঠে ভকারো নাস্তি রাবণে॥

তিনি যখন রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাদুরের গৃহ-জামাতা ছিলেন, তখন উত্তরাধিকার সূত্রেও কি উপাধি লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিতে পারে না ? কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিবার পর

তাঁহার পুত্র হইতেই ত' বাঙ্গালা সরকারের মান রক্ষা হইয়াছিল। আশা করি, বাঙ্গালা সরকার সে কথা ভুলিবেন না।

এমন নাম যে আরও দেওয়া যায় না—এমন নহে। তবে একে তাঁহারা উপাধিলাভ করেন নাই, তাহার উপর আবার তাঁহাদের নাম প্রকাশ—

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা হইতে পারে—ভয় করিয়া সে সব নাম প্রকাশে আমরা বিরত রহিলাম।

নৃত্যাতঙ্ক

বৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ কুমার মিত্র মহাশয় নৃত্যাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, জানিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। সেদিন ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতি সভায় তিনি বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, প্রতাপ চন্দ্র যুবকদিগের নৈতিক উন্নতির জন্য যে সভা স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কি না আজ নৃত্য হয়! অর্থাৎ নৃত্য নৈতিক অবনতির কারণ। কিন্তু সর্ব্ববিধ নৃত্যই কি তিনি নৈতিক অবনতিকর মনে করেন? যখন কৃষ্ণবাবু প্রভৃতি কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহার মন্দির নির্ম্মিত হইলে তাঁহাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল, তখন সে নৃত্য কি নৈতিক অবনতির কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল? আরও এক প্রকার নৃত্য আছে। সাধারণ লোকের আপত্তিজনক ভাষায় তাহাকে বলা হয় "ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচ।" তাহাতেও কি কৃষ্ণ কুমার বাবুর আপত্তি আছে? এই যে তাঁহার পরম স্নেহের পাত্রী—শ্যালিকা পুত্রের কন্যা নর্ত্তিকা (বসু না ঘোষ?) দশবৎসরের অধিক কাল অবিধাব ব্রতাবলম্বিনী না হইয়া স্বামীস্ত্রীরূপে সুবোধের সঙ্গে "ঘর করিবার" পর আজ আদালতের সাহায্যে বিবাহ অসিদ্ধ প্রতিপন্ন করাইয়া শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ হইয়াছে, ইহার প্রতিবাদে তিনি কি করিয়াছেন? সতীত্ব কি তবে বেদান্তের মায়ামাত্র? আর এই যে তিনি হিন্দুস্থান সমবায় বীমামণ্ডলীর সমালোচক-দিগকে ব্যক্তিগত কারণে ঈর্ষাপরায়ণ বলিয়াছেন ইহাও কি সম্প্রীতির অভিব্যক্তি? যাহার সহিত বিবাহ আইনে নিষিদ্ধ নহে, তাহার সহিত যে তাঁহাদেরই "সমাজের" বিদুষী যুবতী বীণা একাকী দিল্লীতে গেল ও দীর্ঘ কয় মাস যাপন করিয়া আসিল এবং ম্যাজিষ্ট্রেট যে রায়ে তাহাকে, তাহার "বড়কাকাকে" ও আর একজন ব্রাহ্ম—লেডি ডাক্তারের পুত্রকে— অনর্থবিলাসী বলিতেন—বীণার চরিত্র যে সন্দেহহীন নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন, ইহাতে ব্রাহ্ম সমাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কি তাঁহার অশ্রু বর্ষিত হইয়াছে? তিনি কি "সমাজের" বেদী হইতে এ সম্বন্ধে সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন? যদি তাঁহার কন্যাদ্বয়ের মধ্যে কেহ বীণার মত

ব্যবহার করিত, তবে তিনি কি করিতেন? তিনি বীণাকে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বর্জ্জনের পক্ষপাতী কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কি উত্তর দিবেন? বীণার পিতামাতার সম্বন্ধেই বা তিনি কি মন্তব্য প্রকাশ করিবেন? যদি তিনি এসব বিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ না করেন, তবে লোক কি মনে করিবে? সভাস্থলে দাঁড়াইয়া নৃত্যের নিন্দা করিয়া নৈতিক উন্নতি সাধনের উপদেশ দান আর ব্যক্তিগত কারণে দুর্নীতিদ্যোতক কার্য্যের প্রতিবাদে প্রবৃত্তির বা সাহসের অভাব—ইহাও কি সমর্থনযোগ্য? কৃষ্ণকুমার বাবু বৃদ্ধ—তাঁহাকে যদি কর্ত্তব্যানুরোধে আমরা সত্যপ্রকাশের কথা হইতে রাধাকান্তবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যার কথা পর্য্যন্ত স্মরণ করাইয়া দিতে যাই, তবে, আশা করি, তিনি আমাদিগের প্রতি অকারণ রোষ প্রকাশ করিবেন না।

কিন্তু তিনি যে বীণার সম্বন্ধে তাহার স্বামী হতভাগ্য অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের মামলার নির্ভীক আলোচনা করেন নাই; সেই মামলার রায়ে বিচারক (তিনিও ব্রাহ্ম) এক ব্রাহ্ম যুবতীর ও তাহার ভগিনীপতি ব্রাহ্ম যুবকের সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন, সে সব প্রকাশও করেন নাই—এ সকল কি সুনীতির প্রতি শ্রদ্ধার বিকাশ বলা যাইতে পারে? নৃত্যাতঙ্কের লক্ষণ দেখাইয়া যেমন সমাজ হইতে দুর্নীতির বিস্তার সম্ভাবনা দূর করা যায় না, তেমনই সত্যকেও গোপন করা যায় না।

এই কি সেই?

আমাদের কোন বন্ধু বলিতেছিলেন, তিনি শুনিয়াছেন, দার্জ্জিলিং যাত্রার পূর্ব্বে হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর গৃহে বসিয়া কে এসরাজ (বীণা নহে) বাজাইয়া গাহিতেছিল:—

"পত্রিকা এই কি তুমি সেই অমৃত প্রবাহিণী?
যার বিমল তটে আঁধার ঘাটে
উঠত আমার স্তুতির ধ্বনি!
কোথা সে রাতের রবি আঁধার ছবি
হৃদ নিমকহারাম যিনি;
কোথা সে পাটোৎপাদক উপপাদক
ভাগ্যান্বেষীর শিরোমণি!
কোথা সে জিতেন-লেখা কালির রেখা
তোমার স্তম্ভ সুশোভিনী!
ছিল যে তোমার বুকে পরম সুখে
আমারই এই পা দু'খানি।
ইত্যাদি"

'অমৃতবাজারের' ভাব দেখিয়া দেশের লোক বিস্মিত হইতেছে। এইবার কি "জাতীয় দলের মুখপত্র" সহযোগীর ছদ্মবেশ "খসিয়া পড়িবে শ্লথ বসনের মত?"

'পত্রিকা'-সম্পাদক যে প্রেস-অফিসার রাখা হউক এবং ইংরাজ সিভিলিয়ান মিষ্টার টাফনেল ব্যারেটকেই সেই পদে বহাল রাখা হউক অনুরোধের সওদা লইয়া হোম মেম্বার মিষ্টার প্রেন্টিশের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন, তাহাও মিষ্টার প্রেন্টিশের মুখেই প্রকাশ পাইয়াছিল। সেও কি "জাতীয়তাবাদী" পত্রের উপযুক্ত কাজ?

'পত্রিকার' নাম সরকারের approved list হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে—অর্থাৎ যে সব সংবাদপত্র সরকার আটকআসামী শিবিরে প্রবেশ করিতে দেন না এবং যে সব পত্র সরকারী বিজ্ঞাপন লাভে বঞ্চিত 'পত্রিকা' সেই সকলের অন্তর্ভুক্ত। অথচ 'পত্রিকা'র সরকারী বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় কিরূপে?

'অমৃতবাজার' যে গত ৩।৪ বৎসর কাল নলিনীর প্রচারক হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। Wish is the father of the thought—সেই জন্যই এবার উপাধি-বর্ষণের আভাস সংবাদে প্রেরিত মিষ্টার গজনভী "নাইট" হইবেন সংবাদ দিয়াই পত্রিকার "বিশেষ সংবাদদাতার" সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল:—

"Talks in well-informed circles also reveal that the Bengal list will contain another knighthood—"

কোন্‌দিকে আশাসফল দৃষ্টি রাখিয়া যে 'পত্রিকার' "বিশেষ সংবাদদাতা" এই কয় ছত্র লিখিয়াছিলেন—তাহা "বুঝ লোক যে জান সন্ধান।"

কিন্তু মানুষের অনেক আশা যে পূর্ণ হয় না, তাহার প্রমাণ কি পূর্ব্বে

(১) রাজা হৃষীকেশ লাহার স্থানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ডিরেক্টার নিয়োগে এবং

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়!"

সম্রাটের জন্মদিনে উপাধি-বর্ষণের তালিকায় শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের নামোল্লেখ না দেখিয়া সহযোগী 'এ্যাডভ্যান্স' আক্ষেপ করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছেন:—

Bengal need not despair, for the damage done to her in Simla or Delhi is bound to be repaired by men who are in the know of things. We cannot, however, in the midst of our rejoicings congratulate our enterprising Baghbazar on its advance story of the General Manager of the Hindusthan Co-operative Insurance having been fixed up for a well-earned Knighthood in the Jubilee Birthday Honours list. We cannot say whether it is a disappointment to Baghbazar or to Hindusthan Buildings or to both. But hope springs eternal in the human breast......"

বাগবাজারের বৈষ্ণবী সহযোগী অমৃতবাজার নলিনীকে কি সান্ত্বনা দেন তাহা দ্রষ্টব্য।

চলতিপথে

মল্লিনাথ

কর্পোরেশনের দলাদলি

সহযোগী "নবশক্তি" বাংলার কংগ্রেসী দলাদলি উপলক্ষ্য করিয়া সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনে কমিটি গঠন ব্যাপারে যে লজ্জাকর দলাদলির অভিনয় হইয়া গেল, উহার সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছেন :—"অনেকের ধারণা নেতৃস্থানীয় লোকদেরই কর্পোরেশনের দুধ রুটীতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোভ। ত্যাগ ও কর্ম্মের প্রতীক খদ্দরধারী কর্ম্মীরা এই দলাদলির মধ্যে নাই। কিন্তু যাহারা ভিতরে একটুও খবর রাখেন, তাহারাই জানেন যে, খদ্দরাবৃত কর্ম্মীরাও এই দলাদলিতে অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।" সহযোগীর এই কথা আমরা সময়োচিত ও প্রাজ্ঞজন-সুলভ মনে করি, তবে সহযোগী যে ভাবে বাংলার স্বার্থত্যাগী কর্ম্মীবৃন্দকে এই ঘৃণ্য দলাদলির সহিত বিজড়িত করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা আপত্তি করি। সহযোগীর মতের পুনরুক্তি করিয়া বলি যে, যাহারা ভিতরের খবর রাখেন, তাহারাই জানেন গত মেয়র নির্ব্বাচন যে উভয়-পক্ষ-সম্মত ভাবে সমাধা হইয়াছিল, তাহা বাংলার নিঃস্বার্থ কর্ম্মীসম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায়। কিন্তু যত গোল বাধিল কর্পোরেশনের কমিটি গঠন সম্পর্কে।

কিন্তু এই গোলযোগ বা বিভেদের কারণ কি বাংলার কর্ম্মীসম্প্রদায়? কখনই নহে; এই বিরোধ ও বিচ্ছেদের মূল কর্পোরেশনের কংগ্রেস ছাপধারী ভাগ্যান্বেষী কাউন্সিলার-বৃন্দ। কর্পোরেশনের কাউন্সিলার-বৃন্দ বাংলার কর্ম্মীসম্প্রদায়ের প্রভাবে প্রথমে দলাদলি বিসর্জ্জন দিয়া একযোগে মেয়র নির্ব্বাচন করিলেন, কিন্তু যেই কমিটির ক্ষুদ্র স্বার্থের তাঁহারা সম্মুখীন হইলেন, তখনই আর তাহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না। উহারা দেশের ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া, যে যাহার আত্মস্বার্থ সাধনে রত হইলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কেন এমন হয়। ইহার উত্তরে একটা কথাই আমাদের মনে আসে, তাহা হইতেছে যে, যাহারা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, তাহারা সকলেই আসলে কংগ্রেসভক্ত নহেন। কর্পোরেশনের দুই কংগ্রেসী উপদলে সন্তোষবাবু বা যোগেশ গুপ্তের ন্যায় কংগ্রেসের আদর্শে আস্থাবান ব্যক্তি খুবই অল্প। সাধারণতঃ যাহারা কংগ্রেস কাউন্সিলার বলিয়া পরিচিত, তাহারা মূলে moderate, কেবল নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে, নিজেদের স্বার্থের খাতিরে, নির্ব্বাচন যুদ্ধে জয়যুক্ত হইবার মতলবে, কংগ্রেস ছাপ পাইবার জন্য তাহারা কংগ্রেসভুক্ত সাজিয়া পড়েন। ইহা ব্যতীত কর্পোরেশনে আর একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী আছে, যাহাদের কর্পোরেশনে সোজা পথে অর্থাৎ নির্ব্বাচন জয়লাভ করিয়া প্রবেশ করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তাহারা কর্পোরেশনের মধু আহরণ করিতে পিছনের দ্বার দিয়া প্রবেশ করে এবং আত্ম-স্বার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়। নলিনীরঞ্জন সরকার উক্ত শ্রেণীর একজন। মেয়র নির্ব্বাচনের পর কর্পোরেশনের দুই কংগ্রেসী উপদলের মিলন প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য এই নলিনী সরকারই মূলতঃ দায়ী। এবং এই বিষয়ের সম্যক আলোচনা আমরা গত সংখ্যায় করিয়াছি। কাপ্তান নরেন্দ্রনাথ দত্ত পরিচালিত পত্রিকায় যে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার পর কাপ্তান দত্তকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে কাপ্তান দত্ত নিজেকে যে দলের পতাকাবাহী বলিয়া জাহির করেন, সেই উপদলে নলিনীর ন্যায় কু-চক্রীর নেতৃ-পর্য্যায়ে স্থান কিরূপে সম্ভব হয়। গত সংখ্যায় ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি এবং পুনরায় বলি তিনি সেদিনকার কর্পোরেশনের কমিটি নিয়োগ সভায় নিজের দলের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া নলিনীর সম্মিলিত উপদলে ভোট দিয়া যে কলঙ্কিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ বিস্মিত হই নাই। ডাঃ মৈত্র এবং তাহার সমপর্য্যায়ের কাউন্সিলারবৃন্দ মূলে সকলেই moderate; কেবল নির্ব্বাচন যুদ্ধে জয়লাভ করিবার মতলবে, প্রতি তিন বৎসর অন্তর সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস ছাপ পাইবার ফন্দীতে উহারা রাতারাতি কংগ্রেসভক্ত

---

(২) রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ডিরেক্টার নিয়োগে দেখা যায় নাই?

তবে 'পত্রিকা' আশায় থাকুন—এক মাঘে শীত যায় না। বিশেষ এবার অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের মামলায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার রায়ে নলিনীকে যে সব উপাধি দিয়াছেন, সে সকলের উপর কি আর কোন উপাধির জলুশ খুলিত? 'পত্রিকা' কি বলেন?

সাহিত্যিকের পীড়া

প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পৃষ্ঠদেশে কার্ব্বঙ্কল্ হওয়ায় সঙ্কটাপন্ন পীড়িত হইয়াছিলেন। গত সপ্তাহে তাঁহাকে ভাগলপুর হইতে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্ত্তমানে তিনি আরোগ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি অচিরে নিরাময় হউন—ইহাই প্রার্থনা।

লাফিয়া পড়েন। কার্য্যোদ্ধার হইয়া গেলেই উঁহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করেন। তবে আশার কথা কলিকাতার করদাতাগণ এই সকল ভাগ্যান্বেষীর যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছে। আগামী নির্ব্বাচনে ডাঃ যতীন মৈত্রের ন্যায় সুবিধাবাদীদিগকে যথোচিত শিক্ষা দিতে কলিকাতার করদাতাগণ বদ্ধ পরিকর।

* * *

কর্পোরেশনের কমিটি নিয়োগ সভায় ২২এ ওয়ার্ডের প্রতিনিধি বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নলিনীর সম্মিলিত উপদলে ভোট দিয়াছেন। তিনি গত সাধারণ নির্ব্বাচনে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের দলের মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র দাশগুপ্তকে পরাজিত করিয়া সেনগুপ্ত দলের প্রার্থী হিসাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। লোকে বলে যে বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি নানারূপ অর্থনৈতিক ব্যাপারে হিন্দুস্থানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত এবং সেইজন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাকি হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার নলিনী সরকারের অনুরোধ, উপরোধ বা আদেশ মানিয়া চলা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই জনশ্রুতি সম্পর্কে বেণীমাধব বাবু সত্য তথ্য আমাদের জানাইবেন কি ?

হিন্দু নারী ও বিবাহ বিচ্ছেদ

হিন্দু সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের আবশ্যকতা আছে কিনা, তাহা লইয়া আজকাল সংবাদ-পত্রে ও সভা সমিতিতে সময়ে সময়ে নানা আলোচনা হইতে দেখা যায়, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, মৌখিক আলোচনা ও গবেষণাতেই উহার পরিসমাপ্তি ঘটে। হিন্দুর সামাজিক আইনানুসারে হিন্দু স্বামীর কারণে বা অকারণে একাধিক পত্নী গ্রহণে বাধা নাই, কিন্তু স্ত্রীর পক্ষে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একমাত্র পুরুষের সঙ্গিনীরূপে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দিন-যাপন করিতে হইবে। স্বামী তাহার মনোমত হউক বা না হউক, কিম্বা স্বামী তাহার অক্ষম হউক, হিন্দু স্ত্রীর পক্ষে সারাজীবন তাহাকেই মানিয়া চলা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অতীত কালে হিন্দু নারী কিন্তু আজ চাকা ঘুরিয়াছে ; যাহারা এককালে কথা কহিতে পারা তো দূরের কথা, এমন কি কোন অনাত্মীয়ের চোখের

অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার

মেয়রের ব্যভিচারের মামলার ফরিয়াদী, ফেণী কলেজের অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের মৃত্যু—আত্মহত্যা, হত্যা, স্বাভাবিক মৃত্যু না অপমৃত্যু সে বিষয়ে এখনও জনগণের সন্দেহ বিদূরিত হয় নাই।

অধ্যাপক প্রমথনাথ এই বৎসর ইন্টার পরীক্ষার Civics-এর পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

[ভাগিনেয় শ্রীবিমলেন্দু সরকারের সৌজন্যে এই আলোকচিত্র প্রাপ্ত]

সমাজ যখন মূক ছিল, অবর্ণনীয় অত্যাচারেও তাহাদের বাক্য স্ফুরণ হইত না, তখন তাহাদের বুক ফাটিলেও মুখ ফুটিত না। দিকে তাকাইয়া কথা কহিতে পারিত না, তাহারা আজ চারিদিকে দৃষ্টি দিতে সাহসী হইয়াছে, তাহাদের কণ্ঠে গান ও মুখে কথা

ফুটিয়াছে ; মূক হিন্দু-নারী সমাজ আজ নিজের দাবী সাধারণের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে পেশ করিতে শিখিয়াছে। আজকাল আর তাহারা মুখ বুজিয়া অত্যাচার সহ্য করে না বা নিজের মনোমত না হইলেও তাহারা আর তাহাদের অমনোনীত স্বামীর সহিত বন্ধন বিধির বিধান হিসাবে মানিয়া লইয়া অন্তরানলে তিলে তিলে আত্মাহুতি দিতে স্বীকার করে না। বরং তাহারা কি উপায়ে, তাহাদের সুখ-শান্তির পরিপন্থী বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে—সেই বিষয়ে প্রতীকার সন্ধানে ব্যস্ত হয়। কিন্তু পথের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখে, তাহারা যে সমাজের অন্তর্গত, সেই হিন্দুসমাজ তাহাদের জন্য কোন পথ প্রশস্ত করিয়া রাখে নাই। তখন তাহারা অন্যান্য ধর্ম্মের উদার বিধি-ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া, তাহাদের অবাঞ্ছিত বিবাহ বন্ধনের শেষ করে। সংবাদ পত্রে এই রকম ধরণের মামলা মাঝে মাঝে দেখা যায় যে স্ত্রী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহাদের স্বামীকে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান করে। কিন্তু ঐ সব মামলার বাদী স্ত্রী বেশ ভালরূপেই জানে যে উহাদের স্বামী কোনমতেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণে স্বীকৃত হইবে না এবং উহাদের মনস্কামনা অর্থাৎ অবাঞ্ছিত স্বামীর সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ আপনাআপনিই আইনানুগ ভাবে ঘটিবে। কিছুদিন পরে ঐ সকল স্ত্রী পুনরায় শুদ্ধি গ্রহণ করিয়া হিন্দুত্ব লাভ করে এবং মনোমত পুরুষকে বরণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করে। যদি কেহ আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, তাহাতে আমাদের বলিবার কিছু নাই ; কিন্তু উপরে যাহা বর্ণিত হইয়াছে ; তাহাতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ যদি আত্মস্বার্থ সাধনের একটি চাতুরী-পূর্ণ কৌশলই কেবলমাত্র হয়, তাহাতে আমাদের আপত্তি আছে। অথচ হিন্দু নারীর পক্ষে অবমাননা, লাঞ্ছনা অথবা মানসিক নির্য্যাতন হইতে রেহাই পাইতে হইলে, এই শঠতা অবলম্বন ব্যতীত উপায় নাই। সুতরাং সকল দিক হইতে বিবেচনা করিলে হিন্দু নারীর মঙ্গলকল্পে হিন্দু সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

সুলতানা

'ইষ্ট ইণ্ডিয়ার' নবতম ছবি "সুলতানা" দেখে আমরা খুসী হয়েছি। "সুলতানা"তে যে দোষ ত্রুটী নেই, তা' আমরা বলি না, তবে মোটের উপর ছবিখানি আমাদের আনন্দ দিতে পেরেছে। ছবিখানির গল্পাংশ হচ্ছে যে একদা কোলকাতার চিঁড়িয়াখানা থেকে কোন এক বড়লোকের শিশুমেয়েকে বেদের দলের চরেরা চুরি করে নিয়ে পালায়। ক্রমে সেই শিশু বেদের দলে থেকেই বড় হয়ে উঠে, নাচতে গাইতে শেখে, আর রাস্তায় রাস্তায় নাচগান কোরে বেড়ায়। পূর্ণ যুবতী সুন্দরী সে এখন, বেদের দল থেকে তার নাম হোল "সুলতানা"। বেদের দল চলেছে নগরের রাজপথে নাচগান করতে করতে। এমনিই একদিন রূপসী সুলতানার দিকে নজর পড়লো এক সৈনিকের। সৈনিক সুলতানাকে একবারে ভালবেসে ফেলেছিলো, সে চেষ্টা করলে সুলতানাকে বেদের দল থেকে চুরি করে নিয়ে যেতে। দু'বার সে ধরা পড়লো, তৃতীয় বারে পুলিশের সাহায্যে সে উদ্ধার করলে তার মনের মানসীকে।

অভিনয়ের দিক থেকে মিঃ গুল হামিদ প্রেমিকের বেশে অতি সুন্দর হয়েছে। মিস জারিনা সুলতানাকে বেশ মনোহারী রূপেই আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। অল্প পোষাক পরিচ্ছদে রাস্তায় রাস্তায় সুলতানার নাচ রাস্তায় পথিকের মনে দোলা না দিয়ে পারে না। মিঃ মজাহর খাঁ ও তাঁর সহধর্ম্মীকে বেদে দস্যুর বেশে আমাদের ভাল লেগেছে। যিনি সুলতানার (বা সায়িদা) পিতার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তিনি দর্শকদের হাততালি নিশ্চয়ই পাবেন। সায়িদার পরিচারিকা একেবারে অচল। অন্যান্য ছোটখাট চরিত্রগুলি মন্দ নয়।

পরিচালনায় সামান্য দোষ ত্রুটী থাকলেও একেবারে নিন্দনীয় নয়। ক্যামেরার কাজ প্রশংসনীয়, তবে শব্দযন্ত্রীর কাজের আমরা তারিফ করতে অক্ষম। "সুলতানা"র সঙ্গীতাংশ বেশ মনোমুগ্ধকর, এবং দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা ইষ্ট ইণ্ডিয়ার সুনামের হানি করে নি।

নিউ থিয়েটাস

"পূরণ ভকত" তামিল সংস্করণের কাজ শেষ হ'য়েছে। দক্ষিণ ভারতীয়দের রসোপযোগী কোরে ছবিখানি তৈরী করবার জন্য নিম্নলিখিত শিল্পিগণ আপ্রাণ চেষ্টা কোরেছেন। আমরা আশা করি সুযোগ্য কর্ম্মীবৃন্দের শ্রম সফল হবে।

পরিচালক—শ্রীদীনেশ রঞ্জন দাশ
চিত্র-নাট্য—শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র
তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র
সহকারী—শ্রীবোকেন চট্টো
চিত্র-শিল্পী—মিঃ ইসুফ মুলজী
শব্দ-যন্ত্রী—শ্রীলোকেন বসু

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্রের সহযোগিতায় শ্রীদীনেশ রঞ্জন দাশ ছবিখানিকে সবদিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত করবার চেষ্টার কসুর করেন নি। আর শ্রীবোকেন চট্টো মিত্র মশায়ের বাহুদ্বয়ে শক্তি সঞ্চার কোরেছেন।

*　　*　　*

শ্রীনীতীন বসুর নতুন ছবির নামকরণ হ'য়েছে বাঙলায় "ভাগ্যচক্র" আর হিন্দীতে "ধুপ-চাওন"। এই ছবির বহির্দৃশ্যগুলো প্রায় সব তোলা শেষ হ'য়েছে। অন্তর্দৃশ্য তোলার চেষ্টা চল্‌ছে। এই ছবিতে বাঙলা সংস্করণের মূল ভূমিকায় নাবছেন, শ্রীমতী উমা, শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপাহাড়ী সান্যাল, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, শ্রীঅমর মল্লিক, শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী আর হিন্দীতে দেখা দেবেন শ্রীমতী উমা, শ্রীপাহাড়ী সান্যাল, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, মিঃ নবাব, মিঃ কেদার, শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মিঃ কাপুর, মিঃ বাবুলাল ও শ্রীমতী দেববালা।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

শ্রীজ্যোতিষ মুখার্জ্জির পরিচালনায় "পায়ের ধূলো" মাথায় গিয়ে উঠেছে। চিরুণী ও ব্রাশেও ধূলো পড়্‌ছে না—তাই মুখুজ্যে মশাইকে আজকাল মাঝে মাঝে 'কাট-ওয়েলে' ঢুকতে দেখা যাচ্ছে। আমরা বলি, যে ধূলো তাঁর মাথায় জমেছে তা' পরিষ্কার করা ও লোশান জলের কর্ম্ম নয়। তিনি চান করবার সময় আচ্ছা কোরে খানিকটা সোডা মাথায় দিলে হয় ত' এ আপদ দূর হ'তে পারে।

রাধা ফিল্ম

এঁদের "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" রূপবাণী'তে পঞ্চম সপ্তাহে পদার্পণ কোর্‌ল। গত কয় হপ্তায় প্রায় ষাট হাজার লোক এই ছবিখানা দেখেছে।

এদের "দক্ষযজ্ঞ" ইটালী টকীজে পাঁচ হপ্তা চ'লে এখন 'আলেয়া'য় দেখানো হ'চ্ছে। "শচী দুলালে-"র দ্বিতীয় হপ্তা আরম্ভ হবে 'হাওড়া টকী হাউসে' আস্‌ছে শনিবার থেকে। আর 'পূর্ণ'-তেও "রাজনটী বসন্তসেনা" তাই।

*　　*　　*

তামিল "ভক্ত কুচেলা" আর তেলেগু "সিরুতোণ্ডা-"র একটি কোরে দৃশ্য তোলা আর বাকী আছে।

"ওয়ামক্ এজরা-"র সম্পাদনার কাজ চলছে।

নিউ থিয়েটার্স লিঃ
ও
হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানী

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেডের কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে শ্রীযুক্ত সুবোধ দে জানাইয়াছেন যে নিউ থিয়েটার্সের সহিত হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর বা শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকারের কোন অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। কোন কোন সংবাদপত্রে এই সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সত্য নহে।

কালী ফিল্মস্

"বিদ্যাসুন্দরে"-র কাজ শেষ হ'লে গাঙ্গুলী মশাই "অন্নপূর্ণার মন্দির" তুল্‌বেন। গাঙ্গুলী মশাই আমাদের জানিয়েছেন যে, "অন্নপূর্ণার মন্দিরে"র চিত্রনাট্য লেখার জন্য তিনি সাধারণকে আহ্বান কোর্‌ছেন—চিত্রনাট্যগুলির সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি জুন মাসের মধ্যেই তাঁর হস্তগত হওয়া চাই এবং জুলাইয়ের প্রারম্ভেই বিশেষজ্ঞ-মণ্ডলীর দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে যাঁর চিত্রনাট্য শ্রেষ্ঠ বলে অনুমোদিত হবে তাঁকে তিনি যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেবেন এবং তাঁরই চিত্রনাট্যখানি পর্দ্দায় রূপান্তরিত হবে। গাঙ্গুলী মশাইয়ের এই কল্পনাটি বাস্তবিকই প্রশংসনীয়—এতে হয়ত' তিনি অনেক ভাল চিত্রনাট্য সংগ্রহ কোরতে পারেন; কারণ যাঁরা এতদিন সুযোগ অভাবে তাঁদের কৃতিত্ব প্রকাশ কোরতে সুবিধা পাচ্ছিলেন না—তাঁদের পক্ষে এটি সুবর্ণ সুযোগ।

দীপালী

'জুপিটার টকী-হাউসে'র আবার হাত-বদল হ'য়েছে। এবং "দীপালী" নামে শীঘ্রই চিত্র-গৃহটির দ্বার উদ্বোধন হবে। এবার যাঁরা এই চিত্র-গৃহটি পরিচালনার ভার গ্রহণ কোরেছেন তাঁরা বিশেষ ধনী ও সুব্যবসায়ী। আশা করি এঁদের সুপরিচালনায় চিত্রগৃহটি অচিরেই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌বে।

সুকল্যাণী

অত্যল্পকালের মধ্যেই 'পূর্ণ থিয়েটারে'-র পরিচালনায় এসে এ চিত্রগৃহটি সাধারণের জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। এই জনপ্রিয়তার একমাত্র কারণ, দর্শকদের প্রতি কর্তৃপক্ষের সুমধুর ব্যবহার—চিত্রগৃহটি দর্শকদের মনোমত কোরে গড়ে তোলা—আর দেশী ও বিলেতী শ্রেষ্ঠ চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা।

আস্‌চে শনিবার থেকে এই চিত্র-গৃহটিতে ওয়ার্ণারের বহু-বিখ্যাত বহু বর্ণের বিচিত্র চিত্র "মিষ্ট্রী অফ্ দি ওয়াক্স মিউজিয়ম" প্রদর্শিত হবে। মোমের মূর্ত্তি জীবন্ত নারীতে পরিণত হল কী কোরে—আর জীবন্ত নারী মোম-মূর্ত্তি হল কী কোরে তারই রক্ত-চঞ্চল কাহিনী হচ্ছে ছবিখানার বিষয়-বস্তু। এই ছবিখানি তোলা কালীন ওয়ার্ণারের ষ্টুডিওর সব দোর বন্ধ রাখ্‌তে হ'য়েছিল। এর পরই 'সুকল্যাণী'-তে "ইন্‌ভিজিবল্ ম্যান," "হুপ্‌লা," "দি ফার্ষ্ট গ্রেট ওয়ার্ল্ড ওয়ার" প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলী প্রদর্শনের ব্যবস্থা হ'য়েছে। দক্ষিণ কলিকাতার সর্ব্বজনপ্রিয় চিত্র-গৃহ 'পূর্ণ থিয়েটারের' পরই এই চিত্র-গৃহটি যে স্থানলাভ কোরেছে তা' দেখে সত্যই আমরা আনন্দিত হ'য়েছি।

—:o:—

সরাই খানা

[ছোট গল্প]

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বর্ম্মা

(১)

বাপ-মা জন্মের পর আদর করে নাম রাখেন—"অচ্যুত।"

বিধাতা বোধ করি তাই উপহাস ক'রে, অতি শৈশবেই তাকে পিতৃমাতৃহীন অনাথ ক'রে ছেড়ে দেন সংসার-হাটে।

বেচারা ভাগ্যের খামখেয়ালী খেলার ক্ষুদ্র ক্রীড়নকটির মত অবহেলায় নিক্ষিপ্ত হ'য়ে এসে পড়ে "বড়বাড়ী"তে।

নামেই "বড়বাড়ী"! মূলে হিতোপদেশের গোদাবরীতটের বৃহৎ শাল্মলী তরুটি ছাড়া আর কিছু নয়।

বাড়ীর জনে জনে যেন শঙ্করাচার্য্যের অনুগত শিষ্য। ভাবটা সকলের "কাতব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ"—গোছের।

"বড়বাড়ী" যেন একটা জরাজীর্ণ অতীতের দালান। কোন রকমে বট বা অশ্বত্থ বীজ একটা নিক্ষিপ্ত হ'লে চারা হ'য়ে গজিয়ে উঠবেই; শুধু ইঁট পাথরের রাজ্য থেকে রস আহরণের শক্তি থাকলেই যথেষ্ট।

তাই অতি সহজেই "বড়বাড়ীর" তালিকা-ভুক্ত হয়ে যেতে তার বাধে না।

অচ্যুত ভাবে কেন এমন হয়।

'কর্ণধার যদি রইলই, তবে নৌকা এমন বাণচাল হয় কেমন ক'রে।'

গিন্নীকে দেখে পর্য্যন্ত এই সমস্যাটাই বারে বারে খোঁচা দেয় তার মনে।

কর্ত্তাও আছেন কিন্তু 'কাকস্য পরিবেদনা' ছেলেও আছে, মেয়েও আছে।

খায়, হাসে, স্কুল কলেজে যায় আর বাকিটা সময় শরীরের সৌন্দর্য্য চর্চ্চাতেই কাটিয়ে দেয়।

অচ্যুত বলে "ভাল, পরচর্চ্চা এরা ক'রে না।" কিন্তু দেহ চর্চ্চাটা! এক এক সময় ছোট আরসীখানায় নিজের সুশ্রী চেহারাটার পানে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবে "আহা! আমিও যদি ওমনি ক'রে মেজে ঘসে চকচকে হ'তে পারতুম!"

কিন্তু সৌন্দর্য্য বাড়াবার উপকরণ জোটে না কিছুই, তাই আপনার মনেই স্বীকার করে "থাক্ গে! ভগবানের দেওয়া দানের ওপর আর খোদকারি ক'রে কি হ'বে! এই ভাল আমার—"

এ'ত গেল অবসর সময়ের চিন্তা। কিন্তু সাংসারিক জীব মাত্রেই, যেটার একান্ত অনিবার্য্যতা অস্বীকার ক'রতে পারে না, সেই আহারের সময়ই বাধে গণ্ডগোল।

"বড়বাড়ী"র আশ্রিতগুলির সেটা একটা প্রাণান্তকারী সংগ্রাম।

হাজিরা দিতে হয় এগারোটার মধ্যেই। তারপর চলে পাচকের খোসামোদ। কারণ প্রকৃতপক্ষে ও বিভাগের সেই ছিল ভাগ্য-বিধাতা।

সত্যিকার কর্ত্তা গিন্নী যাঁরা, তাঁরা তখন আহারাদি সেরে, বিশ্রামের উদ্যোগ করেন।

ভাত চারটি কোনদিন আসে বারোটায়, কোন দিন একটায়; কোন দিন বসবার আসন মেলে, কোন দিন মেলেও না।

সব দিন অন্নের উপকরণও কিছু থাকে না।

অশ্রুসিক্ত অন্নে লবণের প্রয়োজনও হয় না।

পুরাণো আশ্রিতগুলির কাছে এ ব্যবস্থা কিছু নতুন নয়—তাই অসন্তোষের ক্ষুদ্র কাটাটিও কোথাও তাদের বাধে না।

শুধু অচ্যুতেরই হয় মুস্কিল। ভাবে "নিই মুক্তি" কিন্তু মানব সাগর এই বিরাট সহরের মাঝে নিরালম্ব অবস্থায় মাথা গোঁজবার ঠাঁই-টুকুও হঠাৎ ছাড়তে ভরসা হয় না। তাই চোখের জল হাতে পুছে, শুকনো ভাতের গ্রাসগুলো মুখে দিতেই হয়।

এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাড়ীতে নালিশ আপীল চলে না, কারণ বাবুদের প্রত্যেকে নিজেকে ঘিরেই এক একটা স্বতন্ত্র জগত রচনা ক'রে নেন। বাইরের জগতের অস্তিত্ব বা মূল্য ওঁদের কাছে কিছু নেই।

কর্ত্তা ডাকেন "ছোকরা কোর্টে একবার ঘুরে এস ত; "এই দলীলটা রমেশ চৌধুরী উকীলকে দেবে—"

অচ্যুত সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে সেটা নেয়। মুখটা তার প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।—খোদ কর্ত্তার নজরে পড়া!—

হয়ত ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থারও কিছু পরিবর্ত্তন হ'তে পারে।

রাত্রে সাতখানা সংবাদপত্র ঘেঁটে উৎসাহ-দীপ্ত নয়নে, তাঁকে দুনিয়ার খবর প'ড়ে শোনায়

মনে মনে ভেঙ্গে গ'ড়ে রচনা করে কল্পনার রঙীন ফানুষ।

কিন্তু দিনের পর দিন যায়, তবু অবস্থার সুরাহা আর তার হয় না।

গিন্নীমা পাঠান বোনঝি'র বাড়ী তত্ব তালাস নিতে।

সাধ্যমত খুঁটিনাটি সুখবর এনে তাঁকে প্রসন্ন করার, তার কতই না প্রচেষ্টা।

আশ্রিত সাথীগুলিকে শুনিয়ে শুনিয়ে গল্প ফাঁদে "জিনিষ দেখে ত গিন্নীমা লাফিয়ে উঠলেন। চার চারটে আমই হাতের মধ্যে

গুঁজে দিয়ে কি তাঁর পেড়াপীড়ি। আমিও নেব না, তিনিও ছাড়বেন না—"

ওদের চোখের তারার ঈর্ষা কুটীল দৃষ্টি শাণিত ছুরিকার মত চক্‌চক্ ক'রতে থাকে মুখে বলে "সার্থক তোর নাম রেখেছিল বাপ মায়ে—তুই-ই টিকবি—"

পরের দিন অচ্যুত সকলের সাথে খেতে বসতে চায় না।

কল্পনার ওপর যার ভিত্তি, মূল্য তার কতটুকু।

নিজেকে জাহির করার এত চেষ্টা তার—খোলা হাওয়ায় কর্পূরের মত উড়ে যেতে কতক্ষণ।

বলে "আমার খেতে দেরী আছে—"

ওরাও তা চায় না।

এক যাত্রায় পৃথক ফল—

এক পাতে মাছের মাথা, আর এক পাতে কাঁচকলা ভাজা!

ভাগ্যের এ নির্ম্মম পরিহাস সহ্য ক'রে লইতে কে চায়!

কিন্তু তার এত গোপনীয়তা একেবারে নিরর্থক হ'য়ে যায়। ভাগ্যলক্ষী মুখ তুলে হাসেন না।

তবু দিন কাটে।

* * *

সেদিন কিসের উপলক্ষে স্কুল কলেজ সব বন্ধ।

নিত্যকার মত খেতে এসে অচ্যুত ভিতর বাইরের সন্ধিস্থলে দাঁড়ায়—বড় সিড়িটার পাশে।

উপর থেকে কর্ত্তার ছোট মেয়ে "নটী" নামে নীচে। পূর্ণ যৌবনের ঢল দেখা যায় সর্ব্বাঙ্গে; চটুল দৃষ্টি, চঞ্চল চরণ, যেন খরস্রোতা পার্ব্বত্য নির্ঝর। অচ্যুতের সুন্দর মুখের পানে দৃষ্টি পড়তেই সে থমকে দাঁড়ায়।

কতক্ষণ পরে কোমল কণ্ঠে শুধোয়, "আপনি ত আমাদের বাড়ীতেই থাকেন, নয়?"

এই তরুণীটি অচ্যুতের একেবারে অপরিচিতা নয়; তাই চোখের ওপর চোখ রাখতে পারে না। চকিতে একবার ওর সুশ্রী মুখখানার পানে তাকিয়ে নিয়ে নীরবেই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

মেয়েটি বলে "একটু পরে আমার ঘরে একবার যাবেন ত; কয়েকটা জিনিষ এনে দিতে হবে।"

অচ্যুতের কাঙ্গাল মনটা লালায়িত হ'য়ে ওঠে।

এমনই ধারা কাজের তার পাওয়া কিছু তার পক্ষে নতুন নয়; তবু—

'কি মিষ্টি সুন্দর মুখের এই আদেশটুকু—হয়ত বা এটা অনুরোধ—কে জানে! আজ্ঞা পালনের তরে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত মনটা তার ব্যগ্র কণ্ঠে জানায় "আসবো।"

খেতে বসে সে নেশার ঘোরে। জীবনে বোধ করি আজ সে এই প্রথম বোধ করে বিনা উপকরণেও রাশিপ্রমাণ অন্ন অতি সহজেই গলধঃকরণ করা যায়।

সুদীর্ঘ দিনের জমা অভিযোগ, অবহেলা আজ যেন আর কিছুই নেই।

মনে জাগে শুধু "একটু পরে।"

সে কত পরে!—অনির্দ্দিষ্ট কাল—কে জানে কতক্ষণের পরে আসে এই "একটু পরে।"

নিঃশব্দে এক সময় সে "নটি"র ঘরে গিয়ে দাঁড়ায়। সর্ব্বাঙ্গ তার কাঁপতে থাকে বেতস লতার মত—হয়ত অকারণেই।

নটী শয্যায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে নভেল পড়ে। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকায়; বলে "কি চাই?"

নিমেষের মাঝে অচ্যুতের মুখ চোখ বিবর্ণ হ'য়ে ওঠে। শুষ্ক কণ্ঠে বলে "কি জিনিষ আনতে দেবার জন্যে—"

ওর বোধ করি স্মরণ হয়। মৃদু হেসে ব'লে ওঠে "ও:! কয়েকটা scent আর toilet আনতে দেবার জন্যে বলেছিলাম। তা আপনি দেখছি most obedient servant।"

এই বিদ্রূপে অচ্যুতের কাণ দুটো গরম হ'য়ে ওঠে। লজ্জার গাঢ় শোণিত ঝলকে, আরক্ত মুখখানা হিঙ্গুলের মত টক্ টক্ ক'রতে থাকে। মুখে কোন কথা জোগায় না। বলার আছেই বা কি!

নটী সকৌতুকে কতক্ষণ তার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। সহসা এক সময় বলে ওঠে "ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটার ভেতর একটা সাদা কাগজ আছে দিনত।"

অচ্যুত সচকিত হ'য়ে ওঠে।

নির্দ্দিষ্ট কাগজের টুকরাটা নিয়ে নটীর হাতে দেয়।

একান্ত অজ্ঞাতেই তার কম্পিত দু'টি অঙ্গুলী চুম্বন করে "নটীর" প্রসারিত কর পল্লব।

এক নিমিষে অচ্যুতের সর্ব্বদেহে যেন একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ ব'য়ে যায়।

বুকের রক্ত ক্ষুব্ধ সাগর কল্লোলের মত তোলপাড় ক'রতে থাকে।

নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করা বুঝি আর তার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

নটী নতমস্তকে মেলাতে থাকে জিনিষের তালিকা। মুখ দেখে তার কিছুই বোঝা যায় না।

সহসা এক সময় মুখ তুলে তাকিয়ে বলে "দশটা টাকা আর এই listটা দিলুম। দেখে কিনে আনবেন সব—"

অত্যন্ত সন্তর্পণে হাত বাড়িয়ে অচ্যুত টাকা আর ফর্দ্দটা নেয়।

স্পর্শের ছোঁয়াচ লাগাতে আর তার ভরসা হয় না।

নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে বাইরে।

অজানা পুলকের ঢেউ বুঝি আজ তার মরা গাঙ্গে বাণ ডাকে।

কোন্ সোনার কাঠির জীয়ন্ত স্পর্শে কর্ম্ম কোলাহলে ভরা সহরের হতশ্রীরূপ একেবারে বদলে যায়।

—কাণে ভেসে আসে খালি বসন্ত বাহার রাগিনীর মধুর সুর।

চোখের তারায় অচ্যুতের ঘনিয়ে ওঠে মদির বিহ্বলতা।

তাড়াতাড়ি ফর্দটা চোখের সামনে তুলে পড়বার চেষ্টা করে।

কিন্তু সব কটা বিলাস সামগ্রীর নামই তার অজ্ঞাত।

তাই ওর শুভ্র করে লেখা সুশ্রী ছাঁদের অক্ষর গুলোর ওপর হাত বুলোতে থাকে।

তারপর দোকানে দোকানে ছোটাছুটি।

নিজের অজ্ঞতা এবং অযোগ্যতার ছিদ্রগুলো সব ঢেকে রাখার জন্যেই তার এত প্রয়াস।

বাড়ী যখন সে ফেরে তখন বেলা গড়িয়ে আসে।

সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে সে নটীর ঘরের ভিতর এসে দাঁড়ায়। চোখে মুখে তার সলজ্জ কুণ্ঠা এবং সংশয়ের ছাপ।

দেখে—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নটী কাপড়ে ব্রোচ আঁটে।

শুভ্র নিটোল দু'টি হাত ব্রোচ আঁটকাতেই ব্যস্ত।

তাদের কমনীয় লীলা ভঙ্গিমা, দু'গাছি ক'রে চার গাছি চুড়ীর মৃদু 'ঠুন্' 'ঠুন্' শব্দ অচ্যুতের ভারী মিষ্টি লাগে—

—মায় ওর গরদের সাড়ীটার দীপ্ত অগ্নিশিখার মত লাল টকটকে পাড়টুকু শুদ্ধ।

নটী সহসা বঙ্কিম গ্রীবায় তাকায়। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি টেনে এনে বলে "লুকিয়ে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে বুঝি আমার রূপ-সুধা পান করা হচ্ছে?"

অচ্যুতের বুকের মাঝে দুরদুর ক'রে ওঠে। মুখের সমস্ত রক্তটুকু যেন নিঃশেষে কে পান ক'রে নেয়; চোখ মুখ হয়ে ওঠে—ছাইএর মত সাদা। কণ্ঠে স্বর ফোটে না।

নটী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর মুখ টিপে হাসে। বলে "দেখি সাধু পুরুষ, কি জিনিষ আনলেন?"

অচ্যুত ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর জিনিষগুলো ধ'রে দেয়।

হাতে দিতে ভরসা হয় না।

মোড়ক খুলে পরীক্ষা ক'রে ও বলে "যাক্ সবই মিলেছে!"

তারপর "ক্যাশমেমোর" পানে তাকাতেই চমকে ওঠে। বিস্মিত কণ্ঠে ব'লে ওঠে "একী! এ যে এগারো টাকা পাঁচ আনা। আমিত দশটা দিয়েছিলুম— বাকিটা কোত্থেকে—তবে কি—"

নটী ডাগর ডাগর চোখ মেলে তার পানে চায়।

লজ্জায় অচ্যুতের গৌর মুখটা রক্তবর্ণ হ'য়ে ওঠে।

একটু আত্মপ্রসাদও বুঝি পায়।

—গরীবের বেদরদী অর্থ আজ এতদিনে বুঝি সার্থক হ'তে চ'লেছে।

নটীর বুঝতে কিছু বাকি থাকে না।

চোখ দু'টো তার কি এক কারণে জ্বলজ্বল করতে থাকে। ব'লে—"তোমার সেবার পুরস্কার পাবে বন্ধু পাবে—"সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতখানা দিয়ে অচ্যুতের গাল টিপে দেয়।

অচ্যুত কাঁপতে থাকে। চোখের পাতে ঘর, টেবিল, চেয়ার সবই যেন তরঙ্গের শিরে শিরে নৃত্য সুরু ক'রে দেয়। অতি উত্তেজনায় শিথিলাঙ্গে সে সেইখানেই ব'সে পড়ে।

নটীর চোখমুখ তখন হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলতে থাকে।

বোধকরি বিকৃত মনের ক্ষুধায়,—অতৃপ্ত পিপাসায়।

অচ্যুতের চোখে মুখে কয়েকটা চুমা দিয়ে নটী খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে ওঠে। মুখে বলে "লজ্জা কি!—ভারী সুন্দর কিন্তু ভাই—তুমি—"

মুহূর্ত্তের জন্য অচ্যুতের স্বতন্ত্র সত্ত্বা হয়ত কিছু থাকে না। সে ভাবে এই তরুণীটির অতিকায় সাহসের হাতে সে বুঝি একটা খেলার পুতুল।

উদ্ধশ্বাসে সে ঘর থেকে পালাতে চায়—একটু মুক্তির শ্বাস নিতে—কাণে ভেসে আসে "দরজা রাতে খুলে রেখ—"

পুরাণো মহলের শেষ প্রান্তে অচ্যুতের ছোট্ট ঘরখানা। এক নিঃশ্বাসে ছুটে ঘরে এসে সে দ্বার দেয় বন্ধ করে।—যেন কোন প্রবল শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়।.........

ভাবে। ভাল কি মন্দ!—ভদ্রঘরের কুমারী নারী—হয়ত পাপ—কিন্তু—পর্ব্বতের দেহ হ'তে যে স্রোত নামতে চায়, সে নামবেই,—সেখানে এতটুকু খাত পাবে।—

কোনদিকে বাধার প্রাচীর তুলবে সে!—

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ড শত শত ভেসে যায় সে খরস্রোতে—

—তা ছাড়া ব্যর্থ বাসনার ঝড় ঝাপটায় তার হালকা বাসাটুকু জীর্ণ পত্রের মতই খসে পড়তে কতক্ষণ—

ভাগ্যলক্ষ্মী হাসতেই বা কতক্ষণ—

যে বাড়ীতে আজ পর্য্যন্ত শুধু অবজ্ঞা আর অনাদরই পেয়ে এসেছে, তার ওপর একটা দাবীও হয়ত আসতে পারে—

—সে প্রলোভন বড় কম নয়...... তবু......

এক সময় সমস্ত চিন্তাগুলো তার জট্ পাকিয়ে যায়।

আবার খুলতে থাকে—

আবার পাকায়—

সহসা নৈশ স্তব্ধতার বুকে ভেসে ওঠে দু'টি কোমল চরণের অস্পষ্ট সন্তর্পিত ধ্বনি।

দ্বারে শব্দ হয় "খুট্" "খুট্" "খুট্"।

অচ্যুত বোঝে সব—

কিন্তু অন্তরের ভেতর তখন তার ঝড় বয়ে চলে।

......একদিকে তরুণী নারীর অনন্ত কামনা উন্মুখ বুভুক্ষু চাহনি—থরে থরে প্রলোভনের পশরা—

—আর এক দিকে আজন্মের সংস্কার, নীতি—উপদেশের নিষেধ—

আবার দ্বারে করাঘাত শোনা যায় "ঠক্" "ঠক্" "ঠক্"।

চুড়ীর মৃদু আওয়াজও যেন কাণে ভেসে আসে—

অচ্যুত কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দ্বার খুলে দেয়—বাহ্যজ্ঞান হারা হ'য়েই।

চক্ষের নিমিষে লঘু ক্ষিপ্রপদে ঘরে প্রবেশ ক'রে নটী দ্বার রুদ্ধ ক'রে দেয়।

অন্ধকার—সীমাহীন—তলহীন—

(২)

—পরের দিন—

অবিশ্রান্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের জোরে অচ্যুতের মনের গ্লানি অনেকটা মুছে আসে।

এ বাড়ীতে আজ যেন তার একটা দাবী, অধিকার।

এতদিনকার যত কিছু না পাওয়া, পাওয়া—যত অবহেলা, অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা—সব যেন মিশে যায় রৌদ্রসম্পাতে ভোরের কুয়াসা জালের মত।

ভারী গলায় হাঁকে "ঠাকুর, ভাত দাও।"

নিত্যের ব্যতিক্রম দেখে, বিস্মিত পাচক চোখ তুলে তাকায়। অবজ্ঞা ব্যঞ্জক মুখভঙ্গী ক'রে বলে "দেরী হবে, দেরী হবে। এখন ছোট দিদিমণির ভাত যাচ্ছে—"

অচ্যুতের বুকের মাঝে "ছ্যাৎ" ক'রে ওঠে। অজ্ঞাতে মুখটাও বোধকরি লাল হ'য়।

তবু একটা পুলক—'ছোটদিদিমণির ভাত'। আগে যে তারই দাবী।

নীরবে দূরে সরে দাঁড়ায়।

রামকানাই চাকরকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে, হাঁকে "রামা, খাবার জায়গা ক'রে দে, জলদি—জলদি—"

রামকানাই মুখ না ফিরিয়েই ভাঙ্গা হিন্দিতে উত্তর দেয় "বাবু রাতারাতি নবাব বন গিয়া। পিড়্‌চিত হুঁয়াপরই হ্যায়, লেকর উধার বৈঠ্ যাইয়ে। রোজ ত' এইসাই হোতা হ্যায়—হামি এখন ছোট দিদিমণিকা কাপড় থিচনে যাবে।"

হায়রে বিধাতার পরিহাস!

ছোট দিদিমণির পিছনেই সকলে ব্যস্ত।

—কিন্তু তার দাম যে আজ ওর চেয়েও বেশী—এ কথা সে কাকে বলে বোঝায়!

ওদের ছোট দিদিমণি যে তারই—

অচ্যুতের ইচ্ছা হয় লোকটার জিভটা উপড়ে আনতে;—মুখটা চিরকালের জন্য রুদ্ধ ক'রে দিতে।

কিন্তু ভরসায় কুলায় না।

দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত দুর্ব্বলতার সাহসের অস্তিত্ব একেবারেই নেই।

বাড়ীর লোকের কাছে এর নালিশও কোনদিনই চলে না।

কিন্তু আজ—

নিঃশব্দে অচ্যুত নটীর দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ায়।

সবেমাত্র স্নান শেষে নটী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করে।

—পিঠের ওপর কালো চুলের রাশ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিনীর মত যেন গর্জ্জাতে থাকে।

অচ্যুতের ছায়া পড়ে দর্পনের বুকে।

নটী চমকে ওঠে। পিছনে তাকিয়ে বলে—"কে? ওঃ! তা' এখানে কেন?"

কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে বিরক্তির সুর।

অচ্যুত অনেক কিছুই ভেবে আসে—

—কিন্তু ওর কথার ভঙ্গী শুনে কেমন যেন সব গুলিয়ে যায়।

—এ যেন আর কেউ; কাল রাতের "নটী" নয়।

কুণ্ঠিত স্বরে বলে "আমার একটা কথা বলবার ছিল।"

বিস্মিত কণ্ঠে তরুণী শুধোয় "আমার কাছে? কি বলুন।"

ভাঙ্গা কণ্ঠে অচ্যুত জানায় "আমরা এ বাড়ীর আশ্রিত; খাই-দাই বটে—কিন্তু চাকর বামুন যে ব্যবহার করে—। ভদ্রলোকের ছেলে সব—তাছাড়া খাবার ব্যবস্থা—"

নটী বাধা দেয়। বলে "তা আমার কাছে কেন? এ সবের ব্যবস্থা করা কি দেখা শোনার কাজ ত' আমার নয়। বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নীর কাছে যান—"

অচ্যুত কুণ্ঠিত স্বরে বলে "তাঁদের ব'লেও কোন লাভ হয় নি। তাই আপনাকে বলছি—এ রকম ভাবে কাঁহাতক চলে—"

নটী বিরক্তি মিশ্রিত ঝাঁঝাল স্বরে বলে "বরাবর চ'লে আসছে কি করে?"

অচ্যুত থতমত খেয়ে থেমে পড়ে।

মনে হয় বলে ফেলে "আগে চলত কিন্তু আজ সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের দাবী এসেছে যে তার—"

আর সে পরিবর্ত্তনে নিজের চেয়ে নটীর স্বার্থ ই বুঝি বেশী!

কিন্তু বলা আর হ'য়ে ওঠে না; শুধু নীরবে হাতের নখ খুঁটতে থাকে।

নটী বিরক্তি সহকারে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কটুকণ্ঠে শুধোয় "আর কিছু বলবার আছে?"

অচ্যুত কোন রকমে মরিয়া হ'য়ে ব'লে ফেলে "এ রকম ভাবে আর থাকা যায় না—"

"না পারা যায় চ'লে যাবেন—এত সোজা কথা" ব'লে শিশির ভেতর থেকে কতকটা হেজলিং স্নো তুলে নিয়ে নটী মুখে ঘষতে সুরু করে।

অচ্যুতের মুখটা ব্যথায় বিবর্ণ হ'য়ে ওঠে। আসন্ন মৃত্যু রোগীর মত কে যেন সেখানে কালী মেখে দেয়।

হায়রে মানুষের দুষ্ট আশা।

কত বড় প্রলোভনের চটকে ভুলেই না তুই ধরা দিস্ ছলনাময়ী নারীর কাছে।

চোখ ফেটে তার জল আসতে চায়।

জোর ক'রে সংবরণ ক'রে সে সব্যঙ্গ স্বরে বলে "একথা আপনার মুখে শোনাল ভাল—বিশেষ ক'রে কাল'কের ঘটনার পর।"

"নটী" ঘুরে দাঁড়ায়—যেন দলিত ফণা ফণিণী। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে "তার মানে! কালকের ঘটনার পর আপনি কি ভেবে-ছিলেন—আপনার শ্রীচরণের দাসী হ'য়ে থাকব?"

নির্ম্মম কশাঘাতের মত সে কঠিন ব্যঙ্গোক্তি—অচ্যুতের মনে জ্বালা ধরায়।

চোখে বিদ্যুতশিখা ঝলসে ওঠে। পরুষ-কণ্ঠে বলে "সে আশাটা কি বড় বেশী? আজ যদি আমি সব ঘটনা প্রকাশ করি—আমার কি—আমি পুরুষ—"

নটীর চোখে বজ্রাগ্নি জ্বলতে থাকে।

ঠোটের কোনে কিন্তু তাচ্ছিল্যের মৃদু হাসি—ঠিক যেন ঘৃণার শিলে ধার দেওয়া বিদ্রূপের বাঁকা ভোজালি।

ব'লে "তার আগে তোমাকে শান্তি রক্ষকের কাছে পৌছে দিতে বিন্দুমাত্রও দেরী হবে না। ঠিক এখন যেমন দাঁড়িয়ে আছ ওই ভাবেই। আর দরকার হয়ত করবও তাই—"

অচ্যুতের চোখ মুখ শুকিয়ে ওঠে।

লগুড়াহত কুকুরের মত সে সভয়ে ঘর থেকে বাইরে ছিটকে পড়ে। তার পর পথে।

ভাত খাওয়া আর তার হয় না।

এ বাড়ীর অন্নও মুখে রোচে না।

কল্পনার রঙ্গীন ফানুষ ছিঁড়ে যায়।

আবুহোসেনের মত এক রাতের রাজত্বও তার শেষ হয়।

পথে চ'লে আর ভাবে 'কত বড় ভুল করেছে সে।'

—মানুষকে সে চিনতে পারে না।

ভাবে—'কি বিচিত্র নারী!—'

সুখ স্বস্তির শান্তিকুঞ্জ, মানুষের অতিকাম্য বাসগৃহ ত' এ নয়। এ যেন ইট-পাথরে গড়া পথিপার্শ্বের নিষ্প্রাণ সরাইখানা।

—মুসাফিরদের এক রাতের আস্তানা।

নিত্য নব নব যাত্রীর পায়ের ধূলায় আবর্জ্জনা জমতে থাকে। হাসি অশ্রুর শতদল তাতে ফোটে না।

ভাবে আর পথ চ'লে সে।

——

খোলা-চিঠি

শ্রীমতী কাননবালাকে

কাননবালা,

তোমাকে এতোদিন চিঠি দিই নি কিছু মনে ক'রো না। বাস্তবিক, ভারী ভুল হয়ে গিয়েছিলো। সপ্তাহ তিনেক আগে, রূপবাণীর প্রকাণ্ড প্রাচীর পত্রে, হঠাৎ একদিন চোখে পড়্‌লো—সুন্দর এক শিল্পী ফিঁকে লাল ও ফিঁকে সবুজে ভারী মন-ভোলানো এক মুখ এঁকেছেন! জিজ্ঞেস করে' জান্‌তে পারলুম—ও আনন নাকি কাননের! আজ তাই সোজা তোমার কাছে জান্‌তে এসেছি—কানন, কথাটা কী সত্যি? স্বীকার করো আর নাই করো—এটা কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই মানবে—যে—শিল্পীর কল্পনাটি একটি সমুদ্র। এ যেন ঢেউয়ের সারি, বয়ে' বয়ে' শেষকাল্‌টা বালীর গায়ে যখন ভাঙ্গলো তখন তার চিহ্নমাত্র নেই। ও শিল্পীর কাছে দেখ্‌ছি রাবণকে রাম করা রসগোল্লা খাওয়ার মত সোজা; কিম্বা—সীতাকে সূর্পনখা।

কিন্তু, কানন, ভেবে ছাখো—এ দিন তোমার ছিলো না। ফিল্ম তোমার জীবনের অনেকখানি জুড়ে' রয়েছে, বলি—ফ্ল্যাশ্‌ ব্যাক্‌। 'জোর বরাত'-এর গা ঢাকা কাননকে কে না দেখেছে, আর—কেই বা না দেখেছে 'বাসবদত্তা'র গা-খোলা কাননকে? এই দু' কাননের তুলনা ঠিক এক প্যাকেট্‌ মার্‌কোভিচের এক বাণ্ডিল বিড়ির। কী তুমি করো বলো তো! রূপকে ধরে' রাখ্‌তে নাই যদি শিখেছিলে, তবে ছায়াছবির এই রূপোলী রাজ্যে এসেছিলে কেন শুনি! রূপের চক্‌চকে কালো সাগরে ডুবে থাক্‌লেই ত্যো হ'তো! রূপোর রাজ্যে গা, কালো সাগরে পা—এ করেই তো কানন আজ তুমি কুরূপ দেশের রাজকুমারী। দু' হাতে চার হাতের কাজ একসঙ্গে করা অসম্ভব—এ সবাই জানে। কিন্তু, তুমি কিছু শুন্‌লে না। সিনেমাতে তবু নাব্‌লে, বন্যার পর ভাঙ্গা বাঁধকে তবু তুমি দেখালে।

তোমার চল্‌তি রূপ আমার চোখে ভালো না লাগলেও, কানন, তোমার চল্‌তি গুণের অপ্রশংসা আমি কোনদিন করিনি, করবোও না। তোমাকে মানায়, এবং সে অংশগুলোই তুমি পারো ভালো—যে অংশে সেদিন তুমি নেবেছিলে। তুমি নিজেই নিশ্চয়ই স্বীকার করবে—'বাসবদত্তা' তোমার পক্ষে কতদূর ছিলো বেমানান। তার প্রথম নম্বর কারণ—কাঁচলী ঢেকে বাকী দেহটুকু দেখাবার মত তোমার দেহ মোটেই নয়। আর দ্বিতীয় নম্বর—যে সোণালী ভাব কবি স্বপ্নে দেখেছিলেন—সে ভাব তোমার চোখে মুখে ভেসে ওঠেনি, কারণ—সত্যিই, ভাস্‌বার নয়। তুমি ওরকম ভূমিকায় আর নেবো না।

সম্প্রতি, তুমি বাংলা ছেড়ে পাঞ্জাবের আশ্রয় নিয়েছো হিন্দী ছবিতে অভিনয় ক'র্‌তে। এটা আমার মতে ভালো হ'লো না। কারণ, খোট্টাই ভাষার হাব-ভাব নিয়ম-কানুন এক, আর বাংলার হচ্ছে একদম আলাদা। দু' ভাষার দোটানায় পড়ে' তুমি নিজের গুণের অকারণ হত্যা করতেও পারো। একতারা বাজিয়ে যে নাম কর্‌তে চায়, চিরকাল একতারা বাজানোই তার উচিত; অন্য যন্ত্রের নামী যান্ত্রিক হওয়া তার কাছে বড় সম্ভব নয়। মাঝখানে থাক্‌তে গিয়ে একুল ওকুল-দু'কুল যারা হারান, বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সে সুনাম কারো কাছে আগ্রহের জিনিষ নয়। আশা করি, তোমার কাছেও নয়।

আমার খুবই বিশ্বাস পাঞ্জাবের পক্ষ

দেহ-যমুনা

[নাটক]

শ্রীবিশ্বায়ক ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় দৃশ্য

প্রদ্যোতের বাড়ী

[অণিমা ইজি চেয়ারে শুইয়া আছে—চোখে মুখে রোগভোগের শীর্ণতা।]

স্বপনের প্রবেশ

স্বপন—আজকে কেমন আছেন অণিমা দেবী।—

অণিমা—ভালই—বসুন।—আচ্ছা আমার কী হয়েছিল ?

স্বপন—(বসিয়া) একে বলা যেতে পারে cardiac Neurosis। এর জন্য দায়ী আপনার heart and brain. বাস্তবিক এ ক'দিন আপনি এমনি ভাবিয়ে তুলেছিলেন। আমিতো রীতিমত মানে,—দেখুন আপনি brain-এর কাজ একদম কোরবেন না।—এমন কি পড়াটাও বাদ দিলে ভাল হয়।—

অণিমা—পড়াও বাদ দিতে বলছেন ? কিন্তু অতখানি নিষ্ঠুর আপনার না হ'লেও চলতো।—

স্বপন—নিষ্ঠুর ! আপনি কি করে জানবেন অণিমা দেবী—যে আজ নিষ্ঠুর হওয়া আমার পক্ষে কতখানি দরকার—আপনার সম্বন্ধে মানে—আমি কি করে বোঝাবো ? কিন্তু এটা নিশ্চয় জানি যে আমি যদি আজ নিষ্ঠুর না হই—তবে—আপনাকে—আমি,—মানে আমরা হারাবো।—

অণিমা—হারাবেন ! ও ! আপনি মরার কথা বলছেন।—কিন্তু ডাক্তারবাবু ! আমি মরে গেলে কি সত্যিই আপনার কষ্ট হবে ?—

স্বপন—কষ্ট ! না আপনি একথা নিয়ে ঠাট্টাও কোরবেন না। সত্যি বুকে বড় বাজে।—সেদিন এই কথা নিয়ে প্রদ্যোতের সঙ্গে কথা হচ্ছিল।—

অণিমা—তারপর ?—

স্বপন—তাকে এ বিষয়ে অত্যন্ত অনুদ্বিগ্ন দেখলাম। মানে এ সব ব্যাপারে যা হ'য়ে থাকে আর কি।—সে যাক্‌গে—ও বিষয় নিয়ে আপনি আর ভাববেন না।—

অণিমা—না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলুনতো—মিঃ রায়। স্ত্রীর অসুখে স্বামী উদাসীন থাকতে পারে—এ রকম ঘটনা আপনি আর দেখেছেন ?

স্বপন—জীবনের গতিই এই অণিমা দেবী। তবে আমার কথা হচ্ছে—যে প্রদ্যোতের বিয়ে করবার পর এ সব করা—

বিজয়ের প্রবেশ

বিজয়—দিদি আছ কেমন আজকে ?—

অণিমা—ভাল আছি ভাই। তুমি এ কদিন আসনি কেন বিজয় ?—

বিজয়—কেন ? এসেছিলামতো।—তুমি অজ্ঞান হয়েছিলে কিনা—তাই জানতে পারোনি।—আমি রোজ এসে তোমাকে দেখে গেছি।—

অণিমা—তাই নাকি ?—

বিজয়—হ্যাঁ—কেন ডাক্তারবাবুতো সব জানেন। উনিতো চব্বিশ ঘণ্টাই তোমার বিছানায় বসে থাকতেন—

অণিমা—ওঁর ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারবো না বিজয়—উনি আমার জীবনদাতা।—

স্বপন—আমি একটু ঘুরে আসি অণিমা দেবী দু'একটা dying Patient দেখতে হবে।—

অণিমা—আচ্ছা—কিন্তু আসছেন কখন ? পাবেন আজকে এখানে ?—

আব'এর জলো হাওয়া তোমার ঘুন-ধরা রূপে খানিকটা উপকার করতেও পারে। যদি তাতেও না হয়, ভবিষ্যতে গত-রূপের খানিকটা গর্ব্ব যদি তুমি করতে চাও, যদি খানিকটা আনতে চাও, তবে—'সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্তুত' কোনো ওষুধ তোমার ঐ অঙ্গের কোন প্রত্যঙ্গে কিছু পরিমাণে সুন্দর একটি ঘোমটা পরালে পরাতেও পারে। ইতি।—

আনিয়াৎ খাঁ

স্বপন—খাবো? আপনার জন্যে আর পারিনা আচ্ছা।— (প্রস্থান)—

বিজয়—দাদা বলছিলেন তোমাকে চেঞ্জে যেতে।—

অণিমা—কেন আমার যাওয়ার দরকার আছে নাকি?

বিজয়—দরকার নেই? তুমি বলো কি দিদি? তোমার স্বাস্থ্যতো একেবারে ভেঙ্গে গেছে। হঠাৎ—দেখলে মনে হয় তুমি বুঝি আর বেঁচে নেই। এইতো মানুষের চেঞ্জে যাবার সময়। দেওঘর—গিরিডি—আলমোড়া—নৈনীতাল—

অণিমা—বিজয়! তোমার দাদাকে বলো আমি—চেঞ্জে যাবো।—

বিজয়—আচ্ছা বলবো।—

অণিমা—হ্যাঁ। তাঁকে এ কথাও বলে দিয়ো যে আমার যাওয়া দরকার বলে আমি যাবো না, আমার না গেলে—চলবে না জেনেই আমি যাবো।—

বিজয়—না গেলে চলবে না এতো ঠিক কথা দিদি।—এই অল্প বয়সে যদি তুমি invalid হ'য়ে পড়ো।—

অণিমা—চেঞ্জ। কোথায় তোমাকে তিনি একথা বল্লেন?

বিজয়—গীতাদের বাড়ীতে।—

অণিমা—গীতাদের বাড়ী? তুমিও আজকাল সেখানে যাচ্ছো নাকি?—

বিজয়—হ্যাঁ, আমি যে তাকে গান শেখাই।

অণিমা—তুমি তাকে গান শেখাও? ও! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে তুমি একজন গীতশিল্পী। সংসারে তোমারও প্রয়োজন থাকতে পারে।—তা কতদিন থেকে তাকে এই গান শেখাবার ভাণ কর্চ্ছো তুমি?—

বিজয়—ছ'মাস, কিন্তু ভাণ করছি কি রকম?—আর একথা এত চটে মোটেই বা বল্‌ছেন কেন?

অণিমা—জগতে গীতার হিতাকাঙ্খী এতগুলো লোক ছিল জানতাম না।—(প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)—

অণিমা—ভাল কথা তোমাদের সেই গীতা সতী—দেখতে কেমন বিজয়?—

বিজয়—খুবই ভাল দেখতে। কিন্তু গীতা সতী,—হিতাকাঙ্খী, এ সব কথা তুমি বলছো কেন দিদি? তার বাপ মারা গেছে বলেই না।—

অণিমা—চুপ করো। আমি ছেলে মানুষ নই। সংসারে বাপ সকলেরই থাকে আর সকলেরই একদিন না একদিন মারা যায়। কিন্তু তারা সবাই তোমাদের মত অনাথ প্রতিপালকের খোঁজ করে না। (প্রস্থান)

বিজয়—গীতা সতী একথার মানে কি?—

সুস্নাতার প্রবেশ—

সু—আচ্ছা এখানে কি অণিমা বোস থাকেন?—

বি—থাকেন মানে? এটাতো তাঁরই বাড়ী।—

সু—আমিও তো তাই বলছি!—

বি—কই আর তা বলছেন? আছেন কিনা—জিজ্ঞেস কোরলেই হয়—থাকেন থাকেন কোরবার মানে কি?— (প্রস্থান)—

সু—I see

(যতীনের প্রবেশ)

সু—দেখ—তুমি কে?—

য—আমি এ বাড়ীর চাকর। আমার নাম যতীন।—

সু—বেশ। তুমি একবার তোমার গিন্নীমাকে ডেকে দিতে পারো?—

য—কেন পারবো না? আপনি একটু বসুন।—

সু—আচ্ছা বস্‌ছি (যতীনের প্রস্থান) তবু ভাল যে এ বাড়ীর লোক বসতেও বলে। যে—specimen দেখেছি—বাপ্!—

অণিমার প্রবেশ—

অ—কাকে চান আপনি?—

সু—আপনাকেই।—

অ—আরে সুথী তুই! কিন্তু একী চেহারা হয়েছে তোর? কতদিন পরে দেখা বল্‌তো?—

সুস্নাতা—হুঁ। after an age—

অণিমা—বাস্তবিক প্রথমে তোকে দেখে চিনতেই পারিনি। তারপর বিয়ে করেছিস্ নিশ্চয়ই।

সু—হ্যাঁ—বাব্বা,—হিন্দুর মেয়ে এতদিন বিয়ে করিনি কিরে! জাত যাবে যে।—

অ—তাই বটে এ স্যুটকেশ কার ?

সু—আমার ! আমি এখানে এখন কয়েক দিন থাকবো ! কেন, মিঃ বোসের আপত্তি হবে নাকি ?

অ—মিঃ বোস ! না তার আপত্তি হবেনা—তা ছাড়া তার আপত্তির মূল্যই বা কি ?—

সু—বলিস কিরে ? তার আপত্তির মূল্য নেই ? তা হ'লে আছিস ভালো বল ?—

অ—খুব ভাল। কিন্তু আর না—এবার ভেতরে চল্।—

সু—চল্।—(উভয়ের প্রস্থান। একটু পরে যতীন স্যুটকেশ লইয়া গেল)—

(প্রদ্যোত ও বিজয়ের প্রবেশ)

প্রদ্যোত—তারপর ?—

বিজয়—হঠাৎ এমনি চটে উঠলেন আমি ভয়ে আর কিছু বলতে পারলাম না।—

প্র—না পারবারই কথা বটে। গীতার সম্বন্ধে অনেক কথাই উনি এখন জানবার চেষ্টা কোরবেন। দাম্পত্য মনোমালিন্য যতদিন টেঁকে ততদিনই ভাল।—চেঞ্জে যাবেন বললেন ?—

বি—হ্যাঁ—

প্র—একলা না with Physician ?—

বি—কি জানি—না বোধ হয়।—

প্রদ্যোত—বোধ হয় ? তা হ'লে অনুমান করছো ?—দেখ বিজয় আজকে তোমাকে একটু ছোট্ট উপদেশ দিই।—বেশ্যার সম্বন্ধে অনুমান করো ঠকবে না—কুমারী মেয়ের সম্বন্ধে অনুমান করো—তাতেও ঠকবেনা। কিন্তু বিবাহিতা নারীর সম্বন্ধে উঁহু—নৈব নৈবচ।—তা হ'লে এমনি ঠকাই ঠকবে—যে তার ঋণ সারাজীবন ধরে পরিশোধ করতে হবে।—বিবাহ নামক বস্তু যে বড় ভয়ানক জিনিষ।—

বিজয়—বিবাহ ?—

প্র—হ্যাঁ গো হ্যাঁ Legalised Prostitution.

বি—দাদা ?—

প্র—তুমি এখনও ছেলে মানুষ। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর সব কিছু জানতে গেওনা মারা পড়বে।—হ্যাঁ ভাল কথা কে এক তাপহরণ রায় কাল্‌কে গীতাকে তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা গিয়ে বলে এসেছে।—

বি—আমার সম্বন্ধে ? বলেন কি ! কিন্তু কই আমিতো—

প্র—জানতে পারো নি ? কিন্তু এটা ভুলছো কেন যে তুমি জানতে পারলে গীতার জানা হোতনা। সে ব'লে এসেছে যে সুম্নাতা নামে একটি অভদ্র মহিলার তুমি নাকি প্রতিপালক,—এবং আমি মদ খাই ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যি সেই তাপহরণের জন্যে আমার অনুতাপ হচ্ছে।

বি—কেন ?—

প্র—তার তাপের বেগটা আমি অনুভব কোরতে পারলাম না। কিন্তু ভাবছি লোকটা কে ? আর কিসের জন্যই বা তার এত তাপ ?—

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

মনোরম সাধুখাঁ

চিনির চেয়ে মিঠে

জিনিষটা কী আশাকরি আপনাদের না বুঝিয়ে বল্‌লেও চল্‌বে। সঙ্গোপনে, অন্ধকারে ও নির্জ্জনে প্রেমিক তার প্রিয়াকে চুমো খেতে পারে। কিন্তু, ছায়াছবির অদ্ভুত এই রূপোলী রাজ্যে তা একেবারেই অসম্ভব। এখানে ক্যারী গ্র্যাণ্ট যখন উন্মত্তের মত মিরণা লয়কে জড়িয়ে ধরে' চুমো খায়—তখন তাদের আবহাওয়ায় প্রখর উজ্জ্বল আলো। আশে পাশে তীক্ষ্ণ চোখ—অন্ততঃ বাইশ পচিশ জন লোক। ডিরেকটার—ঘড়ি হাতে, কারণ চুমোর স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে আজকাল সেন্সরের কড়াকড়ি—তার গোটা দুই তিন সহকারী, ক্যামেরাম্যান—আর তার তিন চার

গ্লোরিয়া সোয়ানসন ছিলো ছায়ারাজ্যে জন্ বোল্‌স্‌-এর প্রথম প্রিয়া। তাকে চুমো খেতে গিয়ে জন্‌-এর চূড়ান্ত বিপদ—একমাত্র মনোরম সাধুখাঁই বর্ণনা করতে পারেন।

জন সহকারী। শব্দযন্ত্রী তারও সহকারী তিন চার জন। তা ছাড়া আলোর লোক, রিফ্লেকটর ধরবার লোক, দরকারী জিনিষপত্রের লোক ইত্যাদি সমস্ত তো আছেই। এই এতোগুলো লোকের সামনে প্রেম বা চুমোর অভিনয় করা বেশ সাহস ও সামর্থ্যের প্রয়োজন।

অবিশ্যি, অনেকে আছে, যারা সেট্‌-এর ওপর বেশী লোক থাকার যথেষ্ট আপত্তি করে। চল্‌তি কালে হলিউডে অ্যানা ষ্টেন এ বিষয়ে বিখ্যাত।

মুস্কিল অ্যানা ষ্টেন্'এর

রাশিয়ান মেয়েটি এই সেদিন যে ছবিতে অভিনয় শেষ করেছে তার নাম হচ্ছে—'দি ওয়েডিং নাইট'। এতে তার প্রেমিক হচ্ছে গ্যারী কুপার। অ্যানা গ্যারীকে পর্দ্দার ওপর অনেকবার দেখেছে, তার প্রেম করার অদ্ভুত অভিনয় ধারাকে অত্যন্ত প্রশংসাও মনে মনে করেছে। গ্যারীও অ্যানাকে ঠিক তেমনিভাবেই দেখেছে, ও তেমনিই প্রশংসা করেছে। দু'জনই স্যাম্ গোল্‌ড্‌উইনের। ষ্টেনকে গোল্‌ড্‌উইন কী ভাবে গড়ে' তুলেছে—আজ কারো অজানা নেই। এ খবরটিও বোধ হয় আপনারা জানেন—প্রায় আশিজন 'একষ্ট্রা' অভিনেতার ভেতর থেকে গ্যারীকে বার করে এই স্যাম্ গোল্‌ড্‌উইনই। যাক্ গে—'দি ওয়েডিং নাইট্'এর সেট্‌-এর ওপর তো প্রথম গ্যারী ও অ্যানায় মুখোমুখি দেখা। এবং ক্যামেরার সামনে তাদের প্রথম অভিনয়ই প্রেমের। অ্যানা ষ্টেনের ঐ লোভনীয় মুখে গ্যারীকে তখুনি চুমো খেতে হবে। মুস্কিল হ'লো—শুধু রাশিয়ান মেয়েটিরই নয়, গ্যারী কুপারেরও। চারদিকে সব ঠিক ঠাক, কাজ আরম্ভ আর হয় না। স্যাম্ নিজে এলো—ব্যাপার, কী! অ্যানা বল্‌লে—ভদ্রলোকের সঙ্গে ভালো একটু ভাব না হ'লে কী করে' আমি এঁর সঙ্গে চমৎকার প্রেমের অভিনয় করি? আর চারদিকে একবার তাকিয়ে বল্‌লে—এতো লোক এখানে যে ভীষণ লজ্জাই করে আমার! স্যাম্ সব বুঝলে।

সেদিন থেকে ক্যামেরার চোখের সামনে অ্যানা যখন প্রেম করতো সেট্‌-এ লোক থাক্‌তো যতদূর সম্ভব কম। খুব ভালো করে' যখন দু'জনের ভাব হলো তখনই গ্যারী আর অ্যানা প্রথম প্রেম আরম্ভ কর্‌লে—তার আগে নয়।

বি—কি নাম দুটোই শোনালেন দাদা।—তাপহরণ আর সুস্নাতা।—নাঃ এ নাম কোন ভদ্রলোকের নয়। আমি বলছি দাদা এ false.

প্র—কিন্তু গীতা তো false নয়। সেই আমাকে বললে।

বি—তাইতো! তাহলে এখন উপায়?—

প্র—নিরুপায়। আমি অবিশ্যি তাকে যথেষ্ট বুঝিয়ে এসেছি—বাকীটুকু তুমি গিয়ে বোঝাবে।—

বি—আমি এখুনি যাব দাদা?—

প্র—না—বিকেলে যেও।—

বি—আচ্ছা, আজকে তবে আমি যাই। আপনি একবার দিদির সঙ্গে দেখা কোরবেন কিন্তু।— (প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

আরো মুস্কিল

দু'জনে দু'জনের সঙ্গে চেনা নেই জানা নেই হঠাৎ প্রিয়া ও প্রেমিক ভেবে চুমো খাওয়া—ভারী মুস্কিলেরই ব্যাপার। ফ্রানসট্ টোন ও জোন ক্রাওফোর্ড-এর প্রথম প্রেমের দৃশ্য ছিলো—এক খাটের তলায়। ভীষণ তেলাপোকার উপদ্রব সে ঘরে। দু'জনে ঐ বিশ্রী পোকাগুলোকে তাড়াতে তাড়াতে এক খাটের তলায় একই জায়গায় এসে পড়লো—সেখানেই চুমো। সিনেমায় টোন তখন নতুন—ভড়কে গিয়ে খাটের কাঠে মাথায় দু'তিনটে আঘাত তো খেলোই, তা ছাড়া তাড়াতাড়িতে জোনকে নিয়ে একেবারে এক আছাড়! এতো অপ্রস্তুত ফ্রানসট্ জীবনে আর হয় নি।

জন বোল্‌স্-এর কাণ্ড

ফক্সের 'মিউজিক ইন দি এয়ার' তৈরী করবার সময় জন বোল্‌স্ ও গ্লোরিয়া সোয়ানসনের সেদিন সে কি হাসি! জন ও গ্লোরিয়ার ক্যামেরার সামনে এই প্রথম প্রেম নয়। অনেক দিন আগে, নির্ব্বাক যুগে, 'লাভ্‌স অব সুনিয়া' বলে একটি চিত্রে তারা নেবেছিলো, জন বোল্‌স্ তখন একেবারে নতুন। জন-এর প্রথম দৃশ্যই ছিলো গ্লোরিয়ার সঙ্গে প্রেম। তার অবস্থা কী রকম হয়েছিলো, জনের নিজের মুখ থেকেই শুনুন।

"ডিরেকটারের আদেশে গ্লোরিয়াকে বাহুতে জড়িয়ে তো ধোরলাম, কিন্তু তারপরই এতো লজ্জা হতে লাগলো যে কী আর বলবো! বাহুতে অতো সুন্দরী এক মেয়ে—শিরায় শিরায় ঝড় ওঠবার উপক্রম! মুখটা এগিয়ে নিয়ে গ্লোরিয়াকে যে চুমো খাবো তা আর পারি না! যদিও সে একশোবার আমায় বলছে স্বাভাবিক হতে, আশ্বাস দিচ্ছে যে চুমো খেলে সে আমার গালে এক চড় বসাবে না। 'নিজের কথা ভুলে যাও না কেন' সোয়ানসনের কথা এখনও আমার কানে বাজছে, 'ভাবো তুমিই আমার প্রেমিক।'

"আমি তো কিছুতেই আর ভেবে উঠতে পারি না। তখন এক উপায় ঠিক করলুম। মনে মনে ক্যাসানোভাকে আমি পুজো করতুম। গ্লোরিয়াকে আমি ভাবলুম ক্যাসানোভা! ব্যস্—আশ্চর্য্য, তখুনি আমি সব ভুলে গেলুম। মুছে গেলো আমার চারদিক থেকে ক্যামেরাম্যান্ ও ডিরেকটরের অস্তিত্বের কথা। আমি গ্লোরিয়াকে চুমো খেতে আরম্ভ করলুম। অসীম সে চুমো। সে চুমো আর থামে না। ডিরেকটার চেঁচাতে লাগলো 'কাট্'। আর 'কাট্', আমি তখন গ্লোরিয়ার ঠোঁটের ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। যাক্, কোন রকমে যখন এই লজ্জাকর ব্যাপার কাটলো, তখন আয়নায় আমার অবস্থা আর দেখবার মতো নয়। ঠোঁট আর গাল লিপ্‌ষ্টিকের লালে লাল হয়ে গেছে।

"চুমো খেতে এখনও আমার অসুবিধে হয়। 'টকি' আসাতে বেঁচেছি, এখন আমি গান গেয়ে প্রেম করি।"

গার্বো আর লু আয়ার্স

আপনারা সবাই নিশ্চয়ই জানে—লু আয়ার্স একবার গ্রেটা গার্বোর প্রেমিক হয়ে নেবেছিলো। লু'র সেই প্রেম করবার কথা মনে হ'লে মেট্রোর অনেকেই এখনও খুব হাসে। লু' তখন একেবারে কাঁচা ছেলে, সেটি তার প্রথম ছবি। গার্বোর সঙ্গে সে অভিনয় করবে বলে' নাবলো বটে, কিন্তু তখনও তাদের আলাপ হয়নি। ডিরেকটর তাকে এক অন্ধকার বারাণ্ডায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন—গার্বোকে ঢুকতে দেখলেই তুমি ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরবে, তারপর চুমো খাবে একটা।

যাক, গার্বো তো ঢুকলো—লু' কোন রকমে ছুটে' গিয়ে তাকে জড়িয়ে তো ধরলো, কিন্তু কিছুতেই আর চুমো খেতে পারলো না। সে দস্তুর মত কাঁপতে লাগলো। গার্বো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে, তারপর তার হাত ধরে' সোজা নিয়ে এলো ডিরেকটরের কাছে। বললে—"দয়া করে' এ ছেলেটির সঙ্গে আমায় আলাপ করিয়ে দেবেন?—এ যে কিছুতেই আমার চুমো খেতে পারে না!"

লুপ্‌ আর র‍্যামন

লুপে ভ্যালে আর র‍্যামন নোভারো 'লাফিং বয়'তে নেবেছিলো। ন্যাভাজোদের দেশ অ্যারিজোনায় তোলা হচ্ছিলো ছবি। আশে পাশে প্রায় হাজার দুই ন্যাভাজো। এখন, তাদের প্রেমের নিয়ম কানুনে চুমো বলে' কোনো জিনিষ নেই। নোভারো যখন ভ্যালেকে চুমো খাচ্ছে তখন তারা তো অবাক! সটান ডিরেকটরকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—"ঐ ছেলেটি, ঐ মেয়েটিকে অমন করে' কামড়াচ্ছে কেন?"

ডিরেকটর তাকে এ দেশের প্রেমের নিয়ম কানুন বোঝাতে চেষ্টা করে' বললেন—"ওখানে ঐ রকমই গল্প

ছিটে ফোঁটা

বজ্রবাহু

কাল বৈশাখীর এক ঝঞ্ঝা—সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'পূরবীখানা' নিয়ে বসেছিলুম এমন সময় অকস্মাৎ মহীমের আবির্ভাব হল। হাতের 'পূরবীখানা' দেখে বন্ধুবর বলে উঠলেন—আর কেন বন্ধু—কাব্যলক্ষ্মীকে এবারে বিদায় দাও—আর কিছুদিন এদেশে থাকতে হলে কাব্যলক্ষ্মীর অপমৃত্যু ঘটবে।

মহীমের হেঁয়ালী সব সময়ে বোঝা কঠিন! জিজ্ঞেস করলুম—তার মানে?

মহীম ভ্রুকুঞ্চিত করে বললে—মানে আর কি? বাংলাদেশের উৎকট কল্পনা-প্রবন কবিদের (?) অত্যাচারে প্রাণ তার কণ্ঠাগত হয়ে উঠছে। মহীমের আসল কথার নাগাল পাবার উপায় নেই—বাধা দিয়ে বললাম—বাজে কথা ছেড়ে মহীম ব্যাপারটি কি বলতো?

মহীম বললে—দেখছো না উপন্যাস ছেড়ে আজকাল অনুরূপা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতীও পর্য্যন্ত কাব্যলক্ষ্মীর দরজায় হত্যা দিতে সুরু করেছেন।

রোমাঞ্চের চূড়ান্ত

লোমহর্ষক চিত্র আপনারা অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু, তাদের সকলকে হারিয়ে দিয়েছে মনোগ্রামের 'থারটিন্‌থ্‌ গেষ্ট'। আসচে শনিবার, রিগালে চিত্রখানাকে প্রত্যেক চিত্রামোদীরই দেখা উচিত। এই অদ্ভূত গল্পে, অতুলনীয় অভিনয় করেছে জিন্‌জার রোজার্স, লাইল্‌ ট্যালবট্‌, আর জে ফ্যায়েল ম্যাক্‌ডোনাল্ড।

—•—

আমি বললুম—তাতে ক্ষতিটা কি?

মহীম উত্তর দিলে—ক্ষতিটি হচ্ছে এই যে, তাঁদের উপন্যাসকেও কোনরকমে সহ্য করা যায় কিন্তু এইসব উৎকট কবিতাগুলি একেবারেই অসহ্য—এগুলির স্থান কোথায় তা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি:—

"ভৃত্য নিত্য ধূলা ঝাড়ে
যত্ন পুরামাত্রা,
ওরে আমার ছন্দোময়ী
সেথায় ক'রবি যাত্রা?"

আমি হাসতে হাসতে বললুম—কিন্তু বিশ্বকবি তো মর্ম্মরিয়া খেদ করেছেন—"নহে, নহে, নহে।"

মহীম বললে—ঠিক কথাই—কবীন্দ্র রবীন্দ্র সেথায় নহে—কিন্তু আমাদের এই সব কবিদের স্থান সেইখানেই।

কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর একটি গল্পের পরিচয় দিয়েছি এইবার ভারতবর্ষে প্রকাশিত একটি কবিতার কিছু নমুনা শোনাই।—"ফুরায়েছে দীপের জীবন" দীপ নিভে গেছে—কিন্তু সে মাঝে জ্বলেছিল, এখন মসীলিপ্ত প্রগাঢ় অন্ধকারময় জীবন তাই কবি আফশোষ করেছেন:—

"কোথা চাঁদ, কোথা তারা, সকলে হয়েছে
পথহারা,
যে পথে আসিত তারা সে পথ হারায়ে
আজ গেছে।

আমরা কবির দুঃখে দুঃখিত—আমরা সান্ত্বনা দিই:—"আয় চাঁদ আয়।"

তারপর শ্রীযুক্তা দেবী সরস্বতী লিখছেন:—

"কথন জ্বলেছে দীপ, কথন নিভিয়া গেছে
জানি,
আঁধারের ভীষণতা তাতে আরও হয়েছে
ভীষণ,
তৈল গেছে ফুরাইয়া—ফুরায়েছে দীপের
জীবন—"

আমাদের বন্ধুবর মহীম এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েই থামিয়ে দিলেন। আমরা বলি—কবে লেখিকার দোয়াতের কালি ফুরাবে—ক্ষান্ত হবে লেখনী রতন।

* * *

যাক্ আর ভয় নেই—মাভৈঃ মাভৈঃ বলে মহীম লাফিয়ে উঠলো। আমি বল্লুম—কি ব্যাপার হে? মহীম বল্লে—এক দুরারোগ্য রোগের দাওয়াই বাতলেছেন আমাদের শ্রীযতীন্দ্রনাথ দে।

কবি তেজোদীপ্ত কণ্ঠে হুমকি দিয়ে উঠেছেন :—

নারীর পাষাণ চিত্ত পুরুষেরে করেছে পরুষ।"

কিন্তু তারপরই পরুষ কবির—হায়-হায়! হতাশা!!—

"কত হায় নেত্র-মুগ্ধ-রূপের কাঙাল সঁপিয়াছে
প্রাণ দয়িতা নিঠুরে—
আমারি মতন। বিশ্বে নাহি প্রেম।

আহা এ গভীর নৈরাশ্যে সান্ত্বনার সুর খুঁজে পাই কোথা! "ব্যাঘ্র ঝম্ফ ঝম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক লেজ নাড়িতে লাগিল—" নাকি?

* * * *

শ্রীমতী বনমালা দেবী যে গানের মালা-খানি গলায় ধারণ করবার জন্যে উন্মুখী হয়েছেন—মাত্র দু'টি আঁখির জলে, কাণে কাণে কথা আর নীরব অভিমান এত চট্‌পট্ করে উপহার দিলে আমাদের ভয় হয় প্রতিদানের গানের মালার পরিবর্ত্তে ঝুঁনো নারিকেলের মালা এসে না পড়ে। প্রভু কি এত অল্পেই সন্তুষ্ট হন? সঙ্গীত বিজ্ঞানে লেখিকা এটি পাঠালে এতদিনে স্বরলিপি প্রকাশ হয়ে যেতো।

—৬—

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

সব্যসাচী

সে অনেক দিনের কথা—ফিরীওয়ালা এক প্রকার খাবারের সম্বন্ধে হাঁকিত—

"কেট-কেট গরম! চিনি আছে, ঘী আছে, সুজী আছে; জল নেই। কেট-কেট গরম।"

হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর পক্ষ হইতে পাবলিসিটী অফিসার সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (ভায়ার কি এখন পদোন্নতি হইয়াছে?) যে

Reflections on the Hindusthan Co-operative Insurance Society Ltd. —A Reflection

নামক পুস্তিকায় ডিরেক্টারদিগের বিবৃতি (১০ পৃষ্ঠা), নানা জনের সার্টিফিকেট (৮ পৃষ্ঠা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির "ক্লাসিক" নিবেদন (১ পৃষ্ঠা) প্রভৃতি ছাপিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের ঐ "কেট-কেট গরম!"—মনে পড়িল।

ডিরেক্টাররা এই ১০ পৃষ্ঠাব্যাপী বিবৃতি প্রকাশ করিলেন—কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি—কেন হিন্দুস্থানের সম্বন্ধে নিন্দাব্যঞ্জক উক্তি হয় আর এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতির সম্বন্ধে হয় না? তাঁহারা কি বলিতে পারেন—

"অনেক মেয়ে সতী আছেন,
ধরা পড়েছেন রাধা;
অনেক জন্তু বোঝা বয়,
ধরা পড়েছে গাধা।"

তাঁহারা প্রথমেই ধরিয়া লইয়াছেন, কতকগুলি লোক স্বার্থ হেতু হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে ঈর্ষা-প্রণোদিত দুষ্ট প্রচারকার্য্য পরিচালিত করি-তেছে। তাঁহারা সে সব পুস্তিকার উল্লেখ করিয়াছেন, সে সব হিন্দুস্থানের নিন্দাব্যঞ্জক নহে—হিন্দুস্থানের একজন কর্ম্মচারীর ব্যক্তি-গত ব্যাপার সংক্রান্ত। তাহার জন্য যদি হিন্দুস্থান বিপন্ন হয়, তবে তাহা হিন্দুস্থানের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। কারণ, নলিনীরঞ্জন সরকার হিন্দুস্থানের চাকর—যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাকে বিতাড়িত করা যায়।

হিন্দুস্থানের জেনারল ম্যানেজারকে যে বেতন ও অন্যান্য বাবদে প্রাপ্য টাকা দেওয়া হয় সে সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, সে সকলের খণ্ডনে ডিরেক্টাররা বলিয়াছেন—

ভারতবর্ষে অন্যান্য স্থানে (elsewhere in India) এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্ম-চারী বা ম্যানেজিং এজেন্টরা যে টাকা পাইয়া থাকেন হিন্দুস্থানের ম্যানেজার তদপেক্ষা অধিক বা সেইরূপ টাকা পান না।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের যে সব প্রতিষ্ঠানে— অথবা মার্কিণ, হনলুলু প্রভৃতিতে অধিক টাকা ম্যানেজারের পারিশ্রমিক হিসাবে দিয়া থাকে, সে সব প্রতিষ্ঠান **দীর্ঘ ২০ বৎসর অংশীদার দিগকে এক পয়সা দিতে পারে নাই** এমন কথা কি ডিরেক্টাররা বলিতে পারেন? যত দিন হিন্দুস্থান দৈন্যমুক্ত হইতে না পারিবে, তত দিন তাহার পক্ষে কিরূপ ব্যয় করা সঙ্গত, তাহাই বিবেচ্য। আমরা ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহাকে জিজ্ঞাসা করি যখন প্রাণকৃষ্ণ লাহা কোম্পানী বৎসরে ৮ ১০ লক্ষ টাকা লাভ করিত, তখন তাহার ম্যানেজারের বেতন কত ছিল?

তাহার পর ডিরেক্টাররা যাহা বলিয়াছেন তাহা কথার কুঝটিকায় দিক আচ্ছন্ন করিবার মত!—

"We have imposed strict, though reasonable, limitations on his remu-neration. He is paid a fixed mo-derate salary which is supplemented

by a remuneration on a progressive scale dependent on the fulfilment of certain conditions and subject to a maximum limit."

অর্থাৎ ডিরেকটাররা ম্যানেজারের প্রাপ্য পরিমাণ সম্ভব মত করিলেও—তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে যে বেতন দেওয়া হয়, তাহা অত্যধিক নহে; আর তাহাতে তাঁহার আর যে সব প্রাপ্য সংযুক্ত হয় সে সকল ক্রমবর্দ্ধনশীল—কতকগুলি সর্ত্তের উপর নির্ভর করে এবং তাহারও একটা সীমা আছে।

পড়িলে রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছটের' ব্যাখ্যা মনে পড়ে:—

"দুর্ব্বোধ যা কিছু ছিল, হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মত অত্যন্ত নির্ম্মল।"

বুঝা গেল:—

(১) ম্যানেজারকে বেতন দেওয়া হয় এবং তাহা অত্যধিক নহে। তাঁহার মাসিক বেতন কত তাহা অবশ্য প্রকাশ করিতে নাই। ৺স্বরাজ্য দলে থাকিয়া নলিনী যখন সরকারের কর্ম্মচারী মহারাজা ক্ষৌনীশচন্দ্রের দরবারে হাজিরা দিত, তখন সে সরকারের কর্ম্মচারী-দিগের বেতনের যে হার করা সঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করিত—সে হারে বিচার করিলে তাহার বেতনের অবস্থা কিরূপ বোধ হয়?

(২) কিন্তু "শুধু গৌর নয়—গৌর হরি।" বেতনের উপর আবার অন্য প্রাপ্য আছে—তাহা "উপরি"—কিন্তু ডিরেকটারদিগের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু সে পাওনারও একটা সীমা আছে এবং তাহার প্রাপ্তি কতকগুলি সর্ত্ত পূর্ণ করার উপর নির্ভর করে। অবশ্য—

(ক) **পাওনার সীমা—তাহার দৌড় কতদূর তাহা প্রকাশ করা হয় নাই**; এবং

(খ) সব সর্ত্তও লোককে জানিতে দেওয়া হয় নাই।

সুতরাং ডিরেকটারদিগের উক্তি যুক্তিসহ কিনা—হিন্দুস্থানের অবস্থা বিবেচনা করিলে এই কোম্পানী যে ২০ বৎসর অংশীদারদিগকে এক পয়সা দেয় নাই, তাহা বিবেচনা করিলে জেনারল ম্যানেজারের বেতন অত্যধিক বলা যায় কি না, তাহা বুঝিবার উপায় ডিরেক্টাররা রাখেন নাই। তাঁহারা কথার তাজমহল রচনা করিতে পারেন, কিন্তু কথায় লোককে মতত্যাগী করা যায় না।

যাহার কথায় "হীরার ধার" ছিল সেই হীরা মালিনীর (ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরের' হীরামালিনী—বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে' কোন হীরামালিনীর উল্লেখ নাই) উক্তি:—

"পরের ছেলে কথায় টেনে
রাখবে কত দিন?"

২০ বৎসর ত কাটিয়াছে—আর কত দিন এমন ভাবে কথার বালুর বাঁধে মতের প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া রাখা চলিবে?

আমরা হিন্দুস্থানের ডিরেকটরদিগকে বলি, তাঁহারা যদি সত্য সত্যই বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের জেনারল ম্যানেজার বেতন ও অতিরিক্ত ফি লইয়া যে টাকা লইয়া থাকেন, তাহা হিন্দুস্থানের অবস্থার ও জেনারল ম্যানেজারের যোগ্যতার হিসাবে অধিক নহে, তবে তাঁহারা—**ম্যানেজারের বেতন ও অন্যান্য প্রাপ্যের পরিমাণ প্রকাশ করিয়া বলুন এবং ম্যানেজারের অতিরিক্ত প্রাপ্য যে সব সর্ত্তের পূরণের উপর নির্ভর করে, সে সবও প্রকাশ করুন।**

কিন্তু সেই কার্য্য করিবার সময় তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান্ তাঁহারা যে হিন্দুস্থানের ডিরেক্টারী করিয়া পারিশ্রমিক পাইতেছেন, সেই হিন্দুস্থানের হতভাগ্য অংশীদাররা ঘরের পয়সা দিয়া যে সব অংশ কিনিয়াছেন, **সে সকল হইতে তাঁহারা ২০ বৎসর এক পয়সা পান নাই।** ইহা যদি কৃতিত্বের পরিচায়ক হয়, তবে তাহাতে জেনারল ম্যানেজারের গৌরবের কতটা অংশ তাঁহা-দিগের?

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা
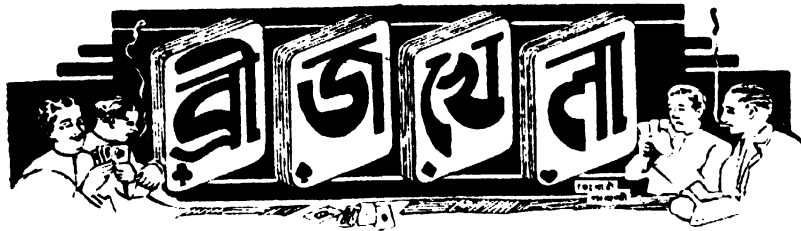
ব্রীজ খেলায় ঠিকমত ডাক দিতে পারাই জয় লাভের মূলভিত্তি। গত কয়েক মাসে ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ লিখে এ সম্বন্ধে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। আশাকরি পাঠকবর্গ এ প্রবন্ধগুলি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করেই কণ্ট্রাক্ট খেলায় প্রবৃত্ত হবেন নচেৎ পদ্ধতি অনুযায়ী না ডাক্‌লে বা ভূয়ো ডাকের মোহে (Psychic bid) নিজের বাহাদুরী দেখাতে গেলে জয়ের আশা সুদূর পরাহত। যা হোক, ডাক সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা আর বোধ করি প্রয়োজন হবে না ; সুতরাং এবার আমরা বিশেষ হাত নিয়ে খেল্‌বার বা খেলাবার নানাবিধ পদ্ধতি ও কৌশল নিয়েই আলোচনা চালাব। তবু ব্রীজ খেলায় ডাক দেওয়া সম্বন্ধে যদি কারও কিছু সন্দেহ থাকে বা জান্‌বার থাকে তাই নিয়ে প্রশ্ন করার জন্যে পাঠকবর্গকে নিমন্ত্রণ দিচ্ছি এবং তা' বিশেষভাবে বোঝাবার চেষ্টা কর্‌ব তাও আশ্বাস দিচ্ছি।

ডুপ্লিকেট ব্রীজ টুর্ণামেণ্ট :— আজকাল কোলকাতায় ডুপ্লিকেট ব্রীজ খেলার খুব বেশী প্রচলন হওয়ায়, প্রত্যেক সপ্তাহে পাঠকেরা 'কি ভাবে খেল্‌তে হয়,' 'কি করে টুর্ণামেণ্ট চালাতে হয়' বা 'Score কি ভাবে লিখ্‌তে হয়, ইত্যাদি প্রশ্ন করে চিঠি লিখ্‌ছেন এঁদের প্রত্যেককে চিঠি লিখে উত্তর দেওয়া একেবারে অসম্ভব বলেই এই পত্রিকার মারফতে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। ডুপ্লিকেট খেলার জন্য যাঁরা উৎসুক আশাকরি এ অংশটী তাঁদের অনেক উপকার কর্‌বে।

ডুপ্লিকেট খেলা প্রত্যেক দলের খেলোয়াড়দের ব্রীজখেলায় নিজ নিজ পারদর্শিতা দেখাবার একটা প্রধান উপায়। যদিও এই ধরনের খেলায় তাসের ভাগ্য (Card-luck) একেবারে যায় না তবু অনেকটা কমিয়ে দেয় বলে এ খেলাটির আদর দিন্ দিন্ বাড়্‌ছে এবং সর্ব্বত্র এতই ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ কর্‌ছে।

এ খেলায় মোট দরকার মাত্র চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজানো দু'খানি ঘর, কয়েকখানা Duplicate-boards (অর্থাৎ তাস নিয়ে যাবার বাক্স) আর কয়েক জোড়া তাস,—ব্যস্। মনে করুন ক-খ দল অ-আ দলকে মোট বত্রিশটা হাত খেল্‌বার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছেন এখন এই দুইদলের দু'জন করে খেলোয়াড়কে দুই ঘরে বস্‌তে দেওয়া হবে এমন ভাবে, যে দলের খেলোয়াড় এ ঘরে বস্‌বে পূব্-পশ্চিম সে দলের খেলোয়াড় অন্য ঘরে বস্‌বে উত্তর দক্ষিণ। যেমন ক-খ যদি এ ঘরে বসেন পূব্ পশ্চিম তবে ক-খ দলের গ-ঘ বস্‌বেন অন্য ঘরে উত্তর-দক্ষিণ। তারপর এ ঘরে আটটী Duplicate-board ও আট জোড়া তাস দিয়ে খেলা আরম্ভ করে, ও ঘরেও তদ্রূপ তাস ও Duplicate-board দিয়ে খেলা আরম্ভ করে দিতে হবে। তারপর হাত শেষ হলে এ ঘর থেকে ওঘর তাস বদলা বদ্‌লি হতে চল্‌ল। অনেক জায়গায় তিন জোড়া তাসেই বদ্‌লা-বদ্‌লি চলে বটে কিন্তু আমার মনে হয় পূর্ব্বোক্ত রূপেই চালানো সমীচিন। আর Score লেখার বিষয়ে বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয় যে আংশিক গেম-এর প্রকৃত মূল্যকে দ্বিগুণ করে ওপরে লিখ্‌তে হবে এবং প্রথম No Trump পিট এর মূল্য ৪০ পয়েণ্ট এবং তারপরে যথাক্রমে ৩০ পয়েণ্ট করেই বাড়্‌বে।

সান্‌ডে ক্লাব :— গত রোব্‌বার হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় এস্, সিংহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে সান্‌ডে ক্লাবের Auction Singles প্রতিযোগিতার পারিতোষিক

বিতরণ কার্য্য বেশ সুন্দর ভাবেই সুসম্পন্ন হয়েছে। 'ছবির পেলা' বিজয়ী হয়েছেন এবং রাজবাটী ক্লাব ফাইন্যালে ওঠার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। আমরা এঁদের সাফল্যে এই সমিতিদ্বয়কে অভিনন্দিত করছি। সুমধুর গান বাজনা, তৃপ্তিকর জলযোগ ও সদা প্রফুল্ল জীতু বাবুর অমায়িক ব্যবহার ওদিন সকলকেই আনন্দ দিয়েছিল; আর ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট জে, এল, নন্দী ম'শায়ের তো কথাই নেই গোড়া থেকেই এ উৎসবে উপস্থিত থেকে অভূতপূর্ব্ব সুমিষ্ট ব্যবহারে সকলকেই মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন।

বড়াল ফ্রেণ্ডস্‌ঃ—২রা জুন বড়াল ফ্রেণ্ডস্‌-এর প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল। জয়মাল্য প্রার্থী হচ্ছে আনন্দ পরিষদ ও Saturn Club. আনন্দ পরিষদের কালা বাবু ক্লাবের ঝগড়া-ঝাটির মধ্যে না গিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে যে একজন নবীন খেলোয়াড়কে তৈরী করে নিয়ে খেলে প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে উঠেছেন সে জন্য প্রশংসা প্রার্থী, এবং প্রশংসার যোগ্যও বলে আমরা মনে করি। বড়াল ফ্রেণ্ডস্‌-এর বৃদ্ধ কেদার বাবু ও সম্পাদক রাখাল বাবু বেশ দক্ষতার সঙ্গেই এতদিন প্রতিযোগিতার সব কাজ চালিয়ে এসেছেন এবং আশা করা যায় তাঁদের চেষ্টায় ফাইন্যালের দিনও বেশ 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হবে।

ল্যান্সডাউন্‌ ক্লাবঃ—ল্যান্সডাউন ক্লাবের প্রতিযোগিতা গত সোমবার থেকে আরম্ভ হয়েছে। এর মধ্যে থেকেই এই প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে নানারূপ কল্পনা জল্পনা ও উৎসাহ ঔৎসুক্য দেখা যাচ্ছে। আমরা এই প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি যে এরা যেন ভাল ভাবেই প্রতিযোগিতা চালাবার চেষ্টা করেন এবং সমর্থ হন এবং আর যেন পরদা তুলে এদের পুরানো স্বরূপ প্রকাশ করে আমাদের বিরাগ ভাজন না হতে হয়।

ব্রীজ খেলার টেষ্ট্‌ ম্যাচঃ—এখন কোল্‌কাতায় ব্রীজ খেলার টেষ্ট্‌ ম্যাচ নিয়ে খুব তাড়াহুড়ো পড়েচে। এদিকে থিটা বিটা ক্লাব ও ল্যান্সডাউন ক্লাবএ টেষ্ট ম্যাচ্‌ চলেচে—যা' সম্পূর্ণ হতে লাগ্‌বে চার দিন। আবার ও দিকে ঘুঘুডাঙ্গা ক্লাব আর সান্ধ্য সঙ্ঘ টেষ্ট্‌ ম্যাচ্‌ খেল্‌চে একশো হাত (deals) করে। এ রকম মন্দ নয়, আবার উত্তর কলিকাতা বনাম দক্ষিণ কলিকাতা টেষ্ট ম্যাচ্‌ খেলাতে পারলে ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট টেষ্ট ম্যাচের চেয়েও নামজাদা হবে বলেই মনে হয়। ভবিষ্যতে এ সকল খেলার হাত নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

সমস্যাঃ—

উ:
ইস্কাবন—পাঞ্জা, চরি।
হরতন—আটা, চৌকা।
রুহিতন—দশ।
চিঁড়িতন—নওলা, তিরি।
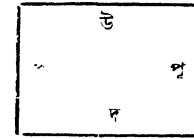
প:
ইস্কাবন—চৌকা।
হরতন—টেক্কা, ছক্কা।
রুহিতন—সাহেব, পাঞ্জা, তিরি।
চিঁড়িতন—আটা।

পূ:
ইস্কাবন—বিবি, দশ।
হরতন—চরি।
রুহিতন—নাই।
চিঁড়িতন—সাহেব, দশ, পাঞ্জা, চৌকা।

দ:
ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম।
হরতন—বিবি, সাতা।
রুহিতন—নাই।
চিঁড়িতন—টেক্কা, গোলাম, ছক্কা।

হরতন রঙ, 'দ' খেলবে। মিলিত হস্তে 'উ' এবং 'দ'কে পাঁচটি পিট নিতেই হবে।

নির্ব্বাক 'কপালকুণ্ডলা'র বিখ্যাত শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী এখন রাধা ফিল্মের 'ওয়ামাক্ এজ্‌রা'য় (উর্দ্দু) অভিনয় করছেন।

ফটো: রাধা ফিল্ম

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—চ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ৫ই আষাঢ়, ১৩৪২—20th June, 1935. { ২৫শ সংখ্যা

দেশবন্ধু-স্মরণে

শ্রীসুবোধ রায়

মাটীর প্রদীপে ঘেরা যে অমর্ত্ত্য-শিখা
মৃত্যুহীন জীবনের জ্যোতির্ম্ময়ী টীকা
জ্বেলেছিলে একদিন এদেশের ভালে,
মৃত্যুর চক্রান্তে ভরা কালচক্র-জালে
সে প্রদীপ চূর্ণ আজি—কিন্তু শিখা তা'র
জ্বলিতেছে অনির্ব্বাণ জ্যোতি-পারাবার
নয়নমনের আগে সর্ব্বভয়হারী।
পথহারা এদেশের হে চির-দিশারী
ঊর্দ্ধলোক হ'তে তুমি কি দেখিছ চেয়ে?
গভীর আঁধারে আছে সারা দেশ ছেয়ে,
সে আঁধারে ভিড় করে যত ক্লীবদল
স্বার্থসুখহিংসাদ্বেষ যা'দের সম্বল!
কোথা শক্তি, কোথা প্রাণ, কোথায় মানুষ?
অলস বিলাসে ভরা রঙ্গীন ফানুষ
জীবন-গগন-ভালে সুখ-জ্যোছনায়
খদ্যোত-পুলকে যেন ভাসিয়া বেড়ায়!
এ মহাশ্মশানমাঝে হে শ্মশানেশ্বর
মৃত্যুঞ্জয়ী শিব ওহে, ওহে শক্তিধর!
জ্বালো আলো মোহগ্রাসী বজ্রাগ্নিশিখায়
অমোঘ কর্ত্তব্যলিপি সত্যের লিখায়,
হেরি যাহা বুঝি মোরা জীবনের ভুল;
কূলের বন্ধন ছিঁড়ি ত্যাগের অকূল
পারাবার মাঝে যেন দিতে পারি পাড়ি
দেশের দশের লাগি' হীন স্বার্থ ছাড়ি',
নিজেরে সঁপিতে পারি জননী-চরণে
করিতে সত্যের পূজা জীবনে-মরণে।

* * * *

বরষ বরষ ধরি' দীর্ঘ প্রতীক্ষায়
এই আবির্ভাব তরে দিন কেটে যায়
স্মৃতি-অক্ষমালা ল'য়ে তব নাম স্মরি';
ধ্যাননেত্রে হেরি আজও পড়িতেছে ঝরি'
তব আশীর্ব্বাদ শত অযোগ্যের শিরে।
তাই জাগে ক্ষীণ আশা এ ঘন তিমিরে—
এ আঁধার রজনীরো আছে অবসান,
দেশ-যজ্ঞচিতাভূমে তব আত্মদান
বিফল হ'বেনা কভু—এই ধ্রুব জ্ঞান
দেশ সত্য, তুমি সত্য, সত্য ভগবান।

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

সব্যসাচী

হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর "জেনারেল ম্যানেজার" যে "ব্যক্তিগত ও গোপনীয়" পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে :—

"আমাদের দাদন-নীতি সম্বন্ধে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন তাহাও আপনাদিগকে স্মরণ করিয়া (**করাইয়া ?**) দিবার জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—"হিন্দুস্থান ইতিমধ্যেই ভারতীয় বীমা ক্ষেত্রের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। **ইহার অনন্য সাধারণ দাদন-নীতি ইহার সাফল্য লাভের অন্যতম প্রধান কারণ।"**

ইহা পাঠ করিয়া 'মার্চেন্ট অব ভেনিসে' কবিগুরু সেক্সপীয়ারের কথা মনে পড়িল—"The Devil can cite scripture for his purpose." কারণ, স্যার রাজেন্দ্রের যে ইংরাজীতে লিখিত পত্র হইতে এই কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, বলা হইয়াছে, তাহাতে কথাটা অন্যরূপ আছে। আমরা নিম্নে তাঁহার পত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"Hindusthan has already attained a leading position in the Indian Iusurance world and its bold investment policy, which is one of the chief factors of its success, is being looked upon with considerable interest by other companies. The success of this experiment will, undoubtedly benefit circles outside the Hindusthan."

অর্থাৎ :—

"হিন্দুস্থান ইতিমধ্যে ভারতীয় বীমা জগতে প্রধান কোম্পানীগুলির মধ্যে স্থান অধিকার করিয়াছে এবং যে সাহস ব্যঞ্জক দাদন-নীতি ইহার সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ অন্যান্য কোম্পানী তাহা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতেছেন। এই পরীক্ষা যদি সফল হয়, তবে ইহাতে হিন্দুস্থানাতিরিক্ত অন্যান্য কোম্পানীর উপকার হইবে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে :—

(১) হিন্দুস্থান "ভারতীয় বীমা ক্ষেত্রের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করিয়াছে"—এমন কথা স্যার রাজেন্দ্রনাথ বলেন নাই। পুর অর্থে "to lead" অথবা "to go before"—"a leading position" বলিলে পুরোভাগ বুঝায় না—ইহা বিকৃত ব্যাখ্যা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

(২) তাহার পর "ইহার অনন্যসাধারণ দাদন-নীতি ইহার সাফল্য লাভের অন্যতম প্রধান কারণ"—এই উক্তিটুকু ইচ্ছা করিয়া সমগ্র উক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। আমরা উপরে স্যার রাজেন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহাতে দেখা যায়—তিনি কোথাও এই দাদন-নীতি **অনন্য-সাধারন** বলেন নাই—ইহা হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজারের ইংরাজী ভাষা-জ্ঞানের অভাবের পরিচায়ক বা ইচ্ছাকৃত বিকৃতি। তিনি ইহা bold মাত্র বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, ইহা এখনও পরীক্ষাধীন—অর্থাৎ ইহা গ্রহণ করা উচিত কিনা তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। তিনি বলিয়াছেন—ইহা অন্যান্য কোম্পানী লক্ষ্য করিতেছেন—অর্থাৎ তাঁহারা ইহার ফলাফল দেখিয়া কাজ করিবেন। গল্প আছে, গ্রামে কলেরার প্রকোপের পর যখন দুই সই পুকুর ঘাটে জল আনিতে যাইতেছিলেন, তখন পতিপুত্রহারা সই অপরাকে তাঁহার পরিবারের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "সই, আমার পক্ষে এবার মড়ক পরে পরেই গিয়েছে। ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম, বৌটি মরেছে; আর মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম, জামাইটি মরেছে।" তেমনই হিন্দুস্থানেই এই দাদন-নীতি যদি সফল না হয়—তাহা যদি সর্ব্বনাশে শেষ হয়, তবে আর সব বীমা কোম্পানী বলিবেন—"মড়ক পরে পরেই গিয়েছে।" স্যার রাজেন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, হিন্দুস্থানের এই দাদন-নীতি experiment মাত্র।

স্যার রাজেন্দ্রনাথ যে বীমা কোম্পানীর পরিচালক সেই ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ানে তিনি ব্যাপকভাবে এই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। ইহার স্থিত তহবিলের প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১২ লক্ষ টাকা মাত্র বন্ধকে দাদন করা হইয়াছে। দেখা যায়, ইহার তহবিলের টাকা নিম্নলিখিতরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে।—

কোম্পানীর কাগজে······প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা, মিউনিসিপ্যাল, পোর্ট ট্রাষ্ট ও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটিতে······প্রায় ১৭ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা, সম্পত্তি বন্ধকে······প্রায় ১২ লক্ষ টাকা, রেলের শেয়ারে ও ডিবেঞ্চারে···প্রায় ২ লক্ষ টাকা, কোম্পানীর পলিসী বন্ধকীতে···প্রায় ৭ লক্ষ টাকা।

স্যার রাজেন্দ্রনাথের পরিচালিত কোম্পানীর শতকরা ২৫ টাকার অধিক সম্পত্তি বন্ধকে দাদন করা হয় নাই। আর হিন্দুস্থানের তহবিলের শতকরা ২৫ টাকা বাদ দিলে অবশিষ্ট প্রায় সব টাকাই সম্পত্তি বন্ধকে বা সম্পত্তিতে প্রযুক্ত হইয়াছে।

'ইণ্ডিয়ান ফিনান্স ইয়ার বুক (১৯৩৩)' লিখিয়াছিলেন :—

হিন্দুস্থানের হিসাবে দেখা যায়—"gilt-edge and bonds and cash are about 12 per cent of the life fund: loans or policies absorb another 12 per cent: the balance is invested either in house and landed properties or loans on mortgages of properties"

এ দেশের ব্যবসাক্ষেত্রে সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, সার জোসেফ কে, সার কাওয়াসজি জাহাঙ্গীর, সার বিকাভাই প্রেমচাঁদ, মিষ্টার ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ, মিষ্টার কামা, সার হরিশঙ্কর পাল, সার চিমনলাল শীতলবাদ, সার লালুভাই শামলদাস, সার হুকুমচাঁদ স্বরূপচাঁদ—সুপরিচিত। ইঁহারা হয়ত কেহই হিন্দুস্থানের জেনারল ম্যানেজারের মত অর্থনীতিবিশারদ ও ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন অথবা বীর নহেন। কিন্তু এই সব প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী যে কয়টি বীমা কোম্পানীর পরিচালক, সে কয়টির হিসাব দেখিয়া আমরা জানিলাম, এই কয়টি কোম্পানীর **স্থিত তহবিলের পরিমাণ প্রায় সাড়ে ২২ কোটি টাকা এবং ইহারা জমি ও বাড়ী বন্ধকে মোট ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার অধিক দাদন করে নাই।** হিন্দুস্থানই এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছে। স্যার রাজেন্দ্রনাথ যে দাদন-নীতি bold বলিয়াছেন, তাহার পরিণতি না দেখিয়া তাহার প্রশংসা করা যায় না। কারণ—নেপোলিয়নও সাহসী বীর ছিলেন, ডন কুইক্‌জোটও তাহাই ছিলেন।

হিন্দুস্থানের জেনারল ম্যানেজার—বীর—কিরূপ বীরত্ব সহকারে স্যার রাজেন্দ্রের উক্তিতে

(১) bold এর ব্যাখ্যা করিয়াছেন "অনন্যসাধারণ"

(২) a leading positionকে বলিয়াছেন—"পুরোভাগে স্থান"

(৩) স্যার রাজেন্দ্রনাথ যে দাদন-নীতি "পরীক্ষা" বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখমাত্র করেন নাই তাহা আমরা দেখাইয়াছি।

এরূপ কার্য্য যে অনন্যসাধারণ সাহসের পরিচায়ক তাহাতে অবশ্যই সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই অসাধারণ সাহসের জন্য কি হিন্দুস্থানের ডিরেক্টাররা তাঁহার বেতনাতিরিক্ত প্রাপ্যের হার বাড়াইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবেন না? আর হিন্দুস্থানের হতভাগ্য অংশীদাররা? তাঁহারা এই জন্য চাঁদা তুলিয়া তাঁহাদের জেনারল ম্যানেজারকে অন্ততঃ একটি পিত্তলের পদক প্রদান করুন।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শ

সত্যবাদী

নলিনী সরকার হিন্দুস্থানের কর্ম্মিগণের প্রতি যে "ব্যক্তিগত ও গোপনীয়" ফতোয়া জারি করিয়াছে, তাহাতে সে লিখিয়াছে :—

"বিগত কয়েকমাসের আনন্দবাজার পত্রিকা ('আনন্দবাজার পত্রিকা'?) পাঠ করিয়া আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিয়া থাকিবেন যে আমিই বর্ত্তমানে ইহার আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল। আমাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্যই না বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শের সংস্কারের অজুহাতে দিনের পর দিন আমার বিরুদ্ধে বিষোদগিরণ (বিষোদ্গীরণ?) করিয়াছে এবং তাহাতে সফলকাম হইতে না পারিয়া, ইহার (তাহার?) অব্যবহিত পরেই হিন্দুস্থানকে লোকচক্ষে হেয় করিবার জন্য আন্দোলন সুরু করিয়াছে।"

চলিত কথায় যাহাকে ব্যক্তিবিশেষের কাছে "পেগের বড়াই" করা বলে—ইহা অবশ্য তাহাই। কিন্তু যে সব ভদ্র সন্তান হিন্দুস্থানে নলিনীর অধীনে কাজ করেন, তাঁহারা এই শাস্ত উক্তিতে মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহাদের অনেকের কি ঈশপের উপকথার মশকের গল্প মনে পড়িবে না? গল্পটি এই—

একটি মশক একটি বৃষের মস্তকের চারি পার্শ্বে কিছুক্ষণ ভন্ ভন্ করিয়া শেষে তাহার শৃঙ্গে বসিয়া বৃষের অসুবিধা করায় ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিল, "আমার ভারে যদি তোমার কষ্ট হয়, তবে তাহা বল; তাহা হইলে আমি মুহূর্ত্তমধ্যে চলিয়া যাইব।" উত্তরে বৃষ বলিয়াছিল, "উহা লইয়া মাথা ঘামাইও না—তুমি থাক বা যাও আমার পক্ষে উভয়ই সমান। সত্য কথা বলিতে কি, তুমি যে আমার শৃঙ্গে বসিয়া আছ, তাহা আমি জানিতেও পারি নাই।"—ইহাতে বুঝায়—The smaller the mind the greater the conceit.

যে "উদ্গীরণ" বানান ভুল করে, "বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ" লিখিতে পারে, সে-ও আপনাকে এত বড় মনে করে যে কোন সংবাদপত্র—বিশেষ 'আনন্দবাজারের' মত বিপুল শক্তিশালী পত্র তাহাকে আক্রমণের লক্ষ্য করিবে, মনে করে!

'আনন্দবাজারের' প্রতাপ নলিনী অনবগত নহে। তাহার কর্ম্মিগণ হয়ত এখনও গোদ ক্ষুদিরামের গৃহে তাহার সুরেশসাধনার সংবাদ জানিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন—তাহার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগে মামলা উপস্থাপিত হইবার পর এই 'আনন্দবাজারেই' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কয়জনের "নিবেদন" ও হিন্দুস্থানের বড় বড় বিজ্ঞাপন মূল্য দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে ও হইতেছে।

তাহার মত কোন লোককে লোকের দৃষ্টিতে হেয় করিবার চেষ্টা করিলে তাহা 'আনন্দবাজারের' মত পত্রের শক্তির অপব্যয়ই হয়।

তাহাকে হেয় করিবার জন্য বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শ বা হিন্দুস্থানকে আক্রমণ করার কল্পনাও হাস্যোদ্দীপক। কারণ, এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের কোনটিই তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি নহে। সহযোগী 'দৈনিক বসুমতী' বলিয়াছেন :—

"আজ নলিনীরঞ্জন হিন্দুস্থান বীমামণ্ডলীর জেনারল (নলিনীর ভাষায় "জেনারেল") ম্যানেজার; কাল তিনি সে পদে অধিষ্ঠিত না-ও থাকিতে পারেন। হিন্দুস্থান বীমা-মণ্ডলীর সহিত উঁহার জেনারল ম্যানেজারের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য নহে।"

এই উক্তি যে ভবিষ্যদ্বাণী না হইতে পারে—এমনও নহে। কারণ, "coming events cast their shadows before."

আর দার্জিলিং-এ ব্রতচারী মিষ্টার গুরুসদয় দত্ত যে পার্টি দিয়াছিলেন, তাহাতে উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই বা নলিনীর নাম ছিল না কেন?

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বারের কথায় নলিনী বলিয়াছে, উহার সংস্কার প্রসঙ্গে 'আনন্দবাজার' যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। তাহাই কি সত্য? দেখা গিয়াছে :—

(১) সভাপতির পদ অধিকার করিয়া থাকা সম্বন্ধে নলিনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে। ইহা কি ভদ্রজনোচিত?

(২) নলিনী চেম্বারের দৌলতে মান ও অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে।

(৩) নলিনীর সভাপতিত্বে চেম্বারের মত প্রতিষ্ঠানের হিসাবের সঙ্গে হিসাব-পরীক্ষকের রিপোর্ট ও সদস্য-তালিকা প্রকাশ বন্ধ হইয়াছে। উদ্দেশ্য?

যে কোন ভদ্রলোকের পক্ষে কি এই সব অভিযোগ ইত্যাদি পদত্যাগের যথেষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হয় না? কিন্তু নলিনীর বিশ্বাস, সে এই সব প্রকাশেও অপদস্থ হয় নাই। গল্প আছে :—

নাম-বিভ্রাট

এক নাম ও দুই নামী—ইহা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু নামের একত্ব যখন ব্যক্তির দ্বিত্ব লোপ করিয়া নাম-রহস্যের সৃষ্টি করিয়া তুলে তখনই হয় বিব্রত অবস্থা। সম্প্রতি আমাদের এইরূপ একটা মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছে। "চিত্রালী"র কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকারকে অনেকে নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড্-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ বি, এন, সরকার বলিয়া ভুল করিতেছেন। তাঁহাদিগের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, এই দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। নিউ থিয়েটার্স-এর মিঃ বি, এন, সরকারের মাসিক কাগজের কার্য্যাধ্যক্ষ হইবার মত সখ ও সময় নাই।

এক নায়েব জমিদারকে পত্র লিখিয়াছিল—"প্রজারা গত রাত্রিতে আমাকে কাছারী হইতে টানিয়া বাহির করিয়া সম্মুখের গাব-গাছে বাঁধিয়া জুতা মারিয়া রক্তপাত করিয়াছে। আর আমার মুখে মূত্র ত্যাগ করিয়াছে। ইহার পর তাহারা আমাকে অপমান করিতে চাহিয়াছে। বিদিতার্থ নিবেদন।" পত্র পাইয়া জমিদার লিখিয়াছিলেন, "তোমার মান তোমার চামড়ার কত নিয়ে জানাইবে।"

নলিনীকে তেমনই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, কি হইলে সে মনে করে, সে লোকের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। অবশ্য চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের পরও যে এমন কথা বলিতে পারে তাহাতে "সকলই সম্ভব।"

কিন্তু চেম্বারের সদস্যরা কি করিবেন?

তাঁহারা দেখিয়াছেন, নলিনীর সম্বন্ধে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন—

(১) সে সত্য কথা বলে নাই

(২) তাহার চরিত্র সন্দেহাতীত নহে

এখন কথা, নলিনীকে সভাপতি রাখিতে তাঁহারা অসম্মত কি না? যদি তাঁহারা অসম্মত থাকেন, তবে সেই অসম্মতি জ্ঞাপনের কোন্ উপায় তাঁহারা অবলম্বন করিতেছেন?

তাঁহাদিগের পক্ষে অবশ্যই সভাপতির সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে সে সকলের পর তাহার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব উপস্থিত করাই সঙ্গত। যদি দেখা যায়, তাহাতেও সে পদত্যাগ করিতেছে না—তবে তাহার জন্য অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সে ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহার আলোচনা আমরা প্রয়োজন হইলে করিব। আজ আমরা কেবল বলিব, বণিকসম্প্রদায়ের লোকরা কিরূপে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাদিগের প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠানে এইরূপ লোককে সভাপতি রাখিতে পারেন? যে ব্যক্তি ক্ষমতা-লোভে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে—তাহার স্বরূপ কি? যাহার কথার মূল্য নাই, সে কোন্ শ্রেণীর লোক? সভাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্বন্ধে নলিনীর প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের যেমন পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—চেম্বারের নিয়ম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধেও তেমনই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারেন—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন।

অতঃপর চেম্বারের সদস্যরা কি করেন, তাহাই দ্রষ্টব্য। তাঁহারা কর্ত্তব্যপালন না করিলে আমরা বাঙ্গালার বণিক সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে অবহিত হইতে বলিব। চেম্বারের মত প্রতিষ্ঠান যেন কলুষিত না হয়।

বিবিধ

হাঁটি—হাঁটি—পা! পা!

গতবার আমরা সংবাদ দিয়াছিলাম, নলিনী সরকার 'ফরওয়ার্ডের' ডিরেক্টারী ত্যাগ করিয়াছে। নলিনী ডিরেক্টারী ত্যাগ করিল—"unwept, unhonoured and unsung."

"নর্তকীর লীলা শেষ হল তব
ওহে হিন্দুস্থানী বীর।
তোমার বিদায়ে ফেলিবে কি কেহ
এক ফোঁটা আঁখি-নীর?
'লিবার্টি'-লীলায় বহু সেবকের
প্রাণো পড়েছে ছাই;
নীরোর নজীরে বাজায়েছ বীণা
রোম পুড়ে—দেখি তাই।
প্রেতপুরী সম হতেছে কি বোধ?
তাই কি এ ত্যাগ ভোগে?
ভেষজ কি তার— ধরেছে তোমায়
যে দারুণ মহারোগে?"

তাহার সহ-ডিরেক্টাররা তাহার বিদায় সংবাদটি বড় করিয়া দিয়াছেন (ব্লাক বর্ডার দিয়া নহে)। যেন তাঁহারা কলার বাতাস দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। যে সব চাকরীয়ার বেতন বাকি আছে, তাঁহাদিগের কি হইবে? কেন? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা কি মনে নাই?—

বৃদ্ধকে যখন প্রাঙ্গনে তুলসী তলায় নামান হইল, তখন ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া বলিলেন, "ওগো, আমার কি করে গেলে গো?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কি আবার করে যাব? বাড়ী ঘর, ছেলে বৌ, ধান টাকা—সবই ত রইল; কলা খেয়ে যেতে আমিই চল্লাম।"

সকলেই রহিলেন; আমাকে আর বিদায় ক্ষণে কেন? কর্পোরেশনের মোটর গাড়ী বীমায় যদি কমিশন পাওয়া যায়, তবে মুস্কিলে কতকটা আসান অবশ্যই হইবে।

নলিনীর সহ ডিরেক্টাররা বলিয়াছেন—কাজের বাহুল্য আর স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ—এই দুই কারণে নলিনী কাজ ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বীণার মামলায় সে কাজের যে ফর্দ আদালতে দিয়াছিল, তাহাতে কি 'ফরওয়ার্ডের' ডিরেক্টারীর উল্লেখ ছিল? না—এটা ছিল "চ বা ভূ হি?" আর সে "বড়কাকা" রূপে বীণার নষ্ট স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার সাধনের জন্য তাহাকে দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিল এবং কাছে রাখিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার নিজের স্বাস্থ্যের যে বিঘ্ন করা প্রয়োজন, তাহা ত আদালতে বলে নাই! স্বাস্থ্য লাভ করিতে যাইবার সময় বীণার যে আহার্যের ফর্দ দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন—এই কি রোগীর পথ্য? সেই ফর্দ অনুযায়ী আহার্যেও কি তাহার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হইল না? সে যেরূপ "বড়কাকা" রূপে বীণার স্বাস্থ্যের জন্য যে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিল, বীণার সেইরূপ উদ্বেগ-প্রদর্শনেও কি বিপরীত "বড়কাকার" স্বাস্থ্যহানির প্রতিকার হইতে পারে না?

এই ব্যাপারে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার বটে। দার্জ্জিলিং হইতে মন্ত্রী বিজয়প্রসাদ যেমন এক বৎসর পূর্ব্বে মেয়র নির্বাচন সম্বন্ধে ফতোয়া জারি করিয়াছিলেন, এবার নলিনী দার্জ্জিলিং হইতে তেমনই 'ফরওয়ার্ডের' ডিরেক্টারী ত্যাগের সংবাদ প্রচার করিল। সংবাদ কি স্বিদ্ধপ্রচারিত? না—কাহারও উপদেশে ইহা প্রচারিত হইয়াছে? কাহার দার্জ্জিলিং গমনের কারণও আমরা জানি।

লঙ্কার আগুন নিবিলেও যেমন লেজের আগুন নিবিতে বিলম্ব হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রে কি তেমনই হইবে?

ইহার জের কত দিনে মিটিবে?—

(১) শুনিয়াছি, 'ফরওয়ার্ডের' স্বামিত্ব নলিনীর দ্বারা ক্রীত হইয়াছিল, তাহা কি সে বিধানচন্দ্রাদিকে দিয়া বলিয়া গেল—

"আর ত ব্রজে যাব না, ভাই, যেতে প্রাণ আর নাহি চায়। তোমরা ননী খেও গোষ্ঠে যেও প্রেম বিলাইও গোপিকায়।"

(২) অতঃপর সে আর জার্ণালিষ্টস এসোসিয়েশন নামক পাঁচমিশালী সভার সদস্য থাকিতে পারিবে কি না?

(৩) এখন হইতে সে কি তবে 'অমৃত বাজার পত্রিকাতেই' undivided allegiance দিতে পারিবে? এ বিষয়ে কি বাগবাজারের সহিত তাহার কোন বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে?

(৪) বীণার কি ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক এখন নলিনী-শাসিত কোন প্রতিষ্ঠানে স্থান পাইয়াছে, সে কি 'অমৃতবাজারে' বাজার রিপোর্টারের স্থানে চাকরী পাইবে?

(৫) উপাধি-তালিকা প্রকাশের পরই এই কোম্পানী কি কাবুলীওয়ালা হইবে?

'ফরওয়ার্ড' যখন স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার পর প্রায় দ্বাদশবর্ষ কাল অতিবাহিত হইয়াছে। 'ফরওয়ার্ড', 'নিউ ফরওয়ার্ড', 'লিবার্টি', আবার 'ফরওয়ার্ড' নলিনী বরাবরই কোন না কোনরূপে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল সেকালের আটক প্রভৃতি যখন যাহাই কেন হউক না—সে বলিতে পারিত "I am still the Vicar of Bray."

এখন সেই 'ফরওয়ার্ডের' সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ ঘুচিল। একটা কথা আছে—

"It is the first step that counts" সে হিসাবে নলিনীর 'ফরওয়ার্ডের' ডিরেক্টারী ত্যাগ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু—

(১) হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীতে

(২) বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সে কি হইবে?

যদি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় নলিনীকে 'ফরওয়ার্ডের' ডিরেক্টারী ত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তিনি কি তাঁহাকে এই দুইটি বিষয়ে সদুপদেশ দিবেন?

হিন্দুস্থান সম্বন্ধে বিধান বাবুর, বোধহয়, কিছু জানা আছে। আর বেঙ্গল ন্যাশনাল? তবে আরম্ভ যখন হইয়াছে, তখন অগ্রসর হইতে আর বিলম্ব হইবে না—এমন অবশ্যই মনে করা যাইতে পারে।

দেখা যাউক, কি হয়।

ষড়যন্ত্র!

অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের অতর্কিত, অপ্রত্যাশিত শোচনীয় মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে লইয়া হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজারের পৃষ্ঠপোষক পরিচালিত কয়খানি পত্র বিশেষ আলোচনা করিতেছেন। এই সব পত্রের কথা—কতকগুলি লোক নলিনী সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া অধ্যাপক প্রমথনাথকে তাঁহাদের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। কথাটা যেমন অসঙ্গত, মৃত অধ্যাপকের প্রতি তেমনই অসম্মানব্যঞ্জক। প্রমথনাথ যখন তাঁহার অশেষ দুঃখের কারণ বীণাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন তিনি কাহার প্ররোচনায় সে কাজ করিয়াছিলেন। তখন সেই বিবাহ-সংবাদ নলিনী জানিত আর তাহার ভগিনীপতি ডাক্তার শিশির কুমার মিত্রেরও তাহা অজ্ঞাত ছিল না। আজ এই সব পত্র যাহাদিগকে উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রকারী বলিতেছেন, তাঁহারা কেহই সে বিবাহ ব্যাপার অবগত ছিলেন না।

তাহার পর বীণা যে স্বামীর নিকটে যাইতে চাহে নাই, সে যে clandestine visit-এ বারাণসীতে গিয়াছিল, সে যে আপনাকে অসুস্থ বলিয়া প্রচার করিয়াছিল—তখন রোগীর পক্ষে কুপথ্য ভোজ্য ভক্ষণ করিয়াছে, সে যে বড়কাকার সঙ্গে একাকিনী দিল্লীবাসে গিয়াছিল—এ সব কি কাহারও ষড়যন্ত্রে? যদি কাহারাও ষড়যন্ত্রে এ সব হইয়া থাকে, তবে তাহারা কাহারা? বীণার দিল্লী যাত্রা ব্যাপারে তাহার ডায়েরীর লেখা উদ্ধৃত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলিয়াছিলেন—

এই বিষয়ে বীণা বা তাহার "বড়কাকা" বা ডাক্তার শিশির মিত্র কেহই সত্য কথা বলে নাই।

"It was the accused who first put the heed into her head of accompanying him to Delhi."

"Under thes circumstances, it must not be regarded as unduly uncharitable if people are so low-minded as to regard the conduct of the accused and Bina as not wholly above suspicion."

রবীন্দ্রনাথ ও "চার অধ্যায়"

অচিরে রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়ে"র দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইবে। বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে "চার অধ্যায়ে"র অতি-বিতর্কিত "আভাষটী" বাদ দিবার আদেশ দিয়াছেন। "খেয়ালী" প্রথমে এই "আভাষে"র অযৌক্তিকতা ও সাহিত্যিক রুচি-বিগর্হিত রীতি লইয়া আন্দোলন সুরু করে। পরে অনেক সহযোগীই তাহাতে যোগদান করেন। ১৮শ সংখ্যা (১৯শে বৈশাখ, ১৩৪২) "খেয়ালীতে" আমরা লিখিয়াছিলাম—"অবশেষে বলিতে চাই যে, তাঁহার কৈফিয়ৎটী একাধিকবার মনোযোগের সহিত পাঠ করিবার পর আমাদের পূর্ব্ব ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে যে, এই "আভাষটী" যেমনি নিষ্প্রয়োজন তেমনি সাহিত্য-রীতি-রুচি-বিগর্হিত। পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহা তুলিয়া দিলে রবীন্দ্রনাথের গৌরব বাড়িবে বই কমিবে না।"

রবীন্দ্রনাথ যে বিক্ষুব্ধ জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করতঃ আমাদের এই একান্ত সঙ্গত ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের সহিত আমরাও তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আরও প্রকাশ, ইতিপূর্ব্বে মারাঠী ও হিন্দীতে "চার অধ্যায়ের" অনুবাদ সম্বন্ধে তিনি যে অনুমতি প্রত্যাহার করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় সংস্করণে "আভাষ" বাদ দেওয়ার পর তিনি পুনরায় তাহা দান করিয়াছেন।

অর্থাৎ আসামী নলিনীই তাহাকে প্রথম দিল্লীতে তাহার সঙ্গিনী হইয়া যাইবার কথা বলিয়াছিল। আর বীণা সেই প্রস্তাবানুসারে সাগ্রহে কাজ করিয়াছিল। প্রমথনাথের আপত্তির আশঙ্কা যে বীণার মনে ছিল না, তাহাও নহে।

যদি এ ব্যাপারে কোন ষড়যন্ত্র হইয়া থাকে, তবে সে ষড়যন্ত্রীরা কাহারা? ম্যাজিষ্ট্রেটের মতে শিশির মিত্রও এই ব্যাপার সম্পর্কে সত্য কথা বলে নাই।

তাহার পর বীণার একাকিনী তাহার "বড়কাকার" সহিত দিল্লীবাস। সে সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের উক্তি—

এ স্থলে যদি কোন ষড়যন্ত্র হইয়া থাকে, তবে কাহারা তাহাতে লিপ্ত ছিল?

দিল্লীতে উভয়ের একত্র বাসের বিষয় সেই সময়েই যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও দেখা গিয়াছে।

প্রমথনাথ যে তাঁহার আর্জ্জিতে তাঁহার স্ত্রীর প্রতি পরপুরুষগমনের অভিযোগ আনিয়াছিলেন, সে-ও কি কোন ষড়যন্ত্রে?

তাহার পর প্রমথনাথ পত্নীর সহিত ব্যভিচারের অভিযোগে নলিনীকে অভিযুক্ত করিয়া আদালতে নালিশ করেন। নলিনীর তরফ হইতে প্রথমে অজুহাত দাখিল করা হয়—ইহা রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধ-

বাদীদিগের ষড়যন্ত্রে হইয়াছে। শেষে কিন্তু মামলায় নলিনীর তরফেও আর এই কথা বলা হয় নাই।

আর এখন কয়খানি সংবাদপত্র রাজনীতির কথা না তুলিয়া ষড়যন্ত্রের কথা তুলিতেছে। নলিনীর সঙ্গে এই সব লোকের শত্রুতার কি কারণ থাকিতে পারে?

অধ্যাপক সরকার মামলা চালাইবার খরচ কোথায় পাইয়াছেন, সে বিষয়ে এডভোকেট-জেনারলের প্রশ্নের উত্তরে—জেরাতেও কোন ষড়যন্ত্রের সন্ধান মিলে নাই।

স্ত্রীকে দুশ্চরিত্রা বিশ্বাস করিয়া স্বামী নালিশ রুজু করেন। ইহার মধ্যে বাহিরের লোকের ষড়যন্ত্রের স্থান কোথায়? ম্যাজিষ্ট্রেটের ঐ যে মত প্রকাশ—"not above suspicion." —তাহার পরও কি বাহিরের লোকের ষড়যন্ত্রের কথা উঠিতেছে।

কিন্তু এই ধাপ্পায় লোক ভুলিবে না।

লোক বলিতেছে—

প্রমথনাথের মৃত্যু-রহস্য ভেদ করা পুলিশের কর্ত্তব্য। সে পক্ষে পুলিশ কি চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে," লোক তাহা জানিতে চাহে।

মৃত্যুর পর পক্ষাধিককাল সে সংবাদ প্রকাশিত না হওয়ায় ও আনুসঙ্গিক কতকগুলি কারণে যে লোকের মনে চাঞ্চল্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

পুলিশ যদি এই মৃত্যু-রহস্য ভেদ করিতে পারে—তাহা হইলেই বুঝা যাইবে—যদি ষড়যন্ত্র থাকিয়া থাকে, তবে তাহাতে কাহারা লিপ্ত ছিল।

লোক যাহা বলিতেছে, তাহা অসঙ্গত, এমন কথা কি পুলিশ বা বাঙ্গালার গভর্ণর তীক্ষ্ণবুদ্ধি সার জন এণ্ডার্শন বলিবেন?

আমরা আবার জিজ্ঞাসা করি—এই রহস্য ভেদ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে?

দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দির

সহযোগী—"বসুমতী"র 'আলাপ-আলোচনার' স্তম্ভে অধ্যাপক শ্রীকুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম-এ, দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দিরের অসম্পূর্ণতার যে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা স্মৃতি-মন্দিরের উন্মোচনের বিবরণীর সময় প্রকাশ না করিলেই শোভন হইত। সত্য বটে, দেশবন্ধুর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের জন্য যে সুদীর্ঘ দশ বৎসর লাগিয়াছে তাহা বিশেষ পরিতাপের বিষয় এবং এ' বিষয়ে আমরা কুমুদবাবুর সহিত একমত।

বিশেষ উৎসাহের সহিত সন্তোষ বাবুর সাহায্য করিয়াছিলেন। বন্ধুবর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী দিনেকের তরে ময়মনসিংহ-প্রীতি পরিহার করিয়া সন্তোষবাবুর "খিদিরপুর ব্রিগেডে" যোগদান করিয়াছিলেন। সুরেন বাবুর "গেঁয়ো নেতা" নলিনী দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দির উন্মোচন-উৎসবে যোগদান করে নাই কেন? কেহ কেহ বলিতেছেন সন্তোষ বাবু তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে সাহস পান নাই, কারণ পাছে দার্জ্জিলিংয়ে শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের উদ্যান-সম্মিলনীতে যেমন

অষ্ট-সখার খেদোক্তি

বিদায় বিদায় আজি নিরুপায়
দেখা হ'বে পরপারে
আধো আলোকের অরুণ আভায়
মন্দাকিনীর ধারে।

Sj. Nalini Ranjan Sarker

Resigns From 'Forward' Directorate

Sreejut Nalini Ranjan Sarker has resigned from "Forward" Directorate owing to pressure of work and reasons of health.

We have accepted his resignation with regret and take this opportunity of expressing our great appreciation of his services to "Forward" since it was founded by Deshbandhu Chittaranjan Das in 1923.

B. C. Roy, T. C. Goswami, N. C. Chunder, P. D. Himatsingka, Rai Harendra Nath Choudhury, N. N. Dutta, S. C. Roy, S. C. Mitra, *DIRECTORS.*

—ফরওয়ার্ড—১৫ই জুন ১৯৩৫

এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুর ঐকান্তিকতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার অদম্য চেষ্টা না থাকিলে হয়ত এই অসম্পূর্ণ স্মৃতিমন্দিরও নির্ম্মিত হইত না।

উন্মোচন-উৎসবের দিন আর একটী বিষয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। খিদিরপুর অঞ্চলে সন্তোষবাবুর জনপ্রিয়তা ঐ দিনের উৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছে। শ্রীযুক্ত দীপেন্দু প্রামাণিক, শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি "খিদিরপুর ব্রিগেডে"র যুবকবৃন্দ

নিমন্ত্রিতা মহিলারা নলিনীর সহিত একযোগে উক্ত সম্মিলনীতে যোগদান করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন কলিকাতায় অনুরূপ পরিস্থিতি হয়ত সন্তোষবাবুকেও বিব্রত করিতে পারিত।

নবকলেবরে নাট্যনিকেতন

গুহজার নাট্যনিকেতন নবরূপ পরিগ্রহণ করিয়াছে। সত্ত্বমৃত নাট্যনিকেতনের এক অংশ ধর্ম্মতলায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে ও মূল নাট্যনিকেতন নব কলেবরে 'চিরকুমার' বেশ ধারণ করিয়াছে। এই অদল বদলে

হিন্দুস্তান ইন্সিওরেন্স বা নলিনীরঞ্জন সরকারের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা গুহজা তাহা জানাইবেন কি? আচ্ছা, আর এক কথা—গুহজা ত' নাট্যজগতের বাসিন্দা। নলিনীর সাকরেদী তিনি কি হিসাবে করেন তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? সিথিতে উনপঞ্চাশী-দাদার বাড়ীতে নলিনীর সহিত গুহজার পদার্পণের উদ্দেশ্য কি নাট্য-নিকেতনের রূপ পরিবর্ত্তনের সম্পর্কে না আর কিছু? যাহা হউক এই 'চিরকুমার' বেশ নাট্যনিকেতনের শ্রীঅঙ্গে কতদিন টিকিবে?

সাহিত্য সেবক সমিতি

১৪।১ বেচু চ্যাটার্জ্জির ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত গোপেন মিত্রের ভবনে সাহিত্য সেবক সমিতির মেঘোৎসব অধিবেশন গত রবিবার সন্ধ্যায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায় বাহাদুর জলধর সেন, শ্রীকান্তি ঘোষ, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী, শ্রীপ্যারিমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। গোপেন বাবু ও সাহিত্য সেবক সমিতির সম্পাদক উৎসবটীকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী সুস্থ হইয়া ডাক্তারের পরামর্শক্রমে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বাঙ্গালোর যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। প্রকাশ, চিকিৎসকগণ নাকি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে বুঝিয়া না চলিলে এবং পুনরায় এইরূপ অসুখ হইলে তাঁহার জীবন সংশয় হইতে পারে এবং শিশির বাবুও নাকি নিয়মিত জীবনযাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। জীবানন্দের সেক্রেটারী প্রফুল্লর ভাষায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—"দাদা, এই বার নিয়ে ক'বার হ'ল?"

বাস্তবিক, তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত ও শক্তিমান্ লোকের বুঝা উচিত যে, তাঁহার জীবনের উপর দেশের লোকেরও দাবী আছে—সে জীবনকে স্বেচ্ছায় নষ্ট করিলে তাঁহাকে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে। আশা করি, তিনি অচিরে নিরাময় হইয়া আসিয়া রঙ্গমঞ্চে যোগদান পূর্ব্বক নটরাজের চরণে নব নব অর্ঘ্য প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন।

পরলোকে নরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের বন্ধু ও সহকর্ম্মী পি, এন, বি'র পিতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৮ই জুন শনিবার বেলা ১২টার সময় অকালে পরলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি সার্ভেয়ার জেনারেল অফিসের রেজিষ্টার ছিলেন এবং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৯ বৎসর হইয়াছিল।

বন্ধুর এই নিদারুণ শোকে সান্ত্বনার ভাষা খুঁজিয়া পাইনা। ঈশ্বর তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন—ইহাই প্রার্থনা।

স্বদেশী রেকর্ড কোম্পানী

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় অনেকগুলি স্বদেশী রেকর্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—ইহা অতি আনন্দের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কোম্পানীগুলির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিদেশী প্রতিষ্ঠান "হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস" রেকর্ড ব্যবসায় ছিল একচেটিয়া। এবং রেকর্ড বিক্রয় করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদের দেশের সহস্র সহস্র টাকা বিদেশে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে "হিজ মাষ্টার্স ভয়েসে"-র ভয়েস কিছু নীচু হইয়া গিয়াছে।

এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে "হিন্দুস্থান মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্", "মেগাফোন" ও নব প্রতিষ্ঠিত "সেনোলা" কোম্পানীর নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানগুলি এতাবধি যতগুলি রেকর্ড প্রস্তুত করিয়াছেন—সবগুলিই অতি উচ্চ শ্রেণীর হইয়াছে এবং সেগুলির চাহিদাও বাজারে খুব বেশী।

নব প্রতিষ্ঠিত "সেনোলা" কোম্পানী ইতিপূর্ব্বে গ্রামোফোন মেসিনই কেবল মাত্র প্রস্তুত করিতেন। সম্প্রতি ইঁহারা রেকর্ড তুলিবার মনস্থ করিয়াছেন—আগামী আগষ্ট মাস হইতে তাহা বাজারে বাহির হইবে। শ্রীব্রজেন ভদ্রের পরিচালনায় ইঁহারা যে "সীতা" নাটকখানি রেকর্ডে তুলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমরা পরম প্রীত হইয়াছি।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি কথা বলিতে চাই যে, "স্বদেশী" নাম দিয়া ভাটিয়া-নন্দন, মাড়োয়ারী নন্দনরা যে সকল রেকর্ড কোম্পানী খুলিতেছে—তাহাদেরও আমদের সমর্থন করা উচিৎ নয়, কারণ তাহারা আমাদের এই বাঙ্‌লাদেশের বুকের উপর বসিয়া অর্থ শোষণ করিয়া আবার আমাদেরই চোখ রাঙাইতে কসুর করে না। সুতরাং বাজারে সম্পূর্ণ বাঙালী পরিচালিত যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হইয়াছে আমাদের সর্ব্বতোভাবে সেই প্রতিষ্ঠানগুলিকেই সাহায্য করা উচিৎ।

কড়েয়ার কৈফিয়ৎ

আমাদের কড়েয়ার সহযোগী 'নবশক্তি' এবার "চিঠি-পত্র" বিভাগে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স সম্বন্ধে কিছু লেখা ছাপিয়াছেন। তাহার আলোচনা আমরা এবার করিব না। কিন্তু সহযোগীর একটি উক্তির যুক্তি কিরূপ তাহাই দেখাইব। সহযোগীর চেম্বারের প্রতি দরদ তাহার অপরিণত অবস্থার জন্য। সহযোগী এই প্রতিষ্ঠানটির সম্বন্ধে বলিয়াছেন—এই "প্রতিষ্ঠান এখন পর্য্যন্ত গঠন পথে।" অর্থাৎ তাহার এখনও সমালোচনা সম্বন্ধে maturity হয় নাই!

এই চেম্বার যখন স্থাপিত হয়, তখন কাপ্তান নরেন দত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও বোধ হয়, হামাগুড়ি টানিতেছিলেন। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহার প্রতিষ্ঠা এবং ইহার বহু বৎসর পরে বোম্বাইয়ে মার্চ্চেন্টস চেম্বার, কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার ও খোদ ফেডারেশন অব চেম্বার্স প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহারা ৫০ বৎসরের প্রতিষ্ঠানকেও "এখন পর্য্যন্ত গঠন পথে" বলিতে পারে, তাহারা যদি পিতামহীকে স্তন্যপান শিক্ষা দিবার চেষ্টা করে, তবে তাহাতেও বিস্ময়ের কারণ থাকে না।

নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যুক্তির অভাবেই কি সহযোগী এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। গল্প আছে—এক চোর ধরা পড়িয়া—প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াও যখন বলিতে থাকে, সে চোর নহে, তখন তাহার সিঁদ কাটিয়া ঘরে প্রবেশের কৈফিয়ৎ দিতে আদিষ্ট হইয়া—কোন সঙ্গত কৈফিয়তের অভাবে বলিয়াছিল—"এজ্ঞে—এই পিদ্দীপের তেল গেতে এসেছিলাম।"

প্রায় ৫০ বৎসরের প্রতিষ্ঠানকে "এখন পর্য্যন্ত গঠনের পথে" বলিয়া তাহার বর্ত্তমান সভাপতির প্রতি সহানুভূতি উদ্রেকের চেষ্টা কিরূপ হাস্যোদ্দীপক তাহা কি বীর কাপ্তান সাহেব বুঝিতে পারেন না?

—:০:—

মানহানির মামলা

৺ মেয়রের মামলার জের

“হিন্দুস্থানের” প্রচার-সম্পাদকের সাক্ষ্য

হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর কর্ম্মচারী ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল আলিপুরের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে, সেনের এজলাসে ‘খেয়ালী’র সহিত সংশ্লিষ্ট শ্রীযুত সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত সুধীরকুমার সরকার ও শ্রীযুত যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ করেন।

প্রকাশ, উক্ত পত্রে আবেদনকারীকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

গত মঙ্গলবারে এই মামলার আর এক দফা শুনানী হয়।

“মানিক জোড়কে চিনিয়া রাখুন”

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ বীমা কোম্পানীর পাবলিসিটি অফিসার শ্রীযুত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তাহার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি ডাঃ সান্ন্যালের সহিত ছাত্রাবস্থা হইতে পরিচিত। ডাঃ সান্ন্যালও উক্ত বীমা কোম্পানীর কর্ম্মচারী। সাক্ষী বলেন যে, তিনি সাহিত্য সেবায় ব্যাপৃত আছেন। সাক্ষীর কতকগুলি কবিতার পুস্তক ইত্যগ্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সাক্ষী আরও বলেন যে, তিনি কয়েকখানা সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।

“নিশীথ রাত্রে নহে”

অতঃপর সাক্ষী উক্ত সাপ্তাহিক পত্রের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে প্রকাশিত “মাণিকজোড়কে চিনিয়া রাখুন” শীর্ষক নিবন্ধটি দেখাইয়া বলেন যে, উক্ত প্রবন্ধে তাঁহার এবং আবেদন-কারী ডাঃ সান্ন্যালের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত নিবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি (সাক্ষী) এবং আবেদনকারী সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রোডের একটা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া এডভান্স পত্রের পরিচালক শ্রীযুত জে, সি, গুপ্ত, গৌরাঙ্গ প্রেসের শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার এবং বসুমতীর সম্পাদক শ্রীযুত সত্যেন্দ্র-কুমার বসুর নিকট গিয়াছিলেন। সাক্ষী বলেন, এই উক্তি যথার্থ নহে, তাঁহারা সুরেশ বাবুর নিকট যান নাই, তাঁহারা শেষোক্ত ভদ্রলোকদ্বয়ের নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু নিশীথ রাত্রে নহে। তাঁহারা (সাক্ষী ও আবেদনকারী) অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকার কর্তৃক কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে আনীত মামলার সংবাদ প্রকাশ বন্ধ রাখার অভিপ্রায়ে যান নাই, এই ব্যাপারের সহিত যাহাতে হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীকে কোনরূপে

বিজড়িত করা না হয় তজ্জন্য শেষোক্ত ভদ্রলোকদ্বয়কে অনুরোধ করিতে গিয়াছিলেন।

'বীমার দালাল' শীর্ষক প্রবন্ধ

উক্ত পত্রের ২১শে মার্চ্চের সংখ্যাতে "বীমার দালাল" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সাক্ষী বলেন যে, উক্ত প্রবন্ধে ডাঃ সান্ন্যালকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "উক্ত নিবন্ধের স্থানবিশেষে দালালি আরম্ভ করিল" এই অংশটীতে আবেদনকারীর সম্বন্ধে জঘন্য কুৎসা রটনা করা হইয়াছে।

"নলিনী-বিজয়"

তাহার পর সাক্ষী "নলিনী-বিজয়" শীর্ষক নিবন্ধ দেখাইয়া বলেন যে, উক্ত নিবন্ধে আবেদনকারী, সার বিজয়প্রসাদ সিং রায় এবং শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত নিবন্ধের আর একটি অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, ডাঃ সান্ন্যাল যুবতী কমলাকে সংগ্রহ করা ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট।

"হীরামালিনী"র তাৎপর্য্য

অতঃপর সাক্ষী বলেন যে, ২রা মে তারিখে 'নলিনী-বিজয়' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে আবেদনকারীর কার্য্যাবলীকে "হীরা মালিনী"র কার্য্যের সহিত তুলিত করা হইয়াছিল। 'হীরা মালিনী"র চরিত্র কবি ভারতচন্দ্রের "বিদ্যা-সুন্দর" কাব্যে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই হীরা যুবতী সংগ্রহে সহায়তা করিয়াছে।

সাক্ষী আরও বলেন যে, এই মামলা সম্পর্কে পুলিস যখন হাজরা রোডের ভ্যারাইটিস প্রেসে খানাতল্লাস করিতেছিল, তখন সাক্ষী তথায় ছিলেন। এই সময়ে সাক্ষীর সনাক্তকরণ অনুযায়ী পুলিস কতকগুলি প্রবন্ধ হস্তগত করে।

মামলার শুনানী আগামী ২৮শে জুন পর্য্যন্ত মুলতুবী আছে।

শ্রীযুক্ত অমূল্য ভাদুড়ী ও শ্রীযুক্ত সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঃ সান্ন্যালের পক্ষে ও ব্যারিষ্টার মিঃ ডি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ বসু "খেয়ালী"র পক্ষে মামলা পরিচালনা করিতেছেন।

"উজলি মোদের পথ লোক-লোকান্তরে!"

দেশবন্ধু স্মৃতি মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষে রাজবন্দী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসুকে যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম :—

আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ৮ই যে তার করিয়াছিলেন, ১০ই তারিখে তাহা আমার হস্তগত হইয়াছে। কেওড়াতলায় দেশবন্ধু স্মৃতিমন্দিরের উদ্বোধন উৎসব ১৬ই তারিখে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। সম্ভব হইলে সেই বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি "বাঙ্গালী" মহাপুরুষের স্মৃতিপূজায় আপনাদের সহিত মিলিত হইয়া আমার দীন অর্ঘ্য নিবেদন করিতাম। দেশবন্ধুকে "বাঙ্গালী" বলিয়া ভাবিতেই আমার ভাল লাগে। তিনি ছিলেন সর্ব্বতোভাবে মনে প্রাণে "বাঙ্গালী" এবং আমার মনে তাঁর সব চেয়ে বড় আসন 'বাঙ্গালী' হিসাবেই। তিনি শুধু আমার রাজনৈতিক গুরু ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাহার চেয়ে অনেক বড়—বাঙ্গালী চরিত্রে যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু গভীর, যাহা কিছু সুন্দর, তাঁহার মধ্যে সেই সকল গুণের সমাবেশ আমি দেখিয়াছিলাম। তাঁহার ব্যক্তিত্বের এমন একটা উদ্দীপনাময়ী শক্তি ছিল যে, তাঁহার নিকটে গেলেই মনে হইত—"হ'বে হ'বে হ'বে জয়!" তাঁহার মহত্ব সম্বন্ধে বাগ্‌বিস্তার করা আমার পক্ষে প্রগল্‌ভতারই নামান্তর হইবে কারণ কবির ভাষায় বলিতে গেলে তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে হয় :—

"অনাগতকালপটে অতীতের স্মৃতি
যতদিন রবে লেখা, তাঁর কর্ম্ম-গীতি
ধ্বনিবে বিরামহীন যুগযুগান্তরে,
উজলি মোদের পথ লোক-লোকান্তরে।"

যে আদর্শ তিনি পোষণ করিতেন এবং যে আদর্শ লাভের জন্য তিনি আত্মাহুতি দান করিয়াছেন, সে আদর্শ এখনও আমাদের অনায়ত্ত—তাঁহার অমর স্মৃতি উদ্দেশ্যে আমরা যে মৃত্তিকার স্মৃতিসৌধ উৎসর্গ করিতেছি তাহা যেন দিনের পর দিন ব্যথার সঙ্গে আমাদিগকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

নাইট-বার্ড

গত শনিবার থেকে 'ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর' উর্দ্দু বাণী-চিত্র "নাইট্-বার্ড" গণেশ টকী হাউসে দেখানো হ'চ্ছে। একটি ডিটেক্‌টিভ কাহিনী নিয়ে ছবিখানার গল্পাংশ রচিত হ'য়েছে। এ ধরণের গল্প সবাক্ যুগে বাঙলাদেশে ইতিপূর্ব্বে চিত্রপটে রূপান্তরিত হয় নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় গল্প-লেখক ও চিত্র-নাট্যকার দু'জনেই গল্পের ঘটনাকে বিবৃত কোরতে পারেন নি বলে গল্পটি বড়ই একঘেঁয়ে হ'য়ে পড়েছে।

পরিচালনার দিক থেকে "ডি-জির" কাজ আশানুরূপ হয়েছে।

শ্রীশৈলেন বসুর আলোক চিত্রের কাজের আমরা প্রশংসা কোরছি।

নিগমের শব্দ স্থিরীকরণ চলনসই বলা যেতে পারে।

সেটিংস সাজ-সজ্জা, নেপথ্য-সঙ্গীত ও নাচ-গানের বিশেষ অপ্রশংসা করা যায় না।

ছবিখানার একটা বিশেষত্ব আমরা লক্ষ্য কোর্‌লাম যে, অভিনেতৃবর্গ সকলেই সুঅভিনয় কোরেছেন। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গুল হামিদ, মজহার খাঁ, নাজির, পাহেলওয়ান ও আনোয়ারি।

রূপবাণী

রাধা ফিল্মের হাস্য-মুখর "মানময়ী গার্ল'স্ স্কুল" রূপবাণীতে সপ্তম হপ্তায় পদার্পণ কোর্‌ল। হাস্য কৌতুক রসে সুমধুর এই বাঙ্গলা কথা-চিত্র খানি এতই চিত্তাকর্ষক হ'য়েছে যে এ পর্য্যন্ত যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই পুলকিত ও মুগ্ধ হয়েছেন।

রাধা ফিল্ম কোম্পানী

পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় নষ্ট-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সম্প্রতি দার্জ্জিলিঙে অবস্থান কোরছেন। ইনি ফিরে এলেই জুলাই মাসের প্রথম হপ্তায় নতুন ছবির কাজে হাত দেবেন বোলে আশা করা যাচ্ছে।

* * *

খুব সম্ভবতঃ রাধার পরবর্ত্তী বাংলা ছবি হ'বে একখানি সুবিখ্যাত গোয়েন্দা-নাটক অবলম্বনে গৃহীত। আমরা ছবির নাম এবং পরিচালকের নাম যথা সময়ে জানাবো।

* * *

শ্রীমতী কাননবালা গত হপ্তায় লাহোর থেকে ফিরেছেন। রাধা ফিল্ম কোম্পানীর সৌজন্যে ইনি সেখানকার আর একটি প্রতিষ্ঠানে একখানি হিন্দুস্থানী টকীতে অভিনয় করবার অনুমতি পেয়েছিলেন। তা' সে ছবি, নানা কারণে আর শেষ হোল না। শোনা যাচ্ছে শ্রীমতী কাননকে রাধা ফিল্মের পরবর্ত্তী বাংলা ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে।

* * *

ঢাকার অন্যতম চিত্র-গৃহ 'মতিমহল টকীজ'-এর সদ্গতি লাভ করবার পর, সম্প্রতি, সম্পূর্ণ বাঙালী পরিচালনায় এই ছবি ঘরটি খোলবার ব্যবস্থা হ'চ্ছে, এর নূতন নামকরণ হয়েছে "চিত্রালয়।" রাধা ফিল্মের সর্ব্বজনপ্রিয় পৌরাণিক কথা-চিত্র "দক্ষ-যজ্ঞ" শীঘ্রই এখানে দেখানো হ'বে।

ছায়ায় "দেবদাসী"

পায়োনীয়র ফিল্মের নবতম অবদান—বাংলা কথা-চিত্রে "দেবদাসী" আগামী ২২শে জুন, শনিবার "ছায়ায়" মুক্তিলাভ কোরবে। বাংলার পল্লীজীবনের ঈর্ষা-অসূয়া, অবিচার অনাচারের উজ্জ্বল চিত্র এই "দেবদাসী"। সমাজপতি স্মৃতিভূষণের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, বাউলের ভূমিকায় সুকণ্ঠ বিনয় গোস্বামী, অতসীর ভূমিকায় পদ্মাবতী, দেবদাসীর ভূমিকায় শান্তি গুপ্তা অভিনয় কোরেছেন। মিঃ মায়ার আলোকচিত্র বিভাগে এবং মিঃ ব্রাডবার্ণ শব্দযন্ত্র বিভাগে কাজ কোরেছেন। শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষের পরিচালনা এবার কতদূর সাফল্য মণ্ডিত হয়, তাই দেখ্‌বার জন্য আমরা উদগ্রীব রইলাম।

দীপালীর উদ্বোধন

গত রবিবার অপরাহ্ণ ৫.৩০ ঘটিকার সময় চিত্তরঞ্জন এভিনিউ নর্থে—নূতন সবাক চিত্র-গৃহে "দীপালী"র উদ্বোধন হয়েছে। পূর্ব্বে এখানে জুপিটার টকী হাউস ছিল। সম্প্রতি নূতন পরিচালনায়, সুসংস্কৃত হইয়া "দীপালী" নাম ধারণ কোরেছে। দীপালী চিত্রগৃহে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৩০টি বসিবার আসন আছে এবং নিম্নশ্রেণীর আসনে পর্য্যন্ত গদি আঁটা আছে।

মাননীয় বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চিত্রগৃহের উদ্বোধন করেন। সভারম্ভের পূর্ব্বে স্তোত্রপাঠ হয়।

দীপালীর কর্ত্তৃপক্ষ রায় সাহেব কে এল রায়, শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ রায়, মিঃ জে পি রায়, মিঃ জি ডি রায় প্রভৃতি নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক-দিগকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন। অবশেষে ফক্সের 'ওয়ারিয়াস হাসবেণ্ড' প্রদর্শিত হয়।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এবং মহিলাগণের মধ্যে ডাঃ জে এন মৈত্র, মিঃ এবং মিসেস এস এন ব্যানার্জ্জি, কেশব গুপ্ত, অভয়াপদ চক্রবর্ত্তী, কিরণ চন্দ্র দত্ত, দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক, মন্মথ নাথ মিত্র, জে সি সেন, ক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ দস্তিদার, দেবেন ঘোষ, বিমল চ্যাটার্জ্জি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য!

'অ্যান্ ইম্পর্ট্যাণ্ট ডে ইন্ ইয়োর লাইফ'

শ্রীতারাপদ রাহা

ছোট ভাই কাঞ্চু এবার ম্যাট্রিক দিল। সত্যি কথা বলতে কি—স্কুলের খাতায় ওর বয়স পনের বছর ছ'মাস তিন দিন হ'লেও ও এবার সবে চৌদ্দয় পড়েছে, সুতরাং বাবার কড়া হুকুম ছিল ওকে সঙ্গে করে 'হলে' পৌছে দিয়ে লেখা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার বসে থাকতে হ'বে কোথায়ও কাছে। ঘাবড়াবার ছেলে ও নয়, তবু বাবার যে কি ভয়! বাবা নিজেই 'নার্ভাস'।

ফাষ্ট' পেপার শেষ হ'লে কাঞ্চু হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল।

কিরে কেমন লিখলি?

ওঃ—সুপার ফাইন্।

এস্‌সে কোনটা লিখলি?

বাঁ-হাতে কোশ্চেনটা ধ'রে ডা'ন হাতের আঙ্গুল দিয়ে ও দেখিয়ে বল্লে, কেন এইটা! দেখো না কেমন মজার এস্‌সে পড়েছে—An important day in your life.

কাঞ্চু খুব ভালো লিখেছে এমনি তার দৃঢ় বিশ্বাস দেখে আমার খুব ভালো লাগলো। তার বাঁ কাঁধে হাত দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা কি লিখলি বল'ত!

কাঞ্চু বিস্ময়ে ভ্রূ কুচকে বলে উঠলো, কেন মনে নেই—সেবার দমদমার বাগান বাড়ীতে গিয়ে তুমি বলেছিলে—অতীনদার পকেট থেকে যদি আমি নোতুন বউদির চিঠি-খানা এনে দিতে পারি তা' হলে তুমি আমার একটা স্কুল-পার্কার দেবে?...সত্যি মনে নেই তোমার, বলো...বলো...। কাঞ্চু উত্তর শুনবার জন্য পা আছড়াতে লাগলো।

বন্ধু অতীন্ নোতুন বিয়ে করেছিল, বউয়ের চিঠি সে কিছুতেই দেখাবে না। কাঞ্চু দুষ্টামীতে ওস্তাদ—কি ক'রে জানি না, সত্যি ও চিঠিখানা এনে দিয়েছিল, পার্কারও ও একটা আমার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছিল। বললাম, মনে নেই আবার! নিশ্চয় আছে, তুই তাই লিখেছিস না কি?

সিয়োর, হোয়াই নট্, একজামিনার মার্ক দিতে বাধ্য।

আমি হেসে তার হাত ধরে পুটীরামের দোকানে ঢুকলাম।

* * *

কাঞ্চু খাবার আর ডাব খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে 'হলে' ঢুকেছে। 'প্যারাগন'এ এক গ্লাস 'ব্যানানা' খেয়ে 'হল'এর পাশেই ঘুর-ছিলাম। বাবাকে নার্ভাস বলে নিন্দা করেছি, এখন দেখছি আমি নিজেও নার্ভাস: কাঞ্চু সেকেণ্ড পেপারের সময় পাছে 'আপ্‌সেট্' হ'য়ে পড়ে—ভেবে আমিও স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। কোন রকমে আজকের দিনটা কেটে গেলেই এক রকম নিরাপদ।

এক রকম অন্যমনস্ক হয়েই পথে চলে-ছিলাম—হঠাৎ সামনে দেখি ডলা-মোচড়ানো খানিকটা কাগজ, খানিকটা বল্‌লে ভুল হয়—বেশ খানিকটা। উপরে শাদা কাগজের একটা আবরণ—দেখে সন্দেহ হ'ল: কেউ হয়ত কিছু টুকেছে। তুলে নিলাম, খুলে বিস্মিত হলাম: শাদা কাগজের আবরণের মাঝে একখানা য়ুনিভার্সিটীর খাতা—উত্তরাংশ—অর্থাৎ দরকার হ'লে মূল-খাতার সঙ্গে যেখানা জুড়ে দেওয়া হয়। উপরে নাম নেই, লিখবার একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু বেশ করে কেটে দেওয়া হয়েছে—রোল নাম্বারও।

আশ্চর্য্য হয়ে পাতা উল্টালাম, দেখি প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই একটা এস্‌সে লেখা সুরু হয়েছে। লেখা শেষ করে আবার তা আগা-গোড়া কেটে দেওয়া হয়েছে, উপরে লেখা আছে—An important day in my life.

আমি নিজে নিজেই হাসলাম: সব ভায়ারাই যে দেখছি এইটা লিখেছে; যাঁরা ইংলিশের একজামিনার আছেন তাঁরা এবার কত 'ফানী ষ্টোরী'ই শুনবেন!

কিন্তু আমারও যে এবার এমন একটা কাহিনী শুনবার সৌভাগ্য হ'বে তাই কি আগে জানতাম! এস্‌সেটা পথে পড়েছি, বাড়ীতে ও পড়েছি,—বন্ধু-বান্ধবকে শুনেয়েছি, আরও দশজনকে শোনাতে চাই তাই সেটা বাংলায় তর্জ্জমা করে পাঠাচ্ছি—

এস্‌সেটাকে বাংলা করলে এমনি দাঁড়ায়:

বয়স আমার সবে ষোল—মানে পনোরো পেরিয়ে ষোলয় পড়েছি। আর ছ'মাস আগে যদি আমার পরীক্ষা দিতে হ'ত—তা' হ'লে আমি হয়ত আর হয়ত কেন, নিশ্চয়ই—এসসে লিখতাম না,—কারণ তার আগে আমার জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যাকে আমি ইমপর্ট্যাণ্ট বলতে পারি। গত দশ বছরের কথা আমার বেশ মনে আছে, তার প্রতিটী দিন যেমন এক ঘেয়ে তেমনি নিরর্থক।

মাকে কবে হারিয়েছিলাম মনে নাই, থাকলে বলতাম—সেটা আমার স্মরণীয় দিন: কারণ বেদনা আনন্দের চেয়ে মনে দাগ রাখে বেশী। শুধু শুনতাম মা আমার জলে ডুবে মারা গেছে।

বাবা আমার যে দিন বিয়ে করে নোতুন মাকে ঘরে আনলেন সেদিন আমি বাড়ীতে উপস্থিত থাকলে বলতাম—সেটা আমার একটা স্মরণীয় দিন,—কিন্তু সে দিন আমি

কলকাতায় মিশনারী হোষ্টেলে, আর আজও আমি সেখান থেকে পরীক্ষা দিচ্ছি।

হোষ্টেলে সেই ঘণ্টা বাজলে—ওঠা, পড়া, ঘণ্টা বাজলে খাওয়া, স্কুলে যাওয়া, ঘণ্টা বাজলে খেলা, শোওয়া,—এর মাঝে আর বৈচিত্র্য কোথায় ?

কিন্তু ছ'মাস আগে একটা দিনে কি করে আমার জীবনটা একেবারে ওলোট পালট হয়ে গেল, সেই কথাই আজ বলব।

কয়েকদিন ধরে কাগজে দেখছিলাম এমপায়ারে উর্ব্বশীরাণীর নৃত্য হবে। উর্ব্বশী বাঙ্গালীর মেয়ে, পাশ্চাত্যে তিনি নৃত্য-কলা দেখিয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করে এসেছেন। তাঁর অগ্নি-নৃত্য, অসি-নৃত্য, চন্দ্রকলা, সাগর-নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাচের সঙ্গে আমার নাড়ীর বুঝি একটা যোগাযোগ আছে—নইলে হোষ্টেলে মিস্ গিলিংস যখন পিয়ানো বাজাতেন তখন ঘরে কপাট দিয়ে নাচতাম কেন ? বন্ধুরা গান ধরলে বা নিজে গান গাইলে ভেতর থেকে প্রাণটা দুলে উঠ্‌তো কেন ?

রবিবারের 'পারফরমান্স' সাড়ে পাঁচটায়—সুতরাং অনুমতি পেতে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। সমীর, নির্ম্মল, কান্তি, প্রমথেশ ও আমি—পাঁচজনে কন্‌সেসানে টিকেট পেলাম। মিস্ গিলিংস্ নিজে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে এলেন। তাঁর কোথায় 'এন্‌গেজমেণ্ট' ছিল, বলে গেলেন গাড়ী নিয়ে তিনি সাড়ে আটটায় ফিরবেন, আরও দু'চার মিনিট দেরী হ'তে পারে, আমরা যেন অপেক্ষা করি।

বাঁচলাম বাবা ! বুড়ী থাকলে আমাদের সকল স্ফূর্ত্তি একেবারে মাটী হ'ত আর কি !

সোয়া পাঁচটায় 'কনসার্ট' সুরু হ'ল, কি দেখব কি জানি—আমার বুকের ভেতর নৃত্য সুরু হ'ল। প্রমথেশ ঠাট্টা আরম্ভ করলে, তোকে নামিয়ে দিলেও হয়, মেয়ে সাজালে ধরবার উপায় নেই—বলবো এই উর্ব্বশী রাণীর নৃত্য।

নির্ম্মল বল্‌লে, চিবুকে আবার তিল !

কান্তি বল্‌লে, বাঁ গালে আবার টোল !

কেমন লজ্জা করছিল।...আলো নিভে গেল, এবার কি দেখব বলে উৎগ্রীব হয়ে রইলাম। ষ্টেজ থেকে পর্দ্দা সরে গেল, আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লাম—দেখি সমস্ত ষ্টেজ খানায় আগুন ধরে গেছে, আর তার লেলিহান শিখা বাতাসে কাঁপছে। কিন্তু কেউ চীৎকার করে উঠে না কেন ? আগুন ক্রমে এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হল—তার মধ্যে একটী নারী—অবনত-মুখী, তার গায়ে চারিদিকের কাপড় দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রাণটা আমার ভয়ে শিউরে উঠছিল : সত্যি পুড়ে মরবে না ত !

আলো বদলে গেল : মেয়েটী মুখ তুলে দাঁড়িয়ে হাসছে—যেন বলতে চায় অগ্নি-পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হ'ল। সারা গা তার পাতলা রেশমী কাপড়ে ঢাকা। চারিদিক থেকে করতালি পড়লো।

আলো নিভলো, উর্ব্বশীকে হারালাম আমরা। প্রমথেশ আমার গা টিপে বল্‌লে, কেমন—বলিনি,—কতটা মিল আছে তোর সঙ্গে দেখলি ত !

নির্ম্মল বললে, ওরই মত ছিপছিপে !

কান্তি বললে, বয়স কত হবে রে, ত্রিশ বত্রিশ নয় ?

কেউ কোন উত্তর দেবার আগেই আবার নৃত্য সুরু হ'ল : জোছনা রাত্রে চন্দ্রকলা ও কামকলা নৃত্য। এইবার আমরা সত্যি সত্যি উর্ব্বশীর রূপ দেখতে পেলাম—চোখে আমার স্বপ্ন ঘনিয়ে এল, হৃদয় অবশ হয়ে এল। এ যেন আমার অনেক দিনের চেনা ইতিহাস। বাঁশী বাজছিল, ক্রমে সুর মিলিয়ে গেল, উর্ব্বশীও ধীরে ধীরে জোছনার মাঝে হারিয়ে গেল।

এরপর হ'ল অসি-নৃত্য, সাগর-নৃত্য, 'ব্লুম্ অব্ এ লিলি'। প্রত্যেক নৃত্যটা এর অপরূপ সুন্দর, অনবদ্য। জীবনের এক নোতুন অধ্যায়ের দ্বার খুললো আমার। সব চেয়ে ভালো লাগলো ওর শেষ নৃত্য আত্মাঞ্জলি : ভক্ত তার নিজের জীবন নৃত্যের মাঝে ভগবানের পায়ে নিবেদন করে দিচ্ছে। এইটাই বোধ হয় ওর মাষ্টার-পিস্। চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন আর এ জগতে নাই, ওর দেহটাই শুধু নাচের তালে তালে তাঁর পায়ে এগিয়ে দিতে চাইছে, আত্মাটা অনেক আগেই অঞ্জলি দেওয়া হয়ে গেছে। নাচতে নাচতে উর্ব্বশী কোথায় মিলিয়ে গেল। প্রেক্ষাগৃহে যবনিকা পড়লো।

নাচ এই প্রথম দেখলাম বলেই হ'ক অথবা উর্ব্বশী রাণী সত্যি ভালো নেচেছে বলেই হ'ক—মনে মনে তাকে আমি 'অ্যাডোর' করলাম। আর সত্যি বলতে কি সামনা সামনি তাকে একটু দেখে নিতে ইচ্ছাও মনে জেগেছিল।

* * *

দর্শকেরা প্রায় সব চলে গেছে, কিন্তু মিস্ গিলিংস্ না এলে আমাদের যাবার উপায় নেই, তাই থিয়েটারের টিকেট ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জটলা করছিলাম। দুষ্টু-বুদ্ধি এতক্ষণে ফিরে এসেছিল তাই সমীর আর নির্ম্মলের কাছে সাগর-নৃত্যের 'পোজটা' দেখাচ্ছিলাম, আমার হাত মুখ চোখের ভঙ্গী দেখে ওরা হাসছিল, কিন্তু তত গ্রাহ্য করিনি, হঠাৎ একটী পশ্চিমী লোক আমার সামনে এসে বললে, খোকাবাবু, উর্ব্বশী রাণী আপনাকে সেলাম দিচ্ছেন।

আমাকে ?

জি হুজুর

শুনে বুকের মাঝে ধড়াস্ করে উঠ্‌লো, নির্ম্মল ও সমীর পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করে নিল। চেয়ে দেখি আমাদের সামনে এক-খানা মোটরে উর্ব্বশী রাণী মৃদু মৃদু হাসছে। এগিয়ে গেলাম, ভয়ও একটু করলো, কি

মনে করেছে কি জানি, হয়ত মনে করেছে ওকে ঠাট্টা করছিলাম। এগিয়ে গিয়ে বললাম, নমস্কার।

ও নমস্কার করে বল্‌লে, খোকা তুমি নাচ শিখবে?

লজ্জায় আমার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। বাধা কত তাও জানি, তবু তখন যেন আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম, বললাম, শিখবো।

উর্ব্বশী রাণী কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপর বল্‌লে, আস্‌তে পারবে আমার সঙ্গে এখন আমার বাসায়?

এত বড় একটা প্রলোভন, জয় করা কত কঠিন, তবু মিস্ গিলিংস্‌এর কথা স্মরণ করে আমার বলতে হ'ল, না, এখন না, আপনার ঠিকানা দিয়ে যান, কা'ল আমি আপনার সঙ্গে দেখা করবো।

সমীর, নির্ম্মল প্রমথেশ ও কান্তি এগিয়ে এল। নির্ম্মল বললে, যা না! আমরা সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টকে বলবো—তোর কাকা এসে তোকে নিয়ে গিয়েছেন, আবার রাত্রে পৌঁছে দেবেন।

শুনে উর্ব্বশী রাণী একটু হাসলে, বল্‌লে, আচ্ছা থাক্ কালই এসো। তোমরা সব এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

বললাম, সাড়ে আট্‌টায় সুপারিন্‌-টেণ্ডেণ্টের গাড়ীতে যাবো।

উর্ব্বশী নিজের নামের কার্ড দিয়ে বল্‌লে, কাল সন্ধ্যা ছটায় দেখা করো, অন্যথা না হয়,—বলে আমার মুখের দিকে বেশ ভালো করে তাকিয়ে দেখলে,—আর তোমার ঠিকানাটা আমায় দাও।

আমার কাছে কাগজ ছিল না, কলম ছিল। উর্ব্বশী নিজের কাছ থেকে এক-খানা কার্ড বের করে বললে, তোমার ঠিকানাটা লিখে দাও।

তাড়াতাড়িতে ঠিকানাই লিখিলাম, নামটা আর লিখিনি। উর্ব্বশীর আর আর সঙ্গীদের নিয়ে গাড়ী চলতে সুরু করলো, আমরা আবার উপরে উঠে দাঁড়ালাম। নির্ম্মল বলে উঠ্‌লো, আর কি এইবার কেল্লা ত মার দিয়া, উর্ব্বশী তোর প্রেমে পড়ে গেছে, যা বিলেত চলে, নাচ শিখ গিয়ে।

নিজের অবস্থাটা আমি তখনও ভালো করে বুঝতে পারি নি, স্বপ্ন দেখছি না ত! মাথাটা ক্রমেই ঘুলিয়ে যাচ্ছিল একি হ'ল! সমর ও নির্ম্মলের কথা কানেই ঢুকছিল না; বুকের ভেতর কেমন করে আসছিল। কি যেন একটা ভাবতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কে যেন ডাকলে—বাবু!

চেয়ে দেখি সেই পশ্চিমী লোকটা। বললে বাবু, উর্ব্বশী রাণী জিজ্ঞেস করছেন, আপনি কি এখনই একটু আসতে পারবেন? একঘণ্টা পরে আপনাকে আমি পৌঁছে দেবো, উনি গাড়ীতে অপেক্ষা করছেন।

কি উত্তর দেবো ভেবে পাচ্ছিলাম না, প্রমথেশ এবার গম্ভীর হয়েই বললে, তুই যা, আমরা এদিকে ব্যবস্থা করে নেবো। আমি যন্ত্র-চালিতের মত লোকটার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। উর্ব্বশী হাত ধরে আমায় উঠালে, দেখলাম এবার সে একটু গম্ভীর হয়ে পড়েছে, আমাকে পাশেই বসালে। বিলিতি সেণ্টের গন্ধে আর উর্ব্বশীর গায়ে গা লেগে আমি ক্রমেই কেমন হয়ে পড়লাম। উর্ব্বশী আনমনা হ'য়ে কি যেন ভাবছিল।... এ কি প্রেম? আশ্চর্য্য! কি করে হয়! ও যে কত বড়! আমি সুন্দর তা জানি, কিন্তু উর্ব্বশীরাণীর মত খ্যাতনামা একজন নর্ত্তকী—? আর তা ছাড়া আমি যে কত ছোট, আমার কেমন যেন ভয় করছিল।

বাসায় পৌঁছে উর্ব্বশী নিজে হাত ধরেই আমায় নামালে। হঠাৎ যেন কোন রাজ-কন্যার পুরীতে এসে পৌঁছিলাম। আমাকে একটী সু-সজ্জিত কক্ষে বসতে দিয়ে উর্ব্বশী আর এক ঘরে চলে গেল, বললে একটু বসো আমি আসছি।

কয়েক মিনিট পরে বেয়ারা এক কাপ কফি আর বিস্কুট নিয়ে এলো। খাওয়ার প্রবৃত্তি তখন আমার ছিল না, তবু কফিতে চুমুক দিলাম,—তখন মন আমার নেতিয়ে পড়ছে: ভাল করলাম কি মন্দ করলাম—কিছুই বুঝছিলাম না।

আরও মিনিট পাঁচেক পরে দেখি উর্ব্বশী ফিরে এল, দেখলাম—মুখহাতের রঙ বেশ ভালো করে ধুয়ে সাড়ী বদলে এসেছে, মূর্ত্তি অনেকটা শান্ত, সৌম্য। ভেবেছিলাম আমার সামনে কোথায়ও বসবে, কিন্তু তা না করে, কৌচে আমার পাশেই এসে বসলো। আমার কফি খাওয়া শেষ হয়েছিল, আমি সঙ্কুচিত হয়ে এক পাশে সরে বসলাম। উর্ব্বশী একটু হেসে আমার একখানা হাত নিজের হাতের মাঝে টেনে নিয়ে বল্‌লে, অত সঙ্কোচ কেন তোমার? আমি হাসলাম।

উর্ব্বশী আমার দিকে তাকিয়ে রইল: হাসলে আমার বাঁ গালে টোল খায়—তাই দেখছে কি!

উর্ব্বশী আবার গম্ভীর হয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, নাচ ভাল লাগে তোমার?

খুব।

কেন?

জানি না, ছেলেবেলা থেকেই খুব ভাল লাগে।

উর্ব্বশী আবার হাসলে: খুব বড় হয়েছ বুঝি!

আমি লজ্জা পেলাম। আমার হাতখানা নাড়তে নাড়তে উর্ব্বশী বললে, যাবে আমার সঙ্গে নাচতে?

আমি ত জানিনে কিছু।

আমি শিখিয়ে নেবো।

যাবো।

উর্ব্বশী আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌লে, বাড়ীর জন্য মায়া করবে না? মা কাঁদবে না?

মা নেই, বাবা আবার বিয়ে করেছেন।

উর্ব্বশী আমার মুখের দিকে চেয়ে কি যেন দেখতে লাগলো. তারপর আবার মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা তোমার নামটা কি তাও বলোনি, কার্ডেও লেখনি।

বললাম, পরিমল ব্যানার্জ্জি।

উর্ব্বশী ক্রমেই যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে, কেমন করে আমার দিকে তাকাচ্ছে : ও আমায় দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত খানি পান করে নিতে চায় না কি!

প্রশ্নও থামে না, বলে, সবাই তোমায় পরী বলে ডাকে বুঝি?

বললাম, হ্যাঁ।

বাড়ী কোথায়?

যশোর--শান্তিগ্রাম।

তুমি খুব বড়লোকের ছেলে বুঝি?

হাঁ, আমার বাবা ওখানকার জমিদার।

যাবে তুমি আমার সঙ্গে, যাবে? উর্ব্বশী ক্রমেই আমায় টানচে—যাবে?

আমার কেমন ভয় করছিল, আবার আনন্দও হচ্ছিল, বললাম যাবো।···ও কি সত্যি আমায় ভালবেসে ফেললো!

আচ্ছা কি নামে ডাকবো তোমায়—পরী —কেমন?

তাই ডাকবেন।

হাঁ, তাই,—নাচের পক্ষে তাই আমার সুবিধে হবে।

···উর্ব্বশী ক্রমেই আমায় টানচে কেন? কেমন করে তাকাচ্ছে! ...ও কি চায়! বুকের মাঝে আমার কেমন করতে লাগলো, মাথার মাঝে কেমন করে উঠলো। বইয়ে যে সব কথা পড়েছি এ কি তাই! ও কি আমায় 'কিডন্যাপ' করতে চায়! ভয়ে, বিস্ময়ে, আনন্দে মুহূর্ত্তের জন্য চোখ আমার বুজে এসেছিল বুঝি, সেই ফাঁকে উর্ব্বশী আমায় এক হ্যাঁচকা টানে বুকের উপর টেনে নিয়ে আমার গালে, মুখে, চোখে, আমার মুখের তিলে, হাসলে যেখানে টোল খায় সেখানে—পাগলের মত চুমু দিতে লাগলো। ও হাঁপাচ্ছে :—মানিক আমার, সোনা আমার, ওঃ, ওঃ, ওঃ—মাই ডলিং, মানিক, ওঃ, ওঃ.... .

উর্ব্বশীর এ কি হল! ভয়ে আনন্দে আমি প্রায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লাম—শুধু অনুভব করছিলাম আমি ওর বুকের কম্পনে দুলছি। আমি ক্রমে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ছি বুঝে উর্ব্বশী প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলো, পরী তুই আমায় চিনতে পারিসনি! আমি যে তোর মা!

গরম গরম জলের ফোটা আমার মুখের উপর টস্ টস্ করে ঝরে পড়তে লাগলো। আমার বুকে অসহ্য আনন্দ হচ্ছিল, জ্ঞান আমার ফিরে আসছিল। আস্তে আস্তে বললাম,—তুমি মা!···তুমি নাকি মরে গিয়েছ?

কাঁদতে কাঁদতেই মা বললে, তাদের কাছে মরেছি আমি তোর কাছে নয়।··· তুই আমার সঙ্গে যাবি সত্যি?

যাবো, কিন্তু তুমি আমায় চিনলে কেমন করে বলত?

মা আমার চোখের দিকে চেয়ে বললে, নিজের রূপ নিজে দেখে চিনবো না! তা ছাড়া,—আমার গালের তিল আর টোলে চুমু খেয়ে বললে,—এই যে চিহ্ন রয়েছে যে!— আর সবার উপর তোর নাচের ভঙ্গী দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল।

সেদিন রাত্রে মা আমায় আসতে দেয়নি : মিস্ গিলিংস্‌এর কাছে ফোন করে মা আমার রাত্রের ছুটী চেয়ে নিয়েছিল।

দেশে আমার কে আছে? সেখানে ত নোতুন মায়ের রাজত্ব। মার সঙ্গেই বিদেশে যাবো,—কেন যাবো না?—মা ত আমায় প্রাণ ভরেই ভালবাসে।

*

···মার্ক কিন্তু কাটবেন না, স্যার : এর চেয়ে 'মোর ইম্পর্ট্যান্ট ডে'—জীবনে আমার আর নেই।

দেহ-যমুনা

[নাটক]

শ্রীবিশ্বায়ক ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(যতীনের প্রবেশ)

প্র—যতীন! আমি বাথরুমে চল্লাম—আমার একটি বন্ধুর আসবার কথা আছে,—যদি আসে বসতে বলবি। বুঝলি!—আর শোন্।—আচ্ছা ডাক্তার বাবু কখন কখন এখানে আসেন রে?—

য—একবার সকালে আর একবার বিকেলে।

প্র—থাকে কতক্ষণ?—

য—তা ঠিক নেই—কখনো আধ ঘণ্টা কখনো একটু বেশী।

প্র—এই ঘরেই বসে টসে বোধ হয়।

য—হঁ্যা। কেবল অসুখের সময়—বৌদিমণির শোবার ঘরে ডাক্তারবাবু যেতেন।

প্র—হু

য—বাবু একটা কথা বল্‌বো?

প্র—কি বল? (একটু অপেক্ষা করে) বল না!

য—আপনি আবার কবে থেকে বাড়ীতে থাকবেন বাবু। বৌদিমণি তো তাই রোজ রাত্তিরে কাঁদে।

প্র—কাঁদে! কাঁদে কি রে?—

য—হঁ্যা বাবু। রোজ রাত্তিরে বারোটা একটার সময়—আমি পষ্ট পাশের ঘর থেকে শুনতে পাই—বৌদিমণি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

প্র—রোজ রাত্তিরে কাঁদে! তুই বলছিস্ কি!

য—আমি কি মিথ্যে বল্‌ছি বাবু।—আমি একদিন জিজ্ঞেস কোরেছিলাম—তাতে তিনি বললেন—তুই ভুল শুনেছিস্।

প্র—হু। আচ্ছা—যা তুই—তাকে একবার বলিস্—না-না দরকার নেই।

য—বৌদিমণিকে কিছু বলবো?—

প্র—বলবি?—আচ্ছা বলিস্ আমি একবার ডেকেছি।

(দুজনেই দুদিকে চলিয়া গেল)

(অণিমা ও সুস্নাতার প্রবেশ)

অ—তারপর কি হোল?

সু—তারপর আর কি হবে? বিয়ে না করা ছাড়া উপায় ছিল না—কাজেই কোরতে হল বিয়ে। টাকা কড়ি, লোকজন, বাড়ীঘর—সব কিছুরই প্রাপ্তি ঘটলো জীবনে। সুখ শান্তিরও অভাব হোল না।

অ—তারপর?

সু—প্রথম প্রেমের অনাস্বাদিত মধু নিঃশেষ হোতে লাগলো—দিনের পর দিন।

অ—তারপর?

সু—পতি দেবতা আমার এতদিন খুসীই ছিলেন। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার কোরলাম—যে তিনি আমার উপর বীতরাগ হয়েছেন। অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে

নাচ আমার শিখতেই হবে,—রক্তে আমার নাচ রয়েছে; কিন্তু মা বলেছে তার আগে আমার অক্সফোর্ডের পরীক্ষাগুলি পাশ করে নিতে হ'বে।

আর ম্যাট্রিক পাশ না করলে মা আমায় সঙ্গেই নেবে না। আর—আমার পরীক্ষার ফল বের হওয়া পর্য্যন্ত মা এখানেই থাকবেন আমারই জন্য।

সুতরাং আমার মিনতি—সত্য কথা বলেছি বলে মার্ক আমার যেন না কাটেন। তা'হলে পাশ করবই, বিলেত আমি যাবই, নাচ আমি শিখবই।

* * *

ছেলেটা এসেটা এইখানে শেষ করেছে। আচ্ছা আপনাদের কি মনে হয়—ঘটনাটা কি সত্যি?

থাকবার মেয়ে আমি নই। একদিন straight জিজ্ঞেস কোরলাম—

অ—কি উত্তর পেলি!

সু—তা বেশ! উত্তর এল "তুমি আমার সাহায্যের পক্ষে যথেষ্ট modern নও। যদি এখানে থাকতে চাও তবে প্রশ্নহীন নীরবতায় কাল কাটাতে হবে—নইলে—"

অ—নইলে?

সু—নইলে আমার একলা বাস করার পক্ষে কোলকাতা যথেষ্ট বড় জায়গা।

অ—তার মানে—তিনি তোকে তাড়িয়ে দিলেন বল্?

সু—হ্যাঁ তাড়িয়েই দিলেন। যথেষ্ট মিষ্টি কথা এবং যুক্তির পাথেয় দিয়ে।

অ—তুই মুখ বুজে এই অবিচার কেন সহ্য করলি?

সু—কেন সহ্য কোরলাম! না সহ্য ক'রে উপায় ছিল না ব'লে! তুই জানিস্‌নে অনি—আমার কথা কাউকে বলবার নয়। বিয়ের পূর্ব্বেরও না—পরেরও না। মোহ জিনিষটাই এমনি। বিয়ের আগের মায়াজাল—বিয়ের পরে যখন ছিঁড়ে গেল—মোটেই বিস্মিত হলাম না। আমার যা পাওনা—তার থেকে আমাকে বাঁচাবে কে?

অ—অথচ তুই বললি যে সেই লোকটা বিয়ের আগে তোকে—

সু—হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাতেও অবাক হবার কিছু নেই।

অ—Scoundrel!

সু—মোটেই না। পুরুষ—সে যে শাশ্বত,—সে যে সনাতন,—সৃষ্টির সুরু থেকে কখনও কোন নারী কোনো পুরুষের কাছ থেকে সুবিচার পেয়েছে বলতে পারিস্?—না পায়নি। কারণ নারীর ইতিহাসে আছে শুধু দান—শুধু দান—গ্রহণে তার মহাপাপ।—

(যতীন দুই কাপ চা দিয়া গেল)

য—আপনার কাপড় জামা বার ক'রে—বৌদি-মণির ঘরে রেখে এসেছি।

(চলিয়া গেল)

সু—অথচ এর প্রতিবিধানও নেই।—

অ—প্রতিবিধান নেই এমন কথা বলিস্‌নে।—

সু—না প্রতিবিধান নেই। আমি বলছি প্রতিবিধান নেই।

অ—হবে।

সু—তাই আমি ঠিক করেছি অনি—আমি modern হবই। তার জন্যে নয়—আমার নিজের জন্যেই। modern কাকে বলে আমি জানতে চাই।

অ—তা তার নাম তুই বল্‌ছিস্‌নে কেন?

সু—হিন্দু মেয়ের স্বামীর নাম মুখে আনতে নেই—তাতো তুই জানিস।—ইহকাল তো গেলই—পরকাল তো—আমার দেখতে হবে। (প্রস্থান)

(প্রদ্যোতের প্রবেশ)

প্র—তুমি বোধহয় শুনে থাকবে—আমি যতীনকে দিয়ে একবার তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।—

অ—কেন?—

প্র—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস্ কোরব ব'লে।—

অ—আমার অপেক্ষা কোরবার সময় নেই—কাজ আছে।—

প্র—কাজ আছে?—আমার কথা যদি তুমি শুনতে ইচ্ছা না কর তবে যাও।—

অ—এতক্ষণ কথাটা বলা হয়ে যেতো।—

প্র—না যেতো না।—আমি জানতে চাই তুমি এ রকম ব্যবহার আমার সঙ্গে আরম্ভ করেছো কেন?—

অ—কি রকম ব্যবহার?

প্র—এ কথাও কি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে?—

অ—না, বলতে হবে না—কিন্তু আমি কেন এ রকম ব্যবহার কচ্ছি—এ কথাও তোমাকে বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই।

প্র—শোন! তোমার সম্বন্ধে সহ্য করার সীমা তুমি অতিক্রম করেছো আমি আর সহ্য কোরব না।—

অ—এ কথা বহুবার শুনেছি।—

প্র।—আশ্চর্য্য! গীতার কথা যখন ভাবি—

অ—তখন? বল—বল—গীতার কথা যখন ভাবো—তখন? তখন-কী?

প্র—তখন দেখি যে সে-ও নারী—তুমিও নারী—কিন্তু কি তফাৎ!

অ—তফাৎ! তফাৎ তো থাকবেই।—

—তার সঙ্গে একজন কুলবধুর যথেষ্ট তফাৎই তো থাকা উচিত।—

প্র—তার মানে? গীতা কুলবধূ নয়?—তা সে সত্যিই নয়। কিন্তু কুলের গর্ব কোরছ,—কোন্ কুলের বধূ তুমি? যে কূল ভাঙছো—না যে কূল গড়ছো?

অ—তুমি যাও—যাও,—আমার সামনে থেকে—যাও বলছি এক্ষুণি।—

প্র—কথাগুলো সহ্য কোরতে পারছ না না?—আচ্ছা চল্লাম—আমি।—

(চলিয়া গেল)

(স্বপনের প্রবেশ)

অ—স্বপনবাবু! আপনি গীতার ঠিকানা জানেন?—

স্ব—নিশ্চয়ই জানি।—কিন্তু কেন?

অ—আমাকে সেখানে একবার নিয়ে যেতে পারবেন?—

স্ব—আ-প-না-কে?—গীতার—বাড়ী!

অ—হ্যাঁ, আমি একবার তাকে দেখতে চাই।—দেখবোই আমি তাকে! পারবেন নিয়ে যেতে?

স্ব—দেখুন, আপনার নিজের চোখে সেগুলো দেখা—

অ—না—না—মিঃ রায়, আমি নিজের চোখেই দেখতে চাই—

স্ব—নিজের চোখেই দেখতে চান? কিন্তু আমি প্রদ্যোতের বন্ধু—মানে বুঝলেন না?—

অ—বুঝেছি। আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন কি না? আমি যাবোই।—

স্ব—বেশ আপনি যখন বল্‌ছেন···কিন্তু,

অ—বলুন।

স্ব—আপনি যে যাবেন—সে কথা কাউকে জানাতে পারবেন না,—আর সেখানে গিয়ে আমার কথা অনুযায়ী আপনাকে চলতে হবে।—

অ—তাই হবে।—

স্ব—আচ্ছা তবে আজকেই সন্ধ্যের সময়—কেমন?

অ—আচ্ছা।—

স্ব—তবে আমি এখন চল্লাম। হ্যাঁ, আর একটা কথা—আপনি তখন আমাকে যেতে বলেছিলেন—কিন্তু তিনদিন আগে আমি একজনকে কথা দিয়েছিলাম—সেখানে খাবো ব'লে—আজকের মত যদি ক্ষমা করেন—

অ—আচ্ছা।—

(স্বপনের প্রস্থান)

(সুস্মাতার প্রবেশ)

স্ব—কোথায় যাবি আজকে?

অ—চুপ—কাউকে বলিস্ নে। যাবো একটা যায়গায় বেড়াতে।

সু—কোথায় ?—কথা কইছিল কে ?—

অ—ডাক্তার স্বপন রায়।—

সু—কে—কে বল্লি ?—

অ—ডাক্তার স্বপন রায়।—

সু—স্বপন রায়! না—না—অনিমা—না—না—

অ—কি আশ্চর্য্য! অমন করছিস্ কেন ?—স্বপন রায়কে তুই চিনিস্ নাকি ?—

সু—না— বোধ হয়— কিন্তু না—বেড়াতে যাস্নে তুই।—

অ—কী আশ্চর্য্য! অমন করছিস্ কেন ? আমার বেড়াতে যাওয়ার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কী ?—

সু—সম্বন্ধ আছে।—দোহাই তোর,—তুই আর ভুল করিসনে অনু।

(দ্রুতবেগে প্রস্থান)

অ—আমি আর ভুল করবো না—কিন্তু কেন ?—

(ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল)

যবনিকা

ক্রমশঃ

খোলা-চিঠি

জ্যোৎস্না গুপ্তাকে

জ্যোৎস্না,

রূপের খানিকটা জৌলস ক্যামেরার সামনে ধরা পড়ে বলে'—আজ আমি তোমায় বলতে এসেছি—সে জন্য, আজীবন তুমি নিশ্চিন্ত থেকো না। রূপসী তুমি ঠিক নও, রূপশ্রীর একটি ছায়া মাত্র। পর্দ্দার ওপর প্রথম সে ছায়া যখন পড়্‌লো তখন আমার কী মনে হয়েছিলো জানো ?—মনে হয়েছিলো, তুমি মোমের একটি পুতুল, মুখ নাড়ো, আর এখানে সেখানে করো আনা-গোনা। ভাগ্যিস্ সে অবস্থা তোমার ওপর বেশীদিন স্থান পায় নি! পেলে এতোদিন আমার মত ক'টি সমালোচকের গরম কথায় সে মোমের পুতুল নিশ্চয়ই গলতো!

"মানময়ী"তে মনে হ'লো তোমার অভিনয় আব্‌ছা খানিক প্রাণের পরশ পেয়েছে। কিন্তু, সে প্রাণের পরিমাণ সাগরের তীরে একটি বালুর কণা। অভিনয়ে আরো প্রাণের দরদ তোমার চাই। ছবির এই ছায়ার পথে তা না হ'লে তোমার পায়ের জন্য অনেকগুলোই কাঁটা!

অভিনয়ে এই দরদ আনাটা জ্যোস্না, তোমায় নিজেই শিখ্‌তে হবে। কারণ, আমি জানি, শেখাবার লোক আমাদের দেশে নেই। নেই বল্‌লে অন্যায় করবো, আছে—কিন্তু, সে অত্যন্ত অল্প। তুমি নিজে যতটুকু শিখ্‌বে ততটুকুই যথেষ্ট।

এখন ভাব্‌বার জিনিষ হচ্ছে, সেই শিখ্‌বার শক্তি তোমার আছে কিনা! সত্যি কথা বল্‌তে কী—আমার সন্দেহ হয়।

যদি থাকে, কোনো কথা নেই। সুনামের সোণালী পথে তখন তোমার একচ্ছত্র আসা যাওয়া!

আর, যদি না থাকে! তা'হলে বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি—ওহে মেয়ে, তুমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য একটি মেয়ে; তুমি জ্যোৎস্না হ'লেও অমাবস্যা। তোমার তুলনা চক্‌চকে ভাঙ্গা একটি আলোর! যে নাকি পথের ধারে পড়ে' রয়েছে, সবাই দেখ্‌ছে কিন্তু নিচ্ছে না। সে পড়েই আছে। গেলো গ্রীষ্ম, এলো বর্ষা। জল পড়ে' পড়ে' মরচে ধরলো তার গায়ে। তারপর, আরেকদিন সূর্য্য হয়তো উঠ্‌লো—সাড়া পড়্‌লো হয়তো গাছের শাখায় শাখায়, কিন্তু রবি-কর তার গায়ে আর পড়্‌লো না!...

এই তো গেলো আসল কথা। এখন যার জন্য আজ তোমার এই অনেকটা অযোগ্য আদর—সেই সম্বন্ধে কিছু বলি। গোড়াতেই বলেছি—তুমি রূপসী নও, রূপশ্রীর একটি ছায়া মাত্র। বাংলার এই শিশু শিল্পে তোমার নামের একটু আঁচড় রাখতে হ'লে তোমার ঐ শীর্ণ শরীরে আরেকটু বেশী শ্রীর প্রয়োজন। আরেকটু স্বাভাবিক আবরণ।

ছিটে ফোঁটা

বজ্রবাহু

আজকাল মাসিক সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় যে সব কবিতা দেখা যায় সেগুলির অধিকাংশই Personal. ব্যর্থ প্রেমিক প্রেমিকাদের হা হুতাশ, নিরাশা আর চোখের জলে ভারাক্রান্ত। এগুলির দ্বারা লেখক লেখিকাদের কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় কিনা বল্‌তে পারি না তবে সাহিত্য সৃষ্টি না হয়ে ডেঁপোমি এবং ন্যাকামীর যে সৃষ্টি হয় তাতে আর কোন সন্দেহই নেই।

সম্প্রতি শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী এক নাতি দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন—'ভ্রষ্ট লগ্ন' এবং বঙ্গশ্রী সম্পাদক তা সসম্ভ্রমে পত্রস্থ করেছেন! এ বিষয়ে আমাদের অবিশ্যি বলবার কিছুই নেই। বাজারে মাসিক সাপ্তাহিকের অভাব নেই—হাতের কাছে কাগজ কলম আছে এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্রীমতীর অল্প বিস্তর নাম ডাকও আছে; সুতরাং শুধু 'ভ্রষ্ট লগ্ন' কেন অনেক কথাই তিনি লিখতে পারেন। তবে এ 'ভ্রষ্ট লগ্ন' যদি কবির Personal Matter হয় তবে যার "জীবনের শূন্য পুরী হইয়াছে বুঝি বা দুর্ব্বহ" এবং 'যে স্বেচ্ছায় উপেক্ষা ভরে প্রেমের সাম্রাজ্য ভূমি ত্যজেছিলো' 'প্রিয়ার সহজ প্রেম,' এবং 'সুন্দর প্রাণের স্নিগ্ধ নীড়' প্রত্যাখ্যান করেছিলো তার কাছেই চুপি চুপি জানালে বেশী ফলপ্রদ হত। এ ধরণের কবিতা সাধারণে না প্রকাশ করাই ভালো।

* * *

উক্ত সংখ্যাতে শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায় চৌধুরী একটি গল্প লিখিয়াছেন 'শনি—রবি—সোম।' গল্পটি সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই—গল্পটি ভালোই হয়েছে। গল্পটির একস্থানে লেখক 'পাইরেক্স' সম্বন্ধে এক চমৎকার বিজ্ঞাপন এঁটে দিয়েছেন!—লেখক গল্প লেখা অপেক্ষা Publicityর কাজে আরও হাত পাকিয়েছেন বেশী—অতঃপর লেখককে কোন এক Officeএ publicity officerএর কাজে বাহাল হতে দেখলে আমরা খুশীই হব। এই দুর্দ্দিনের বাজারে লেখক এবং 'বঙ্গশ্রী' সম্পাদকের নিশ্চয়ই কিছু পাওনা হয়েছে!

* * * *

উক্ত সংখ্যায় আর একজন কবি শ্রীবীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী পাদ পূরণ কবিতা (?) লিখেছেন—"মমতা, সীমাবদ্ধ, অন্ধ স্নেহ, অভিলাষ।" দুইটি লাইনের মধ্যে এক একটি ভাবকে ভাষার দ্বারা ছন্দোবদ্ধ করেছেন। "মমতা" সম্বন্ধে কবি লিখ্‌ছেন,—

"উড়ে গেলে মন কাঁদে পোষা-পাখী তরে।
ছে'ড়ে যে'তে মায়া হবে কেন না ধরারে?"

অতঃপর কবির লেখা "ছাই, পাশ, আপদ, বালাই" বঙ্গশ্রীর পৃষ্ঠায় পত্রস্থ হতে দেখবার বাসনায় রইলুম।

* * *

এই সংখ্যায় পরিশেষে "নব বর্ষের জয় যাত্রার" বন্দনা গান গেয়েছেন শ্রীশৌরীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।—

কবি আফশোষ করে বলেছেন:—

তোমাকে দেখ্‌লে মনে হয়—যেন—এই মাত্র খুব ভীষণ একটি অসুখ থেকে তুমি উঠে এসেছো। তোমার দেহের শিরায় শিরায় রক্তের প্রবাহ বেশ কম। উপযুক্ত খানিক যত্ন নিলে এই দেখানো দুর্ব্বলতা তোমার কম্‌তে পারে।

আজ আর বেশী কিছু বল্‌তে ইচ্ছে যাচ্ছে না। তবে, যৎটুকু বলেছি তার একটু যদি তুমি মেনে চলো—তা হ'লে কিছুদিন পর আমরা সবাই জান্‌তে পারবো—জ্যোৎস্না, তোমার নামের একটা মানে আছে। ইতি

আনিয়াৎ খাঁ

—:০:—

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা

সমস্যার সমাধানঃ
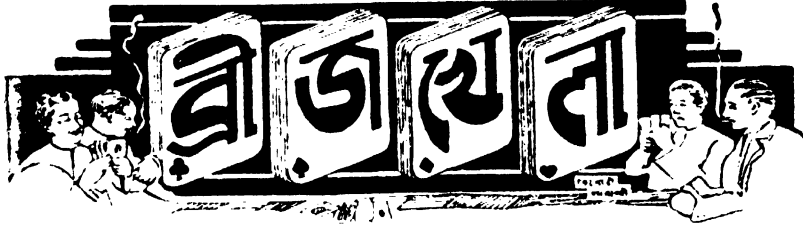
ইস্কাবন—পাঞ্জা, তরি।
হরতন—আটা, চৌক্কা।
রুহিতন—দশ।
চিঁড়িতন—নওলা, তিরি।

ইস্কাবন—চৌক্কা।
হরতন—টেক্কা, ছক্কা।
রুহিতন—সাহেব, পাঞ্জা, তিরি।
চিঁড়িতন—আটা।

	উ	
প		পু
	দ	

ইস্কাবন—বিবি, দশ।
হরতন—তরি।
রুহিতন—নাই।
চিঁড়িতন—সাহেব, দশ, পাঞ্জা, চৌক্কা।

ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম।
হরতন—বিবি, সাতা।
রুহিতন—নাই।
চিঁড়িতন—টেক্কা, গোলাম, ছক্কা।

হরতন রঙ, 'দ' খেল্‌বে। মিলিত হস্তে 'উ' এবং 'দ'কে পাঁচটি পিট নিতেই হবে।

'দ' যথাক্রমে ইস্কাবনের সাহেব এবং রঙের বিবি খেল্‌লেন। যদি 'প' রঙের পিটটা নেন্ এবং রুহিতনের সাহেব খেলেন 'দ' ইস্কাবনের গোলাম পাশাবেন। যদি 'প' পুনরায় রুহিতন খেলেন, 'উ' তুরূপ করবেন এবং চিঁড়ের নওলা খেল্‌বেন এবং এদিকে 'দ' তুরূপের পিটে চিঁড়ে পাশাবেন।

ভেনাস ক্লাবের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুপ্ত আমাদের সমস্যার নির্ভুল উত্তর দিয়েছেন।

ডুপ্লিকেট খেলার জের :— ডুপ্লিকেট খেলায় আটজোড়া তাস ব্যবহারের কথা বলেছি বটে, কিন্তু তার কোন কারণ আপনাদের কাছে উপস্থিত করিনি। এজন্য অনেকেই আটজোড়া তাসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ধাঁধায় পড়েছেন। অতএব তাঁদের জন্যে ব্যাপারটা আরও পরিস্কার করে বল্‌তে চাই। এর কারণটা আপনাদের চোখের সামনে ধরলে আপনারা ভাববেন এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, এ অতি সামান্য কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে আমরা বুঝতে পারব যে সময় সময় এই সামান্য কারণই বাস্তব পক্ষে ভাল খেলায় অনেক বিঘ্ন ঘটাতে পারে। মনে করুন ডুপ্লিকেট-কণ্ট্রাক্ট খেলতে খেলতে এক পক্ষ হয়তো Grand Slam করলেন। এখন সেই তাস অন্য ঘরে নিয়ে যাবার সময় এ ঘরের অনেক দর্শক এই তাস নিয়ে ও ঘরের খেলোয়াড়গণ কিরূপ খেলেন তাই দেখতে ছুটলেন; কিন্তু তাঁদের মুখে চোখে রয়ে গেল এই তাসগুলির অবস্থার ছাপ এবং তাঁদের দীপ্ত মুখচোখ থেকেই উক্ত খেলোয়াড়গণ তাসের অনেক খবর পেলেন, অবশ্য অনেক খানিকটা অনুমানের ওপর। অপর পক্ষে যদি আট জোড়া তাস ব্যবহার করা হত, দর্শকবৃন্দ বা যিনি তাস এ ঘর থেকে ও ঘরে নিয়ে যান তাঁদের কারও তাসের কথা মনে থাক্‌তও না এবং এঘর ওঘর দৌড়াদৌড়িও করার কারণও থাক্‌ত না। সুতরাং তাস জানাজানির সম্ভাবনা এ ক্ষেত্রে একেবারেই নেই। এ ছাড়া গতবারে ডুপ্লিকেট খেলার সম্বন্ধে প্রায় সবই বলা হয়েছে এবারে শুধু খেলোয়াড়দের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে আমাদের প্রবন্ধ শেষ করব। এ খেলায় খেলোয়াড়দের অবস্থা ভেদ দু'রকম পদ্ধতি অনুযায়ী হয়ে থাকে—তা নিয়ে দিচ্ছি।

১নং পদ্ধতি :—এ পদ্ধতিতে যিনি প্রথম তাস দেবেন তিনি হবেন নন্-ভাল্‌নারেবল আর তাঁর বিপক্ষ দল হবেন ভাল্‌নারেবল। এইরূপে তিনহাত খেলা চলবে অর্থাৎ মনে করুন 'ক' যদি প্রথমে হাত দিয়ে থাকেন তা'হলে তিনি হবেন নন্ ভালনারেবল আর তাঁর প্রতিপক্ষ 'অ' হবেন ভালনারেবল। পরের দানে 'অ' যখন হাত দিলেন, তিনি হলেন নন্-ভালনারেবল আর 'ক'র দল হলেন তখন ভালনারেবল। আর তৃতীয় হাতে 'ক'র খেঁড়ী 'খ' হাত দেওয়াতে 'ক'রা হলেন নন্-ভালনারেবল আর তখন 'অ'র

"... ...হেলা সয়তান
রচিয়াছে নিজধাম, করি' অপমান—"
তারপর :—
"... ...হোথা নারায়ণ
অনন্ত শয্যায় র'ল নিদ্রায় মগন।
ভাঙ্গা তুই লীলাঘুম, জাগা নারায়ণে—"
তুই যে মা অনশ্বরা তোর পরশনে—"

কবিতার মিল বার করতে কবিকে দস্তুর মতো ওস্তাদের কসরৎ চালাতে হয়েছে। এ ধরণের কবিতা না লিখলেই চলে না !—

দল হলেন ভালনারেবল। চতুর্থ হাতে উভয় পক্ষই হবেন ভালনারেবল। আবার পঞ্চম হাত থেকে যিনি তাস দেবেন তিনি হবেন ভালনারেবল আর বিপক্ষ দল হবেন নন্-ভালনারেবল। সুতরাং পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম হাতে যথাক্রমে 'ক', 'অ' ও 'ক'র খেঁড়ী 'খ' হবেন ভালনারেবল আর তাঁর বিপক্ষদল 'অ'রা, 'ক'রা এবং পুনরায় 'অ'রা হবেন নন্-ভালনারেবল। অবশেষে অষ্টম হাতে দুই পক্ষই হবেন নন্-ভালনারেবল। এর পর আবার প্রথম হাত থেকে পর পর অষ্টম হাত অবধি যেরূপ চলেচে ঐরূপই চলতে থাকবে। এই পদ্ধতিতে আট হাতে একটি চক্র (cycle) পূর্ণ হয় অর্থাৎ প্রত্যেক আট হাতের পর খেলোয়াড়দের অবস্থা আবার ঘুরে ঘুরে আসবে।

২নং পদ্ধতি :—দ্বিতীয় পদ্ধতিতে প্রথম হাতে দুই পক্ষই থাকবেন নন্-ভালনারেবল। দ্বিতীয় হাতে তাস-বণ্টনকারী (অর্থাৎ 'অ') হবেন নন্-ভালনারেবল আর বিপক্ষ দল হবেন ভালনারেবল। তৃতীয় হাতেও ঐরূপ চলবে অর্থাৎ তাস বণ্টনকারী 'খ' হবেন নন্-ভালনারেবল আর বিপক্ষ দল হবেন ভাল-নারেবল। চতুর্থ হাতে উভয় পক্ষই হবেন ভালনারেবল। তারপর পুনরায় ১ থেকে ৪ হাত পর্য্যন্ত অবস্থা এই রকম ঘুরতে থাকবে কিন্তু পঞ্চম হাতে 'ক' আর হাত দিতে পাবেন না,—হাত দেবেন 'অ', কারণ এই পদ্ধতির প্রধান বিশেষত্ব এই যে চার হাতে একটি চক্র (cycle) পূর্ণ হলেও প্রত্যেক চার হাতের পর তাস বণ্টন করতে দেওয়া হবে পরবর্ত্তী একজনকে লাফিয়ে অর্থাৎ পঞ্চম হাত দেবেন ষষ্ঠ ব্যক্তি (বা দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ 'অ')। প্রত্যেক চার হাতের পর এইরকম চলবে। মনে করুন প্রথম হাতে তাস দিয়েছেন 'ক', তা হ'লে চার হাত বাদে 'ক'র বদলে 'ক'র পরবর্ত্তী খেলোয়াড় 'অ' তাস দেবেন; আবার দ্বিতীয় চার হাত বাদে 'অ'র পরবর্ত্তী খেলোয়াড় 'ক'র খেঁড়ী 'খ' তাস দেবেন। এমনি করেই খেলা চলবে। বস্তুতঃ পক্ষে এ পদ্ধতিতে প্রত্যেক ষোল হাতের পর খেলোয়াড়দের অবস্থা ঘুরে ঘুরে আসবে।

ডুপ্লিকেট খেলায় পয়েণ্ট গণনার তালিকা :—

এখন পয়েণ্ট গণনার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল। No Trumpএর খেলায় প্রথম পিটের মূল্য ৪০ পয়েণ্ট এবং তারপর প্রত্যেক পিটের জন্য ৩০ পয়েণ্ট করেই বাড়বে। ইস্কাবন বা হরতন রঙের খেলায় প্রত্যেক পিটের জন্য ৩০ পয়েণ্ট করে বাড়বে আর রুহিতন বা চিঁড়িতন রঙের খেলায় প্রত্যেক পিটের জন্য ২০ পয়েণ্ট করে বাড়বে। ডাকের খেলা করেও যদি বেশী পিট পাওয়া যায় তার মূল্য অনার স্তম্ভে অর্থাৎ ওপরে লিখতে হবে। ডবল ... ...ন নাকি চালিকে কাঁধে তুলে' নিয়ে-

ছিলো, বলেছিলো—এমনি ভাবে তোলো ছবি।

পনেরো বছর আগে এক সকাল বেলা কুগান রাস্তার ওপর মারবেল খেল্‌ছিলো। টিপ্‌ করে' মারতে যাবে, ঠিক তখুনি—ঠিক এমনি ভাবেই তাকে কাঁধে তুলে' নিয়েছিলো চার্লি চ্যাপ্‌লিন।

মনের মানুষ

হলিউডের রূপোলী রাজ্যের অপূর্ব্ব সুন্দরী রাণীরা সেদিন তাদের পছন্দমত পুরুষেরা কী রকম হবে—তা বলেছেন।

মে ওয়েষ্ট্‌-এর কথা গোড়ায় বলি, কারণ, পুরুষদের প্রতি তার আগ্রহটার দাম আজকাল সব চেয়ে বেশী। মে'র সেই এক সুর—লম্বা, ঘন চামড়ার রঙ্‌, সুপুরুষ।

জেনেট্‌ ম্যাক্‌জেনাল্ড বলে—তাকে খুব চালাক হ'তে হবে, পুরুষত্বের প্রাবল্য তাতে থাকতে হবে, আর সমবেদনায় তাকে হ'তে হবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

'আমি আর কিছু চাই না, চাই চরিত্র', বলেছে লয়েটা ইয়ং 'তার শারিরীক শ্রী সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অন্ধ।'

ম্যাজ্‌ ইভান্‌স্‌এর মতে তার পছন্দ মত পুরুষ হচ্ছে খুব বড়ো একজন ব্যবসাদার। অবিশ্যি, ফিল্ম্‌ শিল্পের নয়। সাধারণের কাছে সম্মান তার হবে সমুদ্রের মত গভীর।

বেরসিক লোককে মউরিণ ও' সুলাভান মোটে দেখ্‌তে পারে না। সে চায় তার স্বপ্নের মানুষ তাকে সর্ব্বদা সুখী রাখতে পারবে। সমস্ত জিনিষেই তার একটু না একটু রুচি থাক্‌বে, এবং যে কাজের সে মানুষ—সে কাজে তার থাক্‌বে দক্ষতা।

অ্যালিস ফে খুব টাকাওলা মানুষ চায়। তা ছাড়া তাকে লম্বা হ'তে হবে, খেলোয়াড় হতে হবে। এই এই জিনিষে তার অরুচি থাক্‌বে না—গান, নাচ, রেডিয়ো, বায়োস্কোপ ও থিয়েটার। বয়েস তার এখন তিরিশের বেশী হবে না, কম হবে। অ্যালিস্‌কে তাকে খুব ভালোবাস্‌তে হবে। সে এমন কিছু করবে না যাতে তার সুখ কিম্বা শরীর নষ্ট হয়।

জিন মুইর বলে—সে পছন্দ করবে সেই পুরুষকে—যে তাকে খুব ভালো করে' জানে। আর জিনও তাকে জানে খুব ভালো করে'। তাকে এমন হ'তে হবে যাতে তাকে আমি ঠকাতে পারবো না, বা ঠকাতে ইচ্ছে যাবে না।

“দি ডেভিল ইস্ এ ওম্যান” এ মার্লিন ডিট্রিশ

তার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক সিজার রোমিরো।

পর্দ্দার সেরা পুরুষ

মে ওয়েষ্ট সেদিন পর্দ্দার ওপর তার সব চেয়ে প্রিয় পুরুষ অভিনেতাদের নাম বলেছে। তারা হচ্ছে—

জেম্‌স ক্যাগ্‌নি
পল কাভানক্‌
গ্যারী কুপার
বিঙ্গ্‌ ক্রস্‌বি
ক্লার্ক গেবল্‌
জর্জ্জ র‍্যাফ্‌ট্‌

তার মতে এরাই হচ্ছে হলিউডে দেখতে সুন্দর খাঁটি পুরুষ মানুষ।

জায়গা বদল

সম্প্রতি হলিউডে ট্যাক্সের প্রবল চাপ পরেছে। সেইজন্য স্যামুয়েল গোল্ড্‌ইন সেদিন ভয় দেখিয়েছে তার ষ্টুডিয়ো শুদ্ধ সে নাকি হলিউড ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু, জিজ্ঞাস্য হচ্ছে যাবে কোথায়?

উত্তরে গোল্ড্‌ইন বলেছিলো—ইংলণ্ড।

হ্যাঁ, ইংলণ্ডের ওপর হলিউডের অনেক প্রযোজকেরই নজর পরেছে। এমন অনেক অভিনেতা, অনেক অভিনেত্রী আমেরিকায় আজ আছে যারা ইংলণ্ডের নামে পাগল। অনেকে ইতিমধ্যেই ছুটি নিয়ে এসে বিলেতের সব ষ্টুডিয়োয় অভিনয় ক'রে যাচ্ছে। কিছু-দিন হ'লো যারা এসেছে তাদের ভেতর বিখ্যাত হচ্ছে, মউরিন ও সুলাভান, ফে রে, আর লিলিয়ান হার্ভে। 'সোল্‌জার্স্‌ থ্রি'-তে মউরিনকে আমরা দেখতে পাবো কনরাড্‌ ভিড্‌ ও সি আব্রে স্মিথ্‌-এর সঙ্গে। সি আব্রে জাতে ইংরেজ হ'লেও আমেরিকার আমদানী। ফে রে রবার্ট্‌ জেনাটের প্রিয়া সেজেছে। ছবির নাম এখনও ঠিক হয় নি। আর, হার্ভে নেবেছে—'ইন্‌ভিটেশন টু ওয়াল্‌ট্‌স্‌-এ।'

আরো যারা আসবে

খুব শিগ্‌গীরই বিলেতে যাদের আসবার সম্ভাবনা আছে তাদের নাম হচ্ছে—রিচার্ড্‌ ডিক্স্‌, ম্যাজ্‌ ইভান্‌স্‌ আর নোয়া বিয়ারী। ওয়ালেস্‌কে আনবার চেষ্টা চলেছিলো, কিন্তু কৃতকার্য্য না হয়ে তাঁর ভাই এসেছে নোয়া।

বিলেতে পলি ওয়ার্ড্‌ ক্রমশঃ খুব নাম করছে।

বিলেতে আসবার এ মতলবটা এখন যে একটি বিখ্যাত ষ্টুডিয়োর মাথায় খেল্‌ছে—তার নাম হচ্ছে—মেট্রো গোল্ড্‌ইন মেয়ার। অবিশ্যি, হলিউড একেবারে ছাড়বার মতলব

তাদের নয়—তাদের মতলব হচ্ছে-দু'জায়গায় ছটো ষ্টুডিয়ো তৈরী করা। তাদের মতলব যদি কাজে পরিণত হয় তা হ'লে যারা বিলেতে আস্‌বে ঠিক হয়েছে তাদের নাম—নর্মা শিয়ারার, রবার্ট্ মন্টগোমারী, ক্লার্ক্ গেবল্, ফ্রেডারিক মার্চ্চ আর জিন্ হার্লো।

ইউনিভার্সালের মারগারেট্ সালিভান বলেছে—সুযোগ পেলে সে বিলেতে অভিনয় করতে একবার আস্‌বেই।

জেসি ম্যাথুসএর ব্যাপারটি আবার উল্টো। সে হলিউডে যাচ্ছে। খুব সম্ভব ফ্রেড অ্যাস্‌টেয়ারের সঙ্গে এক নাচের ছবিতে নাবতে।

কথার টুক্‌রো

'পৃথিবীতে মেয়ে পুরুষের সমান দরকারই বটে, কিন্তু, রাজত্বটা থাকা উচিৎ পুরুষদের।' বলেছে জিন হার্লো। 'প্রেমে পড়বো না—এমন প্রতিজ্ঞা মেয়েরা কখনই করতে পারে না'—অ্যান্ সাদার্ণ। 'কোন বিবাহিত জীবনে যদি গোল্‌মাল্ হয়, জান্‌বে মেয়েরাই দোষী'—বেটি ডেভিস্। 'মিছে কথা আমি বলি না'—জোন্ ক্রাওফোর্ড! নতুন করে আবার আমার সব আরম্ভ করতে হবে'—অ্যান্ ভোরশাক্। 'সিনেমার কিম্বা রেডিয়োয় কোন বিখ্যাত লোকদের চাল্ মারতে দেখলে আমার গা জ্বলে' যায়'—বিঙ্ ক্রস্‌বি। 'লোকেরা আগে আমায় গালাগাল দিতো, মারবে বলে ভয় দেখাতো'—জিন মুইর। 'মনে মনে আমার চেয়ে সুখী হয়তো কেউ নেই'—ক্যারল লম্বার্ড।

খুচরো খবর

মার্লিন ডিট্রিশের ভাবী ছবি 'বাই এনি আদার নেম' হ'তে পারে।

* * *

ষ্ট্যান লাউরেল ও অলিভার হার্ডিতে ঝগড়া হয়ে তাদের ভেতর যে ছাড়াছাড়ি হয়েছে আপনারা বোধহয় জানেন। সেটা মিটিয়ে দেবার চেষ্টা চল্‌ছে খুব বেশী।

* † †

শারলী টেম্পল্ এর 'লিট্‌ল্ কর্ণেল' কল্‌কাতায় শীগগীরই আসছে।

—•—

সাহিত্য-পরিচয়
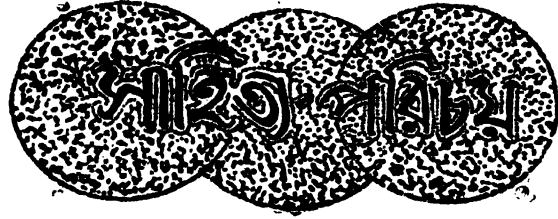
কাঁকর—কবিতার বই। সুভোঠাকুর প্রণীত। প্রকাশকও সুভোঠাকুর। দাম ছ' আনা।

বই খানায় সতেরটি কবিতা অগ্র-মিল ছন্দে, অর্থাৎ প্রত্যেক লাইনের শেষে মিল না দিয়ে প্রত্যেক লাইনের গোড়ার দিকে মিল দিয়ে গ্রথিত করা হয়েছে। খালি শেষ কবিতাটিতে অগ্র পশ্চাৎ দুদিকেই মিল আছে। কবি বইখানির মুখবন্ধই লিখেছেন, "যে কাঁকর গুলো জীবনের চলার রাস্তায় কাঁটার মত কঠিন হয়ে পায় পায় ফুটছিলো এই "কাঁকর" কবিতার কেতাবের মধ্যেও সেই কাঁকরই কাঁটার মত ছড়ান চারি ধারে" এবং এর কবিতার রসাস্বাদন কর্ত্তে হলে এ উক্তি যে সম্পূর্ণ খাঁটি তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

প্রচ্ছদ পটে কোন আর্টের পরিচয় পাওয়া যায় না।

Bidhilipi Ephemeris—প্রথম খণ্ড, ৫০নং হালদার পাড়া রোড, কালীঘাট, কলিকাতা, বিধিলিপি গ্রন্থ বিহার হইতে প্রকাশিত। দাম ৩৷৹ টাকা।

এই এফিমেরিস বা স্ফুট পঞ্জিকা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত করা হয়েছে—তার কারণ আজকাল প্রায় সকলেই সংখ্যাবাচক ইংরেজী অক্ষর গুলির সহিত পরিচিত। সুতরাং ইহা ভারতের সর্ব্বত্র এবং অন্যান্য দেশেও ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

স্ফুট পঞ্জিকার সাথে পরিচিত হতে হলে কতগুলো জিনিষ জানা প্রয়োজন। আমাদের দেশী পঞ্জিকা গুলিতে যে হিসাবে গ্রহস্ফুট লিপিবদ্ধ করা হয় তাতে নামের আদ্যক্ষর দ্বারা গ্রহ এবং সংখ্যার দ্বারা রাশি গুলোকে ব্যক্ত করা হয়। এই স্ফুট পঞ্জিকাতে কিন্তু পাশ্চাত্য প্রণালী মতে গ্রহ ও রাশি এই দুটিই প্রতিরূপক দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। অক্ষর বা সংখ্যার বদলে প্রতিরূপক ব্যবহারের ঢের সুবিধা ও উপযোগিতা আছে। এই সুবিধা ও উপযোগিতাই বই খানায় বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে।

বই খানা যে কোন দেশের যে কোন ভাষাভাষী ব্যক্তির পক্ষে বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। এক ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য সর্ব্বত্র গ্রহ ও রাশির এই প্রতিরূপক গুলো প্রচলিত।

হ্যাজেল্ ফর্বেস
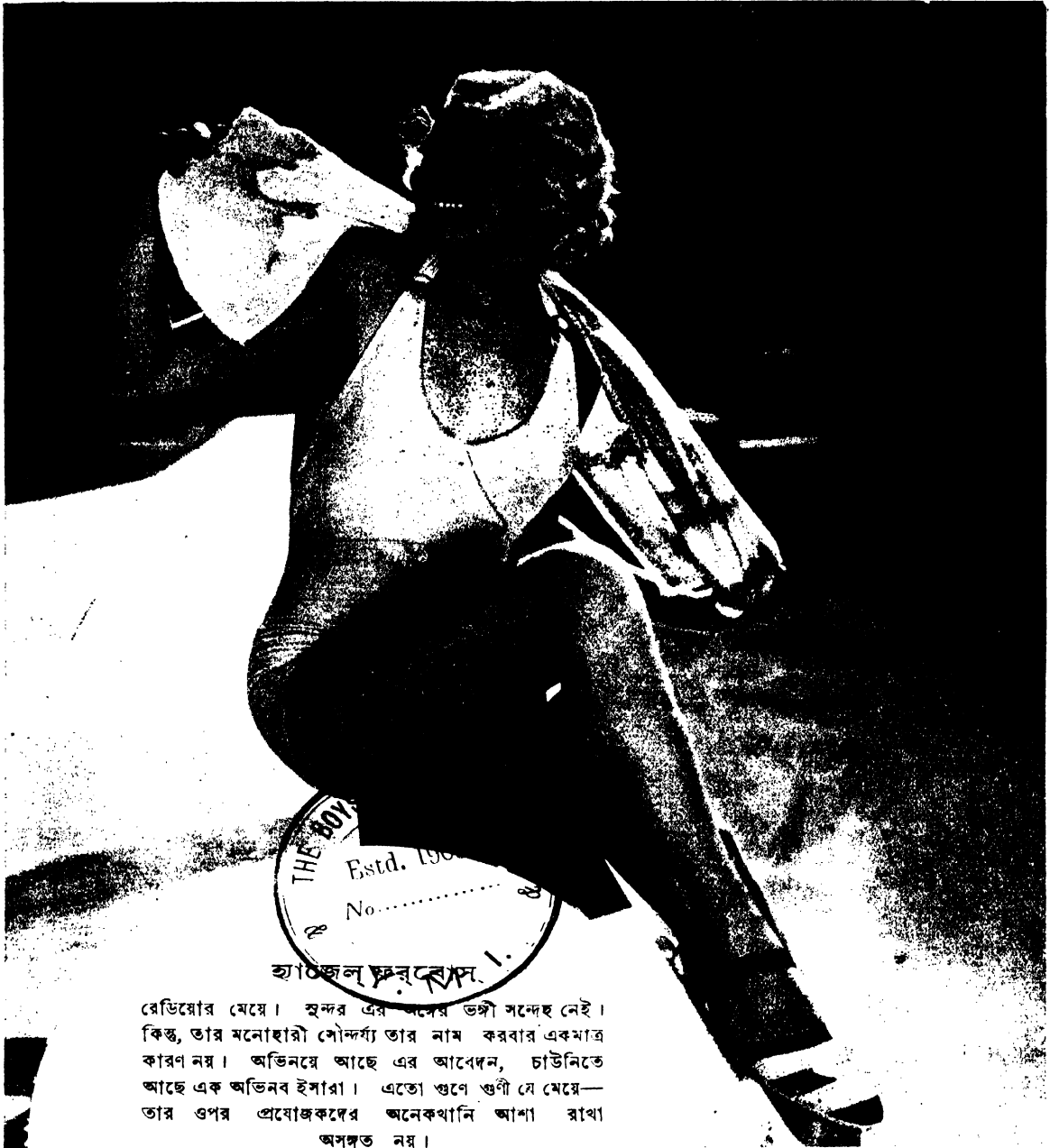
রেডিয়োর মেয়ে। সুন্দর এর অঙ্গের ভঙ্গী সন্দেহ নেই। কিন্তু, তার মনোহারী সৌন্দর্য্য তার নাম করবার একমাত্র কারণ নয়। অভিনয়ে আছে এর আবেদন, চাউনিতে আছে এক অভিনব ইসারা। এতো গুণে গুণী যে মেয়ে—তার ওপর প্রযোজকদের অনেকখানি আশা রাখা অসঙ্গত নয়।

খেয়ালী
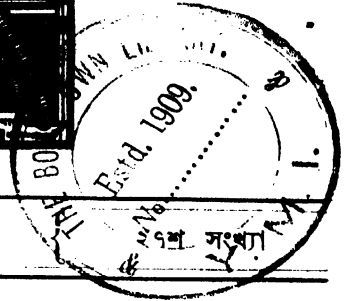
পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ১৯শে আষাঢ়, ১৩৪২—4th July, 1935. } ২৭শ সংখ্যা

মিলনের আবেদন

রাজসাহীর কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন মৈত্র বাংলার কংগ্রেসী কলহের অবসানকল্পে "করজোড়ে" আবেদন করিয়াছেন। তাঁহার এই আবেদন ফলপ্রসূ হইলে আমরা যে বিশেষ সুখী হইব তাহা বলা বাহুল্য। বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারা লইয়া কংগ্রেসের উভয় পক্ষের মধ্যে যে কোন মতভেদ নাই, তাহা প্রাদেশিক সমিতির কার্য্যকরী সমিতির বিগত অধিবেশনে পরিলক্ষিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রবাবু নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির জব্বলপুর অধিবেশনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন তাহাতে মনঃপীড়া অনুভব করিয়া সুরেন্দ্রবাবু নির্ম্মলচেতা সরল-প্রাণ শিশুর ন্যায় যে আবেদন করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা তাঁহার নিষ্কলুষ স্বদেশ প্রেমের পরিচায়ক। তবে ভাবপ্রবণতার আতিশয্যবশে তিনি দুই একটা কথা যা বলিয়া ফেলিয়াছেন তাহা আমরা বেমালুম হজম করিয়া ফেলিতে পারিলাম না।

বাংলা কংগ্রেসের গ্রহমণ্ডলের শনি শ্রীকিরণশঙ্কর রায়কে যে সার্টিফিকেট সুরেন্দ্রবাবু দিয়াছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে সুরেন্দ্রবাবুর নিজেরই কি বিশ্বাস আছে? যিনি বাংলা কংগ্রেসে উপদলীয় দলাদলির প্রবর্ত্তক, যিনি কভু সুভাষের গলে, কভু সেনগুপ্তের স্কন্ধে, কভু বিধানচন্দ্রের মস্তকে ভর করিয়া গত চৌদ্দ বৎসর যাবৎ বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে আত্মকলহের বীজ বপন করিয়া আসিয়াছেন তিনি যে রাতারাতি বিড়াল-তপস্বী সাজিয়া নিরামিষাশী হইলেন অর্থাৎ উপদলীয় দ্বন্দ্বে তাঁহার বীতরাগ হইল এইরূপ কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। ইহার মধ্যে তীক্ষ্ণধী কিরণশঙ্করের অন্য কোন গুপ্ত চাল নিহিত নাই ত?

স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হয় যে যতদিন কিরণশঙ্কর তেওতার বহু-বিভক্ত জমিদারীতে প্রজা শাসনে মনোনিবেশ না করেন বা বীনাপাণির বিলাস-কুঞ্জে অবসর গ্রহণ না করেন ততদিন বাংলায় কংগ্রেস কলহের অবসান হইবে না। এটা আমাদের কল্পনা প্রসূত উক্তি নহে। কিরণবাবুর কার্য্যাবলী পর্য্যাবেক্ষণ করিবার সুযোগ আমাদের বহুবার হইয়াছে, এই উক্তি আমাদের অভিজ্ঞতা প্রসূত। কিরণবাবুর কি মনে আছে মৈমনসিংহের নিখিল বঙ্গ ছাত্র সম্মেলনের প্রারম্ভে ইউরোপীয়ান এ্যাসাইল্যাম লেনের গুপ্ত-কক্ষে ডাঃ আলমের সভাপতিত্বে যে সম্মেলন হইয়াছিল তাহা পণ্ড করিবার পরামর্শ কে দিয়াছিল? কিরণবাবু স্মৃতিসিন্ধু মন্থন করিলে হয়ত স্মরণ করিতে পারেন, সেই রাত্রে সেই মন্ত্রণাগারে কে কে উপস্থিত ছিলেন? তৎপরেই ময়মনসিংহ-সম্মেলন পণ্ড হইল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন বর্ম্মণ আজ সুদূর দেউলীতে রাজবন্দী হইলেও সে ইতিহাস কেহ কেহ ত' জানেন। A. B. S. A ও B. P. S. A র সৃষ্টির গুপ্ত ইতিহাস যদি কোনদিন প্রকাশ পায় হয়ত সেদিন ইউরোপীয়ান এ্যাসাইল্যাম লেনের কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তি-কাহিনী অপ্রকাশ্য রহিবে না।

যাহা হউক সুরেন্দ্র বাবুর আবেদন সফল হইলে আমরা সুখী হইব। নিরাকার পরম ব্রহ্মের হৃদয়ে সুরেন্দ্র বাবুর আকুল ক্রন্দন রোল স্পর্শ করিলে বিধানচন্দ্রের শ্মশান বৈরাগ্য মুছিয়া যাইতেও পারে।

কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন আসন্নপ্রায়। প্রাদেশিক কমিটির রাষ্ট্রমঞ্চে যে এই সময়ে এইরূপ একটী নাট্যাভিনয়ের কসরৎ দেখিতে পাইব তাহার আভাষ আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম।

বিবিধ

শিলিগুড়িতে চপলা-চমক!

'অমৃত বাজার পত্রিকার' শিলিগুড়ি সংবাদে প্রকাশ, নলিনী সরকার ("নাইট" না হইয়া) যখন দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় ফিরিতেছিল, তখন সহরের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি রেল ষ্টেশনে তাহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিল। (কি জন্য?) তাহার অসুখের জন্য সে শীর্ণ দেখাইতেছিল (হয়ত বা ভ্রাতুস্পুত্রী বীণার বৈধব্য বেদনায় সে শীর্ণ হইয়াছে)। সে উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিল। সে "অমৃত বাজার পত্রিকার" সংবাদদাতাকে বলিয়াছিল, সে শীঘ্রই বিলাতে যাইবে—এ সংবাদ সত্য নহে।

আমরা "অমৃত বাজার পত্রিকার" সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি—

এই সংবাদ-রত্ন কোন খনির গর্ত্ত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে? ইহা সত্য সত্যই শিলিগুড়ি সংবাদে ছিল, কি কলিকাতায় সৃষ্ট হইয়াছে, তিনি তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন কি?

দার্জ্জিলিংএ ও কলিকাতায় বহু ভদ্রলোকই যে নলিনী সরকারকে নিমন্ত্রণ করিতে ইতঃস্তত করিতেছেন, তাহা দেখা গিয়াছে। এই সময় জলপাইগুড়ির "বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি" সহসা কলিকাতাগামী নলিনীকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন কেন? শিশুপাল যখন রুক্মিনীহরণের অপমানের মত ভুলিতে চড়িয়া নগরে প্রবেশ করে তখন নারদ যেমন তাহাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, ইহা কি সেইরূপ? নহিলে রাত্রিকালে কয় মিনিটের জন্য রেল ষ্টেশনে এই "সম্বর্দ্ধনার" কারণ কি? দার্জ্জিলিং মেল সন্ধ্যার পর শিলিগুড়ি ত্যাগ করে—নলিনী ট্রেন ছাড়িবার কতক্ষণ পূর্ব্বে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আর সে কিরূপেই বা "ন' দন্তের মধ্যে নবায়ের" মত—চকিতে লোকের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিল:—কাহারাই বা ষ্টেশনে তাহাকে "সম্বর্দ্ধিত" করিয়াছিলেন; সে সব সংবাদ 'অমৃতবাজার' প্রকাশ করিলেন না কেন? সে সব সংবাদ দিতে 'অমৃতবাজারের' যে কার্পণ্য তাহাতে কি মনে হয় না—

"সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে, হায়! হায়! কেহ কারও নয়?"

আরও একটি ব্যাপারে 'অমৃতবাজারের' এই ভাবান্তর লক্ষিত হইয়াছে। শিলিগুড়ির পর জলপাইগুড়ি। 'ফরওয়ার্ডে' সুসংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তথায় হিন্দুস্থানের দালালদিগের উদ্যোগে এক বৈঠক হয় এবং তাহাতে হিন্দুস্থানের ডিরেক্টার—যাঁহার চাকরীয়া পুত্র বীমার কাজে অভিজ্ঞ হইতে সাগর লঙ্ঘন করিয়াছে—সেই শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্তও এক লম্ফে মেট্রোপলিটন হইতে হিন্দুস্থানে আগত এবং আইনভঙ্গ আন্দোলনে কারাবরণের পর মন্ত্রীর গৃহে স্থানপ্রাপ্ত নলিনাক্ষ সান্যাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। নলিনীরঞ্জন ঘোষ নামক এক ব্যক্তিও তাহনায় যোগ দিয়াছিলেন।

পালা—"হিন্দুস্থান বন্দনা" এখন যে হিন্দুস্থানের দালালরা এইরূপ বৈঠকানুষ্ঠান করিতেছে আর ডিরেক্টার মূল গাইয়েন সাজিয়া তান ধরিতেছেন, এ সংবাদ 'অমৃতবাজার' প্রকাশ করিলেন না কেন? আর অখিল চন্দ্র—বলিহারী তোমায়। ঘাড়ল গুলিমারা মামলার খ্যাতি লাভ করা তুমি—পশার জমাইবার আশায় কলিকাতায় আসিয়া হতাশ হইয়া গিয়াছ। তাহার পর জোয়ারের মত ভাসিয়া বেড়াইয়া এবার ত ব্যবস্থা পরিষদে কূল পাইয়াছ। তবুও অপত্যস্নেহশীলতা হেতু বুড়া বয়সে এ কি লীলা?

"তুমি জান কত রঙ্গ
তুমি জান কত রঙ্গ
ধান ভান, গান গাও
বাজাও মৃদঙ্গ!"

চা-বাগানী ডিরেক্টার তুমি—এখন কি প্রচারক হইয়া দাঁড়াইবে? সাপ যেমন মধ্যে মধ্যে খোলস বর্জ্জন করে, মানুষের কি তেমনই মধ্যে মধ্যে মত বদল করা চলে? নলিনী রঞ্জন ঘোষটি কে—

"কি জাতি, কি নাম ধরে?
কোথায় বসতি করে?"

বাজার-রহস্য।

সংপ্রতি মৈমনসিংহ জেলার কোন লোক রসা রোডের জমীতে বাজার বসাইতে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাহার পশ্চাতে আছে—একটা কোম্পানীর বল। এই বল ইহার মধ্যেই কিরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে। বাজার হইলে অবশ্য সম্পত্তির "ভ্যালুয়েশন" বাড়িবে। কিন্তু কোন কারণে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলাররা এই স্থানে বাজার বসাইতে দিতে পারেন? এটি—

"ভাঙ্গা ঢোল তালকানা যন্ত্রী
শনি রাজা কুঞ্জ মন্ত্রী?"

স্থানটির পার্শ্বে ও সম্মুখে তিনটি বিদ্যালয়—সত্যভমা বিদ্যালয়, দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয় আর নবপ্রতিষ্ঠিত কালী বিদ্যালয়। ইহার মধ্যে বাজার বসাইলে তাহা যে কিরূপ অসঙ্গত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। পাড়ার মেয়েরা অনেকে এই ভদ্রপল্লীর মধ্যে হাঁটিয়া স্কুলে যাতায়াত করে। সকলেরই যে মটর-বিহারী বড়কাকা আছে তাহাও নহে। সেই জন্য এই স্থানটি বাজারের পক্ষে অনুপযুক্ত।

আরও কথা এই যে—এই স্থানটির পশ্চিম দিকে এখনও ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের হাত পড়ে নাই—মধ্যে মধ্যে কলেরা দেখা দেয়। এইরূপ স্থানে বাজার হইলে স্থানটি আরও অস্বাস্থ্যকর হইবে।

এই স্থানে বাজারের কোন প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। কারণ, নিকটে অন্ততঃ চারটি বাজার আছে—

কালীঘাটের বাজার,
টালিগঞ্জের বাজার,
আর একটি বাজার
লেক বাজার

যে স্থানে নূতন বসতি হইতেছে, সে স্থানে আরও একটি বাজারের কোন প্রয়োজন নাই—আর একটি বাজার বসিলে এই চারটি বাজারেরই ক্ষতি হইবে এবং **এই চারিটি বাজারের মধ্যে লেকবাজার কলিকাতা কর্পোরেশন করদাতাদিগের অর্থে স্থাপিত করিয়াছেন ও পরিচালিত করিতেছেন।**

ইহার ক্ষতি কর্পোরেশনের স্বার্থহানি। সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা অবশ্যই প্রয়োজন।

কর্পোরেশন কি সার ফিলিপ সিডনী হইয়া বলিবেন—"Thy necessity is greater than mine?"—

কর্পোরেশনের অনুসন্ধান ফলে স্থির হইয়াছিল, এই স্থানটি বাজারের পক্ষে অনুপযুক্ত। তথাপি এই প্রস্তাব—"মরিয়া না মরে" কেন?

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী প্রমুখ পল্লীর অধিবাসীরা জানাইয়াছেন, **তাঁহারা এই স্থানে বাজার চাহেন না।** কিন্তু তবুও কয়জন কাউন্সিলারের উৎসাহের অন্ত নাই! "পঞ্চানন্দ" একবার লিখিয়াছিলেন, "সংস্কারকদিগের মনোভাব বুঝা দায়। আমি বলি, আমি সুখী, আমার গৃহিণী বলেন, তিনি সুখী; কিন্তু সংস্কারকরা বলেন, যে হেতু আমাদের বাল্যবিবাহ হইয়াছিল সে জন্য আমরা অসুখী"! এত সেইরূপ ব্যবস্থা।

স্থানীয় লোকেরা এই স্থানে বাজারে আপত্তি করিতেছে—ইহাতে নিকটবর্ত্তী কর্পোরেশনের বাজারের আর্থিক ক্ষতি অনিবার্য্য—তবুও কতিপয় কাউন্সিলার এই বাজার মঞ্জুর করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছেন। ইহার পশ্চাতে যিনি আছেন ও যে প্রতিষ্ঠান আছে—তাহা আমরা পরে—প্রয়োজন হইলে, প্রকাশ করিব।

আমরা জমীর মালিককেও সাবধান করিয়া দিতেছি—বাজার বসাইবার অনুমতি পাইলেই যে সব সাফ হয়, তাহা নয়। তাহাতে কম্বল ভারীও হইতে পারে।

আমরা কর্পোরেশনের কাউন্সিলারদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি—তাঁহারা যেন মনে রাখেন, তাঁহারা কোন প্রতিষ্ঠান হইতে নির্ব্বাচিত হন না—সাধারণ নির্ব্বাচনে তাঁহাদিগকে দাঁড়াইতে হয়; নির্ব্বাচনের সময়ও আগতপ্রায়। ব্যক্তিবিশেষকে তুষ্ট করিলেই ভোট পাওয়া যায় না।

নূন ভক্ষকদের গুণগান

হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর বিরুদ্ধে আমরা যখন আন্দোলন আরম্ভ করি তখন হিন্দুস্থান সম্বন্ধে দেশবাসী অবহিত হন নাই। তাহার পর "আনন্দবাজার পত্রিকা"র ধারাবাহিক আলোচনা হওয়াতে দেশবাসী বেশ চঞ্চল হইয়া উঠাতে "হিন্দুস্থানে"র সমর্থক এক শ্রেণীর লোক দেখা দিয়াছে। ইহাদের স্বরূপ দেশবাসীর জানা উচিত। এই চক্রের মণ্ডলাধিপতি হইতেছে সাবিত্রী এবং ইহার প্রধান সহায় ডাক্তার নলিনাক্ষ সান্ন্যাল, শ্রীযুত সুধীন্দ্রলাল রায় ও শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেন। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দুস্থানের তীব্র সমালোচনা করিয়া বেড়াইতেন এবং সুধীন্দ্র ব্যতীত অপর তিনজন হিন্দুস্থানের কর্ম্মচারীরূপে বাহাল হইয়াছেন। বাহাল হওয়ার পর সমালোচনার পরিবর্ত্তে গুণগান করিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। সাবিত্রী মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্রের কৃপাতে "উপাসনা" কাগজ পরিচালনা করিত এবং ওই পত্রিকার "বীমা, ব্যাঙ্কিং" প্রভৃতি বিভাগের ভার সে নলিনাক্ষের উপর অর্পন করে। উপাসনার ১৩৩৯সালের বৈশাখ সংখ্যায় বীমা আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দুস্থানের তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। সুধীন্দ্রলাল "পুষ্পপাত্রে"র বীমা বিভাগের চালক ছিল এবং ১৩৩৯ সালে ওই পত্রিকার বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়

সুধীন্দ্রলাল হিন্দুস্থানের কঠোর তীব্র সমালোচনা করে এবং ওই প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। তাহার পর "ইন্স্যুরেন্স হেরাল্ড" পত্রিকায় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে "ইনভেষ্টমেণ্ট অফ লাইফ ফণ্ড" নামক প্রবন্ধেও হিন্দুস্থানের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে। সেই প্রবন্ধ বর্দ্ধিত করিয়া "গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিস এণ্ড লাইফ ফণ্ড" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া প্রচার করে। উপেন্দ্রনাথ সেনও প্রবন্ধে হিন্দুস্থানকে আক্রমন করিয়া মুখবন্ধের পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থানে চাকুরী পাইয়াছে। যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বে "হিন্দুস্থানে"র তীব্র সমালোচনা করিয়া আসিয়াছে তাহারাই আজ হিন্দুস্থানের সমর্থক সাজিয়া "আনন্দ-বাজার"কে স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পরায়ণতার দোষে অভিযুক্ত করিবার প্রচেষ্টা পাইতেছে। যাহারা সামান্য স্বার্থের খাতিরে এত শীঘ্র মত বদলায় তাহাদের মতের মূল্য দেশবাসী যে বুঝিয়া লইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সমস্ত লোকের মুখোস যত শীঘ্র খসিয়া স্বরূপ বাহির হইয়া পড়ে ততই মঙ্গল। সেদিন আগত প্রায়।

রূপাভিসার—শ্রীভগবল্লীলা কীর্ত্তন

গত বুধবার (২৬শে জুন) সন্ধ্যায় পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাগবাজারস্থ ভবনে স্বনামধন্য কীর্ত্তনীয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য কীর্ত্তনসুধাকর মহোদয় "রূপাভিসার" লীলা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সুবিখ্যাত কীর্ত্তনকলাবিৎ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয়ের যোগ্যতম ও প্রিয়তম ছাত্র। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি বিশুদ্ধ "গরাণহাটী" রীতিতে কীর্ত্তন করিয়া দুই ঘণ্টার উপর সময় শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। গৌরী, পুরবী, পুরিয়া, হিন্দোল, সোহিনী, বেহাগ, মালকোষ প্রভৃতি খাঁটি রাগ-রাগিনীর আলাপের দ্বারা ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজের অপূর্ব্ব সঙ্গীত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পণ্ডিত নৃত্যগোপালের কণ্ঠ যেমন সুমধুর, অঙ্গহার গুলি সেইরূপ মনোহর। সর্ব্বোপরি তাঁহার ভক্তি গদগদ শুদ্ধ ভাবের নিখুঁত অভিব্যক্তি বড়ই হৃদয়স্পর্শ হইয়াছিল। আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সর্ব্বান্তঃ-করণে প্রার্থনা করি।

কীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার পর আন্দুলের সুবিখ্যাত কালী কীর্ত্তন-গায়ক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন, কৃষ্ণনগরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিদাস ভক্তিচূড়ামণি, পণ্ডিত সুধাকণ্ঠ মণিলাল গীতরত্নাকর, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু রাগশেখর, পণ্ডিত তোতাজী, ভূষণলাল, শৈলপ্রসাদ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গায়কবর্গ ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী ও শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতে সমবেত সুধীবৃন্দের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। গীতান্তে প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল। রাত্রি ১টার পর আসর ভঙ্গ হয়।

মাইকেল ও শরৎচন্দ্র

গত শনিবার ১৪।১ বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত গোপেন মিত্রের ভবনে সাহিত্য সেবক সমিতির উদ্যোগে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অধ্যাপক জ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রায় খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ সোম, শ্রীযুক্ত কে, পি, চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী, শ্রীমতী মমতা মিত্র, শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু প্রভৃতি সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী মহিলা ও ব্যক্তিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু, শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমতী মমতা মিত্রের কবিতা গুলি সময়োপযোগী ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল।

কিন্তু এই অনুষ্ঠানে কথা-শিল্পী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটী উক্তি অশোভন ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল। স্মৃতিসভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়া তিনি কবির ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষগুলির বিশ্লেষণ করিতে লাগিলেন। রাজনীতির হট্টমন্দিরে যে বাগ্‌বিতণ্ডা মার্জ্জনীয়, বীনাপাণির পুণ্য অঙ্গনে তাহা পরিত্যাজ্য তাহা কি শরৎচন্দ্রের ন্যায় বয়োবৃদ্ধ সাহিত্যিক-শ্রেষ্ঠের মনে উদয় হইল না? অমর কবি মাইকেল নাকি স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার ফলে ও অন্যান্য দোষে শেষ জীবনে কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাই তাহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই। শরৎচন্দ্র আরও বলিলেন যে মাইকেলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে গিয়া তাঁহার দোষগুলি ভুলিলে চলিবে না। মাইকেলের সাহিত্য-সৃষ্টির দোষগুণের বিচার করিলে কাহারও কিছু বলিবার ছিল না—তবে যদি পরলোক-গত কবির ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে কেহ চেষ্টা করেন, তাহা তিনি যেই হউন না কেন, তাহা যে নিন্দনীয় তাহা আমরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি। অমর কবি মাইকেলের স্মৃতি-বাসরে শরৎচন্দ্রের এই অপমানসূচক উক্তিগুলির আমরা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। ব্যক্তিগত চরিত্র বিশ্লেষণ করার ঔৎসুক্যে যদি কোন সমা-লোচক মানসকন্যা চরিত্রহীনা সাবিত্রীর স্রষ্টার ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর কটাক্ষ করে, তাহা হইলে শরৎচন্দ্রের উক্তি অনুযায়ী তাহা কি দোষনীয় হইবে না?

এই প্রসঙ্গে সাহিত্য সেবক সমিতির সম্পাদক শ্রীকেশব দে ও পৃষ্ঠ-পোষক শ্রীগোপেন মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তাঁহারা কি বাণীকুঞ্জকে ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচারক আখড়ায় পরিণত করিয়াছেন? শরৎচন্দ্রের আচরণে আমরা ক্ষুণ্ন ও মর্ম্মাহত হইয়াছি। এই সম্বন্ধে সাহিত্য সেবক

সমিতির কর্তৃপক্ষের বা অন্য কোন সাহিত্যিকের কিছু বলিবার থাকিলে আমরা তাহা পত্রস্থ করিব। Goldsmith সম্বন্ধে Johnson যাহা বলিয়াছিলেন তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া আমরাও বলি :—Let not his faults be remembered—He was a great man !

"দু'কুল বজায় র'বে।"

যুবরাজ যখন জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে গমন করিয়াছিলেন, তখন হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"হেদে ও সহরবাসী আর কি হাসি হাসবি রেড়ো বলে ?
দেখ না চেয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে রাণীর ছেলে ॥
চৌঘুড়িতে সঙ্গে করে সাদা মোসাহেব—
নাড়ীটেপা ফেরার সাহেব, বারুণেট নায়েব ॥"

তেমনই আজ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের চালে আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়—আর কি কেহ হাসিতে পারিবে ? ঢাকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে—তথায় ঘোষণা করা হইয়াছে—**বাঙ্গালার গভর্ণর সার-জন এণ্ডার্সন বাঙ্গালার ব্রতচারী সমিতির পৃষ্ঠপোষক—"মহা-পালক" হইতে সম্মত হইয়া-ছেন**। পূর্ব্বে মিষ্টার দত্ত একাই নৃত্য করিতেন—এখন অনেক সরকারী চাকুরীয়াই সে নৃত্যে যোগ দিবেন। আর মিষ্টার দত্ত—তিনি ত—

"ফিক্‌র দানে, এক তাড়াতে কল্লে বাজিমাৎ।
মাছ, কাতুরে ভেকো হ'ল কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ ॥"

হীরামালিনী বিদ্যাকে বলিয়াছিল—
"নাতনীলো, তোর দু'কুল বজায় র'বে।
অতিথ সেবা পতি সেবা দুই সেবাই তোর হবে।"

এ-ও তেমনই। ব্রতচারী প্রতিষ্ঠান জাঁকিয়া উঠিবে আর সেই সূত্রে তাঁহার সহিত তাঁহার চাকরীর মনিব সার জন এণ্ডার্সনের ঘনিষ্ঠতার সুযোগও ঘটিবে। এমন না হলে চাল ? মিষ্টার দত্ত বিলাতে যাইয়া যদি ইণ্ডিয়া অফিসে ব্রতচারী নৃত্য দেখাইবার সুযোগ লাভ করেন, তবে হয়ত বিলাতের লোক মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ট্রাফালগার স্কোয়ারে সরাসরি নেলশনের স্তম্ভের চূড়ায় স্থাপিত করিবে। হয়ত তাঁহাকে—। গল্প আছে, কোন যাত্রার দলের গাহনায় বিরক্ত হইয়া লোক তাহাদিগকে প্রহার করে ও তাহারা বাদ্যযন্ত্রগুলা ফেলিয়া পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়। তাহাদের গ্রামের লোককে তাহারা বুঝাইয়াছিল—যদি পরবৎসর তাহারা গাহনা করিতে না যায়, সেই জন্য বারোয়ারীর কর্ত্তারা যন্ত্রগুলা আটকাইয়া রাখিয়াছেন।

নিন্দা, না প্রশংসা ?—

শালগ্রামের শোয়া বসা যেমন বুঝা যায় না, তেমনই 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র নিন্দা প্রশংসাও বুঝা যায় না। গতপূর্ব্ব রবিবারে কবিরাজ শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের প্রথম বার্ষিক স্মৃতি সভা সম্বন্ধে লিখিত প্যারায় সহযোগী লিখিয়াছিলেন :—

"His charities knew no bounds and there were numerous deserving institutions in Bengal which did not enjoy the benefit of his benefactions."

অর্থাৎ **বঙ্গদেশে সাহায্য পাইবার উপযুক্ত বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার নিকট সাহায্য পায় নাই।**

বোধ হয় লেখক "very few" লিখিতে যাইয়া "numerous" লিখিয়া বিদ্যা চটকাইয়াছেন। আর যদি তাহা না হয়, তবে যে এই উক্তি অশোভন ও ইহার "লেখকস্য পৃষ্ঠদেশ" বেত্রাঘাতের যোগ্য—তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। দেশে সাহায্য পাইবার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভাব নাই—সব প্রতিষ্ঠানেই যে একজন দাতা সাহায্য করিতে পারেন, এমন মনে করা যায় না। তবে সেজন্য কবিরাজ মহাশয়কে নিন্দা করা—বিশেষ তাঁহার বার্ষিক স্মৃতি-সভা উপলক্ষে—যে নিন্দনীয় তাহাও কি সহযোগীকে বলিয়া দিতে হইবে? এই প্যারাতেই কবিরাজ মহাশয়কে "Erudite Scholar" বলা হইয়াছে। Erudite অর্থে thorough scholar; কাজেই সহযোগীর উক্তি "অজ্ঞানীর" বা "শবদেহের" মত বলিতে হয়। আমরা জানি, কোন ডবল এম, এ,—কোন প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান সম্পাদক "dead carcase" লিখিয়া রাজা হৃষিকেশ লাহার নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। গল্প আছে, ভূদেববাবু কোন বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাইয়া নাম জিজ্ঞাসা করায় একটি বালিকা উত্তর দিয়াছিল—"মন্দাকিনী" শুনিয়া ভূদেববাবু পণ্ডিত মহাশয়কে বালিকাটি কি পড়ে জিজ্ঞাসা করায় গুরু মহাশয় বলেন—"দ্বিতীয় ভাগ"—তখন ভূদেববাবু বলেন, "বেশ!" আমরাও সহযোগীকে বলি—"বেশ!"

রসকেলি প্রচার

"কীর্ত্তনে কলঙ্ক" শীর্ষক প্রবন্ধে সহযোগী "নবশক্তি" কীর্ত্তনের রসকেলিতে সমাজের নৈতিক আবহাওয়া দূষিত হয় বলিয়া যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমরা প্রীত হইয়াছি। উক্ত প্রসঙ্গে সহযোগী লিখিয়াছেন :—

"... ...যে অনধিকারীর হাতে পড়িয়া কালী হইয়াছেন ডাকাতের দাবী, শিব হইয়াছেন গঞ্জিকাসেবী, সেই অনধিকারের ফলেই স্থান বিশেষে কৃষ্ণের সুমধুর কীর্ত্তন হইয়াছে নেড়া নেড়ীর অপ-কাণ্ড। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমাভিসারের অর্থ যেখানে অনর্থ ঘটাইতে পারে, সেখানে তাহা বাদ দেওয়া কি সঙ্গত নয়? কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রসকেলিতে সমাজের নৈতিক আবহাওয়া দূষিত হইবার আশঙ্কা আছে। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যায় আদি রস প্রচারের প্রয়োজন আদৌ আছে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। কিন্তু কীর্ত্তনের নামে স্মৃতি সভায় জনসাধারণের সম্মুখে বিশিষ্ট ভদ্র মহিলাদের গানে এই রসকেলি প্রচারের কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা আছে কি? ইহাতে সমাজের কতখানি উন্নতি বা উপকার হয়? যাহারা সহরে ও মফঃস্বলে কীর্ত্তনের সুমধুর গানে জনসাধারণকে আনন্দ পরিবেশন করিতেছেন, তাহাদের নিকট নিবেদন, কীর্ত্তনের মাধুরীকে তাহারা যেন 'খেলো' খেয়ালে পরিণত না করেন।..."

স্মৃতি সভায় (দেশবন্ধুর?) জনসাধারণের সম্মুখে বিশিষ্ট ভদ্র মহিলাদের (দেশবন্ধু-তনয়া ও রাজমহিষী প্রভৃতি?) রসকেলি প্রচারের অপচেষ্টার প্রতিবাদ আমরা পূর্ব্বেও করিয়াছি। ভগবৎভক্তি ধনী রমণীদের drawing room fashionএ পর্য্যবসিত হওয়ায় আমরা মর্ম্মাহত। সহযোগী "নবশক্তি"র সৎসাহসের প্রশংসা করিলেও আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে, পাছে এই স্পষ্ট উক্তির ফলে অস্থায়ী সম্পাদক ভাস্করের

কোপানলে পড়িয়া "নবশক্তি" কলিকাতা কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপন হইতে বঞ্চিত না হন!

পরলোকে দুর্গাচরণ

উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক আমাদের সুহৃদবর শ্রীযুক্ত জগদ্ধাত্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘকাল রোগভোগের পর পরলোক গমন করিয়াছেন। উত্তর কলিকাতার মুকুট-হীন নেতা হিসাবে বহুবৎসর যাবৎ তিনি কলিকাতার রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শোকসন্তপ্ত জগদ্ধাত্রী কুমারকে ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

ভূমিকম্প

সংবাদ, গত ৩০শে জুন জলপাইগুড়ীতে "মডারেট" ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল। আশা করি, অখিলচন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে তথায় যে সভা হইয়াগিয়াছে তাহার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ীকে লক্ষ্য করিয়া বিবিধ প্রসঙ্গে যাহা লিখিত হইয়াছিল, আমরা শুনিতে পাইলাম ভাদুড়ী মহাশয় উহাতে ব্যথিত হইয়া শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবাসে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে তিনিতো নেশা প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছেন, তবে কিনা, "বিশুর" বিবাহে অত্যধিক খুসী হইয়া তিনি একটু বেসামাল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা তো এই কথাই বলিয়াছিলাম যে তিনি মাঝে মাঝে "বেসামাল" হইয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা তিনি একেবারে বিস্মৃত হইয়া পড়েন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং পুনরায় অতি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি যে তিনি যখন তাঁহার জীবন কলালক্ষ্মীর সেবায় উৎসর্গ করিয়া জনসাধারণেকে তৃপ্তি ও আনন্দ দান করিতে নিয়োজিত করিয়াছেন; তখন তাঁহার জীবনকে মাঝে মাঝে "বেসামাল" হইয়া যথেচ্ছাচার পূর্ব্বক অকাল পরিসমাপ্তির পথে টানিয়া লইবার অধিকার নাই। অবশ্য আমরা শুনিয়া খুব খুসী হইয়াছি যে শ্রীমতী কঙ্কাবতী পূর্ব্বেকার অপেক্ষা অধিকতর কড়া শাসনে শিশিরকুমারকে ইদানীং রাখিতে পারিয়াছেন: সে শাসন এমনিই যে শিশির কুমারের পক্ষে শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়ের আবাসে এক পেয়ালা চা পান করাও চলে না, কি জানি, শ্রীমতী উপস্থিত নাই—তাঁহার অনুমতি লওয়া হয় নাই তিনি শুনিলে যদিই বা কিছু অনর্থ ঘটে!

এক ও অপর দৃশ্য

হিন্দুস্থান সমবায় বীমামণ্ডলীর ডিরেক-টাররা তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজারকে অতিরিক্ত অধিক বেতন প্রদানের অভিযোগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"His remuneration has never been out of keeping with the Society's position, and it has risen as the Society has risen in business."

বিলাতের বিখ্যাত একচুয়ারী বীমা কোম্পানীর কর্ম্মচারীর বেতন সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

In every promotion the element of moral character should be assigned a dominating place. No ability can atone in the fulfilment of duty and trust for deficiency of high principles.

টসের চা

সম্প্রতি বাজারে বহু প্রকার চা-এর আমদানী দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও স্বাদে, বর্ণে ও গন্ধে টসের চা নিজ অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য পূর্ব্ববৎ বজায় রাখিয়াই আসিয়াছে। দীর্ঘ সময় পরিশ্রমের পর ক্লান্তি অপনোদনে এক কাপ চা যে খুবই—খুবই উপাদেয়, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যদি ভাল না হয় তাহা হইলে মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে। এ অবস্থায় টসের চা ব্যবহারে মন স্বতঃই প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

মধুস্মৃতি

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

ত্রিষষ্টি বৎসর শেষ, তোমার মৃত্যুর দিন হ'তে
বঙ্গবাণী মন্দিরেতে কত ভক্ত গেয়ে গেল গান।
কত ভক্ত গাহিছে আজিও, শুধু তব অবদান—
গঙ্গোত্রীর উৎসে যথা ভাগিরথী বহে ভীম
স্রোতে —
প্লাবিয়া ভারত বক্ষ, সেইমত গৌড়জন চিতে
অমিত্র ছন্দের গুরু মন্দিরায় তুলি' মন্দ্রসুর
বাণীর বন্দনা করে। বন্ধ্যাভূমে তুমি যে
অঙ্কুর
রোপণ করিয়া গেছ কবি' তব রুদ্র লেখনীতে
আজি তাহা পরিণত মহামহীরুহে। মহাকবি?
সাহিত্যের চিত্রপটে এঁকে গেছ যে জ্বলন্ত ছবি,
অপূর্ব্ব অদ্ভুত বীরপূজা, কোথায় তুলনা তা'র?
বাণীচিত্ত কোকোনদে মৃত্যুহীন তব দীপ্ত
নাম,—
মধুলুব্ধ ভৃঙ্গসম আজো তাই তুলিছে ঝঙ্কার।
মৃত্যু ধর্ম্মী এ কবির—মৃত্যুঞ্জয় লহগো প্রণাম।

* * *

আমরা শুনিতে পাইলাম শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস "গৃহদাহ"কে নাট্যরূপ দিতেছেন। তিন মাস বাদে শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী বাঙ্গালোর হইতে ফিরিয়া আসিলে, নব নাট্যমন্দিরে পাদপ্রদীপের সম্মুখে উপস্থিত করার প্রচেষ্টা হইবে।

সাগরপারে ৺মেয়রের মামলার ঢেউ

বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা সমাকীর্ণ পাশ্চাত্য দেশেও যে কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকারের ব্যভিচারের মামলা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল, "নিউস্ অফ্ দি ওয়র্ল্ড" নামক একটি বিলাতী সংবাদপত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদে তাহা সবিশেষ উপলব্ধি হইবে।

DRAMA OF DYING PROFESSOR

SENSATIONAL SEQUEL TO CAUSE CELEBRE

COURT ACQUITS GIRL-WIFE AND EX-MAYOR

TRAGEDY has added to the sensations of a cause celebre at Calcutta in which the ex-mayor of the city, Mr. N. R. Sarkar, was accused of misconduct with his cousin, the pretty young wife of Prof. P. N. Sarcar.

Not long after the acquittal of Mr. Sarkar, Prof. Sarkar was found dying from opium poisoning in a train 100 miles from Calcutta, states Reuter.

He left a letter asking his nephew to draw on money from a provident fund for his mother and his creditors.

He declared that he was the victim of a "deep-laid conspiracy" and did not know how things would end.

The case in which he was concerned began in the Chief Presidency Magistrate's Court on March 11.

Mrs. Sarkar was married to the professor in 1929. Mr. Sarkar was a witness at the wedding.

Alleged "Confession"

Her husband's petition alleged that misconduct took place at Calcutta, where his wife lived after her marriage, as she was still a student at Calcutta University, and afterwards at Delhi.

He also alleged that she had confessed her guilt before the birth of a child.

Her husband and his brother-in-law described how they discovered Mrs. Sarkar and Mr. Sarkar in a bedroom at Mr. Sarkar's house.

Mrs. Sarkar denied all the accusations. Dressed in a costly sari—the garment worn by Indian women—she gave her evidence calmly and faced cross-examination without a tremor.

She said that she had not wished to marry her husband at first, but finally consented to do so.

Her husband, she asserted, never objected to her association with the ex-mayor until after the birth of the child. Even then he did not accuse her of misconduct.

She declared that her husband was the father of her child.

—"*News of the World.*"

"অধ্যাপকের রোমাঞ্চকর মৃত্যু"

"ডাকসাইটে মামলার চাঞ্চল্যকর পরিণতি"

"আদালত কর্তৃক বালিকাবধূ ও ৺মেয়র দায়মুক্ত"

কলিকাতার যে ডাকসাইটে মামলায় কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ এন, আর, সরকার তাঁহার আত্মীয়া (cousin) এবং অধ্যাপক পি, এন, সরকারের সুন্দরী তরুণী পত্নীর সহিত গর্হিত আচরণ করার অভিযোগে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইয়াছিলেন, তাহার সহিত মৃত্যুবেদনা সংযুক্ত হওয়ায় তাহা আরও চাঞ্চল্যকর হইয়াছে।

রয়টার সংবাদ দিতেছেন যে, মিঃ সরকারের মুক্তিলাভ করার অনতিবিলম্বেই অধ্যাপক সরকারকে কলিকাতা হইতে ১০০ মাইল দূরে রেলগাড়ীর কামরায় অহিফেন বিষে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক সরকার একখানি পত্রে তাঁহার ভাগিনেয়কে "প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড" হইতে তাঁহার গচ্ছিত অর্থ লইয়া তাঁহার মাতা এবং পাওনাদারদিগকে দিতে বলিয়াছেন।

তিনি সেই পত্রে আরও বলিয়াছেন যে তিনি এক "গভীর ষড়যন্ত্রের" মধ্যে পড়িয়াছেন এবং তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না কিভাবে সকল সমস্যার সমাধান হইবে।

তিনি যে মামলায় ফরিয়াদী ছিলেন, উহা কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গত ১১ই মার্চ্চ আরম্ভ হইয়াছিল।

শ্রীযুক্তা সরকারের সহিত অধ্যাপকের বিবাহ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ঐ বিবাহ অনুষ্ঠানে মিঃ নলিনী সরকার একজন সাক্ষী ছিলেন।

"স্বীকারোক্তি"র কথা

অধ্যাপক সরকার তাঁহার আবেদনে বলিয়াছিলেন যে উক্ত অবৈধ আচরণ কলিকাতায় সংঘটিত হয় এবং তখন শ্রীযুক্তা সরকার কলিকাতাতেই বাস করিতেন কারণ, শ্রীযুক্তা সরকার ঐ সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী ছিলেন। এবং পরে উক্ত অপরাধ দিল্লীতেও ঘটে।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে তাঁহার স্ত্রী তাঁহার নিকট তাঁহাদের পুত্র সন্তানের জন্মের পর সব অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা সরকারের স্বামী এবং স্বামীর ভগিনীপতি কিরূপ অবস্থায় মিঃ সরকারের বাড়ীতে মিঃ সরকার এবং শ্রীযুক্তা সরকারকে একখানি শয়ন গৃহে দেখিয়াছিলেন, আদালতে তাহা বর্ণনা করেন।

শ্রীযুক্তা সরকার সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেন। ভারতীয় মহিলাদিগের পরিচ্ছদ একখানি মূল্যবান শাড়ীতে ভূষিতা হইয়া তিনি কোর্টে শান্তভাবে সাক্ষ্য দেন এবং কোনরূপ অধীরতা প্রকাশ না করিয়া জেরার সম্মুখীন হ'ন।

তিনি বলেন যে প্রথমে তিনি অধ্যাপককে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তবে শেষ পর্য্যন্ত তিনি রাজী হইয়াছিলেন।

তাঁহার স্বামী, তিনি দৃঢ়ভাবেই জানান, ভূতপূর্ব্ব মেয়রের সহিত মিলামেশাতে তাঁহাদের সন্তান না জন্মান পর্য্যন্ত কখনও আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তখনও কোনরূপ গর্হিত আচরণের বিষয়ে অভিযোগ করেন নাই। তাঁহার স্বামীই যে তাঁহাদের পুত্রের পিতা,—সেকথাও শ্রীযুক্তা সরকার বলেন।

—নিউজ অফ দি ওয়ার্লড, লণ্ডন

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

নিউ থিয়েটার্স

গত রবিবার, প্রকাণ্ড বড় এক সেট্‌এ 'ভাগ্য-চক্রে'র একটি দৃশ্যের ছবি তোলার কথা ছিলো। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ একটি দুর্ঘটনায় সেটি সেদিন সম্ভব হয়নি। বিশ্বনাথ ভাদুড়ী এই চিত্রে একটি প্রধান অংশে আছেন। তাঁর কপালে হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত ফোঁড়া গজিয়ে ওঠে। শনিবার দিন রাতে তার অবস্থা আরো গুরুতর হয়ে ওঠে! ডাক্তার বল্‌লে—সম্পূর্ণ বিশ্রাম। অথচ রবিবার দিন ঐ বড় সেট্‌-এ তাঁকে ছাড়া ক্যামেরা চলে না, অতএব সেট্ দাঁড়িয়েই রইলো, তার গায়ে আলো আর পড়্‌লো না। বিশ্বনাথ বাবু একটু ভালো হ'লেই ঐ দৃশ্যে ক্যামেরা আবার ঘুরবে।

* * *

এই ভ্যাপ্‌সা গরমে প্রায় ঐ বিশেষ চর্ম্ম-রোগটি হচ্ছে। ফোঁড়া হয়েছে আমাদের 'হুয়া' ভায়ারও। 'বি' ইউনিটে বসেছিলুম। কথাবার্ত্তায় জান্‌তে পারা গেলো—'হুয়া'—'দেবদাসে'র ঐ গোঁফ-পাকানো ভদ্রলোক, আর তাঁর স্বাভাবিক চলায় চল্‌তে পারছে না। শিরদাঁড়াকে খানিকটা হেলিয়ে তবে চল্‌তে হয় 'হুয়া'কে।

একটা সিগ্রেট্‌ খেতে এলো সাইগল—পশ্চিমে 'দেবদাস'। ছবিটির প্রযোজক শ্রীযুক্ত মিত্র একটু বিশ্রাম করছিলেন। তিনি বল্‌লেন—ঐ বাদামী 'সুট্' ভালো হবে না হে সাইগল, কালোটা পরে' এসো।

হিন্দি 'দেবদাস'এ সাইগল তা হ'লে 'সুট্' পরছে। হিন্দী ছবি ব'লে বেশ মানাবে সন্দেহ নেই।

* * *

"দেবদাস" প্রসিদ্ধ পরিচালক কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের "বামুনের মেয়ে"র শীঘ্রই সবাক চিত্ররূপ দেবেন। নিউ থিয়েটার্সের প্রসিদ্ধ অভিনেতৃসঙ্ঘ এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে চিত্রখানি ব্রিটিশ একুসটিক্‌ শব্দযন্ত্রে গৃহীত হবে। সুতরাং আশা করা যায়, এই মুখর চিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে। চিত্রখানি উত্তর কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহ "রূপবাণীতে" মুক্তিলাভ করবে। ইহার বিশদ বিবরণ এবং চরিত্রলিপি পরে প্রকাশ পাবে।

* * *

ভারত-বিখ্যাত উর্দ্দু সবাক্ "পূরণ ভকতে"র তামিল "পূরণচন্দ্র" নাম নিয়ে শীঘ্রই মাদ্রাজের 'এড্‌ওয়ে টকীজে' মুক্তিলাভ কোরবে।

মুকুল থিয়েটারে 'দেবদাস'

ঢাকার বিখ্যাত ঐ চিত্র-গৃহে 'দেবদাস' আগামী ১৩ই জুলাই মুক্তিলাভ করবে। উদ্বোধন-উৎসবে উপস্থিত থাক্‌বার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ মিঃ বি, এন, সরকারকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু, আগামী ১০ই জুলাই স্যার এন, এন, সরকার কিছুদিন থাক্‌বার জন্যে আস্‌বেন কল্‌কাতায়—তাই মিঃ বি, এন, সরকারের ঐ নিমন্ত্রণে যোগদান করা সম্ভব হ'লো না। যদিও মিঃ সরকার

কথা দিয়েছেন—যে অদূর ভবিষ্যতে "মুকুল থিয়েটার" একবার তিনি পরিদর্শন করবেনই করবেন।

কালী ফিল্মস্

"বিদ্যাসুন্দরে"র কাজ শেষ হ'য়েছে।

* * *

"সরলা" ও "মণিকাঞ্চন" (২য় পর্ব্ব) অনতিবিলম্বে যা'তে সুরু হয়, তার তোড়-জোড় চল্‌ছে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

"পায়ের ধুলো"র কাজ শ্রীজ্যোতিষ মুখার্জ্জীর পরিচালনায় বিশেষ ব্যস্ততার সঙ্গে তোলা হচ্ছে। এই চিত্রের চিত্র-শিল্পী শ্রীশৈলেন বসু ছবিখানির ভেতর যা'তে নতুন কিছু দেখাতে পারেন, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা কোরছেন—তাঁর চেষ্টা সফল হ'ক।

* * *

'ডি-জি' পরিচালিত "বিদ্রোহী"র বিদ্রোহ ঘোষণার দিবস পূর্ব্বেই প্রচারিত হ'য়েছে। ছবিখানি দেখবার জন্য আমরা উৎসুক হ'য়ে পড়েছি। শোনা যাচ্ছে, জয়পুরের ভগ্ন-কীর্ত্তি-স্তম্ভের নানা নিদর্শন এই ছবির ভেতর প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠবে। 'ডি-জি'র এতদিন হাসির ছবির ওপর একাধিপত্য ছিল—এবার তাঁর নব পথ গৌরবময় হ'তে দেখলে আমরা তাঁকে প্রাণভরে প্রশংসা কোরব।

রাধা ফিল্ম

"মানময়ী গার্লস স্কুলে"র শেষ হপ্তা "রূপবাণী"তে চল্‌ছে। ছবিখানির চাহিদা বাজারে না মেটার জন্যে কর্ত্তৃপক্ষ আসছে শনিবার থেকে ছবিখানা 'কর্ণওয়ালিশে' মুক্তির ব্যবস্থা কোরেছেন।

* * *

এদের হিন্দী 'দক্ষযজ্ঞ' শীঘ্রই নিউ সিনেমায় মুক্তি পাবে।

* * *

শেঠী পরিচালিত "থাণ্ডারবোল্টে"র বিচার দৃশ্যের কাজ হচ্ছে।

* * *

ক্রাউন ও কর্ণওয়ালিস

কালী ফিল্মসের স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ক্রাউন ও কর্ণওয়ালিস থিয়েটার স্থায়ীভাবে পরিচালনার ভার গ্রহণ কোরেছেন। বিশদ বিবরণ আস্‌ছে হপ্তায় প্রকাশিত হবে।

বেঙ্গল টকিজ—

বাংলার চিত্র-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে আর একটি নব-গঠিত চিত্র-প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটীর নাম 'বেঙ্গল টকিজ'! অফিস খোলা হয়েছে ১১নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রিটে।

নতুন হ'লেও প্রতিষ্ঠানটির কর্ত্তৃপক্ষদের তৎপরতার প্রশংসা করা যায়। কারণ, ইতি-মধ্যেই এঁরা কার্য্যক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়েছেন। শ্রীমধু বসুর হাতে এঁরা প্রযোজনা

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

চক্ষুহীন চক্ষুচিকিৎসকের কীর্ত্তি

শ্রীঅভয়ঙ্কর

কলিকাতার রাস্তাঘাট ও পার্ক প্রভৃতির নামকরণ করিবার জন্য প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টে একটি করিয়া 'রোড নেমিং' কমিটি আছে। গত ১৩ই মার্চ্চ এক নং ডিষ্ট্রিক্টের রোড নেমিং কমিটির অধিবেশনে মাত্র ছয় জন সভ্যের উপস্থিতিতে কয়েকটি নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে ভাবে পুরাতন নাম কোনও সঙ্গত কারণ না থাকাতেও পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এত অল্প সংখ্যক সভ্যের পক্ষে এরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন করা অনুচিত—ইহা অধ্যাপক পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য উত্থাপন করা সত্বেও পরিবর্ত্তন সাধন প্রস্তাব কমিটী গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার (হেদুয়ার) এর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া বটকৃষ্ণ উদ্যান করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেন যে, কর্ণওয়ালিশের নাম পরিবর্ত্তন করিবার কোনও সঙ্গত হেতু নাই এবং যদি হেতু বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে চার নম্বর ওয়ার্ডস্থিত এই পুষ্করিণীর নাম চার নম্বর ওয়ার্ডের কোনও প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের নামেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই ওয়ার্ডে রাজা রামমোহন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির বাস ছিল। তাঁহাদের নাম কিম্বা বাঙ্গালার গৌরব বঙ্কিম, রমেশ, উমেশচন্দ্র প্রভৃতি কাহারও নামে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বটকৃষ্ণ পালের নাম স্মরণ করা উচিত। কিন্তু এ অঞ্চলের সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করিতে হইলে ২নং ওয়ার্ডে কিম্বা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ এক্সটেনশনে নূতন কোনও উদ্যান তাঁহার নামানুসারে রাখাই সঙ্গত। প্রভাতবাবু আরও বলেন যে, ওয়ার্ড কাউন্সিলারগণের মত লওয়া হউক। ওয়ার্ড কাউন্সিলার জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় ও সামসুদ্দিন আহমেদ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কমিটির সভ্য নহেন বলিয়া তাঁহাদের বক্তব্য বলিতে দেওয়া হয়না এবং ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্রের আগ্রহাতিশয্যে তিন ভোট পক্ষে ও দুই ভোট বিপক্ষে হওয়াতে উক্ত পুষ্করিণীর নাম বটকৃষ্ণ উদ্যান গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ডাক্তার মৈত্রের এই অতিরিক্ত আগ্রহের অন্তরালে মেয়র হইবার তীব্র বাসনা উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাঁহার আশা ছিল যে স্যার হরিশঙ্করকে এইভাবে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার সাহায্যে ভোট বৈতরণী পার হইবেন। কিন্তু স্যার হরিশঙ্কর এই চালবাজীতে ভুলিবার মত নির্ব্বোধ নহেন। কাজে কাজেই ডাক্তার মৈত্রের আশা স্বপ্নে পরিণত হয়। আমরা ডাক্তার মৈত্রের অনুষ্ঠিত এই অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ করি। এরূপভাবে যথেচ্ছ নাম পরিবর্ত্তন করা অনুচিত। আশা করি ডিষ্ট্রীক্ট কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না।

* *

বিবেকানন্দ রোডের যে অংশ চিৎপুর অভিমুখে গিয়াছে সেই অনামিত অঞ্চলের নাম মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ কিম্বা কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের নামানুসারে রাখিবার প্রস্তাব বহু পূর্ব্বেই হইয়াছিল। ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরাও সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু সে সময়ে

বিভাগ ও পরিচালনার ভারার্পন করেছেন। খ্যাতনামা পরিচালক শ্রীযুত বসু তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের সাহায্যে সর্ব্বপ্রথম একখানি হিন্দী ছবি তোলা স্থির করেছেন। ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিও ভাড়া নেওয়া হ'য়ে গেছে। আগামী ১৫ই জুলাই এই ছবিখানির প্রথম 'শুটিং' হ'বে।

উক্ত রাস্তা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কর্পোরেশনের হস্তে তখনও প্রদান করেন নাই এবং উক্ত রাস্তা তখনও সাধারণের জন্য উন্মুক্ত না হওয়াতে আইনতঃ কোনও নামকরণ করিবার অধিকার বর্ত্তায় নাই বলিয়া উক্ত প্রস্তাবগুলির আলোচনা স্থগিত থাকে। কিন্তু ১৩ই মার্চ্চের সভায় উক্ত রাস্তার নাম কালীকৃষ্ণ ঠাকুর রোড রাখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। সভায় প্রভাতবাবু বলেন যে, রাস্তা এখনও ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কর্পোরেশনকে প্রদান করেন নাই ও রাস্তা সাধারণের জন্য আজিও উন্মুক্ত করা হয় নাই, অতএব আইন অনুসারে নামকরণের অধিকার কর্পোরেশনের বর্ত্তায় নাই; অতএব এই প্রস্তাব স্থগিত থাকুক। সভাপতি এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিলে প্রভাতবাবু রবীন্দ্র নাথের নামানুসারে ও পাঁচুবাবু মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের নামানুসারে রাস্তার নাম রাখিবার প্রস্তাব করেন। সভা ভোটাধিক্যে ঐ দুই নাম বর্জ্জন করিয়া কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের নামানুসারে নামকরণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কালীকৃষ্ণ বিখ্যাত লোক। কিন্তু তিনি এই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ও মহর্ষি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী। সেইজন্য আমরা এই সভ্য-বিরল সভায় যে নামকরণ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।

এই সভায় রবীন্দ্রনাথের নামানুসারে নামকরণের বিরুদ্ধে একজন সভ্য বলেন যে, জীবিত ব্যক্তির নামে স্মারক চিহ্ন রাখা উচিত নহে। অথচ তিনি উক্ত সভায় রাণী হর্ষমুখীর নামে একটী ও রাণী দেবেন্দ্রবালার নামে অপর একটী রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব করিলেন ও সভায় তাহা ডাক্তার মৈত্রের চেষ্টায় গৃহীত হইল। রাণী হর্ষমুখী জীবিতা আছেন। কাহারও ভোট ভিক্ষার সুবিধা অসুবিধার উপরই কি কলিকাতার ভাগ্য নির্ভর করিবে?

সভায় সর্ব্বাপেক্ষা হাস্য-জনক ব্যাপার ঘটিয়াছে মাণিকতলা ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্ত্তন লইয়া। মাসাধিক কাল পূর্ব্বে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু রমেশচন্দ্র দত্তের বাসভবন মানিকতলা ষ্ট্রীটে ছিল, সেহেতু চিৎপুর হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট রমেশ চন্দ্র রোড নামে অভিহিত হউক ও অন্য একজন কাউন্সিলার প্রস্তাব করেন যে, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে সার্কুলার রোড পর্য্যন্ত কাদম্বিনী চন্দ্রমুখী রোড হউক, কারণ এই দুইজন মনঃস্বিনী মহিলা বাঙ্গলার প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট। ইহাঁরা এই রোডস্থিত বেথুন কলেজের ছাত্রী ও ইহাঁদের নিবাস এই রাস্তার সন্নিকটেই ছিল। তখন রাস্তার নাম সহসা পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে, এ সম্বন্ধে জনমত কি তাহা জানা হউক, এই বলিয়া ডিষ্ট্রিক্ট কমিটীর সভাপতি ডাক্তার মৈত্র বিচার স্থগিত রাখেন। অথচ ১৩ই মার্চ্চের সভা চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইতে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত রামদুলাল সরকারের নামানুসারে রাখিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। রামদুলাল সরকারের স্মৃতিরক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যে কারণে রমেশচন্দ্র ও কাদম্বিনী চন্দ্রমুখী নাম গৃহীত হইল না, সে কারণ বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও রামদুলাল সরকারের নাম রমেশচন্দ্রের পরিবর্ত্তে কেমন করিয়া গৃহীত হয়?

আর এইরূপ পরিবর্ত্তন হাস্যজনক হইয়াছে এই জন্য যে মাণিকতলা ষ্ট্রীট মধ্যস্থল হইতে দ্বিখণ্ডিত করা হইল এবং পশ্চিমার্দ্ধ (চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইতে চিৎপুর পর্য্যন্ত) মাণিকতলা ষ্ট্রীট, মধ্যের অংশ (চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইতে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত) রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট ও পূর্ব্বার্দ্ধ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে সারকুলার রোড পর্য্যন্ত) মাণিকতলা ষ্ট্রীট রাখা হইল। এরূপ হাস্যজনক অবস্থার সৃষ্টি যে সমস্ত কাউন্সিলার করিতে পারেন, তাঁহাদের মতামতের প্রতি যদি করদাতাগণ শ্রদ্ধা পোষণ না করেন তাহা হইলে কি অন্যায় হয়?

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হইতে চিৎপুর পর্য্যন্ত মাণিকতলা ষ্ট্রীটের নাম বজায় রাখিতে ডাক্তার মৈত্র অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং রমেশ চন্দ্রের নামে মাণিকতলার নামকরণে তাঁহার আপত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দুষ্টলোকে বলে যে, তিনি তাঁহার নিজের নামানুসারে উক্ত অঞ্চলের নাম রাখিবার অভিলাষী এবং সেই জন্য ঐ অঞ্চলটুকু বজায় রাখিয়া বাকী অঞ্চল পরিবর্ত্তনে তাঁহার বাধা না থাকায় ১৩ই মার্চ্চের হাস্যকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

এইরূপ হাস্যকর অবস্থার যাঁহারা সৃষ্টি করেন তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদনের কি কোনই ব্যবস্থা হইবে না?

ন্যাশনাল নিউস্‌পেপার্স লিমিটেড

নবতম মাসিক পত্রিকা "চিত্রালী"র পরিচালনা-ভার ন্যাশনাল নিউসপেপার্স লিমিটেড গ্রহণ করিয়াছেন। "খেয়ালী", "ভ্যারাইটিজ্", "চিত্রালী", "ভ্যারাইটিজ্ প্রেস" ও "খেয়ালী প্রেস" এই পাঁচটী প্রতিষ্ঠানের সম্মিলনে ক্রম-বর্দ্ধমান ন্যাশনাল নিউস্‌পেপার্স লিমিটেডের পুষ্টি সাধনের পশ্চাতে মিঃ বি, এন, সরকারের আনুকূল্য ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মিত্রের সহযোগিতা যে বিদ্যমান আছে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সম্প্রতি প্রসিদ্ধ কয়লা ব্যবসায়ী ও বঙ্গেশ্বরী কটন মিলের অন্যতম ডিরেক্টার কলিকাতার বণিক সমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষ ন্যাশনাল নিউস্‌পেপার্স লিমিটেডে যোগদান করিয়াছেন। একদিকে মিঃ সরকার ও শ্রীযুক্ত মিত্র ও অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত ঘোষের সম্মিলিত সাহচর্য্যে ও সহযোগিতায় ন্যাশনাল নিউস্‌পেপার্স লিমিটেডের যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহা সুনিশ্চিত।

শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
ন্যাশনাল নিউস্‌পেপার্স লিঃ

এপিঠ ওপিঠ

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

শুনেছিস লা, মুরলা ?

কী গা, ভোঁদার মা ?

তোর সোয়ামী যে আর একটা নোতুন সংসার পেতেচে।

তাইতো বলি তিন সপ্তাহ হ'তে চল্লো নন্দ বাড়ী আসবার নামটিও মুখে আনে না।

আজকাল প্রত্যেক শনিবার নন্দ বুঝি বাড়ী আসেনা ?

না। বিষ্টুদার হাতে শনিবার শনিবার খরচার টাকা পাঠিয়ে দিয়েই খালাস।

বিষ্টুকে তাই কিছু জিজ্ঞেস করেছিলি, নাকি ?

তা আর করিনি। বলে, তুই কিছু ভাবিসনে মুরলা, নন্দ ভালোই আছে। যে কাজকর্ম্ম পড়েছে বাড়ী আসবার ফরসুতই করতে পারচে না।

আজকাল পুরুষমানুষদের ওপর এতটুকু বিশ্বাস কয়া যায় না। দশ বছরের ওপর তোর সঙ্গে ঘর করচে আর তার কি না এই কাজ।

তা যা বলেচো মিথ্যে নয়। আমি মনে করতুম ওর বুঝি সত্যিই কাজ পড়চে। খবরটা যখন পেলুম তখন একবার সেখানে গিয়ে তার চৌদ্দ-পুরুষ উদ্ধার করে আসি। আমি হলুম গিয়ে মধু সামন্তর মেয়ে, আমার চোখে ধূলো দেবে এখন পর্য্যন্ত কেউ জন্মায়নি।

আজ আসি, ভোঁদার আবার কাল থেকে জ্বর হয়েচে, বলিয়া বিগতযৌবনা কাত্যায়ণী বাড়ীর চৌকাট ডিঙাইয়া বাহির হইয়া আসিল।

কাত্যায়ণীর মুখে নন্দর কীর্ত্তির কথা শুনিয়া মুরলা বাঁশের খোঁটাটি ধরিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

মল্লিকপুরের নন্দ মাইতি মাধবগঞ্জের চট কলে হেড্ মিস্ত্রী। দু'পয়সা বেশ উপরি রোজগার আছে এবং পসার প্রতিপত্তিও খুব। বাড়ী হইতে কোস দশেক দূরে চটকল, রোজ হাঁটিয়া সকাল সাতটায় হাজির দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। ইহার উপর ভোরের দিকে এমন কোন গাড়ী থাকেনা যে আড়াই কোস পথ ভাঙ্গিয়া সে ট্রেন ধরিবে। কোন উপায় না থাকায় সে চটকলের কুলিদের কোয়ার্টারে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। হেড মিস্ত্রী তাহার ঘরদোর সাধারণ মিস্ত্রীর চাইতে একটু স্বতন্ত্র। প্রত্যেক শনিবার সে সন্ধ্যার পর বাড়ী আসে। রবিবার দেখিতে দেখিতে একরকম কাটিয়া যায়। আবার সোমবার সকালে সে কাজে হাজিরা দেয়। একটু আধটু যা দেরী হয় তাহা সে সাহেবকে বলিয়া ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। গত দশ বৎসর ধরিয়া সে এই বাঁধাধরা নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম করে নাই।

আর ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন ফল হইবে না এই কথা মনে হওয়ায় মুরলা একাই মাধবগঞ্জের চটকলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ট্রেনে চড়িয়া মুরলা কিছুতেই অশ্রান্ত মনকে সংযত করিতে পারিল না। নানা রকম চিন্তায় তাহার দেহমন অবশ এবং অধীর হইয়া উঠিল।

মুরলা চিন্তা করে—মাধবগঞ্জ পৌছিয়া সে কী করিবে ? নন্দকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিবে না—সেখানে সে ঝগড়াঝাটি করিয়া তুমুল কাণ্ড বাধাইবে ? মিষ্ট কথায় তাহাকে বারণ করিলে কোন ফলই হইবে না। ঝগড়াঝাটি করিয়া লোকজন জড় করাই শ্রেয়। লোকে বুঝুক্ সে কতদূর অধঃপাতে গিয়াছে। রক্তারক্তি হয় হোক তাহাতে মুরলা এতটুকুও ভ্রুক্ষেপ করিবে না। বদমায়েস মেয়েটিকে একবার হাতের কাছে পাইলে হয়। চুলের মুঠি ধরিয়া তাহাকে সে কী কঠোর শাস্তি বিধান করিবে তাহা সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। নন্দ এ কাজ কেন করিতে গেল ? মেয়েটাই যত নষ্টের মূল। তাহা না হইলে সহজে কি সে তাহাকে বশে আনিতে পারে ?

মুরলার মানশ্চক্ষুর সামনে অকস্মাৎ ভাসিয়া ওঠে তাহাদের গতজীবনের শান্তি-পূর্ণ সংসারের উদ্বেগহীন মনোরম ছবি। এই সে দিন পর্য্যন্ত ছুটির দিন সন্ধ্যার সময়ে দাওয়ায় বসিয়া নন্দ তাহাকে লইয়া কত গল্পগুজব করিয়াছে।

শুনেচিস নোতুন-বৌ ? নন্দ মুরলাকে নোতুন-বৌ বলিয়া ডাকে।

মুরলা আদরে গলিয়া উত্তর দেয়; ক্যেনে ? কী বলছিলে ?

দশ বছর ধরে তোর সঙ্গে ঘর করচি একটা জিনিষও তোকে দিতে পারলুম না, বলছিলুম কি তোকে সোনার নথ আর কোমরের বিছাটা এইবার গড়িয়ে দিই।

এ-বছর কি রকম দু'বচ্ছর পড়েছে, দেখচিস না ? এক বিশ ধানও হলো না। এ-সময় খামাকা অতোগুলো টাকা খরচ করতে যাস্‌নি। খড়ের অভাবে গরুবাছুর-

গুলো না খেতে পেয়ে মরে যাবে। দে টাকাগুলো আমায় দে। তোর হাতে থাকলে সব খরচ হয়ে যাবে। অসময়ের জন্যে গচ্ছিত ক'রে রেখে দিই।

তা হ'লে তুই গয়না চাসনা, কেমন?

তুই তো রয়েছিস, আমার আবার গয়না কী হবে? তার চেয়ে আসচে শনিবার বাড়ী আসবার পথে বিচতলার হাট থেকে কাপড়-জামা কিনে আনিস। আমোদ ক'রে পরে বাঁচবো।

আজ এই সমস্ত কথাবার্ত্তাগুলি মুরলার কাছে স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। মন অজ্ঞাতসারে আপনার খেয়ালেই সে-সব সুখ-কল্পনার কেয়ারী সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা যেন ধুইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

ট্রেন হইতে নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে বিপুল জনস্রোতের মধ্যে আসিয়া মুরলা আপনাকে অত্যন্ত অসহায় বলিয়া মনে করিল। মাধবগঞ্জের চটকলে যাইবার কোন পথই তাহার জানা নাই। এত বড় রাস্তা ঘাট, দুই পাশে নানাবিধ দোকানের বিচিত্র সমাবেশ, খড়খড়ি ওয়ালা ঘোড়ার গাড়ী, সে জীবনে কখনও দেখে নাই। তাই উদ্দাম জনস্রোতের মধ্যে পড়িয়া সে কী করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, একবার তাহার মনে হইল ঝড়ো হাওয়ার মত নন্দর উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া তাহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে তাহার ভুল বুঝিতে পারিল। ও জিনিষ কল্পনায় আনিতে কিছুই বাঁধে না। তাহাকে এই অজানা অচেনা পথ হাঁটিয়া নন্দর খোঁজ লইতে হইবে।

মুরলা একটু করিয়া পথ হাঁটে, লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে মাধবগঞ্জের চটকল কতদূর। উত্তর শুনিয়া পূর্ণ উদ্দমে চলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু একটা চিন্তা তাহার চলার গতিকে মন্দীভূত করিয়া আনে! নন্দ যদি মেয়েটিকে লইয়া কোথাও বাহির হইয়া থাকে!

বেলা অধিক হওয়ায় রাস্তার ধারে একটা বাজারের মধ্যে ঢুকিয়া চ'পয়সার বাতাসা-মুড়ি কিনিয়া মুরলা ক্ষুধার আংশিক জ্বালা নিবৃত্তি করিল। বৈশাখের দ্বিপ্রহরের আকাশ হইতে উল্কার মত অগ্নিবৃষ্টি পৃথিবীর বুকে একটা প্রলয় বিভীষিকার পূর্ব্বাভাস জানাইয়া দেয়। কাঠ ফাটা রৌদ্রে ধরণী ফাটিয়া একাকার হইয়া আছে, বাহিরে পা দেয় কাহার সাধ্য। চারিদিকে আগুণের ঝলকা, বাহির হইলে আর রক্ষা নাই, পুড়াইয়া ঝলসাইয়া দিবে। দিগন্ত বিস্তৃত সীমাহীন আকাশের কোলে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ধরিলে দেখা যাইবে ধোঁয়ার মত একটা তরল পদার্থ কুণ্ডলী পাকাইয়া আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভা স্রাবের মত বিস্তারিত হইতেছে। বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মাথা যেন কেমন ঝিমঝিম করে।

একটু বিশ্রাম করিয়া রৌদ্রের প্রখর তেজ একটু কমিয়া আসিলে মুরলা আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিল। মিস্ত্রীদের কোয়ার্টারের মধ্যে যখন ঢুকিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

একটি অপরিচিত লোককে মুরলা জিজ্ঞাসা করিল:—এখানে নন্দ মিস্ত্রী কোথায় থাকে বলতে পারো?

মুরলার দিকে আবছা অন্ধকারে চাহিয়া সে বলিল:—আমার সঙ্গে এসো, দেখিয়ে দিই।

বাড়ী হইতে আসিবার সময়, নন্দ পাটালি গুড় খাইতে ভালবাসে বলিয়া একটা ন্যাকড়ায় জড়াইয়া খানিকটা পাটালিগুড় মুরলা সঙ্গে আনিয়াছিল। কেন সে ইহা লইয়া আসিয়াছে এখন আর সে তাহা ভাবিতে পারে না। সে নন্দর সহিত রীতিমত ঝগড়া করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া আসিয়াছে—পাটালিগুড় সঙ্গে আনার কী স্বার্থকতা থাকিতে পারে সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তবুও অভ্যাস বশে পাটালির পুটলিটী সে দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল।

নন্দর বাড়ীর দরজার কাছে আসিয়া সে হাঁকিল—নন্দ বাড়ী আছিস? কে এসেচে দেখ বলিয়া প্রায়ান্ধকারের মধ্যে লোকটী কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

নন্দ সবেমাত্র চটকল হইতে ফিরিয়া আসিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া শ্রমবিমুখ দেহটীকে একটু বিশ্রাম দিবার সরঞ্জাম করিতেছে এমন সময় বাহির হইতে কাহার কণ্ঠস্বর কানে গেল। হ্যারিকেন লইয়া দরজা খুলিতেই মুরলাকে দেখিতে পাইয়া একটু থতমত খাইয়া গিয়া বলিল:—নোতুন বৌ যে? কী করে এখানে এলি বলতো? আয় ঘরের মধ্যে আয় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকিস নে।

ঘরে ঢুকিয়া কিছুক্ষণের জন্য মুরলার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। কয়েকটী কথা অজ্ঞাতসারেই সে বলিয়া ফেলিল:—বাড়ী থেকে বেরিয়ে ভয়ে আর বাঁচিনে। তোকে খুঁজে বের করতে পারবো কোন আশাই ছিল না বলিয়া সে একপ্রকার কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।

কী এমন হয়েছে যে এখানে আমার খোঁজ করতে এসেচিস, নোতুন বৌ?

নন্দর কথা শুনিয়া মুরলা কেমন যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেল। আঁচলের কোনে চোখ মুছিয়া অপরাধীর ন্যায় সে একটু হাসিতে চেষ্টা করিল। পরমুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল কী জন্য তাহার এখানে অতর্কিত শুভাগমন হইয়াছে। চকিতে কি যেন অঘটন ঘটিয়া গেল। সে তাহার স্বামীর আশ্রয়কে নিরাপদ স্থান বিবেচনা করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া নন্দর বাহু বন্ধনে নিজেকে আত্মসমর্পন করিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিল না। ইহার পর নূতন করিয়া ঝগড়ার সূচনা করা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আনন্দাশ্রুকে কী করিয়া সে নিরানন্দের নির্ম্মম নিগড়ে বন্দী করিয়া রাখিবে? আজিকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দের যে অব্যক্ত শিহরণ তাহার মনে রণিয়া রণিয়া উঠিতেছে তাহার প্রকৃত উন্মাদনা জীবনে সে একটি মুহূর্ত্তের জন্য অনুভব করে নাই।

পরিত্যক্তা লাঞ্ছিতা স্ত্রীর সহিত স্বামীর অকস্মাৎ দেখা হইলে যে ভাব বৈলক্ষণ্য ঘটে তাহার কোন আভাসই নন্দর মুখে ফুটিয়া উঠিল না।

মুরলাও নন্দর মুখে বা কথাবার্ত্তায় কোন-রূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিল না। নন্দকে আগে যেমন শান্তশিষ্ট বলিয়া মনে হইত এখনো তাহাকে ধৈর্য্যের প্রতীক বলিয়া ভুল হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

নন্দ এখনও পর্য্যন্ত মেয়েটির সম্বন্ধে কোন কথাই মুরলাকে বলে নাই। এইবার সে বলিল:—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, নোতুন বৌ, ওই তক্তার ওপর বস।

মুরলা তক্তার ওপর আসিয়া বসিল।

ঘরটির আয়তন নিতান্ত অল্প পরিসর নয়। মুরলার প্রথমেই নজরে পড়িল দুইটী বিভিন্ন তক্তায় আলাদা ভাবে দুইটী পৃথক বিছানা পাতা আছে, দেখিয়াই তাহার সর্ব্ব শরীর রাগে রি রি করিয়া উঠিল। হাত-পায়ে কেমন যেন সে দুর্ব্বলতা বোধ করিতেছে, কণ্ঠনালী তাহার শুকাইয়া আসিল। মনে হইল ধরণীর অতল গর্ভে সে যেন ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছে।

মুরলা যে মাটির ঘরে থাকিয়া মানুষ হইয়াছে তাহার কাছে এ ঘরটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। জানলার ধারে আমকাঠের একটি ভগ্ন টেবিল, উপরিভাগ খবরের কাগজ দিয়া মোড়া, কোণগুলি ছোট ছোট কাঁটা পেরেক দিয়া আটিয়া দেওয়া হইয়াছে। টেবিলটির একধারে একটা পুরাণো কলম এবং কালীর দোয়াত এবং অপর পার্শ্বে খান কতক যাত্রাদলের বই। গামছার বদলে দড়িতে একখানা বহুদিনকার ব্যবহৃত তোয়ালে।

চুপ করিয়া থাকা মুরলার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। বলিল:—ঘরে একটা কালী ঠাকুরের ছবি রাখতে পারিস নে?

এত দেব দেবী থাকিতে হঠাৎ কালীর ছবির কথার যথেষ্ট কারণ আছে। বিবাহের প্রথম বৎসরে নন্দর এমন কঠিন ব্যামো হইয়াছিল যে বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না। মুরলা গ্রামের জাগ্রত দেবতা কালীঠাকুরের কাছে "হত্যা" দিয়া তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় পড়িয়াছিল। তৃতীয় দিবস ভোরের দিকে স্বপ্নে সে আদেশ পাইল:—যা নন্দর জন্যে ভাবিস নে, ভালো হয়ে উঠবে। এর পর থেকে দুবেলা আমার নাম করবি। এর বেশী তোর কাছ থেকে কিছু চাই নে। নন্দ ভাল হইবার পর মুরলা তাই দু'বেলা কালীর নাম স্মরণ করিয়া জলগ্রহণ করে।

নন্দ উত্তর দিল ভুল হয়ে গেছে নোতুন-বৌ।

মুরলা এ কথার কোন জবাব দিল না, মনে মনে কালীকে একবার চক্ষু বুজিয়া স্মরণ করিল।

মুরলার হঠাৎ মনে হইল কথা কহিয়া

নিস্তব্ধতার অসহ্য গুমাট সে সরাইয়া দিবে। অথচ কথা কহিবার কোন সহজ পন্থাই সে খুঁজিয়া পাইল না। মনের অকথিত চিন্তার রাশি তাহাকে কথা কহিবার জন্য প্রবুদ্ধ করিতেছে। চুপ করিয়া থাকা কেমন যেন তাহার অস্বস্তিকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বাড়ীতে থাকিতে নন্দর কাছে মুরলা একই কথার পুনরাবৃত্তি করে—গরু, ছেলে-পিলে এবং দুদ্দিন আসার আগে তাহার আশু প্রতিবিধান করা।

মুরলার মন শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। ইহার পর একটা কথা স্মরণ হওয়ায় সে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল—দেখ, মঙ্গলা গাইটার গেল শনিবার একটা বাছুর হয়েচে। দেখতে ঠিক মায়ের মত।

নন্দ যন্ত্রচালিতের ন্যায় মুরলার কথাগুলি আবৃত্তি করিল: তাই নাকী? তাহার মনে তখন অন্য একটি চিন্তা কাজ করিয়া চলিয়াছে। একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা বলিবার জন্য সে মুরলার দিকে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

মনোরম সাধুখাঁ

জেনেট ম্যাক্‌ডোনাল্ড

যে মেয়েরা ছায়াছবিতে অভিনয় করে, তাদের বিয়ে করা যে উচিৎ নয়—এ মতের পক্ষপাতী হচ্ছে জেনেট ম্যাক্‌ডোনাল্ড। কিন্তু তার নিজের বিয়ে ঠিক। তার ভাবী স্বামীর নাম বব্ রিচি। তাকে আমি ভালোবাসি, সময় পেলেই তার সাহচর্য্য কামনা আমি করি, কিন্তু, তবু তাকে বিয়ে আমি করিনা, কারণ অভিনেত্রীর জীবন আর স্ত্রীর জীবন আমার মতে এক নয়। বব্‌কে আমি বিয়ে করবো জানি, তবে এখন নয়। স্ত্রী জীবন আমার আরম্ভ হবে তখন—যখন অভিনেত্রী জীবন আমার হবে শেষ। বিয়ে করা সম্বন্ধে সুন্দরী ম্যাক্‌ডোনাল্ডের এই হচ্ছে অভিমত।

সোনালী লাল চুল, নীল চোখ এই মেয়ের বিয়ের বিষয়ে এই ধারণা কিছুমাত্র অসাধারণ নয়। বেশীর ভাগ লোকই বিশ্বাস করে অভিনেত্রীদের বিয়ে হওয়া ঠিক উচিৎ নয়। অবিশ্যি, এর উল্টো অভিমতের অনেক সুন্দর উদাহরণ আছে—তবুও বেশীর ভাগ লোকই এমতে বিশ্বাস করে বেশী।

বিয়ের বিষয়ে এতো গম্ভীর হলেও অন্যান্য বিষয়ে জেনেট্ কিন্তু এত গম্ভীর নয়। যে সেট্-এ ও যখন থাকে, এক একটা কথা, এক একটা টিপ্পনীতে হাসিয়ে সবাইকে মারে। সহকারী কর্ম্মীদের ভেতর জেনেট্-এর মত এতো প্রিয় অভিনেত্রী খুব কমই আজ আছে।

একদিন এক পাল্কী চড়ে' সে এলো—আগা গোড়া ঢাকা, ঠিক একটা কুকুরের ঘরের মত দেখতে। সেট্'এর ওপর তার 'নটি ম্যারিয়েটা'র পরিচালক ভ্যান্ ডাইক তো অবাক! হঠাৎ, হাস্‌তে হাস্‌তে বেরুলো ম্যাক্‌ডোনাল্ড, হাতে তার প্রকাণ্ড এক ফলের ঝুড়ি!—এই কাজটা হচ্ছে ভ্যান্ ডাইক্‌কে একটু সন্তুষ্ট করবার জন্যে, কারণ, আগেরদিন সেট-এ আসতে দেরী হয়েছিলো।

ভ্যান্ ডাইক-এর মতলব

সবাইকে জব্দ করতে ভারী ভালবাসে এই ডব্লিউ এস্ ভ্যান্‌ডাইক্। যার মত কৌশলী পরিচালক আমেরিকায় আজ বিরল। সে একদিন 'নটি ম্যারিয়েটা'য় যত মেয়ে নাচতে এসেছিলো সবাইকে করলে নেমন্তন্ন। অনেক রাত অবধি খাওয়া দাওয়া—হঠাৎ, সে বল্লে কাল খুব সকালে সকলকে সেট-এ উপস্থিত থাক্‌তে হবে, কারণ, 'শুটিং' হবে।

পরদিন ভোর হ'তে না হ'তে প্রায় ঘুমোতে ঘুমোতে মেয়েরা ষ্টুডিয়োয় এসে উপস্থিত! এসেতো অবাক! কারো দেখা নেই। ব্যাপারটা জেনেট ম্যাকডোনাল্ডের কানে একদিন গেলো। সে বল্লে দাঁড়াও, জব্দ আমিও তাকে করছি।

তারি প্ররোচনায় একটি মেয়ে গিয়ে ভ্যান্ ডাইক্‌কে ডিনারে নেমন্তন্ন করে এলো। ভ্যান্ ডাইক গিয়ে দেখে নেমন্তন্নে সেই একমাত্র পুরুষ, আর বাকী আঠারোজন মেয়ে। খাওয়া দাওয়ার পর বাজলো বাজনা, আরম্ভ হ'লো নাচ। ঐ আঠারো জন মেয়ের সঙ্গে একবার করে' ভ্যান্ ডাইক্‌কে নাচতে হ'লো। নাচতে নাচতে তার সারা গায়ে হ'লো ব্যথা, মাথা গেলো ঘুরে। অনেক রাতে পরিশ্রমে প্রায় আধমরা হ'য়ে পরিচালক ভ্যান্ ফিরলো বাড়ী।

পরদিন তার জীবনে এই প্রথম সেটএ দেড় ঘণ্টা দেরীতে এসেছিলো পরিচালক ভ্যান্ ডাইক।

গার্ব্বোর টেনিস পোষাক

গার্বো টেনিস খেল্‌তে ভালবাসে। এক-মাত্র এই খানেই অনেক অভিনেত্রীর সঙ্গে তার যা মিল। কার সঙ্গে সে খেলে, কী পরে' খেলে এই জান্‌বার জন্যে হলিউড তো ক্ষেপে উঠলো।

অবশেষে অনেক খোঁজ ক'রে জানা গেলো টেনিস্ খেল্‌বার মোটে দু'জন বন্ধু তার আছে। তারা হচ্ছে ডোলোরেস্ ডেল্ রিয়ো আর তার স্বামী মিঃ কেডরিক গিবন্‌স্—মেট্রোর্ আর্ট ডিরেক্টর।

খাটো একটা হ্যাফ প্যাণ্ট গার্বো পরে টেনিস খেল্‌বার সময়, মোটা একটা সোয়েটার আর বড় একটা টুপী। ব্যাটে আর বলে মারে সে পুরুষের মত জোরে, মেয়েদের মত নয়।

নেল্‌সন এডি

নেল্‌সন এডির নামে হলিউড এখন পাগল। ভদ্রলোকের গান ও অভিনয় দুটোই আসে চমৎকার। চেহারায় বেশ পরিস্কার পুরুষত্ব, ৬ফুট লম্বা, সুন্দর নীল চোখ। এর গান শেখার কৌশলে সুন্দর এক অভিনবত্ব আছে। বাড়িতে বসে গান শেখ্‌বার সময় সামনে গ্রামোফোনের মত অদ্ভুত এক যন্ত্র নিয়ে নেলসন বসে। এ যন্ত্রটি তক্ষুনি তক্ষুনি এডির গলা রেকর্ড্ করে। গান শেষ হ'লেই রেকর্ডের ওপর সে সেটা শুনতে পায়—কোথায় ভুল, কোথায় বেসুরো তখুনি তাই সে বুঝ্‌তে পারে।

অনেকদিন থেকে জীবনের অন্যতম এর আকাঙ্খা হচ্ছে—সিনেমায় নাবা। কিন্তু, সুযোগ এতদিন পায় নি। অবশেষে কপালের জোরেই বল্‌তে হবে—সে 'নটি ম্যারিয়েটা'য় নেবেছে ম্যাকডোনাল্ডের প্রেমিক হয়ে।

জিয়েনিথ লয়েড্ বিলেতে খুব নাম করছে।

ভারী রসিক—এই নেলসন, হাসতে যত পারে হাসাতেও পারে তত। টেনিস খেলে, ভালোবাসে কোরাস্‌এ গান গাইতে, আর ভালোবাসে জোরে মোটর ও এরোপ্লেন চালাতে।

আসচে সপ্তাহের ছবি

অনেক গুলো ভালো ভালো ছবি আমরা আসচে সপ্তাহে দেখতে পাবো।

পয়লা নম্বর হচ্ছে—মার্লিন ডিট্রিচের 'দি ডেভিল্ ইস্ এ ওম্যান'। এ ছবিটির সঙ্গে মার্লিনের অনেক ইতিহাসের সংস্পর্শ রয়েছে। যে তাকে আজ এতখানি বড়ো ক'রে তুলেছে—সেই জোসেফ ভন ষ্টার্ণবার্গ, এ ছবিটির তোলা শেষ হতে হতেই হলিউড্ থেকে বিদায় নিয়েছে। এ ছবিটির ক্যামেরাম্যানও ছিলো ভন নিজে! মার্লিনের সঙ্গে অভিনয় করেছে সিজার রোমিবো আর লিওনেল্ অ্যাট্উইল্।

তারপর, শার্লি টেম্পল্-এর 'লিট্‌ল কর্ণেল'। মিষ্টি ঐ মেয়ে—যার হাবভাব, অভিনয় ভঙ্গী বিখ্যাত কোনো অভিনেত্রীর থেকে কোনো অংশে কম নয়। শার্লির গুণের পরিপূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে এই চিত্রে, সঙ্গে আছে—লিওনেল ব্যারীমুর, এভ্‌লিন ভেন্‌এবল্ আর জন লজ্।

অ্যান্ ডোরশাক এককালে জোন ক্রাওফোর্ড্ এর 'ষ্ট্যাণ্ড ইন' ছিলো। সেই অ্যান্ আজ বিখ্যাত। 'সুইট্ মিউজিক্'এ রুডি ভ্যালি আর ডোরশাক গেয়ে আর নেচে চমৎকার প্রেম করেছে।

মার্লিনের নতুন ছবি

ডিট্রিশের নতুন ছবির নাম হচ্ছে 'দি পার্ল নেক্‌লেশ'। গল্পটি হ'চ্ছে আধুনিক এক মেয়ের রঙীন জীবন নিয়ে। প্রযোজনা করবে—আর্ণশ্ লুবিশ। আর—পরিচালক, মার্লিনের ইচ্ছে মত—ফ্র্যাঙ্ক্ বরজেস্। তার সঙ্গে কে কে নাব্‌বে—তা এখনও ঠিক হয় নি।

খুচরো খবর

কিছু দিন আগে জেসি ম্যাথুসের এক ছেলে হয়েছিলো। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, সে সেদিন মারা গেছে।

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

সব্যসাচী

হিন্দুস্থান সমবায় বীমামণ্ডলীর "জেনারেল ম্যানেজার" যে ব্যক্তিগত ও গোপনীয় পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তিনি হিন্দুস্থানের দাদন-নীতি সম্বন্ধে স্তর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি কিরূপ বিকৃত করিয়া আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযোগী করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে পাঠকদিগকে জানাইয়াছি।

আজ সেইরূপ আর একটি আপত্তি জনক কার্য্যের পরিচয় দিতেছি।

বিলাতের বিখ্যাত একচুয়ারী মিষ্টার ক্লিণ্টন হিন্দুস্থানের দাদন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"A substantial part of the investments are represented by landed and house properties, and by mortgages. Having regard to this the Directorate at my request, have had the properties valued by qualified valuers and the reports of these gentlemen have been submitted to me. In addition, the management have furnished me with full reports of all of the other investments for which I asked details. Further, I have been furnished with full information in respect of all cases where interest or instalments of principal are in arrear. On the basis of this information I have made an independent and stringent valuation of the Assets, and have satisfied myself that the Society is fully able to meet its commitments to its policy-holders."

নলিনীর স্বাক্ষরে প্রকাশিত পুস্তিকায় ইহার অনুবাদ নিম্নলিখিতরূপ করা হইয়াছে :—

"দাদনী টাকার একটা মোটা অংশ ভূসম্পত্তিতে ও বাড়ীঘরে খাটানো হইতেছে। এই সম্পর্কে আমার অনুরোধ ক্রমে ডিরেক্টরগণ অভিজ্ঞ (!) ভ্যালুয়ার দ্বারা সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন এবং তাহাদের (তাঁহাদের?) (ভ্যালুয়ারদের) রিপোর্ট আমার নিকট দাখিল করিয়াছেন! অধিকন্তু কর্ম্মকর্তৃপক্ষ অন্যান্য সর্ব্ববিধ দাদন সম্পর্কে সম্পূর্ণ রিপোর্ট আমাকে দিয়াছেন, বিস্তৃত বিবরণ উপস্থাপিত করিতে আমি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলাম। এবং (?) যে যে স্থলে মূল টাকার সুদ অথবা আসল টাকার কিস্তি বাকী পড়িয়া আছে, সে বিষয়েও যাবতীয় তথ্য আমাকে জানানো (?) হইয়াছে। এই সকল তথ্যের উপর (?) ভিত্তি করিয়া আমি কোম্পানীর মোট সংস্থানের পরীক্ষা নিরপেক্ষ ও কড়াকড়ি ভাবে করিয়াছি এবং তাহার দ্বারা এ বিশ্বাস আমার হইয়াছে যে, কোম্পানী বীমাকারীগণের (?) দাবী মিটাইতে সম্পূর্ণ সমর্থ।"

বিষয়টির গুরুত্ব বোধে আমরা নলিনী-মার্কা বাঙ্গালা ভাষার বাহার দেখাইতে বিরত হইলাম।

মিষ্টার ক্লিণ্টন আপনাকে নিরাপদ রাখিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—

(১) ভূসম্পত্তিতে ও বাড়ী প্রভৃতি বন্ধকীতে যে টাকা দাদন করা হইয়াছে **তদ্ভিন্ন** "অন্যান্য সর্ব্ববিধ দাদন সম্পর্কে **সম্পূর্ণ রিপোর্ট**' দেওয়া হইয়াছে (full reports)

(২) যে যে স্থলে সুদ বা আসল টাকার কিস্তি আদায় হয় নাই, সেই সকল স্থলেও

"যাবতীয় তথ্য" (full information) তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু ভূসম্পত্তিতে ও বাড়ী প্রভৃতি বন্ধকে যে টাকা খাটান হইতেছে সে সকল সম্বন্ধে full report or full information পাইয়াছেন **এমন কথা মিষ্টার ক্লিণ্টন বলেন নাই।** সে সম্বন্ধে কেবল **তাঁহার অনুরোধে** ডিরেক্টাররা উপযুক্ত ভ্যালুয়ারদিগের দ্বারা ঐ সব সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করাইয়া তাহাদের রিপোর্ট মিষ্টার ক্লিণ্টনকে দিয়াছেন। সুতরাং—

এই সব সম্পত্তির মূল্য কত তাহা নির্দ্ধারণের কোন দায়িত্ব মিষ্টার ক্লিণ্টনের নাই। তিনি কেবল ভ্যালুয়ারদিগের রিপোর্টে নিভর করিয়া মূল্য ধরিয়াছেন। রিপোর্টে ভুলভ্রান্তি থাকিলে সেজন্য তিনি দায়ী নহেন।

ভ্যালুয়ার নির্ব্বাচন ডিরেক্টাররা করিয়াছেন—কি ম্যানেজার করিয়াছেন, তাহা জানা নাই। তাঁহার কাস্তির কথাও আমরা জানি না। মিষ্টার ক্লিণ্টন তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—qualified—অর্থাৎ তাঁহারা যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাহাতে তাঁহাদিগের রিপোর্ট আদালতে গৃহীত হইতে পারে! নলিনী-মার্কা পুস্তিকায় বলা হইয়াছে—তাঁহারা "অভিজ্ঞ"!

মিষ্টার ক্লিণ্টনের কথা—**তাঁহার অনুরোধে** উপযুক্ত ভ্যালুয়ারদিগের দ্বারা ভূসম্পত্তির ও বন্ধকী বাড়ী প্রভৃতির মূল্য নির্দ্ধারণ করাইয়া তাঁহাদের রিপোর্ট, তিনি আর সে সব দাদনের সম্পূর্ণ বিবরণ চাহিয়াছিলেন সে সকলের সম্পূর্ণ সংবাদ এবং যে সব ক্ষেত্রে সুদ বা আসল টাকার কিস্তি খেলাপ হইয়াছে সে সকলের সম্পূর্ণ বিবরণ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সকলে নির্ভর করিয়া তিনি এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছেন যে, হিন্দুস্থান বীমাকারীদিগের দাবি শোধ করিতে সমর্থ।

তিনি বলিয়াছেন, তিনি উপস্থাপিত রিপোর্টে ও সংবাদে নির্ভর করিয়া **কোম্পানীর সংস্থানের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন**—কোথাও বলেন নাই—মোট সংস্থানের **পরীক্ষা করিয়াছেন।** তবে নলিনী-মার্কা পুস্তিকায় valuation-এর অনুবাদ "পরীক্ষা" করা হইয়াছে কি জন্য? ইহাতে কি লোকের মনে ভ্রান্ত বিশ্বাসের উদ্ভব হইতে পারে না? যদি হয়, তবে তাহার জন্য দায়ী কে?

মিষ্টার ক্লিণ্টন যদি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করিতেন, তবে তাহার যে মূল্য হইত, তিনি কোম্পানীর দ্বারা নিযুক্ত ভ্যালুয়ারদিগের রিপোর্টে নির্ভর করিয়া কোম্পানীর মোট সংস্থানের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা কখনই ততটা মূল্যবান বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতে হয়,—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যে একাদশজনের সার্টিফিকেট হিন্দুস্থান বিজ্ঞাপনরূপে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের "নিবেদন" যে হিন্দুস্থানকে সর্ব্বতোভাবে ভারতীয় কর্তৃক পরিচালিত কোম্পানী বলিয়া দেশের লোকের সাহায্য ও সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করা হইয়াছে, সেই হিন্দুস্থানের মোট সংস্থান সম্বন্ধে সাতসমুদ্র তের নদীপারের একচুরারীর মত গৃহীত হয় কেন? ইনি যে বিখ্যাত একচুরারী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ দেশের ভূমি সম্পত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। এইরূপ সম্পত্তি though within the ample range of his genius lie wholly outside the area of his exact knowledge.

এদেশের ভূমি সম্পত্তি প্রভৃতির অবস্থা অবগত আছেন, এমন কোন লোকের মত কি অধিক মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য হইত না? যে নূতন ভাবে টাকা খাটান হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে এদেশের অবস্থাভিজ্ঞ লোকের মতই যে অধিক নির্ভরযোগ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। এই দাদন-নীতি যে এখনও পরীক্ষাধীন তাহা স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন।

যে দাদন-নীতি এখনও পরীক্ষাধীন তাহার সমর্থনে হিন্দুস্থানের জেনারল ম্যানেজারের এই যে অসাধারণ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য—তাহার মূল কোথা তাহা ও অনুসন্ধানযোগ্য, সন্দেহ নাই। ভূমি সম্পত্তিতে ও বাড়ী প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়া টাকা খাটান যদি সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও লাভজনক হইত, তবে যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও সব বীমা কোম্পানী এই নীতি অবলম্বন করিত, তাহা বলা বাহুল্য। তাহারা যে তাহা করে নাই, তাহার কারণ কি এই যে—তাহাদের বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও কর্ম্মঠ পরিচালকরা কেহই হিন্দুস্থানের জেনারল ম্যানেজারটির মত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান নহেন?

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা

তাসের খেয়াল :—
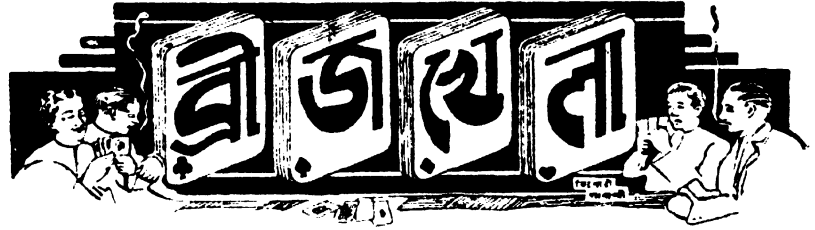
বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা। প্রায়ান্ধকার আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘ ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছিল। নেবুবাগানের অপূর্ব্ববাবুর গৃহে এক আলোকোজ্জ্বল কক্ষে তাঁর কতিপয় বন্ধু মহাসমারোহে মুড়ি ও বিড়ি ধ্বংস করতে করতে ব্রীজ খেলছিলেন। এই দুর্য্যোগেও লোক সমাগম বড় মন্দ হয় নি।

'মলিন তাস সজোরে ভাঁজিয়া' (দোহাই রবিবাবু আপনার চুরি করি নি—আমি নিজের চোখেই দেখেছি) তাস বণ্টন শেষে সুকুমার বাবু ডাক দিলেন 'একখানি রুহিতন'। ধ্যান স্তিমিত নয়নে কড়ি কাঠের দিকে চেয়ে বরফ জমানো রুইমাছের মতন ঘোলাটে চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত করে অপূর্ব্ববাবু বল্লেন 'No bid'. কণ্ঠে তাঁর সুস্পষ্ট কাতরতা। জলদগম্ভীর স্বর আরও গম্ভীরতর করে মণিবাবু ডাক দিলেন "দুইখানি হরতন'। বর্ষার আঘাত হইতে শরীরটাকে বাঁচাবার জন্য একটা পথের কুকুর জানালার ধারে বসে সতৃষ্ণনয়নে মুড়ির থালার দিকে চেয়েছিল—সে এই জীমুত গর্জ্জনে ভীত হয়ে কেঁউ কেঁউ রব তুলে উর্দ্ধ পুচ্ছে পালালো। অপূর্ব্ববাবুর যেঁড়ী চুণীবাবু সোণার চশমাটি ভাল করে মুছে নিজের হাতের তাস দ্বিতীয়বার উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করে বল্লেন 'No bid.' যেঁড়ীর জবাবে অপূর্ব্ববাবুর অর্দ্ধনিমীলিত ঘোলাটে চক্ষু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল। এবারে তাঁর মুখের ভাব দেখে গৃহস্থিত সকলেই দুঃখিত হলেন।

খেলা চল্‌ছিল কণ্ট্রাক্ট ব্রীজ। সুকুমার

বাবু ও মণিবাবু গেম করেছেন সুতরাং তাঁদের ভালনারেবল অবস্থা।

খেঁড়ীর ডাকের উত্তরে সুকুমার বাবু ডাক দিলেন 'দুই খানি ইস্কাবন'। জবাবে মণি বাবু বললেন 'চারখানি হরতন'। সুকুমার বাবু ছয়খানি রুহিতন ডাক দিলেন। মণি বাবু No bid বলে ডাক শেষ করলেন। খেলা শেষে দেখা গেল যে পাঁচখানি রুহিতনের খেলা হয়েছে। একটি পিটের জন্য খেঁসারৎ দিতে হল। তারপর সুরু হল গবেষণা। খেয়ালীর পাঠক পাঠিকার জন্য হাত কয়টি নিয়ে দিলাম।

কৃষ্ণবাবু। সে কি? এত বড় হাত আপনাদের আর মোটে দুইটী হরতনের খেলা হবে?—কখনই না।

চুনীবাবু। কেন হবে না? আমি প্রথমে খেলব ইস্কাবনের টেক্কা তারপর ছোট ইস্কাবন, অপূর্ব্ব তুরূপ করবে। অপূর্ব্ব খেলবে চিঁড়িতন আমি তুরূপ করে ইস্কাবন খেলবো। অপূর্ব্ব তুরূপ করে আবার চিঁড়িতন খেলবে আমি সাহেব তুরূপ করব।

সুকুমার বাবু। আপনার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই,—ওকে ব্রীজ খেলা বোঝাচ্ছেন! দেখ কেষ্ট যা' পারিস্ তা' কর।

কৃষ্ণবাবু সুকুমার বাবুর ধমক খেয়ে এতক্ষণ একমনে কি ভাবছিলেন এবার সহসা তাঁর চোখে একটা দীপ্তি দেখা দিল। এবার তিনি উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলেন, "খেলা আছে। স্লামও আছে। তবে সে স্লাম No Trump-এও হবে না, নয়খানি হরতনেও হবে না, রুহিতনেও হবে না, সে স্লাম হবে ইস্কাবনে।" অপূর্ব্ববাবু চুনীবাবুর টেক্কা সমেত ছয়খানি ইস্কাবনের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত কতে মৃদু ভর্ৎসনা সূচক স্বরে বললেন, "তাইত চুনীলাল স্লামটা miss করলে—টেক্কা সমেত ছয়খানি ইস্কাবন পেলে আর একটা ডাক দিলে না।—ছিঃ।" চুনীবাবু ঘন ঘন চশমা মুছতে মুছতে একবার

ইস্কাবন—দশ, আটা, সাতা।
হরতন—টেক্কা, বিবি, গোলাম, দশ, সাতা, চৌকা।
রুহিতন—নাই।
চিঁড়িতন—টেক্কা, সাহেব, দশ, নয়।

ইস্কাবন—নাই।
হরতন—ছক্কা, পাঞ্জা।
রুহিতন—সাতা, দুরি।
চিঁড়িতন—বিবি, গোলাম, আটা, সাতা, ছক্কা, পাঞ্জা, চৌকা, তিরি, দুরি।

	মণিবাবু	
অপূর্ব্ব বাবু		চুনীবাবু
	সুকুমার বাবু	

ইস্কাবন—টেক্কা, ছক্কা, পাঞ্জা, চৌকা, তিরি, দুরি।
হরতন—সাহেব, নয়।
রুহিতন—আটা, ছক্কা, পাঞ্জা, চৌকা, তিরি।
চিঁড়িতন—নাই।

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি, গোলাম, নয়।
হরতন—আটা, তিরি, দুরি।
রুহিতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম, দশ, নয়।
চিঁড়িতন—নাই।

অপূর্ব্ববাবু। (সুকুমার বাবুর প্রতি) এমন ডাকা কেন? ডেকে যদি খেলা না করতে পার তবে ডেকে ফল কি?

সুকুমার বাবু। তোমার চোখের দৃষ্টি এবার বেশ সরল হয়েছে দেখছি—আর সে ঘোলাটে ভাবটা নেই।

কৃষ্ণবাবু। (এতক্ষণ খেলা দেখছিলেন) আচ্ছা মণিবাবু, আপনারা ছয়খানি হরতন ডাকলেন না কেন? আপনাদের দুইহাতে ন'খানি হরতন তারপর এত অনার ট্রীক।

মণিবাবু। তা'তে কি হোতো? তা'তে যে দুইখানির মোটে খেলা হোতো—ভজা কোথাকার?

অনধিকার চর্চ্চা ছেড়ে দিয়ে বরং এই বর্ষায় একটা মেঘ মল্লার গা।

কৃষ্ণবাবু। বলে ত গেলে অনেক কথা; কিন্তু অপূর্ব্ব ইস্কাবন তুরূপ করে কখনই চিঁড়িতন খেলত না,—ও খেলত রুহিতন।

অপূর্ব্ববাবু। কখনই না। বিশ্বাস না কর ফিরে খেল। দেখ আমি চিঁড়িতন খেলি কি না?—

সুকুমার বাবু। তা ত হোলো? কিন্তু খেলাটা হোলো না কেন? দুই হাতেই হাতের বিভাগ খুব ভাল,—সাড়ে ছয়খানির বেশী অনারের পিট অথচ স্লাম নেই? কি গোলমাল হচ্ছে ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

অপূর্ব্ববাবুর প্রতি আর একবার কৃষ্ণবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে মনে হোল ভদ্রলোক বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

কৃষ্ণবাবু অপূর্ব্ববাবুর প্রতি রহস্যঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বল্লেন, "না অপূর্ব্ব, স্লাম তোমাদের নয়—স্লাম হোতে পারত এই মনিবাবু ও সুকুমার বাবুর। ইস্কাবন রঙ হয়েছে সুকুমার ছয়খানি ইস্কাবন ডাক দিয়েছে এখন তুমি কি খেলবে বল?"

অপূর্ব্ববাবুর মনে পূর্ব্বের সেই চিড়িতন খেলার কথা গাঁথা ছিল। তিনি আর দ্বিতীয়বার ভুল খেলতে রাজী নন্ তাই মৃদু হেসে বল্লেন "আমি চিঁড়িতনের বিবি খেলব।"

কৃষ্ণবাবু বল্লেন, "চিড়িতনের বিবির উপর মণিবাবু টেক্কা মারবেন, এখন চুনীবাবু কি করবেন বলুন?"

চুনীবাবু। "আমি চুরি তুরূপ করব।"

কৃষ্ণবাবু। "বেশ, সুকুমার তার ওপর নয় তুরূপ করবে। করে পাঁচখানি রুহিতন খেলবেন এবং সেই পাঁচখানি রুহিতনের পিটে মণিবাবুর হাতের পাঁচখানি হরতন পাশ দিবেন। তারপর হরতনের চুরি খেলে টেক্কা মারবেন, মেরে চিড়িতনের সাহেব খেলবেন। চুনীবাবু তুরূপ করলে তিনি ইস্কাবনের গোলাম তুরূপ করে হরতনের তিরি খেলবেন। এখন তোমাদের চারজনের হাতে নিম্নলিখিত তাস থাকবে।—"

ইস্কাবন—দশ, আটা, সাতা।
চিড়িতন—দশ, নয়।

চিড়িতন—গোলাম, আটা, সাতা, ছক্কা। হরতন—ছক্কা,	মণিবাবু অপূর্ব্ব বাবু চুনীবাবু সুকুমার বাবু	ইস্কাবন—টেক্কা, ছক্কা, পাঞ্জা, চৌকা। হরতন—সাহেব।

ইস্কাবন—সাহেব, বিবি।
হরতন—আটা, তিরি।
রুহিতন—নয়।

"সুকুমার বাবুর হরতনের তিরির উপর মণিবাবু সাতা তুরূপ করবেন আর চুনীবাবু হরতনের সাহেব দেবেন। মনিবাবু এবার চিঁড়িতনের দশ খেললে চুনীবাবুকে তুরূপ করতেই হবে। তিনি টেক্কাই তুরূপ করুন, কি ছোট বড়ই তুরূপ করুন টেক্কা ছাড়া তাঁর আর পিট নেই। কাজেই মণিবাবুদের little slam, বুঝলে বোকারাম?"

অপূর্ব্ববাবুর ঘোলাটে চোখ আরও ঘোলাটে হয়ে এলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, "এ তো বড় আশ্চর্য্য কথা। একহাতে টেক্কা সমেত ছয়খানি ইস্কাবন অথচ তারই প্রতিপক্ষ হাতে সাতখানা রঙ পেয়ে সেই ইস্কাবনেই little slam করতে পারবে?—নাঃ, ব্রীজ বাস্তবিকই বড় শক্ত খেলা!—"

——

মানহানির মামলা

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের সাক্ষ্য

হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর কর্ম্মচারী ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যালের মানহানি করিবার অভিযোগে 'খেয়ালী'র বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার সরকার ও শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে, সেনের এজলাসে যে মামলা চলিতেছিল, ঐ মামলা সম্পর্কে গত শুক্রবার আরও কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ায় শ্রীযুক্ত সুধীর সরকার আদালতে হাজির থাকিতে পারেন নাই।

ফরিয়াদী পক্ষে মিঃ কিরণশঙ্কর রায়ের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। তিনি বলেন, তিনি বাঙ্গলা ভাষায় মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। তিনি ডাঃ সান্ন্যাল ও বাবু সাবিত্রীপ্রসন্ন চ্যাটার্জ্জিকে চিনেন। সাবিত্রী বাবু একজন কবি। "মাণিক জোড়কে চিনিয়া রাখুন" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে সাক্ষী বলেন, ডাঃ সান্ন্যাল ও সাবিত্রী বাবুর সম্পর্কেই ঐ কথা বলা হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিলে এইরূপ বুঝা যায় যে, তাঁহারা এমন কিছু করিতেছেন যাহা তাঁহাদের করা উচিৎ ছিল না। তাঁহারা নিশাকালের দূতিয়ালী রূপে রাত্রির অন্ধকারে জঘন্য কিছু করিতেছেন, পরবর্ত্তী 'বামার দালাল' শীর্ষক প্রবন্ধেও ঐ দুই ব্যক্তির কথাই বলা হইয়াছে। 'ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কর্ম্মচারী' বলিতে ডাঃ সান্ন্যাল-কেই বুঝাইয়াছে। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে যে ঐ দুই ব্যক্তির কথাই বলা হইয়াছে, তাহা বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধেও তাঁহাদের কথাই উল্লেখ করা হইয়াছিল। "বিবিধ—নলিনী-বিজয়" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পর্কে সাক্ষী বলেন, ঐ প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ডাঃ সান্ন্যাল কোন প্রণয় ব্যাপারে দূতিয়ালী করিতেছেন। এবং বাগবাজারের কমলা নাম্নী কোন স্ত্রীলোক ঐ প্রণয় ব্যাপারের প্রধানা নায়িকা। শেষ প্রবন্ধে বলা হয় যে, ডাঃ সান্ন্যাল বঙ্কিম-চন্দ্রের 'বিষবৃক্ষের' হীরা ঝির মত কাজ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের মালিনীও ঐরূপ একটী চরিত্র।

সাক্ষী ফরিয়াদীকে গত ১০ বৎসর যাবৎ জানেন। তিনি সচ্চরিত্র ভদ্রলোক বলিয়া পরিচিত। ডাঃ সান্ন্যাল কয়েকটী

"সকলেই কি নলিনী সরকার"

নলিনাক্ষের উক্তি প্রসঙ্গে জিতেন্দ্রলাল

গত ২৪শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের বাড়ীর সম্মুখে ল্যান্সডাউন রোডের উপর কবিরাজ অনাথনাথ রায়কে জুতা দ্বারা প্রহার করার অভিযোগে ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যালের বিরুদ্ধে যে মামলা আনা হইয়াছে, গত শনিবার আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল কে সেনের এজলাসে তাহার শুনানী হয়।

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন, তিনি উভয় পক্ষকেই চিনেন। ২৪শে মার্চ্চ প্রাতে স্যার বিজয়প্রসাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করবার কথা ছিল। ঐ দিন সকাল বেলায় ফরিয়াদী তাঁহার (সাক্ষীর) বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সাক্ষী কাউন্সিলর মিঃ দেবেন্দ্রনাথ দাস, ডাঃ দেবেন্দ্রকুমার দাস ও ফরিয়াদীকে লইয়া মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদের গৃহে গমন করেন। তাঁহারা কাউন্সিলর মিঃ দাসের মোটরযোগে গিয়াছিলেন। তাঁহারা তিন জনে স্যার বিজয়প্রসাদের গৃহে যান; ডাঃ দাস মোটরের মধ্যেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা নীচের তলায় অপেক্ষা করিতেছিলেন এমন সময় দেখিতে পান যে, ডাঃ সান্ন্যাল সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছেন। তখন ডাঃ সান্ন্যালের সহিত কবিরাজের কথাবার্ত্তা হয়। তাঁহাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে সাক্ষীর নাম উল্লেখ করা হয় বলিয়া সাক্ষীও উহাতে যোগ দেন। আসামী ফরিয়াদীকে বারবার বলে যে, ফরিয়াদী তাহার (আসামী) সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় কতকগুলি মানহানিকর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছে কিন্তু ফরিয়াদী তাহা অস্বীকার করেন। উক্ত বিবরণে বলা হইয়াছিল যে, ডাঃ সান্ন্যাল কয়েকটি সংবাদপত্র আফিসে ঘুরাফেরা করিয়াছিল এবং তৎকালীন মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে আনীত মামলার প্রকাশ বন্ধ রাখিবার জন্য টাকা দিতে চাহিয়াছিল। এই সম্বন্ধে আলোচনার সময় সাক্ষীর নাম উল্লেখ করা হয়। তিনি বলেন যে, ডাঃ সান্ন্যালের সাবাদপত্র অফিসে ঘুরাফেরা করার কথা তিনি ফরিয়াদীর নিকট হইতে শুনিয়াছেন; কিন্তু তখন ফরিয়াদী এমন কথা বলেন নাই যে, ডাঃ সান্ন্যাল কাহাকেও টাকা কবুল করিয়াছিল।

প্রায় ৪৫ মিনিটকাল কথাবার্ত্তার পর সাক্ষী মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদকে বলেন যে, কবিরাজ নীচের তলায় আছেন। তখন কবিরাজকে ডাকা হয় এবং আরও প্রায় ১৫ মিনিট পরে তাঁহারা (সাক্ষী ও ফরিয়াদী) দুইজনে নীচে আসেন। ডাঃ সান্ন্যাল তখন ঐখানে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার হাতে একখানি কাগজ ছিল, ডাঃ সান্ন্যাল কবিরাজকে ঐ কাগজখানিতে যাহা লেখা আছে তাহা পড়িয়া নাম স্বাক্ষর করিতে বলে। ফরিয়াদী উহা পাঠ করেন এবং বলেন,—"এখানে বসিয়া আমি সহি করিব না" কিন্তু আসামী তাহাকে তখনই স্বাক্ষরের জন্য পীড়াপীড়ি করে। ফরিয়াদী ও আসামীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া সাক্ষী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত মানহানিকর বিবরণ প্রত্যাহারের কথা বলা হইতেছিল। সাক্ষী তখন মোটরের দিকে অগ্রসর হন। ফরিয়াদী ও আসামী তাহার পশ্চাদানুসরণ করেন। আসামী তাহার ডান হাতে কবিরাজের গলা জড়াইয়া ধরে—আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যেন সে বন্ধুত্বের জন্যই ঐরূপ করিয়াছিল। ঐভাবেই তাহারা মোটর পর্য্যন্ত আসে। সাক্ষী গাড়ীতে উঠিলে কবিরাজও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উঠেন। গাড়ীর দরজা বন্ধ ছিল। এই সময় আসামী জুতা দিয়া ফরিয়াদীর ডান হাতের উপরিভাগে আঘাত করে। আসামীর হাতে চটি ছিল, না স্যাণ্ডেল ছিল, সাক্ষী তাহা বলিতে পারেন না। সম্ভবতঃ আসামী দুইবার আঘাত করিয়াছিল—কিন্তু সাক্ষী তাহা সঠিক বলিতে পারেন না। প্রহারের সময় আসামী চিৎকার করিয়া বলিয়াছিল,—তুমি কি সকলকেই নলিনী সরকার মনে করিয়াছ। সাক্ষী তখন ডাঃ সান্ন্যালের হাত ধরিয়া ফেলেন এবং তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলেন,—"রাস্তার উপর এসব বিশ্রী ব্যাপার কেন?" অতঃপর তাহারা মোটর ছাড়িয়া দেন। সাক্ষী এই বিষয় মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদের গোচরে আনিয়াছিলেন।

সাক্ষী আসামীকে মন্ত্রীভবনে ফিরিয়া

প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং তাঁহার পরিচিত বহু বন্ধু-বান্ধব আছে।

মেদিনীপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী অধ্যক্ষ মিঃ থাকপ্রসাদ বিশ্বাসকে প্রবন্ধগুলি দেখান হইলে তিনিও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। সাক্ষী বলেন যে, ডাঃ সান্ন্যাল বিদ্যালয়ে তাঁহার সহপাঠি ছিলেন। তিনি ফরিয়াদীকে একজন চরিত্রবান খ্যাতনামা ভদ্রলোক বলিয়া জানেন।

১০ই জুলাই পর্য্যন্ত শুনানী স্থগিত আছে। পাব্লিক প্রসিকিউটর মিঃ জে, কে, মুখার্জ্জি, মিঃ এ, কে, ভাদুড়ী এবং মিঃ সরোজ ব্যানার্জ্জি ফরিয়াদী পক্ষ সমর্থন করেন।

কৌসুলী মিঃ ডি, এন, ব্যানার্জ্জি এবং মিঃ হীরেন বসু আসামীপক্ষ সমর্থন করেন।

যাইতে দেখিয়াছিলেন। ফরিয়াদী ও আসামী দুইজনকেই তিনি প্রায় ১৫ বৎসর ধরিয়া চিনেন। তৎকালীন মেয়রের বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানীর সময় ফরিয়াদী কোন পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত যুক্ত ছিলেন কি না তাহা সাক্ষী বলিতে পারেন না।

আসামী পক্ষের এডভোকেট মিঃ বি, পি, পাইনের প্রশ্নে সাক্ষী বলেন যে, 'খেয়ালী'র শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকারের সহিত তাঁহার পরিচয় আছে। অক্ষয় বাবু আদালতে উপস্থিত আছেন।

ডাঃ দেবেন্দ্রকুমার দাস অভিযোগে উল্লিখিত ঘটনার সময় মোটরে বসিয়াছিলেন। তিনি ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেন।

আগামী ১২ই জুলাই পর্য্যন্ত শুনানী স্থগিত আছে।

কৌঁসুলী মিঃ ডি, এন, ব্যানার্জ্জি; মেসার্স এইচ, এন, বসু; কে, এল, পাল ও ননীলাল ঘোষের সহিত ফরিয়াদী পক্ষে এবং মিঃ বি, পি, পাইন; মেসার্স এ, কে, ভাদুড়ী ও সরোজ ব্যানার্জ্জিকে লইয়া আসামী পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

"যোগ্য আসি মিলিল যেন যোগ্যে!"

শ্রীসত্যবাদী

"বন থেকে বেরুল টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে"

আদালতের সাহায্যে পাওনাদারদিগকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর পতি (ভর্ত্তা অর্থাৎ ভাতকাপড়াদি প্রদাতা কিনা, বলিতে পারি না) শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু—"ব্যবসা ও বাণিজ্যের" পৃষ্ঠে হিন্দুস্থানের বিজ্ঞাপন বহন করিয়া নলিনী-স্তুতিগানে মত্তভাবে দেখা দিয়াছেন। যে ব্রাহ্ম সমাজ একদিন বাঙ্গালার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষনা করিয়াছিল সেই ব্রাহ্ম সমাজের কন্যা বীণার সহিত ব্যভিচারের মামলায় অভিযুক্ত নলিনীকে আশ্রয় দিবার জন্য ব্রাহ্মরা কি অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন? তাঁহারা হিন্দুস্থানের জন্য দেশের লোকের দ্বারে নিবেদন-ঝাঁকা বহন করিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে চারজন ব্রাহ্ম—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নীলরতন সরকার
প্রফুল্লচন্দ্র রায়
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

তাহার পর 'সঞ্জীবনী'—শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী'—যে 'সঞ্জীবনী' কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে তারাপদ বাবুর উপস্থিতিতে আপত্তি করিয়াছিল সেই 'সঞ্জীবনী' নলিনীকে সমর্থন করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহার পর—কৃষ্ণকুমারের জামাতা শচীন্দ্রপ্রসাদ আসর লইয়াছেন। অধ্যাপক প্রমথনাথের মৃত্যুতে "পাস পোর্ট" প্রাপ্ত

যুবতী বীণার "গতি" করিবার জন্যই এই চেষ্টা কিনা, বলিতে পারি না। কারণ, ব্যভিচারের মামলার রায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া দিয়াছিলেন—আসামী নলিনী সরকার—"is the first cousin of Bina's father...... their mothers being sisters......there would have been no bar to their marriage under the Civil Marriage Act, 1873"

যদি তাহাই হয়, তবুও আমরা বলিতে বাধ্য—'ব্যবসা ও বাণিজ্য' নলিনীকে সমর্থন করিতে যাইয়া যে পাপ করিয়াছে, তাহা ঘৃণ্য। এই পত্রের লেখক অকম্পিত অঙ্গুলীতে লিখিয়াছে :—

"অন্যপরে কা কথা, দেশপূজ্য স্বর্গীয় সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যখন বাংলা দেশের নেতৃত্বের আসন হইতে অপসারণ করিবার জন্য চক্রীরা দল বাঁধিল, তখন সর্ব্ব প্রথমে তাহারা এক বিধবা ব্রাহ্মণ মহিলার দ্বারা সুরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে খোরপোষের দাবীতে এক মামলা রুজু করাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।"

যিনি এই দেশে জাতীয়তার মন্ত্রদীক্ষাদাতা—যাঁহার তলপীদার সাজিয়া অ্যান্টিসারকুলার সোসাইটীর পরিচালকরা অনায়াসে টাকার হিসাব না দিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, যাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—সেই মহাপুরুষ আজ মৃত। তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার শত্রুরাও কখন তাঁহার সম্বন্ধে যে পাপের ইঙ্গিত করিতে সাহস করে নাই, আজ এই পরাশ্রয়ী লেখক সেই পাপের সঙ্গে তাঁহার নাম সংযুক্ত করিয়া তাহার উপাস্য দেবতার সমর্থন চেষ্টা করিল! হায়—আকাশ তোমার কি বজ্র নাই যে, এইরূপ পাপীর মস্তকে তাহা পতিত হয়।? ক্রমশঃ

যাহারা এমন ঘৃণ্য কাজ করিতে পারে—তাহাদের পৃষ্ঠদেশ বিনামাঘাতেরও যোগ্য নহে। ইহা কেবল পূজ্যপূজা ব্যতিক্রমই নহে, পরন্তু মহাপাপ।

অতঃপর, প্রয়োজন হইলে—নলিনীপদলেহনশীল এই লেখক কি—যাঁহার আশ্রয়ে আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার জামাতা হইয়াছে—তাঁহার চরিত্রেও কলঙ্ক লেপন করিয়া নিমকহারামীর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইবে না?

শুনা যায়, নলিনী কোন বিশেষ কারণে তাহার পিতৃদত্ত নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। এই লেখক কি কারণে পিতৃদত্ত নামের "শঙ্করকে" "প্রসাদে" পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল—সে রহস্য আমাদের অবিদিত নাই। যখন ধর্ম্ম ও নীতির আদর ছিল, তখন যে সব ঘটনা লোক সমাজে নিন্দিত বলিয়া বিবেচিত হইত এখন কোন কোন সমাজে সেই সব ঘটনায় লোককে "ভাগ্যবান" মনে করা হয়। যথা—

(১) দেশের কাজের অছিলায় টাকা লইয়া তাহার হিসাব না দেওয়া।

(২) আশ্রয়দাতার কন্যার সহিত প্রেমে লিপ্ত হওয়া।

(৩) বিবাহের পর ৯ মাসও যাইবার পূর্ব্বে স্ত্রীর নিকট হইতে সন্তান লাভ।

(৪) আইনের ফাঁকিতে উত্তমর্ণকে প্রাপ্যে বঞ্চিত করা ইত্যাদি—।

এইরূপ "ভাগ্যবানদিগের" কথা "ব্যবসা ও বাণিজ্যে"র লেখক অবশ্যই অবগত আছেন। তিনি অবশ্যই আরও জানেন—স্ত্রীর প্রভাবে সম্পাদিত পত্রে বিজ্ঞাপন লাভ করা যায়।

এইরূপ "ভাগ্যবানরা" কি এই লেখকের আদর্শ ও উপাস্য?

যে লেখক আজ মৃত নেতা—দেশের গুরু সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে অকথ্য অভিযোগের সংযোগ করিতে পারে, সমাজ কি তাহাকে অপাংক্তেয় বলিয়াই বিবেচনা করিবে না? সেরূপ কাজ কি ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে ব্যভিচারের মতই নিন্দনীয় নহে? কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় এ বিষয়ে কি বলেন? তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান কি এইরূপ কাজের সমর্থনে তাঁহার সহায় হইতে পারে?

ব্রাহ্ম সমাজ এই জাতীয় লোকের সম্বন্ধে কি মত ব্যক্ত করিবেন?

অবশ্য এই যে দীর্ঘ প্রবন্ধ ইহাতে হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত

অভিযোগের কোন উত্তর নাই—আছে কেবল নলিনী-স্তুতি। যদি বেকার লেখকের তাহাতে সুবিধা হয়, বলিতে পারি না; কিন্তু যাহারা ঘুঘু দেখে, তাহাদিগকে যে কখন ফাঁদও দেখিতে হয় না, এমন নহে। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—তবে এস, নলিনী—বামে নলিনাক্ষ, দক্ষিণে শচীন্দ্র প্রসাদ ও পদতলে সাবিত্রীপ্রসন্নকে লইয়া তুমি তোমার আশ্রিতের বীণাধ্বনি-মুখর হিন্দুস্থান-কুঞ্জে বিরাজ কর।

একাদশ রথীর "নিবেদন" দেশবাসীর যে সংশয়ের অপনোদন করিতে পারে নাই, কাউন্সিলার শ্রীমতী কুমুদিনীর পতির তাহা অপনোদনের চেষ্টা—

"হাতী ঘোড়া গেল তল;
ভেড়া বলে—'কত জল' ?"

অতঃপর "এক সময়ে বালীগঞ্জের যে অঞ্চল ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণাবস্থায় নানারূপ পুতিগন্ধ-পূর্ণ ডোবা ও পানাপুকুরে আবৃত (?) ছিল এবং মানুষের বাসের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত"—আর যে স্থানে কোন ধুরন্ধর "স্ত্রী-রত্ন দুষ্কুলাদপি" হিসাবে রাসমণির সন্ধান পাইয়াছিল—তথায় কি এই লেখকটি আপনার "ইচ্ছানুযায়ী বাটী নির্ম্মাণ করতঃ পরমসুখে বসবাস" করিতে পারিবেন ?

এদিকে কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচনের কাল সমাগত। এবার কি শ্রীমতী কুমুদিনীকে আমরা বিধানী দলের ছাপ লইয়া নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইতে দেখিব! তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী লতিকা ঘোষ, বোধ হয়, বিধানী প্রীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবেন না।

ওদিকে চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যদি লতিকার প্রচারক কর্ম্মচারীর কাজ যায়—তবে কি সে স্থানে শ্রীমতী কুমুদিনী ও শচীন্দ্রপ্রসাদ একযোগে নিযুক্ত হইয়া কাজ চালাইতে পারিবেন না? প্রচারকার্য্যে—নির্লজ্জ প্রচারকার্য্যে শচীন্দ্রপ্রসাদের কৃতিত্ব-পরিচয় ত 'ব্যবসা ও বাণিজ্যের' আলোচ্য প্রবন্ধটিতেই পাওয়া যাইতেছে; আর যদি সেবাসদনের জন্য নারীরই প্রয়োজন হয়, তবে সঙ্গে শ্রীমতী কুমুদিনী থাকিলে আর অভাব হইবে না।

এখন দেখা যাউক, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। হিন্দুস্থানের নারী ক্যানভাসারেরও প্রয়োজন হয় না!

ছিটে ফোঁটা

বজ্রবাহু

আজকাল মাসিক, সাপ্তাহিক খুললেই দেখতে পাওয়া যায় প্রাচীন মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তণ করে তাঁকে শ্রদ্ধা প্রণতি জানিয়ে নবীন লেখকরা ভক্তি-উচ্ছ্বাসপূর্ণ লম্বা লম্বা কবিতা রচনা করেছেন। মহাপুরুষের গুণগান—তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শন—এ উদ্দেশ্য অবিশ্যি প্রশংসনীয়। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের লেখকরা অধিকাংশ স্থলেই এ মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরিত হয়ে কবিতা রচনা করেন না—তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে কেবল কিসে তাঁদের নাম ছাপার হরফে প্রকাশিত হয়। ফলে এমন সব রাবিশ প্রকাশিত হয়—এমন উৎকট সব তুলনা দেওয়া হয়—যা একান্তই অসাড় এবং অর্থহীন।

"মাসিক মোহাম্মদী"র আষাঢ় সংখ্যায় বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত "মোহাম্মদ" শীর্ষক একটি কবিতা লিখেছেন—উপমার কি বাহার দেখুন :—

"নীলাভ নভের মাঝে জেগে তুমি একটি
রূপালি চাঁদ,
তোমার লাগিয়া শুধু ব্যাকুলিয়া করিনু
আর্ত্তনাদ।"

অতঃপর কোনদিন এবার আর এক মহাপুরুষের সঙ্গে হয়ত বা কোকিলের তুলনা দেখ্‌বো!

* * *

উক্ত সংখ্যায় আবুল ফজল তাঁর লিখিত "নারী ও পুরুষ" উপন্যাসে লিখেছেন :—

"তোমার মরতে ইচ্ছে হচ্ছে শুনে আজ খুব ক'রে কিছুক্ষণ হাস্‌লাম। কিছুদিন ধরে স্বামীর খবর নেই, তিনি চিঠিপত্র লিখছেন না, এই দুঃখে তোমার মরতে ইচ্ছে হচ্ছে! জীবনকে তোমরা কত তুচ্ছ ভাবো এবং কত নগণ্য জিনিষের উপর তার ভিত্তিস্থাপন করেছ দেখে সত্যি তোদের জন্য করুণা হয়। একটা পুরুষ তোমার সুখদুঃখকে অবহেলা ক'রে, তোমার অস্তিত্বকে অস্বীকার ক'রে—এমন কি, নিজের কৃতকর্ম্মের দায়িত্বও তোমার উপর চাপিয়ে নিজে নিরুদ্দেশ হয়ে টো টো করে হাওয়া খাচ্ছে, সেই পুরুষের জন্য তোমার ঘুম হচ্ছে না, তোমার চোখের জল থাম্‌ছে না, খাওয়া-পরায় তোমার অরুচি ধরেছে—এমন কি, সুদুর্লভ মানব-জীবনের উপর পর্য্যন্ত তোমার বিতৃষ্ণা এসে গেছে দেখে, তোমাদের মত অসহায়াদের জন্য করুণা ছাড়া আর কি হতে পারে, বল? হে পরমুখাপেক্ষিণা পরগাছা! স্বামী ছাড়া যদি তুমি বাঁচতে না পার, তোমার জন্য পৃথিবীতে কি পুরুষের দুর্ভিক্ষ লেগেছে?—"

লেখক কথাগুলি "হেনার (বোধকরি বাঙ্গালী হিন্দু) বিধির দ্বারা ব্যক্ত করেছেন —তার এক বান্ধবী মরিয়মের কাছে। লেখকের এ ছাগলামী মতবাদ পড়ে আমাদের মনে হল অতঃপর "পতি-পরম গুরু" মার্কা চিরুণীর কি ব্যবস্থা হবে?—

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ১২ই আষাঢ়, ১৩৪২—27th June, 1935. { ২৬শ সংখ্যা

ভাগ্যবান পুত্রের ভাগ্যহীন পিতা

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত হিন্দুস্থান বীমা কোম্পানীর কর্ম্মচারী ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যালের সমভিব্যাহারে জলপাইগুড়িতে হিন্দুস্থানের দালালী করিতে গিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্র-বিজয়ী জাতীয় দলের সভাপতি অখিল বাবু হিন্দুস্থানের অন্যতম ডিরেক্টার! বহু পুত্রের পিতা হিসাবে অখিল বাবু ভাগ্যবান ব্যক্তি বটে! কিন্তু স্নেহপ্রবণ পিতার কর্ত্তব্য পুত্রের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করা। চতুর নলিনীরঞ্জন হিন্দুস্থানের ডিরেক্টার অখিল বাবুকে কুক্ষিগত করিবার মানসে তাঁহার এক পুত্রকে বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের তহবিল হইতে দত্তজার পুত্রের প্রবাসের ব্যয়ভার বহন করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। এই উপকারের প্রত্যুপকার করা সমীচীন বোধে অখিল বাবু জলপাইগুড়ির জনসভায় হিন্দুস্থানের গুণকীর্ত্তণ করিয়াছেন। এই কীর্ত্তণে খোল বাজাইয়াছেন হিন্দুস্থানের বেতনভোগী কর্ম্মচারী ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল। প্রভুর জয়গান করা ভৃত্যের কর্ত্তব্য; সেই হিসাবে নলিনাক্ষের যে কর্ত্তব্যচ্যুতি হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য। তদুপরি নলিনাক্ষের প্রভুভক্তি সিজারের স্ত্রীর ন্যায় সন্দেহাতীত। কিন্তু অখিল বাবুর ন্যায় গণ্যমান্য বয়োবৃদ্ধের যে মতিভ্রম হইতে পারে তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। যে বন্ধনে তিনি আজ হিন্দুস্থানের সহিত আবদ্ধ তাহা কি এতই অচ্ছেদ্য। ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট পদের কার্য্য করিয়া যে অর্থ তিনি উপার্জ্জন করিবেন তাহার দ্বারা কি পুত্রের প্রবাসের ব্যয় বহন করিতে পারিবেন না? এই সামান্য অর্থের জন্য হিন্দুস্থানের দাসত্ব করিতে হইতেছে? যে "আনন্দবাজারের" কৃপায় ও যে জাতীয় দলের আনুকূল্যে তিনি আজ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য তাঁহারা কি বলেন?

শুনিয়াছিলাম কিছুদিন পূর্ব্বে অখিল বাবু শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত মাখম লাল সেনকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া "আনন্দবাজার"কে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে আন্দোলন স্থগিত রাখিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুরেশ বাবু ও মাখম বাবুর প্রত্যাখানের ইতিহাস তাঁহার স্মরণ আছে কি? "আনন্দবাজার" ও জাতীয় দল অখিল বাবুর এই স্বৈরাচার সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করেন তাহা প্রণিধান যোগ্য। নলিনীর সহিত যিনি বর্ত্তমানে সংশ্রব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবেন তিনি যেই হউন তাঁহাকে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করা হইবে—ইহা যেন বৃদ্ধ অখিল বাবু স্মরণ রাখেন।

নরেশ্বরের নারীলীলা

('সন্ধানী' রচিত)

অথ ভূমিকা

"রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায়!"
আজিকার দিনে কোন্ অর্ব্বাচীনে
সে কথা মানিবে, হায়!
তম্বুর তীর্থে পূজাদান-ছলে
যত পূজারীর ভিড়
পূজারী তো নহে, শিকারী যে তারা
তূণেতে লুকানো তীর!
বাঘিনী ও বাঘে যে মধুর ফাঁদে
মেলিল মিলন-মেলা,
প্রেমের নামেতে নরনারী আজি
খেলে সেই কাম-খেলা।

অথ কথারম্ভ

অর্থ যদি থাকে তব, আর থাকে বড় বড় বাড়ী,
তার সাথে থাকে যদি "রোল্‌স" কিম্বা অন্য বড় গাড়ী,
ক্ষতি নাই—কামাও বা রাখো তুমি ইয়া চাঁপদাড়ী,
করতলগতা তব অবশ্যই হ'বে সেই নারী
যারে তব প্রাণ চায়। নারী যদি হয় গররাজী?
বেপরোয়া কর ব্যয় অবশ্যই জিতে যাবে বাজী।
তবে বড় ক্ষণস্থায়ী—এ নারীরে নাহিক নির্ভর
বরনারী বারনারী হ'য়ে যায় দুদিনের পর।
বিশ্বাস হ'লো না কথা? এর পরে চাহিছ প্রমাণ?
মনে নাই? ইন্দোরের রাজ্যপাট ইন্দ্রের সমান
বেহাত হইয়া গেল—গেল রাজ্য, গেল ধনমান,
আর একজন ধনী বেঘোরেতে হারাইল প্রাণ
যে বারনারীর তরে—সেই বহুখ্যাতা মমতাজ্,
বারনারী হ'য়ে দেখ বৌবাজারে আসিয়াছে আজ।

অথ কথাশেষ

কিন্তু অপরূপ এই মানুষের স্মৃতি!
দু'দিন অধিক তা'হে করে নাকো স্থিতি
কোনো কথা—অপরের অবস্থা দেখিয়া
শিখিতে চাহে না কেহ—শিখে সে ঠেকিয়া!
নহে, শুনি কি আশ্চর্য্য! সেই মালাবারে,
মমতাজ-মন্থন-বিষে-ভরা সে পাহাড়ে,
কোন্ মহারাজ এক পুরাণো ধাঁচায়
তিনটি যুবতী ধরি পুরিল খাঁচায়!
কিন্তু হায়—তারা শেষে কাটিয়া শিকল
প্রেমিক রাজার হৃদি করিয়া বিকল
উড়িয়া গিয়াছে চলি'! এর কিবা ফল,
কাম-সিন্ধু-মন্থনেতে কিবা হলাহল
উঠিয়া কাহারে করে সমূলে নির্ম্মূল?
পথের ভিখারী হ'য়ে জীবনের ভুল
আবার বুঝিবে কেবা?—সে সন্দেশ লাগি'
সংবাদ-জগতে সবে রহিয়াছে জাগি'

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

"দেবদাসী"

প্রযোজক—পায়োনিয়ার ফিল্মস

পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার—প্রফুল্ল ঘোষ

কথা ও কাহিনী—নলিনী চট্টোপাধ্যায়

আলোক শিল্পী—মিঃ মায়ার

শব্দ-যন্ত্রী—মিঃ বাডবার্গ

সম্পাদক—রবীন্দ্রনাথ দে

রসায়নাগার-পদ্ধতি—মিঃ শুলমাষ্টার

ভূমিকা :—স্মৃতিভূষণ অহীন্দ্র চৌধুরী ; পঞ্চানন—ভানু রায় (ঐঃ); হেরম্বনাথ—কার্ত্তিক দে ; কুবলয়—ভাস্কর দেব; কেবলরাম—ইন্দু মুখোপাধ্যায় ; বাউল—বিনয় গোস্বামী ; শেখর—রবী রায়। দেবদাসী—শান্তি গুপ্তা ; অতসী—পদ্মাবতী ; আরতী নৃত্য—কুমারী শ্রীরূপা দেবী।

প্রথম মুক্তি—"ছায়া"। শনিবার ২২শে জুন, ১৯৩৫।

মঞ্চের ওপর একদা নলিনী চট্টোপাধ্যায়ের "দেবদাসী" অনেককে আনন্দ দানে সমর্থ হয়েছিলো—এ কথা সবাই জানে। পরিচালক প্রফুল্ল বাবু এক কথায় সেই মঞ্চ-নাট্যেরই হুবহু পর্দ্দা-সংস্করণ ক'রে—দুঃখের বিষয়—ততটা আনন্দ-দানে মোটেই সমর্থ হননি। চিত্রোপযোগী গল্পের গড়নে নজর অল্প রেখে, বাউলের গানের চাপে দর্শকদের সন্তুষ্ট করতে গিয়ে প্রফুল্লবাবুর এ নব প্রচেষ্টাও হয়েছে ব্যর্থ। অথচ, প্রফুল্ল ঘোষ—এ নামটির পরিচয় আজ পেতে হ'লে ভারতের ছায়াচিত্র ইতিহাসের আদিকাণ্ড আমাদের খুঁজতে হয়। উদ্যম, আয়োজন ও আড়ম্বরের কিছুমাত্র ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও এ বিশেষ পরিচালকটির সাফল্যমণ্ডিত পথের দর্শন কবে যে মিলবে তাই ভাবি! এঁর পরিচালনায় যে ছবিগুলো—সেগুলো দেখে আমাদের বিন্দুমাত্র আর সন্দেহ থাকে না যে—এর মস্তিস্কে সাধারণ জ্ঞানের অনুপস্থিতি যতটা না মাটি করেছে—তার চেয়ে ঢের বেশী করেছে ভারতের বিখ্যাত বন্দর—বোম্বাই। বোম্বাইয়ের আবহাওয়া এর শিরায় শিরায়। প্রতি গ্রন্থী ও মেরুদণ্ডে সে আবহাওয়া শিরিষের আঠার মত আটকে গেছে। আমাদের বাংলাদেশের দুর্ব্বল আবহাওয়া সে রোগকে তাড়াতে এখনও সক্ষম হয়নি।

স্থানে অস্থানে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সঙ্গীতের প্রয়োগ, প্রাণ-হীন পরিচালনা ও অভিনয়, সস্তা আলোকশিল্প ও অস্পষ্ট শব্দ—এ গুলো হচ্ছে "দেবদাসী" চিত্র সংস্করণের বিশেষত্ব।

গল্পটি ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালীর মন মেপে গড়া। তিলক, চন্দন ও রুদ্রাক্ষের মালার অন্তরালে ত্রিবেণীর সমাজপতি স্মৃতিভূষণের অন্তরাত্মা ডুবে ছিলো অগাধ পাপের সাগরে। হরিনাম ছিলো তার মুখেই, কিন্তু নারী-নাম ছিলো তার বুকে। যুবকদলের নেতা শেখর সবাইকে তার শাসন অমান্য করতে শেখাতো। সেই গ্রামেই রাধারমণ জিউর সেবায়েত্ ছিলো হেরম্বনাথ। সে মন্দিরেরই সেবাদাসী দেবদাসীকে ভালো বেসেছিলো শ্রেষ্ঠীপুত্র কুবলয়। স্মৃতিভূষণের প্ররোচনায় সে তাকে হরণ করে। কিন্তু, দেবদাসীর যে অন্তর রাধারমণের প্রেমে উৎসর্গ করেছিলো—সে অন্তর আর মানুষের প্রেমে সাড়া দিলে না। দেবদাসীর অনুপস্থিতির এই সুযোগে স্মৃতিভূষণ প্রকাশ্যে এক কুৎসিৎ ইঙ্গিত করলে। সে হেরম্বকে মন্দির ছাড়া করতে চাইলে। কিন্তু, তার জারিজুরী শেষে সব যায় ভেঙ্গে। বাউলের স্ত্রী অতসীর রূপ উপভোগ করতে গিয়ে সে পড়ে ধরা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে সে আগুনে।

ছায়াচিত্রপোযোগী গল্পই—সন্দেহ নেই। কিন্তু, এর কাঠামটি বড় ছোট। চিত্রে

তৃপ্তিকর ক'রে তুলতে হ'লে যে পরিমাণে যোগাযোগ অদল বদল ও পরিবেশন পদ্ধতির প্রয়োজন প্রফুল্লবাবু তা কিছুই করেন নি। ফলে তাঁর কাজ হয়েছে প্রাণহীণ, আনন্দ দানে অসমর্থ। পূর্ণ প্রকাশ কোন চরিত্রই পায়নি। ক্রম বিকাশের শিথিল পথে বারে বারে বাধা দিয়েছে অকারণ,—অত্যধিক সঙ্গীত। ছায়াছবির কারুকার্য্যের সাধারণ নীতিগুলোর ব্যবহারও একেবারে নেই বললেই চলে। কুবলয়ের গৃহ-ত্যাগের সময় দেবদাসীর মাথার ওপর আকাশে ঘন ঘন মেঘ দেখানোর কোন মানেই হয় না। আর মানে হয় না একশোবার রাধাকৃষ্ণের 'ক্লোজ আপ' দেখানোর। এত সস্তায় ভক্তদের খুসি করবার এ একটি দুরাশা মাত্র। তবে, প্রফুল্লবাবুর একটা জিনিষের প্রশংসা আমি করি। সেটা হচ্ছে পুকুর-পারে অকারণ নারীর ভেজা দেহ দেখবার লোভ সম্বরণ। প্রজ্ঞাপনী ও চিত্রগৃহের প্রাচীর গাত্রে দু'একটা ছবি থাকলেও, অত্যন্ত সুখের বিষয়, আসলে তা দেখা যায়নি।

অত্যন্ত সস্তা ও সাধারণ হচ্ছে চিত্রটির আলোক-শিল্প। আগাগোড়া 'ফ্লাট', আলো ও ছায়ার কোনরকম সামঞ্জস্যই এতে দেখা যায়নি। এ শাখায় এ বিদেশী-শিল্পীর হাত একেবারে যে কাঁচা তাতে আর সন্দেহ নেই। সারা চিত্রে একটি গভীর কিম্বা একটি সুন্দর 'শট' ও ইনি দেখাতে পারেন নি। আর অত্যন্ত হাস্যাস্পদ হচ্ছে এর ক্যামেরার সামনে মেঘের পরিকল্পনা। বাংলার ফিল্মশিল্পে অত্যন্ত নীচু শ্রেণীর শিল্পী এই অবাঙ্গালী মিঃ মায়ার।

শব্দযন্ত্রী মিঃ ব্রাড্‌বার্ণএর 'মাইক্' সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত 'ব্লাণ্ট' মনে হ'লো। ইনি হচ্ছেন পায়োনীয়ারের আরেকজন অনভিজ্ঞ শিল্পী যিনি নাকি এ শাখায় একেবারে অনধিকার প্রবেশ করেছেন। মাইকের স্থিতি সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান এর তো নেইই, তা ছাড়া শব্দ গ্রহণের সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষাও ইনি কোনদিন পান নি। ফলে "দেবদাসী" যে রকম কথা বলেছে তা আমাদের বোঝবার অযোগ্য। এমন খুব অল্প সময়ই আছে যেখানে তার কথা স্পষ্ট, স্বাভাবিক। কোনো অভিজ্ঞ শব্দযন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে মিঃ ব্রাডবার্ণ আরো বেশ কিছুদিন 'মাইক্' কাঁধে ক'রে ঘুরে বেড়ান—এই আমার তাঁকে একমাত্র উপদেশ। এর এতদূর অসাফল্যের জন্য দায়ী হচ্ছেন সম্পাদক। চিত্রখানিকে এখনও উন্নত করবার যে একমাত্র উপায় আছে সে হচ্ছে —কাঁচি। কিন্তু, সম্পাদককে মনে হ'লো কাঁচি চালাতেই তিনি জানেন না। চিত্রখানির সচলতা কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি

করবার জন্য তাঁর ছবির অনেকটা ছেঁটে বাদ দেওয়া উচিত্ ছিলো। আর, সামর্থে কুলোলে গানের সংখ্যা কমালে তিনি আমাদের অত্যন্ত কৃতজ্ঞভাজন হ'তেন। সময় এখনও আছে, চিত্রখানির উন্নতি একমাত্র তিনিই এখন করতে পারেন।

সঙ্গীতের সংখ্যায় বাংলা বোধ হয় এই প্রথম বোম্বাইর সঙ্গে প্রতিযোগীতা করলে। মোটে, সতেরোখানা গান। বেশীর ভাগই গেয়েছেন পায়োনীয়ারের কে, সি, দে—শ্রীমৎ বিনয় গোস্বামী। কেষ্টবাবুর ব্যর্থ অনুকরণে সময় তাঁর কেটেছে, গান গেয়ে নয়। তাঁর যে দু'একটা গান সুরের জন্য শোনবার যোগ্য হয়েছিলো—সেগুলো আবার শব্দযন্ত্রীর কৃপায় সুন্দরতর হয়ে উঠেছিলো। শেষ গানটি—'চল চলরে প্রেমের কাঙ্গাল' এর সুর নিউ থিয়েটার্স্-এর 'পূরণ ভকত'-এর 'যাও সাধুকা সং'এর নীচ অনুকরণ প্রিয়তায় পরিচয় মাত্র। শ্রীমতী শান্তি গুপ্তার প্রথম গানটিই শব্দযন্ত্রী আমাদের মোটেই শুনতে দেননি, দ্বিতীয়টি চলনসই।

দুটি নাচও আছে "দেবদাসী"তে। প্রথমটি কুমারী শ্রীরূপা দেবী (এঃ) নেচেছেন 'আরতি নৃত্য'। আমাদের মতে সেটি চলন সই, তবে দ্বিতীয় নাচটির প্রয়োগ হাস্যাস্পদ। ওরকম সস্তা কোমড় নাচাবার স্থান মন্দির যে নয় প্রফুল্লবাবুর তা জানা উচিত ছিলো।

দৃশ্যপট দেখাবার বেশী কিছু নেই। তবে যেটুকু দেখানো হয়েছে—মন্দ নয়। যদিও শ্রেষ্ঠীপুত্রের গৃহে অহেতুক ফোয়ারা ইত্যাদি দেখানোর কোন সার্থকতা নেই। সাজসজ্জা সাধারণ। তবে শ্রেষ্ঠীপুত্রের পোষাক কোন ধরণের বুঝতে পারলুম না।

অভিনয়ও, সুখের বিষয়, চিত্রটির অন্যান্য গুণের সঙ্গে সমতাল রেখে চলতে পেরেছে! সবাই-ই প্রায় মঞ্চাভিনেতা; অতএব সকলেই মঞ্চ অনুরূপ অভিনয় করেছেন। —তাও নিকৃষ্ট শ্রেণীর। একমাত্র অহীন্দ্র চৌধুরীই স্মৃতিভূষণের অংশে আমাদের যা একটু সন্তুষ্ট করতে পেরেছিলেন। তাঁর ছেলের ভূমিকায় ভানু রায়ের চালচলন

মিঃ বি, এন্, সরকার
ও
ন্যাশনাল নিউস্পেপার্স লি

দুষ্ট বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া শত্রুপক্ষ বাজারে এক মিথ্যা গুজব প্রচার করিতেছে যে, "ভ্যারাইটীজ" ও 'খেয়ালী' পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতি লইয়া আমার সহিত মতভেদের ফলে মিঃ বি, এন্, সরকার ন্যাশনাল নিউজ্পেপার্স লিমিটেডের ডিরেক্টারের পদ ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যেই এই গুজব প্রচারিত হইয়াছে এবং ইহা বিদ্বেষপ্রসূত মিথ্যা ভিন্ন কিছুই নহে। আমাদের উভয়ের মধ্যে ন্যাশনাল নিউজ্পেপার্স লিমিটেডের কোনো ব্যাপার লইয়া মতভেদ হয় নাই। মিঃ বি, এন্, সরকার ন্যাশনাল নিউজ্পেপার্স লিমিটেডের ডিরেক্টার পদত্যাগ করেন নাই বা সেরূপ করিবার ইচ্ছাও তাঁহার নাই। আশা করি, আমার এই অস্বীকৃতির ফলে এই মিথ্যা গুজব সম্বন্ধে সমস্ত কাণা ঘুষার অবসান ঘটিবে।

শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার
ম্যানেজিং ডিরেক্টার,
ন্যাশনাল নিউজ্পেপার্স লিঃ

ক্যামেরার পক্ষে একটু অস্বাভাবিক হ'লেও মন্দ নয়। মন্দিরের সেবায়ত্ কার্তিক দে একেবারেই অচল, তাঁর ভাবাবেশ আমাদের হাসিয়েছে। শ্রেষ্ঠীপুত্র ভাস্কর দেবের অভিনয় কারো প্রাণস্পর্শ করতে সমর্থ হয়নি। অন্যান্য অংশ একেবারেই অনুল্লেখ-যোগ্য। অভিনেত্রীদের ভেতর নাম ভূমিকায় শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা একেবারেই অচল, ও প্রাণহীন। তাঁর বাচনভঙ্গী আধুনিক—আধোআধো; অতএব হাসি পাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। এ চিত্রে, অহীন্দ্রবাবুর নজর যার ওপর—অতসীর রূপে পদ্মাবতীর অভিনয় আমরা অভিনয়ের পর্য্যায়েই ফেলতে পারছি নে।

তবে, ধর্মপ্রাণ ও সঙ্গীতপ্রাণ বিশিষ্ট সব বাঙ্গালীর কৃপায় পায়োনীয়ার ফিল্মিস্-এর নবতম অবদান "দেবদাসী" "ছায়া"র পর্দায় কয়েক সপ্তাহ ধরে' যে চলবে এ আমাদের পক্ষে আশা করা অসঙ্গত নয়।

নিউ থিয়েটার্স

"ভাগ্য-চক্র"-কে সেদিন দেখে এলুম ক্যামেরার সামনে ঘুরতে। আর, হিন্দীতে "ধূপ-চাওন"। পরিচালক শ্রীনীতীন বসু—পরিচালনার পরিশ্রমে দেখি ফিন্ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবীর কথা ভুলেছেন। গায়ে গেঞ্জি, আঁট করে' মালকোছা-মারা ধূতি নীতীন বাবুকে সেদিন সেট্-এর ওপর ভারী ব্যস্ত সমস্তই দেখা গেলো। 'লাইট্স্' 'অ্যাক্শান্' 'কাট্' 'মুকুল, আমরা টেক্ করছি' 'দিলীপ, তুমি ঠিক আছো' ইত্যাদি নানারকম তাঁর ভাষা জোরে জোরে ভেসে আস্ছিলো আমাদের কানে।

ক্যামেরার নাগালের বাইরে ওদিকে টেবিলের ধারে আধো-আঁধা বসে' আছে ছবির নায়িকা উমা। তার লাল-পাড় শাড়ি, কালো ষ্ট্র্যাপ্ জুতো।

'সেট্টি হচ্ছে—একটি ব্যাঙ্কারের আপিস' পরে চায়ের ওপর জানতে পারলুম 'একটি আধুনিক ব্যাঙ্ক'।

* * *

'বি ইউনিটে' ঢুকতেই শুনি ঐক্যতানের সঙ্গে বাজ্ছে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর। পা চালিয়ে চলি—দেখি কে গো নাচে! নিস্তব্ধ নতুন এই ইউনিটের ষ্টুডিয়ো। তীক্ষ্ণ পরিচালক

প্রমথেশ বড়ুয়া, পরিদর্শক শ্রীযতীন মিত্র ও তাঁর সহকারী মিঃ মান্নার—চোখের তলায় শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'দেবদাস' হিন্দী জন্মলাভ করছিলো। আবার সেই চন্দ্রমুখীর ঘর। রাজকুমারী ছিলো বসে—বুঝতে পারলুম, কিন্তু ক্ষেত্রমণির অংশে নাচে কোন্ ঐ ইরাণী মেয়ে? একজনকে জিজ্ঞেস করে' জানতে পারলুম—ও ক্ষেত্রবালাই, অতো সুন্দর পোষাক পরে' নাচছে। নাচটি অনেক বাড়িয়ে দে'য়া হয়েছে। নতুন তানে, নতুন সুরে, নতুন তালে নাচে ক্ষেত্রবালা।

আমি নাচের কিছু নাই বুঝি—ধরলুম। সেদিন ষ্টুডিয়োয় সদলবলে ঐ দৃশ্যের দর্শক ছিলেন উদয়শঙ্কর। সেই নাচটি সমাপ্ত যখন হ'লো, তাঁরাও প্রশংসা না করে' পারেন নি।

* * *

"বিজয়া" তোলবার তোড়জোড় চলেছে। শ্রীদীনেশ রঞ্জন দাশ "বিজয়া"-র আনুষাঙ্গিক কাজে বিশেষ ব্যস্ত আছেন। "বিজয়া"র চরিত্র-লিপি ঠিক হ'য়েছে। আস্‌ছে আগষ্টের প্রথম হপ্তাতেই ষ্টুডিও সরগরম হ'য়ে উঠবে "বিজয়া"-র শুটিং নিয়ে, আর মহলা বস্‌বে আস্‌চে মাসের প্রথম হপ্তা থেকে। চরিত্র-লিপি নীচে দেওয়া হ'ল।

বিজয়া—শ্রীমতী চন্দ্রাবতী
রাসবিহারী—শ্রীঅমর মল্লিক
নরেন—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
দয়াল—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বিলাস—"হুয়া"
অন্যান্য চরিত্র এখনও ঠিক হয় নি।

রাধা ফিল্ম

শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ গোয়েন্দা-নাটক "কণ্ঠহার" সবাক্-চিত্রে রূপান্তরিত করার স্বত্ব এরা কিনেছেন। মঞ্চে নাটকখানি প্রায় পাঁচ শ' রাত্তির ধরে সগৌরবে চলেছিল। নির্ব্বাক্ পর্দায়েও ছবিখানির জনপ্রিয়তা বোধ হয় লোকে এখনও বিস্মৃত হন নি। 'রাধা ফিল্ম' নাটকখানিকে ভেঙে চুরে আধুনিক চিত্রোপযোগী কোরে গড়ে তোলবার জন্য বিশেষ যত্নবান হ'য়েছেন।

এতদ্ভিন্ন এই প্রতিষ্ঠানটি ভক্তি-মূলক নাটক "কৃষ্ণ-সুদামা" তোলাও সঙ্কল্প কোরেছেন। তবে কোন গল্পটি আগে তোলা হবে তা' সঠিক বলা যায় না।

* * *

এদের তেলেগু 'ভক্ত কুচেলা' আগামী রথযাত্রার সময় ভিজাগাপটমের 'পূর্ণ থিয়েটারে' মুক্তি পাবে।

"ভার্ণাকুলার" ???

"ভার্ণাকুলার" (?) ঔপন্যাসিক শ্রীশরৎচন্দ্র তাঁহার "কন্টিনেণ্টাল" জীবন যাপনের উদ্যোগের প্রারম্ভে দেশীয় সংবাদপত্রকে "ভার্ণাকুলার" আখ্যা দিয়া শ্লেষ করিয়াছেন। তিনি কি এইবার তাঁহার "ভার্ণাকুলার" সাহিত্যলীলা শেষ করিয়া ফেরঙ্গ-সাহিত্যে হাতে-খড়ি দিবেন?

তামিল "সিরুতোণ্ডা" সম্পাদকদের হাতে রয়েছে।

* * *

এদের বাঙলা "দক্ষযজ্ঞ" ৬ই জুলাই ঢাকার "চিত্রালয়ে" মুক্তিলাভ কোরবে। পূর্ব্বে এই চিত্রগৃহটি ঢাকার "মতিমহল টকীজ" নামে পরিচিত ছিল। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের হংস সিনেমার সত্ত্বাধিকারী এই চিত্রগৃহ পরিচালনের ভার গ্রহণ কোরেছেন।

"ইন্দিরা এম্, এ"-র পর এদের হিন্দি "দক্ষযজ্ঞ" নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ কোরবে।

কালী ফিল্মস্

হপ্তা দুই পরে কালী ফিল্মস্ সরগরম হয়ে উঠবে। শ্রীনরেশ মিত্র তুলবেন "সরলা" আর শ্রীতুলসী লাহিড়ী তুলবেন "মণিকাঞ্চন" (২য় পর্ব্ব)। "সরলা" রঙ্গমঞ্চের একখানা বহু বিখ্যাত নাটক—বাঙালী সমাজের সুখ-দুঃখের নিখুঁৎ চিত্র। মঞ্চে যাঁরা এই নাটকে অভিনয় কোরে যশোপার্জ্জন কোরেছিলেন তাদের মধ্যে অনেককে পর্দ্দায়ও দেখা যাবে। আমাদের মনে হয় ভূমিকালিপি যদি এইভাবে বণ্টিত হয়, তা' হ'লে ভাল হয়।

শশীভূষণ—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
বিধুভূষণ—শ্রীজীবন গাঙ্গুলী
নীলকমল—শ্রীনরেশ মিত্র
গদাধর—শ্রীতুলসী লাহিড়ী বা
শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী
প্রমদা—শ্রীমতী শিশুবালা
সরলা—শ্রীমতী মায়া মুখার্জ্জি
গোপাল—শ্রীমতী মুকুল

* * *

এ ছাড়া শোনা যাচ্ছে, এই ষ্টুডিওতে নাকি "কাল-পরিণয়ে"র সবাক্ সংস্করণ তোলা হবে। এই ছবিখানির নির্ব্বাক সংস্করণ তুলে গাঙ্গুলী মশাই যেমনি নাম কেনেন, তেমনি 'ম্যাডানে'-র তহবিলও ভরিয়ে তোলেন। আমাদের ইচ্ছা গাঙ্গুলী মশাই স্বয়ং এই ছবিখানি তুলে নিজের তহবিল পূর্ণ কোরে তোলেন।

* * *

তারপর পরশুরাম লিখিত সর্ব্বজনপ্রশংসিত "কচি-সংসদ" ও "স্বয়ম্বরা" তোলারও কথা চল্‌ছে। হাসির ছবি তুলে এই প্রতিষ্ঠানটি যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। আশা করি, এই ছবি দু'খানা তোলার পর এঁদের সে যশ আরও বৃদ্ধি পাবে। ছবি দু'খানি তোলার ভার পড়েছে শ্রীতুলসী লাহিড়ীর ওপর।

* * *

"বিদ্যাসুন্দর" তোলা প্রায় শেষ হ'য়েছে। ছবিখানির সম্পাদনা চল্‌ছে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

সুপ্রসিদ্ধ আলোক-চিত্র-শিল্পী শ্রীযতীন দাস বাঙলা ও হিন্দীতে হাস্যরসাত্মক নাটক "রাতকাণা"-র সবাক্-সংস্করণ তুলবেন।

* * *

আগামী ৩রা আগষ্ট "ডি-জি" পরিচালিত বহু-প্রতীক্ষিত "বিদ্রোহী" মুক্তি পাবে "রূপবাণীতে"। আমরা যতদূর শুনেছি তা'তে মনে হয়, "ডি-জি"-র তোলা এই ছবিখানা চিত্র রসিকদের অপূর্ব্ব আনন্দদানে সমর্থ হবে।

* * *

শোনা যাচ্ছে, "ব্লাড এণ্ড বিউটী"র কাজ শেষ কোরে শ্রীধীরেন গাঙ্গুলী স্বতন্ত্রভাবে ছবি তোলায় মনোনিবেশ কোরবেন। তাঁর অধুনা কর্ম্মস্থলেই তিনি আপাততঃ ছবি তুলবেন। "ডি-জি"-র কর্ম্মশক্তির ওপর আমাদের আস্থা আছে—মনপ্রাণ দিয়ে কাজ কোরলে অদুর ভবিষ্যতে কোলকাতায় হয়ত আমরা আর একটি বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত ষ্টুডিও দেখতে পাব। "ডি-জি" তোমার যাত্রাপথ সফল হ'ক!

* * *

প্রকাশ যে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়ার অভিনেতা গুল হামিদ শীঘ্রই পরিচালকের পদে উন্নীত হবেন। তাঁহারই নিজের লেখা একটি গল্প তিনি পরিচালনার জন্য আয়োজন কোরছেন। আমরা তাঁকে অভিনন্দিত কোরছি।

পপুলার পিকচার্স

এদের "মন্ত্রশক্তি" প্রায় শেষ হ'য়ে এল। ছবিখানি যা'তে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তার জন্য কর্তৃপক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা কোরছেন।

পায়োনিয়র ফিল্মস্

এরা বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" তোলার তোড়জোড় কোরছেন। শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ এই ছবিখানারও পরিচালনা কোরবেন।

ম্যাডান থিয়েটার্স

শ্রীএণ্ডি মুর রায় পরিচালিত "ফ্যানটম অফ ক্যালকাটা" শীঘ্রই 'ক্রাউনে' আস্‌ছে। গত হপ্তায় এই ছবিখানার 'প্রাইভেট শো' হ'য়েছে—আমাদের জনৈক বন্ধু খবর দিয়ে গেলেন। এই ছবিখানি 'ম্যাডানে'-র অপকীর্ত্তির আর একটি স্তম্ভ। দেখা যাক্!

ভারতলক্ষ্মী

চারু রায়ের "ডাকু-কা-লেড়কা"-র কাজ শেষ হ'তে আর দেরী নেই

* * *

শ্রীতুলসী লাহিড়ী চা বাগান অবলম্বনে যে ছবি তোলার মনস্থ কোরেছিলেন—তা' বোধ হয় কার্য্যে আর পরিণত হ'ল না।

রূপকথা

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র এম্, এল্, এ মহাশয়ের পৌরহিত্যে বহুবাজার মোড়ে "রূপকথা" চিত্রগৃহের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হ'য়েছে। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট
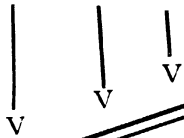
ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হ'য়ে উৎসবে যোগদান করেন।

চিত্রগৃহটি পূর্ব্বে "চিত্র-ছায়া" নামে পরিচিত ছিল। শ্রীসতীশচন্দ্র মল্লিক চিত্র-গৃহটিকে সুসংস্কৃত কোরেছেন এবং ক্লাইস্ আইকন্ শব্দযন্ত্র "রূপকথা" র রূপশ্রী বাড়িয়া তুলেছে। নিমন্ত্রিতদের "বেবুনা" ছবি দেখানো হয়। আমরা চিত্র-গৃহটির উন্নতি কামনা করি।

ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিমিটেড

এদের পরিচালনাধীনে বাঁকিপুরের 'এলফিনষ্টোন পিক্‌চার প্যালেস' বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠছে। এই জনপ্রিয়তার কারণ, কর্ত্তৃপক্ষ দেশী ও বিলাতী ভাল ভাল ছবি দেখাচ্ছেন বলে। এ ছাড়া সাধারণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কর্ত্তৃপক্ষ আগষ্টের গোড়াতেই এখানে চারদিন 'রঙ্গমহল থিয়েটার'-কে দিয়ে "মহানিশা," "পতিব্রতা", "কাজরী," "অশোক" ও "পথের শেষে" অভিনয় করানোর ব্যবস্থা কোরেছেন। শ্রীনরেশ মিত্র, শ্রীযোগেশ চৌধুরী, শ্রীরবি রায়, শ্রীভূমেন রায়, শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা, শ্রীমতী আসমানতারা, শ্রীমতী চারুবালা প্রভৃতি 'রঙমহলে'র শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ এই অভিনয়ে যোগদান কোরবেন। 'ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্সে'-র পক্ষ থেকে 'রঙমহলে'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীশিশির মল্লিকের সহযোগিতায় শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল প্রোগ্রামের ব্যবস্থা কোরছেন। সান্যাল মশাইয়ের কাজের ওপর আমাদের আস্থা আছে—সেজন্য মনে হয়, বাঁকিপুরবাসী আগষ্টের প্রথম হপ্তায় এই আনন্দ উৎসবে যোগদান কোরে বিশেষ তৃপ্তিলাভ কোরবেন।

রীডেন এণ্ড কোং

সম্পূর্ণ বাঙালী প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটির কর্ম্মকুশলতার পরিচয় সকলেই অবগত আছেন। এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যাঁরা জড়িত আছেন সকলেই বিশেষ কার্য্যদক্ষ

গান

নীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মোর—সন্ধ্যা রাতের ফুল বাসরে তোমার নিমন্ত্রণ।
বঁধু তোমার নিমন্ত্রন॥
তোমার তরেই গেঁথেছি আজ ফুলের আভরণ॥
যা' কিছু মোর ছিল আশা—
তোমায় শুধু ভালবাসা—ছিল আশা
তোমার সাথে মধুর রাতে প্রেমের আলাপন॥
যে বারতা হয়নি বলা—আছে গো প্রাণ জুড়ে—।
যে অনলে চির জীবন—হৃদয় আছে পুড়ে—॥
আমার হৃদয় গেল পুড়ে।
আজিকে সব থরে থরে
প্রেমের পূজায় দিব ধ'রে—থরে থরে
চরণ-ধুলো ধুইয়ে দেবে—সজল দু'নয়ন।
আমার সজল দু'-নয়ন॥

লোক। ইতিমধ্যেই এরা কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছবি এবং "কালী ফিল্মস", "পায়োনিয়র ফিল্মস" ও পপুলার পিক্‌চার্সে"র চিত্র-পরিবেশনার ভার প্রাপ্ত হ'য়েছেন। আমরা এই চিত্র-সরবরাহকারীদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

এভারগ্রীন পিক্‌চার্স

নায়ক শ্রীললিত মিত্রের প্রত্যাবর্ত্তনের পর আবার পূর্ণোদ্যমে এদের কাজ সুরু হ'য়েছে। জাকজমকপূর্ণ একটি বৃহৎ দৃশ্য তোলার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের চিত্র-শিল্পী পি, সাণ্ডেল, শব্দযন্ত্রী শ্রীহিতেন মজুমদার প্রভৃতি শিল্পীরা বিশেষ ব্যস্ত আছেন।

রূপবাণী

২৯শে জুন শনিবার হইতে রাধা ফিল্মের গীতি মুখর কথা-ছবি "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" "রূপবাণীতে" অষ্টম সপ্তাহে পদার্পণ কোরবে। হাস্য-রসাত্মক এই নূতন ছবিখানি এ পর্য্যন্ত অগনিত নর নারীর প্রশংসা অর্জ্জন কোরেছে। মেট্রো গোল্ডউইনের শ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর চিত্র "ট্রেজার আইল্যাণ্ড" অতঃপর 'রূপবাণীতে' প্রদর্শিত হবে।

চিত্রনাট্য প্রতিযোগিতা

'কালী ফিল্মসের' সত্বাধিকারী শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী জানিয়েছেন—তিন হপ্তা পূর্ব্বে "অন্নপূর্ণার মন্দিরে"র চিত্র-নাট্য লেখবার জন্য সাধারণকে অনুরোধ করি। এবং প্রাপ্ত চিত্রনাট্যগুলির মধ্যে বিশেষজ্ঞগণ যাঁর চিত্রনাট্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা কোরবেন তিনি যথোপযুক্ত পুরস্কার পাবেন এবং তাঁর চিত্রনাট্যখানি পর্দ্দায় রূপান্তরিত করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতাবধি দু' একখানি চিত্রনাট্য আমার হস্তগত হ'য়েছে।

যাঁরা এ বিষয়ে উৎসাহী তাঁরা এই সম্মানজনক প্রতিযোগিতায় যোগদান করার পরামর্শ আমরা দিই। আগামী ১৫ই জুলাই অবধি "অন্নপূর্ণার মন্দিরে"-র চিত্রনাট্য গ্রহণ করা হবে।

——

বিবিধ

প্রজাপতির পরিণতি

চৌরঙ্গীর সহযোগীর পৃষ্ঠায় একখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে—সার হরিশঙ্কর পাল দার্জ্জিলিং-এ যে স্থানে মোটর-নিবাসে সর্ব্বদাই পেট্রোলের গন্ধ পবন আমোদিত করে সেই স্থানে তাঁহার গৃহে বাঙ্গালার গভর্ণরকে যে ভোজ দিয়াছিলেন—তাহাতে অতিথিগণ। স্বয়ং গভর্ণর, সার জন উডহেড, মিষ্টার রীড ও সার হরিশঙ্কর পুরোভাগে—সকলেরই বেশ এক ধরণের, বর্ণের বৈষম্য না থাকিলে সার হরিশঙ্করকেও এ বেশে লোক ইংরাজ বা ফরাসী মনে করিতে পারিত। তাঁহার এই পরিচ্ছদে আমাদের বাল্যকালে পঠিত বিষয় মনে পড়িল—গুটিপোকা প্রজাপতিতে পরিণত হয়। বাঙ্গালার বিবাহ-বাজারের 'প্রজাপতি'-কুমার যে 'বংশ পরিচয়' দিতেছেন এবং যাহাতে বেউড় হইতে তল্লা ও গেঁটে পর্য্যন্ত নানা বংশের পরিচয় আছে, তাহাতে আমরা প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্বনামধন্য বটকৃষ্ট পাল মহাশয়ের বিবরণে দেখিতে পাই :—

"পরিধানে সামান্য সাদা ধুতি, অঙ্গে একটি ছোট মেরজাই, স্কন্ধে একখানি চাদর এবং পদস্থানে ঠনঠনের চটি জুতা—কচিৎ পেনালা জুতা এবং শীতকালে গাত্রে সামান্য বালাপোষ, ইহাই তাঁহার চিরব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ ছিল। প্যাণ্ট, চোগা, চাপকান, পাগড়িরূপ ধড়াচূড়া পরা দূরে থাকুক, তিনি কখনও জীবনে মোজা পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন নাই।"

তিনি কখন হ্যাটকোট পরিধানের কল্পনা করিতে পারিতেন কি না, বলিতে পারি না।

বিলাতী বেশ সম্বন্ধে দুইটি গল্প বলিব—

(১) ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্যরা যখন নবাগত বড়লাট লর্ড ডাফরিনকে অভিনন্দিত করিতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে ইংরাজের বেশধারী কোন বাঙ্গালীকে (নামটা করিব না) দেখিয়া লর্ড ডাফরিন বলিয়াছিলেন, ভারতসভায় ফিরিঙ্গীরাও আছেন, ইহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতসভায় কোন ফিরিঙ্গী সভ্য নাই শুনিয়া তিনি বলেন, "আপনাদের দেশীয় পরিচ্ছদে আপনারা দেবদূতের মত দেখান। কেন যে আপনারা আমাদের পোষাক পরেন, বুঝিতে পারি না।" সেই কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "—রা ঐ পোষাক পরেই বা কেন; আর গালাগালি খাইতে যায়ই বা কেন?" পাঠকগণ লক্ষ্য করিতে পারেন, গড়ের মাঠে লর্ড ডাফরিনের যে মূর্ত্তি আছে, তাহাতে তাঁহার বেশে প্যাণ্ট-কোটের উপর একটা ঢিলা আবরণ আছে।

(২) দর্জ্জিপাড়া পল্লীতে কোন ডাক্তারের গৃহে প্রতি সন্ধ্যায় কয়জন ডাক্তারের মজলিস বসিত। সকলেরই পরিধানে প্যাণ্ট কোট। তাই পাড়ার কোন বৃদ্ধ গৃহস্বামী ডাক্তারের পিতৃব্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হ্যাঁ হে, তোমার বাড়ীতে কি রোজই বিয়ে হয়?" গৃহস্বামীর পিতৃব্য এই প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করিলে বৃদ্ধ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "তবে প্রতি সন্ধ্যায় চুণাগলির বাজাওয়ালারা আসে কেন?"

সে কালের বুড়াদের বর্ণজ্ঞান ছিল। তাই নবীন-নীরদশ্যাম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র নাই—আছে পীতবাস, আর গোরোচনা গৌরী রাধার অঙ্গে নীলাম্বর। একালে অনুকরণেই যত গোল বাধাইয়াছে।

জাহাঙ্গীর নিজে শ্যামবর্ণ ছিলেন—তাই গৌরাঙ্গী নূরজাহানের পাশে বসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"এ শ্বেতপদ্মে ভ্রমর।"

ইংরাজ কখন ভুলিয়াও এদেশে এদেশের লোকের বেশ পরিধান করে না। কিন্তু এদেশে সার হরিশঙ্কর হইতে—অনেকে (হয়ত বা সার জগদীশ চন্দ্র বসুর ভাষায় International Swindlersরা পর্য্যন্ত) যে বিদেশী পোষাকের আদর দেখান, সেটা বিদেশী পোষাকের শ্রেষ্ঠত্বে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হেতু—না দাসমনোবৃত্তির পরিচয়? বটকৃষ্ট পাল কোম্পানীর রসায়ন পরীক্ষাগারে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে কি?

নোটেবল (নট-এবল নহে)

অনুপস্থিতি

দার্জ্জিলিং-এ সার হরিশঙ্কর পালের প্রদত্ত ভোজে সম্মিলিত ব্যক্তিদিগের যে চিত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দুইজনের প্রতিকৃতি না দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি এবং অতিথি-তালিকা দেখিয়া সে বিস্ময় দৃঢ় হইয়াছে। সে দুইজন—

(১) চকদীঘীর রায় বাহাদুর ললিত মোহন সিংহ রায়ের জামাতা রজনী বাবু;

(২) ৺মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকার।

ছবিতে পাকা চুলে পাকা কলপ দেওয়া রাজা বাহাদুর মণিলাল সিংহ রায়কে চিনিতে বিলম্ব হয় না। সার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়ও হংসবৎ গ্রীবা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু রাজা বাহাদুরের ভ্রাতা ও সার বিজয় প্রসাদের পিতা রজনী বাবুর ছবি নাই! তিনি যদি রাজা বাহাদুরের ভ্রাতা ও মিনিষ্টারের পিতা না-ও হইতেন, তবুও তাঁহার দার্জ্জিলিং যাইতে ছাড় প্রয়োজন হইত না—কেন না, তিনি আর যুবক নাই, তবে কি তিনি দার্জ্জিলিং-এ গমন করেন নাই?

আর ৺মেয়র? তিনি ত সেদিন দার্জ্জিলিং-এই ছিলেন। তবে কি মিষ্টার গুরুসদয় দত্তের পার্টির মত এ ভোজেও তিনি অরুচি দেখাইয়াছেন? না—ইহা গত মেয়র-নির্ব্বাচনের উপসংহার? অবশ্য দ্রাক্ষা ফল যে টক—সে কথা এক্ষেত্রে উঠিতেছে না। নলিনী দার্জ্জিলিং এ গেল—সঙ্গে অবশ্য কোন ভগ্নস্বাস্থ্য আত্মীয়া নাই—আর পার্টিতে সে ছিল না! তবে কি—

"উচল বলিয়া অচলে চড়িনু;
পড়িনু অগাধ জলে!"
"শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু;
বজর পড়িয়া গেল!"

বাগবাজারের বিভ্রম

আলঙ্কারিকরা বিভ্রমের যে লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন, বাগবাজারের সহযোগীর তাহারই বিকাশ—নলিনী সরকারের দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের সঙ্গে সঙ্গে পরিলক্ষিত হইতেছে। স্বয়ম্বরান্তে অজের প্রত্যাগমন কালের কথায় কালিদাস যুবতীদিগের বিভ্রমের পরিচয় দিয়াছেন:—

"অঞ্জন দক্ষিণনেত্রে করি বিলোপন,
অকজ্জল বামনেত্রে কোন বা যুবতী
অঞ্জন-শলাকা করে করিয়া ধারণ
গবাক্ষের মুখে গেলা অতি দ্রুতগতি।"

আমাদের সহযোগীরও সেইরূপ ভাব দেখা গিয়াছে। গতপূর্ব্ব মঙ্গলবারে সহযোগীর শেষ পৃষ্ঠায় ৮খানি ছবি ছাপা হইয়াছে। চিত্রগুলির শিরোনামা—"দেশবন্ধু স্মৃতিকথা: কোয়েটার আহত চিত্র।"

প্রথম চিত্র—

চিত্তরঞ্জনের মাল্যাদিভূষিত প্রতিকৃতি নিম্নে লিখিত:—

"Showers of flowers on the sacred portrait of the Nation's Beloved—at the foot of the magnificent monument erected on the tears and sighs of his countrymen".

তাঁহার দেশবাসীর অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত চমৎকার স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে জাতির প্রিয়পাত্রের পবিত্র প্রতিকৃতির উপর বর্ষিত কুসুমধারা।

"কাব্যির" কি দৌড়! স্মৃতিস্তম্ভ কি তবে হাওয়ার উপর (দীর্ঘশ্বাস ত হাওয়াই বটে) প্রতিষ্ঠিত?

দ্বিতীয় চিত্র—

কোয়েটার কাবারী বাজারের ভগ্নাবশেষ। নিম্নে লিখিত:—

"Nothing is left of the Karbari Bazar except the broken front arch which reminds people of the fateful night at Quetta."

কারবারী বাজারের ভগ্ন সম্মুখ তোরণ ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট নাই—উহাই লোককে কোয়েটার ভীষণ রাত্রির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

তোরণের উপর লিখিত আছে—**"কাবারী বাজার"**

'অমৃতবাজারের' যোগ্য সহঃ সম্পাদকরা তাহাকে **কারবারী বাজার** করিয়াছেন। দীনবন্ধুর সৃষ্ট ঘটীরামের মত তাঁহারা স্থির বুঝিয়াছেন—বাজারে যখন কারবার হয়, তখন উহার নাম অবশ্যই **কারবারী** বাজার। কিন্তু সব সময় কি বিচার বিবেচনা

করিয়া নামকরণ হয় ? 'অমৃতবাজারে' বিমল ও নির্ম্মল দুই-ই আছেন ; কিন্তু কাহাকেও দেখিলে বিমল বা নির্ম্মল মনে করা যায় না।

তাহার পর—

যে চিত্রে বহু নরনারীকে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান দেখা যাইতেছে। তাহার নিম্নে লিখিত হইয়াছে—

"Jack Braddock who beat Max Boer in a fifteen round contest for the world's heavy weight championship."

অর্থাৎ হেভি ওয়েট চ্যাম্পিয়নসিপে ম্যাক্স বেয়ারকে পরাজয়কারী জ্যাক ব্রাডক ; আর—

একজন ভীমকায় পুরুষের চিত্রের নিম্নে লিখিত :—

"Hunger-stricken Refugees outside the Gymkhana enclosure impatient for food"

অর্থাৎ জিমখানার ঘেরা জায়গায় খাদ্যের জন্য অধীর ক্ষুধার্ত্ত আশ্রয়প্রাপ্ত ব্যক্তিরা (কোয়েটার দুর্লভ)।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—এক চিত্রের ব্যাখ্যা অন্য চিত্রের নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে।

বিভ্রম ব্যতীত যে এমন হইতে পারে না, তাহা বাগবাজারের বৈষ্ণবরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এখন জিজ্ঞাস্য—এই বিভ্রমের কারণ কি ? এই রোগের নিদান কি হইতে পারে ? দেখা গিয়াছে—নলিনী সরকারের বিরুদ্ধে বীণার সহিত ব্যভিচারের মামলা উপস্থাপনাবধি সহযোগী বিব্রত হইয়াছেন। প্রথম দিন মামলার সংবাদ 'এ্যাডভান্স', 'আনন্দবাজার' ও 'বন্দেমাতরমে' প্রকাশিত হইলেও 'অমৃতবাজারে' প্রকাশিত হয় নাই। এই সংবাদ সম্পর্কে হিন্দুস্থানের কর্ম্মচারীরা যে 'এ্যাডভান্স' ও 'দৈনিক বসুমতীর' দ্বারে ধর্ণা দিয়াছিল, তাহা তাহাদেরই একজন স্বীকার করিয়াছে। 'অমৃতবাজারে' কি ব্যবস্থা হইয়াছিল ?

তাহার পর রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির "নিবেদন" বিজ্ঞাপন হিসাবে ছাপিয়া 'আনন্দবাজার' ও 'বসুমতী' তাহার সমর্থন করেন নাই ; কিন্তু 'অমৃতবাজার' সমর্থন করিয়া "দাসখতের" মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়াছেন।

'আনন্দবাজার' 'বসুমতী', 'এ্যাডভান্স' 'বন্দেমাতরম', 'খেয়ালী', 'স্বদেশ' প্রভৃতি পত্র বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শ নলিনীর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিলেও 'অমৃতবাজার' একেবারে নির্ব্বাক—এমন কি শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষের পত্রখানিও সম্পূর্ণ প্রকাশের সৌজন্য দেখান 'অমৃতবাজারের' পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

অধ্যাপক প্রমথনাথ সরকারের মৃত্যু যে আত্মহত্যা তাহা প্রতিপন্ন করিবার বলবতী

"জেগেছে পুরুষ ভাঙ্গিয়া গড়িতে
স্বর্গে মর্ত্তে নব বিধান ?"

হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর ডিরেক্টার-গণ নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ একচুয়ারী মিষ্টার টি, ই, ইয়ং এর নাম অবগত আছেন। বীমা কোম্পানীর ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন :—

"Let the selection of the principal officer by the Directors and the choice of under-officials by the chief be as rigorous and searching as possible in order that men of high moral character, may alone be appointed."

আর ব্যভিচারের মামলায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার রায়ে হিন্দুস্থানের প্রধান কর্ম্মচারী আসামী নলিনীরঞ্জন সরকার ও বীণার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"Under the circumstances it must not be regarded as unduly uncharitable if people are so low-minded as to regard the conduct of the accused (i. e. Nalini) and Bina as not wholly above suspicion."

বাসনাও 'অমৃতবাজার' ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

এ হেন 'অমৃতবাজার'—সরকারের বিজ্ঞাপন লাভকারী "জাতীয়" দলের পত্র প্রকৃতপক্ষে কোন্ দলের?

নলিনী দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিলেই 'পত্রিকার' যে বিভ্রমবিকাশ দেখা গিয়াছে, তাহাতে শঙ্কিত না হইয়া পারা যায় না।

"এত প্রথম বলি বইত নয়
পরেই বা কি হয়!"

ইউনিক্ এসিওরেন্সে
দেশবন্ধু স্মৃতি-বার্ষিকী

গত ১৬ই জুন রবিবার সন্ধ্যায় ১০নং ক্যানিং ষ্ট্রীটস্থ হেড অফিসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দশম স্মৃতি-বার্ষিকী যথাবিহিত-ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। দেশবন্ধু ইউনিক এসিও-রেন্সের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সভায় কলিকাতার মেয়র মিঃ এ, কে, ফজলুল্ হক্, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ, ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আব্দুলমোরির দল কর্ত্তৃক কালীকীর্ত্তন ও সঙ্গীতাদি এই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভূক্তি ছিল।

স্মৃতিসভার শেষে ইউনিকের অন্যতম ডিরেক্টার মিঃ এ, কে, ফজলুল্ হক্ কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হওয়ায় অন্যান্য ডিরেক্টারগণ তাঁহাকে একমাত্র পত্রদান করেন। ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বক্তৃতা ও মেয়র মহোদয়ের প্রত্যুত্তরের পর সভা ভঙ্গ হয়।

প্রীতি-সম্মিলন

আগারওয়াল ষ্টীম ন্যাভিগেশন এণ্ড কোর স্বত্বাধিকারী মিঃ এম্, বি, বাজাজের অভ্যর্থনার জন্য শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার গত শুক্রবার অপরাহ্নে কলিকাতার টাউন হলে এক প্রীতি সম্মিলনের আয়োজন করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত, মিঃ গগন মেটা, শ্রীযুক্ত সুরেশ রায়, মিঃ আই, বি, সেন, শ্রীযুক্ত অজিত হালদার, অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বাগতম্

'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদক আমাদের পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ অদ্য বৃহস্পতিবার প্রাতে কারামুক্তি লাভ করিবেন। স্বাগতম্।

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

সব্যসাচী

হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর "জেনারেল ম্যানেজার" যে "ব্যক্তিগত ও গোপনীয়" পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে :—

"হিন্দুস্থানের প্রথম যুগে বহু ভুলভ্রান্তি ঘটিয়া থাকিলেও সেই প্রাথমিক দোষ ক্রটী সংশোধন করিয়া আজ হিন্দুস্থান ভারতীয় বীমাক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।"

হিন্দুস্থানের জেনারেল ম্যানেজার বলিতে পারেন, হিন্দুস্থান "ভারতীয় বীমাক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে", কিন্তু সে বিষয়ে যে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দুস্থানের প্রথম যুগে অবশ্য বর্ত্তমান "জেনারেল ম্যানেজার" "দাদার" কেরাণী হইয়া তাহাতে প্রবেশ করেন নাই; কিন্তু যখন ক্রটি সংশোধনের চেষ্টা হয়, তখন কি তিনি ছিলেন না? আর ক্রটি সংশোধনের জন্য যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা কি বীমা কোম্পানীর সম্ভ্রমবর্দ্ধক?

এই উপায় সম্বন্ধে তখন (২৬শে এপ্রিল, ১৯২৩) 'কমার্শাল গেজেট' পত্র ব্যবসা-বিষয়ক মামলা শিরোনামায় লিখিয়াছিলেন—

"Babu Jogendra Chandra Ghosh, an assistant in the office of the Inspector General of Police, Bengal has sued the Hindusthan Insurance Society Ltd., claiming Rs 2,000. The case has been filed at Barisal. The plaintiff is a combined policy holder and his policy has matured. As reported in a previous issue, the Raja of Surangi got a decree in the High Court of Calcutta on his claim of Rs 20,000 on the maturity of his combined insurance policy; and in this Hon. Mr. Justice Page observed that the Society had committed a breach of contract."

অর্থাৎ—

বাঙ্গলার ইনস্পেক্টার জেনারেল অব পুলিশের অফিসের কর্ম্মচারী বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ২ হাজার টাকার দাবীতে হিন্দুস্থান বীমা মণ্ডলীর বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করিয়াছেন। মামলা বরিশালে দায়ের হইয়াছে। ফরিয়াদী কম্বাইণ্ড পলিসির মালিক এবং পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে এক সংখ্যায় আমরা সংবাদ দিয়াছিলাম, তাঁহার কম্বাইণ্ড পলিসির মেয়াদ পূর্ণ হইলে **সুরাঙ্গীর রাজা কলিকাতা হাইকোর্টে নালিশ করিয়া এই কোম্পানীর বিরুদ্ধে ২০ হাজার টাকার ডিক্রী পাইয়াছেন।** সেই মামলার বিচারক পেজ বলিয়াছিলেন—**বীমা-মণ্ডলী চুক্তিভঙ্গ করিয়াছে।**

বিচারক পেজ বলিয়াছিলেন—কোম্পানী had committed a foudamental breach of faith—এই fundamental কথাটির প্রতি আমরা পাঠকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করি।

ইহার পরে একখানি বাঙ্গালা মাসিকপত্রে এই বিষয় আলোচিত হয়। **পত্রখানির নাম 'উপাসনা'।** হিন্দুস্থানের আজিকার পাবলিসিটী অফিসার—নিমকের মর্য্যাদারক্ষা-পরায়ণ সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, তখন "মেসার্স ভট্টাচার্য্য চৌধুরী এণ্ড কোংর অর্থানুকূল্যে" মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'উপাসনা' সম্পাদকরূপে পরিচালিত করিতেছিলেন। 'উপাসনায়'—"জীবনবীমার কষ্টিপাথর" প্রবন্ধে, প্রবন্ধলেখক বলেন, কোন কোন বীমা কোম্পানী "চুক্তি-পত্রের মধ্যে কোন খুঁত ধরিয়া দাবীর টাকা

না মিটাইয়া অব্যাহতি পাইবার একপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়াছে"—ইত্যাদি। ইহার পর লেখক বলেন :—

"গবর্ণমেণ্টের Blue Book হইতে আমরা একটি উন্নতিশীল সুবৃহৎ জীবন বীমা কোম্পানীর কথা জানিতে পারি, যাহা এদিকে আরও এক ধাপ নিয়ে গিয়াছে; যে লোভনীয় চুক্তিতে দেশবাসীর নিকট আবদ্ধ হইয়া উক্ত কোম্পানী বিশেষ জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন—তাহারই দাবীর সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন; এই অজুহাতে যে ঐ চুক্তিজনিত ঋণের পরিমাপ অনুযায়ী টাকা তাহাদের বীমা তহবিলে নাই! কিন্তু ইহার জন্য কোম্পানী কার্য্য স্থগিদ রাখিল না—শুধু এই বিভাগের কার্য্য স্থগিদ রাখিয়া শাখা হিসাবে ঐ চুক্তি বিভক্ত করিয়া উহার বৃহৎ দায়ের জন্য অতি সামান্য নামমাত্র তহবিল মজুদ রাখিল এবং অন্যান্য কার্য্যপ্রণালী চালাইতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক এই যে, কয়েক বৎসর পরে এই চলতি বিভাগে বৃহৎ উদ্ধৃত্তি প্রকাশ হইল, কিন্তু কোম্পানী পৃথিবীর সভ্যজগতের সমস্ত নিয়মানুযায়ী লুপ্ত বিভাগের ঋণ পরিশোধের জন্য কিছুমাত্র অর্থ না দি। অভাগ্য পলিসি-হোল্ডারদের দাবীর টাকা আদায়ের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য উপায় না রাখিয়া নূতন কার্য্য সংগ্রহের জন্য চলতি বিভাগে উচ্চ "বোনাস" ঘোষণা করিয়াছেন। লুপ্ত বিভাগের কতক পলিসি-হোল্ডার আদালতে যাইয়া নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিল ও তদনুযায়ী অর্থ আদায় করিল। কিন্তু অগণিত পলিসি হোল্ডারদের অধিকাংশকেই হয় চুক্তির অঙ্গীকৃত অর্থকে বিসর্জ্জন দিতে হইল অথবা প্রতিপত্তিশালী বিরুদ্ধ পক্ষের প্রস্তাবিত সর্ত্ত সমূহের নিকট আত্মসমর্পন করিতে হইল।"

এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে **সাবিত্রী প্রসন্ন সম্পাদিত 'উপাসনা'য়** প্রকাশিত প্রবন্ধের মন্তব্য—

"এইরূপ অবস্থা কখনই সম্ভবপর হইত না, যদি দেশের গবর্ণমেণ্ট নিরীহ প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার প্রাথমিক কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত না হইতেন।"

এই উক্তির সহিত বিচারক পেজের উক্তি মিলাইয়া লইতে হইবে—

হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলী যাহা করিয়াছে, তাহা—"Fundamental breach of contract"

যে কোম্পানীর সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি দেশের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ে বিচারকের রায়ে হয়—তাহার ত্রুটি সংশোধন পদ্ধতি দেখিয়া কি মনে হয় না—

কোম্পানী মান অপেক্ষা জানই বড় মনে করিয়াছেন?

দীর্ঘ ২০ বৎসর কাল অংশীদারদিগকে লাভ হিসাবে একটি কাণা কড়িও না দেওয়া অবশ্য চুক্তিভঙ্গ বলা যায় না—কিন্তু তাহাতে যে আশাভঙ্গ হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

চুক্তির কথায় আমাদের একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। হিন্দুস্থানের ডিরেকটাররা যে পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন, জেনারেল ম্যানেজারের উপরি পাওনা যে সব সর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট হয়, সে সকলের মধ্যে—বৎসরে অন্যূন যে কাজ দিতে হইবে, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ কাজ সংগ্রহের উপর নির্ভর করে। এই নূতন কাজ কি হিসাবে ধরা হয়? যদি এমন হয় যে, বর্ষশেষে হেড অফিসের তুলনায় এজেণ্টরা প্রত্যেকে ১০ বা ১৫ হাজার টাকার কাজ কোনরূপে পাঠাইয়া দেন এবং তাহার কতকটা প্রিমিয়ম আপনারাই দিয়াছেন, তবে ৩ মাসের পরে ঐ সব পলিসি বাতিল হইলে কি হয়? তাহাতে অবশ্য কোম্পানীকে ডাক্তারের ফীস দিতে হয় এবং তাহা ত্রৈমাসিক প্রিমিয়মের টাকার প্রায় সমান হইতে পারে। কিন্তু এই যে টাকার কাজ ৩ মাসের পরেই বাতিল হইয়া যায়, তাহার উপর অর্থাৎ প্রত্যেক এজেণ্টের প্রেরিত ঐ ১০ বা ১৫ হাজার টাকার উপর কি জেনারেল ম্যানেজার উপরি হিসাবে শতকরা এক বা দেড় টাকা পাইয়া থাকেন? যদি তাহা হয়, তবে এই টাকাটা কি নিরবচ্ছিন্ন লোকশানই নহে?

এমন হয় কিনা, তাহাই আমরা জানিতে চাহি। কিন্তু ডিরেকটাররা যেরূপ অস্পষ্টভাবে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে কথার কুজ্ঝটিকায় সংবাদ ঢাকা পড়িয়াছে। আমরা উপরে যে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা সরলভাবে তাহার উত্তর দিবেন কি?

যে সময় 'উপাসনায়' হিন্দুস্থান সম্বন্ধে উদ্ধৃত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন সম্পাদক সাবিত্রীপ্রসন্ন লিখিয়াছিলেন :—

"অর্থনীতি, ব্যাঙ্কিং, ইনসুরেন্স, শিল্পবাণিজ্য বিভাগের সম্পাদনে সাহায্য করিতেছেন, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, এম-এ (কলিকাতা), পি-এইচ-ডি (লণ্ডন)"

মাণিক জোড়ই বটে!

অবিচার

শ্রীচিত্তরঞ্জন পাণ্ডা

দিনের সূর্য্য পশ্চিমাকাশে ফাগ্ ছড়িয়ে অদৃশ্য হোল। সাঁজের স্নিগ্ধ ছায়া পড়ল পৃথিবীর বুকের উপর। ধীরে ধীরে রাস্তার কোলাহল পথিকের চলাচল বন্ধ হোল। ধরণী কালো আঁচল খানা জড়িয়ে নিলে গায়ে ক্লান্তিতে। সকলেই এলিয়ে পড়লো নিদ্রার কোলে। অনিমেষের রুমমেট্ তপনও খানিকটা আগে শুয়েছে। নাসিকাধ্বনি তার গভীর প্রসুপ্তির পরিচয় দিচ্ছিল। অনিমেষের টেবিলের আলোটা তখনও জ্বলছিল। কতশত ভাবনা জড় হয়ে আসছিল। তার মাথার সামনে টেবিলে একটা ফটো। একজন তরুণী। মুখে প্রথম যৌবনের দীপ্তি-শান্ত কমনীয় মুখশ্রী। অনিমেষ নয়নে তাকিয়েও তৃপ্তি পাচ্ছেনা যেন। ফটোটাও যেন সজীব। তরুণীর ব্যাকুল নয়নের ব্যগ্র দৃষ্টি যেন তার উপর নিবদ্ধ। শান্ত করুণ চাহনি—অপ্রকাশ ব্যথায় ভরা। গভীর তৃপ্তিহীনতার সঙ্গে তাকে দেখলো। তারপর আর একটা গ্রুপ ফটো বার করলো। হোস্টেলে ছাত্রদের মাঝখানে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্। তার পাশে মেয়ে প্রতিমা দেবী। বাম পাশে অনিমেষ। ফটো তোলবার সময় অনবধানতা বশতঃ অথবা ফাজিল্ বাতাসের দুষ্টুমিতে প্রতিমার আঁচলের একপ্রান্ত উড়ে পড়েছিল অনিমেষের কোঁচার উপর।—আসন্ন শুভলগ্নের সূচনায় যেন। এই ফটোতে প্রতিমা উঠেছে আরও সুন্দররূপে, অনেকক্ষণধরে দেখলো। প্রতিমা! দেবী প্রতিম রূপ। বিধাতার অপূর্ব্ব অতুলন সৃষ্টি। প্রতিমাকে নিয়ে সে কত কল্পনার রঙীন তাজমহল গড়ে তুললো।

মা আর ছোটবোন রাগিনী অনিমেষের প্রতি পত্রে প্রতিমার কর্ম্মকুশলতা, শিক্ষা এবং বুদ্ধির প্রশংসার অজস্রতায় বুঝতে পারলো যে অনিমেষ প্রতিমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। তার রূপমুগ্ধ কত কিশোরী-তরুণী যুবতীর ফটো তার কাছে আস্‌ত, কিন্তু সবাইকে সে প্রত্যাখ্যান করেছিল। মা মনে করলেন এটাও একটা সাময়িক মোহ। সাময়িক একটা বাসনাকে প্রাধান্য দিয়ে তার স্বর্গগত পিতৃ পিতামহের অর্জ্জিত নাম, খ্যাতি খোয়াতে তিনি রাজী হলেন না। সব চেয়ে বেশী আপত্তি হোল—প্রতিমা আধুনিকা—প্রগতিবাদিনী। তার মা চির-কাল এদের ভয় করে চলতেন।

পরদিন। কি একটা কাজে অনিমেষের বাবা হঠাৎ তাদের হোষ্টেলে গিয়ে হাজির। অনিমেষের বন্ধু তপন বন্ধুপিতাকে মিষ্টি আলাপনে বচনে ও মধুর ব্যবহারে আপ্যায়িত করলো। রাত্রে অন্যান্য বিষয় আলোচনার পর অনিমেষের পিতা তপনের নিকট অনিমেষের বিয়ের কথা পাড়লেন। তপনও বন্ধুর অভিপ্রায়টী ব্যক্ত করবার সুযোগ খুঁজছিল। টেবিলের উপরের ফটো-খানা তাঁকে দেখাবার কৌতূহল সে কোন মতে দমন করলো—পাছে বন্ধুর বাবা অন্য রকম ভাবেন এই আশঙ্কায়। তপন তাঁকে প্রতিমার পরিচয় দিয়ে বল্লে—বন্ধু—একেই পছন্দ করেছে। প্রফেসারও অনিমেষকে পছন্দ করেন। তাঁর মেয়েকে অনিমেষের হাতে দিতে পারলেই খুসী হন!

অনিমেষের পিতা তপনের কথার উপর ভালোমন্দ কিছু বল্লেন না। পরদিন সকালে বাড়ী গেলেন। অনিমেষও ষ্টেশান্ পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়েছিল। তিনি যাবার সময় অনিমেষকে আশীর্ব্বাদ পর্য্যন্ত করতে ভুলে গিয়েছিলেন।

কিছুদিন পরে অনিমেষের পরীক্ষার ফল্ বা'র হলো। অনিমেষের স্থান সর্ব্বপ্রথম। এমনি মেধাবী ছেলের কৃতিত্বের কথা নিয়ে আলোচনা চলছিল প্রতিমাদের বাসায় চায়ের টেবিলে! পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রতিমা শুনছিল আর তন্ময় হয়ে তার ধ্যানের অপরূপ সমুজ্জ্বল ছবিটী নিরীক্ষণ করছিল। মাতা পিতার সঙ্কল্পের কথা তার কাণে গিয়েছিল অনেকদিন আগে। পিতার ডাকে তার তন্ময়তা ভেঙ্গে গেল। চোখ তুলে দেখলে—অনিমেষ এসে বসেছে, তাই চা নেবার জন্য ডাক পড়েছে। অনিমেষ তার সাফল্যের খবর নিয়ে এসেছিল তার শ্রদ্ধেয় প্রিয় অধ্যাপকের কাছে। তাঁকে দেখে মুহূর্ত্তের জন্য প্রতিমার ভাবান্তর ঘটল। আকস্মিক পীড়ায় গাল দুটী রক্তাভ হলো। পরক্ষণেই নিজেকে সম্বৃত করে চা নিয়ে এলো—পিতা অনিমেষকে ফেলে অন্দরে চলে গেলেন। প্রতিমা টেবিলের উপর পেয়েলাটী আর টোষ্টের প্লেট্টী রেখে মুখে ভদ্রতার হাসি এনে বললে—

তুমি তো পরীক্ষায় first হয়েছো অনিমেষ দা'। আমাদের খাওয়াতে হবে কিন্তু। সত্যি বলতে কি তোমার ও সফলতায় বড্ড খুসী হয়েছি।

—সেটা আর বেশী কি—নিজের দাদার মত মনে কর বলেই'ত...

—মার কাছে চিঠি দিয়েছ ত?

হ্যাঁ, বোন রাগিনীর কাছেও দিয়েছি।

—রাগিনী কে?

—আমার বোন।

—তার কথাতো আমি জানি না!

—কিন্তু সে তোমায় জানে।—

—দুষ্টু তুমি। আমি জানি না অথচ তিনি আমার কথা জানেন।—এ তোমার ভা—রী—অন্যায়।

—অন্যায় নয়। কিছুমাত্র অন্যায় নয়। তোমায় যে আমি আমার জীবন থেকে বাদ দিতে পারিনা।—তাই…

নিজের এই উক্তিতে নিজেই চমকে উঠল। অসাবধানতায় অন্তরের গোপন কথাটী প্রকাশ হয়ে পড়লো। প্রতিমাও চঞ্চলতা অনুভব করলে। অনিমেষ সেদিনের জন্য বিদায় নিলে। সারা রাস্তায় নিজের এই দুর্ব্বলতার জন্যে নিজকে ধিকার দিতে দিতে চলল।

এর কয়েকদিন পরে কল্পনা, স্বপ্ন, সত্যের রূপ নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হল। যদিও এর জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। পিতার চিঠিতে জানতে পারলে যে তারই অধ্যাপক বনবিহারী বাবুর মেয়ে প্রতিমার সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। আনন্দের আতিশয্যে সে প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারলে না। তারই মানসসুন্দরী কল্পনা-রাণী হবে তারই জীবন-সঙ্গিনী!…

হেমন্ত কাল। পাখীর কণ্ঠে মধুর গান। কাননে ফুলের হাসি। বাতাসে ভেসে আসে দূরের বাঁশীর সুর। নদীর বুকে আনন্দের স্পন্দন। আকাশে অমৃত তারকার দীপালি। ধরণীর বুকে কার পূজার আয়োজন। এমনি আনন্দের দিনে শানায়ের সুরও মঙ্গল শাঁথে মঙ্গল ধ্বনির সঙ্গে প্রতিমা বরণ সাজে এলো তার হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হোতে।

পাড়াগাঁ। প্রকৃতির ষ্টুডিও বাঁশবন। পদ্মপুকুর। কাজলদিঘি। সবুজ-ক্ষেত। চারিদিকে ভিজেমাটীর সিউলি ফুলের গন্ধ অযত্নের মধ্যে পল্লীরাণীর স্বভাব সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে বিলাসিনী নগরীর কৃত্রিম সৌন্দর্য্যকে তুচ্ছ কোরে। প্রতিমার বেশ ভালই লাগলো। মধুযামিনী উদযাপন করে অনিমেষ কোলকাতায় চলে গেছে।

কিন্তু কয়দিন যেতে না যেতেই সে দেখলো তার চারিদিকে গম্ভীর থমথমে ভাব। ছেলেমেয়েরা তাঁর কাছে ঘেসে না। সকলে তাকে এড়িয়ে চলতে চায়—যেন কিসের ভয়ে। দয়াদরদের অভাব স্পষ্ট দেখতে পেলো। মা'ও তাকে তেমন শুধান্ না। কেন এরকম হলো? সে কিছু বুঝতে পারলে না। বুঝবেই বা কিরূপে? সাংসারিকতায় অনভ্যস্তা—সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। পর্ব্বত প্রমান লজ্জা—সীমাহীন সঙ্কোচ। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে না। সকালে ঠাকুরঝি রাগিণী তার টেবিলের উপর কি রেখে চলে যাচ্ছিল—প্রতিমা তার হাত ধরে টেনে নিজ বিছানায় বসালে। কি বলবে তাকে? —যে দুঃসহ ব্যথা বুকের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়েছে—কিসে তার প্রকাশ দেবে। তার অন্তর মরুভূমির দিগন্ত প্রসারিত বালুকা রাশির মতো জলছে অহঃরহ—স্নেহ বারিবর্ষনের অভাবে। শান্ত সজল দৃষ্টিতে ঠাকুরজির পানে চেয়ে বললে—

—কোথায় যাচ্ছ?

—চা' আনতে।

—কেন?

—আবার কেন কি? তুমি খাও না?

…একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রতিমা বললে—হাঁ……কিন্তু তোমরা ত কেউ খাও না—আমার জন্যে এতটা কষ্ট নাইবা করলে।

—আচ্ছা, মাকে বোলব। এই ব'লে রাগিণী চলে যাচ্ছিলো। পেছন থেকে প্রতিমা ডাকলে…

—ঠাকুরঝি?…

রাগিণীর কাছে তার করুণ উচ্ছ্বসিত ডাক বুকভাঙ্গা ক্রন্দনের সুরের মত বাজলো। কিন্তু চলে গেল—উপেক্ষা করে।

দাসী এসে পর্দ্দার কাছে দাঁড়িয়ে—কাপড় সাবান তোয়ালে হাতে নিয়ে—নির্ব্বাক পুতুলের মত। প্রতিমা দেখতে পেয়ে ডাকলে।

—কিরে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে?

—চান্ করবার সময় হয়েছে।

—তা' বলতে পারছিস্ না। ঝি কোন উত্তর দিলে না। প্রতিমা এবার অপেক্ষাকৃত কোমল সুরে ঝির হাতটা ধরে বললে:

—ঝি, এবাড়ীর আমি কি কেউ নয়?

ঝি একবার চারিদিক চেয়ে চুপি চুপি বললে,…ঠাকরুণ বলেন, আপনি বড় ঘরের মেয়ে—তাই দেমাক হয়েছে। আপনি নাকি তাদের ঘেন্না করেন। বরণ করবার দিন হেঁটে এসেছিলেন। তাদের কোলে ক'রে আনতে আপনি ঘৃণা মনে করেছিলেন।

—আর কোন কিছু?

—কাল থেকে নাকি আবার চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। এরা ভাল চা বানাতে পারে না বলে। এখানের কিছুই নাকি আপনার ভাল লাগে না।……

অপরিসীম বেদনা ও অভিমানে প্রতিমার বুকটা দুলে উঠল। উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাসটা চেপে বল্‌লো।

—যা তুই, কাল থেকে আমার কাজ আর কাউকে করতে হবে না। ঝি কিছু না বলে চলে গেল।

দিনরাত এত বড় শাস্তির বোঝা কি ক'রে বইবে। অসহনীয় অসীম বেদনায় সময় সময় চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করে—অথচ কাঁদতে পারে না। কি একটা অস্পষ্ট বেদনা বুকে পিঠে খচ্ খচ্ করে। তার মনপ্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে চারিদিকের বিদ্রোহে। সে কি সত্যই অপরাধিনী? সে দেখে তার চারিদিকে সুন্দর। মন তার দয়াদরদে সহানুভূতিতে

ভরা। বাড়ীর কুকুর বিড়ালগুলিকেও তার ভাল লাগে। তবে তারা ভুল বুঝেছে কি? নারীর সহজ প্রকৃতি বদলায় না পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে। সে তাদের ঘরের একটা আস্‌বাবের মতো। শোভা সম্পাদনের জন্য। কোন কাজে অধিকার নেই। —সে কি করে বাঁচবে।

পিয়ন চিঠি দিয়ে গেছে। রঙীন খাম। অনিমেষ লিখেছে প্রতিমা তার জীবনের সন্ধ্যাতারা মঙ্গলগ্রহ। অনিমেষ ধরণীর মাটি আর প্রতিমা হচ্ছে পূর্ণিমার চাঁদ। অনিমেষ তপন্তের স্নিগ্ধ মলয় আর প্রতিমা কাননের যুঁই ফুল। সুন্দর সমাবেশ। প্রণয় লিপিকা—। বার বার করে পড়ে প্রাণে শান্তি পেলো খানিকটা।

পরদিন। সকালে উঠে মার কাজ করতে গেল। মা বারণ করলেন রাগিণীকে দিয়ে। রাগিণী গিয়ে বললে—

—বৌদি আপনি যান্—। দাদা শেষে জানতে পারলে আমাদের বোক্‌বেন।

—না ঠাকুরঝি, মায়ের পুজোর ভাগ আমাকেও দিস। পুণ্যের ভাগ একা নিবি কেন ভাই?

মা উল্টো বুঝলেন। তাই রাগিণীর দিকে চেয়ে বললেন—আমরা এখনও খৃষ্টানি হয়নি রাগিণী। পুজো-পার্ব্বণে পুণ্যি হয় কিনা আমরা জানি না। আমরা মুর্খ, তবে এ বিদ্রূপ আমরা বুঝি। নেহাৎ বাঙ্গাল নয় আমরা।

প্রতিমা হতভম্ব হয়ে গেলো। সরলতার এমনি বিষময় ফল হবে তা' তার ধারণা ছিল না। ভার-হৃদয় নিয়ে চলে গেলো নিজের ঘরে। বিছানায় শুয়ে নিরব অশ্রুপাতে শয্যাতল সিক্ত করলো। কিছুদিন পরে হঠাৎ মাকে ধরলো কাল-রোগে। প্রায় সময় সংজ্ঞা থাকে না। প্রতিমা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে প্রাণপন সেবা করতে লাগল। এত কোরেও রোগের উপশম হোল না। প্রতিমা চোখে মুখে আঁধার দেখে অনিমেষকে তার করলো মায়ের যখন চেতনা হয় তখন প্রতিমাকে তার পাশে দেখে বিরক্তিতে ললাটের শিরগুলি কুঞ্চিত হত। এ যে তার গরবিনী পুত্রবধূ। তার সমস্ত আশা-ভরসা সাধ যে মাটী করে দিয়েছে। সুখী হতে পারল না এমন বউ নিয়ে। কিছু দরকার হলে রাগিণীকে ডাকত। —যেন বউ অস্পৃশ্যা—কলুষিতা—মূর্ত্তিমতী পাপ। ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় সব সময় মুখ ফিরায়ে থাকত পাছে বধূর পাপ মুখ দেখে ফেলেন। প্রতিমার বুকে বড় বাজত। গুমরে গুমরে কাঁদত—রুদ্ধ বেদনা বুকের মাঝে। সে দিন হঠাৎ রোগ বেড়ে গেল। প্রতিমার সমস্ত বেদনা অভিমান অশ্রুর বন্যারূপে বার হয়ে মার বুক প্লাবিত করলো। মায়ের বুকে মুখ গুজে কাঁদতে কাঁদতে বলল—মা—ও মা, আমি বড় দুঃখিনী আমাকে ক্ষমা কর মা। মা'র কানে এ করুণ আর্ত্তনাদ, কাতর মিনতি পৌঁছাল কিনা সে জানি না। সজল চোখ দুটী তুলে দেখল মায়ের বুকের স্পন্দন নেই। নিস্পলক দৃষ্টিতে রাগিণীর মুখের দিকে চেয়ে আছে।

অনিমেষ বাড়ী এসে অশ্রুজলে মা'র স্মৃতিতর্পণ করলো। তারপরে যথাশাস্ত্রে পারলৌকিক অনুষ্ঠান শেষ করা হোল। অনিমেষ কয়দিন পরে মায়ের শোক ভুলিল প্রতিমার সীমাহীন ভালবাসায়। কিন্তু স্বামীর অজস্র ভালবাসার নীড়ের মধ্যে থেকেও প্রতিমা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তার মনে অতীতের সেই অবিচার কাহিনী ভেসে ওঠত। —বিচার নেই—বিনা অপরাধে—বিনা বিচারে সে নীরবে শাস্তি সহ্য করেছে। সে কল্পনা নয়নে দেখে—কি ভীষণ দিনগুলো। তার চোখ দুটো অশ্রু সজল হয়। বিদ্রোহী বুকের রক্ত উষ্ণ ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে।

চলতি পথে

শ্রীমল্লিনাথ

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

গত পূর্ব্ব দুই সপ্তাহে আমরা কর্পোরেশনের কয়েকজন কাউন্সিলারের কর্পোরেশনে প্রায় গত তিন বৎসরের কাজের সমালোচনা করিয়া তাহাদের স্বরূপ কলিকাতার করদাতাগণের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছি। যে কয়জন স্বার্থান্বেষীর স্বরূপ কলিকাতার করদাতাগণের সম্মুখে আমরা ধরিয়াছি, আমরা মনে করি আগামী নির্ব্বাচনে যাহাতে তাহারা কোন উপায়েই কর্পোরেশনে না প্রবেশ করিতে পারে, তাহার জন্য এখন হইতে পল্লীতে পল্লীতে প্রচার কার্য্য আরম্ভ হওয়া উচিৎ। কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীর তরুণ কর্ম্মীবৃন্দের দৃষ্টি এ বিষয়ে আমরা আকর্ষণ করি।

* * *

২১নং পল্লীর প্রতিনিধি ডাঃ সুবোধচন্দ্র ঘোষ গত তিন বৎসর যাবৎ কর্পোরেশনে বিরাজমান আছেন। তিনি যে আছেন, একথা যিনি কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণের নামের মুদ্রিত তালিকা না দেখিয়াছেন তিনি জানিতে পারিবেন না। গত তিন বৎসরের মধ্যে আমরা কদাচিৎ তাঁহাকে কর্পোরেশনে মুখ খুলিতে দেখিয়াছি। অবশ্য অস্বীকার করি না, যে তিনি একজন একনিষ্ঠ উপদল প্রেম-মুগ্ধ। সেই জন্য তাঁহাকে কয়েকটী উপদল ঘটিত ভোটাভুটি ব্যাপারে রুগ্নাবস্থায়ও কর্পোরেশনে আসিতে দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি শুধু ঐ জন্যই ২১নং পল্লীর করদাতাগণ সমীপে করজোড়ে ভোট ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন? ২১নং পল্লীর পূর্ব্বতন কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় যতদিন কর্পোরেশনে ঐ পল্লীর প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার কর্ম্মকুশলতার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। অমৃতবাবু আগামী নির্ব্বাচনে প্রার্থী হইবেন কিনা, তাহা আমরা সবিশেষ পরিজ্ঞাত নহি। কিন্তু তিনি প্রার্থী হউন বা না হউন, ডাঃ ঘোষের ন্যায় অমনোযোগী ব্যক্তির কর্পোরেশনে না যাওয়াই বিধেয়। ২১নং ওয়ার্ডের হিন্দু-মুসলমান করদাতাগণ এ বিষয়ে চিন্তা করুন।

* * *

কিছুদিন পূর্ব্বে কর্পোরেশনের কমিটি নিয়োগ সভায় ভোট দেওয়া সম্পর্কে আমরা কাশীপুরের কুমার বিশ্বনাথ রায়কে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটী অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমরা জানিতে পারিলাম তাহাতে কুমার সাহেব মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন এবং ঐ ব্যাপারে তাঁহার মুখপত্র "স্বদেশ" পত্রিকাও দুঃখ করিয়াছেন। "স্বদেশ" পত্রিকায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, যেহেতু কুমার সাহেব কর্পোরেশনে একটী দলের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহাকে ন্যায় বা অন্যায় হউক, দলের অনুজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। কুমার সাহেব যদি বলেন তাঁহার বিবেকবুদ্ধি বলিয়া কোন কিছু নাই, তাহা হইলে অবশ্য আমাদেরও বলিবার কিছু নাই। কিন্তু যদি তিনি নিজেকে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন একজন শিক্ষিত আদর্শবাদী তরুণ বলিয়া দাবী করেন, তবে তাঁহাকে যদি বলা হয় যে জীবনে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটে, বিশেষতঃ রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে, যাহাতে উপদলীয় শৃঙ্খলার কোন ওজুহাত থাটে না, তাহা হইলে আশা করি তিনি সেই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিবেন। কুমার সাহেব নলিনী সরকার সম্বন্ধে যে অভিমত পোষণ করেন বলিয়া শুনিয়াছি তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে দলগত স্বার্থের জন্য আর যাহাই করুন না কেন, তিনি কখনও অন্ততঃ নলিনীর সম্মিলিত উপদলে গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের সহিত হাত মিলাইয়া ভোট দিবেন না। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, তিনি আমাদের নিরাশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, তাঁহার উচিৎ ছিল ঐ ব্যাপারে তাঁহার দল ছাড়িয়াই কার্য্য করা এবং যদি প্রয়োজন হইত, তবে কর্পোরেশনের কাউন্সিলারের পদত্যাগ করা। তিনি যদি অন্ধভাবে (আমরা স্বীকার করি নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে) নলিনীকে সমর্থন না করিয়া, কর্পোরেশনের আসন পরিত্যাগ করিতেন এবং ঐ ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া পুনঃ নির্ব্বাচন প্রার্থী হইতেন, আমরা নিশ্চয়ই জানি, তিনি গত সাধারণ নির্ব্বাচন অপেক্ষা অধিকতর ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই।

কুমার সাহেব আমাদের বিশেষ প্রীতিভাজন বন্ধুবর। বন্ধুজনের বিবেক-বিরুদ্ধ কার্য্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করিতে আমরাও যে ব্যথা পাই নাই, তাহা নহে।

অমরেশ ও মীনা

নাটক

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র
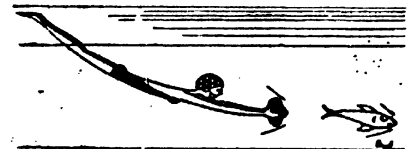
(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা—হ্যাঁরে মীনা, প্রকাশের কি হ'য়েছে রে ?

মীনা—তোকে কে ব'ললে শুনি ?

সুরমা—আব্দুল।

মীনা—কি বললে আব্দুল ?

সুরমা—ব'ললে—মেমসাবকো বহুৎ গোসা হুয়া থা—প্রকাশ বাবুকা ভি। মেমসাব প্রকাশ বাবুকা ভাগানে মাঙ্গতা রাহা মালুম হুয়া—ছাই হিন্দুস্থানী আমার মুখ দিয়ে আবার ভালো বেরোয় না। তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি কি হ'ল শুনি ?

মীনা—হয়নি কিছুই।

সুরমা—নিশ্চয়ই হ'য়েছে। আমায় বল্‌বিনি—তাই বল। প্রকাশ দেখলুম ঝড়ের মতোন বেরিয়ে গেল। ওর গাড়ী খানা দাঁড়িয়েছিল, তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠ্‌তে গিয়ে মাথাটা এমন ঠুকে গেল যে বেচারা 'পা' দানিতেই ব'সে পড়ল।—বোধ হয় কেটেকুটেও গেছে !

মীনা—তা হ'লে ডাক্তারকে ফোন্ ক'রে দে ওঁকে গিয়ে দেখে আসুগ

সুরমা—আমার তো তার জন্যে ঘুম হচ্ছে না। তুই বরং গাড়ী খানা বার ক'রে নিয়ে তাকে একটু attend ক'রে আয় জ'মবে ভালো অসুখ অবস্থায়।

মীনা—আমি যেন তাই কর্ত্তে না পেরে ম'রে যাচ্ছি।

সুরমা—তা যাচ্চ কিনা অন্তর্য্যামী জানেন, আমরা আর কি ব'লবো বল। কিন্তু ব্যাপার কি ? প্রেম কি চ'টে গেল ?

মীনা—তোর বুঝি ধারণা আমি প্রকাশের প্রেমে একেবারে···?

সুরমা—আমার ধারণা শুধু ? জানেনা কে ? অমরেশ জানে, চৌধুরী জানে, আমি জানি—এমন কি ঐ আব্দুলও জানে।

মীনা—জেনে শুনে তোরা তো বেশ্ চুপ ক'রে ব'সে আসিছ।

সুরমা—কব্ব কি 'তা বল ? 'স্বামী স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি'—এ উপদেশ তো তোকে দেওয়া চ'লবে না। বন্ধুবান্ধব ডেকে পরামর্শ করাও চ'লবে না, বা সেকেলে পল্লী-গ্রামের মত মাথা নেড়া ক'রে, ঘোল ঢেলে গ্রামের বার ক'রে দেওয়াও চ'লবে না।—কি কর্ব্ব তা' বল্ ?

মীনা—তা কর্ত্তে পারলে তাই কর্ত্তিস্, —না ?

সুরমা—তা যদি পারতুম, তা হ'লে আর তুই স্বামীর ঘরে ব'সে বুক ফুলিয়ে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে প্রেম কর্ত্তে সাহস করতিস্ ।

মীনা—ধন্যবাদ যে—সে বর্ব্বর প্রথা দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে!—কিন্তু ভাই ঠাকুরঝি-মণি, রাগ্ করিসনি, আমি তোর দাদাকেই ভালোবাসি, প্রকাশকে নয়।

(বলিতে বলিতে সহসা উত্তেজিত হইয়া)

না, না! প্রকাশকে কিছুতেই নয়। সে আমার কেউ নয়, সে আমার শত্রু! সে আজ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে, দেখিস্ আর যেন সে বাড়ীতে ঢুকতে না পায়।

(এই বলিয়া সুরমার হাত চাপিয়া ধরিল

এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল)

সুরমা—দেখ্—দাদা বোধ হয় টেলি-ফোন কর্চ্ছে।

মীনা—নিশ্চয়ই তিনি—অনেকক্ষণ বেরিয়েছেন, তাই বোধ হয়—

(এই বলিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত টেলিফোন ধরিয়াই ডাকিলেন। "হ্যালো……"

মুখে তাঁর ছিল আনন্দের হাসি; সহসা হাসি অন্তর্হিত, বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন।)

"না, না—এ কে! এ যে প্রকাশ!

(টেলিফোন্ দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন।)

সুরমা—প্রকাশ! আমায় ফোনটা দে, আমি জবাব দিয়ে দিচ্ছি।

মীনা—থাক্, আমিই দেখছি।

(এই বলিয়া টেলিফোন্ তুলিয়া লইলেন পুনরায়ঃ একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া সুরমার উদ্দেশে বলিলেন)

"দেখিনা কি বলে!—"

(সুরমা কোন জবাব দিলে না, কিন্তু ফোনে কথোপকথন সুরু হইয়া গেল)

"হ্যালো"—

"হ্যা—আমি"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমিই মীনা"—

(টেলিফোন কাণে লাগাইয়া মীনা কথা শুনিয়া যাইতে লাগিলেন, ক্ষণে ক্ষণে তাহার চোখের ভাবান্তর লক্ষিত হইতে লাগিল। সুরমা গম্ভীর হইয়া উঠিলেন।—কথা শেষ হইল, মীনা ধীরে ধীরে রিসিভারটি হুকের উপর রাখিয়া দিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, ক্ষণকাল পরে বলিলেন)

মীনা—প্রকাশের অসুখ। মাথা কেটে গেছে, ভয়ানক bleeding হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও উঠেছে। আমায় দেখবার জন্যে একেবারে—

সুরমা—বুঝতে পেরেছি। চলে এসো।

মীনা—কিন্তু যাওয়া কি উচিৎ?

সুরমা—না।

মীনা—আমারও তাই মত। কিন্তু—

সুরমা—কিন্তু গেলে ক্ষতি কি, এইতো ব'লবে?

মীনা—না, তা নয়। তবে অসুখটা Serious। শেষে একটা কথা না দাঁড়িয়ে যায়। সত্যিই যদি—

সুরমা—তবে গাড়ী বার কর্ত্তে ব'লে দাও,

যেতেই যদি হবে ! আমায় অমন ক'রে মিনতি ক'রে বলবার দরকার কি ? আমি তো বলেইছিলুম !

মীনা—আধ ঘণ্টার ভেতর ঘুরে আস্‌বো ঠিক্। আব্দুল—?

সুরমা—কিন্তু দাদা এ'সে প'ড়ল।

(অমরেশের প্রবেশ)

অমরেশ—মীনা, এইবার তোমার গান শুন্‌বো।

সুরমা—কিন্তু অতো ফুল কি হবে ?

অমরেশ—তোদের জন্য এনেছি।

সুরমা—গান্ কিন্তু হবেনা।

অমরেশ—কেন ? মীনা ?

মীনা—প্রকাশ টেলিফোন ক'রেছিল আমায় একবার ওর কা'ছে যাবার জন্য...

অমরেশ—কেন ?

মীনা—ওর মাথা কেটে গেছে গাড়ীর দরজায় ধাক্কা লেগে : খুব bleeding হচ্ছে, জ্বরও হ'য়েছে। তাই ডাক্‌ছিল।

অমরেশ—ও ! তবে আর কি ক'রে তোমার গান শোনা হবে !

(স্তব্ধ হইয়া রহিল অন্যমনস্ক ভাবে)

মীনা—তুমি কি বল ? যাবো তার কাছে ?

অমরেশ—(যেন চমকিয়া উঠিল মীনার কথায়) নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই যাবে। তুমি আমার কাছে আবার অনুমতি চাইছো নাকি ?

(মীনা নিরুত্তর)

ছিঃ মীনা ! তুমি নিজেকে এ রকম ক'রে ছোট কর এ আমি একেবারেই অনুমোদন করি না।

মীনা—কিন্তু তুমি যে গান্ শুনবে ব'লেছিলে ?

অমরেশ—সে আমি গ্রামোফোনে শুনে নোব'খন। কিংবা সুরো গাইবে। কিন্তু তুমি আর বিলম্ব ক'রোনা, তৈরী হ'য়ে নাওগে।

(মীনার প্রস্থান :)

(সুরমা ও অমরেশ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া ম্লান মুখে বসিয়া রহিল, পরে সুরমা কথা কহিল)

সুরমা—গান তো আমার কাছে শুনবে, কিন্তু ফুল গু'লোর বোধহয় অমর্য্যাদা হ'ল,—কি ব'ল দাদা ?

অমরেশ—ফুলের কখনও অমর্য্যাদা হয় বোন ? সংসারে এমন কেউ নেই, এমন কিছু থাক্‌তে পারে না যার থেকে ফুলের অমর্য্যাদা হ'তে পারে !

সুরমা—কিন্তু ভালোবাসার যে বস্তু বা যে মনটি তুমি ফুল দিয়ে স্মরণীয় ক'রে রাখ্‌তে চাইলে, সে চাওয়ার মর্ম্ম যদি ওরা না বুঝতে পারে, তবে ফুলের কি মর্য্যাদা গেল না ?

অমরেশ—বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তাতে ফুলের গৌরব অম্লানই রইলো ! মর্য্যাদা যদি কারুর গেল' ব'লতে চাও, তা হ'লে তারই গেল যে সে দানের মর্ম্ম বুঝতে না পারে !

(এই বলিয়া অমরেশ হাসিতে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই বলিল :)

কিন্তু সে থাক্, তুই বরং আমায় একখানা গান্ শুনিয়ে দে। সে থাক্ ! (সুরমা পিয়ানোয় বসিয়া গান ধরিল)

(গান)

(খাম্বাজ মিশ্র)

যদি ব্যথার কাঁটা সইতে হবে
কোমল কেন কর' প্রাণ,
যদি স'বি আমার কেড়ে নেবে
কেন করেছিলে দান !
মোর বাগানে যত তরু
যদি শুখায়ে করিবে মরু,
তবে কেন হৃদয় আমার
করনি পাষাণ !
যদি আমার আলোক ভুবন
আঁধারেতে ক'রবে মগন,
তবে কেন আলোর ধারায়
ভাসালে নয়ান !
আমার যত ভুলের কথা
না বুঝিলে মরম ব্যথা,
তবে কেন পরাণ ভরে
দিলে অভিমান !

(সুরমা গান গাহিয়া চলিলেন। অমরেশ চোখ্ বুজিয়া শুনিতে লাগিল : ক্ষণকাল পরে সে চাহিয়া দেখিল, মনে হইল অভিমানের ব্যথায় তাহার বুক্ ভরিয়া উঠিয়াছে। সহসা সে উঠিয়া দাঁড়াইল—অন্তরের প্রবল উচ্ছ্বাস ইহাতে হয়তো কিছু

প্রশমিত হইবে এই ভাবিয়া; ইতিমধ্যে সুরমার গান শেষ হইল, কিন্তু তাহারা স্তব্ধ হইয়া রহিল—তরঙ্গায়িত সুরধ্বনির মধ্যে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া। অল্প পরে অমরেশ একটি মালা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে সুরমার গলায় পরাইয়া দিল। ব্যাকুল কণ্ঠে সুরমা বলিয়া উঠিল)

সুরমা—একি ক'রলে দাদা! কা'র মালা তুমি কা'কে দিলে?

অমরেশ—কথা ক'সনে। আমার দেবার ইচ্ছে হ'য়েছে আমি দিয়েছি। আমার বোনের গলাটি যদি একটি মালা দিয়ে আমি সাজিয়ে দি, কাজটা অশাস্ত্রীয় হবে তুই ভাবিস্?

সুরমা—না, তা হবে না, তা ভাবিনা। কিন্তু—একি! তুমি কাঁদচ?

অমরেশ—আরে দূর......

সুরমা—হ্যাঁ কাঁদচো।

অমরেশ—নারে, না না!......

সুরমা—দেখি, আমার দিকে ফেরোত'?

অমরেশ—ওরে বাপ্‌রে, এ মেয়েটা বড়ো জ্বালালে......

(বলিতে বলিতে অশ্রুর বন্যা তাহার দুই চোখে ছাপাইয়া উঠিল, কিন্তু সে মুখ ফিরাইয়াই দাঁড়াইয়া রহিল; সুরমা নির্ব্বাক, নিস্পন্দ :)

শেষ ক'রে দেওয়া গান খানির সুর যেন এখনও ভাসিয়া আসে ধীরে—নামিয়া আসে যবনিকা।

(ক্রমশঃ)

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শ

সত্যবাদী

কড়েয়ার কবরস্থানের সহযোগী 'নবশক্তি' নলিনীর সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সভাপতিপদে বৃত থাকা সম্বন্ধে তাহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"চেম্বারের বর্ত্তমান সভাপতি গত দুই বৎসর যাবৎই (?) সভাপতির পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এই বৎসরও তিনি যে এই পদ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন তাহার ইঙ্গিত বর্ত্তমান বৎসরে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া যে বক্তৃতা দেওয়া হয় তাহা হইতেই সুস্পষ্ট বোঝা (বুঝা?) যায় এবং বর্ত্তমান সমিতির অমত সত্যেও (সত্ত্বেও?) কমিটীর সভ্যগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহাকে (তাঁহাকে?) চেম্বারের সভাপতি পদে বৃত করেন। ১৯৩৫ সালেও সভাপতির আপত্তি সত্ত্বেও সকলের অনুরোধে তিনিই বিনা-বিরোধে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হ'ন।"

"সত্ত্বেও" যে ভাবে একবার "সত্যেও" এবং আর একবার "সত্ত্বেও" হইয়াছে তাহাতে সহযোগীর সম্বন্ধে বলিতে হয়—

"অনেক জন্তু বোঝা বয়—ধরা পড়েছে গাধা।"

ধন্যবাদ বক্তৃতাটি যে সভাপতি টাইপ করাইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী দিয়া আসিতেছেন, তাহাও যেমন আমরা জানি—তাহা কাহার ইঙ্গিতে রচিত তাহাও তেমনই আমাদের অবিদিত নাই। ধীরেন্দ্র সেনের পচা উক্তির কারণ যে আমরা জানি না, তাহা নহে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—**মিথ্যা কি কখন সত্য হইতে পারে? প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী কি ভদ্র-সমাজে স্থান পাইবার উপযুক্ত?**

নলিনী সরকার যে শিশু নহে, তাহা নীণার মামলায় প্রতিপন্ন হইয়াছে—সে কি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার প্রয়োজন বুঝে না? আমরা জানি মিথ্যার প্রকার ভেদ নাই। ইংরাজ মিথ্যাকে দুই প্রকার বলেন—Black and White; নলিনী কি Brown lie সৃষ্টি করিবে?

সহযোগী লিখিয়াছেন—

"এই প্রসঙ্গে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে চেম্বারের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার কৃতিত্ব অনেকটা নলিনী বাবুর।" অবস্থার উন্নতির পরিচয়—

(১) পোর্টট্রাষ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার সঙ্কুচিত হইয়াছে।

(২) চেম্বার যেরূপ ঋণগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহার অস্তিত্ব বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা। ইত্যাদি

নলিনী জানিত, যে **চেম্বারের উন্নতি সাধন ত পরের কথা** চেম্বারের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেও পারে না। তাই সে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা হৃষীকেশ লাহাকে "in all sincerity" (তাহার আন্তরিকতায় কি রাজা সাহেবেরও সন্দেহ ছিল ?) লিখিয়াছিল—

"I adore you and strongly I am convinced that your connection with the Chamber is essential not only for the (?) progress but for its very continuance."

নলিনী অবশ্য তখন ভাবে নাই যে এই পত্রখানি প্রকাশ পাইবে।

অবশ্য রাজা সাহেব এখন মৃত—আর ব্যাঙ্কিং কমিটীর সভ্য হইবার জন্য তাঁহার নামে ভারত সরকারের অর্থসচিবের কাছে টেলিগ্রাম পাঠাইতে হইবে না। তাই সে তাহার ভক্তির পরিচয় দিয়াছে :—

(১) রাজা সাহেবের মৃত্যুর দিন বেলা ৪॥টার পর অর্থাৎ যথাকালেই চেম্বারের কার্য্যালয় বন্ধ করিয়া সংবাদপত্রে সংবাদ পাঠান হয়, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য চেম্বারের কার্য্যালয় বন্ধ হয়। ইহা যে ধৃষ্টতা তাহা কোন্ দণ্ডের উপযুক্ত ?

(২) রাজা সাহেবের স্মৃতিতর্পণের জন্য কলিকাতার শেরিফ কর্ত্তৃক যে সভা আহূত হয়, তাহাতে চেম্বারের সভাপতির (এমন কি প্রধান সদস্যদিগেরও) উপস্থিত থাকা প্রয়োজন মনে করে নাই। সে কি তখন দার্জ্জিলিংএ কোন শর্ম্মার লেজ ধরিয়া বৈতরণী পারের আয়োজনে ব্যস্ত ছিল ?

(৩) রাজা সাহেবের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের শেষ দিন কলিকাতায় উপস্থিত থাকিয়াও সে কি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া অপমানজনক বিবেচনা করিয়া তাহাতে বিরত ছিল ?

(৪) তাহার আগমনের দিন চেম্বারের সেক্রেটারী ও বীণার "মাষ্টার মশাই"ও অনুষ্ঠানে গরহাজির হইয়াছিল।

এই মৌলিক শ্রদ্ধাভিব্যক্তির তারিফ না করিয়া থাকা যায় না।

নলিনীর বোম্বাই-প্রীতি সুপরিচিত। কিন্তু এ বিষয়ে তাহার নীতি—to love in public and hate in private. সে শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র ঘোষকে লিখিত পত্রে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্শকে "foreign chamber" বলিতে দ্বিধানুভব করে নাই। আর রাজা সাহেবের কাছে আনুগত্য দেখাইয়া লিখিয়াছিল :—

"It was owing to my conviction of the importance of your connection with the chamber that I broke with the Bombay group."

ইংরাজী যতই অশুদ্ধ হউক না—কথাটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

বোম্বাইয়ের স্বার্থ যে বাঙ্গালার স্বার্থের বিরোধী রাজা সাহেব তাহা বুঝিয়া কাজ করিতেন এবং রাজা সাহেবের জন্যই নলিনী বোম্বাই ওয়ালাদের ত্যাগ করিয়াছিল।

কিন্তু সে চেম্বারে বক্তৃতায় প্রকাশ্যভাবে বোম্বাইয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে এবং—

(১) টাকার বাট্টামূল্য নির্দ্ধারণের সময় বোম্বাইয়ের ফটকাবাজরা বাঙ্গালায় তাহাকেই দালাল করিয়াছিল। সে বোম্বাইওয়ালাদের তরফে সাংবাদিকদিগকে তাহার গৃহে আলোচনা সভায় আহ্বান করিয়াছিল এবং আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে **অর্দ্ধসত্য বিলাসী** অর্থাৎ **মিথ্যাবাদী** বলিয়া বোম্বাইয়ের তুষ্টিসাধন করিতেও ত্রুটি করে নাই। তবে বোম্বাইওয়ালারা তাহাদিগের চেষ্টার ব্যর্থতায় বাঙ্গালায় নলিনীর প্রভাবের স্বরূপ বুঝিয়াছিলেন—বুঝিয়াছিলেন, শূন্য কুম্ভের মধ্যে দমকা হাওয়ার শব্দকে মেঘগর্জ্জন মনে করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

(২) শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি যখন বাঙ্গালায় কাপড়ের কলওয়ালাদিগের সঙ্ঘ স্থাপিত করিতে উদ্যোগী হন, তখন সে—বোম্বাইওয়ালাদিগের তরফে তাহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। আশা করি, চেম্বারের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য হইলেও শৈলেন্দ্র বাবু এবং 'অমৃতবাজারের' হইলেও মহীতোষ বাবু সে অভিজ্ঞতা ভুলেন নাই। তবে তদবধি সেই সঙ্ঘের যে আর কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না—তাহার কারণ হয়ত অনুসন্ধান করিতে হইবে।

চেম্বার নলিনীর আমলে আত্মরক্ষার্থ কিরূপ নিয়ে নামিয়াছে, তাহা সরকারের নিকট প্রেরিত পত্রে—**বঙ্গীয় মহাজন সভার সম্বন্ধে কটুক্তিতেই বুঝিতে পারা যায়।** ইহার পূর্ব্বে চেম্বারের পক্ষে কখন অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে হীন প্রতিপন্ন করিবার হীন চেষ্টার দ্বারা আপনার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। এখন মহাজন সভা যদি চেম্বারের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেন, তবে কেহই সে সভাকে দোষ দিতে পারিবেন না।

প্রতিশ্রুতিভঙ্গই যে চেম্বার হইতে ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের সম্বন্ধ ত্যাগের কারণ, তাহাও আমরা জানি।

যাহার সম্বন্ধে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের মত আমরা ইহার পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, সে যদি চেম্বারের সভাপতি হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়—তবে সে চেম্বারের সম্বন্ধে লোকের কিরূপ ধারণা হয়?

পুনর্যৌবন লাভের উপায়

ডাঃ কে, পি, ঘোষ, এম, বি

বাল্যের পর যৌবনে পা দিয়েই মানুষ তার জীবনের অটুট স্বাস্থ্য অভিজ্ঞতা, জ্ঞান নিয়েই চলতে থাকে জীবনের পথে, বীর বিক্রমে, শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেও। উদ্দেশ্য থাক্‌বে জীবনটাকে উপভোগ করবে সম্পূর্ণ ভাবে। কিন্তু দৈহিক শক্তির যদি অভাব ঘটে এ বয়সে, তবে তার মানসিক গতি পিছিয়ে পড়্‌বে নিশ্চয়ই। শরীর তার ক্রমশঃ হয়ে পড়্‌বে পঙ্গু। বুদ্ধিতে তার মরচে পড়বে। জীবনটা পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে শেষে এক ভীষণ নিরাশায়। জীবনের গতির সঙ্গে পারবে না চল্‌তে—পিছিয়ে পড়বেই সব পথে। শিথিল হয়ে পড়বে তার কর্ম্ম-শক্তি। এর চেয়ে কী ভীষণ পরিণাম হতে পারে এক যুবকের পক্ষে।

অধুনা হস্তক্ষেপ করেছেন অনেক পণ্ডিত প্রকৃতির উপর। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ভরোনফ্ বানর গ্রন্থি মানব দেহে সংযোগ করে দিয়ে যৌবন-হারা নর নারীকে বৃদ্ধকে চেষ্টা করছেন যৌবনের পথে ফিরিয়ে আনবার, জীবনী শক্তি বাড়াবার। কিন্তু আমাদের দেশের ক'জন পারে সে উপায় অবলম্বন করতে। অকাল বার্দ্ধক্যের দরুণ মানব যখন লুটিয়ে পড়ে ঝড়া শেফালীর মতন ম্লান হাসি হেসে, তখন দেহে এমন একটি শক্তির দরকার হ'য়ে পড়ে যার প্রভাবে তার আবার যৌবনের তাজা শক্তিশালী রক্তধারা শিরার মধ্যে সতেজে বইতে থাকে। একটা প্রবাদ আছে—সময় থাক্‌তে সাবধান হ'লে রক্ষা পাওয়া যায় অনেক দুঃখ কষ্টের হাত থেকে। এটা খুব খাটী সত্য কথা।

নীরোগ হবার জন্যে আলো, বাতাস, সূর্য্যকিরণ, খাদ্য, পরিশ্রম, বিশ্রাম প্রভৃতির দরকার তো আছেই, তা ছাড়া দরকার হয়ে পড়ে, এমন একটা ঔষধের যার অতীব সুন্দর ক্রিয়ায় সতেজ হয়ে উঠে দেহের মাংসকোষ স্নায়ু, রক্তকণাগুলি। শরীরের নব বল ফিরে আসে, জীবনীশক্তি দ্বিগুন বাড়িয়ে দেয়। এসব ফল পাওয়া যায় রচিটোন ব্যবহারে—এটা আমার অভিজ্ঞতার ফল। স্বভাবজাত ফল, উদ্ভিজ্জ ও ধাতব কয়েকটী মূল্যবান ও উপকারী উপাদান সংমিশ্রনে তৈরী রচিটোন-কার্য্যকারিতা গুণ পৃথিবীর মধ্যে যশঃ লাভ-করিয়াছে—পুনর্যৌবন লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে।

খোলা-চিঠি

শ্রীজহর গাঙ্গুলীকে

সুলাল,

'জহর' বলে যত লোক তোমায় জানে, তার চেয়ে—আমি মনে করি—তারা ঢের বেশী চেনে 'সুলাল'কে। অন্ততঃ, তাই বলে' আমি তো জানি। বন্ধু আনিয়াৎ খাঁ'র অনুরোধে এ সপ্তাহে আমি তোমায় এই চিঠি লিখ্‌তে বসেছি। যখন আনিয়াৎ খাঁকে জিজ্ঞেস করলুম—তুমি আমায় এ রকম অনুরোধ করছো কেন? সে বল্‌লে—সুলালকে তুমি চেনো, অতএব তুমিই লিখ্‌বে ভালো। বাস্তবিক, ভেবে অবাক হই, ও জান্‌লে কী করে' আমার সঙ্গে তোমার একদিন আলাপ হয়েছিলো!

তোমার মনে আছে সুলাল, গাঙ্গুলী মশাইয়ের আখ্‌ড়ায় সেই দিনটা? যেদিন 'তুলসীদাস'এর একটি দৃশ্যের জন্য রাণীবালা এক গাছের ধারে দাঁড়িয়ে একটা গান গাইছিলো, হাতে তার ফুলের ডালা। আর, এদিকে এক লোহার চেয়ারে বসে'—তুমি তুলসীদাস—মুখে পাউডার মাখ্‌ছিলে! এমন সময় হারু আমার হাত ধরে এসে উপস্থিত। সেই তো দিলে আলাপ করিয়ে। তোমার কথা শুনেই—কেন যেন—আমার মনে হ'লো, তুমি বেশ একটু ছ্যাব্‌লা।

সেদিনই, টলিউডের ট্রাম যখন ছাড়বার জন্যে 'ঘন্টি' মারলে, মুখে সিগারেট্‌, আমি বসে' বসে' ভাবছিলুম—এ ছ্যাবলা ছেলেটিকে তুলসীদাসের ঐ গম্ভীর পার্টে দেওয়া কেন? তুমি আজ ভেবে দ্যাখো, সুলাল, কত সত্যি কথা আমি সেদিন ভেবেছিলুম! 'রূপবাণী'র পর্দ্দায় গান গেয়ে উঠলো কালী ফিল্মস্‌-এর 'তুলসীদাস'। একবাক্যে সবাই স্বীকার করলে, ঐ গম্ভীর অংশে সুলালকে মোটেই মানায় নি।

জহর গাঙ্গুলী

আজ আমি আবার বল্‌ছি—আর কোনোদিন মানাবেও না। 'তুলসীদাস'এ তুমি ছিলে বেমানান। পর্দ্দার ওপর চোখ বুজে' ভাবুক ভাব নিয়ে তুমি যখন আড়ষ্ট ভাবে আনাগোনা করছিলে, আমার তখন হাসি পাচ্ছিলো।—একটি ছ্যাব্‌লা ছেলেকে অকারণ গম্ভীর সাজতে দেখ্‌লে যে রকম হাসি মানুষের পায়, সেই রকম হাসি।

যেটা গম্ভীর—ইংরিজিতে যাকে বলে 'সিরিয়াস্‌'—সে রকম অংশের মানানসই অভিনয়ের মানুষ তুমি নও। যেটা হাল্কা, মাঝে মাঝে হাসাতে যেটা পারে—ইংরিজিতে যাকে বলে 'সিরিয়ো কমিক'—সে রকম অংশ সুলাল, তোমার সাফল্যের জন্য।

উদাহরণ দেখতে চাও? চট্‌ করে' চলে' এসো 'রূপবাণী'তে। সেখানে তোমারই অভিনয় 'মানস'কে দ্যাখো, আগের চেয়ে অনেক উন্নত কিনা!

অতএব, ভবিষ্যতে ভারী অংশ তোমাকে নিতে যদি দেখি, তা হ'লে বাধ্য হ'য়ে আমায় তোমাকে তুলনা করতে হবে সেই বিশেষ জীবের সঙ্গে—যার কানদুটো ভারী বড়ো, আজীবন ভার 'বয়ে' যারা আসছে। কারণ, নিজের ভালো যে মানুষ সত্যি সত্যিই না বোঝে, তাকে ঐ বিশেষ জীবের মত কাপড়ের বোঝা না বইলেও—নিন্দের বোঝা বইতেই হয়। সেটা অবশ্যম্ভাবী, তুমি যে পুরুষ তার মত সত্যি।

মানস মোহনের অংশে রূপ দিয়ে তোমার জনপ্রিয়তা সাধারণের ভেতর খানিক জন্মলাভ করেছে—এটা বোধহয় তুমি জানো। সে জনপ্রিয়তার বয়েস এখনও ছোটো। কোনো বেমানান্‌ অংশ নিয়ে তাকে যদি এখন তুমি বিগড়ে দাও তা হ'লে তোমার ভবিষ্যতে শুক্লপক্ষ বলে' কোনো তিথি থাক্‌বে না। ঘোর কৃষ্ণপক্ষে যাবে ছেয়ে। সে অন্ধকারে আলো জ্বালতে কোন সখাই তখন আস্‌বে না। অতএব, সুলাল, সেই সন্ধ্যের আগে সাবধান!

আরেকটি জিনিষ তোমায় বল্‌বার আমার ইচ্ছে আছে। সেটা হচ্ছে—পুরুষের রূপ। পর্দ্দায়—তুমি বোধহয় জানো—রূপের প্রয়োজন—সে কী পুরুষ, কী নারীর! অবিশ্যি রূপ তোমার নেই, আছে স্বাভাবিক একটা শ্রী। সে শ্রীটাকে চিরকাল যুবক রাখতে চেষ্টা ক'রো। তোমার স্বাস্থ্যে এখন মোটা হ'য়ে যাবার একটা ধাত্‌ এসেছে, সেটাকে অবিলম্বে আট্‌কে ধরো। বাহুতে বজ্র এনে তাকে বাধা দাও। মোটা হবার রোগ তোমাকে ধরেছে, আয়নার সামনে গিয়ে দেখো—তোমার থুতনীর নীচে উঠছে আরেকটা থুতনী। তোমার যুবক-শ্রীতে এটা অস্বাভাবিক প্রৌঢ়ত্বের লক্ষণ। সুলাল, সময় নেই, যাও চট্‌পট্‌। পার্ক ষ্ট্রীটের কোনো বিউটি স্যালুনে ঐ 'ডবল্‌ চিন্‌' এর দিয়ে এসো বিসর্জ্জন। ইতি—

শুভাকাঙ্খী তোমাদের

সেলিম।

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

মনোরম সাধুখাঁ

জেম্‌স্‌ ডান্‌

জেম্‌স্‌ ডান-এর নাম আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন। পর পর স্যালি ইলীয়ার্স-এর সঙ্গে অভিনয় ক'রে ভদ্রলোকের নাম আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। জেমস্‌এর মতে মানুষের কাছে ভাগ্য ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু থাকতে পারে না। মানুষের আজ যে এতো নাম, কাল যে এত কুৎসা—সব কিছুরই জন্য দায়ী তার ভাগ্য।

ভাগ্য জিনিষটার ওপর জেম্‌স্‌ এতো বিশ্বাস করে তার কারণ—নেহাৎ কপালের জোরে সে আজ পর্য্যন্ত হলিউডের ক্যামেরার সামনে বেঁচে আছে।

চার বছর আগে মিঃ ডান্‌ পথে পথে ঘুরে বেড়াতো। হঠাৎ ফক্স ফিল্মের একটা ছবিতে ছোটো একটা অংশ অভিনয়ের জন্য সে এক কাজ পায়। তাড়াতাড়ি সে চলে আসে হলিউডে, কিন্তু কী জন্য জানি ঐ ছবিটির কাজ সাময়িক ভাবে বন্ধ থাকে। কাজেই জেমস্‌কে অত্যন্ত হতাশ হ'তে হয়।

কিন্তু, ধৈর্য্য ধরে সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

সেই সময় ফ্রাঙ্ক বরজেস্‌ 'ব্যাড গার্ল'-এর জন্য এক নায়ক খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। জেম্‌সকে দেখে তাঁর ভারী মনে ধরে গেলো। তিনি তাকে একরকম জোর করেই ঐ অংশটিতে অভিনয় করতে নিলেন।

ডান্‌ তো অবাক! কোনরকম অভিজ্ঞতা নেই, কিছু নেই একেবারে এক ছবিতে প্রধান নায়কের অংশে অভিনয়! অবাক হবারই কথা বটে।

কিন্তু, ভাগ্য তার প্রতি ছিলো সুপ্রসন্ন। 'ব্যাড গার্ল'-এ স্যালি ইলায়ার্স-এর সঙ্গে তার অভিনয় পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে উঠলো।

জেমস তাই বলে—"ভাগ্যের খেলা নয়? নিশ্চয়, ধরুন, যদি গোড়ায় যে ছবিটিতে আমার অভিনয় করবার কথা ছিলো, সেটা বন্ধ না হ'তো। তা'হলে ওটিতে অভিনয় করেই তো আমায় আবার অজানা দেশে ফিরে যেতে হতো। কারণ ও ছবিটিতে অভিনয় আমি পরে করলেও আমার কাজ হয়েছিলো অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

স্যালি ইলায়ারস্‌কে কিছুদিন পরে দেখা যাবে কলম্বিয়ার 'কার্ণিভাল'এ।

কিসের থেকে কী!

হলিউডের বাজারে হাজারে হাজারে অভিনেতা আর অভিনেত্রী। কিন্তু, তারা জীবন আরম্ভ করেছিলো কি দিয়ে, আর আজ তারা কী, তুলনা করতে হ'লে—করতে হয় আকাশে আর পাতালে। বেশীর ভাগই নরনারীর জীবন আরম্ভ হয়েছিলো যা দিয়ে তা অত্যন্ত হেয়, এবং অনেকের অত্যন্ত নীচু।

উইল্‌ রোজার্স—যার আজ এতো সন্মান, এতো প্রতিপত্তি—প্রথম জীবনে তার কাজ ছিলো গরু চরানো!

জেনেট্‌ গেনর এখন 'ফারমার টেক্‌স্‌ এ ওয়াইফ' এ অভিনয় করছে।

জেনেট গেনর যে এখন 'ফারমার টেক্‌স্‌ এ ওয়াইফ'এ অভিনয় করছে, সে এক কালে এক জুতোর দোকানে ছিলো কেরাণী। কিন্তু, লস অ্যান্‌জেলস্‌এ হঠাৎ তার বাপ মা চলে আসতে সে একবার ফিল্মে ঢোকবার চেষ্টা করলে। দুঃখের বিষয় প্রথমে কেউ তাকে নিতেই চাইলে না। অবশেষে হঠাৎ সে এক ডিরেক্টরের চোখে পড়ে গেলো। তার ফলে হ'লো 'সেভেন্থ হেভেন'—যাতে অভিনয় ক'রে জেনেট অ্যাকাডেমির প্রাইজ পেয়েছিলো।

ওয়ার্ণার বাক্সটার বীমা কোম্পানীর দালাল ছিলো।

জন বোলস্‌ তার বাবার সঙ্গে তুলো বেচতো।

গ্যারী কুপার প্রথমে বাসের ড্রাইভার ছিলো, পরে হয়েছিলো চিত্রকর।

গ্রেটা গার্বো যে ষ্টক্হলমে নাপিতের দোকানে কাজ করতো আজ তা কে না জানে?

মঊরিস্ শেভালিয়ে ছিলো কাঠের মিস্ত্রী।

আর, জর্জ্জ ব্যাঙ্কক্রফট্—একজন নাবিক।

হাত দেখে যারা

হাত দেখে যারা ভবিষ্যৎ বলে তাদের আপনারা হয়তো অবিশ্বাস করেন। কিন্তু, ফ্রান্সিস্ ডি করে না। ভবিষ্যৎ বক্তাদের প্রতি অগাধ তার বিশ্বাস! কেন সে এতো বিশ্বাস করে তার উপযুক্ত প্রমাণ আমি দিচ্ছি। একদিন ফ্রান্সিস্ তো এক জ্যোতিষীর বাড়ী গেলো। অনেক কথাই সে বললে। তার ভিতর একটি হচ্ছে—'আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—পোষাক পরা একটি লোক তোমার মোটরের কাছে দাঁড়িয়ে। এমন একটা কিছু হবে যাতে তোমার পয়সা লাগবে!'

ফ্রান্সিস্ যেতে যেতে ভাবলে—হয়তো তার ড্রাইভার শিগগীরই এক অ্যাকসিডেণ্ট করে বসবে। কিন্তু মোটরে উঠতে গিয়েই সে ভয়ানক অবাক! এক পুলিশ তার গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে। বেজায়গায় অনেকক্ষণ গাড়ী রাখা হয়েছে ব'লে তাকে জরিমানা দিতে হবে।

একরকম ব্যবসা

অসংখ্য রকমের অদ্ভুত চিঠি যে হলিউড বাসীরা পায় তা আপনারা জানেন। সম্প্রতি মে ওয়েষ্ট এক চিঠি পেয়েছে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে। যে তার স্ত্রীর সঙ্গে তার আর বনছে না। সে তাকে ছেড়ে আরেকজনকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু, স্ত্রীকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড না দেওয়া পর্য্যন্ত বেচারা কিছুতেই তাকে ছাড়তে পারছে না। মে কী দয়া করে' তাকে টাকা ক'টা দিয়ে দেবে?

মে দেয়নি। কারণ, খোঁজ নিয়ে জানা গেলো ঐ একই লোক আজ অনেকদিন হ'লো ঐ একই কথা বলে' অনেকের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছে!

বিয়ের ইতি?

কন্সট্যান্স্ বেনেট্এর চলতি স্বামী হচ্ছে মারকুইস্ ডি লা ফেলাইস্। ভদ্রলোক এক কালে পোলা নেগ্রী, গ্লোরিয়া সোয়ানসন প্রভৃতির স্বামী ছিলেন। এখন মনে হচ্ছে কন্সট্যান্স্কেও আবার তাঁকে ছাড়তে হবে।

ট্রোকাডেরো কাফেতে কনি সেদিন খেতে গিয়েছিলো। সঙ্গে কেউ যায় নি, সে ছিলো একলা। একটু পর, মারকুইস্ ঢুকলো—সঙ্গে আরেকজন অভিনেত্রী—জোন্ মার্শ্। সবাই চুপচাপ, কারণ একটা আচমকা বজ্রপাতের আশঙ্কা সবাই করছিল।

কনির মত ঝগড়াটে মেয়ে সারা হলিউডে আছে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু, আশ্চর্য্য, কিছু হ'লো না।

ম্যাডাম বেনেট গম্ভীর ভাবে মারকুইস্ আর জোন যে টেবিলে বসে ছিলো সেখানে একবার মাত্র গেলো আর চলে এলো। একটু পর মারকুইস্ জোনকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কনি পড়ে রইলো আবার একলা।

ব্যাপারটা শুনে কার না মনে সন্দেহ হয় শুনি!

অদ্ভুত কাজ

সারা হলিউডে টমাস্ এ সিপ্‌ম্যানের মত অদ্ভুত কাজ আর কারো হয়তো নেই। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছে যে সমস্ত অদ্ভুত চিঠিগুলো সব আসে—সেগুলো তাকে বেছে ঠিক জায়গায় পাঠাতে হয়।

ধরুন, কতগুলো চিঠি এলো, খামের ওপর আর কিছু লেখা নেই—শুধু আছে—'বেল্ অফ্ দি নাইনটিস্', হলিউড্, বা 'কাম্ আপ্ এণ্ড্ কিস-মি-সামটাইম'।

টমাস্ তখুনি বোঝে এ চিঠিগুলো যাকে লেখা হয়েছে তার নাম হচ্ছে মে ওয়েষ্ট।

আরো কতগুলো এলো—সেগুলোতে হয় এক ধোঁয়া শুদ্ধ বন্দুক আঁকা, নয় একটা ক্রস্এর ধারে কতগুলো মৌমাছি।

সিপ্‌ম্যান একটা নিঃশ্বাস ফেলে চিঠিগুলোকে বিঙ্ ক্রস্‌বির বাড়ি পাঠিয়ে দিলে।

কিন্তু, সম্প্রতি তাকেও একটু গোলমালে পড়তে হয়েছিলো একটি চিঠি এলো তাতে আর কিছু নেই—শুধু আঁকা এক সাদা ভাল্লুক কাঁপ্‌ছে।

অনেক ভেবে চিন্তে সিপ্‌ম্যান শেষ পর্য্যন্ত চিঠিটা ক্লডেট্ কল্‌বার্ট্এর কাছে পাঠিয়ে দিলে। এবং কল্‌বার্ট্‌ও স্বীকার করেছিলো চিঠিটা তারই।

'ডেভিড্ কপারফিল্ড' এর আগমন

চার্ল্‌স্ ডিকেন্সের 'ডেভিড্ কপারফিল্ড' খুব কম লোকই আছে যাঁরা পড়েন্ নি। ঐ সুন্দর মর্ম্মস্পর্শী গল্পটি ছায়াচিত্রে সুন্দরতর হয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। মেট্রো-গোল্ড্‌ইন মায়ারের এ চিত্রখানি আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবারই দেখা উচিত্। এতে একসঙ্গে এতোগুলো নামী অভিনেতা নেবেছে—চিত্রের ইতিহাসে যা আগে কোনোদিন হয় নি। কয়েকটা নাম বলি—লিওনেল ব্যারীমুর, ডবলিউ সি ফিল্ডস্, লুই ষ্টোন্, বেসিল রাথবোন, ফ্র্যাঙ্ক লটন, মউরিন ও' সুলাভান, ম্যাজ ইভান্স্, এডনা মে ওলিভার ইত্যাদি। আর, সব চেয়ে সেরা হচ্ছে ফ্রেডি বারথলোমিউ। দশ হাজার ডেভিডের ছোটোবেলাকার অংশ-প্রার্থী ছেলেদের ভেতর সে ছিলো একজন। কোনো রকমে সে তো প্রযোজক ডেভিড্ ও' শেল্‌জ্‌নিক-এর আপিসে গিয়ে সটান্ ঢুকে পড়লো। দরজা বন্ধের আওয়াজ হ'তেই মিঃ শেল্‌জ্‌নিক সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন—ভারী চমৎকার দেখতে ছোট্ট একটি ছেলে। চোখ দিয়ে তার বুদ্ধির প্রভাব ফুটে বেরুচ্ছে।

জিজ্ঞেস্ করলেন—'কে তুমি?'

'আমি ডেভিড্ কপারফিল্ড্'—ছেলেটি জবাব দিলে।

মিঃ শেল্‌জ্‌নিক আশ্চর্য্য হয়ে তাকে কোলে তুলে' নিলেন। 'হ্যাঁ, তুমি ডেভিড্ কপারফিল্ডই বটে।'

খুচ্‌রো খবর

'জর্জ্জ হোয়াইটস' এর 'স্ক্যাণ্ডাল্‌স্'-এর পর অ্যালিস্ ফে এখন অভিনয় করছে 'আর্জেনটিনা'য়।

* * *

রোজ্‌মারি এমস্ হচ্ছে হলিউডে একমাত্র মেয়ে যে জাপানী ভাষা জানে।

* * *

জন নাইটের হঠাৎ অসুখ হওয়ায় বিঙ্ ক্রস্‌বির বৌ তার জায়গা দখল করতে বাধ্য হয়েছে ফক্সের 'রেড হেড্‌স্ অন্ প্যারেড্'এ।

* * *

শারলি টেম্পল্ যে ছবিতে এখন অভিনয় করছে তার নাম—'আওয়ার লিট্‌ল্ গার্ল্'। জোয়েল ম্যাক্‌রিয়া হচ্ছে ছবিখানিতে তার বাবা। আর রোজমারি এমস্ তার মা।
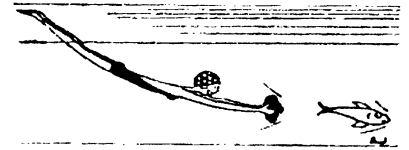
খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ২৬শে আষাঢ়, ১৩৪২—11th July, 1935. { ২৮শ সংখ্যা

অমর স্মৃতির অবমাননা

বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যসেবক সমিতির মধুস্মৃতি সভায় স্বর্গগত মহাকবির স্মৃতির উদ্দেশ্যে যে কটাক্ষ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ও বহুদর্শী সাহিত্যিকের পক্ষে শোভন হইয়াছিল কি না বাংলার সাহিত্যানুরাগী সুধী সমাজকে তাহার বিচার করিতে হইবে। এই সংখ্যায় স্থানান্তরে শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসুর পত্র ও তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইল। তাহা হইতে পাঠকবর্গ উক্ত দিনের ঘটনা সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হইবেন। গত পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত আমাদের প্রতিনিধির বিবরণের সহিত প্রভাতকিরণ বাবুর পত্রে উল্লিখিত বিবরণের কোন অসামঞ্জস্য নাই। অবশ্য সাহিত্যসেবক সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কেশব দে বা শ্রীযুক্ত গোপেন মিত্র অদ্যাবধি এই প্রসঙ্গে আমাদের নিকট কোন বিবৃতি পাঠান নাই। আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধির বিবরণ ও প্রভাত বাবুর বিবরণের সহিত সাহিত্যসেবক সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের বিবৃতি একই মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করিলে হয়ত এই ঘটনার যথাযথ বিশ্লেষণ করা হইবে।

"দেশ তাঁকে নেয়নি একথা বললে ভুল করা হয়, দেশ তাঁকে যথেষ্ট দিয়েছিল, তিনি নিজের দোষে সব নষ্ট করেচেন এবং কষ্ট পেয়েছেন"—বাংলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের এই উক্তি সত্য না মিথ্যা তাহার বিচার ভার বর্ত্তমানে বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দের উপর অর্পণ করিলাম। "জাগতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে শাস্তি পেতে হবে এ ভগবানের বিধান, তিনি নিজের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করেছেন. সে জন্য দুঃখ্য করে লাভ নেই।" শরৎচন্দ্রের এই উক্তি অমোঘ সত্য বলিয়া বিবেচনা করিলে শরৎচন্দ্রকেই কি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় না যে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে কি কোন "জাগতিক নিয়ম লঙ্ঘন" করেন নাই। "ভগবানের এই বিধান" যদি সত্য হয় ত শরৎচন্দ্র নিজেও কি "শাস্তি" গ্রহণ করিতে রাজী আছেন ? সুতরাং সেই জন্য কেহ যদি শরৎচন্দ্রের "কৃত কর্ম্মের ফলভোগে"র জন্য দুঃখ করেন তাহা হইলে শরৎচন্দ্র কি বলিবেন !

শরৎচন্দ্র বাংলার গৌরব ও বাঙ্গালীর গৌরব। বাঙ্গালার মস্তিষ্কের অপব্যবহারে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় একবার বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মণীষী শরৎচন্দ্রের মস্তিষ্কের বিকৃতি স্মৃতিবাসরে শরৎপ্রতিভার অশোভন শৈথিল্যে পরিস্ফুট হওয়ায় আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমরা আশা করি শরৎচন্দ্র স্বীয় ভুল বুঝিয়া মধুসূদনের প্রতি এই শ্লেষবাণী প্রত্যাহার করিয়া মহাকবির অমর স্মৃতির অবমাননার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। ভুল ভ্রান্তি স্বীকার করিতে দোষ নাই। এবং যিনি এই "জাগতিক" ধর্ম্ম পালন না করেন তাঁহাকে শাস্তি পাইতে হইবে—এটাও ভগবানের বিধান—আশা করি শরৎচন্দ্র তাহা বিস্মৃত হইবেন না।

বিবিধ

বিবাহ-বিচ্ছেদ ও 'অমৃতবাজার'

স্যার হরি সিং গৌর যখন হিন্দুর অসবর্ণ বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করিতে উদ্যত হন, তখন পাঁচকড়ি বাবু লিখিয়াছিলেন—"মনে করি, গান ধরি—"গৌর ! গৌর ! বল মন।" হিন্দুর বিবাহ-বিচ্ছেদের কথায় বাগবাজারের সহযোগীর তেমনই ভাবাবেশ দেখা যাইতেছে। হিন্দুর মেয়ে মুসলমান হইয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া আইনকে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারে, ইহা বলিয়া সহযোগী মত প্রকাশ করিয়াছেন "আইন গাধা।" আর পরোক্ষে হিন্দুর বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থনে বলিয়াছেন—"রাজনীতিতেই হউক আর সামাজিক জীবনেই হউক, রক্ষণশীলতার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।" নিশ্চয়—:কেবল সংবাদপত্রে ভুল লেখাও ছাপা সম্বন্ধে সহযোগী রক্ষণশীল। সহযোগী বলেন, হিন্দুর মেয়ে যে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করে, সে ধর্ম্মবিশ্বাস হেতু নহে—কারণ, তাহার পর সে আবার হিন্দু হয়। তাহার ধর্ম্মত্যাগের কারণ সেই "unhappily wedded" woman যে স্বামীর সঙ্গে মিল হয় না তাহার স্ত্রীত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চাহে—to get rid of an uncongenial husband. কিন্তু কোন স্বামী congenial আর কে uncongenial তাহা কিরূপে স্থির হইবে? কে-ই বা তাহা স্থির করিবেন—ডাক্তার, না মনস্তত্ত্ববিদ, না যুবতীর বা প্রৌঢ়ার বড়কাকা বা ঐরূপ কোন প্রিয় নিকটাত্মীয়? কিন্তু কথা—মনের মিল হইল না মনে করিলেই যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটান হয়, তবে কখন কি হয় কে বলিতে পারে?

"Use every man after his desert, and who should 'scape whipping?'

শেষে কি হিন্দুর মধ্যে পারস্যে প্রচলিত ঘণ্টা বা দিন চুক্তি-বিবাহ চলিত হইবে?

কিন্তু যাহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসঙ্গত, তাহারাই কি সব সময় বিবাহিত জীবনের passport ত্যাগ করিতে চায়? 'অমৃতবাজারে' প্রকাশিত নলিনী সরকারের বিরুদ্ধে আনীত ব্যভিচারের মামলার রায়ে ত দেখা যায়, ম্যাজিষ্ট্রেটের মতে—বীণার বিবাহ ghastly failure হইয়াছিল। কিন্তু সে ত আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের ছাড় প্রার্থনা করে নাই! বিবাহ-বিচ্ছেদের পর যদি আবার বিবাহ হয়, তবে আবার যে ঐ পথের পথিক হইতে হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? সেই জন্যই বোধ হয় হিন্দুদিগের বিশিষ্ট সমাজের ব্যবস্থা—সাত পাকের বিবাহ চৌদ্দ পাকেও নাকচ হয় না।

কিন্তু সে ব্যবস্থায় যদি সহযোগীর অরুচি জন্মিয়া থাকে, তবে আর একটা ব্যবস্থা ত বৈষ্ণব সহযোগীর অজ্ঞাত থাকার কথা নহে! সে—

কণ্ঠীবদল।

রামকেলীর মেলায় ও বাগনাপাড়ায় যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে ত এ সমস্যার সমাধান সহজেই হইতে পারে। সেকালের সেই গানেই ত সে ব্যবস্থার পরিচয় ছিল:—

"এবার পুজোয় ঝুমকো দিবি,
তবেই ঘরে র'ব;
নইলে তোর কপালে ঠেকিয়ে কলা
বাগনাপাড়ায় যাব।"

সহযোগীর যদি বিবাহ-বিচ্ছেদেই বিশেষ আগ্রহ হয়, তবে সেই প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা তিনি অবশ্যই সহজে করিতে পারেন। তাহা হইলে আর স্বামী বা স্ত্রী congenial কি uncongenial সে বিষয়ও বিবেচনার কোন প্রয়োজন হয় না—ব্যাপারটা প্রায় যথেচ্ছাচারের দলেই পড়ে।

দার্জ্জিলিং ও কোয়েটা

কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহেন—সর্ব্বজ্ঞতার অভিমান করাও মানুষের সঙ্গত নহে। তবু এক এক সময় এক একটা কাজের কারণ সন্ধানে ব্যর্থমনোরথ হইয়া আমরা বিস্ময়ানুভব করি। সম্প্রতি বাঙ্গালা সরকারের একটি ও ভারত সরকারের একটি ব্যবস্থায় আমরা তেমনই বিস্ময়ানুভব করিয়াছি।

প্রথমটি দার্জ্জিলিং সম্বন্ধে। ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে, লোকের পক্ষে দার্জ্জিলিং

প্রবেশে যে সব বাধাবিধি ছিল, সে সব প্রত্যাহৃত হইল। কিন্তু এখন—এই দারুণ বর্ষায় কে দার্জ্জিলিং-এ যায়—যে সময় লোক স্বাস্থ্য বা আরাম লাভের জন্য দার্জ্জিলিং-এ যায়—সেই সময় বাধাবিধির বাহুল্যে অনেকের তথায় যাইবার বাসনা "উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে" হইয়াছিল। এখন অসময়। এখন বাধা থাকা না থাকা সমান। কি কারণে যে, সরকার বাধাবিধি বিধিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহা আমরা জানি। সন্ত্রাসবাদীরাই তাহার জন্য মূলতঃ দায়ী। কিন্তু তবুও বাঙ্গালার এই একমাত্র শৈলাবাসে জনসাধারণের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা করা কি অসম্ভব? বিলাতের House of Lords ও House of Commons যেমন পাশাপাশি হইলেও স্বতন্ত্র—সেইরূপ রাজকর্ম্মচারীদিগের পল্লী ও জনসাধারণের পল্লী কি স্বতন্ত্র করা যায় না? বাধাবিধিতে দার্জ্জিলিং সহরেরও ক্ষতি অল্প হইতেছে না—বাড়ীর ভাড়া পড়িয়াছে—ব্যবসা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—ইত্যাদি। রাজপুরুষদিগের জীবন নিশ্চয়ই বহুমূল্য—কিন্তু সাধারণ লোকের জীবনও অমূল্য—সুতরাং যাহারা এই স্বাস্থ্যাবাসে যাইতে চাহে—তাহাদিগকে সে সুযোগ প্রদান করাই আমরা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। সেই জন্যই আমরা বলি, সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে এমন একটা ব্যবস্থা যদি বাঙ্গালা সরকার করেন, তবে ভাল হয়।

কোয়েটা সম্পর্কে নাগপুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে—ভারত সরকার নাকি প্রাদেশিক সরকারগুলির বরাবর দুই দফা ইস্তাহার জারি করিয়াছেন—সাবধান—কোয়েটার ভূমিকম্পজনিত দুর্গতি সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কি সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশিত হয়, সে দিকে খরদৃষ্টি রাখা হয়।

কোয়েটায় ভূমিকম্প সংবাদপত্রের ব্যবহার্য্য হিসাবে বাতিলের বস্তাবন্দী হইয়াছে। রঞ্জন, অতিরঞ্জন, শঙ্কা, উদ্বা, হা হুতাশ, দীর্ঘশ্বাস—সব শেষ হইয়াছে। সাংবাদিকেরা to fresh fields and pastures anew গিয়াছেন—এ সময় ভারত সরকারের এই ইস্তাহার কেন? লর্ড কার্জ্জন একবার বলিয়াছিলেন—সরকারের কর্ত্তব্যে অবহিত হইতে বিলম্ব হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি? প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে এমন কি সংবাদ বা মত প্রকাশিত হইতে পারে যে, সরকার সেজন্য সতর্ক হওয়া প্রয়োজন মনে করেন? এক্ষেত্রে প্রকৃতিই সন্ত্রাসবাদীর মত কাজ করিয়াছে—কিন্তু তাহার উপর কাহারও কোন অধিকার নাই।

মাত্র ১১৫

ময়মনসিংহ—টাঙ্গাইলে সাহেবউল্লা শেখের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাহার বয়স হইয়াছিল—১ শত ১৫ বৎসর মাত্র। কিসে তাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহা প্রকাশ নাই। Infantine liver বা দাঁত উঠা ইহার কারণ নহে ত? আজকাল এত বয়স সচরাচর দেখা যায় না। ময়মনসিংহের লোক কি সাধারণতঃ দীর্ঘজীবী হয়? ময়মনসিংহেরই আর একখানি গ্রামের নলিনী সরকারের বয়স কত হইল?

অনাথ ও সনাথ

কথায় বলে—

"নিষ্কর্ম্মা কি করে?
ধানে চালে এক করে।"

দেখিতেছি, কলিকাতায় একদল নিষ্কর্ম্মার আবির্ভাব হইয়াছে—ইহারা বেকার নহে, চাকরী সম্বন্ধে সাকার—কেবল কাজের অভাবে নিষ্কর্ম্মা। ইহারা এক বৈঠক করিয়াছে—"মিলনী ক্লাব"—এই সমিতির

নামেই ইহার ফিরিঙ্গিত্ব সপ্রকাশ। এই সভায় যে সব মত প্রচারিত হয়, সে সবও ফিরিঙ্গি সুলভ। এই সভায় মোড়লী করেন—শ্রীঅনাথগোপাল সেন। যে অনাথরা নারীকে সনাথ করিতে ব্যাকুল, ইনি যে তাহাদেরই একজন তাহা সেদিন "মিলনী ক্লাবের" অধিবেশনেই তিনি বলিয়াছেন। ইহার এক পাল কোকিল শিশু আছে কিনা, তাহা আমরা জানিনা। কিন্তু দেখিতেছি, ইনি প্রগতি-পরায়ণাদিগের সহিত ঐ বিষয়ে একটা রফা করিবার জন্য ব্যস্ত। ইনি বলিয়াছেন—অর্থ, চাকরী এমন কি বিবাহ-বিচ্ছেদ বিষয়েও প্রগতিপরায়ণারা যাহা চাহেন, তাহাই তাহাদিগকে দিয়া পুরুষরা এই রফা করুন যে, তাহারা বিবাহটা করুন এবং বিবাহ করিয়া সন্তান প্রসবও করুন। কিন্তু তিনি অনুরোধ জানাইলেই কি প্রগতি-পরায়ণারা তাহা রক্ষা করিবেন—সে ক্ষেত্রে যে

"যুবতী-চিত কঠোর অতি
বজর জিনি বুক।"

তিনি যদি charity begins at home নীতি অবলম্বনের চেষ্টা করিতেন, তবেই একথা বুঝিতে পারিতেন। রফা যে অনেকে করে, তাহাতে সন্দেহ নাই—সে রফা principle-এর সঙ্গেও হইতে পারে। কেননা, দেখা গিয়াছে—যে উকীল আইনভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে সে-ই আবার ইংরাজ সরকারের কাছে ন্যস্ত সম্পত্তি Ward জমীদারের খাস মুন্সীর কাজ করে এবং হিন্দুপরিবারের চাকুরীয়া হইয়া নিরীহ প্রভুকে উপদেশ দেয়।

যে সব নারী জননী হইতে নারাজ তাহারা যে এই "মিলনী ক্লাবে"র অনাথের উপদেশেই সনাথ হইবেন এমন মনে করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তবে প্রগতিপরায়ণার জননীত্বে অসম্মতি আর সংযম এক কথা নহে—এক উৎসে উভয়ের আবির্ভাবও হয়না। এইরূপ আলোচনা যে Mixed Club-এ হয়, তাহার সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কথাই প্রয়োগ করা যায়। তিনি বলিতেন, তিনি এইরূপ প্রতিষ্ঠানের পক্ষপাতী—কারণ, যদি বেহাত হয় একজন সভ্যের একটি স্ত্রীই বেহাত হইবে—কিন্তু তিনি ত দশজনের স্ত্রী বেহাত করিবার সুযোগ পাইবেন। পুণ্যশ্লোক মহারাজা স্যর মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর পুত্র কি এই "ক্লাবের" প্রতিষ্ঠার উৎসবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন?

অনাথোক্তির উত্তরে নাকি অপর পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল—সন্তানের জননী হইতে প্রগতিপরায়ণাদের আপত্তি নাই—যত আপত্তি কোন পুরুষের গৃহিণী হইতে। ঠিক কথা—

"সতত কি বসে অলি কমলে?
সে নানাফুলে মধু খেয়ে বসে এসে কমলে।
মিষ্টি খেয়ে হয় অরুচি
কাসনে হয়গো রুচি।—
কিন্তু
মিষ্টি যত খাওয়া যায়
কাসন তাহার সিকি নয়—
তবুত কাসনে রুচি দেখায় সকলে।"

বিদ্যাসুন্দরের টপ্পায় দুর্নাম আছে পুরুষের—

"পুরুষ ভ্রমরাজাতি নানাফুলে মধু খায়।"

ইংরাজ কবি লিখিয়াছেন—

"Weep no more ladies, weep no more,
Men were deceivers ever
One foot in sea and one on shore
To onething constant never."

এখন প্রগতিপরায়ণারা পুরুষের সঙ্গে এক ব্র্যাকেটে থাকিবার চেষ্টায় সে পরিবাদ লইতেও ব্যস্ত হইয়াছেন। সেইজন্য সেদিন আমাদের এক বন্ধু যখন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নতুন কুচ্ছ কি আছে হে?"—তখন তিনি উত্তর দিলেন, "কুচ্ছই এখন ধর্ম্ম হয়েছে—কাজেই কুচ্ছ আর নাই।"

"মিলনী ক্লাবের" আঙ্গিনায় যাঁহারা নারী হইয়া বলেন, নারীরা গৃহিনী হইতে নারাজ তাহারা কি বেড়া নাড়িয়া গৃহস্থের মন বুঝিবার চেষ্টা করেন?

আমাদের "বিষকণ্ঠ বাচস্পতি" ভায়া অভিজ্ঞ লোক। তিনি বলিয়াছেন—প্রগতি-পরায়ণাদের পতাকা দেখিয়া ভয় পাইবার

কারণ নাই—ওসব যৌবনের চাঞ্চল্য—জোয়ারের জল অল্পকালের মধ্যেই ভাটার টানে সরিয়া যাইবে, তখন? আর সে-ই বা কয়দিন? "বসনে শাসনে" ত তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। দাশু রায় ত তাহা "তালপাতার ছায়া"য় বলিয়াছেন। কিন্তু তিনিও মনে করিতে পারেন নাই—অনেকের মন অনেকদিন হামাগুড়ি দিতে পারে।

কিন্তু এসব আলোচনা কিসের জন্য? যাহারা এই সব আলোচনায় মত্ত হয়, তাহারা কোন সমস্যার সমাধান করিবার জন্য সে কাজ করে না—সে ক্ষমতা—সে যোগ্যতা তাহাদের নাই। তাহারা সেই—"ক্ষমতা নাই ধরতে ঘোঁড়া, বোঁড়া ধরতে চাও।"—তবে ইহার মধ্যে যে sex-appeal অর্থাৎ যৌন ভাবের অনুশীলন আছে, তাহাই এখন অনেকের জপমালা হইয়াছে। আর সেই জন্যই "মিলনী ক্লাবের" মত প্রতিষ্ঠানও চলে এবং তথায় লোক-সমাগমও হয়। প্রগতির এই পরিণতি জাতিকে কোথায় লইয়া যাইবে?

Offensive and Defensive

হিন্দুস্থানের তরফ হইতে ইংরাজীতে আর একখানি পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে ডিরেক্টারদিগের স্বাক্ষর নাই। তবে প্রথমখানি ছিল offensive—এখানি defensive. ইহার পরিচয় পাঠকগণ যথাকালে পাইবেন।

মন্দির পুনর্গঠন

এই জড়বাদ বিড়ম্বিত যুগে, যখন এক পুরুষের স্থাপিত বিগ্রহ প্রায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষের গলগ্রহ হইয়া তাহার পর নিগ্রহ বিবেচিত হইয়া থাকেন, সেই যুগে—ভগ্ন মন্দিরের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অসাধারণ ব্যাপার বটে। কিন্তু যাহা অসাধারণ, তাহা একেবারেই যে অসম্ভব নহে, সম্প্রতি গুপ্তীপাড়ার নিকটে আয়দা গ্রামবাসীরা তাহা দেখাইয়াছেন। এই গ্রামে বহুকাল পূর্ব্বে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সর্ব্বমঙ্গলার যে শিলামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। গ্রামের শ্রীযুক্ত গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে অতিথিরূপে যাইয়া রায় জলধর সেন বাহাদুর মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারই উদ্যোগে গ্রামবাসীরা মন্দির পুনর্নির্ম্মাণে বদ্ধ পরিকর হন এবং অল্পকাল

আয়েদায় নব-নির্ম্মিত মন্দির

মধ্যেই তাহারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সেদিন এই নব নির্ম্মিত মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; আর উৎসবে যোগদান জন্য কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্যিকও আয়দায় গমন করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সাধারণের—কোন ব্যক্তির বা কোন পরিবারের নহে। ইহা সাধারণের প্রদত্ত টাকায় নির্ম্মিত হইল এবং ইহাতে বর্ণ নির্ব্বিশেষে হিন্দু মাত্রেরই পূজাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের—হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম্মের স্থান বড় অল্প নহে। গ্রামে দেবমন্দির কেবল ধর্ম্মজীবনের নহে পরন্তু সামাজিক ও কর্ম্মজীবনেরও কেন্দ্র ছিল—আবার তাহাই করা যে সম্ভব, আয়দার হিন্দু সাধারণ তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সর্ব্বমঙ্গলা তাহাদিগের মঙ্গল করুন। সর্ব্বমঙ্গলা শক্তি—তাহার সাধনায় শক্তি লাভ করিয়া আয়দাবাসীরা মলিন-শ্রী গ্রামের পুরশ্রী ফিরাইয়া আনুন এবং গ্রাম হইতে যে শক্তি উৎসমুখে উৎসারিত হইবে তাহাতে আমাদের বৈশিষ্ট্য প্রবল হইয়া জাতীয়তার বিস্তার সাধন করুক।

বসুজ কাহিনী

বীণার সহিত ব্যভিচারের অভিযোগের মামলায় নলিনীরঞ্জন মুক্তি পাইলেও ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে কুত্রাপি তাহাকে নির্দ্দোষ বলেন নাই। বরং প্রমথনাথের পক্ষে ফৌজদারী মামলা না করিয়া দেওয়ানী আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করাই সঙ্গত ছিল ইহা রায়ে লিপিবদ্ধ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটই এই ইঙ্গিত দিয়াছেন যে ফৌজদারী মামলায় যে পরিমান প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবশ্যক তাহা এই মামলায় না পাওয়া গেলেও দেওয়ানী আদালতের পরোক্ষ প্রমাণ গৃহীত হয় বলিয়া ঘটনাবলী হইতে এই মামলা পরিচালন সহজ হইত। তিনি রায়ের অন্যত্র বলিয়াছেন যে সাধারণ লোকে নলিনীবাবুর চরিত্র সন্দেহাতীত নহে ইহা ধরিয়া লইলে সন্দেহকারীকে সঙ্কীর্ণমনা বলা চলে না। এতৎ সত্ত্বেও—"ব্যবসা বাণিজ্য" সম্পাদক নলিনীস্তুতি গাহিতে গিয়া দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোন কুচক্রী লোক সমাজের অন্তরালে কি গোপন চক্রান্ত করিয়া সুরেন্দ্রচরিত্র নাকি মসীলিপ্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল এইকথা তুলিয়া নলিনী-চরিত্রের সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। নলিনীচরিত্র আদালতে বিচারিত হইয়া বিচারকের মানদণ্ডে তুলিত হইয়াছে।

কোনও অজ্ঞাত-নাম কুচক্রী যদি কোন সুদূর অতীতে গোপনে সুরেন্দ্রনাথের সম্পর্কে মিথ্যা কলঙ্কের প্রলেপ দিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে, সেই কাহিনী জনসাধারণে প্রকাশ করিবার এ ক্ষেত্রে সার্থকতা কি? কোনও বিচারক কি সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এইরূপ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে তিনি "সত্য কথা বলেন নাই"? নলিনীরঞ্জন সম্বন্ধে কিন্তু বিচারক স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "বড় কাকা সত্য কথা বলেন নাই।" তাঁহার উক্তি এই:— "Neither Bina, nor Borakaka has told the truth." কাজেকাজেই সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অজানা চক্রান্ত কাহিনী প্রকাশে নলিনীচরিত্রের দোষ স্খলিত হয় না বরং অযথা সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকেই অবমাননা করা হয়। এ ভাবে সুরেন্দ্রকথা প্রচার করাও যে তাঁহার স্মৃতির অবমাননা একথা সম্ভব শচীন্দ্রপ্রসাদের বুদ্ধির অতীত। শচীন্দ্রপ্রসাদ কি জানেন যে যশোহর জেলার বিশ্বানন্দকাটির এক বহুজ মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও উপায় না দেখিয়া নিজ জেলার সর্ব্বজনমান্য নেতার বিধবা পত্নীকে আর্জ্জিতে নেতার "রক্ষিতা" বলিয়া অভিহিত করার জন্য বিচারকের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিল। সেই মামলার বিষয় আমরা অবগত আছি। যে ঘৃণিত ব্যক্তি আপনার জেলার গৌরবকে এমনভাবে ম্লান করিতে পারে তাঁহাকে কি আখ্যায় ভূষিত করা উচিত, তাহা শচীন্দ্রপ্রসাদ বলিবেন কি? প্রয়োজন হইলে কুক্কুরাধম এই নরপশুর স্বরূপ আমরা ব্যক্ত করিব।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

পাটনা প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রসমিতি "প্রভাতী সঙ্ঘ" কর্ত্তৃক বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনুষ্ঠিত এক পুরস্কার প্রতিযোগিতা হইবে। নিম্নলিখিত প্রত্যেক বিষয়েই পুরস্কার (পদক ও পুস্তক) দেওয়া হইবে। ১। গল্প ২। কবিতা ৩। ছবি আঁকা ৪। ছাত্রীদের জন্য বিশেষ গল্প প্রতিযোগিতা ৫। প্রবন্ধ—ক। জাতি গঠনে বঙ্কিমচন্দ্র, খ। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালী, গ। আধুনিক বাংলা কবিতার ধারা, ঘ। বাঙ্গালী কি সভ্য?—যে কোন একটী বিষয়। প্রবন্ধাদি পাঠাইবার শেষ দিন—১লা আগষ্ট, ১৯৩৫।

ন্যাশনাল ইনসিওরেনস্ কোং

আমরা ৭নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটস্থ ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। এই বৎসরে কোম্পানী ২ কোটী ১৮ লক্ষ টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন এবং উহার মধ্যে ১ কোটী ৬৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। বৎসরের শেষে কোম্পানীতে ৯ কোটী ৭৪ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার বীমাপত্র চলতি ছিল।

কি মিতব্যয়িতা, কি নিরাপদ ও লাভজনক উপায়ে তহবিল বিনিয়োগ, কি তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি সকল দিক হইতেই ন্যাশনাল একটী আদর্শ প্রতিষ্ঠান। আলোচ্যবর্ষে ন্যাশনাল তাঁহাদের প্রিমিয়ামের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করিয়াছেন। তবে এই সম্পর্কে বার্ষিক সভায় সভাপতি মিঃ জে চৌধুরী জানাইয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ ভেলুয়েশনে অতিরিক্ত হারে প্রিমিয়াম প্রদানকারী পলিসিগ্রাহকগণকে অতিরিক্ত হারে বোনাস দেওয়া হইবে। ন্যাশনালের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, বীমার দাবীর টাকা আইনের গোলমালের জন্য ৬ মাসের অধিককাল কোম্পানীতে পড়িয়া থাকিলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য কোম্পানী এই টাকার উপর একটী নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বীমা কোম্পানী রহিয়াছে, তাহার মধ্যে "ন্যাশনাল" অন্যতম। বীমাকারীগণ এই কোম্পানীতে নির্ভয়ে বীমা করিতে পারেন।

ময়ূরভঞ্জে ক্ষিতীশচন্দ্র

আমরা জানিয়া প্রীতিলাভ করিলাম, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী

দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে একজন ইংরাজ এই পদে ছিলেন। তাঁহার পর পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ মিষ্টার প্রভাতকুমার সেন ঐ পদ লাভ করেন। ক্ষিতীশবাবু তাঁহার পরবর্ত্তী। ক্ষিতীশবাবু ব্যবস্থা পরিষদে কার্য্যদ্বারা সুপরিচিত হইয়াছেন। তিনি কোন দলের ছাড় না লইলেও তাঁহার যোগ্যতাহেতু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাঁহার বিরুদ্ধে কংগ্রেসপক্ষে কোন প্রার্থী উপস্থিত করেন নাই। ক্ষিতীশবাবু "ফেডারেশনের" বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং তিনি ইষ্টার্ণ ষ্টেটসের অর্থাৎ উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের রাজন্যগণের তরফে গোল টেবিল বৈঠকে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ময়ূরভঞ্জের শাসন পরিষদে তিনি প্রধানরূপে কাজ করিবেন। ময়ূরভঞ্জ উন্নতিশীল দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। আমরা আশা করি, তিনি রাজ্যের গৌরববৃদ্ধি ও প্রজাদিগের আরও উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন।

চক্ষুচিকিৎসকের চক্ষুলজ্জা !

কলিকাতা কর্পোরেশনের যানবাহন বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত মনি রায়ের বিরুদ্ধে একজন মুসলমান মোটর চালকের "পবিত্র দাড়ি" ধরিয়া টানা ও বিভাগীয় শ্রমিকদিগকে উৎপীড়ন করার অভিযোগ হয় এবং সেজন্য কর্পোরেশন হইতে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োজিত হয়। এই সম্পর্কে প্রথম যে বিভাগীয় তদন্ত হয় তাহার ফলে চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দে মহাশয় এক রিপোর্ট দাখিল করেন। সেই রিপোর্টে দে মহাশয় বলিতেছেন—"The statement and the behaviour of the complainant led me to believe the story of assault and beard pulling is entirely got up."

তাহার পর যে তদন্ত কমিটি বসে তাহার ফলে তদন্তকারী কমিটির সভাপতি মিষ্টার রুনি যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহারও সিদ্ধান্ত শ্রীযুক্ত দের সিদ্ধান্তের অনুরূপ। কমিটি অনেক সাক্ষীসাবুদকে জেরা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হন। চক্ষুচিকিৎসক ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ঐ কমিটির সভ্য ছিলেন ; কিন্তু কমিটির কয়েকটি অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন নাই। তথাপি তিনি রিপোর্টের বিরুদ্ধে একটি স্বতন্ত্র রিপোর্ট দাখিল করিয়া শ্রীযুক্ত রায়কে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য সুপারিশ করেন। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ্যভাবে মুদ্রিত হইয়াছে কিন্তু ডাক্তার মৈত্রের রিপোর্ট গোপনীয় বলিয়া লিখিত থাকায় ৩রা জুলাই তারিখে সেক্রেটারী মহাশয় টাইপ করিয়া তাহা "Confidential" লিখিয়া কাউন্সিলারদিগকে প্রেরণ করেন। অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ না করিয়া গুপ্তভাবে তাহা প্রচার করিবার উদ্দেশ্য কি ? ডাক্তার
ক্‌-লজ্জার খাতিরে ইহা গোপন
টেলি— -ন, না মানহানির দায় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এরূপভাবে কাজ করিয়াছেন ? প্রকাশ্য তদন্তের ফলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে হইলে তাহা প্রকাশ্যেই করা উচিত। চক্ষুলজ্জা অথবা আদালতের ভয়ে গোপনে এইরূপ মত প্রচার করা উচিত নহে। যিনি প্রকাশ্যে আপনার মত প্রচার করিতে সাহসী নহেন, তাঁহার মতের মূল্য কি ?

কাউন্সিলারদিগকে যদিও এই অভিমত "গোপনীয়" বলিয়া প্রেরণ করা হইয়াছিল, তথাপি অভিমতটি গোপন রাখা হয় নাই—সুবিধামত বাহিরের লোকের নিকট প্রকাশ করা হইয়াছিল। কর্পোরেশনের বেতনভুক কর্ম্মীদের যে সমিতি আছে সেই সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন মেয়রের সহিত এই বিষয় লইয়া সাক্ষাৎ করে। সেই ডেপুটেশনের বক্তব্যের মধ্যে ডাক্তার মৈত্রের রিপোর্ট উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা এই গুপ্ত রিপোর্টের বিষয়বস্তু অবগত হইলেন কিরূপে ; কে তাহাদিগকে এই রিপোর্ট জানাইয়াছে সে সম্বন্ধে তদন্ত হওয়া উচিত। তাহা হইলে চীফ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় যে এই আন্দোলন "Got up" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন সেই "Getting up"-এর অন্তরালে কে বা কাহারা আছে তাহা বুঝা যাইবে।

তদন্তে আর একটা গুরুতর বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। জেরায় জানা গিয়াছে যে যানবাহন বিভাগের শ্রমিকগণ তাহাদের তরফে আন্দোলন চালাইবার জন্য কয়েকজন কাউন্সিলারকে সাত হাজার টাকা দিয়াছেন। এই কাউন্সিলার কয়জন কে ? এ সম্বন্ধে কোনও তদন্ত হইবে কি ?

সোণার বাংলা ব্যাঙ্ক

গত রবিবার প্রাতে সাড়ে আট ঘটিকার সময় ১৩৭নং ক্যানিং ষ্ট্রীটে সোণার বাংলা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ক্লাইভ ষ্ট্রীটের শাখার উদ্বোধন হইয়াছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত সুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর নব প্রচেষ্টা সফল হইলে আমরা আনন্দিত হইব।

রক্তাল্পতা ও তাহার প্রতিকার

ডাঃ আর, এম, চৌধুরী

আমাদের দেশের স্বাস্থ্য বিবরণী পাঠ করিলে দেখা যায় যে এদেশের নরনারী বিবিধ দুরারোগ্য রোগে ভুগিতেছে। মৃত্যুর হারের দিক বাদ দিলে ও নানাবিধ দুরারোগ্য রোগে রুগ্ন লোকের সংখ্যাও অন্যান্য সভ্য-দেশের তুলনায় এদেশে অনেক বেশী।

বাস্তবিক পক্ষে স্বাস্থ্যহীন জাতির উন্নতি-লাভ অসম্ভব। সমস্ত উৎকট রোগ বর্ত্তমানে আমাদের সামাজিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, রক্তহীনতা রোগ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। স্ত্রীলোকের মধ্যে অতিরিক্ত রক্তস্রাব, অল্পবয়সে বিবাহ, পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব, শ্বেত প্রদর, রক্ত প্রদর প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইতে দেখা যায়।

এই রোগে পথ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুনির্ব্বাচিত ঔষধের দ্বারা দ্রুত ও কার্য্যকরী ফল পাওয়া যায়। সুনির্ব্বাচনের অভাব বশতঃ অনেক-ক্ষেত্রে যে কেবল অযথা অর্থব্যয়ই হয়, তাহা নহে, কোন কোন স্থানে রোগভোগ কাল অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে। যে ঔষধ সহজে ভুক্ত পুষ্টিকর দ্রব্যসমূহ হজম করাইয়া, সর্ব্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিয়া এবং দ্রুত শরীরে নূতন রক্ত-কণিকা বৃদ্ধি করিয়া নববল ও জীবনী শক্তির সঞ্চার করিতে সক্ষম, এমন টনিকের সাহায্য লওয়াই কর্ত্তব্য। "রচিটোন" প্রকৃতিজাত দ্রব্য এবং মহোপকারী ধাতুসমূহে গঠিত বলিয়া একটি মহোপকারী মৃদুউত্তেজক টনিক। "রচিটোন" যে কেবল দেহের ওজন ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে তাহা নহে। পরন্তু ইহা শরীরে নব রক্তকণিকা দ্রুত বৃদ্ধি করিয়া রক্তকে সতেজ করে। এবং শরীরে নববল ও নূতন জীবনী শক্তির সঞ্চার করে।

রক্তাল্পতা রোগে যে রচিটোন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা উচিত তাহা বলাই বাহুল্য।

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

রাধা ফিল্ম

রাধা ফিল্মের বহু-প্রশংসিত বাণী-চিত্র "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" 'রূপবাণী'তে গত ন' হপ্তা ধরে অসংখ্য দর্শক সমাগম কোরেছে। প্রথম থেকে আট হপ্তার মধ্যে প্রতি হপ্তায় আনুমানিক প্রায় পাঁচ হাজার টাকা কোরে টিকিট বিক্রি হ'য়েছে। ছবিখানির চাহিদা এখনও পর্য্যন্ত বাজারে খুব বেশী—তাই শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী আগামী হপ্তা থেকে 'কর্ণওয়ালিস্ থিয়েটারে' দেখাবার ব্যবস্থা কোরেছেন। আশা করা যায়, 'রূপবাণী'-র মত 'কর্ণওয়ালিসে'ও ছবিখানা জনপ্রিয় হ'য়ে উঠবে।

* * *

শ্রীমৃণাল ঘোষ

সুগায়ক শ্রীমৃণাল ঘোষ "মানময়ী গার্লস্ স্কুলে" রাজেন্দ্র বাড়োরীর ভূমিকায় অভিনয়ে ও গানে সাফল্যলাভ করায় ডাঃ এস্, মিত্র গত রবিবার তাঁকে একটি স্বর্ণ-খচিত রৌপ্য পদক উপহার দিয়েছেন।

* * *

ঢাকার 'চিত্রালয়ে' "দক্ষযজ্ঞ" বিপুল গৌরবে দ্বিতীয় হপ্তায় পড়্ল।

* * *

পরিচালক জি, আর, শেঠীর "পাণ্ডব বোল্ট" এই মাসের শেষেই মুক্তিলাভের অপেক্ষায় থাকবে।

* * *

দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তেলেগু "ভক্ত কুচেলা" বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ কোরেছে।

* * *

শ্রীতড়িৎ বসু পরিচালিত "ওয়ামাক এজ্রা" ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অচিরেই মুক্তিলাভ কোরবে।

তিনজন পরিচালকের অধীনে তিনটি ইউনিটে বাঙ্লা "কৃষ্ণ-সুদামা" ও "কণ্ঠহার" এবং "দুলারী বেটী"-র কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

শ্রীমতী পেসেন্স কুপার এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান কোরেছেন। 'ডি জি' পরিচালিত "ব্লাড এণ্ড বিউটী"-র শ্রীমতী সুলতানা অভিনীত ভূমিকার অবশিষ্টাংশে ইনি অভিনয় কোরবেন।

* * *

বাঙ্লা "বিদ্রোহী"-র যে ট্রেলার 'রূপবাণী'-তে দেখানো হ'চ্ছে তা' দেখে আমরা বিশেষ প্রীত হ'য়েছি। ট্রেলারটি দেখে মনে হ'চ্ছে চিত্রজগতে "বিদ্রোহী" সত্য বিদ্রোহ ঘোষণা কোরবে।

* * *

শ্রীযতীন দাশের "রাতকাণা"-র মহলা জোরভাবে চলছে। চিত্রামোদীদের কাছে এই ছবি সম্পর্কে আমরা একটা মজার খবর জানাচ্ছি। খবরটি হ'চ্ছে শ্রীমতী ইন্দুবালার মা এই ছবিতে একটি ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য মনোনীতা হ'য়েছেন। দেখা যাক্, এবার মা হারে কী মেয়ে হারে!

শ্রী:জ্যোতিষ মুখার্জ্জির "পায়ের ধূলো"র কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এল। মুখার্জ্জি মশাই ছবিখানির সাফল্যের জন্য অবিরাম পরিশ্রম কোরছেন। তাঁর সাধনা সফল হ'ক।

*　　*　　*

এরপর শোনা যাচ্ছে মুখার্জ্জি মশাই নাকি মঞ্চ-নাটক "পথের শেষে" তুলবেন।

"হেন্‌রী দি এইট্‌থ্"

ঐ বিখ্যাত চিত্রটির ভূমিকা আজ নিষ্প্রয়োজন। লণ্ডন ফিল্ম্‌সএর আলেকজান্দার কোর্ডা 'প্রাইভেট লাইফ অফ্ হেনরী দি এইট্‌থ্' প্রযোজনা করে' সারা পৃথিবীর সিনেমা রাজ্যে অনবদ্য এক ইতিহাস তৈরী করেছেন। ঐ চিত্রে অভিনয় করেই চার্লস্ লফটন্ আমেরিকান্ একাডেমীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার পান। মনে আছে—কলকাতায় চিত্রটির যে দিন উদ্বোধনের কথা ছিলো? সেই সার্ব্বজনীন ঔৎসুক্য? কিন্তু, অনাহুত এ'লো এক নীল আকাশে কালো মেঘ। ভারত গভর্ণমেণ্ট্ চিত্রটিকে ভারত রাজ্যে করলেন নিষিদ্ধ। সে দুঃখ চিত্রামোদীদের ভুলতে লেগেছিলো অনেকদিন। কিন্তু, অপ্রত্যাশিত সুবর্ণ এক সুযোগ এসেছে। কল্‌কাতার অতি কাছে ফ্রেঞ্চ চন্দননগরের "সিনেমা ডি ফ্রান্সে" চিত্রখানি আগামী শনিবার ১৩ই থেকে দেখানো হবে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার অসংখ্য চিত্রামোদীরা করবেন এ আমরা অনায়াসেই আশা করি।

ফ্যান্‌টম অফ্ ক্যালকাটা

এই ছবিখানির সমালোচনা স্থানাভাব বশতঃ এ হপ্তায় বের হ'ল না। ছবিখানা দেখাবার সময় আমাদের কোনও এক বন্ধু বল্‌ছিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্টতম কোন ছবি—তার যদি প্রতিযোগিতা হয় তা' হ'লে এই ছবিখানা নিঃসংশয়ে প্রথম স্থান অধিকার কোরবে।

রূপবাণী

১৩ই জুলাই শনিবার থেকে 'রূপবাণী'তে মেট্রো'-র বহু বাঞ্ছিত "ট্রেজার আইল্যাণ্ড" দেখান হ'বে। সুচতুর জল দস্যু বেশে ওয়ালেস্ বিয়ারী, লাওনেল ব্যারীমুর ও বালক জিমের ভূমিকায় জ্যাকি কুপারের অভিনয় এই ছবিতে হৃদয় গ্রাহী হ'য়েছে।

চক্ষুচিকিৎসকের চক্ষুলজ্জা

CONFIDENTIAL

Circulated in connection with Item No. 1 of the Special meeting of the Corporation dated 5.7.35

- - - - - - - - -

Report of Dr. J. N. Moitra M. B., Member, Motor Vehicles Department Enquiry Special Committee.

- - - - - - - - - - -

"I have carefully gone through the report of Mr. Rooney, President of the Motor Vehicles Enquiry Committee, but I am sorry that I do not agree with his findings. There have been many side issues not quite relevant to the terms of reference. The main issue, viz., whether the Superintendent abused, assaulted and insulted Abdul Hashem has been amply proved and I have not the slightest hesitation in finding Mr. M. N. Roy guilty of the charge. I am also convinced that Mr. M. N. Roy did deliberately insult the Mahomedan feeling by pulling his beard and the denial of this allegation in toto appears to me a gross perversion of truth quite unbecoming of any respectable man. If Mr. M. N. Roy had admitted his sudden loss of temper owing to any undue provocation, his conduct could have been justified to some extent but without it I do not find any redeeming feature to support his conduct. As the name of the Calcutta Corporation has been tarnished by Mr. M. N. Roy, he should be allowed to resign forthwith but if he does not do so, I recommend his dismissal.

Central Municipal Office.
Calcutta, the 3rd July 1935,

B. Mukerji,
Offg. Secretary to
the Corporation

"খেয়ালী"র মামলায়

রহস্যময় পরিস্থিতি

গতকল্য "খেয়ালী"-র মানহানির মামলায় এক রহস্যময় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। প্রকাশ যে, "খেয়ালী"র ভূতপূর্ব মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদক শ্রীসুধীর কুমার সরকার দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক আবেদন পেশ করিয়াছেন। এই আবেদনের সহিত আমরা একমত নহি এবং সুধীর বাবুর এই কার্য্য আমরা সমর্থন করি না।

শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কোনই সংশ্রব নাই

"খেয়ালী" ও সুধীর বাবু

"খেয়ালী"-র পঞ্চম বর্ষ ত্রয়োদশ সংখ্যা হইতে শ্রীসুধীরকুমার সরকারের সহিত "খেয়ালী"র সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে এবং ত্রয়োদশ সংখ্যা হইতে বর্ত্তমান সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং সুধীর বাবুর বর্ত্তমান কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিবার কোনই ক্ষমতা "খেয়ালী"র নাই। বলা বাহুল্য, গতকল্য আদালতে তাঁহার আচরণ আমরা সমর্থন করি না।

মানিক-জোড়কে চিনিয়া রাখুন

অন্ধকারের অন্তরালে হিন্দুস্থানের নৈশ-দূত

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার যেদিন প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকার তাঁহার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগে কলিকাতার মেয়র নলিনীরঞ্জনকে অভিযুক্ত করেন, সেই দিনই গভীর রাত্রে, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীটের গুপ্ত রাস্তায় হিন্দুস্থান বিল্ডিং হইতে দুইজন লোককে বাহির হইতে দেখা গিয়াছিল। মাণিক-জোড়ের নাম আপনাদের জানাইতেছি: ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল ও ব্যবসাদার-কর্ম্মী সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তাঁহারা সেইখান হইতে প্রথম গিয়াছিলেন "এ্যাড্ভ্যান্স"-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কাছে। তাহার পর যথাক্রমে—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও বসুমতীর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নিকট। উহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, পরদিন প্রভাতে যাহাতে মামলাটির বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয়। শ্রীযুক্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বসু এই সংবাদের সত্যাসত্য সাধারণকে জানাইবেন কি?

"খেয়ালী"র পঞ্চম বর্ষ একাদশ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত

ঐ সংখ্যায় শ্রীসুধীর কুমার সরকার প্রকাশক ও মুদ্রাকর ছিলেন।

বামার দালাল

কলিকাতার এক ইনসিওরেন্স কোম্পানীর কর্ম্মচারী বীমার দালালী পরিহার করিয়া বামার দালালী আরম্ভ করিয়াছেন। এক কবি-যশঃপ্রার্থী সাহিত্যিকও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরী গ্রহণ করিয়া আদর্শচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহারা স্থান বিশেষে দালালী ব্যবসায় আরম্ভ করিলে অশেষ লাভবান হইবেন।

'খেয়ালী'র পঞ্চম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা হইতে পুন[illegible] সংখ্যার শ্রীসুধীর কুমার সরকার সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকর ছিলেন।

এপিট ওপিট

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একটি ভীতি সঙ্কুল মুহূর্ত্ত—

জানলার মধ্য দিয়া অন্ধকার লেপিয়া যাওয়া পরিচিত পথের দিকে চাহিয়া নন্দ কী ভাবিল তাহা সেই-ই জানে। পরে মিনতিকণ্ঠে বলিল: তোকে চিঠি দিইনি বলে কিছু মনে করিসনে নোতুন-বৌ। বিষ্টুকে দিয়েই তো খবর পাঠিয়েছিলুম, এর পর কিছু লিখে জানাতে হবে এটা ভাবতে পারিনে। এখানে আমি একা নেই। একটি মেয়ে আমার কাছে আছে। সত্যি বলছি, নোতুন-বৌ, ও রকম শান্তশিষ্ট মেয়ে হঠাৎ চোখে পড়ে না। বাপের সঙ্গে দেখা করতে ও-পাড়ায় গিয়েচে, এক্ষুণি হয়তো এসে পড়বে। একটা কথা আমার রাখ, দেখা হলে তাকে যেন কিছু গালমন্দ করিসনে। মেয়েমানুষের ওপর আমার যে খুব লোভ আছে তা নয়। হঠাৎ এসে পড়লো, না করতে পারলুম না। যা বল্লুম মনে থাকবে তো?

মুরলা নন্দর দিকে তাকাইয়া তাহার কথাগুলি গিলিতেছিল। সে চিন্তা করে: মাথার চুল ছিঁড়িয়া পাগলের মত চিন্তা করিয়া, দরজা জানলা, বাসনকোশন ভাঙ্গিয়া তচনচ করিয়া একটা তুমুলকাণ্ড করাই হইতেছে ঠিক উপযুক্ত সময়। তাহার প্রতি নন্দ যেরূপ অবিচার করিয়াছে তাহার আশু প্রতিশোধ লইতে হইলে ইহা ছাড়া অন্য কোন সহজ পন্থা তাহার জানা নাই।

তবুও কেন জানিনা, মুরলা ধীরকণ্ঠে বলিল: আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। ছেলেগুলোর কী ব্যবস্থা করেচিস, শুনি?

তার ব্যবস্থা কি আর না করেছি, নোতুন-বৌ। তুই ওদের নিয়ে যেমন ঘরসংসার করছিলি তেমনি ক'রগে যা। তার যা কিছু খরচপত্তর সেতো আমাকেই করতে হবে।

মুরলা কোন জবাব দিল না। তাহার চক্ষু দুটি হইতে অশ্রুবন্যা অপ্রত্যাশিত ভাবে গণ্ড বহিয়া তাহার হাতের উপর আসিয়া পড়িল। চক্ষু মুছিয়া লইবার কোন চেষ্টাই সে করিল না।

ছি: মুরলা, কাঁদিসনে বলিয়া পুনরায় জানলার ভিতর দিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বলিল: ওই বোধহয় সুন্দরী আসচে। চোখ মুছে ফ্যাল নোতুন-বৌ, ওর সামনে কান্নাকাটি করে কোন লাভ নেই।

মুরলা কাপড়ের খোঁট দিয়া চক্ষুদুটি বেশ করিয়া মুছিয়া লইল। সে কল্পনায় সুন্দরীকে অপূর্ব্ব সুন্দরী বলিয়া মনে করিয়াছিল। ইহার অতুলনীয় রূপ-সৌন্দর্য্যের কাছে তাহার দুঃখ চিন্তাক্লিষ্ট দেহের ক্রমবিলীয়মান সৌন্দর্য্য হীনপ্রভ বলিয়া মনে হইবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? ইহার উপর সে তিন-চারিটি শিশুর জননী।

পুনরায় ঈর্ষার জলন্ত বহ্নি মুরলার দেহের প্রতিটি শিরায় উন্মত্তবেগে নাচিয়া উঠিল। কিন্তু হঠাৎ তাহার চক্ষু দুটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল। যে-মেয়েটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল সৌন্দর্য্যের প্রখর জ্যোতি, দেহের লাবণ্য-কান্তি বলিতে তাহার কিছুই নাই। ও রকম সাধারণ ধরণের মেয়েমানুষ ইতিপূর্ব্বে সে বহুৎ দেখিয়াছে। নন্দ কেমন করিয়া এই কুৎসিত মেয়েটির প্রতি মুগ্ধ হইল কিছুতেই সে বুঝিতে পারিল না।

ঘরের মধ্যে একটি অপরিচিত নারীকে দেখিয়া সুন্দরীর আপদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মুরলা কোন কথা কহে নাই। যত গোল বাঁধিল সুন্দরীকে লইয়া। চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া সুন্দরী রুদ্ধ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল: এ-সব আবার কি, নন্দ?

অপরাধীর ন্যায় নন্দ বলিল: কিছু নয়। তুই খামাকা মাথা গরম করিস কেন, বলতো? গাঁয়ের চেনা লোক দেখা করতে এসেচে, তাতে দোষ কি?

ও-সব কথা তুই অন্যলোকদের বোঝাগে। তোর আর একটা সংসার আছে আগে আমায় জানাসনি কেন?

মনে করেছিলুম একদিন তোকে সুবিধে মত বল্লেই হবে।

বেশ, তুই ওকে নিয়ে থাক। আমি এক্ষুণিই আমার বাবার কাছে চল্লুম— বলিয়া সুন্দরী ঘর হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই নন্দ তাহার হাতটি খপ করিয়া ধরিয়া বলিল: রাগ ক'রে চলে যাসনে, সুন্দরী, আমার কথাটা শোন।

সুন্দরী রাগের মাথায় পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

মুরলা বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থায় তক্তার উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মেয়েটিকে সে কি বলিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। নন্দকে সান্ত্বনা দিবার মত কোন ভাষা সে খুঁজিয়া পাইল না। সে তাড়াতাড়ি বলিল: তোর জন্যে কী এনেচি দেখ।

পরমুহূর্ত্তে সুন্দরী পাশের ঘর হইতে কাপড় ছাড়িয়া পূর্ব্বোক্ত ঘরে প্রবেশ

করিল। মুরলা সুন্দরীর দিকে চাহিয়া বলিল: এই জিনিসটা ধর।

নন্দ ঘরের কোণে কী একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। বলিল: মুরলার হাত থেকে ও জিনিষগুলো নেনা সুন্দরী। ও তোর কিছু অনিষ্ট করবে না।

নন্দ নরম হইয়া যাইতেই সুন্দরী ঠাণ্ডা হইয়া গেছে। তাহার সে উগ্রমূর্তি আর নাই। বলিল: তুই যা করচিস, তাই কর। ওকে কী করে আদর যত্ন করতে হবে তা তোর ঠেঙ্গে শিখতে হবে নাকী? পরে পাটালির পুটলিটি হাতে লইয়া মুরলাকে বলিল: এ গুলো তোদের তৈরী বুঝি?

হ্যাঁ! কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মুরলা সুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল: গেল শনিবার রাতে মঙ্গলা গাইটার একটা নই-বাছুর হয়েচে। সারারাত চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত ফেলতে পারিনি।

গরু-বাছুর পালতে আমার খুব ভাল লাগে।

ইহারই মধ্যে সুন্দরী মুরলার সহিত বেশ আলাপ জমাইয়া লইয়াছে। বলে: মুখে একটা আঁচিল হয়েচে, কী ক'রে এটা নষ্ট করি বলতো?

মুরলা হাসিতে হাসিতে বলে: আঁচিলের গোড়াটায় একটা চুল বেঁধে রাখিস, তা'হলে আপনিই খোসে যাবে।

নন্দ বলে: আজ রাতে বুঝি রান্নাবান্না করবিনে, সুন্দরী? বাড়ীতে অতিথি এসেচে, উপোস করে থাকলে তোকেইতো নিন্দে করবে।

তোকে অতো হাঁপাতে হবেনা। লোকজন এলে তার ব্যবস্থা করতে হয় এটা আমার জানা আছে।

রাত যে অনেক হতে চল্লো। কখন ও সব করবি? খেয়ে-দেয়ে কত গল্প করতে পারিস করনা।

সুন্দরী এ-কথার কোন জবাব না দিয়া খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য রান্না-ঘরের দিকে উঠিয়া গেল।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেলে মুরলা পুনরায় তক্তার উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিল: রাতে তাহার শোয়ার ব্যবস্থা ইহারা কোথায় করিবে কে জানে! নন্দকে বিশ্বাস নাই। বলা যায় না, অন্য কোন লোকের বাড়ীতে সে তাহার শোয়ার ব্যবস্থা করিয়া আসিবে। সুন্দরীকে সে একটিমাত্র রাতের জন্য ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না, ইহা বিশ্বাস করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

পুনরায় মুরলা তাহার অন্তরে তীব্র জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল এবং থাকিয়া থাকিয়া তাহার দেহের প্রতিটি শিরা অসহনীয় উত্তেজনায় কঠিন হইয়া উঠিল।

সুন্দরী নন্দকে বলে: তুই একটু বাইরে যা দিকি, আমাদের দরকার আছে।

নন্দ এ-কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া ঘরের বাইরের দাওয়ায় বসিয়া বিড়ি খাইতে খাইতে নানা রকম চিন্তা করিতে লাগিল।

সুন্দরী একটু সপ্রতিভ হইয়া বলিল: রাত অনেক হয়েচে, এইবার তুই আমার বিছানায় শুয়ে পড়।

আর তুই কোথায় শুবি?

তোর পাশেই।

না, না, তা হয় না। আমার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। যেখানে হোক শুলেই হলো। মেঝেতে শোওয়া আমার অভ্যাস আছে। বাইরের দাওয়ায় একটা রাত আমি স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারবো।

তুই কি পাগোল হয়েচিস, মুরলা। একটা রাত তোর পাশে শুতে আমার কোন কষ্ট হবে না।

ক্ষীণকায়া সুন্দরীর সহিত নন্দ কী করিয়া অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইল ইহা কল্পনা করিতেও মুরলার মনের কোণে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুকাবহ ঔৎসুক্যের প্রবল অস্বচ্ছন্দতা উঁকি মারিয়া ওঠে। তাহার চোখের সামনে একটি চিত্র ভাসিয়া ওঠে। সুন্দরীর ওই তো হাড়গোড় বারকরা চেহারা! রূপের বিশদ বিশ্লেষণ করিতে তাহার মনের প্রসারতা আপনা হইতে সঙ্কুচিত হইয়া আসে। নন্দ সুন্দরীর মধ্যে এমন কী জিনিষের সন্ধান পাইল যাহাতে তাহার মন-প্রাণ ইহার উপর অবলীলাক্রমে সমর্পণ করিতে লেশমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিল না।

নন্দ বাহির হইতে বলিল: —এবার ঘরের মধ্যে আসতে পারি, সুন্দরী?

আয়না, বাইরে বেশীক্ষণ থাকলে ঠাণ্ডা লেগে আবার অসুখ করতে পারে।

নন্দ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিছানার উপর শুইয়া বলিল: —আলোটা এইবার নিবিয়ে দে, সুন্দরী

হা, দিই।

আলো নিবিয়া যাইতেই বাইরেকার পুঞ্জীভূত সূচীভেদ্য অন্ধকার ঘরটিকে নিমেষে গ্রাস করিয়া ফেলিল। দুই একটি কথা কইবার পর ঘরটি নিস্তব্ধ হইয়া আসিল।

সুন্দরীর পাশে শুইয়া মুরলার চোখে ঘুম নাই। সে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে নন্দর বিছানার দিকে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া আছে। এবং থাকিয়া থাকিয়া বাড়ীর কথা, সুন্দরীর কথা তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে।

সকালে উঠিয়াই মুরলা নন্দকে বলিল: — আজ এখুনিই বাড়ী যাবো।

এত তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে চাস কেন? কষ্ট ক'রে এলি যখন, দু'দিন থেকে গেলে হতোনা?

আর তোকে দরদ জানাতে হবে না। ছেলেপিলেগুলোকে বাড়ীতে একা ফেলে এসেচি, এখন তোর সঙ্গে রঙ্গ আলাপ করবার সময়ই বটে।

তা হলে আমার সঙ্গে চল, তোকে একটু এগিয়ে দিই। এক্ষুণি আমাকে আবার চটকলে ছুটতে হবে বলিয়া নন্দ তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরিয়া লইল।

সুন্দরী মুরলার হাতে দুটো টাকা দিয়া বলিল :—ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু মিষ্টি কিনে দিস।

টাকা দিতে হবেনা সুন্দরী, তোর মুখের কথাই যথেষ্ট।

দুদিন থেকে গেলে হত না?

ঘর সংসার ফেলে এসেচি, এখানে দুদণ্ড থেকে স্বস্তি পাবো না।

নন্দ এবং মুরলা নিঃশব্দে অনেকখানি পথ চলিয়া আসিল। মুরলা ভাবে নন্দকে সে কোন কথা না বলিয়াই বিদায় লইবে। তাহাকে কোন কথা বলা এখন বৃথা। একটি চিন্তা তাহাকে উৎব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এ কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া নন্দ তাহাকে যে পরিমাণ টাকা পাঠাইয়াছে খরচার অনুপাতে তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। অথচ নন্দকে টাকার কথা বলিতে তাহার কেমন যেন লজ্জা বোধ করিতেছে। নন্দ এ সম্বন্ধে কোন কথা মুখ ফুটিয়া বলে নাই।

রাস্তায় যাইতে যাইতে কোন কথা মুরলার মুখ দিয়া বাহির হইল না। নন্দ তাহার সহিত যে এই দীর্ঘ দশ বৎসর সংসার করিয়াছে, এ সময় অন্ততঃ তাহার চুপ করিয়া থাকা কি উচিত।

রাস্তার চৌমাথায় আসিয়া নন্দ থামিল। এইখান হইতেই তাহাকে চটকলের রাস্তা ধরিতে হইবে। অতি সংক্ষেপে সে বলিল :—বাড়ী গিয়ে মাঝে মাঝে চিঠি দিস, আর যখন যা দরকার হবে তা লিখতে যেন লজ্জা করিস নে নোতুন বৌ।

পরে দশটাকার একখানি নোট মুরলার হাতে দিয়া বলিল :—নে এটা ধর। আমার ঠেঙ্গে এখন আর কিছু নেই। পরে আরও কিছু পাঠিয়ে দেব'খন।

তুই বাড়ীই যখন আর মাড়াবি নে তখন আর তোর টাকা নিয়ে কি করবো? এখনও এ শরীরে শক্তি সামর্থ্য আছে, তা দিয়ে ছেলেগুলোকে খেতে দিতে আমি পারবো।

বাড়ী যাবোনা তোকে কে বল্লে?

তা হলে, এই সামনের শনিবার তোর যাওয়া চাই। ছেলেপিলে এবং গাই-বাছুরগুলো তোর একবার দেখা দরকার নয়? না গেলে কিন্তু হুলুস্থূল কাণ্ড বাধাবো, এটা যেন মনে থাকে।

যাবো নোতুন-বৌ, যাবো। ওই চটকলের ভোঁ বাজলো, আর আমি দাঁড়াতে পারবো না।

আচ্ছা, তুই যা। কথাটা যেন স্মরণ থাকে বলিয়া মুরলা ষ্টেসনের পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। দুই এক পা চলিয়া আসিয়া সে নন্দর দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই সে দেখিল নন্দ একই যায়গায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুরলা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহাকে অনেক কথাই না বলিতে পারায় সে গুম হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুরলা একটুখানি থামিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল।

নন্দ কথা বলবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল। পরে হাত নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল :—ছেলেপিলেগুলোকে একটু যত্ন করিস, নোতুন-বৌ।

মুরলা প্রত্যুত্তরে কী বলিল তাহা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

নন্দ চটকলের পথ ধরিল।

খানিকটা পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া মুরলা তার পশ্চাদভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। কিন্তু কোথায় নন্দ? তাহাকে আর দেখা যায় না। মুরলার হঠাৎ মাথা গরম হইয়া উঠিল। সে চিন্তা করে : পুরুষ মানুষকে যেন কেউ বিশ্বাস না করে। নন্দ তাহাকে কি প্রতারণাটাই না করিয়াছে। সুন্দরীকে বাহাদুর বলিতে হইবে। এই অল্প কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে আদর যত্ন করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। শত চেষ্টা করিয়াও সে একটী কথাও বলিতে পারে নাই। আর নন্দকেও বলিতে হয় মাত্র মাস দুয়েকের ঘনিষ্ঠ আলাপে সুন্দরীর কথায় সে ওঠা বসা করিতেছে। বুদ্ধিশুদ্ধি তাহার কি একেবারে লোপ পাইল নাকী? তাহার যে আর একটি সংসার আছে একথা নন্দ যেন ভুলিয়াই গেছে—এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে মুরলার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

গাঁয়ে ঢুকিতেই যখন সকলে তাহাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া উদব্যস্ত করিয়া তুলিবে তখন তাহাদের মুখ সে কি করিয়া ঠেকাইয়া রাখিবে : হ্যাঁলা মরলা, নন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারলিনি? মেয়েটার কাছে জব্দ হয়ে ফিরে এলি! সত্যই তো সুন্দরীর কাছে জব্দ হইয়াই সে ফিরিয়া আসিয়াছে। নন্দ ফিরিয়া আসে ভালোই। না আসিলে তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। এখনও তাহার দেহে যে অপরিমিত ক্ষমতা আছে তাহা ভাঙ্গাইয়া সে ছেলেপিলেদের এবং নিজের কোনরকম গ্রাসাচ্ছাদন করিয়া লইতে পারিবে।

মুরলা কল্পনায় দেখে : প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় নন্দ কারখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুন্দরীর সঙ্গে কতরকমের ঠাট্টা তামাসাই না করে।

মুরলা পথ চলিতে চলিতে একটা কথা স্মরণ হওয়ায় থামিয়া যায় : সুন্দরীর কাছে ফিরিয়া গিয়া এক্ষুণি সে একটা হেস্তোনেস্তো করিবে। সে যখন তাহার কাছ হইতে নন্দকে ছিনাইয়া লইয়াছে তাহাকে সহজে সে নিষ্কৃতি দিবে না। আবার ভাবে : না, থাক, যাইয়া কোন লাভ নাই। সুন্দরীর কি দোষ—নন্দ আস্কারা না দিলে সে কি মাথায় চড়িয়া বসিতে পারিত—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে সে ষ্টেসনের দিকে দ্রুত আগাইয়া চলিল।

শেষ

——

নাট্য-তরঙ্গ

পথের সাথী প্রসঙ্গে

রঙমহলে 'পথের সাথী' দেখে এলুম। অভিনয় দেখতে দেখতে বারম্বার বিমর্ষচিত্তে কেবল এই কথাই স্মরণ করতে হচ্ছিল যে, এই সব তথাকথিত নাট্যরূপায়িত উপন্যাস-গুলি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবার সময়ও মূলতঃ উপন্যাসই থেকে যায়। অতগুলি দৃশ্যে এবং সঙ্গীতে বিভক্ত হ'য়ে, এবং অতগুলি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাড়ে চার ঘণ্টা কি পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী হৃদয়ভেদী বক্তৃতা সত্বেও কোনখানেই এর নাটকত্ব দানা বেঁধে ওঠে না।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই নাম করতে হবে—অমর মাষ্টারের ভূমিকায় নরেশ মিত্রের, আর শোভার ভূমিকায় চারুবালার। চমৎকার। সমস্ত বইখানির মধ্যে এই দুটি ভূমিকা—অনেকক্ষণ আর অনেকদিন ধ'রে মনে রাখবার মত হয়েছে। যোগেশবাবুর অভিনয় নূতনত্ব বিহীন। সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট ক'রে,—কেবলমাত্র বাক্যে-ন্দ্রিয়কে সচল ক'রে অভিনয় করা,—তাঁর কাছে এতবার দেখেছি যে ও আর ভাল লাগেনা। যোগেশবাবুর মত একজন অভিনেতার নিজেরই বা ভাল লাগে কেন ভেবে বিস্মিত হই। জহর গাঙ্গুলী তাঁর মানস মোহনেই র'য়ে গেছেন—এতদিন পরেও তাঁর কিছুমাত্র প্রগতির লক্ষণ দেখা গেলনা। প্রথম দর্শনের মুখে রুবির মত একজন শিক্ষিতা কুমারীর সঙ্গে তাঁর আলাপ—আরও সংযত হওয়া দরকার। বড় বৌয়ের ভূমিকায় রাজলক্ষ্মী বেশ স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। পথের সাথীর অভিনয় প্রসঙ্গে আর কারুর নাম করবার ইচ্ছে নেই।

অত্যন্ত আনন্দিত এবং বিস্মিত হয়েছি 'পথের সাথী'র গানগুলি শুনে। অমন দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনার ওপর—সুর সংযোজনার এতখানি বিশেষত্ব সত্যিই আশা করতে পারিনি। দুঃখের বিষয় বাঙলা দেশের প্রায় সবগুলি সাপ্তাহিকই পথের সাথী"র সমালোচনায় এই গানের সুর সম্বন্ধে কোন-রকম উচ্চবাচ্য করেন নি। কোন একটি রাগিণীর সঙ্গে অন্য একটি নিষিদ্ধ বা অপ্রচলিত রাগিণীর দুরূহতম সংমিশ্রন, কোন অলৌকিক উপায়ে তাঁদের সকলের কান এড়িয়ে—ভাবতে বিস্ময় লাগে আমার। বাইজী আর কীর্ত্তনওয়ালীর মুখে "কৃষ্ণ কলঙ্কিনী আমি থাকি গোকুলে"—গানখানি বাঙলা রঙ্গমঞ্চের সুরের ইতিহাসে রেকর্ড হ'য়ে থাকা উচিত। এতখানি অপ্রত্যাশিত নূতনত্ব আজকাল সত্যিই বিরল। একই গানের মধ্যে দুজনের কণ্ঠে গজল ও কীর্ত্তনের পরস্পর বিরোধীলীলা এমন যে অপরূপ মূর্ত্তি ধারণ করতে পারে—আমি নিজের কানে না শুনলে কিছুতেই বিশ্বাস করতুম না। এই অভিনব অভূতপূর্ব্ব conception-এর জন্য সুরশিল্পী অমর বোসকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই অমর বোস নামীয় ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে আমার মনে যে দু'একটি প্রশ্ন জেগেছে তা আমি এই প্রসঙ্গে বলতে ইচ্ছে করি। রঙ্গমহলের প্রায় প্রত্যেকখানি নাটকে অত্যন্ত দীনতম ভূমিকাতেও লক্ষ্য করেছি এঁর অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য। দর্শক সাধারণের মনে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দুর্ল্লভ একটি ক্ষমতা এঁর আছে। কিন্তু তবু আমার মনে হয় (অবিশ্যি আমার মনে হওয়াটা নির্ভুল না হতেও পারে) যে রঙ্গমহল কর্তৃপক্ষ ভূমিকা বণ্টনের সময় এঁর প্রতি ঠিক সুবিচার করছেন না।

সেদিন আমার একটি বন্ধু বাঙলার মেয়ে দেখে এসে বললো—যে, নরেশবাবুর অসুস্থতার জন্য সে আজকে অমর বোসকে—তাঁর ভূমিকা অভিনয় করতে দেখে এলো। এবং শেষ অবধি একথা তার মনে করবার সুযোগ ঘটেনি যে এটা অমরবাবুর original part নয়। নরেশবাবুর মত একজন প্রথম শ্রেণীর শক্তিমান অভিনেতার ভূমিকা—যে অভিনেতা ভালভাবে অভিনয় করতে পারেন—তার প্রতিভাকে অস্বীকার করবো কোন যুক্তি দিয়ে ?—

একে তো আমাদের দেশে drama নেই—যা আছে তার সব গুলিকে drama বলা চলে না, এবং আজকাল যা চলছে তা উপন্যাসেরই সবাক্ সংস্করণমাত্র। আমাদের উপন্যাস সাহিত্য, নাট্য সাহিত্য, আর ফিল্ম সাহিত্য একই। আজকাল কায়ক্লেশে একখানা উপন্যাস লিখে ফেলতে পারলেই—রঙ্গমঞ্চ আর ছায়াচিত্র পর্য্যন্ত তার গতি অবারিত। এইতো আমাদের সাহিত্য প্রতিভা আর প্রগতি। মৌলিক কোন কিছু করার পথ সব দিক দিয়ে এঁটে বন্ধ করা। এইভাবে আর বছর পাঁচেক চললে—মৌলিক নাট্যকারকে লোকে রাঁচি পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। কারণ আগামী পাঁচবৎসরের মধ্যে বাঙলাদেশে এই সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে যে, উপন্যাসের বাণীই—নাটকের বাণী ; নাটকের বাণীই—ছায়াচিত্রের বাণী ; এবং ছায়াচিত্রের বাণীই হয়ত বা গ্রামোফোনের বাণী ; অতএব উপন্যাস লেখো।—

যাক্ যা বলছিলাম। মুগ্ধ হ'য়েছি 'পথের

দেহ-যমুনা

[নাটক]

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ দৃশ্য

ভবানীপুর

গীতার ড্রয়িংরুম

বিজয়ের প্রবেশ

বিজয়—(ঘরে গীতাকে না দেখিয়া) গীতা! গীতা!—(গীতার প্রবেশ)—

গীতা—কি বলছেন ?—

বিজয়—কি বলছেন কি রকম—সেই মালকোষের তানটা—

গীতা—গান আর আমি শিখবোনা।—

বিজয়—(বিস্মিত হইয়া)—বুঝলাম না!

গীতা—আর আমি গান শিখবোনা।

বিজয়—আর—তুমি—গান শিখবেনা ?—কেন ?—

গীতা—কেন আবার! এম্নি শিখবোনা।

বিজয়—এতো আচ্ছা—এক জ্বালায় পড়া গেল দেখছি। (চটিয়া) আরে—গান যে কেন শিখবেনা তারতো একটা কারণ আছে ?—

গীতা—সব জিনিষেরই কি কারণ থাকে নাকি ?—

বিজয়—নাঃ—থাকেনা—এমনি একটা উড়ো কথা বললেই হ'ল আরকি।—

গীতা—আমার আর ইচ্ছে নেই।—

বিজয়—এইতো বেশ কথা। (একটা চেয়ারে বসিল) কিন্তু কেন ইচ্ছে নেই সে কথা—অ—হ!—তুমি বুঝি সেই কথা ভেবে গান শিখবেনা বলছো!—

গীতা—(বিস্মিত)—কোন কথা ?—

বিজয়—সেই যে কি ছুটো নাম দাদা বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছে সুস্নাতা আর একটা কি যেন—হ্যাঁ তাপহরণ তাদের কথাতেই বুঝি ?—

গীতা—কি তাদের কথায় ?—

বিজয়—তাদের কথাতেই বুঝি গান শিখবেনা বলছো ?—

গীতা—তারা কি বলেছে—আপনি জানেন ?

বিজয়—জানিনা! আমি সুস্নাতার প্রতিপালক—আর—

গীতা—সুস্নাতাকে জানেন না আপনি ?—

বিজয়—রামোঃ। জানা দূরে থাক অমন বিদ্‌ঘুটে নাম আমার বাবাও কখনও শোনে নি।—আমি বুঝতেই পারছিনে—সে লোকটা আমার againstএ এরকম বলে গেল কেন!—মিছি মিছি—

গীতা—মিছি মিছি ?—

বিজয়—নিশ্চয়ই।—

গীতা—কিন্তু আমি তার সব কথা বিশ্বাস করেছি।—

বিজয়—বিশ্বাস করেছো ?—ভাল। (মুখ ফিরাইয়া বসিল)

গীতা—(বড় কষ্টে হাসি চাপিয়া) রাগ করলেন ?—

বিজয়—না—

গীতা—সত্য বলুন না রাগ করলেন ?—

বিজয়—না।—

গীতা—আমি নিশ্চয় বলছি আপনি রাগ করেছেন।

বিজয়—(হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া) দেখ গীতা সব সময় তোমার এ ইয়ারকি আমার ভাল লাগে না।—

সাথীর' গানের সুরে। এই গুণী সুরশিল্পী এবং অভিনেতাটিকে আমরা বড় ভূমিকায় দেখতে চাই। রঙমহল কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি, তাঁরা যেন আমার কথাগুলো একটু ভেবে দেখেন। কারণ অতি ছোট ছোট ভূমিকা থেকেই আমরা পেয়েছি; শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যো, রাধিকানন্দ প্রমুখ বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃবৃন্দকে—তবে অমর বোসকেই বা পাবো না কেন ?

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

(একটু পরে গীতা উঠিয়া বিজয়ের কাছে গিয়া)

গীতা—কৈ ! তানটা দেখিয়ে দেবেন চলুন—।

বিজয়—না !—আমি আর গান শেখাবো না ।—

গীতা—কিন্তু কেন শেখাবেন না তারতো একটা কারণ আছে ?

বিজয়—এমনি—আমার ইচ্ছা নাই ।

গীতা—(একটু পরে)—যাক বাঁচা গেল ।—কালকেই তো দেওঘর যাচ্ছি—(বিজয় হঠাৎ তার দিকে চাহিল) যাব না লিখে দিয়েছিলাম । কিন্তু কি হবে আর কোলকাতায় থেকে । যাই দিন কতক একটু বেড়িয়ে আসি ।—

বিজয়—যাওয়াচ্ছি তোমাকে—আসুক দাদা আজকে ।—

গীতা—দাদা এসে আমাব কি করবেন ?

বিজয়—কি করবেন তা দেখতেই পাবে । সাহস কম নয় ?—

[গীতা হাসিতে হাসিতে হারমোনিয়ামে গিয়া বসিল এবং বেয়াড়া রকম একটা গৎ বাজাইতে লাগিল—বিজয় আপন মনে বক বক করিতেছে দেখিয়া সুর কমাইয়া দিয়া তাহা শুনিতে লাগিল ।]

বিজয়—আর গান শিখবোনা ।—ওঃ ভারী ভয় দেখানো হ'ল আমাকে ! ও ভয়ে কম্পিত নয় আমায় হৃদয় ! হুঁঃ ।—

গীতা—(হারমোনিয়াম থামাইয়া)—কী চা'টা খাবেন—না এইরকম বসে বসে বক্ বক্ কোরবেন ?—

বিজয়—(চটিয়া)—চা না দিলে কি উড়ে আসবে নাকি ?—

গীতা—তাই বললেই তো হয়—(চলিয়া গেল এবং চা লইয়া আসিল) আচ্ছা বিজয়বাবু আপনি এত frank কেন ?—আপনি কি জানেন না সংসারে frank হওয়া কত বিপদ ।—

বিজয়—আমার আবার বিপদ কি ? তিন কুলে কেউ কোথাও নেই—যে—হটাৎ মরে গিয়ে আমার বিপদ ঘটাবে :—তবে ?—

গীতা—(ব্যথিত হইয়া)—কেউ নেই আপনার ?—

বিজয়—না :—

গীতা—আহা, তা হ'লে তো আপনার বড় কষ্ট !—

বিজয়—ওঃ! দরদ যে একেবারে উথলে উঠলো । আমার কেউ নেই তাতে তোমার কী ?—ভয়ানক ডেঁপো হয়ে উঠেছ দেখছি ।

গীতা—আপনার উপর যে রাগ করে তার মত হতভাগ্য পৃথিবীতে নাই ।—আপনি পাগল—একেবারে বদ্ধ পাগল ।—

বিজয়—আর কেউ একথা বললে আমি সহ্য কোরতাম না—

গীতা—(হাসিয়া)—কেবল আমি বলেছি বলেই বুঝি সহ্য করলেন ?—

বিজয়—(গম্ভীর)—নিশ্চয়—

গীতা—কিন্তু কেন সহ্য কোরলেন । বলুননা বিজয় বাবু—!—

বিজয়—আঃ ! তুমি বড় বিরক্ত কোরতে পার ?—

গীতা—আজকে একটা সত্য কথা বলবো বিজয়বাবু—রাগ কোরবেন না বলুন—

বিজয়—আমি কি সাধে রাগ করি । তোমার অত্যাচারে আমার রাগ হ'য়ে যায় । কিন্তু বল তোমার সত্যি কথা—

গীতা—(একটু হাসিয়া) আপনাকে আমার—ভা - রী ভাল লাগে ।

বিজয় আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া পা দুলাইতে লাগিল—)

গীতা—সত্যি । এতখনি ভাল না লাগলেও চলতো ।—(চলিয়া যাইতেছিল)

বিজয়—এই বুঝি ভাল লাগার নমুনা ?—

গীতা—(হাসিয়া)—আসছি এখুনি ।

(প্রস্থান)

[বিজয়ের মুখে হঠাৎ প্রফুল্লতা দেখা দিল । সে গুণ গুণ করিয়া তান ভাজিতে ভাজিতে ঘরময়—ঘরময় খানিকটা বেড়াইয়া আসনে গিয়া বসিল । তারপর একটা গান গাহিতে লাগিল ।]

—গান—

সন্ধ্যায় বেলায় আমার দোরে—
থামবে তুমি হে মোর রাণী—
সেই আশাতেই রইল পাতা
মোর অভিলাষ আসন খানি ॥
তপন যখন অস্ত রাগে
চুমবে ধরায় শেষ সোহাগে

তখন রাঙা বনের পথে
চরণ তোমার পড়বে জানি ॥
হয়ত চাওয়া ব্যর্থ হবে
হয়ত তুমি আসবে না গো—
হয়ত গোপন গভীর প্রেমে
আমায় ভাল বাসবে না গো—
তবু আবার শেষ নিশীথে—
নূতন ক'রে চাওয়ার গীতে
সেতার আমার বাঁধতে হবে
—আসন আবার রাখবে আনি ॥

(গানের মাঝখানে গীতা ঘরে ঢুকিয়া বিজয়ের চেয়ারের পিছনে দাড়াইয়া গানের পর্দ্দাগুলি দেখিয়া লইতেছিল। গান শেষ হইয়া গেল)—

গীতা—আপনার মুখে এ গান কিন্তু ঠিক কান্নার মত শোনাচ্ছে।

বিজয়—কান্নারই গান কিনা !—

গীতা—তাই হবে বোধ হয়। কিন্তু আজ্‌কে তান করলেন না কেন ?—

বিজয়—তানে মনের কথা ঠিক সহজ ক'রে গাওয়া যায় না।

গীতা—(মুখে কাপড় চাপা দিয়া)—ও মা ! এই কি আপনার মনের কথা নাকি ?—

বিজয়—ভাগ্‌ !—

(গীতা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পালাইল) —— (ক্রমশঃ)

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

মনোরম সান্যাল

অদ্ভুত উপহার

সম্প্রতি রাশিয়া থেকে জেনেট গেনর অদ্ভুত্ এক উপহার পেয়েছে। ঐ বহুদূর দেশ থেকে জেনেট্‌এর কাছে বেশ ভারী এক প্যাকেট এলো—সবাই তাই ঠিক করলে ভারী দামী এক উপহার এসেছে। তাড়াতাড়ি তো খুলতে দে'য়া হ'লো। কিন্তু, আশ্চর্য্য, যত খোলা হচ্ছে তত খড়। অনেকক্ষণ পর, ছোট্ট একটি বাক্স থেকে বেরুলো বারোটি ডিম ! জেনেট্ বললে—দাম আছে ডিমগুলির। কারণ, প্রত্যেকটি ডিমের ওপরই আঁকা আছে তার ছবি—এক একটি ছবিতে বিশিষ্ট ভূমিকায়।

ঐ উপহারদাতার ডিমগুলিকে সেদ্ধ করে' দে'য়া উচিত্ ছিলো। একদিন জেনেট্‌এর কুকুর একটি ডিম ভেঙ্গে ফেললে। বাক্সে বন্ধ ডিমগুলির বয়েস কম হয় নি। রাশিয়া থেকে আসতে তাদের ভেতর পচে' একেবারে বিষ হয়ে গিছ্‌লো। এতো জঘন্য দুর্গন্ধ, যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত খারাপ। সে গন্ধ—এত ভীষণ যে নাকে গেলে ম'রে যাওয়াটা কিছু বিচিত্র নয়। তাই ভাঙ্গা ডিমের খানিকটা অংশ গায়ে লাগাতে কুকুরটিকে আচ্ছা ক'রে অ্যান্‌টিসেপ্‌টিকে স্নান করানো তো হ'লোই তা ছাড়া—ঘরটিকে ধোয়া হ'লো আগাগোড়া ফিনাইল আর স্পিরীটে। আর, ঐ ডিমের কুচোগুলো সাকে তুলতে হ'লো—মুখে তাকে পরতে হ'লো এক গ্যাস্ নিবারণী মুখোস, হাতে দস্তানা !

রাশিয়া থেকে এসেছিল ঐ উপহার ভারী যে দামী—আমাদের আর সন্দেহ নেই।

অ্যানা ষ্টেন্ ও হলিউড্

হলিউডের প্রত্যেকটি কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে—ভারী পরিষ্কার কথা সেদিন বলেছে রাশিয়ান্ মেয়ে অ্যানা ষ্টেন্। সে বলে—এই পার্টির কথাই ধরুন না। অন্যান্য জিনিষের মত—এই নিছক আনন্দের জিনিষটিও হলিউডে অত্যন্ত অস্বাভাবিক। এখানে মেয়েরা খেতে আসে প্রযোজক ও পরিচালকদের চোখের সামনে—নিজেদের দেহ-ভঙ্গিমার রূপ দেখাতে। তারা কথা কয়, চায়, হাঁটে—নিজের নিজের অস্বাভাবিক এক অভিনবত্ব নিয়ে। এবং সেটা তারা করে—এই আশায়, যে, কোনো প্রযোজক ও পরিচালকদের চোখে হঠাৎ পড়লে—একটা ফিল্মের কনট্রাক্ট তারা পেলে

পেতেও পারে। অস্বাভাবিকতার আবহাওয়ায় সব সময় তাই তাদের কাটে, স্বাভাবিকতার সাহচর্য্য তাই তারা পায় না।

শুধু মেয়েরাই—মিস ষ্টেনের মতে—এ রোগের ভোগী হলিউডে নয়। অনেক অসংখ্য পুরুষও। তাদের ভেতর কেউ গল্প লিখিয়ে, কেউ কবি, কেউ গান করে। যে সব গুণের পরিচয় দিতেই থাকে ব্যস্ত, স্বাভাবিকতার সাহচর্য্য তাই তারা পাবে কোথায়?

অ্যানা ষ্টেন্ তাই যখন কোনো পার্টি দেয়, সে এমন কোনো লোককে নেমন্তন্ন করে না, যাদের কিছুমাত্র ভবিষ্যৎ এই ছায়াছবির শিল্পের ওপর আংশিক ভাবেও নির্ভর করছে।

তাই তার পার্টিতে শোনা যায় অতি স্বাভাবিক হাসি, কথাবার্ত্তা আর দেখা যায় সাবলীল চালচলন।

ঐ রাশিয়ান্ মেয়ের আবহাওয়ায় যারা আসে—তারা আনন্দ তাই পায় অনেকের চেয়ে অনেক বেশী।

মেয়েদের চেনা

মেয়ে জাত্‌টা পৃথিবীতে অন্যতম একটা রহস্য—এ সবাই স্বীকার করবেন। তাদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না, তাই অচেনা একটি মেয়ের অন্তরের পরিচয় পাওয়া সবার কাছে দুষ্কর। অনেকে তাদের হাবভাব, চালচলন, চোখমুখ দেখে তাদের অন্তরের খানিকটা পরিচয় পেয়েছেন। তাঁদেরই কয়েকজনের মতামত আমি আপনাদের আজ শোনাচ্ছি।

ফ্রেডরিক মার্চ্চ বলে—একটি মেয়ের পরিচয়ের আয়না হচ্ছে একটি মেয়ের শরীরের ভঙ্গী। সে যখন চলে, তার শরীরের চলা আমি দেখি; সে যখন দাঁড়ায়—তার শরীরের দাঁড়ানো আমি দেখি। চলনে ও স্থিরতায় শরীরের আঁকাবাঁকা রেখা তাদের মনের পরিচয়ে কথা কয় বেশী।

একটি মেয়ের পরিচয়—ক্লার্ক গেবল্-এর মতে—তার রুচি। আমি দেখি তার রুচি তার চেহারার সঙ্গে ঠিক খাপ্ খেয়েছে কি না। নিজের রূপের উন্মেষ যে কোনখানে নিজে সে বুঝতে পারে কি না। তাদের সেই সৌন্দর্য্য মেপে তাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা আমি ঠিক করি।

রোনাল্ড কলম্যান বলে—পরিচয়ের জানালা একটি মেয়ের হচ্ছে—চোখ। মেয়ে যখন হাসে, আমি তার চোখের দিকে চেয়ে দেখি সে হাসি তার চোখেও আছে কি না।

মউরিশ শেভালিয়ে এতক্ষণ এক কোণায় চুপটি করে' ছিলো বসে। শেরীর গ্লাসে মৃদু একটা চুমুক মেরে সে বল্‌লে—উহুঁ! আমার মতে তোমাদের কারো মিল্‌লো না। একটি মেয়েকে আমার ধারণার জন্যে আমি যখন

উপরের ছবিটি হচ্ছে গ্রেথী হানসেন।
মেয়েটি অভিনয় করে গুমো-ব্রিটিশের ছবিতে।

মাপি, আমি একমনে শুনি তার কণ্ঠস্বর। সুন্দর কণ্ঠস্বর হচ্ছে সুন্দর স্বভাবের পরিচয়। একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর তোমার কানে এসে যখন বাজে, চোখ বুজে তক্ষুনি তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো—এর হৃদয়ে, এর মুখে আছে তার গলার মত মধু। শুধু একটি মেয়ের গলা শুনে নিরুদ্বেগে আমি তাকে ফুল পাঠাতে পারি, তার মুখ বা তার চেহারা একবার মাত্রও না দেখে।

মেয়েদের ঠোঁট দেখে তাদের সম্বন্ধে ধারণা করা সব চেয়ে সোজা। এবারকার বক্তা হচ্ছে রিচার্ড আরলেন। আমি দেখি তার ঠোঁটের ভঙ্গী ঠিক স্বাভাবিক কি না। তাতে রং মাখা বা তার নড়নচড়ন হচ্ছে আমার একমাত্র লক্ষ্য করবার বিষয়।

এবার গ্যারী কুপারের অভিমত জিজ্ঞেস করা হ'লো। সে বললে—একটি মেয়েকে দেখতে হ'লে, সবচেয়ে আগে আমি দেখি তার চোখ। তার পরেই ঠোঁট। সত্যিই, একটি মেয়ের ঠোঁট তার গুণের পরিচয় দেয় সবচেয়ে বেশী। তার ঠোঁটের প্রসাধন যদি হয় খারাপ, কোনো কাজেই যত্ন তার নেই—এ বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হতে পারেন। যদি তার প্রসাধন হয় ভারী—সে ন্যাকা। যে ঠোঁটের প্রসাধন পরিষ্কার, স্বাভাবিক, মনোরম—সে ঠোঁট দেখলেই চুমো খেতে আমার ভারী একটা আকাঙ্খা হয়।

আমেরিকান 'লা মিজারেবল্'

টোয়েন্টি-এথ সেঞ্চুরির সত্বাধিকারী ডেরাইল্ জানুক সেদিন তাঁর 'লা মিজারেবল্' সম্বন্ধে ভারী মজার কয়েকটি খবর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—ভিক্টোর হিউগোর ঐ গল্পটি কিনতে আমার পয়সা লাগে নি, কারণ ওর সম্পত্তি এখন সাধারণের। পরিচালনার জন্যে পরিচালক বলস্‌লেওয়াস্কিকে আমি ধার করি মেট্রো থেকে। বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান্ গ্রেগ টোল্যাণ্ড্ আমি আনি স্যাম গোল্ড্‌উইনের কাছ থেকে। আলেক্‌জান্দার কোর্ডার কাছ থেকে ধার করে আনি চার্লস্ লফ্‌টনকে। [illegible] কাছ থেকে নিয়ে আসি রবেন্ [illegible]কে। ফ্রানসেস ড্রেক আসে প্যারামাউন্ট থেকে। রেডিয়ো থেকে জন্ বিল্। আর, বিলেতের স্যর সেড্রিক্ হার্ডউইককে আমি আনি হলিউডের নতুন এক কোম্পানী, প্রিন্সিপাল পিকচারস্ থেকে।

খুচরো খবর

ক্লদেত্ কলবার্ট কলম্বিয়ার হয়ে আবার অভিনয় করবে 'সি ম্যারেড হার বস'এ।

• •

শার্লি টেম্পল অনেকদিন কাজ করবার পর ছুটি পেয়েছে আট সপ্তাহের।

•

ক্যাথরিন ডি মিল প্যারামাউন্টের 'ক্রুসেড'এ অভিনয় করবার পর—কলম্বিয়ায় এসেছে।

•

'সিলভিয়া স্কারলেট' হচ্ছে ক্যাথরিন হেপবার্ণ এর পরের ছবি।

তুমি কে বট হে ?

সত্যবাদী

কো তুঁহু বোলবি মোয় ;

বেগোল সভায় তুঁহু আছিলা অন্তক্ষণ—

রুক্ষ-ভবনে তুঁহু রচলহি শয়ন—

তুমি কে বট হে ? কলিকাতা কর্পোরেশনের এক মহিলা কাউন্সিলারের স্বামী শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, তুমি যে আজ নলিনীর স্তুতিবাদ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইয়াছ এবং second string to your bow হিসাবে বঙ্গলক্ষ্মীর শচিদা বাবুর প্রশংসা করিতেছ, তোমার আশা কি ?

কাহারা বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সর্ব্বনাশ ঘটাইতে অগ্রণী হইয়াছিল, সে সংবাদ দেশের লোক রাখে। যে দলের দ্বারা সে কাজ হইয়াছিল, সে দলে কি শচীন্দ্র প্রসাদের আজিকার উপাস্য দেবতাটি ছিলেন না ?

তুমি যদি নলিনীর স্তুতিগান করিয়া তৃপ্তি বা লাভ অর্জ্জন করিতে পার, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু নলিনীর কথার সূত্র ধরিয়া তুমি যে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এক ব্রাহ্মণ বিধবাকে দিয়া খোরপোষের দাবীতে মামলা রুজুর চেষ্টার কথা বলিয়াছ, তোমার সেই মহাপাপ দেশের লোক কখন ক্ষমা করিবে না। তোমার এই ঘৃণ্য কার্য্যের দ্বারা তুমি প্রতিপন্ন করিয়াছ—এই হতভাগ্য দেশে এখনও নেতৃগণকে টানিয়া ধূলায় নামাইবার ও শেষে "নানা পূতিগন্ধময় অপবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে পঙ্কলিপ্ত" করিবার লোক খুঁজিলেই পাওয়া যায়।

হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর যে সকল ত্রুটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে, সে সকলের কোন কৈফিয়ৎ তুমি বা তোমার উপাস্য দেবতা দিতে পারে নাই—তাই লোককে গালি দিয়া সমালোচনা স্তব্ধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় রত হইয়াছ।

তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, **এণ্টি-সার্কুলার সোসাইটির হিসাব দিয়াছিলে কি ?**

তুমি তোমার পাওনাদারদিগের ন্যায্য প্রাপ্য দিবার কি চেষ্টা করিতেছ ? সে জন্য কি হিন্দুস্থানের প্রচারকের কাজ গ্রহণ করিয়াছ ?

এই সে দিন তোমার স্ত্রীর পিতা—লতিকার পিতার মেসোমশাই (বড় কাকা নহেন) রুক্ষকুমার মিত্র তাঁহাদের তরুণ বয়সের কথায় বলিয়াছিলেন—পাছে বড়লাট বাঙ্গালার রঙ্গালয়ে গমন করিলে দুর্নীতির প্রশ্রয় প্রদান করা হয় সেই জন্য যুবকরা আন্দোলন করিয়া লর্ড ডাফরিনের রঙ্গালয়ে গমন বন্ধ করিয়াছিল। আর তুমি—তুমি কি করিতেছ ? তোমার উপাস্য দেবতার বিরুদ্ধে ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত ব্যভিচারের অভিযোগে যে মামলা হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গ বিচারকই বলিয়াছেন—

তোমার উপাস্য সত্য কথা বলে নাই

এবং

তাহার চরিত্রও সন্দেহাতীত নহে।

এই উভয় উক্তির পরও যে তুমি কৃষ্ণকুমার বাবুর গৃহে আশ্রয় লইয়া এই দেবতার অর্চ্চনা করিতেছ, ইহাতে কি কৃষ্ণকুমার বাবুর মুখেই চূণকালী দেওয়া হইতেছে না ?

কৃষ্ণকুমার বাবু যদি এই প্রগতির যুগে মত-পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তবে তোমরা শ্বশুর-জামাই একটা কাজ কর। বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক—ভাগলপুরের লেডী ডাক্তারের পুত্র নলিনীকে আদালতে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন—কিন্তু বিচারক তাঁহাকেও সত্যসন্ধ বলেন নাই। তোমরা সেই বিষয়ে উদ্যোগী হও—শ্রীহেরম্ব চন্দ্র মৈত্র, শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রভৃতিকে দিয়া নলিনীর একটা সার্টিফিকেট প্রচার কর। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যেমন হিন্দুস্থানের সার্টি-

ফিকেট দিয়াছেন—তেমনই ইঁহারা নলিনীর ম্যাজিষ্ট্রেট-দত্ত কলঙ্ক-লেপ প্রক্ষালিত করুন।

নলিনী অবশ্যই সেজন্য পারিশ্রমিক-প্রদান-পরাঙ্মুখ হইবে না।

ব্রাহ্ম সমাজের (অবশ্য "সাধারণ") বেদী হইতে প্রতি রবিবারে উপাসনারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে সেই সার্টিফিকেট পঠিত হইয়া তাহার পর "ওঁ তৎসৎ" উচ্চারিত হইতে পারে।

ইহাতে হয়ত রামানন্দ বাবুর সহযোগও লাভ করা দুঃসাধ্য হইবে না।

ব্রাহ্ম সমাজের তরফ হইতে আরও একটা কাজ যে হইতে পারে না, এমন নহে। কৃষ্ণকুমার বাবু ও তস্য জামাতার উপদেশে যদি নলিনীর সহিত বীণার বিবাহ হয়, তবে ত সব গোলই চুকিয়া যায়। কারণ, যে সমাজের অনুকরণই ব্রাহ্ম সমাজে সমাদৃত সে সমাজে এমন হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেটই passport দিয়াছেন—নলিনীর সহিত বীণার বিবাহ আইনে বাধে না।

আজ শচীন্দ্রপ্রসাদ তাহার গুরুর গুরু পরমগুরু ডাক্তার বিধাচন্দ্র রায়ের কথায় লিখিয়াছে—"যাহার (যাঁহার?) অসাধারণ প্রতিভা ও চিকিৎসা-নৈপুণ্যের গুণে সমগ্র ভারতে বাঙ্গালীর এখনও মান ও ইজ্জৎ রক্ষা হইতেছে।" ভাল কথা—কিন্তু যে ডাক্তার-শিরোমণি স্যার নীলরতন সরকার অর্থলাভের লোভ ত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে রোগীর চিকিৎসায় কৃষ্ণকুমার বাবুর গৃহে দিনের পর দিন কাটাইয়াছেন—যিনি দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রাজার ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়াছেন তিনি এখনও জীবিত আছেন এবং শচীন্দ্রপ্রসাদের প্রশংসাই তাঁহার যশ বিধান-চন্দ্রের তুলনায় মলিন করিতে পারিবে না। তবে এই উক্তিতে অকৃতজ্ঞতার স্বরূপ দেখা যায় বটে।

আজ তুমি শচীন্দ্রপ্রসাদ চিত্তরঞ্জনের মহিমাকীর্ত্তন করিতেছ বটে, কিন্তু তোমারই আশ্রয়দাতা কৃষ্ণকুমার 'মালঞ্চের' একটি কবিতার জন্য কুমারী বাসন্তী হালদারের সহিত চিত্তরঞ্জনের বিবাহের সময় কি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা 'সঞ্জীবনীর' পুরাতন ফাইল খুঁজিলে জানিতে পারিবে।

শচীন্দ্রপ্রসাদ লিখিয়াছে—

বিধানচন্দ্রপ্রমুখ "বিরাট পুরুষের গায়ে কাদা দিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া ধুলায় ধূসরিত করিলে কাহাকে নিয়া ভারতের রাষ্ট্র ও পৌর সভায় দাঁড়াইবে এবং বিশ্বের দরবারে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিবে?"

কেন—শচীন্দ্র প্রসাদকে। যে tenacityর ফলে শচীন্দ্র প্রসাদ পদ্ম লাভ করিয়াছিল—তাহা কি অসাধারণ নহে? সেই ব্যাপারেও শচীন্দ্র প্রসাদের মূলমন্ত্র "রহু ধৈর্য্যং" প্রকাশ পাইয়াছিল।

আমরা কৃষ্ণকুমার বাবুকে জিজ্ঞাসা করি—নলিনীর সম্বন্ধে ব্রাহ্ম ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার রায়ে যে সব কথা লিখিয়াছেন, তাহার পর তিনি কি তাঁহার কোন নিকট আত্মীয়ার নলিনীর সহিত ঘনিষ্ঠতা সমর্থন করিতে পারিবেন?

তিনি কি জামাতাটির খপ্পরে পড়িয়া শেষে নলিনীর সমর্থনে জীবনের শেষ কয়টা দিন ব্যয় করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিবেন? কিন্তু এই নলিনীই "নিবেদনে" তাঁহার স্বাক্ষর গ্রহণ প্রয়োজন মনে করে নাই।

যাহার দ্বারা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বর্ত্তমান অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার স্তাবকতা করিয়া শচীন্দ্রপ্রসাদ কি পাইবার আশা করে জানি না। শেষে হয়ত তাহাকেও বলিতে হইবে—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু তাই
ভাবি দেখি মনে।"

শত শচীন্দ্রপ্রসাদ "মাথায় পাগ বাঁধিয়া দিনিকেষ্টর মত দেই দেই করিয়া" নাচিয়া বেড়াইলে সত্যকে কখন মিথ্যা ও মিথ্যাকে কখন সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবে না। আর তাহাদের মত গোটাকতক কুপুত্রের কাজে বঙ্গজননীর নাম কলঙ্কিত হইবে না।

মাইকেল ও শরৎচন্দ্র

স্মৃতিবাসরে শ্লেষবাণী শরৎ-প্রতিভার অশোভন শৈথিল্য

গত সংখ্যার "খেয়ালী"তে মাইকেল স্মৃতিসভায় কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অশোভন উক্তির প্রতিবাদ করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু "খেয়ালী"র সম্পাদককে যে পত্র লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা আমরা প্রকাশ করিলাম। এ সম্বন্ধে অন্যান্য সাহিত্যিক বা কবির যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহা আমাদের জানাইলে আমরা তাহা প্রকাশ করিব।

—সম্পাদক, "খেয়ালী"

শ্রীযুক্ত খেয়ালী সম্পাদক মহাশয়

বরাবরেষু

সেদিন সাহিত্য সেবকসমিতিতে মধুস্মৃতি-বাসরে শরৎচন্দ্র যে ক'টি কথা বলেছিলেন তার মূলে ছিল আমারি একটি কবিতা। আমি সুরু করেছিলাম,

"তোমারে চিনিতে পারেনি কো
তোমারি দেশের পুরুষ ও নারী!
বহু অবহেলা বহু বঞ্চনা
ঝরঝর চোখে নামালো বারি।"

এবং এই ভূমিকাটিকেই ফেনিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছিলাম—দেশ মধুসূদনের মূল্য বোঝেনি, ঘোর দারিদ্র্যকষ্টে জীবন তাঁর কেটেছে, তবু বিনিময়ে দেশকে তিনি দান ক'রে গেছেন অমূল্যসম্পদ! সেদিন আমি ছাড়া আর কোনো সাহিত্যিক জিনিষটা নিয়ে সভায় এভাবে আলোচনা করেন নি। সুতরাং বলা যেতে পারে, ঐ কবিতাটার প্রসঙ্গেই শরৎবাবু বল্লেন—"দেশ তাঁকে নেয়নি একথা বল্লে ভুল করা হয়, দেশ তাঁকে যথেষ্ট দিয়েছিল, তিনি নিজের দোষে সব নষ্ট করেছেন এবং কষ্ট পেয়েছেন। জাগতিক নিয়ম লঙ্ঘন করলে শাস্তি পেতে হবে, এ ভগবানের বিধান, তিনি নিজের কৃতকর্মের ফলভোগ করেছেন, সেজন্য দুঃখ ক'রে লাভ নেই।"

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য কিনা আমাদের জানা নেই. কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র-অনুসারে যে বলা

হয়নি, একথা উত্তরকালে নিশ্চয় শরৎবাবুরও মনে হবে। স্মৃতিসভায় মহাকবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে, তাঁর দারিদ্র্যক্লেশের কথা মনে ক'রে যদি আমরা দেশের আত্মবিস্মৃতভাবকে কতকাংশে দায়ী করি ও ভবিষ্যতে এরকম বিরাট ভুল আর যেন না হয় সেজন্যে সতর্ক হই, তবে মমতামিশ্রিত অশ্রুবাষ্প মোচনের সদুদ্দেশ্যে স্বর্গগত সাহিত্যিকের চরিত্রগত দৌর্ব্বল্যের উল্লেখ করলেই কি আমাদের ত্রুটি-স্খালন হবে? না আমরা জাতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনের শৈথিল্য হ্রাস করতে পারব? আঘাত দেবার জন্যে না হলেও যদি তাঁর কথায় লোকে আহত হয়, তবে সে দুঃখ তাঁরও। যাই হোক সিঁড়িতে পৌঁছবার আগেই আমি গিয়ে বল্‌লাম, "শরৎদা, আজ আপনি আমাদের মনঃক্ষোভের কারণ হলেন।" তিনি বল্‌লেন, "তোমরা যদি দেশকে অকৃতজ্ঞ বল, তবে আমরাও ঐ সব বলব।" আমি বল্‌লাম, "দেশ যদি অকৃতজ্ঞ নয়, তবে সাগরদাঁড়ির ভিটে ধ্বসে যাচ্ছে কেন?—" একথার কোনো জবাব তিনি দিলেন না, হয়ত জবাব কিছু ছিল না ব'লে।

মধুসূদনের প্রতি বিপুলশ্রদ্ধা না থাকলে যে শরৎচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ ক'রেও পাওয়া যায় না, সেই সভাসমিতিতে দুর্লভ শরৎচন্দ্র সেদিন আমাদের আসরে উপস্থিত হতেন না। জানি। তবু মহাকবির দরিদ্র অবস্থা—যা যতই স্বেচ্ছাকৃত হোক, চিরদিন লোকের মনে করুণা ও সমবেদনার উদ্রেক ক'রে এসেছে, তার কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে স্মৃতিবাসরে শ্লেষবাণী ও উপদেশবর্ষণ শরৎ-প্রতিভার শোভন ও প্রাসঙ্গিক হয়েছে—ধীরমস্তিষ্কে একথা হয়ত তিনি নিজেও বলবেন না, কারণ তাঁর দীপ্তশক্তিতে আস্থা হারাবার আমাদের কোনো কারণ ঘটেনি। তবু, এ ধারণাও আমাদের গেল না, যে বিদ্যাসাগর মশায় রক্ষা না করলে মাইকেলকে পাওয়া যেতনা, এবং যাঁদের কাছে সে যুগে বিশেষ সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন তাঁরা তাঁর কয়েকটি বন্ধু—দেশ নয়।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

"তোমারে চিনিতে পারেনি বন্ধু
তোমারি দেশের পুরুষ ও নারী!"

সাহিত্য সেবক সমিতির মধু-স্মৃতিবাসরে শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসুর যে কবিতাটি শরৎবাবুর উষ্মার কারণ হইয়াছিল, আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম। এই আবেগময়ী কবিতার বিচার ও শরৎচন্দ্রের অশোভন উক্তির বিশ্লেষণের ভার বাংলার সাহিত্যানুরাগী সুধী-সমাজের উপর অর্পণ করিলাম।

মধু-স্মৃতি-বাসরে

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ

তোমারে চিনিতে পারেনি বন্ধু,
তোমারি দেশের পুরুষ ও নারী!
বহু অবহেলা, বহু বঞ্চনা
ঝর ঝর চোখে নামালো বারি!
কুৎসায় হ'ল কুৎসিত পথ,
মনোরথ হ'ল লক্ষ্যহারা;
অকবির হাতে গভীর বেদনা
অবমাননার বহিল ধারা;
তোমার রুগ্নশয্যারি পরে
বিমুগ্ধজনগণেরি কৃপা
পাওনি বন্ধু, কাব্যলোকের
রজনী তবুও যে মণিদীপা!
তবু ঝলমল, হর্ষ-উছল,
প্রতিভা-তরল নির্ঝরিণী!
উপবাস লীনা কল্পনা, তবু
অনবনমিতা, বিদ্রোহিণী!
দুদিনে ঘোর দুর্য্যোগে সখা
নির্য্যাতনে ও লাঞ্ছনাতে
কাব্যলক্ষ্মী বাঁচিল কি ক'রে,
রোগের শোকের ঝঞ্ঝাবাতে?

যে মহাপুরুষ বটতরুসম
বিপুল, বিরাট ছায়ার তলে
রাখিল তোমারে, অনশন হ'তে
বাঁচালো তোমারে করুণা বলে,
সে যে কি মহৎ উপকার ক'রে
গিয়েছে দেশের, আজি তা বুঝি!
তাহারি পরশ পবিত্র মাটি
বিদেশী জনের! কে দেখে খুঁজি?
দেশের, জাতির সম্পদ যাহা—
পূতরজো যার সকল ধূলি,
বিস্মরণের তা হ'ল? আমরা
বাঙ্গালী এতই সহজে ভুলি!
তবুও তোমার স্মৃতির দিবসে
যখন তোমার কাহিনী স্মরি,
পরিত্রাতা সে বিদ্যাসাগরে
শিহরি, আমরা প্রণাম করি।

তোমার দেশের অধিবাসী আজ
বুঝিয়াছে নাকি মর্ম্ম তব!
স্থানে অস্থানে কবিতা ও গানে
আনে বন্যায়, অনভিনব!
সমাধিতে দেয় মাল্য শোভন,
কুসুমগুচ্ছ যতনে আনি,
তবু কেন হায়, ধ্বসে ভেঙ্গে যায়
সাগরদাঁড়ির সে বাড়ী খানি?

কপোতাক্ষের ছল ছল জল
আসন্ন ম্লান সন্ধ্যাকালে
করে হাহাকার, সারা বাংলার
প্রাণহীনতার গানের তালে !
আত্মভোলা যে বাঙালী আমরা,
প্রায়শ্চিত্ত জানি কি করা ?
মধুচক্রের মধু লুটে নিয়ে,
বন্ধু, ভুলেছি বসুন্ধরা !

অপমানহত দুর্গত যারা,
তুমি এসেছিলে তাদের মাঝে ;
প্রেমসুমধুর ভাষারে, বন্ধু
লাগালে বন্দরূপের কাজে !
বিরহ মিলনে, শীতচন্দনে,
অনুলেপনে ও অশ্রুধারে
গুমরি যে বাণী ছিল বন্দিনী,
দিলে বাঞ্ছিত মুক্তি তারে !
অনভিলষিত পরিবেষ্টনে
দুঃখদিনের গহনে পশি,
সহানুভূতির শিঞ্জন হীন
তপশ্চরণ, করিলে বসি ;
একদা প্রভাতে হল বিতরণ
সাধনালব্ধ রতন রাজি,
মোহবিহ্বল পাঠকের দল
বোঝেনি সেদিন বুঝেছে আজি।

জীবনে তোমার প্রতিফলিত যে
অকথিত সেই একটি বাণী,—
চির আয়াসের, নহে বিলাসের
ভারতী মায়ের সাধনা খানি !
নিশীথ প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া
নিভিবে উষার প্রথম বায়ে,
ক্লান্ত তনু ও শ্রান্ত মানসে
কঠিন সে পূজা, রজনী ছায়ে !

তুমি শিখাইলে, অভিমান ভরে
চলিবে না থাকা ঘরের কোণে,
পৌরোহিত্য নিয়ে কোলাহল
অচল মায়ের পূজাঙ্গনে ;
বিনা আহ্বানে, বিনা সংবাদে
পঞ্চপ্রদীপ ধরিতে হবে,
মালা গেঁথে, ডালা সাজায়ে সে পূজা
সুসম্পূর্ণ করিতে হবে ;
পরাজয় নয়, পরের বেদনা
ভিজায়ে তুলিবে আঁখির পাতা ;
নিজের দুঃখ ভুলে যেতে হবে,
রচিতে হইবে পরের গাথা ;
তুমি শিখাইলে, চির নির্ভীক,
অচপল, ধীর রহিবে কবি,
তীক্ষ্ণ তীব্র কশাঘাতে তার
অসদাচরণ মিলাবে সবি !
জাতির মনের গোপন তথ্য
নিয়ত জ্বলিছে যাদের হাতে,
অতীত বর্ত্তমানের কাহিনী
যারা গাঁথে ভবিষ্যতের সাথে,
মানুষের কথা লিখে যায় যারা,
আগে হয় যেন মানুষ তারা।
সবার ঊর্দ্ধে সাধু, স্বতন্ত্র
করে নিজেদের কর্ম্মধারা !

জনসাধারণ চ'লে যায় পথে,
কবি হবে অসাধারণ সম,
মনোরম হবে আচরণ তার,
সে হবে সবার আপনতম,
সকলের কথা ধুয়ে মুছে যায়,
তার নাম রয় নিয়ত জাগি,
সুদূরতম ও নিকটতম সে,
জয়ে তোমামোদে অনুরাগী।
প্রভাত কিরণে তরুণী প্রকৃতি
অরুণ বরণ সুষমা ধরে,
নব বরষণে মুখরা ধরণী
লভে শিহরণ হরষ ভরে,
গেরুয়া রঙের পাল তুলে তরী
দূরে চ'লে যায় চাঁদিনী রাতে,
সারা দিনমান তারি কলগান
রচে কবিপ্রাণ লেখনী পাতে !
কবির সে পথ খুঁজে ফিরি মোরা
ভাবপ্রবণ জাতির মাঝে,
আমাদের ভাঙা এ বীণাযন্ত্রে
ধ্বনিছে তোমার ভর্ৎসনা যে !
দুর্ব্বল কর, অক্ষম মন,
কণ্ঠ ও ক্ষীণ, ভরসা গত,
তবুও তৃপ্তি জাগিছে হৃদয়ে,
চিনেছি তোমারে বেদনাহত !

চিনেছি তোমারে আপনার ব'লে,
চিনাতে তোমারে করিনি ত্রুটি,
স্মৃতিবেদীতলে প্রীতি শতদলে
কবিতা মোদের রহিবে ফুটি।
অনাগত কালে নূতন মানব
স্মরিবে যখন তোমারে সবে,
আমাদেরি মত শ্রদ্ধাবিনত,
প্রেমাশ্রুবিগলিত সে হবে !
সমাগতজন মধুঝঙ্কার
মন্ত্রমুগ্ধ শুনিবে বসি।
বাংলামায়ের কালো ছেলে, তার
ভাগ্যগগনে পূর্ণ শশী !
ভাগ্যগগনে পূর্ণ শশী গো,
ছিলে বিজয়ের বিষাণ তারি !
ধর্ম্ম তোমার বিভিন্ন, তবু
মর্ম্মে যে তুমি এ বাংলারি !
এই বাংলার নন্দদুলাল,—
আধুনিকতম তরুণ দলে
নয়নাভিরাম, ভক্তি প্রণাম
করে অবিরাম চরণ তলে।

লক্ষ্য মোদের সাধনা তোমার,
এত সুকঠোর, সুদুঃসহ,—
ও গো লাঞ্ছিত, ও গো বাঞ্ছিত,
সঞ্চিত প্রেম লহ গো লহ ॥

সাহিত্য সেবক সমিতিতে মধু-স্মৃতিবাসরে পঠিত।

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

সব্যসাচী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যে একাদশ জন বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর তরফে স্বদেশবাসীদিগের নিকট "নিবেদনে" স্বাক্ষর দিয়াছেন, তাঁহারা যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সে কাজ করেন নাই এবং রবীন্দ্রনাথ হইতে দেবীপ্রসাদ খৈতান পর্য্যন্ত একাদশজনের যোগাযোগ কাকতালীয়বৎ হয় নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। তাঁহারা সমালোচকদিগকে কুৎসাকারী বলিয়া আপনারা যে কুৎসা-প্রিয়তার পূর্ণ পরিচয় প্রকট করিয়াছেন, তাহা শোচনীয়। বিশেষ তাঁহারা বাহিরের লোক এবং হিন্দুস্থানের হিসাবপত্র ও দাদন পরীক্ষা করিবার সুযোগ যে তাঁহারা লাভ করেন নাই, তাহাতেই তাঁহাদের পত্রের অসারত্ব সপ্রকাশ।

তাঁহারা যে সুর ধরিয়াছিলেন—হিন্দুস্থানের ডিরেক্টাররা ও কয়খানি সংবাদপত্র সেই সুরে গান ধরিয়াছেন। ইহাতে যে হিন্দুস্থানের সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহের কারণ থাকিলে সে কারণ দূর হইবে—এমন মনে করা যায় না। হিন্দুস্থান সম্বন্ধে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি পত্রে যে সব অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে—সে সকলের উপযুক্ত উত্তর না দিয়া লোককে গালি দিলে বা এখানে ওখানে ঠিকা কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সভাধিবেশন করাইলে যে কোন ফলই হইবে না, তাহা, বোধ হয়, হিন্দুস্থানের পরিচালকরাও বুঝিতেছেন।

হিন্দুস্থানের ডিরেক্টাররা বড় গলায় বলিয়াছেন—

"Every proposal for investment has to be fully considered by the Board of Directors"

অর্থাৎ টাকা দাদনের প্রত্যেক প্রস্তাব ডিরেক্টারসঙ্ঘ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বিবেচিত হয়।

ভাল কথা। এই উক্তিতে জেনারল ম্যানেজার আপনার দায়িত্ব ডিরেক্টারদিগের মস্তকে ন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং যদি কোন ত্রুটিতে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, তবে সে জন্য ডিরেক্টারদিগকেও দায়ী করা চলিবে।

আমরা আজ হিন্দুস্থানের ডিরেক্টারদিগকে—(ইঁহাদের মধ্যে মাধবগোবিন্দ রায় ও বীণা সরকারের ভগিনীপতি শিশির কুমার মিত্রও আছেন)—দুইটি ব্যাপারে কয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আশা করি, তাঁহারা সদুত্তর দিবেন :—

(ক) করিমগঞ্জ চা-বাগানে হিন্দুস্থান টাকা দাদন করিয়াছিল কি না? যে দলিলে টাকা দাদন করা হইয়াছিল, সে দলিল সম্বন্ধে আদালত বা আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কর্ম্মচারী কি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন? যদি মত এই হইয়া থাকে যে, হিন্দুস্থানের দাবী দোপে টিকিতে পারে না, তবে প্রস্তাব কিরূপ পরীক্ষা করা হইয়াছিল?

(খ) গোয়াবাগানে যে বাড়ীটি হিন্দুস্থান বন্ধক রাখিয়া এখন পাওনা টাকা আদায়ের জন্য কিনিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে—

(১) তাহাতে কত টাকা মূল্য নির্দ্ধারণে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে?

(২) সুদে আসলে কত টাকার দাবিতে নালিশ হইয়াছিল?

(৩) কত টাকার দাবিতে হিন্দুস্থানের পক্ষ হইতে ঐ বাড়ীটি ক্রয় করা হইয়াছে?

(৪) ঐ বাড়ীতে গৃহস্বামীর অবিবাহিতা কন্যার কোন দাবি আছে কি না ?

(৫) হিন্দুস্থান ঐ বাড়ী কিনিবার পর হইতে গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ঐ বাড়ী পড়িয়াছিল কি না এবং সে সময় পর্য্যন্ত মোট টাকার সুদ ধরিলে হিন্দুস্থানের পাওনা কত টাকা হয় ?

(৬) ঐ বাড়ী সারাইতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

(৭) ঐ বাড়ী কত টাকা মাসিক ভাড়ায় কলিকাতা পুলিসের কোন কর্ম্মচারীকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে ?

(৮) ভাড়ার হিসাবে ঐ বাড়ীর মূল্য কত টাকা দাঁড়ায় ?

জমী কেনাবেচায় কতটা সতর্কতা অবলম্বন করিলে তবে নিরাপদ হওয়া সম্ভব, তাহা ডিরেক্টাররা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন কি ? ইহা যদি কেবলই লাভের হয়, তবে হিন্দুস্থানের যে সব ডিরেক্টার ধনী তাঁহারা কেবল ঐ কাজেই অর্থনিয়োগ করেন না কেন ?

জমী যখন কেনা হয়, তখন সেই অঞ্চলে জমীর দাম কে পরীক্ষা করে এবং সাধারণতঃ জমী কেনাবেচায় যে দালালী হয়, তাহাই বা কে পাইয়া থাকে ?

তাহার পর জমী ভরাট করা প্রভৃতির ঠিকায় যে কোন কমিশন থাকে না, বা থাকিতে পারে না—ডিরেক্টাররা কি সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া থাকেন ?

বাড়ী করিবার ঠিকা সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য।

জমী ক্রয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, বিক্রয় সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়।

বর্ত্তমানে জমী ও বাড়ী যদি লাভেরই হয়, তবে হিন্দুস্থানের বোর্ডের সভাপতির চৌরঙ্গী রোডের উপরিস্থিত জমী—বিক্রয় বা তাহাতে গৃহনির্ম্মাণ বিলম্বিত হইতেছে কেন ?

এ সব প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যাইবে কি ?

অল্পদিন পূর্ব্বে কোন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল—হিন্দুস্থানের নূতন কার্য্যালয় বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইবে। চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে নির্ম্মিত অনেক বাড়ী এখনও খালি পড়িয়া আছে। কাজেই ঐ স্থানে বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে গৃহনির্ম্মাণ করিলে তাহাতে লাভ হইবে কি না, ডিরেক্টাররা তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? এই গৃহনির্ম্মাণের প্রয়োজন ও বর্ত্তমান গৃহ ভাড়া হইবার সম্ভাবনার বিষয়ও তাঁহাদিগের বিবেচ্য।

সম্প্রতি ভারত সরকার তাঁহাদিগের এক বিবৃতিতে বীমা কোম্পানীর ব্যয় সম্বন্ধে যে সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, হিন্দুস্থানের ব্যয় কি সে সীমা অতিক্রম করে নাই ?

হিন্দুস্থানের বিজ্ঞাপন কি নিয়মে সংবাদপত্রে প্রদত্ত হইয়া থাকে ?

আজ আমরা যে কয়টি প্রশ্ন করিলাম—সেগুলির সদুত্তর ডিরেক্টাররা দিবেন কি ?

হিন্দুস্থানের জেনারল ম্যানেজারের বেতন সম্বন্ধেও আজ আমরা কয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব—

(১) বেতন ব্যতীত "উপরি" দিবার ব্যবস্থা আর কোন বড় কোম্পানীতে আছে ?

(২) যত দিন এই জেনারল ম্যানেজার আর একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কেন্দ্রীয় তুলা কমিটীর সদস্য ছিলেন, তত দিন সেই কমিটীর জন্য বোম্বাই গতায়াতের সময় তাঁহার গতায়াদির ব্যয় কমিটী দিতেন, না হিন্দুস্থান দিতেন ?

(৩) ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটীর কাজে ইনি যখন কয়মাস বীণাকে লইয়া দিল্লীতে বিরাজিত ছিলেন—তখন সেই মাসের বেতনও ইনি পাইয়াছেন কি না ?

হিন্দুস্থানের দুর্ভাগ্য অংশীদাররা যেভাবে ব্যবহৃত হইতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহাদিগের অর্থে হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও পরিচালিত হইয়াছে। যে সময় তাঁহারা স্বদেশীর প্রতি অনুরাগহেতু নূতন অনুষ্ঠানে টাকা দিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের সে কাজ যে বিশেষ প্রশংসনীয় ছিল, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘ ২০ বৎসরকাল ডিরেক্টাররা কোনরূপ ত্যাগ স্বীকার করেন নাই এবং জেনারল ম্যানেজার—(থাক সে কথা) কিন্তু এই অংশীদাররাই একটা কাণা কড়িও দেখিতে পাইতেছেন না। এ যেন সেই—

"আয়ান করিল বিয়া রাধিকা সুন্দরী,
তাঁরে লয়ে লীলা করেন মুকুন্দমুরারি;
এ সব দুঃখের কথা কারে বল কই—
যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই।"

এদিকে যত অধিক দিন অংশীদাররা লাভের অংশে বঞ্চিত থাকিবেন, ততই শেয়ারের দাম কমিবে এবং যদি কোন চক্রীর চক্রান্ত থাকে, তবে তাহার পক্ষে সেই সুযোগে সস্তা দামে শেয়ার কিনিয়া লইবার সুবিধা হইবে। তাহার পর—controlling শেয়ার সস্তায় হস্তগত হইলে—তখন অংশীদারদের সম্বন্ধে নীতি পরিবর্ত্তন হইতে কতক্ষণ ? এইরূপ ব্যাপার যে এদেশেও জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীতে কখন হয় নাই, এমন নহে।

সুতরাং যে দিক দিয়াই কেন দেখা যাউক না—হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রয়োজন; কারণ, নিরপেক্ষ অনুসন্ধানফল প্রকাশ ব্যতীত লোকের মন হইতে সন্দেহ দূর হইবার কোন উপায় নাই। ডিরেক্টারদিগের আপনার ঢাক আপনি বাজানর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—হইতে পারেও না।
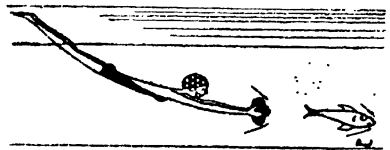
আইডা লুপিনো
ও
রিচার্ড আর্লেন

আইডা লুপিনো খাঁটি ইংরেজ। কিন্তু, আমেরিকান্ আবহাওয়া প্রিয় এর কাছে ঢের বেশী। বিলেতে বিখ্যাত অভিনেতা ষ্ট্যান্লি লুপিনো—নাম শুনেছেন বোধ হয়—আইডা আবার তারই মেয়ে। আর পাশে রিচার্ড্ আর্লেন, পুরুষত্বের প্রাচুর্য্য নাকি এর বেশি। লুপিনো আর আর্লেনকে এখানে একসঙ্গে আমরা দেখ্তে পাচ্ছি প্যারামাউণ্টের 'রেডি ফর্ লাভ' এ্।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা [ফোন—পার্ক ৩২৪

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ২রা শ্রাবণ, ১৩৪২—18th July, 1935. { ২৯শ সংখ্যা

ব্যর্থ-আক্রোশ

১৯৩১ সালের ৩রা জানুয়ারী এক নগণ্য সাপ্তাহিক রূপে "খেয়ালী" যখন প্রথম আত্মপ্রকাশ করে তখন সে তাহার মর্ম্মকথায় দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছিল,—"দেশের অগ্রগতির পথে যে সব কণ্টক আত্মত্যাগী পান্থদের চরণযুগল ক্ষত-বিক্ষত করিতেছে, "খেয়ালী" আপনার খেয়ালে সেগুলি একটি একটি করিয়া তুলিতে থাকিবে। কণ্টক-কুল অপসৃত করিতে তাহাকেও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, কিন্তু এই লাঞ্ছনাকে বরণ করিয়া সে এই ব্রতে আত্মনিয়োগ করিবে……"খেয়ালী" সত্যকথা বলিবে, প্রিয়কথা বলিবে কিন্তু 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্ নীতি' সে মানিবে না। অপ্রিয়-সত্য কঠোর হইলেও নির্ভীকভাবে তাহা ব্যক্ত করিতে সে কুণ্ঠিত হইবে না।"

বাঙ্‌লা দেশের পবিত্র মৃত্তিকায় ভূমিষ্ঠ হইয়া বাঙ্‌লার রাজনীতিতে ও বাঙ্‌লার সমাজে যে ব্যভিচার ও অন্যায়ের বিষ বাঙ্‌লার রাষ্ট্র-জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া স্বপ্ন-জগতে "খেয়ালী" যে মায়া-মন্দির রচনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কাপুরুষের আঘাতে আজ সেই মন্দিরে সত্যের দেবতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

"**From** pavement to the Mayoral chair," এই দম্ভোক্তিকারী বহুরূপীর মুখোস খুলিতে "খেয়ালী" যে অপ্রিয়-সত্য ভাষণে কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহা কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মাননীয় শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার সিংহের রায়ে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। রাষ্ট্র-সেবায় প্রতাপান্বিত বহুরূপী ভণ্ডের মুখোস খুলিবার প্রয়াসে সে যে বহু শত্রুর সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সে জানে। বাঙ্‌লার রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে কণ্টকগুলি অপসৃত করিবার প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ গত রবিবার "খেয়ালী"-র অন্যতম পরিচালককে যে নির্ম্মম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে—তাহাতে আমরা ব্যথিত হইলেও বিস্মিত হই নাই। পরাজয়ের পঙ্কতিলক মস্তকে বহন করিয়া কাপুরুষেরা আজ সম্মুখ-সংগ্রাম পরিহার করিয়াছে। খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া "খেয়ালী"-র আবির্ভাব হইলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার অভিযান আজ সার্থক হইয়াছে।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার মর্ম্মকথার প্রতিধ্বনি করিয়া আমরা আজিকার দিনে আবার বলিতেছি,—"অপ্রিয় সত্য কঠোর হইলেও নির্ভীকভাবে তাহা ব্যক্ত করিতে "খেয়ালী" কোনদিনও কুণ্ঠিত হইবে না।

———**———

প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে গুণ্ডামী

প্রকাশ, গত ১৪ই জুলাই রবিবার বেলা আন্দাজ দশটার সময় বালীগঞ্জে গড়িয়াহাটা রোড জংসনে এক ভীষণ গুণ্ডামি হইয়া গিয়াছে। ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকার যখন তাঁহার বন্ধু ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের বাড়ী হইতে ফিরিতেছিলেন তখন কতিপয় গুণ্ডা তাঁহাকে আক্রমণ করে। গুণ্ডাদের আক্রমণের ফলে অক্ষয় বাবু সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছেন। প্রকাশ, অক্ষয়বাবু আক্রমণকারীদের মধ্যে নাকি দুই একজনকে চিনিতেও পারিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণ এই যে, ঘটনার দিবস বেলা প্রায় নয়টার সময় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার তাঁহার বন্ধু ও ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ২০নং সাউথ এণ্ড পার্কে শ্রীযুক্ত মিত্রের গৃহে গমন করেন। তিনি তথায় প্রায় একঘণ্টা কাল ছিলেন। বেলা আন্দাজ দশটার সময় অক্ষয় বাবু তাঁহার নিজের গাড়ীতে বাড়ী ফিরেন। তাঁহার গাড়ী গড়িয়াহাটা রোডের জংসনে উপস্থিত হইলে কতিপয় ব্যক্তি গাড়ীর দিকে অগ্রসর হয় এবং গাড়ীটিকে আটকাইয়া ফেলে। তখন গড়িয়াহাটা রোডের সংস্কার হইতেছিল এবং রাস্তায় যানবাহনাদি চলাচল বন্ধের জন্য কর্পোরেশনের বোর্ড তথায় লটকান ছিল। প্রকাশ, আততায়ীগণ অক্ষয় বাবুর গাড়ী থামাইবার জন্য সেই বোর্ডখানি গাড়ীর সম্মুখে ফেলিয়া দেয়। আচম্বিতে এই ব্যাপার ঘটায় অক্ষয় বাবুর ড্রাইভার গাড়ী থামাইয়া দেয়। গুণ্ডাগণ তৎক্ষণাৎ অক্ষয় বাবুকে আক্রমণ করে।

প্রকাশ, গুণ্ডাগণ সংখ্যায় প্রায় ছয় সাত জন ছিল। তাহাদের দুই একজনকে নাকি অক্ষয় বাবু চিনিতেও পারিয়াছেন। গুণ্ডাদের প্রত্যেকের হাতেই লাঠি, লোহার ডাণ্ডা, হাণ্টার ইত্যাদি ছিল। এতগুলি লোকের আক্রমণে অক্ষয় বাবু সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়াছেন। অক্ষয় বাবুর দুর্দ্দশা দেখিয়া রাস্তায় যে কুলীরা কাজ করিতেছিল তাহারা অক্ষয় বাবুর সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলে গুণ্ডারা পলায়ন করে। কাহাকেও ধরিতে পারা যায় নাই।

এই ঘটনার পর অক্ষয়বাবু রক্তাক্ত দেহে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের গৃহে পুনরায় গমন করেন। অক্ষয় বাবুর অবস্থা দেখিয়া শ্রীযুক্ত মিত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে লইয়া যান। তথায় তাঁহার আহতস্থানগুলি ব্যাণ্ডেজ করিয়া দেওয়া হয়। তৎপর অক্ষয়বাবু ও তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মিত্র টালিগঞ্জ থানায় গমন করেন এবং ঘটনার বিষয় ডায়েরী করেন।

আঘাত যাহাতে বিষাক্ত না হইয়া পড়ে তজ্জন্য শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের ডাক্তার অক্ষয় বাবুকে "এণ্টি টিটেনাস" (ধনুষ্টঙ্কার প্রতিষেধক) ইনজেকসন লইতে বলেন। অক্ষয় বাবু অতঃপর তাঁহার মাতুল ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুর সহিত পরামর্শ করেন এবং ডাঃ বসু তাঁহাকে ইনজেকসন দেন।

———

খোলা-চিঠি

শ্রীমতী শান্তি গুপ্তাকে

শান্তি

যা-ই বলো না, সিনেমার নাবা তোমার হয়েচে একটা ভ্রান্তি। অন্ততঃ গত সাতই আষাঢ় পায়োনীয়ারের "দেবদাসী" তাই প্রমাণ করেছে। চুল খুলে, মালা গেথে আর কথা বলে' সেলুলয়েডএর ওপর যখন তুমি বিচরণ করে' বেড়াচ্ছিলে, তখন আমার মনে কী হচ্ছিলো জানো? মনে হচ্ছিলো—এ মেয়েটি মঞ্চ নাট্যে হাঁটতে জানে, ছায়া-নাট্যে নয়। ক্যামেরার ঈগল-চোখের সামনে তুমি বারে বারে ধরা পড়ছিলে, তোমার চাল-চলন তার লজ্জায় যে ঘোমটা একশোবার টানছিলো, সেটা স্বাভাবিক নয়, এমন এক শাড়ির। সে অস্বাভাবিকতার হিমালয় তোমার পক্ষে ছিলো অলঙ্ঘনীয়।

আশ্চর্য্য, অস্বাভাবিকতার শুধু তোমার চালচলনেই রাজত্ব করলে না, করলে তোমার কণ্ঠে, তোমার কথা বলার ভঙ্গীতে। অষ্টাদশ শতাব্দির দেবদাসী তোমার মুখে যখন কথা কইছিলো: মনে হচ্ছিলো, আধুনিকা অকালপাকা চঞ্চলা কোনো সীতা চন্দ যেন চাঙ্গোতে বসে' 'সাংরুক্ত' আনতে আদেশ দিচ্ছে। সেই রকম হাত-কাটা-জামা, হাই-হিল্ মেয়ে, যারা মুখের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটাকেও পাউডার আর ক্রীম দিয়ে পেইণ্ট করেছে। মাইক্এর ভেতর দিয়ে এ দোষটা তোমার আমার কানে কাটার মতন বিঁধছিলো। নিজের কাণ্ড নিজে যখন তুমি দেখ্ছিলে তোমার তখন কি মনে হচ্ছিলো জানিনে। আচ্ছা, এক রঙ্গমঞ্চে যদি তুমি রামায়ণের 'রাবণ" দেখতে গিয়ে ভাখো ইন্দ্রজিতের মৃত্যু-সংবাদে মন্দোদরী রাক্ষস বাদের পাশে বসে' ভয়ানক কাঁদছে। কাঁদছে তাতে দোষ নেই কিছু, কিন্তু হঠাৎ যদি সে হাতের চুড়ির চাপ থেকে একখানা রুমাল বার করে' চোখের জল মুছতে আরম্ভ করে— তখন তোমার মনের অবস্থাটা কী রকম হবে ভাবতে পারো? দৃশ্যটি কল্পনায় টেনে এনে ভেবে দেখো। ঠিক সেই অবিকল অবস্থা হয়েছিলো আমার।

তারপর—এখন আলোচ্যের বিষয় হচ্ছে তোমার মুখ। অপেরা-গ্লাস্এর চোখে তা সুন্দর লাগতে পারে, কিন্তু ক্যামেরার চোখে নয়। ঈগল-চোখ তার, ভারী অভদ্র, ভারী অপ্রিয় সত্যের অবতারণা সে করে। তার মত্ মত সে তোমার মুখের সঙ্গে প্রেম করতে অস্বীকার ও অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সে বলে—তোমার থুত্নীর তলাটা বেশ ভারী, আর মুখের গড়নটা

মঞ্চের মত অত মিষ্টি নয়। আমি কিন্তু, শান্তি, ক্যামেরার এ কথায় বিশ্বাস করিনি। আমি তার সঙ্গে তর্ক করেছিলেম। ও বলে "দেবদাসীতে তোমার মুখে শ্রীও ফোটাতে পারেনি, তার জন্য খানিকটা দায়ী হচ্ছে ওর চালক। এমন কয়েকটি বিশেষ 'কোণ' ইংরিজীতে যাকে বলে angle—নাকি আছে যেখান থেকেও বেশ তোমার দিল্-দরিয়া ভাবে দেখতে পেতো। কিন্তু সে 'কোণ' গুলো যে কোন খানে ক্যামেরার কর্ণধারের মাথায় তা মোটেই প্রবেশ করেনি।

সিনেমার এই পিছল পথে পায়ের খানিকটা দাগ রাখতে হ'লে—প্রথম নম্বর কর্ত্তব্য তোমার হওয়া উচিত—ছায়ার এই আবহাওয়াটাকে চমৎকার করে' চেনা। ক্যামেরার সঙ্গে আলাপ করে' তার সামনে তোমার চলনটাকে বেশ সাবলীল করে' নাও। তার রুচিমত নিজেকে তুমি গড়ে' তলো'। ভাব প্রকাশে আনো আরো গভীরতা। আর, দূর করে' ফেলো তোমার কণ্ঠস্বর থেকে ঐ অস্ফুট, আধোআধো, আধুনিক ভাষা,—তার ছন্দ, তার গন্ধ।

তা হ'লেই আমি ঠিক জানি, শান্তি, তোমার এই নতুন জীবনেও পড়বে তোমার নামের ছায়া। ইতি।

আনিয়াৎ খাঁ

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

"ফ্যান্‌টম্ অফ্ ক্যাল্‌কাটা"

বা 'শয়তান কেন কাঁদে' ?

প্রযোজক—ম্যাডান থিয়েটার্স লিঃ

পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার—শ্রীঅ্যাণ্ডিমুর রায়

শ্রেষ্ঠাংশে—অ্যাণ্ডিমুর, প্রফুল্ল ঘোষ, তারাপদ ঘোষ, এলা দেবী, শ্রীমতী জলা, রাধা দত্ত, কুমারী নবাব, সামসেদ, পারুল, সন্তোষ সিংহ, রবি ঘোষ, কমল ঘোষ, শঙ্কু পাত্রে, ইত্যাদি

গত ৮ই জুলাই ক্রাউন সিনেমায় প্রথম মুক্তি

সারা জগতের নিকৃষ্টতম, কিম্ভূতম সবাক চিত্র সেদিন ক্রাউন সিনেমায় জন্মলাভ করেছে। বা, মানব জীবনে যা একেবারেই অসম্ভব সেই অ্যাণ্ডিমুর সেদিন সর্ব্বসাধারণের সামনে একটি ত্রিভুজ আণ্ডা প্রসব করেছে সেই আণ্ডাই আবার প্রমাণ করেছে যে তার প্রসবকারী জান্তবজগতেও একটি বিশেষ জীব। তার মস্তিষ্ক যে কোন বিশেষ রকম পচা গোবরে কোন শয়তানের তৈরী, তা আবার বিশ্লেষণ করতে হ'লে আমায় হ'তে হয় এক দুষ্প্রাপ্য মিউজিয়মের 'ইউজিনি' ডাক্তার। সিনেমা-শিল্পকে এ-হেন ভাবে অপমান করবার জন্য, দর্শকদের ওপর এহেন অহেতুক অত্যাচার নিবারণের জন্য বাংলা-দেশে অবিলম্বে এক সোসাইটি গঠন করা উচিত। এবং সেই সোসাইটির প্রথম নম্বর কর্ত্তব্য হবে—ঐ কিম্ভূত নামের দুষ্প্রাপ্য জীবটিকে অবিলম্বে বিচারালয়ে প্রেরণ। দ্বিতীয় নম্বর কর্ত্তব্য—ওকে খোঁয়াড়ে বহুদিন রাখ্‌বার ব্যবস্থা। কারণ, তা না হ'লে ভবিষ্যতে আবার এ হেন উপদ্রবের আশঙ্কা আছে।

ল্যাজ, মুণ্ড, ঘটনাহীন এক গল্প; পরিচালনায় 'পরিচালনা' এই কথাটির নিকৃষ্ট অপমান; হাস্যাস্পদ, উন্মাদ অভিনয়; অশুদ্ধ উচ্চারণের মানে হীন কথা; বেসুরো অশ্রাব্য সঙ্গীত; চক্ষুকে পীড়াদায়ক নৃত্য; নিকৃষ্ট আলোক-শিল্প; ও নিকৃষ্টতর শব্দ সংযোজনা—এগুলো হচ্ছে চিত্রটির অতুলনীয় আকর্ষণ!

নিছক বদ্‌মায়েসী ও ছেলেমানুষীর জন্য একটি ফিল্ম্ ষ্টুডিয়োর জন্ম নয়—একথা বার বার সিনেমা শিল্পের এই শয়তান অ্যাণ্ডিকে মনে করিয়ে দিচ্ছি। তাকে কাপ্তেন করে' কতগুলো কুশ্রী বাঙালী ও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়ের লীলা-শতদল যেন এবার থেকে সাধারণের চোখের অন্তরালেই ফুটে' উঠে, কোনো ক্যামেরা বা মাইকের সামনে নয়। ফেরঙ্গ, ফুটির

মত গাল—রুথ্ দত্তের ঐ 'শরদার্ বুছি বোকিছে' 'চোন্' আর 'পুনিমা চন্দ' তুমি এবার থেকে নিরালায় একলাই শুনো। তোমার ঐ শয়তানের দিব্যি, দোহাই তোমার, গরীব বাঙ্গালীর কষ্টার্জ্জিত প্রতিটী পয়সা তুমি অমন পচা গোবরে আর ফেলিয়োনা। এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে বোকা পেয়ে তাঁর টাকার এ-হেন শ্রাদ্ধের কোনো সার্থকতা নেই। 'রাণ্ডি'দের দেহ দেখিয়ে, অ্যাণ্ডি, ফিল্ম তোলা জিনিষটা এতো ফাঁকির কারবার মনে ক'রোনা। তোমার এই আণ্ডা দেখবার প্রবেশ মূল্য যদি এক পয়সাও হ'তো—তবুও তার জন্যে তোমার ঐ নিচক টুক্‌রোটির ব্যয়, আমি বল্‌বো, দুর্গন্ধ এক নর্দ্দমায় ফেলে দেবার চেয়েও নিকৃষ্ট।

ছায়াছবি সম্বন্ধে যার প্রাথমিক জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই, তারই পরিচালকের স্থান গ্রহণ করা অসহ্য। উড়িষ্যাদেশের উপকথায় এক গল্প আছে—ল্যাজকাটা এক বানরের। সেই দেশের রাজা মারা যাওয়ার পর বানরচন্দ্রের অভিলাষ হ'লো ঐ খালি সিংহাসনে বস্‌তে। সিংহাসনে বসা দূরে থাক, রাজবাড়ির কাছাকাছি যেতেই তার অসীম দুর্দ্দশার কথা উড়েদের আজ অবিদিত নেই। আমাদের অ্যাণ্ডিমুরের অবস্থা হচ্ছে তাই! সিনেমারাজ্যে অনধিকার প্রবেশ সে করেছে, এখন বাকী আছে অসীম দুর্দ্দশা।

চিত্রটির বিস্তৃত আলোচনা আর করবো না। কারণ, ভদ্রলোকের ছেলের অহেতুক আরো খানিকটা মুখ খারাপ করতে হয়। সিনেমা সম্বন্ধে এক ফোঁটা জ্ঞান হ'তে অ্যাণ্ডির এখনো ত্রিশটা নরক অবস্থান বাকী। যে সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রী নেবেছিলো তাদেরও অভিনয় জিনিষটা বুঝতে তাই। প্রত্যেকটি মেয়েই ক্যামেরার সামনে এসে হেসে ফেলেছে, আর যে ইন্‌স্‌পেক্টর সেজেছিলো সে জীবনে টেলিফোনই ধরে নি। সন্তরণ-বীর প্রফুল্ল ঘোষ আগাগোড়া হাস্যাস্পদ। এ দল অবিলম্বে না ত্যাগ করলে অদূর ভবিষ্যতে সন্তরণ বীরকে জলে সাঁতার না কেটে—কোথায় যে কাটতে হবে বুঝতে পারছি। কুস্তি করে' সন্তোষ সিংহেরও এ দলে পড়ে মাথা মোটা হয়ে গেছে। মেয়েকে তার চুরি করে' নিয়ে গেছে গুণ্ডার দল, তবুও মুখে হাসি তার ধরে না।

এ কিম্ভুত চিত্রটি 'ক্রাউনে' আর কিছুদিন চল্‌লে কোনো দুর্ঘটনার আশঙ্কা আমরা করছি।

রাধা ফিল্ম

এই ষ্টুডিওতে একসঙ্গে দু'খানা ছবি তোলা হবে—"কণ্ঠহার" ও "কৃষ্ণসুদামা"। প্রথমোক্ত চিত্রখানি পরিচালনা কোরবেন শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবিখানি আস্‌চে বড়দিনে পর্দ্দায় ফুটে উঠবে।

আর "কৃষ্ণসুদামা" তোলা হবে পুজোর আসর মাৎ করবার জন্য। এতে সুদামা অংশে অভিনয় কোরবেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী আর কৃষ্ণ সাজ্‌বেন শ্রীমৃণাল ঘোষ। শ্রীমতী কানন বালাকেও একটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাবে।

* * *

এদের তেলেগু ছবি "ভক্তকুচেলা" মদ্র দেশে খুব চল্‌ছে। আর তামিল "সিরুতোণ্ডা" কে শীঘ্রই মুক্ত করবার জন্য সম্পাদকরা জোরসে কাজ চালিয়েছেন।

* * * *

বহু-প্রশংসিত "মানময়ী গার্লস স্কুল" কর্ণওয়ালিসে-ও তার আসর জমিয়ে নিয়েছে। মানস কুমার ও নীহারিকা পুজোর আগে যে স্কুল বন্ধ কোরবেন—এরূপ ত' মনে হ'চ্ছে না।

এভারগ্রীন পিক্‌চার্স

এদের ষ্টুডিওটি—ছোট-খাটোর ওপর বেশ হ'য়েছে। ষ্টুডিওতে গেলে সবাই ব্যস্ত দেখা দেখা যায়, তার ভেতর আবার বিশেষ ব্যস্ত দেখা যায়, পি, স্যাণ্ডেলকে।

* * *

এদের দ্বিতীয় ছবি "পঞ্চবান" প্রায় শেষ হ'য়ে এল।

পপুলার পিক্‌চার্স

এদের "মন্ত্রশক্তি" শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোরবে। কর্তৃপক্ষ দিনরাত খাট্‌ছেন যা'তে ছবিখানি সাধারণের উপভোগ্য হয় বলে। শ্রীসতু সেন এই ছবির পরিচালক। চলচ্চিত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে তার কোন পরিচয় না থাক্‌লেও মঞ্চের অভিজ্ঞতা তাকে এপথে অনেকটা সাহায্য কোরবে বলে আমরা আশা করি।

শোনা যাচ্ছে, এঁদের পরবর্ত্তী ছবি তোলা হবে বড়ুয়া ষ্টুডিওতে। ছবির নাম—"মহানিশা" আর পরিচালক হচ্ছেন শ্রীনরেশ মিত্র।

নিউ টন্‌ফিল্ম

পায়োনিয়র ষ্টুডিওতে এই প্রতিষ্ঠানের উর্দ্দু ছবি "ডার্বী-কা-শিকার," বুলচণ্ডানির পরিচালনায় শীঘ্রই সুরু হবে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

শ্রীজ্যোতিষ মুখুয্যে দিন রাতই "পায়ের ধুলো" গায়ে মাথায় মাখ্‌ছেন। ধুলোর সঙ্গে লড়াই কোরতে বেচারীর সোনার অঙ্গ কালী হ'য়ে গেল। মাই ডিয়ার মুখুয্যে মশাই কুছ্‌পরোয়া নেই। দু'দিন পরে 'ডি-সোটো' লাল রাস্তায় ছোটালেই আবার শরীর হ'য়ে উঠ্‌বে লাল—'চিয়ার আপ্‌'।

* * *

আস্‌চে মাসের পয়লা হপ্তাতেই 'রূপবাণী'-র রূপোলি পর্দ্দায় "বিদ্রোহী"

শেষাংশ—পরপৃষ্ঠায় দেখুন

ও চামেলি!

বিজনকুমার চট্টোপাধ্যায়

ও চামেলি! ঘুমস্‌নে আর—ওঠনালো সই মুঞ্জরি,
কাজলা-ভোমর ঘুরে' বেড়ায় পাগল হ'য়ে গুঞ্জরি!
'স্বপন-মাখা চাঁদনী রাতে,'
জাগবে সে আজ তুহার সাথে,
মন-ভোলানো গুঞ্জরণে—
করবে লো তোর মনচুরি;
ঘুম-দরিয়া মথন ক'রে ওঠনালো সই মুঞ্জরি!

* * *

গোলাপ-বালা বল্‌চে—ওলো ঘোম্‌টা খোলো ঘোম্‌টা খোলো,
পাৎলা মিহিন্‌ পাপ্‌ড়ি ঠোঁটে রাঙা হাঁসি ফুটিয়ে তোলো!
তোমার মনের গোপন-কথা,
হৃদ্‌-গহনের হরষ ব্যথা,
'জানাও সখি জানাও তা'রে—
সরম ভরম আজকে ভোলো;—
পাৎলা মিহিন্‌ পাপ্‌ড়ি ঠোঁটে—রাঙা হাঁসি ফুটিয়ে তোলো!

রূপতরঙ্গ

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষ অংশ

বিদ্রোহ সুরু কোরবে। অতীত-গৌরব রাজস্থানের কীর্ত্তি-গাঁথা চির রসিক 'ডি-জি'-র হাতে মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেছে যেদিন দেখ্‌ব, সেদিন আর আমাদের আনন্দের অবধি থাক্‌বে না।

পায়োনিয়র ফিল্ম

শোনা যাচ্ছে, শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন কোরে আবার বোম্বাই উপকূলে পাড়ি মারছেন।

এর পরে এঁদের "চন্দ্রশেখর" তোলা হ'বে। আমরা বলি, নামের মোহে না ভুলে কর্ত্তৃপক্ষ এই লাইনে সংশ্লিষ্ট কোনও কাজের কাজীর ওপর এই ছবি তোলার ভার অর্পণ করুন।

"জহিরণ"

অভিনেতৃ সঙ্ঘের পরিচালনায় ভূপেন্দ্র বাবুর এ হাস্য-গীত-মুখর চার অঙ্কে সম্পূর্ণ নাটক খানি গত শনিবার ১৩ই জুলাই থেকে "রূপ-মহলে" আরম্ভ হয়েছে। নাটক খানির বিষয় বস্তু হচ্ছে—স্বাধীনতার জন্যে পুরুষ ও স্ত্রীতে প্রতিদ্বন্দিতা। সারা পৃথিবী বিনা কাজে ঘুরে' এসেও পুরুষরা তাদের ঘরের কোণে স্ত্রীদের দেখতে চায় তাদেরই জন্যে অধীর প্রতিক্ষায়। মেয়েরা এ আবাহমান নিয়ম মানতে চাইলে না, তারা চাইলে ফেলে দিতে তাদের লজ্জার কালো ওড়না, তাদের মেঘবরণ চুল আর কুচবরণ রূপকে তারা উন্মুক্ত ক'রে দিতে চাইলে দিনের সূর্য্য ও রাতের চাঁদনি আলোয়। আরমানি সওদাগর আস-দের স্ত্রী জুমেলি কারান-নগরের এই দলের ছিলো 'ক্যাপ্‌টেন'। উকিল সাহেবের স্ত্রী জোবিয়া আর বায়রামের কবি কন্যা জহিরণ, ও অনেক তরল রূপ তরুণী ছিলো তার সহ-কারী। রূপবান ইরাণী এক চিত্রকর আমেদের বুকে তারা সকলেই বাঁধ্‌তে চাইলে বাসা। আমেদের চোর ও অকৃতজ্ঞ বন্ধু হিন্দোল, এক বান্দা, তায় দিতো বাধা।

হাসিতে, মনজল-করা গানে, আর নাচের জন্য নাচে "জহিরণ" হাল্‌কা, খোস্‌ মেজাজী, বেশ দিল্‌ দরিয়া আকর্ষণ। যাদের জন্য এর জন্ম, তারা এ দেখে খুব প্রাণখুলে' হাস্‌বে, দেবে হাত্‌তালি, আর মন দিয়ে করবে উপ-ভোগ—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আমাদের নেই।

ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স্‌এর অন্যতম প্রচারকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্ন্যাল

কোন অংশে কে নেবেছে প্রজ্ঞাপনীতে তার উল্লেখ নেই। অতএব, মঞ্চ-নামেই আংশিক আলোচনা কর্ত্তব্য। সেদিনকার দর্শকদের দেখলুম সব চেয়ে ভালো লেগেছে আরমানি সওদাগর আসদের বাচাল বান্দা ছাতিমকে। তারপর, যথাক্রমে হিন্দোল, আমেদ আর আসদ। মেয়েদের ভেতর প্রাণের প্রথম নম্বর অভাব ছিলো না উকিলের স্ত্রীর জোবিয়ার। তারপর আসদ-জরু জুমেলি আর বায়রামের হায়রান্‌ করা মেয়ে জহিরণ।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

গত রবিবারের ঘটনা সংশ্রবে আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহ-সংবাদ-পত্রসেবী প্রভৃতিরা টেলিফোনে, বাড়ীতে এবং পত্রে আমার প্রতি যে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাদের সকলকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার।

অভাবনীয়! অনবদ্য! অচিন্ত্যনীয়! অভুতপূর্ব!

?

INDIAN POSTS AND TELEGRAPH DEPARTMENT

O T H (19/40) DACCA 13

AUROFILMS

CALCUTTA

CONGRATULATIONS DEVDAS BREAKS RECORD OF CHANDIDAS SITA OPENING NIGHT

BANERJEE

M/R 20/

আপনি কী দেখাইয়াছেন ?

না হইলে...... তারিখের জন্য আবেদন করুন

: এজেন্সী :
এম্, এল, সা (বর্ম্মা) লিঃ
৩৮৯, ড্যাল্‌হাউসী ষ্ট্রীট্
—রেঙ্গুন—

ঃঃ চিত্র পরিবেশক ঃঃ

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন

ফোন : ক্যাল ২৪৯৯ ১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। গ্রাম : অরোফিল্মস্

বিবিধ

দেশ দেশ নন্দিত করি

দার্জ্জিলিং হইতে ম্লানমুখে ফিরিবার সময় পথে শিলিগুড়িতে ৬মেয়র নলিনী সরকার নাকি 'অমৃতবাজার পত্রিকার' প্রতিনিধিকে বলিয়াছিল—**সে শীঘ্রই বিলাতে যাইবে—সংবাদ সত্য নহে।**

তাহার পক্ষে শীঘ্র বিলাতে যাইবার বাধা যে নাই, তাহা নহে। "তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ যাবন্নভাসতে।" বিলাতে যাইয়া যদি বক্তৃতা করিতে হয়! অন্ততঃ লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিতে হয়। শেষে কি "গীতা নাড়ে হাত, বানরে নাড়ে মাথা" হইয়া দাঁড়াইবে? নলিনীর ইংরাজী জ্ঞানের কথা ধরি না—তাহার "ব্যক্তিগত" পুস্তিকায় তাহার বাঙ্গলা জ্ঞানেরও যে পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প মনে পড়ে। কোন রবিচ্ছায়া কয় বৎসর বিলাতে থাকিয়া ফিরিবার পথে বলিয়াছিল—"ক' বছর বাঙ্গলা না বলে, আমার বাঙ্গলা বল্‌তে ভুল হচ্ছে।" শুনিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "তোর ত বড় বিপদ হ'ল! ইংরাজী বাঙ্গলা কোনটাই বিশুদ্ধ বলতে পারবি না?" যে ফিরিঙ্গী মেয়েটি নলিনীর নিঃসঙ্গ আবাসে তাহার লাইব্রেরী সাজাইত—সে-ও কি নলিনীকে ইংরাজী কথোপকথন শিখাইতে পারে নাই?

নলিনী বিলাত যাক বা না যাক তাহার খ্যাতি যে গিয়াছে, তাহার পরিচয় পাঠক 'খেয়ালী'তে উদ্ধৃত 'নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড' পত্রে তাহার বিরুদ্ধে আনীত ব্যভিচারের মামলার বিবরণে পাইয়াছেন। সেই বিবরণে বীণার বর্ণনা—

"Dressed in a costly sari...she gave her evidence calmly and faced cross-examination without a tremor."

সে যে মূল্যবান শাড়ী পরিয়াছিল—দরিদ্র শিক্ষকের পত্নীর পক্ষে তাহা পরিধানের কথায় কি কোন ইঙ্গিত আছে? যদি থাকে, তবে বলি—স্বামী দরিদ্র, পিতাও তাহাই—কিন্তু স্নেহশীল বড়কাকা ত দরিদ্র নয়। তবে মূল্যবান শাড়ী আসিবে না কেন? হয়ত মূল্যবান শাড়ী দিল্লী যাত্রার সময় কেনা হইয়াছিল।

দিল্লী যাত্রা সম্বন্ধে ডাক্তার শিশির মিত্র যাহাই কেন বলুন না—ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলিয়াছেন, নলিনীই বীণাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিল—আর কেহ নহে!

তাহার পর সে যে জেরায় টিকিয়াছিল সে—without a tremor. এমন নহিলে বুকের পাটা? কিন্তু tremor ত তাহার পক্ষে নূতন নহে—ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ে দেখি সে বারাণসীতে যে গোপন যাত্রা করিয়াছিল তাহাতে—

"A great joy came into my mind"

অর্থাৎ তাহার মনে এক বিরাট আনন্দ উদ্ভূত হইয়াছিল।

আবার

"I felt very happy before I started for Delhi"

বড় কাকার সঙ্গে একাকী দিল্লী যাত্রার পূর্ব্বে সে খুবই সুখানুভব করিয়াছিল।

সুতরাং বলা যায়, tremor বা শিহরণ তাহার পক্ষে নূতন নহে—তাহাতে সে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। সে ত নিজেই তাহার রোজনামচায় লিখিয়াছিল—সে কাহার ভয় করে?

বিলাতী পত্রের সংবাদদাতা দুইটি কথা বলিয়াছেন—(১) বীণা (অধ্যাপকের) বালিকা পত্নী আর (২) সে সুন্দরী ও অল্পবয়স্কা।

মামলার সময় তাহার বয়স (ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ে দেখা যায়) ২৪ বৎসর; অভিযোগোক্ত ঘটনার সময়ও সে বালিকা ছিল না—যে যৌবনে কুকুরীও রমা হয়—সে তখন সেই যৌবনে উপনীতা।

আর বীণা সুন্দরী কি না, তাহা আমরা কেমন করিয়া বলিব? আইনতঃ যে ব্যক্তি তাহা বলিবার অধিকারী ছিলেন—সেই হতভাগ্যের রহস্যাচ্ছন্ন মৃত্যুর পর তাঁহার শব ত বাক্সেবন্দী প্রোথিত হইয়াছিল।

রসা রোডে বাজার

রসা রোডে যে বাজার করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং তাহাতে স্থানীয় লোকরা যে আপত্তি করিয়াছেন, সে বিষয় আমরা পূর্ব্বে পাঠকদিগকে জানাইয়াছি। এই বাজারের পশ্চাতে যে রহস্য আছে, ক্রমে তাহা উদ্ঘাটিত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন—"রবির পশ্চাতে ছায়া দেখিতেছি।" এক্ষেত্রে ছায়া বিরাটত্বে রবিকে অভিভূত করিতেছে। একটু অনুসন্ধান করিলেই এই বাজার প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে কোন প্রতিষ্ঠানের প্রভাব বা প্রয়োজন দেখা যাইবে। বাজার বসিলে—এমন কি বাজার বসান কর্পোরেশন কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইলেই—জমির "ভ্যালুয়েশন" বাড়িবে। যে জমির "ভ্যালুয়েশন" বাড়ে "মার্জ্জিন" হিসাবে তাহার মূল্য বাড়িয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের ইষ্টচিন্তা কি কর্পোরেশনের নিকট গুরুত্বে—

(১) পল্লীবাসীর আপত্তি ও

(২) আপনাদের অবশ্যম্ভাবী ক্ষতি পরাভূত করিবে?

এইস্থানে বাজার বসিলে যে পল্লীবাসী-দিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে কেবল তাহাই নহে—সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশনের নবপ্রতিষ্ঠিত বাজারের আর্থিক ক্ষতিও অনিবার্য্য অর্থাৎ ইহাতে করদাতাদের অনিষ্টই সাধিত হইবে।

তদ্ভিন্ন বিভাগীয় তদন্তেও প্রতিপন্ন হইয়াছে, স্থানটি বাজার বসাইবার পক্ষে অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

কিন্তু এই সকল বিষয় সত্ত্বেও কি কর্পোরেশনের জনকয়েক কাউন্সিলার এই স্থানেই বাজার প্রতিষ্ঠার সমর্থন করিবেন?

ডাক্তার মৈত্রের "বদলে গেল মতটা"

কলিকাতার ৩নং হালসিবাগানে কোন মাড়োয়ারী ধনী একটি কল বসাইতেছেন। তাহাতে সীসার পাত প্রস্তুত করা হইবে। ওয়ার্ড কাউন্সিলার ডাক্তার যতীন্দ্র মৈত্র ১০ই মার্চ্চ লিখিয়াছিলেন:—

"I have personally inspected the place and am of opinion that the factory in question be removed and work stopped immediately."

তাহার পর ১৯শে মার্চ্চ তিনি হেলথ অফিসারকে লেখেন:—

"I understand that a lead factory is about to be started in my Ward (34 Simla Road). If so I have got the strongest objection. Kindly do the needful."

এ সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যাল আইনের ৩৮৫ ধারা অনুসারে কাজও হয়।

সহসা ডাক্তার মৈত্রের মত পরিবর্ত্তন হইল কেন?

বিলাতে ভারত-কথা

বিলাতে এ দেশের সংবাদ কিরূপে বিকৃত করিয়া এ দেশের লোকের—বিশেষতঃ হিন্দু-দিগের—বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য পরিচালিত করা হয়, সংপ্রতি তাহার একটি নমুনা পাওয়া গিয়াছে। মিষ্টার এচ, জি, ফ্রাঙ্কস্ ভাগ্যান্বেষণে এদেশে আসিয়া এসোসিয়েটেড প্রেসে কূল পাইয়াছিলেন। তথায় চাকরীর সময় তিনি বিশেষ ব্যবসাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া বাঙ্গালার একদল মুসলমানকে একখানি ইংরাজী দৈনিক পত্র প্রচারে প্ররোচিত করেন। তখন মদ্রজ শর্ম্মার সহিত বন্দোবস্তে 'বেঙ্গলীর' ভগ্নাবশেষ ক্রীত হয় ও মিষ্টার ফ্রাঙ্কস্ তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। অর্থাৎ বাঙ্গালার মুসলমানরা কোন বাঙ্গালী বা অবাঙ্গালী মুসলমানকে দিয়া তাঁহাদের মুখপত্র পরিচালন সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। শুনিয়াছি, শর্ম্মার যে 'হুইপ' পত্র সরকারের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, তিনিই তাহারও পরিচালন করিতেন। সংপ্রতি তিনি বিলাত গিয়াছেন। বিলাতের সংবাদপত্রে তাঁহার তথায় পৌঁছা সংবাদে বলা হইয়াছে—

বাঙ্গালার হিন্দুরা এই শীর্ণকায় অধ্যয়নরতাকৃতি লোকটিকে হত্যা করিতে চেষ্টিত!

হিন্দুরা কখন এইরূপ হীন কার্য্য করে না। মিষ্টার ফ্রাঙ্কস বাঙ্গালার মুসলমানদিগের ও সরকারের নিকট যত "গেরামভারী" বলিয়াই কেন বিবেচিত হন না, হিন্দুরা তাঁহাকে ভাড়াটিয়া লেখক বলিয়াই বিবেচনা করেন

and they would not touch him even with a pair of tongs.

নট মন্মথনাথ

প্রফুল্ল নাথ ঠাকুরের "রাজা" উপাধিলাভে আলীপুরের "হ্যাপি ক্লাবের" সদস্যরা রাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর গৃহে 'মুক্তাধারার' অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহার চিত্র 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। একখানি চিত্রে দেখা গেল—রাজা মন্মথনাথ স্বয়ং অভিরাম স্বামীর সাজে সজ্জিত! প্রৌঢ় রাজা মন যে এখনও হামাগুড়ি দিতেছে, তাহা ইহাতে বুঝিতে পারা যায়। সেক্সপীয়র বলিয়াছেন :—

"All the World's a stage. And all the men and women merely players" যখন যুবক মন্মথনাথকে 'বেঙ্গলী'র সুরেন্দ্র নাথ "কুমার" বলিয়াছিলেন তখন হইতে অভিরাম স্বামীর অভিনয় পদ্ধতি বিবেচনা করিলে সেই কথাই কি মনে পড়ে না?

কিন্তু সেক্সপীয়রই অন্যত্র বলিয়াছেন :—

"A poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more."

তাহাই বটে—মানুষ কত রঙ্গে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে—তাহার পর আর তাহার কথা কেহই শুনিতে পায় না। শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জন মানুষের সম্বন্ধেই কি এই কথা বলিতে হয় না? তাহারা দিনকয়েক নানা রূপে আপনাকে ঘোষণা করে বটে, কিন্তু তাহার পর—সব শেষ, খড়ের আগুন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া খপ করিয়া নিভিয়া যায়।

"হ্যাপী ক্লাবের" প্রসিদ্ধ অতিথিদিগের যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে (অন্ততঃ সম্মুখে) আমরা রাজা প্রফুল্ল নাথ ঠাকুরকে খুঁজিয়া পাইলাম না। ইহার কারণ কি? তবে কি "শিবহীন যজ্ঞ" হইয়াছিল?

কালার অপরাধ

বিলাতের কোন পত্র সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে—

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই জন ভারতীয় ছাত্র স্বরাষ্ট্র আফিসে ও ভারত সচিবের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন, লণ্ডনের উপকণ্ঠে কোন সন্তরণ স্থানে তাহাদিগকে সন্তরণ করিতে দেওয়া হয় নাই। ঐ স্থানের ম্যানেজার বলিয়াছেন, কালা বা পীতবর্ণ ব্যক্তিদিগকে তথায় সন্তরণ করিতে দেওয়া তাঁহাদের নিয়ম বিরুদ্ধ।

এ দেশে যাহা হয়, তাহাতে বিদেশে এই সংবাদে আমরা বিস্মিত হই নাই।

কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বাঙ্গালী জজ একবার দার্জ্জিলিংএ গিয়াছিলেন। তিনি কোন য়ুরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হয়ত সেই জন্যই—তাঁহার পত্নী সঙ্গে থাকায়—য়ুরোপীয় হোটেলে তাঁহার স্থান লাভ ঘটিয়াছিল। তাঁহার

সাহিত্য পরিচয়

মূর্ত্ত প্রশ্ন — শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩০, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ গুহ রায় বি-এ কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে। দাম—দুই টাকা।

বিশ্বনাথবাবু বই খানিতে প্রকৃত পক্ষেই একটি মূর্ত্ত প্রশ্ন পাঠকদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, বিশেষ করিয়া তিনি বলিতে চাহিতেছেন ধর্ম্ম যে সমাজ নয়, ধর্ম্ম যে মুষ্টিগত কয়েকটি ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের অভিব্যঞ্জনা নয়, সে যে বিশ্বব্যাপী মানব মাত্রেরই কল্যাণের অগ্রদূত, আসল মানুষটাকে তরজমার বাহিরে রাখিলে ধর্ম্মের হিসাব যে ফুৎকারে উড়িয়া যায়, অথচ সমাজের প্রাণই হইতেছে ধর্ম্ম। হিন্দু সমাজের তলে তলে বহুদিন হইতেই একটা ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়া তাহা বহুদূর বিস্তৃত হইয়া এতখানি বৃহদায়তন হইয়াছে যে, সমগ্র হিন্দু সমাজটাই বুঝি এইবার তাহার গর্ভে ডুবিয়া যায়। এতদিন হিন্দু সমাজ শুধু সতীত্বের অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যের গুণগান করিয়া, শিখা-উপবীতের ভিত্তির উপর সমাজের গণ্ডী বাঁধিয়া, বাহিরের মুক্তির সহজ পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছিল। বাস্তব জীবনের কঠোর সত্যের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে নাই। কিন্তু আজ আর বসিয়া থাকিলে চলিবেনা। তীর জ্যা মুক্ত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার এই সর্ব্বনাশী গতিকে রোধ করিতে হইবে।

গ্রাম্য দলাদলি, অকারণে হৈ চৈ ইত্যাদিতে পূর্ণ গ্রামের চিত্র খানিও অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। বিশেষতঃ গ্রন্থকারের তারিণী চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে অভিনব।

নায়ক অমূল্য লাঞ্ছিতা ধর্ষিতা ইন্দুকে বিবাহ করিল। লাঞ্ছনার ইতিহাস জানিয়াও তাহাকে লইয়া ঘর বাঁধিল। কিন্তু প্রাণে তাহার শান্তি আসিল কই? তাই প্রদীপ যখন নির্ব্বাপিত তখন আশৈশব শিক্ষার উপর অমূল্য বিজাতীয় ঘৃণা অনুভব করিল। তাহার মনে হইল; হিন্দু হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়া আজ তাহার গৌরব করিবার কিছুই নাই। সে যদি হিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ না করিত তাহা হইলে আজ হয়তো সে চেষ্টা করিলে ইন্দুকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতে পারিত এবং ইন্দুরও বিবেকবুদ্ধি সত্যভ্রষ্ট হইয়া আজ অভাগীকে এই শোচনীয় পরিণামের দিকে টানিয়া আনিত না।

এইরূপ বহু প্রশ্ন লেখক বই খানিতে উত্থাপন করিয়াছেন! বই খানির ছাপা ও ভাষা বেশ ঝরঝরে! প্রচ্ছদপট খানিও চমৎকার হইয়াছে। বই-র অনুপাতে দাম একটু অধিক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

দি ক্যালকাটা ডেণ্টাল রিভিউ

দন্ত চিকিৎসা সম্পর্কিত একখানা মাসিক পত্রিকা। ২৩নং ষষ্টীতলা রোড, নারকেল ডাঙ্গা প্রিন্টিং হাউস হইতে এস, এম, দাসগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত এবং প্রকাশিত। সম্পাদক আর, এন, ঘোষ, ডি, ই, ডি, পি (প্যারী)। বার্ষিক মূল্য ৬৲, প্রতি সংখ্যা আট আনা।

স্বাস্থ্যের সহিত দাঁতের সম্বন্ধ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। দাঁত যাহার ভাল স্বাস্থ্যও তাহার ভাল,—বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ইহাই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তাই আজ সমগ্র বিশ্বের চিকিৎসকগণ দাঁত সম্বন্ধে যত্ন লইতে সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন। সুতরাং এ ধরণের পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা যে কত গভীর তাহা সহজেই অনুমেয়। পাশ্চাত্যদেশে এরূপ পুস্তকের প্রচলন যথেষ্টই আছে। কিন্তু প্রাচ্যে ইহাই প্রথম। তন্নিমিত্ত আমরা ডাঃ ঘোষকে অভিনন্দিত করিতেছি। তাঁহার এই প্রচেষ্টা সর্ব্বপ্রকারে ফলবতী হউক। সাধারণ পাঠক এই মাসিক পত্রিকায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ প্রয়োজনীয় বহু তথ্য পাইবেন।

ভোজন পাত্রে ময়লা দাগ দেখিয়া তিনি সে বিষয়ে অনুযোগ করিলে হোটেলের য়ুরোপীয় পরিদর্শক বলিয়াছিলেন—"ওটা দাগ নয়—ও আপনার প্রতিবিম্ব।"

শতায়ুর আকাঙ্খা

মার্কিনের প্রসিদ্ধ ধনী জন, ডি রকফেলারের বয়স ৯৬ বৎসর হইয়াছে। এই বয়স হইলে বীমা কোম্পানীরা বীমার টাকা বীমাকারীকে দিয়া দেন। সেই জন্য গত ৮ই জুলাই তিনি বীমা বাবদে প্রায় দেড় কোটি টাকা পাইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার আর কোন আনন্দ বা স্পৃহা নাই। এখন তাঁহার কেবল বাসনা—তিনি আর ৪ বৎসর বাঁচিবেন—শতায়ু হইবেন। কেশ যখন শ্বেত হয়—দন্ত বিগলিত হয়—তখনও মানুষের বাঁচিবার বাসনা যায় না।

ক্যালকাটা কমফোর্টস্

বহুবাজার ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে যেখানে 'ক্যালকাটা হোটেল' ছিল, সেখানে উপরোক্ত নামে একটি বোর্ডিং হাউস ও রেস্তরা হইয়াছে। উদ্বোধন দিবসে নিমন্ত্রিত হইয়া আমরা সেখানে যোগদান করি। হোটেলটির ব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

অমরেশ ও মীনা

নাটক

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য—ঘর

অমরেশ ও সুরমা

সুরমা—এ রকম কর্লে তো চ'লবেনা দাদা!

অমরেশ—কি ক'রেছি তা বল?

সুরমা—খাওয়া ছেড়েছো—নাম মাত্র একবার ব'সো। রাত্রের ঘুম নির্ব্বাসিত—অর্দ্ধেক রাত্রে উঠে দেখি পশ্চিমের বারান্দায় পায়চারি ক'রছো।

অমরেশ—তোকে বুঝি মীনা ব'লেছে?

সুরমা—মীনা বলতে যাবে কেন, তার ব'য়ে গেছে; আমি দেখেছি। মীনা বেশ ঘুমুতে পারে, পারনা তুমি!

অমরেশ—(অল্পক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) বুঝতে পারছি আমার উপর একটা পরিবর্ত্তন ঘনিয়ে এসেছে। আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও কিছু ক'রে উঠতে পারছি না।—কি করি ব'লতে পারিস?

সুরমা—বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসবে?—দার্জ্জিলিং কিংবা সিমলা?

অমরেশ—মীনাকে সঙ্গে নিয়ে, না রেখে?

সুরমা—তোমার যা খুসী।

অমরেশ—এইটি তুমি ঠিক ব'লতে পারলে না! তাকে আমি সঙ্গে নিতে পারবো না, কারণ, মন তার যে সুরে বাঁধা আছে, আমার মন তাতে সাড়া দেয় না। তাকে রেখে যেতেও পারবো না, কারণ, আমার ভেতর সঙ্গোপনে স্বামী ব'লে যে প্রাণীটি বাসা বেঁধে আছে সে স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব ক'রতে চায়।—কিন্তু সে ইতর, সে হিংস্র, সে স্বার্থপর। আমি তার নির্দেশ মান্‌তে চাই না।

সুরমা—তা হ'লে সমস্যা যে তুমিই নিজেই সৃষ্টি ক'রলে দাদা! এর সমাধান তুমি ক'রবে কি দিয়ে?

অমরেশ—তাইতো ভাবছি। সেই ভাবনার জন্যেইতো পরিবর্ত্তন গুলো তোর চোখের ওপর অমন—

(মীনার প্রবেশ)

(অমরেশ স্তব্ধ হইয়া গেল)

মীনা—আমি আসতেই বুঝি ব্যাঘাত হ'ল?

সুরমা—এসো, ব'সো।

মীনা—আমি ব'সলে তো তোমাদের কথা হবে না!

সুরমা—আমরা এমন কোন কথা কইছি না, যা তোমার সামনে কওয়া চলে না।

মীনা—সত্যি! আমি ভাবছিলুম তোমাদের কথা আমার সামনে কওয়া বুঝি আর চ'লবে না!

সুরমা—এমন কিছুই হয়নি যার জন্যে তোমার এ রকম মনে হ'তে পারে।

মীনা—বাকী কিছুই নেই! আমি এমন নাবালিকা নই যে বুঝতে কিছুই পারি না! তোমরা সাধুতার ভান কর্লেও এ বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে যে, আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চ'লছে!

সুরমা—ষড়যন্ত্র! কি ব'লছো তুমি মীনা!

অমরেশ—একটু ঘুরে আসিগে—

মীনা—কেন, কথাটা কি বড়ো বেশী তীব্র হ'ল?

অমরেশ—না, তা হয়নি। কিন্তু—ষড়যন্ত্র কর্চ্ছি তোমার বিরুদ্ধে একথা অন্ততঃ তোমার বলা চলে না!

মীনা—কেন, আমার উপর অনুকম্পা কি তুমি খুব বেশী ক'রেছো যে আমার ঐ কথা বলা হবে একেবারে অমার্জ্জনীয় অপরাধ?

সুরমা—মীনা, লোকটাকে একটু শান্তি দে। আমি মিনতি ক'রে বলছি। তোর হয়তো চেয়ে দেখবার অবসর নেই, কিন্তু থাকলে দেখতিস কি ঝড় ওর বুকের উপর দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে।

মীনা—তোমরা শুধু একটা দিকই দেখ্‌ছো। আমার ভেতর যে কি হচ্ছে তা তোমরা দেখনা, দেখতে চাওনা!

সুরমা—তার মানে?

মীনা—তার মানে, তোমরা নিজের কষ্ট বোঝ, পরের কষ্ট বোঝনা।

অমরেশ—কষ্ট——

মীনা—হ্যাঁ, হ্যাঁ কষ্ট। তুমি তো বিদ্রূপ কর্ব্বেই। সুযোগ পেয়েছো, বিদ্রূপ কর্ব্বে না! কিন্তু—

(মীনা সহসা কাঁদিয়া ফেলিল, সে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল)

(সুরমা ও অমরেশ প্রথমটা অবাক হইয়া গেল, পরে সুরমা বলিল—)

সুরমা—আচ্ছা, এ সব কী আমায় ব'লতে পারিস?

মীনা—আমি জানি না।

(উঠিয়া প্রস্থানোদ্যত মীনা, সুরমা পথ আগলাইয়া ধরিল)

সুরমা—যে না ব'লবে—আমার দিব্যি!

মীনা—ব'লবো কি, তুমি দেখ্‌তে পাওনা?…সে দিন থেকে আমার সঙ্গে ভালো করে কথা কন্ না। আমি বিছানায় শুয়ে থাক্‌লে সে বিছানা উনি স্পর্শ করেন না! আমি যেন বাড়ীর কেউ নই, আমি যেন মরে গেছি!

সুরমা—কিন্তু তুই তো কখনো জিজ্ঞাসাও করিস্‌নি ওর কাছে গিয়ে—

মীনা—জিজ্ঞাসা কি কর্ব! জিজ্ঞাসা না ক'রেই জানি এ আগুনের কারণ হচ্ছে প্রকাশ!

অমরেশ—একে যদি আগুন ব'লেই তোমার ধারণা হয় তা হ'লে তার কারণটা নিশ্চয়ই এমন কিছু—যাতে সত্যিই আগুন ধরে!

মীনা—জানি, জানি—তুমি যা ব'লবে তা জানি। কিন্তু সে 'কারণ' নিয়ে খেলা ক'রেছে কে? তুমি না আমি? প্রকাশকে আমাদের মাঝে ছেড়ে দিয়ে, ঔদার্যের মুখোশ প'রে তুমি নিজে সে আগুন জ্বালিয়ে দাওনি?

অমরেশ—আমি! তা হয়তো দিয়েছি। তাই সে আমায় এমন ক'রে ঘিরে ধ'রেছে। কিন্তু আমি তো কথা কইনি। আপত্তিও করিনি। জ্বলুক সে!—আমার নিজের হাতে জ্বালানো শিখা আমাকে নিয়েই জ্বলুক। তুমি তার ভেতর এসো না!

(প্রস্থান)

মীনা—আমি যেতেও চাই না—

(প্রস্থানোদ্যত)

সুরমা—কিন্তু একটা কথা আমায় বলবি?

মীনা—বল্তে হবে—

সুরমা—তুই কি আজ কোমর বেঁধে ঝগড়া কর্ত্তেই এসেছিলি?

মীনা—তাই এসেছিলাম। কিন্তু আমার পায়ে ধ'রে মাপ্ চাওয়া উচিৎ ছিল, না?

সুরমা—পাগল! সে কাল উঠে গেছে!

মীনা—উঠে যাবে কেন, তোমরা তো আছো! দরকার হ'লে তোমরা চেও!

সুরমা—সে রকম দরকার আমাদের হয় না ভাই! যদি গ্রহের ফেরে কখনও বা হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে পায়ে ধরবার আর অবকাশই থাকবে না!

মীনা—পত্র পাঠ বিদায় না কি?

সুরমা—তা হ'লে তো জাতটা গোকুলে বেড়ে উঠবে। তা নয়; নবাব সিরাজদ্দৌলা ফৈজীকে দেয়ালে গেথে ফেলেছিল জানত'? —সেই রকম একটা কিছু!......

মীনা—তাই কর্ো যদি তোমার আশ্ মেটে, তোমার দাদাকে তাই না হয় বোলো!

সুরমা—আরে ছর, তা ব'লতে যাবো কেন! এ ব্যবস্থা তো তোমাদের জন্য নয়, এ ব্যবস্থা আমাদের জন্য! তোমাদের হদ্দ জেলের পুলিশ কোর্ট বা কয়েক মুঠো গিনির খেসারৎ! ওকি ভাই, তুমি এই কথায় আবার চোখের জল ফেলবে? আমি সত্যি ভাই ঠাট্টা ক'রে ব'লেছি, বিশ্বাস না হয়—

(দীপকের প্রবেশ)

ওমা, একি তুমি! কবে ফিরলে গো?

দীপক—ফিরেছি কা'ল।—নমস্কার!

(মীনাকে)

(মীনা প্রতিনমস্কার করিল)

সুরমা—আমায় একটা খবর দিতে নেই?

দীপক—খবর আমি কোন্ কালে কাকে দিয়েছি!—কিন্তু মীনাদি'র এরকম রোদন-ভাব কেন?

সুরমা—সে ওকে একটা কথা বলেছি ব'লে ও কেঁদে ফেললে। আচ্ছা তুমি বলতো—

(মীনা প্রস্থানোদ্যত কিন্তু সুরমা তাহাকে খপ্ করিয়া ধরিয়া বলিল—)

—পালালে ছাড়বো না।

মীনা—আঃ! কি হচ্ছে!

সুরমা—কেন, কথাগুলো কি সাহসের সঙ্গে আলোচনা করা যায় না? যাকে বলে —boldly? (নিম্নস্বরে)

মীনা—যায়, কিন্তু জামাই বাবু এদ্দিন পরে এলেন তুমি না হয় একটু একলাই থাকলে! আমি ততোক্ষণ বরং বাবুর্চ্চিখানায় খবরটা দিয়ে আসিগে।

(প্রস্থান)

দীপক্—চুপি চুপি কথাটা হল কি?

সুরমা—সে কথা তুমি শুন্তে চাও কি হিসেবে?

দীপক্—বলেছো ঠিক্। স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে চুপি চুপি যে কথা হয় পুরুষের তা শোনা যায় না!

সুরমা—শুনলে সময়ের অপব্যবহার হয় পুরুষের, না?

দীপক্—ঠিক্ তাই, কারণ ওর চেয়ে অ-কেজো আলাপ সংসারে খুব কমই আছে কিন্তু—

সুরমা—ঐ যাঃ! তোমায় একটা নমস্কারও করিনি এতোক্ষণ।—

(সুরমা দীপককে নমস্কার করিল)

কৈ, একটা আশীষ বচনও মুখ দিয়ে বেরুলো না?

দীপক্—আমার আশীষ বচন কি তা তোমার জানা আছে। বারে বারে তার পুনরুক্তি কর্ত্তে চাইনা!

সুরমা—সেই ভারতবর্ষ ও সেই ভারতের নারী—সেই সব কথা তোমার আশীষ বচন চিরকাল ধরে?

দীপক্—চিরকাল। ও ছাড়া অন্য আশীষ ভারতের নারীর জন্য আর নেই—তোমার জন্যও না!

সুরমা—ভারতের নারীর জন্যে যদি তোমার এতোখানিই দরদ তা হ'লে তাদের দু'জনের আলাপকে অ-কেজো ব'লে তুমি কি ক'রে ফতোয়া দিচ্ছ?

দীপক্—তা না দিতে পারলে আমি সব চেয়ে সুখী হতুম সুরমা! কিন্তু তা হবার নয়। দু'জন স্ত্রীলোক মিলে কোন কাজের কথা কখনও ক'য়েছে ব'লে আমার মনে হয় না। অবশ্য, এর ব্যতিক্রম যে কখনও হয়নি তা বলি না।—কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে হয় একজন পুরুষ অদৃশ্যভাবে কাজ করে অথবা পুরুষেরই দেওয়া নির্দ্দেশ অনুসারে হয় কাজের অনুষ্ঠান!

সুরমা—কিন্তু তাই কি সাধারণ নিয়ম নয়? আমরা কাজ করব, তোমরা তো অদৃশ্যভাবে প্রেরণা জুগিয়ে দেবেই। আমাদের সকল অনুষ্ঠান তো তোমাদের নির্দ্দেশ

ফুটেছিল একটি ফুল

শ্রীমনসা চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘ আট বছর শিক্ষয়ত্রীর জীবন কাটিয়ে গান গেয়ে, মাসিকের পাতায় নিজের কবিতা ছাপিয়ে হঠাৎ একদিন বিভা সরকার আবিষ্কার ক'রে বসলো—তার জীবন, এই এক ঘেয়ে বেসুরো জীবন থেকে তাকে পেতে হ'বে মুক্তি—যে কোনরূপে মুক্তি। নিঃসঙ্গ জীবন-যাত্রা আর শেষ পর্য্যন্ত চরম ব্যর্থতার কল্পনা আজ বিষিয়ে তুলেছে তার জীবন-ধারাকে। পাংশু, বিবর্ণ দিন, ক্লান্ত নিষ্প্রাণ রাত্রি—কোন রকমে দিনের পর দিনের ছেঁড়া সুতো টেনে যাওয়া, রাত্রির অন্ধকারে নিরাশার বেদনায় ডুকরে কেঁদে উঠা—যেন তারি অপেক্ষায় থাকে উন্মুখ হ'য়ে। না, সে আর পারে না, অবসাদের পাষাণপুঞ্জ, ছন্দহীন জীবনের বিভীষিকা সে আর সইতে পারে না। একটা সুরাহা তাকে করতেই হ'বে। স্কুলে একদল মেয়ে নিয়ে আর বাঁচতে যেন পারছে না সে। যদিও মানুষ নিয়েই বাঁচে মানুষ। মানুষকে ভালবেসে, নিবিড়ভাবে কাছে পেয়ে। কিন্তু আজ আর ভাল লাগছে না তার বন্ধুদের সঙ্গে অকৃপণ হৃদ্যতা, অলস আনন্দ। ......মানুষ যাকে চায়, যাকে আশা করে—তাকে পায় না। এই দুঃখ আর এই পরাজয় মানুষের চিরন্তন। দূরে থেকে কাছে আসা, আর ভালবেসে ভুলে যাওয়া। কেন এমন হয়? মানুষের চিরকাল এ কান্না কেন? টেবিলের উপর সাজানো টাইমপিসটার দিকে তাকিয়ে ভাবলে বিভা।

সে যখন লেখে—রামধনুর টুকরা'র মতো রঙিন উজ্জ্বল কথার স্রোত যখন সৃষ্টি করে, তখন খুব ভাল লাগে তার একা থাকতে, নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে লেখার সমুদ্রে, অন্ধকারে। তাকে ঘিরে থাকে, তার নিঃসঙ্গতাকে ঘিরে থাকে তখন স্বপ্ন আর কল্পনা। নির্জনতা হয় মুখর। আর যখন তার ইচ্ছা হয় না লিখতে, ক্লান্তি আর অবসাদ জমে উঠে প্রাণের পরদায়, তখন জীবনের পূর্ণতাকে ডেকে আনবার তাগিদে সে হয় অস্থির, উন্মত্ত।......

হঠাৎ আয়নার দিকে চেয়ে কপালে গড়িয়ে পড়া দু'এক গাছা চুল সরিয়ে দিতে দিতে সে ভাবলে: 'বিয়ে করবে, নিশ্চয়ই বিয়ে করবে সে এবার।' তাতে হয়তো পাবে প্রচুর শান্তি, সুখ। অবসাদের কারা-প্রাচীর ভেঙ্গে যাবে আর সে অনুভব করবে অপর একজনের উষ্ণ রক্তের স্পর্শ। উভয়ে উভয়ের মধ্যে মিশে থাক্‌বে। কিন্তু কা'কে সে বিয়ে করবে? অনেকের কথাই মনে হ'লো, কিন্তু ভাল লাগলো না তার। তারপর কল্পনার সমুদ্র থেকে তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো এক তরুণ কবি। আফ্রোদিতে যেমন ক'রে ফুটে উঠেছিল ঢেউয়ের সমুদ্র থেকে। ......এমন এক সময় ছিল যখন পরিতোষ, এই তরুণ কবি, বিভাকে ভাল বাসতো। দু'জনেই কলেজে পড়তো, তখন তাদের বয়সও ছিল এক। দু'জনেরই ছিল অপরূপ, অবিশ্বাস্য, আশ্চর্য্য সে-ভাল-বাসা। এক-ই পাড়ায় থাকতো তারা। পরস্পর দেখা হ'তো প্রায় অনেক সময়ই, তবু তারা দু'জন দুজনকে লিখতো চিঠি। ......একদিন ভোরে বিভা একখানা চিঠি পেল, সাদা খামে। খসে পড়া বকের পালকের মতো সুন্দর সাদা খামে, মুক্তার মতো লেখা। পরিতোষের বুকের উষ্ণতা আর বুকের স্পন্দন বয়ে এনেছিল সে-চিঠি। —'তুমি চিঠি দিতে এত দেরী করো কেন? তোমার চিঠি না পেলে কেমন ক'রে বাঁচি। আমার বুকের জমাট করা ব্যথা, যে-ব্যথা তিলে তিলে শুষে নেয় আমার বুকের রক্তকে, হয়তো তুমি বোঝ না।' দুঃখ করে লিখেছিল পরিতোষ। আবার জবাব দিয়েছিল বিভা: 'ওগো বুঝি, বুঝি তোমার বুকের ব্যথা। কিন্তু কী করবো!' তারা অপেক্ষা করেছিল অনেক মাস, অনেক বছর, শুধু আনন্দ নয়—ব্যথা, আশঙ্কা আর আতঙ্ক নিয়ে। কিন্তু একদিন এক অজ্ঞাত সমুদ্রের ফেনিল জলোচ্ছ্বাসে, তারা ভেসে গিয়েছিল, ডুবে গিয়েছিল। তারপর আর তাদের দেখা হয়নি। ভগবানকে ধন্যবাদ তবু তারা পরস্পরে পরস্পরের খবর জানতো

অনুসারেই সংঘটিত হবে। তাই কি হবে না?...

দীপক্—না হবে না। কেন তা হবে? চিরকাল ধরে এই বিধি মাথায় তুলে নিয়ে কে তোমাদের নৃত্য কর্ত্তে ব'লেছে? এখন বেশ হবে যে, আমরা বরাবরই বলে যাবো এবং তোমরা বরাবরই শুনে যাবে? জগতের দরবারে তোমাদের নিজস্ব কথা ব'লে কি কখনো কিছু থাকবে না? এমন কি কখনই হ'তে পারবে না যে তোমাদের কোন এক নিজস্ব নির্দ্দেশ অনুসারে সারা পৃথিবীময় একটা তোলপাড় প'ড়ে গেল?...

সুরমা—আমাদের নির্দ্দেশ অনুসারে পৃথিবীময় তোলপাড় হয় এ আমরা মোটেই চাই না—জেনে রাখবেন মহাশয়। সে কাজ কর্ত্তে হয় করগে তোমরা। যে যতই বলুক, আমরা থাকবো ঠিক্ তোমাদের জন্যে, নিজের জন্য বিশ্বের দরবারে কোন অজুহাতেই আমরা হাজির হ'তে চাই না। সুতরাং বক্তৃতা থাক্।

(ক্রমশঃ)

ধূসর, অস্পষ্ট। অতীতের অন্ধকার থেকে আজ এই জ্যোতির্ম্ময় পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিভা আবার চিঠি লিখলো পরিতোষকে।—'অনেকদিন পর তোমাকে আবার চিঠি লিখছি। আশ্চর্য্য হ'বে নিশ্চয়ই। ভয়ানক একা লাগছে। সময় যেন আর কাটতে চায় না। এই দীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটিতে কী আর করবো এখন। তোমাকে আমার নিতান্ত দরকার। পত্র পেয়ে চলে এস কিন্তু! আর কবে আসবে চিঠি লিখ। ষ্টেশনে লোক রাখব।'

বিভার চিঠি এসে সময়েই পৌছাল পরিতোষের হাতে। ফলে তার বুকে জ্বলে উঠলো বহুদিনের নির্ব্বাপিত জ্বালা। সে ভাবলে: 'কেন সে যাবে বিভার কাছে? বিভা তার কে? জীবন মালঞ্চে ফুটেছিল একটী কুসুম, আবার ঝরে গ্যাছে।' অনেকক্ষণ চুপকরে রইলো সে আকাশের দিকে চেয়ে। তারপর আবার ভাবলে: বিভা যখন ডেকেছে তাকে, কেন যাবে না সে! কীসের জন্য? লোকের কাছে যাওয়াই কী অপরাধ? তার নিতান্ত একা লাগে। সময় কাটছে না। তাই সে লিখেছে তাকে যেতে। না, সে যাবে—নিশ্চয়ই যাবে বিভার কাছে।......তাড়াতাড়ি একটা পোষ্ট-কার্ড লিখে পাঠিয়ে দিল সে: 'আসছে সোম-বার তোমার ওখানে গিয়ে পৌছাব। তবে ষ্টেশনে লোক রাখবার তেমন দরকার নেই।'

* * *

পরিতোষ এলো। আর তাকে পেয়ে বিভা সুখী হ'লো খুব। এক রাত্রে তারা ঘরে বসে গল্প করছিল: চালিয়ার পারতো ব্যারণ সাজতে। তাই ব্যারণ লণ্ডন গেলে চালিয়ার একরাত্রে ব্যারণ সেজে জেনে-ভিভের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে শেষটায় পড়লো ধরা। আর ব্যারণও ফিরে এলো সে-রাত্রে। স্বামীকে চিনতে পেরে জেনে-ভিভ তার সঙ্গে অভিনয় করলে বে-হিসাবে। কিন্তু ব্যারণ প্রকাশ করলে, সে এসেছে ভোরে।......হঠাৎ বিভা বল্লে: 'চলো ছাদে যাই। সেখানেই শোনা যাবে তোমার গল্প।' সুন্দর হাওয়া বইছিল ফুর-ফুরে, নরম। একটা পাটি আর পাখা নিয়ে সে উঠলো ছাদে। পরিতোষও নিঃশব্দে চল্লো তার পিছন পিছন। আকাশে চাঁদ আর তারা। তারাগুলো ফুটে উঠছিল একটার পর একটা করে আমাদের গোপন বাসনার মতো।

—'সত্যি বড় একা লাগে!' আস্তে বল্লে বিভা।

—'কেন এমন হয়?'

—'প্রাণ যেন হাহাকার ক'রে উঠে। সর্ব্বদাই যেন অনুভব করি একটা অভাব—দারুণ একটা অভাব। বুক যেন ভেঙ্গে যেতে চায়। বড় কষ্ট!'

—'হলোই বা! কষ্ট কী তোমার জন্য নয়?'

—'সহ্য আর হয় না মোটেই। আর এ-কষ্টতো দিচ্ছ তুমিই।'

—'আমায় স্পষ্ট ক'রে একবার বুঝিয়ে বলো, কী বলতে চাও তুমি।'

—'আমি যা' চাই, তাকি পাব না।'

—'কী চাও তুমি?'

—'আনন্দে আমার বুক ভরে দেবে না? তুমি কী আমাকে সৃষ্টি করবে না আবার নতুন সুরে, নতুন ধারায়।'

পরিতোষ একটু ভাবলে। তারপর বল্লে আবার:

'—আরো অপেক্ষা করো কিছুদিন।'

—'কেন তুমিতো এসেই পড়েছ।'

পরিতোষ কোন কথা বল্লে না।

—'ওগো কেন, কেন তুমি আমাকে সুখী করতে চাও না?' শুধাল বিভা।

—'তুমি আর আমি কী করতে পারি, বিভা। কতটুকুন ক্ষমতা আমাদের।'

দুজনেই চুপচাপ। কাটলো খানিকক্ষণ। তারপর পরিতোষের একখানা হাত তার হাতের ভেতর টেনে এনে আস্তে একটু চাপ দিয়ে বল্লে বিভা: 'তুমি কী আমায় পেতে চাও না?'

পরিতোষ নীরব, নিস্তব্ধ। তারপর বল্লে: 'পুরুষ চিরকালই ভালবাসে নারীকে প্রাণ দিয়ে, অন্ধ হয়ে; কিন্তু নারীই শিখায় তাকে প্রতারণা। আমিও একদিন তোমায় ভালবেসেছিলুম বিভা।'

বিভার হাতের উষ্ণ স্পর্শ গিয়ে লাগলো তার হৃৎপিণ্ডে। আর ইচ্ছা হ'লো তার ভেঙ্গে পড়তে, লুটিয়ে পড়তে—চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠতে।

অস্পষ্ট অন্ধকারে পরিতোষের বিস্ফারিত দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে নরম সুরে বল্লে বিভা: 'তোমাকে ছাড়া আমি যে আর বাঁচি না—বাঁচতে পারিনা।'

নূতন প্যাকেট থেকে একটা ক্যাভেণ্ডার জ্বালালো পরিতোষ। তারপর বল্লে: 'তোমাকে সুখী করতে পারব না আমি! রেখা, যে রেখা আমাকে একদিন আশ্রয় দিয়েছিল তার স্নিগ্ধ, কোমল বুকে, তাকেই জীবন পথের সাথী করবো বলে ভেবেছি। তুমি যেদিন আমার ভালবাসাকে অপমানিত, পদদলিত করে চলে গেলে, সেদিন হতাশার বেদনায় আমি উঠেছিলুম পাগল হয়ে, আর রেখা,—সেই ছোট মেয়ে, আমার বৌদির বোন, আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল তার যৌবনের জৌলুশে, স্পর্শের দীপ্তিতে। আমি তাকে ভালবাসি। রেখাকে, সেই ছোট্ট মেয়েকে—যৌবন তার নিটোল, চাঁদের মতো সুন্দর। তুমি আর ভুল ক'রোনা বিভা।'

'তবে তুমি—'আর কোন কথাই বেরুল না তার মুখ দিয়ে। ডুঁকরে কেঁদে লুটিয়ে পড়লো বিভা তার কোলে, ঝরণার মতো, বাতাসের মতো।

পরিতোষও বিভাকে বুকে জড়িয়ে বসে রইলো সেখানে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ ......।

ডায়েরীর ছিন্ন-পত্র

প্রেমের আভাষ

রঞ্জন

প্রেমের একটা রূপ আছে। মানুষ মানুষকে ভালবাসে তার নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে দিয়ে, হেলায় ফেলে, তার সামনে যদি অমূর্ত্তভাবে বিপদও আসে তবুও তারা তাকে উপেক্ষা করে, বুভূক্ষাভরে থেৎলে ফেলে দিয়ে চ'লে যায় ঠিক নদীর উদ্দাম গতির মতো···

সৃষ্টি আদিম কালের। প্রথম মানব-মানবী আদম্ আর ইভ্ বুঝি এই পৃথিবীর বুকের ওপর প্রথম প্রেম, প্রথম চুম্বন, প্রথম পুরুষ-নারীর মধুর মিলন দেখিয়েছিলেন তাই আজ তাঁরই সৃষ্টি পৃথিবীর জীবেরা ভালবাসার ডোরে, প্রেমের বাঁধনে, স্নেহের দাবীতে কাঙ্গাল, রিক্ত একেবারে নিঃস্ব! প্রেমের দুয়োরে এসে দাঁড়ায় যারা, তারা বাদ-বিচার মানে না কিছু, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী নির্ব্বিচারেই এসে যোগ দেয় সকলে।

পিতা স্নেহ করেন ছেলেকে, মা সন্তানকে বুকের পাশে টেনে নিয়ে তাঁর বুকের সিঞ্চিত উষ্ণ দুগ্ধ পান করান, স্ত্রী ভালবাসে তার প্রাণ-প্রতিম আরাধনার নিধি স্বামীকে, স্বামী তার প্রিয়াকে বুকের মাঝে টেনে আনে, তার তপ্ত আবেগময় অধরে নিজের অধর স্পর্শ করে, বলে, ওগো আমার জীবনের সাথী!···

এমনি ভাবে ভালবাসে সকলে—

ভালবাসার বিচিত্র ধারা বেরিয়ে পড়ে নানাদিকে এই জগতের বুকের ওপর দিয়ে।

যৌবন কৈশোরের সন্ধিক্ষণে—

আমার এই জীবনের ওপর দিয়ে এ রকমের একটা চিত্র আছে আঁকা, যার তুলির মোহনীয়তায় আমার জীবনের একটি অধ্যায় পরিপূর্ণ হয়েছে শুভ্র, সুন্দর স্বচ্ছ কিন্তু করুণ তা ততাশে—

আজ ডায়েরী লিখ্তে ব'সে অতীতের অনেক কথাই ভাবি—

মনে পড়ে শিউরে উঠি আবার তারই বিভোরে মগ্ন হ'য়ে পড়ি!···

সে মধুর কিন্তু অতি করুণ স্মৃতিগুলো আজ আমায় উন্মনা ক'রে তোলে যেন।···

লক্ষ্মৌতে আলাপ—

'বাণী'র সম্পাদক হিসেবে—

গীতা বলে: তরুণ কবি আপনি!

কলেজে পড়ে, তার বন্ধু অণিমা হেসে বলে: না, সাহিত্যিক, কথা সাহিত্যিক, শরৎচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য!···

আমার বোন চিন্ময়ী বলে: বেশ, দাদা কবিই হ'ক, আর কথা সাহিত্যিকই হ'ক, তোদের কী!···

চিন্ময়ীর কথায় বাধা দিয়ে রেণুকা বলে : কবি না ছবি !…হাঁ, ভারী তো লেখা, ওরকোম আমি ঢের ভালো লিখতে পারি, লিখি না যে তাই !…

সুন্দরী ওকে, ফুটফুটে চেহারা তার, কেউ যদি তাকে একটু কড়া কথা বলে, অমনি তার কান দুটো লাল হ'য়ে পড়ে, চোখ ছলছলো হয় !…

আমায় দেখলেই মুখ ফেরায় ও, কিন্তু সভা থেকে পালায় না।…

আমার সুখ্যাতি ওর প্রাণে যেন সয় না !…

রেণু, রেণুকা ; আমার পালী'র বোন যেন !…

কিন্তু আশ্চর্য্য ও, আমায় দেখলেই ওর প্রাণে যেন একটা অস্বস্তি বোধ আসে !…

আমার বোনের কানে কতোবার ব'লেছে ও, জানলি চিনু ! তোর দাদা, চিনুদা, লিখতে কিছুই জানে না, যা লেখে নকল, এর ওর নকল, আমি তো ওর লেখা পড়িই না !…

প'ড়বো কী আর, ছাই, যত সব রাবিশ, রূপক গল্প লিখবে তাতেও কবিজনোচিত ভাব, দেখ না, অমিয়দা, ওরে অমিয় জীবন মুখোপাধ্যায়, যে আগে 'বাণী'র সম্পাদক ছিলো, সে কেমন লেখে…কতো নাম !…

আরোও কত কী বলে !…

রোজ রাত্রে চিন্ময়ী আমার লেখার সমালোচনা করে, তীব, খুবই তীব্র, তর্ক ক'রতে ক'রতে যখন সে সীমার বাইরে চলে যায়, তখন সে চীৎকার ক'রে ব'লে ওঠে : হ্যাঁ, তোমার লেখা ছাই দাদা !…আমি কেন, তোমার লেখা ও…ওই রেণুও পড়ে না !…

'রেণু'র কথা উঠতেই আমি হেসে ব'লে উঠি : থাক্, আর ব'লতে হবে না, বুঝেছি, তোমার তর্কের দৌড় কতোদূর !…

চিন্ময়ী আমার হাসি দেখে আরোও রেগে যায়, বলে : তোমার লেখা কেউ পড়ে না !…

কেউর ওপর যেন একটু অকারণেই জোর দেয় ও !…

'রেণু'র কথা উঠলেই আমি হেসে বলি : হ্যাঁ, ভা-রী তো, না হয় একটু গানই জানে ভালো—না হয় দু একটা রেকর্ডও আছে, তাতে এতো দেমাক !…

'রেণু'র কাছে এ কথা ব'লতে সাহস হয় না আমার, আড়ালেই বলি।…

কিন্তু আশ্চর্য্য ও, আমার সামনে ও যেন একটু বেশীই অপমান করে আমায়…

আশ্চর্য্য এ রেণু !…

কাউকে ও কিছু চায় না ব'লতে, কিন্তু আমায় দেখলে ও যেন সাত হাত দূরে থাকলেও লাফিয়ে ছুটে আসে !…

কিন্তু 'রেণু'র এ অপমান আমার মনকে কশাঘাত করে না, কিন্তু তবুও করে !…

এ কীসের অনুভূতি বুঝতে পারি না, কিন্তু তবুও যেন বুঝি !…

আশ্চর্য্য এ নারী-প্রকৃতি !…

এই রেণুকে নিয়ে আমার জীবনের একটি বড়ো অধ্যায় গঠিত হয়েছে, পরের কতোগুলি ছিন্ন-পত্রে তা একের পর এক ক'রে লিখে যাবো !… (ক্রমশঃ)

পারকার ও "সুমিত্রা"

শ্রীপরিতোষ দে

একান্তই দরকার তাই আজ আনলাম পারকার লেডিজ প্যাটার্ণ
'মন—দেয়া—নেয়া'—প্যাটার্নটুকু যার নিছক মডার্ণ।
লিকলিকে মাফচেনে দোলে যেথা মধুর লকেট্
তার নিচে আলগোছে পেনটিরে করব কি সেট্ ?
বলো যদি কাঁচুলির বোতামের ফাঁকটায়
দেখি ওর রোল গোল্ড ক্লিপ্‌টা কেমন আটকায় !

রাত বেশ চাঁদনী—খব খবে জ্যোছনা !
গুলজার বীথিকার ওই গুলো টকটকে রোজনা !
খই-ফোটা হাস্নুর ভুর ভুর গন্ধে
প্রাণমন নাচে কোন সামপেন রূপসীর নাচন-ছন্দে !
ফিন্‌ ফিনে শাড়ীটিও ফুর ফুর সমীর-দোদুল—
ফাঁকে ফাঁকে ঝিক্‌মিক্ শরীরের কাঁচা সোনা—লাবনী—লোলুল !
খোঁপা-খসা এলোচুল দখিণায় অধরে লুটায় ;
লাল গাল, নীল চোখ ইসারা ছড়ায় !

একদম একেলা তুমি যেথা ঝকঝকে ঝলমল—
ঢুল ঢুল তনুভারে টলমল
সেথা আজ আনলাম এই মোর 'পারকার'—
পরাণের গোপনের সুগোপন উপহার !
যৌবন-মৌ-লালী ঈপ্সারে রূপ-দান করো
কবিতায় কবিতায় গল্পে গল্পে
সব তব জীবনের রাঙা রাঙা স্বপনের এক এক চিত্র
এঁকে যেও ফর ফরে তন্বী 'সুমিত্রা' !

স্বদেশী বীমা কোম্পানী

সব্যসাচী

হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর তরফ হইতে আর একখানি পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে ডিরেক্টারদিগের স্বাক্ষর নাই। ইহাতে হিন্দুস্থানের দাদন নীতির সমর্থনচেষ্টায় বলা হইয়াছে, বিদেশের অনেক বিখ্যাত বীমাভিজ্ঞ জমী ও গৃহাদিতে টাকা খাটান সমর্থন করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কয় জন খ্যাতনামা লোকের নাম দিয়া লোককে অভিভূত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, এই চেষ্টা সাধারণ ভাষায় ধূলি নিক্ষেপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কারণ—

(১) প্রুডেন্সিয়ালের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী সার জর্জ্জ মে'র কোম্পানীতে পলিসীর উপর ধার ধরিয়া মর্টগেজে মোট খাটান টাকার পরিমাণ :—

বৎসর		পরিমাণ (প্রায়)
১৯২৭	...	১৮ টাকা
১৯২৮	...	১৯ „
১৯২৯	...	১৭ „
১৯৩০	...	১৮ „
১৯৩১	...	১৬ „
১৯৩২	...	২০ „
১৯৩৩	...	১৬ „

কখনই শতকরা ২০ টাকার অধিক নহে।

(২) সার জিরাল্ড রায়ান যে ফিনিক্সের চেয়ারম্যান তাহার হিসাব :—

১৯২৭	...	২৭ টাকা
১৯২৮	...	২৯ „
১৯২৯	...	২৮ „
১৯৩০	...	২৯ „
১৯৩১	...	২৯ „
১৯৩২	...	২৭ „
১৯৩৩	...	২৫ „

দেখা যাইতেছে, বন্ধকে দাদনের টাকার পরিমাণ কমাইয়া আনা হইতেছে।

(৩) মিষ্টার পেনম্যান যে এটলাস কোম্পানীর একচুয়ারী সেই এটলাস কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই, এইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই :—

১৯২৭	...	১৯ টাকা
১৯২৮	...	১৭ „
১৯২৯	...	১২ „
১৯৩০	...	১২ „
১৯৩১	...	১৩ „
১৯৩২	...	১৩ „
১৯৩৩	...	১১ „

কোন বৎসরই বন্ধকে দাদনের টাকার পরিমাণ কুড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে নাই।

(৪) মিষ্টার কুটস যে প্রভিডেন্ট মিউচুয়ালের ম্যানেজার তাহার হিসাব—

১৯২৭	...	৯ টাকা
১৯২৮	...	১১ „
১৯২৯	...	১১ „
১৯৩০	...	১২ „
১৯৩১	...	১১ „
১৯৩২	...	১০ „
১৯৩৩	...	১০ „

কুত্রাপি বারো টাকার অধিক নহে।

সুতরাং এই সকল কোম্পানীর সহিত হিন্দুস্থানের দাদননীতি একইরূপ বলিলে গল্পটা উড়িয়ার গল্পই মনে পড়ে। স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র এক দিন কোন পর্ব্বোপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। গঙ্গার ঘাটে এক উড়িয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলে, "আমাকে চিনতে পারছেন না?" মিত্র মহাশয় "না" বলিলে সে সপ্রতিভভাবে বলে,

"কেন? আমরা ত এক আফিসে কাজ করি!" তাহার কথায় মিত্র মহাশয়ের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হওয়ায় তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কোথায় কাজ কর?" সে বলে, "কেন, হাইকোর্টে?" মিত্র মহাশয়ের বিস্ময় আরও বাড়িয়া যায় এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি হাইকোর্টে কি কাজ কর?" তখন উত্তর পাওয়া যায়—"আপনার এজলাসে আমি পাখা টানি।"

যে সব বিলাতী বিশেষজ্ঞের দোহাই দিয়া হিন্দুস্থান নিজকার্য্য সমর্থনের চেষ্টা করিয়াছেন, যে সব কোম্পানীর সহিত হিন্দুস্থানের দাদন নীতির তুলনা করা যায় না। এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি বিষয়ের প্রতি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব—হিন্দুস্থানের পুস্তিকায় এই সব কোম্পানীর মর্টগেজে টাকা খাটানর নজীর উদ্ধৃত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বলা হয় নাই যে, এই সব কোম্পানীর মর্টগেজের যে সব অঙ্ক দেখা যায়, সে সব—

Mortgages including Loans on Policies.

হিন্দুস্থানের পুস্তিকায়?

Including Loans on Policies কথা কয়টির অনুল্লেখ কি ইচ্ছাকৃত? যদি ইচ্ছাকৃত হয়, তবে তাহা কি সঙ্গত?

আমরা ডিরেক্টারদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি half-truth অর্থাৎ যাহা more dangerous than untruth সেই পর্য্যায়ভুক্ত হয় না?

যদি পলিসীর উপর ঋণ ধরা যায়, তবে কি হিন্দুস্থানের জমীজমায় আটকও এই জাতীয় দাদনের পরিমাণ শত করা ৭০ টাকার উপর উঠে না?

আমরা যে কয়টি বিদেশী কোম্পানীর অঙ্ক উদ্ধৃত করিয়াছি, সেগুলিতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রায় সব কয়টিতেই মর্টগেজে খাটান টাকার পরিমাণ কমাইয়া আনা হইতেছে। ইহার কারণ 'ইকনমিষ্ট' পত্রে গত বৎসর বিবৃত হইয়াছিল:—

"Owing to the lower rates of interest prevailing, increasing difficulty has been experienced in the last few years in obtaining satisfactory mortgages, and the proportion of assets to be invested, which so recently as 1930 was 29·3 p. c., fell by the end of 1933 to 21·2 p. c."

এ সব বালাই কি হিন্দুস্থানের নাই ?

যে 'কমারশ্যাল গেজেট' এক সময়ে হিন্দুস্থানের কম্পাইণ্ড পলিসী সম্বন্ধে গৃহীত নীতির নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই 'গেজেট' ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে (৮ই সেপ্টেম্বর) এইরূপে টাকা খাটান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছিলেন :

"We for ourselves would view a percentage between 20 to 30 under mortgages and land and buildings as quite safe, provided the mortgages are carefully and constantly watched, and fresh securities taken whenever considered necessary."

অর্থাৎ—

আমরা মনে করি, যদি মর্টগেজের প্রতি সর্ব্বদা যত্ন সহকারে লক্ষ্য রাখা হয় এবং প্রয়োজন হইলেই অতিরিক্ত "সিকিউরিটী" লইবার ব্যবস্থা হয় তবে **মর্টগেজে এবং জমী ও বাড়ীতে** প্রযুক্ত টাকার পরিমাণ শতকরা ২০ হইতে ৩০ টাকা হইলে তাহা নিরাপদ বলা যায়।

যদি তাহাই হয়, তবে কি হিন্দুস্থানের দাদনের পরিমাণ নিরাপদ-সীমা অতিক্রম করিয়া যায় নাই ?

হিন্দুস্থানের দাদন কি কেবল কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় সহরে জমীতে ও বাড়ীতেই প্রযুক্ত হয় ? না—যে জমীদারীর উপর টাকা দাদন করিয়া বাঙ্গালার লোন আফিসগুলি আজ আপনারা যেমন বিপন্ন হইয়াছে, লোককেও তেমনই বিপন্ন করিয়াছে, সেই জমীদারীর উপরও দেওয়া হইয়াছে ? আমরা মনে করি—কলিকাতায় জমীতে "জুরিশডিকশন" ঘটাইয়া মফঃস্বলে যোল বা সতের বাড়ীতেও টাকা খাটান "mortgages on real property in big cities" হয় না। অথচ শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র মল্লিক হিন্দুস্থানের দাদন নীতির সমর্থনে ঐরূপে টাকা দাদনেরই সমর্থন করিয়াছিলেন।

এইরূপ দাদনের প্রশংসা করিবার সময় কি হিন্দুস্থানের ডিরেক্টাররা তাঁহাদের দাদনে **অনাদায়ী সূদের বিরাটত্ব লোকের মন হইতে মুছিয়া দিতে পারিবেন ?**

ব্রীজখেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা
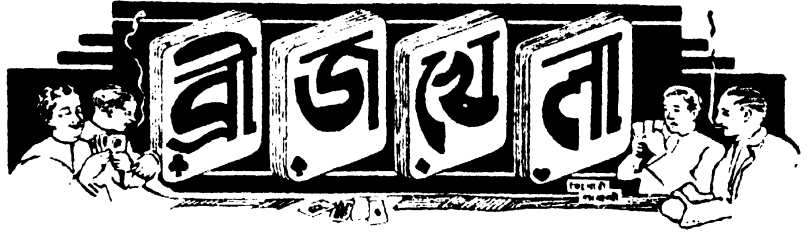
ব্রীজখেলার ডাক শেষ হলে ডাকদার তাঁর ডাকের মত কতকগুলি পিট নেবার চেষ্টা করেন আর তাঁর বিপক্ষদল ডাকদারের ডাক অনুযায়ী পিট যা'তে না হয় তার জন্য প্রাণপণে বাধা প্রদান করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে এই যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইহাতেই হয় ব্রীজখেলার উৎকর্ষ সাধন। এই উৎকর্ষ উভয় পক্ষের খেলার বা খেলাবার দক্ষতার উপর নির্ভর করে। এই দক্ষতা যাঁর যত বেশী তিনি তত খেলা দেখাতে পারবেন এবং বিজয়মাল্য সর্ব্বদা তাঁরই। প্রধানতঃ দেখা যায় উভয়পক্ষই দুই একটা টেক্কা সাহেব প্রভৃতি পেয়ে থাকেন। এই টেক্কা, সাহেব ও সেই রঙের ছোট ছোট তাস গুলি খেলাবার উপায় নির্দ্ধারণ করতে যিনি যত শীঘ্র পারেন, তিনি অপর পক্ষের নিকট হতে তত পিট আদায় করে নিতে পারবেন। পূর্ব্বোক্ত ছোট তাস গুলি খেলাবার দুই প্রকার উপায় আছে, তা' এই—

(১) বিপক্ষদলের বড় তাস বের করে দিয়ে নিজের পরবর্ত্তী ছোট ছোট তাস দাঁড় করানো,—যা'কে ইংরাজীতে Suit establishment বলে।

আর, (২) নিজের এমন একটি অবস্থা প্রস্তুত করা যায়, যার দ্বারা নিজের তাস বড় না হলেও পিট পাওয়া যাবে। এইরূপ অবস্থা তিনটা উপায়ে আনা যায়, যথা (১) Straight Lead (২) Play for a drop (৩) Finesse. প্রত্যেকটী পর পর নিয়ে আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করবো।

Suit Establishment :—মনে করুন আপনি পেয়েছেন এক রঙের ১০, ৯, ৮, ৭, ৬, ৫, ৩, ২। এখন আপনি যদি দুইবার কি তিনবার উক্ত রঙটি খেলে নেন, তা' হলে ঐ রঙের বড় বড় তাসগুলি পড়ে গেলে বাকি তাসগুলির পিট সব আপনারই। এখানে অবশ্য বিশেষ করে স্মরণ রাখ্‌তে হবে যে আপনার হাত অর্থে আপনি ও আপনার খেঁড়ীর হাত নির্দ্দেশ করছে, উপরন্তু যখনই কোন সময় আপনার হাতের কথা বলা হবে তখনই উভয়কার হাত নিয়েই ধরতে হবে।

Straight Lead :—Straight lead অর্থাৎ যেই আপনি এক একখানি বড় তাস খেল্‌ছেন তৎক্ষণাৎ তার পরবর্ত্তী তাসগুলি আপনা আপনি বড় হয়ে যাচ্ছে। এখন ধরুন আপনার হাতে যদি সাহেব, বিবি, গোলাম বা বিবি, গোলাম, দশ কিংবা গোলাম, দশ, নওলা, আটা থাকে তবে তখন বিপক্ষদলকে একটা ছটো পিট দিয়ে দিলেই আপনার অনেকগুলি পিট সুনিশ্চিত।

সমস্যা

উ:
ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম।
হরতন—পাঞ্জা।
রুহিতন—সাহেব, বিবি।
চিঁড়িতন—দশ, আটা।

প:
ইস্কাবন—সাহেব, দুরি।
হরতন—নাই।
রুহিতন—গোলাম, নয়, আটা
চিঁড়িতন—নয়, সাতা।

পূ:
ইস্কাবন—চৌকা, তিরি।
হরতন—ছক্কা, তিরি।
রুহিতন—সাতা।
চিঁড়িতন—ছক্কা, পাঞ্জা।

দ:
ইস্কাবন—বিবি।
হরতন—আটা, চৌকা।
রুহিতন—টেক্কা, দশ, তিরি, দুরি।
চিঁড়িতন—নাই।

হরতন রঙ, 'দ' খেল্‌বে; 'উ' এবং 'দ'-কে সব পিট নিতে হবে বিপক্ষদল যতই বাধা দিক না কেন।

বীজ প্রতিযোগিতা :—

২৩শে জুন রবিবার ইয়ং ফ্রেণ্ডসের বীজ প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হয়েছে। নানা-বিষয়ে নিজেদের মধ্যে গোলমালের দরুণ প্রতিযোগিতা সমাপ্তির বিলম্ব ঘট্‌লেও সমিতির সেক্রেটারী কেজ্‌রিওয়াল ম'শায়ের ও অন্যান্য সভ্যের অক্লান্ত চেষ্টায় কার্য্যটী অবশেষে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। Auction (singles) এর ফাইন্যালে রাজবাটি ক্লাব হাবড়া সান্‌ডে ক্লাবকে পরাজিত করে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং auction

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

মনোরম সাধুখাঁ

ঝগড়ার শেষ

ষ্ট্যান্ লাউরেল আর অলিভার হার্ডির ভেতর সম্প্রতি যে ঝগড়ার জন্ম হয়েছিলো, সুখের বিষয়, সেদিন শেষ হয়েছে। কি কারণ জানিনে, হঠাৎ মোটা হার্ডি একদিন এসে বল্লে লাউরেল্-এর সঙ্গে ছবিতে আর আমি নাব্‌বো না। পরদিন ষ্ট্যান্ও মেট্রোর হল্‌রোচ্-এর ষ্টুডিয়োয় এলো, বল্লে সেই একই কথা। হলিউড-এর মাথা গেলো গোলমাল হয়ে। লাউরেল ছাড়া হার্ডি—এ কী সম্ভব? একী হ'তে পারে? এ যে অবিশ্বাস্য!

জন কেডন, হল্‌রোচের এক মাতাল, সে বল্লে—এ যে 'জিন্' ছাড়া 'ককটেল্'! লি জ্যাক, বিখ্যাত পেটুক,—সে বল্লে—মনে হয়—এ ডিম ছাড়া ওমলেট্! টি হার্টস, কবি, তার মতে এ যেন চাঁদ ছাড়া পূর্ণিমা!

সবাই উঠে পড়ে' লাগ্‌লো। হলিউডের এই ছায়া-রাজ্যে এমন একটা অসম্ভব জিনিষ ঘট্‌তে দেয়া কিছুতেই হবে না। হবে না—হবে না! হ'তে দেয়া হ'লোও না। অনেক চেষ্টা চরিত্র। রোগা লাউরেল্-এর মাথায় কত হাত বোলানো! মোটা হার্ডির ভুঁড়িতে কতো হাত চাপ্‌ড়ানো!

চার্লস্ (বাডি) রোজারস্—মেরি পিক্‌ফোর্ডকে বিয়ে করবে কিনা—মনোরম সাধুখাঁ এ সপ্তাহে বলেছেন।

যাক্—হল্‌রোচের ষ্টুডিয়োয় আবার একদিন দেখা গেলো—বিখ্যাত ঐ রোগা-মোটার দল ক্যামেরার সামনে আবার বোকামী আরম্ভ করেছে।

ছবির নাম 'বনি স্কট্‌ল্যাণ্ড'।

দেমাক্ ভারী

মিকি রুনি হচ্ছে কলম্বিয়া কোম্পানীর বাচ্চা এক অভিনেতা। ছোকড়া ছবিতে খুব ঝগড়াটে অংশে নাবে। কিছুদিন হ'লো মিকির এক আশ্চর্য্য আচরণ হলিউডের সবাইকে অবাক করে' দিয়েছে! ব্যাপারটি শুনলে আপনিও যে অবাক হবেন সন্দেহ নেই।

মিকি একদিন দুপুরবেলা ছবি তোল্‌বার সেট্ থেকে ছুটি পেয়ে তার দু'চাকার গাড়িটা নিয়ে বেড়িয়ে পড়লো রাস্তায়। খানিকটা দূর এসে, সে রাস্তাতেই একটা জায়গা ঠিক করে' বনবন্ করে' ঘুরতে আরম্ভ করলে।

এমন সময় আগাগোড়া ঢাকা একখানা মোটর এসে মিকিকে পথ ছেড়ে দেবার জন্য বাঁশী বাজালে। রুনি ভ্রূক্ষেপও করলো না। আপন কাজে সে রইলো আপনি মেতে।

ড্রাইভার গাড়ির চলন বন্ধ করে' পথ পরিষ্কার পাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লো।

(duplicato) এ 'ছত্রভঙ্গ' দল-এর জয়লাভ আশানুরূপ হয়েছিল। ফাইন্যালে এঁদের খেলা বেশ উচ্চাঙ্গের হওয়াতে দর্শকেরা প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলেন। উক্ত খেলাগুলির পর অ্যাড্‌ভোকেট মিঃ চৈতন্যচন্দ্র বড়াল মহাশয়ের সভাপতিত্বে পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমাধা হয়।

ভেতরে বড় টুপিতে মুখ-ঢাকা এক মহিলা ছিলেন বসে,' তাঁকেও খুব শান্ত হয়ে বসে থাক্তে দেখা গেলো না। হর্ণ-এর ওপর হর্ণ বাজতে লাগলো!

বেহায়া মিকি তবু নড়্বার-চড়্বার নাম করে না!

মহিলাটি তখন ড্রাইভারকে কী যেন বল্লেন। আশে পাশে যে সমস্ত লোক যাওয়া আসা করছিলো, তারা চেনা এক গলা শুনে' থমকে দাঁড়ালো!

এ যে গার্বো!

চিনির একটা দানা পেলে পিপড়েরা যেমন জোটে, গার্বোর গাড়ির আশে পাশে ভিড় হ'লো ঠিক তেমনি।

নড়বার নাম মিকি তখনও করে না!

গাড়ীর পেছন দিককার একটা দরজা গেলো খুলে'। উপস্থিত সবার নিঃশ্বাস হ'লো বন্ধ!

একী সত্যি!

গম্ভীর মুখ—বেরুলো গ্রেটা গার্বো! (কার মুখ দেখে ঘুম থেকে সেদিন সবাই উঠেছিলো!)

মিকির রকমসকম দেখে গার্বোর গাম্ভীর্য্য আর রইলো না। সে হেসে ফেল্লে। ড্রাইভারের কানে কানে সে যেন কী বল্লে!

ড্রাইভার মিকির কাছে গিয়ে পৃথিবীর আট্ নম্বর আজব-কথা শোনালে—'গার্বো তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান!'

মিকি চোখ পাকিয়ে মুখ বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কে?

'গ্রে-টা গা-র-বো, নাম শোনো নি?'

'ও—ও, গ্রেটা গার্বো? নাম শুনিচি বটে! ভারী দেমাক্ তার—না? নিজেকে সে কী একটা যেন ভাবে?—যাও, বলোগে, আমার এখন সময় নেই; আমি এখন খেলায় ব্যস্ত।'

ঘটনাটি হলিউডে আজ ইতিহাস। মিকির অদ্ভুত, অভিনব, অবিশ্বাস্য কথা আজ হাজার হাজার লোকের মুখে মুখে।

তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু

মিকি রুনি এ হেন ঐতিহাসিক এক কাজ করলেও মেট্রোর ফ্রেডি বারথেলোমিউ তা সমর্থন করে না। কারণ, আজকাল তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু হচ্ছে—সবার কাছে স্বপ্ন গ্রেটা গার্বো! ছোটো ছেলে মেয়ে গ্রেটা গার্বোর অত্যন্ত প্রিয়—এ খবর বোধহয় আমেরিকার চল্তি প্রেসিডেন্টএর নাম যে জানে না, সেও জানে। আগে সবার অজান্তে রোজ সে যেতো সমুদ্রের ধারে, শুধু বাচ্চাদের সঙ্গে খেল্তে। কিন্তু, সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান্দের জ্বালায় সে বাসনা তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে।

ফ্রেডি বারথেলোমিউ—'ডেভিড কপার-ফিল্ড' অভিনয় করে' যে নাম করেছে—সেই চট্‌পটে চালাক ছেলেটি এখন 'অ্যানা কারনিনা'য় সেজেছে গার্বোর ছেলে।

ফ্রেডি বলে—"মিস্ গার্বোর সঙ্গে অভিনয় করতে আমার কী রকম যে ভয় হচ্ছিলো আপনি জানেন না। (ফ্রেডি তো বাচ্চা ছেলে, পৃথিবীর অতি বিখ্যাত অভিনেতাদেরও গার্বোর সঙ্গে নাবতে বুক কাঁপে।) প্রথম দৃশ্যেই ছিলো, মিস্ গার্বো আমাকে জড়িয়ে ধরে' আদর করবেন ও চুমো খাবেন। আমি সেট্-এ বসেছিলুম, খবর এলো মিস্ গার্বো এসেছেন, বেসিল্ রাথবোন আমাকে নিয়ে গিয়ে দিলে আলাপ করিয়ে। মিঃ রাথবোন—'ডেভিড কপারফিল্ডে' সেজেছিলো আমার নিষ্ঠুর বাবা, 'অ্যানা কারনিনা'তেও তাই। আলাপ হবার পরে আমার সঙ্গে মিস্ গার্বো এমন ব্যবহার আরম্ভ করলেন আমি যেন তাঁর কতদিনের চেনা। সেদিন থেকে, তিনি আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। সময় পেলে আমার সঙ্গে খেলা তো করেনই, তা ছাড়া কত গল্প, কত কথা। হ্যাঁ, আমি আর মিস্ গার্বো সেদিন ফুটবল খেল্ছিলুম, গ্রেটা একখানা গোল করেছিলেন!"

বাড়ি বলেছে 'না'

এ এক প্রকাণ্ড বড় গুজব—যে—মেরি পিকফোর্ড বুড়ো ডগলাসকে ছেড়ে, চার্লস্ বাডি রোজারস্-এর প্রেমে এখন খুব মেতে আছে। সবার মত তারা অবিশ্যি এ গুজবটা একদম অস্বীকার করছে। চার্লস সেদিন বলছিলো—দূর! আমরা নিছকই বন্ধু মাত্র! প্রেম ট্রেম আমাদের প্রাণে জাগেনি।

এ কথা বল্বার পরই তারা কিন্তু একদিন বড় জোড় ধরা পরে' গেছে।

পামবিচ-এ একদিন দেখা গেলো চার্ল্স্ (বাডি) রোজারস্ গেছে বেড়াতে। কিছুক্ষণ খোঁজ করবার পর এও জানা গেলো—যে—মেরি পিকফোর্ডও এসেছে সেখানে। তবু তারা বলে—এ আহ্বান তাদের প্রেমের নয়, বন্ধুত্বের।

নিস্তব্ধ পামবিচএর নির্জ্জনতায়, একজন পুরুষ ও একজন নারীর নিছক বন্ধুত্বের আহ্বানে এ হেন আগমন—সন্দেহজনকই বটে! প্রেমের আদান-প্রদান সেখানে এ দু' নায়কনায়িকার যে হয়নি—এ অবিশ্বাস্য।

যাক—তবু গুজন। চার্লস বলেছে—বিয়ে করবার ইচ্ছে আমার আছে, এবং করবোও। আপনাদের আমি কথা দিচ্ছি দশ বছরের ভেতর বিয়ে আমি করবোই করবো।

কিন্তু কাকে—চার্লস্ তা চালাকের মত বাদ দিয়ে গেছে।

সই তাদের চাই

মেয়ে মহলে অত্যন্ত প্রিয় এক অভিনেতা আজকাল হচ্চে জিন রেমণ্ড। তার ছাই রংএর চুল, নীল রংএর চোখ—অনেক মেয়েরই স্বপ্নের বিষয়! সম্প্রতি এই জিন রেমণ্ড চারদিকে গিছলো বেড়াতে। সেখানেই সে গিয়েছিলো সেখানেই তাকে দেখবার জন্যে অসম্ভব রকমের ভিড় হয়েছিলো। রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য পুলিশ

সে জনতাকে বাধা দিতে বেগ পেয়েছিলো।

তিনজন মেয়ে কিছুতেই জিন্‌এর সই জোগাড় করতে পারলে না! তারা নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলো। লুকিয়ে জিন যেখানে ছিলো সে হোটেলে তারা কোনো-রকমে ঢুকলো। গিয়ে দেখলে এক ওয়েটার জিনের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে। ওয়েটারকে উপযুক্ত বখশিষ দিয়ে মেয়েরা তার হাত থেকে ট্রেটা তুলে নিলে। তারপর তিনজন ডিমগুলোকে ভাগাভাগি করে' একে একে জিনের ঘরে ঢুকলো।

বলা বাহুল্য, সই তাদের মিলেছিলো।

ম্যারিয়ন ডেভিস্

মেট্রোতে ম্যারিয়ন যে আজকাল নেই—এ খবর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। একটা বিষয়ে মনোমালিন্য হওয়ায় সে চলে এসেছে ওয়ার্ণার ব্রাদার্স-এ। যে বিষয়ে মনোমালিন্য—সেটা আপনাদের বলছি। বিখ্যাত ছবি 'ব্যারেট্‌স্ অফ্ উইমপোল ষ্ট্রীট' আপনারা দেখেছেন। সে ছবিটিতে নর্মা শিয়ারার যে অংশে অভিনয় করেছিলো সে অংশটা নেবার ইচ্ছে ছিলো ম্যারিয়ন ডেভিস-এর। মেট্রো তাকে বলেছিলো দেবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা রাখতে পারেনি। তাই ম্যারিয়ন রাগ করে' চলে আসে ওয়ার্ণার-এ।

ওয়ার্ণার ব্রাদার্স-এর হয়ে তার প্রথম ছবি হচ্ছে 'পেজ মিস গ্লোরী'। সঙ্গে আছে ডিকপাওয়েল আর মেরি য়্যাসটর। পরিচালনা করেছেন মারভিন লি রয়।

'পেজ মিস গ্লোরী' সেদিন শেষ হয়েছে। এবং, তাই জন্যেই ষ্টুডিয়োতে ম্যারিয়ন এক উৎসবের আয়োজন করেছিলো। উৎসব শেষে সে প্রযোজক ও পরিচালক থেকে আরম্ভ করে' ছবিটির প্রত্যেকটি খ্যাতনামা পুরুষকে একটি করে' হীরের ঘড়ি উপহার দিয়েছে। আর, ইলেক্‌ট্রিক ও সেট্-এর মিস্ত্রীদের প্রত্যেককে দিয়েছে ভারী এক টাকার তোড়া!

হায়রে মেট্রো!

খুচ্‌রো খবর

'মরক্কো'র পর মার্লিনকে এবার চুমো খাবে গ্যারী কুপার 'পার্ল নেক্‌লেস'-এ।

* * *

'মিউটিনি অন্ দি ব্রাউন্‌টি'তে অভিনয় করতে গিয়ে চার্লস লফ্‌টন সেদিন সমুদ্রে হারিয়ে গিছলো।

* * *

জেনেট গেনরকে সেদিন তার হাল্ ফ্যাসানের নোখগুলো কাটতে হয়েছে 'ফারমার টেক্‌স-এ ওয়াইফ'-এর জন্যে।

জুড ও তামাক

শ্রীসত্যবাদী

ঈশপের উপকথায় আছে—একজন মানুষের সঙ্গে এক অপদেবতার পরিচয় হয় এবং উভয়ে একত্র আহার করিতে বসে। শীতের দিন—খুব ঠাণ্ডা; তাই মানুষটি তাহার আঙ্গুল গরম করিবার জন্য মুখের কাছে লইয়া ফুঁ দিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া অপদেবতা জিজ্ঞাসা করিল "বন্ধু, ও কি?" দেবতাটি বলিল, "আঙ্গুলগুলা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, তাই ফুঁ দিয়া গরম করিতেছি।" অল্পক্ষণ পরে খাদ্যদ্রব্য আনা হইল। আহার্য্য গরম দেখিয়া লোকটি তাহাতে ফুঁ দিতে লাগিল। অপদেবতা জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধু, ও আবার কি?" লোকটি উত্তর দিল, "খাবার বড় গরম; তাই ফুঁ দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইতেছি।" তখন অপদেবতা বলিল "তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব শেষ হইল। যে লোক একই মুখে ফুঁ দিয়া গরম ও ঠাণ্ডা করে, তাহার সহিত বন্ধুত্ব রাখা চলে না।"

নলিনীর বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী প্রীতির রহস্য আমরা ইতিপূর্ব্বে ভেদচেষ্টা করিয়াছি। সে কোন বন্ধুকে অবাঙ্গালী প্রধান ইণ্ডিয়ান চেম্বারের সদস্য দেখিয়া লাহোর হইতে তাড়াতাড়ি লিখিয়াছিল—তিনি সেই foreign চেম্বারের মেম্বার কেন? অবশ্য foreign বলিতে যে বিদেশী বুঝায়, তাহা হয়ত সে সঠিক জানিত না। কিন্তু ভাবটি সপ্রকাশ।

সে পরলোকগত রাজা হৃষীকেশ লাহাকে লিখিয়াছিল (পত্রে)—সে বোম্বাইওয়ালাদের সঙ্গে সম্পর্কসূত্র ছিন্ন করিয়াছে।

অথচ বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সে বক্তৃতায় সে-ই বলিয়াছিল—প্রাদেশিকতা সাম্প্রদায়িকতারই মত বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে!

কেবল কি তাহাই? টাকার বাট্টামূল্য নির্দ্ধারণে সে বোম্বাইয়ের মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছিল। আর তাহার His Master's Voice বিষয়ে নিষ্ঠাহেতু বোম্বাইয়ের ফাটকা-বাজরা বাঙ্গলায় লোকমত প্রভাবিত করিবার জন্য যে লোক পাঠাইয়াছিল, তাহাদিগকে সাংবাদিক সম্মিলনে সম্মিলিত হইবার ব্যবস্থা সে-ই করিয়াছিল। এমন কি—আজ হিন্দুস্থানের সার্টিফিকেট সহি করাইবার জন্য সে যাহার শরণাগত হইয়াছে সেই স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে "অর্দ্ধসত্যবিলাসী" বলিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই।

আর বাঙ্গলায় কাপড়ের কলসমিতির প্রতিষ্ঠা ব্যাপার—সে কথা আর একদিন বলিব।

বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর ব্যবসা বিস্তার প্রয়াস যে প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দু নৌকায় পা রাখাই অসঙ্গত।

তাহাতে যে বিপদ ঘটিতে পারে। বাঙ্গলায় এইরূপ "দোদলবান্দাগিরী" আর কত দিন চলিবে?

নলিনীর পৃষ্ঠপোষক কয়েকটী লেখক বলিতেছেন :—

(১) হিন্দুস্থান সম্বন্ধে যে সকল সমালোচনা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র মত অতি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে সে সকল কতিপয় "স্বার্থান্ধ ব্যক্তির" কার্য্য এবং (২) ইহার পশ্চাতে কতিপয় ক্ষুদ্র বীমা কোম্পানীর চেষ্টা রহিয়াছে।

একটু চেষ্টা করিলেই এইরূপ লেখার উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ—

(১) ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি একাদশ জনের যে "দেশবাসীর প্রতি" (কবিতা নহে—নিবেদন) সংবাদপত্রে হিন্দুস্থানের পরক্ষে বিজ্ঞাপনরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই গালির আরম্ভ। তাহাতে বলা হয় :

(ক) "কয়েকজন দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক" হিন্দুস্থানের "নিন্দাপ্রচার করিতেছে,"

(খ) "দেশবাসী যেন এই প্রকার বিদ্বেষমূলক, রুচিবিগর্হিত প্রচারকার্য্য অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়া যান।"

(২) হিন্দুস্থানের সুশীল ডিরেক্টাররা যে পুস্তিকা প্রচার করেন, তাহার আরম্ভ এইরূপ—

"It has come to our notice that certain persons...have for sometime been carrying on a mischievous and malicious propaganda against the Society.

(৩) হিন্দুস্থানের "জেনারেল ম্যানেজার" যে "ব্যক্তিগত ও গোপনীয়" পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন—তাহাতে সমালোচনা "ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষমূলক" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

তাহার পর আর বুঝিতে বিলম্ব হয় না, কোন উৎস হইতে এই সব পত্রের হিন্দুস্থানের সমালোচকদিগের আক্রমন নির্গত হইতেছে। কি জন্য ইহারা spitting dirt করিতেছে।

হিন্দুস্থানের উন্নতি হয়, ইহাই বাঙ্গালীর অভিপ্রেত। সেই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই—সংবাদপত্রের দায়িত্ব স্মরণ করিয়াই 'আনন্দবাজার' প্রমুখ পত্র হিন্দুস্থানের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা বহুদিন পূর্ব্বে যখন এ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছিলাম, তাহার পর হিসাব পরীক্ষা করিয়া—অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তবে সহযোগীরা এই কার্য্যে আমাদিগের আরব্ধ কার্য্যে যোগ দিয়াছেন।

কোন বীমা প্রতিষ্ঠানের প্ররোচনায় আমরা কেহ এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই—সেরূপ কার্য্য সংবাদিকের আত্মসম্মান-জ্ঞানের বিরোধী। এ দেশে এখনও সহস্র সহস্র বীমা কোম্পানীর কার্য্যক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং কোন কোম্পানীর পক্ষে হিন্দুস্থানের অনিষ্টের দ্বারা আপনার ইষ্ট সাধনের প্রয়োজন থাকিতে পারে না।

দেশের লোক কখনই ধাপ্পায় ভুলিবেন না।

আজ হিন্দুস্থানের ডিরেক্টাররা ও স্থাপকরা বিলাতের বিশেষজ্ঞদিগের নজীর দেখাইয়া কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু বিলাতের বিখ্যাত একচুয়ারী ইয়ং ম্যানেজারের চরিত্র সম্বন্ধে যে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, হিন্দুস্থানের ডিরেক্টাররা সে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন কি? হিন্দুস্থানের জেনারল ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগে যে মামলা রুজু হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ রায় 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়াছে। ডিরেক্টাররা অবশ্যই সেই মামলার নথি পাঠ করিবার সুযোগ ও সময় পাইয়াছেন। পাঠ করিবার সময় কি একচুয়ারী ইয়ংএর কথা একবারও তাঁহাদের মনে পড়ে নাই? সেই রায়ের পর তাহারা কি করিয়াছেন? আজ বাঙ্গালার লোক তাহাদিগকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। সহযোগী 'দৈনিক বসুমতী' এসম্বন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—নলিনী সরকারের সহিত হিন্দুস্থানের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য নহে।

হিন্দুস্থান নলিনীর সহিত সম্বন্ধে গৌরব-ভ্রষ্ট হইতেছে কিনা—তাহাও ডিরেক্টারদিগের অবশ্য বিবেচ্য। "ডুডুও খাই টামাকও খাই" বলা তাহাই কেন বলুক না—দেশের লোক হিন্দুস্থানের বিষয় বিবেচনা করিয়াই দেখিতেছেন।

ছিটে ফোঁটা

বজ্রবাহু

কিছুদিন পূর্ব্বে "দেশে" শ্রীউষা ঘোষ একটি গল্প লিখেছেন—"সমাধি" পরিশেষে লেখিকা ফুট-নোটে স্বীকার করেছেন গল্পটি "মোঁপাসার ছায়া অবলম্বনে!"

মৌলিক গল্প লিখে ছাপাতে হলে প্রথমতঃ অনেক কষ্ট এবং লাঞ্ছনা স্বীকার করতে হয়; তাই আজকাল অনেকেই এই পথ অনুসরণ করতে দেখি এতে সুবিধে অনেক, প্লটের হাঙ্গাম নেই—নতুনত্ব সৃষ্টি করবার জন্যে কসরৎ করতে হয় না—ছাপাও হয় অনুবাদ বলে। কিন্তু এর সঙ্গে অনেকস্থলেই হয় আসল গল্পটিকে হত্যা করা। মোঁপাসার original গল্পের যদি কেউ দেখি, আনাড়ি হাতের "সমাধি"তে তা হলে সত্যিই মনে হয় মোঁপাসাকেই সমাধিস্থ করা হয়েছে—

শ্রীমতী ঘোষ তাঁর গল্পের একস্থানে লিখেছেন :—

"আবছায়া অন্ধকারে হয়ে এ কথা ভেবেছি ; তার দুটি দুটি চোখ যেন কোথায় পেয়েছিল। কিন্তু তার চোখের সামনে থেকে কে মড়া চুরি (?) করে নিয়ে যাবে?......তার মুখের হাসি দেখে আমার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠত। মনে হ'ত, আমি যেন এ জগতে আর নেই, কোন এক অজ্ঞাত জগতে চলে গিয়ে অনাস্বাদিত অদ্ভুত পুলক আনন্দ উপভোগ করছি। একদিন তাকে আমার মনের গোপন কথা প্রকাশ করলাম। সে সম্মতি দিল। কী রকম সুখ যে সেদিন থেকে আমি উপভোগ করতে লাগলাম তা বলবার নয়। সে আমার প্রণয়িনী—একথা ভাবতেই আমার হৃদয় ভরে উঠত গর্ব্বে, মন ভরে যেত পুলকে। কিন্তু সে যে প্রণয়িনীর চাইতেও অনেক বেশী আমার কাছে, সে যে আমার জীবন—না না, তার চেয়েও যে সে বেশী মূল্যবান আমার কাছে দুনিয়ায় আমি কিছু চাই নে, ঐশ্বর্য্যের কামনা করি নে,—আমি চাই তাকে।"—বেচারি মোঁপাসা!—

* * *

আষাঢ়ের "অঞ্জনা"য় শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য তাঁর "কলদীপের সাহিত্য সাধনা"য় শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের পরিচয় দিবার প্রসঙ্গে একস্থানে লিখেছেন :—

শ্রীকৃষ্ণ গোপ, গোপাঙ্গনাগণ সহ এ দেশে আসিয়া কলদহকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই এ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া এ দেশে বাস করিতে লাগিলেন। গয়েশপুর, ঘোষপুর, গোপিনী পোতা, কানাইনাটশাল, গোবরডাঙ্গা, গোপীপুর (গৈপুর), গোপালপুর প্রভৃতি স্থানের নাম তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।"

শ্রীকৃষ্ণের নতুন এক লীলা-স্থলের পরিচয় আমরা পেলুম—

অতঃপর কোনদিন আমরা শুনবো বাঁশবেড়িয়ায় শ্রীকৃষ্ণ দেব গমন করেছিলেন এবং তথাকার বংশবৃক্ষ হতে তাঁর বাঁশী প্রস্তুত হয়েছিল!—

* * *

আজকাল পল্লী গাথা বা folk songs-এর রেওয়াজ দেখছি প্রায় প্রতি সাময়িক পত্রেই। কতকগুলি গেঁয়ো উৎকট কথার সমাবেশে ভাবের মাথায় লাঠি মেরে এক একজন দুর্দ্ধর্ষ কবির প্রলাপ উক্তি কাব্যরসকে কি ভাবে খেঁজিয়ে তুলছে তারই কিছু নমুনা শুনুন :—

"ঐ যে দেখায় কোন গেরস্তের ছনের ঘরের চাল,
ঘরের পথে যায়রে গরু ধইরা মাঠের আল।
(গান) মনরে আমার বেলা নাই আর,
চলরে বৃন্দাবন, ওরে চলরে বৃন্দাবন।"

কোন গেরস্তের ছনের (সোনের) ঘরের চাল দেখেই রসিক কবি মাঝিকে ফরিদপুরের 'চকদিঘির গাঙ্গ' থেকে একেবারে বৃন্দাবনে পাড়ি দেওয়াচ্ছেন। অতঃপর সেখানে কণ্ঠি বদল করে আবার স্বগ্রামে ফেরাবেন কবে?—

কবিতার নাম "ফরিদপুরের মাঝি"—লেখক শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্য। কবিতার তলে ফুটনোটে লেখা—'বরিশালের মাঝি'র ছায়ায়।

* * *

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'বিচিত্রা'য় শ্রীধীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী "অতৃপ্তির অন্ধকারে" কেঁদেছেন :—

"অধরে অধর নাহি নয়নে নয়ন রাখ নাই,
বক্ষোপরি বক্ষ নাহি, চুম্বনের নাহিক আবেশ—"

যে দিনকাল তাতে আর চুম্বনের আবেশ থাকে কী করে?

* * *

উক্ত সংখ্যাতেই শ্রীসুপ্রভা দেবী বি-এ, মস্ত এক মৌলিকত্বের আভাস দিয়েছেন তাঁর "চিরঞ্জীবি" কবিতার মারফৎ। কবির ফিলজফি হচ্ছে এই যে এই নশ্বর পৃথিবীর মাঝে সব কিছুই ক্ষণভঙ্গুর—সত্য কেবল প্রেম যা চিরস্থায়ী। শ্রীমতী সুপ্রভা উদার কণ্ঠে তাই গেয়ে উঠেছেন বিশ্ব প্রেমের মহিমা—

"আমি শুধু চলে যাবো, আমার হৃদয়
সকল শস্যে তৃণতলে মানব অন্তরে,
উপহার রেখে যাবো চিরমৃত্যুঞ্জয়,
জাগিবে সে ধ্রুবতারা অনন্ত অম্বরে।
কত নব আঁখি তটে মুগ্ধ পরিচয়!
চিরন্তন প্রেম মোর লভিবে বিজয়।

আমরাও কামনা করি তিনি চির বিজয়িনী হোন!

ভূমেন রায়—জ্যোৎস্না গুপ্তা
—আর—
সুলতানা—গুল্ হামিদ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর নবতম অবদান "বিদ্রোহী"র দু'টি ভাষা। এই দু' ভাষার দু' জোড়া নায়ক আর নায়িকা আমাদের জন্য একসঙ্গে একটি ছবি তুলে' পাঠিয়েছেন। বাঁ দিক থেকে—বাংলা সংস্করণের ভূমেন রায় আর জ্যোৎস্না গুপ্তা, তারপর হিন্দীর সুলতানা আর গুল্ হামিদ। রাজপুতানার মনোরম এক কাহিনী, এই "বিদ্রোহী" শিগ্গীরই মুক্তিলাভ করবে।

খেয়ালী

পরিচালক

টেলীগ্রাম 'ভ্যারিটি' | ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ ৯, রামময় রোড্, কলিকাতা | টেলীফোন পার্ক ৩২১

পঞ্চম বর্ষ, ২০শ সংখ্যা বৃহস্পতিবার ১০ই শ্রাবণ, ১৩৪৩ ২৩শে জুলাই ১৯৩৬

নিবেদন

"খেয়ালী"র উদ্ভবের মূলে সাহিত্যিক প্রেরণা এবং ছায়াচিত্রশিল্পে বাঙ্গালীর সুপ্রতিষ্ঠার পথে সহায়তা করার চেষ্টা ছাড়া কোন নির্দ্দিষ্ট মতবাদ প্রচার বা উপদলীয় স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু যাঁহাদের উপর "খেয়ালী"র সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল, ঘটনাস্রোতে পড়িয়া ইচ্ছায় হৌক, অনিচ্ছায় হৌক, তাঁহারা রাজনীতির অনতিক্রম্য প্রভাবে সকল সময়ে মূলনীতি অনুসরণ করিতে পারেন নাই।

যে তীব্র সমালোচনায় সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইতেছে বলিয়া "খেয়ালী" আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে, দেখা যাইতেছে সে আলোচনা গ্লানিকর মনে করিয়া অনেক শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন।

যে "খেয়ালী" একদিন সাহিত্য-রস পরিবেশনের উদ্দেশ্যে এবং বিশিষ্ট একটী শিল্পে বাঙ্গালীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আজ তাহার অনুসৃত নীতিতে যদি কাহারও অসম্মান ও অমর্য্যাদা ঘটিয়া থাকে তাহা "খেয়ালী"র প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের পক্ষে পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই! এই কারণেই "খেয়ালী"র পরিচালকমণ্ডলী বর্ত্তমান সম্পাদন-নীতির পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া নূতন ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"খেয়ালী"র বর্ত্তমান ম্যানেজিং-ডিরেক্টর ও সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকারের স্থানে অন্যতম ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মিত্র বি, এল্, মহাশয় কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেন। সম্পাদন-বোর্ডের নবনিযুক্ত সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের সহিত "খেয়ালী" বা ন্যাশনাল নিউজ-পেপার্স লিমিটেডের কোন সম্পর্ক রহিল না।

ব্যক্তিগতভাবে "খেয়ালী"র কাহারও উপর কোন বিদ্বেষ নাই এবং কোন কারণেই কোনদিন "খেয়ালী" অযোগ্যের চাটুবাদ করিবে না। রাষ্ট্রে, সমাজে, শিল্পে ও সাহিত্যে এবং বাঙ্গালীর ব্যবসায় প্রচেষ্টায় নিত্য নূতন পথে "খেয়ালী" তাহার নির্ভীক জনসেবার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। কিন্তু "খেয়ালী"র এই উদ্দেশ্যের সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে দেশবাসীর শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির উপর। "খেয়ালী"র পরিচালকমণ্ডলী সেই শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি হইতে কখনও বঞ্চিত হইবেন না, এই ভরসা করিয়াই নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিলেন।

———**———

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

নিউ থিয়েটার্স

'বি ইউনিট'-এ শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" সেদিন হিন্দী-কথা বলা শেষ করেছে। বাংলা ভাষায় চিত্রটি যতখানি জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয়েছে, আমরা আশা করি বাংলার বাইরেও সে ঠিক ততখানিই জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

সাইগল, যমুনা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, রাজকুমারী, ক্ষেত্রবালা প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনিন্দ্য-সুন্দর অভিনয়, গান ও নাচ ছাড়া চিত্রটির অন্যতম আকর্ষণ হবে এর সঙ্গীত। আপনাদের নিশ্চয়ই অজানা নেই যে এই হিন্দী সংস্করণের সঙ্গীত পরিচালক হচ্ছেন বিখ্যাত শ্রীযুক্ত তিমির বরণ। সর্বদা হাসি-মুখ, সম-বিখ্যাত আমাদের মিহির দা'র ভাই। উদয়শঙ্করের নাচের সঙ্গে যন্ত্রের সঙ্গতে অদ্ভুত মায়াজাল রচনা করে তিমির-বরণ সারা জগতের যে সম্মানলাভ করেছেন তা আজ নতুন করে বলাই আপনাদের বাহুল্য। সেই তিমিরবরণ হিন্দী "দেবদাস"-এর সঙ্গীত ও সুরের পরিকল্পনা করেছেন। সুরের ঝঙ্কারে, তার অভিনব তান ও তালে, মানুষের মনকে কতদূর যে অভিভূত করে' ফেলা যায়—তিমির বাবুর সঙ্গত তার হবে নিদর্শনী। যন্ত্রের ভেতর দিয়ে সে যাদুমন্ত্রের উচ্চারণ শুনতে আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছি।

রাধা ফিল্ম

এই প্রতিষ্ঠানের "মানময়ী গার্লস্-স্কুল" এর 'কর্ণওয়ালিসে' বারো হপ্তা সুরু হ'বে আসছে শনিবার থেকে। ছবিখানি সম্বন্ধে নতুন কিছু বলা অনাবশ্যক।

• • •

গুজব রটেছিল যে, শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত প্রতিষ্ঠান ত্যাগ কোরে অন্যত্র যোগদান কোরবেন। কিন্তু এই গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি আপাততঃ "কণ্ঠহারে"-র চিত্র-নাট্য লেখার কাজে ব্যস্ত আছেন।

* * *

এই প্রতিষ্ঠান "কৃষ্ণ-সুদামা" নামে একখানা ভক্তি-মূলক ছবি তোলার তোড়-জোড় কোরছেন। প্রকাশ যে, এই ছবির জন্য কর্তৃপক্ষ মূল্যবান সাজ-পোশাক ব্যবহার কোরবেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীযতীন দাশ "বিদ্রোহী"-র সঙ্গে "রাতকাণা"-কে বের কোরবেন বলে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম কোরে এই ছবিখানি তুলছেন। কয়েকদিন আগে এই ছবির সেট্ ও একটি দৃশ্য তোলা দেখে আমরা বিশেষ প্রীত হ'য়েছি। মনে হয়, ছবিখানি প্রেক্ষাগৃহে হাসির হুল্লোড় তুলবে।

• • •

এই প্রতিষ্ঠানের সুদর্শন নট গুল হামিদ যে ছবিখানার পরিচালনা কোরবেন তার নাম হচ্ছে "খায়বার পাশ"। ছবির গল্পটি এঁর নিজেরই লেখা।

বেঙ্গল টকিজ

গত ১৭ই জুলাই থেকে ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের ষ্টুডিওতে এই নব-জাত প্রতিষ্ঠানের প্রথম হিন্দী ছবি "ওয়ান ফেটাল নাইটের" শূটিং সুরু হয়েছে। চার্লস্ ক্রীড, শ্রীশান্তা ঘোষ, শ্রীমণি সাণ্ডেল, গফুর প্রভৃতি টেকনিশিয়ানগণের সহযোগিতায় শ্রীমধু বোস এই ছবিখানার পরিচালনা কোরছেন।

পপুলার পিকচার্স

এদের প্রথম ছবি "মন্ত্রশক্তি" উত্তর কোলকাতার সুসংস্কৃত চিত্র-গৃহ "উত্তরায়" শীঘ্রই মুক্তিলাভ কোরবে। শোনা যাচ্ছে, ছবিখানি যা'তে সাধারণের চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ হয় তার জন্য কর্তৃপক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেছেন; তাদের এ শ্রম ফলবতী হ'লে আমরা সুখী হব।

কালী ফিল্মস্

"বিদ্যাসুন্দরের" কাজ শেষ হ'য়েছে।

* * *

ষ্টুডিও যে সময় বিশ্রাম পায়, সেই সময় গাঙ্গুলী মশাই "কাল-পরিণয়ে"-র কাজে একটু একটু হাত লাগান।

পায়োনিয়র ফিল্ম

গত সংখ্যায় উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে আমরা লিখেছিলাম, "...নামের মোহে না ভুলে কর্ত্তৃপক্ষ এ লাইনে সংশ্লিষ্ট কোনও কাজের কাজীর ওপর এই ছবি তোলার ভার অর্পণ করুন।" আমাদের কথায় তা' হ'লে কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণপাত কোরেছেন। আমরা শুনলাম, এই শিল্পে বহুদিন ধরে জড়িত শ্রীসুশীল মজুমদারের ওপর কর্ত্তৃপক্ষ তাদের পরবর্ত্তী চিত্র রসরাজ অমৃতলালের "তরুবালা" তোলার ভার অর্পণ কোরেছেন। সুশীলবাবু উদ্যোগী ও কর্ম্মঠ পুরুষ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আমাদের মুখরক্ষা কোরবেন।

অমৃতলালের "খাসদখল"

প্রকাশ যে, 'সিষ্টোফোন' প্রচারক সরকার এণ্ড দত্ত শীঘ্রই অমৃতলালের "খাসদখল" বাণী চিত্রে রূপান্তরিত কোরবেন।

এভারগ্রীন পিক্চার্স

অন্যত্র প্রকাশিত নিবেদন অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁদের দ্বিতীয় ছবি "পঞ্চবান" আবার গোড়া থেকে তোলা আরম্ভ কোরবেন।

বঙ্গীয় চিত্র প্রদর্শক সমিতি

বঙ্গীয় চিত্র প্রদর্শক সমিতির সহকারী সভাপতি ও স্ক্রিন কর্পোরেশন লিমিটেড এর (রূপবাণী) সহযোগী ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ এম্, এ, বি, এল, মহাশয় গত ১৯শে জুলাই শুক্রবার প্রাতে বড়লাট বাহাদুরের আইন-সচীব স্যার এন, এন, সরকার মহাশয়ের সহিত তদীয় কলিকাতাস্থ বাস ভবন—৩৬।১, এলগিন রোডে সাক্ষাৎ কোরেছিলেন। মাননীয় আইন-সচীব মহাশয় মনোরঞ্জন বাবুর সহিত ভারতীয় চিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, ও নব-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় চিত্র-প্রদর্শক সমিতি স্বীয় কার্য্যে কিরূপ অগ্রসর হ'য়েছে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে স্যার নৃপেন্দ্রনাথ উক্ত সমিতির পৃষ্ঠপোষক হ'তে সম্মত হ'য়েছেন। পরিশেষে জনসাধারণের মধ্যে দেশীয় চিত্র-শিল্প বিষয়ে উৎসাহ, অনুরাগ ও জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি সিনেমা সংক্রান্ত পাঠাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা কত তা' সবিশেষ উল্লেখ কোরে ঘোষ মহাশয় আইন-সচীব মহোদয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন।

রূপবাণী

২৭শে জুলাই শনিবার থেকে 'রূপবাণী'তে মেট্রো-গোল্ডউইন মায়ারের "ডেভিড্ কপার-ফিল্ড" মাত্র এক হপ্তার জন্য দেখানো হবে। প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ লক্ষ লক্ষ নর-নারীর হাসি অশ্রু মাখা ডিকেন্সের এই প্রেম রসাত্মক গল্পটী সাহিত্যে অমর হ'য়ে আছে। তাহাই অপূর্ব্ব অভিনয়-রসে চিত্রে সজীব প্রাণস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে। এই চিত্রের সজীব প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি যেমনি মনোহর হ'য়েছে, ৬৫জন শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে অভিনয়ও তেমনি অনবদ্য রূপ পেয়েছে।

রূপকথা

শনিবার থেকে "ডাক্তার জিকিল এণ্ড্ মিষ্টার হাইড্" এবং বুধবার থেকে "সঙ্গ অফ্ সঙ্গস্" দেখান হবে। এদের পরবর্ত্তী আকর্ষণ হচ্ছে "মহুয়া"।

———

বিবিধ

দিগ্বিজয়ী দার্শনিক

ক্রোচেকে যিনি তর্কযুদ্ধে পরাস্ত ক'রেছিলেন, বঙ্গের সেই অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী দার্শনিক (? কুস্তিগীর—অবশ্য মস্তিষ্কের) ডক্টর (কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়—পরিভাষা সমিতির সৌজন্যে) সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত গত ১১ই জুলাই রোমকপুরী দীপিত ক'রে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছেন। দু'চার-জন কৌতূহলী প্রশ্ন ক'রেছেন যে ক্রোচেকে ত তিনি অনেকদিন হোলো 'ধোবিপাট' মেরেছেন, তবে আবার শ্রীরোমে গিয়েছিলেন কি মতলবে ?—আমরা সংস্কৃত কলেজ থেকে বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পেলুম যে ডক্টর দাসগুপ্ত এবার মুসোলিনীকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে ইতালীতে—

"প্রেম বিনে এই জগৎ ফাঁকা,
প্রেমের সমান আর কি আছে ?"—

—এই তত্ত্ব প্রচার কর্ম্ম সেরে ফিরে এসেছেন। ওদিকে মুসোলিনীও উক্ত গুরুর নবদীক্ষার প্রেরণায় মাতোয়ারা হ'য়ে শ্রীমতী আবিসিনিয়াকে প্রেমের ভুজপাশে বাঁধবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন ?—ধন্য গুরুদেব !—আর ধন্য তাঁর প্রেমবিতরণের মহিমা !

পরিভাষা-সমিতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হঠাৎ একটি পরিভাষা-সমিতি গজিয়ে উঠেছে। 'গড্ডলিকা'র স্রষ্টা রাজশেখর বসু মহাশয় এই সমিতির মূল সভাপতির পদে অভিষিক্ত হ'য়েছেন। রাজশেখর বাবুর পদোন্নতি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হ'তে থাকুক। প্রথম প্রোমোশন—'গড্ডলিকা' থেকে 'চলন্তিকা'য়। দ্বিতীয়বারে একেবারে ডবল প্রোমোশন—'হসন্তিকা' ছাড়িয়া একেবারে 'পরিভাষা'র কোঠায়। তিনি সংস্কৃত শব্দের জন্ম দিতে সুরু ক'রেছেন, যেমন— 'গতীয়', 'স্থিতীয়' ইত্যাদি। 'গতীয়' কথাটির পরিচয় পেয়ে অনেক মাতৃভাষা শিক্ষার্থী বাঙালী শিশু বেগতিক না দেখে! বেঙ্গল কেমিক্যালের (আমাদের প্রেসে "পেটকাটা অ'-এর অভাব নাই, কাজেই 'ব'-ফলাকে বরকরফ করা সম্ভব হ'ল না) পেটেন্ট সিরাপ কিংবা এসেন্স বা ট্যাবলেট কমপাউণ্ড ক'রে ক'রে রাজশেখর বাবু বোধ হয় এই অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তি লাভ ক'রেছেন। এখন আমাদের [illegible] রসিক বন্ধুর মধ্যে বেজায় তর্ক লেগেছে. তাঁকে কি উপাধি দেওয়া যায়—"পরিহাসেন্দুশেখর" না "পরিভাষেন্দু-শেখর" ? সহৃদয় পাঠকবর্গের ভোট পেলেই আমরা কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেলব।

পারিভাষিক উপন্যাস

এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটি প্রস্তাব আছে। পরিভাষা গুলিকে জলচল করতে হ'লে একটা পারিভাষিক বারোয়ারী উপন্যাস লেখা দরকার। কারণ, উপন্যাসের ভিতর দিয়ে না এলে কোন প্রব্লেমই আজকাল আর বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান পাবার যোগ্য ব'লে বিবেচিত হয় না। অতএব, অধ্যাপক ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রমুখকে লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি পারিভাষিক উপন্যাস লিখাইবার ব্যবস্থা করুন। উপন্যাসটি যদি রোমান্টিক, মনস্তত্ত্বমূলক, অথবা স্বপ্নলব্ধ হয়, তবে নবযুগের নব বেদব্যাস অভিনব পুরাণ প্রবেশের আদি পথ প্রদর্শক ডক্টর গিরীন্দ্র শেখর বসুকে দিয়া ইহার কথোদ্‌ঘাত লেখান যাইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ

এতদিন পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে বলি কেন, সমগ্র কলিকাতা নগরীতে) হিন্দুদর্শন শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ অধ্যাপনা করিবার উপযুক্ত অধিকারী অধ্যাপকের একান্ত অভাব ছিল। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে অভাব পরিপূর্ণ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে বরিশালের স্বনামধন্য দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী (জুনিয়র) এম-এ, পি-আর-এস, পি-এচ্-ডি মহোদয় মাসিক ২৫০্ টাকা বেতনে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহার যোগ্যতার তুলনায় এ বেতন অতি সামান্যই বলিতে হইবে। তথাপি ইঁহাকে এইপদে নিয়োগ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কথঞ্চিৎ গুণগ্রাহিতারই পরিচয় দিয়াছেন।

বেদান্তে ইঁহার তুল্য অধ্যাপক বর্ত্তমানে সমগ্র বঙ্গদেশে আর নাই। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতি মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। ইনি কাব্য ও অলঙ্কারে ইঁহারই Senior namesake স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী (সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ) মহাশয়ের সমতুল্য। আর গবেষণায় ইনি সার্ রাধাকৃষ্ণন, অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, মহামহোপাধ্যায় কুপ্পু স্বামী শাস্ত্রী প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতবর্গের সমস্তরের লোক। প্রকৃত কথা বলিতে কি, ইনি অচিরে সংস্কৃত "আশুতোষ অধ্যাপক" বা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের আসন অলঙ্কৃত করিলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

খেলার মাঠে

শ্রীদ্রোণাচার্য্য

আই, এফ, এ

আই, এফ, এ শীল্ড খেলার যবনিকা পাত প্রায় হয়ে এল। শেষ পর্য্যন্ত স্থানীয় টিম মহমেডান দলই সেমি-ফাইনাল খেলবে। এ দল এ বছর লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে যে গৌরব অর্জ্জন করেছে শীল্ড জয়ে যদি সে গৌরব অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়, তাহলে ক্রীড়ামোদী মাত্রেই খুসী হবে। বর্ত্তমানে সেমি-ফাইনালে খেলবে মহমেডান ও ইষ্ট ইয়র্কস এবং লিষ্টারসায়ার ও এইচ, এল, আই বনাম লয়ালস, বিজয়ীদল। ফাইনাল খেলা হবে ২৭শে জুলাই।

আই, এফ, এ শীল্ড

চতুর্থ রাউণ্ডে মোহনবাগান মুলতান আগত লিষ্টারশায়ারের কাছে ২—১ গোলে পরাজিত হয়। খেলার গুণাগুণ হিসাবে মোহনবাগানের পরাজিত হওয়া মোটেই সঙ্গত হয়নি। বিশেষতঃ যে গোল দুটি হয়েছে তাও মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। যে কোন গোল-কীপারেরই তা আট্‌কান সঙ্গত।

বিজয়ীদল এবার সেমি-ফাইনালে এইচ, এল, আই ও লয়ালস্ বিজয়ীদলের সঙ্গে সেমি-ফাইনাল খেলবে। ডুরাণ্ড প্রতি-যোগিতায় একাধিকবার এই দল সেমি-ফাইনাল ও ফাইনালে খেলেছে। তাছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও কয়েকটি প্রতি-যোগিতায় এই দলটী বিশেষ নাম করেছে। ১৯৩১ সালে প্রথম এই দল আই, এফ, এ শীল্ড খেলতে আসে। সেবার মোহনবাগান দলের সহিত তাহাদের খেলা হয় ও মোহন-বাগান দল তাদের প্রতিপক্ষ দলকে ৩—২ গোলে পরাজিত করে। এবার সৈনিকদল ২—১ গোলে পুনঃ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে।

খেলাটি বেশ উন্নত ধরণের হয়েছিল। তুলনায় বিজয়ী দল অপেক্ষা বিজিত দল অনেক ভাল খেলেছিল। শুধু ভাল খেলা নয়, ভাল খেলার নিদর্শন স্বরূপ গোল করবার বহু সুযোগ পেয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার হয়নি। নতুবা মোহনবাগান ইয়র্কস এণ্ড ল্যাঙ্কসের নিকট যে হারে জিতিয়াছিল ঐ হারেই জিতিতে পারিত।

আবহাওয়া বেশ ভালই ছিল। প্রাতে ও দ্বিপ্রহরে আকাশে দুই এক খণ্ড কাল মেঘের উদয় হয়। খেলার সময়েও ঐরূপ সূচনা দেখা যায়। সৌভাগ্যবশতঃ কোন বর্ষণ হয় নি, গ্রীষ্মাধিক্য খুব ছিল। ইহা সত্ত্বেও মোহনবাগান মাঠে যেরূপ জনসমাগম হয়েছিল উক্ত মাঠের ইতিহাসে উহা অভূতপূর্ব।

বেলা এক ঘটিকা হইতে লোক সংখ্যা সমবেত হইতে থাকে, এই সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। সাড়ে চার ঘটিকার সময় মাঠের সাধারণ দর্শকদের গেট বন্ধ হয়। কিছু পরে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের গেটও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কারণ তখন আর মাঠে তিল ধারণের স্থানও ছিল না। কেল্লার নিকটবর্ত্তী উঁচু জায়গাটিও ঐরূপ হয়েছিল।

মোহনবাগান দল অসুস্থ ও আহত খেলোয়াড় লইয়া তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সহিত যেরূপ খেলেছিল অন্য কোন টীম এভাবে খেলতে সক্ষম হত কিনা সন্দেহ। মাঠে টীম নির্ব্বাচনের সময় জানা গেল যে হামিদ (মোহনবাগানের বিখ্যাত সেণ্টার হাফ) ভীষণ জ্বরে শয্যাগত; তিনি খেলবেন না। ইহা ব্যতীত খুলনার সহিত জলে খেলিয়া সন্মথ দত্ত ও এ, রায়চৌধুরী জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। বিমল মুখোপাধ্যায় ঐ দিন খেলার সম[illegible]াঙ্গুষ্ঠে আঘাত পান। ফলে

তাঁহার পায়ের নখাগ্রে ব্যাণ্ডেজ কর্ত্তে হয়। গোলরক্ষক কে, দত্তও সেদিন ডান পায়ে ভীষণ আঘাত পেয়েছিলেন। তবুও হামিদ ব্যতীত অন্য সকলেই যথাক্রমে নিজ নিজ স্থানে ভালই খেলেছিলেন।

মন্মথ দত্ত জরগায়েও আশাতীত ভাল খেলেছিলেন। তিনিই মোহনবাগানের পক্ষে গোল করেছিলেন।

সেণ্টার হাফে বোথ্‌রা কিছুই খেলিতে পারেন নাই। বিমল মুখার্জি তাঁহার স্বাভাবিক খেলা খেলিয়াছিলেন। ফরওয়ার্ডে নন্দ পরিশ্রম করিয়াছিলেন বটে, তবে তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হয়নি। গুহ ও চৌধুরী দুইজনেই নিজ নিজ স্থানে ভাল খেলেছিলেন।

ফরওয়ার্ড লাইনে সবচেয়ে ভাল খেলেছিলেন করুণা ভট্টাচার্য্য। তিনি যখন বল লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন বড় সহজে কেহ তাঁহার নাগাল পাননি, তাঁহার বল কাটানর ভঙ্গী বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর। এত স্বচ্ছন্দভাব সহিত তিনি বল কাটান বা নিজ পক্ষীয় খেলোয়াড়দের পাস করেন যে, তাঁহার ঐ ধরণের খেলা দেখিয়া তাঁহাকে তারিফ না করে থাকা যায় না। যখন মোহনবাগান দল আক্রান্ত হইতেছিল তখনই তিনি অতিরিক্ত হাফ ব্যাক হিসাবে রক্ষকভাগে খেলছিলেন। তাঁহার এই খেলা বহুকাল দর্শকদের মনে থাকবে। সৈনিকদলও আপ্রাণ চেষ্টা করে খেলেছিল। ওদের গোলরক্ষক ক্লেমেণ্টস ও লাইন ম্যান হাফপেনির খেলা হয়েছিল চমৎকার।

ক্যালকাটা

স্থানীয় ইউরোপীয় দল ক্যালকাটা ইষ্ট ইয়র্কসের কাছে ১—০ গোলে পরাজিত হয়। "শীল্ড ফাইটার" হিসাবে ক্যালকাটার যথেষ্ট নাম আছে এবং এ বছর ক্যালকাটা যেরূপ শক্তিশালী তাতে অনেকেই ভেবেছিল ক্যালকাটা শেষ পর্য্যন্ত ফাইনালে যাবেই। কিন্তু তাদের এই পরাজয় অনেকটা আশ্চর্য্যজনকই।

গোল হওয়ার জন্য দায়ী ক্যালকাটার গোলরক্ষক আর্মষ্ট্রং। গোল রক্ষকের ভুলের জন্যই সৈনিকদল গোল করিতে সমর্থ হয়।

সেমি-ফাইনালে ইষ্ট ইয়র্কস স্থানীয় মহমেডান দলের সঙ্গে খেলবে।

সাহিত্য-পরিচয়
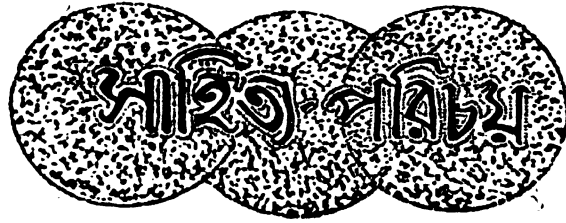
চিত্রে রুশ বিদ্রোহের ইতিহাস শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জি এণ্ড কোং, ১৫নং কলেজ ষ্ট্রীট. গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। মূল্য বারো আনা।

রুশিয়ার রাষ্ট্র বিপর্য্যয়ের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বলিত পুস্তক। ১৮২২ সাল হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক নীতি পর্য্যন্ত রুশিয়ার ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলী এই বহিতে গ্রথিত করা হইয়াছে। ইহাতে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জ্ঞানলাভের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তাই করিবে। প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বর্ত্তমান রুশিয়ার রাষ্ট্র পরিস্থিতি বর্ণনা আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে। আলোচ্য বহিতে গ্রন্থকার রুশিয়ার হালচাল বিশদভাবে বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং এই সকল ঘটনা চিত্রে সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

বইখানি আগাগোড়া আর্টপেপারে ছাপা। পাঠকবর্গ, এ বইখানি পড়িয়া রুশিয়া সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানিতে পারিবেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। প্রচ্ছদপটে রুশিয়ার মানচিত্র দেওয়ায় লেখকের রুচির প্রশংসা করা যায়।

আর্য্য-জীবনের আদর্শ—বন্ধু দীনানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। প্রকাশক—প্রবোধচন্দ্র মতিলাল। সাধনা মন্দির আশ্রম, বড়িষা, ২৪ পরগণা। বড়িষা মডার্ণ প্রিণ্টিং প্রেস হইতে মুদ্রিত।

বড়িষা সাধনা মন্দির আশ্রমের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব সভায় বন্ধু দীনানন্দ প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। বক্তা আশ্রমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন জাতি ধর্ম্ম ও স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে জীব মাত্রের, এমন কি ইতর প্রাণীর পর্য্যন্ত আপ্রাণ সেবায় প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রকৃত মানব ধর্ম্ম। প্রভৃতি জীবের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধনই প্রকৃত আর্য্য ধর্ম্ম, এবং ইহাই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ।

জ্ঞান-পিপাসু পাঠক মাত্রেরই বইখানি পড়া উচিত। ছাপা ও বাঁধাই নিকৃষ্ট।

এঁরা কারা

শ্রীহরিচরণ ভঞ্জ

আলেকজাণ্ডার কোর্ডা

পরিচালক ও প্রযোজক—উভয় বিষয়েই তিনি সিদ্ধহস্ত। তিনি হঙ্গেরিয়াবাসী এবং প্রথম জীবনে সংবাদপত্রের সংবাদদাতা ছিলেন। এজন্য কিসে দর্শকে আনন্দ পায় সে বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান জন্মে। ১৮৯৩ সালে, ১৬ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। লণ্ডন ফিল্ম প্রোডাকসনের তিনিই ডান হাত। "প্রাইভেট লাইফ অফ হেনরী দি এইট্থ" তাঁরই গড়া অবিনশ্বর ছবি। এ ছাড়া আরও তিনটি ছবি তাঁহার যশের মুকুটে আর একটী পালক সংযুক্ত করেছে—সে গুটী হচ্ছে—"ক্যাথ্রিণ দি গেট্", "ডন্ জুয়ান" স্কারলেট পিম্পারনেল। মেসিনের ন্যায় দুই তিন মাসে সাধারণ ছবি তোলার তিনি আদৌ পক্ষপাতী নন। এবং ছবি ভালো করবার জন্যে তিনি সব ডিপার্টমেণ্টে বাছাই লোক নিযুক্ত করেন। ফলে বরাবরই তিনি পান ভাল ছবি আর জগৎ-জোড়া নাম।

সেসিল-বি ডি-মিল

সেসিল-বি-ডি-মিল

হলিউডের বিখ্যাত পরিচালক। ১৮৮১ সালে, ১২ই আগষ্ট অ্যাশফিল্ডে জন্মগ্রহণ করেন। হলিউডে তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছবির পরিচালনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন—"He loves spectacle on the screen more than anything else" কথাটা একেবারে খাঁটা। তাঁর ছবির মূল প্রতিপাদ্য হ'চ্ছে একটা উপদেশ বা শিক্ষাদান; "টেন কমাণ্ডমেণ্টস্"; "দি সাইন অফ্ দি ক্রশ"; "দিস্ ডে এণ্ড এজ" সবগুলোই হ'চ্ছে শিক্ষাপ্রদ। তাঁর তোলা ছবির মধ্যে তিনি অকৃতকার্য্য হয়েছেন মোটে তিন-খানিতে। তিনি বলেন—"Do not what the others do." এজন্যই তিনি ছবির [illegible] এমন নেন্ যা নাকি আধুনিক আবহাওয়া হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এবং সেই গল্পে প্রাণ-সঞ্চার করেন জনতা, সাজসজ্জা ও নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলীতে। তাঁর আধুনিক ছবি হচ্ছে "দি ক্রুসেড্স"।

ভ্যান্ ডাইক

জগৎ-বিখ্যাত আরণ্যচিত্র "ট্রেডার হর্ণে"র পরিচালক। ১৮৯৯ সালে ক্যালিফোর্ণিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ভ্রমন করিবার খুব ঝোঁক আছে। জঙ্গলের হাওয়া তিনি ভালবাসেন; এজন্য তাঁকে অপরিসীম কষ্টভোগ করতে হয়, কিন্তু ইহাতেই তাঁর আনন্দ। এককথায় ইনি টকিযুগে আরণ্যচিত্রের জন্মদাতা।

জোসেফ ভন্ ষ্টার্ণবার্গ

ভিয়েনাতে তাঁহার জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একজন Cutter, সাপ্তাহিক
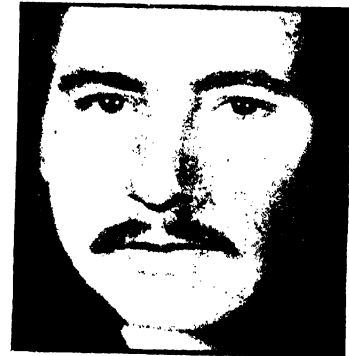
জোসেপ ভন্ ষ্টাণবার্গ

আয় ছিল তিন পাউণ্ড। কিন্তু তাঁর ছিল অসাধারণ প্রতিভা তাই আজ তিনি হলিউডের একজন নামজাদা পরিচালক। তাঁর প্রথম নাম-করা ছবি "ব্লু এঞ্জেল" কিন্তু তাঁর হাতের প্রথম ছবি হচ্ছে "স্যাল্ভেশন হাণ্টার্স"

মাদকতাময়ী জার্ম্মাণ তারকা মালিন ডিয়েট্রিচের সাফল্যের জন্য তিনিই দায়ী। তিনি যে একজন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তাঁর ছবির বিশেষত্ব হচ্ছে গম্ভীরভাব, আর্টিষ্টিক টাচ্ ও দৃশ্যসজ্জা। "স্কারলেট এম্প্রেস" তাঁর আধুনিক ছবি। নিখুঁত পরিচালনা ও টেম্পো জ্ঞান তাঁহার ন্যায় কাহারও আছে কিনা সন্দেহ।

রুবেন ম্যামোলিয়েন

রুবেন ম্যামোলিয়েন

ফিল্মজগতের শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৯৮ সালে ট্রাইফিস সহরে তাঁর জন্ম। ১৯২০ সালে যখন লণ্ডনে আসেন তখন একবিন্দুও ইংরাজী জানতেন না। নিউ ইয়র্কে একজন বিখ্যাত মঞ্চ-প্রযোজক ছিলেন। তারপর প্যারামাউণ্ট কোম্পানীর সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। ছবির সাহায্যে গল্প বলার তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। তাঁর তোলা ছবি হচ্ছে "সিটি ষ্ট্রীটস", "ডাঃ জিকেল এণ্ড মিঃ হাইড", "লাভ মি টু নাইট্", "সঙ্ অফ্ সঙ্গস্" ইত্যাদি। তাঁর মতে টকিতে সংলাপ যত কম হয় ততই ভাল। তিনি চান 'এক্শন'। তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছবি "কুইন্ ক্রিশ্চিনিয়া" সত্যই অতুলনীয়।

আর্ণষ্ট লুবিশ

ফিল্মজগতের সর্ব্বোচ্চ বেতনভোগী হলিউডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচালক। ১৮৯২ সালে বার্লিনে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯২১ সালে "জিপ্সী ব্লাড"-এর পরিচালনায় নাম কেনেন। Critic-দের মতে—"He has the born cameraman's ability to see a story in terms of pictures; he has the dramatists instinct for situation; and he has a wonderful gift of dissecting the vices and weaknesses of mankind." চিত্র-নাট্য লিখিতে তাঁর লাগে তিন চার মাস। কিন্তু তিনি শূটিং করেন কেবলমাত্র ছয় সাত সপ্তাহ। তাঁর "ট্রাবল ইন্ প্যারাডাইসে" যেরূপ ঘটনা পারম্পর্য্য আছে এরূপ সৃষ্টি কেবলমাত্র তাঁতেই সম্ভব।

আর্ণষ্ট লুবিশ

ফ্রাঙ্ক বর্জেস

১৮৯৮ সালে সল্টলেক্সিটিতে এঁর জন্ম। চিত্রতারকা নির্ম্মাণে এঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। এঁর গড়া ছবি "সেভেন্থ হেভেন", "এ ফেয়ারওয়েল টু আর্ম্মস," "ব্যাড্ গার্ল" প্রভৃতি। "Has the ability to make audiences see themselves in the places of the players." মানুষকে হাসাইবার ও কাঁদাইবার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। গল্পের প্রতি তাঁর নজর থাকে খুব। কারণ তিনি বলেন—গল্পের গাথুনি না হলে, টেকনিক্ কি কর্ব্বে? পরিচালকের যোগ্য কথা বটে!

ফ্রাঙ্ক ক্যাপরা

ইটালিতে জন্মগ্রহণ করেন। নিউ ইয়র্কে এসে সংবাদপত্র বিক্রয় করতেন। মহাযুদ্ধের সময় ফ্রণ্টে তের মাস কাটিয়েছিলেন। অনেক উত্তেজনাপূর্ণ ছবি তুলেছেন। তাঁর পরিচালনা প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁর আধুনিকতম ছবি "ইট্ হ্যাপেণ্ড ওয়ান্ নাইট"।

ভিক্টর সেভিলি

ভিক্টর সেভিলি

বার্মিংহামে ১৮৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ফিল্ম বিক্রী করতেন। পরে একজন পরিচালক হন। অনেক ছবি তুলেছেন। তারমধ্যে "আই ওয়াজ এ স্পাই" সর্ব্ববিখ্যাত। তিনি সব রকম ছবি তুলতে পারেন।

ওয়াল্টার ফোর্ড

ওয়াল্টার ফোর্ড

১৮৯৭ সালে, ২১শে এপ্রিল লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কমেডি ছবি তোলার জন্য বিখ্যাত। এঁর প্রথম ছবি "রোম এক্সপ্রেস"। এখন ইনি গেমোঁ-ব্রিটিশ কোম্পানীতে আছেন।

শেষাংশ পরপৃষ্ঠা দেখুন

অমরেশ ও মীনা

নাটক

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দীপক—(অল্প স্তব্ধ থাকিয়া) নাঃ! আমার স্ত্রী হওয়া তোমার উচিৎ হয় নি।

সুরমা—(হাসিয়া) কার হলে ভালো হোত বললে?

দীপক—থাক, বাজে ব'কে কোন লাভ নেই। এখন অমরেশ কোথা গেল তাই বলো। সে যে আমায় চিঠি লিখে জানালে—

সুরমা—দাদা চিঠি লিখেছিলো?

দীপক—হ্যাঁ—

(মীনার প্রবেশ)

মীণা—কি চিঠি? কাকে চিঠি লিখেছেন?

দীপক—আমায়।

মীণা—কি লিখেছেন তাতে?

দীপক—লিখেছে খুব শীঘ্র ওর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে। ওর নাকি অনেক কথা আমায় বলবার আছে। চিঠিখানার ভেতর মিনতি ছত্রে ছত্রে। বেদনা যেন ওর প্রতি অক্ষরটিতে মাখানো। আমি তো প্রথমে দস্তুরমতো ভয়ই পেয়ে গেছলুম।—ও আছে তো ভালো?

মীণা—সম্ভবতঃ ভালোই আছেন।

(অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল)

দীপক—আমিও তাই আশা করি। কিন্তু আমায় এ রকম জরুরি চিঠি দেবার কি কারণ হ'য়েছে তা কি আপনি জানেন?

মীণা—আমি কি করে জানতে পারি বলুন? আপনার স্ত্রী হয়তো জানতে পারে।

সুরমা—আমি কি ক'রে জানবো? যে কথা তিনি তোমায় বলেন নি, সে কথা তিনি আমায় বলেছেন বলে তোমার বিশ্বাস হয়?

মীণা—তাই হয়! কিন্তু সে যাক্। তিনি যতো ইচ্ছে চিঠি লিখন গে, যা খুশী করুন, আমার তাতে কিছু ক্ষতি নেই। কথাটা তাঁকে বোলো। (প্রস্থানোদ্যত)

সুরমা—ক্ষতি হয়তো তোমার কিছু নেই, কিন্তু আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানিনে এটা তুমি বিশ্বাস ক'রে যাও ভাই।

(এই বলিয়া সুরমা মীণার হাত ধরিল)

মীণা—থাক থাক—যথেষ্ট হয়েছে।

(মীণা হাত ছাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল)

দীপক—তোমাদের হাত কাড়াকাড়ি হ'ল কিন্তু আমি অবাক হ'য়ে বসে রইলুম; ভেতরের ব্যাপারটা কি আমায় বলবে?

সুরমা—(যথেষ্ট গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল সে বলিল—) না!

দীপক—বলবে না?

সুরমা—না! আমি বলবার কে? যে তোমায় চিঠি লিখে আনিয়েছে, সে তোমায় বলতে পারবে। আমি পারবো না।

(অমরেশের প্রবেশ)

অমরেশ—এই যে দীপক এসেছো!

সুরমা—দাদা, কেন তুমি ওকে অমন ক'রে চিঠি লিখেছিলে বলতো?

অমরেশ—কেন, তাতে কি হ'য়েছে?

সুরমা—কিছু হোক বা না হোক্, তুমি অমন ক'রে চিঠি লিখবে না।

অমরেশ—(হাসিয়া) আমি কি কর্ব, বা না কর্ব—সে কি তুই ব'লে দিবি তবে হবে?

সুরমা—তা নয়, তবে যে কাজ ক'রলে তোমার স্ত্রীর মনে কষ্ট হবে সে কাজ তুমি ক'রবে না—আমি তা কোরতে দোব না। আমি নিমিত্তের ভাগী হ'তে পারবো না।

(এই বলিয়া সহসা তাহার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল—সে প্রস্থান করিল)

অমরেশ—হঠাৎ কি হ'ল আমি বুঝতে পারছি না।

দীপক—আমি গোড়া থেকেই না।

অমরেশ—আমি তোমায় চিঠি লিখেছি ওর তাতে আপত্তি কিসের!

দীপক—মীণা দি'ই বা আপত্তি কেন এত ক'রল!

অমরেশ—সে ছিল নাকি এখানে?

দীপক—হ্যাঁ—চিঠির কথা শু'নে তিনিও—

অমরেশ—এইবার সব বুঝতে পেরেছি। আর ব'লতে হবেনা। (স্তব্ধ রহিলেন ক্ষণিক)

দীপক—কিন্তু কি জন্য তুমি আমায় ডেকে আনলে বলতো এবার?...

অমরেশ—তাই বলবো। বলবার জন্যই আমি অপেক্ষা করছি দীপক। তোমাকে সে কথা শুনিয়ে আমি নিজেকে হাল্কা ক'রে নোব!......কিন্তু তোমায় পেয়ে আমার কী ভালো যে লাগছে তা আমি বল্তে পারি না!......(দীপকের হাত ধরিলেন) আমার বল্‌বার কথা দূরে চ'লে যাচ্ছে, তুমি শুধু এগিয়ে আস্‌ছো!......

দীপক—তোমার চিঠি পেয়ে আমি প্রথমে ভয় পেয়ে গেছলুম।

অমরেশ—পাবারই কথা। কেউ কখনোও আমায় ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে দেখেনি। কখনও কোন ব্যথা আমার ভেতর আছে কিনা কেউ শোনেনি। তাই তুমি ভেবেছিলে একটা কিছু গুরুতর হ'য়েছে, না?

দীপক—ঠিক্ তাই।

অমরেশ—কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার আজ কোথায় গেল! (স্তব্ধ হইয়া যাইলেন)

(একজন অ-মুসলমান খানসামা চা, ইত্যাদি লইয়া আসিল এবং একটি ছোট টিপয়ের উপর ট্রে খানি রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

দীপক—(তাহার দিকে চাহিয়া বলিল) ঠিক হ্যায়—(খানসামা প্রস্থান করিল) বৌ-দি'মণি সর্ব্বাগ্রে খাবারটা ঠিক্ ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি এটা তাঁর কখনোও ভুল হয় না!

(ক্রমশঃ)

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ

ম্যরিশ এল্‌ভি

১৮৮৭ সালে ১১ই নভেম্বর ইয়র্কসায়ারে জন্মগ্রহণ করেন। বিটিশ পরিচালকদের মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছবির পরিচালনা করেছেন। তাঁর তোলা ছবি হচ্ছে কনরাড ভিড অভিনীত "ওয়াণ্ডারিং জিউ", গ্রেস ফিল্ড, এর "স্যালী ইন আওয়ার এ্যালী", "লাভ, লাইফ এণ্ড লাফ্‌টার"।

ফ্রাঙ্ক লয়েড

১৮৯৯ সালে গ্লাসগোতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৯৩৩ সালে শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে এ, এম্, পি, এ, এস্ উপাধি লাভ করেন। তাঁর জগৎ বিখ্যাত ছবি "ক্যাভেল্‌কেড"।

৯ই শ্রাবণ

শ্রীঅজিত ঘোষ

কাল ৯ই শ্রাবণ। কাল তার জীবনের সপ্তদশ-মঙ্গলময় উৎসব। জীবনের ষোড়শটি সোপান ডিঙ্গিয়ে কাল সপ্তদশে পা দেবে বুলা। আনন্দের কোলাহলে তার বাড়ী ভরপুর। সকলের প্রাণে আনন্দ, সকলে অপেক্ষা করছে কখন রাত্রি প্রভাত হ'বে, কখন্ শেষ হ'বে বুলার পুরাতন বয়ের এই শেষ দিনটা। কিন্তু যাঁকে উপলক্ষ্য করে এত আনন্দ কোলাহল তার প্রাণে কিন্তু আনন্দ নেই। সে ভাবছে অনবরত: হাতে একটা-ও পয়সা নেই তার, কী করা যায় তাই ভাবছে বুলা। সমস্ত দিন মাথার মধ্যে ঐ কথা চলাফেরা করেছে কিন্তু ঐ সমস্যার সমাধান হয়নি। অবশ্য তার বাড়ীতে টাকার অভাব নেই, কিন্তু সে কী করে চাওয়া যেতে পারে? বুলা চায়, এই দিনটার যেন শেষ না হয়—তা' হ'লে অন্ততঃ শচীনের কাছে তার প্রতিজ্ঞাটা সে রক্ষা করতে পারে। শচীনেরও কাল জন্মদিন, এ'কথা জেনেছে সে তার ভাই অমলের কাছ থেকে। তারও জন্মদিনে-ত একটা উপহার দেওয়া দরকার, কিন্তু সে পাচ্ছে কোথা থেকে? শচীনকে তার ঘড়ীর ব্যাণ্ড কিনে দেওয়ার ওর খুব ইচ্ছা, কিন্তু যৎসামান্য টাকা ওর পুঁজি তাই দিয়ে একটা রূপোর ব্যাণ্ড-ই হয়না ত একটা সোনার ব্যাণ্ড! তার বাড়ীতে আজ আনন্দ, সকলের মুখে হাসি কিন্তু এ হাসি তার ভাল লাগে না—আনন্দের বদলে বিরক্ত এনে দেয় প্রাণে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চেয়ারে বসে মুখ-ঢাকা দিয়ে একমনে সে ভাবতে লাগল।

এখন-ও বুলা ভাবছে। স্মৃতির অতল তল থেকে বায়োস্কোপের ছবির মত মাস কতক আগেকার কথা ক্রমে ক্রমে তার মনে পড়ল। শচীন ছিল তার ভাইয়ের সহপাঠি। একদিন শচীন তাদের বাড়ীতে অমলকে ডাকতে আসে। অমল তখন বাড়ী ছিল না, সেটা বলতে বুলা বেড়িয়ে আসে। সেই দেখাই তার প্রথম এবং এই প্রথম দেখাতেই শচীনের সৌন্দর্য্য ওর মনকে নাড়া দিয়ে গেছল। তারপর থেকে প্রায়ই শচীন ওদের বাড়ী আসত এবং অমলের মধ্যস্থতায় ওদের আলাপ-ও হ'তে বেশীদিন লাগেনি। যেদিন থেকে শচীনের সাথে মেশবার সুযোগ হয়েছিল সেদিন থেকেই ওর কুমারী জীবনের প্রথম নৈবেদ্য শচীনের পায়ে নিবেদন করেছিল। শচীন-ও এমন সুন্দর চোখে কোন নারীকে কখন-ও দেখেনি। অন্তরে যে প্রেম নিয়ে পুরুষ সমস্ত নিখিলের সৌন্দর্য্য ও বিস্মিত-মণ্ডিত করে' নারীকে নারীর চেয়েও অনেক বড় করে, শচীনের চোখে ছিল সেই উজ্জ্বল প্রেমের দৃষ্টি। তাই তার যৌবনের নিভৃত নিলয়ে যে প্রেমের দীপ জ্বালালে তার প্রতি সে তার কুমার জীবনের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু তাদের এই মিলনে একটা ছিল অন্তরায়। সেটা হচ্ছে শচীনের অর্থ হীনতা। কিন্তু তার গুণ ছিল অনেক। তার রূপ এবং গুণ দিয়ে অর্থের ফাঁকটুকু পূরণ করে দিতে কিন্তু বেশী সময় লাগে নি। তাদের এই বিবাহ নিশ্চিত বলেই সকলের ধারণা। কাল ৯ই শ্রাবণে কী দেওয়া যেতে পারে শচীনকে? শচীন নিশ্চয়ই ওর জন্মদিনে একটা-না-একটা কিছু দেবেই আর সে শচীনের জন্মদিনে কিছু দেবে না, এ' হ'তে পারে?—শচীনের ঘড়ীর একটা 'ব্যাণ্ড' দেবার ইচ্ছা ওর মনে অনেক দিন ধরেই আছে, কিন্তু টাকা না হ'লে কী করে সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করবে? একটা কথা তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বাবার কাছে কী টাকা চাওয়া যেতে পারে না অন্য কোন একটা জিনিষের অছিলায়? কিন্তু না, না; যদি জানতে পারে তা হ'লে—? লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফেলে বুলা দু'হাতের ভেতর। আর সে পারে না—বুলা কেঁদে ফেলে। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল;—একজন কে ঘরের মধ্যে এসে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। সমস্ত ঘরটায় ঘন নিবিড় অন্ধকার যেমন আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়ে গেল, বুলার চিন্তায় ঘন-কালো মেঘ সহসা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এতক্ষণে ওর সমস্যার একটি সমাধান হয়েছে। আলোতে ওর গলার হারটা চক্ চক্ করছিল, সেটাকে খুলে বুলা টেবিলের উপর রাখলে। পাকা সোণার তৈরী হারটা, এ'টাকে বিক্রী করলে অনায়াসে শচীনের ঘড়ির 'ব্যাণ্ড' হয়ে যা'বে। বুলা এতক্ষণে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।—কিন্তু কাকে দিয়ে 'ব্যাণ্ডটা' কিনে আনা যেতে পারে! অমলকে না বিহারীকে দিয়ে! না বিহারীকে দিয়েই আনান যাক। বিহারী পুরাতন ভৃত্য ওকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। বিহারীকে পাঠানো ঠিক হ'ল। বিহারী এল। বুলা বললে বিহারী, আমার জন্য একটা কাজ করে দিতে হ'বে। কাউকে বলবে না কিন্তু!

—কী কাজ, দিদিমণি?

—আমার এই হারটা বেচে ঘড়ির একটা সোণার 'ব্যাণ্ড' আনতে হ'বে।

—হারটা বেচব? কেন? কার জন্য সোনার ব্যাণ্ড?

বুলা চুপ করে রইল। বিহারী একটু একটু জানত ভিতরকার খবর, তাই সে অন্য প্রশ্নের অবতারণা করলে—হারটাত বেচব, কিন্তু মা যখন হার কোথায় গেল জিজ্ঞাসা করবেন তখন কী বলবেন আপনি?

বুলা একটু ভাবলে, তার পর বল্লে—সে তোমায় কিছু ভাবতে হ'বেনা ; সব ঠিক হয়ে যা'বে—বলব যে হারিয়ে গেছে।

বিহারী আর কিছু বললেন', চলে গেল।

* * *

বিহারী ফিরে এসেছে। জিনিষটী বাস্তবিক ভারী চমৎকার। বিহারীর পছন্দ আছে বলতে হ'বে। ঐ ব্যাণ্ডটী যেন শচীনের ঘড়ীর জন্যেই তৈরী হ'য়েছিল আর বিহারী সমস্ত বাজার উজোড় ক'রে কিনে এনেছে। শচীনের চামড়ার ব্যাণ্ডটী কি বিশ্রী! এই ব্যাণ্ডটা কিন্তু ভারী চমৎকার মানাবে।—যাক এতক্ষণে মনের মত জিনিষ পাওয়া গেল। শচীনকে যখন দেবে তখন সে ভারী আশ্চর্য্য হয়ে যা'বে নিশ্চয়! কী মজা। বুলা এ'বার নিশ্চিন্ত হ'ল। সে প্রতীক্ষা করতে লাগল, কখন সকাল আট্টার সময় শচীন আস্‌বে।

* * *

শচীন কিন্তু খুব 'পাঙ্ক্‌চুয়াল।' কখনও দেরী করে না—ঠিক আট্টার সময় শচীন এল। সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ শুনে বুলার প্রাণের ভিতর দুর দুর ক'রে উঠ্‌ল। শচীন ঘরে ঢুকল। কাগজে মোড়া একটা জিনিষ বার করে বুলার হাতে দিয়ে বল্‌লে—তোমার জন্মদিনে আমার উপহার।

বুলাও তাড়াতাড়ি ওর প্যাকেটটী শচীনের হাতে দিলে। শচীন জিজ্ঞাসা করলে—একী?—আমাকে আবার এ দেবার মানে? বুলা বল্লে—দুষ্টু, তোমার জন্মদিন আমাকে জানাওনি ত—কিন্তু দেখ আমি জানি এবং সেই জন্যই আমার যৎকিঞ্চিৎ উপহার। খুলে দেখ কী দিয়েছি।

শচীন ও বুলা দু'জনেই ওদের যে যার জিনিষ তাড়াতাড়ি খুলতে লাগল। বুলা আগে খুলে দেখলে ওর হারের জন্য একটা সোণার লকেট। হর্ষে বুলা অস্ফুট শব্দ করে উঠ্‌ল কিন্তু পরক্ষণেই ওর মুখ নৈরাশ্য এবং বিস্ময় মিশ্রিত একটা ভাবে পরিণত হ'ল। ওর মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে শচীন বল্‌লে—কী হয়েছে বুলা তোমার? তোমার মুখের ভাব ওরকম হ'ল কেন? তোমার কি পছন্দ হয়নি? বুলা তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল না, না, পছন্দ হ'য়েছে আমার—আমার কিছু হয়নি। তোমার যা জিনিষ খুলে দেখ। এ'বার বিস্মিত হ'বার পালা শচীনের। মোড়কটা খুলে জিনিষটী দেখেই ও চমকে উঠলো। বুলা ভয় পেয়ে গেল, বল্‌লে—ও রকম করছ কেন? আমার জিনিষ পছন্দ হয়নি নাকী? শচীন ম্লান একটু হাসি হাস্‌লে, তারপর অস্ফুট স্বরে বল্‌লে—বুলা, আমার ঘড়িটা বেচে তোমার জন্য হারের লকেট কিন্‌লুম আর তুমি কী না কিনেছ আমার জন্য ঘড়ির ব্যাণ্ড!—কপাল দেখ—এ'বার বুলার পালা। সে বল্‌লে—যাক্! দুঃখ পাবার কী আছে! তুমি-ও যেমন ঠকেছ আমি-ও তেমনি ঠকেছি! আমার হার বিক্রী করে তোমার ঘড়ির ব্যাণ্ড কিনেছি!—দু'জনের উপহার কাহারও কাজে লাগল না।

শচীন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বুলার দিকে। বুলা বলতে লাগল—তোমাকেও কিছু দিতে পারলুম না, আবার তোমার উপহারও মিছামিছি হ'ল। আমার এ' জন্মদিনটা দেখছি ভারী অপয়া!

শচীন বুলার দিকে এখন-ও স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখে ওর বিহ্বল-ভাব, গাঢ়স্বরে শচীন ডাক্‌লে—বুলা, তোমার এবং আমার উপহার বৃথা গেল, যাক্‌গে! কিন্তু তোমার জন্মদিন বৃথা যাবে কেন? আজ সবার সেরা উপহার তোমায় দেব—এই বলে' আলিঙ্গন-উৎসুক-দু'হাত দিয়ে টেনে আন্‌লে শচীন বুলাকে বুকের উপর, বুলা বাধা দিলে না; লজ্জায় ওর মুখটা সিঁদুরের মত রক্তিম হয়ে উঠেছে; শচীন ওকে নিবিড়-উন্নত-আলিঙ্গনে বন্দী করে' চুমু খেয়ে বল্লে—আজ আমার এই শ্রেষ্ঠ উপহার—

একটি ইংরিজি গল্পের ছায়া নিয়ে লেখা।

সনেট্‌

—শ্রীসুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত

অবরুদ্ধ গৃহ কোণে জাগি কাটে আঁধার যামিনী,
সে আঁধারে মোর আত্মা প্রেতলোক ক'রেছে সৃজন ,
অশান্তি বিদ্রোহ ভারে রোমাঞ্চিত ক'রেছে জীবন,
বুকেতে বহিছে ঝড়, কানে রেশ বাজে রিণি রিণি !
বাহিরে ছুটিতে চাই, চাপি ধরে রাত্রি কুহকিনী,
নামি আসে শ্লথ তন্দ্রা, চোখে নামে ফুলের স্বপন ;
শুধু মুহূর্ত্তের তরে শান্ত হয় অশান্ত যৌবন,
অপরূপ হয় চক্ষে ক্ষণতরে আকাশে মেদিনী !
সমস্ত আঁধার ঘেরি কল্পলোকে রঙীন উৎসব,
র'চেছি জাগ্রত স্বপ্নে, নিখিলের যত রূপ-কণা
এক সাথে জড়ো হ'য়ে মোরে আজি ক'রেছে উন্মনা,
থেমেছে বাহিরে ঝড় শান্ত হোল মত্ত কলরব।
তবু ও বুকেতে কাঁদে অবরুদ্ধ অস্ফুট বাসনা,
সুষুপ্ত রাত্রির তটে জাগা প্রাণ রবেনা নীরব।

[নাটক]

দেহ-যমুনা

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[বিজয় একা একা বসিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। একরাশ ফুল ও বোকে লইয়া প্রদ্যোত প্রবেশ করিল]

প্রদ্যোত—কি বিজয় একা ঘরে বসে বসে হাসছো কেন?—

বিজয়—(হাসিয়া)—হাসচি একটা কথা মনে ক'রে।—

প্রদ্যোত—কথাটা কী?—

বিজয়—আজকে গীতা বলছিল আমাকে নাকি তার ভারী ভাল লাগে।—

প্রদ্যোত—তাই নাকি?—

বিজয়—হ্যাঁ,—আরও বললে যে এত ভাল না লাগলেও চলতো!—

প্রদ্যোত—বটে! তাই মনে করে তুই হাসছিস?—ওরে পাগল! তুই কি জানিস—যে এর চেয়ে মূল্যবান কথা আমাদের জীবনে আর নেই!—

বিজয়—কে জানে ও সব। তবে কথাটা আমার ভালো লাগলো।

প্রদ্যোত—ভালো লাগলো তো? তাহ'লে আর ভয় নেই।—

বিজয়—ভয় নেই মানে?—

প্রদ্যোত—মানে বুঝতে দেওনা।—গীতাকে সে কথা বলেছিলে?—

বিজয়—কোন কথা!—

প্রদ্যোত—বেশ—এর মধ্যে ভুলে মেরে দিয়েছো।—যাক্‌গে আর তার দরকারও নেই।—গীতা কোথায় গেল?—

বিজয়—আমার মাথাটা বড় ধরেছে—আমি ছাদে চললাম। গীতাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

(একটু পরে গীতা প্রবেশ করিল)

প্রদ্যোত—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?—

গীতা—ও দাদা! এত ফুল এনেছো কেন?—

প্রদ্যোত—তোকে সাজাবো বলে।

গীতা—আমাকে সাজাবে কেন? আজকে আমার এত ভাগ্য কেন?—

প্রদ্যোত—ভাগ্য?—তা তোদের ভাগ্য তো তোরই গীতা।

গীতা—আর তোমার?—

প্রদ্যোত—আমার ভাগ্য খারাপ।

গীতা—ও মা! বল কি—খারাপ? কেন বলনা।—

প্রদ্যোত—সে তোর শুনে কাজ নেই। ও ঘরে চল। কতকগুলো কথা আছে।

গীতা—চলো—

(উভয়ে চলিয়া গেল)

(অন্যপথে অনিমা ও স্বপন রায় প্রবেশ করিল)

স্বপন—আস্তে অনিমা দেবী আস্তে। এখনি কেউ এসে পড়বে। ওঃ! প্রদ্যোতের পেছন পেছন খুব এসে পড়া গেছলো না হোক।—

অনিমা—কিন্তু আর না এবার চলুন।

স্বপন—এখনি যাবেন?—ও ঘরের কথাগুলো একবার শুনবেন না?—

অনিমা—না—না—আপনি ফিরে চলুন।

স্বপন—কিন্তু আর একটুখানি দাঁড়ালেই—

অনিমা—না—না—মিঃ রায় এ দৃশ্য দেখে আমার পুলকিত হবার কথা নয়। আপনি যদি না যেতে চান—আমি একলাই চললাম—

স্বপন—(ব্যস্ত হইয়া) না—না—একলা যাবেন না।

(বাহির হইতে কে ডাকিল—"প্রদ্যোত আছ নাকি হে?" অনিমা কি বলিতে যাইতেছিল—স্বপন মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—এবং চোখের পলকে দেয়ালের সুইচ বন্ধ করিয়া দিল—সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে তাহারা পাশের বারান্দা দিয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিল।)—

বাহিরে প্রভব—আরে—ঘরের আলো নিভিয়ে দিলে কে?—প্রদ্যোত!—প্রদ্যোত!—

(ঘরে ঢুকিল গীতা)

গীতা—একি! ঘর অন্ধকার কেন?—(আলো জ্বালিয়া দিল)—কে?—(প্রভব প্রবেশ করিল) ও, প্রভব বাবু! আসুন।

প্রভব—প্রদ্যোত আছে?—

গীতা—আছেন।

প্রভব—একটা regular ম্যাজিক হয়ে গেল এখুনি। যেই আমি প্রদ্যোত বলে ডেকেছি অমনি খট্ করে ঘরের আলো গেল নিভে। আর যদি ভুল শুনে না থাকি তবে কারা যেন দুম দুম করে ছুটেও পালালো মনে হ'ল।

গীতা—বলছেন কি?—কিন্তু কেউ তো ছিল না এ ঘরে!

প্রভব—নিশ্চয়ই ছিল।—

গীতা—কি জানি। আপনি বসুন, আমি দাদাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

(গীতার প্রস্থান)

(একটু পরে প্রদ্যোত প্রবেশ করিল)

প্রদ্যোত—কি একটা আলো নিবে যাওয়ার mystery শুনিয়ে গীতাকে ভয় পাইয়ে দিইয়েছিস্। একে যা ভীতু মেয়ে তারপর—

প্রভব—সে থাক্‌গে—আমাকে ডেকেছিস কেন?—

প্রদ্যোত—ডেকেছিলাম—আসছে পরশু আমার স্ত্রীর জন্মতিথি তুই সন্ধেবেলায় নিশ্চয়ই আসবি, without fail.

প্রভব—আসবো :—

প্রদ্যোত—তারপর !—যে লোকটার সন্ধানে কলকাতায় এসেছিলি তাকে পেলি ?

প্রভব—আমিতো প্রথমেই তোকে বলেছিলাম যে তাকে পাওয়া শক্ত হবে. সে একটি সুন্দর শয়তান।

প্রদ্যোত—দেখতে খুব ভাল বুঝি ?—

প্রভব—হুঁ। সে বিষয়ে তার কোন ত্রুটীই নেই।—অদ্ভুত বক্তা, অসীম সাহস—অথচ আশ্চর্য্য রকম Devil !

প্রদ্যোত—তার ওপর তোর এত রাগ—কী করেছে সে ?—

প্রভব—বলেছিতো আজও সে কথা বলবার সময় আসেনি। আচ্ছা আমি উঠি। পরশু যাবো তোর বাড়ী—

প্রদ্যোত—হ্যাঁ যাস,

(প্রভবের প্রস্থান)

(গীতার প্রবেশ)

গীতা—কিন্তু বৌদি আমাকে কিছু বললেন না—আমার যেতে কেমন লাগছে দাদা !

প্রদ্যোত—এই সেখানে যাওয়ার জন্যে বায়না ধরেছিলি—এরই মধ্যে মত বদলে গেল ? ও সব পাগলামী করিসনে, তোর যাওয়া সেখানে আজ একান্ত দরকার মনে রাখিস—তোর যাওয়ার উপর তার জীবনের অনেকখানি নির্ভর করছে।

গীতা—যাবো।

প্রদ্যোত—গত বছর অনিমার জন্মতিথি উৎসবের কথা মনে পড়ছে কী মধুর সেই স্মৃতি।

গীতা—এই বছরও তো সেই তিথি ফিরে এসেছে।

প্রদ্যোত—হ্যাঁ ফিরে এসেছে, কিন্তু কেবল আমার দিয়ে শুক্‌নো কর্ত্তব্য করাতে. পরিপূর্ণ বর্ষার নদী গেছে মরে,—তুই পারে তার জেগে উঠেছে শ্রীহীন বালুচর।

গীতা—তুমি আজকাল কী রকম ভাবে কথা বলো—তোমার আদ্দেক কথা আমি বুঝতেই পারিনে।

প্রদ্যোত—তোর বুঝে দরকার নেই ভাই, পারিবারিক জীবনে তুই একনিষ্ঠ সঙ্গীলাভ কর—এই আমি শুধু কামনা করি। বন্ধ্যার দুঃখ বোঝা যায় গীতা—কিন্তু মৃতবৎসার দুঃখের তুলনাই হয় না, কিন্তু আর না এইবার তুই যা।

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়—বাড়ীতে কে এসেছিল দাদা ?

প্রদ্যোৎ—আমার বন্ধু—প্রভব।

বিজয়—না-না-আর কেউ

প্রদ্যোৎ—না—কই আরতো কেউ আসেনি।

বিজয়—সে কি ! আমি ছাদের উপর থেকে স্পষ্ট দেখলাম—একটি মহিলা ও একজন পুরুষ এই বাড়ী থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন।

গীতা—মহিলা সঙ্গে নিয়ে কেউ তো আসেননি বিজয় বাবু।

বিজয়—হ্যাঁ নিশ্চয়ই এসেছিল, মহিলাটীর মুখ ঢাকা ছিল কিন্তু—পুরুষটি যে ডাক্তার স্বপন রায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রদ্যোৎ—স্বপন রায় !

বিজয়—নিশ্চয় স্বপন রায়.

(প্রদ্যোৎ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল।)

গীতা—কি ব্যাপার বিজয় বাবু ?—দাদা, অমন ক'রে চলে গেলেন কেন ?—

বিজয়—আমি কি ক'রে বলবো ? আমি কি হাত গুনতে জানি নাকি ?

গীতা—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে।—

বিজয়—আর আমিই বুঝতে পেরেছি, এ কথা যদি ভেবে থাক, তাহ'লে তোমার মত মেয়ে পৃথিবীতে যত কমদিন বাঁচে ততই মঙ্গল। ভ্যালা মুস্কিল—

(প্রস্থান)

[গীতা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল]

ক্রমশঃ

নাট্য-তরঙ্গ
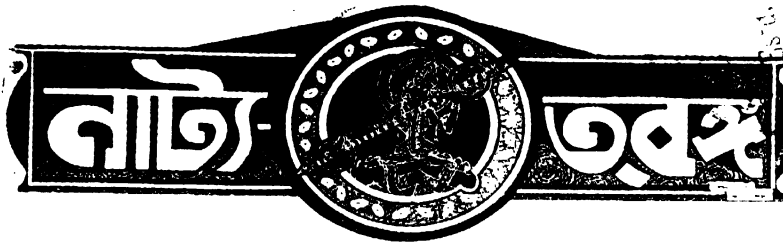
শ্রীনটশেখর

নাট্যজগতের একটি বিশেষ সংবাদ— সুসাহিত্যিক, শক্তিশালী লেখক "মহাপ্রস্থান" রচয়িতা সত্যেন্দ্র কৃষ্ণ গুপ্ত নব-নাট্য মন্দিরের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। এই নূতন খবরটি হঠাৎ প্রাচীর পত্রে ঘোষিত দেখে আমরা সকলেই কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছিলাম, আমাদের ধারণাও ছিল সত্যেন বাবুর চেহারা, হাব ভাব, এমন কি কথা বলার ভঙ্গীটুকু পর্য্যন্ত "রাসবিহারী" চরিত্রের অনুরূপ। এবং সেই ধারণা মিথ্যা হয়নি।

আমরা তাঁর দ্বিতীয় দিনের (রবিবার ১৬ই জুলাই) অভিনয় দেখে এসেছি। তিনি জীবনে এই প্রথম প্রকাশ্যভাবে রঙ্গাবতরণ ক'রে এই চরিত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রূপদক্ষ শিশির কুমার যে ভূমিকার অপরূপ রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সত্যেনবাবু সেই ভূমিকার অভিনয় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের অভিব্যক্তি দেখিয়েছেন, সেই জন্য তিনি যথেষ্ট প্রশংসার দাবী ক'রতে পারেন। তাঁর চলনে-বলনে "রাসবিহারী"র অভিসন্ধি দর্শকগণের কাছে প্রকাশ হ'য়ে প'ড়েছিল। বকধার্ম্মিক, বিড়াল-ব্রতী "রাস বিহারী"র স্বার্থপরতা, শঠতা ও নীচতা তাঁর প্রত্যেক কথাবার্ত্তায় পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছিল। বিশেষ ক'রে "রাসবিহারী" যখন বন্ধু বনমালীর জন্য কপট-শোক দেখিয়ে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মদের কাছে অভিনয় ক'রছেন, যেখানে 'বিলাসে'র ঔদ্ধত্যের জন্য পাছে 'বিজয়া'র বিষয় সম্পত্তি হাত-ছাড়া হয় সেই ভয়ে—"রাসবিহারী" "বিলাস"-কে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ক'রছেন। যে দৃশ্যে "নরেন"-কে আড়ালে ডেকে "রাসবিহারী" অন্তরের গোপন অভিপ্রায়টী জানিয়ে দিচ্ছেন, যেখানে "বিজয়া"-র তাচ্ছিল্যে ক্ষিপ্ত হ'য়ে নিজের অন্তরস্থ মূর্ত্তি প্রকাশ ক'রে ক্রোধের অভিনয় ক'রছেন, যেখানে "বিজয়া" কে আশীর্ব্বাদ ক'রছেন,—সেই সমস্ত স্থানে সত্যেনবাবু নিজের মৌলিকতা দেখাতে সমর্থ হ'য়েছেন। এই সকল বিশিষ্ট ব্যাপারে তিনি দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত শুধু মুগ্ধ ক'রে দেন নি, অনেককে চমৎকৃতও ক'রেছিলেন।—তাঁর শেষ

কথাটি,—"বড় জ্যাঠা মেয়ে তো"—প্রশংসনীয়।—

কিন্তু দুই-এক স্থলে তাঁর অভিনয় সুবিধার হয়নি, দৃষ্টান্ত স্বরূপ—শেষদৃশ্যে বরবধুকে আশীর্ব্বাদ করার সময়। আর একটি বক্তব্য এই যে, তাঁর কণ্ঠস্বর আরও একটু উচ্চ হ'লে ভালো হোতো।—তাঁর উচ্চারণ সুস্পষ্ট,—কণ্ঠ মিষ্ট—বাচন ভঙ্গীতে কোনো জড়তা নেই, যদিও দুই চার যায়গায় তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ আড়ষ্টভাব দেখা যায়। আরও একটি কথা। সত্যেনবাবুর সাজসজ্জা চরিত্রোচিত সুসামঞ্জস হ'লেও আগাগোড়া একরকম হওয়ায় বড়ই একঘেয়ে ঠেকেছে। অন্ততঃ দুই তিনবার বেশ পরিবর্ত্তন বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

আশা করা যায়, দুই চার রাত্রি অভিনয়ের পর সত্যেনবাবু তাঁর এই সামান্য দোষ ত্রুটীগুলি শুধ্‌রে নিতে পারবেন।—আমরা তাঁর অপ্রত্যাশিত সাফল্যে তাঁকে অভিনন্দিত করি।

"পরেশের" অভিনয় যেন আগের চেয়ে আর-ও খুলেছে।—"বিলাস" বেশী শৈলেন চৌধুরী সুন্দর অভিনয় ক'রেছেন। সত্যেন বাবুর পর তিনি-ই প্রশংসা-যোগ্য।—"নরেনে-র" অভিনয়ে এদিন অন্যবারের তুলনায় কিঞ্চিৎ আতিশয্য লক্ষিত হ'লো, তথাপি তাঁর অভিনয় বেশ হৃদয়গ্রাহী বলা যায়, এবং তাঁর অকারণ বিচিত্র হাসিটি যেন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মাধুর্য্যপূর্ণ ও উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে।—

কিন্তু "বিজয়া"র ভূমিকায় কঙ্কাবতী সেদিন বড় ঝিমিয়ে প'ড়ছিলেন।—তাঁর এই নিরেশ্ অভিনয়ে আমরা বিশেষ আনন্দের সন্ধান পেলাম না।—তাঁর অতি দ্রুত কথা বলার রীতিটুকু পরিবর্জ্জন করা উচিত। তাঁর প্রায় সকল কথার ভিতর অধিকাংশ স্থলেই অহৈতুক উষ্মা প্রকাশ পেয়েছিল; কৈ পূর্ব্বে পূর্ব্বে অভিনয়ে তাঁর এ ভঙ্গী তো আমরা লক্ষ্য করিনি!—

"বিজয়া" নাট্যের বহু দুর্ব্বলতা এবারেও আমাদের চোখের সাম্‌নে ধরা প'ড়েছিল। নাটকের গতি অত্যন্ত মন্থর এবং অনিবার্য্যতার অভাবে "কার্য্য" (action) অনেকস্থলে নিষ্প্রয়োজন ব'লে মনে হ'য়েছে,—শুধু তাই নয়, অতি সাধারণ দুই চারিটি ভুল অমার্জ্জনীয়।

* * *

রেকর্ডে—"সীতা"

(ক্ষেমীশ্বর)

পুণ্যবতী সীতার কাহিনী যুগে যুগে কীর্ত্তিত হ'য়ে আস্‌চে। আজও জন-সাধারণের অন্তরের অন্তঃপুরে এই মহীয়সী নারীর অমল স্মৃতি চির-নবীন, চির-জাগ্রত। কত কবি কত না ভাষায়, ছন্দে সীতার চরিত্র গাথা রচনা ক'রে অমর হ'য়ে গেছেন। আজিকার দিনেও ধরিত্রী-দুহিতা সীতা নিখিল-মানস-লোকে বিহার ক'র্‌ছেন।—

কিছুদিন পূর্ব্বে সীতা-র পবিত্র সুন্দর কথা নাটকাকারে প্রকাশিত হ'য়ে লক্ষ লক্ষ

নর নারীর প্রাণ পরিমুগ্ধ ক'রে দিয়েছে। চিত্রে সীতা'র উত্তর-চরিত গতি ও ছন্দে মুখর হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু রেকর্ডে সীতার পালা সঙ্গীতে রসে এই সর্ব্ব প্রথম রূপ পেল। "সেনোলা মিউজিক্যাল প্রোডাক্টস্" নামক নব-গঠিত রেকর্ড প্রতিষ্ঠান বিশ্ব-বন্দিতা সীতার জীবনের শেষ তথ্যটুকু অবলম্বন ক'রে একটি পালা প্রকাশ ক'রেছেন। এই পালাটি রচনা ক'রেছেন বেতার বিশ্রুত সব্যসাচী কলাবৎ ও রূপদক্ষ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। এই দেশের রেকর্ড ক্ষেত্রে যে সকল নাট্য-পালার ফসল ফলে' গেছে, সেগুলির মধ্যে এই "সীতা-পালা" অ-রূপণ রস-ধারায় পরি-পুষ্ট হ'য়ে সোনা ফলে' উঠেছে।

পালাটির প্রয়োগ-নৈপুণ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায়। এতাবৎ কাল রেকর্ড-নাট্য রঙ্গমঞ্চের দাসত্ব ক'রে হীন অনুকরণ করে আস্‌ছিল,—কিন্তু আলোচ্য "সীতা পালা"য় সেই প্রচলিত ভ্রান্ত রীতির সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘ'টেছে। পালা-রচয়িতা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ যেমন রচনায় একটি নূতন ধারা প্রবর্ত্তন ক'রেছেন সেইরূপ প্রয়োগ-কৌশলে ও পরিচালনায় তাঁর অভিনবত্ব প্রমাণিত হ'য়েছে। প্রথমেই উৎসব-সঙ্গীত এই পালার সূচনা নিয়ন্ত্রিত করে; রামের জীবনে উৎসবের আনন্দ কোলাহল হঠাৎ থেমে গেল দুর্ম্মুখের অমোঘ বার্ত্তা শুনে। সীতার নির্ব্বাসন চিত্র বেদনা-ভারাতুর হ'য়ে উঠেছে।—এবং পালার উপ-সংহৃতিটি করুণ রস-সঞ্চারে যে রূপ পরিগ্রহ ক'রেছে—সত্যই স্বভাব সুন্দর অনুপম। এই পালাটির আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে, শুধু মাত্র একতারার মত একটি করুণ সুরের ঝঙ্কার তোলে নি, এর ভিতর অমলিন হাস্য-রসেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিচিত্র ভাবে ও রসে "সীতা" পালা সাতখানি রেকর্ডে অপূর্ব্ব শ্রী-মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে।

"সীতা"-পালার আর একটি সম্পদ—সঙ্গীত। সঙ্গীত পরিচালনা ক'রেছেন গুণী-শিল্পী সঙ্গীত-কোবিদ শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। বিভিন্ন গানে সুর-সন্নিবেশ যেরূপ শ্রুতি মধুর হ'য়েছে, সঙ্গীত সঙ্গতি প্রভৃতির রচনার মূলগত ভাবটীকে তেমনি সঞ্জীবিত ক'রে তুলেছে।

তথাপি এই পালার মধ্যে কিঞ্চিৎ ত্রুটীও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। অভিনয়ের দিকটা আরও উন্নত হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু এই চারিটি স্থানে এই দোষ নাট্য-পালার স্বচ্ছন্দ গতি অবরোধ করেনি। —কোনো বস্তুই নিখুঁত হয় না, এবং নূতন দলের এই নব প্রচেষ্টা দোষ ত্রুটী বর্জ্জিত হ'তে পারে না ব'লেই আমাদের বিশ্বাস। এই উদ্যম যেন মধ্য পথে এসেই স্তব্ধ হ'য়ে না যায়। আমাদের মনে হয়, জনসাধারণ এই "পালার" উপযুক্ত মূল্য দিতে কার্পণ্য ক'রবেন না।—তার কারণ—তা'রা যখন বারংবার করুণ সীতার কাহিনী শুনবে, নূতন রূপে এই চিরন্তনী ধরা দেবে। অভিনয়, অভিনয় ব'লে মনে হ'বে না, তা'রা চোখের 'পরে সমস্ত ঘটনা ও কার্য্য প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ক'রতে পারবে।

ছিটে ফোঁটা

বজ্রবাহু

বাংলায় একটা চল্‌তি কথার প্রয়োগ আছে—'ব্যাং যায় ব্যাঙ্ যায় খল্‌সে বলে আমিও যাই,—সাহিত্যের হাটেও হয়েছে ঠিক তাই। কতকগুলি অকাল-পক্ক ডেঁপো সাহিত্যিক এসে পুষ্প-ধূপ-চন্দনগন্ধ বিরাজিত পবিত্র বাণীর দেউলে যথেচ্ছাচার আরম্ভ ক'রেছে। জঘন্য পূতিগন্ধময় নরকার জনক কল্পনাকে আশ্রয় করে এরা বেসাতি সুরু করেছে। অধিকাংশ মাসিক, সাপ্তাহিকের পাতা খুললেই চোখে পড়ে গল্প আর কবিতা—আনাড়ি হাতের লেখা—যার না আছে কোন অর্থ, না আছে কোন ভাবের সুসঙ্গতা, না আছে কোন ভাষার পরিপাট্য। রামা, শ্যামা, যদো, মধো যার যা খুশী তাই পাতার পর পাতায় উদ্গার করে রেখেছে—সবাই এক একজন বড় বড় লিখিয়ে!—সকলেই 'রিয়ালিষ্ট'—লেখার প্রতি লাইনটি ভাল্‌গারিটিতে পরিপূর্ণ, আর Sex হয়েছে ছেলের হাতের মোওয়া। সকলেরই হাতই একেবারে Psycho-analysisএ পরিপক্ক।—এই সব অকাল-পক্কদের স্থান কোথায় তা আমরা ইতিপূর্ব্বে অনেকবারই নির্দ্দেশ করেছি—সম্পাদকগণ এবিষয়ে একটু সমাহিত হলে পাঠক শ্রেণীর অনেক সুবিধা হ'য়!

* * *

ঢাকার মাসিক 'শান্তির' আষাঢ় সংখ্যায় উপরোক্ত ভাবের একটি নাতি দীর্ঘ গল্প প্রকাশিত হ'য়েছে। গল্পটির নাম—প্রেম ও যৌবন। লেখক—শ্রীনিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। গল্পটির স্থানে স্থানে বিশেষ আপত্তিজনক বলে আমরা সেগুলি আর উদ্ধৃত করে আমাদের লেখনী কলঙ্কিত করতে চাইনে। গল্পটির plot হচ্ছে এক কবি তার প্রিয়ার কাছে তার প্রেমের স্বপ্ন ভোগরসে অভিষিক্ত করতে না পেরে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গিয়ে ঢুকলো মদের দোকানে।—সেখানে এক পাইট্ বি-হাইভ ব্রাণ্ডি টেনে চল্‌লো এক গণিকা-লয়ে!—এই কুৎসিত ঘটনাকে এমন জঘন্যরূপে ব্যক্ত করবার এবং ছাপাবার কী স্বার্থকতা থাকতে পারে? ঢাকার মুকুল থিয়েটারে শীঘ্রই শরৎচন্দ্রের "দেবদাস" দেখানো হবে—ধুরন্ধর লেখকের বোধহয় তাই অকস্মাৎ শরৎচন্দ্রের অনুরূপ একটা কিছু সৃষ্টি করে বাজিমাৎ করবার ব্যর্থ আশা জেগেছে—কিন্তু শরৎচন্দ্রে আর শ্রীনিবারণ চন্দ্রে অনেক তফাৎ!

উক্ত সংখ্যাতেই শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কবিতা লিখেছেন—"তাইত তোমারে দেবী গুরুর সমাজ মানি জানাই প্রণাম—"

কবির রূপসী মানসী কবিকে তার প্রেম জ্ঞাপন করলে এবং কবিও তাই তক্ষুনি গদ্‌গদ্ চিত্তে কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেন। ভালো কথা! তারপর—

"তোমারে বাসিয়া ভাল ছেড়েছি যখন আমি
সাধনা আমার
তোমার নেশায় যবে সমাধি ঘটিল মোর
সকল আশার
তোমার প্রেমের মাঝে যখন ঘুমায়ে আছি—
এমনি সময়
সহসা চাহিয়া দেখি তোমার ক্ষণিক মোহ
পাইল বিলয়।"

কিন্তু তা সত্ত্বেও—

"আমার সাধনা ধারা তুমিই ফিরায়ে দিলে,
করিলে দুর্ণাম
তাইত তোমারে দেবী গুরুর সমাজ মানি
জানাই প্রণাম।"

যাক্!—কবি তাঁর মানস প্রিয়াকে গুরুর আসন দিয়ে হৃদয়ের প্রণাম জানান—প্রত্যহ পাদোদক গ্রহণ করুণ তাতে আমাদের আপত্তি করবার কোন কারণ নেই—শুধু গুরু বলে ডেকে এবং প্রণাম জানিয়েই যে রেহাই দিয়েছেন এই যথেষ্ট!

ডায়েরীর ছিন্ন-পত্র

প্রেমের আভাষ

রঞ্জন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রেণু আমার !—

পথিক পথ চল্‌তে বাধা পাবে, তা বোলে সে থামবে না, চল্‌বে, এই তার শাস্তি। শ্রান্ত তনুখানি তাকে থেকে থেকে ইসারায় জানিয়ে দেবে ঢুলে পড়তে ঐ ভূমিতলে, তবুও তাকে মাথা উঁচু কোরে চল্‌তে হবে।—

একটা বড়ো আশ্চর্য্য দেখ্‌বে, পৃথিবীর গতির সঙ্গে মানুষের গতি চলে অবিশ্রান্ত-ভাবে, কিন্তু পৃথিবীর গতি ঠিক নিয়মভাবে চলে, মানুষের গতির বেলায় তা নয়, কিন্তু তবুও মানুষ পৃথিবীর সঙ্গে পাল্লা দিতে ছাড়ে না। চন্দ্র গ্রহণ হবে, মানুষ দূরবীন্‌ হাতে কোরে চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখ্‌তে চেষ্টা কোরবে, কেমন ধারা, কেন হয়, হবার কারণ কি, ইত্যাদি।...আকাশে মেঘ ঝিলিক্‌ মারে, মানুষ সেটা ধোরে নিজের কাজে লাগায়, এমনি আরোও কতো কি।... প্রকৃতির সঙ্গে বুক ফুলিয়ে লড়াই কোরতে এতটুকুও বাধে না তাদের।...কিন্তু আশ্চর্য্য, পৃথিবী মুহূর্ত্তের জন্যে যখন একটু সচেতনের সুরে নাড়া দিয়ে ওঠে অমনি লোকেদের প্রাণে যেন একটা বিষম বাজ্‌ এসে পড়ে। ছুটোছুটি করে, একটা কিছুর আশ্রয় খুঁজ্‌তে চায়, বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ কোরতে থাকে !... লোকেদের যখন এরকোম ভাব ওঠে, আড়াল থেকে পৃথিবী একবার মুচ্‌কী হাসি হেসে প্রকৃতির কানে বলে, কেমন ! দেখ্‌লি মজা ! তোকে অপমান করে, এত সাহস ওদের !...যেই একটু পা গুটিয়ে পাশ ফিরেছি অমনি গুঁটিপোকার দল কিল্‌বিল্‌ কোরে বেরিয়ে যে যার পথ দেখবার জন্যে ছুটে বেড়াতে লাগলো !...হাহা-হাহা ! বেশ মজা !...ঠিক যেন তাসের ঘর, একটু হাওয়া বোয়েছে, অমনি এদের জারিজুরি ভেঙ্গেছে !...

আচ্ছা রেণু ! জগন্নাথের রথ দেখেছো তো ? মানুষের কেমন ধারা যেন একটা ধারণা, তারা মনে করে, সত্যি তাদের পুণ্য বাড়্‌বে যদি একবারটিও উল্টোরথ রথ-যাত্রার সময় টান্‌তে পারে।...চাকার তলাতেও পোড়ে যদি মানুষ পিষে যায়, লোকে কাঁদবে না তাদের এ অপমৃত্যুর জন্যে, বোলবে সকলে, বড়ো পুণ্যাত্মা ছিলো হে, তাই ও রথের তলায় পোড়ে মোরেছে।...আশ্চর্য্য নয় রেণু ?...

সেদিন আমার বন্ধু অমিত একটা গল্প বোলেছিলো, মন্দ লাগেনি আমার কাছে, এ প্রসঙ্গে সে-কথাটা বোললে অত্যুক্তি হবে না বোধহয়, সত্যি ঘটনা, শোনো :

সে-দিন এক বুড়ী অর্দ্ধোদয়-যোগে স্নান কোরতে এসেছিলো বাঘবাজার গঙ্গায় ; হঠাৎ এলো বান, চোরাবান, বুড়ীটি নিজেকে অনেকবার বাঁচাবার চেষ্টা কোরলো, পারলো না, গেলো ভেসে, কাছে যারা নাইছিলো, তারা ভয়ে তীরে উঠে পোড়লো, বুড়ীটি ভয়ে চীৎকার কোরতে লাগলো—বাঁচাও আমায়, বাঁচাও একটিবার !......লোকে সব থতমত, এ-ওর মুখের দিকে চাইতে লাগলো মাত্র ; কিন্তু কেউ এগোতে সাহস পেলো না—জলের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে বুড়ীটি গেলো অতল জলে তলিয়ে......বাঁচলো না !...

লোকে বাড়ী ফিরলো, মুখে তাদের সেই এক কথা, আহা-হা, বুড়ীটি চোখের সামনে ভেসে গেলো, কেউ বাঁচালে না !...কিন্তু যা-ই বলো, আজকের এমন দিনে ও মোরতে পারলো ; বড়ো পুণ্যাত্মা ছিলো ও নিশ্চয়ই... ইত্যাদি !......

আশ্চর্য্য মানুষের মন ! বাঁচাবার সাহস তো হোলো না কারুরও, আবার মরণ তাকে আলিঙ্গন কোরেছে, তাতেও মানুষের তৃপ্তি এলো না, পুণ্যাত্মা বোলে শ্লেষবাণীও ছাড়লো !......

তাই ভাবি রেণু, এ রকোম মানুষের মন আর এ রকোম শক্তি নিয়ে কেন মানুষ প্রকৃতির ওপর টেক্কা মারে !......

আচ্ছা, আজ তবে এইখানেই শেষ করি— ইতি—

তোমাদের রঞ্জন

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা
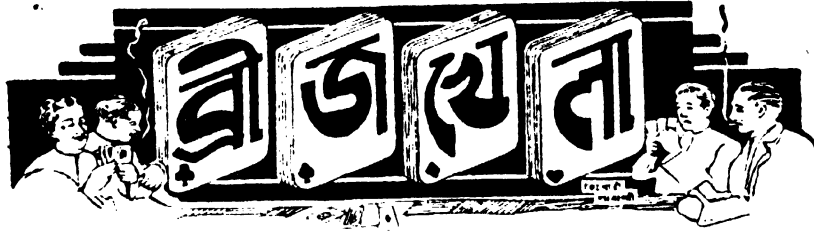
প্রাথমিক দুইটী চিঁড়িতনের ডাকঃ—ডাকদার যখন কোন রঙের দুইটী ডাক দেন তখন বুঝতে হবে যে তাঁর হাতে সেই রঙের তাসই খুব বেশী। কিন্তু এই চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেখা যায় দুইটি চিঁড়িতন ডাকের বেলায়। চিঁড়িতন হাতে থাকলে বা না থাকলেও ডাকদার এই রঙে দুইখানি ডাক দিতে পারেন সেজন্য সকলে এ ডাক পছন্দ করেন না। তবে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এই ডাকটির বিশেষত্ব জেনে রাখা উচিত। ইংলণ্ডের মিঃ ম্যানিং ফস্টার এই ডাকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা' বলেছেন তা' নিয়ে দেওয়া হল।

(১) সর্ব্বদাই ইহা একটি প্রাথমিক ডাক। তাস বণ্টনকারী এই ডাক দিতে পারেন আর পারেন তাঁর 'পাশ' দেওয়ার পর যিনি প্রথম ডাকবেন।

(২) এই ডাকের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার মধ্যে একটি 'মনগড়া' অর্থ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু এই ডাক যদি আংশিক score এর সময়, বা বিপক্ষ দলের বা খেঁড়ীর ডাকের পর হয় তা' হলে ইহার মধ্যে আর উক্ত বৈশিষ্ট্য থাকে না।

(৩) এ একরকম শক্তিব্যঞ্জক ডাক। ডাকদারের ডাকের পর খেঁড়ীকে এ ডাকের জবাব দিতেই হবে তা' তাঁর হাত যতই খারাপ হক না কেন, তবে তিনি তাঁর হাতের তাস অনুযায়ী ডাক দিতে পারেন।

(৪) এ ডাক গেম-সম্ভাবনা সূচক। এ ডাকের মধ্য দিয়ে ডাকদার তাঁর খেঁড়ীকে বলেন, "ওগো বন্ধু, তোমার একটু সাহায্য পেলে আমার হাতে 'গেম' আছে, এখন তুমি ভেবে বল কিসে খেলবে রঙ্ এ না ফেরাই এ।"

(৫) এ ডাক স্লাম-সম্ভাবনা ঘোষণা করে না। এ ডাকের পর ডাকদারের খেঁড়ীর কর্ত্তব্য ডাকটিকে শুধু 'গেম' পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা। তারপর সমস্ত নির্ভর করে ডাকদারের উপর। যদি তিনি স্লামে যেতে চান তো যাবেন নিজের উপর দায়িত্ব নিয়ে।

খেঁড়ীর জবাবঃ—প্রাথমিক দুইটী চিঁড়িতন ডাকের পর হাতের অবস্থা অনুযায়ী খেঁড়ীর কিরূপ জবাব হবে তা' "ইয়ার বরো" বহু বীজ-প্রতিযোগিতা দেখে ও বহু গবেষণার পর যা' স্থির করেছেন তা পাঠকবর্গের জন্যে নিয়ে দেওয়া হল।

(১) খেঁড়ীর হাতে যদি একটি টেক্কা ও সাহেব না থাকে তবে তিনি দুইখানি রুহিতন ডাকবেন। ইহা বিরতিমূলক ডাক (Negativo response)। এই ডাকে ডাকদারকে বুঝতে হবে যে তাঁর খেঁড়ীর হাতে কিছুই নাই এমন কি রুহিতনও না থাকতে পারে।

(২) যদি মিলিত অবস্থায় দুটি সাহেব বিবি তাঁর হাতে থাকে তা' হলেও দুইটি রুহিতন ডাক হবে। এ ডাকও বিরতিমূলক।

এতে ডাকদার বুঝবেন যে তাঁর খেঁড়ীর হাতে কিছুই নেই।

(৩) যদি তাঁর হাতে একটি টেক্কা ও একটি সাহেব থাকে তা' হলে দুইটি ফেরাই-এর ডাক হবে। যদি ডাকবার মত কোন রঙ না থাকে অথচ হাতে দুইটা টেক্কা বর্ত্তমান তা' হলেও পূর্ব্বোক্ত ডাক হবে (অর্থাৎ দুইটা ফেরাই-এর)। আর ডাক দেবার মত কোন রঙ থাক্‌লে তো কথাই নেই—খেঁড়ী সেই রঙেই ডাক দেবেন।

(৪) যদি হাতে একটি টেক্কা ও একটি সাহেব থাকে বা দুইটা টেক্কা থাকে এবং মাইনর স্যুটে ডাকের মত রঙ থাকে তা' হলেও দুইটা ফেরাই-এর ডাক হবে। কখনও মাইনর স্যুটের ডাক হবে না।

(৫) যদি হাতে একটি টেক্কা ও একটি সাহেব বা দুইটি টেক্কা থাকে এবং major suit এ ডাকবার মত একটি বড় রঙ থাকে তবে সেই রঙের দুইটি ডাক দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এখন ডাকার মত বড় রঙ কি তার স্পষ্ট সংজ্ঞা জানা দরকার। নিম্নলিখিত রূপ তাস থাক্‌লে ডাকার মত বড় রঙ হাতে আছে বলা যায়, টেক্কা, সাহেব, ×, × বা টেক্কা, ×, ×, ×, × বা সাহেব, ×, ×, ×, × কিম্বা আরও লম্বা হাত (Long Suit)। কিন্তু বিশেষভাবে ইহাও মনে রাখা দরকার যে হাতে যদি বিবি গোলাম নিয়ে পাঁচখানা বড় রঙ হয় ও অন্য রঙের একটি টেক্কা ও একটি সাহেব থাকে তবে সেই রঙে ডাক না দিয়ে সে স্থলেও দুইটী ফেরাইয়ে ডাক দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

এখন ডাকদারের ডাকের পর যদি তাঁর বিপক্ষ দল ডাক দেন তা' হলে তাঁর খেঁড়ীর হাত খারাপ থাক্‌লে তিনি নাও ডাক্‌তে পারেন,—সেখানে তাঁর কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয়বার ডাক ফিরে আসবার পর তাঁর হাত খারাপ থাক্‌লেও দুইটী ফেরাই এ ডাক দিয়ে সেই ডাকটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কিম্বা যদি বড় রঙে সাহায্য করতে পারেন তো তিনি তাই করবেন।

* Minor Suit—চিঁড়িতন, রুহিতন
Major Suit—হরতন, ইস্কাবন।

চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং ক্লাবঃ—গত ৩০শে জুন রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ এম, এল, এ মহাশয়ের সভাপতিত্বে উল্লিখিত সমিতির ব্রীজ প্রতিযোগিতার পারিতোষিক বিতরণ হয়। রাসবাগান ক্লাব এই প্রতিযোগিতায় বিজয় মালা অর্জ্জন করেন। যথাবিহিত অনুষ্ঠানের পর অবশেষে সভাপতি মহাশয় বলেন যে এই অনুষ্ঠানে তাঁদের কার্য্যাবলী মনোজ্ঞরূপেই সুসম্পন্ন হয়েছে সন্দেহ নাই এবং আরও বলেন যে মহদুদ্দেশ্যে স্বর্গীয় মহাপুরুষের নাম শিরে ধারণ করে তাঁদের সমিতি চল্‌ছে তাঁরা যেন সেই স্বর্গীয় আত্মার আশীর্ব্বাণী লাভ করেন এবং সেই নামের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে তাঁদের সমিতির শ্রীবৃদ্ধি করণে যত্নবান হন। আমরাও

সভাপতি মহাশয়ের সহিত গলা মিলিত করে ভগবানের নিকট উক্ত প্রার্থনাই জানাই।

ল্যান্সডাউন ক্লাবঃ—বিগত ৭ই জুলাই রবিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে উক্ত সমিতির পুরস্কার বিতরণ কার্য্য সমাধা হয়েছে। Contract (singles)এ Venus Comrade দে-মল্লিকদের পরাজিত করে এবং Contract (Duplicate)এ Lansdowne Club Theta Betaকে পরাজিত করে প্রতিযোগিতায় জয়-মুকুট লাভ করেছেন। Crockford's Club Auction (singles)এ ও Auction (Duplicate)এর ফাইন্যালে উঠে না খেলার দরুণ উক্ত বিভাগেও Lansdowne Club পুরস্কার লাভ করেছেন। আমরা সমিতিগুলিকে ধন্যবাদ জানাই।

বেঙ্গল ব্রীজ এসোসিয়েশন্ঃ—বিগত দীর্ঘ দুই বৎসরে উল্লিখিত এসোসিয়েশনের সাধারণ কার্য্য বিবরণী সভার অধিবেশন হয় নাই এবং কোনরূপ হিসাবপত্র সাধারণে জ্ঞাপন করা হয় নাই, উপরন্তু উক্ত বিষয় সংক্রান্ত কোন আলাপ-আলোচনা পর্য্যন্ত হয় নাই। এই অভিযোগে কলিকাতার কয়েকটি সমিতি ব্রীজ এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। সুপ্ত ব্রীজ এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন যতই রূঢ় হক না কেন ইহাতে প্রত্যেক ব্রীজামোদীরই সম্মতি আছে। কয়েকজন নিষ্কর্ম্মা নামেচ্ছুর নাম জাহির করণার্থে দীর্ঘ দুই বৎসর ব্যাপী এই যে ব্রীজ এসোসিয়েশন্ প্রহসন ইহার অবসান শীঘ্রই বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যতে এই আন্দোলনের ফল সাধারণে জ্ঞাপন করা হবে।

——

খোলা-চিঠি

শ্রীমতী মায়া মুখার্জ্জীকে

মায়া,

সিনেমা দেখে দেখে চোখ যাদের তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি চিন্‌তে পেরেছে—তারা ঐ বিশেষ জগতে এক নতুন আগন্তুককে কেমন যেন আগের থেকেই চিন্‌তে পারে। তার চালচলন, তার চাউনি, তার কথা বলা ভবিষ্যতে কোন স্তরে গিয়ে পাল্ নাবাবে—এ তারা কেমন যেন আগের থেকেই জান্‌তে পারে। তার ভাবী-কাল সোণালী কি কালো—এ যেন সে অদেখা কোন গোপন চোখে দেখ্‌তে পায়। তার ধারণা ক্ষুরধারের 'কুরকী'র মত ধারালো।

সবাক যুগের "বিল্বমঙ্গল"এ সিনেমার সাগরে প্রথম সাঁতার কাটতে যে নতুন মেয়েটিকে দেখে এলুম, তাকে আমার বেশ ভালো লাগ্‌লো, তার নাম হচ্ছে মায়া। মনে আশা হ'লো—এ নতুন আগন্তুক উন্নতি করবে। নিপুণ ঔপন্যাসিকের চরিত্রাঙ্কণের পটুতার মত আব্‌ছা একটা আভাষ পেয়েছিলাম তোমার অভিনয়ে। ভাবী আকাশের রঙ্গমঞ্চে চোখের ওপর একটা 'অপেরা-গ্লাশ' লাগালুম। দেখলুম—তোমার নামের ওপর একটি তারা মিট্‌মিট্ করছে। তবে তাদের স্থিতির মাঝে দূরত্বের স্বাভাবিক এক ব্যবধান।

এ বিশেষ পৃথিবীতে নামের মুকুট পরতে হ'লে প্রথম নম্বর প্রয়োজন—শারীরিক সুন্দর গঠন, এবং সুন্দরতর মুখ। মায়া, তোমার চেহারায় সে ছায়া আছে। ভাব প্রকাশের উপযোগী গঠন তোমার চোখে, তোমার যৌবনে আছে জীবন।

দ্বিতীয় নম্বর প্রয়োজন—অভিনয়ের ক্ষমতা, সেই সঙ্গে সঙ্গে ভালো গানের গলাও আজকাল চাই।

অভিনয় তুমি করতে পারো, তবে সেটা সরল হ'তে একটু সময় নেবে। ছোট্ট শিশুর মত সে, উঠ্‌তে শিখেছে, হাঁটতে শেখেনি। চল্‌তে চল্‌তে অভিনয়ের আরো গভীর জলে তোমায় নাবতে হবে। তোমার সেই চলায় আনতে হবে আরেকটু দ্রুতগতি, তা না হ'লে

বাদল এলো

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক

বাদল এলো, বাদল এলো, বাংলা দেশের মাটির বুকে,
তপ্ত তৃষার দগ্ধ প্রাণে সুর জেগেছে শান্তি সুখে।
বেণু বনের শন্‌শনিতে কোন্ উতলার নিশাস জাগে,
সিক্ত বেতস-পল্লবে তার আঁখির পাতায় কাঁপন লাগে।
দম্‌কা হাওয়ার কন্‌কনিতে সখীর হাসি চমকে ফোটে,
থমকে থামে পথিক পথে, গন্ধে মাতাল চিত্ত লোটে।
বাদল এলো বিধুর বুকে,—হায়, কবেকার কোন্ সে সাকী,
কদম-ফুলের পুলক তুলে',—মেঘের নীলে কাজলা-আঁখি,
শাঙন-জলের সুরায়-ভরা পাত্রখানি উথ্‌লে দিয়ে,
যায় সে সকল কবির মনে তিনটি মাসের বায়না নিয়ে!
কবে যে তার গান বেজেছে আমার বুকে কোন্ কালেতে,
লাখ জনমের বর্ষারাতে তাই বসেছি আসর পেতে।
আজ দাত্তরী আদর ক'রে, ঐ ডাকে তায় কলস্বরে,—
বাদল এলো, বাদল এলো, বাংলা দেশের কবির ঘরে।

এই নামের বাজীতে তুমি খানিকটা পিছিয়ে পড়তে পারো। সে পিছিয়ে পড়াটা তোমার পক্ষে শোভন হবে না।

গানের গলা তোমার আছে, তবে অভিনয়ের মত আরো গভীরতা তাতে দরকার।

এগুলো নিজের শাসনের নীচে আন্‌তে পারলে দ্বিতীয় নম্বরের ঢুটো গুণই তুমি আয়ত্ত করবে।

কিন্তু, পয়লাটায় ভয় আছে, সাবধান। রূপ জিনিষটা, জানো মায়া, ভারী পিছ্‌লে পড়ে। সে জীবনে ঘন ঘন ডাক হয়তো আসে সত্যি, তবে তার সব ডাকে সাড়া দিতে নেই।

রূপকে তোমার ধরে' রাখতে হবে। এ ধরে' রাখার মন্ত্র আমাদের দেশের রূপবতীদের জানা নেই—সেটা তুমি চার দিকে চাইলেই জান্‌তে পারবে, দেখতে পাবে চোখে। কত রূপসী তো চোখের সামনে ডুব মারলো, ছ'দিন আগে রূপের গরব যারা করতো, কুরূপ তাদের ওপর এখন পরব করছে। রূপকে তারা শরীরের ওপর পরতে শিখেছিলো, ধরতে শেখেনি। আমার কথা হচ্ছে—মায়া মুখার্জ্জী, তুমি কেন শিখ্‌বে না! ইতি।

শুভাকাঙ্খী তোমাদের

সেলিম

ম্যালেরিয়া

স্বাস্থ্যই সম্পদ—ইহা শুধু ব্যক্তিগত ভাবে নয়, জাতিগত ভাবেও বলা চলে। আজ বাঙ্গালী সে সম্পদে বঞ্চিত। ইহার কারণ আলোচনা করিলে দেখা যায়, অন্যান্য কারণের মধ্যে ম্যালেরিয়া অন্যতম। যাঁহারা পল্লীগ্রামের খবর রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, কত সমৃদ্ধিশালী শ্রীসম্পন্ন গ্রাম ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে। প্রতি বৎসর বাঙ্গালাদেশে যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার অর্দ্ধেকের উপর মারা যায় ম্যালেরিয়া জ্বরে। যাহারা কোনরূপে মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা পায় তাহারাও ভুগিয়া ভুগিয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকে। তাহাদের জীবনীশক্তি প্রায় নষ্ট হইয়া যায়, এবং অন্য কোন সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা থাকে না। ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া উঠিলে যাহাতে তাড়াতাড়ি নষ্টস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহার চেষ্টা করা বিশেষভাবে উচিৎ। পুষ্টিকর খাদ্য নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে বিশেষ সাহায্য করে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, কিছুদিন রোগ ভোগের পর, হজমশক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং কোন খাদ্যই বিশেষ কাজে লাগে না। এ অবস্থায় এমন কোন ঔষধের ব্যবস্থা করা উচিৎ, যাহা আহার্য্য দ্রব্য উত্তমরূপে হজম করাইয়া তাহা হইতে সার অংশ গ্রহণ করিতে সাহায্য করে। সুইজারল্যাণ্ডে প্রস্তুত "রুচিটোন" ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ম্যালেরিয়ার পর ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে ইহা অদ্বিতীয়। পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিশেষজ্ঞগণ ম্যালেরিয়ার পর ইহা সেবনের ব্যবস্থা দিতেছেন। ইহা রক্তস্থিত ম্যালেরিয়া বীজাণু ধ্বংস করিতে সাহায্য করিয়া নবজীবনের সঞ্চার করে ও তাড়াতাড়ি নষ্টস্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিয়া কর্ম্মঠ ও স্বাস্থ্যবান করে। আর ম্যালেরিয়ার—পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়।

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

মনোরম সাধুখাঁ

উপদ্রব

আমেরিকার অন্যান্য অনেক উপদ্রবের ভেতর ধনীদের সন্তান চুরি আজকাল বিখ্যাত কিছুদিন আগে লিণ্ডেনবার্গএর এক ছেলের অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনী আজ কারো অজানা নেই। এই 'কিড্ন্যাপারস্'রা খাদ্যান্বেষী হিংস্র জন্তুদের মত আমেরিকার সহরে সহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টাকার জন্যে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে চুরি এদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কিছুদিন হ'লো সিনেমার যে সমস্ত বিখ্যাত মা বাপ—তাদের ওপর এদের নজর পড়েছে। তার মেয়ে চুরি যাবে এ খবরের পর মার্লিন ডিট্রিশ কতোখানি যে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলো তা বলাই বাহুল্য। রাত্রি বেলা মেয়ের ঘরে পুলিশ রেখে দরজার কাছে বন্দুক নিয়ে কতোদিন যে সে ঘুমিয়েছে তার হিসেব নেই।

এ খবর পেয়ে হলিউডের প্রতি মা বাপের ঘরে গেলো সাড়া পরে'। সবাই হ'য়ে উঠলো সন্ত্রস্ত, সাবধান। বন্দুক, পুলিস, ডিটেক্টিভের ছড়াছড়ি।

জোন্এর সাবধানতা

জোন্ ব্লনডেল্এর ছেলে নরম্যান স্কট্ (বারণস্)-এর জন্য সাবধানতার অন্ত আজ নেই। সে তার বাড়ীতে এমন অভিনব এক ব্যবস্থা করেছে যে, জোর করে কেউ তার ছেলের ঘরে ঢুকতে গেলেই ঢং ঢং করে চম্কানো এক ঘণ্টা বেজে উঠবে। এবং সেই ডাকে যারা আস্বে তাদের হাতে—বলা বাহুল্য, প্রস্তুত পিস্তল।

অ্যান্ ভোরণাক মেট্রোর নাচের একজন পরিচালক।

কিন্তু, এই ফাঁদে জোন আর তার স্বামী জর্জ্জ বার্ণস্ একদিন নিজেরাই পড়ে' ভারী জব্দ হ'য়েছিলো। একদিন রাতে—ছেলে তাদের তখনও হয়নি—তারা চুপি চুপি এসেছিলো সেই ঘরে। সন্তানের আগমনের জন্যে তারা হয়ে উঠেছিলো অধীর! তারা দেখ্তে এসেছিলো—সেই ঘর যে ঘরে তাদের ভাবী সন্তান থাক্বে। ঘরে বৈদ্যুতিক সেই প্রচণ্ড ঘণ্টা লাগানো হ'য়েছে। কিন্তু মিঃ আর মিসেস্ বারনস্এর সেটা জানা ছিলো না। অতএব ঢোকামাত্রই ঘণ্টার সেই বীভৎস চীৎকার। লোকজন, পিস্তল, বন্দুক, লাঠি আর বাঁশ ছুটে' এলো অসংখ্য!

"গুলি ছুঁড়োনা" কেঁদে উঠ্লো জোন। পেটে তার ছেলে—মা হবার তার অদম্য আকাঙ্খা। "আমরা জোন আর জর্জ্জ" গর্জ্জে উঠ্লো মিঃ বারণস্।

কপাল বলেই একে

ডোনা মারিয়া মারগারিটা গুডালুপ্ বাসটাডো কাস্টিলাডা—এই প্রকাণ্ড নামটি হচ্ছে মার্গো বলে' মেয়েটির আসল নাম। ক্লড্ রেইন্স্ এর সঙ্গে 'ক্রাইম উইদাউট্ প্যাশন্'এ অভিনয় করে' এ হয় জগদ্বিখ্যাত। জর্জ্জ্ র‍্যাফটের সঙ্গে 'রাম্বা'য় নাব্বা'র পর সে আগে যে রঙ্গমঞ্চে নাচ্তো—সেইখানেই ফের কিছুদিন নাচ্বার জন্যে প্রতি সপ্তাহে পেলে একহাজার ডলার।

ঠিক এক মাস আগে তার মাইনে ছিলো সপ্তাহে দেড়শ' ডলার।

ডগ্‌লাসের ভবিষ্যত

আগামী বছর থেকে ডগ্‌লাস্ ফেয়ার-ব্যাঙ্কস্‌কে আর পর্দার ওপর লাফাতে ঝাঁপাতে আর তরোয়াল নিয়ে খেল্‌তে দেখা যাবে না, কারণ সিনেমায় নাব্‌বার সখ তার গেছে শেষ হয়ে'। সে এবার থেকে ছবির প্রযোজক হবে শোনা যাচ্ছে, তবে কোন কোম্পানীর হয়ে' তা এখনও ঠিক হয় নি। 'প্রাইভেট লাইফ্ অফ ডন্ জুয়ান' তা হ'লে বিখ্যাত না হ'য়েও বিখ্যাত। কারণ, ওটি তার শেষ ছবি।

ডগলাসেরই আরেক বিখ্যাত বন্ধু সিনেমা থেকে বিদেয় নেবে শোনা যাচ্ছে—সে হচ্ছে —মউরিশ শেভালিয়ের।

প্যারীতে অবিচ্ছিন্ন শান্তিময় জীবন শেভালিয়েরের এখন কাম্য।

সকাল বেলায় ঘুম

'ভোরের বেলা ওঠা ভালো জানি, তার চেয়ে ভালো কিন্তু বিছনায় থাকা'—এই লাইনটি হচ্ছে বিখ্যাত এক ইংরাজি গানের অনুবাদ। আকাশ যখন সকাল বেলা সোনালী মাথায় মাখে—তখনও নাক ডেকে ঘুমোতে কেবল আমার কিম্বা আপনারই ভালো লাগে না। হলিউডের প্রায় প্রত্যেক বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীরই তাই!

ন'টার সময় ষ্টুডিয়োয় যেতে হ'লে তাদের উঠতে হয় অন্ততঃ ছ'টায়। অথচ, ঠিক ঐ সময়ে ঘুম কারো ভাঙ্গতে চায় না। তাই সকলেরই প্রায় আমার মতো অ্যালার্ম ঘড়ির সাহায্য নিতে হয়। তবে তার ব্যবহার যার যা নিজস্ব।

জোন ক্রাওফোর্ড সেই রকম ঘুম ভাঙ্গানো ঘড়ি ব্যবহার করে—যারা প্রথমে করে ফিস্-ফিস্ পরে করে গর্জ্জন। এ দুটোর কাঁটা সে পনেরো মিনিটের ব্যবধানে রাখে। গর্জ্জনের আগে ঐ সময়টা সে আরেকটু চোখ বুজে নেয়। জিন পার্কারও করে তাই।

ঘণ্টা বাজা শেষ হ'লেই লাফিয়ে ওঠে ক্লার্ক গ্যাবল্। ব্যায়াম করে খানিকক্ষণ, স্নান করে তারপর। ক্লার্কএর মতে যে ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠতে পারে সে মস্ত গুণী লোক।

ভারী মধুর ভাবে দিনের আলো দেখে ম্যাজ ইভান্‌স্। তার মা তার আগে ওঠে ইভান্‌স্‌এর বিছনার কাছে এসে একখানা রেকর্ড চালিয়ে দেন। কমলার এক গ্লাস রসে চুমুক দিয়ে ম্যাজ বিছানা ছাড়বার জন্যে প্রস্তুত।

ঘুম ভাঙ্গানো ঘড়িব দরকার লাগেনা র‍্যামন নোভারোর। রোজ ছ'টার সময় উঠতে তার কোন কষ্টই হয় না।

তারপর আরো

ষ্টুয়ার্ট আরউইনএর অভ্যেস হচ্ছে—'আর পাঁচ মিনিট'। এই পাঁচ মিনিট করতে করতে বাড়িতে খাওয়ার সময় আর তার থাকে না, তাই সে 'ব্রেকফাষ্ট' খায় ষ্টুডিয়োয়।

বিছানা থেকে নিজেকে টেনে তুলতে জিমি ডুরাণ্টের কী অবস্থা তা তার মুখ থেকেই শুনুন—

'ঘণ্টায় ঘুম আমার ঠিক ভাঙ্গে, আমি উঠি। উঠে দূর করে ঘড়িটাকে ফেলে দিই জানালার বাইরে। তারপর ঘণ্টা খানেক পর অর্দ্ধাঙ্গিনীর কটু-কটু মধুর ভাষায় সত্যিই ভাঙ্গে ঘুম।'

টেড হিলি ঘড়ির বাজনাটাকে বাড়াবার জন্যে একটা প্যান্ চাপা দিয়ে রাখে। কারণ, ভারী গভীর তার ঘুম।

বিছানা থেকে অনেকদূরে ঘড়িটাকে রাখে ওটো ক্রুগার। উঠে' ওটাকে বন্ধ করতে যেতে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

সিনেমা রাজ্যের বাসিন্দাদের জীবনটা বেশ আরামের যখন তাদের কাজ থাকে না।

খুচরো খবর

নর্ম্মা শিয়ারারের ভাবী ছবি হচ্ছে 'রোমিয় ও জুলিয়েট্'। জুলিয়েট যে নর্ম্মা তা জানা গেছে—তবে রোমিয়াকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

* * *

'প্রিন্সেস্ ও হারা'—চেস্টার মরিস্ ও জিন পারকারের এইমাত্র শেষ হয়েছে ছবি।

* * *

বিঙ্ ক্রস্‌বির স্ত্রী ডিক্সী লী জো মরিসনের সঙ্গে "লাভ ইন ব্লুম্"-এ অভিনয় করছে।

———

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীঅনিল চন্দ্র রায়

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪২—1st August, 1935. { ৩১শ সংখ্যা

স্বাগত !

দীর্ঘকাল অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কারণে বিনা বিচারে বন্দিদশায় কালাতিপাত করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যে সরকারের বিধানে তাঁহার বন্দিদশা ঘটিয়াছিল, সেই সরকারের নির্দ্দেশে বিনা সর্ত্তে মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিনা সর্ত্তে মুক্তিলাভে মনে হয়, এতদিনে সরকার বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত ভুল করিয়াছিলেন। হয়ত যাহাদিগের প্রদত্ত সংবাদে তাঁহারা নির্ভর করিয়াছিলেন, তাহারা নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নহে। হয়ত তাহাদিগের স্বরূপ সরকারের নিকটেও প্রতিভাত হইয়াছে। ভারতবর্ষের—বিশেষ বাঙ্গালীর কল্যাণকামীদিগের পক্ষে শরৎচন্দ্রের মুক্তি বিশেষ আনন্দের কারণ। যদি তাঁহার মুক্তি নূতন ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের প্রবর্ত্তিত নূতন নীতির পরিচায়ক হয়, তবে তাহা আরও আনন্দের বিষয়। কারণ, এখনও বহু বাঙ্গালী বিনা বিচারে বন্দী রহিয়াছেন এবং দেশের গোয়েন্দা শ্রেণীর লোক ব্যতীত আর সকলেরই কথা—তাঁহাদিগকে হয় প্রকাশ্যভাবে বিচারাধীন করা হউক, নহেত মুক্তি দেওয়া হউক।

আমরা শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতেছি। শরতের বিগলিতাম্বু গগনে শরতের পূর্ণচন্দ্রের মত তিনি আমাদিগের রাজনীতিক গগনে বিরাজ করুন। আজ বাঙ্গালীর বিষম দুর্দ্দিন। উপযুক্ত নেতার অভাবে ভারতের রাজনীতিক পরিচালনদণ্ড বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হইয়াছে। দেশ যেন শ্মশান। সেই শ্মশানে শিবার অশিব চীৎকার আর শ্মশান সারমেয়দিগের স্বার্থজনিত কলরব কেবল অমঙ্গল সূচিত করিতেছে। তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনীর সূচিভেদ্য অন্ধকারে সন্ত্রাসবাদ-আলেয়ার আলো জ্বলিতেছে—নিবিতেছে। জনগণ আজ ভীতিবিহ্বল। এই অবস্থার প্রতীকার ও পরিবর্ত্তন করিবার জন্য প্রয়োজন—সাধকের। যিনি সাধকের একাগ্রতায় সকল বিঘ্ন পরাভূত করিয়া শবসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন—এ কাজ তাঁহার পক্ষেই সম্ভব।

তাই এক একবার মনে হয়, তাঁহার এই বন্দিদশা বুঝি—মঙ্গলের উদ্ভব সম্ভব করিবার জন্য অমঙ্গলের ব্যাপ্তি। এমন ত পূর্ব্বেও হইয়াছে। যদি মানুষের সহিত দেবতার কথার অবতারণা দোষের না হয়, তবে বলিতে পারি, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুযুধান কৌরব ও পাণ্ডব বাহিনীর মধ্যে যিনি অর্জ্জুনের জয়রথ হইতে কর্ম্মযোগধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, কারাগারে তাঁহার আবির্ভাব। হয়ত কারাগারেই নূতন নীতি শরৎচন্দ্রের নিকট প্রতিভাত হইয়াছে।

এই কারাবাসকালে তাঁহাকে আরও নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। অর্থাভাব তুচ্ছ—কেন না, অর্থের প্রয়োজন কেবল পরার্থে; শরৎচন্দ্র কোনদিন অর্থকে পরমার্থ মনে করেন নাই। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, তাঁহার ভ্রাতা নির্ব্বাসনে রোগভোগ করিতেছেন, তাঁহার স্নেহশীল পিতৃদেব দেহরক্ষা করিয়াছেন—বিধবা জননীকে সান্ত্বনা দানের জন্যও তিনি তাঁহার নিকট থাকিতে পান নাই।

তবুও হয়ত তাঁহার এই কারাবাস ব্যর্থ হয় নাই। হয়ত ইহার প্রয়োজন ছিল—ইহা তাঁহার পরীক্ষা—তাঁহার শ্যামিকা দগ্ধ করিবার জন্য ইহা অগ্নি পরীক্ষা।

হয়ত ইহা তাঁহাকে ভবিষ্যতের কার্য্য-পদ্ধতিতে সতর্কতার প্রয়োজন বুঝাইয়া দিয়াছে। কারণ, তিনি যাহাদিগকে স্নেহদানে কার্পণ্য করেন নাই—যাহারা তাঁহার প্রসাদলাভপুষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যেও যে "জুডাস ইস্কেরিয়ট" থাকিতে পারে এবং তাহারা যে স্বার্থ-সিদ্ধির প্রলোভনে, অর্থ বা উপাধিলাভের আশায়, তাঁহার বিরুদ্ধে হীন ষড়যন্ত্র করিতে পারে, তাহা যে তিনি বুঝিয়াছেন, সরকারকে লিখিত তাঁহার পত্রেই তাহা বুঝিতে পারা গিয়াছে। আজ সেই সকল ঘৃণ্য জীব তাহাদিগের বিবরের অন্ধকারেই আশ্রয় লইয়াছে। সেই অন্ধকারই তাহাদিগের প্রিয়, তাহাই তাহাদিগের আবরণ। কর্ম্মবহুল দৈনন্দিন জীবনের বিরলপ্রাপ্ত অবসরে যদি তাঁহার কখন দেশদ্রোহীদিগকেও দেশসেবক বলিয়া ভুল হইয়া থাকে, তবে এখন আর সে ভুল হইবে না। দীর্ঘ দিনের বাধ্যতামূলক অবসরকালে তিনি যে চিন্তা ও অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা যে জাতীয় কার্য্যে প্রযুক্ত হইবে এবং প্রযুক্ত হইয়া দেশের কল্যাণসাধন করিবে তাহাতে আমাদিগের সন্দেহমাত্র নাই। সেই বিশ্বাস বুকে লইয়া আমরা আজ তাঁহাকে বলিতেছি—"স্বাগত!"

—————*—————

জাতীয়তার মূর্ত্তপ্রতীক "খেয়ালী"

'খেয়ালী'র গত সংখ্যায় যে "নিবেদন" প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে 'খেয়ালী'র নীতি, রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে পাঠকগণ বিস্মিত হইয়াছেন। তাহার কারণ, 'খেয়ালী'র নীতি, রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে যে মতের আভাষ তাহাতে প্রদত্ত হইয়াছে, অনেকে তাহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যথার্থ নহে। সেই জন্য আমাদের পক্ষে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। তাহাতে বলা হইয়াছে :—

"খেয়ালীর উদ্ভবের মূলে সাহিত্যিক প্রেরণা এবং ছায়াচিত্র-শিল্পে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠার পথে সহায়তা করার চেষ্টা ছাড়া কোন নির্দ্দিষ্ট মতবাদ প্রচার বা উপদলীয় স্বার্থসংরক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু যাঁহাদের উপর 'খেয়ালীর' সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার ন্যস্ত ছিল, ঘটনার স্রোতে পড়িয়া ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাঁহারা রাজনীতির অনতিক্রম্য প্রভাবে সকল সময়ে মূলনীতির অনুসরণ করিতে পারেন নাই।"

কিন্তু আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা গতপূর্ব্ব সংখ্যার 'খেয়ালীর' প্রথম সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত উক্তিতেই সপ্রকাশ :—

"দেশের অগ্রগতির পথে যে সব কণ্টক আত্মত্যাগী পান্থদের চরণযুগল ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, 'খেয়ালী' আপনার খেয়ালে সেগুলি একটি একটি করিয়া তুলিতে থাকিবে। কণ্টককুল অপসৃত করিতে তাহাকেও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু এই লাঞ্ছনাকে বরণ করিয়া সে এই ব্রতে আত্মনিয়োগ করিবে··· 'খেয়ালী' সত্য কথা বলিবে, প্রিয় কথা বলিবে! কিন্তু 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' নীতি সে মানিবে না। অপ্রিয় সত্য কঠোর হইলেও নির্ভীকভাবে তাহা ব্যক্ত করিতে সে কুণ্ঠিত হইবে না।"

'খেয়ালী' যদি রাজনীতির প্রভাবমুক্ত না হইয়া থাকে, তবে তাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া। কারণ, একদিন স্যর আশুতোষ চৌধুরী পরলোকগত মনীষী বিপিন চন্দ্র পালের মতানুসরণ করিয়া বলিয়াছিলেন বটে, পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই এবং তাহাতে অনেকের মনে ইলবার্ট বিলের আন্দোলন কালে কবি হেমচন্দ্রের উক্তি উদিত হইয়াছিল—

"পরের অধীন দাসের জাতি, নেশান আবার তারা?
তাদের আবার এজিটেশন—নরুণ উঁচু করা!"

কিন্তু তাহার পর ভারতে নবযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে এবং সেই যুগে যুগধর্ম্ম প্রচারক সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন—পরাধীন জাতির রাজনীতি ব্যতীত আর কিছুই নাই। রাজনীতির সহিত

জাতীয়তার, অর্থনীতির ও সমাজনীতির সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ, তাহা আমরা প্রতিদিন অনুভব করিতেছি। সুতরাং রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি ত্যাগ করিয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধি আমরা সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি না। সে উদ্দেশ্য—**জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধন।**

কেবল ছায়াচিত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠানরূপে 'খেয়ালী' প্রচারিত হয় নাই—পরিচালিত হইবেও না। দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠা চেষ্টায় শিল্পের এই বিভাগে 'খেয়ালী' অপেক্ষাকৃত অধিক মনোযোগ দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা তাহার গৌণ উদ্দেশ্যের একটি অংশ মাত্র। 'খেয়ালী' চলচ্চিত্রের পত্র নহে। জাতির জীবনে চলচ্চিত্রের চিত্রের মত যে সব পরিবর্ত্তন চলিতেছে, সে সকল তাহার রচনা-মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইবে এবং সে সেই সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য লোকমত গঠন করিবে।

'খেয়ালীর' পূর্ব্বোল্লিখিত উক্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করি এবং পরে ন্যাশানাল নিউজপেপার্সের অধীনে তাহার পরিচালনভার গ্রহণ করি।

গত সংখ্যায় প্রকাশিত "নিবেদনে" লিখিত হইয়াছে—

"যে তীব্র সমালোচনায় সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইতেছে বলিয়া 'খেয়ালী' আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে, দেখা যাইতেছে সে আলোচনা গ্লানিকর মনে করিয়া অনেক শ্রদ্ধেয় বন্ধু ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন।"

এ সম্বন্ধে আমাদের মত আমরা গতপূর্ব্ব সংখ্যায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছি!—

"বাঙলা দেশের পবিত্র মৃত্তিকায় ভূমিষ্ঠ হইয়া বাঙলার রাজনীতিতে ও বাঙলার সমাজে যে ব্যভিচার ও অন্যায়ের বিষ বাঙলার রাষ্ট্র-জীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া স্বপ্ন-জগতে 'খেয়ালী' যে মায়া-মন্দির রচনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, কাপুরুষের আঘাতে আজ সেই মন্দিরে সত্যের দেবতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।"

আমরা যে কোন উপদলের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য কখন চেষ্টা করি নাই, তাহা মনে করিয়া আমরা যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি, আমরা যে যথাসাধ্য সত্যের সেবা করিয়া সফলকাম হইয়াছি, তাহাতে তেমনই আপনার চেষ্টা সার্থক মনে করিতেছি।

আমরা যখন উপদলগঠনচতুর নলিনীরঞ্জন সরকারকে সরকারের লোক বলিয়াছিলাম—যখন বীণার বীণা বাজিতেছে বলিয়াছিলাম, তখন যাঁহারা সে কাজ সাংবাদিকের দুঃসাহসিক কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারাই স্বীকার করিতেছেন, আমরা সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ না করিয়া কাহারও সম্বন্ধে কোন উক্তি করি না। কারণ আমরা সাংবাদিকের যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছি, তাহা ব্যক্তিকে তুচ্ছ মনে করিলেও যে স্থানেই ব্যক্তির সহিত জাতির অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধ সেই স্থানেই ব্যক্তির স্বরূপ—প্রয়োজন বোধে—ব্যক্ত করিয়া দেয়। আজ ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণে মাননীয় শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার সিংহের রায়ে নলিনীর স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে!—

(১) সে সত্য কথা বলে নাই

(২) তাহার চরিত্র সন্দেহাতীত নহে

অনাচার নিবারণকল্পে—কর্ত্তব্যবোধে—আমরা কোন কোন প্রতিষ্ঠানের অপ্রিয় সমালোচনা করিয়াছি। তাহার উদ্দেশ্য—সে সকলের ত্রুটি সংশোধন। আমরা হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর নানা ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্পর্কে আজ আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টারদিগকে আর একটি কথা বলিব। খড়িলের চা-বাগানে রীড নামক যে ইংরাজ, হীরানাম্নী কুলী রমনীর কাছে অবৈধ প্রস্তাব করিবার ও সেই সম্পর্কে শেষে গুলি চালাইবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তাহার কথা ডিরেক্টারদিগের মধ্যে অন্ততঃ শ্রীঅখিল চন্দ্র দত্তের মনে আছে। সেই সম্পর্কে তাঁহার সহিত চীফ কমিশনারের আলোচনা বিবরণ ১৯২০ পৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিতও হয়। সেই মামলায় রীড আদালতের বিচারে অব্যাহতিলাভ করিলেও তাহার ইংরাজ প্রভুরা তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছিলেন। মাননীয় সিংহ মহাশয়ের রায়ের পর হিন্দুস্থানের ডিরেক্টাররা কি নলিনীরঞ্জনকে তাঁহাদিগের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে রক্ষা করা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন?

যখন শ্রীনলিনাক্ষ সান্ন্যাল ও শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় হিন্দুস্থানের কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন নাই, তখন তাঁহারা 'উপাসনায়' হিন্দুস্থান সম্বন্ধে যে সমালোচনা করিয়াছিলেন—তাহাতে প্রকাশিত মত ও আমাদের প্রকাশিত মত কি অভিন্ন নহে? আজ কি তাঁহারা, হিন্দুস্থানে চাকরী পাইবার পর, সে মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন? শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন যখন দেশবন্ধুর 'ফরওয়ার্ডে' চাকরী করিতেন, সেই সময় হইতে তাঁহাকে আদর্শবাদী কবি বলিয়া জানিতাম। ডাঃ নলিনাক্ষও সুপরিচিত কংগ্রেসকর্ম্মীরূপে সাইমন কমিশনের তীব্র বিরোধিতা হইতে আরম্ভ করিয়া কারাবরণ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। সেই জন্যই হিন্দুস্থানের জেনারল ম্যানেজারের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত ব্যভিচারের মামলার বিবরণ প্রকাশ সম্পর্কে তাঁহাদিগকে 'এ্যাডভান্স' পত্রের শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র গুপ্তের গৃহে রাত্রিকালে দেখিয়া আমি মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। তাহা আমি অনিবার্য্য মনে করি। আমি তাঁহাদের সে কার্য্য কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি

না এবং সেই জন্যই 'খেয়ালীতে' তাহার তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত চরিত্র আমরা আলোচনা করি নাই—সে আলোচনা আমরা সংবাদপত্রের গাম্ভীর্য্যহানিকর মনে করি। এই দুইজনের ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে যেমন আমরা কোন আলোচনা করি নাই—স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধেও তেমনই কোন আলোচনা করি নাই। তাঁহার রাজনীতিক মত আমরা অবজ্ঞা করিতে পারি। তিনি বাঙ্গালা সরকারের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেও আমরা বলিব, তিনি ভারতের রাষ্ট্রগুরু দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথের অক্ষয়কীর্ত্তি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার কলঙ্ক সপ্ত সমুদ্রের সম্মিলিত সলিলেও প্রক্ষালিত হইবার নহে। কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্র আমাদের আলোচনার বিষয় হইতে পারে না। এই তিনজন যদি মনে করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদের ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্রের আলোচনা করিয়াছি, তবে তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। যদি আমরা ভ্রমক্রমেও তাহা করিয়া থাকি, তবে আমরা, তাহা বুঝিলে, আপনারাই সেজন্য লজ্জিত হইব। তাঁহারা আমাদের সমালোচনায় দুঃখিত হইয়া থাকিলে সেজন্য আমরা দুঃখিত। একথা বলাই বাহুল্য যে ভবিষ্যতেও এই নীতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং কাহারও ব্যক্তিগত চরিত্রের আলোচনা 'খেয়ালী' করিবে না। এই প্রসঙ্গে আমরা শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর সম্বন্ধে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। তিনি দ্বিজবর রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের দৌহিত্রী ও শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা—তিনি অরবিন্দেরও ভগিনী। তিনি কেন—কোন মহিলার চরিত্রে কোনরূপ দোষারোপ করা আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও অনুসৃত নীতির বিরোধী। তিনি যদি পুনরায় 'খেয়ালীতে' প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করেন, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন, সমাজে যে সব অনাচার প্রবেশ করিয়াছে, আমরা সেই সকলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি। তিনি আমাদের উক্তির উদ্দিষ্টা নহেন। তথাপি এই বিদুষী মহিলা যদি আমাদের উক্তিতে বিক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হইয়া থাকেন, তবে সেজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত—এ কথা বলিতে ক্ষণমাত্র দ্বিধাবোধ করি না।

এই প্রসঙ্গে আমরা আর একটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিব। যিনি এদেশে জনমতের সুপ্তশক্তি জাগ্রত করিবার জন্য তূর্য্য-নিনাদ করিয়াছিলেন সেই শিশিরকুমার ঘোষ এবং তাঁহার ভ্রাতা ও সহকর্ম্মী মতিলাল—বক্ষের শোণিতে যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'

খেয়ালী
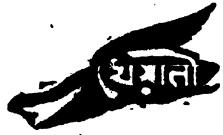
সৃষ্ট ও পুষ্ট করিয়াছেন সেই 'অমৃতবাজার পত্রিকা' আমরা জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়াই মনে করি। তাহা কেবল তুষারকান্তির বা পরমানন্দের নহে—তাহা আমাদের সকলের—তাহা জাতির। তুষারকান্তি বা পরমানন্দ বা অপর কাহারও সহিত ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু 'অমৃতবাজার' যদি নলিনী-রঞ্জনের স্তুতিগান করে ও সেইজন্য দেশপূজ্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়েরও অপমান করে, 'অমৃতবাজার' যদি লাট দপ্তরের সহিত অকারণ ঘনিষ্ঠতা করে—তবে তাহা দেশবাসী কখনই সহ্য করিবে না। সেজন্য যাহারা দায়ী তাহাদিগকে তীব্র সমালোচনা সহ্য করিতেই হইবে। তাঁহারা জানেন, আইরিশ নেতা কনোলী লিখিয়াছেন—অনুসন্ধানের ফলে লোক—"have been able to reveal in their true colours of infamy many who had posed in the lime light.. as whole-souled patriots." এদেশে যাহারা সেই জাতীয় লোক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, 'অমৃতবাজার' যদি তাহাদিগের সমর্থনচেষ্টা করেন, তবে আমাদিগকে অপ্রিয় সমালোচনা—এমন কি অনেক অপ্রকাশিত সংবাদ প্রকাশও করিতে হইবে। আশা করি, আমাদিগকে সেই অপ্রিয় কার্য্য করিতে হইবে না।

যে স্থানেই কোন ব্যক্তির কার্য্য কোন প্রতিষ্ঠানের অনিষ্টকর হইবে—সেই স্থানেই আমরা সেই কার্য্যের সমালোচনা করিব। আর যে স্থানে কোন ব্যক্তির কাজ বা কোন প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা জাতীয়তার বিরোধী হইবে—সেই স্থানেই আমরা নির্ভীকভাবে—কোন ব্যক্তির বা দলের বা প্রতিষ্ঠানের মুখ না চাহিয়া সত্য প্রকাশ করিব। সে জন্য যদি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, তবে সে লাঞ্ছনা আমরা দেশ মাতৃকার আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিব।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত "নিবেদন" সম্বন্ধে আর একটি কথা না বলিলে আমি প্রত্যবায়গ্রস্ত হইব। উহাতে বলা হইয়াছে, "সম্পাদন বোর্ডের নবনিযুক্ত সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের সহিত 'খেয়ালী' বা ন্যাশানাল নিউজপেপার্স লিমিটেডের কোন সম্পর্ক রহিল না।" ন্যাশানাল নিউজপেপার্স লিমিটেডের কল্যাণকল্পে আমি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক সঙ্ঘের সেক্রেটারী পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া-ছিলাম; কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন নাই। এ পর্য্যন্ত কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাঙ্গালার সংবাদপত্রের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য সাংবাদিক মাত্রই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আমি যখন 'ফরওয়ার্ডে' সাংবাদিক জীবন আরম্ভ করি, তখনই তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। আমি জানি, বাঙ্গালার বহু রাজনৈতিক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক—আজ যাঁহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বা করাইয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিতেছেন, তাঁহাদিগেরও কেহ কেহ—নানা বিষয়ে তাঁহার সাহায্য লাভ করিয়াছেন। প্রথম পরিচয় হইতে আজ পর্য্যন্ত আমি তাঁহার নিকট স্নেহ ও কাজে সাহায্য লাভ করিয়া আসিতেছি। বিশেষ 'চিত্রালী' সম্পর্কে তিনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন, সে জন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আমি আশা করি ভবিষ্যতে তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত হইব না।

আজ বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। নবযুগের আবির্ভাব সূচনা তরুণ অরুণালোকে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। এই সময় সমাজ ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যাহাতে আবর্জ্জনা মুক্ত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। 'খেয়ালী' সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে আবির্ভূত হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ বা স্বার্থ প্রণোদিত নহে। যেদিন সে সেই আদর্শভ্রষ্ট হইবে—যে দিন সে মত অপেক্ষা ব্যক্তিকে উচ্চাসন প্রদান করিতে চাহিবে—যে দিন সে অনাচারের ও অত্যাচারের ভয়ে ভীত হইবে—সে দিন তাহার মৃত্যু হইবে—সেই দিনই তাহার সহিত আমার সকল সম্বন্ধ শেষ হইবে।

যে উচ্চ আদর্শ লইয়া সার্দ্ধ চারি বৎসর কাল পূর্ব্বে 'খেয়ালী' তাহার জয়যাত্রার পথ অবলম্বন করিয়াছিল, আমরা যে সেই আদর্শে উপনীত হইয়াছি, এমন নহে। তবে আমরা যেন কখন আদর্শভ্রষ্ট না হই। যে চিন্ময়ী জননীকে আমরা মৃন্ময়ীরূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছি—আজ নবোদ্যমে কার্য্যারম্ভের সময় আমরা কেবল তাঁহারই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। মানুষ ক্ষুদ্র—দেশ বিরাট;—মানুষ ভ্রান্তিমুক্ত নহে,—মত অবশ্য গ্রাহ্য; মানুষ দুর্ব্বল—দেশমাতৃকাই তাহাকে সবল করিতে পারেন। আজ আমরা দেশ মাতৃকার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি আমাদের সকল দৌর্ব্বল্য, সকল দুঃখ, সকল দৈন্য দূর করুন—তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের জয়যাত্রা সফল হউক—আমরা যেন কখন না ভুলি

"বাহুতে তুমি, মা, শক্তি;
হৃদয়ে তুমি, মা, ভক্তি;
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

আমরা আজ তাঁহারই নাম গ্রহণ করিয়া নবোদ্যমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি—

"বন্দেমাতরম্।"

শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
ন্যাশানাল নিউজপেপার্স লিমিটেড।

বিদেশে ভারত-কথা

বিদেশে—বিশেষ বিলাতে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রচার কার্য্যের প্রয়োজন বহুদিন হইতে অনুভূত হইতেছে। যাহারা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহা বুঝিয়াই বিলাতে কংগ্রেস কমিটী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ও 'ইণ্ডিয়া' পত্র প্রচারিত করেন। তাহার পর আজ সাম্রাজ্যবাদ ও অর্থ নৈতিক জাতীয়তা প্রবল হইয়াছে এবং একদল লোক সর্ব্বপ্রযত্নে ভারতের কুৎসা প্রচার করিতেছে। উপন্যাস, নাটক, ছায়া-চিত্র, বক্তৃতা—প্রচারের কোন উপায়ই তাহারা ত্যাগ করিতেছে না। বিদেশে ভারত সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বিদেশে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে প্রচারকার্য্যে অবহিত হইবার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি প্রচারকার্য্য তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—

(১) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচারের প্রতি বাদ ও সত্য ঘোষণা।

(২) ভারতের রাজনৈতিক অবস্থায় স্বরূপ প্রকাশ।

(৩) ভারতের দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ও সভ্যতা সম্বন্ধে সত্য প্রচার।

আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম বাঙ্গলার একখানি সংবাদপত্র—"দৈনিক বসুমতী" ভারতীয় কৃষ্টির কথা তুলিয়া বলিয়াছেন—"সে কৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধি করা ও বুঝান দুঃসাধ্য। "ভারতের প্রাচীন (প্রাচীন ভারতের?) রসায়ণ বিজ্ঞান" হইতে হঠযোগ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ের তালিকা দিয়া সহযোগী লিখিয়াছেন :—

"শিক্ষিত সাধনবলসম্পন্ন মনিষীগণ (মনীষিগণ!) যদি এই বিষয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তবেই ইহা সম্ভবপর হইতে পারে, নচেৎ কংগ্রেস বা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় একার্য্য সম্ভবপর হইবে না।"

উপসংহারে সহযোগী বলিয়াছেন :—

"হয় ত সুভাষবাবু এ সকল কথা মনে করিয়া তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতির তালিকা প্রস্তুত করেন নাই; কিন্তু যাহা সত্য তাহা চিরকাল সত্য। তোমার ভারত, আমার ভারত এবং আচার্য্য শঙ্করের ও চৈতন্যদেবের ভারতে অনেক প্রভেদ। ভারতের প্রকৃত স্বরূপ (স্বরূপ কি প্রকৃতরূপ নহে?) তাহার পরিচয় দিতে না পারিলে মিথ্যা ভারতের পরিচয় দিয়া লাভ কি? কিন্তু প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় দিবার সময় কি এখন আসিয়াছে?"

"রায়ের গঙ্গা," "বসুর গঙ্গা" প্রভৃতির মত নানাজনের নানা ভারত, কি হাস্যোদ্দীপক নহে?

সহযোগীর উক্তির মধ্যে যে দম্ভ ও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় সপ্রকাশ, আমরা তাহার আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমরা তাঁহাকে বলিব—যে সকল বিদেশী ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্খার বিরোধী, তাহারা সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে দিতে চাহিবে না—সেজন্য তাহারা হয়ত ভারতের উপাধিধারী রাজা মহারাজাদের সাহায্যও চাইবে। কিন্তু এ দেশের কোন সংবাদপত্রের সম্বন্ধে যদি এমন সন্দেহের অবকাশ ঘটে যে, সেই পত্র ভারতের অকল্যাণকামীদিগের প্রচেষ্টায় প্রকাশ্য বা পরোক্ষভাবে সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবের পথে বাধা প্রদান করিতেছেন, তবে তাহা একান্তই দুঃখের কারণ হইবে।

সহযোগীর সম্বন্ধে যেন দেশের লোক মনে সেরূপ সন্দেহ পোষণ করিতে না পারেন।

যৌবন লাভ

ডাঃ এস, সেনগুপ্ত

স্বাস্থ্য এমনই একটী জিনিষ যে, কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই ইহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিয়া থাকে। বিধির অলঙ্ঘনীয় বিধানানুযায়ী যৌবনের পর প্রৌঢ়ত্ব এবং প্রৌঢ়ত্বের পর বার্দ্ধক্য আসিবেই। কিন্তু এই বার্দ্ধক্য সময় মত আসিলেও, প্রত্যেক লোকই আবার তাহার যৌবনকে ফিরাইয়া পাইতে চায়, এমনই যৌবনের মহিমা, এমনই যৌবনের প্রলোভন! ইহা শুধু আজ নয়, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই মানুষ যৌবন শক্তির সমাদর করিতে শিখিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সেও অনেক মহা মহা ব্যক্তি পুনর্যৌবন লাভের চেষ্টা করিয়াছেন, এমন দৃষ্টান্ত আমাদের শাস্ত্র পুরাণাদিতে বিরল নহে। কেবল আমাদের দেশে কেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অনেকে যৌবন লাভের জন্য কোন কোন বিশেষ বিশেষ নদী, কূপ, জলাশয় অথবা প্রস্রবনে স্নান করিয়াছে এবং কেহ কেহ আজকালও করিয়া থাকে।

নিম্নে চিত্রটী জার্ম্মেনীর প্রসিদ্ধ Der Jungbrunnen" নামক একটী প্রস্রবনের। লব্ধ প্রতিষ্ঠ শিল্পী "লুকাস্ ক্র্যানেক" (Lucas Cranack 1472—1553) অঙ্কিত এই প্রস্রবনের মূল চিত্রটী বার্লিনের কাইসার ফ্রেডারিক্ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। চিত্রে দেখা যায় যে, দূর দেশাগত বহু প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ নরনারী এই প্রস্রবনে স্নানার্থ আসিতেছে। অনেকে মনের আনন্দে বাধাহীনভাবে স্নান করিতেছে, এবং অনেকে আবার স্নানান্তে আমোদ স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইতেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জার্ম্মাণগণের এই বিশ্বাস ছিল যে, এই প্রস্রবনে স্নান করিলে পুনর্যৌবন লাভ হয়। এই অন্ধ বিশ্বাস অবশ্য অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা ইহাকে অন্ধ বিশ্বাসই বলি আর যাই বলি না কেন, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ইহার মূলে ছিল স্বাস্থ্যলাভের অদম্য আকাঙ্খা। এই তো গেল অন্ধ বিশ্বাসীদের কথা। এবার দ্রব্যগুণে যাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের কথা ধরা যাউক। সভ্যতার প্রথম যুগ হইতেই মানুষ সম্ভবতঃ স্বাস্থ্যধ্বংসকারী গুপ্ত কারণগুলিকে দমন করিয়া মানুষের পূর্ণ স্বাস্থ্য ও আশা ভরসা দান করিতে সমর্থ, এ প্রকার উদ্ভিজ্জ ও খনিজ জিনিষের আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। চিকিৎসকগণও বহু শতাব্দীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দ্বারা যৌবন লাভের নানাপ্রকার
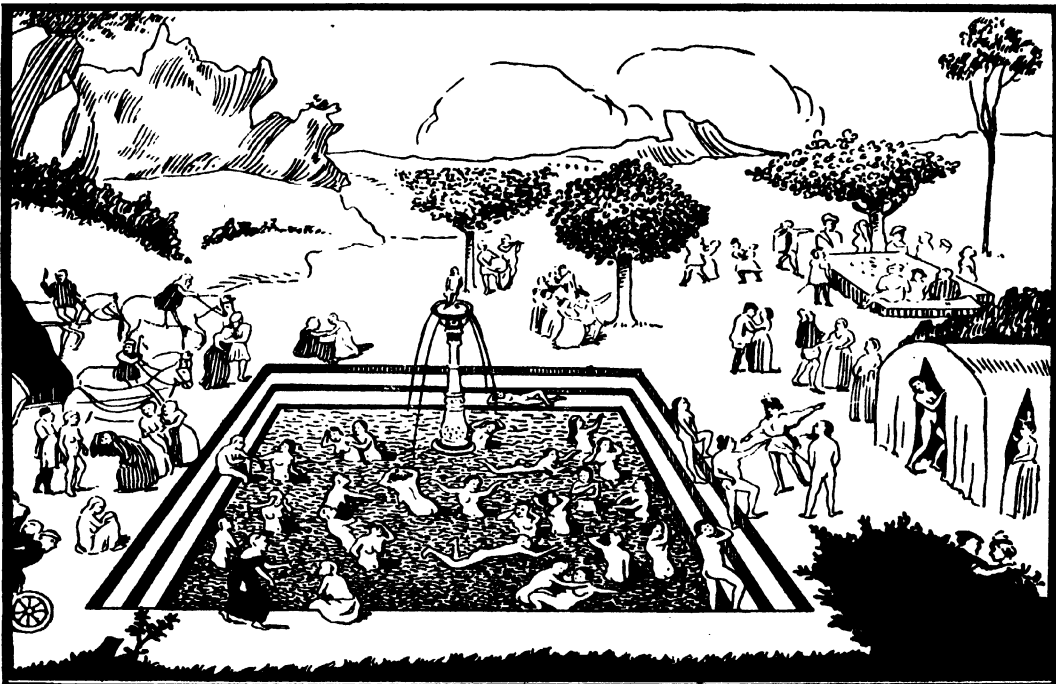
শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসুর নিকট আমাদিগের সসম্ভ্রম নিবেদন—

গত ৪ঠা জুলাই, ১৯শে আষাঢ় তারিখের "খেয়ালী"তে "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" প্রকাশিত হিন্দুস্থান-কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ উপলক্ষ্য করিয়া শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু এবং তাঁহার স্বামী "ব্যবসা ও বাণিজ্যের" সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু সম্বন্ধে অত্যন্ত নীচ ও ঘ্নানিজনক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত প্রবন্ধ জনৈক লেখক লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে খেয়ালীতে উহা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধে এবং "খেয়ালী" পত্রে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু সম্বন্ধে এ্যান্টি সারকিউলার সোসাইটী ও তাহার ফাণ্ড সংক্রান্ত যে উক্তি এবং ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে রিজ্লী ও কার্লাইল্ সারকিউলারের প্রতিবাদ স্বরূপ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ এই এ্যান্টি সারকিউলার সোসাইটী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার সভ্যদিগের কোনরূপ চাঁদা ছিল না, কিম্বা সাধারণের নিকট হইতে কেহ কখনও চাঁদা চাহেন নাই কিম্বা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এই সোসাইটীর ফাণ্ড সম্বন্ধে সাধারণের নিকট কোন হিসাব দেন নাই বলিয়া "খেয়ালী"তে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এইরূপ মিথ্যা রটনার জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি।

পরম শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু সম্বন্ধে যে সমস্ত জঘন্য, অভদ্র এবং কুৎসিৎ উক্তি এবং ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা যে শুধু আগাগোড়া সর্ব্বৈব মিথ্যা তাহাই নহে, পরন্তু, তাঁহার ন্যায় একজন উচ্চ বংশসম্ভূতা বিদুষী, সর্ব্বজন মান্যা, পূত চরিত্রের নারী সম্বন্ধে এরূপ জঘন্য লেখা বাহির হওয়ায় আমরা যে কতদূর দুঃখিত ও লজ্জিত বোধ করিতেছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী ইলেক্শন উপলক্ষ্য করিয়া উক্ত প্রবন্ধে শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসুর সম্বন্ধে যে ঘ্নানিজনক এবং জঘন্য ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ৯নং ওয়ার্ডের সর্ব্বাঙ্গীন উপকার সাধনে শ্রীযুক্তা বসু মহোদয়ার প্রয়াস ও প্রচেষ্টার কথা আজ সর্ব্বজন বিদিত। সুতরাং "খেয়ালীতে" এইরূপ মিথ্যা রটনার জন্য আমরা বিশেষভাবে দুঃখিত হইয়াছি।

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু ও তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসুর সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে লিখিত সমস্ত নিন্দাজনক, ঘ্নানিকর উক্তি ও ইঙ্গিত আমরা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করিতেছি এবং তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন করিতেছি যে, ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে "খেয়ালীতে" এমন কিছু কখনো প্রকাশিত হইবে না যাহা কোনওরূপে তাঁহাদিগের অসন্তোষের বা অসম্মানের কারণ হইতে পারে। আশা করি, আমাদের এই সশ্রদ্ধ ও আন্তরিক নিবেদন তাঁহারা অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিবেন।

ঔষধ প্রস্তুত করণে চেষ্টিত আছেন। সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত "রচি" কোম্পানীর "রচিটোন" নামক টনিকও এই প্রকার একটী সাধু প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ। যে সমস্ত অশেষ গুণ সম্পন্ন দ্রব্যাদির সংমিশ্রণে "রচিটোন" প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটাই সহস্র সহস্র বৎসরের পরীক্ষিত এবং মানবের চির সুহৃদ বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং "রচিটোন" সেবনে যে জরাজীর্ণ দেহেও পুনরায় যৌবনের জোয়ার বহিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই টনিকের উদ্ভিজ্জ এবং খনিজ উপাদানগুলির প্রত্যেকটিই তেজস্কর অথচ উগ্রবীর্য্য নহে। এই টনিক নিয়মিতভাবে সেবন করিলে দেহে যৌবনের সুষমা ফিরিয়া আসিবে এবং মানুষ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সুস্থ দেহে জীবন উপভোগ করিয়া যাইতে পারিবে। সুতরাং "রচিটোন" বিজ্ঞানের একটী শ্রেষ্ঠ অবদান।

রূপতরঙ্গ

নিউ থিয়েটার্স

"ভাগ্য-চক্রে"-র চক্র দ্রুতগতিতে ঘুরছে। আশা করা যায়, আর দিন পনেরোর মধ্যে "ভাগ্য-চক্রে"-র চক্রের গতি নিয়ন্ত্রিত হবে। চালক-চিত্রী শ্রীনীতীন বসুর চেষ্টার অন্ত নেই—ছবিখানাকে অসাধারণ করবার জন্য। শ্রীরাইচাঁদ বড়ালও এবার আরও কিছু গানের ভেতর নতুনত্ব দেখাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। আর, শ্রীমুকুল বসু শব্দযন্ত্রে তাঁর একছত্র দাবী এবার সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করবার জন্য বিশেষ উৎসুক হ'য়ে উঠেছেন। "ভাগ্য-চক্র"-কে যারা রূপ দেবার ভার নিয়েছেন তাদের সম্বন্ধে সকলেই উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। এদের মধ্যে উমা, পাহাড়ী, কৃষ্ণচন্দ্র, দুর্গাদাস, বিশ্বনাথ, মল্লিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* * *

হিন্দুস্থানী "দেবদাস" সম্পাদকদের হাত থেকে বেরিয়ে এ হপ্তা থেকেই মুক্তি প্রতীক্ষায় থাকবে। আমরা যতদুর জানি, ছবিখানির সর্ব্ববিভাগই অনবদ্য রূপ পেয়েছে এবং ছবিখানির মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিশ্বাস শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া ভারতের সর্ব্বত্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক বলে অভিহিত হবেন। এই ছবির সাফল্যের জন্য অবশ্য এখানে আর একজনের নাম কোরতে হবে, তিনি হচ্ছেন—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র। তার সর্ব্বদর্শী তত্ত্বাবধনা পরিচালককে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য কোরেছে।

বিলাসী

মিত্র মশাই আপাততঃ "রাজা ভোজ" নামে একখানা তামিল ছবি তোলার কাজে ব্যস্ত আছেন।

* * *

শ্রীদীনেশ রঞ্জন দাশ শীঘ্রই "বিজয়া" তোলা সুরু কোরবেন।

পরিচালক শ্রীহেমচন্দ্রের হিন্দী ছবি আরম্ভ হ'য়ে গেছে। সাধারণ গল্প থেকে এ গল্পের ভেতর একটু অভিনবত্বের আভাষ ফুটে ওঠ্‌বে। গল্পটির মুল বিষয়বস্তু হ'চ্ছে, দারিদ্র্য বশতঃ সামাজিক বন্ধন ছিন্ন কোরে একজন চিত্রাভিনেত্রীর জীবন বরণ করে এবং পরে সাধারণকে জানিয়ে দেয় ষ্টুডিও সম্বন্ধে তাদের ধারণা ভ্রান্ত। এই অভিনেত্রীর ভূমিকায় নাম্‌বেন শ্রীমতী মলিনা ও মিঃ সাইগাল নাম্‌বেন একটি গীতি-বহুল চরিত্রে।

রাধা ফিল্ম

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বীয় তত্ত্বাবধানে "কৃষ্ণ-সুদামা"-র শুটিং এ হপ্তা থেকে সুরু হ'য়েছে। সুদামার অংশে নাম্‌ছেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী। অন্যান্য ভূমিকায় আত্ম-প্রকাশ কোরবেন শ্রীমৃণাল ঘোষ, শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য, শ্রীতুলসী চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী কাননবালা, শ্রীমতী বীণা, শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীমতী সরযুবালা।

* * *

শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি "কণ্ঠহারে"-র চিত্রনাট্য লেখা শেষ কোরেছেন। বাঙ্‌লার কয়েকটি প্রখ্যাত-

ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিমিটেড

বাহুল্য বোধে গত সংখ্যা হইতে ন্যাশনাল নিউজ পেপার্স লিমিটেডের সম্পাদন বোর্ড বিলুপ্ত করা হইয়াছে। "ভ্যারাইটীজ," "খেয়ালী" ও "চিত্রালী" পত্রিকাত্রয়ের সম্পাদকগণের উপর স্বতন্ত্র পত্রের সম্পাদনা-নীতি নির্দ্ধারণের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কাগজের নীতির জন্য দায়ী হইবেন। সম্পাদনা বিভাগ ব্যতীত অন্যান্য বিভাগ ম্যানেজিং ডিরেক্টার স্বয়ং পরিচালনা করিবেন।

সম্পাদকত্রয়

"ভ্যারাইটিজ"—শ্রীবিশ্বাবসু রায়চৌধুরী

"খেয়ালী"— শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়
সার্ভেন্ট, ফরওয়ার্ড ও লিবার্টির ভূতপূর্ব্ব নিউজ এডিটর।

"চিত্রালী"— শ্রীসুবোধ রায়
'নবশক্তির' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও 'বঙ্গবাণী'র ভূতপূর্ব্ব সহ-সম্পাদক।

শ্রীনীতীন বসুর "ধূপ-চাওন" প্রায় শেষ হ'য়ে এল। আধুনিক একটি ঘটনার ওপর ভিত্তি কোরে পণ্ডিত সুদর্শন এই ছবির আখ্যানভাগ রচনা কোরেছেন। ছবিখানির সঙ্গীত একটি আকর্ষনীয় বিষয় হবে। এ ছাড়া বৃহৎ সেট্ ও স্বাভাবিক দৃশ্যাবলী নয়ন-মন বিমুগ্ধ কোরবে। ছবিখানির সঙ্গীত পরিচালনা কোরছেন শ্রীরাইচাঁদ বড়াল আর শব্দানুলেখক হ'চ্ছেন শ্রীমুকুল বসু।

নামা শিল্পী এই চিত্রে অভিনয় কোর্‌বেন। এদের মধ্যে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী যথাক্রমে রণলাল ও মধুর ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ কোরবেন। ছবিখানি আগামী বড়দিনে 'রূপবাণী'তে মুক্তিলাভ কোরবে।

* * *

"ওয়ামাক্ এজ্‌রা" ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মুক্তির অপেক্ষা কোর্‌ছে। ছবিখানি সিন্ধু ও বেলুচিস্থানের স্বত্ব ইতিমধ্যেই বিক্রীত হ'য়েছে।

* * *

"থাণ্ডারবোল্টে"র দু'টি দৃশ্য তোলা বাকী আছে। সে দু'টি শেষ হবে এই মাসের মাঝামাঝি।

* * *

তড়িৎ বসুর তেলেগু ছবি "ভক্ত কুচেলা" মন্দ্রদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তালাভ কোরেছে। প্রকাশ ভিজিয়ানাগ্রামে, কোকনদে ও বেজওয়াদাতে "ভক্ত কুচেলা" চাঞ্চল্য সৃষ্টি কোরেছে।

* * *

কর্ণওয়ালিসে "মানময়ী গার্লস্-স্কুলে" পূর্ব্ববৎ দর্শক সমাগম কোর্‌ছে।

* * *

আস্‌ছে শনিবার থেকে এদের বহু-প্রতীক্ষিত হিন্দি সবাক্-চিত্র "দক্ষযজ্ঞ" নিউ সিনেমায় মুক্তিলাভ কোর্‌বে।

ইণ্ডিয়া পিক্‌চাস লিঃ

কোলকাতার 'রঙ্গমহল থিয়েটার' আস্‌চে ৫ই, ৬ই, ৮ই ও ৯ই আগষ্ট বাঁকাপুরের এল্‌ফিনষ্টোন পিক্‌চার প্যালেসে "মহানিশা", "বাঙ্‌লার মেয়ে", "পতিব্রতা", "কাজ্‌রী" ও "পথের সাথী" অভিনয় কোরবে। আমরা 'ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্সের' কর্ত্তৃপক্ষকে তাদের এই ব্যবস্থার জন্য অভিনন্দিত কোর্‌ছি।

কালী ফিল্মস

এদের "প্রফুল্ল" আবার তোলা সুরু হ'য়েছে। ছবিখানার পরিচালনা কোর্‌ছেন শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী।

উত্তরা ও শ্রী

পত্রান্তরে প্রকাশ যে, "রূপবাণী"-র কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গাঙ্গুলী মশাইয়ের মনোমালিন্যের কারণ তাঁরা অবাঙালী প্রতিষ্ঠানের ছবি দেখাচ্ছেন বলে। মনোমালিন্যের কারণ যাই হ'ক, সে বিষয় আমরা এখানে কিছু বলতে চাইনা। কিন্তু এই প্রসঙ্গে সহযোগী ইঙ্গিত কোরেছেন, যে, গাঙ্গুলী মশাই তা' হ'লে 'কর্ণওয়ালিসের' উদ্বোধনে—অবাঙালী প্রতিষ্ঠানের যে ছবি নিয়ে বিচ্ছেদের উদ্ভব হ'য়েছে, সেই ছবি কিরূপে দেখাচ্ছেন। সহযোগীর অবগতির জন্য গাঙ্গুলী মশাইয়ের কাছ থেকে এ বিষয় অনুসন্ধান নিয়ে আমরা জানাচ্ছি যে, এই চিত্রগৃহ দু'টী গ্রহণের পূর্ব্বে পূর্ব্বেকার মালিকরা যে ছবিগুলি দেখাবার বুকিং করেন সেগুলি গাঙ্গুলী মশাই দেখাতে বাধ্য। সেই কারণেই 'ক্রাউনে'—"ফ্যানটম্ অফ্ ক্যালকাটা" ও 'কর্ণওয়ালিসে'—"মানময়ী গার্লস স্কুল" দেখানো হয়। তা'ছাড়া একথাও এখানে উল্লেখ কোর্‌তে হয় যে. গাঙ্গুলী মশাই এ দু'টি চিত্র-গৃহের উদ্বোধন কার্য্য এখনও সম্পন্ন করেন নি। আস্‌চে ১০ই "উত্তরা" নাম নিয়ে সুসংস্কৃত হ'য়ে 'ক্রাউন' মূর্ত্তি, পরিগ্রহ কোর্‌বে। আর 'কর্ণওয়ালিস' "শ্রী" রূপে আত্মপ্রকাশ কোর্‌বে আস্‌ছে মাসে।

পপুলার পিক্‌চার্স

আস্‌চে ১০ই এদের বহু-প্রতীক্ষিত "মন্ত্র-শক্তি" 'উত্তরায়'-য় উদ্বোধিত হবে। মঞ্চের মত পর্দ্দায়ও যদি ছবিখানি জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠে, তা' হ'লে আমরা কর্তৃপক্ষের শ্রম সার্থক মনে কোর্‌ব।

জ্যোতিষ বন্দ্যো ও পায়োনিয়র

'ছায়া'র প্রচার-সম্পাদক আমাদের জানাচ্ছেন, রাধা ফিল্মের পরিচালক শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পায়োনিয়রের হ'য়ে "চন্দ্রশেখর" তোলবার জন্য নিয়োজিত হ'য়েছিলেন এবং তিনি একহাজার টাকা নিয়ে রসিদও সই কোরেছিলেন কিন্তু এখন তিনি উক্ত কার্য্যে যোগদান কোর্‌তে অস্বীকৃত হ'য়েছেন। এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা যদি ইচ্ছা করেন তা' হ'লে ১৭০নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে গিয়ে উক্ত রশিদ দেখে আসবার জন্য কর্তৃপক্ষ আহ্বান কোরেছেন। পরে এ বিষয় আমরা যথাযথ ব্যাপার সাধারণকে জানাব।

রাজপ্রসাদ ও রাজপুতনার আরও অনেক রমণীয় স্থানেও গৃহীত হ'য়েছে। এই বিষয় চিত্রখানিকে সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল কোরে তুলবার জন্য পরিচালক ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় আপ্রাণ চেষ্টা কোরেছেন। প্রযোজক বি, এল, খেমকা এই চিত্র তুল্‌তে এক লক্ষ টাকা খরচ কোরেছেন। এজন্য আশা করা যায় যে ছবিখানি বাঙ্গালা কথা চিত্রে নতুন কিছু দেখাতে সমর্থ হবে। রায় বাহাদুর নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাস্যরসাত্মক শ্রেষ্ঠ প্রহসন "রাতকানা" ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মের আর একখানা নবতম সৃষ্টি, ইহাও "বিদ্রোহী"র সঙ্গে 'রূপবাণী'তে দেখান হবে।

=নিবেদন=

"খেয়ালী"র পঞ্চম জন্মতিথিতে আন্তরিক শুভ কামনা জ্ঞাপন করিয়া ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন, যে "ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বাংলার দাবী ও স্বার্থগন্ধহীন জনসেবার গৌরব "খেয়ালী"র সতেজ লেখনীমুখে পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।" তাঁহার এই শুভকামনা শিরোধার্য্য করিয়া বাংলার জাতীয়তার আদর্শের নির্ভীক মুখপত্ররূপে নবরূপে ও নবসাজে "খেয়ালী"র প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার দায়িত্বভার গ্রহণ করিলাম।

দেশবন্ধু-প্রতিষ্ঠিত ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর পরিচালিত ফরওয়ার্ড-সঙ্ঘে যে অনাবিল স্বদেশপ্রেমের আদর্শ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার স্মৃতি এখনও আমার মন হইতে বিদূরিত হয় নাই। অতীতের সব গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া স্বার্থগন্ধহীন জনসেবার গৌরবে "খেয়ালী"র শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

বাংলার সাহিত্যিক ও সাংবাদিক সুধী সমাজের নিকট আমার এই নব কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় অকুণ্ঠ সহযোগীতা কামনা করিতেছি।

শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়
সম্পাদক, "খেয়ালী"

"বিদ্রোহী"

৩রা আগষ্ট শনিবার 'রূপবাণী'তে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফিল্মের নতুন রোমাঞ্চকর চিত্র "বিদ্রোহী"র শুভ উদ্বোধন হবে। অহীন্দ্র চৌধুরী, ভূমেন রায়, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, জ্যোৎস্না গুপ্তা, ডলি দত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অভিনেতৃরা এই চিত্রে আত্মপ্রকাশ কোরেছেন। বীরত্বময় রাজপুত জীবনের রোমাঞ্চকর এই চিত্রটী আরাবল্লীর পর্ব্বতের বিভিন্ন প্রদেশের, জয়পুরের

অমরেশ ও মীনা

নাটক

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অমরেশ—(হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল) তা হয়না বটে!

দীপক—কিন্তু তোমার সে আব্দুল গেল কোথা? তাকে তো দেখছিনা?

অমরেশ—তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। মীনাও তাকে আর রাখতে চাইলে না।

দীপক—কারণ?

অমরেশ—কারণ, মুসলমান আর provide কর্ব্বনা।

দীপক—অ্যাঁ! Communal ব্যাপার নাকি?

অমরেশ—কতকটা তাই। দেশে হিন্দু সংগঠনের দিন্ এসেছে। চাই হিন্দুকে রক্ষা করা। আমি তাই সমস্ত মুসলমান চাকরদের ছাড়িয়ে দিয়ে হিন্দু চাকর রেখেছি!......

দীপক—আমি সেই মুসলমানগুলোকে রাখতে চাই। তুমি তাদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়োত'!

অমরেশ—দোব। হিন্দুগুলোকে ছাড়িয়ে দেবে না কি?

দীপক—দোব। তুমি হাস্‌ছো অমর?

অমরেশ—হাসির কথা, হাসবো না!

দীপক—না হাসবে না, এ হাসির কথা নয়। তুমি কি ভাবো হিন্দু সংগঠন করে 'হিন্দুস্থানের কোন উপকার তুমি সাধন কর্ত্তে পারবে? পারবে না। পারবে শুধু ঝগড়া কর্ত্তে, আর কিছুনা!

অমরেশ—(হাসিয়া) তবে কি মুসলমান সংগঠন কোরতে বলো?

দীপক—না—তাও বলিনা।

অমরেশ—তবে? তবে কি কোরব বলো?

দীপক—কিন্তু সে কথা থাক্। তুমি আব্দুলকে আমার কাছে বরং পাঠিয়ে দিও আমি তাকে রাখবো।

(এই বলিয়া দীপক দ্রুত আহার করিতে লাগিল)

অমরেশ—তা দোব পাঠিয়ে, কিন্তু তোমার মতটা শুনলে আমাদের উপকার হয়তো' হ'তে পারবে।

দীপক—উপকার! (বলিয়াই হঠাৎ হা' হা' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন) আমার মতামতে কারুর কোন উপকার হয় না অমর। সকলে বরং ঠাট্টাই করে। কিন্তু আমার মত কি জানো অমর?

(এই পর্য্যন্ত বলিয়া সহসা গম্ভীর হইলেন এবং প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন)।

আমার মতে হিন্দু-মুসলমান এ দুটো জাতকেই ভেঙ্গে গড়তে হবে। এদের দুটোরই ধর্ম্মের বাইরের আবরণ বদলে দিতে হবে:—ভুলে দাও হিন্দুস্থানের শতাব্দীজীর্ণ দেবতার আবাসগুলি। নূতন করে দেবালয় স্থাপন করো—নূতন পরিকল্পনায়! মন্দিরে মিশুক মসজিদ্, মসজিদে মিশুক মন্দির! হিন্দুকে হিন্দু ব'লে ডাকা ছাড়ো, মুসলমানকে মুসলমান বোলে ডেকো না। হিন্দু-মুসলমানকে বলো 'ভারতীক্'!—এক দেবালয়ে ওরা আরাধনা করুক্, এক মন্ত্রে ওরা দীক্ষিত হোক্—একটিমাত্র সাধনায় ওরা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠুক!—মহাদেব নয়, রাধাকৃষ্ণ নয়, আল্লা নয়, খোদা নয়; দেবালয়ের মধ্যে থাকুক্ শুধু এক মূর্ত্তি, এক চিত্র—সে ভারতবর্ষ!

(কথা শেষ হইলে দীপক ও অমরেশ দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অল্প পরে দীপক কথা কহিল)।

দীপক—কথা কও না যে অমর?

অমরেশ—এর পর কি কথা কইবো খুঁজে পাচ্ছি না।

দীপক—এইবার তোমার নিজের কথা বলো।

অমরেশ—সেও যেন হারিয়ে গেল। দুঃখ যেন আর কিছুই রইলো না!

দীপক—তাহ'লে এখন থাক্, রাত্তিরে এসে শুনবো। (হাসিয়া) তখন হয়তো দুঃখের বীণা আবার বেজে উঠলেও উঠতেও পার্ব্বে!

দীপক—একি! চারটে বাজলো! আমায় এখুনি যেতে হবে।

অমরেশ—কোথায়?

দীপক—ডাঃ কিচলু চারটে পঁয়তাল্লিশের ট্রেণে কলকাতা আস্‌ছেন, তাঁকে রিসিভ্ কোর্ত্তে যেতে হবে।

অমরেশ—তুমি না গেলে চলেনা?

দীপক—পাগল! আমি না গেলে চলে!

অমরেশ—কিন্তু, রাত্তিরে নিশ্চয়ই এসো, আমার অনেক কথা তোমার জন্য তোলা রইলো।

দীপক—নিশ্চয়ই আসবো। এসে সমস্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি কোরে দোব। কোন ভয় কোরো না, ভয় ক'রেছ কি গেছ'!—চললুম, আর আমার সময় নেই।

অমরেশ—এসো। কিন্তু একটা কথা তোমার এখনই জেনে যাওয়া উচিৎ।

দীপক—বলো—

অমরেশ—আমি তোমায় ভালোবাসতাম, আজ তোমায় শ্রদ্ধাও জানাচ্ছি!

দীপক—শ্রদ্ধা!—বাপ্‌রে বাপ্! কথাটা আমার স্ত্রীকে শুনিয়ে দিও ভাই, তার কাজে লাগতে পারে; আমায় বলা বৃথা।

(ব্যস্তভাবে প্রস্থান)

(অমরেশ সহাস্যমুখে মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া রহিল, পরে বিপরীত দিকে ফিরিতেই দেখিল—মীনা দাঁড়াইয়া আছে। মীনা ধীরে ধীরে অমরেশের অতি সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল)

মীনা—চিঠি লিখেছিলে শুনলাম ?

অমরেশ - হ্যাঁ—

মীনা—চিঠিখানার ভেতরে শুনলাম মিনতি ছত্রে ছত্রে! অনেক কথাও নাকি বলবার আছে তোমার ?

অমরেশ—হ্যাঁ—

মীনা—আমি জান্তে পারি কি সে কথা ?

অমরেশ—না—

মীনা—কিন্তু চিঠিখানার মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ হয় আমি ?

অমরেশ—এ সব কথা আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে ক'রতে পারছি না !

মীনা—প্রয়োজন হয়তো মোটেই নেই, কিন্তু আমায় এ রকম করে কতদিন তুমি রাখতে চাও ?

অমরেশ—এ কথার মানে বোঝা শক্ত।

মীনা—বুঝতে ইচ্ছা করলে বোঝা যায়। সমস্ত রাত্রি বারান্দায় পায়চারি কর্লে বোঝা যায় না !

অমরেশ—অত্যন্ত সুখের বশবর্ত্তী হয়ে যে সমস্ত রাত্রি ধরে বারান্দায় পায়চারি করি, তা বোধ হয় নয় ?

মীনা—তা নয় জানি। কিন্তু আমিই কি খুব সুখে বিছানায় শুয়ে থাকি ব'লে তোমার মনে হয় ?

(সহসা কাঁদিয়া ফেলিল ও তাহা দেখিয়া অমরেশ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল কিন্তু মীনা তাহাকে ধরিল)

একটা কথা আমায় বলে যেতে হবে।

অমরেশ—বলো—

মীনা—আমার অপরাধ কি এমনই গুরুতর যে আমায় মাপ্ করা যায় না ?

(অমরেশ সহসা কোন কথাই বলিতে পারিল না) চুপ্ করে থেক' না, বলো ?

অমরেশ—আমাকে তুমি কখনোও এ-রকম প্রশ্ন করবে এ আমার ছিলো কল্পনার অতীত।

মীনা—জানি, স্ত্রী তোমার কাছে মাপ্ চায় এ তুমি সহ্য কোরতে পার না। চাইবার আগে তুমি তাকে ক্ষমা করো। তাই না আমার এত সাহস! তাই না তোমার সামনে দাঁড়িয়ে এতো অপরাধেরও ক্ষমা চাইতে পারছি !

অমরেশ—কিন্তু এ'তো অপরাধ নয় মীনা। ভালবেসে যদি কাউকে—

মীনা—ছাই ভালোবাসা ! ভালো আমি কাউকে বাসিনা, বাসতে পারি না ! একথা আর কেউ না বুঝুক, তুমিও কি বুঝবে না ? তোমারও কি ভুল হবে ?

অমরেশ—বুঝতে যে আমি পারিনি, ভুল যে আমার হয়—সে কি আমারই দোষ ?

মীনা—না, দোষ আমার। তোমার নয়। আমি তোমায় গান্ শোনাতে চেয়ে পারিনি, —চ'লে গেছি প্রকাশের বাড়ী। তুমি অপেক্ষায় ব'সেছিলে সারারাত, আমি ফিরিনি ! আকাশের চাঁদ চেয়ে চেয়ে ডুবে মরে গেল, আমি প্রকাশের সেবায় ব্যস্ত রইলুম। ফিরেও দেখলুম্ না !—দোষ আমার নয় তো কার ! কিন্তু তুমি,—কেন আমায় যেতে দিলে ? কেন আমায় ছেড়ে দিলে ? কেন আমায় জোর ক'রে আট্‌কে রাখলে না ?

(প্রবল উচ্ছ্বাসে তাহার স্বর কম্পিত হইয়া উঠিল, সে দ্রুত সরিয়া যাইয়া একখানি কৌচে গিয়া বসিয়া পড়িল ও রুদ্ধ আবেগে অবনত হইয়া রহিল—অমরেশ ধীরে ধীরে তাহার পাশে গিয়া বসিল)

অমরেশ—মীনা চুপ করো। যা হ'য়ে গেছে তা যেতে দাও, তুমি সত্যই বলেছো তোমাকে আমার যেতে দেওয়া উচিৎ হয়নি। তোমায় ধরে রাখা উচিৎ ছিলো—কোহিনুর যেমন করে লোকে বুক দিয়ে আগলে রাখতে পারে, তেমনি ক'রে। এ আমারই ভুল, আমায় তুমি ক্ষমা কর মীনা।

মীনা—না, না—তুমি ও কথা বলতে পাবে না। আমি শুনবো না। তুমি আবার কিসের জন্য হীনতা প্রকাশ কর্ব্বে আমার কাছে ?—বরং আশীর্ব্বাদ করো যে, যে-জিনিষ তুমি আজ আমায় ফিরিয়ে দিলে, কখনও যেন আমি তা আর হারিয়ে না ফেলি !

অমরেশ—আশীর্ব্বাদ নয়—প্রার্থনা ! আজ শুধু প্রার্থনা কোরব যে, আজকের মিলন আমাদের চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকুক্ !

মীনা—(তরল হাস্যে) আর তো কোন ঝগড়া নেই ?

অমরেশ—না।

মীনা—তা হ'লে সেদিন যেখান থেকে ছন্দপতন হ'য়েছিল সেইখান থেকে আবার সুরু করি ?

অমরেশ—মানে কি ?

মীনা—মানে—সেদিনের সেই গান্ শোনা ! যে অ-সমাপ্ত সুর সেদিন বন্দী হ'য়ে রইলো, তাকে মুক্তি না দিয়ে তো আমি পারবো না !

অমরেশ—কিন্তু আজতো ফুল নেই।

মীনা—আজ তুমি আছো—নেই বা থাক্‌লো ফুল ?...

(এই বলিয়া মীনা পিয়ানোয় বসিয়া গান ধরিল কিন্তু প্রথম লাইন গাহিতে গিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল)

অমরেশ—ও কি ! ও সব চলবে না।

মীনা—আচ্ছা আর হবে না।...

(মীনা গাহিতে লাগিল)

গান

"দয়া দিয়ে হবে গো মোর
জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার
চরণ ছুঁতে।
তোমায় দিতে পূজার ডালি
বেরিয়ে পড়ে সকল কালী,

পরাণ আমার পারিনে তাই
পায়ে থুতে।
এতদিন ত ছিল না মোর
কোনো ব্যথা,
সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ছিল
মলিনতা।
আজ ঐ শুভ্র কোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে
দিয়ো না গো দিয়ো না আর
ধূলায় শুতে॥"

(অন্তরা যখন চলিতেছে তখন তাহার মুখে দিব্য হাসি। গান একবার শেষ হইয়া পুনরাবৃত্তির সময় সহসা টেলিফোন বাজিয়া উঠিল ও মীনা সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। অমরেশ রিসিভারটি তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন "হ্যালো")

অমরেশ—"হ্যালো"।
" "কে ?"
" "ও ! প্রকাশ !"
" "কি বলছো বলো ?"

(রিসিভার কানে দিয়া অমরেশ প্রকাশের কথা শুনিতে লাগিল ; মীনার মুখ ইতিমধ্যে ফ্যাকাশে হইয়া গেছে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া টেলিফোনের দিকে চাহিয়া রহিল)

অমরেশ—প্রকাশ তোমায় একবার টেলিফোনে চাইছে।

মীনা—আমি পারবো না কথা কইতে, বলে দাও।

অমরেশ—"হ্যালো !—ও এখন আস্‌তে পারবে না বল্‌ছে "...

(রিসিভার কানে লাগাইয়া প্রকাশের কথা শুনিয়া)

অমরেশ—প্রকাশ বলছে, একবারটি তুমি কথা কও, ওর কি বিশেষ কথা আছে।

মীনা—আমি পারবো না। তুমি টেলিফোন রেখে দাও।

অমরেশ—(টেলিফোনে প্রকাশকে) "ওহে, ও এখন আসতে পারচে না, যদি কিছু বলবার থাকে আমায় বলো।

(প্রকাশের কথা শুনিতে লাগিল। পরে মীনাকে বলিল)

প্রকাশ বলছে—আমি মিনতি "কর্চি, একবারটি তুমি এসো। একটিবার মাত্র"

মীনা—না, না ! আমি পারবো না—

(মীনার প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

বালিগঞ্জের লেকে

শ্রীশচীন্দ্রকুমার ঘোষ

বেলা-শেষে অস্তাচলের মূলে কনক-বরণ ক্লান্ত অরুণ আলো
যখন চ'লে গেলো—
দিক্-বালিকার কপোলতলে বিদায়-ক্ষণের রাঙা পরশ এঁকে,
আমি তখন বালিগঞ্জের লেকে—
আপন মনে দেখছি বসে কতো।
দীর্ঘ-দেহী বোটগুলো সব বুকে নিয়ে তরুণ তরুণীরে—
জলকেটে ঐ ছুটছে ক্ষেপার মতো।
আর, ওপারের ঘন বনচ্ছায়া
কাকচক্ষু জল-মুকুরে—দেখ্‌ছে আপন ঝিলি মিলি কায়া।
অদূরেতে দোল লোহার পুলে
কোমল-কঠিন পায়ের চাপে ভীরু সেতুর শীর্ণ দেহখানি —
শিহরিয়া উঠছে দোদুল দুলে !···
এমনি আরও কতো
হাসভরা কী কলরোল লেকের বুকে চলছে অবিরত।
চারিদিকে পুলক খেলা মোর
নয়নেতে মাখিয়ে দিল
কী এক স্বপন ঘোর !···
সহসা সে হারিয়ে ফেলা স্মৃতি বীণার সুর
ক্ষণেক তরে করল আমার অন্তর ভরপুর
করুণ তানে বেজে—
"অচেনার ঐ আঁখির আড়ের মৌন সলজ্জ ভাষা
বড়োই মধুর সে যে !"···
এ জীবনে মম
পথের পাশে ফুটে ওঠা, শুকিয়ে যাওয়া শিথিল পুষ্প সম
মিশে গেছে সে মূর্চ্ছনা অতীত কালের বুকে
বেদন বিধুর মুখে !···
আজ সহসা মৃদু সুবাস তা'র
ঝাপটা হাওয়ায় ভেসে এলো অন্তরে মো'র করে গেলো
স্মরণ সঞ্চার !
···সুদূর পানে তাকিয়ে দেখি মৌন ভীরু যেন কে এক মেয়ে
অধীর ধরার পানে আছে সকৌতুকে চেয়ে ;
লুটিয়ে প'ল লেকের বুকে আঁচলখানি তা'র,
স্বপন আমার পাড়ি দিলো অন্ধকারের পার !···

ডায়েরীর ছিন্ন-পত্র

প্রথম ও প্রেম ৩ রঞ্জন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একা—

আমি চলেছি একা !—

বাবা আছেন, মা আছেন, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই আছে, তবুও আমি একা—আমি আমার জীবন-রচা পথে চলেছি একেলা, সেখানে নেই কেউ—নীরব, নির্জ্জন, গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা—

জীবন-প্রিয়া আমায় ডেকে বলে :

ওগো, বড়ো যে ব্যথা !...

আমি ভাবি, তাইতো !...

কিন্তু কী যে ব্যথা বুঝতে পারি না ; তবুও যেন মনের অগোচরে বাজে এক ব্যথা, না-জানা-ব্যথা।...সে ব্যথার নেই অবসান।...তাতে আছে এক অবসাদ।.....সে চায় বিশ্রাম, তবুও সে টেনে নিয়ে যায় অনেকদূর ; চলন্তিকা আমি, চলি, কিন্তু মনের অগোচরে থেকে থেকে এই কথাই জাগে, কেন যাই, কেন চলি, চলায় কি আছে, চলার অবসান কোথায় ?...

বুঝি না, তবুও চলি।......

চলার মাঝে হঠাৎ যদি নিস্তেজের আমেজ-টুকু দেখা যায়, অমনি বাইরের কথা আমায় জানায় ; ওরে চল্ চল.....

ঠিক দীপশিখার মতনই চলি।......

এমনি চলার পথে চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ অশ্রুর সাথে দেখা।—

অশ্রু, কি জানি কেন, আমায় ইসারায় ডাকে, বলে :

পথিক, আমি তব হব সাথী।...

আমি হাসি, নিরর্থক সে হাসি।—

তাকে বলি :

বান্ধবী, এ চলার মাঝে আছে যে শত বাধা ! .....

অশ্রু আমার হাতদুটি ধরে মিনতি-মাখা সুরে বলে :

তবুও.....।

সে চায় আমায়—

আমি বলি তাকে :

এই অনন্ত পথে বিশ্বের অভিসার যাত্রা। তুমি, আমি, চেতন, অচেতন সকলেই চলেছে নিজের জীবনকে স্বচ্ছ সুন্দর ক'রে, তাদের মনের বাসনাকে রঙিন ফলকে ফলিয়ে, কল্পনাকে রঞ্জিত ক'রে দিয়ে ...তুমি এসো না প্রিয়া আমার, তোমার জীবনকে পঙ্কিল পথে ফেলো না।

তবুও অশ্রু আসে, আমার জীবনের পথে এসে দাঁড়ায়, শত স্মৃতির মাঝে তার সে স্মৃতি মধুর হ'য়ে দাঁড়ায়......

মানুষ চায় আরো, আরো, বাসনার সীমাকে পেরিয়ে যেতে চায় যেন...

অশ্রু আমায় টেনে নেয় তার বুকে, প্রথম সোহাগ-চুম্বন পরশ পায় তার ঠোঁটে ; বুকের বাঁধন ভেঙ্গে যায় তার, সুদূরে হারিয়ে যাওয়া স্বপনমাখা আঁখিদুটি তুলে আমার দিকে চেয়ে বলে :

ওগো, আমি তোমার, তুমি আমার !...

সুন্দর সে, আমার প্রিয়া সে যে।...

অলক্ষ্যে থেকে সে এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, আমার জীবনের সবটুকু আসন সে কেড়ে নেয়, বলে আমায় :

আসনে বোসবো আমি, একা ; থাকবে না তাতে কেউ। যদি আসে, দূর হ'তে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবো অন্য পথের দিকে.......

সেই অশ্রু, আমার প্রিয়া, আমার প্রেয়সী ; আমার জীবন-পথে চলা যাত্রী—

অশ্রু আর নেই।...

কাল তাকে চিতাবুকে তুলে দিয়ে এসেছি আমি নিজে, এই দু'হাত দিয়ে।...

সারা আকাশ, সারা বাতাস, সারা পৃথিবী এখন আমার চোখের সামনে আঁধার, ঘন-ঘোর আঁধার, মসীমলিনে ঢাকা এমনি গাঢ় আঁধার...

চারিদিক ছেয়ে কান্নার রোল ভেসে আসে আমার কানে—

আর সেই কান্নার মাঝে থেকে থেকে ভেসে ওঠে অশ্রুর শেষ মিনতি...

রঞ্জনদা, জীবনের শেষ আশা আমার পূরণ ক'রে দাও।.. তোমার কাছে কখনোও মুখ-ফুটে কিছু চাই নি, আজ চাইছি।...আমি ভাল বেসে এসেছি তোমায় আজীবন ধ'রে, নিজের জীবনকে এমনি ভাবে কাটিয়ে দেবো ব'লে বাবা মায়ের শত অনুনয়েও বিয়ে করিনি।.. আজ শেষবার, শেষ মিনতি আমার ; তুমি মুখ ফুটে একবার বলো, তুমি আমায় ভালবাসো কি না।...

ঘর ভর্ত্তি লোক, অশ্রু প্রলাপ বকে, আমার হাতদুটি তার বুকের ওপর ধ'রে রাখে।...

যে মেয়ে মুখ ফুটে কখনো কোনো কথা বলেনি কাউকে, সেই আজ অকুণ্ঠিত-চিত্তে সকলের সামনে বলে।...

বুকের ভেতর কীসের বেদনায় যেন গুম্‌রে মরি।...

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।...

অশ্রু আমার দিকে সজল চোখে চেয়ে বলে :

কাঁদছো তুমি ! ওগো, না, না, কেঁদো না।...আমি জানি, বেশ ভাল ক'রেই জানি,

তুমি আমায় তোমার চলার পথে যেতে মানা ক'রেছিলে ; তুমি চেয়েছিলে একাই চ'লতে, কিন্তু আমি দিইনি তোমায়, তোমার জীবন-কুঞ্জের রাণী হ'য়ে বোসেছিলাম এতোদিন। ...আজ বিদায় দিও।...বিদায় ক্ষণে জানতে চাই আমি শুধু তোমার ব্যথার ব্যথী হোয়েছি কি না।...

মাথা আমার টন্ টন্ ক'রে ওঠে···

অশ্রুর বুকের ওপর মাথা রাখি...

সে আমায় তার শীর্ণ বাহুদুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরে...

তারপর।...

হ্যাঁ, তারপর, সব শেষ...

অশ্রু চ'লে গেছে ; আমার জীবনকে কেড়ে নিয়ে চ'লে গিয়েছে যে সে !...

আজ শুধু তারই কথা মনে পড়ে—

এই দুনিয়াদারীর কাছে জানতে চাই, অশ্রুর ভালবাসায় আমার কী হয়েছে ?—

———

"অনেকগুলি হারানো সুরের একটি"

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মেসের একটি নির্জ্জন কক্ষে অপলকা তক্তার উপর শুয়ে শুয়ে নিজের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের কথাই ভাবচি। আত্মীয় স্বজন এবং প্রিয়জনদের আমার কাছ থেকে তফাতে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে রাখায় মহাকালের কী যে তৃপ্তি সেটা শত চেষ্টা করেও বুঝতে পারছি না। নিজের সামর্থ্য বলতে একটুও নেই, নেই নিজের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য। মহাকালের সামান্য একটু চটুল নয়নের অপাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গিমায় যন্ত্র চালিতের ন্যায় ওঠানামা করচি। থেকে থেকে বিদ্রোহী মন দুর্জ্জয় ক্রোধে এর বিরুদ্ধে অভিযান করবার জন্যে রীতিমত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু পুঞ্জীভূত বিরাট অদৃশ্য শক্তির কাছে আপনা হতেই মাথা নত হয়ে আসে।

মেসের জীবন। প্রতিটি দিবসের এক-ঘেয়ে নিরানন্দ জীবনযাত্রার পৌনঃপুনিক আবৃত্তি আর ইচ্ছে হয় না। এ লেখায় না আছে আত্মতৃপ্তি, না আছে বৈচিত্র্য। পদে পদে নিজেকে নিজেরই কাছে হেয় বলে মনে হয়, পরকে কথার রঙীন ছটায় মুগ্ধ করতে কেমন যেন সঙ্কোচ আসে। তা ছাড়া সব গুছিয়ে লেখবার মত আমার সামর্থ্যও নেই।

এমন সময় চাকরটা সুনন্দার হাতের-লেখা খামের চিঠি এবং পার্শ্বেলে পাঠানো কতক-গুলো গোলাপফুল এনে দিলে। ফুলের পার্শ্বেলটি তাড়াতাড়ি খুলে ফেললুম। দূর থেকে আসার দরুণ বিকসিত পুষ্পের সুমিষ্ট সৌরভ নষ্ট হয়ে গেছে। যেটুকু আছে রাতের রজনীগন্ধার সমস্ত রাত নিজেরে অন্তরের লুকানো যৌবন-সুরভি বিলিয়ে ঊষার নবীন

আলো ধরার বুকে ছড়িয়ে পড়বার সাথে সাথে যে রিক্ত পাণ্ডুরতা ঠিক সেইরূপ। দু'দিন আগে এদের যে রূপসম্ভার ছিল আজ তা নেই। যেটুকু আছে তার মধ্যে ফুটে উঠেছে অকাল-মৃত্যুর করুণ ছবি। আজ এরা নিঃসম্বল, আবর্জ্জনার স্তূপে নিঃসঙ্কোচে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সুনন্দার দান এরূপ ভাবে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকবে, মন তাতে কিছুতেই সায় দেয়না।

চিঠিখানা খুলতে কেমন যেন ভয় করচে। যাকে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে একদম প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। তাকে আবার বেদনাপ্লুত অন্তরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ দিয়ে একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চাই না। যে যবনিকা পড়ে গেছে সেটা অন্ধকারের জঠরে বিলীন হয়ে থাক। কিন্তু পারলুম না। চিঠিটা অগত্যা খুলতেই হলো। সুনন্দা লিখেচে—সুবোধদা, তোমার জন্মতিথি উপলক্ষে আমার অন্তরের প্রীতি-উপহার গ্রহণ কর। তুমি কেমন আছো? চিঠি পত্তর দাওনা কেন? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ভাবলুম চিঠির কোন উত্তর দেবোনা। কী হবে পুরানো বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে দু'চারটে কথা বলে? শেষে চিঠি লিখতেই হলো। জবাব না দেওয়া অসভ্যতা।

সুনন্দা, কী আশ্চর্য্য দেখেছো—থাক, ওকথা তোমাকে এখন জানিয়ে কোন লাভ নেই। আগে তোমাকে আমার অন্তরের শুভেচ্ছা জানাই। তুমি এখন যে আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে পড়েচো তার আবেষ্টনীতে তোমার অন্তরের অবারিত আকাঙ্খা, না না আনন্দের বিচিত্র সমাবেশ আরো সুমধুর এবং গৌরবস্ফীত হয়ে উঠুক এই কামনাই করি।

নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস দেখেছো, সুনন্দা? তুমি এখন অপরের গৃহিনী এবং যে জায়গায় তুমি আছো সেইটাই এখন তোমার দেশ, তোমার কল্পনাতীত স্বর্গ। আর আমি—

প্রত্যেক মানুষের জীবনে এমন একটি শুভমুহূর্ত্ত আসে যে সময় তার জীবনটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে রসঘন বাস্তবতার বিচিত্র মাধুরিমায়, তার বেঁচে থাকার প্রকৃত সার্থকতায়, তার ভবিষ্যতের সত্যিকার সম্ভাবনায়।

তোমার চিঠির প্রতিটি ছত্রে আনন্দের দ্যুতি বিচ্ছুরিত। মনে হচ্চে আমিও এর কিছু অংশ উপভোগ করবার চেষ্টা করচি, যে আনন্দের বিমল পরিবেষ্টন আমার পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেচে।

সুনন্দা, তুমি তোমার চিঠিতে আভাসে, ইঙ্গিতে একটু জমিয়েচো যে সাত বৎসর আগে ভবিষ্যতের রঙীন কল্পনায় এই মাটির বুকে দুটী তরুণ প্রাণ অজানা আশঙ্কার সুখকল্পনায় অস্থায়ী নীড় রচনায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। এটা কি এখনো তুমি স্বীকার কর?

সাত বৎসর আগেকার করুণ ইতিহাস।

কিন্তু তোমার চিঠি পড়ে কী মনে হয় জানো? তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ির পর কত যুগ যেন কেটে গেচে। মনে হয় কোন স্মরণাতীত যুগে স্বপ্নাচ্ছন্ন মেঘমেদুর বর্ষার প্রথম অরুণালোক তোমার আমার আকস্মিক পরিচয়—যেন ক্ষণিকের বিদ্যুৎ দীপন। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি দৈব দুর্ব্বিপাকে যে দুটী প্রাণ ছিন্ন হয়ে গিয়ে বিভিন্ন পথ ধরে চলেছে এখন তারা কী ভাবে সময় কাটাচ্চে। আমার অন্তরের ভাবপ্রবণতা ত্রুটী বিচ্যুতি এগুলোর এখন তোমার কাছে কোন দাম নেই জানি। সেই জন্য কারুর কাছে কোন কিছু লিখতে ইচ্ছে হয়না। কেন লিখছি একথা হয়তো তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারো, এর উত্তরে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করা আমার সাধ্যাতীত।

এখন কী ভাবে সময় কাটাচ্চি এটুকু বোঝাতে গেলে গত তিন বছরের ঘটনা তোমাকে না বললে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।

অবস্থা বৈগুণ্যে জীবনের সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম-পদ্ধতির বিশিষ্ট ধারা আমার বদলে গেছে। পদে পদে লোকের কাছে হেয়, অপদার্থ বলে প্রতিপন্ন হচ্চি। দেবার মত জিনিষ কিছু নেই। যৌবনের পূর্ণপাত্র অকালে নিঃশেষিত হয়ে গেচে। আছে শুধু বংশের আভিজাত্য গৌরব, চরিত্রের বিমল জ্যোতি। এইটুকু নিয়ে কোনরকম ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছিলুম। ব্যাঙ্কে যা সঞ্চিত অর্থ ছিল একদিন দেখলুম তাও শেষ হয়ে গেচে। যে-বংশগৌরবকে এ্যাদ্দিন

নিজের জীবনের চেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে এসেচি একদিন তাও সামান্য কয়েকটি টাকার জন্যে খুইয়ে বসলুম। মানে একজন বিশিষ্ট বন্ধুর গচ্ছিত রাখা সোনার জিনিষ তার বিনা অনুমতিতে অম্লান বদনে বিক্রী করে চোর অপবাদ নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে রইলুম। ব্যাপারটা শুনে খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, তা জানি, সুনন্দা। আশ্চর্য্য হবারই তো কথা। নিজেকে বাঁচাতে হলে ওছাড়া কোন উপায় ছিল না। যে ঐশ্বর্য্যশালী সুবোধকে তুমি জানতে—তখন তার অপমৃত্যু ঘটেচে। নিজের মান সম্ভ্রমকে বাঁচাবার জন্যে তোমার কাছে কিছু অর্থ চাইতে গেলে হয়তো পেতে পারতুম, হয়তো কেন, এরকম বিপদের কথা শুনলে নিশ্চয় তুমি পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু তোমার কাছে অর্থভিক্ষা করে নিজের মান বাঁচাতে ইচ্ছে হ'লো না। সুনন্দা, মানুষের জীবনে এমন এক আধটা অঘটন ঘটে যার ফলে তার সমস্ত জীবনটা পঙ্গু হয়ে যায়। এ অবশ্যম্ভাবী ঘটনা-স্রোতকে সে কী করে রোধ করবে?

তোমাদের বাড়ীতে তখন আমার নিয়মিত যাতায়াত চলেচে। সে সময়কার কথা তোমার স্মরণ আছে? তখন তোমার বয়স কম ছিল না, সুনন্দা। কৈশোরের সন্ধিস্থল পেরিয়ে তখন তুমি যৌবনে পদার্পণ করেচো। তোমার-আমার নিভৃত আলাপ নিয়ে কত লোকে কত রকম কাণাঘুষো করেচে। অলক্ষিতে চলেচে তখন তাদের সরস রসনার কুৎসিত আলাপ। আমরা তখন তাদের উপেক্ষা করেছিলুম। কারণ, আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ আমরা তখন স্বীকার করে নিয়েচি, যেখানে লোকের কোন কুৎসিত ইঙ্গিত পৌঁছায়না।

বর্ত্তমানে তোমার পরিচিত সুবোধদা একজন পাঁড় মাতাল। মদই আমাকে বাচিয়ে রেখেচে সুনন্দা, মদই আমাকে বিস্মৃতির কোমল পরশ দিয়ে আমার দেহের প্রতিটি উদ্ধত রেখাকে সংহত করে রেখেচে।

আজ খুব ভোরের দিকে একটি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। অবশ্য মদের খোঁজে, কারণ হাতে এক কপর্দ্দকও ছিল না। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো অপ্রত্যাশিত ভাবে। তার ঘরেও জিনিষটা মজুত ছিল। নির্ব্বিকার চিত্তে আকণ্ঠ ভরে তরল গরল পান করলুম। ভাল না লাগায় একটা অজুহাত দেখিয়ে সকাল সকাল বিদেয় নিয়ে রাস্তায় নেমে এলুম।

বেলা বেশী হয়নি। ঘাসের উপর শিশিরের বিন্দু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

চোখ দুটো বেশ ভার বোধ হচ্ছে। দিগন্ত বিস্তৃত শান্ত নীলাকাশের কোলে কিসের খোঁজে দৃষ্টি প্রসারিত করে ধরলুম। কিন্তু সকালের অস্পষ্ট আলোয় সমস্ত আকাশ যেন কুয়াসাচ্ছন্ন তরল অন্ধকারে একাকার হয়ে আছে। মাটির উপর পা পড়ছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না—একটা লঘু ছন্দের অসংযত অস্পষ্ট গতিভঙ্গিমা। মাঝে মাঝে মনটাও তিক্ততায় ভরে উঠচে হারানো জিনিষের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায়।

নেশার মাত্রা বেশী হওয়ায় বাসায় ফিরেই বিছানা নিতে হলো। চিন্তা করবার মত অবস্থাও আমার ছিলনা। অর্দ্ধচৈতন্য অবস্থায় যখন শুয়ে আছি চাকরটা তোমার চিঠি দিয়ে গেল। আর তার সঙ্গে পেলুম জন্মতিথি উপলক্ষে তোমার স্নেহের উপহার—গোলাপ-ফুল।

বিছানায় শুয়ে তোমার চিঠি পড়চি। সামনের জানলাটা খোলা আছে। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মাথাটা অসম্ভব রকম ধরে আছে। চোখের জ্যোতিও ক্ষীণ হয়ে এসেচে।

আমকাঠের অপলকা টেবিলটার ওপর তোমার দেওয়া গোলাপফুলগুলো বিশীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। এক একবার ওদের দিকে চাইচি আর থেকে থেকে অনেক হারাণো কথা অস্পষ্ট স্মৃতির ফলকে ঠেলে ঠেলে উঠচে।

সুনন্দা, তোমার বুদ্ধি আছে এটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। ঠিক সময়েই ফুল-গুলো পাঠিয়েচো। আমার জীবন-আকাশে যখন নেমে এসেচে মৃত্যুর নীল পাণ্ডুরতা, প্রত্যেকটি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যখন চলেচে বিদায় আরতির অভিনব গোপন আয়োজন, অকাল বোধনের ভীতিসঙ্কুল আশঙ্কায় যখন গুণচি প্রতিটি মুহূর্ত্ত, ঠিক সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে জন্মতিথি উপলক্ষে তোমার প্রীতি-উপহার পেলুম। এ জন্ম মৃত্যুর অঙ্কে একটা পরিপূর্ণ বিরতি। ফুল কিনে আমার মৃত্যু বাসর সাজাতে হবেনা, সুনন্দা, সে তুমি নিজেই ব্যবস্থা করে দিয়েচো।

———

সাহিত্য-পরিচয়
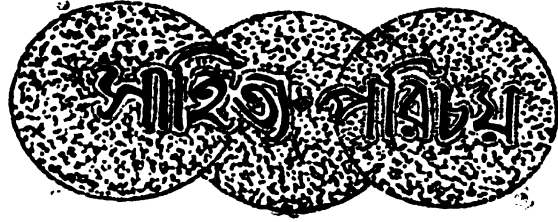
তুষার তীর্থ অমরনাথ—শ্রীনিত্য নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রবাসী কার্য্যালয় ১২০।২ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

লেখক স্বয়ং তুষারতীর্থ অমরনাথ পরিভ্রমণ করিবার সময় পথে যে সকল স্থান দর্শন করিয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন; এবং বিশিষ্ট স্থান সমূহের ছবি দ্বারা উক্ত বর্ণনাকে আরও প্রাঞ্জল করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ভ্রমণ কাহিনী হিসাবে বইখানি খুবই সুখপাঠ্য হইয়াছে। ভাষায় কোন জড়তা নাই। উপন্যাসের ন্যায় ঘটনা-গুলি পর পর সন্নিবেশিত করায় বইখানি একবার পড়া আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। ছন্দের একটানা গতি সকল সময়েই অব্যাহত রাখা হইয়াছে।

কিন্তু ভ্রমনকাহিনী যদি কাহিনীতে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তাহার সার্থকতা কোথায়? নিত্যনারায়নবাবুর পূর্ব্বে আরও অনেকে ভ্রমনকাহিনী লিখিয়াছেন এবং গতানুগতিক ধারাকে বজায় রাখিয়া সকলেই শুধু পথ-চলার বিশদ বিবরণই দিয়াছেন। গবেষকের অন্তদৃষ্টি লইয়া ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, ঐতিহাসিক তথ্যের রহস্যোদ্ধার যদি কাহিনী বর্ণনায় ফুটিয়া না উঠে তাহা হইলে সে কাহিনী অনুসন্ধিৎসু পাঠকের ক্ষুধা কতটুকু মিটাইতে পারে? সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডারেও তাহার দান কতটুকু? কথা-সাহিত্যে রস পরিবেশন করা সাহিত্যের চরম পরিণতি নয়, উহা তাহার একটা অঙ্গ স্বরূপ। সুতরাং কাহিনী যদি তাহার অক্ষয় সম্পদ লইয়া সাহিত্যের ভাণ্ডারে সংযোগ হয় তবে তাহা হয় সম্পূর্ণ—এবং দেখিতে পাই

তাহার সার্থকতা। নিত্যনারায়ণ বাবু সাহিত্যিক আসরে নবাগত নহেন এবং তাঁহার এই বইখানি পাইয়া আমরা ভাবিয়াছিলাম, হয়ত ইহাতে আমরা গতানুগতিক ধারার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইব। কিন্তু সে বিষয়ে আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। নিত্যনারায়ণ বাবু তাঁহার অগ্রগামীদের পথই অনুসরণ করিয়াছেন।

চিত্রে অনেক সময় ঘটনার রূপ পাঠকের নিকট মূর্ত্ত হইয়া উঠে। বইখানিতে বহু চিত্র সন্নিবেশিত থাকায় এ বিষয়ের সার্থকতা হইয়াছে। আগাগোড়া আর্ট কাগজে ছাপা, বাঁধাই সুদৃশ্য এবং প্রচ্ছদপটটি মনোরম হইয়াছে। ভবিষ্যৎ ভ্রমনকারীগণ পূর্ব্বে এ-বইখানি একবার পড়িলে অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।

শ্রীরাধা-চিন্তা (মহামায়া) শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী। কলিকাতা, ৭৭১, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—আট আনা—পৃঃ ৫৪।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায়চৌধুরী মহাশয় ইতিপূর্ব্বে ভক্তি-রসাত্মক অনেক পুস্তকই প্রণয়ন করেছেন—এবং সেগুলি পাঠক ও সুধী সমাজে বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করেছে—এই পুস্তকখানিতেও লেখক সে মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এই পুস্তকে শ্রীরাধাকে উপলক্ষ্য করে লেখক শক্তিতত্ত্বের সুনিপুণ আলোচনা করেছেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

ছিটে ফোঁটা

বজ্রবাহু

বঙ্গশ্রী—শ্রাবণ—১৩৪২

প্রথমেই শ্রীসূর্য্য রায়ের ছবি সন্ধিক্ষণ। মেয়েটির পা অসম্ভব সরু হয়ে গেছে। ঠ্যাং-এর ওপর দিয়েই যেন ভারতীয় চিত্রকলার স্রোত বয়ে গেছে। 'স্মৃতি মন্দিরে' কবি শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের একটা লাইন—

"কাটা সৈন্যের দেহপিঞ্জরে প্রাণপাখী মরে লাজে"—উপমার কী বাহার—বলি কাটা সৈন্য কাকে বলে?—এহেন কাব্য পড়লে প্রাণপাখী যাদের আছে তাদের কাটা সৈন্যের মতোই অবস্থা হয়।

শ্রীরমা প্রসাদ চন্দের "জাতি গঠন ও কুসংস্কার" মানে—আবোল তাবোল—বাতুলের প্রলাপোক্তি। চড়কা (!) কী জিনিষ? চরকাতো জানি। চড়কা কী চন্দ মহাশয়ের সুসংস্কার?—

*　　*　　*

শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের "একপথ" গল্প না কী? একটি ছেলে বন্ধুর বোনকে ভালোবেসে বিয়ে কর্ত্তে না পেরে আত্মহত্যার তোড়জোড় করেও অকৃতকার্য্য—শেষে অন্যত্র বিবাহ! প্লটেরও একপথ। এত লিখ্‌লে প্লটের দুর্ভিক্ষ হবে না!—আবার ছাইকলজির চেষ্টা আছে, আর আছে

চট্ চট্ চট্ আর নিউ প্যারা। টেনে বোনা আর কাকে বলে!

* * *

প্রতীক্ষিত—কবিতা কার? শ্রীঅনুরূপা দেবীর। পড়লে এঁর উপন্যাসের প্রতিও শ্রদ্ধা উঠে যাবে। তিনি যেন অনুগ্রহ করে আর কবিতা না লেখেন।

* * *

হ্যাঁ, কবিতা লেখা উচিত—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের, যাকে সম্প্রতি "উনপঞ্চাশীতে" পেয়ে বসেছে। 'মেঘের মমতা' 'বসন্ত তিমির', 'উনপঞ্চাশী বেগ'—কী নেই? সবই আছে—কেট্ কেট্ গরম। নেই শুধু মানে। কেন লেখে এরা?—কাব্য কি এতই সস্তা?

* * *

পূর্ব্বাচল—আষাঢ়, ১৩৪২

কভারে লেখা আছে "উপাদেয় মাসিক!" লেখা উচিত ছিল 'মুখ রোচক' কিংবা 'সুখাদ্য' যদিচ মাসিকখানাকে লাগলো 'অখাদ্য'। পূর্ব্বাচল নামটাও যেন পদ্মাপারের। এই পদ্মাপারের কাগজে একটি পদ্মাপারের ঘটনা আছে। শ্রীঅনাথ গোপাল সেনের "বাজে-মেয়ে"তে লেডি সিন্‌হার মুখে একটি কথা আছে—"পদ্মাপারের মেয়েরা আমাদের সমাজের ভাল ভাল ছেলেগুলিকে বশ করছে। এরা মুখে সর্ব্বদাই বলে ওদের দেশ হচ্ছে মেয়েদের স্বর্গ। তা হলে কেন যে দেশ ছেড়ে এখানে মরতে আসে বুঝিনে।"—

পদ্মাপারের উপর লেখকের এত আক্রোশ কেন? কিন্তু কথাটা উপভোগ্য!—

* * *

উক্ত সংখ্যাতে "সান্ত্বনা ও গান" যথাক্রমে শ্রীঅপূর্ব্ব কৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীবিনয় কৃষ্ণ ঘোষের কবিতা—এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায়!—"ধরার উপকণ্ঠে", "অচেনার মোহে" কবি (!) সম্পাদকের গতি বিধি আছে দেখছি। বিনয় ঘোষের "দখিন্ সাগর" কী South Sea? সে আবার কোথায়?—

নাট্য-তরঙ্গ

শ্রীনটশেখর
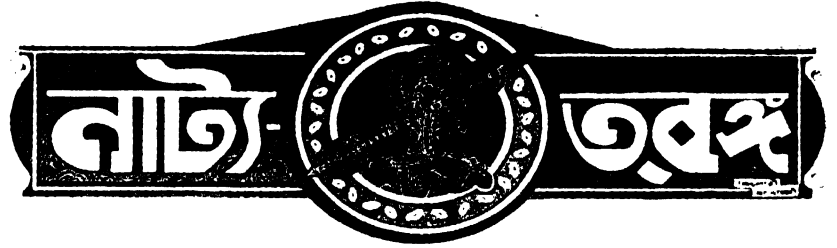
নাট্যনিকেতনে—"খনা"

বৃহস্পতিবার ১১ই জুলাই "খনা"-র উদ্বোধন হ'য়েছে। কর্তৃপক্ষের ধুমধড়াক্কা দেখে মনে হ'য়েছিল নাট্য-জগৎ হয়ত' "খনা"-র উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভীষণ তোলপাড় কোরবে। কিন্তু আমরা ব্যথিত হ'লাম—প্রাতঃস্মরণীয়া খনা"-র নাট্যরূপ দেখে।

নাট্যকার হ'চ্ছেন শ্রীমন্মথ রায়। "খনা"-র রচনা দেখে মনে হ'ল নাটক রচনা থেকে তিনি কিছুদিনের জন্য বিরত থেকে এ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় কোরে তারপর এই কাজে হাত লাগান। নাটকটি পঞ্চাঙ্ক ও দশটি দৃশ্যে বিভক্ত। কিন্তু কোনও দৃশ্যের সঙ্গে কোনও দৃশ্যের যোগসূত্র কোথাও রক্ষিত হয় নি। তা' ছাড়া নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত ও চরিত্র সংপুষ্টি "খনা"-র ভেতর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

নাটকের প্রযোজনাও হ'য়েছে অত্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর। যেখানে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর মত একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই কাজে নিয়োজিত সেখানে অত্যন্ত extraordinary কিছু না হ'লেও প্রথম শ্রেণীর প্রযোজনা হবে—এটা আশা করা বোধ হয় আমাদের অসঙ্গত নয়।

গানের সুর দিয়েছিলেন শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। নাটকের সুর-সংযোজনা তাঁর এই প্রথম। তথাপি আমরা বলি ভবিষ্যতে এই কাজ তাঁর প্রথম ও শেষ হয় যেন।

শ্রীনরেন দত্তের দৃশ্য-পট পরিকল্পনার ভেতর নূতনত্বের আভাষ কিছুই পেলাম না।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর আমরা প্রশংসা কোরতে পারলাম না সত্য; কিন্তু অভিনীত চরিত্রের ভেতর অনেকেই সুঅভিনয় কোরেছেন। তার মধ্যে বরাহরূপী শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর রূপসজ্জা ও ভাব-ব্যঞ্জনা হ'য়েছে অভিনব। শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কামান্দক আনন্দ-দায়ক। শ্রীমনি ঘোষের ভৈরবে গৌরব আছে; কিন্তু মুখ ভঙ্গীর অস্বাভাবিকতা তাঁকে কিছু পরিমাণে দমন কোরতে হবে। শ্রীননী মল্লিকের মহাকাল চরিত্রোপযোগী হ'য়েছে। শ্রীজীবন গঙ্গোপাধ্যায়ের মিহিরে সুরেলা অস্বাভাবিক অভিনয় কর্ণ-পীড়াদায়ক।

শ্রীমতী সরযূবালার খনা উচ্চাঙ্গের হ'য়েছে। শ্রীনিরুপমার মাদনিকা ও শ্রীমতী লাইটের তরলিকা কোনক্রমে চলনসইয়ের পর্য্যায়ে ফেলা যায়। শ্রীমতী চারুশীলার ধরণী প্রশংসার যোগ্য।

মোট কথা, "খনা" দেখে আমরা খুশী হ'তে পারি নি। কর্ত্তৃপক্ষ পরবর্ত্তী নাটকে নিজেদের দোষ ত্রুটি বুঝে যদি এখন থেকেই কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হন তা' হ'লেই সুখের বিষয়।

ওপারের ছায়া

NIRMAL DE

মনোরম সান্ধুখাঁ

ভারী সাহসী লোক

ভদ্রলোক জঙ্গলের ভীষণতম জন্তুদের নিয়ে 'ছবি তুলে' অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। বন্য বাঘ, গোঁয়াড় গণ্ডার, কুটিল কুমীর কিছুই তাঁকে বাধা দিতে আজ পর্যন্ত পারে নি। দর্শকদের প্রাণে অভিনব এক ভয় জাগাতে আফ্রিকার বিপদময় জঙ্গলে জঙ্গলে তিনি ছোট্ট এক ক্যামেরা, শব্দযন্ত্র ও শিল্পীর দল নিয়ে কত রাত কত দিন নির্ভয়ে ঘুরে' বেড়িয়েছেন। পৃথিবী তাঁর সাহস দেখে অবাক হয়েছে!

ভদ্রলোকের নাম ডব্লিউ এস ভ্যানডাইক, প্রখ্যাতনামা পরিচালক।

কিন্তু, সেই ভদ্রলোক লিফ্‌ট্‌এ চ'ড়ে পনেরোতলার বেশি যেতে সাহস পান না!

পনেরোতলা!— আপনাদের কাছে অবাক হবার মত হয়তো কিছু হ'তে পারে, কারণ কল্‌কাতারও দশতলার বেশী কোনো বাড়িতেই নেই। কিন্তু, এটা আপনাদের মনে রাখা উচিত্‌ যে ক্যালিফোর্ণিয়া কল্‌কাতা নয়। সেখানে বড় রাস্তার ধারে সবচেয়ে ছোটো যে বাড়ি তার উচ্চতা মোটে পনেরোতলা। আর, যে গুলো বেশ বড়, তারা আশিতলা, নব্বুইতলা অবধি অনায়াসে যায়।

ভ্যান্‌ডাইক্‌এর বুক ভয়ে কাঁপে পনেরো তলার ওপর গেলে।

সম্প্রতি ডাইকের কয়েকজন বন্ধু তাঁকে 'রেইন্‌বো রুম্‌'-এ চা খেতে নেমন্তন্ন করলে। অসীম সাহসী পরিচালকের নামটা বেশ চমৎকার শোনালো—বাঃ, বেশ তো নাম! রেইন্‌বো রুম! যথাসময়ে বন্ধুদের নিয়ে তিনি তো লিফ্‌ট্‌-এ চাপলেন। নিরীহ ভাবে সঙ্গের এক ভদ্রলোক বললেন 'আটষট্টি তলা, লিফ্‌টম্যান।'

হঠাৎ!—কী যে হ'লো কেউ বুঝতে পারলে না! ভ্যান্‌ডাইককে কী ভূতে পেয়েছে! সে তো দরজা খুলে' ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌! সে একেবারে

এই মেয়েটির নাম—ক্যারল ডেভিস।
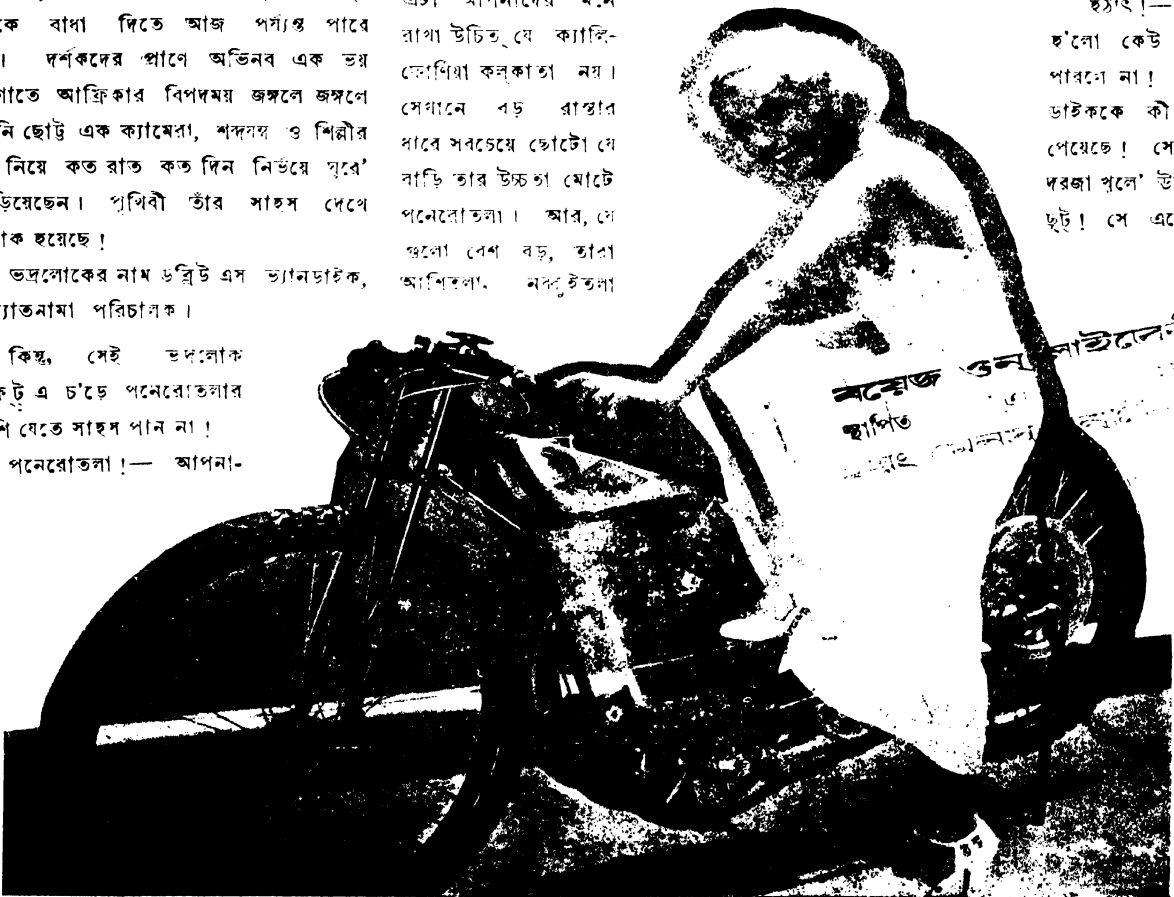
প্রাণের ভয়ে ছুট। মুখে এক ফোঁটা রক্ত নেই, মনে হয় মরে' গেছে।

সেদিন সারারাত অসীম সাহসী ভ্যান ডাইক্‌কে তার বন্ধুরা আর খুঁজে' পায়নি!

র‍্যামন নোভারোর খবর

আমাদের পত্রিকার চার পাঁচজন পাঠিকা র‍্যামন নোভারোর ভাবী ছবি কী—এই জানবার জন্যে কিছুদিন আগে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তার উত্তরে আমি তাঁদের জানাতে চাই, নোভারো একটি ছবিতে এখন অভিনয় করছে বটে, তবে সেখানা আমরা দেখতে পাবো কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কারণ, ছবিখানা স্প্যানীশ্ ভাষায়।

নাম—'এগেইন্‌স্ট্ দি কারেণ্ট'। এই চিত্রটির প্রযোজক, পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক, প্রধান অভিনেতা ও প্রধান গায়ক হচ্ছে র‍্যামন নোভারো। স্পেন হচ্ছে ঐ সুন্দর নায়কের দেশ। দেশের লোকদের জন্য সম্প্রতি সে নিজে ছবি তুলতে আরম্ভ করেছে। ভবিষ্যতে আমাদের জন্য আর কোনো ছবিতে সে নাববে কিনা জানা নেই।

যে রকম স্বাধীন ব্যবসা নোভারো আরম্ভ করেছে—সে রকম আর মাত্র একজন ব্যবসায়ী হলিউডে আছে—সে হচ্ছে চার্লি চ্যাপ্‌লিন।

সান্‌সেট্ ও হিল্‌হার্ষ্ট নামে হলিউডের এক জায়গায়, যে ষ্টুডিয়োয় অনেকদিন আগে সুবিখ্যাত ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ ছবি তুলতেন—সেই ষ্টুডিয়োই র‍্যামন নোভারো এখন কিনে নিয়েছে।

পূজো বলে একেই

চেহারার সৌন্দর্য্যে ও মনোমুগ্ধকর অভিনয়ে জিন রেমণ্ড সম্প্রতি খুব মহিলাদের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছে। তার চুল, তার নাক, তার ঠোঁট ইস্কুলে কলেজে রেষ্টুরেণ্টে মেয়েদের এখন আলোচনার বিষয়। জিন অনেক মেয়ের স্বপ্নের এখন সঙ্গী।

সেই রূপোলী চুল জিন রেমণ্ড কিছুদিন হ'লো ভারী অদ্ভুত এক চিঠি পেয়েছে। তাতে আর কিছু নেই, শুধু তারই নাম এক হাজার বার লেখা!

খবর নিয়ে যে ব্যাপারটি জানা গেলো তা হচ্ছে এই—

মেয়েদের একটি ইস্কুলে তখন অঙ্কের ক্লাশ। হঠাৎ, শিক্ষয়িত্রীর নজরে পড়লো—এক যুবতী অ্যাল্‌জেব্রার অঙ্ক না করে' খুব মন দিয়ে কী যেন লিখছে। কাগজটা টেনে নিয়ে তিনি দেখলেন—তাঁর ছাত্রী জিন রেমণ্ডের প্রেমে মশ্‌গুল, প্রেম নিবেদন করে' তাকেই সে লিখছে এক চিঠি। মাষ্টারণী মহাশয়ার রাগ হ'লো, তিনি ছাত্রীকে শাস্তি দিলেন—একটা কাগজে ঐ জিন রেমণ্ডেরই নাম এক হাজার বার লিখতে।

সানন্দে এই শাস্তি মেয়েটি বরণ করে' নিয়েছিলো!

শুভ-সংবাদ

সন্তানের বাপ ও মা হবার আশা অর্ল্ জলসন ও রুবি কিলার এক রকম ছেড়েই দিয়েছিলো। মনে মনে তারা এতদিন ঠিক করছিলো—একটি ছোট্ট ছেলেকে কোল আলো করতে তারা পোষ্য নেবে কিনা! কিন্তু, তার প্রয়োজন আর নেই। একদিন, স্বপ্ন দেখেছে রুবি—স্বর্গের সোণালী সাগরের ঢেউ থেকে তার বাড়িতে ছিট্‌কে পড়ছে—লোভনীয় রক্ত মাংসের এক শতদল! রুবি জেগে উঠলো। নির্জ্জন রাত্রি, তবু অল্‌কে কানে কানে বল্‌লে সেই কথা। আনন্দে অল্ লাফিয়ে উঠলো।

জননীর মধুময় রূপকে বরণ করতে রুবির বেশী দেরী আর নেই।

এই সঙ্গে আরেকটি শুভ-সংবাদ আপনাদের দিই। অ্যাডল্‌ফ্ মেন্‌জু ভেরি টিস্‌ডেল্‌কে কিছুদিন হ'লো যে বিয়ে করেছে তা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। সেদিন রাতে কী এক গোপন কথা টিস্‌ডেল অ্যাডল্‌ফকে শুনিয়েছে—তা কী আপনাদের এখনো আরো পরিষ্কার করে' আমায় বলতে হবে?

মেরী পিক্‌ফোর্ডের প্রেম

মেরী পিক্‌ফোর্ড চার্লস্ বাডি রোজার্স্‌এর সঙ্গে সত্যি সত্যিই প্রেম করছে কিনা তা এখনো জানা যায় নি। তবে, খবর এটুকু পাওয়া গেছে—যে—মেরী কিছুদিন হ'লো তার বিখ্যাত বাড়ি 'পিক্‌ফেয়ারে' কিছুদিন থাক্‌বার জন্যে বাডিকে নিমন্ত্রণ করেছিলো। এবং, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বাডি নাকি সানন্দে এসেছিলো।

এটুকু শুনে আমরা অনায়াসে বলতে পারি—এদের ভেতর নিশ্চয়ই খুব গভীর প্রেম চলেছে। নিরালা, নির্জ্জন, প্রকাণ্ড এক বাড়িতে একটি যুবক ও যুবতীর সংযম অভ্যাসে যথেষ্টই সন্দেহ আমাদের আছে।

কিন্তু, এখন শুনতে পাই, মেরী শুধু বাডিকেই আসতে বলে নি, নিমন্ত্রণ করেছিলো বাডির মা মিসেস্ রোজার্স্‌কেও। এ আবার কী রকম যেন ঠেক্‌চে—না? কথাটে আমার এক বন্ধু—সে এ কথা শুনে, কী বলেছিলো জানেন? বলেছিলো—মানুষদের ভেতর ঘুমোয় কারা বেশী? শিশুরা, আর বৃদ্ধরা।

আবার সিনেমায়

যাক্, চার্লস্ বাডি রোজার্স্ আবার সিনেমায় ঢুকবে মনস্থ করেছে। সুন্দর ঐ অভিনেতাকে শিগ্‌গীরই তা হ'লে আমরা আবার পর্দ্দার ওপর দেখতে পাবো। অবিশ্যি, এ খবরটা শুনে' কল্‌কাতার কয়েক পুরুষ মহল মনে মনে চটে' যাবে জানি। কারণ যদি জান্‌তে চান, একান্ত গোপনে আপনাদের আমি বল্‌তে পারি। কিন্তু, খবরদার, খবরটির প্রকাশ যেন করে' ফেল্‌বেন না!

ক্লেয়ার ট্রেভয়েরকে দেখা যাবে 'দান্তেস্ ইন্ ফারনো'তে

একদা, আমার চেনা এক ভদ্রলোক 'প্লাজা'য় চার্লস্ বাডি রোজার্স্-এর এক ছবি দেখতে গিছলো তার মেয়ে বন্ধুকে নিয়ে। সাড়ে ন'টার শো, তায় আবার বৃষ্টি, তাই ভিড়ও তেমনি হয় নি। অন্ধকারে হঠাৎ, বুকের কোণে কোনো একটা বাঁশী বেজে ওঠাতে ঐ ভদ্রলোক তার সঙ্গিনীকে কী একটা করতে যেন গিছলেন। বন্ধুনী বারণ করেছিলো, বলেছিলো—চার্লস্ রোজার্স্‌কে চোখের সামনে রেখে, তোমাদের ওসব আমার ভালো লাগে না!

এ অপমানের ভুক্তভোগী—ভদ্রলোক একাই শুধু নয়, আমি জানি, অনেকে।

যাক্‌গে, যা হয়েছে তা হয়েছে। বাডির নাম এককালে ছিলো, কিন্তু, রেডিয়ো ষ্টুডিয়ো তা শুনলে না, আবার তাকে পরীক্ষা করলে।

কিছুদিন পর নাচে গানে ভরা এক ছবিতে তাকে দেখা যাবে।

শার্‌লির জন্মদিন

উইলিয়ম সেক্সপীয়ার যে দিন পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন, সে দিনই জন্মদিন হচ্ছে শার্‌লি টেম্পল্‌এর। সেদিন তার জন্মদিন উপলক্ষে হলিউডের প্রায় সমস্ত লেখকদের, ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিলো। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ জন বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এসে ফক্সের 'সান-রুমে' জমায়েৎ হ'লো ভোজ খেতে, তামাসা দেখতে আর শার্‌লির কাছ থেকে উপহার নিতে। কিন্তু, ভারী দুঃখ। শার্‌লিই শেষ পর্য্যন্ত এলো না—তার হঠাৎ ভীষণ সর্দ্দি হয়েছিলো।

খুচরো খবর

জন ব্যারীমুর আর ডোলোরেস্ কস্‌টেলোর বিচ্ছেদ-সংবাদ নাকি ভিত্তিহীন।

* * *

অ্যান্ হার্ডিং খুব শীগ্‌গীরই বোধ হয় সৈনিক দলের এক মেজরকে বিয়ে করবে।

* * *

'মাস্কুইরেডার'-এ খানিকটা অভিনয় করে' মিরণা লয় রাগ করে' কোথায় চলে গেছে। তার জায়গায় উইলিয়ম পাওয়েল্‌এর সঙ্গে এখন অভিনয় করছে অজানা এক মেয়ে—লুইস্ রেইনার।

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা

সমস্যার সমাধানঃ—

ইস্কাবন—টেক্কা, গোলাম।
হরতন—পাঞ্জা।
রুহিতন—সাহেব, বিবি।
চিঁড়িতন—দশ, আটা।

ইস্কাবন—সাহেব, ছুরি।
হরতন—নাই।
রুহিতন—গোলাম, নয়, আটা।
চিঁড়িতন—নয়, সাতা।

উ

প পূ

দ

ইস্কাবন—চৌকা, তিরি।
হরতন—ছক্কা, তিরি।
রুহিতন—সাতা।
চিঁড়িতন—ছক্কা, পাঞ্জা।

ইস্কাবন—বিবি।
হরতন—আটা, চৌকা।
রুহিতন—টেক্কা, দশ, তিরি, ছরি।
চিঁড়িতন—নাই।

হরতন রঙ, 'দ' খেল্‌বে; 'উ' এবং 'দ'-কে সব পিট নিতে হবে, বিপক্ষদল যতই বাধা দিক্ না কেন।

'দ' ইস্কাবনের বিবি খেল্‌লেন; 'প' ইস্কাবনের ছুরি মারলেন এবং 'উ' টেক্কা দিয়ে পিট্‌টা নিয়ে রঙের পাঞ্জা খেল্‌লেন। 'পূ' রঙের তিরি দেওয়াতে রঙের পাঞ্জারই পিট গেল আর 'প' একখানি রুহিতন পাশালেন। এখন 'উ' রুহিতনের সাহেব খেল্‌লেন, 'দ' টেক্কা দিয়ে পিট্‌টা মেরে নিয়ে 'পূ'র রঙ বের করে দিলেন।

যদি 'প' রুহিতনের শেষ তাসখানি পাশান, 'উ' বিবিখানি পাশ দেবেন। যদি 'প' ইস্কাবনের সাহেব পাশান, 'উ' চিঁড়িতনের আটা পাশ দেবেন। আর যদি 'প' চিড়ে পাশান 'উ' ইস্কাবনের গোলাম পাশ দেবেন।

বেঙ্গল ব্রীজ এসোসিয়েশন্ঃ—কোল্‌কাতার কয়েকটি ব্রীজ ক্লাব অকর্ম্মণ্য বেঙ্গল ব্রীজ এসোসিয়েসনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সুরু করেছিল তার ফলে গত ২১শে জুলাই তাঁদের একটি সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় বেঙ্গল ব্রীজ এসোসিয়েশনকে পুনর্জ্জীবিত করে নূতন কমিটি গঠন করা হয়। এই নবগঠিত কমিটির সভাপতি জে, কে, গাঙ্গুলী ম'শায় ব্রীজ ক্লাবগুলির ও সাধারণ ব্রীজ খেলোয়াড়দের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন লিখে পাঠিয়েছেন।

24th, July 1935.

"At an informal meeting of the members of the Bengal Bridge Association held on 21.7.35 at 226, Upper Circular Road, it was resolved to revive the present Association. Accordingly a Provisional Committee consisting of Messrs. J. K. Ganguly, M. L. Banerjee, U. Seal, B. C. Chatterjee and S. B. Roy was formed to device ways and means for this purpose. The above committee was empowered to receive applications for affiliations and to receive subscriptions etc. The General Meeting of the Association will be held on Sunday the 11th August 1935 at 5. P. M. at Theta Beta Club (226, Upper Circular Road). All the Bridge Clubs or Teams or bodies are requested to pay their subscriptions for the current year to any of the above five on or before the above date. For further particulars they are requested to communicate with the Secretary, Mr. S. B. Roy at 226 Upper Circular Road (near Shambazar Junction).

(Sd) J. K. Ganguly
President, Provisional Committee.
Calcutta
226, Upper Circular Road.

Play for a drop :—হাতে পর পর তাস না এলে ছোট তাসের পিট করিয়ে নিতে হলে মধ্যবর্ত্তী তাসগুলি (intermediate cards) ধরে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। বিপক্ষদলের হাতে যখন এই মধ্যবর্ত্তী তাসগুলি অরক্ষিত অবস্থায় থাকে তখনই এ নিয়ম

খাটে (অর্থাৎ পাশে ছোট ছোট তাস না থাকলে)। এই ভাবে যে তাসগুলির খেলা হয় সেগুলিকে Play for a drop বলে অর্থাৎ খেললেই পড়ে যাবে। এখন ধরুন নিম্নলিখিত হাতগুলি আপনারা পেয়েছেন।

(১) গোলাম, দশ, ছক্কা, পাঞ্জা।
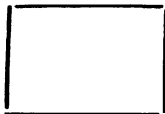
টেক্কা, সাহেব, আটা, পাঞ্জা, চৌকা।

এ ক্ষেত্রে দেখুন ১৩ খানা তাসের মধ্যে আপনাদের হাতে ন'খানা আর বাকি চার খানা যদি দুইহাতে দুই দুই করে থাকে তবে টেক্কা সাহেব খেললেই বিবি পড়ে যায়। তা হলেই আপনাদের গোলাম বড় হয়ে গেল।

(২) আটা, ছক্কা, পাঞ্জা, চৌকা, তিরি।
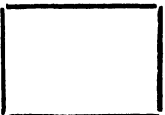
টেক্কা, বিবি, গোলাম, দশ, নয়, সাতা।

এ হাতে আপনারা সর্ব্বসমেত এগারো-খানি তাস পেয়েছেন। এখন বিপক্ষদলের হাতে যদি এক এক করে তাস পড়ে আর আপনারা যদি টেক্কা খেলেন তবে সাহেব তখনই পড়ে যায়। সুতরাং পরবর্ত্তী পিটগুলি আপনাদের।

(৩) টেক্কা, সাহেব, গোলাম, তিরি, দুরি।

আটা, সাতা, ছক্কা, পাঞ্জা, চৌকা।

এ ক্ষেত্রে আপনারা দশখানি তাস পেয়েছেন। এখন বিপক্ষ দলের হাতে যদি তাস দুই এক বা এক দুই ভাবে বিভক্ত হয়ে থাকে আর আপনারা যদি টেক্কা সাহেব খেলেন তবে বিবি পড়ে যাচ্ছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও পরবর্ত্তী পিটগুলি আপনাদের হবে।

ক্যালকাটা নর্থ ক্লাব:—ক্যালকাটা নর্থ ক্লাবের উদ্যোগে ডুপ্লিকেট কণ্ট্রাক্ট লীজ প্রতিযোগিতার যে বিশেষ নিয়ম-কানুনগুলি তৈরী হয়েছে এবং খেলোয়াড়দের দেওয়া হয়েছে তা' খুবই চমৎকার। কেবল ১০নং নিয়মের একাংশ "A spectator interested in any team may not look at any of the hands of the players of that particular team"-এর সহিত আমরা একমত নহি। আমরা এ অংশের তীব্র প্রতিবাদ করি।

ভেনাস ক্লাব:—গত রবিবার থেকে ভেনাস ক্লাবের ব্রীজ-প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। এ নিয়ে এদের খুব উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। আশা করা যায় এদের প্রতিযোগিতা শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ সাফল্য লাভ করবে।

উপরের এই সুন্দরী মেয়েটির নাম হচ্ছে জেসি ম্যাথুস, ভাব অভিব্যক্তিতে অদ্বিতীয়া। সম্প্রতি "ফার্ষ্ট এ গার্ল" ছবিতে ইনি অতুলনীয় অভিনয় করেছেন।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯ রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীঅনিল চন্দ্র রায়

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪২—8th August, 1935. { ৩২শ সংখ্যা

কংগ্রেসের আত্মহত্যা

নব পরিকল্পিত শাসন-সংস্কার বিধির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই কংগ্রেসী মহলে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা হইবে না বর্জ্জন করা হইবে এই লইয়া তুমুল বাগবিতণ্ডা চলিতেছে। মন্ত্রবীর সত্যমূর্ত্তি মন্ত্রীর সিংহাসনের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অর্ব্বাচীনের ন্যায় লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া মুখ খুলিলেন সর্ব্ব প্রথম। ভুলাভাই সাহেব "মৌনং সম্মতি লক্ষণম্" হিসাবে বিজ্ঞজনের ন্যায় নীরব রহিলেন। কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ "অশ্বত্থামা হত ইতি" করিয়া শ্যাম ও কুল দুই রক্ষা করিলেন। অপর পক্ষে ডাক্তার আনসারি সাহেব মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পক্ষে এক ফতোয়া ঝাড়িয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রসঙ্গে বাংলা "না গ্রহণ না বর্জ্জন" মতবাদ সমর্থন করে নাই। মন্ত্রীত্ব গ্রহণ প্রসঙ্গেও বাংলা গ্রহণ-নীতির উপাসক হইবে না, এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। জাতীয় দল যখন শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুকে সম্বর্দ্ধনা করেন সেই প্রীতি-সম্মিলনে শ্রীযুক্ত বসু বাংলার কংগ্রেসের পক্ষে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা উচিত নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও এখনও এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত বসু প্রকাশ্যে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই, তবে মনে হয় বাংলায় কংগ্রেসের পক্ষে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা যে আত্মঘাতী হইবে তাহা শরৎচন্দ্র মনে করেন। সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারার কঠোর আবেষ্টনে-বদ্ধ বাংলা যে শরৎচন্দ্রের অনুগামী হইবে তাহা সুনিশ্চিত। কংগ্রেস যদি বর্ত্তমানে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার সঙ্কল্প করেন তাহা হইলে কংগ্রেসের ইচ্ছামৃত্যু হইবে এবং মদারেত দল ও কংগ্রেসী দলের মধ্যে কোন প্রভেদই থাকিবে না।' বাংলার জাগ্রত জনমত কংগ্রেসের এই আত্মহত্যার অনুমোদন করিবেন?

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির এই বিষয়ে সত্বর মতামত প্রকাশ করিয়া জনমত গঠন করা উচিত। আমাদের মনে হয় বাংলার কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্ম্মীদের এক সম্মিলন আহ্বান করা প্রয়োজন। সেই সম্মিলন মন্ত্রীত্ব গ্রহণ প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, তাহাই নিখিল ভারতে বাংলার দাবী বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বিবিধ

কীর্ত্তন

গত ১লা আগষ্ট বৃহস্পতিবার, রাত্রি ৮ ঘটিকায় মজঃফরপুরের প্রবীণ এ্যাড-ভোকেট শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ মিত্র এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের কলিকাতা বাগবাজারস্থ ভবনে বাঙ্গলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কীর্ত্তনীয়া শ্রীল নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত ছাত্রীসঙ্ঘ মাথুর পালা-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বালিকারা সকলেই অল্পবয়স্কা; কাহারও বয়স বার কি তের বৎসরের অধিক হইবে না। ব্রজবাসী মহাশয়ের ছাত্রীবৃন্দের মধ্যে কলিকাতা কর্পো-রেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার ও তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়দ্বয়ের কন্যাদিগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অল্প বয়সে ইঁহারা কীর্ত্তনে যেরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

প্রীতি সম্মেলন

গত সোমবার ৬ই আগষ্ট ক্যালকাটা ক্লাবে অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকায় ডোসানি ফিল্ম কর্পোরেশন ভারত গবর্ণমেন্টের আইন সচীব সার, এন, এন, সরকার, কে-টিকে এক প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। এতদু-পলক্ষে সহরের বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। ডোসানি কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষতঃ জি, এ, ডোসানি অভ্যাগতবৃন্দের আদর অভ্যর্থনায় বিশেষ তৎপর ছিলেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সার এন, এন, সরকার; মিঃ ডোসানি (সিনিয়র); মিঃ ডোসানি (জুনিয়র), মেসার্স আর, এন, সরকার; বি, এন, সরকার; জে, এন, মিত্র; নিতীন বসু; পি, সি, বড়ুয়া; এস, কে, দে; লালজী হেমরাজ হরিদাস; এল, এন, ক্ষেত্রী; রাধা কিষণ চামারিয়া; ডবলিউ, সি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ; তুষার কান্তি ঘোষ; এ, এস, গজনভী; এ, কে, বসু; এস, হেমাদ; অনাদি বসু; জি, রামশিষণ; আর, বড়াল; এ, ডি, মল্লিক; বসন্ত কুমার চ্যাটার্জ্জি; দেশাই (মেট্রো); লাহিড়ী (কলম্বিয়া), এণ্ডরুস্ (নিউ এম্পায়ার); মনোরঞ্জন ঘোষ, এস, ঘোষ; হরকুমার চ্যাটার্জ্জি; এইচ, কে, চ্যাটার্জ্জি; অক্ষয়কুমার সরকার।

ঋতুচক্র

বৎসর বৎসর ঋতুগুলি পর পর ঘুরে আসে নির্ভুল নিয়মে। দিনের পর যেমন রাত্রি, শীতের পর তেমনি বসন্ত। ভারতের ছয়টি ঋতুর আসা-যাওয়ার নিয়মের কখনও ব্যতিক্রম হয় না। বৎসরের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত ঋতুচক্রের সঙ্গে মানুষের জীবন ধারাও পরিবর্ত্তিত হ'তে থাকে।

কোন ঋতুতে কি আহার ও পান করা উচিত সে সম্বন্ধে আমাদের পঞ্জিকায় নির্দ্দিষ্ট বিধি দেওয়া আছে। দেহের স্বাস্থ্য ও মনের শান্তি লাভ করবার জন্যে এখনো ভারতের অনেক লোক নিখুঁতভাবে সে সমস্ত বিধি পালন করে।

এ দেশের লোক এককালে এখনকার মত এত বেশী চায়ের কদর বুঝত না। তখন যারা চায়ের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল তাদের ধারণা ছিল চা শুধু শীত কালেই সেব্য, গরম চায়ের পাত্র নিঃশেষ করার পর যখন উষ্ণতাটি সমস্ত ছড়িয়ে পড়ে ভারী আরাম দেয় সেই জন্য। কিন্তু আজকাল চা-পানের কোন নির্দ্দিষ্ট ঋতু বা সময় আছে বলে কেউ মনে করে না। যে-সমস্ত সংসারে নিয়মিতভাবে চা খাওয়া হয়, সেখানে সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত চায়ের পাট কোন সময়ে বন্ধ থাকে না। আজকাল চা সব সময়েই খাওয়া হয়।

সত্য কথা বলতে গেলে, গ্রীষ্মকালে সমস্ত পানীয়ের মধ্যে একমাত্র চা-ই আমাদের শরীর ঠাণ্ডা রাখতে পারে। গরম যখন অসহ্য তখন ঠাণ্ডা সরবৎ প্রভৃতি খেতে লোভ হলেও, আসলে তাতে শরীর ঠাণ্ডা হয় না। কিন্তু দারুণ গ্রীষ্মকালে দুপুরে যদি দু-তিন পেয়ালা ভালো স্বদেশজাত চা খাওয়া যায় তাহ'লে প্রচুর ঘাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর কয়েক ঘণ্টা সত্যি শীতল থাকে। বছর ভ'রে দিন রাত যে কোনো সময়ে শুধু একটি মাত্র পানীয়ই ব্যবহার করা যায়—সে পানীয় হ'ল চা। তার বদলে আর কিছু চলে না, চলতে পারে না। চা সকল ঋতুতে আদর্শ পানীয়।

সাহায্য অভিনয়

আগামী শুক্রবার ৯ই আগষ্ট সন্ধ্যা ৬৷৹ ঘটিকার সময় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ "রঙ্গমহলে" শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে এক সাহায্য রজনী অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতদুপলক্ষে এক বিরাট জলসার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সাহায্য অভিনয় যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণেরই ইহাতে যোগদান করা বাঞ্ছনীয় কারণ ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এক মঙ্গলময় প্রেরণা। এতদ্ব্যতীত এই জলসার আকর্ষণও কম নয়। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, মিহির কিরণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির পরিচালনায় কুমারী আরতি দাস, কল্যানী দাশগুপ্ত, গীতা দাস, ইভা গুহ, ভারতী মজুমদার (রেডিও), নিভারাণী সেন, উত্তরা দেবী (রেডিও), শ্রীমান জহরলাল প্রভৃতির দ্বারা প্রাচ্য সঙ্গীত গীত হইবে। শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ তাঁর দলবল সহ অর্কেষ্ট্রায় রস পরিবেশন করিবেন ও নৃত্যশিল্পী মনিবর্দ্ধন প্রাচ্য নৃত্য প্রদর্শন করিবেন। অতঃপর

অর্দ্ধোদয় যোগ

(নক্সা)

শ্রীনীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

(গঙ্গার চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। চারি দিকে হট্টগোল। মাঝে মাঝে 'এই ড্রাইভার', 'এই গাড়োয়ান' এই রব শোনা যাচ্ছিলো। ঠিক এই রকম সময় একটী বৃদ্ধা গঙ্গার স্নান সেরে একটা রিক্সার নিকটে এসে ডাক্‌লেন)—এই রিক্‌সো-ওলা, ভাড়া যাবি ?

(রিক্‌সা-ওয়ালা "ঠুং ঠুং" করতে করতে এগিয়ে এসে বল্‌লে) কাহে নেই যায়গা মাই-জি!—উঠিয়ে। কাঁহা যায়গা ?

(বৃদ্ধা কাপড় নিংড়োতে নিংড়োতে আস্তে আস্তে রিক্‌সায় উঠে বস্‌লেন, তারপর সূর্য্যদেবকে উদ্দেশ্য করে একটী প্রণাম করলেন।)

(রিক্‌সা-ওয়ালা পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করলে)—বলিয়ে মাইজী কাঁহা যায়গা। আউর বহুৎ যায়গা যানা হ্যায়, থোড়া জলদি বলিয়ে মায়ি।

(বৃদ্ধা হঠাৎ রেগে উঠে বল্‌লেন) কলি-কালে হলো কি! আরে বলচি, এতনা তাড়া তাড়ি করচো কেন ? থোড়া প্রণাম করতা,—দেখতে পাত্যা নেই হ্যায়।

(রিক্‌সা-ওয়ালা বৃদ্ধার রকম দেখে বল্‌লে)

আচ্ছা মাইজি, লেকেন—যাস্তি দেরী হোনেসে যাস্তি ভাড়া দেনে হোগা।

(বৃদ্ধা রিক্‌সা-ওয়ালার কথায় আরো রেগে উঠে বলে উঠলেন) কেয়া বল্‌তা ? বেশী ভাড়া দেনে হোগা ? কাহে দেনে হোগা ? আমাকে বোকা পাতা হায় না ? আমি যেন আর নেই রিক্‌সো-গাড়ী চড়্‌তে পারতা হ্যায় ?

(এবার রিক্‌সা-ওয়ালার ভারী রাগ হলো, তবু পাছে ভাড়াটা হাতছাড়া হয়, এই ভয়ে চু'কুল সামলে সে বললে)—কাহে ঝগড়া করতা মাইজী ? যাস্তি দেরী হোনেসে যাস্তি ভাড়া তো সব-কই দেতা হ্যায়, আপ্ কাহে নেই দেগা ?

(এ দিকে বৃদ্ধার সঙ্গে রিক্‌সা-ওয়ালার ঝগড়া বাধবার প্রায় কাছাকাছি হ'য়ে এসেছে, এমন সময় একজন ভলেন্টিয়ার এসে সব শুনে মিট্‌মাট করিয়ে দিচ্ছিলো এমন সময় একটী বৃদ্ধ এসে সেই ভলেন্টিয়ারকে জিজ্ঞেস্ করলেন—'বলতে পারেন মশাই হরেনের বাড়ী কোথায় ?

(ভলেন্টিয়ার গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস্ করলে) তিনি কোথায় থাকেন ?

(বৃদ্ধ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন) —কোথায় থাকেন মানে ? তাও আপনি জানেন না ? তিনি আজ প্রায় দশ বছর কল্‌কাতায় কাজ কচ্ছেন, আর আপনি বল্‌লেন কিনা তিনি কোথায় থাকেন ?

ভলেন্টিয়ার—দেখুন, দশ বছর ছেড়ে একশো বছর কল্‌কাতায় থাকলেও কেউ তাঁকে চিন্‌বে না। তিনি কোথায় কাজ করেন ? কি নাম ? ঠিকানা কত—

বৃদ্ধ—থাক্ থাক্, বুঝতে পেরেছি আপনার বিদ্যে, এতদিন কল্‌কাতায় রইলেন, আর একজন কোল্‌কাতার লোককেই চিন্‌তে পারলেন না ? তার নাম, ধাম, ঠিকানা, পত্তর, সব দিতে হবে, তবে আপনি খুঁজে দেবেন ? এই আপ্‌নি ভলেন্টিয়ো। (খুব রেগে) কাঁধে আবার কাগজের ফুল দিয়ে বাহার দেওয়া হচ্চে, লজ্জা করে না, বৃদ্ধ লোকের একটা উপকারও করতে পারলেন না—। ছিঃ ছিঃ—

ভলেন্টিয়ার—কি আশ্চর্য্য (অল্প হাস্য) আপনি ঠিকানা বা নাম কিছুই বল্‌বেন না, খালি বল্‌চেন—'হরেনের বাড়ী কোথায় ? কল্‌কাতায় হরেন কি একজন। (বৃদ্ধ রেগে উঠে) আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, হরেন বলে কল্‌কাতায় আর কেউ নেই, আমি খুব জানি। আপ্‌নি তার নাম, ঠিকানা, গোত্র, চোদ্দ-গণ্ডা কৈফিয় চাইছেন, কি মতলব বলুন দিকিনি মশাই ?

(চলিয়া যাইতে যাইতে)

বাবাঃ, কল্‌কাতায় গোয়েন্দা ভরা।

(প্রস্থান)

(ভলেন্টিয়ার হো হো করে হেসে উঠে, পরে)—এ রিক্‌সা-ওয়ালা, জল্‌দি চালাও, রাস্তা বন্ হো যাতা। (প্রস্থান)

(বৃদ্ধা আস্তে আস্তে ঠিক্ হয়ে বসে বল্‌লেন)

এইবার চালাও রেক্‌সো-ওলা

(রিক্‌সা-ওয়ালা "ঠুং ঠুং" করে আস্তে

শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্যের "অকল্যানীয়া" নাটিকা শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট কর্ত্তৃক অভিনীত হইবে।

শুভ-বিবাহ

গত রবিবার স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ সরকারের সহিত শ্রীমতী অমিয়ার শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত বুধবার বড়লাট লর্ড ওয়েলিংডন স্যার নৃপেন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আস্তে রিক্সা-চালানো শুরু করে জিজ্ঞেস্ করলে)

কাঁহা যানে হোগা মাইজী ?

বৃদ্ধা—আমার ভাসুরের গলিমে জায়েগা, বুঝতে পারা ?

(রিক্সা-ওয়ালা গাড়ী চালাতে চালাতে বল্‌লে) ভাসুরের গলি ?

বৃদ্ধা—হ্যাঁ-রে, শুনতে নেই পাতা হ্যায় ? কালা নাকি ?

(কিন্তু রিক্সা-ওয়ালা সারাদিন রিক্সা চালিয়েও ভাসুরের গলি এপর্য্যন্ত বের করতে পাল্লেনা। সমস্ত দুপুরটা রোদ্দুরে ঘুরে তার মেজাজটা টগবগিয়ে উঠ্‌লো, সে এক যায়গায় রিক্সা থামিয়ে বৃদ্ধাকে একটু ঝাঁঝালো-গলায় বল্‌লে—)

দিন ভোর ঘুমকেও তো 'ভাসুরের গলি' নেই মিলা ! কোন রাস্তাকা উপার হ্যায় বলিয়ে।

(বৃদ্ধা সারাদিনটা ঘুরে ঘুরে বিরক্ত হয়ে গেছ্‌লো, তার মেজাজের টেম্পারেচার তখন ৯৮ ডিগ্রী। তিনি খিঁচিয়ে উঠে বল্‌লেন)

এতদিন রিক্সা চালাতা হ্যায়, আর আমার ভাসুরের গলিটা খুঁজে দিতে নেই পারতা হায় ! ঐ দিকে হায়—(বলিয়া তিনি 'সেণ্ট্রাল্ এভিনিউ'এর দিকে হস্ত প্রসারিত করলেন। রিক্সা-ওয়ালা সেই দিকে গাড়ী চালাতে সুরু করে দিলে, কিন্তু সে'খানেও প্রায় আধঘণ্টা ঘুরেও ভাসুরের গলি মিল্‌লো না। এদিকে এক রাস্তায় ৫।৬ বার একজন মেয়ে মানুষকে একটা রিক্সা-ওয়ালা নিয়ে ঘোরা ফেরা করচে দেখে স্থানীয় কতকগুলি যুবক এগিয়ে এসে বললে)

এ' রিক্সা-ওয়ালা, হিঁয়া এত্‌না কাহে ঘুমতা ? ও-জানানা কাঁহা যায়গা ?

রিক্সা-ওলা।—বাবুজি মায়ি যায়গা ভাসুরের গলি, লেকেন সবির-সে এত্‌না ঘুমায়া, লেকেন 'ভাসুরের গলি' আভিতক্ নেই মিলা !

(যুবকরা একবার পরস্পর পরস্পরের মুখে চাওয়া-চায়ি করে বল্‌লে)

—ভাসুরের গলি ?

গাড়োয়ান—হ্যাঁ—বাবুজী !

(এতক্ষণে রাস্তায় লোক জমে গেছে। সকলেরি মুখে এক কথা "ভাসুরের গলি ?"—কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা আস্তে আস্তে রিক্সার পরদাটা সরালেন, তারপর হঠাৎ সাম্‌নের লোক্‌টীর দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—)

—কে ঠাকুর পো ?

আগন্তুক—কে বৌদি ?—

(তারপর আগন্তুকটী রিক্সা-ওয়ালাকে বল্‌লে)—এই আশুতোষ দে লেনে নিয়ে চল্। বৌদির ভাসুরের নাম আশুতোষ বলে, উনি 'ভাসুরের গলি' বলেছিলেন।

—সমাপ্ত—

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

বিদ্রোহী

প্রযোজক—বি, এল, খেমকা।

কথা-শিল্পী—চারুচন্দ্র ঘোষ।

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা—ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

আলোক-শিল্পী—প্রবোধ দাস।

শব্দযন্ত্রী—সি, এস, নিগম।

গীত-রচয়িতা—শৈলেন রায় ও অজয় ভট্টাচার্য।

সুর-শিল্পী—কৃষ্ণচন্দ্র দে ও হিমাংশু দত্ত।

সম্পাদনা—ধরম বীর।

চিত্র-পরিবেশক—এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্স।

ভূমিকা-লিপি: অম্বর—অহীন্দ্র চৌধুরী, রামচন্দ্র—ভূমেন রায়, যশোবন্ত রাও—ললিত মিত্র, অজয়—বাণীভূষণ, তুলসী—জ্যোৎস্না গুপ্তা, মাধবী—ডলি দত্ত, রাণী মল্লিকা—সুনীতি, কল্যাণ—পূর্ণিমা, নাগরিক—চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, নাগরিক-পত্নী—ইন্দুবালা, চারণদ্বয়—অনুপম ঘটক ও শচীন দেব বর্মন, ইত্যাদি।

প্রথম মুক্তি—"রূপবাণী", [illegible]।

শ্রীযুক্ত বি, এল, খেমকার প্রযোজনায় ইষ্ট ইণ্ডিয়ার নবতম অবদান "বিদ্রোহী" দেখে যে আমরা খুশী হয়েছি তা স্বীকার না করে পারিনে। গল্পের অদ্ভুত-পূর্ব্বত্বে এ হেন ছবি যে প্রথম বাংলার ছায়াছবির রূপোলী পর্দায় রূপ পেল, তা অনায়াসেই বলা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতের রাজপুতানার চিত্ত-আলোড়নকারী বীরত্ব-গাথা হচ্ছে এর গল্পাংশ; এর মধ্যে আছে প্রেমের পরশ, অত্যাচারের দানবলীলা, আর লোমহর্ষণকারী ঘটনাক্রম। যারা এখনো "বিদ্রোহী" দেখেনি, তাদের জন্যে গল্পটা কিছু বলি:—রাজ্যের রাজা যশোবন্ত সিংহ ছিল সেনাপতি অম্বরের চক্রান্তে নারী ও সুরাতেই মত্ত। কিন্তু অম্বর নিজে রাজ্যশাসনের নামে চলেছিল অত্যাচারের লৌহরথে অপ্রতিহত-গতিতে—রাজ্যের লোক এমনিই নিঃসাড়, হীনবীর্য্য হয়ে পড়েছিল যে তাকে বাধা দেবার কথাও মাত্র কেউ ভাবতে পারতো না। কিন্তু অম্বরের অত্যাচারে ভগবানের আসন বুঝি টললো! সেই দেশের জনসাধারণ ক্রমশঃ উত্যক্ত অত্যাচারিত হয়ে হয়ে শেষ পর্য্যন্ত একজন যুবকের অধীনে করলে বিদ্রোহ-ঘোষণা; সে যুবক আর কেউই নয়, একজন সাধারণ প্রজা, রামচন্দ্র। এ বিদ্রোহ-ঘোষণা রাজার বিরুদ্ধে নয়, রাজ্য-শাসনের বিরুদ্ধে নয়, সেনাপতি অম্বরের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে। অম্বরের পাপের ভারা তো পরিপূর্ণ হয়েই ছিলো, শুধু বাকী ছিলো তাকে ডুবিয়ে দেওয়ার। রামচন্দ্রের অমিত পরাক্রমের চাপে সে ভারা সত্যিই শেষ পর্য্যন্ত ডুবলো। এটুকুই হচ্ছে মূল গল্পাংশ—এর পাশে এসে ভিড়েছে রামচন্দ্রের প্রতি তুলসী-মাধবীর ভালবাসা ও প্রেম। মাধবী অম্বরের মেয়ে হ'য়েও এই বীরের প্রতি তার আসক্তি তার বাপের কাছেও প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হয়নি। নিয়তির কি অদ্ভুত লীলা! যে অম্বর রামচন্দ্রকে জীবন্ত কবর দিতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র, তারই মেয়ে কিন্তু ভালবাসে সেই বিপ্লবী বীরকে, পূজা করে অন্তরের গোপন কোনে অত্যন্ত সঙ্কোচে, অত্যন্ত ভক্তিভরেই। কিন্তু রামচন্দ্রের কি [illegible]ওর ওপর কোন টান ছিলো, কে জানে? রামচন্দ্রকে দেখেছি তুলসীর অন্তঃসলিলা প্রেমের ফল্গুতে পরিপূর্ণ উপভোগে অবগাহন করতে। অবিশ্যি শেষ পর্য্যন্ত মাধবীর প্রেমকে রামচন্দ্র অস্বীকার করে থাকতে পারেনি, সেইজন্যেই রামচন্দ্রের মুখে তুলসীর সঙ্গে পূর্ণ-মিলনের দিনে দেখি মেঘের ছায়া। তুলসী শুধায় কি হলো তার, রামচন্দ্র উত্তর দেয়, তুলসী, আর একজন আমাকে বিশ্বাস করে আমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলো, কিন্তু আমি, তুলসী, তাকে পায়ে দলে চলে এসেছি; আর কি তার দেখা
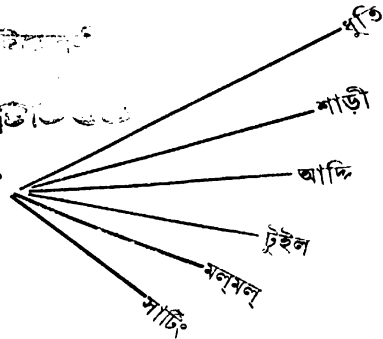
পাবো এ জীবনে? তুলসীর কিন্তু অজানা ছিলো না কে সে। তাই সে তার দয়িতকে আশ্বাস দেয়, আসবে, সে আসবে। সত্যিই মাধবী এলো; মাধবী কি তুলসীর অধিকারে হাত দিতে এসেছে, সে কি রামচন্দ্রকে তার সুখের, আনন্দের দিনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে এসেছে? না; সে এসেছে তার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করে তার কামনার ধনকে অপরের হাতে তুলে দিতে; কিন্তু তার চোখের জল তাকে করলে বিশ্বাসঘাতকতা, সে বাধা মানলে না; সকল শাসন, সব সংযম অস্বীকার করে দুই গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে প্রকাশ করে দিলে তার মনের গোপন ব্যথা, লুকোনো কথা। এখানে কিন্তু মনে মনে নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, এ ছাড়া কি আর কোন পথ ছিল না? হয়তো বা ছিলো, নয়তো বা ছিল না,—কে বলতে পারে ঠিক করে?

পরিচালনায় শ্রীযুক্ত ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পরিচালনা একেবারেই নিখুঁত একথা বলতে পারতুম যদি তিনি নাগরিক ও নাগরিক-পত্নীর জাপানী মালের মত সস্তা হাস্য-রস বিতরণ কিছু কম করে করতেন। অতি সস্ত হয়েছে এঁদের অভিনয়। আর অম্বরের মৃত্যু-সংবাদে মাধবীর আলু-থালু বেশে ঘুম-ভাঙ্গার দৃশ্য না দেখালেও চলত; সত্যি, ওতে দেখার কি আছে বলুন তো?

"বিদ্রোহী"র ফটোগ্রাফী বেশ ভালই হ'য়েছে। শ্রীযুক্ত দাস যতরকম কোনা (angle) থেকে সম্ভব, কলা-শিল্পের বিশেষ পরিচয় না দিলেও, সবখান থেকেই ক্যামেরার হাতল ঘুরিয়ে মনোমুগ্ধকর ছবি তুলে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করেছেন।

ছবিখানির সব চেয়ে যা আমাদের রস-উপভোগে বাধা দিয়েছে তা হচ্ছে এর শব্দ-যন্ত্রীর কাজ। এ কথার যদি কেউ অর্থ করেন যে ছবিখানি অশ্রাব্য বা কষ্ট-শ্রাব্য, তবে অবিশ্যি ছবিটির প্রতি অবিচার করা হ'বে। ছবিখানির অন্যান্য বিভাগের কাজ যে ধরণের উন্নত হ'য়েছে, সেই তালে পা ফেলে চলতে শব্দ-যন্ত্রী পারেন নি।

চিত্রখানির নাচগানও কম আকর্ষণের জিনিষ নয়। সঙ্গীত কয়খানি বেশ সুরচিত আর তাতে যে সুর-সংযোজনা করা হ'য়েছে, তাও বেশ শ্রুতিমধুর। তবে নাচগুলি উপভোগ্য হ'লেও, মনে হয়, মাত্রা বেশী হ'য়েছে। হিন্দী ছবি হলে আমাদের কিছু বলার থাকতো না, কিন্তু বাংলা ছবির পক্ষে তা মাত্রাধিক্য।

"বিদ্রোহী"র অভিনয় ধারার কথা বলতে গেলে প্রথমেই অহীন্দ্রবাবুর নাম করতে হয়। তাঁর অভিনয়, রূপসজ্জা, চালচলন, বাচন ভঙ্গী, সব দিক থেকেই তিনি তাঁর ভূমিকাকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

পপুলার পিকচার্সের "মন্ত্রশক্তি"-র মৃগাঙ্কের বৈঠকখানা

"বিদ্রোহী"র নায়ক রামচন্দ্রের অংশে ভূমেন রায়ের অভিনয় অপ্রশংসনীয় নয়, তবে তার ভেতর মাঝে মাঝে মঞ্চের ছায়া এসে পড়েছে। এ টুকুও যেদিন তিনি পরিবর্জ্জন করতে পারবেন সেদিন পর্দ্দায় তাঁর অভিনয় হবে একেবারেই নিখুঁত। অলস ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ রানা যশোবন্ত সিংহের বেশে ললিত মিত্র যে-টুকু সুযোগ পেয়েছেন, তার সদ্ব্যবহার তিনি করেছেন। তুলসীর ভূমিকায় জ্যোৎস্না ও মাধবীর অংশে ডলি মন্দ অভিনয় করেন নি। তবে এঁদের অভিনয় আগের চেয়ে উন্নত না দেখে দুঃখিত হ'য়েছি। রাণী মল্লিকার ভূমিকায় সুনীতি বেশী মাত্রায় গাম্ভীর্য্য বজায় রাখতে গিয়ে, মনে হলো, আড়ষ্ট হ'য়ে পড়েছেন। পুর্ণিমার গানটী বেশ ভালই লাগলো—অভিনয় তার বিশেষ কিছু করার ছিলনা। শচীন দেবের ও অনুপম ঘটকের গান দুটিও বেশ সুন্দর। অন্যান্য চরিত্র অনুল্লেখযোগ্য বিবেচনা করি।

মোট কথা, ইষ্ট ইণ্ডিয়ার নবতম ছবি "বিদ্রোহী" বাংলার ছায়াছবির রাজ্যে একটু নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে এবং "রূপবাণী"র রূপোলী পর্দ্দায় "বিদ্রোহী" এখন বেশ কিছু দিন অন্যান্য ছবি দেখনোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালাতে সক্ষম হ'বে বলেই মনে হয়।

* • *

"রূপবাণী"তে "বিদ্রোহী" দেখানোর আগে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার একখানি হাস্য-রসাত্মক ছোট ছবি "রাতকাণা" দেখানো হয়। এর পরিচালনা করেছেন আলোক-চিত্রশিল্পী শ্রীযতীন দাস। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন রঞ্জিত রায়, ভুনিয়া বালা, কেষ্ট মুখার্জ্জি, সুহাস সরকার, নগেন্দ্র বালা ও ইন্দু বাগার মা। সু-রসিক ব্যক্তিমাত্রেই এই ছবিটিতে প্রচুর হাস্য-রসের খোরাক পাবেন, এ আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। গ্রাম্য-মেয়ের বেশে পুর্ণিমার একটী গান ও শ্রীরঞ্জিত রায়ের গোবর্দ্ধনের অংশে অভিনয় সত্যিই বেশ উপভোগ্য।

হিন্দী দক্ষযজ্ঞ

ধর্ম্মমূলক চিত্রনাট্য "দক্ষযজ্ঞ" রাধা ফিল্মের এক গৌরবময় কীর্ত্তি। এরই বাংলা সংস্করণ সপ্তার পর সপ্তা ও মাসের পর মাস উত্তর কোলকাতার চিত্রগৃহ ক্রাউনে বহু দর্শকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিল। এই "দক্ষযজ্ঞেরই" হিন্দী সংস্করণ গেল শনিবার থেকে নিউ সিনেমায় দেখান হচ্ছে এবং দর্শক সমাগমও হচ্ছে বেশ।

অভিনয়ের দিক থেকে শ্রীমতী রাধাবাই ও বীণাপাণি দু'জনেই বিশেষ প্রশংসার যোগ্যা, এঁদের গানগুলিও হয়েছে বেশ উপভোগ্য। মিঃ নির্ম্মল কর, শ্যামনারায়ণ ও ত্রিলোক কাপুরও অভিনয় করেছেন ভালই। সতীর স্বয়ম্বর সভা ও দক্ষরাজের যজ্ঞ আয়োজন—এ দুই দৃশ্যেরই পরিকল্পনা ও সাজসজ্জা হয়েছিল ভারী সুন্দর। কৈলাস পর্ব্বতের দৃশ্য ও মহাদেবের আবাস, মায় নন্দী-ভৃঙ্গী ও "আবগারী বিভাগ" প্রভৃতিতে একটী বেশ

realistic atmosphere এর সৃষ্টি হয়েছিল। এ সবের জন্য ডিরেক্টর জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশংসার্হ।

মিঃ ডি, জি, গুপ্তের হাতে ফটোগ্রাফি ও ডাঃ রক্ষিতের হাতে অডিওগ্রাফি খুবই ভাল উৎরেছে। প্রফেসর ছোটে খাঁ ও মিঃ অনাথ বোস সঙ্গীত-পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

নিউ থিয়েটার্স

বি-ইউনিটএ শরচ্চন্দ্রের হিন্দী "দেবদাসের" কাজ শেষ হয়ে গেছে—আপাততঃ সেন্সরের অনুমোদন সাপেক্ষ। চিত্রটি যে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করবে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

* * *

তামিল ছবি "রাজা ভোজার" কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ছবিখানি ওদেশে যাতে খুবই আকর্ষনীয় হয় তারই চেষ্টা করা হচ্ছে।

* * *

পরিচালক বড়ুয়া অতঃপর নূতন ছবির কাজে হাত দেবেন। বিস্তৃত ও সঠিক বিবরণ আপনারা পরে জানতে পাবেন।

* * *

পরিচালক হেমচন্দ্রের "লেডি ইন্ ডিসট্রেস" এর কাজ দিন রাত্রি সমান ভাবেই চলছে। ছবিখানি হবে সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

রূপোলী পর্দ্দার খ্যাতনামা নট—গুল হামিদ—"খায়বার পাশের" পরিচালনা কোরবেন। ছবির গল্পটি এঁর নিজেরই লেখা, সুতরাং আশা করা যায় ছবিখানিতে এঁর কৃতিত্ব বেশ ভালই ফুটে উঠবে, যেমন উঠেছে অভিনয়ে।

রাধা ফিল্ম

এদের পৌরাণিক বাংলা ছবি "কৃষ্ণ সুদামা"র সুটিং সুরু হয়েছে। রেডিও ও গ্রামোফোন গায়িকা রাধারাণী সুনীতার ভূমিকায় (সুদামার স্ত্রী) অভিনয় কচ্ছেন। সুদামার ভূমিকায় অভিনয় কচ্ছেন বাংলার সুপ্রসিদ্ধ নট অহীন্দ্র চৌধুরী। তাছাড়া রুক্মিণীর ভূমিকায় কাননবালা ও নারদের ভূমিকায় মৃনাল ঘোষ দেখা দেবেন। সুদামার কুটিরের একটি দৃশ্য ইতিমধ্যে তোলা হয়ে গেছে। শ্রীযুত ফণী বর্ম্মার সহায়তায় শ্রীযুত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ছবিখানির তত্ত্বাবধান কচ্ছেন। ক্যামেরার হাতল ঘোরাচ্ছেন নবীন যন্ত্র-শিল্পী বীরেন দে; ইনি বাংলা ছবিতে এই প্রথম হাত দিলেন, অবশ্য পূর্ব্বে তামিল ছবিতে এর গুণ প্রকাশ পেয়েছে। শব্দ নিয়ন্ত্রন কচ্ছেন নিতীন পাল, দৃশ্য সজ্জার ভার নিয়েছেন কোলাপুরের শঙ্করজী, এর পরিচয় নূতন কোরে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

* * *

জ্যোতিশ বাবুর "কণ্ঠহারের" চিত্র-নাট্য লেখা শেষ হয়েছে এবং সুটিং শীঘ্রই সুরু হবে। ভূমিকা লিপিতে আমরা দেখতে পাব অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, ভূমেন রায়, জহর গাঙ্গুলী, মৃনাল ঘোষ, (দক্ষযজ্ঞ-খ্যাত) তুলসী চক্রবর্ত্তী, কানন বালা, রাধারাণী, প্রভৃতিকে।

* * *

হিন্দী "দক্ষযজ্ঞ" নিউ সিনেমায় দ্বিতীয় সপ্তাহে এবং "মানময়ী গার্লস স্কুল" 'কর্ণওয়ালিশে' চতুর্দ্দশ সপ্তাহে পড়ল। উভয়স্থানেই এখনও যথেষ্ট দর্শক সমাগম হচ্ছে।

* * *

"ভক্ত কুচেলা" দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে দেখানো হচ্ছে ও বেশ জনপ্রিয়তা লাভ কচ্ছে। মাদ্রাজের "গেটী টকী হাউসে" ১৭ই আগষ্ট ও বাঙ্গালোরের "প্যারাগন টকিতে" ২৪শে আগষ্ট ছবিখানি দেখানো হবে বলে স্থির হয়েছে।

* * *

উর্দ্দুছবি "ওয়ামাক্ এজরা" ও "খাণ্ডারবণ্ট" শেষ হয়ে মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে।

উত্তরা

ক্রাউন টকী হাউসের আমুল সংস্কার কার্য্য সম্পূর্ণ না হওয়ার দরুণ ১০ই আগষ্ট "মন্ত্রশক্তির" মুক্তি লাভ সম্ভব হ'বে না। আগামী ১৭ই আগষ্ট ক্রাউনের সুসংস্কৃত সুরম্য গৃহ "উত্তরা"র "মন্ত্রশক্তি" মুক্তিলাভ করবে।

দীপালী

আগামী শনিবার ১০ই আগষ্ট থেকে "দীপালীতে" বিগত মহাযুদ্ধের বিশ্ববিখ্যাত চিত্র "অল্ কোয়ায়েট্ অন্ দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট্" দেখানো হ'বে। বিগত মহাযুদ্ধের এমন জীবন্ত চিত্র আর হয় নি—ভবিষ্যতে হ'বে কি না সন্দেহ। শান্তি-নীতি প্রচারের দিক থেকে "লিগ অফ নেশনস্" এ ছবিকে বেশ উঁচু স্থান দিয়েছেন, আর এই শান্তি-নীতি প্রচারের দিক থেকে এ ছবির প্রয়োজনীয়তা এখন কোনও সময়ের চেয়ে কম নয়।

রূপকথা

আগামী শনিবার ১০ই আগষ্ট বহু-প্রত্যাশিত গন্ধর্ব্ব সিনেটোনের "মহারাণী" "রূপকথার" রূপোলি পর্দ্দার ওপর আত্ম-প্রকাশ করবে। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় ক'রেছেন বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার গৌরব সুগায়িকা শ্রীমতী পদ্মা দেবী।

ছায়া

আস্‌ছে ১৭ই আগষ্ট "ছায়া"র এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছর সুরু হবে। এই বছরটিও যাতে প্রথম বছরের ন্যায়ই সাফল্য-মণ্ডিত হয় "ছায়া"র কর্ত্তৃপক্ষ তার বন্দোবস্ত করেছেন। কারণ এপর্য্যন্ত এ সিনেমায় শুধু বিদেশী ছবিই দেখানো হত। কিন্তু এরপর এরা নিজেরাই বাংলা ছবি তুলে দেখাবেন বলে মনস্থ করেছেন। খুবই সুখবর।

১০ই আগষ্ট থেকে "ছায়া"য় টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরীর "বুলডগ ড্রামণ্ড ষ্ট্রাইকস ব্যাক্" ছবি খানি দেখানো হবে। এতে অভিনয় করেছেন রোনাল্ড কোলম্যান, লরেটা ইয়ং। ছবিখানি না দেখলে পরে আপনাদের অনুতাপ কর্ত্তে হবে।

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা
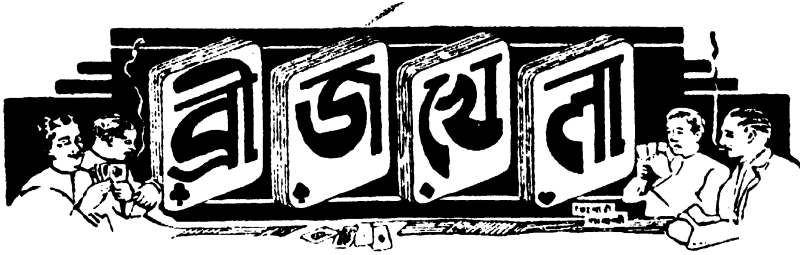
আবাহনমূলক ডবলে খেড়ীর জবাব :—৫ই বৈশাখের খেয়ালীতে আমরা "আবাহনমূলক ডবলের" পর খেঁড়ীর জবাব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছিলাম। খেয়ালীর কতিপয় পাঠক এ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার জন্যে আমাদের জানিয়েছেন। তাঁদের অনুরোধে এ বিষয়ে আরও বিস্তৃতভাবে লিখ্ছি।

প্রতিপক্ষ পাশ দিলে খেঁড়ীর পাশ :—আবাহনমূলক ডবলের পর প্রতিপক্ষ পাশ দিলে খেঁড়ীও যদি পাশ দেন তবে বুঝতে হবে যে তিনি অন্ততঃ তিনটী কম পিটের খেসারৎ পাবার আশা রাখেন। ডাকদারের যদি No Trump ডাক হয় তবে এরূপ অবস্থায় পাশ দিতে হলে তাঁর হাতে অন্ততঃ আড়াইথানি অনারের পিট থাকা প্রয়োজন। আর যদি রঙের ডাক হয় তবে সে ক্ষেত্রে পাশ দিতে হলে তাঁর হাতে রঙের অন্ততঃ চারথানি সুনিশ্চিত পিট পাবার সম্ভাবনা থাকা চাই।

মনে করুন 'ক' ডেকেছেন "একখানি No Trump"। প্রতিপক্ষ 'অ' বল্লেন 'ডবল'; 'খ' পাশ দিলেন। এরূপ অবস্থায় 'আ' কি বল্বেন ?

তাঁর হাতে যদি আড়াইথানির কিছু বেশী অনারের পিট থাকে তবে তিনি নিঃসঙ্কোচে পাশ দিতে পারেন।

আবার মনে করুন 'ক' ডেকেছেন 'একথানি ইস্কাবন'। প্রতিপক্ষ 'অ' বল্লেন 'ডবল'; 'খ' পাশ দিলেন। এরূপ অবস্থায় 'আ' কি বল্বেন ?

তাঁর হাতে যদি ইস্কাবনের চারটী পিট পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবেই তিনি পাশ দিতে পারেন, নচেৎ নয়।

প্রতিপক্ষ পাশ দিলে খেঁড়ীর ডাক :—কিরূপ অবস্থায় খেঁড়ীর পক্ষে পাশ দেওয়া চলে তা' উপরে জানালাম। অন্য ক্ষেত্রে খেঁড়ীকে ডাক দিতেই হবে। নিম্নে যতদূর সম্ভব তা' সবিস্তারে জানাচ্ছি।

মনে করুন 'ক' ডেকেছেন 'একথানি ইস্কাবন'। 'অ' 'ডবল' দিয়েছেন। 'খ' পাশ দিলেন। এখন 'আ' কি ডাক দিবেন ?

(১) তিনি যদি ইস্কাবনের একথানি পিট ধরবার যোগ্য তাস পেয়ে থাকেন (যথা, টেক্কা বা সাহেব, দশ, নয় কিম্বা বিবি, গোলাম দশ) এবং আর একটি অতিরিক্ত অনারের পিট পেয়ে থাকেন তবে তিনি একটি No Trump ডাক দিতে পারেন।

(২) বিবি বা তদূর্দ্ধ তাস সমেত যে কোন মুখ্য রঙের (Major Suit) চারথানি তাস পেলে তিনি সেই রঙটী ডাক দিতে পারেন।

(৩) যদি তিনি কোন মুখ্য রঙের ঐ প্রকার তাস এবং সেই সঙ্গে কোন গৌণ রঙের (Minor Suit) বিবি বা তদূর্দ্ধ তাস সমেত পাঁচথানি তাস পেয়ে থাকেন তবে তিনি সেই মুখ্য রঙটী ডাক দিবেন।

(৪) যদি তিনি কোন মুখ্য রঙের চারথানি এবং কোন গৌণ রঙের ছয়খানি তাস পেয়ে থাকেন তবে তিনি উক্ত গৌণ রঙটী ডাক দিবেন।

(৫) যদি তিনি নিম্নলিখিত রকমের হাত পেয়ে থাকেন—

ইস্কাবন—বিবি, ×, ×, × ; হরতন—×, ×, × ; রুহিতন—×, ×, × ; চিঁড়িতন—×, ×, ×। সে ক্ষেত্রে তিনি দুইথানি চিঁড়িতন ডাক দিবেন। (কেন না, প্রতিপক্ষ 'ইস্কাবন' ডাক দিয়েছেন।)

(৬) যদি প্রতিপক্ষ কোন গৌণ রঙ ডাক দিয়ে থাকেন আর 'আ' যদি দুইটী মুখ্য রঙ্ পেয়ে থাকেন তবে তিনি বড় রঙটা আগে ডাক দিবেন।

(৭) যদি 'আ' একটি ডাকের যোগ্য রঙ্ পেয়ে থাকেন এবং দুইখানির বেশী অনারের পিট পেয়ে থাকেন তবে তিনি শক্তিব্যঞ্জক ডাক দিতে পারেন অর্থাৎ একখানি ইস্কাবনের ডবলের পর তিনি তিনখানি হরতন ডাক দিবেন।

(৮) যদি 'আ' আড়াইখানির বেশী অনারের পিট এবং ইস্কাবনের একখানি পিট ধরবার যোগ্য তাস পেয়ে থাকেন তবে তিনি এ ক্ষেত্রে একেবারে দুইটী No Trump ডাক দিতে পারেন। এ ডাকও শক্তিব্যঞ্জক।

প্রতিপক্ষ ডাক দিলে :—যদি আবাহনমূলক ডবলের পর ডাকদারের খেঁড়ী কোন ডাক দেন তবে 'আ' সে ক্ষেত্রে পাশ দিতে পারেন। সে অবস্থায় তিনি ডাক দিলে বুঝতে হবে যে সে ডাক স্বেচ্ছাকৃত—বাধ্যতামূলক নহে। সুতরাং তাঁর হাত মোটের উপর ভাল। ফলতঃ দেড়খানি অনারের পিট এবং পাঁচ তাস সমেত একটি ডাকযোগ্য রঙ থাকলে তিনি এ ক্ষেত্রে ডাক দিতে পারেন।

* * *

"তাসের খেয়াল" (খেয়ালী, ১৯শে আষাঢ়) নিয়ে আমাদের তাসের আথড়ায় অত্যন্ত গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছে। তার সম্পূর্ণ খবর শীঘ্রই খেয়ালীর পাঠকবর্গ পাবেন। নৈহাটী রামকৃষ্ণ সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীপ্রফুল্ল কুমার চক্রবর্ত্তী ও শিবপুরের শ্রীগোবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায় আমাদের গত সমস্যার নির্ভুল উত্তর দিয়েছিলেন। সময়াভাবে গত সপ্তাহে ইহা প্রকাশিত হয় নাই।

ব্রীজ এসোসিয়েশনের নূতন আইন :—বেঙ্গল ব্রীজ এসোসিয়েশনের নূতন কমিটি প্রত্যহ সভার অধিবেশন করে ব্রীজ খেলার নূতন আইন-কানুন তৈরী করতে ব্যস্ত। নূতন আইন-কানুন প্রবর্ত্তিত হলে শীঘ্রই কোলকাতার তিন-চারটী স্থানে এই আইন-কানুনের অনুলিপি রাখা হবে এবং প্রত্যেক ব্রীজ খেলোয়াড় ও ব্রীজ সমিতির সভ্যগণকে সাধারণ সভায় আহ্বান করা হবে আইন-কানুনগুলি দেখে পরীক্ষা করে মতামত প্রকাশ করবার জন্যে।

বিজয়ী 'ছত্রভঙ্গ' :—সম্প্রতি 'ছত্রভঙ্গদল' Lansdowne Club ও Crockford's Club-এর সহিত ব্রীজ প্রতিযোগিতায় 'ছত্রভঙ্গ দল' বিজয়ী হয়েছেন। 'ছত্রভঙ্গ-দলের' খেলায় এ হেন চরমোৎকর্ষ দেখে কার না আনন্দ হয়। ভবিষ্যতে এঁদের খেলা আরও কিরূপ উন্নতিলাভ করে তা' জানতে সকলেই আগ্রহান্বিত।

—

ডায়েরীর ছিন্ন-পত্র

প্রেমের আভাষ — **রঞ্জন**

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রেণু, রেণু, রেণু···

আমার মনের রেণু···

আশ্চর্য্য এই রেণু—

আমায় সে চায় না, তবুও চায়। আমি তার সামনে গেলে সে যেন অস্বস্তি বোধ করে, মন তার যেন ব'লতে চায়:

যাও, যাও, চ'লে যাও, আমার সামনে হ'তে চ'লে যাও···

কিন্তু চ'লে গেলেই তার মন-প্রাণ কেঁদে ব'লে ওঠে যেন:

ওগো, এসো, এসো, আমি যে তোমার!···

আশ্চর্য্য!···

যতদূরে স'রে যাই ততো কাছে এসে দাঁড়ায়, আবার তার কাছে ছুটে গেলে, দূরে পালিয়ে যায়। পাতার আড়াল থেকে আমায় দেখে, আর মুচকী হাসি হাসে—

প্রহেলিকা!···

সেদিন কি একটা দরকারে তার দাদা প্রতুলের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাই তাদের বাড়ী—

হঠাৎ আমায় দেখে সে বলে:

আবার কেন?

আশ্চর্য্য হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে বলি:

তার মানে?

রেণু একবার চারিদিক তাকায়, তারপর বলে চুপিচুপি:

ছোড়দা বাড়ী নেই, কোলকাতা গেছে কাল, জানেন না?···

সত্যি আমি জানতাম না এ-কথা, তাই তার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য্য সুরে বলি:

সত্যি আমি জানতাম না রেণু?···

রেণু আমার কথায় বাধা দিয়ে খুব আস্তে বলে:

নাঃ, জানতেন না!···প্রাণের বন্ধু আপনার···আবার এ-ও জানতেন না!···

ব'লেই সে হেসে পালিয়ে যায়—

আমি যেন থতমত খেয়ে পড়ি।

আমার বোন চিন্ময়ীর কাছে সে বলে কতো কথা!...আর তার সব কথাতেই নায়ক হয় আমার নাম!···

চিন্ময়ী বাড়ীতে এলে বলে:

দাদা! তুমি এতো দুষ্টু জানতাম না!... 'রেণু'র নামে কেন গল্প লেখো? সে বড়ো রাগ ক'রছিলো কিন্তু!...

আমি সে কথায় কান না দিয়ে লিখতে বসি—

চিন্ময়ী নাছোড়বান্দা!

আমার কলমটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলে:

আচ্ছা, কেন বলো দিকি, তুমি ওর নামে যা তা লেখো ?

আমি চিন্ময়ীর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকি গম্ভীর ভাবে। তারপর আস্তে, খুব আস্তেই বলি :

কেন ? কি লিখলাম আমি ?

চিন্ময়ী যেন হঠাৎ আমার এ-হেন গম্ভীর ভাব দেখে থতমত খায়। সে একবার পাশ ফিরে চায়, তারপর সে ভাব কাটিয়ে নিয়ে আমার টেবিলের ওপর রাখা দোয়াতদানির দিকে চেয়ে আস্তে বলে :

'শিখা' গল্পে কে এক 'অমল' আছে, তার সঙ্গে 'রেণু'র···কি যাচ্ছেতাই লিখেছো··· ও-তো খু-ব রেগে গেছে তোমার ওপর···আর তোমার সঙ্গে কথা ব'লবে না ও...দেখে নিও...

আমি আবার গম্ভীর ভাবে লেখার দিকে মন দি।

চিন্ময়ীর কাছে এ আবহাওয়া সইলো না ব'লেই বোধ হয় যেন কলমটা আমার টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে দুম্‌দাম্‌ ক'রে ঘর ছেড়ে চলে যায়—

আশ্চর্য্য তারপর রেণুর পরিবর্ত্তন—

যখনই তাদের বাড়ী যাই, আর রেণু আসে না তেমন !···দূর হ'তে কেবল দেখে দেখে··· তার সে দৃষ্টিতেও যেন কী মাখানো থাকে !···

বুঝি না, তবুও যেন বুঝি !···

দিন চ'লে যায়, এক পা, দু'পা ক'রে এগিয়ে—

হঠাৎ বাড়ী থেকে খবর আসে, মার খুব অসুখ !···

সন্ধ্যেবেলা—

রেণুর দাদা প্রতুল এখনোও কোলকাতা— তাদের বাড়ী যাই।

ওপরে তার মা থাকেন। তাঁকে বলি :

মাসীমা ! আমি তো কাল কাশী যাচ্ছি।

রেণু তাঁর পাশে ব'সে কী যেন সেলাই করে আর ছাদে তার ছোট ভাই-বোনেরা হৈ-চৈ বাধিয়ে খেলা করে।

রেণুর মা আশ্চর্য্য হ'য়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন :

কাশীতে ?···হঠাৎ !

তাঁকে বাবার লেখা চিঠিখানি প'ড়ে শোনাই। রেণুও চুপ ক'রে শোনে।

চিঠি পড়া শেষ হ'লে তাঁর মা বলেন :

তা হ'লে তোমরা সকলেই যাবে বোধ হয় ?

আমি বলি :

হ্যাঁ, বউদি, আমি, চিন্ময়ী সকলেই যাবো, দাদা দু'দিন পরে যাবেন। ছুটির জন্ম দরখাস্ত ক'রেছেন, পেলেই তিনিও যাবেন !

তাঁর মা বলেন আবার :

হ্যাঁ, তা যেতে হবে বৈ কি তোমাদের ! তোমার মার অসুখ যখন !···

আমি চিঠির খামটা মুড়তে মুড়তে বলি :

তা হ'লে মাসীমা কালই সকালের ট্রেনে যাচ্ছি আমরা।—প্রতুলের সঙ্গে দেখা হ'লো না; সে এলে একবার কাশীতে পাঠিয়ে দেবেন।···

রেণুর মা বলেন :

হ্যাঁ, তা দেবো বৈ কি বাবা !...সে তোমায় এত ভালবাসে···নিশ্চয়ই যাবে !

আমি আর দেরী না ক'রে তাঁকে প্রণাম ক'রে উঠে পড়ি :

তা হ'লে মাসীমা আসি। কাল পৌঁছে প্রতুলকেও একখানা চিঠি লিখে দেবো।

হ্যাঁ, বাবা তাই দিও, আর আমাকেও একখানা দিও। তোমার মার অসুখ শুনে আমার মনটা বড়ো খারাপ হ'লো !...

আমি আর কিছু না ব'লে পাশ ফিরি। সামনেই রেণু।···রৌদ্র···মেঘ !···

সাঁঝের আবছা অন্ধকারে বাড়ী ঢাকা পড়ে—

রেণু কী একটা অছিলায় আমাদের সামনে হ'তে উঠে পড়ে।

সিঁড়ি বেয়ে কী যেন ভাব্‌তে ভাব্‌তে সদর দরজার কাছে আসতেই একটা খস্‌খস্‌ আওয়াজে চমকে ফিরি...

চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ !...

আবছা আঁধারে কিছু ভালো দেখা যায় না, তবুও...

সারা দেহ যেন অকারণে কেঁপে ওঠে—

পাশে, দেওয়ালের গায়ে মিশে দাঁড়িয়ে থাকে রেণু !···

তার দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে বলি :

রেণু—এখানে ?

কী জানি কেন সে আরোও আমার কাছে স'রে আসে। একবার চারিদিক তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে ইসারায় বলে :

চুপ !...

তারপর আস্তে, খুব আস্তে বলে :

চিত্তদা'—

কথা আর ব'লতে পারে না সে—

চোখ দুটো তার ছলছল্ ক'রে ওঠে যেন !···

রেণুর চলার ছন্দে আমার মনে জাগে দ্বন্দ্ব !...

রেণুর কাঁপা গলার স্বরে আমার মনে দোল খায় এক ভীষণ তরঙ্গ !!···

রেণুর এ-হেন আগমনে আমার প্রাণে আনে কাঁপন !!!...

ধীরে ধীরে, অতি ধীরে সে আমার কাছে এসে দাঁড়ায়...

শরীরের উষ্ণ রক্ত-প্রবাহ তখন আমার হিম অসাড় হ'য়ে পড়ে...

হাত দুটো তার আমার কাঁধের ওপর তুলে দেয়...

সহায় যেন চায় সে !...

কাণ্ডারী যেন আমি !···

সহায়-হীন কাণ্ডারীর তখন প্রাণের কম্পন আরোও নেচে ওঠে দ্রুততালে !···

তার চুলের গুচ্ছ মুখে এসে পড়ে...

অস্পষ্ট আঁধারে দেখা যায় তার স্বপন-মাখানো আঁখি দুটো যেন মিনতি জানাতে চায়···

বলে :

তুমি যেও না !

সামনে বন্ধন, প্রতিবন্ধক, কিন্তু ছিন্নের অস্ত্র আমার হারিয়ে যায়...

প্রবল স্রোত তখন আমার দেহের ওপর আসে ধীরে ধীরে···

রেণু...রেণু...সারা চিত্ত-ভরে তখন রেণুর কথা, রেণুর মিনতি, রেণুর আকুল চাহনি জাগে মনে !...

রেণুর শরীর ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপে !···

তার কাঁধের ওপর আমার হাত দুটো অজানা ভাবে নেমে আসে—

রেণুর শরীর আমার নিজের দেহের ওপর লুটিয়ে পড়ে···

অন্ধকারে উন্মাদ নৃত্য !···তার শরীর কাঁপে, আমার প্রাণ কাঁপে···

বুকের মাঝে তীব্র দাহন জ্বলে !...

ক্ষণিকের জন্যে মন আমার বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে।···

রেণুর আধ-স্ফুটন্ত গোলাপরঙ্গে রঞ্জিত আনন খানি নেমে আসে···

চোখ তার বুঁজে আসে মোহের আবেশে···

মুহূর্ত্তে ভুলে যাই আমি কে, কোথায় !···

রেণু আমার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে। ডুকরে কেঁদে ওঠে :

তুমি...তুমি আমায় অপমান ক'রলে কেন ?...

অপমান !···

রেণু বলে :

না, না, আমি পারবো না, পারবো না···

হঠাৎ ওপর থেকে একটা কাঁসার থালা পড়ার ঝন্ ঝন্ আওয়াজ কানে আসে···

মুহূর্ত্তে আমরা দু'জন ছিন্ন হ'য়ে পড়ি—

আর সঙ্গে সঙ্গে সদরের বাইরে এসে দাঁড়াই—

তারপর জীবনের ওপর দিয়ে অনেক তরঙ্গ এসে দোল খেয়েছে, কাউকে ধ'রে রাখতে পারি নি আমি, এক এক ক'রে চ'লে গেছে—

রেণু যে আমার জীবনের একটি বড়ো অধ্যায় গ'ড়ে তুলেছিলো, তা-ও আজ ধূলায় বিলুণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছে...

সকালের ডাকে তার বিয়ের এক নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম !

আমি কার কাছে জানবো এ নারী রহস্যের অর্থ ?···

প্যারাডাইস লষ্ট

শ্রীঅতুল দাশগুপ্ত

জ্যোছনার মত ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি।

সুন্দরী সে ছিল বটে; কাব্যের ভাষায় যাকে বলে—অপূর্ব্ব! শিল্পীর হৃদয় রক্তে তুলি রাঙ্গিয়ে আঁকা—ঠিক যেন একখানি পটের ছবি! মেয়েটির নাম অলকা। আমাদের পাশের বাড়ীতেই থাকত সে। ব্যবধান ছিল মাত্র একখানা প্রাচীর এবং এত সন্নিকটে থেকেই আমাদের সকলের সাথে ওদের হ'য়েছিল, প্রবল ঘনিষ্ঠতা। আমাকে বড় ভাল লাগত অলকার; তাই সমবয়সী সঙ্গীদের ছেড়ে প্রায়ই আসত আমার কাছে।

বসেই সে বলত—গল্প বল বিনুদা!

অনুরোধ বা আব্দারের সুর ছিল না তা'তে, এ যেন তার দাবী! জানতুম সে এক রোখা মেয়ে; ওর হাত থেকে এড়ানো যাবে না। তখন ওকে জিজ্ঞেস করি—কিসের গল্প বলব অলকা? রাক্ষস খোক্কস, না ভুত প্রেতের গল্প?

অলকা দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ ক'রে বলত—না-না, ও সব বাজে গল্প আমি শুনব না। তুমি যে সব গল্প কবিতা লিখছ ঐগুলো আমায় শোনাতে হবে। বলনা—!

অলকার মত একজন একনিষ্ঠ ভক্ত পেয়ে আমার মনেরও পরিবর্ত্তন ঘটে যায়। নূতন কিছু লিখলেই ওকে সর্ব্বাগ্রে শোনাবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠতাম। অলকাকে না শোনাতে পারলে লেখার সার্থকতাও যেন অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এই কাব্য চর্চ্চার ভেতর দিয়ে এমন একটা অনাবিল আনন্দ আমাকে পুলকিত ক'রে তুলত, যা নাকি অর্থের বিনিময়েও ঘটে না। তার উপর অলকার আগ্রহ আমাকে দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়ে দিল। সাহিত্য সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে বাস্তব জগত ছেড়ে কল্পজগতে প্রবেশ কোরলুম।

সার্থকতার আনন্দে কাব্যজগতের ভেতর দিয়ে জীবন তরী ভাসিয়ে চলেছি, জানি না কবে—কোথায় গিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। ভাববারই বা প্রয়োজন কি? মানুষ তার জীবনে আকাঙ্খা ক'রে—সুখ ও শান্তি। আমি সুখী আজ অলকার অনুপ্রেরণায়; তারই উৎসাহের মোহমদিরায় হ'য়েছি কবি, কবি নামের অধিকারী! জীবনের জয়যাত্রায় জয়ী আমি। প্রেমিক না হলে কবি হওয়া যায় না, এটা হোল বন্ধুদের একটা পচা আইডিয়া; তাই তারা বলত—তুমি পড়েছ নারীর প্রেমে তাই এ কাব্যোচ্ছ্বাস! বন্ধুদের এ যুক্তি খণ্ডন কর্ত্তে, বসে নিরালায় ভাবতুম—সত্যই কি পড়েছি নারীর প্রেমে? কে সে নারী? কার রূপের মোহে মন আমার মজল? ………কৈ, গত জীবনের ইতিহাস আলোচনা করেও ত কোন সন্ধান পাচ্ছি না! তবে কি বন্ধুদের কল্পনা অলীক? …নারী—হ্যাঁ, অলকাই আমার জীবনে প্রথম নারী। তা'হলে কি তারই প্রেমে পড়লুম?……

ইহাই কি প্রেম? প্রেম যে স্বর্গীয় এক অনুভূতি! সেটা কি এতই সহজ লভ্য? অলকা—ঐ ছোট্ট মেয়ে, প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব কি বুঝবে? ওর প্রেমে প'ড়ে আমার লাভ? ……সাধারণ মানুষ যে যার প্রেমে পড়ে, তাকেই চায় জীবনের সুখ দুঃখের সাথী কর্ত্তে; কিন্তু আমি? আমার এ আকাঙ্খা ত পরিতৃপ্ত হইবার নয়! প্রধান বাধাই যে সমাজ। অলকা আমার হ'তে পারে না! অলকা—সত্যই কি অলকার প্রেমে পড়েছি? ………তাইত, ওর চিন্তায় মন আমার এত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে কেন? বুকের মাঝেও অনুভূত হয় একটা কম্পন; দেহের প্রতি শিরা উপশিরায়—রক্তের একটা উন্মাদ শিহরণ! না—অস্বীকার কর্ত্তে পারি না; অলকা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে একটু জায়গা ক'রে নিয়েছে। ভালবাসি—অলকাকে আমি ভালবাসি।……

কালের স্রোত ছুটেই চলেছে ; দিন যায়—আসে রাত্র, আবার দেখা দেয় দিন। এমনি বাঁধা গতের মতই একটানা সুর!

মানুষ কল্পনায় তার জীবনের চলার পথ বেছে নেয়- সত্য, কিন্তু চলতে হয় তাকে নিয়তির ইচ্ছাধীনেই! কালের হাত থেকে নিস্তার নেই কারও ; সে ধনী কিম্বা রাস্তার ভিখারীই হোক। আমি আর বাদ যাব কেমনে?

আমার জীবন স্রোতের বাঁকে অকস্মাৎ পড়ল এক বাধা। কালচক্রের নিষ্পেষণে সুখস্বপ্ন আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এইখানেই আমার কাব্যজীবনের ট্রাজিডি! সেদিন অতি প্রত্যুষেই অলকা এসে আমার কাছে বসল অতি বিমর্ষ বদনে।

অলকার চোখে জল দেখে আমার বুকখানি কেঁপে ওঠে এক অজানা আশঙ্কায়! বিস্মিত মনে শুধাই একি! তুমি কাঁদছ কেন অলকা? কি হ'য়েছে আমায় খুলে বল। তোমার মুখে হাসি না দেখতে পেলে আমার প্রাণও যে কেঁদে ওঠে!

অলকা বললো—কেন শোননি? বাবা যে বদলি হ'য়েছেন লক্ষ্ণৌতে। কালই আমরা সকালে সেখানে রওনা দেব। বিনুদা—অলকার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে গেল যেন এক ঝলক অশ্রুতে!

ওর অন্তর-ব্যথার সন্ধানটুকু পেয়ে আমিও একটু মুষড়ে গেলাম। হঠাৎ অলকারা এখান থেকে চলে যাবে তা'ত একবারও ভাবিনি মনে! বাস্তবিকই এ সংবাদ শুনে আমিও একেবারে মর্ম্মাহত হ'য়ে গেলাম। এতদিনের ঘনিষ্ঠতা যেন একটি মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হ'য়ে গেল। ওকে কি বলে যে সান্ত্বনা দেব তাই ভেবে পাইনে। অলকারা চলে যাবে এই কথা ভাবতে ভাবতে একেবারে তন্ময় হ'য়ে গেলাম।

আমাকে নীরব দেখে অলকা বলে উঠল—বিনুদা', আমার কিন্তু যেতে ইচ্ছে হয় না।

অলকার চোখ দু'টো মুছে দিয়ে বললুম—উপায়ত নেই কিছু। যেতে যে তোমার হবেই। মিছে আর দুঃখ ক'রে কি ফল হ'বে বল? বেড়াতে কি তোমার সাধ হয়না? নূতন দেশে যাবে ; কত নূতন জিনিষ, নূতন মানুষ দেখতে পাবে। তা'তে কি আনন্দ কম?

কাতর চোখ দুটো তুলে আমার পানে অলকা বললো—তোমায় ত সেখানে দেখতে পাবনা। তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার যে বড় কষ্ট লাগে! তারপর তোমার কবিতাও আর শুনতে পাবনা। তা'হলে আমি কেমন ক'রে থাকব? সকল সময় তোমার কথাই মনে হবে। বিনুদা, তুমিও কি সেখানে যেতে পারনা?

অলকার শিশুসুলভ সরল মনোভাবে আমার ব্যথিত অন্তরও একটু না হেসে পারলনা। ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললুম—তাও কি হয় অলকা? আমি কি

এখন কোথাও যেতে পারি? তোমাদের সাথেইবা যাব কেমন ক'রে? আমিত আর তোমাদের আপন জন কেহ নই! বৃথা মনোকষ্ট পেওনা। যদি সুযোগ হয় কোনদিন তবে হয়ত আর একবার দেখা হ'তেও পারে।

অলকা একটু নীরবে কি যেন ভেবে বলে উঠল—আচ্ছা বিনুদা', তোমার কবিতাগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে? মাঝে মাঝে পত্র লিখবে? পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাবে আমাদের ওখানে? তা'হলে আর আমার কোন কষ্ট হবেনা।

পরের দিন। পাড়া প্রতিবেশী সকলের কাছে বিদায় বার্ত্তা জানিয়ে, অলকার পিতা পরিবারস্থ সকলকে নিয়ে লক্ষ্ণৌ-এর পথে রওনা দিলেন।

অলকার বিদায় বেলার করুণ চাহনি আজও আমার বুকে ব্যথার স্তূপ হ'য়ে আছে। যতই দিন কাটতে থাকে ততই যেন কি একটা অভাব আমাকে চিন্তিত ক'রে তুললো। বুকখানি বড় হালকা মনে হ'তে লাগল। জীবনের জয়যাত্রার পথের সকল সম্পদ আমার আছে, তবে কেন মনে হয়—চতুর্দ্দিক শূন্য! অলকার অভাবেই কি আজ মনের এ চঞ্চলতা? বুকের হাড়গুলো মুচড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে একটা প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস।......বহুদিন কেটে গেল।

অলকার কথা কোনক্রমেই ভুলতে পারিনি। কেমন একটা এলোমেলো চিন্তায় কবিতা লেখার ঝোঁকও আমার কমে আসে! অলকার অবর্ত্তমানে কাব্যচর্চ্চা আমাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় তৃপ্তি দেয়না। কোন সার্থকতাও যেন খুঁজে পাইনে। আমার জীবনের আশা আকাঙ্খার সকল উৎসই তিরোহিত হ'য়ে গেছে অলকার সাথে সাথে! কোন কিছু লিখতে বসলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে অলকার মুখখানি; ...অলকারা চলে যাওয়ার পর ওদের এক পৌঁছ সংবাদ ব্যতীত আর কোন খবর পাইনি। আমিও লিখিনি; লিখবই বা কার কাছে? অলকার নিকট পত্র লিখবার কোন অধিকারও আমার নেই! বৃথা চিন্তা ক'রে লাভ? কালচক্রে হ'য়েছিল ঘনিষ্ঠতা ঐ ছোট্ট মেয়েটার সাথে, আবার তারই ঘূর্ণপাকে হ'য়ে গেল চিরবিচ্ছেদ! নেশা—একটা চোখের নেশা!! মানুষের জীবনে এমন কত ঘটনা ঘটে থাকে; জীবন নাট্যের পট পরিবর্ত্তন ছাড়া কি বলব? এই ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়ে ডুবে থাকলে চলবে কেন? লোকই বা বলবে কি? কত ভাবেই নিজেকে বুঝাতে চাই, কিন্তু মন আমার কিছুতেই মানে না!

শত চেষ্টা ক'রেও মনকে সংযমের বাঁধে বাঁধতে পারিনে। তারই ফলে প্রতি পদক্ষেপেই দেখছি ব্যর্থতার প্রতিমূর্ত্তি! 'শিথিল হ'য়ে আসে দৈনন্দিন কাজ কর্ম্মের ধারা। বন্ধুর দল বিস্মিত মনে শুধায়—তোর হল কি বিনয়? সারাদিন আপন মনে কি যে ভাবিস তা আমাদের বোধগম্য হয় না। দিনরাত্র অমন বিমর্ষভাবে চিন্তা কোরলে শরীর যে ভেঙ্গে পড়বে। আজকাল কবিতা লেখা ও একেবারে ছেড়ে দিয়েছিস; বলি ব্যাপারখানা কি বলত?

বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তর সহসা দিতে পারি না। তাদের নিরস্ত কর্ত্তে অন্যপ্রসঙ্গ উথাপন ক'রে কোন রকমে নিজেকে সামলে নেই। সর্ব্বদাই মনে ভয়—পাছে বন্ধুরা আমার দুর্ব্বলতা ধ'রে ফেলে! তবে কি আর রক্ষা আছে? অবশেষে কাব্যচর্চ্চা একেবারে ত্যাগ কোরলুম। মনের সকল চিন্তাধারা আমূল পরিবর্ত্তন ক'রে সাংসারিক কাজ কর্ম্মে

গোলাপ রাণী

শ্রীবিজনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গোলাপ রাণী! গোলাপ রাণী! তোমার ঠোঁটের লাল হাসি,
ম্লান ক'রে হায় চপল চাঁদের চোখ-ঝলসা রূপরাশি;
মুচ্‌কে হাস যখন তুমি,
ইচ্ছে ক'রে তোমায় চুমি,
রঙীন তোমার ঠোঁটের পানে চোখ দু'টী মোর যায় ভাসি'!

কল্প-বনের রাণী তুমি ফুল বঁধুদের অপ্সরী,
জড়িয়ে ধরি তোমায় বুকে স্বপন-ঘোরে ভুল করি;
প্রজাপতি তোমার বুকে,
নিথর হ'য়ে বসে সুখে—
হিয়ার সুধা নিঙড়ে নিতে বেড়ায় ভ্রমর গুঞ্জরি'!
গোলাপ রাণী! গোলাপ রাণী! তুমিই প্রেমিক ফুল বঁধু,
চিত্ত তোমার সরস সদাই স্নিগ্ধ তোমার মন মধু!
মিষ্টি তোমার দৃষ্টিখানি,
সত্যি তুমিই ফুলের রাণী,
বুক জুড়োনো পরশ তোমার প্রাণ যে আমার চায় শুধু!

নিজেকে মগ্ন ক'রে রাখলুম—বলতে গেলে একেবারে নূতন জীবনে প্রবেশ!...

আজকাল দিনগুলো কাটে যেন জলের স্রোতের ন্যায়।...দেখতে দেখতে নানা সুখ দুঃখের ভেতর দিয়ে দিনের পর দিন গত হ'য়ে বছরের পর বছরও কেটে যায়।...

এক...দুই...তিন ক'রে ছ'টা বছর কেটে গেল। এই ছ'টা বছরের ইতিহাস আলোচনা নাই বা কোরলুম; বর্ত্তমানকেই আঁকড়ে ধরি। এখন আর আমি তরুণ নই, পূর্ণ যুবা। আনন্দময় নব যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ প্রবাহিত আমার দেহের শিরায়। বুকের মাঝে বাসা বেঁধেছে কত রঙীন আশার কামনা!

পাঠ্যাবস্থা অতিক্রম ক'রে কর্ম্মজীবনে প্রবেশ ক'রেছি। জীবনের সাথী করেছি সত্য ও একনিষ্ঠতা। অধ্যবসায়ী হ'য়ে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশে পরিণত হ'তে তখন আমার জীবন মরণ পণ! বিয়ে করিনি। চিরকুমার থাকাই জীবনের সঙ্কল্প। তা'বলে সংসারের প্রতি উদাসীন আমি নই! নারী মায়াবী; নারীর রূপ—মায়া মরীচিকা! তাই একজন নারীকে জীবন সাথী কর্ত্তে আমি নারাজ।

এখন আর অলকার কথা তেমন মনে পড়ে না। মনে হ'লেও আর পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে চঞ্চল ক'রে তোলে না। একান্ত মনে ওর কথা চিন্তা কর্ত্তেও আমার প্রবৃত্তি হয় না।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি। যখন প্রকৃতির এক অনবদ্য রূপ মানুষের প্রাণে জাগিয়ে তোলে রঙীন সুখ স্বপ্ন ছবি, এমন মনোরম দিনের এক সকাল বেলা।

প্রাতঃকৃত্য কার্য্যাদি সমাধা ক'রে, একটা সোফার উপর ব'সে একাগ্রচিত্তে শুনছিলুম পাখীর কুহু কুহু ধ্বনি। আজিকার নববসন্তের মূর্ত্তিখানি আমাকে আনন্দে ভরপুর ক'রে তুললো; আকস্মিক মনের এ চপলতায় একটু বিস্মিত হ'য়ে গেলাম। আরও কত বসন্ত কেটে গেছে আমার জীবনে; কিন্তু কৈ, এমন ভাবে ত পুলকিত ক'রে তোলেনি কোন দিন! তবে আজ কেন এমন হোল? নূতন কোন উৎসও খুঁজে পাইনে!

বহুদিন পর আজ আবার আকাঙ্খা জাগল—একটি কবিতা লিখি! মনের আকাঙ্খা পূরণ করাই হোল প্রকৃতির ধর্ম্ম। আমি সেই মুহূর্ত্তেই বসলুম লিখতে; কিন্তু ব্যর্থ হোল সকল চেষ্টা। কোন প্রকারেই একটি কবিতার সৃষ্টি কর্ত্তে পারলুম না। পুনঃ পুনঃ হ'তে লাগল ছন্দ পতন! বিরক্ত হ'য়ে কাগজ কলম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চেয়ে রইলুম বাইরের পানে। নবীন সূর্য্যের সোণালি কিরণ নিস্তব্ধতাময়ী উষাকে তখন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছে।

আমি যখন প্রকৃতির রূপ সুধা পানে মগ্ন, ঠিক এমনি সময় বৌদির ডাক কানে এল—ঠাকুর পো!

ফিরে চাইতেই দেখি বৌদি একজন সুন্দরী তরুণী সহ আমার রুমে ঢুকছেন।

অপরিচিতার পরিচয় পাওয়ার আকাঙ্খায় শুধালাম—ইনি কে বৌদি?

আমার প্রশ্ন শুনে বৌদি উঠলেন উচ্চ-রবে হেসে; তরুণীর ঠোঁটের কোণেও একটু তরল হাসি।

বৌদি বললো—চিনতে পাচ্ছ না ঠাকুর পো? আশ্চর্য্য বটে! মনের বইটার পাতাগুলো একবার সন্ধান ক'রে যাও, চিনতে পারবে।

বৌদির রহস্যপূর্ণ হাবভাবে একটু থতমত খেয়ে গেলাম। আর একবার বাঁকা চোখে চেয়ে তরুণীর পানে, চেষ্টা করলুম মনের দ্বন্দ্ব ঘুচাতে; কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হলাম।

বললুম—মুখখানা যেন চিনি মনে হয়; ঠিক গুছিয়ে বলতে পাচ্ছি না কে!

বৌদি বললে—তা' স্মরণ হ'বে আর কেমন ক'রে? কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছ, সেই সাথে অলকাকেও ভুলে গেছ। ইনি যে তোমার সেই "বড় আদরের অলকা!" আগ্রা প্রবাসী বাঙ্গালী কবি রজত রায়ের নাম শোননি? ইনি আজকাল তারই সহধর্ম্মিনী। কথাটা শুনে চম্‌কে উঠ না—যাই আমি চা নিয়ে আসছি; সেই অবসরে তোমরা দু'জনে দু'টো সুখদুঃখের কথা ক'য়ে নাও।

বৌদির মুখে তরুণী বধূটির পরিচয় পেয়ে আমি একেবারে বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। এই সেই ছোট্ট অলকা; আজ পরিপূর্ণ রূপ-যৌবনে কি অসামান্যা সুন্দরীই দেখাচ্ছে তাকে! এমনি আচম্বিতে—এই নূতন পরিচয় নিয়ে যে কোনদিন ওর সাথে হ'বে সাক্ষাৎ তা' ছিল আমার স্বপ্নাতীত। স্বপ্নেরও অগোচর যাহা, তাহাই ঘটে নিয়তির বিধানে! মনের পটে আমার জেগে ওঠে গত জীবন নাট্যের সকল দৃশ্যগুলো। একটা মোহময় আবেশে আমার দেহ মন আলোড়িত ক'রে তুললো। শত চেষ্টা ক'রেও আমি আর একবার অলকার পানে ফিরে তাকাতে পারলুম না।

ছিটে ফোঁটা

বজ্রবাহু

"ব্রতচারিণী"র প্রভাবতী দেবী সরস্বতী সম্প্রতি স্বর্গব্রতের মায়া কাটাতে চেয়েছেন—অতীত বর্ত্তমানের ভাবধারা থেকে নিজেকে অপসারিত করে ভবিষ্যতের নরকের দিকে পাড়ি দিতে সুরু করেছেন। সাহিত্যের ডাষ্টবিন "ভবিষ্যতে"র আষাঢ় সংখ্যায় তিনি তাঁর ভবিষ্যত জীবনের যে আভাষ দিয়েছেন তাতে আমরা চমৎকৃত হলাম। শ্রীযুক্তা দেবী সরস্বতীর "সবই মিছে, সবই মিছে" কবিতাটি পড়বার পর থেকেই আমাদেরও কেবল মনে হচ্ছে যে জগৎটাই মিছে আর তার চাইতেই মিছে স্বর্গের কথা।

"স্বর্গ কোথায় পাইনি ঠিকানা কাজেই
তাহা না চাই নরকেই থাকি,—"

তা থাকুন্; নরকে যদি তাঁর এত রুচি তো আমরা আর কি করবো?—

* * *

পৃথিবীতে অষ্টম আশ্চর্য্য আছে, নবম আশ্চর্য্যের কথা এখনও শুনি নি—এই অষ্টম আশ্চর্য্যময় পৃথিবীর মাঝে ক'রকম যে অতি আশ্চর্য্য ধরণের পাগল আছে—তার এখনও সন্ধান করে ওঠা যায় নি। তবে আমরা সম্প্রতি একটি ৯নং পাগলার সন্ধান পেয়েছি। এই ৯নং পাগলার জন্যে একটি special mental observation House-এর দরকার হয়ে পড়েছে। আমরা charity করেও এর জন্যে চাঁদা দিতে প্রস্তুত আছি। শ্রাবণের 'ভবিষ্যতে'—এই ৯নং পাগলা পাগলামীর চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন—

"তোমার লালসা—৯লা ৯পৃষ্টিক সম হ'য়ে
যে ল ৯মা লেপিয়াছে, মোর
ওষ্ঠাধরে লোভাতুর লে ৯ হান লাগে।
লক্ষ লক্ষ বর্ষ নিশি ভোর
তৃষাতুর উদগ্র উত্তাপে
উদ্বে ৯ ত সেথা—"

এর নাম না কী কবিতা!—এ "৯ লা ৯ পষ্টিকে"র জন্মদাতা ভবিষ্যত পরিচালক সুভো ঠাকুর।

* * *

উক্ত সংখ্যাতেই মৃণাল সর্ব্বাধিকারী 'মানব বিধাতার নব বিধান' প্রচার করেছেন। বিধাতার বিধান ভবিষ্যৎ সমাজে তা হলে উঠ্‌লো দেখছি! তবে আশার কথা ভবিষ্যৎ সম্পাদক মহাশয় সবিনয়ে জানিয়েছেন এটা 'গল্পনা। জল্পনা'। মনের খেয়ালে কাজকর্ম্ম অভাবে অনেকেই অবশ্য অনেক রকম আবোল-তাবোল জল্পনা করে থাকে, তবে সেগুলি কোনদিনই কাজে আসে না। এই দুর্ভিক্ষের বাজারে এমন ভাবে কাগজ কলম (সময়ের কথা নাই বা বললাম) নষ্ট করবার স্বার্থকতা কী?

* * *

'অর্চ্চনা'র শ্রাবণ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্না নাথ চন্দ এম্-এ, বি-এল্ একটি কবিতা লিখেছেন—"অদ্বিতীয়া"!

কবি বহু অনুসন্ধানের পর অদ্বিতীয়ার সন্ধান পেয়েছেন।

—"ক'ত কাঁধে রাখিয়াছি এই হাত,
কত বুকে এই বুক—
শুধু ফুল হতে ফুলে গেছি উড়ে,
মেলে নাই এত সুখ!"

সর্ব্বনাশ!—"নারী" "লক্ষ—লীলা," "চুম্বন" "লজ্জাহীনা" আরও অনেক আছে। বছ'র কয়েক আগে "ভারতবর্ষ", "বিচিত্রা" প্রভৃতিতে জ্যোৎস্না বাবুর মিষ্টি হাতের লেখা কত চমৎকার গল্প, কবিতা পড়েছিলাম—সেই তরুণ বয়সেও জ্যোৎস্না চন্দের লেখার সংযম ছিল, শুচিতা ছিল। এখন আবার এ পরিবর্ত্তন কেন?—এও কী ভবিষ্যতের infection নাকি?

ভুলিব না

শ্রীলতিকা ভাদুড়ী

১

আমি কভু না ভুলিব ভুলি যদি না রহিব
এ সংসারে আর,
জানিনা জীবন পারে পুনঃ কি পাইব তারে
হৃদয়ে আমার;
বিধি যার প্রতিকূল তার প্রতি নাহি কূল
অকূলে সাঁতার
এ জন্মে যদি না পাই পরজন্মে নাহি চাই
সে ত অন্ধকার।

২

বুক চিরে রক্ত দিব, ক্ষুদ্র প্রাণ বিলাইব
তাহার মঙ্গলে,
জীবনের যত দুঃখ, আনন্দে সহিয়া যাবে
তার সুখ হ'লে।
এই মহাপণ করি— ধ্রুবতারা লক্ষ্য করি
ছুটিব সম্মুখে।
সহি মহাবজ্র ঝড়; বক্ষ করি দৃঢ়তর
মহামৃত্যু মুখে॥

অমরেশ ও মীনা

নাটক

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অমরেশ—হ্যালো প্রকাশ? মীনা এখানে নেই, এখান থেকে চ'লে গেছে। সুতরাং—(অল্প থামিল)

হ্যাঁ, এই খানেই ছিলো এতোক্ষণ।

অমরেশ—এইমাত্র চ'লে গেল"

(রিসিভার রাখিয়া দিল)

(সুরমার দ্রুত প্রবেশ)

সুরমা—হ্যাঁগো দাদা, মীনার আবার কি হ'ল?

অমরেশ—কেন?

সুরমা—দেখলুম দৌড়ে তেতলায় উঠে গেল।—কি হ'য়েছে তার?

অমরেশ—হয়নি কিছুই। প্রকাশের সঙ্গে পাছে টেলিফোনে কথা কইতে হয় তাই বোধ হয় পালিয়েছে।—তা' যাক, আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি কয়েকজন ভদ্র লোককে নিমন্ত্রণ ক'রে আস্‌তে। তারা এখানে খাবে ও গান টান গাইবে; যেমন ধরো—সান্যাল, মল্লিক, ভট্টাচার্য্য, বড়াল। তুমি সমস্ত বন্দোবস্ত করে দাও খাবার দাবার। সমস্ত আলোগুলো আজ জ্বেলে দিও—ঝাড়গুলো শুদ্ধ।

তোমরাও সকাল সকাল তৈরী হ'য়ে নাও। সময় আর নেই, সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমি চললুম।

সুরমা—আজ বুঝি মিলনোৎসব?

অমরেশ—(হাসিয়া ফেলিল, বলিল)—'হ্যাঁ'

সুরমা—তাই বুঝি বৌ গান গেয়ে শোনালে?

হ্যাঁ—

সুরমা—আমি বুঝি বাড়ী ছিলাম না? আমায় বুঝি একটুও খবর দিতে নেই?

অমরেশ—অভিমান?

সুরমা—হ্যাঁ, অভিমান! বিরহের সময় আমি গান গেয়ে শোনাতে পারি, মিলনে—আমি কি কেউ নই?

(তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনিয়া বলিল:)

না গো—কিছুনা। অভিমান মোটেই না। এতটুকুও আমার অভিমান নেই। তুমি নিমন্ত্রণের পালা শেষ ক'রে এ'সো, আমি ততোক্ষণ শাঁখ বাজিয়ে আর একবার বধবরণের ব্যবস্থা ক'রে রাখিগে—এসে দেখো, সমস্ত কাজ complete একেবারে!

(প্রস্থান)

(ধীরে ধীরে মীনার প্রবেশ)

মীনা—বেরিয়ে গেল!

(প্রকাশের প্রবেশ: সে অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া রহিল)

মীনা—দলবীর?—একি, কার পায়ের শব্দ! (স্তব্ধ ভাবে নিরীক্ষণ)

(দলবীরের প্রবেশ)

হ্যারে, সাব কি নিকাল্ গিয়া?

দলবীর—জী।

মীনা—কাঁহা গিয়া কুছ বোলা?

দলবীর—জী নেহি।

মীনা—কব লৌটে গা বোলা?

দলবীর—জী নেহি।

মীনা—আচ্ছা, দোস্‌রা কোই আদমি কোঠিমে আয়া দেখা?...

দলবীর—জী নেহি।

মীনা—আচ্ছা যাও। (দলবীরের প্রস্থান)

(প্রকাশ মীনার সম্মুখে আসিল)

প্রকাশ—দলবীর দেখেনি, কিন্তু আমি এসেছি।

মীনা—এ্যাঁ! তুমি!......

(ঘরের সমস্ত আলো জ্বলিয়া উঠিল)

(এক মুহূর্ত্ত প্রকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে বলিল:)

আমি এই আশঙ্কাই করছিলাম।

প্রকাশ—কারণ, তুমি ঠিক্ জান্‌তে টেলিফোনে অপমানের পর আমি বাড়ীতে ব'সে থাক্‌বো না।

মীনা—অপমান?—হ্যাঁ, আমি ইচ্ছে করেই কথা কইনি টেলিফোনে। তা জান্‌তে পেরে, এখানে না এলেই ভালো হ'ত।

(প্রস্থান)

(প্রকাশ একখানা কৌচে বসিল। মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ; পরে সে কলিং বেল্ টিপিল)

(দলবীরের প্রবেশ)

প্রকাশ—কোন্ হ্যায় তোম্?

দলবীর—আরদালী—

প্রকাশ—দেউড়ীমে আর কোন্ হ্যায়?

খেয়ালী

দলবীর—দরোয়ান হ্যায়।

প্রকাশ—(অল্প স্তব্ধ থাকিয়া বলিল :)

আচ্ছা আভি যাও। কোন কাম্‌কা ওয়াস্তে বোলায়াথা খেয়াল নেই। আভি যাও।

(মীনার প্রবেশ)

মীনা—এখোনো বসে ?

প্রকাশ—তুমি ফিরে আসবে এই কল্পনায়।

মীনা—আমি ফিরে আসবোনা, আসতে পারবো না। আমায় আপনি ভুলে যান্—আমায় নিস্কৃতি দিন, আমায় সহজ সরল ভাবে সংসারে বাস কোরতে দিন !

প্রকাশ—তোমায় নিস্কৃতি দেবো আমার এ ক্ষমতা নেই মীনা। কেউ কাউকে ইচ্ছা কর্লেই নিস্কৃতি দিতে পারে না : যেমন কেউ কাউকে ইচ্ছা কোরলেই ভালবাস্‌তে পারে না।—তা' ছাড়া,—কেন, কিসের জন্য দোব' নিস্কৃতি ?—কার জন্য দোব ?···

মীনা—আমার স্বামীর জন্য দেবেন ? আমার স্বামী ?

প্রকাশ—আমি স্বীকার করি না তোমার উপর তোমার স্বামীর অধিকার ! বিবাহ একটা দুর্ঘটনা !—আর কিছুই নয়।—ভালবাসার বলে যদি কেউ তোমায় আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে তো সে আসুক, আমি পথ ছেড়ে দোব। আমি যদি পারি, সংসারকে আমায় পথ ছেড়ে দিতে হবে !

মীনা—না, না—এ সব আমি শুনবো না। না, না— (প্রস্থানোদ্যত)

প্রকাশ—দাঁড়াও।

(মীনা দাঁড়াইল)

মীনা—না, কোনমতে না !—

প্রকাশ—কিন্তু পালিয়ে যাবে ভয়ে ?

মীনা—ভয় !

প্রকাশ—হ্যাঁ ভয়। তুমি আমায় ভয় করো তাই তুমি চলে যাচ্ছো, পাছে তোমার সতীত্বের মুখোস্ খুলে পড়ে। তুমি আমায় ভয় করো তাই তুমি টেলিফোন ধর্ত্তে সাহস করনি, পালিয়ে বোধহয় তেতলায় গিয়ে উঠেছিলে !

মীনা—তেতলায় ! কে বল্লে ?

প্রকাশ—আমি জানি। আমি কল্পনায় দেখতে পেলুম। ও-সময় ও-ছাড়া তুমি আর কিছু কর্ত্তে পারো না।

মীনা—ও !—কল্পনা !—হ্যাঁ, আপনার কল্পনা ঠিকই হ'য়েছিল। কিন্তু আমি সতীত্বের মুখোস পরে থাকি ব'লে আপনি মনে করেন ?

প্রকাশ—হ্যাঁ, মনে করি। তাই তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করো না : তোমার ভয় হয়, পাছে তোমার অন্তরের নিগূঢ় অনুরাগ কাহিনী তুমি আমার কাছে প্রকাশ কোরে ফ্যালো ! তোমার সতীত্ব তাই পালিয়ে পরিত্রাণ পেতে চায় !

মীনা—হাতের কাছে কিছু নেই, তাই এর উত্তর দিতে পারলুম না,—থাক্‌লে দিতুম।

প্রকাশ—আক্ষেপ কেন? এই নাও—

(স্বীয় ছড়িখানি মীনার দিকে ঠেলিয়া দিল)

ওই দিয়ে আমার সকল অপরাধের তুমি শাস্তি দাও, মাথা পেতে নোব'। আঘাত করো—

মীনা—নিয়ে যান আপনার ষ্টিক্। শাস্তি আমি কাউকে দিতে চাই না...

(ছড়িটি প্রকাশের দিকে ঠেলিয়া দিল)

প্রকাশ—আমি জানি তুমি আমায় শাস্তি দিতে পার না। আমি জানি।—আমায় আঘাত কর্লে আঘাত তুমি নিজেকেই কোরবে। আমার জন্য তুমি সঞ্চিত ক'রে রেখেছ করুণা, মমতা, প্রীতি: শাস্তি নয়। শুধু অপরিসীম অনুকম্পা!

মীনা—না, না, না! (স্বর গাঢ় হইয়া আসিল)

প্রকাশ—বলো এ কথা মিথ্যা? একবার শুধু বলো? শুধু একটি মাত্র কথা! জীবনে আর আমি কোন কথা শুনতে চাইবো না!—বলো এ কথা মিথ্যা?

মীনা—(অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে) আমি জানি না, আমি এখানে থাক্‌বো না।

(প্রস্থানোদ্যত)

প্রকাশ—আর এক মিনিট্—আর একটা কথা—(এই বলিয়া সহসা প্রকাশ মীনার হাত ধরিয়া ফেলিল)

মীনা—ছাড়ো, ছাড়ো। আমায় স্পর্শ কোরো না—

(অমরেশের প্রবেশ)

(প্রকাশ মীনাকে ছাড়িয়া দিয়া চকিতে সরিয়া দাঁড়াইল)

অমরেশ—এ কি!

(অমরেশ স্তম্ভিত)

মীনা! প্রকাশ! এ সব কি?

মুক্তি-আবাহন

শ্রীঅভয়ঙ্কর

শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু

সত্যের সাধনা সাথে মাধুরী মিলায়ে
চিত্তের কাঠিন্য সহ করুণা বিলা'য়ে
পূর্ণ আয়োজন তব মাতৃপূজা লাগি'।
সুতীব্র তপস্যাসহ দীর্ঘ রাত্রি জাগি'
ক'রেছিলে ভক্তিসহ শক্তি আরাধনা!
আপন স্বার্থের তরে ক্ষুদ্র এক কণা
রাখ নাই—দেছ তুমি সর্ব্বস্ব বিলায়ে
তাই পেলে শতগুণ তাহার ফিরা'য়ে।
বিত্ত ত্যজি' চিত্ত-শক্তি লভি' অভিনব
অর্জ্জিলে জীবনে তব অমর গৌরব।

ভবানী-ভাবনা-মন্ত্র তন্ত্র করি' সার
বিনা-বিচারের সেই বন্দী গুরুভার
বহিলে সহাস্য মুখে দীর্ঘদিন ধরি'
কল্যাণী-কল্যাণ-হস্ত বরাভয় স্মরি'।

ত্যাগের তিলক ভালে মুক্তি-পথ-চারী!
হিংসাদ্বেষ হীনপ্রাণ সত্যব্রত ধারী!
বহুদিন পরে এলে আমাদের মাঝে,
দাও আমাদের দীক্ষা মনুষ্যত্ব-কাজে।
তব অসমাপ্ত কাজ, অসমাপ্ত বাণী
আকাশে বাতাসে আজও করে কাণাকাণি;
তাহারে সম্পূর্ণ করে—ছিল নাকো কেহ,
দেশমাতৃকার পুণ্য দেউলের গেহ
পূজারী অভাবে ছিল ম্লান অন্ধকার
কে জ্বালে আরতি-দীপ? পূজা-অর্ঘ্য-ভার
কে সাজাবে?—তাই মোরা তব পথ চাহি,
কাটায়েছি দীর্ঘ দিন—আজি তাই গাহি
নব আশা ভরে তব স্বাগত-বন্দনা।
নব উপচারে আজি সত্য-আরাধনা
শিখাও মোদের তুমি—হও নব গুরু
তোমার নির্দ্দেশে পুনঃ কর্ম্ম হোক্ সুরু।
দেশবন্ধু-আদর্শের হোক্ উদ্বোধন,
অচেতন দেশবক্ষে জাগুক চেতন।*

প্রকাশ—আমি মীনাকে একটা প্রশ্ন কর্লাম, কিন্তু ও কিছুতেই উত্তর দেবে না, পালিয়ে যাবে। তাই—

অমরেশ—থাক্, আর শুন্‌তে চাই না।... মীনা! যা দেখলুম্ তা কি সত্যি? বলো, এ আমার চোখের ভুল নয়? বলো, এ আমি জাগ্রত এক দুঃস্বপ্ন দেখলুম্ না?

মীনা—না—এ সত্যি!

(ইত্যবসরে প্রকাশ সরিয়া পড়িল)

অমরেশ—কখনো না। এ সত্যি নয়, এ মিথ্যা। এই ক্ষণিক আগে তুমি আমায় অমৃতের সন্ধান দিয়েছিলে, এখনই কি আবার বিষ ঢেলে দিতে পার!—এ সম্ভব নয়। আমি এ বিশ্বাস কোরবো না। এ মিথ্যা!

[* শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তি উপলক্ষে আনন্দোচ্ছাস]

মীনা—না—এ সত্যি !

অমরেশ—সত্যি !— প্রকাশকে তুমি ভালোবাসো, এ কথা সত্যি ? আমায় ভালোবাসো না,—এ কথা সত্যি ?—তবে এতো উল্লাস কেন, উচ্ছ্বাস কেন, কিসের জন্য উৎসবের এ আয়োজন ! কেন এ আলোকের সমারোহ !—সমস্ত অন্ধকার কোরে দাও। অন্ধকারে আমায় আবৃত কোরে রাখো, আমায় আচ্ছন্ন কোরে ফ্যালো !

(অমরেশের মুখ ঢাকিয়া অবস্থিতি ও দলবীরের প্রকাশকে লইয়া প্রবেশ)

প্রকাশ—অমরেশ, তোমার নেপালী আমায় ছাড়ে না।

অমরেশ—(মুখ তুলিয়া বলিলেন) কাহে দলবীর ?

দলবীর—হুজুর, পোড়া আগে এই বাবু, হামকো পুছা দেউড়ীমে কোই হ্যায় কিনা। আভি দেখা বহুৎ তুরন্ত কোঠিসে নিকাল যাতা। হামারা মালুম. কুছ গোলমাল হুয়া, ঐ ওয়াস্তে হাম্ রোখ দিয়া।

অমরেশ—কুছ গোলমাল নেই দলবীর। বাবু; হামারা দোস্তি হ্যায়। এইসা কাম্ ঠিক্ নেই হুয়া।

দলবীর—কসুর মাফ্ কিজিয়ে হুজুর।

প্রকাশ—ঠিক্ হ্যায়, যাও।

(দলবীরের প্রস্থান)

অমরেশ—ও নতুন লোক্, তোমায় চেনে না প্রকাশ। তাই এ ব্যাঘাত।—কিন্তু সে যাক্, তোমার গাড়ী আছে ?

প্রকাশ—আছে, কেন ?

অমরেশ—তুমি মীনাকে নিয়ে যাও। ওকে আমি তোমায় দিলুম !—

(সুরমার প্রবেশ)

সুরমা—সে কি দাদা ? এ রকম কথা তো শুনিনি !

অমরেশ—বেঁচে থাক্‌লে অনেক রকম শুন্‌তে হয়।

(সুরমা অবাক)

প্রকাশ—কিন্তু এর মানে ?...

অমরেশ—মানে তুমিও জানো, মীনাও জানে।

(দীপকের প্রবেশ)

অমরেশ—এই যে দীপক এসেছ। সমস্ত ব্যাপারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হ'য়ে গেল তুমি আসবার আগেই। তোমরা থেকে বাকী সব ব্যবস্থা ক'রে দিও ! আমি এ বাড়ী থেকে চল্‌লুম।

দীপক—ব্যাপার কি ? আমি যে তোমার কথা শোনবার জন্য তাড়াতাড়ি আসছি।

অমরেশ—আমি আর শোনাতে পারবো না। এবার ওরা শোনাবে !

দীপক—কিন্তু তুমি চল্‌লে কোথা ?

অমরেশ—আপাততঃ বাড়ীর বাইরে, তারপর যেখানে হয়।—চল্‌লুম—

(প্রস্থানোদ্যত কিন্তু সহসা ফিরিয়া মীনাকে বলিল :)

মীনা !—না আমার ভুল হ'য়ে গেছে ; তোমায় ডাকবার আমার অধিকার নেই।

(প্রস্থান)

দীপক—এ সব কী সুরমা ?

সুরমা—পরে বোলবো, এখন ওকে ধরো, যেতে দিও না।

দীপক—কিন্তু আমার তো সময় হবে না, আজ রাত্রে যে আমায় আলিগড় রওনা হ'তে হবে—জরুরি টেলিগ্রাম এসেছে। একটা হিন্দু-মোশ্লেম্ কনফারেন্স attend কর্ত্তে হবে।

সুরমা—হবে না এখন কনফারেন্স attend করা। শীঘ্র যাও। জেনো, আমাদের ভয়ানক বিপদ্ !

দীপক—বিপদ্ !—(দ্রুত প্রস্থান)

সুরমা—আয় মীনা, আমরা যাই।

মীনা—আমি এ-বাড়ীর ভেতর যাবো ?

সুরমা—যাবিনি তো যাবি কোথা ?—ওরা পাগল হয়ে গেছে বোলে কি তুইও হবি ! আয়—

(সুরমা ও মীনার প্রস্থান)

প্রকাশ—(সহসা হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন :) শোকের চোটে এরা জিনিষটা একেবারে প্রহসন কোরে ফেল্‌লে !—এদের খাতিরে এবার একটা সিগারেট্ খাওয়া যাক্...

(ঝাড়গুলি একে একে নিবিয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারে একাকার : ইহার ফাঁকে কখন যবনিকা নামিয়া আসিয়াছে !)

(ক্রমশঃ)

চিঠিপত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ

মাননীয়

শ্রীযুক্ত খেয়ালী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনার ৯ই শ্রাবণ তারিখের "খেয়ালীতে" সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগশীর্ষক প্রবন্ধে আমার সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত, লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। যে সমস্ত বিশ্ববরেণ্য অধ্যাপকদের নিকট আমি এখনও পাঠ গ্রহণ করি এবং বহু বৎসর পাঠ গ্রহণ করিলেও আমার অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবে না তাহাদের সহিত সমকক্ষভাবে আমাকে তুলনা করা যে আমার কতদূর দুঃখ ও লজ্জার বিষয় হইয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ, সার রাধা কৃষ্ণ, অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা, মহাঃ গোপীনাথ কবিরাজ, মহাঃ কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিতগণের সহিত আমার যে তুলনা হইতে পারে ইহা স্বীকার করা আমার পক্ষে একান্ত বাতুলতা। পূজ্যপাদ অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, মহাঃ শ্রীযুক্ত সীতারাম শাস্ত্রী, ডাঃ শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর, ডাঃ শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ সকলেই আমার অধ্যাপক এবং তাহাদিগকে বিদ্যা ও চরিত্রের মহত্বে আমি পরম ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকি। আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগে আমি তাহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া ধন্য হইব এইমাত্র আমার অন্তরের একান্ত কামনা। পরম ভক্তি ভাজন ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত মহাশয় নিরাময় দীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া আশুতোষ চেয়ারের ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদের গৌরব বৃদ্ধি করুন্ ও আমি শিষ্যরূপে তাহাদের পরিচারণ করি ইহাই আমার একমাত্র আকাঙ্খা। কোন সুদূর কল্পনাতেও ইহাদের গৌরবের অধিকারী হইব এইরূপ স্পর্দ্ধা আমার মনে স্থান পায় না।

আপনার কাগজে যে প্রবন্ধটী বাহির হইয়াছে তাহার সহিত আমার যে প্রত্যক্ষতঃ বা পরোক্ষতঃ কোন যোগ নাই তাহা আপনার অপেক্ষা অধিক ভাবে কেহই জানেন না, অথচ এইরূপ প্রবন্ধ পড়িয়া সকলেরই এইরূপ মনে হইতে পারে যে ইহা আমাদ্বারা প্রণোদিত। এইরূপ প্রবন্ধ বাহির হওয়ায় আমার এবং অতি সম্মানিত ব্যক্তিদিগকে আমার সহিত তুলনা দ্বারা অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখান হওয়ায় লোকদৃষ্টিতে আমি বিশেষভাবে অপরাধী হইয়াছি। সেই পাপস্খালনের জন্য আমার এই নিবেদন।

বিনীত

শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

[১০শ সংখ্যার 'খেয়ালী'তে 'বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ, পি, এচ, ডি, পি, আর, এস মহোদয়ের গুণপণার সম্পর্কে যে কথাগুলি প্রয়োগ করা হইয়াছিল তাহা তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মান সূচক জ্ঞানেই আমরা উহা ছাপিয়াছিলাম। কিন্তু উহাতে তাঁহার অসন্তোষের কারণ ঘটিয়াছে তাঁহার লিখিত পত্র হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। কারণ, কেহ কেহ এই প্রশংসা পত্র তাঁহারই লিখিত বলিয়া অনুমান করেন। ইহা নিশ্চয় আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য আমরা ইহাই জানাইতেছি যে প্রবন্ধোক্ত পত্র সম্পর্কে আশুবাবুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন সম্পর্ক নাই; উক্ত পত্রের লেখক সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি।

সঃ খেঃ]

পপুলার পিক্‌চার্সের

প্রথম অবদান

ক্রাউন টকী হাউস

সুসংস্কৃত হইয়া

বাঙ্গালীর পরিচালনায়

উত্তরা

নাম লইয়া

দ্বারোদ্‌ঘাটিত হইবে।

শনিবার, ১৭ই আগষ্ট, '৩৫

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর

"মন্ত্রশক্তি"

[কালী ফিল্মসের R. C. A. শব্দযন্ত্রে গৃহীত]

—সুরশিল্পী—

কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ-গায়ক)

বিভিন্ন ভূমিকায়—

নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজহর গাঙ্গুলী, শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীবলাই ভট্টাচার্য্য, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা, শ্রীমতী তারকবালা (লাইট্), শ্রীমতী চারুবালা, শ্রীমতী হরিমতী, শ্রীমতী গিরিবালা, শ্রীমতী কমলা (ঝরিয়া) ও শ্রীমতী রাণী

পরিচালক—সতু সেন

উক্ত দিবসেই

মন্ত্রশক্তি

"উত্তরা-তে" উদ্বোধিত হইবে

Enquire of

J. K. MITRA, Managing Partner

Phone : B. B. 244. 64, Balaram De St., Cal.

or KALI FILMS

নাট্য-তরঙ্গ

শ্রীনটশেখর

"রূপমহল" রঙ্গালয়টি কুক সাহেবের আড়গড়ায় আড্ডা জমিয়েছে বটে, কিন্তু তাই ব'লে একথা মনে করবার কোনো কারণই নেই যে এখানে এখনও সেই ঘোড়ার চিঁহি ডাকই শুনতে পাওয়া যায়। সত্য কথা বলতে গেলে, এই রঙ্গালয়টির পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে মোটেই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে, এর অভিনেতৃ-সঙ্ঘ সু-অভিনয় করবার চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন না। দৃষ্টান্তরূপে, গত ২রা আগষ্ট শুক্রবার রজনীর উল্লেখ করা যেতে পারে। সেদিন তিনখানি নাটক অভিনয়ের আয়োজন হ'য়েছিল—চন্দ্রগুপ্ত, মানময়ী গার্লস্ স্কুল ও রাতকাণা। চন্দ্রগুপ্তে চাণক্যের ভূমিকায় গিরিশ-দৌহিত্র শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন বসুর অভিনয়ই ছিল এ রাত্রির সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। দুর্গাবাবু বোধ হয় বছর দশেক পরে আবার প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নামলেন। দুর্গাবাবুর অভিনয় হ'য়েছিল আগাগোড়া খুব সংযত; দর্শকদের করতালির লোভে প'ড়ে তিনি যে সস্তা প্যাঁচের অবতারণা করেন নি, এটা খুবই আনন্দের কথা। এর পরই উল্লেখ করতে হয়, বাচালের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু ও এ্যান্টিগোনাসের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সন্তোষ সিংহের নাম। সুরসিক অভিনেতা হিসাবে বাঙলা রঙ্গমঞ্চে আশুবাবুর জুড়ি মেলাই ভার। সন্তোষ বাবুর অভিনয়ও বেশ প্রাণবান্ হ'য়েছিল। চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, কাত্যায়নের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত গণেশ গোস্বামী, মলয়কেতুর ভূমিকায় শ্রীযুত পশুপতি সামন্ত ও সেলুকাসের ভূমিকায় শ্রীযুত সন্তোষ দাস অভিনয়টিকে সাফল্য মণ্ডিত করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে" গানটি তুলসী বাবুর গলায় বেশ সুগীত হ'য়েছিল।

তবে এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ না ক'রেও থাকা যায় না। সেদিন রূপমহলের অভিনেতৃসঙ্ঘ যতটা কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, অভিনেত্রীসঙ্ঘ যদি তার এক চতুর্থাংশও দেখাতে পারতেন, তাহ'লে সমগ্র অভিনয়টি বেশ উচ্চ শ্রেণীর হ'তে পারতো। রূপমহলের কর্তৃপক্ষ অভিনেত্রী সম্প্রদায়ের উন্নতির দিকে একটু বিশেষ লক্ষ্য রাখলে তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'তে পারবেন ব'লে আশা করা যায়।

* * *

রূপমহলের নূতন গীতি নাটিকা "জহিরণ" বেশ জমে উঠেছে। প্রত্যেক অভিনেতাই আপন আপন ভূমিকার মর্য্যাদা রাখতে পেরেছেন। অভিনেত্রীগণের অভিনয় ভালো হয় নাই।

"জহিরণ" হাল্কা হাস্য রসের নাটিকা। নাট্য রচয়িতা ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাস্যরস ছড়াতে গিয়ে স্থানে স্থানে vulgarity-র বাহুল্য করেছেন। তিনি তাঁর পুরাতন স্বভাব ছেড়ে দিলে সুরুচির পরিচয় দিতেন।—

* * *

ক্যালকাটা থিয়েটার্স পরিচালিত নাট্য-নিকেতন রঙ্গমঞ্চে বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্তের "বিদ্যাসুন্দর" গীতিনাট্য অভিনীত হ'বে। আমরা বরদাপ্রসন্নের রচনার 'পরে বিশেষ কোনো আস্থা রাখিনা। কারণ তিনি এতোকাল ধ'রে তথাবাচ্য নাটক-নাটিকা অনেক কিছু লিখেছেন, কিন্তু তাঁর কোনো নাটকেই সামান্য শক্তির-ও পরিচয় পাওয়া যায় নি। তিনি একজন ডি-এল-রায়

পত্রোত্তর

সুধীর বসু

জানিস্ শ্রী, ঘুমের হাওয়ার আমেজে ঘুম মোটে পায় না। তোর কথা ভাবি বিছানায় শুয়ে গায়ে নরম র‍্যাগ টেনে। আর যাদের মনে পড়ে তারা নিবিড় হয়ে উঠে না। মিলিয়ে যায় পর্দার অন্তরালে শুধু আলোর ঝলক আমার মনের উপর পড়ে তাই তোকে আরও বেশী করে পাই যেমন করে বিরহী যক্ষ পেতে চেয়েছিল তার বধূকে। রামগড়ের উচ্চতা যক্ষরাজকে মুগ্ধ করেছিল কিন্তু আমার বিশ্বাস ঘুমের শৈলদেশে যক্ষের না-মেটা আশা পরিপূর্ণতা পেয়েছে। তার কারণ ঘুমের কনকনানিতে ভেসে-আসা করুণ গুঞ্জন আকাশে বাতাসে, প্রান্তরে আবাসে, ঝরণায় কাননে, মানুষে পশুতে, মানুষের মন যেন মেঘমেদুর আকাশের মত- বর্ষণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে। কারুণ্যকে মানুষ কবে বরণ করেছিল জানি না তবে মানুষকে সম্পূর্ণ অন্তরাল করতে তার চেয়ে কার্য্যকরী আর কিছু নেই। আমি আজ নিজের সত্ত্বা তোর মধ্যে ফিরে পেয়েছি এই ঘুমের উপরে। আশ্চর্য্য হয়ত লাগে কিন্তু তবু মনে হয় সেটা আমার জীবনের চরম লাভ। কিন্তু ঘুমের নির্জ্জন আবেষ্টনে এর সার্থকতা তাই কোলাহলে একে নিঃশেষ হ'তে দেব না। তুই আসিসনি, এসোনা আমার মিনতি, আমার পরম মুহূর্ত্তে তোমার সঙ্গ আমার ভোগের চরম ট্র্যাজেডি। তুই যে নারী তাই যে তোকে ভয়। তোর পুরুষকে আমি গ্রহণ করেছি আমার চিরন্তনী নারীর মধ্য দিয়ে আর তোর নারীকে আমি ভালবেসেছি আমার পৌরুষের সাহায্যে। মানুষের এই যে দ্বয়ী-বিভক্তি স্রষ্টার নানা-বিভক্তির মত কল্পনায় পরিপূর্ণ। তাই বাস্তবের নিষ্ঠুর পরিমণ্ডলে একে যাচাই করতে চাই না। আমি তোকে পেয়েছি তা সত্য, আরও বেশী সত্য যখন তোর সঙ্গ এখানে আমি সহ্য করতে পারব না কামনায় ভরপুর আমার দেহমন কেমন তোর কল্পনায় শান্ত ও সমাহিত। আমি যে তোকে ভালবেসেছি বিজ্ঞানে নয়, সংস্কারে নয়, শুধু মনের সহজ তাগিদে—তাই আমার সব উত্তেজনা আবেগে স্তিমিত হয়ে আসে মৃত্যুর শিথিলতায় নয়, পরিতৃপ্তির সজীবতায়। যে উছল লেখা তোর আবাল্য সখী সে আজ তোর প্রেমে মহীয়সী, শিবের সাধনার সাফল্য তার অন্তরে ও বাহিরে।

হয়ত আমি শীঘ্র নামবো। আর তোকে দেখবো। কিন্তু আমার প্রিয়া হারানোর দুঃখ আমার মহান্ জীবনে ঘটবে সুনিশ্চিত। তাই বলে আমি তাকে ঠেকাতে চাই না। আজিকার দিনের পরম লাভকে আমার ভবিষ্যৎ দুঃখের সান্ত্বনা বলে পেতে চাই না। আমি এ মুহূর্ত্তকে হারাতে চাই সম্পূর্ণ

প্রভৃতির পুচ্ছগ্রাহী লেখক (?)। আর একটি বক্তব্য এই যে বরদাপ্রসন্ন গান লিখতে গিয়ে নিজের অক্ষমতা বারবার প্রকাশ ক'রেছেন। "বিদ্যাসুন্দরে"র মত বস্তুতে তিনি কেন হাত লাগালেন, সেইটিই আমাদের বিস্মিত ক'রেছে।—

যে "বিদ্যাসুন্দর" রচনা ক'রে রায়গুণাকর কবিকুলকেশরী ভারতচন্দ্র অমর হ'য়েছেন, সেই কাব্য-কে বরদাপ্রসন্ন হেন লেখক কি রকম রূপে নাট্য-সাজে সজ্জিত ক'রে তুলবেন, তাই দেখবার জন্যে আমরা কৌতুহলী হ'য়ে উঠেছি। ভালো হ'লেই ভালো, মুমূর্ষু বাঙ্গলা রঙ্গালয়ের পক্ষে মঙ্গল সন্দেহ নাই। আমরা কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভ করতে একান্ত অভিলাষী।—

সঙ্গীত প্রয়োগের দিকে যেন কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।

নিঃশেষে বিস্মৃতির কোলে। মহাকাল তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রেখার সূক্ষ্ম টান রেখে যায়—মানুষ তাই তাতে রঙ ফলাতে পারে। মহাকালের সৃষ্টি রঞ্জিত হ'লেও মিথ্যা হয় না—এ যে চোখওয়ালা মানুষের কানামাছি সেজে বুড়ী ছোওয়া। আমি কিন্তু সত্যই বিস্মৃত হ'তে চাই আজকের পাওয়া। হিসাবী সে নয় হিসাব করা তার সাজে না। আমার পূর্ণতা আমার নব জীবন দিক্। মরণের চেয়েও বিচ্ছিন্ন করুক আমার বর্ত্তমান সত্ত্বাকে আমার ভবিষ্যৎ জীবন থেকে। আমার জীবন আমি ফেলে যেতে চাই এইখানে, এই ঘুমে, রক্ত অস্তিহীন শবের গহ্বরহীন সমাধি হোক ঘুমের কুয়াশায়। তাই তোর চেয়েও প্রিয় বলে ডাকছি আজ বিস্মৃতিকে। সে কি ধরা দেবে না?

ওগো পত্রলেখা, তোমার প্রেম শেষে কি আমার মধ্যে পরিণতি পেল? প্রেমের সরল পথে সাবলীল তোমার গতি, বক্র সে ত নয়, তাই আমার আনন্দ। কে কবে গ্লানিকে তৃপ্তি বলে গ্রহণ করেছে? প্রেম-সমাহিত চিত্তে তোমার যে অহেতুক উদ্বেগ ও সন্দেহ তাকে যদি তোমার আত্মার প্রকাশ বলে গ্রহণ করি আমার কি ভুল হ'বে? কিন্তু তবু ভাবি প্রেমের সম্মোহনে কেমন করে তোমার দয়িতের রূপ কল্পনায় সম্পূর্ণতা প্রকাশ পেলে না। আশ্চর্য্য লাগে, অসম্ভব বলে ভাবি না। রূপ যে রসজ তা আমি জানি। জীবনের বসন্ত রাতে যে মূর্ত্তি আলিঙ্গনাবদ্ধ হয় বৈশাখের নিদাঘ দিনের সে অস্পৃশ্য, অনাদৃত হয়ে উঠে। অথচ জীবনে বসন্ত যতবার আসে, বৈশাখ ঠিক ততবার আসে, মানুষ যদি বসন্তে জন্মে বৈশাখে না মরে। রূপজ রস তোমার শ্রীলার ভাগ্যে এরই মধ্যে ঢের ঘটেছে কিন্তু তার আয়ুষ্কাল আরও ক্ষুদ্র। আমার যৌবন-রূপকে ঘিরে যার আরতি তার শিখা লেলিহান হ'লেও ঝড়ে নিভে যায়। ভাবতে বড় তৃপ্তি লাগে আমার বার্দ্ধক্যের মৃত্যুশয্যায় শায়িত শ্রীলাকে তুমি সেদিনও ভালবাসবে তোমার জীবনে-আসা বসন্তের জোয়ারে। আমি যে প্রেমের অধিকারে মহাকালকে অতিক্রম করতে চাই—জরা, বার্দ্ধক্য, ও অভিজ্ঞতাকে। নতুন করে বাঁচতে চাই পৃথিবীতে জন্মের প্রথম দিনের মত। ঊষার আলো বড় ভালো রাতের পরে। কে কবে আঁধারের গভীরতার পর আলোর উগ্রতা সহ্য করেছে? তাই আমি কামনা করি সেই প্রেমের রূপ যা নিত্যকাল ঘটবে—সুনিয়মিত বিরামে। প্রেমের বীভৎসতা সহ্য আমি করতে পারব না তাই আমি তোমায় নিতি জানাচ্ছি।

ভয় নেই লেখা আমি যাব না তোমার স্বর্গে—আমার প্রেমের বৈকুণ্ঠে। আমি নারী হ'লেও আমি তোমার প্রেমে সমাদৃত তাই আমি আমার আত্মপ্রকাশকে সফল করব। মনোহর হোক তোমার জীবন, মহান হোক তোমার প্রেম। আমি নিঃশেষে তোমার প্রেম চাই। তোমার জীবনে ঘুরে আসুক ঘুমের দিন স্বাচ্ছন্দ্যে ও সরলে, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত।

পুনর্যৌবন লাভের উপায়

ডাঃ কে, পি, ঘোষ

বাল্যের পর যৌবনে পা দিয়ে মানুষ তার জীবনের অটুট স্বাস্থ্য অভিজ্ঞতা, জ্ঞান নিয়েই চলতে থাকে জীবনের পথে, বীর বিক্রমে, শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করেও। উদ্দেশ্য থাকে জীবনটাকে উপভোগ করতে সম্পূর্ণভাবে। কিন্তু দৈহিক শক্তির যদি অভাব ঘটে, এ বয়সে, তবে তার মানসিক গতি পড়বে পিছিয়ে। শরীর তার ক্রমশঃ হয়ে পড়বে পঙ্গু, বুদ্ধিতে তার মরচে পড়বে—জীবনটা পূর্ণ হ'য়ে উঠবে শেষে এক ভীষণ নিরাশায়।

অধুনা হস্তক্ষেপ করেছেন অনেক পণ্ডিত প্রকৃতির উপর। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক ভরোনফ্ বানর-গ্রন্থি মানবদেহে সংযোগ করে দিয়ে যৌবন হারা নরনারীকে, বৃদ্ধকে চেষ্টা করছেন যৌবনের পথে ফিরিয়ে আনবার, জীবনী শক্তি বাড়াবার। কিন্তু আমাদের দেশের ক'জনে পারে সে উপায় অবলম্বন করতে। কিন্তু সঠিক ক'রে জীবন পথে চলার পন্থা আমাদের জানা নেই বলে, আমরা পঙ্গু হ'য়ে পড়ি। দ্রুত বিকল হ'য়ে পড়ে দেহের যন্ত্রপাতি। একটা প্রবাদ আছে—সময় থাকতে সাবধান হ'লে, রক্ষা পাওয়া যায় অনেক দুঃখ কষ্টের হাত থেকে।

নীরোগ হবার জন্যে আলো, বাতাস, সূর্য্য-কিরণ, খাদ্য, পরিশ্রম, বিশ্রাম প্রভৃতির দরকার তো আছেই, তা ছাড়া দরকার হ'য়ে পড়ে এমন একটী ঔষধের যার অতীব সুন্দর ক্রিয়ায় সতেজ হ'য়ে উঠে দেহের মাংস কোষ, স্নায়ু, রক্তকণাগুলি। শরীরের নববল ফিরে আসে, জীবনী-শক্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। এ সব ফল পাওয়া যায় রচিটোন ব্যবহারে—এটী আমার অভিজ্ঞতার ফল। স্বভাবজাত ফল, উদ্ভিজ্জ ও ধাতব কয়েকটী মুল্যবান ও উপকারী উপাদান সংমিশ্রনে তৈরী রচিটোন কার্য্যকারিতা গুণে পৃথিবীর মধ্যে যশঃলাভ করিয়াছে—পুনর্যৌবন লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে।

যবনিকা

গত ১৬ই শ্রাবণ তারিখের একত্রিংশৎ সংখ্যায় খেয়ালীতে ত্রয়োদশ পৃষ্ঠায় "শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসুর নিকট আমাদিগের সসম্ভ্রম নিবেদন" শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে উহা, শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার এবং শ্রীযোগ-জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা উভয়ে শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসুর নিকট যে স্বাক্ষরিত নিবেদন পত্র পাঠাইয়াছি তাহারই হুবহু নকল প্রকাশ করিয়াছি। উক্ত প্রবন্ধে আমাদিগের উভয়ের কোনও স্বাক্ষর না থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা আমাদিগেরই নিবেদন।

উক্ত ১৬ই শ্রাবণ তারিখের খেয়ালীতে অষ্টম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে তৃতীয় লাইন হইতে একাদশ লাইনের মধ্যে শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসুর সম্বন্ধে শ্রীঅক্ষয়কুমার সরকার যে স্বাক্ষরিত উক্তি করিয়াছেন উহা খুব সরল মনে এবং আন্তরিকতার সহিত করিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উক্তি আমাদিগের উভয়ের স্বাক্ষরিত নিবেদনের উক্তির কিয়দংশের বিরোধী হইয়াছে বলিয়া উহা এতদ্দারা প্রত্যাহার করা হইল।

শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার

শ্রীমতী শান্তি গুপ্তাকে এবার আমরা দেখব 'পপুলার পিক্‌চার্স'-র "মন্ত্রশক্তি"তে বাণীর ভূমিকায়। 'উত্তরা'-য় ছবিখানা আসচে ১৭ই আগষ্ট থেকে দেখানো হবে।
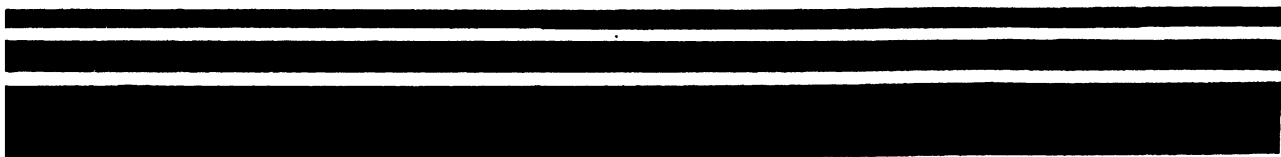
খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীঅনিল চন্দ্র রায়

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪২—15th August, 1935. { ৩৩শ সংখ্যা

বাঙ্গলা ও মন্ত্রীত্ব গ্রহণ সমস্যা

প্রস্তাবিত সংস্কৃত শাসন ব্যবস্থায় কংগ্রেস পক্ষের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ যে কংগ্রেস পক্ষের আত্মহত্যার সমতুল্য হইবে তাহা গত সংখ্যায় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও, বাঙ্গালার পক্ষে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ যে মারাত্মক, তাহা সুনিশ্চিত। অন্যান্য প্রদেশের রাজনৈতিক অবস্থা প্রধানতঃ বাঙ্গলার ন্যায় জটিল নয়, সুতরাং সেই সকল স্থানের নেতৃবৃন্দ শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া যদি দেশের কোন মঙ্গল করিবার স্বপ্ন দেখেন, তাহা হয়তো শেষ পর্য্যন্ত স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত না হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভব হইলেও হইতে পারে। কিন্তু প্রস্তাবিত শাসন ব্যবস্থায় এই প্রদেশের কাউন্সিল যেরূপ ভাবে গঠিত হইবে তাহাতে জাতির ও দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কোন কর্ম্মপন্থা সেই কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদন করান সম্ভবপর নহে। তাহার পর একবার সংস্কৃত শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে জাতীয়তার পরিপন্থী সাম্প্রাদায়িক বাঁটোয়ারা রদ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই, কেন না, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সমন্বিত প্রস্তাবিত শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণের অর্থ ই সাম্প্রাদায়িক বাঁটোয়ারাকে পরোক্ষভাবে মানিয়া লওয়া।

এমত অবস্থায় আমাদের মনে হয়, বাঙ্গলায় কংগ্রেস পক্ষের কাউন্সিলে যাওয়া বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু মন্ত্রীত্ব বর্জ্জন করা উচিত। প্রস্তাবিত শাসন ব্যবস্থায় বাঙ্গলার কংগ্রেসকে সর্ব্বদাই প্রাদেশিক কাউন্সিলে বিরুদ্ধবাদী দল হিসাবে থাকিয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং অন্যান্য বহুবিধ সরকারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিরত কাউন্সিলের ভিতরে ও বাহিরে আন্দোলন পরিচালনা করিয়া উহার প্রতীকার করিতে হইবে। যদি কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে, তাহা হইলে কাউন্সিলের বাহিরে দূরের কথা, সরকারী অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভিতরে কোন আন্দোলনের চিন্তাও অযৌক্তিক, কেন না, নিজেরাই যদি মন্ত্রী হইয়া বসেন, তবে কি তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবেন? আর প্রস্তাবিত শাসন ব্যবস্থায় এমনিই ভাবে প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠিত হইবে যে তাহার দ্বারা কোন সৎকার্য্য আশা করা বৃথা। সুতরাং যে দিক দিয়াই হউক, সকল দিক দিয়া চিন্তা করিলে আগামী শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা যে অন্ততঃ বাঙ্গলার পক্ষে অনুচিত সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

—*—

বিবিধ

পরলোকে দেবপ্রসাদ

মাসাধিক কাল রোগভোগের পর বাংলার তথা ভারতের রাজনীতির ও সমাজনীতির ক্ষেত্রে সুপরিচিত স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। সুতরাং সাধারণ বাঙ্গালী হিসাবে তাঁহার মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমানে বাংলার সুযোগ্য লোকের এত অভাব লক্ষিত হইতেছে যে তাঁহার অভাব বিশেষরূপেই অনুভূত হইবে। দেব প্রসাদ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর মধ্যম পুত্র। পঠদ্দশায় তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত রাজনৈতিক আন্দোলনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট শিক্ষানবিশী করেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কলিকাতায় দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি বক্তৃগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তদবধি কংগ্রেসে নূতন দলের প্রাধান্য না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সহিত তাঁহার যোগসূত্র ছিন্ন হয় নাই। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও শাসন সংস্কারে গঠিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি কখনও কোথাও উগ্র মত প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু দেশের কল্যাণকর কার্য্যে সর্ব্বদাই অবহিত ছিলেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হইতে ভাইস-চ্যান্সেলারের পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একচ্ছত্র প্রভুত্ব। তথায় আশুতোষের সহিত তাঁহার যে সংঘর্ষ হয় নাই, এমন নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলাররূপে তিনি কোন নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন।

দেবপ্রসাদ বাবু বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার পিতামহের ভ্রমন বৃত্তান্ত তাঁহারই চেষ্টায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং তাঁহার ইউরোপ দর্শনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং নানা পত্রে তাঁহার বাংলা প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং তিনি কিছুদিন তাহার সহকারী সভাপতি ছিলেন।

অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তিনি বিশেষ যত্ন লইতেন এবং সেগুলির কাজ মনোযোগ সহকারে নির্ব্বাহে সহায়তা করিতেন।

সামাজিক ব্যাপারে তিনি শিষ্টাচারের বিশেষ আদর করিতেন এবং সেকালের ভদ্রতা তাঁহাতে বিশেষভাবে লক্ষিত হইত। এটর্ণীর ব্যবসায়ে তিনি বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। আজ তাঁহার মৃত্যুতে বাংলায় একজন সুপ্রসিদ্ধ কৃতী লোকের অভাব হইল, এবং বাঙ্গালী সমাজ তাঁহার জন্য শোকাভিভূত হইবে।

শরৎচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা

গত রবিবার অপরাহ্নে কলুটোলার বিখ্যাত সেন-পরিবারের বাটীতে 'হিতবাদী' পত্রিকার উদ্যোগে শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুর সম্মানার্থে এক প্রীতি-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার মেয়র মিঃ ফজলুল হক্ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের সহিত ভুরি ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। কবিরাজ সত্যব্রত সেন ও সেন পরিবারের অন্যান্য সকলে অভ্যাগতদের বিশেষ আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। শরৎ পণ্ডিত রচিত ও অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে কর্ত্তৃক গীত "রাহুগ্রাসমুক্ত শরচ্চন্দ্র করিছে কিরণ-দান" শীর্ষক গানটী সময়োচিত হইয়াছিল।

সম্মিলনের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন মহাশয় 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতখানি গাহিলে পর শরৎচন্দ্রকে এবং সভাপতিকে মাল্যভূষিত করা হয়। তৎপরে অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ও অন্ধগায়ক শ্রীগোপালচন্দ্র সেন তাঁহাদের সুমধুর সঙ্গীতে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক শ্রীযুত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত এবং শ্রীযুত হেম সেনের কমিক গান বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত, ডাঃ জে, এম, দাশগুপ্ত, ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, রায় বাহাদুর জলধর সেন, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বসু, শ্রীঅমল হোম, ডাঃ সুন্দরী

রাহুগ্রাসমুক্ত শরচ্চন্দ্র করিছে কিরণ-দান

আজ আমি কি গাহিব গান।

(যথা) রাহু-গ্রাস-মুক্ত শরচ্চন্দ্র করিছে
কিরণ-দান

পেয়েছি আজিকে এই পুণ্যতিথি
এ গৃহ আজি যে পূর্ণ অতিথি
ভুলিব না কভু আজিকার প্রীতি
গ্রহণে মুক্তি স্নান

আনন্দে পুরিল সবার অন্তর
হৃদয়ে হৃদয়ে নাহিক অন্তর
ভেদাভেদ সব ভুলি অতঃপর
প্রাণে যেন মিশে প্রাণ। *

* (কলুটোলার সেন পরিবারে শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসুর সম্বর্দ্ধনা সম্মিলনীতে অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র দে কর্ত্তৃক গীত ও শ্রীশরৎ পণ্ডিত কর্ত্তৃক রচিত।)

মোহন দাশ, শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়, শ্রীউপেন্দ্র নারায়ণ নিয়োগী, মিঃ পি, কে, চক্রবর্ত্তী ও শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

চা-চক্র

গত শনিবার "ইন্সিওরেন্স ওয়ার্ল্ড" আপিসে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র রায়ের নিমন্ত্রণে এক চা-চক্রের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার, শ্রীসুধাংশু বিকাশ রায়চৌধুরী, শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকরুণা কুমার নন্দী ও আরও অনেকে মিঃ রায়ের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

অনুশাসন না শাসন?

বড়দিনের উৎসবে তরুণ-তরুণীর অবাধ নৃত্যকে নিন্দা করিয়া ফ্রী চার্চ্চ অফ্ স্কটল্যাণ্ডের বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক এক নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন "অবাধ নৃত্য এই পৃথিবীবাসীরই পরিকল্পনা, উহা পরম পিতার অভিপ্রেত জিনিষ নয়।"

জীবনের অধিকাংশ দিনই যাহারা অবাধ নৃত্যে অভ্যস্ত, তাহারা বৎসরের একদিন তাহা বন্ধ করিলেই কি পরম পিতার অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে? ইহার জন্য প্রয়োজন ধর্ম্মযাজকের অনুশাসন নয়, চাই সামাজিক শাসন।

জীবনে যাহাদের যৌন-আকর্ষণ নানাভাবে একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাদের এই সকল রীতি পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে চাই নীতির স্থায়ী পরিবর্ত্তন। দুঃখের বিষয় আমারদের জীবনেও পাশ্চাত্যের অনুকরণে যৌন-প্রভাব একটা বড় স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন হইতে সে বিষয়ে অবহিত না হইলে ভবিষ্যতে সমূহ সামাজিক বিপদের সম্ভাবনা।

আত্মহত্যাই কি বাহাদুরী?

সম্প্রতি বালীগঞ্জ লেকে এক জোড়া যুবক-যুবতী (হতাশ প্রেমিক ও প্রেমিকা) একসঙ্গে আত্মহত্যা করিয়াছেন। এই লইয়া কতক গুলি কাগজ হৈ চৈ বাধাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগের ছবি প্রভৃতি ছাপাইয়া এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেছেন, যেন, তাঁহারা কতদূর বাহাদুরী প্রকাশ করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, আত্মহত্যার বিশেষতঃ এইরূপ আত্মহত্যার মধ্যে সত্যই কি কোনো বাহাদুরী আছে। নরনারীর অবাধ মিলন ও মিশ্রণের ফলে যে পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক ও সহজ আকর্ষণ জন্মায় তাহা ভাল কি মন্দ তাহা লইয়া আলোচনার এ স্থান নহে। পাশ্চাত্য-প্রভাব যে আমাদের দেশে আসিতেছে তাহা তো প্রত্যক্ষ। কিন্তু সেই প্রভাবে এইরূপ অভিভূত হওয়াই কি একমাত্র পন্থা? যদি সামাজিক নিয়ম বা বন্ধনের ফলে কোনো প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের পথে বাধা জন্মায়, তাহার ফলে আত্মহত্যার আশ্রয় লওয়া কি কাপুরুষতা নয়? নিজের শক্তিতে, সত্য ও সহজ প্রেমের শক্তিতে সমাজ বন্ধন লঙ্ঘন করিয়া বা ভঙ্গ করিয়া পরস্পর যাঁহারা মিলিত হ'ন, তাঁহাদের সহিত একমত না হইলেও তাঁহাদের পৌরুষ ও প্রেমের শক্তি প্রশংসনীয়। কিন্তু এই অসহায়ভাবে মৃত্যুর হস্তে অকালে ও স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ আমাদের মতে সর্ব্বথা নিন্দনীয়। এইরূপ উদাহরণে সমাজের তো কোনো কল্যাণই হয় না, বরং বিশেষ ক্ষতিই হয়।

নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব

গত ৯ই আগষ্ট "রঙমহল" রঙ্গমঞ্চে শিশির কুমার ইন্‌ষ্টিটিউটের উদ্যোগে একটী বিচিত্র অনুষ্ঠান ছিল। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন কলিকাতার মেয়র মৌলভী ফজলুল হক্। সেই সভায় শ্রোতৃমণ্ডলী-যুবকবৃন্দের যেরূপ অভদ্রতা ও অশিষ্টতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়। সভাপতি বক্তৃতা করিতে উঠিলে তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সকলে হাততালি দিতে আরম্ভ করিলেন। শিশির কুমার ইন্‌ষ্টিটিউটের সম্পাদক ইন্‌ষ্টিটিউটের কার্য্যবিবরণী পড়িতে উঠিলে তাঁহাকেও অনুরূপ ব্যবহার পাইতে হয়। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর সভায় একটী পত্র পাঠাইয়াছিলেন। যুবকবৃন্দের এইরূপ অশিষ্টতার ফলে তাহা সভায় পাঠ করাই সম্ভবপর হয় নাই। আসল কথা, সকলে বিচিত্র অনুষ্ঠানের গীতবাদ্যের জন্য এইরূপ অধীর হইয়াছিলেন যে, কয়েক মিনিট ভদ্রভাবে অপেক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। গীতবাদ্যের ব্যবস্থা যখন ছিল তখন তাহা হইতই—না হয় ৫ দশ মিনিট পরে। এই সময়টুকু ধীর ও ভদ্রভাবে অপেক্ষা করার শিক্ষা ও সহবৎ আমাদের যুবকেরা হারাইয়া ফেলিতেছে,—ইহা একান্ত পরিতাপের বিষয়।

শুধু এই সভায় নয়, প্রায় প্রত্যেক সভা-সমিতিতে কিম্বা যেখানে কোনো কারণে বহুলোক সম্মিলিত হন সেখানেই একটা না একটা এইরূপ অধীর অশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই উচ্ছৃঙ্খলতা যুবকসমাজের যেন একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হইয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্য জাতির যত দোষই হ'ক এই নিয়মানুবর্ত্তিতা, পাঁচজনে মিলিয়া সুশৃঙ্খলায় কার্য্যনির্ব্বাহের শক্তি তাহাদিগকে বড় করিয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্যে যেখানে তাহার অভাব, সেখানেই আজ ডিক্টেটারের আবির্ভাব হইয়াছে। বাঙ্গালায়ও কি সেই দিন আসিল?

বি, এন, রেলওয়ে
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক !—

বি-এন-রেলওয়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণের সুবিধার জন্য একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে। ব্যাঙ্কের প্রায় ২৪০০০ হাজার সভ্য আছে এবং তাহারা প্রায় সকলেই অল্প বেতনের কর্ম্মচারী। ব্যাঙ্কের মুলধন প্রায় এক কোটি টাকা। ব্যাঙ্কের পরিচালক সমিতির ১১জন সভ্য থাকিলেও ইহা মাত্র ১জন লোকের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। তিনি বি, এন রেলওয়ের একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী। কয়েকজন সভ্য গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ব্যাঙ্কের পরিচালনা কার্য্যের সমালোচনা করিতে থাকায় এবং অন্যায় ও অবৈধ ব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে থাকায় উক্ত পরিচালক মহাশয়ের কোপানলে পড়িয়াছেন। তিনি কয়েকজন সহকর্ম্মীর যোগাযোগে অন্যায় ও অবৈধ মতে উক্ত কয়েকজন সভ্যের নাম ব্যাঙ্কের শেয়ার-হোল্ডার শ্রেণীভুক্ত হইতে অপসারিত করিয়াছেন। উক্ত সভ্যগণ সে জন্য আলিপুরের দ্বিতীয় মুনসেফী আদালতে মোকর্দ্দমা দায়ের করেন এবং সম্প্রতি উক্ত মোকর্দ্দমায় নিষ্পত্তি হইয়াছে যে, সভ্যগণের নাম ব্যাঙ্কের শেয়ার-হোল্ডার শ্রেণীভুক্ত হইতে অপসারিত করা বে-আইনি। মোকর্দ্দমা মায় খরচা ডিক্রি হইয়াছে।

শুনা যাইতেছে যে, উক্ত মোকর্দ্দমায় বহু সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছে। এবং পরেও হইবে। শেয়ার-হোল্ডারের অর্থ ব্যক্তিগত আক্রোশের জন্য ব্যয়িত হওয়া কোনওমতে উচিৎ নহে। আমরা মাননবর মন্ত্রীমহাশয় কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির রেজিষ্ট্রর এবং বি, এন রেলওয়ের এজেণ্ট মহাশয়কে এ বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যথাবিহিত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

———

"সব বুঝি যায়—"

শ্রীঅপ্রকাশ মিত্র

সে বড় কঠিন ঠাঁই পাইবার চান্স নাই,
বাপ বড়ো কড়া ;
বৃথা কবিতার চাপে, সকলের প্রাণ কাঁপে,
কেন বেঁচে মরা !
'বিধি প্রতিকূল' জেনে, যে নারী মনের কোনে,
করে বৃথা 'হোপ্'
তাহারি সুখের তরে, এমন শকতি নাই,
দিতে পারি হোপ্' !
না বাড়ায়ে জঞ্জাল, লেকে ও হোটেলে,
শোন বলি বালা—
ভাদ্র-আশ্বিন পরে, বাপ-মা'র বাছা বরে,
দিও বর মালা।
কবিতার মহাবুলি, 'মহাবজ্র', 'মৃত্যু'-খালি,
শুনে ভয় হয় !
ঘরের বাহির করি প্রগতির পথ ধরি,
সব বুঝি যায় !

(গত সপ্তাহের 'খেয়ালী'তে শ্রীলতিকা ভাদুড়ীর "ভুলিব না" কবিতার উত্তরে।)

শ্রীঅরবিন্দ—লহো নমস্কার!

মানুষের মন সাধারণতঃ মৃত্তিকাধর্ম্মী। মাটীর টানে তাহার দেহ মন নিম্নগামী। সে সাধারণতঃ মনে করে যে তাহার হাতেই যেন এই ভুবনের ভার এবং এই মনে করিয়া সে এমন ভাবে চলে যে, অহঙ্কারে তাহার আর মাটীতে পা পড়িতে চাহে না। কিন্তু সঙ্কটকালে দেখা যায় যে, যে-দেহ ও মনের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া সে নিজেকে বড় মনে করিয়া আস্ফালন করিয়াছে সেই দেহ-মনের উপর তাহার কোনই জোর নাই। যে কোন মুহূর্ত্তে তাহারা ভাঙ্গিয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে, নিজের দেহ ও মনকে সব সময়ে সে ইচ্ছামত চালনা করিতে পারে না, এমন কি মানুষের দৃষ্টি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়াতে সে বর্ত্তমানের যবনিকার অন্তরালে কি আছে তাহা দেখিতেই পায় না। এই স্বল্পদৃষ্টি লইয়া জীবনের পথে চলিতে গিয়া সে পদে পদে হোঁচট খায় এবং নিজের প্রেয় বলিয়া যাহার পশ্চাদনুসরণ করে কিছু দিন পরে বুঝিতে পারে যে তাহা প্রেয় হইলেও শ্রেয় নহে এবং কল্যাণের পরিবর্ত্তে তাহা তাহার জীবনে অকল্যাণই আনয়ন করিয়াছে।

তাই চাই জীবনের উর্দ্ধায়ন। অন্তরের অন্তরতম সত্ত্বাকে দেহ ও মনের উর্দ্ধে তুলিয়া অতি মানস-লোকে পৌছিতে হইবে। সেথানকার আলোকে জীবনের পথ আলোকিত করিয়া চলিতে পারিলেই মানুষের সকল সন্দেহ, সকল সমস্যা, সকল অকল্যাণের অবসান।

ইহাই হইল শ্রীঅরবিন্দের যোগের মর্ম্ম-বাণী। ভারতীয় যোগের পক্ষে এই কথা নূতন নহে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এই কথাকে যে নূতন রূপ ও ব্যবহারিক মূর্ত্তি দান করিয়াছেন তাহা তাঁহার একান্ত নিজস্ব। অতি অল্পকথায় তাঁহার বিরাট যোগধর্ম্মের ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। তবে এক কথায় বলিতে হইলে ইহার জন্য একমাত্র প্রয়োজন আত্মসমর্পণ। নিজের ভালমন্দ, সুখ দুঃখ, সমস্ত জগজ্জননীর হাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহার নির্দেশের জন্য একান্ত অভিপ্সার সহিত পথ চাহিয়া থাকিলে নির্দ্দেশ আসিবেই। তাঁহার যোগে শরীরকে কষ্ট দিয়া কৃচ্ছ্র সাধনের ব্যবস্থা নাই, হঠযোগীর নানারূপ শারীরিক প্রক্রিয়াও নাই। সহজ মনে, সহজ প্রাণে, ধ্যানের মধ্যে জগজ্জননীর সাহায্য কামনা করা—ইহাই তাঁহার যোগের মূল কথা। তাই অনেকের নিকট তাঁহার যোগ আত্মসমর্পণ-যোগ নামে খ্যাত।

তাঁহার যোগশিক্ষার আর একটি বিশেষত্ব—তিনি জীবনকে পরিহার করিতে বলেন না। জীবনের সর্ব্ব অংশকে উর্দ্ধায়িত করিয়া ঈশ্বরের নির্দ্দেশে প্রত্যেকের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, ইহাই তাঁহার বাণী। তাঁহার শিক্ষায় এই সুন্দর পৃথিবী ও জীবন সুন্দরতর ও সুন্দরতম হইবে।

১৯০৯ সালে যখন তিনি পণ্ডিচেরীতে পদার্পণ করেন তখন তিনি জানিতেন না যে কোথায় দাঁড়াইবেন কিন্তু যাঁহার নির্দ্দেশে তাঁহার যাত্রা সুরু, তাঁহারই কৃপায় আজ পণ্ডিচেরী সাধনাশ্রম বিশ্ববিখ্যাত যোগ-প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে বহু সাধক ও সাধিকা স্থায়ীভাবে সাধনা-রত।

আজ ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের পূণ্য জন্মদিন। দর্শনার্থী বহু নর-নারী দেশ বিদেশ হইতে আসিয়া আজ পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই আশা করে একদিন তাঁহার যোগ শিক্ষা শুধু বাঙ্গালা বা ভারতকে নয়, সারা পৃথিবীকে নূতন পথ দেখাইবে।

শ্রীপ্রমোদ সেন

শ্রীঅরবিন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে পণ্ডিচেরী-যাত্রা

"চিত্রালী"র 'বৈদিশিক বার্ত্তার' লেখক শ্রীপ্রমোদ সেন শ্রীঅরবিন্দের জন্মতিথি দিবসে উৎসবে যোগদান ও শ্রীঅরবিন্দের দর্শনলাভ করিতে পণ্ডিচেরী যাত্রা করিয়াছেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমেই অবস্থান করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। "চিত্রালী" ও "খেয়ালী"তে উৎসব-কাহিনী ও শ্রীঅরবিন্দের বাণীর মর্ম্মকথা পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

গান

শ্রীসুবোধ রায়

আমার প্রাণের ফুল-বাগানে
তুমি সখী ফুল রাণী,
ব্যাকুল এমন-মৌমাছি মোর
সেথায় মধু-সন্ধানি।
রূপকুমারী তোমার রূপে
আমার মনের অন্ধকূপে
জাল্‌লে আলো তাইতো ভালো
তোমার রূপের গুণ জানি।
অরুণিমার অধর কোনে
তোমার হাসির রঙ্‌ জাগে,
প্রজাপতির পাখায় তোমার
রূপের রঙের ছোপ্ লাগে।
হৃদয় আমার তোমায় ঘিরে
গুঞ্জরিয়া সদাই ফিরে,
তোমার তরে রইল পাতা,
আমার বুকের ফুল-দানী।

—•—

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা

তাসের খেয়াল (২)

আষাঢ়ের বর্ষণ-ক্লান্ত অপরাহ্ণে নেবু-বাগানের তাসের আড্ডাটী বেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল। খেলা চল্‌ছিল অকসন্ ব্রীজ। খেলোয়াড় চারজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে দিলাম। অমিতাভ বসু,—ইনি সাইকিক ডাকের একান্ত পক্ষপাতী ; ডাক্তার কে, এন, ঘোষ,—ইনি কালবার্টসনের একনিষ্ঠ শিষ্য ; ডাক্তার বি, বি, ভট্টাচার্য্য,—ইনি ডাকের (call-এর) পরম অনুরাগী (অবশ্য ডাক্তার মাত্রেই তাই কেননা call-ই তাঁদের একমাত্র ভরসা) ; এবং আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অপূর্ব্ববাবু—ইনি গৃহস্বামী। এতদ্ব্যতীত মণিবাবু, সুবোধবাবু, নৃপেনবাবু, কৃষ্ণবাবু প্রভৃতি অনেকেই এক এক জনের স্কন্ধে ভর করে খেলার আনন্দ উপভোগ করতে ব্যস্ত ছিলেন।

অপূর্ব্ববাবু ও তাঁর খেঁড়ী ডাক্তার ভট্টাচার্য্য পর পর দুইটী 'রবার' করায় অপর পক্ষ বিশেষ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। এমন সময়ে অমিতাভ বাবু নিম্নলিখিতভাবে তাসবণ্টন করলেন। খেয়ালীর পাঠক পাঠিকারা হাত কয়টী দেখে বলুন দেখি কাদের হাতে game আছে। অবশ্য প্রথম lead-টা ঠিক আইন-সঙ্গতভাবে দিতে হবে এবং খেলাটাও (কি নিজের পক্ষের কি বিরুদ্ধ পক্ষের) নির্ভুল-ভাবে খেলতে হবে। বাস্তবিক তাসের বিভাগটা পড়েছে অতিশয় অদ্ভুত।

পূর্ব্বেই বলেছি অমিতাভবাবু বিশেষ উত্তেজিত ছিলেন। তাই এবার তিনি তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র 'সাইকিক' ছাড়লেন। ডাক হল 'একখানি হরতন'। (কারণ প্রতিপক্ষের ইস্কাবনের game-এর সম্ভাবনা নাই এবং পরে তিনি ডাক ফিরিয়ে চিঁড়িতন রঙ্গ করতে

ইস্কাবন—সাহেব, গোলাম, আটা।
হরতন—দশ, নয়, আটা, সাতা, চৌকা।
রুহিতন—দশ, নয়, তিরি।
চিঁড়িতন—নয়, চৌকা।

ইস্কাবন—নয়, ছক্কা, পাঞ্জা, দুরি।
হরতন—গোলাম, পাঞ্জা, তিরি।
রুহিতন—টেক্কা, বিবি, সাতা, ছক্কা, চৌকা, দুরি।
চিঁড়িতন—নাই।

	ডাক্তার ভট্টাচার্য্য	
ডাক্তার ঘোষ		অমিতাভ বাবু
	অপূর্ব্ববাবু	

ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, দশ।
হরতন—টেক্কা, ছক্কা।
রুহিতন—পাঞ্জা।
চিঁড়িতন—দশ, আটা, সাতা, ছক্কা, পাঞ্জা, তিরি, দুরি।

ইস্কাবন—সাতা, চৌকা, তিরি।
হরতন—সাহেব, বিবি, দুরি।
রুহিতন—সাহেব, গোলাম, আটা।
চিঁড়িতন—টেক্কা, সাহেব, বিবি, গোলাম।

পারবেন।) চারখানি অনারের পিট পেয়ে আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে অপূর্ব্ববাবু বল্‌লেন 'ডবল'। ডাক্তার ঘোষ দেখলেন হরতন রঙ্গ হলে তাঁর হাতে খেলার পিট হচ্ছে পাঁচখানির বেশী। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্তভাবে বল্‌লেন 'পাশ'। ডাক্তার ভট্টাচার্য্য পাঁচখানি হরতন পেয়েছেন খেঁসারতের আশায় তিনিও বল্‌লেন 'পাশ'। এবার অমিতাভ বাবু বল্‌লেন 'দুইখানি চিঁড়িতন'। অপূর্ব্ববাবুর কণ্ঠে আবার ঝঙ্কৃত হল 'ডবল'। ডাক্তার ঘোষ বল্‌লেন 'দুইখানি হরতন'। ডাক্তার ভট্টাচার্য্য 'ডবল'। ক্লান্ত-ক্লিষ্ট-কণ্ঠে অমিতাভ বল্‌লেন 'তিনখানি চিঁড়িতন'। অপূর্ব্ববাবু উত্তেজিতস্বরে বল্‌লেন 'ডবল'। ডাক্তার ঘোষ আবার বল্‌লেন 'তিনখানি হরতন'। ডাক্তার ভট্টাচার্য্য সোল্লাসে 'ডবল' দিলেন। ম্রীয়মাণ অমিতাভবাবুর কণ্ঠ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছিল তিনি অস্পষ্টস্বরে বল্‌লেন, 'No bid.' তাঁর চোখে মুখে আশঙ্কার ঘন-কালিমা।

অপূর্ব্ববাবু চিঁড়িতনের টেক্কা খেল্‌লেন। তাঁর এবং তাঁর খেঁড়ীর উপর্য্যুপরি 'ডবলে' গৃহস্থিত সকলেই অল্পবিস্তর চাঞ্চল্য অনুভব করছিলেন ; এবার 'ডামির' হাত দেখ্‌তে সবাই অধীর হয়ে উঠ্‌লেন। 'ডামি' দেখে অমিতাভবাবু কিন্তু আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌লেন। তাঁর এই মুহ্যমান অবস্থার মধ্যে পার্শ্বোপবিষ্ট মণিবাবু তাঁর হাত থেকে তাস টেনে নিয়ে নিজেই খেল্‌তে আরম্ভ করলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল অমিতাভবাবু দর্শকমাত্রে রূপান্তরিত এবং মণিবাবু সোল্লাসে পিটের পর পিট কুড়িয়ে নিচ্ছেন। 'ডামির' তিরি তুরুপ করে প্রথম পিট নিয়ে তিনি খেল্‌লেন ইস্কাবনের দুরি। দশের পিট নিয়ে চিঁড়িতন খেলে 'ডামির' পাঞ্জা তুরুপ করলেন। তারপর ইস্কাবনের বিবির পিট নিয়ে রুহিতনের পাঞ্জা খেলে রুহিতনের বিবির পিট নিলেন। এবার রুহিতনের টেক্কার পিট নিয়ে পুনরায় রুহিতন

খেলে নিজের হাতে তুরূপ করলেন। তারপর ইস্কাবনের টেক্কার পিট নিয়ে আবার চিড়িতন তুরূপ করলেন। এইভাবে নয়টা পিট সংগ্রহ করে তিনি তাস ফেলে বললেন, "চারখানি হরতনের খেলা হয়ে গেল।" (কেন না এখনও তাঁর নিজের হাতে হরতনের টেক্কা মজুত।) সকলেই হতভম্ব। এ তো বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রতিপক্ষের হাতে পাঁচখানি অনারের পিট এবং সাহেব, বিবি, দশ, নয় সমেত আটখানি রঙ অথচ বিপক্ষদলের চারিটার খেলা হয়ে গেল! এ কেমন করে সম্ভব? তখন সুরু হল গবেষণা।

কৃষ্ণবাবু বললেন, "অপূর্ব্ব যদি হরতনের সাহেব lead দিত তবে খেলা short!"

নৃপেনবাবু বললেন, "সে তো চার হাত দেখে বলছ। চিড়িতনের টেক্কা, সাহেব, বিবি নিয়ে চিড়িতন lead হওয়াই উচিত। বিশেষ যখন হরতনের বিবির দু'খানি পিট পাবার সম্ভাবনা আছে কেননা প্রথমে ডাক দিয়াছেন অমিতাভবাবু,—কাজে কাজেই তাঁর হাতে টেক্কা থাকার বেশী সম্ভাবনা। সুতরাং আমার মতে lead হয়েছে correct!"

কৃষ্ণবাবু, "কাজে কাজেই 'ডবল'-এর খেলায় extra হয়ে গেল। এর চেয়ে wrong lead দিয়ে খেলাটা short করতে পারলে ভাল হত না কি?"

কথাটা অপূর্ব্ববাবুর মনে লাগল। তিনি ভেবে স্থির করলেন রঙ lead দিলেই খেলাটা short হত, সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে রঙ lead দেওয়াই ঠিক। তিনি বিশেষভাবে কথাটা মনে রাখবেন স্থির করলেন। তার ফলে কি দাঁড়াল তা' পরে খেয়ালীর পাঠক-পাঠিকাদের জানাব।

ইত্যবসরে পাঠক-পাঠিকারা ভাবতে থাকুন অমিতাভবাবুর হরতন ডাক ছাড়া তাঁর কিম্বা ডাক্তার ঘোষের আর কোন ডাকে game আছে কি না অথবা তাঁদের বিপক্ষদলের কোন ডাকে game আছে কি না? যদি থাকে তবে আগামী সপ্তাহে খেয়ালী মারফৎ জানাবেন।

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

নিউ থিয়েটার্স

এঁদের "ভাগ্যচক্রে"র চাকা অবিরতই ঘুরছে, সম্প্রতি চক্রের স্পীড্ আরও বেড়ে উঠেছে। কর্তৃপক্ষ স্থির কোরেছেন পুজোর আগেই চক্রের পরিণতি রূপালী পর্দায় ফুটিয়ে তুলবেন। এবং চণ্ডীঘোষ ও আনওয়ার শা রোডে তার তোড়জোড় চলছে। আনওয়ার শা রোড ষ্টুডিওতে এক বিরাট সেট্ তৈরী হচ্ছে,—"ভাগ্যচক্রের" এক থিয়েটার দৃশ্যের। এ দৃশ্যটি খুবই জমকালো হবে সন্দেহ নেই। চণ্ডীঘোষ ষ্টুডিওতেও একটি সিঁড়ির দৃশ্য তোলা হ'বে।

* * *

"বি" ইউনিটে যে তামিল ছবির কাজ হচ্ছিল। আপাততঃ বড়ুয়া ষ্টুডিওতে তার কাজ হচ্ছে—এরও মূলে রয়েছে ভাগ্যচক্র।

রাধাফিল্ম

"কৃষ্ণ-সুদামা"র শূটিং অপ্রতিহত গতিতে চলেছে। শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টার অন্ত নেই—ছবিখানাকে সবদিক থেকে সুন্দর

কোরে তোলবার জন্য। তিনি একজন অভিজ্ঞ ও গুণী—তার এ চেষ্টা সার্থক হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়! আর এঁকে প্রযোজনা কাজে যিনি সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য কোরছেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীফণী বর্ম্মণ। এঁর গুণের পরিচয় কারও অবিদিত নেই। আমরা শুনলাম, "কৃষ্ণ-সুদামা"র পোষাক-পরিচ্ছদে এক নতুনত্ব ফুটে উঠবে। ছবি-খানির ভূমিকা-লিপি নির্ব্বাচনেরও তারিফ করা যায়।

রুক্মিণী—শ্রীমতী কাননবালা
সত্যভামা—শ্রীমতী বীণা
নারদ—শ্রীমৃণাল ঘোষ
সুদামা—শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী
ঐ স্ত্রী—শ্রীমতী রাধারাণী
কৃষ্ণ—শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য

আসচে পূজার আসর তা'হলে জমে উঠবে "কৃষ্ণ-সুদামা"র মুক্তিতে।

* * *

"কণ্ঠহারে"র সেট্ তৈরী হ'চ্ছে। শেষ হ'লে অবিলম্বেই শূটিং সুরু হবে।

* * *

'কর্ণওয়ালিসে' "মানময়ী"র আসর এখনও বেশ জমে রয়েছে।

* * *

দক্ষিণ ভারতে "ভক্ত-কুচেলা"—তেলেগু ছবি এখনও বেশ জোরেই চল্‌ছে।

এই ছবির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হ'য়ে 'রাধা' শ্রেষ্ঠ শিল্পী-সমন্বয়ে "লঙ্কা-দাহন"—আর একখানা তেলেগু ছবি তোলা স্থির কোরেছেন।

কালী ফিল্মস্

"প্রফুল্ল" তোলা হ'চ্ছে। ধীরে ধীরে কাজ এগুচ্ছে—ছবিখানার সাফল্যের জন্য।

* * *

"কাল-পরিণয়" নির্ব্বাক-যুগে গাঙ্গুলী মশাইয়ের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। সেই খানাই বাণী-চিত্ররূপে মুক্তি পাবে—গাঙ্গুলী মশাইয়ের হাত দিয়েই। একটা অভিনব কিছু আমরা প্রত্যাশা করি।

* * *

"বিদ্যাসুন্দর" মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে।

* * *

"মণিকাঞ্চন" (২য় পর্ব্ব) এবার সত্য সত্যই তোলা হবে এবং মনে হয় অতি সত্বরই।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

"পায়ের ধুলো" দিনরাত গায়ে মেখে শুনছি মুখুয্যে মশাইয়ের মাঝে মাঝে নাকি গলদঘর্ম্ম হ'চ্ছে। হবারই কথা। কারণ তাকে "পথের শেষে" শীঘ্রই যাত্রা কোরতে হ'বে। খেমকা বাবুর না শুনে উপায় নেই।

এভার গ্রীন পিক্‌চাস

"পঞ্চবাণে"র বাণ তূনীর থেকে যা'তে শীঘ শীঘ বেরুতে পারে—তার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টার অন্ত নেই।

বড়ুয়া পিক্‌চাস

এই ষ্টুডিও এখন ব্যস্ত আছে একখানা

তামিল ছবি তুলতে। এর পরিচালনা কোরছেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।

বেঙ্গল টকীজ

ভারতলক্ষী ষ্টুডিওতে শ্রীমধু বোস পরিচালিত "ওয়ান্ ফেটাল নাইট্" উর্দ্দু চিত্রের কাজ প্রায় এক-চতুর্থাংশ শেষ হয়েছে।

"মহারাণী"

গন্ধর্ব্ব সিনেটোনের "মহারাণী" ছবিখানা 'রূপকথা'-য় দেখে আমরা বিশেষ প্রীত হ'য়েছি। ছবির গল্পের ভেতর চিত্রোপযোগী মালমসলা ও অভিনীত চরিত্রের সুন্দর অভিনয়, বিশেষতঃ শ্রীমতী পদ্মা দেবী আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। ছবিখানির আর একটি বিশেষত্ব এর প্রাঞ্জল হিন্দী বুঝ্তে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না। মোটকথা, ছবিখানা বাঙ্লা ছবির মত বাঙালীদেরও আনন্দ দিতে সমর্থ হবে।

ভেনিসে দেশী ছবি

এ বছরে ভেনিসে আন্তর্জ্জাতিক চিত্র-প্রদর্শনীতে ভারত থেকে শ্রীদেবকী বসুর, "লাইফ্ ইজ এ ষ্টেজ" ও প্রভাত ফিল্মের "অমৃত-মন্থন" সেখানকার প্রতিনিধিবর্গের সাম্নে দেখানো হবে।

দীপালী

আসচে শনিবার ১৭ই আগষ্ট থেকে 'দীপালী'তে ওয়ার্ণার ব্রাদার্সের অনুপম নৃত্যগীত মুখর চিত্র "ফুট্লাইট্ প্যারেড্" দেখান হ'বে। নৃত্যগীতের সৌন্দর্য্যে, শ্রেষ্ঠা সুন্দরীর দৈহিক লাবণ্যের মাধুর্য্যে, চিত্র-কলার সম্বন্ধে হাস্য রসের প্রাচুর্য্যে "ফুট্লাইট প্যারেড্" সত্যই দ্রষ্টব্য চিত্র।

এই সঙ্গে এভার গ্রীন্ পিক্চার্সের প্রথম অবদান, অভিনব হাস্যরসাত্মক চিত্র "শেষ পত্র" রূপোলী পর্দ্দায় উপর মুক্তিলাভ ক'রবে।

ছায়া

টলষ্টয়ের অনবদ্য প্রণয় কাহিনী 'রেসারেক্সনের' নবতম সংস্করণ "উই লিভ্ এগেন্"। মামেলিয়ানের রূপ কল্পনায়, টলষ্টয়ের প্রতিভায়, ফ্রেডিরিক্ মার্চের কলা-নৈপুণ্য, আনা ষ্টেনের অনুরাগ রঞ্জিত অভিনয়ে ছবিখানা হ'য়েছে সুন্দর, মর্ম্মস্পর্শী। ১৭ই আগষ্ট থেকে ছবিখানা 'ছায়া'-য় প্রদর্শিত হবে।

উক্ত দিবসে 'ছায়া'র প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব মাননীয় রাজা সার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে, টি, সন্তোষ রাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হ'বে।
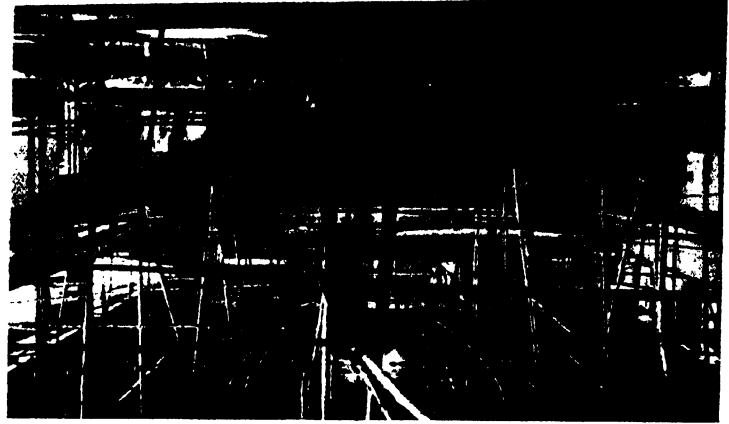
আসচে বুধবার 'ক্রাউন টকীজ' সুসংস্কৃত হ'য়ে 'উত্তরা' নাম নিয়ে দ্বারোদ্ঘাটিত হ'বে। ওপরের ছবিখানা 'ক্রাউনে'-র সংস্কার কার্য্যের একটি দৃশ্য।

'রূপবানী'তে স্যার নৃপেন্দ্র

ভারত সরকারের আইন-সচিব মাননীয় স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় গত ৯ই আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যায় 'রূপবাণী'র চিত্র-গৃহে পদার্পণ কোরেছিলেন। শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রকাশ চন্দ্র নান প্রমুখ 'রূপবাণী'র ডিরেক্টারগণ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর সত্বাধিকারী মিষ্টার বি, এল, খেমকা ও এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্সের

খেলার মাঠে

শ্রীদ্রোণাচার্য্য

লীগ্ ও শীল্ড খেলা হ'য়ে গেল, সকলে ভাবলে যাক্ এবার গড়ের মাঠ আবার নীল হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু তা' হ'ল না, লোকের জুতোর চাপে মাঠ যে নেড়া সেই নেড়াই এখনও পর্য্যন্ত থেকে গেল।

শনিবার দিন দ্বারভাঙ্গা শীল্ডের ভারতীয় জোনের শেষ খেলা মোহনবাগান বনাম মহামেডান স্পোর্টিং খেলায় জনসমাগম যা' হ'য়েছিল, তা শীল্ডের কোনও বড় খেলার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

এই খেলায় উভয় পক্ষই ২-২ গোল দেয় বলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে মোহনবাগান তার প্রতিপক্ষ দল অপেক্ষা এই দিনে অনেক ভাল খেলে।

এই খেলায় যে অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হয়েচে সে বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত।

খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে খেলার মধ্যে আক্‌চা-আক্‌চি হয়, সেটা তবুও কতকটা বরদাস্ত করা যায়। কিন্তু মেম্বার্স গ্যালারী থেকে উঠে খেলোয়াড়কে মারতে যাওয়ার ধৃষ্টতা একেবারে অসহনীয়।

ধ্যানচাঁদ

উক্ত খেলার মাঠে যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত হতে পারেন না তাঁদের খেলার মাঠের আবেষ্টনীর প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়াই উচিত। আই, এফ, এর কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া উচিত—তা' নয়ত কোন অদূর-ভবিষ্যতে ময়দানেই বেলডাঙ্গা বা সহিদগঞ্জের তাণ্ডবলীলার একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ অনুষ্ঠিত হ'তেও পারে। খেলার মাঠে সাম্প্রদায়িক বীজ যাতে না মহীরূহ উৎপাদন করে সে বিষয়ে শান্তিকামী দেশবাসী ও আই, এফ্, এর কর্ত্তৃপক্ষের ইতিমধ্যেই অবহিত হওয়া সঙ্গত।

ভারতীয় হকি দল

ভারতীয় হকি দল নিউজিল্যাণ্ডের খেলা শেষ কোরে অকল্যাণ্ড থেকে ২৬শে জুলাই মারামা জাহাজযোগে ভারতের দিকে রওনা হ'য়েছে। গত ২৪শে জুলাই রোটোউরাতে মাওরী দলের সঙ্গে একটা ম্যাচ খেলিয়া ভারতীয় দল ১১—০ গোলে জয়লাভ কোরেছে। উক্ত গোল সংখ্যার মধ্যে রূপসিং ৫টি, ধ্যানচাঁদ ৫টি ও ওয়েলস ১টি গোল দিয়েছিলেন। খেলার সময় খুব বৃষ্টি হ'য়েছিল; কিন্তু তা'তে খেলার কোন ব্যাঘাত ঘটে নি।

কর্ম্মাধ্যক্ষ মিষ্টার এস্, আর, হেমাদ স্যর নৃপেন্দ্রনাথকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোংর নতুন লোমহর্ষক চিত্র "বিদ্রোহী" ও সঙ্গীত মুখর প্রহসন "রাতকাণা" রূপবাণীতে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হ'চ্ছিল। স্যর নৃপেন্দ্রনাথ প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত দু'খানি চিত্রই দেখে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন। 'রূপবাণী' প্রেক্ষাগৃহের মনোরম সাজ-সজ্জা ও আসনাদির আরামপ্রদ ব্যবস্থা দেখিয়াও আইন-সচিব মহাশয় প্রশংসা জ্ঞাপন করেন।

পপুলার পিকচার্স

'উত্তরা' চিত্রগৃহে আগামী ১৭ই আগষ্ট এদের মন্ত্রশক্তির উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু চিত্র গৃহের আমুল সংস্কার সাধিত না হওয়ায় জন্মাষ্টমীর দিন (২১শে আগষ্ট, বুধবার) 'মন্ত্রশক্তি'র উদ্বোধন হবে। শনিবার থেকে টিকিট বিক্রী হবে।

—

ভারতীয় দল সর্ব্বশুদ্ধ নিউজিল্যাণ্ডে ২৮টী ম্যাচ খেল্‌ল। তা'তে ভারতীয় দলের পক্ষে ৩৫৩টী গোল ও বিপক্ষে ২০টী গোল হ'য়েছে। ভারতীয় দলের পক্ষে ধ্যানচাঁদ ১৩১টি, রূপ শিং ১৫৪টি, ওয়েলস ৬৪টি, সাহাবুদ্দিন ২৫টি, ডেভিডসন ৯টি, ফার্ণাণ্ডিজ ১০টি ও হরবিল শিং ৪টি গোল দিয়েছেন।

ফিরবার পথে ভারতীয় দল অষ্ট্রেলিয়াতে ৬টি ম্যাচ খেলবে। সে জন্য মেলবোর্ণ থেকে তারা ১৭ই আগষ্টের পূর্ব্বে ভারতের দিকে রওনা হ'তে পারবে না।

ভারতীয় দলের এই জয়-গৌরবে আজ বিশ্ববাসী মুগ্ধ। হকি খেলায় তারা যে অজেয় এ কথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই; আর এ কথাও আজ বিশ্ববাসী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কোরেছে যে, ধ্যানচাঁদ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেন্টার-ফরোয়ার্ড। বাঙ্‌লা থেকে মোহনবাগান দলের পি, দাস (ব্যাক) ও এন, মুখার্জ্জী (গোল-কীপার) এই ভ্রমনে অপরূপ ক্রীড়া-নৈপুণ্য দেখিয়ে বাঙালীর মুখরক্ষা কোরেছেন। ভারতীয় দল এ অবধি কোথায় কত গোলে জয়লাভ কোরেছে তা' নিয়ে প্রদত্ত হ'ল।

১৫ই মে	জয়ী	ডানীভাকি	২১—০
১৬ই মে	„	হকীজ বে	১৭—০
১৮ই মে	„	পভার্টি বে	১১—০
২০শে মে	„	ওয়াইরোয়া	১৮—১
২২শে মে	„	বুশ ইউনিয়ন	৬—০
২৫শে মে	„	ওয়াঙ্গানি	১৮—০
২৯শে মে	„	মানাওয়াতু	২২—০
৩০শে মে	„	হোরোহেনুয়া	১৬—০
১লা জুন	„	ওয়েলিংটন	১০—১
৩রা জুন	„	কান্টারবারী	৫—১
৬ই জুন	„	সাউথ কান্টারবারী	১২—০
৮ই জুন	„	ওটাগা	১৭—০
১০ই জুন	„	নর্থ ওটাগা	১৬—১
১৫ই জুন	„	সাউথল্যাণ্ড	১৩—১
১৯শে জুন	„	মিড-কান্টারবারী	১১—০
২২শে জুন	„	নিউজিল্যাণ্ড (প্রথম টেষ্ট)	৪—২
২৬শে জুন	„	ওয়েষ্ট কোষ্ট	১৩—০
২৯শে জুন	„	নিউজিল্যাণ্ড (দ্বিতীয় টেষ্ট)	৩—২
২রা জুলাই	„	নেলসন	১২—০
৪ঠা জুলাই	„	টারানাকি	৩—০
৬ই জুলাই	„	ওয়াইকাটো	৭—০
১০ই জুলাই	„	পিয়াকো	১৪—১
১১ই জুলাই	„	ওয়াইপা	৫—২
১৩ই জুলাই	„	অক্‌ল্যাণ্ড	৯—৩
২০শে জুলাই	„	নিউজিল্যাণ্ড (তৃতীয় টেষ্ট)	৭—১
২২শে জুলাই	„	টেম্‌স	১০—০
২রা আগষ্ট	„	টিম্‌ওয়ার্থ	২৪—০
৩রা আগষ্ট	„	নিউ সাউথ ওয়েল্‌স	১১—১

সুস্বাগতম্।

ভারতীয় চা

অবসাদ ও তন্দ্রালসতা দূর করে

চা প্রস্তুত করার প্রণালী

১। উৎকৃষ্ট ভারতীয় চা ব্যবহার করিবেন।

২। সম্ভব হইলে মাটীর পাত্র ব্যবহার করিবেন; প্রত্যেকের জন্য এক চামচ চা এবং এক চামচ অতিরিক্ত দিবেন।

৩। দেখিবেন যেন জল টগবগ করিয়া ফোটে।

৪। আগে চা দিয়া তাহার উপর ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিবেন।

৫। চা অন্ততঃ পাঁচ মিনিট ভিজিতে দিবেন; তাহার পর চিনি ও দুগ্ধ দিয়া পান করিবেন।

ভারতীয় চা'র যে কেবল অত্যাশ্চর্য্য স্নিগ্ধকর গুণ আছে তা নয়; ইহা **সুলভ,** নির্দ্দোষ ও বলকারক পানীয় এবং ভারতীয় শ্রমে ভারতে উৎপন্ন ও প্রস্তুত; **বাস্তবিকই** ইহা ভারতের নিজের জিনিষ, অথচ ভারতবাসীর মধ্যে এ যাবৎ ইহা **খুব** বিস্তৃত ভাবে আদৃত নয়। ইহার আস্বাদ অনুভব করিয়া না থাকিলে আজই **এক** পেয়ালা চা পান করুন।

প্রকৃতই স্বদেশোৎপন্ন—ভারতীয় চা

ডায়েরীর ছিন্ন-পত্র

একা

রঞ্জন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভাল লাগে না। জীবনটা যেন একটা মরীচিকা !···

সংসারের বাঁধন নেই, তবুও আছে। মনের ভেতর যেন কীসের একটা অভাব !···

বাবা আছেন ; স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু বান্ধব সকলেই আছে, তবুও যেন নেই !...

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এসে সারা আকাশকে ছেয়ে ফেলে—

আমি অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে থাকি আকাশ পানে...

মিট্‌মিট্‌ করে গুটিকয়েক তারা, আর তারই পাশে এক-ফালি রূপোলী চাঁদ রূপের লহর ছড়িয়ে চ'লে যায়···

আকাশ রূপালী রঙে রাঙিয়ে ওঠে, আবার ওঠে না !...

দেখি, দেখি,—

তবুও যেন দেখা শেষ হয় না আমার !

ভাবি,

এই অনন্ত, সীমাহীন, নিথর, নিকষ কালো—

ঘন কালো আকাশের বুকে কেমন মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলে তারাদল !···

এই-ই তারাগুলো আবার পৃথিবীর চেয়ে যে কতো বড়ো তা কে জানে !···

যখন ভাবি একথা, অমন আশ্চর্য্যে নিজের মনের দিশা হারিয়ে ফেলি আমি নিজে !...

মনে প'ড়ে যায় সহসা একটি দিনের কথা—

এমনি এক আধ-পূর্ণিমা রাতে আমি আমার জীবনের-সব-চেয়ে-বড়ো-পাওয়া আরাধ্যা মার কোলে শুয়ে কতো গল্পই না শুনেছি !···

চোখ দুটো আমার ভ'রে আসে জলে—

বুকের মাঝে যেন কীসের এক বেদনার অনুভূতি পাই !...

মার স্নেহমাখানো কোলের ওপর মাথা রেখে শুনি তার অনেক কথা !···

কথার স্রোতের মাঝে থেই হারিয়ে ফেলি যেন আমরা !

সব কথা বুঝি না আমি, তবুও যেন বুঝবার চেষ্টা করি, সকলকে কাছে পেতে পারি না, তবুও কেন যে পাই না তার কারণ খুঁজি !···আবার কারণের মাঝে নিজের শক্তির অকুলান হ'লেই বলি মাকে :

তুমি কিছু জানো না মা ! আমি জানি সব !···

এমনি ভাবে এক এক ক'রে নানান কথা বলেন মা আমায় !···

কথার মাঝে হঠাৎ পাল তোলেন !··· অন্য কথা বলেন :

রঞ্জন ! ঐ যে দূরে—অনেক দূরে ছোট্ট তারা মেয়েরা জ্বলে মিট্‌মিট্‌ করে, ওরা কে জানিস্‌ ?...মানুষ ম'রে গেলে ঐ—ঐখানেই তারা হ'য়ে আশ্রয় নেয় !...ঐ সব তারা গুলোও মানুষ ছিলো একদিন ! আজ তারা স্বর্গে !···ওটা স্বর্গ !...ঐখানে থাকে তারা আর পৃথিবীর বুকের ওপর যারা থাকে তাদের দেখে···

তারাদের মাঝেও আমাদের মতো হাসি-কান্না, কথাবার্ত্তা সবই আছে !···চাঁদ, ঐ যে, মেঘের পাশে মুখখানি লুকায়, ঐ চাঁদ, ওদের দেশের রাণী !...

আরোও কতো কী বলেন মা !···

হঠাৎ আকাশের পূব-দিক থেকে এক ঝলক্ বিদ্যুৎ চিক্‌মিকিয়ে ওঠে···

ভয়ে মার কোলের ভেতর মাথা গুঁজি—

মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে মধুর স্বরে বলেন :

ভয় কি বাবা ! ছিঃ ! ভয় ক'রতে আছে কি ?

মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধ'রে বলি :

না মা—

কথা আর ফুরোয় না ; হঠাৎ কড়্ কড়্ কড়াৎ ক'রে একটা মেঘের গুরু গম্ভীর আওয়াজ কানে আসে...

শিউরে উঠে মার কোলের ওপর উঠে বসি। মা আমায় দুহাত দিয়ে বুকের মাঝে টেনে নেন !...

মাথায় একটা ছোট্টো চুমু দিয়ে আদরের সুরে বলেন :

ভয় ক'রতে আছে কি বাবা ? ছিঃ ! ভয় ক'রলে তো চলবে না বাবা আমার !...এখন থেকে তোমায় সাহসী হ'তে হবে যে !... চিরকাল তো আর আমি থাকবো না তোমার কাছে !...

ভয়ে মার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলি :

কেন মা ?...তুমি যাবে কোথায় ?

মা আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন :

চিরকাল তো কেউ থাকে না বাবা !... আমিও একদিন চ'লে যাবো, এমন এক রাজ্যে যাবো, যেখানকার আকাশ-বাতাস, আলো-অন্ধকার সবই এক অদ্ভুত রকমের... সে এক অজানা রাজ্যে...

মার কাপড়ের আঁচলখানি নিয়ে মুখের ওপর বৃথা রগ্ ড়াতে রগ্ ড়াতে বলি :

তা হ'লে, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে মা !...

মা আমায় আরোও বুকের কাছে টেনে নিয়ে এসে বলেন :

কেউ যে সে-সময় সঙ্গে যেতে পারে না বাবা !...

আমার গলা তখন একটু কেঁপে ওঠে—

চোখ দুটো বৃথা রগ্ ড়াতে রগ্ ড়াতে বলি :

না, তা হ'লে আমি তোমায় ছাড়বো না, কিছুতেই ছাড়বো না...

বাধা আর মানে না, চোখ দুটো দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়ে...

মা আমায় তাঁর কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছিয়ে দিয়ে একটু হেসে বলেন :

ওমা ! এরি মধ্যে কান্না !...পাগলা আমার ! ছিঃ ছিঃ ! না, না, আমার রঞ্জনকে ফেলে কে চ'লে যাবে !...না, না, কেউ যাবে না !...

আমার গলা তখন বেশ ভারী হ'য়ে ওঠে :

এই তো তুমি ব'লছিলে, আমায় ছেড়ে...

কথা আর এগোয় না। বুকের ভেতর থেকে যেন একটা ভারী জিনিষ উঠতে থাকে !...

মা আমায় তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নেন। বলেন :

নারে, না, পাগলা আমার !...আমি যাবো না, তোকে ছেড়ে কোথাও যাবো না, কখ্ খনো যাবো না !...তোকে ছেড়ে কোথায় একদণ্ডও গেছি রে ?...

এমন সময় সারা আকাশ ছেয়ে মেঘের মেলা বসে...

ছাদ তখন আঁধারে ঢাকা পড়ে!...

মা তখন আমায় কোলে ক'রে উঠে পড়েন। বলেন:

চল্ বৃষ্টি আসবে এখুনি আবার!

সাত বছরের জ্ঞান আমার তখন বোঝেনি এর কথা—

তখন বোঝেনি মার এ আশ্বাস-বাণী!...

কিন্তু আজ বুঝছি, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রতে পারছি এর অভাব!...প্রতি পলে-পলে, প্রতি দণ্ডে-দণ্ডে, প্রতি মুহূর্ত্তে আমার কেবলই মনে হয়, মা আমার, আমার জননী, যাঁর স্নেহ-বিজড়িত-বুকের মাঝে থেকে এত বড়ো হ'য়েছি, যাঁর শিক্ষায় আমার শিক্ষা, যাঁর দয়ায় আমার মনে করুণার সঞ্চার, যাঁর প্রেমে আমার মন বিমোহিত—সেই আরাধ্যা মা, পূজনীয়া মা আমার আর আসবে না আমার কাছে, আমার দুঃখে দুঃখী হবে না, আমায় আর তাঁর মতো বুকের মাঝে টেনে নিয়ে কেউ আদর ক'রবে না, কেউ চোখের জল মুছিয়ে দেবে না!...

হঠাৎ আকাশ থেকে একটি তারা খ'সে পড়ে—

তখনি আবার মনে পড়ে আমার—

হ্যাঁ মা-ই তো আমায় ব'লেছিলেন, যে মানুষ ম'রে যায়, সেই আকাশের তারা হয়!...বুঝি মা-ও তারা হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন!...

নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করি—

এই অগণিত তারার মাঝে মা আমার তু হ'লে কোথায়?—

ছিটে ফোঁটা

বজ্রবাহু

শ্রাবণের 'ভবিষ্যতে' হেমদা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে 'অবৈধ', গল্পটির নাম 'অবৈধ' না দিয়ে লেখক মহাশয় 'আজগুবি' কিংবা 'গাঁজা' দিলেই ভালো করতেন; কারণ এ হেন গল্প শুধু গেঁজুড়ে সমাজেই চলে থাকে। গল্পের প্রথমেই রমনার মাঠ দেখে ভেবেছিলুম ছাগলদের ছাগলামীর কথাই হয়ত লেখক বলবেন; কারণ আমাদের এক রমনার বন্ধু রমনার মাঠের ছাগলের অত্যাচারের কাহিনীই ইতিপূর্ব্বে শুনিয়েছিলেন; কিন্তু পরিশেষে দেখা গেল এ লেখকের মগজ আরও উর্ব্বর—গোঁওয়ার আওতায় ছাগলামীকেও হার মানিয়েছে। ছেলেবেলায় গেঁজুড়ে সমাজের একটি গল্প শুনেছিলাম—একদিন দুই গেঁজুড়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে গাঁজার কল্কেয় টান দিচ্ছিল। নেশা যখন পেকে উঠ্‌লো তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বদ্ধ ঘরে অন্ধকার যখন বেশ জমাট বেঁধে উঠ্‌লো—তখন একজন অপরজনকে ঘরের আলো জ্বালতে বল্‌লে—অপরজন আবার তাকেই সেই কাজ করবার আদেশ দিলে। এমনি দুজনে চল্‌লো তর্ক-বিতর্ক—কেউই আলো জ্বালতে রাজি নয়—অথচ অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালা চাই-ই! প্রথমে তর্ক পরে হাতাহাতি—অবশেষে আপোষে মিট্‌মাট্‌ হল প্রথমে যে কথা কইবে—সেই জ্বালবে ঘরের আলো। দুজনে প্রবল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কিছুতেই আগে কথা কইবে না। দুজনেই বদ্ধ অন্ধকার ঘরে গুম্ হয়ে বসে রইল নির্ব্বাক অবস্থায়। গভীর রাত্রে সেই আড্ডা ঘরের ওপর নজর পড়লো পুলিশের। পুলিশ দরজায় ঘা দিতে লাগলো—কিন্তু কোন উত্তর নেই, অবশেষে পুলিশ দরজা ভেঙ্গে দুজনকে ধরে নিয়ে গেলো থানায়। প্রশ্নের পর প্রশ্নেও উভয়ের মুখ থেকে কোন কথা বার করা যায় না। অগত্যা থানার দারোগা বেত চালালে দুজনের পিঠে—একজন তার মধ্যে প্রহার বেদনায় চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—অপরজন তৎক্ষণাৎ সোল্লাসে লাফিয়ে উঠ্‌লো—জ্বাল আলো! প্রহারাঘাতে প্রথমজনের নেশা কিন্তু কেটে গেছে। সে দেখলে থানার ভেতর দারোগার রোষ চক্ষুসমেত বেত্রদণ্ড এবং বাইরে সকালের চড়া রোদ্দুর। সে তখন বল্‌লে—ওরে শালা—সকাল হয়ে গেছে যে রে—এ যে থানা!

আমাদের লেখকের রমনামার্কা গল্প ঠিক এই ধরণের অবৈধ প্রেমের কার্য্য চল্‌লো রমনার মাঠে—নায়ক নায়িকা দুজনেই পরস্পরের সান্নিধ্যে আত্মহারা—অকস্মাৎ তারা বদ্ধ হল দুটি কঠিন বাহুর আলিঙ্গনে। উভয়েরই যখন প্রেমঘোর কেটে গেল—দেখলো তারা পুলিশের হেফাজতে বন্দী। প্রেমিকা তার প্রেমিকের কাছ থেকে তার প্রেমের বিনিময়ে যে টয়লেটের বাক্সটি উপহার লাভ করেছিলো সেখানে টয়লেটের পরিবর্ত্তে রিভলভার এবং তাজা কার্ত্তুজ বিরাজমান।

লেখক মহাশয়কে আমরা সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিই বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্র সস্তা গাঁজার নেশার জন্যে নয়।

* * *

আষাঢ়ের 'ভবিষ্যতে' শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী নরকে বাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। শ্রাবণের 'ভবিষ্যতে' তাঁর অনুজা শ্রীহাসিরাশি দেবী আবার সীমাহীন অনন্ত পথে বাস ক'রবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

তিনি বিলাপ করেছেন—

"ফিরিব না আর কোনদিন
কোন গৃহ ছায়ে বসি,
কিম্বা কোন মুক্ত বাতায়নে
বসি দুইজনে,
এতটুকু সীমার মাঝারে,—
দোঁহে দোহা পানে চাহি মিলনের
লগন যাপিতে।"

তিনি অসীমের পথে বিচরণ করুন পক্ষ মেলিয়া—কিন্তু নীচের দিকে যেন তাকাবেন না—তা হ'লেই আমাদের আশঙ্কা হয় কথামালার কচ্ছপের কথা স্মরণ করে।

—

দ্বন্দ্ব

(গল্প)

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

তেতলা মস্ত বাড়ী 'মাধবী-কুঞ্জের' উন্মুক্ত জানালা দিয়া কেতকী পাশের জীর্ণ একতলা বাড়ীটার নবাগত ভাড়াটিয়াদের দেখিবার জন্য উন্মুখ দৃষ্টি প্রসারিত করিল।

দেখিল—ময়লা জামাপরা তালিমারা স্যাণ্ডেল পায়ে একটি তরুণ যুবক, হাতে শাঁখা, লাল পাড় শাড়ী পরিহিতা একটি প্রৌঢ়া আর ডাঁটিহীন সুতো বাঁধা চশমা চোখে হুকা হাতে একটি বৃদ্ধ।

আসবাব পত্রের মধ্যে দু'তিনটে পোঁটলা, ভাঙা ট্রাঙ্ক, পায়াহীন একটি তক্তাপোষ, খান দুই চেয়ার, জীর্ণ একটি টেবিল, খানকতক বাসন, মাদুর, সতরঞ্চি, হাঁড়ি, সরা, কড়া, চাটু, বেড়ি···ব্যস্! ইহা লইয়াই একটি সংসার!

তরুণ যুবকটির দিকে দৃষ্টি পড়িতেই কেতকী দেখে—সে যেন তাহার দিকেই উন্মুখ নয়নে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে।

উপেক্ষায়ই হয়ত কেতকী নাক সিঁটকাইল—তারপর ভ্রূটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অবজ্ঞার স্বরে কহিল—Idiot!

অকস্মাৎ পিছনে মৃদু করস্পর্শে চমকাইয়া ফিরিতেই কেতকী দেখিল নমিতা।

নমিতা ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা টানিয়া আনিয়া বলিল—কী রে কেতকীরাণী,

এতক্ষণ কোন প্রিয়তমের পানে মগ্ন ছিলি ?... কে Idiot রে ?

কেতকী অভিযোগের ভাণ করিয়া কহিল—প্রিয়তম ! প্রিয়তম আর কোথায় পাবো বল্ ? তোরা তো আর এক আধটা জুটিয়ে দিলি না ! তোর মতো তো কবি নই যে সহজেই প্রেমিক জুটে যাবে !

নমিতা হাসিয়া বলিল—যাক্, বুঝলুম সবই ! তার আর ভাবনা কি ! বল্না কালিদাসের মেঘদূতের কাজ করি—কিংবা বন্দেগিরি—তোর জন্যে আমি সবই করতে পারি। বলিস্ তো দেখ, পাশের বাড়ীর ছেলেটির সঙ্গেই তোকে engage করে দিই। হ্যাঁ, তা Idiot হল কিসে ?

কেতকী নমিতার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া জানালার সামনে দাঁড় করাইয়া দিলে, তারপর সমস্ত ঘটনাটি তাহাকে বলিল।

নমিতা কহিল—ওঃ এই, তার জন্যে তোর এত অভিযোগ করবার কি আছে ?

কেতকী চটিয়া উঠিয়া বলিল—বারে, তোর তো আচ্ছা যুক্তি দেখছি ! ওই তো বাপ্ রূপ, আর ওই তো অবস্থা—তার আবার অমন ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকা কেন ? কক্ষনো যেন মেয়েমানুষ দেখে নি।

নমিতা বাধা দিয়া বলিল—কেন গরীব বোলে !—এ তোর অন্যায় আভিজাত্যের অহঙ্কার। যদি দেখেই থাকে এমন কী অপরাধ করেছে—? মানুষ মানুষকে দেখেই থাকে, আর তুই যা সুন্দর......সুতরাং এতে অভিযোগ করবার কিছুই নেই।

—নাঃ কিছুই কল্লে নি ! তোর সঙ্গে তর্কে পারা যায় না। দেখিস্ প্রথম দেখাতেই যেমন দরদ, Love at first sight নয়তো ; শেষকালে নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই করিস্ ! যাক্ ! বাজে আলোচনা এখন ছাড়্। চল, চা খাবি চল্।—

কেতকী নমিতাকে টানিয়া লইয়া গেল।

সেদিন কেতকীর জন্মতিথি !

অন্ধকারের পশরা মাথায় লইয়া সন্ধ্যা নামিয়াছে। কেতকীদের ড্রয়িংরুমে তখন তাহার নিমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধবদের মজলিশ্ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

পাশের বাড়ীর জীর্ণ দেয়াল ভেদ করিয়া এক করুণ গানের সুর আসিয়া আলোক সজ্জিত সুরুচি সম্পন্ন ঘরটিতে প্রবেশ করে—

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলাম না
পথের শুক্নো ধূলো যত !

নিমেষে ঘরের সমস্ত কোলাহল নিস্তব্ধ হইয়া—সেখানে কেবল রণিয়া রণিয়া গানের প্রতি কলিটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াতে থাকে।

চোখের রিম্লেশ চশমাটি ঠিক করিয়া বসাইয়া সদ্য বিলাত প্রত্যাগত নবীন ব্যারিষ্টার মিঃ অর্ণব মিটার বলিয়া উঠিল—মিস্ রায়, এমন সভাটা একটা বেসুরো গানে নষ্ট হয়ে গেল—দয়া করে আপনি যদি একটা গান শোনান।

কেতকী একটু গর্ব্বের হাসি হাসিয়া বলিল—নাঃ, এতে আর অসুবিধার কারণ কি থাক্তে পারে ? তারপর পিয়ানোর চাবি টিপিয়া গান ধরিল—

আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে
তখন আপনি এসে দ্বার খু'লে দাও
ডাকো তা'রে।

* * *

ওবাড়ীর গান তখন থামিয়া গেছে।

গান শেষ হইলে কেতকী দেখিল—বাইরের জানালায় দাঁড়াইয়া ওবাড়ীর ভাড়াটিয়া নবাগত যুবকটি,—দৃষ্টি তাহার তাহারই দিকে নিবদ্ধ।

চেয়ার হইতে উঠিয়া আসিয়া মিষ্টার মিটার গর্জ্জ কণ্ঠে তাহাকে বলিল—ইধার কিয়া মাংতা—হাটো হিঁয়াসে—

যুবকটি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল কোন কথা না বলিয়া। ঘরের আর আর মেয়েরা উহাকেই লক্ষ্য করিয়া গোটা কতক অপমান জনক কথা শুনাইয়া দিল।

মিষ্টার মিটার বলিল—লোকটা একটা Scoundrel. কেতকী আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল—ওকে আপনি চেনেন নাকি ? মিষ্টার মিটার কহিল—আরে রামঃ,

*** কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ***

উত্তরায় (ক্রাউন) ১৭ই আগষ্ট শুভ-উদ্বোধন

পপুলার পিক্‌চার্সের প্রথম অবদান

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর

"মন্ত্রশক্তি"

[কালী ফিল্মসের R. C. A. শব্দযন্ত্রে গৃহীত]

: সুর-শিল্পী :
কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)

: পরিচালক :
সতু সেন

: বিভিন্ন ভূমিকায় :

শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজহর গাঙ্গুলী, শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীবলাই ভট্টাচার্য্য, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা, শ্রীতারকবালা (লাইট্), শ্রীমতী চারুবালা, শ্রীমতী হরিমতী, শ্রীগিরিবালা, শ্রীমতী কমলা (ঝরিয়া) ও শ্রীমতী রাণী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় হইতেছে।

Enquire of :

J. K. Mitra
Managing Partner
64, Boloram De Street
Calcutta
PHONE: B.B. 244

KALI FILMS
Tollygunge
Calcutta.

ওকে চিন্‌তে যাবো কিজন্যে, begger classএর হবে আর কি···

নমিতা কিন্তু ইহাদের এই নীচ রসিকতায় যোগদান করিতে পারিল না। সে প্রতিবাদ করিয়া বসে—আর যাই হোক্ বিলাত তো যায় নি; সুতরাং কাল্‌চারের কিছুই জানে না। তা না হলে আর পরের জানলায় এসে দাঁড়ায়!

মিষ্টার মিটার উত্তেজিত স্বরে বলেন—মিস ঘোষ অকস্মাৎ আমাকে অপমান করবার কোন কারণই দেখতে পাইনে। পাঁচটা ভদ্র মহিলা যেখানে উপস্থিত হয়েছেন সেখানে অকারণে দরজায় এসে উঁকি মারাটাও বোধ করি এদেশের সভ্যতা নয়। যাক্, যদি এতে আপনার ব্যথা লেগে থাকে তারজন্যে আমি দুঃখিত।

নমিতা গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয়—প্রয়োজন নেই!

কেতকী আসিয়া নমিতাকে শান্ত করে—নমি, আজকের দিনে এমন একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গকে চাপা দে ভাই—

নমিতা ভাবে—কেতকী হইতে আরম্ভ করিয়া ইহাদের প্রত্যেকের লোকটির ওপর আক্রোশ কেন? বেচারার দোষ কী? গরীব?—হবে বোধ হয়।

মার্জ্জিত হাসি এবং উচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্য দিয়া মিষ্টার রায়এর বাড়ীতে কেতকীর জন্ম-তিথি উৎসব রজনী সাফল্য মণ্ডিত হইয়া ওঠে—এ পাশের ভাঙা একতলা বাড়ীটার ক্ষুদ্র কক্ষে হ্যারিকেনের আলো জ্বালিয়া কেতকীর অপমান নীরবে গায় মাখিয়া দীনদরিদ্র যুবকটি একাগ্রচিত্তে তাহারই পরিপূর্ণ ছবিখানি দেখিতে থাকে।

রাত্রি ক্রমে বাড়িয়া চলে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে বন্ধুদের সব উপহার দিবার পালা!

যুবকটি বসিয়া দেখে—সোনার ব্রুচ্, নেকলেশ—ভালো ভালো বই, আংটি, রিষ্টওয়াচ—এমনি কত কী।

মিষ্টি মৃদু হাসির লহরী—হিল তোলা জুতার খটাখট্ আওয়াজ—গ্রীবা হেলাইয়া কথা কহিবার অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা—শিক্ষিত সভ্য আভিজাত্য সমাজের চমক্ লাগানো চাল্ চলন—দেখিতে মন্দ লাগে না।

বর্ষণ মুখর সন্ধ্যা।

টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। তখনও সুদূর ব্যাপী আকাশ জোড়া কালো মেঘ।

আকাশ রংএর শাড়ী দিয়া দেহলতাকে আচ্ছাদিত করিয়া কেতকী নীচের ঘরে বসিয়া একখানা বাংলা মাসিক পত্র পড়িতেছিল। একটি কবিতা—তাহার চমৎকার লাগে। কবি শৈলেশ বোস—ইঁহার কবিতা পুস্তক 'মন্দাক্রান্তা' বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছে। কয়েকটি লাইন কেতকীর অন্তরকে স্পর্শ করে—বার বার সে পড়ে—

শ্রাবণ রাত্রি ভোরের স্বপন সম;
অচিন্ যাত্রী, স্নিগ্ধ ও অনুপম;
তরুণ প্রাতের উজল আলোক মাখা
নয়ন আমার তোমারি নয়নে ঢাকা,—
সপ্ত রংয়ের অঞ্জন রেখাগুলি
উঠিছে ফুটিয়া দেখ নাকি প্রিয়তম!

দরোয়ান আসিয়া জানাইল—একঠো আদ্‌মি আপ্‌কো সাথ মুলাকাৎ মাংতা।—

গম্ভীর কণ্ঠে কেতকী বলিল—উস্‌কো সেলাম দেও।

খানিক পরে ঘরের দরজায় যাহার আবির্ভাব হইল তাহাকে দেখিয়াই কেতকীর

ছন্দ

শ্রীঅনন্ত কুমার ওহদেদার

কানের উপরে কলম গুঁজিয়া
খুঁজিয়া ফিরিছি ছন্দ,
এমন সময়ে গিন্নী আসিয়া
বাধাল ভীষণ দ্বন্দ্ব,
আমি কহিলাম, "আহা তিষ্ঠতি,
রচিতেছি এবে ছন্দ;"
প্রিয়া মোরে কন করিয়া ভ্রূকুটি—
'ভাত তবে আজ বন্ধ'।
শুনিয়া সখীর এহেন বারতা
নাড়ী হ'ল ক্ষীণ মন্দ,
হাত হতে ত্বরা লেখনী খসিল
ছন্দ হইল অন্ধ।

সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তাহার সহিত পাশের বাড়ীর ওই ব্রুট্‌টার কী দরকার থাকিতে পারে?

তীক্ষ্নস্বরে কেতকী জিজ্ঞাসা করিল—কাকে চাও?

আগন্তুক যুবকটী বলিল—আজ্ঞে আপনাকে।

কণ্ঠস্বরকে আরও একটু চড়াইয়া কেতকী কহিল—কী দরকার? হাতের খবরের কাগজে মোড়া একটি বাণ্ডিল কেতকীর টেবিলে রাখিয়া পাশের বাড়ীর যুবকটী বলিল—আপনাদের বাড়ীর ছাদ থেকে এটা উড়ে এসে আমাদের বাড়ীতে পড়েছিল—চাকর বাকর বাড়ীতে নেই, তাই এটা দেবার জন্যে নিজেকেই আপনাদের কাছে আস্‌তে হোল। আপনাকে হয়ত বিরক্ত করলুম—ক্ষমা করবেন।

তাহার কথায় কেতকী একটু লজ্জিত হইয়া ওঠে। কাগজের বাণ্ডিলটি খুলিয়া কেতকী দেখে তাহার জন্ম-তিথি উপলক্ষে মিষ্টার ডাট্‌ এই সিল্কের শাড়ীখানি তাহাকে উপহার দিয়াছিল। কাপড় কেতকীর খুবই প্রিয় সামগ্রী। এই খানি হারাইয়া গেলে তাহার আফশোষের সীমা থাকিত না।

কেতকী বলিল—চাকর বাকরের কাজ, ব্যাটাদের যদি একটু দায়িত্ব জ্ঞান থাকে। তারপর ব্যাগ হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া বলে—ধন্যবাদ, এই নাও এর জন্যে তোমাকে কিছু বখ্‌শিষ দিলুম।

যুবক তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলে—বহু ধন্যবাদ! অর্থের প্রয়াশী হয়ে আমি আপনার কাছে আসি নি—ওই ধন্যবাদ টুকুই কী যথেষ্ট নয়?

কথাগুলি শেলের মতো গিয়া কেতকীর অন্তরে বিঁধিল—বলিল তা হোক্‌! আমি তো তোমায় ইচ্ছে করেই দিচ্ছি—নিতে দোষ কী?

যুবক হাত দুটি জোড় করিয়া বলিল—মাপ্‌ করবেন। আমার এমন কোন দম্ভ নেই যে নিজেকে আপনার সমতুল্য বলে মনে করবো। আমার থেকে ঢের needy আপনি প্রত্যহ আপনারই দরজায় দেখ্‌তে পাবেন—তাদের ওই টাকাটি দিলে বোধ হয় আর একটু সৎপাত্রে দান করা হবে। তারপর কপালে হাত দুটি ঠেকাইয়া যুবক ধীরে ধীরে চলিয়া যায়।

রাগে, অপমানে কেতকী জ্বলিয়া ওঠে। ওঃ এত দর্প—এত অহঙ্কার! সামান্য নীচ-মন একজন আজ তাহার সহিত তাহারই ঘরে বসিয়া নির্ব্বিবাদে সমকক্ষতা জানাইয়া চলিয়া গেল। অথচ সে একটি কথাও বলিতে পারিল না।

বিরক্তিতে তাহার সমস্ত শরীর রিম্‌রি করিয়া উঠিল।

পথে আরও তিন চারদিন কেতকীর সঙ্গে পাশের বাড়ীর যুবকটির দেখা হইয়াছে;—

যুবকটিই প্রথমে বিনীতভাবে হাত তুলিয়া কেতকীকে নমস্কার জানাইয়াছে কিন্তু কথা বলা তো দূরের কথা নমস্কারের কোন প্রতিদানই সে দেয় নাই। কেন?...কিসের জন্য সে ওই হতভাগাটার সহিত আলাপ করিবে? তাহাদের সোসাইটির সহিত মিশিবার ওর কী অধিকার আছে? সে কিসে তাহাদের সমতুল্য?

তাহাকে লইয়া কেতকীদের ড্রয়িংরুমে তার ফ্রেণ্ডদের মধ্যে বিলক্ষণ আলোচনা চলে।

লিলি একটু বক্র হাসি হাসিয়া বলে—কেতকী, তোর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ছেলেটি যখন এত ব্যস্ত তখন নিশ্চয়ই ও তোর লভে পড়েছে। আহা বেচারা—pity!

সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর মেয়েরা সকৌতুকে হাসিয়া ওঠে।

কেতকী চোখ দুটি পাকাইয়া বলে—একটা ক্রুট্ রাস্কেল!

সুপ্তি গুপ্তা সুরসিকা। হাসিতে হাসিতে বলে—চমৎকার প্রেমিক সম্ভাষণ! কিসে এত ওর 'পর রাগ হোল! জানালা খুলে ওদের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকতে—ওর গান শুনতেও তো কসুর করিস্ নে। তবে?

কেতকী তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলে—কক্ষনো নয়! কেতকী রায় কথনই এতো cheap নয়। আর দেখবার প্রয়োজন হ'লেও ওর দিকে তাকাতে যাবো না—এটা সুনিশ্চিত। সেদিন out of mercy একটা টাকা দিতে গেলুম ফিরিয়ে দিয়ে বলে কিনা অর্থের প্রয়াসী হোয়ে আপনার কাছে আসিনি—ননসেন্স!

সকলেই ঘটনাটি শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায় কেতকী সবিস্তারে ও সুরঞ্জিত-ভাবে ঘটনাটি সকলকে শোনায়।

নন্দিতা আজকাল আর বড় একটা কেতকীদের বাড়ী আসে না। ডাকিয়া পাঠাইলেও নানা অজুহাত দেখাইয়া ফিরাইয়া দেয়। তাহার এসব আলোচনা ভালো লাগে না। অনেকদিন সে ইহার প্রতিবাদও করিয়া বসিয়াছে; কিন্তু তাহাকে উপহাস করিয়া সবাই উড়াইয়া দেয়।

কেতকীদের দল পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে লইয়া আলোচনা করিবার চমৎকার সুযোগ পাইয়াছে—এমন একটি খোরাককে তাহারা অবহেলা করিতে পারে না। অধুনা ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের সান্ধ্য মজলিশ বেশ জমিয়া ওঠে।...

নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিড়িয়া ভাঙা একতালা বাড়ীর জীর্ণ দেওয়াল ভেদ করিয়া বাঁশী বাজিয়া ওঠে।

বাঁশীর শব্দে কেতকীর ঘুম ভাঙিয়া যায়। বিরক্ত হইয়া কেতকী জানালা বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু তবুও বাঁশীর সুর মরে না। বাঁশীর করুণ সুর রণিয়া রণিয়া কেতকীর বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গিয়া হয়ত একটু ব্যথার উদ্রেক করে। পাশ ফিরিয়া শুইয়া কেতকী বলে—ভালো বিপদ, ঘুমাবার সময় যত disturbance. কিন্তু তবুও সে উহাতে মন সংযোগ না করিয়া থাকিতে পারে না—সুরটি কেমন যেন তার ভালো লাগে।

বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সে আবার জানালা খুলিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক স্তিমিত ম্লান জ্যোৎস্নার আলো আসিয়া শয্যার 'পর লুটাইয়া পড়ে।

জ্যোৎস্নার মধ্যে কেতকী নিজেকে ডুবাইয়া দিল—তাহার মনের মধ্যে তখন বাঁশীর সেই করুণ সুরের আবেগ উথ্লাইয়া উঠিতেছে।

—যাহাকে সে কেবল অন্তর ভরিয়া ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে—যাহাকে দেখিয়া সে কেবল দম্ভ ভরে চোখ ফিরাইয়া লইয়াছে—যাহাকে লইয়া তাহাদের সোসাইটিতে কত হীন আলোচনা হইয়াছে—অলক্ষিতে আজ তাহারি ছবি কেতকীর মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে—তাহার সম্বন্ধে দু একটা কথাও মনে উদিত হয়—তাহার পরিচয় জানিবার জন্য বহুদিন—বহুদিন পরে আজ যেন একটু আগ্রহ হয়।...কেন?

প্রশ্নটি মনের মধ্যে উদিত হইলেই কেতকী লজ্জিত হইয়া ওঠে। কোথাকার কে একটা vagabond তাহার কথা ভাবিয়া রাত জাগিবার কী প্রয়োজন? মনের মধ্য হইতে জোর করিয়া তাহার চিন্তা মুছিয়া ফেলিয়া কেতকী পাশ ফিরিয়া শোয়। কিন্তু তবুও তাহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। বাঁশীর সুরের সাথে সাথে ঘুরিয়া ফিরিয়া কেতকীর মন আবার পুনরায় জাগিয়া ওঠে।

কয়দিন হইল পাশের বাড়ীর ভাড়াটিয়া যুবকরা উঠিয়া গেছে।

পাশের বাড়ীর যুবকটির গান—বাঁশী—কেতকীর প্রতি দৃষ্টিপাত সবই বন্ধ হইয়া গেছে। দু একদিন যেন কেতকী হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিল।

জানালা বন্ধ করিবার—ড্রয়িংরুমে তাহাকে লইয়া আলোচনা করিবার আর কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না।

কিন্তু তবুও কেতকীর যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হয়। নিতান্ত অকারণেও বার বার জানালায় গিয়া দাঁড়ায়—ওইখানে ছেলেটি বসিয়া থাকিত—ওইখানে বসিয়া কী যেন লিখিত—ওইখানে বসিয়া গান গাহিত—সবই তাহার কণ্ঠস্থ। ফাঁকা বাড়ীটা কেমন যেন তাহাকে বেদনা দেয়। কেতকী ঘৃণা অবশ্য তাহাকে করিত এবং ছেলেটি যে তাহাকে ভালো বাসিয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিল—তাহার জন্য গর্ব্বও সে অনুভব করিত—তাহার প্রতি তাহার আগ্রহও ছিল না—কিন্তু তবুও আজ সে গর্ব্ব-ভাব হারাইয়া ফেলায় দুঃখও লাগে।

কয়দিন হইতে কেতকীর কেমন যেন পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সদা হাস্য চঞ্চলা তরুণী কেতকী হঠাৎ কেমন একটু গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে।

বন্ধু বান্ধবীরা তাহার ড্রয়িংরুমে প্রত্যহই আসিয়া উপস্থিত হয়। নানা রহস্যালাপে 'টেবল্ টক্সে' সান্ধ্য আড্ডা মুখরিত হইয়া ওঠে, কিন্তু কেতকী তাহাতে পূর্ব্বের মতো ঠিক যোগদান করিতে পারে না। কিসের অভাব সে যেন অনুভব করে।

সেদিন লিলি বলিল—কেতকী রায়ের লাভার চলে যাওয়ায় তার এই change.

প্রীতি সেন বলিল—তা পাশের বাড়ীর ছেলেটি কোথায় গেল? আচ্ছা অমন একটা idiot-এর সঙ্গে কেতকী কী করে প্রেমে পড়লি বল্‌তো!

সুরসিকা স্বপ্নি গুপ্তা টিপ্পনি কাটিয়া বলে—যার সাথে যার মজে মন—বুঝলে কিনা।

সকলেই হাসিয়া ওঠে।

কেতকী বলিল—বেচারির এখান থেকে চলে গিয়েও নিস্তার নেই—কী এমন সে তোদের কাছে অপরাধ করেছিল বল্ তো?

যাক্! আমি পছন্দ করিনি তাকে নিয়ে কোন আলোচনা করতে।

কেতকী গম্ভীর হইয়া ওঠে। প্রসঙ্গটা আর বাড়িতে পারে না।

নমিতা আজকাল আর আসে না—বহুবার কেতকী ডাকিয়া পাঠাইয়াছে—কিন্তু নমিতা কোন বারই আসে নাই।

লিলির কথাটি বহুবার কেতকী গোপনে ভাবিয়া দেখিয়াছে;—কিন্তু তাই কী হয়। পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে সে সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়াছে—অকারণে তাহাকে বহুবার আঘাত করিয়াছে বলিয়া অনুতপ্ত হইতে পারে—তবে তাহার সহিত প্রেমে পড়িবার মতো দুর্ব্বলতা অন্ততঃ কেতকী রায়ের নাই!

অনেক দিন পরে শীতের এক কন্ কনে সকালে হঠাৎ নমিতা আসিয়া হাজির হইল। চেয়ার হইতে উঠিয়া আসিয়া কেতকী নমিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে—after an age I see! না এলেই তো হোত—আমাকে যখন বর্জ্জনই করেছিস্—তখন তো আমার কাছে আস্বার কোন দরকারই নেই। অভিমানে কেতকীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায়।

নমিতা হাসিল—বিশেষ কাজে ভাই ব্যস্ত ছিলাম ক'দিন তাই আস্তে পারি নি। তোদের দলের আর যার ওপর রাগই থাক্ না কেন তোর ওপর আমার একটুও রাগ নেই।

কেতকী বলিল—থাক্ গে ওসব কথা। ওদের আজকাল আমারও ভালো লাগে না। ওসব drawing-room life—কোন sincerity নেই ওদের ভেতর। কেমন আছিস্?

নমিতা কহিল—আছি ভালোই! তারপর লাল চিঠি একখানি কেতকীর হাতে দিয়া অনুরোধ জানাইয়া বলে—কেতকী যা-ও-য়া চাই-ই—

চিঠিখানি শেষ করিয়া কেতকী লাফাইয়া উঠিয়া বলে—নমিতার বিয়ে how strange এতদিন অথচ আমাকে কিছুই জানাস্ নি। হ্যাঁরে তোর husband শৈলেশ বোস্—কবি শৈলেশ্ বোস্? Congratulation. যাক্ আমার favourite কবির সঙ্গে তোর বিয়ে হচ্ছে—ভদ্র লোকের বাড়ী কোথায় রে? তোর সঙ্গে নিশ্চয়ই আগে আলাপ ছিল? আমায় তো কিছুই বলিস্ নি—

উন্মুখ আগ্রহের সহিত বিস্মিত প্রশ্ন তুলিয়া কেতকী নমিতার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে।

নমিতা বলিল—হ্যাঁ শৈলেশ্ বসু। 'মন্দাক্রান্তা'? কবি শৈলেশ্ বসু। শীগ্গি আবার তাঁরি লেখা 'কেতকী' বের হবে। শৈলেশ বসুকে তুই বিলক্ষণ চিনিস্ কেতকী। তোদের পাশের বাড়ীতে সেই যে ভাড়াটে ছিল—প্রথম আসার দিন আমাকে যাকে দেখিয়েছিলি—তোর গান শোনবার জন্য যে এসে তোদের জানালায় দাঁড়িয়েছিল—অর্থাৎ কিনা যে তোর দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়েছিল—সেই নির্লজ্জ idiotটিকেই জীবন মন্দিরে বরণ করে নিতে হোল্। তোরা হয়ত এর জন্যে আমাকে খুবই গালাগাল দিবি—আমি কিন্তু ভাই নিরূপায়।

কেতকীর চক্ষের সামনে যেন শত-দীপ্ত আলোক এক সঙ্গে নিভিয়া গেল।

শৈলেশ বোস—যে কবিকে সকলের অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে মনের নিভৃত কোণে চিরদিন পূজা করিয়া আসিয়াছে—যাহার প্রতি তাহার শ্রদ্ধার সীমা নাই—যাহার কবিতা মাধুর্য্যে তাহার সমস্ত অন্তর মুগ্ধ—সে ওই দীনহীন পাশের বাড়ীর ভাড়াটে যুবক—ঘটনাচক্রে আজ নমিতার স্বামী!

বিশ্বাস যেন হয় না। না জানিয়া তাহাকে কত অপমান কত আঘাতই না করিয়াছে—অবহেলায় ঘৃণা ভরে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে—তখন তাহার পরিচয় জানে নাই। কেন—কেন তাহাকে সে জানাইল না সেই কবি শৈলেশ বোস্—হোক্ না দীন—হোক্ না অপরের কাছে উপেক্ষিত তাই বলিয়া 'মন্দাক্রান্তা'র কবি তাহার কাছে কখনই উপেক্ষিত হইত না।

তাহাকে না হয় সে অবজ্ঞাই করিয়াছিল কিন্তু তাই বলিয়া কী এমনি করিয়াই তাহার শাস্তি দিতে হয়?

অমরেশ ও মীনা

নাটক

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—তৃতীয় অঙ্ক—

দৃশ্য—ঘর

সুরমা ও দীপক

দীপক—ভাবছো কেন, সে ফিরে আসবেই। নিরুদ্দেশ হ'য়ে কিছুতেই সে থাকতে যাবে না!

সুরমা—আমার মন কু' গাইছে। তখনই যদি তুমি তাকে ধরে নিয়ে আসতে তো এতো বিপত্তি হ'ত না।

দীপক—আমি তাকে ফেরাবার কসুর করিনি। কিন্তু তোমায় বলেছি তো, সে এ-বাড়ী আর ফিরবে না বল্লে! আমি অনেক মিনতিও করলুম, কিন্তু তার সেই এক কথা! বলে, "দীপক! জীবনে আমি তোমার কাছে কিছু চাইনি, আজ শুধু তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাইছি যে, আমায় বাড়ী ফিরে যেতে বোলো না!"—আমি কেমন থমকে গেলুম, দিলুম তাকে ছেড়ে; ভাবলুম, ভাবের আধিক্যে এখন ঐ সব বলছে—পরে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ব্যাপার যে এতদুর গড়াবে তা তো জানি না।

(মুহূর্ত্তকাল দু'জনেই স্তব্ধ রহিল)

দীপক—আজ ক'দিন হ'ল সে গেছে?

সুরমা—আজ সতেরো দিন।

দীপক—এই সতেরো দিনে একখানা চিঠিও তো সে লিখ্‌লে না!—আশ্চর্য্য!

সুরমা—চিঠি সে লিখ্‌বে না। কী আঘাত পেয়ে সে ঘরবাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে তা তুমি জান না, আমি জানি।—চিঠি সে কিছুতেই লিখ্‌বে না। আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক সে রাখ্‌বে না। আমরা তার মন থেকে একেবারে দূরে চলে গেছি!

দীপক—এই আঘাতটা যে কি তা আমি আজও বুঝে উঠতে পারলুম না। আন্দাজ করি বৌদি'র সঙ্গে কিছু মতান্তর হ'য়ে থাকবে। কিন্তু এমন কি গুরুতর হ'তে পারে তা, যে এরকম একটা ছেলেমানুষী কত্তে হবে?

সুরমা—ছেলেমানুষী! তুমি হ'লে কি কত্তে একবার ভাবতে পারো?

দীপক—কাজটা কি সেটা না বল্‌লে, কি করতুম তা কি করে ভাববো?

সুরমা—থাক্ সে কথা। ও আলোচনা থাক্......

দীপক—ও আলোচনা কি আমার সঙ্গে করা যাবে না?—

সুরমা—না।—বাড়ীর কলঙ্কের কথা লোকের মুখে মুখে যত কম ফেরে ততই ভালো!

দীপক—কলঙ্ক!...

(দীপক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল)

কি হ'য়েছে সুরমা আমায় সত্য বলবে?

সুরমা—আমি বলতে পারবো না!—

দীপক—কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি! প্রকাশ, প্রকাশ—এর ভেতর আছে সেই প্রকাশ!

(এই বলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ক্ষণকাল; পরে সহসা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিলেন) এর কি কোন কিনারা নেই এ দেশে? পেশোয়ার থেকে সুরু করে কুমারিকা পর্য্যন্ত এই যে কলঙ্কের স্রোত ব'য়ে চ'লেছে, এ কি থামবে না? যেখানে যাই ঐ এক কথা, ঐ এক কাহিনী—যে দেশেই যাই! জাতির মর্ম্মান্তিক সমস্যার দিনে—

সুরমা—থামো বাপু, তোমার বক্তৃতা সব সময় ভালো লাগে না।

দীপক—বক্তৃতা!—তুমি মনে কর আমি এটা একটা বক্তৃতা দিলাম?—

সুরমা—তা ছাড়া আর কি? আমরা মরছি আমাদের ঘরের কষ্ট নিয়ে, তুমি পেশোয়ার সুরু করে দিলে। কে এখন

তোমার 'জাতির মর্ম্মান্তিক সমস্যার' কথা ভাবে বলতো?

দীপক—তুমি সঙ্কীর্ণ, তাই শুধু ঘরের দুঃখটাই দেখ,—বাইরের দিকে চোখ দেবার তোমার অবসর নেই।

সুরমা—ঘরের দুঃখ আগে লাঘব করি, তারপর সময় থাকে, বাইরে চেয়ে দেখবো।

দীপক—কিন্তু বাইরে—চতুর্দ্দিকে যদি আগুন লেগে গিয়ে থাকে তুমি ঘরের দুঃখ লাঘব করে কর্বে কি? ঘর যে তোমার অবিলম্বেই বাইরের আগুনের ফুল্‌কি নিয়ে জ্বলে উঠবে!

সুরমা—তা যদি জ্বলে উঠে সবাই মিলে মরে যাওয়া যাবে। কি আর করা যাবে!

দীপক—তার মানে?

সুরমা—তার মানে—যে দেশের বাইরেও জ্বল্‌লো এবং ভেতরও জ্বললো—অর্থাৎ যে দেশের ঘরে বাইরে আগুন লেগে গেল, সে দেশের মেয়ে পুরুষের মৃত্যু ছাড়া আর কি উপায় হ'তে পারে? তোমার কংগ্রেস বা ডাক্তার কিচ্‌লু রেজোলিউশন্ ক'রে কিছু কর্ত্তে পার্ব্বেন কি?—

দীপক—(বজ্রকণ্ঠে কহিলেন) Resolution কি! দেশে এমন কঠোর Legislation করা উচিত—Lycurgus-এর Legislation-এর মত কঠোর—চলে যাচ্ছ যে?

সুরমা—Lycurgus-এর কথা শুনতে পারবো না। মীনা কি কচ্ছে এখন আমার দেখা দরকার।

দীপক—দেখা তো যথেষ্ট হ'য়েছে, দেখার পালা এবার শেষ করো। Lycurgus-এর কথা শুনলে পাপ হ'বে না, দেখার চেয়ে কম ফলও হবে না,—বরং ভালো হ'তে পারে।

সুরমা—তা হয়ত পারে, কিন্তু মীনাকে অনেকক্ষণ কাছ ছাড়া করে রেখেছি—ওকে আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না—ওকে একবার দেখা দরকার।

দীপক—মোটেই বিশ্বাস হয় না! মানে? এখনও কি প্রকাশ সম্পর্কে ওঁর কোন রকম দুর্ব্বলতা থাক্‌তে পারে বলে মনে কর?

সুরমা—না, তা মনে করবার কোন কারণ দেখি নি। সে জন্য ওকথা বলি নি।

দীপক—তবে? প্রকাশ এসে কোন রকম ব্যাঘাত ঘটাতে পারে?

সুরমা—সে হয়তো আস্‌তে পারে এবং ব্যাঘাতও ঘটাতে পারে কিন্তু সেজন্য ভাবনা নেই; কারণ, এ বাড়ীতে এখন তুমি আছো

দীপক—ঠিক্ তাই!

সুরমা—তবু কিন্তু ভাবনা আমার মীনাকে নিয়েই। সে সারাক্ষণ একলাটি থাকে, সারাক্ষণ লোকজন এড়িয়ে থাক্‌তে চায়। তাই তাকে আমার একদণ্ডও বিশ্বাস হয় না!

দীপক—তোমার কথা হেঁয়ালীর মত। এই রকম ব্যাপারের পর অমরেশ বাড়ী ছাড়া, তাই হয়তো লজ্জায় উনি কারুর সঙ্গে

মেলামেশা কর্ত্তে চান না। এতে অবিশ্বাস করবার কি কারণ আছে!

সুরমা—সে তুমি বুঝতে পারবে না।—তুমি যা ভাবছো সেইজন্য যে তাকে আমি বিশ্বাস করি না—তা নয়। তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি দেখে আসি, এসে তোমায় বলবো।— (প্রস্থানোদ্যত)

(সবেগে মীনার প্রবেশ)

একি!

মীনা—এই যে তোমরা এখানে দুজনেই আছ!

সুরমা—কি হয়েছে রে? অমন হন্তদন্ত হয়ে এলি যে?

মীনা—হয়নি কিছুই। একলা বসেছিলুম হঠাৎ কি রকম ভয় পেলুম!

দীপক—(হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন) ভয়!

সুরমা—সত্যি, কিসের ভয় শুনি?—

মীনা—না—ভয় ঠিক নয়। কি রকম মনে হ'ল তাই তোমাদের কাছে চলে এলুম।

সুরমা—বেশ করেছিস্। একলা সব সময় থাকা উচিত নয়। আয় আমরা গল্প করি।

দীপক—আমি তা হ'লে ইতিমধ্যে ঘুরে আসিগে—

মীনা—না না আপনি থাকুন। বাড়ীতে আমরা মোটে দুজন স্ত্রীলোক—একজন পুরুষ মানুষ থাকা উচিত।

দীপক—পুরুষ মানুষ থাকা উচিত আপনাদের আগ্‌লাবার জন্য! এ অত্যন্ত বিস্ময়কর প্রস্তাব!...থাকতে অবশ্য আমি বাধ্য, কিন্তু অনুরোধটা সত্য বলে বিশ্বাস করতে আমার কষ্ট হচ্ছে!

মীনা—কেন?

দীপক—আমি ভাবতুম দেশে এমন কয়েকজন স্ত্রীলোক অন্ততঃ আছেন যাদের পুরুষ মানুষে আগ্‌লাতে হয় না। যারা সকল অবস্থাতেই পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চল্‌তে পারে।—ভাবতুম আপনি তাদের দলে, তাদের একজন।

সুরমা—এখন যদি সে ভাবনা তোমার গিয়ে থাকে তো ভালোই হয়েছে। ও কোনদিন পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চল্‌তে চায়নি, চাইবেও না। সুতরাং—

দীপক—সুতরাং আমার যে ভুল হয়েছে আমি স্বীকার করতে বাধ্য।

মীনা—কিন্তু ভয় আমার কিছু নেই। আমি এমনি বলেছিলাম। আপনি স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসতে পারেন।

দীপক—তা হলে তো সকল সমস্যাই চুকে গেল। বেশ, আমি তা হলে ঘুরেই আসিগে। (প্রস্থানোদ্যত)

মীনা—তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার ভয়ানক আগ্রহ হচ্ছে, সুরো যদি রাগ না করে তো জিজ্ঞাসা করি।

সুরমা—আমি রাগ করতে যাবো কেন?

মীনা—আচ্ছা—স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চলে একি আপনি ভালো বলেন ?

দীপক—এর চেয়ে ভালো কিছু ভাবতে পারি না—এতোই ভালো বলি !...কল্পনা করুন, ভারতবর্ষে একটা রেজিমেণ্টের ভেতর স্ত্রী পুরুষ পাশাপাশি বন্দুক ঘাড়ে করে কাবুল ফ্রণ্টিয়ারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ! কল্পনা করুন তো একবার !—কল্পনা করুন, নিখিল বিশ্বের দৈহিক শক্তি-প্রতিযোগীতায় ভারতের স্ত্রী ও পুরুষ First Second হ'য়ে দেশে ফিরে এল !—কল্পনা করুন, মুস্লিম্ ইউনিভারসিটির ভাইস্ চ্যান্সেলার—বিদুষী নারী আমিনা খাতুন ! কল্পনা করুন, সাত ফুট একটা রয়েল-বেঙ্গল বাঘ শীকার করেছেন আমাদের বাড়ীর পাশের শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ! Statesman-এ ছবি বেরিয়েছে—বিশ্বের জনসভা তাঁকে অভিনন্দন পাঠিয়ে দিয়েছে !—কল্পনা করুন একবার !...

সুরমা—ইন্দিরা বাঘ মারবে ! তা হ'লেই হ'য়েছে ! (হাসিয়া উঠিল)

দীপক—তাকে চিরকাল 'কোমলাঙ্গী' ক'রে রাখলে বাঘ কেন, একটা মশাও সে মারতে পারবে না। কিন্তু বন্দুক হাতে তুলে দিলে, বাঘের বাবাও হয়ত সে মেরে আসতে পারবে !

মীনা—(ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন) স্বীকার কর্লাম আপনার কথা। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে সমান তালে চলার ফলে স্ত্রীলোকের কপালে যে কলঙ্কের তিলক ফুটে উঠে, তার ইতিহাস কি আপনার জানা আছে ?

দীপক—আছে।

সুরমা—বাইরে তোমার কতো কাজ রয়েছে—তোমার দেরী হ'য়ে গেল না ত' ?

দীপক—সত্যি—কথার ঝোঁকে অনেক দেরী করে ফেললুম। ফিরে এসে আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দোব।

(প্রস্থানোদ্যত)

ক্রমশঃ

সাহিত্য-পরিচয়

দখিন হাওয়া—(কবিতার বই) শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু বি-এ গ্রন্থকার কর্তৃক ৭নং রাজা বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা—পৃঃ—৫৬

সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রভাত কিরণ বসু সুপরিচিত। সুদীর্ঘকাল ধরে ইনি নানা সাময়িক পত্রে গল্প কবিতা লিখে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। এঁর লেখার ভেতর এমন একটা বিশিষ্ট মাধুর্য্য, একটা orginal style এবং বিশেষ একটা expression চোখে পড়ে যা সাধারণ লেখক শ্রেনী হতে পৃথক। "দখিন হাওয়া" কবির সে মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

কবি এই পুস্তকে নানা ভাবের কবিতা সন্নিবদ্ধ করেছেন। কখনো আশার গানে কবি তাঁর রঙিন, কখনো গভীর নিরাশায় ভাঙা বীণার মতো করুণ—কখনো হাসির ফোয়ারায় উচ্ছ্বসিত—কখনো রূঢ় বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাতে এবং রাষ্ট্রের সংঘাতে ম্রীয়মান। কখনো তিনি বল্ছেন—

"নতুন উষার রক্ত আভায় উচ্ছ্বসিত মন।
নতুন সবুজ পল্লবে আজ ভরল দূরের বন।
মুঞ্জরিত কুঞ্জতলে,
পুষ্প দলে, ঝর্ণাজলে,
আনন্দ গান কেবল চলে অন্তর-রঞ্জনে !"

আবার পরক্ষণেই বিষাদ ক্লিষ্ট অন্তরে বল্ছেন—

"মনের মতন প্রাণের মতন,
গানের আমার কই আয়োজন ?
আমার গানের রঙিন স্বপন রয়না
দু'একমাসও।"

এমনি আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে, হাসি কান্নার উচ্ছ্বাসে কাব্য তাঁর পাল তোলা নৌকার মতোই খরস্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। "দ্বিতীয় পক্ষ," "চায়ের দোকান," "দুটি দিন," "কৈশোর স্বপ্ন," "পুত্রহারা," "পরস্ত্রীকাতরতা" প্রভৃতি কবিতা গুলি খুব উচ্চাঙ্গের হয়েছে—স্থানাভাব বশতঃ আমরা তার বিস্তৃত আলোচনা করতে পারলাম না। অবশেষে "আরো মিষ্টি ক'রে"র ভেতর কবির মনের গতি এবং অপূর্ব্ব মিষ্টত্বের আস্বাদ পাই।—

কবি মিষ্টি করেই জানিয়েছেন—

"ঘুমিয়ে-পড়া জাতের কেন ঘুম পাড়ানো গানে
মিষ্টি সুরের মাদকতায় আন্‌ব নেশা প্রাণে ?
ফুলের গন্ধ দখিন হাওয়ার কাজ ভোলানোর রেশে,
মন্দ মধুর কাব্য কেন ধরব সর্ব্বনেশে ?—"

কিন্তু অবশেষে তাঁর সত্যকারের কবি-প্রাণ সাড়া দিয়ে উঠেছে—

এমনি করে খুলে দিয়ে অনেক গুলি আঁখি,
যেদিন আমার সাম্‌নে চলা থাকবে না আর
বাকী,
সেদিন যদি এলো কাছে, আজ এসেছ যারা,—
সব অনুরোধ রাখ্‌ব সেদিন, কাজ হবে যে সারা।
যাবার বেলায় সেদিন আমি ঘুমিয়ে পড়ার
ঘোরে,
শেষ-মিনতি রাখব তোমার, গাইব মিষ্টি
ক'রে !—"

প্রভাত কিরণের 'দখিন-হাওয়া' প্রভাত কিরণের মতোই উপভোগ্য—আমরা তাকে সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।—

———

ফুলশয্যার রাত্রি। অম্বর আর বাণী মন্ত্রের শক্তির প্রভায় আকৃষ্ট হ'য়েছে। এখানে অম্বর সেজেছেন শ্রীরথীন বন্দ্যোপাধ্যায় আর বাণী হ'চ্ছেন শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা। কাল থেকে 'উত্তরায়' পপুলারের "মন্ত্রশক্তি" দেখানো হ'চ্ছে।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীঅনিল চন্দ্র রায়

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ৫ই ভাদ্র, ১৩৪২—22nd August, 1935. { ৩৪শ সংখ্যা

"খেয়ালী" ও নলিনীরঞ্জন সরকার

উপদলগঠনচতুর নলিনীরঞ্জন সরকারকে যখন আমরা সরকারের লোক বলিয়াছিলাম তখন আমাদের বহু শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে আমরা বলিয়াছিলাম যে সুভাষচন্দ্রই নলিনীকে পত্র বিশেষে Government-Man বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ "খেয়ালী" নলিনীরঞ্জন সরকারের ন্যায় লম্পট ও সরকারের লোককে বাংলার কংগ্রেসের পুণ্য অঙ্গন হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য যে অভিযান করিয়াছিল তাহাতে বাংলা কংগ্রেসের বড় তরফের বহু বন্ধু "খেয়ালী"র উপর ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। নলিনী-প্রীতি-মুগ্ধ বহু বন্ধু আমাদের বলিয়াছিলেন যে বসুভ্রাতৃদ্বয় মুক্তিলাভ করিলে তাঁহাদের মনোভাব বুঝিলে তাঁহারা নলিনীকে পরিত্যাগ করিতে ক্ষণমাত্র দ্বিধাবোধ করিবেন না। সুভাষচন্দ্র বর্ত্তমানে সুদূর প্রবাসে অবস্থান করিলেও মধ্যমাগ্রজ শরৎচন্দ্র আজ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। বাংলা কংগ্রেসের বড় তরফের নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীবৃন্দের শরৎচন্দ্রের সহিত আলাপ আলোচনার সুযোগও হইয়াছে। নলিনী সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মনোভাব কি তাহা তাঁহারা অবগত হইয়াছেন কি?

পরমপ্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রকে পূর্ব্বে বহুবার আমরা বলিয়াছিলাম যে কংগ্রেসের বড় তরফের নলিনী ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত আমাদের কোন কলহ বা মনোমালিন্য নাই। তবে যাঁহারা নলিনীর ন্যায় সরকারের লোককে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিবেন তাঁহাদের সহিত আদর্শবাদী কংগ্রেস-কর্ম্মীদের সহযোগিতা অসম্ভব। আমরা তাঁহাকে আরও বলিয়াছিলাম—আমরা দল বুঝি না, মত বুঝি না—তবে যে ব্যক্তিকে দেশের শত্রু, নেতৃবিশেষের শত্রু বলিয়া মনে করি তাহাকে বাংলার রাজনীতিক্ষেত্র হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করিবই—এবং শ্রীশরৎচন্দ্র বসু মুক্ত হইলে তিনি যদি বলেন যে নলিনী "সরকারের লোক" নয় এবং তাহাকে কংগ্রেসের আসরে আশ্রয় দেওয়া উচিত তাহা হইলে নলিনীর সহিতও আমরা করমর্দ্দন করিব! সত্যেন বাবু নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে শরৎচন্দ্রের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের মনোভাব কি তাহা কি তিনি জানিতে পারেন নাই? তিনি ও শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় স্পষ্টই বলুন যে নলিনীর ন্যায় দু'মুখো সাপের সহিত একযোগে কার্য্য করা শরৎচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব না অসম্ভব? বড় তরফের কংগ্রেস কর্ম্মীবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা নলিনীর প্রীতিমুগ্ধ তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। নলিনীর বিরুদ্ধে "খেয়ালী"র নিরলস অভিযান আমাদের কল্পনাপ্রসূত নহে তাহা সত্যেন বাবু প্রভৃতি বন্ধুবর্গ কি এখন অস্বীকার করিতে পারেন?

বহুরূপী নলিনীর মুখোস খুলিতে "খেয়ালী" যে সাংবাদিক দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছে তাহাতে ইতিহাস সৃষ্টি হইয়াছে। "From pavement to the Mayoral Chair" এই দম্ভোক্তিকারককে মেয়রের সিংহাসন হইতেই পুলিশ কোর্টে ব্যভিচারের মামলার আসামী হইতে হইয়াছিল। "সর্দ্দার শঙ্কর রোডে বীণার বীণা আজও বাজিতেছে" বলিয়া যে সংবাদ "খেয়ালী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া ৺প্রমথনাথ স্বীয় মর্ম্মবেদনা জনসমাজে ব্যক্ত করেন। তৎপরে মাননীয় শ্রীযুক্ত সুশীল সিংহ তাঁহার রায়ে স্পষ্টই বলিয়াছেন নলিনী—

১। সত্য কথা বলে নাই

২। তাহার চরিত্র সন্দেহাতীত নহে।

নলিনীর স্বরূপ প্রকাশ করিতে "খেয়ালী" যে ইতিহাস রচনা করিয়াছে তাহাতে সে সত্যই গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে। যুদ্ধ-কালীন ত্রুটী (War-time follies) হিসাবে তাহার কোন কোন ভুলভ্রান্তি হইতে পারে, তবে বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "খেয়ালী"র বিরুদ্ধে নেতৃবিশেষের নিকট যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহা যে ভিত্তিহীন ও অমূলক তাহা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও স্বয়ং শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ও স্বীকার করিবেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় বয়োবৃদ্ধ সাহিত্যিকও যে কোন বিষয়ের সত্যাসত্য অবধারণ না করিয়াই আমাদের বিরুদ্ধে নেতৃবিশেষের নিকট মতামত প্রকাশ করিলেন তাহাতে আমরা মর্ম্মাহত। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের নিরপেক্ষতায় আমাদের আস্থা আছে। শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বিরুদ্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার বিচার ভার সত্যেন বাবুর উপর অর্পণ করিলাম।

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বড় তরফের বন্ধুবরদিগের নিকট আমাদের নিবেদন যে নলিনীরঞ্জন সরকার ব্যতীত অন্য কাহারও উপর আমাদের কোন আক্রোশ নাই। তাঁহারা নলিনীকে পরিহার করুন— তাঁহারা আমাদের বহুদিন পরিচিত সহকর্ম্মী—তাঁহাদের সহিত একযোগে বাংলার কংগ্রেসের সেবা করিতে দ্বিধা বোধ করিব না।

জননায়ক শরৎচন্দ্র বসুর নেতৃত্ব আমরা স্বীকার করি। তিনিও স্পষ্টই বলিয়াছেন—সরকারের লোক নলিনীকে পরিহার করিতে হইবে। আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলি ঃ—ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং।

বাংলার কংগ্রেস-কলহ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের নির্দ্দেশ

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বাংলার কংগ্রেসের দুই বিবদমান দলের মধ্যে মিলন আনয়নের জন্য সর্ত্ত-সম্বলিত যে পত্র গত জানুয়ারী মাসে ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার সরকারের মারফতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়ের নেতৃত্বাধীনে উপদল বিশেষ সে নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া সুভাষচন্দ্রকে পূর্ব্বপত্রের এক উত্তর প্রেরণ করেন।

সম্প্রতি কার্লসবাদ হইতে কলিকাতার জনৈক বন্ধুর নিকট লিখিত এক পত্রে সুভাষচন্দ্র পূর্ব্ব পত্রের সকল প্রস্তাবই পুনঃ সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবে ছিল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ প্রত্যাখ্যান করিবেন এবং বর্ত্তমান প্রাদেশিক কমিটীর পরিচালক সমিতি ভাঙ্গিয়া দিয়া উভয় দল হইতে সম সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া নূতন পরিচালক সমিতি গঠন করা হইবে।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্বন্ধে নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী যে মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রকাশ, শ্রীযুক্ত বসু অত্যন্ত তীব্র ভাবে তাহার নিন্দা করিয়াছেন।

জেনোয়া হইতে প্রেরিত পূর্ব্ব পত্র যখন সুভাষচন্দ্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শ্রীযুক্ত অক্ষয় সরকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করেন তখন শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়-অধ্যুষিত গরিষ্ঠ দলের বহু ব্যক্তি শ্রীযুক্ত সরকারের উপর নানারূপ ব্যক্তিগত আক্রমণ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। আমরা বর্ত্তমানে সে-সব উক্তির পুনরুল্লেখ করিতে চাই না। কেহ কেহ এমন কি উক্ত পত্রের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন! তাঁহারা এখন কি বলেন? যাহা হউক, বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়ের পরিচালিত দল সুভাষচন্দ্রের সুচিন্তিত নির্দ্দেশ উপেক্ষা করেন কিনা তাহা প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র সুদূর কার্লসবাদের রোগশয্যা হইতে বাঙ্গলার কংগ্রেসের দলগত দ্বন্দ্ব নিবারণকল্পে যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করিতেছেন তাহার জন্য তিনি সমগ্র কংগ্রেস-কর্ম্মীর ধন্যবাদার্হ।

বিবিধ

তদন্তে আতঙ্ক

বীমা কোম্পানীর তরফ হইতে প্রচারকার্য্য বিশেষ প্রয়োজন—স্বদেশী বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে যখনই আমরা আলোচনা করিয়াছি তখনই একথার উল্লেখ করিয়াছি। এই প্রচার কার্য্যের আসল উদ্দেশ্য জনসাধারণের মনে বীমার সম্বন্ধে জ্ঞান ও ধারণা জন্মানো এবং যে কোম্পানীর তরফ হইতে এই প্রচারকার্য্য হয় অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় সেই কোম্পানীর শ্রেষ্ঠতা ও সুবিধা প্রতিপাদন করা। তবেই সেই কোম্পানী সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে পারে। কিন্তু প্রচারকার্য্য করিতে গিয়া যদি জনসাধারণের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না দেওয়া যায় এবং তাহাদের ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবে কেহ অধীর বা ক্রুদ্ধ হয় তাহা হইলে ফল কি উল্টা হয়না?

সম্প্রতি ময়মনসিংহ হইতে এইরূপ একটী সংবাদ সবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সহরের কয়েকজন ভদ্রলোকের উদ্যোগে একটী সভা আহূত হয়। "ঐ সভায় শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার হিন্দুস্থান কোঅপারেটীভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলিবেন এইরূপ কথা হয়।" সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে "উপস্থিত বহু ভদ্রলোক তাঁহাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু শ্রীযুক্ত সরকার তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই। সভায় এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় যে জনসাধারণের যাহাদের উপর আস্থা আছে বাঙ্গলা দেশের এমন কতিপয় বিশিষ্ট লোকদ্বারা হিন্দুস্থানের অবস্থা সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত করা হইক। কিন্তু শ্রীযুক্ত সরকার তাহাতে সম্মত হন নাই। শ্রীযুক্ত সরকার অধৈর্য্য হইয়া পড়েন এবং রাগান্বিত হ'ন, ইহাতে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ বিরক্ত হইয়া সভাত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।"

এখন জিজ্ঞাস্য এই—"আনন্দবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত এই রিপোর্ট পাঠে জনসাধারণের মনে কি ধারণা হইবে? প্রথমতঃ বিশেষ আপত্তিজনক ও লক্ষ্য করিবার বিষয়

নলিনী 'স্যার' হইলেন কবে?

মীরাটের 'ফাইনান্সিয়ার' পত্রিকার নির্লজ্জ উক্তি

মীরাট প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে প্রকাশিত 'ফাইনান্সিয়ার' (Financier) নামক মাসিক পত্রিকার জুন সংখ্যায় শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকারের এক ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে শ্রীযুক্ত নলিনীকে 'স্যার' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। উক্ত পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এক পুরা পাতা বিজ্ঞাপন ছাপা হইয়াছে। আমরা উক্ত ছবি ও তাহার নিম্নের "Sir Nalini Ranjan Sarkar, Kt" বর্ণনার প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

Financier—

স্থাপিত ১৯০৯

SIR NALINI RANJAN SARKAR, Kt,
General Manager,
Hindusthan Co-operative Assurance Society
and Ex-Mayor of Calcutta.

MEERUT PRINTING WORKS, MEERUT

এইযে—উক্ত সভা সাধারণ সভা নহে। "যে সব ব্যক্তিকে চিঠি দ্বারা আমন্ত্রিত করা হইয়াছিল শুধু তাহারাই ঐ সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিয়াছিল।"

"খেয়ালী" "আনন্দবাজার", "এডভান্স" "বসুমতী" পত্রিকায় আলোচনার ফলে যদি হিন্দুস্থান সম্বন্ধে কোন দ্বিধা বা সন্দেহ জাগ্রত হইয়া থাকে তবে তাহা জনসাধারণের মনেই হইয়াছে—কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তির মনে তো হয় নাই। অতএব কতকগুলি স্বনির্ব্বাচিত বিশেষ ব্যক্তির মন হইতে সন্দেহ দূর করিতে পারিলেই কি হিন্দুস্থানের ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে? কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে তাঁহাদিগকেও হিন্দুস্থানের জেনেরাল ম্যানেজার সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবে বিরক্তি ও রাগারাগির ফলে শেষ পর্য্যন্ত সভা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার এই নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটীর কথা বলিয়াছি। ময়মনসিংহের আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণও এই প্রস্তাবই করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের কল্যাণকামী যে কোন দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিই এই প্রস্তাব করিবেন। আমরা পুনরায় বলিতেছি হিন্দুস্থানের পরিচালনা-নীতি সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যদি দ্বিধা জাগিয়া থাকে তাহা নিরসনের একমাত্র উপায় এইরূপ নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটীর ব্যবস্থা করা। কিন্তু তদন্ত কমিটির নামোল্লেখ মাত্র শ্রীযুক্ত নলিনী সরকার এইরূপ ক্ষেপিয়া গেলেন কেন তাহা সাধারণ বুদ্ধির অতীত! ময়মনসিংহের কয়েকজন ভদ্রলোকের নিকট যে কথা তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন, তদন্ত কমিটীর নিকট সেই কথা যদি শ্রীযুক্ত নলিনী সরকার প্রমাণ করিতে পারেন তাহা হইলে শুধু কোম্পানীর ভিত্তি সুদৃঢ় নহে, তাঁহারও কৃতিত্ব কি প্রমাণিত হইবেনা? এক্ষেত্রে তদন্ত কমিটীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে কি জনসাধারণের বিশ্বাসের মূলে নূতন করিয়া আঘাত করা হয় না?

প্রাচ্য আদর্শ

বঙ্কিমচন্দ্র রহস্যচ্ছলে জনৈক নামজাদা পাশ্চাত্য সমালোচক কর্ত্তৃক রামায়ণের সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় বাহাত্তুরে বৃদ্ধ পিতা দশরথের সত্য রক্ষার জন্য রামের রাজ্যত্যাগ রামের পক্ষে অত্যন্ত বোকামির পরিচায়ক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া পত্নী ও রাজ্যের সুবিধা ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণের বনানুগমন একেবারেই সমর্থিত হয় নাই ইত্যাদি। এই সমালোচনার কশাঘাত দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আদর্শের বিভিন্নতাই পরিস্ফুট করিয়াছেন। ঐহিক ঐশ্বর্য্যের নিকট সত্য সত্যরক্ষা, ধর্ম্ম প্রভৃতি কিছুই নহে—ইহাই তো পাশ্চাত্য আদর্শ।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটী খবর পড়িয়া নূতন করিয়া এই পুরতন কথাগুলি মনে পড়িল। ঢাকা জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী এক গ্রামে জনৈক চৌকীদার একটী মুসলমান বণিকের দেড় হাজার টাকার একটী পুঁটুলী কুড়াইয়া পায়। সে ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাহা আত্মসাৎ করিতে পারিত, কেহ জানিতেও পারিতনা। কিন্তু তাহা না করিয়া সে এই টাকা মালিককে ফিরাইয়া দেয় এবং উক্ত ভদ্রলোক যখন তাহার এই সততার জন্য তাহাকে ১০০৲ এক শত টাকা পুরস্কার দিতে আসেন তখন তাহাও সে লইতে অস্বীকার করে। ইহাই তো চিরন্তন ভারতীয় আদর্শ ও সভ্যতা! বঙ্কিমবাবুর কথাগুলি স্মরণ করিয়া মনে হয় এই চৌকীদার নিশ্চয়ই ইংরাজী পড়ে নাই এবং পাশ্চাত্য বিলাসোজ্জ্বল সভ্যতার উগ্র সুরা নিশ্চয়ই সে গলাধঃকরণ করে নাই। তাহা করিলে বোধহয় তাহার ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে এই লোভ সম্বরণ করা দুরূহ হইত এবং পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসারে আত্ম-প্রতিষ্ঠার সহায়ক এতগুলি টাকা ছাড়িয়া দিয়া বোকামির (?) পরিচয় দিত না!

যাহা হউক এই ধার্ম্মিক ও সৎ চৌকীদারকে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে পুরস্কৃত

ন—লি—নী

Mr. Facing Both Ways

বন্ধনমুক্ত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু যে দিন মুক্তিলাভ করেন সেদিন শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার শরৎচন্দ্রকে এক অভিনন্দন (?) পত্র প্রেরণ করেন। যে পিয়ন বহিতে শরৎচন্দ্রকে পত্র প্রেরিত হয় সেই পিয়ন-বহিতেই শরৎচন্দ্রকে প্রেরিত পত্রের উপরেই বাংলার লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীকে এক পত্র পাঠান হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

Private Secy. To Governor of Bengal

Mr. Sarat C. Bose
1, Woodburn Park

সাধু! সত্যই "ক্যাপিটল" নলিনীকে Mr. Facing-Both-Ways আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিল।

হিন্দুস্থানের কোন কর্ম্মচারীর কৃপায় আমরা এই সংবাদ পাইয়াছি। নলিনীবাবু সত্যাসত্য জানাইবেন কি?

✻ ✻ ✻ কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ✻ ✻ ✻

উত্তরায় (ক্রাউন) বুধবার ১৭ই আগষ্ট হইতে

পপুলার পিক্‌চার্সের প্রথম অবদান

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর

"মন্ত্রশক্তি"

[কালী ফিল্মসের R. C. A. শব্দযন্ত্রে গৃহীত]

: সুর-শিল্পী :
কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)

: পরিচালক :
সতু সেন

: বিভিন্ন ভূমিকায় :

শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজহর গাঙ্গুলী, শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীবলাই ভট্টাচার্য্য, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী, শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা, শ্রীতারকবালা (লাইট্), শ্রীমতী চারুবালা, শ্রীমতী হরিমতী, শ্রীগিরিবালা, শ্রীমতী কমলা (ঝরিয়া) ও শ্রীমতী রাণী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় হইতেছে।

Enquire of :

J. K. MITRA
Managing Partner
64, Boloram De Street
Calcutta
PHONE: B.B. 244

KALI FILMS
Tollygunge
Calcutta.

করা উচিত এবং যথাসম্ভব এই সংবাদ ইহাদের সগোত্র মহলে প্রচারিত হওয়া উচিত। তাহা হইলে ইহাদের আদর্শ উন্নীত হইয়া জনসমাজের প্রভূত কল্যাণ হইবে।

পুলিশের কর্ত্তব্য

এই প্রসঙ্গে কলিকাতার অস্থায়ী পুলিশ কমিশনার মিঃ গর্ডন কলিকাতা পুলিশের কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য ও বিবৃতি বাহির করিয়াছেন তাহাতে পুলিশের প্রতি কয়েকটী মূল্যবান উপদেশ আছে। এইরূপ স্পষ্ট উপদেশ দান করিয়া তিনি জনসাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

পুলিশ জনসাধারণের নিকট এত অপ্রিয় কেন এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে এই বিষয়ে শুধু জনসাধারণের নহে, পুলিশেরও কিছু কিছু দোষ আছে। অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের ব্যবহার অত্যন্ত উদ্ধত, জনসাধারণের মানসিক এবং আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তাহারা উদাসীন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাহাদের সকল সময়ে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তাহারা জনসাধারণের ভৃত্য এবং তদনুসারে সহৃদয়তা, বিনীত ব্যবহার প্রভৃতির দ্বারা সকল সময়ে জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জনের চেষ্টা করা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

কোনও ত্রুটী না দেখিলে মিঃ গর্ডনের ন্যায় দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি সরকারীভাবে এবং প্রকাশ্যভাবে এই উক্তি করিতেন না। যদিও ইহা একান্তভাবে কলিকাতা পুলিশের জন্য, তথাপি আশা করা যায় কলিকাতা এবং কলিকাতার বাহিরের সমগ্র পুলিশ-বাহিনী যদি মিঃ গর্ডনের উপদেশ মানিয়া চলে, তাহা হইলে জনসাধারণের সহিত

তাহাদের ব্যবহারিক জীবন অনেকটা প্রীতি ও বিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিবাহের নূতন কায়দা

ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া বিবাহবিচ্ছেদপূর্ব্বক পুনরায় শুদ্ধি হইয়া অন্য বিবাহ করা আজকাল যেন হিন্দুসমাজের মধ্যে বিবাহের একটা নূতন কায়দা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সম্প্রতি যশোহরে এইরূপ বিবাহের ফলে এক চাঞ্চল্যকর মামলার সৃষ্টি হইয়াছে। মামলা এখনও বিচারাধীন অতএব সে সম্বন্ধে অর্থাৎ ভূতপূর্ব্ব বা বর্ত্তমান কোন্ স্বামীর স্বত্ব সাব্যস্ত সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে চাহিনা। তবে এই মামলার বহু পূর্ব্বে বিবাহের নূতন কায়দার বিরুদ্ধে আমরা মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহার ফলে যে কতরূপ মুস্কিল হইতে পারে বর্ত্তমান মামলাই তাহার প্রমাণ। অতএব সমাজের যাঁহারা মঙ্গল চিন্তা করেন সেই সকল সমাজনেতাদের প্রতি আমাদের আবেদন যে হিন্দু-বিবাহ-আইন সোজাসুজি পরিবর্ত্তনের দিন আসিয়াছে কিনা তাঁহারা যেন ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন। সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের পরিবর্ত্তন না করিতে পারিলে বিবাহের এই নূতন কায়দার ফলে সমাজদেহ দিন দিন নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িবে বলিয়াই আমরা আশঙ্কা করি।

নলিনী ও বড়তরফ

বাংলার কংগ্রেসের পুণ্য অঙ্গন হইতে **কংগ্রেসদ্রোহী Government Man নলিনীরঞ্জনকে বিতাড়িত** করিবার জন্য বাংলার কংগ্রেসের তথা-কথিত বড়তরফ সচেষ্ট হইবেন কি?

বাঙ্গালীর ব্যবসায় প্রচেষ্টা

গত ৯ই আগষ্ট তারিখে নিউ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেসন কোং লিমিটেড এক কোটী টাকা মূলধনে রেজেষ্ট্রি করা হইয়াছে। এই কোম্পানির ডিরেক্টরগণের অধিকাংশই প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন বাঙালী ব্যবসায়ী এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার সরকার নিযুক্ত হইয়াছেন। সালকিয়া ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির মালিক প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নন্দ কুমার সিংহ মহাশয়কে চেয়ারম্যান করিয়া মেসার্স ন্যাসনাল মেরিন্স সিণ্ডিকেট ম্যানেজিং এজেন্সি গঠন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে কোম্পানি কলিকাতা, রেঙ্গুন, মাদ্রাজ অঞ্চলে জাহাজ চালাইবেন—পরে ভারতের অন্যান্য বন্দরেও জাহাজ চলিবে।

পণ্ডিত মুর্খের পাগলামি

বীর পণ্ডিত রামচন্দ্র শর্ম্মা কালীঘাট কালী মন্দিরের পশুবলি রদ করিবার মানসে প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, এ সংবাদ "খেয়ালী"র পাঠক পাঠিকাগণ অবগত পাইয়া থাকিবেন। পাঠকবর্গ শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে কালীঘাটের

৺মার মন্দিরের সেবাইত হালদার মহাশয়গণ বেগতিক দেখিয়া মন্দিরের সর্ব্বময় অধিকার বাগবাজারের শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণের হস্তে সমর্পন করিবেন বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতঃপর শ্রীশ্রী মহাপ্রসাদের পরিবর্ত্তে শ্রীমালপো এবং শ্রীল বোঁদে প্রসাদের দ্বারাই মার ভক্তগণ তৃপ্তি লাভ করিবেন। মা অবশ্য মহামায়া—জড়রূপ কি চিণ্ময়ী তাহা আজিও শাস্ত্রে স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই। কিন্তু তিনি যে "পরমবৈষ্ণবী"—তাহা এতদিনে সুপ্রমান হইয়া গেল। এর পর মা'র নাসিকায় ও ভ্রূমধ্যে সিন্দুর-তিলক ও সিন্দূর-বিন্দুর পরিবর্ত্তে অতীতের লুপ্ত পাঠাবলির স্মারক হিসাবে তিলকমাটীর হাড়িকাঠ চিহ্ন কবে হইতে শোভা পাইবে?

যোগাযোগ

বাংলার কংগ্রেসের বড়তরফের সহিত নলিনীর যোগাযোগ ছিন্ন করিতে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বন্ধুগণ প্রস্তুত আছেন কি?

* * *

ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রায়োপবেশনের সংবাদ আমাদের আফিসে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পরম ভাগবত অধ্যক্ষ, ক্রোচে ও মুসোলিনীর অধ্যক্ষ গুরু শ্রীল ডক্টর দাসগুপ্ত মহোদয় তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত মুসোলিনীর আবিসিনীয়া দিগ্‌বিজয়ের ইচ্ছা দর্শনে ব্যথিতচিত্তে সংকল্প করিয়াছেন যদি মুসোলিনী এ সমরাভিযান কামনা পরিত্যাগ না করেন তবে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের গদীতেই প্রায়োপবেশন করিবেন (অবশ্য অনাহারে নহে)! তাঁহার উদ্দেশ্য আর ভবিষ্যতে রোম যাইবেন না। আর পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার বৈষ্ণবপ্রেমধর্ম্ম প্রচার করিবেন না—। "আর গোঠে যাবে না কানাই!"

—

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

অভিনেতৃবর্গের মধ্যে শ্রীললিত মিত্র ছাড়া সকলেই একেবারে 'নভিস্'। 'হীরো' ও "হীরোইন্" যথাক্রমে ছানু আর মলিনা এতদিন 'রিহের্শাল' মক্স কোরেও কার্য্যক্ষেত্রে এমন 'কাঁচা' হ'য়ে গেলেন কেন, তা' ঠিক বুঝ্তে পার্লুম না। অন্যান্য চরিত্র অনুল্লেখ-যোগ্য।

শেষপত্র

হু'য়ীলের হাসির ছবি

প্রযোজক : এভারগ্রীন পিক্চার্স

গল্প-লেখক ও পরিচালক } শ্রীকালীপদ দাস

আলোক-চিত্র শিল্পী } পি, সান্যাল, শ্রীধীরেন দে

ভূমিকায় : শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী, শ্রীললিত মিত্র, শ্রীছানু মজুমদার, শ্রীমতী মলিনা রায় ইত্যাদি

প্রথম মুক্তি : "দীপালীতে" শনিবার, ১৭ই আগষ্ট, '৩৫

সর্ব্বত্র "নন্—ডেলিভারীর" ছাপ বুকে মেরে অবশেষে সত্য সত্যই "শেষপত্র" মুক্তি পেলো। ছবিখানা দেখে মনে হ'ল, যদি এখানি লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাক্ত তা' হলে প্রযোজকদের ভবিষ্যৎ ভালই হ'ত।

ছবির গল্প-লেখক ও পরিচালক (অবশ্য 'হিরো' নয়) একই ব্যক্তি। তার সম্বন্ধে বেশী কথা বলে তার মনঃক্ষোভের উদ্রেক কোরতে চাই না। শুধু এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে—ড্যাশে যদি যব মাড়তে পারত তা' হ'লে আর ভাবনা ছিল কী? পরিচালক-লেখক ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান সঞ্চয় কোরে তারপর কপ্তেন ঘায়েল করা 'প্রাক্‌টিশ' কোর্লে কী সব দিক থেকে ভাল হয় না?

আলোক-চিত্র ও শব্দ-যন্ত্রের কাজও হ'য়েছে তথৈবচ। তবে চেষ্টা কোর্লে এরা দাঁড়িয়ে যেতে পারেন।

নিউ থিয়েটার্স

"ভাগ্যচক্র" মীরার বাইরের ঘরের দৃশ্য তোলা হ'চ্ছে।

* * *

ঐ ছবিরই "এ" ইউনিটে প্রেক্ষাগৃহের ও ম্যানেজারের সেট্ তোলা হ'বে।

* * *

বড়ুয়া একখানা ছবির চিত্রনাট্য লিখ্ছেন।

* * *

শ্রীহেমচন্দ্রের "লেডী ইন্ ডিস্ট্রেস"র হোটেলের দৃশ্য তোলা শেষ হ'য়েছে।

"উত্তরা"-র উদ্বোধন

গেল মঙ্গলবার ২০শে আগষ্ট সন্ধ্যেয় মহা আড়ম্বরে "উত্তরা"-র উদ্বোধন সুসম্পন্ন হ'য়েছে। উৎসবের পৌরহিত্য করেছিলেন জাষ্টিস্ স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। উত্তর কোলকাতার পুরোনো ক্রাউন সুসংস্কৃত হয়ে নব সাজে নব নামে কোলকাতার চিত্রা-মোদীদের যে যথেষ্ট আনন্দ দেবে তাতে আর কোন দ্বিধা নেই। ক্রাউনের শুধু নাম বদলানোই হয়নি, আগেকার সব কিছু,—মায় বসবার জায়গা ও শব্দ প্রক্ষেপনী যন্ত্র পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। স্যার মন্মথ ছোট একটি বক্তৃতা করে "উত্তরা" উদ্বোধন হোল বলে ঘোষনা করার পর ছবিতে কালী ফিল্মসের রাণীবালার একখানি উদ্বোধনী গান ও একটি ছোট বিলাতি কার্টুন দেখানো হয়। সব শেষে প্রচুর জলযোগের পর ঐ দিনকার অনুষ্ঠান শেষ হয়।

"ছায়া"র জন্মতিথি

গেল শনিবার দিন সকাল সাড়ে ৯টার সময় সন্তোষের রাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে "ছায়া"-র প্রথম জন্মতিথি উৎসব সু-সম্পন্ন হ'য়েছে। ডাঃ ডি, এন, মৈত্র, শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা আর সভাপতি মহাশয় "ছায়া"র জন্মদিনে তার শুভকামনা করে বক্তৃতা করেন। উৎসবের শেষে জলযোগ এবং ছবি দেখানো হয়েছিল।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

"পায়ের ধূলো" 'রূপবাণী'-র পর্দ্দায় ফুটে উঠ্বে—আস্ছে ২৭শে সেপ্টেম্বর।

এর পর শ্রীজ্যোতিষ মুখুয্যে "পথের শেষে" তুলবেন। এই ছবিতে শ্রীনরেশ মিত্র, শ্রীযোগেশ চৌধুরী, শ্রীভূমেন রায়, শ্রীজয়-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন দে, শ্রীমতী জ্যোৎস্না, শ্রীমতী মুকুলরাণী প্রভৃতি অভিনয় কোরবেন।

রাধা ফিল্মস্

আকাশের অবস্থা ভাল না থাক্লেও 'রাধা'-র "কৃষ্ণ-সুদামা"-র কাজে ব্যাঘাত ঘটে নি। এই ছবির এক-চতুর্থাংশ প্রায় শেষ হ'য়েছে। ছবিখানির গীত রচনা কোরেছেন, শ্রীকৃষ্ণধন দে আর তা'তে সুর-সংযোজনা কোরছেন শ্রীঅনাথ বসু ও শ্রীমৃণাল ঘোষ। ছবিখানিতে অনেকগুলি নাচ দেখানো হবে এবং তার পরিকল্পনার ভার পড়েছে শ্রীকুমার মিত্রের ওপর। আলোক-চিত্রে শ্রীবীরেন দে নতুন কিছু দেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা কোরছেন। প্রকাশ যে, নারদের স্বর্গ থেকে অবতরণ ও ইন্দ্রের আকাশে কথাবার্ত্তার দৃশ্য

অতি সুন্দরভাবে গ্রহণ করা হ'য়েছে। এই ছবির প্রযোজক অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিখানিকে সর্ব্বসুন্দর করবার জন্য চারিদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে নীরবে কাজ কোরে চলেছেন। আমরা আশা করি, হরিপদবাবু যখন এবার নিজেই কার্য্যক্ষেত্রে স্বয়ং অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তখন ছবিখানি নিশ্চয়ই সাধারণকে খুশী কোরতে পারবে।

* * *

শ্রীজ্যোতিষ বাঁড়ুজ্যের হাতে "কণ্ঠহার"এর কাজ সুরু হ'য়েছে এবং মধু ও সরোজের একটি দৃশ্য গত হপ্তাতেই তোলা শেষ হ'য়েছে। এই ছবিতে শ্যামলের ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য শ্রীমান সতু নিয়োজিত হ'য়েছে।

* * *

"মানময়ী গার্লস স্কুল" কর্ণওয়ালিসে সমভাবে চলেছে। ছবিখানির জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি।

কালী ফিল্মস্

"মণিকাঞ্চন" (২য় পর্ব্ব) তোলা হ'চ্ছে। এতে অভিনয় কোরেছেন, শ্রীতুলসী লাহিড়ী; শ্রীরঞ্জিত রায়, শ্রীমতী প্রভাবতী ও শ্রীমতী রাণীবালা।

উদয়শঙ্করের নাচ

এই মাসের শেষ দিকে কোলকাতায় আমোদ প্রমোদের বাজারে উদয়শঙ্করের নাচ যে একটা বিশিষ্ট আকর্ষণ হ'বে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নেই। অন্ততঃ ১৯শে আগষ্ট সোমবার বিকেলে শ্রীযুক্ত শঙ্করের বাড়ীতে চা'য়ের নেমন্তন্নে যে দু'টি নাচের আভাষ পেয়েছি, তাতে মনে হয় কোলকাতায় নৃত্য-প্রিয় কলা-রসিক লোকমাত্রেই এই নাচ দেখে মুগ্ধ হবেন। এছাড়াও শোনা গেল, উদয়শঙ্করের দলে লাহোরের সম্ভ্রান্ত বংশের এক মুসলমান মহিলা শিল্পী যোগদান কোরেছেন—শ্রীযুক্ত শঙ্কর তো তাঁর খুবই সুখ্যাতি করলেন এবং বললেন শিবনৃত্যে এই মহিলাটি পার্ব্বতীর অংশে নাচবেন। কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের ম্যাডান থিয়েটারে বসবে এই নাচের আসর আসছে ৩১শে আগষ্ট, আর সময় যখন বেশী নেই তখন কোলকাতার নৃত্যানুরাগী সমাজকে এখন থেকেই ঐ বিষয়ে অবহিত হ'তে অনুরোধ করি। ঐ দিনকার অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত হীরেন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্করের আদর আপ্যায়নে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গ বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন।

"খেয়ালী"র বিরুদ্ধে মানহানির মামলা

গত মঙ্গলবার আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে, সেনের এজলাসে "খেয়ালী"র পক্ষ হইতে উকীল শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ বসু ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল বনাম "খেয়ালী"র সম্পাদক ও মুদ্রাকরের মানহানির মামলায় "খেয়ালী"র পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের উপর শমন জারি করার আবেদন করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের নামে শমন জারির আবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অন্যান্য সাক্ষীদের নামে শমন জারি করা সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট অদ্য (বৃহস্পতিবার) মতামত দিবেন।

১। মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়।
২। হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার।
৩। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ।
৪। কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান, ব্যারিষ্টার ও 'এ্যাডভান্সের' ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীযোগেশ চন্দ্র গুপ্ত।
৫। আনন্দ বাজার পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীসুরেশ চন্দ্র মজুমদার।
৬। 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুর।
৭। আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, উদ্ভট-সাগর।
৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগ্‌চি।
৯। কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট শ্রীনরেন্দ্র নাথ শেঠ।
১০। 'হিতবাদী'র বার্ত্তা-সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ।

SUSPENSE

Ingenious Plot
Exciting Situations
Amazing Climax
MYSTERY

!

Aurora Film Corporation

Presents

"AH-E-MAZLUMAN"

OR

Wailings of the Oppressed

With

A. KABULI
Master DAMODAR
Miss AZMAT BIBI
Miss INDUBALA
Miss ROSHANARA

At Your

FAVOURITE CINEMA

NEW CINEMA

ON—— ?

A New Tonfilm Production

গতি-নির্দ্দেশ

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পারলুম না বাবা কিছুতেই পারলুম না। অতি বড় শত্রুও সে সময় চুপ করে থাকতে পারেনা। বাধ্য হয়ে তাঁর কাতর অনুরোধ রাখতে হলো, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নার্স বিচিত্রা কম্পিত-কণ্ঠে বলিল: কিন্তু আমি নিজেই বুঝতে পারচি না আমার কৃত-কর্ম্মের অপরাধ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কী না। মনে হয় আমার অন্তরাত্মা নিশ্চয় তখন সায় দিয়েছিল।

ধর্ম্মভীরু পিতা কন্যার কথাগুলির প্রকৃত অর্থ করিতে না পারিয়া বলিলেন: কোন কথা গোপন করিসনে, মা, সমস্ত ঘটনাটি খুলে বল। তোর বয়েসটাই যে মস্ত বড় অন্তরায়।

সোমবার রাতে হাঁসপাতালে ঢুকেই শুনলুম দোতলার দক্ষিণদিকের ন'নম্বর বেডের লোকটির অবস্থা সঙ্কটজনক। সিনিয়ার নার্স সবিতা তখনও আসেনি। ডাক্তার রুদ্র চলে যাবার সময় আমায় বলে গেলেন রোগীর আশা ছেড়ে দিয়েই একটু বিশ্রাম করতে চললুম, বিচিত্রা। যদি দেখ রোগীর খুব কষ্ট হচ্চে ওই কাগজে-মোড়া ওষুধটা খাইয়ে দিয়ে আমায় রিং করো।

—রোগীর নাম তোর মনে আছে?

—রমেন।

—বয়েস?

—বছর পঁচিশ হবে।

—হু। তারপর—

গত দু'সপ্তাহ ধরে দিনরাত পরিচর্য্যা করে রোগীর ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। রোগী ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে আসতে দেখে মনে মনে খুসী হয়েছিলুম। কিন্তু রোগটা এরকম হঠাৎ বেঁকে দাঁড়াবে এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। সে-দিন রাতে রোগীর শিয়রে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলুম। রাত বোধ করি তখন তিনটে—অতিরিক্ত পরিশ্রম করার দরুণ দেহ আর বইতে চাইছিল না। কাজেই রোগীর পাশে একটু জায়গা করে নিলুম। অবশ হাতটি কপালের উপর পড়ে রইলো। রমেন বাবু কপাল থেকে আমার হাতটি টেনে নিয়ে বল্লেন: এ-সময় তুমি আর ঘুমিয়ে থেকো না। দীপ নিবতে বেশী আর দেরী নেই। চলে যাবার সময় তুমি আমার কাছে সজাগ হয়েই থেকো, বুঝলে?

চট্ করে তন্দ্রাটা ভেঙ্গে গেলো। সান্ত্বনাসূচক-কণ্ঠে বল্লুম: ভয় কি রমেনবাবু, আমি তো আপনার কাছেই জেগে রয়েচি।

রমেনবাবুর কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে এলো। তবুও অজ্ঞাতসারেই টানা-টানা কয়েকটি কথা বেরিয়ে এলো: পঁচিশ বছর বয়েসে মানুষ স্বেচ্ছায় মরতে চায়না, বিচিত্রা।

—আপনার কী হয়েচে যে আপনি মরতে যাবেন?

—কথাটা তুমি ঠিক ধরতে পারোনি।

—ওসব কথা এখন থাক রমেনবাবু। আপনি আগে ভালো হয়ে উঠুন তারপর একদিন সব শুনলেই হবে।

—যত শিগ্‌গির এই ঘৃণিত জীবনের অবসান হয় ততই মঙ্গল। এর চেয়ে টেনে বেঁচে থাকার সামর্থ্যও আমার নেই।

—প্রত্যেকের জীবনে এক আধটা অঘটন ওরকম ঘটেই থাকে—তা বলে নিজের জীবনকে নষ্ট করতে যাবেন কেন? বেঁচে থাকাটাই যে মানুষের চরম সার্থকতা।

—সে কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত ধরণীর বিকৃত রূপ দেখে অন্তরের সমস্ত কোমল বৃত্তিগুলো কঠিন হয়ে গেচে। ভালবাসার প্রতিদানে পেয়েচি অসংখ্য লাঞ্ছনা। এমন কাউকে রেখে যাচ্চি না যে আমার অকাল-মৃত্যুতে অন্ততঃ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে।

—কে বললে? ভেবে দেখুন ভালবাসার প্রতিদান কেউ কি আপনাকে দেয় নি? খুঁজে দেখলে হয়তো জানতে পারবেন আপনার অকাল-মৃত্যুতে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে লোকের অভাব হবে না। অত বকবেন না, রমেনবাবু, একটু চুপ করে

থাকুন। আপনার কী হয়েছে যে আপনি অত নিরাশ হচ্ছেন।

রমেনের বিশীর্ণ মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। আমার হাতের আঙুলগুলি নাড়তে নাড়তে বল্লেন: বেঁচে থাকবার ইচ্ছে আমার পুরদস্তুরই আছে। আর যদি বাঁচি সে তোমার জন্যেই। আমার শিয়রে বসে দিনের পর দিন তুমি যে রকম প্রাণ দিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করেচো তা আমি কিছুতেই ভুলিতে পারবো না।

—ওতে তো আমার কোন কৃতীত্ব নেই, রমেনবাবু? আর্ত্তের সেবা করাই যে আমাদের জীবনের ব্রত। লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখা আমাদের শাস্ত্রে নাকি বারণ। রোগীকে বাঁচিয়ে তোলাই আমাদের পরম লাভ।

—একটা অনুরোধ আমার রাখবে? সে সাহস তুমিই আমাকে দিয়েচো।

—বলুন। সম্ভব হয়তো নিশ্চয় রাখবো।

—আমাকে তুমি শান্তিতে মরতে দেবে?

—ও কথা কেন বলচেন?

—জীবনের পরিপূর্ণ পেয়ালা অকালে নিঃশেষ করে আজ রিক্ত অবস্থায় মৃত্যু-রাজ্যের তোরণে এসে পৌঁচেচি। ওই কথাটি বারবার কেবল মনে হচ্চে। রাগ করোনা, বিচিত্রা, তোমার সুখস্মৃতি নিয়ে মরতে দাও। সরে এসো আরো কাছে—

পরেশবাবু শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন: থামলি কেন, মা, বলে যা।

—এই ওষুধটা আপনাকে খাইয়ে দিই। এক্ষুণি আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন।

—শেষ ঘুমাবার আগে এ-অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে, বিচিত্রা।

—রোগীর কথাগুলি শুনে সত্যিই ভয় পেয়ে গেলুম। এর আগে কত মুমূর্ষু রোগীর শিয়রে বসে তাদের মৃত্যু-যন্ত্রণা লক্ষ্য করেচি মুহূর্ত্তের জন্য কিন্তু কোন দুর্ব্বলতা মনে আসেনি। কিন্তু রমেনবাবুর কথা কয়টি কেন যে আমাকে বিচলিত করে তুলেচে তা আমি বুঝতে পারলুম না। এক একটি মুহূর্ত্ত কেটে যায় রমেনবাবু রোগের যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে ওঠেন। বুঝতে পারচি সকলের আগে সব শেষ হয়ে যাবে। নিস্তব্ধ ঘরে ওঁর কষ্টশ্বাস স্পষ্ট শুনতে পাচ্চি। অন্যান্য রোগীরা তাদের স্বতন্ত্র বিছানায় আরামে ঘুমোচ্চে। অনেক দূরে বিজলি বাতির অস্পষ্ট আলো ঘরের অন্ধকারকে আরো ঘনীভূত করে তুলেচে। বেশ করে একবার চারদিক চেয়ে রোগীর উপর ঝুঁকে পড়লুম। তারপর আর কিছু মনে নেই, বাবা।

পরেশবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন: কাজটা কিন্তু ভাল করনি, বিচিত্রা। যাক, রোগী যখন মারা গেচে ও-সম্বন্ধে আর কোন চিন্তা না করাই ভালো।

—কিন্তু রমেনবাবু যে বেঁচে আছেন, বাবা!

—আাঃ, বেঁচে আছে?

—হ্যাঁ। ভোর বেলা পর্য্যন্ত মৃত্যুর করাল ছায়া তাঁর মুখে ছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু সকাল হইতেই রোগীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। অন্ধকারের যবনিকা সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর ঘনান্ধকার ঘুচে গিয়ে তাঁর মুখে তখন ফুটে উঠেচে আনন্দের নবারুণরাগ। ডাক্তার রুদ্র রোগীকে বেশ করে পরীক্ষা করে নিজের বিস্ময় দমন করতে পারলেন না। একটা ইনজেক্‌সন্ করে তিনি চলে গেলেন।

—মৃত-ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন আলোচনাই চলে না, মা। কিন্তু রমেন যে বেঁচে আছে! সাধারণকে এ ব্যাপারটা বলে হয়তো রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভগবানের দরবারে এ ফাঁকিটা যে ধরা পড়ে যাবে, বিচিত্রা।

—কী বলচো, বাবা?

—ঠিকই বলচি, মা, একটু চিন্তিত হইয়া পরেশবাবু বলিলেন: ডাক্তার রুদ্র কেমন লোক?

—খুব ভালো।

—প্র্যাকটিস?

—সব চাইতে বেশী।

—আজ রমেন কেমন আছে, মা?

—ভয় কেটে গেচে।

—তা হলে আর কোন আশা তোর নেই।

—ভগবান এ কী করলে!

—ও নাম তুই কোন সাহসে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিস?

—আমি যে সত্যই অপরাধী, বাবা।

—একটু আগে তুই না বললি মন তোর সায় দিয়েছিল।

—কী যে বলেচি তা আর মনে করতে পারচি না।

—কিন্তু এ-কাজটার জন্যে তোর অনুতাপ হয়?

—না হওয়াই অন্যায়।

* * *

সাত দিন পরে—

পরেশবাবু ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন: আজ রমেন কেমন আছে, মা।

—আগেকার চাইতে অনেক ভালো।

—ডাক্তার রুদ্র কী বলেন?

—রোগী এ-যাত্রায় বেঁচে গেল।

—কিন্তু তোর কিছুই ব্যবস্থা করতে পারলুম না, মা।

—ওই কথাই রমেনবাবুর সঙ্গে হচ্চিলো।

—সে কি তোকে কিছু বলেচে?

—বেঁচে উঠবে জানলে এ-কাজ তিনি করতেন না। কিন্তু আমায় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েচেন এ-বিপদ থেকে তিনি উদ্ধার করবেন।

—কিন্তু তার মৃত্যু না হলে তোর তো মুক্তি নেই, মা।

—মরতে তিনি এতটুকু কাতর নন, বাবা। শুধু এইটুকু অনুরোধ আমায় জানিয়েচেন এ-অবস্থায় তাঁকে যেন মরতে না বলি। একটু সুস্থ হয়ে উঠে—হেঁটে বেড়াতে পারলেই এ-কাজ তিনি স্বেচ্ছায় করবেন।

বিচিত্রার কথাগুলি শুনিয়া পরেশবাবু বেশ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। ব্যাপারটি তাঁর কাছে আরো জটিল হইয়া উঠিল। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলিলেন: রমেনের মুখের কথাই এই কঠিন সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেচে, মা। তার মৃত্যু-কামনা করে তোকে শাস্তি দিতে পারবো না। সে বাঁচুক।

চীনা কবিতা

শ্রীমনসা চট্টোপাধ্যায়

আমার বাগানে জন্মেছে একটা
পারসিমন্ গাছ,
বেশ সুন্দর সে-গাছ।
তোমার প্রতীক্ষায় অধীর হ'য়ে
বসে থাকি আমি সেখানে, তারি নীচে।
চাঁদ তার রূপার জাল ছড়িয়ে যায়
শান্ত সাগরের বুকে;
আর বিস্মৃত অতীতের কথা জানিয়ে
দেয় মনে।

নিস্তব্ধ টরকুইস্ হ্রদে
আমাদের ছোট্ট নৌকার কোলে
তোমার ক্লান্ত দুর্ব্বল আঙুল দিয়ে
তুমি ধরে থাক আমাকে।
আর আমি চেয়ে থাকি তোমার দিকে
একটা অতৃপ্ত আকাঙ্খা নিয়ে।...
তুমি জানালার গায় আবার এলিয়ে
দাও দেহ;
মৃদু বাতাসে কাঁপে তোমার চুল।...
তুমি সুন্দর, ফুলের মতো কোমল
তোমার হৃদয়।
কিন্তু আমিই নৃশংস,
তোমাকে আঘাত করি'
বুক ভরে' দেই ব্যথায়। *

* (Novel magazine থেকে Barbara Huttonএর 'Poem from Chinese' কবিতার অনুবাদ)

অমরেশ ও মীনা

নাটক

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মীনা—না আপনি ব'লে যান।

সুরমা—এখন ও কথা থাক মীন', ও তো আবার ফিরেই আস্‌ছে।

মীনা—না—আপনি আর একটু অপেক্ষা করে আমায় বলে যান। আমি মিনতি কর্চ্ছি।

দীপক—আচ্ছা, বলুন কি বল্‌তে হবে?

মীনা—পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে সমান তালে চলার ফলে স্ত্রীলোকের প্রতিমুহূর্ত্তে কলঙ্ক অর্জ্জন করবার যে সম্ভাবনা আছে তার বিষয়ে আপনি কি বল্‌তে চান?

দীপক—সে সম্ভাবনা ত' পুরুষেরও রয়েছে।

মীনা—বেশ তা হ'লেই বা আপনি কি কর্ত্তে চান?

দীপক—সম্ভাবনা দেখে আমি পেছিয়ে যেতে চাইনে।

মীনা—যদি সত্যি কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক নিজের ললাটে কলঙ্কের দাগ্ দিয়ে বসে—আপনি কি কর্ব্বেন?

(মীনার গলার স্বর কেঁপে উঠ্‌লো)

দীপক—আমি তাদের কলঙ্কিত জীবনকে সংশোধিত করবার পরামর্শ দোব।

মীনা—বহু চেষ্টার ফলেও সে যদি তার কলঙ্কিত জীবনকে সংশোধিত কর্ত্তে না পারে?

দীপক—আমি যদি কোন State-এর Dictator হ'তুম, আমি তার execution-এর order দিতুম বা, তার হাতে রিভলভার দিয়ে বল্‌তুম shoot কর নিজেকে!

মীনা—প্রাণে বাঁচিয়ে রাখ্‌তেন না?...

(মীনা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দীপকের দিকে চাহিয়া রহিল)

দীপক—না। State-কে আমি শুদ্ধ, পবিত্র ও বলদৃপ্ত রাখতে চাই। State-এর মধ্যে থাক্‌বে না কোন কলঙ্ক, কোন অশুচি, কোন দুর্ব্বলতা! সুতরাং—"shoot yourself and get out of this world"—এই কথাই হ'তো আমার চরম কথা!

সুরমা—থামো, থামো—আর তোমায় বল্‌তে হবেনা, থামো।

দীপক—আর আমার বলবারও নেই কিছু। এবার বোধহয় আমি যেতে পারি বৌদিমণি?

মীনা—আসুন।

(দীপক চলিয়া গেল। মীনা ও সুরমা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল)

সুরমা—চুপ করে রৈলি যে ?

মীনা—ভাবছি।

সুরমা—ঐ ওর কথাগুলো ভাববার যোগ্য মনে করিস্ ?

মীনা—কথাগুলো বেশ জোরালো। কাণ একেবারে ঝাঁ ঝাঁ করে, মনও চল্‌তে থাকে।

সুরমা—আবার আমি যদি উল্টো বক্তৃতা দি, দেখবি, তখনও কাণ ঝাঁ ঝাঁ করবে। ওরা সব পেশাদারী বক্তা। ওদের মতের কোন মূল্য নেই, কথারও সামঞ্জস্য নেই।

মীনা—যাক্‌গে—। আমি এখন চল্লুম। আর ভালো লাগছে না—

সুরমা—একলা থাক্‌লে আরও ভালো লাগবে না।—ভালো কথা, তখন সত্যি ভয় পেয়েছিলি না ?

মীনা—ও কিছু না···

সুরমা—আমায় বল্‌তে হবে। না বল্‌লে ছাড়বো না।

মীনা—যে জন্য ভয় পেয়েছিলাম এখন দেখছি সেটা মিথ্যা।

সুরমা—তবু, জিনিষটা কি আমি শুনবো।

মীনা—(মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া) আমার মনে হ'য়েছিল প্রকাশ যেন ছাদ দিয়ে এসে আমার ঘরের পাশে দাঁড়িয়েছে !

সুরমা—প্রকাশ— !—এরকম মনে হবার কারণ কি ? তুই কি এখনও প্রকাশের কথা ভাবিস্ ? আমায় লুকোস্ নি, সত্যি বল ভাই ?

মীনা—ভাবতে আমি চাই না। কিন্তু তবু সে আসে !

সুরমা—এরকম হ'তেই পারে না।

মীনা—এই রকমই হয়। অন্ততঃ আমার হচ্ছে। আমি ভাবতে চাই না, তবু অজ্ঞাতসারে তার চিন্তা আমার মাথায় এসে দাঁড়ায়। চেষ্টার আমি ত্রুটি করি না বাধা দেবার, কিন্তু সে আস্‌বেই ! কোন বাধা সে মানবে না—সে আসবেই ! (এই বলিয়া কি ভাবিয়া সে চুপ করিল এবং পরক্ষণেই মনে হইল তাহার চোখ মুখের ভাব যেন সহসা রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। তীক্ষ্ণ অথচ অবরুদ্ধ কণ্ঠে সে পুনরায় বলিতে লাগিল) তোমায় বলিনি ঠাকুরঝি ভাই, এ কদিন রাত্রে ঘুমোতে পারি নি। ঘুমোলেই স্বপ্ন—প্রকাশ ! জেগে উঠে দেখি ফুলগাছের টবের ধারে দাঁড়িয়ে কে একজন ! ভয় হয়, বুঝিবা প্রকাশ !—প্রকাশ যেন চারিদিকে জাল পেতে ব'সে র'য়েছে, কোথাও তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না !···

সুরমা—দাদার কথা বুঝি একটুও মনে আসে না ?

মীনা—আসে, সর্ব্বক্ষণ আসে। কিন্তু তা'তে প্রকাশ যায় না ! তাঁর ছবি—আমার স্বামীর ছবি আমি বুকের মধ্যে কবচের মতো রেখে দিয়েছি—কিন্তু মানুষের হৃদয় এক জিনিষ, মস্তিষ্ক আর এক জিনিষ। প্রকাশ আমার মাথায় দুঃস্বপ্নের মতো চেপে ব'সে আছে, আমি কি কর্ব্ব বল্‌তে পারিস্ ?···

(সুরমার হাত চাপিয়া ধরিয়া সজলচক্ষে চাহিয়া রহিল)

সুরমা—তোমার মরণই ভালো !

মীনা—(সাগ্রহে বলিয়া উঠিল) আমিও ঠিক্ তাই ভাবি—মরণ ভালো ! সত্যি, তুই আমার মরণে সাহায্য করবি ?

সুরমা—নে নে,—আর আদিখ্যেতা কর্ত্তে হবে না। বালাই ষাট ! মর্ত্তে যাবি কেন ! স্বামী ঘরছাড়া হ'য়ে গেছে—সে ফিরে যাতে আসে তার জন্য কামনা কর্। ফিরে এলে তাকে সুখী কর, তবে তো বুঝবো বেঁচে থাকা সার্থক হোলো।—মরার কথা পরে।

মীনা—সে কি ফিরে আস্‌বে !

সুরমা—নিশ্চয়ই আসবে। তুই ডাক্‌লেই আসবে। ভালোবাসার টান্ সংসারে কখনও ব্যর্থ হয়নি এতো তুইও জানিস্।

মীনা—জানি। কিন্তু কতো দুঃখে সে আমায় প্রকাশকে বিলিয়ে দিয়ে গেছে সে কি তুমি ভুলে গেছ ? অপরাধ আমার বহু ছিলো, ক্ষমাও ছিলো তেমনি অজস্র ! তবু শেষ পর্য্যন্ত সেও সহ্য কর্ত্তে পারলে না। স্বামী হ'য়ে স্ত্রীকে দান ক'রে গেল বন্ধুর কামনার অগ্নিশিখায়। মানুষ কতো কষ্ট পেলে এ কাজ কোরতে পারে তা যদি জান্‌তে, তা

হ'লে ব'লতে না সে এ বাড়ী আবার ফিরে আসবে !

(মীনা ছেলেমানুষের মতো কাঁদিয়া উঠিল)

(টেলিগ্রাম লইয়া দলবীরের প্রবেশ)

দলবীর—মাইজি, 'তার'।

সুরমা—কোথা থেকে আবার টেলিগ্রাম এল।

মীনা—ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দেয় !...

সুরমা—চুপ্ কর, দেখি—

(দলবীরের প্রস্থান)

(সুরমা ক্ষিপ্রহস্তে টেলিগ্রামের খামখানি ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিলেন)

"Reaching home Tuesday afternoon. No Public demonstration need be held.

Amaresh Bose. M. A. PH. D.

মীনা—Reaching home Tuesday afternoon !

সুরমা—হ্যাঁ, ফিরে আসছেন আজ ! (আনন্দে মীনাকে জড়াইয়া ধরিল) দলবীর, দলবীর !

(দলবীরের প্রবেশ)

দলবীর, হামারা নাম্ লেকে সরকার বাবুসে পাঁচঠো রুপেয়া লে লেও।

দলবীর—কাহে মাইজী ?

সুরমা—সন্দেশ খাও। টেলিগ্রামমে বহুৎ আচ্ছা খবর মিলা—বাবু সাব আজ আয়েগা। ঐ ওয়াস্তে তোমকো পাঁচ রুপেয়া বখ্‌শিস্ কিয়া।

দলবীর—(লম্বা সেলাম করিয়া বলিল) একঠো রুপেয়া দিজিয়ে মাইজী। পাঁচ রুপেয়াকো সন্দেশ খায়েগা তো হাম্ মরেগা।

(সুরমা ও মীনা হাসিয়া উঠিল)

সুরমা—আচ্ছা এক রুপেয়াকো খাও। চার রুপেয়া রাখ্ দেও, দোস্‌রা দিন খাও।

দলবীর—আচ্ছি বাৎ। (পুনরায় সেলাম করিয়া প্রস্থান)

সুরমা—কিগো বৌদি, হাসি যে ধরে না ?

মীনা—সত্যি, এ একেবারে আশাতীত ! সত্যি !

সুরমা—আমি বলেছিলুম সে আস্‌বেই !

মীনা—কিন্তু "No Public demonstration need be held" এ কথাটার মানে কি ভাই ? কথাটা যেন কেমন খাপছাড়া, না ?

সুরমা—ওটা হয়তো এই জন্য লিখেছেন যে, আমরা যেন আনন্দের আতিশয্যে কোন রকম ঘটা বা কিছু না করি। না লিখলেই হ'তো, কে ওঁর টেলিগ্রামের আদেশ শুনতে যাচ্ছে। আমি রোশুন-চৌকির ব্যবস্থা কর্ত্তে যাচ্ছি।

মীনা—আবার নাম দিয়েছেন M. A. PH. D. title সমেত। টেলিগ্রামে এরকম তো কেউ দেয় না ?

সুরমা—ওটা হয়তো যে চিঠির কাগজে টেলিগ্রাম ছ'কে দিয়েছিলেন তাতে ছিল। টেলিগ্রাফ্ অফিস্ বুদ্ধি ক'রে সব শুদ্ধই লিখে দিয়েছে !—ও সব খুঁটিনাটি এখন থাক্। ঘরদোর অত্যন্ত বিশ্রী হয়ে আছে, সে সবের ব্যবস্থা করবি তো আয়...

মীনা—চলো। কিন্তু ভাই সুরমা, ও ঘরে যদি তিনি আর না যেতে চান ?

সুরমা—তা হ'লে তিনি যাবেন কোথা ?

মীনা—তা বটে !

(এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া পুনরায় সে প্রশ্ন করিল :) আচ্ছা আমায় যদি আর না নেন ? এমন কি হ'তে পারে না ?...

সুরমা—স্বামী ফিরে পাচ্ছিস্ আজকের দিনে কোথায় আনন্দে মেতে উঠবি, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত গ্লানি, সমস্ত ভ্রান্তি দূরে ফেলে দিয়ে জীবনের পথে নূতন করে যাত্রা সুরু করবি, তা নয়, যতো সমস্ত অমঙ্গলের চিন্তা, বিশ্রী কল্পনা ! ছিঃ !

মীনা—না না, অমঙ্গলের চিন্তা নয়। আমার আনন্দ ! এ আমার কল্পনাতীত সৌভাগ্য সুরমা !...কিন্তু ভয় !—আমার ভয় আনন্দকেও ভ্রূকুটি করতে চায়। তাই, যে কাজ আমার নিজের বুক দিয়ে করা উচিত সে কাজেও উৎসাহ হ'য়ে আসে ম্লান।

সুরমা—তা হ'লে আর কষ্ট ক'রে আস্‌তে হবেনা, এইখানে বসেই তুমি আকাশ-পাতাল ভাবো। আমার দাদার ঘর আমিই সাজিয়ে দিতে পারবো।

মীনা—বোন হিসেবে তোমার যা করা

নাট্য-তরঙ্গ

নটশেখর

দীনবন্ধু সম্মিলনী

"নব নাট্যমন্দির" রঙ্গমঞ্চে উক্ত সৌখীন সম্প্রদায় "পতিব্রতা" নামক তথাবাচা নাটকটির অভিনয় আয়োজন ক'রেছিলেন— গত বৃহস্পতিবার, ১৫ই আগষ্ট, রাত্রি ৯টায়।

অনেক সৌখীন সম্প্রদায়েরই নাট্যাভিনয় করবার ঝোঁক দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় সকল সম্প্রদায়ই সাধারণ রঙ্গালয়ের অতি হীন অনুকরণ ক'রে আসছেন; তাঁদের মধ্যে উচ্ছিষ্ট ভোজন প্রবৃত্তি ত্যাগ ক'রে কোনো মৌলিক চিন্তা বা ধারণা কিংবা সূক্ষ্ম রসানুভূতি বা লোকোত্তর সৌন্দর্য্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। সৌখীন সম্প্রদায় ত' ব্যবসা করতে বসেন না; তবুও তাঁদের নাট্যনির্ব্বাচন কেন এরূপ বেরসিকের মত হ'য়ে থাকে?

দীনবন্ধু সম্মিলনীটিও ঠিক এই ভুলটিই ক'রে বসেছেন। "পতিব্রতা" কি একখানি নাটক?—না, তাহা ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকগণের সম্মুখে ভদ্রসম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনয়ের যোগ্য? এই রকম অপকৃষ্টতম "নামে-নাটকে"র অভিনয় প্রচেষ্টা অতি নিন্দনীয়। সম্মিলনীর কোন্ সভ্য-ম'শায়ের হৃদয়ে এর অভিনয় স্পৃহা প্রথম জেগেছিল জানি না, তবে আমরা কখনই তাঁর বুদ্ধির তারিফ করতে পারি না। "পতিব্রতা"য় আছে কি?—না আছে গল্পের বাঁধুনি, না আছে 'বস্তু'র সৌন্দর্য্য, না আছে নাট্যরচনা রীতির বালাই, না আছে রসসৃষ্টির চেষ্টা। শুধু কতকগুলি অসংলগ্ন দৃশ্য ও অশ্লীল ভাব-ভাষা পরপর জুড়ে দিয়ে একটি শ' দুয়েক পৃষ্ঠার নাটক (?) খাড়া করা হ'য়েছে। এরপর হয়ত দেখা যাবে যে, পুলিশকোর্টের চমকপ্রদ নারীহরণ মামলার কাহিনীগুলি অথবা খোদ পিনালকোডটিকেই নাট্যরূপ প্রদান ক'রে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নাটক ব'লে চালান হ'চ্ছে। জিজ্ঞাসা করি, দীনবন্ধু সম্মিলনীতে কি সত্যই রসিকের অভাব? রসজ্ঞানহীন, নাট্যবোধ-বর্জ্জিতেরাই এই শ্রেণীর অপাঙ্‌ক্তেয় নাটক অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচন করতে পারে।

* * *

দীনবন্ধু সম্মিলনীর যন্ত্রসঙ্গীত বিভাগকেও প্রশংসা করা যায় না। এ বিষয়ে ত' তাঁদের আগে বেশ উৎকর্ষ ছিল। ভবিষ্যতে এ দিক্‌টায় একটু বিশেষ অবহিত না হ'লে আরও অবনতি ঘট্‌বে।

* * *

অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্ব্বে শ্রীযুত শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'টি আবৃত্তি হোলো। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের "অপরূপ"। আবৃত্তির স্থানে স্থানে তাল কেটে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় আবৃত্তি কালিদাসের কুমারসম্ভবের "মদনভস্ম" অংশটুকু। এটি অপেক্ষাকৃত ভাল হ'লেও অত্যন্ত দ্রুত লয়ে আবৃত্তির দরুণ একঘেয়ে মনে হোলো। এর চেয়ে শৈলেন

উচিত তা তুমি করবেই, আমার যা করা উচিত তাও তুমি করে দিও। তোমার উপর আমার সকল ভার রইলো।

সুরমা—তোমার কাজ আমি করতে যাবো কোন হিসেবে?

মীনা—তুমি না করলে, আমার কাজ করবার আর তো কেউ সংসারে নেই! আমার মা থাকলে হয়তো তিনি এ কাজ করতেন, তোমার মা থাক্‌লেও হয়তো তাঁর উপর আমার দাবী চল্‌তো; কিন্তু এঁরা যখন কেউ নেই—তুমি ছাড়া আর কার ভালোবাসার উপর আমি জোর করতে যাবো?

(মীনা সজল চক্ষে সুরমার একখানি হাত চাপিয়া ধরিল)

(ক্রমশঃ)

বাবুর একখানি বৈঠকী গান হ'লে বোধ হয় জমত ভাল।

* * *

এর পর যবনিকা উঠ্‌লো। "পতিব্রতা"র অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে হ'লে অনেক কথাই বল্‌তে হয়। কিন্তু নানা কারণে আমরা আমাদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করেই প্রকাশ করলুম।

দুই চারিটি ভূমিকার অভিব্যক্তি সত্যই প্রশংসার্হ। "কালীনাথে"র ভূমিকায় হরিধন মুখোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর অঙ্গহার, হাব-ভাব, প্রবেশ ও নিষ্ক্রামণ উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল। চরিত্রগত বিশেষত্বটুকু তিনি সাধ্যমত ফোটাতে চেষ্টা ক'রেছিলেন। প্রকৃত অভিনয় করবার শক্তি তাঁর আছে—আমরা বিনা দ্বিধায় স্বীকার ক'রছি, তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ব'লেই মনে হয়।

"জ্যোৎস্না"র ভূমিকায় নেমেছিলেন নলিন দেব। এঁর অভিনয় দক্ষতা হয়ত থাক্‌তে পারে, কিন্তু স্ত্রীভূমিকার (বিশেষতঃ তরুণী সুন্দরী নায়িকার ভূমিকার) উপযোগী চেহারা ও কণ্ঠ না থাকায়, আমরা তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করতে পার্‌লুম না। হয়ত অন্য কোন ভূমিকা দিলে তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে পার্‌তো।

"রণেন্দ্রে"র ভূমিকায় অসিত ঘোষালকে মানিয়েছিল বড় সুন্দর। তাঁর অভিনয়ের প্রথম ভাগটার চেয়ে শেষের দিক্‌টা উৎরে গিয়েছিল ভাল। "সুধাংশু"র ভূমিকায় কুমারী নীলিমা—একটি ছোট্ট মেয়ে—খুব ভালো অভিনয় ক'রে—সমস্ত দর্শককে সমভাবে আনন্দ দিয়েছেন। তাঁকে আমরা আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি।

"তরলা"র ভূমিকায় নেমেছিলেন—গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। এঁকে মানিয়েছিল যেমন চমৎকার, অভিনয়ও (বিশেষ ক'রে শেষ কয়টা দৃশ্যে) তেমনি স্বভাব সুন্দর হ'য়েছিল।

"তারক"বেশী ডাক্তার রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সু-অভিনয় করেছেন; এবং "গুপে গুণ্ডা" বিমল ঘোষের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। আর দু'একটি ভূমিকার অভিনয় চলনসই; তা ছাড়া অবশিষ্টগুলি উল্লেখের অযোগ্য।

* * *

"বৈষ্ণবে"র গান নিন্দনীয়। পঞ্চম দৃশ্যে রণেনের বাড়ীতে বন্ধুদের অড্ডায় গান ও বেহালা নাটকের গতিরোধ করেছে। শৈলেনবাবু গান গেয়েছিলেন ভাল—একথা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাঁর জানা উচিত যে রঙ্গমঞ্চের উপর বৈঠকী গানের অভিনয় ও সত্যকারের বৈঠকীগানে অনেক প্রভেদ। অভিনয়ের মধ্যে সত্যকার বৈঠকী গান বা জল্‌সা রসসৃষ্টি করে না, রসভঙ্গই করে থাকে।

* * *

আমাদের প্রবীন পাকা অথচ চির-কাঁচা সবুজ পুরাতন নাট্যমন্দির ফেরত শ্রীরমেন

চট্টোপাধ্যায় ওরফে দেবুদার প্রযোজনা অতি প্রশংসার না হ'লেও কোনোখানেই নিন্দার হয় নি। তাঁর শ্রীবৃদ্ধি হোক্—এই আমাদের কামনা।

• • •

সে রাত্রের অভিনয়ে আকৃষ্ট হয়ে ৩টি মেডেল উপহার দেওয়া হয়েছে—'সুধাংশু'র ভূমিকায় কুমারী নীলিমাকে এবং "গুপে গুণ্ডা"-বেশী বিমল ঘোষকে। প্রথমটি সম্বন্ধে আমরা আনন্দে সায় দিতে পারি। কিন্তু দ্বিতীয়টির সুবিচার হয় নি। আমাদের মতে যোগ্যতার ক্রম অনুসারে কালীনাথের ভূমিকায় হরিধনবাবু প্রথম, তরলার ভূমিকায় গোবিন্দবাবু দ্বিতীয় ও গুপে গুণ্ডার ভূমিকায় বিমলবাবু তৃতীয়। কালীনাথের ভূমিকায় হরিধনবাবু নিজের মৌলিকতা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করেছেন, এমন কি অনেক স্থলে এই ভূমিকার আদি অভিনেতা নরেশ মিত্রকে পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে গেছেন। দীনবন্ধু সম্মিলনীর এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতাকে অগ্রাহ্য করে "গুপে গুণ্ডা"র ভূমিকাভিনেতাকে পুরস্কার দিয়ে রসবেত্তার পরিচয় দেওয়া হয় নি। হরিধনবাবুর অভিনয় আগাগোড়া মৌলিক, কিন্তু বিমলবাবু অভিনয় ক'রেছেন—আসল "গুপে গুণ্ডা" কৃষ্ণধনকে হুবহু নকল ক'রে!

শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট

গত শুক্রবার ৯ই আগষ্ট 'রঙ্গমহল' রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে ও সাহায্যে এক বিরাট জলসা ও অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অনিবার্য্য কারণে সভার বিজ্ঞাপিত সভাপতি রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর উপস্থিত হইতে না পারায় কলিকাতার মেয়র মিঃ ফজলুল হক সভার পৌরহিত্য করেন। ঐ অনুষ্ঠানে জগদ্বিখ্যাত নৃত্য-শিল্পী উদয়-শঙ্করের উপস্থিতি একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সভায় প্রথমে সম্পাদক মহাশয়ের বক্তৃতার-পর সভাপতি মহাশয় কিছু বলিয়াছিলেন। ইহার পর বিবিধ আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

জলসায় শ্রীমনি বর্দ্ধনের নৃত্য ও তিমির-বরণের অর্কেষ্ট্রা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। সঙ্গীতের তালিকার বাহুল্যতাহেতু দর্শকদিগের মনে সামান্য বিরক্তি উৎপাদন করিলেও নিন্দনীয় ছিল না। শ্রীউত্তরা দেবীর সুমধুর কণ্ঠে বাঙ্গলার নিজস্ব গীতি-সম্পদ কীর্ত্তনখানি শ্রোতাদিগের অন্তর স্পষ্টতঃই অভিভূত করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইনষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে একটী কথা না বলিয়া পারি না; তাহা হইতেছে যে ভবিষ্যতে যখন তাঁহারা কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবেন, তখন তাঁহারা যেন হিন্দী-গান অথবা হিন্দী চালে বাঙ্গালা গান অপেক্ষা বাঙ্গালী দর্শক-দিগের কথা চিন্তা করিয়া বাঙ্গলা ও বাঙ্গলা-চালের গানকে প্রাধান্য দেন। জলসার পরে ইনষ্টিটিউটের সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্যের "অকল্যানীয়া" নাটক অভিনয় হয়। নাটক রচনায় স্থানে স্থানে সংলাপের দোষ-ত্রুটী বা ঘটনার অসামঞ্জস্য থাকিলেও, উহা যে সকলের চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

অভিনেতাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিনয় করিয়াছিলেন অতসীর ভূমিকায় শ্রীবগলা ভট্টাচার্য্য। তার পরে নাম করা যাইতে পারে সুকান্তর অংশে শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য্যের। পূর্ব্বেকার প্রায় প্রতি অভিনয়ে অনিলবাবু যে চরিত্র রূপ দিতেন, তাহার প্রায় সব কয়টিতেই কয়েকখানি করিয়া গান থাকিত, এইবার কিন্তু ঐ বিষয়ে আমরা হতাশ হইয়াছি। দীপকের ভূমিকায় ধীরেন বসু ও মালবিকার অংশে মিহির গাঙ্গুলী এবং দেবব্রতের ভূমিকায় প্রমোদ গুহ বেশ ভালই অভিনয় করিয়াছেন। সুমনার ভূমিকায় অপর্ণা গাঙ্গুলীর অভিনয় প্রাণহীন। অভিনয়ে রূপসজ্জা, আলোক-সম্পাত, ও দৃশ্যপট হইয়াছিল অনিন্দ্যনীয়।

ভবিষ্যতে যাহাতে programme ছয় ঘণ্টার মধ্যে সমাপ্ত হয়, তাহার দিকে ইনষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, ইহার চেয়ে অধিক সময় লইলে শেষ পর্য্যন্ত বড় একঘেয়ে হইয়া পড়ে।

সত্যানন্দ শর্ম্মা

পুরুষ ও নারী

শ্রীমুকুল দত্ত

আদিম সে যুগ হ'তে
পুরুষ ও নারী রয়েছে মিশিয়া,
জীবনের খরস্রোতে !
পুরুষ দেখায় পথ
নারী চলে সেই পথে,
পুরুষ তাহার চলার পথেতে
নারীরে লইল সাথে।
কঠিন তাহার বক্ষ মাঝারে
নারীরে লুকায়ে রাখে,
বলিষ্ঠ ঐ পেশীর আড়ালে
নারীর লজ্জা ঢাকে !
তবু নাকি হায় পুরুষেই সদা
করে নারী অপমান
নারীর নিন্দা অপবাদে শুধু
পুরুষের জয় গান।
পুরুষ নারীর যৌবন নিয়ে
খেলে নাকি ছিনিমিনি,
নারী নাকি তার জীবন দিয়ে
ঘুচায় নরের গ্লানি।
নর নাকি শয়তান,
নারী—মহিমায় মহিমান্বিত,
হইয়াছে গরীয়ান্ !

* * *

প্রগতির এই যুগে—
নারী আসিয়াছে সমুখের পথে—
সাহস লইয়া বুকে !
পুরুষ দেবে না বাধা—
চলিতে সমুখ পানে,
ফেরাবে না আজি কথার বাঁধনে
প্রেমের স্তুতি ও গানে !
শুধু, এইটুকু আমি চাই—
অনেক পুরুষই ভাই—
যতেক মিথ্যা কথার বাঁধনে
আটকায় পথটাই !

মিথ্যা কথার জাল বুনে বুনে
রচিছে নারীর গান—
নারী ভাবে বুঝি সত্যি তাহাই
বোঝে নাক অপমান !
পুরুষে দিতেছো দোষ—
শুধু এই আপশোষ—
ইভা খাওয়াইল জ্ঞানের ফল
আদম করিল ভুল।
মর্ত্তের মাঝে তাই নেমে এল
স্বর্গের যত ফুল !
পুরুষ অচঞ্চল ;—
নারী তো তাহার দেহের পরশে
করিল উশৃঙ্খল !
সুধা নাহি দেয় নারী দেয় বিষ
সেই বিষ পান করে—
পুরুষ হয়েছে সত্য ও শিব
ভুলিয়াছে আপনারে !
নর নহে শয়তান,
জীবনের জয়-যাত্রার পথে
পুরুষই আগুয়ান—
করে নাই বঞ্চিত
করে নাই লাঞ্ছিত
নারীরে করেছে সাথী—
নারীর ললাটে পরায়ে দিয়েছে
বিজয় মাল্য গাঁথি !

* * *

নারী যদি আজ ভুলে—
পুরুষকে ছেড়ে আপনিই পথ চলে,
পুরুষে দু পায়ে দলে,—
হয় যদি আগুয়ান।
পুরুষ তবুও কহিবে না কথা
হৃদয় মাঝারে লুকাইয়া ব্যথা—
গাহিবে তবুও নারী জয় গাথা
করিবে না অপমান্ !

আজি বিংশ শতাব্দীর
নারী জাগরণ মাঝে—
দুষ্ট এনের ক্ষতের মতন—
পাপ লুকাইয়া আছে।
এই শুধু আপশোষ—
নারী তাকাইলে পুরুষের পানে—
হয় নাক কোন দোষ—!
পুরুষের বেলা যত—
লালসা মাখান আঁখি যে তাদের
ক্ষুধা ভরা অবিরত !
পুরুষ বাড়ায় দেহের ক্ষুধা
নারী লইয়াছে দীক্ষা—
পুরুষ হয়েছে কামনার দাস
নারী দেয় শুধু শিক্ষা—!
তাই যদি হয় সত্য
রঙিন পক্ষ মেলিয়া কেমনে
নারী ঘুরে অবিরত
চলিতে সমুখ পানে
নারী যেন রাখে মনে,
পুরুষের বাহু বিনে—
চলাই অসম্ভব !
পুরুষ বাহুতে করি নির্ভর
পুরুষের সাথে বান্ধিয়া ঘর
পুরুষেই সে তো দিবে বিলাইয়া
আপনার যা' কিছু সব !
করে নাই কভু, করিবে না নর
নারীর অপমান !
নারী সাথে মিলি আজিও পুরুষে—
গাহিছে নারীর গান !
পুরুষ ও নারী এক সাথ হয়ে
করে যদি অভিযান—
নারী যদি লয় মাথায় তুলিয়া
পুরুষের যত দান !
তবেই হইবে নারীর প্রগতি
জগতেতে আগুয়ান !!

———

ব্রীজ খেলা
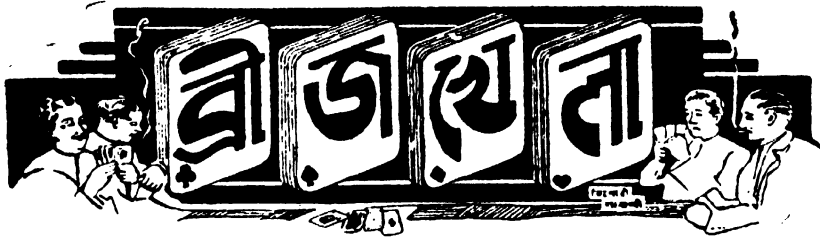
শ্রীদুর্ব্বাসা

এসোসিয়েশনের সভার অধিবেশনঃ—বিগত ২৬শে শ্রাবণ রোববার "থেটা বেটা ক্লাব" সংলগ্ন প্রাঙ্গনে ব্রীজ এসোসিয়েশনের সাধারণ সভার অধিবেশন হয়ে গেল। এসোসিয়েশনের সুষুপ্তির জড়তা যে এতদিনে ভঙ্গ হোল তার মূলে ছিল শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল, সান্ধ্য সঙ্ঘ প্রভৃতি ক্লাবের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত কর্ম্মশক্তি এবং ল্যান্সডাউন ও থেটা বেটা ক্লাবের সংগঠন নৈপুণ্য। বাস্তবিক এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আপ্রাণ চেষ্টা ব্যতীত এসোসিয়েশনের অধিবেশনের আশা হোত সুদূরপরাহত। তাই সমষ্টিগত এই ক্লাব সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণকে এবং ব্যক্তিগতভাবে অস্থায়ী কমিটির প্রত্যেক সভ্যকে আমরা আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এসোসিয়েশনের কর্ম্মশৈথিল্যের বিষয় 'খেয়ালীর' পৃষ্ঠায় আমরা অনেকবার অনেকভাবে আলোচনা করেছি। আশাকরি নব-সংগঠিত এসোসিয়েশনের নির্ব্বাচিত কর্ত্তৃপক্ষগণ এই সঙ্ঘের মর্য্যাদা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত করে সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হবেন।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি নির্ব্বাচিত হন আমাদের অক্লান্তকর্ম্মী যামিনী দাদা। বাস্তবিক যামিনী দাদার কর্ম্মশক্তির তুলনা নাই। এসোসিয়েশনের উন্নতির সংকল্প নিয়ে সকাল থেকে সমস্ত দিন যে ভাবে তিনি প্রত্যেক ক্লাবে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন তা'তে তাঁর কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। এ বিষয়ে দাদা আমাদের তুলনাবিহীন। যাই হোক্ সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করে যামিনী দাদা প্রথমেই অস্থায়ী কমিটির অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী এবং সেই প্রসঙ্গে উক্ত কমিটির সম্পাদক শচীবাবুর কর্ম্মদক্ষতার সমুচিত প্রশংসা করে সভার কার্য্য সুরু করলেন। তারপরে সুবিখ্যাত ব্রীজ সাংবাদিক শ্রীযুত সুকুমার বসু অস্থায়ী কমিটি কর্ত্তৃক সংকলিত নিয়মাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে টুর্ণামেণ্ট সম্বন্ধীয় নিয়মগুলির পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন এবং সেই নব-নিয়মাবলী প্রণয়নের ভার তিনি এসোসিয়েশনের স্থায়ী কমিটির উপর ন্যস্ত করতে চান। সমগ্র সভা তাঁর এ মত সমর্থন করেন। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে স্থিরীকৃত হয় যে অস্থায়ী কমিটির সঙ্কলিত নিয়মাবলীর মধ্যে ৩১ হইতে ৪৮ নং নিয়ম কয়টি আমূল পরিবর্জ্জিত হইবে এবং অন্য নিয়মগুলি গ্রহণ করা হইবে। তৎপরে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া উক্ত সভা ভঙ্গ করা হয়।

"ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশন" সংগঠনঃ—তার পরেই আরম্ভ হয় নব সংগঠিত ব্রীজ এসোসিয়েশনের সাধারণ সভা। ইহাতেও যামিনী দাদা পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। শ্রীযুত সুকুমার বোসের প্রস্তাবে এসোসিয়েশনের নব-নামকরণ হয় "ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশন"। তারপর শ্রীযুত নৃপেন দাসের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত নির্ম্মল সরকারের সমর্থনে এই এসোসিয়েশন রেজিষ্টার্ড করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর পর সুরু হয় কমিটি নির্ব্বাচন। সভাপতি নির্ব্বাচনের ভার স্থায়ী কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয় এবং শ্রীযুত যামিনী গঙ্গোপাধ্যায় ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। তারপর সম্পাদকের নির্ব্বাচন। এ প্রসঙ্গে সভামধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য ও বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। অস্থায়ী কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত শচী রায়ের এবং এস্‌প্লেনেড্ ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক শ্রীযুত যতীশ বসুর নাম এ প্রসঙ্গে উত্থিত হয়।

অনেক বাদ-প্রতিবাদ ও তর্ক বিতর্কের পর শচীবাবু নিজ নাম প্রত্যাহার করেন এবং যতীশবাবু সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হন। তারপর যতীশবাবুর প্রস্তাবে আনন্দ পরিষদের শ্রীযুত গণেশ ভট্টাচার্য্য সহকারী সম্পাদক এবং নর্থ ক্লাবের শ্রীযুত নগেন সেন কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। কার্য্য পরিচালনা সমিতির সভ্য নিম্নলিখিত কয়টি ক্লাব হ'তে গৃহীত হবার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

(১) সান্ধ্য সঙ্ঘ।
(২) ক্রকফোর্ডস্ ক্লাব।
(৩) এ্যাপোলো ক্লাব।
(৪) ল্যান্সডাউন ক্লাব।
(৫) লুনার এণ্ড ফুলস্ ক্লাব।
(৬) স্যাটার্ণ ক্লাব।
(৭) হাওড়া নর্থ ক্লাব।

আমরা এই নব সংগঠিত কমিটিকে আমাদের সানন্দ অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি তাঁরা কার্য্যদক্ষতার গুণে সারা ভারতের ব্রীজমহলে এই এসোসিয়েশনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন এবং "ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশন" নামের সার্থকতা বজায় রাখ্‌তে পারবেন। সম্পাদক যতীশ বাবুর কার্য্যক্ষমতার যা' পরিচয় আমরা এর পূর্ব্বে পেয়েছি তা'তে আমাদের বিশ্বাস তিনি আমাদের এ আশা সফল করতে পারবেন। এ বিষয়ে আর একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। অস্থায়ী কমিটির সম্পাদক হিসাবে নিয়মাবলী সঙ্কলনকল্পে শচীবাবু যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার জন্য তিনি ব্রীজ-সাধারণের ধন্যবাদার্হ। তাঁর সংগঠন-নিপুণতার যে পরিচয় আমরা এ প্রসঙ্গে পেলুম তা'তে তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে তিনি এসোসিয়েশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংলিপ্ত না হলেও পরামর্শ ও প্রচেষ্টার দ্বারা যেন এই এসোসিয়েশনকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।

এসোসিয়েশনের নিয়ম-কানুনে পাঠকবর্গের মতামত :—

ব্রীজ এসোসিয়েশনের Provisional Committee ব্রীজ-সংক্রান্ত যে সকল নিয়ম-কানুন সংগঠন করেন তন্মধ্যে ৩১ হইতে ৪৮ নং নিয়মগুলি সাধারণ সভায় বাতিল দেওয়া হয় ও নব গঠিত কমিটির উপর ইহার পুনর্গঠনের ভার দেওয়া হয়। এ জন্য প্রত্যেক নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে ব্রীজ খেলোয়াড় ও ব্রীজ সমিতিগুলির মতামত জান্‌বার জন্যে নব সংগঠিত 'ইণ্ডিয়ান ব্রীজ এসোসিয়েশনের' সেক্রেটারী ম'শায় পত্র দিয়েছেন ও জানিয়েছেন যে এই সকল নিয়ম-কানুনের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত পেলে নিয়ম সংগঠন সহজসাধ্য ও সত্বর হয়ে উঠবে। সুতরাং ব্রীজ-সাধারণের অবগতির জন্য ৩১ হইতে ৪৮ নং নিয়মগুলি প্রকাশিত করা গেল। আশা করি পাঠকবর্গ উক্ত নিয়মগুলি উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করে স্বীয় মতামত "ইণ্ডিয়া ব্রীজ এসোসিয়েশনের" সেক্রেটারী ম'শায়ের নিকট পাঠিয়ে দেবেন।

চলতি পথে

শ্রীমল্লিনাথ

নিরন্ন বাঙ্গলা ও ভাবী শাসনতন্ত্র

বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান হইতে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানবতার আর্তনাদ আমাদের কর্ণে আসিয়া ধ্বনিত হইতেছে। পল্লীর সর্ব্বহারা কৃষকের হাহাকারে আজ বাঙ্গলার গগন-পবন প্রতিধ্বনিত। সকলের ঘরে আজ অন্ন নাই। খাটিয়া খাইবার মত কাজও নাই। বাঙ্গলার মাঠ আজ সাহারার মরু-ভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে। অনাবৃষ্টি তার সকল শ্যামলতা সকল সৌন্দর্য্য হরণ করিয়াছে। স্বর্ণপ্রসবিনী বাঙ্গলা আজ কঙ্কালসার বিগত-যৌবনা নারীর মত নিঃসম্বল, অসুন্দর। বাঙ্গলা মার বুকে আজ মধু ক্ষরে না, তার সে শ্যামল সৌন্দর্য্য নাই, তাই তার বুকের দুলাল পল্লী কৃষ-কের গৃহে আর শ্রী নাই, তার ঘরে আর অন্ন নাই, তার মরাইভরা ধান নাই, গোয়ালভরা গরু নাই, পুকুরভরা মাছ নাই। সে আজ নিঃস্ব, একেবারে অসহায়-রূপে নিঃস্ব।

বাঙ্গলা নিঃস্ব হইয়াছে, সে অতি পুরানো কথা; তার গলায় দাসত্বের শৃঙ্খল যে দিন হইতে পরান হয়, সে দিন হইতে সে সর্ব্বহারা সাজিয়াছে। তার স্বাধীনতা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সব গিয়াছে। সেদিন হইতে তার তাঁত গিয়াছে, তার মসলিন গিয়াছে, তার ময়ূরপঙ্খী 'নাও' গিয়াছে, গিয়াছে আরো কত সম্পদ। কিন্তু এত গিয়াও তার যা ছিল, তা খুব গৌরবের না হইলেও, তাতে তার সন্তান-দের পেটের দুমুঠো অন্ন জুটিত, অঙ্গের আবরণ এক টুকরা বস্ত্র জুটিত।

কিন্তু এ বৎসর কৃষকেরা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহা তাদের চরম দুর-বস্থা বলা যায়। প্রায়ই সংবাদ পাইতেছি আজ অমুক লোক নিজের সন্তানগণের ভরণ পোষণের উপায় না করিতে পারিয়া বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কাল অমুক স্ত্রীলোক শিশুসন্তান ও রুগ্ন স্বামীর অন্নকষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে সকল জ্বালার অবসান করিয়াছে। এই সে দিনও দলে দলে কৃষকগণ বর্দ্ধমানের আদালতপ্রাঙ্গণে, হুগলীর আদালতে এবং আরো কয়েক স্থানে আসিয়া তাহাদের ক্ষুধার অন্ন চাহিয়াছে। আসন্ন দুর্ভিক্ষে তাহাদের কি উপায় হইবে তাহা জানিতে চাহিয়াছে। জানিতে তারা কিছু পারে নাই; তাদের জন্য সরকার যে কিছু করিতে পারিতেছেন না এইটুকু তারা অবশ্য জানিয়া গিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, উপায় কি? এ সকল নিরন্নদের মুখে কে অন্ন তুলিয়া দিবে? দায়িত্ব এদিকে তাহাদেরই বেশী, যাদের শাসনের রথচক্র অপ্রতিহত গতিতে ঘুরিয়া চলিয়াছে, সকল বাধা বিপত্তিকে মথিত করিয়া, জনমতকে উপেক্ষা করিয়া। কিন্তু তাঁদের কর্ত্তব্য এই বলিয়া তাঁরা সম্পাদন করিবেন যে, ফাণ্ডে টাকা নাই।

ফাণ্ডে টাকা নাই বলা দুই তিন বৎ-সর আগে চলিত, কিন্তু এখন ওকথা একেবারে অচল। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার পল্লীগ্রামের কৃষকদিগকে রেডিও ও গ্রামো-ফোন শুনাইবার জন্য ১৬ লক্ষ টাকা খরচ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পল্লীর অবস্থার উন্নতির নামে এই অপব্যয় সম্ভবপর হয়, যদি কোষাগারে যথেষ্ট অর্থ আমানত থাকে। বাঙ্গলা সরকার রেডিও শুনাইবার ইচ্ছা দমন করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের মুখে

যদি দু'মুঠো অন্ন তুলিয়া দিতে পারেন, তবে তাহাতে অনেক কাজ হইবে। পল্লীর কৃষক বাঁচিলেই পল্লীর উন্নতি হইবে। কৃষকের বুকে বল থাকিলে রেডিও এবং গ্রামোফোন না শুনিয়াও তারা পল্লীর উন্নতি করিবে এবং এতদিন করিয়াছেও তাই।

বাঙ্গলার জমিদারদের কৃপায়, গবর্ণমেন্টের একের পর আর এক ট্যাক্সের বোঝায় দেশের প্রজা ও কৃষকগণ যেরূপভাবে ঋণের বেড়াজালে আটকাইয়া পড়িয়াছে তাহাতে তাহাদের এ অন্নকষ্ট যে সাময়িক নয় তাহা নয়, দারিদ্র্য তাহাদের ঘরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়াছে। দুর্ভিক্ষ তাহাদের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইতে চলিয়াছে। ইহাদের এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য কি সরকারের তরফ হইতে কোনও চেষ্টা হইয়াছে?

পাঠকগণ জানেন, হোয়াইট পেপার অনুমোদিত বহুনিন্দিত ইণ্ডিয়া বিল পাশ হইয়া গেল। এই বিলের নিন্দায় ও গুণগানে বিভিন্নদল কিছু দিন অতি ব্যস্ত ছিলেন। ধনীর স্বার্থ, দেশীয় রাজ্যের রাজাদের স্বার্থ প্রভৃতি লইয়া আমাদের দেশের মুক্তিকামী কংগ্রেস নেতারা হইতে আরম্ভ করিয়া সরকার ভক্ত আপ-কা-ওয়াস্তে মডারেট নেতারা পর্য্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। এই বিলে কৃষকের স্বার্থ কতটা রক্ষিত হইবে না হইবে, ভূমিহীন কৃষকগণ কিরূপে বাঁচিবে, ঋণভার প্রপীড়িত জোতদারগণের কি অবস্থা হইবে, জমিদারগণ প্রজাদিগকে কতটা সুবিধা দিবে তাহার আলোচনা হয় নাই, কারণ এত ক্ষুদ্র বিষয়ের আলোচনা অত বড় বিলের মধ্যে হইতে পারে না। এত ছোট কথা সাম্রাজ্য পরিচালকগণ আলোচনা করিতে পারেন না। কাজেই ইণ্ডিয়া বিল ভারতের যত কিছু সুবিধা দিবে বলিয়া চীৎকার উঠুক না কেন, ভারতের জনগণের যে তাহাতে কোন সুবিধা হইবে না তা কি বুঝিতে বিলম্ব হয়? জনগণের কথা চিন্তা না করিলে তাদের দুঃখ কিরূপে দূর হইবে? যতদিন জনসাধারণের, কৃষক ও শ্রমিকগণের জন্য কেহ দরদ দিয়া চিন্তা না করিবেন, যতদিন না তাদের জন্য শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা হইবে ততদিন ভারতের কৃষক ও শ্রমিকের দুঃখ দূর হইবে না। ভারতের কৃষক-শ্রমিকের দুঃখ দুর্দ্দশার সহিত বাঙ্গালার কৃষক-শ্রমিকের অবস্থাও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ভারত শাসন বিল যে কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য নিরর্থক তাহা স্থানান্তরে আলোচনা করিব। এখানে শুধু দুর্ভিক্ষপীড়িত বাঙ্গালার কৃষক ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য দুঃখ প্রকাশ ও মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন ব্যতীত আর কিই বা আমরা করিতে পারি!

সাম্রাজ্যলোলুপ ইতালী

আবিসিনিয়া সীমান্ত উয়াল ওয়ালে ইতালীয় শান্ত্রীর উপর আবিসিনিয়া উপজাতি অথবা সৈন্যের গুলিবর্ষণ উপলক্ষ্য করিয়া আজ বিশ্বব্যাপী আবার এক মহাপ্রলয়ের সূচনা হইতে বসিয়াছে। বর্ব্বর আবিসিনিয়াকে সায়েস্তা করিবার জন্য শক্তিমদমত্ত ইতালি রক্তচক্ষু হইয়া সীমান্তে একটীর পর একটী সেনাবাহিনী প্রেরণ করিতেছেন। দলে দলে বোমাবর্ষী হাওয়াই জাহাজ—বৈজ্ঞানিক যুগের মৃত্যুদূতরূপে মানুষ সংহারের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

ওদিকে হাবসি সম্রাট প্রথম হেল সেলাসী মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প। 'বর্ব্বর' কালা আদমীর দেশের প্রত্যেকটী প্রজা বলিয়াছে যে, মাতৃভূমির স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাহারা দেহের শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জ্জন দিতে পিছপাও নয়।

অবস্থা ঘোরতর বুঝিয়া বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের টনক নড়ে। কেহ না মানিলেও নিজে মোড়ল সাজিয়া তাহারা আগাইয়া আসিলেন 'শান্তি' রক্ষার জন্য। অথচ তাঁহাদের কি মতলব হইল, তাঁরা বলিলেন, শান্তি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না, একটী আপোষ কমিশনের হাতে ব্যাপার মিটাইবার ভার অর্পন করা হইবে। হইলও তাই। একটী আপোষ কমিশন গঠিত হইল তিন শক্তির কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি লইয়া। এই তিন শক্তির প্রথম দুইটী হইল ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন, এবং তৃতীয়টী হইল শক্তিমদমত্ত ও যুদ্ধকামী ইতালী। কি দুর্ভাগ্যের জন্য জানি না, আবিসিনিয়ার কোন প্রতিনিধি এই তথাকথিত আপোষ কমিশনে স্থান পাইবেন না।

প্যারিসে আপোষ কমিশনের আলোচনা চলিতেছে। আবিসিনিয়া তার সর্ব্বনিম্ন দাবী পেশ করিয়াছে। একটা মিটমাটের জন্য, কিছু ঋণের পরিবর্ত্তে সে তার একটা প্রদেশ—রাজ্যের একটা অংশ—ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তথাপি ইতালী নাছোড়বান্দা! এই নিম্নতম দাবী মানিতেও সে রাজী নয়। তাই আপোষের কথা চলিতে থাকিলেও ইতালী অপেক্ষা না করিয়াই সমান ভাবে সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। অগ্নিকাণ্ডের জন্য বারুদ প্রস্তুত, শুধু অগ্নি সংযোগের অপেক্ষা।

ইতালীর যুদ্ধের জন্য এত তর্জ্জন গর্জ্জন রাষ্ট্রসঙ্ঘ কেবল অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করিতেছে। প্রতিকারের কোন উপায় তার হাতে নাই। আর থাকিলেও হয়ত সে প্রতিকার করিতে চায় না। কারণ যাদের সমবায়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত তাদের অস্তিত্ব সাম্রাজ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসঙ্ঘ কোনমুখে উগ্র সাম্রাজ্যবাদী ইতালীর কুকীর্ত্তির প্রতিবাদ করিতে যাইবে? কাজেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ এ বিষয়ে নীরব।

INDIAN BRIDGE ASSOCIATION

To

The Bridge Editor "Kheyali".

Dear Sir,

Would you kindly favour me by having the attached rules printed in your esteemed journal? These rules had been framed by the Provisional Committe and was subsequently debated in the general meeting of the Indian Bridge Association, for being recasted by the Council. As the secretary of the Association I ask for your help. We get them published so that all members of the Association can read these rules and inform me of their opinion.

Thanking you in anticipation,

I remain,

Yours truly

Jotish Chandra Bose

Hony. Secy. Indian Bridg Association

The Rules in Question

Annual Registration of Competitions

31 (a) Every competition once registered by the promoters or committee thereof with the Association. shall be registered annually and subject to these Rules, such competitions shall be managed by the promoters or committee thereof who may have the power to deal with infringements of the laws and proprieties of the game and the rules, regulations and bye-laws of their competition subject to the right of appeal to the Council.

(b) The registration fee for all open competitions shall be Rupees two per annum for each and every competition. The registration fee for an out-station competition shall be Re. 1/- per annum. The registration fee together with the application giving all the informations wanted in Rules 32 shall be forwarded to the Hony. Secretary on or before the 15th of May of every year Any fee for registered competition which has not been paid within the prescribed date shall cease to be a registered competition during the year of default. In case the competition is not run, money so received will be returned at the end of the year.

The date of the commencement and completion of any competition shall be determined by the Council. These dates shall be fixed as far as practicable with the dates asked for by the promoters or committee of the competition.

New Registration of Competition

32. First applications for registration of competitions of any kind with the Association shall have to submit the following information along with the competition.

(a) Name of the competition.
(b) Year of formation.
(c) Names and addresses of the Secretary.
(d) Telephone No. of the office, if any.
(e) State whether any Record Book. Cash Book and Minute Book is kept.
(f) The place, where the tournament will be played, must be mentioned.
(g) The approximate date of commencement and finish of the tournament.

All applications must be sent to the Hony. Secretary together with the registration fees for the current year and the rules, regulations and bye-laws under which the said competitions are conducted. The Council may allow the registration or refuse any such application without assigning any reason for such refusal. In the event of rejection these fees received shall be returned.

Conditions of Registration of Competition

33. All competitions upon their first registration and annual renewal of their registration with the Association do so on the strict and distinct understanding that they assent to and agree to be bound and abide by the Rules, Regulations. Bye-laws of the Association in force from time to time.

Power to Take Over Competition

34 The Council if requested by the promoters or committee. may at any time take over in its own hand the direct management and control of any registered competition and call upon its committee to make over to the Council all trophies, books, letters, documents and funds belonging thereto.

Review Appeal

35. The Council may review. reverse, confirm or otherwise deal with any decision of the committee of any registered competition and may do so either of its own motion or on appeal against such decision.

Jurisdiction Over the Rules of Competitions

36 The rules, regulations and bye laws, under which any registered competition is conducted, once they are approved of by the Council. shall not be altered without the previous consent in writing of the Council. The Council may of its own motion revise, alter, add to or delete any such rules, regulations or bye-laws which shall be binding on all parties concerned.

Representation of the Council in the Competitions

37. The Hony. Secretary or a Member of the Council who will be delegated with power shall be one of the committee member of all the committee of all the registered competitions.

Obligatory Informations

38 The Secretaries of all registered competitions shall forward to the Hony. Secretary yearly the rules, regulations, and bye-laws under which such competition is conducted and managed together with the names of all clubs, associations, and bodies entered for such competitions before the commencement of the competition and the final results thereof within a week of their completion.

Finality of the Council Decision

39 Upon any question that may arise as to the interpretation of the rules, regulations, and bye laws relating to the management and control of any registered competition the decision of the Council shall be final and shall be accepted as such by the committee of such registered competitions and by all parties concerned.

Restrictions on Participation in Non-Registered Competition

40. No affiliated club, association or body shall take part in any competition which is not registered within the Association except with previous consent in writing of the Council. Any club association or body offending against this Rule shall be suspended or otherwise dealt with as the Council may think fit.

Conduct of Competition

41. The Council may call upon the Secretary of any competition registered with the Association for such information or explanation as to the conduct of the same as it may from time to time deem necessary. The Council may disqualify or disallow any affiliated club or association, or body from taking part in any competition and no affiliated club association, or body, so disqualified or disallowed shall take further part in such competition. Any club, association, or body offending against this Rule may be suspended or otherwise dealt with as the Council may think fit.

Entry Fee of a Registered Competition if Not Paid

42. (a) **Any club, association or body wishing to play in a competition shall inform the promoter or committee, of the competition in writing on a form to be supplied by the promoters or committee.**

(b) A club, association or body who shall once send the form duly signed to the promoter or committee, shall have to pay the entry fee of the competition whether that club, association or body plays in the competition or not In default the club, association, or body shall be suspended for such period or to be dealt with otherwise as the Council shall think fit.

Misconduct how to be Punished

43. (a) In the event of any registered competition or any affiliated club, or association or body being proved to the satisfaction of the Council to have been guilty of any breach of the laws of the game or the rules, regulations or bye-laws of the association or of any misconduct. The Council may order the offending competition, club, association, or body to be suspended for such period as it may think fit or otherwise to be dealt with as the Council shall think fit.

(b) Should the Council decide that a charge or allegation made against a competition, club association or body should be investingated by the Council, the competition, club, association, or body concerned shall be furnished with a copy of such charge or allegation and shall have the right to attend and be heard when the charge or allegation is investigated by the Council or by any sub-committee to which the Council may delegate the duty of conducting such investigation.

Consequences of Suspension

44. No suspended player, officer or member of any affiliated club or association or body or of any registered competition shall be eligible for membership of any other club, association, or body affiliated to the Association or of any other competition registered with the Association during the period of his suspension except with the special permission in writing of the Council previously obtained.

Protest.

45. **Every protest, complaint, appeal or claim made by the committee or officer of a registered competition or by an affiliated club, associaiion, or body. player or member shall be in writing and in duplicate and signed by them or on behalf of the body or person preferring the same and shall be lodged** with the Hony. Secretary within forty-eight hours and for outstation clubs, associations, bodies or competitions four days of the decision or occurance to which it relates accompanied with a deposit of Rupees Five which may be forfeited if it is considered to have been made without justification. The lodging of such protest, complaint, appeal or claim shall not operate as a stay of any decision to which it may relate pending its investigation by the Council unless the Council so orders. Any protest, complaint, appeal or claim which is not lodged in the manner prescribed by this rule shall not be investigated by the Council and shall be deemed to have failed

Club Interested shall Abstain from Voting

46 No member of the Council shall vote on a matter protest, complaint, appeal or claim in which club or body which he represents on the Council is represented is interested either directly or indirectly.

Restrictions on Playing for more than One Club.

47. (a) No player shall play for more than one club, association or body in the same year except with the previous permission in writing of the Council.

(b) Should any player for a second club, association or body in the same year or for two teams in the same competition in breach of this Rule he shall be suspended or otherwise dealt with as the Council shall think fit.

(c) If any club, association, or body allows a player to play for two teams in the same competition, that club shall be scratched or otherwise dealt with as the Council shall think fit.

Tour.

48. **No affiliated club or association or body or player shall join any tour in or out of India which is not recognised by the Association, without the previous sanction in writing of the Council.**

———

কলোম্বিয়ার অভিনেত্রী এ্যান্ সদার্ণ। ভাল অভিনয় কোর্‌তে পারেন বলে সবাই একে স্নেহের চক্ষে দেখেন। এর ভাবী ছবি হ'চ্ছে "এইট্ বেল্‌স।"

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীঅনিল চন্দ্র রায়

পঞ্চম বর্ষ } বৃহস্পতিবার, ১২ই ভাদ্র, ১৩৪২—29th August, 1935. { ৩৫শ সংখ্যা

দেশসেবার আদর্শ

দেশসেবা যাঁহাদের জীবনের ব্রত, কোনও স্বার্থের খাতিরে বা আত্মতৃপ্তির জন্য যাঁহারা দেশসেবক সাজেন না, সুখে-দুঃখে, বন্দী বা মুক্তভাবে যাঁহারা দেশের কল্যাণচিন্তা ভুলিতে পারেন না—তাঁহারা দেশসেবা সম্পর্কে যে সকল কথা বলেন, তাহার মধ্যে কোনো মেকী বা ফাঁকী থাকে না—একটা চিরন্তন সত্য, একটা দূরপ্রসারী আদর্শ তাঁহাদের বাণীতে মূর্ত্ত হইয়া উঠে।

গত শনিবার এল্‌বার্ট হলে কংগ্রেস জাতীয় দলের পক্ষ হইতে অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যে সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট উত্তর দান করিয়াছেন সে সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াই এই কথাগুলি মনে পড়িল।

কংগ্রেস জাতীয়দলের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্ম্মপদ্ধতি কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে মুক্তি লাভ করিবার পর জনসাধারণে এই তাঁহার প্রথম সুচিন্তিত উক্তি। বাঙ্গলার জনগণ তাঁহার নিকট হইতে এইরূপ একটা উক্তি আশা করিতেছিল। অতএব সে দিক দিয়া ইহার একটা প্রয়োজনীয়তা তো আছেই কিন্তু ব্যক্তিগত কথা বলিতে গিয়া তিনি দেশসেবার যে চিরন্তন আদর্শের কথা বলিয়াছেন তাহার মূল্য আজিকার দিনে অপরিসীম। তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন—"চরিত্র পবিত্র না হ'লে যথার্থভাবে দেশসেবা করা সম্ভবপর নয়।" সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এই আদর্শ সত্য হইলেও, আজিকার দিনে বাঙ্গলা দেশে এই আদর্শ মনে রাখিবার যেমন প্রয়োজন হইয়াছে, এমন বোধ করি আর কোথাও না।

রামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করিয়াছেন পঞ্চাশ বৎসর এবং বিবেকানন্দ মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। এই ন্যূনাধিক অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই বাঙ্গলা ভুলিতে বসিয়াছে যে, চরিত্রবলই জগতে একমাত্র বল, সে ভুলিয়াছে যে, কলঙ্কিত ধূলিমলিন ফুলে পূজা হয় না, সে বিস্মৃত হইয়াছে যে, দেহেমনে পবিত্র পূজারীই একমাত্র মাতৃপূজার অধিকারী। এই কথা ভুলিয়াছে বলিয়াই আজ দেশের অঙ্গনে সিংহের পরিবর্ত্তে ফেরুপালের আবির্ভাব হইয়াছে, দেশ-সেবার মুখোস পরিয়া স্বার্থপর চরিত্রহীন লোক আসিয়া মাতৃপূজার বেদী কলঙ্কিত করিতেছে।

পাশ্চাত্য প্রভাবে পড়িয়া কলিকাতা লণ্ডনের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ হইতে চেষ্টা করিতেছে। তাই বিলাস-লালসার

ক্ষেত্র এই কলিকাতা নগরী অর্থের পদতলে আত্মবিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাই আজ টাকার জোরে,—চরিত্রের বলে নয়—লোকে দল গড়ে, সংবাদপত্রে দেশহিতৈষিতার ঢক্কানিনাদ করাইয়া নাম কিনিবার চেষ্টা করে।

চরিত্রহীন লোক সব দেশেই আছে। কিন্তু তাহাদের স্থান দেশসেবকদের পুরোভাগে নহে—অন্যত্র। অর্থের পূজারী পাশ্চাত্যেও এই নীতির বিশুদ্ধতা যথাসম্ভব রক্ষিত হয়—ইতিহাসে তাহার নজীর আছে। খুব বেশী দিনের কথা নহে সেইজন্য বোধ হয় অনেকেরই মনে পড়িবে যে, পার্ণেলের মত দেশসেবককে কোন্ অপরাধে দেশসেবার অঙ্গন হইতে চিরনির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। আর আমাদের এই চৈতন্য-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের দেশে সেই কথা ভুলিয়া আমরা চরিত্রহীন দেশসেবকদের প্রশ্রয় দিব?

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যথাসময়ে এই স্মারক সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। বাঙ্গলার—অন্ততঃ যুবক-বাঙ্গলার—আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত, যে, বিবেকানন্দের ত্যক্ত পতাকা তাহারা আবার তুলিয়া লইবে। অর্থ সম্পদ্ বা পদবীর কোনো সাময়িক মোহে বিভ্রান্ত না হইয়া তাহারা নির্ভীক মনে সত্যকে গ্রহণ ও মিথ্যাকে বর্জ্জন করিবে, দেশসেবার পুণ্যাঙ্গনে যদি কোনো চরিত্রহীন লোক আসিয়া দাঁড়ায়, অন্যদিক দিয়া সে যত বড়ই হউক তাহাকে বিতাড়িত করিতে হইবেই। একবার এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে চলিতে পারিলে দেশ হইতে ভণ্ড ও অযোগ্যগণ অপসৃত হইবে এবং দেশকর্ম্মীদের মধ্যে এমন লোক আবির্ভূত হইবে যাহারা শুধু এখানে এবং এখনই নহে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে মানব সমাজের আদর্শ বলিয়া পূজা পাইবে।

বিবিধ

"স্যর নলিনী"

মিরাটের সংবাদপত্রে নলিনীসরকারকে স্যর বলিয়া তাহার যে ছবি বাহির হইয়াছে এবং তাহাকে যে বলা হইয়াছে, নলিনী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বি, এ", পরীক্ষায় পাশ—তাহা লইয়া আমরা অনেকগুলি পত্র পাইয়াছি। এক রসিক পাঠক দাশরথির কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন—"কুজোর যেমন সাধ যায় চিৎ হয়ে শুতে;" আর একজন লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

> "যেমন রাখাল বসে বাদসার পাটে
> যজ্ঞের ঘৃত কুকুরে চাটে"!

সে যা'ক। এখন এই বিবরণ সম্বন্ধে দুইটি কথা জিজ্ঞাস্য।

প্রথম কথা—কে বা কাহারা সংবাদপত্রখানিকে স-চিত্র নলিনীর বিবরণ সরবরাহ করিয়াছিল? সে বা তাহারা কেন এ সব মিথ্যা সংবাদ দিয়া পত্রখানিকে অপদস্থ করিল? আশাকরি ব্যাপারটা এমন নয় যে, নলিনীর এবার "নাইট" হইবার বিশেষ পাকা বন্দোবস্ত ছিল—শেষে কোন কারণে (হয়ত বা বীণার মামলার রায়ে) তাহা ফাঁসিয়া গিয়াছিল। পত্রিকাখানি ঐ চিত্র কোথা হইতে পাইয়াছিল?

দ্বিতীয় কথা—আমরা সরকারের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করিব। ইহা কি অনুমান করা যায় যে, **সরকার নলিনীকে নাইট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন?** যদি এই অনুমান অসঙ্গত না হয়, তবে জিজ্ঞাস্য—কোন্ কাজের পুরস্কারে নলিনীর উপাধি প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল? ইহা কি এলবার্ট হলের সভায় পাদুকামাল্য লাভের পুরস্কার? না—নলিনী সরকার এমন কোন কাজ করিয়াছে যে জন্য সে পুরস্কার লাভ করিতে পারে? সরকারকে কাজের খাতিরে হয়ত এমন লোককেও সহ্য করিতে হয়, যাহাদের সম্বন্ধে Grattau এর কথা বলা যায়—তাহারা So obnoxious that they are "only supportable by doing these dirty acts the less will refuse to do." কিন্তু নলিনীর সম্বন্ধে সরকার যদি পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তবে সে কি জন্য? পুলিসের পক্ষে কোন সাক্ষীকে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার নর্টন একবার বলিয়াছিলেন, সে প্রেসিডেন্সি জেলের এম্, এ,; নলিনী কোথাকার বি, এ,?

সরকার নলিনীকে নাইট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কিনা, তাহা সরকারই জানেন। কিন্তু যদি তাঁহারা সে সংকল্প করিয়া থাকেন, তবে কি স্যর জন এণ্ডার্সন একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন।

সংবাদটা কোন্ ছিদ্রপথে বাহির হইয়া গিয়াছিল?

সে আজ অনেক দিনের কথা, বাঙ্গালা সরকার নলিনবিহারী সরকার মহাশয়কে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিবেন বলিয়াছিলেন।

তিনি সে উপাধি লইতে অস্বীকার করেন। সরকার তাঁহাকে C. I. E. করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তদবধি নিয়ম হয়, উপাধির সংবাদ পূর্ব্বাহ্নে কাহাকেও দেওয়া হইবে না। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যায়—বাঙ্গালা সরকার officially নলিনীকে সংবাদ জানান নাই। সে অবস্থায় সংবাদ যদি বাহির হইয়া থাকে, তবে তাহা Unauthorised Source হইবে। সে ছিদ্রপথের সন্ধান সার জন করিবেন কি? লাটদপ্তরের গুপ্ত সংবাদ যদি সত্য সত্যই বেফাঁস হয়, তবে তাহা কি ভয়ের কথা নহে? ইহার পূর্ব্বেও কোন গুপ্ত সংবাদ বাহির হইয়া যায় নাই ত?

নলিনীর ত—নৌকা চড়া হইল না, কেবল কাদা মাখা সার হইল। আহা!!

ময়মনসিংহে নলিনীর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল তাহা পাঠকগণ জানিয়াছেন। তাহার পর 'ফরওয়ার্ডে' "ইউনাইটেড প্রেসের" সংবাদ প্রকাশিত হয়। ঢাকার উকিল সভায় নলিনীকে নিমন্ত্রণ করা হয়, এবং তথায় নলিনী হিন্দুস্থানের বিবরণ বিবৃত করে। ঢাকা হইতে 'এডভান্সে' সংবাদ আসিয়াছে—ঢাকার উকিল সভা কখনই নলিনীকে নিমন্ত্রণ করেও নাই—সে সম্মান লাভের আশা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব, তাহা বুঝিবার বুদ্ধি তাহার আছে। যে সহরে এক লক্ষ এক হাজার লোকের বাস, সেই সহরের ৮ জন মাত্র লোক একযোগে তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন। সংবাদদাতা বলেন, এই ৮ জনের একজনও নিমন্ত্রণে এক পয়সাও ব্যয় করেন নাই—যাহারা এই নিমন্ত্রণ উকীল সভা হইতে হইয়াছিল বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়াছে **তাহারাই খবর যোগাইয়াছিল।** আবার এই ৮ জনের মধ্যে ৪/৫ জন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। "অনুষ্ঠানটি যবনিকার অন্তরালে অবস্থিত উদ্যোক্তাগণকারীদিগের কীর্ত্তি, আর এই ৮জন লোককে নিমন্ত্রণপত্রে স্বাক্ষর দিতে সম্মত করান হইয়াছিল—ইহা ছাড়া এই অপবাদের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না।"

এখন জিজ্ঞাস্য—"ইউনাইটেড প্রেস" যদি এইরূপ সংবাদ প্রকাশে প্ররোচিত হন, তবে সংবাদপত্রের পক্ষে ইঁহাদের সংবাদ গ্রহণ করা সঙ্গত কিনা?

আর জিজ্ঞাস্য—ব্যভিচারের মামলার রায়ে নলিনীর সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট যে সব উক্তি করিয়াছেন, তাহার পর যাহারা নিমন্ত্রণের পত্রে স্বাক্ষর দিয়াছিলেন তাঁহারা কাহারা? তাঁহাদের নাম জানিয়া সাবধান হওয়া ঢাকার লোকের কর্ত্তব্য।

প্রগতি সঙ্ঘ

গত বুধবার ২১শে আগষ্ট রাজবালা বালিকা বিদ্যালয়ে ভবানীপুরে প্রগতি সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত কামজীৎ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, এডভোকেট মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ডাঃ চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কৃষি বিষয়ে এক সারগর্ভ বক্তৃতা দেন।

রাজবালা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী রাজবালা মিত্র, সঙ্ঘের সহকারী সভাপতি শ্রীযুত লোভজীৎ মুখোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রীযুত পরিতোষ গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে সম্বর্দ্ধিত করেন।

সভায় নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন :— ডাঃ চারুচন্দ্র চ্যাটার্জি, শ্রীযুক্ত রামতারণ চাটার্জি, শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীতারাকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী ও শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের ন্যায়ের অধ্যাপকের পদ খালি পড়িয়াছে। প্রার্থী আছেন বহু মহামহোপাধ্যায় ও মহা-মহোপাধ্যায়কল্প নৈয়ায়িক পণ্ডিত ; যথা— মমঃ বীরেশ্বর তর্কতীর্থ (বর্দ্ধমান), মমঃ রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ (ভূতপূর্ব্ব বেলুড়), বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য (ছোট—কাশী), রমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ (রাজসাহী), অনন্ত তর্কতীর্থ (কালীঘাট), তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ (শ্যামবাজার), অমরেন্দ্র মোহন তর্কতীর্থ (বিশ্বভারতী—of Gitanjali Fame), যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ (দৌলতপুর) ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইঁহাদের পৃষ্ঠবল প্রায় সকলেরই আছে— অবশ্য দুই একজন ব্যতীত এবং আমরা যতদূর জানি সেই দুই একজনই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম। বৃদ্ধ মহামহোপাধ্যায় বা মমঃ-কল্পের দল নিবিত্তব্যবহার হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু সুনাম বৃদ্ধি হইবে কিনা সন্দেহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান তরুণ কর্ণধার গুণগ্রাহী ব্যক্তি। ইতিপূর্ব্বে দুই একটী অধ্যাপক নিয়োগে তিনি যথেষ্ট গুণগ্রাহিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। এই সকল নিয়োগের মধ্যে প্লেটো-অধ্যাপক জিতেন্দ্র প্রসাদ নিয়োগী ও সংস্কৃতের অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী এম, এ, পি, আর, এস, পি, এইচ, ডি, প্রভৃতি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিয়োগে ভাইস চ্যান্সেলার মহাশয় যে বিবেচনা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, আগামী ন্যায়ের অধ্যাপক নিয়োগে তাহার যেন কোন ব্যত্যয় না ঘটে।

ছোট না বড় ?

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু বলিয়াছেন, তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠদিগকে তিনি স্মরণ রাখিতে বলেন— **চরিত্র পবিত্র না হইলে দেশসেবা সার্থক হয় না।** শরৎ বাবু বিনয় বশে তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠদিগকেই এই কথা স্মরণ রাখিয়া দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু একথা যে বৃদ্ধ, যুবক, বালক সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য তাহা বলা বাহুল্য! কারণ, যাহারা অসচ্চরিত্র, তাহারা পূজার অধিকারী নহে এবং দেশসেবা পূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে—তাহা মাতৃপূজা। আজ বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রে দুর্নীতিপরায়ণের বাহুল্য দেখিয়াই যে শরৎবাবু এই কথা বলিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎবাবুর এই পরামর্শানুসারে যদি বাঙ্গালার যুবকরা কাজ করেন, তবে কতগুলি "নেতাকে" স্থানত্যাগ করিতে হইবে, তাহাও সহজেই বুঝা যায়। তবে দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়ালও ভাল। এই প্রসঙ্গে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে স্বতঃই আগ্রহ হয়—নলিনী শরৎবাবুর অপেক্ষা বয়সে ছোট—না বড় ?

অতি সাবধানতা কি ভাল ?

রাজসাহীর কুসুম কুমারীর উপর পাশবিক অত্যাচারের মামলার প্রাথমিক শুনানী শেষ হইয়াছে এবং ২১ জন আসামীকেই দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। মামলা এখনও 'বিচারাধীন—অতএব সে বিষয়ে আমরা কোনো মন্তব্য করিতে চাহি না। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য—এই মামলার প্রাথমিক শুনানী জেলের মধ্যে হইল কেন? এইরূপ মামলা তো পূর্ব্ববঙ্গে আজকাল প্রায়ই হইতেছে কিন্তু কোনোটাই তো জেলের মধ্যে হয় নাই। তবে কি বুঝিতে হইবে যে, সরকারও সেখানকার অশিক্ষিত মুসলমান জনগণের নিকট হইতে বিচারের বাধার আশঙ্কা করিয়া জেলের মধ্যে এই বিচার করিতে বাধ্য হইয়াছেন? অন্ততঃ সেখানকার মুসলমানদের মনে এইরূপ ধারণা হওয়া বিচিত্র বা অস্বাভাবিক নহে।

আমাদের মনে হয়, যেখানেই কোনো সাম্প্রাদারিক রঙ্ লাগিয়া যায়, সেইখানেই সরকারের তরফ হইতে অতি সাবধানতা অবলম্বন করা হয় এবং এই অতিসাবধানতার ফলে অসংযত গুণ্ডাশ্রেণীর লোকদের উচ্ছৃঙ্খলতা আরও বাড়িয়া যায় কারণ তাহারা স্বভাবতঃ মনে করিতে পারে যে, সরকার তাহাদের ভয় করিতেছেন।

অবশ্য শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যেই সরকার এই সকল উপায় অবলম্বন করেন মানি কিন্তু আমাদের মনে হয় এই অতিসাবধানতার ফলে অনেকে প্রশ্রয় পাইয়া ভবিষ্যতে শান্তি ভঙ্গ করিতে সাহস পায়।

যেখানে সুশৃঙ্খলায় সুবিচারের জন্য সরকার এই কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন সেখানকার হিন্দু জনসাধারণের অবস্থা কি তাহা ভাবিবার বিষয়।

কোন্ পথে!

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নামে আছে :—

"কৃষ্ণ নাম বল ভাই আর সব মিছে
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।"

ধর্ম্মজগতে হিন্দুর তবু তো কৃষ্ণ নাম আছে কিন্তু রাজনৈতিক জগতে সে যে কি নাম জপিবে তাহা তো বলা কঠিন। কারণ আজকাল যেখানে যাহাই বলা হউক না কেন মুসলমান ভ্রাতৃগণ তাহা হইতে সাম্প্রদায়িক গন্ধ আবিষ্কার করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র কুমার বসু প্রস্তাব করিয়াছিলেন সমবায় বিভাগের কার্য্য-পদ্ধতির তদন্ত করিবার জন্য একটী কমিটী নিয়োগ এবং এই কমিটীতে অধিকাংশ বেসরকারী সদস্য গ্রহণ করা হউক। দুঃখের বিষয় মৌলভী আবুল কাসেম এবং এচ, এস, সুরাবর্দ্দী এই প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িকতা আবিষ্কার করিয়া ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং সরকার ও বেসরকারী তরফ উহার বিরোধিতা করায় প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হয়।

গ্রাম্য কৃষকদের জীবনে সমবায় বিশেষ প্রয়োজনীয়। অন্যান্য দেশে এই সমবায় দ্বারা গ্রামের কি অসীম উন্নতি হইয়াছে তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এ দেশে তাহা হয় নাই এবং হইতেছে না। অতএব এই বিভাগকে সুপরিচালিত করিবার জন্য জনসাধারণের ও সরকারের যত কড়া দৃষ্টি থাকে ততই ভাল—এই কথাটা কাহারও মনে পড়ে না ইহাই দুঃখের বিষয়। যে সকল বেসরকারী সদস্য নরেন্দ্র বাবুর বিপক্ষে ভোট দিলেন, তাঁহাদিগের মনোবৃত্তি বুঝিয়া উঠা দায়।

হিন্দুজাতির যুদ্ধ বিদ্যাশিক্ষা

ডাঃ মুঞ্জে সম্প্রতি হিন্দুজাতির সামরিক শিক্ষা সম্বন্ধে বোম্বাইয়ে একটা সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন। হিন্দু যে সামরিক জাতি ছিল, ভারতবাসী যে এক সময় লড়াই করিতে পারিত—একথা বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ না হইয়াও জানা যায়। অতএব পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বক্তৃতা দিয়া তাহা প্রমাণ না করিলেও ভাল। সামরিক শিক্ষা যে জাতির কল্যাণের জন্য বিশেষ প্রয়োজন সে কথাও অস্বীকার কেহ করিবেন না। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে সামরিক বিদ্যালয় বর্ত্তমান অবস্থায় নির্ব্বিঘ্নে চলিবে কি? সরকারের কি তাহাতে সম্মতি ও সাহায্য থাকিবে। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় আর্থিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য একটী পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য সরকারী ও বেসরকারী সদস্য মিলিয়া একটী কমিটী আহ্বানের জন্য জনৈক বেসরকারী সদস্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন কিন্তু মধ্য প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী সে প্রস্তাবে রাজী হ'ন নাই। অথচ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মত নিরীহ পরিকল্পনা আর কি হইতে পারে? (তবে অবশ্য ঐ কথাটার মধ্যে সোভিয়েট্ গন্ধ আছে) সেখানে একটা সামরিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সম্বন্ধে সরকারের সহযোগিতা পাওয়া যাইবে?

ডাঃ মুঞ্জের এবং বিশেষ করিয়া মালব্যজীর দেশীয় নৃপতিদের উপর বিশেষ প্রভাব আছে। মালব্যজী যেমন তাঁহাদের সাহায্যে বিরাট হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তুলিয়াছেন, তেমনি যদি তাঁহাদের সাহায্যে একটী সামরিক শিক্ষালয় গড়িয়া উঠে তাহা হইলে সত্যকার দেশের কল্যাণ হইবে।

শ্রীবঙ্ক কুমার চট্টোপাধ্যায়

বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র শ্রীবঙ্ক কুমার

রূপতরঙ্গ

বিলাসী

মন্ত্রশক্তি

পরিবেশক—পপুলার পিকচারস।
কথা শিল্পী—অনুরূপা দেবী।
পরিচালনা—সতু সেন।
আলোক চিত্রশিল্পী—সুরেশ দাস।
শব্দ যন্ত্রী—[illegible]।
সুর শিল্পী—কৃষ্ণচন্দ্র দে।
সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ভূমিকা লিপি: রমাবল্লভ—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, [illegible]—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অম্বর—অহীন্দ্র [illegible] রায়, মৃগাঙ্ক—জহর গঙ্গোপাধ্যায়, [illegible]—[illegible] মুখোপাধ্যায়, বাণী—শান্তি গুপ্তা, [illegible] দাস, [illegible]সুন্দরী [illegible] চারুবালা [illegible], [illegible] প্রভৃতি।
প্রথম মুক্তি "উত্তরা", ২২শে আগষ্ট, ১৯৩৫।

সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন "উত্তরা"য় যখন "মন্ত্রশক্তি" দেখতে যাবার জন্যে প্রেস থেকে বেরিয়ে এসে বাসে উঠলুম, মনে বেশ একটু সন্দেহ ছিল যে হয়তো রাত জেগে আর শেষ পর্য্যন্ত দেখতে হবে না ; ইণ্টারভ্যাল পর্য্যন্ত যা দেখবো, তাই হবে আমাদের সমালোচনা লেখার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের সন্দেহ যে অমূলক, মনে পড়লো আবার যখন রাত সাড়ে এগারটার পর বাড়ী ফেরবার জন্যে "উত্তরা"র সামনে বাস ধরলুম। পপুলার পিকচারসের প্রথম ছবি হিসেবে, এক কথায় বলতে গেলে, "মন্ত্রশক্তি" ভাল-মন্দোয় এক রকম বেশ উতরে গেছে বলতে হবে।

"মন্ত্রশক্তি"র গল্প নতুন করে বলার যে কোন দরকার আছে, তা মনে হয় না। "মন্ত্রশক্তি" উপন্যাস হিসেবে আর বাংলার থিয়েটারে অভিনীত হয়ে সকলেরই বেশ জানা হয়ে গেছে। কে না জানে সেই রাজনগরের জমিদারের সুন্দরী দাম্ভিকা মেয়ে বাণীকে, আর কারই বা অচেনা আছে প্রিয় "বন্ধু" অম্বর ও মৃগাঙ্ককে? ঐ দাম্ভিক মেয়েটির শেষ পর্য্যন্ত কতখানি পরিবর্ত্তন ঘটেছিলো, আর অম্বর-মৃগাঙ্ক অবশেষে কেমন করে বন্ধুত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে নিজেদের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলো, তা কি আর নতুন করে জানাবার প্রয়োজন আছে? অম্বরের হিন্দু শাস্ত্রের ওপর চূড়ান্ত আস্থার বলে কেমন করে সে তার জীবনের সায়াহ্নে তার গর্ব্বিতা স্ত্রীকে নিজের করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো তাও বাংলার লোকের কি এখনো অজানা আছে?

পরিচালনা মোটের ওপর মন্দ নয়, তবে হিন্দী ছবির মত "মন্ত্রশক্তি"তে একখানা-কম-এক ডজন গান জুড়ে দিয়ে পরিচালক ছবির গতি অত্যন্ত মন্থর করে ফেলেছেন। পরিচালনায় এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে বড় খুঁত। শ্রীযুক্ত সতু সেন একজন প্রথিতযশা মঞ্চ-প্রযোজক ; সেই জন্যে তাঁর পরিচালনায় জায়গায় জায়গায় বেশ থিয়েটারের ছাপ পড়েছে। আর এতগুলো যে গান দেওয়া হয়েছে, তাও আমাদের মনঃপুত হোল না। গানের সংখ্যা কিছু কমিয়ে দিলে, আমরা মনে করি, ছবিখানির অনেক

চট্টোপাধ্যায় প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা মূলক প্রবন্ধ লিখিয়া ডক্টর অফ্ সায়েন্স উপাধি লাভ করিয়াছেন। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে একটী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। বাঙ্গলার এই উদীয়মান যুবকের সাফল্যে আমরা আনন্দিত এবং আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

উদ্বোধন উৎসব

গত ২৫শে আগষ্ট রবিবার প্রাতে ৮ঘটিকার সময়, স্থানীয় এস, ডি, ও, শ্রীযুক্ত নবগোপাল দাস মহাশয়ের সভাপতিত্বে ট্রেভার হলে বারাসত এসোসিয়েসনের উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। ডাঃ কালিদাস নাগ, ডি-লিট্, ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভা উপলক্ষ্যে মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতাদির আয়োজন হইয়াছিল। পরিশেষে ডাঃ কালিদাস নাগের সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হয়।

অদর্শনের নিদর্শন

গত মঙ্গলবার টাউন হলে কলিকাতা কর্পোরেশন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। সেই সভায় অনুপস্থিত ছিলেন :—

সরকারী ও ইউরোপীয় সভ্যবৃন্দ
ও
পোর্ট ট্রাস্টের নির্ব্বাচিত সভ্য
শ্রীনলিনী রঞ্জন সরকার

উন্নতি হবে। শ্রীসত্তু সেনের এতদিন থিয়েটার ব্যাপারে নাম-যশ থাকলেও, ছায়াছবির রাজ্যে এই তার প্রথম পদার্পণ। তিনি তাঁর প্রথম কাজ যে রকম ভাবে সু-সম্পন্ন করেছেন তাতে তিনি আমাদের প্রশংসা পেতে পারেন।

"মন্ত্রশক্তি"র শিল্পীদের ভেতর একেবারে নিষ্কলা প্রশংসার দাবী করতে পারেন এর আলোক চিত্রশিল্পী শ্রীসুরেশ দাস। তাঁর কাজ দেখে সত্যি আমরা খুব খুসী হয়েছি। আসামের পাহাড়ের দৃশ্য, জল প্রপাতের মনোমুগ্ধকর শোভা, সুন্দর ট্রেন-সট গুলি খুব মনোমুগ্ধকর হ'য়েছে।

শব্দযন্ত্রীর কাজে শ্রীমধু শীল ও তাঁর সহকারীরা তাঁদের খ্যাতি অনুযায়ী কাজ কোরেছেন।

সম্পাদকের কাজ আমরা তারিফ করতে পারলুম না। ছবিখানিতে কাঁচি আর একটু উৎসাহের সঙ্গে তিনি যদি চালাতে পারতেন, তবে ছবিটি অনেক বেশী উপভোগ করতে পারতুম। ছবিখানির মন্থর গতির কথা আগে যা বলেছি, তার অনেকখানি উন্নতি হোত যদি তিনি "মন্ত্রশক্তি"র গানের ওপর কাঁচি হাতে নজর দিতেন।

গানে কেষ্ট বাবুর সুর সংযোজনা

নিন্দনীয় নয়; দু'একখানা তো বেশ ভালোই লাগলো। তবে নেপথ্য সঙ্গীত বিশেষত্ব-হীন। এই ছবিতে নাচ আছে একখানি, নতুনত্ব কিছু না থাকলেও, উপভোগ্য। গীতি রচয়িতারও এই প্রশংসা থেকে কিছু অংশ প্রাপ্য। বাণী-অম্বরের বাসর ঘরে গানের পরিকল্পনাটী চমৎকার।

রসায়নাগারের কাজ মোটের ওপর চলনসই।

এর পরে অভিনয়ের কথা। "মন্ত্রশক্তি"র অভিনেতৃবর্গের ভেতর কেউই খুব বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি বটে, তবে কারুর অভিনয় খুব খারাপ হয় নি। এই ছবিতে শান্তি গুপ্তাকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলতে দেখলুম। "দেবদাসী"তে তাঁকে মনে হয়েছিলো যেন একটি কাঠের পুতুল। কিন্তু "মন্ত্রশক্তি"তে তাঁকে আবার দেখে রক্ত মাংসে গড়া মানুষ বলেই চিনতে পেরেছি। এই ছবিতে শান্তির অভিনয় অনেক উন্নত হয়েছে। রমাবল্লভের ভূমিকায় নির্ম্মলেন্দু বাবু একেবারে ভুলে গেছেন যে তিনি ফিল্মে অভিনয় করছেন,—তাঁর অভিনয় একেবারেই থিয়েটারী চালের। মৃগাঙ্কের অংশে জহর গাঙ্গুলী ভাল অভিনয় করেছেন। অন্দ মন্দো নয়, তবে আরও উন্নত আশা করেছিলাম। কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের আশুনাথ ছোট্ট ভূমিকা হলেও বেশ ভাল লাগলো। শ্রীমতী রাজলক্ষীর অভিনয় অপ্রশংসনীয় নয়। লাইটের তুলসীমঞ্জরী আমাদের আনন্দ দিয়েছে, তবে অতগুলো গান তিনি একা গাইতে অস্বীকার করলে ভালই করতেন। মনোরঞ্জনের ডাক্তার নিখুঁত। রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অম্বর কয়েক জায়গায় যেমন বেশ ভাল লেগেছে তেমনি আবার কয়েক জায়গায়, মনে হোল, ন্যাকামির বাড়াবাড়ি হয়েছে। তাঁকে এ ন্যাকামি বা মেয়েলিপনা ছাড়তেই হবে। তা না হ'লে' তাঁর কাছ থেকে ছায়া-ছবি শিল্পে কিছু আশা করা আমাদের পক্ষে বৃথা হবে।

আর্ত্তের লাগি

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী

আবার এসেছে ছুটে দামোদরে, কি ভীষণ বন্যা!
ভাসায়ে নে গেছে হায়! গৃহস্থের কত, ঘরকন্না।
ক্ষুধিত রাক্ষসী ঐ বিশাল জঠরে
সারা বছরের ধন লইয়াছে হ'রে,
নাই অন্ন ঘরে ঘরে, কোথা রবে নিরাশ্রয় তারা,
বুক ফাটা সেই দুঃখ, বুঝিবে বা কারা?
প্রাণাধিক পুত্র গেছে কারো শিশুকন্যা;
শত শত পশুপক্ষী ভাসাইল বন্যা।
নিভিয়াছে আশাদীপ ভেসে গেছে ঘর
কাঁদিছে মুহূর্ত্ত বসি' কোথা অবসর?
ক্ষুধার তাড়নে, ক'রে ছুটাছুটি, পরণে নাহিক বাস;
সুহৃদ যাহারা তাহাদের তরে দাঁড়াও তাদের পাশ!
তাহাদের লাগি অন্নবস্ত্র, অর্থ ভিক্ষা মাগি;
শ্মশান হইতে মুমূর্ষু পুন উঠুক জীবনে জাগি'!

মোটের উপর, প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে পপুলার পিকচারসের "মন্ত্রশক্তি" মন্দ হয়নি স্বীকার করতে হবে। "মন্ত্রশক্তি"র আখ্যান-ভাগ বাঙ্গালার কাছে খুব প্রিয়; সেইজন্যে 'উত্তরায়' "মন্ত্রশক্তি" কিছুদিন মন্ত্রজাল বিস্তার করে দর্শক আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে—এ রকম আশা করা আমাদের খুব অন্যায় হবে না।

অবশেষে

প্রযোজক—নিউ থিয়েটার্স।

কথা-শিল্পী—সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পরিচালক—দীনেশ রঞ্জন দাস।

শব্দ-যন্ত্রী—লোকেন বসু।

আলোক-চিত্র-শিল্পী—ইউসুফ মূলজী।

সঙ্গীত-পরিচালক—রাইচাঁদ বড়াল।

ভূমিকা-লিপি—দোলগোবিন্দ—অমর মল্লিক, ত্রৈলোক্য—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, অলক—প্রমথেশ বড়ুয়া, শীলা—মলিনা ইত্যাদি।

প্রথম মুক্তি—"চিত্রা", ২০শে আগষ্ট, ১৯৩৫।

কোলকাতার উপকণ্ঠে দুই "রিটায়ার্ড" ধনীর বাস; নাম তাঁদের দোলগোবিন্দ আর ত্রৈলোক্য। এঁদের দুজনের মধ্যে খুবই প্রীতির সম্বন্ধ। তাঁদের ছেলে মেয়ে—দোলগোবিন্দের ছেলে সুপুরুষ যুবক অলক আর ত্রৈলোক্যের মেয়ে সুন্দরী তন্বী শীলা—দু'জনে ভালবাসে পরস্পরকে; বিয়েও তাদের হবে এরকমও অনেকটা ঠিক ছিল। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা, তাদের সাজানো বাগান এক "রামছাগল" এসে করে দিলে ধ্বংস। "অবশেষে" সেই "রামছাগলটী"কে বিদায় দিয়ে তাদের মিলন সম্ভব হোল। এইটুকুই হচ্ছে আসল গল্প, এর সঙ্গে নানা রকম মাল-মসলা মিশিয়ে বেশ একটী চমৎকার হাসির গল্প শেষ পর্য্যন্ত খাড়া করা হয়েছে।

পরিচালক দীনেশ দাস এতদিন আমাদের অবোধ্য তামিল-তেলেগু "বাঙে, তায়ের বাঙে"র রাজ্যে নাম কিনেছিলেন; তিনি যে আমাদের জন্যে এমন হাসির হররা সৃষ্টি করতে পারেন, "অবশেষে" দেখার আগে পর্য্যন্তও বিশ্বাস করতুম না। "অবশেষে" তিনি যে রকম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাতে তাঁর কাছে ভবিষ্যতে আমাদের আরও অনেক বেশী আশা করা দুরাশা নয়। যেখানে ঠিক যেমনটি দরকার, তিনি সেখানে ঠিক তেমনটি দিয়ে চিত্র-নাট্যটীকে বেশ কৌতুহলোদ্দীপক করেছেন; সেইজন্যে "অবশেষে"কে আগাগোড়া দেখতে আমাদের একটুও বিরক্তি হয় না।

দু' রীলের ছোট্ট হাস্য-রসাত্মক ছবি, তাতে গান বা নেপথ্য-সঙ্গীতের বিশেষ কিছু স্থান ছিল না, তবুও যতটুকু এই ছবিতে আমরা পেয়েছি, সবটাই রাই বাবুর উপযুক্ত হয়েছে।

"অবশেষে"র রেকর্ডিং ও ফটোগ্রাফী নিন্দনীয় নয়।

অভিনেতাদের মধ্যে সবচেয়ে আমাদের ভাল লেগেছে দোলগোবিন্দের বেশে মল্লিক মশাইকে। টাইপ-চরিত্র ফুটিয়ে তোলার মল্লিক মশাইয়ের যে একটা নিজস্ব ধারা আছে, তা এই ছবিতে পুরোপুরি বজায় রেখে মল্লিক মশাই আমাদের খুব আনন্দ দিয়েছেন। বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অঙ্গসজ্জা চমৎকার—অভিনয়ও ভাল। মলিনা চঞ্চলা তন্বী শীলাকে আমাদের বেশ উপভোগ্য করে রূপ দিয়েছেন। প্রমথেশ বাবুর অলক মন্দ নয়। ছোটোখাটো ভূমিকা গুলির ভেতর "চাকর" দুজন বেশ চরিত্রোপযোগী হয়েছে।

"অবশেষে"র দৃশ্যপট, সাজসজ্জা নিউ থিয়েটার্সের উপযুক্ত।

ছোট্ট হলেও, নিউ থিয়েটার্সের "অবশেষে" কমিক ছবি হিসেবে একটী সার্থক সৃষ্টি। এর জন্যে পরিচালক দীনেশ বাবু আর নিউ থিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষ, উভয়কেই অভিনন্দিত করি।

নিউ থিয়েটার্স

নিউ থিয়েটার্সের হিন্দি "চণ্ডীদাস" ২৪শে আগষ্ট থেকে বোম্বেতে দেখানো হচ্ছে এবং দর্শকদের খুব ভীড়ই এর সাফল্য প্রমাণিত করেছে।

* * *

আসছে মাসের মাঝামাঝি "ব্লাড ফিউড" কলকাতায় মুক্তিলাভ কোরবে।

* * *

"ভাগ্যচক্রের" কাজ শেষ হ'য়ে এল; কর্তৃপক্ষ স্থির করেছেন হিন্দি ও বাংলা, দু সংস্করণই, সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগ থেকে কলকাতায় দেখানো হ'বে।

* * *

বড়ুয়ার নতুন বই "বামুনের মেয়ে"র কাজের জল্পনা চলেছে।

নতুন চিত্র-গৃহ

সারণের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এন, দাসের পৌরহিত্যে কাছারী ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী কালীবাড়ী ষ্টেসনের সন্নিকটে হাউসের "লক্ষ্মী টকী" দ্বারোদ্‌ঘাটন হ'য়েছে। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

"ছায়া"য় "স্কার্লেট পিম্পার্নেল"

ফরাসী বিপ্লবের ঘোর দুর্দ্দিন। স্কার্লেট পিম্পার্নেল একটী তরুণ সম্প্রদায়ের নেতা। সাধারণ-তন্ত্রবাদী বিপ্লবীদের হাত থেকে ফ্রান্সের ধনীদিগকে গোপনে উদ্ধার করাই

তাদের কাজ। রোবাস্পিয়ারী সিভোলিন্‌কে ডাকিয়ে তাকে সাবধান করে দিলেন যদি সে স্কার্লেট পিম্পার্ণেলকে শীঘ্র বন্দী না করতে পারে সাধারণ-তন্ত্রীদের হাতে তাঁর মৃত্যু অনিবার্য্য। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি পিম্পার্ণেল তখন লণ্ডনের যুবরাজের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত। সেখানে তাঁর ছদ্মনাম পার্সি সার্ ব্লাকেনী। এই আধপাগল বিলাসী ব্যক্তিটী যে সেই সুবিখ্যাত পিম্পার্ণেল একথা তাঁর পত্নীও কখন সন্দেহ করতে পারেন নি।

লেডী ব্ল্যাকেনী ভ্রাতার প্রাণ দণ্ডের ভয়ে পিম্পার্ণ্যাল লীগ সম্বন্ধে সংবাদ প্রেরণ করেন ও পরে স্বামীই পিম্পার্ণ্যাল জানিয়া স্বামীর প্রাণ রক্ষার্থে ফ্রান্সে গমন করেন। সেই মুহূর্ত্তে পিম্পার্ণ্যালকে হত্যা চেষ্টা ও পিম্পার্ণ্যালের সস্ত্রীক অন্তর্দ্ধানের রহস্যময় কাহিনীতে এর পরি সমাপ্তি।

কালী ফিল্‌ম্‌স

শ্রীদেবকী বসু বোম্বাই থেকে ফিরে 'কালী ফিল্মসে' যোগদান কোরেছেন। এখানে তিনি "নিমাই সন্ন্যাস" ছবি তুলবেন। অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এই চিত্রে সুর-সংযোজনা কোর্‌বেন।

* * *

শ্রীতুলসী লাহিড়ী "মণিকাঞ্চন (২য় পর্ব্ব) তোলায় ব্যস্ত আছেন।

* * *

"প্রফুল্লে"র কাজও ধীরে ধীরে এগুচ্ছে।

* * *

'উত্তরা'-য় "বিদ্যাসুন্দরে"-র ট্রেলার দেখানো হচ্ছে—ছবিখানি আগতপ্রায়।

রাধা ফিল্ম

চিত্ররাজ্যের জনপ্রিয় শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে "কৃষ্ণ-সুদামা"-র কাজ অর্দ্ধেক শেষ হ'য়েছে। সুদামার কৃষ্ণের প্রাসাদ ত্যাগের দৃশ্য তোলার পর কৃষ্ণজন্মের শোভাযাত্রার দৃশ্য তোলার বিশেষ তোড় জোড় চলেছে। এই চিত্রে প্রায় তিন শ' বাড়তি অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্মিলনের একটি বৃহৎ দৃশ্য তোলা হবে।

* * *

"কণ্ঠহারে"-র কাজও অন্য সেটে চলেছে। আপাততঃ এই ছবির পুলিশ আউট পোষ্ট—যেখান থেকে হত্যা সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয়, সেই দৃশ্য তোলা হ'চ্ছে।

* * *

এদের উর্দ্দু ছবি "ওয়ামক্ এজ্‌রা" কেন-বার জন্যে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে মোটা মোটা টাকার 'অফার' আস্‌ছে। ছবিখানিকে বড়দিনের পূর্ব্বে কোলকাতায় মুক্ত করবার জন্য চেষ্টা চল্‌ছে।

* * *

"মানময়ী গার্লস্ স্কুল" ষোল হপ্তায় পড়লেও এখনও বেশ দর্শক সমাগম হ'চ্ছে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া

শ্রীজ্যোতিষ মুখুয্যে "পথের শেষে"-র আনুষঙ্গিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

* * *

গুল হামিদের "খায়বার পাশ"এর কাজ ধীরে ধীরে এগুচ্ছে।

মহানিশা ফিল্মস্‌

'রঙমহলে'-র আর একটি 'ইউনিট' এই নামে বড়ুয়া ষ্টুডিওতে "মহানিশা" তুল্‌ছে।

ছবিখানার পরিচালক হ'চ্ছেন শ্রীনরেশ মিত্র। শব্দযন্ত্রী ও আলোক শিল্পীর কাজ কোর্‌ছেন শম্ভু সিং ও শ্রীঅশোক সেন। রঙমহলের শিল্পীরা যাঁরা এই নাটকে নেমেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই চিত্রে আত্মপ্রকাশ কোর্‌বেন। এই ছবির কর্ণধার হ'চ্ছেন শ্রীশিশির মল্লিক। মল্লিক মশাই একজন করিৎ-কর্ম্মা লোক। আশা করি, সকলের সমবেত চেষ্টায় ছবিখানি সাধারণের মনোরঞ্জনে সমর্থ হবে।

চিন্তাকণা

৺ স্বর্ণলতা দেবী

প্রেম ও কর্ত্তব্য

প্রেমের স্বভাব শান্ত, সুন্দর, আনন্দময়। কোথাও সঙ্কোচ নেই, কোথাও জটিলতা নেই—অনাবিল সরল সুগম পথ। প্রেমিকের দুঃখ নাই, শোক নাই, মান নাই, অভিমান নাই, আনন্দ-সুধা পানে মত্ত বিভোর। তাচ্ছিল্য, অবহেলা, ঘৃণা এ সকল তার পরিপূর্ণ প্রাণের কোথাও এক বিন্দু স্থান পায় না। নির্ভীক, বাহ্যিক বিষয়ে প্রেমিক একেবারে উদাসীন। আহার, নিদ্রা এ সকলের দাস তিনি নহেন পরন্তু—সমস্ত সংসারই তাঁহার বশীভূত। সমস্ত ইন্দ্রিয় নিচয় তিনি জয় করেছেন। অতএব বাহ্য-জগৎ এবং অন্তর্জগৎ সকলই তাঁহার অধীন।

প্রেমের কাছে কোন কর্ত্তব্য নাই। প্রেম কর্ত্তব্যের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বেড়াতে পারে না। কর্ত্তব্য যে কাজ জোর করে করায় প্রেমের তাহাই স্বতঃসিদ্ধ। প্রেম পূর্ণ আনন্দময়। সেই আনন্দ থেকেই সে সকল কাজ ক'রে থাকে আর সেই জন্যই কোন কাজেই তার ভার বোধ হয় না এমন কি সে যা করে অনেক সময় তাহা তার অজ্ঞাত থাকে। কিন্তু কর্ত্তব্য নিয়ে যারা কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়ায় তাদের পিঠের ভারটা বড় বেশী,

---

"রূপবাণী"

রাজপুত বীরত্ব-বৈভব পূর্ণ রাজস্থানের অপূর্ব্ব আলেখ্য "বিদ্রোহী" ও তৎসহ হাসির ফোয়ারা "রাতকানা" আস্‌ছে শনিবার থেকে পঞ্চম হপ্তায় পড়বে। ছবিখানা দেখবার জন্যে 'রূপবাণী'র সামনে অগণন দর্শক সমাগম দেখলেই ছবিখানার জনপ্রিয়তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

সময় সময় তার চাপে সমস্ত মনটা তাদের অবসাদে ভ'রে যায়। সেইজন্য কর্ত্তব্য শেষ চায়, সমাপ্তি চায়, বিশ্রাম চায়, প্রেম কিন্তু তাহা চায় না। প্রেমের গতি অবিশ্রান্ত বিরামহীন। ভারহীন উন্মুক্ত গতিটুকু তার সীমা ছাড়িয়ে অসীমে মিলাতে চায়।

এক ও বহু

আমরা একা হই কখন? যখন আমরা আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে দূরে অবস্থিতি করি তখনই মনে হয় একা আছি। সত্যই কি তাই? বহু দূরে নির্জ্জনে সঙ্গীহীন অবস্থায় নিজেকে অত্যন্ত একা মনে হয়। তখন স্নেহময়ী জননীর জন্য স্নেহময় পিতার জন্য ব্যথার ব্যথী বন্ধুদের জন্য এবং অন্যান্য প্রিয় আত্মীয় স্বজনের জন্য সারা মন-প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। তারপর যখন তাদের কোলে আসি, তখন প্রাণটা আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে যায়, আর নিজেকে একা মনে হয় না। কিন্তু এ আমাদের মহাভুল যে, ইহাই আমাদের দুর্ব্বলতা। আমরা এত অক্ষম যে, নিজের ভার নিজে বহন ক'রতে পারি না। আমাদের অন্তরের বেদনারাশি, আমাদের প্রতিদিনকার সুখদুঃখের বোঝা আনন্দমনে আমরা মাথায় তুলে নিতে পারি না। তাই অপরকে ডাকি, নিজের বোঝা পরের ঘাড়ে চাপিয়ে ভার লাঘব করি। আমাদের প্রেম দুর্ব্বল তাই প্রেমময়ের দেওয়া সুখদুঃখ বেদনা-যন্ত্রণা হ'তে আমরা মুক্ত হ'তে চাই—অর্থাৎ তাকে এড়িয়ে পালাতে চাই। আমরা যখন একা থাকি, সকলের স্নেহ আদর থেকে দূরে গিয়ে যখন আমাদের নির্জ্জনে দিনগুলো কাটে তখন আমাদের চিন্তারাশি যে সমস্ত বিশ্বভুবনকে বেঁধে প্রাণের মধ্যে টেনে এনে আপনাকে পরিপূর্ণ করে তা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু তখনই আমরা পরিপূর্ণ হই, তখনই আমরা প্রকৃত উদার সরল, বহুর সঙ্গে তখনই আমরা মিলিত হই। আর যখন বহুর কোলাহলে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে তাদের আদর স্নেহে যত্নে আপনার স্বরূপ ভুলে যাই, তখনই আমরা সমগ্র বিশ্বের মাঝে একা হই। তখনই আমরা প্রকৃত নিঃসহায় ও দুর্ব্বল। আমাদের বিরাটশক্তি, অতুল প্রেম তখন লুকিয়ে পড়ে। স্নেহ-মমতা আদর যত্নের কোলাহলে আমাদের সমস্ত প্রাণ চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। মিলন তখন সুদূরে—জনতার ভিড়ে তখন আপনাকে আপনিই খুঁজে পাই না।

—

ছিটে ফোঁটা

শ্রীবজ্রবাহু

মাসিক বসুমতীর শ্রাবণ সংখ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (!) কবিতা শ্রীঅপূর্ব্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের। অপূর্ব্ব কৃষ্ণ এবারে এক আত্মীয়াকে নিয়ে পড়েছেন যিনি—"ধরণীর পথ প্রান্তে অতি সঙ্গোপনে" কাছে আসেন। তাঁকে ডেকে অপূর্ব্ব কবি (!) বলছেন (কানে কানে নয়) "পর্শে তব মুঞ্জরিল জীর্ণ পুষ্পদল।" জীর্ণ পুষ্পকেও যিনি মুঞ্জরিত করতে পারেন তিনি নিশ্চয়ই ভেল্‌কি জানেন। পুষ্পদল আবার কোথায়?—না, "অন্তরের মৌন বীথি মাঝে।" বীথি, তাও আবার মৌন!

* * *

"পুলকের অলক্তকে প্রেমের প্রাঙ্গন দীপ্যমান" মানে রোমাঞ্চের শিহরণের যে আলতা তাতে দীপ্যমান!—তাও আবার "হাসে দুর্ব্বাদলে!" (বক্ষোপরে নয়?) পাঠক ভয় পাবেন না। আবার আত্মীয়াকে দেখে "কামনার স্রোতস্বিনী ছুটে!" সে কেমন আত্মীয়া?—

—না "আত্মার আত্মীয়া!" সে "মাল্য দিলে পরম কৌতুকে"—"প্রণয়ের সত্য-প্রীতি পুষ্প সম ফোটে সুরভিত এই দীন বুকে।" এততেও কবির বুক দীর্ণ? তবে ক্ষুন্ন হবে কীসে?—এর পর আছে "সৃজনের বীজ নিদ্রা।" ফুটনোটে বীজ নিদ্রার কথার মানে দেওয়া উচিত ছিল। উপমা দেবার শক্তি নেই, মানে করবার সামর্থ নেই, শুধু কতকগুলো অসাড় শব্দ পর পর সাজিয়ে যারা কবিতা লিখ্‌তে চায়, কবি যশঃপ্রার্থী তারা যে উপহাসিতই হয় একথা সংস্কৃত শ্লোকে আছে, একান্ত যারা সেই সব রাবিশ ছাপায়, তাদের সম্বন্ধে কী কিছু নেই?—

* * *

সম্প্রতি বালীগঞ্জের লেকে যে একজোড়া যুবক যুবতী হতাশ প্রেমিক ও প্রেমিকা) এক সঙ্গে আত্মহত্যা করেছে—তাদের ছবি ছাপা হয়েছে একটি কাগজে। দু'লাইন কবিতা quote করা হয়েছে তলায় নাম দেওয়া হয়েছে 'মৃণাল'। কোনদিন হয়ত আমরা দেখবো কোন কোটেশনের তলায় লেখা রয়েছে 'তিন কোড়ে।'
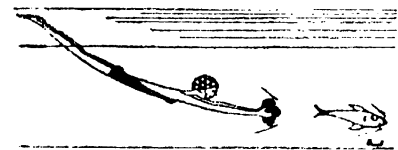
BLAZING A NEW TRAIL OF SPECTACULAR GLORY !

Aurora Film Corporation

presents

AH-E-MAZLUMAN

Or

Wailings OF THE Oppressed

a New Tonfilm Productions

Next Change At

NEW CINEMA

The Popular Picture-Resort.

Spectacle

The Earthquake
Bewitching Dances
Drama of Real Life

The Love Of A True Wife Lifted Him To Paradise............Was Adored By All......He Met A Siren....Was Hurled Back To Hell ..Was Spurned By All

............*Why*———!

■ ■ *Featuring* ■ ■

A. KABULI
AZMAT BIBI
Miss INDUBALA

অমরেশ ও মীনা

শ্রীলক্ষ্মী মিত্র

নাটক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সুরমা—না না, আর কারুর ভালোবাসার উপর তোমায় জোর কর্ত্তে যেতে হবে না। আমিই সব করে দোব। আমি কর্ব্ব নাতো কর্বে কে? তুমি শুধু সেই দিনের মতোই চুপটি করে ব'সে থাকো—সেই পাঁচবছর আগের প্রথম মিলন দিনটির মতো। সেদিন ঘর সাজিয়ে দিয়েছিলাম নিজের হাতে আমি। আজও, আমিই দোব!

(এই বলিয়া সুরমা মীনার অশ্রুসিক্ত মুখখানি দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া প্রীতিজ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিল। মীনা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল ক্ষণকাল, টেলিগ্রামখানি আর একবার সে পড়িল এবং কি ভাবিয়া অবশেষে যুক্তহস্তে কাহার উদ্দেশে চোখ বুজিয়া প্রণতি জানাইল: প্রবেশ করিল প্রকাশ)

মীনা—(চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি! আবার!

প্রকাশ—হ্যাঁ আমি। আবার আমি!

মীনা—সুরমা! দলবীর!—সুরমা!

প্রকাশ—কেউ শুনতে পেলেনা। গলাটা একেবারে চাপা। ডাকো, ডাকো আরও চেঁচিয়ে ডাকো।

মীনা—আপনি—আপনি এখানে আবার কেন এসেছেন? আমি প্রাণপণে আপনাকে ভুলে যেতে চাচ্ছি—

প্রকাশ—প্রাণপণে আমায় ভুলে যেতে চাচ্ছ! আমায়!

মীনা—না না! আমি কি বলছি বুঝতে পারছি না!

প্রকাশ—কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি।

মীনা—কি আপনি বুঝতে পেরেছেন?

প্রকাশ—যে আমায় ভুলে যেতে তোমায় প্রাণপণ কর্ত্তে হ'য়েছে। নিয়োগ কর্ত্তে হ'য়েছে তোমার সমস্ত শক্তি আমায় ভুলে যেতে! বিনা-আয়াসে তুমি আমায় ভুলে যেতে পারনি, পারনা!......এই অমৃতময় বাণীটুকু আমার চিরকালের হ'য়ে থাক্। এই আমার গৌরব, এই আমার triumph!

(প্রকাশ প্রস্থানোদ্যত কিন্তু সহসা ফিরিল)

হ্যাঁ, হ্যাঁ—একটা কথা কি ব'লতে এসেছিলাম, না ব'লেই চ'লে যাচ্ছি। এমনই excitement যে সব ভুলে যেতে বসেছি!

(স্তব্ধ ক্ষণকাল)

মনে প'ড়েছে। আমি তোমায় নিমন্ত্রণ কর্ত্তে এসেছিলাম। আমার বিবাহ!......

(প্রকাশ একতাড়া রঙিন খাম বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল)

মীনা—বিবাহ!

প্রকাশ—হ্যাঁ—! মনে কোরেছিলাম্ এ সবের ভেতর আর মাথা দোবনা, কিন্তু ওরা ছাড়লে না।......

ছোট্ট একটি মেয়ে। বয়স বোধকরি চোদ্দ'র বেশী হবে না। লেখাপড়াও অল্পস্বল্প জানা আছে, 'কথামালা' শেষ ক'রে 'বোধোদয়' ধ'রেছে।—ওকি! খামখানার দিকে অমন ক'রে চেয়ে রইলে কেন? পড়বে পত্রটা?—এই নাও।

(একখানি খাম তুলিয়া লইয়া মীনার হাতে দিল)

অমন শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলে চ'লবেনা। প'ড়ে দেখ। তুমি প্রাণপণে যাকে ভুলে যেতে চাচ্ছ, প্রাণপণে তাকেই মনে রাখতে আসছে ঐ বালিকাটি যার নাম ওখানে সোনার অক্ষরে লেখা। সে হয়তো স্বর্গের সুষমা আমার হাতে তুলে দিতে আসবে এবং শিবের মতন হয়তো পূজোও কর্বে, কিন্তু আমি—আমি তাকে কি দিয়ে তার ভালোবাসার মূল্য দোব ব'লতে পার?

মীনা—না, আমি ব'লতে পারি না।

প্রকাশ—আমিও ব'লতে পারি না! অথচ, আশ্চর্য্য দেখ, এ ছাড়া আর আমার পথই রইল না!

মীনা—কিন্তু বিয়ে করে যাকে নিয়ে আসবেন তাকে ভালবাসার সঙ্গতি থাকবেই বা না কেন?

প্রকাশ—সরল প্রশ্ন বটে! কিন্তু ভুলে গেছ অতীতের স্মরণীয় দিনগুলি?...... তোমার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তোমাদের বাগানের এক সুরভিত মিলন বিথিকায়! পাশেই ছিলো ভেনাসের Statue, দূরে ছিলো ঝরণা!......সেই থেকে কতোদিনের কতো অসংখ্য রোমাঞ্চকর ঘটনা—যা ভুলে যাওয়া মানে জীবনের সমাধি!

মীনা—সে থাক্, আপনি নিরস্ত হোন—আমি শুনতে চাই না......

প্রকাশ—কিন্তু আমি না বলে পারবো না। আমার আজ মনে পড়ে লেকের ধারে নিরালা বেঞ্চেতে বসে আমরা দুজন; কেউ কোথাও নেই—মাঝে মাঝে শুধু মোটরের হর্ণ কাণে আসে! গ্লোবের বক্সে বসে সেই ছবি দেখা 'It happened one night'! সেই ডায়মণ্ডহারবারে পিকনিক্, সেই মোটর-লাঞ্চে করে বারাকপুরের রেস্, সেই—

মীনা—জানি, জানি—সব জানি। সব আমার মনে আছে। সমস্ত! কিন্তু আপনি থামুন!......

প্রকাশ—মনে থাকবেই, ভুলতে পারবে না। এখন বলতো, পৃথিবীর আর কোনও স্ত্রীলোককে ভালোবাসার সঙ্গতি আমার থাক্‌তে পারে কিনা?

মীনা—তা যদি না পারে, তা'হলে বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র ছাপিয়ে, রঙ্গিন্ কাগজ খানা আমার হাতে পৌঁছে দিতে এসেছেন কি আমায় অপমান কোরতে?

প্রকাশ—তোমার অপমান!

মীনা—হ্যাঁ। শুধু তাই নয়। বিবাহ ক'রছেন আপনি এমন এক শিক্ষাহীনা বোধোদয় পড়া বালিকাকে যা আপনার মতো লোকের একেবারেই অনুপযুক্ত। এতো শিক্ষিতা মেয়ে থাক্‌তে কেন যে আপনি ঐ মেয়েটিকেই পছন্দ কোরতে পেরেছেন, তা কি আমায় বুঝিয়ে ব'লবেন?

প্রকাশ—তা আমি নিজেই জানি না মীনা।

মীনা—আপনি জানেন, এবং যদি বলি আমিও জানি,—আশ্চর্য্য হবেন না।

প্রকাশ—তুমি জানো!

মীনা—হ্যাঁ জানি। আপনি ভেবেছেন শিক্ষিতা মেয়েদের সঙ্গে অবৈধ প্রেমই করা যায়, বিবাহের পক্ষে তারা নিরাপদ নয়; তাই বোধোদয় পড়া মেয়েটীকে আবিষ্কার কোরেছেন। ভেবেছেন এমন একখানি হৃদয় নিয়ে খেলা কোরবেন যেখানে কালির একটা আঁচড়ও পড়েনি!

প্রকাশ—মীনা! একি অভিযোগ! তুমি হুকুম দাও—শুধু একটি কথা—আমি ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দিই বিবাহের সমস্ত আয়োজন।

মীনা—থাক্। সহৃদয়তার পরিচয় আর দেবেন না। সেদিন আপনি একটা কথা বলেছিলেন, আপনার হয়তো স্মরণ থাকতে পারে। আজ আমি তারই পুনরুক্তি কোর্ত্তে চাই।

(বলিতে বলিতে তাহার চোখমুখ এক অস্বাভাবিক দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল)

আপনি ভেবেছেন এক নির্দোষ শিক্ষিতা নারীকে নির্ম্মম ভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রে দিয়ে চরিত্রবতী অকলঙ্ক স্ত্রীর অঞ্চল ধ'রে নিরুদ্বেগে জীবন কাটাবেন। কিন্তু আমি তা হোতে দেবনা। শান্তি আমি আপনাকে উপভোগ কোর্ত্তে দোব না, কোনওমতে না।—মনে রাখবেন।......

(প্রকাশের হাত-ঘড়িটির দিকে লক্ষ্য করিয়া সহসা বলিয়া উঠিল)

কেন আপনি ঐ ঘড়িটা আবার প'রেছেন, ও কার ঘড়ি? আপনার পরবার কি অধিকার আছে?

প্রকাশ—এ তোমার ঘড়ি। আমি শুধু যক্ষের ধন আগলে র'য়েছি। ফিরিয়ে নাও মীনা, ফিরিয়ে নাও।

(টেলিফোন ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল)

মীনা—টেলিফোন!......কে টেলিফোন করে!

প্রকাশ—থাক্ টেলিফোন। (দ্রুত আসিয়া রিসিভার নামাইয়া রাখিল) ফিরিয়ে নাও ঘড়ি। আমি যক্ষের ধন আগলে র'য়েছি। ফিরিয়ে নাও মীনা, ফিরিয়ে নাও।......

(মীনার মুখ মুহূর্ত্তে পাংশুবর্ণ: প্রবল এক ধাক্কায় সহসা যেন সে সংবিৎ ফিরিয়া পাইল)

মীনা—না, না—এ আমি কাকে কি ব'ললুম! আমি নিজেকে একেবারে ভুলে গেছি। কোথায় কত নীচে আমি নেমে এলুম!—আপনাকে কি কথা আমি ব'লেছি বলুন তো? আমার মুখ দিয়ে কি কথা বেরিয়ে গেছে?......

প্রকাশ—এই ঘড়ি তুমি ফিরে চেয়েছো। এই ঘড়ি!

মীনা—এ কথা মিথ্যা! এ কথা আমি বলিনি, এ আমি ব'লতে পারিনা,—না, না, না!......

(তীক্ষ্ণ করুণ কণ্ঠে মীনা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল এবং দূরের একটা কোচের উপর সবেগে আছাড় খাইয়া পড়িল: প্রবেশ করিল দীপক)

দীপক—একি! এ রকম অবস্থার মানে?

(প্রকাশ স্তব্ধ রহিল, কোন কিছু জবাব দিতে পারিল না)

শুনছেন? আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রছি।

(কথার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন্ রিসিভারটি সশব্দে হুকের উপর বসাইয়া রাখিলেন)

প্রকাশ—আমায় ব'লছেন?

দীপক—হ্যাঁ। ওঁর এ রকম ক'রে থাকবার মানে?

প্রকাশ—সেটা আমি কি ক'রে জানবো?

দীপক—ও, আপনি জানেন না!

(কাছে সরিয়া আসিল)

আপনি এখানে এমন সময়ে কি কোরছেন?

প্রকাশ—মাফ করেন, আপনি জিজ্ঞাসা করবার কে?

দীপক—আমি?

প্রকাশ—হ্যাঁ—

দীপক—অর্থাৎ, এই প্রশ্ন করবার আমার অধিকার আছে কিনা আপনি জানতে চান?

প্রকাশ—ঠিক তাই।

দীপক—অধিকার আমার আছে। না আমি এদের আত্মীয় বলে আমার অধিকার নয়। আমার অধিকার আমি বাঙালী ব'লে। রাস্তার এক লোক এই প্রশ্ন আপনাকে কর্ত্তে পারে, যে আপনাকে চেনে।

প্রকাশ—তার মানে? ব্যাপারটা যে জটিল কোরে ফেললে হে ছোকরা।

দীপক—তা হয়তো ক'রেছি। কিন্তু শীঘ্র বলুন আপনি এখানে কি ক'রছেন? আর কেনই বা ঐ ভদ্রমহিলা ওরূপ অবস্থায়?—বলুন।

প্রকাশ—What! you mean to intimidate me! আমি ব'লবনা।

(প্রস্থানোদ্যত)

ক্রমশঃ

সবুজ মেয়ে

শ্রীসমর লাহিড়ী

তখন রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গিয়েছিল।

পড়া ছেড়ে উঠে পড়লাম। সাধারণতঃ এত রাত পর্য্যন্ত আমি পড়ি না, এবং কখনও পড়িনি; কিন্তু এবার ব্যাপারটা ঘটেছে একটু উল্টো রকমের। সারা থার্ড ইয়ারটা' তো নো ক্লিয়ার করে কেটেছেই, উপরন্তু সেকেণ্ড ইয়ারটাও তা থেকে বাদ পড়েনি; কাজেই এখন সবটা পুষিয়ে দিতে হ'চ্ছে সুদে আসলে। সমস্ত সাব্জেক্টই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে গ্রীক। বিশেষতঃ লজিকের তো আগাগোড়াই দাঁড়িয়েছে "ফ্যালাসি" হ'য়ে। কাজেই কতকগুলো বাছা বাছা প্রশ্ন—অতি বিস্বাদ ওষুধের মত, নিতান্ত অনিচ্ছায় গিলতে হ'চ্ছে। কি আর করা যায়; নান্যপন্থা—একেবারে ক্লীন্ ফেল করা ছাড়া। কিন্তু পাশ আমাকে কোরতেই হবে, যেমন কোরেই হ'ক। বিশেষ কোন কারণে নয়, শুধু এই জন্যে যে—আমি কখনও ফেল হইনি। কাজে কাজেই চলেছে প্রায়শ্চিত্তের পালা।

*　　*　　*

ঘড়িতে ঢং কোরে বাজ্‌ল সাড়ে এগারোটা।

ঘড়ির বাজ্‌নাটা এখন আশ্চর্য্য রকম মিঠে শোনাল। শুনেই মন বল্‌ল—যথেষ্ট হয়েছে, আর 'পাদমেকম্ ন গচ্ছামি।' টেব্‌লের ওপোর বইখাতাগুলো ছড়িয়ে রেখেই উঠে পড়্‌লাম। সারা দেহমন ভরে উঠেছিল ক্লান্তিতে, আর শ্রান্ত দুই চোখ বেয়ে নেবে এসেছিল গভীর তন্দ্রা। পোষাক বদ্‌লে, হাতমুখ ধুয়ে গেলাম শুতে।

একটা সিগ্‌রেট্ ধরিয়ে নিয়ে, ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিলাম সাদা, নরম বিছানাটার কোলে। আঃ! বিছানাটা কি নরম, আর কি সুখস্পর্শ! শরীরের অর্দ্ধেক ক্লান্তি বিছানাটার নিবিড়ঘন স্পর্শের মধ্যে হারিয়ে গেল। চিৎ হ'য়ে উপুড় হ'য়ে, পাশ ফিরে নানারকম ভাবে বিছানাটাকে অনুভব কোরতে লাগ্‌লাম—সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে।

যে গভীর তন্দ্রার ভাবটা এসেছিল, শোয়ার পর অনেকটা হাল্কা হ'য়ে গেল; স্বপ্নঘন হ'য়ে উঠ্‌ল মনটা। মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল সারাদিনের নানান ঘটনার টুকরোগুলো। নিতান্ত হাল্কা চিন্তা, ভাসা চিন্তা, ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, টুকরো টুকরো চিন্তা। ভীড় কোরে আসতে লাগ্‌লো তারা মাথার ভেতর। ক্ষণস্থায়ী চিন্তা—ভেসে বেড়ানো হাল্কা মেঘের মত; একটার পর একটা, আসে আর পালায়; কোন গুরুত্ব নেই এদের ভেতর, নেই কোন দুর্ভাবনা। শুয়ে শুয়ে ঘুম আসার পূর্ব্বের এই চিন্তাগুলো লাগে ভারি মজার। এগুলোকে চিন্তা না বলে, বলা উচিৎ স্বপ্ন—জেগে স্বপ্ন দেখা; স্বপ্নের মতই অলীক এরা—আর অদ্ভুত। দিনের আলোয় ভাব্‌তেই পারা যায় না এদের কথা—রাতের অন্ধকারে ব'য়ে আনে এরা স্বপ্নের রেশ মনের কোনে। ঘুমের আগে মনটাকে নিয়ে এই হাল্কা খেলা খেল্‌তে বেশ লাগে—ভারি মজার, আর ভারি আরামের।

*　　*　　*

জানি না কতক্ষণ ছিলাম এভাবে।

হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝলক হাসির আওয়াজ ভেসে এসে চম্‌কে দিলো। চিন্তার টুকরোগুলো বাতাসে তাড়া খাওয়া ভাঙ্গা মেঘের মত, পালাল ছুটে এদিক সেদিক। আমাদের বাড়ীর কএকখানা বাড়ী বাদে যে বাড়ীখানা কিছুদিন থেকে খালি পড়েছিল, সেই বাড়ীটা থেকেই হাসির আওয়াজ এসেছিল। আমাদের বাড়ী থেকে ও বাড়ীটার দোতলার ঘরগুলো সবই দেখা যেত। সেদিকে চেয়ে দেখি, আমার ঘরের দিকে মুখ করা ও বাড়ীর একটা ঘরে অনেকগুলি মেয়ে র'য়েছে—

তাদেরই হাসির আওয়াজ। নানান বয়সের, নানান পোষাকের মেয়ের আসা-যাওয়ায় দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন ঐ ঘরে নানান রংএর বেলুন ভেসে বেড়াচ্ছে: উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিক আলোয় ওদের নানান রংয়ের সাড়ীর বাহার, এই দূরত্বের বাধা ভেদ কোরেও আমার চোখকে আনন্দ দিতে কৃপণতা কোরছিল না।

একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম যে ও বাড়ীতে একটা বিয়ে ছিল। ও বাড়ীটার সামনে দিয়ে যাতায়াত কোরবার সময় গত কয়েকদিন ধ'রেই দেখেছি অনেক লোক যাতায়াত কোরছিল। ছাদে আর উঠানে যে হোগ্‌লা ছাওয়া হয়েছে, এমন কি গেটে যে ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্‌-এর 'স্বাগতম' টাঙ্গান হ'য়েছে, কলেজ থেকে ফেরবার পথে আজ তাও লক্ষ্য কোরেছিলাম। বাজ্‌নার আয়োজন না থাকাতেই বিয়েটাকে ভোলা এত সহজ হয়েছিল।

ঐ জান্‌লাটার দিকেই চেয়েছিলাম।

চেয়েছিলাম বটে, কিন্তু ঐ চাওয়ার পেছনে মনটাকে নিযুক্ত কোরতে পারিনি। এক সময় মনটা সজাগ হ'য়ে উঠতে দেখি—ঐ ঘরে মাত্র একটী মেয়ে আছে। দূরত্বের ব্যবধান এড়িয়ে যতটুকু চোখে পড়্‌ল, তাতে মনে হ'ল যেন মেয়েটি অবিবাহিত। তবে বয়স যে ওর যৌবনের পথে কিছু এগিয়েই পা বাড়িয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ জাগেনা; বয়স ওর পনেরো থেকে কুড়ীর মধ্যে যে কোন সংখ্যাটা হ'তে পারে। পরনে ছিল ওর উজ্জ্বল সবুজ রংয়ের সাড়ী! রং ফরসা থাকায়, সবুজ সাড়ীটায় ওকে মানিয়েছিল সুন্দর। দূরত্বের বাধা অতিক্রম কোরেও আমার চোখ দুটো ওর যে পরিচয় সংগ্রহ কোরেছিল—তাতে ওকে সুন্দরী বল্‌তে দ্বিধা হয় না। হাব্‌ভাবে বেশ একটু আল্‌ট্রা-মডার্ণ দলের মেয়ে বলেই বোধ হ'ল।

বোধহয় অনেকক্ষণের ব্যবহারে গিয়েছিল ওর সাড়ীটা আল্‌গা হয়ে, তাই ও গুছিয়ে নিচ্ছিল। ওসময় ওদিকে চেয়ে থাকাটা যে নিতান্ত ভদ্রতা সঙ্গত নয় বা রুচি সঙ্গত নয়, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম, আর তা বেশ ভাল ভাবেই; কিন্তু চোখ তা চায় না মানতে কিছুতেই, বলে—এখন তার যা বয়স, তাতে এগুলোকে সে অসঙ্গত বলে বিবেচনা করে না। আচ্ছা অবুঝ, আর পাগল! এই সময় কতকগুলো মেয়ে সে ঘরে ঢুকে পড়ায়, সবুজ মেয়েটি উঠ্‌ল একটু চম্‌কে, তাড়াতাড়ি নিলো কাপড় গোছান সেরে। কিছুক্ষণের জন্য ঘরে একটা সোরগোলের সৃষ্টি কোরে, যেমন আচমকা তারা এসেছিল তেম্‌নিই হুড়মুড় কোরে তারা বেরিয়ে গেল—সেই সবুজ সাড়ী পরা মেয়েটিও।

আন্‌মনে চেয়েছিলাম ঐ জান্‌লাটার দিকে। ক্ষাণিক পরে দেখি, সবুজ মেয়েটি আবার এসেছে ঐ ঘরে। এবারেও ছিল

একা। সমস্ত সাড়ীটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ও দেখে নিলো সেটা ঠিক আছে কিনা। অতঃপর আল্‌গা হ'য়ে মুখের ওপর এসে-পড়া চুলগুলোকে ও চট্‌পট্ গুছিয়ে নিলো। ঘরে বোধহয় একখানা আয়না ছিল, তার দিকে লক্ষ্য রেখেই ও আরো কএকটা ছোট খাট প্রসাধন ক্রিয়া সেরে নিলো। ভাবলাম, আগেরবার অসময়ে মেয়েরা এসে পড়ায়, যে প্রসাধন-ক্রিয়াটা গিয়েছিল মাঝ পথে থেমে, এবার সেটা হ'ল সম্পূর্ণ। প্রসাধনের পালাটা শেষ হওয়ার পরও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বেশ ভালভাবে দেখে নিয়ে, মেয়েটি ব্যস্তভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

একবার বাধা পাওয়ায় ঘুমটা আর সহজে আসতে চাচ্ছিল না। উঠে বাথ্‌রুমে ঘুরে এলাম। অতঃপর এক গ্লাস জল খেয়ে, একটা সিগরেট্ ধরিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম! চোখ গেল ও বাড়ীর জান্‌লার দিকে। দেখি, সবুজ মেয়েটি আবার কখন এসেছে ঐ ঘরে; এবারেও ও ছিল একা। আবার আরম্ভ হ'য়েছে ওর প্রসাধনের পালা। যেদিকে আয়নাটা ছিল (অবশ্য এটা আমার অনুমান, কারণ আমার ঘর থেকে আয়নাটা দেখা যাচ্ছিল না), সেইদিকে মুখ কোরে দাঁড়িয়ে, আঙুলের ডগায় রুমালের কোন জড়িয়ে কপাল, চোখের কোল, গাল, গলা, এককথায় সারা মুখখানা—প্রাণপণ যত্নে ঘোস্‌ছে। পাঁচ, ছয়, সাত মিনিট হ'য়ে গেল, তবু ওর মুখ 'ঘসা-মাজা' আর শেষ হয় না। এই সময় হুড়-মুড় কোরে আবার একদল মেয়ে ঐ ঘরে ঢুকে পড়ল, আর ওদের হৈ চৈ গণ্ডগোলে ঘরটা উঠল ভ'রে। নিতান্ত অপ্রস্তুত সবুজ মেয়েটি নিঃশেষে ওদের মধ্যে মিশে পড়বার চেষ্টা কোরতে লাগল। মেয়েরা কিন্তু অনেকেই বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা। কয়েকজনে যেন কি বল্‌ল ওকে, আর ওদের মধ্যে হাসির বাণ ডেকে উঠলো। বুঝলাম ওকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা চলেছে। কিছুক্ষণ বাদে মেয়েরা যেমন আচম্‌কা এসেছিল, আবার তেমনিই গেল বেরিয়ে—সবুজ মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে।

এরপর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঐ মেয়েটিকে আমি খুব কম কোরে সাত-আটবার ঐ ঘরে আসতে দেখলাম, আর প্রতিবারই কিছু-না-কিছু খুচরো প্রসাধন সারতে দেখলাম। নানারকম খুটিনাটি প্রসাধন—কখন খোঁপাটা, কখন সাড়ীটা, সাড়ীর কোঁচটা, কানের ইয়ারিংটা কিছু-না-কিছু প্রসাধন লেগেই আছে। বার বার মুখ ধোওয়া, অনেকক্ষণ ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ মোছা, পান-খাওয়া, ঠোঁটের পাশ সযত্নে পরিষ্কার করা,—বাদ নেই কিছুই। সবক্ষণই চলেছে ওর প্রসাধন; ওর প্রসাধনের আরম্ভ আছে শেষ নেই। আশ্চর্য্য মেয়ে, অদ্ভুত মেয়ে!...... বুঝলাম প্রসাধন ক্রিয়াটা ওর বাতিক।

* * *

তখন একটা বেজে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকার পর আবার যখন চাইলাম ঐ জান্‌লার দিকে, তখন বেশ একটি আপ-টু-ডেট যুবককে দেখলাম ঐ ঘরে। যুবকটি কাকে যেন কি বল্‌ছিল। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকার পর, আবার যখন চাইলাম ওদিকে, তখন আর যুবকটিকে দেখতে পেলাম না সে ঘরে—দেখলাম সেই সবুজ মেয়েটিকে।

ওর শরীরের আধখানা দেখা যাচ্ছিল, আর আধখানা বাধা পাচ্ছিল দেওয়ালের আড়ালে। কখন ওর শরীরের একটু দোলা, কখন খোঁপার কিছুটা, কখন অনাবৃত হাতটা দেখা যাচ্ছিল। ও যে প্রসাধনে নিযুক্ত রয়েছে একথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ থাকলেও, এবার কিন্তু আমার একটু অন্যরকম মনে হ'ল। সেই যে যুবকটিকে আমি ওঘরে ঢুকতে দেখেছিলাম, তাকে তো আর বেরোতে দেখিনি! আর মেয়েটিরই বা এত ভীতভাবে চারিধারে চাইবার প্রয়োজন কি! অন্যান্য বারে তো ওর মুখে এমন ভয়-চকিত ভাব দেখিনি। আমার মনে হ'ল, ঐ মেয়েটি যে প্রসাধনে নিযুক্ত হ'য়ে নিজেকে ঐ ঘরের মধ্যে আট্‌কে রেখেছে—যেটাকে আমি মনে কোরেছিলাম ওর বাতিক, সেটা শুধু ওর নিরালায় ঐ যুবকটির সাথে সাক্ষাৎ করবার ছল। ব্যস্! আর কি, সব জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেল। বুঝলাম ঐ ছেলেটি ঐ মেয়েটির প্রেমে পড়েছে। মনে লেগে গেল নেশা, রক্ত বইল উদ্দাম, আমি রীতিমত

উত্তেজিত হ'য়ে উঠলাম। বিছানার ওপর উঠে বোসে চোখ দুটোকে জোর কোরে পাঠিয়ে দিলাম—ঐ জানলার ভেতর দিয়ে যতটা দেখা যায় তার চেয়ে আর একটু বেশী দেখতে পাবার আশায়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! চেয়ে চেয়ে চোখ আর ঘাড় টাটিয়ে ওঠা ছাড়া আর কোন লাভই হ'ল না।

* * *

কিছুক্ষণ কেটে গেল।

রীতিমত বিরক্ত হ'য়ে উঠলাম। ঘোমটার আড়াল থেকে নব-বধূর চকিত চঞ্চল চাউনির মত, মেয়েটি একটু কোরে চাউনি দিয়েই দেওয়ালের আড়ালে অদৃশ্য হয়। আর আমার কাছে সবচেয়ে অসহ্য হ'য়ে ওঠে—ঐটেই। আমার বহুক্ষণের আশা পূর্ণ হ'ল,—বিরক্ত হ'য়ে যখন শুয়ে পড়ব ভাবছি।

আবার একদল তরুণী হৈ চৈ কোরে ঘরে ঢুকে পড়ল। সবুজ মেয়েটি উঠল চমকে, গেল ধরা পড়ে। বিছানা ছেড়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম অধীর আগ্রহে, এ'র পর কি ঘটে দেখবার জন্যে।...মেয়েদের হাসি আর থামতে চায় না, ওকে ঘিরে ওরা হাসির বন্যা বইয়ে দিল। এর মধ্যে হাসির যে কি থাকতে পারে, আমি তো ভাবতেই পারছিলাম না। আর সেই যুবকটাই বা গেল কোথায়? আমি রুদ্ধশ্বাসে, অধীর উত্তেজনায় অপেক্ষা কোরতে লাগলাম।

মেয়েটি অতর্কিতে ধরা পড়ার লজ্জায়, আমার আরোও মনে হ'ল ভয়ে, নিশ্চেষ্টভাবে মেয়েদের হাতে আত্মসমর্পণ কোরল। দু-একবার ও যেন কিছু বলবার চেষ্টা কোরল, কিন্তু কে তখন শোনে ওর কথা; সমবেত মেয়েদের উচ্চ চীৎকার আর হাসিতে ওর করুণ, মৃদু স্বর গেল ডুবে। এই সময় ও এদিকে মুখ ফেরায়, আর ওর মুখে উজ্জ্বল আলো পড়ায়, ওর ব্যথা পাওয়া করুণ মুখখানি আমার চোখে ভেসে উঠল। মাঝের দূরত্বের বাধা ভেদ কোরেও, ওর ব্যথার পরিমাণ বোঝা আমার পক্ষে শক্ত হ'ল না। ও যেন আর পারে না, এবার বুঝি ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে!...

এর পরের ব্যাপারগুলো ঘটে গেল অনেকটা স্বপ্নের মত।

একটি মেয়ের উচ্চ চীৎকার কানে এলো—"ঐ যে ওখানে।" বুঝলাম ছেলেটির কথা হ'ল। এতগুলি তরুণীর মাঝে ছেলেটির অবস্থা যে কি দাঁড়াবে, ভাবছি, এমন সময়ে একটি মেয়ে ছোট ছোট কয়েকটা কৌটা, আরো কি কি সব এনে হাজির কোরল। আমি শুধু অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকতে পারলাম। এরপর চলল মেয়েটিকে সং সাজানোর পালা। কেউ কৌটা থেকে সাদা মত কি একটা বার কোরে ওর মুখে ঘসে, পাউডার পাফ হবে বোধহয়, কেউ লম্বা মত কি একটা—বোধহয় লিপ্‌ষ্টিক্, বার কোরে ওর ঠোঁটে লাগায়, কেউ ওর গালে খানিকটা কি রগড়ায়—রুজ কি ক্রীম হ'বে বোধহয়।... এইভাবে চলল ওর শাস্তি। সবাই মিলে ওকে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। কারো মনে নেই মেয়েটির প্রতি এতটুকু সহানুভূতি। আশ্চর্য্য

চাঁদ্‌নী রাতে

শ্রীবিজনকুমার চট্টোপাধ্যায়

কোন্ বনের ওই কোন্ কোণেতে হাস্‌নু-হানা ফুটলো গো।
কোন্ কাননের গোপন ডালে কোকিল কূজন ছুটলো গো!
আকাশ ভরা চাঁদের আলো—
চোখে আমার লাগ্‌চে ভালো,
কোন্ দরদীর কণ্ঠ মিঠে গহীন রাতে ছুটলো গো!
কোন্ বনের ওই কোন্ কোণেতে হাস্‌নু-হানা ফুট্‌লো গো!

বসন্তেরই রঙীন হাওয়া রাঙিয়ে দিলে আমার প্রাণ,
দূর বিমানে কল্প-বনে ফুল-পরীরা করচে গান;
জাগ্‌ছে মনে অনেক কথা,
নেইক' প্রাণে একটু ব্যথা,
দখিণ হাওয়ায় আস্‌চে ভেসে' পাপিয়ার ঐ করুণ তান,
বসন্তেরই রঙীন হাওয়া রাঙিয়ে দিল আমার প্রাণ!

বসোরারই গোলাপ ফোটে আজ্‌কে আমার মনের কোণে—
প্রাণ-সায়রে ঢেউ উঠেছে বইচে মলয় আমার মনে,
ভাস্‌চে চোখে কেবল আলো;—
নেইক' কিছু মলিন কালো,
গুঞ্জরিছে কাজ্‌লা ভ্রমর মুঞ্জরিত কুঞ্জবনে,
বসোরারই গোলাপ ফোটে আমার মনের গোপন কোণে!!

———

ব্যাপার!......মেয়েরাই পারে মেয়েদের প্রতি এতটা হৃদয়হীন হতে। এই সময় একটি মেয়ে এসে কি যেন বলল, আর মেয়েরা একে একে সবাই বেরিয়ে গেল। সবুজ মেয়েটিকেও যাবার জন্যে টানাটানি কোরেছিল, কিন্তু কি একটা ব'লে ও রয়ে গেল।

মেয়েরা চলে যেতেও জান্‌লার কাছে এগিয়ে এলো। এবার ওর মুখটা অনেকটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। ও যে কি গভীর লজ্জা পেয়েছে নিজের ব্যবহারে, আর কি নিবিড় ব্যথা পেয়েছে মেয়েদের আচরণে—ওর মুখ দেখে তা আমার বুঝতে একটুও দেরি হ'ল না। অতর্কিতে ধরা পড়ায় অপ্রস্তুত, ব্যথিত মেয়েটির জন্য সহানুভূতিতে সারা মনটা ভরে উঠল।......কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। তারপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জেগেছিলাম সে রাতে, কিন্তু সেই সবুজ মেয়েটিকে আর আসতে দেখিনি ও ঘরে। পরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই।

সকালে মায়ের ডাকে যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন অনেকখানি রোদ এসে ঘর ভরে ফেলেছে—বেলা নটা বেজে গেছে। মা কপালে হাত দিয়ে দেখতে দেখতে বল্‌লেন, "এত বেলা অবধি ঘুমোচ্ছিস্, শরীর ভাল আছে ত?" বল্‌লাম, "কাল রাতে একটু বেশীক্ষণ পড়েছিলাম।"

"রাতে না পড়ে, সকালে পড়লে কি হয়! সব কিছুই···।" মাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বল্‌লাম, "যা পারব না রোজ রোজ সেই এক কথা বলে লাভ কি। ভদ্রলোকে শীতকালে ভোরে উঠে পড়তে পারে না।" "জগতে তুই-ই এক যা ভদ্রলোক জন্মেছিস্" মিষ্টি-রসে এমনি অনেক কিছু বলতে বলতে মা বেরিয়ে গেলেন। উনি যে কেন রাগেন, ওঁর রাগ দেখলে হাসি পায়, তেমনি ভালও লাগে! রাগতে পারেন না তবু রাগা চাই। আশ্চর্য্য!

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই ও বাড়ীর সেই জানলার দিকে নজর গেল, সঙ্গে সঙ্গে রাতের ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেল। জানলাটা বন্ধ ছিল, কিছুই দেখতে পেলাম না।

* * *

জোরসে চলেছিল পড়া, এমন সময় দেখি বোন বেরোচ্ছে স্কুলে। ওকে ঘরে ডেকে জিজ্ঞাসা কোরলাম, "এই, তুই ওসব ব্যবহার করিস্?"

বুঝতে না পেরে ও জিজ্ঞাসা কোরল, "কি সব?"

বল্‌লাম, "এই লিপ্‌ষ্টিক্, কি রুজ, কি সব তোদের আছে না?"

"না আমি ও-সব ব্যবহার করি না"—ও উত্তর কোরল।

বিশেষ রকম আশ্বস্ত হ'য়ে বল্‌লাম, "আচ্ছা যা।" ও কিছু বুঝতে না পেরে—অবাক হ'য়ে বেরিয়ে গেল।

রাতের কথা, সেই বেচারি অপ্রস্তুত, ব্যথিত মেয়েটির কথায় সারা মনটা উঠল ভরে। পড়া গেল গোলমাল হয়ে, এগজামিনের কথা গেলাম ক্লীন্ ভুলে। আজ সতেরোই নভেম্বর, দোসরা ডিসেম্বর টেষ্ট।

ব্রীজখেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা
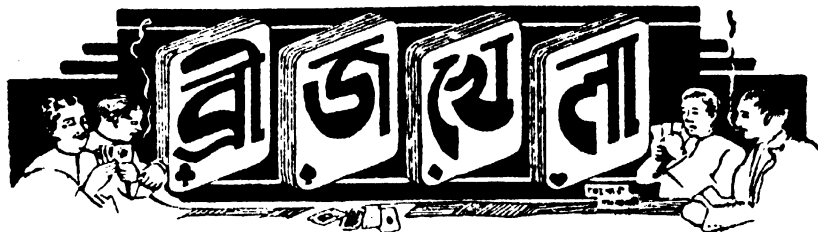
বিগত কয়েকমাস ধরে খেয়ালীর পাঠক-বর্গকে মিঃ কালবার্টসনের The approaching forcing system সম্বন্ধে বিশদভাবে বলে এসেছি। যদিও কালবার্টসনের পদ্ধতি সমগ্র ব্রীজ-জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে তবু ব্রীজমহলে এটিই একমাত্র নয়। ব্রীজ সাধারণে প্রধানতঃ আরও ছয়টি পদ্ধতি চলে আস্‌ছে। সুতরাং যথাক্রমে সাতটি পদ্ধতি হচ্ছে এই,—

1. The approaching forcing system, more frequently called the Culbertson, or Two forcing system.

2. The official system, sometimes called the artificial two clubs system.

3. The one-over-one system in the version frequently called the Sim or Four horsemen's system.

4. The one-over-one system in the version frequently called the Reeth system.

5. The one-two-three system sometimes called the Lenz system.

6. The Vanderbuilt system, sometimes called the One club system.

7. The Boland system, also an artificial club system.

এবার আমরা কালবার্টসনের পদ্ধতি ব্যতীত আরও যে ছয়টি পদ্ধতি প্রচলিত সে কয়টির এক একটি গ্রহণ করে খেয়ালীর পাতায় আলোচনা করব। একটি পদ্ধতির সহিত আর একটির বিভেদ বা সামঞ্জস্য এবং প্রত্যেকটির বিশেষত্ব বিশদরূপে আলোচিত হবে। এ স্থলে অনেকে বল্‌তে পারেন যে সেটি সবচেয়ে উত্তম এবং সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করেছে সেটি আয়ত্ত করলেই যথেষ্ট,—উপরন্তু আরও ছয়টি পদ্ধতি আয়ত্ত করার সার্থকতা কোথায়। তাঁদের অবগতির জন্য বলতে চাই যে যিনি একবার সব কয়টি পদ্ধতির সহিত উত্তমরূপে পরিচিত হয়েছেন তিনিই নির্ব্বিঘ্নে যে কোন খেঁড়ীকে নিয়ে খেলে বিজয়মাল্য অর্জ্জন করতে পারবেন।

পয়েণ্ট গণনাঃ—কিন্তু এই সব পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করার পূর্ব্বে পয়েণ্ট গণনা (Point count) সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া দরকার। কেন না এই পয়েণ্ট গণনা পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি গুলির সহিত বিশেষভাবে জড়িত এই পয়েণ্ট গণনা আর কিছুই নয় মাত্র মূল্য তালিকা থেকে টেক্কা সাহেব প্রভৃতি ফেরাইএর মূল্য নির্দ্ধারণ করে সমগ্র হাতটির মূল্য গণনা। ফেরাইয়ের মূল্য তালিকা হচ্ছে এইরূপ, যথা একটি টেক্কা=৪, একটি সাহেব=৩, একটি বিবি=২, একটি গোলাম=১, দুইটি দশ=১।

এখন এই তালিকা থেকে ফেরাইএর মূল্য নির্দ্ধারণের পর তাসবণ্টনকারীর হাতে যদি ১৩ পয়েণ্ট থাকে তবে তিনি একটি ফেরাইএর ডাক দিতে পারেন। চতুর্থ ব্যক্তির হাতে ১৫ পয়েণ্ট থাক্‌লে তিনি একটি ফেরাইএর ডাক দিতে পারেন। যদি তিনটি রঙে প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে তবে ১৯ পয়েণ্ট নিয়ে যে কোন অবস্থায় দুইটী ফেরাইএর ডাক দিতে পারেন। সব রঙেই প্রতিরোধের শক্তি থাক্‌লে ১৭ পয়েণ্ট নিয়ে যে কোন অবস্থায় দুইটি ফেরাইয়ের ডাক দিতে পারা যায়। ২১ পয়েণ্ট হাতে নিয়ে যে কোন রঙে পিট

ধরার ক্ষমতা থাকলে যে কোন অবস্থায় তিনটী ফেরাইএর ডাক দিতে পারা যায়। দ্বিতীয় বা তৃতীয় হাতে একটি করে পয়েন্ট কম নিয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ ডাক দিতে পারা যায়; অর্থাৎ প্রথম হাত ১৩ পয়েন্ট নিয়ে যত ডাকতে পারবেন, দ্বিতীয় হাত ১২ পয়েন্ট নিয়ে সেই ডাক দিতে পারবেন ও চতুর্থ হাত ১৫ পয়েন্ট এবং তৃতীয় হাত ১৪ পয়েন্ট নিয়ে সেই ডাক দিতে পারেন। তাসবণ্টনকারীর ডাক শুনে তাঁর খেঁড়ী তাঁর হাতের পয়েন্ট গণনা করে তবে ডাক দেবেন। যদি দুইহাত মিলিয়ে মোট ২২ পয়েন্ট হয় তবে দুইটী ফেরাইএর খেলা সম্ভবপর এবং ২৪ পয়েন্ট হলে তিনটী ফেরাইয়ের খেলা হবে আশা করা যায়। এ গেল ফেরাইএর বেলা কিন্তু রঙের বেলা ডাক হবে নিম্নলিখিতরূপ।

১০ পয়েন্ট নিয়ে ডাকদার বা দ্বিতীয় ব্যক্তি একটি রঙের ডাক দিতে পারেন। এবং ১২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় বা চতুর্থ ব্যক্তি একটি রঙের ডাক দিতে পারেন। প্রতিরোধ কল্পে ডাকদারের ডাকের পর যে কোন ব্যক্তি হাতে ৮ পয়েন্ট নিয়ে একটি রঙের ডাক দিতে পারেন। 'গেমের' উঁচু ডাকতে গেলে নিজের হাতের পয়েন্ট গণনা করে এবং খেঁড়ীর হাতের অবস্থা পরস্পর জেনে তবে অগ্রসর হতে হবে।

বোলাণ্ড পদ্ধতি (Boland System):—এই পদ্ধতি অনুযায়ী ডাকদার হাতে চিঁড়িতন নিয়ে কিম্বা না নিয়ে প্রাথমিক একটি চিঁড়িতনের ডাক দিতে পারেন। এই ডাক সত্য কি না, অর্থাৎ হাতে চিঁড়িতন আছে কি না তা' জানা যায় দ্বিতীয় বারের ডাকে। যদি দ্বিতীয়বার ডাকদার চিঁড়িতন ডাকেন তা' হ'লে বুঝতে হবে যে ডাকদারের চিঁড়িতন ডাকটি ঠিক, আর তা' যদি না হয় তবে তাঁর এই ডাক Vanderbuiltএর চিঁড়িতন ডাকের ন্যায় চালাকি-প্রসূত (artificial bid)।

প্রাথমিক যে কোন রঙের একটি ডাকে ডাকদারের হাতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তার চেয়ে কিছু অধিক শক্তি তাঁর হাতে বর্ত্তমান, এ কথা ডাকদার তাঁর খেঁড়ীকে এই চালাকির ডাকের দ্বারা জ্ঞাপন করেন। সুতরাং এ ডাকের পর খেঁড়ীর উত্তর বাধ্যত-মূলক। এমন কি হাতে কিছু না থাকলেও একটি রুহিতন ডেকে ডাকদারের ডাকটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই রুহিতন জবাব খেঁড়ী রুহিতন নিয়ে বা না নিয়েও ডাকতে পারেন; কেননা তাঁর কর্ত্তব্য হচ্ছে শুধু ডাকটিকে একটিবারের মত বাঁচিয়ে রাখা। এই চালাকির ডাকের পর খেঁড়ী যদি অন্য কোন রঙ বা ফেরাইএর ডাক দেন তা হ'লে 'গেম' অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত। তৃতীয় বা চতুর্থ হাতের এই ডাকে হাতের শক্তি আরও বাড়িয়ে দেয়। এতদ্ব্যতীত দুইটি প্রাথমিক ডাক বা অন্যান্য ডাকের কৌশল প্রায় কালবার্টসনের approaching forcing systemএর মত।

গড়পার মিতালী সম্মিলনীঃ—

গড়পার মিতালী সম্মিলনীর উদ্যোগে অকৃসন্ সিঙ্গেল্‌স-এ 'অম্বিকা সুন্দরী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ' প্রতিযোগিতা বের হয়েছে। বিগত ২৫শে আগষ্ট প্রতিযোগিদের নাম গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এঁদের প্রতিযোগিতা এই প্রথম; ইতিমধ্যে এ সম্বন্ধে যেরূপ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তা'তে এঁদের প্রতিযোগিতা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হবে বলেই মনে হয়।

ওপারের ছায়া

কালিদাস পতিতুণ্ডী

অদ্ভুত সখ

"রবার্টা"য় নেচে তন্বী মেয়ে জিন্‌জার রোজার্স খুব নাম করেচে, এ খবর আপনারা পেয়েচেন। সম্প্রতি এই নাচিয়ে মেয়েটি তার এক মজার সখের পরিচয় দিয়ে হলিউড বাসীদের আশ্চর্য্য করে ফেলেচে খুব বেশী রকম। ভাল ভাল গাউন ও নব্য ফ্যাসানের পোষাক কেনা জিন্‌জার রোজার্সের নাকি একটি খুব পুরানো অভ্যাস এবং তার জন্য সে মাঝে মাঝে ভারী ব্যস্ত কোরে তোলে তার স্বামী লুই আয়ার্সকে। সেদিন কি জানি কেন ষ্টুডিওর শুটিং বন্ধ ছিল। কি ক'রে দিনটা কাটান যায় এই হ'য়ে দাঁড়াল জিন্‌জার রোজার্সের মহা ভাবনা। বাড়ীতে ফিরে এসে সিন্দুক খুলে একটি ভারী টাকার তোড়া বার করে জিন্‌জার যাত্রা করলে উইলসায়ার বাজারের দিকে—যে বাজারটি আজও হরেক রকম নূতন পোষাকের আড়ৎ বলে বিখ্যাত। সেখানে জিন্‌জার রোজার্সের পছন্দ হল অনেক কিছুই এবং সে সমস্ত জিনিষ কিনিতে সে কার্পণ্যও কর্ল্লে না। বাড়ী ফিরে এসে জিন্‌জার রোজার্স দেখে যে তার পুরাণ পোষাকগুলি তার ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র অধিকার করে বসে আছে এবং তার নূতন পোষাক রাখবার তিল মাত্রও জায়গা নেই। এই সমস্যার একটা সমাধান করবার জন্যে জিন্‌জার তার এক বন্ধুকে ডেকে তার কতকগুলি পুরান পোষাক নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ কর্ল্লে। জিন্‌জারের বন্ধু ত এ কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল কারণ এ পোষাকগুলি তখনও পর্য্যন্ত জিন্‌জার একবারও পরে উঠতে পারে নি। বন্ধুকে বিস্মিত দেখে হেসে জিন্‌জার বল্লে, নূতন হলেও সে স্বচ্ছন্দে এগুলি নিয়ে যেতে পারে কারণ ভবিষ্যতে ও পোষাক পরবার সুযোগ বা সময় জিন্‌জার আর পাবে না।

ভালউ ভাল গান ও নব্য ফ্যাসানের পোষাক কেনা নাকি জিন্‌জার রোজার্সের বাতিক।

তামাসা বটে!

জিন্‌জার রোজার্সের স্বামী লুই আয়ার্স, —"অল্ কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট"-এ যার অভিনয় আপনাদের খুব মিষ্টি লেগেছিল, —হচ্ছে একজন ভারী মজার লোক। লোক-দের হঠাৎ ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে চমকে দিতে তার খুব ভাল লাগে এবং এ বিষয়ে সে একজন পাকা ওস্তাদ। এই সেদিন এ রকম একটি ব্যাপার করে সে তাদের আত্মীয় স্বজনদের ভারী ভয় খাইয়ে দিয়েছিল। জিন্‌জার রোজার্সের মা আর ভাই একটুতেই বড় ভয় পেয়ে থাকেন। সেদিন তাঁরা দুজন তখন টিফিন করতে বসেছেন হঠাৎ ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল টেলিফোন। রিসিভার ধর্লে ফিলিস্, জিন্‌জার রোজার্সের ভাই। ফোন করছে লুই আয়ার্স তাঁদের শিগ্‌গির

আসবার জন্যে—তাদের নাকি ভারী বিপদ। টিফিন ফেলে জিন্জার রোজার্সের মা আর ভাই তাড়াতাড়ি চলে এলেন। সেখানে এসে দেখেন দরজায় দাঁড়িয়ে লুই। সে হেসে বল্লে তার স্ত্রী নাকি তৈরী করেছে অতি সুন্দর এক কেক্ আর তাই খাবার জন্যেই তাঁদের ফোন ক'রে আনা।

জননী হবার সখ

আজকাল হলিউডের নামজাদা প্রায় সকল অভিনেত্রীদের জননী হ'বার সখ বড় প্রবল হয়ে উঠেছে। গ্লোরিয়া ষ্টুয়ার্ট কিছুদিন হল তার ষ্টুডিওর কাজ বন্ধ করে চুপ করে বাড়ীতে বসে আছে, কারণ সে নাকি খুব শিগ্গির মা হবে। তবে গ্লোরিয়ার মা হওয়ার সখ কিছু অদ্ভুত। সে নাকি তার স্বামীর কাছে বলেচে যে সে যমজ সন্তানের মা হ'তে চায় এবং এই জোড়াটি যদি ছেলে না হয়ে মেয়ে হয় তা'হলে সে হবে আরও খুসী। এই আগন্তুকদের জন্যে গ্লোরিয়া সব রকম জোগাড় করতে এখন থেকে আরম্ভ করেছে। গ্লোরিয়ার এই ইচ্ছা পূর্ণ হল কিনা সে সংবাদ পেলেই আমরা আপনাদের জানাব।

মে ওয়েষ্টের বিয়ে

'সেক্স্ অ্যাপিল' কথাটা সিনেমা জগতে আজকাল বড় বেশী ব্যবহার হচ্চে এবং এর মূলে যে সব দুষ্টু মেয়েরা আছে তাদের মধ্যে মে ওয়েষ্ট একজন। এই মে ওয়েষ্টের ছবি "বেল্ অফ্ দি নাইন্টিজ্" একজন দর্শককে উত্তেজিত করে কি ভাবে তাকে ফৌজদারী আদালতে টেনে নিয়ে গেছ্ল সে খবর আপনাদের আগেই দেওয়া হয়েচে। সম্প্রতি এই মে ওয়েষ্ট বিয়ে সম্বন্ধে তার মতামত কোনও এক ভদ্রলোকের কাছে বলেচে। সে বলে বিয়ে তার কাছে প্রথম প্রথম এক আশ্চর্য্য কৌতুক বলে মনে হ'ত এবং সে এতে আনন্দ পেত প্রচুর। কিন্তু সিনেমা জগতে তার নাম ছড়িয়ে পড়লে পর তার

মে ওয়েষ্ট বিয়ের ব্যাপারটাকে প্রথমে কৌতুক বলে গ্রহণ কোরে আনন্দ পেতেন। কিন্তু পরে তার পাণি-প্রার্থীর সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল—ততই তিনি বিরক্ত হ'তে লাগলেন।

পাণি-প্রার্থীর সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে বিয়ে ব্যাপারটা তার কাছে ভারী বিরক্তিকর হয়ে উঠ্ল। ক্রমে হলিউডের সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় মন্তব্যের ভিতর স্থান পেতে লাগ্ল মে ওয়েষ্টের বিয়ের কথা। মে বলে যে, কাগজে সে তার বিয়ের সম্বন্ধে নিত্য নতুন খবর পড়ে অবাক হয়ে যায় কারণ

আমি সত্য আর সত্য মোর ভগবান

শ্রীসুবোধ রায়

সুপ্তির তমিস্রা ভেদি' স্বপ্নের পাথার
আসে তব শুভ্র দীপ্তি—আলোর জোয়ার
অমোঘ আদেশ তব—"কোথা যাও ভেসে
কালস্রোতে তৃণসম দেশ হ'তে দেশে!
জড়তার মোহ নাশি' জাগো একবার
দেখ চেয়ে চারিদিকে—চেনো আপনার
কঠোর কর্ত্তব্য আর সত্যের সাধনা।
এ জগতে সূর্য্য চন্দ্র প্রতি ধূলিকণা
আপনার কক্ষপথে আছে অবিচল,
তুমি শুধু আত্মঘাতী মোহেতে বিহ্বল
রচিতেছ স্বপ্নপুরী আকাশ-কুসুম
বক্ষে জাগে ভয় আর চক্ষে লাগে ঘুম।
জাগো জাগো আত্মভোলা মহান্ পুরুষ
জাগাও জাগাও তব অজেয় পৌরুষ
দেখ তব আত্মজ্যোতি জ্বলিছে অম্লান
বল—"আমি সত্য আর মোর ভগবান।"

—*—

সে নিজে এ সব খবরের বিষয় বিন্দু বিসর্গও জানে না। এর সঙ্গে সঙ্গেই আসতে আরম্ভ হল চিঠির তাড়া আর টেলিফোনের কল্ বিয়ের প্রস্তাবের খবর নিয়ে। এই সব প্রেমিকদের জ্বালায় মে অস্থির হয়ে উঠেচে। এই প্রেমিকদলের ভিতর সকল শ্রেণীর লোকই আছেন। কেউ হচ্ছেন অভিনেতা, কেউ চিকিৎসক কেউ বা ধনী ব্যবসাদার। সম্প্রতি একজন ডিউক্ নাকি মে'র পাণি পীড়ন করবার জন্যে ব্যস্ত হয়েচেন। কিন্তু মে বলে যে বিয়ে করবার সঙ্কল্প উপস্থিত তার নেই, কারণ তার মনের মানুষ সে আজও খুঁজে পায়নি।

মার্লে ওবেরন, ষ্টুডিওর কাজের পর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আনন্দ কোরতে ভালবাসেন।

খুচরো খবর

মার্লে ওবেরন তাঁর ষ্টুডিওর কাজ সেরে প্রত্যহ যান এক কার্নিভ্যালে আমোদ কর্ত্তে, সঙ্গে থাকে আর তিনজন তাঁর প্রিয় বান্ধবী। ফ্রেড্রিক মার্চ আর হার্বাট মার্শাল শিগ্গির নাকি এই দলে যোগ দেবেন।

* * *

বিনি বার্নেস্ মেট্রোর নতুন ছবি "দি ব্ল্যাক্ চেম্বারে" অভিনয় করার জন্যে তার দেহের ওজনকে ১৬ পাউণ্ড কমিয়ে ফেলেচেন। এর জন্য বিনিকে ৮ সপ্তাহ কেবল একটু দুধ আর লেবুর রস খেয়ে কাটাতে হয়েচে।

* * *

এডি ক্যাণ্টর ভারী কাজের লোক। সম্প্রতি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের জন্য এডি গেছ্ল এবং সেখানে সে একখানা বই লেখে যে বইটি প্রতি কথা এক ডলার হিসাবে সে বিক্রী করেচে।

* * *

র‍্যাল্‌ফ্ বেলামীর সখ হচ্চে তারকা অভিনেত্রদের স্বাক্ষরিত ফটো সংগ্রহ করা। সম্প্রতি তার ঘরে গিয়ে দেখা গেছে যে সে তার ঘরটি ভর্ত্তি করে ফেলেচে এই সব ছবি দিয়ে আর সবার ওপরে সে জায়গা দিয়েচে ক্যাথ্রিন্ হেপ্‌বার্ণকে।

* * *

হ্যারল্ড্ লয়েড্ তার পরবর্ত্তী ছবিতে একটি গোয়ালার ভূমিকায় নামবে এবং এ ছবিতে তার প্রধান কাজ হবে বাড়ী বাড়ী দুধ জোগান। এ ভূমিকার জন্য তাকে আজকাল এক গয়লার সঙ্গে ঘুরতে হচ্চে আর তার জন্য তাকে সদাই সন্ত্রস্ত থাক্‌তে হয় পাছে কাগজওয়ালাদের ক্যামেরায় ধরা পড়ে যায়।

প্যারামাউন্টের সুন্দরী মেরী এলিস্—নৃত্য-গীত-অভিনয়ে সমপারদর্শিনী।

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

গ্রাম—ভ্যারিটি] কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা। [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীঅনিল চন্দ্র রায়

পঞ্চম বর্ষ { বৃহস্পতিবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৩৪২—12th September, 1935. } ৩৭শ সংখ্যা

চিরন্তন আদর্শ

কতকগুলি কথা আছে যাহা চিরনূতন, কতকগুলি আদর্শ আছে যাহা চিরন্তন। চরিত্রের আদর্শ এই চিরন্তন আদর্শগুলির মধ্যে অন্যতম। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাঁহার মুক্তির পর হইতে জনসাধারণের সম্মুখে এই চির-পুরাতন অথচ চিরনূতন আদর্শের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ জোরের সহিত এবং বার বার উল্লেখ করিতেছেন।

গত বৃহস্পতিবার এলবার্ট হলে স্বর্গত মতিলাল ঘোষের ত্রয়োদশ মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্মৃতিসভায় শারীরিক অসুস্থতার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিয়া তিনি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে মতিবাবুর "নির্ভীক দেশসেবা, সংযম, সত্যনিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ ও অক্লান্ত কর্ম্মশক্তির" উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ— "এ সকল গুণের উৎস ছিল তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা ও দৃঢ়তা এবং তার মূলে ছিল তাঁর একনিষ্ঠা।"

অতঃপর তিনি বলেন "কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর তিরোধানের ১৩ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা কতকগুলি ধনবান কিন্তু স্বার্থপর ও চরিত্রহীন লোকের নেতৃত্বে সেই আদর্শ ভুলতে ব'সেছে। তাঁদের মধ্যে কেহ বা ত্যাগী কর্ম্মবীর অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের শিষ্য ব'লে এবং কেহ বা শ্রীঅরবিন্দের চেলা ব'লে পরিচয় দেন। কিন্তু তাঁদের আবির্ভাবে সামাজিক আবহাওয়া দূষিত এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্র কলঙ্কিত হ'য়ে প'ড়েছে।"

সত্যই ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। সকলের মধ্যেই সকল শক্তি থাকে না, অতএব সকলের নিকট হইতে ত্যাগী চরিত্রবান্ দেশ সেবকের আদর্শ আশা করা হয়তো নিতান্ত দুরাশা। কিন্তু মুখে বড় কথা বলিয়া ত্যাগ ও চরিত্রের আদর্শ সম্বন্ধে নজীর দেখাইয়া কার্য্যে বিপরীত আচরণ করিলে শুধুই যে ঘোরতর অন্যায় ও মিথ্যাচার হয় তাহা নহে, দেশের ও দশের সম্মুখে এইরূপ কার্য্য যে হীন উদাহরণের সৃষ্টি করে তাহাতে দেশের সমুদয় আব্‌হাওয়া কলুষিত হইয়া পড়ে। বাঙ্গলা দেশে বহুদিন হইতে এইরূপ একটা দূষিত আবহাওয়ার আবির্ভাব অনেকেই অনুভব করিতেছিলেন কিন্তু কেহই শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর ন্যায় তাহা অকুণ্ঠকণ্ঠে ঘোষণা করিতে সাহস করেন নাই।

জানিয়া শুনিয়া দেহের ক্ষতস্থান সম্বন্ধে অচেতন ও নীরব হইয়া থাকায় ভবিষ্যতে দেহের সমূহ ক্ষতি। একদিন না একদিন দেহের সেই ক্ষত সকলের সমক্ষে বাহির হইয়া পড়িবেই এবং তখন তাহা এরূপ ভয়াবহ-রূপ ধারণ করিবে যে, আরোগ্য বা প্রতীকারের কোনো উপায়ই থাকিবে না। সেই জন্য সময় থাকিতে নির্ম্মমভাবে তাহার প্রতীকার করা উচিত। দেশ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর এইরূপ স্পষ্টোক্তিতে তাই যাঁহারা ব্যথা বোধ করিবেন তাঁহাদিগকে আমরা ম্যাৎসিনির (Mazzini) নিম্নলিখিত সুবিখ্যাত উক্তিটা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই ঃ—"দেশের স্তুতিগানে কিম্বা গর্ব্বিত কথায় হীনতার গ্লানি ঢাকা যায় না। দেশের গুণগরিমা গর্ব্বভরে কীর্ত্তন করায় নহে, দোষ ক্রটী উদ্‌ঘাটন ও দূর করার উপরেই দেশের সম্মান নির্ভর করে।"

ধর্ম্মপ্রচারক না সাম্রাজ্যবাদীর স্তাবক?

বন মহারাজ কর্ত্তৃক শাসনসংস্কারের জয়গান

আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে গৌড়ীয় মহাপ্রভু বন মহারাজের বিলাতের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে প্রবীন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ধর্ম্ম-প্রচারের অছিলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের জয়গান করা বৈষ্ণবধর্ম্মসম্মত কি না জানি না—তবে ধর্ম্মের নামে এই ভণ্ডামী অসহ্য। লণ্ডনের কোন সভায় বন মহারাজ নবপরিকল্পিত শাসন-সংস্কারকে "Very Well" সার্টিফিকেট দিয়া লর্ড জেটল্যাণ্ড, স্যার স্যামুয়েল হোর ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের "কোরাস গার্ল" বর্দ্ধমানাধিপতির সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাইতে পারেন—কিন্তু বৃটেনে ও ইউরোপে প্রচারকার্য্য দ্বারা ভারত-হিত চেষ্টা করিয়াছেন এই অসত্য বাক্য-প্রয়োগে বন মহারাজের অভ্যর্থনায় কোন কোন কংগ্রেস নেতার সহযোগিতা সংগ্রহ করা শঠতারই নামান্তর।

"খবরের কাগজে দেখিলাম এবং একটি মুদ্রিত পত্রীতেও তাহা আছে, যে, কলিকাতা গৌড়ীয় মঠের "ত্রিদণ্ডী স্বামী বি, এইচ, বন মহারাজ" ব্রিটেনে ও ইউরোপে যে কাজ করিয়াছেন তাহার দ্বারা ভারতহিতচেষ্টা খুব সাহায্য পাইয়াছে ও অগ্রসর হইয়াছে ("the cause of India has been greatly helped and advanced")। এই কাজ যে লণ্ডন গৌড়ীয় মিশন সোসাইটীর পরিচালনায় সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার প্রেসিডেণ্ট খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী লর্ড জেটল্যাণ্ড এবং তাহার ভারপ্রাপ্ত প্রচারক ("Preacher-in-charge") স্বামী বি, এইচ, বন। তিনি ধর্ম্মোপদেশ কি দিয়াছেন এবং কি ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন জানি না, এবং যদি জানিতাম তাহা হইলেও তাহার সমালোচনা করিতাম না। কিন্তু তিনি নিজ রাজনৈতিক যে মত লণ্ডনে একটি সভায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের জানা আবশ্যক; কারণ, কাগজে দেখিয়াছি সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক তাঁহার অভ্যর্থনা হইবে।

বিলাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশ্যন নামক একটি সভা আছে। ভারতবর্ষে বড় চাকরী করিবার পর মোটা পেন্স্যন লইয়া যে-সব ইংরেজ স্বদেশে গিয়া আরামে থাকেন ও ভারতের শাসনের গুণ গান করেন, প্রধানতঃ তাঁহারা ইহার সভ্য। ভারতীয় কতকগুলি রাজা মহারাজা নবাবও সভ্য। ভারতবর্ষে স্বাজাতিক (ন্যাশনালিষ্ট) উদারনৈতিক সঙ্ঘ (National Liberal Federation), কংগ্রেস প্রভৃতি জনপ্রতিনিধিসমষ্টি যে সব রাজনৈতিক মত ব্যক্ত ও আদর্শ পোষণ করেন, তাহার বিরোধিতা করা এই সভার একটি প্রধান কাজ। এই সভায় গত ২৬শে জুন পার্লামেণ্টের সভ্য হিউ মলসন্ সম্প্রতি আইনে পরিণত ভারত-গবর্ণমেণ্ট বিল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহা ঐ সভার মুখপত্র এশিয়াটিক রিভিয়ু চলিত (জুলাই-সেপ্টেম্বর) সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে ভারত-গবর্ণমেণ্ট আইনটির সমর্থন ও প্রশংসা আছে। প্রবন্ধটি পঠিত হইবার পর তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই আলোচনায় স্বামী বি, এইচ, বনও যোগ দেন। তিনি বলেন :—

"I am not a politician, nor have I much interest in politics. On the other hand, I have come from India and have travelled as a religious monk all over my country, so constantly coming in contact with the people, not so much the politicians, but

knowing the mentality and outlook of the people in general. What has been talked of the present Constitution that is coming into force very soon in our country? The common people think a little differently from the great politicians, who give so much of their time and brain to think out the best good of the country."

"Those people in India who have some education, who can read English fairly well, but do not give so much time to politics as the people here give, have a general knowledge of what is going on in the world, and especially Indian politics. *Most of them think that reform has been very good and very practical under the present circumstances in our country, that further results will be very good provided the c*[illegible]*is genuineness and sincerity on both sides. That seems to be the general mentality now in our country, that the new Constitution will work very well provided the Ministers show their willingness to rise above party politics and really look on all the people of the country as their brothers and seek their real good.* Page 168.

বন স্বামীর এই অমূল্য কথাগুলির অনুবাদ করিব না। ভারতবর্ষের মুরুব্বি ইংরেজরা যাহা বলে ইহা তাহারই প্রতিধ্বনি। স্বামীটি বলিতেছেন, যে, (রাজনীতিচর্চ্চাকারীরা ছাড়া) দেশের অধিকাংশ লোক মনে করে, শাসনসংস্কারটা খুব ভাল হইয়াছে ("the reform has been very good")। এবং স্বামীটি বলিতেছেন যে দেশের লোকদের সঙ্গে মিশিয়া নাকি তিনি ইহা জানিতে পারিয়াছেন। বড় বড় পলিটিশিয়ানরা তাহা করেন না কিনা, তাই তাঁহারা তাহা জানিতে পারেন না! কিন্তু স্বামীটি নিজেই যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার আনাড়িত্ব ও অনধিকারচর্চ্চা বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন, তিনি যে শুধু পলিটিশিয়ান নহেন তাহা নহে, পলিটিক্সে তাঁহার বড় একটা রুচি নাই।

বন স্বামীটিকে খুব আড়ম্বরের সহিত অভ্যর্থনা করা হইবে, শুনিতেছি। লর্ড জেটল্যাণ্ড এখন ভারত সচিব, এবং স্বামীটির মুরুব্বিও বটে। তাঁর কাছে অভ্যর্থনাটার খবর পৌঁছিবে, এবং তিনি ও অন্য ইংরেজরা তাহা হইতে বুঝিবেন, যে, স্বামী বন যে বলিয়াছিলেন, যে, দেশের অ-পলিটিশিয়ান অধিকাংশ লোক ভারতশাসন-সংস্কার আইনটাকে খুব ভাল মনে করে, তাহাই ঠিক এবং স্বাজাতিক (ন্যাশনালিষ্ট) কংগ্রেসওয়ালা ও উদারনৈতিকরা যাহা বলে, তাহা মিথ্যা।"

—প্রবাসী (আশ্বিন, পৃষ্ঠা ৮৯৪-৯৫)

ব্রীজ খেলা

শ্রীদুর্ব্বাসা

সমস্যা :—

উ
ইস্কাবন—টেক্কা, বিবি, দশ, তিরি, দুরি।
হরতন—সাহেব, দশ।
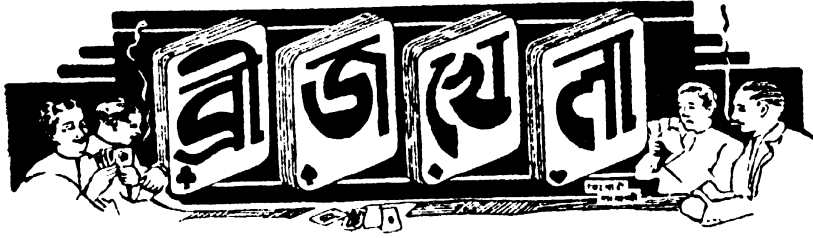
প
ইস্কাবন—গোলাম, সাতা, পাঞ্জা।
রুহিতন—বিবি, পাঞ্জা।
চিঁড়িতন—নয়, আটা।

পূ
ইস্কাবন—নয়, আটা, ছক্কা, চৌকা।
হরতন—টেক্কা, বিবি।
চিঁড়িতন—বিবি।

দ
ইস্কাবন—সাহেব।
হরতন—ছক্কা, পাঞ্জা।
রুহিতন—সাহেব, সাতা।
চিঁড়িতন—গোলাম, চৌকা।

ফেরাই-এর খেলা। 'দ' খেল্‌বে। 'উ' এবং 'দ'-কে পাঁচটি পিট নিতে হবে বিপক্ষদল যতই বাধা দিক না কেন।

"Official system"-এ প্রাথমিক দুইটি চিঁড়িতনের ডাক :—এই পদ্ধতি অনুযায়ী ডাকদার হাতে চিঁড়িতন নিয়ে কিম্বা না নিয়ে প্রাথমিক দুইটি চিঁড়িতনের ডাক দিতে পারেন। ইহা একটি কৃত্রিম ডাক। এই ডাকে ডাকদার তাঁর খেঁড়ীকে বলেন, "ওগো, বন্ধু, এই লও 'গেম'।" এখন এই ডাকের উত্তর খেঁড়ী দুইভাবে দিতে পারেন। প্রথমতঃ তাঁর হাতে যদি কিছুই না থাকে তবে তিনি দুইটি রুহিতন ডেকে ডাকটিকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারেন। ইহাও একটি চালাকি-প্রসূত ডাক; কারণ রুহিতন নিয়ে কিম্বা না নিয়েও খেঁড়ী এই জবাব দিতে পারেন। আর দ্বিতীয়তঃ তাঁর হাতে যদি একটি টেক্কা ও একটি সাহেব বা দুইটি টেক্কা থাকে তবে তিনি টেক্কা বা সর্ব্বসমেত যে কোন পাঁচতাস রঙে ডাক দিতে পারেন। কিন্তু ডাকযোগ্য রঙ না থাক্‌লে দুইটী ফেরাই-এ ডেকে নিয়ে ডাকটি বাঁচিয়ে রাখবেন।

অতঃপর ডাক ঘুরে এলে ডাকদারের হাতে যদি ফেরাই-এর ডাক থাকে বা যে রঙের ডাক আছে সেই প্রকৃত ডাক ডেকে নেবেন। কিন্তু ডাকদারের ফেরাই-এর ডাক খেঁড়ীকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হলে তিনি ইস্কাবন, হরতন বা রুহিতনের বিবি—১০ শীর্ষক যে কোন রঙের চারখানি তাস নিয়ে ডাক দেবেন। অন্যথা চিঁড়িতন ডেকে ডাকটি বজায় রাখবেন। এখন ফেরাই-এর খেলায় খেলতে হলে হাতে কি অভাব ডাকদার জানেন এবং খেঁড়ীর জবাবে বুঝতে পারলেন তাঁর সেই অভাব পূর্ণ হল কতখানি। এইবার অন্য রঙে ডাক জানিয়ে তাঁর খেঁড়ী কিসে খেল্‌তে ইচ্ছুক জেনে নেবেন। প্রাথমিক এই চালাকির ডাক ছাড়া আর সব ডাকের কায়দা-কানুন প্রায় স্বাভাবিক। ডাকদার যদি কোন রঙে ডাক দেন খেঁড়ীর ডাকযোগ্য কিছু থাক্‌লে সেটা ডাক্‌বেন অন্যথা ফেরাইএ ডেকে ডাকটি রক্ষা করবেন। অতঃপর ডাকদারের হাতে আর যা' রঙ থাকে তিনি জানাবেন আর খেঁড়ী পূর্ব্বের ন্যায় উত্তর দিয়ে দুইজনের মধ্যে বলাবলির পর যাতে মিল্‌বে সেই রঙ করে খেলে যাবেন।

অন্য রঙে প্রাথমিক দুইটার ডাক :—প্রাথমিক দুইটি চিঁড়িতনের ডাক ব্যতীত অন্য কোন রঙের প্রাথমিক দুইটার ডাকের বেলায় Lenz System (পরে আলোচিত হবে) এর সহিত একটু বিভেদ দৃষ্ট হয়। খেঁড়ী যদি অনাবশ্যক একটি ডাক বাড়িয়ে দেন তবে ডাকদার ইচ্ছা করলে ডাক ছেড়ে দিতে পারেন। তাই খেঁড়ীর কর্ত্তব্য হচ্ছে ডাকটিকে অনর্থক না তুলে অন্য কোন ডাক বল্‌বার থাক্‌লে বলবেন এবং তা না হলে যতটা তাঁর সামর্থ্য সেই অবধি ডাকটিকে একেবারে তুলে দেবেন।

প্রাথমিক তিনটার ডাক :—ডাকদার এই ডাক দিলে বুঝ্‌তে হবে যে তাঁর হাতে ন্যূনকল্পে রঙে পাঁচখানি খেলার পিট আছে এবং সর্ব্বসমেত আটখানি খেলার পিট আছে ও অন্য রঙে অন্ততঃ একখানি অনারের পিট আছে। আর এই ডাক মুখ্য রঙে হলে হাতে একটি অনারের পিট থাকলেই তাকে 'গেমে' তুলে দিতে পারা যায়। কিন্তু গৌণ-রঙে হলে সেটি পর পর সাজান হওয়া চাই যাতে খেঁড়ী অন্যান্য রঙে প্রতিরোধের শক্তি থাক্‌লেই ফেরাই-এর ডাক দিতে পারেন।

মুক্তি প্রয়াসী

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বিশী

গভীর রাত্রি! সুষুপ্ত মহানগরী নিদ্রার কোলে অচেতন। চারিদিক—নিঝুম—স্তব্ধ। সমস্তদিন কর্ম্মক্লান্ত জগতের একটানা পরিশ্রমের পর এই ক্ষণিকের উপভোগ্য বিশ্রাম কেহই হেলায় নষ্ট করে না।

শুধু দুই জনের চোখে আজ ঘুম নাই। দুই জন,—প্রাসাদোপম অট্টালিকায় পালঙ্কে দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শায়িত নায়ক নায়িকা নয়—অতি নগণ্য হেয় বস্তু—হয়ত মানুষের কল্পনার অতীত তাহারা—হতভাগ্য রাস্তা ও ফুটপাথ।

ফুটপাথ কহিল,—ঘুমিয়েছ?

রাস্তা।—আর ঘুম। বেদনায় সমস্ত শরীর টন্ টন্ করছে ভাই—ঘুম এতে আসে?

ফুটপাথ।—কি করবে বল? অসহায় যে আমরা। সভ্যতার এই মর্ম্মন্তুদ অবদান আমাদের মাথা পেতে নিতেই হ'বে।

রাস্তা।—আমার এক এক সময় কি মনে হয় জানো?

ফুটপাথ।—কি?

রাস্তা।—বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার সমাধি হোক্। মানব সভ্যতার পরিসমাপ্তি ঘটুক; যে সভ্যতা এমনি করে পলে পলে আমাদের জীবনকে দগ্ধ করছে, আমাদের জীবনে না আছে বিকাশ না আছে ক্ষয়। কেবল জ্বালা—দিবা রাত্রি কঠোর নিষ্পেষণের তীব্র অসহনীয় জ্বালা।

ফুটপাথ।—কিন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় আমরা পারবো কেন? আমাদের সে শক্তি কোথায়?

রাস্তা।—শক্তি অর্জ্জন করতে হ'বে। আজ না হয় দু'দিন পরে হবে। বিজ্ঞান বুঝবে তখন প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের এই আজন্ম প্রাণপাত পরিশ্রমের ব্যর্থ ফল। লজ্জায় প্রকৃতির আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

ফুটপাথ।—আমাদের যে রকম ইট—সুরকি—পিচ—সিমেন্ট দিয়ে অবরুদ্ধ করে রেখেছে—তা থেকে শীঘ মুক্তি পাবার সম্ভাবনা কোথায়?

রাস্তা।—আছে, বন্ধু আছে! ধৈর্য্য হারালে চলবে কেন? মনই হবে আমাদের একমাত্র সহায়। মনের প্রসারতায় স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে।

ফুটপাথ।—কিন্তু বিজ্ঞানই যে আমার জন্ম দাতা। সহরে না থাকলে আমার অস্তিত্ব কোথায়?

রাস্তা।—একে অস্তিত্ব বল বন্ধু? সহস্র সহস্র নর নারী তোমার মস্তকে পদাঘাত করছে—তুমি এতটুকুও প্রতিবাদ করতে পারছ না। পদধুলি হয়েছে তোমার মস্তকের ভূষণ। পরাধীনের অস্তিত্বের মূল্য কি? তোমার ওই পার্থক্যের গণ্ডী ভেঙ্গে চলে এস আমরা একসঙ্গে মিলিত হই।

উপর হইতে শব্দ হইল, আমাকেও তোমাদের দলে নাও বন্ধু।

রাস্তা ও ফুটপাথ উভয়েই চমকাইয়া দেখিল, লাইট্ পোষ্ট হইতে বিদ্যুৎ কথা বলিতেছে।

বিদ্যুৎ কহিল,—আমারও কি কম দুঃখ ভাই। আমার ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন—কেমন উন্মুক্ত আকাশ তলে মেঘের কোলে খেলা করে বেড়াচ্ছে—আর হতভাগ্য আমি বিজ্ঞানের অমানুষিক অত্যাচারে বন্দী হ'য়ে তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছি। আমি হাঁপিয়ে উঠেছি—পরাধীনতার এ মর্ম্মান্তিক জ্বালা আর সহ্য হয় না—আমি মুক্তি চাই।

উৎফুল্ল হইয়া রাস্তা কহিল,—আমরা সাদরে তোমায় গ্রহণ করলাম বন্ধু। তুমি আজ থেকে আমাদের দুঃখের সাথী হ'লে। আমাদের তিন জনের মন আজ একসঙ্গে মিলিত হ'ল। আমাদের লক্ষ্য এক—আদর্শ এক।

ফুটপাথ।—মিলিত হ'য়ে তারপর কোথায় যাবে?

রাস্তা।—কেন? প্রকৃতির মাঝখানে। যেখানে আকাশ এত অপরিসর নয়, বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ নেই—নদী শৃঙ্খলিত নয়। পাখীর ডাকে আছে প্রাণ। সমস্ত বৃক্ষলতায় একটা সুস্পষ্ট সজীবতা। যেখানে সূর্য্যের আলো এত সঙ্কুচিত হ'য়ে প্রবেশ করে না, চিমনীর ধোঁয়ায় জোৎস্না রুক্ষ হয়ে ওঠে না—তেমনি নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ থাকে। তাতে স্নান করে শান্তি আছে—দেহ মন পবিত্র হয়।

গৌণরঙে প্রাথমিক চারটির ডাক দিতে হলে প্রাথমিক তিনটির ডাক অপেক্ষা ডাকদারের হাতে একটি বেশী খেলার পিট থাকার দরকার। উপরন্তু একটি অনারের হাতে পিট থাকলেই 'গেম' অবধি ডাক দেওয়া যায়। রঙে 'গেম' অবধি ডাক দিতে হলে Lênz System অনুযায়ী দেওয়া হয়। অন্যান্য ডাক সাধারণ।

নর্থ ক্লাবের ফাইন্যালঃ—কথায় বলে 'পুরানো চাল ভাতে বাড়ে',—এই নর্থ ক্লাবের প্রতিযোগিতায় প্রতিপন্ন হ'চ্ছেও তাই। এদের উদ্যোগে দুটী প্রতিযোগিতা বের হয়েছিল তার ফাইন্যাল খেলা সম্প্রতি হয়ে গেছে। কণ্ট্রাক্ট ডুপ্লিকেট প্রতিযোগিতায় লুনার ফুলস ক্লাব ওয়াণ্ডারারস্দের হারিয়ে বিজয়মাল্য অর্জ্জন করেছেন আর অকসন্ সিঙ্গেলস্ এর ফাইন্যালে ক্রকফোর্ডস ক্লাবের দু'দলের মধ্যে একদল আর একদলকে হারিয়েছেন। আমরা লুনার ফুলস, ক্রকফোর্ডস প্রভৃতি পুরাতন ক্লাবগুলিকে ধন্যবাদ জানাই।

ফুটপাথ ও বিদ্যুৎ ভাবে তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল। কহিল,—কিন্তু আমাদের সঙ্গে যদি আর সকলে যোগ না দেয়?

রাস্তা উত্তেজিত হইয়া কহিল,—আমাদের তাদের বোঝাতে হবে। বোঝাতে হবে, জাতি ভেদ—উচ্চনীচের পার্থক্যের সময় এখন নয়। আমাদের চাই একতা। স্বাধীনতার যজ্ঞে আহুতি দেবার চাই সম্মিলিত শক্তি। রোড—ষ্ট্রীট—এভিনিউ—লেন—বাইলেনের সব পার্থক্য উঠিয়ে দিতে হবে। ছোট বড় সব একত্র হয়ে লড়তে হবে আমাদের পরাধীনতার বিরুদ্ধে। সে যতই সুকঠিন সংগ্রাম হোক না কেন, আমাদের উত্তীর্ণ হয়ে আসতে হবে, বিজয়ের জয়টীকা ললাটে ধারণ করে—তবেই আমাদের জীবন—তবেই আমাদের মুক্তি।

পূর্ব্ব দিক ফর্সা হইয়া আসিল। সুপ্ত জগৎ জাগ্রত হইল। সেই নিত্য নৈমিত্তিক কোলাহলের মধ্যে রাস্তার স্বাধীনতার স্বপ্ন কোথায় মিলাইয়া গেল, কেহ খবরও রাখিল না।

কিন্তু পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাহার ওই বিদ্রোহী মনের কি কোনও মূল্য নাই?

মানসী-প্রিয়া

শ্রীনৃপেন্দ্র গোপাল মিত্র

মম অঙ্গন দিয়া চলি গেল সে,
—চতুর অঙ্গনা।
অঞ্জন আঁকা আঁখি কোণে মাখা,
প্রেমিক গঞ্জনা।
যৌবন ভীত চঞ্চল পদে,
ত্রস্ত চলেছে তন্বী।
অঞ্চল তার খসি পড়ে গেছে,
মুক্ত সে রূপ-বহ্নি।
কাঁচলি বাঁধন নাহি মানে রূপ,
দীপ্ত জয়ন্তিকা।
কণ্ঠে দুলিছে, হীরক গাঁথা
কনক ললন্তিকা।
মৃণাল বাহুর ছন্দ-দোলনে,
বাজিছে রতন-চুর।
নিরালায় বসি, আনমনে যেন,
বীণাপাণি সাধে সুর।
অলক্ত-রাগ রঞ্জিত পদে,
মৃদু মঞ্জীর বাজে।
নৃত্য-কুশল অপ্সরা নয়ন,
ইন্দ্র-সভার মাঝে।
গুণ্ঠন-হারা গোপন চারিণী
ওষ্ঠে রক্ত লেখা।
আজিকার প্রাতে চলেছে আমার
প্রাঙ্গণ পথে একা।
অনাগত আশে, অশান্ত চিতে,
পড়েছিনু আধ-ঘুমে।
সহসা মধুর, শিঞ্জিনী-ধ্বনি,
বাজিল মর্ম্ম চুমে।
জাগিলাম আমি, নেহারিনু তারে,
গোপন-চারিণী শুদ্ধা।
শিরায় শিরায় খেলিল বিজলী,
চঞ্চল হিয়া মুগ্ধা।

লাজে বাধ বাধ, কম্পিত স্বরে,
ডাকিলাম তারে "দেবী"।
চরণ পূজার অধিকার মাঙ্গে,
এ দীন ভক্ত সেবী।
ব্রহ্ম লগনে, শয্যা ত্যজিয়া,
গোমতী কূলে স্নাসি।
পবিত্র দেহে, শুদ্ধ চিতে,
গোময়ে লেপিয়া ঠাঁই।
অর্চ্চনা তরে, পূজা সম্ভার,
সাজাইব থরে থরে।
বন্দিব তব চরণ-কমল
অটুট নিষ্ঠা ভরে।
বিস্ময় মুখে স্থির আঁখি মেলি,
চাহিয়া আমার পানে।
কম্প ওষ্ঠে, ক্ষীণ হাসি আনি,
মৃদু সুরে সে ভানে।
"দেবী আমি নহি, পূজা নাহি চাই"
—মন্থর পদে চলে।
ত্রস্ত নারীর, মন্থর গতি,
অন্তর কথা বলে।
মূক নির্ব্বাক, বিস্ময়-হত,
ক্ষণেক রহিনু চাহি।
জাগায়ে চেতন, খেলি গেল সুখে,
প্রাতের গন্ধ-বাহী।
বল সঞ্চারী, দ্বিধাহীন স্বরে,
ডাকিলাম তারে "নারী"।
স্নেহের প্রতীক, ওগো দয়াময়ী,
আমারে যেওনা ছাড়ি।
নিঃসঙ্গ মোর, একক জীবনে,
চির আত্মীয়া রূপে।
মমতা হস্ত সদা প্রসারিয়া
কাজ ক'রে যাবে চুপে।

কর্ম্মের শেষে, ক্লান্ত দেহে,
গৃহে ফিরি আমি যবে।
মাতৃস্নেহের মমতা লয়ে কি,
মঙ্গল কথা কবে।
অবসাদ-ঝরা ক্লান্ত আঁখি,
বারতা জানাল শুধু।
পলেক চাহিয়া, তারি পরক্ষণে,
রমণী চলিলা মৃদু।
দ্বিধা জাগে প্রাণে, রমণী হৃদয়
পাষাণে গঠিত কি?
অথবা এ কোন, কুহকীর খেলা,
—মোহিনী রাক্ষসী।
নিভৃতে নিরালে, নির্জ্জন ঘরে,
আমারে পাইয়া একা।
অতুল রূপসী, বিদ্যুৎময়ী
প্রাতে দিল আজ দেখা।
বিভ্রান্ত মন, সভীত চরণ,
ক্ষীণ কম্পিত স্বর।
"ওগো রাক্ষসী, খেলিতে কি খেলা,
এসেছিলে মোর ঘর।"
উচ্চহাস্যে ভীতি অপসারি,
কৌতুকভরে চাহি।
বীণা-নিন্দিত, সুললিত, স্বরে,
তরুণী উঠিল গাহি।
জানিনা মোহিনী, নহি মায়াবিনী,
ভয় করা তব মিছে।
যাত্রার পথে, অজানা তরুণ,
ডেকো নাক আর পিছে।
গরব গমনে, চঞ্চল পদে
রূপসী চলিয়া যায়।
গুরু লাঞ্ছিত, অশান্ত হৃদি,
গুমরয় বেদনায়।
সহসা অচিন্ ঘন শিহরণ,
জাগিয়া উঠিল বক্ষে।
অজানিত কোন নূতন আঁজন,
লাগিল তরুণ চক্ষে।
দ্বিধা সংকোচ, সরম ভরম
সকল যাইল দূরে।
হৃদয় যন্ত্র, মোহন মন্ত্রে,
বাজিল নূতন সুরে।
অনুরাগ ভরা ব্যাকুল পরাণে,
ডাকিলাম তারে "প্রিয়া"।
চকিতে রমণী, ফিরিয়া চাহিল,
—দুলিয়া উঠিল হিয়া।
আনন্দ থর-কম্পিত-দেহ
নিচল চটুল নারী।
হর্ষ-ব্যথার মিলন মুরতি,
বিশ্ব-চিত্ত-হারী।
প্রকাশিত ভাষা নয়ন যুগলে,
আনত লজ্জা ভরে।
আমারও বক্ষে ঘন উল্লাসে
নাহি যে পলক পড়ে।

——

অভাব

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

"Human life is like a pendulum between smiles and tears"—

অনন্ত পথের পথিক আমরা। এ ছাড়া আর আমাদের কোনো উপায় নেই। আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনের পরিধি যত বড়োই হোক না কেন, অনন্তের দিক দিয়ে তা' চিরকালই ক্ষুদ্র। আমাদের খাটতে হবে, এবং এজন্য কখনো অতৃপ্ত আস্বাদনেও তৃপ্ত হতে হবে, কখনোও দুঃখপ্রাপ্তিতে অবসন্ন হ'তে হবে কিন্তু কিছুতেই শান্তি নেই। সব সময়েই মনে হবে আমাদের কতো অভাব, কতো দুঃখ, কতো ব্যথা। কিন্তু এই ব্যথা, এই দুঃখ, এই দৈন্য জীবনের শেষ অবধিও তাড়া কোরবে।

মানুষের জীবন যেমন, জাতীয় জীবনও সেই রকম। চারিদিকে কেবলই অভাব আর অভিযোগ দেখতে পাই। যেখানে অন্ন-বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, সুশিক্ষার অভাব, একতার অভাব, সেখানে শক্তি কোথায়? ব্যক্তি বিশেষের জীবনে যে অভাব নিশিদিন তাড়া কোরছে, দেখছি জাতীয় জীবনেও বর্ণে বর্ণে তা মিলে চোলেছে।

আমি মনে কোরতে পারি আমার চেয়ে অনেক লোক সুখী, কিন্তু সত্যি কথা বোলতে গেলে তারাও কোনো না কোনো একটার অভাব অনুভব করে, যাতে সে এই মরজগতে এসেও তৃপ্ত হতে পারে না। সকলেরই মনে হয়, কী যেন অভাব!

প্রেমিকা প্রেমিকের অভাব সইতে না পেরে বোলেছে:

'শ্যাম আমার শমন হ'ল'—

শ্যাম কিন্তু শমনের অধিকার কোরবার কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। তখনই ইচ্ছে কোরে মোরতে হবে এই বলে:

'আমি মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব'—

আবার মরবার পর সখিরা অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার কী ব্যবস্থা কোরবেন, তাও ঠিক হোয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে:

'নীরে নাহি ডারবি' অনলে নাহি দাহবি
না পোড়ায়ো এ রাধা অঙ্গে, না ভাসায়ো জলে'

শুধু তমালের ডালে বেঁধে রাখতে হবে।...

যাক, এমন নিদারুণ বিরহ জ্বালাতেও মরা হোলো না, শ্যাম মথুরা থেকে ফিরে এলেন। রাধার আনন্দের আর সীমা নেই!

কথায় বলে না—'স্বভাব যায় না ম'লেও'। মানুষের এমন স্বভাব, এলেন যদিও বা, অমনি রাধার মনে হোলো:

'সখি, ভাল করি পেখন না ভেল'—

আবার যদিও বা দেখা হোলো, চোলে গেলেই মনে হবে:

'সখি! কি পুছসি অনুভব মোয়'

• * •

'জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল'

[বিদ্যাপতি]

আবার নানা রকম লোকের নানা রকম অভাব যেমন রুচি।

আমার নিজের খাওয়া-পড়ার সংস্থান নেই অথচ—

'বিয়ে কোরলে পুত্র-কন্যা
আসে যেন প্রবল বন্যা'।

ছেলে-পুলেকে খেতে দিতে পারি না। চোখের সামনে হয়তো ছেলেগুলো না খেতে পেয়ে অনাহারে মোরেছে। সমস্ত জীবনটা একটা অনুশোচনায়, অশ্রুপাতে, দুঃখে জর্জ্জরিত!...

আমার এই অবস্থা, কিন্তু আমার পাশের বাড়ীতে হয়তো টাকার কুমীর, দিনরাত টাকার গাদার ওপর বোসে অতি সুখে দিনপাত করে। হয়তো ভাবি, সে কতো সুখী। কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস কোরলে হয়তো জানতে পারি যে তার এই ঐশর্য্য ভোগ কোরবার মতোন একটি লোকও নেই। সেই অভাবে তার আনন্দ কোলাহলের লেশ মাত্রও নেই। গৃহিনী দিনরাত ধোরে তাড়কেশ্বরে হত্যা দিয়ে পোড়ে আছেন, আবার হয়তো কালীঘাটের মন্দিরে, ষষ্টীতলার গাছে ঢিলের পর ঢিল বেঁধে চোলেছেন আর কর্ত্তা গালে হাত দিয়ে বোসে বোসে ভাবেন। কিন্তু কোনো ফলই হয় না, শুধু 'অরণ্যে রোদন'। এতেই আবার শেষ হয় না, তারপর অসহ্য বোধ কোরে যদিই বা তাঁরা পুষ্যি রাখেন—সেও আবার 'দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা'। ছেলে একটি দুর্দ্দান্ত, দুশ্চরিত্র জানোয়ারের মতো হয়তো বা শেষে পরিণত হোলো।.....

তাই বলি, দুঃখ দৈন্যের অভাব এ সংসারে বড়ো কম নয়।

একের যাতে অভাব, অপরের তাতে আনন্দ and vice versa। বসন্ত হাওয়া এসে লাগতেই কবির দল নাচতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে সাপ্তাহিক আর মাসিকগুলো ভরে ওঠে; সময় সময় কেতাবের আকারে বাজারে বেরোয়, যদিও লোকে সব সময় সেগুলো পয়সা দিয়ে কেনে না। মাছের বাজারের মতো কবিদের বাজারেও যখন হুড়োহুড়ি পড়ে, তখন যদি হঠাৎ কবি-দলের সর্দ্দার অন্যপথ দেখেন তা হোলে কি অকস্মাৎ আনন্দ কোলাহল থেমে গিয়ে একটা অভাবের ছায়া এসে পড়ে না?

কবি গেয়েছেন:—

'বসন্ত তোর শেষ ক'রে দেবে রঙ্গ—'

তারপর আবার বাদল নেমে আসে। এবার কবির দল একেবারে পাগল হোয়ে পড়ে:

'রিম্ ঝিম্ মন মনরে বরষে'—

এবার কিন্তু সর্দ্দারও তাদের সঙ্গে গেয়ে ওঠেন—

'নয়নে বাদল, গগনে বাদল, হৃদয়ে বাদল
ছাপিয়া
এসগো আমার বাদলের বঁধু, চাতকিনী
আছে চাহিয়া'
(রবীন্দ্রনাথ)

কবিরদল যখন আনন্দে বিভোর আমরা কিন্তু তখন বেজায় চোটে যাই। আমাদের আপিস যাবার সময় এসে পড়ে—ট্রাম্, বাস্, গাড়ী-ঘোড়া চারিদিক গিজ্ গিজ্ করে, বোসবার যায়গা অবধিও থাকে না; বাড়ী-ঘর স্যাঁত্ সেতে, বাড়ীতে রান্না চড়ে না বাজার যাওয়া হয়নি বোলে, চারিদিক গোলমাল, মনে শান্তি কিছুতেই পাই না, এমনি সময় কবি আবার তাঁর বাড়ীর ছাদের চিল-কোঠা ঘরে বোসে আপন মনে তান ধরেন:

'এস গো আমার বাঁদলের বঁধু'......

আবার হয়তো লেখক তাঁর নির্জ্জন ঘরে বোসে নায়ক-নায়িকার বিরহ-স্বপ্ন ভাবেন, আর মাঝে মাঝে লেখেন:

'......দূরে, অতি দূরে সে চলে গেছে, তার বুকে রেখে গেছে শুধু স্মৃতি!......এই স্মৃতিই তার বুকে জ্বলে রাবনের চিতা জ্বলার মতো!......ঠোঁটের কোণে এখনোও তার প্রিয়র সেই উত্তপ্ত আবেগময় চুম্বনের রেশ মুছে যায়নি,—সে চুম্বন কল্পলোকের রচা চুম্বন নয়, স্বর্গের অমৃত নয়, বাস্তবের, অতি বাস্তবের একটা নিবিড় নিপীড়ন........ ইত্যাদি...আবার হয়তো প্রেমিকা তার প্রেমিককে লিখছে চিঠি:

'......কলেজের পরীক্ষা শেষ হোয়ে গেলে তুমি আসবে বোলেছিলে, কিন্তু দু'মাস হোয়ে গেলো, এখনো ফিরলে না! তুমি কী নিষ্ঠুর বল তো!......তুমি জানো, তুমি না এলে আমার কী রকম কষ্ট হয়।...... তোমার সেই মধুর আলিঙ্গন এখনোও আমার বুকে যেন মধু বর্ষণ করে! স্বপন ঘোরে তোমায় যে কতোবার দেখি!...তুমি কি আমায় স্বপনে দেখো না? ...শুনেছি, একজন যদি অপর একজনের কথা দিনরাত ভাবে, তাকে মনে মনে ভালবাসে খুব, তবে সেই অপরজনটি তার কথা দিনান্তে একবারও নিশ্চয় মনে কোরবে!...শুনেছি, স্বপনে যদি কেউ কাউকে দেখে, তখন দু'জনেরই মনের আকর্ষণ বাড়ে।...সত্যি কথা কি? আমি তোমায় গতকল্য রাতে স্বপনে দেখেছিলাম, তুমি কি আমায় ভেবেছিলে?...তুমি এসো, একবারটী এসো, আমার কাছে এসো......' ইত্যাদি এক লম্বা বারো পাতার বিরহের চিঠি, তারপর চিঠির শেষে লেখা হয়,

'ইতি, তোমারই বিরহ-কাতরে কাতরিণী মীরা'...

একই সময় বিভিন্ন রুচির লোকের বিভিন্ন ভাবের গোলমালে একটা বেশ বড়ো রকমের অভাব-অভিযোগের ভাব ফুটে ওঠে।

প্রথম যৌবনে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম অসহনীয় হোলেও চলে, কিন্তু এ ভাব বেশীদিন থাকে না, একদিন অভাব এদের দুয়ারেও এসে ধাক্কা মারে।...কিছুদিন বাদে এদের মধ্যে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' ভাব উদয় হয়।

বিবিধ

মিঃ বি, এন্, সরকার

ন্যাশনাল নিউস্‌পেপার্স লিমিটেডের পরিচালক-বোর্ডের সভাপতি মিঃ বি, এন, সরকার কর্ম্মভার হেতু উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বণ মহারাজের বিজয় অভিযান

বণ মহারাজ শ্রীবিলেত ধাম থেকে হৃষ্ট-পুষ্ট কলেবরে সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছেন। তিনি যখন ফিরলেন, তাঁর বৈষ্ণবী ছিটে-ফোঁটা-কাটা গায়ে বিলাতী গন্ধ শোঁক্‌বার জন্যে ছুটলেন বর্দ্ধমানের মহারাজ থেকে ফজ্‌লুল্ হক্ পর্য্যন্ত,—সকলেই কিন্তু গাঁট থেকে পয়সা খসিয়ে—এক্ একটি জুঁই-এর গোড়ে নিয়ে গিয়ে হাজির।—বণ মহারাজ তাঁদের বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়েছেন, তাঁরা এখন প্রেমাশ্রু ফেল্‌ছেন আর—

—হরি বোল হরি বোল—বলো বলো
বলোরে ভাই,
বণ মহারাজ থলি ক'রে
এনেছে রে মাল্‌পো ভ'রে,
সেই আনন্দে আহার যে নাই।

ব'ল্‌ছেন—আর হু'হাত তুলে উদ্ধশ্বাসে নেচে নেচে সারা হ'চ্ছেন।

বণ মহারাজ আর এক মহাকাজ ক'রে এসেছেন। অ্যাবিসিনিয়ার রাজার গলায় কন্ঠি, হাতে কুড়োজালি,—আর মুখে "বণ-বণ" নাম দিয়ে এসেছেন, প্রতিদিন তিলক-সেবার ব্যবস্থাটা ক'রে এসেছেন কিনা জানা যায় নি। হবিষ্যান্ন ও কাঁচকলার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন।

অ্যাবিসিনিয়াকে তাই ইতালীর air-attack থেকে বাঁচাবে ঐ "বণ।" নামের কি মহিমা!

এমনি ধারা ব্যক্তিগত ভাবে আরোও অনেক অভাব রোজ আমাদের মনে উদয় হয়।···

জাতীয় জীবনেও আমাদের এমনি কতো রকম অভাব অভিযোগ দিনরাত ব্যতিব্যস্ত কোরে তোলে।···

তারপর আসে জাতীয় সাহিত্যের কথা:—

আগামী বারে সমাপ্য

ন্যাশনাল নিউস্‌পেপার্স লিঃ
ও
শ্রীযুক্ত মিত্র, লাহিড়ী ও বসু

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত অজিতনাথ লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মল কুমার বসু ন্যাশনাল নিউস্‌পেপার্স লিমিটেডের তাঁহাদের সমস্ত অংশ বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত পরিচালকরূপে বা অংশীদাররূপে তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

'খেয়ালী', 'ভ্যারাইটিস্'র শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ও ন্যাশনাল নিউস্‌পেপার্স লিমিটেডের গঠনে শ্রীযুক্ত মিত্রের ঋণ অপরিশোধনীয়। বর্ত্তমানে ন্যাশনাল নিউস্‌পেপার্স লিমিটেডের সহিত তাঁহার অর্থনৈতিক যোগসূত্র ছিন্ন হইলেও আশা করি তাঁহার আন্তরিক শুভেচ্ছা, সহানুভূতি ও সহযোগিতা হইতে আমরা কোন দিনই বঞ্চিত হইব না।

অজাতশত্রু বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অজিতনাথ লাহিড়ীর স্নেহ-বিজড়িত সহযোগিতা ভবিষ্যতেও যে অটুট রহিবে তাহা আশা করা দুরাশা নহে।

কল্যানীয় শ্রীমান্ নির্ম্মলকুমার বসুর কর্ম্মময় জীবন সাফল্য মণ্ডিত হউক ইহাই কামনা করিয়া আমরা তাঁহার নিকট হইতে বর্ত্তমানে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

নামে দয়া?

শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মার প্রায়োপবেশনে কালী-ঘাটে পাঁঠা বলি বন্ধপ্রায়। কিন্তু পাঁঠাগুলির গতি কি হ'বে! বলি হ'বার জন্যেই তো তাদের পাঁঠা-জন্ম। কালীঘাটে বন্ধ হ'লে, কসাইখানায় বেড়ে উঠ্‌বে। কারণ অন্ধের কি-বা রাত্রি কি-বা দিন। আহা কৃষ্ণের জীব—কৃষ্ণ ভক্তদেরই উদরে আশ্রয় লাভ করুক্। কিন্তু গৌড়ীয় মঠে তো হাঁড়িকাঠ পুঁত্‌বার উপায় নেই। তাই নাসিকাগ্র থেকে ললাট পর্য্যন্ত ঐ হাঁড়ি-কাঠের trade mark মঠবাসীরা সযত্নে ধারণ ক'রেছেন। পাঁঠাগুলির আর এখানে বলি হ'বে না। তা'দের বল-আনো (বনানো) হ'বে। নেহাৎ যেগুলি কচি সেগুলিকে ক্ষুর বাদ দিয়ে আস্ত ভাবে দেওয়া হ'বে। শর্ম্মা রাম তা'র কি উপায় ঠাওরেছেন?

বি, পি, সি, সি'র পুনর্গঠন

প্রকাশ, বর্ত্তমান বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্যকরী সমিতির দুইদলই উভয়দল হ'তে নির্ব্বাচন করে একটা সম্মিলিত ও সম্মত নামের তালিকা ব্যক্তিবিশেষের হাতে অর্পণ করবেন এবং তাঁহার বিচারে তাহা সঠিক বলে গৃহীত হ'লে তাহাই হ'বে চরম নির্দ্দেশ। এরূপ ব্যবস্থার কথাই আমরা ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করেছিলাম—অতএব তা' হ'লে আমাদের কিছুই বলবার নাই। কিন্তু যদি সম্মিলিত তালিকা উভয়দলের সম্মতিক্রমে গৃহীত না হয় তাহা হ'লে বর্ত্তমানে যাঁরা কমিটীর আসন দখল করে আছেন' তাঁরা তাহা

ত্যাগ ক'রবেন ব'লে প্রকাশ। আমাদেরও মনে হয়, তা' হ'লে বিরোধী দলেরও অবিলম্বে কমিটীর আসন অধিকার করা উচিত, কারণ বর্ত্তমানে যারা কমিটীতে আছেন, তাঁরা যে জনমতের প্রতীক নহেন, তাহা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পরিষদ নির্ব্বাচনেই বুঝতে পারা গেছে।

যাহা হউক, যদি এতদিনের বাঞ্ছিত সম্মিলিত তালিকা সত্যই গৃহীত হয়, তা' হ'লে আশা করি যাহার উপর বিচারের ভার আছে, তিনি অবিলম্বে তাঁর নির্দ্দেশ দান ক'রে বহুদিনের এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি ও অবসান ক'রে দেবেন।

ভাগ্যলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স

যে সমস্ত ইনসিওরেন্স কোম্পানী কর্তৃপক্ষের কর্ম্মপ্রচেষ্টায় স্বাবলম্বী ও সাফল্য-মণ্ডিত হইতে যত্নবান তন্মধ্যে ভাগ্যলক্ষ্মী ইনসিওরেন্স কোম্পানী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রভিডেণ্ট কোম্পানী হিসাবে ভাগ্যলক্ষ্মী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, কারণ—১৯৩৫ সালের ৩১শে মার্চ্চের অবসানে তাঁহারা সর্ব্বসমেত এক লক্ষ দশ হাজার দুই শত সাত টাকা বারো আনার দাবী মিটাইয়াছেন।

জীবনবীমা বিভাগ ১৯৩৪ সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের এগার মাসের মধ্যে ৮,১৯৭৫০৲ টাকার মূল্যের ৮৩৩টী আবেদন পত্র পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে ৫৩৩টী প্রস্তাব গৃহীত হইয়া পলিসিতে পরিণত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ হইতেছে ১৮,৫৯১৶০ তন্মধ্যে ১৭,০০০৲ টাকা খরচ হইয়া ১৫০১৵ বীমা-তহবিলে জমা হইয়াছে। প্রথম বৎসরের খরচের দিক দিয়া বিচার করিলে হার শতকরা ৯১·৮ অধিক নহে এবং কোম্পানীর পরিচালকবর্গের কর্ম্মদক্ষতার পরিচায়ক। ম্যানেজিং এজেণ্টের কর্ণধার মিঃ কে, সি, ব্যানার্জ্জি বিজ্ঞ লোক এবং অন্যান্য পরিচালকেরাও বাংলায় বিশেষ সুপরিচিত।

সুতরাং আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

স্বদেশী প্রদর্শনী

আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে একটী স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে। প্রদর্শনীটী একমাস যাবৎ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রহিবে।

উক্ত প্রদর্শনীর কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন শ্রীযুক্ত নির্ম্মল কুমার বসু ও অন্যতম সহকারী সভাপতি হইয়াছেন শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্র প্রামানিক, শ্রীযুক্ত সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি বন্ধুগণও বিভিন্ন বিভাগে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। তাঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা সুনিশ্চিত।

মিলন শঙ্খ

ময়মনসিংহে এক জনসভায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাংলার কংগ্রেসের দলাদলি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, একপক্ষ কালের মধ্যেই বাংলার কংগ্রেসী দলাদলির অবসান ঘটিবে। শ্রীযুক্ত গুপ্ত একটী দলের একজন বিশিষ্ট নেতা সুতরাং তাঁহার এই উক্তি নির্ভরযোগ্য। যাঁহারা বাংলা কংগ্রেসের আভ্যন্তরিক বিষয়গুলির খবর রাখেন তাঁহারা শ্রীযুক্ত গুপ্তের এই উক্তি সমর্থন করিবেন। নির্ব্বাসিত সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের আবেদন যে বর্ত্তমানে ব্যর্থ হইবে না তাহা সুনিশ্চিত। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মধ্যস্থতায় বাংলা কংগ্রেসের বিবদমান দল দুইটী সঙ্ঘবদ্ধ হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।

রূপ-তরঙ্গ

বিলাসী

নিউ থিয়েটার্স

শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া এবার একখানা উর্দ্দু ছবি তুলবেন এবং তার আপাততঃ নামকরণ হ'য়েছে "শয়তান"। শ্রীনীতীন বসু ও শ্রীরাইচাঁদ বড়াল যথাক্রমে আলোকচিত্র ও সঙ্গীত পরিচালনার কাজ কোরবেন। পৃথ্বিরাজ, বড়ুয়া ও রাজকুমারী বিভিন্নাংশে আত্মপ্রকাশ কোরবেন।

ছবিখানা সঙ্গীত মুখর হ'য়ে নব পরিকল্পনায় বড়দিনে মুক্তি পাবে।

* * *

বাংলা "ভাগ্যচক্র" এবং হিন্দী "ধূপ চাওন" তোলা শেষ সীমায় এসে পৌচেছে। আনোয়ার সা রোড ষ্টুডিওতে থিয়েটারের একটা বিরাট সেট সম্প্রতি শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী হ'য়েছে। এবং সেই সেটেরই কাজ মিত্র মশাইয়ের তত্ত্বাবধানে তোলা হ'চ্ছে।

এই মাসের শেষে 'চিত্রা'-য় "ভাগ্যচক্রে"-র চক্র ঘুরবে।

* * *

বোম্বে, দিল্লী, লাহোর ও এলাহাবাদে হিন্দী "দেবদাস" মুক্ত হ'য়ে উক্ত স্থানগুলিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কোরেছে। আমরা পরিচালক বড়ুয়া ও নিউথিয়েটার্সের অন্যান্য কর্ম্মীবৃন্দকে আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছি।

* * *

বাংলার খ্যাতনামা ছায়াছবির পরিচালক ও হাস্যরসিক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিউথিয়েটার্সে যোগদান করেছেন বলে প্রকাশ।

রাধা ফিল্ম

পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে, রাধা ফিল্মের গোয়েন্দা-নাটক "কণ্ঠহারে"র চিত্রগ্রহণ কার্য্য, বিভিন্ন 'ইউনিটে', পুরোদমে চলচে। গত হপ্তায়, রাত্রিতে টালিগঞ্জ অঞ্চলের এক জনবিরল রাস্তায়, এই সবাক্-ছবির অন্তর্গত এক

মোটর ডাকাতির দৃশ্য তোলা হয়। তবুর 'রণলাল'-বেশী অহীন্দ্র চৌধুরী 'হার্লি ডেভিড্‌সন' মোটার 'বাইক' পূর্ণ গতিতে ছুটিয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়ে, এক চলন্ত ট্যাক্সী আক্রমণ করে। নরেন্দ্রের বিশ্বাসী ভৃত্য মধু (নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী) পাঁচশত টাকার এক তোড়া নিয়ে, নরেনের দেশের বাড়ী থেকে ফিরছিল। পথিমধ্যে এই ডাকাতির দৃশ্য, পিস্তলের গুলিতে মোটরের সামনের Wind Screen ভঙ্গ, আরোহী ও চালকের আর্ত্তনাদ—এদের স্বাভাবিক আলেখ্য অতি নিপুণভাবে রাধা ফিল্ম কোম্পানীর বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মীরা গ্রহণ কোরেছিলেন। এই চিত্র গ্রহণে সচল ট্রাকের উপর একাধিক ক্যামেরা এবং বিশেষ street lighting-এর জন্য প্রায় সিকি মাইল ব্যাপী cable রাস্তায় বসাতে হোয়েছিল।

এর পর রঙ্গিলার আবাস-কক্ষের একটি নৃত্য-গীত-মুখর মজ্‌লিশের ছবি তোলা হ'বে।

* * *

গত হপ্তায় "কৃষ্ণ-সুদামা"-র শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবের বিরাট শোভাযাত্রার দৃশ্য তোলা হয়। এই দৃশ্যে, বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত, প্রায় তিনশতাধিক Extra আর্টিষ্টের সমাবেশ করা হোয়েছিল।

এই দৃশ্যের পর সুদামার দারকায় আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণের বরে সুদামার পর্ণ কুটীর রাজপ্রাসাদে রূপান্তরিত হ'বার scene গুলি তোলা হ'বে।

কালী ফিল্মস্‌

সেদিন কালী ফিল্মস্‌ ষ্টুডিওতে দেখ্‌লুম "মণিকাঞ্চন" (২য় পর্ব্ব) তোলা হ'চ্ছে। যেখানে আমাদের মিকি মাউস ফিল্মম্যানথানা রোজ গিয়ে বিশ্রাম কোরত সেখানে দেখ্‌লুম একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার ভেতরে বসে আছে রাণীবালা আর 'উত্তরা'র ম্যানেজার চিত্রগুপ্ত এবং তুলসী লাহিড়ী বোকাটি সেজে পাশে দাঁড়িয়ে। আর পাশে ক্যামেরা মাইক্‌ নিয়ে সব দাঁড়িয়ে আছে। আর সামনে যেখানে টুমনির ঘর ছিল সেখানে বসে বেশ প্রশান্ত মনে গাঙ্গুলী মশাই শুটিং দেখ্‌ছেন—কাছে শিশু শিশুর মত বসে রয়েছে। আমাদের দেখে গাঙ্গুলী মশাই ব্যস্ত হয়ে দারোয়ানকে চেয়ার দেবার জন্য হাঁকাহাঁকি কোরতে লাগ্‌লেন। আমরা খানিকটা শুটিং দেখে চলে এলাম।

* * *

কয়েক হপ্তা পূর্ব্বে এই ষ্টুডিওতে "নিমাই সন্ন্যাস" তোলা হবে বলে বিজ্ঞাপিত হ'য়েছিল। এখন শুনছি ও ছবিখানা ওখানে তোলা হবে না—দেবকী বসু অন্য আর একখানা ছবি তুল্‌বেন।

* * *

নবীন শিল্পী শ্রীসুকুমার দাসগুপ্ত এই ষ্টুডিওতে শীঘ্রই একখানা ছবি তোলা সুরু কোরবেন। বন্ধুবর সুকুমারকে আমরা গল্প-লিখিয়ে বলে জানি, ক্যামেরার হাতল ঘুরোতে দেখেছি, সম্পাদনা কোরতেও দেখেছি,—এবার পরিচালনার গুরুভার থেকে তাঁকে উত্তীর্ণ হ'তে দেখ্‌লেই, আমরা বন্ধুগর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে উঠ্‌ব।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

এ মাসের ২৮শে 'রূপবাণী'র রূপোলী পর্দ্দায় শ্রীজ্যোতিশ মুখার্জ্জী পরিচালিত "পায়ের ধূলো" মুক্তি পাবে। এই সঙ্গে মুখার্জ্জী মশাইয়ের তোলা ব্যঙ্গ-চিত্র "দিগ্‌দারী"ও দেখানো হবে। "দিগ্‌দারী" এখনও ষ্টুডিওতে দিনরাত তোলা হচ্ছে। এতে অভিনয় কোরছেন, শ্রীতুলসী লাহিড়ী, শ্রীরঞ্জিত রায়, শ্রীমতী কমলা (ঝরিয়া) প্রভৃতি।

* * *

গুল হামিদের "খায়বার পাশে'র অন্তর্দৃশ্য তোলা শেষ হয়েছে। বহির্দৃশ্য তোলবার জন্য এরা শীঘ্রই আফগানিস্থান অভিমুখে যাত্রা কোরবেন।

* * *

অসমাপ্ত "ভিক্টিম" ছবি শেষ ক'রবার ভার নিয়েছেন মিঃ জি, আর, শেঠী। ছবিখানা "মার্ডারার" নামে আত্মপ্রকাশ কোরবে।

মহানিশা

বড়ুয়া ষ্টুডিওতে "মহানিশা"-র শুটিং বেশ জোর ভাবেই এগিয়ে চলেছে। শ্রীনরেশ মিত্র ও তার সহকারী শ্রীরবি রায় "মহানিশা" যা'তে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কোরছেন। শ্রীশিশির মল্লিকের নব প্রচেষ্টা যে জয়যুক্ত হবে—এ ধারণা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ, মল্লিক মশায়ের কার্য্যশক্তির ওপর আমাদের প্রবল বিশ্বাস আছে—তাঁকে আমরা এ অবধি কোন কাজেই পরাজিত হ'তে দেখিনি।

কর্ম্মীকে শক্তি ও কাজে উৎসাহ দেয়—
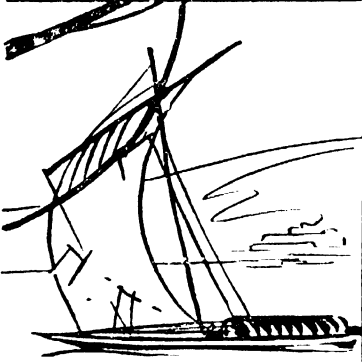
ভারতীয় চা

বহুক্ষণ কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের পর, গা, হাত পা ছড়িয়ে একটু আরাম করতে ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। এই সময়ে ভারতীয় চায়ের মত শরীর জুড়োন, তৃপ্তিকর পানীয় আর কিছু পাওয়া যাবে না। চা যে কতখানি অতিরিক্ত শক্তি ও কাজের উৎসাহ দিতে পারে তা শ্রমিক মাত্রেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে। খাওয়া মাত্রই চা ক্লান্তি দূর করে ও সমস্ত দেহে মনে যেন ঐন্দ্রজালিক পরশ বুলিয়ে দেয়। ভারতীয় চা তাই ভারতের শ্রমিক মাত্রেরই সম্পদ। নিত্য যারা পান করে, চা তাদের আনন্দস্বরূপ ; ভারতবর্ষকে যারা ভালবাসে চা তাদের গর্ব্বের বস্তু।

চা প্রস্তুত-প্রণালী

ভালো দেশী চা নিন। টাটকা জল ফোটান। পরিষ্কার ও শুকনো মাটির পাত্র গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। যে ক'জনের জন্যে চা হ'বে প্রত্যেকের জন্যে এক চামচ ক'রে আর পাত্রের নামে আর এক চামচ চা নিন। পাত্রে চায়ের পাতার উপর ফুটন্ত জল ঢালুন। পাঁচ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখার পর পেয়ালায় ঢেলে দুধ ও চিনি মেশান।

ভারতের গর্ব্ব ও আনন্দ—ভারতীয় চা

I. K. 23

এক পেয়ালা চা

(গল্প)

মোহাম্মদ মোদাব্বের

কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত দিল্লী থেকে কোহাট পর্য্যন্ত সোজা রেল পথ হয়নি। কতক পথ ট্রেণে এবং কতক ঘোড়ার গাড়ীতে যেতে হ'ত!

এই দিল্লী থেকে ঘোড়ার গাড়ীর এক দিনের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই আমার গল্পের আরম্ভ। গাড়ী আস্তাবলের সামনে তৈরী, ঘোড়া গাড়ীর সঙ্গে জোড়া রয়েছে, শুধু যাত্রার নির্দ্দেশের অপেক্ষা। আরোহীদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য ফুটে উঠ্ছে—জায়গা দখল বে-দখল নিয়ে! একজন আধঘণ্টা আগে এসে তার পোঁটলাটী রেখে, নিজের জায়গাটায় একটা ময়লা গামছা রেখে—অর্থাৎ জায়গাটা যে রিজার্ভ হয়ে গিয়েছে এই নিদর্শন রেখে নেমে বাইরে হাওয়া খেতে গিয়েছে। ফিরে এসে দেখে, জায়গাটা ত' লোপাট হয়েছেই, গামছাটাকেও কেউ আদর করে বেঞ্চের উপর রাখেনি। এ সব দেখে শুনে রাগ সামলানো অতি বড় সাধুর পক্ষেও অসম্ভব। এই রকম ছোট খাটো ব্যাপারকে কেন্দ্র করে গাড়ীর ভিতর ও বাইরে একটা অসন্তোষের গুঞ্জন ধ্বনিত হ'চ্ছে।

দরজার কাছে একটি যুবক বাইরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বসে আছে আর তার বিপরীত দিকের একটা সিট রয়েছে খালি। যে ভদ্রলোক সিটটী রিজার্ভ করেছিলেন, তিনি ঠিক সময়ে উপস্থিত হতে না পারায় সিটটা খালি পড়ে আছে।

আস্তাবলের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী চল্‌তে আরম্ভ করেছে। একটী বাঁকা পথ পার হয়ে গাড়ীটা সোজা রাস্তার মোড় ফিরতেই দেখা গেল একটী অস্বাভাবিক মোটা লোক এক হাতে প্রকাণ্ড এক পোঁটলা এবং অন্য হাতে ছাতা উচু করে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গাড়ীর দিকে দৌড়ুচ্ছেন। কোচম্যান তাঁর কাছ থেকে গাড়ী থামাবার ইসারা পেয়ে গাড়ী থামিয়ে ফেললো। ভদ্র লোকটী গাড়ীর অল্প পরিসর দরজার মধ্য দিয়ে তাঁর সুবিপুল দেহভার কোনক্রমে হিঁচড়াইয়া ঢুকাইয়া খালি জায়গাটায় ধপ করে বসে পড়লেন। তারপর পোঁটলা ও ছাতাটী বেঞ্চির তলায় ঢুকিয়ে রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে একে একে সকল যাত্রীর উপর দিয়ে তার রক্তজবার মত লাল দুটী চোক ঘুরিয়ে নিলেন। দিল্লীর গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য যে তাঁর উপর প্রবল প্রতাপে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিল তার প্রমাণ ছিল তাঁর স্বেদসিক্ত জামা ও কাপড়।

তাঁর চোখ দুটী সকলের উপর থেকে ঘুরে এসে দরজার নিকট উপবিষ্ট যুবকটীর উপর নিবদ্ধ হল। যুবকটী এতক্ষণ ভদ্র লোকটীর অবস্থা দেখছিল। এখন লোকটীর সঙ্গে একেবারে চোখাচোখী হয়ে যাওয়ায় আর হাসি চেপে রাখতে পারলোনা।

ভদ্রলোকটী কিন্তু যুবকের হাসিতে বিরক্ত না হয়ে বরং কথা বলবার একটা সুযোগ হল মনে করে বললেন—

—কি জ্বালাতন, মশাই, এক কাপ চা খেতে পেলুম না। একবার ভেবে দেখুন দেখি।

সুদূর বাঙ্গলা দেশ থেকে এই রুটি খোরের দেশের মধ্য দিয়ে ভারতের একেবারে শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত একা একা যাওয়া যে কত কষ্টকর তা যারা সে দুঃখ ভোগ করেছেন তাঁরাই জানেন। কাজেই এই সুদূর যাত্রী-পথে একটা অদ্ভুত রকমের মানুষ পাওয়া গিয়েছে বুঝতে পেরে যুবক অমর বেশ খুশীই হচ্ছিল।

ভদ্রলোকের কথা মত ভেবে দেখবার কোন চেষ্টা না করে অমর একটু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে ফিরে তাকালো।

ভদ্রলোক মনে করলেন তার কথা শুনবার একটা লোক তবু পাওয়া গেল। তাই তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে লাগলেন: দেখুন মশায়, আমার এ চিরকেলে অভ্যাস, খাওয়ার পর এক কাপ চা খাওয়া। একটু কড়া চা না হলে আমার সে দিনটা যেন একেবারে বিশ্রী ভাবে কাটে। এতকালের অভ্যাস মশায়। আর অভ্যাসের উপর জুলুম করতে নেই তাতে আত্মার কষ্ট হয়। আপনি যখন আমার বয়েসে গিয়ে পৌছুবেন তখন বুঝতে পারবেন মানুষ কি রকম ভাবে অভ্যাসের দাস।

অমর ভদ্রলোকের কথার ভঙ্গী দেখে তাঁকে একটু ঘাঁটিয়ে মজা দেখবার জন্য বললো:

"আমরা যখন রেল ষ্টেশনে পৌছাব তখন আপনি সেখানে নিশ্চয়ই চা পাবেন।"

"তাই নাকি! তাত আমি একটুও ভেবে দেখিনি। অবিশ্যি খাবার বেশ খানিকটা পরে, তা হলেও চা খাওয়া হবে, তা হোক্, নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।"

যখন ঘোড়ার গাড়ী ষ্টেশনে এসে পৌছিল তখন ট্রেণ এসে গিয়েছে। যাত্রীরা নেমেই রিফ্রেশমেণ্ট রুমে ঢুকে পড়লো। যে যা পারে কোন মতে খেয়ে ট্রেণে গিয়ে জায়গা দখল করে নিয়ে বসে পড়লো। কিন্তু মোটা লোকটাকে দেখা গেল, রিফ্রেশমেণ্ট রুমের এক কোণে একটা ছোট টেবিলে বসে উৎসুক ভাবে একটা ওয়েটারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। হোটেলে তখন ওয়েটারদের তুলনায় খদ্দের যথেষ্ট সংখ্যক বেশী ছিল। কাজেই খদ্দেরদের খাবার পেতে যথেষ্ট দেরী হচ্ছিল। মোটা ভদ্র লোকটী যখন ওয়েটার-এর দর্শন পেলেন তখন গাড়ী ছাড়ার হুইস্‌ল পড়ল। চা আর তার ভাগ্যে জুটল না। তিনি ভারী দেহটাকে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে টেনে নিয়ে গাড়ীতে উঠে পড়লেন। তারপর পকেট থেকে একটা সিল্কের রুমাল বের করে ঘর্ম্মাক্ত মুখ মুছতে লাগলেন।

অমর জিজ্ঞাসা করলো:

"কি হল? চা পেলেন?"

"আর মশায়! এ যে পাথর চাপা কপাল!" তার মুখে চোখে হতাশের ভাব ফুটে উঠলো।

* * *

ট্রেণ পাঞ্জাবের ধূসর পার্ব্বত্য অঞ্চলের ভিতর দিয়ে হু হু শব্দে ছুটে চলেছে। পাহাড়ের উপত্যকার শীর্ষে দেবদারু গাছ গুলো যেন পার্ব্বত্য প্রহরীর মত পথিকের গতিপথে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে ধূসর ক্ষেতগুলি যেন মলিন সতরঞ্চির মত পড়ে আছে না জানি কোন অনাগত জনগণের অভ্যর্থনার জন্য। পাহাড়ের অন্তরাল থেকে অস্তোন্মুখ সূর্য্য উঁকি দেয়। বিদায় বেলায় তার মুখে ফুটে ওঠে হাসি-

কান্নার রক্তিম আভা। ধূসর গোধূলির এই মনোরম দৃশ্য অমরের মনে কাব্যের গুঞ্জন তুলছিল।

মোটা মানুষটার মনে কিন্তু এ সব সৌন্দর্য্য কোন দাগ কাটে না। তাঁর প্রতি নিশ্বাসে থাকে অস্বস্তি ও অতৃপ্তির একটা অস্ফুট প্রকাশ।

অমরের দৃষ্টি এতক্ষণ বাইরের সৌন্দর্য্য পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করছিল। হঠাৎ সে "উঃ একটু চা!" এইকথা কয়টা শুনতে পেয়ে গাড়ীর ভিতরে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলো এবং একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলো: "কি মশায়, চার কথা ভাবছেন নাকি?"

ভাবছে কিনা তার কোন উত্তর না দিয়ে মোটা লোকটা বললো: "মশায়, অভ্যাস কখনো ছাড়া যায় না। আর দেখুন, আমার বয়েস হয়েছে এই প্রায় তিন কুড়ি। আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি, কোনো দিন অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয় এমন কোন কাজ করবেন না। উঃ, ষ্টেশনের ওয়েটার গুলো কি পাজী! সেই বেটার জন্যেই আমার মুখের গ্রাস ফসকে গেল। উঃ, এক কাপ চা!"

"আচ্ছা, এতক্ষণ যখন সহ্য করলেন, তখন আর একটু সহ্য করে থাকুন। আর একটু পরে চা পাওয়া যেতে পারে।"

"কোথায়!" ভদ্রলোক যেন মৃত দেহে প্রাণ ফিরে পান।

"ক্যামবেলপুরে ট্রেণ বদলী করে আমাদের আবার ঘোড়ার গাড়ীতে চড়তে হবে। সেখানের সরাইতে চা মিলতে পারে।"

"তাই নাকি? তা তো আমি ভাবি নি! সত্যি তা'হলে ক্যামবেলপুরে চা পাওয়া যাবে!"

চা পাওয়া যাবে এই আশায় উৎফুল্ল হয়ে ভদ্রলোকটী গুন গুন সুরে গান করতে লাগলেন। অনেক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গীতের গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল। কিন্তু ট্রেনের দোলায় তাঁর গানের গুঞ্জন থেমে গেল। তার বদলে শোনা গেল তাঁর বিকট নাসিকা গর্জ্জন।

ক্যাম্বেলপুর ষ্টেশনে এসে ট্রেণ থামতে অমর ভদ্রলোকটাকে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললো, "শুনছেন? ও মশায় উঠে পড়ুন।"

"অ্যাঁ, আমরা কোথায়?"

"ক্যামবেলপুর এসে গিয়েছি। এখানে আমাদের ঘোড়ার গাড়ী ধরতে হবে।"

"ও, ধন্যবাদ আপনাকে, ভাগ্যিস জাগিয়ে দিয়েছিলেন।" মোটা ভদ্রলোকটী তার মোট বাঁধিতে আরম্ভ করলেন!

ষ্টেশনের সরাইয়ের বাইরে দুইটী প্রকাণ্ড ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়িয়ে, একটী যাবে কোহাট এবং একটী নওশেরা।

সরাইয়ের মধ্যে একটী ওয়েটারের সাথে তর্করত মোটা লোকটির কাছে গিয়ে অমর জিজ্ঞাসা করলো, কোহাট যাবেন ত?

হ্যাঁ, কিন্তু দেখুন ত এরা কি ধরণের লোক! যদি চা-ই না রাখবে ত হোটেল রেখেছ কেন বাপু!

"তাই ত! ভারী অন্যায়!"

"অন্যায় নয়? সরাই রাখবে অথচ চা রাখবে না। এ একেবারে অসহ্য!"

এমন সময় ষ্টেশনের কুলী হাঁকলো—"কোহাট জানে ওয়ালা হাজির!"

ভদ্রলোকটী রাগে গজ গজ করতে করতে গাড়ীতে এসে অমরের বিপরীত বেঞ্চিতে বসে পড়লেন।

অমর ভদ্রলোকের বিরক্তিপূর্ণ মুখভাব দেখে জিজ্ঞাসা করলো—"এবারও তাহলে আপনাকে নিরাশ হতে হলো।"

"আর বলবেন না মশায়। একেবারে অসহ্য! এতটা পথ ট্রেণে গাড়ীতে কাটালুম এক কাপ চা পেলুম না খেতে!"

"আর এক জায়গায় কিন্তু চা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

"কোথায়"?

ভদ্রলোকের মনের মধ্যে যেন আশায় বিদ্যুৎ খেলে যায়।

"পথে একটী সরাই আছে, সেখানে সব রকম খাবার পাওয়া যায় শুনেছি।"

"আর চা-ও পাওয়া যায়?" জিজ্ঞাসা করে একটা আশাপ্রদ উত্তর পাওয়ার জন্য ভদ্রলোক উন্মুখ হয়ে থাকেন!

"খুব সম্ভব।" অমর ছোট দুটী কথায় উত্তর দিয়ে বাইরের দিকে তাকায়।

পার্ব্বত্য পল্লীর বুকের উপর দিয়ে ঘরবাড়ী কাঁপিয়ে গাড়ী তীরবেগে ছুটে চলে। গাড়ীর ঝাঁকানি সত্ত্বেও অনেক যাত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেকে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। কেউ কেউ স্থান অভাবে বসেই ঘুমুচ্ছে। ঘুমুচ্ছে আর ঝাকানি খেয়ে অন্যের গায়ে ঢুলে পড়ছে।

যাত্রীদলের মধ্যে একমাত্র অমর ঘুমুতে পারেনি। এত অসুবিধার মধ্যে ঘুম তার আসেনা কোনোদিন। সে চাঁদের আলোয় পাহাড়ের অপূর্ব্ব শোভা দেখে, মাঝে মাঝে কোচম্যানের চাবুকের শব্দ আর পল্লীর কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ কানে এসে তার তন্ময়তা ভেঙ্গে দেয়।

যখন একটা সরাইয়ের কাছে তাদের গাড়ী এসে দাঁড়ায় তখন যাত্রীদের সকলেরই প্রায় ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে।

সরাইটা তামাকের ধূম ও চা কেকের সুগন্ধে মশগুল। অমর একটা টেবিলে বসে তার ক্ষুধা মিটিয়ে খেয়ে নিয়ে উঠে পড়ল। তারপর মোটা ভদ্রলোকটীকে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নেওয়ার জন্য বলতে এসে দেখে যে তিনি ওয়েটার-এর সঙ্গে তর্জ্জন গর্জ্জন করছেন। ব্যাপার কি জানিতে চাইতে ভদ্রলোকটী বললেন, "দেখুন না মশায়, আমি এক কাপ চা চাচ্ছি, তা নবাবের ব্যাটার মেজাজ দেখুন না ; ও বলে কিছু খাবার না খেলে চা দেওয়া হবে না। চা না খেয়ে মশায় কিছুই আমি খেতে পারবো না।"

ওয়েটারকে অমর বুঝিয়ে ব্যাপারটা বলতেই সে চা আনতে চলে গেল।

মোটা ভদ্রলোকটী চা-এর আশায় উদ্গ্রীব হয়ে বসে থাকলেন।

এমন সময় সরাইয়ের কর্ত্তা এসে বললেন, "গাড়ী ছাড়বার সময় হয়েছে। কোহাটের যাত্রীরা উঠে পড়ুন।"

সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে গাড়ীর দিকে চললো। অমর তার বাক্স সুটকেসের উপর একটু আরাম করে বসবার উপায় খুঁজতে লাগলো। এমন সময় সে ভদ্রলোকটীর কর্কশ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে :

"এই ওয়েটার, আমার চা কোথায় ? চা ?"

"এক মিনিট সবুর করুন মশাই। এখনি আসছে।"

সকলেই গাড়ীতে উঠেছে। কেবল মোটা ভদ্রলোক সরাইয়ের দরজায় অধৈর্য্য ভাবে পায়চারী করছেন। তার মন গাড়ী ও চা-র মধ্যে যেন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। এমন সময় গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বেজে উঠলো। কোচম্যান ভদ্রলোকটীকে জানালো, সে আর অপেক্ষা করতে পারে না।

ভদ্রলোকটী গাড়ীতে উঠতে যাবেন এমন সময় ওয়েটার এক কাপ চা নিয়ে উপস্থিত।

ভদ্রলোকটী গাড়ীর পা-দানীতে এক পা ও মাটীতে এক পা রেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিয়েই চীৎকার করে উঠলেন, "পাজী

হতভাগাটা, মরবার আর সময় পাওনি! গাড়ী ছাড়বার সময় পেয়ালার করে এক পেয়ালা জলন্ত আগুন নিয়ে এসেছ!"

তিনি ওয়েটারের হাতের ট্রেতে গরম চা-এর কাপ সজোরে রেখে দিলেন।

গাড়ীর মধ্যে গিয়ে ভদ্রলোক যখন বসলেন তখন অমর তাঁর চোখে অশ্রুবিন্দু দেখতে পেয়েছিল।

গাড়ী আবার চলতে আরম্ভ করেছে। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ পরে মনের দুঃখ দমন করে অমরকে বললেন—"না মশায়, একটু চা পেলুম না!"

• • •

রাত্রের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে গাড়ী একটার পর একটা উপত্যকা ও সমতল ভূমি পার হয়ে ছুটে চলেছে। গাড়ীর চলার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না। মাঝে মাঝে দুরন্ত হাওয়া দেবদারু শাখায় বাঁশী বাজায় আর গাছের পাতায় বৃষ্টিধারা যেন ডমরু বাজায়। চলন্ত মেঘের ব্যূহ ভেদ করে ক্ষয়োন্মুখ চাঁদের দুর্ব্বল আলোক-শিশুগুলি বৃষ্টি ও বাতাসের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে।

রাত্রের বার্দ্ধক্য উপস্থিত, তাই আবহাওয়ায় ভাসে একটা শান্ত শীতলতা, এই শীতলতাই ঊষার অগ্রদূত। পথের ধারে একটা খড়ের কুটীর দেখিয়ে কোচম্যান বলে, এই ঘরটায় আগে একটা ডাইনী থাকতো। কত লোকের রক্ত না জানি সে খেয়েছে।

গাড়ী পাহাড়ের সরু পথ ঘুরে একটা খোলা-ময়দানের মধ্য দিয়ে চললো। ভোরের আকাশে সূর্য্যের আভা ফুটে উঠলো। দেখতে দেখতে সেই আভা পাহাড়ের মাথায় নানা রঙের ইন্দ্রধনু রচিত হল। দেখতে দেখতে গাড়ীও আর এক সরাইখানার দরজায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। কোচম্যান তার ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম করবার জন্ম খুলে দিল।

অমর গাড়ী থেকে নেমে সরাইতে না ঢুকে সেই অঞ্চলের আরণ্যিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে থাকে। দৃষ্টি যত দূর যায়, সে দেখে পাহাড়ের পাহাড় সেই বনভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে; যেন মিলিটারী ক্যাম্প রচনা করেছে। তাদের নীচে পাহাড়ের পাদদেশে কুলুকুলু রবে ঝরণা বয়ে চলেছে, আর সেই ঝরণার উপর বৃক্ষশাখা হতে মাধবী লতা ঝুঁকে পড়ে মৌন বৃক্ষ শাখার সহিত মুখর ঝরণার মিলন ঘটাচ্ছে।

অমরের কাছে এই অরণ্য-সৌন্দর্য্যের মূল্য অতুলনীয়। সে এ সৌন্দর্য্য কয়েক মুহূর্ত্ত নিষ্পলক নেত্রে উপভোগ করে। কিন্তু বেশীক্ষণ তার এ তন্ময়তা থাকে না। কাছেই অন্যের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে সে ফিরে দেখে সেই মোটা ভদ্রলোকটী একেবারে তার পাশে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে।

অমর একটু হেসে বলে, "কি মশায়, কেমন লাগছে আপনার? চা পেলেন?"

আর মশায়, চা পাওয়ার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। ওই রাক্ষস-পুরীটায় গিয়েছিলুম—ওটাকে ব্যাটারা বলে কিনা হোটেল—ওখানে চা বলে কোন জিনিষের নাম নিশানা নেই। তারা বলে কি জানেন? বলে, ও জিনিষ এখানে কখনো কেউ চায়নি।"

কোচম্যান গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা বাজায়। আবার তাদের যাত্রা সুরু হয়। বিশ্রামের পর ঘোড়াগুলি দ্বিগুণ তেজে ছুটে চলে। গাড়ী দেবদারুর সারির মধ্যের পথ দিয়ে, যবের ক্ষেত পিছনে ফেলে ছুটে চলে। কখনও পাহাড়ের চড়ায় গাড়ী ওঠে আবার কখনো উপত্যকার সমতল ক্ষেতে নেমে যায়।

অবিশ্রান্ত ভাবে কয়েক ঘণ্টা চলার পর গাড়ী অবশেষে কোহাট সহরের রাস্তায় এসে পড়লো।

এবার যখন গাড়ী থামলো তখন কোন ছোট-সরাইয়ের সামনে নয়, বা কোন-সাধারণ হোটেলের সামনে নয়। একেবারে প্রকাণ্ড তিতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো।

মোটা ভদ্রলোকটী গাড়ী থেকে নেমেই অমরের দিকে চেয়ে একটা অপূর্ব হাসি হেসে বললেন:—

"আপনার ভদ্রতা সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনার মত সঙ্গী না পেলে আমার এই দীর্ঘভ্রমণ মৃত্যুর মত ভীষণ হয়ে উঠতো। আপনি বুঝতে পারছেন না, চা না পাওয়ার দুর্ভাগ্য আমার পক্ষে কত বেশী যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিল। যাক্, এখন আমার সে দুঃখ ঘুচল। এতদিনের অভ্যাস কখনো ছাড়া যায় না। আর আমার বয়েসে কেউ ছাড়তে পারে না। আমি আপনাকে শুধু একটা উপদেশ দিয়ে রাখছি,—কোন ভাল জিনিষ অভ্যাস করার পর যেন কোনদিন সে অভ্যাস ত্যাগ করার চেষ্টা করবেন না। আমি এখন চা খেতে চললাম। চা খুবই দেরীতে পেলুম সত্য, কিন্তু একেবারে না পাওয়ার চেয়ে ঢের ভাল। ভালকথা, আমার পরিচয় দিয়ে যাই, আমার নাম ইম্যান্যুয়েল দত্ত, বাঙ্গালী খৃষ্টান। ময়মনসিং বাড়ী। তবে ব্যবসার খাতিরে অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়। যাক্, আবার আপনার সঙ্গে দেখা হলে সুখী হব। এখন আমি চল্লুম to drink your health in a cup of Tea!

অমর অবাক হয়ে মোটা ভদ্রলোকের যাওয়ার পথের পানে কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থেকে আপন মনেই বল্লে:—লোকটা কি পাগল!

ডায়েরীর ছিন্ন-পত্র

লেখকের অবদান— (৭) —রঞ্জন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মাটির বুকের ওপর এসে মানুষ যখন আশ্রয় নেয় তখন থেকেই তার ভেতর একটা আকাঙ্ক্ষা, একটা বাসনা, একটা স্পৃহা জেগে উঠে, সীমার বাইরে ছেড়ে যেতে চায়...

বাইরে থেকে তার পরিচয়, সে একজন 'মানুষ' কিন্তু তার আসল পরিচয় তার ভেতরকার দিয়ে···মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়ে...

এই সীমাহীন বিচিত্র নীলিমার বুকের ওপর বিন্দু বিন্দু ভাবে অগণিত তারা জ্বলে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র তারকারাশিগুলোর অন্তরালে যে কী বিচিত্র কাহিনী জড়ানো আছে, তা মানুষ যখন ভাবে, তখন সে দিশেহারা হ'য়ে পড়ে।···ভাবে, সে আরও ভাবে, কিন্তু দিশা পায় না তার!...

তেমনি মানুষের বাসনাও। ছোট্ট সীমারেখা টেনে নিয়ে যখন সে মার কোলে আসে, তখনই সে কেঁদে ওঠে, তার প্রাণের ভেতরকার একটা সুপ্ত বাসনা জেগে ওঠে—মার দুধ পান করে!···শিশু কাঁদে মায়ের দুধের জন্য, এ চিরন্তন!···এ কাউকে বলে দিতে হয় না।...শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এটার সন্ধান পায়!···এ প্রকৃতিগত!...

তারপর পৃথিবীর বুকের ওপর এক পা দু'পা ক'রে যখন সে এগিয়ে আসে, তখন থেকে একের পর এক ক'রে বাসনাও জেগে ওঠে তার মনের মধ্যে!...এটা চাই, ওটা চাই, সেটা না হ'লে চ'লবে না, ওটা তো পাবার কথাই, ইত্যাদি!···বাসনার সীমা যেন নেই তার কাছে!...

আজ বাংলা সাহিত্যকে ফলে ফুলে সাজিয়ে দেবার জন্যে পূজারীদল দাঁড়িয়ে আছে মায়ের দ্বারে সাজি হাতে ক'রে!...

শীর্ণ মায়ের জীর্ণ বস্ত্র আর নেই তাঁর অঙ্গে, তাঁর অঙ্গে এখন নানাফুলে সজ্জিত ও সুরভিত, সু-আননখানি যেন হেসে নেচে ওঠে...

বাণীর চরণ কমলে আজ প্রণত দুজন, যাঁদের কথা সহজেই মনে পড়ে আমাদের—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—

রবীন্দ্রনাথ লেখার ভেতর দিয়ে যে জিনিষটি ফোটাতে চেয়েছেন, শরৎচন্দ্রও তাই চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক লেখার ভেতর যে কথাটা ফুটে ওঠে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, শরৎচন্দ্রের লেখার ভেতরেও তাই দেখতে পাওয়া যায়—

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের লেখার তুলনা ক'রতে গেলে আমাদের সাদা বাঙ্গালায় বলা যেতে পারে—রবীন্দ্রনাথ যেন স্বর্গ থেকে পারিজাত কুসুম চয়ন ক'রে মায়ের মাথায় মুকুট ক'রে পরিয়ে দিতে নেমে এলেন এই ধরাতলে, আর শরৎচন্দ্র—দূরের ঐ পাক-জলাশয় থেকে একটি ফুটন্ত কোকনদ নিজ হাতে তুলে নিয়ে এলেন এই মরলোকে মায়ের রাতুল চরণে অর্ঘ্য দিতে ভক্তিভরে!...

রবীন্দ্রনাথ সন্ধান পেলেন ধনী গৃহের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের অন্তর্নিগূঢ় বেদনা আর শরৎচন্দ্র খুঁজে পেলেন, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রলেন সকলের কাছ হতে দূরে থাকা, বুভুক্ষাতরে ধেথলে-ফেলে-দেওয়া, সমাজের আইনে বাণবিদ্ধ করা গ্রাম্য-রমণীর প্রাণের গোপন-কথা।...রবীন্দ্রনাথের কানে এসে পৌঁছলো 'গোরা'র গোরার ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি, মা আনন্দময়ীর স্নেহের কথা, বিনয় ও ললিতার প্রেম, সুচরিতার ঢেকে-রাখা, চেপে-রাখা পবিত্র-প্রেম, যে প্রেমের পূজায় সে নিজেকে শূন্য, রিক্ত একেবারে নিঃস্ব হ'তেও কুণ্ঠা বোধ করেনি কখনোও।...

আর শরৎচন্দ্র—তাঁর প্রাণে এসে তীরের ফলার মতো বিধলো 'চরিত্রহীনে'র সতীশের পথ-খোয়ার ব্যর্থতা, 'সাবিত্রী'র লুকিয়ে-রাখা মনের কথা, তার অপূর্ব্ব প্রেমে নিজেকে বলিদান, 'কিরণময়ী'র হা-হুতাশ-করা ব্যর্থ-

নিঃশ্বাস আর 'উপেন্দ্র'র সৎপথে চলে আসা একটা নূতন ছন্দ।..'দেবদাসে' দেবদাসের জীবনকে তিলে তিলে দগ্ধে মারার যে একটা নূতন-পন্থা, 'পার্ব্বতী'র সমাজের কঠিন-শাসনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও নিজের মনের সঙ্গে আর সমাজের সঙ্গে যে একটা তুমুল দ্বন্দ্ব তার কথা, আর 'চন্দ্রমুখী'র পাঁক-জলাশয়ের ভেতর থেকে উঠে আসা একটি সুন্দর পদ্মের অতি করুণ কিন্তু অতি বিচিত্র কাহিনীর মর্ম্ম কথা... এ কাহিনী দেবতুল্য শরৎচন্দ্রের প্রাণে এসে বিঁধেছিলো তাই তাঁর লেখনী হ'য়েছে এমন সতেজ, নির্ভীক কিন্তু করুণ।...

রবীন্দ্রনাথ ঋষিশ্রেষ্ঠ আর শরচ্চন্দ্র দেবতুল্য!...

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে ভালবাসেন নিজের আত্মাকে তার মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে—তাই তাঁকে আমরা বলি 'কবি,' জগৎ তাঁকে চেনে 'কবি শ্রেষ্ঠ' বলে—"The great Philosopher in the World' ব'লে—

তাই বুঝি তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে, প্রতি কথায় ফুটে ওঠে তাঁরই রচিত মধুর গান:—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও
আপন সুর
তারই মধ্যে তোমার প্রকাশ, তাই
এত মধুর!"

বঙ্কিম যেদিন বাঙ্গলা সাহিত্যে অমৃত বিতরণ ক'রলেন, সেদিন এল বাঙ্গালায় এক নূতন যুগ, নূতন আলো, নূতন চিন্তাধারা।... লোকে চ'মকে উঠে এ ওকে বলে:

বাঙ্গলার ভেতর এমন!...

অপর জন দশ হাত বুক উঁচু ক'রে আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে বলে:

হুঁ।—

আজ সারা বাঙ্গলা, সারা বাঙ্গলা কেন, সারা পৃথিবী ছেয়ে বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা উঠেছে। তাঁরা যেমন একদিকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছেন আবার তেমনি হতাশের সুরও কাণে ভেসে আসছে:

আজকাল বাঙ্গলায় কি লেখা হচ্ছে?... লেখকেরা কি দিচ্ছেন?...

পাঠক উত্তর দিতে পারেন না, বইয়ের পাতা সামনে খুলে দেখান। বইটি টেনে যখন তিনি প্রথম পাতার ওপর দৃষ্টি ফেরান, পাঠক তাঁর কাছ থেকে দূরে স'রে যান, লজ্জা করে তাঁর সামনে ব'সে থাক্‌তে, লেখায় এমন সব কথা!...লেখকের লেখা প'ড়ে পাঠক 'বাহবা' দেবার আগেই লেখক নিজেই তাঁর গুণকীর্ত্তন গেয়েছেন যদি তাতেও পাঠক-পাঠিকার মন ভোলাতে পারেন!...লেখক জানেন বোধহয়, লেখক, কবি, শিল্পী ও গায়কের আছে নানা বিপদ—তার মধ্যে প্রেমের বিপদই বেশী।... তাই তাঁরা এই বিপদকে বুকে টেনে নেবার জন্যেই বুঝি এই সব অশ্লীল সাহিত্য প্রকাশ করেন?...

আজ আমার ডায়েরীর পাতা ভর্ত্তি ক'রতে গিয়ে একটা কথা মনে পড়ে। বঙ্কিম বাবু একদিন আমার দাদামশাই শ্রীযুক্ত

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ব'লেছিলেন :

লিখ্‌তে যখন চেষ্টা ক'রবে, তখন সব কথা খুলে লিখ্‌বে না, যা জানবে সত্যি তাই লিখবে আর বাকীটুকু ছেড়ে দেবে পাঠক পাঠিকার হাতে।...অর্থাৎ ডট্‌, ড্যাস্‌...তার মানেই, 'পাঠক বোঝ'।...

বড় দুঃখ হয় আমার। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে কালে এমন এক জিনিষ ছিল যা, বিদেশীয় সাহিত্যেও স্থান পেয়েছে—যেমন রবীন্দ্রনাথের 'গল্পাঞ্জলি' শরৎবাবুর 'শ্রীকান্ত' (প্রথম অংশ) ইত্যাদি।...

কিন্তু আজকাল লেখার মধ্যে সে প্রাণ নেই, সে উৎসাহ নেই, সে চেষ্টা নেই।...তাতে আছে নানা ঢংএ কথা বলা, ঠিক যেন বাবড্‌ হেয়ার কাটা একজন ইয়োরোপীয় মহিলাকে টেনে নিয়ে এসে বাঙ্গলা দেশের পাড়াগায়ের কুলবধ্‌ ক'রে সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে।...হাস্যাস্পদ ছাড়া আর কিছুই নয় এ।

তাই ভাবি, লেখকের এমন কিছু বের করা চাই, যা লেখার ঢং তো দূরের কথা, চিন্তাধারাও হবে নূতন, জগতের আর সকলেরও যাতে থাক্‌বে অজ্ঞাত—সেইটেই হবে লেখকের অবদান।...পাঠক সাগ্রহে প'ড়বে, আশ্চর্য্য হবে, বুঝবে—

—হ্যাঁ, লেখকের দান বটে !......

ওপারের ছায়া

পতিতপাবন পতিতুণ্ডী

ছেলে চুরির ভয়ে

ছেলে ধরার ভয়ে মর্কিণ মুলুক কম্পমান। তারই করাল কালছায়া দেখা দেয় মাঝে মাঝে হলিউডের বুকে। সবাই ত্রস্ত ব্যস্ত—কে জানে কবে দেখা দেয় তার কাছে। ছেলে মেয়েদের মা'য়েদের ত রাতে ঘুম নেই—দিনে অবসর নেই ; যতক্ষণ সেটের ওপর কাজ করে ততক্ষণই তাদের শান্তি।

মার্লিন ডিয়েট্রিশ

সারা দিনরাত ভাবনা ! ভাবনা ! আর ভাবনা ! কেবলি ওই এলরে ! তাইত হলিউডের ছেলেমেয়েদের জন্য সর্ব্বদা 'পাহারা' মোতয়েন থাকে কে জানে কখন চুরি করে নিয়ে যায়। মার্লিন থেকে আরম্ভ করে এ্যান হার্ডিং পর্য্যন্ত সবাই তাদের ছেলে মেয়েদের ছেলেধরাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে নতুন নতুন প্ল্যান বা'র করতে সুরু করেছেন। এ্যান ত তাঁর মেয়ে জেনের জন্যে রোজ নতুন নতুন লুকিয়ে রাখবার প্ল্যান বার করছেন। সব চেয়ে মজা করেছেন অল জলসন। অল জলসন ত ছেলের জন্যে আলাদা ডিজাইনের একটা অংশই তৈরী হয়েছে। সেটা একেবারে সম্পূর্ণরূপে যাকে বলে 'কিডন্যাপ প্রুফ।' কোন বাইরের লোক বাড়ির সেদিকের দরজা মাড়াতে গেলেই ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠবে। মজা হোল কিন্তু সেদিন। গভীর রাত। রাত তখন নিশুথি। হঠাৎ ঢং ঢং করে বাড়িতে ঘণ্টা বাজতে সুরু করল। ঘণ্টা শুনে রুবির সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল দেহে যেন আর প্রাণ নেই। আঁতকে উঠে অল জলসনের গলা জড়িয়ে ধরলে। জলসন ধড়ফড়িয়ে উঠে হাতে বন্দুক ধরলে চেপে আর পেছনে রইল রুবি। সে এগোতে সুরু করলে। সব আলো গেছে নিভে। ওঘর থেকে কার গোঁ গোঁ শব্দ আসছে। জলসন ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল। খুব আস্তে আস্তে। তারপর ফট করে আলোটা দিলে জেলে। একি তাদেরি বুড়া চাকরটা যে। রুবি জিজ্ঞেস করলে ব্যাপারটা কি !—'কি জানি কে যেন এসেছিল।' আলো নিবলে কে ?—'আমি। কার পায়ের শব্দ পেলাম বলে মনে হোল তাই আলো নিবিয়ে দেই।' এখানে পড়ে আছ কেন—'তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে।'—সে রাত্রে ওদের ঘুম হয়নি তা নয়, রোজই এমনি হয়। ওরা ওমনিই ভাবে আর ওদের রোজগারের বেশী পয়সা খরচ করে ছেলেকে ছেলেধরার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে।

ভেড়া পাওয়া হোল না

বেচারা! বেচারা! তিন দিন ধরে মার্লিনের ছবি রোজ প্রত্যেক শো দেখেছে। কিছুতেই তার আর তৃপ্তি নেই। মার্লিনকে আপনার করে নিতে হবে, তাকে ওর পেতেই হবে, তা নয়ত কিছুতে ও বাঁচবে না, বাঁচতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গে সূচ বিদ্ধের জ্বালায় সে অস্থির। গভীর রাতে ঠিক করলে লিখে দেবে—'বাড়ি দেব, গাড়ি দেব; থরে থরে সাজিয়ে দেব মোহর ঝুড়ি ঝুড়ি।'—সকালে উঠে ও লিখে দিলে—'নাও তুমি আমার বাড়ি, নাও আমার বিশ হাজার ভেড়া, নাও নাও আমার অমর প্রেম—যা তোমায় আমায় চিরদিন বাঁচিয়ে রেখে দেবে। আহা! সত্যিই বেচারা! ও বড় দুঃখী! জানে না ত যে মার্লিন বিবাহিতা।

লোকপ্রিয়ের এই কি চিহ্ন!

ওদেশের ষ্টাররা চিত্রামোদীদের কি ধরণের চিঠি পান সেটা বেশ দেখবার মত। মার্লিন ড্রাজ এবার তাঁর ফ্যানমেল বেশ চমৎকার ভাগ করে দেখিয়েছেন। গত মাসে তিনি যতগুলো চিঠি পেয়েছেন তারা এই রকম।—

১। কিছু দান করবার জন্যে চেয়েছিল ২১৫ খানা চিঠি।

২। তাঁর চাকরানী হিসেবে কাজ করবার জন্যে কাজ চেয়েছিল ৩০৬ খানা চিঠি।

৩। মেয়েরা তাঁর সেক্রেটারী হিসেবে কাজ চেয়েছিল ৪৮০ খানা চিঠিতে।

৪। ছোট ছেলেমেয়েরা পোষ্য হতে চেয়েছিল ৬০ খানায়।

৫। পাণি প্রার্থণা করেছিল ২০০ খানা চিঠিতে।

৬। বৃদ্ধ আর ধনী লোকেরা তাঁকে দত্তক গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাও ৭৯ খানায়।

৭। শতকরা একশ টাকা হারে লাভ দেখিয়ে নতুন নতুন ব্যবসাদার টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে তারও ৫০ খানা চিঠি।

৮। জাপান, চায়না, ভারতবর্ষের চিঠি যা তিনি পড়তে পারেন নি তাও ১০০ খানা।
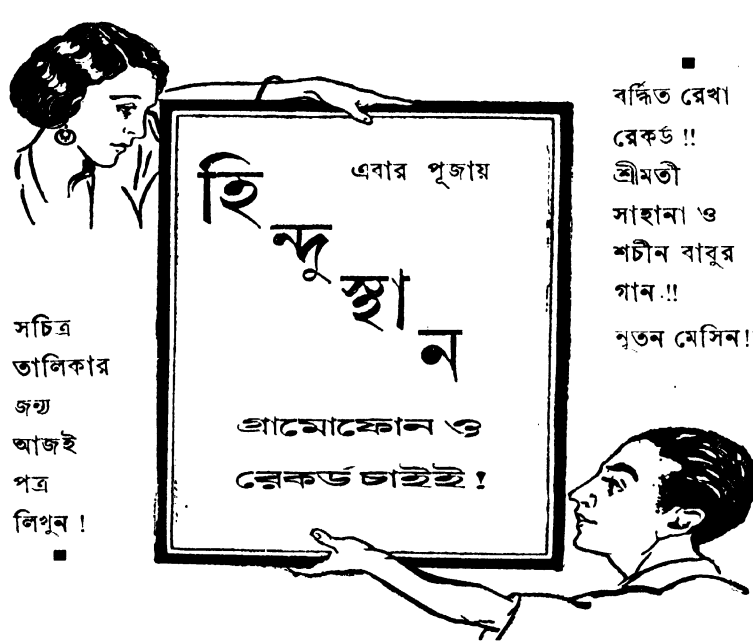
৯। বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে পেয়েছেন ১০০ খানা।

সবশুদ্ধ কতগুলো চিঠি পেয়েছিলেন এইবার আপনারা গুণে নিন।

সহকারীর পদোন্নতি

মানুষের কপাল কবে কোথায় আস্তানা গাড়ে কেউ তা বলতে পারে না। কাল যে রাজা আজ সে ফকির। আজ যে ফকির কাল সে রাজা—এমনিই মানুষের কপাল। ভাগ্যের চাকা বোঁ বোঁ করে চলেছে, কখন যে কিসের ওপর দিয়ে যায় কে তা বলবে!

মার্লিন ছিল একজনের 'ষ্ট্যাণ্ড-ইন', আর আজকে মার্লিন? সে একদিন ছিল যখন

আরনল্ড গ্রে'র নামে লোকে যেত ছবি দেখতে। তখন জোয়েন ম্যাক্‌ক্রিয়া তাকে ঘোড়ায় চড়তে শেখায়। তারপর সবাক যুগে আরনল্ড-এর নাম গেল উবে। এখন বন্ধু জোয়েল-এর হয়ে সে কেবল ঘোড়ায় চড়ে আর লাফায়, এমনই বরাৎ।

ওমনিই বরাৎ খুলেছে জর্জ্জ লোলিয়ের। পাঁচবছর ধরে সে ছিলো রিচার্ড ডিক্সের 'ষ্ট্যাণ্ড-ইন' রেডিওর ওই 'দি এ্যারিজোনিয়ান' বই খানায় ডিক্স-এর 'ষ্ট্যাণ্ড-ইন' থাকা সত্বেও একটা ছোট অংশে অভিনয় করতে পায়। ব্যস্‌ আর কে তাকে পায়! শুনলুম 'দি থ্রি মাসকেটিয়ার্স' সে নাকি একটা খুব বড় অংশ অভিনয় করতে পাচ্ছে। কে জানে এইবার হয়ত ক্লার্ক গেব্‌ল্‌ ফ্রেডারিক মার্চ্চ-এর পর তার নামও কোনদিন দেখতে পাব।

মেরী ড্রেসলারের সাজঘর

মে রবসনের আশা মেরী ড্রেসলার হবে। চেষ্টারও তাঁর অন্ত নেই। তাই মেরীর বড় সাধের ছোট পোর্টেবল্‌ সাজঘর মে কিনে নিয়েছেন। ঘরের বাইরেটা পেন্ট করে নতুন করে নিচ্ছেন তবে ভেতরটা ঠিক সেই পুরোণো দিনের মতই রেখেছেন। এতটুকু নড়চড় হতে দেন নি, সেই আসবাব-পত্তর, সেই ছবিগুলো, সেই পাউডার পাফ, সেই লিপষ্টিক, সেই ব্রাশ এমন কি সেই মাথার কাঁটা দুটো—সব ঠিক জায়গায় আছে,—ঠিক সেই আগেকার মত। মে বলেন এতেই নাকি মেরীর স্পিরিট তার মনে জেগে উঠবে। মেরীর শক্তি ও স্মৃতি নিয়ে কাজ করলে মে আরো লোককে আনন্দ দিতে পারবে এই তার বিশ্বাস।

খুচরো খবর

প্যাটরিসিয়ার এলিসের আসল নাম হচ্ছে প্যাটরিসিয়া লেফট্‌ উইচ।

* * *

কার্ল ব্রিসনের বেভার্লি পাহাড়ের বাড়িখানা রোনাল্ড কলম্যান কিনে নিয়েছেন।

* * *

অনেক লোকের মত এডওয়ার্ড ডি রবিনসনের হলিউডে দুষ্প্রাপ্য বইয়ের লাইব্রেরী আছে।

* * *

অ্যানা ষ্টেনের চিত্রামোদীদের কাছ থেকে প্রথম চিঠি পাওয়া হচ্ছে দুখানা চিঠি।

* * *

মে ওয়েষ্ট পাকা ব্যবসাদারও বটে।

ছিটেফোঁটা

শ্রীবজ্রবাহু

'খেয়ালী বনাম শান্তি'

বজ্রবাহুর বাঁ হাতের ঈষৎ অন্তর টিপ্পনী এক হেমদা কান্তকে ক্যাব্‌লা কান্ত করে ছেড়েছে এবং শান্তির ডাষ্টবিনে করুণ আর্ত্তনাদ শোনা যাচ্ছে, পদ্মা পার হয়ে যার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমাদের কর্ণ পীড়া ঘটাচ্ছে।—

এই সব দুধের বাছারা, আবোল তাবোল বক্‌বার সময় সামান্য একটু ধমক্‌ খেলেই ভ্যাঁ! শাসন সরে গেলেই বলে 'বেশ করেছি—আরো করবো'।

কিন্তু নাচটা পুতুল নাচের মত অপূর্ব্ব। সুতো ধরে টানে একজন হাত পা তোলে আর একজন। বাংলা সাহিত্যের ভরা মজ্‌লিশে বাজে ফাজ্‌লামি করলেই হাত ধরে তুলে দেবার ভার বজ্রবাহু প্রমুখ সমালোচকদের। ভাড়ুচি দেবার কুমতলব এখানে ফেঁসে যাবে।—আমাদের এক কথা—গালাগালির ভয় থাকে—সংযত হয়ে কলম ধর!—

আজকে বাংলাদেশে সাহিত্য বোঝে একটি লোক—শ্রীহেমদা কান্ত আর একটি কাগজ ঢাকার শান্তি।—যে লোক লিখেছিলো 'প্রিয়াকে গুরুর সমান জ্ঞান করে প্রণাম জানাই' এবং যে কাগজ তাই ছেপেছিলো!—'খেয়ালীর' বজ্রবাহুকে এই লোকই 'সাহিত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ' ঠাওরে দাঁত খিচিয়েছেন।—এই বিজ্ঞলোকটির লেখার যৎকিঞ্চিৎ নমুনা ইতিঃপূর্ব্বে আমরা কিছু শুনিয়েছি—পাঠক পাঠিকার তা বোধহয় স্মরণ আছে সুতরাং এঁর সম্বন্ধে আজ আর কিছু নাই বা বল্‌লাম!—

বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর ভাবনা রইল না, সাহিত্য সম্রাটদের প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ভব দেখে তাঁরা ভয় না পেলেই হল। অশ্লীলতার বন্যায় যারা ভেসে আসছে ভবিষ্যৎ সম্রাট্‌ বর্ত্তমানে তাদেরই আঁকড়ে ধরেছে,— কিন্তু সাবধান—'অতি বাড় বেড়ো নাকো'—

খেয়ালী-মানহানির মামলা

শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারের সাক্ষ্য

ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের মানহানির অভিযোগে 'খেয়ালী' পত্রিকার শ্রীযুক্ত যোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যে মামলা আনীত হইয়াছে, আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে, সেনের এজলাসে শুক্রবার পুনরায় তাহার শুনানীর সময় আসামী পক্ষের সাক্ষী হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের জবানবন্দী গৃহীত হয়।

সাক্ষী বলেন, গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখ অপরাহ্নে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের জনৈক উকিলের নিকট হইতে টেলিফোনে তিনি জানিতে পারেন যে, প্রমথনাথ সরকার সাক্ষীর বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করিয়াছে। সাক্ষী তখন তাঁহার উকিলের সহিত পরামর্শ করেন। ঐ দিন ডাঃ সান্যাল বা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সহিত উক্ত মামলা সম্পর্কে তাঁহার কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। ঐ দিন তাঁহাদের সহিত অফিস সংক্রান্ত কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছিল কিনা তাহা সাক্ষীর স্মরণ নাই। তাহারা উভয়েই সাক্ষীর অধীনস্থ কর্ম্মচারী। তাহার মামলার সময় দুই একদিন সাক্ষীর সহিত ডাঃ সান্যাল পুলিশ কোর্টে গিয়াছিল। সে স্বেচ্ছায়েই সাক্ষীর সহিত গিয়াছিল।

প্রঃ—আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যাহাতে প্রকাশিত না হয়, তজ্জন্য তদ্বির করিতে ডাঃ সান্যাল কয়েকটি সংবাদপত্র অফিসে গিয়াছিলেন, এ কথা আপনি জানিতেন কি? আমি এই কথা শুনিয়াছি।

প্রঃ—এই মামলার বিবরণ অপ্রকাশিত রাখার জন্য আপনি নিজে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কি?—কখনও না

এমন কি আমার জনৈক বন্ধু এই জন্য সংবাদপত্র অফিসে টেলিফোন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলে, তাহাতে আমি অসম্মত হই।

১৯২৯ সাল হইতে স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের সহিত সাক্ষীর পরিচয়। ঐ সময় তাহারা উভয়েই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯২৯-৩০ সালে সাক্ষী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিরও সদস্য ছিলেন। সাক্ষী এখন আর কংগ্রেসের সদস্য নহেন।

স্যার বিজয়প্রসাদের সহিত সাক্ষীর বন্ধুত্ব আছে। মধ্যে মধ্যে কার্য্য ব্যপদেশে তিনি স্যার বিজয়প্রসাদের বাড়ীতে যাইয়া থাকেন। ডাঃ সান্যালের সহিতও স্যার বিজয়প্রসাদের বন্ধুত্ব আছে কিনা, তাহা সাক্ষীর জানা নাই। স্যার বিজয়ের বাড়ীতে ডাঃ সান্যালকে সাক্ষী কখনও দেখেন নাই। স্যার বিজয় দুই তিনবার সাক্ষীর বাড়ীতে আসিয়াছেন; কিন্তু বঙ্গীয় মিউনিসিপাল বিল সম্পর্কে আসেন নাই। দিল্লীতে মন্ত্রি-সম্মেলনে স্যার বিজয়প্রসাদের সহিত ডাঃ সান্যালও গিয়াছিলেন কিনা, তাহা সাক্ষী বলিতে পারেন না। সাক্ষী বর্ত্তমানে কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নহেন। পূর্ব্বে তিনি স্বরাজ্য দলে ছিলেন।

'খেয়ালীতে' কতগুলি বিশ্রী জিনিষ বাহির হইয়াছে বলিয়া সাক্ষী শুনিয়াছেন। 'খেয়ালী' পত্রিকায় সামাজিক কুৎসা বাহির হয় বলিয়া সাক্ষী এই জাতীয় পত্রিকার উপর সন্তুষ্ট নহেন। 'খেয়ালী' যখন প্রথম বাহির হয়, তখন তিনি অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময় উক্ত পত্রিকার বর্ত্তমানের মত অবনতি ঘটে নাই।

বাগবাজার বা অন্যত্র 'কমলা' নামে কোন স্ত্রীলোক আছে কিনা, তাহা সাক্ষী জানেন না।

❋ গান ❋

কথা—শ্রীশান্তি প্রকাশ মিত্র

সুর—শ্রীসুনীল কুমার দাশগুপ্ত

(ভাটিয়ালী)

ভোলা, তুই কিসের আশে থাকিস্ বোসে 'পরে ?
ও তোর মুখে হাসি হাতে বাঁশী,
আছিস্ আপন খেয়াল-ভরে
ওরে তোরে ত কেউ বোঝে না,—
তারা বোঝে না কভু আপনা;
ফিরিয়ে মুখ সবাই যায়,
তুই ত তাকাস্ না রে সে-ধারে।
ঝড়ের দিনের অট্টহাসে,
(তোর) পরাণ কাঁপে কী উল্লাসে;
নেচে বেড়াস্ দিকে-দিকে—
সদা আগল খোলা তোর দুয়ারে।
ফুটলে তারা আঁধার কোলে,
বাজাস্ বাঁশী বেভুল বোলে;
জানি নে কার পাস রে দেখা—
তোর ও অগাধ হৃদয় মাঝারে।

প্রঃ—যদি কোন রচনায় 'কমলা' কথাটি থাকে এবং আপনার ও স্যার বিজয়প্রসাদের নাম তথায় উল্লেখ করা হয়, আর যদি বলা হয় আপনার সহিত স্যার বিজয়প্রসাদের বন্ধুত্ব 'কমলকুঞ্জে' হইয়াছে, তবে এইরূপ কেহ বলিলে কি সে উপহাসাস্পদ হইবে না যে, কমলা নাম্নী স্ত্রীলোকের জন্যই আপনাদের বন্ধুত্ব সম্ভবপর হইয়াছে ?

—না। ইহা শুধু উপহাস নহে, দুরভিসন্ধি প্রণোদিত মিথ্যা। যদি কেহ স্যার বিজয়প্রসাদ ও আমার নামের সহিত 'কমলা' নামের উল্লেখ করে, তবে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা হইবে।

সাক্ষী আসামীদের চিনেন না। সাক্ষী 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। আসামীরা তথায় কাজ করিত কিনা, তাহা সাক্ষী জানেন না।

জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন, ডাঃ সান্যালের সহিত সাক্ষীর গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া পরিচয়। ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ডাঃ সান্যাল বা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে কোন সংবাদপত্র অফিসে যাইবার জন্য তিনি বলেন নাই। ডাঃ সান্যাল তাহাকে স্যার বিজয়ের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন, একথা সত্য নহে।

প্রঃ—একদিকে 'কমলা' এবং অপর

বাঙ্গলার পল্লীসম্পদ্

শ্রীবিভূতি ভূষণ মালাকার

বাঙ্গলার চাষীর স্বাস্থ্যই বাঙ্গলার পল্লী সম্পদ্। এই সম্পদের অধিকারী হইয়াই বাঙ্গলা ধনে জনে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। স্বাস্থ্য সম্পদ্ নষ্ট হওয়ায় বাঙ্গলার সেই উৎকর্ষতা আজ স্বপ্নে পরিবেশিত। বাঙ্গলা আজ দীনা, হীনা, নিরভরণা, পরপ্রদেশের মুখাপেক্ষিনী। বাঙ্গলার প্রতি তাই আজ অ-বাঙ্গালী করুণার নেত্রে চাহিয়া দেখে, বাঙ্গালী তাহাদের কৃপালাভে নিজেকে ধন্য মনে করে, নিজের জাতীয়তা ও বৈশিষ্ট্য হারাইয়া পর পদ-লেহনে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

বাঙ্গলা, তথা ভারতের অন্যান্য গ্রামের ন্যায় বেলডাঙ্গাও একটি কৃষিপ্রধান পল্লীগ্রাম। রেশম, পাট, ধান প্রভৃতি দ্রব্যের উন্নতিতেই বেলডাঙ্গার উন্নতি, ইহাদের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বেলডাঙ্গা ও আণ্ডিরণ, নওয়াপুষ্করনী, কাগ্‌জীপারা, কাপাসডাঙ্গা, স্বরূপনগর, মনীন্দ্রনগর, মহেশপুর, রামেশ্বরপুর প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহের অবস্থাও আজ শোচনীয়। এই সব গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই চাষী গৃহস্থ। ইহারা সারাদিন মাঠে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া ও দিনান্তে উদর পুরিয়া খাইতে পায় না, আবশ্যকীয় পরিচ্ছদ পায় না। এই দারুণ অভাবে বাঙ্গলার চাষীর স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, চাষীর অমূল্য সম্পদ্ যাদুকরের মায়াবলে যেন চির অন্তর্দ্ধান করিতেছে। বাঙ্গলার চাষী সারাদিন পরিশ্রম করিয়া গোধূলি লগ্নে লাঙ্গল ঘাড়ে আপন মনে গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিত, তাহাদের গানের ঝঙ্কারে বাঙ্গলার আকাশ ও বাতাস প্রতিধ্বনিত হইত। গোপাল তাহার গরুর পাল তাড়াইতে তাড়াইতে সময়ে সময়ে ছোট ছোট খাল বিল স্বচ্ছন্দে

দিকে আপনি ও স্যার বিজয়—ইহাদের মধ্যে গোপন প্রণয়ের দৌত্যকার্য্য ডাঃ সান্ন্যাল কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে, এই কথা যদি কেহ বলে তবে তাহা বিদ্বেষপ্রসূত মিথ্যা হইবে?—হাঁ।

আপনার কাজেই ডাঃ সান্ন্যাল স্যার বিজয়প্রসাদের বাড়ীতে যাতায়াত করিয়াছিলেন, একটি রচনায় যে এইরূপ বলা হইয়াছে তাহা কি সত্য?—না, সত্য নহে।

ডাঃ সান্ন্যাল ও সাক্ষী যখন কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল।

শুনানী স্থগিত আছে।

—

লাফাইয়া পার হইয়া যাইত। আজ আর তাহার সে দিন নাই। তাহারা আজ সর্ব্বহারার স্থায় জীবন যাপন করিতেছে। মনে প্রফুল্লতা নাই, হৃদয়ে উদ্যম নাই, রোগপ্রতিরোধক স্বাস্থ্য নাই! সকলদিকে সে আজ কাঙাল, শূন্যমনে সে আজ মৃত্যুপথ-যাত্রী।

দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিন দূর করিতে হইলে, এই হৃত সম্পদ্ পুনরায় অর্জ্জন করিতে হইলে ইতর ভদ্র, ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রত্যেককে সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে হইবে, সমবায় প্রথায় স্বদেশী দ্রব্যের যাহাতে বহুল প্রচলন হয় তাহার যথাবিহিত চেষ্টা করিতে হইবে। বিদেশ ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমরা যথাক্রমে যে ২।৹ কোটি ও ১০ কোটি টাকার কাপড় বৎসরে আমদানী করি তাহা বন্ধ করিয়া যাহাতে ঐ পরিমান কাপড় বাঙ্গলার মিলে ও কুটীর-শিল্পের সাহায্যে উৎপন্ন করিতে পারি তাহার সমূহ ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের এই দুর্গতির দিনেও ১৯৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে একলক্ষ সত্তর হাজার টন চিনি বিদেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গলাদেশে আমদানী করিয়া আমাদের চিনির ক্ষুধা মিটাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। যাহাতে এই চিনি আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হয় তাহার জন্য ধনীকে তাঁহার ধনাগার উন্মুক্ত করিয়া শর্করা শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। পাটের চাষ অল্প করিয়া যাহাতে উহার ন্যায়সঙ্গত মূল্য পাওয়া যায় তাহার জন্য বাঙ্গলা সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। মুর্শিদাবাদ জেলার ইস্‌লামপুর, চক্, বেলডাঙ্গা, মির্জ্জাপুর ও মালদহ জেলার মালদহ, ইংরাজবাজার প্রভৃতি গ্রামের রেশম, মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া ও কান্দী, নদীয়া জেলার মেহেরপুর সাধনপাড়া, বহিরগাছি, মুড়াগাছা, ধর্ম্মদা, নবদ্বীপ, দেবগ্রাম, রাণাঘাট ও মড়ক, বর্দ্ধমান জেলার মাটিয়ারী ও দাঁইহাট, এবং ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর প্রভৃতি গ্রাম বা নগরের পিত্তল তাম্র বা কাংসনির্ম্মিত গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী তৈজসপত্র, ঢাকার শাখার কারুকার্য্য, যশোহরের বোতাম, মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম আস্তিরণ; নদীয়া জেলার রাণাঘাট, গোয়াড়ী, ধোড়াদহ, বুধকোলগ্রাম প্রভৃতি গ্রামের মৃৎশিল্প পুনঃ সঞ্জীবিত করিতে হইবে। ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমাদের এই শিল্পকে সাহায্য ও সহানুভূতির রসে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে, দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে উহার অবাধ প্রচলন হয় সে বিষয়ে সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের বাঙ্গলাদেশকে কায়মনবাক্যে স্বদেশী ভাবাপন্ন করিতে হইবে। দেশজ জিনিষের বহুল প্রচার হইলে বহু বেকারের অন্নের সংস্থান হইবে, বহু অব্যবহৃত ও অকর্ষিত জমি ব্যবহারে আসিবে। চাষীর দুঃখ দৈন্য দূর হইলে তাহার মলিন মুখে হাসি ফিরিবে, তাহার হৃত সম্পদ্ পুনরায় ফিরিয়া আসিবে, সঙ্গে সঙ্গে উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র প্রভৃতির বেকার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

—•—

ক্ষমা

শ্রীঅলকা দেবী

তার মরমের গোপন বীণায় যে রাগিণী নিত্য বাজে,
শান্ত সজল ছায়াচ্ছন্ন মৌন মধুর স্তব্ধ সাজে
অকথিত বাণী স্বপনের আধ ভাষা
চির অমলিন বঞ্চিত ভালোবাসা
প্রদীপের মত তিলে তিলে যায় নিশেষে আপনা দহি
অকরুণ কোন্ দেবতার লাগি অর্ঘ্য আনিছে বহি।
বিস্মিত আমি স্তব্ধ হৃদয়ে ডাকি
ফিরে এস ওগো প্রাণ প্রিয় মোর "সাকী"
তোমারি বিহনে আজিকার এই বাদলের মধুনিশি
তিক্ত হয়েছে; সিক্ত আঁখির অশ্রু সায়রে মিশি!
উচ্ছল প্রেম চঞ্চল হয়ে কাঁদে
স্বপনের ঘোরে অজানারে বুকে বাঁধে
জাগরণে শুধু তোমারেই ডাকে, ফিরে এস প্রিয়তমা
অনুতপ্তের বুকের অনল নিবাও করিয়া ক্ষমা॥

দেশবন্ধু

"নিঃশেষে করিলে তুমি পূর্ণ আত্মদান
তোমার দানেতে হ'ল জাতি দীপ্যমান;
অমর আত্মার সেই জ্যোতির আলোকে

সুভাষচন্দ্র

কংগ্রেস কনক-জয়ন্তী সংখ্যা

খেয়ালী

পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ

কার্য্যালয়—৯, রামময় রোড, কলিকাতা

গ্রাম—ভ্যারিটি] [ফোন—পার্ক ৩২৪

সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চম বর্ষ { শনিবার, ১২ই পৌষ, ১৩৪২—28th December, } ৫০শ সংখ্যা

কংগ্রেস ও নারী

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

কংগ্রেস্ কনক-জয়ন্তী উপলক্ষে নারীর কংগ্রেসে কাজ নিয়ে "খেয়ালী"র জন্য আমায় একটা প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে। ভারতের নানা প্রান্তেই তো নারী কংগ্রেসের কাজে লিপ্ত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই নীরব সেবা দ্বারা কংগ্রেসকে পুষ্ট করছেন—নাম তাঁদের জানে খুব অল্প লোকেই, ইতিহাসে তাঁদের স্থান দেয় আরো অল্প জন। নারী হয়ে আমিই সকলের কথা জানি না, তা অন্যের কথা কি বল্‌ব।

কংগ্রেস নারীকে গৌরবের আসন দিয়েছেন; যাঁরা সর্ব্বপ্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা করেন, তাঁরা তৎকালীন সমাজে, আপন আপন প্রদেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতেন, শিক্ষায়, কৃষ্টিতে, দীক্ষায়, ব্যবহারে আদর্শ রূপে পরিগণিত হতেন। তাঁদের অধিকাংশই সমাজ-সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতেন এবং প্রগতিশীল সমাজভুক্ত ব'লে পরিচিত হতেন। ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য্য সমাজ কিম্বা এই সমস্ত সমাজের আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গ দ্বারাই বিশেষ করে কংগ্রেস সভা অনুষ্ঠিত হয়। তবুও এর জীবনের প্রথম চার বৎসর এই সভায় নারী প্রবেশাধিকার লাভ করেন নি। প্রথম নারী সভ্য গ্রহণ করা হয়। এঁরা ছিলেন সংখ্যায় চারিটি। পণ্ডিতা রমাবাই, লেডী নীলকণ্ঠ, মিসেস নিকম্ব এবং আমার মা ডাক্তার মিসেস গাঙ্গুলী। এর পর বৎসর

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

কল্‌কাতায় ষষ্ঠ অধিবেশনে মাত্র দুইটি নারী সভ্যা হিসাবে যোগ দেন—যদিও দর্শক হিসাবে ১০-১২ জনের উপর এই সভা দেখতে গিয়েছিলেন—এবং তার মধ্য থেকে ৺ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত নারী-সমিতিতে যদিও ইতিপূর্ব্বে মা বক্তৃতা, প্রবন্ধাদি পাঠ ইত্যাদি করেছিলেন, তবুও প্রকাশ্য সভায় নারীর—এমন কি তাঁর বক্তৃতা বোধ হয়, এই প্রথম। তারপর কত নারী-ই কংগ্রেস মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষার প্রবাহে দেশবাসীর মনে নব আশার অঙ্কুর জাগিয়ে তুলেছেন এবং তাঁদের মধ্যেও বাংলার নারী বাংলার গৌরব অক্ষুণ্ণই রেখেছেন। এই বাংলার মেয়েই একদিন কংগ্রেসের নেতৃত্বপদ গ্রহণ ক'রে ভারত-নারীর যশোগরিমা ভাস্বর করে তুলেছেন। বাংলার নারী গান গেয়ে কংগ্রেস সভাতল মুখরিত করেছেন, সুললিত কণ্ঠস্বরে দিক্ ধ্বনিত করে প্রাণ মাতিয়ে তুলেছেন, বাংলার নারীরই লেখনী-নিঃসৃত "অতীত গৌরববাহিনী মম বাণী" সঙ্গীতের ধুয়ায় রোমাঞ্চিত সভাজন আপন অজ্ঞাতসারেই গায়কবৃন্দের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে "নমো হিন্দুস্থান" বলে দেশের পানে প্রণতি জানিয়েছেন।

বাংলার নারীরাই প্রথমে স্বেচ্ছাসেবিকার ব্রত গ্রহণ করেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যারূপে অতিথি, প্রতিনিধিগণের সেবার ভার গ্রহণ করেন, সভায় চিত্তোদ্দীপক সঙ্গীত

অপর প্রদেশের পথ প্রদর্শক এই বাংলা দেশ। দেশ সেবার জন্য প্রথম কারাভোগের সৌভাগ্য লাভ করেছেন এই বাংলারই নারীগণ।

বাংলার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় নারী সমাজ এগিয়ে চলেছে—অন্যান্য প্রান্তেরও নারী নিজেদের ত্যাগ, শক্তি ও সেবা দ্বারা কংগ্রেসের মহিমাকে উজ্জ্বল করেছেন, অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য দুঃখের তিলক মাথায় ধারণ করেছেন।

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টদের পরিবারস্থ নারী-রূপে যে সমস্ত নারী স্বামী, ভ্রাতা বা পিতার আদর্শকে অম্লান রাখবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে খেটেছেন, তাঁদের মধ্যে নেহেরু পরিবার, দাশ পরিবার, গান্ধী সহধর্ম্মিণী, সেনগুপ্ত সহধর্ম্মিণী, চন্দাবরকর সহধর্ম্মিণী, প্যাটেল কন্যা, লাজপত রায়ের কন্যা ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুত্রের জননী হিসাবে মহম্মদ আলীর মাতার নাম আজও কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে। মতিলাল সহধর্ম্মিণীকে জহরলালজননীরূপেই বুঝি দেশ ভাল করে চেনে—সে তাঁর শঙ্করী রূপের চেয়ে গণেশজননী মূর্ত্তিকেই বুঝি বেশী সমাদরে অন্তরে গ্রহণ করে।

দেশের পতাকার শিরোভাগে যে ত্যাগের রং আজ জেগেছে—তাকে রাঙিয়ে তুলেছে হৃদয়-রক্ত দিয়ে যারা তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা কম নয়, এবং সেই সমস্ত নারীকে যদি দেশ আজ স্মরণ করতে যায় তো মেদিনীপুর জেলা নিবাসিনী সেই সমস্ত সামান্য গ্রাম্য নারীকে আজ ভুললে চলবে না, যারা To keep the flag unsullied, তার ছিন্ন টুকরা বক্ষে রেখে ক্রোধান্বিত বুটের তলায় কলঙ্ক কালিমা নিজের দেহেই মেখে নিয়েছিল।

কংগ্রেস তার সোনার কাঠির স্পর্শ দিয়ে জাগিয়ে তুলেছে ঘুমপুরীর রাজকন্যাকে তার বহুবর্ষের মূর্চ্ছাভরা নিদ্রা থেকে। জেগে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদের সকলেই—তাই আজ দেখা যায় সাতের কোঠায় যাঁরা পা দিয়েছেন সেই বয়সের নারীরাও দ্বাদশবর্ষীয়ার হাত ধরে—আচার পরায়ণা নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবাও মুসলমান নারীর হাতে হাত রেখে চোখ মেলে ছুটে এসেছেন, ডাক দিয়েছেন দেশের ভাগ্য বিধাতা বজ্ররবে যে তাই বলে।

কংগ্রেসের স্পর্শলাভ করে আজ ভিন্ন-প্রদেশের ব্রাহ্মণ-কন্যা অন্য প্রদেশের বণিক-পুত্রের প্রসারিত পাণিতলে আপনার পাণি স্থাপন করতে ইতস্ততঃ করলে না। বাংলায়, পাঞ্জাবে, বিহারে, উড়িষ্যায়, মাদ্রাজ ও যুক্ত প্রদেশে মিলন সংঘটিত হ'ল—দেশের মানুষ কবির কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলল্ এই ভারতের মহামানবের তীর্থে আমার চিত্ত জেগে উঠুক। এবং এই চিত্ত জাগানিয়ার ব্যাপারে নারী দান করল আপনাকে, যাতে সে আপনার রক্তমাংস, মেদমজ্জা দিয়ে মিলিত ভারতের প্রেমিক সন্তানকে গড়ে তুলতে পারে। নারীর চক্ষে জাগল স্বপ্ন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের, তারই বক্ষে জাগল দুরাশা—দেশের বন্ধন হতে মুক্তির,—তাই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে অকুতোভয়ে, অসমসাহসিক হৃদয়ে। বাংলার নারী কোন প্রদেশের নারীর চেয়ে পিছনে পড়ে রৈল না, চলল আগে আগে বর্ত্তিকা নিয়ে হাতে, অন্ধকারের প্রথম যাত্রী হয়ে।

মনে পড়ে সেদিনের কথা আজও, যেদিন ভাটিয়া সেবাদলের সঙ্গে বাংলার স্বেচ্ছাসেবকের দ্বন্দ্ব লেগে গেল—বাংলার বুকে অতিথি হয়ে এসে যখন অন্যপ্রদেশের স্বেচ্ছাসেবকগণ, বাংলার উৎসাহদীপ্ত অন্তর, তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের, দেশভক্তগণের সেবা করবার জন্য, ব্যগ্র আকুলতা সত্ত্বেও, একরকম জোর করেই নিজেদের স্কন্ধে সকল ভার তুলে নিতে গেলেন, তখন বিক্ষুব্ধচিত্ত বঙ্গ যুবকগণ অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য ভুলে গিয়ে উদ্যতফণা হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু পরক্ষণেই

নারীর কথায় মন্ত্রমুগ্ধের মত নতশির হয়ে সকল ক্রোধ শান্ত করে স্থির হয়ে দাঁড়াল। সেদিন মনে হয়েছিল বিদ্যাসাগরের এই দেশ আজও মাতৃভক্তি ভুলে যায় নি, সেদিন শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্ত এই কথা স্বীকার করেছিল যে বঙ্কিমচন্দ্রের এই দেশ সাধকের মন্ত্রকে ভুলে যায় নি, বন্দেমাতরম্ শিক্ষাকে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করতে পেরেছে। সেদিন বুঝেছিলাম সন্তানকে দেশসেবা করতে দিয়েই বাংলার নারী রত্নগর্ভা নাম ধারণ করবে। কারাগারে দিনের পর দিন যখন নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগল, যখন দেখলাম ঘরণী গৃহিণী যাঁরা তাঁরা দেশকে ভাল করতে পারলে ঘর আরো ভালো হবে ভেবে গৃহ ছেড়ে কারাভবনে আসছেন, যখন দেখলাম বৃদ্ধ পতির সেবা ছেড়ে এলেন নাতির কল্যাণ কামনায়, ছাত্রী ছেড়ে এলেন পাঠ্যপুস্তকের রাশি, নববধূ নূতন জীবনের মধু আস্বাদে না ভুলে বিরহের সিন্দুর মাথায় মাখলেন, বিধবা জপ-তপ ঠাকুর অর্চনা দেশসেবার মধ্যেই নিমগ্ন করে দিলেন, তখন বুঝলাম এই ভারত জনসভা কংগ্রেসই একদিন দেশ-দেবকীর শৃঙ্খল মুক্ত করবে। তারই পাঞ্চজন্যের আরাব যেন মনে হয় দেশের নারীর কাণে মুরারির মুরলীধ্বনির মত লেগেছে, তাই তাঁরা এসেছেন দলে দলে কারাগার পানে ছুটে, দেশের আশার স্থল যারা তাদের কানে লেগেছে গোষ্ঠবিহারীর বাঁশীর ধ্বনির মত, তাই শ্রীদাম সুদামের মত তারাও গৃহ ছেড়ে বাহিরে এসেছে। এসেছে সকলে মুক্তি কামনা ক'রে, পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের আশায়—তাতে তো আর সন্দেহ নাই। আজ সফলতা বিফলতার জন্য দুঃখ করি না, আজ মনে হয় যেন শুনতে পাই ভারতের জন-নারায়ণ নারীকে উদ্দেশ করে বলছেন

মরণ-সাগর মন্থন করে অমৃত যে উঠে
তাহারে বহিয়া আনিছ লক্ষ্মি! সুকর-পর্ণপুটে
মোর নাহি ভয়, নাহি ভয়
পিয়াইয়ে সুধা-করিবে আমারে তুমিই মৃত্যুঞ্জয়।

সেই পুরাতন কথা

●

মোহাম্মদ মোদাব্বের

১৯১৮ সালের শেষাশেষী একদিন শুনলাম, কোন এক জাতি নাকি হঠাৎ স্বাধীন হয়ে গিয়েছে। বাবা ত এ খবর পেয়ে যা খুসী! তাঁর খুসী দেখে মনে হল যেন, আমরাই স্বাধীন হয়ে পড়েছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, বাবা, স্বাধীন মানে কি?

বাবা শুধু দুটো কথায় উত্তর দিলেন—জীবন্তরে, জীবন্ত!

আমি বললাম: আচ্ছা বাবা, আমরা কি তা হলে মরা?

বাবা আর কোন উত্তর দিলেন না। শুধু একটু হাসলেন।

* * *

১৯২০ সালের শেষের দিকের কথা। উচ্চ-প্রাথমিক শ্রেণীতে তখন পড়ি। বাবা আশা করে আছেন যে, আমি যদি বৃৎসই করে আর দুটো লাফ কোন রকমে দিতে পারি, তবে হাইস্কুলের নীচের সিঁড়ির নাগাল ধরতে পারি। তারপর আর গোটা কতক বছর কৃচ্ছ্রসাধনের পর আমার কমপক্ষে দারোগা-গিরি চাকুরীটা আর আটকায় কে?

ঠিক এই সময় একটা দারুন হুজুগের কথা কানে এসে কেবলই ঘা মারতে লাগল। স্কুলে সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার' আসতো। তখন ইংরেজী বুঝবার মত বিদ্যা অর্জ্জিত হয় নি, তাই কাগজখানা চেয়ে বাড়ী নিয়ে যেতাম।

বাবা আমায় পড়ে শুনাতেন, আজ অমুক হাকিম অমুক জায়গায় বদলী হলেন। কাল অমুক সাব-রেজিষ্ট্রার এত দিনের ছুটী পেলেন।

আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করতাম, গান্ধী কি করছেন? দেশবন্ধু কে? মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী কি করেন?

তিনি চোখ পাকিয়ে মুখ কালো করে এমন ভয় দেখাতেন যে, তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে রেহাই পেতাম।

এখন বুঝতে পারছি, তিনি আসল জায়গা না পড়ে আমাকে 'কলিকাতা গেজেট' পড়ে শুনাতেন।

যাই হোক, আমার অকূলের কাণ্ডারী ছিলেন, আমার এক জ্যাঠা মশায়। মৌতাতের নেশায় তিনি সব সময়ই মশগুল থাকতেন। তাঁকে ঘর থেকে গুড় চুরি করে এনে দেওয়া ছিল আমার বড় কাজ। আমার মা নেশাখোর মানুষকে মোটে দেখতে পারতেন না, তাই জ্যাঠা মশাইও পারতপক্ষে মার নজরে পড়তে চাইতেন না। কাজেই তাঁর মৌতাতের উপাদান গুড় চুরি করে এনে দেওয়ার গুরুভার আমার উপরই পড়ল। দু'একবার ধরা পড়ে মার কাছে যে পুরস্কারটা পেয়েছি তার কথা উল্লেখ আর নাই বা করলাম!

ইংরাজী ভাষায় জ্যাঠামশায়ের অসাধারণ দখল! তিনি নাকি পাঠশালা থেকেই 'মা-সরস্বতী'কে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে চণ্ডুখোর সাধু মিয়ার আড্ডায় ভর্ত্তি হন। তাঁর এত বিস্তার কথা তখন কি আর বুঝতাম? তাই কাগজখানা নিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হতাম। তিনিও ইংরেজী 'অমৃতবাজারের' পাতার উপর নীরবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তারপর বলতেন: "গান্ধী-মহারাজ বিলেত থেকে এসে অনেক ফৌজ যোগাড় করেছেন। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই হবে। তারপর তিনি দিগ্বিজয়ে বেরুবেন এবং এক এক করে সমস্ত দুনিয়ার তিনি মালিক হবেন। মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী গান্ধী-মহারাজের দুই জবরদস্ত সেনাপতি।" এই রকম আরো কত কী!

বাবার কানে এই সব আজগুবী কথা যথা সময়ে তুললাম। ফলে জ্যাঠামহাশয়ের কাছে যাওয়া আমার চিরদিনের জন্য বন্ধ হল।

এ সব সত্ত্বেও গান্ধী, কংগ্রেস এবং এই ধরণের আরো কতকগুলি নাম আমার মনের পটে দাগ কেটে গেল।

* * *

১৯৩০ সালে আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হল। জীবন-জোয়ারের প্রবল তরঙ্গ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তোলপাড় করে তুলছে। কংগ্রেস-নেতা ও পত্রিকা-সম্পাদকদের আওতায় থেকে নিজেকে আর সামলাতে পারলুমনা, মিলের কাপড় ছেড়ে খদ্দর পরলুম, পায়ে 'সু'র বদলে স্যাণ্ডেল উঠলো।

লবণ তৈরীর নির্দ্দেশ কংগ্রেস দিয়েছিল, কিন্তু লবণ তৈরী করতে পারিনি। লবণ কিনেছি যথেষ্ট, এবং তা লুকিয়ে লুকিয়েই। লবণ তৈরী করলে কেমন করে দেশ স্বাধীন হবে সে ভাবনা কংগ্রেসকে ভাবতে দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতুম।

* * *

১৯৩২ সাল। গিন্নীকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার ধর্ম্ম কচ্ছি; জীবনের যাত্রাপথ সুগম করবার জন্য নানা রকম প্ল্যান তৈরী কচ্ছি, এমন সময় খবর এল, গান্ধী বন্দী হয়েছেন। কংগ্রেসের হুকুম: সবাইকে আইন অমান্য ক'রে জেলে যেতে হবে।

খবরটা বাড়ীতে এসে গিন্নীকে দিলাম; এবং আরো পাঁচজন পরে শুনলেন।

একদিন রাতে গিন্নীকে সোহাগের সুরে বললাম: বড় দুঃখ রয়ে গেল, তুমি আমার কাছে আব্দার করে কখনো কোন জিনিষ চাইলে না।

গিন্নী বল্লেন: চাইলে দিতে পারে কজন? একটা সামান্য জিনিষ দিতেও অনেকের সাধ্যে কুলায় না।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গিন্নীর দিকে চাইলাম।

তিনি বললেন : আমার ইচ্ছামত কোন কাজ যদি করি, তা সহ্য করতে পারবে ত ?

"অবশ্য !" শুধু এই একটা কথায় উত্তর দিলাম।

২৫শে জানুয়ারীর রাতে হঠাৎ গিন্নী বললেন : জেলে যাবো। কংগ্রেসের নির্দ্দেশ।

পাশের কামরা থেকে শ্যালক চীৎকার করে উঠলো : আমি জেলে যাবো। কংগ্রেসের আদেশ অমান্য করা কোন যুবক-যুবতীর পক্ষে শোভা পায় না।

সকালে মাষ্টার মশাই এসে বললেন : ছেলেদের পড়ানোর অন্য ব্যবস্থা করুন, কারণ, আমি জেলে যাচ্ছি।

আমার মাথার মধ্যে যেন দারুন ভূমিকম্প আরম্ভ হল। ভাবতে লাগলাম, এরা হ'লো কি ? কংগ্রেস কি ভারতের প্রত্যেক মানুষটাকে পাগল করে তুললো !

* * *

গিন্নী, শ্যালক, মাষ্টার-মশাই—সবাই সরকারী অতিথি। বিপন্ন হয়ে আমিও বাঙ্গালার তৈমুরলঙ্গের অতিথি হলাম। এঁর নামটা অবশ্য এখানে উল্লেখ করব না।

সত্য বলতে কি, এই তৈমুরলঙ্গের প্রভাব আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। এঁর ব্যক্তিত্ব অসামান্য—বিশেষ করে বক্তৃতার সময়। যখন ইনি বক্তৃতা করতে উঠেন তখন তৈমুরলঙ্গের দিগ্বিজয়ের মত বিরাম-বিহীন ভাবে এঁর বক্তৃতার তুফান চলতে থাকে।

ভাবলাম, যদি বক্তৃতায় দেশ স্বাধীন করা সম্ভবপর হ'ত তবে একমাত্র এঁর দ্বারাই তা হত।

তৈমুরলঙ্গ নূতন ফন্দী আঁটবার একজন বড় রকমের ওস্তাদ। কূট-বুদ্ধির জন্য রাজনীতিক মহলে তাঁর খ্যাতি—সুখ্যাতি ও কুখ্যাতি দুইই—অসাধারণ। তিনি বললেন : মুসলমান কংগ্রেস-কর্ম্মীদের উচিত, বাঙ্গলায় খোদাই-খিদমতগার দল গঠন করা।

আমরা কয়েকজন কংগ্রেসকর্ম্মী পরম উৎসাহে দল গঠন করতে লাগলাম। দলে ৫/৬ জন যুবক পাওয়া গেল। কিন্তু এত অল্প লোক নিয়ে কংগ্রেসের সাথে সাথে আইন অমান্য আন্দোলন ত চালানো যায় না ! তাই চার পাঁচজন হিন্দু ভলান্টিয়ার-এর সাথে একজন করে মুসলমান যুবককে আইন-অমান্য করতে পাঠাই। আর সংবাদপত্রে তদবির তাগাদা করে ছাপিয়ে দিই : 'লাল সার্ট'-দল গ্রেপ্তার ইত্যাদি।

"লাল সার্টের" সন্ধানে সরকারী সেনা-শাস্ত্রী দিকে দিকে ছুটলো। কিন্তু যার কিছু নেই তার সন্ধান পাবে কোথায় ? পাঁচজনকে পাঁচদিন জেলে পাঠিয়ে আমাদের stock শেষ হয়ে গিয়েছিল !

একদিন দুপুরে একজন পুলিস-ইনস্পেক্টর জনৈক বিখ্যাত সাংবাদিকের কাছে এলেন আমার সন্ধানে। তিনি আমায় ডেকে পুলিস ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। জানলাম, 'লাল সার্টের' সন্ধানে তাঁর শুভাগমন।

আমি পরিষ্কার বলে দিলাম, আমি কিছু জানি না। পুলিশ কর্ম্মচারিটী বললেন : গান্ধীজীর ভক্তদের মিথ্যা কথা বলতে নেই। অগত্যা আমি কোন বিশেষ নীতিবাগীশের ভাষায় উত্তর দিলাম : আমি জানি, কিন্তু বলব না।

পুলিশ ভদ্রলোক হতাশ হয়ে অবশ্য হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

* * *

মে মাসের শেষে আমরা কয়েকজন দিল্লী যাওয়ার জন্যে শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত। দিল্লী কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে। আমাদের সঙ্গে তৈমুরলঙ্গও ষ্টেশনে

হাজির। আমরা অন্য কয়েকজন লুকিয়ে ট্রেনে ঢুকে পড়লাম, কিন্তু তৈমুরলঙ্গ ত আর তাঁর বিরাট দুই হাতিয়ার লুকোতে পারেন না! কাজেই তাঁর দিল্লী যাওয়া হল না। আমরা একজন রসিক-সঙ্গীর অভাব অনুভব করলুম।

* * *

দিল্লীর জেলের ভিতর আমরা একটী ছেলেকে পেয়েছিলাম, তার স্মৃতি আজও ভুলতে পারিনি।

তাকে উর্দ্দু, হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষার খিচুড়ী পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করি যে, জেলে এসেছিস কেন?

উত্তরে সে বলে, সে 'দিল্লী-গেট' হয়ে জেলে এসেছে। 'দিল্লী-গেট' অর্থে সে ডেলিগেট বুঝাতে চায় এ সত্য পরে উদ্ধার করতে পেরেছিলাম।

তার জীবনী একদিন পরম ধৈর্য্যের সঙ্গে শুনে আশ্চর্য্য হলুম। মাত্র ১৬ বৎসর বয়স। এই বয়সে সে পকেট কেটে ও বিনা টিকিটে ট্রেণ চড়ে ১২ বার দণ্ডিত হয়েছে। এবার জেলে এসেছে 'কংগ্রেসী বাবু সা'বদের' কাছ থেকে সৎপথে চলার শিক্ষা নিতে। তার অতীতের কৃত অন্যায় কাজের জন্য রোজ তাকে প্রাণ খুলে কাঁদতে দেখেছি।

দিল্লী জেল ছেড়ে আসবার দুদিন আগে আর একটী লোককে পেয়েছিলাম, যার কথা ভুলতে পারা আদৌ সহজ নয়। তার নাম চমনলাল, সীমান্তের কংগ্রেস-কর্ম্মী। ছেলেটি যেন হাসির জীবন্ত ফোয়ারা। শার্দ্দূল-শিশু গান্ধীজীর শিক্ষায় ঋষি হতে বসেছে। অহিংস-নীতিতে আস্থাবান তারাই ততবেশী, যারা যত বড় বীরের জাতি—এ-সত্য আবিষ্কার করতে হয়নি, কংগ্রেসের সংস্রবে এসে নিত্য দেখেছি। চমনলাল আমায় বলে: বাঙ্গলার হিন্দুরা কংগ্রেস দখল করে রেখেছে, আপনারা শতকরা ৫৫ জন হয়েও কেন বেশী করে ওতে ঢুকতে পারেন না? আমাদের সীমান্তের পাঠানেরা দেখুন ত, সবাই কংগ্রেসের মেম্বর!

আমি তাকে বলি: চমনলাল, পাঠানেরা স্বার্থকে ত কর্ত্তব্যের উপর ঠাঁই দেয় না। আমাদের কাছে স্বার্থটাই যে বড় হয়ে দাঁড়ায় ভাই!

দিল্লী থেকে আমার বিদায়ের দিনে

খিলাফত নেতা মৌঃ সৌকত আলি

চমনলাল অশ্রুর রেখায় আমার বুকের পটে তার মধুর স্মৃতি এঁকে দিয়েছিল।

'দিল্লী-গেট' ছেলেটাও খুব কেঁদেছিল।

* * *

পাঞ্জাব মেল কলকাতার পথে ছুটে চলেছে। তার একটা কামরায় বেদনা-সিক্ত মন নিয়ে একপাশে শুয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে ভাবছি: ধন্য গান্ধী, ধন্য কংগ্রেস তোমাদের পরশ পেয়ে কত মূক যে ভাষা পেল, আর কত রত্নই যে উদ্ধার হল, তার কি ইয়ত্তা আছে?

রাত্রের নিস্তব্ধতাকে তোলপাড় করে দিয়ে পাঞ্জাব মেল চলে, আর যেন গর্জ্জন করে বলে: নাই! নাই! নাই!!

কংগ্রেসের সুবর্ণ-জয়ন্তী

আরতি মুখার্জ্জি

ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক সাধনার প্রতীক কংগ্রেসের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব সপ্তাহ। দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া জয়ী হওয়ার আনন্দ এ নয়, সহস্র প্রকারের বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া নিজের অস্তিত্ব দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল বজায় রাখিয়াছে ইহাই আনন্দের অন্যতম কারণ। কিন্তু ইহা আনন্দের একমাত্র কারণ নয়। একটা পরাধীন জাতির মধ্যে রাষ্ট্র-চেতনা বোধ জাগ্রত করার জন্য কংগ্রেস যা করিয়াছে, একটা পরাধীন জাতির ইতিহাসে তাহার মূল্য অতুলনীয় বলা চলে। এবং সেই রাষ্ট্রচেতনা বোধ অর্জ্জনের যা আনন্দ—সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব তাহারই মূর্ত্ত বিকাশ।

তবে আমাদিগকে ইহা এখন দেখিতে হইবে যে, সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য কী? বিভিন্ন দিক হইতে প্রশ্ন জাগিয়াছে যে, কংগ্রেস কী দেশের সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক চিন্তা-ধারার পীঠস্থান? সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে কংগ্রেসকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। সকল শ্রেণীর, বিশেষতঃ উপেক্ষিত সর্ব্বহারা শ্রেণীর, স্বার্থ রক্ষার জন্য কংগ্রেস কী করিয়াছে তাহা খতাইয়া দেখিতে হইবে। এবং ভবিষ্যতের কর্ম্মপন্থা এই উপেক্ষিত শ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষার অনুকূলে যাহাতে হয় সেই চেষ্টা করিতে হইবে।

কংগ্রেসের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা প্রথমে অভিজাত ও মডারেট শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান ছিল, পরে ইহার সেই মডারেট রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যে আকার ধারণ করে, তাহার শুভ ফল

কংগ্রেস

(স্মৃতিকথা)

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কংগ্রেসের বয়স ৫০ বৎসর—আমার ৬০; সুতরাং আমার জন্মের ১০ বৎসর পরে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র অন্য প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, এই প্রসঙ্গেও তাহাই বলা যায়—বৎসরে কালের মাপ হয় না; কালের পরিমাপ হয়—ভাবে, আর অভাবে। তখন দেশে যে নূতন ভাবের প্লাবন আসিয়াছিল, তাহা বালকদিগকেও স্পর্শ না করিয়া যায় নাই। আমি যখন প্রথম রাজনীতিক সভায় যোগদান করি, তখন আমার বয়স ৭ হইতে ৮ বৎসর। আর যোগদানের জন্য আমাকে আসন সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। আদালত অবমাননার অভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ যখন মুক্তি-লাভ করিয়া বাঙ্গালার নানা স্থানে যাইয়া বক্তৃতা করেন, তখন আমি কৃষ্ণনগরে বিদ্যালয়ের ছাত্র। কৃষ্ণনগরে যে সভা হয়, তাহা দেখিতে আমি গিয়াছিলাম এবং আমার ভৃত্য আমাকে উচ্চে তুলিয়া সুরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়াছিল। তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতার কিছুই বুঝি নাই, কেবল মনে আছে, গৃহে ফিরিয়া শ্রুত কয়টি কথার অর্থ শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—All the waters of the Ganges. সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের রাজনীতিক প্রকৃতি ছিল না; কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া যেমন দেশে বিরাট মুক্তি-সংগ্রাম ঘোষিত হইয়াছিল—তেমনই সেই কারাদণ্ড উপলক্ষ করিয়া দেশে বিরাট আন্দোলন হয়। তখনও আমরা slave mentality বা দাস্যমনোভাব বর্জ্জন করিতে পারি নাই—এখনও পারিয়াছি কিনা বলিতে পারি না, তাই তখন ইংরাজের অনুকরণে জামার উপর কাল ফিতা সেলাই করিয়া সুরেন্দ্রনাথের জন্য শোকের চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলাম।

যখন আমার বয়স ১০ বৎসর তখন শিক্ষা-পদ্ধতি একটু ভিন্নরূপ ছিল। তখন মাইনর (মিডল ইংলিশ) পরীক্ষার সাধারণ বয়স ছিল—১২ বৎসর। কাজেই ১০ বৎসরে আমাদিগকে ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাহিত্য—বাঙ্গালায় এই সকল পাঠ করিতে হইত। লোহারামের ব্যাকরণ, পদ্যপাঠ দ্বিতীয়ভাগ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত-মালা ও অক্ষয়কুমারের 'চারুপাঠ' তৃতীয় ভাগ পড়িলে বাঙ্গালায় জ্ঞান ভালরূপই জন্মিত। তারিণীচরণের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের' ভাষার নমুনা—"পর্ব্বতকটকে লৌহ কীলক প্রোত করিয়া আরোহন করিলেন।" সুতরাং 'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী' সংবাদপত্র আমরা অনায়াসেই পড়িতে ও পড়িয়া বুঝিতে পারিতাম। টুর্কী যুদ্ধের কথা ও ইলবার্ট বিলের আন্দোলন কালেই আমরা জানিতাম।

তখনও বাঙ্গালী ভাবের ঘরে চুরী করিতে শিখে নাই—কাজেই কংগ্রেস যে জাতীয় আন্দোলনের প্রতীক, তাহাকে আমরা বালকেরাও ভক্তি করিতাম। ব্রাহ্ম-সমাজের বাগ্মী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রাঞ্জল বাঙ্গালায় লোককে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শ বুঝাইয়া দিতেন।

তখন যে কেবল আমরা—বালকেরাই কংগ্রেসকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতাম, তাহা নহে; প্রৌঢ়দিগেরও সেই ভাব ছিল। তখন শ্রদ্ধা দেখাইবার ভাবও একটু অন্যরূপ ছিল। শুনিয়াছি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার কোন পুত্রকে ডাকিলে পুত্র ইজার চোগা পরিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইতেন—পিতা পরিবারের কর্ত্তা—তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়া দরবারে উপস্থিত হওয়া। লাট-প্রাসাদে ধুতি-চাদরে যাওয়া তখন প্রায়

১৯২০ হইতে ১৯৩২ সাল পর্য্যন্ত ভারতের স্বরাজ আন্দোলন।

এখন ভারতের স্বরাজ আন্দোলন কার্য্যতঃ স্থগিত আছে কিন্তু চিন্তা-ধারার দিক দিয়া এ আন্দোলন এখনও চলিতেছে এবং ভবিষ্যতেও চলিবে। কংগ্রেসের কর্ত্তব্য হইবে, জনগণের চিন্তা-ধারা বিশ্লেষণ করিয়া গণ-স্বার্থ রক্ষার জন্য উপযুক্ত কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার দিকে চালাইয়া লওয়া। যে আন্দোলনে গণ-স্বার্থ বজায় থাকে না সে আন্দোলনকে গণ-আন্দোলন বলা যাইতে পারে না। কিন্তু গণ-আন্দোলন পরিচালনার একমাত্র উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। এই কংগ্রেস যদি সর্ব্বহারার মুক্তি সাধনার কর্ম্ম-পন্থা গ্রহণ করে, তাহা হইলে তার এই সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব সার্থক ও সুন্দর হইবে।

কল্পনাতীত ছিল—কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই কল্পনাতীত ব্যাপার সম্ভব করিয়াছিলেন। যে যুগে নিমচাঁদ ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখিবার স্বপ্ন দেখিতেন—তখনও সে যুগের প্রভাব মুছিয়া যায় নাই। আমরাও বার্টলেটের Familiar Quotations কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম। তখন কংগ্রেসে যাইতে হইত—বিলাতফেরতদিগের ইংরাজের বেশে আর অন্যের চোগা-চাপকানে। পাঞ্জাবীরা পাগড়ী বাঁধিয়া আসিতেন, বাঙ্গালীরা হয় গোলটুপী (Skull Cap) নহেত লেজ বিশিষ্ট বা লেজহীন "পিরালী পাগড়ী" পরিয়া যাইতেন। পার্শী মেটা ও ওয়াচা প্রভৃতি যে টুপী ব্যবহার করিতেন, তাহার সম্বন্ধে মিষ্টার ষ্ট্যাক কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

"Whene'er I see a Parsee hat
I want to sit on it and make it
flat."

তখনও কলিকাতা হইতে উড়িষ্যায় বা মাদ্রাজে যাইতে হইলে জাহাজে যাইতে হয়। তাই ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় টিভলী গার্ডেনে কংগ্রেসের অধিবেশনে যখন উপস্থিত হই—তখন বয়সের অল্পতা হেতু "প্রতিনিধি" হইতে না পারিলেও দর্শকরূপে গিয়াছিলাম বটে, কিন্তু চাঁদনীর দোকানে তৈয়ারী ইংরাজের পোষাকে।

যাহারা যাত্রার পরম ভক্ত তাহাদিগের কথায় বলা হয়, তাহারা চাটাই পাতায় সময় যাইয়া চাটাই তুলিয়া তবে বাড়ী ফিরে। আমরাও তাহাই করিয়াছিলাম। তখন যানের যথেষ্ট অসুবিধা ছিল—এসপ্লানেড পর্য্যন্ত ঘোড়ার ট্রামে যাইয়া কালীঘাট গামী ঘোড়ার ট্রামে অগ্রসর হইয়া অনেকটা পথ হাঁটিয়া টিভলী গার্ডেনে যাইতে হইত। আমরা কংগ্রেস বসিবার ১০/১৫ দিন পূর্ব্ব হইতে প্রায় প্রত্যহই সেই তীর্থস্থানে যাইয়া চালা (তখনও মাদ্রাজী প্যাণ্ডাল কথাটা তত প্রচলিত হয় নাই) বাঁধা দেখিতাম। বাগানের বাড়ীতে অফিস করিয়া বসিয়াছিলেন মিষ্টার জানকীনাথ ঘোষাল, আর তথায় আসিতেন মিষ্টার হিউম। মিষ্টার হিউম তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিথি। ঘোষাল মহাশয়—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা ও স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী। তাঁহার সম্বন্ধে মাদ্রাজের সাংবাদিক জি, পরমেশ্বরণ পীলে লিখিয়াছিলেন—"His arrival heralds the Congress.…If Mr. Hume's claims to be known as the 'father' of the Congress ought to be unassailed, Mr. Ghosal has a right to be known as its 'mother.'" তিনিই আফিসের সব কাজ করিতেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অপরাহ্নে আসিতেন; কিন্তু কংগ্রেসের অধিবেশনের কয় দিন পূর্ব্বে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার মাতা জীবিতা—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রতি রবিবার মা'র কাছে যাপন করিতেন। সীমলার বাড়ীতেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। সুরেন্দ্রনাথও অসুস্থ ছিলেন; অধিবেশনের শেষ দিন আলষ্টার পরিয়া বক্তৃতা করেন।

সহরের নানাস্থানে নানা প্রদেশের প্রতিনিধিদিগের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যেস্থানে এখন মোহনবাগান রো, মোহনবাগান লেন, কীর্ত্তি মিত্র লেন ইত্যাদি তথায় তখন কীর্ত্তি মিত্রের "মোহনবাগান ভিলা" ছিল—তাহা তখন বিক্রীত হইয়াছে, কিন্তু ভাঙ্গা হয় নাই। তথায় বহু প্রতিনিধির স্থান হইয়াছিল। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ও ভাগ্যকুলের রায় মহাশয়েরা হইতে খানীরাম জমাদার পর্য্যন্ত প্রতিনিধিদিগের ব্যবহার জন্য বাড়ী দিয়াছিলেন।

কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে উড়িষ্যার প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন কটকের তৎকালীন বিখ্যাত ব্যবহারাজীব

জানকীনাথ বসু

ইঁহার দুই পুত্র
সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বর্ত্তমানে কংগ্রেসের অধিনায়কত্ব করিতেছেন।

কলিকাতার নেতৃগণের মধ্যে অনেককেই আমি ইহার পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়কে ও উড়িষ্যার প্রতিনিধি জানকীনাথ বসু মহাশয়কে—সেই প্রথম দেখি। আর অসাধারণ বাগ্মী লালমোহন ঘোষের বক্তৃতা সে-ই প্রথম শুনি। লালমোহনের বক্তৃতা যাঁহারা শুনেন নাই, তাঁহাদিগকে তাহার স্বরূপ বুঝান অসম্ভব। তাঁহার উপস্থিত উত্তর দিবার ক্ষমতাও অসাধারণ ছিল। বিডন বাগানে কংগ্রেসের এক অধিবেশনে তিনি যখন সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বলিতেছিলেন, তিনি বার্দ্ধক্য হেতু আর কংগ্রেসে পূর্ব্বের মত কাজ করিতে পারেন না—তখন বোম্বাইয়ের ফিরোজশা মেটা মাথা নাড়িয়া সে কথার প্রতিবাদ করিতেছেন দেখিতে পাইয়া তিনি বলেন—"Though the splendid physique and perennial youth of my friend Mr. Pherozesha Mehta belie all

insinuations of advancing age—we are growing old." যাঁহারা জানিতেন, মেটা চুলে ও গোঁফদাড়ীতে কলপ ব্যবহার করিতেন তাঁহাদিগের উচ্চ হাস্যে সভা-মণ্ডপ ধ্বনিত হয়।

আর এই অধিবেশনে পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য, মুন্সী গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, কাপ্টেন বেনন, বক্সী টেকচাঁদ, দীনশা ইদালজী ওয়াচা, ফিরোজশা মেটা, বাল গঙ্গাধর তিলক, গনেশ শ্রীকৃষ্ণ খপর্দে, আনন্দ চালু, বিজয়রাঘব আচারিয়া প্রভৃতিকে প্রথম দেখি।

পরবর্ত্তীকালে ইহাঁদিগের কাহারও কাহারও সহিত পরিচয়ের ও ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছিল। বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের স্নেহ লাভ করিয়াছি এবং তাঁহার পরিবারে উৎসবে যেমন বিপদেও তেমনই আমার জন্য আহ্বান আসিয়াছে। কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার মহাশয়ের সহিত এক সঙ্গে আমি সাংবাদিকদিগের প্রতিনিধি সঙ্ঘে য়ুরোপে গমন করি। তিনি আমাকে অনুজের ও আমি তাঁহাকে অগ্রজের মতই দেখিয়াছি—বিদেশে আমি তাঁহার স্বাস্থ্যাদির প্রতি লক্ষ রাখিতাম বলিয়া তিনি আমাকে তাঁহার Guardian বলিতেন। বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের সহিত উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধবাদির অনুষ্ঠিত স্বদেশী মেলার সময় আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়—তদুপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া তিনি আমাদিগের অতিথি ছিলেন; 'বন্দেমাতরম্' আমলেও তাঁহার প্রভাব অল্প ছিল না। আমরা যখন জার্ম্মান যুদ্ধ কালে বিলাতে, তখন তিনিও তথায়—চিরলের বিরুদ্ধে মামলার জন্য গিয়াছেন। তিনি লণ্ডনের উপকণ্ঠে মায়দা ভেলে থাকিতেন। তথায় তাঁহার সহিত আয়াঙ্গার মহাশয়ের ও আমার কংগ্রেসের [illegible] প্রথম আলাপ হয়। প্রথম যে দিন আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই, সে দিন সাদর সম্ভাষণ জানাইয়াই তিনি বলেন, "মিষ্টার ঘোষ, আপনার কাছে আমার ক্রটি স্বীকার করিতে হইবে। এই মামলার জন্য কেলকায় যখন মতিবাবুকে ('পত্রিকার' মতিলাল ঘোষ) একখানি আবশ্যক পুস্তক সংগ্রহ করিতে পত্র লিখেন, তখন তিনি আপনার নিকট হইতেই (Record of Criminal Cases (between Europeans and Indians) পাঠাইয়াছিলেন। সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয় নাই।" তখন বিলাতের কংগ্রেস কমিটি ও India পত্র মিষ্টার পোলাকের কর্ত্তৃত্বাধীন। পোলাক ইহুদী এবং ভারতসচিব মিষ্টার মণ্টেগুর অনুগত। সে অবস্থায় বিলাতে এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের জন্য ভারতের অর্থব্যয় অপব্যয়—এই মত কংগ্রেসের অধিবেশনে জ্ঞাপন করিবার জন্য আমরা যে পত্র লিখি, তিলক তাহাতে আয়াঙ্গারের ও আমার স্বাক্ষর গ্রহণ জন্য পত্র প্রেরণের পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে—দুরন্ত শীতে আমাদিগের হোটেলে আসিয়াছিলেন। তিনি কেন স্বয়ং কষ্ট করিয়া আসিলেন, তাহা বলায় তিনি বলেন, "বলেন কি হেমেন্দ্র বাবু? আয়াঙ্গার ও আপনি এখানে আছেন, আর আমি আপনাদিগের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কাজ করিব?" দেখিলাম, নেতার প্রকৃত প্রকৃতি তাঁহাতে ফুটিয়া আছে। আজ এতদিন পরে তাঁহাদিগের কথা লিখিতে বসিয়াছি—তাঁহাদিগের স্মৃতি আমাকে পীড়িত করিতেছে। ইহাঁদিগের ত্যাগ পুণ্যে আমাদিগের জাতীয় জীবন পবিত্র হইয়াছে। এই তিলকই এদেশে প্রথম ঘোষণা করেন, নেতার আসন দেশের লোকের শ্রদ্ধার ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার বিরুদ্ধে যখন প্রথম রাজদ্রোহের মোকর্দ্দমা উপস্থাপিত হয়, তখন তিনি শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন:—"Beyond a certain stage we are all servants of the people. You will be betraying and disappointing them if you show a lamentable want of courage at a critical time." আর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ইনিই আদালতে বলিয়াছিলেন:—

"There are higher Powers that rule the destiny of things; and it may be the will of Providence that the cause which I represent may prosper more by my suffering than by my remaining free."

মিষ্টার কেন এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং যে মিষ্টার কেনেডীও ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন, মজঃফরপুরে বোমায় তাঁহারই স্ত্রী ও কন্যা নিহত হইয়াছিলেন।

এই অধিবেশনের সভাপতি ফিরোজশা মেটার অভিভাষণ তখন আমাদিগের কাছে খুব ভাল লাগিয়াছিল; কারণ, তাহাতে ভাষার ঝঙ্কার ও টঙ্কার ছিল। মেটা বোম্বাইয়ে লোকের প্রীতির ও প্রশংসার কেন্দ্র ছিলেন। তাহার অনেক কারণ ছিল। কিন্তু বাঙ্গালা তখন কাহারও কাছে মস্তক নত করিত না। যে অধিবেশনে ওয়াচা সভাপতি, সে অধিবেশনে মেটার জন্য কলিকাতার অভ্যর্থনা সমিতি—Bengal Landholders' Associationএ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সভার গৃহ পার্কষ্ট্রীটে—তাহার সম্পাদক আশুতোষ চৌধুরী। মেটা টেলিগ্রাফ করেন—একটা এসোসিয়েশনের গৃহে কি তাঁহার থাকিবার সুবিধা হইবে? মনে পড়ে, বিডনবাগানে অপরাহ্নে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত হইলে জানকীনাথ ঘোষাল যখন নস্য লইতে

লইতে সেই টেলিগ্রাম তাঁহাকে দেখাইলেন, তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চক্ষুতে ক্রোধ ফুটিয়া উঠিল—তিনি ঘৃণা সহকারে টেলিগ্রাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—একজন মাত্র ভলান্টিয়ার হাওড়া ষ্টেসনে যাইয়া মেটাকে বলিবে, তাঁহার বাসের কোন বন্দোবস্ত করা হইবে না। তাঁহার কথায় কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। মেটাকে সেবার হোটেলে যাইতে হইয়াছিল।

মেটার বক্তৃতাকে গর্জ্জন বলিলে বলা যায়। আনন্দমোহন বসুর বক্তৃতা জলপ্রপাতের মত দ্রুত ও গম্ভীর। সার গাই ফ্লিটউড উইলসন বলিয়াছিলেন মালব্যজীর বক্তৃতা torrential eloquence আর সুরেন্দ্রনাথের—journalistic thunder. সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর কখন উচ্চ ও কখন নিম্ন হইত; তাহার বর্ণনায় একজন লিখিয়াছেন—"It is some thing like a billow which, rising very high, falls with a tremendous noise and all its force having spent itself by the fall, kisses the sandy shore foaming —in silent stillness." লালমোহনের বক্তৃতা a rich repast—সেরূপ মাধুর্য্য কতক পরিমাণে পাওয়া যাইত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতায়। তিনি কংগ্রেসের Omnibus resolution প্রস্তাব করিতেন —বলিতেন, তিনি Old driver of the omnibus. তখন কংগ্রেসকে যানের সহিত তুলিত করিয়া লিখিত হয়—তাহার চালক উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "a tall and majestic form with a sedate face, supplemented by hairy appendage reaching the breast," আর অশ্বযুগল? সুরেন্দ্রনাথ ও আর্ডলে নর্টন—"Attached to the Congress coach they stand tantly, pawing the ground, biting the bit, inpatient to be led." আর সহিস?—"On either side of the Congress coach, active, energetic ready to run, each proud of his own animal, stand two short forms......Mr. Madan Mohan Malaviya and Mr. Bipin Chandar Pal."

আজ যখন কংগ্রেস উন্নতির পথে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে তখন সে যানের সে চালক আর নাই—বাহনদ্বয় নাই, আছেন কেবল পণ্ডিত মদনমোহন। যাত্রীদিগের প্রায় সকলেই পরলোকগত। আজ মনে হয়—উমেশচন্দ্রের মত চালকের অভাব কি আর কেহ পূর্ণ করিতে পারিবেন?

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে স্বেচ্ছাসেবক গ্রহণ করা হয়। তখন স্বেচ্ছাসেবকরাও ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত ছিল—তাঁহারা ঘরের খাইয়া আসিয়া কাজ করিতেন, গাড়ীভাড়াও ও লইবেন না। আর আজ? আজ স্বেচ্ছাসেবকদিগের হোটেলের খরচ আর ট্যাক্সি ভাড়ার অঙ্ক কিরূপ দাঁড়ায়? তাই জিজ্ঞাসা করিতে কৌতুহল হয়—আমরা কি সত্য সত্যই অগ্রসর হইয়াছি? তাই মনে হয়—কবে আবার সে দিনের ভাব ফিরিবে? সে আদর্শানুসরণ করিয়াছেন—বাঙ্গালী সুভাষচন্দ্র বসু।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনেও সরকারী কর্ম্মচারীরা কংগ্রেসের নামে ভয় পাইতেন না। তবে জমীদাররা তখন এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বরীতি অনুসারে এবারের অধিবেশনের জন্য ছোট লাটের ও তাঁহার পরিজনগণের জন্য ৭ খানি প্রবেশপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। মিষ্টার পি, সি, লায়ন তখন ছোটলাটের প্রাইভেট করেন এবং পত্রে লিখেন "The Government of India definitely prohibit the presence of Government officials at such meetings", পূর্ব্ববঙ্গ যখন স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয় তখন এই লায়নই তাহার ছোটলাট ফুলারের প্রিয় কর্ম্মচারী ছিলেন এবং পদত্যাগ পত্রে ফুলার লিখিয়াছিলেন—তিনি যেন তাঁহার (ফুলারের) সঙ্গে পতিত না হয়েন। ফুলারের শাসন উদয় পাটনীকে নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বে ফাঁসীর, বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলন ভঙ্গের ও মুসলমানদিগকে "সুয়ো বিবি" বলার জন্য পরিচিত। কংগ্রেসে সরকারের এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ হয় এবং বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের প্রাইভেট সেক্রেটারী বলেন—মিষ্টার লায়ন একটু ভুল করিয়াছেন এবং—"The Government of India recognise that the Congress movement is regarded as representing in India what in Europe would be called the more advanced Liberal party, as distinguished from the great body of Conservative opinion which exists side by side with it."

এইস্থানে একটি কথার উল্লেখ করিব। কংগ্রেসের অধিবেশন কালে দেশে সহবাস-সম্মতি আইনের পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতেছে। 'বঙ্গবাসীর' চেষ্টায় "আইন চাই না" আন্দোলন প্রবল হইয়াছে। লর্ড ল্যান্সডাউনের সরকার এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেস যদি ঐ আইন সমর্থন করেন, তবে সরকার কংগ্রেসকে দেশের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান বলিয়া মানিয়া লইবেন। কিন্তু মিষ্টার হিউম এই আইনের পক্ষাবলম্বী হইলেও কংগ্রেসের নেতারা

স্থাপন করেন। তাহার পর কংগ্রেসের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহার জন্যও একদল লোক কংগ্রেস বর্জ্জন করিয়াছেন।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—ইহাতে ৪জন মহিলা কলিকাতা হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন :—

শ্রীমতী হেমন্তকুমারী শুকুল
" সুশীলা মজুমদার
" হেমন্তকুমারী চৌধুরাণী
" কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্নী এবং যখন চন্দ্রমুখী বসু এম, এ, ও তিনি বি, এ, উপাধি লাভ করেন, তখন হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"যেই দুঃখে লিখিয়াছি 'বাঙ্গালীর মেয়ে',
তারই মত সুখ আজ তোমা দোঁহে পেয়ে।"

ইনি এই সময় ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অধিবেশনের শেষ দিন ইনিই সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের ভার পাইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে কংগ্রেসে কোন মহিলা কখন বক্তৃতা করেন নাই এবং ইনিও কখন এরূপ সভায় বক্তৃতা করেন নাই। কাজেই বক্তৃতা করিতে উঠিয়া ইনি বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। এই বিব্রতভাব হেতু তিনি কম্পিত হইতেছিলেন দেখিয়া তাঁহার পিতৃস্বসাপুত্র মনোমোহন ঘোষ উঠিয়া যাইয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে সাহস দেন। এই কথায় আজ হয়ত অনেক মহিলা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না।

৪৫ বৎসর পূর্ব্বে কংগ্রেসের এই অধিবেশন আমাদের যুবকদিগের কল্পনাকে কিরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা আজ অনেকে অনুমান করিতেও পারিবেন না। আজ এতদিন পরে সেই অধিবেশনের কথা লিখিতে বসিয়া আমি যেন সেই গ্যালারীপূর্ণ দর্শক, নিখিলদল ও মঞ্চের উপর উপবিষ্ট নেতৃগণকে চলচ্চিত্রের চিত্রের মত দেখিতে পাইতেছি; তাঁহাদিগের অনেকের কণ্ঠস্বরও যেন কালের ব্যবধান মধ্য দিয়া আমার কর্ণগোচর হইতেছে। আমি যেন শুনিতে পাইতেছি, অভিভাষণ শেষে লিখিত কাগজ ত্যাগ করিয়া সভাপতি বলিতেছেন :—

"Our duty lies clear before us to go on with our work firmly and fearlessly, and above all with humility."

আর তাহার পর তিনি উদাত্ত স্বরে কার্ডিনাল নিউম্যানের প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম সঙ্গীতের একাংশ আবৃত্তি করিতেছেন :—

"Lead kindly light amid the encircling gloom,
Lead thou me on!
The night is dark and I am far from home
Lead thou me on
Keep thou my feet, I do not wish to see
The distant path, one step's enough for me."

৪৫ বৎসরে দেশের ও দেশের লোকের রাজনীতিক আদর্শের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে পরিবর্ত্তন কংগ্রেসেও প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই পুরাতন আর ফিরিবে না—হয়ত

"—The past will always win
A glory from its being far
And orb into the perfect star
We saw not when we moved therein.

আর সেই জন্যই সে দিনের কথা আমাদিগের ভাল লাগে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'বৃত্রসংহার' পরিত্যাগ করিয়া 'পৌষপার্ব্বণ' চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বনে যে একটা সুখ আছে—'বৃত্রসংহারে' তাহা নাই। পিঠা-পুলিতে যে একটা সুখ আছে নারীর বিম্বাধর প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশশুদ্ধ জেমস, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে।"

যখন সে দিনের কংগ্রেসে বাঙ্গালীর প্রভুত্ব স্মরণ করি, তখন মনে হয়—কংগ্রেসে নেতার দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া কি আমরা বাঙ্গালী নাম রাখিব? যে বাঙ্গালার সাধনায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল, সেই বাঙ্গালা কি বাঙ্গালা ভাষা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া—ইংরাজের অনুসরণ না করিয়া—অন্যান্য প্রদেশের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবে?

আজ সেই কথাই মনে হয়। যে সব বাঙ্গালী নেতাকে তখন সমগ্র ভারতের অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করিতে দেখিয়াছি ও দেখিয়া মনে করিয়াছি—বাঙ্গালী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি, তাঁহারা আজ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগেরও যাইবার আহ্বান শুনা গিয়াছে; আমাদেরও—

"গীত শেষ, অপরাহ্ন; সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে—
বসি ধ্যানমগ্ন এই জীবন-প্রভাস তীরে।
সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু * * *
এই কূলে সন্ধ্যা—ঊষা অন্য কূলে মুগ্ধকরী।"

আজ এই জীবন-সন্ধ্যায় আশা করিতেছি, বাঙ্গালীর সাধনা ব্যর্থ হইবে না; কিন্তু ঐযে অন্য কূলে ঊষা—উহার অরুণরাগ কি প্রথমে বাঙ্গালীর ললাটেই পতিত হইবে না? বাঙ্গালী কি আবার সমগ্র ভারতের নেতৃত্ব লাভ করিবে না?

বড়দিন ও নব-বর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ—

কালী ফিল্ম্‌সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য—

মহাকবি ৺গিরিশচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক—

প্র ফু ল্ল

বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ সম্মেলনে, বাঙলার চিত্রজগতে
এক নবপ্রেরণা আনয়ন করিয়াছে।

উ ত্ত রা—

১৩৮।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,—শ্যামবাজার
টেলিফোন—বড়বাজার ২২০২

শনিবার ২৮-শে ডিসেম্বর
হ ই তে স গৌ র বে
৩য় সপ্তাহ

প্রত্যহ তিনবার অভিনয়
৩টা, ৬-১৫ ও ৯-৩০টা

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় হইতেছে।

ফ্রি ও কমপ্লিমেণ্টারী পাশ একেবারে বন্ধ।

কংগ্রেস ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা

শ্রীফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে, ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে যে সকল বাঙ্গালী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নে কয়জনের নাম প্রদান করিলাম। ইঁহারা জীবিত থাকিয়া এখন পর্য্যন্ত দেশসেবা করিতেছেন। নামের তালিকা পাঠ করিলে সকলকে এখন চিনা যায় না—কাজেই আর কে কে জীবিত আছেন, জানিলে এই তালিকা সংশোধন করিয়া লইতে পারি।

(১) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল, হাইকোর্টের উকিল। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের পুত্র এবং নিজেও রায় বাহাদুর।

(২) শ্রীযুত সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—"ভারতবাসী"র সহযোগী সম্পাদক ও ডাক্তার। ইনি পরলোকগত সার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের অগ্রজ। এখনও কলিকাতায় অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিতেছেন।

(৩) শ্রীযুত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম, এ,—অধ্যাপক সিটি কলেজ। বর্ত্তমানে সিটি কলেজের স্বনামখ্যাত প্রিন্সিপাল।

(৪) শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ,—"সঞ্জীবনী"র প্রধান সম্পাদক।

(৫) শ্রীযুত জলধর সেন, জমীদার, গোয়ালন্দ। ইনিই "ভারতবর্ষ" সম্পাদক, ইনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায় বাহাদুর জলধর সেন।

(৬) শ্রীযুত কামিনীকুমার চন্দ এম, এ,—শিলচরের জমীদার। ইনিও গত ৫০ বৎসর কাল দেশসেবা করিয়া বর্ত্তমানে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। বাঙ্গালার সরকারী শিক্ষা বিভাগের শ্রীযুত অপূর্ব্বকুমার চন্দ—ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় (কলিকাতা) অধিবেশনে প্রতিনিধিরূপে যে সকল বাঙ্গালী যোগদান করিয়াছেন, আজ তাঁহাদের নামের তালিকা নিম্নে প্রদান করিতেছি।

কলিকাতা হইতে—মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র (পরে রাজা হইয়াছিলেন), জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (হুগলী উত্তরপাড়ার জমীদার), দুর্গাচরণ লাহা সি, আই, ই (পরে মহারাজা হইয়াছিলেন), শ্যামাচরণ লাহা, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়ার জমীদার, পরে রাজা হইয়াছিলেন), রায় বাহাদুর কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা ছোট আদালতের জজ), শালীগ্রাম সিংহ (কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, জমীদার ও প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট), রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী এম, এ, বি, এল ("হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদক), রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর (জমীদার), আনন্দমোহন বসু (পরে কংগ্রেসের সভাপতি হন), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্যার হন), মহেশচন্দ্র চৌধুরী (কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ও জমীদার) মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ বাহাদুর, মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর (উভয়েই শোভাবাজার রাজবাটীর), নরেন্দ্রনাথ সেন ("ইণ্ডিয়ান মিরর" সম্পাদক, পরে রায় বাহাদুর হন), জগন্নাথ খান্না (ব্যবসায়ী), কুমার সত্যবাদী ঘোষাল (খিদিরপুর ভূকৈলাসের জমীদার), কালীনাথ মিত্র (এটর্ণী), যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (জীবিত) নীলকমল মুখোপাধ্যায় (জমীদার), উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (উকীল), যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ("সুরভি"-সম্পাদক), পণ্ডিত জাওলালাল শর্ম্মা (ছোট আদালতের উকীল), পণ্ডিত সদানন্দ মিশ্র ("সুর সুধানিধি" সম্পাদক), দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী (কলিকাতা কর্পোরেশনের মহিলা কাউন্সিলার কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলীর পিতা), দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (পরে স্যার হন), সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী (জীবিত), চণ্ডীকিশোর কুশারী, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু এম, ডি, এল, আর, সি, পি, কালীশঙ্কর সুকুল (সিটি কলেজের অধ্যাপক), হেরম্বচন্দ্র মৈত্র (জীবিত), কৃষ্ণকুমার মিত্র (জীবিত), পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (ব্রাহ্ম-নেতা), উমেশচন্দ্র দত্ত (সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল), শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ("রেইজ ও রায়ত" সম্পাদক), জয়গোবিন্দ লাহা, প্রাণনাথ দত্ত (ব্যবসায়ী ও মিউনিসিপাল কমিশনার), সুরেন্দ্রনাথ দাস এম, এ, (এটর্ণী ও মিঃ কমিশনার), পশুপতি বসু (জমীদার), জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ), ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, এম, এ, বি, এল (শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান), এম, ঘোষ (ব্যারিষ্টার ও জমীদার,) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল (পরে হাইকোর্টের জজ ও স্যার), আর, ডি, মেটা (ব্যবসায়ী), কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল (হাইকোর্টের উকীল), এন, এন, ঘোষ (ব্যারিষ্টার), ডবলিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যারিষ্টার ও কংগ্রেস সভাপতি), গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল (হাইকোর্টের উকীল), জে, ঘোষাল (জমীদার—খ্যাতনামা লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী ও শ্রীযুক্তা সরলা দেবীর পিতা)।

মেদিনীপুর হইতে—দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ এম, এ, বি, এল (উকীল), ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, আর, সি, পি (মহিষাদলের ডাক্তার), যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (মহিষাদল হাইস্কুলের হেডমাষ্টার), যদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, (শিক্ষক), কৈলাসচন্দ্র সামন্ত, মহেন্দ্রনাথ সামন্ত ও প্রিয়নাথ দাস—(তিনজনই পাটশালের জমীদার), কুঞ্জবিহারী দাস ও অধরচন্দ্র ঘোষ (চন্দ্রকোনা), তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘাটাল), বৈকুণ্ঠনাথ হাজরা (কাঁথির উকীল)।

হুগলী হইতে—গঙ্গাচরণ সরকার (অবসর প্রাপ্ত সাব জজ—ইনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা), মহেন্দ্রলাল বসু (জমীদার), সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আনন্দকুমার দত্ত, হেমকুমার দত্ত, গোকুলচন্দ্র মণ্ডল, যোগেন্দ্রকৃষ্ণ সোম, বিপিনবিহারী ঘোষ ও পরেশনাথ বিশ্বাস (হোরা), কিশোরীমোহন গাঙ্গুলী বি, এ, (শ্রীরামপুরের উকীল ও শিবপুর নিবাসী), উমাকালী মুখোপাধ্যায় বি, এল (শ্রীরামপুরের উকীল), লক্ষ্মীকান্ত মল্লিক (সিঙ্গুরের জমীদার), উপেন্দ্রনাথ রায় (পানিসেহালার জমীদার)।

হাওড়া হইতে—জটাধারী হালদার, কাঙ্গালীচরণ হালদার (শিবপুর), তরঙ্গনাথ রায়চৌধুরী (উত্তরপাড়ার কৃষিজীবি), শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়ার জমীদার), চন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস (উত্তরপাড়ার ডাক্তার), জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়ার জমীদার—পরে রাজা হন), হৃদয়কৃষ্ণ সামন্ত, উমেশচন্দ্র বৈতালিক ও আশুতোষ মাইতি (তিনজনই গুর্জ্জরপুরবাসী), মুন্সী মুকুল হক (উলুবেড়িয়ার উকীল), মৌলবী সৌকতআলি (উলুবেড়িয়ার ব্যবসায়ী) অম্বিকাচরণ বসু (হাইকোর্টের উকীল ও উলুবেড়িয়ার জমীদার) শ্রীপতি বসু বি, এ (উলুবেড়িয়া)।

ফরিদপুর হইতে—অম্বিকাচরণ মজুমদার (ফরিদপুর মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান—ইনি পরে কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন), শ্রীযুত জলধর সেন (গোয়ালন্দের জমীদার —জীবিত)।

রঙ্গপুর হইতে—মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল (উকীল), প্রসন্ননাথ চৌধুরী (উকীল), সমিরুদ্দীন আমেদ বি, এ (জমীদার), মুন্সী রজবআলি আমেদ (উকীল, নীলফামারী)।

দিনাজপুর হইতে—দেবেন্দ্রনাথ পালিত এম, এ, বি, এল (উকিল)।

মুর্শিদাবাদ হইতে—বৈকুণ্ঠনাথ সেন (উকীল—ইনি পরে রায় বাহাদুর ও কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন), গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল (উকীল), শ্রীশচন্দ্র বসু সর্ব্বাধিকারী (জমীদার), বরদা প্রসাদ বাগচী (উকীল), ডাক্তার রামদাস সেন (জমীদার), শ্রীনাথ পাল (জমীদার), কে, সি, রায়, আশুতোষ ঘোষ (উকীল, জঙ্গীপুর)।

যশোহর হইতে—কালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ (উকীল ও জমীদার), যোগেন্দ্রনাথ সেন এম, এ (নড়াইল কলেজের প্রিন্সিপাল), সুরনাথ চৌধুরী (জমীদার), কিশোরীনাথ সরকার এম, এ, বি, এল (উকীল), মতিলাল ঘোষ ("অমৃতবাজার পত্রিকার" সহযোগী সম্পাদক), নীলকমল দাস (ঝিকরগাছা), অমৃতলাল রায় (ঝিকরগাছা), শিবেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ (কালিয়া)।

খুলনা হইতে—ত্রিগুণা চরণ সেন এম, এ (সেনহাটী—খিদিরপুরস্থ রিপণ কলেজ স্কুলের হেড মাষ্টার), মনোমোহন সেন (ডাক্তার), ইন্দুভূষণ মজুমদার বি, এ, (মহেশ্বরপাশা), যদুনাথ কাঞ্জিলাল (বাগেরহাট, উকীল), মৌলবী সৈয়দ বসরতুল্লা (তালুকদার, বাগেরহাট), বিপিনবিহারী রায় (বাগেরহাটের উকীল)।

বাখরগঞ্জ হইতে—মৌলবী সৌফুদ্দীন মহম্মদ (উকীল ও জমীদার), রাখাল চন্দ্র রায় (জমীদার), পি, এন, রায় (ব্যারিষ্টার ও জমীদার), চন্দ্রকান্ত সেন এম, এ, বি,এল (হাইকোর্টের উকীল)।

ঢাকা—রমাকান্ত নন্দী (ঢাকা মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান), কৈলাশচন্দ্র সেন (উকীল ও জমীদার), খাজা আবদুল আলিম (জমীদার), সৈয়দ আবদুল বারি (জমীদার), মৌলবী রিয়াজুদ্দীন (জমীদার)।

রাজসাহী—ভুবনমোহন মৈত্র (উকীল ও জমীদার), রাজকুমার সরকার (জমীদার), দিঘাপাতিয়া), মহেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল বি, এল, (উকীল), শ্যামাচরণ রায় বি, এল, (উকীল)।

নাটোর—যাদবচন্দ্র বিশি (জোয়ারীর জমীদার), শরৎচন্দ্র বসু বি, এ (নাটোর হাই স্কুলের হেডমাষ্টার), ডাক্তার কেদার নাথ পান (তাহিরপুর)।

পাবনা—গিরিশচন্দ্র রায় বি, এল (পাবনা মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান), এ, চৌধুরী (ব্যারিষ্টার), উমাপতি রায় বি, এ (খেতুপাড়া), যাদব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, (সিটি কলেজের অধ্যাপক) জগদীশচন্দ্র রায় (বাগবাটী, সিরাজগঞ্জ), যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (চাটমোহর), রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য (পেচাকোলা)।

নদীয়া—রায় বাহাদুর যদুনাথ রায় (কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান), যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় (উকীল), সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী (রানাঘাট মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান), ডাক্তার আথার আলি

(ডাক্তার, চুয়াডাঙ্গা), অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান), নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী (জমীদার), বি, পাল চৌধুরী (এঞ্জিনিয়ার ও জমীদার), বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এল (উকীল, কৃষ্ণনগর), মুন্সী ফকির আলি মিয়া (জমীদার)।

রানাঘাট—কৃষ্ণচন্দ্র ঘটক, অক্ষয়কুমার ঘোষ (মিউনিসিপাল কমিশনার), গিরিজা ভূষণ দত্ত (ডাক্তার), যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র (শিক্ষক, চাকদহ), জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী (ডাক্তার, কৃষ্ণগঞ্জ), নন্দগোপাল ভাদুড়ী (কৃষ্ণগঞ্জ), সুরেশ চন্দ্র রায় এম, এ (ভাজনঘাট), বিপিনবিহারী মৈত্র এম, বি, (শান্তিপুর), সুরেন্দ্রনাথ রায় (জয়রামপুর)।

ত্রিপুরা—গোবিন্দচন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল (উকীল), মুন্সী লতীফ হোসেন (সাহাবাজপুর), মুন্সী এনায়েৎ আলি (কানপুর)।

চট্টগ্রাম—অন্নদাচরণ খাস্তগীর (ডাক্তার), অখিলচন্দ্র সেন এম, এ, বি, এল (হাইকোর্টের উকীল)।

জলপাইগুড়ী—হরমোহন দাস (জোৎদার ও রায়কতদিগের দেওয়ান), ডাক্তার তমিজুদ্দীন আমেদ (ডাক্তার), নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ এম, এ, বি, এল (উকীল ও জমীদার)।

মৈমনসিংহ—মৌলবী হামিদ উদ্দীন আমেদ বি, এল (উকীল), রেবতী মোহন গুহ এম, এ, বি, এল (উকীল), ঈশানচন্দ্র গুপ্ত, বনোয়ারীলাল চৌধুরী (জমীদার, সেরপুর), গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (সেরপুর), ললিত চন্দ্র সেন (নাকরাইল), অম্বিকা প্রসাদ সেন (নাকরাইল), ভবানী কিশোর মজুমদার বি, এল (উকীল হুসেনপুর), মৌলবী মৌসের আলি খাঁ (তালুকদার, টাঙ্গাইল), রামনারায়ণ অগস্তী বি, এ (শিক্ষক, কিশোরগঞ্জ)।

মালদহ—মধুসূদন সিংহ বি, এ।

বর্দ্ধমান—মথুরা নাথ সান্যাল বি, এ, (পূর্ব্বস্থলী), প্রমথনাথ রায় (পূর্ব্বস্থলী), অবিনাশচন্দ্র নন্দী (পূর্ব্বস্থলী)।

২৪পরগণা—আশুতোষ বিশ্বাস এম, এ, বি, এল (উকীল ও মিউনিসিপাল কমিশনার, খ্যাতনামা মডারেট নেতা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাসের পিতা), দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বি, এল (উকীল, আলিপুর—স্যার চারুচন্দ্র ঘোষের পিতা), রেভাঃ পি, এম, মুখার্জ্জী (মিশনারী, টালিগঞ্জ), নবাব গোলাম রব্বাণী (মহীশূর নবাব পরিবার), মহেন্দ্রনাথ সেন (শিক্ষক, সাউথ সুবার্ব্বান মিউনিসিপাটীর কমিশনার) সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী ও গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—৪জনই রহড়া নিবাসী, সারদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বরাহনগর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান), শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে কর্ম্মযোগী শশিপদ নামে খ্যাত

হন—স্যার এলবিয়ন রাজকুমার ব্যানার্জ্জির পিতা), ঈশ্বরীচরণ মুখোপাধ্যায় (জমীদার, বরাহনগর), যোগেন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল (হাইকোর্টের উকীল)। বিজয় লাল দত্ত ও সুরেন্দ্র চন্দ্র বসু (আড়বেলিয়া), রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, বি, এ (জমীদার, টাকী)।

হাজারীবাগ—রায় যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (সরকারী উকীল)।

পুরুলিয়া—পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী এম, এ, বি, এল (উকীল, হাইকোর্ট)।

বালেশ্বর—কুমার বৈকুণ্ঠনাথ দে (জমীদার)।

কাছাড়—দীননাথ দত্ত (ম্যানেজার, সি, এন, জে, টি কোং লিঃ)।

শিলং—কালীকান্ত বড়কাকতী বি, এ,

ডিব্রুগড়—দেবীচরণ বড়ুয়া বি, এ ও গোপীনাথ বড়দলুই বি, এ,

নওগাং—সত্যনাথ বোডা বি, এ (চা বাগানের মালিক)।

শ্রীহট্ট—বিপিনচন্দ্র পাল (জমীদার) ও জয়গোবিন্দ সোম এম, এ, বি, এল (হাই-কোর্টের উকীল ও "খৃষ্টান হেরল্ড" সম্পাদক)।

শিলচর—শ্রীযুত কামিনী কুমার চন্দ এম, এ (জমীদার, জীবিত)।

মৈমনসিংহ—কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী (জমীদার)।

২৪পরগণা—শ্রীশচন্দ্র বসু (রস পাগলা)।

ইহা ছাড়া ঐ অধিবেশনে মান্যবর মিঃ রাণাডে, রাজা লক্ষ্মণ সিং, ইন্দোরের প্রধান বিচারপতি মিঃ বৈজনাথ প্রভৃতি দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

অনেক প্রতিনিধি নিজ নিজ নাম লিখিয়া না যাওয়ায় তাঁদের নাম এই তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে।

অনেক প্রবাসী বাঙ্গালী ও কলিকাতার কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) করাচীর "সিন্দ অবজারভার" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত এন, এন, গুপ্ত। ইনিই খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত; বর্ত্তমানে বোম্বায়ের বান্দ্রা নামক স্থানে বাস করেন।

(২) লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুত জি, এন, চট্টোপাধ্যায়।

(৩) পাঞ্জাব চিফকোর্টের উকীল যোগেশচন্দ্র বসু এম, এ, বি, এল, (৪) এলাহাবাদের মিউনিসিপাল কমিশনার টি, এন, ঘোষ, (৫) এলাহাবাদ মিউনিসিপাল বোর্ডের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান চারুচন্দ্র মিত্র, (৬) এলাহাবাদ হিন্দু সমাজের ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, (৭) সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সান্ন্যাল, এলাহাবাদে, (৮) এলাহাবাদের উকীল শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, (৯) এলাহাবাদের ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১০) বৃন্দাবনের মিউনিসিপাল কমিশনার পণ্ডিত রাধাচরণ গোস্বামী, (১১) কাশীবাসী অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ রামকালী চৌধুরী, (১২) আলিগড়ের উকীল ভবানীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, (১৩) মীরাটের উকীল শৈলকান্ত চট্টোপাধ্যায়, (১৪) লক্ষ্ণৌয়ের উকীল ও মিউনিসিপাল কমিশনার অবিনাশচন্দ্র ঘোষ বি, এল, (১৫) লক্ষ্ণৌনিবাসী হাইকোর্টের উকীল বিপিনবিহারী বসু এম, এ, (১৬) লক্ষ্ণৌয়ের ব্যবসায়ী বি, এম, রায়, (১৭) ফয়জাবাদের উকীল ও মিউনিসিপাল বোর্ডের সদস্য বিপিনবিহারী দত্ত বি, এল, (১৮) খাণ্ডোয়ার উকীল হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, (১৯) (২০) হোসনাবাদের উকীল বিহারীলাল বসু ও ক্ষেত্রমোহন বসু (২১) মাউএর উকীল মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, (২২) পাটনার উকীল গুরুপ্রসাদ সেন এম, এ, বি, এল—ইনি পাটনার খ্যাতনামা নেতা—কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে সভাপতি হইয়াছিলেন, (২৩) পাটনার উকীল পূর্ণেন্দুনারায়ন সিংহ এম, এ, বি, এল—ইনি বহুদিন কলিকাতার থিয়সফিক্যাল সোসাইটী হইতে প্রকাশিত "ব্রহ্মবিদ্যা" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, (২৪) সাহাবাদের উকীল কিশোরীলাল হালদার, (২৫) সারণের উকীল বংশীধর গুপ্ত।

সেবার মোট ৪৩৬ জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। অবাঙ্গালী প্রতিনিধিগণের মধ্যে কয়েকজনের নামও নিম্নে প্রদত্ত হইল—তাঁহারা প্রায় সকলেই সর্ব্বজন পরিচিত।

মাদ্রাজের—(১) জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার—'হিন্দু' নামক ইংরাজী দৈনিক পত্রের সম্পাদক, (২) এস, সুব্রহ্মণ্য আয়ার—ইনিই ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মিসেস বেসাণ্টের গ্রেপ্তারের পর আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

বোম্বায়ের—(১) দাদাভাই নৌরজী—ইনিই কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে কলিকাতায় সভাপতি হইয়াছিলেন। (২) এন, জি, চন্দ্রভারকর—পরে 'স্যার' হন, (৩) দিনসা ইদুলজী ওয়াচা পরে 'স্যার' হন—এখনও জীবিত।

পাঞ্জাব হইতে—(১) পণ্ডিত সত্যানন্দ অগ্নিহোত্রী—ব্রাহ্ম প্রচারক—(ইনি কি বাঙ্গালী?) (২) অবসর প্রাপ্ত বি, সি, এস—এ, ও, হিউম, সিমলা।

এলাহাবাদ হইতে—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বি, এ, (শিক্ষক)।

কাশী হইতে—(১) জমীদার, ব্যাঙ্কার ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট মাধো দাস

(২) জমীদার ও ব্যাঙ্কার মধুসূদন দাস
(৩) রায় শ্যামকৃষ্ণ দাস জমীদার ও ব্যাঙ্কার।

নাগপুর হইতে—গঙ্গাধর রাও মাধো চিৎনবীশ।

ভাগলপুর হইতে—তেজ নারায়ণ সিংহ—খ্যাতনামা দানবীর, সম্প্রতি পরলোকগত দীপ নারায়ণের পিতা।

প্রথম দিন কলিকাতা টাউন হলে কংগ্রেস বসিয়াছিল। ঐ দিন সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর সহিত রাজা রামপাল সিং ও মিঃ কটন সভায় আসিয়াছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

হুগলী উত্তরপাড়ার জমীদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স তখন ৭৯ বৎসর, তিনি অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, সেই অবস্থায় দুইজনের কাঁধে ভর দিয়া তিনি সভায় উপস্থিত হন ও সভাপতি মনোনয়ন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া বক্তৃতা করেন। লক্ষৌয়ের নবাব রেজা আলি খাঁ বাহাদুর ঐ প্রস্তাব সমর্থন করিয়া উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা করেন। হামিদ আলি খাঁ ঐ বক্তৃতা ইংরাজীতে সকলকে বুঝাইয়া দিলে সভাপতিকে তাঁহার আসনে বসাইয়া দেওয়া হয়।

সভাপতির বক্তৃতার পর জয়কৃষ্ণ বাবু পুনরায় এক বক্তৃতা করেন ও কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করেন।

ঐ দিন খুব বেশী ভিড় হইয়া সভাস্থলে গরম হওয়ায় পর দিন বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গৃহে কংগ্রেসের সভা হইবে স্থির হয়। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিন সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

ঐ দিন সন্ধ্যায় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রিপন কলেজ গৃহে বাঙ্গলার প্রতিনিধিদিগের এক সভা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় দিন সভায় বহু প্রস্তাব আলোচিত হয়।

তৃতীয় দিনে আবার টাউন হলেই কংগ্রেস বসিয়াছিল। চতুর্থ দিন টাউন হলেই কংগ্রেস শেষ হয়। চতুর্থ দিনে প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতিকে এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমবেত প্রতিনিধিদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

পুরাতন প্রসঙ্গ

শ্রীরমেশ চন্দ্র মণ্ডল

* কথিত *

চুঁচুড়ার বিশিষ্ট নাগরিক ও জমিদার অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মণ্ডল তৃতীয় ভারতীয় মহাসভায় যোগদান করিয়াছিলেন—কিছুদিন পূর্ব্বে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নিকটই শুনিয়াছিলাম। তাই কংগ্রেস জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সেই সময়ের কিছু কথা শুনিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম।

প্রথমেই তিনি বলিলেন যে, যখন তিনি তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, ভগবান তাঁহাকে কংগ্রেসের কনক জয়ন্তী উৎসব দেখাইবার জন্য বাঁচাইয়া রাখিবেন এবং একদিন তাঁহাকে এই পুরাতন দিনের কথা বলিতে হইবে। সেদিনের কোনো কিছু স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার নিকট আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন :—"ওই যে বল্‌লাম আজকের পরে কাল পর্য্যন্তই মানুষের দৃষ্টি চলে না—তো পঞ্চাশ বৎসর পরে কি হ'বে তা আর জান্‌বো কি ক'রে? নইলে অনেক কিছুই লিখে এবং সংগ্রহ ক'রে রেখে দিতুম। সেইজন্যে গোড়াতেই বলে রাখি যে, আমার কাছে বেশি কিছু আশা ক'রবেন না। এত বয়সে স্মৃতিশক্তি সাধারণতঃ ক্ষীণ হ'য়ে আসে, সে তো জানেন।"

আমি বলিলাম, তার জন্য তাঁহার চিন্তিত হইবার কোনো কারণ নাই। আমি তাঁহাকে মাঝে মাঝে এক একটি প্রশ্ন করিব এবং তিনি যেটুকু মনে পড়ে সেইটুকু গল্প করিয়া আমাকে বলিবেন। অতঃপর তিনি আরম্ভ করিলেন :—

"কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হয় মাদ্রাজে।" তাঁহাকে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তিনি যখন তৃতীয় অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন তখন ইচ্ছা করিলে প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনেও তো যোগদান করিতে পারিতেন; তাহা করেন নাই কেন? উত্তরে তিনি বলিলেন :—খবর পাই নি। প্রথম অধিবেশনের খবর খুব অল্প লোকেই পেয়েছিলেন। অধিবেশনের সংবাদ খবরের কাগজ প'ড়ে ব্যাপারটা জানতে পারি। তখন থেকেই দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদান ক'রব—এটা মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম।" কিন্তু কি একটা বাধা পড়ায় দ্বিতীয়টাতে যাওয়া হয়নি।

"আপনারা কোন্ পথে গিয়েছিলেন—জলপথে, না স্থলপথে?"

"আমরা প্রায় জন চল্লিশ লোক মিলে একটা ষ্টীমার charter ক'রেছিলাম।"

"আপনার সহযাত্রীদের মধ্যে কয়েকজনের নাম যদি বলেন—"

"কয়েকটি নাম বেশ মনে আছে, কিন্তু সব নাম তো মনে পড়ে না।"

"যা' মনে আছে তাই বলুন।"

"প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হ'চ্ছেন—ডব্লিউ সি, বাঁড়ুয্যে, সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে। তারপর মতিলাল ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ সেন (Indian Mirror), যাত্রামোহন সেন, নফর পাল চৌধুরী। শ্রীরামপুরের গোস্বামীবাড়ীর একজন আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। তাঁর নাম ঠিক মনে পড়ছে না—সম্ভবতঃ নন্দলাল গোস্বামী। এছাড়া যতদূর মনে পড়ে উক্ত অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন ভাগ্যকুলের জানকীনাথ রায়, দুর্গামোহন দাশ, কলিকাতার তখনকার বিখ্যাত এটর্ণী আশুতোষ ধরের পুত্র ভোলানাথ ধর প্রভৃতি।

"ষ্টীমার-যাত্রা বোধহয় ভালই লেগেছিল।"

—"হ্যাঁ মধ্যপথটা ভালই কেটেছিল। কিন্তু মাদ্রাজের কাছাকাছি গিয়ে অনেকের অবস্থা কাবু হয়েছিল। Coast খুব rough ছিল—বিশেষ ক'রে Harbourএ প্রবেশ করবার সময় জাহাজ এত Roll ক'রেছিল যে, আমাদের মধ্যে দু'একজনকে মাদ্রাজে পৌঁছিয়েও শুয়ে থাকতে হ'য়েছিল।"

সেই অধিবেশনে অন্যান্য প্রদেশবাসীদের মধ্যে কাহারও নাম মনে পড়ে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—

"আনন্দ চার্লু, বদরুদ্দিন তায়েবজী, (ইনি এবারের সভাপতি হয়েছিলেন) ফিরোজশা মেটা—ইহাঁদের কথা বেশ মনে পড়ে। এই অধিবেশন থেকেই আনন্দ চার্লুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং পরে সেটা কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতায়ও পরিণত হয়। ফলে, এলাহাবাদ কংগ্রেস থেকে তিনি একটা কি প্রয়োজনে ক'লকাতা এসেছিলেন। সেই অবসরে তিনি আমার এই চুঁচুড়ার বাড়ীতেই প্রথম পদার্পন করেন এবং এখানে একদিন একবেলা কাটিয়ে তবে ক'লকাতা যান। এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প বলি। এলাহাবাদ থেকে আমি তারিখ ও সময় জানিয়ে বাড়ীতে এক টেলিগ্রাম করি—Ananda Charlu is accompanying me, arrange for his food. (আনন্দ চার্লু আমার সঙ্গে যাচ্ছেন তাঁর খাবার যেন তৈরী থাকে)। চুঁচুড়ায় পৌঁছে আহারের সময় বাঙ্গালীর ঘরে অতিথিকে যেমন দেওয়া হ'য়ে থাকে তেমনি ব্যঞ্জনাদিতে থালা সাজিয়ে তাঁকে দেওয়া হ'য়েছে। তিনি তো তাই দেখেই চ'মকে উঠে বল্লেন—'What are these? Is it possible for a man to take all these?' আমি তাঁকে সবিনয়ে বুঝিয়ে বল্লাম যে বাঙ্গলার অতিথিসৎকারের এই রীতি। তাঁর যা' ভাল লাগে তাই তিনি খাবেন, বাকী প'ড়ে থাকবে। উত্তরে তিনি বল্লেন—'But where is curd?' তখন দেখি তাইতো—আসল জিনিষেই ভুল হ'য়েছে। তাড়াতাড়ি আধ সের দই আনিয়ে দিলাম। এদিকে যখন দইয়ের ব্যবস্থা হ'চ্ছে তখন তিনি তাঁর চাবী আমাকে দিয়ে বল্লেন যে, খেতে বস্‌লে তাঁর আর উঠ্‌তে নেই, তাই তিনি উঠ্‌তে পারলেন না। সেইজন্য আমি যেন কিছু মনে না করি তাঁর চাবী দিয়ে তাঁর বাক্স খুলে একটি আচারের শিশি আছে সেইটি আমাকে বার ক'রে আনতে বল্লেন। আমি তৎক্ষণাৎ সেটি বার ক'রে নিয়ে এলাম। দেখি এক শিশি লঙ্কার আচার। ইতিমধ্যে দইও এসে প'ড়ল। তিনি সেই দই ও লঙ্কার আচার দিয়েই আহার একরকম শেষ ক'রলেন। যতদূর মনে পড়ে দুই একটা তরকারীতে বোধহয় হাত দিয়েছিলেন।

"যাক্—তারপর আমাদের আসল বক্তব্যে আসা যাক্। মাদ্রাজে পৌঁছে শুন্‌লাম যে ডেলিগেট্‌দের থাকবার জন্য দুটি বাড়ীর বন্দোবস্ত হ'য়েছে—একটা ওয়েলিংটন হাউস্ অপরটি মোর্‌স্ হাউস্। প্রথমোক্ত বাড়ীটি যাঁহারা সাহেবী কায়দায় থাক্‌বেন ও সাহেবী খানা খাবেন তাঁদের (অর্থাৎ Heterodox-দের) জন্য আর শেষোক্তটি যাঁরা দেশী ও গোঁড়া ভাবে থাকবেন তাঁদের (অর্থাৎ Orthodoxদের জন্য। তখন কয়েকজন মাদ্রাজী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমাদের কারবার ছিল। তাই মনে হ'ল যদি তারা শোনে যে, আমি Heterodoxদের সঙ্গে বাস ক'রছি তাহ'লে হয়তো তারা কিছু মনে ক'রতে পারে। এই ভেবে বন্ধুবর ভোলানাথ ধরকে বল্‌লাম, চল ভাই আমরা 'মোর্‌স্ হাউসে'ই যাই। স্বেচ্ছাসেবকদের বলাতে তারা আমাদের 'মোর্‌স্ হাউসে' পৌঁছে দিলে।"

স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যবস্থা কি রকম ছিল জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন :—

চমৎকার স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে প্রায় সকলেই গ্রাজুয়েট্—এইটেই ছিল সবিশেষ লক্ষ্য ক'রবার বিষয়। স্বেচ্ছাসেবকদের দলপতি এবং দুটী হাউসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন Great grandson son of H. H. the Maharaja of Kandy. তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম যে, এই সব শিক্ষিত গ্রাজুয়েট্ দিয়ে আমাদের সেবার কার্য্য কেন করানো হচ্ছে? তার উত্তরে তিনি ব'লেছিলেন যে, লেখাপড়া শিখ্‌লেই তা মানুষ হয় না। আপনাদের মত লোকের সঙ্গ ও সেবা ক'রে যে শিক্ষা ওরা পাবে তাতে ওদের মানুষ হ'বার পথে সাহায্য ক'রবে।

"যাক্, মোর্‌স্ হাউসে পৌঁছে একটা ঘর ঠিক ক'রে নেওয়া গেল। কিন্তু সেখানে আমাদের চাকরদের দেখতে পেলাম না অথচ জিনিষপত্র নিয়ে তারা আগেই রওনা হ'য়েছিল। তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুইই পেয়েছিল। ভাবলাম আগে তার ব্যবস্থা হোক্—পরে

চাকর সন্ধান করা যাবে। চা এল এবং তার সঙ্গে এল জলখাবার—দুখানি চাপাটী, অবশ্য ঘিয়ে ভাজা। তার মধ্যে খানিকটা ফাঁপা, ভেঙে দেখি খানিকটা ক'রে নারকোল। এই সঙ্গে আর একটি উপাদেয় জিনিষ ছিল—আধখানা ক'রে চেরা বড় লঙ্কা ভাজা। Orthodox খাবারের এই ব্যবস্থা দেখেই তো চক্ষু চড়কগাছ! ভোলানাথকে বল্লাম কাজ নেই ভাই জাত বাঁচিয়ে। জাত বাঁচাতে গেলে প্রাণটা যাবে। নির্ঘাত এখান থেকে মারাত্মক অর্শ নিয়ে বাড়ী ফিরতে হবে। তার চেয়ে চল অবিলম্বে ওয়েলিংটন হাউসে। স্বেচ্ছাসেবকগণ বল্লে যে, তখন ওয়েলিংটন হাউসে গিয়ে স্থান পাওয়া বোধ হয় অসম্ভব হ'বে। বল্লাম—চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কি? অতএব পত্রপাঠ ওয়েলিংটন হাউসে যাত্রা ক'রলাম! সেখানে গিয়ে দেখি যে আমাদের চাকরেরা আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান। তারা আগে থেকেই আমাদের জন্যে একটি ঘর অধিকার ক'রে জিনিষপত্র গুছিয়ে আমাদের জন্যে নিশ্চিন্ত প্রতিক্ষায় ব'সেছিল—তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হ'ল তারা যেন জান্‌ত যে শেষ পর্য্যন্ত আমরা সেখানে গিয়ে হাজির হব। তারপর যে কদিন সেখানে ছিলাম বেশ আরামেই কেটেছিল। আবার ওর মধ্যেও দুটো দল ছিল। কয়েকজন ওয়েলিংটন হাউসে থেকেও দেশী খানা খেতেন—মোরস্‌ হাউস থেকে তাঁদের খাবার আস্‌ত। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভাগ্যকুলের রায় মশাই, "ইণ্ডিয়ান মিররে"র নরেন্দ্র নাথ সেন প্রভৃতি।

বাঙ্গালীদের মধ্যে কাহার কি বৈশিষ্ট্য ছিল জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন:—"দুটী লোক সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম মিঃ ডব্লিউ সি বাঁড়ুয্যে, সাহেবিনায় ইনি ছিলেন অপরাজেয়। জাহাজে এক টেবিলে ব'সে খানা খাওয়া, ডেকের উপর সকাল সন্ধ্যা পদচারণা, তাঁর চলন, বলন ও পোষাকের কায়দা দেখে জাহাজের ক্যাপ্‌টেনের চক্ষু চড়কগাছ! আমাদের অনেককে সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা ক'রেছে—"এই পুরো সাহেবি কেতাদুরস্ত লোকটি কে?" মাদ্রাজে পৌছে তিনি আর হিউম্‌ সাহেব একটি হোটেলে গিয়ে উঠেছিলেন।

আর একজন ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে। তাঁর বাগ্মীতা ও স্বদেশানুরাগের খ্যাতি তখনই দেশময় ছড়িয়ে গেছল। তাঁকে দেখ্‌বার জন্য হাজার হাজার লোক ওয়েলিংটন হাউসে আস্‌ত। তখনকার দিনে সে জনস্রোত যারা দেখেছে তারাই জানে তাঁর Popularity কি অদ্ভুত ছিল। আর তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বাগ্মীতা সেও এক অসম্ভব কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। কংগ্রেসের খোলা অধিবেশনে Arms Act সম্বন্ধে একটা Resolution ছিল। সেই Resolutionএর প্রায় ৫০, ৬০ টি Amendment প'ড়েছিল।

সভাপতি মহাশয়ের চক্ষুস্থির। তখন সভাপতি মহাশয় ও অন্যান্য সকলের অনুরোধে সুরেন্দ্রবাবু দাঁড়ালেন Resolution-এর স্বপক্ষে বক্তৃতা ক'রতে। তাঁর বক্তৃতা অর্দ্ধপথে অগ্রসর হ'তে না হ'তে—প্যাণ্ডেলের চারিদিক থেকে সংশোধনকারী-দল চীৎকার আরম্ভ ক'রে দিলেন—"I withdraw, I withdraw.।" সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতার পর দেখা গেল সেই প্রস্তাবটি নির্ব্বিবাদে এবং সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হ'য়ে গেল।"

পুরানো দিনের আর কারও বক্তৃতার কথা তাঁর মনে পড়ে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—Allahabad Congress এ Mr. Bradlaugh র বক্তৃতা—সেতো কথা নয়, আগুনের ফুল্‌কি! সেই হৃদয়-দ্রব-কারী ও চিত্ত-উত্তেজক বক্তৃতার কথা আজও ভুল্‌তে পারিনি।"

"যেতে আসতে আপনাদের ক'দিন লেগেছিল?"

"যেতে লেগেছিল দু'দিন দু'রাত্রি আর কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু ফিরতে ক'দিন লেগেছিল তা' আমি বল্‌তে পারি না কারণ আমি ওখান থেকে বেরিয়ে একটু ঘুরে, অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি দেখে বাড়ী ফিরেছিলাম।"

"তারপর আপনি আর কতদিন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন?"

"তারপর নিয়মিতভাবে ১০।১২ বৎসর যোগ দিয়েছিলাম। যে বছর কাশ্মীর পণ্ডিত বিশ্বনাথ কংগ্রেসে যোগ দিতে গিয়ে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হ'ন এবং পরে মারা যান সেইবার কংগ্রেস থেকে ফিরে এসে মনটা খুব খারাপ হ'য়ে যায়। তারপর থেকে আর যাইনি।" এই পর্য্যন্ত শুনিয়া আমি বলিলাম যে, হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটী কি করিতেছেন বলিতে পারি না, কিন্তু আমার মনে হয় তাঁহাদের কর্ত্তব্য আপনার ন্যায় সেই পুরাতন দিনের একজন কংগ্রেস সেবীকে এই উপলক্ষ্যে অভিনন্দিত করা।

শ্রীরমেশ চন্দ্র মণ্ডল

ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন যে, আজ চুঁচুড়ার যেরূপ পাণ্ডববর্জ্জিত অবস্থা দেখিতেছেন একদিন তাহা ছিল না। তখন এখানে দেশের ও দশের কাজে জনসাধারণের আগ্রহ ছিল। তৃতীয় অধিবেশন থেকে ফেরার পরই চুঁচুড়ার কয়েকজন বিশিষ্ট অধিবাসী মিলে একটি সভা আহ্বান করেন এবং সেই সভায় আমাকে অভিনন্দিত করেন। আগে এখানে সভা-সমিতি নিয়মিতই হ'ত। সুরেন্দ্রদা (বাঁড়ুয্যে মশাই) এসে আমার এই বাড়ীতে সভা ক'রে গেছেন। এখন যেমন সভা ক'রে বাড়ী বাড়ী গিয়ে লোক ডাকতে হয় তখন তা' ছিল না। সুরেন্দ্রদা'র সভায় ঢুকতে না পেরে বহুলোককে হতাশ হ'য়ে ফিরে যেতে হ'য়েছিল। অথচ আমাদের এ বাড়ীতে হাজার লোক অনায়াসে ধরে, সেতো জানেন।

এই পর্য্যন্ত বলার পর তাঁহাকে ক্লান্ত দেখিলাম। অতঃপর সেই অশীতিপর বৃদ্ধকে আর বিরক্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ভারত জাতীয় মহাসভায়

গত পঞ্চাশ বৎসরের জাতির ভাগ্যবিধাতৃগণ

ডব্লিউ, সি, বোনার্জ্জী (বোম্বে)
১৮৮৫—(কলিকাতা), ১৮৯২—(এলাহাবাদ)

দাদাভাই নৌরজী ১৮৮৬—(কলিকাতা)
১৮৯৩—(লাহোর), ১৯০৬ (কলিকাতা)

১৮৮৭—বদরুদ্দিন তায়েবজী (মাদ্রাজ)

১৮৮৮—জর্জ্জ ইয়ুল (এলাহাবাদ)

স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন
১৮৮৯—(বোম্বাই), ১৯১০—(এলাহাবাদ)
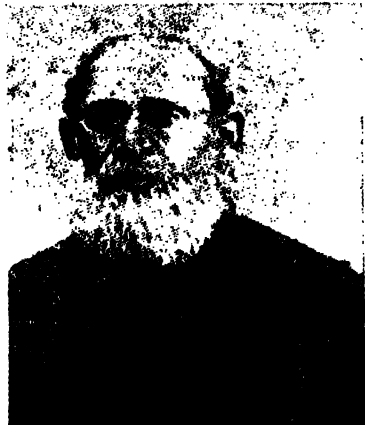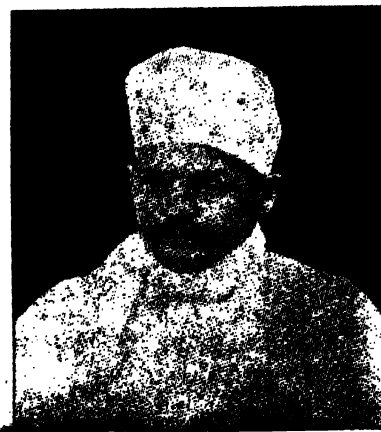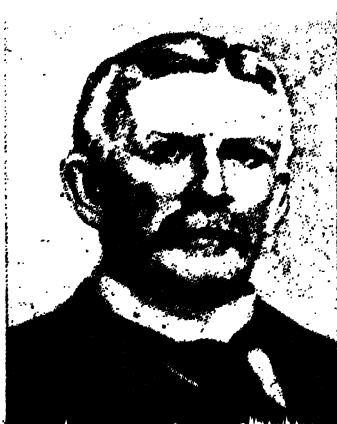
১৯১১—বিষেণ নারাণ ধর (কলিকাতা)

১৯১৪—ভূপেন্দ্রনাথ বসু (মাদ্রাজ)

১৯১৮—সায়েদ হাসান ইমাম (বিশেষ অধিবেশন—বোম্বাই)

১৯১২—আর, এন, মুধলাকর (বাঁকীপুর)

১৯১৫—এস্, পি, সিংহ (বোম্বাই)

১৯১৯—মতিলাল নেহেরু (অমৃতসহর)
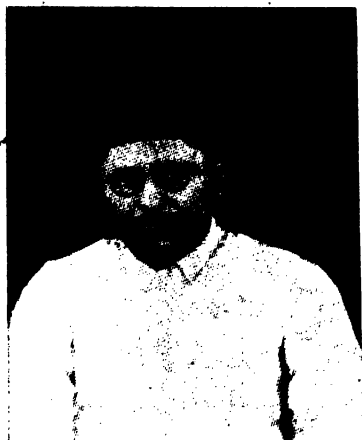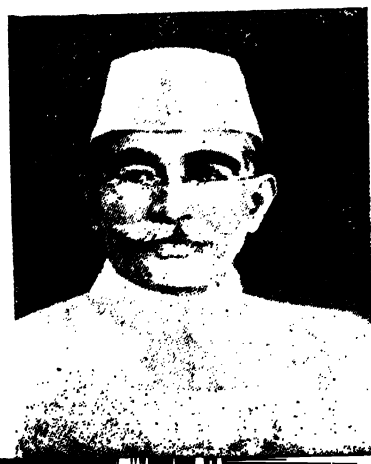
১৯২৯—জহরলাল নেহেরু (লাহোর)
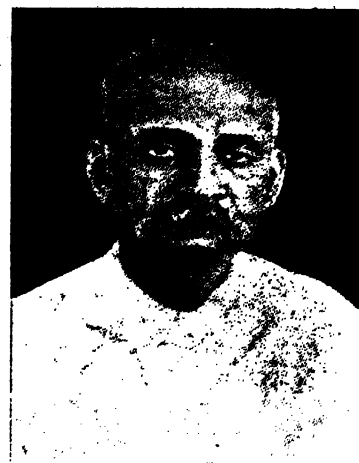
১৯৩১—বল্লভভাই প্যাটেল (করাচী)

১৯৩২—সেট রণছোড়লাল (দিল্লী)

নৃত্যে, গীতে—

মনোরম

দৃশ্যসম্পদে—অতুলনীয়

ভাবে, ভাষায়

অভিনয়ে—অদ্বিতীয়

আধুনিক যুগের প্রেম ও

প্রণয়ের আলেখ্য
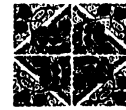
প্রভারগ্রাণ পিক্‌চার্সের নূতন অর্ঘ্য

স্বয়ম্বরা

ঃ শ্রেষ্ঠাংশে ঃ

জনা ব্যানার্জ্জী	নমিতা রায়	অশ্রুময়া দেবী
রাণীবালা	প্রকাশমণি	হরিসুন্দরী
ললিত মিত্র	অতুল গাঙ্গুলী	জীবন সাহা ।
পুলিন বর্দ্ধন	সুধীর দাস	ভূপেন চক্রবর্ত্তী

শনিবার, ২৮শে ডিসেম্বর হইতে

সগৌরবে তৃতীয় সপ্তাহ

রূপকথা

বহুবাজার জংশন]

[ফোন ঃ বি, বি, ৯৭৭

বাঙলা ও কংগ্রেস

শ্রীপ্রমোদ কুমার সেন

আজ অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগছে যে, কংগ্রেসে, অর্থাৎ নিখিল ভারতের রাজনীতিতে বাঙলার স্থান কোথায়। বাঙালী ক্রমশঃই অনুভব করছে যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ তার সমস্যা নিয়ে আদৌ ব্যস্ত নয়; সকলেই তা'কে সাহায্য করা দূরে থাকুক, খানিকটা কোণ-ঠাসা করতে পারলেই যেন তৃপ্ত হয়। অবশ্য আসল দোষ দিতে হ'লে আমাদের জাতিকেই দিতে হয়। বাঙ্গালীর চেষ্টায় ও প্রেরণায় বাঙলার জাগরণ এসেছিল, যার ঢেউ এক সময়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল; বাঙ্গালীর উদ্যমহীনতা ও ঐক্যের অভাবে আবার বাঙ্গলার অধোগতি হয়েছে একথা স্বীকার করতেই হবে। রাজনীতি, সামাজিক প্রগতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ধর্ম্মে বাঙলার কাছে যে অন্য প্রদেশ ঋণী সে কথা তাদের মধ্যে কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু আজ তারা কার্য্যতঃ শুধু তা অস্বীকার করেই তৃপ্ত নয় বাঙ্গালী ও বাঙ্গলার প্রতি তাদের অনেকেই ঈর্ষান্বিত।

একথা আলোচনা করার প্রয়োজন শুধু বাঙলার আত্মসম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নয়, এ সমস্যার সমাধান না করলে ভারতের ভাবী সমস্যার সমাধান হবে না। কাজেই একদিকে বাঙ্গালীকে যেমন স্বপ্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে, তেম্‌নি আর প্রদেশগুলিকে বোঝাতে হবে যে ভারতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হ'লে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠ্‌বে। ভারতে জাতীয় ঐক্য এসেছে কংগ্রেসের চেষ্টায়, কাজেই এবিষয়ে কংগ্রেসের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আজ রাষ্ট্রীয় সংস্কারের ধূমে এই জাতীয় ঐক্যের সূর্য্য ঢেকে গেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন প্রদেশই এ বিষয়ে অবহিত নয়। প্রাদেশিকতার [illegible] বিষ জাতির সর্ব্বাঙ্গে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে। আশঙ্কা হয় যে নূতন রাষ্ট্র বিধান যখন প্রবর্ত্তিত হবে তখন আর এই সর্ব্বনাশ ঠেকাবার আর কোন উপায় থাক্‌বেনা। কাজেই এখন থেকেই আমাদের সাবধান হ'তে হবে—যদি গোটা ভারতীয় সভ্যতা আমরা রক্ষা করতে চাই।

ভারতের দেহে বর্ত্তমান যুগে নূতন জীবন সঞ্চার হতে আরম্ভ করেছিল এই বাঙলা থেকেই। যে বৎসর বাঙলার সাধক রামকৃষ্ণ সর্ব্ব ধর্ম্মে নিগূঢ় ঐক্য দেখিয়ে দেহ রক্ষা করলেন, তার এক বৎসর আগেই রাজনীতি ক্ষেত্রে সেই ঐক্যের প্রতীক কংগ্রেসের অভ্যুদয় হ'ল। তারপর রামকৃষ্ণ শিষ্য বিবেকানন্দ কম্বুনিনাদে আব্রহ্ম হিমাচল ভারতকে আহ্বান করলেন আত্মোপলব্ধি করতে। তিনি আবার শিখালেন ভারতকে ত্যাগধর্ম্ম, সেবাব্রত—প্রতিষ্ঠা করলেন বর্ত্তমান ভারতের। অপরদিকে তিনি পাশ্চাত্যের কাছে প্রতিপন্ন করলেন যে, ভারত কালের গতিতে অবসন্ন হ'য়ে পড়লেও তার স্বধর্ম্ম অবিকল আছে, তার প্রাণের স্রোত বাধা পেলেও তা' শুখিয়ে যায় নি। এঁদের আগেই রামমোহন রায়ের সাধনায় ভারত প্রতিভা বিকাশ করতে আরম্ভ করেছিল, এবং অচিরেই সমগ্র বঙ্গদেশে ভাব-গঙ্গা বইতে আরম্ভ করল যা'র প্রভাবে সমগ্র জাতির আবার নূতন জীবনের সঞ্চার হ'ল। সকল ক্ষেত্রেই দিক্‌পালের আবির্ভাব হ'তে লাগল,।

রাজনীতি ক্ষেত্রেও সর্ব্বপ্রথমে জাতীয় অধিকারের দাবী করলেন সুরেন্দ্রনাথ। এঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে, অদম্য উৎসাহে এবং অপূর্ব্ব ত্যাগে সমগ্র ভারত রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের [illegible] ব্যক্ত হয়ে উঠল। দেশের আরম্ভ হ'ল অপূর্ব্ব উদ্দীপনা। বাস্তবিক বল্‌তে গেলে সেকালে কংগ্রেস বল্‌তেই বোঝাত সুরেন্দ্রনাথ। ইনি যখন দেশময় জাতীয় ভাবের প্রবাহ বহাচ্ছিলেন, তখন এল বাঙলার কঠোর অগ্নি পরীক্ষা—বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। সমগ্র জাতির অঙ্গে হ'ল কষাঘাত—মুহূর্ত্তের মধ্যেই জাতি হয়ে উঠ্‌ল সচেতন। জাতি আর পূর্ব্ব সংকীর্ণ আদর্শ নিয়ে ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হ'তে চাইল না—আর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠ্‌ল—স্বরাজের আদর্শ। এই আদর্শে জাতিকে উদ্দীপিত করলেন অরবিন্দ। তাঁর বিপুল ত্যাগে, মহান চরিত্রে জাতীয় সত্ত্বা জেগে উঠ্‌ল—জাতির মধ্যে প্রথম পূর্ণ চেতনার সঞ্চার হ'ল।

দুঃখের বিষয়ে জাতির প্রথম উন্মাদনার উচ্ছাস পত্রে ছাপিয়ে অযথা নষ্ট হয়ে গেল। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার শিক্ষা ত' একদিনে হয় না, কাজেই প্রায় দশ বৎসর বাঙলা আবার স্তব্ধ ভাবে রইল। কিন্তু এই দশ বৎসরের কংগ্রেসের ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য নয়। তা'রপরে বাঙলায় যে জাগরণের সূচনা দেখা গিয়েছিল তা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়্‌ল লোকমান্য তিলক, এ্যানি বেসান্ত ও পরে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিভায়। বলা চলে এখন থেকেই সমগ্র ভারতের রাজনীতিক জীবনের সূচনা হ'ল। মহাত্মা গান্ধীর সহকর্ম্মী হ'লেন বহু প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি। কিন্তু এই সমগ্র ভারতের আন্দোলনে যথার্থ ভাবে প্রাণ সঞ্চার করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তাঁহার সহকর্ম্মী যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি। ১৯১৭ থেকে ১৯৩২ পর্য্যন্ত ইতিহাস সেদিন্‌কার ঘটনা, আমাদের অনেকেরই মনে আছে, এর বিশদ আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

কিন্তু এ থেকেও একটা জিনিষ সুস্পষ্ট যে এই সমগ্র ভারতের জাতীয়

সাধনায় বাঙলার দান কতখানি। বাঙলা সকল প্রদেশের উন্নতির জন্তে মেতে উঠেছিল, সকলের সমৃদ্ধিতে বাঙলা সমৃদ্ধ অনুভব করেছিল। বাঙলার নেতৃবর্গ যেমন ছিলেন বাঙ্গালীর প্রিয়, তেম্নি সম্মান-ভাজন হয়েছিলেন অপর প্রদেশের নেতৃবর্গ। মহাত্মা গান্ধী বাঙলা ভ্রমণ কালে প্রত্যেক জেলায় ও গ্রামে গ্রামে যে আদর অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন, অপর কোন প্রদেশে তিনি তেম্নি পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। অবশ্য তাঁর মত অসাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে অপর কা'রও তুলনা করা উচিৎ নয়, কিন্তু অপর প্রাদেশিক নেতৃবর্গের তুলনায় বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দ (এক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছাড়া) কি কোন প্রদেশে আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছে?

যাঁরা উদার প্রাণ তাঁরা এ সকল বিষয় লক্ষ্য করেন না সত্য, কিন্তু জনসাধারণের কাছে ইহা উপেক্ষনীয় নয়। আমাদের যদি সমগ্র ভারতের সহিত প্রাণের যোগ থাকে, তা'হলে আমরা কোন প্রদেশকেই উপেক্ষা করিতে পারি না। কিন্তু এতকাল পরেও কি সে নিবিড় যোগ স্থাপিত হয়েছে? দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাদেশিক সংবাদপত্র-গুলিই দেখা যাক্। বাঙলার সংবাদপত্র-গুলিতে অন্য প্রদেশের যেরূপ সংবাদ থাকে, প্রাদেশিক সংবাদপত্রগুলিতে বাঙলার সংবাদ কি সে পরিমাণে থাকে—না সেগুলিকে সেরূপ বড় বড় হরফে ছাপান হয়? মালব্যজী কাশীর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্তে আর্থিক সাহায্য চাচ্ছেন পড়্‌লেই বাঙলার প্রত্যেক সাংবাদিক সে সংবাদটিকে যোগ্যভাবে প্রকাশ করেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর জন্তে অর্থের প্রয়োজন এ সংবাদটি কয়টী প্রাদেশিক সংবাদপত্রে উপযুক্তভাবে প্রকাশিত হয়?

সত্য কথা বল্‌তে গেলে বাঙলা আজ সমগ্র ভারতের, বিশেষতঃ তা'র পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলোর উপেক্ষায় বদ্ধ হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে, কোন বাঙালী ব্যবসায়ীকে বিহার থেকে বিহারী-দের বয়কটের জন্তে ব্যবসা গুটিয়ে আস্‌তে হয়েছিল! রাঁচিতে শুন্‌লাম (একজন বাঙালী বস্ত্রব্যবসায়ীর কাছে) যে, কোন বিহারী যদি ভ্রমক্রমে তার দোকানে প্রবেশ করে তা'হলে অপর বিহারীরা তা'কে টেনে নিয়ে যায় এবং বলে জাতভাইদের দোকান থেকে কেনা উচিৎ। সম্প্রতি আসামে কি বিশ্রীভাবে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ প্রচারিত হচ্ছে সকলেই জানেন। বিহারেও বহুদিন থেকে ঐ ব্যাপার চলেছে। সেদিনও "সার্চ্চলাইট" কাগজে কত বাঙ্গালী বিহারে চাকুরি করে তা' নিয়ে আলোচনা চলেছে। আমরা লাহোরের হিন্দু মুসলমান বয়কট নিয়ে দুঃখ করছি, কিন্তু বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও যুক্ত-প্রদেশে যে বয়কট চলেছে তা'র হিসাব কে রাখে? গত আগষ্ট মাসে যখন কলিকাতায় নিখিলভারত সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছিল (যার সভাপতি হয়েছিলেন একজন মাদ্রাজী, মিঃ চিন্তামণি) তখন আমি ছিলাম মাদ্রাজে। একজন মাদ্রাজী সাংবা-দিক আমাকে বল্লেন যে, মাদ্রাজী সাংবা-দিকরা বলে যে, 'ও বাঙলার ব্যাপার', তা'রা কেউ আর কষ্ট করে কল্‌কাতায় আসেনি।

বহু দুঃখে এ সকল বিষয় আলোচনা করতে হয়, কারণ জাতীয় ঐক্যের এত মন্ত্র আওড়ান সত্ত্বেও ভারতের অবস্থা এই হয়েছে এবং ভবিষ্যতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের ফলে আমরা আরও সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হব। বাঙ্গালীর অপরাধ যে তারা শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হয়ে কর্ম্ম-ব্যপদেশে অনেক দেশে ছড়িয়ে রয়েছে এবং চাকুরী বা ব্যবসা করছে। কাজেই তাদের যতদিন তাতে না মারা যায় ততদিন প্রদেশগুলোর স্বস্তি নেই। কিন্তু আমরা এর উত্তরে যদি বলি যে বাঙলা দেশ থেকে শুধু মণিঅর্ডারে ৬ কোটির ওপর টাকা বছরে অন্য প্রদেশের লোকেরা পাঠায় (এ সংবাদটি গত বৎসর জনৈক অর্থনীতিবিৎ দিয়েছেন) তা'হলে আমাদের হবে মহা অপরাধ!

আসল কথা সকল প্রদেশের নেতৃবর্গ এমন স্বার্থান্ধ হয়ে পড়েছেন যে, তাঁরা সমগ্র জাতির কথা ভাবতে চান না। অল্প কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির চাকুরি জুটলে বা শিল্প ব্যবসায় সুবিধা করতে পারলে তাঁরা সন্তুষ্ট—কারণ তা'তে নিজের ও আত্মীয়স্বজনের পেট ভরবে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় যদি সহস্র সহস্র স্বজাতি অপর দেশে নিরন্ন হয় তা'হলে তাঁদের কিছুই আসে যায় না। আজ যদি বাঙলা দেশে ব্যাপকভাবে বিহারী ও উড়িয়া ও আসামীদের বয়কট আরম্ভ হয় তা' হ'লে বিহারে বাঙালী বিদ্বেষ প্রচারকারী কাগজওয়ালা বা নেতাদের টনক নড়বে না, কিন্তু এ বেচারারা হবে নিরন্ন। এই সকল কর্ম্মব্যপদেশে সকল প্রদেশের লোকের মধ্যে মিলন হচ্ছিল, কিন্তু এই লোভী, স্বার্থান্ধ, অদূরদর্শী প্রাদেশিক নেতাদের বিকৃত বুদ্ধিতে জাতীয় ঐক্য একেবারে নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

কংগ্রেসী নেতারা এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন, বরং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই অর্থনাশকর আন্দোলনে প্রশ্রয় দেন। বিহারে যে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন অনেকদিন ধরে চল্‌ছে, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বা অপরাপর কংগ্রেসী নেতৃবর্গ কি বিহারীদের বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, বর্জ্জন-নীতি মারাত্মক। আসামে যে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন বিষোদ্গীরণ হচ্ছে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বরদলই বা তরুণ রাম ফুকান কি

তার প্রতিবাদ করছেন? আমরা এখনও বলি যে, কংগ্রেস থেকে এ মনোভাবের শুধু নিন্দা করলেই হবে না, কংগ্রেসী নেতাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে এ মনোভাব সকল প্রদেশ থেকে দূর করতে। যদি এখন তা না করা হয়, তা হলে কয়েক বছর প্রাদেশিক শাসন চলার পর নাৎসীদের ইহুদি বয়কটের মত কাণ্ড কারখানা আরম্ভ হবে।

এই হ'ল সাধারণ ভাবে প্রদেশগুলির বাঙলার প্রতি মনোভাব। কিন্তু কংগ্রেস রাজনীতিক্ষেত্রেও বা কি কাণ্ড না করছেন? সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কংগ্রেসের ধাতে কি করে সহ্য হ'ল আমরা ভেবেই পাইনা। একটা বিষয়ে লক্ষ্য করবার আছে যে, এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে সমূহ ক্ষতি বাঙালা দেশের ও পাঞ্জাবের। সেই জন্যেই কি কংগ্রেস এ বিষয়ে উদাসীন? বাঙলা দেশের যা কিছু উন্নতি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেষ্টা ও সাধনায় হয়েছে—কিন্তু এই বাঁটোয়ারার ফলে নূতন সংস্কারের পর তাদের একেবারে হীনবীর্য্য হয়ে পড়তে হবে। অবশ্য আমরা এমন মূঢ়মতি নই যে বলব মুসলমান বা অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোককে দাবিয়ে রাখা হোক। সকল সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্যে বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ই সর্ব্বপ্রথম কামনা করেছে। আজ মহাত্মা গান্ধীর মুখে যে সকল কথা শোনা যাচ্ছে, তার প্রত্যেকটীর ওপর বিবেকানন্দ ৪০ বৎসর আগে জোর দিয়েছেন। তিনিই প্রথম দরিদ্রকে নারায়ণ বলেছিলেন। বাঙলার চিত্তরঞ্জন মুসলমানদের কিরূপ বন্ধু ছিলেন তা এখনও অনেকের মনে আছে—জাতির মুক্তিকামী মুসলমান নেতৃবর্গ ছিলেন তাঁর সহকর্ম্মী। কিন্তু আজ কংগ্রেসের জাতিয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবর্গ পর্য্যন্ত বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে নীরব। এ বাঁটোয়ারা যে জাতির পক্ষে কতদূর অনিষ্টকর তা' ডাঃ কিচলুর কথায় বুঝা যায়। তিনি এমন কথা বলেছেন যে, লাহোরের বর্ত্তমান হাঙ্গামার কারণই আগামী নির্ব্বাচন। মুসলমান নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, যিনি যতই গোঁড়ামী দেখাতে পারবেন তিনি ততই সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার পাত্র হবেন।

বাঙলার অন্যান্য সমস্যা সমাধান করবার বিষয়েও কংগ্রেস আজকাল বিশেষ মাথা ঘামান না। অবশ্য সকল বিষয়ে তাঁদের হাত নেই, তবে যেটুকু করলে বাঙলা সমূহ সর্ব্বনাশের হাত থেকে বাঁচে সেটুকু করা কি তাঁদের উচিৎ নয়? এবিষয়ে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। প্রথমে কংগ্রেসকে বজ্র নিনাদে ঘোষণা করতে হবে যে কোন প্রদেশেই বাঙ্গালী বিদ্বেষ চলবে না। যে নেতা বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচার করবে বা তা'তে প্রশ্রয় দেবে কংগ্রেসে তা'র স্থান নেই। দ্বিতীয়তঃ জাতীয়তার মূল-আদর্শের প্রতি চাই কংগ্রেসের অবিচলিত শ্রদ্ধা—সুতরাং তার এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় থাকলে চলবে না—কংগ্রেসকে, কংগ্রেসের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে অকুণ্ঠ চিত্তে বলতে হবে—ভারত চায় পূর্ণ স্বরাজ, নরনারীর জন্য অসাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনাধিকার—যেমন আজ মিশর ব্যবস্থা করেছে।

কংগ্রেস ও জাতীয় জাগৃতি

শ্রীহর্ষনাথ ঘোষ

জন-সাধারণের (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ) মতের অনুবর্ত্তী শাসন-তন্ত্রের আদর্শ যখন য়ুরোপের সর্ব্বত্র স্থান পেল, সেদিন থেকে মানব-সমাজের এক নূতন যুগ—যার মূলে বিশ্ব-বিশ্রুত ফরাসী বিপ্লব। সেদিন থেকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মানুষের সতর্কতা ও আকাঙ্খা দুর্নিবার হ'তে আরম্ভ হ'ল। সমাজ সৃষ্টির গোড়ায়ও হয়ত সঙ্গবদ্ধ মানুষের ঐ একই শুভেচ্ছা, কিন্তু তবুও মধ্য-যুগে প্রভুত্ব করবার সীমাহীন লিপ্সায় মানুষের সমাজ-সৃজনের সমস্ত কল্যাণ-কামনার প্রচেষ্টাকে বীভৎস করে তোলা হয়েছিল।

পশ্চিমে যখন এরই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'ল তার কিছুকাল পরে আমাদের এই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ-সভ্যতার ছোঁয়া লাগল। তখন দেশবাসী নিজদেশের শিক্ষা ও সভ্যতায় আস্থা হারিয়েছে; হয়ত বহু বর্ষ ধ'রে বিদেশীদের কাছে পরাজিত হয়েই এরূপ ঘটে থাকবে। এক অলস কর্ম্মশক্তিহীন আরামপ্রিয়তাও দেশের সব-কিছুর প্রতি শ্রদ্ধাহীন মনোবৃত্তি তখন দেশ জুড়ে বিরাজ কচ্ছিল আর ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি বিদেশীর অবজ্ঞা অজস্রধারায় বর্ষিত হচ্ছিল। এমনি সময় এই বাংলাদেশে রাজা রামমোহন জাতীয় জীবনের এই অলস প্রশান্তির মধ্যে এক নূতন কর্ম্মপ্রেরণা ফিরিয়ে আনতে ব্রতী হলেন। তাঁর অসীম কর্ম্মশক্তি ও ধী-শক্তির প্রভাবে তিনি জাতির মধ্যে একটা সংস্কার ও আত্মচেতনার সঙ্কল্প জাগিয়ে তুললেন। যেন স্পন্দনহীন মহাসমুদ্রের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ-রেখা ভেঙ্গে পড়্‌ল। এতে প্রবল প্রতিঘাত তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের যোগ্য হবার সংকল্প মনে ধারণ করবার শক্তি তিনি দিতে পেরেছিলেন। রামমোহনের প্রভাবে বাঙ্গলাদেশে নূতন ভাবধারা স্থান পেয়েছিল। তারই ফলস্বরূপ আমরা পেলাম সুরেন্দ্রনাথকে, আনন্দমোহন ও বিপিনচন্দ্রকে। আর এদেরই শিক্ষার আলোকে ভারতের জাতীয় জাগরণের সুরু।

বৃটিশ-শাসন নিয়ন্ত্রণে ভারতবাসীর প্রথম ক্ষীণ প্রতিবাদ ইলবার্ট বিলের সময়ে। আত্ম-মর্য্যাদায় ঘা খেয়ে ভারতবাসী সম্ভবতঃ সেই প্রথম ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে। তারপর ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ হিউমের প্রচেষ্টায় বোম্বাই নগরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। সুরু থেকে প্রায় এগার ব'ছর পর্য্যন্ত কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসনে তার শুভেচ্ছা অজস্রভাবে বর্ষণ করে চলেছিল—এমন সময় লোকমান্য তিলক অসাধারণ প্রতিভাবলে কংগ্রেসের মধ্যে ও ভারতের জাতীয় জীবনে এক নূতন সুর নিয়ে এলেন। পরাধীনতার গ্লানি কংগ্রেস সভ্যদের মধ্যে তাঁর প্রাণেই সত্য ক'রে ও বেশী ক'রে আঘাত ক'রল; তাই তিনি শুধু 'মারাঠা কেশরী' নন—, 'কংগ্রেস কেশরী'ও হলেন। জাতীয়তার উদ্দীপনা তাঁর হৃদয়ে প্রবলভাবে জেগে উঠ্‌ল। কংগ্রেসের সুরু থেকেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন দেশের শিক্ষা ও রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎকর্ষ দুর্ব্বল হাতে আসবে না, পরের নীতি অনুকরণ করেও নয়। দেশকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ও সঙ্ঘবদ্ধ করবার পন্থা তিনি অবসংবাদপত্র 'কেশরী'-তে তিনি জ্ঞানগর্ভ ও ভাবদ্যোতক প্রবন্ধ লিখে দেশবাসীর কাছে জাতীয়তার বাণী প্রচার করতে লাগলেন। ভারতবাসীর জাতীয়তার উদ্বোধন এই মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ বীর কেশরীর আপ্রাণ প্রচেষ্টায়। বৃটিশ-শাসকগণ লোকমান্য তিলকের এই প্রয়াসকে ভাল চক্ষে দেখ্‌লেন না। তিলককে রাজদ্রোহিতার অপরাধে কারাবরণ করতে হ'ল। ১৮৯৭ খৃঃ স্যার শঙ্করণ নায়ারের সভাপতিত্বে অমরাবতী কংগ্রেসে লোকমান্য তিলকের কারাদণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল। গভর্ণমেণ্টের কাজের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের এই প্রথম বিক্ষোভ-প্রকাশ।

এর কয়েক বছর পর ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় আরম্ভ হয়। ১৯০৩ খৃঃ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বাংলাদেশকে দুই ভাগে ভাগ করা হবে ব'লে ঘোষণা করেন। তার ফলে বাংলাদেশে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব ও রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় ও নেতৃত্বে এক তীব্র আন্দোলন সুরু হয়। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে বাংলাদেশকে ভাগ করা হ'ল। ফলে বাংলাদেশ জুড়ে প্রবল বিক্ষোভাগ্নি জ্বলে উঠ্‌ল; সারা দেশ জাতীয়তার ভাবে মেতে উঠ্‌ল, আর দেখতে দেখতে সমগ্র ভারতবর্ষে তার প্রতিধ্বনি গিয়ে পৌঁছল। বাঙ্গালীর এই মাতৃপূজার মন্ত্র সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রহণ করল।

ভারতের পরবর্ত্তী জাতীয় জীবনের যা বিকাশ তার মূলে বাঙ্গালীর এই দিনের আত্মভোলা-সেবা ও দুর্দ্দমনীয় দেশহিতৈষণার আদর্শ। আজ যা-কিছু জাতি-হিসাবে

জন্য আজ যা-কিছু অনুভূতি ও সমবেদনা, তার মূলে ঐ দিনের বাঙ্গালীর জাতীয়-আন্দোলনের মন-মাতানো ছন্দ।

১৯০৬ খৃঃ অব্দে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থেকে স্বরাজ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করাই হ'ল কংগ্রেসের আদর্শ। 'স্বরাজ' কথাটি এই প্রথমবার কংগ্রেস-মণ্ডপে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ব'লে সভাপতি প্রচার করলেন। এর পর থেকে ভারতে জাতীয়তার নূতন যুগ এসে পড়ল। বাংলায় 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্' জাতীয়তার বাণী প্রচার করতে লাগল। ভারতবর্ষ জুড়ে জাতীয়তার জয়গান ধ্বনিত হয়ে উঠল।

কংগ্রেসের নরমপন্থী মডারেটদল চরমপন্থী জাতীয়দলকে সহ্য ক'রে উঠতে পারছিল না। সংখ্যায় মডারেটদল ছিলেন বেশী। চরমপন্থীদের মধ্যে তিলক ও অরবিন্দ ছিলেন অগ্রণী। এদের নেতৃত্বে চরমপন্থীদল ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠল। দুই দলের বিরোধ বেড়ে উঠে ১৯০৭ খৃঃ সুরাট কংগ্রেস দক্ষযজ্ঞে পরিণত হ'ল।

এর পর মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৫ খৃঃ শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত হোম-রুল আন্দোলন সুরু করলেন। তাঁর মন্ত্র হ'ল—"Strike the iron while it is red." দেশের নেতৃবর্গ অধিকাংশ তাঁর আন্দোলনে যোগ দিলেন। গভর্ণমেণ্ট Defence of India Act জারী করে দিলেন। শত শত কর্ম্মী বিনা বিচারে বন্দী হ'ল। শ্রীমতী বেশান্তকে কারাগারে পাঠান হ'ল।

১৯১৭ খৃঃ কল্‌কাতা কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। অ্যানি বেশান্ত তখন ছাড়া পেয়েছেন। তিনি সভানেত্রী হলেন। মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন।

মহাযুদ্ধের সময় ভারত সম্রাট ভারতীয়দের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রদান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তদনুযায়ী ভারত সরকার ১৯১৮ খৃঃ এক 'রিপোর্ট' দাখিল করেন। ইহাতে দেশের অনেকেই নিরাশ হন এবং কংগ্রেস অধিবেশনে ঐ রিপোর্টের নিন্দা করা হয়। ঐ বৎসর পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের সভাপতিত্বে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রতিবাদ করে। কিন্তু দেশবাসীর প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ঐ আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। ইহাতে দেশ-ব্যাপী এক আন্দোলন হ'ল ও মহাত্মা গান্ধী তার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। "আমরা নিরুপদ্রব অসহযোগ নীতি অবলম্বন করে এই আইনকে বাধা প্রদান করব"—এইরূপ ঘোষণা ক'রে তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলেন। ৭ই এপ্রিল ভারতবর্ষব্যাপী হরতাল অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হ'ল। কিন্তু পরে ঐ তারিখ বদলে ১৩ই এপ্রিল দিন নির্দ্দিষ্ট হয়। দিল্লীর লোকেরা এ সংবাদ জানতে না পেরে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট দিনে হরতাল পালন করল। পুলিশ আন্দোলনকারীদের প্রতি গুলি চালাল। তার প্রতিবাদ-কল্পে অমৃতসরে সমবেত জনতার উপর গুলি চালিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হ'ল। সারাদেশ এই নৃশংসতার প্রতিবাদে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আশা করেছিলেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এর সুবিচার করবেন। কিন্তু তাঁরাও পরে নিরাশ হ'লেন।

১৯২০ সালে কল্‌কাতায় লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল আর বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ লাভ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলে নির্দ্দিষ্ট হ'ল।

দেখতে দেখতে অসহযোগ আন্দোলন বিরাট রূপ পরিগ্রহ করল। দলে দলে ছাত্রগণ স্কুল ও কলেজ ছেড়ে চ'লে এল। আইন-সভা ছেড়ে দলে দলে লোক বেরিয়ে এল। সারাদেশ জাতীয়তার ভাবে মেতে উঠল। নেতারা ও কর্ম্মীরা দলে দলে কারাবরণ করতে লাগলেন। মহাত্মা গান্ধী বার্দৌলীতে খাজনা বন্ধ করার আয়োজন করলেন। অতঃপর চৌরিচোরার অধিবাসীরা অসহিষ্ণু হ'য়ে পুলিশকে আক্রমণ করায় মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলন বন্ধ ক'রে দিলেন।

১৯২৭ খৃঃ মান্দ্রাজ কংগ্রেসে ডাঃ আন্সারীর সভাপতিত্বে ব্রিটিশ সম্পর্ক বিহীন পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের কাম্য বলে ঘোষিত হয়। এই সময় সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হ'ল।

১৯২৮ সালে কল্‌কাতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। 'পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের কাম্য'—এই প্রস্তাবটী উপলক্ষ্য করে প্রবীণ ও নবীন কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হ'ল। নবীনদলের নেতা হলেন শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু। মহাত্মা গান্ধী অতঃপর প্রস্তাব করেন, ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে যদি নেহেরু কমিটি কর্ত্তৃক রচিত শাসনতন্ত্রখানি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট গ্রহণ না করেন তবে কংগ্রেস কর-প্রদান বন্ধ করবে এবং অন্যান্য কার্য্য দ্বারা অহিংস-অসহযোগ আরম্ভ করবে ও কংগ্রেস পূর্ণ-স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালাবে।

এরপর ভারতব্যাপী এক বিরাট জাতীয় জাগরণের সাড়া পড়ে গেল। পরবর্ত্তী লাহোর কংগ্রেসে ১৯২৯ সালে স্বরাজ অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলে গৃহীত হয়।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ মহাত্মা গান্ধী লবণ-আইন ভঙ্গ করতে অগ্রসর হলেন। তৎপরবর্ত্তী জাতীয় পরিস্থিতি এক

বিস্ময়কর ব্যাপার। মহাত্মার এই আইন-অমান্য আন্দোলন কংগ্রেসের ইতিহাসে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উগ্রতম প্রতিবাদ। এরপর গঠনমূলক কার্য্যে কংগ্রেস মনোনিবেশ করে প্রস্তাব পেশ করল আর কংগ্রেসের শক্তিধর নায়ক নেতৃবর্গের দ্বারা বিশৃঙ্খল আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়ায় রাষ্ট্র-ক্ষেত্র হ'তে সরে দাঁড়ালেন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এই ইতিহাস ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এই পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় মহাত্মা গান্ধীর কর্ত্তৃত্বাধীনে এই পনর বৎসর বাদ দিয়ে—কংগ্রেস ভারতবাসীকে একটা ব্যাপক-আন্দোলন চালাবার মত সুনিয়ন্ত্রিত করে তুলতে পারেনি। কংগ্রেসের প্রচারকার্য্য, ভবিষ্যৎ আদর্শ ও জাতীয়তার বাণী বহন করে—কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা কংগ্রেস দেশবাসীর সামনে ধরতে পারেনি। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেস সুনিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব'লে পরিচিত হতে পেরেছিল—তাঁর রাজনৈতিক চাতুর্য্যের কথা বাদ দিয়ে একথা স্বীকার করা চলে। পঞ্চাশ বৎসর কংগ্রেস-সভায় কেবলমাত্র "পূর্ণ স্বাধীনতাই কাম্য" প্রস্তাব গ্রহণ করবার মত শক্তি সঞ্চয়েই কেটে গেল, এটা মোটেই আশার কথা নয়। জাতীয় সঙ্ঘবদ্ধতার মুখে যে প্রতিরোধ আজ দেশবাসী নিজেরাই সৃষ্টি করে চলেছে, হয়ত এর পরবর্ত্তী ধাপ কাটাতে কংগ্রেসের আরও কত বৎসরই না লাগ্‌বে! নিজেদের মধ্যে যে দুর্ব্বলতা জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে তাকে গোপন ক'রে কংগ্রেস-মণ্ডপ প্রচণ্ড বক্তৃতা স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার মধ্যেই যতই কৃতিত্ব থাকুক, সত্যিকারের সুফল কিছুই নেই! কংগ্রেস কর্ম্মীদের বক্তৃতায়, আলাপ অলোচনার সঙ্গে তাদের অন্তরের প্রকৃত স্বরূপের পার্থক্য যে কত বড় তা' কংগ্রেস অধিবেশনের কতিপয় দিবসের অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারেও যতটুকু প্রকাশিত হয়ে পড়ে তা বাস্তবিক মারাত্মক। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের প্রতীক কংগ্রেস যেরূপ আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে—তার জন্য মহাত্মা গান্ধীর দান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অনন্যসাধারণ একথা স্বীকার না করলে চল্‌বে না। তাঁর কতকগুলি মতামত রাষ্ট্রক্ষেত্রে অচল ও দুর্ব্বোধ্য। কিন্তু তা' সত্ত্বেও গঠনমূলক নীতি ও নৈতিক সংস্কার, যা' আজ কংগ্রেসের আদর্শে স্থান পেয়েছে তার মূল্যও কম নয়।

মডারেট-আদর্শ থেকে আরম্ভ করে আজ সমাজতান্ত্রিক আদর্শ পর্য্যন্ত কংগ্রেসে প্রসার লাভ কচ্ছে,—পঞ্চাশ বৎসরের কংগ্রেস ইতিহাসের এই পরিণতি।

জয়ন্তী না সমাধি?

শ্রীজয়ন্ত উপাধ্যায়

কংগ্রেসের জীবনের পঞ্চাশ বৎসর আসিল। সাধারণতঃ, কাহারো বয়স উনপঞ্চাশ পূর্ণ হইলেই তাহাকে আমরা উনপঞ্চাশ বায়ুর অনুগৃহীত মনে করিয়া কবিরাজের শরণাপন্ন হইবার পরামর্শ দিয়া থাকি। যাঁহাদের পরামর্শ দেওয়া অনুচিত —যথা গুরুজন, অসমীচীন—যথা মনিব—তাঁহাদিগকে বহু কৌশলে উক্ত সৎকর্ম্ম করিতে সবিনয় ইঙ্গিতও করিয়া থাকি। কিন্তু কংগ্রেসের সম্পর্কে উনপঞ্চাশ বৎসর কতটুকু? আমরা বলিয়া থাকি, কংগ্রেস সমগ্র জাতির প্রতীক। জাতির ইতিহাসে পঞ্চাশ বৎসর তো মুহূর্ত্তমাত্র—ব্রহ্মার হাই তুলিয়া তুড়ি দিবার মত। যাহাই হউক, ঐহিক পঞ্জিকার হিসাবে কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল, এবং বিশুদ্ধ আর্য্যধর্ম্ম অনুসারে আশ্রমান্তর গ্রহণের সময় হইয়াছে। সে আশ্রম বাণপ্রস্থ হইবে কি না, তাহার বিচার করুন বিজ্ঞজন।

একটা ব্যাপার কিন্তু উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্ব্বে কোন রসিক ব্যক্তি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু লক্ষ্য করিয়া থাকিলে তাহাতে আশ্চর্য্য বা চমৎকৃত হইবার কিছুই নাই। ব্যাপার এই, ১৯২০ সাল হইতে যাঁহারা কংগ্রেসের কর্ম্মকাণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহারা পঞ্চাশের পূর্ব্বেই বনগমন করিয়াছেন। প্রথম, মহাত্মা গান্ধী। অদ্ভুত উপায়ে দেশকে দশমাসে স্বরাজ দিয়া, তারপর ১৯৩০ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া—তারপর সম্প্রতি বাংলাদেশের জন্ম-দুঃখী ব্রাহ্মণ কায়স্থের আশা ভরসা ডুবাইয়া দিয়া—গান্ধীজী ওয়ার্দ্ধার নৈমিষারণ্যে বসিয়া জাতিকে দৃঢ়দেহ স্বাধীন চেতা করার বিপুল নব-সাধনা করিতেছেন। সে সাধনার ফলে আবিষ্কার হইয়াছে নূতনতর স্বরাজযোগ। তাহার অস্ত্র—পাঠক চমকিত হইবেন না—দূর্ব্বাদল বিনিন্দিত, শ্যামকান্তি বসন্তমনলোভ "সয়া বীন্" (Soya Bean)। "সয়া বীন" কি জানেন না!—দুর্লভ নয়, হরি নামের মতই সুলভ, অথচ তার চেয়েও শক্তিশালী। "সয়া বীন" এক রকমের বিলাতী বরবটী মাত্র। ইহারি সাহায্যে স্বরাজ আসিবে, দুঃখ দূর হইবে, ধূলিধূসরিত ভারতমাতার পাংশুমুখে শোণিত বাহুল্যের গোলাপনিন্দিত রক্তশ্রী ছুটিবে। 'সয়া বীন্' খাইয়াই জাপান রুশিয়াকে হারাইয়াছে, দুর্দ্ধর্ষ চীনজাতিকে হুঙ্কারে পরাভূত করিয়া মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া বগলদাবা করিয়াছে। এই 'সয়া বীনে'র চাষ করিয়াই ফরাসী জাতি গত যুদ্ধে বাঁধা কপি খেকো জার্ম্মানজাতির দন্ত ধূলিসাৎ করিয়াছিল। আজ আবিসিনিয়া যে ইটালীকে কেবলি বাধা দিতেছে, সে-বল তাহারা পাইল কেমন করিয়া? আমরা উচ্চৈঃস্বরে বলিব, 'সয়া বীন্' খাইয়া! এবার ভারতের স্বাধীনতা না আসিয়াই পারে না—আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, শরৎ বোসের উঠানে, জে, সি, গুপ্তের বাড়ীর মাঠে, কিরণশঙ্করের বারান্দার চারিপাশে, সুরেন মৈত্রের জমীদারীতে, তুলসী গোসাইয়ের রেণী পার্কে 'সয়া বীনে'র ঘন বনানী জন্মিয়াছে, আর দলে দলে পতাকা উড়াইয়া জাতীয় ভলান্টিয়ার বাহিনী একটি করিয়া বীন্ খাইয়া যাইতেছে। সয়া-বীনামৃতপানোন্মত্ত সেই বিরাট্ বাহিনীর অমিত-বিক্রম জয়ধ্বনির দাপটে ইংরাজ শাসক—যাক্ সে কথা আজ থাক্! শুভদিন আগতপ্রায়, তখনো রবি ঠাকুর বাঁচিয়া থাকিবেন, তিনিই অপূর্ব্ব সঙ্গীতে সেই কাহিনী রচনা করিবেন। আনন্দে পাগল হইলে আমাদের চলিবে না, আবার চাকরী-বাকরী করিয়া খাইতে হয়।

দ্বিতীয়, রাজগোপালাচারী। তিনি আসলে গান্ধীজীর বেহাই, কিন্তু মনে মনে মাস্তুতো ভাই। ওয়ার্দ্ধায় যখন থাকেন, তখন ছাগলের দুধ ও সয়াবীন্ ভক্ষণ

করেন, আবার বেজওয়াদায় গিয়া টকো দই, লঙ্কা, তেঁতুল, বেগুণ ও ডাল দিয়া রান্না মাদ্রাজী অমৃত "ওয়ঙ্কাপচ্চৌড়ী" সেবিয়া থাকেন। তিনিই এখন কংগ্রেসী মনু-ঠাকুর। প্রকাশ, তাঁহার ন্যাকামো সহ্য করিতে না পারিয়া সত্যমূর্ত্তি একদিন গোদাবরীতে ডুবিয়া মরিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তামিল নাড়ু কংগ্রেসের গদীতে তাঁহাকে বসাইয়া তবে তাঁহার দুঃখ শান্তি করা যায়।

তৃতীয় বিরাগী আমাদের শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়। আজ বারো বৎসর ধরিয়া তিনি বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন। তাঁহার বন্ধুরও অভাব নাই, শত্রুরও অভাব নাই। বন্ধুরা বলেন, কিরণশঙ্কর নিঃস্বার্থভাবে কংগ্রেসের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, নিজের দিকে চাহেন নাই, সম্মান চান নাই। প্রতিপত্তি তাঁহার যথেষ্ট আজও আছে। শত্রুরা বলেন, কিরণশঙ্কর বাংলা কংগ্রেসে দলাদলি আনিয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন। তিনি নিজের দিকে চাহেন নাই সত্য, কিন্তু তাহার কারণ তিনি দলাদলি ঘটাইতেই ভালবাসেন। বস্তুতঃ তিনি নাকি "ইয়াগো"র মত অহেতুক ক্ষতি করিতে ভালবাসেন। বাংলা কংগ্রেসের অশোক বনে তিনি নাকি অঞ্জনা-নন্দনবৎ। একথার সত্য-মিথ্যা নির্দ্ধারণ করা আমার সাধ্য নহে। কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ ইতিহাস যাঁহারা লিখিবেন, তাঁহারা তাহা করিবেন। আমার একমাত্র বক্তব্য এই, তিনি যদি কংগ্রেসের স্বর্ণ লঙ্কায় আগুণ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহাদের ক্ষতি হইয়াছে, তাহারা রাক্ষস হইতে পারে, এবং যাহাদের জন্য আজ তাঁহার দুর্ণাম-দুর্গতি, হয়তো তাঁহার বুকে তাহাদেরই ছবি। গিরিসঙ্কুল গিরিডির শালতরুমূলে বসিয়া কি প্রজ্ঞা তিনি লাভ করিয়াছেন জানি না, তবে তাঁহার [illegible] হইয়া থাকিলেই ভাল।

আরও কয়েকজন দেশনেতা জম্বুদ্বীপ ছাড়িয়া দেশান্তরে বাণপ্রস্থ লইয়াছেন। তাঁহাদের নাম সুভাষ বসু, পণ্ডিত জহরলাল এবং ডাঃ আন্‌সারী। প্রথমোক্ত দুইজন বিদেশে যে-ভাবে চলাফেরা করিতেছেন, তাহাতে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে বাণপ্রস্থ তাঁহাদের পছন্দসই নয়। কিন্তু শেষোক্ত জন—বৈদ্যচূড়ামণি সুরসিক ডাক্তার আন্‌সারী সানন্দে চম্পট দিয়াছেন। একশ্রেণীর ডাক্তার থাকে, তাহারা রোগীর অবস্থা খারাপ দেখিলেই চম্পট দেয়। এই ডাক্তারটীও কংগ্রেস্‌কে দিয়া কম্যুনাল্ বাঁটোয়ারা সমর্থন করাইয়া অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া দেশ ছাড়িয়া পালাইয়াছেন। এখন মুমূর্ষু কংগ্রেস্‌কে লইয়া রাত জাগিতেছেন বৈদ্যকুলতিলক ডাক্তার বিধান রায়—গান্ধীর ভাষায় যিনি "Safest Human Hands !" কিন্তু আশঙ্কা হয়, তাঁহার চিরযৌবনের রসেও কংগ্রেস আবার তাজা হইয়া উঠিবে না। ভাল কথা—তাঁহার অতি-প্রশংসিত 'রচিটোন্' খাওয়াইয়া দেখিলে হয় না? বায়োস্কোপে বিজ্ঞাপনের ছবিতে যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে কেবল কংগ্রেসের নয়, তাঁহারো উক্ত ঔষধ খাওয়া দরকার। তাহা হইলে "Limitations" দূর হইয়া "বসুধৈব কুটুম্বকম্" কথা সার্থক হইবে।

যাহা হউক, পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইতে না হইতেই যে কংগ্রেসের "জয়ন্তী" উৎসব করার হিড়িক পড়িয়াছে, তাহাতে চিন্তার কারণ আছে। যাহার যৌবন শক্তিতে ভাঁটা পড়ে নাই, বার্দ্ধক্য যাহার নিতান্ত চোখে ধরা পড়ে না, তাহার বয়সের কথা ধরিয়া জয়ন্তী করার কথা কাহারো মনেই পড়ে না। (যথা—নলিনী সরকারের জয়ন্তী করিতে কে চাহিয়াছে?) পোনর বৎসর ধরিয়া কংগ্রেসের আশ্বাসে ভুলিয়া লক্ষ লক্ষ যুবা-বৃদ্ধ যে সংগ্রাম করিয়াছে, যে-কষ্ট সহ্য করিয়াছে, আজ অপমানের চরম মুহূর্ত্তে জয়ন্তীর অভিনয় করার অর্থ সেই সাধনার, সেই দুঃখ-সহনের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করা। একি জয়ন্তী, না শ্রাদ্ধ?

সত্য কথা, দিন, দেশ, কাল, পাত্র সবই বদলিয়াছে। স্বরাজ কাহাকে বলে, স্বরাজ কি হইলে আসে, কাহাদের সাহায্যে আসিতে পারে, দেশ অনেক ঠেকিয়া তাহা শিখিয়াছে। যাদুকরের আমগাছের পোনর মিনিটে বীজ হইতে সুপক্ক ফল ধারণের মত কোন তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বরাজ আসিতে পারে সে কথা আর কল্পনা করা যায় না। এতদিন কংগ্রেস তুক্‌তাক করিয়া স্বরাজ আনিয়া দিবে বলিয়া ভরসা দিয়াছে। তথাকথিত নেতারা গান্ধীর কথায় মজিয়াছেন; যাঁহারা গান্ধীর কথায় বিশ্বাস করেন নাই, বরাবর যুক্তি-সহ কথা বলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও কার্য্যকালে নিলামী স্বরাজের আশায় ভুলিয়া গান্ধীর ইচ্ছামত কাজ করিয়াছেন। আজ সে সোনার স্বপন ভাঙিয়াছে। অর্দ্ধভুক্ত, অর্দ্ধনগ্ন, শিক্ষারহিত উত্তেজিত-মস্তিষ্ক মুসলমান কৃষক একদিকে, মিল্ অঞ্চলের গৃহহীন ক্রীতদাসপ্রতিভ শ্রমিক আর একদিকে। মাঝখানে নিঃসহায় মধ্যবিত্তসম্প্রদায়। ইহাদের অন্ন নাই, বস্ত্র

নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, পরমায়ু নাই। 'নয়া বীনে'র স্বরাজে ইহাদের কি? কিরণশঙ্কর কি জে, সি, গুপ্ত যে স্বরাজ আনিতে পারে (কোন স্বরাজই পারে কি?) তাহা গরীবের কি উপকারে লাগিবে? কিরণশঙ্কর বা জে, সি, গুপ্তের ব্যক্তিগত কার্য্যক্ষমতায় আমি সন্দেহ করি না, কিন্তু তাঁহারা যে শ্রেণীর লোক, তাহাতে তাঁহারা বা তাঁহাদের সমদলীয়েরা দেশের জনসাধারণের জন্য বর্ত্তমানের চেয়ে বেশী কিছু করিতে পারিবেন না। মানুষের সাধারণ মনস্তত্বই হইতেছে সুবিধা পাইলেই কোলের দিকে ঝোল টানা। কংগ্রেসের কর্ত্তা এখন যাঁহারা, তাঁহারা নিজেদের দিকে ঝোল টানিতে পারিলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াইবে, গতবারের প্রজাসত্ব আইনের ব্যাপারই তাহার ভালো উদাহরণ।

কংগ্রেসের নেতৃত্ব লইয়া একটা গণ্ডগোল চলিতেছে। শুধু বাংলা দেশে নয়, সব প্রদেশেই তুমুল কলহ চলিতেছে। নাগপুরে মারামারি হইয়াছে, বোম্বাইয়েও প্রায় তাই। যুক্তপ্রদেশে দুই যুধ্যমান কংগ্রেসদলে প্রভুত্ব লইয়া মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইয়াছে। বাংলা দেশে নেতা নাই—একজন মরিয়াছেন, একজন ছাড়িয়াছেন। সব প্রদেশেই যে বিরোধ চলিতেছে, তাহা একটা বিরাট ভাঙ্গনের অগ্রদূত মাত্র। হয় কংগ্রেস থেকে ইহারা সরিবে, নয় জনসাধারণের উপর কংগ্রেসের প্রভুত্বের ও প্রভাবের অবসান হইয়া কংগ্রেস বর্ত্তমান লিবারেল দলের মত একটা বড় ধরণের ডিবেটিং ক্লাবে পরিণত হইবে। আজ কংগ্রেসের আছে কি? ইহারি মধ্যে অস্থিখণ্ড লইয়া যে নখদংষ্ট্রাঘাত চলিতেছে, তাহাতে কবির ভাষাকে একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে হয়:—

"নেতাদল চীৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি
শ্মশান কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।"

সব চেয়ে ভাবনা হইতেছে তাহাদের লইয়া, যাহাদের ব্যবসা পলিটিক্স্ করা, কংগ্রেস্ ভাঙ্গাইয়া যাহারা বাড়ী, গাড়ী এবং অন্যান্য সুবিধা করিয়া লইতে চায়। ইহাদের মধ্যে একআধজন নেতাও আছেন, কয়েকজন প্র-উপ-সও নেতাও আছেন। তাহারা না পারেন এমন কোন কর্ম্ম নাই, নিজের সুবিধার উদ্দেশ্যে না করিয়াছেন এমন বিশ্বাসঘাতকতাও নাই।

প্রাদেশিক স্বরাজ প্রবর্ত্তিত হইবার পর কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মনীতি বদলানো দরকার হইবে, কারণ সকল প্রদেশের মধ্যে যে অত্যাচারের সাম্যবন্ধন ছিল, তাহা শিথিল হইয়া পড়িবে। প্রতি প্রদেশের বিভিন্ন প্রয়োজন, বিভিন্ন সমস্যা। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীনতার প্রচেষ্টার জন্য ঐক্য আনিতে হইলে কৃষক এবং শ্রমিকের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। বর্ত্তমান কংগ্রেসের কর্ত্তা ধনী-সম্প্রদায়,—গান্ধীর হাত বাঁধা বিরলা ও আমেদাবাদের মিল্ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে, বাংলায় বিধান রায়ের হাত বাঁধা নলিনী সরকার ও অন্যান্য অর্থ-সৌভাগ্যবান্‌দের কাছে। কংগ্রেসকে যে বা যাহারা বাঁচাইবে, তাহারা গান্ধী বা গান্ধীর চেলারা নহে। গান্ধী যাহার পূর্ব্বাভাষ, সে এখনো আসে নাই। তাহার মুখ চাহিয়া ব্যথাতুর দেশ দুঃখের রাত্রি কাটাইতেছে।

[আবেদন-নিবেদনের নৈবেদ্য সাজাইয়া কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছিল। মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিতের অবসর বিনোদনের ক্ষেত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিলেও স্বদেশী আন্দোলনের সংঘাতে কংগ্রেস উগ্রপন্থী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তৎপরে গান্ধীজির আবির্ভাবের পর কংগ্রেস দেশের জনমতের আশা আকাঙ্খার বিকাশ ও প্রকাশের একমাত্র সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। গান্ধী আন্দোলনের ব্যর্থতার বালুচরে কংগ্রেস-তরী শতধা ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেস জয়ন্তীর অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের আত্মলোপ না হইলেও স্বীয় প্রাধান্য বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অবসাদের ছায়া কংগ্রেস কর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর করাল রেখাপাত করিয়াছে। তাহার উপর আসন্ন শাসন সংস্কারের বিধি-ব্যবস্থা প্রতি প্রদেশে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাদেশিক স্বরাজের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মনীতি পরিবর্ত্তনের যে প্রয়োজন তাহা এই প্রবন্ধে তীব্রভাবে আলোচিত হইয়াছে। অর্থসৌভাগ্যবানদের কেন্দ্র হিসাবে কংগ্রেসের সার্থকতার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। সুতরাং পুরাতন কংগ্রেসের জয়ন্তী উৎসব একহিসাবে পুরাতন কংগ্রেসের সমাধি হিসাবে পরিণত হইয়াছে। তবে "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" এই মন্ত্রবাণী উচ্চারণ করিয়া কংগ্রেসের অন্তর্জলির ব্যবস্থা না করিয়া কৃষক ও শ্রমিকের সাহচর্য্য ও সহযোগীতায় নির্জ্জীব কংগ্রেসকে পুনরায় সজীব করা যাইতে পারে। লেখকের উপসংহারবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলি কংগ্রেসকে যে বা যাঁহারা সঞ্জীবিত করিবেন তাঁহারা গান্ধীজি বা গান্ধীজির স্নেহ-পুষ্ট চেলা নহেন। গান্ধীজি যাহার পূর্ব্বাভাস তিনি এখনো আবির্ভূত হ'ন নাই। সেই অনাগত গণদেবতার আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় ব্যথাতুর দেশবাসী জয়ন্তী উৎসবের আলোছায়ার অন্তরালে অবসাদের গভীর রাত্রি কাটাইতেছে, তবে আশা আছে যে—

"আসিবে সেদিন আসিবে,
সেদিন প্রভাতে নবীন তপন
নবীন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সেদিন আসিবে।"

সঃ বেঃ]

চন্দ্র ফিল্মস

প্রথম নৈবেদ্য—

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের

শ্রেষ্ঠ সমাজ-চিত্র

?

পরিচালক ও চিত্র-শিল্পী } যতীন দাস

: শ্রেষ্ঠাংশে :

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(নিউ থিয়েটার্সের সৌজন্যে)

? ? ?

কংগ্রেস

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী

সহস্র বন্ধন ও পঙ্কিল আবর্ত্তে পড়িয়া জাতি যেদিন পথ হারাইয়াছিল সেদিন যে-কয়েকটি মহাপুরুষ দেশের প্রাণে আশার কথা শুনাইয়াছিলেন—তাঁহাদের মধ্যে রাজা রামমোহনের কথাই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। মুসলমান রাজত্বে স্বেচ্ছাতন্ত্র ছিল—ইংরাজ রাজত্বের পত্তনের সময় তাই দেশবাসীর মনে বিদেশী রাষ্ট্রীয় শাসনের বন্ধন-বেদনা তীব্র হইয়া উঠে নাই। কিন্তু স্বাধীনতার প্রেরণা যাহার অন্তরে উদিত হয় তাহা তাহার সমস্ত চরিত্র ও চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলে। যে ব্যক্তি একদিনের জন্যও সত্যিকারের মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে—তাহার পক্ষে কোন বন্ধন সহ্য করা অসহনীয়। কাজেই রাজা রামমোহনের ধর্ম্ম ও সমাজদ্রোহীতার আকারে যে বন্ধন-মুক্তির স্বাদ দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল—তাহাই অতি অল্প কালের মধ্যে রাষ্ট্রীয় জীবনেও রাষ্ট্রদ্রোহিতা জাগাইয়া তুলিল।

এই রাষ্ট্রীয় চেতনার মূলে ইংরেজী শিক্ষা এবং কয়েকজন ইংরেজ মনীষীর দান স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

ইংরাজী শিক্ষার ফলে সমগ্র পৃথিবীর দেশ ও জাতির অগ্রগতির বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইল এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় নিজেদের হীনতা বিষয়ে এক অভিনব বেদনা জাগাইয়া তুলিল। এই বেদনাই এই রাষ্ট্র আন্দোলনের জন্মকথা। আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করিয়া হিউম, ওয়েডারবার্ণ প্রভৃতি তৎকালীন হিতৈষী ইংরেজগণ এ বিষয়ে ভারতের দাবী ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ইংরেজগণ ভারতীয় স্বার্থের সহিত বৃটিশ স্বার্থ যুক্ত করিয়া ভারতে ইংরাজ শাসন চিরস্থায়ী করিবার সদ্ উদ্দেশ্যেই হয়ত এই সব আন্দোলনে সহায়তা করিয়াছিলেন। Allian Octavian Hume এর জীবনী লেখক Sir William Wedderburn Bart, বলিয়াছেন—"Being firmly convinced that the interests of Indian people and the British people were essentially the same, he (Hume) believed that under a Government in touch with popular feeling, the administration of India, within the British Empire, might be conducted with equal benefit to East and West, developing all that was best in the two great branches of the Aryan race."

এই সমস্ত মনীষিগণ যখন দেখিলেন যে তৎকালীন রাজপ্রতিনিধিগণ স্বেচ্ছাতন্ত্রের অনুশীলনে ও প্রবর্ত্তনে ব্যস্ত তখন তাঁহারা এই মিলনের পথে পর্ব্বত প্রমাণ বাধা দেখিতে পাইলেন। উদাত্ত কণ্ঠে তাঁহারা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

স্বেচ্ছাতন্ত্রের শেষ পরিণতি নগ্ন-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল—দুর্ভিক্ষ, মহামারী,—অভাব অনটনে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিল—সরকারের নীরবতা সমগ্র জাতির মনে অসন্তোষের বহ্নি জ্বালিয়া দিল—এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয় সংক্রামিত হইতে লাগিল। এই অসন্তোষ যখন রূপ পরিগ্রহ করিল তখন যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম লাভ, আজ তাহার কনক জয়ন্তী।

বিভিন্ন কর্ম্মধারার মিলন বেদীর উপর যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম লাভ হইল—তাহার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহার প্রতিষ্ঠায় গৌরব প্রায় ষোল আনাই বাঙ্গালীর। কংগ্রেসের জন্মের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে বাংলা দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের তূর্য্য নিনাদ ধ্বনিত হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিবার সময় যে আশ্বাসবাণী ভারতবাসীকে শুনাইয়াছিলেন কিন্তু কার্য্যকালে তাহার ভিন্ন অর্থ হওয়ায় এবং দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার সংসাধিত হইল তাহাতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইল। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন "Long before 1858, when the East India Company's rule ended, India had ceased to be a great manufacturing country. উপরন্তু ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য কোম্পানীর হাত হইতে ভারত শাসনের ভার লইবার সময় যে অর্থ কোম্পানীকে দেওয়া হইল—তাহা ভারতবাসীর দেনা হিসাবে National Debt আজও প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ভারতবর্ষকে দিতে হইতেছে। এইরূপে মানুষের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া ভারতবাসী যখন পথ অন্ধকার দেখিতেছিল সেই সময় দাদাভাই নৌরজী, নরেন্দ্রনাথ সেন, গোপালকৃষ্ণ গোখেলে প্রভৃতি ভারতীয় রাজনৈতিক আলোচনার জন্য একটি মিলন-বেদী রচনার প্রস্তাব করেন। তাহারই ফলে ১৮৮৫ খৃঃ বোম্বায়ে সামান্য কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই কংগ্রেসে নয়টী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ বৎসরই কলিকাতায় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটী রাজনৈতিক সম্মেলন আহূত হয়। পর বৎসর এই দুইটী প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া দাদাভাই নৌরজীর সভা-

পতিতে কলিকাতায় যে অধিবেশন হয় তাহাতে প্রায় ৪৪০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

এই সময় কংগ্রেস অধিবেশনের প্রতি রাজকর্ম্মচারীগণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে Lord Dufferin কলিকাতা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগকে এক উদ্যান সম্মেলনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পর বৎসর মাদ্রাজ অধিবেশনেও ভারত সরকার কংগ্রেসের উপর নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন—এবং প্রতিনিধিদের আদর আপ্যায়ন করিয়াছিলেন।

কিন্তু পরবৎসর এলাহাবাদের সরকার সে নীতির অনুসরণ না করিয়া কংগ্রেসের সর্ব্বকাজে বাধা প্রদান করিতে লাগেন; এই সময় কংগ্রেস সরকারী নীতির তীব্র আলোচনা করিতে লাগে। পুলিশের গোয়েন্দাগণ নানা ভাবে কর্ম্মী সম্প্রদায়ের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠে—এই অধিবেশনে Lucknow Punch-এর সম্পাদক মুন্সী সাজাদ হোসেন Police Administration শীর্ষক প্রস্তাবে বলেন—"There is no place, no spot, where Their Highness the Police, like the Angel of Death were not present. Let a man displease them and see the beneficence of our kind Police. He may know nothing about it. There will be a case against him.

এই সময়ে কংগ্রেস ক্রমেই জনপ্রিয় হইতে থাকে, নিম্নের প্রতিনিধির তালিকা হইতে তাহা প্রমাণ হইবে—

১ম	কংগ্রেস	৭২
২য়	"	৪৩৪
৩য়	"	৬০৭
৪র্থ	"	১৮৪৮
৫ম	"	১৮৮৯

বোম্বাই কংগ্রেসের (১৮৮৯) একটু বিবর আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কংগ্রেসের এই চার বৎসরের প্রচারের ফলে ইহা জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। এই অধিবেশনেই বহু মহিলা প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে বিলাতে কংগ্রেসের আশা আকাঙ্খা জানাইবার জন্য Sir W. Wedderburn, Mr. Dadabhai Naoroji, Mr. W. C. Bonerjee এবং কয়েকজন ভারত হিতৈষী M. P. লইয়া একটী কমিটী গঠিত হয় (১৮৮৯, ২৭শে জুলাই)। ১৮৮৯ সালের কংগ্রেস বিলাতে এই প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য ৪৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন।

এইভাবে আরও কয়েকটী কংগ্রেসের অধিবেশন হয় প্রতি বৎসর শাসন নীতির নিন্দা করিয়া এবং শাসনে জনসাধারণের কর্ত্তৃত্ব দাবী করিয়া নেতৃবৃন্দ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়া প্রস্তাব পাশ করিতেছেন। প্রবীন নেতারা যখন এই ভাবে দেশের নগ্নমূর্ত্তি দেশের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছিলেন—তখন তরুণ মনের কোণে স্বাধীনতাপ্রিয়তা স্থায়ী আসন পরিগ্রহ করিতেছিল। ১৯০৫ সাল সেই নবভাবের উন্মেষ সাধন করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই সত্যিকারের স্বাধীনতা আন্দোলন রূপে দেশে উপস্থিত হয়।

১৯০৫ হইতে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেসের আন্দোলন বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবেই রুদ্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এই সময়ে বাংলায় সর্ব্ব প্রকারের সভাসমিতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, 'বন্দেমাতরম্' গান নিষিদ্ধ হয়, বহু ছাত্র ও যুবককে কারারুদ্ধ করা হয়।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন বা স্বদেশী যুগের আন্দোলন এবং বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন—পূর্ব্বের আন্দোলনগুলিতে শুধু ন্যায্য প্রাপ্যের দাবী ছিল, পরাধীনতা হইতে মুক্তি লাভের দাবী তাহাতে ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া কংগ্রেসের গোড়ার অধিবেশনগুলি এবং তাহারও পূর্ব্বে সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলনগুলির দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কাজেই এই কংগ্রেসের ৫০ বৎসরের প্রতি বৎসর এবং প্রতি অধিবেশনই ভারতীয় আন্দোলনের স্মরণীয় দিন। এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিতে বহু কর্ম্মী মৃত্যুবরণ করিয়াছে—শত লাঞ্ছনা মাথা পাতিয়া লইয়াছে—দারিদ্র্য কামনা করিয়া লইয়াছে—নির্ব্বাসন হাসিমুখে বরণ করিয়া লইয়াছে। আজও এই আদর্শকে জয়যুক্ত করিতে দেশবাসীর লাঞ্ছনার শেষ হয় নাই।

অসহযোগ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে ভারতবর্ষে কংগ্রেস আন্দোলন যুবক ও শিক্ষিত সম্প্রদায় অতিক্রম করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করে। সাধারণ কৃষক ও মজুরও তাহার রাজনৈতিক দাবীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যাহারা বাংলার কাঁথি, কন্দভীলা ইত্যাদি প্রভৃতি স্থানের কৃষক আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন তাহারা দেখিয়াছেন—বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের ন্যায় তাহারাও সকল প্রকারের ক্লেশ হাসিমুখে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

অসহযোগ আন্দোলনের উৎস ও গোড়া পত্তন ১৯০৫ সালের আন্দোলন। অসন্তোষ যখন ঘনীভূত হয় বিদ্রোহ তখন আত্মপ্রকাশ করে। সিপাহী বিদ্রোহের গোড়াকার কারণ—টোটায় গরু শূকরের চামড়া নয়, স্বদেশী আন্দোলনের মূল কারণ বঙ্গ বিচ্ছেদ নয় এবং অসহযোগ আন্দোলনের মূলীভূত কারণ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড নয়। ইহা শাসক সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ হৃদয়হীন ব্যবহার ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতির বাঁচিবার দাবী। প্রকৃত মানুষ যে সে

মহাসমারোহে দ্বিতীয় সপ্তাহ চলিতেছে

ভারতীয় চিত্রে যাহা সম্ভব এতদিন পর্য্যন্ত
হয় নাই—আজ তাহাই সম্ভব হইল।

রূ প বা ণী ❋

রূ প বা ণী ❋

কণ্ঠহার

সবাক চিত্রে
রাধা ফিল্ম
কোম্পানীর
অভিনব
গোয়েন্দা
কাহিনী

R F

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্

ফোন ঃ বি, বি, ৩৪১৩

আততায়ী ও গোয়েন্দার মোটর বোটে ও উড়ো জাহাজে রোমহর্ষক দৃশ্যাবলী আপনাকে মুগ্ধ করিবে—দেখিতে দেখিতে আপনার শিরায় শিরায় রক্ত ছুটাছুটি করিবে। আপনি স্বয়ং না দেখিলে—এ সকল কল্পনা করিতে পারিবেন না।

* লাহোর *

কংগ্রেস-স্মৃতি

——রজনী মুখার্জ্জি——

সাড়ম্বরে লাহোর কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দেশের নানাদিক হইতে প্রতিনিধিদল মিলিত হইয়াছেন দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের জন্য। দিল্লী ইস্তাহারের ফলে দেশ সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের আগ্রহ দেশের শক্তিকে কর্ম্ম-পরিণতির দিকে লইয়া যাইতেছিল। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে উল্লাস ও উৎসাহের সঙ্গে কর্ম্মক্ষেত্রে সকলে মিলিত হইলেন।

লাহোরে পণ্ডিত নেহেরুর উপস্থিতির সময় পূর্ব্বাহ্নে সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদের জানানো হয় নাই এবং অভ্যর্থনা ও শোভাযাত্রার আয়োজনের সুবিধার জন্য তিনি লাহোরের আগেকার ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলেন। পরদিন তিনি লাহোরে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে রাজকীয় আড়ম্বরের সহিত অভ্যর্থনা করা হয়। এই উপলক্ষে লাহোরের রাজপথে যে শোভাযাত্রা দেখা গিয়াছিল তাহার তুলনা বিরল।

আমি পেশোয়ার প্রতিনিধিদের মধ্যেই ছিলাম এবং লেপ ও কম্বলের মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়াও লাহোরের শীত হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছিলাম।

পরদিন ভোরে উঠিয়াই স্নানাগার প্রভৃতির খোঁজ করিয়া লইলাম—কারণ এইরূপ ক্যাম্পে থাকিতে এই সমস্ত জিনিষের প্রথমেই খোঁজ লওয়ার প্রয়োজন যে কত বেশি তাহা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। স্নানাগারে চলিয়াছি, হঠাৎ একটা কঠিন বস্তুর গায়ে জোর হোঁচট লাগিল—সঙ্গে সঙ্গেই কাদা জলে চারিদিক ভর্ত্তি হইয়া গেল। তখন আমি বুঝিলাম যে, যেটাতে ধাক্কা লাগিয়াছিল সেটা অগ্নিনির্ব্বাপক যন্ত্র। জল বেশ জোরেই নির্গত হইতেছিল। চারিদিক চাহিয়া দেখি কেহই নাই। জল ও কাদার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য আমি পেশোয়ার ক্যাম্পের দিকে যন্ত্রটির মুখ ঘুরাইয়া দিলাম এবং দৌড়াইয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিলাম। গরম জলের চৌবাচ্চা ও কল দেখিয়া খুসীই হইলাম কিন্তু যে ভাবে ঠাণ্ডা হাওয়ার সামনে লোকে গরম জলে স্নান করিতেছিল তাহা বাস্তবিকই অনিষ্টকর। স্নান সারিয়া তাঁবুতে ফিরিলাম। আসিবার পথে দেখি কয়েকজন লোক মিলিয়া অগ্নি-নির্ব্বাপক যন্ত্রের জলস্রোত বন্ধ করিবার জন্য কোস্তাকুস্তি করিতেছে। পেশোয়ারের প্রতিনিধি-বন্ধুগণ ত চটিয়াই আগুন। শেষ পর্য্যন্ত, এইরূপ রদ্দিমাল দেওয়ার জন্য কণ্ট্রাক্টরদের স্কন্ধেই সব দোষটা চাপিল।

তাঁবু হইতে সকাল সকাল বাহির হইয়া প্যাণ্ডালের দিকে চলিলাম। স্যার পি, সি, রায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিলেন। মহাত্মাজীর সহিত তিনি আসিলেন দর্শকদের সমক্ষে বক্তৃতা করিতে। মহাত্মা গান্ধীর সহিত তিনি বসিয়াছিলেন—যেন দুটি সমজুটী, বয়সই যেন তাঁহাদের সখ্যকে দৃঢ়তর করিয়াছে। আমাদের এই দুই-মিনিটের সভাপতিকে এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বড় একটা দেখি নাই—কারণ সাধারণতঃ কাহারও না কাহারও—হয় মহাত্মাজীর না হয় বল্লভভাই প্যাটেলের—পিঠ চাপড়ানো তাঁহার অভ্যাস। বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল বলিয়া বল্লভভাই প্যাটেল পাঞ্জাবীদের খুব এক হাত লইলেন এবং তাঁহার অবজ্ঞা প্রদর্শন হিসাবে তাহাদের সমক্ষে বক্তৃতা করিতে অস্বীকার করিলেন।

পাঞ্জাবীদের প্রতি মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলের তিরস্কার যে ব্যর্থ হয় নাই—পাঞ্জাবের পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর পাঞ্জাবী ছাড়া গ্রাম হইতে দলে দলে শিখ আসিয়াছিল। তাহাদের পরিধানে ছিল মোটা দেশী কাপড়; তাহারা আনন্দে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিল। প্রদর্শনী খোলার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস কোলাহল মুখরিত হইয়া উঠিল।

বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির কার্য্যারম্ভ হইয়া গেল। এদিকে আসল কংগ্রেসের কাজের মধ্যে ছাত্ররা তাহাদের কার্য্যতালিকা

নিজের দুঃখ দৈন্যের ব্যথা যতটা অনুভব করে পরের সেই পরিমাণ দুঃখ বহু অধিক পরিমাণে তাহার নিকট অনুভূত হয়—এই অনুভূতি বৃদ্ধির জন্য বাংলার কবি ও সাহিত্যিকগণও চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। কাজেই কবি, সাহিত্যিক, দেশপ্রেমিক, কৃষক, মজুর, দীন-দরিদ্রের সবার দানে পুষ্ট কংগ্রেসের পতাকামূলে সমগ্র জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সমবেত হইবার যে আহ্বান আসিয়াছে—তাহাতে সমগ্র দেশবাসী অকপট হৃদয়ে যোগদান করিয়া ইহার সত্যকার শক্তি প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিবে না—ইহাই আমাদের বিশ্বাস ও কামনা।

লইয়া হাজির। কয়েকদিন পূর্ব্বে নওজোয়ান ভারত সভার উদ্যোক্তাগণ গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, সেইজন্য যুবসম্মেলনের সভাপতিত্ব করিলেন মিসেস নাম্বিয়ার। এই সভায় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বিশেষ কেহই যোগ দেন নাই। উল্লেখযোগ্যের মধ্যে ছিলেন মিসেস্ নাম্বিয়ারের ভগ্নী মিসেস্ সরোজিনী নাইডু। এক টেবিলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিসেস্ নাম্বিয়ার তাঁহার বক্তৃতা ও লম্ফঝম্ফ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে লম্ফ ঝম্ফও বাড়িতে লাগিল। তাঁহার এই অদ্ভুত ভাব দেখিয়া মিসেস্ নাইডু তো জড়সড়। তাঁহার ভগ্নীর এই গরম বক্তৃতায় আমাদের কবি-কংগ্রেসনেত্রী মোটেই অভিভূত হইলেন না বুঝা গেল। তিনি সামান্য কিছু বলিয়াই পলাইয়া বাঁচিলেন! সভাপতির অভিভাষণের পর সেখান হইতে সভা ব্রাড্‌ল হলে স্থানান্তরিত হইল। ব্রাড্‌ল হলের সভায় যত লোক আসিয়াছিল তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক ছিল সাদা কাপড় পরিহিত পুলিশের লোক। এখানে মিসেস্ নাম্বিয়ারের সহিত বোম্বাইয়ের পিপ্‌ল্‌স্ ব্যাটালিয়ানের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ এচ্ ডি রাজা যোগদান করিয়াছিলেন। দু'জনে পরামর্শের পর কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইল। সভায় কোনরূপ বাদানুবাদ হয় নাই। তখনকার মত সভার কার্য্য মুলতুবী রাখিয়া পুনরায় বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির প্যাণ্ডালে কার্য্যারম্ভ হয়। কিন্তু গোলমালের পর ভারতের যুবকবৃন্দ মিসেস্ নাম্বিয়ারের সভাপতিত্বে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

মাদ্রাজ হইতে আগত প্রবীণ নেতা মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার চলিয়াছিলেন—তাঁহার পাশেই "এট্যাচীকেস্" হাতে চলিয়াছেন মিঃ এচ্, ডি, রাজা। তখন ইহা দেখিয়া একটু বিস্মিতই হইয়াছিলাম কারণ যিনি স্বাধীনতা আন্দোলন হইতে মুখ ফিরাইয়াছিলেন সেই মিঃ আয়েঙ্গারের সঙ্গে মিঃ রাজার মত একজন স্বাধীনচেতা যুবক কিরূপে থাকিতে পারে বুঝিতে পারি নাই। শুনা যাইতেছে মিঃ আয়েঙ্গার আবার কংগ্রেসে ভিড়িবেন। সেখানে শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার, মিঃ রেনল্ডস্ এবং বার্লিনের মিঃ ভন মোলোর সহিতও আলাপ হইল। এই রেনল্ডসই পরে গান্ধী-আরউইন দৌত্যকার্য্য করেন। মিঃ ভন মোলো পরে এলাহাবাদে আমার অতিথি হইয়াছিলেন।

প্রচণ্ড উৎসাহ, উত্তেজনা ও সুউচ্চ সঙ্গীতের সঙ্গে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইল। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় সেখানে উপস্থিত স্বাধীনতা-প্রস্তাবের বিরোধিতা করিতে, মিঃ শ্রীনিবাস কংগ্রেস হইতে মহাপ্রস্থান করিতে এবং শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ওয়ার্কিং কমিটী হইতে বাদ পড়িতে! ওয়ার্কিং কমিটীতে যখন নেতৃবৃন্দ মিলিত হইলেন তখনকার প্রবল উত্তেজনার কথা এখনও বেশ মনে পড়ে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গুরুগম্ভীর ভাবে বাঙ্গলার সমস্যা আলোচনার জন্য অনুরোধ করিলেন। তার পরই আসিল সুভাষবাবুর "প্যারালেল গভর্ণমেণ্ট" সম্বন্ধে প্রস্তাব। মহাত্মাজী মাত্র কয়েক ভোটে জয়লাভ করেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল স্বাধীনতা প্রস্তাব—ইহা বলাই বাহুল্য। রজনী দ্বিতীয় প্রহর, ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বাজিল এবং প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে পণ্ডিত মালবীয়ের সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইল। আমরা সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলাম এবং

সারামণ্ডপ হইতে উঠিল একটা গগনভেদী হর্ষধ্বনি। জাতীয় পতাকা উড়িতেছিল। সেই মধ্য রাত্রে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে সকলে পতাকাতলে সমবেত হইলাম। পতাকার চারিদিকে জ্বলিতেছিল উজ্জ্বল আলোর বৃত্ত; সেই আলোকে জাতীয় পতাকার ত্রিবর্ণ প্রতিফলিত হইয়া চারিদিকে যেন একটা জ্যোতি বিকীরণ করিতেছিল। আর সকলে চলিয়া গেলে আমি ও আমার এক বন্ধু জে, কে, বি, হাতের ছড়ি লইয়া সামরিক কায়দায় জাতীয় পতাকা অভিবাদন করিলাম এবং যে পতাকা ভারতের যুব-শক্তি উত্তোলিত করিয়াছে তাহাকে কখনই অবনমিত করিব না— এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম।

কংগ্রেসের এই কনক-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে জাতীয় পতাকার বেদীতলে আমরা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করি। সে প্রতিজ্ঞা আমি ভুলি নাই— তাহা আমার জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এখনও মনশ্চক্ষে যেন সেদিনের ছবি স্পষ্টই দেখিতে পাই। আমার মনে হয় এইসময়ে ভারতের যুবাবৃন্দের কর্ত্তব্য স্বাধীনতার শপথের কথা স্মরণ করা এবং তাহাকে নূতনভাবে গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্র-জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করা। যে ভাব-প্রবাহে এক লক্ষ লোক কারাবরণ করিয়াছিল এবং যাহা ভারতবাসীকে তাহার স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন করিয়াছিল এখন চাই সেই ভাবের উদ্দীপনা।

এই কংগ্রেস অধিবেশনের শেষ কয়েকটি কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপ-সংহার করিব। এই সময়েই সুভাষবাবু ও ডাঃ আলম ডিমক্রেটিক কংগ্রেস পার্টি গঠন করেন। এখানে একটা মজার ঘটনা মনে পড়িতেছে। প্রদর্শনীর একটি কাশ্মীরী শাল সভাপতি মহোদয়ের চোখে লাগিয়াছিল। মিসেস্ নাইডু বলিলেন যে, দশজন কংগ্রেস প্রতিনিধি প্রত্যেকে ৫০৲ টাকা করিয়া দিয়া ঐ শালখানি কিনিয়া সভাপতিকে উপহার দেওয়া উচিত। আমি সহাস্যে বলিলাম ভাবী দাতা নির্ব্বাচনের সময় আমার নাম যেন মনে থাকে।

লাহোর অধিবেশনের বিশেষত্ব এই যে, জাতীয় আন্দোলনে ইহা এক অবিনশ্বর চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আশা করি এই জয়ন্তী উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও সংস্কৃত শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে আমরা ১৯৩০ সালে গৃহীত শপথেই আমাদের বিশ্বাস ও [illegible] করিব।

❀

কংগ্রেস দর্শন

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

❀

ছেলেবেলাতে কংগ্রেসের নামটাই ছিল আমাদের কাছে যেন একটা ম্যাজিক্। বাংলার সর্ব্বত্র সকল তরুণ মনের মধ্য দিয়া স্বাদেশিকতার স্রোত প্রত্যক্ষ অথচ প্রচ্ছন্ন-ভাবে প্রবাহিত। তখনও আমাদের অনেক কিছু বুঝিতে বাকী ছিল।

আমরা পাঁচ ছয় জন ছেলে Bengalee হইতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা পড়িতাম; ভাবের আবেগে আমাদের দ মার্কা মেরুদণ্ড হইয়া উঠিত জ্যামিতির লম্ব।

তখনও কংগ্রেস দেখি নাই, সুরেন্দ্রনাথ, লোক মান্য তিলক ও বিপিন চন্দ্রের শুধু ছবিই দেখিয়াছি।

পল্লীগ্রামের ছেলে আমরা, নেতারা কেহই তো আর সেখানে যান না, তাঁরা আসেন সহরে, কাজেই সহরে কিছু দিন না থাকিতে পারিলে আর চলে না। তাই প্রথম বরিশাল-সহরে আসিয়া মহাত্মা অশ্বিনী-কুমারকে দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিলাম। কিছুদিন পরেই দেখিবার সৌভাগ্য হইল স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্রকে। তাঁর আকাশ-বাতাস-কাঁপানো জ্বালাময়ী ভাষা মনে এমন একটা দোলা দিয়া গেল যে, তার পরও বহুদিন আমরা সেই বক্তৃতা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। তখনও বুঝি নাই, কথা ও কাজ— নাম ও কাম এক জিনিষ নয়।

অসহযোগের প্রবল হাওয়া দোলা দেয় নাই, এমন মন খুব বেশী লোকের ছিল বলিয়া মনে হয় না। স্বয়ং দেশবন্ধু যখন আন্দোলনের পুরোভাগে দণ্ডায়মান, তখনও তাঁকে আমরা "চোখে দেখি নি, শুধু বাঁশী শুনেছি"; তবুও সে উদাত্ত বাণী সুদূর পল্লীর নিরক্ষর কৃষকের প্রাণও চঞ্চল করিয়া দিয়াছিল। মনে আছে বরিশাল জেলার এক নগণ্য পল্লী-গ্রামের পার্শ্বস্থ দিগন্তবিস্তীর্ণ ধান্যক্ষেত্রে কয়েকটি অর্দ্ধনগ্ন কৃষক হলকর্ষণ করিতেছিল। আমরা তখন মাঠের পথ ধরিয়া চলিয়াছি। তারা লাঙ্গল ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল আমাদের কাছে এবং আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, বলুন তো খদ্দর কি? গান্ধী কে? দেশবন্ধুই বা কি করেন?"

অভিভূত হইয়া কিছুক্ষণ ভাবিলাম যে, কংগ্রেসের বাণীর সাহায্যে এই সর্ব্বজন অবলেহিত অজানা অচেনা সহর হইতে শিক্ষা-সভ্যতা হইতে বহুদূরে অবস্থিত অর্দ্ধনগ্ন এই কৃষকদের অন্তরে এ চাঞ্চল্য আনিয়া দিল কে? এমন সরল সহজ মনের কথা লইয়া কে আজ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল?

কৃষকদের মোটামুটি, সব কথাই আমরা বুঝাইলাম কথিত ক্ষেত্রের আলের উপরে বসিয়া। তারপরে জানিয়াছি মহাত্মা গান্ধী যখন বরিশালে পদার্পণ করেন, তখন এই কৃষকেরাই পায়ে চলিয়া বরিশাল অবধি গিয়াছিল তাঁহারই দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায়। তারপর সর্ব্বত্রই যখন তখন শুনিয়াছি, "মহাত্মা গান্ধী কি জয়।"

যাঁর মৃদু-মধুর হাস্য একদিকে পণ্ডিত মতিলাল আর একদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে খদ্দর পরাইয়া সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীতে পরিণত করিয়াছিল তাঁর বাণী কংগ্রেসের মধ্য দিয়া প্রচারিত হইয়া কোটি কোটি ভারতবাসীর বুকে দোলা দিবে তা' আর আশ্চর্য্য কি!

দেখিতে দেখিতে অসহযোগের এক অধ্যায় অতীত হইল। দেশের উপর দিয়া স্বাদেশিকতার একটা প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গেল।

কলিকাতায় কংগ্রেস হইবে। ১৯২৮ সাল। পণ্ডিত মতিলাল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাতায় সব-সময়েই

পড়িয়া কংগ্রেস দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছি।

হাওড়া ষ্টেশন থেকে পার্ক সার্কাস অবধি বিরাট মিছিল করিয়া সভাপতিকে ৩৪ ঘোড়ার গাড়ীতে বসাইয়া কংগ্রেস মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হইবে। প্রতিজ্ঞা করিলাম—ইহা দেখিতেই হইবে।

শীতের রাত্রি। সুদূর পল্লী হইতে আসিয়াছি। ভোর হইবার ঢের পুর্ব্বেই হাওড়ায় উপস্থিত হইলাম। লোকে লোকারণ্য। পণ্ডিত মতিলালের ট্রেণ আস্তে আস্তে আসিয়া থামিল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন বাংলার পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। সুভাষচন্দ্র তখন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর G. O. C. সামরিক পোষাক আর সামরিক কায়দায় মার্চ্চ দেখিয়া মনে হইয়াছিল এ এক সত্যই নূতন জীবনের প্রবল স্পন্দন।

ভিড়ের চাপে কি ভাবে যে গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছিলাম তা বর্ণনার অতীত; কিন্তু সত্যই কষ্ট বোধ করি নাই, মনের অবস্থা তখন এমনি।

কংগ্রেসের অধিবেশনের দুই ঘণ্টা পুর্ব্বে কংগ্রেস-নগরে উপস্থিত হইয়াছি। বাহিরে ভয়ানক ভিড়। কার্ড দেখাইতেছি; কিন্তু কিছুতেই ভিতরে যাইতে দেওয়া হইতেছে না। ভিড় ক্রমে বাড়িয়াই গেল। শীতেও গলদঘর্ম্ম। এমন সময় দেখা গেল অশ্বারোহী সেচ্ছাসেবকদের। ভিড়ের মধ্য দিয়াই তাঁহারা অশ্বচালনা করিতেছেন। তখন কংগ্রেস ভুলিয়া প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু করিব কিরূপে? স্বেচ্ছাসেবকেরা কর্ত্তব্যপরায়ণ; তাঁহারা আমাদের উপর দিয়া ঘোড়া চালাইবেনই। এই সময়ে ফটক দিয়া ঢুকিবার চেষ্টা করিতেই সেখানকার স্বেচ্ছাসেবকগণ বাধা দিল। প্রাণের দায়ে বাধা অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করিতেই স্বেচ্ছাসেবকগণ বাঁশীতে জোরে ফুঁ দিলেন, আর ভিতর থেকে পিল্ পিল্ করিয়া দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক লাঠি হাতে আসিয়া উপস্থিত। কি করি! বেড়ার চাপ খাইয়া চেপ্টা হইয়া গেলাম বটে, কিন্তু প্রাণেপ্রাণে বাঁচিয়া গেলাম।

কংগ্রেসের এত জাঁকজমক, বিরাট প্রদর্শনী প্রভৃতির আকর্ষণ ক্ষণকালের জন্য কমিয়া গেল। কংগ্রেস মণ্ডপের মধ্যে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কমলালেবুর আর বাইরে এক এক কাপের চায়ের দাম দুই আনা থেকে চারি আনা পর্য্যন্ত দেখিয়া উৎসাহ কমিয়া গেল অনেকটা।

তারপর যেদিন কুড়ি হাজার শ্রমিক সহ শ্রীযুক্ত কিরণ মিত্র কংগ্রেস মণ্ডপে জোর করিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন সেই দিনকার ব্যাপার দেখিয়া ব্যথিত হইলাম। মহাত্মা গান্ধী গাড়ীর উপর উঠিয়া তাহাদের নিবৃত্ত করিলেন এবং পণ্ডিত মতিলাল তাহাদিগকে বিনা মাশুলে মণ্ডপে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। স্বেচ্ছাসেবকের কর্ত্তব্যপরায়ণতা যে আনন্দ দিয়াছিল, তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তবু একটা 'কিন্তু' মনের মধ্যে রহিয়া গেল।

ভারতের বিখ্যাত নেতৃবৃন্দকে এই কংগ্রেসেই প্রথম দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের বাণী The voice of the Congress is the voice of India সত্যই উপলব্ধি করিলাম। তা সত্ত্বেও এই ধারণাও মনে জাগিয়াছিল যে, কংগ্রেস তখনও দরিদ্র জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠে নাই। তারপর ৭/৮ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কংগ্রেসের প্রতিপত্তি বাড়িয়া গিয়াছে ঢের বেশী! কংগ্রেস যে জাতীয় আকাঙ্খার মূর্ত্ত প্রতীক সে সম্বন্ধে আর কোন রকমের সন্দেহই কাহারও মনে থাকিতে পারে না। আজ সুভাষচন্দ্রের একটা কথা বার বার মনে পড়ে। তাঁকে হুগলীতে বাংলার শ্রেষ্ঠ তরুণ কর্ম্মী বলিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি সত্যিকার কর্ম্মী নই, সত্যিকার কর্ম্মী ও দেশ সেবক তিনিই, যিনি আহার ভুলিয়া নিদ্রা ভুলিয়া সুখ-সুবিধা ভুলিয়া সেবার নেশায় পাগল হইয়া যান।"

সুভাষচন্দ্র বিনয় করিয়া যাহাই বলুন না একথা সত্য যে তাঁহার ন্যায় আত্মভোলা

কনক-জয়ন্তী

শ্রীসুবোধ রায়

দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীর অতীত কাহিনী
জাতীয় জীবন-গাথা গৌরব-বাহিনী
গাহিবে কোথায় আজি সে চারণ-কবি?
জননী-পূজার যজ্ঞে অন্তরের হবি
অকপটে মহানন্দে সমর্পিল যারা,
বাধাহীন, দ্বিধাহীন মৃত্যুঞ্জয়ী তারা।
তাদের স্মরণ করি' আজিকার দিনে
দুর্গম এ পথ যেন যেতে পারি চিনে
তাহাদের অনির্ব্বাণ আত্মার আলোকে,
বাধা-ভয় করি জয় প্রাণের পুলকে।

এ অসংখ্য মূক মুখে দিল যেই ভাষা,
ভগ্ন হতাশ্বাস বুকে জাগাইল আশা,
সীমাহীন অজ্ঞানের আঁধার আকাশে
ফুটালো জ্ঞানের তারা—আলোর আভাসে

দেখাইল ভুলে-যাওয়া জননীর রূপ,
বুঝাইল অসহায় জাতির স্বরূপ,
জ্বালিল যে আদর্শের অনির্ব্বাণ দীপ,
সমগ্র জাতির যেই সংহত প্রতীক,
সে জাতীয় মহাসভা – পুণ্য তার নাম,
ধন্য মোরা তারে সেবি'—তাহারে প্রণাম।

কর্ত্তব্য-পাগল কর্ম্মী যদি আরও দু'চারজন বাঙ্গলায় থাকিত তো দেশের চেহারাই বদলাইয়া যাইত। তবু আশার কথা আজ এই রকম সেবক বিরল হইলেও আছে, এবং আছে বলিয়াই অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া কংগ্রেস বাঁচিয়া আছে এবং থাকিবে। ভারতের এত বড় গৌরব আর কি হইতে পারে?

পূর্ব্বস্মৃতি

শ্রীসুবোধ রায়

অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে বাঙ্গলার যুবক দলে দলে কলেজ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্ধারণের জন্য দেশবন্ধু মহাত্মা গান্ধীকে বাঙ্গলায় আহ্বান করিয়াছেন। এই সময় আমি শান্তি-নিকেতনে ছিলাম। একদিন সকালে বন্ধু-বর অনিলচন্দ্র মিত্র (সম্প্রতি ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি প্রথমে শান্তি-নিকেতনের শিক্ষক ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। মহাত্মাজীর আত্মজীবনীর প্রথম ভাগের বঙ্গানুবাদও ইনি করিয়াছিলেন) একখানি চিঠি হাতে হাজির। সামান্য একটি চিরকুট, উড্ পেন্সিলে লেখা—হাতের লেখা যতদূর খারাপ হইতে হয়! তাড়াতাড়ি চোখ বুলাইয়া দেখি শিরোনামায় লেখা My dear Barodada আর নীচে Yours affly. M. K. Gandhi. মহাত্মাজীর হাতের লেখা সেই দেখিলাম। মহাত্মাজী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে চিরদিনই "বড়দাদা" বলিতেন এবং তাঁহাকে অগ্রজের ন্যায়ই ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। উক্ত পত্রে তিনি জানাইতেছেন যে তিনি তৎপরদিবস বাঙ্গালা অভিমুখে যাত্রা করিবেন, তাই এই সন্ধিক্ষণে বড়দাদার আশীর্ব্বাদ চাহেন।

তৎপূর্ব্বে মহাত্মাজীকে চাক্ষুষও দেখি নাই। তৎক্ষণাৎ অনিলের সহিত কলিকাতা যাত্রার পরামর্শ জুড়িয়া দিলাম। আমাদের এই উৎসাহে ইন্ধন জোগাইলেন ডাঃ চমন-লাল। (এই ডাঃ চমনলাল গুজরাটী—সবর-মতী আশ্রমে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে মহাত্মাজী তাঁহাকে চিকিৎসক হিসাবে শান্তিনিকেতন হাসপাতালে পাঠাইয়াছিলেন।) অতএব যেদিন সকালে নাগপুর মেলে মহাত্মাজীর কলিকাতা পৌছিবার কথা সেইদিন বেলা ১১টা নাগাদ্ আমরাও কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা বলিতে ডাঃ চমনলাল, বন্ধুবর অনিল মিত্র এবং আমি। শ্রীযুক্ত বনারসীদাস চতুর্ব্বেদীও সে যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন বোধ হয়। (শ্রীযুক্ত বনারসীদাস চতুর্ব্বেদী সেই সময়ে শান্তি নিকেতনে মিঃ এণ্ডরুজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি "বিশাল ভারতের" সম্পাদক) বড়বাজারে ডাঃ চমনলালের এক বন্ধুর ওখানে মাধ্যাহ্নিক আহার সমাধা করিয়া আমরা সোজা দেশবন্ধুর বাড়ীতে হাজির হইলাম। বাড়ীর বিরাট প্রাঙ্গনে তো তিলধারণের স্থান নাই—রসারোডে ও বাড়ীর সম্মুখে এত ভিড় যে যানবাহন চলাচল কঠিন। কোনোরূপে বাড়ীর নীচের ঘরে প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গনের ভিড়ের মধ্যে কয়েকজন উর্দ্দিপরা কনষ্টেবলও দেখিলাম। তাহারাও আর সকলের ন্যায় "দর্শনে"র আশায় বসিয়া আছে।

সিঁড়ির নিকটে যাইতেই স্বেচ্ছা-সেবক বলিল যে, উপরে প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাহাকেও যাইতে দেওয়া হইতেছে না। ডাঃ চমনলাল এক খণ্ড চিরকুট লিখিয়া উপরে পাঠাইয়া দিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে মহাত্মাপুত্র দেবিদাস আসিয়া আমাদের উপরে লইয়া গেলেন। সে যাত্রায় ডাঃ চমন-লালের কল্যাণেই "Passport" মিলিয়াছিল, নতুবা উপরে পৌছিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ।

উপরের হলঘর লোকে ভর্ত্তি। পশ্চিম দিকের মধ্যস্থলে মহাত্মাজী তাঁহার চিরা-চরিত দুইটি পা মুড়িয়া সুখাসনে উপবিষ্ট—সৌম্য সহাস মূর্ত্তি—পিছনে একটা তাকিয়া

আছে বটে, কিন্তু তাহাতে মহাত্মাজী ঠেস্ দেন নাই—সোজা হইয়া বসিয়া আছেন। মহাত্মাজীর সামনে কিছু দূরে এক বিরাট আল্‌বোলায় দেশবন্ধু তামাকু সেবন করিতেছেন ও সকলের সহিত আলাপ করিতেছেন। মহাত্মাজী মনোযোগের সহিত কি একটা লিখিতেছেন—লেখার ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্নকারীদের বহু প্রশ্নেরও উত্তর দিয়া চলিয়াছেন। নানা গুরুতর বিষয়ে প্রশ্নের অতি ক্ষিপ্র ও সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনিয়া মনে হইতেছিল যেন সকল কথাই তিনি পূর্ব্বাহ্ণে ভাবিয়া রাখিয়াছেন। মুখে হাসি লাগিয়াই আছে। ইহার মধ্যে হাসি তামাসাও চলিতেছে। দেখিলে মনে হয় যে সম্মুখের এত বড় সমস্যা তাঁহাকে এতটুকুও বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহাকে যে মুহূর্ত্তে দেখিলাম তখনই মনে হইল জ্ঞানে ও প্রেমে এমন সহজ সরল কর্ম্মঠ মানুষ ইতিপূর্ব্বে আর দেখি নাই। ভবিষ্যৎ কোন্ পথে এই চিন্তায় প্রায় সকলেরই মন যেন ভারাক্রান্ত—কেবল দেশবন্ধু ও মহাত্মাজীর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়াটুকুও নাই। এইখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই মহাত্মাজীর সরস কৌতুকপ্রিয়তার কথা সকলেই উপলব্ধি করিবেন। মহাত্মাজী লিখিয়া চলিয়াছেন, দেশবন্ধু আরামের সহিত ধূমপান করিতেছেন এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করিলেন মহাত্মাজীর জ্যেষ্ঠপুত্রবর হীরালাল গান্ধী। হলঘরে মধ্যে মধ্যে পিতলের টবে কয়েকটি "পাম" ছিল। ভিড়ের মধ্যে কোনরকমে পথ করিয়া আসিতে আসিতে একটি 'পামের' কাঁটায় হীরালালের কাপড় আট্‌কাইয়া যায়। হীরালাল তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে যেমন অগ্রসর হইতে যাইবে অমনি সে পড়িল, পামের টব পড়িল এবং সেই সবৃক্ষ টবের ধাক্কা লাগিয়া দেশবন্ধুর গড়গড়ার হুঁকা ও অগ্নিপূর্ণ কলিকাও উল্টাইল। উত্থিত হইল—যাঁহারা অন্যমনস্ক ছিলেন তাঁহারা সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু বেশ লক্ষ্য করিলাম যদিও মহাত্মাজী গভীর

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

মনোযোগের সহিত লিখিতেছিলেন তথাপি তাঁহার ভ্রূও সামান্য কুঞ্চিত হইল না। মুখ তুলিয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"What's the row about?" (গোলমাল কিসের?) ইতিমধ্যে এদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেছে। কেহ আগুন নিভাইতে, কেহ হুঁকা তুলিতে ব্যস্ত। দেশবন্ধু তাড়াতাড়ি হীরালালকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"Are you hurt? হীরালাল উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মহাত্মাজী সহাস্যে বলিলেন—"The point is not whether he is hurt but whether the pot is hurt. It is he who felled the pot. (তাহার লাগিয়াছে কিনা জিজ্ঞাস্য নয়, আসল কথা টবের লাগিয়াছে কিনা, কারণ সেই তো টবকে উল্টাইয়াছে)। সকলে এই উত্তর শুনিয়া হাসিতে যাইবে এমন সময় মহাত্মাজী হাতে তালি দিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। সেইরূপ প্রাণখোলা শিশুসুলভ হাসি কোনো প্রবীণ লোকের মুখে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না এবং সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া উঠিলেন—I am so glad that he has dammaged his foreign "dhotee" (তার বিলাতী কাপড় ছিঁড়িয়াছে এই আমার ফূর্ত্তি) ততক্ষণ হীরালাল দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে। সকলে দেখিল, তাহার কাপড় পায়ের নিকট হইতে উরু পর্য্যন্ত পামের কাঁটায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। হীরালালের পরিধানে ছিল কল্যাণমিলের অত্যন্ত মিহি মল্‌মল্ তাহাকেই মহাত্মাজী বিলাতী বলিয়া
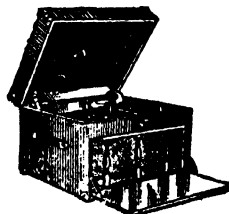
ঠাট্টা করিলেন। একেতো পড়িয়া গিয়াছে, তাহার উপর সকলের সামনে এইরূপ ঠাট্টায় হীরালাল অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিল। সে মুখ নীচু করিয়া তাড়াতাড়ি জবাব দিল—"No ji, no ji, it is not foreign" (না বাবা, উহা বিলাতী নহে) মহাত্মাজী তৎক্ষণাৎ সহাস্যে পাল্টা জবাব দিলেন—"Yes, foreign, according to my definition of the terms and not yours." (হাঁ, তোমার মতে না হইলেও আমার মতে বিলাতী) ওদিক হইতে দেশবন্ধু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"A good bantering between father and son" (বাপ বেটায় চমৎকার কথা কাটাকাটি!) পরমুহূর্ত্তেই ঘর নিস্তব্ধ হইয়া গেল এবং মহাত্মাজী যথাপূর্ব্ব লেখায় মনোনিবেশ করিলেন। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে এমন একটা সরস গোলমাল হইয়া গেছে ঘরের তখনকার অবস্থা দেখিলে সে কথা যেন বিশ্বাসই হয় না।

এখানে একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন। রাজনীতিক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আমি আসিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের দু একটি উল্লেখযোগ্য স্মৃতিকথা এখানে লিপিবদ্ধ করিব। তাহাতে সেইজন্য পারম্পর্য্য বা ধারাবাহিকতা থাকিবে না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আর একবার ঘনিষ্ঠভাবে পাইয়াছিলাম হুগলীতে। তিনি সকালে আসিয়াছিলেন ও সন্ধ্যায় কলিকাতা ফিরিয়াছিলেন। সেই দিন তাঁহার চরিত্রের অমায়িক মাধুর্য্য, সস্নেহ আন্তরিকতা, সারল্য ও সদাশয়তার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। এই সম্পর্কে দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। প্রথমেই স্বর্গীয় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে তিনি আসিয়া উঠিলেন—মহেন্দ্রবাবু তখন এম, এল, সি ও হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান। মিউনিসিপ্যালিটী হইতে এখনই তাঁহাকে মানপত্র দেওয়া হইবে—আর আধঘণ্টা সময় বাকী। মহেন্দ্রবাবু সিগার দিতে গেলেন। দেশবন্ধু হাসিয়া বলিলেন "ওসব তো আর খাই না।"

মহেন্দ্রবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন—"তাহলে তামাক—সেতো একেবারে দেশী—গড়গড়া।"

সুমধুর হাস্যে দেশবন্ধু বলিলেন—"না, না আপনি ব্যস্ত হ'বেন না। ওসব একেবারে ছেড়েছি।" মহেন্দ্র বাবু সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ক'রে পারলেন? প্রথমে বোধ হয় খুব কষ্ট হয়েছিল?"

অন্যমনস্ক ভাবে দেশবন্ধু উত্তর দিলেন—"কষ্ট? কই তেমন • কিছুতো বুঝতে পারিনি। জেলে গেলুম—সেই দিনই ঠিক ক'রলুম—আজ থেকে আর তামাক খাব না। ব্যস—আর খেলুম না।"

স্মিতহাস্যে মুগ্ধ, বিস্ময়ে বৃদ্ধ মহেন্দ্রচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"এইখানেই আমাদের সঙ্গে আপনার তফাৎ।"

হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর মান-

পত্রের উত্তরে দেশবন্ধু যে একটি কথা বলিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মনে রাখা কর্ত্তব্য। মানপত্রে একাধিকবার তাঁহার অনুপম ত্যাগের কথা ছিল। উত্তর দিতে উঠিয়া তিনি প্রথমেই বলিলেন—"আপনারা আমার ত্যাগের কথা বারম্বার উল্লেখ ক'রেছেন। কিন্তু আমার তো মনে হয় আমি কিছুই ত্যাগ করিনি। যা' ত্যাগ ক'রেছি তার চতুর্গুণ ভোগ ক'রছি। ছেড়েছি সামান্য টাকা, পয়সা, প্র্যাক্‌টিস্, কিন্তু তার বদলে পেয়েছি সারা দেশের স্নেহ-ভালবাসা। এ যদি ভোগ না হয় তো ভোগ কা'কে বলব? আমার কিন্তু মনে হয় যে সকল ছেলে তা'দের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দৃক্‌পাত না ক'রে পড়া ছেড়েছে, চাকরী ছেড়েছে, মাতৃযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়েছে, যাদের নামও আপনারা জানেন এবং হয় তো জানাবেন না, প্রকৃত ত্যাগী তারাই। তাদের সে ত্যাগের কাছে আমার ত্যাগ দাঁড়ায় না।"

এতবড় প্রাণ ছিল বলিয়াই না তিনি দেশবন্ধু!—

সাংবাদিক জীবনে আসিবার পর সবিশেষ বক্তব্য "ফরওয়ার্ড" গ্রুপের কথা। এই দলের মধ্যে রাজনীতি ক্ষেত্রের যে সকল লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের কথাই উল্লেখযোগ্য।

সুভাষবাবুর সহিত পরিচয় অবশ্য ইহার বহুদিন পূর্ব্বে হইয়াছিল। ১৯১৫ সাল—তখন উনি আই, এ, দিয়াছেন এবং আমি ম্যাট্রিক। নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে সারা দেশ জানে কিন্তু কর্ম্মী সুভাষচন্দ্র, মানুষ সুভাষচন্দ্র, বন্ধু সুভাষচন্দ্র যে তাহা অপেক্ষাও কত বড় তাহা তাঁহার সেদিনকার বন্ধু-বান্ধব ও সহচরবর্গই জানেন।

তখনকার সুভাষচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত স্বল্পভাষী। তাঁহার আকৃতি ও ব্যবহারে একটা স্বাভাবিক আভিজাত্য তো ছিলই। কিন্তু তৎসত্বেও স্বভাবের এমন একটা অমায়িক মাধুর্য্য ছিল যে তাঁহার দূরত্ব ও স্বল্পভাষিত্বকে মোটেই অহঙ্কার বলিয়া ভুল করিবার অবসর ছিল না। পরে ফরওয়ার্ডে কার্য্যকালেও দেখিয়াছি দূরত্ব রক্ষা করিয়াও এই নিরহঙ্কার অমায়িক ব্যবহার ছিল তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনো কাজে লাগিলে তাহা শেষ না করিয়া তিনি ছাড়িতেন না। খাটিবার শক্তি ও একনিষ্ঠতা তাঁহার ছিল অনন্য-সাধারণ। ফরওয়ার্ডের প্রথম অবস্থায় অপরাহ্ণ চার ঘটিকা হইতে রাত্রি চার ঘটিকা পর্য্যন্ত একাদিক্রমে তিনি বহুদিন কাজ করিয়াছেন। যৌবনে স্বেচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্রসাধন ছিল তাঁহার অভ্যাসের অঙ্গীভূত। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে অধিকাংশ দিন তিনি তাঁহার এলগিন রোডের বাটী হইতে পদব্রজে ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্য্যন্ত গিয়া ট্রাম ধরিতেন ও ফিরিবার সময় ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে পদব্রজে বাড়ী ফিরিতেন।

অধ্যাপক ওটেন সংক্রান্ত ঘটনার পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে বিখ্যাত ধর্ম্মঘটের দিন কলেজ (স্কটিশ) যাইতেছি, ট্রাম হইতে দেখিলাম গেটে দাঁড়াইয়া সুভাষচন্দ্র করজোড়ে ছাত্রদের কি বলিতেছেন আর তাহারা বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যাকালে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম তখন তাঁহার স্বাভাবিক মধুর হাস্যে জবাব দিলেন "কই আমি তো কিছুই জানিনা—তুই বোধ হয় ভুল দেখে-ছিলি!" অনেক পীড়াপীড়ির পর সকল ঘটনা বলিলেন। নিজের সম্বন্ধে কথা বলিতে চির-দিনই তাহার অসীম কুণ্ঠা।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় বোধ হইয়াছিল যখন শুনিলাম তিনি বিলাত যাইতেছেন আই, সি, এস, পড়িতে। জিজ্ঞাসা করিলাম - "তুমি আই, সি, এস প'ড়তে যাচ্ছ একথা কি সত্য?"

হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, বাবার বড় ইচ্ছে!"

আই, সি, এস, পরীক্ষার পর তাঁহার জীবনে যে দ্রুত নাটকীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তখন তাহা ছিল আমাদের কল্পনাতীত। তবু তিনি যে দেশের দশের মধ্যে একজন হইবেন এবং আই, সি, এস পাশ করিলেও চাকরী রাখা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে

একথা তাঁহার সেদিনকার যাহারা সহচর ছিল তাহারা বিশ্বাস করিত ও জানিত।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার রূপে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর কার্য্যক্ষমতা ও অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত ব্যবহার ছিল অনিন্দ্যনীয়। অন্যায় হইলে মৃদুমন্দ তিরস্কার করিতেও যেমন, কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ পাইলে প্রশংসা করিতেও কার্পণ্য করিতেন না। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল তাঁহার গৃহে তাঁহার ব্যবহার। যাঁহারা তাঁহার বাড়ী গিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, আপিসের মনিব কিরূপ অবলীলাক্রমে গৃহে বন্ধু ও অগ্রজে পরিণত হইতেন। আজ সেই সহৃদয় উদার ও সত্যনিষ্ঠ শরৎচন্দ্র বসুকে বাঙ্গলা কংগ্রেসের সালিশ নিযুক্ত হইতে দেখিয়া একদিকে যেমন মনে আনন্দ জাগে তেমনি অপরদিকে মনে হয় যে, এই গুরুভার যোগ্য পাত্রেই অর্পিত হইয়াছে। বাঙ্গলা কংগ্রেসের কলহের অবসান যদি কাহারও দ্বারা সম্ভব তাহা হইলে তাঁহার দ্বারাই তাহা হইবে—ইহা বিশ্বাস করি।

ফরওয়ার্ডে আসিবার পূর্ব্বে 'বিজলী' সম্পাদন কালে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের সহিত পরিচিত হই। রাজনীতিক্ষেত্রে এরূপ বুদ্ধিমান পঠন-পাঠনশীল, রসিক cultured ব্যক্তি বড় বেশি দেখি নাই। আমার চিরদিনই মনে হয় রাজনীতি তাঁহার অবসর-বিনোদনের বিলাস মাত্র—আসলে তিনি সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক। তাঁহার ক্ষুরধার-বুদ্ধিপ্রসূত বাচনিক ভঙ্গি, হাস্যোজ্জ্বল রসিকতা ও রসিকজনোচিত বৈদগ্ধ্যের পরিচয় যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারাই আমার সহিত একমত হইবেন।

ফরওয়ার্ডের অগ্রজ সহকর্ম্মীদের মধ্যে বিশেষ করিয়া মনে পড়ে শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীকে। জানি না কি অপরাধে আজ তিনি দেউলীর বন্দীশালায় বিনা বিচারে আবদ্ধ। কিন্তু তাঁহার সম্পাদক ও সহকর্ম্মী বিরল। অধীনস্থ সহ-সম্পাদকদের একটা কড়া কথা বলিতে তাঁহাকে কেহ শোনে নাই। আলস্য কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। রাত্রি ১২টায় বাড়ী গিয়াছেন—১টায় সময় প্রেস বিকল বা অন্য কিছু জরুরী দরকার পড়ায় ফোন করা হইল। আধঘণ্টায় মধ্যেই তিনি হাসিমুখে হাজির।

আর একজন আজ পরলোকে—বন্ধুবর সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু। সুন্দর দেহমনের অধিকারী এই বন্ধুটি সহকর্ম্মীদিগকে আনন্দে ও উৎসাহে মাতাইয়া রাখিত।

ফরওয়ার্ড লিমিটেড হইতে ফরওয়ার্ড, বঙ্গবাণী ও নবশক্তি—কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই তিনখানি পত্রিকা পরিচালিত হইত। এই তিনখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক-সঙ্ঘের প্রধান বিশেষত্ব ছিল এই যে, ৩৫ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর বয়স্ক তরুণদের লইয়াই তাহা গঠিত ছিল। সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের পরিচালনায় যে শক্তিশালী সম্পাদকসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল বাঙ্গলাদেশে সংবাদপত্র জগতে তাহা "রেকর্ড" স্থাপন করিয়া গিয়াছে। ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, আব্দুল মতীন চৌধুরী, শচীন সেন, প্রমোদ সেন, মোহিত মৈত্র, গোপাল সান্যাল, যোগজীবন ব্যানার্জ্জী, বিজয় দাশগুপ্ত, শচীন সেনগুপ্ত, যতীন মুখার্জ্জী, অনিল রায়, কালীপদ বিশ্বাস, রসরাজ চৌধুরী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার সরকার, প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়া ফরোয়ার্ডের তরুণ সম্পাদক-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পুরাতন ফরোয়ার্ড সঙ্ঘ আজ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ও তাহার কবন্ধ লইয়া এখনো শিয়ালদহের গোরস্থানে টানাটানি চলিয়াছে। শক্তিমান ফরোয়ার্ড সঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্ন উল্লিখিত কর্ম্মীবৃন্দ বর্ত্তমানে কলিকাতার বিভিন্ন সাংবাদিক কেন্দ্রে স্ব স্ব কর্ম্মকুশলতায় পরিচয় দিতেছেন। রিপোর্টার আব্দুল মতিন চৌধুরী ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সহকারী সভাপতির পদলাভ করিয়া, ডাঃ ধীরেন্দ্র নাথ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাধি লাভ করেন ও শ্রীশচীন সেন সুসাহিত্যিকরূপে ও শ্রীশচীন সেনগুপ্ত নাট্যকাররূপে ও শ্রীঅক্ষয় কুমার সরকার তিনখানি সাময়িক পত্রের পরিচালকরূপে সুপরিচিত হইয়া সেই তরুণ সম্পাদক-সঙ্ঘের শিক্ষানবিসীর উৎকর্ষতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড-সঙ্ঘের আওতায় সুদক্ষ সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের সুযোগ ও সুবিধা প্রদানের একমাত্র কৃতিত্ব তদানীন্তন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর।

Hallo Calcutta!

Get Hot!

Tell The folks!

"MAN SINGH" IS MISSING!

He May be at Calcutta

A Good Fortune For you if you Can find him
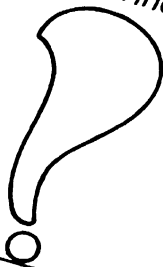
ALKIE OF TAL
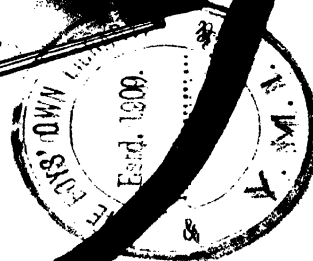
অভিনেত্রী দীপিকা

উপরে : উমা

নীচে : লীলা দেশাই

উপরে : চন্দ্রাবতী

নীচে : কমলেশকুমারী

উপরে : আরতি নীচে : রাজকুমারী

উপরে : মলিনা নীচে : যমুনা

পরে : শান্তি গুপ্তা　　নীচে : জ্যোৎস্না গুপ্তা

উপরে : মীরা দত্ত　　নীচে : রেণুকা রায়

বীনাপাণি

পদ্মাবতী

সরলা

উপরে : দেববালা

নীচে : চারুবালা

ললিতা

পেসেন্স কুপার
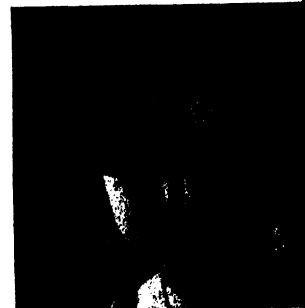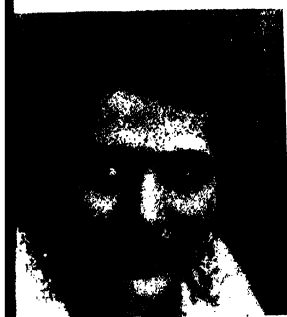
ইন্দিরা দেবী

হিন্দী "দিদি" চিত্রের একটি দৃশ্যে জগদীশ, অমর মল্লিক ও কাপুর। নীতীন বসুর পরিচালনায় ছবিখানা শেষ হ'তে দেরী নেই।

=বার্ষিক সংখ্যা=

খেয়ালী
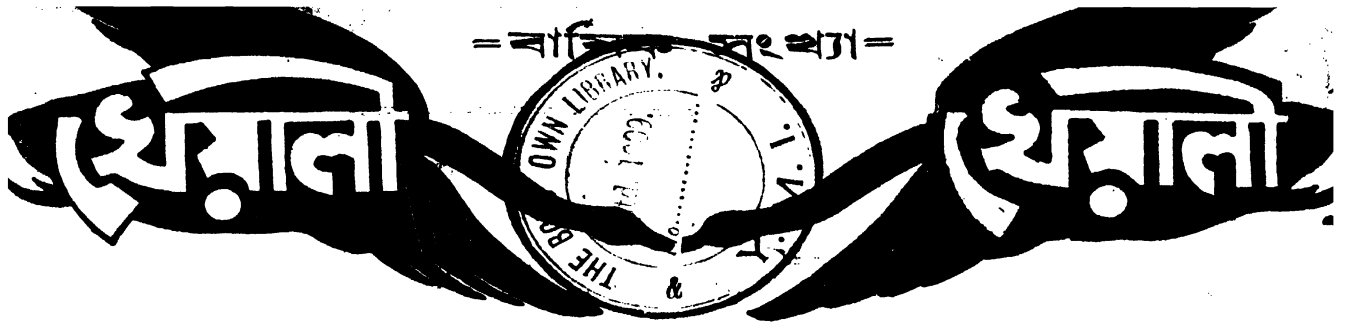
পরিচালক—ন্যাশনাল নিউজ্‌পেপার্স লিঃ

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বৎসরান্তে

ছয় বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু পরিচালিত "ফরোয়ার্ড"-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ও তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত সাংবাদিক দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া যে সমস্ত সাংবাদিকের উদ্ভব হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে কতিপয়ের প্রচেষ্টায় ক্ষণস্ফূর্ত্ত খেয়ালের চরিতার্থে "খেয়ালী"র সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার জন্মদিনের আত্মকথায় নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল যে কোন দল বা ব্যক্তি বিশেষের মাদল বাজাইতে "খেয়ালী" জন্মগ্রহণ করে নাই এবং জাতির অগ্রগতির পথে কণ্টকবিদ্ধ পান্থগণকে কণ্টকমুক্ত করিবার জন্য বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া যদি নিজেকে কণ্টকাঘাত সহ্য করিতে হয় তাহাতেও "খেয়ালী" কুণ্ঠিত হইবে না। শঠতার আবরণ উন্মুক্ত করিতে, বহুরূপীর স্বরূপ প্রকাশ করিতে ও বাঙলার কংগ্রেসকে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের বণিকবৃন্দের অনুগৃহীত ব্যক্তিবর্গের কবল হইতে মুক্ত করিতে "খেয়ালী" বিগত বর্ষে যে সাংবাদিক দুঃসাহসিকতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছে তাহা বর্ত্তমানে সর্ব্বজনবিদিত। সরকারী মন্ত্রী স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহরায়ের সহিত বাঙলা কংগ্রেসের ছোট, বড় ও মাঝারী পুচ্ছধারী কর্ত্তাদের যে যোগাযোগ লোকচক্ষুর অন্তরালে বিদ্যমান ছিল "খেয়ালী"র কঠোর লেখনী ঘাতে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—বাংলার জনসাধারণ জানিতে পারিয়াছেন যে বাঙলা কংগ্রেসের বিধানী দলের গুপ্তদ্বার সরকারী মন্ত্রীর দপ্তরখানার পশ্চাদ্দ্বারের সহিত সংযুক্ত।

আমাদের সাংবাদিক জীবনের শিক্ষাদাতা ও বাঙলার শ্রদ্ধেয় জননেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু যখন মিলন মোহে বিভ্রান্ত হইয়া বিধানী দলের সহিত মিলনসূত্রে আবদ্ধ হইলেন তখন বাঙলার সমগ্র সংবাদপত্রের মধ্যে একমাত্র "খেয়ালী"ই সেই ভূয়া মিলনের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করিয়াছিল এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর তদানীন্তন কার্য্যাবলীর কঠোর সমালোচনা করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। সরকারী মন্ত্রীত্বের আশার ছলনে লুব্ধ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও তাঁহার অনুচর শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের সহিত আদর্শবাদী মন্ত্রীত্ব-বিরোধী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর মিলন যে সম্ভবপর নয় তাহা শরৎচন্দ্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং "খেয়ালী" অপ্রিয় ও কঠোর সত্য বলিলেও বর্ত্তমানে তাহা নির্ম্মম সত্যে পরিণত হইয়াছে। জোড়া-সাঁকোর রাজবাটীর মন্ত্রণা-কক্ষে যে রায়-রুণী প্যাক্টের পরিকল্পনা ও পরিপুষ্টি হইয়াছিল সেই রায়-রুণী প্যাক্টের জাতীয়তা-বিরোধী ভিত্তির উপর শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের যে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহার প্রত্যাশিত ধ্বংসে আমরা উৎফুল্ল হইয়াছি এবং ইহাতে বাঙলা কংগ্রেসের দলগত দুরদৃষ্টিতায় "খেয়ালী"র অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রকট হইয়াছে।

বিগত কর্পোরেশন নির্ব্বাচনের সময় হইতে বিভ্রান্ত শরৎচন্দ্রের বহু আয়াসলব্ধ মিলনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিতে "খেয়ালী" নির্ভীক একাকিত্বের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। রাহুগ্রাসমুক্ত শরৎচন্দ্রের বর্ত্তমান নিরলস কর্ম্ম-প্রচেষ্টা "খেয়ালী"র অভিযানকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছে। যে মিলনের বিরুদ্ধে বাঙলার সমগ্র সংবাদপত্রের মধ্যে একমাত্র "খেয়ালী" কষাঘাত করিয়াছিল আজ সেই মিলনের ভগ্নস্তূপের উপর "বসুমতী", "আনন্দবাজার" ও "এ্যাডভান্স" অল্পবিস্তরভাবে শরৎচন্দ্রের অনুগামীরূপে আমাদের নীতিই অনুসরণ করিতেছেন। ভূতপূর্ব্ব পার্লামেণ্টারী অধিপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া না করিয়া কংগ্রেসের পতাকাকে অবনমিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মেঘমুক্ত শরৎচন্দ্র বর্ত্তমানে "নলিনী-বিজয়ে"র বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া করাইয়া যে অদম্য উৎসাহ লইয়া নির্ব্বাচনসমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন—তাহাই আমাদের বিগত বর্ষের অনুসৃত নীতির চরম পুরস্কার বলিয়া মনে করি।

ফৈজপুর ও বাক্যের বুদ্বুদ

শ্রীপ্রমোদ কুমার সেন

ফৈজপুর নামক গ্রামে পঞ্চাশৎ কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হইল। নেতৃবর্গের আনন্দের সীমা নাই যে অধিবেশন একটা অজানা গ্রামে হইলেও পরম সাফল্যলাভ করিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতি যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া কিছু টাকা লাভ হইয়াছে। অধিবেশনের কার্য্যও ঘড়ি ধরিয়া হইয়াছে—এবার বক্তৃতা বাহুল্য নাই। অন্যান্য অধিবেশনের বিবরণ সংবাদপত্রগুলির চার-পাঁচ পাতায় কুলায় নাই; এবার পৃষ্ঠা দুই-একের বেশী বিবরণ বাহির হয় নাই। বরং গাজন জমিবার আগে ঢাকের বাদ্দিই বেশী করিয়া শুনা গিয়াছিল।

এবার বক্তৃতা বাহুল্য নাই কারণ এমন খুব কম প্রস্তাব ছিল যাহা লইয়া বাদ-বিতণ্ডা হইতে পারে। কংগ্রেস এখন এমন অবস্থায় আসিয়াছে যখন কথার চেয়ে কাজেরই প্রয়োজন। অবশ্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হইবে কিনা লইয়া কিছু বিতণ্ডা আশা করা গিয়াছিল কিন্তু চরমপন্থীদল বিশেষ সুবিধা করিতে পারে নাই। কাজেই কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের ভবিষ্যৎ আপাততঃ শিকায় তোলা রহিল; নির্ব্বাচন শেষ হইলে হয়ত ইহা শিকা হইতে নামান হইতে পারে।

কংগ্রেসে অন্ততঃ তিলকনগরে এবার চাষাভুষার আমদানী ছিল বেশী, কাজেই নেতৃবর্গ ছিলেন কিছু পরিমাণে নিষ্প্রভ—অবশ্য এক জওহরলাল ছাড়া। ইহাতে কংগ্রেস গুলজার হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু উহারা কতদূর কংগ্রেসের বাণী হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে তাহা বৎসর খানেকের মধ্যেই বুঝা যাইবে। অবশ্য আমাদের দেশের কৃষক মজুরদিগের মধ্যে সাধারণ বুদ্ধি যথেষ্ট আছে, এবং উপযুক্ত নেতার পরিচালনায় তাহারা অনেক দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এখনও তাহাদের মধ্য হইতে যুগোপযোগী নেতার আবির্ভাব হয় নাই। প্রফেসর রঙ্গ এবার কৃষক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন—ইনি গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার ধমনীতে কিষাণ-রক্ত প্রবাহিত। কিন্তু ইহা সত্য যে তিনি বৎসরের অধিকাংশ সময় কৃষক-দিগের মধ্যে কাটান না, তাঁহার বক্তৃতা ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদেই শুনা যায়।

জাতীয় আন্দোলনে এরূপ নেতাই পুরোভাগে থাকেন সত্য, কিন্তু এতদিনেও কৃষক বা শ্রমিকদের মধ্যে হইতে নেতার উদ্ভব হইতেছে না কেন? রুশিয়ার ষ্টালিন, জার্ম্মানীর হিট্‌লার, ইতালীর মুসোলিনি, বিলাতের ম্যাকডোনাল্ড বা টমাসের ন্যায় সমাজের নিম্নস্তর হইতে উদ্ভূত জাতীয় নেতা আমাদের দেশে কয়জন? এই কারণেই বোধ হয় আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলন সমাজের নিম্নস্তর সম্যকরূপে স্পর্শ করিতেছে না। উপরের স্তরের আন্দোলনের ঢেউ নিম্ন স্তরে মাঝে মাঝে পৌঁছিয়াছে কিন্তু জোয়ার কমিলেই সমাজ ও জাতির সর্ব্বাঙ্গ ভাটার টানে একেবারেই ভাসিয়াছে। এই জন্যই দেখা যায় যে তিন চারিটা স্বদেশী আন্দোলন সত্ত্বেও বিদেশী মালেই বাজার ছাইয়া আছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাইয়ের অধিবেশনের প্রাক্কালে আলাপরত পণ্ডিত জহরলাল ও শরৎ চন্দ্র বসু

আর আন্দোলনের ব্যর্থতার ন্যায় সর্ব্বনাশা জিনিষ নাই। কিন্তু বার বার আমাদের দেশের আন্দোলন ব্যর্থ হইতেছে কেন? ভারতীয়রা জাতীয় আন্দোলনে যে সাহস, শৌর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছে তাহার তুলনা খুব কম দেশেই—বিশেষতঃ যে দেশ সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র—পাওয়া যায়। তথাপি কেন আমরা এতদিনে সাফল্যলাভ দূরের কথা, সঙ্ঘবদ্ধ পর্য্যন্ত হইতে পারি নাই? আজ দেশের প্রকৃত অবস্থা ঢাকিয়া

কোনই লাভ নাই। আজ সমগ্র দেশে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও আধুনিক কুসংস্কারের বিষে জর্জ্জরিত। এ বিষ পান করিয়া দেশের জন্য অমৃত বিতরণের ক্ষমতা কোন নেতারই নাই। আদর্শ জাহির করিলে বা বাস্তবের নিন্দা করিলে ত' বাস্তব বদ্‌লায় না—কাজেই প্রথমে চাই ব্যাধির সম্যক পরীক্ষা।

পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন যে Independence is nearer—স্বাধীনতা নিকটবর্ত্তী তাঁহার বক্তৃতা ভাল করিয়া পড়িলেই বুঝা যায় তিনি দেশের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া বহির্জগতের ঘটনাবলীর দ্রুত পরিবর্ত্তনে ভারত কিরূপে লাভবান হইতে পারে সেই বিষয়েই ইঙ্গিত করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সারাজগতে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যে মন্থন সুরু হইয়াছে ভারতকে তাহাতে যোগদান করিতে হইবে, এবং সেই মন্থনের ফলে যে অমৃতের আবির্ভাব হইবে ভারত তাহা পান করিয়া শক্তিমান হইবে।

এরূপ একটা অবস্থা উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা আছে একথা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছে, কিন্তু ইহার উপর নির্ভর করিয়া স্বরাজ লাভের আশা মহাত্মা গান্ধীর এক বৎসরের মধ্যে চর্‌কা দ্বারা স্বরাজ লাভের আশার ন্যায়। জাতীর বর্ত্তমান অবস্থায় কোন নেতাই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না যে জাতীয় আন্দোলনের উপযুক্ত ফল কবে ফলিবে। তাহার কারণ সকলেই বুঝিতেছেন যে এতদিন কাজের কাজ হইয়াছে অল্প, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোঁজামিল দিয়া আসা হইয়াছে—এমন কি দেশের জাতীয় চেতনার সম্যক উদ্বোধন হয় নাই। সম্যক উদ্বোধন যে হয় নাই তাহার পরিচয় আমরা পদে পদে পাইতেছি। মুসলমানদিগের সাম্প্রদায়িকতার কথা ছাড়িয়া দিলাম, ভারতের প্রদেশগুলি আজ প্রাদেশিকতার বিষে জর্জ্জরিত। এমন নেতা খুব অল্পই আছেন যিনি এই দোষে দুষ্ট নহেন।

মোটের উপর বুঝা যায় যে, আমাদের নেতৃবর্গের অধিকাংশ জাতীয়-মন্ত্রে উদ্বোধিত হ'ন নাই, জাতীয় কল্যাণ তাঁহাদের কল্যাণ বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁহারা ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজনার বশে আন্দোলনে মাতামাতি করেন, এবং সুযোগমত স্বার্থসিদ্ধি করেন—ব্যক্তিগত স্বার্থ, পারিবারিক স্বার্থ ও প্রদেশগত স্বার্থ। এই হীন স্বার্থপরতার বিষে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, সমগ্র সমাজ এমন কি সমগ্র জাতি জর্জ্জরিত। নেতাগণ যদি সত্যই গণ-আন্দোলন চাহিতেন তাহা হইলে কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসর বয়সে Mass Contact Committeeর ভার মানবেন্দ্রনাথ রায়ের হাতে দিতে হইত না।

এক মানবেন্দ্র নাথ রায়, এক জওহরলাল, এক রঙ্গ বা তাঁহাদের কয়েকজন মাত্র অনুচর রাতারাতি চির-বিড়ম্বিত জনসাধারণের মধ্যে স্থায়ী জাগরণ আনিতে পারিবেন না। তাহার কারণ আছে বহু। কৃষকগণ বা শ্রমিকগণ যদি যথার্থভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে এই নেতাগণের মধ্যেই অনেকে স্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহাদের পীড়ন আরম্ভ করিবে। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহাদের এই পীড়নের কথা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

এই কারণেই কংগ্রেসে পণ্ডিত নেহেরুর আবির্ভাবের পর হইতেই ভারতের অভিজাত সম্প্রদায়ের বৈঠকখানায় চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের অধিকাংশ প্রজা ঠেঙ্গাইয়া, মজুর শোষণ করিয়া বা ধাপ্পাবাজি করিয়া আভিজাত্যের চাল দিতেন ও জাতীয় আন্দোলনে মুরুব্বিয়ানা করিতেন। তাঁহাদের সে সুখস্বপ্নের চমক ভাঙ্গিয়াছে। তাহার উপর বঙ্গের বাহিরে প্রদেশগুলি এরূপভাবে প্রাদেশিকতার বিষ উদ্গীরণ করিতেছে যে, যে বঙ্গদেশ এককালে ছিল জাতীয় আন্দোলনের অগ্রণী সে এ বিষয়ে একরূপ উদাসীন। আজ কংগ্রেসে বাঙ্গলার একজন নেতাকেও দেখা যায় নাই, দেখা গিয়াছিল কয়েকজন অতি উৎসাহী প্রতিনিধিকে।

জওহরলাল কি দেশের এই জড়ত্ব ও সংকীর্ণতা দূর করিতে পারিবেন? তিনি খুব বুদ্ধিমান, কর্ম্মশীল, উৎসাহী এবং বিচক্ষণ—কিন্তু "আপ ভালা ত' জগৎ ভালা" সর্ব্বক্ষেত্রে হয় না। তিনি গোঁজামিল ও ধাপ্পাবাজির আবহাওয়া হইতে কংগ্রেসকে কি উদ্ধার করিতে পারিবেন? ভণ্ড স্বার্থপর নেতা ও তথাকথিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদিগকে তিনি কি কংগ্রেস হইতে অর্দ্ধচন্দ্র দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন? অপর পক্ষে তিনি যদি বর্ত্তমান অবস্থা না বুঝিয়া শুধুই আদর্শ-মায়া মৃগের প্রতি ধাবমান হ'ন তাহা হইলে আবার ভারত বঞ্চিত হইবে।

সত্য কথা বলিতে কি এখন দেশে চাই সর্ব্বক্ষেত্রে ঐকান্তিক কর্ম্ম—যে কর্ম্ম স্বার্থপ্রসূত নয়, যাহা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের, জনসাধারণের সত্য উদ্বোধনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। লোকমান্য তিলক প্রভৃতি স্বদেশী যুগের নেতারা সেই আদর্শের কথা বলিয়াছিলেন, যে, জাতীয় যুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিতে হইবে এবং অপরিসীম ধৈর্য্যের সহিত সেগুলি রক্ষা করিয়া দেশের মঙ্গলজনক কার্য্য করিতে হইবে, এবং এই উপায়ে অচিরেই জাতীয়তার আদর্শ সফল হইবে। দেশবন্ধুর কার্য্যে ভারত এই আদর্শের সাফল্য দেখাইয়াছিল। তাঁহার তিরোধানের পর জাতীয় কার্য্যের

গণ-সাহিত্য (?)

শ্রীসুবোধ রায়

আমার ধারণা ছিল যে "Slogan" বস্তুটির স্থান একমাত্র রাজনীতিক্ষেত্রেই। যেখানে সভা সমিতি মুহূর্ত্তে একটা ভাব দশ হইতে শতে এবং শত হইতে সহস্র মনে ছড়াইয়া দিতে হইবে সেখানে "গান্ধীজীকী জয়" "ভারতমাতাকী জয়" প্রভৃতি জয়ধ্বনির সাহায্য লওয়া ভিন্ন বোধ হয় গত্যন্তর নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এই Sloganএর অভিযান সুরু হইয়াছে। যেখানে নিজস্ব চিন্তা, শান্ত মননশীলতা ও নিভৃত অবসরের প্রয়োজন, সেখানেও কর্ণপটহবিদারী জয়ধ্বনি আসিয়া পৌঁছিতেছে :—

"জয় গণ-সাহিত্যের জয়।" বহুলোকই এই জয়ধ্বনির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়াছেন, এবং এই গণ-সাহিত্যকে আড়ং ধোলাই করিয়া, পালিশ করিয়া "প্রগতি-সাহিত্য" নাম দিয়া নানা স্থানে সভা-সমিতি ও প্রবন্ধাদি পঠিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এই সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিবার পরও "কাঁঠালের আমসত্ত্বের" মত 'গণ-সাহিত্য' বস্তুটি আমার নিকট দুর্ব্বোধ্য রহিয়া গিয়াছে। প্রগতিবাদী সাহিত্য-সাথীরা হয়তো বলিবেন—"এযুগে গণ-সাহিত্য যে বোঝেনা, সে জাহান্নামে যাক্।" জাহান্নামে যাইতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই, কারণ সেখানে বহু পরিচিত লোকের সহিতই সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে গণ সাহিত্যটা বুঝিয়া গেলে ভবিষ্যতে অনেক সুবিধা হইতে পারে।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই Slogan সৃষ্টি অবশ্য নূতন নয়—কেবল মাত্র গণতান্ত্রিক-বাদী সাহিত্যিকরাই যে এই দোষে দোষী তাহা নহে। কিছু কাল পূর্ব্বে আর এক-দল আর একটা কথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন —"অভিজাত সাহিত্য।" যে যুগে জাতি-ভেদ উঠাইয়া দিয়া না হউক, অন্ততঃ জাতিবিদ্বেষ উঠাইয়া দিয়া আমাদের সমাজকে সংহত ও শক্তিশালী করিয়া তোলা হইয়াছে, ঠিক সেই সময় সাহিত্যে এই ভাবে ভেদবিভেদ, জাতি-বিদ্বেষ প্রভৃতি সৃষ্টি করা কি সমীচীন? আমাদের বহু-দিনের দুর্ব্বুদ্ধিপুষ্ট ভেদবুদ্ধিটা কি অবশেষে সাহিত্যে আশ্রয় লইল!

এখন আসল প্রশ্ন হইতেছে এই যে, সাহিত্যের উপর বিশেষ করিয়া কথা সাহিত্যের (নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির) উপর এইরূপ বিভিন্ন লেবেল্ মারিয়া শ্রেণী বিভাগ করিয়া তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন আল-মারীতে সাজাইয়া রাখা চলে কি না? দলের সাহায্যে কোনদিন কি সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে? এসো আমরা সকলে গণ-সাহিত্য সৃষ্টি করি—এই বলিয়া একদিন সকলে কলম হাতে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেই কি গণ-সাহিত্য সৃষ্টি করা যাইবে? এসো আমরা সকলে চাষ করি বলিয়া লাঙ্গল কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলে যত সহজে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয় সাহিত্য সৃষ্টিও কি সেইরূপে হইতে পারে? রাজা, মহারাজা, কোটাল, সওদাগরদের লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতেই হইবে, সরস্বতী তাঁহার বরপুত্রদের নিশ্চয়ই এইরূপ মাথার দিব্য দেন নাই, কিন্তু কলমের পরিবর্ত্তে লাঙ্গল এবং তুলির পরিবর্ত্তে কাস্তে বা হাতুড়ী ব্যবহার করিলে যে তিনি খুসী হইবেন সে কথাও কি গণ-তান্ত্রিক সাহিত্যিকরা হলফ্ করিয়া বলিতে পারেন?

যুগধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে কেহই পারে না। যেমন রাজনীতি, সমাজনীতি তেমনি সাহিত্যেও যুগধর্ম্ম ধীরে ধীরে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অতএব সাহি-ত্যের বিষয়বস্তুরও স্বাভাবিক ভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যাহারা একদিন হয়তো সাহিত্যক্ষেত্রে অপাংক্তেয় ছিল আজ তাহারা সসম্মানে আপনাদের আসন সুপ্রতি-ষ্ঠিত করিতেছে। কালিদাস, সেক্সপীয়ার্, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির আবির্ভাবের পূর্ব্বে কোনও অভিজাত দল সভা সমিতি করেন নাই অর্থাৎ কোনরূপ দলবদ্ধ প্রতিজ্ঞা বা সভার 'রিজোলিউশন্'এর ফলে ইঁহাদের আবির্ভাব হয় নাই। সেইরূপ কোন গণ-তান্ত্রিক বাদী সাহিত্যিকদলের 'রিজোলি-উশন্'এর ফলেও গর্কি, কুপ্রিন্ হপ্টম্যান্ প্রভৃতি বিশ্বপ্রতিভার আবির্ভাব ঘটে নাই। যে প্রাকৃতিক নিয়ম ও শক্তিবলে কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়র্ প্রভৃতির আবির্ভাব

পরিবর্ত্তে আরম্ভ হইয়াছে স্বার্থবুদ্ধির বিকট-লীলা এবং নেতৃবর্গের অধিকাংশ হইয়াছেন দেশবাসীর ধিক্কারের পাত্র। আমরা বাক্যের বুদ্বুদ বা হৈ চৈর হিড়িকে যতই না কেন এই আদর্শ-বিচ্যুত হই, উহা ব্যতি-রেকে ভারতের সত্য শক্তিমান হইবার আশা নাই। ঘটনাচক্রে তাহার হাতে স্বাধীনতা আসিলেও তাহা হইবে চীনের ন্যায় গৃহযুদ্ধের উপলক্ষ ও জন-নির্য্যাতনের কলঙ্কময় পর্ব্ব।

———

সম্ভব হইয়াছে, ঠিক সেই নিয়মের অনুবর্ত্তিতায় এ যুগের সাহিত্য প্রতিভাও জন্ম লইয়াছেন। কেবল যুগধর্ম্মের আদর্শ ও আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের ফলে ইঁহাদের রচিত সাহিত্যের বিষয়বস্তুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

আসল কথা সাহিত্যের বিষয়বস্তু লইয়া এইরূপ মারামারি ও মাথা ফাটাফাটি করার কোন সার্থকতা নাই। দরিদ্রের কথা, শ্রমিকের কথা, বস্তীর বর্ণনা লিখিলেই যে তাহা সাহিত্য হইয়া উঠিবে তাহার কোন মানে নাই। Treatmentই কথা সাহিত্যের প্রাণ। যে সোনার কাঠির স্পর্শে মরা বাঁচিয়া উঠে চাই সেই দরদী প্রাণের ও জাগ্রত মনের প্রতিভায় সোনার কাঠির স্পর্শ। ইহার অভাবে হাজার হাজার Volume বস্তীর বর্ণনা ও শ্রমিকদের দুঃখ দুর্দ্দশা লিখিলেও তাহা কাহারও অন্তর স্পর্শ করিবে না, কালের প্রবাহে তাহা ভুষিমালের ন্যায় বস্তাবন্দী হইয়া ভাসিয়াই যাইবে।

অতএব চাই প্রগতি সাহিত্য, চাই গণসাহিত্য, এই সকল ফরমাস্ না করিয়া যাঁহারা দেশে এই সাহিত্যের নবপ্রবাহ আনিতে চান তাঁহারা এই নূতন আদর্শের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া দেশের লোকের মুদ্রিত নয়ন উন্মীলন করুন। গঙ্গার মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য ভগীরথকে কোনও বক্তৃতা করিতে হয় নাই। তিনি তাঁহার অন্তরের প্রেরণা ও শক্তিবলে ভাগীরথীকে মহেশ্বরের জটা হইতে নামাইয়া মর্ত্ত্যে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাই তিনি আমাদের চির নমস্য। সেইরূপ এ যুগের কোন নব-সাহিত্যিক যদি এই নূতন আদর্শের সাহিত্যধারা প্রবাহিত করিয়া মৃতপ্রায় জাতিকে জাগাইতে পারেন তাঁহাকে আমরা বরণ করিব ও চিরদিন স্মরণ করিব। ইহাই তো চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টির উপায়, কিন্তু তাহা না করিয়া নিজের ইচ্ছামত ও ফরমাস্ মত এক অর্থহীন অস্পষ্ট লেবেল্ মারিয়া সাহিত্যের মধ্যে ইঁহারা যদি দলাদলি সৃষ্টি করেন তাহা হইলে দল সৃষ্টি হইবে, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি হইবে না। প্রগতিবাদী সাহিত্যিকদের নিকট আজিকার দিনে আমার ইহাই নিবেদন।

শ্রমিক আন্দোলনের গোড়ার কথা

শ্রীপ্রভাত চন্দ্র গাঙ্গুলী

আজকাল সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া যে শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে, এই বাঙ্গলাদেশেই তাহার জন্ম। ইংলণ্ডে যখন সবেমাত্র শ্রমিক আন্দোলন আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতেই বাঙ্গলাদেশের চিত্ততটে সেই আন্দোলনের তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করে। শ্রমিক আন্দোলনের মন্ত্র-গুরু যেমন ইংলণ্ডে রবার্ট ওয়েন ও রাস্কিন, বাঙ্গলাদেশেও তেমন সাম্যবাদের দার্শনিক ভিত্তি প্রথম স্থাপন করেন "বন্দেমাতরম" মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। "বঙ্গদর্শনে" ধারাবাহিক রূপে "সাম্য" নামে প্রবন্ধ লিখিয়া ও তাহার পর পুস্তকাগারে উহা প্রকাশ করিয়া বঙ্কিম সর্ব্ব প্রথমে সাহিত্যের মধ্য দিয়া "সাম্য" মন্ত্র প্রচার করেন। পরে আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী "সমদর্শী"তে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও কৃষ্ণকুমার মিত্র "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় সাম্যের গান শুনাইতে থাকেন। "সঞ্জীবনী"র মন্ত্র ছিল তখন "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা" এবং তখন সাম্যবাদ যদিও আত্মপ্রকাশ করে নাই, তবুও সঞ্জীবনী"র দল ছিলেন "রিপাবলিকান" পন্থী। এই "সঞ্জীবনী" পত্রেই প্রথম কুলি আন্দোলনের উদ্ভব হয়। শ্রমিক আন্দোলনের দার্শনিক আলোচনাতেই যে এই কর্ম্মীদলের কার্য্য নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে। কর্ম্মক্ষেত্রেও ইহাঁদের চেষ্টা কম ফলবতী হয় নাই। ৺দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বরাহনগরের ত্যাগীকর্ম্মী ৺শশিপদ বন্দোপাধ্যায়ই ভারতের শ্রমিক মঙ্গল অনুষ্ঠানের পথ প্রদর্শক।

শশিপদ বাবুর নানা মঙ্গল অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রমিক মঙ্গল অনুষ্ঠানগুলি ছিল প্রধান। বরাহনগর তখন বাঙ্গলাদেশের পাটকলের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল; এখনকার ন্যায় তখন পাটকলের এত বিস্তার হয় নাই। এই পাটকলের শ্রমিকরা তখন অধিকাংশই বাঙ্গালী ও স্থানীয় বাসিন্দার মধ্য হইতেই গৃহীত হইত। শশিপদ বাবু এই সমস্ত শ্রমিকদের জন্য নৈশবিদ্যালয় গড়িয়াছিলেন, বয়স্ক শ্রমিকদের মধ্যে সহজে জ্ঞান বিস্তারের জন্য ছায়াচিত্রে বক্তৃতার ব্যবস্থাও শ্রমিকদের পরস্পরের মধ্যে সৌজন্যবর্দ্ধনের জন্য ওয়ার্কিংম্যান ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপন করেন। তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে "ভারত শ্রমজীবি" নামে একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশ আরম্ভ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মিস্ কলেট তাঁহার প্রসিদ্ধ ইয়ারবুকে এই পত্রিকা সম্বন্ধে লিখিতেছেন "This Cheap Working class journal, now in its sixth year, has recently been enlarged in size and contains wood-cuts from English blocks" তখন এদেশে ব্লক প্রস্তুতের ব্যবস্থা ছিল না। শশিপদ বাবু বহু অর্থ ব্যয়ে ইংলণ্ড হইতে উডকাট ব্লক করাইয়া আনিয়া শ্রমিকদিগের এই পত্রিকার শোভা বর্দ্ধন করাইতেন। শ্রমজীবিদিগের মধ্যে সঞ্চয় বুদ্ধি প্রণোদিত করিবার মানসে শশিবাবু "ডিষ্ট্রিক্ট সেভিংস ব্যাঙ্ক" নামে একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। এই ব্যাঙ্কে এক আনা পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হইত বলিয়া পরে ইহা "আনা ব্যাঙ্ক" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আনন্দ মোহন বসু, সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রমিকদের সুবিধার জন্য সিটি কলেজ (মৃজাপুর ষ্ট্রীটে) গৃহে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পর বৎসর ভবানীপুর ও খিদিরপুরে এই স্কুলের শাখা স্থাপিত হয়। ইহাঁদের প্রচেষ্টার সুফল দেখিয়া মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ কর্ম্মী দক্ষিণ ভারতের বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত ৺বীরেশলিঙ্গম পান্টালু মান্দ্রাজে র‍্যাগেড স্কুল নামক শ্রমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন; বোম্বাই সহরে মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, সাপুরজী সোরাবজী বাঙ্গালী ও দয়ালদাস রতনসি ও আহামাদাবাদে ভোলানাথ সারাভাই, রনছোড় লাল ছোটে লাল, মহীপৎরামরুপরাম নীলকণ্ঠ ও শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা শ্রমিক মঙ্গল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলেন।

এই সময়ে একটি সূত্রে প্রথম শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ৺রামকুমার বিদ্যারত্ন প্রচার উদ্দেশ্যে উত্তর আসাম যখন পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি আসামের কুলিদের দুর্দ্দশার কিছু আভাষ পান এবং কলিকাতায় আসিয়া বন্ধু মহলে জ্ঞাপন করেন। শ্রমিক ও বিপন্নের বন্ধু ৺দ্বারকানাথের প্রাণ কুলিদের জন্য কাঁদিয়া উঠে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ কুলিদের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য আসামে গমন করেন। আসামের চা'বাগানগুলি তখন অত্যন্ত দুর্গম ছিল। দ্বারকানাথ কুলি সাজিয়া চাবাগানে প্রবেশ করিয়া কুলিজীবন সম্বন্ধে বহুতথ্য সংগ্রহ করেন। এই কার্য্যে তাঁহার জীবন অনেক বার বিপন্ন হয়। ফিরিয়া আসিয়া দ্বারকানাথ "সঞ্জিবনী" পত্রে কুলি-কাহিনী ও "বেঙ্গলী" নামক ইংরেজী

দৈনিকে "Slave trade in Assam" নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন।

যখন দিনের পর দিন তাঁহার অলস্ত লেখনী হইতে অগ্ন্যুদ্গম হইতে লাগিল, তখন দেশময় মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন গৃহে সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকারের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয় সেই সময়ে আসামের কুলিদের অবস্থা বলিয়া সম্মেলনীর উদ্যোক্তারা বিবেচনা করাতে সভার প্রথম প্রস্তাব এই সম্পর্কেই হইবে স্থির হয় ও আসাম অঞ্চলের প্রতিনিধি শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালের উপর এই প্রস্তাব উথাপনের ভার দেওয়া হয়। বিপিনবাবু অপূর্ব্ব বাগ্মীতার সহিত ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিন আইনের বলে ষ্ট্যাম্প-হীন, রেজিষ্টারিবিহীন মৌখিক চুক্তির বলে কুলিদিগকে দাসরূপে খাটাইয়া লইবার অধিকার চা-করদের কিরূপে জন্মিয়াছে ও তাহার ফলে কুলিদের কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা বুঝাইয়া বলেন ও এই প্রথার উচ্ছেদের জন্য আবেদন করেন।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বিপিন বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং কি করিয়া আড়কাটিদের হাত হইতে বহু কুলিকে রক্ষা করা হইতেছে তাহার বর্ণনা প্রদান করেন। মেদিনীপুরের রামকুমার জানা নামক এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকের পরিবর্ত্তে কুড়ি বৎসর বয়স্ক অন্য একজন লোককে শিয়ালদহের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রামকুমার রূপে হাজির করিয়া এক আড়কাটি চুক্তি পত্র রেজেষ্ট্রি করিয়া লইয়া রামকুমারকে সে চুক্তির বলে চালান দিতে গিয়া ধরা পড়িয়া কুষ্টিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক কি ভাবে দণ্ডিত হয়, তাহাও বর্ণনা করেন। দ্বারকাবাবু এই প্রসঙ্গে ডিব্রুগড় অঞ্চলের মাসিজাল চা বাগানের ম্যানেজার অ্যানডিং সাহেবের বিচারের উল্লেখ করেন। ঐ বাগানের দুইশত কুলি ও কুলি রমণীকে একদিন ক্রুদ্ধ হইয়া অ্যানডিং বেত্রাঘাত করে। এই বেত্রাঘাত এতই নির্ম্মম হইয়াছিল যে, চারিজন কুলি তাহার ফলে মৃত্যু বরণ করে। এই গুরু অপরাধের জন্য অ্যানডিংএর মাত্র তিনমাস জেল ও আড়াই শত টাকা জরিমানা হয়।

এইরূপ বহু তথ্য দ্বারকানাথ আসাম হইতে সংগ্রহ করিয়া ইণ্ডিয়ান এ্যাসো-সিয়েশন হইতে বাঙ্গলা সরকারের নিকট এক মেমোরিয়াল প্রেরণ করেন। সেই মেমোরিয়াল হইতেও কিছু কিছু অংশ সভায় পঠিত হয়।

তাহার পর হাজারিবাগের উকিল হারিচাঁদ মৈত্র ও গিরিডির কালীকৃষ্ণচন্দ্র সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া তাঁহাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

সভাপতি মহাশয় সভার শেষ বক্তৃতায় এই প্রসঙ্গে বলেন যে, "I have to congratulate you that in your very first resolution you have advocated the cause of the labourers in the tea gardens of Assam; I do not call them coolies' for I hate the name "Coolie" being applied to human beings; in passing this resolution you have given unmistakable indication of the sympathy, humanity and philanthropy which should be the guiding and animating principle of all men both as individuals and as forming communities."

এই সম্মেলনের আর একটী প্রস্তাবও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় বলিয়া যাহা স্থির হইয়াছিল, তাহাতে কুলির অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রস্তাব ছিল না। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় প্রস্তাব করেন যে এই সম্মিলনী হইতে কংগ্রেসকে এই বিষয়টি আলোচ্য বিষয়ের তালিকাভুক্ত করিয়া লইতে অনুরোধ করা হউক। দ্বারকানাথ গঙ্গো-পাধ্যায় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রাদেশিক বলিয়া আলোচনা করিতে নারাজ বলিয়া কংগ্রেস যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার তীব্র প্রতিবাদ দ্বারকানাথ করেন। তিনি বলেন যে, প্রশ্নটি মোটেই প্রাদেশিক নহে। কারণ, আসামের কুলিদের শতকরা ২৭ভাগ পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ হইতে ও পাঁচ ভাগ মাদ্রাজ হইতে সংগৃহীত হইত। আসামে পনেরো হাজার মাদ্রাজী ও ছয়শত বোম্বাই বাসী কুলি সে সময়ে ছিল, তাহার প্রমাণ সভায় দ্বারকানাথ প্রদান করিয়া এই যুক্তির অবতারণা করেন যে, এই সমস্যা সর্ব্বভারতের সমস্যা এবং সেইজন্য কংগ্রেসের তাহা গ্রহণ করা উচিত।

রহিমতুল্লা সিয়ানীর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন কলিকাতা নগরীতে হয়। এই সভায় চা-বাগানের কুলিদের দাসত্ব মোচনের জন্য সর্ব্বপ্রথম আলোচনা কংগ্রেস হইতে হয়। বাঙ্গলার অন্যতম কংগ্রেসী নেতা ও স্থাপয়িতা দ্বারকানাথ বারো বৎসর পূর্ব্বে যে আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কংগ্রেস সে আন্দোলনের যৌক্তিকতা এই অধিবেশনে স্বীকার করিলেন। এই প্রস্তাব উথাপন করেন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। তিনি বলেন যে, আসামের কুলিজীবন সম্বন্ধে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। কুলি-জীবন দুর্ব্বিষহবোধে তিনি কুলি নর-নারীকে ষ্টীমার হইতে ব্রহ্মপুত্রে ঝাপাইয়া পড়িতে দেখিয়াছেন। এমন দুর্ব্বিষহ

...রোক্রান্ত জীবন বোধ হয় পৃথিবীর কুত্রাপি ...ই। আসামের ন্যায় অস্বাস্থ্যকর ও ...রেস্থিত প্রদেশে কুলিদিগকে আটক ...খিবার ব্যবস্থা না থাকিলে ...দেশে শ্রমিক পাওয়া ...ায় অসম্ভব হইবে এবং এদেশের একটি ...র্দ্ধমান শিল্প নষ্ট হইয়া যাইবে—এই অজুহাতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এক আইনের বলে আসামে যাইতে স্বীকার করার পর কোনও কুলি যাইতে অস্বীকৃত হইলে কিম্বা বাগিচা হইতে পলায়ন করিলে অথবা বাগিচায় প্রদত্ত কাজ করিতে অস্বীকৃত হইলে—এই সমস্ত দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং কুলিদিগকে এই অপরাধগুলির জন্য আদালতে অভিযুক্ত করিয়া দণ্ড দেওয়া হইতে থাকে। পরে আর একটি আইনের বলে পলায়নপর কুলিদের পুলিশ দিয়া ধরিয়া বাগানের ম্যানেজারের হস্তে সমর্পণ করার ব্যবস্থা হয়। এগুলি অত্যন্ত বর্ব্বর প্রথা। কুলিদের বেতনও অত্যন্ত কম এবং কুলিদিগকে যখন তখন কারণ অকারণে প্রহার করা হইয়া থাকে। এই নির্ম্মম প্রথার এখনই অবসান হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও ললিতমোহন ঘোষাল চা-বাগানের কুলি দের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব সমর্থন করেন।

এইরূপ আন্দোলনের ফলে আসামের চীফ্ কমিশনার স্যার হেনরী কটনের দৃষ্টি কুলিদের দুর্দ্দশার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও তিনি কুলিদের দাসত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য অনেকগুলি আইন প্রণয়ণ করেন। তাঁহার চেষ্টাতেই "ইণ্ডেঞ্চার সিষ্টেম" উঠিয়া যায় ও আড়-কাটির অত্যাচার বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়। কুলিদের দুঃখ মোচনে তাঁহার এই প্রচেষ্টার ফলে তিনিই ইংরেজ মহলের অপ্রীতির কারণ হন কিন্তু ভারতবাসী তাঁহার প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা অপর্ণের জন্য ও তাঁহাকে জাতীয় মহাসভার সভাপতিরূপে বরণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

আজকাল শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে বড় বড় কথা শুনা গেলেও শ্রমিকদিগের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে ও জীবনের আশঙ্কা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সেবা করিতে দ্বারকানাথের মত একজনকেও আজকাল পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ইহার পর বিংশ শতকের প্রারম্ভে বাঙ্গলা দেশে পাটকল, মুদ্রাযন্ত্র, রেল ও ট্রাম প্রভৃতির শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া শ্রমিক ইউনিয়ন সৃষ্টির চেষ্টা চলে। ফোর্ট—গ্লষ্টার জুট মিলে একহত্যা কাণ্ডের সংশ্রবেই প্রথম পাটকলের শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ হইবার জন্য একদল কর্ম্মী চেষ্টা আরম্ভ করেন। সেই কর্ম্মিদলই ট্রামওয়ে ইউনিয়ন, প্রিণ্টাস ইউনিয়ন, রেলওয়ে ইউনিয়ন প্রভৃতি গঠনে যত্নবান হন। এই দলের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জনেরই চেষ্টা উল্লেখযোগ্য—৺প্রভাত কুসুম রায়চৌধুরী, ৺জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায় ৺রজত নাথ রায়, ৺প্রেমতোষ বসু, নিশীথ চন্দ্র সেন ও অশ্বিনী কুমার বন্দোপাধ্যায়। ইঁহারা সকলেই কংগ্রেসকর্ম্মী ও এক প্রেমতোষ বাবু ভিন্ন সকলেই ব্যবহার-জীবি। ইঁহাদের কার্য্য প্রসার লাভ করে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে। গান্ধী আন্দোলন আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে নারী শ্রমিকদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য ঝরিয়া অঞ্চলে দুইজন প্রসিদ্ধা নারী গমন করেন—একজন হইলেন বাঙ্গলার প্রথমনারী গ্র্যাজুয়েট কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও অন্যজন তদীয়া বান্ধবী সুবিখ্যাত মহিলাকবি ৺কামিনী রায়। তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের ফল "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

গান্ধীযুগের প্রারম্ভে শ্রমিক আন্দোলনকে যাঁরা ব্যাপক করিয়া তুলেন তাঁহাদের মধ্যে স্বামী দীনানন্দ, স্বামী বিশ্বানন্দ, জগদীশ চন্দ্র সেন, রামযশ আগরওয়ালা, কিরণচন্দ্র মিত্র, রাধারমণ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জ্জি, ৺কিশোরী মোহন ঘোষ, সন্তোষ কুমারী গুপ্তা ও প্রভাবতী দাশ গুপ্তার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আজকাল অগণিত কর্ম্মী আসিয়া শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু আজ এই প্রবন্ধবর্ণিত শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম স্রষ্টাদের স্মরণ না রাখিলে অন্যায় হইবে। ইঁহাদের ত্যাগে, ইঁহাদের প্রভাবেই আজ শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হইয়াছে। আমরা ইঁহাদের শ্রদ্ধার সহিত স্মরণকরি ও আমাদের অর্ঘ অর্পন করি।

—কলেজের ছেলে, কলেজের মেয়ে—

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

কলেজের ছেলে, কলেজের মেয়ে দিব্য আরামে থাকো!
তোমাদের দেখে ঈর্ষা করিলে, দুঃখিত হ'য়ো নাকো!
ভাবনা বিহীন দিবস, রাত্রি, খুসির আমেজে ভরা,
নূতন প্রেমের আভাসে রঙীন স্বপন-মধুর ধরা;
নাহিক' চিন্তা অর্থের তরে, চ'লে আসে মাসে মাসে,
সকালে ঝোঁকে উঠে চ'লে যাও ডবল-ডেকার বাসে!
নগরীর যত সুখ,
তোমাদের রূপ-দৃষ্টি লভিতে হ'য়ে আছে উন্মুখ!

সমুখে রয়েছে ভবিষ্যতের আলো-ঝলমল আশা,
রাজা বাদশার সম্ভাবনাই মনে বাঁধিয়াছে বাসা!
এখন পেয়েছ বাতাসে আকুল দক্ষিণ-খোলা ঘর!
সেরা দাম দিয়ে সেরা প্রসাধন করিছ অতঃপর!
ফার্পো, পেলিটি, চাঙোয়া, এবং চায়ের দোকান যত,
নিউ মার্কেট, টকি, থিয়েটার, সবি করতলগত!
সখ ক'রে দল বেঁধে,
চলো বোটানিকস্: সোদপুরে কারো বাগানেতে
খাও রেঁধে!

যে দিবসগুলি পেয়েছ আজিকে নির্ভাবনায় ঘিরে,
জমিদারী আর জজীয়তীতেও পাবেনা তা আর ফিরে!
আমাদের দিন কাটিয়া গিয়াছে! তোমাদের দেখে কাঁদি!
তোমাদেরও দিন কেটে গেলে, সুর ধরিবে এমনি 'বাঁধি'!
অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে এ শিক্ষা হ'ল কসা,—
বাঙালী জীবনে কলেজ-লাইফ বৃহস্পতির দশা!
যতদিন বেঁচে রবে,
এমনটি সুখ, এতটা ফূর্ত্তি, কখনো আর না হবে।

কত-কি কিনিছ,—ছবি ও কাগজ, কত-কি দেখিছ খেলা!
গড়ের মাঠের মত প্রাণ,—নাই সরিষা-ফুলের মেলা!
টিনের দালানে, খড়ের কুটীরে, যে টাকা জমিয়া ওঠে,—
ট্যাক্সি ও ট্রামে, প্রেজেণ্টেশনে, তাই অপাত্রে লোটে!
ভালো আছ ব'লে হিংসা হ'লেও, দুঃখও বুকে জাগে,—
দেহ-মন-ধন অপচয় হেরি মরমে আঘাত লাগে!
বাঙালীর ছেলেমেয়ে!
তোমাদের পিতামাতার সঙ্গে দেশ আছে মুখ চেয়ে!

দুলে দুলে আজ চ'লে যাও পথে, জীবনটা নয় দোলা!
অবহেলাভরে ছড়াইয়া যাও চীনাবাদামের খোলা!
ধুতি-শাড়ী আর পাদুকা-বাহার,—আহারেতে রাজকীয়,
বোহেমিয়ানের উচ্ছৃঙ্খল জীবন এতই প্রিয়?
যেদিন সাঙ্গ হবে পড়া, ট্রাঙ্ক্ বাক্স বেডিং সাথে
চ'লে যেতে হবে,—ফিরে যেতে হবে, মাটি-ভরা আঙিনাতে!
ছাউনীতে ঢেকে মাথা,
প্রাসাদ-সমান হোষ্টেল স্মরি ভিজিবে চোখের পাতা!

এই রাজধানী, এ তোমার নয়, অবহেলা-ভরে!
কি করেছ পণ তাহারে তোমার করিয়া আপন তরে?
যত প্রবাসীর হর্ম্ম্যমালায় তোমার আবাস চাহ,
সেই তাহাদেরি অধীনে তোমার ভিক্ষাপাত্র মাগ!
এ তোমার নয়,—তোমার কেবল রূপালি নদীর পারে
শ্যামছায়াঢাকা গ্রামটি, ডাকে যা ভোরের অন্ধকারে!
[illegible]
কলেজের ছেলে, কলেজের মেয়ে, বলো কী
করিতে পারো?

——০:*:০

কথা সাহিত্যের বর্ত্তমান রূপ

শ্রীপ্রিয়লাল দাস

পশুত্ব থেকে মানুষ মনুষ্যত্বের পদে উন্নীত হয়েছে মনের বিকাশের ফলে—এ কথা জ্ঞানী মনীষী প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। তারপর উন্নত মন দিয়ে মানুষ ধর্ম্ম তৈরি করেছে, সমাজ গঠন করেছে এবং তাদের রক্ষাকল্পে রাষ্ট্রের পত্তন করেছে। ফলে মানুষ বাঁধা পড়েছে স্বকৃত বন্ধনে। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পথ ধরেই তাকে চলতে হচ্ছে গ্রহ নক্ষত্রের মত। পশু পাখীর মত যা তা করতে, যে সে পথে চলতে সে পারে না। নদীর জলের স্রোতের মত আনুষ্ঠানিক নিয়মতান্ত্রিকতার ধারায় কালক্রমে মানুষ হয়ে পড়েছে অভ্যস্ত। রীতি নীতি কঠোরতা হয়ে গেছে অনেকখানি সহজ। অনেক নির্দ্দেশের ব্যাখ্যা ও সত্যতা নিয়ে সে আর প্রশ্ন করে না। চুরি করা অপরাধ, পিতা মাতা ভক্তির পাত্র, এ সব সে নির্ব্বিচারে মেনে নিয়েছে।

মানব মনের প্রাথমিক উন্নতির পর এই ভাবেই জগৎ চলে আসছে যুগের পর যুগ ধরে। কদাচ কোন কোন অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে মাঝে মাঝে এক একটা আলোড়ন দেখা দিয়েছে। কিন্তু মানব ইতিহাসের সমগ্র রূপটি বদলায়নি, আংশিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে মাত্র।

তারপর আজ বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ। একি মানব-ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়? কেউ বলেন হাঁ, কেউ বলেন, না। রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, সমাজে আজ যে পরিবর্ত্তনের সূচনা দেখা দিয়েছে কেউ কেউ বলেন এ আমূল পরিবর্ত্তনের লক্ষণ। রাষ্ট্রক্ষেত্রে আজ রাজ-দেবতার আসনে গণদেবতা উপবেশন করেছেন। রাজা তাঁরা হতে চান না। রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সকলে সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে জগতের বারো আনা অশান্তির মূল দারিদ্রের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চান। জগৎ জুড়ে ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে ঐ একই বিপ্লব উপস্থিত। ইউরোপের যুবক সম্প্রদায় আজ বাইবেল, গীর্জ্জা এবং পোপের আধিপত্য অস্বীকার করতে বসেছেন। তাঁরা বলেন "In question of religion and morality no authority can exist outside the mind and conscience of the individual." তাঁরা বলেন "Voice of conscience is the voice of God." অন্যত্র সুস্পষ্টভাবে এই আন্দোলন আরম্ভ না হলেও এই মনোভাব জগতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে, ভালমন্দ তত্ত্বালোচনায় শাস্ত্রোক্ত নির্দ্দেশ অপেক্ষা ব্যক্তিবিশেষের মন এবং বিবেকের অনুজ্ঞাকেই আজ উচ্চ স্থান দেওয়া হচ্ছে। সামাজিক ব্যাপারেও তাই। কালের কঠোর হস্ত রীতিনীতির বাঁধনের উপর দারুণ আঘাত সুরু করেছে। চিরাচরিত সম্বন্ধের ধারণা, আত্মীয়তার ভেদাভেদ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে চলেছে। সনাতন নিয়মের বাঁধা পথে সমাজ আর চলতে চায় না। যে মঙ্গল সাধনের জন্য বিধি বিধান তৈরি হয়েছিল তাতে কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণই হচ্ছে, সম্মুখের দিকে এগিয়ে না দিয়ে তারা পিছনের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে ইহাই এই নবযুগের যাত্রীদিগের ধারণা। যে পুরাতন মতবাদ বাধা দিচ্ছে সে হচ্ছে তাঁদের কাছে অসার ও অকিঞ্চিৎকর। সে হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী। কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে ধর্ম্মে সমাজে মানুষ হবে সম্পূর্ণ মুক্ত বাইরের এবং মনের দিক থেকে। বিন্দুমাত্র বন্ধনও সে সহ্য করতে চায় না। বন্ধনোন্মুখ পুরাতন নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে চুরমার করে দিতে সে আজ দ্বিধা বোধ করছে না।

এক সময়ের মনের মত করে গড়া

ধর্ম্ম ও সমাজ আজ তার মনঃপুত নয়। সে তাকে নূতন ছাঁচে ঢেলে নূতন করে গড়তে চায়। এই ভাঙা-গড়ার খেলায় যত অশান্তি যত বাধা বিঘ্নই বর্ত্তমানে দেখা দেয় না কেন ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল এই তার বিশ্বাস, অমঙ্গল রাত্রি শেষে মঙ্গল প্রভাত দেখা দেবে এই তার ধারণা।

এই সব নবচিন্তা ধারা উচ্ছসিত বন্যাধারার মত আজ বইতে সুরু করেছে কথা সাহিত্যের ভেতর দিয়ে। কাজেই কথা সাহিত্য এখন আর কথার কথা মাত্র নয়। ষোল বছরের নায়ক ও তের বছরের নায়িকার তরল লঘু প্রেমের কাহিনী সে আর বয়ে বেড়ায় না। শিক্ষিত বয়স্থ নরনারী জীবন সমস্যার বিশাল বোঝা মাথায় নিয়ে কথা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে আজ অবতীর্ণ। তাদের বিচার শক্তি, তাদের বিবেক, তাদের স্বাধীন মন হচ্ছে তাদের জীবনের পথ প্রদর্শক আর তাদের সাহায্য করছে আধুনিক মনোবিজ্ঞান। তন্ন তন্ন করে ভাগ করে বিশ্লেষণ করে সে বুঝিয়ে দিচ্ছে যা তোমরা কাজে লাগাও তোমাদের ব্যবহারিক মন যেটুকু অসমগ্র মনের অল্পাংশ মাত্র। বৃহত্তর অংশ আছে অন্ধকারে ডুবে। সেই অন্ধকারের অতলতা থেকে যে নির্দ্দেশ মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে তারও কার্য্যকারিতা আছে। তাকে অগ্রাহ্য করা মানে মানে মানবধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করা। অবশ্য, এর যে কোন অপপ্রয়োগ হচ্ছে না তা নয়। যেমন একখানা পুস্তকে আছে সুখে স্বচ্ছন্দে এক দম্পতি ঘর সংসার করছে হঠাৎ স্ত্রীটির মনে পড়ল তার কোন বাল্য-বন্ধুর কথা। অমনি ঘর সংসার পুত্র কন্যাদি ছেড়ে চলে গেল তার কাছে। এইটাই নাকি তার জীবনের গোপন সত্য এবং সবচেয়ে বড় সত্য—যাঁরা অবহেলা করলে তার জীবনকেই অবহেলা করা হবে। যাই হোক শুধু বহি—প্রকৃতির নয় অন্তর প্রকৃতিরও সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত আজ সাহিত্যের পাতায় ফুটে উঠেছে।

পুরাতনীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাঁরা বলেন সেই আদিম যুগে মানুষের মনও প্রবৃত্তি যে অবস্থায় ছিল এখনও সেই অবস্থাতেই আছে। কোন উন্নতি হয় নি। কতকগুলি সামাজিক অনুশাসন তাদের দাবিয়ে রেখেছে মাত্র। আজ যদি সেই শাসন দণ্ড উঠিয়ে দেওয়া হয় দেখা যাবে প্রবৃত্তির দিক দিয়ে পশুতে মানুষে বিশেষ পার্থক্য নেই। সুদীর্ঘকালের রীতি নীতিতে অভ্যস্ত মানুষ এমন কি অতি বড় সাধু এখনও ঘুমের ঘোরে এমন স্বপ্ন দেখে যা লজ্জাকর ও প্রকাশের অযোগ্য। তাকে যদি সত্য গ্রহণ করা হয় এবং বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা হয় তাহলে সেই আদিম যুগেই ফিরে যাওয়া হবে।

এ সব বাদ প্রতিবাদের ন্যায্যতা অন্যায্যতার বিচার করবে ভবিষ্যৎ। কালের কষ্টিপাথরে কোনটা ঠিক তা স্থির হয়ে যাবে। আমাদের গর্ব্ব এই যে মানুষের চলার পথের নির্দ্দেশ দেবার ভার নিয়েছে আজ কথা সাহিত্য। কালকার কথা সাহিত্য—বয়স যার একশ বছরের বেশী নয়—ভাষা জননীর যে সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান—কিছুদিন আগেও যাকে সাহিত্যবলে গণ্য করা হবে কিনা বলে সুধীসমাজে বিচার চলছিল-আজ সে সর্ব্বেসর্ব্বা। এই সর্ব্বসর্ব্বা হবার যোগ্যতা সে সম্পূর্ণরূপেই লাভ করেছে। এখন সে আর রঙিন আকাশে ডানা বিস্তার করে উড়ে বেড়ায় না। বাস্তবের কঠিন কঙ্করময় ভূমিতে পায়ে হেঁটে বেড়ায়। কলকারখানা থেকে ধান পাটের মাঠ, ধনীর সুরম্য অট্টালিকা থেকে শ্রমিকের দুর্গন্ধ অন্ধকারময় বস্তির খোলাঘর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সে চলাফেরা করে। কোথায় কতখানি সুখ কতখানি দুঃখ তা সে মাপকাঠি দিয়ে মেপে মেপে পাঠক সমাজকে জানিয়ে দেয়।

এ জগতের সব কিছুই মানুষের জন্যে। তারা মানুষেরই সুখের যোগান দিয়ে থাকে। তার উন্নতিতে সাহায্য করে। কিন্তু অনেকস্থলে দেখা যায় তাদেরই চাপে মানুষ ছোট হয়ে যাচ্ছে। কোথায়ও প্রাচুর্য্যের ভারে, কোথায়ও অভাবের তাড়নায়, কোথায়ও সমাজের কঠিন হৃদয়-হীনতায়, কোথায়ও ধর্ম্মের অত্যুগ্রতায়। এই দুঃস্থ অবস্থাকে নিপুনভাবে এ কে সর্ব্ব সাধারণের সুমুখে ধরছে কথা সাহিত্য ক্লিষ্ট পিষ্ট সমাজের দুঃখ বেদনাকে ভাষা দিচ্ছে কথা সাহিত্য। কথা সাহিত্য হয়েছে আজ মানব সমাজের হৃদয়মনের আলেখ্য।
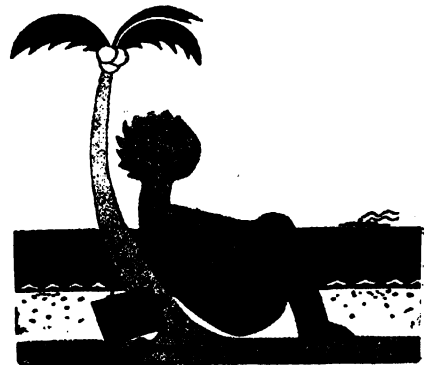
জীবন-ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস

অফিস থেকে এসে জল-যোগান্তে একটু বিশ্রাম করছি, আমার মেয়ে কমলা হাসি-মুখে ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে বল্‌লে, আজ একটা জিনিষ পেয়েচি বাবা, আচ্ছা বল দিকিনি কি?

এক মুহূর্ত্ত চেষ্টার ভাণ করলুম, বল্‌লুম, আন্দাজ করতে পার্‌লুম না মা।

সে আমার হাতটা নিয়ে আদর ক'রে বল্‌লে, যদি জিনিষটা দেখাই তা হ'লে আমায় কি দেবে বল?—ব'লেই আঁচলের একটি লকেট আমার হাতে দিল।

—এ তুই কোথায় পেলি মা? আর এটা যার ভেতর ছিল সে কৌটোটা?

—কৌটো ত কৈ দেখিনি বাবা, কাঠের বড় বাক্সটার ভেতর এটা ছিল, আজ গুছোবার সময় পেয়েচি।

হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, কৌটোটা অনেক-দিন আগেই নষ্ট হ'য়ে গেছে।

—এটা কার বাবা?

—এর একটা ইতিহাস আছে মা, তবে বলি শোন্।

আমরা তখন শান্তিপুরে থাকি।

সেদিন ছিল রবিবার। বিকেলে কয়েক-জন বন্ধু মিলে বাড়ীতেই আসর জমানো গেছে। আমি, অরিন্দম, শুভেন্দু, নবকৃষ্ণ আর বিমলদা'। কিসের একটা আলোচনা হচ্ছিলো, এমন সময় বিমলদা' গেল চোটে। তর্ক করবার সময় সে ধৈর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কথারও খেই হারিয়ে ফেল্‌তো। সেদিনও তাই হ'য়েছিল—তাই এক সময় সে গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে উঠে চলে গেল। শুভেন্দুর কিন্তু একটা বদ্‌-গুণ ছিল। বিমলদা' যত চট্‌ত, সে ততই হেসে কুটি-কুটি হ'ত।

বিমলদা' চলে গেলে সে একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে বল্‌লে, আচ্ছা, বিমলদা'র কি হ'ল বলত?

সকলকে স্তম্ভিত কোরে দিয়ে একটী মূর্ত্তি ঘরের মধ্যে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে বল্‌লে, আমারই মতন অবস্থা বোধ হয়!

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না?

এইবার চিন্‌তে পার্‌লুম। "আমায় চিন্‌তে পার্‌লে না" এই কথা বলার ভঙ্গীটি আমার পরিচিত। সেবারেও এসে বলেছিল, "চিন্‌তে পার্‌লে না?" এইবার নিয়ে তিনবার হ'ল। চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। আর হবারই কথা। অনেকদিন হ'য়ে গেল যে!

দেখ্‌লুম কাঁধের ঝুলিটি তার তেমনিই আছে—না, বোধ হয় আয়তনে একটু বড়ই হবে। বগলের বাঁশীটি কিন্তু এবার দেখতে পেলুম না। তার বদলে হাতে ছিল একটা বাঁশের লাঠি।

বল্‌লুম, সব কুশল ত?

শুধু ঘাড় নাড়্‌লে।

বল্‌লে, লোকটাকে ক্ষ্যাপালে কেন?

বুঝ্‌লুম বিমলদা'র কথা বল্‌চে।

তারপর শুভেন্দুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লে, এ লোকটার হাসিটা ভালো নয়।

শুভেন্দু তখন থ হ'য়ে গেছে।

আগন্তুক বল্‌লে, তোমরা মানুষ চিন্‌লে না? অথচ মন খুলে 'পারিনি' বল্‌তেও তোমাদের বাধে, এমনি তোমাদের অহঙ্কার। কিন্তু আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না। মানুষের দুদিনের কার্য্যকলাপ দেখে তার সম্বন্ধে একটা মতামত দাঁড় করাতে তোমাদের একটুও বাধে না, আশ্চর্য্য। অবাক্ হ'য়ে শুন্‌ছ কি? আমি তোমাদের তত্ত্ব কথা শোনাতে আসি নি। তারপর অরিন্দমের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে নিঃসঙ্কোচে বল্‌লে, এই লোকটা তোমাদের দলে কতদিন রয়েচে? একে একবার পুরীতে যেন দেখিছি ব'লে মনে হচ্ছে। কি হে সমুদ্রে যখন চুবনি খাচ্ছিলে মনে পড়ে?

সকলের দৃষ্টি অরিন্দমের মুখের উপর। তার মুখ তখন রাঙা হ'য়ে উঠেচে। আগন্তুক বল্‌লে, থাক্ থাক্, বড্ড এলোমেলো কথা বল্‌চি, না? দাও ত এক গ্লাস জল, বড্ড হাঁফিয়ে গেছি।

তাকে জল দেওয়া হ'লে সে এক নিঃশ্বাসে সমস্তটা নিঃশেষ কোরে গ্লাসটা আমার হাতে [illegible]তে ব[illegible]লে, রাগ ক'রলে?

তারপর একটু যেন কি ভেবে বল্‌লে, আজো আবার তোমায় ভোগাতে এসেছি... তারপর একটু থেমে বল্‌লে, ভয় নেই আজ আর কোথাও ছোটাবো না। মুখে সেই আশ্চর্য্য হাসি!

বল্‌লুম—আফিং?

—না, সে বালাই আর নেই—ছেড়ে দিয়েচি। একটু থেমে বল্‌লে, কিছু হাত-খরচা।

বল্‌লুম—আচ্ছা সে হবেখ'ন, আজ ত আর যাওয়া হচ্ছে না।

সে কিছুই না ব'লে আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে রইল। এ সেই দৃষ্টি—যার সামনে আমি আপনাকে হারিয়ে ফেলি। আজ ত এ নতুন নয়! এর আগে দুবার হ'য়ে গেছে। প্রথম যেবার এসেছিল, তখন আমার কৈশোর। হাতে একটা বাঁশের বাঁশী ছিল—সে বাঁশীর ফুঁয়ে ফুঁয়ে কি যে মধু ঝরেছিল সেদিন! তারপর সে যখন দ্বিতীয়বার এসেছিল—সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্যে—আফিং ফুরিয়ে গেছ্ল—তাই চাইতে। আর আজ, এই। এর সঙ্গে যেন আমার জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয়!

বোধ হয় মুহূর্ত্তের জন্যে অন্যমনস্ক হ'য়ে গেছলুম। আত্মস্থ হয়ে দেখি, বন্ধুদের সব পালিয়েছে, শুধু অরিন্দম নিতান্ত অপরাধীর মতন মুখ নিচু ক'রে চেয়ারটিতে ব'সে আছে।

হঠাৎ ছোট-ছোট একদল ছেলে-মেয়ে কোথা থেকে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দোর-গোড়ায় হল্লা করতে সুরু ক'রে দিয়েছে। অন্য সময় যাকে সব চেয়ে নিরীহ দেখি সেই মিণ্টুটাই কিনা বলচে, অজিতকা' পাগ্লাটা কোথায় গেল বলনা।

এর আগেরবারে এদেরই দাদা-দিদিদের এমনি কোরেই এর পেছুনে লাগ্তে দেখেছি। ছেলেদের এ সনাতন অভ্যাস! এতে দোষ দেওয়া চলে না। তবুও ধমক দিয়ে তাদের তাড়াতে হ'ল।

ছেলের দলকে রাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে দেখি, অরিন্দম সেইখানটিতে ঠিক একইভাবে ব'সে আছে—আর, আগন্তুক নেই। ঘরটা পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা—একটু বেশীই লম্বা। পশ্চিম দিকে জানালাও নেই, দরজাও নেই, বড় ঘুপ্সী-পানা। তাই এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে দিকটায় এখন আর দৃষ্টি চলে না।

হঠাৎ আর্ত্তনাদ ক'রে সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সেই আগন্তুক। দেখি ডান হাতের মুঠোয় একটা কালো সাপের মাথা। আর সেই ভুজঙ্গ নিজের দেহ দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে তার বাহুটিকে আলিঙ্গন ক'রেছে। তার বাঁ পায়ে বুড়ো আঙুলের গোড়া থেকে টস্‌টসিয়ে রক্ত ঝরছে।

মুখদিয়ে বেরুলো আমার—"অরিন্দম কাঁচিটা শীগগির।"

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছি, অরিন্দম তা এনে দিলে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আগন্তুকের হাতটাকে সাপটা তার সমস্ত অঙ্গ দিয়ে এমন নিবিড় ক'রে জড়িয়ে ধ'রেছে—যার ভেতর দিয়ে কাঁচি ত দূরের কথা একটা ছুঁচও চলে না। হাতের হাড়টা যেন এখুনি ভেঙ্গে যাবে এমনি অবস্থা।

উপায় কি!

আগন্তুককে বললুম তুমি মুঠোটা খুলে দাও, ওটা চ'লে যাক্।

সে ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে জানালে, তোমরা র'য়েচ যে। যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ করতে করতে বললে, বড্ড বিষ, ছেলেগুলো চলে গেছে? ওঃ ওরা আমাকে পাগল কোরে সেই যে আমার সঙ্গ নিয়েচে, আজ জীবন নিয়ে তবে ছাড়লে। তোমার কাছে হাত-খরচা কিছু নিতে এসেছিলুম, তাই দিয়ে আমার পথ-খরচা কোরো।

তারপর একবার ঘাড় তুলে নিজের হাতটার দিকে চেয়ে বললে, এটাকে ছাড়বার কথা বল্‌ছিলে? এখন ছেড়েও আর লাভ নেই। একটু থেমে বললে, যখন আফিং খেতুম তখন বেটা একদিনের তরেও ছোঁয়নি—তা হ'লে টের পেত।

অতি কষ্টে কথাগুলি শেষ ক'রে ঝিমোতে লাগলো। মনে হ'ল যেন আরো কি বলতে চাইছে। কিন্তু ঠোঁট দুটোই শুধু কেঁপে উঠলো, কথা আর বেরুলো না—শুধু ইঙ্গিতে দেখালে সেই ঝুলিটা।

কয়েকটা মুহূর্ত্ত ত শুধু! কিন্তু সে কী অপরিসীম মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার ছবিই না তার মুখে ফুটে উঠতে দেখেছি মা!

বললুম—অরিন্দম, মনেতে বল পাচ্ছি না, কাউকে ডাক না ভাই!

উত্তর যে দিলে সে অরিন্দম নয়, তোর মা। বললে, ঠাকুরপো আমায় ডেকে দিয়ে ওঝা ডাকতে গেছে, তারপর হঠাৎ আঁৎকে উঠে দু'পা পেছিয়ে গিয়ে বললে, ওঃ সাপটা যে ওকে জড়িয়ে রয়েচে!

বললুম, ঐ রকম কোরেই ওর শেষ হ'য়ে গেছে, আর ওঝা এসে কি ক'রবে?

তোর মা লণ্ঠনটা তুলে ধ'রে মুমূর্ষুর মুখটা দেখে বললে, এ যে চেনা মুখ গা,—এ সেই পাগলটা না?

তোর মাকে তখন তিরস্কার কোরে বলেছিলুম, পাগল বোলে আর সম্বোধন কোরো না ওকে, তাতে ওর অন্তরাত্মা শান্তি পাবে না। অসভ্য ছেলের দল ওকে ক্ষেপাবার জন্যে এসেছিল, ও তখন ঐ খোকের ভেতর চৌকির তলায় লুকিয়েছে। ছেলেদের যে ও এত ভয় করত তাতো আগে জানতুম না। ছেলেদের দিলুম তাড়িয়ে, তারপর ও বেরিয়ে এল এই কালকে হাতে জড়িয়ে। পা-টা দেখিয়ে বললুম, ঐখানে ও ছোবল বসিয়েছে।

দুজনে নিতান্ত অসহায়ের মতন মুমূর্ষুর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলুম। কতক্ষণ কেটেছিল জানি না, দেখি অরিন্দম হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলচে ভেতরে যাও বৌদি, ডাক্তার সাহেব এসেছেন, ওঝা একটু পরে আস্‌বে।

সাহেব রোগীর নাড়ী পরীক্ষা ক'রতে গিয়ে আঁৎকে উঠে, "O my lord, the devil is there" ব'লে একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ ক'রে পেছিয়ে এল ভয়ে। তারপর কোন রকমে একটু সাহস সঞ্চয় কোরে তাকে পরীক্ষা কোরে বললে Sorry, he has already expired.

ডাক্তার চ'লে গেল।

অরিন্দম বললে, সাপটা একটুও নড়েনি দেখেচ! ওটাও শেষ হ'য়ে গেল না কি?

বললুম—অরিন্দম, ওঝার অপেক্ষা কোরে কাজ নেই আর—কোমর বেঁধে ফেল। শেষে আমাদের হাতেই ওর কাজটা সারা হবে কে জানত!

আমাদের হাতের নাড়া পেয়ে দেখি, সাপটা আলগা হ'য়ে গেল—নাঃ, ওটাও নিঃশেষ হ'য়ে গেছে।

মানুষেরও একটা বিষ আছে শুনেছি এ হয়ত তারই ক্রিয়া! দেখলুম মুখটা ওর থেতো হয়ে গেছে।

চিতার কাঠটা ঠেলে দিতে দিতে অরিন্দম বললে, পুরীতে সে যখন ডুবে যাচ্ছিলো তখন সেইই নাকি ওকে বাঁচিয়েছিল। ঈশ্বরের কি বিচিত্র লীলারহস্য মা!

দাহ ক'রে যখন ঘরে ফিরলুম তখন ভোর হ'য়ে গেছে।

দুর্ব্বহ কেরাণী জীবনের উপর নিদারুণ অভিসম্পাতের মত মা ধীরে ধীরে উদয় হ'ল আর একটি সোমবারের সকাল—নিতান্ত একঘেয়ে একটানা। কিন্তু সেদিন আর অফিসে যাইনি মা। ঝুলিটা কাছে নিয়ে বসলুম, তোর মাও পাশে এসে ব'সলো। তা থেকে বেরুলো একটা আফিংএর কৌটো, একটা পেন্সিল, একটা ছুরি, একটা আধ-পোড়া চুরুট, খান দুই কাপড়, একটা ছেঁড়া গেঞ্জি, আর একটি কৌটো আর ন্যাকড়া-জড়ানো বইয়ের মত কি একটা জিনিষ।

অনেকগুলো কাপড়ের ফালি জড়ানো—ভাজের পর ভাজ খুলেই চলেছি—শেষে ফালির চেয়েও বেশী কাগজ-জড়ানো যা বেরুলো, তা বইও নয় খাতাও নয়—একখানা ভাজ করা কাগজে কি লেখা। এরই এত যত্ন? আশ্চর্য্য!

কিন্তু না, বিস্ময়ের ঢের বাকী ছিল তখনো।

মেয়ে বললে, চিঠিতে কি লেখা ছিল বাবা?

—চিঠিত নয় মা, ওটা এমনিই একটা লেখা, ঠিক ডায়েরী বলাও চলে না।

"হেডিং"এ লেখা ছিল—আমার জীবনের কয়েক পৃষ্ঠা

—সেটা কোথায় বাবা?

—সেটা থাকতো আমারি বাক্সে মা, তোর মা তাকে যত্ন কোরে একখানা গীতার ভেতর রেখে দিয়েছিল—অনেকদিন আর তা দেখা হয়নি, আচ্ছা দেখত মা আমার বাক্সটা।

কমলা উঠে গেল।

মিনিট কয়েক পরে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে বল্লে, পেয়েছি বাবা, গীতার ভেতরেই ঠিক ছিল ত?

বললুম, তোর মা ছিল—যাকে বলে সাক্ষাৎ গৃহলক্ষ্মী, কোন কাজে কখনো অবহেলা দেখিনি। আচ্ছা, পড়ত মা শুনি।

—তুমিই পড়না বাবা।

তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললুম, বাবার মুখে গল্প শুনতে খুব ভালো লাগে, না?

কমলা তার ডাগর চোখদুটি আমার মুখের উপর তুলে ঘাড় নাড়লে।

বললুম, তবে পড়ছি শোন্।

আমার যক্ষ্মা হ'য়েছিল—রাজযক্ষ্মা। হোমিওপ্যাথি, য়্যালোপ্যাথি, কবরেজী প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্র মন্থন ক'রে যখন একটুও সুধা উঠল না, যখন ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-হোম-যজ্ঞ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ও নৈষ্ঠিক ক্রিয়াকলাপেও কোন সুফল ফলল না, যখন পুরী, সিমলা, আলমোরা, নাইনীতালেও আমার মধ্যে মন্দ ছাড়া ভালো কোনো পরিবর্ত্তনই আনতে পারলে না, তখন আমার শুভার্থীরা আমার আশা একরকম ছেড়েই দিলে। আর ভুগে ভুগে আমারও মনের অবস্থা এত খারাপ হ'য়েছিল যে, দিনরাত কেবল মৃত্যু-কামনা করতুম।

কিন্তু না চাইতেই যা জীবের কাছে আসে একদিন, আমি কায়মনোবাক্যে চেয়েও তা পাইনি।

আমার খুড়তুতো দাদা ছিলেন পাটনার য়্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জেন। তাঁর উপরে যিনি ছিলেন, তিনি সাহেব। এই সাহেবটি ছিলেন রিসার্চ স্কলার। দাদা ছিলেন তাঁর খুব প্রিয়।

তিনি বল্লেন তোমার ভাইকে আমি দেখতে চাই। তখন পাঁচ বছর ভোগা হ'য়ে গেছে। কিন্তু অত ভুগেও শরীরে তখনো একটু বল ছিল। যাওয়া গেল পাটনায়। সাহেব বললে, ১৮ বছরের মিয়াদ—অর্থাৎ কপালে আরো তেরটা বছরের দুর্ভোগ!

তারপর এক অলৌকিক ঘটনা।

পাটনায় হাসপাতালেই শুয়ে আছি। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। বোধহয় অমাবস্যার কাছাকাছিই কি একটা তিথি হবে। চৈত্র মাস। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি তেমন চলে না। যেন অন্ধকারের তৈরী একটা প্রকাণ্ড দেওয়ালে দৃষ্টি আমার বাধা পেয়ে ফিরে আসছিল।

তারপর কখন তন্দ্রা এসেছিল জানি না—দেখলুম জটাজুটবিলম্বিত এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী মূর্ত্তি, গলায় ও বাহুতে মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, বাম হাতে সুদীর্ঘ এক ত্রিশূল সিঁদুর মাখানো।

তিনি যেন বললেন, আমি ত্রিকুট পাহাড়ে থাকি—সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করিস। ব্যস্ তারপর উধাও। বিছানা থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। ঠিক স্মরণ করতে পারলুম না, ঘুমিয়ে

ছিলুম, না, জেগেছিলুম। মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। দেখাই যদি পেলাম, তো কবে কোন্ সময় কোন্ জায়গায় দেখা হবে, কিছুই জান্তে পারলুম না কেন ?

পরদিন একথা দাদাকে বললুম। তিনি বললেন, ও স্বপ্ন। স্বপ্ন কখনো সত্য হয় না। তবে, মনে যখন তোর একটা ধোকা লেগেছে, তখন ঘুরেই না হয় আয় একবার, জায়গাটাও তো দেখা হবে।

দাদাই আয়োজন ক'রে দিলেন ত্রিকূট যাবার। সঙ্গে একজন লোক দিলেন। বৈদ্যনাথধাম ষ্টেশনে লোকটির হাতে কিছু দিয়ে বললুম বাবা বৈদ্যনাথজীকে দর্শন কোরে বাড়ী ফিরে যাও। আমার সঙ্গে যেতে পাবে না।

লোকটা হাতে পায়ে ধ'রে খুব কাঁদাকাটা করতে লাগলো, বললে ডগ্‌দর বাবুকো হাম্ কেয়া বোলে গা বাবুজী ? অর্থাৎ কি কৈফিয়ৎ দেবো ইত্যাদি। যেতে কিছুতেই চায় না। শেষে দশ টাকার একখানা নোট ঘুস্ দিয়ে খুব বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় করলুম।

কিন্তু আশ্চর্য্য ত্রিকূটে গিয়ে যেন দ্বিগুণ বল পেয়ে গেলুম। হ'য়ত মনেতেই পেয়েছিলুম।

যে-পথ দিয়ে সাধারণতঃ সকলে ওঠে পাহাড়ে—তারই আরম্ভ যেখানে, সেখানে একটি মন্দির আছে। আর মন্দিরের পাশেই ঝরণা। ঝরণাটা যে কোথা থেকে আরম্ভ হ'য়েচে তা কেউ বলতে পারে না। পাহাড়ের পাদমূলে যে জায়গাটার কথা বলচি সেখানে এর মুখটা বাঁধিয়ে দেওয়া হ'য়েচে। এই স্বচ্ছতোয়া ঝরণার কোলে ব'সে কি ভাবচি এমন সময় একটা ১৫।১৬ বছরের পাহাড়ী ছেলে এসে বললে, বাবু গাইড ?

পাহাড়ে যে গাইড দরকার হয় তা আমি ভুলেই গেছলুম।

সে আমার ইতস্ততঃ করতে দেখে যা বল্লে, তার সার মর্ম্ম হ'চ্ছে এই যে, শীগগির সন্ধ্যে হবে। আর সন্ধ্যের পর থেকে এখানে বাঘের উপদ্রব হয়, সুতরাং একজন গাইডের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

আমি বললুম তোমরা বাঘকে ভয় করো না ?

সে উত্তরে জানালে, যেহেতু তারাও মানুষ, তাদেরও ভয় বোলে একটা পদার্থ আছে, কিন্তু ঐ যে মন্দির দেখা যাচ্ছে, ওখানে বাঘের দেবতা আছেন। বৎসরের তিনটি নির্দ্দিষ্ট দিনে ওখানে তারা পূজা দেয়। তাই বাঘ আর সকলের উপর উপদ্রব করলেও, তাদের কিছু বলে না।

রোগে ভুগে ভুগে আমি একরকম মোরিয়া হ'য়েই উঠেছিলুম। তবুও যার জীবনের আশা সকলেই ছেড়ে দিয়েচে, তার নিজের দেহটার প্রতি মমত্ববোধ বোধহয় একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

মনে মনে বললুম, হে বাঘ-দেবতা, তোমায় কোনদিন পূজা আমি দিইনি। আমার জীবনের প্রতি মায়া নেই একথা বলব না। তবুও তোমার নিজের গরজে বাঁচাতে হয় বাঁচিও। আজ আর আমার দিক থেকে কোন 'আপীল' নেই।

ছেলেটা যখন নানা কৌশলে নানারকম ভয় দেখিয়েও আমায় টলাতে পারলে না, তখন সে চলে গেল। যাবার সময় তার নিজের ভাষায় যে কথাগুলো বলতে বলতে গেল, তার ভাবার্থ এই যে, শের নামক জীবগুলির আজ একটা বিশেষ পর্ব্ব লেগে যাবে, কেননা, অনেকদিন পরে আজ তারা নরমাংস ভক্ষণে খুবই যে আনন্দিত হবে, তাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধ্যা তখন হ'য়ে গেছে। বোধহয় কল্পনায় সেই পূর্ব্ব-দৃষ্ট সন্ন্যাসী মূর্ত্তিরই ধ্যান করছিলুম, হঠাৎ মানুষের কণ্ঠস্বরে চমক ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি, সম্মুখে এক গেরুয়াধারী প্রৌঢ় বয়সী বাঙালী সাধু।

সাধুজী বোধহয় আমাকে এই বিজনে নিঃসঙ্গ বসে থাকতে দেখে কিছু অবাকই হ'য়েছিলেন।

বললেন—দেওঘর যাবার শেষ মটর-খানাও তো চলে গেল বাবা, আপনি এখনো ব'সে ?

বললুম—দেওঘর থেকেইত এই আস্‌চি।

সাধুজী ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ কোরে বললেন, এই রাত্রে ? কেন ? বাঘের মুখে প্রাণ দিতে ? বিয়ে-থাওয়া করা হয়নি বুঝি ? বাড়ীতে কি মা-বাপও নেই ? এ গোঁয়ার্ত্তুমি ভালো নয়; 'জানে'র মায়া প্রত্যেকেরেই থাকা উচিত।

সাধুজী আমায় নিঃসংশয়ে তাদেরই মধ্যে এমন একজন ভেবে নিয়েছিলেন যারা শুধু বেড়াবার উদ্দেশ্যেই ত্রিকূট আসে। এতে তার বুদ্ধিকে দোষ দেওয়া চলে না। কেননা, এরকম হামেসাই হ'য়ে থাকে। তবে রাত্রে কেউ আসে না। একবার শুধু একটি ২২।২৩ বছরের যুবককে সন্ধ্যার সময় পাহাড়ে উঠতে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু তাকে নামতে কেউ আর দেখেনি। পরদিন তার পরনের কাপড় ও জামার কয়েকটা টুকরো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা গিয়েছিল। পরে সাধুজীর মুখেই একথা শুনেছিলুম।

সাধুজীকে যখন জানালুম যে তাঁর অনুমান ভুল, সাধারণে যে-যে কারণে ত্রিকূটে আসে, তার একটা কারণও আমার ঘটেনি, এবং আমার এখানে আসার এক নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে, যা প্রয়োজন বিবেচনা করলে ধীরে সুস্থে তাঁকে বলতে পারি—তখন তিনি বললেন, ঐ-যে মন্দির দেখচ—ঐখানে আমি থাকি, আজ অমাবস্যা, আজ দেবতার এক বিশেষ পূজা আছে। তুমি আজ মন্দিরে প্রসাদ পাবে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম।

ভাবলুম সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ যে সাধনায় মেলে, তাতো আমার নেই জানা, তবুও অনন্ত লীলাময়ের দুর্জ্ঞেয় দুর্ভেদ্য রহস্যজাল ভেদ করবার কারো ক্ষমতা আছে কি? তাঁর অপার করুণার জ্যোতিঃ কোন্ দিক্ দিয়ে কখন্ কার উপর বিচ্ছুরিত হয় কে বলতে পারে?

সাধুজী চলে গেলেন।

কিন্তু মন আমার চঞ্চল।

মৃত্যুকে কামনাই করেছি, কখনো ভয় করিনি। ভাবলুম, উঠে যাই পাহাড়ের উপর, কী হবে মন্দিরে গিয়ে? সেখানে ঐ লোকটির সামনে সেই মহাপুরুষ যদি আমায় দর্শন না দেন? সংশয় জাগলো মনে।

প্রাণে এক অদ্ভুত উন্মাদনা অনুভব করলুম। স্থির করলুম, মন্দিরে যাবো না। কিন্তু এই অমাবস্যার নিঃরন্ধ্র অন্ধকারে অজানা অচেনা পথে পাহাড়ে ওঠাও তো শুধু দুঃসাহসিক নয়, অসম্ভব।

তবুও সে স্থান ত্যাগ করলুম। কি জানি, সাধুজী যদি ফের আসেন! তখন আর পালাবার উপায় থাকবে না।

হাতড়ে হাতড়ে কতকটা উঠে হাঁফিয়ে পড়লুম। মাথায় তখন রক্ত চ'ড়ে গেছে। ভাবলুম, যার চোখের সামনে অনাগত তেরটি বৎসরের ব্যাধি-ক্লিষ্ট নির্ম্মম রূপ দিবারাত্র জাগছে তার এত সহজে বল হারানো চলে না।

একটু বিশ্রাম কোরে আরো খানিকটা হাতে বুকে ভর দিয়ে উঠলুম। তখন ঘোরিয়া হ'য়ে উঠেছি। অমাবস্যার রাত্রি—মহাপুরুষের দর্শনলাভের এইই ত প্রশস্ত সময়!

এই রকম কিছুদূর উঠি, আবার বিশ্রাম করি, আবার উঠতে থাকি।

দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি কানে আসে, বুঝলুম মন্দিরে আরতি হচ্ছে।

দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গ হঠাৎ যেন একবার দোলা দিয়ে উঠলো—বোধ হয় অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে। তারপর সর্ব্বাঙ্গ থর-থর কোরে কাঁপতে লাগলো; মাথার ভেতরে কে যেন তখন অবিশ্রান্ত যাঁতা ঘুরিয়ে চলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্দ্দম কাসি। তখন বুকে যেন কে আর একখানা যাঁতা নিয়ে বসেছে।

তারপর এক ঝলক···দু ঝলক···

ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। কার স্নিগ্ধ কর-স্পর্শে জেগে দেখি আমারই অভীপ্সিত দেবতা আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

তখন রাত্রির অন্ধকার ভালোভাবে কেটে যায় নি, অথচ উষার আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে ধীরে ধীরে উঁকি দিচ্ছে—এমনি অবস্থা।

পর মুহূর্ত্তেই চোখ দুটো কে যেন জোর কোরে বন্ধ কোরে দিলে—এত ঘুম। ঘুমিয়ে এত শান্তি জীবনে অনুভব করিনি।

তখন পাহাড়ের গায়ে উদয়-অরুণের তরুণ-আলোর ঝিকিমিকি।

চোখ মেলে দেখি সম্মুখে ফুলের সাজি-হাতে সাধুজী। দৃষ্টিতে তার রাজ্যের তিরস্কার।

যা ঘটেছিল তাঁকে জানাতে তিনি হেসে বল্লেন, দুর্ব্বল মস্তিষ্কে মানুষ ওরকম কত খেয়াল দেখে। তিরিশটা বছর এই ত্রিকূটে কাটিয়ে দিলুম, একটা দিনের তরেও ওরকম কাউকে দেখিনি। তারপর একটু হেসে বল্লেন, খুব বরাত জোর যে বাঘের পেটে যাও নি। কাল আরতি হ'য়ে যাওয়ার পর কত খুঁজলুম। ভাবলুম মানুষের মৃত্যু কখন কোথায় কি ভাবে যে দেখা দেয়, তা একটা তাজ্জব ব্যাপার। তোমাকে যে আবার দেখতে পাবো এ ভাবিনি। তোমার আয়ু দেখছি নিতান্তই ফুরোয়নি!

—সেই কামনাই কি করছিলেন সাধুজী?

জিহ্বার প্রান্তভাগ দাঁতে চেপে সাধুজী বললে, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। তুমি ছেলে মানুষ তাই ওকথা বললে, অমঙ্গল কামনা আমরা কখনো কারোর করি না।

শরীরের যেন আর কোন গ্লানি নেই। সেই মহাপুরুষ তাঁর পদ্মহস্ত বুলিয়ে আমার সমস্ত বেদনা নিঃশেষে ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছেন।

দেখলুম সাধুজী পূজার ফুল সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। প্রাণে এক অনাবিল আনন্দ অনুভব করছিলুম অপূর্ব্ব অননুভূত। প্রভাতের রূপ যে এমন অনির্ব্বচনীয় সুন্দর—এ উপলব্ধি তো কখনো হয় নি!

আমার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় নৃত্য কোরে উঠল প্রকৃতির আনন্দের এ বিপুল সমারোহ দেখে। পাখীর কাকলি, ভ্রমরের গুঞ্জন, ফুলের সৌরভ—এ সবের অপূর্ব্ব সম্মিলনে যে অদৃশ্য দেবীর আনন্দঘন রূপেরই আভাষ পাচ্ছিলাম—মনে মনে আমার অন্তরের প্রণাম তাঁরই চরণে নিবেদন করলুম।

ফুল তুলে ফেরবার সময় সাধুজী বলে গেলেন, মন্দিরে দেখা কোরো। বললুম, নিশ্চয়ই; বাঘের পেটে যখন যাইনি, তখন নিজের পেট রেহাই দেবে না।

সাধুজী হেসে বললেন, প্রসাদ পাবে।

তারপর তিন দিন সেখানে ছিলুম। রাত্রে সমস্ত চিত্তকে সজাগ কোরে রাখতুম মহাপুরুষের প্রতীক্ষায়।

পাটনায় ফিরে গিয়ে দাদাকে যখন সমস্ত কথা বললুম, তিনি স্তব্ধ হ'য়ে সব শুনে বললেন, দাঁড়া, সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসি। সাহেব এসে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা নির্ব্বাক বিস্ময়ে শুনলেন, তারপর আমাকে বেশ কোরে পরীক্ষা কোরে দাদার দিকে চেয়ে বললেন, yes, he is radically cured.

দাদার আনন্দ আর দেখে কে? তিনি

সেদিন আমায় মাথায় তুলে নাচতে বাকী রেখেছিলেন।

পরদিন সকালে শয্যা ছেড়ে উঠি উঠি করচি, দাদা এসে বল্লেন, তো'কে সাহেব ডাকচে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দেখা করবি। ব'লেই ব্যস্ত হ'য়ে চলে গেলেন।

গিয়ে দেখি সাহেবের কুটীরের সাম্নে যেন এক উৎসব লেগে গেছে। তিনখানা লরী দাঁড়িয়ে, নানারকম জিনিষপত্তরে বোঝাই একখানা, আর প্রায় চল্লিশ জন লোক দাঁড়িয়ে আছে আর ত খানা লরীর কাছে।

সাহেব বল্লে, তোমাকেও যেতে হবে।

দাদা পাশেই ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি বল্লেন, সাহেব যে ত্রিকূট অভিযানে চলেছেন।

সাহেবের অনুরোধে যেতে বাধ্য হলুম।

কিন্তু সমারোহ কোরে যে দেব-দর্শন মেলে না এ কথা সাহেবকে কেমন কোরে বোঝাবো?

বলাই বাহুল্য মহাপুরুষের দর্শন লাভ সাহেবের ভাগ্যে ঘটেনি।

ফিরে এসে আরো দিনকতক পাটনায় ছিলুম। তারপর আরম্ভ হ'ল আমার নিরুদ্দেশযাত্রা। পথকেই বেছে নিলুম জীবনের সঙ্গীরূপে, ভাবলুম পথের হিসাব না কোরে চল্‌বো শুধু চলার আনন্দে। এ আনন্দই হবে আমার পাথেয়। চল্‌তে চল্‌তে পথের কোনখানে যদিই তাঁর দেখা মিলে যায়!

হঠাৎ একদিন দেখি, কতকগুলো ছেলে আমার পেছুনে লেগেছে। তাদের মধ্যে কেউ বল্‌চে, এই পাগলা, তোর ঘর কোথা? কেউ বল্‌চে, তুই অমন কোরে চল্‌চিস্ কেন, কেউ বা বল্‌চে, তোর মাথায় কি? কে একজন আমার কাছা খুলে দিয়ে বল্‌লে, এই পাগলা, তোর লেজ কেন। আর সকলে তখন হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো। আমার এই বিপন্ন অবস্থা দেখে এক ভদ্রলোক ধমক দিয়ে ছেলেদের নিরস্ত ক'রলেন। তাই কি সহজে থামতে চায় তারা?

তারপর প্রায়ই এমনি হয়।

একদিন এক গাঁয়ের পথে চলেছি, দেখি পথের উপর দুটো মেয়ে কাঁধ ধরাধরি কোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত আর হবে? বড়-জোর নয় কি দশ বছরের। শুনলুম একজন অপরজনকে বলছে, দেখ ভাই, লোকটা কেমন আপন মনেই হাসচে! অপরজন বল্‌লে, ও বোধ হয় পাগল ভাই।

কি জানি কেন লোকে পাগল বলে আমাকে!

—থামলে কেন বাবা?

—এই খানেই যে শেষ মা!

কমলা এক মুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে চুপ কোরে রইল। তারপর বল্‌লে, হ্যাঁ বাবা, সে কি সত্যিই পাগল ছিল?

—না মা, পাগল সে ছিল না। তবে যত্নের অভাবে তার চেহারা ছিল রুক্ষ, ময়লা জমে জমে মাথায় গেছল জট পাকিয়ে। দাড়ি-গোঁফ তো আর কামাত না! কাজেই চেহারাটা ছিল কতকটা পাগলেরই মতন, তার উপর পায়ে থাকত না জুতো; কাপড় জামা —তাও ছিল মলিন শতছিন্ন।

কমলা খানিকক্ষণ চুপ কোরে বসে রইল।

তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে ধরা গলায় বল্‌লে, আজ আর কিছু করতে ভাল লাগছে না বাবা।

তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললুম, নাই বা করলি আজ কিছু মা, কাল রবিবার আছে, মায়ে-বেটায় লেগে যাবো'খন কাজে।

পরক্ষণেই কমলা ব্যগ্রভাবে বল্‌লে, কৈ লকেটের কথা ত বল্লে না বাবা?

—তারই ঝুলির মধ্যে ওটা পেয়েছিলুম কিন্তু ওর রহস্য আমার কাছে আজো অনুদ্‌ঘাটিত মা!

বিয়াত্রিচের স্বপ্ন

দিলীপ দাশগুপ্ত

অস্ত গেছে বিয়াত্রিচে গো, চমকি উঠিলে কেন
[illegible] শুধু তোর [illegible] থামেনি গান—
সাগরের [illegible] জলপরীদের কলতান আসে যেন
[illegible] কানে [illegible] দেবতার মান।

[illegible] চোখে ভাসে কেন [illegible]
আকাশের তারা [illegible] ফুলের গন্ধ সম
[illegible] আকাশের পথে ছুটে চলে অবিরল
[illegible] নিরুপম!

অস্ত গেছে [illegible] বিয়াত্রিচে গো ভাই
[illegible] করিছে এখনও [illegible] গায়—
[illegible] চোখের কাজল [illegible]
[illegible] অভিনয়।

বিয়াত্রিচে গো [illegible] অস্ত গেছে [illegible] চূড়া বেয়ে
এখনও [illegible] বুকের জ্বালা—
প্রভাত [illegible] সরোবর পানে চেয়ে
[illegible] এখনও [illegible]।

[illegible] তুমি [illegible] আজ রাতে
বিয়াত্রিচে গো, লক্ষ্মীটি [illegible] চোখ
[illegible] কেন [illegible] বেদনাতে
[illegible] আলোক!

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]—[illegible] চোখের [illegible]
[illegible]

অ্যান্ এক্স্পেরিমেণ্ট্

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক

(১)

বিপুলের থীসিসের মূল বক্তব্য এই :—

বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ভদ্র-পরিবারে ফাগুন মাসে বিবাহ সংখ্যা কম। কারণ বসন্তকাল মড়ক মহামারীর ঋতু, বাড়ীতে বাড়ীতে চিকেন্ পক্স, স্মল্ পক্স একটা না একটা লাগিয়াই আছে। রোগীর সেবা করিবে না, ছেলেমেয়ের বিবাহ দিবে? প্রকৃতিতে যে প্রেমের অরুণরাগ ফুটিয়া উঠে তাহাতে তরুণ মন গাছপালার পানেই ছুটিয়া চলে, বোটানি পড়ার সুবিধা হয়, পুষ্পের গর্ভকেশরের রেণু আঙ্গুলের ডগায় মাখিয়া গালে বুলাইতে ভাল লাগে; কিন্তু ঘরের ভিতরে বিয়ে করিবার মত প্রণয়রাগ তেমন জমিয়া উঠেনা, যেমনটি জমিয়া উঠে ঐ আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে। গ্রীষ্মকালে নববধূকে লইয়া খালি গায়ে ছাদে শুইবার তেমন সুযোগ ঘটে না, অতএব উহাও অনুকূল নয়। কাজে কাজেই বিবাহ বেশি হয় বর্ষাকালে, যখন বাঙ্গালীর মন সত্যসত্যই সজলমেঘ-মেদুরাম্বর তলে বিরহ বেদনায় ঘনব্যথাতুর হইয়া ভেকরবের সহিত সমস্বরে গান ধরিয়া দেয়—তুমিও একাকী, আমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে ইত্যাদি।

বর্ষা ঋতুতে বাংলার ঘরে ঘরে এই যে তরুণ-তরুণীর বিরহভাব ও পরে বিবাহ ইহার পরম মিলন ঘটে অধিকাংশই পুজার ছুটিতে উৎসবমুখর কক্ষে কক্ষে, গ্রামে গ্রামে, মধুপুরে, গিরিডিতে, দেওঘরে, শিলংএ, দার্জ্জিলিংএ। এই সকল মিলনের পরিণতি ঘটে পরবর্ত্তী বৎসরের শ্রাবণ ভাদ্র মাসে। আর অগ্রহায়ণ মাসে বাকী যে সব বিবাহ হয় তাহার পূর্ণ মিলন বড়দিনের ছুটিতে, শীতের আমেজে সুদীর্ঘ রাত্রির নিভৃত অবকাশে। এবং আর এক প্রস্থ আঁতুড় ঘরের কাজ বাড়ে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে। খবর লইয়া দেখা গিয়াছে নাসের উপার্জ্জন সবচেয়ে বেশি হয় শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত। এবং কলিকাতায় যাহারা ছিন্নবস্ত্রখণ্ড প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ফিরে, অথবা যাহারা পুরাণো কাপড়ের বদলে বাসন বিক্রয় করে, তাহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছে যে, এই কয়মাস তাহাদের ব্যবসায়ে ভাটা পড়িয়া যায়।

অতএব শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক মাস বাংলার ভদ্রপল্লীতে সন্তান প্রসবের ঋতু। সন্তান-প্রসবজনিত মৃত্যু সংখ্যাও এই সময়ে অধিক। ইহাই কাঁথা সেলাইয়ের কাল, নাসদের উপার্জ্জনের কাল ইত্যাদি ইত্যাদি—

থীসিসের title অর্থাৎ নাম—Periodicity of consummation of marriage among middleclass Bengalis as a study in social value. বাংলায়—মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহে বিবাহের পরমিলনের ঋতু পর্য্যায় ও তাহার সামাজিক মূল্য বিচার।

থীসিস্ সমাপ্ত করিয়া বিপুল ঠিক করিল এখানি আমেরিকার কোন বিশ্ববিত্থালয়ে ডক্টরেটের জন্য পাঠাইয়া দিবে; এদেশে উহা বুঝিবার মতো লোক এখনো হয় নাই, ও লাইনে কাহারো গবেষণাও নাই। কিন্তু ও ব্যাটারা আবার বৈজ্ঞানিক রীতিতে লেখা চায়, কেবল ষ্ট্যাটিস্টিকস্ চায়। এজন্য মিউনিসিপ্যালিটি ও শ্মশান ঘাটের আপিসে আপিসে খাতা খুলিয়া হিসাব দেখা দরকার, কিন্তু কেহই তাহাকে সে খাতা খুলিয়া দেখিবার সুযোগ দিল না। বিপুল নিরস্ত হয় নাই। সে জানে তাহার হিসাব ঠিকই হইয়াছে, ভ্রান্তির সম্ভাবনা খুবই কম। তবু শ্মশানঘাটে গিয়া কিছুদিন দেখা উচিত সন্তান-প্রসবজনিত পীড়ায় কয়জন প্রসূতি মরে প্রতি সপ্তায়। তাই বিপুল প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিমতলা ঘাটে বেড়াইতে যায় ও প্রায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে।

* * *

সেদিন রাত্রি প্রায় ন'টা। ওপারের আলোকমালার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি বিপুল বসিয়া আছে। মনে তার কত কিছু ভাব, পেটে ক্ষুধা। সে সকালে দশটায় খাইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে। জলখাবারের পয়সা ছিল না, তাই কিছু খাওয়া হয় নাই। তার বাবা চল্লিশ টাকা পেন্সন্ পান, দাদা বিদেশে রেলে চাকরী করেন। কলিকাতার বাড়ীর একাংশ ভাড়া দিয়া দোতলায় তিনখানি ঘর লইয়া তাহারা বাস করে। বাংলায় এম্-এ পাশ করিয়াছে, অথচ চাকরী জোটে নাই। নিজের পায়ে সে দাঁড়াইবে এ প্রতিজ্ঞা আছে, একেবারে শক্তিহীন সে নয়।

কেবল এই থানিস্টার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তারপর যা হয় দেখা যাইবে। বিয়ের তাল সবদ্ধই আনিয়াছিল, সে ব্রেক্ জবাব দিয়াছে, কারণ থীসিস তা হইলে মাটি হইয়া যাইতে পারে। যাহারা থীসিস লেখে তাহারা নিজের জীবনের খাতা খুলিয়া তথ্য সংগ্রহ করে না, ডক্টরেটের মূল উপাদান পরকীয়া গবেষণা।

এমন সময় আবার সেই হৃৎকম্পকারী "হরি হরি বোল"। বিপুল সচকিতভাবে ফিরিয়া দেখিল, মৃতদেহ নারীর না পুরুষের। বধূর শব দেখিলেই সে তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিয়া যায়,—কত বয়স? কবে বিয়ে হয়েছিল? কেন মারা গেল? —ইত্যাদি তার প্রশ্ন।

এবার মৃতদেহ নারীর নয়; এক প্রাচীনের। বিপুলের কৌতূহল নাই, সে চুপচাপ বসিয়া রহিল। শববাহকদলের এক ছোকরা তার পাশে বসিয়া নীরবে একটি বিড়ি ধরাইল।

বিপুল অনেকক্ষণ বিড়ি খায় নাই, তাই ধোয়াটা ভালই লাগিল। সে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—যারা গেছেন আপনার আত্মীয় বুঝি?

—হ্যাঁ আমার দাদার খুড়-শ্বশুর।

—কি হয়েছিল?

—সে কথা আর বলবেন না মশাই, কিছুই হয় নি। মিলটনের ফার্মে কাজ করতেন, নার্ভাসনেস ছিল, হঠাৎ মাবেল-মেজের পা পিছলে পড়লেন আর হার্টফেল।

—কি নাম?

—ওঃ সিদ্ধেশ্বর মিত্র, আপীসের পুরাণো কেরাণী, বড় সাহেব পর্য্যন্ত কনডোলেন্স মেসেজ পাঠিয়াছেন।

ছোকরা আরও অনেক কথাই বলিতেছিল। মড়া বহিয়া ঘাড়ে ব্যথা হইয়াছিল, মুখ খুলিয়া তাই একটু স্বস্তিলাভের চেষ্টা। কিন্তু পাশে আর কোন সাড়াশব্দ নাই। ফিরিয়া দেখিল ভদ্রলোক কখন নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছেন।

(২)

পরদিন একেবারে সটান মিলটনের আপিসে। দারোয়ানের কাছে বিপুল খবর লইল, আপিসের বড় বাবু অর্থাৎ হেড ক্লার্ক বাঙালী। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া কামরায় প্রবেশ করিল। হাতের দরখাস্ত খানি বাড়াইয়া টেবিলে ধরিল। বড়বাবু হরিনাথ সেন চোখ না তুলিয়াই লেখানি টানিয়া নিলেন, ভাবিলেন টাইপিষ্ট নীরেন আনিয়াছে চিঠিতে সই করাইতে। কিন্তু পড়িতে আরম্ভ করিয়াই অবাক্—লেখা আছে,—

Learning from the burning ghat that etc. অর্থাৎ শ্মশান ঘাট হইতে জানিতে পারিলাম মহাশয়ের অধীনে একটি কেরাণীর পদ খালি হইয়াছে—ইত্যাদি।

আয়ত চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া হরিনাথ বাবু চাহিয়া দেখিলেন এক সুদর্শন যুবক, মুখে বিষাদ ও আশার মাখামাখি ভাব,—bicoloured (দ্বিবর্ণ) টাইপের ছাপার মতো, খানিকটা লাল খানিকটা কালো।

বলিলেন,—একি! কি চান?

বিপুলের কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—আজ্ঞে,—একটা দরখাস্ত,—কাল নিমতলা ঘাটে জানলাম আপনাদের সিদ্ধেশ্বর বাবু মারা গেছেন, তাই যদি······

বড়বাবু কিছুকাল থ মারিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর হো হো করিয়া প্রবল অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িলেন। সিদুবাবু মারা যাওয়ার দুঃখের ধাক্কা তখনো ভাল করিয়া সামলাইতে পারেন নাই, কিন্তু এই অভিনব দরখাস্তখানি যেন হঠাৎ তাঁহার গম্ভীর মনটাকে একটা ডিগবাজি খাওয়াইয়া আবার ঠিক সহজভাবে দাঁড় করাইয়া দিল। মনে মনে তারিফ করিলেন—

সিদুবাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে সত্যই বড় বাবু বেশ মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। বছরের শেষে returns লিখিবার সময়, রাশি রাশি কাজ। সহসা মোটর আপিস সংক্রান্ত সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ কেরাণী পাওয়া দুষ্কর। কি যেন ভাবিয়া শুধাইলেন,—

ইন্সিওরেন্স লিখতে জানেন?

সুযোগ যখন পাওয়া গেছে তখন কি শুধু মিথ্যা কথা বলিবার আর্টের অভাবেই সব পণ্ড হইবে। বিপুল অম্লান বদনে উত্তর করিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, দিল্লীতে এলেন্‌বারির আপিসে অনেকদিন কাজ করেছি।

—তার সার্টিফিকেট আছে?

—আজ্ঞে সঙ্গে নেই, পরে আনিয়ে দিতে পারি।

—টাইপ করতে জানো?

—আজ্ঞে জানি, তবে আমার হাতের লেখাই খুব ভালো।

—হুঃ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। আজকেই কাজে লাগতে পারবে?

—বলেন ত······

বাক্য শেষ করিবার প্রয়োজন হইল না, হরিনাথবাবু লিখিলেন appointed on forty, অর্থাৎ চল্লিশ টাকায় নিযুক্ত।

বিপুল কাজ করিতে বসিয়া গেল। ইন্সিওরেন্স সে কোন কালেই লেখে নাই, তবে বাড়ীতে একখানা ফীল্ডহাউসের মোটা বই আছে, তার বাবার। ভাবিল, কাল সে পিতার কাছে সব শিখিয়া লইবে।

আর ভাবিল, এইবার তার থীসিস্ শেষ হইবে। মাস তিনেক কাজ করিয়াই সে উহা ছাপাইয়া লইবে, এমেরিকায় ছাপানো কপি না পাঠাইলে ত তারা পড়িবেই না। নীরেনের কাছ ঘেষিয়া বসিয়া বলিল, ভাই, আপনি একটু সাহায্য করবেন, এসব কাজ

কোন কালেই করিনি, তাহা মিছে কথা বলে এসেছি, এখন আপনার শরণাপন্ন।

নীরেন বিস্ময়ে বলে, সে কি! সত্যি?

—একেবারে সত্যি, আপনি একটু আধটু কাজ বুঝিয়ে দেবেন, চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো।

নীরেন ভাবিল, লোকটা হয়ত পাগল। কি দুঃসাহস। তথাপি বিপুলের চেহারায় এমন একটি মাদকতা ছিল যাহা দেখিয়া পুরুষেরও মন ভুলিয়া যায়। নীরেন মনে মনে বলিল, আহা, ইনি যদি নারী হইতেন। মুখে বলিল, আচ্ছা, বসুন।

সন্ধ্যায় হরিনাথবাবুর পিছনে পিছনে অফিস হইতে বাহির হইয়া বিপুল পথে নামিল। বড়বাবুর মুখ ভার। বুঝিতে বাকী নাই যে এই ছোকরা তাঁহাকে একেবারে বোকা বানাইয়া চাকরি লইয়াছে,—মনে পড়িল সেই বাল্য-পঠিত প্রবচন, "যাহা কিছু চক্ চক্ করে তাহাই সোনা নয়।" অথচ ছেলেটির হাতের লেখা বড় সুন্দর, মুক্তার মতো ঝরঝরে, আর কোন বানান ভুলের বালাই নাই। ঘাড় না ফিরাইয়াই শুধাইলেন, ওহে তুমি বিয়ে পাশ বলছিলে, তা অন্য লাইনে গেলে না কেন? একাজ কি হবে তোমার দ্বারা?

বিপুলের মুখ শুকাইয়া যায়। সে থতমত খাইয়া বলে,—আজ্ঞে, আপনি অনুগ্রহ করলে পার্ব্বো বই কি! কাল রবিবার, বাবা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

একথায় বড়বাবু মাত্রেরই মন প্রসন্ন হয়। তিনি দাড়িতে মোচড় দিয়া বলিলেন, তা বেশ ত' আমি সকালে বাসাতেই থাকি। কিন্তু তুমি কি ও কাজ পারবে?

বিপুল আর কোন প্রকার তর্ক বিতর্ক করিল না। চট করিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিল,—আজ্ঞে, তবে আসি, আমি এই দিকে যাবো।

বিপুল বাঁয়ের গলিতে প্রবেশ করিল।

রবিবার সকালে হরিনাথ বাবুর বাসায় আসিল বিপুলের বাবা নয়, স্বয়ং শ্রীবিপুল বাহন গুপ্ত। তাহার পিছনে একটি ভৃত্য, হাতে একথালা ভীমনাগের সন্দেশ।

মাঘের শেষ। তখনো বেশ শীত আছে। কলিকাতার আকাশ কালো ধোঁয়ায় কালি হইয়া আছে। কন্‌কনে হাওয়ায় মন যেন জড়সড় হইয়া গৃহের কোণে একটি নিরিবিলি বহ্নিকুণ্ড খুঁজিতে চায়। বিপুলের মন তাই ঘরে ঢুকিয়াই একবার এ কোণে ও কোণে চোখ বুলাইয়া লইল। তাহার প্রবেশমাত্রেই বোধ করি জুতার শব্দ পাইয়া পাশের একটি ছোট্ট কক্ষের দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিল একটী অষ্টাদশী কিশোরী। সুন্দরী চঞ্চললোচনা কিশোরী।

(৩)

হরিনাথবাবু বলিতেছিলেন,—উঃ এ এযুগের ছেলেছোকরা কি মিথ্যেবাদী! তাহা মিছে কথাগুলো বলে আমাকে ঠকিয়ে চাকরীটা নিলে। কিচ্ছু জানে না, ওকে আমি নোটিশ দেবো।

কন্যা মেখলা পিতাকে চা দিতেছিল। বলিল, বিপুলবাবুকে নোটিশ দেওয়া আর চলে না, তা হলে অতগুলো ভীমনাগের সন্দেশ হজম হবে না যে, বাবা।

পিতা মেয়ের মুখে চাহিয়া কি যেন পড়িতে চেষ্টা করিলেন, এবং হাসিয়া ফেলিলেন। মেখলা হাসিল না। সে বলিল, কেন বিপুলবাবু ত বেশ ভাল স্কলার বলে মনে হয়, বরং ওর মাইনে বেশি হওয়া উচিত।

—ছত্তোর তোর স্কলারের নিকুচি করেছে। আমার এখন ইনক্রিমেন্টের কাজ!

বলিয়া হরিনাথবাবু সহসা গাম্ভীর্য্যধারণ করিলেন। খানিক চিন্তার পর কি যেন আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, মেয়ে তখন নিজেই চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছিল। তাহাকে বলিলেন,—তা ওর কাছে তোর পড়াটা না হয় বুঝিয়ে নিস্, একটা টিউটরের খরচ বেঁচে যায়···। বলিতে বলিতে তিনি উঠিলেন।

মেখলা যেন পিতার মুখ হইতে এমনিধারা একটা কথার প্রতীক্ষা কয়েকদিন হইতে করিতেছিল। বিপুল সেদিন ভীমনাগের সন্দেশ পৌঁছাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অনেকক্ষণ বসিয়াছিল। মেখলা একাই পড়িতেছিল, আর মিটি মিটি চাহিতেছিল। তারপর হঠাৎ বিপুলের নানাপ্রকার পরিচয় প্রশ্ন। মেখলা থার্ড্ ইয়ারে পড়ে। যৌবনের চুম্বক শক্তির আকর্ষণ বিপুলকে টানিল কি না জানি না, সে শুধু একজন মানুষ পাইল যাহার সঙ্গে তার থীসিসের আলোচনা চলিতে পারে। থীসিসের প্রকৃত বিষয়ের অর্দ্ধেক নারী। অতএব আজ তার জীবনে প্রথম সুযোগ মিলিয়াছে সেই নারীর অভিমতের সঙ্গে তার মত মিলাইয়া থীসিসটি সম্পূর্ণ করিবার। বিপুলের উৎসাহের তাই অন্ত নাই।

সন্ধ্যা ৭টায় বিপুলের আগমন। মেখলার পড়িবার ঘর। একখানি টেবিল, দুখানি চেয়ার, একটি টিপয়, দেয়ালে একটি র‍্যাক্, একটি টেবিল ল্যাম্প।

বিপুলের যেন আজ নূতন জীবন, নারীর সঙ্গে মুখোমুখি। এ যেন প্রদোষ, আলো-আঁধারের লগন-ক্ষণ!

বিপুল থীসিস্ পড়িতে লাগিল। নার্ভাস সে কোন কালেই নয়, লজিক ও যথেষ্ট পড়িয়াছে, তর্ক করিবার ক্ষমতা অসীম। কেবল সুযোগ পায় নাই, ক্লাশের বন্ধুরা হারিয়া গিয়া তাহাকে চাঁটি মারিয়াছে, বাড়ীতে মা-বাবা কেবল ধমক দিয়াছেন; বউ নাই, থাকিলে সে কাঁদিয়া বাপের বাড়ী যাইত।

মেখলা শুনিতে শুনিতে মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল, ইংরাজি ভাষায় রচনা। বাংলায় যাহা অশ্লীল শুনায়, ইংরাজিতে তাহা রিয়্যালিষ্টিক্ মাত্র। মোপাসাঁ পড়িতে পড়িতে মেখলার মনে ঘাটা পড়িয়া গেছে,—তার মনের নীবি-বন্ধ সম্পূর্ণ মুক্ত, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার কাছে অশ্লীল বলিয়া কিছু নাই। বোটানিতে তার হাতে-খড়ি, হ্যাভলক্ ইলিসে পরিপক্কতা। সবই সায়েন্স মাত্র। তবু সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

হাসিবার কারণ যে কি বিপুল খুঁজিয়া পাইল না। সে সত্যই সিরিয়স্—গভীর-ভাবেই সব লিখিয়াছে। তার অন্তরের সরলতাকে লঙ্ঘন করিয়া তার সাহিত্য-বুদ্ধি কোনকালেই উন্মত্ত হইবার সুযোগ পায় নাই। তাই তার একান্ত সরলমনে মেখলার হাসি বিশ্রী ঠেকিল না, বিস্ময়কর অহেতুক বোধ হইল। অপ্রতিভভাবে থামিয়া শুধাইল,—হাসলেন যে?

মেখলার হাসির হিল্লোল এখনো মিলায় নাই, দুই গালে তখনো টোল খাইয়া আছে। সুকণ্ঠের সহিত চাপাহাসির রেশ মিলিত যে ধ্বনিটি বাহির হইল, তাহা অপরূপ,—যেন সুন্দরীর চামড়ার রং এর সঙ্গে প্রজাপতির পাখার রং মিলিয়া এক অভিনব ইন্দ্রজালের সৃষ্টি

মেখলা বলিল,—আপনার লেখা অতি চমৎকার, কিন্তু আপনার সত্যিকারের কোন অভিজ্ঞতা নেই। অতএব ও থীথিস্ একেবারে বাজে। আপনি ম্যারেজ কন-সামেশান্-এর কিছুই জানেন না, থীসিস্ লিখে বসে আছেন। আমাকেই ওর সংশোধন করতে হবে দেখছি! বলিয়া মেখলা মুখে কাপড় চাপা দিল। তার চোখে চটুল চাহনি, তার কেশে বাতাসের চঞ্চলতা, তার সাড়ীতে সমুদ্রের রং, তার বালা-চুড়িতে রিনিরিণি সুর, তার বক্ষের রেখায় রেখায় দ্রুতশ্বাসের তরঙ্গভঙ্গ। সমস্ত মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড আহ্বান না প্রচণ্ড বিদ্রূপ?

বিপুল দেখিল বিদ্রূপ। তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। সে গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ নিঃস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। মেখলা ভাবিল,—বুঝি শিকারের পূর্ব্বে বিড়াল বসিয়া আছে ওৎ পাতিয়া।

কিন্তু তাহাকে হতাশ করিয়া অবশেষে বিপুল বলে,—দেখুন, আমার অভিজ্ঞতা থাকুক আর নাই থাকুক, তার কৈফিয়ত দিতে আসিনি,—কিন্তু আমার ক্যাল্‌কুলেশনে ভুল কোথায়? আমার কন্‌ক্লুশন্ ঠিক কি না

—নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু কিছু অদল বদল আমি ক'রে দোবো। বলিয়া মেখলা সহসা গম্ভীর হইল, শরতে যেমন সহসা এক টুক্‌রা সাদা মেঘ সূর্য্যকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়।

বিপুল বলে,—আমার থীসিস্ কাটাকুটি করবার কি অধিকার আছে আপনার?

—সে অধিকার আমি ক'রে নেবো।

আবার মেখলার মুখে দুষ্ট হাসি। তানপুরার ঝঙ্কারের মতো তার অস্তিত্ব সমস্ত কক্ষে গম্ গম্ করিতে লাগিল।

বিপুলের ডান হাত নিজের ডানহাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া মেখলা সহসা বলিয়া উঠিল,—আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আপনার থীসিস্ ভুল। আজ আর না, কাল এর ফের আলোচনা হবে। আপনি লেখাটা রেখে যান, আমি একবার ভাল ক'রে পড়ে দেখবো।

বলিয়াই বিপুলকে আর কোন কিছুর সুযোগ না দিয়া মেখলা একটা নমস্কার করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। বিপুল কিছুক্ষণ তড়িতাহতের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, থীসিস্‌খানা রাখিয়া যাইবে কিনা, যদি হারাইয়া যায়! এমনও ত হইতে পারে যে মেখলা উহা তাহার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের পড়িয়া শুনাইবে, তাহাদের অনেকেই হয়ত উহা অ্যাপ্রুভ (অনুমোদন) করিবে। একটা অনাস্বাদিত নূতন রস যেন বিপুলের রসনাকে সজল করিয়া দিল। সে অনিচ্ছাসত্বেও লেখাটা টেবিলের উপর রাখিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

(৪)

সবে ফাগুন পড়িয়াছে। কলিকাতার ফুটপাতের গাছেও তার প্রভাব। কচি কচি কিশলয়, তাহাতে দখিনা বাতাসের আনাগোনা। বিপুল দেখিল বাস্তবিকই মন এ সময়ে বাহিরে ছুটিয়া যায়; প্রকৃতিতে যখন এত রস, তখন বিবাহ করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু দক্ষিণের পবন কেবল পথেই ঘুরিয়া বেড়ায় না, কলিকাতার জানালা গলিয়া কক্ষে কক্ষে তরুণ তরুণীর কেশে আঁচলের দোলা দিয়া যায়। তার মনও তাই চুপিসারে প্রবেশ করিল মেখলার অন্তঃপুরে।

সেদিন রবিবার। হরিনাথবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। বলিলেন, এসো বিপুল, বোসো। হাঁ, তারপর তোমার ছাত্রী কি রকম পড়ছে, ওর ফিলজফিটা একটু ভাল ক'রে দেখো। আর রবিবারে ওকে খুব কতকগুলো টাস্ক দেবে।

বিপুল বোকার মতো ঈষৎ হাসিয়া মেখলার ঘরে প্রবেশ করিল। মেখলা চা সাজাইতেছে। বলিল,—উঃ কি মিথ্যুক্ আপনি। আচ্ছা, আপনি জন্মেছেন কি মাসে?

বিপুল সহজভাবে বলিল,—বোশেখ-মাসে, কেন?

মেখলা হিহি ক'রে হাসিয়া উঠিল। বলিল আপনার থীসিস্ ভুল।

এতক্ষণে চৈতন্য হইল। চকিতে বিপুলের চোখমুখ লাল হইয়া ওঠে। সে ভাবে,

এ মেয়েটা অত্যন্ত ড্যাবলা। মুখে বলে,—ও ভাবে আমাকে আক্রমণ করবেন না। ছি!

—যাক্ গে, এখন চা খান। বলিয়া মেখলা বিপুলকে এক ডিস্ গরম সিঙাড়া ও চা আগাইয়া দিল। তারপর কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য মাধুর্য্য মিশাইয়া নানা কথায় বিপুলকে বুঝাইয়া দিল যে, তার থাসিস বেশ ভাল হইয়াছে, তার নিজের মতের সঙ্গে নাইবা মিলিল।

বিপুল চোখ বুজিয়া আরামে শুনিতেছিল সহসা ডানহাতের উপরে একটা তীক্ষ্ণ চিম্‌টি খাইয়া, উঃ বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহার হাত ঠেকিয়া অর্দ্ধপীত চায়ের পেয়ালা উল্টাইয়া গেল, টেবলক্লথ ও মেখলার সাড়ী ভিজিয়া একাকার। মুখের সিঙাড়া গিলিতে গিলিতে, হাসিতে হাসিতে মেখলার লাগিল বিষম। সে খক্ খক্ করিয়া কাশিতে কাশিতে একেবারে গলদঘর্ম্ম। রোষাভাসে বলিল,—nasty beast! তারপর ঢক্ করিয়া একগ্লাস জল খাইয়া নিজেকে কোনমতে সামলাইয়া নিয়াই বলিল,—ক্ষমা করুন।

বিপুল একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। ক্রুদ্ধ হইবে কি ঘৃণা প্রকাশ করিবে, কি নিজেরই ত্রুটি স্বীকার করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইতেছিল না।

এমন সময়ে মেখলা তাহার অতি সন্নিকটে আসিয়া তাহার দুইহাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—ও কিছু মনে করবেন না, বসুন। একটা কথা বলছি, রাখবেন বলুন।

ভ্রূকুটিভরে বিপুল বলে,—কি?

মেখলা বলে,—Let us experiment your thesis. (আপনার নবতত্ত্ব কার্য্যে পরিণত করি, আসুন)।

বিপুল বুঝিতে না পারিয়া বলে,—সে কি রকম?

—ইঃ ন্যাকামি করছেন! যান যান, কাল বাবাকে বলবেন। বলিয়া মেখলা ঠোঁট ফুলাইয়া তার রাঙা গাল দুইটা আরও রক্তাভ করিয়া তোলে।

বিপুলের ব্যাপারখানা বুঝিতে আরও মিনিট কয়েক দেরী লাগিল। যখন বুঝিল তখন মুখে হাসির লুকোচুরি খেলা সুরু হইয়াছে। সে বলে,—আপনার বাবা কি রাজি হবেন?

চাহিয়া দেখে মেখলা অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু আজ যেন তার প্রতীক্ষা করিবার অধিকার জন্মিয়াছে।

ঘরে ঢুকিলেন মেখলার মা। কিছু ভণিতা না করিয়াই বলিলেন,—বাবা বিপুল তোমার হাতেই মেখলাকে দিতে চাই, এতে আর অমত কোরো না।

* * *

বিয়ে যেদিন হইল সেদিন ফাগুনের শেষ। পুরাতন বৎসরের জীর্ণপাতা ঝরিয়া গিয়া প্রতি গাছেই নব পল্লব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিপুল ভাবিতেছিল, এটা মড়কের মাস, এমাসে বিয়েটা কি উচিত হইল।

চৈত্রের ২রা রাত্রে বিপুলের আকর্ষণে ঈষৎ প্রতিরোধ করিয়া মেখলা বলে,—তোমার থাসিস্…

বিপুল দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। উপরের কড়ি-বরগা গুণিতে গুণিতে বলে,—চুলোয় যাক্।

এবং পর বৎসর পৌষের শেষাশেষি একদা একটি নবজাত পুত্র সন্তান বিপুলের কোলে ধরিয়া দিয়া মেখলা তাহার শেষ দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল,—

—তোমরা জীবনের কোনপ্রকার অভিজ্ঞতা না নিয়ে থীসিস লেখো এই বড় দুঃখ। কি কতকগুলো রাবিস্ লিখেছিলে বল দিথি। মানুষের মন বিশ্লেষণ করে তোমারা বিজ্ঞান রচনা করছো, এর চেয়ে মূর্খতা আর কি হতে পারে!

বিপুল সব সহ্য করিল। কেবল বলিল—তুমি আমার ডক্টরেট মাটি করে দিলে, মেখলা। কিন্তু তুমিও ঠকেছো জেনো। বড় প্রেমে কখনো ছেলে হয় না। বঙ্কিম-বাবুর গ্রন্থে তিলোত্তমার ছেলে হয় নি, কুন্দনন্দিনীর ছেলে হয় নি, শরৎ চাটুর্য্যের রাজলক্ষ্মীরও ছেলে হয় নি, "সৃষ্টির ইচ্ছাই প্রেম" নয়।

মেখলার খোকা কাঁদিয়া উঠিয়াছে। বিপুল আর কি বলিল শোনা গেল না।

নীতীন বসু পরিচালিত "দিদি" চিত্রে সায়গল,
লীলা দেশাই, ভানু ব্যানার্জি, ও চন্দ্রাবতী।
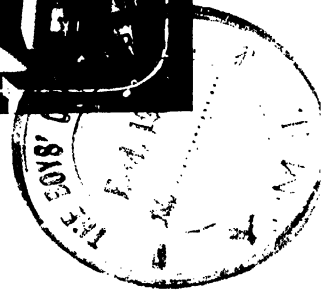
শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও কঙ্কাবতী

অধ্যাপক দিগম্বর ও তাঁর স্ত্রী স্বাগতা—এই দুই বিশিষ্ট ভূমিকায় এঁরা পর্দ্দায় আত্মপ্রকাশ কোর্‌বেন কালী ফিল্মসের আগামী বহু-বিখ্যাত ছবি "দস্তরমত টকী"-তে।
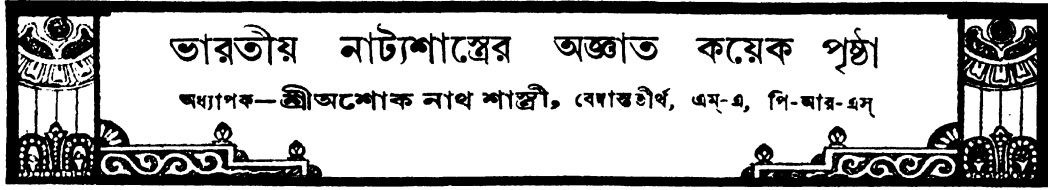
ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের অজ্ঞাত কয়েক পৃষ্ঠা

অধ্যাপক—শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম্-এ, পি-আর-এস্

মানব জীবনের জীবন্ত অনুকরণই নাট্য। তাই নাট্যশাস্ত্রের সঙ্কলনকারিগণ দৃশ্যকাব্যের একটি সাধারণ নাম দিয়াছেন 'রূপক'। রূপক (drama) বলিতে সেই শ্রেণীর সাহিত্যকেই বুঝায়—যাহাতে একের (অর্থাৎ নট-নটীর) উপর অপরের (অর্থাৎ কবিবর্ণিত চরিত্র বা পাত্রের) রূপ (অর্থাৎ স্বরূপ) আরোপিত হইয়া থাকে। এ রূপারোপ একমাত্র দৃশ্যকাব্যেই সম্ভব—শ্রব্যকাব্যে নহে। অতএব, দৃশ্যকাব্যই 'রূপক' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

রূপকের বিষয় রূপণ বা রূপারোপ বা জীবনের অনুকরণ। কিন্তু যে মানবজীবনের অনুকরণ রূপকে করা হয়, সেই জীবনই একটা বিরাট বিচিত্র প্রহেলিকা মাত্র। আর এ কারণে অনুকরণাত্মক নাট্যসাহিত্যের স্বরূপও চির-কুহেলিকায় আবৃত। শুধু ভারত বলিয়া নহে, পৃথিবীর সকল দেশেই দৃশ্যকাব্য-সাহিত্যের উৎপত্তির কোন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু বিশ্ববিশ্রুত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনীষী নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। আর কোন দিন কেহ পারিবেন বলিয়া ভরসাও হয় না। কারণ, এ বিষয়টির মধ্যে এতই বৈচিত্র্য বিদ্যমান যে, তাহার প্রত্যেকটি বিভাগের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সমগ্র স্থিতিকালের মধ্যে সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে না। জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যাইয়া যেমন সকল দর্শন ও বিজ্ঞান মূক হইয়া গিয়াছে, জীবনের অনুকরণস্বরূপ রূপকের উৎপত্তি সম্বন্ধেও সকল গবেষণা সেইরূপ ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তাই এ বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিচিত্র মতবাদ সমূহ উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধটিকে অনর্থক ভারগ্রস্ত করিতে চাহি না।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্য সাহিত্য সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যত কিছু আলোচনা হইয়াছে, সে সকলেরই মূল ভরতের "নাট্য-শাস্ত্র।" বর্ত্তমানে ভরতনাট্যশাস্ত্রের যে সংস্করণ পাওয়া যায়, তাহাই মহর্ষির রচিত মূল গ্রন্থ কি না—সে সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু তাহা বলিয়াই বর্ত্তমানে উপলভ্যমান "নাট্যশাস্ত্র" খানিকে নিতান্ত আধুনিক যুগের রচনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। এ পর্য্যন্ত কোন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত উহাকে টানিয়া খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর নিম্নে নামাইতে পারেন নাই। বরং উহা যে আরও প্রাচীনতর যুগের রচনা (অন্ততঃ উহার মধ্যে নানা যুগের রচনার বিভিন্ন স্তর বর্ত্তমান—ও এই সকল স্তরের মধ্যে কোন কোনটি যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব যুগের রচনা) তাহা বিশ্বাস করিবার পর্য্যাপ্ত কারণ আছে। এ হেন ভরতের নাট্যশাস্ত্র দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাকে কোনরূপেই উপেক্ষা করা চলে না। নাট্যশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, নাট্যসাহিত্য অনাদি। কিন্তু তাই বলিয়া সকল সময়ে নাট্যসাহিত্য অভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে না। যুগবিশেষে অবস্থা অনুসারে রূপক সাহিত্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান কল্পের প্রথম মন্বন্তরের প্রথম সত্যযুগে (১) চতুষ্পাদ ধর্ম্মের প্রকাশহেতু নাট্যের কোন প্রয়োজন না থাকায় উহা তিরোভূত অবস্থায় ছিল। পরে ত্রেতাযুগে জগতে একপাদ অধর্ম্ম সঞ্চারিত হইল দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করেন যে, শূদ্রজাতিসমূহের বেদাধিকার নাই,—এতএব তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তিনি যেন কোন সার্ব্ববর্ণিক পঞ্চম বেদ সৃষ্টি করেন। তদনুসারে পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদের অঙ্গসম্ভূত এই পঞ্চম 'নাট্যবেদ' সঙ্কলন করিয়াছিলেন। আর তদবধি প্রতি কল্পের প্রতি মন্বন্তরের প্রতি ত্রেতাযুগে নাট্যশাস্ত্রের নূতন করিয়া অভিব্যক্তি ঘটিয়া

---

(১) বর্ত্তমান "শ্বেতবরাহ"কল্প = ব্রহ্মার একদিন (দিবাভাগ) = ১৪ মন্বন্তর = ১০০০ চতুর্যুগ = ৪৩২ কোটি মানুষ বৎসর। পর্য্যায়-ক্রমে এক কল্পে সৃষ্টি ও তাহার পরবর্ত্তী এককল্পে প্রলয় ঘটিয়া থাকে। বর্ত্তমান কল্পে সৃষ্টিপ্রবাহ বর্ত্তমান। ১ মন্বন্তর = ১ মনুর অধিকারকাল = ৭১ (বা মতান্তরে কিঞ্চিদধিক ৭১) চতুর্যুগ। চতুর্দ্দশ মনুর নাম যথাক্রমে—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔত্তমি (বা উত্তমৌজাঃ, উত্তম), তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, রৌচ্য-(বা দৈব)-সাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। বর্ত্তমানে শ্বেতবরাহ কল্পের বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম কলিযুগ চলিতেছে। কল্পারম্ভ হইতে ১৯৭২৯৪৯০৩৭ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে।

আসিতেছে। ইহার সৃষ্টিকল্পে ঋক্‌বেদ হইতে পাঠ্যাংশ, সামবেদ হইতে গীত, যজুর্ব্বেদ হইতে অভিনয় ও অথর্ব্ববেদ হইতে রস সংগৃহীত হইয়াছিল। এই নাট্যবেদ ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রথম শিক্ষা করেন মহর্ষি ভরত। পরে তাঁহার শত পুত্রকে অভিনেতা ও (ব্রহ্মার মানসী সৃষ্টি) অপ্সরোগণকে অভিনেত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া ভরতের (তথা ভারতের) প্রথম নাট্যসম্প্রদায় গঠিত হয়। সশিষ্য মহর্ষি স্বাতি "বাদ্যভাণ্ডে"র অর্থাৎ ঢক্কাজাতীয় বাদ্যের অধিকারে ও নারদাদি গন্ধর্ব্বগণ গানযোগে (অর্থাৎ-"তত" বা তারের যন্ত্র ও "সুষির" বা হাওয়ার যন্ত্রের অধিকারে) নিযুক্ত হ'ন। পরে শিবের আদেশে তণ্ডু (নন্দী) তাঁহাকে "তাণ্ডব"নৃত্য, পার্ব্বতী "লাস্য" নৃত্য ও পিতামহ ব্রহ্মা (বিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত) নাট্যমাতৃকাস্বরূপিণী "বৃত্তি"-চতুষ্টয়ের উপদেশ প্রদান করেন। এইরূপে প্রাচীন ভারতে নাট্যবিদ্যা বিশেষ প্রসার লাভ করে।

তবে ইহা ত' গেল দেবলোকের কথা। দেবলোকে যে সকল দৃশ্যকাব্য অভিনীত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রথম রূপকখানির কোনরূপ নাম পাওয়া যায় না। তবে উহা বহুযুগব্যাপী দেবাসুর যুদ্ধের কোন একটি বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে রচিত—ইহাই মাত্র বুঝা যায়। দৈত্যগণের উপর দেবরাজ যে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি উজ্জ্বল রাখিবার জন্য দেবগণ "শক্রধ্বজমহোৎসবে"র আয়োজন করেন, ও সেই উপলক্ষেই দেবলোকে প্রথম নাট্যাভিনয় সম্পন্ন হয়। অবশ্য এই অভিনয় দৈত্যগণের মনে যথেষ্ট বিক্ষোভ উৎপাদন করে, ও প্রতিহিংসা গ্রহণের অভিলাষে তাঁহারা নাট্যবিঘ্ন উৎপাদনে প্রবৃত্ত হ'ন। কিন্তু অচিরেই দেবরাজের ধ্বজপ্রহারে তাঁহাদের শরীর জর্জ্জরিত হইয়া যায়। সেই হইতে ইন্দ্রধ্বজের নাম হয় "জর্জ্জর"; ও ক্রমে নাট্যাভিনয়ের উহা একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহার পর বিশ্বকর্ম্মা শক্ররোধক এক দুর্ভেদ্য নাট্যগৃহ নির্ম্মাণ করিলে তথায় পিতামহ-কর্ত্তৃক রচিত "অমৃতমন্থন" নামক "সমবকার" (দৃশ্যকাব্যবিশেষ) ভরতের নাট্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হয়। পরে হিমাচলে দেবাধিদেব মহাদেবের সম্মুখে অমৃতমন্থনের দ্বিতীয় অভিনয় হয়, ও তৎসহ পিতামহের আর একখানি রূপক "ত্রিপুরদাহ ডিম" (ডিম এক প্রকার দৃশ্যকাব্য) অভিনীত হইয়াছিল (২)। ইহার পরই দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় মহর্ষি ভরতরচিত "লক্ষ্মীস্বয়ংবর" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। চন্দ্রবংশীয় প্রসিদ্ধ নরপতি পুরূরবাঃ এই অভিনয় দর্শনার্থ নরলোক হইতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নাটকখানিতে অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা উর্ব্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ন, ও তাঁহার সখী অপ্সরঃপ্রধানা মেনকা বারুণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। পুরূরবার রূপে আত্মহারা হইয়া উর্ব্বশী অভিনয়ে নিজের পাঠ্যাংশ বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া দেবরাজ-কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হ'ন ও বহুদিন পুরূরবার প্রেয়সীরূপে নরলোকে অবস্থানপূর্ব্বক মর্ত্তে নাট্যকলার প্রথম প্রচার করেন (৩)। কিন্তু তাঁহার শাপমুক্তির পরেই নরলোকে নাট্যকলার বিস্মৃতি ঘটে। তাহার বহু বর্ষ পরে পুরূরবার পৌত্র মহারাজ নহুষ শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান বলে ইন্দ্রত্বলাভ করেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ভরতের শত পুত্র ঋষিগণের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া রচিত একখানি অশ্লীল দৃশ্যকাব্যের প্রয়োগ করায় ঋষিশাপে পাতিত্য (শূদ্রত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহঃ-রাজ নহুষের অনুরোধে মহর্ষি ভরত পুত্রগণকে মর্ত্তে প্রেরণ করেন। তথায় মানুষী অভিনেত্রীগণের সহিত মিশ্রণের ফলে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাদের বংশজাত স্ত্রীপুরুষগণ সকলেই পরবর্ত্তী যুগে নটনর্ত্তকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। ইহারাই "নট", "শৈলূষ" বা "কুশীলব" জাতি নামে বিখ্যাত। ঋষিশাপে ইহারা কেবল শূদ্রত্বই প্রাপ্ত হয় নাই, পরন্তু অত্যন্ত দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল (৪)। এমন কি ইহাদের সেই জাতিগত কদাচার আজও পর্য্যন্ত নটসম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করে নাই। আজিও জগতের সকলদেশেই নটগণ অভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট অল্পাধিক ভাবে অপাংক্তেয় হইয়া আছে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দেবলোকে নাট্যের উৎপত্তি হইতে মর্ত্তে নাট্যের প্রথম প্রচার পর্য্যন্ত যে উপাখ্যান বিচ্ছিন্নভাবে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে উদ্ধৃত করা গেল। নাট্যশাস্ত্রের এই উপাখ্যানটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। নাট্যশাস্ত্র বলিতেছেন যে, বেদই নাট্যের উপাদান। আমরাও দেখিতে পাই যে, ঋগ্বেদে এমন কতকগুলি সূক্ত আছে, যাহাতে নাটকীয় কথোপকথনের আভাষ পাওয়া যায়; এ সূক্তগুলির কোন বিনিয়োগ নাই। উদাহরণ স্বরূপে—(১) পুরূরবা ও উর্ব্বশী, (২) যম ও যমী, (৩) সরমা ও পণিগণ, (৪) অগস্ত্য, লোপামুদ্রা ও তাঁহাদের পুত্র, (৫) ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী ও বৃষাকপি, (৬) ইন্দ্র, অদিতি ও বামদেব, (৭) ইন্দ্র, বসুক্র ও তৎপত্নী, (৮) বিশ্বামিত্র ও নদীগণ, (৯) ইন্দ্র ও মরুদ্‌গণ, (১০) নেম ভার্গব ও ইন্দ্র, (১১) অগ্নি ও দেবগণ, (১২) বশিষ্ঠ ও তাঁহার পুত্রগণ—প্রভৃতি সূক্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই

(২) ভরতের নাট্যশাস্ত্র, ১—৪ অধ্যায়, (বরোদা অথবা কাশীর সংস্করণ)।

(৩) মহাকবি কালিদাসের "বিক্রমোর্ব্বশী" ত্রোটক এই ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

(৪) নাট্যশাস্ত্র, বারাণসী সংস্করণ, ৩৬ অধ্যায়।

সূক্তগুলিকে বলা হয় "সংবাদসূক্ত" (dialogue hymn)। ইহা ছাড়া কয়েকটি সূক্তে "একজনের উক্তি" (monologue) নাটকীয়ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অথর্ব্ববেদেও একটি "সংবাদ-সূক্ত" দৃষ্টিগোচর হয়। অধ্যাপক ম্যাক্স-মুলারের মতে এই সকল সংবাদসূক্তই নাট্যের প্রাচীনতম আদর্শ। বহু প্রাচীন যুগে যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে ঋত্বিক্‌গণ দুই দলে বিভক্ত হইতেন। একদল পুরূরবার উক্তির আবৃত্তি করিতেন, অপর দল উর্ব্বশীর, ইত্যাদি। অতএব, ঋগ্বেদ হইতে নাট্যবেদের পাঠ্যাংশ গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া নাট্যশাস্ত্রের যে বচন পাওয়া যাইতেছে, তাহা ত' আর অপ্রমাণ বলা চলে না। Dr. Hertel ত' উক্ত সংবাদসূক্তগুলিকে "mystery plays" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, সামবেদে গীতের অংশ কতদূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমানে বিশেষভাবে প্রতিপাদনের কোন প্রয়োজন নাই। অধ্যাপক Sylvain Levi-প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণও উহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর যজুর্ব্বেদের অভিনয়ের কথা। সোমযজ্ঞে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সোমবিক্রেতাকে ইষ্টকাদির প্রহারে জর্জ্জরিত করা হইত; ও অনেক সময় সে বেচারী সোমের মূল্যপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইত। ইহা সোমরক্ষক গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে সোমাহরণ ঘটনার অনুকরণাত্মক অভিনয়মাত্র। এইরূপ "মহাব্রত" যজ্ঞানুষ্ঠানেও অভিনয়ের যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যায়। শ্বেতবর্ণ-গোলাকৃতি চর্ম্মখণ্ড লইয়া বৈশ্য ও শূদ্রের বিবাদ ও অবশেষে বৈশ্যের জয়—ইহাই মহাব্রতের মূল ঘটনা। ইহার আনুষঙ্গিকভাবে এক ব্রহ্মচারী ও এক গণিকার পরস্পর গালাগালিরও বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগের (যখন পুরাদস্তুর নাটক রচিত হইল) বিদূষক ও চেটীর কলহ ইহার সহিত বিশেষভাবে তুলনীয়। তাহার পর "অশ্বমেধ" যজ্ঞানুষ্ঠানে পুত্রলাভের আশায় ছিন্নশীর্ষ যজ্ঞাশ্বের সহিত প্রধানা রাজমহিষীর মিলন (=উর্ব্বরতানুষ্ঠানের রূপক) প্রভৃতি বহু যজুর্ব্বেদীয় অনুষ্ঠানে দৃশ্যকাব্যের উপাদান প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, যজুর্ব্বেদে নটশব্দের পর্য্যায় "শৈলূষ" শব্দটিও দৃষ্টিগোচর হয়। এজন্য Hillebrandt সাহেব এ সকল অনুষ্ঠানকে মধ্যযুগের রহস্যাভিনয়ের (mystery plays) সহিত তুলনীয় ধর্ম্মমূলক দৃশ্যকাব্যের বীজস্বরূপ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে Sten Konow, Keith প্রভৃতি গবেষকগণ এগুলিকে লৌকিক নির্ব্বাক্ আঙ্গিক অভিনয়মাত্র (popularmime) বলিতে চাহেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে এতদূর অভিনয়ানুকূল অবস্থার সন্নিবেশ দেখা যায় যে, ইহাদিগকে শুধুই pantomime বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ব্রাহ্মণ সাহিত্যেও বহু আখ্যান মধ্যে দৃশ্যকাব্যের পর্য্যাপ্ত উপাদান সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। দুই চারিটি সংবাদ সূক্তের আখ্যানাংশও কোন কোন ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকায় গদ্য অথবা পদ্যাকারে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, যথা—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপোপাখ্যান শতপথ ব্রাহ্মণের উর্ব্বশী-পুরূরবার উপাখ্যান। এই উর্ব্বশী-পুরূরবার আখ্যান পরবর্ত্তী যুগে মহাকবি কালিদাসের অমৃতবর্ষিণী লেখনী-মুখে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া "বিক্রমোর্ব্বশী" "ত্রোটক"রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে অপ্সরাঃ শকুন্তলা ও দুঃষন্তের আখ্যান—ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দৌষন্তি ভরতের আখ্যান—সম্ভবতঃ কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের মূল উপজীব্য। ইহা ছাড়া রসোৎপত্তির অনুকূল নৃত্য-গীত-বাদ্যের উল্লেখ অথর্ব্ববেদে পাওয়া যায়। এমন কি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেও জনমনোহারিণী নৃত্যকুশলা নারীর (নৃতু) বিবরণও পাওয়া যায়। কৌষীতকিব্রাহ্মণে নৃত্য-গীত-বাদ্যকে "কলা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আর "সুপর্ণাধ্যায়"-খানিকে Dr. Hertel একখানি সুবিস্তৃত পুরাদস্তুর দৃশ্যকাব্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গীত ও বাদ্য ব্যতীত কেবল নৃত্যও নানারূপ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইত। মহাব্রতে বৃষ্টি উৎপাদনের জন্য অগ্নির চারিদিকে কুমারীগণের নৃত্য, বিবাহোৎসবে বরবধূর সৌভাগ্যকামনায় সধবা গৃহিণীগণের প্রমোদনৃত্য, মৃত্যুর পরে মৃতের অন্তিম স্মৃতিচিহ্নটুকু রক্ষা করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে শোকনৃত্য প্রভৃতির অভাব বৈদিক সাহিত্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। আর নাট্যের সহিত নৃত্যের সম্বন্ধ অতি নিগূঢ়। Oldenburg প্রমুখ পণ্ডিতগণ নৃত্যকেই দৃশ্যকাব্যের মূল উপাদান বলিয়াছেন।

এই সকল আলোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বৈদিক সাহিত্যে নাট্যের উপাদান যথেষ্টই বর্ত্তমান ছিল। অবশ্য তাই বলিয়া "সুপর্ণাধ্যায়"কে একখানি পুরাদস্তুর রূপক বলিতে যাওয়াও সুবিবেচনার কার্য্য নহে। Windisch, Pischel ও Oldenberg বলেন যে, সংবাদসূক্তগুলির অন্তর্ভুক্ত ঋক্‌গুলি পূর্ব্বে নাটকীয় গদ্যাংশ (চূর্ণক) দ্বারা পরস্পর সংযোজিত ছিল, এক্ষণে কালক্রমে সেই সকল চূর্ণক বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোন অসংবদ্ধ পদ্যাংশ অবশিষ্ট আছে। এই পদ্যাংশগুলিও অতি প্রাচীন—ইন্দো-ইয়োরোপীয় যুগের গন্ধ এগুলিতে বেশ অনুভব করা যায়। পরবর্ত্তী লৌকিকযুগের গদ্য ও পদ্য—এই উভয়বিধ কাব্যই এই সংবাদসূক্ত হইতে ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। আবার Geldner প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে এগুলি চারণগীতিমাত্র (ballad)। পক্ষান্তরে Konow, Keith, Winternitz প্রমুখ গবেষকগণ এগুলিকে নির্ব্বাক্ অভিনয়

(pantomime) বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশেও কোন কোন গবেষক (বেল্‌ভাল্‌কর প্রভৃতি) এই সকল পরস্পর বিরোধী মতের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—এই সকল সংবাদ-সূক্তাদির কোনটি বা চারণের গীত, কোনটি বা প্রাচীন আখ্যানের ত্রুটিত অংশ, আবার কোনটি বা যাজ্ঞিক রূপকের কথোপকথনের অংশমাত্র। আমরা কিন্তু এরূপ চতুরতার সহিত গোঁজামিল দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে রাজী নহি। নাট্যশাস্ত্রে যে সকল সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে গুলি যে শুধুই অলীক কাহিনীমাত্র নহে, তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। ভারতীয় দৃশ্য কাব্যের উপাদান যে আদিতে বৈদিক সাহিত্য হইতে গৃহীত—এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। অধিকন্তু মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে যেরূপ যাজ্ঞিক দৃশ্যকাব্যের প্রচলন ছিল, ভারতেও যে তাহার অনুরূপ ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত—এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তবে পার্থক্য এই যে, মেক্সিকোতে যাজ্ঞিক-রূপক শুধু দৃশ্যকাব্যেরই উৎপত্তিস্থল বলিয়া গণ্য হয়,—আর ভারতের বৈদিক সংবাদসূক্ত বা যাজ্ঞিক রূপক লৌকিক দৃশ্য ও শ্রব্য—এই উভয়বিধ কাব্যেরই উদ্ভবহেতু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

বৈদিক যুগের পর উঠে পৌরাণিক যুগের কথা। এ সম্বন্ধেও একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা এস্থানে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন হইবে না।

রামায়ণের বর্ত্তমানে উপলভ্যমান সংস্করণে নট, নর্ত্তক, শৈলূষ, নাটক, ব্যামিশ্র প্রভৃতি পদের উল্লেখ আছে (অযোধ্যা কাণ্ড)। এমন কি সীতাদেবী শৈলূষগণের জঘন্য আচারের কথাও বলিয়াছেন। তিলক টীকাকর বলেন "নট" অর্থে "সূত্রধার" ও "ব্যামিশ্র" অর্থে "প্রাকৃতাদি ভাষা মিশ্রিত নাটক।" কিন্তু Keith প্রভৃতি গবেষকগণ এ সকল উল্লেখের মধ্যে হয় প্রক্ষিপ্তবাদ নয়ত' মূকাভিনয়ের ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়াছেন। মহাভারতেও সভাপর্ব্বের "নাটক" শব্দটিকে ইঁহারা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেন। নীলকণ্ঠ অনুশাসন পর্ব্বের "নটনর্ত্তক" পদটির অর্থ করিয়াছেন—ভরতাদি (অর্থাৎ অভিনেতা প্রভৃতি)। কিন্তু Keith-এর মতে এ সকলই মূকাভিনয়। তবে শান্তি পর্ব্বে যে "রঙ্গাবতরণ" শব্দ পাওয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নীরব রহিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের খিল অংশ "হরিবংশে" নাট্যাভিনয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। বসুদেবের অশ্বমেধ যজ্ঞে "ভদ্রনামে" একজন কামরূপী নট অতি সুন্দর নাট্য-প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই ভদ্রের ছদ্ম-বেশে নাট্যাভিনয়ের ছলে বজ্রপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ তনয় প্রদ্যুম্ন বজ্রপুরাধিপতি দানবরাজ বজ্রনাভের কন্যা প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। এই সময় দুইটি নাট্যাভিনয় হইয়াছিল। প্রথমটি অভিনীত হয় বজ্রপুরের

শাখানগর "সুপুরে"। উহাতে রামায়ণের একাংশ নাট্যাকারে গ্রথিত হইয়া অভিনীত হয়। এ অভিনয়ে প্রদ্যুম্ন নায়কের ভূমিকা, শাম্ব বিদূষকের ও গদ পারিপার্শ্বিকের অংশ গ্রহণ করেন। আর নারী ভূমিকায় বারনারীগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার পর দ্বিতীয় অভিনয় হয় খাস বজ্রপুরে। অভিনয় নাটকের নাম ছিল "রম্ভাভিসার"। প্রথমে নটবেশধারী প্রদ্যুম্ন, গদ শাম্ব নান্দী প্রয়োগ করিলে প্রদ্যুম্ন স্বয়ং গঙ্গাবতরণাশ্রিত মঙ্গল শ্লোক পাঠ করেন। পরে নাট্যপ্রয়োগ আরম্ভ হয়। উহাতে রাবণের ভূমিকায় শূর, নলকূবরের ভূমিকায় প্রদ্যুম্ন, বিদূষকের ভূমিকায় শাম্ব ও রম্ভার ভূমিকায় "মনোবতী" নাম্নী এক বারাঙ্গনা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এ অভিনয়ে দৃশ্যপটাদিরও অভাব ছিল না। যদুনন্দনগণ মায়াবলে কৈলাসপর্ব্বতের দৃশ্য পর্য্যন্ত হুবহু নকল করিয়াছিলেন। (ইহাকে পীঠমায়া বা stage-illusion ব্যতীত আর কি বলা সম্ভব?) Keith সাহেব ইহাকে আর mime বলিয়া উড়াইতে চাহেন নাই। তবে তাঁহার মতে হরিবংশ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর রচনা। অতএব, হরিবংশের বচনবলে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করার চেষ্টায় তিনি বিশেষ কোন কৃতিত্ব খুঁজিয়া পান না।

এইরূপে পৌরাণিক সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সাহায্যে ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠার সকল প্রযত্নই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা অগ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে। এই সকল পৌরাণিক প্রমাণের কোন কোনটি তাঁহাদের মতে প্রক্ষিপ্ত; আর অবশিষ্টগুলি—হয় মূকাভিনয় নয় চারণগীতি, অথবা কথকতা, কিংবা পুতুলনাচ বা ঐরূপ এমন কোন একটা ব্যাপারের সূচক—যাহাতে নাট্যের কিছু পূর্ব্বাভাস থাকিলেও যাহা কোনরূপেই পুরাদস্তুর নাট্যাভিনয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে 'নট' শব্দের পর্য্যায় বাচক দুইটি শব্দের আলোচনা অপরিহার্য্য। প্রথম শব্দটি হইতেছে "ভারত"। মহর্ষি ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রথম প্রচারক বলিয়া ভরতপুত্রগণ ও ভরতপুত্রগণের বংশজাত নটগণ "ভারত" নামে খ্যাত হ'ন। অতএব, প্রাচীন শাস্ত্রমতে "ভারত" শব্দের অর্থ 'নট'। কিন্তু এই সকল পাশ্চাত্ত্য গবেষক বলেন, তাহা নহে—ভারতগণ "ভারত" শাখার প্রাচীন চারণ কবি (rhapsode) মাত্র। ইঁহারাই প্রথমে গীতাকারে মহাভারত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরে ইঁহাদের রচিত বিচ্ছিন্ন গীতাংশ একত্র সংবদ্ধ ও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া "ভারত" ও পরে "মহাভারতে"র রূপ ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ ইঁহারা শ্রব্যকাব্যের উদ্ভব কারণ হইলেও হইতে পারেন; কিন্তু দৃশ্য কাব্যের সহিত ইহাদের সম্পর্ক কিছুই নাই। এমন কি ইঁহারা স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন যে, "ভাট" শব্দটিও "ভারত" শব্দের অপভ্রংশ। পক্ষান্তরে, আমরা জানি যে, "ভাট" শব্দের সহিত "ভট্ট" (প্রাকৃত) ও "ভর্ত্তা" (সংস্কৃত) শব্দের সম্পর্কই নিকটতর। ভট্ট ও চারণগণের জীবিকা একইরূপ ছিল। ভট্টগণ সঙ্করজাতি—ক্ষত্রিয়পিতা ও বিপ্রকন্যা মাতার সংযোগে উৎপন্ন। তাঁহারা পতিত হইলেও নটগণের মত কদাচারী (জায়াজীব) ছিলেন না। দ্বিতীয় শব্দটি "কুশীলব"। সকলেই জানেন যে, মহর্ষি বাল্মীকিরচিত রামায়ণ মহাকাব্যের গান বা আবৃত্তির প্রথম প্রবর্ত্তক ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর যমজ তনয়—কুশ ও লব। তাঁহাদের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্যই "কুশীলব" শব্দটি নটের পর্য্যায়রূপে এ যাবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে—এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত হয় কি? অবশ্য তাই বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে চাহিনা যে, রামতনয়দ্বয়ই নটসম্প্রদায়ের আদিপুরুষ ছিলেন; অথবা মাত্র এইটুকু প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই কুশলবের রামায়ণ গানকে পুরাদস্তুর অভিনয়ের শ্রেণীভুক্ত করাকেও আমরা সঙ্গত মনে করি না,—বিশেষতঃ যখন বহু গবেষক "কুশীলব" শব্দটির মধ্যে নটের জাতিগত দুশ্চরিত্রতার স্পষ্ট আভাস পাইয়া থাকেন (কু—শীল +ব=কুশীলব)। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই শব্দটি ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতার পরিপোষক একটি ক্ষুদ্র প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে বলিয়া আমাদের দৃঢ় ধারণা। কারণ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাভাষ্যকার ভগবান্ পতঞ্জলি ও কুশীলবগণের (বিশেষতঃ নটস্ত্রীগণের) চরিত্রদোষের কথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন।

তর্কের খাতিরে না হয় মানিয়া লওয়াই গেল যে, রামায়ণ-মহাভারত-হরিবংশ-পুরাণাদির বিবরণ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্ভরযোগ্য নহে; অথবা উহাতে মূকাভিনয়-জাতীয় অভিনয়ের আভাস ব্যতীত প্রকৃত নাট্যের কোন প্রসঙ্গই পাওয়া যায় না। কিন্তু মহর্ষি পাণিনির "অষ্টাধ্যায়ী"-ব্যাকরণ-সূত্রে যে "নট" শব্দ ও "শিলালিন্" ও "কৃশাশ্ব" নামক দুইজন প্রাচীন নাট্যসূত্র-রচয়িতা নাট্যাচার্য্যের উল্লেখ রহিয়াছে, (৫) তাহাকে ত' আর মূকাভিনয় বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। Goldstucker প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পাণিনির বয়স খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীতে ফেলিলেও Keith উঁহাকে টানিয়া অনেক নীচে নামাইয়াছেন, কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও ঋষিকে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব

(৫) বেল্‌ভালকরের মতে ইঁহারা ভরতের পূর্ব্ববর্ত্তী। অন্ততঃ বর্ত্তমানে উপলভ্যমান "নাট্যশাস্ত্র" অপেক্ষা এ দুইটি নটসূত্রের প্রাচীনত্ব স্বীকার্য্য।

পঞ্চম শতাব্দীর পরে স্থাপন করিতে পারেন নাই। বরং Levi প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কুশাখকে একজন ইন্দো ইরাণীর বীর বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আর শতপথব্রাহ্মণেও "শিলালী"র নাম পাওয়া যায়। অতএব, শিলালী ও কুশাখকে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীর পরে ফেলিতে পারা যায় না। আর তাহা হইলে ভারতীয় নাট্যোৎপত্তির উপর গ্রীক্ প্রভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কারণ, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে গ্রীসেও পুরাদস্তর নাট্যাভিনয় প্রচলিত ছিল—একথা এখন পর্য্যন্ত কোন গবেষক বলিতে সাহস পান নাই। Satyrikon-এর প্রবর্ত্তক Thespis, তৎপরবর্ত্তী Phrynikos,—Attic Tragedy-এর জন্মদাতা Aischylos ও তাঁহার অনুগামী Sophokles, Euripides প্রভৃতি,—Doric Farce ও Commedy-র সুবিখ্যাত রচয়িতা Phormis, Epicharmos, Deinolochos, Rhinthon প্রভৃতি,—Old Attic Commedy যুগের Chionides, Ekphantides, Magnes, Kratinos, Aristophenes, Pherekrates, Telekleides, Krates (the tragedian), Hermippos, Kallias, Hegemon, Eupolis প্রভৃতি গ্রীক্ নাট্যকারগণের কেহই খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। পক্ষান্তরে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বা তাহার পূর্ব্বেও ভারতে একাধিক নটসূত্র রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

গ্রীক্ প্রভাবের কথা উঠিলেই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে "যবনিকা"র কথা। এই একটি মাত্র শব্দকে কেন্দ্র করিয়া Weber, Windish-প্রমুখ পাশ্চাত্য গবেষকগণ এককালে বেশ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে অবশ্য "যবনিকা" শব্দটির উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় নাট্যে গ্রীক্ প্রভাবের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার প্রবৃত্তি গবেষকদিগের মধ্যে আর বড় একটা দেখা যায় না। যবনিকার সহিত যবন শব্দটির (Ionian, Bactrian, Bactro-Persian Greek = যবন) ব্যুৎপত্তিগত সম্বন্ধ থাকা খুবই সম্ভব। হয়ত পারস্য বা ব্যাক্ট্রিয়া হইতে কারুকার্য্যখচিত পর্দ্দা ভারতে তৎকালেও আসিত; কিন্তু ঐগুলি প্রাচীন যুগে রঙ্গমঞ্চে ব্যবহৃত হইত কিনা সন্দেহ। কারণ, খৃঃ দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত কবিরাজ রাজশেখরের "কর্পূর মঞ্জরী" সট্টক (প্রাকৃতভাষাময় দৃশ্য কাব্য বিশেষ) ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীনতর সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে যবনিকা (বা জবনিকা) শব্দটি ব্যবহৃত হয় নাই। এমন কি নবম শতাব্দীতেও বাচস্পতি মিশ্র ঐ অর্থে "তিরস্করণী" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। সাধারণতঃ প্রাচীন নাট্যগ্রন্থাদিতে ঐ অর্থে পটী, অপটী, প্রতিসীরা, তিরস্করণী (তিরস্করিণী) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখা

যায়। অতএব, যবনিকা অর্থে গ্রীক্ বা পারসীক পর্দা বুঝাইলেও উহার সাহায্যে ভারতীয় নাট্যে গ্রীক্ প্রভাব প্রমাণিত করা যায় না।

এইরূপে যবনিকার মায়া কাটান সম্ভব হইলেও কালিদাস-কৃত "অভিজ্ঞানশকুন্তল" নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে উল্লিখিত সুন্দরী সশস্ত্রা যবনী প্রতিহারীগণের হাত হইতে এত সহজে নিস্তার পাওয়ার উপায় নাই। "Periplus of the Erythroean Sea" নামক খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে রচিত একখানি গ্রীক্ পুস্তকে দেখা যায় যে, পশ্চিম ভারতের সুবৃহৎ বন্দর Barygaza-র (বর্ত্তমান Broach বা ভৃগুকচ্ছ) রাজগণের বিলাসের উপকরণ হিসাবে গ্রীক্ বণিকেরা নৌকা বোঝাই দিয়া যবনী বা ব্যাক্ট্রিয়ো পারসীয়ান্-গ্রীক্ সুন্দরী আমদানি করিতেন। আর পশ্চিম ভারতের অনার্য্য বিলাসপ্রিয় শক নরপতিগণ এই সকল অনায়াসলভ্যা মনোমোহিনী বিদেশিনী গণিকাপ্রায়া বীরাঙ্গনাগণকে (প্রকাশ্যে শরীর রক্ষিণীরূপেও অপ্রকাশ্যে নর্ম্মসঙ্গিনী হিসাবে) প্রতিপালন করিতেন। শকুন্তলায় এইরূপ যবনীর ছায়া যে দৃষ্ট হয়, তাহা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতীয় নাট্যোৎপত্তির উপর গ্রীক্ নাট্যের প্রভাব স্বীকার করিবার উপযুক্ত বিশেষ কোন হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইরূপ গ্রীক্ সুন্দরীর ভারতে আমদানী খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে (অর্থাৎ আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে) কোনরূপেই সম্ভব হয় নাই। অথচ তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে পুরাদস্তুর নাট্যাভিনয় যে চলিত, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

গ্রীক্ নাট্যের দুইটি প্রধান বিশেষত্ব—(১) দেশ-কাল-ঘটনার সমতা বা সামঞ্জস্য (unity), ও (২) কোরাস্ (chorus)-এর প্রবর্ত্তন। অথচ ভারতীয় নাট্যে এই দুইটি বিষয়েরই একান্ত অভাব। ভারতীয় নাট্যে দেশকালঘটনার সমতা প্রায় নাই বলিলেই চলে। দুইটি অঙ্কের ব্যবধানে একযুগ পর্য্যন্ত অতীত হইয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত ভারতীয় নাটকাদিতে বিশেষ বিরল নহে। এই সকল কারণে ভারতীয় নাট্যকে গ্রীক্ নাট্য হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া গণনা করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ বা তাহারও পূর্ব্ব পূর্ব্ব শতাব্দীতে ভারতে যে প্রকৃত নাট্যাভিনয় হইত, সে সম্বন্ধে প্রমাণাভাব না থাকিলেও সে সকল নাট্যাভিনয়ের কোনরূপ বিবরণ সংগ্রহ করা বর্ত্তমানে কঠিন। পৌরাণিক প্রমাণ বাদ দিয়া কেবল ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, অভিনয়ের প্রাচীনতম বিবরণ ভগবান্ পতঞ্জলির মহাভাষ্যে সংগৃহীত হইয়াছে (৬)। ভাষ্যকারের মতে—পরোক্ষ অতীতের ঘটনা প্রত্যক্ষবৎ দেখাইবার উপায় ছিল তিনটি—(১) শৌভিক বা শোভনিক গণ দর্শকসমক্ষে কংসবধ ও বলিবন্ধ প্রভৃতি অতীত ঘটনার প্রত্যক্ষ অনুকরণ করিয়া যাইতেন। (২) চিত্রের সাহায্যেও এই সকল অতীত ঘটনার অনুকরণ করিয়া দেখান হইত। (৩) গ্রন্থিকগণ এই সকল ঘটনার আবৃত্তি করিয়া সমবেত শ্রোতৃবর্গকে শুনাইতেন। কংসবধ-পা র আবৃত্তিকালে তাঁহারা দুইটি দলে বিভক্ত হইতেন, একদল হইত কংসের পক্ষ ও অপরদল হইত বাসুদেব-ভক্ত। শ্রোতৃগণের মনে গভীর ছাপ দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিজ নিজ অঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বর্ণলেপনও করিতেন। সাধারণতঃ, কংসপক্ষীয়গণ কালমুখ ও বাসুদেবের ভক্তবৃন্দ রক্তমুখ হইতেন।

উক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শৌভিকগণ কেবল আঙ্গিক অভিনয় করিতেন। পক্ষান্তরে গ্রন্থিকগণ বাচিক অভিনয়ের সহিত অল্পবিস্তর আঙ্গিক অভিনয়ও করিয়া যাইতেন। আর বর্ণ বিন্যাসের বিধান দেখিয়া মনে হয় যে, শেষোক্ত শ্রেণীর অভিনেতৃবর্গ নেপথ্যবিধি বা আহার্য্যাভিনয় সম্বন্ধেও একেবারে উদাসীন থাকিতেন না। শৌভিকগণ শুধুই মূকাভিনেতা ছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধেও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। মহাভাষ্যের টীকাকার কৈয়ট বলিয়াছেন—"শোভনিক" শব্দের অর্থ "কংসাদির অনুকরণকারী নটগণের ব্যাখ্যানোপাধ্যায়"। কৈয়টের "ব্যাখ্যানোপাধ্যায়" শব্দটির অর্থ বিশেষ অস্পষ্ট। এই টীকাংশ হইতে ঠিক বুঝিয়া ওঠা যায় না যে, শোভনিকগণ ঠিক নাট্যাচার্য্যরূপে কংসাদির অনুকরণকারী নটগণকে শিক্ষাপ্রদান করিতেন, অথবা তাঁহাদের মূক অঙ্গবিক্ষেপের তাৎপর্য্য দর্শকগণকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। (বর্ত্তমান যুগে দক্ষিণ ভারতের "কথাকলি" নৃত্যে এরূপ ব্যাপার দৃষ্ট হয়। একজন মূকাভিনয় করেন, ও তাঁহার অভিনের বিষয় বস্তু পশ্চাৎ হইতে গায়ক ও কথকের দল গীত ও আবৃত্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন।) যদি প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে শোভনিক-গণকে অতি সুশিক্ষিত নট ও নাট্যাচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অন্যথায়

(৬) যাঁহারা স্বর্গত মমঃ গণপতি শাস্ত্রীর মতের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্য পাণিনি ও কৌটিল্যের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবি ভাসের গ্রন্থগুলিকেই ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের বর্ত্তমানে উপলভ্যমান প্রাচীনতম নিদর্শন বলিবেন।

[বলিতে হয়—শৌভনিকগণ নট ছিলেন না, মূক অভিনেতৃবর্গের কর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন মাত্র। যাহাই হউক, শৌভিক শব্দটির অর্থ স্থির না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। কারণ, গ্রন্থিকগণের ক্রিয়া পদ্ধতির বিবৃতিদর্শনে বেশ বুঝা যায় যে, আঙ্গিক, আহার্য্য ও বাচিক অভিনয় ভগবান্ পতঞ্জলির অবিদিত ছিল না। পতঞ্জলিকে বর্ত্তমানে একরূপ সর্ব্বসম্মতিক্রমেই "শুঙ্গ" রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের সমকালবর্ত্তী (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগ) বলিয়া ধরা হয়। অতএব, ঐ সময়ে যে পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে রচিত রূপকাবলী ভারতে অভিনীত হইত, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে। কেবল ঐরূপ অভিনয় ব্যতীত নটস্ত্রীগণের চরিত্রহীনতার কথা, ও "ভ্রূকুংস" নামক স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তক বা নটের উল্লেখও মহাভাষ্যে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য গবেষকগণ কি ইহাকেও pantomime বলিয়া উড়াইয়া দিবেন?

হিন্দু গ্রন্থগুলির ন্যায় প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থেও অভিনয়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন বৌদ্ধ "সুত্ত" গ্রন্থগুলিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পক্ষে "বিসূকদস্সন", "নচ্চ", "পেক্খা" প্রভৃতিতে যোগদান নিষিদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য গবেষকগণ বলেন যে, এগুলির সহিত অভিনয়ের কোন সাদৃশ্যই ছিল না, আর এই সকল "সুত্ত" গ্রন্থ তেমন প্রাচীন নয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞ বৌদ্ধ তত্ত্ববিদ্গণ বলেন যে, এই সকল সুত্তগ্রন্থ খৃঃ পূঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে রচিত হয় নাই। ইহা ছাড়া "ললিতবিস্তরে" বুদ্ধের নাট্যকলাজ্ঞানের উল্লেখ আছে। বিম্বিসারের যে নাট্যাভিনয় হইত, তাহারও বিবরণ পাওয়া যায়। "দিব্যাবদান" ও "অবদান-শতকের" মধ্যেও দৃশ্যকাব্যের প্রসঙ্গ যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। অবদান-শতকে বর্ণিত আছে—"ক্রকুচ্ছন্দ" নামক এক পূর্ব্বতন বুদ্ধের আদেশে শোভাবতী নগরীতে নাট্যাভিনয় হইয়াছিল। গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবকালে রাজগৃহেও অভিনয় চলিত। "কুবলয়া" নামে এক অভিনেত্রী সেই সময় বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুককে বিপথগামী করিয়াছিল। অবশেষে বুদ্ধ তাহাকে এক কুৎসিতা বৃদ্ধা রমণীরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন। তখন অনুতপ্তা অভিনেত্রী ভিক্ষুণীর জীবন গ্রহণ করে। ললিতবিস্তর অবশ্য শ্রব্যকাব্যাকারে লিখিত। কিন্তু "সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক" গ্রন্থখানি সংবাদ বা সংলাপে (dialogue) গ্রথিত—নাটকীয়ভাবে পরিপূর্ণ। "মহাবংশে" পাওয়া যায় যে, "থূপ"-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে নাট্যাভিনয় হইত। আর এই সকল গ্রন্থের কোন খানিই খৃষ্টজন্মের পরবর্ত্তীকালে সঙ্কলিত হয় নাই।

অজন্টার 'ফ্রেস্কো' চিত্রের কথা না হয়, ছাড়িয়াই দেওয়া গেল। ইহাতে নৃত্য-গীত-নাট্যসম্পর্কিত চিত্রের অভাব নাই। কিন্তু এগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তিব্বতেও অতি প্রাচীন লৌকিক নাট্যাভিনয়ের লুপ্তাবশেষ এখনও সম্প্রদায়ক্রমে রক্ষিত ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আর সে গুলি ভারতের বৌদ্ধ আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত।

বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির ন্যায় প্রাচীন জৈন গ্রন্থগুলিতেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নৃত্য-গীত-নাট্যদর্শনের নিষেধ কথিত হইয়াছে। তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বয়ং নাট্যকলায় বিশেষ অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছিলেন,—ইহারও উল্লেখ জৈনগ্রন্থে পাওয়া যায়।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণেও দৃষ্ট হয়,—শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম চতুঃষষ্টি ললিতকলায় পারদর্শী ছিলেন। আবার রামায়ণেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সীতা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট শৈলূষজাতির কদাচারের উল্লেখ পূর্ব্বক আক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য গবেষকবৃন্দের নিকট হিন্দুর প্রাচীন আর্যগ্রন্থগুলির কোনই ঐতিহাসিক মূল্য নাই। অতএব, এ সকল উক্তি তাঁহারা বিনা দ্বিধায় ও বিনা যুক্তিতে পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষিপ্ত রচনা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বান্বেষীর তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রের আলোচনায় এইটুকু বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতে নাট্যাভিনয় বিশেষভাবেই প্রচলিত ছিল। সে অভিনয়ে গণিকা অভিনেত্রীও নিয়োজিত হইত। আবার কখন কখন বা স্ত্রীভূমিকায় স্ত্রীবেশধারী পুরুষও অবতীর্ণ হইতেন (৭)।

পূ
উ
দ
প
অশোক
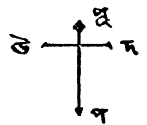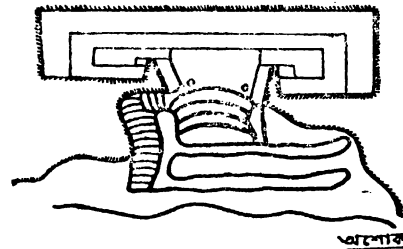
(৭) এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সারগুজা ষ্টেটে যে রামগড় পর্ব্বত বিদ্যমান আছে, তাহার মধ্যে "সীতাবেঙ্গা" ও "যোগীমারা" গুহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের সুপরিচিত। এই দুইটি গুহায় খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর অক্ষরে (ব্রাহ্মী-লিপি) খোদিত দুইটি শিলালেখ দৃষ্ট হয়। এই শিলালেখে দেবদত্ত নামক কোন রূপদক্ষ (অর্থাৎ নট) ও সুতনুকা নাম্নী কোন দেবদাসীর (অর্থাৎ নটী বা নর্ত্তকীর) নাম পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া সীতাবেঙ্গা গুহাটি ভরতনাট্যশাস্ত্রোক্ত কনিষ্ঠ পরিমাণের রঙ্গমঞ্চের আকারে কাটা। উহার পার্শ্বের যোগীমারা গুহাও নেপথ্যের (অর্থাৎ সাজ-

মহাভাষ্যের পরবর্ত্তীযুগ হইতে ভারতে যে সকল নাট্যাভিনয় হইয়াছে, তাহাদের একটা মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। অশ্বঘোষ, ভাস, শূদ্রক, কালিদাস, চন্দ্র, শ্রীহর্ষ, মহেন্দ্রবিক্রম-বর্ম্মা, ভবভূতি, বিশাখদত্ত, ভট্টনারায়ণ, মুরারী, রাজশেখর, ভীমট, ক্ষেমীশ্বর, কৃষ্ণমিশ্র প্রভৃতির পরিচয় ও নাট্যরচনা অনেকেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। হয়ত কোনো কবির আবির্ভাব বা রচনাকাল সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে ইতিহাসের ধারা খুব বেশী বিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল মহাকবি ভাসকে চাণক্য (কৌটিল্য) ও পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে ভারতীয় নাট্যের প্রাচীনতা সম্বন্ধে অনেকটা স্থির নিশ্চয় হওয়া যায়। অন্যথায় অবশিষ্ট কবিগণের সময় দুই এক শতাব্দী এদিক্-ওদিক্ হইলে কোনরূপ বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

পাশ্চাত্ত্য গবেষকবৃন্দ ভারতীয় রূপকোৎপত্তি সম্বন্ধে বহু বিচিত্র মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ বলেন—মৃত মহাপুরুষগণের স্মৃতিতর্পণোৎসব (রাম-কৃষ্ণ-শিব-দুর্গা প্রভৃতির উপাসনা এই উৎসবশ্রেণীতেই পড়ে) নাট্যের উৎপত্তির কেন্দ্র। আবার কাহারও মতে পুতুলনাচ বা ছায়াবাজী (ছায়ানাট্য) প্রভৃতি হইতেই নাট্যের উৎপত্তি। অবশ্য নাট্যের উপর উপাসনা বা ঐ জাতীয় ধর্ম্মমূলক অনুষ্ঠানের (যথা,—হোলি, রামলীলা, দশেরা প্রভৃতি জাতীয় বর্ত্তমান অনুষ্ঠানের প্রাচীন রূপ;—জর্জ্জর উৎসব প্রভৃতির কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়) প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু ছায়ানাট্যের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন (৮)। অতএব, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলির যে কোন একটিও রূপকোৎপত্তির কালসমস্যা সমাধানের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। রূপক হইতেছে "লোকানুকৃতি।" তাই মানবজীবনের মত উহার উৎপত্তি চিরদিন রহস্যাবৃতই থাকিয়া যাইবে।

ঘরের) মত করিয়া সজ্জিত। ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, ঐস্থানে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে রঙ্গাভিনয় চলিত। এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ মদীয় "মেঘদূতের যক্ষ ও যক্ষবধূ" শীর্ষক প্রবন্ধে (চিত্রালী আষাঢ় ১৩৪২) দ্রষ্টব্য।

(৮) ভারতীয় ছায়ানাট্য সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ মদীয় "প্রাচীন ভারতের ছায়ানাট্য" শীর্ষক প্রবন্ধে (খেয়ালী, নববর্ষ সংখ্যা, ১৯৩৫) দ্রষ্টব্য।

রাজপথে—:

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ

ভোর হ'তে সন্ধ্যাবধি সহরের রাজপথে কত লোক আসে আর যায়,
অসংখ্য বিচিত্র মন, কারণে ও অকারণে কেহ কাঁদে কেহ গান গায়;
কেহ ব্যস্ত তুচ্ছ কাজে মূর্খ অন্ধ অর্ব্বাচীন, কেহ করে নিত্য পরিশ্রম,
কারো চলে বেচাকেনা সুসজ্জিত বিপণীতে, অর্থ কারো বেশী কারো কম।

কোথাও বেকার যুবা ব্যথিত উদাস মনে পথ পানে রয়েছে চাহিয়া,
কোটোর প্রবিষ্ট চোখে ধূলি ধোঁয়ার পানে চেয়ে চেয়ে কেঁপে উঠে হিয়া;
জীবন বীমার কাজে ব্যস্ত দালালের দল পরস্পর ভাবে মনে মনে—
চাকরী জুটিল কা'র ট্যাঁকে কা'র বাজে টাকা কেমনে মিশিবে তার সনে।

চলেছে কেরাণী বাবু খেটে খেটে দেহ কাবু হতাশার ম্লানছায়া মুখে—
ঘরেতে রয়েছে রোগী, বাড়িওলা টাকা চায়, ভাবনার বোঝা লয়ে বুকে,
অভিনেতা কবিদের চিনিতে লাগেনা দেরী সার শুধু টেরী আর চুল
চাদর ধুলায় লুটে বিচিত্র অদ্ভুত জামা কারো ছোট কারো বড় ঝুল।

কেহ লাল, কেহ নীল, সবুজ বেগুনে কেহ, ধোয়াটে, হলুদ, সাদা কালো
রঙীন ফানুস যেন স্বপ্নের আকাশে ওড়ে শূন্য বুকে জ্বলে ক্ষীণ আলো,
মরণার্ত্তনাদ করি' কেহ পড়ে গাড়ী চাপা, কেহ পুনঃ চড়ে সেই গাড়ী
কা'রো বা পৈত্রিক বাড়ী নিলামে বিক্রয় হ'ল, কা'রো ভাগ্যে জুটিল সে বাড়ী,

কোথাও শ্রমার্ত্ত কুলী হেঁটে চলে ছ' মাইল মাথায় বহিয়া গুরুভার,
হিসেবী বাবুর বাড়ী ছয়টা ভাণ্ডার খণ্ড দুরদৃষ্টে জোটেনাকো তা'র!
মূক বলদের দল বন্ধু মহিষের সাথে অবিশ্রান্ত গাড়ী টেনে যায়,
তৃষ্ণার্ত্ত পশুর মনে কী প্রার্থনা জেগে উঠে, চালকেরা বোঝেনাতো হায়!

ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা দীনা ভিখারিণী মেয়ে পথে পথে ভিক্ষা মেগে খায়,
তা'রি পার্শ্বে দিব্য-যানে ধনগর্ব্বে গরবিনী বাঁকা ঠোঁটে ব্যঙ্গ কোরে যায়।
কোথাও বা মঠধারী মানুষে ঠকায় নিত্য গেরুয়ার করি অপমান
শ্রমিকের শ্রম রক্তে কেহ অর্থ উপার্জ্জিয়া রঙ্গালয়ে করে নৃত্যগান।

সহসা পথের মাঝে কাহারো মিলিল দেখা পুরাতন সহপাঠী সাথে
বহু কষ্টে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ওষ্ঠের ফাঁকে আলাপন হ'ল ব্যস্ততাতে;
চিনিতে পারিল কেহ, কেহ বা দিলনা চেনা, ব্যর্থ হ'ল কুশল জিজ্ঞাসা
অন্তরে বাহিরে চুরী একসাথে ক'রে গেল চুপে চুপে আশা ও নিরাশা,

নিঃসাড়ে কাহারো হাত পকেটে ঢুকিল কারো অভাবের খুজিতে সঞ্চয়,
কেহ সর্ব্বহারা হ'ল বক্ষে হানি' করাঘাত অর্দ্ধ আয়ু হয়ে গেল ক্ষয়।
দাসীপুত্র কোতো বাবু চলে রাজপথ বেয়ে গজভুক্ত কপিত্থের মত
মা'র বুকে রক্ত-ওঠা অর্থ নিয়ে সাজে বাবু মনে মনে আটে ফন্দী কত।

চায়ের দোকানে বসি' মত্ত জুয়াড়ীর দল স্বপ্ন দেখে দৌড়ের ঘোড়া,
শনির নীরব দৃষ্টি শনিবারে বলে যায় অদৃ তা'দের হায় পোড়া!
'বল হরি হরি বোল'—অদৃষ্টের পরিহাস কারো মরে বংশের দুলাল
কোথাও বা বরযাত্রী চলে মহা সমারোহে মর্ম্মে রচি' সুখ স্বপ্ন জাল।

সারা অঙ্গে ক্লেদ পঙ্ক উন্মাদ চলেছে পথে রুক্ষ জটা ধুলায় ধুসর,—
অট্টহাসি হাসে কভু, হর্ষে কভু গাহে গান, কভুবা চেঁচায় ভয়ঙ্কর।
বিরাট বৈষম্যময় সহরের রাজপথে চলে কত বিচিত্র মানব,
কারো বুকে জাগে পশু, অর্দ্ধেক মানুষ কেহ, মূর্ত্তিমান কেহবা দানব।

———০:০:০———

শীকার

[একাঙ্ক নাটিকা]

শ্রীঅখিল নিয়োগী

[একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম। প্রকাণ্ড প্রাঙ্গন। তোরণদ্বারের ভিতর দিয়া বাহিরে ভিক্ষু বিহার দেখা যাইতেছে—পাশ দিয়া একটি ছোট্ট নদী রজত রেখার মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে। ওপারে অস্পষ্ট ভিক্ষুনী বিহার। ভিতরকার মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে ভগবান বুদ্ধের বিগ্রহ। তলায় রাশি রাশি পুষ্প স্তূপিকৃত।

রাত্রি তখনও শেষ হয় নাই। নিশা ও উষার ঠিক সন্ধিস্থল। তোরণদ্বারের ভিতর দিয়া যে ছোট্ট এক ফালি আকাশ চোখে পড়ে—সেখানে শুকতারাটি তখনও জলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। ঠিক এমনি সময় দুই ঝুড়ি ফুল মাথায় লইয়া জীবক ও মৃগদাব চুপি চুপি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল]

জীবক। এই ত সঙ্ঘারাম?

মৃগদাব। সেই রকমই ত' মনে হচ্ছে। কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না ত!

জীবক। হ্যাঁ, দেখতে পাওয়ার সময়ই বটে! তোমাদের মত নিশাচর ত' কেউ নয়!

মৃগদাব। তা' যা' বলেছিস ভাই—সর্দ্দারের মাথায় কখন যে কি খেয়াল চাপে।—'যাও শেষ রাত্তিরে সঙ্ঘারামে গিয়ে ফুলের দোকান বসাও—ব্যস-এম্‌নি ছোটো—

জীবক। আরে ভাই খেয়াল ত' আর অম্‌নি হয় না;—খেয়ালের পেছনে আছে—সোনার নেশা!

মৃগদাব। আমাদের সর্দ্দারের কিন্তু এ অদ্ভুত দস্যু বৃত্তি! ডাকাতের থাক্‌বে হাতিয়ার—থাক্‌বে মশাল—আর মুখে থাক্‌বে মাভৈঃ রব—; তা নয়—শুধু একটু চোখের চাউনি—একটু মুচকি হাসি—ব্যস কিস্তি মাৎ—

জীবক। সেবার সেই অবন্তীর রাজকুমারের কথা মনে আছে ত? একদিনে সর্ব্বস্ব খুইয়ে একেবারে পথের ভিখিরি! আর সব চাইতে আশ্চর্য্য এই যে—এ দস্যু ধরা পড়ে না! কিন্তু চণ্ডপীড়ের নামে কাঁপে না—এমন লোকও এ তল্লাটে ছুটি মিল্‌বে না!

মৃগদাব। আর এ-ও তেমনি আশ্চর্য্য—যে অত বড় দুর্দ্দান্ত দস্যু—তার একমাত্র মেয়ে সোনালী! আরে তাজ্জব চিজ রে ভাই—সোনালী ত' সোনালী! রাম ধনুকের এক পোছ রঙ—কেউ চুরি করে এনে যেন ওর গায় বুলিয়ে দিয়েছে। চোখের চাউনি নয়ত আগুনের ফুলকি—! আর মুখের হাসি—

জীবক। সে যা-ই হোক কিন্তু ঐ পা' দুটির কাছে মাথা বিকোয় না এমন লোকও বড় চোখে পড়ল না। মনে পড়ে সেই রাজগৃহের ঘটনা?

মৃগদাব। সবই পড়ে ভাই—সেই গোপথ, বিশ্বচরার মন্দির, সপ্তপর্ণীর গুহা, তপোদারাম—কোনো কথাই ভুলিনি—কিন্তু আমি ভাবছি-এই বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে—গেরুয়ার রাজ্যে সর্দ্দার এমন কোন রত্নের সন্ধান পেলেন যার জন্যে এই শেষ রাত্তিরে ফুলের দোকানের ছাউনি ফেলবার দরকার হ'য়ে পড়ল!

জীবক। আছে রে আছে—বনের সাপের মাথায়ই মণির খোঁজ মেলে। গেরুয়ার আশে পাশেই অনেক সময় হীরে জহরৎ চেকনাই দেয়!

মৃগদাব। আরে ভাই ব্যাপারটা খুলেই বল না—একবার দিল খোলসা করে হাসি।

জীবক। ব্যাপার আর কিছুই নয়—সর্দ্দার খবর পেয়েছেন—সঙ্ঘারামে এক নামকরা বৌদ্ধ ভিক্ষু আসবেন—আজকে—আর তাকে দর্শন করতে আসচেন-এক শ্রেষ্ঠী পুত্র নাম মাণিকলাল। গলায় তার এক পরশমণি—যার ছোঁয়া পেলে লোহা হ'বে সোনা—পেতল হ'বে সোনা—রূপো হ'বে সোনা—

মৃগদাব। [মুখ ব্যাদান করিয়া] অাঁঃ—সব সোনা?

জীবক। হাঁারে—হ্যাঁ—হাঁ করে রইলি যে! সব সোনা। কাজেই সর্দ্দারের এবারকার শীকার এই মাণিকলাল।

মৃগদাব। কিন্তু ফুলের ঝুড়ি? এতে কি হ'বে?

জীবক। দেখ্‌ মৃগ, তুই বৃথাই এতদিন সর্দ্দারের সাক্‌রেদী করেছিস্‌—কিন্তু বাজে কথা রাখ—ফুলের দোকান সাজিয়ে রাখ্‌তে হবে না?

মৃগদাব। ঠিক বলেছিস্‌—ভুলেই গেছ্‌লাম।

[দুইজনে মিলিয়া ফুলের দোকান সাজাইতে ব্যাপৃত হইল]।

মৃগদাব। কিন্তু যা বলিস্‌ ভাই, ধর্ম্মের নামে সব চলে।

জীবক। কেনরে আবার কি হল?

মৃগদাব। দেখ্‌লিনে শেষ রাত্তিরে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে আস্‌তে দেখে নগর-রক্ষক পথ আট্‌কে দাঁড়াল। যেমনি বল্লুম সঙ্ঘারামের ফুল—ছেড়ে দিলে।

জীবক। এসব আমাদের সর্দ্দারের আগে থাক্‌তেই জানা। কিন্তু ওদিকে আবার ফর্সা হয়ে গেল।

মৃগদাব। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কাজ শেষ। কিন্তু সর্দ্দারের যে কখন দর্শন মিল্‌বে—আর সোনালী ঠাকুরুণকে আবার কোন বেশে দেখব—সেই হয়েছে আমার মস্ত বড় ভাব্‌না।

রাধা ফিল্মের কীর্ত্তি-স্তম্ভ

বঙ্কিমচন্দ্রের

"বিষবৃক্ষ"

পরিচালক ঃ ফণী বর্ম্মা

ঃ ভূমিকায় ঃ

কানন
শান্তি
মীরা
রেণুকা
তারক
তুলসী
জহর
ভূমেন
কুমার
জানকা

সঙ্গে হাসির ঝরণা

কীর্ত্তিমান

রচনা ও পরিচালনা—
অখিল নিয়োগী

প্রশংসিতভাবে রূপবাণীতে
প্রদর্শিত হইতেছে

ঃ চিত্র পরিবেশক ঃ
প্রাইমা ফিল্মস্ লিঃ
রূপবাণী ভবন—কলিকাতা।

রাধার

আগামী
আকর্ষণ

অপরেশ চন্দ্রের

ছিন্ন হার

ঃ পরিচালক ঃ
হরি ভঞ্জ

ঃ ভূমিকায় ঃ

পৃথ্বীরাজ
শান্তি
রেণুকা
কুমার

RADHA FILM COMPANY
CALCUTTA

জীবক। তোর ভাবনা নিয়ে ত' তুই মাথা ঘামাচ্ছিস!—ওদিকে দেখ চেয়ে আবার কি কাণ্ড!

মৃগদাব। অ্যাঁ—তাইত! চল আড়ালে দাঁড়াই

[ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের দেবদাসীগণ নৃত্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। চোখে তাদের মায়া কজ্জল, ডান হাতে দীপ—বামে সজ্জিত বরণ-ডালা—চলনে অপরূপ গতি—মুখে সুমধুর সঙ্গীত]

হে অপরূপ বুদ্ধ তোমার চিত্ত মাঝে স্মরণ করি—
অভয় দিলে, তাইত তোমায় ধূপের ধোঁয়ায় বরণ করি।
শতেক শিখায় দীপের দীপে
মল্লিকা জুঁই পারুল নীপে
বরব তোমায় সত্য শিবে
চাইবে যুগল চরণ-তরী
হে অপরূপ নবীন তাপস তাইত তোমায় বরণ করি!
হে সুমহান মহান যোগী—মৃত্যু-জরা ব্যাধির অরি—
মৃত্যু-পিছল পৃথিমাঝে চিত্ত ভরি তোমায় স্মরি—
ধ্বংস লীলার যন্ত্র মাঝে—
তোমার অভয়-মন্ত্র বাজে—
(সেত') মুক্তি পথের বন্ধ রাজে—
তাইত ভয়ে হরণ করি—
পেলাম যদি অভয় তোমার আর কি মোরা মরণ ডরি।

[দেবদাসীগণ একে একে তাহাদের দীপাবলি এবং পুষ্পাঞ্জলিতে ভগবান বুদ্ধের বিগ্রহের বেদী সজ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে সঙ্গীত ও নৃত্যের ভিতর দিয়া প্রস্থান করিল]

জীবক। এইবার ত' পালা সুরু হল—এখন আমরা কি করি বলত?

মৃগদাব। আমি বলি কি এত বড় সঙ্ঘারাম এর গো-শালাটা একবার না দেখ্‌লে যে পুণ্য সঞ্চয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে!

জীবক। পেটুক!—তোর নজর চিরদিনই ঐ দিকে।

মৃগদাব। না ভাই আর সব পারি—কিন্তু উদরের ভেতর অগ্নিদেব যখন তীব্র জ্যোতি ছড়াতে থাকেন—সেইটেই ঠিক বরদাস্ত হয় না।

জীবক। তা কথাটা নেহাৎ খারাপ শোনাচ্ছে নারে—তার ওদিকে সর্দারেরও যে কখন আগমন হ'বে—তা' কে জানে! তবে কথাটা তোর মুখ থেকে বেরিয়েছে কি না!

মৃগদাব। দেখ চিরদিনই আমি সাচ্চা কথার লোক। কিন্তু প্রথমটা তুমি কিছুতেই তা' মান্‌তে রাজী নও—জানি শেষ কালটা আমার মতে মত দিতে হ'বেই!

জীবক। দেখ মৃগ, তুই বোকা হ'লে কি হ'বে—বুদ্ধি তোর চিরদিন ঠিকই আছে—

মৃগদাব। নাও-নাও চল—

[দু'জনের প্রস্থান]

[দলে দলে বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ প্রবেশ করিল। মুখে তাহাদের বাণী—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি—
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—"

[আর একদিক দিয়া প্রবেশ করিল—ভিক্ষুনীগণ—তাহারা সমস্বরে বুদ্ধ স্তোত্র গাহিতে লাগিল। মন্দিরের ভিতর হইতে আরতির-শঙ্খ-ঘণ্টা মৃদঙ্গ সমস্বরে ধ্বনিত হইতে লাগিল—ধূপের ধোঁয়ায় সুগন্ধী পুষ্পের গন্ধে সঙ্ঘারাম পবিত্র তপোবনে পরিণত হইল]

[স্তোত্র শেষে বৌদ্ধ ভিক্ষুক-ভিক্ষুনীগণ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। এমন সময় দুইটি বৃদ্ধ ও একটি বৃদ্ধার প্রবেশ]

১ম বৃদ্ধ। পাড়ার যে সন্ন্যাসীর কথা শুনে এলুম—এখনও এসে কি পৌঁছেনি তারা—?

২য় বৃদ্ধ। আরতির শব্দ শুনে আমিও ত ছুটে এলুম—কিন্তু সব যে ফাঁকা দেখছি।

১ম বৃদ্ধ। তোমার সঙ্গে দেখা হল ভালই হল ভায়া—আমায় কিন্তু ঠাকুরের কাছ থেকে একটি মাদুলী চেয়ে দিতে হবে। বাতের ব্যাথায় কোমরটা খসে পড়বার মতো হয়েছে দুপা এগুই ত' তিন পা পেছুই—

২য় বৃদ্ধ। আমিও ত ভাই তিন বছর অম্লশূলে ভুগছি—গিন্নি বল্লে যা মিনসে, সন্ন্যাসীর পায়ে ধরে একটা অষুধ চেয়ে আনগে—

বৃদ্ধা। হ্যাঁগা বাছারা—অমনি আমার জন্তে একটা শেকড় চেয়ে নিয়ো দা ঠাকুরের কাছে—চোখে দেখতে পাইনে বাবা, একটি নাতি ছিল—ডবকা ছোড়া হাত ধরে নিয়ে বেড়াত। কি-কাল রোগেই ধরলে, বাছা আমার দুদিনেই— [ক্রন্দন]

১ম বৃদ্ধ। ভালো জ্বালা একেবারে কাঁদতে সুরু করলে যে!—জানিস্‌ দেবতা-স্থানে চোখের জল ফেল্‌লে কি হয়।

বৃদ্ধা। কি আর হবে বাছা—যা হবার তা ত হয়েই গেছে—শুধু চোখে যে দেখতে পাইনে—দুমুঠো কুড়িয়ে এনে দেবে এমন কেউ নেই—পেটের জ্বালা বড় জ্বালা—

[একটি অবগুণ্ঠনবতীকে লইয়া আর এক বৃদ্ধার প্রবেশ]

২য় বৃদ্ধা। অষুধ-বিষুধ কিছু পেলে বাছারা—আমার এই নাত-বৌটির একটি শেকড় জোগাড় করে দিতে হবে। ষেটের আশীর্ব্বাদে বাছার কোলে আজও একটি ছেলে হ'ল না—

২য় বৃদ্ধ। ছেলে হ'ল না তা আমরা কি করবো—?

২য় বৃদ্ধা। না, বল্‌ছিলুম তোমরা সব যাচ্ছ সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে—তাই আমার জন্তেও যদি—

নিউ থিয়েটার্সের আগামী বাংলা "দিদি" চিত্রের একটি দৃশ্যে [illegible], অমর মল্লিক ও চন্দ্রাবতী। ছবিখানা শীঘ্রই 'চিত্রা'য় আসছে

শ্রীমতী ছায়া "সোনার সংসারে" একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করবার পর "মতিমহল টকীজে"-র "রাঙা বৌ" ছবিতে নাম-ভূমিকায় অভিনয় কোর্‌ছেন।

২য় বৃদ্ধ। হ্যাঁ, আমরা তোমার নাত-বৌয়ের শেকড়ের জন্তে বসে আছি কিনা—

১ম বৃদ্ধা। হ্যাঁ বাছা, আমি যে চোখে দেখতে পাইনে—

২য় বৃদ্ধ। চোখে দেখতে পাও না—সরষের তেল দাও গে, আমরা তার কি করবো?

[প্রথমকে গমনোদ্যত দেখিয়া] ও ভায়া যেয়োনা—যেয়োনা—দাঁড়াও—উঃ আবার বুঝি ব্যথাটা ওঠে।

২য় বৃদ্ধা। উঠ্‌বে না? মন্দিরে এসে অত আদিখ্যেতা? যাবে—যাবে—দেবতা আছেন না—?

২য় বৃদ্ধ। আরে মাগী গালাগাল দিচ্ছিস্ নাকি?

অবগুণ্ঠনবতী। অ ঠাকুমা, কি কচ্ছ—দেখছ না মিন্‌সে মার মুখো হয়ে উঠেছে।

২য় বৃদ্ধা। আসুক না মিনসে—সামনের দাঁত কটি ভেঙ্গে দেবো—

[একটি বৃদ্ধকে টানিয়া লইয়া রণ-রঙ্গিণী বেশে একটি স্ত্রীলোকের প্রবেশ]

স্ত্রীলোক। আয় মিন্‌সে আয়—চল সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে।

১ম বৃদ্ধ। কি হ'ল আবার তোমাদের—এমন মারমূর্ত্তি কেন।

স্ত্রীলোক। আজ বাদে কাল চিতার তলায় যাবে—মিন্‌সে নদীর ধারের মেয়ে মানুষের স্নানের ঘাট থেকে নড়বে না রোজ ত্রিবেলে—আজ এমন শেকড় পরিয়ে দেবো যা ঠাকুরের কাছ থেকে—পায়ের নফর হয়ে থাকবি—

৩য় বৃদ্ধ। ছাখ, কিছু বলিনে বলে—আমি যা খুসী তাই করবো—তাতে তোর কি?

স্ত্রীলোক। রোস্—তোর যা খুসী তাই করছিস্—আজ আমার একদিন কি তোর একদিন।

[কোমরে কাপড় বাঁধিল]

১ম বৃদ্ধ। [দ্বিতীয় বৃদ্ধকে ধরিয়া] ওহে ভায়া সব গিন্নিই দেখছি একই ধাতে তৈরী—চল—এখান থেকে পালাই চল—

২য় বৃদ্ধ। উঃ আমার ব্যথাটাও আবার কেমন চড়ে উঠল—

১ম বৃদ্ধা। ও বাছা—আমি যে দেখতে পাইনে—আমার কি গতি হবে—

২য় বৃদ্ধ। মর মাগী—ফের পেছু ডাকে?

স্ত্রীলোক। কি মিন্‌সে—এখন পেছুচ্ছিস্ যে বড়?

৩য় বৃদ্ধ। পিছুচ্ছি কোথায়? আমি যাচ্ছি স্নান করতে।

স্ত্রীলোক। স্নান করতে! তবে রে পোড়ার মুখো!

[ছুটিয়া গিয়া কোমরের কাপড় ধরিল]

৩য় বৃদ্ধ। ভাল হবে না বলছি ছাড়—ছাড়—ছাড়বিনে তবে এই স্থাখ মজা—

[দুই হাতে স্ত্রীলোকের চুল ধরিয়া মারিল টান]

স্ত্রীলোক। ওরে মিন্‌সে খুন কল্লেরে—

[দুইজনে ছুটোপুটি করিতে করিতে ফুলের দোকানের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল—ঠিক এমনি সময় জীবক ছুটীতে ছুটীতে প্রবেশ করিল]

জীবক। ওরে মৃগ, ছুটে আয়—মাগী-মিন্সেতে সব ফুল নষ্ট করে ফেল্লেরে—[উভয়ের দিকে] কেমন ধারা লোক গা তোমরা? ঠাকুরের জন্ত আনা ফুল—তাই তোমরা দুপায়ে দলছ?

স্ত্রীলোক। [জিব কাটিয়া] ওমা তাইত! —তা এই মিন্‌সের জন্তেই ত যত অনর্থ!

৩য় বৃদ্ধ। দেবতার ফুল মাড়িয়েছে—ও মাগী আজ মরবে।

স্ত্রীলোক। বটে! আর মিন্সে বুঝি স্নানে বেরুবে! চল্ মিন্‌সে, আজ আমার একদিন কি তোর একদিন—

৩য় বৃদ্ধ। যাচ্ছি যাচ্ছি—ওই যে আর একটি বউ অষুধের জন্তে এসেছে—ওকেও তোর সঙ্গে নেনা—আহা একলা মানুষ—!

স্ত্রীলোক। ইঃ—আপনি খেতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে—চল্ মিন্‌সে চল্—

১ম বৃদ্ধা। ওগো আমার কি গতি হবে!

স্ত্রীলোক। আমায় কে পেছু ডাকে!

জীবক। পেছু ডাকবে না?—এযে দেবতার ফুল পায়ে দল্‌লে এর কি হবে?

স্ত্রীলোক। ফুল পাবে বাছা—আরো ফুল আস্‌বে—

[ঠিক এমনি সময় একদল ফুলওয়ালী ফুল লইয়া নাচিয়া গাহিয়া প্রবেশ করিল]

ফুলওয়ালীদের গান॥

পুব হ'তে ফুল আনবো লুটে মৃদুল দখিন বায়।
গাঁথিস্‌নে হায় অঞ্জলি দে দেবের যুগল পায়॥
আনব সুবাস আনব মধু—
সঁপব পরাণ—সঁপব বধূ
ভয় শুধু তোর কোমল পরাণ মূর্চ্ছা যদি যায়!
আলগোনে তোর কোমল শেকড়!
বলছি বধূ সইবে এভর—
কাশ, বেলি, জুঁই সাজবে ভালো দেবের চরণ ছায়।

[মৃগদাবের প্রবেশ]

মৃগদাব। [জীবককে] এ যে মেলা ফুল-ওয়ালী এসে হাজির হ'ল! আমাদের ঠাকুরুণীর ব্যবসাটা এরা একেবারে মাটী না করে ছাড়বে না দেখছি।

জীবক। তাইত রে মৃগ, ব্যাপারটা এরা ত খুব মোলায়েম করে তুলছে না! এরাও সব সোনালী ঠাকরুণের ছোট সংস্করণ নাকি?

মৃগদাব। নারে—না। দেখছিস্‌নে—চেহারা দেখে মালুম হচ্ছেনা তোর? ফুল বিক্রী করাই এদের পেশা—

জীবক। তা না হয় তোর কথাই মান্‌লুম। কিন্তু ঠাকরুণ যদি এখনও না এসে পৌছন্ এরাই ত' সকলকার চাহিদা মেটাবে। ঠাকরুণ তখন ফুল বেচবেনই বা কার কাছে—দেখাই বা পাবেন কার!

মৃগদাব। তাই ত রে! তবে উপায়?

জীবক। উপায় আমার বরাৎ আর তোর হাত যশ। [উভয়ের প্রস্থান]

স্ত্রীলোক। ও মিন্সে দাঁড়া—এই ফুল-ওয়ালীদের কাছ থেকে গুটী কয়েক ফুল কিনে নি। এ না পেলে ত' আবার দেবতা খুসী হবে না—কই গো বাছারা আমায় এক কড়ির ফুল দাও ত [ফুল-ওয়ালীগণ হাসিয়া এ ওর গায়ে ঢলিয়া পড়িল]

স্ত্রীলোক। ওমা রকম দেখনা—দেবে ফুল, না হাসতে সুরু করে দিলে—বলি আমি কি তোদের সঙ্গে রসিকতা কচ্ছি নাকি লা?

১ম ফুলওয়ালী। রসিকতা ত' তুমিই সুরু করলে ঠাক্‌রুণ।

স্ত্রীলোক। ওমা! আবাগীর কথা শোনো—আমি আবার কি রসিকতা করলুম তোদের সঙ্গে?

২য় ফুলওয়ালী। বলি ফুল ত' কিনবে ঠাক্‌রুণ, দিতেও আমরা পারি কিন্তু তোমার এক কড়ার ফুল ত' আমাদের কাছে মিলবে না।

৩য় ফুলওয়ালী। তাও কাণাকড়ি কিনা কে জানে।

স্ত্রীলোক। মর মুখপুড়ি,—তা না হয় ত' কড়িরই দে ওই গোটা আষ্টেক মল্লিকা দিস্ কিন্তু—

[ফুলওয়ালীগণ আবার হাসিতে লাগিল]

স্ত্রীলোক। [কপোলে তর্জ্জনী রাখিয়া] আবাগীদের রকম দেখনা—বলি কটা চাই তাই বল না—

৪র্থ ফুলওয়ালী। কটা আছে তাই না হয় শুনি—

স্ত্রীলোক। মর ছুঁড়ি—আবার হাসছে দেখনা।

৫ম ফুলওয়ালী। বলি সোনা-দানা কিছু আছে?

স্ত্রীলোক। অবাক করলি তোরা—তোদের কাছে কি ফুল মোহর দিয়ে কিনতে হবে নাকি?

৬ষ্ঠ ফুলওয়ালী। ঠাক্‌রুণ, এইবার সত্যি কথা বলেছ, এ মধু মালঞ্চের ফুল, কত বড় বড় শ্রেষ্ঠীপুত্র কোটালপুত্রেরা সোনা-দানা দিয়ে এই ফুল কিনে দেবতার পায়ে দেবে। ওকি এমনি মেলে?

স্ত্রীলোক। [মুখ বাঁকাইয়া] ইঃ নে মিন্সে চল আর ফুলে কাজ নেই। ঠাকুরকে বলে কয়ে অমনি এক টুকরো শেকড় চেয়ে নেবো'খন। [বৃদ্ধকে লইয়া প্রস্থান]

[জন কয়েক সম্ভ্রান্ত নাগরিকের প্রবেশ]

মলয়। বিক্রম, তুমি দেবদর্শনের জন্যে ফুল চাইলে না। এই ফুলওয়ালীদের কাছে সব রকম ফুল মিলবে।

বিক্রম। সত্যি আজ গোটা সহর ঢুড়ে একটা ফুলের কুঁড়িও খুঁজে পেলুম না। ওগো ফুলওয়ালীরা, কি ফুল আছে তোমাদের কাছে?

১ম ফুলওয়ালী। এই যে নিন্ না—এ সব মধুমালঞ্চের ফুল—আপনাদের জন্যেই ত' তুলে রেখেছি—তা কি কি চাই আপনার? মালঞ্চ, অপরাজিতা, পলাশ, জুই, বেলী, কাশ, জবাব, থলকমল—সব পাবেন আমাদের সাজিতে—

বিক্রম। তা দাও—সবারই কিছু কিছু করে নিয়ে যাই—

[ফুলওয়ালীরা সাজি হইতে ফুল তুলিয়া নাগরিকের হাতে দিল] ঠিক এই সময়ে ভিতরে একটা গোলমাল শোনা গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে একদল পথিক ছুটিয়া প্রবেশ করিল—

১ম পথিক। ওরে ঐদিকে ঐদিকে—সন্ন্যাসী ঠাকুর ভিড়ের ভয়ে খিড়কির পথ দিয়ে মন্দিরে যাচ্ছে—ওরে বটুকে—ও জনার্দ্দন—এই পথে এই পথে—

[দলে দলে লোক প্রাঙ্গনের এক পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্য পথ দিয়া ছুটিয়া যাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গেল সেই দুই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তার নাত বৌ—আর ছুটীতে ছুটীতে আসিল সেই স্ত্রীলোকটী, বৃদ্ধ স্বামী তার হাতের মুটায় ধরা]

স্ত্রীলোক। চল্ মিন্সে চল্—দেরী হয়ে গেলে আর একটু শেকড়ও মিলবে না—মাগী মিন্সেতে ছুটেছে দেখ না—যেন কেউ কোনদিন সন্ন্যাসী ঠাকুর দেখে নি।

৩য় বৃদ্ধ। না মেলে নাই মিললো। তুই কি আমায় কাপড়ের পুঁটলী পেয়েছিস্ নাকি—টেনে হিঁচড়ে চলেছে দেখ—

স্ত্রীলোক। নে এখন মুখ বন্ধ কর। দেবতার স্থানে আবোল তাবোল বকলে জিব খসে পড়বে নে চল।

[প্রস্থান]

[যাত্রীর ভিড়ের চাপে সেই প্রথম বৃদ্ধা হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। বৃদ্ধার আর্ত্তনাদ শোনা গেল "ওগো বাছারা আমায় বাঁচাও"
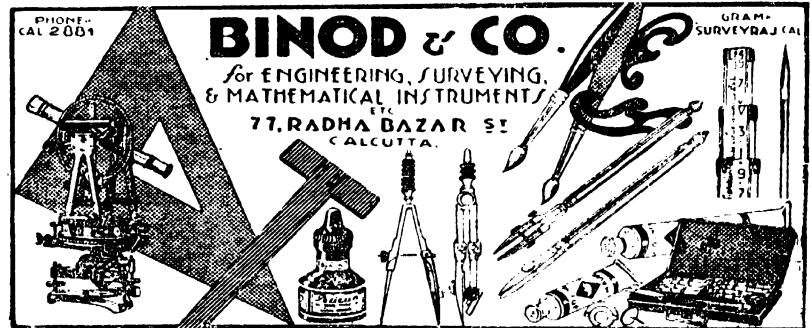
"আমি যে চোখে কিছুই দেখতে পাই নে"—

[ঠিক এমনি সময় তড়িৎ বেগে প্রবেশ করিল দিব্যদর্শন এক যুবক—উন্নত তার ললাট, চোখে অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রশস্ত বক্ষ, বাহুতে ক্ষিপ্রতা—চোখের পলকে ছুটিয়া গিয়া যুবক ভিড়ের মধ্য হইতে বৃদ্ধাকে বাহিরে আনিল ; এই যুবকই মাণিকলাল]

যুবক। মা, তোমার ভয় নাই। তুমি এইখানে দাঁড়াও। তোমার কি কোথাও লেগেছে ?

[বৃদ্ধা তখনও কাঁপিতেছিল—কহিল]

৩য় বৃদ্ধা। না বাছা, এ বারের মতো বেঁচে গেছি। ভগবান তোমায় রাজরাজেশ্বর করুন—সোনার মুকুট তোমার মাথায় থাক—কিন্তু বাছা, দেবদর্শন কি অভাগীর কপালে নেই ?

মাণিক। দেবদর্শন তোমায় আমি করিয়ে দেবো। এখানে একটু দাঁড়াও মা তুমি—আমি দেবতার পায়ে অঞ্জলি দেবার জন্যে কিছু ফুল কিনে নিয়ে আসি—

[ফুলের নামে ফুলওয়ালীরা আসিয়া মাণিকলালকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।]

১ম ফুলওয়ালী। এই নিন—পলাশ, অপরাজিতা, জুঁই, মল্লিকা [মাণিকলালের হাতে তুলিয়া দিতে গেল]

মাণিক। [হাত বাড়াইয়া লইয়া] কিন্তু ওর ত' কিছুই আমি চাই—আমি চাই—

২য়া। কি কি—থলকমল ত ?—তা' এই নিন্ না—

৩য়া। থলকমল কেন হ'তে যাবে—চেহারা দেখেই বুঝেছি ওঁর চাই কাশ ফুল—তাও আমার সাজিতে মিলবে এই দেখুন—

[মাণিক মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল]

৪র্থা। হাসছেন যে বড় ? মনে করেছেন কারো কাছে নেই ? কিন্তু মল্লিকাকে ঠকাতে পারবেন না। মল্লিকা ফুল বুদ্ধদেবের বড় প্রিয়, সেবার নালন্দার পথে—

মাণিক। মিছে কেন কষ্ট বচ্ছ—ও-ও আমার চাইনে—আমি চাই অশোক ফুল—

৪র্থা। অ—শো—ক—ফু—ল !!

মাণিক। হ্যাঁ তাও শুধু আবার ফুল নয়—চাই অশোক ফুলের মালা—

৪র্থা। [মুখ ভার করিয়া] সে আপনি কোথাও পাবেন না শ্রেষ্ঠীপুত্র—এখন ত' অশোক ফুল ফোটবার সময় নয়। যে ফুল মধুমালঞ্চে ফোটে নি—সে ফুল কোথায়ও নেই—

[ফুলওয়ালীর বেশে বিদ্যুতের চমকের মতো হঠাৎ সোনালীর প্রবেশ। হাতে তার অশোক-গুচ্ছের মালা—পরণে রামধেনু রঙের সাড়ী—মায়াবিনীর চোখ, লীলায়িত ভঙ্গী, মুখে মধু, অধরে মেঘলা রাতের ক্ষণপ্রভার চমক]

সোনালী। আছে গো আছে। মধুমালঞ্চে যে ফুল ফোটেনি তা ফুটেছে মদন কুঞ্জে। কিন্তু তাতে মালা হয়েছে একটি, তাও আমার হাতে।

[সোনালীকে দেখিয়া মাণিক চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিল ; তার মুখের পানে ঠিক 'ফটিক জল' পাখী যেমন করিয়া তাকায় জলভরা মেঘের দিকে]

সোনালী। [মাণিককে] ওমা ! আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে রয়েছ কেন ? এ মালা আমি তোমায় দেবো না—

১ম ফুলওয়ালী। হ্যাঁগা কে তুমি ?

২য়া। ফুলওয়ালীর বেশ—

৩য়া। কিন্তু অচেনা মুখ—

৪র্থা। মনে হচ্ছে বিদেশিনী—

৫মা। [কাছে গিয়া হাত ধরিয়া] কিন্তু কোথায় পেলে এ মালা ?

সোনালীর গান—

পায়ের আঘাতে ফোটাল অশোক
কে গো সে বিরহিণী
আঁখি না তাহারে নিরখি কখনো
মন যে বলে চিনি।
উর্ম্মির মতো উড়ায়েছে কেশ
রামধনু রঙা পরিয়াছে বেশ
বচনে নয়নে স্বপনের রেশ
বাজে যেন ঝিনিঝিনি।
মন যে বলে চিনি।
তার বাগানের দখিন দুয়ার সদা
তব তরে খোলা

অর্থ সঞ্চয়ের বিড়ম্বনা

অর্থ সঞ্চয় করা, জগতের বিখ্যাত উভয়সঙ্কটগুলির অন্যতম। করিলেও রক্ষা নাই; না করিলে আরও অধিক বিপদের সম্ভাবনা। রোজ আনি রোজ খাই, কথাটি শুনিতে ভাল। কিন্তু ইহার সহজ সরল কাব্যমধুর ভাবের আড়ালে রহিয়াছে আর একটি কথা। কথাটি সত্য, কিন্তু আশার বা আনন্দের বাণী নহে। রোজ আনি রোজ খাই—অর্থাৎ রোজ না আনিলে রোজ খাইবারও পথ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ! সরল সহজ জীবনযাত্রা ও কাব্য-প্ররোচিত "উন্নত"মনা ভাব খালি পেটে ঠিক উপভোগ্য নহে। এই জন্য পৃথিবীর সকল দেশে, সকল অবস্থার লোকই সঞ্চয়প্রার্থী। সঞ্চয়ই বিপদের আশ্রয়, দুর্ব্বলের বল, দুরবস্থার সম্বল, বার্দ্ধক্যের অবলম্বন। এহেন সঞ্চয়ের গুণগ্রাহী আমরা সকলেই। কিন্তু মুস্কিল এই যে, সঞ্চয় যতই করি, কর্পূরের মত হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। সঞ্চিত অর্থের প্রধান জাতিগত দোষ এই যে, তাহার পরিমাণ যতই বাড়ে, তাহা অকস্মাৎ লোপ পাইবার আশঙ্কাও সমানে বাড়িয়া চলে! ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিলাম—লোকসান। সুদে খাটাইলাম—অধমর্ণ ফেরার। লোহার সিন্ধুকে বন্ধ করিয়া রাখিলাম—চোর ডাকাত ইত্যাদি। বন্ধকি তমসুকেও—মামলা মোকদ্দমা হয়রাণ:—অথচ নিঃসম্বল থাকাও চলে না।

যদি কখন রোজগার বন্ধ হইয়া যায়, যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, যদি কখন অনেক টাকার প্রয়োজন হয়—হইবেই, কেননা জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, এ সব ত ঘটিবেই, খরচও হইবেই—বিনা সঞ্চয়ে অর্থ কোথা হইতে জুটিবে? নগদ সঞ্চয়ে বিপদ; তাছাড়া উপায়ই বা কি আছে? আছে। আজকাল বীমাতে টাকা রাখার বহুবিধ উপায় আছে। এমন বীমা হয় যাহাতে হঠাৎ মৃত্যু ঘটিলে, বাৎসরিক অল্প অল্প টাকা দিয়া, দুর্দ্দিনে পরিবারের জন্য বহু অর্থের ব্যবস্থা করা চলে। যথা মাসিক ২০।২৫ টাকা ব্যয়ে, মৃত্যু ঘটিলে বা জীবদ্দশায়, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে পর, পাঁচ হাজার হইতে সাত হাজার টাকা পাইবার ব্যবস্থা করা যায়। কন্যার বিবাহ, পুত্রের উচ্চশিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থাও বীমার সাহায্যে করা চলে। বীমার টাকা বিনা "প্রোবেট" বিনা "ষ্ট্যাম্প" খরচায় পাওয়া যায়। বীমায় খাটান অর্থ অপরের কবলে পড়ার আশঙ্কা নাই। পত্নী, পুত্র, বা কন্যার নামে বীমা লিখিয়া দিলে আর নিজেও সে টাকা ভাঙ্গিতে পারিবে না। ক্ষণিকের মোহ বা দুর্ব্বলতাজনিত ব্যয়েচ্ছা বীমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, নগদ সঞ্চয় করিয়া কেহ যথার্থ সঞ্চিত অর্থ অপেক্ষা অধিক কিছু কোন সময়ে পাইতে পারেন না। কিন্তু বীমার ক্ষেত্রে এক কিস্তি "প্রিমিয়াম" জমা হইলেই মৃত্যু ঘটিলে বীমাকৃত পুরা টাকা পাওয়া যায়। আমাদের বহু পরিচিত গৃহে পাঁচশত টাকা "প্রিমিয়াম" দিয়া দশ হাজার টাকা পাইয়াছে এরূপ উদাহরণ দেখা গিয়াছে।

জীবন অনিশ্চিত, নগদ সঞ্চয় তদপেক্ষা অধিক অনিশ্চিত ও দুঃসাধ্য। এ ক্ষেত্রে বীমার মূল্য অশেষ। ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড আজ চল্লিশ বৎসর যাবত বীমার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অদ্যাবধি এক কোটী বত্রিশ লক্ষ টাকা এই কোম্পানী বীমাকারীদের দিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার মজুত তহবিল দুই কোটী কুড়ি লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে কোম্পানীর কাগজ প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা, ইলেকট্রীক কোম্পানীর সেয়ার ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা, ইমারতে চৌত্রিশ লক্ষ টাকা (ভাড়া আদায় হয় প্রায় সওয়া লাখ টাকা), অন্যান্য সেয়ার বাইশ লক্ষ টাকা, ডিবেঞ্চার তের লক্ষ টাকা, বীমাকারীদের বীমা পলিসির উপর ধার দেওয়া হইয়াছে এগার লক্ষ টাকা ইত্যাদি। কোম্পানীর বার্ষিক আয় প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। "ভারতের" নিকট বীমা করিলে নগদ টাকার সকল সুবিধা পাইবেন—ঝুঁকি বা অপব্যয়ের ভয় থাকিবেনা। ঠিকানা—**ভারত ভবন**—কলিকাতা। এক হাজার হইতে এক লক্ষ টাকা মূল্যের ও সকল সর্ত্তের বীমারই ব্যবস্থা আছে।

পথ চিনে যদি আস ক্ষতি নাই
হে পথিক পথ ভোলা
আকাশের নীলে উড়িছে আঁচল
নয়নে পরেছে মায়ার কাজল
খুলিয়াছে তার হৃদয় আচল
লও তারে তুমি চিনি
মন যে বলে চিনি।

[সোনালীকে প্রথম দর্শনেই মাণিক নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল এইবার তাহার অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর শুনিয়া বিহ্বলের মত শুধাইল]

মাণিক। কে সে? যার পদাঘাতে অশোক ফুল ফোটে—ঊর্ম্মির মতো যার কেশপাশ—নয়নে স্বপনের বেশ—দেখেছ তুমি তাকে?

সোনালী। ওমা! বিরহিনীর নাম শুনে একেবারে বিরহি হয়ে উঠলে যে!

মাণিক। না না—গোপন কোরোনা আমায় জানতে দাও—তার চোখে কি তোমারই মত বিদ্যুৎ খেলে—মুখে কি ঠিক এমনি মধু—গতিতে কি ঠিক এমনি ছন্দ—বল—বল—

সোনালী। হ্যাঁগা, তুমি কি কোনো রাজসভায় কবিতা লেখ? নইলে এমন বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলতে শিখলে কোথায়?

মাণিক। কথা কি করে বলে জানি না—ছন্দ কি করে গাঁথে শিখিনি কিন্তু আজকের এই সময়টায় যদি কেউ আমার অন্তরের গোপন কথাটি জানতে চায়—আমি তা' অপূর্ব্ব ছন্দে লিখে বোধ করি তাকে শোনাতে পারি—

সোনালী। বল কি? আমার আবার ঠিক উল্টো! কবিতার কথা শুনলেই কেমন যেন গা বমি বমি করে—তা' আমি না হয় আগেই চলে যাচ্ছি—তারপর তুমি যা হয় আপন মনে বকতে থাক—

মানিক। না না যেওনা, শোনো,—আজকের এই সময়টিতে আমি যদি একটি কথা বলি—যদি বলি তোমায় আমার খুব ভালো লাগছে—তবে কি তুমি—তুমি—রাগ করবে—?

সোনালী। নিশ্চয়ই করবো। ঠিক ঐ কথা আগেই আমায় আর একজন বলেছে যে!

মাণিক। তবে—তবে না হয়—তোমার হাতে গাঁথা ঐ মালা গাছি আমায় দাও—দেবদর্শন করে আসি—

সোনালী। কিন্তু এ মালাও যে সেই চেয়েছে, দেবদর্শনের মালা ত' এ নয়!

মাণিক। তোমায় যে পেয়েছে—এই মালার ক্ষতিটুকু সে সানন্দে স্বীকার করে নেবে—কিন্তু এই পাওয়াটাই হবে আমার মস্তবড় মূলধন।

সোনালী। তুমি না হয় মূলধন জোগাড় করে ব্যবসা ফাঁদতে বলেছ—কিন্তু আমার তাতে কি লাভ বলত! কত দাম দেবে এ মালার শুনি?

[ফুলওয়ালিরা ততক্ষণ অবাক হইয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল—প্রাপ্তির কোন আশা নাই দেখিয়া ১মা কহিল]

১মা। ওলো চল চল—দক্ষিণ দুয়োরে ভিড় জমেছে ফুল বেচবিত সেইখেনে চল—

২য়া। হ্যাঁ তাই চল্ চল্—

৩য়া। এই মধুমালঞ্চের ফুল—ক'জনে এর কদর বোঝে?

৪র্থা। আর এ ফুল কেনবার সামর্থ্যই বা কজনের? চললো চল, ও মল্লিকা—ও বিশাখা—

[ফুলওয়ালিদের প্রস্থান]

সোনালী। কৈ ওদের কাছ থেকে তুমি ফুল কিনে রাখলে না? দেব-দর্শন করবে কি দিয়ে?

মাণিক। অশোক ফুলের মালাই যদি না পেলাম ত' দেব-দর্শন আমার রইল—

সোনালী। কেন? অশোক ছাড়া কি আর ফুল নেই? মল্লিকা, অপরাজিতা, স্থলকমল, জবা—কত ফুল ত' ছিল ওদের কাছে রাজ্যের—যত লোক বুঝি শুধু অশোক ফুলই নিয়ে যাচ্ছে—?

মাণিক। রাজ্যের লোকের সঙ্গে আমার কথা বোলোনা বলছি—

সোনালী। ও বাবা—আবার গুমোর আছে!—তা' রাজ্যিছাড়া না হ'লে কি আর কবিতা লিখতে চায়!—কিন্তু অশোক ফুল না হ'লে দেবদর্শন চলবে না কেন শুনি?

মাণিক। অশোক ফুলের মালাই যে আমার মানত—অকালের ফুল কিনা!—কোথায়ও পেলাম না। কিন্তু তোমারও ত' আবার কোথায় মানত আছে বলছিলে!—

সোনালী। বাজে বোকো না বলছি—আমি তোমার মত যার তার জন্যে মানত করতে গেলুম আর কি!

মাণিক। বারে এই খানিক আগেত তুমিই বল্লে!

সোনালী। বল্লুম আমার খুসী!

মাণিক। তবে মালাটী আমায় দাওনা দাওনা ফুলওয়ালী—

সোনালী। [বিদ্যুৎবেগে মাণিকের সম্মুখে আসিয়া] ফুলওয়ালী! কেন আমার কি নাম নেই!

মাণিক। তাই ত! আমি ভুলেই গেছলুম জিজ্ঞেস করতে—শুধু তোমায় দেখে এত ভাল লেগেছিল—যে আর কোনো নামের প্রয়োজন ছিল না!—

সোনালী। তবে কেন ডাকলে ফুল-ওয়ালী—?

মাণিক। ঐ ত' কেমন ভুল হ'য়ে গেল—!

সোনালী। ভুল—ভুল—কেন অমন ভুল হয়? আমার অশোকের মালাটি চাইবার বেলা ত' ভুল হয় না।

৩য় বৃদ্ধা। ও বাছা—আর কতক্ষণ দাঁড়াবো—তোমার ফুল কেনা কি হ'ল না বাবা—

মাণিক। এই যে যাই মা—কিন্তু মন্দিরের ভিড় ত' এখনো কমেনি—তুমি আর একটু দাঁড়াও—না হয় ঐখানে একটু বসে জিরিয়ে নাও—

৩য় বৃদ্ধা। আচ্ছা বাবা—তাই না হয় নিচ্ছি—কিন্তু বাবা আমায় ফেলে যেওনা—আমি দুচোখে কিচ্ছু দেখতে পাইনে—

মাণিক। না, তোমার কোন ভয় নেই। আমি রইলাম এখানে। [সোনালীর দিকে] কিন্তু তোমার নামটি কি তাত' বল্লে না ?

সোনালী। ও কে আগে শুনি ?

মাণিক। এক অন্ধ বুড়ী—ভিড়ের চাপে পড়ে গেছল—আমি টেনে তুলি—আমার সঙ্গে মন্দিরে যাবে বলে বসে আছে—

সোনালী। ও বাবা—আবার দয়া-মায়াও আছে দেখি শরীরে—

মাণিক। কেন বলত ? এত' মানুষেরই কাজ—রুগ্নকে সেবা করা—আর্ত্তকে রক্ষা—

সোনালী। থাক্, পাঠশালায় গুরু মশাইয়ের কাছে খুব পুঁথি আউড়িয়েছ তা' বুঝতে পাচ্ছি—কিন্তু ছন্দ লিখিয়েদের ত' আমি মানুষের মধ্যে ধরি না—

মাণিক। ও—কিন্তু তোমার নামটি ?

সোনালী। কি নাছোড়বান্দা বাবা—যা' ধরবে—ছাড়বার নামটি নেই—নাম কি—নাম—কি কেন তুমিইত' ডেকেছ ফুলওয়ালী বলে—

মাণিক। না—না ও নামে তোমায় সাজে না !

সোনালী। সাজে না ? তবে কি সাজে ? জগদম্বা ?

মাণিক। বাপ্রে—আমি বুঝি তাই বল্লুম—?

সোনালী। আচ্ছা, কি বল্লে তাই বল না—

মাণিক। জানিনে যাও—

সোনালী। ওমা ! আবার অভিমানও ত' আছে দেখছি ! শুনবে আমার নাম ?

মাণিক। [রাগিয়া] কী ? গ্রহচক্র, মণ্ডলী, বারাহী, রেবন্ত, মহাভৈরবী, ঝঙ্কেশ্বরী, একজটী, তক্ষিত, পর্ণশবরী ?—আরো চাই ?

সোনালী। না, ঢের হ'য়েছে—এইবার একটু হাঁফ্ ছেড়ে জিরিয়ে নাও—বাতাস করবো ? [আঁচল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল]

মাণিক। [খপ করিয়া আঁচল ধরিয়া ফেলিয়া] এইবার তবে নামটা বল—

সোনালী। আঃ—আঁচল ছাড়ো না—

মাণিক। উঁহু [চোখ বুজিয়া আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

সোনালী। [হাসিয়া] সোনালী গো—সোনালী—

মাণিক। সোনালী —সোনালী—[যেন নামটা মিষ্টি খাবারের মত চাখিতে লাগিল—তারপর হঠাৎ]

আচ্ছা দেখ—

সোনালী। কি হ'ল পায়ে কাঁটা ফুটল নাকি ?

মাণিক। না, বলছিলুম কি—আমি তোমার নামটার শেষ অক্ষর বাদ দিয়ে যদি শুধু সোনা বলে ডাকি—

সোনালী। [মাথা দোলাইয়া] তবে মোটেই ভালো হয় না—

মাণিক। [ছুটিয়া গিয়া সোনার হাত চাপিয়া ধরিয়া] কেন বলত ?

সোনালী। (চোখে বিদ্যুতের বাণ হানিয়া] পাগল নাকি ?

ঐ দেখ যাত্রীরা সব আস্ছে।

[বাহিরে লোক সমাগমের শব্দ শোনা গেল—কিন্তু মাণিক ততোধিক ক্ষিপ্রতায় সহিত সোনালীর হাত হইতে পলকে অশোক ফুলের মালাটি ছিনাইয়া লইয়া ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধার হাত ধরিয়া কহিল]

চলমা—মন্দিরে যাবে চল—

সোনালী। ওকি, শ্রেষ্ঠীপুত্র আমার মালার দাম কৈ ?

মাণিক। মালার দামের বদলে আমি তোমার কেনা হ'য়ে রইলুম সোনা—

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান]

সোনালী। আজকের নৌকায় হবে কি তবে এই তরুণ যুবা ? কিন্তু তার নাম ? নাম জানিনি অথচ নিজের নাম বলে দিয়েছি—সোনালীর জীবনে ত' এরকম ভুল কখনো হয়নি।

তুমি আছ

শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কে বলিবে, তুমি নাই? বাতুল-প্রলাপ তাই! সে কি হয়? হ'তে সেকি পারে?
না থাকিলে তুমি প্রিয়া, চারিদিকে নিরখিয়া কেন সদা নেহারি তোমারে?
দিনে হ'য়ে সূর্য্যমুখী রহি' মন-মুখোমুখী, কর্ম্মহীন করিলে আমায়!
রজনীগন্ধা হ'য়ে মরমে ফুটিয়া র'য়ে, নিদ্রাহীন ক'রেছ নিশায়!
আঁখি-পথে প্রবেশিয়া কেঁড়ে লয় যারা হিয়া, তাহাদের বশ যবে হই,
প্রভাহীন সবে করি; চিত্ত-রাজাসন 'পরি সমুদিত হও জ্যোতির্ম্ময়ী।
হৃদি-পদ্মে নিশাগমে সুপ্ত রহি' প্রিয়তমে, সমধিক জানা'লে তোমায়।—
তপন মুদিলে আঁখি, আধার-সায়রে থাকি' মহিমা তাহার বুঝা যায়।

কৌমুদী নয়ন-মাঝ সাধিছে ধূমের কাজ, দিবসেও নেহারি আঁধার;
রূপে তব ডুবে থাকি' অভিজাত হ'ল আখি—কারণ ইহাই শুধু তার!
আমার নয়ন-আগে মুখপদ্ম তব জাগে, না পারি হেরিতে চাঁদ তাই।
দুটি প্রেমলতা তব করি' গলে অনুভব, পুষ্পমালা ছিঁড়িয়া ফেলাই।
ফেননিভ শয্যাখানি কণ্টক-অধিক মানি, বুকে তব স্থান দেছ বলি'।
দেবতায় অম্লপানে মন মোর নাহি টানে,—আমি তব অধরের অলি।
অয়ি মোর প্রাণেশ্বরী, কূলে কূলে আছ ভরি' এ-জীবন তটিনী আমার!
ধ্যানলোকে রূপায়িত, মম-বৃন্তে বিকশিত, স্মৃতির সায়রে সুধাধার।

"কথা কও" বলি' পাখী ডাকিত কি থাকি' থাকি', তুমি প্রিয়ে, না থাকিলে বাঁচি?
বিচিত্র ভূষণে সাজি' সঙ্গীত গাহিয়া আজি পাখী-সখি বেড়াত কি নাচি?
প্রিয়তমে, তাহা হ'লে, শোভিবারে করে গলে, যেতে তব মুখচন্দ্র-পাশ,
সৌরভ সঞ্চয় করি উপবন কুঞ্জ ভরি' ফুটিত কি ফুল বারমাস?
পরশিতে কম অঙ্গে, খেলিতে কুন্তল-সঙ্গে, আচলে মারিতে কভু টান,
না থাকিলে তুমি প্রিয়া, মলয়াদ্রি তেয়াগিয়া আসে কি সমীর এই স্থান?
না থাকিলে তুমি প্রিয়া, আছি আমি কি করিয়া? বাক্য কভু হয় অর্থহীন?
তুমি আছ, তাই মম দিবস মাসের সম, নহিলে ফুরা'ত কবে দিন!

পাশ্চাত্য সাহিত্যে নবযুগের ভাবধারা

শ্রীচিত্রগুপ্ত

প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ মনীষি নোভালিস্ (Novalis) যে ব'লেছিলেন, "হৃদয়ই হ'চ্চে বিশ্বজগতে প্রবেশ করবার চাবি," (The heart is the key to the universe) সেই সত্যকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রে বর্ত্তমান যুগের মানুষ জগৎকে হৃদয় দিয়ে দেখ্‌তে আরম্ভ ক'রেচে।

এই যে অসীম ঔদার্য্যের সঙ্গে দরদ দিয়ে জগতকে দেখা, এর সম্বন্ধে চিন্তা করা, এইটেই হ'চ্চে বিংশ-শতাব্দীর পাশ্চাত্য সাহিত্যে আধুনিকতা-আন্দোলনের (Modernist Movement) গোড়ার কথা।

বিংশ শতাব্দীর উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বেকার ভাবধারার বিপরীত সম্পূর্ণ নতুন যে এক উদার ভাব পাশ্চাত্য জগতের সাহিত্যিকদের মনে দেখা দিলে, সেই কথা নিয়ে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার সাহিত্য-জগতে ভিক্টোরিয়ান্ যুগের অবসান হোলো। ইতিমধ্যে Beardsley, Ibsen, Nietzsche এবং Butler Victorian Conventionগুলির বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করতে আরম্ভ ক'রেছিলেন, ফলে উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে পুরোণো ভাবধারার তিরোভাব ঘট্‌লো। কিন্তু তার স্থলে তখনি তখনি কোন নূতনের উদ্ভব হোলো না। উনিশশো খৃষ্টাব্দ থেকে উনিশশো চোদ্দ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাহিত্য জগতে কোন বিশেষ আন্দোলন বা ধারা দেখা যায়নি। এ সময়টায় কেবল গত যুগের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ ধ্বংসমূলক সমালোচনাই চ'লতে লাগ্‌লো। এ সময়ের বস্তুতান্ত্রিক মতবাদীরা লেখকদের কতকগুলো বিষয়ে মুক্তি দিলেন।

এখন আর কোন নভেলের নায়ক-নায়িকার মধ্যে চুম্বনের কথা থাক্‌লে লোকে গালাগালি দিতো না। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ছাড়া দু'জনের মধ্যে কোন রকম মিলনের কথা বইতে লেখা চল্‌তে পারেনা, এ রকম ধারণা আর লোকের রইলো না। সন্তানের ব্যক্তিত্বকে প্রবল আঘাত খর্ব্ব ক'রে দেওয়াই হ'চ্চে মাতাপিতার কর্ত্তব্য কিম্বা প্রাণপণে অর্থ উপার্জ্জন করা এবং সর্ব্বরকমে সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করতে চেষ্টা করাই জীবনের একমাত্র সার্থকতা, এ-ধরণের ধারণা লোকের ক্রমে ক'মে আস্‌তে লাগ্‌লো। মেয়েরা ঘর ছেড়ে বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলে এবং পুরুষদের সঙ্গে ভাইবোনের সমানাধিকার পেতে আরম্ভ করলে। সুতরাং লেখকদের কলমের স্বাধীনতাও সঙ্গে সঙ্গে আপনি বেড়ে গেল।

পথতো খুল্‌লো। কিন্তু সেইটুকুই তো সব নয়! সেই পথ দিয়ে বিজয়াভিযানের অভিমুখে চল্‌বে যে পথিক, তার দেখা কৈ? ..

এই নতুন পথের প্রথম পথিক হ'লেন সামুয়েল বাট্‌লার। তাঁর মৃত্যুর পরবৎসর অর্থাৎ উনিশশো তিন খৃষ্টাব্দে সমস্ত সাহিত্য জগৎকে চমকিত ক'রে দিয়ে তাঁর সম্পূর্ণ নতুন ধরণের বই 'The Way of All Flesh' বার হোলো। ইতিমধ্যেই ভিক্টো-রিয়ানিজ্‌ম্‌এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'য়ে গেছলো। নবযুগের যুবকদের পিতারা তাঁদের পিতামহদের কাছ থেকে যে শাসন-পীড়িত কঠোর ব্যবহার পেয়ে এসেছিলেন, নিজেদের ছেলের ওপর তাঁরা তার থেকে অনেক বেশী উদার ব্যবহার ইতিমধ্যে করতে আরম্ভ ক'রেছিলেন। সামুয়েল বাট্‌লারের Way of All Flesh বইতে এই ধরণের মাতাপিতার কথাই দেখতে পাই। তিনি দেখিয়েচেন তাঁর বইয়ের নায়কের মাতা-পিতা তার ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব করতে গিয়ে কি ভাবে ব্যর্থমনোরথ হ'য়েছিলেন। ধর্ম্মের নামে তার ওপর কি রকম কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হ'য়েছিল, শিক্ষার নামে তাকে কি ভাবে প্রবঞ্চিত করা হ'য়েছিল এবং কর্ত্তব্যের নামে, সে যা-কিছু করতে ঘৃণা করতো—তাকে তাই করতে বাধ্য ক'রে এবং তার সুস্থ সহজাত প্রবৃত্তি (healthy instinct) থেকে তার যা করতে ইচ্ছে যেতো তাতে প্রবল ভাবে বাধা দিয়ে তাকে কি রকম পীড়া দেওয়া হ'য়েছিল এই বই খানিতে তা' তিনি খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়েচেন। ভিক্টোরিয়ান্ যুগের গার্হস্থ্যজীবনের খারাপ দিকটা খুব খুঁটি-নাটীর সঙ্গে দেখিয়ে এই প্রথম একখানি ভালো বই এতদিনে প্রকাশিত হোলো। বইখানি ভালো এই জন্যে যে, লেখক এতে কোন বিদ্বেষ পোষণ ক'রে মাতাপিতাদের বৃথা আক্রমণ করতে চেষ্টা করেন নি। তিনি শুধু দেখিয়েচেন যে স্নেহশীল মাতাপিতা ভিক্টোরিয়ান্ যুগের ধারণা অনুযায়ী তাঁদের সন্তানের প্রতি যে

ব্যবহারকে মঙ্গলজনক বিবেচনা ক'রেছিলেন তার মধ্যে কোথায় কতখানি গলদ্ ছিল।

এই সময়ে জন্ গলস্‌ওয়ার্দ্দী এবং আরো জনকয়েক নাট্যকারের সঙ্গে বিলেতের কোর্ট থিয়েটারে প্রায় দু'বছর ধ'রে অনবরত নাটকের পর নাটক দিয়ে মনীষি বার্ণার্ড শ' তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে খুব প্রতিপত্তি অর্জ্জন ক'রেছিলেন। তিনি পর বৎসর অর্থাৎ উনিশশো চার খৃষ্টাব্দে বাট্‌লারের বইখানির খুব সুখ্যাতি ক'রে বল্‌লেন—

"কিম্ভূত রকমের আদর্শবাদিতা হ'চ্ছে সর্ব্বনাশের মূল। বাট্‌লারের নভেলের মাতাপিতারা সেই রোমান্টিক্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার দরুণই যত গোলমালের সৃষ্টি।"

শ' নিজেও তাঁর অভিনব বাণীমন্ত্রে নবযুগের চিন্তাধারাকে উদ্বুদ্ধ ক'রলেন। তাঁর মত হ'চ্ছে এই, যে, নিজের ওপর মানুষের যে কর্ত্তব্য আছে, সে যদি নিজের সহজ ও সরল মনোবৃত্তির সাহায্যে শুধু মাত্র সেইটুকুই ক'রে যায়—যা করতে গিয়ে বাট্‌লারের রচিত বইয়ের নায়ক ছেলেটি বাপমায়ের মতের বিরুদ্ধে যেতেও ইতস্ততঃ করেনি—তা'হলেই সে একদিন দেখবে সে তার প্রবৃত্তিকে সংযত করতে সক্ষম হয়েচে। তাই তিনি বলেন, যে, মানুষের সব চেয়ে বড় কাজ হ'চ্ছে নিজের ওপর তার কর্ত্তব্য সব আগে পালন করা।

শ' আরও বল্লেন যে একমাত্র ক্রম-বিবর্ত্তন-বাদের থিওরীটি (The Theory of Evolution) ছাড়া আর সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মই আস্থার অনুপযোগী, কারণ মানুষের এই সমস্ত বিশ্বাসের মূলে আছে মাত্র একটি ফ্যাশন।

তারপরে তিনি তাঁর Man And Superman বইখানিতে দেখালেন যে এই-ভাবে তাঁর প্রদর্শিত দিক দিয়ে জীবনের দিকে তাকিয়েও ধর্ম্মপালন করা যায়। বার্ণার্ড শ' হ'চ্ছেন একজন সমাজতন্ত্রবাদী। তিনি বিবাহের কথা, চিকিৎসকদের কথা, Salvation Armyর কথা, সাফ্রাজিসম্ প্রসঙ্গ প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে বহু বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশ করে এই সমস্ত বিষয়কে সাধারণের সহজ বুদ্ধির সামনে খাড়া ক'রে ধ'রেচেন। গলস্‌ওয়ার্দ্দী এবং গ্রাণ্‌ভিল্ বার্কারও ষ্টেজের মধ্যে দিয়ে এই ধরণের কাজ করেচেন।

উনিশশো চার থেকে উনিশশো আট খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরলোকগত বিখ্যাত ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি 'The Dynasty' নাম দিয়ে Napoleonic War নিয়ে প্রকাণ্ড এক নাট্যকাব্য লেখেন। তা'তেও তিনি মানুষের ভাগ্যের পরিকল্পনা ক'রেচেন ক্রম-বিবর্ত্তন-বাদের দিক থেকে।

তারপর বর্ত্তমান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত এইচ্, জি, ওয়েল্‌স্‌ও নতুন সৃষ্টি নিয়ে তাঁর সুপটু হাতে নতুন যুগের মানুষের অবিকল প্রতিকৃতি আঁকলেন। দীনহীন দরিদ্র দোকানদার, দুঃস্থ কেরাণী প্রভৃতির জীবনের সাধনার কথা, সংগ্রামের কথা, তাদের আত্মার কথাও তাঁর কলমের মুখে ফুটে উঠলো। গলস্‌ওয়ার্দ্দী সমাজের সম্পন্ন ঘরের কথা নিয়ে বই লিখ্‌তে লাগলেন। আর্ণল্ড বেনেট্ সাধারণ লোকের স্থূল জীবন কথাও অদ্ভুত কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁর জোরালো উপন্যাসগুলির প্রতি ছত্রে ব্যক্ত ক'রলেন।

তারপর উনিশশো আঠারো খৃষ্টাব্দে ডব্লিউ, এইচ, ডেভিস্ তাঁর Autobiography of a Super-Tramp বইতে যে-শ্রেণীর চিরন্তন adventureএর কাহিনী বিবৃত করলেন, তাও আধুনিক সাহিত্যের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন। আর্ণল্ড বেনেট্, রোজ মেকলে এবং কম্পটন্ মেকেঞ্জী আশপাশের অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর সমাজের বিভিন্ন জীবন-ধারার কথা নিয়ে আলোচনা ক'রলেন। বলা বাহুল্য, এই সমস্ত লোকই আধুনিক ভাব-ধারা নিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির পথে অগ্রসর হ'য়েছিলেন।

উনিশশো পাঁচ খৃষ্টাব্দে শক্তিশালী লেখক জি, কে, চেষ্টারটন্‌এর Heretics নামে বইখানা আর এক নতুন দিকে আলোক নিক্ষেপ ক'রে সাহিত্য-জগতে আত্মপ্রকাশ ক'রলে। এই সময়ে হিলেয়ার বেলকের আবির্ভাবও সাহিত্য-জগতে অনেক নতুন দান এনে দিলে। তাঁর Europe and the Faith, James the Second, How the Reformation Happened প্রভৃতি বই-গুলো প'ড়লেই আমরা দেখতে পাই যে সাধারণতঃ স্কুল-সমূহে কি রকম একদেশ-দর্শিতার সঙ্গে ইতিহাস পড়ানো হয়। জন মেসফিল্ড, ওয়াল্টার ড্য লা মেয়র, জোসেফ কনরাড প্রভৃতি শক্তিশালী লেখকবৃন্দও আধুনিক যুগের সাহিত্যকে মহিমান্বিত ক'রেছেন।

তাছাড়া এডিথ সিটওয়েল্, যাঁর বিখ্যাত বই Wheels উনিশশো যোলো খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাঁর কবিতাও বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শেরার্ড ভাইন্‌স্, আলডুস্ হক্সলি, এবং পি, উইণ্ডহাম লিউইস্‌ও নতুন ধরণের বিষয়-বস্তু নির্ব্বাচন ক'রে নতুন রূপ দিয়ে এক সম্পূর্ণ নতুন রকমের কাব্য-সাহিত্যের সৃষ্টির পরীক্ষা আরম্ভ করেন।

এদিকে আবার সাইকো-এনালিটিক্-স্কুলের লেখক জেম্‌স্ জয়েস্ (উনিশশো বাইশ খৃষ্টাব্দে যাঁর সর্ব্ব-জন-বিদিত বই Ulysses প্রকাশিত হয়), ডি, এইচ, লরেন্স (যিনি Sex-conflict এর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ ক'রে অনেকগুলি উপন্যাস, গল্প, নাট্য এবং কাব্য রচনা করেচেন) এবং আরো অনেকে তাঁদের নতুন ধরণের চিন্তাধারায় আধুনিক সাহিত্যকে বিচিত্র রূপ-সম্পদে বিভূষিত ক'রেচেন।

ভারতীয় চিত্র-শিল্পের আজ দুর্দ্দিন উপস্থিত

শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ

ভারতবর্ষের চিত্র-শিল্প আজ যে কত উচ্চ-স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাই দিকে দিকে দেখিতে পাই যে দেশী প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় বহু চিত্র-গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত কোন দেশী ছবি দেখিতে যাইতেও অনেকে নাসিকা কুঞ্চন করিতেন বা পারত পক্ষে মার্কিনী ছবি পরিত্যাগ করিয়া দেশী ছবি দেখিবার নামও করিতেন না। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকেরাও আজিকার দিনে দেশী ছবির দিকে চোখ ফিরাইয়াছেন। ইহারা ব্যতীত আর এক শ্রেণীর লোক বর্ত্তমানে সিনেমা দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহারা বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত জীবনে অবসর সময়ে যদি একটু-আধটু স্ফূর্ত্তি না পাওয়া যায় তবে তো জীবনই অসহ হইয়া উঠে। তাহারা নিয়মিত অবসর সময়ে সিনেমা দেখিতে আরম্ভ করায় গড়পড়তা চিত্র-প্রিয়ের সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

কিন্তু এই সময়ে ভারতের চিত্রশিল্পের এই উন্নতির স্রোতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে বিদেশীয় বণিক। বিদেশীয় চিত্র-প্রতিষ্ঠান সমূহ এ দেশে আসিয়া ভারতীয়ের স্বার্থ নষ্ট করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। ইতিমধ্যেই তাহাদের দ্বারা দু এক স্থানে প্রাসাদোপম চিত্র-সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন; বোম্বাই নগরে ভারতীয় বণিকগণের আন্দোলনও এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সচেতন করিতে পারে নাই। যদি আরো কিয়ৎকাল এরূপ ভাবে বিদেশীয় চিত্রপ্রতিষ্ঠান এদেশে আসিয়া প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে তাহা হইলে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত হইবে। আজ শিল্পে ও বাণিজ্যে ভারতবর্ষ যে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে সমগ্র জাতির সাধনা।

আট দশ বৎসর পূর্ব্বে যে বস্ত্র এখানে প্রস্তুত হওয়াও অসম্ভব বলিয়া মনে হইত এখন তাহা প্রায় প্রতি ভারতীয় মিলে প্রস্তুত হইতেছে। আজ যদিও বা ভারতীয় চিত্র-শিল্প তেমন উন্নতির শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারে নাই তবু অদূর ভবিষ্যতে উহা যে মার্কিন চিত্র-শিল্পের সমকক্ষ হইবে এ আশা দুরাশা নহে। কিন্তু আমাদের সমগ্র জাতির সম্মিলিত সাধনা না হইলে উহা কোন মতেই সম্ভবপর হইবে না।

এ দেশের বিদেশীয় চিত্র-প্রতিষ্ঠান ও চিত্র-গৃহ, কাহাদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করিতেছে একটু ভাবিয়া দেখিলেই উহা উপলব্ধি করা যায়। ভারতীয় চিত্র-শিল্প কি জাতির নিকট এই সহানুভূতি দাবী করিতে পারে না? গভর্ণমেণ্ট যখন এ বিষয় সম্পূর্ণ উদাসীন তখন জাতির কর্ত্তব্য তাহাদের সম্মিলিত সাধনা ও সহানুভূতি দিয়া এই শিশু শিল্পটিকে সযত্নে রক্ষা করা।

এ বিষয়ে ভারতীয় চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলিকে (চিত্র প্রস্তুতকারক) চিত্র পরিবেশক ও চিত্র-প্রদর্শকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একযোগে কার্য্য করিতে হইবে, নতুবা ভারতীয় চিত্র-শিল্পের পরিণাম যে কি হইবে তাহা ধারণার অতীত।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পূর্ণচ্ছেদ টানিবার পূর্ব্বে আরও একটী কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে। উহা বিদেশীয় ফিল্ম ব্যবসায়ী সমাজকে উদ্দেশ করিয়া। বিদেশীয় ফিল্ম ব্যবসায়ীগণ যদি নিজেদের ছবি নিজেদেরই চিত্রগৃহে প্রদর্শন করিয়াই চলে তাহার ফল তাহাদের পক্ষেই বিষময় হইয়া উঠিবে। কোন বিদেশী ছবি প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শকগণ যে লভ্যাংশ পাইত তাহা না পাইয়া স্বতঃই তাহারা বিদেশীয় ফিল্ম ব্যবসায়ীদিগের উপর বিরূপ হইয়া উঠিবে। তাহার ফল হইবে যে বিদেশীয় ফিল্ম-ব্যবসায়ী-বৃন্দ অদূর ভবিষ্যতে এমন কোন ভারতীয় চিত্র প্রদর্শক পাইবে না যে তাহারা মার্কিনী ছবি second run বা তাহার পরে চালাইবার নিমিত্ত চুক্তি করিবে।

উপরোক্ত উপায়ে বিদেশী বণিক সমাজকে জব্দ করিতে হইলে অবশ্য ভারতীয় চিত্রব্যবসায়ীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। বাঙ্গলার চিত্র নির্ম্মাতা, পরিবেশক এবং প্রদর্শক—সকলকেই এই কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি।

এই সমস্ত নবযুগের সাহিত্য-যজ্ঞের হোতাদের কার্য্যাবলী প্রশংসনীয়। এরা কেউই Classicist-দের মতন বিরাট একটা সৃষ্টির আত্মপ্রসাদের মোহের বশে সাহিত্য সৃষ্টি করতে বসেননি কিম্বা Romanticist-দের মতন কল্পিত সৌন্দর্য্যের বন্দনা-সঙ্গীতে ছন্দো-মাধুর্য্যের কুহেলিকার সৃষ্টি করে মনকে চোখ ঠারতে চেষ্টা করেন নি। এঁরা বর্ত্তমান যুগের প্রাণের কথাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি ক'রে আধুনিক যুগের বাণীকে হৃদয়ের তীব্র অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ ক'রেচেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে এদের এই আধুনিকতার আন্দোলন আর সব কিছুর ওপর জয়যুক্ত হ'য়ে নবযুগের ভাব-ধারাকে মহিমান্বিত করেচে।

দৈন্য-ক্লিষ্ট রঙ্গমঞ্চের পথ নির্দ্দেশ

শ্রীযামিনী মিত্র

ক'লকাতায় থিয়েটারের আজ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা একথা আজ থিয়েটার সংশ্লিষ্ট লোক কেন ক'লকাতার জনসাধারণও বেশ ভাল করে জানেন। এই অবস্থা তার আজ হ'ল কেন এই কথা সামান্য একটু আলোচনা করবার জন্য আমি অনুরুদ্ধ।

আমার এবিষয় অভিজ্ঞতা অল্পদিনের তবুও যেটুকু অধিক বুঝেছি সেটুকু এর যার ফত জানাবার চেষ্টা করবো।

আমার মতে এ'র প্রথম ও প্রধান কারণ দেশের অর্থ সঙ্কট অর্থাৎ কিনা দেশে এমন অর্থ নেই যাতে করে জনকতক লোকের চিৎকার বা কজন কুশ্রী স্ত্রীলোকের নাচ ও একটিং এবং হাত পা নাড়া ও মনস্তত্ব বিশ্লেষণের নাম করে অতি পুরাতন ভাব ও ভাষাপূর্ণ পচা নাটকের অভিনয় দেখে। তবে এমন অর্থ তাদের আছে যা সত্যিকার দেখবার জিনিষ তার জন্য পয়সা খরচ করে। এর প্রমাণ ভাল ফুটবল ম্যাচ্ ভাল বায়স্কোপ এমন কি ভাল থিয়েটারের অভিনয়ের জন্য তাঁরা যে খরচ করতে কার্পণ্য করেন না তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তবু দু'একটার নাম কোরবো ফিল্ম—দেবদাস ও ভাগ্যচক্র থিয়েটার—মহানিশা।

এখন দেখা যাচ্ছে যে লোকে যাত্রা বইয়ের যাত্রা অভিনয়ে এক পয়সাও দিতে নারাজ হোলেও তারা যা চায় তা দিতে পাল্লে টাকা যা আশা করা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা পাওয়া যায়। প্রশ্ন উঠবে তবে তা দেওয়া হয় না কেন? এবং এইটায় হ'চ্ছে থিয়েটারের অবস্থার প্রধান কারণ—উত্তর হ'চ্ছে নানা কারণে—

১। কর্ত্তৃপক্ষের অর্থ ও সাহসের অভাব।

২। উপযুক্ত লোকের অভাব।

৩। নামের প্রতি সাধারণের মোহ ও প্রীতি।

এবার একটু বিষদভাবে বলি।

আধুনিক কোন থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট capital নিয়ে থিয়েটার আরম্ভ করেন নি—প্রত্যেকেই কোনরকমে জোড়া তালি দিয়ে আরম্ভ করে মাছের তেলে (অর্থাৎ কোন থিয়েটারের উপার্জ্জিত টাকা থেকে) থিয়েটার চালাবার মতলবে গিয়ে ফল হ'য়েছে এই যে সে বই (যেহেতু জোড়াতাড়া দেওয়া) fail করায় চারিদিকে দেনা করে ফেলেন—সঙ্গে সঙ্গে ফেলেন আর্টিষ্টদের মাইনে বাকী। ফলে নতুন কিছু experiment করা তাঁদের পক্ষে হয় অসম্ভব—তখন তাঁদের একমা'ত্র আশা হয় কোন বড় লেখকের খ্যাতনামা নভেলকে নাটক করে তার অভিনয় করা—কারণ তাঁরা ভাবেন হয়তো নভেলের ও লেখকের নামে যদিও বই কিছু কাটে:—কিছু কাটে সত্যি কিন্তু সেই কিছুতে থিয়েটার চলে না—কারণ থিয়েটারের মসিক ব্যয় হচ্ছে অন্ততঃ পক্ষে ৭০০০৲ টাকা। মাসে ৭০০০৲ শুনে আশ্চর্য্য হবেন না—৭০০০৲ থেকে খুব কমের মধ্যে যেমন ধরুণ না বাড়ীভাড়া ট্যাক্সসমেত ১৫০০৲ Electric Telephone (Registered) গাড়ীভাড়া ইত্যাদি ১০০০৲ বিজ্ঞাপন ও অভিনয়ের জিনিষপত্র ৫০০৲ থেকে ১০০০৲ অভিনেতা ইত্যাদি ৩৫০০৲ (খুব কম করে এটা সাধারণতঃ ৪০০০৲ থেকে ৫০০০৲ টাকা) এর উপর Copyright ও Production expense আছে কাজেই বুঝতে পাচ্ছেন টাকার অভাব ও দরকার

মত নতুন বই লিখিয়ে অভিনয় না করা কঠিন। এইবার ২নং অর্থাৎ উপযুক্ত লোকের অভাব। এইখানেই থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের সবচেয়ে বিপদ সাধারণের মুখে সর্ব্বদা শুনা যায় বুড়ী অমুককে দিয়েছে নায়িকার পাট—সুন্দরী তিলত্তমা সেজেছে শ্রীমতী মোটা হোঁতকা অমুক—চোখ বুজে বসে Play দেখতে হয়—। খুব সত্যি কথা, থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষ একথা যতটা অনুভব করেন দর্শক সাধারণ সিকিও করেন না কারণ তাঁরা তাঁদের Painted অবস্থায় দূরে বসে রংবে-রংএর আলোর সাহায্যে দেখেন কিন্তু তাঁরা দিনের আলোর স্বরূপে তিনি যখন Reharsal দেন তখন তাঁদের হজম করেন—শুধুই কি তাই নায়িকার Descreption নিয়ে এর উপর আবার Author তাড়া করে বেড়ান —কিন্তু উপায় কি থিয়েটারে মেয়েরা আসেন —একটা বিশেষ পল্লী থেকে—সেখানকার তাঁদের নিজস্ব একটা বিশেষ ব্যবসা আছে এবং যিনি যেরকম সুন্দরী তাঁর সেরূপ পসার থিয়েটার যে মাহিনে দেয়—তার মাত্রা এমন কিছু নয় যে সেখান থেকে তন্বী সুন্দরী (যদি সত্যি সেখানে কেউ থাকেন) তাঁদের সেই ব্যবসা ছেড়ে এখানে আসবেন—যদি হঠাৎ —কোথাও থেকে কেউ এসে পড়েন দুচার দিন দেখবার পর তিনি ফের নিরুদ্দেশ হ'য়েছেন—আবার কিছুদিন পর তাঁকে তাঁর পূর্ব্ব পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিতও দেখা যায় তবে তখন তাঁর কদর থিয়েটারের টাকার উপরে। তবে ও—এক হ'তে পারে—মেয়ে বাদ দিয়ে —শুধু পুরুষ দিয়ে! নাটক হয় তো লিখিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু আমার মনে হয়-তা কাটে না।

তাহোলে—একমাত্র সমাধান হ'চ্ছে যদি সেদিন কোন দিন আসে যেদিন নামের জন্যে ঐ পাড়ার সুন্দরীরা থিয়েটারে যোগ দেন অথবা ভদ্র মেয়েরা সখীভাবে নাম ও সামান্য allowanceএর জন্য ও আর্টের খাতিরে stageএ join করেন—এটা হয়তো অনেকে বলবেন দুরাশা।—আমি বলি যদি থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ ওপাড়ার মেয়েদের একেবারে না আনেন ও মাতাল বা দুশ্চরিত্র অভিনেতাদের রঙ্গমঞ্চে স্থান না দেন—তবে হয়তো এটা সম্ভব হতেও পারে কারণ পুরুষদের সঙ্গে public stageএ অভিনয় আজকাল প্রায়ই হ'চ্ছে—তবে এ পুরুষরা তাঁহাদেরই মধ্যেকার লোক এই জন্যেই বলছি—পুরুষ যাদের কর্ত্তৃপক্ষ নেবেন তাঁরা মদ্যপ বা চরিত্রহীন হ'লে চলবে না।

আমার মতে থিয়েটারের চলার পথের এই একমাত্র গতি—নান্য গতিরন্যথা।

এইবার তৃয় :—অর্থাৎ সাধারণের নামের প্রতি মোহ বা প্রীতি।

—এও একটা বড় কথা অমুক নামছে আরে চ দেখে আসি এটাও খুব আছে—ফলে সেই অমুককে কর্ত্তৃপক্ষ মাসে ৫০০৲ টাকা অন্ততঃ পক্ষে গুনতে হয়—অর্থাৎ সবাই পায় আর না পায় তাঁকে দিতেই হবে—তা তিনি খাতকের পাটেই নামুন আর ডাক্ত'রএর পাটেই নামুন—লোকে যে (হাসনাহানায় শিশিরবাবু) তাঁর সব কিছুর জন্য টাকা দিচ্ছে তা নয়—তবে—He is a seller কাজেই তাকে দমবন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত রাখতে হ'চ্ছে—

—আরও একটা কারণ আছে পুর্ব্বেই বলেছি টাকার অভাব হেতু—বড় কিছু করা যখন সম্ভবপর তখনও নাম করা অভিনেতা—নামকরা লেখকের নামকরা বই নিয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে কোন রকমে দিন গুজরান করতে হ'চ্ছে—

সর্ব্বশেষে থিয়েটারকে নূতন জীবন দিতে হ'লে সর্ব্বপ্রথম চাই অপর্য্যাপ্ত অর্থ যাতে করে দুখানা বই অন্ততঃ পক্ষে পর পর অভিনয় করা চলে।

চাই নূতন লোক মেয়ে অভিনেত্রী ও চরিত্রবান পুরুষ অভিনেতা ও কর্ত্তৃপক্ষ।

চাই নূতন লেখক যে নতুন যুগোপযোগী subject matter নিয়ে আধুনিক ভাষায় আধুনিকভাবে—নাটক লিখে দিতে পারেন—

—আর চাই দর্শকদের কাছে তাঁরা অমুক অমুক নামের কথা না ভেবে এই থিয়েটারে অন্ততঃ একবার পদার্পণ করে দেখা তাঁরা তাঁদের মনের মতন জিনিষ পেয়েছেন কিনা।

আইডিয়ালিজম ও চলচ্চিত্রের স্থান

শ্রীফণী মজুমদার

শিল্পে ও সাহিত্যে realism আর idealism নিয়ে দ্বন্দ্ব চলেছে বহুকাল থেকে। রবীন্দ্রনাথ বস্তুতান্ত্রিক নন বলে তাঁর প্রতি কটাক্ষ করতেও অনেক সমালোচক কসুর করেন নি। এ দ্বন্দ্ব যে আজও মিটেছে তা নয়—বরং চারিদিক থেকে নানাভাবে সমালোচনা করে সবাই মিলে একটা ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করে তুলেছেন।

বস্তুতান্ত্রিকতা আমাদের দেশের কোন প্রাচীন কথা নয়—ইংরাজী realism শব্দ থেকেই এর উৎপত্তি। এক কথায় একে বলা চলে অনুকৃতি শিল্প। এদের মতে সমস্ত সৃষ্টিই হবে প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র যাকে দেখলেই চেনা যায়। কোন বস্তু বা প্রাণী বিশেষের হুবহু বাহ্যিক রূপটাকে ফোটানো—যথাদৃষ্ট বর্ণটি লেখাই হচ্ছে এদের উদ্দেশ্য। অনুভূতির কোন স্থান নেই এতে।

Idealistদের মতে অনুভূতি ছাড়া পৃথিবীতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। তাঁরা বলেন অনুভূতির সঙ্গে বস্তুর এমন একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে যে অনুভূতি ছাড়া বস্তুটি যে কি তা বল্‌বার কোন উপায় নেই। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ যা কিছু আমরা জানার বিষয় বলি সে সবই তো আমাদের অনুভূতির বিভিন্ন রূপ মাত্র। তা ছাড়া এ গুলির অস্তিত্ব বোঝবার উপায় কৈ? এদের মতে কোন কিছুরই একটা বিশিষ্ট যথাস্থিত রূপ নেই—সেটা নির্ভর করে—যে দেখে, যখন দেখে ও যেমন করে দেখে তার উপর। রূপে গন্ধে, সত্যে কল্পনায়, হাসি কান্নায় যা সত্য, তা ক্রমশঃ আপনার রূপ অভিব্যক্ত করছে। সে রূপ স্থির নয়, তা চঞ্চল। তারা বলেন লোকে যা দেখে, যা অনুভব করে সে সমস্তই তাদের কল্পনার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় পরিবর্ত্তিত হয়ে রূপ-রস-গন্ধে ভরে ওঠে।

যতই থিয়োরির জঞ্জাল থাক্ না কেন এ কথা সত্যিই যে সমস্ত শিল্পেরই একমাত্র উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। আর এই রস জিনিষটি হৃদয়ের অনুভবের বস্তু তাই কোন বস্তুর যথাদৃষ্ট রূপটি ফোটানোয় রস সৃষ্টি হতে পারেনা—কারণ এর সৃষ্টি প্রাণের অনুভবের আলোড়নে।

নিছক realism দিয়ে রসসৃষ্টি সম্ভব হয় না—কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে রস সৃষ্টিতে realism থাক্‌তে পারে না। প্রকৃতির অনুভূতির মধ্য দিয়ে যে অলৌকিক আনন্দরস শিল্পীর মনকে স্পর্শ করে সেইটিই শিল্পী বিলিয়ে দেন প্রাণের আবেগে। স্বভাবের যে রূপটি অজ্ঞ অনেকে দেখে তার সঙ্গে শিল্পীর সৃষ্টিতে বাহ্যতঃ কোন সাদৃশ্য না থাকলেও তাঁর অনুভূতির চমৎকারিত্ব স্পর্শ করে সকলের মনকে —সকলের সাম্‌নে খুলে ধরে এক নতুন দৃশ্য—শিল্পীর অনুভূতি দিয়ে তারা তখন একে অনুভব করে—আনন্দ পায়। সেই খানেই হয় যথার্থ রসসৃষ্টি, সেই খানেই শিল্পির স্বার্থকতা।

"গগনে অবঘন মেঘ দারুন
সঘন দামিনী ঝলকই
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগাই।"

আমরা বিদ্যাপতির এ গানে বাদলা রাতের যে রূপটি সবাই দেখি সেইটিই দেখতে পাই—ভাল লাগে, কিন্তু আরও ভাল লাগে এ দেখেই রবীন্দ্রনাথের মনে যে সুর জাগে তার অভিব্যক্তি!

"বাদল বাউল বাজায় রে একতারা,
সারা বেলা ধরে ঝরে ঝর ঝর ধারা।"

ঝর ঝর বৃষ্টির ধারা তার মনের বীণাকে বাজিয়ে তোলে—তার অনুভূতির সোনার কাঠির পরশে। মানব মনের ধরা ছোঁয়া যায় না এমন যে একটি অশরিরী আকিঞ্চন আছে তাকেই তিনি ফুটিয়ে তোলেন। আমরাও কবির অনুভূতির যথার্থ রূপটি দেখতে পেয়ে কান পেতে শুনি—শুনতে পাই 'বাদল বাউলে'র একতারার ঝঙ্কার।

এই যে বিষয়-বস্তুটি অতিক্রম করে একটা অপরিচিত দেশের সন্ধান দেবার শক্তি এইটিই শিল্পীর নিজস্ব। শিল্পী দর্শকের সঙ্গে সেই অপরিচিতার মিলন ঘটিয়ে দেন—যে তাকে নিয়ে যায় দূরে—বহুদূরে—প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই মৃদু হেসে কোন কথা না বলে শুধু অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখিয়ে দেয় ঊর্ম্মি মুখর সাগরের অচেনা অদেখা পারের দিকে 'দিক্ বধূ যথা ছল্‌ছল আঁখি অশ্রুজলে'।

চলচ্চিত্র শিল্পেরও এই idealism থেকেই জন্ম। চলচ্চিত্রে শিল্পীর বাদল বাউলের ঝঙ্কার কান পেতে কাউকে শুনতে হয় না অমনি এসে দর্শকের কানে পৌঁছায়। সমস্ত চিত্রখানি নিজের অনুভূতি দিয়ে তিনি রাঙিয়ে তোলেন—আর এর প্রতিটি রাগিনী দর্শকের মনোবীণায় ঝঙ্কার তোলে। সব চেয়ে বড় কাজ তাঁর দর্শকের মনে ভাবাবেগ জাগিয়ে তোলা। তাই তাঁর অনুভূতি সাধারণের চেয়ে পৃথক—তাঁকে সব কিছুই দেখতে হয় এমন দৃষ্টিতে যা দর্শকের মনে
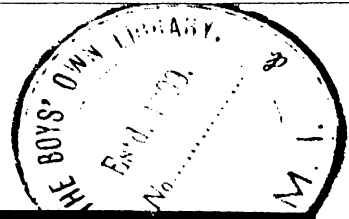
শ্রীভারতলক্ষ্মীর "আলিবাবা"-র একটি দৃশ্যে
হুসেন ও মর্জিনা। মর্জিনা সেজেছেন
শ্রীমতী সাধনা বসু।

ফুলশয্যার রাত্রি—মধুময় এই রাত্রি! জি-সি-টকীজের "ইন্দিরা"-র একটি দৃশ্যে জোৎস্না গুপ্তা ও বিনয় গোস্বামী। তড়িৎ বসু এই ছবির পরিচালক।

নববর্ষের

শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ !

দিনের পর দিন যায়—
কিন্তু

সোনার সংসার

আজও চলিতেছে অপ্রতিহতগতিতে

সোনার সংসার

হাসি ও অশ্রুর মনোরম চিত্র

সোনার সংসার

লক্ষ লক্ষ লোক কর্ত্তৃক প্রশংসিত

উত্তরা

চিত্রগৃহে সগৌরবে চলিতেছে

প্রত্যহ—৬৷০টা ও ৯৷৷০টায়

শনি, রবি ও ছুটীর দিন—৩টা, ৬৷০টা ও ৯৷৷০টায়

অগ্রিম টিকিট পাইবেন

নিজ গরিমায় উদ্ভাসিত
তাই

পণ্ডিত মশাই

সকল বাধা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে

পণ্ডিত মশাই

বাঙ্‌লা ও বাঙ্গালীর নিজস্ব চিত্র

পণ্ডিত মশাই

সমগ্র পরিবারের একমাত্র চিত্র

শ্রী

চিত্রগৃহে মহাসমারোহে চলিতেছে

প্রত্যহ—৬৷০টা ও ৯৷৷০টায়

শনি, রবি ও ছুটীর দিন ৩টা, ৬৷০টা ও ৯৷৷০টায়

অগ্রিম টিকিট পাইবেন

কল্পনা এনে দিতে পারে—ভাবাবেগগুলিকে প্রবাহমান করে।

চিত্রের নায়ক, জীবনটা তার মরুভূমি হয়ে উঠেছে—প্রতি দ্বার থেকে রিক্ত হাতে সে ফিরেছে দিনের পর দিন—। সমস্ত মানবকে সে দেখেছে তার নিজের অনুভূতি দিয়ে রাঙ্গিয়ে—আঘাত পেয়েছে প্রতিপদে। তাই ক্লান্ত দেহটাকে টেনে চলেছে সে কোন সুদূরের উদ্দেশ্যে। দূরে বহুদূরে সে শুনেছে সুদূরের ব্যাকুল বাঁশীর তান---তাই এ পথা চলা—পথ জানা নেই—অবসন্ন দেহ—তবু সে উদাসীর বিরাম নেই। থামলেই সুদূরের বাঁশী যায় থেমে—ভিড় করে আসে অতীতের দীর্ঘ হাহাকার—। তাই তাকে চলতে হয়।

হঠাৎ আসে আকাশ ঘিরে মেঘ---তারই কোলে কালো চুল এলিয়ে দিয়ে আসে বৃষ্টি ঝড়ো হাওয়ায় আঁচলখানি দুলিয়ে।

সেই ঘন মেঘের ছোঁয়া লাগে তার চোখে---প্রাণে—উল্লাসে তার প্রাণ নেচে ওঠে—বলে 'ওকে যে আমি চিনি'। পৃথিবী আজ নতুন রূপ নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায় কতকালের পরিচিতের মত—নদীর জলে কালো মেঘের ছায়া পড়ে—ঝড়ো হাওয়া নদীর বুকে তোলে ঢেউ। আর সেই চেনার আনন্দে প্রাণের মরুভূমির দুঃসহতা ভুলে সে খুলে দেয় ঘাটে বাঁধা নৌকা—বাঁধন হারা সে—।

পাড় থেকে শঙ্কাকুল নাবিকের দল চিৎকার করে ওঠে—'ওকি পাগল, এই ঝড়জলে'—আশঙ্কায় কথা তাদের শেষ হয়না।

কিন্তু পাগল সে তো নয়—সে যে প্রেমিক। ব্যর্থ প্রেম তার শতদিন পরে সফল হয়েছে—ওই বাদল তার প্রাণে এসে ধরা দিয়েছে আজ—তাকে ডাক দিয়েছে গানের সুরে সুরে। সে যে তার চির-পরিচিত।

সে তাই ওদের পিছু ডাকতে নিষেধ করে গেয়ে ওঠে—

"ওরা যে এই প্রাণের রনে মরুজয়ের সেনা—
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।"

সে তখন তার পরিচিতাকে ডেকে বলে—ঊর্দ্ধে তারই উদ্দেশ্যে দু'হাত বাড়িয়ে।

যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে।
সে কথা আজি যেন বলা যায়।

চিত্রশিল্পীর এই অনুভূতি মুহূর্ত্তের জন্যে হলেও দর্শকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় বৃষ্টির এই বিমোহিনী মূর্ত্তির সাথে—তাকেও যেন সে হাতছানি দিয়ে ডাকে—নায়কের সুরে সুর মিলিয়ে তারও গেয়ে উঠতে সাধ যায়—

যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়।

এই যে সমস্ত ঘটনা এড়িয়ে নতুন এক দৃশ্য চলচ্চিত্র-শিল্পী দর্শকের সামনে খুলে ধরেন—যেখানে বৃষ্টির বিমোহিনী রূপ সে নিজের চোখে দেখে মুগ্ধ হয়—তার সুর তার নিজের কানে শুনতে পায়—দেখে সর্ব্বরিক্ত নায়কের প্রাণের উল্লাস—দেখে তারা বাঁধনহারা প্রাণের দাসত্ব স্বীকার ঐ বৃষ্টির কাছে—দেখে নাবিকের আশঙ্কা—যার প্রাণে এ বৃষ্টির সুর ধরা পড়েনি—শোনে নায়কের আখ্যান—শোনে তার গান—তার সাথে গেয়ে ওঠে আর ভাবে, ঐ যে আনন্দলোক—ওর দেখা যদি আমি পেতাম—যদি ওকেই আপনার বলে চিনে নিতে পারতাম—না চিনিয়ে দিলেও—এত প্রাঞ্জল প্রকাশ ভঙ্গী শুধু সম্ভব

হয় চলচ্চিত্রে সমস্ত শিল্পকলার সঙ্গমে এর জন্ম বলে।

তাই idealistদের সব চেয়ে বড় কর্ম্মক্ষেত্র আজ চলচ্চিত্রে—এর সুষ্ঠু ও সরল প্রকাশভঙ্গীর জন্যে। তাই শিল্প জগতের এই নবজাত শিশুটি অগ্রজদের বর্ত্তমানেই নিজের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পেরেছে—সকল শিল্প-কুশলীর দৃষ্টি পড়েছে তার দিকে।

——:×:——

নরমার ভবিষ্যৎ

শ্রীসমীরণ সেন

নরমা শিয়ারার আর ছবিতে নামবে না।

এমন কথা আমি বলেছিলাম আগে; বলছি আজও। বলেছিলাম সেদিন এজন্যে নয় যে সেটাই ছিল আমার মনগড়া ধারণা কিম্বা মনের ঘরে হিসেবের অনুমান; কিম্বা কারোর কারোর মতে publicity stunt. কথাগুলো বলেছিল নরমা নিজে, তার বহু নিকটতম অন্তরের বন্ধুদের কাছে, যারা নরমার স্বামী আরভিং থ্যালবার্গের মৃত্যুর পর বহুবার তাকে সান্ত্বনার স্তোকবাক্য শোনাতে গিয়েছিল। গত ছ'মাস ধরে নরমা নিজেকে দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নানানভাবে ভেবেছে। কোন পথ পায় নি। তাই, তাই তার সঠিক সোজা উত্তর সে ঠিক করেছে। বোধ হয় তার চরম সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হয়েছে। তাই শেষ কথা—'রোমিও জুলিয়েট' নরমার অমর কীর্ত্তি;—ক্যানাডার ছোট্ট মেয়েটির, হলিউডের অন্যতম শ্রেষ্ঠা সিনেমা সাম্রাজ্ঞীর গৌরবময় অবদান যুগযুগান্তরের অক্ষয়-সৌরভ নিয়ে এই নবতম বিজয় অভিযানটিকে উজ্জ্বল এবং স্বর্গীয় করে রাখুক।

অনেক লোক বলে, নরমা ফিরে আসবে, আবার তার সিনেমা-ফ্যানদের সন্তুষ্ট করতে মুখে পাউডার দেবে, ঠোঁটে লিপষ্টিক দেবে, রূপোলী পর্দ্দায় প্রতিমা হয়ে আবার রূপায়িত হবে। কথাটা অত্যন্ত বাজে। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে, স্বামীর শোক ভুলে যেতে নরমা ভারী কাজে মন দেবে না, দেবে না। হাজার হাজার বাতির আলো ওর দেহের দৃশ্য হতে ঠিকরে প্রতিবিম্বিত হয়ে ক্যামেরার মণিমুকুরে ধরা দেবে না। "প্রাইড এ্যাণ্ড প্রেজুডিস" এবং "মেরী এ্যানটয়-নেট"-এর কাগজ পত্র আবার উঠবে ষ্টুডিওর অফিসের লোহার আলমারীতে। এ বছরের শোক—চিরদিনের শোক—গীর্জ্জার ঘণ্টার মত বাজবে ওর বুকে দিনে ও দিনে। সত্যি! সত্যি! সত্যি কথা! নরমা বিদায় নিলে পর্দ্দার অদৃশ্য দায় হতে।

সে এক আশ্চর্য্য রকমের অবিশ্বাস্যের গল্প—অপরূপ পূর্ব্বানুভূতি—অদ্ভুত পূর্ব্বাবরোধ যা একদিন এক নারীর মানসিক অন্তঃদৃশ্যে ধরা দিলে, এবং যা—নিষ্ঠুর সত্যে পরিণত হোল! যে নারীর এ সত্য বোধ হোল সে হারালে—হারালে তার অতি প্রিয়তম আস্পদটিকে। করুণ ট্রাজেডী এমনি করেই জানিয়েছিল, তার আসার বহুদিন আগেই।

এ ব্যাপার সেদিন থেকেই ঘটেছিল যেদিন নরমার অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার স্বামী থ্যালবার্গ সেক্সপীয়রের অমর বিরহের অমূল্য নাটকে নামবার জন্যে ওকেই মনোনীত করে। ওই সময়ে সেক্সপীয়রের আর এক-খানি কম মর্ম্মপীড়াদায়ক বিয়োগান্ত নাটক তোলবার কথা হোয়েছিল। নরমা সেই-

নরমা শিয়ারার

খানাই পছন্দ করেছিল। সেদিন ওকে পরীক্ষা করার জন্যে যখন 'ব্যালকনি'র দৃশ্যটি অভিনয় করতে বলা হোল, ও অভিনয় করলে,—সে অভিনয় নয়, ওর অনভিপ্সু অন্তরের অবর্ণনীয় আর্ত্তনাদ। দর্শকেরা তারিফ করে বল্লে 'নরমা তোমাকেই নামতে হবে।' সেদিন তারা জানেনি ওর অন্তর কেন অমন করে আর্ত্তনাদ করে উঠেছিল। থ্যালবার্গের দৃঢ় পণ, অনুপম অনুনয় নরমাকে জয় করলে। এ যে তার প্রিয়তমের কথা, তাই পারেনি নরমা থামাতে। আর থ্যালবার্গ? থ্যালবার্গ ভেবেছিল বুঝি লজ্জা-শীলা নরমা জগতের শ্রেষ্ঠতম অভিনেত্রীদের সঙ্গে পা ফেলে নারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ করুণ বিচ্ছেদের চরিত্র-রূপকে রূপোলী পর্দ্দায় রূপায়িত করতে পারবে কিনা তাই ভেবে সন্দিহান হয়েছে। সে তো জানতো না—এ ভয়, কিসের ভয়।

নরমার কথা কেউ জানতে পারলে না। সে তো কারুকে জানায় নি, শুধু নিজের অন্তর দিয়েই বোঝবার চেষ্টা করেছিল।

একদিন বাধামুক্ত হোল ; মনে মনে একদিন বল্লে : সমস্ত মিথ্যা, ভুয়ো, ভিত্তিহীন—বৃথা আশঙ্কা ! ছবি যখন মেল্ ট্রেণের গতি নিয়ে এগোতে সুরু করলে, সবাই একবাক্যে বল্লে, নরমার কাজ হচ্ছে সুন্দরতম। তার বেদনা কিছুকালের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ল। এই ভাবে ওই আড়ম্বরপূর্ণ ছবিখানি গড়ে উঠল। আর ছবিখানি শেষ হবার আগে থেকেই পরিচালক জর্জ্জ কুকর থেকে আরম্ভ করে সামান্য প্রপার্টি বয়েজরা পর্য্যন্ত জেনেছিল যে ছবিখানি চলচ্চিত্রের ভাগ্যবিপর্য্যয় আনবে। আরভিং থ্যালবার্গ আনন্দে আত্মহারা। থ্যালবার্গের আনন্দেই নরমার আনন্দ। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায় ছবি উঠতে থাকে পূর্ণাঙ্গ হবার পথে দিনের পর দিন। এমনি কাটে আনন্দে দিন। দিন এলো।

একটি মাত্র দৃশ্য বাকি তা হচ্ছে বিষ খাওয়ার দৃশ্য। গল্পের মর্ম্মপীড়ক নাটকীয়তা চরম পথে উঠেছে এইখানে।

সেদিন সেট থেকে সকলকে যেতে বলা হয়েছিল। নরমা, কুকর আর থ্যালবার্গ তিনজনেই জানত এইটেই হচ্ছে শেষ গ্রহণ। এ দৃশ্য পুনরায় আর তোলবার দরকার হবে না। এই সেই দৃশ্য, যে দৃশ্য নরমাকে জুলিয়েট অভিনেত্রীদের শ্রেষ্ঠতম আসনে বসিয়েছে। চারিদিকে স্তব্ধতা—সারা ষ্টেজের ওপর পাথরের নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝি একটি নিশ্বাসের করুণ স্পন্দনও লোকের কানে বাজে। মহলা শেষ হয়ে গেল। নরমা বলতে আরম্ভ করলে, কোন এক বালিকার ভয়ের, আশঙ্কার, আগামী মৃত্যুর মানসিক আর্ত্তনাদের অমর লিপিগুলি।...জল—জল-সকলের চোখে শুধু বারি বিন্দু।

আরভিং থ্যালবার্গের স্মৃতি চোখের সামনে রেখে ও জীবন কাটাবে। এবং তার প্রচুর অর্থ নানানভাবে নানান উপায়ে খাটাবে।

আজকে নরমার পর্দ্দায় ফিরে আসার

ও-বছর ও এ-বছর

[বিলাসী]

দেখতে দেখতে বাঙ্লা ফিল্ম-শিল্পের বয়স আর এক বছর বাড়ল।

শৈশবত্বের গণ্ডী পেরিয়ে তার যৌবন আজ জোয়ারের জলের মত কানায় কানায়। রূপ, রস ও গন্ধে সে আজ সঞ্জীবিত। তার এই ভরা-যৌবনের জৌলুসে চিত্ররাজ্যের বাসিন্দারা আজ তাকে পূজো কোরছে—তার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে।

আজ ছত্রিশ সালের শেষ দিন। কাল্কের তরুণ-অরুণোদ্ভাসিত আলোকের দীপালোকে বাঙলা ফিল্ম-শিল্পের নব-যাত্রা সুরু হবে।......অন্যান্য বছরকে দূরে যেলে এ বছর আরও এগিয়ে চলুক, বাঙলা শিল্পের জন্মদিনে এই আমাদের একমাত্র শুভেচ্ছা।

উনিশ'শ পঁয়ত্রিশ সালে মোটমাট পূর্ণ দৈর্ঘ্য ১৯ খানা, ২ রীলের দশখানা, ১ রীলের দশখানা, টপিকালে দু'খানা ছবি উঠেছে। সংখ্যার দিক থেকে গেল বছরের চেয়ে আলোচ্য বছরে একখানা ছবি বেশী উঠেছে সত্য—কিন্তু গেল বছর আমরা যে 'কোয়ালিটীর' ছবি পেয়েছি—এ বছরে কোন ছবিই সে 'কোয়ালিটীর' হ'তে পারে নি। গেল বছরের "দেবদাস" ও "ভাগ্যচক্রে"-র গুণের সঙ্গে এ বছরের কোন ছবিরই তুলনা হয় না। এ বছরের নাম-করার মত ছবি হ'য়েছে "গৃহদাহ" "সোনার সংসার," "মায়া," "কালপরিণয়," "বিজয়া," "পরপারে" ও "পণ্ডিত মশাই"। এ বছরে যতগুলি ছবি উঠেছে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল।
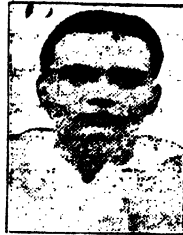
নিখিল ভারতে বাঙালী চিত্র শিল্পের প্রবর্ত্তক শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সরকার

নিউ থিয়েটার্স

গৃহদাহ—(পরিচালক-প্রমথেশ বড়ুয়া। (শ্রেষ্ঠাংশে—যমুনা বড়ুয়া, অমর,)

বিজয়া—(পরিচালক—দীনেশ দাশ। শ্রেষ্ঠাংশে :—চন্দ্রাবতী ও পাহাড়ী)।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র, নিউ থিয়েটার্স বি-ইউনিট।

মন্দ কী—(১ রীল। পরিচালক—অমর মল্লিক। শ্রেষ্ঠাংশে :—প্রতাপ),

মায়া—(পরিচালক—প্রমথেশ বড়ুয়া ; শ্রেষ্ঠাংশে :—পাহাড়ী ও যমুনা)।

কোন আশা নেই, তবে কোন দিন যদি অন্তর দিয়ে অনুভব করে যে—মারভিং-এর সাধ ছিল ছবি তৈরী করা, নরমার ছবিতে নামা ; তার সে সাধ পূর্ণ করতে আবার যদি ছায়া মায়া অঞ্জন সে চোখে দেয় তবেই উৎসুক—চিত্ররস পিপাসুরা আবার নরমাকে পর্দায় দেখতে পাবে। এই হচ্ছে উত্তর।

নিউ থিয়েটার্সের আগামী চিত্র "দিদি"র দু'টি বিশেষ ভূমিকায় চন্দ্রাবতী ও লীলা দেশাই

কমলেশকুমারী

শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলী, সত্বাধিকারী কালী ফিল্মস্

কালী ফিল্মস্‌ের "টকী অফ্ টকীজে"র একটি দৃশ্যে শিশির কুমার ভাদুড়ী ছাত্রদের বক্তৃতা দিচ্ছেন

কালী ফিল্মস্

কাল পরিণয়—(পরিচালক—প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। শ্রেষ্ঠাংশে—জহর, মায়া, রাণী)
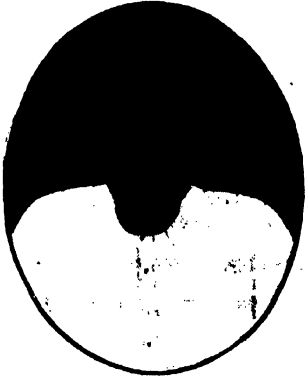
অন্নপূর্ণার মন্দির—(পরিচালক—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী। শ্রেষ্ঠাংশে—ছবি বিশ্বাস ও মায়া)।

ভোট-ভণ্ডুল—(৩ রীল। পরিচালক—জ্যোতিষ মুখার্জ্জি। শ্রেষ্ঠাংশে—শৈলেন ও ফুল্লনলিনী), সঙ্গীত চিত্র ১ খানা, টপিক্যাল ৩ খানা (ফুটবল খেলা চায়না বনাম ইণ্ডিয়া, চায়না বনাম অবশিষ্ট ও বড়লাটের কোলকাতায় আগমন*)

রাধা ফিল্মস্

কৃষ্ণ-সুদামা—(পরিচালক—ফণি বর্ম্মা। শ্রেষ্ঠাংশে—কানন, অহীন ও ধীরাজ)

ঝিনঝিনিয়ার জের—(২ রীল। পরিচালক—ফণি বর্ম্মা। শ্রেষ্ঠাংশে—কুমার মিত্র)।

বিষবৃক্ষ—(পরিচালক—ফণি বর্ম্মা। শ্রেষ্ঠাংশে—কানন, শান্তি ও জহর)।

কীর্ত্তিমান—(১ রীল। পরিচালক—অখিল নিয়োগী। শ্রেষ্ঠাংশে—অজিত চট্টো ও লক্ষ্মী)।

---

* নিউ এম্পায়ারে এই টপিক্যাল দেখানো হ'চ্ছে। এই ছবিবিষয়ে এর পূর্ব্বে কোনও দেশী ছবি দেখানো হয় নি।

মিঃ বি, এল, খেম্‌কা সত্বাধিকারী, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মস্।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া

পথের শেষে—(পরিচালক—জ্যোতিষ মুখার্জ্জি। শ্রেষ্ঠাংশে—জ্যোৎস্না ও জহর)।

সোনার সংসার—(পরিচালক—দেবকী বসু। শ্রেষ্ঠাংশে—জীবন, ধীরাজ, অহীন্দ্র, ছায়া, মেনকা)।

শ্রীমনোরঞ্জন ঘোষ ম্যাঃ ডিঃ 'রূপবাণী'

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

বাঙ্গালী—(পরিচালক—চারু রায়। শ্রেষ্ঠাংশে—মীরা, ধীরাজ, মনোরঞ্জন)।

দেবতায় রগড়—(২ রীল। পরিচালক—চারু রায়। শ্রেষ্ঠাংশে—উষা ও কৃষ্ণ মুখার্জ্জি)।

একটি কথা—(৩ রীল। পরি-

চালক—তুলসী লাহিড়ী। শ্রেষ্ঠাংশে—তুলসী লাহিড়ী)।

পপুলার পিক্‌চার্স

আভর্জ্জন—(পরিচালক—সতু সেন। শ্রেষ্ঠাংশে—লীলা ও সুপ্রসন্ন)।

হ্যাপী ক্লাব—(৩ রীল। পরিচালক—তুলসী লাহিড়ী। শ্রেষ্ঠাংশে—তুলসী)।

কুহু-কেকা—(পরিচালক—চারু রায়। সঙ্গীত-চিত্র (১ খানা)।

পণ্ডিত মশাই—(পরিচালক—সতু সেন। শ্রেষ্ঠাংশে:—রতীন বন্দ্যো, শান্তি গুপ্তা, রবি রায়)।

ডি, জি, টকীজ

দ্বীপান্তর—(পরিচালক—ধীরেন গাঙ্গুলী। শ্রেষ্ঠাংশে—উষা ও মোহন)।

শ্যামসুন্দর—(২ রীল। পরিচালক—হেম গুপ্ত। শ্রেষ্ঠাংশে—বাণীবাবু)।

শ্রীদেবদত্ত শীল সত্বাধিকারী, দেবদত্ত ফিল্মস্

দেবদত্ত ফিল্মস্

রজনী—(পরিচালক—জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জি শ্রেষ্ঠাংশে—অহীন ও চারু)। সঙ্গীত-চিত্র (১ খানা)

চন্দ্র ফিল্মস্

পরপারে—(পরিচালক—যতীন দাস, শ্রেষ্ঠাংশে—জ্যোৎস্না, অহীন ও দুর্গাদাস)

শ্রীযামিনী কুমার মিত্র সত্বাধিকারী, ফার্ষ্ট ন্যাশন্যাল পিক্‌চার্স

ফার্ষ্ট ন্যাশন্যাল পিক্‌চার্স

সরলা—(পরিচালক—চারু রায়। শ্রেষ্ঠাংশে—সরলা ও তারা ভট্টাচার্য্য) সঙ্গীত-চিত্র (১ খানা)

রীতেন এণ্ড কোং

তরুবালা—(পরিচালক: সুশীল মজুমদার। শ্রেষ্ঠাংশে—জ্যোৎস্না ও জহর)। সঙ্গীত-চিত্র (১ খানা)

কোয়ালিটি পিক্‌চার্স

ব্যথার দান—(পরিচালক—হেম গুপ্ত। শ্রেষ্ঠাংশে—ইলা ও হেম)।

জোয়ার ভাঁটা—(২ রীল। পরিচালক—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য। শ্রেষ্ঠাংশে—লীনা ও বিনয় মুখুয্যে)।

মহানিশা ফিল্মস্

মহানিশা—(পরিচালক—নরেশ মিত্র শ্রেষ্ঠাংশে—জহর ও চারু)।

বড়ুয়া পিক্‌চার্স

শিবরাত্রি—(শ্রেষ্ঠাংশে—রেণুকা)।

পরিচালনায় আলোচ্য বছরে যথাক্রমে উল্লেখযোগ্য প্রমথেশ বড়ুয়া (গৃহদাহ ও মায়া), দেবকী বসু (সোনার সংসার), যতীন দাস (পরপারে), সতু সেন (পণ্ডিত মশাই)

আলোক-চিত্রে বিমল রায় (মায়া), শৈলেন বসু (সোনার সংসার,) সুরেশ দাস (পণ্ডিত মশাই), প্রবোধ দাস (পরপারে)

শব্দযন্ত্রে মধু শীল (কাল পরিণয়) মুকুল বসু (গৃহদাহ)।

সঙ্গীত পরিচালনায় রাই বড়াল (গৃহদাহ ও মায়া), তিমিরবরণ (বিজয়া) কৃষ্ণচন্দ্র দে (সোনার সংসার), কমল দাশগুপ্ত (পণ্ডিত মশাই), নিতাই মতিলাল (কুহু-কেকা)।

কারু-শিল্পে অনাথ মৈত্র (মায়া), বটুবাবু (সোনার সংসার) পরেশ বসু (কাল পরিণয়)।

অভিনয়ে পাহাড়ী (মায়া ও বিজয়া), অমর (গৃহদাহ, বিজয়া) দুর্গাদাস (পরপারে), অহীন্দ্র (সোনার সংসার) চন্দ্রাবতী (বিজয়া) মলিনা (গৃহদাহ), মেনকা (সোনার সংসার), শান্তি (পণ্ডিত মশাই) রবি রায় (পণ্ডিত মশাই) মনোরঞ্জন (বাঙ্গালী), রাণীবালা (কাল-পরিণয়)।

এই গেল গত বছরের হিসেব নিকেশ। আগামী বছরে যে চিত্র-শিল্প অগ্রগতি পথে আরও এগিয়ে যাবে তার আভাষ এখন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে—কালী ফিল্মসের "টকী অফ্ টকীজ" হবে নতুন ধরণের ছবি। এই ছবির সবচেয়ে বিশেষত্ব শিশিরকুমার যে ভূমিকায় নামছেন সে চরিত্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক সাদৃশ্য আছে। নিউ থিয়েটার্সের "দিদি" নতুন ধরণের গল্প আর এতে অভিনয় কোরছেন দুই বিদুষী মহিলা—সর্ব্বোপরি এর পরিচালনা কোরছেন নীতীন বসু। শ্রীভারতলক্ষ্মীর "আলিবাবা"—ভদ্র নরনারী-অভিনীত চিত্র। সুতরাং নতুনত্বের দিক থেকে এই তিনখানা ছবির যা' পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা'তে ১৯৩৭ সালে সকলেরই চেষ্টা চলছে নতুন কিছু করবার জন্যে।

মান্দালয় জেলে রাজবন্দীদের দুর্গাপূজা

১৯২৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর মান্দালয় জেলে
শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, জ্যোতিষ ঘোষ,
জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়, মদন ভৌমিক, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত দুর্গা প্রতিমা

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সৌজন্যে।

শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪২

খেয়ালী
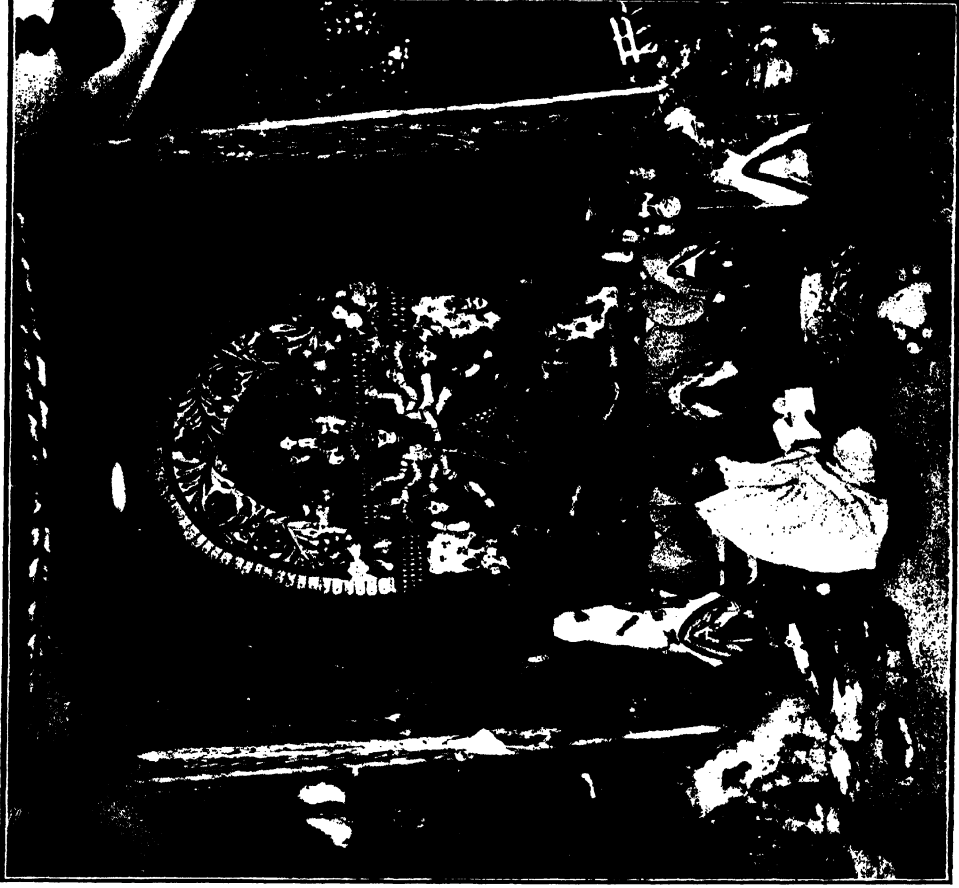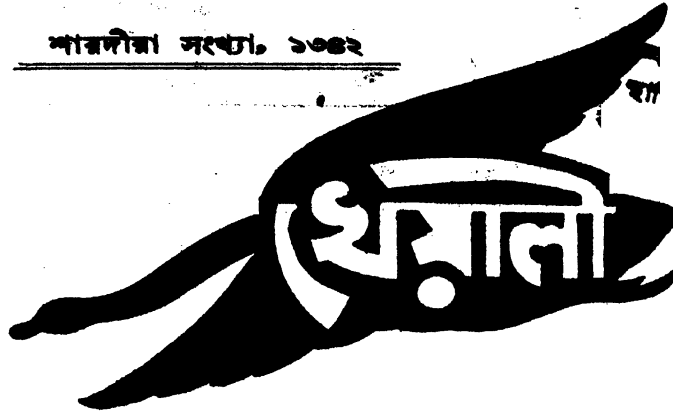
পরিচালক—ন্যাশন্যাল নিউজপেপার্স লিমিটেড্

মূল্য—চার আনা
Price -/4/-

সম্পাদক—শ্রীঅনিল চন্দ্র রায়

মফঃস্বলে—পাঁচ আনা
Mofussil -/5/-

বইয়ের দুঃখ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

স্বনামধন্য নভেলিষ্ট শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কোন্নগরে উপস্থিত হয়ে একটি সভায় বইয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং সে দুঃখ 'বিচিত্রা'র বুকে প্রকাশিত হয়েছে।

এ দুঃখ অবশ্য বইয়ের ব্যবসার দুর্গতির জন্য দুঃখ। এ দুঃখ আমাদের আর পাঁচ রকম দুঃখের মধ্যে একটি সনাতন দুঃখ।

আজ থেকে প্রায় বাইশ তেইশ বৎসর পূর্ব্বে বীরবল 'বইয়ের-ব্যবসা' নামক একটি নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ লেখেন, তাতে তিনি এই দুঃখের কথাই বলেন। কিন্তু সে কথায় বোধহয় কেউ কর্ণপাত করেননি ; কারণ— বীরবল সাশ্রুনয়নে বাহাজ করেননি, করেছিলেন সহাস্যমুখে।

যদিচ সে প্রবন্ধে তিনি পুস্তক বিক্রেতাদের, ধনী ব্যক্তিদের, এমন কি পুস্তক-রচয়িতাদেরও কিছু কিছু সুপরামর্শ দিয়েছিলেন,—কিন্তু তাঁর কথা বোধহয় সকলে রসিকতা জ্ঞানে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বীরবল এখন হয়ত বুঝেছেন যে, রসিকতা কাজের কথা নয় এবং সেই কারণে তাঁর কলম গুটিয়েছেন। এ যুগে অবশ্য কাজের কথা বলার ঢের লোক আছে, আর সে কথা বহু লোক বলছেন ইংরাজী ভাষায়। যদিচ তাতে কোন কাজই বিশেষ অগ্রসর হচ্ছে না—তবু কাজের কথাই যে একমাত্র কথা, এ ধারণা বহু লোকের মনে জন্মেছে। কাজের দিক দিয়ে দেখতে হলে সাহিত্য নামক বস্তুটি যে বাজে কথা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং এ যুগে যে সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হবে—সে আশা বৃথা।

বাজারে যে বই কাটে না, তার জন্য হা-হুতাশ করে কোনও ফল নেই। আমরা সাহিত্যিকেরা বইয়ের ব্যবসার দুরবস্থার কোনও প্রতিকার করতে পারি কিনা—সেইটেই বিবেচ্য। আমার বিশ্বাস, দেশের লোককে দেদার বই কেনানো আমাদের পক্ষে অসাধ্য। বিলেতে যে বাংলার চাইতে বই বেশি কাটে সে কি সাহিত্যিকদের লেখার গুণে বা তাঁদের বক্তৃতার জোরে? মোটেই নয়। ইউরোপ ও আমেরিকার জনকতক ক্ষণজন্মা সাহিত্যিককে বাদ দিলে, সে দেশেও সাধারণ সাহিত্যিকদের আর্থিক অবস্থা আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের চেয়ে ভাল নয়। সে যাই হোক, বিলেতের সঙ্গে বাংলার তুলনা করা বৃথা, কারণ বাংলা যে বিলেত নয় সে কথা ত সকলেই জানেন। আর যদি কেউ না জানেন ত তাঁকে এই স্পষ্ট সত্যটা জানানো অসম্ভব।

একবার বাঙলার দিকে তাকালে দেখা যায় যে, এই বিংশ শতাব্দীতে উনবিংশ শতাব্দীর চাইতে বইয়ের কেনা-বেচা ঢের বেড়ে গিয়েছে। গত শতাব্দীতে বঙ্কিমের নভেলই কি সংস্করণের পর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে? অথচ সেকালে বঙ্কিমই ছিলেন অদ্বিতীয় নভেলিষ্ট। আর এ যুগে আমাদের মত খুদে সাহিত্যিকেরও বই তিন বৎসরে তিনশ খানা বিক্রী হয়।

এই প্রমাণ—যে বইয়ের ব্যবসায় উন্নতি হয়েছে। শুধু, যে পর্য্যন্ত উন্নতি আমরা চাই ততদূর হয়নি। আর বহুকাল ধরে হবেও না। কারণ সংসারের নিয়মই এই যে বহু লোকের ক্ষুধার অনুরূপ খোরাক জোটে না ; তা আমরা বই-ই লিখি আর পাটই বুনি। এ গরমিলের সমস্যার যদি কেউ সমাধান করতে পারেন তাঁকে আমরা বলি Politician ; সাহিত্যিক নয়। বইয়ের ব্যবসা না চললে, সাহিত্যের যে শ্রীবৃদ্ধি হবে তা অবশ্য নয়।

পৃথিবীতে যে সব অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানকে Spiritual Institution বলে যথা: বিদ্যালয়, মঠ, মন্দির, আশ্রম ইত্যাদি; সে সকলেরই একটি—economic basis থাকা চাই। আর সাহিত্যের সৃষ্টি না হোক, স্থিতি নির্ভর করে বইয়ের ব্যবসার উপর। সুতরাং বইয়ের ব্যবসা সম্বন্ধে কোন সাহিত্যিকই উদাসীন হতে পারেন না। অথচ এ ব্যবসা জাঁকিয়ে তোলা সাহিত্যিকদের কর্ম্ম নয়।

এখন বইকে কেনাবেচার মাল হিসেবেই দেখা যাক। তাহলে দেখা যায় এ ব্যবসায় তিনটি পক্ষ আছে। প্রথম (producer) সাহিত্যিক, দ্বিতীয় (distributor) প্রকাশক, তৃতীয় (consumer) পাঠক। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যিক একমাত্র Critic হিসেবে এ ব্যবসার কিছু সাহায্য করতে পারেন,—অবশ্য সে Criticism যদি advertisementএর বেনামদার হয়। পাঠকসংখ্যা কি করে বাড়ান যায়? বইয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে? Demandএর চাইতে Supplyএর পরিমাণ যদি অত্যধিক হয় তাঁহলে কি কোন ব্যবসারই কপাল ফেরে, না কপাল ভাঙ্গে। বর্ত্তমান economic দুর্দ্দশার ত শুনতে পাই অতিরিক্ত production একটি প্রধান কারণ। আর, যে-দেশে শতকরা নব্বই জন লোক নিরক্ষর, সে দেশে বইয়ের চাহিদা কি করে বাড়ান যায় তা আমার অবিদিত।

তারপর আসে প্রকাশক—যিনি হচ্ছেন খাঁটি ব্যবসাদার। প্রকাশকরা আর কিছু করুন আর না করুন বইয়ের চেহারা বদলে দিয়েছেন। ছাপা ছবি মলাটে একালের বইয়ের সঙ্গে—বঙ্কিমী যুগের বইয়ের কি কোনও তুলনা হয়? এসবই ব্যয়সাপেক্ষ আর অনেক স্থলে সে ব্যয়ভার প্রকাশককেই বহন করতে হয়। সুতরাং নূতন বই ছাপ্‌তে প্রকাশকরা যে ইতস্তত: করেন, তার কারণ, না করে তাঁদের উপায় নেই। প্রকাশকরা কি সব রকফেলার ও ফোর্ডের দল? আমার বিশ্বাস তাঁরাও অনেকে সাহিত্যিকদের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত। সুতরাং বই যে বিক্রী হয় না তার জন্য দোষ কাকে দেব? দোষ দিতে পারি শুধু আমাদের অ-বিদ্যার।

পাঁকু

(নক্সা)

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মল্লিক

পঙ্কজ সেন এম্-এ, পি-এইচ্-ডি (লণ্ডন)। এ নামেরও বিবাহের বাজারে আর তেমন মর্য্যাদা নাই। কারণ, মেয়েরাও গ্রাজুয়েট হইতেছে দলে দলে, আর লণ্ডনের পি-এইচ-ডিও বাসা বাঁধিয়াছে কলিকাতার অলিতে গলিতে। হ্যাঁ, আই-সি-এস্ হইলে একটা কথা ছিল—তরুণ সিভিলিয়ান-ই এখন বাঙ্গালা মেয়ের কাছে আদর্শব্যক্তির 'টাইপ'। অতএব সুরমা গুপ্তা পঙ্কজের প্রেম স্রেফ প্রত্যাখ্যান করিয়া বসিল।

পঙ্কজ চেয়ারে বসিয়া কিছুক্ষণ ভাবিল। তারপর উঠিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইল। কালো হৃষ্টপুষ্ট পেশীবহুল দীর্ঘ দেহ, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত। কোন প্রকার নৈতিক পঙ্কে জন্ম হইয়াছে বলিয়াই তাহার নাম পঙ্কজ নয়। বড় ভাই 'শঙ্কর'-এর সঙ্গে নেহাৎ মিলাইতে না পারিয়া কোন রসিক মাতুল তাহার নামটি বাছিয়াছিলেন এই ভাবিয়া যে, অন্ততঃ শঙ্কে পঙ্কে ত বেশ মিলিয়া গেল; আর 'কঙ্কর' শব্দে মিল থাকিলেও কেমন যেন খোঁচা থাকিয়া যায়। বৈদ্যের অম্বষ্ঠ অখ্যাতি ছাড়া তাহার জাতে কোন কলঙ্ক নাই, তথাপি সুরমা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। আশ্চর্য্য!
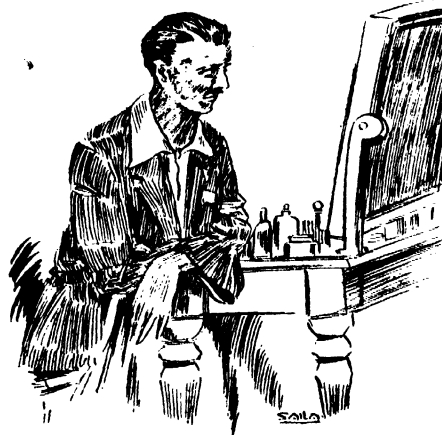
পঙ্কজ আয়নায় নিজের মুখ দেখিতে লাগিল

পঙ্কজ আয়নায় নিজের মুখ দেখিতে লাগিল। আঙ্গুলের পাবে গণিয়া নিজের বয়সটা একবার হিসাব করিয়া লইল। বয়স তাহার বেশী নয়। মানুষের যে বড় হওয়ার সহজ প্রবৃত্তি আছে তাহারি প্রেরণায় সে নিজেকে চিরকালই বড় ভাবিয়া আসিয়াছে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সে একবার 'নাবালক' (আণ্ডার-এজ) হইয়াছিল। কিন্তু দরখাস্ত করিয়াছিল যে ষোড়শ বসন্তের যৌবন-শিহরণ তাহার দেহে বহুপূর্ব্বেই কণ্টকিত হইয়াছে, অতএব পরীক্ষা দিবার অধিকার তাহার আছে। দৈবক্রমে যখন জানাজানি হইয়া গেল তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতাই ঐ বৎসর বয়ঃস্বল্পতায় পরীক্ষা দিতে পায় নাই, তখনও সে নিজেকেই বড় ভাই

প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস করিয়াছিল কি না, ঠিক জানা যায় না।

কিন্তু আজ পঙ্কজ সেন ভাবিল, সে বড় ভুল করিয়াছে!

কে জানে হয়ত সুরমা গুপ্তা সঠিক অনুমান করিতে পারে নাই যে, তাহার বয়স মাত্র তেত্রিশ; হয়ত ভাবিয়াছে উনচল্লিশ। তাই জীবন সম্ভোগের দিবস-গুলি দেখিতে দেখিতেই অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িবে আশঙ্কায় সুরমা তরুণতরের প্রতি অপাঙ্গে চাহিয়াছে।

কিন্তু এ কথা সত্য যে পঙ্কজই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণতম 'ডক্টর', মাত্র চব্বিশ বছর বয়সেই সে ঐ উপাধির পুচ্ছ লইয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। তারপর নয় বছর কাটিয়াছে ভাগ্যান্বেষণে। হ্যাঁ, সে অনেক কথা......

অর্থশাস্ত্রে এম্‌-এ পাশ করিয়াই সে এক দূর-সম্পর্কীয়া বিধবা পাতানো পিসির কিঞ্চিৎ অর্থ আত্মসাৎ করিল। প্রতিদানে পিসীর বিধবা কন্যা অমলাকে দিল শুধু একটি অসামাজিক গুপ্ত চুম্বন। তারপর বিলাতের জাহাজে। লণ্ডনে পৌঁছিয়াই সে যে থীসিস্‌ খানি লিখিল তাহার বিষয়বস্তু 'ভারতীয় রেলপথ'। এ বিষয়ে গবেষকদের সে অগ্রদূত; এবং বিষয়ের অভিনবত্বেই যে প্রবন্ধের সম্মান বাড়িয়া ওঠে এ সত্য সে অনেক পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়াছিল।

আরও অনেক বিষয়েই ত থীসিস্‌ লেখা চলিত। যেমন—ভারতীয় পরিবারে ভ্রাতৃবিরোধ ও তাহার জাতীয় পরিণাম; ভারতীয় ইন্সিওরেন্সে ল্যাপ্‌স্‌ড পলিসি; সিন্দুরের ইতিহাস ও মর্য্যাদা; ভারতীয় বাজারে জাল-মুদ্রা; ভারতীয় আদালতে সাক্ষ্য ও সাক্ষী; গ্রামের ডাকাতি ও স্থানীয় বাজারদরে তাহার প্রভাব, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল বিষয়ে মৌলিক গবেষণার আদর হইবে এরূপ শিক্ষার স্তরে ভারতবাসী এখনো উঠিতে পারে নাই।

অতএব 'ভারতীয় রেলপথ' পঙ্কজ সেনের অর্থনীতি-সাহিত্যে একটি উপাদেয় অবদান। তাহার মূল তত্ত্ব এই যে ভারতে বর্ত্তমানে যে রেলপথ-কার্য্য চলিতেছে তাহা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, এই দরিদ্র দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত ভারতবর্ষ; এখানে চারিদিক ঘেরা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী একেবারে অনাবশ্যক। দেশের জলবায়ু ও আরোহীগণের জীবনাভ্যাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে হইলে চাই চারিদিক খোলা গাড়ী, একেবারে বঙ্গপল্লীর ঢেঁকি-শালের একচালার মতো। মাথার উপরে চাল থাকিবে, আর চারি কোণে চারটি থাম। বৃষ্টির দিনে খানিকটা রবাররুথের পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দিলেই চলে। বেঞ্চের কোন দরকার নাই; কারণ সাধারণ লোক বেঞ্চে বসিতে অভ্যস্ত নয়। মেঝের উপরেই তাহারা মাদুর পাতিয়া স্বচ্ছন্দে বসিতে পারিবে। আর, জল ও জলীয় দ্রব্যাদি ফেলা-ছড়া চলিবে মেঝের কোণে কোনো অনতিবৃহৎ ছিদ্রপথে। ইহাতে আরোহীর স্বাস্থ্যও ভালো থাকিবে, কোম্পানীর ব্যয়ও হইবে লঘু। আর বর্ত্তমানে রেলগাড়ী-শ্রেণীর আকারে যে এক অজগর দেহের ভীষণতা রহিয়াছে তাহার স্থানে আবির্ভূত হইবে এক উন্মুক্ত, অবগুণ্ঠিত রমনীয় দৃশ্য শকটমালা, যাহার রূপ মিশিবে পল্লী-প্রান্তরের অনাবৃত দৃশ্যের সহিত, যাহার প্রাণ মিশিবে ভারতীয়-গণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সরলতার সহিত। এমনি করিয়া গড়িয়া উঠিবে ভারতের রেলগাড়ী—ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে অনাড়ম্বতার প্রতীক। এ সকল গাড়ী দেশীয় কারিগরই নির্ম্মাণ করিবে অনায়াসে, আর দেশীয় ঘরামিই ইহার চাল ছাইয়া দিতে পারিবে প্রতি বৎসর। এইভাবে বেকার সমস্যারও সমাধান! এই চাকায়-চলা একচালার একটি মনোহর পরিকল্পনা লণ্ডন মিউজিয়ামে আজিও সংরক্ষিত আছে।

ডক্টরেট্‌ মিলিল বটে, কিন্তু কোন রেল কোম্পানীতে একটা মোটা চাকরী পঙ্কজ সেন কোন প্রকারেই সংগ্রহ করিতে পারিল না। শোনা যায় লণ্ডনে রেলওয়ের কোন বড় সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সে বলিয়া ফেলিয়াছিল যে, ভারতে কংগ্রেস-শাসন আসিলে সে ঐ প্রকার গাড়ীর প্রচলন করিয়া লইবে। কংগ্রেস শব্দ উচ্চারণ মহা অপরাধ! অতএব পঙ্কজ রেলের চাকরীর সব আশা ত্যাগ করিয়া কোন এক জার্ম্মাণ ফার্মের ম্যানেজার হইয়াছে।

তবে, এই জন্যই কি সুরমা তাহাকে হস্ত-সমর্পন করিতে অস্বীকৃত?

সে ত তিনশো টাকা বেতন পায়। তাহাতেও কি সুরমার দেহপ্রাণ কিনিয়া লওয়া যায় না।

পঙ্কজ চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া আরও খানিকক্ষণ ভাবিল। তাহার 'উইল-টু-পাওয়ার' প্রবৃত্তিও বড় প্রবল, অর্থাৎ সে শক্তি ভালবাসে, লোকের উপর সর্দ্দারি করে। হস্টেলে যখন সে মনিটার ছিল, তখন নবাগত ছাত্রগণের কাছে একেবারে বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি সাজিয়া তাহাদিগকে অনেক কিছু অযাচিত উপদেশ দিত। তারপর বিলাত হইতে ফিরিয়াই সে যখন রেল-কোম্পানীতে চাকরী পাইল না তখন হঠাৎ কংগ্রেসের একজন নেতা হইয়া উঠিল, এবং একেবারে প্রবীণ সাজিয়া শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বক্তৃতা দিয়াও ফেলিল। বিশৃঙ্খলা সে সহিতে পারে না, তাই কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণের উপর এমন সব নোটিস্‌ জারি করিতে লাগিল যে অনেকেই আবার পিকেটিং ছাড়িয়া নানাপ্রকার ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিল। সে সুরমাকে একদিন কুজিসিল্কের কাপড় পরিতে নিষেধ করিয়াছিল।

তবে কি সেই কারণেই আজ প্রেয়সী সুরমা তাহার যৌবনকে নানাভাবে সন্দেহ করিয়া আড়াল টানিয়া দিল? পঙ্কজ কত বড় ভুলই না করিয়াছে! গ্রেট্ অর্থাৎ মহান্ হইবার যতগুলি গুপ্তমন্ত্র পশ্চিমদেশ হইতে আয়ত্ত করিয়া আসিয়াছিল, আজ এই বাংলার মাটিতে সব ব্যর্থ হইয়া গেল, একেবারে উল্টা ফল ফলিয়া গেল যে! একটি তন্বী শ্যামাঙ্গী বাঙ্গালী তরুণী আজ তাহার জীবন-জোয়ারকে এক ধাক্কা মারিয়া ভাঁটায় ফিরাইয়া দিয়াছে!

অতএব পঙ্কজ স্থির করিল, সে এইবার ছোট হইবে, অন্ততঃ সুরমাকেই উপরে চড়িতে দিবে, বিনয়ের তৃণশয্যা পাতিয়া সে নীচে পড়িয়া থাকিবে। আর সে নিজের বয়সকে অযথা আচ্ছন্ন করিয়া প্রবীণত্বের ভাণ করিবে না। বরং গোঁপজোড়া কামাইয়া ফেলিয়া দেহটাকে আরও হাল্কা তরুণ ছিম্-ছাম্ করিয়া লইবে। আর কলিকাতার কোন একটা প্রাইভেট্ কলেজেও অন্ততঃ অধ্যাপক হইতে হইবে। সে তাড়াতাড়ি ক্ষৌরকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

(২)

পঙ্কজ সেনের আর খোঁচা খোঁচা গোঁফ নাই। পরিস্কার ঝরঝরে কামানো। বেশ করিয়া স্নো ঘষা হইয়াছে। গায়ে ফিন্‌ফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে মনোহর স্যাণ্ডেল একেবারে বাইশ বছরের যুবকটী! মানসিক তৃপ্তিভরে গোঁফে চাড়া দিতে গিয়াই পঙ্কজ নিজেই অপ্রতিভ হইয়া যায়। বেশ হাসি-হাসি মুখ! এ হাসিতে তার নিজের বুদ্ধি-মত্তা নিজের বোকামিকেই যেন আঁখি ঠারিতেছে।

এক রজনীতে পঙ্কজ তাহার দেহের থার্ম্মোমিটারে যেন বয়সের পারদ রেখাকে দশ ডিগ্রি নামাইয়া ফেলিয়াছে। নারী-হৃদয় জয় করিবার প্রবল আকাঙ্খাই পুরুষের জীবনে চরম লালসা। তাহারই উদ্দীপনায়

একেবারে বাইশ বছরের যুবকটী

সে গত-যৌবনকে ফিরাইয়া পায়, তাহার চোখে-মুখে রক্তের লালিমা প্রগাঢ় হইয়া উঠে।

সুরমার সন্ধানে বাহির হইবার মুখে সে একবার চিঠির বাক্সটা হাতড়াইল। একখানা খামের চিঠি। সুরমার হাতের লেখা সে চেনে না। তবু মনটা নাচিয়া ওঠে! হয়ত চায়ের নিমন্ত্রণ, কিংবা সাহিত্যিক মজলিস কোনো, কোথাও পিকনিক্ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে এমনও হইতে পারে। এবার সে পঁচিশটাকা চাঁদা দিবে, না হয় দেলখোস্ ক্যাবিন হইতে প্রচুর চপ-কাট্‌লেট কিনিয়া লইয়া যাইবে।

আবার ফিরিয়া চেয়ারে বসিতে হইল। কম্পিত হস্তে চিঠি খুলিয়া পঙ্কজ পড়িতে লাগিল :—

'পাঁকু দা',

হয়ত অভাগীকে ভুলে গিয়েছিলেন, আবার মনে পড়িয়ে দিলুম। আমি সেই অমলা। আপনাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ভালবেসে-ছিলুম, কিন্তু সে ভালবাসা সমাজের চোখে পাপ, তাই কোনো প্রতিদান পাইনি। মা মারা গেছেন অনেকদিন হলো। তারপর শ্বশুরবাড়ীর সম্পত্তি থেকে নানা দৈবযোগে হাজার পঞ্চাশ টাকা পেলুম, তাই দিয়ে কোন মতে খরচ চালিয়ে বেঁচে আছি। জীবন বড় শূন্য ঠেকে, মনে হয় বেঁচে না থাকলেই ভালো ছিলো। আমার মায়ের এক মাস্‌তুতো ভাই আমায় তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিতে চেয়ে-ছিলেন, কিন্তু তাঁকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারিনি। তাই আমি এই কলকাতা-তেই একখানি ছোট্ট বাসা নিয়ে একাই আছি। কিন্তু এমন ধারা আর কতদিন থাকা যায়? যাবোই বা কোথা? আপনাকে সেই বিলেত যাওয়ার পর আর দেখিনি—বড় দেখতে ইচ্ছে হয়। আমার এই নিঃসঙ্গ ছন্নছাড়া জীবনে আপনাকে একান্তে পাবার বাসনা আর আমার নেই। তবু যদি দয়া ক'রে একবার দেখা দেন তাতেই আমার বুক ভরে উঠবে।

আমি শীঘ্রই কাশী চলে যাবো, তার আগে সত্যি একবার এসো (তুমি বলছি ব'লে ক্ষমা কি করবে না?)। পরশু রবিবার, সেদিন সকালেই এসো, আমার এখানেই খাওয়ার নেমন্তন্ন রইলো। আমি পথ চেয়ে ব'সে রইবো। আমার ঠিকানা—৩১নং হিন্দুস্থান রোড, বালীগঞ্জ। ইতি—

অভাগী 'অমু'

বার কয়েক থামিয়া পঙ্কজ চিঠিখানা শেষ করিল। প্রথমেই হিসাব করিয়া দেখিল, অমলার এখন ১৪ প্লাস্ ৯ তেইশ বছর বয়স—অর্থাৎ ভরা যৌবন। 'অমু' দেখিতে মন্দ ছিল না; অন্ততঃ সুরমার চেয়ে অসুন্দরী নয়, ঠিক ঐ রকমটাই দাঁড়াইবে। নয় বছর দেখা হয় নাই, না জানি সে এখন দেখিতে কেমন!

মনে পড়ে সেই বহুদিনের অতীত কথা। কলিকাতার পথে ড্রেনের ঢাক্‌নি-টা তুলিয়া ফেলিলেই যেমন শোনা যায় ভিতরে কলস্রোতা

খেয়ালী

প্রবাহিনী, তেমনি এ সুদীর্ঘ নয় বৎসরের বিস্মৃতির আবরণটা তুলিয়া ফেলিতেই পঙ্কজের অন্তরের ভিতর ধ্বনিত হইয়া উঠিল একটি মনোরম রসগুঞ্জন। সেই নয়নে নয়নে মাখামাখি ভাব, সেই বর্ষার নিভৃত রাতে নিরালায়—"অধরে অধরে মিলন অলকে অলকে।" এই গীতরবের মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া উঠে দু চারিটা লণ্ডনের শ্বেতাঙ্গ তরুণী। কিন্তু সব ছাপিয়া জাগিয়া ওঠে পঙ্কজের আসন্ন বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বে সেই একটি করুণ সন্ধ্যায় অমলার সলজ্জ ব্যথাতুর বেপথুমান মুখচ্ছবি। তাহাকে অবহেলা করিয়াই পঙ্কজ সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছিল।

তাহাকে অবহেলা করিয়াই পঙ্কজ সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছিল

যাক্‌গে ও সব বাজে স্মৃতি। পঙ্কজ সুরমার সন্ধানে বাহির হইল।

সুরমার সহিত প্রথম পরিচয় তাহার সখী নীলার গৃহে। নীলা—কালো চক্‌চকে দীর্ঘাকৃতি শীর্ণগ্রীবা আয়ত-লোচনা মধুরভঙ্গী নীলা—ব্যারিষ্টার মিঃ সেনের ভগ্নী। মিঃ সেন পঙ্কজের সহপাঠী, সহ-লণ্ডনবাসী—সগোত্র। সমান গোত্রে বিবাহ এখনো সংস্কারে বাধে, তাই ভ্রূকুটী করিয়া পঙ্কজ যে দিন হতাশভাবে পশ্চাতে চাহিল, দেখিল একটী মেয়ে সচকিত দৃষ্টিতে সসংকোচে কখন আসিয়া একখানি কৌচের উপর বসিয়াছে। সে-ই সুরমা। নীলা বলিল, সে তাহার সহপাঠিকা, গ্র্যাজুয়েট। কখন কবে কোন্ কলেজ হইতে পাশ করিয়াছে সে তথ্য জানিবার আবশ্যক হয় নাই। আধুনিক বাঙ্গালী যুবকের কাছে 'এ মেয়েটি বি-এ পাশ', এই কথাটাই যথেষ্ট। অমনি যেন চোখের সামনে ডায়েনার (Diana) মূর্ত্তি ভাসিয়া ওঠে,—যেন মনে হয় এ মেয়েটা কস্মিন কালে প্রেমে পড়িবে না, বিবাহ করিবে না, কেবলি ফ্লার্ট্ করিবে, দুনিয়াকে আঁখি ঠারিয়া বিজয়িনী-গর্ব্বে উত্তুঙ্গ হইয়া রহিবে। আর অমনি যুবক প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, ইহাকে জয় করিতেই হইবে। পঙ্কজও অনায়াসে সুরমাকে স্বীকার করিয়া নিয়া তাহার হৃদয়-শিখর লঙ্ঘন করিতে কৃত-সংকল্প হইল।

তারপর অনেকদিন কাটিয়া গেছে। সুরমা নাকি কোন্ মামার বাড়ীতে থাকে; ধনী জমীদার মামা, অতিশয় কঠোর, অত্যন্ত সেকেলে। তাই সখী নীলার গৃহই তাহার লীলা-নিকেতন। পঙ্কজের সঙ্গে যা কিছু সাক্ষাৎ, সব এইখানেই। ঘন উত্তপ্ত চিনির রস যেমন ক্রমেই জুড়াইতে জুড়াইতে দানা বাঁধিয়া ওঠে, যখন তাহাকে মুঠা ভরিয়া খাওয়া চলে, তেমনি পঙ্কজের প্রেমাগ্নিতে উত্তপ্ত হইয়া সুরমার তারল্য ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া এখন বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। কেবল মুঠায় পুরিতে পঙ্কজ এখনো সাহস করে নাই, হয়ত হাত পুড়িয়া যাবার আশঙ্কায়। কারণ একটি ঠিক স্পর্শন-যোগ্য শীতল অবস্থায় সুরমাকে বেশ নিভৃতে একদিনও পাওয়া যায় নাই। আজিও পাওয়া গেল না।

নীলাদের বৈঠকখানায় (ড্রয়িং রুম্ ?) প্রবেশ করিয়াই পঙ্কজ দেখে অনেকগুলি মাথা। সমস্তগুলিই যুগপৎ সঞ্চালিত হইয়া তাহার দিকে ফিরিয়াই যেন বিমূঢ় হইয়া গেল। একি! পঙ্কজবাবু; আপনাকে যে চেনাই যায় না! বেশ ছোকরাটি সেজেছেন ত! আপনার সে মুসোলিনি-ভাব কোথায় গেল? ফেরারী আসামী নন ত যে এই ছদ্মবেশ নিয়েছেন? যাত্রাদলে সখী সেজেছিলেন না কি?......সত্যি বেশ মানিয়েছে এইবার,—নীলা বলিল।

পঙ্কজ একখানি ছোট্ট চেয়ারে বসিয়া পড়িল, কারণ আজ তার মানসিক সংকল্প যে, সে ছোট হইবে, আর বড় নয়। মুখে যেন আধ ফোটা একটা বোকার মত হাসি। পঙ্কজ চায়ের কাপ্ তুলিয়া নিয়া বলিল,—না তেমন কিছু নয়—একটা ব্রণ উঠবে মনে হচ্ছিল বলে গোঁপ কামিয়ে ফেলেচি। ছোট্ট একটি চুমুক দিয়া বলিল,—মাপ্ করবেন, বিনা নিমন্ত্রণেই এসে পড়েচি। এই বিনীত বৈষ্ণব-ভাব তার প্রথম। সুরমা তাহার হাতে রেকাবী হইতে কতগুলি যুঁইফুল তুলিয়া দিয়া বলিল,—তা বেশ করেচেন, সত্যি আমার বেশ ভালো লাগচে আজ। পঙ্কজ যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। জড়সড় ভাবে বসিয়া ফুল শুঁকিতে লাগিল। আজ আর সে বেশি কথা বলিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, কারণ মুখ খুলিলেই তাহার বক্তৃতা আসিয়া পড়ে, বিলাতের অভিজ্ঞ জীবনের দৃষ্টান্ত আসিয়া পড়ে। তারপর নানা কথা।

সুরমা বলিল, রবিবাবুর 'চার অধ্যায়ে' আমরাও তাঁর জীবনের চার অধ্যায় পাই,—সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, প্রপাগাণ্ডিষ্ট।

পঙ্কজ বলিল,—বাঃ আপনার থীওরি অতি চমৎকার! আজ আর অন্য দিনের ন্যায় বলিল না, যে সুরমা, এ তোমার নিজের

মত নয়, অন্যের লেখা থেকে ধারকরা মত ; রবি ঠাকুর কখনো প্রপাগাণ্ডা করেন না।

সুরমা বলিল,—বার্ণার্ড্ শ ভারতে থাকলে নিশ্চয়ই আমাদের নিয়েই একটা নভেল লিখতেন। পঙ্কজ বলিল,—আমারো তাই মনে হয়।

সুরমা বলিল,—'পরিচয়' কাগজে আমরা বাংলা সাহিত্যের কোন পরিচয়-ই পাই নে'। পঙ্কজ বলিল, আমারও তাই বিশ্বাস।

মোট কথা, সুরমা আজ যাহা কিছু বলিল, পঙ্কজ অবাধে তাহাই মানিয়া নিল। তবু মজলিস জমিল না। পঙ্কজের কামানো গোঁফের কাঁটা খচ খচ করিতে লাগিল।

পঙ্কজ জড়সড়ভাবে ফুল শুঁকিতে লাগিল

আজ অমলার সহিত সাক্ষাৎ করিবার দিন। তাহার ওখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ। অমলা এক কালে ভালই রাঁধিত। এখন কি আর তেমন হাত আছে? কি করিয়া থাকিবে? বিধবা মানুষ চিরকাল একার জন্য সিদ্ধ-পক্ক রাঁধিয়াছে। তবে পঙ্কজের জন্য নিশ্চয়ই আজ কিছু আমিষের ব্যবস্থা থাকিবে। হাঁ, কাটলেট্ রাঁধে সুরমার সখী নীলা। সুরমা রাঁধে বলিয়া তাহার জানা নাই। বিবাহ না হইলে তাহা জানা যাইবেও না। কাল পঙ্কজ তাহার চেহারায় একটি ড্রামাটিক্ এফেক্ট্ (নাট্যাঘাত?) রাখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কী জানি সুরমা কী মনে করিল। হয়ত তাহাকে খামখেয়ালী ভাবিয়াছে, যে-গুণটি মানুষের ব্যক্তিত্বের বিশেষ অন্তরায়। ব্যক্তিত্বের মূল মন্ত্র কখনো বদলায় না, কিন্তু পঙ্কজের কী দুর্মতি হইল সে নিজের ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া কাল নিজেকে একেবারে শূন্যে পরিণত করিয়া ফেলিল। বোধহয় সেইজন্যই সে মজলিসে অন্তরের সহিত যোগদান করিতে পারে নাই, অমন সহসা চলিয়া আসিয়াছে। আবার মনে হইল, কাল সে নিজের পৌরুষকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। মনস্তাত্ত্বিক বলে, নারী পৌরুষ-প্রাচুর্য্য আকাঙ্খা করে। সুরমা হয়ত মনে মনে হাসিয়াছে কাল।

না, না, তা নয়। নারী টাকা চায়, বিলাস চায়। বিলাস-দ্রব্য-উপার্জ্জন-ক্ষমতাই পৌরুষ। পঙ্কজ তাহা দ্বারাই সুরমাকে জয় করিবে। ভাগ্যে এখনো অমলা বাঁচিয়া আছে!

অমলা বাঁচিয়া আছে এবং আজ তাহার জন্য নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, একথা ভাবিয়া পঙ্কজের মনো-রসনা রসাল হইয়া উঠিল।

সে আবার ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত হয়। আবার আজ কেন এই প্রসাধন? অমলার কাছে নিজেকে সুন্দর দেখাইবার কেন এই আয়োজন? এমন একদিন ছিল, যেদিন সে বয়সে তরুণ, প্রথম উদ্ভিন্ন যৌবনে স্বভাবতঃ মনোহর ছিল। সেদিন কোন সজ্জার, কোন প্রলেপের প্রয়োজন হয় নাই। অমলা সেদিন তার চেহারার খুঁটিনাটি লইয়া বিচার করে নাই, তার যৌবনের স্বাভাবিক কোমলতাতেই আকৃষ্ট হইয়াছিল, আর আপন অন্তরের কামনায় তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। মানুষ যতই প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় ততই তার দেহের যত্ন বাড়িয়া উঠে। পঙ্কজ অতি যত্নে বেশভূষা করিল। অমলার মন হরণ করিতে হইবে বৈ কি! তাহাকে খেলাইয়া ডাঙায় তুলিতে হইবে। পঞ্চাশ হাজার টাকা!

বেলা তখন হইবে সাড়ে নয়টা। বালীগঞ্জের রাস্তায় সূর্য্যের সোণালি আলো গণিকার ঠোঁটে রঙের মতো ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। পঙ্কজের মনে তখন অমলা—সাদা থান-পরা বিষণ্ণ-মুখী অনবগুণ্ঠিতা অমলা—পিছনে তার আ-নিতম্ব কুন্তল রাশি, বলয়হীন বাহুতে হয়ত একখানি ছোট্ট রেকাবি—ধীরে আসিয়া বলিতেছে—'পাঁকু দা' একটু জল খাও।···পঙ্কজ তাহার নিরাভরণ দেহে লুব্ধ দৃষ্টি ফেলিয়া—না—না—আবার লুব্ধ দৃষ্টি কেন······

নম্বর খুঁজিয়া যখন পাওয়া গেল, দেখা গেলো সুন্দর ঝরঝরে একটি ছোটোখাটো দোতলা বাড়ী। সামনে কোন ফুলের বাগান নাই, শুধু রেলিঙের ধারে গোটা কয়েক টবের গাছ। আর সিঁড়িতে শুইয়া একটি বিলাতী কুকুর। পঙ্কজ চোখ কচলাইয়া দেখিল, না নম্বর ভুল হয় নাই। মনে মনে কহিল, বাঃ বেশ রুচি ত! কিন্তু মুখে 'বাপ্‌স্' বলিয়া তিন হাত পিছনে লাফাইয়া পড়িল, কারণ সেই নিমীলিত-নেত্র নিরীহদর্শন সারমেয় তখন এই আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া একটি অলিম্পিক্ লম্ফ প্রদান করিয়াছে ; এবং সে জানোয়ারটা আগে লাফাইয়া তবে ঘেউ ঘেউ করে।

একটা জলের কলের আড়ালে আশ্রয় লইবার সময় পিছনে পা-টা পিছলাইয়া

গিয়াছিল। পঙ্কজ হাত-পা, জামা-জুতা ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার যখন খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিল ইতোমধ্যে এক ভৃত্য আসিয়া কুকুরটাকে জাপটাইয়া ধরিয়াছে, এবং তাহার গলদেশে শিকল ঝমঝম্ করিতেছে। আশ্বস্ত মনে সিঁড়িতে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'ইস্ মকান্ কিস্‌কা হ্যয়' ? ভৃত্য বাঙ্গালী। বলিল,—আজ্ঞে, কোত্থেকে আসচেন ? এটা পঙ্কজবাবুর বাড়ী।

পঙ্কজবাবুর বাড়ী ! পঙ্কজ রীতিমতো বিস্মিত হইয়া গেল। সুধাইল,—বাবু কোথায় ?

—আজ্ঞে, তিনি ত শুনেচি দিল্লীতে থাকেন। এখানে শুধু মা-ঠাকরুণ আছেন। বলিয়া ভৃত্য মাথা চুলকাইতে লাগিল।

পঙ্কজ ভাবিতেছিল, তবে এই প্রোষিত-ভর্তৃকা মা-ঠাকরুণটীর কী নাম তাহা শুধাইবে কি না। অমলার কি এতটুকু আক্কেল নাই যে আগে হইতে এই অর্ব্বাচীন চাকরটাকে বলিয়া রাখে যে আজ সে নেমন্তন্ন খাইতে আসিবে ! মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি জাগিল। মুখখানা অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর করিয়া বলিল,—তবে খবর দাও ভেতরে যে, আমি দিল্লী থেকে এসেছি।

অমনি তড়িৎপৃষ্টের মতো ভৃত্য আসিয়া তাহার পায়ে টিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিল। এবং তাহাকে পিছনে করিয়া পর্দ্দা ঠেলিয়া একেবারে সরাসরি ভিতরে লইয়া চলিল। সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া দোতলায় পরিস্কার একটি কক্ষ। তাহারি ভিতর পঙ্কজকে ছাড়িয়া দিয়া ভৃত্য বলিল,—বাবু, এইটে আপনার বসবার ঘর।

দিব্যি ঘরখানি। সত্যই বড় ভালো হইত যদি পঙ্কজের এমনি একটি বসিবার ঘর থাকিত। কিন্তু এ সব কি ব্যাপার ? এ ব্যাটা ভৃত্য যে তাহাকেই একেবারে বাড়ীর মালিক ভাবিয়া লইয়াছে। অমলা কি সত্যই তাহার অবর্ত্তমানে তাহার স্মৃতিকে এমনিধারা সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিতেছে, ভরত যেমন রামচন্দ্রকে করিয়াছিল ?

ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—বাবু, চানেরঘরে জল দিয়েচি, কাপড়-চোপড় রেখেচি।

পঙ্কজ তাহার আশ্চর্য্যভাব কোনমতে চাপিয়া ফেলিয়া ভৃত্যের অনুসরণ করিল। ভাবিল, অমলা হয়ত এতক্ষণ ঠাকুরঘরে পূজায় বসিয়াছে। ভৃত্যকে হয়ত সত্যই সে এ সকল উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিল। স্নান করিয়া কুক্কুরাক্রমণের কলঙ্ক-মোচনই শ্রেয়।

স্নানের ঘরে তাহারি জন্য সুন্দর কোঁচান ধুতি, গেঞ্জি, তোয়ালে, সাবান—সব পরিপাটিরূপে সাজানো।

ধুতির কোণে তাহারি নাম লেখা 'পি'।

স্নান শেষ করিয়া সে যখন আবার ঘরে আসিয়া বসিয়াছে তখন তার মন সহিষ্ণুতার সীমা লঙ্ঘন করে প্রায়। অমলার জন্য মন ছট্‌ফট্ করে, অথচ এখনো তার দেখা নাই। অধৈর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল,—হারে, তোর মা-ঠাকরুণ কই ? ডাক এইবার।

ভৃত্য আমতা আমতা করিয়া উত্তর দিল, আজ্ঞে তিনি ত গঙ্গা স্নান করতে গেছেন, এই এলেন বলে।

পঙ্কজের কেমন যেন সন্দেহ হইল। ঠগ জুয়াচোরের পাল্লায় পড়ে নাই ত ! কে জানে, সেই চিঠি, এই বাড়ী—সব একটা প্রকাণ্ড ফাঁদ, তাহাকে ব্লাক্‌মেল্ করিবার একটা বৃহৎ ষড়যন্ত্র। কিন্তু ভৃত্যের ভঙ্গীতে ত সে সব কিছুই মনে হয় না।

লোলুপ দৃষ্টিতে পঙ্কজ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। হঠাৎ পাশের সবুজ পর্দ্দাখানা ঠেলিয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। এটি লোভনীয় শোবার ঘর। চমৎকার পালঙ্কে রমণীয় শয্যা। টেবিলের উপর এক টুকরা কাগজে লেখা আছে—"পাকুদা, অপেক্ষা কোরো, পালিও না যেন।" নাঃ এ অমলার লেখা নিশ্চয়ই।

পঙ্কজ পায়ের শব্দে চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিয়াই দেখিল, সদ্যস্নাতা সুরমা তাহার পায়ে প্রণাম করিতেছে। তার মুখ অত্যন্ত শান্ত, অত্যন্ত স্মিত, অত্যন্ত চতুর এবং মুহূর্ত্তে অত্যন্ত আবেগ-কম্পিত হইয়া উঠিল। সঙ্গের আট নয় বছরের ছেলেটির হাত ধরিয়া বলিল,—খোকা, এঁকে প্রণাম করো, ইনি তোমার বাবা।

পঙ্কজ শুধু বলিল—য়্যাঁ—সুরমা—অমু তুমি ! অমলা বলিতেছিল,—যাক্ দয়া ক'রে এসেচো, বাঁচলুম।......

কিন্তু সে কথা পঙ্কজের কানে পৌঁছায় নাই। তাহার চোখের সামনে তখন সমস্ত কলিকাতা নগরী নাগর দোলার মতো দুলিতেছে।

য়্যাঁ সুরমা তুমি !

দুর্য্যোগ

শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য

সে মেয়েকে আমি দেখেছি অনেকবার,
এ্যালবার্ট হলে জনসভাতল মাঝে
ইনষ্টিটেউর আর্ট গ্যালারীতে একা
মনে হয় যেন দেখিয়াছি একবার।
আর দেখিয়াছি 'চিত্রা' ও 'ছবিঘরে'
হগ্-মার্কেটে শপিংও করিতে যেন,
চোখে পড়িয়াছে আই-এফ্-শিল্ড গেমে
হাততালি দিতে রক্তিম লঘু করে···
নাম জানি নাকো,—নয়তো দেখিতে পেতাম
হয়তো মাসিকে ব্যথার গীতিকা লেখে;
রেডিওতে গান হয়তো বা কভু গায়;
আর, ষ্টুডিওতে প্রাচ্য-নৃত্য শেখে।—
(ষ্টুডেন্ট,—ইহাতে নিশ্চয় ভুল নাই)

আজ দেখিলাম দোতলা বাসের 'পরে
ডবল্-ডেকারে আমারি পাশেতে একা!—
প্রজাপতি সম মৃদু-চঞ্চল ছাঁদে
আসিয়া বসিল সঙ্কোচহীন ভরে।
বাম হাতে তা'র 'মেরিয়া থেরেশা' প্যাড্
আর একখানি 'কটী-ডি-প্যারির' শিশি।
লেটার-পেপারে ইহারি গন্ধে যেন
উহার বুকের রোমান্স রহিবে মিশি!···
সন্ধ্যা অতীত। শ্রাবণ আকাশ খানা
মেঘ-গম্ভীর স্পষ্টই যায় বোঝা;
বাতাসে তখনো বরষণ-শেষ রেশ;
বাস ছুটিয়াছে দক্ষিণ মুখে সোজা······
হাল্কা-হাসির হঠাৎ মুক্ত স্রোতে
বলিল, দেখুন—উর্ব্বর মাথাখানা,—
প্রাজায় দিয়েছে "ব্যাচিলর অফ্ আর্টস্"!
ব্যাপার ওদের বড়োই শক্ত জানা।

আমাদের দেশ?—ঘামাবেনা কভু মাথা;
দেখাবে রাবিশ গতানুগতিক বই,—
সস্তা রোম্যান্স, মেলো ড্রামাটিক্ ঢং
সাইকলজির স্পর্শ তাহাতে কই?
সত্যি বল্‌ছি,—আমাদের দেশ কভু
পার্ব্বেনা আর ওদের সমান হ'তে
বাঙালী জাতির টেষ্ট বলে কিছু নেই,
দিবস কাটায় বাঁচিয়া যে কোনো মতে।
কহিলাম হেসে,—আচ্ছা দেখুন, তবে,
বাংলার নারী এখন প্রগতিশীলা,—
সংস্কারের ভাব্‌টা আপনাদেরই;
নয়কো তো এটা মিছামিছি এক লীলা!"
সমর্থনের ভাব—উজ্জ্বল চোখে
বলিল তরুণী—নিশ্চয়, নিশ্চয়।
পুরুষের মতো নারীর রাইট্‌স্‌গুলি
আধুনিক কালে একতিলও কম নয়।

বাস চলে আর বরষন পরশন
রহিয়া রহিয়া গায়েতে আসিয়া লাগে,
পাশে সেই মেয়ে। কে জানে হয়তো ওর-ও
আমারি মতোই অন্তরে ঢেউ জাগে···
চমকিয়া উঠি!···হঠাৎ শব্দ জোর,
অসহায় মত বাস্‌খানা গেল থেমে।
টায়ার ফেটেছে, যাত্রীরা যত সব
দুর্ব্বার স্রোতে তাড়াতাড়ি এল নেমে।
তারপর—এক উৎকট গোলমাল,
যাত্রী, চালক, কন্‌ডাক্‌টার সাথে।
বচসার সীমা পার হ'য়ে এসে বুঝি
ক্রমে এইবার লেগে যায় হাতে-হাতে।
বাহিরে চলেছে বৃষ্টির সমারোহ,
আর ছায়া-পথ আলো ও অন্ধকার
কোথায় দাঁড়াই? আসে নাকো বাসগুলো,
ট্রামের ষ্টপেজ কাছেও নাইকো আর!
কম্প্রকণ্ঠে কহিল—কী অদ্ভুত,
আর হরিবল্ যতো এ পুরুষগুলো,
ঘন দুর্য্যোগ, ভ্রূক্ষেপ তাতে নেই,
ত্রুটি আধখানি দেখিতে পেলেই হ'লো!

পরিমণ্ডল ক্রমে হয় ঘোরতর,
ঘিরিয়া রাখিনু শত শকতিতে ওকে;
দেখিনু, রয়েছে আমার পানেতে চেয়ে
ভীতা হরিণীর শঙ্কা-জড়িত চোখে···
ভাবিলাম মনে, সঙ্গিনী মোর অয়ি
এখানেতে আজ কেন এ সঙ্কোচন?
বলিলাম হেসে—ভয় নেই, আমি আছি
শঙ্কা তোমার হেথা শুধু অকারণ!

—

পূজা উপলক্ষে আমাদের আফিস দু' হপ্তার জন্য বন্ধ থাকবে। আগামী ১৭ই অক্টোবর থেকে "খেয়ালী" আবার যথারীতি প্রকাশিত হবে।

দিও চরণ তলের ধূলি

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

যা' কিছু আমার সকলি ঢালিব
তোমার চরণ তলে,
হৃদয় আমার রিক্ত করিয়া
দিব হে নয়ন-জলে।

তোমারে দিবহে সকলি আমার
সব নীরবতা কলরব-ভার,
দিব হাসি আর নয়নের ধার
প্রতিদিন পলে পলে।
হৃদয় আমার রিক্ত করিয়া
দিব হে নয়ন-জলে।

বিনিময়ে কিছু দিওনা আমায়,
যদি কভু চাহি ভুলি'—
কঠোর শাসনে দিওগো দেখা'য়ে
চরণ তলের ধূলি।

সব দান দিয়া চরণে তোমার
নামাব আমার হৃদয়ের ভার,
দেখিব না চাহি' সে দান আমার
লয়েছ কি তুমি তুলি;
বিনিময়ে যদি দাও কিছু—দিও
চরণ তলের ধূলি।

—

কয়েদী

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস

স্থানটি আপত্তিকর। হাতে পায়ে শৃঙ্খল জড়াইয়া পর্ব্বত-প্রমাণ প্রাচীর-বেষ্টিত কতকটা সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ জায়গার মধ্যে দাগী খুনী আসামীদের যেখানে মুক্তি দেওয়া হয়—এ সেই জায়গা—কয়েদখানা। দাদা ছিলেন তখন অ্যাসিস্টেণ্ট জেলার, জেল কোয়ার্টারেই থাকতুম আমরা। বাসার পাশেই জেলখানার সীমানা, মধ্যে একটি সরুগলির ব্যবধান। গলির পাশেই অনত্যুচ্চ প্রাচীর—কঙ্কালসার অসংস্কৃত। তাহারি অপর পার্শ্বে কয়েদী-পরিশ্রমজাত নানা শ্রেণীর উদ্ভিদ-শোভিত শাক-শব্জী-ফুল-ফলোদ্যান। তাহার পরই সুদীর্ঘ সুউচ্চ প্রাচীর সুরক্ষিত।

অনেক বস্তু আছে যাহাদের ভিতরকার বর্ণনা দেবার প্রচেষ্টা আপত্তিকর। এস্থানেও সেকথা খাটে।

জেলের কয়েদী। নাম তার মন্মথ। বয়সে প্রৌঢ়। মেথর নয়, তবু মেথরের কাজ করে সে, কারণ পরিশ্রম অল্প। কাজ মাত্র সকালের দিকে তিন ঘণ্টা, তারপর ছুটি।

ছুটীর সময় সে যে কি ক'রতো তা সেই জানে। যেদিন তার সঙ্গে প্রথম চোখোচোখি হোলো, বিরক্ত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে নিলুম। ভাবলুম, অশিক্ষিত, অসভ্য, বর্ব্বর না হলে কি আর জেলে আসে! মনে মনে ঐ জাতটার উপর আমার একটা চিরন্তন বিজাতীয় ঘৃণা ছিল; তারই উত্তেজিত দাহ অসাধারণ ভাবে অন্তরে অন্তরে আমি অনুভব করতে লাগলুম।

শীতের দুপুর। রোজই দেখা হ'ত বিশ্রাম সময়ে বাগানের ধারের একটা জানালা-পথে। প্রায়ই অনুভব করতুম, সে যেন আমার দিকে চেয়ে আছে। প্রথম প্রথম বিরক্ত হতুম বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার দৃষ্টি যেন আমার গা-সওয়া হয়ে গেল, কিন্তু তখন কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলুম যে, তারই দেওয়া বেদনা আমাকে প্রাক্তনের মত নীরবে সইতে হবে!

আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে সে একদিন সহসা ডাকলে "মা"—হতবাক্ হয়ে গেলুম। কিন্তু সে ঐ এক মুহূর্ত্ত। পর মুহূর্ত্তেই বুকের ভেতর থেকে স্নেহে মথিত হোয়ে বেরিয়ে এল "কেন বাবা।"

—আমি তোমার দিকে তাকা'লে তুমি বিরক্ত হও, এ আমি বুঝতে পেরেছি। তবুও কেন চেয়ে চেয়ে দেখি জানো মা, ঠিক্ তোমারই মত আমার একটি মেয়ে ছিল। আমার মায়ের মতন তার গড়ন ছিল ব'লে তাকে আমি 'মা' বলতুম। সেই মাকে আমি হারিয়েছি। তোমাকে দেখলেই তাকে মনে পড়ে, মা, তাই চেয়ে থাকি। তারপর তার নাম ধাম সমস্ত জিজ্ঞাসা করি।

বর্দ্ধমান জেলার কোন এক পল্লীগ্রামে তার বাড়ী—জাতিতে গোয়ালা। একটু লেখাপড়াও জানে।

বললুম তবে মেথরের কাজ কর কেন? বললে, খাটুনি কম, তাই। এর পর থেকে রোজই দেখা হয়। দুপুরের ঐ সময়টায় কেউ কোথাও থাকে না—তাছাড়া সে বহুবার জেলে এসেছে, কর্ত্তৃপক্ষরা বলে, জেলের প্রতি নাকি ওর অসাধারণ মায়া ওকে কড়া পাহারায় রাখবার কোনো দরকার নেই। একথা আমার ওর মুখেই শোনা। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁ মন্মথ, সে কত বড় পাপ, যার জন্যে গোয়ালার ছেলে হয়ে ছত্রিশ জাতের বিষ্ঠাগুলো তোমায় ঘাঁটতে হচ্ছে?

—শুনবে মা, পাপ পুণ্য জীবনে কোনদিন মানিনি। তবে এটা জানি, ভালোর ভালো ফল ও মন্দর মন্দ ফল—এ আছেই। তবে শোনো, বছর ১৫।১৬ আগের কথা, তখন আমার বয়স ৩০ কি ৩১, হরিপালে ডাকাতি হয়—সেই সূত্রে আমার হোলো জেল—দু' এক মাস নয়, সাতটি বচ্ছর। কিন্তু তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি, মা—এ ডাকাতির বিন্দু বিসর্গও জানতুম না আমি।

স্বাস্থ্য ছিল খুব ভাল—এখন ত শরীর ভেঙ্গে গেছে, মা—যেমনি লম্বা তেমনি চওড়াও ছিলুম তখন, গায়ে শক্তিও ছিল অকতো। গয়লার জোয়ানের সেই হোলো বিপদ। হোলো হরিপালে ডাকাতি—বাঁধা পড়লো নন্দীগ্রামের মন্মথ।

হ্যাঁ, বাঁধা পড়লুম আমি, জামিন হবার কেউই ছিল না, আমার হ'য়ে লড়বারও কেউ ছিল না। গয়লার ছেলে তার ওপর লেখাপড়া শিখিনি, প্রাণ বোলে কি আমার কোন জিনিস আছে, মা—নির্ব্বিবাদে জেলেই যেতে হোলো।

বাপ আগেই মারা গিয়েছিলেন। জেল থেকে ফিরে দেখি পৈতৃক ভিটেটার কোন চিহ্নই নেই। গাঁয়ের লোককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, যে-বছরে আমার জেল হয়, সেই বছরের শেষেই মা আমার পাগল হ'য়ে যান্, তারপর একদিন রাত্রিতে কোথায় চলে যান—কেউ তা জানেনা। তারপর হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ দুটো ভালো করে মুছে নিয়ে মন্মথ ফের বলতে লাগলো, যখনই বাইরে থাকি দেশ বিদেশে তাঁর খোঁজ করে বেড়াই কিন্তু কোথাও তো তাঁকে দেখতে পেলুম না, মা। শুনলুম আমার জেল হওয়ার পর যে কদিন তিনি বাড়ীতে ছিলেন, কেবল "মনু আমার কোথায় গেলিরে" এই কথা বলতেন আর বুক চাপড়াতেন। তারপর কি বলছিলুম, হ্যাঁ, জেল থেকে ফিরে দেখি ভিটের কিছুই নেই, শুধু মনসা-তলায়

মা যেখানে সন্ধ্যের সময় রোজ প্রদীপ দিতেন সেইখানটা বুক দিয়ে আগলে আমাদের পল্টু কুকুরটা উপুড় হোয়ে প'ড়ে আছে। কুকুরটা ছিল মায়ের অনুগত······ খুব বুড়ো হ'য়ে গেছে······আমায় দেখতে পেয়ে পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়লো··· বেশ বুঝলুম, তার দুই চোখের কোলে তখন জল এসে জমেছে। মন্মথ চুপ কোরলো।

জিজ্ঞাসা করলুম "তোমার সেই মেয়েটি?"

তার কথাই বলছি, মা।

যেদিন রাত্রে মা আমার চলে যান—তার দু তিন দিন পরে আমার শ্বশুর বাড়ীর লোক খবর পেয়ে আমার স্ত্রীকে নিতে আসে। যেতে সে চায়নি, তাকে জোর করেই নিয়ে যায়—এক-গোয়াল গরুও সেই সঙ্গে খুলে নিয়ে যায়। মেয়েটা তখন বছর নয়-দশ এর হবে, সে আর কি জানে মা, মায়ের আঁচল ধরে সে শুধু কাঁদতে থাকে।

শ্বশুর বাড়ী আমাদের গাঁ থেকে ক্রোশ সাতেক দূরে। খালাস যেদিন পেলুম সেই দিনই সেখানে চ'লে গেলুম······কিন্তু তাদের মা ও মেয়ের কাউকেই পাইনি। মামারা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল—একটী ছেলেও গর্ভে এসেছিল, কিন্তু ঐ ছেলেই হ'ল তার কাল। ছেলেকে ভূমিষ্ঠ করেই মা আমার চলে গেল স্বর্গে। আর আমার স্ত্রী—তারও সহ্য হ'ল না, মা, বড় দুঃখ পেয়ে সেও চলে গেল।

মন্মথ আর একবার চোখ দুটো মুছে নিলে। বললুম—সেত অনেক দিনের কথা, আবার তুমি জেলে এলে কেন?

দুঃখের কথা কী আর বল্‌বো, মা······ পিছন দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মন্মথ বল্লে আজ থাক্, মা···বলে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

পরদিন দেখি মন্মথ তার নির্দ্দিষ্ট নিরালা স্থানটিতে চুপটি করে বসে আছে—দৃষ্টি তার আমার জানালার দিকে। আমাকে দেখতে পেয়ে তার মুখটা যেন সহসা অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বল্লে, আজ মাস্তির দেরী হয়েছে।

—তুমি কতক্ষণ বসে আছ মন্মথ?

—তা প্রায় ঘণ্টা খানেক হলো, মা।

—ঘণ্টা খানেক?

—তাতে কি হয়েছে, আমার ত বসে থাকাই কাজ, মা। তারপর খানিকক্ষণ থেমে সে বল্লে, কাল তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে আবার আমি জেলে এলুম কেন। এর উত্তরটা দেবার জন্যে কাল থেকে প্রাণের ভেতর যেন আমার থেকে থেকে হাঁফিয়ে উঠ্‌ছে—আমার যে দুঃখের কথা কেউ শুন্‌তে চায় না, মা। যাক্—যে কথা বল্‌ছিলুম—সেদিন প্রথমটায় মনে হল এ জীবন আর রাখ্‌বনা—তবু আবার মনে হল একবার, আমার মায়ের খোঁজ করি। খুঁজতে বেরিয়েও ছিলুম কিন্তু কোথাও তাঁকে পাইনি—কত দেশ যে ঘুরেছি—মায়ের আমার দেখা মেলেনি। তখন থেকে জীবনটা খুব ছন্নছাড়া মনে হতে লাগ্‌লো—চুরি করাটাকে আগে ঘৃণাই করতুম—কিন্তু এবার কাঁধে কী যে শয়তান চাপ্‌লো, মা, একদিন বর্দ্ধমান সহরে একটা ছোট মেয়ের গলা থেকে এক ছড়া হার ছিনিয়ে নিই, সঙ্গে সঙ্গে ধরাও পড়ি—জেল থেকে বেরিয়েছি তখন ছ'মাসও হয়নি—দাগী আসামী—ফের ৩ বছর জেল হোলো।

জেল থেকে বেরিয়ে এবার মনে কোরলুম ওসব খারাপ পথে আর যাবো না, কিন্তু একবার যার স্বভাব খারাপ হয়ে যায় তার ফেরা খুব কঠিন, মা, তা ছাড়া, পুলিশও আর সঙ্গ ছাড়তে চাইলে না তাও বটে, আর আশ্রয়ের অভাবে ঐ সমস্ত কুৎসিত আড্ডাতেই ফের ফিরে ফিরে যেতে হয়—নিজের বল্‌তে তো আর কেউই ছিলনা, দূর সম্পর্কের দু একজন যারা আত্মীয় ছিল তারা কেউই আশ্রয় দিলেনা—সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখতে লাগ্‌লো—ক্রমশঃ শরীর ভেঙ্গে আস্‌তে লাগলো—অথচ পেট তো বুঝবে না—কাজেই······

—সে যাই হোক্ মন্মথ, যা হবার তা হ'য়ে গেছে—কিন্তু আমায় কথা দিয়ে যাও আর তুমি কখনো এই বিশ্রী যায়গায় ফির্‌বে না—

—না, মা, মনে মনে তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি এ জীবনে আর এ জায়গায় কখনো আস্‌বো না।

—সেই ভালো, আর তুমি তো একদিন বলেছিলে যে ঝুড়ি, চ্যাঙ্গারি বুনতে জানো—তাই কোরো। বাকী জীবনটা কেটে যাবে।

—আর কত দিনই বা বাঁচ্‌বো, মা।

—তোমার বেরুতে আর কতদিন দেরী আছে?

—মাস সাত আট হবে, ওসব হিসেবও আর রাখিনা।

দাদা হুগলীতে বদলী হয়ে এলেন। যাবার আগে মন্মথর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে দেখি, সে খবরটা আগেই জেনে বিষণ্ণ শুষ্ক মুখে চুপটি করে বসে আছে। সে ব্যথা-ভরা দৃষ্টি দিয়ে একবার শুধু আমার দিকে চেয়ে দেখলে।

প্রথম প্রথম তার জন্যে বড়ই মন কেমন কোর্‌তো—আহা বেচারা! কিন্তু কালের দীর্ঘতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সবই স'য়ে যায়—মন্মথকে দেখতে-না-পাওয়ার যে-দুঃখ তা ক্রমে ক্রমে কমে আস্‌তে লাগলো।

ইহারও বছর খানেক পরে একদিন দেখি, মন্মথ মাথায় মোট নিয়ে পথ বেয়ে চলেছে, আমি উপরের জানালা থেকে দেখতে পেয়েই ডাক্‌লুম, মন্মথ! আমাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে সে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেল। চারিদিক্ তাকিয়ে নিয়ে মোটটা নামিয়ে রেখে সে বল্‌লে, অনেকদিন অনেক খুঁজেছি, মা, আজ ভগবান্ আমার দিকে মুখ তুলে

তাকিয়েছেন। দেখলুম তার চোখের কোণে তখন জল এসে জমেছে। উদ্গত অশ্রু কোন প্রকারে দমন কোরে বললে, তোমার আশীর্বাদে এখন বেশ আছি, মা—নন্দীদের বাগানে মালীর কাজ করি, আর হাটবারে হাটে গিয়ে মোট বই। বেশ আছি।

বললুম, মাঝে মাঝে এসো বাবা।

সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে গেল।

মধ্যে মধ্যে সে আস্‌তো—কখনো মোট নিয়ে, কখনো বা বাগানের উৎপন্ন তরীতরকারী বিক্রী করবার অছিলায়। বলতুম, পয়সা-কড়ির দরকার হোলে চেয়ে নিও বাবা। সে বোল্‌তো, তোমার আশীর্বাদে আমার আর কিছুরই অভাব নেই, মা, সেই জন্যেই তো পায়ের ধূলো নিতে আসি—বলতে বলতে সে আমার পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকাতো।

এমনি কোরে আরো মাস চার কেটে গেলো।

তারপর প্রায় ৭।৮ মাস মন্মথ'র দেখা পাইনি। হঠাৎ একদিন সকালে একটা লাঠির উপর ভর দিয়ে সে বাড়ীর উঠোনে এসে দাঁড়ালো। অতিশয় রুগ্ন চেহারা, বুকের হাড়গুলো জির্ জির্ করছে, পা থর থর কোরে কাঁপছে, মুখ দিয়ে তার আওয়াজ বেরোচ্ছে অতি ক্ষীণ, অস্পষ্ট। দেখে মনে হোলো এ যেন মন্মথ'র প্রেত-মূর্ত্তি।

—এমন দশা হোলো কি করে, মন্মথ?

মন্মথ একবার তার দুর্ব্বল হাতটা কপালে ঠেকালে—বললে, অদৃষ্ট মা, বহুদিন বহু পাপ ক'রেছি, তারি এ প্রায়শ্চিত্ত। জেলে থাক্‌তেই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছিল তারপর ধ'রলো কালাজ্বর। সাহাগঞ্জের হাঁসপাতালে ছ'মাস রইলুম, ভাল হতে পারলুম না—তারা কাল তাড়িয়ে দিয়েছে—বলেই সে বসে পড়লো।

—কিছু খেতে দিতে পারিস্ মা, বড্ড খিদে।

—বাসি রুটি ছিল অভিভাবকদের লুকিয়ে তাই খানকতক ও একটু গুড় এনে দিলুম, বললুম, রাস্তার কলে জল খেও বাবা।

ঘাড় নেড়ে সে জানালে, আচ্ছা।

তার ঐ ঘাড় নাড়ার ভিতর কী যে ছিল জানি না, কিন্তু তাই দেখে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। আমি যে কত বড় অসহায় তা সেইদিন প্রথম টের পেলুম। মন্মথ'র আসল পরিচয় বাড়ীর অভিভাবকদের দিতে পারিনা, অথচ তাকে একজন পথের সাধারণ ভিখারী বোলে পরিচয় দিতেও বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছিল—আমি যে তার মা!

বল্লে, কিছু পয়সা দিতে পারিস্ মা?

খুচ্‌রো চার-পাঁচ আনা পয়সা মোটে আমার হাতে ছিল, তাই দিয়েছিলুম। এই অসময়ে একটা টাকাও তার হাতে দিতে পারলুম না বোলে খুব দুঃখ হতে লাগ্‌লো।

বল্লে, কাঁদিসনে মা, ভালো হয়ে ফিরি, আবার দেখা হবে।

চুচড়োর হাঁসপাতালে থাক্‌বো আমি, মাঝে মাঝে খবর নিস্ মা।

বলেছিলুম, আচ্ছা।

কিন্তু তার খবর নেওয়া আর ঘটে উঠেনি। তারপর সুদীর্ঘ আটটা বৎসর কেটে গেছে—মন্মথ তো একটি দিনও ফিরে এলনা!

যখনই পথে ঘাটে নিরাশ্রয় হতভাগ্যদের দেখি, মনে হয় ওদের মধ্যে বুঝি আমার মন্মথ আছে—এখুনি সে আস্‌বে।

আজ সে নাই জানি, তবুও যখনই খুচরো কয়েক আনা পয়সা আমার হাতে থাকে, তখনই মনে হয়, হয়ত সে আস্‌বে। সে আসেনা। দু'ফোঁটা অবোধ অশ্রু তার উদ্দেশ্যে ঝরে পড়ে।—

—বিরহে—

শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজি বিরহের দিনে নীরব গগন ঘিরে,
তব প্রেমের আলোক ডানাটি মেলিছে ধীরে।
হেরি প্রভাত-অরুণে তরুণ লাবণি খানি,
কোন্ অজানার দেশে ডাকে মোরে হাতছানি।
ওই মধ্য তপনে রক্ত রবির ফাগে,
তব বাসনা-বাসিত মোহন মুরতি জাগে।
ম্লান সান্ধ্য গগনে আগুনে ঢাকিয়া ছায়া,
তব রক্তিমময় চুম্বন পায় কায়া।
যবে অন্ধকারের দ্বন্দ্ব অকূলে নাচে,
মম বেদনা হাসিয়া তোমারে নীরবে যাচে।

এই চন্দ্রধৌত স্পন্দন হীন হাসি,
হেরি ক্রন্দন যায় নন্দন-নীরে ভাসি।
তুমি তারায় তারায় রয়েছ জড়ায়ে মোরে,
আমি মরিয়া বেঁচেছি তোমার প্রেমের ঘোরে।
তুমি দেবতার বেশে পরেছ অর্ঘ্য-মালা,
পুন ভক্তের সাজে হাতে বরণের থালা।
তুমি সীমার মাঝারে কহ অসীমের বাণী,
আমি মনয়ার চুমে পেয়েছি পরশখানি।
আজি মিলন কাঁদিছে হেরি বিরহের শোভা,
মম অন্তর আছে অন্তর তরে ডোবা॥

ভূমিকম্প

অধ্যাপক শ্রীকমলকৃষ্ণ ঘোষ, এম্‌-এ, (চট্টগ্রাম)

"ঝম্ফ ঝম্ফ ভূমিকম্প
নাগকূর্ম্ম নড়িছে।...
রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড
বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
ঢুলুঢুল কুলকুল
ব্রহ্মডিম্ব ফুটিছে।"

—ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল'

"প্রলয়নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ।"

—রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকম্পের নামে কাহার না আতঙ্ক উপস্থিত হয়? ভূমিকম্পের কম্পনে বীরগণেরও হৃৎকম্প ঘটে। পশুশ্রেণীর মধ্যেও ঠিক্ এই একই আতঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। Humboldt বলেন যে, শূকর এবং কুকুর-জাতি ভূমিকম্পের প্রভাবে অত্যন্ত আবিষ্ট হইয়া পড়ে, এবং তিনি আরও বলেন যে, এমন কি মূক কচ্ছপগণও জলাশয়ের বিক্ষুব্ধ শয্যা ত্যাগ করিয়া বনমধ্যে আর্ত্ত চীৎকার করিতে করিতে ধাবিত হয়।

এই আতঙ্ক Humboldt এইরূপে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—"বিগত যুগের কোন ঐতিহাসিক বিপদের স্মরণে এই আতঙ্কের উৎপত্তি নহে; এই আতঙ্কের উৎপত্তি পৃথিবীর স্থাবরতা সম্বন্ধে আমাদিগের প্রাচীন বিশ্বাসের ধ্বংস হইতে। আশৈশব আমরা চঞ্চল জলরাশি ও স্থাবর ভূমি—উভয়ের পার্থক্য দেখিয়া আসিতেছি। আমাদিগের জ্ঞানবুদ্ধি এই পার্থক্য সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যখন অকস্মাৎ আমাদিগের পদতলে পৃথিবী দুলিতে থাকে, প্রকৃতির মধ্যে এক অপরিজ্ঞাত, রহস্যময় শক্তি জাগিয়া উঠিয়া আমাদিগের এই স্থাবর ভূখণ্ডকে আন্দোলিত করিয়া দিতেছে ভাবিয়া আমরা শিহরিয়া উঠি—মুহূর্তের মধ্যে আমাদিগের সারা জীবনের একটা মোহ যেন ঘুচিয়া যায়।"

ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে, বিশেষজ্ঞগণের সেই সব মতবাদ আমরা বর্ত্তমান নিবন্ধে আলোচনা না করিয়া পৃথিবীর কতকগুলি বিখ্যাত ইতিহাস প্রসিদ্ধভূমিকম্পের কাহিনী এস্থানে বর্ণনা করিব।

প্লিনি (Pliny) তাঁহার Natural History নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রাচীন যুগের বিখ্যাত ভূমিকম্প সকল বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল বহুদূরব্যাপী প্রাণান্তিক ভূমিকম্পের মধ্যে অন্যতম একটি ঘটিয়াছিল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে, ইহাতে Asia Minor-এর তেরটি সহর একরাত্রের মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। ইহার পরেই আর একটি হইয়াছিল, তাহাতে ইতালীর অধিকাংশভাগই বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অসাধারণ ভূমিকম্প হইয়াছিল লুসিয়াস্ মারকাস্ (Lucius Marcus) ও সেক্সটাস্ জুলিয়াস্ (Sextus Julius), এই দুই কন্সালদ্বয়ের রাজত্বকালে মুটিনা (Mutina) নামক রোমান প্রদেশে। প্লিনি বর্ণনা করেন যে, দুইটি পর্ব্বত এইরূপে ঝাঁকুনি খায় যে তাহারা ভৈরব শব্দ করিয়া ঘন ঘন পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী ও পৃথক্ হয়। সঙ্গে সঙ্গে, দিবা-দ্বিপ্রহরে উহারা অগ্নি ও ধূম উদ্গীর্ণ করে। এই ঝাঁকুনীতে বহু নগর ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, এবং এই সকল নগরের ও তাহাদিগের পরিপার্শ্বের সমস্ত পশু প্রাণ হারাইয়াছিল।

ট্রাজানের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এণ্টিওক্ (Antioch) নগরী বার বার তিনবার ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় যুগের উক্ত দুই শতবর্ষ পূর্ব্বে রোহ্‌ডস্ (Rhodes) নগরে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে সুবিখ্যাত প্রস্তর মূর্ত্তি কলোসাস্ (Colossus) ভূমিসাৎ হয় ও উক্ত নগরের অস্ত্রাগার ও নগরের প্রাচীরের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়।

১১৮২ খৃঃ অব্দে সিরিয়া ও জেরুসালেমের অধিকাংশই এইরূপে ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়া যায়।

এইবার আমরা আধুনিক যুগের সর্ব্ব-প্রথম প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের বিষয় বর্ণনা করিব। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে ইহা ঘটিয়াছিল। ইহা প্রায় চারি মিলিয়ান্ বর্গ মাইল (অর্থাৎ চল্লিশ লক্ষ বর্গ ক্রোশ) ব্যাপী ছিল। ইহার উৎপত্তিস্থল বোধহয় আতলান্তিক মহাসাগরের নিম্নপ্রদেশ ছিল, উপরের স্থলভাগের মত উক্ত সাগরের তরঙ্গমালাও সমধিক পরিমাণে ভূমিকম্পের সংঘাত পায়। এমন কি বহু-স্থানে যেখানে ভূখণ্ডের উপর ভূমিকম্পের কোনরূপ প্রভাব অনুভূত হয় নাই, সেখানে জলের উপর তাহা অনুভূত হইয়াছিল। এই ভূমিকম্প ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা, এই তিন মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার প্রচণ্ডতম আঘাত লাগিয়াছিল ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, পর্ট্‌গালের রাজধানী লিস্‌বন্ সহরে।

এই সহর পূর্ব্বে, ১৫৩১ খৃঃ অব্দে আর একবার ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এবং ১৭৫৫ সালের পরেও আবার তিনবার—১৭৬১, ১৭৬৫ ও ১৭৭২ খৃঃ অব্দে ভূমিকম্প হইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি ১৭৫৫ সালের মত সাংঘাতিক হয় নাই। আমাদিগের আলোচ্য ভূমিকম্পের প্রসঙ্গে এইরূপ

ঘটিয়াছিল যে ১৭৫০ সালের আরম্ভ হইতে, এত অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ নাগরিকগণও তাঁহাদিগের জীবনে সেরূপ অল্প বৃষ্টি পূর্ব্বে পান নাই। কিন্তু একমাস ধরিয়া গ্রীষ্মকাল অসম্ভবরূপ শীতল এবং আবহাওয়া নির্ম্মেঘ ও সুন্দর ছিল। অবশেষে ১লা নভেম্বর সকাল নয়টা বাজিয়া চল্লিশ মিনিট গত হইলে ভূমিকম্পের এক ভীষণ ঝাঁকুনি অনুভূত হয়। ইহা ছয় সেকেণ্ডের অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু আঘাত এত প্রবল হইয়াছিল যে, সহরের প্রত্যেক গির্জ্জা এবং মঠ, রাজপ্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন বিশাল নাট্যমন্দির ভূপতিত হইয়াছিল, এক কথায় বলিতে গেলে, একটিও নাম করার মত অট্টালিকা অক্ষত ছিল না। প্রায় একচতুর্থ-ভাগ বসতবাটী ভূমিসাৎ হইয়াছিল, এবং অতি অল্প করিয়া গণনার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ত্রিশ হাজার ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছিল। স্তূপীকৃত মৃতদেহ ও জীবিতগণের চীৎকার অবর্ণনীয় ছিল; এবং এইরূপ আতঙ্ক হইয়াছিল যে অতি দৃঢ়চেতা ব্যক্তিও তাহার প্রিয়তম বন্ধুকে ভগ্নস্তূপের তল হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে সাহস পায় নাই। "চাচা আপন প্রাণ বাঁচা"— এই হইয়াছিল তখন প্রত্যেকেরই মুলমন্ত্র— এবং সকলেই খোলাস্থানে কিম্বা পথের মধ্যে গিয়া প্রাণরক্ষার চেষ্টায় ছিল। যাহারা কোন যানারূঢ় ছিল, তাহাদিগের মধ্যেই মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ছিল। কিন্তু চালকগণ অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিল। গোধনও অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই দিনে এক উৎসব ছিল বলিয়া গির্জ্জায় গির্জ্জায় বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছিল, এবং সকল গির্জ্জাতেই ছাদ ভাঙিয়া পড়ায় সমবেত জনমণ্ডলী একেবারে জীবন্ত কবরিত হয়। বাহিরের হতাহতের সংখ্যা গির্জ্জাপতনে হতাহতের সংখ্যার তুলনায় কিছুই ছিল না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রথম ঝাঁকুনি অতি অল্পক্ষণস্থায়ী ছিল; কিন্তু অচিরেই পরপর আরও দুইটি ঝাঁকুনি আসে, এবং এই তিন ঝাঁকুনি, অনেকের মতে, একই ঝাঁকুনি ছিল, এবং সর্ব্বসমেত পাঁচ হইতে সাত মিনিটকাল স্থায়ী হইয়াছিল। প্রায় দুইঘণ্টা পরে সহরের তিন বিভিন্ন বিভাগে অগ্নিকাণ্ড হয়। নির্ম্মল আকাশে শীঘ্রই বাতাস উঠে, এবং বায়ুসংযোগে অগ্নির তেজ এত প্রচণ্ড হয় যে, তিন দিনের মধ্যেই সহরটি ভস্মে পরিণত হয়। প্রকৃতির প্রত্যেক বিভাগ যেন মিলিত হইয়াছিল এই সহরের ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। কারণ ভূমিকম্পের প্রথম ঝাঁকুনি সমুদ্রের নিকট হওয়ার দরুণ অনতিকাল মধ্যেই জলতরঙ্গ চল্লিশ ফিট্ উচ্চে উঠিয়াছিল, এবং বন্দরের মুখে জলরাশি সাধারণ উচ্চতা অপেক্ষা পঞ্চাশ ফিট্ অধিক উচ্চে উঠিয়াছিল। চকিতে উঠিয়া, চকিতে নামিয়া গিয়াছিল বলিয়া সহর রক্ষা পাইয়াছিল, নচেৎ জলতলে সহর নিমজ্জিত ও বিলুপ্ত হইত।

জীবিতগণের আতঙ্ক বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সর্ব্বব্যাপী গণ্ডগোল ও লোকাভাববশতঃ মৃতের সৎকার হয় নাই। এবং এক ভীষণ মহামারী ঘটিত, যদি না অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া সমস্ত মৃতদেহ ভস্মীভূত করিত। দুর্ভিক্ষের ভয় ছিল আরও ঘোরতর। কারণ ভূমি-কম্পের পরে তিন দিনের মধ্যেই একছটাক রুটির মূল্য সত্যসত্যই একসের সোনা অপেক্ষা অধিক হইয়া উঠে। সৌভাগ্যক্রমে ধান ও গমের কতকগুলি গুদাম অগ্নি হইতে রক্ষা পাওয়ায় পরে কিঞ্চিৎ পরিমাণে রুটী পাওয়া গিয়াছিল। ইহার পর, লুণ্ঠনের ভয় হইল, এবং অনেকস্থলে লুণ্ঠন হইয়াওছিল। অবশেষে অপরাধীগণকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়ায় তাহা বন্ধ হয়।

ঐ দিন দুপুরবেলা আর এক ভীষণ ঝাঁকুনি ঘটে। তখন বহু অট্টালিকার প্রাচীর সকল আপাদমস্তক প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিভক্ত হইয়া, আবার এমনভাবে সংযুক্ত হইয়া যায় যে তিলমাত্র চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় নাই। ১লা এবং ৮ই নভেম্বরের মধ্যে গণনায় সর্ব্বশুদ্ধ বাইশটি ঝাঁকুনি হয়।

লিস্‌বন্ হইতে এক মাইল দূরে নদী-বক্ষোপরে একটি নৌকার আরোহীগণ অনুভব করিয়াছিল যে,যেন কোন ভূখণ্ডের সহিত নৌকাটি আসিয়া সশব্দে আঘাত পাইয়াছে, যদিও তখন নৌকাটি ছিল গভীর জলমধ্যে; আর নৌকা হইতে তাহারা দেখিতে পাইয়াছিল যে টেগাস্ নদীর দুধারে অট্টালিকা সকল ভূমিসাৎ হইতেছে। এক তীব্র উত্তর বায়ু সঞ্চালিত ধূলিরাশিতে জল ভরিয়া গিয়াছিল আর সূর্য্য একেবারে ঢাকিয়া গিয়াছিল। নৌকা তীরে পৌঁছাইলে জলপ্লাবনে উহা একেবারে উচ্চ ভূখণ্ডের উপর বাহিত হইয়া-ছিল। সেখান হইতে তাহারা দেখিল যে দুই ক্রোশ দূরে বায়ু এবং স্রোতের প্রতি-কূলেও সমুদ্র প্লাবনের বেগে অগ্রসর হইতেছে; টেগাস্ নদীর গর্ভ বহুস্থানে উপরে ঠেলিয়া উঠিয়াছিল, এবং পোতসকল নঙ্গরচ্যুত হইয়া পরস্পরে এইরূপ আঘাত করিয়াছিল যে উহাদিগের নাবিকগণ বুঝিতে পারে নাই যে তাহারা স্থলোপরে না জলোপরে। একটি পোতের অধ্যক্ষ খবর দেন যে, সমুদ্রের মাঝে পঞ্চাশ লিগ্ দূরে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি এত ভীষণ লাগিয়াছিল যে পোতের ডেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁহার মনে হয় যে, তাঁহার হিসাবের ভুল হওয়ার দরুণ তিনি শৈলখণ্ডের উপর আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

এই প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প সম্বন্ধে, লিস্‌বন্ হইতে চল্লিশ ক্রোশ দূরে এবং সমুদ্রের এক ক্রোশ অন্তর্গত Colares নামক স্থান হইতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।—অক্টোবর মাসের শেষদিনে আবহাওয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, এবং কালোপযোগী উত্তাপ অপেক্ষা অসম্ভব রকম অধিক তাপ ছিল।

অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় কুয়াশা উঠিয়াছিল। কুয়াশা সমুদ্র হইতে উঠিয়া সমস্ত উপত্যকা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, বৎসরের এমন সময় এরূপ কুয়াশা অস্বাভাবিক ছিল। শীঘ্রই বাতাস পূর্ব্ব দিকে গতি পরিবর্ত্তন করে, এবং কুয়াশা পুনরায় সমুদ্রাভিমুখে ফিরিয়া একত্রিত হইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠে। এই কুয়াশা কাটিয়া গেলে, সমুদ্র ভৈরব হুঙ্কারে স্ফীত হয়। প্রশান্ত আকাশ লইয়াই পয়লা নভেম্বর প্রভাত হয়, বায়ুগতি পূর্ব্বাভিমুখে বহিতে থাকে। কিন্তু প্রায় নয় ঘটিকার সময় সূর্য্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে আরম্ভ হয়, এবং অর্দ্ধঘণ্টা পরে বজ্রনির্ঘোষের মত এক গম্ভীর 'গুরু গুরু' শব্দ শ্রুত হয়। এবং এই শব্দ এতদূর বৃদ্ধি পায় যে উহা বৃহত্তম কামান গর্জ্জনের অনুরূপ হয়। তৎক্ষণাৎ ভূমিকম্পের এক ঝাকুনি অনুভূত হয়; এবং ইহার পরে, পর পর দুইটি ঝাঁকুনি, এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বত সকল হইতে অগ্নিশিখা নিঃসৃত হয়। এই তিনটি ঝাঁকুনিতে গৃহের প্রাচীর সকল পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে দুলিয়াছিল। আর এক স্থানে যেথান হইতে দূরে সমুদ্রতীর দৃষ্ট হইত, ফোজো (Fojo) নামক এক শৈলগাত্র হইতে প্রভূত পরিমাণে ঘন কিন্তু পাংশুবর্ণ ধূম উত্থিত হইয়াছিল। এই ধূম চতুর্থ ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে পড়িয়াছিল, এবং আরও কিছুক্ষণ অল্পাধিক পরিমাণে চলিয়াছিল। পৃথিবীর গর্ভ হইতে যেমনি গম্ভীর গর্জ্জন ধ্বনি উত্থিত হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ফোজো পর্ব্বত হইতে ধূম উদ্গীর্ণ হয় এবং ধূমের পরিমাণ শব্দের পরিমাণের অনুপাতে হয়। কিন্তু যেথান হইতে ধূমোদ্গীর্ণ হইতেছিল, সেথানে কিম্বা তাহার সন্নিহিত স্থানে কোনরূপ অগ্নির চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।

ভূমিকম্পের পর বহু নির্ঝর শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, আবার বহু নির্ঝরের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহারা আদিম উৎসে ফিরিয়া গিয়াছিল। যে সকল স্থানে কোনরূপ জল ছিল না, ভূমিভেদ করিয়া সে সকল স্থানে নির্ঝরধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, অনেকগুলি নির্ঝর প্রায় বিশ ফিট্ উর্দ্ধে স্ফীত হইয়া উঠে এবং নানা রঙের বালু উদ্গীর্ণ করে। শৈলগাত্র বিদীর্ণ হইয়াছিল, ভূপৃষ্ঠেও ফাটল ধরিয়াছিল এবং সমুদ্রতটস্থ পর্ব্বত হইতে বৃহদাকার শিলাখণ্ড সকল সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

অনেকের ধারণা যে, এই ভীষণ ভূমিকম্প একমাত্র লিস্‌বন্ নগরেই ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। ইহার তাণ্ডব নৃত্য দেশ বিদেশে প্রসারিত হইয়াছিল—স্পেনের রাজধানী ম্যাড্রিড্ (Madrid), স্পেনের বন্দর কেডিজ্ (Cadiz), জিব্রালটার, জার্ম্মানী, হলাণ্ড, গ্রেট্ ব্রিটেন্ ও আফ্রিকা, এই সকল স্থানেই এই ভূমিকম্পের প্রকোপ অনুভূত হয়, এবং অধিকাংশস্থানেই গুরুত্ব ও ধ্বংসকাণ্ড প্রায় লিস্‌বনেরই অনুরূপ হয়। আমরা এইবার সেই সকল দেশের এই ভূমিকম্পের লীলা অল্পে বর্ণনা করিব।

লিস্‌বন্ হইতে প্রায় দশক্রোশ দক্ষিণে সেণ্ট ইউবিস্ (Saint Ubes) বা সেটুবেল (Setubel) নামক বন্দর-সহর ঘন ঘন ঝাকুনিতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। নগরের পশ্চিমপ্রান্তে শৈলমালাসমন্বিত যে অন্তরীপ আছে, সেথান হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড খসিয়া পড়িয়াছিল।

স্পেনের বন্দর কেডিজ (Cadiz)-এ এই ভূমিকম্প পয়লা নভেম্বর প্রাতঃকালে নয়টা তিন মিনিট্ গত হইলে আরম্ভ হয় এবং পাঁচ মিনিটকাল স্থায়ী হয়। আরম্ভের সময় আবহাওয়া অসম্ভবরূপ সুন্দর ছিল। এথানের অট্টালিকা সকল অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে গঠিত ছিল বলিয়া এদেশে সমস্ত গৃহ ভূমিসাৎ হয় নাই। নগরের অধিবাসিগণ স্ব স্ব গৃহ ও গির্জ্জা পরিত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত স্থানে আশ্রয়ের জন্য আসিলে তাহারা সম্মুখেই এক নূতন বিপদের মুখে পড়ে। এগারটা বাজিয়া দশ মিনিট গত হইলে সমুদ্রের প্রায় চারি ক্রোশ দূর হইতে একটি উত্তাল তরঙ্গ আসিতেছে দেখা যায়, এবং স্বাভাবিক উচ্চতা অপেক্ষা উহার উচ্চতা অন্ততঃ ষাট্ ফিট্ অধিক ছিল। এই তরঙ্গ আসিয়া নগরের পার্ব্বত্য পশ্চিম ভাগে সবেগে নিপতিত হয়। যদিও তরঙ্গবেগ এইরূপে প্রতিহত হয়, তথাপি ইহা নগরপ্রাচীরবর্ত্তী হয় এবং জল হইতে ষাট্ ফিট্ উচ্চ নগরপ্রাচীরের মধ্যস্থানে আঘাত করে এবং প্রায় আট হইতে দশ টন ওজনের অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূরে নিক্ষেপ করে। প্রায় সাড়ে এগারটার সময় দ্বিতীয় তরঙ্গ আসে, এবং উপর্য্যুপরি আরও চারিটি ঠিক্ একই আয়তনের তরঙ্গ আসে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ অল্পাধিক আয়তনের তরঙ্গাঘাত চলিতে থাকে। কতিপয় প্রদেশ ব্যতীত স্পেনের সর্ব্বত্রই এই ভূমিকম্পের প্রকোপ বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

ম্যাড্রিডে সকাল দশটার অল্প পরেই কম্পন বিশেষভাবে অনুভূত হয় এবং প্রায় পাঁচ ছয় মিনিটকাল স্থায়ী হয়। প্রথমে লোকেরা মনে করে যে তাহাদের শিরোঘূর্ণন রোগ ধরিয়াছে, এবং গির্জ্জারও সকলের মনোভাব এইরূপ হয়, আর এত অধিক ভয় হয়, যে বাহিরে আসিবার চেষ্টায় লোকেরা পরস্পরের পদতলে দলিত হইয়াছিল। যাহারা শকটারোহণে ছিল, তাহারা কম্পন বিশেষ অনুভব করে নাই, এবং পদচারিগণ আদৌ অনুভব করে নাই।

জিব্রাল্‌টারে ম্যাড্রিডের প্রায় একই সময়ে কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। প্রথমে, ভূগর্ভের মধ্যে মৃদুস্পন্দন আরম্ভ হয়, ইহা প্রায় আধ মিনিট স্থায়ী হয়। ইহার পরেই একটী ভীষণ ঝাঁকুনি আসে, এবং পরে ভূগর্ভের মধ্যে আর এক মৃদু কম্পন আরম্ভ হয়, ইহা

পাচ ছয় মুহূর্ত্ত স্থায়ী হয়। ইহার পর আর একটি ঝাঁকুনি আসে, কিন্তু ইহা প্রথমবারের মত প্রচণ্ড ছিল না এবং ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় দুই মিনিট কাটিয়া যায়। পৃথিবী দোলায়মান ছিল এবং নগরের অধিকাংশ অধিবাসীর শিরোঘূর্ণন রোগ হইয়াছিল; অনেকে ভূলুণ্ঠিত হইয়াছিল, অনেকে হতভম্ব হইয়াছিল এবং সাগরোপকূলের ছোট ছোট পোত ও নৌকা সকল এবং বহুসংখ্যক ছোট ছোট মৎস্যও তীরের উপরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

আফ্রিকাতেও এই ভূমিকম্প ইউরোপ মহাদেশের মত প্রচণ্ডভাবে অনুভূত হয়। এ্যাল্‌জিয়ার্স (Algiers) নগরের বহু অংশ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। ফেজ্ (Fez) রাজ্যের অন্তর্গত আরজিল্লা (Arzilla) নামক সহরে সকাল দশ ঘটিকার সময় সমুদ্র হঠাৎ এত বেগে স্ফীত হয় যে ইহা বন্দরের একটি পোতকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছিল এবং ভূপৃষ্ঠে এত বেগে নিক্ষেপ করিয়াছিল যে ইহা খণ্ড খণ্ড হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়। মরোক্কো (Morocco) সহরে বহু ব্যক্তি ধ্বংসস্তূপে প্রোথিত হইয়াছিল। ট্যান্‌জিয়ার-এ ভূমিকম্প বেলা দশটায় আরম্ভ হয় এবং দশ হইতে বার মিনিটকাল স্থায়ী হয়।

এই ভীষণ ভূমিকম্পের প্রকোপ আফ্রিকার কত দক্ষিণে অনুভূত হইয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না, কারণ ঐ সকল দেশের অসভ্য বর্ব্বর অধিবাসিগণের নিকট হইতে এই ভূমিকম্পের কোনরূপ সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। তবে ইউরোপের উত্তরে নরওয়ে সুইডেন পর্য্যন্ত ইহার প্রকোপ অনুভূত হয়। নরওয়েতে বহু নদী ও হ্রদের জল ভীষণরূপে আলোড়িত হয় এবং সুইডেনের বহু প্রদেশে কম্পন অনুভূত হয়।

জার্ম্মানী ও হল্যাণ্ডেও এই সুবিখ্যাত ভূমিকম্পের প্রকোপ অনুভূত হয়। রাইন্ নদীর জল ও বহু পরিখা ভীষণরূপে আলোড়িত হয়। ইংলণ্ড ও স্কট্‌ল্যাণ্ডের হ্রদ ও পরিখায় ঠিক এই প্রকার আলোড়ন ঘটে।

আমরা এইবার অপরাপর আরও কতকগুলি ভূমিকম্পের তালিকা দিব—

১৭৮৩ খৃঃ অব্দে এক ভীষণ ভূমিকম্প সিসিলি ও ক্যালাব্রিয়া (ইটালীর দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশ) ধ্বংস করে। ১৮৩৬ ও ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ক্যালাব্রিয়ায় আবার ভূমিকম্প হয়। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের ভূমিকম্পের ফলে ক্যালাব্রিয়া, দুই ভাগে Upper ও Lower Calabria-য়, বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

১৮২২, ১৮৩৫ ও ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে আমেরিকা মহাদেশের অন্তর্গত চিলি দেশে প্রবল ভূমিকম্প হয়। ফলে, ঐ স্থানের সমুদ্রের জল অপসৃত ও উভয়পার্শ্বের সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান সমূহের একশত মাইল ভূমি উন্নত হয়।

১৮২৯ খৃঃ অব্দের ১৩ই জুন ভারতবর্ষের গুজরাটের অন্তবর্ত্তী কচ্ছ প্রদেশে এক প্রবল কম্পন হয়। এই কম্পনের ফলে কচ্ছের রাজধানী ভুজনগর ধ্বংস হয় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ১৬ মাইল স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া নিম্নতম খাদে পরিণত হয়।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে দক্ষিণ ইতালীতে এক ভীষণ কম্প হয়।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা (Manilla) ভূমিকম্পে প্রায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। পুনরায় ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ম্যানিলায় আবার ভূকম্প হইয়াছিল ও দশ সহস্র অধিবাসী মৃত্যুমুখে পড়ে।

১৮৬২ খৃঃ অব্দে চট্টগ্রামে এক প্রবল ভূমিকম্প হয়, ইহার ফলে চট্টগ্রাম ও তদঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের বহু পরিবর্ত্তন ঘটে।

১৮৬৮ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে এক ভীষণ ভূমিকম্পে ইকুয়েডর (Ecuador) ও পেরু (Peru) বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

এই বৎসরে ইংলণ্ডেও কতিপয় ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি অনুভূত হয়।

১৮৭১ খৃঃ অব্দের ইংলণ্ডের উত্তরে ভূমিকম্পের সামান্য ঝাঁকুনি অনুভূত হয়।

১৮৭২ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে স্কট্‌ল্যাণ্ডের বহু স্থানে ভূমিকম্প হয়।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ১২ই জুন তারিখে উত্তর বঙ্গ ও আসাম প্রদেশে ভূমিকম্প হয়। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে উহা লিস্‌বনের ভূমিকম্পকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এই ভূমিকম্পে ষোল লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র বর্গ মাইল পরিমিত স্থান প্রবল বেগে আন্দোলিত হইয়াছিল।

১৯২৩ খৃঃ অব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জাপানে এক প্রবল ভূমিকম্প হয়। এই প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশত সাতজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত, একশত পাঁচ কোটি পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হয়। বিশেষজ্ঞগণের মতে এই ভূমিকম্পের কারণ হইতেছে যে, জাপানের রাজধানী টোকিয়ো হইতে ৬৫ মাইল দক্ষিণস্থ উপসাগরের তলদেশ ধ্বসিয়া যাওয়াতেই এই প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল।

১৯৩৪ খৃঃ অব্দের ১৫ই জানুয়ারী উত্তর-বিহার প্রদেশে এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। ইহাতে প্রায় সমস্ত বিহার বিধ্বস্ত হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণের মতে, হিমালয় পর্ব্বতের অবয়ব বৃদ্ধির ফলেই এই প্রবল ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।

তারপর, তালিকায় সর্ব্ব নিম্নে, কিন্তু সংহারিণী শক্তিতে আদৌ সর্ব্বনিম্নে নহে ১৯৩৫ খৃঃ অব্দের ৩১শে মে রাত্রি তিন ঘটিকার সময় প্রসুপ্ত কোয়েটার রঙ্গমঞ্চে ভূমিকম্পের যে প্রলয় নাচন হইয়া যায়।

ভূমিকম্প এইরূপ প্রলয়ঙ্কর হইলেও ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ভূপৃষ্ঠসংরক্ষণের জন্য উহা একান্ত প্রয়োজনীয়। অবিশ্রান্ত সমুদ্র

তরঙ্গাঘাতের জন্য পৃথিবীর মহাদেশগুলির প্রান্তভাগ সকল এবং বৃষ্টিপাত ও নদীর স্রোতের জন্য অন্তর্বর্ত্তী ভূভাগ সকল ক্রমশঃই হ্রাস পাইত, যদি না ভূগর্ভস্থ শক্তিপুঞ্জের পুনঃসৃষ্টিশীলতা (reproductive energy) থাকার দরুণ সমুদ্রের আক্রমণ ব্যাহত হইত। এইরূপেই শুষ্কভূমির অস্তিত্ব রক্ষা পাইয়াছে। একজন লেখক ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন যে, সমুদ্রতলে যুগ যুগ সঞ্চিত মৃত্তিকা হইতে আমাদিগের বনরাজি ও ক্ষেত্রসমূহ তাহাদিগের প্রাণশক্তি আহরণ করে; আমাদিগের কয়লা ও অপরাপর বহু ধাতু সামগ্রী ঠিক এইরূপে যুগব্যাপী নিমজ্জনের ফলে আমাদিগের ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে। যে সকল সামগ্রী দিয়া আমরা আমাদিগের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করি, তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলিই এক সময়ে সমুদ্রতলদেশে নিমজ্জিত থাকার ফলেই আমাদিগের ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে। অতএব পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের বৃদ্ধিতে ভয় না পাইয়া এই শক্তির হ্রাসই আমাদিগের ভয়ের কারণ হওয়া উচিত। স্যার চার্লস্ লায়েল্ (Sir Charles Lyoll)-এর মতে, একমাত্র সুরাহা হইতেছে এই যে, ভূমিকম্প কয়েক যুগ ধরিয়া কোন কোন বিশিষ্ট প্রদেশে ঘটিলেও, ভূমিকম্প-বলয় স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং আবার কয়েক যুগ ধরিয়া, যে সকল প্রদেশ ইহার উপদ্রব ভোগ করে নাই, তাহারাই পর্য্যায়ক্রমে ইহার প্রলয়ঙ্কর লীলাখেলার প্রধান রঙ্গমঞ্চ হয় ও পূর্ব্বকার রঙ্গমঞ্চগুলি কিয়ৎকালের জন্য বিশ্রাম লাভ করে।*

* অধুনা দুষ্প্রাপ্য "A Hundred Wonders of the World" (Edinburgh, William P. Nimmo & Co. 1881.) By John Small. M. A.—পুস্তক হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অধিকাংশই রচিত হয়। শ্রী-ক।

সম্পাদকীয়

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু বি এ,

যে শ্রেণীর লোক চেয়ারে বসে মনে করে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক—পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা একলা তার দ্বারাই হওয়াই সম্ভব, এবং যে কোন লোককে তোলা ও নামানো শুধু তার ইচ্ছার অপেক্ষা—আমি হলুম সেই ক্লাসের লোক। আমি সম্পাদক। আমি এবং আমরা বলে থাকি কোন গল্পের মাথার ব্র্যাকেটে সত্য-ঘটনা লিখে দিলেই তাকে সত্য বলে মেনে নিতে আমরা নারাজ, ঘটনা শুধু সত্য হলে চলবে না, বিশ্বাস্যও হওয়া চাই।

কাজেই সেদিন বিকেলবেলা লেখকবাবুদের এক এক কাপ চা দিতে ব'লে যখন পূজা-সংখ্যার বিচিত্র আয়োজনের যোগাড় করতে বসলুম তখন আশা করছিলুম নূতনতর একটা কোন খবর পেতে পারব। সারদা বললে, আমি একটা মজার চিঠি পেয়েছি। চিঠিটা সত্যি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেখুন এথেকে যদি কোন গল্প লেখা চলে, তাহলে লিখতে সুরু করি।

চিঠিটা হাতে ক'রে নিলাম। দীর্ঘ আটপাতার চিঠি, খাঁটি মেয়েলি ছাদে লেখা (মেয়েলী ছাঁদে বললুম এইজন্য যে অনেক মেয়েদের লেখা অবিকল রাবীন্দ্রিক ধাঁজের দেখেছি), চিঠির তলায় নাম লেখা আছে 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। নিতান্ত সেকেলে নাম। তা হোক্। যৌবনের উচ্ছ্বাস এবং চিঠির অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় প'ড়ে বয়সটা যে নিতান্ত একালের সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

চিঠিটা পড়বার আগে জিজ্ঞেস করলাম, পেলে কোথায়?

বললে, হাইকোর্টের করিডোরে, বার-লাইব্রেরী থেকে এটর্নী-লাইব্রেরী অবধি যে সরু রাস্তাটা চ'লে গেছে, যেথান দিয়ে পঞ্চাশহাজারী লক্ষপতি ক্রোড়পতিরা নিত্য পদব্রজে যাতায়াত করে, বাবুর্চ্চিরা চা বানায়, তারই একধারে।

খামখানাও দেখলাম, নাম লেখা শ্রীচণ্ডীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আর রেলের কর্ম্মচারীর ঠিকানা। খামে ছাপ পড়েছে শিবপুর পোষ্ট-অফিসের।

চিঠিটা আগেই বলেছি প্রকাণ্ড সমস্তটা তুলে দেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া আমরা বেছে নিই সেইটুকু যেটুকু লোকের কাছে বিশ্বাস্য ব'লে মনে হবে, যেটুকু একেবারে অবিশ্বাস্য—কোন মেয়ে কোন পুরুষকে কখনো কোন কালে লিখতে পারে ব'লে লোকে ভাবতে পারবে না, সে সব অংশ সযত্নে পরিহার করতে হবে।

সুরু হয়েছিল এইভাবে—

প্রিয়তম

প্রাণের চণ্ডীপ্রসাদ

আমার চিঠি যখন গিয়ে পৌছবে তোমার কাছে তখন হয়ত তুমি মাল ওজন করাচ্ছ। তখন পড়বে না, একপাশে রেখে দেবে, অবসরমত পড়বে বলে। তারপর হয়ত ভুলে চ'লে যাবে ফেলে, আর কোনো লোকের হাতে গিয়ে পড়বে আর আমার হবে সর্ব্বনাশ। কুলবধূ আমি স্বামীই না হয় ত্যাগ করেছে তবু যে ভায়ের আশ্রয়ে এসে উঠেছি, আমার কলঙ্কের কাহিনী প্রকাশ পেলে হয়ত সেটুকুও আমার ঘুচবে, একেবারে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, প্রখর রোদে, সহস্র লোকের কলুষিত দৃষ্টির সামনে। তবুও দুঃখ করব না,

বঁধু, তোমার লাগিয়া কলঙ্কিনী নাম
কিনিব ব্রজেরি মাঝে।

বিকেল বেলা কাপড় কেচে যখন ছাতে উঠি, দেখি তুমি আমারি আশা-পথ চেয়ে

দাঁড়িয়ে আছ। তোমায় আমায় এই যে চিঠি লেখালেখি চল্‌ছে, আমাদের বাড়ীর কেউই জানে না। শুধু বলেছি একতলার ভাড়াটেদের বৌকে। একজনকে না ব'লে কি করে থাকি? ভেবো না, সে মরে গেলেও প্রকাশ করবে না, তারও যে গোপন খবর আমি জানি।

যেদিন তোমার চিঠি পাব, সেদিন আমি কেবলি ঘুরব ছাতে অস্থির হয়ে, ময়ূরের মতন হৃদয় যে আমার নাচ্‌বে। যেদিন চিঠি দোব সেদিন থাকব স্থির, সন্ধ্যাতারাটির মতন অচঞ্চল। তুমি বুঝে নিয়ো। তোমারো এই ধরণের একটা কোনো ইসারার কথা লিখে জানিয়ো, যাতে আমি জানতে পারি।

তোমার পাঠানো মনিঅর্ডার সেদিন পেয়েছি, তুমি যে আমার দেওরের নাম-ঠিকানা লিখেছ খুব ভালো হয়েছে। এই সপ্তাহে আরো কিছু টাকা পাঠিয়ো। পাঁচ হয় দশ হয়। জানো ত আমার কত খরচ? তুমি রাগ কোর না। একবার টাকা চাইতে রাগ ক'রে চিঠি দাও নি। কিন্তু বন্ধু, টাকা ছাড়া জীবনের কোন্ আনন্দ সংগ্রহ করতে পারো।

একতলার বৌটি—চামেলী—সেও এই রকম টাকা পায়।

তুমি এক কাজ করতে পারো। আমাদের বাইরের ঘরখানা ভাড়া দেওয়া স্থির হয়েছে, তুমি একে তোমার বৈঠকখানা করতে পারো। তাহলে কলে-কৌশলে তোমাকে চোখের দেখা অনেকবার দিতে পারি।

ধন নয় মান নয়
কিছু ভালোবাসা,
করেছিনু আশা।

যাকে ভালোবাসি তাকে যদি দেখ্‌তেই না পেলাম, যাকে দেখ্‌তে পেলাম তাকে যদি কাছেই না পেলাম, যাকে কাছে পেলাম তাকে যদি মনপ্রাণ সমর্পণ করতেই না পারলাম—তবে

"কিসেরি বা সুখ ক'দিনের প্রাণ
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম গান
অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট, এবার
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে!"

রীতিমত Ultimatum দিয়ে চিঠি শেষ হয়েছে।

এখন কি করা যায়, সেই হল চিন্তা।

এই সময়ে ঘরে ঢুকলেন কৃষ্ণকিশোর। তাঁকে আমরা ভারী ভক্তি করি, ভয়ও যে না করি তা নয়। সকলের কিশোর দা' তিনি। যেমনি মোটা চেহারা, কামানো দাড়ি-গোঁফ সংযম যেন মূর্ত্তিমান। তাঁকে দেখেই চিঠিখানা ডেস্কজাত করলাম।

ঘরে এসেই আবৃত্তি সুরু করলেন—আবার তোরা মানুষ হ! চায়ে চুমুক দিতে দিতে দাঁড়িয়ে উঠে উত্তেজিত হয়ে তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করলেন—ও ছাইপাঁশ গল্পপদ্য লিখে দেশের হচ্ছে কি? কটা ছেলেকে মানুষ ক'রে তুল্‌তে পারছিস্? দেশ যে গেল উচ্ছৃঙ্খলতায়, ছেলে-মেয়েগুলোর পরকাল যে ঝরঝরে হয়ে গেল। তার কি করছিস্?

চিরকুমার কৃষ্ণকিশোর ব্রহ্মচর্য্যের বক্তৃতা একবার ধরলে আর রক্ষা নেই ভেবে আমরা একযোগে বললাম, কিশোরদা, যে ঢেউ এসেছে তাকে রোধ করবার বৃথা চেষ্টা করবেন না। সংযমের বাঁধ ভেঙে অসংযমের বন্যা যদি এলো, ধ্বংসটা ভাল ক'রে হতে দিন; আবার নতুন দেশ, নতুন সমাজ যখন গড়ে উঠবে, তখন কোন গ্লানি হয়ত থাকবে না। কিশোরদাকে থামাবার এইটে হল বাঁধা গৎ। আমাদের মুখস্থই থাকে।

সিনেমায়, রঙ্গমঞ্চে, পার্টিতে, সামাজিক জীবনে, স্কুল-কলেজে অসংযমের স্রোত যদি এসে যায়, যদি হোষ্টেল 'ভবন' 'নিবাস' প্লাবিত ক'রে সে খরস্রোত বাংলার গৃহধর্ম্মও ভাসিয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম করে, তবে তার প্রতিকূলতা করলে বিক্ষোভ আরো বেশী কি রুদ্র হয়ে উঠবে না? কিশোরদা তার জবাব দিতে পারলেন না, শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। তাঁর জীবনের সাধনা ব্যর্থ হবার সূচনা দেখে, তাঁর দীর্ঘদিনের পরিশ্রম অরণ্যে রোদন হবার সামিল দেখে, তিনি নিরুপায়ভাবে চেয়ে থাকেন, দেখে আমাদের কষ্ট হয়।

কিন্তু যতক্ষণ তিনি আমাদের অফিসে উপস্থিত থাকেন, কোন নারীর রূপচর্চ্চা হবার উপায় নেই, পাশের বাড়ীর জানলা দিয়ে বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েদের যে আনাগোনা চলে সেদিকে চোখ ফেরাবার উপায় নেই, এমন কি বায়স্কোপের তারকাদের সূক্ষ্মবেশ-পরিহিত নগ্নতার চেয়েও উগ্রমূর্ত্তির ব্লকের ছাপা পরীক্ষা ক'রে নেবার উপায় নেই।

ভাবলাম, আজকের চিঠিখানা তাঁকে দেখাই। সারদাকে চুপি চুপি বললাম। সারদা বললে খেপেছেন? এখনি আগুন হয়ে উঠবেন, হয়ত ছুটবেন তক্ষনকার বাড়ীর অভিভাবকদের সাবধান ক'রে দিতে। ও দুর্ব্বাসাকে আর চটিয়ে কাজ নেই!

এর কিছুদিন পরে শিবপুরের সেই বাড়ীটাও খুঁজে বার করা গেল, খানিকটা দূরের এক বাড়ীতে উঠে মেয়েটির ছাদ ও মেয়েটিকেও দেখতে পাওয়া গেল।

দূরবীন ক'সে দেখলাম, মন্দ নয়। বেশ বড় বড় চোখ, সুন্দর মুখশ্রী, মনোরম ভঙ্গী। তাদের বাড়ীর ছাদ ঘেঁসে নারকোল-গাছ উঠেছে, তার চেরা পাতাগুলো হাওয়ায় দুলছে, তার নীচে মেয়েটি—না, সেই বধূটিকে মন্দ দেখাচ্ছিল না।

আমরা দূরবীন লাগিয়েছি চোখে, দেখে, সে হাস্‌লে এবং নির্লজ্জের মতন ছাদের আরো এধারে স'রে এল।

ঐ যে আর একটা ছাদে একটা মোটা মতন শ্যামবর্ণ লোক পায়চারী করছে—ঐ নিশ্চয় চণ্ডীপ্রসাদ। কাছাকাছি অন্য ছাদে যেসব পুরুষ উঠেছে তারা সকলেই ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, কিন্তু চণ্ডীপ্রসাদ—সারদা বল্‌লে, বেটা চণ্ডীপ্রসাদ!

চিঠি একখানাই পাওয়া গেছল, আর ত পাওয়া যায়নি, এখন ব্যাপারটা কতদূর অগ্রসর হয়েছে আমাদের জান্‌বার উপায় নেই।

যার বাড়ী ওঠা গেছল, সে সারদার বন্ধু, নাম ব্রজেন। সে বল্‌লে, ও ব্যাপার পাড়ার লোকের কারুরই জান্‌তে বাকী নেই, মানে ঐ মেয়েটা মোটেই ভালো না। আপনাদের পাড়ার সতীশ মিত্তির এখানে আস্‌তেন সূর্য্যমুখী বলে একটা নার্সের কাছে, তিনি আজকাল ঐ বাড়ীতে আনাগোনা করছেন। চণ্ডেটা বোধ হয় এখনো সুবিধে করতে পারেনি।

সারদাকে বলি, মাঝে মাঝে ব্রজেনের কাছ থেকে খবরটা নিয়ো, কি রকম কি চল্‌ছে।

কথাটা শুন্‌তে পেয়ে—কিশোরদা বলেন, নিশ্চয় কোনো নোংরা খবর, তাই দূত পাঠানো হচ্ছে। তোমাদের লজ্জা করেনা, কাগজের এডিটর হয়েছ তোমরা, কি বিরাট্ দায়িত্ব তোমাদের, কোথায় ভালো ভালো খবর দিয়ে দেশকে উদ্বুদ্ধ করবে, তা-না কু-সংবাদ ছাপিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে পরিপক্ক ক'রে তুলছ!

বল্‌লাম, কিশোরদা ছাপাবনা আমরা কিছু, আমরা শুধু সংবাদ সংগ্রহ করছি।

এর পনেরো দিন পরে ব্রজেন এল আমাদের অফিসে খবর দিতে। বল্‌লে—বল্‌ব কি মশায়, যত পাজী হচ্ছে মেয়েটার দাদাটা। সেটা একটা রাস্কেল, সেই লোক জোটায়। চণ্ডী ছোঁড়াটাকে বাড়ীতেই থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে, মাসে যা উপায় করে, যথা সর্ব্বস্ব সে বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতে তুলে দেয়। টাকা রোজগারের ভালো ফন্দী বার করেছে। মানি, এ দুটো না হয় বদমাইস্, কিন্তু সেই স্কাউণ্ড্রেল দাদাটা যদি প্রশ্রয় দেয়, নিজের মায়ের পেটের বোন্, বলেন কি মশায়? পয়সাও আছে ওদের তাছাড়া গুণ্ডা, কে বল্‌বে কে করবে? চোখের সামনে মশায় এমন অনাচার চল্‌ছে যে সওয়া যায়না। আবার নীচের এক ঘর ভাড়াটে আছে, তাদের চামেলী ব'লে একটা বৌ আছে, এই দাদাটা বুড়ো হয়ে মরতে চল্‌ল—

'আবার তোরা মানুষ হ!'—কিশোরদার গলা পাওয়া গেল। আশ্বস্ত হলাম, এবার সব কথা এঁকে খুলে বল্‌তে হবে। একটা বিহিত না করলে আর চল্‌ছেনা। কিশোর দা ঘরে ঢুক্‌তেই ব্রজেনের মুখ হয়ে গেল পাংশুবর্ণ, আমার কাছে স'রে এসে আস্তে আস্তে বল্‌লে—এই সেই দাদাটা! এ-যে দেখ্‌ছি এখানেও আসে!

কিশোরদা তাকে লক্ষ্য করেন নি, হয়ত চেনেনও না। চা-এর হুকুম ক'রে চেয়ারে যুত্ করে বস্‌লেন।

ব্রজেন ব'লে গেল, আমার কথা বলবেন না। এ যখন এখানে আসে তখন সহজেই শায়েস্তা করতে পারবেন। পুরুষের চেয়ে মেয়ে মহলেই এর প্রসার বেশী। কিন্তু মেয়ে মহলে ঢুক্‌লেই চাবুক দেওয়া উচিত।

বললাম—উনি ত চিরকুমার!

—কে বল্‌লে আপনাকে?

—উনি ত খালি সংযমের কথা আওড়ান!

—তা আওড়াবেন বৈকি।

ব্রজেন হয়ত সত্য কথাই বলে গেল, কিন্তু বিশ্বাস্য কিনা তার বিচার করতে আমি সম্পাদকের চেয়ারে গিয়ে বস্‌লাম।

গান

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

তুমি চলো বেড়াতে প্রিয়, আমার সাথে
আকাশ ভরিয়া গেছে জোচ্ছনাতে!
তা সে থাক্ আকাশে
চোখে লাগ্‌বে না সে—
তোমার আঁখির আলো জাগ্‌বে পাশে।
চোখে লাগ্‌বে না চাঁদ তুমি থাক্‌লে সাথে।
যদি পথে দু-ধারি
দেখি জনতা ভারী,
না হয় চাপ্‌ব মোরা রিক্সা গাড়ী—
চল্‌ব চলে না লোক যে-রাস্তাতে।
চলো লেকের ধারে
নয় গাঙ্গ-কিনারে—
যদি ঠাণ্ডা লাগে যাব এক র‍্যাপারে!
তোমার হাতের তাপ লাগ্‌বে হাতে॥

বিলকুল ঝুট

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সেদিন ক্লাবের চায়ের টেবিলে তর্ক-যুদ্ধ ক্রমেই যেন সঙ্গীন্ হয়ে উঠ্লো।

ক্লাব-যায়গা শ্রীঃক্ষত্র-গোচের, অর্থাৎ সম-ভূমিতে দাঁড়িয়ে উচ্চ-ভাষণের এমন স্থান আর দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যাবে না।

সেকেলে লোকগুলো এর স্পীরিট্টা ধরতে পারে না। তুমি বাবা,—হাকিম আছো, সে তোমার এজলাসে, মঞ্চের তক্তের উপর ব'সে। তখন ব'ল্চি হুজুর; ইয়োর অনর! কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টাই কিছু আড়ষ্ট হ'য়ে কাটানো যায় না! তুমি আর আমি যে একই আদি-মানবের নাতি-পুতি—তার উপলব্ধির একটা ক্ষেত্র থাকা চাই-ই চাই! যেটুকু পার্থক্য, প্রভেদ,—কি বৈষম্য—তা ক্ষণিক! মুখোস খসিয়ে দিলে সবাই এক—একথা মনে করিয়ে দেবার তীর্থক্ষেত্র হচ্ছে ঐ ক্লাব!

* * *

আমাদের পলিটিক্স হচ্ছে—খোস-গল্পের প্রাণারাম বিষয়-বস্তু। যেখেনে যত নিষেধ—সেইখেনেই কণ্ডুতিটা সবচেয়ে তীব্র কিনা! তাই পলিটিক্সটা—একটু অঙ্কিত হ'লেই—ফাঁকে-ফোঁকে বা'র এসে পড়ে!

সেদিনও তাই এসে গেল; নন্কো থেকে একলাফে একেবারে ফাষ্টিংএ! গিরধারী গোপালরাম লাখপতি, অতএব তাঁর মতামতের মূল্য থাক—আর—নাই থাক্—জোর অর্থাৎ কিনা, ফোর্স থাক্বেই থাক্বে! গিরধারী বল্লেন, ফাষ্টিং, ফিষ্টিং—ও-সব বুঝিনে ভাই; জেলে যেতে পারি, জাঁতা ঘোরাতে পারি... কিন্তু খৈনি টিপ্তে না দিলেই চক্ষু চড়ক গাছ···

চতুর্দ্দিকে হাসির রোল উঠলো!

মোতিলাল ধমধমিয়ে বল্লেন, ওই কথাই হচ্ছে আসল কথা! যেমন আসলের চেয়ে সুদ বড়, যেমন ছেলের চেয়ে পোতা পেয়ারা, যেমন রুটির চেয়ে চাট্নি মুখ-রোচক—তেমনি···

ব'লে পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার ক'রে এক টিপ নিয়ে বল্লেন—এই দুনিয়ায় নেশাই হ'লো...বড়া-চীজ্—ওটাকে অতিক্রম করলে, সোতো মহাত্মা বান্ গিয়া···

আবার হাসি চতুর্দ্দিকে।

মোতিলালের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সায়েব, এণ্ট্নি গুড্ লাক্ বল্লেন—ঠিক বোলা লাল্জি, ঠিক বোলা—যেমন পল মাটির উপরে ঘাসের সবুজ, যেমন তরুলতার সবুজের মধ্যে ঘনলাল ফুল—যেমন বামুনের ন্যাড়া মাথায় টিকি—যেমন এক হাত টিকিতে সাদা বক ফুল—তেমনি সাদা বোতলের মধ্যে লাল মদ—ওঃ কি আরাম, কি মজা! টিকির উপর কটাক্ষ থাকায় এন্টুনির উইট্টা গেল মাঠে মারা!

এক-একজন আড্ডার সাগ্নিক থাকে, ইন্ধনের অভাবে আড্ডা দমে যাবে; এ কি হ'লো একটা কাজের কথা?—ক্লাবের লেডিজ ম্যান্—ওরফে মন্ডি মিটার—তাই গলা খেঁকারি দিয়ে বল্লেন, নেশার যে সারেসার তার কথা যদি না আসে তো আজকের সব বিতণ্ডাই হয়ে যাবে বাজে, যাকে এক কথায় আমরা বলি রাবিশ্—

সেটি কিং? গোবর্দ্ধন বর্ম্মণ জিজ্ঞেস করলেন। [বর্ম্মনের সংস্কৃতে দখল ছিল]

মন্ডি মিটার সরু গলায় সুরু করলেন:

এই দুনিয়াটা হ'য়ে যেত একটা সন্ন্যাসীর মঠ যদি না থাক্তো এতে—দি এসেন্স অফ ক্রীয়েশন্। ভারি গলায় মির্জ্জা সেলিম বল্লেন,

ব্রাভো, ব্রাভো! জষ্ট রীচ্ট্ দে ভাইটাল পয়েট!

সরু গলায় মন্ডি সুরু ক'রলেন: নেশা? এর কাছে নেশা?...

ভুজঙ্গভূষণ কোঁয়ার বল্লেন: আরে মোশাই—ওটাই যে একটা নেশা···একটা কেন,—পরম নেশা! আজ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করচি আপনাকে!

বট্, এক পাশ থেকে গুরুজি চীৎকার করলেন:—বট্—নথিং লাইক কালাচাঁদ···

চতুর্দ্দিক থেকে হাসির রোল উঠলো। গুরুজি একজন বিখ্যাত কালাচাঁদের সেবায়েৎ—অর্থাৎ কিনা আফিম খোর···

কিন্তু—প্রিন্সিপ্যাল হর্ষবর্দ্ধন বল্লেন—আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একেবারে একটা সত্যি ঘটনা ব'লচি:—সেটা শোনার পর—আপনারা—রায় দেবেন—যাকে হয়:—

সকলে তাঁর দিকে আগ্রহভরে চেয়ে রইল:—

হর্ষবর্দ্ধন শুরু করলেন: বড় বেশী দিনের কথা বলচিনে—দিন পচিশ আগে, আমি লাহোর যাচ্ছিলুম—ইউপির একটা ষ্টেশনে—বেলা ··টে নাগাৎ গাড়িটা থেমেচে—এমন সময় বিস্তর লটবহর সঙ্গে একজন মুসলমান ভদ্রলোক গাড়িতে চ'ড়তে না চড়তেই ট্রেন গেল ছেড়ে—দুটো চাকর আর কিছু জিনিষ ষ্টেশনে পড়ে রইল।

ভদ্রলোক—গাড়িতে উঠেই এমন ছটফট করতে লাগলেন যে মনে হ'লো—তাঁর পেটে কলিক উঠেছে—

অবশেষে একজন জিজ্ঞাসা করলে—মশাই ব্যাপার কি?

ভদ্রলোকটি বল্লেন, আমার জীবনের অবলম্বন—আফিমের কৌটা—ঐ বেটা চাকরের জিম্মায় ছিল—পরের ষ্টেশনে আমাকে নেমে প'ড়তেই হবে···

একজন ভারিক্কে গোচ যাত্রী বল্লেন বসুন; বসুন—ব্যস্ত হবেন না আমার কাছে ওর ভাল ব্যবস্থাই আছে—

আছে? ব'লে ভদ্রলোক নিজের বিছানাটা তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে দিতে দিতে বল্লেন—আপনারা আমার গোস্তাকি মাফ্ করবেন—আমি দিনে রাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দু' ঘণ্টা ঘুমোই—আর সে এই বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটা,—বিছানা তো পাতা হয়ে গেলো—নিজের কাঁচাপাকা দীর্ঘ দাড়িটিকে স্বস্তির হাত বোলাতে বোলাতে—অতিশয় করুণ স্বরে—তিনি বল্লেন—আপনি তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রবেন কি এখন?

পকেট থেকে একটা ডিবে গোছ কৌটা বার ক'রে তিনি বল্লেন—বে-তরদ্দুদ্—যত পারেন নিন্···আপনার···দয়াতে আমি প্রাণ পেলুম···বল্তে বল্তে তিনি একটা কাবুলি মটরের মত বড় বড়ি তৈরি ক'রে—মুখে জল নিয়ে শুয়ে প'ড়ে হা ক'রে পিল্‌টি মুখে দিতে-না-দিতে—ইয়া আল্লা ব'লে ঘুমিয়ে প'ড়লেন।

গাড়ি শুদ্ধ লোকের উদ্বেগ যেন নিমিষে দূর হয়ে গেল!

যিনি আফিম্ দিয়েছিলেন—তিনি বল্লেন: আমি বিশ বছর ধরে দেখছি এই নেশা ছাড়তে কয়েদিদের সব চেয়ে কষ্ট হয়—এ না পেলে মানুষ মরার মত হয়ে যায়!··· দেখলেন তো ভদ্রলোকের অবস্থা চক্ষের ওপর?···

গাড়ি তীরবেগে ছুটচে শীতকালের সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে:—ক্রমেই গাড়ির মধ্যেও অন্ধকার ঘনিয়ে আসচে—মনে হয় আলো হ'লে বেশ হয়—পরস্পরের মুখ না দেখতে পেলে কি আড্ডা জমে?...

হঠাৎ চমকে দিয়ে সকলকে, চারটে আলো জলে উঠলো—আর সকলের চোখ গিয়ে প'ড়লো সেই ঘুমোন্ত মানুষটির মুখের উপর...স্বপ্নে হাসি হাসি মুখ...

একজন বল্লেন, কিন্তু দেখেছেন আপনারা?

কি?

আফিমের গুলিটি দাড়িতে ঝুলে আছে—মুখের মধ্যে যাবার আগেই ওঁর দারুণ অশান্তি শান্ত হ'য়ে গেছে—শুধু পাওয়ার আনন্দেই!

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে কালাচাঁদ দ্রাক্ষা ফলের মত দাড়ির চুলে ঝুলে আছে।

চতুর্দ্দিকে উঠলো হাসির আর্থকোয়েকের খট্‌খট্ শব্দ!

গুরুজি দাঁড়িয়ে উঠে—বিপুল লাঠিটা মাটিতে সশব্দে ঠুকে বল্লেন: বিল্‌কুল ঝুট হ্যায়—

ইয়া শায়তানি কা কীস্‌সা!

অতি আধুনিক সাহিত্যের ইঙ্গিত

শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য্য, তার সাধনা, তার চিন্তাধারা রূপ নিয়ে দেখা দেয় কাব্যে আর সাহিত্যে, তাই কাব্য আর সাহিত্য এমন এক অপরূপ মাধুর্য্যের সৃষ্টি করে, যা সত্য, শিব ও সুন্দর। সাহিত্যের প্রাণ যে সত্য, তা শাশ্বত, সুতরাং তার প্রাচীনতা বা আধুনিকতা নেই এবং থাকতেও পারে না। সত্যিকার কাব্য ও সাহিত্য তাই বহু শতাব্দীর আবর্ত্তনেও লুপ্ত হ'তে পারে নি। অন্তরের জমাট বাঁধা অন্ধকারেও তার চির-ভাস্বর দীপ্তি সত্য পথের ইঙ্গিত দেয়। এমনি ক'রে হিতসাধন করে ব'লেই নামটা হয়েছে সাহিত্য, নইলে এ নামের কোন সার্থকতাই থাকে না।

বাংলাদেশের অতি আধুনিক সাহিত্যে সত্য, শিব ও সুন্দরের রূপ কত ফুটে ওঠে, অন্তরের সত্যিকার ঐশ্বর্য্যের কতখানি বিকাশ হয়, জাতির মনে কতখানি পুষ্টি ও শক্তি দান করে এবং তার সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য কি অক্ষুণ্ণ থাকে, এইটিই বিশেষ ক'রে ভাববার বিষয়।

প্রেম সত্য বস্তু নিশ্চয়ই, আর এই বস্তুটিকে ভিত্তি ক'রেই কথা-সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে। মানুষের ভিতরে এই বস্তুটি আছে ব'লেই জগৎ তার কাছে এত সুন্দর। এই জন্যই প্রেমের ছবি সব চেয়ে বেশী মনোহর। কথা সাহিত্যের এই মনোহারিত্ব মনে পবিত্রতার ছাপ দিতে যে সাধনা ও সংযমের প্রয়োজন, অতি-আধুনিক কথা-শিল্পীর অনেকেরই তা নেই ব'লেই তাঁদের সাহিত্যে অশুচিতাই ফুটে ওঠে বীভৎসরূপে।

সংখ্যার আধিক্য আর উৎকর্ষ এক বস্তু নয়। অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যের সংখ্যা বেড়ে চলেছে খুবই, কিন্তু শুধু সংখ্যাই যদি উৎকর্ষের মাপকাঠি হয়, তা হ'লে যুক্তি আপনা আপনিই মৌন হ'য়ে পড়ে। সত্যিকার সাহিত্য-সৃষ্টি সহজ ব্যাপার নয়, এ সৃষ্টিতে বহুদিনের সাধনা চাই, শুচিতা চাই, কল্যাণ-সাধনের সত্যিকার প্রেরণা চাই।

ভেজাল খাদ্যদ্বারা দেহের অহিতই হয়, এবং এই অহিতেই দেহের ক্ষয়। দৈহিক স্বাস্থ্যহানি দ্বারা যদি জাতির সর্ব্বনাশ হয়, মনের স্বাস্থ্যহানি ও দৌর্ব্বল্য দ্বারাও জাতি পঙ্গু হ'য়ে পড়ে নিশ্চয়ই। অতি-আধুনিক সাহিত্যের নগ্ন কদর্য্যতার মোহ যদি জাতিকে দুর্ব্বল না ক'রে দেয়, তবে আর দেয় কিসে?

ঃ ফটো ঃ
প্যারামাউণ্ট

গ্যারী কুপারের অনেক পুরোনো ছবি এই 'ভারজিনিয়ান'। তখন ভালো করে' নাম তার হয়নি, তবে ভালো অভিনয় করতো। মেরী ব্রায়ান মেয়েটির নাম, বেশ মিষ্টি চেহারা, ভারী নরম ভঙ্গী।

* ফটো *
প্যারামাউন্ট

ছবির নাম 'মেন উইদাউট নেমস্', ভারী উত্তপ্ত উত্তেজনা, বুক কাঁপে
ফ্রেড্ ম্যাকমরে আর ম্যাজ ইভান্স্ নায়ক-নায়িকা, বন্দুকের গুলির ছ
তার সঙ্গে ভালো প্রেমের গল্প।
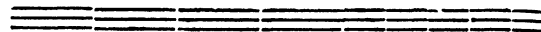
পুষ্টিকর খোরাকির অভাবেই যে আমাদের মন অকালে জরাগ্রস্ত হয়েছে, মনের বাতব্যাধি হয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় আছে কি? সাহিত্য যদি দূষিত ভেজাল বস্তু জোগাতে সুরু করে, তা থেকে জাতি কতটা অনুপ্রেরণা, কতটা শক্তিলাভ করতে পারে?

বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে আর এক বিপদের ভীষণ প্রাবল্য দেখা যাচ্ছে। সেটি হচ্ছে ইংরাজ ও ইংরাজীর ব্যর্থ অনুকরণ। এমন কথা-সাহিত্যও বাজারে চলছে, যা প'ড়ে সত্যিই মনে হয় বাংলা হরফে ছাপা ইংরাজি বই। এই সব কথা-শিল্পী কি বাংলাদেশ ও বাঙালীজাতিকে ইংরাজি চোখে দেখেন, না, বাংলাদেশেই ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠা করতে চান?

যেখানে নতুন সৃষ্টির প্রতিভা নেই, অথচ সাহিত্যিক হওয়ার তীব্র আকাঙ্খা আছে, সেখানে অক্ষম অনুকরণের দ্বারা পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি হ'তে পারে, কিন্তু সাহিত্যের পুষ্টি হয় না। এ সাহিত্য সত্যিকার কোন কল্যাণ সাধন তো করেই না, করে শুধু বিরাট অমঙ্গল। যশোলিপ্সার রঙীন উন্মাদনা পাশ্চাত্যের জঘন্যতাকে বাংলাভাষায় গিল্‌টি ক'রে যে সাহিত্য আমাদের উপহার দিচ্ছে, তার মোহ বাঙালীর মন পঙ্গু ক'রে দেবে, এ আশঙ্কা খুবই আছে।

কথা-সাহিত্য ছাড়াও অতি-আধুনিকদের প্রবন্ধেও এক অভিনব রূপ আত্মপ্রকাশ কচ্ছে। যতগুলো বাংলা কথা থাকে, প্রায় ততগুলো ইংরাজি কথাও তার পাশাপাশি ফুটে উঠে ইংরাজি আর বাংলার, পূর্ব্ব আর পশ্চিমের হাত ধরাধরির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। এটা কি ভাবপ্রকাশের চরম দৈন্য, না, বদহজমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, না অতি-আধুনিক কায়দা?

যে "হরিদাসের গুপ্তকথা," "প্রেমের কাঠ পিঁপড়ে," "বিধবার প্রেম" প্রভৃতি পুস্তককে বটতলা ব'লে এতদিন আমরা নাসিকাকুঞ্চন ক'রে এসেছি, সেই বটতলাই কি চকচকে বিলিতি পোষাকে সেজে-গুজে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় নি?

রত্ন-রহস্য

শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম, বি

"হোপ-ডায়মণ্ড"

বিচিত্র রত্নের বিচিত্র বর্ণ, আকার, ঔজ্জ্বল্য, ও তাহাদের মূল্য অবধারণ আজ আমার এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। আমাদের দেশে বহু যুগ যুগান্তর থেকে রত্ন ব্যবহার চলে আসছে। বিভিন্ন লোকের জন্মগত রাশিচক্রের লগ্ন—স্থানানুযায়ী বিভিন্ন রত্ন ধারণের ফল, তাহার জীবনের উপর তাহাদের অনৈসর্গিক প্রভুত্ব ও ভাল মন্দ উভয়বিধ ফলাফলের তত্ত্ব নির্দ্ধারণ বিশদভাবে আমাদের পুরাতন আর্য্য ঋষি প্রণীত জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অন্তর্গত। কৌতূহলী, শ্রমশীল জ্যোতিষশাস্ত্রের ছাত্র এ সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বিস্তারিতভাবে জানাইতে সক্ষম।

আমি আজ কয়েকটী কিম্বদন্তী ও সত্যঘটনা হইতে মানুষের জীবনের উপর রত্নরাজীর অমানুষিক প্রভাব সম্বন্ধে দু'একটী চিত্তাকর্ষক কাহিনী বিবৃত করিব, যাহা বাঙ্গলা রমন্যাসের চমকপ্রদ বিচিত্র কাহিনী হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে।

(১) আমার এক বন্ধুপুত্রের হাতে একটী নীলা ছিল। অনেকে তাহাকে উহা ধারণ করিতে নিষেধ করিলেও সে উহা ত্যাগ করে নাই। নীলা শনিগ্রহের তুষ্টির নিমিত্ত ধারণ করা হয়। শনিগ্রহ তুষ্ট হইলে বিপুল অর্থ দান করেন ও রুষ্ট হইলে সর্ব্বনাশ সাধন করেন ইহাই আমাদের দেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস। বিপুল অর্থ লাভের আশায় যুবক সে রত্ন ত্যাগ করিতে রাজী হয় নাই। তারপর দৈবক্রমে একদিন নদীপথে নৌকাডুবিতে সেই যুবক জলমগ্ন হয়।—সে বলিল যখন ক্লান্ত হস্তপদ, অবসন্ন দেহ জলের নীচে নামিয়া যাইতেছিল সে বোধ করিল যেন কানের নিকট কে বলিতেছে 'যদি বাঁচতে চাস্ ওই নীলাটা ফেলে দে'—যুবক তখন প্রায় সংজ্ঞাহীন। মাত্র এই আভাষটুকু কানের কাছে আসিতেই তার প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার হইল—শেষ আশায় ভর করিয়া সে অঙ্গুরীয় সমেত বহু মূল্য নীলাটি নদীজলে ফেলিয়া দিল ও একবার প্রাণপণ বলে উপরে ভাসিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—আশ্চর্য্য, পরমুহূর্ত্তেই তাহার হাতে একটী লগী ঠেকিল সে উহা আঁকড়াইয়া ধরিল—জলমগ্ন ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে আগত নৌকায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তাহাকে টানিয়া তোলা হইল।—আজও সে অক্ষত দেহে বাঁচিয়া আছে।

(২) আমার একটী বন্ধু কলিকাতায় লোহের ব্যবসায় করিতেন—তিনি একটী নীলা খরিদ করিয়া আংটীতে বসান। শোধন করিয়া মন্ত্রপূত করাইয়া সেটা তিনি প্রায় দুইবৎসর ধারণ করেন। কোনও বিপদ্‌পাত তাঁহার হয় নাই বটে, কিন্তু এই দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার কারবারে অত্যন্ত লোকসান যায় ও অপ্রত্যাশিতভাবে একটী ইংরাজ কোম্পানীর সহিত মামলা বাধিয়া তাঁহার কারবারের প্রায় ৪০ হাজার

টাকা আটকাইয়া থাকে। দুই বৎসরের পর হঠাৎ একদিন তাঁর খেয়াল হয় যে কারবারের এই লোকসান ও মামলা মোকদ্দমা হয়ত বা তাঁহার হাতের এই নীলার সহিত পরোক্ষভাবে বিজড়িত। যেমন মনে হওয়া অমনি তিনি ঐ নীলাটি হস্তান্তর করিয়া দেন। তাঁহার এক নিকট আত্মীয় ঐ নীলাটি মূল্য দিয়া কিনিয়া লন। ইনি একজন সাধারণ অবস্থার গৃহস্থ ছিলেন। ঐ নীলাটি তিনি এক বা দেড় বৎসর হাতে দেন এবং আপনারা শুনিয়া চমকাইবেন না এই এক বৎসরে উক্ত আত্মীয় ভদ্রলোকটী লক্ষাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়া ধনীপদবাচ্য হইলেন—আরো ছ'মাস পরে হঠাৎ একদিন আমার বন্ধুর নিকট তার আসিল যে কলিকাতার রাস্তায় মটর ও ট্রাম গাড়ীর সংঘর্ষের মধ্যে পড়িয়া তিনি সাংঘাতিক আহত অবস্থায় কলিকাতা মেডিকেল কলেজে পড়িয়া আছেন। বন্ধু গিয়া দেখিলেন—তাহার আত্মীয় অচৈতন্য—তাহার ডান হাতখানি একেবারে গুঁড়াইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ হাতের আঙ্গুল ক'টী—কব্জী পর্য্যন্ত পিণ্ডাকৃতি হইয়া গিয়াছে—আংটী সমেত নীলাটি কিন্তু তার মধ্যে ঠিক রহিয়াছে—আত্মীয় ত হাঁসপাতালে সেই রাত্রেই মারা গেলেন—তাঁর বিধবা-পত্নী শোকে দুঃখে নীলাটি দূর করিয়া দিলেন।

আর একটী মাত্র স্থানীয় সত্যঘটনার কথা বলিয়া ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধিতে তুঙ্গস্থান অধিকার করিয়াছে এমন একটী রত্নের রহস্যের কথা শুনাইয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

(৩) আমার এক আত্মীয়ের হাতে বৃহৎ একটী নীলা সমেত আংটী দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করায় তিনি বলিলেন "নাম মাত্র মূল্যে এটা কিনিয়াছি"—

তিনি বলিলেন রাধাবাজারের কোনও মণিকার একদিন একটী নীলা আমায় বেচিতে দিয়া গিয়াছিল, আমার দোকানের বাক্সে তাহা রাখিয়াছিলাম। প্রায় একমাস পরে সে সেটি ফিরাইয়া লইয়া যায়—কিন্তু আমি বিস্মিত হইলাম যে আমার দোকানের কেনা বেচা সেই হইতে কমিয়া গেল অথচ যে একমাস নীলাটি বাক্সে ছিল—দিন ১০০৲।১৫০৲ টাকার মাল বা ততোধিক বিক্রয় হইত। আগে আমি ইহা বুঝিতে পারি নাই—তখন তাড়াতাড়ি তাহার দোকানে গিয়া সেই নীলাটি চাহিলাম তিনি বলিলেন উহা গাদায় মিশাইয়া দিয়াছি এবং হয়ত ইহার মধ্য হইতে বিক্রীত হইয়া গিয়া থাকিতেও পারে। যাই হোক, সেই গাদা হইতে অনেকগুলি নীলা লইয়া আসিয়া পর পর বাক্সে রাখিয়া দেখিলাম দোকানের কেনা-বেচা আর বাড়িল না—কিন্তু সেই অবধি একটী নীলার সন্ধান করিতে করিতে এই আংটীটি হঠাৎ পাইলাম। একটী ভদ্রলোক ইহা কিনিয়া আনিবার পরই সেই দিনই তাঁহার ছেলে গাড়ী চাপায় মারা গেল ও তিন দিনের মধ্যেই স্ত্রী ও কন্যা কলেরায় মারা গেল—তিনি ব্যস্ত হইয়া এটি মাটির দরে ছাড়িলেন।

এইবার আমি আপনাদিগকে একটী বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি রত্নের জীবনকথা শুনাইব যাহার বিষাদময় করুণ কাহিনী সত্য হইলেও, কাল্পনিক আলাদ্দীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ঐন্দ্রজালিক দীপ্তিকেও হার মানাইয়াছে।

'উইণ্ডসর' ম্যাগাজিনের বিখ্যাত লেখক নোরা বার্ক ঐ নীলা-রাক্ষসীর যে চমকপ্রদ বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে বিস্ময়ে ও ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিতে হয়।

ঐ নীলাটির একটী নাম "নীল্ রাক্ষসী"—অপর নাম "হোপ ডায়মণ্ড"। পৃথিবীর অধিকাংশ বহুমূল্য হীরকখণ্ডের সহিত বহু শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংশ্লিষ্ট। এই রাক্ষসীর মোহে অনর্থপাত ও রক্তপাত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেইজন্য ইহাকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অশুভগ্রহ বলিয়া থাকে, লোকচক্ষুর গোচড়ে আসিয়া অবধি ইহা তাহার প্রত্যেক অধিকারীর রক্তশোষন করিয়া তবে নিরস্ত হইয়াছে, যাহার নিকট গিয়াছে তাহারই অপমৃত্যুর কারণ ঘটাইয়াছে। উপর্য্যুপরি এতগুলি শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটায় ইহার কারণ সম্বন্ধে সাধারণের কৌতুহলী চক্ষু সতঃই দৈবের প্রতি না চাহিয়া এই রাক্ষসীর প্রতিই ভয়ে বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে।

ইহার আকার লম্বা ও চওড়ায় প্রায় ১ইঞ্চি করিয়া এবং আধ ইঞ্চি পুরু। ওজনে প্রায় ৪৫ ক্যারেট।

স্বর্ণপ্রসবিনী, অসীম ধনশালিনী ভারতভূমিই—ইহার জন্মস্থান। কোল্লারের খনি হইতেই ইহা পাওয়া যায়—সুদূর অতীতের স্বাধীন হিন্দুযুগের ইতিহাসে ইহার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় চতুর্থ খৃঃ অঃ গুপ্ত বংশীয়দের রাজত্বকালে। ভারত জয় করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করিয়া সার্ব্বভৌম সম্রাট হ'ন। তিনিই এই রাক্ষসী নীলা ধারণ করিয়া দরবারে বসিতেন। সেই অবস্থাতেই ভারতের এই একচ্ছত্র সম্রাট বিশ্বাসঘাতকের ছুরীতে জীবন দেন।

বহু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া অবশেষে এই রাক্ষসী ৯৯৯ খৃঃ অঃ এক রাজপুত নৃপতিকে আশ্রয় করেন—ছয়মাস অতীত হইতে না হইতেই—বেচারী রাজা জলে ডুবিয়া গেলেন।

তারপর রাক্ষসী গুজরাটে অভিযান করিল—সেখানে ১৩১৬ খৃঃ অঃ মালিক কাফুর (তখন গুজরাটের সিংহাসনের রক্ষক) তাহাকে তাঁহার তরবারীর মূলদেশে সযত্নে স্থান দিলেন—বেশীদিন কাটিল না—দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীনের সহিত গুজরাটের তখন ঘোরতর যুদ্ধ। কমলাদেবীর কন্যা দেবলাকে লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে গুজরাট লণ্ডভণ্ড হইল। প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও কাফুর গুজরাট রাখিতে পারিলেন না—তখন

...র সেনাপতি নিজ বিশ্বস্ত ভৃত্যকে নিজের তরবারী দিয়া গলা কাটিয়া দিতে বলিলেন—আধুনিক জাপানের বীর মৃত্যুর ন্যায়—চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ভারতীয় পাঠানবীর নিজের খড়্গে প্রাণ দিলেন—সেই তরবারী, যাহার মূলদেশে ওই নীল রাক্ষসী রক্তমোক্ষনের আশায় বসিয়া ছিল—তাহার অধিকারীর গলদেশ ছিন্ন করিয়া কৃতজ্ঞতার শোধ দিল।

তারপর শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেল। ১৬৪২ খৃঃ অব্দে সেই রাক্ষসী ফরাসী পর্য্যটক টাভানিয়ারের স্কন্ধে ভর করিল। ইনি ভারত ভ্রমণে আসিয়া ইহার রূপে মুগ্ধ হইয়া মূল্য বিনিময়ে এটী হস্তগত করিয়া ফরাসী দেশে সঙ্গে লইয়া গেলেন। রাক্ষসীর রূপগুণের কথা চাপা রহিল না—ফরাসী-দেশের রাজা চতুর্দ্দশ লুই ইহার দর্শনপ্রার্থী হইলেন। যেমন দেখা অমনি মজা—রাজকোষের ধনভাণ্ডার মুক্ত করিয়া তিনি এটি কিনিয়া লইলেন—রাক্ষসী তখন কখনও রাণী এণ্টয়নেট কখনও কখনও রাজকুমারী ল্যাম্‌বেলার অঙ্গশোভা বৰ্দ্ধন করিতে লাগিল।—হায় হতভাগা রাণী! তিনি ও রাজকুমারী অল্প দিনের মধ্যেই নিষ্ঠুরভাবে ফরাসী প্রজার হস্তে নিহত হইলেন।

রাজা লুই ওই রত্ন-রাক্ষসীকে আমষ্টার্ডামে কোনও বিখ্যাত মণিকারের নিকট কাটাইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু কি দুরদৃষ্ট—যে রাজদূত ঐ মণি বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাঁহাকে পরদিন প্রত্যুষে শয্যায় মৃত দেখা গেল এবং যাঁহারা উহাকে ফিরাইয়া আনিতে গিয়াছিলেন—সকলেই সমুদ্রে জাহাজ-ডুবিতে প্রাণ দিলেন।

রাজপুরোহিত ফ্লুরী আসিয়া রাজা লুইকে অনেক বুঝাইলেন যে ওই রাক্ষসীকে পরিত্যাগ করুন—রাজা অটল অচল, সর্ব্বস্ব যায় যাক তবু উহাকে ছাড়িব না।

ঘটিলও তাহাই—রাজপুরোহিত কারারুদ্ধ হইলেন আর রাজা সর্ব্বস্বান্ত হইলেন—তাঁর শোচনীয় পরিণাম সর্ব্বজনবিদিত।

ডিউক অফ অরলিন্সের নিকট কিছুদিন থাকিয়া তাঁর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া রাক্ষসী রাজা পঞ্চদশ লুইকে বরণ করিল। তিনি প্রথমে এটী তাঁর প্রিয়তমা ম্যাডাম ডুবারেকে দেন ও পরে একদিন রাগের বশে কাড়িয়া লইয়া কন্যা এলিজাবেথকে দেন—এবং এই রত্নের জন্য দুটী মহিলার মধ্যে বিষম বিবাদ ঘটে। অবশেষে মহিলা দুটি ফাঁসীতে ঝুলিলেন ও পঞ্চদশ লুই বসন্তরোগে অকালে প্রাণ হারাইলেন। তারপর ফরাসীদেশে বিপ্লবের বিষম আলোড়ন—ফরাসী রাজকোষের রত্ন ভাণ্ডার লুণ্ঠিত ও অপহৃত হইল। ঐ সময়ে ওই রাক্ষসীর মূল্য ছিল এক লক্ষ পাউণ্ড।

তারপর আর ত্রিশ বৎসর উহার কোনও খোঁজ মিলে নাই।

প্রায় ১৮৩০ সালে লণ্ডন নগরীর দানিয়েল ইলসন্ নামক কোনও রত্ন বিক্রেতার নিকট হইতে টমাস হোপ্ নামক একজন ধনী মহাজন আঠারো হাজার পাউণ্ডে উহা খরিদ করেন। ইঁহার নাম হইতেই এ রত্নের বর্ত্তমান নাম "হোপ্ ডায়মণ্ড"।

ইনি এই রত্নটি তাঁহার কন্যাকে দেন—কিন্তু সে কদিনের জন্য। কন্যাটি মারা গেল—পুত্রটির বিবাহ-বিচ্ছেদ হইল—অল্পদিনের মধ্যেই সুখের সংসার মরুময় হইয়া উঠিল। তিনি এ নীলা বিক্রয় করিলেন রাজপুত্র কানিটোভস্কিকে। যে দালালের হাত দিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন হইল সে বেচারী পাগল হইয়া শেষ আত্মহত্যা করিল।

রাজপুত্র কানিটোভস্কি এই রত্ন তাঁহার প্রিয়তমা অভিনেত্রী লরেন্স লেড্‌নীকে দিয়াছিলেন তিনি নূতন নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে ঐ নীলা বুকের মাঝখানে পড়িয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া। আশ্চর্য্য যে, অভিনয় রজনীর প্রাক্কালে সহসা আহারে বসিয়া রাজপুত্রের সহিত প্রিয়তমার বিষম বিবাদ ঘটিল এবং রজনীতে সহস্র আলোকমালায় ঝলসিত রঙ্গমঞ্চে যখন জনপ্রিয় অভিনেত্রী লরেন্স সগৌরবে অবতীর্ণ হইলেন—প্রশংসমান দর্শকের লক্ষ করতালি-ধ্বনি নিমেষ মধ্যে হাহাকারে ডুবিয়া গেল। ঈর্ষাকাতর রাজপুত্র প্রেক্ষাগার হইতে গুলী করিলেন তাহার প্রিয়তমাকে—স্বহস্তে; বুকের যে স্থানে সেই রাক্ষসী দপ্ দপ্ দীপ্তিতে জ্বলিতেছিল—সেই স্থান ফাটিয়া রক্তস্রোত ছুটিয়া রঙ্গমঞ্চ প্লাবিত করিয়া দিল। লরেন্স লুটাইয়া পড়িল, চারিদিকে মার মার ধর ধর—একটা বিরাট হৈ চৈ—রাজপুত্র পলাইলেন কিন্তু ধরা পড়িয়া ছুরিতে প্রাণ দিলেন।

এইবার ঐ রাক্ষসী সমগ্র ইউরোপ ও এসিয়া জ্বালাইয়া—অবশেষে আমেরিকায় উপস্থিত হইল।

ওয়াসিংটনের প্রসিদ্ধ ধনবতী মহিলা ই, বি, ম্যাকলীন তাহাকে সাদরে আশ্রয় দেন। গত ১৯১২ খৃঃ অব্দে তিনি ইহাকে প্রথম লোক চক্ষুর গোচর করেন—কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চহারে মূল্য দিতে হইয়াছিল—কেবল মাত্র স্বর্ণ মুদ্রায় কুলায় নাই তাঁহার একমাত্র পুত্রকে মোটর সংঘর্ষে বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে তবুও এই সাহসী মহিলা আজও ঐ রাক্ষসীকে ছাড়েন নাই—দৃঢ়-পণে কবলীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

কোল্লারের খনি হইতে এই তীব্র হলাহলের ভীম সৌন্দর্য্য যুগ-যুগান্ত কালাবধি কত সুখের সংসারে বিষের বাতী জ্বালিয়া দিল—কত সুখের জীবন-দীপ ফুৎকারে নিবাইয়া দিল তাহার ইয়ত্তা নাই—মূর্ত্তিমান শনিগ্রহ আকাশপথ পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্রাভ-নীল-বর্ণ এই রাক্ষসী নীলারূপে মর্ত্ত্য-মানবের কাল-স্বরূপ এজগতে অজস্র অশ্রুজলের প্রবাহ বহাইতে আসিয়াছে কিনা—কে বলিতে পারে?

——•——

কদলী পুরাণ
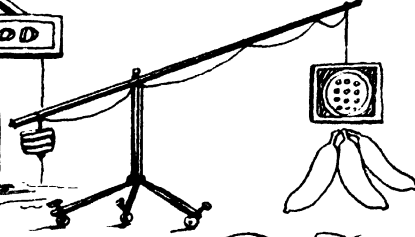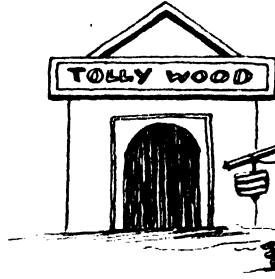
শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল —
বিরচিত
শ্রীশুভময় বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রিত

টালিগঞ্জের বনে,
'কলার' বদলে কদলীর চাষ চলিতেছে প্রাণপণে।
নানাবর্ণের ফলিছে কদলী, দেখিতে বাহার খাসা
মর্ত্তমানের উদর-বিবরে বোম্বাই শাঁস ঠাসা।
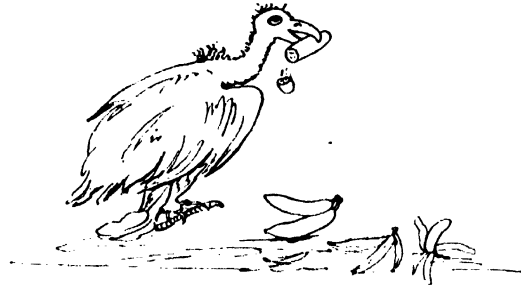
কদলী বিহনে রোচেনা অন্ন, কদলী সবার মুখে,
পচা মাস ছেড়ে শকুনির দল, কদলী চুষিছে সুখে!
টালিগঞ্জের মৃত্তিকা নয়, মহাতীর্থের মাটি,
মেশিনে ফলিছে, হাজারে হাজারে, সুস্বাদু কলা খাঁটি।
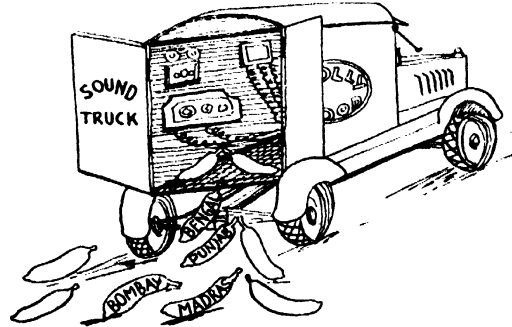
সাত সাগরের পার থেকে আসে, অপরূপ এই বীজ
কোন শুভ এক লগনে ফলিয়া, জন্মিল মহা চীজ!
মেশিন গানের গুমোর গিয়াছে, কলার কামান চলে
উর্দ্দু-হিন্দী-বাংলা-দ্রাবিড়ে কদলীরা কথা বলে!

'কলা-বৌ' আজ — 'মিসেস্ রম্ভা', সতী-রূপসীর সেরা
পঞ্চ-১মীর সম্ভোগ সুখে, করিতেছে ঘোরাফেরা!

* * *
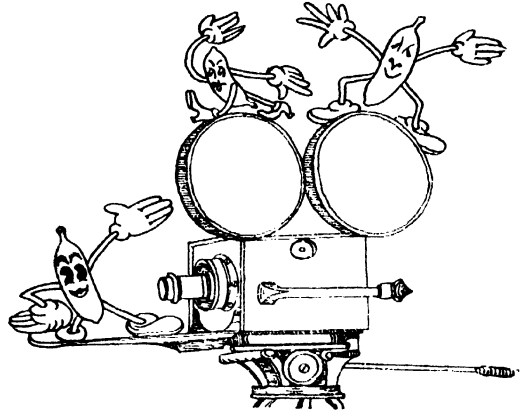
হাতী-গণ্ডারে, করে 'মনোপলি', মহাতীর্থের ধারে—
নিষ্ফল রোষে, চিল ও শকুনী, তারি' মাঝে ফুৎকারে!

বুদ্ধি ও বলে, লড়ালড়ি হেথা, শকুনির সুখ নাই—
তবুও ভুলিয়া, কদলীর লোভ, ছাড়িতে পারে না ছাই!
হাজারে হাজারে, তারি' পিছে ফিরে, যত শৃগালের দল!
হাতী ও চিলের মিতালীর বলে, পুঁজি করে সম্বল!

যৌবনের জয়-অভিষেক

বন্দে আলী মিয়া

মৌন স্বপন যেই দিনে রাতে মরে গুমরিয়া
ভাষা নাহি পায়
অগনিত দ্বারে দ্বারে আজি তাহা উঠেছে জাগিয়া
আলোক ছায়ায়,
পাণ্ডুর ধূসর দিবা—বহে ধীরে শীতল সমীর
কলধ্বনি দিয়া হাসে দুই পারে সুরধুনি তীর
তটপারে দাঁড়াইয়া হেরি আজ একাগ্র নয়নে
অদৃষ্ট কায়ায়।

যৌবন এসেছে দ্বারে অচেনা অতিথি সম
দেবতা নবীন
বাসনা-বহ্নি-শিখা স্বপ্নময় মধু মনোরম
বাজাইছে বীণ।
দেহান্তের দেহ হতে ছুটে চলি পরমাণু পানে
ধরিত্রী-সৃষ্টির সুখে ক্ষণে ক্ষণে দোলা লাগে প্রাণে
নিরাশায় কেটে যায় দুর্লভ জীবন মম
প্রসন্ন সুদিন।

আসন্ন সোণালি বেলা—দেহে লাগে স্বপ্ন-পরশন
মনে জাগে ঘোর,
হেরিলাম অপরূপ বিধাতার সৃষ্টি অগণন
চোখে তৃপ্ত লোর—
কামনার বেদনা সে যৌবনের ঘন গাঢ় রস
বসুধা-ক্ষুধায় হিয়া নাহি আর মানে কভু বশ
উন্মুক্ত নিচোল পথে ধরিত্রীর বার্ত্তা আসে মনে
মোর অগোচর।

ক্ষুব্ধ জীবন মোর তৃষাতুর সকাতর আজ
ভাগিরথী তীরে
রূপের বিত্তমাঝে চাহি আর নাহি কোনো কাজ
যাই ঘরে ফিরে;
সাথে লয়ে আসিলাম মর্ম্মদাহ বেদনা নিবিড়
চিত্তের প্রচ্ছদপটে অগণিত কামনার ভিড়—
অভিষেক করিলাম প্রচ্ছন্ন মানস-লোকে
নয়নের নীরে।

অভিভাবক

অধ্যাপক বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অনু ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এ কি কাণ্ড! যত রাজ্যের মালপত্র সঙ্গে নেবার যে কি দরকার—তার মাথায় এল না। মানুষের মধ্যে ত দুটি—কাকা আর সে। বিদেশে যাচ্ছে মাস দেড়েকের জন্য; তারি মধ্যে এত লটবহর! সে জিনিষগুলো উলটে পালটে দেখল। কি নেই? ইক্‌মিক্‌ কুকার, ঘটিবাটী, থালা, গেলাস বিছানা, তোরঙ্গ, আর যাবতীয় কিছু। আর তারি সঙ্গে সেই অদ্বিতীয় কাঠের সিন্দুক। সবগুলি একত্র স্তূপীকৃত করা রয়েছে। যাওয়া হবে পরশু, এখন থেকেই সুশীলবাবু তাগাদা দিচ্ছেন, "ধীরে সুস্থে একটু গুছিয়ে নেওয়া ভালো। কি বলিস্ মা? নইলে সেই ঠিক যাবার মুহূর্ত্তে যত গোলমাল আর হাঙ্গামা, আমি যেন কেমন দিশেহারা হয়ে যাই।"

অস্বীকার করবার উপায় নেই। সুশীল বাবু যে ব্যস্তবাগীশ লোক, নিতান্ত তুচ্ছ কারণেই তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। কবে, কোন্ সময়ে, কোন্ জায়গায় একটি জিনিষের দরকার হয়েছিল, সেটি তিনি মনের নোট বইয়ে টুকে রাখেন। ভোলেন যথেষ্ট পরিমানেই, কারণ ব্যস্ত লোকদের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে অন্যমনস্কতা। কিন্তু কার সাধ্য সে কথা উত্থাপন করে? সুশীল বাবুর মনে বেশ একটু অহঙ্কার আছে, যে তাঁর মত এত নিয়মিত ও সংক্ষিপ্তভাবে কেউ কাজ করতে পারে না। সকলকেই সে জন্য তিনি মৃদু উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রত্যেক ছোট খাটো জিনিষেরই প্রয়োজন আছে, বিশেষতঃ বিদেশে। সেই কারণেই মিস্ত্রী ডাকিয়ে তিনি মনের মত একটী মজবুত কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক বানিয়ে নিয়েছেন।

এটিতে নানা রকমের খোপ্ আছে; আর সেই সব গোপন কক্ষের অভ্যন্তরে নানা অমূল্য নিধি সযত্নে রক্ষিত থাকে। আপনার যদি বাজী ফেলার ঝোঁক থাকে, সুশীল বাবুর সিন্দুক সম্বন্ধে অন্ততঃ তা খাটাবেন না। কারণ হারবেন, এ কথা অকাট্য।

কিন্তু তাই বলে যদি ভাবা যায় যে সুশীল বাবু হচ্ছেন সেই জাতের লোক যাঁরা মেরুদণ্ডহীন, এবং স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত হবার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছেন, তা হলে মস্ত ভুল করা হবে। যৌবনে তিনি দৃপ্ত ও বলশালী ছিলেন। লেখাপড়ায় এনট্রান্স পাশ পর্য্যন্ত করেছিলেন, তার বেশী অগ্রসর হওয়ার সুবিধা হয়নি। কারণ পূর্ব্বে থেকেই স্থির করা ছিল যে একটি আত্মীয় অবসর গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সুপারিশে তিনি সাহেবের সওদাগরী অফিসে ঢুকে পড়বেন।

ত্রিশ বছর চাকরী করে যখন তিনি কাজে ছুটী নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন, দেখা গেল সঙ্গে এসেছে শুধু কয়েক হাজার প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকাই নয়, আরও দুটী ফাউও এসেছে। একটী অজীর্ণ-রোগ, অপরটী তারই আনুষঙ্গিক, চিত্তের অপ্রসাদ। গত চার বছর তিনি অবসর নিয়েছেন। প্রত্যেক বছরেই তিনি দু তিন বার বিদেশে যান্। মাত্র একান্ন বছর বয়সে তাঁর চেহারায় যে ছায়া পড়েছে সেটি অকাল বার্দ্ধক্যের সুস্পষ্ট চিহ্ন। বায়ুটাই হ'ল তাঁর অজীর্ণ রোগের প্রধান লক্ষণ, অগ্নিমান্দ্য ত আছেই।

এই বায়ুর উপশমের জন্য তিনি কি না করেছেন? সাধ্যের অতিরিক্ত অর্থব্যয় তিনি করেছেন। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি এবং কবিরাজী, এই ত্রিবিধ চিকিৎসায় তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে বায়ু-দমনের ওষুধ আজ পর্য্যন্ত কোনও চিকিৎসা শাস্ত্রেই আবিষ্কৃত হয়নি। দুষ্ট লোকেরা বলে থাকে ও রোগটী তাঁর শিরোদেশে। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, মনের এই চব্বিশ ঘণ্টা অস্বস্তি, ওটা তাঁর প্রকৃত রোগ থেকেই জন্মেছে। তিনি যখন সকরুণ ভাবে বলেন, "মনে হচ্ছে আমার দেহটা গ্যাসে ভরা, এতই ফেঁপে উঠেছে," তখন স্বতঃই বিশ্বাস হয় যে তিনি এবার উর্দ্ধে উঠে যাবেন।

কিন্তু তাঁর শত দোষ সত্ত্বেও একটি বিশেষ গুণ আছে, বাইরের লোকের কাছে তাঁর অপূর্ব্ব বাক্য-সংযম। মানুষ আসলে তিনি মন্দ নন্। একটু একজেদী, আর ব্যস্তবাগীশ, এই যা। মোটের ওপর সুশীল বাবুর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আছে।

অনিমার কিন্তু বিশ্বাস তার কাকার মত সরল আর চমৎকার মানুষ দুটী নেই। একটু আধটু দোষ আর কার না আছে? কিন্তু তাই বলে উপহাসের পাত্র তিনি নন্।

হৃদয়ের দিক্ থেকে সুশীল বাবুর কোনো খুঁত পাওয়া যাবে না, বিশেষতঃ তাঁর ভাইঝির প্রতি ব্যবহারে। হবে নাই বা কেন? অল্প বয়সে তিনি বিপত্নীক হয়েছিলেন; তাঁর স্মৃতিটাও খুব ঝাপসা হয়ে গেছে। অফিসের কাজে তিনি এতই ব্যস্ত থাকতেন, আর তার চেয়ে তাঁর অন্যমনস্কতায়, যে বেচারী স্ত্রীর প্রতি সমুচিত মনোযোগ দেবার অবসর তিনি পেয়ে ওঠেন নি।

অনিমার ভাগ্য নিতান্তই মন্দ। শৈশবে মা ও বাবা দু'জনকেই সে অল্প ব্যবধানের

মধ্যে হারায়। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সে দেখে যে সে মামার বাড়ীতে থাকে; আর প্রতি সপ্তাহে অফিসের কাঁটার মত নিয়মিত ক্রবার করে কাকা তাকে দেখতে আসেন। আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, এ অবস্থায় বিপত্নীক পিতৃব্য আর মাতাপিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রীর মধ্যে যে সম্পর্কটী গড়ে উঠেছিল সেটি অতি মধুর। সুশীল বাবু অনিমাকে নিজের মেয়ে বলেই জানতেন; আর অনিমাও তাঁকে পিতার মত শ্রদ্ধা ও স্নেহ করত।

বছর বারো যখন তার বয়স, সে মাতুলালয় ত্যাগ করে সুশীল বাবুর কাছে চলে আসে। পড়াশুনায় সে ভালই ছিল, কিন্তু ম্যাট্রিক পাশ করবার পর আর সুশীল বাবু তাকে পড়াতে চাইলেন না। এ বিষয়ে তিনি মধ্যপন্থী; কলেজের শিক্ষায় তিনি খড়্গাহস্ত, অথচ একটু লেখাপড়াও জানা দরকার এ কথা স্বীকার করেন। সুতরাং অনিমার অবস্থা অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মতই।

তবে সুখের বিষয় এই যে সে বান্ধবী মহলে অবাধে বিচরণ করে, অন্য স্বাধীনতা যদিও তার নেই। বাড়ীতে বসে পড়াশুনায় কোন আপত্তি সুশীলবাবু করেন না। আর ভরসার কথা এই যে, অনিমা এক রকম সুন্দরী, অর্থাৎ খুবই সুশ্রী,—যদিও রঙটা তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নয়। সব চেয়ে প্রশংসার বিষয় এই যে, তার স্বাস্থ্যটা সত্যই মজবুত, ঠিক সুশীলবাবুর বিপরীত। আঠারো বছর বয়সেই তার দেহে জরা বাসা বাঁধেনি, অথবা লাবণ্য নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি।

হয়ত সুশীলবাবুর ইতিবৃত্তের অংশটা দীর্ঘ হয়ে পড়ল, আর অনিমার বর্ণনাটুকু অন্যায় রকমের সংক্ষিপ্ত। কিন্তু পটভূমিকার প্রয়োজন যেখানে বেশী, রূপচিত্রণ সেখানে লঘু ও অনাবৃত হলে ক্ষতি নেই। তা ছাড়া কল্পনা নামক পদার্থের সাহায্যে অনেক কিছু অনুমান করা যেতে পারে। রমনীর উপস্থিতিটাই পরম সত্য। সৌন্দর্য্যের সমাদর নিশ্চয়ই আছে,—কিন্তু রুচি ও বিচারপদ্ধতি যখন অতি সূক্ষ্ম ও জটিল, তার বর্ণনা মনোজ্ঞ হলেও নিরর্থক। তবে এটুকু আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, অনিমার মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি, দেহগঠনে সামঞ্জস্য আছে আর আয়তন স্থূল ও তন্বীর মাঝামাঝি। চোখদুটিতে বিশেষত্ব আছে; তার মধ্যে অতলস্পর্শী ভাব না থাকলেও এমন একটি আবেশ আছে যার প্রকোপের চেয়ে ব্যঞ্জনই অধিক। তার মুখে বুদ্ধির উগ্র দীপ্তি নেই, আছে স্নিগ্ধ লাবণ্যের আভাষ। সে দিকে তাকালে কখনো মনে হয় মেয়েটি অতি সরল ও সুকুমার, কখনো বোধ হয় চাপা ও গম্ভীর। সম্পূর্ণ আত্মস্থ না হলেও

অ-পাওয়াকে—

শ্রীতারাপদ রাহা

দিবা যেথা আসি' সন্ধ্যার মুখে অনিমেষ চোখে চায়,
ক্ষণিকের দেখা ক্ষণিকে ফুরায়,—মনোব্যথা মনে রয়,—
নয়নের তৃষা মেটেনাকো হায় কথায় ফুটিবে কি
সারা প্রহরের ব্যথার কাহিনী সকলি রহে যে বাকী,—
সেথাই ত সখি আমা দোঁহাকার প্রেমের মিলন-রেখা
সারাদিন ধরে প্রাণ চেয়ে ফিরে শুধু ক্ষণিকের দেখা।
দিবার নিশার এই—নাহি-পাওয়া—এই বুক-ফাটা ছবি—
মানব-জীবনে ঘটে ইহা সখি, মিথ্যা আঁকেনি কবি।
বিদায়-বেলাতে দিবার নয়নে আঁধার ঘনায়ে আসে
নিজের আঁধারে ঢাকিয়া বয়ান নিশা আঁখি-জলে ভাসে।
যুগে যুগে চলে এই লীলা, সখি, দিবা ও নিশার মাঝে,
সন্ধ্যার সোণা-অনুরাগ, সখি, আজো তাই বেঁচে আছে।
না-পাওয়ার এই ব্যথা নিয়ে, প্রিয়া, ফিরে ফিরে
এ যে চাওয়া—
প্রেমের লীলায় এই বড় সাথী, সবাকার বড় পাওয়া।
প্রভাতে নিশার একটী অলক—দিবার কপোলে লাগে,
পূবের আকাশ তাই হেসে ওঠে মিলন-পুলকরাগে।
মৃদু-পরশের স্মৃতি নিয়ে দিবা চলে, আর শুধু চলে,
ক্লান্ত-অবশ দেহখানি দিতে সন্ধ্যার পদতলে।
এমনি যে,—ঠিক এমনি করিয়া আমাদের প্রেম-ধারা
মিলনের তরে যুগে যুগে, প্রিয়া, অমিলন রচে তা'রা।
এত ব্যথা তাই দোঁহার বুকেতে, তাই তুমি চির-চাওয়া
না-পাওয়ার চির-ব্যথার মাঝারে আমাদের চির-পাওয়া।

——

আত্মবিস্মৃত বলা যায় না। এক কথায় অনিমা কাকলীও নয় আবার হেঁয়ালীও নয়।

অনু যখন ঘরে ঢুকে এত জিনিষপত্র দেখলে, তখন তার বিস্মিত হওয়ার কথা ছিল না। কারণ তার কাকার স্বভাব এতদিনে তার ভালো করে চেনা উচিত ছিল। কিন্তু বিস্মিত হওয়াই নাকি সরল ও অকুণ্ঠিত প্রাণধর্ম্মের বিকাশ। বিশেষ করে এই আঠারো বছর বয়সটাতে, যে সময়ে অবিবাহিত মেয়েরা অকারণে গম্ভীর হয় আবার অল্প কারণেই অবাক্ হতে শেখে। সে যাই হোক্, অনু জিনিষপত্র গুছাতে আরম্ভ করলে। কাকা সবই সংগ্রহ করে রেখেছেন, কেবল ওষুধের নিত্য প্রয়োজনীয় বাক্সটা অনিমা নিয়ে এলো।

গত বছর তারা এ সময় পুরীতে ছিলো। সুশীলবাবুর মনটা নির্জ্জনপ্রিয়, কিন্তু বিদেশে অসুখের ভয়ও আছে। সেইজন্য তিনি কাছাকাছি জায়গা পছন্দ করেন, যেখানে খুব ভীড় নেই, অথচ ডাকলে পরে মানুষের সন্ধান মেলে। পুরীতে দুটো জিনিষই আছে, তবু তাঁর ভালো লাগেনি। এই অপছন্দের প্রধান কারণ, অবাঞ্ছনীয় যুবকের সংখ্যাধিক্য। সত্য কথা বল্‌তে কি, সুশীলবাবু মনে মনে এই আধুনিক-শিক্ষিত ও কায়দা-দুরস্ত ছেলেদের একটু ভয়ের চক্ষে দেখেন। তিনি ভাবেন যে ওরা বেশীর ভাগ বাক্য-বলী, সাংসারিক কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে অকর্ম্মণ্য। লেখাপড়ার বাহ্য-মূল্য হয়ত তাদের কিছু পরিমাণে আছে, কিন্তু ত্রিশ বৎসর কাল অফিসে কাজ করে তাদের দায়িত্ব বোধ, বিশেষ করে তাদের ইংরেজী ভাষার জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছে, যেটিকে কোনো মতেই প্রশংসাসূচক বলা চলে না। তাঁর মতে ড্রাফ্‌ট লেখার দায়িত্ব আর অফিসিয়াল চিঠিতে ইংরাজী বিন্যাসে তুলনা নেই।

যদি নিতান্তই সত্য কথা বলতে হয়, তা হলে স্বীকার করতে হবে যে সুশীলবাবু অনিমার সম্বন্ধে বেশী পরিমাণে চিন্তান্বিত। অজানা, অচেনা পুরুষের সংস্পর্শ থেকে তিনি ভাইঝিকে এ যাবৎকাল সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন। অতি-স্নেহ যে পাপশঙ্কী হয়, সে কথা সকলেই জানে। তা ছাড়া আত্মীয়ই বল আর অভিভাবকই বল, সুশীল বাবুর দায়িত্বই ষোল আনা। এই রকম নানা কারণে অনিমা তার জীবনে যুবকের কথা দূরে থাক্, অন্য কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গ পায়নি। এ স্থলে তার অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধি এক দিক থেকে অসম্পূর্ণ। সুতরাং পুরুষ জাতটার সম্বন্ধে যদি তার মনের কোণে একটু মৃদু রকমের কৌতূহল ও জ্ঞানলিপ্সা জন্মে থাকে, সে ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

* * *

এবারে সুশীলবাবু আর অনিমা মধুপুরে এসেছেন। বাড়ীটা পাথরচাপ্‌টী পল্লীর প্রায় শেষ প্রান্তে। সুশীল বাবুর ইচ্ছা অনু-সারেই এখানে আসা হয়েছে, নইলে অনিমার অন্যত্র যাবার ইচ্ছা ছিল। অজীর্ণ রোগটা এবার বর্ষার মরসুমে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেই কারণে পুরী ও রাঁচি পছন্দ না করে কলকাতার কাছাকাছি এই সাঁওতাল পরগণাতে আসাই তিনি মনস্থ করেন। অনিমা একটু মৃদু রকমের আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু সুশীলবাবু সহরের সুখ-সুবিধা অথচ মুক্ত জলবায়ুর উপকারিতা সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে তার মুখবন্ধ করেন।

আজ পাঁচ সাতদিন হল তাঁরা মধুপুরে পৌঁচেছেন। এ কয়দিন বাড়ী গোছগাছ করতে উভয়েই ব্যস্ত ছিলেন। অনিমার একটুও সুযোগ মেলেনি বাইরে বেরুবার; কারণ সে একলা মানুষ, এবং সংসারটি ক্ষুদ্র আয়তনের হলেও তার কাকার মত ব্যক্তির তদারক করা গুরুভার কর্ত্তব্য। সমস্তক্ষণই হয় এটা নয় সেটা, কোনও কাজেই সে লেগে আছে। আর সত্য কথা বলতে কি, অনিমার মধুপুর মোটেই ভাল লাগে না। কী ছাই জায়গা! বেড়ানর স্থান একটা খুঁজে মেলেনা। কারুর বাড়ী যাওয়া সুশীলবাবু আবার পছন্দ করেন না। অন্য বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গ তার নিজেরও খারাপ লাগে। বেশীর ভাগই ত কৃতকার্য্য সরকারী চাকুরের মোটা সোটা জবরদস্ত গৃহিনী, নয় রুগ্ন মেয়ের পাল। যাঁরা এ অঞ্চলের বাসিন্দা, তাঁদের আভিজাত্যের গণ্ডী পেরিয়ে অযাচিত আলাপ করতে যাওয়াতে অনিমার প্রবৃত্তি নেই।

এখানেও জীবন গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। স্বাস্থ্য তার কোনো-দিনই খারাপ নয়, সুতরাং সে-দিকের কোনো পরিবর্ত্তন তার নজরে পড়ে না। তবে মনটা ঈষৎ অপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে। এক এক সময়ে অনিমা ভাবে কাকাবাবু একটু কম গোঁড়া হলে বোধ করি ভালই হত। এটাকে সুস্পষ্ট বিদ্রোহভাব বলে ধরা উচিৎ হবে না, বড় জোর অনিচ্ছাকৃত সমালোচনা বলা যেতে পারে। উদার ও অলস অবকাশ মুহূর্ত্তে তরুণীর হৃদয়ে অনেক চিন্তাই আসে যায়, তার বিশ্লেষণ করায় কোনো ফল নেই। কারণ অনিমা হল সেই ধরণের মেয়ে যাদের ইচ্ছাশক্তি আছে, কিন্তু সুপ্তাবস্থায়। আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেয়ে আত্মত্যাগের স্পৃহাই তার বেশী। বিশেষতঃ তার কাকার বেলায়, যিনি তার একমাত্র হিতৈষী, এবং সত্যকারের তাঁর অভিভাবকত্বকে সে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করে; তবে ক্বচিৎ কখনও তার উগ্রত্বে মন ঈষৎ ক্ষুণ্ন হয়।

সেদিন সকালে সুশীল বাবুর মনটা ছিল সুপ্রসন্ন। শরীরটা ভালর দিকে যাচ্ছে, কেননা রাত্রে আহারের পর ওষুধ না খেয়েও সেটা হজম হচ্ছে। সকালে উঠেই তিনি অনিমাকে স্বয়ং ডেকে এ শুভ-সংবাদ দিলেন। তারপর জামা-কাপড় ছেড়ে বললেন, 'তুই তৈরী হয়ে নে। একটু ষ্টেশনের দিকে

বেড়িয়ে আসি চল্। আসবার সময় বাজারের দিকে ঘুরে আসা যাবে।'

অনিমা কাকাবাবুর ইচ্ছায় প্রস্তুত হয়ে এলো, কিন্তু তার নিজে সহরের দিকে যাবার ইচ্ছা ছিল না। কি আর করা যাবে! যখন তারা ষ্টেশনে এসে পৌঁছুল, তখন কলকাতা থেকে একখানা গাড়ী এসে প্ল্যাটফর্মে লেগেছে। একদল লোক নামলেন; সবাই বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য এসেছেন সেটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। অনিমা লক্ষ্য করলে, যে দুজন ছেলে এই অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে এসেছে তারা উভয়েই যুবক। এক-জনের বয়স একটু কম, বছর চব্বিশ হবে, আর অপরজন বয়সে বড়, আন্দাজ সাতাশ আটাশ হবে। এ অনুমানের কারণ, শেষোক্ত ভদ্রলোকটি অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ও সংযত আর মাথায় কেশের পরিমাণ কিছু অল্পই।

এদিক ওদিক পায়চারী করে যখন অনিমারা ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো, তখন দেখলে সে দলের লোক কেউ নেই। অন্য কাজ কিছু নেই দেখে তারা বাড়ীর ফেরার পথে একটা দোকানের দিকে অগ্রসর হল। কাকাবাবুর আবার দুএকটা জিনিষ ফুরিয়েছে, সেগুলো কিনতে হবে। অনিমা বাইরে একটু অপেক্ষা করতে লাগল, কাকাবাবু দোকানে ঢুকলেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ্ দাঁড়িয়ে থেকে অনিমা দোকানের ভিতর চোখ ফেরালে। সে দেখতে পেল, কাকাবাবু দোকানদারের সঙ্গে তখনও কথা কইছেন, আর দুটী যুবক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পরস্পর বেশ উঁচু সুরেই কথা বলছে। অনিমা দেখেই চিনতে পারলে যে এদের সঙ্গেই কিছুক্ষণ আগে ষ্টেশনে দেখা হয়েছিল। অনিমা একটু পাশ ফিরে দাঁড়ালো।

ছেলে দুটী রাস্তায় বেরিয়ে চলতে সুরু করলে। অনিমা শুনতে পেলে অল্প বয়সী যুবকটী বলছে, "কেন অমলদা? না, না, অত শীগ্‌গির যাওয়া হবে না। হতেই পারে না। আমি ভাব্‌ছি কোথায় তোমার কাছে একটু পড়তে আরম্ভ করব—তা না তুমি......"

অনিমা চকিত হয়ে দেখলে অমলবাবু নামক ভদ্রলোকটী তার দিকে একটু মনোযোগের সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। লজ্জিত বোধ করে অনিমা দোকানে কাকা-বাবুর দিকে অগ্রসর হ'ল—এই যে কাকাবাবুও বেরিয়ে আসছেন!

পথে যেতে যেতে সুশীলবাবু বললেন—'আজকালকার ছেলেরা, জানলি অনু, এমনি সব হয়ে উঠেছে যে হুঁঃ......'

অনিমা বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিল, জবাব দিল না। সুশীলবাবু কিন্তু আপন উৎসাহে বলে যাচ্ছেন, "আমার বরাবরই ধারণা, ওদের লঘুগুরু জ্ঞান নেই।"

এবার অনিমা ধীরে প্রশ্ন করলে, "কেন কি হয়েছে, কাকা?"

"তা হলে আর বলছি কি এতক্ষণ? তুই বুঝি কিছু ভাবছিলি? অন্যমনস্ক হওয়াটা ভাল নয়, বুঝলি মা? বিশেষ করে রাস্তায়।" অনিমা মৃদুভাবে অস্বীকার করলে।

"হবে আবার কি!" সুশীলবাবু অনিমাকে শোনালেন। 'ভাবছিলুম্ এলিজ্যার পেপেনটা নেব না, টাইকো-পেপেন কিন্‌ব। ভদ্রলোক দেখে মনে করলুম্ যে জিজ্ঞাসা করি। ওদের মধ্যে বড় ছেলেটা বল্লে কি জানিস্? কোনোটাই কেনা উচিত নয়। ও সব বাজে কতকগুলো আরক এখানে এসেও যদি কেনেন তা হলে......আবার ছোটটি এমনি চপল যে হেসে উঠ্‌ল। কেন বাবু হাসবার কি হয়েছে? আর অতো উপদেশই বা কী দরকার! আমি ত' কেবল জিজ্ঞাসা করেছিলুম্......"

অনিমা বল্লে "ওঁরা তোমায় কোনো অপমান করার উদ্দেশ্যে ত......"

"ওই হল! একই কথা; বয়োবৃদ্ধদের একটু মান্য করে চলতে হয়।"

সুশীলবাবু একটু অপ্রসন্ন মেজাজেই বাড়ী ফিরলেন। ভাইঝির সঙ্গে সেদিন তেমন আর জমল না। অনিমাও কাকার যাবতীয় কাজ সেরে এবং নিজের আহারাদি চুকিয়ে ঘরে ঢুকল বিশ্রাম করতে। সকালের ঘটনা এমন কিছু গুরুতর হয়নি, অনিমা ভাবলে, যাতে কাকা অতটা অসন্তুষ্ট হন্। কাকা যেন কি হচ্ছেন! এক এক সময়ে এমন অপ্রস্তুত হতে হয়! আচ্ছা অমলবাবু লোকটি হঠাৎ মধুপুর ছেড়ে যাবার কথা তুলেছিলেন কেন কে জানে? বোধ হয় উনি সঙ্গীটার বাড়ীতে অতিথি ছিলেন, নতুন লোকের সমাগমে একটু কুণ্ঠিত বোধ করছেন। তা হবেও বা, তবে অত তাড়াই বা কিসের? পূজার ছুটিতে কলকাতায় বা কি এমন কাজ? যাক্‌গে যত সব পরলোকের বাজে চিন্তা! কিন্তু সত্যি আজকালকার ছেলেরা চুল অত রুক্ষ করে রাখে কেন ভগবান্‌ই জানেন! তাও যদি চুল বেশী হত!

দিনের পর দিন সেই একই ভাবে চলে। স্থান নূতন হলেও অনিমার কাছে তা পুরাতন পাঠ্য বই-এর মত মুখস্থ হয়ে গেছে। এতটুকু সহর, একদিনেই তার দ্রষ্টব্য ফুরিয়ে যায়। আর বেড়ানো? সব দিন কাকাবাবু বাইরে যান না, বাড়ীতে এক কম্পাউণ্ডের মধ্যে অথবা বড় জোর নিকটের বালিভরা নদীর ধারে পায়চারী করেন।

একদিন বিকালের দিকে সুশীলবাবু বললেন, "অনু পাথরোলের কালীবাড়ী বেড়াতে যাবি? সহরের বাইরে—জায়গাটা সবাই ভালো বলে। দেবীও শুনেছি জাগ্রত।" অনু সম্মতি জানায়।

কিন্তু, দুর্ভাগ্য অনুদের সঙ্গে যেন পিছু লেগেছে। মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মোটরের একটা টায়ার ফেটে গেল। পথিমধ্যে বিভ্রাট—সুশীলবাবু ত' ড্রাইভারকে রীতিমত বকতে সুরু করলেন। অনিমা বললে, "ও ততক্ষণ মেরামত করুক না, আমরা একটু হেঁটেই না হয় যাই।"

সুশীলবাবু বললেন—"আরও কতদূর তা কে জানে! তুমি বাপু বড় অসাবধানী লোক; ফাঁকা রাস্তা বলে কি হুঁসিয়ার হতে নেই? তোমার লাইসেন্স কোথাকার? কলকাতার নয় নিশ্চয়ই?"

প্রবাসী বাঙালী ড্রাইভার বিনীতভাবে জানায় টায়ার ফাটার সঙ্গে চালকের কৃতিত্বের কোনো সম্বন্ধ নেই। সুশীলবাবু তার প্রতিবাদে তপ্ত হয়ে ওঠেন।

এমন সময়ে দূরে একখানা গাড়ী দেখা গেল। অনিমা পাশ কাটিয়ে একটু ধারে সরে দাঁড়াবে এমন সময় গাড়ী থেমে গেল। ও মা! এ যে সেই অমলবাবু, আর একটি নূতন ছেলে, সঙ্গে একজন প্রৌঢ়া মহিলা। অনিমা মুখ ফেরালে। অমল গাড়ী থেকে নেমে সুশীলবাবুকে নমস্কার জানিয়ে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করলে। সুশীলবাবু অপ্রসন্ন মুখে জবাব দিলেন, 'ব্যাপার কি তা দেখতেই ত' পাচ্ছেন। উনি এমনি ড্রাইভার, যে মাঝ রাস্তায় এনে এখন চাকা ভাঙলেন।'

অমল বল্লে—'কই না! চাকার ত' কিছু হয় নি, টায়ারটা কেবল ফেটেছে।'

'ওই হল মশাই! ভাঙ্গায় আর ফাটায় তফাৎ কি? এখন বিপদ্ ত' হ'ল!'

"আসুন না, আপনারা আমাদের গাড়ীতে। তারপর ফেরবার পথে আপনারা এ গাড়ীতে উঠ্‌বেন, যদি ততক্ষণে মেরামৎ শেষ হয়। বেশীক্ষণ লাগবে না, মনে হয়। আপনারা কালীবাড়ী যাচ্ছেন ত?"

সুশীলবাবু অনিমার দিকে তাকালেন। সে দিকে উদাসীন বৈরাগ্য দেখে খানিক ইতস্ততঃ করে ওদের গাড়ীতে যাওয়াই ঠিক্ করলেন।

গাড়ী শীঘ্রই এসে মন্দিরের কাছে দাঁড়াল। ওঁরা আলাদা প্রবেশ করলেন। পরস্পর কাছাকাছি রইলেন বটে, কিন্তু সুশীলবাবু তেমন আলাপ করলেন না, বোধ হয় শুধু কেন্‌বার দিনে অপ্রিয় স্মৃতিটা ভুলতে পারেন নি। এটুকু অনিমার দৃষ্টি এড়াল না। সঙ্গিনী মহিলাটীর সঙ্গে তার একটু আলাপ হল, তাই থেকে সে জেনে নিলে যে অমলবাবু তাঁর ছেলের বন্ধু। কলেজে পড়ান; ছুটীতে এখানে এসেছেন। এর বেশী আর কথাবার্ত্তার ফাঁকে জানা গেল না; অনিমারও কেমন লজ্জা করতে লাগল, পাছে অযথা কৌতূহল প্রকাশ পায়।

মন্দির দর্শনের পর বাইরে এসে দেখা গেল যে গাড়ী সারা হয়ে গিয়েছে, সুতরাং অমলবাবুদের আতিথ্য গ্রহণ করার কোনও প্রয়োজনই হল না। সেদিন বাড়ী ফিরে এসে সুশীলবাবু কথায় কথায় বল্লেন, "বিদেশে এই ছেলে ছোক্‌রাদের গায়ে পড়া আলাপ আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না। আমাদের দেশে সামাজিকতা একটা ব্যাধিতে দাঁড়িয়েছে। তা হলে পাড়াগাঁয়ে আর কি দোষ করেছে?"

অনিমা কি একটা সেলাই করছিল, মুখ আনত রেখেই প্রশ্ন করলে, "তুমি কি কিছু অসভ্যতা লক্ষ্য করেছিলে ওঁদের ব্যবহারে?"

"না, তা ঠিক নয়,—তবে মানে হচ্ছে এই, যে আমরা হেঁটে যেতেও ত পারতুম্!"

"তা হলে গাড়ীতে আমাদের নিমন্ত্রণ করাটাই অন্যায় হয়েছে বোধ হয়।"

অনিমার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। "বিদেশে এসে চোখের সামনে কেউ অসুবিধায় পড়েছে দেখলে যদি সাহায্য করবার প্রবৃত্তি হয়, তা হলে তার সমালোচনা চলে না। আর আজকালকার ছেলেদের তুমি দেখতে পার না, এই হচ্ছে আসল কথা, কাকা।" অনিমা হাসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু অনিমার কণ্ঠস্বরে বোধ করি ঈষৎ উষ্মা প্রকাশ পেয়েছিল। অনভ্যস্ত সুরে সুশীলবাবু একটু বিস্মিত হলেন।

* * *

ছুটীর মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। দুএক-দিনের মধ্যেই এবার অনিমারা কলকাতায় ফিরবে। জিনিষপত্র গোছ করা হচ্ছে, সুশীলবাবু পিছনে তাগাদা দিচ্ছেন, "একটু নজর রাখিস্, অনু। আবার শেষ পর্য্যন্ত কিছু পড়ে না থাকে,—অন্যমনস্ক হয়ে যেন কিছু ফেলে যাস্‌নে।"

কিছুক্ষণ পরে কাজের ফাঁকে অনিমা বাইরের দিকে এসে শুনতে পেল, কাকা কার সঙ্গে কথা কইছেন। মুখ বাড়াতেই অমলবাবুর সঙ্গে তার দৃষ্টিবিনিময় হল। এ অবস্থায় সামনে যাবে, কি আত্মগোপন করবে, অনিমা ঠিক্ বুঝতে পারলে না। সামনে বেরিয়ে সহজ সম্বোধন করাটাই ভদ্রতাসঙ্গত ভেবে অনিমা এগিয়ে এল। অমল নমস্কার করে বললে, "আপনি সেদিন আমাদের গাড়ীতে এই পার্সটা ফেলে এসেছিলেন। তাই দিতে এলাম।" অনিমা পার্সটা নিয়ে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালে। দু' চারটে কথার পর অমল আপনি উঠে বল্লে, "আচ্ছা আসি। নমস্কার।"

অনিমা লক্ষ্য করলে অমলবাবু চলে যাবার পর কাকা চুপ্ করে বেতের চেয়ারে বসে রইলেন। সেদিনটা সুশীলবাবুর গাম্ভীর্য্য অটুট রইল।

রাত্রে খেতে বসে কেবল সুশীলবাবু একবার অনুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই অমল ছেলেটী আমাদের বাড়ী চিনলে কি করে জানিস্?"

অনু বল্লে, "সেদিন মন্দিরে ভদ্র-মহিলাটির সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছিল, তখন কথায় কথায় বলেছিলুম্।"

সুশীলবাবু বললেন "হুঁঃ।"

অনু কিন্তু একটা কথা না বলে থাকতে পারলে না—"আজকালকার ছেলেদের কিন্তু দায়িত্ববোধ বড় বেশী।" যাঁকে লক্ষ্য করে বলা হল, তিনি বোধহয় অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন; শ্লেষটুকু কাণে পৌছুল কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

রবিবার রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে অনিমারা একটু আগেই ষ্টেশনে গেল। কারণ ট্রেন অনেক রাতে, সুশীলবাবুর মতে ষ্টেশনে অপেক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত। অনিমার মন একটু বিষণ্ণ। ভাবছিল—প্রথমটায় মধুপুর এসে এত খারাপ লেগেছিল যে বলবার নয়। অবশ্য শেষের ভাগে একটু আধটু বেড়াবার সুবিধা হয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে আবার সেই একঘেঁয়ে জীবন! মধুপুরে যে তার খুব ব্যতিক্রম ঘটেছিল তা নয়, তবে মন্দের ভাল।...আচ্ছা...অমলবাবু কলকাতায় চলে গেছেন কিনা, কে জানে......

ট্রেন এসে পৌঁছুল যথাসময়ে। অনিমারা ফাঁকা দেখে একখানা ইণ্টার ক্লাসের কামরায় উঠল। উঠেই দেখে, অমলবাবু এককোণে সতরঞ্চি বিছিয়ে বসে আছেন। অমল উঠে তাদের নমস্কার করে মালপত্রগুলো তুলিয়ে দিল। সময় অল্প, তার ওপর এই মালের বোঝা। সুতরাং অমলের সাহায্যের পুরো প্রয়োজন ছিল।

ট্রেনে সে রাতে আর বেশী বাক্যালাপ হল না। সুশীলবাবুর প্রশ্নে এক আধটা জবাব অমল দিচ্ছিল, এই পর্য্যন্ত। অনিমা কাকার বারণ সত্ত্বেও জানলায় মুখ বার করেছিল, জিজ্ঞাসা করলে শুধু বলেছিল, 'বড় মাথা ধরেছে।' সুশীলবাবু শুনে বললেন, 'একটা না হয় ক্যাফিয়াস্পিরিন খেয়ে ফেল্। তোদের এই সময় নেই, অসময় নেই, মাথা ধরা রোগটা আমি বুঝতে পারি না।'

অমল অনিমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলে।

অনিমার বোধহয় নিদ্রাকর্ষণ হয়েছিল। জেগে দেখে ট্রেণ বর্দ্ধমানের কাছে এসেছে। সুশীল বাবু আপন মনে বলছেন, "এখানে একটু গরম জলের জোগাড় করতে হবে।" অমল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালে। সুশীলবাবু বললেন, "আমি চা খাইনে, ওটা ভারী বদ্ নেশা। বায়ু বা অজীর্ণ রোগের পক্ষে একেবারে মারাত্মক। আমি লেবু ও গরম জল সকালে খাই। তিনি ব্যাগ খুলে লেবু আর পেয়ালা বার করলেন।

ট্রেণ থামতে সুশীল বাবু চায়ের ষ্টলের দিকে গরম জলের সন্ধানে ছুটলেন। অনিমা সেই দিকেই চেয়ে রইল।

অমল কি যেন ভাবলে। তারপর অর্থসূচক কাশিতেও যখন অনিমা মুখ ফেরালে না, সে তখন একটু ইতস্ততঃ করে, সোজা সামনের বেঞ্চিতে এসে বসল। অমল জানে—হয় এস্পার, নয় ওস্পার। সময় অতি সংক্ষিপ্ত; আর মনের ভিতর অজস্র কথা ভিড় করে রয়েছে। কি যেন বলবে ঠিক্ করতে পারলে না। তারপর অত্যন্ত ভীরু ভাবে বললে, "কিছু মনে করবেন না অনিমা দেবী! আপনার কাকার অনুপস্থিতিতে কোনও সুবিধা করে নেওয়ার উদ্দেশ্য আমার নেই। অথচ ওঁকে ত আর বলা যাবে না! কলকাতায় গিয়ে আপনাদের দেখা কি মিলবে?"

অনিমা মুখ ফেরালে। পলকের জন্য সে অমলের মুখের ওপর দৃষ্টি-নিবদ্ধ করলে। এবং একমাত্র মেয়েরাই যা পারে, সেই এক নিমিষেই অনু অমলের বেশভূষা, চোখ, মুখ সব ঠাহর করে নিলে, কিন্তু জবাব দিলে না।

"শুনছেন, আপনাদের ঠিকানাটা যদি বলেন......আপনার কাকা আবার এখুনি এসে পড়বেন......"

এক মুহূর্ত্তে অনিমার বুকের মধ্যে কি রকম আন্দোলন সুরু হল। ভূমিকম্পের মতই অনেকটা, সে দোলন যেন থামে না। এ রকম অনুভূতি কখনও তার হয় নি। এই ভীরু চাঞ্চল্য-জনিত উদ্বেগ আর তারি প্রতিক্রিয়া,—সঙ্কোচ-জনিত নির্ব্বাক্ স্থিতি, দুয়ে মিলে সে এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। অনুর 'মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ', এদিকে অপর একজনের 'দহে অন্তরে নির্ব্বাক্ বহ্নি!'

অমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "বলবেন কি? ঐ যে সুশীল বাবু আসছেন।" সত্যিই—কাকার কম্ফর্টার দেখা যাচ্ছে।

অনিমা একটু ইতস্ততঃ করলে, তারপর পরিষ্কার গলায় বললে, '১৮।২, ভুবন ধরের লেন। পার্কের দক্ষিণে......'

অমল প্রশ্ন করলে, "আপনার কাকা কি আমার যাওয়া পছন্দ করবেন? কিন্তু উপায়ও ত নেই। আচ্ছা দেখুন, একটা কথা। আপনারা......?"

"বৈদ্য।"

অমল বললে, "আমরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু জাতের জন্য সামাজিক মেলামেশায় কি বাধা হবে?" আমি না হয় কবিরাজী পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলি, কি বলেন...?"

অনিমা হাসি চাপতে পারল না। সে অকৃত্রিম হাসিতে অমল মুগ্ধ হল, আশ্বস্ত হল। কাকা গাড়ীর কাছে এসে পড়েছেন। অনিমা অনেক কষ্টে গাম্ভীর্য্যের আবরণ টেনে দিয়ে জানলার দিকে মুখ বাড়ালে। আড়চোখে দেখে নিলে অমল স্বস্থানে ফিরে গিয়েছে।

সুশীল বাবু তখন বলছেন, "পয়সা দিয়ে গরম জল কিনব এক পেয়ালা, তার এত দেরী...হুঁঃ।"

* * *

সুশীল বাবু একদিন সন্ধ্যায় অনুকে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকে অনু দেখলে কাকা একখানা চিঠি হাতে করে বসে রয়েছেন। অনুর দিকে তাকিয়ে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললেন, "অমল চিঠি লিখেছে।"

অনুর হৃদয়ে বিদ্যুত খেলে গেল। বুকটা এমন ধড়াস্ করে উঠল যে প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্য অনুকে একটু সরে দাঁড়াতে হল।

"অমল লিখ্ছে, সে আমাদের বাড়ীতে আসতে চায়। বিদেশে দৈবাৎ যে আলাপ হয়েছিল, কলকাতায় এসে সেটার পুনরাবৃত্তি ইচ্ছা করে। কিন্তু আমি ভাবছি,—আমাদের

ঠিকানা জোগাড় করলে কি করে সে? তুই কি কিছু বলেছিলি?"

অনিমা ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ থেকে সহজ সুরে বললে, "বলেছি বোধ হয়, আমার ঠিক মনে নেই।"

"কবে? কোথায়?" সুশীলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

"মধুপুরেই হবে।" অনিমা সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দিল।

"কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি এই আজকালকার ছেলেদের স্পর্দ্ধা দেখে। বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে বাড়ী চড়াও।"

"কিন্তু তিনি বোধ হয় শুধু অনুমতি চেয়েছেন—নয় কি? জোর করেও হাজির হন নি! তুমি অপছন্দ কর, লিখে দাও না তোমার অমত আছে।"

অনিমার কথায় ও কণ্ঠস্বরে সুশীল বাবু তার মুখের দিকে তাকাতে বাধ্য হলেন। তারপর একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "আচ্ছা তুই যা! আমার শরীরটা জ্বর ভাব হয়েছে, পরে জবাব দেব।" অনিমা সস্নেহে কাকার গায়ের উত্তাপ দেখে বললে, "এমন কিছু না। তবে আজ আর কিছু খেয়ে কাজ নেই।"

অনিমা চলে গেলে সুশীল বাবু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ভাবতে লাগলেন। বাল্যকাল থেকে অনিমার স্মৃতি, তার অভিভাবকতা ও দায়িত্ব, তার ভবিষ্যৎ, কত চিন্তাই তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে তিনি কাগজ কলম টেনে নিয়ে লিখতে বসলেন। লেখা হলে তিনি ডাক্‌লেন, "অনু শুনে যা। অমলকে জবাব দিলুম—বলেছি দিন তিনেক বাদে সে আসতে পারে ইচ্ছা করলে। এই দেখ্‌ চিঠিখানা।"

অনু এসে চিঠিখানা হাতে নিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আড়চোখে দেখলে কাকার মুখে আত্মতৃপ্তি ও কৌতুকের স্মিত হাসি। কাকার মাথা খারাপ হয়েছে নিশ্চয়ই; বরাবরই একটু ছিট্ আছে অবিশ্যি,—কিন্তু এ একেবারে সকলের সেরা! সুশীলবাবু লিখেছেন—

"Dear Amal Babu,

With reference to your letter of the 17th inst., I beg to acknowledge the receipt of your dated yesterday and in continuation thereof, solicit three days' leave, after which I expect......"

"কিন্তু কাকা, এ রকম ইংরেজী......"

"খারাপ? কোন্ খানটায় শুনি? এ সব ফর্ম্ম্যাল ব্যাপারে অফিসিয়াল চিঠি দেওয়াই উচিত। হাজার হোক্ আমি হলুম্ গিয়ে,—যাকে বলে অভিভাবক। ইংরিজীটা খারাপ হয়েছে? কই আমাদের সাহেবত কখনো এ কথা আমায় বলেনি! তবে হ্যাঁ খুঁৎ একটু আছে বলতে পারিস্, ওই 'leave' কথাটায়। লীভ্—কিসের লীভ?—তাই ত! তা দে, চিঠিখানা না হয় পাল্টে লিখে দিই।"

অনিমা চিঠিখানা রেখে দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। উদ্গত হাসিটা কিছুতেই বাগ মানে না।

শোবার ঘরে ঢুকে অনিমা আয়নার কাছে দাঁড়াল। আপনার মুখ চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখে সে মনে মনে লজ্জিত হ'ল। ভাবলে—অমল বাবুর কি সাহস? কাকাকে আবার চিঠি লেখা হয়েছে! একেবারে ছেলেমানুষ, যেমন তিনি, তেমনি কাকাবাবু! তবে পুরুষেরা একটু ছেলেমানুষ হওয়াই ভালো—সত্যি গাম্ভীর্য্য ওদের মানায় না—মোটেই। কিন্তু অমলবাবুর একটা বিশ্রী দোষ আছে...সব সময়ে সার্ট পরেন কেন? পাঞ্জাবীতে ঢের ভালো দেখাত। তাও সার্টের রঙটা ছাই! পছন্দের জ্ঞান একেবারে চমৎকার। বাড়ীতে বোধ হয় দেখবার কেউ নেই·· হয়ত বুড়ী মাসী-পিসী আছে। শুনেছি ত মা নেই...তাদের কি আর এ সব খুঁটিনাটি জিনিষে নজর···? চুল কম বটে, কিন্তু উল্টো দিকে সিঁথি কাটলে অতটা ত বোঝা যায় না! এটাও কি বলে দিতে হবে?···

শরৎ

শ্রীবীণা দেবী

এসেছে শরৎ ফিরিয়া আবার তাঁহার চরণে দিতে ফুলভার
তরুশাখে পাখী গাহিছে আবার বন্দনা অবিরাম.
আবার তরুণ অরুণ আলোকে জাগিয়া বিশ্ব নমিছে পুলকে
মন্দ পবনে বহিল ভূলোকে আনন্দ অভিরাম।
দীঘি ভরা জল উছল উছল মৃণালে শোভিছে শত শতদল
গগনে হাসিছে শশী নিরমল, কাননে পুষ্পদাম
শুচি সুন্দর শুভ্রবসনা মেঘকুন্তলা কুসুমভূষণা
তাপসী শরৎ ঊর্দ্ধনয়না জপিছে তাঁহারি নাম।

—০—

রাধা ফিল্ম্ কোম্পানীর "কৃষ্ণ সুদামা" কল্‌কাতায় ঝল্‌সে উঠ্‌বে খুব শিগ্‌গীরই। সুদামার অংশে অভিনয় করেছেন অহীন চৌধুরী, রুক্মিণীর রূপ দিয়েছেন রূপবতী কাননবালা, আর শ্রীকৃষ্ণ—ধীরাজ ভট্টাচার্য্য।

ছবি
রাধা ফিল্ম্

মেরী কার্লাইল্ টেনিস্ যে ভালো খেলে
নয় কিন্তু। বল্ আর র‍্যাকেট্ হাতে
তার আসল উদ্দেশ্য—আধুনিক
পোষাক কা রকম হবে তাই দেখা

লিলিয়ান হার্ভে আমেরিকা, ইংলণ্ড—সব জায়গায় ঘুরে কোথাও সোনালী সকাল দেখ্‌তে পেলে না। অতএব, নিজের ঘর পানে, মানে, জার্ম্মেণীতে সে আবার চলনাময়ী ছায়াকে বরণ করে' নিয়েছে।

বেটি ফার্নেস্ উদ্দাম সমুদ্রে বোট্ চালাতে ভালোবাসে। বালুর ওপর নতুনতরো ছবি চাই, অতএব বোট্‌টাকে তুলে সে প্রায় জড়িয়ে ধরলে।

ক্লেয়ার ট্রেভরের ফক্সের মেয়ে, অনেক আশা এর ওপর। এক এক জায়গায় জিন্‌জার রোজার্সের মত দেখ্‌তে। ক্লেয়ার এখন স্পেন্সার্ ট্রেসীর সঙ্গে নেবেছে 'দান্তেস্ ইন্‌ফার্নো'তে।

ছবি
রাধা ফিল্‌ম্‌

ব্যাপার খুব বেশী সুবিধের নয় ; পিস্তল হাতে রণলাল, তার টিপ্‌এর জন্য বিখ্যাত।
রণলাল—নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে—রণলাল কে ? রাধা ফিল্মের 'কণ্ঠহার',
তার রণলাল এই অহীন চৌধুরী, কোনো বিপদ আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত।

ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা

শ্রীনিখিরাজ হালদার

(১)

বড়দিনের ছুটির সময় বাহিরে বেড়াইতে যাইয়া রাণুদের সহিত বেশ কেমন একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। আত্মীয়তার ইতিহাসটুকু যদিও সামান্য, তবুও সেটুকু না বলিলে সবদিক দিয়া সবটুকুই কেমন যেন খাপছাড়া হইয়া যায়। ব্যাপারটা লইয়া কিন্তু রাণুদের বাড়ী সে রাত্রে আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ হইয়া গেল। পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইলে এরূপ নিত্যই কত ঘটিয়া থাকে, কিন্তু এ ঘটনা যে এত আকস্মিক ঘটিয়া উঠিবে তাহা সহজে ভাবা যায় নাই।

সেদিন কয় বন্ধু মিলিয়া ঝিলের দিকে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ছোট্ট সহরের ঐটুকুই মস্ত আকর্ষণ। সন্ধ্যা তখনও হয় নাই। শীতও সেদিন পড়িয়াছিল বেশ। আমরা খানিকটা ঘুরিয়া বাঁধের উপর আসিয়া সবেমাত্র বসিয়াছি, এমন সময় পিছন দিকে ধুপ করিয়া একটা শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি ছোট্ট মেয়ে কাঁদিয়া উঠিল। মেয়েটি দৌড়াইয়া আসিতে আসিতে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি তাহাকে উঠাইয়া পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া কোলে তুলিয়া লইতেই তাহার কান্না শত গুণ বাড়িয়া উঠিল—তৎক্ষণে মেয়েটির বাপ, মা আসিয়া পড়িতেই মেয়েটি আমার কোল হইতে নামিবার চেষ্টা করিতেছিল—তাহার নরম গালটা টিপিয়া বলিলাম, "খুকু লেগেছে—না?"

অপরিচিত লোককে দেখিয়া আঘাতের চেয়ে ভয়টা বোধকরি তাহার বেশীই হইয়াছিল সুতরাং একরূপ জোর করিয়া কোল হইতে নামিয়া ছোট্ট দুইটা হাতে মায়ের কাপড় টানিয়া কান্না সুরু করিয়া দিল। মেয়েটির পিতা কেমন যেন একটু কিন্তু হইয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন,—"বড় দুষ্ট মশাই—"

প্রতিনমস্কার করিয়া উত্তর দিলাম, "ওরকম বয়সে আপনি, আমিও ত ঐরকম দুষ্টু ছিলুম।" একথা শুনিয়া ভদ্রলোকটি যত সন্তুষ্ট হউন আর নাই হউন মেয়েটির মা কোনরূপ লজ্জা না করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, "আপনারা বুঝি কলকাতায় থাকেন?"

হঠাৎ এরূপ প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না—তবুও মুখ দিয়া কেমন বাহির হইয়া গেল, "হ্যাঁ।"

মেয়েটি তাহার মাকে বড্ড জ্বালাতন করিতেছিল। তাড়াতাড়ি দুইটা হাত বাড়াইয়া বলিলাম, "খুকু আসবে।"

অপরিচিতের কণ্ঠস্বরে খুকুর কান্না থামিল বটে, খুকু কিন্তু কোলে আসিল না।

ভদ্রলোকটি এতক্ষণে কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে আপনারা কোথায় আছেন?"

শচীনকে দেখাইয়া বলিলাম,—"পুলিশ লাইনের কাছে আমার এই বন্ধুটির বাড়ীতেই একটু আশ্রয় যোগাড় কোরে নিয়েছি।"

এমন সময় একটি মেয়ে আসিয়া ভদ্রলোকটীকে বলিল,—"বেশ যা হোক জামাইবাবু, একটু আর দাঁড়াতে পারলেন না।"

মেয়েটির হাতে দেখিলাম কয়েকটি বড় বড় বোঁটাসমেত কাঠ গোলাপ রহিয়াছে। বেশ ফিট ফাট, খুব সুন্দরী না হইলেও—তাহার দেহে যৌবনশ্রীর অভাব নাই। সাধারণ বাঙ্গালা পরিবারের মেয়ের বিবাহ-যোগ্য বয়স তাহার পার হইয়া গেলেও তখনও বিবাহ হয় নাই। যাহাই হউক ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন,—"তুমি যেভাবে গোলাপ গাছগুলোকে নিয়ে টানাটানিতে মেতে উঠেছিলে তাতে এগিয়ে না এলে আর করি কি বল। তাছাড়া তোমরা কলেজে পড়া মেয়ে—ভয় ডর ত আর নেই।"

সত্যি ফুল আমার ভারি ভাল লাগে জামাইবাবু, দেখলুম কত ফুটে রয়েছে তাই কটা নেবার লোভ সামলাতে পারলুম না।

"তা তোমার যেমন ফুল লাভ হল—আমরাও এগিয়ে এসে এদের সঙ্গে তেমনি পরিচয়লাভ করলুম" বলিয়া আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"কি বলেন আমরা এগিয়ে এসে কিছু অন্যায় করেছি?"

একজন অবিবাহিত পূর্ণযৌবনা মেয়ের সম্বন্ধে আমাকে মধ্যস্থতায় টানিয়া আনা কেমন একটা বিসদৃশ ঠেকিল। মনে করিলাম কোনও উত্তর করিব না, কিন্তু মেয়েটী নিজেই কোনও দ্বিধা না করিয়া প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা আপনি ত একজন তৃতীয় ব্যক্তি আপনিই বলুন ত জামাইবাবুর এ কাজটা কি ভাল হয়েছে?" হাসিয়া উত্তর দিলাম, "ও ন্যায় অন্যায়ের কথা এখন বাদ দিন, আপনাদের মধুর সম্পর্কের মধ্যে ওরকম ঘটাটা কিছু ত আর অস্বাভাবিক নয়।"

মেয়েটী কিছু একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় শচীন, রমেন ও সুধাংশু তিনজনেই একসঙ্গে বাধা দিয়া বলিল, "সন্ধ্যে হয়ে এল, আজকাল এ জায়গাটায় যে রকম বাঘের উপদ্রব হতে

আরম্ভ হয়েছে এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা ঠিক নয়।"

বাঘের ভয়ে তখনকার মত প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়া গেল, সকলেই তখন বাড়ীর দিকে আসিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। পথে ভদ্র পরিবারের সকলের সহিত বেশ কতকটা পরিচয় হইয়া গেল। তাহাদের সকলকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া আসিবার সময় মেয়েটা আগামী কল্য প্রাতে তাহাদের বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া আমাদের আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। আমরা তাহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া শচীনের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

(২)

পথে আসিতে আসিতে শচীন বেশ একটু রসিকতা করিয়া বলিল,—"সত্যেন, হাজারিবাগ এইবার বোধহয় তোর বেশ ভাল লাগছে কেমন ?"

রমেন আমাকে ঠেলা দিয়া বলিল, "সত্যেন, মেয়েটা বেশ আপ-টু-ডেট না ? আমার কিন্তু ভাই ভারি ভাল লেগেছে—ওর কোথাও যেন একটা লজ্জার আড়ষ্ট ভাব নেই।"

সুধাংশুও রমেনকে সমর্থন করিয়া বলিল, "সত্যেন, লোকে এ সব জায়গায় বাঘ, ভাল্লুক শিকার করতে আসে তুই কিন্তু ভাই একেবারে আসল জিনিস শিকারের ফাঁদ পেতে ফেল্লি।"

সত্যই মেয়েটীর চঞ্চলতার ভাব আমাকে কেমন যেন আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, সুতরাং কোনওরূপ দ্বিধা না করিয়াই বলিলাম, "সুধাংশু—সত্যই মেয়েটীর আলাপ ভারি চমৎকার।"

শচীন চুপ করিয়াই ছিল। এবার সামান্য কিছুক্ষণ আলাপের মধ্যে মেয়েটিকে যে আন্তরিক ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি তাহা তাহার বুঝিতে বাকী ছিল না বলিয়াই বেশ একটু রসিকতা করিয়া বলিল, 'তা মন্দ হবে না সত্যেন, আমাদের কজনের মধ্যে ও রসে তুমিই কেবল বঞ্চিত—অতএব বন্ধুত্বের দিক দিয়ে অন্ততঃ তোমার মুখ চেয়ে শিকার আমরা হাত-ছাড়া কোনও মতেই করতে দেবো না—তাছাড়া তুমি যে ঐরকমই একটা চাও এ'ত আর আমাদের অজানা নেই ভাই।"

সেদিন হইতে আমাকে লইয়া বেশ একটা হাসির ফোয়ারা জমিয়া উঠিল আমি কিন্তু নিশ্চল পাথরের মত চুপ করিয়া রহিলাম। শচীনের স্ত্রী—নিলীমাও এ কথা শুনিয়া বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার অবস্থাও বেশ একটু সঙ্গিন হইয়া উঠিল—অপরাধ মেয়েটিকে আমার ভাল লাগিয়াছে।

সে রাত্রে খাইতে বসিয়া আরও অনেক কথাই হইল কিন্তু নিলীমার অনুরোধে উপস্থিত সকলের জ্বালাতনের হাত হইতে রেহাই পাইলাম।

(৩)

পরদিন নিবারণ বাবুর বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে নিলীমা আমাদের সঙ্গী হইল। নিবারণ বাবু বাহিরে আমাদের আসার অপেক্ষা করিতেছিলেন। বেশ যত্ন-আগ্রহ করিয়া আমাদের বসাইয়া গল্প সুরু করিয়া দিলেন। নিলীমা সটাং ভিতরে ঢুকিয়া গেল। কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর নিবারণ বাবু রাণু রাণু বলিয়া ডাকিতেই রাণু বাহিরে আসিতেই বুঝিতে পারা বাকী রহিল না যে যাহার কথা সকল সময়ে চিন্তা করিতেছি সেই এই—রাণু।

আলাপ আপ্যায়ণে রাণুর যে মোটেই আড়ষ্টভাব নাই তাহা আরও ভাল করিয়া আমার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া গেল। নিবারণ বাবু চায়ের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন—অল্পক্ষণের মধ্যেই চায়ের নিমন্ত্রণ রীতিমত নানাবিধ বাটীর তৈয়ারী খাদ্য মিষ্টান্নের পর্য্যায়ে পড়িয়া গেল।

সকলেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিলাম,—"সকাল বেলা আমাদের ওপর এ সব অত্যাচার কেন নিবারণ বাবু ?"

নিবারণ বাবু বলিলেন,—"অত্যাচার নয় আজ আপনাদের পেয়ে সত্যই আমি যে আনন্দ লাভ করছি সেটুকু থেকে অনুগ্রহ করে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। হঠাৎ রাণু আসিয়া বলিল,—"বেশ আপনারা চুপ করে বসে রইলেন যে বড় !"

শচীন উত্তর করিল,—"এই অসময়ে এ সব কিন্তু ভারী অন্যায় রাণু।"

রাণু জবাব দিল,—"ন্যায় অন্যায়ের কথা পরে ভাববার যথেষ্ট সময় পাবেন, কিন্তু পরে আপনাদের একসঙ্গে পাওয়া হয়ত আমাদের কাছে সাধনা হয়ে দাঁড়াবে সুতরাং উপস্থিত অন্যায়টার জন্য অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন।"

খাওয়ার চেয়ে রাণুর উপর আমার আকর্ষণটা পড়িয়াছিল বেশী। সুধাংশু বলিল, অসময় বল্লে আর উপায় নেই আমাদের উদর পুরণে এরা যদি সত্যই আনন্দ পান, তাহলে মিছামিছি মনোকষ্ট দিয়ে লাভ নেই—"

বলিলাম,—"অগত্যা—।" নিবারণ বাবুর বাড়ীর চায়ের নিমন্ত্রণটা বেশ উত্তম মধ্যম হইয়া গেল। কিন্তু নিলীমা সেই যে আসিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল তাহার আর বাহির হইবার নাম পর্য্যন্ত নাই এবং আসা অবধি নিবারণ বাবুর স্ত্রীকেও দেখা যায় নাই। তাহার পর রাণুও সেই ঢুকিয়াছে তাহারও আর দেখা নাই। এমন সময় রাণু এক প্লেট পান লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সারা হাতখানায় চুণ ও খয়েরে তখনও মাখামাখি। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাণু তাহলে তুমি পানও সাজতে পার দেখছি।"

শচীন কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় তাহাকে বাধা দিয়া নিবারণ বাবুর

স্ত্রী আসিয়া বলিলেন, "শুধু পান সাজা নয় অনেক কিছুই ভাল সাজাতে জানে সুতরাং ভবিষ্যতে কোনও দিক দিয়ে অসুবিধের ভাবনা নেই।"

রাণুর দিদির এ হেঁয়ালীর অর্থ প্রথমটা বোধগম্য হয় নাই, হঠাৎ দরজার আড়ালে চোখ পড়িতেই দেখিলাম নিলীমা মুখ টিপিয়া বেশ হাসিতেছে তখন আসল ব্যাপার বুঝিতে আর মোটেই বিলম্ব হইল না।

রাণুর দিদির কথায় সকলের মধ্যে বেশ একটা হাসির ধুম পড়িয়া গেল। এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে রাণুর অবস্থা দেখিবার জন্য চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম কিন্তু তখনকার মত সেখানে রাণুর দেখা পাওয়া গেল না। এমন সময় ছোট্ট খুকুটা মাছিমা মাছিমা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বেলা বাড়িয়া আসিতেছিল সুতরাং সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়া আমরা উঠিয়া পড়িলাম—আসিবার সময় শচীন বৈকালে রাণুদের সকলকে তাহার বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল।

(৪)

বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলেই জানিত আমি বিবাহ করিব না বলিয়াই ছোট ভায়ের বিবাহে অনুমতি দিয়াছিলাম। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে রাণুকে দেখিয়া অবধি আমার মনের সে অটল সঙ্কল্প অস্থির হইয়া উঠিল এবং এক প্রকার ঠিক করিয়াই ফেলিলাম রাণুকে বিবাহ করিব। আমার এ মনের কথা যে ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় সকলেই তা বুঝিতে পারিয়াছিল। পথে আসিতে আসিতে নানা কথা প্রসঙ্গে নিলীমাকে বলিলাম,—"নীলিমা, তুমিই এ কেলেঙ্কারীটা ঘটালে, ছিঃ! নিবারণ বাবু কি মনে করছেন বলত।" নিলীমা উত্তর দিল, "নিবারণবাবু বেশ ভালই মনে করছেন। তাঁর বেড়াতে আসা এখানে সার্থক হয়েছে। তিনি তাঁর শ্বশুরকে একটা মহা ভাবনার হাত থেকে বাঁচিয়ে যে উপকার করলেন তাতে আপনার ওপর তাঁর কোনও মন্দ ভাবনা আসতেই পারে না।"

এসব কথার উত্তরে বলিবার কিছুই নাই এই ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলাম। এবং পাছে আমাকে ঘাঁটাইলে বিপরীত ফল হয় এই ভাবিয়া আর কেহ কোনও কথা বলিল না।

বৈকালে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রাণুও আসিল। যতই তাহাকে দেখি ততই যেন আকর্ষণ তাহার প্রতি বাড়িয়াই চলে। নারীর লজ্জার সহিত চঞ্চলতা মিশিয়া তাহাকে যেন এক অপরূপ সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে। অন্তরে কোনও দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই—সদা প্রফুল্লময়ী নারী। গত দিনের ঝিলের ধারের ঘটনাটা নূতন করিয়া মনে হইল। সকালের চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষার কথা পুনরায় ভাবিয়া লইলাম।

এতক্ষণ রাণু সকলের সহিত গল্প করিতেছিল, হঠাৎ দেখি নিলীমা ও রাণু দুইজনে চা ও মিষ্টান্ন পরিবেশনে বিশেষ ব্যস্ত, আমার বন্ধুদের মধ্যে রমেন সকলের চেয়ে ছোট বলিয়া শচীনের স্ত্রীকে বউদি বলিয়া ডাকিত। সে রাণুকে এইভাবে কার্য্যে লিপ্ত দেখিয়া বলিল "বউদি, এ তোমাদের ভারী অন্যায়, বেচারীকে নিমন্ত্রণ করে এনে জব্দ করার প্রয়োজন?"

নিলীমা হাসিয়া উত্তর করিল "সত্যেনবাবু লাজুক মানুষ কিনা তাই রাণুর পরিবেশন করার প্রয়োজন হয়েছে।"

রমেন বলিল, "যাক ঘটনাটা বউদি তুমিই করলে।"

এমন সময় রাণু চায়ের কাপটা সত্যেনের সম্মুখে নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল, তাহার পর তাহাকে আর ভোজ সভায় দেখা গেল না।

হঠাৎ নিবারণ বাবু শচীনকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বুঝিলাম আমাকে লইয়াই—এত জল্পনা কল্পনা—যাহাই হউক এসব কিন্তু নিতান্ত মন্দ লাগিল না।

এই ভাবে দুই চারিদিন কাটিবার পর হঠাৎ—নিবারণ বাবু সপরিবারে কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন। রাণুরা চলিয়া আসার পর আমার আর মন টিকিল না—কিন্তু শচীনের অনুরোধে আরও দুই চারিদিন কাটাইয়া কলিকাতায় ফিরিবার সময় শচীনও আমাদের সঙ্গী হইল। বাড়ী ফিরিয়া শুনিলাম আমার নাকি বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। তখনকার মত কোনও কথাই বলিলাম না। বৈকালে ঘুম ভাঙিয়া দেখি নিবারণবাবু শচীনের সহিত বসিয়া বসিয়া কি সব পরামর্শ করিতেছেন। নিবারণ বাবুকে দেখিয়া বেশ একটু আনন্দই অনুভব করিলাম। তাড়াতাড়ি তাঁহার স্ত্রী, কন্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে রাণুর খবরটাও জানিয়া লইতে দ্বিধা করিলাম না।

শচীন হাসিয়া বলিল, "নিবারণ বাবু, ও কথা এক রকম স্থির জানবেন।"

যথোচিত আলাপ আলোচনার পর নিবারণ বাবু বিদায় লইলে রাত্রে বাল্য-বন্ধু বসন্ত আসিয়া হাজির হইতে এক নূতন ভাবনা আসিয়া জুটিল কারণ প্রায় বছর তিনেক পূর্ব্বে এই বসন্তেরই ভগিনীর সহিত আমার বিবাহের কথা ওঠে, তখন বিবাহ করিব না এই অজুহাতেই বসন্তকে মনোকষ্ট দিয়াছিলাম কিন্তু আজ বসন্ত যদি পুনরায় পুরাতন কথার অবতারণা করিয়া বসে, তবে তাহাকে কি বলিব এই চিন্তাই আমাকে পাইয়া বসিল।

শচীন কি একটা কাজে একটু বাহির হইয়াছিল সেই সময় হঠাৎ সেও আসিয়া বসন্তকে দেখিয়া বলিল, "বসন্ত, এত রাত্রে! কি ব্যাপার?"

বসন্ত বলিল,—"সেই কথাটাই ত জানতে এলুম।"

শচীন বলিল, "নিবারণ বাবুর সঙ্গে বুঝি দেখা হয়নি—তা যাই হোক—অত ব্যস্ত

খেয়ালী

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ।

হে খেয়ালী, রূপস্রষ্টা, মহারঙ্গেশ্বর !
এ বিরাট বিশ্বভূমি তব নাট্যশালা,
চলচ্চিত্র অন্তরালে কি বিদ্যুত আলো
জ্ঞানময় তব সত্তা পবিত্র ভাস্বর !
ভাবময় স্বপ্নলোকে ধ্যানী নীলাম্বর,—
রচিয়াছে তব অর্ঘ্য তারকার মালা ;
মর্ত্ত্যবুকে লক্ষকোটি চরিত্রের ডালা
সাজায়েছে প্রেমমুগ্ধা ধরার অন্তর !

মৃত্তিকার অসহায় দুর্ব্বল সন্তান
নানাছন্দে, নানাসুরে তব স্তুতিগান
গাহে নিত্য, অনিবার্য্য ভুলি' মৃত্যুভয়,
তুচ্ছ করি' ধূলিকীর্ণ দুঃখের জঞ্জাল ;
সুন্দর কুৎসিৎ সাজে, দুর্ব্বল-দুর্জ্জয়
শক্তিমান মূর্ত্তি ধরে বীভৎস কঙ্কাল॥

হয়োনা সত্যেনের হয়ে আমিও তোমায় কথা দিচ্ছি তোমার বোনের সঙ্গেই সত্যেনের বিবাহের কথা পাকা।"

বলিয়া বসিয়া সবই শুনিলাম কিন্তু পূর্ব্বের মত না বলিবার শক্তি যেন হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। তবে রাণু যে বসন্তের বোন একথা শুনিয়া আনন্দ পাইলাম আরও বেশী, কারণ এত দিন পরে বসন্তের কথাটা রাখিতে পারিয়াছি এই ভাবিয়া।

রাণুর সহিত বিবাহ আমার হইয়াছে। নিলীমা হইতে আরম্ভ করিয়া নিবারণ বাবুর ছোট্ট মেয়েটা পর্য্যন্ত আমাকে কম বেশী জ্বালাতন করিতে কসুর করে নাই।

তাহার পর আজ কয়েকটা বৎসর গত হইয়াছে। এখন ভাবি ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় জীবনে যে ভুল করিয়াছি তাহার আর চারা নাই।'

আর্টে আমিত্ব

শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালক : রাধা ফিল্ম

বেশ দেখা যাচ্ছে আমাদের আর্টের ভিতর আজ এসেছে একটা আমিত্ব। আর এই আমিত্বের ভাবে উন্মাদ হয়ে ব্যক্তিত্ব এত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যে আর্টে ও কলাবিদ্যায় এসেছে একটা দুর্নীতি। এমন একটা ভ্রান্তি যে শিল্পীরা অতি কৌশলে নকল জিনিষগুলোকে আসল বলে চালাতে চেষ্টা করচেন; অথচ ভাবচেন তাঁরা নিত্য নব নব অবদান সৃষ্টি করচেন।

দু'একটা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত, আর সকলেই চর্ব্বিতচর্ব্বণ অথবা পুরাতন নিয়েই নাড়া-চাড়া করচেন। অনেকস্থলে বরং তা করতে গিয়ে না-পুরাণো-না-নূতন এক বিকৃত শিল্পের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা তবু আমিত্বের ঢক্কা বাজিয়ে নূতনত্বের জয় ঘোষনা করচি।

শিল্পের সৃষ্টি দেখে শিল্পীর কৃতকার্য্যের পুরস্কার দেওয়া ছিল চিরন্তন নিয়ম। কিন্তু আজকাল প্রথমে শিল্পীকে জয়মালা পরিয়ে পরে তার শিল্পের ভালমন্দ বিচার করা হয়। আমিত্বের প্রভাবে ছোটকে বড় ক'রে তুলে ধরা ও বড়কে ছোট করা এও হয়েছে যুগধর্ম্ম। ওস্তাদকে বড় করবার এবং 'বড়পায়াকে' খুসী রাখবার জন্য আজ নানা প্রকারের অভিনব চেষ্টা চলছে। ছবিকে সুসঙ্গত ও পর্য্যাপ্ত করতে আজ ব্যক্তিত্বই বসেছে শ্রেষ্ঠাসনে। সে মন্দকে ভাল বলবে, ভালকে মন্দ। শত প্রতিবাদেও আমিত্বের কোন ক্ষতি হবে না।

চলতি চিত্র ও পুরানো দৃশ্য এঁকে আমরা প্রচার করছি যুগচিত্রের সৃষ্টি। তার খুটিনাটিগুলি পরিপাটী ক'রে দেখে যাচ্ছি, কোথাও যেন কিছু বাদ না পড়ে। কিন্তু পদে পদে যে আসলে ভ্রমপ্রমাদ ঘটে চলেছে, এই তরুণ কলাচেষ্টার যুগের আমিত্ব তা মানবে না। ঘটনাপুঞ্জ সঙ্কুচিত, প্রকাশ অসংলগ্ন, আকার ও প্রাণের ভিতর কোন সংহত সামঞ্জস্য না থাকলেও ব্যক্তিত্ব শক্তি-বলে বর্ত্তমানের ভাব ও কল্পনাপ্রসূত শিল্পকে উচ্চতর আর্টসৃষ্টি বলতে হবে।

এদিকে না আলোচক না ভাবুকদের—কারো মনে তৃপ্তি নাই। অথচ পক্ষপাতিত্ব ও একচোখো দৃষ্টিপাত আমিত্ব কিছুতে ত্যাগ করবে না।

আমিত্বজোরে যেমন তেমন ভাবে রস-সৃষ্টি করলে অথবা শ্রেষ্ঠরস বা রসের পূর্ণতা না দেখাতে পারলে আর্ট হয় না। তবে সমস্যা-শ্রেষ্ঠ কি? কেহ বলেন, আর্টে আদর্শ গড়ে তোলা শ্রেষ্ঠ। দেখাও সতীধর্ম্ম, ভক্তের ঈশ্বরানুরক্তি, কর্ণের দানশীলতা ইত্যাদি। কেহ বলেন আদর্শ যতই মহান হোক না কেন চিরন্তন সত্যের কাছে কিছু নয়। তাহাই প্রকৃত শিল্পীহীনতর বস্তুর ভিতরেও রসসৃষ্টি করতে পারেন। শরীরের ভোগের মধ্যেও রসের পূর্ণতা দেখান যায়। মর জীবনের উদ্বেলিত স্রোতের মধ্যেও অমৃতরসের সন্ধান মেলে।

আর্টে আমিত্ব ও ব্যক্তিত্ব যদি একটু শান্তভাব ধারণ করে, শীঘ্রই আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পে সত্যিকারের আসবে প্রগতি। দেশে সত্যিকারের লাভজনক ব্যবসার হবে প্রসার। সবার বড় জাতির সুবিরাট এই সত্য জগতে হবে সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা। নতুবা ব্যক্তিত্ব আর্টকে শৃঙ্খলিত করে যতক্ষণ মুষ্টিমধ্যে আঃত্ত করে রাখবে, ততক্ষণ আর্টে কিছুতে প্রাণসঞ্চার হবে না। আর্টের সৃষ্টি হবে, তবে জড় পদার্থের শুধু সংখ্যা বাড়াতে। ব্যক্তিত্ব আর্টকে নিয়ে যতদিন ভালমন্দ, শুদ্ধাশুদ্ধ মঙ্গল অমঙ্গলের বিচার করবে, ততদিন উন্নতি সুদূর পরাহত। আদর্শের মানদণ্ড নিয়ে আর্টকে পরীক্ষা করা বিড়ম্বনা মাত্র, আর্ট চিরমুক্ত। আর্টের আচার বিচার নাই। আর্টের প্রভাব প্রসার সূক্ষ্ম। অতএব ব্যক্তিত্বের রক্তচক্ষু বর্ত্তমানে আর্টের উপর যতই পড়ুক, একদিন শিল্পীদেরই জয় হবে। সেদিন আগতপ্রায়!

বায়ু ও চন্দ্র

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

ভুঁয়ে
শু'য়ে
বাতাস ছিল চুপ্‌চাপ্‌···
মৌন আলাপ
চলে স্বপ্নে স্বপ্নে দূরের অজানাদের সাথে—
পূর্ণিমার এক রাতে···
রাত্রি দুপুর তখন,
নিখিল ভুবন
ঘুমে অচেতন—
পূর্ণিমার চাঁদ ষোলকলা মধ্য গগন হ'তে
নীরব সেই ঘুমের উপর ঢাল্‌ছে অবাধ
স্রোতে
আপন-হারা
পুলক-ধারা
সুধাপারা।···
সহসা মুখ তুলে'
চক্ষু দু'টি খুলে'
দেখ্‌লে' বাতাস সেই চাঁদেরে—
বল্‌লে গর্জ্জে' উঠে : "এ' আবার
এল কে রে!
এক-চক্ষু কোন্‌ দানবের একটি মাত্র
চোখ—
নাই সমীহা, নাইক পলক!
কি ভয়ঙ্কর
দৃষ্টি প্রখর!
একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে আমার পানেই
কেন?
সইব না ও-র বেপরোয়া ধৃষ্টতা এ হেন।"
বল্‌লে বাতাস আরো জোরে :
"নিবিয়ে আমি দেবই তোরে
এক নিমিষে
সব নিঃশেষে।"
ব'লেই বাতাস ক্ষ্যাপার মতন
গা-ঝাড়া দে' উঠ্‌ল' তখন—

ছুট্‌ল' কঠিন বেগে···
তাহার আঘাত লেগে'
জাগ্‌ল' নিনাদ গাছের পাতায় পাতায়—
ঠোকাঠুকি লাগ্‌ল' মাথায় মাথায়
ডালে ডালে
তাল-বেতালে।
মেঘ উঠে'
এল ছুটে'
চাঁদে দিল ঢেকে'—
তাই দেখে'
চাঁদে ডেকে'
বল্‌লে বাতাস : "শেষ করেছি তোমার
বাড়াধন
চিরদিনের মত। ঘুমাই এখন।"
বলে' বাতাস পড়্‌ল' আবার শু'য়ে
ভুঁয়ে
শু'য়ে—
চল্‌ল' আবার
স্বপ্নে স্বপ্নে দেখা পাওয়া জানা-
অজানার।···
খানিক বাদে পাশ ফিরিতেই তন্দ্রা
হ'য়ে ফিকে
দৃষ্টি বায়ুর পড়্‌ল চাঁদের দিকে।—
নেবে নাই চাঁদ—তেম্‌নি কুতূহলে
হাস্‌ছে আকাশতলে!
বাতাস গেল আরও চটে'—
বল্‌লে : "বটে!
বেঁচেই আছ দেখ্‌ছি! আচ্ছা, দেখি
আবার।"
তীক্ষ্ণকণ্ঠে করি' সে চীৎকার
ছুট্‌ল' বাতাস তুমুল হ'য়ে—
চল্‌ল' ব'য়ে···
কোলাহল সে তুল্‌ল' কত
নিবিয়ে দিতে চাঁদে জন্মের মত।···
দেখ্‌ল' বাতাস হ'চ্ছে তাহার জয়—
চাঁদে লাগ্‌ল ক্ষয়,
একটি কলা তার
হ'ল অন্ধকার।

ছুট্‌ল' বাতাস আরও জোরে
ধ্বংস করার নেশার ঘোরে···
গুহায় গুহায় জাগ্‌ল' অট্টহাসি,
বেণুরন্ধ্রে বাজ্‌ল' আর্ত্ত-বাঁশী,
নদীতটে উঠ্‌ল' কলতান···
হ'ল অন্তর্দ্ধান
একে একে ষোলকলার কলা সমুদয়—
মিথ্যা তাহা নয়।
বল্‌লে বাতাস : "ধীরে ধীরে
তোরে আমি মেরেছি রে"—
বলেই বাতাস দেখ্‌ল' অবাক্‌ হ'য়ে
পরম বিস্ময়ে,
চাঁদের কলার ঈষৎ একটি রেখা
যাচ্ছে যেন দেখা!—
বাড়্‌ছে ক্রমে যে
আকারে আর তেজে!
ছুট্‌ল' বাতাস মহাক্রোধে আত্মহারাবৎ···
হুঙ্কারে তার ভর্‌ল' জগৎ—
আতঙ্কেতে প্রাণী
হ'ল যুক্তপাণি।—
কিন্তু বৃথা পরাক্রম সে, অতি পণ্ডশ্রম,
কুবুদ্ধির ভ্রম।
ঐ ত' আবার
চাঁদের আকার
ক্রমাগত বেড়ে' বেড়ে' অবিলম্বেই হায়
পরিপূর্ণ ষোলকলা আকাশের গায়
দিল দেখা চমৎকার—
অতি নির্ব্বিকার,
তখনো তেমনি
আলোকের খনি।—
ফেলে' একটি অবসাদের শ্বাস
বল্‌লে বাতাস :
"দেখ্‌লি আমার জোর!—
অনায়াসেই একবার আমি প্রাণ নিয়েছি
তোর;
আমি দয়াবান্‌,
আবার তোরে ফিরিয়ে দিলাম প্রাণ
একটা ফুৎকারে—
প্রণাম করে' যা রে।" *

* ইংরেজী হইতে গৃহীত।

রবি-রাগ

(একটি দৃশ্য)

শ্রীশশাঙ্ক ভূষণ মৈত্র

ঘটনা :—অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পর।

কাল :—বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর।

[বর্ষা সবে শেষ হইয়াছে। মেঘমুক্ত শরতের আকাশে কে যেন খানিক্‌টা পাতলা নীল রং ছড়াইয়া দিয়াছে। সামনে একটা ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী—তাহার ধারে বসিয়া একটি মেয়ে—নদীর জল আসিয়া যেন তার পা ধুইয়া দিতেছে; কাছেই একটা বড় পাথরের উপর একজন পুরুষ—পাশের একটা বড় গাছের ছায়া তাহার উপর পড়িয়াছে। সূর্য্যের দিকে চাহিয়া মেয়েটী যেন দেখিতেছে দূর অতীতের এক করুণ দৃশ্য—আর সেই লোকটী দেখিতেছে মেয়েটির সুন্দর নিখুঁত মুখশ্রী। লোকটির সমস্ত চেহারাটায় যেন একটা রূঢ় কাঠিন্য—তবে আজিকার এই সুন্দর প্রকৃতির প্রভাবে তাহাতে যেন একটু প্রাণের সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে পাখীর কলতানে সমস্ত প্রকৃতিতে যেন পুলকের হাওয়া বহিতেছে। যুদ্ধ-জয়ের বিপুল আনন্দে দীর্ঘ অদর্শনের পর শরতের নূতন সূর্য্যকে আজ আবার সবাই নূতনভাবে বরণ করিয়া লইয়াছে।]

লোক। সত্যি, ঝর্‌ণা, তোমায় দেখে মনে হচ্ছে—তুমি এতদিন কোথায় ছিলে, মনে হচ্ছে যেন তুমি আমার কতদিনের—আমার জন্তেই যেন তুমি এতদিন অপেক্ষা ক'রেছিলে; আমিও যেন—কিন্তু, তুমি আজ কথা কইছনা কেন—কি ভাবছ?—

ঝর্ণা। আমি ভাবছি রঞ্জন, সে আজ আমায় কি বলবে!—

রঞ্জন। সে যা' ব'লে বলুকগে;—সে এসেছে দেরী ক'রে অনেক পরে,—ব্যস্ ফুরিয়ে গেল—আর কি চাই।

ঝর্ণা। কিন্তু তুমিও যে ভুল করছ—সে যে আগে আস্‌তে পারল না। আমার কিন্তু বড় ভয় হ'চ্ছে রঞ্জন,—আমার মনে হ'চ্ছে সে হয়ত আমাকে ভালবাসে।

র। আর আমিই কি তোমায় ভালবাসিনে?

ঝ। আমার কিন্তু অপেক্ষা করা উচিত ছিল—সে ফিরে না-আসা পর্য্যন্ত। সে গেল যুদ্ধে—দেশের জন্যে সৈনিক হ'য়ে মরতে—আর আমি—

র। কিন্তু—আমিও কি এতদিন ধরে যুদ্ধ করিনি ঝর্ণা,—আমার ভাগ্যের বিরুদ্ধে—আমার সংসারের বিরুদ্ধে—কার জন্যে—কিসের আশায় এতদিন সংগ্রাম ক'রে এসেছি? আমার সব চেয়ে বড় কাম্য—(জানুর উপর হাত রাখিয়া) সব সাধনার ধন এই—

ঝ। হ্যাঁ করেছ, করেছ—আর তা' তুমি পেয়েছ।

র। তবে?—কিন্তু তুমি কি তা'কে সত্যি—(আর বলিতে পারিল না।)

ঝ। না, না রঞ্জন, না—হ্যাঁ, তবে না ঠিক তোমায় যেমনটি তেমন না, তেমন না—

র। তাই বল,—আমি তোমায় ভুল বুঝিনি ঝর্ণা, আমি তোমায় ঠিক চিনেছি—আমি তোমার প্রাণের সন্ধান পেয়েছি।

ঝ। তা'কেও আমি একদিন কথা দিয়েছিলাম রঞ্জন, স-ব দিয়েছিলাম তা'কেই—কিন্তু আমিই আর অপেক্ষা ক'রতে পারলেম না। আমি কোনও দিন ভাবিনি সে আবার যুদ্ধ থেকে ফিরে আস্‌বে।—আমার কিন্তু—

র। হ'ত ভাল সে যদি আর না আস্‌ত—আমরা একেবারে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতেম।

ঝ। (পাশের সরু রাস্তার দিকে চাহিয়া) আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—ভাবছি সে এখন দেখতে কেমন হ'য়েছে—তা'র চেহারার কত খানি পরিবর্ত্তন হ'য়েছে।—

র। (কাঁধের উপর হাত দিয়া) তুমি আমায় কথা দাও ঝর্ণা,—তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না—আমি ঠিক বলছি কিন্তু ঝর্ণা,—তা' হলে সেও রক্ষা পাবে না—তুমিও পাবে না।

(মেয়েটীর মুখ যেন হঠাৎ ফ্যাকাশে হইয়া গেল; নিজের অজ্ঞাতেই যেন বুকটা দুলিয়া উঠিল—তারপর রঞ্জনের আরও কাছে সরিয়া আসিল।)

ঝ। না-না, তুমি কেন এসব কথা বলছ রঞ্জন—আমি যাব না—যেতে পারব না।

র। তবে এস আমরা চলে যাই—দূরে—বহুদূরে, যেখানে সে আর আমাদের নাগাল পাবে না। (ঝর্ণা বিস্ময়ে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।) কিন্তু এখানে থেকে কি হ'বে বলো—সামনে আমাদের বিস্তীর্ণ জগৎ পড়ে আছে—আমরা ইচ্ছা ক'রলে—

ঝ। না-না, তার জন্যে দেশছাড়া হ'তে যাব কেন? এইত বেশ আছি আমরা।

র। আচ্ছা বেশ, তাই হ'বে।

ঝ। (সূর্য্যের দিকে চাহিয়া) সন্ধ্যা ত' প্রায় হ'য়ে এল। সে ত' বলেছিল—সন্ধ্যার একটু আগেই—রঞ্জন, তুমি না হয় এখন যাও।

র। না আমি আজ এর শেষ না দেখে যাচ্ছিনে। আমার জীবনে অনেক দুর্দ্দিন এসেছে—হয়ত তার চেয়েও বেশী—কিন্তু, সে দেখতে কেমন বলত?

ঝ। আবার কেন সে কথা রঞ্জন, আমি ত' তাকে এই তিন বছরের মধ্যে একদিনও

দেখিনি—যে দিন থেকে তোমায় পেয়েছি সে দিন থেকে ত' তা'কে একটিবারের জন্যও দেখিনি—হয়ত জীবনেও আর দেখব না—দেখতে পাব না—(আর বলিতে পারিল না।)

র। আচ্ছা তার চেহারাটা কেমন? খুব লম্বা-চওড়া, না ছোট্ট ভালমানুষটি?

ঝ। এই প্রায় তোমার মতন—কিন্তু তুমি এখন যাও রঞ্জন।

র। কোন ভয় নেই; আমি আছি—ভয় কিসের ঝর্ণা,—আর আমিও যাচ্ছিনে তুমি যতক্ষণ না যাও।

ঝ। কেন?—আচ্ছা রঞ্জন, আমায় পেয়ে কি তুমি সুখী হ'তে পারবে? সত্যি কি তুমি আমায় ভালবাস?

(উত্তরে রঞ্জন কোন কথা কহিল না। কেবল দুই হাতে গভীর আবেগে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল)

ঝ। (দৃঢ়কণ্ঠে) না আমার কোন লজ্জা নেই—কোন দ্বিধা নেই, সত্যি কথা, স্পষ্টকথা তা'কে শুনিয়ে দিতে—সে যদি আমার মনের কথা বুঝতে পারত—তা' হ'লে সে কি আর—

র। ঠিক্ বলেছ, ভয় কিসের—কিসের লজ্জা তোমার—

ঝ। কিন্তু, তুমিও আমায় কথা দাও, তুমি তার গায়ে হাত তুলবে না।

র। আচ্ছা বেশ।

ঝ। না, প্রতিজ্ঞা কর।

র। সে যদি ঠিক থাকে, সে যদি কিছু না বলে—তবে আমিও কিছু কর্ব্ব না—আর তা' না হ'লে হ্যাঁ—বুঝতেই পারছ—আমি কিন্তু দায়ী নই।

ঝ। না সে হয়ত কিছু বলবে না—এখন আমাদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে—

র। (বিরক্ত ভাবে) তুমি বার বার ওই কথাই বল—আমি কিন্তু ওসব মানি টানিনে। আমরা যা' চাই তা এক্ষুনি পেতে চাই—তা' আমাদের কেউ দয়া ক'রে দেবেও না বা কারও কেড়ে নেবারও ক্ষমতা নাই—ব্যস্ সোজা কথা।

ঝ। হ্যাঁ—এই সোজা কথার দাবী হয়ত সেও ক'রবে।

র। কিন্তু, কার দাবী গ্রাহ্য হ'বে—তার না আমার?

ঝ। আমার বড় ভয় হচ্ছে রঞ্জন।

র। না ঝর্ণা, কোনও ভয় নেই—তার কোনও সাধ্য নেই যে, সে আমার বা তোমার কোন ক্ষতি করে (জামার নীচে হইতে ছুরিকা বাহির করিল।

ঝ। একি (হাত ধরিয়া) না না—ওটা আমায় দাও, আমায় দাও।

র। (সহাস্যে) আচ্ছা (পাশে ঝোপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া) এর হয়ত আজ দরকারও হ'বে না, বেশ।—আমাদের মত তুমি জীবনকে ভাল ক'রে দেখবার অবকাশ পাওনি কিনা তাই। কিন্তু এ জীবন কি ঝর্ণা?—আমি এক দণ্ডে হাজার হাজার লোক মরতে দেখেছি—হাজার হাজার মরা মানুষের স্তূপের উপর দিয়ে অবাধে হেঁটে গেছি। কতবার আমি নিজে মরতে মরতে বেঁচে গেছি—আবার নিজে শত শত নরহত্যা করেছি—এ জীবন কিছু নয় ঝর্ণা—কিছু নয়। বেশ, সে যদি কিছু না বলে—তবে আর কোনও ভয় নেই—কিন্তু সে যদি আমায় আঘাত করে—তবে কারও রক্ষা নেই—এমন কি তোমারও না।

ঝ। না না, আজকের এই সূর্য্যের কিরণ—এই পাখীর গান—এর মধ্যে তুমি আর যুদ্ধ ক'রো না রঞ্জন, দেশে আবার হিংসার আগুন জালিও না।

র। সবই ত' তার উপর নির্ভর করছে ঝর্ণা—আমি ত' এ চাইনে—আমি চাই তোমায়—আমি ভালবাসি তোমায়—তোমার ওই কালো চুল—তোমার ওই পাত্‌লা দু'খানি হাত—তোমার ওই—

ঝ। আমিও রঞ্জন, পৃথিবীতে আর কিছুই চাইনে—আমি চাই তোমায়।

র। বেশ তবে আর কেন,—এস ঝর্ণা কাছে এস—আরও কাছে—আরও, আরও—

(তাহাদের মিলনের সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল দূরে সঙ্গীতের সুর। ঝর্ণা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল। রঞ্জন তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থিত বৃক্ষের অন্তরালে গমন করিল। যেখানে তাহার ছুরিকা পড়িয়াছিল—সেখানে অপেক্ষা করিয়া রহিল। সঙ্গীত ক্রমে নিকটে আসিল।)

আমার বাঁধন গিয়াছে খুলি,
কেমন ক'রে কোথায় এলাম গেলাম যেন ভুলি'।
রবির গলে কিরণমালা,
নদীর বুকে আকাশ ঢালা,
সবার মুখে রঙের-খেলা—মেঘের ছায়া তুলি'॥

ঝ। ঐ যে—আসছে—

র। আমি এখানে আছি,—কোন ভয় নেই ঝর্ণা।

[গান থামিল। একজন মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'এই যে, এই যে, ঝর্ণা—ঝর্ণা'। ঝর্ণা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একজন সৈনিক পুরুষ সেই সরু রাস্তা ধরিয়া আসিতেছে—তাহার মাথায় উষ্ণীষ, কোমরে পেটীবন্ধ। দীর্ঘ, কৃশ, ঋজু দেহ—চোখেমুখে পশ্চিম মুখী সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ পড়িয়াছে।]

সৈ। ঝর্ণা! ঝর্ণা!

ঝ। এই যে মিহির, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

সৈ। কি কথা ঝর্ণা,—আজকের এই সুন্দর দিনে আমার সঙ্গে তোমার আর কি কথা আছে!—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গেও আমার কথা আছে ঝর্ণা—সে কথা শেষ করতে একদিন দু'দিন না, কতদিন কত যুগ যে কেটে যাবে তা' আমিই জানিনে। কিন্তু, তুমি কি আমায় চিন্‌তে পারছ না ঝর্ণা?

ঝ। আমি ঠিক চিনেছি; তুমিই বরং এতদিন আমায় ভুল বুঝে এসেছ।

সৈ। ঠিক—ঠিক্ বলেছ ঝর্ণা—আমিই তোমায় ভুল বুঝেছি। কিন্তু তুমিই এতদিন—আমার এই—এই (নিজের বুকে হাত দিয়া) খানে সূর্য্যের মতই আলো দিয়ে এসেছ—

সূর্য্যের মত করেই আমি তোমায় ভেবেছি—যুদ্ধের পরে সন্ধ্যা নেমেছে—অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে গেছে—কিন্তু আমার বুকের মাঝে সূর্য্য তখনও ডোবেনি, বরং আরও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।—ঝর্ণা, তোমার কি মনে আছে যুদ্ধের আগে নির্জ্জন বনানীর মাঝে সেই বিদায়-রজনী? 'মিহির, কোথায় যাও, আমায় নাও, আমি যে তোমায় সব দিয়ে বসে আছি—আমায় ফেলে কোথা যাচ্ছ'।—তাই আজ আবার ফিরে এসেছি ঝর্ণা। আমি মরিনি'—তোমার পুণ্যেই বেঁচে আছি,—এস ঝর্ণা, আর এখন যুদ্ধ নাই—মারামারি নাই—রক্ত নিয়ে খেলা নাই, অনন্ত উন্মুক্ত অবসর, আজ তুমি আমায় আপন ক'রে নাও—তুমি আমার—

ঝ। (পিছনে সরিয়া) না

সৈ। না? কেন?

[রঞ্জন সহসা বাহিরে আসিল]

র। (ঝর্ণার পাশে দাঁড়াইয়া) এখন বুঝেছ সৈনিক, কেন 'না'?

সৈ। কে, কে-তুমি? তোমায় দেখে মনে হয় যেন তোমার মনের ভেতর জমাট আঁধার—সেখানে যেন আজকের সূর্য্যের কিরণ গিয়ে পৌঁছায়নি'। এ কে ঝর্ণা?

ঝ। ও আমার—

সৈ। তোমার—তোমার কি? প্রণয়ী? হাঃ হাঃ হাঃ, বেশ বন্ধু, বেশ—বেশ জুটিয়েছ। আমিও আজ সকালে হাসছিলাম—হাসছিলাম ঠিক এই মনে ক'রেই—হাসছিলাম আমার ভাগ্যের কথা মনে ক'রে। বাঃ তোমার কোমরে একখানা অস্ত্রও দেখ্‌তে পাচ্ছি যে—

র। (ছুরিকায় হাত দিয়া) আমায় ঠাট্টা ক'রোনা কিন্তু, ব'লে দিচ্ছি।

সৈ। না আমি তোমাকে ঠাট্টা করছি না—আমি হাস্‌ছি জগতের গতি দেখে—তা' বেশ—বেশ—কিন্তু তোমার ও অস্ত্রের প্রয়োজন হ'বে না বন্ধু। আজকের এই সুন্দর দিনে—সূর্য্যের কিরণে—আবার সেই অস্ত্র কেন?—আমার কি? আমার সামনে আজ অনন্ত পৃথিবী পড়ে আছে। ঝর্ণা আমারই, আমিই আবার তা'কে তোমায় দিয়ে যাচ্ছি—

র। তুমি আমায় দেবে কি রকম? সে ত' আমারই—

সৈ। বেশ, তবেত আর কথাই নেই—তুমিই তা'কে নাও—বাধা দেব না। কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে একটা হাসির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে তাকেও কিন্তু তুমি বাধা দিতে পারবেনা—কি বল বন্ধু? কিন্তু তোমার চোখ মুখ এত আঁধার দেখাচ্ছে কেন বন্ধু, তোমার মনে সূর্য্যের আলো কোথায়—নাঃ তুমি পারবে না। ঝরণা! তবে যাই, কেমন?

(ঝর্ণা অগ্রসর হইবার জন্য উদ্যত হইল)

যৌবন ও জরা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

প্রমত্ত যৌবন আসি' জরারে করিল তিরস্কার—
জীবনের সৃষ্টি-কাব্যে নাহি যার কোনো অধিকার,
কেন তার বেঁচে থাকা? কে সহিবে সেই অপরাধ,
পথ দাও, পথ দাও,—পুরাই মোদের মনঃসাধ।

অবনত শির তুলি' ক্লান্ত চক্ষে করুণ দৃষ্টিতে
কাতরে কহিল জরা—ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টিতে
সকলেরই স্থান আছে,—হোক্ বাল্য, হোক্ না
সে জরা,
কোটি পুত্রে কোলে করি' বৈচিত্র্যে বিপুলা বসুন্ধরা।

যৌবন কহিল হাঁকি—বসুন্ধরা, সেও পরিমিত;
এত স্থান নাহি তার, পালিবে সে বক্ষে অবাঞ্ছিত
অযাচিত আবর্জ্জনা;—পথ দাও, পথ দাও মোরে,
মিথ্যা এই বিঘ্ন চেষ্টা—সৃষ্টি হ'তে যাও তুমি স'রে।

নিঃশাসি কহিল জরা—তব তিরস্করণীর মাঝে
কাণ দিয়া শোন' দেখি, জরারই চরণধ্বনি বাজে।
উপ্তার অশ্রদ্ধা দিয়া ডাকিয়া এনোনা তারে ভাই;
দু'দিন থাকো এ মর্ত্তে, ইচ্ছা নাই একই
সাথে যাই।

——

র। সরে এস ঝর্ণা, ওর কাছে যেও না।

(ঝর্ণা কিছুক্ষণ ইতঃস্তত করিল, তারপর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।)

সৈ। কি বন্ধু, আমি তবে চল্‌লাম, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আজ একটা মেয়ের কান্না শুন্‌তে পারবনা। আজ সবার আনন্দের দিন—দেখছনা—সূর্য্যটা কেমন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে—আজ আর কান্নাকাটি কেন? সে সব অনেকদিন সেরে এসেছি। আনন্দ কর—আনন্দ কর। কই বন্ধু,—তোমায় দেখে ত' মনে হয়না যে তুমি সুখী হ'তে পেরেছ।

র। যাও, আমি তোমার উপদেশ চাইনে—তুমি কি ঝর্ণা-কে কোন দিন ভাল-বাসতে পেরেছ ?

সৈ। হ্যাঁ, কেন—আমার ত' মনে হয় যেন পেরেছি ?

র। বেশ তার আজ এখানেই মীমাংসা হ'য়ে যাক্। (ছুরিকা হাতে লইয়া) তার জন্যে আমি যুদ্ধ করব।

সৈ। (শান্ত ভাবে) কেন বন্ধু? তোমার কাজ তুমি করেছ—আমার কাজ আমি করেছি—আমরা দুইজনে দুইপথ বেছে নিয়েছি—ব্যস্ আর কি—

ঝর্ণা। রঞ্জন।

র। ঝর্ণা—আমি কারও অনুগ্রহ চাইনে—আমি চাই নিজের বলে যা' পারি তাই নিতে।

সৈ। আচ্ছা বেশ, ঝর্ণা বলত আমাদের মধ্যে তুমি কাকে চাও? (ঝর্ণা কোন কথা কহিল না) তুমি কি আমায় চাও না ?

ঝ। না—

সৈ। দেখেছ, বন্ধু দেখেছ, ও তোমাকে চায়, ব্যস্ আর কি চাই, কই হাস্‌ছনা যে ? ফুর্ত্তি কর। হাসি ছাড়া আর এতে কি আছে বন্ধু ?

র। চুপ কর নির্ব্বোধ—(ঝর্ণা সহসা তাহার কাছে গিয়া মুখে হাত দিয়া থামাইয়া দিল)

"আজ যা' রয়েছি তারে হের তুমি অক্ষি মেলি—"

শ্রীশিভুদান রায় চৌধুরী

কালে'র আমি'র সাথে আজের আমি'র বন্ধু হেরিতেছি মিল নাহি কোনো
কালের আমির চিতা জলিতেছে স্মৃতিরূপে আজের আমির বুকে খালি
সেই স্মৃতিটুকু ছাড়া আর কিছু নাহি তার আত্মা নাই প্রাণ নাই মন-ও
কালের কামনা খানি অসীমে বিলীন তাই আজের কামনা জ্বালি
কাল যারে চেয়েছিনু আমার হৃদয় ভরি' আজ সে তো অসীমে হারায়
কোন শূন্য নভলোকে কোথা তার খোঁজ পাই নাই নাই সে আমার নাই
আজ যারে চাহিতেছি রহে সে আত্মায় মম, রহে মোর নয়ন তারায়
কালের কামনা আর আজের কামনা মাঝে মিল নাই মিল নাহি পাই

মোর জীবনেতে হেরি প্রতিদিন প্রতি পলে মৃত্যু হায় হয় উপনীত
ঘড়ির কাঁটার নাচে মৃত্যু নাচিতেছে আর বুকের স্পন্দনে মৃত্যু নাচে
এই আছি ক্ষণপরে মোরে চিনিবেনা বন্ধু আর নাহি রব' পরিচিত
অদূর আকাশে প্রিয় ঐ হের নীল জাগে ঐ হের কালো হাসিয়াছে
কাল যা' ছিলাম আমি তাই নিয়ে তুমি প্রিয় তাই মোরে কোরোনা বিচার,
আজ যা' রয়েছি তারে হের তুমি অক্ষি মেলি ধন্য হবে সাধনা আমার।

———

সৈ। আর রাগারাগি কেন, বন্ধু? আমি ত' বলেইছি আজ হাসির দিন—আমি শুধু হাসব আর ফুর্ত্তি করব। রাগারাগি মারামারির ব্যাপার ত শেষ করেই এসেছি আবার কেন? আনন্দ কর বন্ধু—আনন্দ কর—দেখছনা সূর্য্যের কেমন সোনালী আলো—একটু পরেই হয়ত ডুবে যাবে—আর আসবে না (যাইতে লাগিল)

ঝ। মিহির—(একটু পরে) আমার কিন্তু খুব নিষ্ঠুর মনে ক'রোনা।

সৈ। কোন ভয় নেই ঝর্ণা—আনন্দ কর—উপভোগ কর, এমন সূর্য্যের আলো আর পাবে না—ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

(ধীরে ধীরে সেই সরু রাস্তা দিয়া চলিয়া গেল, মুখে সেই গান)

আমার বাঁধন গিয়াছে খুলি'
কেমন ক'রে কোথায় এলাম গেলাম
যেন ভুলি।'

রবির গলে কিরণ-মালা
নদীর বুকে আকাশ ঢালা
সবার মুখে রঙের খেলা মেঘের
ছায়া তুলি'।'

(ক্রমে মিলাইয়া গেল)

রঞ্জন। (কিছুক্ষণ পরে) ও নিশ্চয়ই পাগল।

ঝ। (সেই রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিয়া) না রঞ্জন,—ওর সূর্য্যের ছোঁয়া লেগেছে।

———

ওপারের ঢেউ

শ্রীপ্রমোদ সেন

বৃটেন ও ইটালী

ইটালী-আবিসিনিয়ার ব্যাপারে ঘটনা-স্রোত যে রকম ভাবে যাবে বলে আমরা অনুমান করেছিলাম ঠিক সে রকম হয় নি। তবে আসল ব্যাপারে, অর্থাৎ যুদ্ধ যে এক রকম অনিবার্য্য, আমাদের অনুমান ভ্রান্ত নয় মনে করি। কারণ সংবাদদাতারাই ইঙ্গিত করেছেন যে ২৪শে সেপ্টেম্বর নাগাত যুদ্ধ আরম্ভ হতে পারে।

আমরা মনে করেছিলুম যে চীন-জাপানের ব্যাপারে যে রকম হয়েছিল, আবিসিনিয়া-ইটালীর সংঘর্ষে জাতিসঙ্ঘ কিছুই করতে পারবে না। পূর্ব্বের অবস্থায় মনে হয়েছিল যে ইটালী আবিসিনায় বে-পরোয়াভাবে চল্‌লে ফ্রান্সের তা'তে মাথা ব্যথা নেই; বৃটেন একটু ক্ষুব্ধ হ'লেও বিশেষ কিছু করবে না, কারণ বৃটেনের আশু কোন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা একেবারেই নেই।

কিন্তু বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর সব জল্পনাই ওলট পালট করে দিয়েছেন। তিনি জাতি-সঙ্ঘে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তা'তে মনে হয় ইটালীকে বেপরোয়াভাবে চল্‌তে দিতে বৃটেন একেবারেই নারাজ। তিনি খুব ধীর গম্ভীর-ভাবে জাতিসঙ্ঘের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং স্পষ্টই বলেন, জাতিসঙ্ঘ যদি একযোগে কর্ত্তব্য পালন করতে নারাজ হয় তাহ'লে বৃটেন ওর সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখ্‌বে না।

বৃটেনের জাতিসঙ্ঘের প্রতি এই নূতন দরদ দেখে বাস্তবিক হাসি চাপা যায় না, কারণ এর আগে জাপান ও জার্ম্মানী ভাল ক'রেই জাতিসঙ্ঘের কান মলেছে, কিন্তু তা'তে বৃটেনের মাথা ব্যথার লক্ষণ একটুও দেখা যায় নি। গত তিন বছর ধরে জাপান উত্তর চীনটা গ্রাস ক'রে ফেল্‌লে, কিন্তু বৃটেন কোনদিন জাপানের বিরুদ্ধে Economic Sanctions—আর্থিক মারণ-যন্ত্র প্রয়োগের কথা বলে নি। সেদিনও জার্ম্মানী সকলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ভার্সাই সন্ধি টুক্‌রো টুক্‌রো করলে, আর বৃটেন তার পরেই হুড় হুড় করে গোপনে জার্ম্মানীর সঙ্গে একটা নৌ-চুক্তি করে ফেল্‌লে। আর পার্লামেণ্টে এই স্যামুয়েল হোরই বৃটেনের সাফাই গাইলেন।

বৃটেনের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য আছে ব'লে আর কেউ যে সাম্রাজ্য বিস্তার করে, এটা বৃটেনের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। এই জন্যেই যখন জার্ম্মানী বিপুল স্পর্দ্ধায় উঠে দাঁড়িয়েছিল বৃটেন তার উন্নত শির অবনত করার জন্যে সর্ব্বস্ব পণ করেছিল। আজ ইটালী সাম্রাজ্য বুভুক্ষায় আফ্রিকার দিকে লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করেছে—বৃটেন তা' বরদাস্ত করবে কি করে? আফ্রিকায় বৃটেন বহু আগেই যে ভাগ বসিয়েছে।

অবশ্য আমরা বল্‌ছিনা যে ইটালীর দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় বাধা দেবার প্রয়োজন নেই। আশু প্রয়োজন হচ্ছে অসহায় আবিসিনিয়াকে রক্ষা করা এবং লোকধ্বংসকারী একটা খণ্ড প্রলয় নিবারণ করা। কিন্তু আমাদের মনে হয় বৃটেন যে রকম নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হ য়ে ইটালীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি। ইটালী পাছে যুদ্ধে জয়লাভ করে আরও শক্তিমান হয়ে পড়ে এই আশঙ্কায় সংঘর্ষের ঠিক প্রাক্কালে বৃটেন লম্বা লম্বা বুক্‌নি ঝাড়্‌ছে। আ বি সি নি য়া র সম্রাট ছয় মাস আগে জাতি-সঙ্ঘের কাছে করুণ আবেদন করেছিল। তা'তে কি বৃটেনের হৃদয় গলেছিল?

সেদিনও বৃটেন ও ফ্রান্স প্যারী-বৈঠকে এক রকম ঠিক ক'রেই ফেলেছিল যে কার্য্যতঃ আবিসিনিয়াকে ইটালীর হাতে সঁপে দেওয়া হবে। কারণ প্রস্তাব হয়েছিল শুধু যে আবিসিনয়ার আর্থিক সম্পদ শোষণ করার অধিকার ইটালীকে দেওয়া হবে তা' নয়, আবিসিনিয়াকে পিটিয়ে মানুষ করার ভার

লীগ-বুড়ীকে কি যুদ্ধের আগুন থেকে জন্ বুল (ইংলণ্ড) বাঁচাবে? ইটালী জ্বালাচ্ছে আগুন, ফ্রান্স উদাসভাবে দেখ্‌ছে—লীগ-বুড়ী ঝাঁপ দিচ্ছে বৃটেনের কোলে। বৃটেন টাল সাম্‌লাতে পারবে ত?

থাকবে ইটালীর ওপর। সৌভাগ্যক্রমে মুসোলিনি এ প্রস্তাবে রাজী হয় নি, কারণ তার খাঁই আরও বেশী।

এ ব্যাপারের আরও একটা দিক আছে। জাতিসঙ্ঘ-ভুক্ত সকলেই ইটালীর এই অভিযানের বিপক্ষে। বৃটেন ও ফ্রান্স যদি সঙ্ঘের গৌরব রক্ষার চেষ্টা না করত তা হ'লে এখনই সঙ্ঘ যেতো ভেঙ্গে ঠিক তাসের বাড়ীর মত। আমরাও অনুমান করেছিলাম তাই। কিন্তু কতকগুলি ক্ষুদ্রশক্তি ও রুশিয়ার মনোভাবে বৃটেন ও ফ্রান্স বুঝ্‌লে যে তা'রা দুজনে যদি যথাকর্ত্তব্য পালন না করে তাহ'লে তাদের নিন্দায় ইয়ুরোপ পঞ্চমুখ হয়ে উঠ্‌বে। বাস্তবিক বেলজিয়ম ও উত্তর ইয়ুরোপের ক্ষুদ্রশক্তিগুলো বল্‌লে যে, জাতিসঙ্ঘ যদি এই মুহূর্ত্তেই বিধান অনুযায়ী কাজ না করে তাহ'লে তা'রা ওর সঙ্গে আর কোনই সম্বন্ধ রাখ্‌বে না।

সেপ্টেম্বরের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে জাতিসঙ্ঘের যে সঙ্কটজনক অধিবেশন হ'ল তা'তে বৃটেন ও ফ্রান্স প্রথমে ইটালীকে খুব তোয়াজই করতে চেষ্টা করল। ইটালীর প্রতিনিধি দুজন আবিসিনিয়াকে অপমান ক'রে সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু নিন্দা হ'ল আবিসিনিয়ার—কারণ সে জোর গলায় অভিযোগ করতে সাহসী হয় কেন? আবিসিনিয়ার পক্ষে প্রফেসর জেজ নামে একজন আমেরিকান খুব ওকালতী করছিলেন, তাঁকে দেওয়া হ'ল সরিয়ে।

কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স যখন দেখ্‌ল মুসোলিনি মহাত্মন একেবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁর একমাত্র বুলি হয়েছে যুদ্ধ—এবং ব্যাপারটাকে বহু কমিটি-কমিশনের কলকাঠিতে ফেলেও ধামা চাপা দেওয়া যায় না, তখনই বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব স্যার স্যামুয়েল হোরের উদার মহান বাণী শোনা গেল—সঙ্ঘের ইজ্জৎ রক্ষা করতেই হবে।

ফ্রান্স দেখ্‌ল দাদা বৃটেন যখন মহান আদর্শে ভরপুর হয়েছেন তখন আর সে একেবারে টিমটিমে ভাবে থাকে কি করে? কাজেই ফরাসী পররাষ্ট্রসচিব লাভালও

ইটালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধের জুজুবুড়ীর ভয়ে জাতিসঙ্ঘ কম্পমান! দুঃস্বপ্নে বেচারা আঁতকে উঠছে।

বল্‌লেন—অবশ্য অনুনয়ের সুরে, কারণ তাঁর ইটালীর সঙ্গে নতুন বন্ধুত্বের জন্যে প্রাণটা একটু আনচান করছিল—হাঁ, সঙ্ঘের ইজ্জৎ রক্ষা করতেই হবে, তবে কি ভাবে, সে বিষয়ে লাভাল রইলেন নীরব। শুধু তিনি ইটালীকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন, ভাই যুদ্ধে আর কাজ কি, আমরাই ধীরে সুস্থে তোমার কেল্লা ফতে ক'রে দেব, তুমি আর জগতের নিন্দা কুড়াও কেন, আর তোমার লোক ধ্বংস করেই বা লাভ কি?

কিন্তু মুসোলিনির রোমক বীরত্ব দেখাবার জন্যে, বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার অভিযান চালান'র জন্যে সদয় উন্মুখ হয়ে আছে। ছ' মাস সাত মাস ধরে তিনি কত তোড়জোড় করেছেন, তাঁর দুই ছেলে, জামাই, আফ্রিকা ঘুরে জানোয়ার কাফ্রিদের ধ্বংস করার জন্যে দেশকে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন—তিনি এখন ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর রাশ টেনে ধরেন কি করে? কে কি বলছে না বলছে তার দিকে তাঁর খেয়ালই নেই। তিনি আগেই বলেছেন এবং এখনও বল্‌ছেন ইটালী জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করতে একটুও দ্বিধাবোধ করবে না, এবং যে কোন ইয়ুরোপীয় শক্তি হোক্‌ না কেন তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানর শক্তি ইটালীর আছে।

মুসোলিনির ক্রোধ

বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব যে রকম অকপট ভাবে বৃটিশনীতি ব্যক্ত করেছেন তা'তে মুসোলিনি গেছেন খুবই চ'টে। এর আগেই ইটালীর কাগজগুলো বৃটেনের শ্রাদ্ধ করছিল এখন তারা গেঁয়ো-গালাগালি সুরু করেছে। স্বয়ং মুসোলিনি এমন কথা পর্য্যন্ত বলেছেন যে, বৃটেনের নিজের আবিসিনিয়ার ওপর লোভ আছে বলেই সে ইটালীকে ওখানে চুঁ মারতে দিতে চায় না। মুসোলিনির একজন অনুচর বলেছে যে, বৃটেনের রক্ষণশীল দল আজ রুশিয়ার বলশেভিকদের সঙ্গে ও ফ্রান্সের সাম্যবাদীদের সঙ্গে কাজ করতে পিছ্‌পাও নয়।

ও-দিকে মুসোলিনি বুঝেছেন যে, বৃটেন হয়ত' সহজে ইটালীর

বাপ্‌কা বেটা—মুসোলিনি ও তাঁর দুই যোগ্য পুত্র। এরাও আফ্রিকার অভিযানে যোগ দিয়েছে।

উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতে দেবে না। ইতিমধ্যেই বৃটিশ রণতরীবহরের একাংশ ভূমধ্যসাগরে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। সুয়েজ খালের খুব কাছেই আলেক্‌জান্দ্রিয়া বন্দরে খান চব্বিশেক বৃটিশ রণতরী আড্ডা নিয়েছে। মাল্টাদ্বীপেও সামরিক তোড়জোড় চলেছে খুব।

কিন্তু বাস্তবিক বৃটেনকে খোঁচা দেবার শক্তি কি ইটালীর আছে? ইটালীর তিন দিকেই সমুদ্র এবং আজকাল কামানের পাল্লা যে রকম, বৃটেনের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধলে, ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ বন্দরগুলোর কোনটাই অক্ষত থাকবে না। কোন সাহসে ইটালী বলে যে, সে যে কোন শক্তির সম্মুখীন হ'তে প্রস্তুত?

তবে মুসোলিনি একটা নতুন চা'ল দিয়েছেন। গত বছর অষ্ট্রিয়া নিয়ে জার্ম্মানী ও ইটালীতে আড়াআড়ি চল্‌ছিল। কিন্তু সম্প্রতি মুসোলিনি যেন জার্ম্মানীকে তোয়াজ করার চেষ্টায় আছেন। সেদিন ইটালীর নূতন দূতকে হিট্‌লার খুব আপ্যায়িত ক'রেছেন এবং বলেছেন ফ্যাসিষ্ট ও নাজীদের আদর্শ এক, কাজেই একদিল্ একপ্রাণ হওয়া সোজা।

মুসোলিনি কি মনে করেন যে, এই সুযোগে ইয়ুরোপে একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করবেন? হাঁ, মাস দুইয়েক আগেই তিনি ইয়ুরোপকে সাবধান করেছেন যে, কোন ইয়ুরোপীয় শক্তি ইটালীর মুখের গ্রাসে হাত দিলে ইয়ুরোপেই তাণ্ডবলীলা আরম্ভ হবে। মুসোলিনির এত তোড়জোড় কি তারই জন্যে?

মুসোলিনি বোধ হয় মনে করেছেন যে, জার্ম্মানী সশস্ত্র হয়ে যে রকম শক্তিমান হয়ে উঠেছে তা'তে ইটালী ও জার্ম্মানী মিলে কিছুদিনের জন্যে ইয়ুরোপকে নাকাল করতে পারবে। কিন্তু তা'র ফল ইটালীর বা জার্ম্মানী কা'রও পক্ষে ভাল হবে না এটা সোজা বুদ্ধিতেই বোঝা যায়। কারণ এখনও ফ্রান্স ইটালীর প্রতি বিরূপ হয়নি, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে জার্ম্মানীর হাতে হাত দেবে অম্‌নি ফ্রান্স উঠ্‌বে গর্জ্জে। আর ফ্রান্সের সঙ্গে রুশিয়ার কি রকম বন্ধুত্ব হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া গেছে চার পাঁচ মাস আগে।

আবিসিনিয়া খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। ছবিতে দেখা যা'চ্ছে একদল পুরোহিত উৎসব-নৃত্যের জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছে।

আফ্রিকার আশঙ্কা

জাতিসঙ্ঘে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি ভাবী যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সাবধান-বাণী দিয়েছেন তা' বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেছেন ইটালী আবিসিনিয়াকে আক্রমণ করলেই আফ্রিকার কালার দল উঠ্‌বে ক্ষেপে। ফলে ইয়ুরোপকে আফ্রিকা থেকে একেবারেই পাততাড়ি গোটাতে হ'তে পারে বাস্তবিক দেখা যাচ্ছে সমগ্র আফ্রিকারই সহানুভূতি আবিসিনিয়ার উপর। এমন কি মিশরেও আবিসিনিয়াকে সাহায্য করার জন্যে তোড়জোড় চলেছে এবং রাজবংশীয় ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত তা'তে অগ্রণী হয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ঝুলু জাতি ঠিক করেছে যে যুদ্ধ বাধ্‌লেই তা'রা আবিসিনিয়ার সাহায্যার্থ সৈন্যদলে যোগ দেবার জন্যে লোক পাঠাবে।

কাজেই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি বলেছেন যে, ইটালী যদি জাতিসঙ্ঘকে উপেক্ষা করে তা হ'লে তাকে সাজা দেবার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকাও তাতে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করবে।

গান

শ্রীঅমূল্য চৌধুরী বি, এ

কোন্ বিরহিনী কাঁদে
আমার এ মন-মাঝে!
কাহার বুকের ব্যথা,
আমার এ বুকে বাজে!
না জানি কিসেরি তরে,
আজি মোর আঁখি ঝরে,—
সে কথা কহিতে নারি,
পাছে মরে' যাই লাজে॥
স্বপন-পারের দেশে,
কে গো মোরে কয় ডাকি,
"তোমার মোহন ছবি,
আমি মনে মনে আঁকি,"
কেন সে এমন করে
বাঁধিতে চাহে গো মোরে,
তারি কথা দেয় বাধা
(মোর) সকল কাজে॥

* ফটো *
রাধা ফিল্ম

কানন, কানন আর কানন। যেদিকে চাওয়া যায় সেদিকেই কানন। রাধা ফিল্মের "কৃষ্ণ-সুদামা" ও "কণ্ঠহার" ছবিতে সম্প্রতি এই মেয়েটি অভিনয় কোরছে।
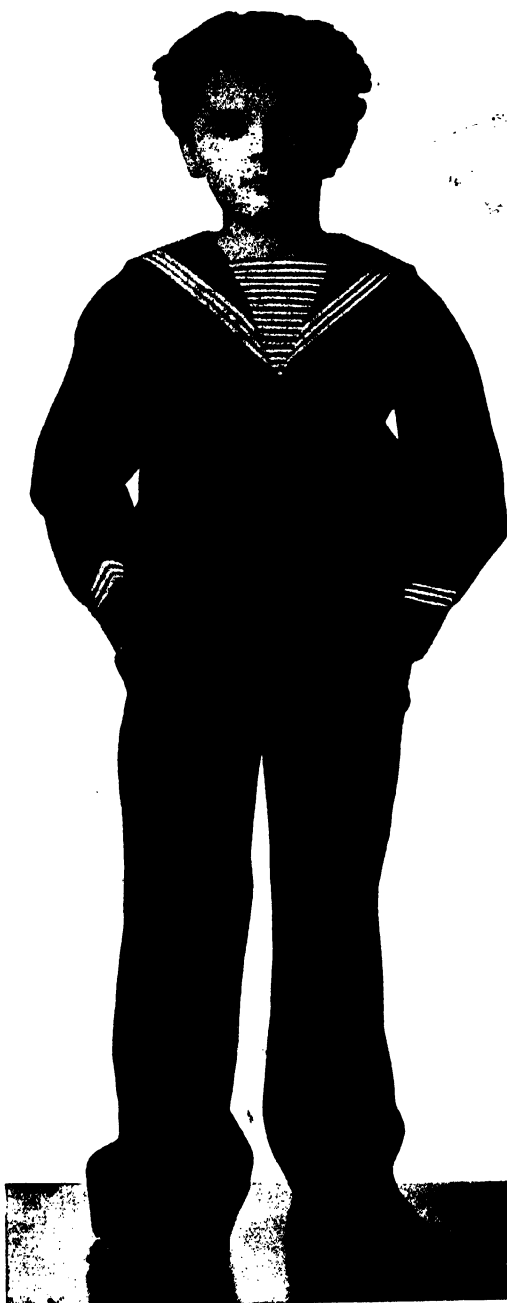
উপরে : গ্রেটা গার্বোর ছেলে ফ্রেডি বারথোলোমিউ। 'মেট্রো'-র "আনা কারনিনা" ছবিতে ফ্রেডি নাকি সুন্দর অভিনয় কোরেছে।

পাশে : 'বি-আই-পি'র "অনার্স ঈজি" ছবিতে গ্রেটা নিসেন এই অভিনব পোষাকে দেখা দেবে।

উপরে : মাণিক-জোর লরেল-হার্ডির বিচ্ছেদ সংবাদে যারা দুঃখিত হ'য়েছিলেন—তারা শুনে সুখী হবেন যে লরেল-হার্ডির আবার মিলন ঘটেছে "বনি স্কটল্যাণ্ড" ছবিতে। এই ছবিটি মিলনের পরেই তোলা।

পাশে : এই যে সুন্দর পোষাক পরা মেয়েটিকে দেখছেন এ হ'চ্ছে "ম্যাজ্ ইভান্স"।

: ফটো :
: ফক্স :

ক্লেয়ার ট্রেভর 'ফক্সে'র সুন্দরী মেয়ে। সব সময়েই হাসি-খুসিতে ভরা এই মেয়েটি আপনাদের মন আনন্দে ভরিয়ে তোলবার চেষ্টা কোরছে।

এদেশে এবং ওদেশে

সংগ্রাহক—শ্রীহরিহর শেঠ

[বহুদিন পূর্ব্বে—সম্ভবত ১৯২০ সালে—শান্তিনিকেতন গিয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ কথাপ্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনোভাব দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, Sex অর্থাৎ যৌন আবেদন ও দেশের লোকের মনে এত দৃঢ়বদ্ধ যে, সামান্য বিজ্ঞাপনের ব্যাপারেও তাহা পরিস্ফুট। কথাটী কতদূর সত্য তাহা এই চিত্রসংগ্রহ হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠও ঠিক উক্তরূপে ভাবিত হইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞাপনের প্রভেদ দেখাইবার জন্য কয়েকটী বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়াছেন। ছবিগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, দেশীয় ঔষধের চিত্রগুলি সমস্তই বল বীর্য্য না হয় ঠাকুর দেবতার কৃপা ইত্যাদি বিষয়েই ইঙ্গিত করে, আর বিদেশী ঔষধের চিত্রগুলি সমস্তই যৌন আবেদন পূর্ণ। ঔষধ সম্বন্ধে যখন একথা খাটে, তখন নৃত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সেই কথা যে অধিকতর ভাবে প্রযুক্ত হইবে—ইহাতে আর সন্দেহ কি? এই তুলনামূলক ছবিগুলি প্রকাশের সুবিধা দান করার জন্য আমরা শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের নিকট ঋণী।]

শ্রীসুবোধ রায়।

এদেশে

দেশীয় ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্র

ওদেশে

স্যানাটোজেনের বিজ্ঞাপন চিত্র

এদেশে

ওদেশে

বিদেশী সিগারেটের বিজ্ঞাপন চিত্র
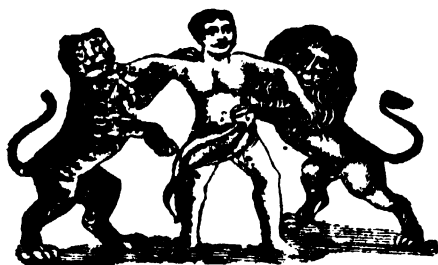
উপরে তিনখানি বলবীর্য্যবর্দ্ধক দেশীয় ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্র

হরলিক্স্ মলটেড্ মিল্কের বিজ্ঞাপন চিত্র

এদেশে

দেশীয় ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্র

দেশীয় ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্র

ওদেশে

গ্রামোফোন কোম্পানীর বিজ্ঞাপন চিত্র

বিদেশী ঔষধের বিজ্ঞাপন চিত্র

এদেশে

ওদেশে

ভারতীয় নর্ত্তকী

বিদেশী নর্ত্তকী

ভারতীয় নৃত্যশীলার বেশ ও ভঙ্গি

বিদেশী নর্ত্তকীর পোষাক ও ভঙ্গি

এদেশে

পুরাকালের ভারতীয় নর্ত্তকী

বরোদার নর্ত্তকী

বোম্বাইয়ের নর্ত্তকী

ভারতীয় বেশে বিদেশী নর্ত্তকী

ওদেশে

বিদেশী নৃত্যের ভাব

এদেশে

আলেয়ারের নর্ত্তকী

দেশীয় লজ্জাশীলার ছবি

ওদেশে

বিদেশী লজ্জাশীলার ছবি

নীরবে

৺নগেন্দ্রবালা ঘোষ।

(আমি) এত করে ডাকি, সাড়াত দিলে না

কেন আছ প্রভু **নীরবে**।

চাহিয়া আকাশে কভু থাকি বসে'

দেখা যদি পাই **নীরবে**।

তটিনীর কূলে কভু যাই চলে

শুনি তার গান **নীরবে**।

যদি দেয় ব'লে পাব কোথা গেলে

তাই থাকি বসে' **নীরবে**।

নিশি শেষ হ'লে শেফালির তলে

সুধাইতে যাই **নীরবে**।

সে কেমন করে পাইয়ে তোমারে

পুজিছে ঝরিয়া **নীরবে**।

তার মত কবে ঝরিব এ ভবে

পুজিতে চরণ **নীরবে**।

প্রতীক্ষা

৺নগেন্দ্রবালা ঘোষ।

আমি হৃদয়ের দ্বার রেখেছি খুলিয়ে

কখন আসিবে বলে'।

যতেক বাসনা এনেছি গুছায়ে

তোমাতে সঁপিব বলে'।

কামনার ফুল তুলিয়ে রেখেছি

তোমারে পুজিব বলে'।

হৃদয়-রক্ত করেছি চন্দন

তোমারে মাখাব বলে'।

নয়নের জল, ঝরে অবিরল

চরণ ধুইব বলে'।

(তুমি) কখন আসিবে বল না আমারে

দুয়ার রেখেছি খুলে।

রাধা ফিল্মের

কর্ম্মীবৃন্দ

শেঠ রাধাকিষণ চামারিয়া
সত্বাধিকারী 'রাধা ফিল্ম কোং'

মিঃ আয়াস নারায়ণ সিংহানিয়া
পরিচালক, ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স লিঃ

শ্রীতড়িৎ বসু
(প্রয়োগ-শিল্পী)

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল
প্রচার-সম্পাদক

শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রয়োগ-শিল্পী

শ্রীফণী বর্ম্মণ
(প্রয়োগ-শিল্পী)

শ্রীহরিচরণ ভঞ্জ
সহঃ পরিচালক

মুন্সী নাসার
নাট্যকার

এম্, মনজুর হোসেন
[illegible]

চলচ্চিত্র কারখানার কথা

শ্রীফণী বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ১৯৩৫ সাল বাংলা ছবির এক গৌরবময় বছর। অনেকগুলি ভাল ভাল ছবি এ বছরে দেখা দিয়েচে এবং আমাদের দেশের ষ্টুডিও-কর্ত্তৃপক্ষেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন যাতে বাংলা ছবিকে যথার্থ উন্নত করা যায়। নতুন ছবিঘর ও ষ্টুডিও যে দুচারটি হয়নি তা নয়, তবে দুঃখের বিষয় তাদের ভাগ্য বিশেষ সুপ্রসন্ন বলে মনে হয় না। দেশের লোকেরা আজকাল দেখতে চায় যথার্থ ভাল ছবি, কাজেই নতুন ভুঁই-ফোঁড়ের দল বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারচে না।

আমাদের স্থানীয় ষ্টুডিওগুলির মধ্যে রাধা ফিল্ম্‌স্ কোম্পানী বেশ প্রশংসনীয়ভাবে এ বছর কাজ কোরেচেন। "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" সত্য সত্যই এঁদের মান বাড়িয়েচে এবং আশা করা যায় "কণ্ঠহার" ও "কৃষ্ণ-সুদামা" রাধার পুর্ব্বযশ অক্ষুন্ন রাখবে। শেষোক্ত ছবিটি পরিচালনা কর্চ্চেন রাধা ফিল্মসের সর্ব্বময় কর্ত্তা শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আর গোয়েন্দা ছবি "কণ্ঠহারে"র ভার পড়েচে "দক্ষযজ্ঞ" পরিচালক জ্যোতিষ বাঁড়ুয্যের উপর। কয়েকটি তরুণ পরিচালকও এই প্রতিষ্ঠান থেকে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেচেন। এদের মধ্যে তেলেগু "ভক্তকুচেলা" ও উর্দ্দু "ওয়ামক্ এজ্‌রা"র পরিচালক তড়িৎ বসু ও হরিপদ বাবুর সহকারী ফণী বর্ম্মার নাম করা যেতে পারে। রাধার ছবিগুলির সাফল্যের আর একটি কারণ হচ্ছে এদের প্রচার বিভাগের কাজ। এর জন্য রাধা ফিল্মস্ ও ইণ্ডিয়া পিকচার্সের সুযোগ্য প্রচারকর্ত্তা শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল ও তাঁর সহকারী শ্রীগুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় ষোল আনা প্রশংসা দাবী কর্ত্তে পারেন।

"ভাগ্যচক্রে"র একটি দৃশ্য

শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রী[illegible], শ্রীইন্দু [illegible]পাধ্যায়

আর একটি প্রতিষ্ঠান, যার কাছে বাংলাদেশের চিত্রজগৎ বিশেষভাবে ঋণী, হচ্ছে নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড্। ভাল ছবি প্রযোজনায় নিউ থিয়েটার্সকে ভারতের শ্রেষ্ঠ ষ্টুডিও বলে মেনে নেওয়া হয়েচে। এক "দেবদাস" দেখিয়ে সারা ভারতকে এঁরা স্তম্ভিত করে দিয়েচেন। টেক্‌নিকের দিক দিয়ে এত ভাল ছবি এখনও এদেশে হয়নি। "দেবদাস" পরিচালক শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া এখন "স্যাটান" (Satan) নামে একটা উর্দ্দু ছবি তুলবেন এবং তারপর তিনি হাতে নেবেন শরৎবাবুর "বামুনের মেয়ে"। হেমচন্দ্র, যিনি এতদিন ছিলেন শুধু সহকারী, এখন নিজে মলিনা, সাইগল ও পাহাড়ীকে নিয়ে একটা উর্দ্দু ছবি পরিচালনা কর্চ্চেন। ছবিটির নাম হচ্ছে "লেডি ইন ডিস্‌ট্রেস্"। শ্রীদীনেশ দাস শরৎবাবুর "বিজয়া" নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্চেন যে দিন দিন তিনি কৃশতনু হয়ে পড়চেন। হাস্যরসিক ডি, জি, বা পরিচালক ধীরেন গাঙ্গুলীও সম্প্রতি এখানে এসেচেন। তাঁর এখন মহা ভাবনা কি ছবি তোলা যায়। পরিচালক নীতীন বসু "ভাগ্যচক্রে"র পেছনে এত খেটেছেন যে এখন কিছুদিন না বিশ্রাম করে তিনি অন্য ছবিতে হাত দেবেন না। শরৎবাবুর অনেকগুলি ভাল উপন্যাসকে চিত্ররূপ দেবার অধিকার নিউ থিয়েটার্স পেয়েচে।

কালী ফিল্মসের গাঙ্গুলী মশায়েরও উদ্যম ও উদ্যোগের অভাব নেই। তুলসী লাহিড়ীকে দিয়ে "মণিকাঞ্চন" ২য় পর্ব্ব তোলাচ্চেন আর তিনকড়ি বাবু ৺গিরীশ চন্দ্রের "প্রফুল্ল" নামজাদা অভিনেতৃবর্গ নিয়ে পরিচালনা কর্চ্চেন। আর এ দুটি ছবির অবসরে যেটুকু সময় পাওয়া যাচ্চে তার মধ্যেই গাঙ্গুলী মশাই নিজে "কাল পরিণয়"কে সবাক ছবিতে রূপান্তরিত কর্চ্চেন। সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক দেবকী বসুও এখানে এসেচেন তবে তিনি কি ছবি তুল্‌বেন তা এখনও ঠিক হয়নি। এ বছরে গাঙ্গুলী মশাই আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ কোরেচেন উত্তর কোলকাতার ক্রাউন ও কর্ণওয়ালিসের পরিচালনা ভার গ্রহণ করে। কালী ফিল্মে বাংলা ছবি বছরে অনেকগুলি তোলা হয় কাজেই এদের নিজস্ব ছবিঘরের খুবই দরকার। এ অভাব এতদিনে পূরণ হল। এগ্‌জিবিটর্স্ সিন্‌ডিকেটের পরিচালনায় সুসংস্কৃত ক্রাউন 'উত্তরা' নাম নিয়ে প্রকাশ পেয়েচে। কর্ণওয়ালিসের নাম হবে 'শ্রী' এবং এরও উদ্বোধন আগতপ্রায়।

বি, এল্, খেমকার নেতৃত্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মসের রিজেণ্ট পার্কের সুবৃহৎ ষ্টুডিওকেও দিনরাত ব্যস্ত দেখা যাচ্চে। খেমকা বাবুর ইচ্ছে যে এখন থেকে আগের চেয়ে আরও বেশী ছবি তিনি তুল্‌বেন। জ্যোতিষ মুখার্জ্জির "পায়ের ধূলো" শেষ করেই "পথের শেষে" ধরেচেন এবং এতে নরেশ মিত্র, ভুমেন রায়, জ্যোৎস্না প্রভৃতি নামকরা অনেক অভিনেতৃদের দেখা যাবে। এর হিন্দি সংস্করণ নাকি খেমকা বাবু নিজেই পরিচালনা কর্ব্বেন। শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র এখানে "সা সুজা" নামে একটি ঐতিহাসিক ছবি শীঘ্রই তুল্‌বেন। সুন্দর চেহারা গুল হামিদ নিজে "খাইবার পাস্" নাম দিয়ে সীমান্ত প্রদেশের একটি ছবি পরিচালনা কর্চ্চেন। এতে তিনি ছাড়া মাজ্‌হার, পেসেন্স্ কুপার ও ললিতা অভিনয় কর্চ্চেন। শেঠি হাতে নিয়েছেন "মার্ডারার"—এতেও থাক্‌বে ইষ্ট ইণ্ডিয়ার সব তারকারা। তেলেগু আর তামিলের অবোধ্য ভাষাও ষ্টুডিওতে গেলেই শোনা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া নিজেদের একটি ছবিঘরও চৌরঙ্গীর কাছে খুল্‌চেন, যার নাম হবে নাকি 'প্যারাডাইস্' অর্থাৎ স্বর্গ।
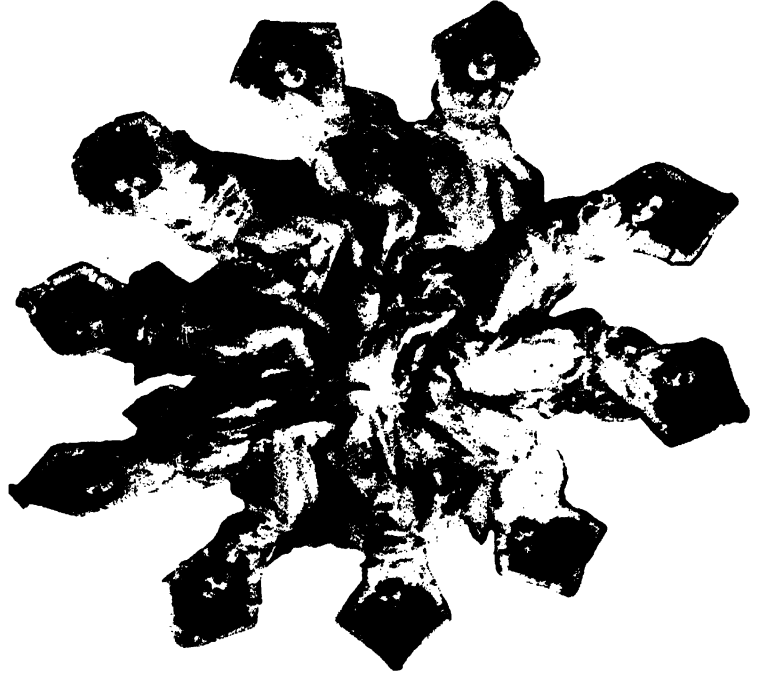
ভারতলক্ষ্মীর অস্তিত্ব দিন দিন লোপ পাচ্ছে। এদের ষ্টুডিও এখন ভাড়া খাট্‌ছে। সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক মধু বোস্ "বেঙ্গল টকিজ্" নাম দিয়ে তাঁর নিজের একটি ইউনিট্ খুলে এই ষ্টুডিওতে "ওয়ান্ ফেটাল্-নাইট্" বলে একখানি ছবির পরিচালনা করচেন। এই ছবিতে আছেন জারিনা খাতুন, ধীরাজ, কাপুর, ইন্দুবালা প্রভৃতি।

পাওনিয়ার ফিল্মস্ এখন 'ছায়া'র মালিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েচে। ছায়া পাওনিয়ারের হয়ে "হরিশ্চন্দ্র" পরিচালনা করচেন প্রফুল্ল ঘোষ আর অমৃতলালের "তরুবালা" পরিচালনার ভার পড়েচে সুশীল মজুমদারের উপর। প্রথম ছবিটিতে দেখা যাবে ভাস্কর দেব ও শান্তি গুপ্তাকে আর দ্বিতীয় ছবিতে নাম্‌চেন শ্রীমতী প্রভা, জ্যোৎস্না, মীরা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি। দেখা যাক্ নতুন হাতে পাওনিয়ারের কি অবস্থা হয়।

"বিদ্যাসুন্দরে"র একটি নৃত্য-দৃশ্য

এবার এ বছরের নতুন প্রতিষ্ঠানগুলির কথা বল্‌ব। "পপুলার পিকচার্স" যামিনী মিত্রের তত্ত্বাবধানে কালী ফিল্মসের ষ্টুডিওতে "মন্ত্রশক্তি" তুলে সৎসাহসের পরিচয় দিয়েচেন। চানী দত্ত নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে তাঁর 'মায়াপুরী'কে ষ্টুডিওতে পরিণত করে "খাসদখল" তুলচেন। এর পিছনে আছে সিস্‌টোফোনের সরকার-দত্তের অর্থ।

এদের উদ্যম প্রশংসনীয়। রঙ্‌মহলের শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক বড়ুয়া ষ্টুডিও ভাড়া করে "মহানিশা"কে সবাক ছবিতে রূপ দিচ্ছেন। এ ছবিতে রঙ্‌মহলের সব অভিনেতা অভিনেত্রীকে দেখা যাবে। নিউটন ফিল্মের যারা নাকি ছিলেন কর্ণধার তাঁরা ওই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে একটি নতুন কোম্পানী গড়েছেন যার নাম হয়েচে ন্যাশন্যাল থিয়েটার্স। এঁরা ভারতলক্ষীর ষ্টুডিওতে "ডার্ব্বি-কি শিকার" নাম দিয়ে একটি উর্দ্দ ছবি তৈরী কোরচেন নিম্মলকারকে নিয়ে। এভারগ্রীনের ছিতেন মজুমদার এক স্যামুয়েল মিটারকে যোগাড় করে কলকাতার বাইরে এক ষ্টুডিও করেচেন যার নাম হয়েচে "ডিক্‌ম্যান ফিল্মস্"; কিন্তু এভারগ্রীন পিকচার্স ও ভাল করে ছবি করবার চেষ্টা কর্চ্চেন নব উদ্যমে। ছবিটির নাম হবে "স্বয়ংবরা"। "কেশরী"র গর্জ্জন থেমে গিয়েচে আর ম্যাডান এখনও সেই কজ্জন্, মোহন আর এগুিকে নিয়ে টানাটানি কর্চ্চে। আর একটি নতুন প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি গড়ে উঠেছে যার নাম হচ্ছে ষ্টার ফিল্মস—তাঁদের প্রথম ছবি হবে উর্দ্দুতে, নাম "জলজলা"। এ ছাড়া ভারতী পিক্‌চার্স ও সোনরে পিক্‌চার্স নামে দু'টি প্রতিষ্ঠানের খবর পাওয়া যাচ্ছে—এরা যথাক্রমে "শকুন্তলা" ও "খাসদখল" তুলছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সিনেমা আমাদের দেশের একটা বড় ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েচে এবং নিত্য নতুন প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠচে। দেখা যাক্ শেষ পর্য্যন্ত ক'জন থাকে।

শ্রীকালীদাস দাস

বাঙ্গালার চিত্র জগতে রূপ সজ্জায় এঁর সুনাম আছে। ইনি বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সম্প্রতি নব-প্রতিষ্ঠিত ন্যাশন্যাল থিয়েটার্সে এ কাজ কোরছেন।

বাঙ্গলার ছায়াচিত্রে ভবিষ্যৎ অভিনেতা (?)

শ্রীবিনামানন্দ

মানুষের মন পরিবর্ত্তনশীল, রুচি নতুনত্বের পক্ষপাতী। সমস্ত জগতে এই কথা যুগে যুগে নিয়ত প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে। সর্ব্বদাই নতুনের পূজা চলেছে, দেখা যায়, আজকের রুচি কাল অচল, আজকের পক্ষপাতিত্ব কাল নীরব।

ছায়াচিত্র মানুষের কাল্পনিক জগতের অন্তঃর্ভুক্ত। বাস্তব জগতের সেখানে কোন সংশ্রব নেই। তাই ছায়াচিত্রের মধ্যে মানুষ চায় নতুনের আস্বাদ, নবীনের আবির্ভাব।

আজ ভারতের ছায়াচিত্র আর শৈশবের দোহাই দিতে পারে না! কারণ প্রত্যহই একটা না একটা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হচ্ছে। ছায়াচিত্রের বাল্যভাব কেটে গেছে, অতএব এই দিকটা লক্ষ্য করবার সময়ও এসে উপস্থিত হয়েছে। আমাদের দেশে ছায়া-চিত্রের ইতিহাস আলোচনা করলে নতুনত্বের আস্বাদ পাওয়া দূরে থাক পুরানোর চর্ব্বিত চর্ব্বণে মন বাস্তবিকই তিক্ত হয়ে উঠে।

প্রতি চিত্রে সেই এক অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, কাননবালা ইত্যাদি দিনের পর দিন ছবির পর্দ্দায় এদেরই প্রকাশ দেখি। আজ ভারতের চিত্রছায়ার আভিজাত্যের সম্বন্ধে খোচা দিলে তার আঘাত লাগে—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই আভিজাত্যের দাবী তারা করেন কেমন করে? কটা নতুন শিল্পীর তাঁরা পরিচয় দিয়েছেন, আর কটা প্রতিভা নিদর্শন তাঁরা দিয়েছেন। অভিজ্ঞতার ছাপ চাকুরী জোগাড়ে সহায়তা করতে পারে বটে, কিন্তু নতুনের দাবী সে কথনই করতে পারে না। বয়স ও অভিজ্ঞতার নিক্তি নিয়ে যদি প্রতিভা ওজন করা যেত, তা হলে ইয়ং স্যামুয়েল গোল্ডউইন, ম্যমুলেন, এদের মত পরিচালকদের জানবার সুযোগ হতো না। প্রতিভার বিকাশ এমনই করে হয়,—সে বয়স মানে না, অভিজ্ঞতা বাছে না, আভিজাত্যের বিচার করে না। অতএব নিরবচ্ছিন্ন দাবী বলে কোন জিনিষ এর মধ্যে থাকতেই পারে না। যুগে যুগে নতুনের পূজা করেছে, দিনের পর দিন নবীন আলোক-সম্পাতে মানুষের মনের রাজ্যে মায়ার সৃষ্টি হচ্ছে, চিন্তার আকাশে রাম-ধনুর আবির্ভাব হচ্ছে। মানুষের চিন্তার ধারা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে, কল্পনার ফানুস রঙিন হতে রঙিনতর হয়ে উঠছে।

পরিবর্ত্তনশীল মন আজ আর পেছন ফিরে তাকাতে চায় না, সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আজ তার বুদ্ধির প্রতি রেণুকণাটী পর্য্যন্ত উন্মুখ হয়ে আছে, সৃষ্টির মাদকতায়, নবীনের নেশায় সেও আজ ভরপুর। এমনিই জগতের প্রগতির দিনে মানুষ চায় নবপ্রচেষ্টা, নবীন উদ্যম, নতুন সৃষ্টি। আজও যদি ছায়াচিত্রের জগৎ আমাদের এইটুকু খোরাকও না জোগাতে পারে, মনের এইদিকটা বরাবরই যদি অন্ধকারে ঢেকে থাকে, তবে কেমন করে প্রসার লাভ করতে পারে আমাদের ছায়াচিত্রে? আজও যদি সেই রঙ্গমঞ্চের উদ্গার নিয়ে আমরা ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি তা হলে সে চেষ্টা কি মানুষের মনকে বিষিয়ে দেবে না?

ছায়াচিত্রের বয়সের অনুপাতে তার উৎকর্ষ আজও আমাদের চখে পড়ল না। 'বক্স অফিস্' বলতে আজ আমরা বুঝি অহীন্দ্র চৌধুরীকে। সমস্ত ফিল্ম কোম্পানী আজ অহীন্দ্র চৌধুরীকে নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। "দেবদাসী", "বিদ্রোহী", "দক্ষযজ্ঞ", "রূপলেখা", প্রভৃতি বিভিন্ন বিভিন্ন কোম্পানীর বই জুড়ে আছেন অহীন্দ্র চৌধুরী। এই সব লক্ষ্য করলে স্বতঃই এই কথা মনে জাগে না কি, যে যাদের মধ্যে সৃষ্টির প্রতিভা পঙ্গু, চিন্তার রাজ্য অপরিসর তারাই পুরাতনের চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে আনন্দ পায়। আজও এমন একটা বাঙ্গালা ছবি দেখলাম না, যাকে উদ্দেশ করে সত্যই নতুন বলে আনন্দে মুখ খানা দীপ্ত হয়ে ওঠে। এই স্থানে একজনের নামের সঙ্গে যদি একটু মৌলিকত্বের দাবী জড়িয়ে না দিই ত অন্যায় করা হবে। তিনি হচ্ছেন প্রমথেশ বড়ুয়া "রূপলেখা" ও "দেবদাসের" প্রযোজক। এঁর প্রযোজনার সুখ্যাতি আজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। চিত্রজগতে তিনি নতুন আলোক প্রদান করেছেন।

আমাদের ছায়াচিত্রে নতুন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা একটুও নেই। কে জানে আমাদের দেশেও ফেড্রিক্ মার্চ ভ্যালেনটিনো, সিভেলিয়ার আছে কি না! কে জানে আবিষ্কারের অভাবে এমনই কত প্রতিভা হয়ত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

তাই ভবিষ্যৎ-অভিনেতা ও চিত্র-জগতের ভবিষ্যৎ ভেবে সত্যই নিরাশ হতে হয়। অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি অভিনেতাদের প্রতিভাও অক্ষয় নয়, জীবনও অবিনশ্বর নয়! তাই বলি আজও যদি নতুন প্রতিভা তাঁরা আবিষ্কার না করতে পারেন, তাহলে অহীন্দ্র চৌধুরী ইত্যাদির পরে ভবিষ্যৎ অভিনেতা হবেন কারা? এবং কাদের নিয়েই বা চিত্র জগতের কাজ চলবে? তবে কি বুঝতে হবে, যে ইতিহাস হতে বাঙ্গালার ছায়াচিত্রের নাম একেবারে মুছে যাবে?

বাঙ্গালায় ছায়াচিত্রের কোন দিক দিয়েই আজ কোনরূপ বিশিষ্টতা প্রকাশ পায় নি। আজও এমন প্রযোজনা দেখতে পাওয়া গেল না যাকে কেন্দ্র করে অভিনেতৃবর্গের প্রতিভার বিকাশ হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় তাঁরা অনুরূপা দেবী, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি বিখ্যাত লেখক-লেখিকাদের ভারে কাটছেন, তাঁদের নামের শক্তি পরিচালকদের দোষকে করুণা করে ঢেকে রাখছে। কারণ যে সব অভিনেতাদের দ্বারা আমরা পয়সা বলে আশা করি, তাঁরা যদি অন্যান্য অখ্যাতনামা লেখকের বইএ নামেন তাহলে দারুণ অসাফল্যই প্রকট হয়ে ওঠে। কারণ আর কিছুই নয়, অভিনেতাদের দোষ দেবার কিছুই নেই, দোষ ডিরেকটরদের। অভিনেতৃবর্গ ডিরেকটরদের হাতে খেলার পুতুল। এমন পথ তাঁরা দেখাতে পারেন না যাতে করে প্রতিভার নব নব বিকাশ হয়—বরঞ্চ বিরুদ্ধ পথে চালিয়ে অন্যান্য লেখকদের প্রকাশ পেতে না দিয়ে ছায়াচিত্র শিল্পকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন।

কয়লার মত কাল-পাথরের খনি থেকেই অমন উজ্জ্বল পাথরের সন্ধান পাওয়া যায়। কে বলতে পারে নব বাণীর সূচনার সৃষ্টির বিশিষ্টতায় আমাদের দেশের ছায়াচিত্র পাশ্চাত্য জগতের ছায়াচিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় দাঁড়াবে না? সুইডেনের অখ্যাত, ছোট পল্লীচিত্র থেকে যখন গ্রেটার উদ্ভব হয়, লুপেভেলের আবিষ্কার হয়, তখন আমাদের দেশেও কি আশা করা যায় না?

গানের তান

সঙ্গীত নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গান গাইবার সময় গানের স্বরবিন্যাস ছাড়িয়া রাগের অন্যান্য সুরে আ, ই, উ, এ, ও বর্ণ যোগে আশ গিটকারী দ্বারা আরোহন অবরোহন করাকে কিম্বা গানের কোন শব্দযোগে রাগের অপরাপর পরিচায়ক স্বর প্রকাশ করাকে 'তান' কহে। তিন সুরের কম তান হয় না, বেশী যত ইচ্ছা হইতে পারে। ধ্রুপদে যে সকল বাঁট হয় তাহাও একপ্রকার তান; কারণ 'তন' ধাতুর অর্থ বিস্তার, সুতরাং তান শব্দে সুরের বিস্তার বুঝায়। ধ্রুপদ গানের মধ্যে যে সকল গমক ইত্যাদি ব্যবহার হয় তাহাও এক প্রকার তান, কিন্তু খ্যালের তান বিভিন্ন প্রকার অর্থাৎ আশযোগে দ্রুতোচ্চারণ। তানের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, আশযুক্ত তান অর্থাৎ বেহলক তান, গিটকারীযুক্ত তান, মীড়যুক্ত তান, কম্পনযুক্ত তান, শব্দযুক্ত তান; গিটকারী তান আশেরই ঘনত্ব। এই সকল তান ব্যতীত আরও কতকগুলি তান আছে, যাহাদিগকে মৃদু, প্রবল ইত্যাদি করিলে বিভিন্ন সংজ্ঞা হয়, যেমন—ঝট্কা, খড্কা, জব্ড়া, মুরকী, হলক তান প্রভৃতি। তিন সুরের ক্ষুদ্র তানের শেষ সুরটি একটু জোর হইলে তাহাকে মুরকী তান কহে। সাত সুরের কিংবা ততোধিক সুরের তানের শেষের কতিপয় সুরে প্রবল জোর দিলে তাহা ঝট্কা তান হয়; ঝটকা শব্দ হইতেই ঝট্কা তান সংজ্ঞা হইয়াছে। অর্থাৎ শেষের সুরগুলি ঝড়ের মত হইবে। হলক-তানের অর্থ এই যে, আ, আ, শব্দ যোগে প্রত্যেক আ-এর পর অন্তস্থ 'য়'-এর আভাস থাকিবে। অর্থাৎ সংক্ষেপে 'আয়, আয়' শব্দের ন্যায় মনে হইবে। এবং জিহ্বা অনবরত ভিতর বাহির সঞ্চালন হইবে। ইহা খুব কঠিন এবং বহুদিন-সাধনা-সাপেক্ষ। খড্কা অথবা খট্কা তান কাটা কাটা সুর হইবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক, বিযুক্ত হইবে। আশ ও কম্পন এই দুই-এর মিশ্রণ অর্থাৎ আট আট সুর হওয়াকে জব্ড়া তান কহে। মুরকী তানের শেষ সুরটি ঃ (বিসর্গ) যুক্ত শব্দের ন্যায় জোর হইবে। মোরগ অর্থে পক্ষী, সুতরাং মুরকী তান মোরগ শব্দের অপভ্রংশ, ভিন্নার্থে মুরকী শব্দে কর্ণালঙ্কার বুঝায়। পক্ষী ঝট করিয়া উড়িয়া যাওয়ার ন্যায় তান করাকে মুরকী তান কহে।

শাস্ত্রে এই সকল তানকে অলঙ্কার কহিয়া থাকেন। সঙ্গীতের অলঙ্কার সকল কণ্ঠভঙ্গী হইতে উৎপন্ন, এবং সেই ভঙ্গী সকল সুরের প্রবলতা বা মৃদুতার উপর নির্ভর করে। ঐ সকল ভঙ্গী গানে না দিলে গান নিতান্ত একঘেয়ে হয়। ইহা খুব মার্জ্জিত কণ্ঠ না হইলে পরিষ্কার নির্গত হয় না। হলক তান, মুরকী তান ইত্যাদি গুরুমুখে একবার দেখা আবশ্যক। ইহা সঙ্কেত দিয়া লেখা যাইতে পারে কিন্তু ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে যেমন টোন্ শিক্ষার সময় শিক্ষকের প্রয়োজন, ইহাতেও তদ্রূপ শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। এক্ষণে নিম্নে একটি খ্যাল গানে ঐ সকল তানের নিয়ম স্বরলিপির দ্বারা দেওয়া হইল। যথা :—

দরবারী তোড়ী—তেতালা

সগর লোগ নিত ধ্যান করত তুআ
প্রভু পরমেশ্বর, অনগিনতী ধরতী ভার ধারণ কারী।
তুআ নাম কাটত কলেশ অঘটন ঘটন তু করত প্রকাশ,
মাতঙ্গ সমরমেঁ পতঙ্গ জিতাবে ধন বহুরূপধারী॥

সঙ্গীত কেশরী—স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। স্বরলিপি—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

দা দা দা পা | হ্মা জ্ঞা হ্মা পা | দা -া হ্মা জ্ঞা | জ্ঞা ঋা ঋা সা
স গ র লো | ০ গ নি ত | ধ্যা - ন ক | র ত তু আ

সা সা ন্া দা | সা সা ন্া সা | জ্ঞা -া া ঋা | জ্ঞা -া ঋা সা
প্র ভু ০ ০ | প র ০ ০ | মে - - ০ | ০ - শ্ব র

সা সা দা -া | দা দা দা দা | নদা -া র্সা -া | র্সা না র্সা র্সা
অ ন গি - | ন তী ধ র | তী - ০ - | ভা ০ ০ র

র্সা র্সা দা দা | র্সা না দা পা | জ্ঞাহ্মা দনা র্সঋ্া জ্ঞ্া | ঋ্র্সা নদা পহ্মা জ্ঞ্া
ধা ০ ০ ০ | ০ ০ র ন | কা০ ০০ ০০ ০ | রী০ ০০ ০০ ০

{পা পা হ্মা নদা | া দা র্সা -া | র্সা র্সা র্সা র্সা | না ঋ্া র্সা -া
{তু আ ০ না | - ম কা - | ট ত ক লে | ০ ০ শ -

র্সা না দা দা | না র্সা জ্ঞ্া ঋ্া | র্সা না ঋ্া র্সা | নর্সা দা -া পা }
অ ঘ ট ন | ঘ ট ন তু | ক র ত প্র | কা০ ০ - শ }

পহ্মা পা -া পা | দা দা হ্মা জ্ঞা | দা হ্মা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা ঋা -া সা
মা০ ত - ঙ্গ | স ম র মেঁ | প ত ০ ঙ্গ | জি তা - বে

সনা সা জ্ঞা জ্ঞা | পা হ্মা দা পা | জ্ঞহ্মা দনা র্সঋ্া জ্ঞ্া | ঋ্র্সা নদা পহ্মা জ্ঞা
ধ০ ন ব হু | রূ ০ ০ প | ধা০ ০০ ০০ ০ | রী০ ০০ ০০ ০

আশ-যুক্ত তান—

১। জ্ঞাহ্মা দনা র্সঋ্া জ্ঞ্াঋ্া | র্সনা দহ্মা জ্ঞঋা সা
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০

মীড়-যুক্ত তান—

২। ন্া সা জ্ঞা -া | া ঋা -া সা | দা া হ্মা জ্ঞা | া ঋা -া সা
আ ০ ০ - | - ০ ০ | ০ - ০ ০ | ০ ০ -

* কম্পন-যুক্ত তান—

২´				৩			
৩। দদা	দদা	ক্ষক্ষা	জ্ঞজ্ঞা	দদা	জ্ঞজ্ঞা	ঋঋা	সসা
আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

মুরকী তান—

২´				৩					
৪। সজ্ঞা	ক্ষদা	নর্সা	নদা	ক্ষনা	দপা	ক্ষজ্ঞা	ক্ষপঃ	দঃ	মুরকী তান এই 'ধ' স্বর জোর হইবে।
আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	

খট্‌কা তান—

২			৩			
৫। র্সনা	দনা	ক্ষজ্ঞা	দক্ষা	জ্ঞঋা	ঋনা	সা
আআ	আআ	আআ	আআ	আআ	আ০	আ

** ঝট্‌কা তান—

২				২			
৬। জ্ঞক্ষা	পদা	পক্ষা	জ্ঞক্ষা	দদা	ক্ষজ্ঞা	ঋসা	নসা
আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

২´				২´			প্রবল।
জ্ঞক্ষা	দনা	র্সর্ঋা	র্জ্ঞা	র্ঋনা	দক্ষা	জ্ঞক্ষা	দনর্সা
০০	০০	০০	০	০০	০০	০০	০০০

হলক তান।

২				৩			
৭। সজ্ঞা	ক্ষদা	নর্সা	র্জ্ঞর্ঋা	নদা	ক্ষজ্ঞা	ঋসা	নসা
আয়্ আয়্	আয়্ আয়্	আয়্ আয়্	আয়্ আয়্	আয়্ আয়্	আয়্ আয়্	আয়্ আয়্	আয়্ আয়্

জবড়া তান।

				২			
৮। নসা	জ্ঞজ্ঞা	ঋসা	ঋসা	জ্ঞক্ষা	দদা	ক্ষদা	ক্ষজ্ঞা
আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

২´				২			
ক্ষদা	ননা	দনা	দক্ষা	দনা	র্সর্সা	নর্সা	নদা
০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

				১				২			
নর্সা	র্জ্ঞজ্ঞা	র্ঋর্জ্ঞা	র্ঋর্সা	দনা	র্ঋর্ঋা	নদা	ক্ষদা	ননা	দক্ষা	জ্ঞক্ষ	দদা
০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

* কম্পনের পৃথক সঙ্কেত না দিয়াও লেখা হইতে পারে অর্থাৎ একাধারে দুই অথবা ততোধিক স্বর দিয়া কম্পন হয়।

** ঝট্‌কা তান অথবা মুরকী তান, একাকী ব্যবহার হয় না ;অর্থাৎ আশ, গিটকারী, কম্পন ইত্যাদি তানের সহিত প্রয়োগ হয়।

ননা	দপা	র্ঋজ্ঞা	ঋসা
০০	০০	০০	০০

গিট্‌কারী তান।

৯। জ্ঞঋদা নর্সর্ঋা জ্ঞর্ঋর্সা নদপা | ঋজ্ঞঋা দনন‌া দপঋা জ্ঞঋসা
আ০০ ০০০ ০০০ ০০০ | ০০০ ০০০ ০০০ ০০০

শব্দযুক্ত তান।

১০। সা দা দা -া | না দা ঋা জ্ঞা | দা ঋা জ্ঞা -া
স গ র ০ | লো ০ ০ গ | নি ত ০ ০

ঋা জ্ঞা ঋা সা | দসা না -া -া | ঋা জ্ঞা ঋা সা
০ ০ ০ ০ | ধ্যা০ ০ - - | ০ ০ ০ ০

দসা নঋা সজ্ঞা -া | জ্ঞঋা ঋদা ঋজ্ঞা ঋসা
কর তু০ ০০ ০০ | তু০ ০০ আ০ ০০

ঝাঁট—

১১। র্সনা দর্সা নদা পঋা | জ্ঞঋা দঋা জ্ঞঋা ঋসা
সগ রলো ০গ নিত | ধ্যা০ নক রত তুঅা

সসা নদা সনা সসা | সঋা জ্ঞা ঋজ্ঞ ঋসা
প্রভু পর মে০ শ্বর | অন গি ০০ নতা

সসা দা র্সনা দপা | পঋা দদা ঋজ্ঞা ঋসা
শ্বর ত ভা০ ০র | ধা০ রন কা০ রী

১২। ঋদা নর্ঋা জ্ঞর্া -া | র্ঋা জ্ঞা র্ঋা র্সা
আ০ ০০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

ঝটকা।

নদা পঋা জ্ঞঋা পদা | নর্সর্ঋা দা র্সা -া
০০ ০০ ০০ ০০ | ০০০ ০ ০ ০

মডার্ন রূপ-কথা

হোসনে আরা বেগম

সখি কহিলেন : রূপকথা মোর শুনাতো হয়েছে ঢের।
রাজার কুমারী মরিল কতই, বাঁচিল কত না ফের—
সোনার কাঠি ও রূপার কাঠির মোহন পরশে ভাই
ঘেন্না ধরেছে শুনিয়া ও-সব, আর শুনে কাজ নাই।
এমন কিছু কি আছে ?
মডার্ণ যুগের 'থ্রিলিং' সকলি হার মানে যার কাছে!
লড়াই রহিবে গল্পও রবে, হাসিও থাকিবে কিছু
রূপ কাহিনীর ধরন খানিও রবে না পড়িয়া পিছু ?
কহিলাম তারে ভাই—
ফরমাস মত কান্না হাসির গল্প কোথায় পাই ?
গল্প হয়ত যা তাই একটা বলিব চক্ষু বুঁজে
হিউমার-এর হাতুড়ি মেরেও হাসিটী পাবে না খুঁজে।
থ্রিলিং হবে কি, হবে না কিছুই মডার্ন যুগের মত
সত্য কিম্বা মিথ্যা কাহিনী তাহাও জানি না অত।
কোন সে আদিম যুগে
দানব রাজার প্রজারা সব মরছিল জ্বরে ভুগে
প্লীহায় কারোবা পেটটি হয়েছে জালার সমান বড়
শক্তিতে নয়—মুখের কথায় যুদ্ধ করিতে দড়।
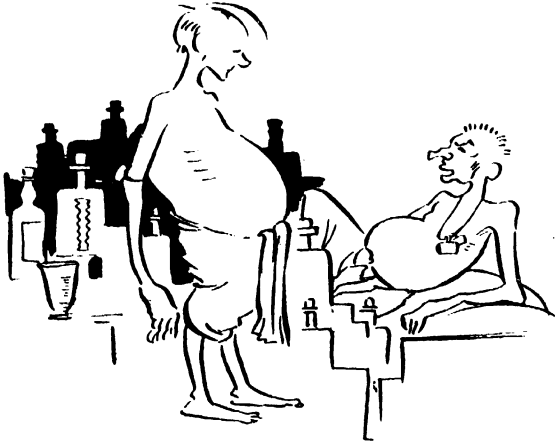
প্লীহায় কারোবা পেটটি হয়েছে জালার সমান বড়

এইরূপ যত প্রজারা মিলিয়া যুক্তি করিল সবে
চিরকালটা কি দানব শাসনে মোদের ভুগিতে হবে ?
নহে নহে, মোরা দানবের কাছে হইব না কভু নত
মুণ্ড করিব, হইব বিজয়ী কিম্বা হইব হত।

ঠিক হল যেই, চলে ধেই ধেই সমরাঙ্গন পানে
পিপীলিকা সারি পিলে-রোগী সবে, শঙ্কা নাহিক মানে

চলে ধেই ধেই সমরাঙ্গন পানে

কারো হাতে লাঠি, গদা কারো হাতে কেহ বা ওষুধ লয়ে
মহা উল্লাসে লাফায়ে লাফায়ে চলিল দিগ্বিজয়ে,
বাধিল ভীষণ রণ।
কুইনিন-জীবি সেনাদের হাতে গদা ঘুরে বন্ বন্।

কুইনিন জীবি সেনাদের হাতে গদা ঘুরে বন্ বন্

হেন কালে সবে বিস্ময়ে হেরে দূর হতে একজন
আসিছে ছুটিয়া হাঁকিছে মুখেতে "ক্ষান্ত হও সেনাগণ"
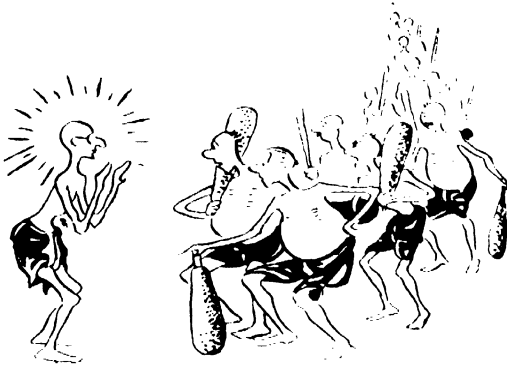
থামিল যোদ্ধা সবে।
ভাবিল এ কোন্ মহা-সন্ন্যাসী দধীচি বুঝিবা হবে
হেরিল চাহিয়া পিছে।
ধারণা তাদের সত্য না হোক—নহেকো নিছক মিছে।
শীর্ণ শরীর কঙ্কাল সম ধ্যানেতে ভগ্ন দেহ
কৌপিন আঁটা ললাটেতে ফোঁটা চন্দন অবলেহ।
কহিলেন আসি: ভাগ্যি এখনো দানব আসেনি রণে
নয়ত কতনা মরিত আজিকে শুধু শুধু অকারণে
যুদ্ধ করিব, স্বাধীন হইব—অস্ত্রেতে [illegible] নয়
হিংসা ছাড়িয়া 'সাইকিক' বলে করিব দিগ্বিজয়।
অমনি সকল বীর
অস্ত্র ছাড়িয়া কুইনিন রাখি, মাথাটা করিয়া থির
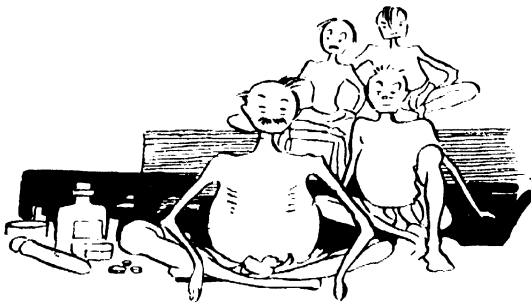
অহিংস রণ করিবার তরে সাধনা করিল শুরু।
সহসা শুনিল দানবের ভেরী বাজিতেছে গুরু গুরু;
পশ্চাতে চাহি দেখিল সভয়ে গুরুজি কোথাও নাই

হেরিয়া বিপদ পলায়েছে দিয়া [illegible] মুখে [illegible]
অমনি বীরেরা পমাদ গণিয়া খুলিয়া কাপড় কাছা
ছুটিল সভয়ে স্মরি মহাবাণী—"চাচাগো আপন বাঁচ"

* * *
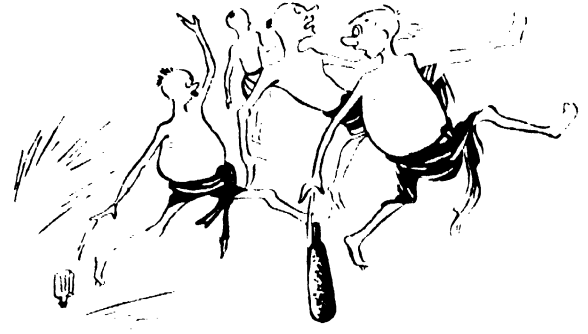
সন্ন্যাসীবাবা ঘরেতে বসিয়া ভাবিছে আপন মনে
মুক্তিরণের সেনারা বুঝিবা জুঝিছে এখনো রণে।
গিন্নী কহিল: ঘরে বসি কেন? মুখেতে শুধুই দড়?
সন্ন্যাসী কয়: রেহাই দাওহে, হাঁপায়ে পড়েছি বড়।
তারপর সাধু হামাগুড়ি দিয়া ছাগের তলেতে বসি
বাঁটে মুখ দিয়া অতি পুলকেতে টান দেয় সুখে কসি।

ভক্ত শুধায়: সাধু মহাশয়, মুক্তি কেমনে পাই?
সাধু ক'ন হাসি: ছাগ দুধ খাও, এর সম [illegible] নাই!

———

এদেশের ফটকা বাজার

শ্রীসত্যনাথ মজুমদার

কলিকাতার পুলিশ সম্প্রতি এখানকার ফটকা বাজারের একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট বহুব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন এইরূপ একটি সংবাদ কয়েকদিন হইল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংবাদ পাঠে দেশের কল্যাণকামী জনসাধারণ আশা করিয়াছিলেন যে বাংলার সরকার কলিকাতায় পাটের ফটকা নামে যে জুয়ার আড্ডা চলিতেছে এবং যাহাতে দেশের সমূহ ক্ষতি হইতেছে তাহার উচ্ছেদের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ১৯২৭ সালে তদানীন্তন গভর্ণমেণ্ট ঠিক এই কারণেই পাট এসোসিয়েশনের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। কিন্তু ফটকা পরিচালনার ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়া কোনও আইন পাশ না করায় পাটের বাজারে আবার জুয়ার আড্ডা জমিয়াছে। এবং আইনের চোখে ধূলা দিয়া আবার এই দরিদ্র দেশের এবং বাঙালীর সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। আমরা আবার দৃঢ়ভাবে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এইরূপ সর্ব্বনাশ সাধনের সহযোগিতা করিতেছে, তাহাদের আভ্যন্তরীণ কার্য্যকলাপের উপর পুলিশ এবং গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অবশ্য পাটের মত সাময়িকভাবে (Seasonal) উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য যে একটা ফটকা বাজারের প্রয়োজন একথা কোনও অর্থনীতিবিদ্ অস্বীকার করিবেন না। যে শস্য মাত্র কয়েকমাস উৎপন্ন হয় কিন্তু যাহার চাহিদা সম্বৎসর ধরিয়া থাকে তাহার কেনাবেচা নিয়মিতভাবে ব্যবস্থা করিতে গেলে ফটকা বাজার Future Market-এর যে প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কলিকাতার ফটকা বাজারের প্রয়োজনীয়তা অন্যভাবে উপলব্ধি হইয়াছে। সমস্ত কথা বলিবার হয় ত এখনও সময় হয় নাই, কিন্তু যদি কৌতূহলী জনসাধারণ ফটকা বাজারে যাঁহারা পাট বেচেন এবং যাঁহারা পাট ক্রয় করেন তাঁহাদের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য অনেকটা সাধিত হইবে।

মোটামুটি এখন এই কথা বলা যায় যে যাঁহারা বাস্তবিক ব্যবসায়ের খাতিরে পাট কিনিতে চান তাঁহারা কেহই দুর্বিপাকে না পড়িলে ফটকা বাজারে পাট ক্রয় করেন না। তাহার একটি কারণ, ফটকা বাজারে পাটের দাম সাধারণ বাজারের অপেক্ষা বেশী। যাঁহারা পাট ক্রয় করেন তাঁহাদের বেশীর ভাগই জুয়াড়ী; তাঁহাদের পাট ক্রয় করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য, দাম চড়িলে তাহা বিক্রয় করা এবং দুপয়সা ভাগ্যলক্ষ্মীর দোহাই দিয়া রোজগার করা। যাহাতে জুয়ার দায়ে পড়িয়া আবার ফটকা বন্ধ না হয়, এবং পুলিশের হুমকী বাঁচাইবার জন্য, একটা কাগজে কলমে নাম আছে যে বিক্রেতাকে settlement-এর সময় চুক্তি অনুযায়ী পাট ডেলিভারী দিতে হইবে। কিন্তু বিক্রেতারা জানেন যে ফটকা বাজারে যে দরে পাট বিক্রয় হয় তাহাতে কোনও ক্রেতাই পাটের ডেলিভারী লইবার জন্য উৎসুক হইতে পারেন না কারণ বাজারের অপেক্ষা সে দর বেশী। বিক্রেতাদের তাহাতে আরও একটি সুবিধা হইয়াছে। যদিও East India Jute Association-এ সাধারণতঃ "এম" কোয়ালিটির পাট কেনা বেচা হয়, সুবিধা পাইলে কার্য্যতঃ তাঁহারা অন্যান্য এবং হীনতর পাটের ষ্টকের উপরও চুক্তি করেন বলিয়া প্রকাশ। যাঁহারা ক্রয় করেন তাঁহাদের মধ্যে অনেক বাঙালী আছেন, বাজারের সত্যকার অবস্থার সহিত তাঁহাদের পরিচয় অজ্ঞতারই নামান্তর মাত্র। কাজেই কি উঠতিবাজার কি পড়তি-বাজার তাঁহারা সর্ব্বদাই bullish অর্থাৎ বাজার আরও পড়িবে, কিম্বা আবার, উঠিবে এই মনোভাব লইয়া operate করেন তাহাতে ঘা খাইয়া ক্রমশঃ তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হয়। বর্ত্তমানে পাটের যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইয়াছে তাহাতেও ফটকা বাজারের অপূর্ব্ব লীলায় অনেক বাঙ্গালীকে এবং অনেক বর্দ্ধিষ্ণু বাঙালীঘরকে অতিশয় বিপদাপন্ন হইতে হইয়াছে।

যাঁহারা বলিবেন যে ক্রেতারা যে ঘা খাইয়াছেন তাঁহা তাঁহাদেরই অজ্ঞতার পরিচায়ক, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত কতকাংশে সত্য। ব্যক্তিগত হিসাবে, যাঁহারা ফটকায় পাট বেচেন এবং বেচিয়া লক্ষপতি হইয়াছেন এবং আজও হইতেছেন তাঁহাদের গুণের ঘাট নাই—তুলনাও নাই। তবে সাধারণ পাঠক পাঠিকা একটা কথা জানেন না। East India Jute Association-এর চুক্তিপত্রের একটা মাহাত্ম্য এই যে ইহাতে পড়তি বাজারেরই সহায় হয়, বাজার উঠিতে সাহায্য করে না। কাজেই বিক্রেতাদের অর্থাৎ অবাঙালী সঙ্ঘের সুবিধা। এইরূপ পক্ষপাতিত্বযুক্ত চুক্তি পত্র আর কয় দিন বাঙালীর অর্থ শোষণ করিবে? কয়দিন?

শুধু বাঙালী হইলে হয় ত বলিতাম না। কারণ, বাঙালী অবাঙালীর প্রশ্ন তুলিলে প্রকৃত সমস্যার মীমাংসা হইবে না। কিন্তু পাটের চাষীদিগের প্রতি কি গবর্ণমেণ্টের কোনও দায়িত্ব নাই? এই যে তাঁহারা এত কষ্ট ও অর্থ-স্বীকার করিয়া পাটের চাষ কমাইবার জন্য সারা বাংলা জুড়াইয়া আন্দোলন চালাইলেন, জন কয়েক অর্থগৃধ্নু ভল্লুকের পাল্লায় পড়িয়া কি তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে? কারণ এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে পাটের দাম চড়িয়াও যে পুনরায় অদ্ভুতভাবে পড়িয়া গেল তাহার মূলে আছে এই সমস্ত অর্থগৃধ্নু জুয়াড়ীদের কারসাজী। পাটের চাষী বাংলাকে অর্থ দেয়, সে অর্থের ভাগ বাঙালীও পায়, অবাঙালীও পায়, তাহাকে মারিয়া লাভ কি? বাংলা গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে সম্যক অবহিত হউন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। প্রত্যেক দেশেই ফটকা বাজার গবর্ণমেণ্টের অনুশাসনে শাসিত। এ দেশে কি তাহা হওয়া একেবারেই অসম্ভব?

ব্যবসা-বাণিজ্য সমালোচনা

ঈ, বি, রেলওয়ে

বড়ই আনন্দের বিষয় যে এবার পূজা উপলক্ষে ঈ, বি, রেলওয়ে অন্যান্য রেলওয়ের অপেক্ষা সকল শ্রেণীর বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীরও ভাড়া সুলভ করিয়া, দারিদ্র্য-পীড়িত বঙ্গদেশবাসী বহুলোক যাঁহারা অর্থাভাবে বৎসরান্তে একবারও আত্মীয় স্বজনের মুখ দেখিতে পারেন না তাঁহাদের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। সকলে এ বৎসর পূজার ছুটিতে আত্মীয় স্বজনের সহিত আনন্দে কাটাইতে পারিবেন।

যাঁহারা শৈল ভ্রমণেচ্ছু অথবা যাহারা অসুস্থ, তাঁহারাও স্বল্প ভাড়ায় দার্জ্জিলিং, কার্সিয়ং বা শিলং ভ্রমণ করিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন ও স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিবেন।

এ বিষয় আমরা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মাসিক টিকেটের ভাড়া হ্রাস

ঈ, বি, রেলওয়ের সহরতলীর দ্বিতীয়, মধ্যম শ্রেণীর পাক্ষিক মাসিক ও ত্রৈমাসিক টিকেট সমূহের ভাড়া অস্থায়ীভাবে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাস হইতে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ কমান হইবে। ইহাতে সহরতলীর যাত্রীদের যে খুবই সুবিধা হইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

মেগাফোন

পূজার আনন্দ সার্থক করিতে হইলে মেগাফোন কোম্পানীর "শকুন্তলা" নাটক একসেট ঘরে না রাখিলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

সেনোলা

সেনোলা রেকর্ড শিশু বিভাগে 'স্বপন বুড়ো'র আমদানী করিয়া রেকর্ড জগতে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। ছেলে মেয়েদের জন্য এই রেকর্ড খুবই সমাদৃত হইবে। আমরা এই বিভাগের উন্নতি কামনা করি।

ল্যাড্‌কো

ল্যাডকোর আনন্দ প্রসাধন সম্ভার প্রত্যেকেরই মন মুগ্ধ করে। 'ল্যাড্‌কো মার্কা' সকল দ্রব্যই আজ বাজারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে সক্ষম। কেশ প্রসাধনে কুন্তলা, স্নানান্তে লাইম জুস-গ্লিসারিন, মুখশ্রী বর্দ্ধনে ফেসক্রিম স্নো ইত্যাদি ল্যাড্‌কোর উৎকর্ষতার পরিচায়ক।

নিমটুথ পেষ্ট

শরীর নীরোগ রাখিতে হইলে দাঁতের যত্ন নেওয়া সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য, এবং দাঁতের সমস্যা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ক্যালকাটা কেমিকেল ওয়ার্কস সম্প্রতি এই সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ক্যালকাটা কেমিকেলের 'নিমটুথ পেষ্ট' ব্যবহারে দাঁত পরিষ্কার ও ঝক্‌ঝকে থাকে, এবং দাঁতের কোন যন্ত্রণায় ভুগিতে হয় না।

মিত্র মুখার্জ্জি এণ্ড কোং

গহনা যদি সুন্দর না হয়, তাহা হইলে উহা ব্যবহারে আনয়ন করে বিরক্তি। মিত্র মুখার্জ্জির দোকানে প্রস্তুত গহনা এ অপবাদ কখনও পায় নাই। নূতন নূতন ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত-কারক বলিয়া এই ফার্ম্মের যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

রয়েস দার্জ্জিলিং চা

বাজারে চায়ের প্রতিযোগিতায় রয়েস দার্জ্জিলিং চা একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। যাঁহারা চা পান করেন তাঁহারা এই চা ব্যবহারে যে তৃপ্তি পাইবেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

টসের চা

দীর্ঘ সময় পরিশ্রমের পর ক্লান্তি অপনোদন করিতে একপেয়ালা চা মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কাজ করে। টসের চা তাতে দিবে তৃপ্তি ও আরাম,—টসের চার ইহাই বৈশিষ্ট্য।

কালীঘাট হোসিয়ারী

এই ফার্ম্মের গেঞ্জী ব্যবহার যেরূপ আরামপ্রদ তেমনি টেকসই। গেঞ্জী প্রস্তুত কারক হিসাবে ইহাদের সুনাম বরাবরই আছে।

রচিটোন

স্বাস্থ্য মানুষের পরম সম্পদ। স্বাস্থ্যহীন মানব সংসারে কোন উন্নতি সাধনই করিতে সক্ষম হয় না। দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে রচিটোন অদ্বিতীয়। রচিটোন কেবল উপকারই করে, কখনও অপকার করে না।

সিন্টোফোন লেবরেটরী

খুবই আনন্দের কথা যে সিনেমা সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি এ প্রতিষ্ঠানটি হইতে প্রস্তুত হইতেছে। শব্দ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ইতি-মধ্যেই নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ছবিতোলার যন্ত্রও শীঘ্রই এ প্রতিষ্ঠান হইতে প্রস্তুত হইবে। আমরা এ প্রতিষ্ঠানের ক্রমশঃ উন্নতি কামনা করি।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল

মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ রাখিতে ও যাবতীয় কেশরোগে লক্ষ্মীবিলাস তৈল অদ্বিতীয়।

ভীমচন্দ্র নাগ

সন্দেশ বলিলে 'ভীমনাগ' এই নামটি ও সঙ্গে মনে জাগে। ইহাতেই বুঝা যায় ভীমনাগ প্রস্তুত সন্দেশ কতখানি খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

ইম্পিরিয়াল চা

ইম্পিরিয়েলের চা স্বাদে, বর্ণে ও গন্ধে বাজারে অতুলনীয় বলিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

বাসন্তী কটন মিলস

শাড়ীর বাজারে 'বাসন্তী' চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়াছে। পাড়ের মাধুর্য্যে, জমির মনো-হারিত্বে ও স্থায়ীত্বে বাসন্তী অতুলনীয়।

লক্ষ্মী ইন্সিয়োরেন্স

গত বৎসরে এককোটী কুড়িলক্ষ টাকার উপর বীমাপত্র বিক্রীত হয় এবং বীমা ভাণ্ডারে উনষাট লক্ষ টাকার উপর অর্থ

সক্রিয় হয়। ইহাই এ কোম্পানীর নিরাপত্তার পরিচায়ক।

আর্য্যস্থান ইন্‌সিওরেন্স

ইহার অভিনব বীমার ব্যবস্থা আজ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

হিমালয় ইন্‌সিওরেন্স

নিম্নলিখিত কয়টি বিশেষত্বের জন্ত এ কোম্পানী সকলের নিকট সুপরিচিত। (১) আজীবন অক্ষমতা বীমা (২) দুর্ঘটনা বীমা (৩) দুই কিম্বা তিন বৎসর নিয়মিত হারে চাঁদা দিবার পর পলিসি বাজেয়াপ্ত হয় না।

জেনুইন ইনসিয়োরেন্স

এ প্রতিষ্ঠানের ক্রমশঃ উন্নতি যে কোম্পানীর পরিচালক কর্ম্মীবৃন্দের অসামান্ত কর্ম্মকুশলতার পরিচায়ক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং ইহা বড়ই আনন্দের ও গৌরবের বিষয় যে এই অল্প সময়ের মধ্যে এই কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ৫১২৭ টাকা পাঁচ আনা মজুত হইয়াছে।

এসিয়ান ইন্‌সিয়োরেন্স

এসিয়ানের সিলভার জুবিলী প্রোগ্রাম বীমা জগতে সম্পূর্ণ নূতন ও অভাবনীয়। এসিয়ানের বীমা ক্রয় করিলে লাভবান যে হইবেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

মেট্রোপলিটন

প্রথম চারি বৎসরের কাজের ভেলুয়েসনে বোনাস দিতে সক্ষম হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

নিউ এসিয়াটিক লাইফ এসিওরেন্স

ছয় মাসে প্রায় ১৫০০,০০০ টাকায় কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

বেঙ্গল ইন্‌সিওরেন্স এণ্ড রিয়াল প্রোপার্টি

এই প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে যেরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে তাহাতে ইহা শীঘ্রই বীমাজগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইতে সক্ষম হইবে।

লীডিং ইন্‌সিয়োরেন্স

জীবন ও বিবাহ বীমার আদর্শ প্রতিষ্ঠান। মাত্র আড়াই বৎসরে ৬০,০০০ টাকার উপর দাবী মিটাইয়া প্রভিডেন্ট বীমা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। শীঘ্রই একটি জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান হইবে।

ইউনিক এসিওরেন্স

এই স্বদেশী কোম্পানীর বীমার পদ্ধতি ধনী নির্ধনী সকলের পক্ষে উপযোগী। চাঁদার হার অল্প এবং উপযুক্ত লভ্যাংশ—ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স

ভারতীয় বীমাক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। গত ভেলুয়েসনে কোম্পানী কম্পাউণ্ড বোনাস দিয়াছে—ভারতীয় বীমাক্ষেত্রে ইহা প্রথম।

মঞ্জুলিকা কেশতৈল

ইণ্ডিয়া প্রাইড কেমিক্যাল ওয়ার্কসের প্রস্তুত মঞ্জুলিকা কেশতৈল যাবতীয় শিরঃপীড়া ও কেশরোগে মন্ত্রশক্তির ন্যায় কাজ করে।

লক্ষ্মী ঘি

বাজারে নানারকম ঘি-ই পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লক্ষ্মী ঘি বিশুদ্ধতায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পারে।

শারদীয় উপহার

কলিকাতার সুবিখ্যাত ব্লক-নির্ম্মাতা ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও হইতে আমরা কয়েকখানি শারদীয় উপহার পাইয়াছি। বিলাতী সমাজে বড়দিনের সময়ে আত্মীয় ও বন্ধুবর্গকে শুভেচ্ছা জানাইয়া পত্র দেওয়ার যে প্রথা প্রচলিত আছে ইহা তাহারই অনুকরণে পরিকল্পিত। ইহা ব্যতীত প্রিয়জনগণকে দিবার উপযোগী বিভিন্ন উপহার পত্রে সুন্দর কবিতা মুদ্রিত আছে; আমরা এইগুলিতে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি।

বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি বিকাশে, নানাশ্রেণীর অনুকৃতি কৌতুক প্রদর্শনে এবং কমিক-গান ও হাস্য-রসের বিকাশে—শ্রীমান অজিতের অভিনয়ে একটি বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে, যা' আমরা সচরাচর অন্যত্র দেখি না। এঁর অনুকৃতি, কৌতুক, মার্জ্জিত রুচি সৌখীন সমাজের উপযোগী। শ্রীমান সুবিখ্যাত গ্রামোফোন কোম্পানীর হাস্য-রসাভিনেতা শ্রীযুক্ত ননী দাশগুপ্তের ছাত্র এবং স্বনামধন্য গায়ক শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। আমরা অভিনয়ক্ষেত্রে

বাঙ্গলার উদীয়মান হাস্য-রসাভিনেতা
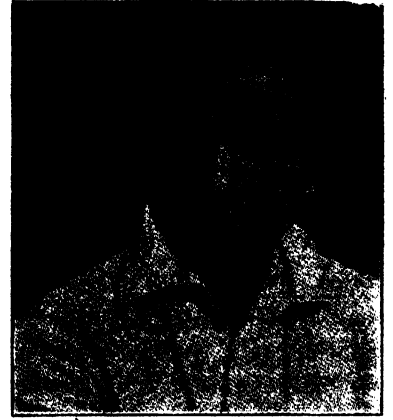
শ্রীমানের সাফল্য এবং ক্রমোন্নতি প্রার্থনা করি। বর্ত্তমানে ইনি রাধা ফিল্ম কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট।
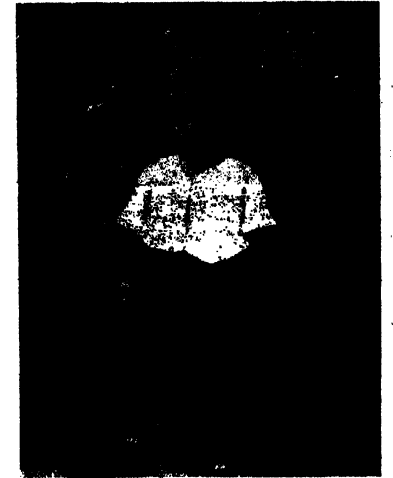
শ্রীমান্ হাবুল, এর বয়স মাত্র দেড় বছর। কিন্তু এই বয়সেই এর ভগবান-দত্ত একটা শক্তির বিকাশ পেয়েছে। শ্রীমান্ ইতিমধ্যেই এমন সুন্দর ফুটবল খেলতে পারে যা দেখে অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড় শ্রীমানের ভূয়সী প্রশংসা কোরেছে।

পি ১৮বি, হাজরা রোডস্থিত ভ্যারাইটিস্ প্রেসে শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও ৯ রামময় রোড হইতে প্রকাশিত।

শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৩

মূল্য—চার আনা　　মফঃস্বলে—পাঁচ আনা
Price -/4/-　　Mofussil -/5/-

খেয়ালী

পরিচালক
টেলিগ্রাম 'ভ্যারিটি'　　ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
৯, রামময় রোড্, কলিকাতা　　টেলিফোন পার্ক ৩২৮
প্রেস—১১, চক্রবেড়িয়া (সাউথ) রোড, কলিকাতা

সম্পাদক—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ণধার

শ্রীযতীন্দ্র মোহন বাগচী

কে বলে খেয়ালী তুমি ? ধ্রুবপদ তোমার সঙ্গীত—
এ নহে হেঁয়ালী কথা ;—যতদূর শুনেছি শ্রবণে,
বুঝেছি তোমার বাণী, দেবতার প্রাণের ইঙ্গিত,
দেশের কল্যাণ লাগি'—সত্য বার্ত্তা জানি যাহা মনে।
দুর্দ্দিনের অন্ধকারে দুর্গত যে দেশের তরণী
চলেছে বন্দর পানে এ তুফানে বাহি' জীর্ণ হাল,
তোমার প্রদিপ্ত রশ্মি ক্ষণে ক্ষণে দেখায় সরণি
কুয়াশার তন্দ্রা টুটি',—আশায় ফুলিয়া উঠে পাল !
কর্ণধার ! তবু বলি হুঁসিয়ার—আরো হুঁসিয়ার,
বহু যাত্রী তব সঙ্গে এ দুর্য্যোগে দেয় আজি পাড়ি ;
রাখিয়া সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, শক্ত হাতে কাটায়ে পাথার,
তীর্থ-মন্দিরের তীরে পার করো সবারে কাণ্ডারি।
কে বলে খেয়ালী তুমি ? মিথ্যা কথা, রাখো এ হেঁয়ালী ;
আঁধারে উঠুক ফুটি শক্তিমন্ত্রে তোমার দেয়ালী।

সুভাষচন্দ্র

ওগো তরুণের প্রিয় বান্ধব দেশের প্রিয়
শ্রদ্ধায় আজ তোমার চরণে প্রণাম করি ;
দেশবাসীদের অন্তর ভরা শ্রদ্ধা নিয়ো
"শতায়ুর্ভব," কর্ম্মের জয় পতাকা ধরি' ;
হে সুভাষ তুমি সর্ব্বহারার ব্যথার সাথী
দরদীবন্ধু, তাই আজ হ'লে বন্দী তুমি
হাসি মুখে কত আঘাত সহেছ বক্ষ পাতি
ধন্য তোমারে বক্ষে ধরিয়া জন্মভূমি।

স্বেচ্ছায় তুমি করেছ বরণ নির্য্যাতনে
দলিত ক্লিষ্ট পতিত জাতির দুঃখ দেখে
দেশের সুপ্তি ভাঙ্গাতে গিয়াছ নির্ব্বাসনে
বাংলা মায়ের শুভাশিষ টীকা ললাটে এঁকে।
হে বিজয়ী বীর স্বদেশাত্মার মুক্তি পথে
রাজৈশ্বর্য্য ফেলে রেখে গেছ তুচ্ছ করি'
প্রবল আত্মা সারথী তোমার কর্ম্মরথে
বাঙ্গালীর তরে রাখিয়াছ প্রেম মর্ম্মভরি।

আত্ম জীবনে যশাকাঙ্খায় মত্ত হ'য়ে—
ভোল নাই কভু দেশজননীরে অন্ধ সম
নির্ভয়ে তাই স্বরাজ মন্ত্রে দীক্ষা লয়ে
সর্ব্ব ত্যাগের ব্রতে ব্রতী হ'লে হে প্রিয়তম।
শারদোৎসবে তোমারে আজিকে বরণ করি
এস ফিরে ভাই দীর্ঘায়ু আর সুস্থ মনে
যৌবনে যোগী এস গৈরিক পতাকা ধরি'
নব জীবনের নব আশা দাও জাতির মনে।

কাস্তে-হাতুড়ী জিন্দাবাদ

উনপঞ্চাশী

বাইরে বেশ ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বারটাও ছিল রবিবার—কারও আফিস যাবার তাড়া নেই। আর তার উপর খুড়োর চায়ের ভাণ্ডারও ছিল অফুরন্ত। কাজেই তর্কটা বেশ জমে উঠেছিল।

রাইচরণ তৃতীয় কাপটা শেষ করে বেশ গম্ভীরভাবে বল্লে—"দেখ, ও নিয়ে আর টানাটানি করে কোন লাভ নেই। ডাক্তার বদ্দিতে যখন রকম বেরকম ওষুধ দেবার পর হালে পানি পায় না, তখন বলে—nature এর উপর ছেড়ে দাও। হিন্দু-মুসলমান problem এরও সেই অবস্থা। যে নেতার পেটে যত বিদ্যে ছিল, সব ওজড় করে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট হয়েছে, Unity Conference হয়েছে, Round Table হয়েছে, খিলাফৎ হয়েছে, জিন্নার সঙ্গে রাজেন্দ্র প্রসাদের মুখ শোকাশুকি হয়েছে, মহাত্মাজীর blank chaque হয়েছে—কিছুতেই কিছু হয় নি। কাজেই ও-নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করে বিশেষ লাভ নেই। যা হবার তা' হবে।"

পল্টু তরুণ কমুনিষ্ট। সে বলে উঠল—"চিকিৎসা হয়েছে না ছাই হয়েছে। যা হয়েছে এ পর্য্যন্ত তা সব আনাড়ীর চিকিৎসা। কাজেই ফলও হয়েছে অশ্বডিম্ব। হিন্দু মুসলমানকে যদি কেউ মেলাতে পারে ত তা' ঐ Hammer and Sickle!

ভট্চায এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। ধা করে চায়ের কাপটা মুখ থেকে নামিয়ে রেখে সে সোৎসাহে বলে উঠল—"ঠিক বলেছিস্ পল্টু! 'যদি কেউ কিছু করতে পারে ত ঐ Hammer and Sickle। মারো মাথায় হাতুড়ি, আর দাও কাস্তে দিয়ে দাড়ী কেটে, ব্যস। তৎক্ষণাৎ মিলন।"

পল্টু চোটে গেল। বল্লে—"আলো-চাল আর কাঁচকলা-খেকো বুদ্ধি কিনা। তার দৌড় আর কতদুর হবে। দেখ ভট্চায। কাস্তে দিয়ে শুধু যে দাড়ীই কাটা যায়, তা নয়; টিকিও বেশ কাটে। আর ঐ ঘণ্টা-নাড়া হাতে হাতুড়ী খেলবে না।"

ভট্চায নীরবে বাকি চা-টুকু শেষ করে নিলে। তারপর নিতান্ত ভাল মানুষটার মত বল্লে—"আহা। চটিস কেন পল্টু, আমি ভাল কথাই বলেছিলুম। তা তোর মনঃপুত না হয়, ত তুই তোর পেটেণ্ট দাওয়াইটারই ব্যাখ্যা কর। কাস্তে আর হাতুড়ী দিয়ে তুই কি রকম হিন্দু মুসলমানের amalgam তৈরি করবি, তা শুনে আমরা ধন্য হই।"

পল্টু বল্লে—"হিন্দু-মুসলমানে মিলছে না, এ কথার সোজা মানে হচ্ছে এই, যে দু দলের যে সমস্ত মাতব্বরদের একসঙ্গে মেলাবার চেষ্টা হচ্ছে তাঁদের সবাই ইংরেজের আশ্রয়ে পুষ্ট হয়েছেন, পয়সা রোজগার করেছেন, এবং আপাততঃ ইংরেজী শাসনের কারখানায় বড় বড় foreman হবার চেষ্টায় আছেন।

তাঁদের মন্ত্রী হওয়া চাই, legislative assemblyর মেম্বার হওয়া চাই, সরকারী চাকরী পাওয়া চায়—তা' না হলে তাঁদের আরামে দিন কাটবে না। এখন দু দলে মাতব্বরের সংখ্যা যত, সরকারী চাকরীর সংখ্যা ত আর তত নয়। কাজেই কামড়া-কামড়ি অনিবার্য্য। নিত্য নূতন চাকরী আদায়ের principle আবির্ভাব হচ্ছে। যাঁদের লোকসংখ্যা বেশী তাঁরা বলছেন, লোকসংখ্যার অনুপাতে চাকরী দাও, যাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি বেশী, তাঁরা বলছেন বিদ্যাবুদ্ধির মাপে চাকরী দাও…যাঁদের বংশবৃদ্ধি করবার ক্ষমতা নেই, এবং বিদ্যা-বুদ্ধিরও অভাব, তাঁরা রাজভক্তির দোহাই দিচ্ছেন। ইংরেজও নিজের সুবিধা মত এক একটা principle মেনে নিচ্ছে। যাদের অসুবিধা হচ্ছে, তারাই চীৎকার করছে। চাকরী ত আর অফুরন্ত নয়, কাজেই দু দলের চাকরীর উমেদারদের ভিতর মিল অসম্ভব।"

খুড়ো একটা হাই তুলে বল্লেন—"তা হলে ঘুরে ফিরে ত সে একই কথা আসছে বাপধন—মিলন অসম্ভব! তোমার কাস্তে হাতুড়ী কাজে লাগল কই?"

পল্টু একটু হেসে বল্লে—"স্থির হোন, খুড়ো। এইবারে কাস্তে হাতুড়ী আসছেন। মাতব্বরদের দল ছাড়া বাকি যত হিন্দু মুসলমান আছে, তাদের প্রধান সম্বল হচ্চে ঐ কাস্তে আর হাতুড়ী; অর্থাৎ তারা হচ্চে চাষী আর মজুর।

সরকারী চাকরীর উমেদার তারা নয়; কে কাউন্সিলে গিয়ে বাহার দিয়ে বসবে অথবা ইংরাজী ইডিয়ম ছুঁড়ে মেরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কাৎ করে দেবে, সে ভাবনা তাদের নেই। সুতরাং মাতব্বরেরা যে সব ব্যাপার নিয়ে আঁচড়াআঁচড়ি কামড়াকামড়ি করেন, সে সব ব্যাপার নিয়ে এদের মাথা ঘামাতে হয় না। এদের ভাবনা কেমন করে এদের মজুরি বাড়বে, মাঠে বেশী ফসল হবে, আর

জমিদার মহাজনের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে এরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে বেঁচে থাকবে। এ সব ব্যাপারের সঙ্গে দাড়ী, টিকি, কলমা গায়ত্রী কোন কিছুর সম্বন্ধ নেই। এখানে হিন্দু মুসলমান সকলেরই এক স্বার্থ। সুতরাং এই সমস্ত স্বার্থ কেমন করে রক্ষা করা যেতে পারে শুধু তাই নিয়ে যদি আন্দোলন করা যায়, তা'হলে হিন্দু মুসলমান সবাই তাতে সমান ভাবে যোগ দেবে। সবাই বুঝবে যে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, সকলেরই স্বার্থ এক; আর সেই এক স্বার্থের অনুসরণ করতে করতে আসবে প্রকৃত মিলন।"

ভটচায এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এইবার বলে উঠল—"সাবাস! সাবাস! কাস্তে হাতুড়ী জিন্দাবাদ!"

রাইচরণ একটু বিরক্ত হয়ে বললে—"শুধু ড্যাঁপোমি করলেই ত হয় না। কথাটা একটু ভেবে দেখা উচিৎ।"

ভটচায বললে—"বৎসগণ! ক্রুদ্ধ হয়ো না। ভাবতে গেলেই আমার ভাব লেগে যায়। পল্টুর বর্ণিত কাস্তে হাতুড়ীর মহিমা শুনতে শুনতেই আমি ভাব নেত্রে অদূর ভবিষ্যতের ছবি বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলুম। বেশ বুঝতে পারলুম নদী, নালা, খাল, মাঠ, জঙ্গল, পাহাড়, কল, কারখানা সমস্তই দেশসুদ্ধ সব লোকেরই সম্পত্তি বলে গণ্য হয়েছে। জমিদার, মহাজন কলওয়ালার বালাই মোটেই নেই, আর দেশের লোকের প্রতিনিধি হিসাবে পল্টুর কাস্তে-হাতুড়ী বাহিনী দেশ-শাসনের ভার নিয়েছে। লোকের পেট ভরেছে; সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; পাছে কেউ চুরি করে সুখের মাত্রা অপরের চেয়ে অযথা বাড়িয়ে নেয়, এ বিষয়ে খপরদারির আর অন্ত নেই। কিন্তু—"

পল্ট হেসে উঠল—"এই যে! খুঁজে খুঁজে একটা "কিন্তু" ঠিক বের করেছ! নৈয়ায়িক পণ্ডিতের বংশ কি না—একটা ফাঁকি বের করতে না পারলে ওর বংশ-মর্য্যাদাই যে নষ্ট হয়ে যায়!"

ভটচায বললে—"না ভাই পল্টু; তোমাদের ফাঁকিটা এতই স্পষ্ট যে তার ধরবার জন্যে নৈয়ায়িকের দরকার হয় না। পেটের জ্বালা যে কত বড় জ্বালা তা এই গরীব বামুনের ছেলেকে আর বুঝাতে হবে না; কিন্তু পেটের জ্বালা মিটলেই যে মানুষের সব অভাব মিটে যায়, তার যে অহঙ্কার নষ্ট হয়ে যায় বা পরের ঘাড়ে নিজের মতামত চাপিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা কমে যায়, তার ত কোন প্রমাণ পাই নে। মানুষের মনটা যদি উদরের By product হতো, তা হলে পেটের তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হয়ত মনের তৃপ্তিও আসত। কিন্তু লক্ষণ দেখে ত তা মনে হয় না। কাজেই যে রোগের উৎপত্তি মনে, পেটের উপর পুলটিস লাগালে তা সারবে কেন?

খুড়ো বললেন—"তাই ত রে। পল্টু ত যাহোক একটা হেস্ত নেস্ত করে এনেছিল। ভটচায আবার কি ফ্যাসাদ বাঁধালো? শেষে কি হিন্দু-মুসলমান মেলাবার জন্যে mental hospital খুলতে হবে না কি?"

ভটচায বললে—"প্রায় তাই বটে। এই ত সেদিন মুসলমানদের একজন মস্ত বড় পাণ্ডা ব্যবস্থা পরিষদে বলে বললেন—তাঁদের ধর্ম্মটা হচ্ছে একেবারে ভগবানের খাস-দপ্তর থেকে আমদানি। আর বাকি সব ধর্ম্মের উৎপত্তি অন্যত্র। এ রকম মনোভাব যদি শিক্ষিত মানুষের ভেতর থাকে, ত মূর্খ কাস্তে-হাতুড়ী-ওয়ালাদের ভিতর থাকবে না কেন? এখন একদল কাস্তে-ওয়ালা যদি মনে করে তারা ভগবানের পুষ্যিপুত্তুর, আর বাকি সবাই ত্যাজ্যপুত্তুর, তা হলে অপর একদলও ঠিক তাই মনে করতে পারে; দু-দলের পেট ভরা থাকলেই যে তারা সকলকেই পুষ্যিপুত্তুর বলে মনে করবে, তার ত কোন মানে নেই। কাজেকাজেই কে পুষ্যিপুত্তুর আর কে ত্যাজ্যপুত্তুর তার একটা সুমীমাংসার জন্যে কাস্তের সঙ্গে কাস্তের যুদ্ধ লেগে যেতে কতক্ষণ?

পল্টু এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এইবার বলে উঠল—"ভুল করছ ভটচায। আমার pointটাই তুমি ধরতে পার নি। আমার pointটা হচ্ছে—"

খুড়ো টীপ্পনি কেটে বললেন—"Something which has no position no magnitude."

খুড়োর বিশাল ভুঁড়িটার দিকে দেখিয়ে পল্টু বললে—"না খুড়ো মশাই, আমার point-এর magnitude ঠিক আপনার ভুঁড়িটার মত না হলেও একেবারে যে নেই তা বলা যায় না। আমি বলছিলাম এই যে রাতারাতি যদি মানুষের পেটের জ্বালা মিটে যায়, তাহলে তাদের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা কমুনিষ্ট ব্যবস্থার সময়েও থাকতে পারে বটে, কিন্তু ঐ অবস্থা আনবার জন্যে যদি হিন্দু মুসলমানে মিলে একসঙ্গে চেষ্টা করে, তা'হলে সেই চেষ্টার ফলে তাদের পরস্পরকে জানবার সুবিধা হবে; আর ভাল করে জানাজানি হলেই বাজে জিনিষ নিয়ে তারা আর মারামারি করতে যাবে না।"

ভটচায বললেন—"আবার যে ন্যায়ের ফাঁকি চালাচ্ছ, বাপধন! কোন্‌টা বাজে জিনিষ আর কোন্‌টা কাজের জিনিষ তাই নিয়েই ত মাথা-ফাটাফাটি। তোমার কাছে ধর্ম্মমতগুলো বাজে জিনিষ বলে মনে হচ্ছে বলেই যে তোমার কাস্তে-হাতুড়ী পন্থী সকলেরই তাই মনে হবে, তা ধরে নিচ্ছ কেন? আর একসঙ্গে অনেক কষ্ট সহ্য করেছ বলেই যে দুজন লোকের বা দু দলের লোকের ষোলআনা মনের মিল হয়ে যায়, তাই বা কে বল্লে? তা যদি হতো,

ত Irish Republicanরা মাইকেল কলিন্সকে খুন করতো না। মুসলমানেরা অপরের সঙ্গে লড়বার সময় এক; কিন্তু তাই বোলে মিয়া মুল্লির লড়ায়ে মাথা ফাটা-ফাটি ত কম হয় নি! আসল কথা ত আমার এই মনে হয় যে মানুষ যতক্ষণ নিজের মতকে অভ্রান্ত ভেবে তা' জোর করে পরের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করবে, ততক্ষণ সে capitalistই হোক্, আর communistই হোক, ধর্ম্মের গোঁড়ামি, আর মাথা ফাটাফাটি অনিবার্য্য।"

খুড়ো বলে উঠলেন—"হায় রে। আবার সেই অনিবার্য্য। যাতে ওটা নিবার্য্য হয়, তার একটু পন্থা বাৎলে দাও না বাপ।"

ভট্‌চায হেসে বল্‌লে—"অজ্ঞানের নিবারণ হয় ডানে। বিনামূল্যে জ্ঞান আমি দিতে রাজী আছি, কারণ বামুনের ঐ ব্যবসা। কিন্তু পন্টু, তায়ার কাস্তে-হাতুড়ি ধারী নধী শূদ্রীরা তা নেবে কি? সোজাকথা বল্‌তে গেলে মহাত্মাজী থেকে আরম্ভ করে পণ্ডিত জহরলাল পর্য্যন্ত সবাই যে বলেন—চুপ। চুপ।

পরিবর্ত্তনের পথে কংগ্রেস

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর দুস্তর পথ বাহিয়া জাতীয় মহাসমিতি আজ যে সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে তাহা যেমন একদিকে ভারতের রাষ্ট্রনীতিজগতে একটা ভাব-বিপ্লবের সূচনা করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি তাহা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও একটা পরিবর্ত্তনের আভাষ দিতেছে। রাষ্ট্রজগতেই এই পরিবর্ত্তনের ফল অধিকতর সুস্পষ্ট হইবে, না সামাজিক জীবনেই এই বিপ্লবের ফল হইবে সুদূর প্রসারী তাহা পলিটিক্যাল গনৎকারগণের হিসাব-নিকাসের অন্তর্ভুক্ত। তবে কংগ্রেসের স্থাপনা হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহার ইতিহাস-বিবর্ত্তন আলোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, ব্রিটীশ-শাসন-তন্ত্র হইতে ক্ষমতা আদায় করিয়া আত্মবশ শাসন-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল, তাহা আজ বৃহত্তর পৃথিবীর চিন্তাধারা হইতে খোরাক সংগ্রহ করিয়া সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের পথে ব্যাপকতর স্বাধীনতার পথ খুঁজিতেছে। তাই কংগ্রেসের রাজনীতির নোঙ্গর আজ তাহার ক্ষুদ্র ঘাটের সীমা ছাড়াইয়া পাড়ি জমাইয়াছে সেই মহাসমুদ্রে যেখানে তাহার লক্ষ্যস্থল স্থূল রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা আহরণ নয়, বা ইংরাজ শাসক-তন্ত্রের পরিবর্ত্তে দেশীয় শাসক-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা নয়, তাহার লক্ষ্যস্থল সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার এমন একটা ওলোট-পালট সৃষ্টি করা যেখানে গণ-শক্তি প্রত্যক্ষভাবে আপন কর্ত্তৃত্ব আপনিই গ্রহণ করিতে পারিবে এবং কেবলমাত্র তাহাদ্বারাই জাতীয় স্বাধীনতা সার্থক ও সফল হইয়া উঠিবে। অর্দ্ধশতাব্দীর রাজনীতির ইতিহাসে এই বিপ্লব শুধু এদেশের পক্ষেই যুগান্তকারী নয়, ইহার শেষদল সমগ্র জগতের ইতিহাসের পক্ষেও যুগ-পরিবর্ত্তন সূচনা করিতেছে।

* * *

১৮৮৫খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন হয় তাহার আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল শাসন ব্যবস্থার কতকগুলি স্থূল ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধন ও নিখিল ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জগতে পরস্পর ভাব আদান প্রদান দ্বারা একটা অখণ্ড ঐক্য স্থাপন করা। কিন্তু যিনি কংগ্রেসের প্রথম পরিকল্পনা করেন সেই মিঃ হিউম কংগ্রেসকে করিতে চাহিয়াছিলেন এমন একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান যাহার কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকিবে ইংরেজী শিক্ষিত মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর আদর্শানুযায়ী একটা ফেরঙ্গ নীতিচালিত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। কিন্তু তৎ-কালীন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের পরামর্শ অনুসারেই কংগ্রেসকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের রূপদান করা হইল—একটা Official Oppositionএর অস্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া হিসাবে এবং এই আদর্শানুসারে বৎসরের পর বৎসর কংগ্রেসের কাজ কেবলমাত্র মূলতঃ আবেদন ও নিবেদনেই সীমাবদ্ধ থাকিতে লাগিল। গৌণভাবে এদেশে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তণ করা তখনকার দিনের কংগ্রেস নেতাগণেরও সুদূর স্বপ্নরাজ্যের কল্পনাপটে প্রতিভাত হইয়াছিল। ১৯০৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেস প্রধানতঃ সরকারী কাজের ক্ষীণ সমালোচনাই করিয়া আসিয়া-ছিল এবং আসর জমাইবার জন্য শাসন-সংস্কারের কথঞ্চিত নিতান্তই পোষাকী হিসাবে কংগ্রেসের কার্য্যনীতি ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত রাখা হইয়াছিল। মোটকথা অবসর বিনোদনের একটা আভিজাত্য সুলভ পলিটিক্যাল-বিলাসই ছিল কংগ্রেসের যথার্থ স্বরূপ। কংগ্রেসের দাবী তখন পর্য্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্রিটিশ শাসক-বর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই, কারণ এই দাবীর

মধ্যে জাতীয়তাবোধের অনুভূতি ছিল না, ছিল বিদেশী মতবাদ-দ্বারা প্রভাবান্বিত নিতান্ত হালকা চিন্তাধারার অভিব্যক্তি।

* * *

১৯০৫ খৃঃ অব্দে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্র সংঘাতে যে আদর্শ ও চিন্তা বাঙ্গালার শ্যামায়মান বনভূমির মেদুর আবহাওয়ায় পুষ্ট হইয়া উঠে, বাস্তবিকপক্ষে তাহাই প্রথম কংগ্রেসকে প্রচলিত চিন্তা-শাঠ্যের জগত হইতে স্বাধীন ও সুস্পষ্ট চিন্তার পথে পথ নির্দ্দেশ করে। যাহা ছিল জাতীয়তা-বর্জ্জিত রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান, স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে তাহা কৃত্রিম অশন-ভূষণের ঐশ্চর্য্য পরিহার করিয়া কঠোর মাটির জগতে মাটির খাঁটি মানুষের মধ্যে নামিয়া আসে। কংগ্রেসের ইতিহাসে তাই ১৯০৫ খৃঃ অব্দই জাতীয় আন্দোলনের আরম্ভ-যুগ ইহার পূর্ব্বে আমরা কংগ্রেসে যে ক্ষীণ রাজনৈতিক তত্ত্ব-কথার প্রতিধ্বনি শুনিয়াছি তাহার মধ্যে ছিল নির্দ্দোশ ও নিরাপদ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নিষ্ক্রিয় অভিব্যক্তি, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যাহার গুরু-গর্জ্জন আসন্ন ঝটিকার বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল তাহা ছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রাণময় রূপ। কিন্তু তবু তখন পর্য্যন্ত পুরাতন-পন্থী কংগ্রেস নেতাগণ জাতীয় আন্দোলনের অব্যর্থ গতি প্রতিহত করিতে করিতে চেষ্টার কসুর করেন নাই। কারণ ইহার পরিণতি যে সরকারের সহিত সঙ্ঘর্ষ তাহা তখনকার দিনের সাবধানী আইননীতি নেতাগণের বুদ্ধির অগোচর ছিল না। ১৯০৫ সালের বেনারস কংগ্রেসে সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে বাঙ্গালীর দাবী "স্বদেশী" সমর্থন করিলেও চরম পথ "বয়কট" সমর্থন করিতে পারিলেন না। বস্তুতঃ ফিরোজশা মেটা, গোখলে, ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যুষিত কংগ্রেসে তীব্র জাতীয়তা ভাবপুষ্ট চরম-মতবাদ প্রচারে বাধার অন্ত ছিল না। কিন্তু মহারাষ্ট্রের তিলক ও বাংলার বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ প্রমুখ বাম-পন্থী নেতাগণের নেতৃত্বে চরম-মতবাদ ক্রমশঃই কংগ্রেসে প্রসার বিস্তার করিতে লাগিল। এই সময়েই রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামের অর্থনৈতিক দিকটাও ক্রমশঃ প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। এই মত সঙ্ঘর্ষের ফলে কংগ্রেস তরণী মাঝে মাঝে নিমজ্জমান-প্রায় হইয়া উঠিত। কিন্তু তবুও চরম-পন্থীগণ ঐক্যের জন্য জাতীয় আদর্শ-পূত মত বিসর্জ্জন দিতে রাজী হয়েন নাই। এই মত-সঙ্ঘর্ষের ফলেই কংগ্রেসকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয়-আন্দোলন ক্রমশঃই তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল ও পুরাতন-পন্থীগণও ক্রমেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ১৯০৭ খৃঃ অব্দের সুরাট কংগ্রেসে যে দক্ষযজ্ঞ অভিনীত হইল তাহাতে চরম-পন্থী জাতীয়তা বাদী ও পুরাতন পন্থী নরম-মতবাদীগণের একটা শক্তিপরীক্ষা হইয়া গেল। অতঃপর নরম-পন্থী ও চরমপন্থীগণের মধ্যে প্রত্যেক কংগ্রেসেই একটা বোঝা পড়া হইত; বস্তুত ১৯১৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দুইদলই কংগ্রেসের আধিপত্যের জন্য তুমুল শক্তিপরীক্ষাই ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু ১৯১৮ খৃঃ অব্দ হইতেই নরমপন্থীগণ জাগ্রত জনমতের গর্জ্জমান ভাবধারার সহিত ছন্দোরক্ষা করিতে না পারিয়া কংগ্রেস পরিত্যাগ করেন ও চরমপন্থীগণ কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ভারত রাজনীতি জগতে চরম-পন্থা বিবর্ত্তণের মধ্য দিয়াই জাতীয়-আন্দোলন বিপুল হইতে বিপুলতর শক্তি সংগ্রহ করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ ঘুরাইয়া দেয়। সামাজিক আন্দোলনে যাহার আরম্ভ তাহাই ঘটনা-বিবর্ত্তনে রাষ্ট্রীয়-আন্দোলনের পথে জাতীয় আন্দোলনে পর্য্যবসিত হইয়া পরিশেষে স্বাধীনতা' আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

* * *

১৯২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেসে যে জাতীয়তার যুগ চলিতেছিল গান্ধীজির নেতৃত্বে তাহা ক্রমে স্বাধীনতা-আন্দোলনের যুগে পরিণতি লাভ করে। কারণ প্রধানতঃ গান্ধীজির নেতৃত্বেই Self determinationও স্বাধীনতা চিন্তা ব্যাপকভাবে কংগ্রেসের গৃহীত নীতি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভারতের প্রত্যেক স্তরের মধ্যে ইহা প্রসার লাভ করিয়া জাতীয় আন্দোলনকে একটা বাস্তবরূপ দান করিয়াছে। অবশ্য অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বে ও "সন্ধ্যা" ও "বন্দেমাতরমের" মাঝ দিয়া বাঙ্গালা দেশে এই স্বাধীনতা চিন্তা বহু পূর্ব্বে পরিস্ফুট হইলেও ব্যাপকভাবে সমগ্র কংগ্রেসের আদর্শ এই নীতিদ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই। ইহা একটা সুদূর রাজনৈতিক কল্পনা হিসাবেই রহিয়া গিয়াছিল। অসহযোগের যুগে এই আদর্শ যে ভাবে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূলীভূত কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আমাদের রাজনীতির কর্ম্মধারাও এই আদর্শ উপলব্ধির জন্য ক্রমশঃ ডেমোক্র্যাসির পথে পরিচালিত হইয়া জনসাধারণের সাথে একটা যোগসূত্র গ্রথিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। গান্ধীযুগের ১৯২৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রথম আটবৎসর Democratisation of congressএর যুগ বলা যাইতে পারে; কারণ এই যুগে স্বাধীনতা-আকাঙ্খার মধ্য দিয়া জাতির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আদর্শ ও কল্পনার ঐক্যদ্বারা একটা জাতীয় সমীকরণ প্রচেষ্টা সফল হইয়া উঠিয়াছে।

আবার এই কয়বৎসর হইতেই কংগ্রেস জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার প্রতীকরূপে অযুত নর-নারীর সশ্রদ্ধ সমর্থন লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই যুগের একটা বিশিষ্ট অধ্যায় ১৯২৯ খৃঃ অব্দের লাহোর কংগ্রেস; কারণ ইহার সভাপতির আসন হইতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ভারতবর্ষের

কাম্য যে পূর্ণ স্বাধীনতা তাহা অকুণ্ঠভাবে প্রচার করেন। কংগ্রেসের আদর্শ ও চিন্তাধারা এইরূপে দ্রুত গতিতে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে এবং যে সকল বিষয়ে কংগ্রেসের আদর্শ অস্পষ্ট ছিল তাহাও ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া কংগ্রেসের সমগ্র চিন্তা ও আদর্শকে একটা সংহতরূপ দান করে। কিন্তু গত কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কংগ্রেসের আদর্শ স্পষ্ট হইয়া উঠিলেও ইহার কর্ম্মধারার মধ্যে পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের একটা চেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল। জাতীয় আন্দোলনকে সংহত রূপ দান করিয়া একটা কেন্দ্রীভূত শক্তিতে পরিণতি করিবার জন্য বিরোধী স্বার্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা গান্ধী-আন্দোলনের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। কিন্তু এই আত্মবোধ যখন তীব্রতর হইয়া জাতির প্রাণের পঞ্জর স্পর্শ করে তখন এইরূপ সামঞ্জস্য-প্রচেষ্টার প্রয়োজন দূরীভূত হইয়া যায়। সুতরাং স্বাধীনতা আন্দোলন যখন বাস্তবিকই জাতির পক্ষে একটা জীবন-মরণ সমস্যায় পরিণত হইল তখন কৃত্রিম সামঞ্জস্যের প্রয়োজনও আর রহিল না। ফলে কংগ্রেসও ক্রমশঃ জাতীয় সমস্যার মূলীভূত প্রশ্নগুলির প্রতি মুখোমুখি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু যাহা হউক গান্ধীবাদের সামঞ্জস্য-নীতি মূলগতভাবে কংগ্রেসের এই democratisation processকে বহুল পরিমাণে বাধা প্রদান করিতেছিল। কিন্তু আসল ডেমোক্র্যাসির উদ্বোধনের পক্ষে যে এইরূপ সামঞ্জস্য-প্রচেষ্টা অনেক সময় জাতীয় আদর্শকে পথ-চ্যুত করে তাহা পণ্ডিত জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতাগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই ক্রমশঃ কংগ্রেসের মধ্যে আর একটা চিন্তাধারার প্রকাশ দেখা গিয়াছে যাহার উদ্দেশ্য ও আদর্শ শুধু শাসন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন নয়, বস্তুতঃ প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনের যথার্থ আদর্শ উপলব্ধি করা। ১৯২১ খৃঃ অব্দে গান্ধী-আন্দোলনে যে ভাবধারা ক্ষীণ স্রোতে প্রবাহিত হইয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট ভাব-জগতের আলোকের সন্ধান দিয়াছিল, বিগত লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে পণ্ডিত জহরলালের নেতৃত্বে তাহা আপন পরিণতি খুঁজিয়া পাইয়াছে; তাই আজ কংগ্রেসে সুরু হইয়াছে আসল ডেমোক্র্যাসির উদ্বোধন।

পরিত্রাণ

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

অনুপমা আশ্রয় পাইল।

বিশেষ কোন আশা না রাখিয়াই সে একটা চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল পরিতোষকে,—যেমন আরো দু-এক জায়গায় লিখিয়াছে।

কিন্তু পরের দিনেই চিঠির জবাব আসিল। একই সহরের মধ্যে চিঠির জবাব অবশ্য এবেলা ওবেলার মধ্যে আসিতে পারে—সে কথা নয়। চিঠির জবাব তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া উত্তর পাঠাইতে বেশী বিলম্ব হয় নাই এইটুকুই আনন্দের ও বিস্ময়ের নয় কি?

কিন্তু চিঠির জবাব লিখিয়াছে স্বয়ং পরিতোষ নয়। লিখিয়াছে তাহার ম্যানেজার। যে বাড়িটির কথা অনুপমা বলিয়াছিল, সেটি এখন সারান হইতেছে। ম্যানেজার সবিনয়ে সেকথা জানাইয়া লিখিয়াছে যে, আপাততঃ অনুপমা তাহার ছেলে ও ভাইকে লইয়া পরিতোষের নিজের বাড়ীর এক অংশে বাস করিতে পারে। যাহাতে তাহাদের কোন অসুবিধা না হয় সে বিষয়ে যে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা একথা জানাইতেও ভোলে নাই।

পরিতোষ নিজে না লিখিয়া ম্যানেজারকে দিয়া চিঠি লিখাইয়াছে ইহাতে অনুপমার অপমান বোধ করিবার কথা। কিন্তু অপমান বোধও সময় হিসাবে মানায়। অনুপমার সে সময় নয়।

আর সত্যই অনুপমা তাহার চিঠি পাইবামাত্র সাগ্রহে নিজে তাহার চিঠির জবাব দিবে এ আশা করিয়া যদি সে চিঠি দিয়া থাকে তাহলে তাহার নিজেকেই ধিক্।

মনের কোণে তেমন কিছু থাকিলে বুঝি সে এ চিঠি লিখিতেই পারিত না।

সে সব দিনের কথা সত্যই কি তাহার মনে আছে, না তাহা মনে করিয়া রাখিবার মত!

সহৃদয় উদার দশজনের উপকারী লোক, বিশেষ করিয়া তাহার স্বামীর এক কালের বন্ধু বলিয়াই অনুপমা তাহার কাছে বিপদের দিনে সামান্য একটু সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছে।

সাহায্যও এমন কিছু বেশী নয়। পরিতোষের একটি ভাড়াটে বাড়িতে মাত্র কয়েক মাসের জন্য সে থাকিতে চাহিয়াছে। তাও একেবারে অমনি নয়। ভাড়াটা কিছু কম করিয়া দিয়া মাত্র। কিছুদিন ধরিয়া

খালি পড়িয়া আছে বলিয়া অনুপমার ভাই শরৎ আসিয়া একদিন খবর দিয়াছিল।

অনুপমা তাহার পর কয়েকদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে এ বিষয়ে পরিতোষকে কিছু বলা যায় কিনা! তারপর একদিন একটা চিঠি ভাইকে দিয়া নিজের নামেই লিখাইয়াছে। অনুপমা কোন প্রকার দুঃখের কাঁদুনি অবশ্য সে চিঠিতে গায় নাই। তাহার সে স্বভাব নয়। প্রয়োজনও ছিলনা। সে শুধু তাহার বাবার মৃত্যু সংবাদটা দিয়া জানাইয়াছে যে, কয়েক মাস পরে তাহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া দেশের বাড়িতেই আশ্রয় লইতে হইবে। শুধু ভাইএর পরীক্ষার পূর্ব্বের কয়েকটা মাস কলিকাতায় থাকিতে পারিলে ভাল হয়। তাহার বাবার মৃত্যুর দরুণ, যে বাড়িতে এখন তাহারা আছে সে বাড়িতে থাকা আর তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আয়ে কুলাইবে না। পরিতোষের ছোট বাড়িটা ত খালিই পড়িয়া আছে। কিছু কম ভাড়ায় হইলে তাহারা কয়েকটা মাস এখানে থাকিতে পারে।

কম ভাড়ার কথাটা লেখার মধ্যে হয়ত একটু আত্মপ্রতারণা ছিল। অনুপমা হয়ত জানিত যে পরিতোষ যদি রাজী হইয়া চিঠির জবাব দেয় তাহা হইলে ভাড়া সে লইবে না। কিন্তু এটুকুর বেশী আত্মপ্রতারণা যদি কোথাও থাকে তাহা হইলে তাহা অনুপমার অজ্ঞাত।

পরিতোষ আদৌ জবাব দিবে কিনা সে বিষয়ে একটু সন্দেহ অবশ্য ছিল। তাহার স্বামীর মৃত্যু ত হইয়াছে সাত বৎসর। এই সাত বৎসর আর কোন সম্বন্ধ দূরের কথা, খোঁজ খবরও নাই। পরিতোষ ভুলিয়া না গেলেও আর নতুন করিয়া পরিচয়ের সূত্রপাত না করিতেও চাহিতে পারে।

কিন্তু পরিতোষ জবাব দিয়াছে। অবশ্য ম্যানেজারকে দিয়া চিঠিটা সে না লিখাইলেই পারিত। এটুকু তাচ্ছিল্যের মতই দেখায়। কিম্বা—অনুপমার হঠাৎ একটা কথা মনে হইয়া একটু কৌতুকও হইয়াছে—তাচ্ছিল্যের মত দেখাইবার চেষ্টাও হতে পারে।

বাড়িতে আশ্রয় দিবার প্রস্তাব করিয়া ম্যানেজারকে দিয়া চিঠি লেখান একটু অদ্ভুত বই কি! নিজের বাড়িতে থাকিতে দিবার প্রস্তাবের জন্যই ম্যানেজারকে দিয়া চিঠি লিখাইতে হইয়াছে—এমনও ত হইতে পারে!

কিন্তু তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ অনুপমা এ প্রস্তাবে রাজী হইয়াছে। কয়টা মাস বইত নয়! একটা আশ্রয় পাওয়া লইয়া কথা!

কিন্তু কয়দিন বাদে আশ্রয় পাওয়াটাই একমাত্র কথা বলিয়া কি জানি কেন মনে হইল না।

কয়দিন ম্যানেজারই আসিয়া খোঁজ খবর লইতেছে।

"পরিতোষ বাবু বলে পাঠালেন—আপনাদের মাঝের ঘরের ফ্যানটা মেরামত হইতে গেছে, আপাততঃ একটা টেবেল ফ্যান পাঠিয়ে দিলে···

অনুপমা ম্যানেজারের সামনে বাহির হয়। সে হাসিয়া বলিয়াছে—"আপনি বলুন গিয়ে ফ্যান আমাদের দরকার নেই। আমরা ফ্যান ত আগেও ব্যবহার করতাম না।

ম্যানেজার সঙ্কুচিতভাবে বলিয়াছে,—"না, না, সে কি হয়"!

বিস্ময়সূচক আপত্তিটা, আগে ফ্যান না ব্যবহার করার কথায়, না ফ্যান দরকার নাই বলায় বোঝা যায় না। কিন্তু অনুপমার এই লইয়া কথা কাটাকাটি করিতে ভালো লাগে নাই, তাহাতে যেন সত্যই ব্যাপারটা লজ্জাকর হইয়া ওঠে। অনুগ্রহকে অন্য একটা অশোভন রূপ দিবার ইচ্ছা তাহার নাই।

সে বলিয়াছে—আচ্ছা তাহলে পাঠিয়েই দেবেন।"

ম্যানেজার আবার আসিয়াছে পরের দিন খোঁজ লইতে। "পরিতোষ বাবু বলে পাঠালেন"।

অনুপমা তাহার কথা মাঝখানেই বন্ধ করিয়া হাসিয়া বলিয়াছে—"আপনার পরিতোষ বাবু রোজ রোজ বলে পাঠান কেন? নিজে একদিন এলেই ত পারেন। এমন কিছু দূরও ত নয়!"

কথাটা এমনভাবে বলিয়া ফেলিবে অনুপমা নিজেও ভাবে নাই, বলিবার ইচ্ছা ছিলনা। বিশেষ ম্যানেজারের কাছে। সরকার মশাই লোকটি অমনিই কি ভাবে কে জানে, চতুর সাবধানী লোক! মুখে তাহার কোন ভাবান্তর হয় না, কিন্তু অনুপমাকে এতখানি সম্মানের সহিত এমন ভাবে আশ্রয় দেওয়ায় কোন কৌতুহল কি তাহার জাগে না? জাগে নিশ্চয়। মনে মনে কি যে একটা গড়িয়া লইয়াছে কে জানে! কথাটা অমন ফস্ করিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে অনুপমা নিজেই জানিত না। সে নিজেই অবাক হইয়াছে।

কিন্তু ম্যানেজার যে উত্তর দিয়াছে তাহাতে সে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

"পরিতোষ বাবুর যে অসুখ!"

অনুপমার কোন উত্তর না পাইয়া যে কথাটা বলিতে আসিয়াছিল তাহাই জানাইয়া ম্যানেজার আবার জানাইয়াছে।

"তিনি বলে পাঠালেন—খোকাকে একটু বেড়াতে যেতে দিতে পারেন রোজ! আমাদের চাকর এসে বিকেলে নিয়ে যাবে কি"!

অনুপমা ঘাড় নাড়িয়া বুঝি সায় দিয়াছে।

ম্যানেজার চলিয়া যাইবার পর মনে পড়িয়াছে, কি অসুখ সে কথাটা জিজ্ঞাসাই করা হয় নাই। করা উচিৎ ছিল।

দুইভাগে ভাগ করা একই বাড়ি। ভিতরের দোতালায় বারান্দার একটা দরজা

খুলিয়া দিলে অনায়াসে যাতায়াত করা যায়। প্রথম দিন আসিয়া দরজাটা তাহাদের দিক হইতে বন্ধ দেখিয়া অনুপমা খুশীই হইয়াছে। এক বাড়িতে বাস করিতে হইলেও সে কথাটা স্মরণ রাখিবার কোন অস্বস্তিকর প্রয়োজন থাকিবে না।

দুপুরবেলা কি খেয়ালে ছেলেটিকে লইয়া অনুপমা নিজেই সে দরজা খুলিয়া ওদিকে প্রবেশ করিয়াছে।

দোতালার লম্বা রেলিঙ দেওয়া বারান্দা চারিদিকের ঘরগুলির সামনে দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। একটা চাকর বাকরের দেখাও নাই।

ঘরগুলির পরিচয় না জানিয়া অনুপমা আগাইয়া গিয়াছে। পরিতোষের ঘর খুঁজিয়া লইতেও অবশ্য তাহার বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু দ্বিধা আসিয়াছে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া। মনে হইয়াছে এমন ভাবে না আসিলেও চলিত! সরকার মশাইকে দিয়া খবর দিয়া বিকালে আসিলে কিছু ক্ষতি ছিল না।

অসুখের খবর শুনিয়া অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার দরুণই না দেখিতে আসাটা অবশ্য অন্যায়; কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা তাহার জন্য করা চলিত বোধ হয়।

কিন্তু এখন আর ফিরিয়া যাওয়াও বোধহয় চলে না। পথে চাকর বাকরের সঙ্গে দেখা হইতে পারে। তাহারা হয়ত পরে পরিতোষকে জানাইতে পারে! তখন কথাটা ভাল শুনাইবে না।

অনুপমা দরজায় ঘা দিয়াছে আস্তে।

কাহারও সাড়া পাওয়া যায় নাই। অনুপমা চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছে। এখনও কোনও লোকজনের দেখা নাই। এখনও সে ফিরিয়া গেলে পারে। আবার ঘা দিবে কিনা সে বিষয়ে তাহার সত্যাই দ্বিধা জাগিয়াছে।

ভয় তাহার সত্যাই একটু মনে আছে। সারা সকাল সে বিষয়ে একেবারে কিছু না ভাবিয়া সে পারে নাই। পরিতোষ যদি সত্যাই পুরাতন দিনের কথা তোলে। আশ্রয় চাহিয়া চিঠি লেখার সময় এসব কথাকে সে আমল দেয় নাই। পরিতোষের ম্যানেজারের মারফৎ জানান প্রস্তাবে রাজী করার সময়ও মনের অস্ফুট দ্বিধাকে তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। সে কোন্ অতীত যুগের কথা। কত স্মৃতির স্তর তাহার উপর জমিয়া আছে। পরিতোষ শিক্ষিত ভদ্রলোক। সেই অতীত যদি তাহার কাছে এখনো জীবন্ত হইয়া থাকে তবুও সে নিশ্চয় তাহাকে পুরাতন পৃষ্ঠা হইতে টানিয়া বাহির করিবে না। সেটুকু সংযম ও সুরুচি নিশ্চয় তাহার আছে, ইহাই অনুপমা ভাবিয়াছে।

কিন্তু এখন মনে হয়, সংযমের ও সুরুচির পালিশ আর মানুষের কতটুকু গভীর! সে পালিশ ভেদ করিয়া অনাবৃত মূর্ত্তি কি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না!

পরিতোষ এখন তাহাকে নিজের হাতের মুঠায় পাইয়াছে বলিলেই হয়। নিজে হইতে দেখা করিতে আসিয়া সে আরো—

এখন যদি পরিতোষ ঠিক শোভনতার সীমা না মানিয়া চলে। সহসা যদি বলিয়া বসে—"এ বাড়িতে ত তোমায় অনেকদিন আগে আসবার কথা অনু! সেই এলে, কিন্তু তখন যদি আসতে?"

পরিতোষ সেদিন একটু উদ্দামই ত ছিল। সে উদ্দামতা এখনও তাহার আছে কি! যদি সে বলিয়া বসে,—"সেদিনের কথা মনে পড়ে অনু, ষ্টীমার ট্রিপ থেকে ফেরার পথে যেদিন তোমায় নামতে দিতে চাইনি, বলেছিলাম সবাই নেমে গেলে একেবারে নিয়ে চলে যাব! খোঁজ পাবেনা কেউ! সেদিন যদি সত্যি ধরে রাখতাম! তাহলে! তাহলে আমাকে এমন করে জীবন কাটাতে হত না! তোমাকেও এমন ভাবে আশ্রয় নিতে আসতে হত না!"

উত্তর অবশ্য অনু তৈয়ার করিয়াই আসিয়াছে—প্রথমে এইটুকুই বলিলে চলিবে—"ওসব কথা আর কেন!"

তবু যদি পরিতোষ না থামিতে চায়, যদি তখনকার মত উত্তেজিত হইয়া ওঠে বলে,—"ওসব কথা আর কেন—বেশ ওসব কথাকে ভদ্রভাবে চেপে রাখতে হবে কেমন? ভেতরে পুড়ে যদি খাক্ হয়ে যায় ওপরের পালিশ ঠিক থাকা চাই! ভদ্রতার শোভনতার দোহাই মেনেই তোমায় হারিয়েছি, আজও তাই মেনে চুপ করে শিষ্টসভ্য অভিনয় করে যেতে হবে! কেন, কেন? বলতে পারো!"

এসব চিন্তা এমন গুছাইয়া তাহার মন হইতে কেমন করিয়া বাহির হইতেছে জানিতে পারিলে অনুপমা নিজেই একটু চমকাইয়া উঠিত নাকি! কিন্তু সে তাহা জানে না বোধ হয়।

পরিতোষের অশান্ত উচ্ছ্বাসের জবাবে সে একটু কঠিনই হইবে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে—শান্ত কণ্ঠে অথচ দৃঢ় স্বরে বলিবে—"তোমার ঘরে কি এইসব শুনতে এসেছি মনে কর!"

পরিতোষ তাহাতেও না থামিতে পারে। তখনকার দিনে সব সময়ে নিজেকে সে সম্বরণ করিতে পারিত না। নিজেই বলিত, "আমাদের রক্তের ধারা একটু আলাদা অনু, চারিধারে পুকুর ডোবাই দেখে আসছ, আমাকে তারই মাফসই মনে কোরো না। আমাদের বংশে পা গুণে গুণে কেউ চলেনি। হঠাৎ এমন একটা কিছু করে বসতে পারি, যা তোমার বেড়া দেওয়া গণ্ডীকাটা জগতের ধারণা চুরমার করে দেবে।" সেদিন অবশ্য সে তেমন কিছু

(শেষাংশ ৬৫এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

কানন

সাংবাদিকের টলিউড পরিক্রমা

পরিবেশক : সুধীরেন্দ্র সান্যাল

রেণুকা

ধর্ম্মতলার মোড়ে ছিল ঠাঁই, বরষ ঘুরিতে শেষ
টালিগঞ্জের 'রিজেন্ট-কাননে' আজো চলে তা'রি জের !
ছায়া-পথে যা'র শুধু চলা ফেরা, ছায়ালোক বার মাস,
ছায়ার-পরশে, অতীত হরষে, অন্তরে পরকাশ !
ছায়া-মায়াবীর সুখ-স্মৃতি ভরা, মায়া-লোক ভালবাসি—
মায়াবী-নটের মায়াবিনী প্রিয়া, তাই কাছে ছুটে আসি।
অন্তরে কা'র কী আছে, না জানি ; বদনেতে চারু হাস
সাংবাদিকের সেইটুকু লাভ, তা'র বেশী নাই আশ !
অতীতে যা'দের পেয়েছিনু প্রীতি, নবীনেরা তা'রি সাথে—
দিয়াছে অঢেল স্নেহের পুলক—মিলিয়াছে হাতে হাতে।

*

রাধার কুঞ্জে আজো জ্বলে আলো, চেরাগের রোশনাই,
ম্লান কিছু তবু, তাহার স্মৃতিটি, ভোলা ত' যায় না ভাই !
নিত্য সকালে, চোখ বুজে দেখি, করিনি একটু ভুল---
নব-আনন্দে মুখর 'চিত্ত'—হরিপদে মশগুল !
অন্তরে যদি ব্যথা দিয়ে থাকি, তারও আজ ক্ষমা চাই—
ব্যথিত চিত্তে সান্ত্বনা দিতে—হরিপদ ভুলি নাই !
দেখেছিনু হেথা 'তড়িৎ'-চমক—মেঘলা আঁধারে ভাসে
ফুটিল সে রেখা বরষা কাটিতে, ভিন্ন শারদাকাশে।
রাধার কুঞ্জে, আজি একান্তে, আজো সখি 'নীহারিকা'
ভুবন-ভুলানো চাহনির মাঝে, জ্বালে প্রাণে প্রেম-শিখা !
রাধা-কুঞ্জের ভাঙ্গিয়াছে বুক, 'মীরা'র পরিত্রাণ
রাধা-কুঞ্জের যুগল-চরণে, লভিল সে নির্ব্বাণ !
'রাজেন বাড়োড়ী' পরাজয় মানে, 'চপলা'র প্রেম-Raceএ।
আলম-বাজারে 'জ্যোতিষ চন্দ্র,' শিঙা ফুকিয়াছে শেষে !

পদ্ম

মায়া

শিশু
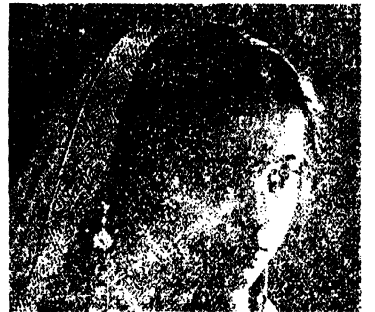
কুসুমের 'রেণু' ঝরিবার আগে, রাধার বরাত জোর
বুদ্ধির দোষে বুড়া শালিখের, নয়নে বহিছে লোর !

*

ছায়ার রাজ্যে সব-ই কী মিথ্যা, শুধু ঝাটা ভোজবাজী,
দেবতার নাই, হেথ নাই ভাই—দানবের কারসাজী !

*

বাল-খিল্যের 'ব্রিগেড' দেখিতে, চল যাই এইবারে
পি-এন-গঙ্গো, সাঙ্গো পাঙ্গো—কভু না বচনে হারে !
'মুক্তি-স্নান,'এর সঙ্গী খুঁজিতে, নবীন পথিক চলে—
স্রোত-মুখে তাই, প্রেম-সরোবরে—'শিলা'-লিপি ভাসে জলে !
'সুশীল'-সুবোধ, বন্ধুটি মোর, এর বেশী বলিব না
সখা 'সুকুমার'—এখন কুমার, ছাড়িয়াছে 'আশীয়ানা' !
মধু লোভে তাই 'মজ লিশি-মুখো-মক্ষিকা-' রাখে হুল্—
'পদ্মে' অরুচি ; ধুতুরার প্রেমে, আজ তাই মশ্‌গুল্ !
মাকাল ফলের চেয়ে ঢের ভালো, 'শিশু'র মুখের হাসি !
সেই দু'টি আঁখি, চকিত চাহনী আমি শুধু ভালবাসি !
'দস্তুরমত নাটক'-এর গতি, কত তা'র হেরফের—
'শিশির ভাদুড়ী' রাখিয়াছে নাকী আজ মান বোতলের !
মায়া-কাননের মায়া-নটী শুনি, নিজরূপে গর্বিতা
বাবুরাম রোড, ছাড়ি যাই চল্—ভিন্ পথে আজ সিধা ।

*

বাঙালীর রচা, পুষ্প-বিতানে, আজো আছে সৌরভ
নত-মস্তকে, তারি গুণ গাই—বাঙালীর গৌরব !
এই সে 'এন্-টি'—কাননে তাহার থরে থরে ফোটা ফুল—
কা'রে ছাড়ি কা'র দিকে ছুটে যাই, শুধু হয় দিক্ ভুল !
'পুতুল'?—খেলার ক্রীড়নক ভাল ; তুনে তা'র ভরা তীর—
শরাহত প্রিয়া, বন্দী সে হিয়া—'কমলেশ' কুমারীর ।
আরো আছে এক খেলোয়াড় ভাল, 'হেম' করে প্রাণপণ
রূপসী 'চন্দ্রা', ক্লান্তি কাতরা, তবু তা'র পায় মন ।

জ্যোতিষ মুখো

শিলা

রাণীবালা

উমা

মলিনা

যমুনা

একদিন ছিল বুকভরা প্রেম ; আজ তাহা নিঃশেষ !
ঢালিতে ঢালিতে শূন্য কুম্ভ আছে আজ অবশেষ !
তা'রি পাশে ধায় তারকা আর এক, দ্যুতি তার পড়ে খসি'—
ম্লান তবু সেই, দীপ্ত-গগনে—আজো শোভে 'উমাশশী !'
কে বলে মলিন, 'মলিনার' আখি—তন্দ্রা-আবেশ হারা
অমরাবতীর উর্ব্বশী নহে—পৃথিবীর অপ্সরা !
হৃদি 'যমুনা'য় তুফান উঠেছে, নাচে তাই 'প্রমথেশ'
বল্কলে নহে, মুকুটে শোভিত—রাজ অধিরাজ বেশ !
আর একজনে, ভুলিতে পারিনা ; কাজ করে ঘর বার,
নব-মল্লিকা সন্ধান চলে—'মল্লিক' বঁধুয়ার !
'মীরা-পাহাড়ী'-র দ্বন্দ্ব মিটেছে, উদ্বাহে পরিণতি
ভাগ্য-চক্র ! ললাটের লিপি ! রোধে কে তাহার গতি !

*

আনোয়ারশা'তে চলে শুনি রাতে, মহা ধুমধাম ভারী
চণ্ডী ঘোষের মমত কাটায়ে, চলে আসি তাড়াতাড়ি ।
নহে মজলিশ্—কর্ম্মবীরের কঠোর সাধনা চলে—
বাঘ ও বাছুরে, করে গলাগলি, এইখানে দলে দলে !
পথ মাঝে নাকী, কাননে আর এক উঠিয়াছে কল-রোলে
শুনি, 'আলিবাবা' আর দস্যুর দলে—বেধেছে গণ্ডগোল !
দুখের সাগরে পাড়ি দিতে তাই 'মর্জ্জিনা' ধ'রে হাল
ঝাড়ু হাতে তাই, আব্দালা মিছে, সাফ্ করে জঞ্জাল !

*

রিজেণ্ট পার্ক-এ, এইখান হ'তে, চল যাই হোল রাত,
(শুনি) খেম্‌কা-রাজের ঠাণ্ডা গারদে—'দেবকী'র ছাড়ে দাত !
সুন্দরী সেরা 'বিমলাকুমারী'—গোলাপ সে বাশোরার,
শুধু চোখে দেখা—সাবধান করে, তাও আজ কারদার !
নহে সে রম্ভা, রূপসী 'মেনকা', চোখে নাই শরাসন
স্নিগ্ধ-মধুর চাহনীর মাঝে, তৃপ্তিতে ভরে মন !
আজি একান্তে, নয়ন-প্রান্তে, তা'রি পাছে ধায় তীর—

অমর মল্লিক

চন্দ্রা

পাহাড়ী

বিমলা কুমারী

মেনকা

ছায়া

হাস্যে-লাস্যে, মধুর ভাষ্যে— অপরূপ 'পিয়ারী'র !
কায়া-সন্ধানে ঝামেলা অঢেল—'ছায়া', সেই মোর ভালো,
মনের রূপালী পর্দার পাতে, ঢালে সে সোণালী আলো !
বৃন্দাবনের বিলাস দেখেছ— দেখনিক লীলা তা'র
দেবকী বোসের গোপন-মনের, লীলা বোঝা ভাই ভার !
'জীবন-নাটকে' যবনিকা টানি, ফিরে আসে নিজ ঘরে—
নব 'সংসার'-এ নানা সুখ, তবু হেথা নাহি মন ধরে।
পঞ্চ-ফুলের অমৃত-পিয়াসী মধু-লোভী প্রজাপতি—
চির-চঞ্চল ভ্রমরের মন, নানা ফুলে তার গতি !
জমিদারী চলে ঢিমে তেতালায়, আপ্‌শোষে 'গোস্বামী'
বাধা নাহি দেন, শুধু বেদনায় কাঁদিছে সে দিবা-যামী !

*

আলমবাজারে, শেষ হোক আজ, ছায়া-মায়াবীর গান,
ভোলা আড্ডির 'জোড়'-ঘুঘু' নাকি লভিল পরিত্রাণ !
সত্য-ব্যাধের ক্ষুধা বড় ভাই তার চেয়ে 'বিধুমুখী'—
উর্ম্মি-মুখর, সাগর-সলিলে, সাতারু সে মহা সুখী !
নকল 'ছায়া'র পরশ হেথায়, তবু তাও ঢের ভালো
ঘরোয়া-বধুর মধুর ব্যাভারে, করে নাকী ঘর আলো !
'হরি ভক্তের' স্বপন টুটেছে, রাধার কাননে পাড়ি
কত রূপসীর মুখ ভার হোল, কতজনা দেয় আড়ি !
দেবালয়ে শুনি, বোধনের সুর, নব আনন্দে মাতে
ব্যর্থ পূজারী লভিল চেতনা—'মন্মথ' শরাঘাতে !

*

আজ, পাবলিসিটির বাজে জয় ঢাক, মায়া-পুরী রূপে আলো
তবু লোকে বলে ঢাকের বাজনা, থেমে গেলে লাগে ভাল !
সকলের মন পাই নাই ভাই, করিয়াছি প্রাণপণ—
যেটুকু দিয়াছ - সেই মোর ভাল, তৃপ্তিতে ভরে মন।

দেবকী বসু

সুশীল মজুমদার

প্রতিহত

শ্রীহৃষীকেশ মৌলিক

গয়াণহাটা ষ্ট্রীট, রাত্রি।

হুস্ করে একটা ট্যাক্সি এসে থামল।

সুরথ স্ত্রীকে বললে, নাম।

মুখ তুলে সজল চোখে সুমিত্রা একবার চারিদিক চেয়ে দেখল। গলির মুখে মুখে, বারান্দায়, পুঞ্জ পুঞ্জ নারী। কুৎসিত মুখে প্রকট প্রসাধন। প্রত্যেকটি পথিকের মুখে তাদের লোলুপ শাণিত দৃষ্টি এসে পড়ছে।

একটা বেসুরা গান, একটা বিশ্রী খলখল্ হাসি। সেই ঘৃণিত আবহাওয়া যেন একটা নোংরা রুমালের মত সুমিত্রার নাক মুখ চেপে ধরে ওর নিঃশ্বাস বন্ধ করে তুলতে চাইল। ট্যাক্সির সিটে লুটিয়ে পড়ে আর্ত্তনাদের সুরে সুমিত্রা বলে উঠল, এখানে কেন?

—এখানেইত! ব্যভিচারিণী মেয়েদের এখানে ছাড়া আর জায়গা কোথায়?

সুমিত্রার লুণ্ঠিত দেহটা বার দুই কেঁপে উঠল। একান্ত বিস্ময় করুণ একটা ভিজে সুর বেরিয়ে আসে, ব্যভিচার? হঠাৎ একটা—

তিক্ত ব্যঙ্গের সুরে সুরথ বলে উঠল, হ্যাঁ, আজ দেখে ফেলেছি বলেই হঠাৎ একটা চুমা নয়?

তুমি না আই-এ, পাশ! এই তোমার শিক্ষা!

সুমিত্রা উত্তর দিলনা।

আবার সেই বীভৎস আবহাওয়াটা ওর উপর চেপে বসে। ওর মনে হলো সামনে যেন উদ্যত-ফণা এক গোক্ষুর সাপ, কিন্তু ও শিশুর মত অসহায়, রোগীর মত দুর্ব্বল। হঠাৎ কেউ যদি জোর করে ওকে চুমা খেতে চেষ্টা করে কি করবে ও! আত্মীয়ের থেকে এ রকম ব্যবহার কে আশা করতে পারে।

সুরথের আবার খেয়াল চাপল।

ট্যাক্সির উপর সহসা দাঁড়িয়ে উঠে বললে, নাম এখানে।

সিটটাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে সুমিত্রা পড়ে রইল।

এখনও নাম, রাস্তার লোকের সামনে আর 'সিন" করতে হবেনা। যেমনি করে টেনে গাড়ীতে এনে তুলেছি তেমনি করে এখানেও নামাব, বলে রাখছি।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সুমিত্রার হাত ধরে সুরথ টানতে থাকে।

ড্রাইভারটা বলে উঠল, দেরী হোতা বাবু।

একটা টাকা ছুড়ে দিয়ে এক ঝটকায় সুমিত্রাকে সুরথ নামিয়ে নেয়।

আবার চারিদিকে একবার চোখ পড়তে শিউরে উঠে সুরথের দেহের উপরেই সুমিত্রা ভেঙ্গে পড়ল।

সুমিত্রার ডান হাতের কব্জিটা শক্তমুঠায় চেপে ধরে গলির মুখে সুরথ পা বাড়ায়।

বেঁকে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা বললে, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? ওর কণ্ঠস্বরে একটি করুণতম হাহাকার ধ্বনিত হয়ে উঠে। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর, ছেলের মৃত্যুতে মার যে-হাহাকার আগুনের শিখার মত আকাশের দিকে লকলকিয়ে উঠে।

—আর সতীপনা করতে হবেনা, বলে সুমিত্রার হাতটা মোচড় দিয়ে একটা দরজা দিয়ে সুরথ ভিতরে ঢুকে পড়ল। দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটীকে বললে, এস।

মেয়েটী প্রথমে বোকার মত চেয়ে থাকে। তারপর চোখে মুখে রহস্য ঘনিয়ে সুরথদের পেছু সিঁড়ি ভাঙ্গে।

—এই? বলে একটা দরজার কাছে সুরথ এসে দাঁড়ালো।

—হ্যাঁ, বলে মেয়েটা ঘরে ঢুকে সুইচটা টিপে দিল, হেঁসে বললে, আসুন।

সুমিত্রার নিজে চোখকেই অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। এ সম্ভব! মাথার ভিতর বুঝি ওর আগুণ জ্বলে উঠল। পড়ন্ত ফলের মত সুমিত্রার দেহটা শিথিল হতেই ওকে টেনে নিয়ে ভিতরে নিচের বিছানায় সুরথ বসল গিয়ে।

সমস্ত গৃহ সজ্জাটা বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত একবার সুমিত্রার চোখে এসে পড়ে, পরক্ষণেই সুরথের কোলে ও মুখ লুকাল।

মায়ের কাছ থেকে মার খেয়ে মা'কেই জড়িয়ে ধরবার মত সুমিত্রার এই শিশুর মত সুরথের কোলে মুখ লুকানতে কি যে যাদু ছিল! সুরথের বুক দুলে ওঠে। এই দুর্দ্দান্ত গোঁয়ার-গোবিন্দ সুরথ, রাগের মাথায় স্ত্রীকে যে বেশ্যার ঘরে টেনে নিয়ে এসেছে।

বিছানার এক সুদূর প্রান্তে মেয়েটী বসেছিল, মেঝের উপর পা গুটিয়ে। চোখের ইঙ্গিতে সুরথকে জিজ্ঞেস করলে এ কে?

সুরথ খানিক চুপ থেকে বললে আমার স্ত্রী।

মেয়েটী একটু অবাক হয়। চোখ বুজে কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করে বোধ হয়।

সুরথ বললে তোমার নাম কি?

—তরলা।

—কতদিন তুমি এ-পথে এসেছ? কি করে এলে এখানে? সুরথ লক্ষ্য করে অবাক হয় যে, এ অবস্থায়ও তরলা ওর দিকে মাঝে মাঝে কটাক্ষ হানতে ক্রুটী করছে না। দেখতেও মন্দ নয়, ডিমের মত মুখের ডৌলটি! নামের খাতিরেই বোধ হয় একটু চঞ্চল চোখ, পাতলা ঠোঁট দুটি। ছ্যাকড়া গাড়ীর আবহাওয়াটা

এখনও মুখে পুরোপুরি আসেনি। স্নিগ্ধ ভদ্রত্বের একটি রেশ এখনও মুখে লেগে আছে।

তবু বয়স ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা।

তরলা ওর মুখের সপ্রশ্ন ভাবটি একটু উসকিয়ে নিয়ে বললে, কেন এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন ?

সে জেনে তোমার কি হবে ? আমি শুনতে চাচ্ছি, তুমি বলবে। পয়সা দেব।

তরলার দেহটা অনিচ্ছায় একটু সর্পিল হয়ে ওঠে, মুখ নেমে পড়ে।

উত্তপ্ত কণ্ঠে সুরথ বললে, কি, বলবে ত ?

একটু নীরব থেকে মুখ তুলে তরলা বললে, সে কী আর শুনবেন ! খুব বেশী দিন এপথে আসিনি, কথাও এমন কিছু নয় :—

একটা নোট বের করে তরলার দিকে এগিয়ে দিয়ে সুরথ বললে, যা-ই হয় বল, দেরী কোরোনা।

নোটটা প্রথমে তরলা নিলেনা।

বিছানার উপর নতমুখে মনোযোগী হয়ে আঁচলের কোনটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে কি ও ভাবতে থাকে। খানিক পরে ও মুখ উঠাল। এবং সুরথের থেকে সুমিত্রার দিকে দৃষ্টি নামিয়ে নোটটা হাতের মুঠায় তুলে নিয়ে ও পাকাতে থাকে।

সুরথ বললে বল।

আনাড়ি অভিনেতার ভীত মুখের ভাব তরলার মুখে নেমে আসে।

—আমার স্বামীরা দু'ভাই ছিলেন। আমার স্বামীই বড়। লেখাপড়া বেশী না জানলেও বেশ ভাল মাইনায় এক সওদাগরী অফিসে তিনি কাজ করতেন। আমার বিয়ের সময় দেওর এম-এ, পড়ছিল। সংসারে আর শুধু এক বিধবা মা। আমি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতেই, আমার বিয়ে হল। ম্যাট্রিক পাস করবার আগে বিয়ে হতে আমার ও বাবার দু'জনেরই আপত্তি ছিল। কিন্তু ভাল পাত্র পেয়ে জোর করে মা বিয়ে দিয়ে দিলেন। পড়াশোনায় ছোট বেলা থেকেই আমার খুব ঝোক ছিল। বরাবর ক্লাশে ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হয়ে এসেছি। কাজেই একেবারে হাল ছাড়লাম না। স্বামীকে বললাম আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দাও। বারটা থেকে চারটা অবধি ক্লাস হয় এমন, বিস্তর ইস্কুল কোলকাতায় আছে তারই একটাতে দাও। আমার পড়াশোনার জন্য তোমাদের সংসারের কাজের আমি ক্ষতি করবনা। তিনি রাজী হলেননা, বললেন, মেয়ে মানুষের বেশী লেখাপড়া শিখে কি হবে, যা শিখেছ ও-ই ঢের। উনি একটু সেকেলে ধরণের, সকল বিষয়েই। কথায়, চালচলনে, পোষাকে। আজকালকার ছেলেদের থেকে একেবারে ভিন্ন রকমের। কিন্তু আমার দেওর ছিল উল্টা। সমস্ত বিষয়ে আধুনিক। মেয়েদের লেখাপড়া, পোষাক, তাদের নাচগান, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি নিয়ে খবরের কাগজ সামনে করে প্রায়ই দু'ভায়ে তর্ক হোত। তর্ক অনেক সময় ঝগড়ায় প্রমোশন পেত, তখন শাশুড়ী এসে থামিয়ে দিতেন। এ সমস্তই আমার দেওর প্রবল আন্তরিকভাবে সমর্থন করত।

স্বামীর প্রধান বক্তব্য ছিল যে, এই করে ইউরোপ আমেরিকার মত দেশটা রসাতলে যাচ্ছে।

পড়তে না পেয়ে মনে ভয়ানক রাগ হোল, দুঃখ হোল। ইস্কুলের বইগুলি সঙ্গে এনেছিলাম। দুপুরে নির্জ্জনে সেগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম আর টপ টপ করে চোখের জল গড়িয়ে পড়ত। যখন মনে হোত আমি ছাড়া ক্লাসের আর সব মেয়েরাই পাশ করে যাবে মন ভয়ানক খারাপ হয়ে যেত। শেষে একদিন আর থাকতে না পেরে দেওরকে বললাম, ও খুসী হয়ে রাজী হ'ল। বললে বেশতো। আমি তোমায় বাড়ীতে পড়াব বৌদি। ইস্কুলে যাবা না দিতে চায় না-ই দিল বাড়ীতে পড়ে তুমি পরীক্ষা দেবে। তোমাদের মেয়েদের আর কি ল্যাঠা।

আমাদের বাসা কলেজ স্কোয়ারের খুব কাছেই। ছুটির ঘণ্টাগুলিতে ও আমাকে পড়িয়ে আবার ক্লাশ করত গিয়ে। প্রথমেই যাতে বাধা না পড়ে সেজন্য দু'জনে পরামর্শ করে ব্যাপারটা গোপনে রেখেছিলাম। কারণ শাশুড়ীও মেয়েদের লেখাপড়া পছন্দ করিতেন না। দুপুরে উপরে তিনি ঘুমিয়ে থাকতেন, নীচের তলায় আমরা পড়াশোনা করতাম। একেবারে নির্জ্জন। প্রথম প্রথম আমার একটু লজ্জা করত। কিন্তু ক্রমেই তা কেটে গেল। গোড়ায় বেশ পড়াশোনা হোত এবং দেওরও ক্লাশ কামাই করত না। কিন্তু দিনে দিনে পড়াশোনার চেয়ে গল্পই হোত বেশী এবং বুঝতে পারতাম ও ক্লাশ কামাই করতে আরম্ভ করেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কত দেশের কত বিষয়ের গল্প ও করে যেত বুভুক্ষু কাণ দিয়ে আমি তা শুনে যেতাম। প্রাণ ধরে বলতে পারতাম না যে তোমার ক্ষতি হচ্ছে, এবার তুমি ক্লাশে যাও। দেওরই ছিল আমার একমাত্র সঙ্গী, বন্ধু, বহির্জ্জগতের মিলন সেতু। ক'লকাতায় আমার বা স্বামীর দিকের প্রায় কোন আত্মীয় স্বজন ছিল না, বাইরেও আমি মিশতে পেতাম না। দেয়ালচাপা হয়ে সারাক্ষণ বাড়ীতে বসে থেকে একটু আলাপ, দুটো মনের কথা বলবার জন্য আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। তখন হাস্যে, গল্পে, কৌতুকে আমার নিঃসঙ্গতার সমস্ত অভাব নিঃশেষে ও মিটিয়ে দিত। ও যেন ছিল আমার তৃষ্ণার জল। ওর দিকে চেয়ে আমার হৃদয় মন স্নিগ্ধ সরস হয়ে উঠত। পড়াশোনার আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা বাইরের জগতের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্খা সমস্তইত

ওর থেকে মিটেছিল! মাঝে মাঝে আমরা সকলে সিনেমায় যেতাম। পরদিন দুপুরে ওই নিয়ে গল্প করতে কী ভাল লাগত!

স্বামীর থেকে এর কিছুই আমি পাইনি। এই জন্যেই বোধ হয় ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটাও অন্তরের ছিল না, ছিল শাস্ত্রের। স্বামীর কথা ভেবে মনে আনন্দ হোত না, এতটুকু তৃপ্তি জাগত না মনে। চেষ্টা করেও পারতাম না। কোন কিছুতেই ওর সঙ্গে আমার মিলেনি। দেওরের সুন্দর মুখের দিকে চাইলে বুক কেমন করে উঠত। চেয়ে চেয়ে আশ মিটত না। সমস্ত মন ওরই চিন্তায় সর্ব্বক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। নির্জ্জনে থাকলে চারদিক ওর গল্পে হাস্যে যেন শব্দময় হয়ে উঠত, চোখ বুজলেই ওর মুখ ভেসে উঠত চোখের সামনে। স্বামীর সম্বন্ধে কর্ত্তব্য সজ্ঞান হয়ে চেষ্টা করেও আমার মন ফিরাতে পারিনি। ও যেন সব দিক থেকে সব রকমে আমায় আকর্ষণ করেছিল। সন্দেহ হোত একেই বুঝি ভালবাসা বলে!

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠতাম।

কতগুলি জড়িত কণ্ঠের কী রকম বিশ্রী হল্লা ভেসে আসে। সুমিত্রা একটু কেঁপে উঠে সুরথের আরও ঘন হোল।

—একদিন একটা মাসিকের একটা অসংযত ছবি সামনে করে কথা হচ্ছিল, ছবিটা নিয়েই। হঠাৎ আমার মুখটা টেনে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে ও গোটাকতক চুমা খেয়ে ফেললে। এত আকস্মিক যে, নিজেকে সম্বরণ করতে আমি সময় পেলাম না। কিন্তু তারপরেই কি পেরেছি?—পারিনি। পাপের পথ এত পিছল যে একবার পা দিলে আর রক্ষা নেই।

সুরথ স্ত্রীর একটি বাহুমূল নেড়ে দিয়ে বলল শুনছ?

সুমিত্রা নিস্তরঙ্গ দিঘীটির মতই পড়ে রইল।

কেঁদে বললে, এখনও আমায় নিয়ে চল বাইরে। এখনও চল। সেদিকে চেয়ে কী রকম একটু হেসে তরলা ফের বলতে আরম্ভ করল, মন এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, ভবিষ্যৎ এমন অস্পষ্ট হয়ে ওঠে! চারদিকের পরিস্থিতি একটু একটু করে সে পথে ঠেলে দেয়, পঙ্কমলিন একেবারে নিম্নতম ধাপ পর্য্যন্ত। আমিও নিজেকে রক্ষা করতে পারলাম না। নিজের অজ্ঞাতসারে কেমন একটা আচ্ছন্ন, অচৈতন্য অবস্থায় ডুবে গেলাম।

কিন্তু পাপ যে চিরকাল চাপা থাকে না, এও আমাদের পক্ষে সত্য হোল। শাশুড়ী জানতে পারলেন, দেওরকে ডেকে বিস্তর ধমকে দিলেন। কিন্তু ও মাকে একটুও ভয় করত না, তিনিও অত্যন্ত ভালমানুষ ছিলেন। সাফ বলে দিল, একথা যদি দাদা জানতে পারে তা'লে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। শাশুড়ী ভয়ে চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখের উপর আমাদের অনাচার চলতে লাগল। এখন মনে হ'ল বেশ্যা আমি, আমারও লজ্জা করে, কিন্তু তখন কী এক সুখে, কী এক মোহে যে পশু বনে গেছলাম! কিন্তু এমনি সহজে পাপ কোন দিন নিষ্কৃতি পায়নি। একদিন কী কারণে অসময়ে বাড়ী ফিরে স্বামী আমাদের বদ্ধঘরে আবিষ্কার করলেন। দরজা খুললে, আমাদের দেখে তিনি যে-সুরে 'এ কি' বলে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, কোনদিন আমি ভুলব না তা!

বিস্ময়ের সঙ্গে এমন একটা বুকভাঙ্গা হাহাকার ধ্বনিত হোল যে আমরা মুখ তুলে ওর দিকে একবার চাইতে পারলাম না পর্য্যন্ত! দু'জন দু'দিকে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলাম। চাইব কী করে?

প্রতিবাদের আমাদের কী আছে? আমাদের মুখের রেখায় পাপের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ছিল যে। এক মুহূর্ত্তে, বাদলা রাতের বিদ্যুৎ-চমকে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ তেমনি সজল পরিষ্কার হয়ে উঠল। কিন্তু ধাপে ধাপে যখন পাপের পথে নেমে গেছলাম।—

না চাইলেও সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তার সেই তীব্র জ্বালাময় দৃষ্টি অনুভব করে ভিতরটা শীতল হয়ে আসছিল। আমার স্বামী হঠাৎ বলে উঠলেন' যাও, আমার বাড়ী থেকে এখুনি দু'জনে বেরিয়ে যাও, এখুনি বলে দরজা দেখিয়ে দিলেন।

দেওর এতক্ষণ যেন নিঃসাড় হয়ে গেছল, বললে, বেশ ত। কুছ পরওয়া নেই।—বলে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

শাশুড়ী এলেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলাম। কিন্তু তখন যদি স্বামীর পা ধরে মার্জ্জনা চাইতাম হয়ত তাঁর দয়া হোত। হোত না হোত কিন্তু সেই আশা আমি একেবারে নিবিয়ে ফেলতে পারি কী করে! আমার সমস্ত ভবিষ্যতের আকাশ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, তবু আত্মাভিমান আমাকে বাধা দিল, হায়! হিন্দু নারীর জীবনে ঈশ্বরের পরেইত স্বামীর সর্ব্বময় স্থান! সকল অসম্মান, দুঃখ কষ্ট জ্বালা থেকে যে রক্ষা করে, এ পৃথিবীতে যে একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় তারও পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে আমার তখন লজ্জা হোল! দেওর গাড়ী নিয়ে এল। নিজের বাক্স বিছানা বই সব ওঠাতে লাগল তাতে। শেষে গাড়ীতে উঠে হাঁক দিয়ে বললে, আসবে ত এস।

ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিয়ে স্বামী বললে, যাও।

বাইরে এসে দেয়ালে মুখ রেখে আমি কাঁদতে লাগলাম। শাশুড়ী বললেন, এবার

তুই ওদের মাপ কর। ছেলেমানুষ না বুঝে যা করেছে—

এ কথায় স্বামী যেন একেবারে ক্ষেপে গেলেন, বল্লেন, চুপ কর তুমি, ওকালতি করতে হবেনা। এদ্দিন কি চোখের মাথা খেয়ে ছিলে? ছেলেমানুষ!

টেনে আমাকে গলিতে বের করে দিয়ে আমাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ দরজার কড়া ধরে আমি কাঁদতে লাগলাম, কতকাল কাঁদতাম জানিনা। কিন্তু আশে পাশে জানলা দরজায় নানা মুখের আবির্ভাব হতে লাগল। পায়লামনা গাড়ীতে উঠে বসি।

এক কাপড়ে স্বামীর ঘর থেকে চির-কালের জন্য বেরিয়ে এলাম। তারপরে একটা বোর্ডিংএ সাত আট দিন, কিন্তু টাকা?

একটা সস্তা ঘর দেখে আমরা চলে এলাম। দেওর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে গোটা দুই টিউশানি জুটিয়ে নিলে। তাতেই কোন রকমে চলত। প্রথম কয়েকমাস ওর থেকে যে প্রাণঢালা প্রেম ও আদর পেয়েছি খুব কম মেয়েমানুষের ভাগ্যেই হয়ত তা জুটে থাকে। কিন্তু তবু আমার মুখ একটু মলিন হলেই হাসি ফোটাতে কী যে ও না করেছে এবং কী যে ও না করতে পারত ভাবতে পারিনা। এমন সময় সংবাদ পেলাম স্বামী আবার বিয়ে করেছেন। ও বল্লে কু'চ পরওয়া নেই।

আমার প্রতি ওর ভালবাসা আরও গভীর আরও উদ্দাম হয়ে উঠল। কিন্তু আমি ভেঙ্গে পড়লাম।

আশ্চর্য্য যেদিন থেকে ঘর ছেড়েছি সেদিন থেকেই স্বামীর প্রতি আমার ভালমানুষ নির্ব্বিরোধ স্বামীর প্রতি একটা অন্তর্নিহিত আকর্ষণ মনে মনে অনুভব করছিলাম এবং দেওরের কুলপ্লাবিনী ভাল-বাসার স্রোতের নীচে তা বেড়েই চলেছিল। সেদিন যা একান্ত সুলভ ছিল যাতে আমার অধিকার ছিল তখন তাই আকাশের চাঁদের মত সুদূর সুদুর্লভ মনে হোত। স্বামীর ঘরে আবার ফিরে যাবার আমার গোপন তীব্র আশা একেবারে উৎপাটিত হয়ে গেল এ সংবাদে।

কিন্তু কোন জিনিষেরই উচ্ছ্বাস চিরস্থায়ী হয়না।

আদর সোহাগের মাঝে আমার জন্য ও কত ত্যাগ করেছে সে কথা দেখা দিতে লাগল। পড়াশোনা, মা-ভাই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সবই ত আমার জন্য ওর ত্যাগ করতে হয়েছে। এবং ধীরে ধীরে সমস্ত কথাবার্ত্তায় এই অভিযোগই বড় এবং প্রধান হয়ে উঠতে লাগল।

চুপ করে শুনে যেতাম এবং বুক গুড়িয়ে যেত।

ওর একটা টিউশানি এই সময় চলে গেল। শত চেষ্টায়ও দ্বিতীয় আর একটা জুটাতে পারল না। একটি একটি করে গায়ের গয়না খুলে দিতে লাগলাম এবং তা প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল ও যখন পড়ল লম্বা অসুখে। আমার এবং ওর এক বন্ধুর অক্লান্ত চেষ্টায় ও ভাল হয়ে উঠল বটে, কিন্তু অভাবে পড়লে মানুষের কী পাশব পরিবর্ত্তন হতে পারে তার পরিচয় পেয়ে শিউরে উঠলাম। রাত পোহালে খাবার চিন্তা অথচ কোন দিক থেকে একটি পয়সা আসবার উপায় নেই, চারিদিক অন্ধকার। সর্ব্বক্ষণ খিটমিট করতে লাগল। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা দেখেও একদিন রেগে মারতে পর্য্যন্ত কসুর করলে না। এই অবস্থায়ই একদিন বাইরে গিয়ে আর ফিরে এলোনা, সাত আটদিন চলে যায় ওর দেখা নেই। আমার অবস্থা তখন আসন্ন হয়ে এসেছে। হাতে একটি পয়সা নেই, একা ঘরে থাকবার ভয়, আর ওর এবং নিজের চিন্তায় শুধু পাগল হয়ে যেতে বাকী ছিলাম।

একদিন ওর বন্ধু এসে খবর দিলেন, ভায়ে ভায়ে মিল হয়েছে, এবং ভাল দেখে বিয়েরও আয়োজন হচ্ছে।

কেঁদে বন্ধুর পা জড়িয়ে ধরে বল্লাম, আমাকে বাঁচান, এ ক'টা দিন আমার কাটিয়ে দিন। তারপর আমার কপালে যা থাকে তাই হবে।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার আত্মীয় স্বজন কি এমন কেউ নেই যার কাছে গিয়ে এ অবস্থায় আশ্রয় নিতে পারি! কেউ ছিলনা। আর থাকলেই বা কী হতো! এই কালামুখ নিয়ে কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব? যার কাছে কোন লজ্জা ভয় নেই সেই মা-ও চলে গেছেন।

উনি রাজী হলেন।

কয়েকদিন পরে বল্লাম, এ অবস্থায় রাত্রে একা থাকতে বড় ভয় করে, ঠিকও নয়। একটি বুড়ো গোছের মেয়ে মানুষ যদি রাতে আমার কাছে শোয় তবে বড় ভাল হয়, উনি তাতেও রাজী হয়ে চলে গেলেন তখন সন্ধ্যা।

কিন্তু সেই রাত্রেই গোটা দশেকের সময় আমার প্রসব হোল। একেবারে একা, পাশে যারা থাকে সব তেতলায় তখন ঘুমিয়ে। কণ্ঠ চিরে ফেল্লেও আমার ডাক সেখানে পৌঁছাবে না। কিন্তু ডাকব কি, কথা বলবারও তখন আমার ক্ষমতা নেই। অসহ্য বেদনায় অবসাদে, আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে আমি পড়ে রইলাম।

জ্ঞান হয়ে দেখলাম, দিন। সুরিঝি আমার ছেলেকে কোলে করে বসে আছে। ও পাশের বাড়ীর ঝি এককালে আমারও ছিল। সেই টানে রোজ একবার ভোরে এসে আমার খোঁজ করে যেত।

হেসে বললে ওমা আমি এসে দেখনু কি তুমি চোখ বুজে পড়ে আছ কত ডাকনু তা তোমার হুসই নেই। চোখের জলে

বিশ্ববিখ্যাতা নর্তকী টিলি লশ্ মেট্রোপলিটান ইণ্টার-ন্যাশন্যালের "গার্ডেন অফ্ আল্লা" রঙীন ছবিতে অপূর্ব্ব নৃত্যকলা প্রদর্শন কোর্‌বেন্।

মুখ ভেসে আছে। আর চুক্‌চুক করে ছেলে তোমার বুক…

তরলা থেমে গেল।

সুরথ নরম গলায় বল্‌লে, এ্যাঃ; ভারী মুস্কিলে পড়েছিলে ত?—হু চারিদিন যেতেও যখন দেওরের সেই বন্ধু এলেন না, ভয়ানক ভাবনায় পড়লাম। সুরিকে তাঁর ঠিকানায় পাঠিয়ে জানলাম পুলিশে তাকে ধরে নিয়ে গেছে। শুনতে মরণ যেন তার কালো বীভৎস মূর্ত্তি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। সেই আর কি, 'অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়।'

আর কোন উপায় না দেখে দেওরের কাছে সুরিকে দিয়ে এক চিটি পাঠালাম। ছেলে হবার খবর জানিয়ে লিখলাম, এ তোমার ছেলে, তার ভরণপোষনের ব্যবস্থা করতে আইনতঃ ধর্ম্মতঃ তুমিই বাধ্য।

ও উত্তরে জানাল ছেলে ওর বন্ধু হরিশেরও হতে পারে। এত শিক্ষিত হয়ে মানুষ যে এত নীচ হতে পারে, ভাবতে পারিনি। বিয়ের পর ও ভাল চাকরী পেয়েছে অনায়াসে। সারাদিন রাত কাঁদলাম। কিন্তু জীবন ভোর কাঁদলেও কোথা থেকেও ত একটা পয়সা আসবে না। শেষ সম্বল, গায়ের শেষ অলঙ্কারটি, হাতের শেষ দু'গাছি চুড়ি সুরিকে খুলে দিলাম। দিনের পর দিন নিজের অনশনে চললেও ক্ষুধায় ছেলের এতটুকু কান্না শুনলেও ত বুক জ্বলে ওঠে।

মাস দুই চলল কোন রকমে।

শেষে একদিন বাড়ীওয়ালা সমস্ত জিনিষ কেড়ে কুড়ে রাস্তায় বের করে দিল। আবার এক বস্ত্রে ঘরের বের হ'লাম। কলেজ স্কোয়ারের ফুটপাতের রেলিং ঘেঁসে সারাদিন অনাহারে মায়ে পোয়ে বসে বসে কাঁদলাম। কত হাজার হাজার লোক সামনে দিয়ে চলে গেল।

দু'টো কি তিনটে পয়সা বোধ হয় পেয়েছিলাম। আর কেউ একবার ডেকে জিজ্ঞেসও করলে না। সহরের লোক এমনি অসম্ভ উদাসীন স্বার্থপর—আমাকে কাঁদতে দেখে এক পানওয়ালী সে রাতে আমায় আশ্রয় দিল। প্রথম দু'চারদিন আমাকে ও আমার ছেলেকে সে খুবই আদর যত্ন করল। কিন্তু সে বেশ্যা। একদিন তার পাপ অভিলাষ সে আমাকে জানাল। আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করলাম। আমাদের খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে খুন হয়ে যাচ্ছে। উঃ, সে কি অবস্থা।

তরলা খানিক চুপ করে রইল। তারপর একটা ঢোক গিলে বললে কিন্তু কোথা যাব। ছেলেটা যদি না থাকত তা'লে হয়ত দুঃস্থ মেয়েদের আশ্রয়ের জন্য যে-সব জায়গা আছে তারই একটাতে উঠতাম গিয়ে। কিন্তু এই কলঙ্ক ঘাড়ে করে গিয়ে সেখানে দাঁড়াতে কিছুতেই মন সরল না। যদি ম্যাট্রিকটা পাশ হতাম তাহলেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতাম।

তারপর কেমন করে ধীরে ধীরে এ পঙ্কে যে ডুবে গেলাম—আবার তরলা খানিকটা চুপ করে রইল।

—কিন্তু যার জন্যে……ছেলেকে আমি বাঁচাতে পারিনি।

ওর চোখের দিগন্তে অশ্রুর আভাষ দেখা দিল। সুরথ মুখ দিয়ে কী রকম একটা শব্দ করে ওঠে। তারপর সবাই চুপ! ঘর একেবারে নীরব! সে-নিস্তব্ধতা বুঝি আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করা যায়!

একটা কাক ডেকে উঠল।

রাস্তায় জল দেবার শব্দ হচ্ছে।

সুরথ সুমিত্রার মাথাটি নেড়ে দিয়ে বল্‌লে, এই ওঠ। সুমিত্রা যেন গভীর ঘুমিয়েছে।

ভোরের চাঁদের মত ওর মলিন স্নিগ্ধ মুখটার দিকে খানিক চেয়ে সুরথ বল্‌লে, সুমি ওঠ ভোর হোল, এ-কণ্ঠ সে-সুরথের নয় স্ত্রীকে যে বেশ্যা পাড়ায় নিয়ে এসেছে।

ওরা এসে রাস্তায় দাঁড়াল।

আসবার সময় তরলার দিকে সুরথ একবার ফিরে চেয়েও দেখেনি।

ওর সঙ্কেতে একটা ট্যাক্সি এসে সামনে দাঁড়াল। তাতে উঠে বসে স্নিগ্ধ-কণ্ঠে সুরথ বল্‌লে এস। একটা বিদ্যুৎ চিরে গেল সুমিত্রার সজল চোখে।—তোমার সঙ্গে? তুমি, যে-তুমি আমায় বেশ্যার বাড়ী নিয়ে এসেছ! আমি তোমার স্ত্রী, এমন অপমান আমি—

অশ্রুবাষ্পে আবরুদ্ধ হয়ে গেল সুমিত্রার কণ্ঠ। টপ্‌টপ করে মুক্তার মালার মত চোখের জল গড়িয়ে পড়ল সেই ঘৃণিত পথে।

এই দৃশ্যে ট্যাক্সিতে বসে সুরথ যেন শরবিদ্ধ হতে লাগল। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে সুমিত্রার কাছে যেযে বল্‌লে, এবার আমার মাপ কর সুমিত্রা। জানত আমি চিরকাল গোঁয়ার, অশিক্ষিত, খেয়ালী; খেয়ালের বশে—তোমাকে ওই অবস্থায় দেখে, মাথায় রক্ত চন করে উঠল। জানি তুমি নির্দোষ। তবু ভাবলাম দেখাব পাপ কী ভীষণ।

—তুমি সরে যাও আমার কাছ থেকে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সুমিত্রা বল্‌লে, তরলার থেকে আমার নির্য্যাতন কম হয়নি। ওর সহায় কিছু ছিলনা, আমার আমি দাঁড়াব নিজের পায়ে…আমার বন্ধনও কিছু নেই।

বলে ও বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

সুরথের পা যেন আঠায় জড়িয়ে গেল সেই রাস্তায়। ভগ্ন কণ্ঠে বল্‌লে, সুমি শুনে যাও…

সুমিত্রা তখন ট্রামে উঠেছে। কণ্ডাক্টার ঘণ্টা টিপল, বাজল ঠন্‌ঠন্—চল্‌ল ট্রাম।

শূন্য দৃষ্টিতে সেদিকে একটু চেয়ে থেকেই সুরথ প্রাণপণে দৌড়াল ট্রামের দিকে।

———•———

পূজার আনন্দ

শ্রীফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

পূজা আসিয়াছে। বৎসরান্তে যেমন আসিয়া থাকে, এবারও তেমন করিয়াই আসিয়াছে। শুনা যায়, মা'র আগমনে বাঙ্গালা দেশে আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। অন্ততঃ একদল লোককে জোর করিয়া ঐ কথা ঘোষণা করিতে হয়। কিন্তু সত্যই কি মা আর বাঙ্গালা দেশে আসিয়া থাকেন? না, বাঙ্গালা তাঁর আগমনে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়?

যে আনন্দ দেখে দেখুক, যে আনন্দ উপভোগ করে করুক—কিন্তু আমরা, বাঙ্গালার দরিদ্র অধিবাসীবৃন্দ—তাহার কিছুই দেখিতে বা উপভোগ করিতে পাই না।

হাঁ—একদিন ছিল, যখন সত্যই মা বাঙ্গালা দেশে আসিতেন। তখন বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে মহাসমারোহে মায়ের পূজা হইত এবং যে বাড়ীতে পূজা হইত সে বাড়ীতে কয়দিন ধরিয়া দীয়তাং ভুজ্যতাম্ চলিত। গ্রামের ধনী, নির্ধন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলে তিনদিন মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইত। তখনও বাঙ্গালা দেশে তথাকথিত আভিজাত্য প্রবেশ করে নাই তখনও লোক বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত উপবাসে থাকিয়া পূজা বাড়ীতে যাইয়া দ্বিপ্রহরে মায়ের প্রসাদ ভক্ষণ সম্মানজনক কার্য্য বলিয়াই মনে করিত। সপরিবারে গৃহে অন্নাহার না করিয়া নিমন্ত্রণ বাটীতে যাইয়া আহার করা তখন পর্য্যন্ত লোক অগৌরবের কথা বলিয়া ভাবিতে শিখে নাই।

মহা সমারোহে পূজার কথা বলিয়াছি। সমারোহ অর্থে এখনকার মত চপ, কাট্‌লেট, কালিয়া, পোলাওএর দিন তখন ছিল না। লোক তখন নিমন্ত্রণ বাটীতে যাইয়া ভীমনাগের সন্দেশ, নবীন দাসের রসগোল্লা বা কৃষ্ণচন্দ্রের রসোমালাই খাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত না। তখন উত্তম চাউলের অন্ন, ঘণ্ট, শুক্তা, ডাল, ডালনা, মাছ, মাংস অম্ল প্রভৃতি দ্বারাই লোক নিজ নিজ উদর পূর্ণ করিত। গব্যদ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ সংযুক্ত চাউলের পরমান্নই উপাদেয় বস্তু ছিল। নারিকেল ও চিনির প্রস্তুত রসকরা তখন মিষ্টান্নের স্থান অধিকার করিয়াছিল। দধিকে জল বলিলেও চলিত, তাহাই তখন লোক সাগ্রহে গ্রহণ করিত। সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জিলাপি ও বঁদিয়ার ব্যবস্থা হইত—ইহাই যথেষ্ট এবং পর্য্যাপ্ত বলিয়া সকলে বিবেচনা করিত। তখনও আমাদের রন্ধনশালায় হিন্দুস্থানী বা উড়িয়া পাচক প্রবেশ করে নাই। আমাদেরই গৃহের মাতা, ভগিনী ও কন্যারা পরস্পরের গৃহে যাইয়া তিন দিন অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়া ব্যঞ্জনাদি পাক করিতেন। পুরুষগণ নিজেরাই অন্নপাক করিয়া লইতেন। কাহারও গৃহিনীর পক্ষে উত্তম ব্যঞ্জন রন্ধন করা তাহার পক্ষে গৌরবের কথাই ছিল।

এ দৃশ্য এখনও বাঙ্গালা দেশ হইতে চলিয়া যায় নাই—কোন কোন গ্রামে এখন পর্য্যন্ত সেই পুরাতন ভাবই প্রচলিত আছে। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত ও সভ্য ব্যক্তিরা আর দ্বিপ্রহরে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিতে যান না। সন্ধ্যায় বা অপরাহ্নে কোন প্রকারে যাইয়া সামান্য কিছু গ্রহণ করিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট যাঁহারা অসভ্য ও অভদ্র বলিয়া বিবেচিত, তাঁহারাই দ্বিপ্রহরে ২ বা ৩ মাইল পথ পুত্রকন্যা সহ রৌদ্রে গমন করিয়া নিমন্ত্রণ বাড়ীতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

মায়ের পূজা কি আর আছে? কলিকাতার মত সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে প্রায়ই বারোয়ারী বা সার্ব্বজনীন দুর্গাপূজাই লোকের দেখিবার জিনিষ হইয়াছে। কোন ধনীর গৃহে আর পূজা হয় না। কাজেই পূজার প্রসাদ গ্রহণের নিমন্ত্রণের বালাই আর নাই বলিলেই হয়। বারোয়ারী বা সার্ব্বজনীন পূজার কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। সার্ব্বজনীন পূজায় ঢাক ঢোল বাজে, পুরোহিত পূজা করেন—সকল ব্যবস্থাই প্রায় হয়—কিন্তু প্রসাদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ নাই। যেখানে বারোয়ারী পূজার প্রাচুর্য্য আছে সেখানে খুব জোর সরায় প্রসাদ সাজাইয়া তাহা বাড়ী বাড়ী বিতরণ করা হয়। লোক কিরূপ শ্রদ্ধার সহিত সেই প্রসাদ গ্রহণ করে, তাহা আর প্রকাশ করিয়া লাভ নাই। অধিকাংশ স্থলেই ফল মূল, মিঠাই প্রভৃতি বিতরিত হয়। প্রসাদ বলিয়া সাধারণতঃ আমরা যে ভাত, ডাল, তরকারী বুঝি, তাহাও বিতরিত হয় না।

আমাদের পূজার আনন্দ গেল কোথায়? মুখে আমরা যতই সাম্যবাদ, শ্রমিক তন্ত্রবাদ কৃষক তন্ত্রবাদ প্রভৃতির বুলি আওড়াই না কেন প্রকৃতপক্ষে আমরা দিন দিন স্ব-তন্ত্রবাদীই হইয়া পড়িতেছি। আজ যাঁহারা কলিকাতা সহরে বড় বড় বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া ধনী বলিয়া পরিচিত হইয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই যদি আমরা অনুসন্ধান করি, তবে আমরা কি জানিতে পারিব? প্রত্যেকেরই গ্রাম্য বাসস্থান ছিল এবং প্রত্যেকের গৃহেই পিতামহ, প্রপিতামহ বা বৃদ্ধ-প্রপিতামহের আমলে সমারোহের সহিতই দুর্গাপূজা হইত। কিন্তু আজ আর হয় না কেন?

আমরা সকলেই সহরমুখী হইয়াছি।

পূজার সময় থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া অর্থব্যয় করি ; সস্তা ভাড়ায় পুরী, কাশী, শিলং ডিহিরী বা দেওঘর যাইয়া অর্থের অপব্যয় করি—কিন্তু কেহই গ্রামে গমন করি না। গ্রামের বাড়ীতে যে দুর্গোৎসব হয়, তাহার ভার পড়ে দরিদ্রতম জ্ঞাতির উপর। তিনি কয়েক বৎসর অতি কষ্টে পূজা সম্পন্ন করিয়া শেষে তিনিও পূজার পাট উঠাইয়া দিয়া আমাদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিতে বাধ্য হন। ইহা আমাদের জাতিগত চরিত্রের লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া এই পথ হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত হইতে হইবে। ধনীরা যদি পূজার সময় মসুরী, শিলং, ওয়ালটিয়ারে না যাইয়া দেশের বাড়ীতে যাইয়া সমারোহের সহিত দুর্গাপূজায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে গ্রাম কি আর জনহীন হয়—না বাড়ীর অঙ্গন জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া থাকে ? তিন দিনের পূজা বটে—কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে পূজার এক পক্ষ কাল পূর্ব্ব হইতে পূজার আয়োজন না করিলে দুর্গাপূজা করা সম্ভব হয় না। সে জন্য বহু লোকজনের প্রয়োজন। গ্রামের লোক সানন্দে ও সাগ্রহে পূজাবাড়ীতে যাইয়া কাজ করিয়া থাকে। পূজার সময় গৃহকর্ত্তা সকলকে একখানি করিয়া নববস্ত্র প্রদান করিয়া এবং সকলকে কয়দিন ধরিয়া নিজগৃহে খাওয়াইয়াই সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। গ্রামের দরিদ্র কৃষক মজুরগণও ঐ একমাত্র নূতন কাপড়ের লোভে ও পূজার তিন দিন মায়ের প্রসাদ পাইবার লোভে কয়দিন ধরিয়া পূজাবাড়ীতে কাজ করিয়া থাকে। ইহাই ত বাঙ্গালার গ্রামের আদর্শ এবং সেই আদর্শ লইয়াই ত বাঙ্গালী এতদিন সুখে ও স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিয়া আসিয়াছে। আজ আপনি যত ধনই উপার্জ্জন করুন না কেন, আপনার অভাব আর কিছুতেই মিটিবে না। অভাবের পরিমাণ বাড়াইলে অভাব যে দামোদরের উদরের ন্যায়ই বর্দ্ধিত হয়।

বাঙ্গালী জাতির এখন কর্ত্তব্য কি ? পূজার এই অবকাশে সকলকে ভাবিতে হইবে পাশ্চাত্য সভ্যতার অসার চাকচিক্য দেখিয়া আমরা যে পতঙ্গের মত দলে দলে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়া গিয়া পুড়িয়া মরিতেছি—ইহাই কি চিরদিন করা চলিবে ? না আবার আমাদের স্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইবে। এখনও বাঙ্গালার গ্রামগুলি লুপ্ত হয় নাই। ধনী ও দরিদ্র সকলে যদি একযোগে গ্রামগুলির প্রতি আকৃষ্ট হই—তবে গ্রামগুলির লুপ্তশ্রী ফিরিতে বিলম্ব হইবে না। আনন্দময়ীর আগমনের আনন্দ শুধু নিজেরা উপভোগ করিব না—গ্রামের সকলকে লইয়া সপ্তাহ কাল ধরিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়া নিজেরা ধন্য হইব এবং গ্রামস্থ সকলকে ধন্য করিব। এই আদর্শ লইয়াই ত আমাদের পিতৃপুরুষগণ গ্রামে বাস করিয়া মহামায়ার অর্চ্চনা করিয়া গিয়াছেন। আমরাই বা কেন, অযথা সে পথ ত্যাগ করিয়া দুঃখময় পথ অবলম্বন করিব ?

আমরা সকলেই ব্যক্তিগত ভাবে জানি, আমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি পূজার সময় দেশভ্রমণে যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা যদি নিজগ্রামে ও নিজগৃহে দুর্গাপূজা করিয়া ব্যয় করেন, তবে তাঁহাদের দ্বারা কত লোক উপকৃত হয়, কত দরিদ্রের বালকবালিকা মহাপূজার সময় নববস্ত্র লাভ করিয়া মহানন্দ লাভ করে—কত গ্রাম্য জরাজীর্ণ গৃহের সংস্কার সাধিত হয় ও কত লোক তিন দিন দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করে। দেশে ত নানাদিক দিয়া নানাপ্রকার আন্দোলন চলিতেছে—দেখিতে দেখিতে বারোয়ারী বা সার্ব্বজনীন পূজার সংখ্যা দ্রুত করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে—সেই সঙ্গে কি আমরা আমাদের আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদিগকে পূজার সময় দেশভ্রমণরূপ অপব্যয় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারি না ! পূজার আনন্দ থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া উপভোগ করা যায় না—পূজার আনন্দ শিলং বা মসুরী পাহাড়ে আরোহণ করিয়াও পাওয়া যায় না—সেই অপার্থিব আনন্দ লাভ করিতে হইলে আমাদের গ্রামগৃহে ফিরিয়া গিয়া পূজামণ্ডপে বসিয়াই তাহা পাইতে হইবে—তাহা পাইবার অন্য কোন উপায়ই নাই।

গল্প-রচনার উপাদান

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া শত চেষ্টা করা সত্ত্বেও একটি লাইন লিখিতে পারি নাই। সাজ-সরঞ্জাম লইয়া লিখিতে বসিলেই সংসারের অসংখ্য অভাব-অভিযোগ কোন সুযোগে মনের মুকুরে প্রকট হইয়া ওঠে বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার সমাধান করিতে পারি নাই। আজকাল গৃহিণী উঠিতে-বসিতে অক্ষমতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া যে-সমস্ত বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সহের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। একটা কিছু না করিলে আর চলে না। যা'হোক একটা কিছু—মুটেগিরি, মুটেগিরিই সই।

হায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রি। তোমার যে এতদূর অধঃপতন স্বচক্ষে দেখিব এ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই। ছেলে-বেলায় পড়িয়াছিলাম—"লেখাপড়া শিখে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।" গাড়ি-ঘোড়া চড়িবার আশা করি নাই, করিয়া-ছিলাম কোন রকমে দু'বেলা দু'মুঠো সংস্থান করিতে পারিলেই নিজেকে ধন্য বলিয়া মনে করিব। যিনিই কথা কয়টি লিখিয়া থাকুন তাহা কত বড় মিথ্যা-প্রচার অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের ফলে সেটুকু প্রকাশ করিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ হইতেছে না। অধীত পুস্তকের জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করিয়া মনের আয়তন হয়তো বাড়িয়াছে, চুল চিরিয়া তর্ক করিবার ক্ষমতা হয়তো মিলিয়াছে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের সরম-সঙ্কোচ, গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী নিত্য প্রয়ো-জনীয় রসদ-আহরণ করিবার অভিনব পন্থার হদিস মিলিল কই? একদিককার অভাব দূর করিতে যাইয়া আর একদিক যে আপনা হইতেই অনাবৃত হইয়া পড়ে।......

বিকাল বেলায় রাস্তা অতিক্রম করিয়া যাইতেছি পিছন হইতে কে যেন ডাকিল: শুনচেন্ দাদা?—

পশ্চাৎ ফিরিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। একটু দাঁড়াইয়া কী করিব ভাবিতেছি এমন সময় অপরিচিত একটি লোক আমার কাছে আসিয়া বলিল: আপনার নাম পরমেশ মিত্র?

—আজ্ঞে হাঁ। উত্তর দিয়া মনে মনে ভাবিলাম ভদ্রলোকটি নিশ্চয় কোন পত্রিকার সম্পাদক। কলিকাতার মত মহানগরীতে এত লোক থাকিতে আমার নাম মনে করিয়া রাখার উপস্থিত আর কোন কারণ মনে আসিল না। আশাও হইল অর্থপ্রাপ্তির কিছু সুযোগ হয়তো মিলিবে। বলিলাম: আপনাকে তো ঠিক চিন্তে পারচি না। এর আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

অপরিচিত ভদ্রলোকটি সোৎসাহে বলিল: আমার গতিবিধি সর্ব্বত্র। বিশ্ববাসীর উপকার করাই আমার পেশা।

তর্ক করিলাম না। সম্পাদকের অবাধ গতিবিধি সত্যই তো সর্ব্বত্র। লেখার বিনিময়ে অর্থ-প্রদান করিয়া তাঁহারা মানুষের অশেষ কল্যাণ করিতেছেন ইহাতেও কোনরূপ সন্দেহ নাই। তবুও জিজ্ঞাসা করিলাম: আমাকে আপনার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাস করতে পারি কি?

—নিশ্চয়, একশোবার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কওয়ার চেয়ে চলুন ওই সামনের চায়ের দোকানে। ধীরে সুস্থে সব কথা হবে'খন।

চায়ের দোকানে ঢুকিয়া দু'কাপ চা দিবার কথা বলিয়া একটু অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন জায়গায় আসিয়া বসিলাম। চায়ে চুমুক দিয়া ভদ্রলোকটি বলিল: আপনি ভারী চমৎকার লেখেন, মশাই। ছেলেবেলা থেকে আপনার লেখা আমি পড়চি।

এইবার ভদ্রলোকটির আপাদমস্তক বেশ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া লইলাম। ভদ্রলোকটির বয়স অনুমান চল্লিশের কিছু উপর হইবে। ভদ্রলোকটি এতক্ষণ অভিনয় করিতেছিল মন্দ নয়। যত গণ্ডগোল বাঁধাইয়া দিল "ছেলেবেলা হইতে আপনার লেখা পড়িতেছি" এই কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া। ভদ্রলোকটি আমাকে ডাকিয়া আনিয়া বিদ্রূপ করিতেছেন না তো? অল্পবয়স্ক ব্যক্তিকে এরূপ মাত্রাজ্ঞানহীন স্তুতিবাদ করার কী যে অন্তর্নিহিত অর্থ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সন্দেহ হইল নিশ্চয় কোন মতলব লইয়া ভদ্রলোকটি আমার পিছনে ঘুরিতেছেন। একটু বিরক্ত হইয়াই বলিলাম: কী জন্যে আপনার শুভাগমন চটপট করে বলে ফেলুন দিকি? আমার আবার অন্য দরকার আছে।

—সত্যি বলচি কয়েক বছরের মধ্যে আপনি বেশ নাম করে ফেলেচেন। লোক-মুখে শুনতে পাই আপনার অর্থ-সমাগমও বেশ ভালোই হচ্চে।

—সে তো সুখবর। কিন্তু আপনার তাতে কী সুবিধে?

—আমার সুবিধের কথা আমি মোটেই ভাবচি না, ভাবচি আপনার। মানুষের ঘরাবাঁচার কথা কেউ বলতে, পারে না। দুর্দিনের জন্যে আপনার কিছু—

ভদ্রলোকটির মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলাম: সঞ্চয় করবার মত কোন সংস্থানই আমার নেই। আপনি বুঝি ইন্সিয়োরের দালাল? এ-কথাটা আগে বল্‌লেই এক কথায় সমস্ত জিনিষের নিষ্পত্তি হয়ে যেতো বলিয়া ভদ্রলোকটিকে কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া চা-ওলার পয়সা মিটাইয়া রাস্তায় নামিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার মহানগরীর পথ-ঘাট গ্যাসের আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সারাদিনের পরিশ্রম-ক্লান্ত দেহ লইয়া গড্ডালিকা-প্রবাহের ন্যায় মন্থর গতিতে কেরাণীর দল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। সামর্থ্য বলিয়া কোন জিনিষ তাহাদের নাই, জীবনের উচ্ছ্বসিত স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণধারার উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিবসের অভ্যাসের ফলে তাহারা তাহাদের নীরস বিলুপ্ত-প্রায় দেহটিকে লইয়া মহানগরীর বিস্তৃত পথ অতিক্রম করে।

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম তাহা স্মরণ হয় না। বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম রাতে গৃহে ফিরিয়া যেমন করিয়া হউক একটা গল্প শেষ করিতে হইবে। কারণ যে-কয়টা টাকা গল্প-লেখার পারিশ্রমিক হিসাবে পাইয়াছিলাম তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়ও ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং কল্পনাও চিন্তাশক্তির সাহায্যে ইহার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে একটা বাস্তবরূপ দিতে ত্রুটি করি নাই। মাঝখান হইতে এই অপরিচিত ব্যক্তির আকস্মিক আবির্ভাব এবং অবান্তর কথাবার্ত্তায় আমার সকল্পিত গল্পের ঘটনাপুঞ্জে ছিড়িয়া খুঁড়িয়া একাকার হইয়া গেল। মন শূন্যতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, চিন্তাশক্তিতে হঠাৎ আঘাত লাগায় কল্পনাশক্তিও ক্রমশঃ বেঁকিয়া দাঁড়াইল এবং মস্তিষ্কের সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী কেমন যেন অবশ হইয়া আসিল। গল্প লিখিবার চেষ্টা উপস্থিত ত্যাগ করিতেই অকস্মাৎ মনের মধ্যে একটি কথা উঁকি মারিয়া উঠিল: সাধারণ মানুষের জীবন-ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণই গল্প বা উপন্যাস রচনার শ্রেষ্ট মাল মসলা। যে নিখুঁতভাবে বাস্তব চিত্র অঙ্কন করিতে পারিয়াছে তাহার গল্প তত উপভোগ্য হইয়াছে। গত দশ মিনিট ধরিয়া এই কথাকয়টি আমার কাণের কাছে অস্পষ্ট গুঞ্জন করিয়া ফিরিয়াছে, যদিও কোন নূতন তথ্য ইহা হইতে আবিষ্কার করিতে পারি নাই। একবার মনে হইল এই কথাকয়টির উপর নির্ভর করিয়া গল্প লিখিলে কেমন হয়? সাধারণ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার জীবনের ঘটনাসমূহ খুটিয়া খুটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেই চলিবে। নিজের সংসারের কথা লিখিতে আর ইচ্ছা হয় না। যাহা জানি তাহা বহু গল্পের মধ্যে আভাষ-ইঙ্গিতে বহুবার প্রকাশ করিয়াছি, বলিবার মত আর কিছু বাকি রাখি নাই। এই মুহূর্ত্তেই আমাকে একটি সাধারণ লোকের খোঁজ করিতে হইবে—সম্পূর্ণ অপরিচিত সাধারণ লোক। অর্থের জন্য তাহার কাছে হাত পাতিব না, শুধু তাহার জীবনের কাহিনীটুকু শুনিবার দাবী করিব মাত্র। ইহার বিনিময়ে মান-সম্ভ্রম যদি ক্ষুণ্ণ হয় তাহাও শ্রেয়। মানুষের জীবনের কাহিনী শুনিবার আশায় পথে পথে আজ যামিনী যাপন করিব।...

গভীর রজনী। নিস্তব্ধতাকে মন্থন করিয়া একটা ভয়াবহ শূন্যতা মহানগরীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। জনসমুদ্রের বিপুল বাহিনীর সে হুট্-কোলাহল আর কর্ণগোচর হয় না। কচিৎ দু'একটি লোক নিস্তব্ধ নগরীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া অনিচ্ছাকৃত অপরাধে সঙ্কুচিত হইয়া দ্রুত পদসঞ্চালনে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। ট্রাম-চলাচল বহু পূর্ব্বেই থামিয়া গিয়াছে, নৈশ গগণ বিদীর্ণ করিয়া মোটর বাস্ পথিকের মনে একটা শঙ্কা জাগাইয়া চোখের পলকে অদৃশ্য হইয়া যায়।

সাধারণ লোকের সাক্ষাৎ-লাভের আশায় মহানগরীর বিস্তৃত পথ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া ফিরিয়াছি। অবশেষে হাজরা রোডের মোড়ের মাথায় ব্যর্থ অন্বেষণে হতাশ হইয়া দাঁড়াইলাম। নিকটবর্ত্তী একটি গ্যাস-পোষ্টের কাছে একটি মধ্যবয়স্ক লোককে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মনে আশার সঞ্চার হইল কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে তাহাকে একটি চলন্ত ট্যাক্সিতে উঠিতে দেখিয়া মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। মিনিট পনেরো বাদে দ্বিতীয় ব্যক্তিটির আবির্ভাব হইল এবং সে আমার পাশ দিয়া দ্রুত অতিক্রম করিয়া গেল। তাহার হাবভাব এবং মুখের অস্বাভাবিক বিকৃত চেহারা দেখিয়া কোন প্রশ্ন করিতে সাহস হইল না। এবং তাহাকে সাধারণ লোকের পর্য্যায় ফেলিতে মন যেন কেমন সঙ্কোচবোধ করিতেছিল।

ইহাদের কথা চিন্তা করিতে করিতে মনের মধ্যে যে কিরূপ অস্বস্তিবোধ করিতেছিলাম তাহার বিশ্লেষণ করিবার সামর্থ্যও তখন আমার ছিল না। গভীর রজনীতে একজন তস্করের মত সুযোগের আশায় ওৎপাতিয়া থাকিয়া অপর একজন অপরিচিত ব্যক্তির জীবনের জীর্ণ-ইতিহাসের আবৃত্তি শুনিবার সে-অপরিসীম আগ্রহ ও

বিপুল ধৈর্য্য সঞ্চয় করিয়া রাখা যে কত বড় দুরূহ বিড়ম্বনা তাহা যাহারা ভুক্তভোগী নহে তাহাদের কেমন করিয়া বুঝাই। আর এমনই ভাগ্য-বিপর্য্যয় যাহাদের সাক্ষাৎ পাইলাম—কোন প্রয়োজনেই তাহারা আসিবে না।

আর একটু অগ্রসর হইয়া গ্যাস্-পোষ্টের ধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। রাস্তায় জনযানবের নামগন্ধ নাই। বাতাস গুমরিয়া মরিতেছে এবং মাঝে মাঝে দূরে কচিৎ দু'একটি মানবের অস্পষ্ট ছায়া ছায়াবাজীর ন্যায় দ্রুত মিলাইয়া যাইতেছে। অবশেষে মানুষের একটি অস্পষ্ট ছায়া আমার গ্যাস্-পোষ্টের নিকটবর্ত্তী আসিতেই আলোতে তাহার মুখমণ্ডল দেখিয়াই আনন্দে অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম: এইরূপ একটি লোককে আমার একান্ত প্রয়োজন। অপরিচিত লোকটির বয়স যে কত তাহা জোর করিয়া বলা কঠিন—২২ কিংবা ৩২ একটা কিছু হইবে। গ্যাসের আলোকে তাহার বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বা নিষ্প্রভতা কিছুই ধরা যায় না। চোখে পড়িল শুধু তাহার আয়ত চক্ষুদুইটির প্রশান্ত গভীরতা।

আমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেই পশ্চাৎ হইতে তাহার জামার কলারটি চাপিয়া ধরিলাম। অকস্মাৎ বাধা পাইয়া লোকটি ভয়ে এবং আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল এবং নিজেকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দুই হস্ত প্রসারিত করিল। তাহাকে অভয়-বাণী শুনাইবার অভিপ্রায়ে মোলায়েম-কণ্ঠে বলিলাম: ভয় পাবেন না আপনি। খুন, চুরি, ভিক্ষা কোনটাই আমার পেশা নয়। একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলাম: একরকম ভিক্ষুকই বটে, কিন্তু অর্থের ওপর আমার কোন লোভ নেই। একটা জিনিষ আপনার কাছে শুধু জানতে চাই—শুধু একটা জিনিষ—আপনার জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস।

অপরিচিত ব্যক্তির চক্ষুদুইটি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল এবং চোখের পলকে চুপ্‌সা সরিয়া দাঁড়াইল। বুঝিতে পারিলাম লোকটি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া অনুমান করিয়াছে। জনবিরল পথে নিশীত রাতে হঠাৎ এইরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন করিলে লোকে প্রশ্নকারীকে পাগল বলিয়া ভ্রম করিবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি। তবুও অতি বিনীতকণ্ঠে বলিলাম: আপনি যা ভাবচেন প্রকৃতপক্ষে আমি তা নই। আমি পাগল নই। আমি একজন গল্প-লেখক। কালকেই একটি পত্রিকার সম্পাদককে একটা লেখা দেবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েচি। কাল যদি না দিতে পারি আমার সংসারের কয়টি প্রাণী না খেতে পেয়ে মারা যাবে। শুধু আপনার জীবনের ঘটনাগুলো আমায় জানান এবং সেইগুলো হবে আমার গল্প রচনার উপাদান। সত্যি বলচি আপনাকেই আমার একান্ত প্রয়োজন—আপনার জীবনের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস আপনার সরল স্বীকারোক্তি। এ সময়ে অন্ততঃ আমাকে নিরাশ করবেন না।

বুঝিতে পারিলাম লোকটির সে সন্ত্রস্তভাব কাটিয়া গিয়াছে। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল: আপনাকে জানাবার মত আমার কিছু নেই। আমার জীবনের ঘটনাগুলো অতি সাধারণ, অতি তুচ্ছ।

আশান্বিত হইয়া বলিলাম: তা হোক, ওইটুকু আমি শুনতে চাই।

—বেশ শুনুন বলিয়া অপরিচিত ব্যক্তিটি যাহা বলিল তাহাই হুবহু নিম্নে প্রদত্ত হইল: পঁইত্রিশ বছর আগে আমি ধরণীর প্রথম আলো দেখি। বাবার একটা ব্যবসা ছিল সেটা আমি যখন আই, এ, পড়ি নষ্ট হয়ে যায়। বাপ-মায়ের আমিই একমাত্র সন্তান। ছ'বছর বয়সে আমি সর্ব্বপ্রথম স্কুলে যাই। কুড়ি বছর বয়সে বি, এ, পাশ করে রেলওয়েতে চাকরি নিই। দশটা পাঁচটা আফিস করি। দশ বছর চাকরি করে মাইনে দাঁড়িয়েচে একশো। পঞ্চান্ন বছরে যখন রিটায়ার করবো প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের হাজার দশেক টাকা নিয়ে ঘরে বসবো এইটুকু যা আশা আছে।

প্রশ্ন করিলাম: বিয়ে করেন নি ?

—হাঁ, বিয়ে একটা হয়েছে বটে—বলবার মত নয়। রোমান্সের কোন গন্ধ নেই। বাবা মেয়ে দেখে এসে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তারপর হ বাবা মারা যান।

—ছেলেপিলে ?

—দুটি—একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলেটির বয়স বছর নয়েক। ইচ্ছে আছে বড় হলে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবো। মেয়েটি ছ'বছরের, বাড়িতেই পড়ে। সংসারে কোন অশান্তি নেই। উচ্চ আশা-আকাঙ্খাকে নিজের অবস্থা অনুযায়ী খর্ব্ব করে এনেচি, সকাল সাতটায় উঠি, চা খেয়ে বাজারে বেরুই। তারপর ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসাই। অফিসের ফেরত কোথাও দাঁড়াই না, সটান বাড়ি ফিরি। আজকে এক আত্মীয়ের হঠাৎ বাড়াবাড়ি অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলুম ফিরতে তাই রাত হয়ে গেল।

ভদ্রলোকটির জীবনের আনুপূর্ব্বিক সাধারণ ঘটনাগুলি স্বকর্ণে শুনিয়া সত্যসত্যই নিরাশ হইতে হইল। দুঃখ ও ক্ষোভে চক্ষু দিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। শুধু এইটুকু শুনিবার আশায় নিশীথ নগরীর জনবিরল পথ কত আগ্রহে অতিক্রম করিয়াছি, পথ-শ্রমজনিত সকল ক্লেশ তুচ্ছ করিয়াছি, কত উদ্বেগপূর্ণ মুহূর্ত্ত কী করিয়া যে অতিবাহিত হইয়াছে—ইহা স্মরণ করিয়া নিজের হটকারিতায় হাত কামড়াইয়া মরিতে ইচ্ছা হইল! বিংশ শতাব্দীর সাধারণ মানুষের
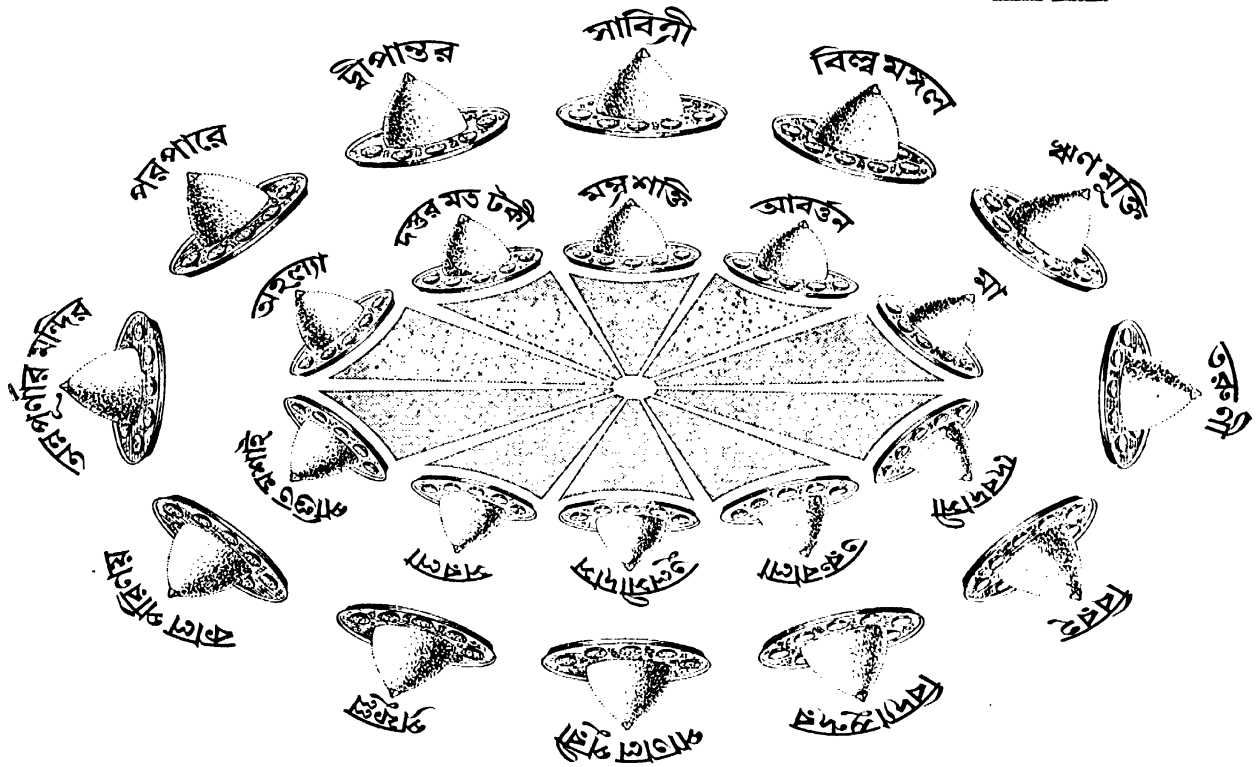
ইহাই কি তবে তাহার জীবন যাত্রার সত্য পরিচয়? সুখ-কল্পনা, ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-বৈচিত্র্য, অসন্তোষ পৃথিবী হইতে চিরতরে তিরহিত হইয়া গেল নাকি? মনে হইল এরূপ মানুষের জীবন কেমন করিয়া সম্ভব? কেমন করিয়া স্বীকার করিয়া লই এই ব্যক্তির উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, নিরাশায় মুহ্যমান হইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলাম: আপনার জীবনে আর কোন ঘটনা ঘটেনি? আর একবার ভাল করে ভেবে দেখুন। আপনার জীবনের ওপর কারুর কোন আক্রোশ নেই? আপনার স্ত্রী আপনাকে কখনও প্রতারণা করেনি? কিংবা আপনার আফিসের কোন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী আপনার উন্নতিতে ঈর্ষাপরবশ হয়ে কোন কিছু—

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া লোকটি বলিল: আমার জীবনে ওর কোনটাই ঘটে নি। আমার জীবনের ধারা শান্ত, সমতালে আবর্ত্তিত। অতি বড় দুঃখ কিংবা আনন্দের উচ্ছ্বসিত মদির স্রোত কোনটাই আমার জীবন-আকাশে দেখা দেয় নি।

—সত্যি করে বলুন আমি যে বিশ্বাস করতে পারচি না।

এইবার লোকটি বেশ বিরক্ত হইয়াই বলিল: সত্যিই তাই, আজ রাত পর্য্যন্ত কোন অঘটনই আমার জীবনে ঘটে নি। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতই আমার জীবনে প্রথম বিস্ময়, প্রথম ব্যতিক্রম। যদি কিছু লিখতে হয় তো ওই সম্বন্ধেই লিখে দেবেন বলিয়া লোকটি চলিয়া গেল।

* * *

মোহাবিষ্টের ন্যায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম তাহা স্মরণ নাই এবং সে রাত্রে কেমন করিয়াই বা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম তাহাও ভুলিয়া গিয়াছি। এই ঘটনার পর সাধারণ লোকের জীবন-যাত্রার উপর কোনরূপ বিদ্রূপ বা কটাক্ষপাত করিতে কেমন যেন সঙ্কোচ আসে।

———

আত্মহত্যা

শ্রীসুশীল রায়

প্রতিমা ওপরের ঘরে ব'সে চিঠি লিখছে। বাবার কাছে, দাদার কাছে, মা-র কাছে, ছোটো-বোন টুনির কাছে,—সবার কাছে জনে জনে সে চিঠি লিখছে। লিখছে, জীবনে যদি সে মনের ভুলেও কাউকে কোনদিন কোনো আঘাত দিয়ে থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে তাকে যেন ক্ষমা করা হয়!—আর আজ এই-যে সে একটি সঙ্কল্প পালনের জন্যে বদ্ধপরিকর হ'য়েছে, তার জন্যে তাকে যেন করা হয় মার্জ্জনা! এ তার নাকি না হ'লে উপায় নেই, হ'তেই হবে; কেন হ'তে হ'বে তার জবাব দেবার মতো ভাষা সে আপাততঃ পাচ্ছেনা। তবে, আজ সে কেন এ-সঙ্কল্পবদ্ধ হ'লো, তা সকলেই নিশ্চয় বুঝেছে, প্রতিমা তা আর খুলেই-বা কি ব'লবে! কিন্তু এমন নাকি হ'তোনা; অযথা তার ঘাড়ে অত বড়ো অপবাদ যে-পৃথিবীতে দিয়ে থাকে, সে-পৃথিবীর নিঃশ্বাস তার কাছে বিষাক্ত, সেখানে থাকতে সে নাকি ইচ্ছুক নয়, তাই তার মহাযাত্রা! রাত্র এখন বারোটা বেজে গেছে। আর ঘণ্টা দু-এর মধ্যেই—প্রতিমা আতঙ্কে পাংশু হ'য়ে উঠলো! অ্যাঁ, আর মাত্র দু-ঘণ্টা? তার সমস্ত শরীরের মধ্যে রক্তচলাচল অকস্মাৎ যেন বন্ধ হ'য়ে গেলো! সে কি? মোটে দু-ঘণ্টা? দু-ঘণ্টায় তার এতো কাজ হবে? এখনো যে অনেক কাজ তার করার আছে! চিঠি যে সবার কাছে এখনো লেখা হ'লোনা! এখনো যে সে পরিপাটি-রূপে তৈরী হ'য়ে নিতে পারেনি! হঠাৎ এখনি যদি অনুপম এসে শিষ দেয়! নাঃ, বড় মুস্কিল হ'লো প্রতিমার, বড্ড মুস্কিল হ'লো! আগের দিনের চিঠিপত্র, গোপনীয় ডায়রি, কোথায় যে কি প'ড়ে আছে, তার ঠিক নেই! সব তো তাকে সংগ্রহ ক'রে বিনষ্ট ক'রে ফেলতে হবে! নইলে—নইলে—প্রতিমা ব্যাকুল হ'য়ে চারিদিক তাকাতে লাগলো—নইলে সবাই তাকে পরিপূর্ণরূপে জেনে ফেলবে, জেনে ফেলবে তার নানাবিধ গুপ্ত তথ্য, তার নিজস্ব গোপন জীবন! প্রতিমা দ্রুত হাতে চিঠি লিখে ফেলতে আরম্ভ করলো! উঃ, ঘড়ির দিকে সে-যেন তাকাতে পারেনা, এত নিষ্ঠুর দ্রুততায় ঘড়ি চ'লতে এর আগে কোনদিন তো সে দেখেনি!

ঠিক। অনুপম এসে গেছে, রাস্তায় সে শিষ শুনতে পেলো যেন! প্রতিমা উঠে জানলার কাছে গেলো, মাথা নিচু ক'রে তাকালো রাস্তায়! চারিদিকে সে তাকালো কিন্তু কই? অনুপম কোথায়? তবে কি এ মস্তিষ্ক বিভ্রম?

প্রতিমা ফিরে এলো। চেয়ারটি নিঃশব্দে সরিয়ে নিয়ে সে ব'সলো! আত্মহত্যা, আজ সে আত্মহত্যা করবে! শুধু সে একা নয়, অনুপমও থাকবে তার সঙ্গে! দু-জনেই একসঙ্গে যখন লোক চোক্ষ হীন হ'য়েছে একসঙ্গেই তাহ'লে তারা—

প্রতিমা আবার উঠে জানলার কাছে গেলো। রাস্তায় বৃষ্টি আরম্ভ হ'য়েছে। পীচএর রাস্তা হাল্‌কা সবুজ গ্যাসের আলোয় উজ্জ্বল কৃষ্ণতায় ঝলমল করছে! চমৎকার! চমৎকার রাত্রি আজ! এমন মধুর রাত্রে অনুপমের সাথে পাশাপাশি ব'সে কতকথা বলায় কত-যে আনন্দ, তা প্রতিমা গুণে উঠতে পারছেনা! কিন্তু, প্রতিমা নিঃশ্বাস ফেললো, কিন্তু সে-সব কথা ভুলে থাকাই

ভালো! আজ অনুপমের সাথে সে একসঙ্গে আত্মহত্যা ক'রে সকলকে জানিয়ে যাবে—বৃথা অপবাদ দেওয়ার পরিণাম কত নিদারুণ!

প্রতিমা ফিরে এলো! চিঠি লেখা সে কোনো-গতিকে শেষ করলো। চিঠিগুলো আশাতীত রকমের সংক্ষিপ্ত হ'য়ে গেলো কেমন যেন, বলার কথা সব প্রতিমা কেন জানি ভুলে যাচ্ছে।

চিঠি লেখা সাঙ্গ ক'রে সে দেরাজ টেনে তার ভেতর থেকে তার গোপনীয় চিঠিপত্র বেছে বের ক'রে নিলো। যাক নিষ্কৃতি! এখন অনুপম এলেই হয়। প্রতিমা ঘড়ির দিকে তাকাতেই ঘড়ি ঢং ক'রে একটা বেজে উঠলো। প্রতিমার বুকের ভেতরেও অমনি দারুণ ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো! তার সর্বাঙ্গে শির-শির ক'রে শীত করে উঠলো ভয়ানক!

জানলা দিয়ে বাইরে অনুভব ক'রে দেখলো বৃষ্টি থেমে গেছে। একটার সময়ই তো অনুপমের আসার কথা! তবে সে এলোনা কেন? তবে কি সে রাজি নয়, সে কি প্রতিমার এই চরম যুক্তি মেনে নেয়নি? সে যে কাল চিঠি লিখেছে তা কি সে পড়ে দেখেনি!

অনুপমের ওপর প্রতিমার ভয়ঙ্কর রাগ হ'লো। এত রাগ হ'লো তা বলবার নয়। মিছিমিছি তাকে প্রতিমার সঙ্গে জড়িয়ে এই-যে কুৎসা দিকে দিকে রাষ্ট্র হ'য়েছে, এ-তে কি অনুপম ব্যথিত নয়? প্রতিমা অনেক ভেবেচিন্তে বুদ্ধি ঠিক করলো, ঠিক করলো—তারা মরবে! সেই কথা জানালো অনুপমকে, আসতে ব'ললো রাত একটা নাগাদ, তবু সে আসতে পারলো না? মৃত্যুকে তার এত ভয়! প্রতিমা একাই মরবে, যা থাকে বরাতে! আরো কিছুক্ষণ সে অপেক্ষা করবে অনুপমের জন্যে যদি তখনও সে না আসে তা হ'লে সে একাই, হ্যাঁ, একাই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে।

জানলার কাছে প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে নীলাভ-বাতি টিমটিম ক'রে জ্বলছে! শাদা আলো প্রতিমা সহ্য করতে পারছেনা ব'লেই নীল-বাল্‌ব জ্বেলে দিয়েছে। প্রতিমা রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে, একটি প্রাণীর সাড়াশব্দ সে পাচ্ছেনা। পাচ্ছেনা সে একটি মানুষেরও চিহ্ন।

ধ্যেৎ। প্রতিমা রাগে জ্বলতে জ্বলতে বিছানার ওপর পড়লো। কাপুরুষ, এতবড়ো কাপুরুষ সে?

ও কি? শিষ না? প্রতিমা জানলার কাছে যেতেই—ঠিক, অনুপম এসেছে। গ্যাস পোষ্টএর নিচে দাঁড়িয়ে চোরের মতো অনুপম ওপর দিকে তাকাচ্ছে। প্রতিমা হাত ইশারা করলো।

ধীর পদবিক্ষেপে প্রতিমা সিঁড়ি ভেঙ্গে বাগান পেরিয়ে অনুপমের সামনে এসে একবার পিছনে তাকিয়ে নিয়ে ব'ললো—কি রাজি?

—নিশ্চয়। অনুপম অস্বাভাবিক ভারি গলায় ব'ললো।

—তবে চলো। প্রতিমা অনুপমের একটা হাত ধ'রে নিলো।

ভিজা পথের ওপর দিয়ে দিয়ে তারা ধীরে ধীরে হেঁটে চ'ললো। এগিয়ে চ'ললো। এগিয়ে চ'ললো তারা দুটিতে ক্রমান্বয়ে সম্মুখে। তারা দু-জন দু-জনের হাত চেপে ধ'রে আছে, কিন্তু কেউই কোনো কথা বলার ভাষা আবিষ্কার করতে পারছে না।

বর্দ্ধমান-রোড দিয়ে তারা ডায়মণ্ড-হারবার্‌এর রাস্তায় এসে পড়লো। ট্রাম লাইন বিষাক্ত সাপের মতো চকচক্ করছে। তারা দু-জন কোনো কথা না ব'লে ট্রাম লাইন ধরে বরাবর বেহালার পথ নিলে।

এমন মূক হ'লো কী ক'রে তারা, সেকথা তারা নিজেরাই জানেনা কিন্তু। ভগবান যেন সব কথা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন।

অনুপম ব'ললো—অসহ্য।

—কি অসহ্য? কম্প্রগলায় প্রশ্ন করলো প্রতিমা।

অনুপম দীর্ঘনিঃশ্বাসের শেষে ব'ললো—এই অপবাদ! তোমায়-আমায় এই মিথ্যা অপবাদ! এতো মিথ্যে কথাও মানুষে জানে! বলে, তুমি-আমি নাকি এক আত্মা হ'য়ে উঠেছি! বলে কিনা, তুমি-আমি চুপিচুপি প্রেম করছি! কী ভয়ানক মিথ্যে বাদী তারা—বলো তো!

প্রতিমা ব'ললো—সত্যিই! আশ্চর্য্য লাগে বড্ড!

—শুধু কি তাই? বলে, আমরা গোপনে চিঠি লেখালেখি পর্য্যন্ত করেছি! ক'রেছি তো ক'রেছি, তারা বলার কে? তারা দেখেছে চিঠি?

প্রতিমা ব'ললো—হু!

—শুধু কি ওই টুকুতেই ক্ষান্ত হ'য়েছে? —অশ্লীল যা-তাও যে রাষ্ট্র ক'রেছে। অনুপম উত্তেজিত গলায় ব'ললো।

প্রতিমা অনুপমের হাত চেপে ধ'রে ব'ললো—সেইজন্যেই তো, শুধু সেইজন্যেই আজ আমি এইপথ বেছে নিয়েছি।

—ঠিক ক'রেছো। চলো যাই দু-জনে। দু-জনে আজ ম'রে জানিয়ে যাই কত বড়ো ধিগ্বাক তারা। অনুপম রাগে রীতিমতো হাঁপাতে লাগলো।

প্রতিমা অনুপমকে দৃঢ় হাতে চেপে ধ'রলো।—চেপে ধ'রলো সে কঠিন ক'রে। অনুপমও প্রতিমার নরম হাতটি বুকের কাছে তুলে নিলো।

হাঁটতে হাঁটতে মাঝেরহাটের ব্রিজের ওপর তারা উঠে এসেছে। এদিকে ওদিকে কাছে দূরে লাল ও সবুজ বাতি জ্বলছে। নিচে অজস্র রেলের রাস্তা।

অনুপম আর প্রতিমা দু'জনে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। কোথায় তারা চ'লেছে, কোথায় তারা যাবে এর কিছুই তাদের জানা নেই। শুধু জানা আছে, তারা আত্মহত্যা করবে। আত্মহত্যা ক'রে তা'রা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। আত্মহত্যা করার পথ আছে নানা, কিন্তু কোন্ পথ তারা অবলম্বন ক'রবে কিছুই তাদের ঠিক নেই! দুজনে তাই হয়ত দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ!

হঠাৎ প্রতিমা ব'ললো—সঙ্গে কিছু এনেছো?

অনুপম তৎক্ষণাৎ ব'ললো—কি?

—"সায়ানিড্"? কিংবা, কিংবা এক-খানা ক্ষুর? আনোনি? একটা রিভলভারও না?

অপরাধীর মতো অনুপম ব'ললো—না তো!

—তবে? তাহ'লে এখন উপায়? অসহায়কণ্ঠে প্রতিমা ব'ললো: তাহ'লে এখন কি করা যাবে?

—সে-ও তো ঠিক কথা! অনুপম প্রতিমার দিকে ফিরে ব'ললো,—তাহ'লে, তাহ'লে, এক কাজ ক'রলে হয় না? আজ ফিরে যাই চলো, আসচে-কাল—

—না, না, সে হবেনা, তা কখনই হ'তে দেবোনা! ভয়ানক উত্তেজিত গলায় আরম্ভ ক'রলো প্রতিমা—আজই, এক্ষুণি, যেমন ক'রে হোক আমি আজই, আজই—

প্রতিমার গলা ধ'রে এলো। অনুপম তার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহার্দ্র কম্প গলায় ব'ললো—ছিঃ, কেঁদোনা! কেঁদোনা, ছিঃ! কাঁদতে নেই যে আজ!

—উঃ, কি ভয়ানক, কি ভয়ানক! সবাই লেগেছে আমাদের পেছনে! আমাদের বেঁচে থাকতে দিতে ইচ্ছে নেই কারু! প্রতিমা ভিজা গলায় ব'ললো!

অনুপম ধীরে ধীরে ব'ললো—ঠিক ব'লেছো, বেঁচে থাকতে দিতে কারো ইচ্ছে নেই! সে-কথা আমি বুঝেছি, এবং বুঝেছি ব'লেই তোমার চিঠি পেয়েই আমি ঠিক করলাম, মরবো! এক সঙ্গে মরবো আমরা। আমি নানাদিক তাকিয়ে কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তুমি সে উপায় যখন আবিষ্কার করলে, তখন আমিও তাতে রাজি না হ'য়ে পারলাম না। এসো, এসো, দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

—কোথায় যাবো?

—তা'বলে দাঁড়িয়ে থেকে তো লাভ নেই! এগোই চলো! অনুপম প্রতিমার হাত ধ'রে টান্‌লো।

—কোথায় যাবো? প্রতিমা আবার ব'ললো।

অনুপম ব'ললো—চলো তো! একটা পন্থা আবিষ্কার করা যাবেই, যেমন ক'রেই হোক্! আচ্ছা—অনুপম দাঁড়িয়ে গেলো: এক কাজ করলে হয়না?

—কি? প্রতিমা তার মুখের দিকে তাকালো।

—ইয়ে, কি ব'লছিলাম—এই, এসোনা দু-জনে দু-জনের গলা চেপে ধরি! দু-জন দু-জনের দম বন্ধ ক'রে দু'জনকে মেরে ফেলি! অনুপম সম্পূর্ণ আন্তরিক গলায় ব'ললো!

—তাহ'লে সে তো আর আত্মহত্যা হ'লোনা! প্রতিমা বেঁকে ব'সলো।

অনুপম একটু থেমে ব'ললো—অতটা বিচার ক'রতে গেলে এখন কি চ'লবে, প্রতিমা? আত্মহত্যা না হোক্, আমরা ম'রতে চাই!

—নিশ্চয়! প্রতিমা দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়ালো!—ব'ললো, বেশ, তবে তাই!

—রাজি?

প্রতিমা ব'ললো—হ্যাঁ।

দু-জনে দু-জনের গলা চেপে ধ'রলো! দু-জন দু-জনের সম্পূর্ণ বিক্রম চালনা ক'রে আপ্রাণ পরিশ্রম আরম্ভ ক'রলো। হঠাৎ অনুপম তার গলা ছেড়ে দিলো। প্রতিমা খুক্ খুক্ ক'রে আরম্ভ করলো কাশতে। অনুপমের গলাও সে দিলে ছেড়ে।

অনুপম ক্ষীণ গলায় ব'ললে—প্রতিমা, গলায় লাগেনি তো?

প্রতিমা ব'ললো—উহুঁ!

অনুপম ব'ললো—নিশ্চয় লেগেছে। নিশ্চয় দাগ ব'সে গেছে!

এতক্ষণে প্রতিমা ব'ললো—অত জোরে চেপে ধ'রতে আছে?

অনুপম ম্লান হাস্‌লো।

প্রতিমা ব'ললে—না, এটা সুবিধে লাগছে না। তার-চে চলো, এক কাজ করি: এখন কোনো ট্রেন আসবে না?

—কি ক'রে বলি বলো। অনুপম উদাস গলায় ব'ললো।

—এত রাত্তিরে হয়ত এদিকে ট্রেন চলেনা, না? প্রতিমা উৎসুক-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো।

—হয়ত না। নির্ব্বিকারে ব'ললো অনুপম।

—তাহ'লে, তাহ'লে কি উপায় হবে বলো তো! একবার যখন বেরিয়েছি, তখন আর কিছুতেই আমি ফিরে তো যেতে পারবো না। কি হবে, অনুপম!

অনুপম ব'ললো—মরতে বড্ডই ইচ্ছে ক'রছে, না?

—ইচ্ছে কি আর করছে? তবে, না ম'রে আর উপায় নেই। বেঁচে থাকতে আমি পারবোনা, কিছুতেই পারবো না! এসো, এখান থেকে লাফিয়ে পড়ি। ওই লোহার ওপর পড়লে কিছুতেই বেঁচে থাকবো না, নিশ্চয়ই মরবো। যেবে লাফ? প্রতিমা উত্তেজিত গলায় ব'ললো।

—উঁহু। অনুপম স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

প্রতিমা অসহায়কণ্ঠে ব'ললো: কেন? তাহ'লে তুমি আমার সঙ্গে ম'রবেনা, তবে কেন রাজি হ'লে আগে! ছিঃ, এতো কাপুরুষ তুমি?

অনুপম ব'ললো—ভুল বুঝো না। এখান থেকে লাফ দিয়ে পড়লে মানুষ মরে না, জখম হয়!

—না, মরেনা! নিশ্চয় মরে! প্রতিমা অস্বাভাবিক দৃঢ়তা প্রকাশ করলো।

অনুপম ব'ললো—তুমি মেয়ে, তুমি ম'রতে পারো; কিন্তু আমি যে ম'রবো না, এ আমি জানি!

—তবে অন্য কোনো উপায় ভেবে ঠিক করো! আর তো দেরি করা চলেনা! আর, এ-রকম রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকাও ঠিকনা। কেউ যদি দেখে ফেলে। তার ওপর পুলিশও তো থাকতে পারে কাছে-ভিতে! প্রতিমা অনুপমের দিকে তাকালো।

গ্যাসের যেটুকু আলো অনুপমের মুখের ওপর প'ড়েছে তাও তাকে ভীষণ হিংস্র ব'লে দেখাচ্ছে! যেন সে ক্ষুধিত ভীষণ শার্দ্দুল! মানবতার কোমল একটু আভাষ পর্য্যন্ত দেখার সুযোগ নেই।

অনুপম ব'ললো—এসো। এসো, ওদিকে যাই, ওই অন্ধকারে। ওখান দিয়ে 'হাটতে' হাটতে সাপেও তো কাটতে পারে!

প্রতিমা ব'ললো—দুজনকে এক সঙ্গে? সে কি সম্ভব?

—অসম্ভবও সম্ভব হয় মধ্যে মাঝে, প্রতিমা! ভয়ানক রুক্ষ গলায় ব'ললো অনুপম!—তুমি এসো।

তারা দু'জন অন্ধকার মাঠের মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চ'ললো। দু-জনে পুনরায় তারা নির্ব্বাক হ'য়েছে।

দূরের বড় রাস্তা দিয়ে অসময়ে একটি ভারি বাস্ সখেরবাজারের দিকে চ'লে গেলো। আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় নিশ্চল অগণ্য তারকা চুপচাপ পৃথিবীর দিকে হাত বাড়িয়ে ঝুলে আছে।

রেল লাইনের দিকে তারা হাটতে আরম্ভ করলো। সুমুখে পড়লো রেলিঙ। অনুপম নির্ব্বিবাদে পেরিয়ে গিয়ে, হাত বাড়িয়ে প্রতিমাকে তুলে নিলো, কিন্তু প্রতিমার কাপড় রেলিঙের সঙ্গে আট্‌কে যাওয়ায় অনুপমের শক্তির অপচয় হ'লো অযথা।

অনুপম ব'ললো—কাপড় ছিঁড়ে গেলো না তো?

—একটু ছিঁড়েছে। যাক্ গে, অনেকদিন পরছি, আর কতদিনই-বা টিকবে!

অনুপম হাস্‌লো। কিন্তু কোনো কথা না ব'লে তাকে নিয়ে এগিয়ে চ'ললো! রেল লাইন ধ'রে তারা ক্রমশঃ এগোচ্ছে।

প্রতিমা ব'ললো—কোথায় যাচ্ছি?

—মরতে।

—তবে চলো।

তারা চ'ললো। ক্রমশই তারা চ'ললো! উদ্দেশ্যহীন পথের সন্ধানে তারা অনবরত ধাওয়া করলো! একটি সিগন্যাল পোষ্টের গায়ের কাছ দিয়ে যেতে যেতে তারের সঙ্গে পা বেধে প্রতিমা রীতিমতো প'ড়ে গেলো। অনুপম ব'ললো—এঃ, প'ড়ে গেলে? পা কেটে গেছে? জ্বালা ক'রছে?

উঁহু. চলো। প্রতিমা উঠে দাঁড়ালো।

হঠাৎ নিঃশব্দ রাত্রে সিগন্যাল পোষ্টের মাথার দিকে দারুণ শব্দ হ'তেই দু-জনে চ'মকে উঠলো। প্রতিমা ভয়ে পাংশু হ'য়ে অনুপমকে জড়িয়ে ধরলে।

অনুপম নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললো—হ'য়েছে। এখানে ব'সো।

—তার মানে? প্রতিমা জিজ্ঞাসা করলো।

—সিগনাল ডাউন দিলো। এইবার ট্রেন আসবে। তৈরী হ'য়ে নাও! অনুপম কম্পগলায় ব'ললো।

—সত্যি?

—হ্যাঁ।

—বাঁচা গেলো, বাঁচা গেলো তাহ'লে। এতক্ষণে সন্ধান মিললো! প্রতিমা ব্যথিত-আনন্দের স্বরে করুণ ক'রে ব'লে উঠলো: কিন্তু ট্রেন আসতে কত দেরি হবে?

—কত আর? এই তো এসে পড়বে!

প্রতিমা ব'ললো—এসো, লাইনে গলা দিয়ে শুয়ে পড়া যাক্!

—উঁহুঁ, সহ্য হবে না। ওতে মনের ভয়ানক জোর দরকার, অত জোর নেই! ট্রেন যেই কাছে এসে পড়বে অমনি দু-জনে লাফিয়ে গিয়ে পড়বো লাইনের ওপর? আচ্ছা?

—তাই বেশ! প্রতিমা কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিলো।

অনুপম ব'ললো—দু'জনে হাতে হাত

ধরে দাঁড়িয়ে থাকবো। কাছে এলেই ওয়ান-টু থ্রী ব'লেই—ঠিক। প্রতিমা অনুপমের হাত ধরলো: কে ওয়ান টু থ্রী ব'লবে?

—আমিই ব'লবো। কিন্তু তার আগে দু-জনে বিদায় নিয়ে নি দু-জনের কাছে! অনুপম ঘুরে দাঁড়ালো।

দু-জনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে দু-জনের চোখ মুছলো। লোহার-পথে ভারি ইঞ্জিন দারুণ শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসচে। অন্ধকারের রাত্রে একটি সার্চ লাইটও নেই!

দু-জনে হাত ধরাধরি ক'রে লাইনের দিকে মুখ দিয়ে দাঁড়ালো। দারুণ বিক্রমে খানিকটা অন্ধকারের পিণ্ড ছুটে চ'লে আসচে। প্রতিমার দেহের সমস্ত রক্ত কে যেন চুষে নিলো. তার মাথার মধ্যে অজস্র ঝিঁঝি-পোকা ঝমঝম ক'রে বেজে উঠ্‌লো। অনুপমের বন্ধন থেকে সে মুক্ত চাইলো!

—ওয়ান—টু—উ—

নিমেষের মধ্যে লোহার নিষ্ঠুর চাকা অনুপমকে টুকরো টুকরো ক'রে দিলো। প্রতিমা দুই হাতে দুই কান চেপে সেইদিকে তাকিয়ে বলে উঠ্‌লো—ইস্!

———

আশ্রম-মৃগ

[তিন রীলের হাসির ছবির জন্য লেখা]

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বড়লোকের একমাত্র ছেলে নাম ক্যাবলা-কান্ত। ছেলেবেলা থেকে কবিতা লিখবার ভারি সখ। তাই বন্ধুরা ডাকে 'কপিবর'। বালিগঞ্জে বাড়ী। বাপ থাকে দেশে। ক্যাবলার ইচ্ছে—লোকে প্রাইভেট টিউটার রেখে বি, এ; এম, এ পাশ করতে পারে সেইবা কেন একজন নাম-করা কবিকে প্রাইভেট টিউটার রেখে কবিতা লিখতে শিখতে পারবে না?

সেই অনুসারে কবিবর গজেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে "Poetry Laboratory" তৈরী হচ্ছে। বর্ষার কবিতা লিখতে হবে—সুইচ্ টিপলেই হ'ল—অমনি খাঁচায় পোষা ময়ূর নাচতে লাগ্‌ল, দাদুরী ডেকে উঠল—মেঘ গর্জ্জনের শব্দ হ'তে লাগল—কৃত্রিম কদম ফুল ফুটলো। বাস্—স্ফূর্ত্তিতে বসে চেয়ারে হেলান দিয়ে—বর্ষায় বিরহের কবিতা লেখ।

তখনো ষ্টুডিও শেষ হয়নি। ক্যাবলা-কান্ত মনের আনন্দে ষ্টুডিওর পাশে এক গাছে উঠে আপন মনে প্রেমের কবিতা লিখছে। ওদিকে চিড়িয়াখানা থেকে একটা বনমানুষ খাঁচা ভেঙ্গে পালিয়ে এসেছে। সে লাফিয়ে গাছে উঠে ক্যাবলাকান্তের খাতাখানা টেনে নিয়ে—তারপর আপন মনে তাতে আঁচড় কাটতে লাগলো। ক্যাবলা খাতা ফিরিয়ে আনতে গেলে—দাঁত খিঁচিয়ে এসে বানরটা তার চাদর কেড়ে নিলে। ক্যাবলাকান্ত কপির ভয়ে—ষ্টুডিওতে পালিয়ে এসে—কবির স্মরণাপন্ন হ'ল। কবিবর বল্লেন ও সেকেলে-ক্যাবলাকান্ত নামে—সে কিছুতেই কবি হ'তে পারবে না। তার নাম পালটে রাখতে হ'বে 'হরিণ'! ক্যাবলা স্পষ্ট দেখতে পেলে সে যেন শকুন্তলার হরিণ। সেই সুন্দরী তাপস কন্যার হাত থেকে—গুচ্ছ গুচ্ছ তৃণ চর্ব্বণ কচ্ছে। আনন্দে সে চীৎকার করে উঠলো ইউরেকা, ইউরেকা।

কবিবর তাকে একটি প্রেমের কবিতা লিখতে দিয়ে চলে গেলেন। এমন সময় এসে ঢুক্‌লো— ক্যাবলার প্রাণের বন্ধু উদ্দীপনা দোদক। সে এসে জানালো সাতদিন ধরে ক্যাবলার লিখিত কবিতা সে ভারতবর্ষের সমস্ত কাগজে ছাপতে পাঠিয়েছে। এগুলি যখন প্রকাশিত হ'বে তখন—সাহিত্য-জগতে একটা রীতিমত সাড়া পড়ে যাবে।

সেই মুহূর্ত্তে ঘরে ঢুক্‌লো এক পিয়ন। তার পেছনে এক মুটে—, ঝাঁকা ভর্ত্তি ফেরৎ-কবিতার পেকেট। সে হুড় হুড় করে সেগুলো ক্যাবলার টেবিলের উপর ঢেলে দিলে। দেখা গেল—তা'রই মাঝে ক্যাবলা কোথায় তলিয়ে গেছে!

উদ্দীপনা তাড়াতাড়ি একটি চিঠি খুলে পড়লো—। ক্যাবলা ততক্ষণে চিঠির পেকেট ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে—চিঠিখানা টেনে নিলে—। তাতে লেখা আছে—

কবিবর,

প্রেমের কবিতা লিখেছেন; কিন্তু জীবনে কখনো প্রেমে পড়েছেন কি? অভিজ্ঞতা না জন্মালে কিছুই লেখা উচিত নয়।

সম্পাদক—বিস্ফোটক
সাহিত্য ভবন।

ক্যাবলা বল্লে, ঠিক বন্ধু—আমি চল্লুম।

উদ্দীপনা বল্লে,—কোথায়—

ক্যাবলা ছাতাটা হাতে নিতে নিতে বল্লে—প্রেমে পড়তে—

বর্ষাকাল। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ক্যাবলা আপন মনে ছাতা মাথায় পথ চলেছে। হঠাৎ সে দেখতে পেলে তার কিছু আগে আগে একটা মেয়ে ভিজতে ভিজতে যাচ্ছে। এটাকে একটা মহা সুযোগ মনে করে—সে ছুটে হাঁপাতে হাঁপাতে তার মাথায় গিয়ে ছাতা ধরলো। কিন্তু মুখের দিকে চাইতেই

তার চক্ষুস্থির। একটি বেঁটে ভদ্রলোক একগাল খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। তার গিন্নির শাড়ী লুঙ্গির মত করে পরে বাজার করে ফিরছেন। হতাশ হ'য়ে ক্যাবলাকান্ত সেই খানেই বসে পড়লো।

পরদিন ষ্টুডিওতে বসে ক্যাবলাকান্ত কবিতা লিখবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা কচ্ছে—এমন সময় হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে উদ্দীপনা এসে ঢুকলো—বল্ল, "Three cheers for our poet" এইবার এমন সুযোগ জুটে গেছে—উঠে পড়। ক্যাবলা অবাক হ'য়ে বল্লে, ব্যাপার কি? উদ্দীপনা বল্লে, আমাদের পাড়ার ঠাকুর্দ্দা তার কলেজে-পড়া নাতনীর জন্যে শিক্ষয়িত্রী রাখতে চান... চল...চট্ পট...।

ক্যাবলা অবাক হ'য়ে বল্লে, শিক্ষয়িত্রী? তা আমি কি করবো? উদ্দীপনা তার হাতের প্যাকেট খুলে তার থেকে একটা মেয়েদের পরচুলা বের করে ক্যাবলার মাথায় পরিয়ে দিয়ে বল্লে, এবার বুঝতে পেরেছিস্?

ক্যাবলা ফিক্ করে হেসে বল্লে,—হ্যাঁ—

ট্যাক্সি এসে ঠাকুর্দ্দার ফটকের সামনে দাঁড়ালো।... দেখা গেল—শিক্ষয়িত্রী-বেশী ক্যাবলাকান্ত ও উদ্দীপনা কার থেকে নেমে কড়া নাড়লে।

একটা মোটা কালো ঝি এসে দরজা খুলে দিল। ক্যাবলা তার চেহারা দেখেই পালাতে যাবে—উদ্দীপনা তারে ধীরে ধরে ফেল্লে, বল্লে, ঘাবড়াস্‌নে—ক্রমশঃ প্রকাশ—ওর সঙ্গে তোর প্রেম করতে হ'বেনা।

ওদিকে ঠাকুর্দ্দা আর নাতনী কথা হচ্ছিল। সেদিন ডাকে একখানা চিঠি এসেছে পাত্রের পিতা বিবাহ উত্থাপন করেছেন—আর পাত্রের একটা ফটো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ঠাকুর্দ্দা বল্লেন, শুকু, তোর পছন্দ হ'য়েছে?

শুকু বল্লে, পছন্দ হয়েছে কিনা তা কি করে বল্‌বো? কিন্তু কী চমৎকার। মরিশ সিভ্যালিয়ারের হাসি, রোমান নেভারোর নাক, ফ্রেডারিক মার্চ্চের কপাল, কেরি গ্রান্টের ঠোঁট—এ আমি নিয়ে চল্লাম ঠাকুর্দ্দা—এই বলে এক ছুটে পালিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময় ঝি উদ্দীপনা আর শিক্ষয়িত্রী-বেশী ক্যাবলাকান্তকে নিয়ে এলো। উদ্দীপনাই আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলে। ঠাকুর্দ্দা নাম জিজ্ঞেস করতেই ক্যাবলা বল্‌তে যাচ্ছিল ক্যাবলাকা—কিন্তু আচম্‌কা উদ্দীপনার ধাক্কা খেয়ে বল্লে, আজ্ঞে—হরি—ণ! উদ্দীপনা শুধরে নিয়ে বল্লে, আজ্ঞে হরিণ সেন বি, এ...গাইতে বাজাতেও অদ্বিতীয়। ক্যাবলা হয়তো পুরুষের মত—পায়ের ওপর পা তুলে-নাচতে সুরু করেছে—উদ্দীপনা চিম্‌টি কেটে থামিয়ে দিলে। ঠাকুর্দ্দা—উদ্দীপনাকে সিগারেটের কৌটো বের করে দিলেন। ক্যাবলাও নিতে যাচ্ছিল—। কিন্তু উদ্দীপনা তার হাত টেনে নিলে।

যাই-হোক—উদ্দীপনা চলে আস্‌তে ঠাকুর্দ্দা—নাত্‌নীকে ডেকে পঠালেন। নাতনী চঞ্চল মেয়ে—ছুটে এসে ক্যাবলার গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে, আপনাকে কিন্তু দিদি বলে ডাক্‌বো। কোন মেয়েকে এমন কাছাকাছি ক্যাবলা কখনো পায়নি। তার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

পরদিন সকাল বেলা ক্যাবলাকান্তের যখন ঘুম ভাঙলো, সে চেয়ে দেখলো টেবিলের ওপরকার ঘড়িতে আটটা বেজেছে। সে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে মাথার পরচুলাটা খুলে বালিশের তলায় রাখলে। তারপর—পাশের বাথরুমে গেল স্নান শেষ করতে—ভাব্‌লে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে Make up শেষ করবে।

ঠিক এমনি সময় শুকু এসে ঘরে ঢুকলো দেখলো ঘরে কেউ নেই। তারপর হঠাৎ বালিশটা সরাতেই পরচুলাটা বেড়িয়ে পড়লো। সে ভারী ভয় পেয়ে গেল। খুট করে পাশের দরজায় একটা শব্দ হ'লো। ক্যাবলাকান্ত ঘরে এসে ঢুকলো। শুকু চট করে আলমারীর পাশে লুকোলো। হঠাৎ তার কি মনে হলো। কাল যে ছোট্ট ফটো খানা এসেছিল—তা যে নিজের বুকের মধ্যে লকেটে পুরে রেখেছিল। সেই ফটো বের করে—ক্যাবলার সঙ্গে মেলাতে লাগলো। দেখলে—একই লোক। তখন সে ফিক্ করে হেসে ফেল্লে।

ক্যাবলা তাড়াতাড়ি প্রসাধন শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এলো। শুকুও হাস্‌তে হাস্‌তে তার পেছন পেছন এলো। ঠাকুর্দ্দা তাদের জন্যে অপেক্ষা কচ্ছিলেন। বেয়ারা এসে জিজ্ঞেস করলে চা তৈরী করবে কিনা।—ক্যাবলাকান্ত মেয়েলী কাজে নিজের গুণপনা দেখাবার জন্যে বল্লে, আপনারা বসুন আমি যাচ্ছি চা তৈরী করতে—। ক্যাবলা পাশের ঘরে চলে গেল।

ঠাকুর্দ্দা ও নাতনী সেইখানে বসে শুনতে লাগলো পাশের ঘরে শব্দ হচ্ছে—ঝন্—ঝন—ঝনাৎ......

ঠাকুর্দ্দা ও নাতনী গেল ছুটে দেখতে—গিয়ে যা দেখল তা'তে ঠাকুর্দ্দার চোখ কপালে উঠলো। কাপ...সসার...খাবার...জিনিষ পত্র...সব ভেঙ্গে চুরমার—আর তারি মধ্যে ক্যাবলাকান্ত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে। ঠাকুর্দ্দা যত রাগতে চায় ব্যাপার দেখে—শুকু তত খিল্ খিল্ করে হাসে...।

সেইদিন বিকালে বাগানে বসে ঠাকুর্দ্দা নাতনীতে কথা হচ্ছিল। ঠাকুর্দ্দা বল্লে, আমি কিছুতেই ও মাষ্টারনীকে রাখবো না। নাতনী বল্লে, কিন্তু আমার যে ওকে ভারী ভাল লেগেছে ঠাকুর্দ্দা—! ঠাকুর্দ্দা রেগে বল্লে, তা হলে ওকে গলায় ঝুলিয়ে রাখগে। শুকু খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বল্লে, রাখবোই ত'—তারপর লকেট খুলে ফটোটা একবার দেখে নিলে!

ঠাকুর্দ্দা রাগে গস্ গস্ করতে করতে চলে গেল—শুকু তার পেছন পেছন ছুটল।

ক্যাবলাকান্ত একটা ফুল গাছের আড়ালে লুকিয়ে সব শুনছিল। সে ভারী দমে গেল। এমন সময় একটা লোক দেয়াল টপকে তার সামনে লাফিয়ে পড়ল। ক্যাবলা চমকে উঠলো। ফিরে তাকিয়ে দেখলে—উদ্দীপনা। উদ্দীপনাকে সব কথা খুলে বল্‌তে সে বল্লে, তুই ভয় পাস্‌নে—আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। ক্যাবলা জিজ্ঞেস করলে,—কি?

উদ্দীপনা বল্লে, বুড়োর বড্ড ভুতের ভয়। আমাদের বাসা থেকে—ছাদ দিয়ে দিয়ে এ বাসায় আসা যায়। আমি আজ রাত্তিরে বুড়োকে ভুতের ভয় দেখাব। তা হ'লে এই খালি বাড়ীতে বুড়ো ভারী ভয় পাবে আর তোকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। ক্যাবলা মাথা নেড়ে বল্লে, সেই ভালো।

যে কথা সেই কাজ। রাত্তির তখন বারোটা। বুড়ো অনেক রাত্তির জেগে বই পড়ে। বুড়ো যেই শুতে যাবে—অমনি দমকা হাওয়ার আলো গেল নিভে—। সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও সুরু হ'ল—। কালো কালো মেঘের-ফাকে-আসা চাঁদের আলোতে দেখা গেল—কালো একটা লম্বা মূর্ত্তি—বারান্দা দিয়ে ঘুরছে। বুড়ো খাটের ওপর বসেই ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। হঠাৎ একটা মড়ার মাথার খুলি একেবারে বিছানার ওপর এসে পড়ল। এইবার ঠাকুর্দ্দা রাম-রাম চীৎকার করতে করতে—শিক্ষয়িত্রীর ঘরে—একেবারে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। ক্যাবলা ততক্ষণ—ঘরের দরজা খোলা রেখে উদ্দীপনার কাণ্ডটা দেখছিল।

বুড়ো এসে একেবারে ক্যাবলাকে জড়িয়ে ধরে রাম রাম জপ করতে লাগলো। হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল সে যাকে জড়িয়ে ধরেছে সে একটি মহিলা। প্রথমে সে লজ্জিত হ'ল—তারপর—ফোকলা দাঁতে ফিক্ করে হেসে ফেল্লে, বল্লে,—তোমার হাতটিতো বেশ নরম!—আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেবো না হরিণ, আমার মনের হরিণ···আমার বনের হরিণ···ক্যাবলার চোখ গিয়ে উঠলো কপালে!

তখন থেকে সুরু হ'ল ঠাকুর্দ্দা আর নাতনীর প্রেম নিয়ে খেলা। ঠাকুর্দ্দা জানে ক্যাবলা মেয়ে ছেলে, তাই তার সঙ্গে প্রেম করতে চায়। আর নাত্নী জানে শিক্ষয়িত্রী পুরুষ মানুষ তাই সে যখন তখন—গলা জড়িয়ে ধরে বলে, দিদি আমায় পড়াবেন না?

ক্যাবলাকান্ত কিছু কিন্তু বুঝতে পারেনা—কেবল দুজনের মাঝখানে পড়ে হাবুডুবু খায়।

সেদিন ঠাকুর্দ্দা বাজার থেকে একশিশি কলপ এনে চুলে লাগিয়ে—ফিট বাবু সাজছে—এমন সময়—ঝিটা বাইরের ঘর ঝাট দিতে এসে অচেনা লোক মনে করে চীৎকার করে উঠল। ঠাকুর্দ্দা তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে—চুপ কর সদু—আমি রে আমি—তোর মনিব। ঝি কর্ত্তার কাণ্ড দেখে ঝাটা হাতে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কর্ত্তা জিজ্ঞেস করলে—মিস্ বাবা কোথায় র‍্যা! ঝি আঙুল দিয়ে শিক্ষয়িত্রীর ঘর দেখিয়ে দিলে।

ঠাকুর্দ্দা পা টিপে টিপে ক্যাবলার ঘরের সামনে হাজির হ'ল। আজ সে নটবর বেশ সেজেছে। পরণে শান্তিপুরের ফিন্ ফিনে ধুতি—গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী—হাতে মার্কেটের ফুল—রুমালে ভুর ভুরে আতরের গন্ধ। ক্যাবলা বসে বই পড়ছিল বিকেলের দিকটা। শকুন্তলা তখনো কলেজ থেকে আসেনি। আস্তে আস্তে গিয়ে কর্ত্তা ক্যাবলার গা' ঘেসে বসল। হাতের ফুলের তোড়া থেকে একটা ফুল নিয়ে—খোঁপায় পরিয়ে দিলে। তারপর তার মুখের দিকে এগিয়ে যাবে—যাবে—হঠাৎ থমকে গিয়ে বল্লে, একি—তোমার মুখে দাঁড়ি?

ক্যাবলা ভুলে সেদিন দাঁড়ি কামায়নি। তাই খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি উঠেছিল।

এমনি ভাবে ধরা পরে সে ছুটে পালাতে যাচ্ছিল—কিন্তু কর্ত্তা তার চুলটা ধরে ফেল্লেন। পরচুলা কর্ত্তার হাতেই রয়ে গেল—ক্যাবলা তো প্রাণভয়ে বারান্দা দিয়ে লম্বা দৌড়—। সিড়ি দিয়ে নিচে নামতে যাবে—একেবারে শুকুর সাম্না সাম্নি পড়ে গেল। শুকু তার অপরূপবেশ দেখে—চটকরে তার হাতটা ধরে ফেল্লে। এমন ভাবে ধরা পড়ে গিয়ে ক্যাবলাকান্ত ভারী ঘাবড়ে গেল। বল্লে—এই—আমি—আমি—শুকু ফিস্ করে হেসে ফেলে বল্লে, হ্যাঁ-তুমি—তুমি হরিণ। এই শকুন্তলারই মনের হরিণ—। এই বলে বুক থেকে লকেটখানি বের করে তার সামনে ধরলে। ক্যাবলা অবাক হয়ে দেখলে—তার নিজের ফটো যা তার বাবা শুকুর ঠাকুর্দ্দাকে পাঠিয়েছিল সম্বন্ধের জন্যে!

এইবার ক্যাবলাকান্ত একগাল হেসে ফেল্লে। দু'জনের মুখ—কাছাকাছি এসে একেবারে জোড়া লেগে গেল।

নারীর লজ্জা

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু

সত্যি কথা বললে দেখি
তোমরা ভারী চটো,
তোমরা বেজায় চটো !
কোণটি ঠাসা করবে মোদের
এই তোমাদের 'মটো',
সেইটি কেবল 'মটো' !
গলাবাজী, কলমবাজী,
তাইতে দেখি নিত্যরাজী,
আমরা খারাপ, আমরা পাজী
প্রমাণ করতে ছোটো !
একটু ঈষৎ স্পষ্ট কথায়
তিড়বিড়িয়ে ওঠো।

তোমরা নারী,—নারীর লজ্জা
কাগজ খুলে পড়ো,
আশা করিই পড়ো ?
অপমানের কাঁটা গায়ে
বিধছেনা যে বড়,
লাগছে না যে বড়,
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে
কলঙ্কদাগ নারীর নামে,
কোথায় সভা ? ডাইনে বামে
কী আন্দোলন করো ?
সমাজচ্যুতা নির্য্যাতিতার
গৃহ কোথায় গড়ো ?

পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলে
খোলা আকাশ তলে
বিপুল ধরাতলে।
দুঃখিনীদের কান্না কোথায়
ডুবল কোলাহলে,
গভীর কোলাহলে ?

নৃত্য-গীতি-শিল্প-রেখা,
অনেক বিদ্যা, অনেক লেখা,
অনেক কিছুই হ'ল শেখা,
পরিশ্রমের বলে।
ভুললে শুধুই ব্যথা কোথায়
নারীর চোখের জলে !

নয় কি তারা কেউ তোমাদের
মানুষ তারা নয়,
গণ্য তারা নয় ?
দাসীর মতন ভাবো তাদের,
তাইত' মনে হয়,
দেখেই মনে হয় !
কুশ্রী তারা, গরীব তারা,
ড্রইংরুমের নেই ইসারা,
মোটর বিলাস, সুরের ধারা,
বর্ণ পরিচয়,
নেই ব'লে কি, করবে তাদের
নারীত্বে সংশয় ?

কী অসহায় তারা,—তাদের
কী দুঃখে দিন কাটে,
কী কষ্টে দিন কাটে !
সীতা যেন বন্দিনী আজ
শত্রুপুরীর ঘাটে ;
বিপজ্জনক ঘাটে !

একটি রাত্রে তাদের মাথায়
আজীবনের বোঝা চাপায়
যে পশুদল, বাড়ীর ছাতায়
তোমার যদি হাঁটে,
লাগাও চাবুক,—বোন্ যে তোমার
তেপান্তরের মাঠে !

আমরা পুরুষ, ভালো কিছু
করতে গেলেও দোষ,
বলতে গেলেও দোষ !
সপ্তরথীর ছুটবে তখন
শব্দভেদী রোষ,
ভ্রূকুঞ্চনের রোষ !

হিল্-উচু-শু, স্কার্ট শাড়ীতে,
ট্যাক্সী, বাসে, ট্রাম গাড়ীতে,
মেমের সঙ্গে পাল্লা দিতে,
দিলত দেখি খোস্ !
পাটের ক্ষেতে কাঁদিস্ যারা
নারীই তারা নোস্।

স্তাবক দলের বন্দনাতে
উচ্ছ্বসিত হিয়া—
গুঞ্জরিত হিয়া,
নাগরিকায় পুজে তারা
পল্লী বিসর্জ্জিয়া,
বিস্মরণে দিয়া।

তাই ব'লে কি মহোৎসবে
তুমিও নিমজ্জিত হবে ?
নারী-জাতির অগৌরবে
অমর্য্যাদা নিয়া
সজ্জা যদি লজ্জা না পায়,
ধিক্ প্রগতিপ্রিয়া !

বাংলার ফিল্ম শিল্পে বাঙ্গালী বনাম অবাঙ্গালী

শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ

পূজোর বাজারে একটু অপ্রিয় সত্যের আলোচনায় প্রয়াসী হ'য়েছি ব'লে হয়ত অনেকেই আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু মুখবন্ধেই আমার একটি নিবেদন আছে সেটি আশা করি আপনাদের উপস্থিত বিরক্তি থেকে নিবৃত্ত ক'রবে। প্রকৃতির অচ্ছেদ্য নিয়মে যেমন বিরহ আছে ব'লে মিলনের মাধুর্য্য প্রকাশ পায়, বর্ষার ঘন অমানিশার পর বলেই, শারদ পূর্ণিমার হসিতচ্ছবি আমাদের কাছে এত সুন্দর বোধ হয়, শীত ও গ্রীষ্মের আতিশয্যের মধ্যবর্ত্তী বলেই যেমন ঋতুরাজ বসন্ত আমাদের কাছে এত প্রিয় মনে হয়, সেইরূপ অপ্রিয়ের আভাস মাঝে মাঝে না থাক্‌লে প্রিয় বোধ হয় শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ হত না।

আমি অনেকের মত মামুলি ধারায় 'আমাদের ফিল্মে অনেক গলদ আছে' ইত্যাদি বলে ফিরিস্তি না দিয়ে একটা জীবন্ত ও বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হ'তে সাহসী হ'য়েছি। ভূতের নাম শুনেই অনেক পালান, কিন্তু আমি এগিয়ে এসেছি—দেখব বলে এটা সত্যিই ভূত না ভুল—না মনের বিকার। আমি জানি অনেকেই হয়ত বল্‌বেন—Fools rush in where angels fear to tread—তবুও আশা করি আপনারা একটু ধৈর্য্য ধরে আমার এ তুচ্ছ লেখা পড়ে দু চার মিনিট ভাববেন আমরা কোন পথে যাচ্ছি! তা যদি মামুলি ধরণে শ্মশান বৈরাগ্যের মতও ভাবতে পারেন তবেই বুঝব আমার লেখা সার্থক হ'য়েছে। আপনাদের ওপর মতের প্রভাব বা প্রতিষ্ঠা ক'রব সে দুরাশা আমার নেই, কাজেই সে ভুল ধারণা আমি পোষণ ক'রতে পারিনা।

আজ বাংলায় ফিল্মশিল্পের যথেষ্ট প্রসার হ'য়েছে। ফিল্মশিল্প বল্‌তে শুধু চিত্র নির্ম্মাণ ও চিত্রপ্রদর্শনই বোঝায় না—প্রচার-শিল্প ও চিত্র-পরিবেশনও ফিল্ম শিল্প পর্য্যায় ভুক্ত। ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবে বাংলা পিছিয়ে ছিল কিন্তু বাংলার নিজস্ব ধারা নিজস্ব সম্পদ এখন পশ্চিম ভারতকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে ভাবের উৎকর্ষে ও বৈশিষ্ট্য বিকাশের নৈপুণ্যে এই শতধা বিভক্ত বাংলা অনেকের আচার্য্যের স্থান নিতে পারে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একথা শতবার স্বীকার ক'রবো যে ফিল্মশিল্পে পশ্চিম ভারতে New Theatres বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছে। এটা আরও আমাদের শ্লাঘার কথা যখন ভাবি যে এ প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর। অনেকে হ'য়ত বল্‌বেন—অবশ্য তাঁদের বল্‌বার যুক্তি আছে তা অস্বীকার করিনা—যে New Theatres এর সাফল্যের মূলে শুধু পুরুষকার নয় অদৃষ্টেরও অনেক হাত আছে। একাধারে সারদা ও কমলার আশীর্ব্বাদ ক'জনের ভাগ্যে জোটে; বাণীর পুত্র চঞ্চলা কমলার বিরাগ ভাজন হয় ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাদের উপর বাণী ও কমলার আশীর্ব্বাদ শ্রাবণের বারিধারার মত বর্ষিত হয়, বিশ্বকর্ম্মা অকাতরে তাঁর উৎসাহ ও নৈপুণ্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার যাঁদের জন্য খোলা রেখেছেন তাদের আর ভয় কি? সমালোচকের নৃশংস স্তর হতে অনেক উর্দ্ধে তাদের স্থান।

আমরা ফিল্ম জগতে বাঙ্গালীর গৌরবে গৌরবান্বিত হই কিন্তু নিজেরা জানিনা বাঙ্গালী বলতে আমারা কতটুকু বুঝি! Risley ও অন্যান্য নৃতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে বাংলা ভাষাভাষী Mongolo—dravidian race যদি বাঙ্গালী হয় তবে পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর প্রমুখ বাংলা ভাষাভাষী, পুরুষানুক্রমে যাদের বাংলার মাটী বাংলার জল বাংলার হাওয়া বাংলার ফল অস্থিমজ্জার গঠন করেছে সেই পশ্চিম ভারতীয় বঙ্গবাসীর স্থান কোথায়? যাঁরা মাতৃভাষা ও কৃষ্টিতে বাঙ্গালী অথচ পশ্চিম ভারতীয় সামাজিক অনুশাসন পালন করেন, সামাজিক বন্ধন যাঁদের পশ্চিম ভারতের সঙ্গে তাদেরই বা স্থান কোথায়? বাংলার মুসলমানরাও বাংলা ভাষাভাষী, পুরুষানুক্রমে বাংলায় তাদের বসবাস কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ বাংলার কৃষ্টি হ'তে বহুদূরে তাদেরই বা আমরা অনেকে বাঙ্গালী বলিনা কেন? কেহ হয়ত ব'লবেন যা'রা

নিজেকে বাঙ্গালী বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেন তারাই বাঙ্গালী। যদি এই কথাই স্বীকার করি তবে বঙ্গসমাজের ইয়োরোপীয় ভাবাপন্ন বহু বাঙ্গালীর স্থান কোথায়? মোটকথা আমরা যারা "বাংলার জন্য বাঙ্গালী" বা "বাঙ্গালীর জন্য বাংলা" বলিয়া চীৎকার করি আমাদেরই বাঙ্গালী সংজ্ঞার কোন বিশেষ ধারণা নেই।

আমাদের নিজের গম্ভীর ধারণা নাই অথচ আমরা বাঙ্গালী বনাম অবাঙ্গালী প্রভৃতির নানারূপ মুখরোচক তর্ক তুলি।

তর্কের খাতিরে আপাততঃ আমরা বাঙ্গালী ব'লতে বেশীর ভাগ লোক যা বুঝি অথচ প্রকাশ ক'রতে পারি না তাই মোটামুটি সাব্যস্ত করে নিয়ে দেখতে পাই একটা শিল্পের প্রসারতার সঙ্গে প্রাদেশিকতা খুব কড়াকড়ি রকম খাটান যায় না। ফিল্মশিল্প আজ বাংলার বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর অর্থ বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিশ্রমে উন্নত হয়েছে। কিন্তু যে সব তথাকথিত অবাঙ্গালীর চেষ্টায় উৎসাহে ও উদ্যমে বাংলার ফিল্মশিল্প অগ্রসর হয়েছে ও অনেকের অন্ন-সমস্যার সমাধান ক'রেছে, বাংলার স্বার্থের দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে তাদের এখন হেয় প্রতিপন্ন করে, একমাত্র বাঙ্গালীর চেষ্টায় সব হয়েছে এ কথা বলা ভুল হবে। আমি কারো নাম উল্লেখ ক'রে গাত্রদাহের সৃষ্টি ক'রব না, কিন্তু প্রায়ই আমরা দেখি যে আমরা অনেক কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত কাজ করে ফেলি। আমাদের কথায় ও কার্য্যধারার কোন ঐক্য পাওয়া যায় না। যে প্রতিষ্ঠান উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে "এ প্রতিষ্ঠান আমাদের নিজস্ব বাঙ্গালীর নিজস্ব, অতএব আসুন বাঙ্গালী আসুন আপনাদের নিজের প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যান"—তাদেরই মূলে দেখা যায় অবাঙ্গালীর অর্থ, অবাঙ্গালীর সাহায্য অবাঙ্গালীর পৃষ্ঠপোষকতা তাদের প্রধান ভিত্তি, কোন কোন স্থলে অবাঙ্গালীর নাম অবাঙ্গালীর খ্যাতি ও পরিশ্রম এ প্রতিষ্ঠানকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে। তবে হয়ত জিজ্ঞাসা ক'রবেন এত জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার আস্ফালন কেন? উত্তরে আমি ব'লতে চাই এই "বাঙ্গালী" "বাঙ্গালী" বলে চীৎকারে তিনটি স্বার্থ রহস্যানেই বিদ্যমান। প্রথমতঃ ভাব-প্রবণ বাঙ্গালীর সহানুভূতি লাভের প্রয়াস—ব্যবসায়ের দিকে এতে অবশ্য একটু সুবিধে আছে। দ্বিতীয়তঃ তারা ভাবেন এই চীৎকারে অবাঙ্গালীর নিকট বহু বহুপ্রকার ঋণ সাধারণের দৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসার বাহিরে চলে যাবে। এতে এক চক্ষু হরিণের মত একটু আত্মপ্রসাদও হবে যে আমরা বেশ নিরাপদে আছি কারণ অনেক স্থলেই তাঁদের ধারণা উত্তমর্ণকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব। এটা নিজের বিশ্বাসঘাতী প্রবৃত্তিকে ইন্ধন দিয়ে ক্ষণিক সুখানুভবের প্রয়াস। তৃতীয়তঃ এই চীৎকার নিজের স্বজাতীয় বা বাঙ্গালী বেতনভুক কর্ম্মচারীকে হস্তপদ বন্ধন ক'রে ন্যায্য প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করবার একটা হীন প্রচেষ্টা। ভাবপ্রবণ জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালী জনসাধারণ ও সমালোচকের চোখে ধুলো দিয়ে স্বজাতি উৎপীড়ন ক'রে স্বার্থসিদ্ধি করার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। অবশ্য একথা আমি স্বীকার ক'রব যে যাঁহারা "বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান" "বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান" বলে উচ্চকণ্ঠে অনুক্ষণ চীৎকার করেন তাঁদের সকলেরই যে তিন স্বার্থ তা নয় কম বেশী প্রায়ই তাঁদের এক বা একাধিক স্বার্থ দেখতে পাই।

যারা চীৎকার করেন না, তাদের মধ্যে কয়েকজনের মূলধন প্রধানতঃ বাঙ্গালীর বা মূলধন তথাকথিত অবাঙ্গালীর হ'লেও বাঙ্গালীর সঙ্গে মিশে তারা কারবার করেন। কিন্তু তাদের কারো কারো একটা inferiority complex আছে। যে কোন পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতীয় কিম্বা পশ্চিমভাবাপন্ন বাঙ্গালী হাওড়া ষ্টেশনে ইয়োরোপীয় পরিচ্ছদে সেখানে গেলেই মোটা বেতনে সমকক্ষ (বাঙ্গালীর অন্ততঃ তিন গুণ বেতনে) স্থায়ী কর্ম্মচারী হন—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর বিনা যোগ্যতায় বা বিনা পরিশ্রমে বাঙ্গলার অর্থনষ্ট ক'রে যান—আর পরিশ্রমী ও উপযুক্ত বাঙ্গালী কর্ম্মিগণ স্বল্পবেতনে কায় ক্লেশে খেটে কোনরূপে সংসার চালিয়ে হাঁ করে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে হয়ত বলেন—হা রে বঙ্গদেশ! তথাকথিত বাঙ্গালী ও

কালী ফিল্মস্-এর কৌতুক-চিত্র "রেশমী রুমালে"-র কয়েকটি দৃশ্য।

ওপরের ছবিতে বিভিন্নাংশে আছে—ডাঃ হরেণ মুখার্জ্জি, জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি সাবিত্রী (পক্ষী) কমলা, প্রভা, ঊষা দেবী, প্রকাশমণি প্রভৃতি। ছবিখানা শীঘ্রই এখানে দেখাবার ব্যবস্থা চল্‌ছে

ফিরে-পাওয়া কৈশোরের রাত

শ্রীকরুণাময় বসু

নারিকেল কুঞ্জতলে দেখা যায় সাগরের পাড়,
সবুজ জলের রেখা, সাগরের ফেনা আর ছায়া,
ধূসর পাহাড় শ্রেণী, সূর্য্যাস্তের উদাস বিস্তার
করুণ চোখের মতো বেদনায় আনে নীলমায়া।
ক্ষীণালোক গোধূলিতে আকাশের রূপালি গুঞ্জন
নিঃশব্দ ওপার হ'তে ভেসে আসে জলের মর্ম্মরে,
জোনাকির ঝিকিমিকি, ক্ষীণশব্দ কপোত কূজন
একখানি ছবি আঁকে মেঘ আর আলোর নির্ঝরে।
দূরে দূরে দেখা যায় লবঙ্গ ও জাফরান বন,
শীতল সবুজ গন্ধ ছায়াঢাকা আঙ্গুরের ক্ষেতে
আঁকা বাঁকা পথগুলি রূপসীর চোখের মতন
মিনতি আঁকড়ি ধরে পথিকের দূর পথে যেতে।
এখানে বসিয়া থাকি ঝিকিমিকি বালুকার তীরে,
স্রোত গুলি বয়ে যাক বহুদূর স্মৃতিহারা দেশে,
স্মৃতি? সেত' সত্য নয়, এই ম্লান সন্ধ্যাটিরে ঘিরে
কতো কথা মনে আসে, ছবি আঁকি কাহার উদ্দেশ্যে?
স্বপ্ন সব মুছে গেছে, কৈশোরের রোমাঞ্চিত রাত
এই স্বর্ণ-গোধূলিতে ফিরে বুঝি এসেছে দৈবাৎ।

খাঁটী বাঙ্গালী মালিক ও কর্ম্মকর্ত্তারা দেখেন না এ অনুপযুক্ত ও অযোগ্য ভিন্নজাতি স্পৃহায় কার লাভ?

খাঁটী বাঙ্গালী ও বঙ্গবাসী তথাকথিত অবাঙ্গালী মালিক ও কর্ম্মসচিবদের অধিকাংশ স্থলেই একজন সমালোচকের মতে প্রধান দোষ—'almost criminal weakness for rank aliens of doubtful merit'। বাংলার মাটীর এমনি গুণ যে আমরা মুখে যাই বলি মাঝে মাঝে ভুল ক'রে ঔদার্য্যে যীশু খ্রীষ্ট হ'য়ে বসি—এক গালে যে এক চড় বসায় তৎক্ষণাৎ তাকেই অন্য গাল ফিরিয়ে দিই। তা নাহলে যে ব্যক্তি স্পর্দ্ধা ক'রে ব'লেছিল ও কাগজে কাগজে লিখে বেড়িয়েছিল যে বাংলায় গল্প লেখক নেই। চিত্র-নাট্য প্রণেতা নেই, চিত্র পরিচালক নেই। তাকেই বাংলার বরণীয় প্রতিষ্ঠান বঙ্কিম চন্দ্র রবীন্দ্র নাথ 'ও শরৎ চন্দ্রের সাধের বাংলায় বাংলা ছবির গল্প লেখকের উচ্চাসনে পুষ্প-মাল্যে বিভূষিত করে বসিয়েছেন। ভেরী নিনাদে চৌদিকে প্রচার করেছেন যে সেই অবাঙ্গালী তথাকথিত গল্প লেখক বাংলার উল্লিখিত মণীষিগণের উচ্চতর বা তুল্য স্থান পেতে পারেন। গত বৎসরও আমি লিখেছিলুম "জানিনা বন্দেমাতরমের ঋষির পূত আত্মা এ দৃশ্য কেমন উপভোগ কচ্ছেন"। এক বৎসর চলে গেছে সেই বাঙ্গালী বিদ্বেষী তথাকথিত গল্প লেখক গোটাকতক পিপীলিকার ন্যায় সমালোচকের আস্ফালনকে তুচ্ছ করে বাঙ্গালী ও বাংলার সাধের প্রতিষ্ঠানের অর্থে পুষ্ট হ'য়ে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন ক'রে সর্ব্বসমক্ষে প্রণাম দিয়েছে যীশুর উপদেশ যদি কেউ পালন করে ত সে বাঙ্গালী ও বাংলার বরণীয় প্রতিষ্ঠান।

যে বিজাতীয় দুর্বৃত্ত ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী বঙ্গললনাকে প্রতিভাবান বাঙ্গালী স্বামীর স্নেহ পাশ হ'তে বিচ্ছিন্ন ক'রে পাশব বৃত্তি চরিতার্থ ক'রে নিয়ে বেড়িয়েছিল ও পরে দলিত-কুসুমের ন্যায় ফেলে দিয়ে লজ্জাবনত বাঙ্গালীকে ব'লে বেড়াত বাঙ্গালীর মধ্যে পুরুষ নেই—তাকে তথাকথিত অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানগুলি বাঙ্গালীর সম্মানার্থে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দেয় নি, ঘৃণা ভরে তার দিকে ফিরেও চায় নি. কিন্তু বাংলার বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান সকল বিষয় জেনেও নিষ্প্রয়োজনেও তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে ও বুঝিয়ে দিয়েছে বাঙ্গালী জানে আততায়ীর নিকট কেমন ক'রে গলা বাড়িয়ে দিতে হয়।

প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি ক'রে আর লাভ নেই। আমি আপনাদের শুধু বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে বাঙ্গালীর ও বাংলার ফিল্মশিল্পের স্বার্থই আমাদের প্রধান কাম্য। বাস্তবিক প্রয়োজন স্বার্থ ও উন্নতির জন্য অবাঙ্গালীর সাহায্য ও প্রচেষ্টা প্রত্যাখান করা বা অস্বীকার করা বাতুলতা। অবাঙ্গালীর ঋণ নিজের হীনতা ও সঙ্কীর্ণতার আবরণে ঢেকে অকারণ বাহাদুরি নেওয়ার চেষ্টা একটা মানসিক বিকৃতির পরিচয় মাত্র। সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ সামনে রেখে জাতীয় স্বার্থে অনুপ্রাণিত হ'য়ে শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে তবেই বোধ হয় সব দিক রক্ষা হয়।

সভ্যতায় বর্ব্বরতার বীজ !

শ্রীবিমল চন্দ্র ঘোষ

মানুষ তুমি উজলি ভূমি,—
কতনা খেল্ খেলালে !
সাজিয়ে সঙ্ মাখিয়ে রঙ্
কতনা ঢঙ্ দেখালে।
ছিলে শাখায় গিরি গুহায়
দিলে জনম সভ্যতায় ;
কতনা বেশ পরিলে গা'য়
সেকালে আর একালে,
সাজিয়ে সঙ্ মাখিয়া রঙ্
কতনা ঢঙ্ দেখালে ॥

একদা তাই বলিলে ভাই
পশুতে আর মানবে—
আছে তফাৎ লক্ষ হাত
দেবতা আর দানবে।
তবু যে হায় স্বার্থ দায়
ছদ্মবেশ ধূলে লুটায়,
পশুরও মন লজ্জা পায়—
মৃত্যুময় আহবে;
দেখিতে পাই তফাৎ নাই
দেবতা আর দানবে ॥

কেতাবে যাহা লিখিলে তাহ
কর্ম্মে কভু করনা,
সর্ব্বনাশা মনের ভাবা
মুখেতে কর ছলনা ;
সভ্য ব'লে কতনা ছলে
দুর্ব্বলেরে চরণ তলে
নিষ্পেষিত করিলে বলে ;
নাড়িয়া মিঠে রসনা
মৈত্রী বাণী শুনালে দানি
কেতাবে লেখা ছলনা ॥

তোমরা পুন বলিলে শুন,
মানুষ যত জগতে
কোরোনা চুরি, মেরোনা ছুরী
ভায়ের বুকে মরতে,
ভুলেও মনে পরের ধনে
কোরোনা লোভ, মরণ পণে
করিও ত্যাগ অসৎ জনে
বরণ করি' মহতে
একদা তুমি উজলি ভূমি
কহিয়াছিলে জগতে ॥

মনের মত ধর্ম্ম কত
রচিলে শত দেউলে,
দিবস রাতি দ্বন্দে মাতি'
প্রগতি পথে এগুলে,
মর্ত্ত্য'পরে দম্ভভরে
শানিত ছুরী ধরিয়া করে
চলেছ যেন পরস্পরে
সাপেতে আর নেউলে ;
দ্বন্দে রত দেবতা কত
রচিলে শত দেউলে ॥

শ্রীভগবানে জীবন-দানে
গড়িতে তুমি শিখালে
রচিয়া গীতি দেউলে নিতি
অমিয় বাণী বিলালে।
এপারে বসি' গ্রহের রশি
বরাতাকাশে বাঁধিলে কসি'
হেরিয়া নভে হাঁসিল শশী
অমিলে মিল মিলালে,
শ্রীভগবানে জীবন দানে
পূজিতে তুমি শিখালে ॥

আজিও তাই দেখিতে পাই
গড়িয়া নর-দেবতা,
ভাগ্য ঠুকে মরিছে দুকে ;
শিখালে তুমি যে কথা
জপিছে প্রাণে ; মোহের টানে
একূল হ'তে অকূল পানে
যাহার আজো হয়নি মানে
আজিকালের যে কথা
অজ্ঞতম মূর্খ সম
গড়িছে নর-দেবতা ॥

মর্ত্ত্যে তাই তুলনা নাই
তোমারি সেই কথাতে
নাই যে কূল লক্ষ ভুল
উল্টা ঠিক্ ধরাতে।
চলেছ ছুটি' ধরিয়া টুটি
নিরন্নের হরিয়া রুটি
কাঁদিছে তা'রা ধূলায় লুটি
দৈন্যে ভাঙ্গা বরাতে ;
বাহবা বাহা কতনা আহা
করিছ লীলা ধরাতে !
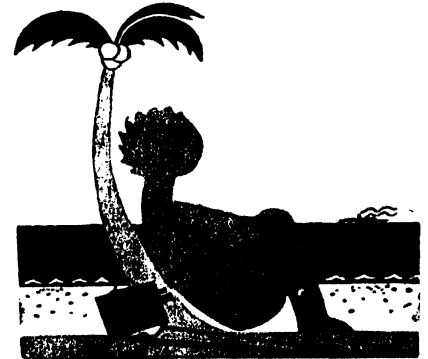
রঙীন ফানুষ

শ্রীসন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায়

পার্ক সার্কাসে কংগ্রেস্ একজিবিসন্ বসেছে। একে আমোদ প্রমোদ, আনন্দ উৎসব, তার ওপর রাজনৈতিক আন্দোলনের আমেজটুকু ত আছেই। আজ শনিবার, দলে দলে লোক, কেউ ট্রামে, কেউ বাসে, ভাড়া গাড়ী, ট্যাক্সিতে স্ত্রী-পুরুষ দল বেঁধে সকলেই কড়েয়ার দিকে ছুটেছে। এদের মধ্যে কলকাতার বাইরে থেকে, সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে যারা এসেছে, তা'দের মধ্যে অনেকেই হয়ত জানে না, একজিবিসন্ বস্তুটাই বা কি! কিন্তু উৎসাহ কারুরই কম নয়, গাড়োয়ানের দ্বিগুণ ভাড়ায় রাজী হ'য়ে, সাত সকালে দু'মুঠো ভাত মুখে গুঁজে, পুটলিতে কিছু আহার্য্য সংগ্রহ করে এরা সকলেই ছুটে এসেছে—জগতের আনন্দ বিতরণের বুভুক্ষু কাঙালী এরা।

বড়বাজারে এক পাইকারী মশলার দোকানে পাঁচুগোপালের খাতা লেখা কাজ। অন্ধকূপ গুদামের একপ্রান্তে বসে তেলের ডিবে জ্বালিয়ে সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্য্যন্ত যাবতীয় মাল আমদানি ও কাট্তির হিসাব পাঁচুকে রাখতে হয়। সন্ধ্যাবেলা কর্ত্তা এলে সারাদিনের হিসাব তাঁকে মোটামুটি বুঝিয়ে দিয়ে তবে সে ছুটী পায়। রবিবার দিন খালি দোকান বন্ধ থাকে, সেইদিন পাঁচুর ছুটী, এছাড়া তার একঘেয়ে, নিরানন্দ জীবনের আর ব্যতিক্রম নেই। মাস কাবার হ'লে বাইশ টাকা মাইনে তার বরাদ্দ, পূজোর সময় পার্ব্বনী বাবদ পাঁচ টাকা বেশী পায়।

আজ শনিবার হলেও দু'টোর সময় দোকান বন্ধ হয়েছে। কর্ত্তা'র অসুখ বেড়েছে, তাঁর ছোট ছেলে আজ দোকানে বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না, অগত্যা পাঁচুগোপাল ছুটি পেল। দোকান থেকে বেরিয়ে তার হঠাৎ একজিবিসনের কথা মনে পড়ল, পাশের বাড়ীর যতীনবাবু সেদিন মেলা দেখে ফিরে কত গল্প করছিলেন, মোমের মানুষ, পুতুল নাচ, কলের ঘোড়া, আরও কত কি। পকেটেও খুচরো ক'আনা পয়সা রয়েছে, তরুদি' উল কিনতে দিয়েছিল, ভাবলে এখনও ট্রামে উঠে পড়া যাক, পয়সা পরে শোধ করলেও চলবে। পাঁচু যখন পার্ক সার্কাসে পৌছল তখন প্রায় তিনটে বাজে। চারিদিক লোকে লোকারণ্য, গাড়ী-ঘোড়ার বিষম ভিড়, এত ঠেলাঠেলির মধ্যে চলাও মুস্কিল। আট আনা পয়সা প্রবেশ মূল্য দিয়ে সে যখন একজিবিসনে ঢুকল তখন তার পকেটে একটা কপর্দ্দকও নেই। তা হোক্, সে ত আর বড়লোকের মত এখানে জিনিষ কিনতে আসেনি, পাঁচটা জিনিষ দেখতেই এসেছে।

গেট্ দিয়ে ঢুকে সামনেই নজরে পড়ল উঁচু কাঠের মঞ্চের ওপর বিরাট এক কাগজের হাতী—হাতীর পেটের ভেতর বসে কয়েকজন লোক রোশনাই বাজাচ্ছে—তা'দের মাথায় জরীর তাজ পরা গায়ে লাল কোর্ত্তা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে পাঁচু খানিকক্ষণ তাই দেখলে। কী মিষ্টি আওয়াজ, চৌধুরীদের বিয়ে বাড়ীতেও তো সে অনেকবার রোশনাই শুনেছে, কিন্তু এর কাছে সে বাজনা লাগেই না। আর একটু এগিয়ে যেতেই মস্ত এক দেবদারু গাছের তলায় পাল খাটিয়ে কোন মাড়োয়ারী সমিতি জল বিতরণ করছে। দুপুর রোদে এতটা পথ এসে পাঁচুর জল তেষ্টা পেয়েছিল, আঁজলা ভরে যতটা পারে জল খেয়ে নিয়ে পাশেই গাছ তলার একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। একজিবিসন্ ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না, পয়সা দিয়ে ঢুকেছে যখন ধীরে সুস্থে দেখলেই হবে—বরং একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক্।

সামনে মস্ত কাপড়ের দোকান, কাঁচের শো-কেসের ভেতর হরেক রকমের সাড়ী সাজান রয়েছে, বেশীরভাগই সিল্কের, জমিতে ঘন জংলা কাজ; কালো মতন চোখে চশমা পরা একজন দোকানদার হলদে কাগজের বাক্স থাকে থাকে সাজিয়ে রাখছে। পেছনে একদল মেয়ে সঙ্গে এক প্রবীন ভদ্রলোক দোকানে ঢুকলেন। চশমা পরা দোকানদারটীর মুখে কাষ্ঠ আপ্যায়িতের হাসি, ব্যস্ত সমস্ত হয়ে মেয়েদের বসবার জন্য চেয়ার এগিয়ে দিলে।

সকলের পেছনে লাল সাড়ী-পরা মেয়েটির মাথার চুল এলো খোপায় জড়ান, প্রায় কাঁধের ওপর নেমে এসেছে কাণের লম্বা দুলের ঝুম্কোর শেষ-প্রান্তটুকু খালি চুলের ফাঁকে দেখা যায়, কোমরের কাছ দিয়ে আঁচলা পিঠের দিকে উঠে গিয়েছে, পায়ে সাদা চামড়ার হিলতোলা চটী। ঘাড়ের ওপর ঝুরো ঝুরো চুল এসে পড়েছে, তার ওপর মোটা সাদা বেলফুলের মালা—মুখটা ঠিক যেন আরবী ঘোড়ার পিঠে রাজপুত্রের পাশে সাহ'জাদার মত—চারপাশে কারবাইড্ ল্যাম্প জ্বলছে, সব আলোর আলো। বরণডালার ওপর ঘিয়ের দীপ, মঙ্গল ঘট, শ্বেতশঙ্খ...গালের ওপর যেন আগুনের তাপ লাগল। চারিদিকে কী ভীষণ হৈ চৈ, অফুরন্ত কলরব, বহুদূরে—সব অস্পষ্ট...রাত্রের অন্ধকারে কপালের চন্দন ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা, মিষ্টি বেলফুলের গন্ধ, লাল সাড়ীর আঁচল-খানা সাদা ধবধবে বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে...মুখে চাপা দিয়ে কাশতে কাশতে

সেদিন দোকানের বিশু চাকরটার কাপড়ে যেমন রক্তের ছোপ লেগে গিয়েছিল···

"অ লতি, ওখানে অমন করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? অত হাঁ করে কি দেখছিস্‌ ?"

আশার ক্ষণ-ভঙ্গুর স্বপন বাস্তবের কঠিন স্পর্শে নিমেষে চূর্ণ হল!

* * *

"কি, কি···কিছু···ম-মনে···ও! তা-তাইত!

ডামির গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, গলায় কোঁচান চাদর ঝোলান, পরিপাটি করে কাপড় পরা—যেন কেতা'দুরস্ত নব্য যুবকটি। সুবাসিত কেশ তৈলের বিজ্ঞাপন—একহাতে তেলের বোতল, অপর হাতে ছড়ি। পাঁচু একটু অন্যমনস্ক হয়ে, আর একটু হ'লেই ঘাড়ে পড়েছিল আর কি! চোখ মেলে, চারিদিক দেখতে দেখতে হাটায় যথেষ্ট বিপদ আছে। ভদ্রলোকটির কী ভীষণ ভুঁড়ি, তার ওপর কত মোটা সোনার চেন্‌ ঝুলছে পেছনের অদয়ায় শীর্ণ মেয়েটি বোধহয় ওর কন্যারত্ন। অগাধ সম্পত্তি, ফেলোয়া কারবার, অমন দশ বিশটা ঘড়ি, ঘড়ির চেন্‌ কেননা নিশ্চয়ই দেবে। বিকেলে মোটরে করে গঙ্গার ধারে হাওয়া খাওয়া···ভগ্নস্বাস্থ্য, অত অত্যাচার চলবে না···সূক্ষ্ম কাশ্মিরী শাল, ছোটবাবুর বিয়েতে পাল মশাইরা যেমন দিয়েছিল, হাঁটুর ওপর থেকে পায়ের নীচে অবধি ঢেকে থাকবে...সজল, করুণ চোখ দু'টি মিনতি ভরা, গালে ম্লান পাণ্ডুর আভা···গ্যাস্‌ পোষ্টগুলো শন্‌ শন্‌ করে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে...না ওকে ছেড়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব···পাঁচু সস্নেহ আদরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলবে, "তোমার ভাবনাই বা কিসের? পৃথিবীর কোন সুখেরই ত অভাব নেই আমাদের। দেখ, তোমায় আমি কত ভালবাসি—ছিঃ কাঁদ কেন?" অক্লেশে এই রকম কত কথাই সে বলে যাবে-প্রত্যেকটা কথা উচ্চারণ করতে সে অসহ্য মানসিক উদ্বেগ, সে নিদারুণ যন্ত্রণা আর নেই, যাতে তার সাধারণ, দৈনন্দিন জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠেছিল।···

ভদ্রলোকটি একজায়গায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তাঁতে সুতো বোনা দেখছিলেন, বেশী লোক জমতে দেখে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন।

পাঁচুর একজিবিসনে এই রকম লোকের ভীড় ঠেলে টো টো করে ঘুরতে আর ভাল লাগছিল না। একটা সুবিধে গোছের বসবার জায়গা পেলে চুপ করে বসে হরেক রকম লোকের শোভাযাত্রা দেখে ঢের বেশী আনন্দ পাওয়া যেত। কত নানা ধরণের লোক যেন উদ্বাস্ত হয়ে ভীড় ঠেলে উদ্দেশ্যহীনের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশীর ভাগ লোকই বেশ-ভূষার পারিপাট্যের দিকে রীতিমত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে বলে মনে হয়, পাঁচুর গায়ে কিন্তু কোরা মার্কিনের অর্দ্ধমলিন সার্ট, গলায় অর্দ্ধেক বোতাম নেই, কাপড়টা অনেকদিন হল ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবে মনে করেছিল, কিন্তু রবিবার ছাড়া সময়ই হয়না, এমন জান্‌লে কে আজ একজিবিশন্‌ দেখতে আসত? হেঁট হয়ে চলতে চলতে পায়ের জুতোটার দিকে নজর পড়ল—নাঃ এ জুতোটা দিয়ে আর কতদিন চলবে? এত চারিদিকে ছিঁড়ে গিয়েছে আর মেরামত করাও যায় না, অথচ নতুন কেনবারও পয়সা নেই। গেল মাসে অনেক কষ্টে দুটো টাকা জমিয়েছিল, আর একটা কাপড় না কিনলেই নয়, তাও খরচ হয়ে গেছে।

পাশেই একটা বড় মার্ব্বেল পাথরের দোকান। লাল সালুর ওপর তুলো দিয়ে ফার্ম্মের নাম লেখা রয়েছে, ইটালিয়ান্‌ হবে বোধ হয়, নামটা পড়া পাঁচুর বিদ্যের কুলোয় না। কত সুন্দর সুন্দর পাথরের কাজ, প্রতিমূর্ত্তি, মানুষ ও জন্তুর, ছেলেদের নানা ধরণের খেলনা পাশাপাশি সাজান রয়েছে।

তুমি এসো আজি মনের আঙিনা বাহি

বন্দে আলী মিয়া

জীবনের মোর বিজন-গহনে
কে তুমি বাজালে বীণা
মনে পড়ে মোর কবে শুনেছিনু
সুর যেন তার চিনা,
বসি বাতায়নে ছিনু আনমনে
তোমার হেরিনু পথে
গুঞ্জরি গীতি তরুণী পথিক
চলেছো অরুণ রথে।
ভাবি আর চেয়ে দেখি বারবার
কবে যেন তুমি ছিলে আপনার
তোমাতে আমাতে আজিকে হে প্রিয়া
নহে কভু পরিচয় ;
কালে আর কালে জনমে জনমে
ছিনু আমি তোমাময়।

তোমার মনের ভাঙিয়াছে ঘুম
মোর মৃদু পরশনে
তাই বুঝি তব বেপথু পরাণ
শিহরায় খনে খনে,
তুমি বাজায়েছ বীণাখানি তব
আমি গাহিয়াছি গান
একদা দু'জনে ছিনু পাশাপাশি
আজি মরু ব্যবধান।
তুমি ভুলে গেছ সে দিনের কথা
মোর মনে তাহা আনে আকুলতা
নিরজনে আজ সপ্ত সাগর
বুক মোর উথলায়,
জীবনের স্রোতে যারা এলো ভাসি.
তারা আজ নাহি হায়।

বাতাসে বাতাসে অশেষ হরষ
রঙ লাগিয়াছে নভে
ফুলেতে পাতায় জেগেছে কামনা
সাজি মধু উৎসবে,
বন বীথিকার আঙিনা আজিকে
সবুজে গিয়াছে ভরি
আজ তুমি এসো হে প্রিয় বন্ধু
সুর তোলো গুঞ্জরি' ;
সে দিন তোমারে যে-কথা বলিনি
সেই সুরে তব বাজে কিঙ্কিনী
হেথা দুইজনে বসি মুখোমুখি
চোখে চোখে রবো চেয়ে
তুমি এসো কাছে আমার মনের
আঙিনার পথ বেয়ে।

একজন সাহেব, দোকানদারই হবে বোধ হয়, ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পাঁচুর ঢুকতে সাহস হল না। দু'জন তরুণী একটি ছোট ছেলের

হাত ধরে দোকান থেকে বেরুল, শাড়ী-পরা অথচ যেন মেম মেম ভাব, বাঙ্গালী কিনা ঠিক বোঝা গেল না। দু'জনের মধ্যে একজন একটু বেশী লম্বা, একজন পরেছে চাঁপাফুল রঙের সিল্কের শাড়ী, আর একজন ময়ূরকণ্ঠি, জরির ফুল-তোলা পাড়। তাড়াতাড়িতে একজনের আড়ালে পড়ে মুখটা ভাল করে দেখাই গেল না—সামনে এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে দেখায় চূড়ান্ত অসভ্যতা। অগত্যা পাঁচু তাদের ঠিক পেছনে পেছনেই চলতে লাগল। ভিড়ের মধ্যে মেয়েমানুষের, অপরিচিত হলেও, কাছে কাছে চললে ততটা অশোভন দেখায় না।

'চাঁপা': "সুজিৎ বাবুর কী আক্কেল! একসঙ্গে বেরুবেন বলেছিলেন, আসলে কি অপমান হত?"

'ময়ূরকণ্ঠি': "আমায় কিন্তু আগে থেকেই খবর পাঠিয়েছিলেন, রোটারী ক্লাবে কি মিটিং আছে, ৫টার মধ্যে ফেরা অসম্ভব।... আমার ঐ কালো এবনাইটের ম্যাডোনাটা কেনবার ভারী ইচ্ছে হয়েছিল—যা দাম!"

'চাঁপা': "তোকে আবার কখন খবর দিলেন? আমি ওসব attitude-এর কোন অর্থই বুঝি না। রোটারী ক্লাব থাকলেও আমাদের engagement-ও আগে ঠিক হয়েছিল।"

'ময়ূরকণ্ঠি': "এতে তোমার দোষ ধরা মোটেই উচিত নয়—ক্লাবে আজ চীফজাষ্টিস্‌কে নাকি At home দেওয়া হচ্ছে। নিজের ভবিষ্যতের দিক ত আগে দেখতে হবে।"

পাঁচু আশ্চর্য্য হয়ে কথোপকথন শুনতে শুনতে চলছিল...মাঝে ছাই সব কথা শোনাও যায় না, লোক যা ঘাড়ের ওপর পড়ে—কি বিশ্রী গোলমাল।

ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে কেমন মজা হয়, কিন্তু তা কী করে সম্ভব। ছোট ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, মাঝে মাঝে মুখ তুলে এটা ওটা কি জিজ্ঞেস্ করছে। আচ্ছা ভিড়ের মধ্যে ছেলেটা যদি হঠাৎ হারিয়ে যায় কিংবা হঠাৎ যদি মেয়ে দুটিকে গুণ্ডায় তাড়া করে! সে সকলের আগে গিয়ে বুক দিয়ে পড়ে ওদের উদ্ধার করবে, যে রকম করে পারে ছেলেটিকে খুঁজে এনে দেবে। মেয়ে দুটির চোখে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি, হাত ধরে ওকে কত ধন্যবাদ দেবে। পাঁচু ওদের বুঝিয়ে বলবে কৃতজ্ঞ হবার কিছুই দরকার নেই, সাধারণ ভদ্রতার খাতিরেই সে ওটুকু কষ্ট স্বীকার করেছে, তাও বা এমন কি আর? 'ময়ূরকণ্ঠির' সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিনিময় হবে, অল্প একটু ঠোঁটের কোনে হাসি টেনে 'চাঁপা' ওর হাত ধরে চায়ের দোকানে একসঙ্গে গিয়ে বসবে।

পুতুল নাচ হচ্ছে—সকলেই দেখবার জন্যে উৎসুক, কি বিষম ঠেলাঠেলি—এক বৃদ্ধর হাত থেকে কী কতকগুলো কাগজে-মোড়া জিনিষ মাটিতে পড়ে গেল, পাঁচু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জিনিষগুলো ভদ্রলোকটির হাতে তুলে দিলে। বৃদ্ধ একটু হাসলেন মাত্র, "থাক্, থাক্, আমিই নিচ্ছি। হাঁ করে পেছন ফিরে চলেছে, উজবুক দেখতেও পায় না। কানা নাকি!"

ছোট ছেলেটি একটা পানওয়ালার পাশে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে পুতুল নাচ দেখবার বৃথা চেষ্টা করছে। মেয়েদুটি অন্যমনস্ক হয়ে কথা কইতে কইতে এগিয়েই চলেছে। পাঁচু একটা দোকানের আড়ালে দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ছেলেটি তখনও উৎসুক দৃষ্টিতে পুতুল নাচের 'রাবণ বধ' দৃশ্য দেখতে মহা ব্যস্ত। আরও খানিকদূর গিয়ে হঠাৎ 'চাঁপা' ফিরে দাঁড়াল, ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক দেখছে! 'ময়ূরকণ্ঠি' পাশের দোকানে যেখানে বিনামূল্যে তেলের স্যাম্পেল্ বিতরণ হচ্ছে সেই দিকে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেল। পাঁচু চট্ করে গিয়ে ছেলেটির হাত ধরলে বল্লে, "খো...খোকা ত-ত তুমি হারিয়ে-গে-গেছ?" খোকা অবাক হয়ে খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর হঠাৎ ব্যাপারটা যেন বুঝতে পেরে কেঁদে উঠল। পাঁচু আর দেরী না করে, একরকম টানতে টানতেই ছেলেটিকে নিয়ে 'ময়ূরকণ্ঠির' কাছে হাজির করলে। 'চাঁপা' দূর থেকে ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। ছেলেটির গালে মৃদু একটা চড় মেরে বললে, "দুষ্টু ছেলে তুমি যেখানে সেখানে চলে যাও কেন?

অপরিচয়

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যে কোনো দিনের যে কোনো' খনে
বাহিরে আসিলে অকারণে,
কত সে জনতা ফেরে দেখি
রাজপথ' পরে আনমনে।
কেহ বা সুখী কেহ বিষণ্ণ,
যৌবন জরা-অনুগামী—
ধনী, দরিদ্র, ভালো বা মন্দ,—
কাহারেও নাহি চিনি আমি।

জানিতে ভারী সাধ হয় মনে
অজানা যত নরনারী,
যা'দের দেখি এবেলা ওবেলা
নিত্য ধরার পথচারী।
চিনিতাম যদি অপরিচিতরে—
সার্থক হ'ত আমার প্রাণ,
তাদের ব্যাকুল সুখের শোকের
করিতাম মধু গরল পান।

কত বিচিত্র হায় ধরিত্রী!
পূর্ণ অথচ শূন্য—
কত বড় ফাঁক জীবনে আমার
ব্যবধানবোধে ক্ষুণ্ণ।

তোমায় আমি একশ' বার বলেছি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।" 'ময়ুর ষ্ঠি' ছেলেটিকে কাছে টেনে আদর করে বল্লে, "আহা ওকে মারছ কেন? এই ভিড়ের মধ্যে বড়ো লোকই হারিয়ে যায়, তা ওতো ছেলে মানুষ। না রবি তুমি কেঁদনা, চুপ কর।"

পাঁচু হতভম্বের মত চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিল, 'চাঁপা' এগিয়ে এসে তার আপাদ-মস্তক বেশ করে নিরীক্ষণ করে বললে, 'তুমি রবিকে কোথায় দেখতে পেলে, কি করছিল ও? আমরা খুঁজছিলুম দেখে বুঝি তুমি ওকে কাঁদতে দেখে আমাদের কাছে নিয়ে এলে?'

পাঁচু তখনও নির্ব্বাক, আশার স্বপন এমন ভাবে কার্য্যে পরিণত হতে দেখে সে কাঁদবে কি হাসবে, কিছুই ঠিক করতে পারছিল না। 'ময়ুরকণ্ঠী' তাকে উদ্ধার করলে। ছেলেটির মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে, "লোকটি রবিকে বুদ্ধ করে আমাদের কাছে ধরে না নিয়ে এলে আমাদের কি বিপদেই পড়তে হত বল দেখ। এই লোকে-লোকারণ্য, এর মধ্যে ছোটছেলেকে খুঁজে পাওয়া কি সহজ কথা।" পাঁচুর দিকে চেয়ে বল্লে, "তুমি আজ যা আমাদের উপকার করলে তা আমরা বলে বোঝাতে পারব না। তুমি যখন ওকে দেখতে পেলে তখন কি রবি আমাদের দেখতে না পেয়ে কাঁদছিল?" পাঁচু নিঃশ্বাস চেপে মুখ লাল করে কোনরকমে বলে ফেলল, "হুঁ"।

তারপর 'চাঁপা' আর 'ময়ুরকণ্ঠি' নিজেদের ভেতর খানিকক্ষণ কি বলাবলি করলে, পাঁচু তখন মনের ভেতর ভাজছিল কী বলে মেয়ে ছুটির সঙ্গে সে ভাব করবে।

'চাঁপা' তার হাতের ভ্যানিটিব্যাগ খুলে একটা টাকা পাঁচুর হাতে গুজে দিয়ে বললে, "তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছ কিন্তু এর বেশী আর আপাততঃ কিছু দিতে পারলাম না বলে কিছু মনে কোরো না…" 'চাঁপা' আরও কি বলতে যাচ্ছিল, 'ময়ূরকণ্ঠি' বলে উঠল, "ঐ নীলিমাদিরা যাচ্ছে না? অসিতবাবুও সঙ্গে এসেছেন দেখছি। চল, ওদের ধরা যাক্, এখুনি আবার ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

পাঁচু নিষ্পন্দ নির্ব্বাক হয়ে কাঠের প্রতিমূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল, একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরুল না। তার হাতটা ঝি ঝি করে জ্বলে উঠল, মনে হল হাতের ওপর কে যেন একটা জ্বলন্ত অঙ্গার ফেলে দিলে। ছি, মেয়েদুটি তাকে কী ভাবলে, বেশভূষা দেখে হয়ত মনে করে থাকবে লোকটা ভিখারী, কিছু পাবার আশায় হয়ত অমন উপযাচক হয়ে ছেলেটাকে খুঁজে দিয়ে গেল। টাকাটা কেন সে নির্ব্বোধের মত হাত পেতে নিলে, কেন সে ছুড়ে ফেলে দিতে পারলে না?… চেঁচিয়ে বলে উঠতে ত পারত, "ওগো আমি দীন দুঃখী হলেও তোমাদের কাছে ভিক্ষার লোভে আসিনি। তোমাদের দেখে আকৃষ্ট হয়ে দুটো মিষ্টি কথার আশায় তোমাদের সামান্য উপকারটুকু করেছি।" সেজন্য তোমাদের এমন করে অপমান করবার ত অধিকার ছিল না, এই রকম কত কথাই তার বলবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সবই অব্যক্ত রয়ে গেল, নীলকণ্ঠের গলায় তীব্র হলাহলের মত সেই বাক্যগরল অসহ্য জ্বালা সয়েও তাকে কণ্ঠেই ধারণ করতে হল।

রাত্রি হয়ে এসেছে, দোকানে দোকানে, গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে, চারিদিকে আলোর রামধনু সৃষ্টি হয়েছে। পাঁচু আর চলতে পারছিল না, মনে করেছিল সামনে যেমনি কোন বসবার জায়গা দেখতে পাবে, আগে গিয়ে বসে ক্লান্ত পা দুটোকে একটু বিশ্রাম দেবে। হঠাৎ তার পিঠে কে মৃদু ধাক্কা দিলে, আশ্চর্য্য হয়ে পেছন ফিরে দেখে…

"মাইরি, কতক্ষণ থেকে এই ভিড়ের মধ্যে ঘুরছি, একলা আর ভাল লাগে না, চলনা বাড়ী ফেরা যাক্। হাঁ করে চেয়ে রইল, ন্যাথ! ··ন্যাকা!···কিছু জানে না। বলে "জন্ম গেল ধান ভেনে···"

পাঁচু কোন কথা না বলেই তার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হল—খালি মনে পড়ছিল তার 'চাঁপার কথা···মুখে কী রকম একটা চারু কমনীয়তা...ঈষৎ উদ্ধত হলেও কথায় কী শান্ত মাধুর্য্য...গলায় সরু সোনার হার চিক্ চিক্ করছে, বাদামী রঙের লকেটটার ওপর কী যেন লেখা ছিল...বুকে ব্লাউজের নীচে রুমাল রাখে কেন?...কি মিষ্টি গন্ধ, কে একরাশ জুঁই ফুল যেন ডালা উজার করে সামনে ঢেলে দিলে।···মুখে কিসের একটা কাটা দাগ...কতকগুলো ব্রণ উঠে শ্রীহীন মুখটাকে যেন আরও কুৎসিত বীভৎস করে তুলছে...দাঁতে কালো রঙের ও কিসের ছোপ?...'ময়ূরকণ্ঠি' হাসলে ঠোঁটের পাশে গালের ওপর কি সুন্দর একটি ছোট টোল খায়...

দুর্গন্ধময়, পচা পুকুর—ছোট, সরু অন্ধকার গলি...একজিবিসনে ঢুকতে কত বড় একটা আলোর ডোম্ জ্বলছিল। চাওয়াই যায় না, চোখের ভেতর কী রকম করতে থাকে। গ্যাসের পরিমিত আলোয় যতদূর বোঝা যায় পাশেই কতকগুলো সারবন্দি খোলার ঘর। মাথা নীচু করে তবে ঘরের ভেতর ঢুকতে হল...তেলমশলা ও কেয়াখয়েরের মিশ্রিত গন্ধ—দরজার কাছে একটা হারিকেন জ্বলছে—চারিদিক কী ভয়ানক স্তব্ধ। একজিবিসনের দারুণ হট্টগোল আর কানে আসে না।

"চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন গো? বিছানা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না, এদিকে এতক্ষণ ধরে বসবার জায়গা ত খুঁজছিলে। বস স্থির হয়ে, আমি আসছি।"

* * *

দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পাঁচুর সমস্ত শরীর যেন টলছিল। পায়ের শিরাগুলোর যেন রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে—মাথার ওপর কে একটা বিশ মন ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়েছে।

"আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়া গিয়েছে। তুমি এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছ? দেখ, মুখে একটাও কথা নেই—তুমি বোবা নাকি গা।

গলায় কিসের নরম, শীতল স্পর্শ—আবার সেই অসহ্য মাথা ঘষার গন্ধ—গন্ধটা ওকে পাগল করে দেবে নাকি—কপালে কা.ল.া উল্কির টিপ, চুলের তলায় কপালের ওপর তেল চক্ চক্ করছে, . . হিংস্র লোলুপ দৃষ্টি।

পাঁচু আর সহ্য করতে পারছিল না হাতের মুঠোর মধ্যে সে রৌপ্য অঙ্গার তখনও জ্বলছে। জোর করে বিছানার ওপর টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দি.য় মাতালের মতন টলতে টলতে সে দরজা দিয়ে অন্ধকার গলির পথে বেরিয়ে পড়ল।

রাস্তায় নেমে তার কানে গেল, কে যেন বলছে, "বলি হ্যালো চাঁপা, তোর বাবু এরি মধ্যেই চলে গেল। মিন্‌সে কিছুই দিলে না বুঝি?"

পৃথিবীর বাস্তব জীবনে অবাস্তবের কতকগুলো রঙীন স্পর্শ বড়ই বিসদৃশ্য বোধ হল।
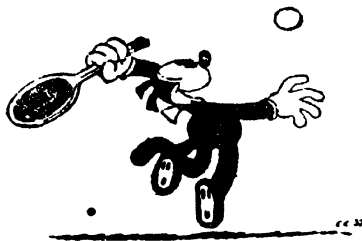
সাতরাজার ধন-মাণিক!

=শ্রীচিত্রগুপ্ত বিরচিত=

জানালার শার্সী ঝনঝন্ করিয়া ভাঙ্গিয়া একটি বল আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িল !...

আসন্ন তন্দ্রার মায়া কাটাইয়া রায়-গিন্নি উঠিয়া গিয়া ভাঙ্গা শার্সীর মধ্য দিয়া পথের দিকে তাকাইলেন,—কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাগে গজ গজ করিতে করিতে বলটি তুলিয়া রাখিলেন। বলের অধিকারী বল লইতে আসিলে ভাল-ভাবেই জানিয়া যাইবে কাহার কাঁচ সে ভাঙ্গিয়াছে !...সহরের বাড়ী ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের খর্পরে পড়ার ফলে শহরের উপকণ্ঠে এই বাড়ীটি কিনিয়া কয়েকদিন হইতে তিনি বাস করিতেছেন কিন্তু ইতিমধ্যেই পাড়ার লোকে তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আড়ালে রায়বাঘিনী বলিয়া ডাকিতে সুরু করিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে দরজায় ভীরু করাঘাত শুনিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া তিনি কট্‌মট্ করিয়া তাকাইলেন। একটি ছেলে। ছেলেটি কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "বাবা আস্‌চেন্ আপনার শার্সীর কাঁচ পরিয়ে দিতে। অসাবধানে আমিই ওটা ভেঙ্গে ফেলেছি।"

বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সে রাস্তার মোড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। রায়-গিন্নী দেখিলেন একখানি বড় কাঁচ এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম হাতে লইয়া একটি লোক সত্যই তাহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে। চোখা-চোখি হইতেই ছেলেটি চেঁচাইয়া বলিল, "এই বাড়ী।"

ক্ষতিপূরণের আশ্বাসে এবং অপরিচিত ছেলেটির সদ্বিবেচনা ও সত্যকথনে খুসী হইয়া রায়-গিন্নী তাহাকে বলটি ফিরাইয়া দিলেন। ছেলেটি আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল।

লোকটি আসিলে রায়গিন্নী তাহাকে ভাঙ্গা শার্সী দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "বেশ ভালো ক'রে এটে দিও বাপু।"

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া মাপিয়া কাঁচ কাটিয়া জানালার কাঠ চাঁচিয়া পিন্ দিয়া কাঁচ পরাইয়া পুটিং দিয়া আঁটিয়া মায় স্পিরিট দিয়া কাঁচের উপর হইতে নিখুঁৎ করিয়া পুটিংএর দাগ উঠাইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম লোকটি বলিল :—

"পুরোপুরি আট আনাই দেবেন মা।"

রায়-গিন্নী আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন, "তার মানে ?"

লোকটি আমতা আমতা করিয়া বলিল :—

"আপনার ছেলে অবিশ্যি আমায় বলেছিল, মা ছ'আনার বেশী দেবেন না। কিন্তু দোকানে আমি একগাদা হাতের কাজ ফেলে আপনি ডেকেচেন বলে আগে ছুটে এলুম—আর খাটুনিটা নিজের চোখেই দেখলেন তো !"

"আমার ছেলে !" রায়-গিন্নী কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।...

(২)

ছেলেটীর নাম মাণিক। গরীব বিধবা দিদিমার একমাত্র নাতি। পিতামাতা নাই—পাড়ার স্কুলে সে বিনা বেতনে পড়িত। একদিন হেডমাষ্টার মহাশয়ের নিকট কি একটা নতুন রকমের বুদ্ধির পরিচয় দেওয়ার ফলে তিনি তাহাকে স্কুলে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই হইতে সে দুপুর রৌদ্রে বল খেলিয়া, ফল পাড়িয়া মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার রায়-গিন্নী এবং ছবি-বাঁধাই-ওয়ালাকে বোকা বানানোর কাহিনী শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে সে লোকের ভালো করে না। সময় সময় সে গায়ে পড়িয়া লোকের খুব ভালোও করিয়া থাকে। একদিনের

শ্রীমতী সাধনা বসু

শিক্ষা, দীক্ষা, আভিজাত্য ও বংশ গৌরবে ইনি গৌরবান্বিতা। নাচে ও গানে ইনি সমপারদর্শিনী। ভারতলক্ষ্মীর হাস্যগীতমুখর "আলিবাবা" ছবিতে এর বহুবিখ্যাত ভূমিকা মঞ্চিনাতে প্রথম চিত্রাবতরণ কোরবেন। মধু বোস এর পরিচালক।

কাহিনী বলি, "সেদিনও এইরকম গ্রীষ্মের দুপুর। নিয়মিত দ্বিপ্রাহরিক ভ্রমণের সময় একটি বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে মাণিক দেখিল ঠিক সদর দরজার উপর একটি লোক একটি আলমারী লইয়া ধস্তাধস্তি করিতেছে কিন্তু ভারী আলমারীটাকে একটুও নড়াইতে পারিতেছে না। দেখিয়া মাণিকের মনে দয়া হইল। সে আগাইয়া গিয়া বলিল, "কি দাদা একলা যে এটাকে নিয়ে ঘেমে উঠ্‌লেন। হাত লাগাবো নাকি?" লোকটি যেন বাঁচিয়া গেল। সে তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। মাণিক মহোৎসাহে হাত লাগাইয়া দিল। কিন্তু আলমারীটা বোধ হয় বড্ড ভারী ছিল। তাই ঘন্টা খানেক ধরিয়া দুজনে দুইদিক ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও সেটাকে এক ইঞ্চিও নড়াইতে পারিল না। শেষে হতাশ হইয়া লোকটি বলিল, "না ভাই বৃথাই তোমায় খাটালুম এটা ঘরে আর ঢুকবে না, এইখানেই পড়ে থাক্‌।"

মাণিক অবাক হইয়া বলিল, "সেকি দাদা আমি যে ঘন্টাখানেক ধ'রে এটাকে বাইরে বার করতে চেষ্টা করলুম! এ্যাঃ আগে বল্‌তে হয়।"

তাহার কথা শুনিয়া লোকটি ঘুসি তুলিয়া তাহার দিকে আসিবার উপক্রম করিতেই সে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

(৩)

এই ভাবেই মাণিক দিনে দিনে শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছিল কিন্তু সহসা বিধাতার মনে কি খেয়াল হইল, তিনি মাণিকের সহিত একটু রসিকতা করিয়া ফেলিলেন, অর্থাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার একটি চাকুরী জুটাইয়া দিলেন।

সেদিন ছিল রবিবার। মাণিক সকালবেলা কি একটা মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া পাড়ার দয়াল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। দয়ালবাবু ছিলেন সুরসিক ব্যক্তি এবং পাড়ার সকলের সরকারী ঠাকুর্দ্দা। মাণিক যাইতে যাইতে হঠাৎ তাহার নজরে পড়িয়া গেল। ঠাকুর্দ্দা তাহাকে দেখিতে পাইয়া কাছে ডাকিলেন। মাণিক আসিয়া কাছে দাঁড়াইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকালবেলা কোথায় চলেছিস?"

ঠাকুর্দ্দা মাণিককে একটু স্নেহের চোখে দেখিতেন।

মাণিক প্রশ্নটা এড়াইবার জন্য ঢোক গিলিয়া বলিল, "এই একটু ইয়েতে—মানে ইয়ে। আপনি কেমন আছেন?"

ঠাকুর্দ্দা সুখে ছিলেন না। তাঁহার ছেলেগুলি একটিও মানুষ হয় নাই—মাতাল গেঁজল হইয়া বাড়ী ছাড়িয়াছিল। মেয়েগুলিকে তাহাদের শাশুড়ীরা ছেঁচকি পোড়া করিয়া ইহলোক হইতে বিদায় দিয়াছিলেন। থাকিবার মধ্যে তাঁহার গৃহে ছিলেন একমাত্র ঠাকুরমা। তা তিনিও এমন যে তিনি না থাকিলেই ঠাকুর্দ্দা ভালো থাকিতেন।

মাণিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, "দেখ, অনেক কষ্টে সংসারে সুখ খুঁজে পেয়েছিলুম, তা এখন আবার তাতেও গোল বেধেছে। সংসারে যখন দেখলুম কোথাও সুখ পাইনা তখন মাথায় এক প্ল্যান এলো। গ্রীষ্মকালে দুপুর রোদ্দুরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতুম—তারপর যখন সহ্য করতে পারতুম না তখন এসে দাঁড়াতুম ছায়ায়। রোদ্দুর থেকে ছায়ায় এসে দাঁড়িয়ে যে সুখ পেতুম্‌ সে আর কি বোল্‌বো। শীতকালে করতুম ঠিক উল্টোটা—রাতদিন জলে পড়ে থাকতুম। আর বড্ড শীত ধরলে লেপের মধ্যে ঢুকে সুখের আস্বাদ নিতুম। কিন্তু এখন মুস্কিল হয়েছে কি জানিস্‌। ক্রমাগত এই ক'রে ক'রে শেষে ওটা প্র্যাক্‌টীস হয়ে গেছে। শীত গ্রীষ্মে রোদে জলে এখন আর কষ্ট হয়না। কাজেই জীবনের একমাত্র সুখটুকু ভেগেছে। এখন কি করি বল দেখি?"

শুনিয়া মাণিক একটু ভাবিয়া বলিল, "হয়েছে! আপনি এক কাজ করুন ঠাকুর্দ্দা। আপনি ক'নম্বর জুতো পায়ে দেন?"

ঠাকুর্দ্দা বলিলেন, "সাত নম্বর, কেন?"

"তা হলে আপনি চীনে বাড়ী থেকে ওর চেয়ে ছোটো একজোড়া—ধরুন পাঁচ নম্বর বুটজুতো কিনে আনুন। সেইটে সকাল

বেলা পায়ে এঁটে সারাদিন ঘুরে বেড়াবেন। রাত্তিরে শোবার আগে সেই বুট যখন খুলবেন—দেখবেন কী সুখ!"

ঠাকুর্দ্দা খুসী হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে মাণিক, তোর এত বুদ্ধি তবু তুই টাকা রোজগারের চেষ্টা করিস না? এই দেখ আজকের ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে লিখেচে। এক সাহেবের চাই বেশ চালাক চতুর চটপটে, আর জোয়ান এক বয়। চাক্‌রী খুব উঁচুদরের না হ'লেও মাইনে দেবে পঁচিশ টাকা—দেখনা চেষ্টা ক'রে। সাহেব সুবোর কাছে চাক্‌রী করলে মাইনে ছাড়া টাকাটা সিকেটা মাঝেমাঝে উপরিও মিলবে। এ চাক্‌রী যদি যোগাড় কর্ত্তে পারিস তবেই বুঝবো তোর বাহাদুরী।"

নিজে হাতে টাকা রোজগার করিবার কল্পনা মাণিককে হঠাৎ উৎসাহিত করিয়া তুলিল। সে ঠাকুর্দ্দার নিকট হইতে সাহেবের নাম ঠিকানা টুকিয়া ও বুঝিয়া লইয়া সেদিনকার মত বাড়ী চলিয়া গেল।

(৪)

সোমবার সকালে দিদিমাকে বুঝাইয়া রাজী করিয়া মাণিক চাকরীর চেষ্টায় কলিকাতার পথ ধরিল। বলিয়া গেল নিয়মিতভাবে পত্রাদি দিবে এবং মধ্যে মধ্যে ছুটী লইয়া বাড়ী আসিবে।

সাহেবের নিকট পৌঁছাইবার পূর্ব্বে পথে কি ভাবিয়া মাণিক থমকিয়া দাঁড়াইল। তাড়াতাড়ি পরণের জামা ও কাপড়ের স্থানে স্থানে খামচাইয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। তাহার পর একটা বাড়ীর দেওয়ালে ঠুকিয়া কপালটায় কালশিরা পড়াইল। শেষে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়া দরওয়ানের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পাশ কাটাইয়া দৌড়াইয়া একেবারে সাহেবের কামরায় ঢুকিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব রাগিয়া তাহাকে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল—

"You sir advertisement paper, Want smart boy. I want sir. Very poor. Give me."

রাগ ভুলিয়া এবং প্রায় হাসিয়া ফেলিতে ফেলিতে সামলাইয়া লইয়া সাহেব হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার বেশভূষা ও চেহারার অবস্থা অমন কেন?

মাণিক কিন্তু ইংরাজী ছাড়িল না। বলিল,

"Your advertise কা কলমে much boy come at gate, বোধ হয় hundred. I alone fight them. All defeat, fly. I alone come in. Therefore you see I strong than all sir."

তাহার শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইয়া না হউক তাহার রকম সকম দেখিয়া সাহেবের কেমন কৌতুক বোধ হইল। তাহার উপর তিনি ছিলেন বেপরোয়া ব্যাচিলার মানুষ। তাই সুপারিশ এবং পরিচয়-পত্রের অভাব সত্ত্বেও সাহেবের নিছক খেয়ালেই মাণিকের চাকুরীটা সত্য সত্যই জুটিয়া গেল। মাণিক মহানন্দে তাহার চাকুরী প্রাপ্তির সংবাদ ঠাকুর্দ্দাকে জানাইয়া কাজে লাগিয়া গেল।

(৫)

এবার কিন্তু মাণিকের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে রীতিমত মন দিয়াই চাকুরী করিতে লাগিল। সাহেবের কৃপায় সে খাইতে পায় ভালো—পোষাক পাইয়াছে মনের মত এবং সবার উপর সাহেব কাজের জন্যই হউক বা আমোদের জন্যই হউক যখন যেখানে যান মাণিককে তাঁহার টু-সীটার গাড়ীর পিছনের সীটে বসাইয়া সঙ্গে লইয়া যান। এমন কি সিনেমায় যাইলে তাহাকে নিম্নশ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দেন। শিলংএ গল্‌ফ খেলিতে যাইবার সময় সার্জেণ্টদের কামরায় চড়াইয়া তাহাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। একে মাণিক চোর নয়, তাহার উপর তাহার সেবা যত্নে অবিবাহিত সাহেব তাহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই মাণিক বেশ সুখেই চাকরী করিতে লাগিল।

কিন্তু পরিবর্ত্তন যতই হউক মাণিকের স্বভাব তো? তাই হঠাৎ একদিন তাহার পূর্ব্ব স্বভাব মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া সাহেবকে তাহার উপর চটাইয়া দিল।

আফিসে একটি চাকরী খালি হওয়ায় খেয়ালী সাহেব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন এবং স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন বিবাহিত লোকদিগের আবেদন অগ্রাহ্য হইবে। তিনি নিজে অবিবাহিত বলিয়া অবিবাহিতদিগের প্রতিই তাঁহার পক্ষপাত ছিল। বিজ্ঞাপন পড়িয়া অনেকেই দরখাস্ত পাঠাইল। একটি লোক কিন্তু স্বয়ং আসিয়া মাণিককে জানাইল সে সাহেবের দর্শন-প্রার্থী। মাণিক বিজ্ঞাপনের কথা জানিত। সাহেবের বিজ্ঞাপন তাহার পছন্দ হয় নাই। তাহার ইচ্ছা ছিল বিবাহিত লোকেই চাকরীটা পায়। সে লোকটার হাতে লেফাফা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চাকরীর জন্যে এসেছেন?"

লোকটী বলিল, "কেন?"

মাণিক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বিয়ে হ'য়েচে?"

লোকটি বলিল, "ভাগ্যিস্ হয়নি, সেই ভরসাতেই তো এসেচি।"

মাণিক নির্লিপ্তের মতন বলিল "তাহ'লে ফিরে যান। আপনার কোন আশা নেই। বিবাহিত লোককেই চাকরী দেওয়া হবে। কাগজওলারা ভুল ছেপেছে। এইমাত্র টেলিফোনে কাগজওলাদের সাহেব খুব গালাগাল দিয়েচেন। সাহেবের মেজাজ এখন ভয়ানক গরম।

লোকটি চলিয়া গেল। দিন দুই পরে কিন্তু সে আবার আসিল এবং সে সময় সাহেব মাণিককে কোথায় পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া তাহার সাহেবের সহিত সাক্ষাতের সুযোগও জুটিয়া গেল।

সাহেব কিন্তু তাঁহার দরখাস্ত পড়িয়া মুখ মচকাইলেন। বলিলেন, "তুমি ভুল ক'রেচো বাবু। বিবাহিত লোকদের জন্যে এ চাকরী নয়।"

লোকটি প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "সে কি সাহেব? তবে যে আপনার বয় সেদিন ব'ললে—"

"কি ব'লেচে সে?"

লোকটি তখন মাণিক তাহাকে যাহা বলিয়াছিল, সব বলিল। আরও বলিল, বিবাহ করিয়া সাহেবকে খুশী করিয়া এবং কাঁদিয়া কাটিয়া চাকুরীটি যোগাড় করিবার আশায় সে তাহার বহুদিনবাঞ্ছিত এক দরিদ্র বিধবার কন্যাটীকে কাল বিবাহ করিয়াছে। কারণ সে জানিত ও চাকরীটি পাইবার যোগ্যতা এবং উপযুক্ত প্রশংসা পত্র তাহার আছে, তাই মাণিকের কথায় সে চাকরী পাওয়ার একমাত্র প্রতিবন্ধকটি দূর করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া আসিয়াছিল। লোকটি কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "সাহেব একটা পেট নিয়ে উপোস করছিলুম এখন দু'টো পেট ভরাবো কি দিয়ে?"

ঠিক এই সময়ে মাণিক আসিয়া উপস্থিত হইল।

ব্যাপার শুনিয়া এবং মাণিককে সম্মুখে পাইয়া সাহেব মাণিকের উপর রাগিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইলেন লোকটিকেও যা' তা' বলিয়া গালি দিলেন। বলিলেন, "ওর কথা শুনে তুমিই বা দুম ক'রে বিয়ে ক'রে বস্‌লে' কোন আক্কেলে। তোমার মতন লোক ঢুক্‌লে আমার আফিস তো দুদিনে উঠে যাবে।

সে মেয়েটি সাগর-দুহিতা

শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত

এখন সকাল হোল কাঁচা রোদে রমণীয় আজ এই সোণালি সকাল।
সাগর-বীচের 'পরে শুধু বালি—শুধু বালি—বালি আর বালির পাহাড়
এই পথে হেঁটে যাওয়া মানুষের সারি সারি কত না পায়ের দাগ আঁকা
আঁকা-বাঁকা কত দাগ—তা'দের চিনিনে আমি; শুধু চিনি একসারি তা'র।

কাল সে এ পথ বেয়ে হেলে দুলে চলে' গেছে—চলে' গেছে কি জানি কখন!
কখন মোমের মত দু'খানি পায়ের চাপে বালুকণা শিথিল হয়েছে;
সাগরের সাদা জলে হয়ত পড়েছে রাঙা-রঙিন্ শাড়ীর ছায়া তা'র,
কি জানি কখন কাল, সেই মেয়ে হেঁটে গেছে—হেঁটে গেছে কি জানি কখন!

চপল ঢেউএর মত সে মেয়ে কখন আসে, কখন দোলায়ে যায় বেণী,
লাল শাড়ী উড়ে পড়ে অবোধ শিশুর মত আলুথালু বাতাসের বেগে,
ওড়ায় বালুর কণা, আবার পাহাড় গড়ে, আর গড়ে গভীর সুড়ং।
সে-মেয়ে চপল মেয়ে, সে-মেয়ে কঠিন মেয়ে, সেই মেয়ে সাগর-দুহিতা!

এখন সকাল হোল, আমি তো চিনেছি আজ সরস পায়ের দাগ তা'র।
সাগর-জলের ঢেউ ও-দাগ মোছে'নি আজো—ও-দাগ মুছিবে ঠিক কাল।
কালও সকাল হবে সোণালি সকাল হবে কাঁচা রোদে সোণালি সকাল;
সাগরের লোণা জলে—আর লোণা হাওয়া লেগে, ও-দাগ মুছিবে ঠিক কাল।

অবশেষ লোকটীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিতান্ত হৃদয়ের কাছে বাধ্য হইয়াই তাহাকে চাকরীটি দিলেন এবং অনেক কাণ্ডের পর মাণিকের চাকরীটি সে যাত্রা যাইতে যাইতে রহিয়া গেল।

(৬)

এদিকে মাণিক সেই যে কলিকাতায় চাকুরী করিতে গিয়াছে তাহার পর অনেকদিন কাটিয়া গেলেও সে দিদিমাকে না দিয়াছে একখানি পত্র, না আসিয়াছে স্বয়ং। সুতরাং দিদিমা বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। শেষে প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া মরিয়া হইয়া তিনি একেবারে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন ঠাকুর্দ্দার নিকট। মাণিকের ঠিকানা দিতে হইবে। তিনি নিজে যাইবেন তাহার সহিত দেখা করিতে। মাণিক তাঁহাকে ভুলিলেও তিনি তো তাহাকে ভুলিতে পারেন না।

অবশেষে মাণিকের ঠিকানা লইয়া তিনি সেখানে গিয়া হাজির হইলেন। দরওয়ান জিজ্ঞাসা করিল তিনি কি চান? তিনি বলিলেন তিনি মাণিককে চান—তিনি মাণিকের দিদিমা।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরওয়ান একলাফে একেবারে দশহাত পিছাইয়া গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জোরে জোরে 'রাম নাম' উচ্চারণ করিতে লাগিল। দিদিমা তাহার কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্রমাগত 'রাম নাম' উচ্চারণেও তিনি বিদায় হন না দেখিয়া শেষে দরওয়ান তাঁহাকে বলিল তিনি ফিরিয়া যাউন। মাণিক এতক্ষণ তাঁহাকে লইয়া ঘাটে গিয়া পৌছি-য়াছে। দাহ করিবার বিলম্ব নিশ্চয়ই হইবে না—তাঁহার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। সে আরও প্রতিজ্ঞা করিল সে মাণিককে বুঝাইয়া যথাসময়ে ভালো করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ শান্তি করিতেও বলিবে।

ব্যাপারটা হইয়াছিল এই। কলিকাতার আবহাওয়ায় আসিয়া মাণিককে এদানী রেসে পাইয়াছিল। পরপর দুইটী শনিবার সে সাহেবের নিকট বাজে অছিলায় ছুটী লইয়া রেস খেলিতে গিয়াছিল। আজ আর অন্য কোন অছিলায় ছুটী লইবার সুবিধা হইবে না বুঝিয়া মাণিক একেবারে কাঁদিয়া গিয়া পড়ে যে তাহার বাড়ী হইতে লোক এই মাত্র সংবাদ দিয়া গিয়াছে যে তাহার দিদিমা মরিয়া গিয়াছেন। তাহাকে বাড়ী গিয়া দিদিমার দাহ কার্য্যের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অগত্যা বাধ্য হইয়া সাহেব তাহাকে ছুটী দিয়াছেন। দরোয়ানও ব্যাপারটি এইরূপই জানিত। সুতরাং সে সদ্যোমৃতা দিদিমার প্রেতাত্মাকে তাহার নিকট আসিতে দেখিয়া অমন আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল।

যাহাই হউক মৃতা দিদিমা অনেক কষ্টে নিজেকে জীবিতা বলিয়া প্রমাণিত করিয়া এবং দরওয়ানকে নগদ একটাকা ঘুস্ দিয়া সেবারকার মত সাহেবের নিকট মাণিকের কাংচুপির কথা ফাঁস না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া বিদায় লইলেন। দিদিমা তাহার কাঁচা ঘাড়টা না মটকানোতে এবং নগদ একটা টাকা দেওয়াতে কৃতজ্ঞ দারোয়ান সত্যই ঘটনাটা চাপিয়া গেল।

কিন্তু হায়! মাণিকের চাকরীতে বোধ হয় শনির দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কারণ চাকরী তাহার গেলই।

কিছুদিন হইতে একটি কুমারীর প্রতি সাহেবের পূর্ব্বরাগের সঞ্চার হইয়াছে। সাহেব তো আর বাঙ্গালী নয়, যে কবিতা লিখিয়াই প্রেমের সমাপ্তি ঘটিবে? মেমের সহিত সাহেব আলাপ জমাইয়া তুলিলেন এবং তাহার জন্মদিনের নিমন্ত্রণও পাইলেন। এবং মেমের কাছে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাহার জন্মতিথিতে তিনি, মেমের জীবনকে বসন্ত আসিয়া যতবার অভিনন্দিত করিয়াছে তাহার প্রত্যেক বারের জন্য একটি করিয়া গোলাপ ফুল উপহার পাঠাইবেন। অর্থাৎ সাদা কথায় মেমের যত বয়স ততগুলি গোলাপ ফুল পাঠাইবেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে মাণিককে ডাকিয়া তিনি কতকগুলি ফুল মেমের বাড়ী বিকালে গিয়া দিয়া আসিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিয়া টাকা দিয়া দিলেন। মাণিক যথা সময়ে কাজ সারিয়া আসিল। তাহার পর রাত্রে তিনি কামাইয়া কামাইয়া গালের মাংস প্রায় তুলিয়া ফেলিয়া এক ঘণ্টা ধরিয়া টাই বাঁধিয়া অশেষ সাজ সমাপ্ত করিয়া একলা গাড়ী করিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে চলিলেন আজ মাণিককে সঙ্গে লইলেন না। কারণ আজকের পক্ষে মাণিক নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় তৃতীয় ব্যক্তি। তাহাকে না লওয়ার ফলে গাড়ীর accessories চুরী যাইলে আজ তাহার সে ক্ষতি সহিবে।

সাহেব চলিয়া যাইবার পর মাণিক দরোয়ানের সহিত বেশ করিয়া গল্প জমাইয়া তুলিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় যে মুচির নিকট সে ধারে জুতা সারাইয়া লইয়াছিল সে আসিয়া পয়সা চাহিল। কিন্তু পয়সা দেওয়ার পরিবর্ত্তে সে অসময়ে পয়সা চাহিতে আসিয়াছে বলিয়া মাণিক মার-মুখো হইয়া উঠিল। বেচারী মুচি বলিল যে অনেকদিন হইয়া গেল জুতা সারানো হইয়াছে, অথচ মাণিককে সে ঠিক একা কোন দিন ধরিতে পারে না। আজ দূর হইতে সাহেবকে একা গাড়ী লইয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া সে আসিবার সুযোগ পাইয়াছে। উত্তরে মাণিক বলিল,—

"ওরে গাধা তা নয়। তোকে জুতো সারানোর পয়সা দেবার আগে যার কাছ থেকে জুতো কিনেছি তার দেনা শোধ করতে হবে তো? জুতোওলার পালা যে আগে পড়ে এটা বুঝিস্ না? জুতো কেনার দাম আগে দেবো, তারপর তুই এসে তোর

পয়সা নিয়ে যাস্। এখন যা বিরক্ত করিস নি।"

তাহার যুক্তির উত্তরে মুচি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সাহেবের গাড়ীর হর্ণ শোনা গেল। দরোয়ান শশব্যস্তে গেট খুলিয়া ধরিল। সাহেব গাড়ী হইতে মাণিককে দেখিয়াই লাফাইয়া নামিলেন এবং বিনাবাক্যে মাণিকের উপর ঘুসি মারিয়া ফেলিয়া লাথির পর লাথি চালাইতে লাগিলেন। মুচির পয়সা না দেওয়ার জন্য মারিলেন? তাহা নয়। সে কথা যখন চলিতেছিল তখনো তো আসেন নাই। কারণটা অন্যরূপ।

সাহেব জানিতেন মেমের বয়স কুড়ি বছর। তাই তিনি মাণিককে বলিয়া দিয়াছিলেন এককুড়ি গোলাপ ফুল দিয়া আসিতে। মাণিক বুঝিয়াছিল মেমসাহেব কিছুদিন পরে তাহার মনিবেরও মনিব হইবে তাই এই ভাবী মহামনিবের সম্মুখে মাত্র কুড়িটী গোলাপ ফুল লইয়া যাইতে তাহার মন সরে নাই তাই সে বুদ্ধি করিয়া নিজের খরচে আর এক ডজন ফুল কিনিয়া ইহাতে তোড়া করিয়া মেম সাহেবের বয়ের হাতে দিয়া আসিয়াছিল। মাণিক খুব ভক্তি করিয়াই দেবতার মাথায় ফুল চড়াইয়াছিল। সে ফুল পড়িলও বটে কিন্তু যথাস্থানে নহে। ক্রুদ্ধ মেম সাহেবের হাত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়া আছড়াইয়া পড়িল উঠানের উপর। সঙ্গে সঙ্গে মাণিকের অদৃষ্টও সাহেবের হাত হইতে ছিটকাইয়া পথে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল! প্রেরিত ফুলের সাহায্যে তাহার বয়সের উপর অবিশ্বাসী সাহেব মর্ম্মান্তিক ঠাট্টা করিয়াছেন ধরিয়া লইয়া অভিমানিনী মেম সাহেব তাঁহার সহিত একটিও কথা কহেন নাই। শেষে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া মেম সাহেবের জননীর নিকট অপমানিত হইয়া সাহেব ফিরিয়া আসিয়াছেন।

মাণিককে মারিয়া মারিয়া ক্লান্ত হইয়া শেষে সাহেব তাহার পাওনা চুকাইয়া এবং অতিরিক্ত এক মাসের মাহিনা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

সদ্য চাকরী হারাইয়া মাণিক সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর দিকেই চলিতেছিল। পথে দোকানে রেডিওর গান হইতেছে শুনিয়া সে ক্ষানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া শুনিল। তাহার পর হঠাৎ তাহার মনে হইল। চাকরী গিয়াছে তাহাতে ক্ষতি কি? সে গান শিখিবে। তাহাতে চাকরীর লাঞ্ছনা সহিতে হইবে না অথচ খাতিরের সহিত রেডিওতে টকীতে গ্রামোফোনে গান দিয়া সে প্রচুর উপার্জ্জন করিতে পারিবে।

তখনও সব দোকান বন্ধ হয় নাই। মাণিক তাড়াতাড়ি এক বাদ্য-যন্ত্রের দোকানে ঢুকিয়া সস্তা দেখিয়া একটি হার্ম্মোনিয়ম এবং একখানি "সরল-হার্ম্মোনিয়ম-শিক্ষা" কিনিয়া লইল। বাড়ী গিয়া দিদিমাকে বলিল চাকরী করিয়া আর ক'টাকা উপার্জ্জন হইবে। তাহার চেয়ে গান গাহিয়া সে ঢের বেশী রোজগার করিতে পারিবে। কাজেই পরদিন হইতে সে দিবারাত্র হার্ম্মোনিয়ম বাজাইয়া এবং তারস্বরে চীৎকার করিয়া গলা সাধিতে লাগিয়া গেল।

তাহার পর কি হইল বলুন দেখি? তাহাও বলিয়া দিতে হইবে? ছিঃ! মাণিক যে এখন লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিয়াছে সেখানকার মরিস কলেজে গান শিখিবে বলিয়া। বিশ্বাস হইতেছে না? মাণিক টাকা কোথা পাইল? মশায় এত জানেন, আর এটা বোঝেন না যে মাণিকের মতন ছেলে দিবারাত্র গলাসাধা সুরু করিলে পাড়ার লোকের কি অবস্থা হয়? বেচারারা সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া বিছানায় শোয় একটু ঘুমাইবে বলিয়াই তো। সুতরাং তাহারা মাণিকের মতন ছেলেকে ঘাটাইতে সাহস না করিয়া তাহাকে বুঝাইল যে তাহার গানের প্রতিভাকে অযত্নে নষ্ট না করিয়া অবিলম্বে লক্ষ্ণৌ চলিয়া যাওয়া উচিৎ। এবং তদুদ্দেশে তাহারা চাঁদা করিয়া লক্ষ্ণৌএর টিকিট কিনিয়া তাহাকে নিজেরা গিয়া ডেরাডুন একস্প্রেসে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছে।

মায়াতরু

কালী সেন

আমারে আশ্রয় দাও প্রণয়ের স্বপ্নমায়া তরু,
তোমার যৌবন শাখে আমি যেন ফুল হ'য়ে ফুটি';
এ ব্যর্থ জীবন কাঁদে চারিদিকে নিরাশার মরু
ঊষর বালুর বুকে নিত্য আমি অনাদরে লুটি'।
তোমার সবুজ স্নিগ্ধ পল্লবিত প্রেম স্বপ্ন শাখে
হে প্রিয় এ একনিষ্ঠ পূজারীর স্থান যেন থাকে।

পুত্র চাই—

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ নিয়োগী

কিছুদিন হইল আমাদের দেশে জনবৃদ্ধি সমস্যা লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান অন্নসমস্যার জন্ত এই জনবৃদ্ধিই নাকি দায়ী—এইরূপ অভিমত বহু বিজ্ঞ ও চিন্তাশীল মহাজনের মুখ হইতে অমৃত ও আশ্বাস বাণী সম নির্গত হইতেছে। উপদেশ স্থলে প্রজনন সম্বন্ধে নৈতিক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। সুযোগ বুঝিয়া সুচতুর বৈদ্যগণ প্রজনন-বন্ধকারী নানাবিধ ঔষধ বিক্রয় করিয়া নিজেদের বিনা বাধায় আগত পুত্রকন্যার ভবিষ্যত সংস্থান করিতেছেন। অপব্যয় এবং স্বাস্থ্য নষ্ট হইলেও মা ষষ্ঠী কৃপা বিতরণে বিরূপা হইতেছেন না—হয়ত হইবেনও না। তাই গুর্জ্জর নেতার আর্ত্তনাদের সঙ্গে সমস্ত দেশ গুমরিয়া মরিতেছে। দেশ বুঝি আর রক্ষা হয় না!

অথচ আমরা প্রজনন বন্ধ করিতে যখন আকাশ পাতাল বিদীর্ণ করিতেছি তখন ইয়োরোপীয় জাতি সমূহ এই প্রজনন বৃদ্ধি করিতে কতই না প্রয়াস পাইতেছে! বেকার সমস্যা সমাধান করিতে সমর্থ না হইলেও সন্তান তাহাদের চাইই। সাম্রাজ্য বাদী রাজ্য সমূহের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির যে অদম্য আগ্রহ তাহাতে হাজার হাজার সন্তান বলির প্রয়োজন!

কিন্তু তাহাতে বাধা অনেক। গত এক শতাব্দী ধরিয়া ইয়োরোপে নারী জাগরণ এত দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে যে, প্রায় সর্ব্ব ক্ষেত্রেই নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিয়াছেন। পার্লামেণ্টে তাঁহারা পুরুষদের সহিত রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, আদালতে বিচারকের আসনে বসিয়া সুবিচার করিতেছেন, উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার হইতে কেরাণী ও কুলী পর্য্যন্ত সকল কাজেই তাহারা পুরুষের পাশাপাশি থাকিয়া কাজ করিতেছেন। ইহা ছাড়া ভোটদান ব্যাপারে ইহারা বহু দেশে পুরুষের সমান দাবী লাভ করিয়াছেন। বাহিরের এই কর্ম্মক্ষেত্রে আসার ফলে ইয়োরোপীয় জাতি সমূহ আর একটা ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষা মেয়েদের "ঘরছাড়া" করিয়াছে, জীবনের আনন্দ সম্পূর্ণভাবে একস্থানে এক অবস্থায় আবদ্ধ রাখিয়া পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করিতে তাহারা নারাজ। সন্তান প্রজননে তাহাদের একটা বিতৃষ্ণা আসিয়াছে—তাহাতে পারিবারিক যে বন্ধন আসিবে তাহা ভাবিয়া তাহারা মাতৃত্ব হইতে নিজেদের দূরে রাখিতেছে। ফলে রাষ্ট্রপতিদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাইয়াছে—তাহারা সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্ত যেরূপ নর শক্তির (man power) প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন—ইয়োরোপের মায়েরা তাহা পূরণ করিতে পারিতেছেন না। তাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন উপায়ে রাষ্ট্রপতিরা নারী জাতির নিকট সন্তান দাবী করিতেছেন—রব উঠিয়াছে "মা লক্ষীরা পুত্র দাও! পুত্র দাও!! ফরাসী গভর্ণমেণ্ট মায়েদের উৎসাহ দিয়া মাভৈঃ দানে বলিয়াছেন—নির্ব্বিবাদে পুত্র প্রসব করিয়া যাও, সাংসারিক প্রয়োজনে প্রথম চারজন রাখিয়া বাকী সন্তানদের আমাদের অর্পন কর! অর্থাৎ ফ্রান্সের মায়েরা কোন মতে চার সন্তানের ভরণ পোষণ করিয়া পঞ্চম সন্তান হইতে প্রত্যেকের দায়িত্ব ষ্টেটের উপর চাপাইতে পারেন। হিট্‌লার চাবুক হস্তে মেয়েদের গৃহের দরজায় পৌঁছাইয়া দিয়া কড়া পাহারায় তাহাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। মুসোলিনীও তাহার পদাঙ্ক অনুসরন করিতেছেন—বলিতেছেন—"গৃহের কাজ কর্ম্ম ও বৎসরে বৎসরে রাষ্ট্রকে সন্তান দান ছাড়া বাইরে তোমাদের কোন কাজ নাই।"

গত বৎসর হারেমে (Harem) যে International Women Congress হইয়াছিল তাহাতে বৃটীশ পার্লামেণ্টের সভায় ভাই কাউণ্টেস্ এষ্টোর (Astor) এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন এবং দুঃখ করিয়া বলেন—

"I pity the German and Italian women whose only rights are making children by order of the Dictetor rulers of their countries."

দুঃখ তাহারা করিয়াছেন—এবং প্রতিবাদও করিয়াছেন। কিন্তু সামাজিক কল্যাণে কিম্বা পারিবারিক মঙ্গলের জন্য তাঁহারা এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা করিয়াছেন আপন আপন জাতিকে জগতের দরবারে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার জন্য। ধনবাদী এই রাষ্ট্র সমূহের কার্যাবলী আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা অনুভূত হইবে।

জার্ম্মেনী

গত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মেনীর রাষ্ট্রশক্তি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িলে, ইয়োরোপীয় অধিকতর শক্তিশালী জাতি সমূহের ষড়যন্ত্রে জার্ম্মেনীকে একরকম নিরস্ত্র করা হয়। নিভৃতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া ১৯৩৫ সালে জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট এই শক্তিপুঞ্জের ফতোয়া অগ্রাহ্য করিয়া দেশে বাধ্যতা মূলক সামরিক শিক্ষার প্রচলন করেন এবং জার্ম্মেনীর কারখানায় রাত্রি দিন হাজার হাজার লোক কাজ করিয়া এয়ারোপ্লেন, যুদ্ধজাহাজ, কামান বন্দুক ইত্যাদি যাবতীয় যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিতেছেন। সরকারী বিবরণে যে হিসাব পাওয়া যায় তাহা অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বাস যোগ্য নহে। কেননা সামরিক শক্তির পরিচয় রাষ্ট্রপতিরা প্রকাশ করা যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করেন না।* বর্ত্তমান জার্ম্মেনীর আধুনিক রণ সজ্জার যতটা খবর পাওয়া যায় তাহাতে

সৈন্য সংখ্যা—১২ লক্ষ (রিজার্ভ বাদে)

রণ সজ্জায় সজ্জিত এয়োরোপ্লেন ৫ হাজার •

যুদ্ধ জাহাজ—৩৫ হাজার।

এই সকল আকাশপোত ও যুদ্ধ জাহাজগুলি এমন আধুনিক ভাবে সজ্জিত যে অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা বিরাট জাতির অস্তিত্ব ধরা পৃষ্ঠ হইতে লোপ করিয়া দিতে সক্ষম হইবে। জার্ম্মেনীর বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে এয়োরোপ্লেন পরিচালনা এবং বিষাক্ত গ্যাস প্রস্তুত প্রভৃতি রাসয়নিক বিদ্যা বাধ্যতামূলক ভাবে শেখান হইয়া থাকে। নানা বিভাগে জার্ম্মেনীর নরনারী রাত্রি দিন পরিশ্রম করিয়া জাতির রণ সম্ভার বাড়াইয়া তুলিতেছে। যুদ্ধ আসন্ন—বলিষ্ঠ সন্তান দাও, সন্তান দাও বলিয়া হিট্লার জার্ম্মেনীর গৃহের দরজায় দরজায় নারীদের সজাগ করিয়া তুলিতেছেন।

ইটালী

গত মহাযুদ্ধে ইটালী প্রায় ৫৬ লক্ষ নরনারী যুদ্ধে এবং যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত করিয়াছিল। বর্ত্তমান ইটালী সমর সজ্জায় ইয়োরোপীয় অন্যান্য দেশ সমূহ হইতে কোন অংশে পশ্চাৎপদ নহে। বর্ত্তমান ইটালীতে—

সৈন্য সংখ্যা—১২॥০ লক্ষ।

সমরোপযোগী খ-পোত—২॥০ হাজার।

আলোচ্য বর্ষে ৪২০টী চেজার (chaser) ৩৩০টী বোমা নিক্ষেপকারী আকাশ পোত (Bombers) এবং ৪০০ স্কাউটীং (Scouting) মেসিন নির্ম্মিত হইতেছে। বর্ষশেষে ইটালীর খ-শক্তি সাড়ে চার হাজার এয়োরোপ্লেন সজ্জিত হইবে। ইহা ছাড়া ৪ কোটী ৭০ লক্ষ (৭০ কোটীর টাকার উপর) পাউণ্ড ব্যয়ে ইটালী তাহার নৌশক্তি দৃঢ় করিবার জন্য দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৩৯ সালের মধ্যে ইটালীর নৌশক্তি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

এই সমস্ত রণ সম্ভার নির্ম্মাণ শেষ হইলে মুসোলিনীর বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ মানুষ চাই। কাজেই ইটালীয়ান মায়েদের ঘরের বাহিরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিয়া প্রজনন শক্তি হারাইলে চলিবেন না। "মা লক্ষ্মীরা গৃহে ফিরিয়া যাও, সুস্থ সবল শিশুর জন্মদান কর; ইটালীর বিশ্ব আধিপত্যের পথ সুগম করিয়া বীর প্রসবিনী জননী রূপে আদৃতা হও!"

ফ্রান্স

ফরাসী রাষ্ট্রপতিরা সর্ব্বাপেক্ষা মুস্কিলে পড়িয়াছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দির বিপ্লবের কোন ফাঁকে যে ফরাসী বিদুষীগণ 'ঘরছাড়া' হইয়াছিলেন, তাহার সন্ধান রাখেন না। বিলাসীতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় ফরাসী মহিলাগণ এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, আজ শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের গৃহে ফিরাইয়া সুস্থ যুদ্ধপোযোগী সন্তান প্রজননের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারিতেছেন না। প্রজনন সংখ্যা (birth rate) অন্যান্য দেশের তুলনায় কম বলিয়া ফ্রান্সে সৈন্য সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ১৯৩৫ সালে ২৭শে জুনের চেম্বারের অধিবেশনে যুদ্ধমন্ত্রী Colonel Fabry বলিয়াছেন যে—

"the very existence of France is at stake"। তাই ফরাসীরা সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কার বাদী ফ্রান্স কর্ত্তৃপক্ষগণ মুসোলিনী অথবা হিটলারের মত চাবুক অথবা চুলের মুঠো ধরিতে পারিতেছেন না। তাই তাঁহারা পুরস্কার প্রভৃতির প্রলোভন দেখাইয়া করজোড়ে বলিতেছেন—"মা লক্ষ্মীরা, এমন ছন্নছাড়া ভাবে চলিও না—গৃহের দিকে ফিরিয়া তাকাও, নিঃসঙ্কোচে সন্তান প্রসব কর, পুত্র তোমাদের আমোদের ভাগ বসাইবে না। জন্মিলেই আমরা লইয়া যাইব—লালন পালন করিব। মাভৈঃ—শুধু সন্তান দাও, তাহা না হইলে মুসো-হিট্লারের উদরগত হইয়া ফরাসী দেশ জাহান্নামে যাইবে! অতএব পুত্র দাও।"

---

* Under the Nazi Administration orders have been issued and enforced punishing with death, the discloser of information about the German armed forces.—D. M. Year Book 1936.

• ইহা ছাড়া সহস্রাধিক Commercial machines আছে এবং সেগুলিকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যুদ্ধোপযোগী করা যাইবে।

পরিত্রাণ

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ

করে নাই। তাহার স্বামীর সামনেই শুধু একদিন হাসিয়া বলিয়াছিল—"একসঙ্গে একদিন কবে স্কুলে পড়েছিলে বলে খুব সুবিধেটা পেয়ে গেলে বিনয়। বন্ধুত্ব তোমার সঙ্গে কোনদিন এমন কিছু গভীর ছিল না, কিন্তু তারই নামে আমার হাত পা বাঁধা হয়ে রইল।"

স্বামী বুঝি খুব খানিকটা হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"চিরকাল সমান পাগল রয়ে গেলে!"

পরিতোষ গম্ভীরভাবে বলিয়াছে—"পাগল হতে আর পারলাম কই!"

তারপর বুঝি অদ্ভুতভাবে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"তুমি আমায় এখানে এমন রোজ আসতে দাও কেন বলত বিনয়! তোমার মনে কি সত্যি কিছু হয় না? অনুর সঙ্গে আমার পরিচয়টা কিরকম ছিল তুমি ভালরূপেই জান। ওর কথার ওপর রাগ করে ওকে অপমান করে অমন নির্ব্বোধের মত অতদিন সরে না থাকলে, তোমার আজ এখানে স্থান হবার কথা নয়, তবু তুমি আমায় বিশ্বাস করে আসতে দাও। তোমার বন্ধুত্বের লোভে যে আসিনা তা ত বোঝ!"

বিনয় হাসিয়া বলিয়াছে—"তোমায় আমি চিনি যে"

পরিতোষ অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়াছে—"হুঁ তোমার চেনাই রয়ে গেলাম।"

আজ পরিতোষ সত্যই অসংযত হইয়া উঠিতে পারে। বলিতে পারে—"শুনতে আসনি বলেই শুনতে হবেনা মনে করছ কেন? চিরদিন আমি নিঃশব্দে মুখ বুজে থাকব এমন ধারণা আমিই গড়ে তুলেছি, আজ আমিই ভেঙে দেব। তোমার ধারণা-মত ভালো হয়ে বঞ্চিতই হয়েছি। আজ খারাপ হতে বাধা কি! আজ তোমার এই আশাটাকে আমি যদি নিজের মত মানে করে নিই অনু! সেইমত আয়োজনই যে করেছি তা কি বোঝনি। তুমি চাইবামাত্র সাগ্রহে তোমায় ডেকে এনেছি, অন্য কোথাও নয় নিজের বাড়িতে স্থান দিয়েছি—সে কি শুধু আমার উদারতা আর মহত্ত্ব মনে কর অনু?

অনু বলিবে—"আমি করতে চাই।"

"না অনু, নিজেকে ভুল বুঝিও না। আর তোমায় নিজেরও কি কোন কিছু বোঝবার নেই! কোন ভুল তোমার সংশোধন করবার, কোন অন্যায়ের প্রতিকার করবার! কোনখানে আজ ত তার বাধা নেই অনু! আজ যদি আবার আমি তোমায় চাই।

অনুপমা এ পরিণতির কথাও ভাবিয়া রাখিয়াছে। প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে ইহার জন্যও।

ছেলেটিকে যে এবার পরিতোষের দিকে আগাইয়া দিবে। বলিবে—"ভাল করে চেয়ে দেখো, নিজেকে তুমি ভুলে যাচ্ছ!"

না ইহার পর আর বোধহয় কিছু বলিবার প্রয়োজন থাকিবে না। অনুপমা, ছেলের মাথায় হাত রাখিয়া নূতন করিয়া সাহস পায়।

দরজায় এবার একটু জোরেই সে ঘা দিয়াছে। ভিতর হইতে পরিতোষই সাড়া দিয়াছে—"কে?"

তাহার চাকরবাকর এরকম দরজায় ঘা দিয়া বোধ হয় ঘরে প্রবেশ করেনা।

অনুপমা এবার দরজা খুলিয়া ভিতরে ঢুকিতে দ্বিধা করে নাই।

পরিতোষ ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কি একটা বই পড়িতেছিল। প্রথমে খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে—স্মিতমুখে।

"আমায় এটা খুব বেশী লজ্জা দিলে! আমারই যাওয়া উচিত ছিল আগে!"

"না না, তোমার অসুখ শুনলাম!" অনুপমা নিজেই একটি শোফায় বসিয়াছে—"আমি জানতাম না!"

"অসুখ! না, অসুখ এমন কিছু নয়, তবে কদিন একটু নড়াচড়া ঘোরা-ফেরা বারণ।"

হাসিয়া তাহার পর বলিয়াছে—"পুরাণ একটা ব্যথা আছে বহুদিনের সঙ্গী মাঝে মাঝে চাড়া দেয়। তখন একটু জব্দ হয়ে থাকতে হয়!—খোকা এত বড় হয়েছে!"

কথাগুলা যে বাহিরের আবরণ মাত্র তাহা দুজনেই বুঝি জানে। দুজনেই পরস্পরকে লক্ষ্য করিতেছে, বিচার বিশ্লেষণ তুলনা করিয়া দেখিতেছে সবিস্ময়ে! সহজ আলাপের একটা পর্দ্দা শুধু উপরে ফেলা।

বিস্ময়ের কারণ আছে বই কি! অনুপমা ঠিক পরিতোষকে এরকম দেখিতে আশা করে নাই। পরিতোষকে বুঝি তাহার চিনিতেই একটু কষ্ট হইয়াছে।

উপর হইতে দেখিলে চেহারায় এমন কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু কোথায় কিসের যেন অভাব ঘটিয়াছে—কিসের তাহা অনুপমা বুঝিতে পারে না। পরিতোষের গলার স্বর কথার ভঙ্গিতে পর্য্যন্ত তাহার ইঙ্গিত আছে অথচ ঠিক ধরা যায় না।

পরিতোষ আবার বলিয়াছে—"তুমি ত বিশেষ কিছু বদলাও নি।"

অনুপমা কথার মোড় ফিরিবার সম্ভাবনায় এবার নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু না, কোন কিছু ঘটে নাই।

পরিতোষ অন্য কথায় ফিরিয়া গিয়া বলিয়াছে,—"তোমাদের কোন কষ্ট হচ্ছে না ত!"

"না, কষ্ট কিসের! কষ্ট করেও কটা মাস যেখানে হোক থাকতে হ'ত। এত ভালো থাকবার আশাইত করিনি।"

"কোথায় যাবে এরপর!"

"কোথায় আর! দেশের বাড়িতে।"

"দেশে একটা বাড়ি আছে তোমার বাবার, না?" বলিয়া পরিতোষ কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেছে। এই অন্যমনস্কতাটা অনুপমা গোড়া হইতেই লক্ষ্য করিয়াছে। ঠিক বুঝিতে পারে নাই। এও কি একটা ভান। হৃদয়ের দুর্ব্বার আবেগকে গোপন করিবার একটা ছল!

হঠাৎ তাহাদের সম্বন্ধে আবার সচেতন হইয়া পরিতোষ ছেলেটিকে কাছে ডাকিয়াছে—"শোন এদিকে!" অনুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে "কি নাম রেখেছ ওর!"

"বাদল।"

"শোন বাদল! শুনে যাও।"

বাদল ভীত সঙ্কুচিতভাবে পরিতোষের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার মুখের দিকে খানিক তাকাইয়া থাকিয়া পরিতোষ বলিয়াছে—"মুখ অনেকটা বিনয়ের মত না?"

না, গলার স্বরে কোন কম্পন নাই, কোন রুদ্ধ আবেগের পরিচয়ও না।

অনুপমা মুখে হাসিয়া বলিয়াছে—"হ্যাঁ আছে একটু!" মনে মনে সে কি একটু বিস্মিত হইয়াছে!

বাদলকে পাশে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াই পরিতোষ আবার অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছে। পাশের বইটা একবার তুলিয়া লইতে গিয়া আবার রাখিয়া দিয়া বলিয়াছে—"তোমাদের তাহলে কষ্ট হচ্ছে না কিছু,—হলে জানিও।"

"হ্যাঁ জানাব ম্যানেজারকে।"—অনুপমার কণ্ঠ কি একটু শুষ্ক!

পরিতোষ কোন উত্তর দেয় নাই।

ফাষ্ট ন্যাশনাল
পিক্‌চার্সের
প্রথম অবদান

স্বর্গীয় তারক গাঙ্গুলীর

সরলা

ঃ পরিচালক ঃ
চারু রায়

ঃ আলোক-শিল্পী ঃ
বিভূতি দাস

ঃ ভূমিকায় ঃ

অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য,
তারাকুমার ভাদুড়ী, কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়,
তারাকুমার ভট্টাচার্য্য
প্রভা, মনোরমা, সুশীলা,
হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
শ্রীমতী সরলা

বাঙ্গালী ঘরের
চিরন্তন ব্যথার
কাহিনী

— শুভ-উদ্বোধন —
২১শে অক্টোবর ১৯৩৬

A POPULAR PICTURES RELEASE

ঃ সুর-সংযোজনা ঃ
নিতাই মতিলাল
পরিচালিত
সুর-সঙ্ঘ

অনুপমা আবার বলিয়াছে—"আচ্ছা আজ তাহলে উঠি।"

পরিতোষ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছে—আচ্ছা! একটু সারলেই আমি যাব একবার।

অনুপমা আর কিছু বলে নাই। ছেলের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেছে।

দরজার বাহিরেই ম্যানেজার দাঁড়াইয়া ছিল কে জানিত। অনুপমা প্রথমতঃ একটু বিরক্তই হইল, ম্যানেজারের এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকার কি প্রয়োজন।

কিন্তু ম্যানেজারের প্রশ্নে যে বিস্মিত হইল—

"আপনি কি ভেতরে গেছলেন?"

কথা গুলা নয়, গলার স্বর ও মুখের ভাবই কেমন অদ্ভুত। অনুপমা বিরক্তি ভুলিয়া অবাক হইয়া বলিয়াছে—"হ্যাঁ—কেন?"

"না কিছু নয়।"

অনুপমা কিন্তু তাহাতে আশ্বস্ত হয় নাই। ম্যানেজারের মুখের ভাবে একটা কি রহস্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

সে একটু রূঢ় ভাবেই বলিয়াছে—"কিছু নিশ্চয়ই। কেন জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন।"

ম্যানেজার তাহার মুখের দিকে খানিকক্ষণ অদ্ভুতভাবে তাকাইয়া থাকিয়া বলিয়াছে—"আপনি তাহলে বুঝতে পারেন নি।"

"কি বুঝব।"

"তাহলে বলছি, চলুন।"

ম্যানেজার তাহার সঙ্গে বারান্দার শেষ-প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া থামিয়াছে। তাহার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছে—"আমি জানলে আপনাকে যেতে দিতাম না এমনভাবে। কখন কি বেঠিক বলে ফেলেন।"

"বেঠিক বলে ফেলেন।" অনুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট হইয়া উঠিতে দেরী হয় নাই।

"এরকম—?" তাহার প্রশ্ন সে শেষ করিতে পারে নাই।

"হ্যাঁ, এই একবছর হয়েছে। অনেক সময়ে ঠিক থাকেন, আবার এক এক সময়ে সামলান শক্ত হয়। কিছু বেঠিক এখন বলেন নি ত?"

না বেঠিক কিছু পরিতোষ বলে নাই; অনুপমার সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এরূপ অবস্থাতেও পরিতোষ তাহার সহিত একেবারে সাধারণ ভাবে ব্যবহার করিয়াছে। তাহার অন্তঃস্বর মর্য্যাদা সে রাখিয়াছে। মনের উপর কোন শাসন যখন নাই তখনও তাহার মুখ হইতে কোন বেফাঁস কথা বাহির হয় নাই, কোন আভাষ পাওয়া যায় নাই—উদ্বেল অতীত স্মৃতির।

অনুপমার মুখ নিজের পরিত্রাণের আনন্দেই বুঝি চাক এর মত শাদা হইয়া গেছে।

যাহা কিছু সে কল্পনা করিয়া ভীত হইয়াছিল, সম্বন্ধের যে জটীলতা অতীত জীবনের জের টানিবার যে সম্ভাবনা—সে বিষয়ে এবার সমস্ত দুর্ভাবনা হইতে সে মুক্ত।

নিশ্চিন্তভাবে এবার সে ক'টা মাস কাটাইয়া দিতে পারে।

কিন্তু মাঝের দরজা খুলিয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে অনুপমার আর এক দণ্ড এখানে থাকিতে ইচ্ছা করে না কেন? কেন পরিতোষের এই দুর্ভাগ্যে সমবেদনার চেয়ে আর একটি অনুভূতি তাহার বড় হইয়া ওঠে।

নতুন স্যার

জাহান্-আরা বেগম চৌধুরী

অনাদি চক্রবর্ত্তী তাঁহার একমাত্র কন্যা রাণুর নয় বৎসর বয়সে বিবাহ দিয়া গৌরী-দানের পূণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

রাণুর শ্বশুর এলাহাবাদে একজন বড় ডাক্তার। পুত্রকে বিলাত পাঠাবার পূর্ব্বে বিবাহ না দিয়া কিছুতেই পাঠান হইবেনা ইহাই গৃহিণীর ধনুর্ভাঙ্গা পণ ছিল। সুন্দরী পাত্রীর সন্ধানে এবং পুত্রকে বিলাত পাঠাইবার উদ্দেশ্যে হরিশঙ্করবাবু কিছুদিনের জন্য প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া বসিলেন।

কলিকাতা সহরে পাত্রীর অভাব হয়না—বিশেষ করিয়া যেস্থলে পাত্রপক্ষ ধনী। কয়েক দিনের মধ্যেই রাণুর সহিত হরিশঙ্কর বাবুর পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। প্রথম শুভলগ্নেই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। বিবাহের সাতদিন্ না কাটিতেই নিরঞ্জন বিলাত যাত্রা করিল।

অনাদি চক্রবর্ত্তীকে বড়লোক বলা যায়না। মধ্যবৃত্ত গৃহস্থ মাত্র। হরিশঙ্কর বাবু বড়লোক—এলাহাবাদে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি—এই কথাটি প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার মনের এক নিভৃত কোণে খোঁচা দিয়া তাঁহাকে সজাগ রাখিত। এইজন্য প্রাণ খুলিয়া তিনি কাহারও সহিত মিশিতে

লেখিকা।

পারিতেন না। কাজেই অনাদিবাবুর সহিতও পারিলেন না। দুই বৈবাহিকের সদ্ভাবও রহিল না। অনাদি চক্রবর্ত্তীর বুঝিতে দেরী হইলনা যে তাঁহার বড়লোক বৈবাহিক তাঁহাকে অবহেলা করেন।

কলিকাতায় থাকা কালে অনাদিবাবু প্রায়ই বৈবাহিকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও নিরঞ্জনের সংবাদ লইতে যাইতেন। পরে আর হরিশঙ্করবাবু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা দরকার মনে করিতেন না। চাকর আসিয়া খবর দিত "বাবু এখন ব্যস্ত আছেন।"

এই উপেক্ষায় অনাদিবাবুর মন ভাঙিয়া গেল। গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—ভবিষ্যতে রাণুকে কোনদিনও ঐ অভদ্র পরিবারে পাঠাইবেন না। ইহার পর হইতে রাণুর বিবাহ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা তাঁহাদের বাড়ীতে হয় নাই। রাণুও এই বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিল। হয়ত তাহার বুঝিবার শক্তি তখন ছিলনা।

সে নিয়ম মত স্কুলে যাইত। ছুটীর পর বাড়ী ফিরিয়া নাকে মুখে কিছু গুঁজিয়াই আবার পার্কে ছুটিত। তাহার সহিত ছুটিয়া—লাফাইয়া কেহ পারিয়া উঠিতনা। এমনি করিয়া একটির পর একটি দিন চলিয়া গিয়া রাণুকে বয়সের উচ্চ হইতে উচ্চতর ধাপে উঠাইয়া দিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সাত বৎসর কাটিয়া গেল। এই দীর্ঘ সাত বৎসর দুই বৈবাহিক কেহ কাহারও খবর জানিতেন না।

রাণু ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে। কলেজেও ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহার আর আনন্দের সীমা নাই।

সে যখন স্নান করিয়া একথোকা কোঁকড়ান ভিজে চুল পিঠের ওপর ফেলিয়া দিয়া বড় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া টিপ পরিত তখন তাহারই মনে হইত, সত্যিই সে বড় সুন্দর।

কলেজে আসিয়া প্রথম শ্রেণীর মাঝামাঝি জায়গাটি সে দখল করিয়া বসিল। ক্লাশের মেয়েদের সহিত আলাপ জমাইতে তাহার বিশেষ দেরী হইল না। একদিন রাণুর সিথির মাঝখানে সরু সিন্দুর রেখা আবিষ্কার করিয়া ইলার কৌতূহল বাড়িয়া গেল। সে বলিল নিশ্চয়ই রাণুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে—এতদিন সে তাহার নিকট গোপন রাখিয়াছে।

ইলা অভিমানে ফুলিতে লাগিল। রাণু বলিল—সে নিজে কোন দিন সিন্দুর পরে নাই। মা তাহাকে রোজ পরাইয়া দেন। মা বলিয়াছেন সিন্দুর নাকি তাহাকে পরিতে হয়—মানত আছে। ইলা তাহাকে বুঝাইয়া দিল বিবাহের পূর্ব্বে সিথিতে সিন্দুর পরা হিন্দু সমাজে একেবারেই অসম্ভব। তাহার পর ইহারা নিজে নিজেই স্থির করিয়া লইল যে নিশ্চয়ই রাণুর অল্প বয়সে বিবাহ

হইয়া গিয়াছে—এই জন্যই তাহার স্মরণ নাই। পরে এই লইয়া আর কেহ মাথা ঘামায় নাই।

একদিন ক্লাশে বলিয়া শোনা গেল—বিজ্ঞানের প্রফেসর আট মাসের ছুটিতে যাইবেন এবং আগামী সপ্তাহে তাঁহার স্থান অধিকার করবেন নতুন একজন প্রফেসর! এ প্রস্তাব কাহারও যেন মনঃপূত হইল না। আবার নতুন প্রফেসর! লেক্চার বুঝতে না পারলে একজন নতুন লোককে কি করিয়া প্রশ্ন করা যায়! সঙ্কোচ কাটিতে আবার কিছুদিন যাইবে। এই ভাবিয়া সকলেই একটু নিরুৎসাহ হইয়া গেল।

যথা সময়ে এক তরুণ প্রফেসরের আবির্ভাব হইল। পরিধানে সাহেবী পোষাক। গোঁপ দাড়ি কামানো—ফর্সা রং—লম্বায়ও সাধারণের তুলনায় একটু বেশী। মুখশ্রী সুন্দর। এক কথায় সুপুরুষ বলা যায়।

কিছুদিন পর দেখা গেল নতুন প্রফেসরের লেকচার বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হয় না। গম্ভীরভাবে ক্লাশে ঢুকিয়া লেকচার দিয়া—তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যান। এতটুকু দেরী করিতে তাঁহার সাহস হয় না যদি কেহ কিছু প্রশ্ন করিয়া বসে—তবেই তো বিপদ! সাম্না সামনি এত গুলো মেয়ের প্রশ্নের উত্তর তিনি কিছুতেই দিতে পারিবেন না। একদিন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে লেকচার দিতে গিয়া—তাঁহার দৃষ্টি পড়িল রাণুর উপর—ত্রস্তে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। রাণুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। সেদিন বাড়ী ফিরিয়া নতুন প্রফেসর কোন কাজে মনযোগ দিতে পারেন নাই। রাণুর বড় বড় করুণ চোখ দুটি কেবলই তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। জনহীন গৃহে ইজি চেয়ারে শুইয়া অতীত জীবনের কত কথাই আজ মনে পড়িয়া হৃদয়খানা গুমরাইয়া উঠিল।

এখন প্রায়ই নতুন প্রফেসরের দৃষ্টি রাণুর দৃষ্টির সহিত একত্র হইয়া যায়! রাণু চম্কাইয়া উঠে—যদি কেহ দেখিয়া ফেলে! পরের দিন রাণু ঠিক করিয়া আসে সে সাম্নে বসিবে না। কিন্তু দেখা যায় কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হইয়া উঠে না।

নোটীশ

পূজা উপলক্ষে "খেয়ালী" আফিস দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকিবে। আগামী ৫ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে "খেয়ালী" আবার যথারীতিভাবে প্রকাশিত হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"খেয়ালী"

তিনমাস কাটিয়া গেল। পড়াশুনায় আর রাণুর মন বসে না। প্রফেসর লেকচার দেন্—রাণুর লেখা হয় না—সে যেন ভালো করিয়া বুঝিতেই পারে না। হাঁ করিয়া প্রফেসরের দিকে তাকাইয়া থাকে। লেক্চার শেষ হইলে দৃষ্টি বিনিময় হইয়া যায়—রাণু অপ্রস্তুত হইয়া নড়িয়া বসে। প্রফেসর চলিয়া গেলে—সমালোচনা হয় "আজ নতুন Sir কি রকম পড়ালেন!" রাণুর খুব ভালো লাগে নতুন স্যারের গল্প শুনতে—বলিতে সে কিছুই পারিত না—"নতুন স্যার" বলিতেই যে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠে।

বাড়ী ফিরিয়া রাণু শুইয়া পড়ে—হাতমুখ ধুইবারও আর ইচ্ছা হয় না। ক্ষুধাও কমিয়া গিয়াছে—খাবার দেখিলেই গা জ্বলিয়া উঠে। পড়ার সময় হইলেই মনে হয় মাথা ধরিয়াছে। এখন প্রায় সব মেয়েরাই নতুন স্যারের সঙ্গে নানান্ রকম আলোচনা করে। কত প্রশ্ন করে উত্তরও পায়। রাণু কলেজে যাইবার আগে প্রস্তুত হইয়া যায় আজ সে নিশ্চয়ই নতুন স্যারের সহিত কথা কহিবেই। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও সে পারে না—জিভ জড়াইয়া যায়।

পূজার ছুটির সময় হইয়া আসিল। একদিন বাড়ী ফিরিয়া রাণু যাহা শুনিল তাহাতে হৃদয় যেন ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইল। মা রাণুকে কোলের কাছে বসাইয়া সযত্নে গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার বিবাহের ইতিহাস খুলিয়া বলিলেন। তারপর একখানা চিঠি রাণুর কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া পড়িতে বলিলেন। এতকাল পর হরিশঙ্করবাবু ক্ষমা চাহিয়া অনাদিবাবুর নিকট পত্র দিয়াছেন। এবার পূজাও সময়
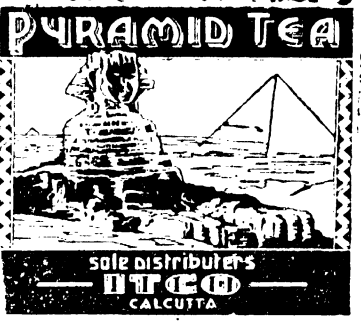
রাণুকে পাঠাইবার জন্ম বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন—২/১ দিনের মধ্যেই লোক পাঠাইতেছেন। চিঠি পড়িয়া রাণু হতভম্ব হইয়া গেল। কি করিবে সে!

পরদিন যন্ত্রচালিতের ন্যায় কলেজে ছুটিল। নতুন স্যারকে প্রাণ ভরিয়া একবারটি শেষ দেখা দেখিয়া আসিবে। ইলা নতুন স্যারকে জিজ্ঞাসা করিল "এবার ছুটিতে কোথায় যাবেন স্যার? "এখনও ঠিক করিনি কিছু।" নতুন স্যারও অনেক মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিলেন—কে কোথায় যাইবে। অনেকেই অনেক দেশের নাম করিল। হঠাৎ রাণুর পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কোথায় যাবেন? রাণু দুবার ঢোক গিলিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া ধীরে ধীরে কহিল—"অমৃতসহর।" ইলা অবাক হইয়া বলিল—"অমৃতসহর?" রাণু কহিল "হ্যা।" রাণু একবার মাত্র শুনিয়াছে—তাহার শ্বশুরালয় বহু দূরে—এলাহাবাদে। সে তাড়াতাড়ি এলাহাবাদ ভুলিয়া গিয়া অমৃতসর বলিয়া বসিল।

তাহার পরদিন ইলা বেড়াইতে আসিয়াছিল বলিল—আজ নতুন স্যার ক্লাশে আসেন নাই দেখিয়া তাহারা খোঁজ করিয়া জানিয়াছে বাড়ী হইতে জরুরী তার আসায় স্যার একদিন আগেই দেশে চলিয়া গিয়াছেন।

ঠিক সময় মত রাণুর খুড়শ্বশুর আসিয়া পৌঁছিলেন—এবং ঐ রাত্রেই রাণুকে লইয়া রওনা হইলেন। শ্বশুরবাড়ীর আদর যত্নে ও এক হাত ঘোম্‌টার ভিতর রাণুর সারাটাদিন্ কাটিয়া গেল। রাত্রি দশটার পর—একদল সমবয়সী আসিয়া রাণুকে জোর করিয়া নিরঞ্জনের ঘরে ঠেলিয়া দিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সম্মুখেই নিরঞ্জনকে দেখিয়া রাণু চমকাইয়া বলিয়া উঠিল—"এ্যা—স্যার—?" নিরঞ্জনও উদ্বেগভরে রাণুর হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—এ্যা—আপনি—তু—মি?"

———

প্রত্যাশী

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

আমার আশার কোথাও ত ছেদ নাই,
শত-বিফলতা-বিজয়ী হয়েছি তাই।
ছেড়ে ও ছাড়ে না
হেরে ও হারে না
হেন দুর্ব্বার জনে
কেমনে এড়াবে বুঝিয়াও প্রাণপণে?
মানি পরাভব এতদিনে দিলে ধরা,
ফুলহারে মোরে বরিলে স্বয়ম্বরা।
তবু মনে হয়
এত পাওয়া নয়
এ যে দস্যুর হাতে

আপনারে দিয়া মারিলে আত্মঘাতে।
মুক্তির মাঝে তোমারে যে পেতে চাই,
ফেলি জয়মালা তাই দূরে সরে যাই।
আপনার টানে
যদি মোর পানে
কোনো দিন এস ভেসে
মানিব তখন বরিয়াছ ভালবেসে।

———

স্কুলসমূহে দন্তরোগ

ডাঃ রণেন্দ্র নাথ ঘোষ, ডি, ঈ, ডি, পি, (প্যারিস), পি জি আর, ডেণ্ট (ইংলণ্ড), আরও কতিপয় অভিজ্ঞ দন্ত চিকিৎসকের সাহায্যে সমগ্র কলিকাতায় স্কুল সমূহে কিছুদিন হইতে দন্ত পরীক্ষা করিতেছেন। গত ৭ মাসে তিনি ১০,০০০ হাজারের বেশী ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা করিয়াছেন। ডাক্তার ঘোষের মতে, গড়ে শতকরা ৭০ জন ছাত্র ছাত্রী দন্তরোগে আক্রান্ত হয়।

ডাক্তার ঘোষের এই চেষ্টা প্রশংসনীয়।
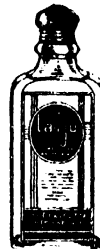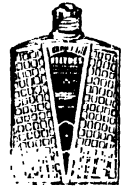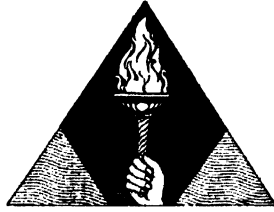
দেবদত্ত ষ্টুডিওতে

জি, সি, টকাজের

ইন্দিরা

সাহিত্য গুরুর শ্রীপাদপদ্মে
সিনেমার সুন্দরতম শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঃ পূজারী ঃ

শ্রীতড়িৎ কুমার বসু
এম্, এ, বি, এল

KHEYALI Regd. No. C. 1928

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১১ চড়কডাঙ্গা (সাউথ) রোডস্থ ভ্যারাইটীজ প্রেসে মুদ্রিত ও ন্যাশনাল
নিউজপেপার্স লিমিটেডের পক্ষে ৯, রামময় রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।
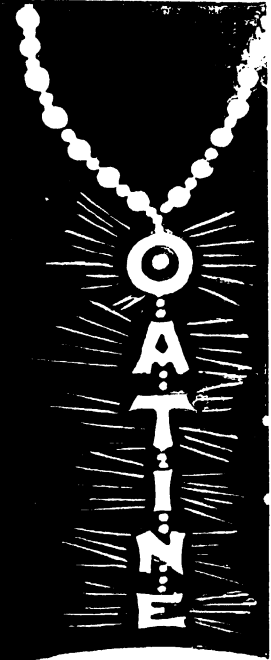
শারদীয়া
খেয়ালী
চিত্রপট

রাধা ফিল্মসের ধর্মমূলক বাণীচিত্র "প্রভাস মিলন"-এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় শ্রীমতী ছায়া। আসছে ৯ই অক্টোবর রূপবাণীর রূপোলী পর্দায় ছবিখানি আত্মপ্রকাশ করবে।

বোম্বে টকিজ এর "প্রেম কাহিনী" চিত্রের একটী বিশিষ্ট দৃশ্যে অশোককুমার ও মায়া দেবী

শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৪

মুল্য চার আনা মফঃস্বলে পাঁচ
Price -/4/- Mofussil -

পরিচালক: ন্যাশনাল নিউজপেপার্স লিঃ
১১, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ), কলিকাতা
টেলিগ্রাম: 'ভ্যারিটি' টেলিফোন: সাউথ ৪৬৬
সম্পাদক—শ্রীযোগজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়

খেয়ালী

আবির্ভাব

ছোট কথা, তুচ্ছ কাজ, ক্ষুদ্র সুখ দুখ
শঙ্কিত সঙ্কোচে যবে দুরু দুরু বুক
ভুলে যাই অপরেরে, ভুলি আপনারে
কীটসম পিষ্টপ্রায় পাষাণের ভারে
শক্তিহীন থাকি প'ড়ে আমি অচেতন
বাঁচিবার ছলে শুধু মরণ-সাধন।
সহসা নয়নে আজি হেরিনু কি আলো,
কাণে মোর সঞ্জীবনী মন্ত্র কে শোনালো
কে বুঝালো বেদনা সে চেতনার সাথী
ভয়ঙ্কর সর্ব্বগ্রাসী অন্ধ অমা-রাতি
শঙ্কাহারী শঙ্করের পূজার সে ক্ষণ
মৃত্যু-শিখা নহে—এ যে হোম-হুতাশন
কোন্ দেবলোক হ'তে করিতে তর্পণ
আহ্বান আসিল আজি? করিনু অর্পণ
নির্ভয়ে প্রাণের হবি—অপূর্ব্ব বিস্ময়
প্রাণহীন নহি আমি পূর্ণ প্রাণময়।
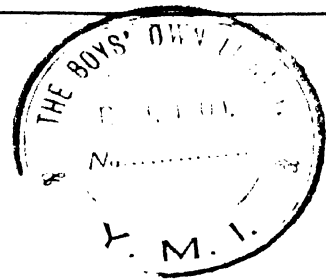
সেদিন মাধবী নিশি মধু-অবসরে
স্বপন-জ্যোছনা মাখা ফুলের বাসরে
বেজেছিল আমাদের মিলনের বাঁশী
প্রস্ফুট হৃদয়-পদ্ম সুরভির রাশি
ভ'রেছিল আমাদের মনোবনভূমি
তোমার আঁখির জ্যোতি মোর আঁখি চুমি'
জ্বালালো নয়নে মোর প্রাণ-বহ্নি-শিখা
আঁকিল ললাটে মোর প্রেম জয়ন্তিকা।
স্বপন-মানসী যবে সত্যে দিলে ধরা
সেই দিন হ'তে মোর সর্ব বসুন্ধরা
মিলালো তোমার মাঝে ; মোর স্বপ্ন, আশা
জনম-মরণ-প্লাবী মোর ভালবাসা
রচিল অলোকপুরী—অলকা-বিলাস
বিশ্ব সেথা গতিহীন—কাল রুদ্ধশ্বাস।
তুমি আর আমি শুধু—কেহ কিছু নয়
মুহূর্ত্ত অনন্ত সেথা—প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।

* * *

দেখেছিনু সত্যরূপ—নাহিক সংশয়
মুহূর্ত্ত অনন্ত চির—প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।
কিন্তু সে গহীন রাতে স্বপ্নময় চোখে
দেখি নাই খর দীপ্তি দিনের আলোকে
দেখেছিনু মানসীর মোহন-মায়ায়
দেখি নাই ক্রূর হিংসা মিথ্যা ছলনায়
দেখেছিনু বালুতীরে ছোট খেলা ঘরে
দেখি নাই সু-উত্তাল চলোর্মি-সাগরে।
দেখেছিনু রাধাশ্যাম জীবন-দোলায়
দেখি নাই নটরাজ রুদ্রের লীলায়।
আধ জাগা আধ ঘুমে গেল বহুদিন
শান্তির শয়ন-ক্রোড়ে সুখ স্বপ্নলীন।
স্বপন টুটিয়া দেখি তুমি নাই পাশে
দিবসে সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসে।
সে অকাল-ছায়া-ম্লান তব দুটি চোখে
জাগে নাকো মোর ছবি দীপ্তির পুলকে
নহ তুমি বহুদূরে—তবু ব্যবধান
উভয়ের মাঝে যেন সাগর সমান।
এ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান করিবারে লয়
সকল শকতি মোর মানে পরাজয়
ডাকি "তুমি কাছে এসো"—ব্যথাদীর্ণস্বর
তোমারে চিনি না আমি—আসিল উত্তর।

* * *

আবার দেখিনু চেয়ে একি ভয়ঙ্কর!
তব মূরতির এ কি নব রূপান্তর
তোমার মাঝার হতে এল বাহিরিয়া
শঙ্কর—সে সংহারের রুদ্র মূর্ত্তি নিয়া
নয়নে প্রলয়-বহ্নি মুক্ত জটাজাল
কাল-গঙ্গোত্রীর ধারা সেথায় উত্তাল
শঙ্কায় শিহরি দেখি একটি নিমেষে
বিশ্ব তৃণখণ্ডসম তাহে গেল ভেসে।
তারপর ধীরে তাঁর তৃতীয় নয়ন
প্রলয়বহ্নির শিখা করি সংহরণ
আপনি মগন হ'ল আপনার মাঝে
তাঁহার দক্ষিণ মুখে প্রশান্ত বিরাজে
মধুর উদার হাসি পূর্ণ শিবময়
ক্ষণ আগে যেই সৃষ্টি লভেছিল লয়
সে আবার এল ফিরে নূতন শোভায়
নবরূপ পেল তাঁর আঁখির বিভায়।

* * *

একি নিদারুণ ব্যথা, একি হর্ষ মোর!
একি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন, একি সত্য ঘোর!
সর্ব বিপরীত আসি' মিলে এক ঠাঁই
এক মহাসত্য আছে—অন্য কিছু নাই।
দূরে গেল দ্বিধা মোর, দূরে গেল ভয়
আজিকে বলিতে পারি-জয় চির জয়
জয় তব সত্য প্রেম, জয় মিথ্যা ছল,
জয় ভালবাসা, জয় ঘৃণা হলাহল,
স্নেহে জয়, আঘাতেও জয়-বার্ত্তাবহ
বল মিলনের জয়, জয়তু বিরহ,
জয় জন্ম, জয় মৃত্যু,—সকলের মাঝে
অমৃত আনন্দময় এক সত্য রাজে।
এই আবির্ভাব আর এই আবিষ্কার
বুকের শোণিতে মোর রূপ দিনু তার
অমর নির্ঘোষে বলি—নাহিক সংশয়
মুহূর্ত্ত অনন্ত চির—প্রেম মৃত্যুঞ্জয়।

শ্রীসুবোধ রায়

সমালোচনা ও সমালোচক

লেখক—[illegible] নাথ মিত্র

আজ বিংশ শতাব্দীতে আলোচনা কথাটার নূতন কোরে ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন আর নেই। তবুও আমার মনে হয়, কেহ কেহ ইহার মর্ম্মার্থ বুঝতে সক্ষম হননি এবং এই কারণেই সমালোচনার নাম দিয়ে যথেচ্ছাচারিতা প্রকট হয়ে উঠেছে, স্বার্থদুষ্ট হয়ে উঠেছে।

সেই বিষয়ে আজ কিছু বলবার চেষ্টা করব—আশাকরি কেহ তার কদর্থ করবেন না। দুঃখে, লজ্জায়, ঘৃণায় মনের মধ্যে যে ভাব আজ সজাগ হয়ে উঠেছে তাই প্রকাশ করবার দুঃসাহস নিয়ে আপনাদের সাম্‌নে উপস্থিত হচ্ছি—আশাকরি ক্ষমা করবেন—হয়তো কেউ কেউ বলবেন অনেক কিছু নষ্ট জিনিষত জগতে বিদ্যমান আছে তা বলে কি কেউ সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আমি তাঁদের এই কথা নতশিরে গ্রহণ করব, কিন্তু তাঁদের একবার ভাবতে অনুরোধ করব—এই প্রকার সমালোচনার দ্বারা কি ফিল্ম-শিল্পের উন্নতি কোনদিন হবে—তাঁদের জিজ্ঞাসা করব শিল্পিদের নিঃস্বার্থ চেষ্টা কি এদের দ্বারা কতক পরিমাণে ব্যর্থ হয়না।

যে কোন কার্য্যারম্ভে মানুষ মাত্রকেই কিছুকাল শিক্ষাধীন থাকতে হয়—সেই কার্য্যে তৎপরতা লাভ করবার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় চিত্র সমালোচকদের সে বালাই নেই। লিখতে একটু ও দ্বিধা বোধ করছিনা—এরা ঠিক যেন রূপকথার সোনার কাটি আর রূপার কাটি ছোয়ান মানুষের মতন। কখন যে এদের লেখার শক্তি জন্মায় আর লিখিত বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয় তা জানা সহজ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ফিল্ম-শিল্পের উন্নতি এরা কামনা করেন মনে প্রাণে, লেখার মারফতে তা প্রকাশও করেন কিন্তু কোন ছবির দোষগুণ আলোচনা করবার সময় ছবিগুলিকে পাকা ব্যবসাদারের মতন বিজ্ঞাপন লব্ধ টাকা, আনা, পাই-এর মাপকাঠিতে ওজন করেন এবং সেইমত মত প্রকাশ করেন। এরূপ স্বাধীন মতাবলম্বী জন সমষ্টি পৃথিবীর অন্যত্র আছে কিনা সন্দেহ। এদের আর একটি দৃঢ় ধারণা আছে এরা জনমত সৃষ্টি করেন—এরা যা কিছু লিখবেন বা বলবেন, বাইরের বৃহৎজনসমাজের কাছে হবে তা ধ্রুব সত্যভাষণ। এরা কোনদিন কোন কালে হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে, জনসাধারণ ছবির মূল্য ধার্য্য করেন তাঁদের সহজ সরল জ্ঞানের দ্বারা—তাঁদের আত্মতৃপ্তির তুলাদণ্ডে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অনেক ছবির নাম করা যেতে পারে—যার প্রশংসায় উক্ত সমালোচকরা আত্মহারা হয়েছেন কিন্তু দর্শকগণ আত্মহারা হয়নি এবং এমন দৃষ্টান্তও অপ্রচুর নয়—ছবি বিশেষের নিন্দায় উক্ত সমালোচকরা সারা সহরটাকে মুখর কোরে তুলেছেন। অথচ সেই ছবি দেখবার জন্য দর্শকের স্বল্পতা কোনদিনই হলোনা। অবশ্য একথাও স্বীকার করব মানুষের মন চির চঞ্চল—এবং তার উপর কোন দাগ দেওয়া বিশেষ কষ্ট সাধ্য নয়।

বিশ্বের দরবারে মানুষ সর্ব্বকালে এসে দাঁড়িয়েছে ছাত্রের বেশে কিন্তু উক্ত সমালোচকরা মনে জ্ঞানে বিশ্বাস করেন তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন ত্রাণকর্ত্তারূপে। তাঁদের সন্তুষ্ট না রাখলে ফিল্মব্যবসায়ীদের

দিন চলা অসম্ভব—ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কেহ কেহ অভিমানে অভিভূত হয়ে কাহারও কাহারও দৈনন্দিন জীবন নিয়ে আলোচনা কোরতেও কুণ্ঠিত হননা। ক্ষনিকের মত্ততায় ভুলে যান সহজ ভদ্রতা জ্ঞান।

ছবির উদ্দেশ্য জনসাধারণের সামনে ভাব বিশেষের রূপ প্রকাশ করা ও তাঁদের তৃপ্তি দেওয়া, কিন্তু উক্ত সমালোচকরা ছবির সার্থকতা বিচার করেন না সেদিক থেকে—তাঁরা প্রথমেই দেখেন প্রশংসাবাণী বাবদ কতটা আর্থিক লাভ তাঁদের হয়েছে এবং সেইমত ভাল মন্দের তালিকা প্রস্তুত করেন। দুঃখের বিষয় তালিকা প্রস্তুত করার শক্তি আছে কিনা সে বিষয়ে চিন্তা তাঁরা কোনদিনই করেন না।

এত কথা লেখার পর হয়ত এদের মধ্যে কেহ কেহ প্রশ্ন করবেন "নাম প্রকাশ করুণ কে বা কারা এ কাজ করেছে?"—সেই জন্যে পূর্ব্বেই আমি বলে রাখছি সে কার্য্য আমার দ্বারা সম্ভবপর হবেনা কারণ, আমি কোনদিনই চাইবনা কোন কলহের সৃষ্টি কোরতে; আর আজ আমি সকল কথা লিখছিও না কারুর প্রতি ঈর্ষা প্রণোদিত হয়ে। আমায় যদি কেহ বিশ্বাস করেন ত এইটুকুই বলতে পারি, যা কিছু আজ আমি লিখেছি তা আমার নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর কোরে। আমাদের ভাষায় একটি চলতি কথা আছে "মনের অগোচরে কোন পাপ লুকান থাকেনা।" কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে আমার কাছ থেকে জবাব চাওয়া আর কাহারও উচিত নয়। যাঁরা দোষী তাঁরা জ্ঞাত আছেন তাঁদের দোষ।

এখন উক্ত সমালোচকদের বন্ধুভাবে বলতে চাই অপ্রস্তুত অবস্থায় কোন বিষয়ে সমালোচনা করবার জন্য যেন প্রস্তুত হবেন না—দেনা পাওনার মাপকাঠিতে যেন সমালোচনার তারতম্য না ঘটে। ফিল্ম-শিল্প আজ উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে একথা অতি বড় নিন্দুকও অস্বীকার করতে পারবেন না এবং সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করতে পারবেন না কেউ যে, এর উন্নতির জন্য ষোল আনা দায়ী ফিল্মব্যবসায়ীদের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম। বৈদেশিক কোন বিশিষ্ট লোকই এর উন্নতির সহায়তা করেন নি—করেছে দেশের লোক যাঁরা এই কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। তাঁদের শিক্ষা নির্ভর করেছে আত্মনির্ভর শীলতার উপর—তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টার উপর। অনেক সময় দেখা গিয়াছে প্রযোজক বিশেষ যার অর্থ-সামর্থ কম, উক্ত সমালোচকদের সন্তুষ্ট করতে না পারায় তাঁদের হাতে অযথা নিগৃহিত হয়েছেন এবং তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

আজ আমি উক্ত সমালোচকদের তাই জানাতে চাই—এই ফিল্মশিল্প তাঁদের কাছ-থেকে আশা করে সহানুভূতি—চায় না তাঁদের কাছ থেকে বিদ্বেষপ্রসূত ব্যবহার। আজ ভারতের মানচিত্রে বাংলা ফিল্মব্যবসায়ী হিসাবে যে আসন লাভ করেছে তার সে আসন যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে তার জন্যে নিস্বার্থভাবে সকলকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

উক্ত সমালোচকদের আমার একমাত্র অনুরোধ—তাঁদের শিক্ষা নির্ভর করুক তাঁদের সাধনার উপর—তাঁরা শক্তিলাভ করুণ একনিষ্ঠ সাধকের মতন—টাকা, আনা, পাইএর তুলাদণ্ডে ছবির গুণাগুণ বিচার করা ভুলে যান। দেশের শিল্পের মধ্যে, দেশবাসীর সাধনার মধ্যে, নিজেদের বিলীন করুণ, তাঁদের সঙ্গে সমভাবে প্রশংসা অর্জ্জন করুণ—নিঃস্বার্থপর দীন সেবক হিসাবে অনন্ত যশলাভ করুণ।

ছোট জুঁই

শ্রীমতী রুচিরা দেবী

একটি জুঁই ফুটেছে মোর গাছে,
একটি যেন অশ্রুজলের ফোঁটা,
বুকেতে ভীরু গন্ধটুকু আছে,
বাতাসে কাঁপে আলগা ছোট বোঁটা!
সজল মেঘে আকাশ হ'ল কালো,
অকালে আজ গোধূলি এল নেমে,
এমন দিন লাগিছে বড় ভালো,
নূতন ক'রে পড়িনু তব প্রেমে।
হয়ত তুমি হাসিবে মনে মনে,
দ্বিধায় মরি তাইত অকারণে।
আমার টবে ফুটেছে ছোট জুঁই,
ফুটেছে উঠে মনের ছোট আশা,
ইহারে তুলে কোথায় বল থুই?
কোথায় রাখি এ মোর ভালোবাসা?
পাপড়িগুলি কোমল ছোট ছোট
চোখের জলে রয়েছে যেন গাঁথা!
বাতাস লেগে হ'য়েছে ফোটো ফোটো,
চার ধারেতে ঘন সবুজ পাতা!
রাখিনু ইহা তোমার পদ মূলে,
আমার পূজা একটি ছোট ফুলে॥

করিব ভাষায় এদের আমি বলতে চাই, "দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া" অতএব আসুন সকলে মিলে দ্বেষ-হিংসা ভুলে গিয়ে একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় স্ব স্ব সাধনায় নিজেদের ব্যাপৃত করি। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

ওঁ শান্তি

সত্যিকারের আর্ট কি?

শ্রীমেঘেন্দ্র লাল রায়

প্রবন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সত্যিকারের আর্ট কি? অর্থাৎ আর্টের প্রকৃত অর্থ কি? এই প্রশ্ন হয় তো অনেকের মনে হাস্যের উদ্রেক করবে। অনেকে হয় তো চিন্তা ক'রবেন যে, আর্টের অর্থ এতোই সহজ সরল সুবোধ্য যে, এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করাই বাতুলতা। অনেকে উত্তর দেবেন আর্টের অর্থ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা—যা মানুষকে আনন্দ দান করে। অবশ্য এ উত্তর দিলে আমাদের কিছু ব'লবার নেই। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা ক'রলে এই প্রশ্ন কি মনে আসে না যে "সৌন্দর্য্যে"র প্রকৃত অর্থ কি, "আনন্দ দানের" কি অর্থ আর্টের রাজ্যে। আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি, যে কোন কথার অর্থ যত জটিল, যত বিভিন্ন অর্থ পূর্ণ হয় সে কথারই অর্থ আমরা অত্যন্ত সোজা সরলভাবে নিয়ে থাকি। এই সহজ ভাবে আর্টের অর্থ গ্রহণ করার জন্য আজও আর্ট কথাটীর প্রকৃত সংজ্ঞা যে কি তা ঠিক হয় নি। বিখ্যাত জার্ম্মান লেখক Schasler তাঁর Aestheticsএর বিখ্যাত পুস্তকে লিখেছেন "যে জগতে কোন শাস্ত্র এই Aestheticsএর মতন (তা Plato Aristotle থেকে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত) দার্শনিকদের হাতে "বেপরোয়া"ভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় নি—আর সেই কারণে Aestheticsএর ঠিক সংজ্ঞা বা নির্দ্দেশ দেওয়া কঠিন।" আমরা Artএর বা সৌন্দর্য্যের অর্থ দিতে অনেক সময়ে Socrates, Plato বা Aristotle বা Plotonuis ইত্যাদি দার্শনিকের মতামত উল্লেখ করি। কিন্তু উল্লেখ করার সময় আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই যে, সক্রেটিস্ বা প্লেটো সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের গবেষণার মধ্যে কখনও সৌন্দর্য্যকে মানুষের জীবন বা দেশের, সমাজের, জাতির হিত সাধন থেকে পৃথক ক'রে দেখেন নি। প্রবন্ধে বলা হয় যে সৌন্দর্য্যের বা আর্টের সৃষ্টির সঙ্গে দেশের, সমাজের বা নিজের কোন সম্পর্ক নাই অথচ সেই প্রবন্ধেই নজীর দেওয়া হয় উক্ত লেখকদের পুস্তক থেকে "শান্তং শিবং অদ্বৈতম্" একটা কোন কথাই নয়। এর ফলে দেখি উক্ত লেখকদের গবেষণা কদর্থ পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

সৌন্দর্য্যের প্রকৃত অর্থ কি, বা আনন্দের প্রকৃত রূপ কি, বা আনন্দের শ্রেণী বিভাগ সম্ভব কি না, আর্টের প্রকৃত সংজ্ঞা কি এসব গভীর চিন্তা আমাদের মনে আসে না।

আর্টের অর্থ আজও সঠিক ভাবে স্থিরীকৃত না হওয়ার দরুণ জগতের সাহিত্যে, আমাদের সাহিত্যে কোনটা সত্যিকারের আর্ট আর কোনটা মেকী আর্ট তা সম্যক বুঝতে পারি নে। সেই জন্য আধুনিক সাহিত্যে কোন কবি বা নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক কিছু খ্যাতি লাভ করেছেন ব'লে তাঁদের নাম, হয় রবীন্দ্রনাথ না হয় দ্বিজেন্দ্রলাল বা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে উল্লেখ করে বসি। যাদের নাম করি তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই মেকী আর্টিষ্ট। কিন্তু মেকী আর্টিষ্ট বা প্রকৃত আর্টিষ্টের বিচার ক'রবেন কে? এর উত্তর আমরা কোথায় পাবো। সত্যিকারের আর্টিষ্টের সংখ্যা সব দেশেই অত্যন্ত কম—মেকী আর্টিষ্টএর সংখ্যাই বেশী। মেকী আর্টিষ্ট হবার সুবিধাও হয়েছে আজ অনেক। যিনি ভাষা এক রকম করে আয়ত্ত করেছেন তাঁর পক্ষে আর্টিষ্ট হওয়া খুবই সহজ সাধ্য। কারণ আর্টে অনেক প্যাঁচ কষা আরম্ভ হয়েছে এবং প্যাঁচ কষার techniqueও এই সব লেখক আয়ত্ত করেছেন বেশ ভালভাবেই—অর্থাৎ আর্টের সৃষ্টিতে হঠাৎ কাঁদানো বা রাগানো বা হঠাৎ উত্তেজনা বা অবসাদ আনা বা কবিত্বে একেবারে ভাসিয়ে দেওয়া এ সব কি করে লেখার মধ্যে এনে মানুষ উত্তেজনার সৃষ্টি কর্ত্তে হয়, এ সব মেকী আর্টিষ্ট বেশ জানেন। কিন্তু হঠাৎ কাঁদান, রাগানো বা অবসাদ আনা প্রকৃত আর্ট নয়। সমগ্র লেখা মনকে ব্যাপকভাবে যখন সাড়া দেবে তখনই তা প্রকৃত আর্ট। লেখকের সৃষ্টিতে কবিত্ব আছে অর্থাৎ প্রচুর সার করা কথা বর্ত্তমান, বাস্তবতা আছে অর্থাৎ যা প্রকৃতির নকল বা photography, নানান রকম ঘটনার সৃষ্টি ঘাত প্রতিঘাত আছে অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বিখ্যাত লেখকদের অক্ষম অনুকরণ যাতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির পরিবর্ত্তে বদহজমের পরিচয় এবং অনেক সময়ে গল্পের কি উদ্দেশ্য বা কি পরিণাম তা প্রকাশ হয়ে প'ড়ে পাঠকের কাছে রচনার আংশিক পাঠ করলে। আবার এও অনেক সময়ে দেখা যায় যে প্রকৃত বড় আর্টিষ্ট অনেক সময়ে অনুকরণের মোহে, বড় লেখকের প্রভাবে সময় সময় মেকী আর্টিষ্ট হয়ে পড়েন। এই মোহ থেকে বাদ প'ড়েছেন Shakespeare (সুযোগের অভাবে) গিরিশচন্দ্র (ইচ্ছা করে) টলষ্টয় প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, আগেকার কবিতা, আগেকার গীত চিরদিনই লোককে আনন্দ দান করবে—তার কারণ তখন রবীন্দ্র নাথের বিরাট পাণ্ডিত্য ছিল না তাই তাঁর প্রতিভার মৌলিক বিকাশের সুবিধা হয়েছে।

কিন্তু যখন রবীন্দ্রনাথ প্রকাণ্ড পণ্ডিত হ'লেন, Shakespeare, Ibsen Shelly থেকে জগতের সব বিখ্যাত বই পাঠ ক'রলেন ও প্রভাবিত হ'লেন, তখন তিনি বিস্মৃত হ'লেন যে, তিনি উক্ত কোন লেখকের চেয়ে কম বড় আর্টিষ্ট নন্; সুতরাং তাঁর লেখায় প্রভাব আসা উচিত নয়—সেই কারণে ঘরে বাইরের রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথের কাছে ছোট। ঠিক ঐ এক কারণেই বিরহ বা পাষাণীর দ্বিজেন্দ্রলাল, সাজাহান বা চন্দ্রগুপ্তের দ্বিজেন্দ্রলালের চেয়ে বড়, ঠিক ঐ একই কারণে দেবদাস বা পরিণীতা, রামের সুমতি ইত্যাদির শরৎচন্দ্র, গৃহদাহ বা শেষ প্রশ্নের শরৎচন্দ্রের চেয়ে বড়—কারণ গৃহদাহের বা শেষ প্রশ্নের শরৎচন্দ্র মহা পণ্ডিত, দেবদাসের শরৎচন্দ্র তা নয়। এই মতামতগুলি হয় তো পাঠকের কাছে অদ্ভুত ব'লে মনে হ'তে পারে কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা ক'রলে হয় তো এই কথার মধ্যে সত্য উপলব্ধি ক'রতে সক্ষম হ'বেন।

আর্ট নিয়ে এতো তর্ক এতো গবেষণা কিন্তু আর্ট জগতে কি উদ্দেশ্য সাধন ক'রছে? তথা কথিত আর্টিষ্ট জগৎময় কি কার্য্যে লিপ্ত আছেন?

প্রকৃত আর্টিষ্ট সময় সময় (হাততালী পাবার জন্যে) এবং মেকী আর্টিষ্ট তো বটেই নিজেদের শক্তি নিয়োজিত করেছেন মানুষের বা নারীর যৌন ক্ষুধাকে জাগাতে, লিপ্সাকে খাদ্য দিতে। যে বিরাট সাম্রাজ্য উপন্যাসের ছোট গল্পের জগৎময় ছড়িয়ে পড়েছে তার মধ্যে শতকরা নিরেনব্বইটা গল্প, উপন্যাস যৌন প্রেম, যৌন ক্ষুধা নিয়ে লেখা—এর মধ্যে শ্লীলতা বজায় রেখে অতি সুন্দর সৃষ্টিও যে নেই তা নয়—তবে বেশীর ভাগ অসুন্দর ও অস্বাস্থ্যকর। শুধু সাহিত্যে কেন, প্রস্তর মূর্ত্তিতে, তৈল চিত্রে, নারীর নগ্ন সুমোহন মূর্ত্তি, ছবির বিজ্ঞাপনে, ঔষধের বিজ্ঞাপনে চতুর্দ্দিকেই মানুষের নারীর যৌন লিপ্সাকে জাগ্রত ক'রবার চেষ্টা দেখা যায়। কি সঙ্গীত কি ছায়াচিত্র সর্ব্বস্থানেই এই সব দৃশ্য দেখে মনে হয় যেন, বর্ত্তমান আর্টের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়েছে মানবের পাশব প্রবৃত্তিকে সুমোহন বেশে চিত্রিত ক'রে সমগ্র জগতে পরিবেশন করা। আর্ট কি সত্যই এই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। যাহারা নিজে আর্টিষ্ট নয় অথচ আর্টকে ভালবাসেন, তাঁরা কি নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে এই কথা জিজ্ঞাসা ক'রছেন, না সে আর্ট কি শুধু ধনীর অবস্থাপন্নের জন্যই, তাদের অবসরের চিত্তবিনোদনের জন্যই হয়েছে—যে আনন্দ এই সব আর্টিষ্ট দান করেন তার সঙ্গে দীনদরিদ্র নিরক্ষর বুভুক্ষু পীড়িতের কোন সম্বন্ধ নাই। যাকে আমরা আর্ট বলি তা জগতের দুঃখই বাড়িয়ে চলেছে, জগৎকে এক পদও অগ্রসর ক'রতে পারছেনা এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে মহৎ প্রবৃত্তি আছে তাকে ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত ক'রছে। আর্ট এর উদ্দেশ্য কি শুধু সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে আনন্দ দান করা বা একটু শান্তি দেওয়া বা একটু আমোদ দেওয়া—না আর্টের সে উদ্দেশ্য নয়—আর্টিষ্টের উদ্দেশ্য ঢের বেশী মহৎ। প্রকৃত আর্টিষ্টের মধ্যে সেই শক্তি বর্ত্তমান যার যাদুদণ্ডে মানুষের যৌক্তিক দৃষ্টিকে ভাবের রাজ্যে নিয়ে যায়—যাতে আমরা নিজের কথা ভাবি। দেশের কথা ভাবি, নিজের সমাজের কথা চিন্তা করি, যে ভাবেতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা চিন্তা করি যে মানুষ সব ভাই; জগতের নারী সব বোন। এই জগতে বা সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে কলহ-বিবাদ, যুদ্ধ-হত্যা, রক্তপাত আর্টের রাজ্যে অসম্ভব হয় না কেন? আর্টের মধ্যে আজও মানবের আধ্যাত্মিক রূপ লুক্কায়িত আছে যা আজ জগতের সুখী ধনী জনকতক লোক কণ্ঠরোধ ক'রলেও, ভগবানের স্বর, আত্মার মধ্যে বিবেকের ধ্বনি জেগে উঠছে। বিজ্ঞান দীর্ঘকাল যুক্তির পতাকা উড়িয়ে, ঈশ্বর, নীতি সব বিসর্জ্জন দিয়ে আজ আবার ধর্ম্মের, ভগবানের একটা স্থান যে আছে তা স্বীকার কচ্ছেন—Whitehead কি Bertrand Russelle বাদ যান না। আর্টের ক্ষেত্রেও কি তা হচ্ছেনা? ঋষি টলষ্টয় সে আর্টের অর্থ দিয়েছেন Religious perception তা কি ঠিক নয়? তা নিশ্চয়ই সত্য—Religious perception মানে জগতের দুঃখ কষ্টের ভগ্নস্তূপের ওপরে মানবের বিরাট ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা—যাতে মানবের দুঃখ কষ্টের অবসান হয়। যাতে প্রত্যেক মানুষ এই জগতের বিরাট হাহাকারকে লক্ষ্য ক'রে বিলাস বর্জ্জন ক'রে।

মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু, যতীন্দ্র মোহন, সুভাষ চন্দ্রের বাণী কেন আমাদের হৃদয়ে আশার আলোক আনে। কেন জগৎময় আজও পাঠক Dickens, Stugo, Dostoevcsky, Tolstoy, Romaein Rolland রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি আদর ক'রে পাঠ করে? কেন আজও Millet, Bastien, Lepage, Iules Breton Lhermitte প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রকরের তৈলচিত্র আদর করে দেখে?

আর্ট যদি সত্যিকারের আর্ট হয়, আর্টের উদ্দেশ্য যদি হয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা সে সৌন্দর্য্য জগৎময় সুখের যোয়ার আনতে সক্ষম হয়। সেই আর্টই তবে প্রকৃত আর্ট—তখনই আর্ট মানুষকে একত্বের দিকে অগ্রসর ক'রবে—ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হবে সেই আর্টের সৃষ্টির ওপরে।

প্রকৃত আর্ট এর রাজ্য আজ যে নির্ব্বাসিত হয়েছে তা নয়। মেকী আর্ট আর্টের নামে আজ জগতে দীর্ঘকাল ধরে যে রূপ দেবার চেষ্টা করেছে তা সত্যিকারের আর্টের

ধ্বংশের পথে বাংলার ফিল্ম শিল্প

শ্রীচিত্তরঞ্জন ঘোষ

'রূপবাণী কি চিত্রা' কি উত্তরার' বাইরে যদি কেউ শনি রবিবার বিকেলবেলা দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁর নিশ্চয় ধারণা হ'বে দেশের যতটাকা সব সিনেমা কোম্পানীগুলো লুটে নিয়ে যাচ্ছে। বাইরের চাক্‌চিক্য ও লোক-সমাগম দেখে এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। তারপর দিন দিন বাণী-চিত্রের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। ছবির সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মাতার সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে, পরিবেশকের সংখ্যাও কিছু বেড়েছে আর সিনেমা হাউসের ত' কোন কথাই নেই। কিছুদিন এমন চলেছিল যে, ব্যবসায়ের বাজার মন্দা হওয়ায়, খালি গুদোমগুলো তেলের কল ও বড় গোয়াল ঘর ও কোন কোন জায়গায় সিনেমা হাউসে রূপান্তরিত হয়েছে। মফঃস্বলে এমন জায়গাও আছে যেখানে খালি বারোয়ারীতলা নাট-মন্দিরও এখন একটা আয়ের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। ইচ্ছায় হোক্, অনিচ্ছায় হোক লোকে কিছু কিছু চিত্রামোদী'ত হচ্ছেই, টাকার চলাচলের গতি একটু দ্রুত হ'য়েছে।

কেউ নিজেদের সখে কেউ বা অন্দর মহলের তাড়নায় সিনেমা কোম্পানীগুলোকে কিছু আক্কেল সেলামী দিতে বাধ্য হয়েছেন।

আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করেন যে, বাস্তবিকই কি সিনেমা কোম্পানীগুলি খুব লাভ ক'চ্ছে? এক টাকার টিকিটের মধ্যে সাত আনাও সব সময় নির্ম্মাতার কাছে পৌঁছায় না। সিনেমা হাউসের অংশ, পরিবেশকের অংশ, বিজ্ঞাপনের খরচ দিয়ে প্রায় সাত আনা নির্ম্মাতার কাছে গেলেও এর কতটুকু তার কাছে থাকে তা একবার ভাবা উচিত। এই সাত আনার অর্দ্ধেক বা সাড়ে তিন আনাই কল কব্জার ফিল্ম, প্লেট, কাগজ রাসায়নিক দ্রব্যের দাম হিসেবে যায়। বাকী তিন আনার মধ্যে দশ পয়সা কর্ম্মচারী, সংগঠনকারী ও অভিনেতা অভিনেত্রীর জন্য খরচ হয়। অপ্রত্যাশিত খরচের জন্য ও ভাড়া, টেক্স, বিজলী প্রভৃতির খরচ ৩।৩॥ পয়সা যায়। সর্ব্বশেষ বাকীর আধ পয়সার মধ্যে মূলধনের সুদ বাদ দিলে চিত্র নির্ম্মাতার খাস তহবিলে কত থাকে এইবার ভাবলেই বোঝা যায়। অপ্রত্যাশিতভাবে দু একটা ছবি তাড়াতাড়ি সেরে কম খরচে কোন রকমে ব্যবস্থা করে যদি ভাল ফল পাওয়া যায় তবেই রক্ষা। অবশ্য এ হিসেব মোটা-মুটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবির প্রথম বৎসরের জন্য। ছবির চাহিদা থাকলে দ্বিতীয় ও পরবর্ত্তী বৎসর হয়ত কিছু লাভ হয় তা'ও লোকে যতদূর ভাবে তার তুলনায় কিছুই নয়। ছবি যদি লোকে না নেয় তবে লোকসানের অঙ্ক কেমন দাঁড়ায় তা এখানে না'ই বললাম।

সিনেমা হাউসগুলির অবস্থাও তাই। ভাল ছবি বৎসরে যদি এক আধটা হয় তবেই কিছু লাভ থাকে। সাধারণ ছবিতে টাকায় আধ পয়সাও হয় না। তবে ব্যবসার খাতিরে রূপোপজিবিনীর মত বাহিরের চাকচিক্য রাখতেই হয়। অদৃষ্ট-ক্রমে ভাল ছবি একটার বেশী দুটি সময়মত পড়'লে কিছু থাকে। যা কিছু বেশী লাভ হ'তো তা আমাদের দেশের পরাক্রমশালী লোকের কৃপায় হতে পারে না, চার আনাও ফাঁকি দিয়ে কেমন করে চালবাজী ক'রে পঞ্চাশটা মিথ্যে কথা বলে, ভয় দেখিয়ে সিনেমা দেখব এই মতলব। বিশদ ব্যাখ্যা এ সম্বন্ধে করার দরকার নেই, সকলেই বুঝতে পারেন এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ক'রে ভারতীয় দণ্ডবিধির গোটা ৪।৫ ধারার মধ্যে নিজেকে ও এ পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষকে আনা যুক্তিযুক্ত নয়।

সহরের চেয়ে মফঃস্বলে সিনেমা হাউস-গুলির ওপর অত্যাচার আরও বেশী। সব জায়গায় লাইসেন্সের এক বড় ঘটা আছে। স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের দলাদলির গণ্ডীতে যেতে হয়। এক জায়গায় লাইসেন্স দেওয়া হল। বড় মালিক বা জমিদারের কাছে নালিশ হ'ল "হুজুরের প্রপিতামহ সিনেমা হাউসের পেছনের গাছের আম ভালবাসতেন, সেখানে সিনেমা দেখান হয় সেখানে তাঁর সাধনার মহাপীঠ ছিল ইত্যাদি। কাজেই ও লাইসেন্স নাকচের চেষ্টা করতে হবে।"

সুন্দর পবিত্র রূপ নয়। মেকী আর্টিষ্ট আজ আর্টকে গণিকার বেশে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছে—সেই কারণে গণিকার যে রকম বেশভূষা রূপ অলঙ্কার, সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তণ ক'রতে হয় প্রেমাস্পদের আকর্ষণ ঠিক রাখবার জন্য—সেই রকম পাঠকের মন ভোলাবার জন্য মেকী আর্টিষ্টকে সর্ব্বদাই নূতনত্বের সাহায্য নিতে হয়। এইসব কথা ধীরভাবে আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন।

সিনেমা হাউসকে মফঃস্বলে জব্দ করবার আর একটা সোজা উপায় আছে। হয় মসজিদ কাছে (অর্থাৎ প্রায় ১॥ ক্রোশ কাছে) নয় কালীবাড়ীর আরতির অসুবিধে আর কালীবাড়ী খোঁজ ক'রতে গিয়ে ৩০ ৪০ জনকে জিজ্ঞেস করে অতি কষ্টে এক আধজনের কাছ থেকে জানা যায় প্রায় এক মাইল দূরে, শিবমন্দিরের কুলুঙ্গীতে অপূজিত ছোট মাটির কালীমূর্ত্তির ভগ্নাংবশেষ, তাও লোক চক্ষুর অন্তরালে। আমাদের ভাই ছাহেবদের পক্ষে অবশ্য জব্দ করার আরও সুবিধে। কাছাকাছি মস্‌জিদ না থাকলেও কবর আছেই; আর কবরে প্রতি-সন্ধ্যায় মৃতের কল্যাণ কামনায় যে 'চেরাগ' দেওয়া হয় তা দূরের সিনেমা হাউসের loud speakerএর আওয়াজে কাঁপে।

মফঃস্বলে সিনেমার যদি প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ হ'ল (আর আজকাল প্রায়ই হয়) তবে; আরও সুবিধে। প্রথম rate cutting বা কম প্রবেশমূল্য করা। চার আনা থেকে কমতে ক'মতে এখন প্রবেশমূল্য এক আনা হয়েছে। তাও দল বেঁধে লোক এসে পাইকিরি বন্দোবস্ত করতে জোর করে। অনেক জায়গায় না দিলে বাইরে টিন পেটান ইট পড়া ত' আছেই আরও যে কতরকম ভৌতিককাণ্ড বা punitive measure হয় তা বলার দরকার নেই। কর্ত্তৃপক্ষের কাছে নালিশ হলেই হয়ত হুকুম হবে, তুমি একমাস আর তুমি একমাস ক'রে চালাবে'। অর্থাৎ কিনা এক সিনেমায় এক মাসের আয়ে দুমাসের খরচ চালাতে হবে। এ বন্দোবস্তে পরিবেশকের ছবি দেওয়া প্রায় অসম্ভব, সিনেমা হলের খরচ চালান শক্ত তা কর্ত্তাদের ভাববার দরকার নেই। রেষারেষিতে পতিত জমির ভাড়া মাসে ১০০৲ হল হয়ত জমির দামই ২০০৲র বেশী নয়। আর তার উপর জমিদারের আমলা কর্ম্মচারী তাদের সতায় পাতায় গোষ্ঠী গোত্র সবকে বিনা পয়সায় প্রত্যেক দিন সিনেমা দেখাতে হ'বে। পরাক্রান্ত জমিদার এত ভাড়া নিয়েও এত অযথা অন্তঃকরণ যে এক আনা বা দু' আনা খরচ ক'রে আত্মীয় স্বজনকে দেখতে বলতে পারেন না বা ব্যবস্থা ক'রতে পারেন না।

খোজ করে দেখা গেছে মফঃস্বলের সিনেমা হাউসের মধ্যে শতকরা ৮০টিই জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। বাকীগুলির উপর ও দামী কলকব্জা বসাবার জন্য ও আবহাওয়া আসনাদির উন্নতির জন্য কড়া তাগাদা। অথচ লোকেরাও আগের মত ছবিতে সন্তুষ্ট নয়। ছবি দর্শকের কাছে কিসে ভাল হয় কিসে মন্দ হয় পরে ব'লব এখন দর্শকদের সিনেমা হাউসের ওপর কিরূপ ভাব সে কথা আগে বলি। আজকাল মফঃস্বলে দর্শকের কিছুতেই মন ওঠে না। ক'লকাতায় অমুক হাউসে গদি আঁটা

[illegible] "গ্রহের ফেরে" চিত্রের নায়িকার ভূমিকায় শান্তা হালদার। [illegible]

"গ্রহের ফেরে" প্রধান তিনটি ভূমিকায় শান্তা হালদার, সুবোধ মুখোপাধ্যায় (জুঃ) ও নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।

মায়া মুখার্জ্জি: রাধা ফিল্মের পৌরাণিক ছবি "প্রভাস মিলনে"-র এক বিশিষ্ট ভূমিকায় একে দেখা যাবে।

চেয়ার এখানে তা হবে না কেন? যদি বেশী দামের আসনে কোন জায়গায় অয়েল ক্লথের গদির ব্যবস্থা হ'ল ত দর্শকরা ছুরির ধার পরীক্ষার একটা সুবিধে খুজে পেলেন—অবশ্য সকল দর্শকই যে এরূপ তা নয়। ক্রটীধরার স্পৃহা বা ছিদ্রান্বেষণের ইচ্ছা এখন তাদের খুব বলবতী হয়েছে। হয়েছে। সকলেই সূক্ষ্ম সমালোচক হ'য়েছেন। গ্রীক্ দার্শনিক Diogines যদি Visuvius এর মত অগ্ন্যুৎগার করতে পারতেন তবে যা হত, আমাদের সিনেমার পৃষ্ঠপোষক দর্শক এক একজন আজকাল তাই হ'য়েছেন। "ভাল না কিছুই ভাল না" এই ভাব। Machine ভাল না আলো ভাল না sound ভাল না acoustic condition ভাল না, হ'ল্ ভাল না আসন ভাল না, দেয়াল, দরওয়াজা, পরদা ছাদ ছবি জমি কিছুই ভাল না। এখানেই তাঁরা নিরস্ত নন্, নগদ যখন কিছু পকেট থেকে গেছে তখন এখানে থামলে ভাল না। সিনেমার কর্ত্তা ম্যানেজার, টিকিট বিক্রেতা, দরওয়ান মায় পানওয়ালা কেউই ভাল না এমন কি তাদের বাড়ীর উর্দ্ধতন ও অধস্তন কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত কেউই ভাল না, ছবির নির্ম্মাতা অভিনেতা পরিবেশক পরিচালক ইত্যাদি সকলেই এইরূপ। এখানেও ক্ষান্ত নন। কোন্ প্রযোজক বা পরিচালক কবে কতটুকু খাঁটির সদ্ব্যবহার করেছেন তাও কল্পনার সাহায্যে বাস্তব ক'রে উদ্গার করা চাই।

দর্শকের এরূপ মনোবৃত্তির ফলে ছবির সংখ্যার অনুপাতে দর্শকের মোট সংখ্যা বাড়চে না। ৪।৫ বছর আগে যখন বছরে ৪।৫টা বাংলা ছবি তৈরী হ'ত তখন যে পরিমাণে দর্শক ছিল এখন বছরে ১৭ ১৮টা ছবি হয় কিন্তু দর্শক ৪ ৫ বছর আগের তুলনায় ৪॥ গুণ বাড়ে নি। আগের তুলনায় বিনা পয়সার ছবি দেখার পৃষ্ঠপোষক ৬ ৭ গুণ কি তারও বেশী বেড়েছে কিন্তু যারা পয়সা দিয়ে দেখেন এরূপ দর্শক দ্বিগুণ কি আড়াই গুণের বেশী হয় নি। কাজেই লাভের অংশ ভাগ হ'য়ে আসে। এখন যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাকে diminishing return বলা যেতে পারে। আগে বিজ্ঞাপনে যে পরিমাণ খরচ হ'ত তার চেয়ে এখন ঢের বেশী হ'য়েছে। পরিবেশক যা পেতেন তার চেয়ে তার পারিশ্রমিক ঢের বাড়িয়েছেন। অভিনেতা অভিনেত্রীর ত' কথাই নেই। আগে সিনেমাকে তাঁরা গ্রাহ্য কর্ত্তেন না। থিয়েটার ও অন্যান্য ব্যবসায় তাঁদের প্রধান আয়ের পথ ছিল। আজকাল অভিনেতারা সিনেমাকেই একমাত্র অবলম্বন ক'রে নিয়েছেন,—অবশ্য অভিনেত্রীর পক্ষে একথা খাটে না কাজেই দৈনন্দিন খরচ আগের চেয়ে ঢের বেড়েছে। সব দিক দেখলেই বলা যায় খরচ যেমন বেড়েছে আয় সে অনুপাতে কমেছে।

এখন আমাদের দেখতে হবে আয় কমার জন্য কে কতটা দায়ী বা কার কতটা দোষ। আমাদের সিনেমা পত্রিকার কৃপায় ও বিদেশী ছবির আধিক্যে আমাদের দর্শকগণ বিদেশী ছবির সঙ্গে আমাদের ছবির সবসময়ই তুলনা করতে চান। তুলনা ক'রে দেখে শুনে ভালকরে সমালোচক হ'য়েছেন। আগে যেমন বাংলা ছবি হ'লেই ২।৪ বার দেখা চাইই; আজকাল ছবির সংখ্যা বাড়ার জন্য ও দেশের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তুলনা ও সমালোচনা ক'রে ও পরের কাছে শুনে গোড়া থেকেই বাছাই করেন। বিদেশী ছবির তুলনায় আমরা কিছুতেই দাঁড়াতে পারিনা তা তারা ভেবে দেখেন না। ছবির কলকব্জা, ফিল্ম, প্লেট ইত্যাদি সবই বিদেশী। বিদেশের নির্ম্মাতারা যে দামে পান এখানে তার চেয়ে টাকায় চার আনা থেকে দুআনা বেশী দিতে হয়। ফিল্মশিল্প জিনিসটাই বিদেশী, স্বাধীন আমেরিকায় যত টাকা খরচ করে গবেষণা ক'রে তাঁরা শিল্পকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়েছেন আমাদের তা'র ধারণার অতীত। সেখানে সাধারণ একটি ছবিতে যা খরচ হয় তাতে আমাদের সবগুলি ষ্টুডিওর এক বছরের সমস্ত খরচ চলে। আমাদের বাংলা ছবি বাঙ্গলার বাহিরে খুব কমই দেখান হয় আর বিদেশী (প্রধানতঃ আমেরিকার) ছবির বাজার সমগ্র পৃথিবী, সরকারের নানাপ্রকার সহানুভূতি আছে, লোকের সহানুভূতি আছে। আমাদের অবস্থা কি তাই? পরলোকগত মহামান্য সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ ইংলণ্ডের ফিল্ম প্রতিষ্ঠানের জন্য তার নিজের প্রাসাদ বাকিংহাম প্যালেস একবার ছেড়ে দিয়েছিলেন আর আজ যদি আমরা গিয়ে বলি—রাজপ্রতিনিধিকে, নয় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে, নয় জঙ্গীলাটকে, নয় এক জেলার কালেক্টার সাহেব ও পুলিস সাহেবকে যে তাঁদের কুঠীতে সিনেমা সিনের উপলক্ষে মাত্র ২।১ দিনের জন্য অনুমতি দিতে—তবে কি ফল হয় আশাকরি আমার সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ মনে মনে ভেবে দেখিবেন। আফ্রিকার সিন তুলবার জন্য টেম্স নদীর ধারে অনেকটা জায়গা বাস্তব আফ্রি পল্লীতে রূপান্তরিত করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ধারের শীতপ্রধান দেশের গাছ অনেক নষ্ট ক'রতে হয়েছিল এজন্যে শুধু গাছের ন্যায্য দাম নিয়ে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আর আমরা যদি চাই আলিপুর চিড়িয়াখানায় রাস্তার উপর সামান্য একটু সিন্ নিতে—তবেই দৈনিক নগদ ১০০৲ দিতে হবে, ইডেন গার্ডেনে ২০৲ বোটানিকেল গার্ডেনে ২০৲ ইত্যাদি। আর গাছ কাটা আগুণ জ্বালা ত' একেবারে নিষিদ্ধ এইত গেল কর্ত্তাদের সহানুভূতির কথা। এইবার আমাদের প্রিয়তম দেশবাসীর কথা একটু বলি। আমেরিকায় যদি কোন পল্লীতে ছবিতোলার দরকার হয় সেখানকার পল্লীবাসী

সানন্দে সহানুভূতি করেন। অভিনেতা অভিনেত্রীরা যেমন পরিচালকের কথামত কাজ করেন পল্লীবাসীও তাইই আর এখানে সাধারণ স্থানে ছবি তুলতে গেলে ত হাট ব'সে যায়। নির্জ্জন রাস্তায় নায়ক নায়িকা চলছে দেখাবার দরকার হলে তার উপায় নাই। যাকেই খোসামোদ করে বলি "মশায় একটু সরে দাঁড়ালে আমাদের সিন্‌টা হ'য়ে যায়" তখনই শতকরা ৯৫ জনের কাছ থেকে জবাব পাব "কেন মশাই একি আপনার বাবার রাস্তা"—সকলেই ব্যস্ত কি করে তার মুখ সিনেমার পরদায় দেখান যাবে। আচ্ছা যদি ভীড়ের দৃশ্য তুলতে যাই। হয়ত একজন গাড়ী চাপা পড়েছে—এ দৃশ্যে সকলের মুখেই একটু সহানুভূতির ভাব দরকার। জোড়হাত করে বলা হ'ল কিন্তু ক্যামেরা চালাবার সময় দেখা গেল সবাই হাঁসছেন। যদি বলি "মশাই হাঁসবেন না ছবি খারাপ হবে" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হ'ল "কেন মশাই আমরা কি আপনার মাইনের চাকর।" টেম্‌সের ধারের কাস্ত্রি পল্লীর মত যদি কোন জায়গা দৈবাৎ কোন জমিদারের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে ছবি তুলি। সিন তোলার সময় ৪।৫ শ' বাইরের লোকে জায়গা ভর্ত্তি হয়ে যাবে, কেউ সরবে না। জোর চলে না বাইরে টিন পেটাবার ভয় আছে। পুলিস আসবে না, রক্ষা কর্ত্তা কেউ নেই। টেম্‌সের ধারে কাস্ত্রি পল্লীতে কিন্তু কেউ যায় নি।

এবার আর্থিক সহানুভূতির কথা বলা যাক। বিদেশী কোম্পানীরা Bankর সহানুভূতি পায় কোটি কোটি টাকা নিয়ে কারবার করতে বসে। দরকার হ'লে কোটি টাকা ধার পায় তাও কম সুদে। যে মূলধন নিয়ে বসে তাতে গোড়া থেকে সচ্ছন্দভাবে চালাতে পারে। আমাদের দেশে ভারতবর্ষে ২।১টি প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানেরই মূলধন ৪।৫ লাখ টাকার বেশী ছিল না। প্রথম দমকা খরচের মুখেই প্রায় সব টাকা ফুরাবার পর বাজারে হাত পাততে হ'ল। Bankএ স্থায়ী আমানতের সুদ শতকরা বৎসর ২॥ কি ৩৲ কিন্তু ফিল্ম ষ্টুডিওর সব সম্পত্তি সত্ত্বেও তাদের চটা সুদের কমে বা কম টাকায় ব্যাঙ্কের হুণ্ডিতে টাকা পাওয়ার উপায় নেই। যে সব বড় বড় প্রতিষ্ঠান বাজারে হাত পাতেন তারা শতকরা বৎসরে ৩০৲ থেকে ৪৮৲ সুদ বা ব্যাজ দিতে বাধ্য। কাজেই তুলনা ক'রে দেশী আর বিদেশী সাত নেই। আমরা বিদেশীর সমকক্ষ হ'তে পারি না। এ ছাড়াও কত রকম যে অসুবিধে সেকথা বিশেষভাবে বলবার স্থান হবে না ভবিষ্যতে যদি আপনারা শুনতে চান তবে বলার ইচ্ছা রইল।

এই অবস্থায়, লোকের সহানুভূতি কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতির অভাবে দর্শকের ঘন ঘন মত পরিবর্ত্তনের ফলে আমাদের ফিল্ম শিল্প ঝড়ে হাল ভাঙ্গা নৌকার মত ভাসছে। কাজেই আমরা গঠনের দিকে না গিয়ে বোধ হয় ধ্বংসের দিকেই যাচ্ছি।

দেশকল্যাণে সিনেমা

শ্রীহেমন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

শত দুঃখের মধ্যেও আমাদের আনন্দের খোরাক যোগাইতে হইবে। দেশব্যাপী দৈন্য, মহামারি, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, শত শত কদাচারের মধ্যে থিয়েটার চাই, বায়স্কোপ চাই। বুদ্ধিমান বা জ্ঞানীব্যক্তি যাহাই বলুন না কেন, পৃথিবীর সকল দেশে ইহাই চলিয়া আসিতেছে। সকল রকম দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও মানুষ কিছু আনন্দ চায়, যাহাতে সে ক্ষণেকের জন্যও নিজেকে ভুলিয়া এক স্বপ্নের জগতে বাস করিতে পারে। সমস্ত দিন ধরিয়া সে নিজেকে, নিজের জনকে বাঁচাইবার জন্য জীবন যুদ্ধ চালায়, তাহার পর আসে তাহার বিশ্রাম ও শান্তির পালা।

শহর হইতে বহুদূরে, গ্রামে যেখানে অন্য কোন আনন্দ-আয়োজন নাই, সেখানেও লোকে বারোয়ারী তলায় বা চণ্ডীমণ্ডপে জমায়েত হয়, নানা ভাবে গানবাজনায় নিজের আনন্দ দিতে চেষ্টা করে। যাহারা একান্ত ছোট, নিতান্ত গরীব তাহারা তাড়ির দোকানে দেশী মদের আনন্দে মাতোয়ারা হয়। সকলেরই উদ্দেশ্য এক —যে কোন রকমে কিছু আনন্দ বা স্ফূর্ত্তি করা, ক্ষণেকের জন্য দুঃখকে ভুলিয়া যাওয়া।

শহরের কথা আলাদা। পুরাণদিনের চালও বদলাইয়াছে, চলনও নাই। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের মাত্রা এবং প্রকার ভেদও হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন লোকে কীর্ত্তন বা যাত্রা শুনিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করিত, এখন সেই সময় সেই লোকই থিয়েটার বা বায়স্কোপে কাটাইয়া থাকে। মোটের উপর আনন্দ কিছু চাই। জীবন যদি কেবল পরিশ্রমেই সীমাবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে হয়ত মানুষ যন্ত্র হইয়া যাইত। কল সারাদিন চলে, কেহ বা সারারাত চালায়, কিন্তু তাহার চলা বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে একেবারেই চুপ হইয়া যায়—তাহাতে আর কোন প্রাণের চিহ্নই পাওয়া যায় না। কিন্তু মানুষ কল নহে, পরিশ্রমের পর সে চায় বিশ্রাম—এবং তাহার সঙ্গে কিছু নিরর্থক আনন্দ। এই আনন্দের মধ্য হইতে সে পরদিনের পথ চলার খোরাক সংগ্রহ করে।

যে সকল মহাজন বলেন যে, মানুষের জীবনে খেলা বা নিছক আনন্দের কোন স্থান নাই—তাঁহারা এ পৃথিবীর আলো হাওয়ায় বাস করেন না। তাঁহাদের বাস অন্য কোন এক প্রস্তর কঠিন লোকে —যেখানে কাজ ছাড়া আর কিছু নাই। যেখানে যন্ত্র বলিয়া আলাদা কিছু নাই, মানুষই যন্ত্রের স্থান দখল করিয়া বাস করিতেছে।

আমাদের আনন্দ চাই—কিন্তু সেই আনন্দ কি প্রকার হইবে, কেমন করিয়া সকল লোকে সেই আনন্দরস সমভাবে ভোগ করিতে পারিবে, তাহাই আমাদের এখন ভাবিবার কথা। বর্ত্তমান জগতে সিনেমা আনন্দ জগতের এক বৃহত্তর স্থান দখল করিয়াছে। এমন দেশও আছে যেখানে সিনেমা মানুষের জীবনে জলহাওয়ার আলোর মতই অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। সিনেমাকে এই দেশের লোকেরা আনন্দ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে মানবের বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের সেবায় প্রয়োগ করিয়াছে।

সেই দেশের কথাই বলি। শিশু শিক্ষায়, জনশিক্ষায়, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রচারে, দেশের অবস্থা সকল বিষয়ে উন্নততর করিবার কাজে তাহারা সিনেমাকে এক অতি প্রয়োজনীয় বস্তু করিয়া তুলিয়াছে। সকলে পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভ করিবার সুবিধা বা সুযোগ পায় না। তাহারাও এই সিনেমা-প্রচারের সাহায্যে সহজে এবং অল্পকাল মধ্যে প্রচুর শিক্ষা লাভ করিয়া নিজের এবং দশের কাজে পূর্ণ ব্রতী হইতে পারে। সিনেমাকে তাহারা সামান্য করিয়া রাখে নাই, তাহাকে বৃহত্তর করিয়া মহত্তর কাজে প্রয়োগ করিয়াছে।

কিন্তু আমরা এখনও কোন স্তরে পড়িয়া আছি? আমরা সিনেমাকে নিজেদের এবং দেশের কোন বড় কাজে কতটুকু লাগাইয়াছি? দেশীয় সিনেমার জন্ম হইয়াছে বহুকাল। সে এখন শিশু নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, দেশীয় সিনেমার শিশুসুলভ চপলতা আজিও দূর হয় নাই। সত্য বটে, যে দেশীয় গভর্ণমেণ্ট আমাদের তেমন সহায়তা করেন নাই, কিন্তু তাই বলিয়া প্রান্তরে বসিয়া ক্রন্দন করিয়া লাভ কি? দেশীয় সিনেমার উন্নতি আজ বড় কম হয় নাই—কিন্তু সে কেবল টেকনিকের দিক হইতে। যে সিনেমা অন্য দেশের মানুষের জীবনধারা পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে, সেই সিনেমাই আমাদের দেশে আজ পর্য্যন্ত আমাদের আদিম জীবন ধারায় টেকনিকে কোন পরিবর্ত্তনই আনিতে পারে নাই।

সিনেমা চিত্রের কাহিনী ভাল না হইলে সাধারণে তাহার আদর হয় না। সিনেমা-ব্যবসায়ীও তাহার ন্যায্য লাভ হইতে বঞ্চিত

হয়, একথা সত্য। কিন্তু এমন কোন বাঁধা ধরা নিয়ম আছে কি, সিনেমা চিত্রের কাহিনী বরাবর একই ধারায় চলিবে? মানুষের মন পরিবর্ত্তনশীল, তাহার চাহিদাও পরিবর্ত্তনশীল। তাহা ছাড়া যাহা আজ মানুষের ভাল লাগিতেছে না, কাল তাহা ভাল লাগিতে পারে। ব্যবসায়ী বাজারে যখন নূতন পণ্য, সুগুণ পণ্য চালাইতে চাহে, তখন সে এক দিনেই তাহার পণ্যের জাহাজ উজাড় করিয়া বিক্রয় করিয়া যায় না। মাল বাজারে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই সে তাহার ভবিষ্যৎ ক্রেতার মনে তাহার আগামী পণ্য সম্বন্ধে কৌতূহল এবং সেই সঙ্গে চাহিদার সৃষ্টি করে। সিনেমার ব্যাপারেও তাহা সম্ভব এবং আমাদের তাহা নিশ্চয়ই করিতে হইবে। একটি আমেরিকান ছবির কথা জানি, যাহাতে আমেরিকার জেল খানার জঘন্য অবস্থা এবং বন্দিদের প্রতি ভীষণ অত্যাচারের বিষয় এক চমৎকার কাহিনীর মধ্য দিয়া দেখান হয়। সেই ছবিখানির নাম "I am a fugitive from the Chain Gang." ছবিখানি যুক্ত রাষ্ট্রের বহু স্থানে প্রথমে দেখাইতে দেওয়া হয় নাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেই ছবিখানি ক্রমে প্রচার লাভ করে। ইহার ফলে দেশব্যাপী আন্দোলন হয়, এবং ফলে ঐ দেশের জেল খানার বহু উন্নতি সাধন হয়। এই প্রকার আরো অনেক ছবি আছে, যাহার কাহিনী চমৎকার, কিন্তু তাহার মূল উদ্দেশ্য থাকে কোন কুসংস্কার, ব্যাধি, অশিক্ষা, অত্যাচার বা দেশের ক্ষতিকর অন্যান্য নানা অবস্থার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ছোট ছোট এমন বহু চিত্র দেখিয়াছি, যাহাতে অবশ্য শিক্ষনীয় নানা বিষয়ের অবতারণা গল্পচ্ছলে করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশের সিনেমার এখন পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে। এতদিন যাঁহারা সিনেমাকে কেবল পয়সা রোজগারের পন্থা মনে করিয়াছিলেন, হয় তাঁহাদিগকে আদর্শ বদলাইতে হইবে—নয় সিনেমা জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে। যাঁহারা এতদিন চিত্র লইয়া খেলা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের এখন এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমানের দর্শক শিশু নয়। তাঁহাদের মনের চাহিদার প্রতি সদা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। সত্য কথা, সকলেই আনন্দ চায়, কিন্তু সেই আনন্দের মধ্যে আরো কিছু বেশী দান করিতে হইবে। কি ভাবে সেই "আরো কিছু" দান করিতে হইবে, তাহা সিনেমা জগতের জ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা স্থির করিবেন। আমরা বাহির হইতে কেবল ইঙ্গিত মাত্র করিতে পারি।

চিত্র পরিচালক এবং প্রযোজকদের কর্ত্তব্য এখন বহু পরিমাণে বাড়িয়াছে। চিত্র-পরিচালক এবং দেশ সেবকের মধ্যে ভেদ নাই। দুইজন নিজ নিজ ক্ষেত্রে দেশের এবং দশের সেবায় নিযুক্ত। শিক্ষক তাঁহার ছাত্র-ছাত্রীমণ্ডলকে যে নিয়ত জীবন যাত্রার উপযোগী শিক্ষা ছাড়াও মহাজীবনের শিক্ষাও দান করেন, সে ধারা আমাদের চিত্র পরিচালককে জাতীকে—দর্শককে কেবল আনন্দ দান করা ছাড়াও মহত্তর জীবনের চিন্তার খোরাক, অবশ্যই দিতে হইবে। জাতিকে সত্য এবং ন্যায়ের পথে চালনা করিবার সাহায্য চিত্রপরিচালক বহুভাবে করিতে পারেন। কুৎসিত, মলিন, সস্তা আনন্দে মানুষের জীবন বেশীদিন বাঁচেনা। প্রতি মানুষের অন্তরে যে মহামানব বাস করে, সে কখনও অসুন্দর বা মলিনতায় তৃপ্তি পায় না, সুখী হয় না।

চিত্র-শিল্প সাধনার বস্তু। যাহার অন্তদিকে কিছু হইল না, জীবনে যে কিছুই করিতে পারিল, সেই অবশেষে হইল চিত্র-পরিচালক, এই ধারার হত্যাকরা অবিলম্বে প্রয়োজন। যাহাদের শিক্ষা নাই, কৃষ্টি নাই, জীবনে যাহারা কোনদিন সত্য সুন্দরের পূজা করিতে পারিল না, সে শিল্পসাধনার অযোগ্য—লোকশিক্ষার ভার তাহার হাতে কখনও থাকিতে পারে না। তাহার হাতে যদি শিক্ষার ভার দেওয়া হয়—তাহা হইলে যে কেবল তাহার নিজের জীবনকে নয়, আরো অনেকগুলি জীবনের পথ বিভ্রম করিবে। সে কেবল কুশিক্ষা এবং অসত্যের প্রচারই করিতে পারে।

আমাদের দুঃখ অনেক। সে দুঃখকে আর না বাড়াইয়া তাহাকে হ্রাস করিবার চেষ্টাকে সার্থক করিতে হইবে। সুখের বিষয় বাংলা দেশের চিত্র প্রতিষ্ঠানে জন এবং দেশহিতকর চিত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে এবং কার্য্য আরম্ভও হইয়াছে। দেশের প্রাণস্বরূপ চাষ এবং চাষীদের জীবনের উপর ভিত্তি করিয়া কাজ হইবে। বিদেশে চাষের উন্নতি নানা ভাবে—বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাধন করা হইয়াছে। আমরা লোক দেখান কৃষি—প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই করি নাই। রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধী এদিকে দেশবাসীদের দৃষ্টি বহুবার আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তাহার ফলে হয়ত সামান্য কিছু কাজ হইয়াছে। কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহার সহস্রগুণ হওয়ার প্রয়োজন আছে।

এতদিন পরে একজন প্রযোজকের দৃষ্টি চিত্র-শিল্পের মহত্তর দিকে পড়িয়াছে, ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু একলা একজন ব্যক্তি কি করিতে পারেন যদি না দেশের এবং দশের সাহায্য এবং শুভইচ্ছা তাঁহার কাজে না থাকে? তবে সুখের কথা শুভচিন্তা এবং শুভকার্য্য কখনও ব্যর্থ হয় না, তাই আমরা মনে করি বাংলাদেশের এই মহাপ্রাণ চিত্র প্রযোজকের এই শুভ

প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থ হইবে না, এবং ইঁহার দৃষ্টান্ত জায়তের অন্যান্য প্রযোজকদেরও অনুপ্রাণিত করিবে।

দেশীয় চিত্রপ্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার প্রয়োজন। চিত্র-প্রতিষ্ঠান বলিতে সাধারণ লোকের যে ধারণা আসে, তাহা সর্ব্বাংশে না হইলেও কতক পরিমাণে সত্য। চিত্রের মধ্যে যদি দেশ এবং লোক শিক্ষার কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে চিত্র-প্রতিষ্ঠান-গুলিকেও বিদ্যালয়এর আদর্শে গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। তাহা ছাড়া যদি ভদ্র এবং শিক্ষিত যুবকযুবতী দ্বারা চিত্রশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের চিত্র-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভদ্রজনের বাসোপযোগী করিতে হইবে। বর্ত্তমান বাংলাদেশে আদর্শ চিত্র-প্রতিষ্ঠান বলিতে একটি ষ্টুডিওর নাম কিয়ৎপরিমাণে করা যাইতে পারে। কিন্তু এই ষ্টুডিওকেও সর্ব্বোতভাবে আদর্শস্থানীয় করিতে হইলে ইহাকে আরো বহুভাবে সংস্কৃত করিতে হইবে।

দেশের শিক্ষিত বেকার সংখ্যা কম নহে। ইহারা কাজের অভাবে—দুঃখ দৈন্যে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই শিক্ষিত বেকার যুবকদের মধ্যে এমন বহুজন আছে যাহারা চিত্র-শিল্পের নানা কাজে নিজের জীবন সার্থক করিতে পারে। কিন্তু এই কার্য্য করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রয়োজন, তাহা কখনও পাওয়া যাইবে কি না জানিনা।
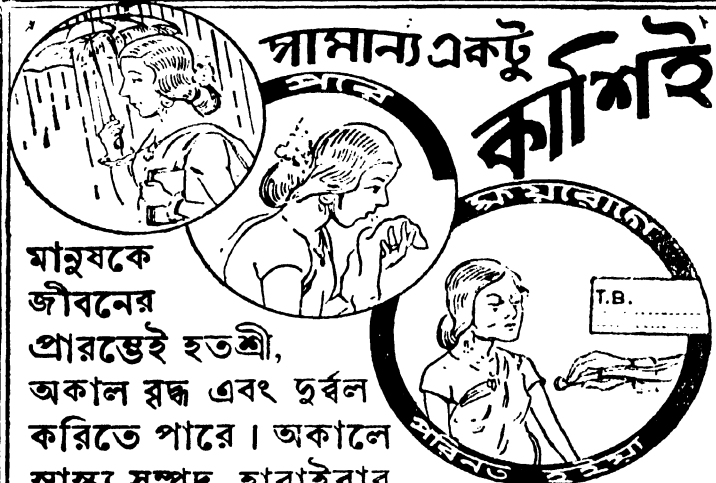
বলিবার বহু কথা আছে, কিন্তু স্থানের অভাব, লোকের শুনিবারও ইচ্ছা বা অবকাশ কম। সামান্য কয়েকটি কথাতে পূজার বিদায়ের পূর্ব্বে বেদনার কথা জানাইলাম। জানিনা, ইহা অরণ্যে রোদন হইল কি না। কিন্তু একথা সত্য এবং অতি নিকট যে, একদিন বর্ত্তমানের দর্শক চিত্র-নির্ম্মাতার নিকট হইতে এমন সকল দাবী করিবে, যাহা মিটাইতে না পারিলে কোন প্রযোজক বা পরিচালকের নিস্তার নাই। বাজে ছবি কেবল লোকের হীনরুচির খোরাক যোগায়, ইহাও অচিরে দূর করিতে হইবে।

সাধারণের মধ্যে এখন বহুজন দেশীয় চিত্র-শিল্পের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। তাঁহারা এই ব্যবসায়ের অন্দিগলির সকল কথা হয়ত ভাল করিয়া বোঝেন না, কিন্তু তাঁহাদের অনেকের কথা এবং আদর্শের ইঙ্গিত প্রণিধানযোগ্য। ছবি সাধারণের জন্য প্রস্তুত হয়, সেইজন্য আমাদের সাধারণকে বাদ দিয়া কোন কিছু করা চলিবে না। যে সকল মহাজন দেশের জনমত গঠন করেন, যাঁহারা নিজেদের জীবন দিয়া দেশের কল্যাণপথ সহজ করেন, যে সকল মহাপুরুষের কথা দেশের আবালবৃদ্ধ-বণিতা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে, চিত্র-পরিচালক এবং প্রযোজকদেরও তাঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। মনে হয় এমন দিন কাছে আসিতেছে যখন সিনেমায়

চিত্রনাট্যে চলমান প্রবাহ

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দী ভাষার সবাক চিত্র "অচ্ছুত কন্যা" বাঙ্গলাদেশে আসিয়া যেভাবে দিগ্বিজয় করিয়াছে, তাহাতে সকলেরই চমক লাগিয়াছে। সকলেই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিতেছেন—"ব্যাপারটা কি?" ব্যাপার আর কিছুই না। ছায়াচিত্র যে সকল গুণে চিত্তাকর্ষক হয়—কাহিনী, চিত্রনাট্য, অভিনয়, সঙ্গীত পরিচালনা, ফটোগ্রাফী, শব্দযন্ত্রের সুস্পষ্ট কাজ—এই বাণী চিত্রখানিতে তাহার সুষ্ঠু সমাবেশ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলাদেশের বাণীচিত্রের গতি ও প্রগতি সম্বন্ধে সামান্য দুচারকথা বলিতে চাই।

"অচ্ছুতকন্যার" কথা বাদ দিলে অন্যান্য প্রদেশের বাণীচিত্রের তুলনায় বাঙ্গলাদেশের বাণীচিত্রের উৎকর্ষ যে অনেকগুণ অধিক, সেকথা সর্ব্ববাদীসম্মত,—যদিও সময়ের দিক দিয়া দেখিলে বোম্বাইয়ে ছায়াচিত্র ব্যবসায় বাঙ্গলার বহু পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। তবুও নিজেদের মধ্যে একথা স্বীকার করিতে দোষ নাই যে, আদর্শ হইতে এখনও আমরা বহু দূরে—বাঙ্গলাদেশে সত্যকার ভাল ছবি এখনও খুব কমই হয় ও হইতেছে।

যে কয়টি উপাদানের সমাবেশে বাণীচিত্র পর্দ্দায় ফুটিয়া ওঠে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বাঙ্গলার নানা কোম্পানীর চিত্রে তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

প্রথমেই কাহিনীর কথা বলি। কিছুদিন হইতে বাঙ্গলার একটা হুজুগ বা ফ্যাশান আসিয়াছে চলতি উপন্যাসগুলিকে পর্দ্দায় রূপান্তরিত করা। বিখ্যাত বা ভাল উপন্যাস যে পর্দ্দায় রূপান্তরিত হইতে পারে না—এমন নহে। কিন্তু জনপ্রিয় উপন্যাস হইলেই যে পর্দ্দায় তাহা জনপ্রিয় হইবে—এধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ঘটনা সামান্য হইলেও বর্ণনা, কথোপকথন, মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ, লিখিবার ভঙ্গী (style) প্রভৃতির সাহায্যে অনায়াসে একখানি বড় ও চিত্তাকর্ষক উপন্যাস রচিত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ একখানি উপন্যাসকে আট, দশ বা বার রীল বাণীচিত্রে সংহত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই কাজ চিত্রনাট্যকারের, এবং দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এখনও বাঙ্গলায় সত্যকার শক্তিমান চিত্রনাট্য লেখকের একান্ত অভাব। তাহার প্রমাণ—পর পর 'রজনী', 'বিষবৃক্ষ' প্রমুখ কয়েকখানি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বাণীচিত্রের শোচনীয় ব্যর্থতা। বিখ্যাত ও বিরাট উপন্যাসকে কিরূপে সুসংহত চিত্তচমকপ্রদ বাণীচিত্রে রূপান্তরিত করা যায় তাহা যাঁহারা "A Tale of two Cities" এবং Resurrection-এর Talkie version দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। দুইখানি উপন্যাস দুই শ্রেণীর—একখানি ঘটনাবহুল এবং অপরখানি মনস্তত্ত্বমূলক। আমাদের দেশে নানা কারণে এখনও ঐতিহাসিক উপন্যাসকে বাণীচিত্রে রূপান্তরিত করা হয় নাই কিন্তু চিত্রনাট্যের দোষে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের হতাশময় পরিণতি আমরা 'রজনী' ও 'বিষবৃক্ষ'-এ দেখিয়াছি। এমন কি নিউ থিয়েটারসের মত এতবড় কোম্পানীতেও চিত্রনাট্যের দোষে "গৃহদাহ"

মধ্যে দিয়া আমাদের দেশের জাতিগঠনের নানা হিতকর এবং কল্যাণকর পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে। যাঁহারা এখন সিনেমার নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহারাও অচিরে সিনেমাকে স্কুল-কলেজের মত হিতকর অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই গ্রহণ করিবেন।

উপযুক্ত খ্যাতি ও বিত্ত অর্জ্জনে সমর্থ হয় নাই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস চলিয়াছে এবং সেইজন্যই পর্দ্দায়ও তাহার বাণীরূপ সেইরূপ অপ্রতিহত বেগে চলিবে—এই ভ্রান্ত ধারণা আমাদের সিনেমা কোম্পানীগণ যত শীঘ্র ছাড়িতে পারেন, ততই মঙ্গল। কিন্তু তাহা ছাড়িতে পারেন না বলিয়াই 'পথের শেষে', 'মুক্তিস্নান' প্রভৃতি ব্যর্থ সৃষ্টির তালিকায় ভারি হইয়াই চলিয়াছে।

কেবল বায়স্কোপের জন্যই চিত্রনাট্য লেখার চেষ্টা বাঙ্গলায় অতি অল্পই হইয়াছে। "মায়া" ও "দিদি"তে নিউ থিয়েটার্স সেই চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু 'মায়া' ও 'দিদির' কাহিনী অর্থাৎ আখ্যানভাগ এত দুর্ব্বল, নানা অসামঞ্জস্যতায় পূর্ণ যে, Technical Production-এর দিক দিয়া ইহাদের যতবড় মূল্যই থাক, ইহারা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাণীচিত্র হয় নাই সে কথা বোধহয় কর্ত্তৃপক্ষও স্বীকার করিবেন।

সম্প্রতি প্রকাশিত নিউ সপুলার পিক্‌চার্সের "ইম্পষ্টার" বা "ধূমকেতু"র কথাই ধরা যাক্। কাহিনীটি বাণীচিত্রের উপযোগী, নানা নূতন ও চিত্তচমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশও ইহাতে আছে কিন্তু চিত্রনাট্যকারের ভাষার দৈন্যে ইহা একান্ত Dull ও Boring হইয়াছে। ছবি দেখিয়া মনে হয় কর্ত্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ পয়সা খরচ করিতে কার্পণ্য করেন নাই, কিন্তু "জল পড়ে, পাতা নড়ে" ধরণের কথোপকথনের ফলে ছবিটি হইয়াছে প্রাণহীন।

ইংরাজীতে ছায়াচিত্রের একটি অতি-সার্থক নাম আছে। সেই নামটি হইতেছে —Movie। ইহার আখ্যানভাগের একটা চলমান প্রবাহ সবসময়ে বর্ত্তমান থাকা চাই। চিত্রনাট্যকার তাঁহার লিপিকুশলতার গুণে যদি দর্শকের মনকে ঘটনা হইতে ঘটনান্তরে, ভাব হইতে ভাবান্তরে লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার চিত্রনাট্য অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হয়। গতিই ইহার প্রাণ—স্থিতিই ইহার মৃত্যু। কিন্তু বাঙ্গলায় অধিকাংশ ফিল্মই haulting, চলিতে চলিতে হঠাৎ যেন থামিয়া যায়; প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি ফিল্মে বহুবারই এইরূপ অবাঞ্ছিত ছেদ পড়ে এবং বাঙ্গলাদেশের চিত্রনাট্যকার, পরিচালক ও প্রযোজক সকলে মিলিয়া এই সকল ছেদ ভর্ত্তি করিবার অপরূপ কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন—সঙ্গীত। যেখানে আর কিছু বলিবার, আর কিছু করিবার নাই, লাগাও সেখানে একখানি গান। আখ্যানভাগকে ভাবের দিক দিয়া ফুটাইয়া তোলা বা অগ্রসর করিয়া দেওয়া ভিন্ন বাণীচিত্রে গানের যে কোনও স্থান বা প্রয়োজনীয়তা নাই, একথা যেন তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝেন না, তাই "মুক্তিস্নানে" শেষের দিকে Tensionএর মধ্যে হঠাৎ একটা অপ্রয়োজনীয় হাস্যকর গানের Triology
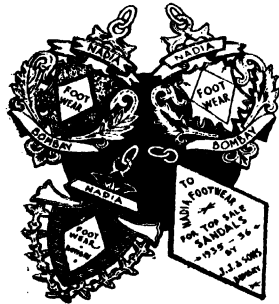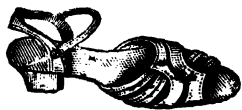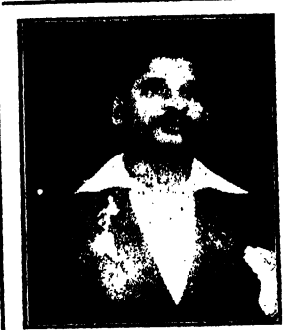
আরম্ভ হয়। অনেক সময়ে যেহেতু একজন অভিনেত্রীকে কিনে লওয়া হইয়াছে এবং যেহেতু তাঁহাকে মোটারকম পয়সা দিতে হইবে সেইজন্য তাঁহাকে দিয়া স্থানে-অস্থানে গান গাওয়াইয়া লওয়া হয়। বড়ুয়ার মত সু-পরিচালকও এই প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই; প্রমাণ—'গৃহদাহ' বাণীচিত্রে অচলার পিত্রালয়ের পরিচারিকার ভূমিকায় শ্রীমতী হরিমতীর একাধিক গান।

Technical-এর দিক দিয়া—অর্থাৎ Photography, সাউণ্ড ও সম্পাদনা—নিউ থিয়েটার্স-এর মত উচ্চাঙ্গের ছবি এখনও বাঙলার কোন কোম্পানী বাহির করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ কোম্পানীতেই এখনও সম্পাদনার কাজ অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ও কাঁচাহাতে সম্পন্ন করা হয়—অথচ সম্পাদনাই ছবির প্রাণ, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যে-ছবি আট মাস বা এক বছর ধরিয়া তোলা হইল, তাহার সম্পাদনা যেদিন ছবি দেখান হইবে তাহার পূর্ব্বদিন সমস্তরাত্রি ধরিয়া চলিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে সম্পাদনার ত্রুটী অনিবার্য্য।

"সোনার সংসারে"র আর্থিক সাফল্যে অনেককে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছি—"ইহাতে আছে কী?" স্বীকার করি ইহার কাহিনী বাজে ও দুর্ব্বল। কিন্তু চিত্রনাট্যে একটা চলমান প্রবাহ সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং সাধারণের সুবোধ্য। তৎপরে পরিচালনার গুণে অভিনয়, ফটোগ্রাফী শব্দযন্ত্রের কাজ প্রভৃতি যথাসম্ভব ভাল। এইরূপ Successful Teamwork অল্প ছবিতেই চোখে পড়ে।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কোনো কোম্পানীকে বড় করিয়া আর কোন কোম্পানীকে ছোট করা নহে। আমাদের ফিল্ম শিল্পের গতিও প্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা লিখিত হইল। এবারে স্থান সংক্ষেপে অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলা হইলনা—বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশৈলেন্দ্র কুমার মান্না

নিউ থিয়েটার্সের বি-ইউনিটের কর্ণধার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্রের সহকারীরূপে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া শ্রীমান্ শৈলেন্দ্র কুমার মান্না শুধু চলচ্চিত্র মহলের তরুণ কর্ম্মীবৃন্দের মধ্যে নিজের অধ্যবসায়কে কেন্দ্রীভূত করেন নাই। সম্প্রতি কয়েকটি বন্ধুর সহিত জাপানী ও জার্ম্মানী মালের আমদানীকারক এক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। শুভকামী বন্ধু হিসাবে আমরা তাঁহার এই নব প্রচেষ্টায় সাফল্য কামনা করিতেছি।

N. I. P.—120

নিউ থিয়েটার্সের "বিদ্যাপতি"-র একটী বিশিষ্ট দৃশ্যে রাজা শিবসিংহের বেশে দুর্গাদাস ও রাণী লছিমারূপে শ্রীমতী ছায়া

ওরিয়েণ্টাল কিনেটোন আর্টসের "রূপোর ঝুমকো" চিত্রের একটী দৃশ্যে পারুল ও কমলা।

✽ কমলা টকীজ-এর প্রথম চিত্র "রাজগী"-র একটী বিশিষ্ট ভূমিকায় শ্রীমতী অরুণা।

✽ কমলা টকীজ-এর প্রথম চিত্র "রাজগী"-র একটী বিশিষ্ট ভূমিকায় শ্রীমতী মেনকা।

টলিউড় ট্রিপ

: লেখক :
শ্রীসুধীরেন্দ্র
—সান্যাল—

SILENCE PLEASE

TRESSPASSERS WILL BE PROSECUTED

খেয়ালী-মনের তন্দ্রা কাটেনি, বরষ ঘুরিতে ফের
কোলাহলময় সহরের বুকে, সুরু হোল তারই জের!
মায়ার পরশ ভুলিতে পারিনি, টলিউড্ ভালবাসি
ধর্ম্মতলার নীড় ছেড়ে তাই, মাঝে মাঝে ছুটে আসি।
আমি জানি এই অরূপের মাঝে, রূপের বেসাতী চলে,
ছায়া ও কায়ার অন্তর ঘিরি' মরীচিকা শুধু ছলে!

*

রিজেণ্ট পার্কে 'সোনার কুটির,' ভরেছিল ফল-ফুলে
নির্ম্মূল হোল এরই বুক হ'তে, কার নিমেষের ভুলে!
রমা ও রমেশ আজও ছুটে মরে—সন্ধানে অজানার
ছিঁড়ি ফুল ডোর, কাটিয়াছে ঘোর, রঘুনাথ অলকার!
দেবকী বোসের স্বপ্ন সাধনা, লাড্ডুর মোহ, মেওয়ার দানা
নিমেষে টুটিল, খেমকা রাজের এলো যেই পরোয়ানা!
এলো মধুলোভী মৌমাছী দল; নিঃশেষ হোল মৌ—
ভাঙ্গা আসরের মাঝে নেচে গেল, সেই ফাঁকে 'রাঙা বৌ'!
আজও শুনি দূরে, সুরে ও অসুরে, করে আর্ত্ত হাহাকার
'মিলাপ' বুঝিবা করিছে বিলাপ—হায় হায়, কারদার!

*

সব চলে গেছে, আজ শুধু দেখি, মহাশ্মশানের বুকে
মোর পানে চায়, কোন সে পান্থ—হাসি ঢল ঢল মুখে।
গুল হামিদের সাধনার পীঠ, অপরূপ পরিপাটি
বেসেছিল ভাল আফ্‌গানী বীর—এই বাঙলার মাটি!

*

মনের আঁধার নিভাইতে যবে রাধার কুঞ্জে আসি
সহসা দেখিনু, থামের আড়ালে, হরির চিত্তে হাসি!
ছিন্ন-হারের হারানো দানার সন্ধানে দুইজনা
ময়ূর-ভঞ্জে মানুষ করিতে চলিতেছে জল্পনা!
চুপিসাড়ে সেই অবসরে কোন মায়ালোভী হুঁশিয়ার

চন্দ্রাবতী

ছায়া

লীলা

মলিনা

উমা

মেনকা

কমলেশকুমারী

কানন

'পরপারে' করি লীলাখেলা শেষ, আজও মানে নাই হায়!
ফণী বর্ম্মার কাটে নাই নেশা, ভাঙ্গে নাই তার ভুল,
মাইথলোজীর থল থল ভারে, সখা আজও মশগুল্!
অনাদরে হায়, রেণু বারবার—ধুলায় লুটায়ে পড়ে
জানে মরীচিকা—তবু সে মায়ার পিছু পিছু ছুটে মরে!
শান্তির নাহি অবসর ভাই কর্ম্মের কোলাহলে—
শূণ্য কানন ছাড়ি নীহারিকা, পলাতকা গজ বলে!

*

এস যাই ছুটে এইখান হ'তে, ঐ সে পথের ধারে
যে দিকে তাকাই, হাসি মুখ গুলি, মনে পড়ে বারে বারে!
মহা-তীর্থের একটি প্রান্তে, হেথা দেবতার আশীষ ঝরে
ভারতের সেরা কর্ম্মী-সঙ্ঘ, জাগ্রত আজি তাহারই বরে!
বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, ছায়া-তরু ছায়, রঙীন্ ফুলে,
তা'রি গীতি-হার, ভারতমাতার, অপরূপ ঐ কণ্ঠে দুলে!
এই সে N. T. সাধনার পীঠ, শিল্পীর বিস্ময়
সোনার আখরে লিখিয়া রেখেছে বাঙ্গালীর পরিচয়!
ছায়া ও কায়ার দ্বন্দ্বের মাঝে, শিল্পীর সন্ধান
গহন-কাননে ছুটিছে হেথায়—পঞ্চশরের বাণ!
এই মর্ত্তের পারিজাত বনে—গলে কার ফুলহার
কত তাপসের স্বপ্ন-সাধনা, রূপসী সে মেনকার!
কোমলকান্ত পদাবলী হেথা, নব বিস্ময় আনে
তা'রি পরিচয়, লিখে রেখে যায়, কতরূপে, কত গানে!
শুনি ঐ দূরে রথ ঘর্ঘর, পথ পাশে, তরুছায়—
বিশপীর কবি এলো নাকী আজ, এইখানে মিথিলায়!
প্রাণের ঠাকুরে বেসেছিল ভাল, মানে নাই কোন বাধা
হিয়ায় হিয়ায়, ধ্বনি মূরছায়, ডাকে আয়—'অনুরাধা!'
কবির কাব্য নহে ত' বিলাস প্রাণ দিল মরা প্রাণে
রাণী লছমীর চেতনার মাঝে, জাগিল ছন্দ গানে!
দেবকী বোসের কামনার ধন, জীবনের সঞ্চয়
বিশপীর ঐ দেবতার পায়, ফুল হ'য়ে ফুটে রয়!

পাহাড়ী

অমর মল্লিক

লীলা হালদার

মুক্তি কোথায়? হায় রে পান্থ, কর্ম্মের কোলাহলে
সাত-সাগরের পার হতে তাই, ছুটে এলে উড়ো-কলে!
শিল্পী-মনের তৃপ্তি কোথায়? বুকে এসে লাগে দোল
গারো-পাহাড়ের বুক-ফাটা ঐ ঝর্ণার কলরোল!

*

লীলা-কমলের চলে লুকোচুরি, তারি মাঝে উমাশশী
শত তারকার দীপ্তি নিঙাড়ি—একাসনে আছে বসি!
তা'রি এক ধারে ছন্দ চপল, লীলায়িত কা'র গতি
তনু-সুষমায়, সারাদিক ছায়—রূপসী চন্দ্রাবতী!
মলিনার চোখে নেমেছে সন্ধ্যা, তাই বুঝি কমলেশ
নব-জীবনের ঊষার আলোকে, ধরিয়াছে নব বেশ!

*

হেমচন্দ্রের টুটিয়াছে 'খাদ'—বাকী আছে পাকা সোনা
বন্ধু নীতীন ছাড়িয়াছে বাণ—শেষে হ'বে জানা শোনা!
এই মৃত্তিকা, শস্য-শ্যামলা, জন্মভূমির মান—
শিল্পীর মন তারি মাঝে পায়, হীরকের সন্ধান!
মজুরীর লোভে নগদ বিদায়, বুঝেছে জীবনে সার—
চাকভাঙ্গা মধু, মিলিয়াছে শুধু মল্লিক বঁধুয়ার!
হায় বিদূষক, জাগা ঘরে তা'র হোলো বুঝি 'বৌ'লুট,
অহি সান্যাল ভাঙ্গিয়াছে তা'র মস্তকে "জ্যাক্-ফ্রুট্"!
ময়ূর ছাড়িয়া কার্ত্তিক আজ পেতেছে নূতন ফাঁদ
গহন-কাননে বাহুর আড়ালে, ধরা পড়ে রাইচাঁদ!
পাহাড়ী বঁধুর মিলন-বাসরে আজও চাঁদ জেগে রয়
দুইটি তৃষিত হিয়ার মাঝারে, প্রেম হোক অক্ষয়!

*

কাচ-কাঁচাদের ব্রিগেডের মাঝে, ছুটিছে 'মেশিন গান্'
রোলারের চাপে, বুঝি কোন ফাঁকে, যায় অভাগার জান্!
দূর থেকে ভাই কুর্নিশ করি, আনোয়ার শা'র পীর
জানি অকারণে বিছুটি ঘসিলে, পিঠ করে চিড়্‌বিড়্!

রাণীবালা

[illegible] রায়

শান্তি গুপ্তা

জ্যোৎস্না গুপ্ত

গুল হামিদ

সাধনা বোস
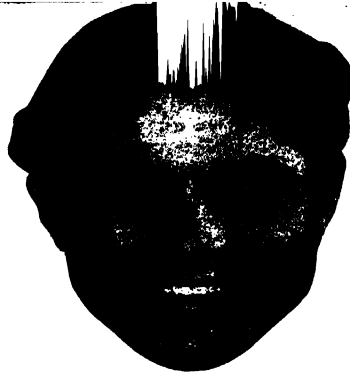
এর চেয়ে ভালো পথ পাশে ঐ, জানি যাহা রয় সয়
মধুর সাধনা রাখিয়াছে মান, চলে তা'রি 'অভিনয়'!

*

প্রিয় গঙ্গোর কাটিয়াছে মোহ, সাঙ্গো পাঙ্গো সাথে
কচি-কাঁচা আর বুড়া ধাড়ী নিয়ে, কচি-সংসদে মাতে!
তুই সতীনের বিচ্ছেদে আজ, রাণীর মুখেতে হাসি
ঐ চোরা নয়নের চাহনি মাখানো মুখখানি ভালবাস!
মুক্তি-স্নানের মিটিয়াছে জের, রেখেচে সবার মান
সুশীল-সুবোধ বন্ধুটি মোর, মারিয়াছে পিট্‌টান্!
সুকুমার আজ, ছাড়ি আশীয়ানা কমলার বর চায়
বামনের হাতে চাঁদ ধরা দেখে, মনে মনে হাসি পায়!

*

যে দিকে তাকাই, পূজার বাজার---বাহার চমৎকার
পোষ্টার আর ইস্পাষ্টারে করে বুঝি ছারখার!

*

নির্ম্মল নীল আকাশের বুকে আশ্রয় হারা তারা
দেখি তাহার মাঝারে 'জ্যোৎস্না' ছড়ায়, হায়রে ছন্দহারা!
শিশুর মুখের হাসি মিলায়েছে, আজ সে পিঁজরাপোলে
কতজনা আসে, কতজনা যায়, কতজনা পথ ভোলে!
কালের চক্র ঘোরে নিশিদিন, বিধি ইঙ্গিতে চলে
গ্রহ ফেরে তাই ভাসে শীলা-লিপি, আজিও বানের জলে!
এই মরীচিকা, এরি তরে আজও এত হাঁসি কাঁদাকাটা
ছায়ার সাধনা মিলায় ছায়ায়, তারি ত'রে পথ হাঁটা!
জীবনের এই পান্থ-শালায়, পুঁজি হোল কানা কড়ি
জানি কিছু নাই, তবু সে মায়ার বন্ধনে আজ মরি!
মানুষের প্রীতি ভালবাসা যাহা, আছে কিছু অবশেষ
সেও ছায়া-ছবি!—জীবনের শেষে হবে তাও নিঃশেষ!

*

ঢাকের বাজনা থামেনি বন্ধু, আজ তাই জোড়া ঢোলে
বাজে চড়বড়্—আমি লাজে মরি! আঁখি তবু নাহি খোলে!

———:(:০:):———

মায়া মুখার্জ্জি

বিমলাকুমারী

শিশুবালা

প্রাচীন ভারতে কবিপ্রসিদ্ধি

অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম্-এ, পি-আর-এস্

কবিগণের মনোবৃত্তি যেমন বিচিত্র, তাঁহাদিগের খেয়ালও তেমনই অদ্ভুত। অনেক সময় তাঁহারা এরূপ বিষয় নিজ নিজ কাব্যে উপনিবদ্ধ করিয়া থাকেন, যাহা কেহ কোন দিন শুনেন নাই বা দেখেন নাই, অথচ যাহা বহুকাল ধরিয়া কবিসম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। অশাস্ত্রীয়, অলৌকিক অথচ পরম্পরাক্রমে কবিসমাজে পরিচিত বিষয়সমূহের সাধারণ নাম **'কবিসময়'** বা **'কবিপ্রসিদ্ধি'**।

কোন কোন প্রাচীন আচার্য্য বলিয়াছেন, এই প্রকার উদ্ভট কবিপ্রসিদ্ধি ত' দোষস্থানীয়; অতএব, কাব্যে তাহাদিগের স্থান নাই। কিন্তু কবিরাজ রাজশেখরের মতে—কবিপ্রসিদ্ধি কাব্যমার্গের উপকারক—গুণস্থানীয়, দোষ নহে। রাজশেখর যে কবিপ্রসিদ্ধিকে কেন গুণ বলিয়াছেন, তাহার কারণও উল্লেখ করিয়াছেন। কবি বলিতে বর্ত্তমানে কেবল লৌকিক কাব্যরচয়িতাকেই বুঝায়; কিন্তু 'কবি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'ক্রান্তদর্শী'—যিনি বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যৎ বিষয়ও দর্শন করিতে সমর্থ। প্রাচীন যুগের ঋষিগণই ছিলেন প্রকৃত কবি। সরহস্য, সাঙ্গোপাঙ্গ সহস্র শাখাত্মক বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক সপ্তদ্বীপা বসুমতীর অন্তর্গত নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া তৎকালে যে সকল অলৌকিক বিষয়ের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী যুগে কালপ্রভাবে সে সকলের অনেক পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল। কিন্তু দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন প্রাচীন ঋষিকবিগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ নবীন কবিগণ তাঁহাদিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত কবিপ্রসিদ্ধিগুলির পূর্ব্বরূপের অন্যথা করেন নাই। তাই আজিকার দিনে মনে হয় যে, অধিকাংশ কবিপ্রসিদ্ধির বিষয়ই উদ্ভট ও লোকপ্রসিদ্ধির বিরোধী।

সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথ কবিরাজ কয়েকটি কবিসময়ের উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি প্রায় অনেকেরই নিকট সুপরিচিত। তথাপি সাধারণের নিকট প্রচারের উদ্দেশ্যে সেই প্রসিদ্ধিগুলিই প্রথমে উদ্ধৃত করা হইল।

সংস্কৃত কবিগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে—

(১) নভঃস্থল ও পাপ মলিন অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ;

(২) যশঃ, কীর্ত্তি ও হাস্য শুভ্রবর্ণ *;

(৩) ক্রোধ ও অনুরাগ রক্তবর্ণ;

(৪) পঙ্কজ, ইন্দীবর (নীলোৎপল) প্রভৃতির জন্ম নদী ও সাগরে;

(৫) জলাশয় মাত্রেই রাজহংসাদি জলচর পক্ষীর আশ্রয়;

(৬) চকোর চন্দ্রিকা-(জ্যোৎস্না)-পায়ী;

(৭) বর্ষাকালে হংসগণ মানস-সরোবরে গমন করে;

(৮) নারীর পদাঘাতে অশোক, ও মুখমদ্যের গণ্ডূষসেকে বকুল বিকশিত হয়;

(৯) যুবকমাত্রেই কণ্ঠদেশে হার ধারণ করেন;

(১০) বিরহীর হৃদয় বিরহতাপে স্ফুটিত হয়;

(১১) মদনের ধনুঃশর পুষ্পময় ও ধনুর জ্যা ভ্রমরশ্রেণী দ্বারা নির্ম্মিত;

(১২) কন্দর্পের কুসুমশরে ও যুবতীর কুটিল কটাক্ষে যুবজনের হৃদয় বিদ্ধ হয়;

(১৩) দিবাভাগে পদ্ম ফুটে, ও রাত্রিতে ফুটে কুমুদ;

(১৪) শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয়পক্ষেই চন্দ্র আকাশে উদিত হইলেও শুক্লপক্ষেরই কৌমুদীর বর্ণনা সাধারণতঃ করা হয়;

(১৫) মেঘগর্জ্জন শ্রবণে ময়ূর-ময়ূরী বিলাসনৃত্য করে;

(১৬) অশোকের পুষ্প হইতে ফল জন্মে না;

(১৭) বসন্তে জাতীপুষ্প ফুটে না;

(১৮) চন্দনের পুষ্প বা ফল কিছুই জন্মে না।

অতঃপর কোন্ কোন্ পুষ্প কি কি অদ্ভুত উপায়ে বিকশিত হয়, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

যুবতী নারীর নূপুরশিঞ্জিত অলক্তরঞ্জিত চরণের মৃদু আঘাতে অশোক, সবিলাস দর্শনে তিলক (তিলফুল), আলিঙ্গনে কুরবক, স্পর্শে প্রিয়ঙ্গু, মুখবিবরের সীধুগণ্ডূষসেকে বকুল, নর্ম্মবাক্যে (মধুর সপ্রেম বচনে) মন্দার, মৃদু মধুর স্মিত হাস্যে চম্পক, মুখমারুতের ব্যজনে চূতমঞ্জরী, গীতশ্রবণে নমেরু ও পুরোভাগে নর্ত্তনের দ্বারা কর্ণিকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়।—ইহাই প্রসিদ্ধি।

কবিপ্রসিদ্ধি লইয়া যে সকল সংস্কৃত কবি আলোচনা করিয়াছেন, কবিরাজ রাজশেখর (খ্রীঃ ৯ম-১০ম শতাব্দী)

* কীর্ত্তি—শৌর্য্যবীর্য্যাদিসম্ভূত, যশঃ—বিদ্যাদিপ্রসূত;—"খড়্গাদিপ্রভবা কীর্ত্তি-র্বিদ্যাদিপ্রভবং যশঃ"। কুযশঃ বা অযশঃ কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ।

তাঁহাদিগের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। রাজশেখর কবিসময়কে প্রথমতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

(ক) স্বর্গ্য কবিসময়,

(খ) ভৌম কবিসময়

ও (গ) পাতালীয় কবিসময়।

এই তিন শ্রেণীর কবিপ্রসিদ্ধির মধ্যে ভৌম কবিপ্রসিদ্ধিই প্রধান; কারণ তাহার বিষয় বহু বিস্তৃত। এই পার্থিব কবিসময়কে আবার চারিভাগে ভাগ করা চলে—

(১) জাতিগত, (২) দ্রব্যগত, (৩) গুণগত, ও (৪) ক্রিয়াগত।

এইবার ইহাদিগের প্রত্যেকটি বিভাগকে পুনরায় তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করা যায়—

(১) অসৎ অর্থাৎ সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন অলীক বিষয়ের উপন্যাস;

(২) সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বিষয়ের অনুপন্যাস;

(৩) নানা বিষয়গত কোন বস্তুর কোন একটি বিশেষ বিষয়ের সহিত নিয়মিতরূপে সম্বন্ধ স্থাপন।

অতএব, এক ভৌম কবিসময়েরই মোট বারটি অবান্তর বিভাগ হইল। এইবার একে একে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

(ক) প্রথমতঃ জাতিগত ভৌম কবিসময়ের কথা ধরা যাউক—

(১) অস্তিত্বহীন বিষয়ের উপন্যাস; যথা—নদীমাত্রেই পদ্ম উৎপল প্রভৃতির উৎপত্তি, জলাশয়মাত্রেই হংসাদি জলচর পক্ষীর অবস্থিতি, পর্ব্বতমাত্রেই সুবর্ণ রত্নাদির আকর। নদী মাত্রেই যে পদ্ম জন্মিবে, জলাশয় মাত্রেই যে হংসাদি বিচরণ করিবে, অথবা পর্ব্বতমাত্রেই যে রত্নসুবর্ণের আকর মিলিবে—এ অতি অসম্ভব কথা।

(২) বিদ্যমান বিষয়েরও কাব্যে অনুপন্যাস, যথা—বসন্তে মালতী ফুটে না। অশোকের ফল ও চন্দনের পুষ্পফল জন্মে না ইত্যাদি প্রসিদ্ধি, প্রকৃতপক্ষে বসন্তে মালতী ফুটে, অশোক চন্দনাদিরও ফল জন্মে; কিন্তু সংস্কৃত কবিগণ তাহার কথা-কাব্যে কোন মতেই উপনিবদ্ধ করিতে চাহেন না।

(৩) বহুস্থলে দৃষ্ট বস্তুর একমাত্র স্থানে নিয়মকরণ; যথা—বস্তুগত্যা বহু জলাশয়েই নক্র মকরাদির অবস্থিতি দৃষ্ট হইলেও কবিগণ বলেন, শুধু সমুদ্রই মকরের স্থিতিস্থান। এইরূপ অন্য স্থানে মুক্তা পাওয়া যাইলেও কবিগণের প্রসিদ্ধি—শুধু তাম্রপর্ণীই মুক্তা প্রাপ্তির একমাত্র স্থান।

(খ) এইবার দ্রব্যগত কবিসময়ের পালা—

(১) অস্তিত্বহীন বস্তুর সন্নিবেশ; যথা—সূচীভেদ্য বা মুষ্টিগ্রাহ্যরূপে অন্ধকারের বর্ণনা; জ্যোৎস্নাকে কুম্ভে ভরিয়া লইয়া যাইবার বর্ণনা।

(২) বর্ত্তমান দ্রব্যের অনুপন্যাস; যথা—চন্দ্রিকা কৃষ্ণপক্ষে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও কেবল শুক্লপক্ষের চন্দ্রিকার উল্লেখ; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কৃষ্ণ পক্ষের জোৎস্না সম্বন্ধে সকল কবিই একেবারে নীরব।

(৩) দ্রব্য বিশেষের প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে নিয়ম (সংকোচ)—চন্দন নানাদেশে উৎপন্ন হইলেও একমাত্র মলয়পর্ব্বতই উহার উৎপত্তি স্থান বলিয়া সংস্কৃত কবিগণের প্রসিদ্ধি আছে। ঐরূপ, কেবল হিমাচলই ভূর্জ্জ পত্রের একমাত্র উদ্ভবস্থল বলিয়া বর্ণনা।

(গ) অতঃপর ক্রিয়াগত কবিপ্রসিদ্ধি—

(১) অস্তিত্বহীন ক্রিয়ার অস্তিত্বযুক্ত রূপে বর্ণনা; যথা—চক্রবাক দম্পতী রাত্রিতে জলাশয়ের বিভিন্ন তীরে থাকিয়া পরস্পরের বিরহে অতিঃদুঃখে নিশাযাপন করে—এইরূপ প্রসিদ্ধি সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে খুবই প্রচলিত। এইরূপ অন্য দৃষ্টান্ত—চকোরের চন্দ্রিকাপান, বর্ষাকালে হংসগণের মানস সরোবরে গমন, ইত্যাদি।

(২) যাহার বস্তুতঃ অস্তিত্ব আছে, এরূপ ক্রিয়ার অস্তিত্বহীনরূপে বর্ণনা; যথা—দিবাভাগে নীলোৎপল প্রস্ফুটিত হইলেও কবিগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে রাত্রিতেই উহা ফুটিয়া থাকে, দিবাতে ফুটে না।

(৩) ক্রিয়াবিশেষের কালবিশেষে নিয়মন—কোকিল সকল ঋতুতে ডাকিলেও কেবল বসন্তেই পিককূজনের প্রসিদ্ধি। এইরূপ, সকল সময়েই ময়ূরের নৃত্য সম্ভব হইলেও একমাত্র বর্ষাতেই শিখীর কেকাধ্বনি ও নৃত্যের প্রসিদ্ধি।

(ঘ) সর্ব্বশেষে গুণগত কবিসময়ের কথা—

(১) অবর্ত্তমান গুণের বর্ত্তমানরূপে কল্পনা; যথা—যশঃ, কীর্ত্তি, হাস্য প্রভৃতির শুক্লিমা; অযশঃ, পাপ প্রভৃতির কৃষ্ণিমা, ক্রোধ-অনুরাগ প্রভৃতির রক্তিমা। প্রকৃত-পক্ষে এই সব গুণ ত রূপহীন; তথাপি বিশেষ বিশেষ গুণের উপর বিশেষ বিশেষ বর্ণের আরোপ করিবার এই যে প্রবৃত্তি—ইহা কেবল সংস্কৃত কবিগণেরই বৈশিষ্ট্য নহে। বিদেশীয় কবিগণের মধ্যেও ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

(২) বর্ত্তমান গুণের অবর্ত্তমানতা কল্পনা—কুন্দকুসুম শ্বেতবর্ণ হইলেও উহার কুট্মল (কুঁড়ি) গুলিতে শ্বেতবর্ণের অভাবই কবিগণ বর্ণনা করেন; বরং শ্বেতবর্ণের পরিবর্ত্তে উহাতে রক্তিমাভার আরোপ করিতে দেখা যায়।

(৩) গুণবিশেষের দ্রব্যবিশেষে নিয়মন—সাধারণভাবে পুষ্পসমূহকে শুক্লবর্ণ বলিয়া কল্পনা। এইরূপ, সাধারণতঃ মেঘ সমূহের কৃষ্ণতা ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বলা বাহুল্য—পুষ্প নানা বর্ণের, আর মেঘও শ্বেত, রক্ত, স্বর্ণ প্রভৃতি নানা বর্ণের হইতে দেখা যায়।

সংস্কৃত কবিগণ প্রায়ই কৃষ্ণ ও নীল বর্ণের মধ্যে, কৃষ্ণ ও শ্যামবর্ণের মধ্যে, শুক্ল ও গৌর বর্ণের মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলেন না। অথচ, শ্যাম, নীল ও কৃষ্ণ তিনটি পৃথক বর্ণ। গৌর ও শুক্ল বর্ণও অভিন্ন নহে।* নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার রস শ্যামবর্ণ, বীভৎস নীলবর্ণ ভয়ানক কৃষ্ণ, বীর গৌর ও হাস্য শুক্ল বর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি ভরত এইসকল বর্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে কতদূর অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহার পরিচয় নাট্যশাস্ত্র হইতে রঞ্জক বর্ণগুলির উপাদান-বিশ্লেষণের অংশ পাঠ করিলে উপলব্ধি করা যায়।

* শ্যাম=স্বর্ণাভ বা ঈষৎ পীতাভ নীল, স্বর্ণ গালাইলে যে বর্ণের ধূম বাহির হয়, তাহাই শ্যাম। নীল—মূলবর্ণ; তাম্র গালাইলে যে বর্ণের ধূম নির্গত হয় তাহা নীল। কৃষ্ণ=অন্ধকারের বর্ণ। গৌর—পীত ও রক্তের মিশ্রণ। পাটল=শ্বেত ও রক্তের মিশ্রণ, অর্থাৎ গোলাপী।

রাজশেখরের ভৌম কবিসময় এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে। এইবার স্বর্গস্থ কবি প্রসিদ্ধির কথা—

(১) চন্দ্রবিম্বে যে কলঙ্ক চিহ্ন আছে, তাহাকে কবিগণও কখন শশ কখনও মৃগ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। চন্দ্র মৃগাঙ্কও বটেন, আবার শশাঙ্কও বটেন। অতএব, সংস্কৃত কবিগণের মতে চন্দ্রস্থ শশ ও মৃগ অভিন্ন।

(২) কামদেবের রথধ্বজে মীন ও মকর উভয়েরই বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তাই মদন কখনও মীনকেতন, কখন মকরধ্বজ। অর্থাৎ সংস্কৃত কবিগণের সিদ্ধান্তে—মদনের ধ্বজস্থিত মীন ও মকরের কোন পার্থক্য নাই।

(৩) চন্দ্রকে কখনও অত্রিনেত্রসমুদ্ভূত জ্যোতিঃ কখনও বা সমুদ্রগর্ভ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহাও কবিপ্রসিদ্ধির একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত।

(৪) শিব ও চন্দ্র অতি প্রাচীন হইলেও কবিগণ উহাদিগকে 'বাল' বা নবীন বলিয়া বর্ণনা করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন না।

(৫) হরনেত্রসঞ্জাত বহ্নিতে ভস্মসাৎ হইলেও অনঙ্গ সংস্কৃত কাব্যে চিরদিনই মূর্ত্তরূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন।

(৬) দ্বাদশ মাসে পর্য্যায়ক্রমে দ্বাদশ আদিত্যের উদয় শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ হইলেও কবিগণ এ পার্থক্য স্বীকার করেন না।

এইরূপ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসিদ্ধির উল্লেখ রাজশেখর করিয়াছেন।

পরিশেষে পাতালীয় কবিসময়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) নাগ ও সর্প ভিন্ন জাতি হইলেও কবিগণ উহাদিগের অভিন্নতারই উল্লেখ করিয়া থাকেন।

(২) দৈত্য, দানব, অসুরগণকে পরস্পর অভিন্ন কল্পনা। দৈত্যগণ দিতির সন্তান; হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ, বিরোচন বলি, বাণ প্রভৃতি দৈত্য। দানবগণ দনুর বংশধর; বিপ্রচিত্তি, শম্বর, নমুচি, পুলোমা—ইহারা দানব। আর বল, বৃত্র, বৃষপর্ব্বা প্রভৃতি দেবদ্রোহীরা অসুর। কিন্তু সংস্কৃত কবি-সময়ে এ সকল চুল-চেরা প্রভেদ রক্ষিত হইতে দেখা যায় না।

কবিসময়ের দৃষ্টান্ত অনন্ত। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নাই। অতএব, এইখানেই যবনিকা-পাতন করা ভাল।
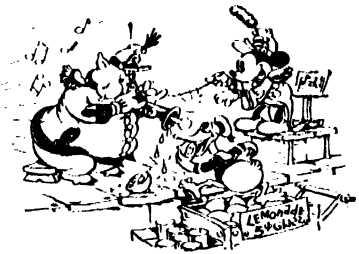
দুর্ব্বোধ্য

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পশ্চিমের একটি নাতিদীর্ঘ সহর। শীতের শেষ; তবুও এর নির্ম্মম প্রকোপ একতিলও কমেনি।

পূর্ব্ব দিকের জানলা ভেদ করে দোতালার মেঝের ওপর সোনালী রোদ এসে পড়েচে। জানালার ধারে পিঠ রেখে শীতের স্নিগ্ধ কবোজ্জ্বল সকাল উপভোগ করতে করতে প্রতুল একখানা বই পড়ছিল।

বাড়ীর সংলগ্ন বাগানটিতে অসংখ্য ফুল ফুটে আছে। মরসুমী ফুলই বেশী; মাঝে মাঝে ভালো জাতের গোলাপ। বিশ্রাম করবার জন্যে এখানে-ওখানে বিরামকুঞ্জ। দূরে পর্ব্বতমালার অগণিত শ্রেণী, কুয়াসার দুর্ভেদ্য যবনিকায় অস্পষ্ট,—রহস্যজড়িত।

ট্রেন-জারনির দরুণ প্রতুলের সারা দেহে একটা অবসাদ অনুভূত হচ্চে। সম্মুখের আরশীতে আপনার দেহের ছায়া দেখে কিসের আগ্রহে তার চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আপনার দেহের গঠন-মাধুর্য্যে আপনিই মোহিত হয়ে ক্ষণকাল সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রতুল বাগানে এসে ঢুক্‌ল। ফুলগাছ-গুলি প্রদক্ষিণ করতে করতে একটি গোলাপ ফুল তুলতেই সে দেখতে পেলে প্রতিমা শোবার ঘরের জানলার গরাদ ধরে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রতুল ক্ষণকাল প্রতিমার দিকে স্থির দৃষ্টে চেয়ে রইল। ঔৎসুক্যের অপার রহস্য প্রতিমার চোখেমুখে দেদীপ্যমান। তার বন্ধনমুক্ত নিবিড় কেশদাম পিঠের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে আছে। প্রতুল প্রতিমাকে লক্ষ্য করে গোলাপফুলটা ছুড়ে মারলে। জানলার গরাদে ধাক্কা খেয়ে ফুলটি নীচে পড়ে গেল। স্বামীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই প্রতিমা একটু হেসে উঠল। প্রতুল ঘরে ফিরে এল।

প্রতুল বল্‌ল: "ঘুম ভাঙলো, প্রতিমা? তোমার আশায় বসে বসে সময় যেন আর কাটতে চায় না।"

প্রতিমা বল্‌ল: "আমার জন্যে না চায়ের আশায়? আধ ঘণ্টার আগে ওটা পাচ্ছো না, বুঝলে? এতখানি ট্রেন-জারনির পর অনেক রাতে শুয়ে ভোর বেলায় মানুষ উঠতে পারে। তোমার সবই অনাসৃষ্টি।"

"ছ'টার পর কোনদিন আমায় বিছানায় পড়ে থাকতে দেখেচ, প্রতিমা?"

"থাক হয়েচে। নিজের দুর্ব্বলতা আর প্রকাশ কর না। কতদিন তোমায় আমি ডেকে দিয়েচি। চল বাগানটা একবার দেখে আসি। চায়ের জল হলেই ভজুয়া খবর দেবে।"

এমন সময় ভজুয়া চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকল।

প্রতুল বল্‌ল: "বিকেলের দিকে বাগানে গেলেই হবে। এখন চা খেতে খেতে গল্প করা যাক, কি বল, প্রতিমা?"

প্রতিমা হাঁ না কোন কথাই বল্‌ল না; একমনে চা করতে বস্‌ল।

চায়ে চুমুক দিয়ে প্রতুল বল্‌ল: "কাছে পিঠে এমন স্বাস্থ্যকর জায়গা আর নেই; বিশেষতঃ এমন চমৎকার বাড়ী মেলা দুষ্কর।"

প্রতিমা এ-কথায় কোন জবাব দিল না। শুধু বল্‌ল: "এ-জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগে।"

বিস্মিত কণ্ঠে প্রতুল বল্‌ল: "এর আগে এখানে তুমি এসেছিলে না কি?"

"হাঁ।"

"এখানে আসার প্রস্তাব যখন চল্‌ছিল তখন ও-কথা আমায় তোমার জানানো উচিত ছিল।"

"কেন?"

"নতুন জায়গায় বেড়াতে আসার একটা প্রবল আকর্ষণ থাকে। এখানে পদে পদে তোমায় সে-অভাবটা বিঁধবে।"

"ও আশঙ্কা তোমার অমূলক। একটা অনুরোধ আমার রাখবে?"

"বল।"

"তোমার গুণের তো ঘাট নেই। তাই আগে থেকে তোমায় সাবধান করে দিই। যার তার কাছে আমার অজস্র প্রশংসা করে পরিচয় দিয়ে বেড়িও না। ওটা আমি সহ্য করতে পারি না। আমার এ-অজ্ঞাতবাস অনুচ্চারিতই রয়ে যাক। এর ব্যতিক্রম হলেই এখানে আমি একদণ্ডও টিকতে পারবো না।"

"ভারী অদ্ভুত প্রস্তাব তো, প্রতিমা। নিজেকে এতটা হীনতা স্বীকার করতে হবে জেনেও কেন যে তুমি এখানে এলে বুঝতে পারচি না"

"না বোঝার তো কোন কারণ দেখচি না।"

"সে সূক্ষ্ম অন্তরদৃষ্টি আজও আমার হয়নি।"

"এক নাগাড়ে পাঁচ বছর এক জায়গায় কাটালে সে জায়গাটার ওপর একটা মায়া পড়ে যায়—বিশ্বাস কর?"

"করি।"

"তাই তুমি যখন এখানে আসবার প্রস্তাব করলে প্রতিবাদ করতে পারলুম না। অথচ

এখানকার লোকেদের ওপর আমার এক-তিলও আগ্রহ নেই।"

"চল না একটু বেড়িয়ে আসি ?"

"এখন থাক ; ঘরের অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে।"

প্রতুল একাই বেড়িয়ে গেল।

প্রতিমার কাজ করতে মন বসচে না। অতীতের কত ঘটনা একে একে তার স্মৃতিপথে ভিড় করে এসে দাঁড়াল। এই ঘরে বসে রমেশের সঙ্গে কত কথাই না সে কয়েচে। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে অকারণ ঝগড়া, মান-অভিমানের কৌতুক অভিনয়, তারপর আপনি সেধে কথা বলা—প্রতিমা আর চিন্তা করতে পারল না। সুখ-কল্পনার উন্মাদনায় তার স্নায়ুমণ্ডলী চঞ্চল হয়ে উঠল। রমেশের যুদ্ধ যাওয়ার ঘটনাটি সে আজও ভুলতে পারে নি।

"একটা সুখবর শুনেচো, প্রতিমা ?" রমেশ বলল।

"কি ?"

"যুদ্ধে যাচ্চি।"

প্রতিমা কম্পিত কণ্ঠে বলল : "তোমায় যুদ্ধে আমি যেতে দেবো না"

"এ কঠিন অনুরোধ কেন, প্রতিমা ?"

"যুদ্ধে যারা যায় তারা আর ফেরে না।"

"ভারী মজার জিনিষ তো। একথা তোমায় কে বললে ?" রমেশ হেসে উঠল।

"কে আবার বলবে ? আমি জানি।"

"তা হলে আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তুমি চাও না, কেমন ?"

"তাই বুঝি বলচি তোমাকে মৃত্যুর মুখে স্বেচ্ছায় ঠেলে দিতে মন সরে না।"

"মানুষ অমর নয়, প্রতিমা। মৃত্যু এখানেও আসতে পারে। তখন কি দিয়ে তার রাশ টেনে রাখবে, শুনি ?"

"মৃত্যুকে রোধ করবার ক্ষমতা আমার নেই, জানি। কিন্তু তবুও এখানে তোমার কিছু হলে তোমায় দেখতে পাব, তোমাকে সেবা-শুশ্রূষা করবার সুযোগ আমার মিলবে—এখানে যে আমি স্বাধীন, রমেশদা। বিদেশে কে তোমায় দেখবে বল তো ? তেষ্টার জল এগিয়ে দেবারও লোক তুমি পাবে না।" প্রতিমার গলা ধরে এল

তারপর একদিন রমেশ প্রতিমার অনুরোধ উপেক্ষা করে যুদ্ধে চলে গেল। কয়েক মাস পরে খবরের কাগজে রমেশের মৃত্যু সংবাদ প্রতিমা জানতে পারলে।

• • •

সন্ধ্যা হয়ে গেচে ঘরে চাকর আলো জ্বেলে দিয়ে গেচে। বিকেলের দিকে প্রতিমা একা বেরিয়েচে এখনও ফেরেনি। তোতালার ঘরে চেয়ারে বসে প্রতিমার কথা ভেবে ভেবে প্রতুল উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রতিমা ক্রমশঃ দুর্বোধ্য হয়ে উঠচে। এখানে আসা অবধি এই কয়দিনে তার কথাবার্ত্তা, তার চলাফেরা সবই কেমন সন্দেহজনক বলে মনে হচ্চে।

এমন সময় প্রতিমা ঘরে ঢুকল। প্রতুল বলল: "এইখানে বস প্রতিমা, কথা আছে।"

প্রতিমা প্রতুলের কাছে অন্য একটা চেয়ারে বসল। প্রতুল পুনরায় বলল: "ব্যাপার কি বল তো, প্রতিমা?"

"কিছুই না," দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিমা উত্তর দিল।

"তুমি জানো বোধহয় কোন জিনিষ গোপন করা আমি ভালোবাসি না। তোমার মুখচোখের অবস্থা স্বাভাবিক নয়, দিন দিন দেহ শীর্ণ হতে চলচে, কথাবার্ত্তা প্রায় একদম বন্ধ—এরপরও কি আমায় বিশ্বাস করতে বল তোমার কিছু হয়নি?"

"যেখানে মানুষ কোন কথা গোপন করতে চায় সেস্থলে তাকে পেড়াপীড়ি করে কোন লাভ হয় না। অশান্তি সৃষ্টি হবে অথচ কোন মীমাংসাই হবে না।"

"এমন কি গোপনীয় কথা যা তুমি আমাকে বলতে পারো না?" প্রতুল রাগে ফেটে পড়ল।

"হয় তো কিছু আছে যা তোমাকে শোনাবার নয়।"

"সে যাই হোক, আমি জানতে চাই—জানবার অধিকার আমার আছে।"

"গোপন করার অধিকারও আমার আছে, জেনো?"

প্রতুলের মাথায় আগুন জলে উঠল। সিগরেট কেস থেকে একটা সিগরেট বার করে ধরিয়ে সে বলল: "তোমাকে বলতেই হবে প্রতিমা। কোন কথা আমি শুনতে চাই না। বিয়ের পর থেকে একদিনও তোমায় বুঝতে পারিনি—আজকে তুমি আরও দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠেচো।"

"রমেশের সঙ্গে এখানে আমার প্রথম আলাপ হয়," প্রতিমার কণ্ঠ কেঁপে উঠল।

"কে রমেশ?" প্রতুল বিস্মিত হয়ে বলল।

"আমার যৌবনের প্রথম স্বপ্ন।"

"এমন একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার আমার কাছে তুমি গোপন করতে চাইছিলে প্রতিমা? ভারী নিষ্ঠুর তো তুমি?" প্রতুলের কণ্ঠ হতে শ্লেষ ঝরে পড়ল: "তারপর?"

"একদিন সে চলে গেল।"

"লোকটা দেখচি একদম ক্রট্। রস যেখানে জমে উঠেচে সেখানে পালিয়ে যাওয়াটা শাস্ত্রবিগর্হিত— কাপুরুষেরই নামান্তর।"

"পালিয়ে সে যায়নি।"

"তা হলে? বল প্রতিমা চুপ করে থেকো না।"

"যুদ্ধে গিয়েছিল; সেখানেই সে মারা যায়।"

"ভারী মর্ম্মান্তিক ঘটনা দেখচি। তারপরের শিকার বুঝি আমি?"

প্রতিমা চুপ করে রইল।

"বলেই ফেল না, প্রতিমা, লজ্জা কি? সেই জন্যে বুঝি আমাকে আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছিলে?"

প্রতিমা তবুও নীরব রইল। প্রতুল চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে খানিকটা পায়চারি করল। বলল: "তোমাদের মহালা কদ্দিন ধরে চলেছিল প্রতিমা? মনে আছে?"

"তার মানে?"

"অতি সরল, প্রশ্নের প্রয়োজন হয় না।"

"ও কথাগুলো এখন জিজ্ঞেস করে কোন লাভ আছে?"

"তোমার জীবনের এত বড় একটা ট্রাজেডি শুনতে পাবো না, তাও কি কখনও হয়। আমায় বঞ্চিত কর না, প্রতিমা, বল। শুনতে ভারী ভালো লাগচে।"

"প্রথম জীবনে একজনকে ভালোবাসতুম—এটা কোন নারীর কাছে নতুন নয়।"

"কই এ-ব্যাপারটা তো বিয়ের পর আমায় জানাওনি?"

"আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে?"

"প্রয়োজন বোধকরিনি।"

"উচিত ছিল; তাহলে সব কথা জানতে পারতে।" ক্ষণকাল চুপ করে থেকে প্রতিমা বলল: "আজ রমেশের সঙ্গে দেখা হল।"

"সে কি! এই না বললে রমেশ যুদ্ধে মারা গেচে।"

"তাই জানতুম; খবরের কাগজের সংবাদ আজ মিথ্যে বলে প্রমাণ হল। রমেশ মরেনি, বদ্ধ পাগল হয়ে গেচে।"

"পাগল হয়ে গেচে, বল কি ?

"হাঁ।"

"তোমায় চিনতে পেরেছিল ?"

"বোধহয় না।"

"মানে ?"

"একবার যেন বিদ্যুতের মত তাকালে তারপর বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল" বলেই প্রতিমা দৃষ্টি আনত করলে।

'কিছুই বুঝলে না ?'

"মনে হল আমার নাম ওর মুখে একটীবার শুনতে পেলুম—খুব অস্পষ্ট। কিন্তু ও-কথা থাক—"

বলেই প্রতিমা আসন্ন অশ্রুর প্রস্রবণ কোন রকমে চেপে চলে যাচ্ছিল। প্রতুলের দিকে তাকাতেও যেন তার সাহসে কুলিয়ে উঠছিল না। মনটা তার এমনই বিশ্রী হয়ে গেছে—কি সে করবে, কি ভাবে সান্ত্বনা পাবে বুঝতে না পেরে যেন সে দিশেহারার মত বিহ্বল হয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে শোবার ঘরে এসে বালিশের ওপর মুখ গুঁজে সে শুয়ে রইল।

* * *

হঠাৎ আলোর স্পর্শে প্রতিমা যখন জাগল তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেচে। শিশির স্নিগ্ধ পুষ্পপল্লবে বালার্করঞ্জিত পূর্ব্বাকাশ যেন একটা যাদু সৃষ্টি করেচে।

প্রতুল প্রতিমার ঘরে ঢুকল। শিশিরে ভেজা ফুলটির মত—তার চোখ দেখলেই বোঝা যায় এইমাত্র সে চোখ মুছে ঘরে ঢুকচে।

প্রতিমার হাত ধরে প্রতুল বলল: "প্রতিমা, মনের নিভৃতে রমেশকে যে-ভাবে এদ্দিন বাঁচিয়ে রেখেচো, অতটা পারবে না, কিন্তু তবুও আমার স্থান ঐ রমেশের পাশে যদি দিতে পার—" প্রতুলের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

প্রতিমা আর চুপ করে থাকতে পারল না। প্রতুল তাকে কতখানি ভালোবাসে সে তা বিশেষভাবে জানে। হতভাগিনী নিজের এ-দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে নিজেই বা কি শান্তি পেল এবং প্রতুলের সুখ স্বপ্নটুকু ভেঙে তার কিই-বা লাভ হল? আত্মধিক্কারে সে নিজেকে প্রতুলের পায়ের নীচে ঠাঁই দিয়ে কিছু বলল না, শুধু দু'হাত দিয়ে প্রতুলের পাদু'টি নিজের বুকের কাছে টেনে নিলে।

সুরেশচন্দ্রের সমালোচনা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বর্ত্তমান যুগে আবার সাহিত্য সমালোচনার একটা হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। "শনিবারের চিঠি" নামক মাসিকের পরিচালকগণ সমালোচনার এক নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিয়া সাহিত্যিক মণ্ডলীকে সচেতন করিয়াছেন। গত কয় বৎসর সে জন্য প্রায় সকল সাহিত্যসেবীই আমাদের সহিত 'শনিবারের চিঠি' পাঠ করিয়া থাকেন। ছোট ছোট মাসিক পত্রগুলিতেও ঐ ধরণের সমালোচনার চেষ্টা হইয়া থাকে। কখনও কখনও সমালোচকগণ সংযমের মাত্রাহারাইয়াও ফেলিতেছেন। 'প্রবাসী'র পুস্তক সমালোচনা কতকটা নিরপেক্ষ; তাহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই। 'তপোবন' নামক একখানি নবপ্রকাশিত মাসিকপত্র "মাসিক সাহিত্যে'র সমালোচনা প্রকাশ করিতেছিলেন —কিন্তু তাহাতে ঝাল বা নুন থাকিত না। সম্প্রতি 'প্রবর্ত্তকে'ও মাসিক পত্রিকার সমালোচনা প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু তাহাতে আলোচনা অপেক্ষা ব্যক্তিগত আক্রমণই অধিক দেখা যায়। 'পরিচয়ে' পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হয়; তাহার অধিকাংশই পাণ্ডিত্যপূর্ণ। বাহুল্য ভয়ে এখানে মাত্র কয়খানির কথাই উল্লেখ করিলাম। ৺সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত "সাহিত্যে" যে সমালোচনা প্রকাশ করিতেন, তাহা অনেক সময় কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইত বটে, কিন্তু সে সময়ে সকলেই তাহা সাগ্রহে পাঠ ও উপভোগ করিতেন। আমরা নিম্নে তাঁহার কয়েকটি সমালোচনা তুলিয়া দিয়া তাঁহার আদর্শের পরিচয় দিব।

১। ১৩১০ সালের বৈশাখের সাহিত্যে চৈত্রের 'প্রবাসী'র (১৩০৯) সমালোচনায় মধ্যে আছে—"পুরাতত্ত্বের কয়েকটি কথায়" শ্রীযুত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, ঋগ্বেদে (১০ম মণ্ডল ২য় অনুবাক ২য় ঋক) "আরোহন্তু জনয়ো যোনিম্ অগ্নে" দেখিতে পাওয়া যায়। জননীগণ অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করুন। ইহার কি অর্থ হইবে, সন্তান-শালিনী রমণী স্বামীর অনুগমন করিবে? সম্ভব, কারণ অপুত্রকন্যকা রমণীর পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার পক্ষে তৎকালে কোনও অন্তরায় ছিল না। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার এমতের সহিত সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া প্রক্ষিপ্ত মতবাদের আশ্রয় লইয়াছেন। ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোনও ঐ মতবাদী। তাঁহারা বলেন, বস্তুতঃ উক্ত শ্লোকের পাঠ 'আরোহন্তু জনয় যোনিম্ অগ্রে' (জননীগণ অগ্রে যোনি অর্থাৎ গৃহ প্রবেশ করুন)। ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ পশ্চাৎকাল প্রবর্ত্তিত প্রথা সমর্থনের জন্য অগ্রে শব্দকে অগ্নে করিয়া দিয়াছেন।" এই উদ্ধৃত মত উদ্ধৃত করিয়া লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—"পরিবর্ত্তন কথিত ও লিখিত উভয় কালেই সহজসাধ্য

সন্দেহ নাই।" তাঁহার সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ দশ বিশ কোটি হিন্দুর মনে একটু সন্দেহ থাকিতে পারে। ক্ষীণতম অনুমান ও কিছু পরিমাণ সন্দেহের প্রমাণে ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন ব্রাহ্মণগণকে ধূর্ত্ত বলিতে পারেন, জালিয়াৎ মনে করিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণসন্তান চারুবাবু প্রত্নতত্ত্বের এই অপরূপ রত্নকণা রাজপথের আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষেপ না করিয়া প্রবাসীর পাগড়ীতে পরাইয়া দিলেন কেন? বিলাতী বুট লেহন করিবার প্রবৃত্তি এদেশ হইতে কবে লুপ্ত হইবে, তাহা অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন।

২। ১৩১০ সালের জ্যৈষ্ঠের সাহিত্য হইতে বৈশাখের প্রদীপের সমালোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন এক নিশ্বাসে 'রামায়ণী কথা' শেষ করিয়াছেন। দীনেশবাবুর মতে "অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত রামায়ণকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দুইখানি পৃথক কাব্যে পরিণত করা যাইতে পারে।" বেদব্যাস বেদের বিভাগ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং নজীরের অভাব নাই। দীনেশবাবু যদি রামায়ণকে দুইখানি পৃথক কাব্যে পরিণত করিয়া চিরস্মরণীয় ও চিরজীবী হইতে পারেন, তাহাতে কাহার কি আপত্তি? তাহার পর —"একখানি অযোধ্যাকাণ্ডেই আরব্ধ ও অযোধ্যাকাণ্ডের পরিসমাপ্তি—বিষয় রাম-বনবাস। আর একখানি আরণ্যকাণ্ডে আরম্ভ ও লঙ্কাকাণ্ডে পরিসমাপ্ত—বিষয় সীতার উদ্ধার। এই দুই অংশের সঙ্গে কাব্যগত কোন স্বাভাবিক বন্ধন লক্ষিত হয় না।" 'কাব্যগত স্বাভাবিক বন্ধন' কি বস্তু, লেখক বোধ করি তাহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন, "রাম বনবাসের পর সীতাহরণ ও তাহার উদ্ধার হইয়াছে, ইহাতে সাময়িক পৌর্ব্বাপর্ব্যের সংস্রব আছে, কিন্তু কাব্য হিসাবে এই দুই ঘটনা পরস্পর নিরপেক্ষ।" আমরা এই সূক্ষ্মতত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিলাম না। তথাপি স্বীকার করি, রামায়ণের এই অদ্ভুত বিভাগ সম্পূর্ণ নূতন ও মৌলিক। বীজের সহিত বৃক্ষের ও বৃক্ষের সহিত ফলের সম্বন্ধও বোধ করি দীনেশবাবু স্বীকার করিবেন না। কেন না, ফলের সহিত বৃক্ষের বৃন্তরূপ একটা 'বন্ধন' দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা 'স্বাভাবিক' কি না, হলপ করিয়া দীনেশবাবুকে কে বলিতে পারে? আর বীজের সহিত বৃক্ষের সম্বন্ধ বাঁধিবার মত স্বাভাবিক বন্ধন রজ্জু ত খুঁজিয়া পাওয়া ভার। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, বীজে ও বৃক্ষে সম্বন্ধ নাই। আবিষ্কারটি অতি অদ্ভুত, অধ্যাপক বসুর আবিষ্কার নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কিন্তু উপায় কি? "রামায়ণী কথায়" আর একটা সত্য আছে; বিশ্লেষণ করিতে করিতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম করিয়া ফেলিলে শেষে কিছুই থাকে না, সব উড়িয়া যায় কিন্তু সমগ্র প্রবন্ধটি মজুদ থাকে।

ছলনা

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বরতনু ছিলো শুয়ে শয্যাপরে।
পাশেতে দাঁড়ায়ে দেখি,
নিঃশ্বাস পড়ে না—একি!
ভয়েতে স্তিমিত মন, বিজন ঘরে।

চিরতরে হয়ে গেলো শেষ!
অধরের আকুল কম্পন,
পরশের শীতল চন্দন—
যতনে বিনানো ঘন কেশ।

নাম ধরে' ডাকি বারবার।
সেই পুরা-পরিচিত ভাষা
নাহি শুনি' হারাইনু দিশা,
অন্ধকার মরণের পার!

ধরিনু মুখের কাছে বাতি।
জীবনের কোন চিহ্ন নাই,
এতটুকু সাড়া নাহি পাই—
ঘনায়িত বিচ্ছেদের রাতি।

এই যারে ভালোবেসেছিনু—
কত দিন নীরবতা সহি'
কত রাতি বেদনায় দহি'
অন্তরে যারে চেয়েছিনু!

নিমেষেতে ফুরাইলো প্রাণ!
উচ্ছল যৌবনে যার
মগ্ন আছিনু বারে বার,
কোন্ পথে করিলো প্রয়াণ!

সহসা আকুলি' ওঠে মন।
বিধাতারে দিই অভিশাপ
বিরহীর হৃদি-অনুতাপ
দহে যেন তারে অনুখন।

কত ক্ষণে জাগে শিহরণ।
বুঝি মোরে করুণায়
মিটি মিটি চোখ চায়
ঠোঁটের কিনারে ওঠে কুঞ্চন।

বুঝিনু সে প্রেম-চতুরালি!
কপট নিদ্রার ভাণে
মরণ অধিক হানে
বিষের যাতনা মোরে খালি।

রাগিয়া কহিনু তারে আমি—
"কেন মিছে অছিলায়
জেনে নিলে, মোর, হায়
কত প্রেম অন্তর-যামী।"

৩। ১৩১০ সালের আষাঢ়ের সাহিত্যে—জ্যৈষ্ঠের প্রদীপের সমালোচনায় আছে—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ সোমের "সেকেন্দ্রা" একটি বিশেষত্বহীন কবিতা। পদ্যে ইতিহাসে। কবিত্বের লোভ বোধ করি চুন-সুরকীতে চাপা পড়িয়াছে

৪। ঐ সাহিত্যে—জ্যৈষ্ঠের বান্ধবের সমালোচনায় বলা হইয়াছে—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সিংহ "ব্রাহ্মণ সমস্যার" মীমাংসায় বলিয়াছেন—"(১) বিনা আহ্বানে কাহারও দান পরিগ্রহ করিব না। (২) পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা না থাকিলে দারপরিগ্রহ করিব না। (৩) তপঃসাধনে যত্নশীল হইবে। ব্রাহ্মণসন্তানগণ এই তিনটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া তাহা পালন করিতে যত্নশীল হইবেন, আবার স্বদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, আবার ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট আদর্শে সমগ্র হিন্দুজাতি গৌরবান্বিত হইবে।" শুধু ব্রাহ্মণ কেন, প্রতিজ্ঞা তিনটি সমভাবে সাধারণ মনুষ্যমাত্রেরই প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে।

৫ ঐ সাহিত্যে জ্যৈষ্ঠের বঙ্গ দর্শন সমালোচনায় লিখিত হইয়াছিল... শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় "দেবদর্শন" প্রবন্ধ লিখিয়া বলিতেছেন—বাঙ্গালী, বাজে খরচ করিও না নজে এত কালী কলম বাজে খরচ করিলেন কেন? উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত যে বেশী উপকারী, প্রবন্ধ রচনার ঝোঁকে তাহা বিস্মৃত হইলেন?

৬। শ্রাবণের সাহিত্যে আষাঢ়ের ভারতীর সমালোচনায় প্রকাশিত হয়—প্রথমেই শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'ধরণীর প্রেম' নামক একটি কবিতা। সমগ্র কবিতাটির উদ্দিষ্ট কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের মত "ও রসে বঞ্চিত" দল বুঝিতে পারিলে বুঝি কবিতাই হইত না কবিতাটি তিলোত্তমা। অর্থাৎ পুরাকালে বিশ্বের নিখিল সৌন্দর্য্যের তিল তিল চয়ন করিয়া যেমন তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, যতীন্দ্রবাবুও তেমনই 'ধরণীর প্রেমে' বাঙ্গালা নীতি কবিতার ঐশ্বর্য্য আহরণ করিয়াছেন। যতীন্দ্রবাবু পরে "আষাঢ় এলায়ে দিল কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ" লিখিবেন জানিলে রবীন্দ্রনাথ কখনই মানসীতে "বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী" আগে লিখিয়া ফেলিতেন না ইহা আমরা হলপ করিয়া বলিতে পারি।

৭। অগ্রহায়ণের সাহিত্যে আশ্বিনের প্রদীপের সমালোচনা আছে। তাহাতে লেখা হইয়াছে—শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠের "আসামের নাগা জাতি" প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য। লেখক বলিতেছেন—"যে পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধটি সঙ্কলিত হইল, তাহা অনেক দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে অসভ্য নাগাদিগের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না জানি না।" ইচ্ছা করিলে সেন্সসের বিবরণ পড়িলে জানিতে পারিতেন।

৮। পৌষের সাহিত্যে আশ্বিনের প্রবাসীর সমালোচনায় বলা হইয়াছে—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্তের "রূপালী" নামক গল্পটি পড়িয়া নিরাশ হইয়াছি। প্রবীন লেখক পাকা ঘুটি কাঁচাইতে বসিলেন কেন, বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের 'রেডিয়ম' নামক বৈজ্ঞানিক রচনাটি দেখিয়া মনে হইতেছে, যোগেশবাবুও প্রবাসীর সুরে গলা সাধিয়াছেন। "বেকেরল ও অন্যেরা সুরে নিয়ম ও ইথারিয়াম নামক ধাতুদ্বয় হইতে তেজ নির্গত হইতে দেখাইয়াছেন" ও "তাঁহার সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক নবাবিষ্কৃত রেডিয়ম নামক ধাতুর তেজ বিকিরণ ক্ষমতা আরও বিস্ময়জনক" প্রভৃতি জটিল ও অদ্ভুত ভাষা যোগেশবাবুর রচনায় শোভা পায় না। বিদেশী সংবাদপত্রে যাহা সহজে পড়া গিয়াছে, মাতৃভাষায় লিখিত প্রবন্ধ হইতে তাহা আয়ত্ত করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। ইহা দুঃখের বিষয় নয় কি? যাহা হউক প্রবন্ধের দৈন্যতা সম্পাদক অন্য প্রকারে পূর্ণ করিয়াছেন; সুতরাং পাঠকগণের আক্ষেপের কারণ নাই। এতগুলি লেখকের এক তাড়া লেখনীতে যাহা সিদ্ধ হয় নাই, সম্পাদক একটি মাত্র তুলিতে তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। এবারকার তুলির ফল—"বঙ্গের এক শ্রেণীর সমালোচকের নমুনা।"—সমালোচকের লাঙ্গুলে শিশুবোধক বাঁধা। আচ্ছা বঙ্গের সমালোচকের ছবি আঁকিতে গিয়া সম্পাদক মহাশয় এলাহাবাদের মডেল গ্রহণ করিলেন কেন? শিশুবোধক ত এখন বাতিল হইয়া গিয়াছে। চোরের উপদ্রবে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ও গতপ্রায়;

এ অবস্থায় সমালোচকের ল্যাজে শিশুবোধকের বদলে একখানি সচিত্র বর্ণপরিচয় বাঁধিয়া দিলে কেমন হইত? "এক শ্রেণীর সমালোচক" বলিলে কাহাদের বুঝিবে? নিশ্চয়ই যাহারা রামানন্দী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নয়, যাহারা প্রবাসীর 'পো' ধরিতে অক্ষম, এবং যাহাদের উপদ্রবে চুরী করিয়া প্রবন্ধাদি লিখিলেই ধরা পড়িতে হয়, তাহারা? সম্পাদক একটি কথা জানিয়া রাখুন, বিশ্ববিদ্যালয় দাগিয়া দিলেই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির গর্ব্ব বৃথা। কোন শিক্ষাই গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিতে পারে না এবং মাতৃস্তন্যের সহিত যাহারা শীলতা ও সৌজন্য আহরণ করিবার অবকাশ পায় নাই, তাহারা দুর্ভাগ্য, কৃপার পাত্র, সুতরাং আর অরণ্যে রোদন অনাবশ্যক।

উপরে আমরা যে ৮টি সমালোচনা উদ্ধৃত করিলাম, সেগুলি ১৩১০ সালে অর্থাৎ ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইলেও সেগুলি যাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিত, তাঁহারা সকলেই আজও শ্রীভগবানের কৃপায় জীবিত। এইগুলি পড়িয়া শুধু যে পাঠকবর্গ আনন্দলাভ করিবেন তাহা নহে, যাঁহাদের সম্বন্ধে লেখা তাঁহারাও এগুলি এত কাল পরে পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। তাঁহারা সকলেই জীবনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন, কাজেই এগুলি তাঁহাদের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জানাইবার উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত হইল না। দীনেশচন্দ্র রায় সাহেব ও পরে রায়বাহাদুর হইয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-লিট উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন; চারুচন্দ্র সাংবাদিক জীবন ত্যাগ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে সম্মানসূচক এম-এ উপাধি দান করিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন সিংহ ও যোগেশচন্দ্র রায়ও নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে (ম্যাজিষ্ট্রেট ও অধ্যাপকরূপে) অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শনের পর রায়বাহাদুর হইয়াছেন। বাকী সকলের সম্বন্ধে নাই বা বলিলাম। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর সুনাম বৃদ্ধি করিয়া আজও বোম্বায়ে বাস করিতেছেন। নগেন্দ্রনাথ সোম ও যতীন্দ্র মোহন বাগচী আজ সর্ব্বজন সমাদৃত কবি। রামানন্দবাবুকে বাঙ্গালা দেশে কে না জানে? কাজেই আমাদের বিশ্বাস—তাঁহাদের সম্বন্ধে স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের লিখিত আলোচনাগুলি উদ্ধৃত করায় তাঁহারা অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইবেন। এইরূপ বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও তাঁহারা যে গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে কি অধিক শ্লাঘার বিষয় নহে?

আজিকে এমন করি কেটে যাবে নিশি

বন্দেআলী মিয়া

আধখানি ভাঙ্গা চাঁদ দেখা যায়
ঝাউবন পারে
তারি সাদা আলো এসে লুটাইয়া
পড়িয়াছে দ্বারে;
খণে খণে আসে বাস কোথা বুঝি
ফুটিয়াছে হেনা—
কাশ ঝাড় মনে হয় উথলায়
সাগরের ফেণা।
পুবালী বাতাস আসে বাতায়ন
পথ বাহি মম
বাহিরের জোছ্না ধারা ঘুম সম
মধু মনোরম;—
এমন মাধবী রাতে ঘর কোণে
রহে নাকো মন
আমাদের দিয়েছে ডাক রূপময়ী
বাহির ভুবন।
তোমারে সাথেতে লয়ে দু'জনাতে
যাবো বালুচরে
জোছনার আলোধারা ঝুরছিবে
তব আঁখি 'পরে।
তব মুখে রবো চেয়ে পাশে বসি
গাবে তুমি গান
তোমার সুরের সাথে মিশে যাবে
নদী কলতান।
দোল্ খাবে তারকারা ঢেউ 'পরে
সারা নিশি ভরি,
বাতাসেতে ঝাউবন ক্ষণে ক্ষণে
উঠিবে শিহরি।
নদীর বালুর চরে মুখোমুখি
মোরা বসে রবো
যে-কথা হয়নি বলা নিরজনে
তোমা আজ ক'বো।
শামুক কুড়ায়ে প্রিয়া মালা গেঁথে
দেবো তব গলে
বালু তুলে মুঠি মুঠি দুইজনে
ফেলে দেবো জলে।
আধখানি বাঁকা চাঁদ ভেঙে ভেঙে
হবে শত খান
মোদেরি ঘেরিয়া নদী ঢেউ সনে
গাবে কলগান;
বালুর কাঁকর লয়ে জোছনায়
করিব গো খেলা
মোদের এমনি করি কেটে যাবে
নিশীথ এ বেলা।

যশোলিপ্সায়

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

লিখিতে লিখিতে হঠাৎ একদিন দৃঢ়-বিশ্বাস হইল বাংলাদেশের লোক আমাকে দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া আছে। যার মনের কথা ও হাতের লেখা পাইয়াছে তার মুখের চেহারা দেখিবার বাসনা হওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। সুতরাং অতঃপর কোন একটি বড় সভায় উপস্থিত হইয়া কিছু বক্তৃতা দিতে পারিলে জনসাধারণের এবং আমার আকাঙ্খা যুগপৎ চরিতার্থ হয়। ফটো ছাপানো কিছু না, ফটো দেখিয়া কখনও লোক চেনা যায় না।

অ্যালবার্ট হলে একটি সভার আয়োজন শুনিয়াই যাচিয়া গিয়া খবর দিলাম, আমি কিছু বলিব। কর্তৃপক্ষরা মুদী ও ময়রা জাতীয়, সম্প্রতি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি লইয়া মাথা বিপুলভাবে ঘামাইতেছে, তাহাদের পাঠ্য পত্রিকাগুলিতে আমার নাম কখনো দেখেন নাই বলিয়া চিনিতে পারিল না। তবু বলিল, ৬টা থেকে ৯টা অবধি হল্ পাওয়া যাইবে, অন্যান্য বক্তৃতার মধ্যে যদি সময় হয় আমাকে বলিতে দেওয়া হইবে।

ছয়টা বাজিবার দেড়ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে আমি একটি কবিতা লইয়া শূন্য হলে বসিয়া রহিলাম। একে-একে, দুয়ে-দুয়ে লোক আসিতে লাগিল। আমার সহিত তাহাদের পরিচয় ছিলনা বলিয়া আমারই অনুকম্পা হইতে লাগিল। একজন আমার পা-টা মাড়াইয়া দিয়াই চলিয়া গেল, একটা নমস্কার পর্য্যন্ত করিল না। ক্রমশঃ কয়েকটি তরুণীও আসিল। আমি এই চিন্তায় পুলকিত হইয়া উঠিলাম যে, যখন আমার নাম ঘোষণা করা হইবে, তখন এই তরুণীগণ এবং ঐ তরুণেরা তারস্বরে (?) ভাবিতে থাকিবে—ইনি? ইনিই সেই বিখ্যাত—

স-ছটা হইয়া গেল, তখনো সভানেত্রীর দেখা নাই। কর্তৃপক্ষের অস্থিরতা স্পষ্টই লক্ষ্য করিলাম, আমার নিজেরও অনুভব করিলাম—সময় ক্রমশঃই সংক্ষিপ্ত হইতেছে। সাড়ে ছয়টায় সভার কার্য্য সুরু হইল। রিপোর্ট ব্যতীত তিনটি বক্তৃতার পর আমার কবিতা পাঠ। বেশী অপেক্ষা করিতে হইবে না। সভানেত্রী-বরণ যিনি করিবেন এবং যিনি সমর্থন করিবেন, দুই জনেই যেন প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন, নাতিক্ষুদ্র বচনবিন্যাসে ২০ মিনিট কাটাইয়া দিলেন। অতঃপর সেক্রেটারীর রিপোর্ট পাঠ, মুদ্রিত পুস্তকের খোলপেজী দুই ফর্ম্মা আয় ব্যয় হিসাব অবধি পড়িয়া তিনি যখন নিরস্ত হইলেন, তখন সাড়ে সাতটা। উঠিলেন 'বক্তিয়ার দা'—এ ধরণের বাংলানাম কখনো শুনি নাই। তিনি সুরু করিলেন—'মাননীয়া সভানেত্রী মহোদয়া ও সমবেত ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ, আজ আমাকে বক্তৃতার জন্যে এরা ধরেছেন, কিন্তু আমার বলবার বিশেষ কিছু নাই, দুটি কথায় আমি শেষ করব' এই ভণিতার পর ঝাড়া আধঘণ্টা তিনি গল্প ও কবিতা আবৃত্তি যায় নাচন কোঁদন পর্যন্ত পরম উৎসাহে চালাইতে লাগিলেন। ভিড় ক্রমেই কমিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার অধ্যবসায় কমিবার লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি তখনো বলিতেছেন, 'আমার পরে আরো অনেক বক্তা রয়েছেন, আমি আর আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাইনা, শুধু একটি কথা—এই বলিয়া আরো পনেরো মিনিট। 'আমার শরীর অসুস্থ' (না জানি সুস্থ থাকিলে কি করিতেন) আর আমি কিছু বলতে চাইনা, তবে এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মশায় যা বলতেন—ইহার পরেও দশ মিনিট। 'আমার কথা শেষ হ'য়ে গেছে, আর আমার কিছু বলবার নেই, আমি খালি এই বলতে চাই নারী জাগ্রতা আছেনই, তাঁকে জাগাবার দরকার নেই, এখন পুরুষ আসলে হয়, মোহানিদ্রা যদি কারুর থাকে ত পুরুষের, নারীর নয়। নারীশক্তি নারী মহিমা নারী জগতের কল্যাণরূপিণী'—বলিয়া নারীমণ্ডলীদের দিকে চাহিয়া প্রশংসা উদ্রেকের চেষ্টা করিয়া আরো দশমিনিট কাটাইয়া দিলেন। ঘনঘন করতালি পড়িলে তিনি আসন পরিগ্রহ করিলেন।

ইহার পর উঠিলেন দ্বিতীয় বক্তা—বচনলাল দাশগুপ্ত, এমন নামও কখনো শুনি নাই। তিনি কৃপা করিয়া বলিলেন 'রাত অনেক হয়েছে, আমি আপনাদের বেশী সময় নোবনা। আমি যখন বিলাতে

ছিলাম তখন জোন্‌স্ স্মিথকে ব'লে আমি ভারতবাসীর যা দেবার আছে জ্ঞানের ভাণ্ডারে, তা তোমার পাশ্চাত্যদেশবাসীরা স্বপনেও কল্পনা করতে পারোনা। আমি আমেরিকায় গিয়ে আন্দোলন চালাই, জাপানে, এবং ফিলিপাইন আয়ল্যাণ্ডে এই নারী প্রগতি নিয়ে—" ইত্যাদি। পঁচিশ মিনিট কাটিল। 'আমি সামান্যলোক, আমি আর কি বলব। যুবকদের শুধু বলি, যুবতীদের সম্মান করতে শেখো, বৃদ্ধদের বলি বৃদ্ধাদের সম্মান করো। তা নইলে দেশ রসাতলে গেল। খেতে পাবেনা। নেশন বিল্ডিং নেশন বিল্ডিং করছ—ন্যাশানেল ফিলিং কই? একটা কারবার ফেল হ'লে এদেশের লোক রেগে যায়, বলে স্বদেশী কন্‌সার্ণে থাক্‌ব না, কিন্তু ওদের দেশে যে লাখোকারবার দুবেলা ফেল মারে, তাতে কি? সুতরাং—' বিশ মিনিট! কর্ত্তৃপক্ষ কাণের কাছে গিয়া জানাইয়া দিল, সংক্ষেপ করুন স্যার।' 'আচ্ছা' বলিয়া প্রবলতর উৎসাহে এবং উচ্চতর আর্ত্তনাদে তিনি বক্তৃতা চালাইতে লাগিলেন, এবং আধঘণ্টা আগে যে কথাটা বলিয়াছিলেন, তাই দর্শকরা ভুলিয়া গিয়াছে এটা হাইতোলা দেখিয়া অনুমান করিয়া কথিত কথার পুনরাবৃত্তি সুরু করিয়া আরো পনেরো মিনিট কাটাইয়া দিলেন। হল অর্দ্ধেক খালি হইয়া গেছে, আমার কান্না পাইতেছিল কিন্তু দারুণ উইল-ফোর্স খাটাইয়াও লোকটাকে বসাইতে পারিতেছিলাম না। একসময়ে অবশ্য সে বসিল, কিন্তু তখন শোনাইবার লোক নাই বলিলেই হয়! ইহার উপর আবার সভানেত্রী যখন অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে আমার নাম উচ্চারণ করিলেন; তখন আমিই শুনিতে পাইলাম না, নরহরি দাস না নকুড় প্রামানিক কি বলিলেন! সুতরাং আমাকে উঠিতে দেখিয়া কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। ইহার উপর প্রথম দুইলাইন শুনিয়া বুঝিতে পারিল কবিতা, তখন এক সারির লোক ছাড়া সমস্ত ব্যক্তি সশব্দে এবং সবেগে গৃহত্যাগ করিল, যেন পালাইয়া বাঁচিতে চায়।

কিন্তু মানুষ একবার মরীয়া হইয়া উঠিলে তাহাকে থামানো দুঃসাধ্য। রাগে ক্ষোভে নিরাশায় দুরাশায় ভাঙা গলা লইয়া আমি চীৎকার করিয়া কবিতা পড়িয়া আড়াই ডজন লোককে শুনাইয়া তবে ছাড়িলাম।

সভা শেষ হইয়া গেছে।

একটি প্রৌঢ়া মহিলা আমার কাছে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'বাবা, তুমি বেশ বলেছ!'

শুনিয়া সুখী হইলাম, ইনি প্রবীণা হইলে কি হয়, ইঁহারও তরুণী কন্যা ও পুত্রবধূ থাকিতে পারে, নিশ্চয় তাহাদের কাছে গিয়া বলিবেন 'অমুক চন্দ্র অমুক, আজ যা চমৎকার কবিতা পড়লে একখানা!' শুনিয়া তাহাদের মুখ বিস্তৃত হইবে এবং অদেখা কবির যখন মন চঞ্চল হইবে কল্পনা করিয়া আমিই বিস্ফারিত হইয়া উঠিলাম।

বাহির হইবার আগে, কর্ম্মকর্ত্তাদের একজনকে টানিয়া বলিলাম, 'কবিতাটা লাগল কেমন?'

জবাব পাইলাম, 'আমি কি কিছু শুনিচি মশায়? আমি তখন ধন্যবাদটা মুখস্ত করছিলুম মনে মনে।'

গর্ব্বভরে কহিলাম, 'ভালো লেগেছে ঐ মহিলাটির।'

দেখাইয়া দিতেই অপ্রত্যাশিত উত্তর আসিল, 'উনিত' কাণে কিচ্ছু শুনতে পান না! একেবারে কালা।'

'কালা?' আমি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম। 'বদ্ধ!' বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইলেন।

জীবন ও মৃত্যু

শ্রীহেমেন্দ্র মল্লিক

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশ।

শেষ শরতের চন্দ্র ছিল আকাশের বক্ষে, আর ছিল বাংলার প্রান্তর প্রবাহিত শির-শিরে রোমাঞ্চময় বাতাস।

সৌমেন বলিল, আর নয় ছায়া, আর এক মিনিটও নয়। বেশ হিম পড়চে এবারে, তোমার আর ছাতে থাকা ভালো নয়, ঘরে চলো।

ছায়া সৌমেন্দ্রের স্ত্রী। চার মাস টাইফয়েডে শয্যাশায়িনী থাকার পর মাত্র কাল সে পথ্য করিয়াছে। কাল রাত্রের গাড়ীতে কলিকাতা হইতে সৌমেন আসিয়াছে পত্নীর পথ্য করার অনুষ্ঠানের সাক্ষী হইতে। আজ বহুদিন পরে ছায়া ছাতে উঠিয়াছে। স্বামীর দিকে মাথা ফিরাইয়া ক্ষীণস্বরে সে অনুনয় করিল, আর একটু থাকি না! আজ কতদিন পরে, কত পূর্ণিমার পর ছাতে এসেচি বলোতো তোমার সঙ্গে?

তথাপি মৃদু আপত্তির স্বরে সৌমেন কহিল, তাহার মস্তকে একটি হাত রাখিয়া, আমার কথা শোনো ছায়া, হিম পড়চে বড্ড। ঈশ্বর না করুন, আবার যদি কোন রকম টার্ণ নেয় তাহলে যে আর কোনকালেই তোমায় নিয়ে জ্যোৎস্নায় বেড়াতে পাবো না মনি? চলো ঘরে যাই এবার। আজ মোটে প্রথমদিন খোলা হাওয়ায় বেরিয়েছো!

সৌমেন নিজের চেয়ার ছাড়িয়া ইজি-চেয়ারে-শায়িতা রুগ্ন পত্নীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দুটি শীর্ণ বাহু প্রসারিত করিয়া ছায়া মৃদু অনুযোগ করিল, আজ তোমার সঙ্গে কত গল্প করব ভেবেছিলাম!

ছায়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল!

নবজাত শিশুর ন্যায় অতি সন্তর্পণে তাহাকে বুকে তুলিয়া ব্যথিত স্বরে সৌমেন কহিল,—ছিঃ, দুঃখ করচ তুমি? তোমাকে সুস্থ দেখবো, তোমাকে নিয়ে হাসবো, খেলবো, চাঁদের আলোয় গল্প করব—এ সাধ আমারই কি কিছু কম ছায়া? অনেক ভুগেছো বলেই না আমার এত ভাবনা তোমার জন্যে! নাও, গলাটা ভালো করে জড়িয়ে ধরো দেখি, সিঁড়ির দিকে যাচ্ছি!

কিন্তু সিঁড়ির দরজার কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বে কানের কাছে মুখ লইয়া ছায়া ডাকিল—ওগো! আরও নিবিড়ভাবে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সৌমেন কহিল,—বলো—

—আমি কি খুব ভারী আছি এখনও?

হাসিয়া সৌমেন কহিল, আগের চেয়ে অনেক কমে গ্যাচো অবশ্য, এতদিন ভুগলে! কেন?

অবোধ শিশুর ন্যায় আব্দারের স্বরে ছায়া কহিল,—আমাকে কোলে নিয়ে ছাতে একটু বেড়াও না! আমি তো হাঁটতে পারবো না—বেড়াবে? পাঁচ মিনিট, ঠিক বলচি!

সৌমেন ভালবাসে তাহার প্রিয়তমা পত্নীকে! সে জানে সুস্থ অবস্থাতেই এই আদরিণী পত্নী তাহার কাছে কতবার কত অসম্ভব প্রকারের বায়না ধরিয়াছে! সেই ছায়া আজ এ প্রকার আকাঙ্খা প্রকাশ করায় সে বিন্দুমাত্র বিস্মিত না হইয়া পুনরায় ফিরিয়া ধীরে ধীরে পদচারণা সুরু করিল!

স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া আপন মনেই ছায়া কহিল, আচ্ছা, কতগুলো জ্যোৎস্না কেটে গ্যাছে বলোতো এর মধ্যে? সাত-আটটা হবে, না? উঃ, এতদিন আমি বিছানায় পড়েছিলাম? এতদিন তুমি পাওনি আমাকে তোমার কাছে! কত কষ্ট পেয়েচো তুমি, না?

স্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া সৌমেন কহিল, জীবনে কিছুই বৃথায় যায় না ছায়া। এতগুলো জোছনায় তোমাকে কাছে পাইনে বলেই না আজকের জোছনা এত ভালো লাগচে আমাদের! বহুদিন তোমাকে বুকে নিতে পাইনে বলেই না কাল রাত থেকে কেবল তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি? কিছুই অপচয় হয়না ছায়া এ জগতে! সৌমেনের স্কন্ধদেশে একটা চিমটি কাটিয়া ছায়া কহিল, আহা, সারাদিন সঙ্গে সঙ্গে আছো সেকি নিজের ইচ্ছায়, না, আমি বায়না ধরচি বলে; বলোতো সত্যি করে!

ধীরে ধীরে ঘুমন্ত শিশুর ন্যায় দুটি হাতের উপর সাবধানে ছায়াকে বক্ষের সম্মুখে আনিয়া সৌমেন কহিল, আমি জবাব দেবোনা ছায়া ও কথার। আমার দিকে চাও, আর, পারো তো পড়ে নাও ওর উত্তর!

দুই হাতে স্বামীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ছায়া কহিল,—ইস্ ঐটুকুতেই অভিমান হল বাবুর! আমি কি এমন বলেচি গো তোমায়?

সৌমেন নিরুত্তর রহিল। তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

ছায়া ব্যথিতস্বরে কহিল, নাগো—আর অমন করে আমি কক্ষনো বলব না তোমায়। ওকি' তোমার চোখে জল কেন? বলো না, বড্ড কষ্ট পেয়েছো ও কথায়?

বাষ্পরুদ্ধস্বরে সৌমেন কহিল, তুমি কষ্ট দাওনি ছায়ারাণী। আমি ভাবছিলাম—ঈশ্বর আমাকে আর একটু হলেই কি হতভাগা, কি নিঃস্ব করতে বসেছিলেন! কতবড় দুর্ভাগ্যের মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন

তিনি আমায়! তুমি জ্বরের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে থাকতে—আর আমি ছট্‌ফট্ করতাম। আমার পিঞ্জরাবদ্ধ আত্মার সে মর্ম্মান্তিক হাহাকার আমি নীরবেই চেপে রাখতাম আমার বুকের মধ্যে! মনে হত কোন্ দুরন্ত দৈত্য তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোন্ অন্ধকার পাতালের গহ্বরে আমার বুকের আশ্রয় থেকে! ইচ্ছা হত, যেখানে তোমার চৈতন্য, তোমার আত্মা পালিয়ে গেছে শরীরটাকে অচেতন অসাড় করে রেখে, সেখানে গিয়ে তোমাকে বুকে করে ফিরিয়ে আনি! তুমি চোখ মেলে তাকাতে, চিনতে পারতে না আমায়! উঃ, ছায়া—তুমি বুঝতে পারবে না তোমার ঐটুকু বুকের মধ্যে. কী যন্ত্রণা, কী অসহ্য অশান্তির জ্বালা আমি নিজের হৃদয়ে বহন করেছি এতদিন। নাঃ, আর ভাববোনা ওসব কথা। আমাদের দুর্ভাগ্য কেটে গেচে এবার। কিন্তু আর নয় সোনা, এবার যেতেই হবে তোমায় ঘরের মধ্যে। বিগলিত স্বরে ছায়া কহিল, কিন্তু শুয়েই ঘুমাবেনা তা বলে রাখচি!

রাত্রি প্রায় পৌনে দুই। ছায়া ঘুমাইয়াছে। রোগীনির শয্যাপাশে ইজিচেয়ারে বসিয়া সৌমেন। ছায়ার শীর্ণদুর্ব্বল একখানি হাত নিতান্ত অসহায়ভাবে বিছানার ধারে তাহার হাতের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে!

পাশের ঘরে দিদিও ঘুমাইয়াছেন। কয়দিন রাত জাগার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যের যথেষ্টই হানি হইয়াছে, ইহা সৌমেনের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই, যখন দিদি আসিয়া কহিলেন, সোমু, তুই বরং আগে একটু ঘুমিয়ে নে, মাঝ-রাতে না-হয় তোকে তুলে দিয়ে আমি শুতে যাবো,—তখন সে প্রবল আপত্তির স্বরে কহিল, না-না তোমাকে আর এক ঘণ্টাও ঘুম কামাই করতে দেবো না দিদি। আমিই রইলাম আজ। তাছাড়া, এখন আর কোন চিন্তাও নেই।

হাতের ম্যাগাজিন বন্ধ করিয়া সৌমেন চাহিল নিদ্রিতা ছায়ার মুখের দিকে। তাহার মনে হইল ছায়ার চোখের পাতা যেন কাঁপিতেছে। যেন ঠোঁট দুটি এক-প্রকার নড়িয়া উঠিতেছে। সহসা, ঘুমের মধ্যেই, যেন অত্যধিক যন্ত্রণায় তাহার সমস্ত পাণ্ডুর মুখখানি বিকৃত হইয়া উঠিল! বিস্মিত সৌমেন হাতের মুঠার মধ্যে অনুভব করিল—ছায়ার ধৃত হাতখানি ক্রমেই শীতল হইয়া উঠিতেছে!

কিছু বুঝিতে না পারিয়া সে দাঁড়াইয়া শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল, ছায়া ছায়া—কষ্ট হচ্ছে কোনো? ছায়া—

কোন সাড়া নাই ছায়ার। তাহার সমস্ত দেহখানি বারকয়েক প্রবল ভাবে শিহরিয়া উঠিল! অপ্রকৃতিস্থ সৌমেন অধীর স্বরে পুনরায় ডাকিল,—ছায়া, কি কষ্ট হচ্ছে বলো, ছায়া, লক্ষ্মিটি, তাকাও আমার দিকে!

ছায়া চোখ মেলিল। কিন্তু তাহার সে দৃষ্টি দেখিয়া অভিভূতের মত সৌমেন চীৎকার করিয়া উঠিল, দিদি—ও দিদি, শিগগীর এসো, ছায়া কি রকম করচে! দিদি—

ছায়ার চোখের কোন্ হইতে একফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাহার নিশ্বাস ক্রমেই দ্রুততর হইয়া উঠিতেছে। উদভ্রান্তের ন্যায় সৌমেন তাহার মস্তকে একটা হাত রাখিয়া পুনরায় ডাকিল,—ছায়া, ছায়া—সাড়া দাও আমার ছায়া—

নিঃশব্দে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিদি কহিলেন সর, দেখি।—শীগগীর পাখাটা দে সোমু।

পাখা লইয়া সৌমেন নিজেই বাতাস করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট অতিবাহিত হইল। ছায়ার মুখের সে বিকৃত চেহারা প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে—তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের বেগও কমিয়া আসিল। দিদির মুখের দিকে চাহিয়া সৌমেন কহিল, এরকম হচ্ছে কেন হঠাৎ? দীনু কাকাকে ডেকে আনবো? কম্পকণ্ঠ আশঙ্কাস্বরে দিদি কহিলেন,—না, আর দরকার নেই তার। ঘুমিয়ে পড়েছে এবার।

কিছুক্ষণ পরে সহসা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া উদ্বিগ্নস্বরে দিদি কহিলেন,

—নীচের দরজায় শব্দ হল না। সোমু? বিস্মিতভাবে সৌমেন কহিল, নাতো! ওতো কুকুরটা শব্দ করচে।

হ্যাঁ, নীচের তলায় সদর দরজা খোলার শব্দ হইয়াছিল এবং কুকুরটিও সহসা ডাকিতে শুরু করিয়াছিল। রান্নাঘরের কাছে পোষা বিড়াল দুটিও যেন একসঙ্গে কান্নার সুর ধরিয়াছে!

সৌমেনের বাহুতে হাত রাখিয়া দিদি আর্ত্তস্বরে কহিয়া উঠিলেন, আমার কিছু ভালো মনে হচ্ছেনা সোমু, কুকুরটা ডাকচে, বেরাল দুটোও কি রকম কাঁদচে শুনচিস্?—

দাঁড়াও আমি দেখচি গিয়ে—

গমনোদ্যত সৌমেনের হাত ধরিয়া দিদি কহিলেন, থাস্‌নে সোমু, তুই দাঁড়া বরং বউএর কাছে—আমিই দেখচি! কিন্তু দরজার নিকটে গিয়া সহসা দিদি শুব্ধ হইয়া গেলেন! পরক্ষণেই একপ্রকার ছুটিয়া শয্যার পাশে আসিয়া ছায়ার একটি হাত ধরিলেন

ব্যাকুলভাবে, বউ—ও বউ, ছায়া লক্ষ্মি, দিদি আমার—

রোগিণীর সমস্ত মুখমণ্ডলে আবার সেই অকথ্য যন্ত্রণার বিকৃতি! দেহখানি থাকিয়া থাকিয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে!

অধৈর্য্যস্বরে সৌমেন কহিয়া উঠিল

দরজা বন্ধ করলে কেন দিদি? কিসের ভয় করচ তুমি? আমি চললাম ডাকতে দীনুকাকাকে! ভীত চকিত কণ্ঠে দিদি কহিলেন, দরজা খুলিসনে সোমু, কথা শোন্ আমার—বাইরে যাসনে!

বিমূঢ়ের ন্যায় সৌমেন কহিল—কেন? কিসের ভয় পাচ্ছো তুমি?

জানালার দিকে চাহিয়া কম্পিতস্বরে দিদি কহিলেন—সদরে আমি নিজের হাতে খিল দিয়েছি আজ! কুকুরটাই বা জোরে ডাকে না কেন, যদি ঘরে কেউ ঢুকবেই?

ওদিকে উত্তরোত্তর যন্ত্রণার আধিক্যে মস্তক হেলাইয়া ছায়া কাঁদিয়া উঠিল,

—উঃ, বাবারে—না, আমি যাবোনা গো—ছাড়ো আমায়—আর।

মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিয়া সহসা দৃঢ়স্বরে সৌমেন কহিল, তুমি ভয় পেয়োনা দিদি! যেই হোক, আমি শত্রু তাড়াই আগে ঘর থেকে!

বলিয়া দেয়ালের পেরেক হইতে অনেক দিনের পুরাতন ও সখের শঙ্কর মাছের চাবুকটি লইয়া সে খিল খুলিয়া ফেলিল!

দিদি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

—কাকে তাড়াবি চাবুক দিয়ে সোমু, যাসনে বাইরে ভাই।

কবাট খুলিয়া সৌমেন বারান্দায় আসিল। ছায়ার সখের পোষা ময়নাটা সিড়ির ধার হইতে ডাকিয়া উঠিল—কেগা, না—হবেনা। পরক্ষণেই কে যেন কণ্ঠনালী চাপিয়া তাহার স্বর বন্ধ করিয়া দিল।

উঃ, বারান্দায় কি ঠাণ্ডা! সৌমেনের সমস্ত শরীর একবার কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

সিঁড়ির চাতালে কাহার পদশব্দ! দ্রুতপদে সেইদিকে অগ্রসর হইয়া নির্ভীক কণ্ঠে সৌমেন হাঁকিল,—কে? পদশব্দ যেন নীরবেই অগ্রসর হইতেছে। চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সৌমেন সিড়ির দিকে চাহিল—কোথায় কে?

উঃ, আবার সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস! হাতের মধ্যে চাবুকটি শক্ত করিয়া ধরিয়া সে পুনরায় হাঁক দিল, কে—কে ওখানে? নীচ হইতে এবারে কুকুরের কান্নার শব্দ স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

...পদশব্দ আরও নিকটে......মাথার উপরেই আলো, অথচ, বিকারগ্রস্তের ন্যায় সৌমেন দেখিল সিড়ির দেওয়ালে কাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।

—কে তুমি? দাঁড়াও ওখানে! অস্বাভাবিক দৃঢ়তার সহিত সৌমেন চীৎকার করিয়া উঠিল।

একটা তুষার-শীতল বাতাসের হল্‌কা

সৌমেনের সমস্ত মুখেচোখে আসিয়া নিষ্ঠুর কষাঘাত করিল।

···পদশব্দ এবার বারান্দার কয়েক ধাপ নীচেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই অস্পষ্ট কৃষ্ণ প্রতিবিম্বটি-ও।

বিকৃত কর্ণেন্দ্রিয়ে সৌমেন শুনিল একটা অশ্রুতপূর্ব্ব ক্রুর কণ্ঠস্বর।

—সরো—আমি কাজে এসেচি! নিজের অজ্ঞাতেই সৌমেনের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইল।

—না, পথ নেই এদিকে, ফিরে যাও!

আবার সেই অসহ্য ঠাণ্ডা বাতাস! সৌমেনের দেহ যেন এখন লৌহের ন্যায় কঠিন ও অনুভূতি-হীন হইয়া উঠিতেছে।

—সরে দাঁড়াও মূর্খ! কাজ সেরেই আমি চলে যাবো।

না—না, পথ নেই—কে তুমি? একি সৌমেনের কণ্ঠস্বর?

—আমি? আমাকে চেনবার সময় হয়নি এখনো তোমার! সরো, পথ দাও।

জ্ঞানহীন উন্মাদের ন্যায় হাতের চাবুক ঘুরাইয়া প্রাণপণ শক্তিতে সৌমেন আঘাত করিল সেই কৃষ্ণ ছায়ামূর্ত্তির উপর—শপ্—শপ্—শপ্!—সঙ্গে সঙ্গে অমানুষিক চীৎকার—হবেনা, হবেনা এখানে—চলে যাও শয়তান—

অসহ্য উত্তেজনায় দৃষ্টিহীন ক্রোধোন্মত্ত পশুর ন্যায় সৌমেন লাফাইয়া পড়িল সেই প্রতিবিম্বের উপর।

···একটা দুঃসহ আঘাতের বেদনায় সৌমেনের চেতনা ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু, তাহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সে নিমেষের জন্য অনুভব করিল সেই অসম্ভব শীতল বাতাসের ঝড় ও শুনিতে পাইল—নীচের দরজার কবাটে একটা প্রবল ধাক্কার শব্দ।

•

সৌমেন চোখ মেলিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিবামাত্রই হাটুর যন্ত্রণায় একটা অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

গায়ে হাত রাখিয়া শান্তকণ্ঠে দীনুকাকা কহিলেন, বড্ড ব্যথা লাগচে হাটুতে, নয়রে সোমু?

—পা ভেঙ্গে গ্যাচে—দীনুকাকা?

—নারে পাগল, ভাঙেনি পা, জখম হয়েচে একটু।

বিদ্যুৎচমকের ন্যায় পুনরায় উঠিয়া বসিয়া সৌমেন জিজ্ঞাসা করিল—ছায়া—বৌ?

প্রশান্ত আশ্বাসবাণীর মত দীনুকাকা কহিলেন, আর কোন ভয় নেই সোমু, বউমা ঘুমাচ্চে এখন।

দীনুকাকার একখানি হাত আবেগভরে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সৌমেন কাঁদিয়া উঠিল, কাকা—কাকা, আমি অনেক কষ্ট পেয়েচি; বলো—সত্যি ক'রে।

দীনুকাকা পূর্ব্ববৎ শান্তকণ্ঠে কহিলেন, —হ্যাঁরে পাগল, বৌমা খুব ভালো আছে এখন। নার্স রয়েচে সঙ্গে! আর কোন ভয় নেই।

একমাস পরে। শীতের প্রত্যুষ! গৃহের পশ্চাতে বাগানের মধ্যে বেড়াইতেছিলো ছায়া ও সৌমেন।

আচলে ঝরা সিউলি ফুল কুড়াইতে কুড়াইতে ছায়া সহসা প্রশ্ন করিল—তুমি এখনো ঠিক করে হাটতে পারোনা নয়? ব্যথা আছে একটুও?

নবোলব্ধ স্বাস্থ্যের পালিশ আসিয়াছে ছায়ার গণ্ডে। রোগজীর্ণ-দেহ-লতিকায় পরিপূর্ণ যৌবনের জোয়ার আসিয়াছে প্রতি অঙ্গ ছাপাইয়া।

তাহার একখানি হাত ধরিয়া সৌমেন কহিল—না, ব্যথা আর নেই, তবে সময় সময় হঠাৎ একটু খচ্খচ্ করে হাঁটুর নীচেই। ভেবোনা ও সেরে যাবে।

আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে ছায়া কহিল—আমার জন্যই তোমার এই কষ্ট।

তাহার মুখে হাত চাপিয়া ধরিয়া সৌমেন কহিল—চুপ, ওকথা কক্ষনো নয়।

স্বামীর স্কন্ধে হাত রাখিয়া উৎসাহ-দীপ্ত ভঙ্গিতে দেহ দোলাইয়া ছায়া কহিল—না, বলবেনা অমনি! আমার কি অহঙ্কারের কথা বলোতো ওটা? বলিয়া স্বামীর মস্তকটি নিজের বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সে পুনরায় কহিল—শুনচো ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ?—ও প্রাণ তোমারই দেওয়া! তুমি যুদ্ধ করেছো মৃত্যুর সঙ্গে এই প্রাণের জন্যে! আচ্ছা··· তোমার ভয় লাগেনি একটুও? ছায়া শিহরিয়া উঠিল।

হাস্যোৎফুল্ল মুখে সৌমেন কহিল—তা ঠিক জানিনে, তবে ক্রোধ হইয়াছিলো খুব তখন ঈশ্বরের উপর। এতখানি কষ্ট দিয়েও তাঁর হয়নি? মনে হচ্ছিল, যদি যেতেই হয় তাহলে দুজনেই যাব একসঙ্গে।

ছায়ার গণ্ড বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। স্বামীর উদ্যত হস্ত ধরিয়া ফেলিয়া সে কহিল—থাক থাক, মুছোনাগো,—আমার বড় অহঙ্কারের—বড় আনন্দের—বড় কৃতজ্ঞতার অশ্রু ওটা। বলিয়া সে সৌমেনের বক্ষে লুটাইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইবার পর সহসা সৌমেন প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, সে তাহলে খালি হাতেই ফিরেছিলো সে রাত্রে?

মৃদু কম্পিত কণ্ঠে সৌমেনের বুকের মধ্য হইতে ছায়া কহিল—না, দীনুকাকার আর একটা রোগী—একটা বিধবা মেয়ে থাইসিসে ভুগছিল চার বছর ধরে—সে মারা যায় সেই রাত্রে।

সৌমেন ও ছায়া পরস্পরকে আরও আঁকড়াইয়া ধরিল।

জাত-ব্যবসা

(কৌতুক-চিত্র)

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বাপ আর ছেলে।

ব্যবসা ওদের মন্দ চলে না।

মন্দই বা বলি কি করে যখন ওদের অবস্থা স্বচ্ছল!

জুতোর কারবার। বাপ-ব্যাটা দু'জনেই খাটে লাভও হয় প্রচুর।

একথা শুনে আপনারা হয়ত মনে করে বসেছেন ক্যানিং ষ্ট্রীটে কিম্বা নিদেনপক্ষে কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে ওদের চমৎকার জুতোর দোকান, 'শো'-কেসে নানারকম জুতা রকমারী সাজে সাজানো। খদ্দের আসছে, যাচ্ছে—; কত হেলিওট্রোপ্‌ কত জর্জ্জেটের খস্‌খসানি ওদের দোকানে নিত্যই লেগে আছে। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়।

তা হলে ভালো করে সব কথা খুলেই বলি :

বাপ আর ছেলে।

কোনো বাড়ীতে ছাদে হোগলা বাঁধা দেখলেই ওদের মাথায় টনক নড়ে—যেমন ঢাকের বাদ্যি শুনে চড়ুকের পিঠ চচ্চড় করে ওঠে।

হোগলা বাঁধা দেখলেই ধরে নেয়া যেতে পারে—বাড়ীতে হয় বিয়ে নয় শ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধ কল্‌কাতায় ঘটা করে বড় একটা হয় না—হয় প্রায়ই বিয়ে। তখন ওদের কর্ত্তব্য হচ্ছে—পাট করা ধুতি-জামা পরে একটা ভালো কোঁচানো উড়নী গলায় ঝুলিয়ে বিয়ে বাড়ীর ভীড়ে মিশে যাওয়া।

তারপর চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাদ্যে উদর পূরণ করে আস্‌বার মুখে নিজের ছেঁড়া জুতোটা ভুল করে ফেলে রেখে—ভালো নতুন চক্‌চকে কোনো জুতোর ভেতর পা এক রকম ভুল করেই গলিয়ে দিয়ে সটান রাস্তায় পড়া—; তারপর সেখান থেকে ধরে কার সাধ্যি!

এমনি করে বাপ-ব্যাটাতে ব্যবসা মন্দ চলে না।

সকালবেলা উঠেই ওরা পাঁজি দেখতে সুরু করে—দেখে কখন বিয়ের লগ্ন আছে।

পাড়া-প্রতিবেশী দেখে মনে করে, আহা! বাপ-ব্যাটা কি ধার্ম্মিক—প্রতিটি পা চলে—পাঁজির পাতা উল্টে—! এমন নইলে এমন লক্ষ্মীমন্ত ঘর হয়! মুখে হাসি লেগেই আছে!

আষাঢ় মাস—পাঁজি ভরা বিয়ের তারিখ—কাজেই ওদের মুখ ভরা হাসি অক্ষয় হয়ে আছে!

বাপ একটা বিয়ে বাড়ী থেকে চমৎকার চক্‌চকে একজোড়া চটি 'পা-সাফাই' করে নিয়ে এসেছে।

বাড়ী এসে একবার ভাবলে, ছেলেকে দিয়ে দি, জায়গা মত জমা দিয়ে আসুক।

আবার খানিক বাদেই মনে হ'ল—চটি—হোক্ না নতুন—কতই বা আর দাম উঠবে!

সাম্‌নেই আর একটা বিয়ের তারিখ আছে, বদলে এক জোড়া নতুন 'সু' নিয়ে এলেই হ'বে।

এই রকম সাত-পাঁচ ভেবে আর ছেলেকে ডেকে জুতো জমা দিয়ে আস্‌তে বলে নি!

সন্ধ্যে হ'তেই 'জুতো-জামা-কাপড়ে' ভদ্র সেজে বাপ বেরুলো শীকারের সন্ধানে।

দু'তিনটে গলি পেরিয়েই মিলে গেল চমৎকার এক বাড়ী আলোর মালায় ঝক্‌ মক্‌ কচ্ছে। লাউড স্পিকারে পাহাড়ী সান্যালের গান প্রাণপণে লোককে 'প্লিজ' করবার চেষ্টা করছে—!

দোরের কাছে পৌঁছুতেই এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে একটা বেলের গোড়ে গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বল্লেন, আসুন, আসুন—এই যে ভেতরে বস্‌বার জায়গা—

আপত্তি করবার সময়ও ছিল না—বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না—বাপ আস্তে আস্তে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকে দেখলে তারি বয়সী অনেক ভদ্রলোক সেখানে বসে গল্প জমিয়েছেন। বাপেরও আসর জমানর আর্টটা বেশ ভালো করেই জানা ছিল—নইলে এসব ব্যবসায় উন্নতি করা মুস্কিল!

দিব্যি জমে গেল আসরে—কথায়—রসিকতায় হাসির ফোয়ারা ছুটল।

ওদিকে ছেলে সন্ধ্যেবেলায় স্নান শেষ করে হঠাৎ পাঁজিতে দেখতে পেলে সেইদিনই আষাঢ় মাসের শেষ বিয়ের তারিখ।

সর্ব্বনাশ! এজন্যে ত' ও প্রস্তুত ছিল না।

আগের তারিখে যতগুলো জুতো পাওয়া গিয়েছিল সবই জমা দেয়া হয়ে গেছে! ঘরে এমন জুতো নেই—যা পায় দিয়ে কোনো নেমন্তন্নে যাওয়া চল্‌তে পারে।

পুরোনো জুতোর খোঁজ করা গেল—তা-ও মিল্‌লো না!

এ বাড়ীতে পুরানো জুতোই বা কোথায় পাওয়া যাবে?

মুখখানা ভার করে মহা দুঃখিত মনে ও বাইরের ঘরে গিয়ে বসে রইল।

তবে কি আষাঢ় মাসের শেষতারিখ এ বছর তাকে কাঁদিয়েই বিদায় নেবে?

হঠাৎ দেখতে পেলে পাশের বাড়ীর চাকর এক জোড়া ছেঁড়া চটি 'ডাষ্টবিনের' কাছে ফেলে দিয়ে চলে গেল!

ছেলে যেন হাতের কাছে স্বর্গ খুঁজে পেলে! বোধকরি ও বাড়ীর বড় ছেলের হ'বে! ছেঁড়া চটি ফেলে দিয়ে নতুন জুতো কিনে আন্‌লে।

তা আসুক ক্ষতি নেই—; এমন মুস্কিল-

আসান ওর জীবনে আর কোনো দিন হয় নি।

আনন্দে লাফিয়ে উঠে রাস্তা থেকে ও জুতো জোড়া কুড়িয়ে আন্‌লে। ও হরি! শুধু ছেঁড়াই নয়—আবার পেরেক ওঠা।

তা হোক গে!

কোনো রকমে একটা বিয়ে বাড়ী পৌঁছুতে পারলে বাঁচা যায়। তারপর ও জুতোকে সে আর চিন্‌তেও পারবে না!

জুতোর দৈন্য ঢাক্‌বার জন্যে সাজ পোষাকটাও ভালো করেই করল। যাতে ফিরতি মুখে বেশ ভালো জুতো নিলেও পোষাকের সঙ্গে গড়মিল না হয়!

বরাত ক্রমে ছেলে গিয়ে পৌঁছল সেই বাড়ীতে যেখানে ইতিপূর্ব্বেই তার বাপ গিয়ে ইতিমধ্যেই আসর জমিয়ে ফেলেছে।

ছুটে এলেন সেই আগের ভদ্রলোক, গলায় ঝুলিয়ে দিলেন মালা, বল্লেন, যান্‌, ফরাসে বসুন গিয়ে।

ছেলে আগের ঘরেই ঢুকতে যাচ্ছিল কিন্তু একটি ছোক্‌রা বাবু—তাকে আর একটি ঘর দেখিয়ে বল্লেন, আপনি এই ঘরে আসুন, ও ঘরে বুড়োদের আড্ডায় গিয়ে কি হ'বে বলুন?

ঘরে গান বাজনা খুব জমে উঠেছে। কিন্তু সেদিকে ছেলের নজর নেই। কেন না ফেরার সময় ও জুতো আর কিছুতেই নেয়া চল্‌বে না—এর মধ্যে পেরেকে পা কেটে গেছে।

ও করলে কি দরজার মুখেই ঘাঁটি আগলে বসে রইল।

'পাত পড়েছে' শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে উঠে ছাদে ছুটতে হ'বে—'ফার্ষ্ট ব্যাচে' বসা চাই-ই—নইলে জুতো সব হাত-ছাড়া হয়ে যাবে।

যে কথা সেই কাজ।

ঠেলে ঠুলে—পরিবেশনকারীদের চুঁ মেরে, বাচ্চা, কচি কাচাদের কাঁদিয়ে ও ফার্ষ্ট ব্যাচেই জায়গা নিয়ে প্রকাণ্ড একটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, তারপর পকেট থেকে রোমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিলে!

যথা সময়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে পান চিবুতে চিবুতে ও যখন সদর রাস্তায় পা বাড়ালো, তখন কে বল্‌বে এই খানিক আগে যাবার সময় পেরেক তোলা ছেঁড়া চটি পায়ে ও খোঁড়াচ্ছিল।

অন্য ঘরে বাপের অবস্থা তখন একটু কাহিল হয়ে এসেছে!

'গপ্পী' লোক পেয়ে বাড়ীর লোক কিছুতেই তাকে ছেড়ে দেবে না।

—বসুন না মশাই, আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন। এই কথা বলে বলে সবাই মিলে তাকে 'লাষ্ট ব্যাচ' অবধি আটকে রেখেছেন।

যতবার বাপ উঠতে গেছে—বুড়োরা তাকে টেনে বসিয়ে দিয়েছেন!

অবশেষে এলো সেই লাষ্ট ব্যাচ! বুড়োরা তাকে মাঝখানে রেখে খেতে বসলেন।

প্রথমেই বাপের মেজাজ বিগড়ে গেল। লুচি···ঠাণ্ডা···শক্ত!

টেনেও ছেঁড়বার উপায় নেই! তারপর প্রায় আদ্ধেক জিনিষই ফুরিয়ে গেছে।

—এই আস্‌ছে—!

কিন্তু আর তার দেখা নেই!

মিষ্টির পর্ব্ব শেষের দিকে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

শেষটায় এলো দই!

কিন্তু মুখে দিতে প্রাণ ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়ে উঠল···এমনি টক"

যাক্‌—কোনো রকমে খাওয়া পর্ব্ব শেষ করে বাপ উঠে পড়লো।

কিন্তু যে জন্যে আনা তার সুবিধে হ'বে কি করে—! লাষ্ট ব্যাচ···মাত্র দু'জন বুড়ো···যার যার জুতো চিনে নিতে একটুও দেরী হ'ল না।

বাপের ভাগ্যে পড়ল—সেই ছেঁড়া পেরেক তোলা চটি—যা ছেলে ফেলে গিয়েছিল!

সারাটা সন্ধ্যে হাস্তরস বিতরণ করবার পারিশ্রমিক স্বরূপ বাপ মুখখানাকে আম্‌শী করে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

কিন্তু হাঁটাও কষ্টকর!

পেরেকে পায় ফোস্কা উঠে গেল—কোনো যায়গা দিয়ে বা রক্ত পড়তে লাগলো।

কিন্তু তাই বলে শুধু পায়ে ত' পথ চলা যায়না—বিশেষ করে গলায় যখন বেলের গোড়ে দুলছে—আর সাজপোষাকের যখন এমন ঘটা!

কোনো রকমে বাড়ী পৌছে বাপ একেবারে হুম্‌ড়ীখেয়ে পড়ল।

ছেলে কোথায় বসেছিল—ছুটতে ছুটতে এসে আনন্দে একেবারে বত্রিশ পাটি দাঁত বিকশিত করে বল্লে, বাপ, আজ খুব দাঁও মেরেছি—চমৎকার চক্‌চকে চটি—বোধ করি আজকের কেনা!

বাপ চটির দিকে চেয়েই বুঝতে পারলে এ সেই চটি যা আজ সে নিয়ে গিয়েছিল—পরক্ষণেই চোখ পড়ল তার নিজের পায়ের দিকে—তখনও সেখান দিয়ে রক্ত পড়ছে!

মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছেলের হাতের চক্‌চকে চটি ফস্‌ করে নিজের হাতে টেনে নিয়ে চটাচট্‌ তার দু'গালে কসে লাগিয়ে দিলে!

ছেলে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল!

মরু-বীণা

শ্রীসুজিত রায়

তুমি আমায় করলে অবহেলা
তুমি আমায় করলে গৃহহারা,
তাইতো আমি ভাসিয়ে মেয়ে ভেলা
চলছি ভেসে মুক্ত: বাঁধন হারা।
ধূ ধূ বারি পুঞ্জীভূত ফেনা
ইসারাতে ডাক দিয়ে যায় মোরে;
চুকিয়ে দিয়ে সকল লেনা দেনা,
বিদায় তোমায় দিলাম নয়ন লোরে।

বন্ধু তুমি শুনলে না মোর কথা
মুখ ফিরিয়ে নিলে ঘৃণাভরে।
অবহেলে দিলে আমায় ব্যথা,
দিলে আঘাত আমার অন্তরে।

তবুও তোমার ঘৃণায় ভরা অমৃতময় বাণী,
হে বন্ধু মেয়ে! প্রাণে আজও জ্বালায় পরশমণি।

আগমন

শ্রীসুশীল রায়

মঞ্জুলার হাত কাঁপচে, পা কাঁপচে, সমস্ত শরীরে তার অসহ্য শিহরণ, তবু সে শুনছে, তার কানের মধ্যে অনবরত শব্দ হ'চ্ছে : পালাতে পারো ? যদি পথে এতো বাধা, বিপথে যেতে রাজি আছো তুমি ? বলো, লক্ষ্মীটি, সত্যি ক'রে বলো, তুমি আমার সঙ্গে চলে আসবে ! সে কি, উত্তর দাও ! কথা বলছোনা কেন ? হ্যালো ! কি বললে ? ছিঃ, It is my will, and not my passion, বিশ্বাস করো না ? যদি কামনাই হ'তো তাহ'লে তোমার কাছে এমন মিনতি জানাতে আস্‌তাম না। শিউলি আছে, সুনীলা আছে, বকুল আছে, তারা আমায় ডাকে, আমি অবাধে তাদের কাছেই চ'লে যেতাম। শুন্‌ছো তো ? মঞ্জুলা, শোনো ! উত্তর দাও ! আমি তোমাকে ভালোবাসি, তোমার মতো ভালো কাউকে আমি—হ্যাল্‌লো, হ্যাল্‌লাউ—

আর চীৎকার করলে চ'লছেনা, ফোন ছেড়ে দিয়ে মঞ্জুলা ব'সে পড়লো সোফায়। আর শহরের আর এক প্রান্তে শ্যামল উন্মাদের মতো আবৃত্তি করছে : নিষ্ঠুর ! জীবনে ভালোবাসা যে না বোঝে, সে কি মানুষ ? ভালোবাসা বুঝি আবার, বোঝাতে হয় ? কেন, মঞ্জুলা এতদিনেও তাকে চিন্‌তে পারেনি ? শ্যামল তো নিজেকে রিক্ত ক'রে দিয়েছে তার কাছে, তবু তাকে তার—মঞ্জুলার—চিন্‌তে এত বেগ কেন ?

রিং বাজলো ফোন্‌-এ। শ্যামল দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়েই বললো—মঞ্জু ? বলো, তুমি আমায় ভালোবাসো ? আমি তোমার ভালোবাসা চাই-ই চাই ! হ্যালো, হু ইউ ? কে ভাই তুমি ? দিলীপ ! কি খবর ?

ওপার থেকে দিলীপ ব'ললো : এত লাফাচ্ছ কেন ? আর ভালোবাসা, ভালোবাসা ব'লে চেঁচাচ্ছ কেন ? মঞ্জুটা কে ?

শ্যামল একটা ঢোক গিলে ব'ললো : আমার নায়িকা। রিয়ার্শেল দিচ্ছিলাম ভাই ! পুজোর মধ্যে আঁহুলে একটা থিয়েটারে জোর-জবরদস্ত ক'রে পার্ট দিয়েছে। ক্লাশের একপাল ছেলে আঁহুলের, তাদের এড়ানো মুস্কিল।

—তাও ভালো। ওপার থেকে দিলীপ স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ব'ললো : তুমি বুঝি নায়ক ?

—না ভাই, ভিলেন। শ্যামল হাস্‌লো এপারে।

—আমি ভাবলাম, দিলীপ অপরপ্রান্ত থেকে বললো : তুমি বুঝি দারুণ প্রেম করছো।

পাগল নাকি ? পড়ো নি কবিতা ? 'প্রেম ব'লে কিছু নাই, আছে মোর শুধু প্রয়োজন।' আমারও তাই। প্রেম-ট্রেম ভালোবাসি না।

দিলীপ বললো : প্রেমের পায়ে প্রণাম। প্রেমের বাগান করবে বোঝাই। পড়োনি সেই ইংরাজি কবিতা ? যাক্‌ বাজে কথা। যা বলছিলাম, শিউলির বিশ্রী রকমের মাথা ধ'রেছে নাকি, নিজে তাই ফোন্‌ ধরতে পারলোনা, সে বলছে : তুমি একবার এসো। তার নাকি তোমার কাছে ভীষণ এক দরকার ! শিউলির 'ভীষণ' ছাড়া কথা নেই জানোই তো ! হয়ত এসে দেখবে—কিছুই না, তবু এসো।

শ্যামল মনে মনে বললো, ব'য়ে গেছে যেতে ! কিন্তু তবু সে ব'ললো—শিউলিকে বলো, আমার মাথা কটকট করছে, চোখ দিয়ে জল ঝরছে, বুক টিপ্‌টিপ করছে, কারণ একটা অ্যাস্‌পিরিন্‌ ট্যাবলেট খেয়েছি, হার্ট তাতে দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে !

দিলীপ কিছুক্ষণ থেমে ব'ললো—শিউলি ব'লছে, অ্যাস্‌পিরিন্‌ খেলে কেন ? ভেরামন্‌ খেলেই পারতে।

—তা বটে। শ্যামল এপারে হাস্‌লো, ব'ললো—শিউলিকে ভেরামন্‌টা খেয়ে ফেল্‌তে বলো, তারও তো মাথা ধ'রেছে !

হঠাৎ তারের ভেতর দিয়ে রাশিকৃত ঝাজ এসে উপস্থিত : ধ'রেছেই তো ? এক-শো বার ধ'রেছে। আমি ভেরামন্‌ খাই কি না খাই, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। একবার আস্‌তে বলছি—

শ্যামল দুঃখের হাসি হাস্‌চে, শিউলির কথাগুলো তার কাছে তেমন মুখরোচক লাগছেনা কেন-যে, তা সে নিজেই বুঝতে পারছে না। আশ্চর্য্য এই পৃথিবী, শিউলি শ্যামলকে ডাকছে, শ্যামল যাচ্ছেনা ; শ্যামল মঞ্জুলাকে ডাক্‌ছে, মঞ্জুলা আস্‌চে না। কী সমস্যা এই পৃথিবীর, কী রীতি এই দুনিয়ার। দারুণ কড়া রকমের একটা কবিতা লিখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গালাগাল দিতে ইচ্ছে করছে শ্যামলের।

কিন্তু কবিতা লিখে যে-দেশে পেটের ভাত আর পরনের কাপড় জোটানোই দায়, সে-দেশের পৃথিবী কী সাংঘাতিক রকমের কঠিন ও কর্কশ তা বোঝা যায় সহজেই। অতএব এ-পথ প্রশস্ত নয়। শ্যামল বিরত হ'লো।

কাব্য-পথ থেকে সে সরে এলেও, মঞ্জুলার কবিত্বময় অবয়ব, তার বব্‌-কাটা

নিউ থিয়েটার্সের আগামী আকর্ষণ "বিদ্যাপতি"
বিভিন্ন দৃশ্যে ঃ দুর্গাদাস, অমর মল্লিক, দেববালা, অহি সান্যাল, পাহাড়ী, ছায়া, কানন, শৈলেন পাল।

বামে :
নিউ পপুলার পিকচার্সের "ইন্সপেক্টার" ছবিতে রেবার ভূমিকায় শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা।

দক্ষিণে :
"রাজগী"-র একটী দৃশ্যে ধীরাজ ভট্টাচার্য্য ও অরুণা। ছবি : কমলা টকীজ।

হাল্কা কোঁকড়া চুল, তার ঠোঁটের নিখুঁত ভাজ, তার কানের সেই রূপোর লম্বা ঝুমকো, এবং সবার ওপরে তার কথা বলার পরিপাটি ধরণটি শ্যামল ভুলতে পারছে না কিছুতেই। শেলির জীবনে যেমন হ্যারিয়েট, শ্যামলের তেমনি এ। অবশ্য, শ্যামল তাই ভাবে। আরো ভাবে যে : তারা দু'জন—সে ও মঞ্জুলা—এক গভীর রাত্রে চুপি চুপি বেরিয়ে প'ড়েছে। রিম্‌ঝিম্ ক'রে বিষ্টি হ'চ্ছে রাস্তায় দু'জনের মাথায় ছোট্ট একটা ছাতি। সর্ব্বাঙ্গ তাদের ভিজছে, খেয়াল নেই তাদের দু'জনের কোনো দিকে। দূরে ওই রেল-ষ্টেশন, অগুন্তি লাল আলোক সার। একটা ট্রেণ এসে দাঁড়াতেই তারা উঠে ব'সলো। হু হু শব্দে চ'লেছে রেল-গাড়ি। বাচ্চা ষ্টেশনগুলো পিছনে পেছনে স'রে যাচ্ছে। গাড়ী এসে দাঁড়ালো জংশনে। তারা নামলো, রেল-অফিসার এসে ব'ল্লো—টিকিট?

শ্যামল চম্‌কে উঠলো। তা-ও ভালো, তুমি! কি মনে ক'রে? হঠাৎ এই অসময়ে?

সুনীলা সংক্ষেপে ব'ললো—এলাম।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তারপর? ব'সো! কিছু নতুন সংবাদ আছে?

—হু। আমার মন খুব খারাপ।

—কিচ্ছু নতুন নয়। শ্যামল ব'ললো : আমি মন-খারাপ নিয়েই ব'সে আছি। এ বাদে যদি কিছু জানাতে চাও, বলো!

ধূসর চোখে তাকালো সুনীলা। ব'ললো—কি জানাবো বলো!

—যা ইচ্ছে তোমার! উদাস জবাব দিলো শ্যামল।

—বলছিলাম কি, সুনীলা নখ খুটতে খুটতে ব'ললো—চলোনা, পুজোয় কোথাও যাই!

—কোথায় যাবে বলো।

—পাহাড় কিংবা সমুদ্র!

—দু'টোই রাবিশ। ওর একটা পাথর, আরেকটা পাথার। কোনোটাই ভালোবাসি না। শ্যামল বেঁকে বস্‌লো।

সুনীলা একটু ভেবে বললো—তবে চলো জামতারা।

কেন, গিরিডি দোষ করলো কি? শ্যামল হাস্‌লো।

—তাই সই। চলো। সুনীলা প্রায় তৈরী হ'য়ে বস্‌লো যেন।

শ্যামল একটু ভেবে বল্‌লো—আচ্ছা, কাল এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আজ আমাকে ছুটি দাও! আমার কাজ আছে বড্ড। আচ্ছা, উঠি! ওই ফোন্-এ কে আবার ডাকছে।

শ্যামল ব'ললো—কে?

ওপার থেকে—আমি মঞ্জুলা। মত আমার বদলেছে।

শ্যামল পিছন ফিরে তাকালো, সুনীলা তখনো ব'সে অদূরেই। কী ভীষণ বিপদ হল তার, একটা কথা সে বল্‌তে পারছে না

এখন—তার এই মহা আনন্দ অবসরে। তার কানের মধ্যে শব্দ হ'চ্ছে, নানারকম, তার একটা প্রত্যুত্তর দেওয়ার সাধ্য তার নেই! কি বলবে সে? কিছু বলতে গেলে সুনীলা শুনে ফেল্‌বে যে! সুনীলাকে সে যেতে বলবেই বা কেমন ক'রে? কিন্তু আর উপায় নেই! সুনীলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে বললো—আচ্ছা, এসো।

আচ্ছা এসো।

সুনীলা গা মোড়ামুড়ি দিয়ে রওনা হ'লো। এখন এই একা ঘরে সে নির্ব্বিবাদে মনের কথা বলতে পারে। বল্‌লো, মঞ্জুলা, মঞ্জুলা। (উত্তর নেই)। হ্যালো।

নাঃ, বিপদ কম হ'লোনা। মঞ্জুলা ফোন্ ছেড়ে দিয়েছে! দিক্। একটু অপেক্ষা করলো শ্যামল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে শুন্‌তে আরম্ভ করলো অসময়ের সশব্দ পদপাত। মনের মধ্যে গুঞ্জন বেজে চ'লছে মঞ্জুলার। এরি জন্যে শ্যামল জীবনের পল অনুপল দিচ্ছে বিসর্জন। তবু এক-লহমার জন্যেও নিরিবিলিতে সাক্ষাৎ পাচ্ছেনা তার! কি বিপদ হ'লো শ্যামলের! সুনীলা এসে হত্যা ক'রে দিয়ে গেলো তার এই সুবর্ণ সুযোগ! আবার এখনি শিউলি সশরীরে না এসে পড়ে। বলা যায়না, যেমন তার বরাৎ! এখন সে মঞ্জুলাকে আবার ডাক্‌বে ফোনে, সে ভাবছে। যেই ডাক্‌তে যাবে অমনি শিটলি হয়ত এসে পড়বে। মঞ্জুলার সঙ্গে তার খোলাখুলি কথাই হ'তে পারবে না! তবু, শ্যামল চেষ্টা ক'রে দেখতে চায়!

উঠে গিয়ে সে ফোন্ ধরলো, ইয়েস পি-কে ডাব্‌ল্‌সিক্স-ও—নাইন্। কে? মঞ্জু?

ওপার থেকে আওয়াজ এলো : মঞ্জু কই? মঞ্জুলাকে তো খুজে পাওয়া যাচ্ছেনা! এই রাত্তির ক'রে একা একা গেলো কোথায়? আপনি কে?

—আমি? শ্যামল হিমশিম খেয়ে গেলো নিজের পরিচয় দিতে, বল্‌লো—বলবেন, আমি গীতা। টিউটোরিয়াল ক্লাসের টাস্ক্—

কোনো রকমে শ্যামল নিষ্কৃতি পেল। একেবারে হতাশায় ভেঙে পড়লো সে চেয়ারের ওপর। তার স্নায়ু আর উপশিরা যেন ছিঁড়তে আরম্ভ ক'রছে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে। মাথা নিচু ক'রে ব'সে ছিলো, সিড়িতে জুতোর শব্দ শুনেই সে বুঝলো—এসেছে শিউলি! যন্ত্রণার ওপর আবার জ্বালা।

হ্যাঁ জ্বালাই বটে। এ-জ্বালা আবার তার চেয়েও অসহ্য। সম্মুখে এসে উপস্থিত মঞ্জুলা স্বয়ং।

—আস্‌তে ব'ললে, এলাম। এখন কি করবো। মঞ্জুলা স্থিরগলায় বললো।

—ব'সো। সংক্ষেপে ব'ললো শ্যামল।

মঞ্জুলা ব'স্‌লো। শ্যামলের দিকে ঘুরে ব'ললো—কোথায় যাবে বলো! পাহাড় না সমুদ্র।

—দুইই সমান। দুই অপূর্ব্ব। তুমি কোথায় যেতে চাও?

—আমি? মঞ্জুলা ম্লান হাস্‌লো : এখানে থাক্‌বো ব'লেই এলাম। এখন বলো, রাজি আছো?

শ্যামল একটু ভেবে ব'ললো—থাকো। কিন্তু তার আগে—

—কি বলো!

—এই ঘরে এসো।

পাশের ঘরে গিয়ে আলো জ্বাল্‌তেই দেখা গেলো, সুনীলা চুপচাপ ব'সে আছে, তার চোখ দু'টো জ্বল জ্বল ক'রে জ্বলছে। শ্যামল পাথরের মতো স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়ালো। সুনীলা নড়লোনা পর্য্যন্ত। মঞ্জুলাও তার দিকে তাকালো, এবং শ্যামলের হাত ধ'রে টান্‌লো আস্তে ক'রে।

—তুমি যাওনি? শ্যামল সুনীলাকে প্রশ্ন করলো।

—উঁহু। তবে, এখন যাচ্ছি। ও কে?

শ্যামল মঞ্জুলাকে দেখিয়ে ব'ললো—এ? এখনো ঠিক জানি না, কে? তবে দু-একদিনের মধ্যেই একটা সম্বন্ধ ঠিক ক'রে ফেল্‌তে হবে।

—তার মানে?

—চিঠিই পাবে। শ্যামল বললো।

দুর্য্যোগ

(ছোট গল্প)

শ্রীঅমিয় কুমার রায় চৌধুরী

গ্রামটি এমন কিছু বিখ্যাত নয়। নাম ? নিশ্চিন্তপুর কি এ'রকম একটা কিছু হবে। নিশ্চিন্তপুরে সকাল থেকে সেদিন বৃষ্টি পড়তে সুরু হয়েছে। বৃষ্টি —অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। পথ মাঠ ঘাট, ছোট গাছপালা সব জলে ডুবে গেছে। চারধারে শুধু বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ ও ঝড়বাদলের উদ্‌ভ্রান্ত শোঁ শোঁ গর্জ্জন। বাতাসের মধ্যে যেন বরফ মেশানো, ঠাণ্ডা কন কন করছে—বুকের হাঁড় পাঁজরা যেন জমে যেতে চায়। এই দুর্য্যোগে নারাণ মিস্ত্রী একটা ছোট গরুর গাড়ীতে তার স্ত্রীকে নিয়ে চলেছে হাঁসপাতালের দিকে।

প্রচণ্ড বাতাসের ভরে বৃষ্টির ছাট যখন কতগুলো তীক্ষ্ণ শরের মত তার মুখে এসে লাগছে, তখন দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে আসছে, গরুর রাশ পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না। বলদ বেচারীর সমস্ত শক্তি শরীর ভেদ করে, জলের ভেতর দিয়ে তার পাগুলিকে কোন রকমে টেনে নিয়ে চলেছে। অবসন্ন পশু দুটি ধীরে ধীরে জলমগ্ন পথ দিয়ে গাড়ী টেনে চলেছে। গ্রাম থেকে হাসপাতাল প্রায় দশক্রোশ দূরে। যতসময় যাচ্ছে আর মিস্ত্রী ততই ব্যস্ত হয়ে উঠছে আর তাড়াতাড়ি যাবার জন্য থেকে থেকে হ্যাট হ্যাট শব্দ করে চাবুক চালাচ্ছে।

পথে যেতে যেতে সে নিজে নিজেই বকবক করছে—আন্না, আন্নাকালী···অন্নু···আর কেঁদোনা! আর একটু সহ্য কর। এই হাঁসপাতালে পৌছলাম বলে। ডাক্তারবাবু একটা ওষুধের বড়ি দিলেই তোমার অসুখ সেরে যাবে। ডাক্তার বড় ভাল লোক··· আমরা পৌছালেই তিনি ছুটে আসবেন, চেঁচিয়ে বলবেন হয়তো—"আগে আসতে পারনি ? সময় নেই, অসময় নেই, এলেই হোল! হবেনা, ওসব হবেনা, কাল সকালে এসো।······হা শোন্, ওকে—! তোর স্ত্রী ?······আগে বলতে হয়। আচ্ছা বউটাকে কি মেরে ফেলবি নাকি! আয় দেখি।"

তারপর বলদের ল্যাজে একটা মোচড় দিয়ে, তার স্ত্রীর দিকে না তাকিয়েই বলে যেতে লাগল—"আমি বলব, হুজুর, মাইরি বলছি, সকাল বেলাতেই রওনা হয়েছিলাম, কিন্তু ওপরওয়ালার ইচ্ছা অন্য, নইলে এত জলই বা পড়বে কেন ? এমন ভাল একজোড়া ষাঁড় নিয়েও ঠিক সময়ে আসতে পারলাম না। আর হুজুর...এ ষাড়, ষাড় নয়তো—যেন গাধা।" ডাক্তারবাবু তখন নাকের ডগায় চশমা টেনে বলবেন, "একটা ছুতো লেগেই আছে। তোকে চিনতে আর বাকী নেই আমার। কোথায় মদ আর তাড়ি খেয়ে চুড় হয়ে বসেছিলি, আর এখন···;" আমি বলব "বাবু অতটা গোল্লায় যাইনি আজও, স্ত্রীর আমার এত অসুখ···আর আমি কিনা নেশা কোরব ? নেশার উপযুক্ত সময়ই বটে!" আমার কথা শুনে ডাক্তারের মন ভিজবে, তিনি নিশ্চয়ই তোমায় হাসপাতালে ভর্ত্তি করে নেবেন। আমি তখন পাদুটো তাঁর জড়িয়ে ধরে বোলব, "দোহাই হুজুর, আন্নাকে আমার বাঁচিয়ে তুলুন।" তিনি কটমট করে তাকিয়ে বলবেন—"আমার পা না ধরে, একটু মদ যদি কম খাস, স্ত্রীকে যদি একটু···। না, তোদের ধরে—চাবুক লাগান উচিত।"

সত্যি চাবুক কেন ? জুতো খাওয়া উচিত আমায়। ভগবান খুব শাস্তি দিন আমায়। কিন্তু, ডাক্তার বাবু আন্নাকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। মা কালীর দিব্যি, আন্না ভাল হলে, আপনি যা চাইবেন তৈরী করে দেব···এক পয়সাও নেবনা। ...না, জলের ঝাপটায় কিছু দেখতে পাচ্ছি নে, এখন পথ ভুল না করলেই হয়।

নারাণের মনে শান্তি নেই, তাই বকে চলেছে সে আপন মনে। একি কম আপশোষের কথা! এতদিন মদেই সে মত্ত হয়েছিল—তাই সংসারের সুখ, দুঃখ সম্বন্ধে সে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। বিবেক বলে কিছু তো ছিল না তার! আজ চেতনার জাগরণে, নিজের দুর্ব্বলতায় সে অত্যন্ত লজ্জিত নিজের কাছে। ···সেদিনও সে মদ খেয়ে এসে বেমালুম তার স্ত্রীকে গালাগাল দিল, ও অনেক রকমে যন্ত্রণা দিল। এতদিন তার ধারণা ছিল যে, মাতলামী ও প্রহারের মধ্যে দিয়েই স্বামীত্ব ফলাবার একমাত্র পথ। স্ত্রীরা যেন পুরুষের সব নির্ম্মমতা, সব অত্যাচার সইতেই এসেছে দুনিয়াতে। অন্যদিনের মত সেদিনও আন্না, সব অত্যাচারই সয়েছিল নীরবে, কিন্তু তার দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে একটা মূক ঘৃণা ও কঠোরতার আভাষ ফুটে বেরিয়েছিল। আন্নার সমস্ত শরীর ঠক ঠক করে কেঁপে উঠল······সে মেজের উপর সশব্দে আছড়ে পড়ল। সব যেন তাল গোল পাকিয়ে গেল নারাণের, সত্যিই সে ভয় পেয়ে

গেল······আন্না যদি না বাঁচে!···ওঃ আন্নার সে দৃষ্টি নারাণ ভুলতে পারবে না। সারারাত নারাণ স্ত্রীকে কোলে নিয়ে বসে রইল, অয়োস্তপ্ত, অচৈতন্ত মাথাটিতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। ভোরের আভাষের সঙ্গে, আন্নার বুঝি একটু জ্ঞান ফিরে এল। বেদনাতুর ডাগর চোখ দুটো তুলে সে তাকাল স্বামীর পানে—এ দৃষ্টির মাঝে নেই রাত্রের সেই কঠিনতা, বরং একটু আর্দ্রভাবই আছে। নারাণ অবাক হয়ে গেল—মেয়েরা কত ভাল, কত মহৎ; তারা পুরুষের সব দোষ ক্ষমা করে······বদলে তারা চায় একটু ভালবাসা, একটু ভাল ব্যবহার; কিন্তু পুরুষ কত নিষ্ঠুর, তারা মেয়েদের উপর প্রভুত্বই করতে চায়, তাদের ভালবাসতে জানেনা পুরুষ, তাদের যে মানুষের মত অধিকার আছে বাঁচবার ও জীবনকে উপভোগ করবার, তা' পুরুষ দিতে চায় না। তারা যে পরিমাণে ভালবাসে পুরুষকে, পুরুষ তার কতটুকু ফিরিয়ে দেয়! নারাণের চোখে জল।

পরদিন প্রাতেই সে গাড়ীজুতে স্ত্রীকে নিয়ে হাঁসপাতালে চল্ল। নারাণের বড় আশা, এবার অন্ততঃ ভগবান ক্ষমা করবেন, তার স্ত্রীকে আবার ফিরিয়ে দেবেন—তারপর নারাণ আর মদ খাবে না, আর আন্নার গায়ে হাত তুলবে না। আজ হঠাৎ নারাণ আবিস্কার কোরল যে আন্নাকে সে বড় বেশীরকম ভালবাসে—তাই আন্নাকে না হলে তার চলেনা। এপর্য্যন্ত তার স্ত্রীর প্রতি যত দুর্ব্যবহার করেছে সমস্ত মনে হয়ে, তাকে অনুতাপে দগ্ধ করতে লাগল।

অস্পষ্ট ভাষায় সে বল্ল—শোন, আন্না, ডাক্তার যদি তোমায় জিজ্ঞেস করে আমি তোমার প্রতি অত্যাচার করি কিনা, তাহলে তুমি উত্তর দিও, না কখনও না। সত্যি বলছি আন্না······তোমার গা ছুয়ে প্রতিজ্ঞা করছি ভবিষ্যতে আর তোমায় কষ্ট দেব না। অনেকবার তো তুমি ক্ষমা করেছ আমায়···এবারও মাপ কর। দেখ কত যত্ন করে তোমায় হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি ···এতেও বিশ্বাস হয় না! উঃ, কি মুষলধারে বৃষ্টি! আন্না, উত্তর দিচ্ছনা কেন? না, বড় ঝড় আমরা পথ ভুল যেন না করি।

"তোমার বুকের সে ব্যথাটা এখনও আছে, বড় কষ্ট না? আচ্ছা আমি কি নিষ্ঠুর! আন্না, কথা বলছ না যে!"

হঠাৎ তার স্ত্রীর বরফের মত ঠাণ্ডা অঙ্গে হাত দিয়েই সে চমকে উঠল। আবার সে বলতে লাগল—"রাগ করেছ বুঝি, ক্ষমা বুঝি আর করবে না? ওরকম ভাবে মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে কেন? সমস্ত দেহ অত আড়ষ্ট কেন? মুখ একেবারে ফ্যাকাশে কেন?"

তারপর সে রাগ করে স্ত্রীকে বল্ল—আমি নয় নিষ্ঠুর, আমি নয় পশু, তাবলে তুমি কি রকম মেয়ে, এত কথা বলছি···আর তুমি একটা উত্তর দেওয়াও দরকার মনে করলে না? তুমিও তো কম নিষ্ঠুর নও!

স্ত্রীর নিস্তব্ধ ভাব দেখে তার ভয় হোল। হাতের রশি ছেড়ে দিল সে। তারপর পিছন না ফিরেই মিস্ত্রী তার স্ত্রীর গায়ে হাত দিল। তুষার শীতল হাতখানিতে হাত দিতেই, সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো, "নেই, আন্না নেই, বোধহয় মরে গেছে। আমিই কি ওকে মেরে ফেল্লাম!" নারাণ মিস্ত্রী কেদে ফেল্ল।

দুঃখের চেয়ে রাগ হোল নারাণের বেশী, ভগবানের অবিচারে। দুঃখের মধ্যে সে আজ নিজেকে ফিরে পেয়েছিল, ফিরে পেয়েছিল তার চেতনাকে। আন্নার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবার—তাকে প্রাণভরে ভালবাসবার আগেই সে চলে গেল!

তাদের বিবাহিত জীবনের সুদীর্ঘ ত্রিশটা বছর কেটে গেলেও, এই সময়টা তার ধোঁয়ার মত মনে হতে লাগলো অস্পষ্ট। এই তো সেদিনের কথা···যেদিন প্রথম আন্নাকে সে ঘরে এনেছিল।...কিন্তু মদ, দারিদ্র্য ও কলহের মাঝে জীবনকে উপভোগ করার সুযোগ তার হয় নি। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা কেউ বোঝেনা। আশ্চর্য্যের
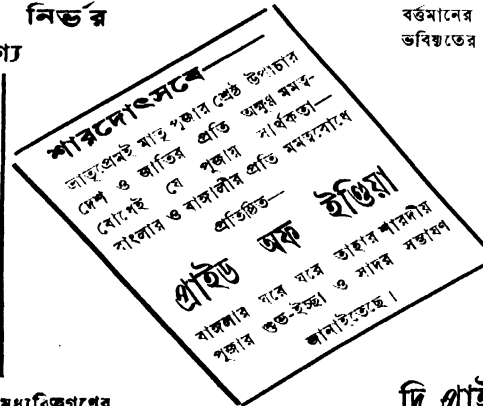
রীতেনের আগামী আকর্ষণাবলী

বাঙ্‌লার নর-নারীর পূত চরিত কথা

শ্রীকৃষ্ণ জন্ম

শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমাবেশে

*

রবীন্দ্রনাথের

চোখের বালি

সম্ভ্রান্ত শিল্পী সমাবেশে

*

শচীন্দ্রনাথের হাসির নক্সা

সার্ব্বজনীন বিবাহোৎসব

শ্রেষ্ঠ তারকা সমন্বয়ে

হাসি-কান্নার অপূর্ব্ব সমাবেশ

কালী ফিল্মসের

পরশুরাম বিরচিত

কচি-সংসদ

হাস্যরসের নির্ঝরিণী

পরিচালক—জ্যোতিষ মুখার্জ্জি

ভূমিকায়: ললিত মিত্র, ঊষা দেবী, প্রফুল্ল মুখার্জ্জি, চিত্রা দেবী, গীতা ব্যানার্জ্জি, সত্যব্রত রায়, চাঁদু প্রভৃতি।

পূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!
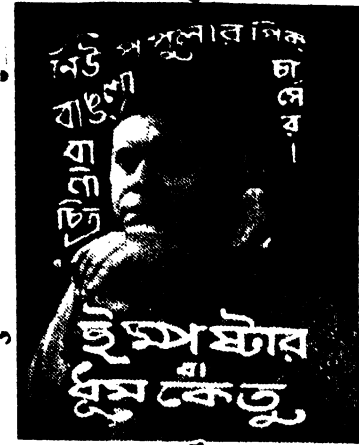
"শ্রী" চিত্রগৃহে চলিতেছে

*

বসন্ত কুমার চ্যাটার্জ্জির

অভিনব পৌরাণিক কাহিনী

কৈ কে য়ী

অপরাজেয় শিল্পী সম্মেলনে

*

আর একখানি হাসির হর্‌রা

সুবোধ রায়ের

মালা-বদল

ভূমিকায়—দেববালা, প্রফুল্ল, সাবিত্রী, অর্দ্ধেন্দু, জয়নারায়ণ প্রভৃতি।

পরিচালক—জ্যোতিষ মুখার্জ্জী

: পরিবেশক :

রীতেন এণ্ড কোং

টেলিফোন কাল ১০৯২ ও ১০৯৩

টেলিগ্রাম ফিল্মসার্ভ

৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিষয় এই যে, জীবনের যে মুহূর্ত্তে নারাণের মন স্বীকার করে নিল যে স্ত্রীর প্রতি কোন কর্ত্তব্যই তার করা হয়নি, স্ত্রীর কাছে সে কত বিষয়ে অপরাধী, আর আন্নাকে না হলে তার জীবনের একদিনও চলবে না, ঠিক সেই সময়ে আন্না তাকে ফেলে চলে গেল। তার মনে পড়ল যে তার উদাসীনতার জন্ম তার স্ত্রীকে ভিক্ষা পর্য্যন্ত করতে হয়েছে দ্বারে দ্বারে...... কতদিন আন্নার অনাহারে কেটেছে। আজ তার মনে হোল, আন্না যদি আর দশটা বছর অন্ততঃ বাঁচতো! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, সে ভাবল—আমি বড় হতভাগা, নইলে...।

"হা ভগবান, আচ্ছা আমি চলেছি কোথায়? এখন তো আর তাকে নাবিয়ে তোলবার প্রয়োজন নেই, এখন যে ফিরতে হবে।—" এই বলে সে গরুর গাড়ীর রাশ টেনে তাকে ফিরিয়ে কষে চাবুক লাগাল বলদ দুটোকে।

পথ ক্রমশই দুর্গম হয়ে উঠেছে—ভাল করে দেখা যাচ্ছেনা;—কখন বা গাড়ীটা পথের বাঁকের বটগাছে ধাক্কা খাচ্ছে। একটা ধূপছায়ার মত আকাশে ঘূর্ণি হাওয়া, জোলো বাতাসে দৃষ্টি ঘোলাটে কোরে তোলে...কিছুই ঠাহর পাচ্ছেনা সে।

মনে পড়ল তার...সেই ত্রিশ বছর আগেকার কথা। আন্না তখন অবস্থাপন্ন ঘরের দুলালী, তন্বী কিশোরী।...নারাণের মত সুনিপুণ কারিগর সে অঞ্চলে ছিলনা, সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিবার মত উপায় ও যোগ্যতা তার ছিল; কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই সে মদের ভক্ত হয়ে উঠল—তারপরেই পতনের সূত্রপাত। কাজ না করলে ভালভাবে, খরিদ্দার আসবে কেন? ...তাদের বিয়ের দিনএর কথা তার মনে আছে...কিন্তু এর মাঝে এতগুলো বছরে মাতলামী করা ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছু সে স্মরণ করতে পারল না।

সন্ধ্যা এল নেমে, ক্রমে পাতলা থেকে ঘন হোল অন্ধকার; বাতাস যেন আরও ক্ষেপে উঠল, ঠাণ্ডা, চঞ্চল, উদ্‌ভ্রান্ত। নারাণ ভাবতে লাগল, "যদি আবার—জীবনটা নতুন করে সুরু করতে পারতাম! নতুন যন্ত্রপাতি কিনে, খুব মিহি কাজ করে খরিদ্দারের মন জোগাতে তার মত সুনিপুণ কারিকরের কয়দিন লাগে?" টাকা? টাকা তো তার কাছে আসবার জন্ম লাফালাফি করেছে, সে নিজেই কুড়িয়ে নেয় নি। নিজের যোগ্যতায় তার অসীম বিশ্বাস...সে যদি আবার টাকা রোজগার কোরে স্ত্রীর হাতে দিতে পারতো! না...সে আর ভাবতে পারেনা।

রাশ ছেড়ে দিল সে, অনেক চেষ্টা করেও রশি হাতে রাখতে পারল না, ভাবল,—"বলদ দুটো পথ ঘাট চেনে, ঠিক পথেই যাবে। এখন একটু ঘুম লাগাই।...তারপর সৎকারের প্রয়োজন।"—নারাণ একটি হাই তুলল।

দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল, চোখের পাতা ভার বুজে এল, নারাণ একেবারে এলিয়ে পড়ল। একটু পরে মনে হোল গাড়িটা যেন কোথায় থামল। কোথায় এল দেখবার জন্ত সে গাড়ীথেকে বেরুবার চেষ্টা করল। কিন্তু একটা তন্দ্রাজড়িত শিথিল জড়তা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল—নিশ্চিন্ত হয়ে সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম ভাঙার পর। একটা মস্তবড় ঘর—জানালার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রোদ তার মুখের উপর এসে পড়েছে আর চারধারে কতগুলো উন্মুখ দৃষ্টি। তাদের সম্বোধন করে সে বলে উঠল—ভাই সব শেষ কাজ কর—ভটচাযকে খবর দাও। সমবেত সকলে বলে উঠল—"ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি শুয়ে থাক।"

সামনে ডাক্তার বাবুকে দেখে নারাণ লাফিয়ে উঠে কৃতজ্ঞতা জানাতে চেষ্টা কোরল...কিন্তু একি হাত পা গেল কোথায়, সব যেন অসাড় হয়ে গেছে।

"পঞ্চাশ বছর বেঁচেছি···বড় কম নয়। ভগবান যে এতদিন পরমাই দিছলেন, তা তাঁর দয়া। মাপ কর দয়াময়, মাপ কর তোমরা সকলে···! কিন্তু, কিন্তু আর একটা মাস যে বাঁচা দরকার আমার।··· আমার স্ত্রী···আমার আত্মার শেষ কাজ যে করা হয়নি। আত্মা···শোন ক্ষমা কর... আমি, আমি বড় পাপী ডাক্তার বাবু··· আমার স্ত্রী তার দেহের মধ্যে আমারই সন্তানকে বড় করে তুলছিল···আমি... আমি···উঃ...বড় লেগেছে, না আত্মা... আমি তোমায় মেরে ফেলতে চাইনি আমি তোমায়...ভাল···বা···ডাক্তার বাবু একটা লাঠি তৈরী করে দেব তোমায় তু—উ—মি···ই—ই···।

ডাক্তার নাড়ী দেখলেন, গম্ভীর হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সব শেষ।

বেকার

শ্রীঅরুণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সকাল বেলায়
পেয়েছি বাড়ীর চিঠি—
টাকা না পাঠালে ওঠে না উনোনে হাঁড়ি
কথাটা সত্যি,—কিন্তু কী করি বল?
অফিস দোরে হানা দিয়ে দিয়ে রোজ,
এলবার্ট সু'র গোড়ালী গিয়ে ক্ষোয়ে,
রঙ বেরঙের পাঁচটা পড়েছে তালি—
গোটা তিন চার লাগাতে হবে আরো
হায় ঠনঠনে, হায় রে ন্যাঙটা কালী
নিত্য তোমারে সেলাম ঠুকিয়া যাই
চাকরী চাকরী একান্ত প্রার্থনা
পাষাণ কর্ণে পশে নাক বুঝি আর—
তার চেয়ে মাগো এক কাজ কর তুমি
সেই ভাল হবে—তোমার হাতের খাঁড়া
ফাঁড়ার মতন পড়ুক আসিয়া ঘাড়ে।

—•(•)•(•)•—

বাংলার বর্ত্তমান সমস্যা

শ্রীইন্দিরা দেবী

বাংলা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার গতি যে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি লাভ না করে অধোগতি লাভ করছে—তা সহজেই অনুমান করা যায়। বাংলা দেশের জল, মাটী আর বাতাস পেয়ে যারা প্রাণধারণ করছে, তাদের মানুষের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার সঙ্গতি নষ্ট, কোন রকম দু'বেলা দু'মুঠো অথবা কোন রকমে বেঁচে থেকে জরাজীর্ণ-ভাবে পাপক্ষয় ক'রে যাচ্ছে—সাধারণভাবে একথাটা বলা চলে নিঃসঙ্কোচে। মুষ্টিমেয় ধনীক ও আভিজাত্য সম্প্রদায়ের কথা ছেড়ে দিলে মোটামুটীভাবে বাংলা দেশের অধিবাসীদের পক্ষে জীবন ধারণ করাটা বা বেঁচে থাকাটা একটা প্রবল সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। বাংলা দেশের উপর যাদের জন্মগত অধিকার মাতৃভূমি হিসাবে, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রাণ যাত্রার অহরহ বেঁচে থাকার দ্বন্দ্বের ভিতর তারাই পেছিয়ে পড়ছে—এর কারণ কি? এ দোষ কাদের?

বাংলা দেশে বাস করে দেশের বা দশের উন্নতি করা দূরে থাক—নিজের পরিবার প্রতিপালন করা যখন একটা ভয়ঙ্কর রকমের দুরূহ ব্যাপার বলে আজকাল পরিগণিত হচ্ছে—সেজন্য যুবকেরা বিবাহের দায়িত্বকে ঘাড় পেতে নিতে সহজে রাজী হয় না—অধিক বয়সে নিজেকে এই ভার বহনের উপযুক্ত ও সক্ষম মনে না করা পর্য্যন্ত তারা বিবাহের নামে পিছিয়ে পড়ে, ভয় পায়—এই ভয় পাওয়া বা পিছিয়ে পড়ার পিছনে অন্য বহু, বহু কারণ বর্ত্তমান থাকলেও বর্ত্তমান অর্থহীনতা এর প্রধানতম ও অন্যতম কারণ বলে আমার মনে হয়।

একটা জিনিষ আমার খুব চোখে লাগে—যখন দেখি বাংলার বাইরে থেকে দলে দলে শোভাযাত্রা করে চলেছে বাংলা দিকে, দু'হাতে তারা বাংলা থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে—আমাদের চোখের সামনে অথচ আমরা সকরুণভাবে তাদের সেই বিরাট শোভাযাত্রার দিকে তাকিয়ে আছি, তাকিয়ে আছি তাদের বিজয় কেতনের দিকে—বিস্ময়ের হতাশার অবসাদের দৃষ্টি নিয়ে, যদি কখনও সুযোগ মেলে, যদি কখনও তাদের অনুগ্রহ দৃষ্টির কোমল ছায়াতলে নিজেদের নিক্ষেপ করতে পারি হয়তো তাদের কৃপাপ্রসাদ লাভ করে তাদের বিজয় কেতন বহন করবার মর্য্যাদা লাভ ক'রে আমরা ধন্য হই, গৌরব অনুভব করি। তাদের কোলাহল মুখর বিরাট শোভাযাত্রার পিছনে চলে আমাদের মূক অভিনয়। অথচ ঘরে আমাদের ছেলে মেয়েরা ভাল করে খেতে পায় না, পূজা আসছে তাদের এসময় একটু আনন্দ দেবার সামর্থ ও অধিকার নেই। তারা ভাল করে শিক্ষা পায় না, মানসিক ও দৈহিক পুষ্টি সাধনের মতো ঘরে আমাদের কোন রসদ নেই, তাদের মা'র রান্নাঘরের অন্ধকারের ভিতর জীবন কেটে যায়—জীবনে ভাল করে দেখবার জানবার ও শোনবার সুখ থেকে আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত—বঞ্চিত করি আমরা তাদের আমাদের অসামর্থের জন্য।

এমনিভাবে নিতান্ত অবজ্ঞার ভিতর, অনাদরের ভিতর, অশ্রদ্ধার ভিতর ও কুশিক্ষার ভিতর অভাব, নিরাশার ভিতর আমাদের জীবন—আমাদের ছেলে মেয়েদের জীবন বেয়ে চলে—এজন্য দায়ী কে? দোষ কার?

অথচ আরো দুঃখের ও ক্ষোভের বিষয় আমাদের মুষ্টিমেয় সংখ্যায় অবস্থা সাধারণ শ্রেণী থেকে শুধু আর্থিক অবস্থার দিক দিয়ে একটু উন্নত বলেই বিলাস ব্যসনের ঢেউ বয়ে চলেছে আমাদের সাধারণ শ্রেণীর অসহ দুঃখের, অভাবের ও ব্যর্থতার উপর দিয়ে। তাঁদের দৃষ্টি নিজেদের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতর ঘুরে ঘুরে মরে, সীমাকে অতিক্রম করে অসীমের দিকে নিজেদের এগিয়ে অপরের দিকে দৃষ্টি দেবার মত মন তাঁদের নেই, সময় তাঁদের নেই। নেপালী না হলে তাঁদের ইজ্জত রক্ষা করবে কে? অবাঙ্গালী না হলে তাদের ভৃত্যের কাজ করার মত মানুষ খুজে পাওয়া, অবাঙ্গালী দোকান হতে জিনিষপত্র না কিনলে তাঁদের জীবনযাত্রা দুরূহ হ'য়ে উঠে—এই যে ভেদবুদ্ধি এক বাঙ্গালীকে অন্য বাঙ্গালী থেকে পৃথক করে রেখেছে, অনুন্নত করে রেখেছে—অপরিচিত অনাত্মীয় ও 'হরিজন' শ্রেণীভুক্ত ক'রে রেখেছে। সেজন্য অবাঙ্গালী আমাদের মন টানে বেশী। পাশাপাশি দোকান থাকলেও অবাঙ্গালীই আমাদের ভাণ্ডারী হ'য়ে উঠে—শোভাযাত্রা বেড়ে চলে—আমরা হাহুতাশ করে মরি।

জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে, ব্যবসা ক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে পেছিয়ে পড়েছে—এর অন্যতম কারণ হলো এই—বাংলাদেশের উপর, বাংলার শিল্পের উপর,

জীবন গাঙ্গুলী

কালী ফিল্মসের পৌরাণিক চিত্র "শ্রীকৃষ্ণ জন্মে" 'কংসে'র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবিখানি উঠছে প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর নিজ তত্ত্বাবধানে।

বাঙ্গালীর ব্যবসায় উপর, বাংলার অধিবাসীদের বাংলার আভিজাত্য ও ধনীক সম্প্রদায়ের কোন সহানুভূতি নেই, মমতা নেই ; দায়িত্ব নেই। সেজন্য বাংলার শিল্প মরছে, শিল্পি মরছে, বাংলার ব্যবসা মরছে—অপর দেশের অধিবাসী এসে জয় করছে বাংলাকে, তার শিল্পকে—ব্যবসার উপর দিয়ে সুরু করেছে নিজেদের বিজয় অভিযান! আমরা শুধু মূক হয়ে আছি, ব্যথা, বেদনায়, অভাবে আমাদের দৈহিক, মানসিক জীবনের অপমৃত্যু ঘটছে।

বাংলা মরছে—বাঙ্গালী আজ ধ্বংসের পথে—অন্ততঃ ব্যবসা ... দিক দিয়ে। ...চন্দ্রের সেই উক্তি "বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী রক্ষা না করিলে আর কে করিবে ?"

যে বাণীর প্রতিধ্বনির কথামত সে বাণী শোনবার মত মানুষ কই ?

এমনি দু'টী বিভিন্ন সুর দু'টী বিভিন্ন ধারার ভিতর দিয়ে আমাদের দেশের জীবন বয়ে চলেছে, এমনি অসামঞ্জস্যর ভিতর দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে উঠে—আমাদেরই ঘৃণ্য অপদার্থ জীবনের পুনরাবৃত্তি ক'রে যাচ্ছে।

বর্ত্তমানের এই অর্থনৈতিক অবস্থার ভিতর বাংলাদেশের মেয়েদের কি করবার আছে ? বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ করে বাংলাদেশের এই চরম পরিণতির ভিতর বর্ত্তমান বাস্তব জীবনে বহু বহু সমস্যার উদ্ভব হয়ে আমাদের জীবন ...াকে আরো দুরূহ করে তুলেছে। বর্ত্তমান শিক্ষা বাস্তব জীবনের দিক দিয়ে বিশেষ কার্য্যকরী নয় বা হয়না। বছরের পর বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয় যেসব কল্পনা বিলাসী শিক্ষিত যুবকদের প্রসব করছেন—বাস্তবক্ষেত্রে তারা পড়ছে পিছিয়ে—শিক্ষা তাদের অসার হয়ে পড়ছে। এই তথাকথিত শিক্ষার উদ্দেশ্য খুব উচ্চ ও সৎ হলেও আমাদের বাস্তব জীবনযাত্রার ভিতর এশিক্ষা খুব কার্য্যকরী হ'য়ে উঠছে না, আমাদের দুর্ভাগ্য বলতে হবে—তখন আর উপায় না দেখে ব্যবসায়ে ও অফিসে শিক্ষানবিশি ও চাকরী করা ছাড়া আমাদের আর অন্য কোনও উপায় বা পথ থাকে না জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করার জন্য। কিন্তু সেখানেও যখন স্থানাভাব ঘটতে থাকে তখন আর কি করা যায় ? এই হয়েছে শিক্ষিত বেকারদের অবস্থা। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরোক্ষভাবে বেকার সমস্যার স্রোত আরো প্রবল ও চঞ্চল করে তুলছে। এমন অবস্থায় মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে কি হবে—শিক্ষিতা হয়ে মেয়েরা করবে কি ? এ প্রশ্ন অনেক অভিভাবক ও বহু, বহু শিক্ষিতা মেয়েদের একটা প্রবল চিন্তার কারণ হয়ে দাড়িয়েছে! বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষাব্যাপারে সে সব বিধি নিষেধ ও

ধারা ও ক্যারিকোরাম নির্দ্দিষ্ট ছিল—বর্ত্তমানে তা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়েও মেয়েদের বিশেষ কিছু উপকারে আসে না। বর্ত্তমান শিক্ষার এমন কতকগুলো বিধি নিয়ম আছে যা মেয়েদের স্বাস্থ্যের মোটেই পরিপন্থী নয়। আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের শোচনীয় স্বাস্থ্য আমাদের বার বার সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মেয়েদের শিক্ষাব্যাপারে আমরা মোটেই বিরুদ্ধবাদী নই—বরং তাদের জয়যাত্রার পিছনে থাকবে আমাদের স্নেহশুভেচ্ছা ও ভালবাসা। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির ধারার মাঝে আমাদের সৌন্দর্য্যের, স্বাস্থ্যের ও সুর বহাতে চাই যাতে করে মেয়েদের জীবন সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠে—এরা যখন 'মা' হয়ে উঠবেন—এদের ভিতর দিয়ে যাদের শুভাগমন ঘটবে—তারা তাদের সঙ্গে বহন করে আনবে শুভাশীষ জাতির ও দেশের জন্য!

শিক্ষার ভিতর বা শিক্ষার নামে যে একটা আত্মস্ফীতির ভাব আসে বা আছে তা অনেক সময় মেয়েদের পারিবারিক জীবনকে নষ্ট করে ফেলে শিক্ষার নামে—যদি গর্ব্বের সঞ্চার হয়—তাতে করে সংসারের সৌন্দর্য্য থাকে না—থাকেনা একটা সহজ সুন্দর সুর।

শিক্ষার এই অহেতুক আত্মস্ফীতির দ্বারা শুধু মেয়েদের জীবন সুর ক্ষুণ্ণ হয়, তা নয়—সংসার শ্মাশন হয়ে উঠে।

বর্ত্তমানে শিক্ষিত যুবকদের অবস্থা যখন শোচনীয়—তখন শিক্ষিতা মেয়েদের অবস্থা কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষকতা, নার্সের কাজ, গভর্ণনেস, ইনসিওরেন্সএর এজেণ্ট, ডাক্তারী, টাইপিষ্ট, ওকালতি বড়জোর ব্যারীষ্টারী। একট্রেস মেয়েরা করতে পারে আর করছেও—কিন্তু তারপর! যখন আর কোন পথ থাকবে না তখন অফিসের পুরুষদের স্থলে মেয়েদের

নিয়োজিত করা যেতে পারে—কিন্তু তাতে করে অবস্থার অবনতি ছাড়া উন্নতি ঘটবে না। বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

শিক্ষা সমস্যা মেয়েদের এই শোচনীয় পরিণতির ভিতর এনে ফেলেছে! এর সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে চলেছে বিবাহ সমস্যা!

অভিভাবকদের পায়ের কড়ি খরচ করে, কর্জ্জ করেও মেয়েদের বিবাহের ব্যাপার ক্রমশঃ মূক হয়ে অবস্থা ধারণ করছে, শিক্ষিতা হলেও আমাদের ও 'চোকেনা' ঘর তেমনিই আছে, আগেকার চেয়ে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেনি—পণ প্রথার স্রোত তেমনিভাবে জোয়ারে বয়ে চলেছে—সেজন্য বাংলাদেশে 'স্নেহলতা'র অভাব আজও হয় না—বিপন্ন দুস্থ অভিভাবক ও পিতামাতাকে মর্ম্মান্তিক চিন্তার দায় থেকে অব্যাহতি দেয়—আপনাদের বিসর্জ্জন দেয়—অগ্নি দেবতাকে অথবা গঙ্গার বা নদীর গভীর শীতল জলে নিজেদের অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন জীবনের দেনা মিটিয়ে! কখনও কখনও দু' একটা জায়গায় বিনাপণে বিবাহের কথা আমাদের কানে আসে যেগুলোর যোগাযোগ ঘটে—ধনী ও আভিজাত্য সম্প্রদায়ের ভিতর। কিন্তু এই পণহীন বিবাহের ভিতর মনুষ্যত্বের জ্যোতির্ম্ময় সুর নেই—আছে নামের মোহ—সংবাদপত্রে, বড়, বড় হরফে বিনাপণে বিবাহের বিরাট আড়ম্বরময় সংবাদের জন্য। মহৎ ও ত্যাগী মানুষ আমাদের দেশে বিরল—একথা বলি না—তবে সাধারণের মনোবৃত্তি এই রকম! এমনই মনোবৃত্তি আমাদের সমাজ জীবনের অনেকখানি ক্ষতি করছে—যুগের ধারা পরিবর্ত্তিত হলেও এর কোনও পরিবর্ত্তন আজও এলো না—এ সমস্যা দূর করে কে—এদিক দিয়েও জাতি পঙ্গু হয়ে পড়ছে দিন দিন।

তারপর দিনের পরদিন একটা সমস্যা প্রবল আকার ধারণ করছে এবং এর স্রোত যে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে তা শ্রীভগবানই জানেন। এই লজ্জাস্কর পরিণতি থেকে আমাদের রক্ষা করবে কে? বাংলাদেশে নারীহরণ প্রভৃতি যেসব ঘৃণিত পাপকার্য্যের স্রোত অবাধিতভাবে বয়ে চলেছে সেকথা ভাবতেও লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে আমাদের মাথা নত হয়ে পড়ে। এটা অনেকটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটা আনুসঙ্গিক ব্যাপারের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে—এজন্য আমরা আর মাথা ঘামাইনা, ভাবিনা, চিন্তা করিনা,—জাতির মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরেছে—তাই প্রতিবাদ করবার মত, প্রতিকার করবার মত কেউ নেই। এ পাপ, অত্যাচারিতা নারীর অশ্রুজল ও দীর্ঘশ্বাস জাতির জীবনের মূলে একটু একটু জমা হচ্ছে—কালে এ পাপ ও অভিশাপে সমগ্রজাত সারা দেশ ছারখারে যাবে—যদি এই পাপ অবিলম্বে দমিত না হয়—এর গতিবেগ অবিলম্বে রোধ না করলে অচীরে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটবে!

আমাদের চোখের উপর দিয়ে যখন এ নারকীয় কাণ্ড চলে তখন আমরা একটু হৈ, হৈ একটু চীৎকার একটু প্রতিবাদ করে—পাশ ফিরে সুখ নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়ি। মেয়েদের রক্ষার নামে আজকাল বাংলাদেশে একটা ব্যবসার গোড়াপত্তন ঘটেছে। অত্যাচারিতা ও নিগৃহীতা মেয়েদের রক্ষার নামের অন্তরালে নারী কেনাবেচা চলে এবং বাংলাদেশে এমন অনেক অনেক সমিতি আছে যাদের নারীরক্ষার বিরাট ভণ্ডামীর পিছনে কেমন নিঃশব্দে কেমন সুন্দরভাবে বাংলাদেশের মেয়েদের বাংলার বাহিরে রপ্তানী করা হয়—এও বাংলাদেশের পরম লজ্জাস্কর লাভজনক একটা ব্যবসা—বাংলার এই ঘৃণ্য লজ্জাস্কর আবহাওয়া থেকে বাংলার নারীকে রক্ষা করবে কে? এসমস্যা আজ প্রবল হয়ে উঠেছে আমাদের জীবন যাত্রার ভিতরে।

আসব নাক ভুলে

শামসুদ্দীন্

আর কখনো তোমার পথে
আস্‌ব নাক ভুলে,
তোমার কথা রইল লেখা
আমার চিত্ত-কূলে।
রাতের শিশির প্রভাত বেলায়
মিলিয়ে গেল আলোর বিভায়;
ঝরা-কুসুম ফিরবে না আর
শুষ্ক শাখার মূলে॥
কোন্ আঁধারে মনের বনে
শুধু লীলার ভরে,
ফুটেছিল গোলাব-কলি
চিত্ত-বালুর চরে।
সে কথা হায় রইল আঁকা
মনের পটে রক্ত-মাখা;
স্মৃতির রেখা লুপ্ত হবে
মৃত্যু নদীর কূলে॥

এভাবে বাংলাদেশ, বাংলার সংসার, বাংলার সমাজ ও বাংলার সাধারণ অধিবাসীরা বিভিন্ন দিক থেকে ঘা খেয়ে আহত হয়ে অমর্য্যাদা, অপমান, অভাব সয়ে সয়ে এত পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে যে আরও পশ্চাৎগমন করা মানে—মৃত্যু—প্রত্যেক দিক দিয়ে। পিছনে অসম্ভব অথচ সামনে এগিয়ে যাওয়ার মত আমাদের সামর্থ নেই, নিস্তার নেই। এদিক দিয়ে অচীরে এ ঘৃণ্য আবহাওয়ার একটা পরিবর্ত্তন না এলে বাংলার অবস্থা যে কী হয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মরছে অভাবে ও নিরাশায়, নারীরা মরছে অমর্য্যাদা ও নিগৃহীতা হয়ে, ধনী ও আভিজাত্য সম্প্রদায় ডুবে মরছে বিলাসব্যসনে, ছেলেমেয়েরা মরছে অভাব, কুশিক্ষায় আর অনাদরে। বাংলাদেশ বাঁচবে কি করে······আমাদের বাঁচাবে কে?